প্রবাসী—১৩৩৩, বৈশাখ হইতে আশ্বিন

২৬শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

ক্যালাক দোষ

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ ১ম খণ্ড	বৈশাখ, ১৩৩৩	১ম সংখ্যা

আশীর্ব্বাদ ও স্বস্তিবাচন

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

প্রবাসী

পরবাসী চ'লে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণভরে।
বারে বারে শুভদিন
ফিরে গেল অর্থহীন,
চেয়ে আছে সবে তোমা তরে,
ফিরে এসো ঘরে ॥

আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
বন ভরা ফুলে ফলে,
এসো, এসো, লহ তুলে,
উঠে ডাক মর্ম্মরে মর্ম্মরে।

কোথা যাবে সে কি জানা নেই?
যেথা আছো ঘর সেখানেই।
মন যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহছাড়া,
পরবাসী বাহিরে অন্তরে।

আঙিনায় আঁকা আলিপনা,
আঁখি তব চেয়ে দেখিল না।
মিলন-ঘরের বাতি
জ্বলে অনিমেষ-ভাতি
সারারাতি জানালার পরে

ফসলে ঢাকিয়া যায় মাটি,
তুমি কি লবে না তাহা কাটি'?
ওই দেখো কতবার
হ'লো খেয়া পারাপার,
সারি গান উঠিল অম্বরে।

বাঁশি প'ড়ে আছে তরুমূলে,
আজ তুমি আছো তারে ভুলে।
কোনোখানে সুর নাই,
আপন ভুবনে তাই
কাছে থেকে আছো দূরান্তরে।

এসো এসো মাটির উৎসবে,
দক্ষিণ বায়ুর বেণুরবে।
পাখীর প্রভাতীগানে,
এসো এসো পুণ্যস্নানে
আলোকের অমৃত নির্ঝরে।

ফিরে এসো তুমি উদাসীন,
ফিরে এসো তুমি দিশাহীন।
প্রিয়েরে বরিতে হবে,
বরমাল্য আনো তবে,
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে।

দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে,
বীর তুমি বক্ষে লহ তারে।
পথের কণ্টক দলি'
ক্ষত পদে এসো চলি'
ঝটিকার মেঘমন্দ্রস্বরে।

বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে, তবে
ঘর তব আপনার হবে।
তুফান তুলিবে কূলে,
কাঁটাও ভরিবে ফুলে,
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

[শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু—

আশীর্ব্বাদ

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদকবরেষু

তোমার সম্পাদিত প্রবাসী এবার ষড়্‌বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। এই উপলক্ষ্যে আমার শুভ আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, ভয়কে জয় করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। শিষ্যের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নাই। তোমার গৌরবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গের বাহিরে সুদূর এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনে করিয়াছিলাম, প্রবাস হইতে প্রকাশিত হইল বলিয়াই বোধ হয় পত্রিকাখানির নামকরণ হইল প্রবাসী। পরে জানিতে পারিলাম, তখন হইতেই দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলে। প্রবাসীর মলাটে লিখা থাকিত;

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে।
পরদাস-খতে সমুদায় দিলে॥"

অনেক দিন হইতেই দেশে চারিদিকে একটা জড়ত্ব ও অবসাদ দেখা যাইতেছে। অতি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতা প্রতিদিন জাতীয় জীবন কলুষিত করিতেছে। দেশের যখন দুর্দ্দিন আসে, তখন দুঃখকে সে নানা দিক্ দিয়াই নিদারুণ করিয়া তোলে।

কেবল মাত্র অতীতের গুণ কীর্ত্তন করিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি এবং দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেছি। কথার গ্রন্থিবন্ধনে আমরা যে-জাল বিস্তার করিয়াছি, সেই জালে আপনারাও আবদ্ধ হইয়াছি।

জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে; দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে; ভয়ের অতীত হইতে হইবে; সহস্র প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধশক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি

করিয়াই আমরা দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।

এই নিরাশার মধ্যেও যথেষ্ট আশার আলোক আছে। যখন নিশির অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতম, তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জাতীয় জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়। এ-সব অন্ধকারের আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

যে-শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্ত্বের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মনুষ্য ভয়ের অতীত হইত, যে-বীরধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্ব্বহ ভার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত,—সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই শিক্ষা যেন তোমার লেখা দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

[**শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—**

ছেলেদের জন্যে বই লিখি, কিন্তু সে-বই ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেবার ভারও নিজে নিতে হয়। শুধু এই নয়, ব্লক তৈরি করাতে ছুট্‌তে হয় ফিরিঙ্গীর কাছে! হাফ্‌টোন এবং থ্রী-কলার বলে' দুটো জিনিষই তখন ছাপাখানা থেকে অনেক দূরে অজ্ঞাতবাস করছে। সেই সময়ে রামানন্দ-বাবুর মাথায় খেয়াল উঠ্‌লো সচিত্র প্রবাসী প্রকাশ করার! আমি তখন আছি এলাহাবাদে চার্চ্চ-রোডে জজ সাহেবের বাংলায়, আর রামানন্দ-বাবু থাকেন ভরদ্বাজ-আশ্রমের কাছাকাছি আর-একটা বাসায়—দুজনেই প্রবাসী আমরা! ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণি-বাবু তখন নতুন নতুন ছাপাখানাটা সুরু করেছেন। একজন হিন্দুস্থানী চিত্রকর সে ছবি আঁকে বই সাজাতে। বাংলার চিত্রকর সবাই ভবিষ্য তখন, কেবল সকাল হচ্ছে মাত্র। সেই সচিত্র মাসিক পত্রের আরম্ভের যুগে সেই সময়ে রামানন্দ-বাবুর সাহসে ভর করে' প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার দেখা দেবার আয়োজন আরম্ভ হ'য়ে গেল। সচিত্র মাসিক পত্রিকা বার করার স্বপ্ন অনেক দিন এসেছিল আমাদের অনেকের মনে, কিন্তু সে পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের বিষয়ে সন্দেহ নিয়েই আস্‌তো ভাবনাটা। তাই রামানন্দ-বাবু যখন নিঃসংশয়ে ছবি ছাপানোর প্রস্তাবটা আমার কাছে পাড়লেন, তখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েতে পরিপূর্ণ তাঁর সংসারটির দিকে চেয়ে আমি বলেছিলেম, কাগজটা চালাতে গিয়ে শেষ না বিপদে পড়েন! সেই প্রবাসী আর আজকের প্রবাসী সমান ভাবে চলে' এল, নতুন নতুন আর্টিষ্ট এল ছবি দিতে 'প্রবাসীতে'। এ যে হ'ল তার জন্যে দায়ী আমি নয়, রামানন্দ-বাবু। নতুন বাংলার আর্টিষ্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর অাল্‌বমে তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হ'তে হয়েছে; আর আমরা আর্টিষ্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপ্‌তো ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি সমস্ত, যদি না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দ-বাবু। কোথায় ছিল তখন নবযুগ, কোথায় বঙ্গবাণী, কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় বা বসুমতীর পুরস্কার! প্রবাসীর সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার বিনামূল্যে দেওয়া এবং নেওয়া সম্পর্ক বহু বৎসর আগে সেই প্রবাসে স্থির হ'য়ে গেছে। এখনকার আর্টিষ্ট তারা কেউ সত্যিই আমার ছাত্র—কেউ ছাত্র না হ'য়েও ঐ নামে চলে' যায়। সবাইকে প্রবাসী বিনা খরচে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সুতরাং তাদের সবার হ'য়ে আজ আমি প্রবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আর আমার নিজের দিক্ থেকে বল্‌ছি, শোভন কীর্ত্তি তোমার হউক।

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**শ্রী অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—**

লণ্ডন

আগামী বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী' পঁচিশ বৎসর বয়স অতিক্রম করবে। এই পঁচিশ বৎসর, কখনও দেশে কখনও বিদেশে, কিন্তু সর্ব্বদাই প্রবাসে, আমি প্রবাসী পড়েছি ও সর্ব্বদাই আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেছি। নানা বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও আপনি যেরূপ সর্ব্বপ্রকারে প্রবাসীর

উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, সেজন্য সকল বাঙ্গালীই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি, যেন আপনারই তত্ত্বাবধানে প্রবাসী প্রতিবৎসর আরও উন্নতিলাভ করে এবং বাঙ্গালীর ও ভারতের মুখোজ্জ্বল করতে থাকে।

শ্রী অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

"প্রবাসী"র পূর্ব্ববর্ত্তী "প্রদীপে"র আমল হইতেই আমি উহার সহিত অল্পবিস্তর সংশ্লিষ্ট আছি, এবং প্রথমাবধি আমি উহার একজন রীতিমত পাঠক। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, চিত্রকলা, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে যাহা কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, "প্রবাসী" তাহার সকল বিষয়েই উপাদান যোগাইয়াছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয়ের "বিবিধ প্রসঙ্গ" গুলি "প্রবাসী"র মৌলিক বিশেষত্ব ও সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য। তাঁহার মতামতসমূহ বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকবর্গ সমধিক আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করিয়া থাকেন, ইহা সকলের সুবিদিত। "প্রবাসী"র চয়নগুলিও খুব উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ। "প্রবাসী"র সমালোচনা বাংলা লেখকদের আদর্শকে উচ্চ করিয়াছে। বঙ্গের অনেক মাসিক পত্রিকা "প্রবাসী"র বিশেষত্বগুলির অনুকরণ করিয়া সেগুলির উপকারিতা ও জনপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছে। বাংলা মাসিকের পক্ষে মাসের প্রথম তারিখে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে "প্রবাসী"ই প্রথম পথপ্রদর্শক। "প্রবাসী" উন্নতিশীল সংস্কারকামীদলের মুখপত্র, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহার স্বাধীন ও নির্ভীক আলোচনা উহাকে সর্ব্বদা নবীন, সরস ও আধুনিক রাখিয়াছে। গতানুগতিকতার মোহ ও যশোলিপ্সা উহাকে কখন প্রলুব্ধ করে নাই, সত্যের অপলাপ করিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে কখন উহা স্বীকৃত হয় নাই, স্বাধীন চিন্তার মুক্ত বায়ু উহা ঘরে ঘরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে, প্রাচীন গরিমা উহাকে ভবিষ্যতের মহিমা সম্বন্ধে অন্ধ করে নাই। উহার উদার মত সকল দেশ কাল ও পাত্র হইতে জাতীয় পুষ্টি-সাধনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। যাহারা দুর্ব্বল ও অসহায়, যেমন স্ত্রীজাতি ও ভারতীয় অন্ত্যজ জাতিসমূহ, তাহাদের উন্নতিকল্পে "প্রবাসী" তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। যাঁহারা "প্রবাসী"কে অতি অগ্রসর মনে করেন, সেইসকল প্রাচীনপন্থী পাঠকগণও উহার মতামত খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করেন এবং তাহাদের প্রচেষ্টাসমূহের জন্য উহার সহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস পান, দেখিয়াছি।

যিনি সকল শুভ উদ্যমকে জয়যুক্ত করেন, কল্যাণকে স্থায়ী ও মহিমামণ্ডিত করেন, সেই বিশ্বনিয়ন্তা উত্তরোত্তর "প্রবাসী"র শ্রীবৃদ্ধি করুন, এবং উহার প্রবীণ সম্পাদক দীর্ঘকাল উহার সম্পাদনে ব্রতী থাকিয়া বাঙ্গালী জাতির হিতসাধন করিতে থাকুন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—

প্রবাসীর পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইল। খুব দীর্ঘকাল নহে। কিন্তু আমাদের দেশে একখানা মাসিকের জীবনে এই কালের মধ্যেই কত জোয়ার-ভাটা খেলিয়া যায়। প্রবাসী উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই অগ্রসর হইয়াছে। সম্পাদকের কাছে পূর্ব্বাহ্লেই যে-দিন শুনিয়াছিলাম, প্রবাসীকে এক শত পৃষ্ঠার মাসিকে পরিণত করিবেন, তখন একটু বিস্মিত না হইয়াছিলাম তা নয়। ভাবিয়াছিলাম, চলিবে কি? প্রবাসী তো চলিয়াছেই, একশত পৃষ্ঠাকে অতিক্রম করিয়া আরও কত মাসিকের পথ-প্রদর্শক হইয়াই অগ্রসর হইতেছে। প্রবন্ধগৌরবে ও চিত্র-সৌন্দর্য্যে প্রবাসী এখনও সকলের অগ্রণী হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। আমি এই ২৫ বৎসরের প্রত্যেক সংখ্যা প্রবাসীর পঠনীয় যাহা কিছু সকলই পাঠ করিয়াছি এবং ইহাতে পঠনীয় বিষয় যথেষ্টই থাকে। আমি এ কথা বলি না, যে, অন্য কোন মাসিকে সুপাঠ্য প্রবন্ধ থাকে না। তাহা হইলে অন্য সকল মাসিক হইতে প্রবাসী প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়া দিত না। পুরাতন নব্যভারতে প্রবন্ধের গৌরব খুবই ছিল। আধুনিকও দু'একখানার বেশ গৌরব আছে। কিন্তু প্রবাসীকে কেহই অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। প্রবাসীই বাংলা মাসিককে

সুচিত্রিত করিয়াছে। প্রবাসীই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছে, যে, বঙ্গদেশেও মাসিক পত্র মাসের প্রথম দিনেই নিয়ম-মত বাহির হইতে পারে। কিন্তু প্রবাসীর প্রধান কথা সম্পাদকীয় মন্তব্য, উহার বিবিধ প্রসঙ্গ। ষ্টেড্ সাহেবের রিভিউ অব্ রিভিউস্ ছাড়া আর কোথায়ও এমন নির্ভীক সুচিন্তিত সম্পাদকীয় মন্তব্য এযাবৎ পাঠ করি নাই। প্রবাসীর কনিষ্ঠ মডার্‌ন্ রিভিউকেও এই সঙ্গে যদি উল্লেখ করি, তবে পাঠক অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। কোন দলের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া, সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া, নির্ভয়ে কথা বলিবার সাহস মানুষের একটা মূল্যবান্ সম্পত্তি। এ সম্পদ প্রবাসী-সম্পাদকের আছে, আজ ইহা স্বীকার না করিলে অকৃতজ্ঞতা-দোষে দুষ্ট হইতে হয়। তাই সাহসে ভর করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিলাম। এই নির্ভীকতার জন্য সম্পাদককে অনেক সময়ে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে না হইয়াছে, তা নয়। অনেক সময়েই তিনি 'মহাযান' পথে চলিতে পারেন নাই। অন্য দিকে, এমন সকল তত্ত্ব একমাত্র প্রবাসীতেই আলোচিত হইয়াছে, যাহাতে অন্য কোন মাসিক হাতই দিতেন না, এখনও দেন না। আমরা প্রবাসীর উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি-কামনার সঙ্গে-সঙ্গে ভগবচ্চরণে সম্পাদকের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

পাবনা, ৯ই ফাল্গুন ১৩৩২

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

[**শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য**—

প্রবাসীর প্রতি

হে প্রবাসী, ছিলে যবে প্রয়াগের তীর্থ-অধিবাসী,
বাণীর মন্দিরে সেথা দিলে দেখা নবীন পূজারী
জোড়-হাতে দাঁড়াইয়া নতনম্র পূজা-অভিলাষী
জননীর। রচি' অর্ঘ্য ভরি' ভরি' তব হেমঝারি
বর্ষিলে যে পাদ্য-বারি, হের তাহা উল্লাসি' উচ্ছ্বাসি'
সেথা হ'তে কলস্বরে বঙ্গভূমে আসিল প্রচারি'
তব উচ্চারিত মন্ত্র কল্লোলিয়া দিব্য সমুচ্ছ্বাসি';
দীপ্তজ্ঞানগরিমায় হিতবাক্য তব মনোহারি।
যে পঞ্চবিংশতি বর্ষ সঁপিয়াছ মাতার সেবায়
অবিমিশ্র সত্যবাণী উদ্ঘোষিয়া নির্ভীক পরাণে—
গদ্যে পদ্যে প্রত্নতত্ত্বে হেরি আজি প্রকাণ্ড প্রচ্ছায়
বনস্পতিরূপে তুমি তুলি' শির আকাশের পানে
দাঁড়ায়েছ সেই বর্ষচয়ে,—তব বিরাট্ সত্তায়
ধন্য পূর্ণ করি' বঙ্গ নিত্য নব উৎসারিত দানে।

শান্তিনিকেতন, ১১ ফাল্গুন ১৩৩২ শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

[**শ্রী নিরুপমা দেবী**—

কাহারো বিষয়ে কোন কথা বলিতে গেলে বা ভাবিতে গেলে নিজের সঙ্গে তাহার যতটুক্ সম্বন্ধ বা যতখানি যোগ যখন বা যে-স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেই দিনের কথাই বোধ হয় মানুষের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তাই আজ তাহার পঞ্চবিংশ বাৎসরিক জন্মদিনে প্রবাসীর শুভ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহিত প্রথম পরিচয়ের দিনগুলির কথাও মনে পড়িতেছে।

১৩০৮ সালে প্রবাসীর সূতিকাগারেই তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। ইহার সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া গ্রহণ করিবার শক্তি তখন আমাদের না জন্মিলেও তখন হইতেই আমরা তাহার অনুরক্ত পাঠক ছিলাম। সে-সময়টা সাহিত্য-রাজ্যের বড় সুবর্ণ সময়। সেই ১৩০৮ সালেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মহাশয়ও নব পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর তত্ত্বাবধানে ভারতীর তখন নূতন জীবনে নূতন উদ্দীপনা, সমাজপতির সাহিত্যের তখন পূর্ণ উন্নতি। সেই সময়ে দূর এলাহাবাদ হইতে নবপ্রকাশিত নূতন মাসিক পত্র প্রবাসী আমাদের অপ্রবীণ অন্তর যে কিসে টানিয়াছিল, তাহা আজ আর মনে করিয়া বলিতে পারি না। হয়ত প্রবাসী নামেরই গুণে, অথবা প্রদীপকে পূর্ণ জ্যোতিতে জ্বালিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত রামানন্দ-বাবুই এই নূতন কাগজ প্রবাসী বাহির করিতেছেন, এইজন্যই হয়ত আমরা প্রথম সংখ্যা হইতেই ইহার গ্রাহক হইয়াছিলাম।

পনেরো বৎসর আগের কথা। ১৩১৭ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে নিজের লেখা 'হোরী খেলা' বলিয়া একটি কবিতা নামহীন ভাবে যেদিন প্রকাশিত হইয়াছিল,

সেদিনের আনন্দের পরিমাণ আজ আর অনুভবের মধ্যে নাই। ১৩১৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতেই প্রবাসীর সঙ্গে লেখক ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সুরু হইল। ১৩১৯ সালে বৈশাখে ভারতীর জন্য 'শিবরাত্রি' ও প্রবাসীকে 'অদ্বৈত' নামে কবিতা ইতিপূর্ব্বেই পাঠাইয়া তাহারই প্রকাশের অপেক্ষায় আছি, ইতিমধ্যে রামানন্দ বাবুর এক পত্র এবং ১৩১৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসী তাহাতে 'দিদি'র দুই অধ্যায় ছাপানো আর 'দিদি'-নামা ছেঁড়া খাতাখানির যদি কিছু সংশোধন করিবার থাকে সেজন্য সেখানাও পৃথক ভাবে আসিয়াছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত হওয়া সেদিন সাহিত্য আলোচনার সার্থকতা বলিয়া নিজেদের কাছে গণ্য হইয়াছিল।

আজ তাহার এই পঞ্চবিংশ বৎসর পূর্ণ হইবার দিনে তাহার জন্য অধিকতর শুভ প্রার্থনা করি। সে শতংজীব হউক, অধিকতর উন্নত, অধিকতর শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন হউক। যদি তার কোন ত্রুটী থাকে, ক্কচিৎ কখনো পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেগুলি যেন দিন দিন ক্ষয় হইয়া যায়, গুণ যাহা আছে তাহা যেন বৃদ্ধি পায় শুক্লপক্ষের শশিকলার মতই। আজ সে "সাহিত্য", "প্রদীপ" নিবিয়া গিয়াছে, "বঙ্গদর্শন"ও কয়েক বৎসর পরেই কাল-সাগরের বুদ্বুদের সঙ্গে মিশিয়াছে, আরও নূতন মাসিক পত্র উঠিয়া ভাসিয়া সেই সাগরে মিলাইয়াছে, কিন্তু প্রবাসী ভগবৎ-ইচ্ছায় উন্নতির পথেই চলিয়াছে। নূতন আরও অনেক মাসিক পত্র সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু প্রবাসীর যশ অক্ষুন্নই আছে এবং আশা করি চির-দিনই থাকিবে। সে বাংলার একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র রূপেই তাহার চিত্ত বিনোদন করিতেছে।

শ্রী নিরুপমা দেবী

[শ্রী পুলিনবিহারী দাস—

বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ প্রবাসী পত্রিকা অত্যন্ত দক্ষ-তার সহিত প্রতিমাসে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গলা ভাষার বহুবিধ উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে, এবং নবীন সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যামোদীগণের উৎসাহ-বৰ্দ্ধন, আনন্দলাভ ও সাহিত্যচর্চ্চার অবসর ও সুযোগ প্রদান করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবেই দেশের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছে। আবার দেশ-বিদেশ-প্রদেশ-সম্ভূত বহুবিধ নূতন তত্ত্ব, নূতন জ্ঞান ও নব গবেষণার ফলসমূহও আহরণ করিয়া যে দেশ মধ্যে জ্ঞানসমষ্টির বৃদ্ধির চেষ্টা দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়াছে, তাহা দেশ-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকিবেন।

বৰ্ত্তমানে ব্যক্তিগতভাবে আমার বক্তব্য এই, যে, ভারতের একটি লুপ্ত বিদ্যা, যাহার প্রয়োজন এবং উপ-কারিতা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং সেই বিদ্যার অভাববশতঃ বাঙ্গালীজাতি ক্রমশঃ ভীরু, কাপুরুষ, নিস্তেজ, দুৰ্ব্বল ও আত্মসত্তাশূন্য হইয়া পড়িতেছে, সেই অসিবিদ্যা ও লাঠিকৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে আমি যে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা লোকসমক্ষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সুযোগ একমাত্র প্রবাসী পত্রিকা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এ সম্পর্কে প্রবাসী কর্তৃপক্ষগণ বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার ও যথেষ্ট সৎসাহসেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভয় হেতুই হউক, কিম্বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, দেশস্থ অসংখ্য ধনী ও দেশহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সকলেই দেশে অসিবিদ্যা ও লাঠি-কৌশল প্রচারার্থ আমাকে কোনও রূপে সাহায্য ও সুযোগ প্রদানে সম্পূর্ণই উদাসীন ছিলেন, এবং বৰ্ত্তমানেও উদাসীনই আছেন।

এসম্পর্কে প্রবাসী হইতে আমি যেভাবে উপকৃত হইয়াছি এবং লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা প্রভৃতি লুপ্তবিদ্যা কথঞ্চিৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া যে সামান্য মানসিক তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ-গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি,—এবং প্রার্থনা করিতেছি, ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে প্রবাসী চিরতরে দেশহিত-ব্রতে রত থাকুক এবং প্রবাসীর কর্তৃপক্ষগণ মঙ্গলময়ের শুভ ও মঙ্গলাশীর্ব্বাদ লাভে তৃপ্তি লাভ করিয়া জনসমাজের হিতসাধনে সমর্থ থাকুক।

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

[শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—

"প্রবাসী" ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্মোৎসবে যে আমরা সকলেই আনন্দিত হইব, ইহাতে সন্দেহ কি? "প্রবাসী"র সকল মতের সহিত যদিও একমত হইতে পারি না, তথাপি সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার যে-বাণী প্রবাসী এত কাল বহন করিয়া আনিয়াছে, মূলতঃ তাহার সহিত আমার আন্তরিক যোগ আছে। শিক্ষাসম্বন্ধীয় কিম্বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে যে-মতানৈক্য আছে, তাহা মূল লক্ষ্যের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর। সেজন্য অপর সকল পত্রিকা হইতে "প্রবাসী"র মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করা অন্ততঃ আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

[শ্রী প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—

সহস্র সহস্রের ব্যাকুল প্রার্থনা,—প্রবাসী দীর্ঘজীবী হোক; আমি সেই সঙ্গে গলা মিশিয়ে বলি,—এই শুভ দিনটা যেন অনেক বার ঘুরে ঘুরে আসে। বিদেশী কোন কোন মাসিকের যেমন বয়সের গাছ-পাথর নাই, আমাদের এই খাঁটি স্বদেশীটির বেলাও যেন তাই হয়। প্রবাসীর কথা উঠ্‌লেই তার মৌলিকতাটিই আগে চোখে পড়ে। আমি পাঠকপাঠিকার নিকট উপস্থিত কর্‌তে যাচ্ছি কেবল গুটি কয়েক বাঁচা বাচা বিশেষত্ব—

১। নব যুগের পত্রের অগ্র-দীপবাহী প্রবাসী। যদি কখনও সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয়, তবে মাসিক সাহিত্যে প্রবাসীর এই নবতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে।

২। সে-কালে বঙ্গদর্শন যেমন নূতন নূতন লেখক আবিষ্কারে পটুতা দেখিয়েছিল, একালে প্রবাসী তেমনই কতকগুলি খাঁটি চিত্রকর খুঁজে বার করেছে। বঙ্গদর্শন কাঁচা লেখকের হাত পাকিয়ে দিত; প্রবাসী চিত্রশিল্পের শিক্ষানবীশকে তুলি-খেলায় পাকা খেলোয়াড় করে' তুলেছে। এই দলাদলির দেশে সাহিত্য ও চিত্র-কলায় মিতালি শুধু যে সম্ভবপরই নয়, অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক, প্রবাসী প্রথম তা প্রমাণ করে।

৩। সাহিত্য-সংসারে শ্লীলতা ও কলাকৌশল একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত ঝগড়া মিটিয়ে কেমন করে' পরস্পরের সহায় হ'তে পারে, প্রবাসী আগাগোড়া রচনা নির্ব্বাচনে কড়া নজর রেখে তা একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়েছে। অথচ প্রবাসী আপাদমস্তক রূপ-ভজা। তার কায়মনোপ্রাণ যেন চিরসুন্দরের একটি জয়গান। তবে তাতে এতটুকু ছিদ্র নাই, যে বিকারের কলি প্রবেশ করে।

৪। রাজনীতি হ'তে আরম্ভ ক'রে দেশবিদেশের নিত্যকার মর্ম্ম ও কর্ম্মশক্তির বিবিধ বিকাশকে প্রবাসী যেন চোখে চোখে রাখ্‌তে চায়। যথাসময়ে ঠিক জায়গাটিতে বেশ একটা জোরে ঘা দিতে প্রবাসীর মত ওস্তাদ বড় নাই। অথচ প্রবাসীর সেই আঘাতে কাজের কথাই জাগে, বৃথা ব্যথা লাগে না।

প্রবাসীর বোঝা-পড়া ব্যক্তি নিয়ে নয়, বিষয় নিয়ে। আলোচনা ও সমালোচনায় প্রবাসীর আন্তরিকতা, উদারতা ও নির্ভীকতা তার প্রতি বড় সাহিত্য-বৈরীকেও বশ করে' ফেলে।

৫। এই অকালবার্দ্ধক্য ও অল্পায়ুর আবহাওয়ায় প্রবাসীর স্থির যৌবনে দিন দিনই আরও চেক্‌নাই বাড়্‌ছে। এজন্য দায়ী প্রবাসীর একনিষ্ঠার অদ্ভুত অমৃত-রসায়ন। এই গ্রীষ্মপ্রধান মুলুকেও খেটে খেটে প্রবাসীর উচ্চাঙ্গের আদর্শটি ক্লান্ত হচ্ছে না। সে যেন বুড়ো হতেই চায় না। তাই ব'লে কলপ মেখে সে কচিও সাজে না। সে জাত্‌-কাচা, তার ধাত্‌ কাঁচা। এদিকে তার অবিচ্ছিন্ন সাধনার বনেদটি ঠিক যেন পাকা ইস্পাতে গড়া।

শ্রী প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

[শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী—

আগামী চৈত্র-শেষে "প্রবাসী"র পচিশ বৎসর পূর্ণ হইবে। এখন সে প্রাপ্তবয়স্ক, দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকুক, এই প্রার্থনা করি। এই দীর্ঘ কাল প্রবাসী বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর জন্য যে আনন্দের আয়োজন করিয়াছে, সেই কারণে তাহাকে বিশেষভাবে নববর্ষের শুভ ইচ্ছা ও স্বাগত জানাইতেছি। 'প্রবাসী' তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের কাজ নিয়মিত করিবে জানি। তবু বলিতেছি ইহার কষ্টিপাথরে যাচাই করা

বিবিধ প্রবন্ধ, কাব্য সাহিত্য, দেশ-বিদেশের কথা প্রভৃতির রচনা ও সঙ্কলনে যে-আদর্শ এত দিন অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে যেন ভ্রষ্ট না হয়। দেশের বিবিধ নূতন সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা আবশ্যক। অতীত যাহা আমাদের দিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা যখন আর নাই তখন কেবল বৃথা অহঙ্কারে তাহারই বর্ণনায় মুগ্ধ না থাকিয়া ভবিষ্যতে আবার তাহা কি উপায়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় তাহারই চেষ্টা আবশ্যক। ভবিষ্যতের মানুষ গড়িবার, মানুষের চলিবার পথ নির্দ্দেশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া প্রবাসী তাহার পূর্ণশক্তি নিয়োগ করুক, ইহাই তাহার পক্ষে নববর্ষের সম্যক্ আবাহন।

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

[শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু—

"প্রবাসী" মাসিক পত্র যে ২৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করল, এটি বাংলাদেশের পরম সৌভাগ্যের কথা বল্‌তে হবে। একশ বৎসর হবে বাংলাদেশে সাময়িক পত্র আরম্ভ হয়েছে, এর মধ্যে বেশীর ভাগ মাসিক পত্র অকালে মারা গিয়েছে। "প্রবাসী" যে এখনও সাধারণের প্রিয়পাত্র হ'য়ে রয়েছে, সেটা প্রবাসীর গুণ বল্‌তে হবে। প্রবাসী প্রবন্ধ-সম্ভারের জন্য পরিচিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি যার লেখক সেই পত্রিকা যে সাধারণের মনোরঞ্জন করবে, তা বলা বাহুল্য।

পরিশেষে আমি প্রবাসী ও প্রবাসীর সম্পাদকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

[শ্রী বামনদাস বসু—

১৯০১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমি আমার পত্নীর অসুখের জন্য একমাসের ছুটী লইয়া এলাহাবাদে আসি। তখন আমরা এখানকার চ্যাঠাম্ লাইন্সের দ্বারভাঙ্গা রিট্রীট নামক বাংলায় অবস্থিতি করিতেছিলাম। সেই সময় সেইখানে ২রা সেপ্টেম্বর রামানন্দ-বাবুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অবিনাশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সাথে লইয়া আসিয়া আমার সহিত আলাপ করাইয়া দেন। আলাপ হইবার পর রামানন্দ-বাবু আমাকে কয়েক মাসের প্রবাসী উপহার দেন। সেই বৎসরের এপ্রেল মাসে প্রবাসীর জন্ম হয়। আমাকে তিনি প্রবাসীর উন্নতিসাধনের জন্য কিছু লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। আমি জাতিতে বাঙ্গালী হইলেও আমার জন্ম লাহোরে, এবং শিক্ষা, কর্ম্মভূমি ও বসবাস পঞ্জাব, বোম্বাই বা আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশেই হইয়া আসিয়াছে। আমি মুদ্রিত করিবার মত বাংলা কখনও লিখি নাই, লেখায় তত দক্ষও ছিলাম না। ইহা রামানন্দ-বাবুকে বলায় তিনি আমার লেখার আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হন।

আমার ছুটী ফুরাইয়া যাওয়ায় তাঁহার সহিত আলাপ হইবার কয়েক দিবস পরেই আমাকে পুনরায় আমার কর্ম্ম-স্থান সিন্ধুপ্রদেশে প্রত্যাগমন করিতে হয়। নবেম্বর মাসে পুনরায় ছুটী লইয়া আসি। সে-সময় পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য রামানন্দ-বাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। যাহাই হউক, প্রবাসীতে লিখিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতাম। কিন্তু কোন্ বিষয় লইয়া লিখিব, ইহাই ছিল মহা সমস্যা। অবশেষে ইহাই মনস্থ করিলাম, যে, বোম্বাই প্রদেশের কয়েকটি শহরের বিবরণ ও তাহাদেরই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে লিখিব। মাননীয় শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইতিপূর্ব্বে "বোম্বাই-চিত্র" নামক একটি পুস্তক বাংলায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি সেখানকার ঐতিহাসিক ঘটনা তত সুবিস্তৃত ভাবে লেখেন নাই। সেখানকার মনোরম শহরগুলিরও তেমন বর্ণনা করেন নাই। "শত্রুঞ্জয় পাহাড়," "গিরনার", "রত্নাগিরি," "আহমদনগর", বা "মহারাষ্ট্র নৌসৈন্য," অথবা মহারাষ্ট্রী বা গুজরাটী ভাষা ও সাহিত্যের কেহই বর্ণনা করেন নাই। বাঙ্গালীর নিকট এইসকল বিষয় আমোদদায়ক হইবে মনে করিয়া আমি সেইসকল প্রবাসীতে বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করি। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, কচ্ছপ্রদেশে আমার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী প্রবাস বা পদার্পণ পর্য্যন্ত করেন নাই। তাহার বিবরণ বাংলায় আমিই বোধ হয় প্রথম লিপিবদ্ধ করি। প্রবাসীতে এসকল ছাড়া "ইংরেজী ভাষায় বাঙ্গালী লেখক" নামক আরও দুটি প্রবন্ধ লিখি।

প্রবাসীর গুণেই এইসকল প্রবন্ধগুলি বাহির হইবার প্রায় ১৫ বৎসর পরে বাংলা দেশের শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী (Director of Public Instruction) ডান্ সাহেব Calcutta Review নামক পত্রিকায় "Bengalee Writers of English Verse"—ইংরেজী কবিতার বাঙ্গালী লেখক—নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমি অন্যান্য কার্য্যে অতিরিক্ত ব্যাপৃত থাকায় আমার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে পারি নাই। অধুনা আমি কলিকাতার জনৈক সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের উপর সেগুলি সমাপ্ত করিবার ভার দিয়াছি। প্রবাসী বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালীকে স্বদেশের সহিত মিলিত হইতে সক্ষম করিয়াছে এবং স্বদেশী বাঙ্গালীকেও প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী সতত শ্রুতি ও দৃষ্টিগোচর রাখিতে সচেষ্ট করিয়াছে। শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের সেই সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তক প্রবাসীর গৌরবেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ। প্রবাসীর স্বনামধন্য, সুযোগ্য সম্পাদক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞানবাবুর ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন, এবং শুধু তাহাই নহে, তিনি যথাসাধ্য তাঁহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করেন এবং তাহার প্রবাসীতে তাহা মুদ্রিত করেন।

শ্রী বামনদাস বসু

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রবাসী পত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রামানন্দ [চট্টো]পাধ্যায় প্রদীপ নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করিতেন। [সে]ই সময় হইতে আমি প্রদীপ ও তাহার পর প্রবাসীর [লে]খক-শ্রেণীভুক্ত। সে ত্রিশ বৎসরের কথা। রামানন্দ-[বা]বু তখন প্রয়াগ-প্রবাসী, আমি লাহোরে। প্রবাসীর [প]চিশ বৎসর পূর্ণ হইল। প্রথম হইতেই প্রবাসী উচ্চ [অ]ঙ্গের মাসিক পত্র; কালে যেমন ইহার প্রচার বৃদ্ধি [হইয়া]ছে, রচনার উৎকর্ষও সেইরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে। [মুদ্রা]-যন্ত্রের কার্য্যে, চিত্র ও প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে প্রবাসী শ্রেষ্ঠ [মা]সিক-পত্র। যে উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া এই পত্রের [প্রতি]ষ্ঠা হয়, পঁচিশ বৎসর সেই আদর্শ রক্ষা করিবার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা হইয়াছে। এখন মাসিক পত্রের সংখ্যা বিস্তর, উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রের অভাব নাই, কিন্তু প্রবাসীর দেশবিদেশব্যাপী যশ অক্ষুন্ন রহিয়াছে। লেখক, পাঠক সকলের পক্ষেই ইহা আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

কলিকাতাবাসী হইলেও আমি চিরপ্রবাসী। কর্ম্ম-উপলক্ষে বহুকাল আমাকে উত্তর ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতে হইয়াছে। এখন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় সুদূর প্রবাসে বাস করিতেছি। প্রবাসীর পঞ্চবিংশ বৎসর পূর্ণ হইবার উপলক্ষে আমি এই পত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। প্রবাসী কর্ত্তৃক দেশ ও ভাষার সেবা এবং লোক-শিক্ষা ও লোকরঞ্জন অবারিত হউক।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার—

১৩৩২ বঙ্গাব্দের অবসানে প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে, ইহা যথার্থই আনন্দের সংবাদ। আপনার কৃতিত্বে ও কর্ম্মদক্ষতায় এই সাহিত্যমুকুরখানি যে-ভাবে উন্নত হইয়াছে ও লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে স্মরণ করিতেছি। যে-সময়ে এই পত্রের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তখনও যেভাবে উহার কল্যাণ কামনা করিতাম, এখনও সেইভাবেই উহার কল্যাণ কামনা করি।

সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার সযত্নপালিত প্রবাসীর উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করিতেছি।

শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার

[শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই উপলক্ষে আপনাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। প্রবাসীর সত্যনিষ্ঠা, উদারতা, নির্ভীকতা এবং স্বদেশপ্রীতি অতুলনীয়। ইহা পড়িয়া উপকৃত হইয়াছি, ইহাতে লিখিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি এই কর্ম্মক্ষেত্রে আমাকে টানিয়া না আনিলে আমি কিছুই

করিতে পারিতাম না। বিশেষ কিছু যে করিয়াছি তাহা নহে, তবে সামান্যও যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি, তাহা আপনারই জন্য। প্রবন্ধাদি লিখিতে যাইয়া যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছি; কর্ম্মক্ষেত্রই শিক্ষাক্ষেত্র হইয়াছে। এসমুদায়ের জন্য আমি আপনার নিকটই ঋণী। এজন্য চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। সর্ব্বোপরি কৃতজ্ঞ বিধাতার নিকট।

শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ

[**শ্রী রামলাল সরকার**—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। আমার বোধ হয় সচিত্র মাসিক পত্র বঙ্গদেশে প্রবাসীই সর্ব্বপ্রধান। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যে অনেক নূতন তথ্য প্রদান করিয়াছে। প্রবাসীর মত খ্যাতনামা লেখক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার মত ক্ষুদ্র লেখকেরও একটু স্থান আছে। প্রবাসীর নিকট আমি কৃতজ্ঞ, কারণ প্রবাসীর মারফতে আমার পরিচয়টা বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছে। কারণ, যেখানেই যাই, প্রবাসীর পরিচয় দিলে সকলেই আমাকে চেনেন ও সম্মান প্রদর্শন করেন। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে চীন দেশের বিষয় যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রবাসীর মারফতে আমি বঙ্গসাহিত্যে দিয়া দিয়াছি। তন্মধ্যে তিব্বতের নিকল্‌স্ সাহেব, পেকিন রাজপুরী, চীন ব্রহ্মসীমান্তের অসভ্য জাতিসকল ও চীনের রাষ্ট্রবিপ্লবের সচিত্র প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমস্ত চিত্র-গুলিই আমার নিজস্ব, আমার নিজের তোলা।

প্রবাসীর পঞ্চশস্য, বেতালের বৈঠক ও দেশবিদেশের কথার মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষার বিষয় আছে। বর্ত্তমানে প্রবাসীর অনুকরণে ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, বঙ্গবাণী প্রভৃতি মাসিক পত্রগুলি বেশ খ্যাতি লাভ করিতেছে। এটা প্রবাসীর পক্ষে গৌরবের বিষয় বটে। কেননা, প্রবাসীই পথপ্রদর্শক।

শ্রী রামলাল সরকার

[**শ্রী সতীশচন্দ্র গুহ**—

প্রবাসীর ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আপনাকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাইতেছি। এই সিকি শতাব্দী ধরিয়া প্রবাসীর ভিতর দিয়া এবং অন্য নানাভাবে দেশ-সেবা ও দশসেবা করিয়া আপনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কেহ কেহ আপনাকে Stead সাহেবের সহিত তুলনা করে; আমার বিবেচনায় Stead সাহেবের চেয়ে আপনার কৃতিত্ব অধিক। এই ২৫ বৎসরে দেশের লোকের চিন্তার ধারা যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে, আপনার বিবিধ প্রসঙ্গ ও দেশের কথা [দেশ-বিদেশের কথা] না থাকিলে অবশ্য ততটা লাভ হইত কি না সন্দেহ। আপনার অপরাপর লেখা পুস্তকাদি বা অপর কর্ম্মজীবনের কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র সম্পাদকীয় বিচারকে যথাসম্ভব পক্ষপাতশূন্য করিতে চেষ্টা করিয়া এবং নব্যদের চিন্তার খোরাক জোগাইয়া আপনি সাক্ষাৎভাবে যতটা কাজ করিয়াছেন, দেশের কোনো জীবিত লোকেই ঠিক্ এভাবে করিতে চাহেন নাই, এরূপই মনে হয়।

সতীশচন্দ্র গুহ (দ্বারভাঙ্গা রাজ লাইব্রেরিয়ান্)
(Late Manager & Assistant Editor, The Dawn Magazine.)

[**শ্রী সত্যকিঙ্কর সাহানা**—

প্রবাসী যে আজ বাংলা মাসিকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সেজন্য বাঁকুড়া-জেলা-বাসী আমি প্রাণের মধ্যে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ক্ষুদ্রাকারের প্রবাসীতে দুই-একটা কবিতা লিখিতাম, তখন হইতেই প্রবাসীকে ভালবাসি। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, প্রবাসীর উন্নতি হউক।

শ্রী সত্যকিঙ্কর সাহানা

[**শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**—

প্রবাসীর বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল জানিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। এতদিন কোন গতিকে বাঁচিয়া থাকাটাই বাংলা মাসিকের পক্ষে বিস্ময়কর কথা —প্রবাসী ত বাঁচিয়া আছে heroically—মানুষের মত। প্রবাসী আমাদের গর্ব্ব করিবার বস্তু।

সমাজ, শিল্প, রাষ্ট্র, সাহিত্য, আর্ট—বাংলার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রবাসীর প্রভাব প্রতিভাত। বাংলা দেশে প্রবাসীই আধুনিক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—

আজ তাহাকে অনুসরণ করিয়া কত কাগজই অহরহ জন্ম-লাভ করিতেছে। ছাপা, ছবি, সম্পাদন আর নিয়মিত প্রকাশে প্রবাসী অতুলনীয়। তার পর লেখার কথা। সে-সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, রবিবাবু এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিস্তর রচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে—প্রবাসীর সাহিত্যিক মর্য্যাদার ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আমি জানি না। প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ ত তার একান্ত নিজস্ব সম্পদ—তেমন সুচিন্তিত যুক্তিপূর্ণ নির্ভীক আলোচনা আর কোনো বাংলা পত্রিকায় দেখিলাম না।

প্রথম দর্শনেই প্রবাসীকে ভালবাসিয়াছিলাম। সে প্রায় অনেক দিনের কথা। তখন আমি বিদেশে সুদূর প্রবাসে। কাগজখানি হাতে পাইয়াই মলাটের উপর দেখে পড়িলাম—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,
পরদাসখতে সমুদায় দিলে।
পরহাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে।"

অমনি প্রবাসী পরমাত্মীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত একেবারে আমার হৃদয়াসনে আসিয়া বসিল। সে যে আমার ব্যথার ব্যথী—স্বদেশের দুর্দ্দশা ও অধীনতার বেদনা তখন আমার চিত্তেও কাঁটা ফুটাইতে সুরু করিয়াছিল। সহমর্ম্মী প্রবাসীর সাক্ষাৎ পাইয়া মন একেবারে গলিয়া গেল।

তদবধি প্রবাসীর সঙ্গ ছাড়ি নাই। আমার প্রথম বাংলা রচনাটি প্রবাসীতে ছাপা হইলে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া বলিবার নয়। সে-দিন প্রবাসীকে যেন আরও নিকটে পাইলাম। তার পর, যখন আপনার সহকারীরূপে আমার ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োজিত করিয়া প্রবাসীর জয়-যাত্রায় হয়ত কিছু সাহায্য করিতে পারিয়াছিলাম, তখনকার কথা ভাবিয়া আজ গৌরব বোধ করিতেছি।

ষোলবৎসরব্যাপী আমার সাহিত্যিক জীবনে অনেক বাংলা মাসিক ও সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় হইল, কোনটিই আমার চিত্ত অধিকার করিতে পারিল না, যেমন করিয়া প্রবাসী করিয়াছে। এর কারণ ইহা নয়, যে, প্রবাসীতে যা কিছু প্রকাশিত হয় সমস্তই উৎকৃষ্ট। সে-কথা আমি বলি না। আমি বলিতে চাই, প্রবাসীর অকুণ্ঠিত বলিষ্ঠ ভঙ্গিমা এবং তার সুমার্জ্জিত সুকুমার শ্রীসম্পদ্ আমার হৃদয়কে যেমন করিয়া স্পর্শ করে, আর কোনো কাগজ তেমন করে না।

প্রবাসী দীর্ঘায়ু হউক এবং সংস্কার-মুক্ত অব্যাহত স্বাধীন চিন্তা ও উৎকৃষ্ট কাব্য-সাহিত্য ও আর্টের বাহন হইয়া বাঙালীকে আনন্দ দান করুক, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলুক, ইহাই কামনা করি।

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রী হরিহর শেঠ—

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মাসিক "প্রবাসীর" পচিশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, ইহা বঙ্গভাষাভাষী সকলের কাছেই আনন্দসংবাদ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। "প্রবাসীর" জন্য শুভ ইচ্ছা এবং নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার দীর্ঘ জীবনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

প্রবাসী বাঙ্গলার গৌরব। জানি না, প্রবাসীর পূর্ব্বে ভারতীয় অন্য কোন ভাষায় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমৃদ্ধ মাসিক আর কিছু ছিল কি না। এই প্রবাসীর অধিকতর উন্নতির জন্য আপনাদের আগ্রহের কথা জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

শ্রী হরিহর শেঠ

[শ্রী হীরানন্দ গিরি—

আগামী চৈত্র মাসে প্রবাসীর পচিশ বৎসর পূর্ণ হইবে জানিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এই পত্রিকা বঙ্গ-সাহিত্যের এবং বাস্তব জগতের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছে। শ্রীভগবানের নিকট ইহার বহুল প্রচার ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সতত প্রার্থনা করি।

শ্রী হীরানন্দ গিরি

[শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়—

যুগে যুগে যে ভাব জাতির জীবনে রসের রসদ যুগিয়ে চলে, প্রবাসী জাতিকে দিনের পর দিন সেই ভাব-ধারাতেই

অভিব্যক্ত ক'রে চলেছে। সুতরাং প্রবাসী জাতির গর্ব্ব ও গৌরবের জিনিষ। এই যৌবন-পুষ্ট যাত্রীটিকে তার নব বর্ষের অজানিত পথযাত্রায় অভিনন্দিত করবার জন্য আমার মনের ভিতর আজ যে-কামনা ছন্দিত হ'য়ে উঠেছে, তাই সত্যিকার ছন্দে ধ'রে প্রবাসীকে উপহার পাঠাচ্ছি। এই শুভেচ্ছার সঙ্গে আপনিও আমার নব বর্ষের শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন।

দুর্গম যাত্রার পথে একান্ত নির্ভীক—
সত্যবাক্, কণ্ঠে তব অগ্নিময় বাণী,
প্রাবৃটের মেঘ আর বসন্তের পিক—
এক সঙ্গে এ দু'য়েরে মিলায়েছ আনি'।
ভাষা দিয়ে রচেছ ভাবের ইন্দ্রজাল,
ওস্তাদ জহুরী তুমি—পাকা মণিকার।
যে-গৌরবে দীপ্ত আজি বাঙ্গালার ভাল,
কিছু কম নহে তাহে কৃতিত্ব তোমার।
জাতির জীবনে যাহা সত্য ও সুন্দর,
পত্রে পত্রে আঁকা তব তাহারি দীপালী,
প্রবাসে তোমার জন্ম—তবু নহ পর,
বাংলার আত্মজ তুমি—খাঁটি সে বাঙালী।
দাঁড়ায়েছ পচিশের প্রান্তে আজি আসি',
শুভ হোক্ যাত্রা তব—জয়তু 'প্রবাসী'!

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বিজলি

শ্রী শ্রীধর শ্যামল

যবে কালবৈশাখীর ধূমল করাল কালো আঁখি
ধরারে বিস্মিত করি' গগনে সঘনে দেয় হানা'
অম্বরে ডম্বরু বাজে—কে গো তুমি চকিতে চমকি'
রুষে ওঠ দিকে দিকে প্রসারিয়া শতদীর্ঘফণা?
স্বনে' ওঠে নিঃস্ব বায়ু, বিশ্ব ব্যাপি' উড়ে যায় ধূলি,
তিমির-মগন ধরা—অবলুপ্ত গ্রহ চন্দ্র তারা,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ওঠে তরুশীর্ষ সঘনে আন্দোলি',
সহসা পান্থের প্রাণে স্তব্ধ হ'য়ে যায় রক্ত-ধারা।
জ্বলে ওঠ আরবার—জ্বলে ওঠ হে প্রলয়ঙ্করী!
ঝঞ্ঝার সঙ্গিনী তুমি—হে ভীষণা কালের কিঙ্করী!
হানো-হানো দিকে দিকে দিগন্ত-প্রসারী মহাভীতি;
নিবিড়-জলদ-জালে তীব্র-করোজ্জ্বল তব জ্যোতিঃ।
যেথা মিথ্যা অত্যাচার রুদ্র তেজে ক্রুদ্ধ রূপ ধরে,
দুর্ব্বল যেথায় পড়ে প্রবলের বিরাট্ খর্পরে,
যেথা নীচ স্বার্থ বসে' নিজ হাতে অন্ধকূপ গড়ে,
ঘৃণা যেথা বাঁধা আছে আপনার রচিত নিগড়ে,
মহিমার মহাস্রোত পঙ্কিল করে কে মূঢ়মতি,
সেথায় ঝলকি' যাক্—তীব্র-করোজ্জ্বলে তব জ্যোতিঃ
হানো হানো আরবার রুদ্র তেজ কালের কিঙ্করী,
ঝঞ্ঝার সঙ্গিনী তুমি, হে ভীষণা হে প্রলয়ঙ্করী!

পূর্ব্ববঙ্গে বক্তৃতা *

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ময়মনসিংহ ম্যুনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর

ময়মনসিংহের পুরবাসিগণ, আজ সর্ব্বপ্রথমে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি এই ক্লান্ত দেহে আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে' এখানে এসেছি। অনেক দিন পূর্ব্বেই আমার আসা উচিত ছিল—যখন আমার শক্তি ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, যৌবন ছিল, সেই সময়ে এখানে আসার হয়তো প্রয়োজন ছিল—সে-প্রয়োজন এখানকার জন্যে নয়, আমার নিজেরই জন্যে। নিজের শক্তিকে, সেবাকে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত করার যে-সার্থকতা, সে কেবল দেশের জন্যে নয়, যে সেবা করে তার নিজের পরিপূর্ণতার জন্যে। আমরা ছেলেবেলা থেকে কলকাতায় মানুষ এবং সেই দক্ষিণ বঙ্গে জীবনের অধিকাংশ দিন কাটিয়েছি। বাংলার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি আমার ধ্যানের মধ্যে ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর করবার অবকাশ পাইনি। আজকে বহু পরে বহু বিলম্বে আপনাদের দ্বারে আমি সমাগত।

আমার শক্তির অভাব আপনাদের জানিয়েছি। এই-জন্যে আজ যে আমার অর্ঘ্য এনে দেশমাতার এই পূর্ব্ব-বঙ্গীয় পীঠস্থানে দেবো, তাঁর কাছে পূজা নিবেদন করব, সে-সম্বল আমার মধ্যে নেই। কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্যে এসেছি আপনাদের সঙ্গে পরিচয় লাভ করব বলে'। কিন্তু পরিচয় সহজে হয় না। যথার্থ পরিচয় সেবা ও ত্যাগের দ্বারাই সম্ভব, কেবল চোখের দেখায় বা বাক্য-বিনিময়ে হয় না। যখন তীর্থদর্শন সহজ ছিল না, যখন সমস্ত পথ পায়ে পায়ে চলতে হ'ত, যথেষ্ট কষ্টস্বীকার করে' যাত্রীরা তীর্থে যেত, তখনই কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা তীর্থপর্য্যটনের সফলতা লাভ হ'ত। যখন অল্প সময়ে কর্ত্তব্য শেষ করে' ফিরে' আসার কোনো সুগম পথ ছিল না, তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল তখনই মিলত। এখন যেমন দ্রুতবেগে আসা তেমনি দ্রুতবেগে ফিরে যাওয়া যায়; কেবল ক্ষণিক চোখে-দেখার মিলন ঘটে, কিন্তু পরিচয় ঘটে না, যে-পরিচয় কর্ম্ম-সাধনার যোগেই সম্ভব। আমি আপনাদের বল্লুম যে, এই পূর্ব্ববঙ্গের শ্যামলক্ষেত্রে আমাদের বঙ্গমাতার একটি বিশেষ পীঠস্থানে আমি এসেছি। কিন্তু দেশের অধিষ্ঠাত্রীর দেবী মূর্ত্তি তো সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের চর্ম্ম-চক্ষে পড়ে তাঁর বাহ্য দারিদ্র্য, তাঁর আশু অপূর্ণতা। আমরা যারা জড়ভাবে অলসভাবে দেশে থাকি, যারা সেবায় উদাসীন, ত্যাগ করতে অসমর্থ, তাদের কাছে দেশের পূর্ণ মূর্ত্তি প্রকাশ পায় না। যখন নিষ্ঠার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে সেবায় ব্রতী হই তখনই আবরণ উন্মোচিত হয়—দেশের যে-ভবিষ্যৎকাল সম্পদে পূর্ণ, সৌন্দর্য্যে সরস, মহিমায় উজ্জ্বল, তার রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন আমাদের সেবায় কৃপণতা থাকে তখন কেবলমাত্র প্রাণ-ধারণের দ্বারা, ভোগের দ্বারা বর্ত্তমান কালটুকুর মধ্যেই বদ্ধ থাকি, ভাবীকালের রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, সেইজন্যে আমরা কর্ম্মে উৎসাহও পাই না। যে-কৃষক নিজের ক্ষেত্রে নিজে লাঙ্গল দেয়, ধান বোনে, যখন তার ক্ষেতে প্রথম অঙ্কুরের উদ্গম হয় তখন সে তাকে সামান্য তৃণ বলে' অবজ্ঞার চোখে দেখে না, সে-ই জানে এর মূল্য কত; তখন এই অপরিণত তৃণের মধ্যেই সে অনাগত কালের সফলতা দেখতে পায়, এই শ্যামল অঙ্কুরের মধ্যেই সে তার আনন্দিত ধ্যানের দৃষ্টিতে অঘ্রাণের ধানের সোনার রূপ প্রত্যক্ষ করে। তেমনি দেশের হিতসাধনায় যারা যথার্থভাবে আত্ম-সমর্পণ করে, তারাই ক্ষুদ্র আরম্ভের অসমাপ্তির মধ্যেই বৃহৎ পরিণতির ঐশ্বর্য্য স্পষ্ট দেখতে পায়, অকর্ম্মা সমালোচকদের পরিহাস-বাক্যের নিরন্তর অভিঘাতেও তাদের শ্রদ্ধা অভিভূত হয় না। তারা

* এই বক্তৃতাগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংশোধন করিয়া ও স্থানে স্থানে স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন।

অপূর্ণের মধ্যেই সম্পূর্ণকে দেখে বলে'ই ন বিভেতি কদাচন। আমরা যখন দেশের বর্ত্তমানকালীন ম্লান রূপকেই একান্ত বলে' জানি তখন কেবল কর্ম্মহীন নিজের অশ্রদ্ধার অন্ধতাই প্রকাশ করি। দেশের যে-রূপ শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে, কর্ম্ম ও ত্যাগের ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, এই মুহূর্ত্তেই যেন একান্ত বিশ্বাসে তা আমরা দেখতে পাই। যদি ধ্যানের দৃষ্টিতে দেশের পূর্ণ রূপ দেখতে পারি তবে আর বিলম্ব হবে না, দৃঢ় বিশ্বাসের আলোতে সমস্ত মোহ-আবরণ কেটে যাবে, অতি সত্বর সেইসকল ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু আমরা ত বিশ্বাস করতে পারি না। তাই ত আমরা ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষে জর্জ্জরিত; এত আত্মাবমাননা ত সহ্য হবে না। বিরোধের বিষে আমাদের সকল হিত-কর্ম্মই যে বিমষ হ'য়ে শুকিয়ে মরছে। কেউ ত কখনো দেব-মন্দিরে ঝগড়াঝাঁটি করবার কথা মনেও করতে পারে না। সেখানে সবাই যান শুচিবস্ত্র পরিধান করে', পবিত্র দেহমন নিয়ে। কেননা দেবতার'পরে শ্রদ্ধা আছে। দেশের সত্যকে প্রাণ মন দিয়ে শ্রদ্ধা করিনে বলে'ই দেশের পূজা-বেদীর সাম্‌নে আত্মাভিমানের দ্বারা আমরা পরস্পরকে আঘাত করি। ভক্তি-বিশ্বাসের অনুভূতির দ্বারা বিস্তৃত কালে, দেশের যে-পরিচয় তার থেকে বঞ্চিত আছি বলে'ই আমাদের পূজা অহমিকা দ্বারা কলুষিত হচ্ছে। সুদূর অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত যে বিরাট্ মন্দিরের প্রাঙ্গণ প্রসারিত তারই মাঝখানে দেশের সত্য মূর্ত্তি আমাদের ধ্যানে নির্ম্মল হোক, উজ্জ্বল হোক। যখন একনিষ্ঠ কর্ম্মের দ্বারা আত্মনিবেদন করতে পারব, শ্রদ্ধানত চিত্তে আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দেশের প্রতি নিবেদন করতে পারব, তখন তাঁর শক্তিশালিনী মূর্ত্তি প্রত্যেকের মধ্যে আবির্ভূত হ'য়ে শক্তিসঞ্চার করবে, প্রত্যেকের দৈন্য দূর করবে। রেল-গাড়ীর বাতায়ন থেকে আমি দেখ্‌ছিলুম দৈন্যপীড়িত দেশ নয়, কলহ-মুখরিত দেশ নয়—ভাবীকালের মধ্যে যে-দেশ, রথে চড়ে' যে-দেশ আস্‌ছেন, আমি দেখ্‌ছিলুম তাঁকে। আমরা যেন তাঁর জন্যে অর্ঘ্য নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকি, তাঁর স্তব-মন্ত্র গুঞ্জরিত হ'তে থাক্, আমরা করজোড়ে উদয়াচলের দিকে চেয়ে থাকি। তাই আমি এই সুন্দরী পূর্ব্ব বঙ্গভূমির মধুকর-গুঞ্জিত, নবচূতমুকুলশোভিত মূর্ত্তির মধ্যে দেশের উজ্জ্বল মহিমা ধ্যানে দেখ্‌তে চেষ্টা করছিলুম। সেই পূর্ণ পরিচয় কি করে' আপনাদের কাছে পরিস্ফুট করতে পারব তাই আমি ভাব্‌ছিলুম। আমার কণ্ঠে, আমার বাণীতে কি অত জোর আছে? শুধু আছে আমার ইচ্ছা! সেই ধ্যানের রূপ দেখতে আপনাদের আমি আহ্বান করছি। কিন্তু স্বাস্থ্য নেই, যৌবনের তেজ নেই, কেবল বিশ্বাস আছে। আজ দেশের পরমাকাশ মুখরিত করে' নূতন যুগের সঙ্গীত যে মহাপ্রত্যাশার ভূমিকা রচনা করেছে তারই মধ্যে স্বদেশের ভাবী সফলতা উপলব্ধি করে' আমার জীবন অবসান হবে—এই আমার শেষ কামনা।

* * *

ময়মনসিংহ জনসাধারণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর

মহারাজ, ময়মনসিংহের পুরবাসিগণ ও পুরমহিলাগণ, আমি আজ আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে' আপনাদের প্রীতি-সুধা সম্ভোগ করছি।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলুম—তুমি কেন আজকের দিনে পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণের জন্যে এসেছ, কোন্ সাহসে তুমি বের হ'য়েছ? কি করতে পার তুমি তোমার হীন-শক্তিতে? এপ্রশ্নের আমার একটা খুবই সহজ উত্তর আছে। তা এই যে, আমি কোনো কাজের দাবী রাখিনে। যদি আমি কোনোদিন আনন্দ দিয়ে থাকি আমার সাহিত্য আমার কাব্যের মধ্য দিয়ে, তবে তারই প্রতিদান-স্বরূপ আপনাদের প্রীতির অর্ঘ্য সংগ্রহ করে' যেতে পারি। বাংলা দেশ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করবার পূর্ব্বে এটুকু পুরস্কার যদি নিয়ে যেতে পারি তো সেই আমার সার্থকতা। আমি কোনো কর্ম্ম করেছি কি না একথার দরকার নেই। আপনাদের এআতিথ্যের বরমালাই আমার যথেষ্ট। এ খুব সহজ উত্তর, কিন্তু এ উত্তর সম্পূর্ণ সত্য নয়।

আরেক দিন এসেছিল যে-দিন সমস্ত বাংলা দেশে মানবের [illegible] ও উদ্বোধিত হয়েছিল। সে-দিন আমিও তার মধ্যে ছিলুম—শুধু কবিরূপে নয়, আমি গান রচনা করেছিলুম, কাব্য রচনা করেছিলুম, বাংলা দেশে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল সাহিত্যে তারই রূপ প্রকাশ করে' দেশকে কিছু দিয়েছিলুম, কিন্তু কেবলমাত্র সেই-

টুকুই আমার কাজ নয়। একটি কথা সেদিন আমি অনুভব করেছিলুম, দেশের কাছে তা বলে'ও ছিলাম—সে-কথাটি এই যে, যখন সমস্ত দেশের হৃদয় উদ্বোধিত হ'য়ে উঠে তখন কেবলমাত্র ভাব-সম্ভোগের দ্বারা সেই মহা মুহূর্ত্তগুলি সমাপ্ত করে' দেওয়ার মত অপব্যয় আর কিছু নেই। যখন বর্ষা নাবে তখন কেবলমাত্র বর্ষণের স্নিগ্ধ আনন্দ-সম্ভোগই যথেষ্ট নয়, সে-বর্ষণ কৃষককে ডাক দিয়ে বলে—বৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে। সেদিন আমি একথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম—আপনাদের মধ্যে অনেকের তা মনে থাকতে পারে অথবা বিস্মৃতও হ'য়ে থাকতে পারেন।—'কাজের সময় এসেছে, ভাবাবেগে চিত্ত অনুকূল হয়েছে। এখনই কর্ম্ম করবার উপযুক্ত সময়। কেবলমাত্র ভাবাবেগ স্থায়ী হ'তে পারে না। ক্ষণকালের যে-ভাবাবেগ তা দেশের সকলের চিত্তকে, সকলের হৃদয়কে সম্মিলিত করতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেকের শক্তি ব্যাপ্ত হ'লে পরই কর্ম্মের সূত্রদ্বারা যথার্থ ঐক্য স্থাপিত হয়। কর্ম্মের দিন এসেছে।'—এই কথা আমি বলেছিলুম সেদিন। কিরূপ কর্ম্ম? বাংলার পল্লী-সব আজ নিরন্ন, নিরানন্দ, তাদের স্বাস্থ্য দূর হ'য়ে গেছে—আমাদের তপস্যা করতে হবে সেই পল্লীতে নতুন প্রাণ আনবার জন্যে, সেই কাজে আমাদের ব্রতী হ'তে হবে। একথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা আমি করেছিলুম, শুধু কাব্যে ভাব প্রকাশ করিনি। কিন্তু দেশ সে-কথা স্বীকার করে' নেয়নি সেদিন। আমি যে তখন কেবলমাত্র ভাবুকতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়েছিলাম একথা সত্য নয়। তারও আগে প্রায় ত্রিশ বছর আগেই আমি পল্লীর কর্ম্মের কথা বলেছিলুম—যে-পল্লী বাংলা দেশের প্রাণ-নিকেতন সেইখানেই রয়েছে কর্ম্মের যথার্থ নক্ষত্র, সেইখানেই কর্ম্মের সার্থকতা লাভ হয়। এই কাজের কথা একদিন আমি বলেছিলুম, নিজে তার কিছু সূত্রপাতও করেছিলুম। যখন বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া বইতে আরম্ভ করে তখন কেবলমাত্র পাখীর গানই যথেষ্ট নয়। অরণ্যের প্রত্যেকটি গাছ তখন নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে, তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ উৎসর্গ করে' দেয়। সেই বিচিত্র প্রকাশেই বসন্তের উৎসব পরিপূর্ণ হয়—সেই শক্তি-অভিব্যক্তির দ্বারাই সমস্ত অরণ্য একটি আনন্দের ঐক্য লাভ করে, পূর্ণতায় ঐক্য সাধিত হয়। পাতা যখন ঝরে' যায়, বৃক্ষ যখন আধমরা হ'য়ে পড়ে, তখন প্রত্যেক গাছ আপন দীনতায় স্বতন্ত্র থাকে—কিন্তু যখন তাদের মধ্যে প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় তখন নব পুষ্প নব কিশলয়ের বিকাশে উৎসবের মধ্যে সব এক হ'য়ে যায়। আমাদের জাতীয় ঐক্যসাধনেরও সেই উপায়, সেই একমাত্র পন্থা। যদি আনন্দের দক্ষিণ হাওয়া সকলের অন্তরের মধ্যে এক বাণী উদ্বোধিত করে তা হ'লেও যতক্ষণ সেই উদ্বোধনের বাণী আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত না করে ততক্ষণ উৎসব পূর্ণ হ'তে পারে না। প্রকৃতির মধ্যে এই যে উৎসবের কথা বললুম তা কর্ম্মের উৎসব। আম-গাছ যে আপনার মঞ্জরী বিকশিত করে তা তার সমস্ত মজ্জা থেকে, প্রাণের সমস্ত চেষ্টা দিয়ে। কর্ম্মের এই চাঞ্চল্য বসন্তকালে পূর্ণ হয়। মানবীয় জাতিও এই কর্ম্মশক্তির পূর্ণরূপ দেখতে পাই। বসন্তকালে সমস্ত অরণ্য এক হ'য়ে যায় বিচিত্র সৌন্দর্য্যের তানে, আনন্দের সঙ্গীতে। তেম্নি আমরা দেখতে পাই সব বড় বড় দেশে তাদের যে ঐক্য তা বাইরের ঐক্য নয়, ভাবের ঐক্য নয়—বিচিত্র কর্ম্মের মধ্যে তাদের ঐক্য। জাতির সকলকে বলদান, ধনদান, জ্ঞানদান, স্বাস্থ্যদান—এই বিচিত্র কর্ম্ম-চেষ্টার সমন্বয় হয়েছে যেখানে সেইখানেই যথার্থ ঐক্যের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কবির গানে নয়, সাহিত্যের রসে নয়—কর্ম্মের বিচিত্র ক্ষেত্র যখন সচেষ্ট হয় তখনই সমস্ত দেশের লোক এক হয়। আমাদের দেশও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছে। বক্তৃতার মিথ্যা উত্তেজনায়, শুধু বাক্যে, শুধু মুখে ভাই বললে ঐক্য স্থাপিত হয় না। ঐক্য কর্ম্মের মধ্যে। এই কথাই আমি বলেছিলুম, যখন মনে হয়েছিল যে, সময় এসেছে। সময় এসেছিল, সে শুভ সময় চলে' গিয়েছে। তখন আমার যৌবন ছিল; সব বিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়িয়েই আমি একথা বলেছিলুম, কেউ গ্রহণ করলে বা না করলে তা ভ্রূক্ষেপ না করে'।

আবার দিন এসেছে—দেশের লোকের চিত্তে জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অনুকূল অবসর এসেছে—এমন সময়ে বয়সের ভগ্নাবশেষের অন্তরালে কি করে' চুপ করে' বসে' থাকি? আবার স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে যে, যদি মনের মধ্যে যথার্থই আনন্দ উপলব্ধি করে'

থাক তবে কেবলমাত্র বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা ভাবরস-সম্ভোগে তা অপব্যয় কোরো না। যে অনুকূল সময় এসেছে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না তোমার দ্বার থেকে, সকলে মিলে সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হও। সম্মিলিত দেশের সৃষ্টির মধ্যেই দেশের আত্মা তার গৌরবের স্থান লাভ করেন। বিশ্ব-বিধাতা বিশ্বকর্ম্মা আপনার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত কোথায় ?—তাঁর বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে। তেম্‌নি দেশের আত্মার স্থানও দেশের নব সৃষ্টির কাজের মধ্যে, ভাব-সম্ভোগে নয়। সেই বিচিত্র সৃষ্টির শক্তি কি জেগেছে আজ আমাদের মধ্যে—যে-শক্তিতে দেশের অন্ন-দৈন্য, স্বাস্থ্যের দৈন্য, জ্ঞানের দৈন্য সব ঘুচে যাবে ? বসন্তকালের অরণ্যে যেমন তরুলতা সব ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হ'য়ে উঠে তেম্‌নি কর্ম্মের বিকাশে সমস্ত দেশে একটি বিচিত্র রূপ ব্যাপ্ত হ'য়ে যায়। সেই লক্ষণ কি দেখ্‌তে পাই আমরা ? আমি তো সায় পাইনে অন্তরে। ভাবাবেগ আছে, কিন্তু তার মধ্যে কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা অতি অল্প। কিছু কাজ যে হয়নি তা বল্‌চিনে, কিন্তু সে বড় অল্প। আবার সেজন্যে পুরোনো কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে। কিন্তু আমার সময় গিয়েছে, স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে, আর অধিক দিন বাকী নেই আমার। তথাপি আমি বেরিয়েছি—পুরস্কারের জন্যে নয়, বরমাল্য নেবার জন্যে নয়, করতালি লাভের জন্যে নয়, সম্মানের ট্যাক্স আদায় কর্‌বার জন্যে নয়—দেশকে আপনারা জান্‌তে চাচ্ছেন কর্ম্মদ্বারা, এইটুকু দেখে যাব আমি। জীবনের অবসান-কালে আমি দেখে যেতে চাই যে, সর্ব্বত্র কর্ম্মশক্তি উদ্যত হয়েছে। তা যদি না দেখ্‌তে পাই তবে জান্‌ব যে, আমাদের যে-ভাবাবেগ তা সত্য নয়। যেখানে চিত্তের সত্য উদ্বোধন হয়, সেখানে সত্য কর্ম্ম আপনি প্রকাশ পায়। দেশের মধ্যে কর্ম্ম না দেখে আমাদের চিত্ত বিষণ্ণ হয়েছে। মরুভূমির মধ্যে আমরা কি দেখ্‌তে পাই ? খর্ব্বাকৃতি কাঁটাগাছ, মনসা গাছ দূরে দূরে ছড়ানো রয়েছে; তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, আছে বিরুদ্ধ রূপ আর চিত্তের দৈন্য। মরুভূমিতে প্রাণশক্তি কর্ম্ম-চেষ্টাকে বড় করে' তুল্‌তে পারেনি, সমস্ত উদ্ভিদ্ সেখানে দৈন্যে কণ্টকিত। এখনো কি তাই দেখ্‌ব আমাদের মধ্যে ? বসন্তের দক্ষিণ সমীরণ কি বইল না ? মরুভূমির যে প্রাণের দৈন্য, বিরোধে বিদ্বেষে ভেদে বিভেদে সব কণ্টকিত তাই দেখ্‌ব এখনো ? তা হ'লে যে সব ব্যর্থ হবে, মরুভূমিতে বারি-সেচন যেমন ব্যর্থ হয়। নেব আমরা এই শুভদিনকে, কেবল হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়—কর্ম্মের মধ্যে চারদিকে তাকে বেঁধে নেব, কখনো যেতে দেব না—এই আমাদের পণ হোক। আমার কাজের পরিচয় দেবার অবকাশ নেই, কিন্তু অল্প কাজের মধ্যে সফলতার যে লক্ষণ দেখেছি, তাতে যে-আনন্দ পেয়েছি সেই আনন্দ আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতে চাই। পূর্ব্বকালে এমন একদিন ছিল যখন আমাদের গ্রামে গ্রামে প্রাণের প্রাচুর্য্য পূর্ণরূপে ছিল। গ্রামে গ্রামে জলাশয় খনন, অতিথিশালা স্থাপন, নানা উৎসবের আনন্দ, শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা—এ সবই ছিল। সেই ছিল প্রাণের লক্ষণ। আজকের দিনে কেন জল দূষিত হ'য়ে গেছে, শুষ্ক হ'য়ে গেছে ? কেন তৃষ্ণার্ত্তের কান্না গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ ভেদ করে' উঠে ? কেন এত ক্ষুধা, অজ্ঞানতা, মারী ? সমস্ত দেশের স্বাভাবিক প্রাণচেষ্টার গতি রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। যেমন আমরা দেখ্‌তে পাই, যেখানে নদীস্রোতের প্রবাহ ছিল, সেখানে নদী যদি শুষ্ক হ'য়ে যায় বা স্রোত অন্যদিকে চলে' যায় তবে দুকূল মারীতে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হ'য়ে পড়ে। তেম্‌নি একসময়ে পল্লীর হৃদয়ে যে-প্রাণশক্তি অজস্র ধারায় শাখায় প্রশাখায় প্রবাহিত হ'ত আজ তা নির্জীব হ'য়ে গেছে, এইজন্যেই ফসল ফল্‌ছে না। দেশবিদেশের অতিথিরা ফিরে যাচ্ছেন আমাদের দৈন্যকে উপহাস করে'। চারদিকে এইজন্যেই বিভীষিকা দেখ্‌ছি। যদি সে-দিন না ফেরাতে পারি, তবে সহরের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে, নানা অনুষ্ঠান করে' কিছু ফল হবে না। প্রাণের ক্ষেত্র যেখানে, জাতি যেখানে জন্মলাভ করেছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় যেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো—তা হ'লেই আমি বিশ্বাস করি, সমস্ত সমস্যা দূর হবে। যখন কোনো রোগীর গায়ে ব্যথা, ফোড়া প্রভৃতি নানারকমের লক্ষণ দেখা যায় তখন রোগের প্রত্যেকটি লক্ষণকে একে একে দূর করা যায় না। দেহের সমস্ত রক্ত দূষিত হ'লেই নানা লক্ষণ দেখা দেয়। একটা সম্প্রদায়ের ভিতরে যদি বিরোধ, ভেদ, বিদ্বেষ প্রভৃতি রোগ-লক্ষণ দেখা দেয়, তবে তাদের বাইরে থেকে স্বতন্ত্র আকারে দূর করা যায় না। দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করে' স্বাস্থ্য

সঞ্চার করতে হবে, তবেই সমস্ত সমাজ-দেহের বিরোধ, বিদ্বেষ, দৈন্য, দুর্গতি সব দূর হ'য়ে যাবে। এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে আমি আজকে এসেছি।' অনুকূল সময় এসেছে, বসন্ত-সমীরণ বইতে আরম্ভ হ'য়েছে, আমি অনুভব করছি যে, মনে করিয়ে দেবার দিন এসেছে। দ্বিতীয় বার যেন এ সময় আমরা নষ্ট না করি, যথার্থ কর্ম্মে যেন আমরা ব্রতী হই। দারিদ্র্যের মাঝখানে, অপমানের মাঝখানে, দেশের তৃষ্ণার মাঝখানে প্রত্যক্ষভাবে সকলে মিলে কাজ করতে হবে। এর বেশী কিছু বলতে চাইনে আজ। কালকে হয়তো আপনারা একথা ভুলেও যেতে পারেন, অথবা বলতে পারেন যে, আমি খুব ভালো করে' বলেছি। এইটুকুই যদি আমার পুরস্কার হয় তবে আমি বঞ্চিত হ'লাম। আমি আজ যা বলছি তা আমরা প্রাণ দিয়ে, আয়ত্ত করে'। আমার যে স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু তাই আমি দিচ্ছি আমার প্রতি নিশ্বাসে। এর পরিবর্ত্তে আমি চাই সত্যিকার কর্ম্মী। পল্লীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূর করবার জন্যে যারা ব্রতী, তাদের পাশে আমি আপনাদের আহ্বান করছি। তাদের আপনারা একলা ফেলে রাখবেন না, অসহায় করে' রাখবেন না, তাদের আনুকূল্য করুন। কেবল বাক্য-রচনায় আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত হ'লে, আমাকে যতই প্রশংসা করুন, বরমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশের জন্যে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখের কথায় আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগের ভিক্ষা। তা যদি না দিতে পারেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না, আপনাদের উত্তেজনা যতই বড় হোক না কেন। আমার স্বল্পাবশিষ্ট নিশ্বাস ব্যয় করে' একথা বলছি, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, স্তুতিলাভের জন্যে কিছু বলছি না—দেশের জন্যে আমার ভিক্ষাপাত্র ভরে' দিন ত্যাগ দিয়ে, কর্ম্মশক্তি দিয়ে। এই বলে' আজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করি।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রগণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর

শিক্ষার ক্ষেত্রে

শান্তিনিকেতনে আমি আমার ছাত্রদের মধ্যে বিশ বছর বাস করছি, সেখানে আমি তাদের সঙ্গের সঙ্গী। আমাদের মধ্যে যে কেবল গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ তা নয়। সম্মানের যে-দূরত্ব তার উপর দাঁড়িয়ে আমি কাজ করিনি, বয়স্যভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চেষ্টা করেছি। কেননা আমার বিশ্বাস, অন্তরে তাদের সমবয়সী না হ'তে পারলে তাদের কিছু দিতে পারা যায় না। তেম্নি করে' তোমাদের খুব কাছে যেতে যদি আজ পারতুম, তোমরা এখানে যে ছাত্রজীবন বহন করছ যদি তোমাদের শিক্ষক হ'য়েও সে-জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতে পারতুম, তা হ'লেই যথার্থ তোমাদের কাছে আসতুম।

আমার বয়স বেশী হ'লেও মনে কোরো না যে, আমি সাবেককালের দরজা থেকে তোমাদের ওপরে বাক্যবর্ষণ করছি। আমার প্রাচীন বয়স আধুনিককালের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। তোমরা যদি আমার কবিতা পাঠ কর তা হ'লে দেখতে পাবে, আমি তারুণ্যের কবি, আমার বাণী এই নবযুগেরই বাণী; জীর্ণকে, অর্দ্ধমৃতকে আঁকড়ে ধরে' অতীতের দিকে উজানে পাড়ি দিতে আমি কখনো বলিনে। তোমরা যারা যুবক তাদের মধ্যে যৌবনের সাহস হোক, যৌবনের যা ধর্ম্ম—নতুনের পরীক্ষা দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, দুঃসাহসের ভিতর দিয়ে নিজের বীর্য্য পরীক্ষা করা, তাই তোমাদের হোক্। নির্জ্জীব সংস্কারের জালে নিজের জীবনকে ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা, এ যেন তোমাদের না ঘটে, নব জীবনের চাঞ্চল্য তোমাদের মধ্যে আসুক। প্রাণের ক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষ-ভাবে তোমরা জ্ঞান আহরণ করো, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বিদ্যায়তনগুলি সংসারক্ষেত্রের বাইরে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে মানুষকে তার স্বস্থান থেকে উৎপাটিত করে' এনে খাঁচার মধ্যে পাখীকে যেমন করে' রাখা হয় তেমনি করে' রেখে শিক্ষার বাঁধা খোরাক দেওয়া

লাগল। তার পর কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ ডান হাতটা শূন্যে একবার নেড়েই হাত পেতে বললে—এই নাও—

হাতে একটা সন্দেশ।···

আমি ওর দিকে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে আছি দেখে বললে—আর একটা খাবে? এই নাও।

হাত যখন ওঠালে, আমি তখন ভাল ক'রে চেয়েছিলাম, হাতে কিছু ছিল না। শূন্যে হাতখানা বার দুই নেড়ে আমার সামনে যখন পাতলে তখন হাতে আর একটা সন্দেশ। অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটার! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল কিন্তু আমি আর নড়লাম না সেখান থেকে।

লোকটা অনেক গল্প করলে। বললে—আমি গুরুর দর্শন পাই কাশীতে। সে অনেক কথা বাবা। তোমার কাছে বলতে কি আমি বাঘ হ'তে পারি, কুমীর হ'তে পারি। মন্ত্রপড়া জল রেখে দেবো, তার পর আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাঘ কি কুমীর হয়ে যাব—আর একটা পাত্রে জল থাক্‌বে, সেটা ছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবো। সাতক্ষীরেতে ক'রে দেখিয়েছিলাম, হাকিম উকিল মোক্তার সব উপস্থিত সেখানে—গিয়ে জিগ্যেস্ ক'রে আস্‌তে পার সত্যি না মিথ্যে। আমার নাম চৌধুরী-ঠাকুর—গিয়ে নাম করো।

আমি অবাক হয়ে চৌধুরী-ঠাকুরের কথা শুন্‌ছিলাম। এসব কথা আমার অবিশ্বাস হ'ত যদি-না এই মাত্র ওকে খালি-হাতে সন্দেশ আন্‌তে না-দেখতুম। জিগ্যেস্ করলাম—আপনি এখন কি কলকাতায় যাচ্ছেন?

—না বাবা। মুরশিদাবাদ জেলায় একটা গাঁয়ে একটি চাঁড়ালের মেয়ে আছে, তার অদ্ভুত সব ক্ষমতা। খাগড়াঘাট থেকে কোশ-দুই তফাতে। তার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে বেরিয়েচি।

আমি চাকুরি-বাকুরী খুঁজে নেওয়ার কথা সব ভুলে গেলাম। বললাম—আমায় নিয়ে যাবেন? অবিশ্যি যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চৌধুরী-ঠাকুর কি সহজে রাজী হন, অতিকষ্টে মত করালুম। তার পর মেসে ফিরে জিনিষপত্র নিয়ে এলাম। চৌধুরী-ঠাকুর বললেন—এক কাজ করা যাক্ এস বাবা। আমার হাতে রেলভাড়ার টাকা নেই, এস হাটা যাক্।

আমি বললাম—তা কেন? আমার কাছে টাকা আছে, দু-জনের রেলভাড়া হয়ে যাবে।

চাঁড়াল মেয়েটির কি ক্ষমতা আছে দেখ্‌বার আগ্রহে আমি অধীর হয়ে উঠেচি।

খাগ্‌ড়াঘাট ষ্টেশনে পৌছতে বেলা গেল। ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে একটা ছোট মুদির দোকান। সেখানে যখন পৌছেচি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দোকানের সাম্‌নে বটতলায় আমরা আশ্রয় নিলাম। রাত্রে শোবার সময় চৌধুরী-ঠাকুর বললেন, আমার এই দুটো টাকা রেখে দাও গে তোমার কাছে! আজকাল আবার হয়েচে চোর-ছেঁচড়ের উৎপাত। তোমার নিজের টাকা সাবধানে রেখেচ তো?

চৌধুরী-ঠাকুরের ভয় দেখে আমার কৌতুক হ'ল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ ত হাজার হোক্, পথে বেরুলেই ভয়ে অস্থির। বললাম কোন ভয় নেই, দিন্ আমাকে। এই দেখুন ঘড়ির পকেটে আমার টাকা রেখেছি, বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না, এখানে রাখা সব চেয়ে সেফ্—

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙলো। উঠে দেখি চৌধুরী-ঠাকুর নেই, ঘড়ির পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার টাকাও নেই, চৌধুরী-ঠাকুরের গচ্ছিত দুটা টাকাও নেই, নীচের পকেটে পাঁচ-ছ আনার খুচরা পয়সা ছিল তাও নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করাও দেখচি বিষম মুস্কিল। ঘণ্টা-খানেক কাট্‌ল, আমি সেই বটতলাতে বসেই আছি। হাতে নাই একটি পয়সা, আচ্ছা বিপদে তো ফেলে গেল লোকটা! মুদিটি আমার অবস্থা দেখে শুনে বললে—আমি চাল ডাল দিচ্ছি, আপনি রেঁধে খান বাবু। ভদ্রলোকের ছেলে, এমন জুয়োচোরের পাল্লায় পড়লেন কি ক'রে? দামের জন্যে ভাব্‌বেন না, হাতে হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষ দেখ্‌লে চিন্‌তে দেরি হয় না, আপনি যা দরকার নিন্ এখান থেকে। ভাগ্যিস্ আপনার সুটকেস্‌টা নিয়ে যায় নি?

দুপুরের পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিম মুখে চল্‌লাম। আমার সুট্‌কেসে একটা ভাল টর্চ্চলাইট ছিল, মুদিকে ওর চাল-ডালের বদলে দিতে গেলাম, কিছুতে নিলে না। ক্রমশঃ

রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ইং ১৮৮৯ সাল। সে বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির পর আমি দ্বিতীয় বার কটক কলেজে গেছি। দেখি, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের সঙ্গে এক সৌম্যমূর্তি শাদা-পেনটুলেন-চাপকান-পরা এক ছাত্র আমার ব্যাখ্যান শুনছে। এ-পাশে সে-পাশে দৃষ্টি নাই, ধীর ও স্থির। বালকটি কে ?

পরে শুনলাম ময়ূরভঞ্জের ভাবী রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও।

রাজপুত্রই বটে। সুকুমার মুখ আভিজাত্যের অভিমানে মণ্ডিত হয়েছে। মৃদুভাষী, অল্পভাষী, বিনীত, নম্র। কেবল আমি নই, কলেজের অন্য শিক্ষকেরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

যিনি দু-তিন বছর পরে ময়ূরভঞ্জের রাজা হবেন, তাঁর সঙ্গে ভাব ক'রতে পারলে একটা-না-একটা ভাল চাকরি জুটবে। তাঁর সহপাঠীদের মনে এ চিন্তা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখতাম ব্যাখ্যানের অবকাশে শ্রীরাম ঘরের বাইরে এক আশুদগাছের তলায় দাঁড়িয়েছেন, সেই দু-তিনটি সহপাঠীর সঙ্গে কথা কইছেন, অন্য কোন ছাত্রকে দেখতে পেতাম না। হয়ত তারা কাছে যেতে সঙ্কুচিত হ'ত। আলাপ-বিমুখের কাছে কেহ যায় না।

ওড়িষ্যার বড় নদী, মহানদী। কটকের সাত-আট মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে এর এক শাখা বেরিয়েছে। এই শাখার নাম, কাঠজুড়ি। দক্ষিণে কাঠজুড়ি, উত্তরে মহানদী। এই দুই নদীর মধ্যে ত্রিকোণ ভূমিতে কটক। কলেজ কাঠজুড়ির নিকটে। আমার ও কলেজের অন্য শিক্ষকদের বাসা কলেজের কাছে ছিল। মহানদীর দিকে, কলেজ হ'তে প্রায় দুই মাইল দূরে, একটা গ্রামের নাম তুলসীপুর। সেখানে একটা কুঠীতে শ্রীরাম থাকতেন। গোবিন্দবাবু তাঁর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। তিনি শ্রীরামকে পুত্রবৎ চোখে চোখে রাখতেন। তাঁর শিক্ষার গুণেও শ্রীরামের স্বভাব মধুর হয়েছিল। তিনি বেশভূষায় আড়ম্বর আসতে দেন নি।

কলেজের বাইরে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা হ'ত না। এক দিন শুনলাম শ্রীরামকে বিলাত পাঠাবার কথা হ'চ্ছে। দৈবাৎ সেদিন ঘরের বাইরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, ইংরেজীতে, 'আপনার বিলাত যাবার কথা শুনছি। প্রজারা বিরক্ত হবে না?' তিনি উত্তর করেছিলেন, 'বিরক্ত হবার কারণ দেখি না। যদি কেহ হয়, বিলাত হ'তে ফিরে এলে সে কারণ পাবে না।' বুঝলাম, বালক বটে, বয়স আঠার বছর, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত ও পরিণামদর্শী। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে, বিশেষতঃ ওড়িষ্যায়, সমুদ্রযাত্রা ক'রলে জাতি-নাশের শঙ্কা ছিল।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বিলাত যাওয়া হয় নাই। ইং১৮৯০ সালে এফ-এ পাস হ'য়ে কলেজে বি-এ পড়তেও আসতে পারেন নি। দুই বৎসর পরে তাঁকে রাজ্যভার নিতে হবে, এখন রাজকর্ম শিখতে হবে, কলেজে পড়তে আসতে গেলে সে শিক্ষা হবে না। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা। তিনি সেখানে থেকে ইং১৮৯০ সালে জুন মাসে আমাকে এক পত্র লেখেন। এই আমাকে তাঁর প্রথম পত্র। তিনি লেখেন, তিনি বাড়ী বসে বি-এ পরীক্ষার জন্য প'ড়বার সংকল্প করেছেন, বিজ্ঞান শাখা প'ড়বেন। ভূতবিদ্যা (Physics) শিখতে কি কি যন্ত্র কিনতে হবে, তার একটা তালিকা চান। তাঁর এই সংকল্পে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম, এবং যন্ত্র-মূল্যপুস্তকে চিহ্নিত করে তালিকা পাঠিয়েছিলাম। দিন পনর পরে তিনি দ্বিতীয় পত্রে জানতে চান, আমি তাঁর কাছে যেতে পারব কিনা। নানা কারণে আমি সম্মত হ'তে পারিনি।

কটক কলেজে তখন মোহিনীমোহন ধর, এম-এ, বি-এল, গণিত-বিদ্যার 'লেকচারার' ছিলেন। তাঁর চাকরি বেশী দিন হয় নি। রাজা তাঁকে পত্র লেখেন, এবং মোহিনীবাবু কলেজের কর্ম ছেড়ে দিয়ে রাজার কাছে চলে যান। অক্টোবর মাসে রাজা আমাকে লেখেন, তিনি কতক

লাগল। তার পর কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ ডান হাতটা শূন্যে একবার নেড়েই হাত পেতে বললে—এই নাও—

হাতে একটা সন্দেশ।…

আমি ওর দিকে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে আছি দেখে বললে—আর একটা খাবে? এই নাও।

হাত যখন ওঠালে, আমি তখন ভাল ক'রে চেয়েছিলাম, হাতে কিছু ছিল না। শূন্যে হাতখানা বার দুই নেড়ে আমার সামনে যখন পাতলে তখন হাতে আর একটা সন্দেশ। অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটার! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল কিন্তু আমি আর নড়লাম না সেখান থেকে।

লোকটা অনেক গল্প করলে। বললে—আমি গুরুর দর্শন পাই কাশীতে। সে অনেক কথা বাবা। তোমার কাছে বলতে কি আমি বাঘ হ'তে পারি, কুমীর হ'তে পারি। মন্ত্রপড়া জল রেখে দেবো, তার পর আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাঘ কি কুমীর হয়ে যাব—আর একটা পাত্রে জল থাকবে, সেটা ছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবো। সাতক্ষীরেতে ক'রে দেখিয়েছিলাম, হাকিম উকিল মোক্তার সব উপস্থিত সেখানে—গিয়ে জিগ্যেস্‌ ক'রে আস্‌তে পার সত্যি না মিথ্যে। আমার নাম চৌধুরী-ঠাকুর—গিয়ে নাম করো।

আমি অবাক হয়ে চৌধুরী-ঠাকুরের কথা শুনছিলাম। এসব কথা আমার অবিশ্বাস হ'ত যদি-না এই মাত্র ওকে খালি-হাতে সন্দেশ আন্‌তে না-দেখতুম। জিগ্যেস্‌ করলাম—আপনি এখন কি কলকাতায় যাচ্ছেন?

—না বাবা। মুরশিদাবাদ জেলায় একটা গাঁয়ে একটি চাঁড়ালের মেয়ে আছে, তার অদ্ভুত সব ক্ষমতা। খাগড়াঘাট থেকে কোশ-দুই তফাতে। তার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে বেরিয়েচি।

আমি চাকুরি-বাকুরী খুঁজে নেওয়ার কথা সব ভুলে গেলাম। বললাম—আমায় নিয়ে যাবেন? অবিশ্যি যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চৌধুরী-ঠাকুর কি সহজে রাজী হন, অতিকষ্টে মত করালুম। তার পর মেসে ফিরে জিনিবপত্র নিয়ে এলাম। চৌধুরী-ঠাকুর বললেন—এক কাজ করা যাক্‌ এস বাবা। আমার হাতে রেলভাড়ার টাকা নেই, এস হাঁটা যাক্‌।

আমি বললাম—তা কেন? আমার কাছে টাকা আছে, দু-জনের রেলভাড়া হয়ে যাবে।

চাঁড়াল মেয়েটির কি ক্ষমতা আছে দেখ্‌বার আগ্রহে আমি অধীর হয়ে উঠেচি।

খাগ্‌ড়াঘাট ষ্টেশনে পৌছতে বেলা গেল। ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে একটা ছোট মুদির দোকান। সেখানে যখন পৌছেচি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দোকানের সাম্‌নে বটতলায় আমরা আশ্রয় নিলাম। রাত্রে শোবার সময় চৌধুরী-ঠাকুর বললেন, আমার এই দুটো টাকা রেখে দাও গে তোমার কাছে! আজকাল আবার হয়েচে চোর-ছেঁচড়ের উৎপাত। তোমার নিজের টাকা সাবধানে রেখেচ তো?

চৌধুরী-ঠাকুরের ভয় দেখে আমার কৌতুক হ'ল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ ত হাজার হোক্‌, পথে বেরুলেই ভয়ে অস্থির। বললাম কোন ভয় নেই, দিন্‌ আমাকে। এই দেখুন ঘড়ির পকেটে আমার টাকা রেখেছি, বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না, এখানে রাখা সব চেয়ে সেফ্‌—

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙলো। উঠে দেখি চৌধুরী-ঠাকুর নেই, ঘড়ির পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার টাকাও নেই, চৌধুরী-ঠাকুরের গচ্ছিত দুটা টাকাও নেই, নীচের পকেটে পাঁচ-ছ আনার খুচরা পয়সা ছিল তাও নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করাও দেখচি বিষম মুস্কিল। ঘণ্টা-খানেক কাট্‌ল, আমি সেই বটতলাতে বসেই আছি। হাতে নাই একটি পয়সা, আচ্ছা বিপদে তো ফেলে গেল লোকটা! মুদিটি আমার অবস্থা দেখে শুনে বললে—আমি চাল ডাল দিচ্ছি, আপনি রেঁধে খান বাবু। ভদ্রলোকের ছেলে, এমন জুয়োচোরের পাল্লায় পড়লেন কি ক'রে? দামের জন্যে ভাব্‌বেন না, হাতে হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষ দেখ্‌লে চিন্‌তে দেরি হয় না, আপনি যা দরকার নিন্‌ এখান থেকে। ভাগ্যিস্‌ আপনার সুটকেস্‌টা নিয়ে যায় নি?

দুপুরের পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিম মুখে চল্‌লাম। আমার সুট্‌কেসে একটা ভাল টর্চ্চলাইট ছিল, মুদিকে ওর চাল-ডালের বদলে দিতে গেলাম, কিছুতে নিলে না। ক্রমশঃ

রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ইং ১৮৮৯ সাল। সে বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির পর আমি দ্বিতীয় বার কটক কলেজে গেছি। দেখি, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের সঙ্গে এক সৌম্যমূর্তি শাদা-পেনটুলেন-চাপকান-পরা এক ছাত্র আমার ব্যাখ্যান শুনছে। এ-পাশে সে-পাশে দৃষ্টি নাই, ধীর ও স্থির। বালকটি কে?

পরে শুনলাম ময়ূরভঞ্জের ভাবী রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও।

রাজপুত্রই বটে। সুকুমার মুখ আভিজাত্যের অভিমানে মণ্ডিত হয়েছে। মৃদুভাষী, অল্পভাষী, বিনীত, নম্র। কেবল আমি নই, কলেজের অন্য শিক্ষকেরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

যিনি দু-তিন বছর পরে ময়ূরভঞ্জের রাজা হবেন, তাঁর সঙ্গে ভাব ক'রতে পারলে একটা-না-একটা ভাল চাকরি জুটবে। তাঁর সহপাঠীদের মনে এ চিন্তা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখতাম ব্যাখ্যানের অবকাশে শ্রীরাম ঘরের বাইরে এক আশুদগাছের তলায় দাঁড়িয়েছেন, সেই দু-তিনটি সহপাঠীর সঙ্গে কথা কইছেন, অন্য কোন ছাত্রকে দেখতে পেতাম না। হয়ত তারা কাছে যেতে সঙ্কুচিত হ'ত। আলাপ-বিমুখের কাছে কেহ যায় না।

ওড়িষ্যার বড় নদী, মহানদী। কটকের সাত-আট মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে এর এক শাখা বেরিয়েছে। এই শাখার নাম, কাঠজুড়ি। দক্ষিণে কাঠজুড়ি, উত্তরে মহানদী। এই দুই নদীর মধ্যে ত্রিকোণ ভূমিতে কটক। কলেজ কাঠজুড়ির নিকটে। আমার ও কলেজের অন্য শিক্ষকদের বাসা কলেজের কাছে ছিল। মহানদীর দিকে, কলেজ হ'তে প্রায় দুই মাইল দূরে, একটা গ্রামের নাম তুলসীপুর। সেখানে একটা কুঠীতে শ্রীরাম থাকতেন। গোবিন্দবাবু তাঁর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। তিনি শ্রীরামকে পুত্রবৎ চোখে চোখে রাখতেন। তাঁর শিক্ষার গুণেও শ্রীরামের স্বভাব মধুর হয়েছিল। তিনি বেশভূষায় আড়ম্বর আসতে দেন নি।

কলেজের বাইরে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা হ'ত না। এক দিন শুনলাম শ্রীরামকে বিলাত পাঠাবার কথা হ'চ্ছে। দৈবাৎ সেদিন ঘরের বাইরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, ইংরেজীতে, 'আপনার বিলাত যাবার কথা শুনছি। প্রজারা বিরক্ত হবে না?' তিনি উত্তর করেছিলেন, 'বিরক্ত হবার কারণ দেখি না। যদি কেহ হয়, বিলাত হ'তে ফিরে এলে সে কারণ পাবে না।' বুঝলাম, বালক বটে, বয়স আঠার বছর, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত ও পরিণামদর্শী। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে, বিশেষতঃ ওড়িষ্যায়, সমুদ্রযাত্রা ক'রলে জাতি-নাশের শঙ্কা ছিল।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বিলাত যাওয়া হয় নাই। ইং১৮৯০ সালে এফ-এ পাস হ'য়ে কলেজে বি-এ পড়তেও আসতে পারেন নি। দুই বৎসর পরে তাঁকে রাজ্যভার নিতে হবে, এখন রাজকর্ম শিখতে হবে, কলেজে পড়তে আসতে গেলে সে শিক্ষা হবে না। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা। তিনি সেখানে থেকে ইং১৮৯০ সালে জুন মাসে আমাকে এক পত্র লেখেন। এই আমাকে তাঁর প্রথম পত্র। তিনি লেখেন, তিনি বাড়ী বসো বি-এ পরীক্ষার জন্য প'ড়বার সংকল্প করেছেন, বিজ্ঞান শাখা প'ড়বেন। ভূতবিদ্যা (Physics) শিখতে কি কি যন্ত্র কিনতে হবে, তার একটা তালিকা চান। তাঁর এই সংকল্পে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম, এবং যন্ত্র-মূল্যপুস্তকে চিহ্নিত করো তালিকা পাঠিয়েছিলাম। দিন পনর পরে তিনি দ্বিতীয় পত্রে জানতে চান, আমি তাঁর কাছে যেতে পারব কিনা। নানা কারণে আমি সম্মত হ'তে পারিনি।

কটক কলেজে তখন মোহিনীমোহন ধর, এম-এ, বি-এল, গণিত-বিদ্যার 'লেকচারার' ছিলেন। তাঁর চাকরি বেশী দিন হয় নি। রাজা তাঁকে পত্র লেখেন, এবং মোহিনীবাবু কলেজের কর্ম ছেড়ে দিয়ে রাজার কাছে চলো যান। অক্টোবর মাসে রাজা আমাকে লেখেন, তিনি কতক

দ্বিতীয় বাসলী-মন্দিরের সম্মুখে গ্রথিত শিলালিপি
[শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহীত আলোকচিত্র হইতে]

বামে খর্পর, খড়্গ ও খর্পর দুই-ই ধাতুনির্ম্মিত, প্রশান্ত হসিতবদনা, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, নূপুর-শোভিত চরণদ্বয়ের বামটি শয়ান এক অসুরের জঙ্ঘায় এবং অন্যটি অসুরের মস্তকোপরি স্থাপিত। দেবীর দুই পার্শ্বে দুই সহচরী।

দেঘরিয়া মহাশয়কে দেবীর স্তবের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্তবটি এইরূপ বলিলেন :—

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকে দৃঢ়ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপুরে
সিন্দুরাভাজিহ্বা বিকটিত-দশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাজয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গাং পিব পিব রুধিরং বাসলী পাতু সানাঃ॥

বর্ত্তমান মন্দিরের পশ্চিমাংশে একই বহিঃপ্রাচীরের অন্তর্ভুক্ত আর-একটি মন্দির দেখিলাম। শুনিলাম চণ্ডী-দাসের জীবদ্দশায় বাসলী দেবীর যে-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই প্রথম মন্দির ভাঙ্গিয়া যাইবার পর এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার চূড়ার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাওয়ায় এবং মন্দির ভিত্তি ফাটিয়া যাওয়ায় ইহা দেবীমূর্ত্তি ধারণের অনুপযোগী হইয়াছে। এই মন্দিরটি মরগড়ি প্রস্তর (সং মর্কট প্রস্তর, laterite stone) চতুষ্কোণ করিয়া কাটিয়া তাহাতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্দিরের ন্যায় এটিও পঞ্চচূড় ; গঠন-প্রণালী একই ধরণের, কেবল আকারে কিছু বড় মনে হইল। ঐ মন্দিরের পুরোভাগে মন্দির-গাত্র-সংলগ্ন একখানি প্রস্তরফলকে চারি-ছত্র লিখন দৃষ্ট হইল। তাহা পড়িবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফলকটি উচ্চে থাকায় পড়িতে পারিলাম না। আমরা সেখান হইতে ছাতনার রাজা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহের নিকট যাইলাম। রাজবাটী নিকটেই ; রাজা ও তাঁহার কয়েকজন কর্ম্মচারী আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাজবাড়ী হইতে বাঁশের এক সিঁড়ী লইয়া রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ সহ পুনরায় বাসলী-মন্দিরে গমন করিলাম এবং ঐ সিঁড়ীর সাহায্যে দ্বিতীয় মন্দির-গাত্র-সংলগ্ন প্রস্তর-ফলকের নিকটবর্ত্তী হইয়া ঐ লেখা পাঠ করিলাম। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি-মহাশয়ও এই বয়সে বিশেষ উৎসাহের সহিত সেই সিঁড়ী অবলম্বন করিয়া উপরে গিয়া আমার পড়া ঠিক হইল কি না মিলাইয়া দেখিলেন। ঐরূপে ঐ প্রস্তর-ফলকের পাঠ পাইলাম :—

ব্রহ্মাশেষ-সুরেশবন্দ্যচরণ শ্রীবাসলী-প্রীতয়ে
শর্ব্বাস্ত্র স্মরশায়কর্ত্তু শশভৃৎ সঙ্খ্যে শকাব্দে ততে।
সামন্তান্বয় সাগরেন্দুবীরস্তুতীত জিসত্ত কেশরী
মুণ্ডধৃত-বরো বিবেকনৃপতিঃ সৌধং দদৌ দার্শদং॥

লেখাটির তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের পাঠ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই ; তবে প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রসম্বন্ধে কোন-রূপ সন্দেহের কারণ নাই। দ্বিতীয় ছত্র হইতে পাওয়া যায় ১৬৫৫ শকাব্দে ঐ দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথম মন্দিরের আয়ুষ্কাল দুইশত বৎসর ধরিলেও তাহার নির্ম্মাণকাল চণ্ডীদাসের সমকালেই দাঁড়ায়।

সেখান হইতে রাজা ও তাঁহার লোকজন সহ আদি বাসলী মন্দির স্থানে আসিলাম। দেখিলাম ভগ্নাবশেষ ও ভগ্নস্তূপ। চণ্ডীদাস-ভক্তগণ যদি এখনও আসিয়া ইহা হইতে সত্যের সূত্র বাহির করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে হয়ত সফলকাম হইতে পারেন। আর কিছু দিন পরে হয়ত কালের অঙ্গুলি শেষ চিহ্নগুলিও লোপ করিয়া দিবে।

চণ্ডীদাসের সমাধি

[শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহীত আলোকচিত্র হইতে

চারিদিকে বেষ্টনী প্রাচীরাবশেষ-সমন্বিত তিন চারি বিঘা সমচতুষ্কোণ ভূমি; ইহাই এখানে "বাসলী-স্থান" নামে খ্যাত, এবং এখানকার লোকের দৃঢ় নির্দ্দেশ অনুসারে এই ভূমিই চণ্ডীদাসের পদঃরজে পবিত্রিত, চণ্ডীদাসের প্রেমের সাধনায় পূত, চণ্ডীদাসের অতুল সঙ্গীতে মুখরিত। প্রাচীরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বার; পশ্চিমেরটি বড় এবং যত্ন-নির্ম্মিত কারুকার্য্যযুক্ত; শুনিলাম উহা ছিল মুখ্য দ্বার। বাসলী যাঁহার প্রতিষ্ঠিতা, যাঁহার কুলদেবতা, সেই ছাতনারাজ নিত্য হস্তী আরোহণে বাসলী-মন্দিরে আসিতেন; দ্বারের একটু দূরে এক পার্শ্বে হস্তী বাঁধিবার প্রস্তর-নির্ম্মিত আলান (স্তম্ভ) আজিও শৃঙ্খলচিহ্ন বুকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্তম্ভটি দৃঢ়রূপে প্রোথিত। পূর্ব্বের দ্বারটি খিড়কীর দ্বার, পশ্চিমেরটি অপেক্ষা ছোট। উহারই ঠিক সম্মুখে মাত্র কয়েক হস্ত দূরে "বাসলীপুকুর" বা "শাঁখাপুকুর"। "বাসলী-স্থানে"র দক্ষিণে পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে "ধোবাপুকুর", রামী-ধোপানীর নামের সহিত জড়িত। "বাসলী-স্থানে" স্থানীয় কোন লোক আজি পর্য্যন্ত জুতাপায়ে প্রবেশ করেন না, ভগ্নাবশেষ প্রাচীর হইতে ইষ্টক খুলিয়া দিতে কেহই সাহস করিলেন না, বাসলী ও চণ্ডীদাস বিষয়ক ব্যাপার তাঁহাদের কাছে এতই সত্য, এতই পবিত্র। বাসলী-স্থানের মধ্যে দুইটি বড় ভগ্নস্তূপ দেখিলাম, একটি সদর দরজার সম্মুখে, অন্যটি স্থানটির ঈশান কোণে। শুনিলাম সদর দরজার সম্মুখের স্তূপটি নাটমন্দিরের এবং ঈশান কোণেরটি দেবী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। এখনও পোত ঠিক আছে বলিয়া মনে হইল। দেবী-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের নিকটেই দেখিলাম কয়েকটি বিল্ববৃক্ষ; শুনিলাম এগুলি চণ্ডীদাসের রোপিত বিল্ববৃক্ষের বংশধর, তাহার শিকড় হইতে উৎপন্ন পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র; গাছগুলির কণ্টকবিহীনতা এবং তাহাদের ফলের ক্ষুদ্রতা দেখিয়া গাছগুলিকে প্রাচীন

বলিয়াই মনে হইল। যে-নদীতে চণ্ডীদাস স্নান করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নির্ম্মাল্য পদ্মফুল পাইয়াছিলেন, তাহা বাসলী-স্থান হইতে দেড় মাইলের মধ্যে। প্রাচীরের ভগ্নাবশেষের ইষ্টকগুলিতে এবং নাটমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরে কি-একটা লেখা রহিয়াছে দেখিলাম। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের আগ্রহে খানকয়েক ইষ্টক শাবল দিয়া তুলিলাম; সব ইটে লেখা নাই, কতকগুলিতে আছে। একই স্তরের গাঁথনীতে দুই রকমের ইটই রহিয়াছে। লেখযুক্ত ইষ্টক কয়খানি ভাঙ্গিয়া গেল; পাঁচ-ছয়-খানি বিদ্যানিধি-মহাশয় সঙ্গে লইলেন। আশা করি ঐ মূক ইষ্টক যে-আলোক দিবে তাহাতে কতকটা অন্ধকার বিদূরিত হইবে। তাহার পর আমরা গ্রামের মধ্যে রাস্তার পাশে দেখিলাম সেই শিলাপট্ট-খানি যাহার উপর বসিয়া চণ্ডীদাসের অমৃতোপম পদাবলীর অধিকাংশই রচিত হইয়াছিল। শুনিলাম ঐ শিলাপট্টখানি পূর্ব্বে "ধোবাপুকরের" ঘাটে ছিল, এবং রামী উহারই উপর কাপড় আছড়াইত; পরে উহার উপর রামীর সহিত বসিলেই চণ্ডীদাসের কবিত্ব স্ফুরিত হইত। কাজেই সেখানি প্রেমসিদ্ধ চণ্ডীদাসের বড়ই প্রিয় হয়। পরে সেখানিকে "ধোবাপুকুরের" ঘাট হইতে গ্রামের মধ্যস্থলে পথিপার্শ্বে আনয়ন করা হইয়াছে; উদ্দেশ্য তাহা অহর্নিশি জীবরূপী বা নররূপী ভক্তের পদরেণুতে পবিত্রিত হইবে। ঐ শিলাপট্টখানি দেখিয়া এবং স্থানীয় ব্যক্তি-গণকে ঐ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অপরাহ্ণে বাঁকুড়ায় ফিরিলাম।

ছাতনায় অনেকেরই মুখে যে-কিম্বদন্তী শুনিলাম তাহা এইরূপ।—পূর্ব্বকালে এই পথ দিয়া মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর ও তথা হইতে মেদিনীপুর হইয়া শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর লোক যাতায়াত করিত; ব্যাপারীরা নানাবিধ পণ্য বলদের পৃষ্ঠে দিয়া ব্যাপারার্থে এই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেন। ছাতনা জনপদ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বলিয়া পথিক ও ব্যাপারী অনেক সময় এখানে রাত্রিযাপন করিতেন। কোন শুভদিনে দেবী ছাতনা-রাজকে স্বপ্ন দেন,—"অমুক ব্যাপারীর অমুক বলদের পৃষ্ঠের বোঝার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে যে কৃষ্ণ প্রস্তরফলকখানি পাইবে তাহা লইয়া সাত বার দুগ্ধে ধৌত করিলে ফলকের উপর যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিবে, তাহাই তোমার কুলদেবতা এবং তোমার রাজ্যের রক্ষয়িত্রী দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা কর; তাহাই আমার মূর্ত্তি। আর এক যে তরুণ ব্রাহ্মণ-যুবক তাহার সহোদরকে লইয়া বৃক্ষতলে শয়ান রহিয়াছে তাহা-দিগকে সযত্নে তোমার রাজ্যে বাস করাইয়া আমার পূজারী নিযুক্ত কর; তাহারা যে-স্থান হইতে আসিতেছে তথায় আমার প্রতিষ্ঠা আছে এবং তাহারা আমার পূজা-পদ্ধতি অবগত আছে।" স্বপ্নাদেশ-অনুসারে অনুসন্ধান করায় রাজা যে-প্রস্তরফলক পাইলেন তাহা সাত বার দুগ্ধে ধৌত করিয়া যে-মূর্ত্তি পাইলেন তাহাই এই বাসলী-মূর্ত্তি এবং যে ব্রাহ্মণ-যুবক দুইটিকে পাইলেন তাঁহারা দেবীদাস মুখোপাধ্যায় ও চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া গ্রামের নিকটে তাঁহাদের বাসস্থল; জীবিকার্জ্জনের জন্য তাঁহারা মল্লভূমের রাজধানীর পথে চলিয়াছিলেন। রাজা দেবীর স্বপ্নাদেশ মানিয়া কুলদেবতা ও রাজ্যের রক্ষয়িত্রী দেবতা রূপে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দেবীদাস ও চণ্ডীদাসকে তাঁহার পূজক নিযুক্ত করেন। দেবীদাস বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন; চণ্ডীদাস কোন দিন বিবাহ করেন নাই। দেবীদাসের দুই পুত্র, উদ্ধব ও পদ্মলোচন; তাঁহাদের বংশ এখনও রহিয়াছে, এবং তাহারাই বাসলীর পূজারী। দেবগৃহের সংস্রবে তাহাদের উপাধি এখন "দেঘরিয়া" হইলেও সামাজিক ব্যাপারে তাঁহারা "মুখোপাধ্যায়" বলিয়াই পরিচিত। বর্ত্তমান পূজারী শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র দেঘরিয়া বলিলেন, তিনি দেবীদাস হইতে অধস্তন বাইশ কি তেইশ পুরুষ। দেঘরিয়া-দের কুরসিনামা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম গৃহদাহে তাহা নষ্ট হইয়াছে, তবে অন্য দেঘরিয়ার গৃহে তাহা আছে কি না অনুসন্ধান করিবেন। দেবীদাসের বংশ এখন বহুবিস্তৃত হইয়াছে; কাহারও গৃহে ঐ কুরসিনামা এবং চণ্ডীদাসের স্বহস্ত লিখিত দুই চারিটি পদ পাইবার আশার ক্ষীণরশ্মির সন্ধান পাইয়াছি। দেঘরিয়াদের কুরসিনামার একখণ্ড সম্ভবতঃ ছাতনার রাজ-সেরেস্তায় আছে; রাজাকে ঐ সম্বন্ধে অনুরোধ করায় তিনি সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমরা ছাতনার অনেক লোককে চণ্ডীদাস ও বাসলী-

আদি বাসলীস্থানের পশ্চাতের দ্বার—বাসলী বা শাঁখা পুকুরের ঘাটের নিকট। চণ্ডীদাসের সহোদরের বংশধরগণের কয়েকজন।
[শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহীত আলোকচিত্র হইতে

ংক্রান্ত অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম তাঁহারা ণ্ডীদাস-বিষয়ক বীরভূম-সংক্রান্ত প্রথম মত সম্বন্ধে বিশেষ কান খোঁজ-খবর রাখেন না। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা, ণ্ডীদাস ছাতনার বাসলীর উপাসক ছিলেন; এবং খানেই "ধোবাপুকুরের" ঘাটে যে-শিলাপট্টে বসিয়া ছিপ য়া মাছ ধরিবার ব্যপদেশে তিনি,

"রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥"

বিয়া "কিশোরী-স্বরূপ রজকিনী-রূপ" দেখিয়া "পরাণ ড়াইতেন," এবং যে-শিলাপট্টে রামীর সহিত একত্রে বেশন করিলেই তাঁহার অতুলনীয় কবিত্ব স্ফুরিত হইত ই শিলাপট্টে বসিয়াই তাঁহার অমৃতোপম পদাবলী রচিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাসের মৃত্যু-সম্বন্ধে অনেকে বলিলেন, তাঁহার মৃত্যু ছাতনায় হইয়াছিল; তাঁহারা কবির সমাধি-স্থানও দেখাইলেন; স্থানটি "ধোবাপুকুরের" পশ্চিমে অনতিদূরে। দুই একজন বলিলেন, চণ্ডীদাসের নশ্বর দেহের অবসান ছাতনায় হয় নাই; তিনি শেষ বয়সে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছিলেন, আর ফিরেন নাই।

বাসলীপুকুর বা শাঁখাপুকুর সম্বন্ধে কিম্বদন্তী:—

মল্লভূমের (বিষ্ণুপুরের) এক শাঁখারী একদিন বাসলী মন্দিরের নিকট দিয়া শাঁখা বিক্রয় করিতে যাইতেছিল; মন্দিরের খিড়কী দরজার বাহিরে একটি সুন্দরী বালিকা শাঁখারীকে বলিলেন, "আমাকে শাঁখা পরাইয়া দাও"। শাঁখা দেওয়া হইলে বালিকা শাঁখারীকে বলিলেন, "মন্দিরে

গিয়া বাবাকে বল কুলঙ্গীতে যে দুটি টাকা আছে শাঁখার মূল্য স্বরূপে তিনি তাহা তোমাকে দিবেন।'' শাঁখারী মন্দিরে গিয়া তাঁহার কন্যা শাঁখা পরিয়াছে জানাইয়া চণ্ডীদাসকে শাঁখার মূল্য চাহিলে চিরকুমার চণ্ডীদাস বিস্মিত হইয়া বাহিরে আসিলেন, এবং শাঁখারীর কথানুসারে বাপীতটে বালিকার সন্ধান করিলেন, কিন্তু বালিকাকে দেখিতে না পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, তুই কি শাঁখা পরিয়াছিস্? যদি পরিয়া থাকিস্ আমায় দেখা, আমি শাঁখারীর মূল্য মিটাইয়া দিই"। এই কথায় পুষ্করিণীর মধ্য হইতে দুইখানি নবশঙ্খপরিহিত অনিন্দ্যসুন্দর হস্ত উত্থিত হইতে দেখা গেল। শাঁখারী আপনার সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হইয়া শাঁখার মূল্য লইলেন না, অধিকন্তু প্রতি বৎসর এক জোড়া করিয়া শঙ্খবলয় ঐ পুষ্করিণীর ঘাটে দিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার লোকান্তে তাঁহার বংশের শেষ ব্যক্তি পর্য্যন্ত ঐরূপে প্রতি বৎসর এক জোড়া শঙ্খবলয় ঐ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া যাইতেন। শুনিলাম এখন সে শাঁখারীর বংশে আর কেহ নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৩২২।২৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ঐ পুকুরের যৎ-কিঞ্চিৎ পঙ্কোদ্ধার করিয়া আমাদের সাধের "শাঁখাপুকুর" ও "বাসলীপুকুর" নামের স্থানে Bombay tank না কি একটা নূতন নাম দেওয়া হইয়াছে! রক্ষা এই, স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই "বাসলীপুকুর" ও "শাঁখাপুকুর"ই বলিয়া থাকে।

এখন কথা হইতেছে, চণ্ডীদাস কোথায় ছিলেন, বীরভূমের নান্নুর বা নান্নুরে কি বাঁকুড়ার ছাতনায়? কোন্ দেবীর আরাধনা করিতেন চণ্ডীদাস,—বীরভূমের বাশুলী বা বিশালাক্ষীর, কি ছাতনার বাসলী বা বজ্রেশ্বরীর?

বীরভূম নান্নুরে যে বাশুলীমূর্ত্তির পূজা হয় তাহা পদ্মাসনা, চতুর্ভূজা, বীণাপাণি মূর্ত্তি। যে-মন্ত্রে তাঁহার ধ্যান হয়, তাহাতে স্পষ্ট জানা যায় ঐ "বাশুলী" শব্দটি "বিশালাক্ষীর" অপভ্রংশ। ধ্যান মন্ত্রটি এই,—

> "ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং শারদবদনাং
> চতুর্ভুজাং বীণা চণ্ডিকা দেবীং সুপ্রসন্নাং বরপ্রদাং
> ত্রিহস্তে বীণা চেব এক হস্তে জপায়িনী
> বামপদ পদ্মাসনে দক্ষিণপদ শিবোপরি—
> সচন্দনবিল্বপত্রং পুষ্পং ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষী দেব্যৈঃ নমঃ।"

বীরভূমের নীলরতন-বাবু মন্ত্রটির বিকৃতি "মূর্খ পূজকের" স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রোক্ত-বিশালাক্ষী-ধ্যানমন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্,—তাহা বিকৃত বা অবিকৃত যাহাই হউক—, মন্ত্রটি কোথা হইতে আসিল, এবং দ্বিভুজা বিশালাক্ষীর স্থানে চতুর্ভুজা বীণাপাণি মূর্ত্তিই বা কিরূপে কোথা হইতে আসিল তিনি তাহার কারণ দেখান নাই। অনেক স্থলেই দেখা যায় অর্থলোভী, শিথিল-ধর্ম্মবুদ্ধি লোকে প্রস্তরনির্ম্মিত যে-কোন মূর্ত্তি পাইলেই তাহাকে সিন্দুর,চন্দন, বস্ত্রালঙ্কার ও ফুলদল দিয়া সাজাইয়া, স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্তির কথা রটাইয়া, মূর্ত্তিটির কোন-এক নাম দিয়া সেটি স্থাপিত করে, এবং নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে দেবতার একটা মন্ত্রও রচনা করিয়া লয়। এক্ষেত্রে সেরূপ কিছু হইয়াছে কি না কে বলিবে? বীরভূম যে বিশালাক্ষীর স্থান তাহা কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু সে বিশালাক্ষী নিশ্চয়ই তন্ত্রোক্তা দেবী; একটা মনগড়া কিছু নহে। তন্ত্রসারে বিশালাক্ষী দেবীর এই ধ্যান-মন্ত্র দৃষ্ট হয়;—

> "ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদপ্রভাম্।
> দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গ-খেটক-ধারিণীম্॥
> নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাম্।
> সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্।
> মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
> শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুট মণ্ডিতাম্॥
> শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্।
> সর্ব্ব সৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥"

ইহাতে দেখা যায়, বিশালাক্ষী দেবী দ্বিভুজা, খড়্গখেটক-ধারিণী, ত্রিনয়না, শবোপরিস্থিতা, জটামুকুটমণ্ডিতা। নান্নুরে বাশুলী নামে পূজিতা মূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির কোনও সাদৃশ্য নাই। নান্নুর-স্থিতা বাশুলী দেবীর মূর্ত্তি বা ধ্যান-মন্ত্র হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনও তন্ত্রের সঙ্গে মিলে না। ধ্যান-মন্ত্রটি ছন্দোহীন, অর্থহীন, ব্যাকরণহীন, বাঙ্গালা-সংস্কৃতের মিশ্রণে রচিত; তবে তাহা মিলে কেবল ঐ পূজিতা মূর্ত্তির সহিত; এবং সেইজন্য সন্দেহ কিছু বেশীরূপই হয়। হিন্দুর দেশে হিন্দু বা বৌদ্ধ তন্ত্রানুসারে যে-কোন দেবতারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা সেই সেই শাস্ত্রোল্লিখিত মন্ত্রের সহিত মিলে; মন্ত্র "মূর্খ পূজকের" দ্বারা বিকৃত হইলেও সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় না। ঐ কথা ছাড়িয়া দিয়া যেরূপে যে মন্ত্রে, নান্নুরের বাশুলীদেবীর পূজা হয় তাহাই শাস্ত্রসম্মত

আদি বাসলীস্থানের সদর দরজা
[শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহীত আলোকচিত্র হইতে

ধরিয়া লইলে, কিংবা তাহা ভুলিয়া তন্ত্রসারের দ্বিভুজা বিশালাক্ষীকে নান্নুরে স্থাপিতা করিলেও ইহা নিশ্চিত যে, ঐ "বাশুলী" শব্দ বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ। বিশালাক্ষী যে নিত্যা-সহচরী "বাসলী" নহেন, তাহা নিঃসংশয়েই জানা গিয়াছে।

ছাতনায় যে "বাসলী" দেবীর পূজা হয়, তিনি খর্পর-খড়্গ-শোভিতা, দ্বিভুজা, নৃমুণ্ডমালিনী, অসুরদলনী। তাঁহার ধ্যান-মন্ত্রটি এই :—

"ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসানা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গাং পিব পিব রুধিরং বাসলী পাতু সা নঃ ॥"

ছাতনার "বাসলী"র পূজক সংস্কৃতজ্ঞ নহেন; তিনি মন্ত্রটির দুই এক স্থল বিকৃত করিয়া উচ্চারণ করিলেন; কিন্তু সে-বিকৃতি এরূপ কিছু মারাত্মক নহে; তাহাতে মন্ত্রটি রূপান্তরিত হয় নাই।

"ঠঁ আয়াতা স্বর্গলোকে দৃঢ় ভুবন তলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দুরাভাজিহ্বা বিকটিত-দশনা মুণ্ডমালাচ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাজয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গাং পিব পিব রুধিরং বাসলী পাতু সানাঃ ॥"

ইহা যে সত্যই সংস্কৃত জ্ঞানাভাব-জনিত বিকৃতি তাহা সহজেই বোধগম্য। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃপায় জানিয়াছি এই ধ্যানমন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রের "বজ্রেশ্বরী" বা "বাসলী" দেবীর। বজ্রেশ্বরী হইতে "বাজ্‌সরী"—"বাজ্‌সলী"—"বাসলী" সহজেই হয়। ধ্যানমন্ত্রটি হইতে বেশ বুঝা যায় উহা রচিত হইবার পূর্ব্বেই বজ্রেশ্বরী বাসলীতে পরিণত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধতন্ত্র হইতে পাওয়া যায় এই "বাসলী" নিত্যার সহচরী। চণ্ডীদাস যে-বাসলীর পূজা করিতেন তিনি যে নিত্যার সহচরী—নিত্যার আদেশ-পালিকা ছিলেন, চণ্ডীদাসের পদ হইতেই তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায় ;—

"নিত্যের আদেশে বাসলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।"

নিত্যেতে গমনই চণ্ডীদাসের সকল সাধনার লক্ষ্য। বাসলীর নিকট "রাই কানু দুহুঁ নওল চরিত" শুনিয়া, সহজ সাধনায় দীক্ষিত হইয়া, কিশোরীস্বরূপ রজকিনী-সঙ্গ লাভ করিয়াও নিত্যেতে গমনই তাঁহার লক্ষ্য :—

"এক নিবেদন তোমারে কব
মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব ॥
বাসলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি ॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে ॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হৈলা।
বাসলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা ॥"

এই নিত্যার কোথাও প্রতিষ্ঠা ছিল কি না অনুসন্ধান করিয়া একটি পদ পাইলাম,—

"শালতোড়া গ্রাম,　　অতি পীঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাসলী　　নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা ॥
চণ্ডীদাস কহে　　সে এক বাসলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে　　নিদ ভাঙ্গিল
পীরিতি হইল সুরু।"

এই ছাতনা ও শালতোড়া, বাঁকুড়া জেলার দুই পরস্পর

সংলগ্ন থানা; ছাতনা গ্রাম হইতে শালতোড়া গ্রাম ৭।৮ ক্রোশের মধ্যে। এইসকল হইতে মনে হয় বীরভূমের "বাশুলীর" সহিত চণ্ডীদাসের "বাসলীর" কোন সংস্রব নাই; ছাতনার "বাসলী"ই চণ্ডীদাসের "বাসলী"।

ছাতনা বা সামন্তভূম, মল্লভূমেরই অঙ্গীভূত সামন্তরাজ্য। মল্লভূমে বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষরূপেই লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে বীরহাম্বীর ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মল্লরাজগণ মনসার উপাসক ছিলেন। আজিও বিষ্ণুপুরের রাজাদের ছাড়-দেওয়া নিষ্কর জমির আয় হইতে বিষ্ণুপুর পরগণার প্রায় প্রতি হিন্দু গ্রামেই মনসার পূজা হয়। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহুপ্রচলিত "মনসার ঝাঁপান" এখনও অনেক স্থানে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়; "মনসা-মঙ্গল" এখনও কোথাও কোথাও গীত হয়। ধর্ম্ম পূজার প্রসারও মল্লভূমে বড় কম নয়; বিনোদরায়, কৌতুকরায়, দক্ষিণারায়, বাঁকুড়ারায় প্রভৃতি বহু নামে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা অনেক-স্থানেই সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। এইসকল ধর্ম্মের পূজক ব্রাহ্মণ আছেন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিও আছেন। তবে "মনসা" ও "বাসলী" বৌদ্ধতন্ত্রের হইলেও যেখানেই তাহারা গ্রাম্যদেবতারূপে পূজিতা সেখানে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের পূজক ব্রাহ্মণ; তাঁহারা হিন্দুর দেবীরূপেই পূজিতা হইতেছেন। ঐ সকল দেবতার মূলে যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব আছে, একথা অনেকেই স্বীকার করেন না বা জানেন না। মল্লভূমে ধর্ম্মঠাকুরের ভিতর দিয়া বৌদ্ধ প্রভাবের কথা অনেকেই জানেন। রমাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" বিষ্ণু-পুরের নিকটবর্ত্তী শল্দা-ময়নাপুরে রচিত হইয়াছিল; রমাই পণ্ডিত জাতিতে ডম্ ছিলেন; আজিও রমাই পণ্ডিতের বংশধরগণ বর্ত্তমান; এই বংশের জীবন ডম্ বিখ্যাত বাদ্যকর। (এই 'ডম্' কথাটার সহিত কি ধর্ম্ম-ধম্ম-ধম্ এর কোন যোগ আছে?) মল্লভূমেরই ইন্দাস থানার অন্তর্গত সুখসায়র গ্রামে সীতারাম দাসের "ধর্ম্ম-মঙ্গল" রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা মল্লভূমের গ্রামে গ্রামে পাটাতন বাঁধিয়া ধর্ম্মমঙ্গল গীত হইতে শুনিয়াছেন তাঁহাদের কেহ কেহ কিছু দিন আগেও জীবিত ছিলেন দেখিয়াছি। দেখিতে পাওয়া যায় একজন মল্লনৃপতিও কতকগুলি ধর্ম্মের গান রচনা করিয়াছিলেন।

মনসা ও বাসলী গ্রাম্য দেবতারূপেই পূজিতা হইয়া থাকেন। গৃহদেবতা ও গ্রাম্য দেবতার পার্থক্য হিন্দুমাত্রেই জানেন। তবে এ দুর্দ্দিনে, যখন হিন্দুসন্তান আমরা আমাদের ঘরের সব খবর রাখি না; অথবা এ সুদিনে, যখন বাঙ্গালী ভিন্ন অন্যেও বাংলাভাষার চর্চ্চা করিতেছেন, তখন গৃহদেবতা ও গ্রাম্য দেবতার পার্থক্য বিবৃত করিবার চেষ্টাকে বিশেষ দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়া মনে করি না। গৃহস্বামীর প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে অভীষ্ট দেবতারূপে যে-দেবতার প্রতিষ্ঠা তাঁহার নিজের গৃহে হয় তাহাই গৃহ-দেবতা; ঐ দেবতার নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা-পার্ব্বণাদি ঐ গৃহস্বামীর অর্থব্যয়েই নির্ব্বাহ হয়। গ্রাম-দেবতা গ্রামের সকলেরই পূজিতা; তাঁহার নিত্যসেবা সাধারণের বা রাজার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে নির্ব্বাহ হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি বেশী থাকিলে তাহার আয় হইতে নৈমিত্তিক পার্ব্বণাদিও নিষ্পন্ন হয়; যদি দেবোত্তরের আয়ে সংকুলান না হয়, গ্রামবাসিগণ চাঁদা দিয়া সে-ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। ঐ দেবতা গ্রাম্য সাধারণের, কাহারও নিজস্ব নহেন। যিনি চণ্ডীদাস ও রামীরজকিনীকে সহজ-সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, সেই "বাসলী" গ্রাম্য দেবতা ছিলেন :—

"গ্রাম্যদেব বাসলীরে, জিজ্ঞাস গে করজোড়ে
রামী কহে……সাধন।"
"হাসিয়ে বাসলী কয় শুন চণ্ডী মহাশয়
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রামে দেবতা আমি ইহা জানে রজকিনী
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে।"

ইহা হইতে মনে হয় তাঁহার আসন ও প্রভাব সিদ্ধেশ্বরী, সর্ব্বমঙ্গলা, নিত্যকালী, জয়দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণের সমানই ছিল। কাজেই ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির পূজারী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সে যাহাই হউক, বাসলী যে গ্রাম্য দেবতা ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। ভূমিকম্পে বা অন্য কোন কারণে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িলে গ্রাম্যদেবতার পূজা বন্ধ হয় না, ইহা হিন্দুমাত্রেই জানেন। কারণ গ্রামবাসী সকলেই এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেরও অনেকে তাঁহার সেবাইত। অবশ্য কোন নৈসর্গিক কারণে গ্রামবাসী মাত্রেই গ্রাম্যদেবতার সহিত

যমুনা

গঙ্গা

শিল্পী শ্রী নন্দলাল বসু

ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]
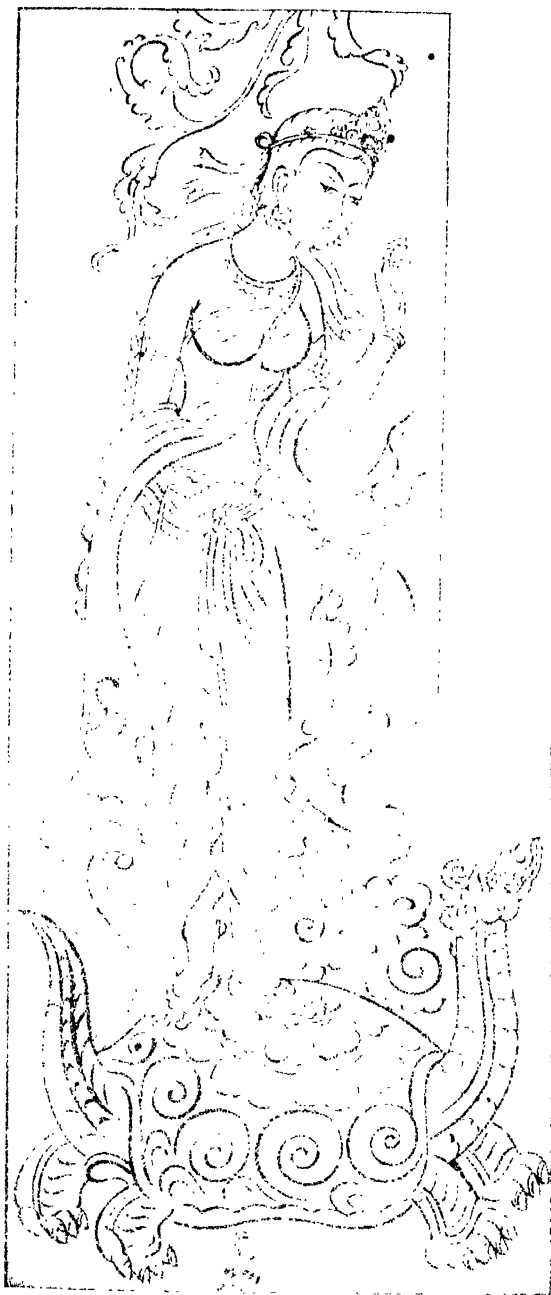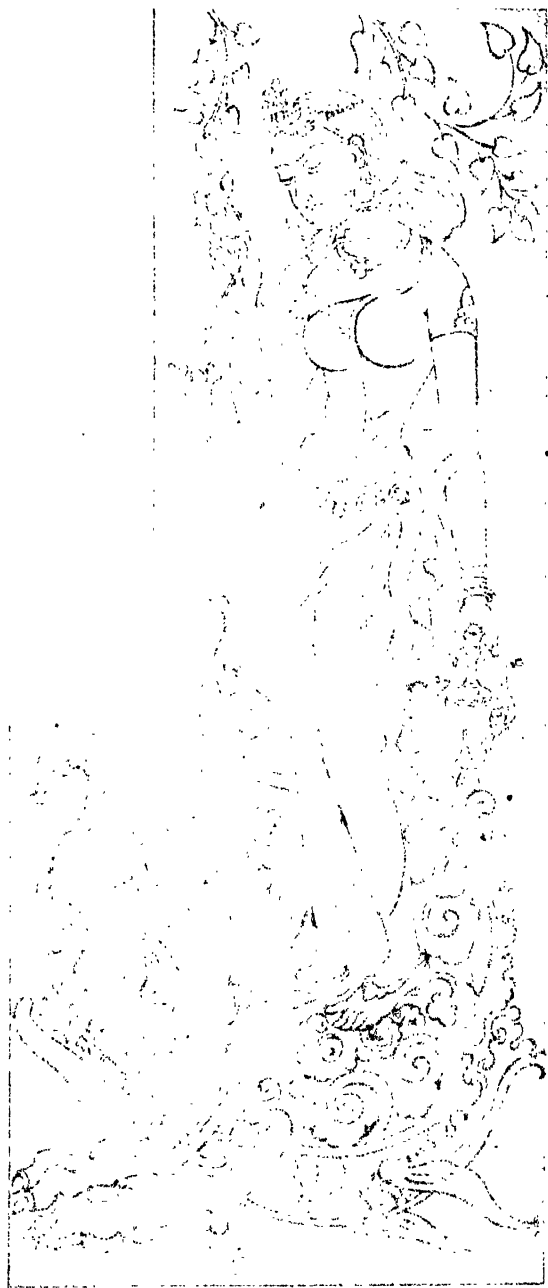
এককালে লয়প্রাপ্ত হইলে গ্রাম্য-দেবতার পূজা বন্ধ হওয়া সম্ভব। ছাতনায় প্রতিষ্ঠিতা "বাসলী" যে মাত্র ছাতনার গ্রাম্যদেবতা ছিলেন তাহা নহে। আজিও বাসলী দেবী সমগ্র ছাতনা রাজ্যে বা সামন্তভূম পরগণায় রক্ষয়িত্রী দেবীরূপে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামযুক্ত নামে কেন্দুয়াসিনী, ডাকাইসিনি, কুদ্‌রাসিনি, মুকুন্দাসিনি, জিনিসিনি প্রভৃতি নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সর্ব্বত্রই ধ্যানমন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রের "বাসলী" দেবীর ধ্যান। ইহা হইতে দেখা যায় নান্নুরে পূজিতা "বাশুলী" গ্রাম্যদেবতা ছিলেন না; আর ছাতনায় পূজিতা "বাসলী" দেবী আজিও গ্রাম্য-দেবতা।

ধোবা পুকুর

[শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহীত আলোকচিত্র হইতে

একটা কথা উঠিতে পারে, নান্নুর গ্রাম কোথায়? যখন বীরভূমে নান্নুর পাইতেছি তখন অন্য স্থানে নান্নুর না পাইলে চণ্ডীদাস যে তথায় ছিলেন একথা মানিব কেন? নিশ্চয়ই ভাবিবার কথা। কিন্তু বীরভূমে যে নান্নুর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার নাম নান্নুর ছিল কি বৎসর কয়েক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকলে এবং এখনও গ্রাম্যলোকেরা তাহাকে নাহুড় বলিয়া থাকে? নাম সাদৃশ্যে কোন গোল নাই ত? জনপদের নাম চিরদিনই পরিবর্ত্তিত হয়, ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লী হয়, কপিলক্ষেত্র কলিকাতা হয়, মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর হয়, বাঁকুড়া সহরের একাংশ "দেবীপুর" কেন্দুয়াডিহি হয়। কে বলিবে যে নান্নুরে ছত্রীরাজগণের প্রভাব বিস্তারের পর তাহার নাম নান্নুর হইতে ছত্রিনা বা ছাতনায় পরিবর্ত্তিত হয় নাই? আর এক কথা, বাঁকুড়া জেলায় গ্রামের নাম সম্বন্ধে একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়; একই গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখা যায়; একই বাঁকুড়া সহরে রামপুর, পাটপুর, গোপীনাথপুর, লোকপুর প্রভৃতি কতগুলি জনপদ রহিয়াছে; কলিকাতা হইতে যখন কেন্দুয়াডিহিতে আসি তখন বলি বাঁকুড়া যাইতেছি, যখন 'রামপুর' হইতে আসি তখন বলি 'কেন্দুয়া-ডিহি'তে যাইতেছি। কে বলিতে পারে ছাতনারই যে-অংশে বাসলী দেবী প্রথমে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন সে-অংশের নাম নান্নুর ছিল না? হয়ত কালপ্রভাবে নান্নুর নাম ছাতনাগর্ভে লীন হইয়াছে। আর এক কথা; সর্ব্বত্র গ্রামের মাঠগুলিরও এক একটা নাম দেওয়া হয়; নাম-গুলি প্রায়ই কোন দেবতার, বৃক্ষের বা ব্যক্তির নামানুসারেই করা হয়, যেমন মনসাতলার মাঠ, কুড়চিতলার মাঠ, গোকুলের বা গোকুলোর মাঠ, নন্দর বা নোদার মাঠ। এ-দেশে রাজার ছোট ছেলেকে নুনু বা নানু বলে। কে বলিতে পারে যে ছাতনার রাজাদের গৌরবের সময়ে কোন 'নানু'কে ঐ মাঠের অধিকাংশ ভূমি খোরপোষরূপে ভোগ করিতে দেখিয়া সাধারণে উহার নাম নানুর বা নান্নুর মাঠ রাখে নাই? চণ্ডীদাস অনেক স্থলে নান্নুর মাঠের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন;—

"নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে বাসলী বসয়ে যথা।"

* * * * *

বহুদিন পরলোকগত সুপ্রতিষ্ঠিত মহাকবিকে অনেক দেশই আপনার বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করে, ইহা

সুপরিচিত। শুনিয়াছি, যে সাতটি গ্রীকনগরীর পথে পথে জীবন্ত হোমর ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিতেন তাহাদের প্রত্যেকেই মৃত হোমরের অধিবাসিত্ব দাবী করিয়াছিল। বাঁকুড়া ও বীরভূম উভয়েই চণ্ডীদাসকে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। চেষ্টা যাহাই হউক, শেষ পর্য্যন্ত সত্য জয়যুক্ত হউক, ইহাই বাঞ্ছনীয়। *

শ্রী সত্যকিঙ্কর সাহানা

মন্তব্য

চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে নানাজনে নানাকথা লিখিয়াছেন। সে সমস্ত একত্র করিয়া বিদ্বৎবল্লভ শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-নামক গ্রন্থে পাঠকের গোচরে আনিয়াছেন। তাহাতে দেখি, চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। দেশ, কাল, পাত্র,—এই তিন বিষয়ের জ্ঞান না হইলে সে জ্ঞান অস্থির। তাঁহার প্রচলিত পদ হইতে পাই, তিনি বড়ু ছিলেন, দ্বিজ ছিলেন, বাসলী-দেবী তাঁহার উপাস্যা মাতৃ-স্বরূপা ছিলেন, বাসলীর বরে ও আদেশে তিনি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনা করেন, নান্নুর গ্রামের মাঠে, হাটের নিকটে বাসলীর স্থান ছিল। অর্থাৎ তিনি (বড়ু—বটু) অবিবাহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বাসলী মায়ের পূজা করিতেন, নান্নুরের মাঠে।

এখানে একটা আশ্চর্য্য কথা আছে। তিনি বাসলী-মঙ্গল না রচিয়া পরে যাহা সখী-সংবাদ নামে খ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ গান গাইলেন। পূর্ব্বকালে অনেক কবি স্বপ্নাদেশ পাইয়া গান রচিয়াছিলেন; চণ্ডীদাসও আদেশ পাইয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহার আদেশ, তাঁহার মহিমা গাইলেন না; যাঁহার গাইলেন, তিনি কবির উপাস্য নহেন, যে-ভাবে গাইলেন, তাহাতে ঈশ্বরভক্তির লক্ষণ নাই। ইহার উত্তর তাঁহার প্রচলিত পদ হইতে পাই। তিনি সহজ সাধন করিতেন, রামী রজকিনীর সহিত তাঁহার প্রসক্তি ছিল। এই হেতু তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং সে-লীলাবিকাশে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভজন-সাধন, বিশেষতঃ তন্ত্রোক্ত সাধন যেমন গুহ্য তেমন গোপ্য; চণ্ডীদাস যে সে কথা গাহিয়া বেড়াইতেন, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। পরকীয়া প্রীতি বা কোন্ নির্বোধ স্বীয়মুখে প্রচার করিয়া থাকে? সহজিয়া-দিগের এ রীতি নয়। চণ্ডীদাস সহজ-সাধক ছিলেন, এবং রামী তাঁহার নায়িকা হইয়াছিল। এই ঘটনা ধরিয়া অন্যে পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাসের ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে এই প্রসঙ্গ আদৌ নাই। নীলরতনবাবুর অশেষ যত্নে সংগৃহীত পদাবলীর শেষে 'রাগাত্মিক পদে' সাধন-প্রকরণ আছে বটে, কিন্তু সে-সব-পদ যে চণ্ডীদাসের তাহা বলা দুরূহ। কারণ যোগের পরিভাষায় বর্ণিত হইলেও লোকসমাজে নিন্দনীয়, এবং তন্ত্রমতে দূষণীয়। এখানে বাসলীর উপদেশ-ছলে চণ্ডীদাস গুরু সাজিয়াছেন! গোপি-চাঁদের গানে যোগ বিষয়ে এইরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে, ছন্দেও মিল আছে। অথচ জানি সে-সব গোপিচাঁদের নয়, কবির। এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকিবে।

চণ্ডীদাসের কাল-সম্বন্ধে ইহা স্থির যে, তিনি চৈতন্য মহা-প্রভুর পূর্ব্বে ছিলেন। অর্থাৎ ১৪০৭ শকের পূর্ব্বে ছিলেন বোধ হয় আর একটু যাইতে পারা যায়। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল। বিদ্যাপতি মহারাজা শিবসিংহের সময়ে ছিলেন, এবং শিবসিংহ ১৩২২ শকে রাজা হন। অতএব চণ্ডীদাস এই শকে ছিলেন, এবং চৈতন্য দেবের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে আজ পাঁচ শত সাড়ে পাঁচ শত বৎসর। এইরূপে যে কাল পাইতেছি, তাহার সহিত অন্য দুই এক লিখিত প্রমাণের মিল হইতেছে। যেমন, বিধুনেত্র পঞ্চবাণ—১৩৫৫ শকে চণ্ডীদাস ৯৯৬ পদ রচনা সমাপ্ত করেন। ইহার দশবৎসর পরে পণ্ডিত কৃত্তিবাসের জন্ম হয়।

চণ্ডীদাস কোন্ দেশের মানুষ, কোথায় বাসলীর পূজা করিতেন? এতকাল শুনিয়া আসিতেছি, বীরভূমের নান্নুর নামক গ্রামে যে, এখন প্রশ্নটা নূতন ঠেকিতেছে। কিন্তু পুরানা টাকাও বাজাইয়া দেখা ভাল। নান্নুর যেখানে হউক, সেখানে বাসলী চাই। আশ্চর্যের বিষয়, বীরভূমের নান্নুরে বাসলী নাই! যিনি আছেন, তাঁহার নাম

* যদি কেহ এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমাকে 'বাঁকুড়া'র ঠিকানায় পত্র দিলে তাঁহার এখানে থাকিবার বা ছাতনা যাইয়া বাসলীস্থানাদি দেখিবার সমস্ত ব্যবস্থা বিশেষ আনন্দের সহিত করিয়া দিব।

বিশালাক্ষী। আরও আশ্চর্য্য, ইহাঁর না ধ্যানে, না বিগ্রহে তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষীর মিল আছে! যদিও প্রত্যহ ধ্যানে ইহাঁকে বিশালাক্ষী বলা হইতেছে এবং লোকেও বিশালাক্ষী বলে, ইনি যে কোন্ দেবী তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত। * পূজনীয় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের প্রসাদে আমরা জানিয়াছি, বাসলী ও বিশালাক্ষী দুই পৃথক দেবতা; উভয়েই নিত্যার আবরণ-দেবতা বটেন, কিন্তু মূর্তিতে ভিন্ন, সুতরাং ধ্যানেও ভিন্ন। অতএব নান্নুরের বিশালাক্ষী, না বাসলী না বিশালাক্ষী। ইহার নিত্যপূজায় যে-ধ্যান করা হয়, তাহা না সংস্কৃত না বাঙ্গালা। নীলরতনবাবু মনে করিয়াছেন, এই অদ্ভুত সৃষ্টি মূর্খ পূজারীর কীর্তি। কিন্তু পূজারীর সাধ্য কি, ধ্যান পরিবর্তন করেন, এক বিগ্রহের স্থানে অন্য বিগ্রহ বসান। ধ্যানের ভাষা অশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু রাম স্থানে শ্যাম হইতে পারে না। বাসলীর তন্ত্রোক্ত ধ্যানে বা-স-লী এই নামই আছে, বাশুলী নাই, বিশালাক্ষী নাই। বাসলী ও বাশুলী, দুইটি নামের একটিতে 'স', অন্যটিতে 'শ'; 'শ' স্থানে 'শু' ই পরে আছে বলিয়া, লোকমুখে ঘটিতে পারে, কিন্তু 'স' স্থানে 'শ' আকস্মিক না হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে চণ্ডীদাস ৯৬টি পদে বাসলীর নাম করিয়াছেন, সর্বত্র বা-স-লী কুত্রাপি বা-শু-লী নাই, বি-শা-লা-ক্ষী নাই। ইহা হইতে বুঝি, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের গায়ক বা লিপিকর বা উভয়েই বা-স-লী জানিতেন অন্য নাম জানিতেন না। বা-স-লী দেবী বজ্রেশ্বরী হউন আর যিনিই হউন, তিনি বাসলী, এই প্রকৃত নামেই পরিচিত ছিলেন। নচেৎ ধ্যানে এই নাম থাকিত না। "ধর্ম্মপূজাবিধানে"ও এই নাম থাকিত না। অতএব দেখিতেছি, নান্নুরের বিশালাক্ষী বা বাশুলী চণ্ডীদাসের বাসলী নহেন।

নীলরতন-বাবু লিখিয়াছেন,—

"এখন আর বিশালাক্ষীর মন্দির গ্রামের মাঠে নাই। এখন তাহার মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে লোকের বসতি হইয়াছে। গ্রামটা দেবী-মন্দিরের পশ্চিমে ছিল, ক্রমে পূর্ব্বধারে সরিয়া আসিয়াছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিশালাক্ষীর মন্দির প্রাচীন নহে, আধুনিক ধরণের সামান্য একতলা ইষ্টকালয় মাত্র। মন্দিরের সম্মুখে প্রবেশ-দ্বারে কয়েকটি শিব মন্দির আছে; সেগুলিও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। তবে দেবীর বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ আছে। আমার মনে হয় যে, এ স্তূপটিই বিশালাক্ষী দেবীর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।"

এখানে দেখা যাইতেছে, মন্দির নূতন, গ্রামটিও বসতিতে নূতন। যদি বলি, এখানে পূর্বকালে বাসলী ছিলেন, এখন নাই; বাসলীর মন্দির ছিল, এখন নাই; মাঠ ছিল এখন নাই; তাহা হইলে পূর্বকালে যে ছিল, তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। সে প্রমাণের অভাবে ভগ্ন স্তূপ দেখাইয়া নান্নুর ও বাসলীর একত্রাবস্থিতি সিদ্ধ হইবে না। বাসলী গ্রামদেবী ছিলেন; সাহানা-মহাশয় ঠিক ধরিয়াছেন গ্রামদেবীর পূজা সহসা বন্ধ হয় না। নান্নুরে এমন কি দুর্ঘটনা হইয়াছিল যে বিগ্রহ অন্তর্হিত হইয়াছেন? নান্নুরে এক সমাধি-মন্দির আছে, সেটা নাকি চণ্ডীদাসের সমাধি-মন্দির। এই মন্দির সম্বন্ধে নীলরতন-বাবু কিছুই লেখেন নাই। ইহার বয়ঃক্রম জানিলে দেবী-মন্দিরের সহিত তুলনা করা যাইত। হয়ত দুই-ই এক সময়ের, কোনও আধুনিক চণ্ডীদাস-ভক্তের কীর্তি। নান্নুর, গ্রামের এই নামটিও নাকি প্রাচীন নয়। ইহার পূর্বনাম সাঁকালীপুর বা সাঁকুলীপুর। সরকারী মাপচিত্রে এই নাম আছে। সম্প্রতি এই নাম পরিবর্তন করিয়া নান্নুর রাখা হইয়াছে। আমি নান্নুর যাই নাই, দেখি নাই। শুনিয়াছি নাদুর এক পাড়ার নাম ছিল, কিন্তু এই নাম ও নান্নুর যে এক, তাহার প্রমাণ চাই। যদি পরিবর্তনের কথাটা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন আরও দুরূহ হইয়া উঠে। বাসলী নাই, নান্নুরও থাকে না। যোগচিহ্ন না থাকিলে চণ্ডীদাসকেও পাই না। অবশ্য কিম্বদন্তী আছে, এবং কিম্বদন্তী হাসিয়া উড়াইবার বস্তু নয়। তথাপি জানি কিম্বদন্তী নূতন গড়িয়া উঠিতে পারে, দুই এক পুরুষ গত হইতে না হইতে ভক্তের নিকট সত্যে পরিণত হইতে পারে। বীরভূমে ইতিহাস-অনুসন্ধান-সমিতি হইয়াছে। আশা করি, সে-সমিতি উল্লিখিত তর্কের মীমাংসা করিয়া "অখিল ভুবনে অনুপাম রস-শেখরের" কবিত্ব-স্ফূর্তির দেশ নির্ণয় করিবেন।

কিন্তু যদি কিম্বদন্তীমাত্র মূল হয়, তাহা হইলে বাঁকুড়া জেলার ছাতনার ঐতিহ্য মানিব না কেন? এখানে বহু-কালের কিম্বদন্তী ব্যতীত স্বয়ং বাসলী আছেন, চণ্ডীদাসের

* কেহ কেহ নাকি বলিয়াছেন, বাগীশ্বরী। কিন্তু তন্ত্রোক্ত বাগীশ্বরী যে আমাদের জানা সরস্বতী।

অগ্রজের বংশ আছে। আর আছে, রামী ধোপানীর পুকুর ও পাট (পাথর), ও শাঁখা পুকুর। নাই, নান্নুর। এ বিষয়ে পরে লিখিতেছি।

প্রথমে দেখিতেছি, ছাতনার বাসলীর বিগ্রহে ও ধ্যানে ঐক্য আছে, তন্ত্রোক্ত ও ধর্ম্ম-পূজা-বিধানোক্ত ধ্যানের সহিত আছে। দ্বিতীয় মন্দিরের পাষাণে বা-স-লী এই নাম ও বানান স্পষ্ট লেখা আছে। এই লেখার মধ্যে যে-শক আছে, তাহাতে বাসলী দেবী সেখানে অন্ততঃ দুই শত বৎসর আছেন। প্রথম মন্দিরের বেষ্টন-প্রাচীরের ইটের লেখা পড়িতে পারি নাই। পড়াইবার তরে কয়েকখানি ইট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পাঠাইয়া-ছিলাম। পরে শুনি, পড়া দূরে থাক, সেগুলি হস্তান্তরিত হইয়াছে। তাহাতেও শকের উল্লেখ আছে। মনে হইতেছে, ১৪৭৬। অতএব প্রায় চারিশত বৎসর পাইতেছি। কিন্তু মন্দিরের পরেও সে প্রাচীর নির্ম্মিত হইতে পারে। বরং এইরূপ মনে হয়, প্রথমে পাথরের বেষ্টন ছিল, পরে ইটের হইয়াছিল। মন্দিরটি পাথরে নির্ম্মিত। ছাতনার নিকটে শুশুনিয়া নামক পাহাড় আছে। পাথর নিকটে, এখনও অফুরন্ত; বালিয়া পাথর নরম, কাটিতে তেমন পরিশ্রম নাই। যিনি মন্দির করাইতে পারিয়াছিলেন, তিনি বেষ্টনের পাথর জোগাড় করিতে পারিলেন না ? অন্য দিকে দেখিতেছি,স্থপতির দোষে, কিংবা অশ্বত্থের আক্রমণ হইতে রক্ষায় উপেক্ষায় পাথরের মন্দির দুই শত বৎসরও টিকে নাই। প্রাচীরের ইটও সমান নয়। কতক ইটে ছাপ আছে, কতক ইটে নাই। ছাপের ছাঁচও এক নয়; কতক ছাঁচে অক্ষর উপরে ভাসিয়াছে,কতক ছাঁচে ডুবিয়া গিয়াছে। ত্রিবিধ ইটও ছোট ছোট টালির মতন। প্রচুর পাথরের দেশে এইরূপ ইট গড়াইয়া ছাঁচে ফেলিয়া শুখাইয়া পোড়াইয়া লইবার কি প্রয়োজন ছিল, কে জানে। কিন্তু বুঝিতেছি, প্রথম বাসলী স্থান আদিম অবস্থায় নাই।

এখন বাসলী, ছাতনার রাজার কুলদেবী। ছাতনার রাজা, বিষ্ণুপুরের মল্ল-রাজার সামন্ত ছিলেন। এই হেতু ছাতনার রাজ্যের নাম সামন্তভূম। বর্ত্তমান রাজবংশ ছত্রী। এই রাজবংশের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। এক দেবীর, কেহ কেহ বলেন বাসলী দেবীর, পূজা না করাতে তাহাঁর শাপে ব্রাহ্মণ-বংশের উচ্ছেদ হয়, বর্ত্তমান ছত্রীবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা হইয়া বসেন, এবং বাসলীর পূজা করেন। এই কাহিনী অসম্ভব নয়। আমরা জানি, পূর্ব্বকালে ধর্ম্মঠাকুর ও তাহাঁর গণ, ব্রাহ্মণের পূজা পাইতেন না। (এখানে একটু কল্পনা করি।) বাসলী দেবী কাজেই গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে হয় বৃক্ষতলে কিংবা খড়ের কুটীরে নিম্নশ্রেণীর লোকের পূজায় তুষ্ট থাকিতেন।* আদি সামন্তরাজ বিদেশী ছিলেন। তাহার পক্ষে বাসলী জাগ্রৎ দেবতা; প্রজা বশ করিতেই হউক আর বিশ্বাসেই হউক, তিনি বাসলীকে কুলদেবী করিয়া লইলেন। কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ কই ? এমন সময় কোথাকার কে এক বটু আসিয়া জুটিলেন। তিনি চণ্ডীদাস। ছাতনায় কেহ বলে না, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছাতনা। সবাই বলে, তিনি অন্য স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। সে-স্থান নান্নুর কি আর কোন্ গ্রাম কে জানে। ছাতনার শ্রীজীবনচন্দ্র দে-ঘরিয়া কষ্টে এক নাম করিয়াছিলেন। নামটি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু নান্নুর নয়, সে-গ্রামের নামের আদ্যে 'ম' ছিল।

ছাতনার বাসলীর পূজারীর উপাধি দেঘরিয়া। এই নামও প্রাচীনত্বের সাক্ষী। 'দেব-গৃহ' হইতে 'দে-ঘর'; দে-ঘর সম্বন্ধীয় দেঘরিয়া। বর্ত্তমান শ্রীজীবনচন্দ্র দেঘরিয়ার কথায় চণ্ডীদাসের অগ্রজ দেবীদাস হইতে তিনি বাইশ তেইশ পুরুষ পরে। ইহাতে ৫০০—৫৫০ বৎসর পাইতেছি। সময়ের এই মিল বিস্ময়কর। এখানে বলা আবশ্যক দেঘরিয়া মহাশয় চণ্ডীদাসের কাল সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার ফল কিছুই জানেন না। বরং আমরা যে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি, সে নিমিত্ত বাঁকুড়া হইতে গিয়াছি, ইহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়াছিলেন। এইরূপই হয়। রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামার-পুকুর, কিংবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বীরসিংহ গ্রামে তাহাঁদের চরিত শুনিতে গেলে

---

* বাঁকুড়ার মাঠে মাঠে এমন কত গ্রামদেবী বৃক্ষতলে আশ্রয় পাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। সকলের নামের শেষে সিনী আছে। যেমন, কেন্দুয়াসিনী, অর্থাৎ কেন্দু (বৃক্ষ)-বাসিনী, এইরূপ, দেয়াসিনী শব্দ—দেব (গৃহ)-বাসিনী। আমার বাঙ্গালা শব্দকোষে যে বিদেশিনী অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভুল।

সেখানকার লোকে আশ্চর্য হয়। কারণ ইঁহারা তাঁহাদের ঘরের লোক, জানা লোকের চরিত নূতন আর কি হইতে পারে। ছাতনার লোকের এই ভাব দেখিয়া মনে হইয়াছে, দেঘরিয়া মহাশয়ের চণ্ডীদাস-সম্বন্ধ নূতন কল্পিত নয়। দেঘরিয়া বংশ গ্রাম গ্রামান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে. কোথাও-না-কোথাও লিখিত প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। এবিষয়ে সাহানা মহাশয়ের আশা সফল হউক।

বাসলী পাইলাম, চণ্ডীদাসও বংশধরের সঙ্গে-সঙ্গে আসিলেন, কিন্তু নান্নুর কই? ভাষাতত্ত্ব হইতে মনে হয়, নান্নুর নামটি নন্দপুর নামের অপভ্রংশ। নন্দপুর, নন্দনপুর নাম অসাধারণ নয়। সংস্কৃতে 'পুর' শব্দের যে অর্থ, বাঙ্গালায় সে অর্থ ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। গ্রাম পুর, ছোট গ্রাম পুর, গ্রামের পাড়াও পুর। সাহানা মহাশয় বলেন, এ দেশের রাজার ছোট ছেলেকে লোকে নান্তু বলে। না-ন্তু, নন্দ শব্দের অপভ্রংশ মনে হয়। নন্দ—আদরে ন-ন্দ, পরে না ন্দু, না-ন্তু, এবং 'পুর' যুক্ত হইয়া নান্দুপুর, নান্নুপুর। ইহা হইতে স্বচ্ছন্দে নান্দুর, নান্নুর হইতে পারে। রাজার ছোট ছেলের গ্রাম ছিল, সেটি নন্দপুর বা নান্দুর। এই নাম কিন্তু ছাতনায় নাই। গ্রামের নাম পরিবর্তিত হয়, নূতন নাম রচিত হয়, চলিত হয়। কিন্তু যতদিন নান্দুর নাম না পাইতেছি, ততদিন সাহানা মহাশয়ের যুক্তির একটা প্রধান শৃঙ্খল অসংলগ্ন থাকিবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, সালতোড়া গ্রামে নিত্যার অধিষ্ঠান, যাঁহার আদেশে বাসলীদেবী চণ্ডীদাসকে প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সে গ্রাম বীরভূমে নয় বাঁকুড়ায়।

শাঁখাপুকুর প্রমাণের মধ্যে ধরি না। দেবী বহু স্থানে শাঁখা দেখাইয়াছেন। হুগলী আরামবাগের সন্নিকটে এক বিস্তীর্ণ দিঘী আছে। সেটি রণজিৎ রায়ের দিঘী। এখানে শাঁখার গল্প আছে। (কেহ গল্পটি আমূল লিখিয়া পাঠাইলে পাঠকের চিত্তবিনোদন হইবে।) এইরূপ অন্য স্থানেও আছে। বীরভূমে সাকালীপুর স্বচ্ছন্দে শাঁখারী পুকুর হইতে পারে। হয় ত ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে, এবং বিশালাক্ষীর শঙ্খ ধারণ প্রমাণিত হইয়া নান্নুরের পোত দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। ধোপা পুকুর, বাসলী স্থানের সন্নিকটে এই নামের পুকুর, বহুকাল হইতে এই নামে পরিচিত পুকুর, একটা প্রমাণের মধ্যে বটে, বিশেষতঃ পাথরের পাটটি নূতন পাথর নয়।

কিন্তু একটা গুরুতর কথা আছে। বীরভূমে চণ্ডীদাসের পদ এত প্রচলিত যে, নীলরতন-বাবু চৌদ্দ বৎসর তাহার রসাস্বাদন করিয়াছেন, কত নূতন পদ পাইয়াছেন, এবং ৮৩৭টি পদে পদাবলী করিয়াছেন। এক স্থানে এত পদ কেহ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, বাঁকুড়ায় নীলরতন-বাবুর মতন একনিষ্ঠ ভক্ত নাই, কেহ সংগ্রহ করেন নাই। অপর কথা, এই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে বসন্তরঞ্জন-বাবু চণ্ডীদাসের ভণিতাঙ্কিত দুর্লভ পুথি উদ্ধার করিয়াছেন।* সে পুথির পদের তুল্য পুরাতন পদ নীলরতন-বাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। অতএব বলিতে পারি, বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাস-মণির আকর, বীরভূমে ও অন্যত্র সে মণি ঘসা মাজা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বস্তুতঃ সমস্যা এইখানে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যে চণ্ডীদাস, তিনি কি প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাস? তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেন, আর প্রচলিত পদাবলীও গাহিতেন? বোধ হয়, এই দুই বিরোধ মিটাইতে বসিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অদ্বৈত

---

* আমার বিবেচনায় এই পুথি খাঁটি নহে, তথাপি পুরাতন ও বহুমূল্য। খাঁটি তাহাকে বলি, যাহাতে মিশাল নাই। খাঁটি গব্যঘৃত বলিলে বুঝি, তাহাতে গব্যঘৃত ব্যতীত ছাগ মহিষ প্রভৃতি অন্য পশুর নাই। খাঁটি ঘৃত বলিলে বুঝি, বসা বা তেলের মিশাল নাই। বসন্তরঞ্জন-বাবু লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।" আমার সংশয় এইখানে। আমি দেখাইয়াছি, উহার ভাষা এক দেশের, এক কালের, এবং এক কবির নয়; উহাতে মিশাল আছে। দুঃখের বিষয়, আমার সংশয় কেহ নিরাস করিলেন না। আমার বিবেচনায় উহা অনন্ত নামক কোন গায়কের চণ্ডীদাসী পালা। এমন পালা বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর আছে, যদিও পদে চণ্ডীদাসের ভণিতা নাই। সে-সব পালা, ঝুমুর নামে খ্যাত। আমার মনে হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কীর্ত্তন আদৌ নহে, ঝুমুর। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার সংশয়ের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড আছে, চণ্ডীদাসের পদে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ছিল, অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন খাঁটি চণ্ডীদাসের। এই যুক্তি আদৌ টেঁকে না। কারণ বাঁকুড়ায় প্রচলিত ঝুমুরে এই দুইর অসদ্ভাব নাই, অথচ সে-সব চণ্ডীদাসের রচিত নয়, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত নয়। গল-কম্বল গবয়ের লক্ষণ বটে, গোরুরও বটে।

হইতে দেখাতে গিয়াছেন, এক চণ্ডীদাসের স্থানে দুই চণ্ডীদাস কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু দৈব ঘটনারও গণিত আছে, এবং সে গণিত বলে বাসলী-পূজক, বড়ু, সখীসংবাদ, পদ, কর্তা, চণ্ডীদাস নামধারী, বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলে, দুই ব্যক্তির থাকা অসম্ভব। দুই কালে ধরিলেও প্রায় অসম্ভব। ছাতনা ও নান্নুরে ঋজু রেখায় ব্যবধান ৬৪ মাইল; দূর নইলে দুইজনে মিলিয়া যাইতে পারিতেন।*

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

* এই মন্তব্য লিখিবার পর বাসলীর মন্দিরাদির ফটো লইতে ছাতনা আবার গিয়াছিলাম। এবার চণ্ডীদাসের পিতামাতার নাম, তাঁহার কাল সম্বন্ধে এক প্রাচীন লিখিত প্রমাণ পাইয়াছি। সে প্রমাণ এখন বিচারাধীন আছে। পরে প্রকাশ করা যাইবে।

করিম

শ্রী গোপাল হালদার

কিছুতেই কিছু হইল না—দায়রার জজ করিমের কম করিয়া তিন বৎসর জেলের হুকুম দিয়া বসিলেন।

করিম বুঝিল না, এ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে। তাহার অপরাধ সে জানিত। সে রাত্রিতে গোপনে তার প্রতিবেশী গোলাম কাদের মিঞার প্রকাণ্ড পুকুর হইতে জাল ফেলিয়া মাছ চুরি করিতে গিয়াছিল। তা এমন একটা কিছু ভয়ানক অপরাধ বলিয়া সে অন্তত মনে করিতে পারিল না। সে অবাক্ হইল ভাবিয়া, যে, কি করিয়া গোলাম কাদের সাহেব তাহার নামে একটা মিথ্যা নালিশ আনিতে পারিলেন। মিঞা সাহেব তাহাদের অঞ্চলের একমাত্র তালুকদার, তিনি ভদ্র এবং বড়-মানুষ, তার পর দুই বৎসর আগে দ্বিতীয় বার 'হজ' করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কিনা অকুণ্ঠিত চিত্তে সমস্ত আদালতের মাঝখানে বলিয়া গেলেন যে, করিম গভীর রাত্রে তার জেনানায় ঢুকিয়াছিল একটা অসদভিপ্রায় চরিতার্থ করার জন্য। অন্তত, এত বড় পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও তার এরূপ একটা মিথ্যা অপবাদের আশ্রয় নেওয়া উচিত হয় নাই। তার পরে হাজী সাহেবের ওই প্রধানা বাঁদিটা কি মিথ্যাটাই না বলিল! করিম নাকি তৃতীয়া বিবি সাহেবের কাছে কি সব বিশ্রী প্রস্তাব পেশ করিবার জন্য তাহাকে কতদিন কত লোভ দেখাইয়াছে, ফুস্‌লাইয়াছে এবং ভয় দেখাইয়াছে! করিম ভাবিল আর অবাক্ হইল, যে, কি করিয়া এসব কথা এবাঁদিটা বলিতে পারিল। কতদিন সে একে তার বিবি সাখিনার কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, কতদিন সাখিনা তাহাকে আদর করিয়া কত জিনিস খাইতে দিয়াছে। আর সে কিনা আজ এমন সব মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিয়া গেল। কিন্তু, সবচেয়ে তার রাগ হইল যখন সে হাজী সাহেবের মজুরী মামুদকে সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় উঠিতে দেখিল। তাহার মাথায় একেবারে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পারিলে সে ছুটিয়া যাইয়া সেই মুহূর্তেই মামুদের টুঁটি চাপিয়া ধরিত। বজ্জাত লোকটা তাহাকে বলিয়াছিল কিনা সাখিনাকে তালাক দিতে! তার অপরাধ সে গরীব আর সাখিনা সুন্দরী এবং যুবতী। তিন-তিনবার সে টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাকে এম্‌নি করিয়া অপমানিত করিয়াছে। শেষবারে যখন করিম তাকে মারিতে উঠিয়াছিল, তখন মামুদ চুপ করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, "এর মজাও টের পাবি।"—করিমের এসব কথা মনে পড়িল, আর সে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। রোষে, ক্ষোভে এবং প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া সে শুনিলই না মামুদ কি সাক্ষী দিল।

কিন্তু তবু করিম হাকিমের সাম্‌নে মামুদের এই লজ্জাকর প্রস্তাবের কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। তার বিশ্বাস এতে তার এবং সাখিনার দু'জনারই অপমান

হইত। এবং শেষ পর্যান্ত সে আশা করিয়াছিল, যে, দায়রার বিলাতি জজ এ-সব সাজানো নালিশ ধরিয়া ফেলিবেন। কিন্তু, দায়রার জজ নূতন পাশ-করা সাহেব এ দেশের নীতি-জ্ঞান যে নিতান্ত শোচনীয় তাহা বিলাতে বসিয়া শুনিয়াছিলেন, এবং আমাদের নৈতিক উন্নতির জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াই এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাই এই সুযোগ তিনি ছাড়িলেন না; করিমকে তিনটি বৎসর সশ্রম জেলের হুকুম দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই নিদারুণ জেলের বিভীষিকা এবং তার সঙ্গেকার জজ সাহেবের ইংরেজি কটু কথা সবই করিম বোধ হয় সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু তার মনটা কাঁদিতে লাগিল তার স্ত্রী ও ছোট মেয়েটির জন্য।

যে-দিন সে মাছ ধরিতে যাইয়া ধরা পড়িল, সেদিন সাখিনা তার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। হাজী সাহেবের প্রচারিত মিথ্যা কথাটা সে বিশ্বাস করিল, অনেক কাঁদিল, অনেক কোঁদল করিল, এবং স্পষ্ট বলিল যে, করিমের এই দুর্ম্মতি অনেক দিন হইতেই সে লক্ষ্য করিয়াছিল। তার পর পুলিশ যখন তাহাকে সহরের দিকে লইয়া চলিল তখন সাখিনা তাহাকে বিদায় লইবার পূর্ব্বক্ষণে শুনাইল যে সে গরীব, অক্ষম, তার স্ত্রী এবং দেড় বৎসরের ছোট মেয়েটিকে খাওয়াইবার, পরাইবার মত শক্তিটুকুও তার নাই। ইহা ছাড়া আবার সে পরের বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়—এমনি সে বেহায়া, তাহার মুখ আর সে ইহজন্মে দেখিতে চায় না।—করিম অনেক কথা বলিতে চাহিল; কিন্তু সাখিনা তার কোনো কথা শুনিতে দাঁড়াইল না। চোখের জল মুছিতে-মুছিতে করিম সহরের দিকে চলিল। তার ফুফুর ছেলে কাল্লু তাকে সেখানে দেখিতে আসিয়াছিল। সে তার কাছে শুনিল যে, সাখিনা তার ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। করিম কাল্লুর হাত ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া বলিল যেন সে সাখিনাকে পাঁচটা টাকা দিয়া আসে,—জেল হইতে ফিরিলেই করিম এ টাকা শোধ করিয়া দিবে। কাল্লু চোখ মুছিয়া স্বীকার হইয়া গেল এবং পরে আবার দেখা করিতে আসিলে জানাইল যে সাখিনা টাকা লইয়াছে, তার রাগ চলিয়া গিয়াছে, আর সে এখন দিবারাত্র করিমের জন্য কাঁদে। করিমের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কিন্তু সে কাল্লুর মারফতে সাখিনাকে খুব ভরসা দিয়া পাঠাইল।

জেলের দুয়ার যখন তিন বৎসরের মত বন্ধ হইতেছিল তখন করিম ফটকের বাহিরে বিষণ্ণ কাল্লুর দিকে চাহিয়া শেষবার বলিল, যেন সে সাখিনার খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়, তাহার জমি-জমা চাষ-বাস করে। কাল্লু মাথা নাড়িয়া স্বীকার হইয়া গেল।

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া করিম চাষ করিয়াছে, ফসল ফলাইয়াছে। তাহার কাছে জেলের কড়া শাসন, কড়া শাস্তি এবং হাড়-ভাঙা খাটুনি অল্পতেই অভ্যস্ত হইয়া গেল। তিন বৎসর সে কাটাইয়া দিল। তাহার কষ্ট হইল শুধু বাড়ীর কোনো খবর না পাইয়া। সাখিনার নামে তাহার দাদার বাড়ীর ঠিকানায় ও কাল্লুর নামে সে অনেক চিঠিই দিল, কিন্তু কোনো খবরই আসিল না। বিশেষত এই শেষ বৎসরে যখন গান্ধীর দলের লোকে জেল ভরিয়া উঠিল, তখন তাহাদের অনেককে ধরাইয়া সে অনেক চিঠি দিয়াছে, সে-সব চিঠির কি হইল করিম ভাবিয়া পাইল না। আর-একটি জিনিস করিম দেখিয়া অবাক্ হইল যে, তাহাদের সহরের সেই বড় উকীল যিনি তাহার বিরুদ্ধে হাজী সাহেবের পক্ষ হইয়া মামলা চালাইয়াছিলেন, তিনি কলিকাতার এই বড় জেলে এক বৎসরের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার অবশ্য খাটুনি নাই; কিন্তু তবু এত বড় একটা লোক এখন জেলে। করিম একদিন তাঁহাকে সেলাম করিয়া এর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। উকীল-বাবু অনর্গল বকিয়া গেলেন—যেন তখনো কোনো মামলায় তিনি বক্তৃতা করিতেছেন,—তিনি করিমকে বুঝাইলেন ইংরেজের আদালতে ন্যায়-ধর্ম্ম একেবারেই নাই। করিম আর-একবার সেলাম করিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, এ কথার প্রমাণ সে স্বয়ং। উকীল-বাবুর তাহার কথা ভালো করিয়া মনে পড়িল না। তবে তার মক্কেল হাজী সাহেব যে কোনো মিথ্যা কথা বলিবেন এ কথা তিনি মানিলেন না; কারণ দেখাইলেন, হাজী সাহেব

তাঁদের খেলাফৎ কমিটির একজন বিশেষ পাণ্ডা; তাঁর এলাকা থেকে তিনি মাসে ত্রিশ জন লোককে আইন অমান্য করিবার জন্য সহরে পাঠাইবেন বলিয়া নিজ হইতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।—করিম সব কথা বুঝিল না, তবে বিশ্বাস করিল যে, গান্ধী মহারাজের নামে সে যেমন শুনিয়াছে যে অনেক দুর্দ্দান্ত লোকও রাতারাতি শুধ্‌রাইয়া গিয়াছে, হাজী সাহেবও হয়ত তেম্‌নি সাধু হইয়া উঠিয়াছেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া করিম তিন বৎসর পরে একটা নূতন উল্লাসের স্বাদ পাইল—আশায় তার বুক ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে উদ্বেগে তার বুক কাঁপিতে লাগিল। বাড়ী যাইবার ভাড়াটা সর্‌কার দয়া করিয়া দিয়া দিয়াছিলেন। করিম কলিকাতার পথে শতবার পথিকদের জিজ্ঞাসা করিয়া শতবার ভুল করিয়া অবশেষে ষ্টেশনে যাইয়া পৌছিল, এবং একেবারে বাড়ীর ষ্টেশনের টিকিট কাটিয়া গাড়ী চাপিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রিশেষে গাড়ি পৌছাইবার কথা—কিন্তু তার চোখে সমস্ত রাতে এক পলকের জন্যও ঘুম আসিল না।

টলিতে-টলিতে ভোরের আলোয় চির-পরিচিত গাঁয়ের মধ্য দিয়া সে বাড়ীতে যাইয়া পৌছাইল। নিজের বাড়ী সে আজ নিজে আর চিনিতে পারিল না। সবিস্ময়ে সে দেখিল সকালের আলো উঠিতে-না-উঠিতে তার অপরিচ্ছন্ন আঙিনায় 'বন্দেমাতরম্‌' ও 'আল্লাহো-আকবর' এবং মহাত্মা গান্ধী হইতে সুরু করিয়া যত অজ্ঞাত লোকের নামে জয়ধ্বনি চলিল। তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। হল্লার শেষ ছিল না। করিম অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। এদের যিনি মোড়ল এবং পেন্সিল লইয়া অনেক কথা লিখিতেছিলেন তিনি করিমকে চিনিতে পারিলেন, দু-একটা কথাও কহিলেন। করিম তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল এ বাড়ী এখন কংগ্রেস ও খেলাফৎ আফিস। খাজনার দায়ে করিমের বাড়ী-ঘর নীলাম হইয়া গেলে হাজী সাহেব তাহা কিনিয়া লইলেন এবং কংগ্রেস ও খেলাফতের আফিস এখানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কবে যে খাজনা বাকী পড়িল এবং নীলাম হইল, করিম সে-সম্বন্ধে অনেক বিস্ময় প্রকাশ করিল এবং জানাইল যে, তাহার ভিটা সে যে-করিয়াই হোক্ উদ্ধার করিবে; কিন্তু তাহাতে মোড়ল শুদ্ধ সমস্ত চীৎকার-পরায়ণ ভলাণ্টীয়ার-সমাজ রুখিয়া উঠিল। বচসা যখন হাতাহাতিতে যাইয়া ঠেকিতেছিল, তখন মোড়ল তার চেলাবৃন্দকে হাঁকিলেন, "ভাইসব, ভুলো না আমরা অহিংস-ব্রতধারী। এ আহাম্মক যা খুসী বকিয়া যাক্। এ বাড়ী হ'তে আমরা নড়্‌ব না।"—করিম হতাশ হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, একবার ফিরিল, জিজ্ঞাসা করিল—

"আমার বিবি ও মেয়ে—তারা কোথা?"

"তোর বিবি!—বেশ বল্‌ছিস্‌। তুই না তাকে বিনা-দোষে মার-ধর ক'রে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলি। এখন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, আমার বিবি কোথা!—যা! ও কথা মুখে আনিস্‌ না;—সে এখন হাজী সাহেবের নিকে-করা বিবি।"

সে তালাক দিয়াছিল—সাখিনাকে? কবে? কোথায়? মিথ্যা জুয়াচুরী। "ছলিমুল্লা মৌলবী সে তালাকের সাক্ষী"। সে মিথ্যাবাদী? সে আজ কমবখ্‌ত ন্যাসারেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে জেলে গিয়েছে; কিন্তু তার শিষ্যদল তার এ অপমান সহিবে না। অহিংস-ব্রতীদের অর্দ্ধ-চন্দ্রে করিম বিদায় লইয়া গেল। বলিল, সে খুন করিবে।

নীচেকার মাটি হইতে উপরের আকাশটা পর্য্যন্ত সমস্ত দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—তার পর তা একেবারে চুর চুর হইয়া ভাঙিয়া এক প্রলয়-বিলোড়নে অগণিত স্ফুলিঙ্গের মত ছুটিয়া চলিতে লাগিল। সব শেষে রহিল একটা পাণ্ডুর আভা, আর সমস্ত গাছ-পালা, লতা-পাতা, ফুল-ফল, নদী-খাল-বিল মুছিয়া ফেলিয়া একটা শূন্যতা।

গ্রামের শেষ সীমার গাছটির নীচ হইতে করিম যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সাম্‌নের দূর-বিস্তৃত ধান-ক্ষেতগুলির উপরে অস্তগত সূর্য্যের হলদে রঙের আভাটি নিবিতেছে। করিম চলিয়া গেল। পলাইয়া বিনা টিকেটে কয়েদ থাকিয়া শেষে আবার কলিকাতার পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথে পথে হাঁটিয়া বসিয়া শুইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইয়া করিম সজ্ঞাহীন, বোধহীন, নিশ্চল পাথরের মতন চলিল। কিন্তু বেশী দিন এভাবে কাটে না। মনের আগুন নিবিল না এবং ক্ষুধার তাড়া দিনদিনই উৎকট হইতে লাগিল।

ভিক্ষায় তাহার পেট ভরিত না। অবশেষে কোনোরূপে মুঠা জুটাইবার জন্য তাকে কাজের চেষ্টায় লাগিতে হইল; প্রথম-প্রথম অনিচ্ছায়, নিরুদ্যম ভাবে, তার পরে প্রাণপণে, সমস্ত মন দিয়া অনেকের দুয়ারে গেল, তাড়া খাইল, গালাগালি খাইল, এবং অনেকখানে নিতান্ত মার খাইবার ভয়ে পলাইয়া আসিল। সবখানেই জিজ্ঞাসা করিত সে ইতিপূর্ব্বে কি করিত, কোথায় ছিল। প্রথম-প্রথম বলিয়াছিল, কিন্তু পরে আর কাহাকেও বলিল না যে, তার ইতিপূর্ব্বে একটা কদর্য্য অপরাধের অভিযোগে তিন বৎসরের জেল হইয়াছিল। কারণ, সে দেখিয়াছে যে, যখনই সে অভিযোগটাকে মিথ্যা বলে তখনই লোকে মুখ টিপিয়া হাসে, এবং বলে যে সেখানে তার সুবিধা হইবে না।

দিন কাটিয়া যায়। ক্রমে সে বেপরোয়া হইয়া উঠিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়াইয়া দেখিল এখানকার লক্ষ লোক ক্রমাগত কাজের তাড়ায় ছুটিয়াছে, কেহ নিশ্চেষ্ট নাই, তিলেকের জন্য দাড়ায় না। ইহাদের মুখে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তির চিহ্ন আছে—কিন্তু কর্ম্মহীন জীবনের যে-বিষাদ তাহা যে ইহার চেয়ে কত বেশী ভয়ানক তাহা তো তার অজানা নাই। সে বাঁচিতে চায়, কুঁড়েমি করিয়া নয়, ভিক্ষা করিয়াও নয়, গতরে খাটিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কোনোরূপে সে দুমুঠি অন্নের জোগাড় করিতে চায়। জীবনে তার আশা নাই, উৎসাহ নাই, ভরসা নাই, বাঁচিবার সাধও বিশেষ অবশিষ্ট নাই—তার ছোট গাঁয়ের চিহ্নহীন ছোট ঘর ও সংসারের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই সে-সব সাধ তার ফুরাইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষুধা সে-কথা মানে না, তৃষ্ণা সে-কথা শোনে না, তাহারা তাহাকে বাঁচিবার জন্য তাগিদ দিতেছে।

করিম ভাবিল এর চেয়ে জেল ঢের ভাল, হাড়-ভাঙা পরিশ্রম,—খাওয়ার জন্য এমন ভাবিতে হয় না। আর দেহের ক্লান্তির নীচে মনের অবসাদ তলাইয়া যায়।

'মহাত্মা গান্ধীকি জয়' বলিয়া একদল ভলান্টীয়ার খদ্দরের টুকরা উড়াইয়া চলিয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে দু'জন পুলিশ। চারিদিকে লোক চীৎকার করিতেছিল, 'বন্দে মাতরং'। 'মহাত্মা গান্ধীকি জয়' বলিয়া করিম তাহাদের মধ্যে যাইয়া পড়িল। 'এ বিলাতী কাপড়া-ওয়ালা'—নিকালো বলিয়া পুলিশ তাহাকে সরাইয়া দিতে গেল। করিম আপত্তি করিল—কিন্তু দুটি রুলের গুঁতায় মীমাংসা হইয়া গেল।

দু'পারের জনতা ভলান্টিয়ারদের ঘেরিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

হতবুদ্ধির মত করিম পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল, ভাবিয়া পাইল না কেন সরকারের জেলের ফটক বিনা কারণেও একবার তাহাকে বরণ করিয়া লইল, আবার কেন আজ যখন তার নিতান্ত প্রয়োজন তখন সে ফটক তাহার সমস্ত মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া এম্নি করিয়া তার মুখের উপর বন্ধ হইয়া গেল,—একি আইনেরই মর্জ্জি না তার নসিব?

ময়ূরভঞ্জের শিল্প

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

ভারতীয় শিল্পের পরিচয় দিতে হ'লে আমরা সাধারণতঃ সাঁচি, ভরহুত, অমরাবতী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ প্রভৃতি স্থানের শিল্পের উল্লেখ করি। এর মধ্যে যদিও উড়িষ্যার মন্দির-রাজির পরিচয় সহজেই এসে পড়ে, তবু তার মধ্যে ময়ূর-ভঞ্জের শিল্পের স্থান অনেক দিন থেকে ছিল না। প্রথমে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জের শিল্পের কথা পণ্ডিত-মহলে উপস্থিত করেন। তিনি ময়ূরভঞ্জের রাজ-সরকারের সাহায্যে সেখানকার অনেক অজ্ঞাত মূর্ত্তির

১। গজসিংহবাহিনী—ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত

পরিচয় ঐতিহাসিক-মহলে হাজির করেন। তখনই প্রথম বোঝা গেল যে, বাংলারই ঠিক প্রান্তভাগে উড়িয়া-প্রধান এই রাজ্যে এককালে ভারতীয় শিল্প যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তার পরে ময়রভঞ্জের মহারাজের আহ্বানে কলিকাতা মিউজিয়মের শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় সেখানকার শিল্পের অনুসন্ধানে পুনরায় গমন করেন। ময়রভঞ্জের এক প্রান্তে খিচিং গ্রামে চন্দ মহাশয় অনেক পুরানো মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। সেইসব মূর্ত্তির শিল্পকলা আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, ময়রভঞ্জের শিল্প কতটা উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কতকগুলি মূর্ত্তির শিল্প-

২। নাগরাজ—ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত

কার্য্য এত সুন্দর যে, সেগুলি আমরা ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় যুগ গুপ্তযুগের শিল্পের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করতে পারি।

এখানে আমরা ময়রভঞ্জের কতকগুলি মূর্ত্তির পরিচয় দেবো। প্রথম মূর্ত্তিটি—ব্রহ্মাণীর। ইনি চতুর্মুখ, অর্দ্ধ

৩। ব্রহ্মাণী—ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত

৪। নর্ত্তকী—ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত

পর্য্যঙ্ক-অবস্থায় আসীন, বাম ক্রোড়ে একটি বালক, এক হস্তে বালকটিকে ধরে' আছেন, অপর বাম হস্ত ভগ্ন দক্ষিণ এক হস্তে জপমালা, অন্য হস্তটি অভয় মুদ্রায় আছে। সিংহাসনের নীচে বাহন হংস আছে। উপরে তুই পাশে তুই গন্ধর্ব্ব মাল্য নিয়ে আস্‌ছে। মাথায় জটামুকুট। মূর্ত্তিটিতে শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি—এক নাগরাজের। এর মাথায় সর্পের যে-ফণা ছিল সেটি ভগ্ন হ'য়ে গেছে, এবং নীচেও যে-সর্পের ল্যাজ ছিল তাও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। এই নাগরাজের মুখে বেশ একটি প্রশান্ত ভাব দেখা যাচ্ছে,—এরকম শান্ত ও উদার ভাব বুদ্ধদেব ছাড়া আর কোনো মূর্ত্তিতে বড় একটা দেখা যায় না।

তৃতীয়টি—গজসিংহবাহিনীর মূর্ত্তি। মন্দিরের স্তম্ভের শোভা বৃদ্ধি কর্‌বার জন্যে অনেক সময় গজসিংহমূর্ত্তি

দেওয়া হয়। এখানে শুধু যে সিংহ একটি হাতীকে দমন করছে তা নয়, সিংহকে দমন করবার জন্যে একটি নারী-মূর্ত্তিও আছে। এই নারীমূর্ত্তিতে সজীবতার লক্ষণ যথেষ্ট রয়েছে!

চতুর্থটি—নর্ত্তকীদের মূর্ত্তি। এ-গুলিও মন্দিরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্যে (decorative হিসাবে) ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চমটি—একটি বৃষের মূর্ত্তি। সাধারণতঃ এটি নন্দিন্ বলে' পরিচিত ও মন্দিরের সামনে প্রাঙ্গণে স্থান পায়। ময়রভঞ্জের এই বৃষের সঙ্গে আমরা আর-একটি বিদেশী বৃষের তুলনা করতে পারি। সেটি অবশ্য চীনদেশীয়। চীনে পিকিং সহরে সম্রাটের যে গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ আছে সেখানে এটি আছে। এই ছবিখানি বিশ্বভারতীর চৈনিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লিম মহাশয় আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে বাধিত করেছেন। বাকি ছবিগুলি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত হ'ল।

৭। বৃষমূর্ত্তি—চীনের পিকিং সহরে সম্রাটের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে প্রাপ্ত

"উর্ব্বশী"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি অতি-প্রসিদ্ধ কবিতার নাম "উর্ব্বশী"। সেই কবিতাটি-সম্বন্ধে কবীন্দ্রের জীবনী-লেখক ও কাব্য-সমালোচক টম্‌সন্ সাহেব বলেছেন—

Urbasi is perhaps *the greatest* lyric in all Bengali literature and probably *the most* unalloyed and perfect worship of Beauty which the world's literature contains. অর্থাৎ উর্ব্বশী কবিতাটি সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা এবং সম্ভবতঃ বিশ্বসাহিত্যের মধ্যেও সৌন্দর্য্যের অনাবিল পূর্ণপরিণত পূজার শ্রেষ্ঠতম কবিতা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বহুকাল পূর্ব্বেই বলে' গেছেন—

"বাস্তবিক উর্ব্বশীর ন্যায় সৌন্দর্য্যবোধের এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে কোথাও আছে কি না সন্দেহ।"

অজিতকুমার উর্ব্বশী-কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে এই বলে' ব্যক্ত করেছেন—

"উর্ব্বশী-কবিতার মধ্যে সৌন্দর্য্যকে সমস্ত মানব-সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে, তাহার বিশুদ্ধিতায়, তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে।" "জগতের বিচিত্র-চঞ্চল সৌন্দর্য্য সকল সম্বন্ধাতীত এক অখণ্ড সৌন্দর্য্যে নিবিড় লীন।" "সৌন্দর্য্য সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তা। জগতের কোন রহস্য-সমুদ্রের গোপন অতলতার মধ্যে তাহার সৃষ্টি। সমস্ত বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে ক্ষণে-ক্ষণে তাহার বিদ্যুৎ-চঞ্চল অঁচল দোলানোর আভাস পাওয়া যায়......ইহারি নৃত্যের ছন্দে-ছন্দে সিন্ধুর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত, শস্যশীর্ষে ধরণীর শ্যামল অঞ্চল কম্পিত, ইহারি স্তনহারচ্যুত মণিভূষণ অনন্ত আকাশে তারায়-তারায় বিকীর্ণ, বিশ্ববাসনার বিকসিত পদ্মের উপরে ইহার অতুলনীয় পাদপদ্ম স্থাপিত।"

এই বস্তুনিরপেক্ষ abstract ও absolute সৌন্দর্য্যকে

কবীন্দ্র কেনো উর্ব্বশী-রূপে কল্পনা করেছেন, তা বুঝতে হ'লে উর্ব্বশীর আদিম উল্লেখ-স্থান ভারতীয় পুরাণ-কথার আদি-প্রস্রবণ বেদ থেকে পুরাণ ও কাব্যের ভিতর দিয়ে সেই কাহিনীটিকে অনুসরণ করে' দেখতে হবে। ভারতীয় সৌন্দর্য্যবোধ, The Type of Eternal Beauty এই উর্ব্বশীর রূপ ধারণ করে' বিশ্ববিমোহিনী মাধুরী ও শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে উর্ব্বশীর একটি উপাখ্যান আছে। উরু (বিস্তীর্ণা, বহুব্যাপিনী) অসি (তুমি হও) যাকে বলা যায় সেই উর্ব্বশী। উর্ব্বশীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী পুরুরবা। পুরু (প্রচুর, অধিক) রবস্ [দীপ্তি (তুলনীয় রবি)] যার সে পুরুরবা। এই পুরুরবা ঐল, অর্থাৎ ইলার পুত্র। ইলা বা ইড়া ভূমির বা পৃথিবীর এক নাম। পার্থিব প্রত্যেক জীবই পুরুরবা বা পুরুষ। কিছুকাল অপ্সরা-উর্ব্বশী পুরুরবার সহিত একত্র বাস করার পর পুরুরবাকে ছেড়ে চলে' যেতে উদ্যত হয়েছে, আর পুরুরবা কাতর হয়ে পলায়মানা উর্ব্বশীকে বল্‌ছে—

"হয়ে জায়ে, মনসা তিষ্ঠ ঘোরে।—ওগো জায়া, ওগো ক্রূরমনা, তুমি আমাকে ত্যাগ করে' যেয়ো না।"

এ কথার উত্তরে উর্ব্বশী বল্‌ছে—

"পুরুরবঃ, পুনর্ অস্তং পরেহি, দুরাপনা বাত ইবাহম্ অস্মি।—হে পুরুরবা, তুমি পুনর্ব্বার গৃহে পরাবর্ত্তন করো; আমি বাতাসের ন্যায় দুর্লভ—ধারণাতীত।"

পুরুরবা উর্ব্বশীর ঐ কথায় নিরস্ত না হয়ে যখন অন্তরীক্ষপূরণকারিণী আকাশ-বিস্তারিণী অপ্সরাকে ধর্‌তে গেলো, তখন উর্ব্বশী ভীতা হরিণী অথবা ক্রীড়ারতা ঘোটকীর ন্যায় পলায়ন কর্‌তে লাগলো। উর্ব্বশী পালাতে পালাতে শোকার্ত্ত পুরুরবাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেলো—

"ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি, সালা, বৃকানাং হৃদয়ান্যেতা।—স্ত্রী-লোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না, এদের হৃদয় ব্যাঘ্রীর হৃদয়ের তুল্য।"

সেই আকাশ-প্রিয়া দুরাপনা উর্ব্বশীকে পুরুরবা ধরে' রাখতে পার্‌লে না, তাকে হারাতেই হ'লো।

পণ্ডিতেরা বলেন, এই উর্ব্বশী হচ্ছে চিরন্তনী উষা—উষসী; আর পুরুরবা অর্থে সূর্য্য। রবির উদয়ে উষা পলায়ন করে, এই প্রাকৃতিক ব্যাপারটিকে নায়ক-নায়িকার রূপকে বৈদিক কবি প্রকাশ করেছেন। বস্তু-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্য-রূপিণী উষসীকে পাবার আগ্রহে আকাশ হয়েছে ক্রন্দসী—তার ক্রন্দনের বিরাম আজ পর্য্যন্ত হয়নি, সে অ-ধরকে ধর্‌তে না পেরে শূন্য বক্ষ মেলে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে আছে।

গ্রীক পুরাণে একটি অনুরূপ উপাখ্যান আছে—পলায়ন-পরা ইউরোপা দেবীকে এক শ্বেত বৃষ হরণ কর্‌তে ছুটেছে। বেদে সূর্য্যকে বহু স্থলে শ্বেত বৃষ বলা হয়েছে। ঐ ইউরোপা দেবী তা হ'লে বেদের উর্ব্বশী উরূকি বা উষসী।

দান্তে গাব্রিয়েল রসেটি একটি কবিতায় সূর্য্যোদয়ে উষার পলায়নের কথা বলেছেন।

নর্ত্তকী—ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত

৬ নন্দিন্ (বৃষমূর্ত্তি)—ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত

In a soft-complexioned sky
    Fleeting rose and kindling grey,
Have you seen Aurora fly
    At the break of day ?

স্নিগ্ধবরণ আকাশের গায় লালিমা পালায়, ধূসর জ্বলে,
তখন উষারে পালাতে দেখিয়া পিছু পিছু তার দিবস চলে।

এই সুষমা-স্বরূপিণী উষা সমস্ত আকাশ অন্তরীক্ষ পূর্ণ করে' থাকে; পুরুষ বা জীব সেই সৌন্দর্য্যস্বরূপিণীকে ধর্‌তে চায়, কিন্তু অ-ধরকে ধর্‌তে না পেরে সে কাতর হয়, শোক করে।

উরু শব্দের আদিম অর্থ ব্যাপ্ত, বিস্তীর্ণ। সেইজন্যই কালক্রমে দেহের মধ্যে যে অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল তারও নাম হয়েছে **উরু**। উরু শব্দের আদিম অর্থ যখন পরবর্ত্তী অর্থে চাপা পড়ে' গেলো, তখন পুরাণের মধ্যে উর্ব্বশী শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির করা হলো—

নারায়ণোরুং নির্ভিদ্য সংভূতা বরবর্ণিনী।
ঐলস্য দয়িতা দেবী যোষিদ্-রত্নং কিম্ উর্ব্বশী॥—হরিবংশ।

নার অর্থাৎ নরসমূহের অয়ন অর্থাৎ গতি বা আশ্রয় যিনি সেই ভগবান্ নারায়ণের অরূপ পরিব্যাপ্ত বিরাট্ বপু থেকে অপরূপ রূপবতী উর্ব্বশীর উৎপত্তি হয়।

এই নারায়ণই বিষ্ণু—অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক—

যস্মাদ্ বিশ্বম্ ইদং সমং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাদ্ এবোচ্যতে বিষ্ণুর্ বিশ-ধাতোঃ প্রবেশনাৎ॥

এই উর্ব্বশীর উৎপত্তি হয় নর-নারায়ণের তপস্যা-ভঙ্গের জন্য। একান্তমনে কোনো কর্ম্মে অভিনিবেশের নাম তপস্যা। নারায়ণেরই অংশ নর যখন একান্তমনে কোনো কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর্‌তে চায়, যখন সে নিজের চারিদিকে কর্ম্মের কারাগার রচনা করে' নিজেকে বন্দী কর্‌তে থাকে, তখন সৌন্দর্য্যরূপিণী উর্ব্বশী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-

শব্দ হয়ে সেই তপস্বী নরনারায়ণের ইন্দ্রিয়-জালায়নের ফাঁক দিয়ে বারম্বার উঁকি মেরে মেরে তার মনোহরণ করে, তাকে সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যের মধ্যে মুক্তি দিতে হাত-ছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। নরনারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা-রম্ভা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অপ্সরাগণ অসমর্থ হলো, এমন কি জগতের তিল-তিল উত্তমের সমষ্টি-স্বরূপিণী যে তিলোত্তমা সেও যখন পরাভূত হলো, তখন নারায়ণ বিষ্ণুর উরু থেকে উর্ব্বশীকে উৎপাদন করা হলো।

পদ্মপুরাণে এই উপাখ্যানটি একটু অন্যবিধ। মদন ও বসন্তকে সহায় করে'ও অপ্সরারা যখন নরনারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করতে অসমর্থ হলো তখন যিনি স্বমাধুর্য্যে বিশ্বকে মোহিত করেন, সেই মদন ও কুসুমাকর বসন্ত দুজনে মিলে সৌন্দর্য্যললামভূতা অপ্সরাদের অঙ্গ থেকে উর্ব্বশীকে অঙ্গ দান করে। অপ্সরারা সৌন্দর্য্যময়ী; সৌন্দর্য্যের সারাৎসার হচ্ছে উর্ব্বশী। তাই কবি উর্ব্বশীকে বলেছেন—

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষ-পাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল।"

পুরাণেও দেখ্‌তে পাই—উর্ব্বশীর যখন আবির্ভাব হলো তখন

ত্রৈলোক্যসুন্দরীরত্নম্ অশেষম্ অবনীপতে।
গুণৈর্ লাঘবম্ অভ্যেতি যস্যাঃ সন্দর্শনাদ অনু॥
তাং বিলোক্য মহীপাল চকম্পে মনসানিলঃ।
বসন্তো বিস্ময়ং যাতঃ স্মরঃ সস্মার কিঞ্চ ন॥
রম্ভা-তিলোত্তমাদ্যাশ্চ বৈলক্ষ্যং দেব যোষিতঃ।
ন রেজুর্ অবনীপাল তল্লক্ষ্যহৃদয়েক্ষণাঃ॥

সেই উর্ব্বশীকে সন্দর্শন করার পর ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরত্নও হীনপ্রভ হয়ে গেলো; তাকে অবলোকন করে' বায়ু মনে মনে কেঁপে উঠলো; বসন্ত বিস্ময়ে অভিভূত হলো; যিনি স্বয়ং স্মর, তিনিও এমন মতিভ্রান্ত হলেন যে কিছুই স্মরণ করতে পারলেন না; রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাগণও সেই উর্ব্বশীকে মানস-নয়নে দর্শন করার পর আর দর্শনযোগ্য থাকলো না।

সৌন্দর্য্যলোকে নন্দনকাননে যিনি সৌন্দর্য্যের ইন্দ্র-জাল রচনা করেন, সেই ইন্দ্র উর্ব্বশীকে ইন্দ্র-সভার প্রধানা নর্ত্তকী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ইন্দ্র-সভায় থেকেও উর্ব্বশীর মন মর্ত্তের পুরুরবার সঙ্গে সম্মিলিত হবার জন্য চঞ্চল হয়, নৃত্যকালে অন্যমনস্কতায় তার তালভঙ্গ হয়। আবার অন্যদিকে উর্ব্বশীকে দেখে অবধি পৃথিবীপতি পুরুরবারও মন তন্ময় হয়ে আছে: পৃথুলা পৃথিবীর পতি হয়ে পুরুরবা স্বর্গের উর্ব্বশীর বিরহে কাতর। দেবতার শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে উর্ব্বশী-অপ্সরার সঙ্গে মানব-পুরুরবার কিছুদিনের জন্য মিলন হলো।

এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাটিকে অবলম্বন করে' সৌন্দর্য্যের ঐন্দ্রজালিক কবি কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী-নাটক রচনা করেন। কালিদাসের উর্ব্বশী রূপবতী হয়েও রূপাতীত অপরূপ। তার উর্ব্বশী কেবল-সৌন্দর্য্য-রূপিণী, যুবতী-শশিকলা, যূথিকা-শবল-কেশী, স্থিরযৌবনা। বাংলার কবিও উর্ব্বশীকে প্রশ্ন করেছেন—

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী!

সেই উর্ব্বশীর ক্রমবিকাশ নেই, দেশ-কালে সৌন্দর্য্যের ন্যূনাধিক্যের তারতম্য নেই, সে চিরন্তনী, স্বসম্পূর্ণা! 'জা তবো-বিসেস-সঙ্কিদস্স সুউমারং পহরণং মহেন্দস্স'—যে উর্ব্বশী কারো বিশেষ তপস্যায় শঙ্কিত মহেন্দ্রের হাতের প্রধান প্রহরণ—এ প্রহরণ ইন্দ্রের অপর প্রহরণ বজ্রের ন্যায় কঠিন নয়, এটি সুকুমার প্রহরণ! এই সুকুমারের মার বজ্রাঘাতের চেয়েও মারাত্মক! এই উর্ব্বশী 'পচ্চাদেসো রূব-গব্বিদাএ সিরি-গোরিএ'—গৌরীকেও রূপের প্রভায় প্রত্যাখ্যান বা পরাস্ত করেন—সেই প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি কেবলমাত্র গৌরীই নন, তিনি শ্রীগৌরী—শ্রীসমন্বিতা গৌরাঙ্গী; তিনি কেবলমাত্র শ্রীগৌরীই নন, তিনি আবার রূপগর্ব্বিতা—নিজের রূপৈশ্বর্য্য-সম্বন্ধে সচেতনা; তিনিও উর্ব্বশীর কাছে পরাজয় মানেন। এই উর্ব্বশী 'অলঙ্কারো সগ্গস্স'—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা-কিছু ভালোর ভাণ্ডার স্বর্গ, সেই স্বর্গেরও অলঙ্কার-স্বরূপা এই উর্ব্বশী। (বিক্রমোর্ব্বশী ১ম ও ৪র্থ অঙ্ক)

পুরুরবা একান্ত-সৌন্দর্য্যদিদৃক্ষু হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-স্বরূপিণী উর্ব্বশীকে প্রেয়সী করেছিলেন। কিন্তু ভোগ-বাসনাতে সৌন্দর্য্য কলুষিত হয়, তাই রূপসী উর্ব্বশীকে সেবাদাসী করবার বাসনা প্রকাশ পাওয়াতে উর্ব্বশী পুরুরবার উপর কুপিতা হয়ে সৌন্দর্য্যের জন্মভূমি হিমালয়ের একান্তে কুমার-বনে প্রবেশ করলে।

মার কন্দর্পও যার কাছে কুৎসিত প্রতিপন্ন হন এবং

যিনি অবিবাহিত তিনি কুমার ; সেই কুমারের উপবনে কামনার সংস্রব নেই, সেখানে রমণীর প্রবেশাধিকার নেই—সেখানে রমণী অভিশপ্ত। সেই কুমারের উপবনে প্রবেশ করে' উর্ব্বশী পুরুরবার দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হলো—উর্ব্বশী পুরুরবার কামনায় কুপিত হয়ে কুমার-বনে গিয়ে আত্মগোপন করলে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত কামনাপরবশ পুরুরবা সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে শরীরিণী দেখ্ছিলো ; এখন তাকে হারিয়ে তাকে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখ্তে লাগ্লো।

তখন বর্ষাকাল। বর্ষার কবি কালিদাস মেঘদূত-কাব্যে বলেছেন—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ,
কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্ দূরসংস্থে।"—

মেঘোদয় দেখলে প্রিয়পার্শ্ববর্ত্তী জনেরও চিত্ত উদাস হয়, বিরহী জনের তো কথাই নেই।

পুরুরবার চিত্তও প্রিয়া-বিরহে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সে কল্পনায় সর্ব্বত্র প্রিয়ের আবির্ভাব অবলোকন করছে। বর্ষার আবির্ভাবে নূতন ভুঁইচাঁপা ফুল ফুটে উঠেছে, তা দেখে পুরুরবা বল্ছে—

"আরক্ত-কোটিভির্ ইয়ং কুসুমৈর্ নবকন্দলী মলিনগর্ভৈঃ।
কোপাদ্ অন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ ॥"
রক্ত-প্রান্ত কৃষ্ণমধ্য নবকন্দলী ফুল
যেনো গো তাহার কোপছলছল লোচন রাতুল।

সেই সুগাত্রী উর্ব্বশীর অলক্তক-রঞ্জিত পদরাগ বনস্থলীর বুকে অঙ্কিত দেখ্তে দেখ্তে পুরুরবা চলেছে। কিছুদূর গিয়ে সে দেখ্লে—শাদ্বলাচ্ছাদিত স্থানে রক্তবর্ণের ইন্দ্র-গোপ কীট বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে ; অমনি তার ভ্রম হলো সেখানি বুঝি লাল-বুটি-দেওয়া টিয়া-পাখীর পেটের ন্যায় ফিকে-সবুজ-রঙের কাপড় তার প্রিয়া ফেলে রেখে গেছে—শুকোদরশ্যামম্ স্তনাংশুকম্! ময়ূরের 'মৃদুপবন-বিভিন্নো ঘন-রুচির-কলাপঃ' মৃদু পবনে বিচ্ছিন্ন ঘন মনোরম চন্দ্রক-অঙ্কিত কলাপ দেখে পুরুরবার মনে পড়্লো 'সুকেশ্যাঃ কুসুম-সনাথঃ কেশপাশঃ'—সেই সুকেশীর কুসুম-ভূষিত কেশপাশ! রাজহংসকূজিত শুনে পুরুরবার ভ্রম হয় বুঝি সে উর্ব্বশীর নূপুর-শিঞ্জিত শুনছে। পুরুরবা হংসকে সম্বোধন করে' বল্ছে—

মদখেলপদং কথং নু তস্যাঃ
সকলং চোর গতং ত্বয়া গৃহীতম্ ?
কেমন করে' করলি রে চোর এমন অপহরণ
আমার প্রিয়ার চরণ হতে লীলাঞ্চিত গমন ?

পুরুরবা নদীর রূপে সাকার উর্ব্বশীকেই দেখ্তে পেলে—

তরঙ্গ-ভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিত-বিহগশ্রেণি-রসনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনম্ ইব সংরম্ভ-শিথিলম্।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতম্ অভিসন্ধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবম্ অসহমানা পরিণতা ॥
(বিক্রমোর্ব্বশী ৪র্থ অঙ্ক)

নদীতরঙ্গ প্রিয়ার ভ্রূকুটি, মুখর পাখীরা মেখলাখানি,
পুঞ্জিত ফেন অঙ্গের বাস গমন-ত্বরায় শিথিল মানি।
এঁকে বেঁকে তার স্খলিতগমন দেখিয়া আমার মনেতে ভায়
প্রেয়সী আমার কোপের জ্বালায় গলিয়া নদীর রূপেতে ধায়।

পুরুরবা উর্ব্বশীকে খুঁজ্তে খুঁজ্তে চলেছে আর দেখ্ছে তার উর্ব্বশী সীমার সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। পুরুরবা চল্তে চল্তে পথে গৌরীচরণ-কৃতাঙ্গরাগ-যোনি একটি মণি কুড়িয়ে পেলে—সেই মণিটি গৌরীর চরণের অলক্তকরাগ জমাট বেঁধে রূপ ধরেছে, সেটি পুরুরবার সঙ্গে উর্ব্বশীর মিলনের সোনার কাঠি বা জীয়ন কাঠি। কিন্তু পুরুরবা জানে না যে সেটি মিলন-মণি ; সে রক্তাশোকস্তবক-সমরাগ সেই মণিটিকে সুন্দর দেখে মন্দার-পুষ্প-অধিবাসিত উর্ব্বশীর শিখাতে অর্পণ করবে বলে' তুলে নিলে। তখনি তার মনে হলো—সৈব প্রিয়া সংপ্রতি দুর্লভা মে—সেই প্রিয়া তো এখন আমার দুর্লভ, এ মণি তবে কি হবে ? তখনি আবার তার অন্তরে এই দৈববাণী শুন্তে পেলে যে সে তার প্রিয়াকে ফিরে পাবেই পাবে। তখন সে সেই মণিটি সঙ্গে রেখে দিলে।

পুরুরবা চল্তে চল্তে দেখ্লে একটি লতা কুসুম-বিরহিতা শূন্যাভরণা মেঘজলে আর্দ্র হয়ে রয়েছে। সেই নিরলঙ্কারা লতাকে দেখেই পুরুরবার মনে হ'লো—কোপবশে ত্যক্তভূষণা আর্দ্রনয়না তন্বী শ্যামাঙ্গী এই তো আমার প্রিয়া! সে উর্ব্বশীভ্রমে যেই সেই লতাকে আলিঙ্গন করলে, অমনি সেই মিলন-মণির স্পর্শ লেগে লতাটি উর্ব্বশীর রূপ ধারণ করলে। পুরুরবা যে-উর্ব্বশীকে এতক্ষণ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখ্ছিলো সেই বিচ্ছিন্ন রূপকে এখন একটি লতার বাহুল্যবর্জ্জিত শ্রীর ভিতর থেকে একত্র কুড়িয়ে পেলে। উর্ব্বশীর সঙ্গে মিলন হ'লে পুরুরবা উর্ব্বশীকে বললে—

মোরা-পরহুঅ-হংস-রহঙ্গং
অলি-গঅ-পব্বঅ-সরিঅ-কুরঙ্গং
তুজ্ঝহ কারণ রণ্ণ ভমন্তে
কো ণ হু পুচ্ছিঅ মএ্রিঃ রোদন্তে ?
(বিক্রমোর্ব্বশী ৪র্থ অঙ্ক)

ময়ূর কোকিল হাঁস আর চক্রবাকে
অলি গজ পর্ব্বত দেখেছি যাহাকে
নদী ও হরিণে পুছি কাননে ভ্রমিয়া
তোমারি কারণে প্রিয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥

উর্ব্বশীকে নিয়ে পুরুরবা রাজধানীতে ফিরে যাবে ; তখন সে অপ্সরা উর্ব্বশীকেই অনুরোধ কর্‌ছে—

অচিরপ্রভা-বিলসিতৈঃ পতাকিনা,
সুর-কার্ম্মুকাভিনব-চিত্র-শোভিনা।
গমিতেন খেলগমনে বিমানতাং
নয় মাং নবেন বসতিং পয়োমুচা ॥

ললিতগমনা প্রেয়সী আমার, নিয়ে চলো ফিরে মোরে
আমার বাড়ীতে, নূতন মেঘকে রথে পরিণত করে',
বিজলী-বিলাস হবে চঞ্চল পতাকা রথের শিরে,
ইন্দ্রধনুটি রথের চিত্র সকল অঙ্গ ঘিরে।

যতদিন উর্ব্বশী পুরুরবার কাছে কেবলমাত্র ভাবরূপিণী, **abstract** ও **ideal** মাত্র, ততদিন পুরুরবা আর উর্ব্বশীর অবিচ্ছেদ মিলন—পুরুরবা উর্ব্বশীকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করেছে। তখনই পুরুরবা উর্ব্বশীর মিলন-মণি কুড়িয়ে পেয়েছিলো। কিন্তু অপ্সরা উর্ব্বশীকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে এনে উপস্থিত কর্‌তেই একটা শ্যেন পক্ষী তাদের মিলনমণি হরণ করে' নিয়ে পালালো।

পুরুরবা আর উর্ব্বশীর মিলনের একটি সর্ত্ত ইন্দ্র স্থির করে' দিয়েছিলেন যে, যেদিন পুরুরবা উর্ব্বশীর সন্তান সন্দর্শন কর্‌বে, সেই দিন তাদের মিলনের অবসান হবে। উর্ব্বশীর সন্তান-সম্ভাবনা হলো ; কিন্তু উর্ব্বশী পুরুরবার সঙ্গে বিচ্ছেদের ভয়ে পুত্র আয়ুকে গোপনে চ্যবন-ঋষির আশ্রমে তাপসী সত্যবতীকে পালন কর্‌তে দিয়ে এলো। চ্যবন হচ্ছেন সেই ঋষি, যিনি বৃদ্ধ হয়েও পুনর্যৌবন লাভ করেছিলেন। সেই চিরযৌবনের আশ্রম থেকে সত্যবতী একদিন উর্ব্বশীর পুত্র আয়ুকে নিয়ে তার পিতা-মাতার হাতে সমর্পণ কর্‌বার জন্য রাজধানীতে এলেন। সত্যবতীর আবির্ভাবে সৌন্দর্য্য-কল্পনার মিথ্যা কুহক টুটে গেলো—উর্ব্বশী আর সম্বন্ধাতীত ভাবমাত্র রইলো না, পুরুরবা ও উর্ব্বশীর বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে এলো ; কিন্তু কল্পনার ইন্দ্রজালে সম্মোহিত পুরুরবা অনুমান কর্‌তে লাগ্‌লো উর্ব্বশী তার আজীবন-সহধর্ম্মিণী, যতদিন আয়ু তার কাছে আছে ততদিন উর্ব্বশীর স্মৃতিও তার নষ্ট হবার নয়। সংস্কৃত নাটক বিয়োগান্ত করা রীতিবিরুদ্ধ হওয়াতে কালিদাস আয়ু ও ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রের আশীর্ব্বাদের রূপকে উর্ব্বশীকে পুরুরবার আজীবন-সহধর্ম্মিণী করে' দিয়েছেন।

সুন্দরকে সম্ভোগ কর্‌বার কামনা মনে স্থান দিলে অভিশপ্ত হ'তে হয়, এ কথা কবি কালিদাস তাঁর অনেক কাব্যেই প্রচার করেছেন। শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত যখন কেবলমাত্র ভোগলিপ্সার আকর্ষণে মিলিত হ'তে চেয়েছেন, তখন তাঁরা শাপগ্রস্ত হয়েছেন। পার্ব্বতী যখন মদনকে সহায় করে' শিবের হৃদয় জয় কর্‌তে চেয়েছেন, তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আস্‌তে হয়েছে। কামী যক্ষকে প্রভুশাপে প্রিয়ার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে দূরে নির্ব্বাসিত হতে হয়েছিলো। কালিদাস দেখিয়েছেন বিরহী যক্ষ দূরবন্ধুগতঃ হয়ে প্রিয়ার রূপের আদল বহু বস্তুতে দেখ্‌তে পাচ্ছে ; কিন্তু মনের মধ্যে ভোগবাসনা প্রবল থাকাতে সে কিছুতেই সমগ্র রূপকে আয়ত্ত কর্‌তে পার্‌ছে না। তাই যক্ষ খেদ করে' বল্‌ছে—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি, শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্ ;
হন্তৈকস্থং ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যম্ অস্তি।
(মেঘদূত, উত্তরমেঘ)

তব অঙ্গের লীলা দেখি আমি শ্যামা-লতিকার দোদুল দোলে,
চন্দ্রেতে মুখ, চকিত দৃষ্টি হরিণীর টানা আঁখির কোলে,
ময়ূর-বর্হে কেশরাশি তব, ভ্রূবিলাস নদীবীচির গায়,
একস্থানে তবু ছবিটি তোমার হেরি না তো কভু কোপনা হায়!

যক্ষ প্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পাবার লালসায় ধাতুরাগ দিয়ে শিলাপট্টের উপর প্রিয়ার ছবি এঁকেছে ; কিন্তু যখনই সেই ছবিকেও সে স-লালস দৃষ্টিতে দেখ্‌তে যায়, তখনই তার দৃষ্টি অশ্রুজলে আচ্ছন্ন হয়, তার আর ছবি দেখারও জো থাকে না ; সে স্বপ্নে প্রিয়ার দর্শন যদি বা পায়, তাকে আলিঙ্গন কর্‌তে গিয়ে তার প্রসারিত ভুজদ্বয় শূন্যকেই বুকে বাঁধ্‌বার ব্যর্থ প্রয়াস করে ; তার দুঃখে বনদেবতারা শিশিরাশ্রু বর্ষণ করে—

ত্বাম্ আলিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াং
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদ্ ইচ্ছামি কর্ত্তুম্,
অস্রৈস্ তাবন্ মুহুর্ উপচিতৈর্ দৃষ্টির্ আলুপ্যতে মে ;
ক্রূরস্ তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥

মাম্ আকাশ-প্রণিহিত-ভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতোর
লব্ধায়াস্ তে কথম্ অপি ময়া স্বপ্ন-সন্দর্শনেষু,
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥

প্রণয়কুপিতা, তোমার ছবিটি শিলাতলে লিখি ধাতুর রাগে,
চরণে পড়িয়া সাধিব তোমায় এমন ইচ্ছা মনেতে জাগে;
অশ্রুজালেতে দৃষ্টি আমার রুদ্ধ হয় গো আঁখির পাতে,
ক্রূর কৃতান্ত পারে না সহিতে মোদের মিলন ছবিরও সাথে।
স্বপ্নে তোমারে দেখিলে কখনো আলিঙ্গনের জন্য হায়
ব্যাকুল দুহাত বাড়ায়ে বক্ষে বাঁধি [illegible]। কেবল শূন্যতায়;
আমার দুঃখে বনদেবতার চোখের [illegible] ঝরিয়া পড়ে,
মুক্তা-সমান শোভা পায় তাহা তরু-কিশলয় ফুলের 'পরে।

মেঘদূত থেকে উদ্ধৃত শেষ শ্লোকের অনুরূপ পংক্তি টেনিসনের "ইন্ মেমোরিয়াম্" কাব্যে আছে—

Tears of the widower, when he sees
A late-lost form that sleep reveals
And moves his doubtful arms, and feels
Her place is empty, fall like these.

বিপত্নীকের অশ্রু ঝরে, যখন দেখে সেই
সদ্য-হারা মূর্ত্তিখানি স্বপ্ন-মাঝারেই,
সন্দেহেতে শঙ্কা-ব্যাকুল মেল্‌লে বাহু হায়
প্রিয়ার শূন্য স্থানটি 'পরে এম্‌নি আছাড় খায়!

রাজা অজ প্রেয়সী পত্নী ইন্দুমতীকে হারিয়ে বিলাপ কর্‌তে কর্‌তে হারানো প্রিয়ার সৌন্দর্য্য প্রকৃতির মধ্যে পরিক্ষিপ্ত দেখে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন—

কলম্ অন্যভৃতাসু ভাষিতং
কলহংসীষু মদালসং গতম্,
পৃষতীষু বিলোলম্ ঈক্ষিতং
পবনাধূত-লতাসু বিভ্রমঃ
ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং
নিহিতাঃ সত্যম্ অমী গুণাস্ ত্বয়া।
(রঘুবংশ, অজবিলাপ, ৮।৫৯, ৬০)

তুমি তো স্বর্গের সুষমা, মর্ত্তে কিছুদিনের জন্য স্খলিত হয়ে পড়ে' আমার প্রিয়া-রূপে আমার কাছে ধরা দিয়েছিলে; তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েও—

কোকিল-কণ্ঠে কণ্ঠের স্বর,
মরাল-গমনে গতি মনোহর,
হরিণ নয়নে দৃষ্টি চটুল,
দোদুল লতায় ভঙ্গী অতুল,
সান্ত্বনা দিতে রেখে গেছো হায়
স্বর্গে যাবার বিষম ত্বরায়।

রামচন্দ্রও সীতাহরণের পর তাকে অন্বেষণ কর্‌তে-কর্‌তে প্রকৃতির সর্ব্বত্র প্রিয়ার সাদৃশ্য পরিব্যাপ্ত দেখে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করেছিলেন; কিন্তু বর্ষা এসে উপস্থিত হওয়াতে বিরহব্যাকুল রামচন্দ্র সেই প্রিয়াচ্ছবি আর দেখ্‌তে পাচ্ছেন না; তাই তিনি বিলাপ করে' বল্‌ছেন—

যৎ-ত্বন-নেত্র-সমান-কান্তি সলিলে মগ্নং তদ্ ইন্দীবরম্;
মেঘৈর্ অন্তরিতঃ প্রিয়ে তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী;
যেঽপি ত্বদ্ গমনানুকারি-গতয়স্ তে রাজহংসা গতাঃ;
ত্বৎ-সাদৃশ্য-বিনোদ মাত্রম্ অপি মে দৈবং ন হি ক্ষাম্যতি ॥
তোমার নেত্র-সমান-কান্তি সুনীল-নলিনী সলিলে ডুবে;
তোমার মুখের ছবি অনুকারী চন্দ্র ঢেকেছে মেঘের স্তূপে,
তোমার গমন-অনুকারী রাজহংসেরা গেছে মানস-সরে,
সদৃশ বস্তু দেখার তৃপ্তিটুকুও দৈব লুপ্ত করে।

প্রিয়ের সঙ্গে মিলনে সেই প্রিয় নির্দ্দিষ্ট রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, আর তার বিরহে তার রূপ বিশ্বময় ছড়িয়ে যায়। রূপের বাঁধন ভাঙ্‌লেই রূপাতীত অপরূপ প্রকাশ পায়। এই তত্ত্বটি অনেক কবিই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। —কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ "শিশুর বিদায়" কবিতায় খোকাকে দিয়ে বলিয়েছেন যে সে তার মার কাছ থেকে চলে' গেলেও মাকে একেবারে ছেড়ে যাবে না; সে হাওয়ার স্পর্শ হয়ে, জলের শীতলতা হয়ে, বৃষ্টির শব্দ হয়ে, বিদ্যুতের চমক হয়ে, জ্যোৎস্না হয়ে, স্বপ্ন হয়ে মাকে বারম্বার দেখা দেবে—

পূজোর কাপড় হাতে করে'
মাসি যদি শুধায় তোরে
"খোকা তোমার কোথায় গেলো চলে'?"
বলিস্—খোকা সে কি হারায়!
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে!

শেলী তাঁর সন্তানের বিয়োগে লিখেছিলেন—

Where art thou, my gentle child?
Let me think thy spirit feeds,
With its life intense and mild,
The love of living leaves and weeds
Among these tombs and ruins wild:—
Let me think that through low seeds
Of the sweet flowers and sunny grass
Into their hues and scents may pass
A portion..........

(To William Shelley.
অসম্পূর্ণ কবিতা)

কোথায় তুমি বাছা আমার, কোথায় তুমি হায়?
তোমার মধুর উজল জীবন
হয়তো জোগায় সরস গোপন
তরু-তৃণের আনন্দিত বাঁচার প্রেরণায়!

এই শ্মশানের বিজন বাসে
ঘাসের রঙে ফুলের বাসে
গোপন বীজের প্রাণের মাঝে নূতন জীবন পায়।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ একটি হারাণো শিশুকে স্মরণ করে' লিখেছেন—

Three years she grew in sun and shower
Then Nature said, "A lovely flower.
On Earth was never sown:
This child I to myself will take;
She shall be mine, and I will make
A lady of my own.
* * * *
She shall be sportive as the fawn,
That wild with glee across the lawn
Or up the mountain springs:
And hers shall be the breathing balm,
And hers the silence and the calm
Of mute in ensate things. ইত্যাদি
—A Memory.

তিনটি বছর বাড়িলো বাছনি
রৌদ্র-জলে;
কহিল প্রকৃতি দেখিনি কথনো
মর্ত্ততলে
হেনো সুন্দর ফুল।
এই শিশুটিরে আমার করিব
এখন আমি,
সে হবে আমার নববধূ, আমি
তাহার স্বামী
আনন্দ মণ্ডল।
* * *
হর্ষ তাহার নাচিবে সকল
অঙ্গ ঘিরে—
শিশু কুরঙ্গ যেমন রঙ্গে
লাফায়ে ফিরে
প্রান্তরে পর্ব্বতে;
তাহার নিশাসে অমৃত-মথন
সুরভি ববে,
শান্ত নীরব স্তব্ধ হয়ে সে
গোপন রবে
অচেতন বস্তুতে।

টেনিসন তাঁর New Year's Eve কবিতায় এই ভাব প্রকাশ করেছেন—

You will bury me my mother,
Just beneath the hawthorn shade,
And you'll come sometimes
And see me where I am lowly laid.
I shall not forget you mother,
I shall hear you when you pass,
With your feet above my head
In the long and pleasant grass.
If I can I'll, come again mother,
From out my resting place;
Tho' you'll not see me mother,
I shall look upon your face;
Tho' I cannot speak a word,
I shall harken what you say,
And be often, often with you,
When you think I'm far away.

মা গো আমার, আমায় তুমি কবর দিয়ে রেখো
শ্মশান-খোলার শিউলি গাছের তলে,
এসে তুমি মাঝে মাঝে আমার শয়ন দেখো
শিউলি-ঝরার মতন চোখের জলে।
তোমায় আমি ভুল্‌বো না মা, থাক্‌বে তোমায় মনে,
শুনতে পাবো তোমার পায়ের ধ্বনি,
তোমার চরণ পরশ মাগো কোমল ঘাসের বনে
আমার প্রাণে পশবে যে তক্ষণি!
আমি আবার আস্‌বো মা-গো তোমার কাছে উঠে
আমার গোপন শয়ন-ক্ষেত্র ছাড়ি';
দেখ্‌তে আমায় পাবে না তো, আস্‌বো তবু ছুটে,
দেখ্‌বো তোমার মুখ সে মনোহারী!
বল্‌তে কথা পারবো না তো মা গো তোমার সনে,
শুনতে তবু পাবো তোমার কথা,
ক্ষণে ক্ষণে সঙ্গ তোমার নেবো সঙ্গোপনে,—
নেই ভেবে মা তুমি পাবে ব্যথা!

এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করে' রসজ্ঞ কবি বলেছেন—

সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরম্‌ ইহ বিরহো ন সঙ্গমস্‌ তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব যদ্‌ একা ত্রিভুবনম্‌ অপি তন্ময়ো বিরহে॥
মিলন-বিরহ মাঝে বিরহ বরং ভালো মিলনের চেয়ে,—
মিলনে সে একটাই, বিরহে রহে যে প্রিয়া ত্রিভুবন ছেয়ে।

সৌন্দর্য্যজগতে ভাবরাজ্যে এই তত্ত্ব যেমনভাবে কবিরা প্রয়োগ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক রাজ্যেও ভাবুক ভক্ত কবি এটি প্রয়োগ করেছেন। ভাবুক ভক্তেরা বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেক সৌন্দর্য্যের মধ্যে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যাধার যিনি তাঁরই প্রতিচ্ছবি দেখ্‌তে পান; উষার গোলাপী আলোকে, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড দাহনে, গোধূলির ধূসরতায়, সন্ধ্যার লালিমায়, রাত্রের গভীর অন্ধকারে ও প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায়, লতায় ফুলে পল্লবে, জলে স্থলে, সর্ব্ব-জীবের ব্যবহার-লীলায় সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিরই স্ফূর্ত্তি দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন। এইরূপ অবস্থাকে চৈতন্যদেব বলেছিলেন—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" এইরূপ একটি মানসিক অবস্থাকে রূপক উপাখ্যানের ছদ্ম-বেশের ভিতর দিয়ে ভাগবত পুরাণের ভাবুক কবি বর্ণনা করেছেন—তা রাত্রীঃ শরোদৎফুল্ল-মল্লিকাঃ—সেই রাত্রি শরৎকালের আগমনে প্রস্ফুটিত মল্লিকাফুলে সুশোভিত ও আমোদিত হয়েছে; রমার আননের ন্যায় অখণ্ডমণ্ডল নব-কুঙ্কুমারুণ চন্দ্র উদিত হয়ে বনরাজিকে রঞ্জিত করেছে। সেই শারদজ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে ব্রজগোপীরা

কৃষ্ণের বাঁশীর গান শুনতে পেলে। তারা অম্‌নি ব্যাকুল হ'য়ে হাতের কাজ ফেলে রেখেই ছুটে বেরিয়ে পড়্‌লো, এবং

দৃষ্ট্বা বনং কুমুদিনং রাকেশ-কর-রঞ্জিতম্।
যমুনানিল-লীলৈজৎ-তরুপল্লব-শোভিতম্॥

দেখিলো কানন কুসুমভূষণ পূর্ণচাঁদেরি জ্যোৎস্না-মাতা,
যমুনা-বিহারী শীতল বাযতে লীলাচঞ্চল বৃক্ষ-পাতা।

এই সৌন্দর্য্যপুঞ্জের মধ্যে তারা দেখ্‌লে আনন্দসুন্দর অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করছেন। সেই শ্যাম-সুন্দরের সঙ্গে মিলনে গোপীদের মনে যেই ভোগবাসনা উদ্দীপ্ত হ'লো অম্‌নি অরণাজনপ্রিয় কৃষ্ণ তরল আনন্দের ন্যায় কুমুদামোদিত বায়ু দ্বারা বীজ্যমান হিমবালুক যমুনা-পুলিনে অন্তর্দ্ধান করলেন। তখন প্রিয়ের প্রতিরূঢ়-মূর্ত্তি তদাত্মিকা গোপীরা প্রিয়ের ভাবে তন্ময় হ'য়ে সর্ব্বত্র প্রিয়ের মূর্ত্তি প্রতিভাত দেখ্‌তে লাগ্‌লো এবং সকলের মধ্যগত অথচ সকলাতীত সেই সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি প্রিয়কে অন্বেষণ করতে-করতে জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লো—

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদ অশ্বত্থপ্লক্ষ ন্যগ্রোধ……
কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগ পুন্নাগ চম্পকাঃ?
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন মল্লিকে জাতি-যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥
কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর বিভাসি?

দেখেছো তোমরা অশথ পাকুড়, বট তুমি কি গো দেখেছো তায়?
কুরুবক নাগকেশর অশোক চম্পা চামেলি দেখেছো তায়?
মল্লী মালতী জাতি ও যূথিকা মধুময় তারে দেখেছো মানি,—
তাই তোমাদের এত আনন্দ, শোভা দেছে তার পরশখানি।
ওগো ধরিত্রী বলো বলো বলো কোন সে গোপন পুণ্যতপ
তার চরণের পরশে জাগালো অঙ্গে পুলক-মহোৎসব।

গোপিকারা বৃন্দাবনের প্রতিপদার্থে কৃষ্ণের আবির্ভাব অনুভব করতে-করতে বনভূমিতে সকল বস্তুর অন্তর্যামী পরমাত্মার চরণ-চিহ্ন দেখতে পেলে—

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবন-লতাস্-তরূন্
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥

এইরূপে তারা কৃষ্ণে ঢুঁড়িয়া পুছিল ব্রজের লতা ও গাছে—
বনের বুকেতে পরমাত্মার পায়ের চিহ্ন দেখিল আছে!

একটি গোপী কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেয়েছে মনে করে' যেই নিজেকে কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভেবে গর্ব্বিতা হ'য়ে উঠ্‌লো এবং কৃষ্ণকে একান্ত নিজস্ব কর্‌বার বাসনা তার মনে উদয় হ'লো, অম্‌নি কৃষ্ণ তার কাছ থেকেও অন্তর্ধান কর্‌লেন। গোপীরা অন্তর্হিত কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে' বল্‌তে লাগ্‌লো—"দিন-শেষে তুমি যখন ধেনু নিয়ে গোষ্ঠ থেকে গৃহে ফিরে আসো তখন নিবিড়-ধূলিপটলে-ধূসরিত নীলকুন্তলে-আবৃত বদন-কমল প্রদর্শন করে' আমাদের মনে অনুরাগ ও সঙ্গলিপ্সা উজ্জীবিত করে' দাও, কিন্তু কিছুতেই সঙ্গ দাও না।"

অকস্মাৎ অন্বিষ্যমাণা গোপিকাদের সম্মুখে সাক্ষান্-মন্মথ-মন্মথ পরম-রূপবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হ'লেন এবং

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎ-কুন্দ-মন্দার সুরভ্যনিল ষট্‌পদম্॥
শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহ-ধ্বস্ত-দোষাতমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ত-তরলাচিত-কোমল-বালুকম্॥

বিশ্বব্যাপক বিভু সুন্দর সুন্দরীদের সঙ্গে লয়ে'
চলিল যমুনাপুলিনে যেথায় সুরভি অনিল যেতেছে বয়ে'—
অলিচুম্বিত কুন্দ-মাদার চুমিয়া বহিছে গন্ধবহ,
শরৎশশীর জোছনা যেথায় বধিছে আঁধার অশিব সহ,
কৃষ্ণা যমুনা তরল হস্তে বিছায়ে দিয়েছে কোমল বালি,
সকলের আজ প্রাণের তরল নিঃশেষে সব দিতেছে ঢালি।

শ্রীকৃষ্ণ সেই যমুনাপুলিনে গোপীদের নিয়ে রাসমণ্ডলে নৃত্য করতে লাগ্‌লেন। তখন প্রত্যেক গোপী মনে কর্‌তে লাগ্‌লো শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তার পাশেই বিরাজ কর্‌ছেন—তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্ দ্বয়োঃ—মণ্ডলাকারে অবস্থিত প্রত্যেক দুজন গোপীর মধ্যে তারা কৃষ্ণকে বিরাজমান দেখ্‌তে লাগ্‌লো। এবং শ্রীকৃষ্ণও

চকাস গোপী-পরিষদ্ গতোঽর্চ্চিতস্
ত্রৈলোক্য-লক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্ দধৎ॥
(ভাগবত ১০।২৯—৩৩)

গোপীচক্রে অর্চ্চিত হয়ে হইল শোভান্বিত—
ত্রিলোক চুনিয়া শোভা-সম্ভার একটি দেহস্থিত।

এইরূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যিনি সত্য শিব সুন্দর ভগবান্ তিনি সকল-সম্বন্ধাতীত অথচ সর্ব্বগত; পূর্ব্বকালের ঋষিরা তাই বল্‌তেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তাঁরা জড়ের ও রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। কিন্তু বিজ্ঞান বল্‌ছে জড়ই সব, ব্রহ্ম-তত্ত্ব মানুষের কল্পনা মাত্র; সে কল্পনার কাল চলে' গেছে, তা আর ফির্‌বে না—"ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরব-শশী, অস্তাচলবাসিণী উর্ব্বশী।" কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা এই কথায় মিটে না—"তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে, অয়ি অবন্ধনে!"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কষ্টিপাথর

গান

সে যে মনের মানুষ কেন তা'রে
বসিয়ে রাখিস্ নয়ন-দ্বারে।
ডাক্‌না রে তোর বুকের ভিতর,
নয়ন ভাসুক নয়ন-ধারে॥
নিব্‌বে আলো, আস্‌বে রাতি,
তখন রাখিস্ আসন পাতি',
আস্‌বে সে যে সঙ্গোপনে
বিচ্ছেদেরি অন্ধকারে॥
তা'র আসা-যাওয়ার গোপন পথে
যায় আসে তা'র আপন মতে।
তা'রে বাঁধ্‌বে বলে' যেই করে পণ
সে থাকে না, থাকে বাঁধন,
সেই বাঁধনে মনে মনে
বাঁধিস কেবল আপনারে॥

(উত্তরা, মাঘ ১৩৩২) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর্টের অর্থ

মানব তাহার প্রাচুর্য্যের প্রভাবেই আপনাকে অভিব্যক্ত করে; যেটুকু নিজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সেটুকুতে মানবের আত্মা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। সৃষ্টির ভিতরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াই ব্রহ্ম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, অথচ সে-সৃষ্টির আবশ্যকতা তাঁহার পক্ষে কিছুই নাই। সুতরাং এই সৃষ্টি তাঁহার প্রাচুর্য্য প্রকট করিতেছে। মানুষও তেম্‌নি সৃষ্টিতেই আনন্দ উপভোগ করে—এ সৃষ্টি তাহার আতিশয্য বা অমিতব্যয়িতার প্রমাণ—কার্পণ্যের নহে—দৈন্যের নহে। মানব পূর্ণ-স্বরূপে আপনাকে মিলিত করিতে চায়, সেই মিলনে যে অপূর্ব্ব স্বাধীনতার আনন্দ আছে, সে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছে; আর্ট মানবের জীবনের সম্পদকেই অভিব্যক্ত করে। আর্টের এই যে সাধনা, এই সাধনা নিজেই ফলরূপা, এই সাধনার ভিতরেই সিদ্ধির আনন্দ রহিয়াছে।

এই যে জগৎ, কোথা হইতে ইহার উদ্ভব? আমাদের উপনিষদে এসম্বন্ধে দুইটি পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে। উপনিষদের এক স্থানে বলা হইয়াছে,—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন যাতানি জীবন্তি।"

আনন্দ হইতেই এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। আবার অন্যত্র আছে—"ব্রহ্ম তপস্যায় নিরত হন; সেই তপস্যা হইতে যে তাপ সঞ্চার হয়, তাহার প্রভাবেই তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" স্বাধীনতার আনন্দ এবং তপস্যার সংযম, সৃষ্টির ভিতর দিয়া ব্রহ্মের আত্মাভিবিকাশের মূলে দুইটিই সত্য। এই জগৎ আর্টেরই মত সেই পরমপুরুষের লীলা বা খেলা, তাঁহারই বহুধা বিকাশ।

আপনারা বলিতে পারেন, ইহা মায়া এবং মায়া বলিয়া তাহাকে অবিশ্বাসও করিতে পারেন, কিন্তু মায়াবীর তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আর্ট মায়াই বটে, তাহা ছাড়া উহার অন্য কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না। মানবের জীবন স্বাধীনতার পথে বিরামবিহীন অভিযান—স্বাধীনতাই মানবের বৃত্তি, তাহার উপজীবিকা। মৃত্যুকে আশ্রয় করিয়া সে এই উপজীবিকা নূতন করিয়া পাইতেছে। জীবনের নিদারুণ দুঃখ-কষ্টকে সাধারণভাবে দেখিলে কখনই সুন্দর বলা যাইতে পারে না, কিন্তু আর্টের ভিতর দিয়া যখন সেগুলি ফুটিয়া উঠে, তখন সেইগুলিই বাস্তবস্বরূপে আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া থাকে। ইহা হইতে শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে সব জিনিষ আমাদের মনের উপর তাহার সত্ত্বাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহাই সুন্দর। সংস্কৃত ভাষায় তাহাকেই বলা হয়—মনোহর। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই দুইয়ের মধ্যে আছে আমাদের মন।

এই বিশ্বে অসংখ্য বিষয় রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে মাত্র কতক-গুলি আমাদের আত্মার আলোকে পড়ে। আমাদের কাছে তথ্য বস্তুর আকার ধারণ করে; অপরোক্ষ জ্ঞানের আয়ত্ত হয় কেবল সেইগুলি সেগুলি আমাদের মনে সৃষ্টির আনন্দ জাগাইতে সক্ষম হয়। আর্টের সৃষ্টি, আমাদের জীবনে যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সেইগুলিরই ভাবময় অভিব্যক্তি; কাজেই ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার উপর আলো ও ছায়া যে-ভাবে পড়ে, সে হুবহু তেমন ভাবেই উহা গ্রহণ করে। আর্ট তেমন ফোটোর ক্যামেরার মত নয়। বিজ্ঞান কোনো পক্ষপাতিত্ব বুঝে না; যাহা সত্য, অপরিসীম আগ্রহের সহিত তাহাই গ্রহণ করে—বাছাই করে না। শিল্পী কিন্তু বাছাই-ই বড় বুঝে। এই বাছাইয়ের বেলা তাহার অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্টে সঙ্গীতকে আমি কিরূপ স্থান প্রদান করি—এই প্রশ্নটি একবার আমাকে করা হইয়াছিল। বিজ্ঞানে গণিতের যে-স্থান, আর্টে সঙ্গীতের সেই স্থান, ইহা সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ। অভিব্যক্তির যেটুকু সার, তাহাই সঙ্গীত। সঙ্গীতের যে ঝঙ্কার তাহা মুক্ত-অবাধ; বস্তু-বিচারের বাঁধন, চিন্তার বাঁধন সঙ্গীতকে বাঁধিতে পারে না। সঙ্গীত যেন আমাদিগকে সকল জিনিসের আত্মার ভিতরে লইয়া যায়। সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ-ধারা, সেই আনন্দের স্পর্শে আমাদিগকে নাচাইয়া তোলে। কয়েক শতাব্দী আগে বাংলায় এমন একদিন আসিয়াছিল, যেদিন মানবের আত্মায় ভগবৎ-প্রেমের যে চিরন্তন লীলা-নাট্য চলিতেছে, তাহা জীবন্ত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল—ভগবদুপলব্ধির আত্যন্তিক আনন্দধারা চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া।

সেদিন ভাবের একটা আবর্ত্ত সমগ্র জাতির অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলায় সেই ভাবাবর্ত্ত হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল আমাদের বাঙ্গালীর কীর্ত্তন-গান। আমাদের জাতির ইতিহাসে এমন সময় অনেক বার আসিয়াছে, যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার অতীত জিনিসের অনুভূতিতে সমগ্র জাতির অন্তর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

বুদ্ধের বাণী যেদিন ভৌতিক এবং নৈতিক নানা বাধা উপেক্ষা করিয়া ভারতের উপকূল হইতে দূরদেশে পৌঁছিয়াছিল, তখন আসিয়াছিল তেমন দিন। মানব-জীবনের সেই সুমহান্ অভিজ্ঞতার

সম্পদ্ চিরন্তন করিবার জন্য মানুষ যেদিন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা পর্ব্বতকে কথা কহাইয়াছিল; পাথরকে দিয়া গান গাওয়াইয়াছিল। পাহাড়ে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে, উষর নির্জ্জন প্রদেশে এবং জনাকীর্ণ নগরীতে মানবের আশা অমর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সৃষ্টির সেই বিপুল প্রচেষ্টা পথের বাধা-বিঘ্নকে গ্রাহ্য করে নাই, সকল বাধা-বিঘ্নকে দলিত করিয়া আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিল, ভাবকে মূর্ত্তি দান করিয়া। প্রাচ্য মহাদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া এই যে একটা শক্তির খেলা সেদিন দেখা গিয়াছিল, আর্ট কাহাকে বলে, এপ্রশ্নের উত্তর তাহা হইতেই পাওয়া যায়। যাহা সৎ, যাহা সুন্দর, তাহার ডাকে মানবের সৃষ্টিপর আত্মার যে-সাড়া, তাহাকেই বলে আর্ট।

গান্ধার দেশে বুদ্ধের যে-সব প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিতে আমরা গ্রীক শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাই। তাঁহারা মূর্ত্তি-কল্পনায় এনাটমির বৈজ্ঞানিক দিক্‌টার উপরই জোর দিয়াছিলেন; কিন্তু খাঁটি ভারতীয় শিল্প বুদ্ধের আত্মাকে অভিব্যক্ত করিবার উপর,—তাহার অন্তরের ভাবের দ্যোতনার উপরই বেশী জোর দিয়াছে।

বিখ্যাত ইউরোপীয় স্থপতি রোডিনের শিল্পের ভিতর আমরা কি দেখিতে পাই? অপূর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য অপূর্ণের সংগ্রাম; পক্ষান্তরে প্রাচী স্বভাবতঃই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ; পূর্ণতার দিক্ হইতেই তাহার প্রেরণা আসিয়াছে। ভারতের শিল্পীরা অপরের নিকট হইতে যতই ধার করুন, তাঁহারা নিজেদের ঐ বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়াছেন।

প্রতিভায় যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশিষ্ট লক্ষণ একটি হইল—গ্রহণ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা; এই ধার লইবার সময় দুনিয়ার সভ্যতার বাজারে তাঁহারা যে অপরিমিত সম্পদ্ ঋণ দিয়া রাখিয়াছেন, এ-কথাও তাঁহারা জ্ঞাত থাকেন না। যাহারা মাঝারি গোছের, ধার করিতে লজ্জা বোধ করে,—ভয় পায় শুধু তাহারাই; কারণ কিভাবে ধার শোধ দিতে হয়, তাহারা তাহা জানে না। ইউরোপের চিন্তা, ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারা সাদরে বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে আনন্দেরই বিষয়। ইউরোপীয় চিন্তা এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারা আমাদের মনের সংস্পর্শে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় আত্মাটি সেই বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়াও প্রবল প্রভাবে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

কোনো রকমে ভারতীয় আর্টের লেবেল যাহাতে জুড়িয়া দেওয়া যায় এমন জিনিষ মাপিয়া-জুখিয়া দেখিয়া-শুনিয়া তৈয়ারী করিলেই হইল, এই যে যুক্তি, আমাদের শিল্পীরা যেন তাহা মানিয়া না লন। আর্ট গ্রহণও করিতে পারে যেমন উদারতার সহিত, দানও করিতে পারে তেমনি উদারতার সহিত। সকলেরই জন্য তাহার আতিথেয়তা উন্মুক্ত। কারণ, তাহার মত পুরাতন হইলেও তাহার যে-সম্পদ্, সে-সম্পদ্ কল্পলোকের; তাহা তাহার নিজস্ব—তাহা নিত্যই নূতন।

এই বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যেই বিশ্বেশ্বর বাস করেন। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার নিজের বাসস্থান, এ-ভাবে তৈয়ারী করা উচিত, যাহাতে তাহা তাহার আত্মার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে। শিল্পী যিনি, তাঁহাকে আজ এই কথা ঘোষণা করিতে হইবে যে, আমি অমরত্বে বিশ্বাস করি। তাঁহাকে আজ এই ঘোষণা করিতে হইবে যে,আমি বিশ্বাস করি আদর্শে। সেই আদর্শ পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত করিতেছে, স্বর্গের সেই যে আদর্শ, তাহা কেবল কল্পনারই বিলাস নয়, খেয়াল নয়—তাহাই পরম সত্য, তাহাতেই এই বিশ্বের স্থিতি, তাহাই বিশ্বের জীবন। সেই আদর্শই আমাদের জীবন-বীণায় ঝঙ্কার তুলে; আর সেই ঝঙ্কার—সেই সঙ্গীতের সুর ঢেউ তুলিয়া আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সীমা হইতে অসীমে লইয়া যায়। *

(বাঁশরী, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

শান্তং সুন্দরং

কবির কথার প্রতিধ্বনি দিয়া আমি বলিতে চাই না—শান্তই সুন্দর, সুন্দরই শান্ত। আমি শুধু বলিব যে, সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে, সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা যাহা তাহার মধ্যে অনিবার্য্য উপাদানরূপে রহিয়াছে একটা নিবিড় শান্তি। বিশেষতঃ, আমার বক্তব্য শিল্পসৃষ্টি লইয়া—শিল্পের সৌন্দর্য্য-প্রকাশে যে-রকমেরই হউক না কেন, তাহার নিভৃত বনিয়াদ সর্ব্বদাই একটা মহাশান্তি। শিল্পের বাহিরের রূপায়ন যত বহুধা বিচিত্রই হউক, তাহাদের সকলের অন্তরের প্রতিষ্ঠা হইতেছে শান্ত রসায়ন। শৃঙ্গারকে রসের আদি বলা হয়, কিন্তু তাহা বস্তু-হিসাবে, যে-হিসাবে স্থূল শরীর হইতেছে মানব-আধারের আদি-আয়তন। ভাবের হিসাবে, অন্তরাত্মার দিক্ দিয়া, আদি বা প্রথম হইতেছে শান্ত রস।

শান্ত রসই মূল রাগ। অন্যান্য রস তাহাকে ধরিয়া, তাহার উপর নানা রাগিণীর বিচিত্র লীলা খেলাইয়া তুলিয়াছে।

প্রাচীনের সকল শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে তাই দেখি কি-একটা গভীর শান্তি নিহিত। প্রাচীন শিল্পীরা রচনা করিতে বসিয়াছিলেন অন্তরে এই অটল শান্তি লইয়া—তাঁহাদের কাজে কোথাও ত্বরার লেশমাত্র নাই।

তাই দেখি, তাঁহারা যখন কিছু গড়িতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহাদের হাত দিয়া এক-এক মহাভারত, রামায়ণ, ইলিয়দ বাহির হইয়া আসিয়াছে, পিরামিদ বরবদুর কোণারক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পক্ষান্তরে আধুনিকের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখনই দেখি কি-একটা মত্ততা, চাঞ্চল্য, অশান্তি ইঁহাদের প্রেরণার মধ্যে রহিয়াছে, ইঁহাদের সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া-ভাঙ্গিয়া ছোট-ছোট করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে, উদ্বেল উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিয়াছে। ইঁহাদের সৃষ্টি অল্পপ্রাণ। একটানা কি বৃহৎ-কিছু গড়িতে ইঁহাদের ইচ্ছাও হয় না, সাহসেও কুলায় না।

আধুনিক জগতে যে বিরাট্ বা বিপুল জিনিষ আদৌ সৃষ্টি হয় না তাহা বোধ হয় বলা যায় না। আমেরিকার এক-একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ (sky scraper) কলেবর-হিসাবে পিরামিদ অপেক্ষা ছোট হইবে না। আলেকজান্দের দুমা (Alexander Dumas) যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন কিম্বা খবরের কাগজের অনেক লেখক যত কথা লিখিতেছেন তাহা দেখিয়া বাল্মীকির লজ্জায় মাথা নত করা উচিত। আধুনিক শিল্পী বিপুলকে সৃষ্টি করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টি করিতে পারেন না বৃহৎকে। বিপুল হইতেছে ছোট-ছোট খণ্ড খণ্ড জিনিষের পুঞ্জ, আর বৃহৎ হইতেছে একটি গোটা বস্তুর অখণ্ড মহত্ত্ব। আধুনিকের গৌরব অক্টারলোনী মনুমেণ্ট—বড় জোর, "আর্ক দ' ত্রিয়োম্ফ" (Arc de Triomphe)—কিন্তু প্রাচীনের গৌরব গোটা এক-একখানি পাথরের স্তম্ভ (monolith), গোটা একটা পাহাড় কুঁদিয়া তৈয়ারী মন্দির। মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে, আমরা আধুনিকেরা বলিয়া থাকি। কারণ, এই মহাকাব্য রচনা করিতে প্রয়োজন চিত্তের মধ্যে যে অবসর, যে স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য, যে টানা দম তাহা আধুনিকের নাই। গীতিকাব্য অল্প দমের রচনা, আর তাহা আমাদের চিত্তের চঞ্চলতার, প্রাণের মন্দগতির, মনের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির সহিত বেশ মিল খায়।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

আধুনিকে ও প্রাচীনে বৈষম্য হইতেছে প্রকারগত। প্রাচীন শিল্পের ভাবে ও ছন্দে রহিয়াছে যে শান্তি তাহারই কল্যাণে ছোট হউক আর বড় হউক, বাহিরের দৃশ্য বা ঘটনা হউক আর অন্তরের অনুভব হউক প্রাচীনের সকল রকম সৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা গরিমার, মহত্বের, বৃহত্বেরই আভা। শান্তির মধ্যেই গাঢ় হইয়া জমিয়া উঠে একটা আত্মস্থ সামর্থ্য। প্রাচীনের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি এই শান্তির চরম ব্যঞ্জনা, পরাকাষ্ঠা গোচর করিয়া ধরিয়াছে। আধুনিক জগতের কোনো দেশের কোনো শিল্পে ইহার তুলনা নাই।

প্রাচীন, শান্তিকে স্থিতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন, তাই বলিয়া গতির, বেগের, শক্তির ছন্দকে প্রকাশ করিতে যে কম দক্ষ এমন নহে। নটরাজের অঙ্গে অঙ্গে যে-গতির আবেগের তোড় দুলিয়া দুলিয়া যেন গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, জানি না, আর কোন্ শিল্পী বিশ্বশক্তির তাণ্ডব এমনভাবে প্রকট করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। তবে কথা এই, গতির পরাকাষ্ঠা তাঁহারা দেখাইয়াছেন কিন্তু স্থিতির উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া।

অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালেও এই দুইটি আপাতবিরোধী ধর্ম্মের সামঞ্জস্য শিল্পীদের মধ্যে কখনও কোথায় যে, আদৌ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না তাহা নহে। নীট্শ অবশ্য এই দুইটি ধারা হিসাবে দুই শ্রেণীর সাহিত্যের কথা বলিয়াছেন—এক যে-সাহিত্যে মূর্ত্ত বিপুল গতি, আর যে-সাহিত্যে মূর্ত্ত বিশাল শান্তি। প্রথমটির উদাহরণ তিনি দিয়াছেন সেক্সপীয়র আর দ্বিতীয়টির গোটে। গোটে অপেক্ষা ওয়ার্ডসওয়ার্থের সৃষ্টির মধ্যে বোধ হয় ধরা দিয়াছে আরও নিথর নির্ব্বিকার শান্তি—কারণ, গোটের শান্তি প্রধানতঃ স্থির বুদ্ধিকে, উদার মেধাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের শান্তি আসিয়াছে চিত্তের স্থৈর্য্য, প্রাণের সংযমকে ধরিয়া।

সেক্সপীয়র বা মোলিয়েরের তাঁহাদের সৃষ্টিতে গতির ছন্দটাই সম্মুখে প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু সেখানেও তবু প্রাণাবেগের কর্ম্মপ্রেরণার যে বিপুল জটিল সংঘাত তাহারও পশ্চাতে অনুভব করি না কি দ্রষ্টা পুরুষের নিশ্চল শান্তি, একটা প্রসন্ন গভীরতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? লাতিন-সাহিত্যের ছন্দভঙ্গে নিথর প্রশান্তি, স্থাণুর সমাহিত সান্দ্রভাব সর্ব্বজন-বিদিত। গ্রীক ও সংস্কৃত পরম শান্তি ও পরম গতির অপরূপ সামঞ্জস্য দেখাইয়াছে—হোমরের হেক্সামিটারে (ষটমাত্রা), কালিদাসের মন্দাক্রান্তায় একটা ধীর টানা গতি কেমন স্তব্ধতা আনিয়া দিতেছে প্রগতির মোড়ে মোড়ে।

ভারতের শিল্প-জগতে ধ্যানের একতানতা, সমাধির নিরুপম শান্তি।

ভারতের চিত্র, বিশেষতঃ ভারতের ভাস্কর্য্য, শিল্পের এই উত্তম রহস্যকে বুঝাইবার জন্যই যেন গড়িয়া উঠিয়াছে। গতির চঞ্চল আবেগ, শক্তির কর্ম্মাবর্ত্তও ভারতের শিল্পী যেখানে দেখাইয়াছেন সেখানেও তাঁহার প্রধান লক্ষ্য যেন ছিল কি রকমে স্থিতির শান্তিকে তন্ময়তাকে অটুট রাখা যায়।

এই মহান্ শান্তিমন্ত্র আধুনিকেরা যে হারাইয়া বসিয়াছেন তাহার হেতু কি, তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে? জড়-জগতে Degradation of Energy বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা একটি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, শিল্পকলার ধারাতেও দেখি এইরকমই একটা ক্রম-অবনতি চলিয়া আসিয়াছে। শিল্পসৃষ্টিতে অশান্তির অধীরতার আবেগ প্রথম ফুটিয়া উঠে বোধ হয় "রোমান্টিক" আন্দোলন হইতে। শিল্পের যাঁহারা প্রথম স্রষ্টা, একটা বৃহৎ চেতনার অটল শান্তি তাঁহাদের শিল্পরচনার ছিল নৈসর্গিক ভিত্তি। সেক্সপীয়র, মোলিয়ের, দান্তে, হোমর, বাল্মীকি—প্রাচীনতম যে বৈদিক ঋষিগণ—ইঁহারাই ছিলেন এই যুগধর্ম্মের বিগ্রহ। তার পরে ত্রেতাযুগে, শিল্পী এক ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। অন্তরাত্মার শান্ত বৃহৎ সাক্ষাৎদৃষ্টির পরিবর্ত্তে তখন বুদ্ধির চিন্তা-শক্তির প্রভাব প্রখর হইয়া উঠিয়াছে—এই যুগের শিল্পী হইতেছেন মিল্‌তন্, কর্ণেই, তাস্‌সো, সোফোকল (Sophocles), কালিদাস। এই যুগের অবনতির সঙ্গে-সঙ্গে অর্থাৎ ধীশক্তির পরিবর্ত্তে যখন দেখা দিল কেবল বিচার-বিতর্ক, তখন মস্তিষ্কের আবরণ গাঢ়তর হইয়া উপরের আলোর অবতরণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। তখন আসিল Didactic Poetryর যুগ; শিল্পের উদ্দেশ্য হইল কেবল শিক্ষাদান, প্রচার-কার্য্য। তখনই আসিলেন ইংলণ্ডে পোপ, ফরাসীতে বোয়ালো। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তখন দেখা দিল জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিসম্বাদ, আলোচনা-সমালোচনার তুমুল কোলাহল, মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিপুল চাঞ্চল্য! এই যুগই রোমান্টিক যুগ-নামে বিখ্যাত। এই যুগ হইতেই অশান্তির ধর্ম্মকে শিল্প যেন স্বধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতে সুরু করিয়াছে। রুসো বোধ হয় ইউরোপে এই ধারার প্রবর্ত্তক। ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যে ভবভূতির মধ্যে এই ধর্ম্মের ছায়া কথঞ্চিৎ দেখিতে পাইয়াছিলাম। চিত্তের উত্তেজনা—ইমোসনই হইয়া উঠিয়াছে এই যুগের শিল্পসৃষ্টির উৎস ও নিয়ামক। বায়রন বলুন, শেলীই বলুন, এমন-কি হিউগোই বলুন—সকলেই অশান্তির অবতার। তার পরে আসিল কলিযুগ—হৃদয় বা চিত্তের আসন ছাড়িয়া শিল্পপুরুষ যখন নামিয়া পড়িয়াছেন আরও নীচে, প্রাণময় ক্ষেত্রে। ইহাই বর্ত্তমান যুগ। এই যুগের বিশেষ একটা নাম নাই—কারণ শিল্পরচনার কোনো একটা বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতেছে না, যাহার যেমন অভিরুচি, প্রাণের যেমন খেয়াল সে সেই পথেই চলিয়াছে।

প্রাণের আবিল চাঞ্চল্যে আধুনিক শিল্পী অভিভূত। আধুনিক শিল্পীর সত্তা যেন দ্বিধা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত প্রাণের আর কোনো সংযোগ নাই। আধুনিকের অধীর গতিতে সফরীর চঞ্চল প্রতুচ্ছন্দ মূর্ত্তিমান, কিন্তু প্রাচীনে যাহা রূপ পাইয়াছে তাহা হইতেছে সমাহিত অন্তঃস্তব্ধ মহাসাগরের বিপুল দোল। প্রাচীনের ছন্দ যেন বেতার তড়িতের দূর-প্রসারিত তরঙ্গ (Hertzian waves); আর আধুনিকের ছন্দ ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ "রণ্টগেন" রশ্মির ঢেউ। আধুনিকে আছে ঔৎসুক্য, গবেষণা, নূতন তথ্য আবিষ্কারের ক্ষমতা, বহুমুখীত্ব, বৈচিত্র্য, আছে বোধ হয় কৌশল, চমৎকারিত্ব—কিন্তু নাই সৌষ্ঠব, নিটোল সৌন্দর্য্য, চিত্তে যাহা আনিয়া দেয় শান্তি, প্রীতি, তৃপ্তি।

আধুনিক যুগে শিল্পের এই যে পরিণতি, হয় ত ইহার একটা গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খলতা ও বিপুল চাঞ্চল্যের মধ্যেই এখানে-ওখানে দুই-একটি শিল্পীর মধ্যে এই ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস যে পাই না তাহাও নয়।

আধুনিকের সূক্ষ্মতা চাই, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠায় চাই প্রাচীনের বিপুলতা; আধুনিকের সর্ব্বগৌরব চাই, কিন্তু চাই তাহাকে ঘিরিয়া প্রাচীনের অঙ্গসৌষ্ঠব; আধুনিকের বিচিত্র গতিও বরণীয়, কিন্তু সর্ব্বোপরি চাই প্রাচীনের গভীর শান্তি।

(উত্তরা, মাঘ ১৩৩২)　　　　শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

জাতি-বিজ্ঞান

দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ইজিপ্ট ও মেসোপোটেমিয়ায় প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবপ্রস্তর যুগকাল প্রায় সত্তর হাজার বৎসর বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। এক স্থানে যখন নবপ্রস্তর-যুগ, আর একস্থানে তখন প্রত্নপ্রস্তরযুগ থাকিবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষকে একই সময়ে এবং একই ভাবে উন্নত হইতে দেখা যায় না। যে-সময়ে দরদোন (Dordogne)

এবং ব্রিটেনবাসী প্রস্তর যুগের মানুষেরা, ম্যামথ জাতীয় হস্তী যুগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাল কাটাইত, সেই সময়ে নাইল এবং ইউফ্রেটিস্ নদীর উপকূলবাসী মানবেরা উল্লেখযোগ্য সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। যে-সময় মানুষ অগ্নির ব্যবহার মোটেই জানিত না, ও সেই কারণে আম-মাংসও ভক্ষণ করিত,বা মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করিত না,ও প্রস্তরের বিবিধ দণ্ড ও অস্ত্র নির্ম্মাণে পটু ছিল না, এমন এক সময় যে ছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। সেই সময়ই পৃথিবীর প্রত্নপ্রস্তর যুগ।

প্রত্নপ্রস্তরযুগের কাল হইতে এখনকার সময় পর্য্যন্ত লক্ষাধিক বৎসরের ন্যূন হওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে দুইবার তুষার যুগের আবির্ভাব হয়। অনেকের অনুমান, তুষার যুগদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে পৃথিবীতে মানুষের সমাগম হয়। প্রায় লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে শেষ তুষার যুগের অবসান হয়। সুতরাং শেষোক্ত হিসাবে মানব-জাতির বয়স দুই লক্ষ বৎসরেরও অধিক ধরা যাইতে পারে।

প্রায় ছয় সাত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে অন্ত্যাধুনিক যুগের আবির্ভাব হয়। অন্ত্যাধুনিক যুগের প্রারম্ভকালে যদি মানুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রায় ছয় সাত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল।

অন্ত্যাধুনিক যুগের পূর্ব্বের যুগকে বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগ বলা হয়। এই যুগে ব্রিটেন দ্বীপ য়ুরোপ মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল। বহ্বাধুনিক যুগে মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষেরা ধরণী-পৃষ্ঠে বিচরণ করিতেন, এবং এমনও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই যুগের শেষভাগে, মানবের আবির্ভাব হয়।

প্রায় আট কোটি বৎসর পূর্ব্বে জীব-জননী ধরিত্রীর জন্ম হইয়াছিল, এবং প্রায় চার কোটি বৎসর পূর্ব্বে ধরিত্রী জীবজননী-পদারূঢ়া হন। মানব ধরিত্রীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, পৃথিবীতে তাহার বয়স আট লক্ষ বৎসর মাত্র।

অনেকে অনুমান করেন যে, প্রথম তুষার যুগের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল। যদি এই অনুমান যথার্থ হয়, তাহা হইলে, মানব-জাতির বয়ঃক্রম দশ লক্ষ বৎসরের কম নয়। তবে pre-glacial যুগে মানবের অস্তিত্ব ছিল কি না তাহা একরূপ সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক, মানুষের বয়ঃক্রম অন্ততঃ দশ লক্ষ বৎসর ধরা যাইতে পারে।

প্রাচীন মিসরীয় ভাষা, Hamito-Semitic বিভাগের অন্তর্গত। পূর্ব্বে এই ভাষা Semitic বিভাগের অন্তর্গত ছিল। আট হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিসরীয় ভাষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ইহা Semitic বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া Hamito-Semitic বিভাগের অন্তর্গত হয়। Neander উপত্যকা হইতে প্রাপ্ত মানবকঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, Neanderthal জাতি পঁচিশ ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষ। যবদ্বীপে বেনগাওয়ান (Bengawan) নদী-তীরে যে-সকল কঙ্কালাংশ পাওয়া গিয়াছে, ডাক্তার ইউজিন দুবোআর (Dr. Eugene Dubois) মতে, সেগুলি যে-জীবের কঙ্কালাংশ, সেই জীব আধুনিক গরিলা-জাতীয় জীব এবং আধুনিক মানুষের মধ্যবর্ত্তী সূত্র।

প্রাচীন যুগের মানুষের যে-সকল কঙ্কালাস্থি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাচীন যুগের মানুষেরা গরিলা সদৃশ আকৃতি ও গঠনবিশিষ্ট ছিল। এখন মানুষ গরিলা জাতীয় প্রাণী কি না, সে-বিষয়ে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। এখন এই বিষয়ের যথার্থ মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে, মানুষ ও গরিলা জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য, তাহাই প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য।

অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের অপেক্ষা, গরিলাজাতীয় প্রাণীর আকৃতি ও গঠন-বিষয়ে মানুষের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সহিত তুলনায়, আকৃতি ও গঠন বিষয়ে, গরিলা জাতীয় প্রাণী মানুষের খুব নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেও, মানুষ এবং গরিলা একত্র দণ্ডায়মান হইলে, এই উভয় জাতীয় প্রাণীর মধ্যে ব্যবধান অনতিক্রম্য হইয়া পড়ে। মানুষ দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা দাঁড়াইতে পারে, মানুষের গাত্রে বড় বড় ঘন লোম হয় না, তাহার হস্তদ্বয় আজানুলম্বিত নহে, তাহার বক্ষ ও কপাল প্রশস্ত, তাহার সুস্পষ্ট চিবুক আছে, তাহার করোটি সুবৃহৎ ও তন্মধ্যস্থ মস্তিষ্কের পরিমাণ অত্যধিক।

কিন্তু মানুষের বাক্‌শক্তি এবং বিবেচনা-শক্তি মানুষকে পৃথিবীর অন্য সকল প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। গরিলাজাতীয় প্রাণীর বাক্‌-যন্ত্রের অভাব আছে। অনেকে মনে করেন, ভাষা মানুষই তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করা একেবারেই ভুল। কারণ কোন-না কোন আকারে যদি মানুষের বাক্‌যন্ত্র থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন আকারে, মানুষের ভাষাও থাকিবে। মানুষের বাক্‌শক্তি যে একেবারেই উৎকর্ষ লাভ করে নাই, এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

মানুষ যেমন ধীরে ধীরে মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, মানুষের বাক্‌শক্তিও তেমনই অপরিস্ফুট অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ব্বে মানব-শরীরের এমন এক অবস্থা ছিল, যখন মানুষের বাক্‌যন্ত্র অপরিস্ফুট ছিল। মানুষের শরীরের ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মনুষ্য-শরীরস্থ বাক্‌যন্ত্র ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। গরিলা-জাতীয় প্রাণী হইতে মানুষের বিশেষত্ব এই যে, মানুষের বাক্‌শক্তি এবং চিন্তা-শক্তি আছে।

(মাধবী, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রী অমূল্যচরণ ঘোষ, বিদ্যাভূষণ

—

সমবায় ও আদর্শ পল্লী

ভারতের শিল্প-বাণিজ্য বিদেশীর করতলগত। ইহার একমাত্র প্রতিকার —দলবদ্ধ হইয়া কাজ করা, এবং সমবায়কে ভিত্তি করিয়া জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তোলা।

পল্লীই জাতি-সংগঠনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। পল্লীতেই জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

প্রত্যেক পল্লীকে একটি পৃথক্ কেন্দ্র করিয়া একটি সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা প্রয়োজন।

গ্রামস্থ সকল পরিবার হইতে সমপরিমাণ মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। যাহারা টাকা দিয়া অংশ (Share) লইতে অক্ষম, তাঁহাদের জন্য কোন-বিশেষ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে; যেমন তাহাদের পরিশ্রমকে অংশরূপে লওয়া। ব্যাঙ্কের সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য ইহার কাজ হইবে :—

(১) গ্রামবাসীদের মধ্যে যথাসম্ভব কম সুদে টাকা ধার (Loan) দেওয়া। এই সুদ ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী সমিতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে।

(২) গ্রামবাসীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত একটি দোকান (Co-operative Store) খোলা। সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ন্যায্য লাভে এই সমবায়-ভাণ্ডার গ্রামবাসীকে যাবতীয় জিনিষ সরবরাহ করিবে।

(৩) গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে গ্রামবাসীদের অভাব মিটাইয়া যে-অংশটা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা এবং সময় ও সুবিধামত দরে বিক্রয় করা। অন্য স্থান হইতে পাইলেও

ইদের চাঁদের প্রতীক্ষায়

শিল্পী শ্রীযুক্ত ৫, শার, আদগর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

তাহা কিনিয়া রাখা। এইরূপ পণ্য, যথা—চাউল, পাট, গুড় ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে সমিতির আবশ্যকসংখ্যক 'গোলা' এবং গুদাম স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) সমিতিকর্তৃক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চালিত একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা। এই কৃষিক্ষেত্রে য়ুরোপ ও আমেরিকায় যেরূপ উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হইতেছে তাহার পরীক্ষা করা এবং সফল হইলে গ্রামস্থ সকল কৃষকের ক্ষেত্রে উহার প্রবর্ত্তন করা। কৃষির সুবিধার জন্য খাল, পয়ঃপ্রণালী, কূপ প্রভৃতি খনন করা। কৃষকসম্প্রদায়কে শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া লইতে পারিলে পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি জমী (Plots) একটি জমীতে পরিণত করিয়া সহযোগে কৃষিকার্য্য চালান যাইতে পারে। ইহাতে লাভের আশা অধিক।

(৫) সমিতির পক্ষ হইতে মাছের চাষ, গরু, মহিষ প্রভৃতি পালন এবং তৎসঙ্গে দুধ, ঘি, মাখন প্রস্তুতের কারখানা (Dairy farm), হাঁস, মুর্গী, প্রভৃতির পালনশালা (Poultry farm) স্থাপন করা।

(৬) গ্রামবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার নিমিত্ত রজকাগার (Laundry) স্থাপন করা।

(৭) প্রত্যেক পল্লীর বিশেষ শিল্প যাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা যাইতে বসিয়াছে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

(৮) এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যাহা সেই গ্রামের পক্ষে সম্ভব, তাহার প্রচলন করা।

বাংলা দেশে স্থানে-স্থানে এইরূপ দেখা যায় বটে, কুম্ভকার, গোপ, ডোম এবং বাগ্দীরা এইরূপ স্ত্রীপুরুষে একত্রে কাজ করে। তবে তাহারা সংঘবদ্ধ নহে এবং তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়েরও সুবন্দোবস্ত নাই। সমবায় সমিতিকে এই প্রকারের কুটীরশিল্প স্থাপনের সহায়তা করিতে হইবে এবং শিল্প-জাত দ্রব্য-সম্ভার যাহাতে লোকে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাই করিতে হইবে। বাংলার পল্লীতে জাপানের ধরণে দেশলাই, পেন্সিল, গেঞ্জি, মোজা, খেলনা, সাবান প্রভৃতি নানাপ্রকারের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। জাপানী প্রথায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে দৈনিক প্রস্তুত পণ্য-সমূহ সমবায় সমিতির লোক যাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনিবে এবং বিক্রয়ের জন্য সহরের কেন্দ্রীয় সমবায়-ভাণ্ডারে প্রেরণ করিবে।

এইসকল প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত টাকা কোথায়? যদি অসম্ভব হয় তবে প্রতি মহকুমায় অন্ততঃ প্রতি জেলায় যাহাতে একটি সমিতি স্থাপন করা যায়, তদ্রূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহার কার্য্য হইবে, অধীনস্থ কেন্দ্রসমূহে উত্তমরূপে কাজ চলিতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করা এবং আবশ্যক হইলে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের অথবা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্যগণই অধীনস্থ সমিতিগুলি পরিচালিত করিবার নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে এবং উপযুক্ত হিসাব-পরীক্ষকদ্বারা আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করাইবে।

শুধু অর্থ উপার্জ্জন করিলেই পল্লীর অভাব, অভিযোগ, দুঃখ দূর হইবে না। উপার্জ্জিত অর্থ পল্লীর হিতসাধনে ব্যয় করা দরকার। বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত সমিতিই এই অর্থব্যয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের প্রথমতঃ এই কাজগুলি করিতে হইবে।—

(১) গ্রামের শিক্ষা :—প্রতি পরিবারের প্রত্যেক বালক-বালিকা যাহাতে সৎশিক্ষা পাইতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে যথাসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা, দরিদ্রদিগের ছেলেমেয়েদের বিনাবেতনে পড়ান, এবং বই, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি কিনিয়া দেওয়া, ক্রীড়ার বন্দোবস্ত করা, বয়স্কাউটিং, ড্রিল প্রভৃতি শিখাইয়া বালক-বালিকাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা, তাহাদের সুশৃঙ্খল ও সমবেতভাবে কার্য্য করার অভ্যাস বৃদ্ধি করা, পারিতোষিক প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষায় উৎসাহিত করা, অভিনয়, বায়স্কোপ ও ম্যাজিক্‌লণ্ঠন বক্তৃতা দ্বারা আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া, আশু প্রতীকার (First Aid) শিক্ষা, হাতে-কলমে কুটীর-শিল্প-শিক্ষা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা বিশেষ দরকার। নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানবিস্তারের জন্য একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেখানে দেশ-বিদেশের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত কতকগুলি সংবাদ-পত্র নিয়মিতরূপে রাখিতে হইবে।

(২) গ্রামের স্বাস্থ্য :—বাংলার নষ্ট পল্লীস্বাস্থ্য যাহাতে আবার ফিরিয়া পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা। যথা গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, নর্দ্দমা সাফ, ডোবা গর্ত্ত ভরাট করা, মশকবংশ নিপাত করা, ঘরবাড়ী আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মাণ, রাস্তা-ঘাটের উন্নতিসাধন ইত্যাদি। সমিতি হইতে গ্রামে একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গ্রামবাসীদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ সংযতভাবে জীবন-যাপন-প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। তজ্জন্য মধ্যে-মধ্যে পল্লীর সকল লোককে সমবেত করিয়া সভায় বক্তৃতা করা, ম্যাজিক্‌লণ্ঠন সাহায্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্ব বুঝান ও পৃথিবীর নানা দেশের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় খবরাখবর সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া ব্যায়ামাগার স্থাপন করিতে হইবে; সেখানে যুবকেরা নানাবিধ ব্যায়াম, কুস্তী, ঘুষিলড়া, যুযুৎসু, লাঠিখেলা, অগ্নিনির্ব্বাপণ (Fire Drill) প্রভৃতি শিক্ষা করিবে। চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমায়েসদের হাত হইতে গ্রামবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতি-গ্রামে গ্রামরক্ষা (Village Defence) সমিতি গঠন করিতে হইবে।

(৩) পল্লীবাসী নরনারীদের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে সরসতা আনিয়া, অবসাদ দূর করিয়া কর্ম্মে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অভিনয়, কথকতা, যাত্রা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৪) সাধারণ সমিতির (General Committee) অধীনে অনেকগুলি শাখা-সমিতি (Sub-committee) গঠন করিতে হইবে। যেমন, শিক্ষার জন্য একটি। ইহা শুধু পল্লীর শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধান করিবে। এইরূপ স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও বিচার-বিভাগের এক-একটি সাব-কমিটি থাকিবে। এইসব সাব্-কমিটির উপরে থাকিবে সাধারণ সমিতি। সাধারণ সভায় ভোট-অনুসারেই সাব-কমিটিগুলির সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে।

(৫) বিবিধ :—গ্রামবাসীদের আর যাহা-যাহা প্রয়োজন বোধ হইবে, তাহার ব্যবস্থা করা।

সমবায়-সমিতি গঠনের নিমিত্ত বর্ত্তমান রাশিয়ার কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। রাশিয়ায় কৃষকদিগকে দুরবস্থা এবং শোষক-শ্রেণীর কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য অসংখ্য সমবায়-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এইসকল ভাণ্ডারের পরিচালন-কার্য্য কৃষকদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। পণ্যদ্রব্য কৃষকের ক্ষেত্র হইতে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীর হস্তে না যাইয়া, সরাসরি উক্ত ভাণ্ডারে প্রেরিত হয় এবং তথায় উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া কৃষক-দিগকে লাভবান করে। বাংলায় এইরূপ ভাণ্ডার স্থাপিত হইলে কৃষকেরা প্রভূত লাভবান হইতে পারে।

(ভাণ্ডার, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—

বড়দিন

ইংরাজী Christmas শব্দের উচ্চারণ Crismas এবং সাধারণ ইংরাজী অভিধানে উহার অর্থ "Festival of Christ's birth, 25th December" (যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব, ২৫শে ডিসেম্বর) লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ, "*Criste masse*" (the Mass or Church-festival of Christ), খৃষ্টান্ ধর্ম্মসঙ্ঘের উৎসব। এখনকার খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, প্রভু যীশুখৃষ্ট ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যরাত্রির পর তাঁহার জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

ইহাকে "বড়দিন" বলে কেন?

জ্যোতিষিক নির্ণয় হইতে দেখা যায় যে, ২৪শে ডিসেম্বর (৯ই পৌষ) সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন এবং তাহার পর দিন ২৫শে ডিসেম্বর (১০ই পৌষ) হইতে দিনমান বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, যেহেতু ২৫শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে দিনমান প্রথম 'বড়' হইতে থাকে, সেইজন্য ঐ তারিখকে "বড়দিন" এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশের পঞ্জিকাগুলির গণক-মহাশয়গণের মতে ২৪শে ডিসেম্বর (এ বৎসর ৯ই পৌষ) "সর্বাপেক্ষা ছোট দিন" লিখিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা "সর্বাপেক্ষা ছোট দিন" নহে। যে-কোন 'জ্যোতিষিক ভূগোল' খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে ২০শে ডিসেম্বরের কাছাকাছিই ঐ "সর্বাপেক্ষা ছোট দিন" পড়িবে। তাহার পরে যে-দিন প্রথমে দিনমান বড় হইতে আরম্ভ করে, সেই দিনকে ইংরাজীতে "Winter Solistice" বলে। আমা-জ্যোতিষশাস্ত্রে আমরা অজ্ঞ; তথাপি, যতদূর শুনিয়াছি, ঐ শাস্ত্রের মতে উহার নাম 'মকরক্রান্তি' অথবা "উত্তরায়ণ সংক্রান্তি"; অর্থাৎ ঐ দিন হইতেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। জ্যোতিষের মতে, তাহা হইলে ২১শে ডিসেম্বর তারিখ হইতেই দিনমান প্রথম "বড়" হইতে থাকে এবং উক্ত ২১শে ডিসেম্বর তারিখকেই প্রকৃতপক্ষে "বড়দিন" বলা উচিত।

তথাপি, এমন এক কাল ছিল, যে-সময়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে প্রকৃতই ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ঐ "ছোট দিন" এবং ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে "Winter Solistice" পড়িত। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দে (২৭৩ খৃষ্টাব্দে) ২৫শে ডিসেম্বর তারিখেই "বড়দিন" পড়িত এবং ক্রমশঃ এখন পিছাইয়া পিছাইয়া উহা ২১শে ডিসেম্বর পড়িতেছে। খৃষ্টানী উৎসবের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেই প্রথম এই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে খৃষ্টের জন্মদিন The Christian *Dies Natalis* বলিয়া গৃহীত এবং ঐ তারিখে তাঁহার জন্মোৎসব করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই Winter Solistice অথবা মকরক্রান্তিতে (বড় দিন) কেন যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব প্রচারিত হইয়াছিল?

য়ুরোপের পণ্ডিতগণ এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয়ের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পান নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রভু যীশুখৃষ্ট অদ্য হইতে ১৯২৫ বৎসর পূর্বে ২৪শে ডিসেম্বর, মধ্যরাত্রির পর যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের (প্রাচীন ভারতবর্ষের ভিতর পারস্য, বাবিলোনিয়া, মেসোপটামিয়া, মিসর এবং পশ্চিম এসিয়ার গ্রীক বা যবন রাজ্যগুলিও ছিল) যাবতীয় সভ্যদেশে এককালে শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবের পূজার্চনার খুব প্রতিপত্তি ছিল। আমাদের বিষ্ণু ভগবান্ "সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী", এবং দ্বিজমাত্রেই নিত্য উপাসনার গায়ত্রী-মন্ত্র "সবিতৃদেবেরই বরেণ্য বর্গের" মহিমা বিঘোষিত করিতেছে। আমাদের দেশে বারটি সৌর মাসে সূর্য্যের বারটি নাম প্রচলিত আছে। ভবিষ্যোত্তর পুরাণান্তর্গত প্রসিদ্ধ "আদিত্যহৃদয় স্তোত্রে" মাঘ মাস হইতে যথাক্রমে সূর্য্যের নাম "অরুণ, সূর্য্য,বেদাঙ্গ, ভানু, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, যম, সুবর্ণরেতা, দিবাকর, মিত্র এবং বিষ্ণু" লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্যের কথা এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই সুপ্রচলিত আছে।

সেই প্রাচীন যুগের সর্বত্রই সূর্য্যের পূজা খুব আড়ম্বরের সহিত আচরিত হইত এবং সেকালে একমাত্র য়ীহুদী জাতি নিরাকার পরমেশ্বরের পূজক ছিলেন। ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সেকালে দিন বড় হইতে আরম্ভ করিত বলিয়া ঐ দিনে সূর্য্যদেবের জন্মতিথির উৎসব হইত। দেশের আপামর সাধারণ নরনারী খুব ঘটা করিয়া ঐ জন্মোৎসব করিতেন বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ফিলোকেলাস নামক এক প্রাচীন যবন বা গ্রীক জ্যোতির্বিদের পঞ্জিকার দেখিতে পাওয়া যায় যে, ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য্যের জন্মদিন (*Natlis Solis Invicti*) অবধারিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার জে, জি ফ্রেজার বলিতেছেন, "যদি আমরা এক প্রাচীন টীকাকারের প্রদত্ত প্রমাণে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীকেরা সে-সময়ে ঐ ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যরাত্রির পর সূর্য্যদেবের জন্মতিথির উৎসব করিতেন এবং পুরোহিত মিত্রদেবের মন্দিরের গর্ভগৃহ হইতে বাহির হইতে হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেন, "কন্যা প্রসব করিয়াছেন! জ্যোতিঃ বাড়িয়া উঠিতেছে!"

উক্ত সুবিখ্যাত পণ্ডিত বলিতেছেন, "বাইবেল পুস্তকে যীশুর জন্মদিনের কোনোই সংবাদ পাওয়া যায় না, এবং সেইজন্য প্রাচীন সময়ের খ্রীষ্টানেরা জন্মতিথির উৎসব করিতেন না। ক্রমশঃ, ইজিপ্ট (মিশর) দেশের খৃষ্টানেরা জানুয়ারী মাসের ৬ই তারিখে খৃষ্টের জন্মতিথি বলিয়া মানিতে আরম্ভ করেন, এবং ক্রমশঃ ঐ তারিখে খৃষ্টের জন্মোৎসব করিবার রীতি বিস্তৃত হইতে থাকে এবং চতুর্থ শতাব্দেই প্রাচ্য দেশের (মিশর, এসিয়ামাইনর, ইত্যাদি দেশের) সর্ব্বত্রই উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে। অবশেষে, তৃতীয় শতাব্দের অন্তিম সময়ে অথবা চতুর্থ শতাব্দের প্রথম ভাগে, পাশ্চাত্যদেশের (ইটালী ইত্যাদি দেশের) ধর্ম্মসঙ্ঘ ২৫শে ডিসেম্বর তারিখই খৃষ্টের প্রকৃত জন্মদিন বলিয়া স্বীকার করিয়া লন।"

উক্ত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে অখৃষ্টান্ সম্প্রদায় সূর্য্যের জন্মতিথির উৎসব করিতেন, এবং সেই উৎসব উপলক্ষে আনন্দের পরিচায়ক চিহ্ন স্বরূপে আলো জ্বালিতেন। খৃষ্টানেরাও এই উৎসব এবং আনন্দে যোগদান করিতেন। খৃষ্টান ধর্ম্মের পাণ্ডারা যখন দেখিলেন যে, এই উৎসবের উপর সাধারণের অত্যন্ত অনুরাগ রহিয়াছে, তখন তাঁহারা ভিতরে ভিতরে পরামর্শ আঁটিয়া স্থির করিলেন যে, খৃষ্টের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান এই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখেই করা হউক, এবং ৬ই জানুয়ারী তারিখে 'এপিফানী'র উৎসব করা যাউক। সেইজন্য এই রীতির সহিত ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়া রাখিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অগষ্টিন যে উপদেশ দিয়াছেন, 'আমার খৃষ্টান ভ্রাতৃগণের পক্ষে অখৃষ্টান্ সম্প্রদায়ের লোকের মত ঐ তিথিতে সূর্যের জন্য উৎসব করা কখনই উচিত নহে, কিন্তু যিনি সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার জন্যই (খৃষ্টের জন্যই) উৎসব করা উচিত', তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি এই কথা স্বীকার না করিলেও বেশ পরিষ্কার ভাবের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

এই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে খৃষ্টমাস উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার আরও

একটি কারণের কথা কোন-কোন খৃষ্টান লেখক বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ২৫শে মার্চ তারিখে যেহেতু যীশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণের দিন, (ঈস্টার অথবা গুড্ ফ্রাইডে পর্ব্ব) এবং যেহেতু তিনি ঠিক নির্দ্দিষ্ট পুরাপুরি বৎসর (exact number of years) এই ধরাধামে ছিলেন, সেই সূত্র ধরিয়া ২৫শে মার্চ্ তারিখ তাঁহার জননী-গর্ভে প্রথম অবতার (Annunciation) পর্ব্ব দিন হইয়াছিল; এবং সেই তারিখ হইতে নয় মাস গণনা করিয়া ২৫শে ডিসেম্বর তাঁহার জন্মদিন হয়।

(পরিচারিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২) শ্রী অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

অগ্নিদূত

শ্রী সজনীকান্ত দাস

ফাগুন-দুপুরে আগুন জলিছে
থাঁ থাঁ করে চারিদিক্
ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর শূন্য ছাদের 'পরে—
সৃজন করিছে দগ্ধ মরুর
মরীচিকা যেন ঠিক;
শ্মশান-নগরী ঝিমায় তন্দ্রাভরে।
অর্গল আঁটা সব বাতায়নে,
পাণ্ডুর নীলাকাশ,
ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়িছে কিসের লোভে;
কপোত-কপোতী আলিসার কোণে
ফেলিছে ক্লান্ত শ্বাস,
কা কা করে কাক যেন কি মনঃক্ষোভে।
পতিতপত্র দেবদারু-শাখে
ঝলসিছে কিশলয়,
নারিকেল-তরু এলায়েছে পাতাগুলি;
চড়াই খুঁজিছে শূন্য খোপেতে
সুনিভৃত আশ্রয়;—
তপ্ত উঠানে ফেরে না কাকলি তুলি'।
ঘূর্ণী হাওয়ায় শুষ্ক পত্র
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে,
ধূলি-কুণ্ডলী কভু বা ধরিছে ফণা,
বাতাস কাঁদিছে অতি দূরে কোথা
চাপা কান্নার সুরে
ফাগুন-আগুনে যেন সে ক্ষুণ্ণমনা।

নীলিমা ধূসর পাণ্ডু, সবুজ,
দিবসে গভীর রাতি,
রৌদ্র রচিছে বিজন নিশীথ-মোহ,
কাকেরা জাগিছে আর্ত্তকণ্ঠে
জ্বালায়ে দিনের বাতি,
তন্দ্রালুপ্ত দিবসের সমারোহ।
পসরা নামায়ে পসারী ঘুমায়—
ছায়া-করা দাওয়াখানি
উলঙ্গ শিশু মেঝেতে উপুড় হ'য়ে
নিদ্রিতা মা'র পরশ লভিছে
বুকের বসন টানি'
আঁখিপাতা তাঁর টেনে ধরে সংশয়ে।
কোনো বিরহিণী বাতায়ন-ফাঁকে
চাহিয়া দূরের পানে
দেখে চারিদিক্ খাঁ খাঁ মরু সুবিজন,—
শূন্যতা শুধু শূন্যতা আনে
চিন্তাবিহীন প্রাণে
অজানা কারণে ভ'রে ওঠে আঁখি-কোণ।
কাবুলি একটি লাঠি হাতে তার
বসেছে গলির কোণে—
শূন্যমনেতে ভুলিয়াছে ঠাঁই-কাল,
পাহাড়ী দেশের বাহারী সখীরে
পড়ে বুঝি তা'র মনে,
সুদ আর টাকা মনে হয় জঞ্জাল।

ধূলি উড়ে শুধু রহিয়া রহিয়া
পথিকবিহীন পথে
ঘুমায় কুকুর বিরলপত্রছায়,
রৌদ্র-দগ্ধ অন্ধ ভিখারী
পথে বসি' কোনো মতে
প্রার্থনা মুখে অতি ক্ষীণ বাহিরায়।
গরীবের বধূ একেলা বসিয়া
সেলাই করিছে কিছু
অথবা বাসন মাজিছে শান্ত মনে।
আপিসে কেরাণী লিখিতেছে খাতা
মাথাটি করিয়া নীচু—
হতাশে নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণে ক্ষণে।

বাহিরে তাকায়ে দেখে লালে লাল
কৃষ্ণচূড়ার শাখা,
নাগকেশরের গন্ধ ভাসিয়া আসে,
লক্ষপুরীর কাজ কোলাহল
ক্ষণেক পড়িতে ঢাকা।
ভাবে অদৃষ্ট দরিদ্রে পরিহাসে।
ঝাঁঝাঁ চারিদিক্, নগরের বায়ু
উষ্ণ রৌদ্র-তাপে
কি যেন মোহের স্বপন মনেতে আনে,
ফাগুন-দিবসে বিরহী যক্ষ
নিষ্ঠুর কার শাপে
আগুনে পাঠাল প্রেয়সীর সন্ধানে।

বীরভূমের তসর-শিল্প

শ্রী গৌরীহর মিত্র

ধড়লোকের জন্মভূমি বলিয়াই হউক অথবা সাহিত্য, সমাজ, শিল্পকলা কিম্বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশেষত্বের জন্যই হউক, কোন-না-কোন একটি কারণের জন্যই এক-একটি দেশ বিশেষভাবে পরিচিত হয়। প্রাচীন বীরভূমি একাধারে ইহার সকল দিক্ দিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আজ শিল্পের দিক্ দিয়া বীরভূমের শুধু তসর-শিল্পের কথাই বলিব।

বীরভূমের অন্তর্গত বক্রেশ্বরের সান্নিধ্যে তাঁতিপাড়া নামক গ্রামে ও বীরভূমে সদর সিউড়ীর উপকণ্ঠে করিধা গ্রামে প্রচুর-পরিমাণে তসরের নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, থান ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত বীরভূমের আরও দুই-এক স্থানে তসর কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। বীরভূমের এবং পশ্চিমাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা—কোল, হো, ধাঙ্গড় প্রভৃতি জাতি বিশেষভাবে সাঁওতালগণ বীরভূমের ও পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা বনভূমি হইতে তসর-গুটি সংগ্রহ করিয়া আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে এবং পৌষ-মাঘ মাসে তাঁতিপাড়া ও করিধা-গ্রামের তন্তুবায়গণের নিকট দশ-পনর টাকা কাহন (আনায় ছয়টি-আটটি) হিসাবে বিক্রয় করিয়া যায়। এই উপায়ে অনেকের জীবিকার সংস্থান হইয়া থাকে।

তসর-গুটি বৎসরে দুইবার হয়—একবার আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে আর-একবার পৌষ-মাঘ মাসে। এদেশের তন্তুবায়গণ শেষোক্ত সময়ের গুটি (দরে কিছু সস্তা পায় বলিয়া) বেশী ক্রয় করে।

তসর-কীট রেশম-কীটের ন্যায় গৃহাভ্যন্তরে পালন করা যায় না। ইহারা স্বভাবতঃ বনবৃক্ষের উচ্চশাখায় জন্মিয়া থাকে। অনেকেই উহাদিগকে গৃহে রাখিয়া পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রেশম-কীটের ন্যায় ইহাদের পালন-কার্য্যে অত যত্ন বা পরিশ্রম করিতে হয় না। প্রজাপতি বৃক্ষপত্রে ডিম্ব প্রসব করিলে সংগ্রহকারীরা আর-কয়েকটি পত্রের সংযোগে ঐ ডিম্ব-পত্রটিকে একটি গোলাকার বস্তুতে পরিণত করিয়া

দেয় ; এবং দশ-বার দিন পর ডিম হইতে শুঁয়াপোকার ন্যায় কীট বাহির হইলে গোলাকার বস্তুটি পুনরায় খুলিয়া দেয়। তাহারা ঐ কীটগুলি লইয়া আসন, তুঁত, অর্জুন, কুল, সাল, সিমুল, পিপুল, মহুয়া, কেন্দ প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় বা পত্রে। বসাইয়া দিয়া আসে। এক-একটি বৃক্ষ ত্রিশ-চল্লিশটি পর্য্যন্ত কীট বেশ ভালভাবে পোষণ করিতে পারে। সেইজন্য সংগ্রহকারীরাও এক-এক বৃক্ষে উহার বেশী কীট রাখে না। তাহারা সময়-সময় ইহাদের স্বাভাবিক শত্রু পিপীলিকা, বাদুড়, টিক্‌টিকি, কাক, মাছি, কাঠবিড়াল প্রভৃতির লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

তসর-গুটি সাধারণতঃ কুল-বৃক্ষেই জন্মিয়া থাকে। কখন কখন আবার ইহাদিগকে আসন এবং শাল-বৃক্ষেও জন্মিতে দেখা যায় ; কিন্তু কুল এবং আসন বৃক্ষই ইহাদের প্রধান আশ্রয় ও প্রাণদাতা।

ডিম হইতে দশ-বারো দিনের মধ্যেই কীট বাহির হয়। পনর, যোল, বিশ, বাইশ এবং ত্রিশ-চল্লিশ দিন বয়সকে যথাক্রম কীটগুলির শৈশবাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও বার্দ্ধক্যাবস্থা বলা যায়। এই বার্দ্ধক্য-দশায় আসিয়া ইহারা রেশম-কীটের ন্যায় লালা হইতে সূত্র নির্গত না করিয়া পশ্চাৎদিক্ হইতে সূত্র নির্গত করিয়া নিজকে ঐ সূত্র দিয়া জড়াইয়া ফেলে। এই ডিম্বাকৃতি ধূসর বর্ণের বস্তুই তসরগুটি। এই তসর-গুটি তিন-চারি মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকিলে প্রজাপতি বাহির হয়। গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে বর্ষার প্রারম্ভে বা শীতের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুং-জাতি প্রজাপতির সঙ্গমের দুই দিন পরে স্ত্রী-জাতীয় প্রজাপতিগুলি বৃক্ষপত্রে বা শাখায় একেবারে দেড়-দুই শত ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। স্ত্রী-প্রজাপতি পুং-প্রজাপতির সহিত সংযুক্ত না হইয়াও ডিম্ব প্রসব করে সত্য ; কিন্তু ঐ ডিম্বগুলি ফাটে না—দুই-এক দিনের মধ্যেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

তসর-গুটি পাতার সহিত মিশিয়া থাকে বলিয়া সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। তসর-গুটি বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বোঁটার সহিত ঝুলিতে থাকে। বৃক্ষের নিম্ন শাখায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষনিম্নে দাঁড়াইয়া না দেখিলে সহজে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া একপ্রকার দুষ্কর হয়। ইহাদের বিষ্ঠা দেখিতে প্রায় গোলমরিচের ন্যায়।
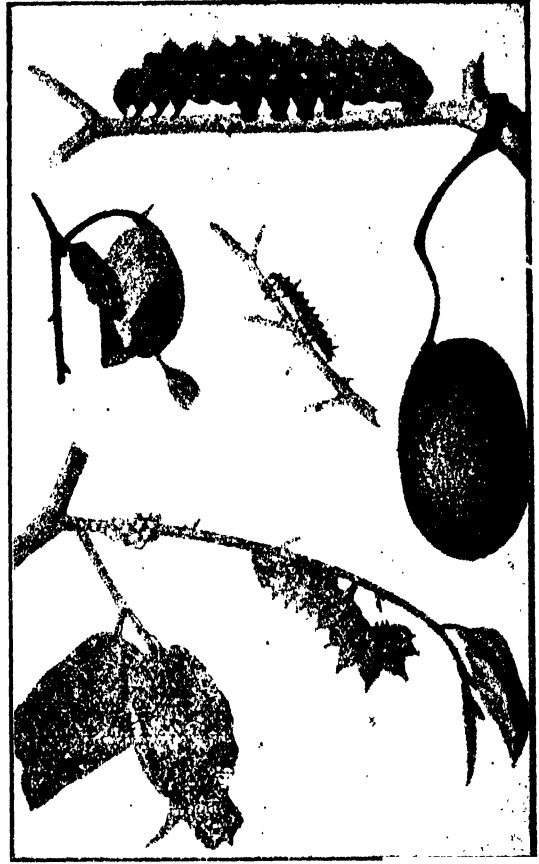
তসর ডিম, কীট ও গুটি
১ম চিত্র—ডিম ; ২য় চিত্র—৪।৫ দিনের কীট ; ৩য় চিত্র—শিশু কীট ১৫।১৬ দিনের ; ৪র্থ চিত্র—যুবক কীট ২০।২২ দিনের ; ৫ম চিত্র—বৃদ্ধ কীট ৩০।৪০ দিনের ; ৬ষ্ঠ চিত্র—কুলগাছের তসর-কীট ; ৭ম চিত্র—বোঁটা-সমেত তসর-গুটি

বিষ্ঠা দেখিয়াই সাধারণতঃ সংগ্রহকারী বা পালনকর্ত্তারা ইহাদের সন্ধান বুঝিতে পারে।

সূতা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই এই গুটিগুলিকে প্রথমতঃ ভালরূপে ক্ষারজলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয় নচেৎ গুটি-মধ্যস্থিত প্রজাপতি বাহির হইয়া গেলে তাহা হইতে আর ভাল সূতা পাওয়া যায় না। গুটিমধ্যস্থিত প্রজাপতি গুটির নিম্নস্থান লালা দিয়া নরম করিয়া বাহির হইয়া যায় ; তাহাতে সূতা কাটিয়া যায় না ; কিন্তু লালা দেওয়া সূতা কিছু কম মজবুত হয়। এরূপ সূতার ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী। তন্তুবায় গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা গুটি সিদ্ধ
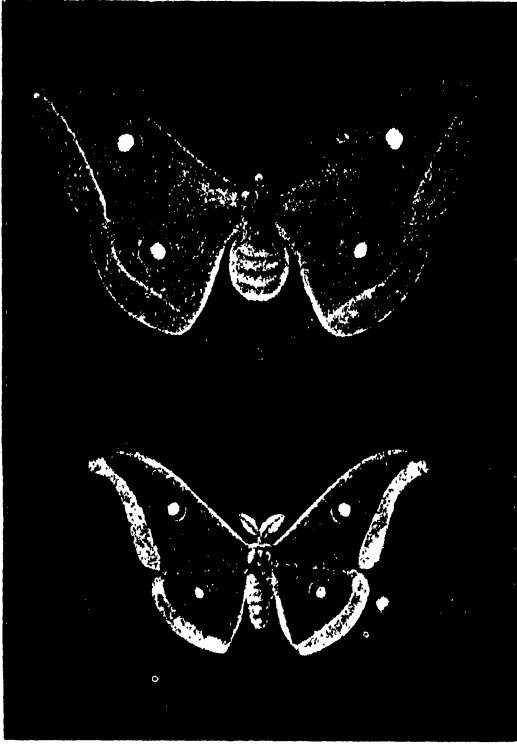
তসর প্রজাপতি
১ম চিত্র—স্ত্রী প্রজাপতি ; ২য় চিত্র—পুং প্রজাপতি

করা, সূতা তোলা, নাটাই করা ইত্যাদি সমুদয় কার্য্যই করিয়া থাকে। তন্তুবায়-মেয়েরা প্রাতে গৃহকর্ম্ম সারিয়া বেলা আট-নয়টা পর্য্যন্ত এবং মধ্যাহ্নে দুই-তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া নেহাৎ কমপক্ষে দৈনিক ছয়-সাত আনা উপায় করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধ গুটির ভিতর মৃত পোকাগুলি তাহারা নিম্নশ্রেণীর হাড়ী, বাউরিদিগকে পয়সায় আট-নয়টি হিসাবে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই মৃত পোকা ঐ জাতিদিগের অতি উপাদেয় খাদ্য।

করিধায় এবং তাঁতিপাড়ায় প্রায় তিনশতাধিক তন্তুবায় দেশী হাতের তাঁত ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা কোন-রকম বিদেশী কলের সাহায্য লয় না। তন্তুবায়-গৃহিণীরা সূতা নাটাই করিয়া দিলে তন্তুবায়গণ উহা শক্ত করিবার জন্য ভাতের কিম্বা খইএর মাড় দিয়া শুকাইয়া লয়। তাহারা মাড়-দেওয়া সূতা তাঁতে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করিয়া ইচ্ছানুযায়ী তসর-কাপড় বা থান প্রস্তুত করিয়া থাকে।

গুটি সিদ্ধ করিয়া মেয়েরা উহা শীতল জলে রাখিয়া উপরের মোটা আবরণটি তুলিয়া দেয়। ঐ মোটা পদার্থই কাট। ঐগুলি মাটির ভাঁড়ের উপর স্থাপনপূর্ব্বক পাক দিয়া কাট-সূতা তৈয়ারি করিতে হয়। কাট-সূতা তৈয়ারি করিতে পরিশ্রম কিছু বেশী করিতে হয়। গুটি হইতে মোটা আবরণ তুলিয়া লওয়ার পর যে মসৃণ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা হইতে অতি মিহি সূতা পাওয়া যায়। ঐ রকমের পাঁচ-ছয়টি গুটি শীতল জলের পাত্রে রাখিয়া তাহাদের প্রত্যেকটি হইতে সূতা বাহির পূর্ব্বক একত্র করিয়া নাটাই করিতে হয়। এইরূপ না করিলে সূতা বেশী দিন টেঁকসই হয় না ; কাপড় বুনিবার সময় সূতা ছিঁড়িয়া যাইবার বেশী সম্ভাবনা থাকে। এই সূতা যেমন মিহি, তেম্‌নি সুন্দর ও মজবুত হয়। গুটি যত শেষ হইয়া আসে, সূতা ততই মিহি হইতে থাকে। সাদা সূতার ন্যায় এই সূতার কোনরূপ নম্বর নাই ; তবে তাঁতিরা তাহাদের নিজ-নিজ ইচ্ছানুযায়ী বেশী বা কম গুটি লইয়া সূতা সরু-মোটা করিতে পারে। দৈনিক ১০০।১২৫ কোয়ার সূতা বাহির করিতে পারা যায়। এইসব কাজ যে স্ত্রীলোকদের তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই জাতির নারী ও পুরুষ উভয়েই উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া আর্থিক হিসাবে এই সম্প্রদায়কে কখন অভাব-অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

গুটির নীচের আবরণ হইতে যে মিহি সূতা পাওয়া যায়, তাহা হইতে অতি সুন্দর-সুন্দর সাড়ী, থান, চাদর ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। কাট হইতে যে-কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহা কাটের কাপড় নামে পরিচিত। কাটের কাপড় পরিধেয় ও শীতবস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। তসর ও কাটের কাপড় শুদ্ধ বলিয়া বিশেষভাবে এই দেশের হিন্দু বিধবাগণ ইহা অতি আদরের সহিত ব্যবহার করেন। এতদ্ভিন্ন অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এবং দোলদুর্গোৎসবাদি দেবপর্ব্বাহেও ইহা ব্যবহৃত হয়। এইসমস্ত কাপড়ে বিদেশী উপাদানের নামগন্ধ নাই। ইহা স্বদেশজাত অতি পবিত্র জিনিষ। ইহা খাঁটি খদ্দর। মেয়েদের

পরনের উপযোগী শাড়ীর পাড়গুলিও স্বদেশজাত রঙ হইতে প্রস্তুত—ব্যবহারে উহা কখন বিবর্ণ হইয়া যায় না। থান হইতে কোট, পিরাণ, ফ্রক ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। ঐসমুদায় প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে থানটিকে একবার উত্তমরূপে ধোলাই করাইয়া লইলে কোট প্রভৃতি জিনিষগুলি আর মাপে খাটো হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এক থান (দশ গজ বিশ হাত) তসরের দাম আঠার টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত হয়। তবে পঁচিশ-ছাব্বিশ টাকা মূল্যের থানগুলি সকলেই পছন্দ এবং ব্যবহার করেন। বীরভূম-প্রদর্শনী এবং অন্যান্য প্রদর্শনীতে বীরভূমের তসর অন্যান্য দেশের তসরকে পরাজিত করিয়াছে। এখানকার তন্তুবায়গণ প্রদর্শনীতে বহুবার বহু মেডেল, সার্টিফিকেট্ ইত্যাদি পুরস্কার পাইয়াছে।

সূতা তৈয়ারি থাকিলে একজন লোক অবসর সময় বাদ দিয়া তিন চারি দিনে একটি থান প্রস্তুত করিতে পারে। একটি ঐ মাপের থান তৈয়ারির জন্য প্রায় এক কাহন (১২৮০টি) গুটির প্রয়োজন হয়। একটি থানের সূতা তৈয়ারি পর্য্যন্ত খরচ হয় অন্ততঃ পনর-ষোল টাকা; বাকী টাকা তাহার পারিশ্রমিক। এই হিসাবে স্ত্রীপুরুষ দৈনিক গড়পড়্তা উপায় করে দেড় দুই টাকা। অর্থাৎ মেয়েরা সাধারণতঃ উপায় করে দৈনিক আট আনা দশ আনা; আর পুরুষরা উপায় করে অন্ততঃ এক টাকা, পাঁচ সিকা। ইহা আজকালকার যে-কোন উচ্চশিক্ষিত কেরাণীর পক্ষে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ ইহাতে গোলামি নাই। শিক্ষিত কেরাণীকুল অপেক্ষা অশিক্ষিত এই তন্তুবায়গণ সর্ব্বপ্রকারেই সুখী। ইহারা তাহাদের অপেক্ষা উপায়ও করে বেশী এবং থাকেও বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে।

আজকাল চাকুরীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এইসমস্ত শিল্পের দিকে মনোযোগী হইলে যে আমরা দু-পয়সা উপার্জ্জন করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে পারি, উপরন্তু দেশেরও কাজ করা হয়, তাহা বোধ হয় বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষিতের পক্ষে এই কার্য্য শিক্ষা করিতে বেশী দিন লাগিবে না বলিয়া ভরসা হয়। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা বা স্বদেশীকে প্রকৃত স্বদেশীভাবে গ্রহণ করিবার আগ্রহ থাকিলে, স্বদেশী শিল্পকে উন্নত করাই প্রকৃত পথ। শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতিতে দেশ যত উন্নত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অপর দিকে মন না দিয়া বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, কর্ম্মিষ্ঠ এবং চরিত্রবান্ ব্যক্তি যতই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন, ততই শিল্পের ও দেশের দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা।

বীরভূমের এইসমস্ত স্থানে তসর ভিন্ন সাদা সূতার কাপড়, গাম্‌ছা, থান, রঙীন চাদর ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঁতের কাপড়গুলি বহু-দিন-স্থায়ী হয়; উহা জীর্ণ হইতে অন্ততঃ দেড়-দুই বৎসর সময় লাগে।

ভারতবর্ষ হইতে ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড্, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ন্যূনাধিক দুই-তিন হাজার মণ তসর রপ্তানি হইয়া থাকে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত এবং মান্দ্রাজ অঞ্চল হইতেও তসর-গুটি রপ্তানি হয়। বিহার ও বাংলা হইতে তসরের কাপড় কিয়ৎপরিমাণে ভারতের অন্যান্য দেশে এবং ইউরোপে রপ্তানি হয়। বাংলায় বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার স্থানে-স্থানে তসরের সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্র-বয়ন হইয়া থাকে। গিরিধি, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম, মানভূম, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে তন্তুবায়গণ তসরের সূতার জন্য গুটি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বীরভূম হইতে কোটের উপযোগী তসর-থান ইউরোপে ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচুর-পরিমাণে রপ্তানি হইত। কলিকাতায় এই তসরের ব্যবসা পরিচালন-জন্য বড়-বড় 'হাউস্' ছিল। সেই 'হাউসে'র কর্ম্মচারিগণ বীরভূমের করিধা, তাঁতিপাড়া, বীরসিংহপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া তন্তুবায়দিগকে দাদন করিত; এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অধিকাংশ তসরই আদায় করিয়া লইত। এখন বিশ-পঁচিশ বৎসর হইতে তসরের এই চালানী কারবার একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই ব্যবসায় এতদিনে আবার যেন জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখাই-তেছে। কারণ স্থানীয় কতকগুলি ভদ্রসন্তান পূর্ব্বোক্তরূপ

দাদন করিয়া তাঁতিদিগের নিকট হইতে ব্যবসাটি (শিল্পটি নহে) হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে তাঁতিদিগের অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল না হইলেও ব্যবসা-হিসাবে ইহা দেশ-বিদেশে প্রসার লাভ করিলে দাদনকারিগণের অবস্থা উন্নত হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, এই শিল্পকে শুদ্ধ বীরভূমেরই কতকটা অংশের প্রয়োজন পূরণে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, দেশ-বিদেশে প্রচলিত করিবার জন্য যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। যৌথ কারবার অর্থে আমরা যন্ত্রপাতি আমদানির কথা বলিতেছি না। আমরা ইহাকে কুটীরশিল্প-হিসাবেই উন্নত দেখিতে চাই। কিন্তু তাহা করিতে হইলে কিছু অধিক-পরিমাণ মূলধন ও সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। কত নারী যে অন্নের অভাবে অকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কত অনাথা বিধবা, কত নিষ্কর্ম্মা যুবক যে উদরের জ্বালায় অসৎপথ-অবলম্বনে বাধ্য হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহাদিগকে গুটি হইতে সূতা বাহির করিতে শিখাইয়া কাজে লাগাইতে পারিলে, তাঁত ধরাইয়া মাকু ঠেলিতে শিখাইলে দেশের অন্ন-সমস্যা দূর করিতে কয়দিন লাগে? কিন্তু এসব করিতে অর্থ চাই, অক্লান্ত-কর্ম্মী মানুষ চাই, প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা চাই।

দেশে বনের অভাব নাই। এইসব বনে গুটির যত্ন করিতে হইবে এবং শত্রুর হস্ত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। আমরা আজিও কি আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না? আমাদের ঘরে অন্ন-সংস্থানের এমন সুন্দর উপায় থাকিতে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এমন পথ থাকিতে, এখনও কি আমরা পরের দুয়ারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিব?

আধুনিক জার্ম্মান্ নারীর আর্থিক প্রচেষ্টা

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দেশে প্রধানত দু'রকম মতবাদ প্রচলিত আছে। একদল লোক বলেন, পশ্চিম এসে ভারতের তথা এশিয়ার পায়ে মাথা নত করবে; একদিন আমাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেই হবে। আর একদল বলেন, সুয়েজের ওপারের লোকের জন্য এক পথ, এপারের লোকের জন্য আর-এক পথ; ওদের পথে ওরা চলুক, আমাদের পথে আমরা চলব। আমি এ দু'রকম মতেরই ঘোরতর বিরোধী।

প্রাচীন যুগে এশিয়া ইয়োরোপের গুরুস্থল ছিল, এদাবী ইতিহাসগত দাবী নয়। প্রাচীনকালে গ্রীক, বৌদ্ধ বা মৌর্য্য আমলে অথবা মধ্যযুগের বাদশাহী আমলে কখনো ভারত ইয়োরোপের গুরুগিরি করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের ঠাকুরদারা ওদের ঠাকুরদাদের সমানে সমানে হয়তো চলছিলেন, কিন্তু তাদের হারিয়ে আগে চলে' গেছেন একথা স্বীকার করা চলে না। আমার কাছে অতীতের ইতিহাসের এই বাণী। ভবিষ্যতে এশিয়া প্রভুত্ব করবে এমন কোনো লক্ষণও দেখ্ছি না।

ওদের পথ ওদের, আমাদের পথ আমাদের—একথা ভ্রান্ত, অসত্য এবং প্রমাণ-বিরুদ্ধ। আমরা যে পশ্চিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি তা'র দৃষ্টান্ত সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে প্রতিদিন পাওয়া যায়। একথা পূর্ব্বে বহুবার বলেছি এবং আজও আবার বলি যে, দুনিয়া চিরদিন ঠিক একভাবে চলে' এসেছে এবং ভবিষ্যতেও চল্বে। চীন বল, জাপান বল, ভারত বল, ইয়োরোপ বল, সব একদিকে চলেছে, তবে ওরা এগিয়ে গেছে, আমরা ওদের পিছু-পিছু ওদের রাস্তাতেই চলেছি—এই যা পার্থক্য। জমিদার-চাষী রাজা-প্রজা স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ যা-কিছু বল সবই জগতে একই রূপ নিয়ে গড়ে' উঠ্ছে। প্রভেদ এই যে, যে-সব কাজ ওরা ৩০, ৪০ ৫০ বা ৬০ বছর আগে করেছে এতদিন পর আমরা তা কিছু কিছু করেছি বা কর্বার চেষ্টায় আছি। স্কুল, কলেজ,

বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্যাক্টরী, ট্রেড-ইউনিয়ন্, নগর-স্বরাজ, পল্লী-স্বরাজ প্রভৃতি যা-কিছু ওদের আছে, সমস্তই আমরা আস্তে-আস্তে গ্রহণ কর্‌ছি। ইয়োরোপে যখন ষ্টীম্-এঞ্জিন্ নামক অদ্ভুত বস্তুটি তৈরী হ'ল তার দেড়শ'বছর পর আমরা হঠাৎ চেয়ে বল্‌লাম—এ আবার কি! ওদের প্রসাদ সবই আমরা পাচ্ছি, কিন্তু আস্তে-আস্তে বেমালুম হজম করে' বলি, ওদের পথে ওরা, আমাদের পথে আমরা। কিন্তু আসল কথা এই যে, ওরা যখন কোনো-কিছুর চরমে ওঠে আমরা তখন কেবলমাত্র গোড়ায় এসে দাঁড়াই। সুতরাং একই প্রণালীতে যে পৃথিবী চল্‌ছে সে-কথা আর অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। একথা সত্য যে, আমরা ওদের ল্যাজে হাত দিয়ে চলেছি মাত্র।

ওদেশে আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা কতভাবে মানুষ করেছে সে-সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলেছি। সেগুলি মোটামুটি এই :—(১) ব্যাঙ্ক্ প্রতিষ্ঠা।—উপার্জ্জিত অর্থ লোকে কোথায় রাখ্‌বে, তা হ'তে লোকে কি করে' লাভবান হবে, কোথায় টাকা রাখ্‌লে নিরাপদে থাকৃবে, ব্যাঙ্ক্ প্রতিষ্ঠিত করে' সে-সমস্যার সমাধান করা হ'ল। (২) জীবন বীমা পদ্ধতি।—পূর্ব্বে লোকে ভয়ে ভয়ে মহা উদ্বেগে জীবন কাটাতো। যদি কারো হঠাৎ মৃত্যু হয়, যদি হঠাৎ কোনো বিপদ্ আসে তবে কি উপায় হবে—এ একটা মহা চিন্তা ছিল। সেই চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ওরা ভাব্‌লে—এমন ব্যবস্থা কর্‌তে হবে যাতে সবাই নিরুদ্বেগে শান্তিতে জীবন যাপন কর্‌তে পারে। ফলে সৃষ্টি হ'ল সর্‌কারী বাধ্যতামূলক জীবনবীমাপদ্ধতি। (৩) জমি-জমার ব্যবস্থা।—পূর্ব্বে যার জমি ছিল তার কোনো ভাবনা থাকৃত না, কিন্তু যার জমি নেই সে নানারূপ আর্থিক অসুবিধা ভোগ করত। এই অনৈক্য দূর কর্‌বার জন্যে জমি-জমার নূতন বিলি-ব্যবস্থা হ'ল। যার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি আছে তা'র কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে যার জমি নেই তা'কে দেবার ব্যবস্থা হ'ল। এই নেওয়া ও দেওয়ার মালিক রাষ্ট্র নিজে। তোমার জমি তোমার থাকৃবে কি না তা'র বিচার-ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হ'ল। (৪) শ্রমিকের বৃহত্তর দাবী।—ফ্যাক্টরীর মজুরই হোক আর কেরাণীই হোক আগে তাদের যা-কিছু অভাব-অভিযোগ বা দাবী তা ট্রেড ইউনিয়নেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঐসব ইউনিয়ন বা সঙ্ঘেই তা'রা এতকাল সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এখন তা'র আমূল পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। ফ্যাক্টরীর মালিকদের সঙ্গে সমানে বসে' মজুর ও কেরাণীরা এখন ফ্যাক্টরী পরিচালন, জমা-খরচের হিসাবপত্র, ও অন্যান্য শাসন-কার্য্যে সমান অধিকারী। (৫) অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা।—কি স্ত্রী কি পুরুষ ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত সবাইকে এই শিক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হ'ত। ১৯১৮ হ'তে বয়স ১৪ থেকে ১৮ পর্য্যন্ত করা হয়েছে।

জার্ম্মান্ রমণীরা তাদের আর্থিক উন্নতির জন্যে অনেক-কিছু করেছে ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মেয়েরা তাদের তুলনায় অনেক পেছনে আছে একথা খুবই সত্যি। কিন্তু তা'র আগে এই কথাটা পরিষ্কার করে' বলা দর্‌কার যে মেয়েরাই যে সব উন্নতির মূল তা সত্য নয়। অনেকের বিশ্বাস যে, বিশেষ কোনো-একটি শক্তির জোরে জগৎ-সংসার চল্‌ছে। তা তো কখনো হ'তে পারে না। হাজার জায়গায় হাজার রকম হাজার শক্তির ও তা'র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর জগতের যত-কিছু উন্নতি নির্ভর করে। যিনি যে-শক্তির বা প্রথার উপাসক বা তা'তে বিশ্বাস-পরায়ণ তিনি প্রায়ই আর-সব শক্তিকে তাচ্ছিল্য বা অগ্রাহ্য করে' বলে' থাকেন—সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ। বিশেষ কোনো শক্তি বা আন্দোলনকে নিজের খুসী, মর্জ্জি বা শক্তি অনুসারে সাহায্য কর্‌বার অধিকারী সকলেই, কিন্তু সেইটেকেই অযথা ফাঁপিয়ে বড় করে' তোল্‌বার দরকার নেই।

আর্থিকই হোক্ আর রাষ্ট্রীয়ই হোক্ যে-কোনো উন্নতি নারীর কর্‌তে হ'লে তা'র স্বাধীনতার প্রয়োজন সকলের আগে। ওদের অনুকরণ করে' স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন আমরা আরম্ভ করেছি, কিন্তু ওদের দেশেও এ বস্তুটি খুব বেশী দিনের নয়। পশ্চিমে এখনও এমন দেশ আছে যেখানে আর্থিকভাবে নারী স্বাধীন নয়। আমেরিকার আল্‌বামা বা নিউ ইংলণ্ড্ প্রদেশে স্ত্রীর উপার্জ্জিত অর্থের অধিকারী তা'র স্বামী। ৪০ বছর আগেও জার্ম্মানীতে-যে দিন প্রথম একটি মেয়ে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে পড়্‌তে এল, সেদিন তা'কে দেখ্‌বার জন্যে মুদী, দোকানী, গৃহস্থ কেরাণী যে-যেখানে ছিল সবাই রাস্তায় বেরিয়ে এল। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ওরা ৪০ বছর আগে যা করেছে আমরাও আজ তা করি। কোনো মেয়ে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়্‌তে যায় তবে ভাবি এ আবার কি জানোয়ার! আজ ১৯২৬ সালে ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ বলেছেন—ল্যাটিন-জাতের মেয়েদের ঘর-কুণো করে' না রাখ্‌লে আর উপায় নেই। ইটালীর একটি বিখ্যাত কাগজের সম্পাদিকা আমাকে সেদিন বলেছিলেন, আমেরিকার মেয়েদের মতন আমরা কখনো হ'তে পারব না।

দৃষ্টান্ত এইরকম আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। এই থেকেই বোঝা যাবে নারীর স্বাধীনতার অভাব আমাদের দেশেই কিছু নূতন নয়। যে-সব দেশে নারীরা চরম স্বাধীনতা লাভ করেছে বলে' আমরা মনে করি সেই-সব সভ্য দেশেও আজ নারীর স্বাধীনতা-সম্বন্ধে এইরকম মনোভাব বর্ত্তমান আছে।

তবু জার্ম্মানীর মেয়েদের কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন হয়েছে। তা'রা আজকাল সব কাজে যোগ দিচ্ছে। যত-রকম স্কুলকলেজ আছে সর্ব্বত্র তা'রা পড়্‌তে আরম্ভ করেছে। কেউ ডাক্তারি পড়ে, কেউ উকীল হচ্ছে, কেউ টেক্‌নিক্যাল স্কুলে বিদ্যাভ্যাস কর্‌ছে, কেউ কাগজ চালায়, কেউবা লেখক হচ্ছে, কেউ বা রাইস্তাগে যাচ্ছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—উঁচু, নীচু ও মাঝারি মধ্যবিত্ত। যে-যে কাজ করে' এরা নানা উপায়ে আর্থিক উন্নতি ও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ পরিষ্কার করে' এনেছে তা প্রধানত এই কয়টি—(১) গৃহস্থালীর কাজ, (২) শিল্পকাজ, (৩) বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিক্যাল কাজ এবং (৪) সমাজ-সেবা। এর সবগুলি আলাদা করে' বিশ্লেষণ করা দর্‌কার।

(১) গৃহস্থালী কাজ।—আমাদের দেশের লোকের একটা ধারণা আছে যে, ইয়োরোপের মেয়েরা বুঝি নাচ-গান করে', স্ফূর্ত্তি করে', হোটেলে রেস্‌টোরাঁতে ঘুরে-ঘুরেই জীবন কাটায়। কিন্তু তা যে কত বড় ভুল ধারণা সে-কথা শুধু এইটুকু মাত্র বল্‌লেই বোঝা যাবে যে, ওদেশে একজন মেয়ে যে-কাজ করে তা আমাদের দেশের মেয়েদের অন্তত পাঁচজনের সমান। মেঝে ঝাঁট দেওয়া, দেওয়াল ঝাঁট দেওয়া, ঘরের ছাত ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, ধাতুর জিনিষ পরিষ্কার করা, রান্না করা, রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন রাখা, এত কাজ ওরা দিন রাত্রি করে যে, না দেখ্‌লে বোঝা যায় না। আমি হঠাৎ না বলে'-কয়ে' না জানিয়ে বিনা নোটিশে নানা সময়ে অনেক গৃহস্থের রান্নাঘরে প্রবেশ করে' দেখেছি, কোনোদিন কোনো সময়ে এতটুকু নোংরা দেখিনি। হঠাৎ ঢুকেই মনে হয়েছে যে, এটা বুঝি একটা উঁচু দরের ল্যাবোরেটারী। এত সব কাজ করে'ও মেয়েরা কাগজ পড়ে, ফুলের বাগান তৈরী করে, গান লেখে, ছেলেদের লেখাপড়া শেখায় এবং আরো কত কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। গৃহস্থালীর এই কাজগুলি যদি অন্য লোক দিয়ে করাতে হয় তবে খরচ অনেক বেশী পড়ে। কাজেই এক হিসাবে এই কাজগুলি অর্থার্জ্জনের একটি অঙ্গ বলে' ধরে' নেওয়া চলে।

কিন্তু এইখানেই গৃহিণীপনার শেষ নয়। জার্ম্মানীতে এই গৃহিণীপনাই একটা বেশ উঁচুদরের ব্যবসার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এই বিদ্যায় যে-সব রমণী উচ্চরূপে শিক্ষিত, দক্ষ, বা পারদর্শী, তাঁরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান বা আস্তানার কর্ত্রী হ'য়ে উপার্জ্জনে সক্ষম হন।

(ক) হোটেল, রেস্‌টোঁরা, বা ছাত্রাবাসের সর্ব্ববিধ বিধি-ব্যবস্থার দায়িত্ব নেওয়া।

(খ) স্বাস্থ্য-নিবাস খোলা।—এই প্রতিষ্ঠানের চরম উন্নতি জার্ম্মানীতে হয়েছে। এই স্বাস্থ্যনিবাসগুলি একাধারে হোটেল ও হাঁসপাতাল। কারো অসুখ হ'লে নিজ বাড়ীতে রেখে শুশ্রূষা ও পথ্যাদির ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ঝঞ্ঝাট আছে। এই স্বাস্থ্যনিবাসে তাদের রেখে সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন দেখে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এতে সময়ের অপব্যয় থেকে ও অনেক হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচা যায়। জার্ম্মানীর বড়-বড় সহরে প্রায় প্রতি রাস্তায় এইরকম স্বাস্থ্য-নিবাস আছে।

(গ) ছাত্রী-আবাস খোলা। এগুলি একাধারে

ছাত্রী-আবাস ও স্কুল। এর নাম দেওয়া যেতে পারে মেয়ে-উপনিবেশ। ১৫০ বা ২০০ ছাত্রী নিয়ে এক-একটা কেন্দ্র করে' তাদের থাক্‌বার ও পড়্‌বার ব্যবস্থা করা হয়।

(২) শিল্প-কাজ।—

(ক) পোষাক তৈরী কর্‌বার ব্যবসা।

(খ) টুপী তৈরী কর্‌বার ব্যবসা; এবিষয়ে ওস্তাদ ফরাসী মেয়েরা। এটা খুব কঠিন কাজ। কোন্ জিনিষের, কি আকারের, কোন্ রঙের টুপী হবে তা ঠিক করে' চারদিকে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি বজায় রেখে টুপী তৈরী করা সহজ নয়। এবিষয়ে সমস্ত নতুন-নতুন নক্সা ফরাসী মেয়েরা উদ্ভাবন করে এবং পরে সেগুলি আর-সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

(গ) কাপড়ের যাবতীয় কাজ শেখ্‌বার স্কুল। এসব জায়গায় তুলো, পশম, রেশম, লিনেন, সিল্ক্, সব-রকম কাপড়ের জিনিষ তৈরী হয়।

যে-সে মেয়ে যা-তা-রকম করে' শিখেই এ-সব জিনিষের দোকান দিতে পারে না। এইজন্য বিদ্যালয়ে পড়্‌তে হয়, পরীক্ষা দিতে হয়, সার্টিফিকেট্ নিতে হয়, মিউনিসিপালিটির লাইসেন্স্ নিতে হয়। তা'র পর সে দোকান খুলে জিনিষ বিক্রয় কর্‌বার অধিকার লাভ করে। এসব জিনিষের ক্রেতারও অভাব হয় না। বড়-বড় দোকান থেকে তৈরী পোষাক আন্‌লে খরচ বেশী পড়ে। এদের কাছে সস্তায় পাওয়া যায় বলে' এদের ক্রেতা সহজেই মেলে।

(৩) বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিক্যাল কাজ।—

(ক) চিকিৎসা-বিষয়ক ব্যবসা বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহযোগিতা। ইহা গৃহস্থালী কাজের অন্তর্গত স্বাস্থ্য-নিবাসের কাজের অনুরূপ নয়। ইহা খাঁটি বিজ্ঞান-সম্মত অত্যন্ত টেক্‌নিক্যাল কাজ। বড়-বড় চিকিৎসালয়ে থেকে হিস্‌টলজি, ব্যাক্‌টিরিওলজি, রাণ্ট্‌গেন্-যন্ত্র চালানো প্রভৃতি কাজে মেয়েদের সহায়তা কর্‌তে হয়। এদের সাধারণ নাম সহযোগিনী।

(খ) ধাতুরসায়ন বিদ্যা বা মেটালার্জ্জি। খনিজ তু ঝাড়া, বাছা, মাপা, ফোটো তোলা প্রভৃতি যাবতীয় জ এদের কর্‌তে হয়।

(গ) খাঁটি রসায়নের কাজ, যথা খাদ্যদ্রব্যে খাদ্য-শক্তির পরিমাপ করা, তাদের অনুপাত স্থির করা ইত্যাদি যাবতীয় রাসায়নিক পরীক্ষা।

(ঘ) বড় বড় এঞ্জিনিয়ারদের অফিসে কাজ। মাপা, ছবি-আঁকা, নক্সা করা প্রভৃতি সমস্ত টেক্‌নিক্যাল কাজ এদের কর্‌তে হয়।

(৪) সমাজ-সেবা।—

আমাদের দেশে অনেক সমাজ-সেবক দেশহিতৈষী আছেন, তাঁরা কোনও পারিশ্রমিক না নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সেবা করেন। কিন্তু জার্ম্মানীতে উকিলি, ডাক্তারি, বা এঞ্জিনিয়ারির মতন এটাও একটা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এই ব্যবসাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) স্বাস্থ্য-বিষয়ক। ইহা ডাক্তারি বা স্বাস্থ্য-নিবাসের গৃহিণীপনার মতন নয়। ইহার সাধারণ নাম নার্সিং দেওয়া যেতে পারে। এই বিদ্যার জন্য ভিন্ন স্কুল আছে। কোনো বিশেষ ব্যাধির নার্সিং-এর জন্যে এক-একজন শিক্ষিতা হয়। যে কলেরার নার্সিংএ পারদর্শিতা লাভ করেছে তা'কে নিউমোনিয়া রোগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত করা হয় না। এক-এক রোগের জন্যে আলাদা-আলাদা সার্টিফিকেট্ আছে। যার যে-রোগের সার্টিফিকেট-আছে সে সেই রোগের শুশ্রূষা কর্‌বার অধিকারিণী। অন্যথায় জেল পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

(খ) শিশুবিষয়ক। কিণ্ডারগার্টেন, শিশু-কেন্দ্র, শিশুভাগ ইত্যাদির জন্যে স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

(গ) অর্থবিষয়ক।—বীমা, টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা, ব্যাঙ্কিং, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক কাজে সাহায্য। এই সমাজ-সেবার বিদ্যালয় ১৯১৪ সালে গোটা জার্ম্মানীতে মাত্র ১২টি ছিল, আজ হয়েছে ৪০টি।

অর্থ-উপার্জ্জনের এই যে, তিন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা গেছে তা'র সুযোগ লাভ কর্‌বার অধিকার হয় মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর। অর্থাৎ প্রত্যেকেই আরো আমাদের বি-এ বা বি-এসসি ডিগ্রীতে যে-বিদ্যা লাভ হয় তা আগে আয়ত্ত করে' তা'র পর এইসব টেক্‌নিক্যাল বিষয় শিক্ষা করে। সে-সব শিক্ষা হ'লে প্রত্যেককেই কোনো-না-কোনো জায়গায় অন্ততঃ ২।৩ বছর অ্যাপ্রেন্টিস

থাকতে হয়। অ্যাপ্রেন্টিস্ থাক্‌বার পরও কারও বয়স যদি অন্তত ২৫ বছর না হয় তবে তা'কে ঐসব কাজ পাবার আগে অপেক্ষা কর্‌তে হয়। সুতরাং এ থেকে সহজেই বোঝা যাবে ওদেশের মাপকাঠিটি বড় সোজা নয়। সেখানে আমাদের দেশের মতন এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে হবার জো নেই। কারো কোনো উপায়ে বিন্দুমাত্র ফাঁকি দেবার সুবিধা নেই। একেবারে এক ছাঁচে সবাইকে ঢেলে সমানভাবে পিটিয়ে তবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এপর্য্যন্ত যা বলা হয়েছে তা'তে এই বোঝা যাবে যে দুনিয়ায় কেউ বসে' কারো জন্যে অপেক্ষা করে' নেই। কি স্ত্রী কি পুরুষ সবাই দ্রুতগতিতে নানা উপায়ে আর্থিক অবস্থা উন্নত কর্‌বার জন্যে অপরিসীম চেষ্টা কর্‌ছে। পৃথিবীর যখন এই অবস্থা, তখন যুবক ভারতের কর্ত্তব্য কি, এই প্রশ্নই স্বতঃ মনে আসে। তুর্কী বোঝে তা'রা সভ্য নয়, জাপান বোঝে তা'রা সভ্য নয়। তা'রা বোঝে সূর্য্য পূর্ব্বে নয়, পশ্চিমে ওঠে। তা'রা জানে কর্ম্মের বেগ, জীবনের প্রবাহ, নূতন চিন্তা, নূতন শক্তি তাদেরি কাছে পাওয়া যাবে যাদের বাড়ী সূর্য্যাস্ত-দেশে। হাওয়ায় উড়্‌বার সময় আর আমাদের নেই। আজ ১৯২৬ সালে ১৯৩০-এর জন্য প্রস্তুত হবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। যা বস্তু তা'কে বস্তু বলে'ই জান্‌তে হবে—বস্তুগতভাবে সমস্ত জিনিষকে পাক্‌ড়াও কর। জাপানীর মতন, তুর্কীর মতন বাঙালী তুমিও আজ খোলাখুলি বল—ইয়োরামেরিকার শিষ্যত্ব গ্রহণ ভিন্ন নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।*

* বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে ৪ঠা ফাল্গুন আলবার্ট হলে প্রদত্ত বক্তৃতার নোট অবলম্বনে শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক লিখিত।

কাল-বৈশাখী

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বহু দিন পরে
শূন্য ব্যোম ভরে'
ছুটিয়া গর্জ্জিয়া এল পর্জ্জন্য প্রবল—
তর্জ্জনে গর্জ্জনে খলখল,
আকাশ বাতাস বিড়ম্বিয়া
নরে তৃণে ধরণীরে নির্ব্বাক্ সংক্ষুব্ধ করি' দিয়া।
এ কোন্ ভৈরব, কাল, বিশ্বামিত্র, ক্রোধন দুর্ব্বাসা ?—
কিবা এর অন্তর-দুরাশা ?—
কি চাহে, কি গ্রাসিবাবে এ মত্ত নর্ত্তন ?—
পিনাকী-প্রলয়ডম্ব তুলিছে রণন ?
বজ্র এর ক্রীড়নক—ছুঁড়ে দেয় দিকে দিকে দিগন্ত ভেদিয়া
ছিন্ন ত্রস্ত স্তব্ধ করি' চলমান এ সৃষ্টির হিয়া !
আঁখি তার জলজ্বল—ঝলসিছে আগ্নেয় বিদ্যুৎ,—

ঘটেছে কি দক্ষযজ্ঞ সেই পুনর্ব্বার ?—
উমা সতী-সার
লাঞ্ছিতা হয়েছে পুনঃ ?—তাই হে মহেশ,
উড়াইয়া আলোড়িয়া বিস্ফারিয়া কেশ
মেঘরূপে সৃষ্টিবুকে দলন-চঞ্চল
প্রমত্ত বিহ্বল
এলে কালবৈশাখীতে স্বরূপ আস্ফালি,'
মুখে অট্টহাস আর হস্তে বজ্রতালি ?

বুঝেছি বুঝেছি রোষ—হে ভৈরব বরষা বৈশাখী—
নিদাঘার্ত্তা ক্লিষ্টা পৃথ্বী তীব্র তাপে শ্বসি' থাকি' থাকি'
বাতাসে ভেটিল তোমা আপনার বেদন-বারতা—
তমি সিন্ধুপুত্র বীর—ভগ্নী ধরা ক্লিষ্টা তাপনতা

শুনিয়া আসিলে ছুটি' আস্ফালিয়া দুরন্ত আক্রোশ,
বক্ষে স্নেহজল, মুখে অভয়-নির্ঘোষ—
জাহ্নবীজড়িত-কেশ রুদ্র-শান্ত মহেশের মত,—
প্রলয়ে দুর্ব্বার আর কল্যাণ-নিরত।
দক্ষনাশে মত্তপদ, হস্তে ডঙ্কা, বয়ানে বিষাণ
নৃত্যমান
যেমন ভৈরব চিরকাল
করুণা বিলাতে ঢালে জাহ্নবীর জলধারা হ'তে জটাজাল,
তেমনি হে দুর্নিবার ভৈরব বরষা,
ধরণী ভগিনী তরে হে শান্ত ভরসা,
প্রলয়ে দুর্ব্বার তুমি, দানব নিদাঘে দলিবারে
বজ্র হাতে অগ্নি চোখে দেখা দিলে দিগন্তের পারে,
ধীরে ধীরে ব্যাপিয়া আবরি' চতুর্দ্দিক্
দুর্দ্দান্ত নির্ভীক
নাশিছ মারিছ ঐ অগ্নিশ্বাস দৈত্য নিদাঘেরে
পলায়ন-পন্থা তার সব ঘেরে ঘেরে।

প্রলয়স্বরূপ শুধু তবু নহ তুমি—
শীতলিয়া প্রচুম্বিয়া ধরণীর ভূমি
ছলছল অবিরল রাশি রাশি ঢেলে দাও স্নিগ্ধ জলধারা
ধূর্জ্জটির জটাচ্যুত জাহ্নবীর পারা।

হে বরষা, হে মহেশ, প্রলয়ে মঙ্গলে অপরূপ,
নির্ব্বাক্ বিশ্বের বুকে দিগ্বিজয়ী ভূপ,
হে কালবৈশাখী, তুমি কাল নও, অনন্ত মঙ্গল—
এক হস্ত নাশলিপ্ত অন্য হস্ত সৃজনে চঞ্চল ;
দেবেশ মহেশ-সম ধ্বংস দাও আবার কল্যাণ,
হে কালবৈশাখী রুদ্র, হে বিদ্রোহী,
প্রণমি তোমারে নতপ্রাণ।

কাব্যপরিচয়

(আলো ও ছায়া, মাল্য ও নির্ম্মাল্য)

শ্রী রাখালচন্দ্র সেন

কবি কামিনী রায় অনেক সময় নিজের কবিতাকে 'সেকেলে' বলিয়া আক্ষেপ করেন। কিন্তু কবিতার বয়স নাই, একথাটা বোধ হয় অতি পুরাতন কথা। তবুও এ পুরাতন কথাটি মাঝে-মাঝে স্মরণ না করিলে আধুনিকতার অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার পথ থাকে না। আজিও আষাঢ়ে মেঘের সমারোহ যখন কতযুগসঞ্চিত যক্ষের ব্যথা সকল বিরহীর মনে ব্যথা জাগায়, সহস্র বৎসরের অন্তরাল হইতে তমসাতীরে সীতা এখনও যখন মন কাঁদায়, তখনই নূতন করিয়া বুঝিয়া লই এই মানুষের মন বহু শতাব্দীর স্রোতে ভাসিয়াও কতটুকু কম বদল হইয়াছে।

সেই মানুষের মনের যত বেদনা, যত আনন্দ, যত আশা কবি কামিনী রায়ের কবিতায় অভিব্যক্তি পাইয়াছে, তা'র মাধুর্য্য, বাল্যে, যৌবনে, স্বদেশে, প্রবাসে, আমাকে কত মুগ্ধ করিয়াছে, সেই কথাটাই আজ বলিতে প্রয়াস পাইতেছি। কবি যে পাগল হাওয়া বাঁশীতে বন্দী করিয়া সুরে জাগাইয়াছেন, যে পলাতকা ছায়া আপন মন হইতে তুলিয়া মধুর তুলিকায় ছবিতে ফুটাইয়াছেন, তাহা যাদের ভালো লাগিয়াছে, তাহাদের কাছে এ আলোচনা অবান্তর হইবে না।

আমার কাছে তিনি প্রধানতঃ প্রেমের কবি। তাঁহার কাব্যে অন্য শ্রেণীর কবিতা যে নাই, তাহা নহে। তবে এইটি তাঁর বীণার প্রধান সুর, এই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী।

সে পূজায় যাহা উপচার—যৌবন—তাহারই তপস্যা লইয়া এ-কাহিনী আরম্ভ করি। বস্তুতঃ যৌবন-তপস্যার মূল সূত্র ধরিতে পারিলে, তাহার প্রেমের আদর্শ অনেকটা

স্পষ্ট হইয়া পড়ে। আজকাল অনন্ত যৌবনের বাসনা অনেক সুরে ও ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তার প্রথম প্রকাশ এই কবিতাটিতে—

> সরল এ দেহ যষ্টি সবলে আঘাতি যাও,
> উজ্জ্বল লোচনোপরি কুজ্ঝটি বাঁধিয়ে দাও,
> শুভ্র হোক, কেশরাজি—এ সকলে নাহি ডরি,
> বাহিরের যত চাও একে একে লহ হরি,
> অন্তঃপুরে ক'র না গমন।
> আত্মার নিবাসে আছে পরশ মাণিক তার
> তাহারে হারালে হবে এ জগৎ অন্ধকার,—
> শারদ কৌমুদী ভার,—বসন্তের ফুল রাশি,
> কবিতা, সঙ্গীত আর প্রণয়ের অশ্রুহাসি
> আছে, যবে আছয়ে যৌবন।

এ যৌবন ভঙ্গুর দেহ ও সমাপ্ত জীবন নিরপেক্ষ। বসন্ত যেমন ফুল ফোটায়, কিন্তু ফুল-ফোটাই বসন্ত নহে, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের বুক ফুলিয়া উঠে, কিন্তু সে পুলক-স্ফীতিই যেমন জ্যোৎস্নার প্রাণ নহে, তেম্‌নি যৌবন দেহে যে লাবণ্যের তরঙ্গ আনে, যাহা একদিন কুল ছাপাইয়া আকাশ বাতাস, জন্ম মরণ মধুর করিয়া তোলে, তাহারই ভাঁটার সঙ্গে-সঙ্গে যৌবনের অবসান নয়।

> আমি যৌবনের লাগি তপস্যা করিব ঘোর,
> কালে না করিবে জয় জীবন-বসন্ত মোর
>
> * * * *
>
> তার পর যেই দিন আয়ু হবে অবসান,
> না হইতে শেষ এই এ পারে আরব্ধ গান,
> জীবন যৌবন দোঁহে বৈতরণী হবে পার,
> উজল হইবে তদা পশ্চাতের অন্ধকার
> শরতের চাঁদনীর রাতে।

অনন্ত-পথ-যাত্রীর শেষ হীন প্রেম-সাধনার অজর পুষ্প এই যৌবন। তা'র পর "ভালবাসার ইতিহাস"। প্রভাতের বাতাস যেমন কোমল স্পর্শে নদীর বুকে পুলক জাগায়, বসন্তের নিঃশ্বাস যেমন করিয়া ফুলের কুঁড়িকে বিকাশ-চঞ্চল করে, তেমনি ভালবাসা কেমন করিয়া ধীরে-ধীরে হৃদয়ে আসে, সেই লজ্জা-চাঞ্চল্য সেই পুলকবেদনার কথা ইহার চেয়ে মধুর ভাষায় কোথায়ও ব্যক্ত হইয়াছে কি?

> হৃদয়ের অন্তঃপুরে নব বধূটির মত
> ভালবাসা মৃদুপদে করে বিচরণ,
> পশিলে আপন কানে আপনার মৃদুগীত
> সরমে আকুল হ'য়ে মরে সে তখন;
> আপনার ছায়া দেখি দূরে দূরে সরি যায়,
> অযুতে অযুত ফুল ফুটে তার পায় পায়।
> শূন্য আলয়ের মাঝে উদাস উদাস প্রাণ,
> কাঁদে সদা ভালবাসা কেহ নাহি তার,
> কেহ তার নাহি বলে' সকরুণ গাহে গান,
> সে যে গেঁথেছিল এক কুসুমের হার—
> মাঝে মাঝে কাঁটা তার কেমনে জড়ায়ে গেছে—
> টানিয়া না ফেলে কাঁটা, মালা পাছে ছিঁড়ে পাছে।

এই যে মালা ছিঁড়িবার ভয়ে কাঁটার আঘাত নীরবে সহ্য করা—এই যে প্রেমের গোপন সুর—তাহার পূর্ণ প্রকাশ, মাল্য ও নির্ম্মাল্যের "ভালবাসা" কবিতায়।

প্রকৃতপক্ষে ভালবাসার দুই চিত্র সকল শিল্পে অঙ্কিত হইয়াছে। এক যে উদ্দাম প্রেম, কালবৈশাখীর মত সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সকল আবরণ উড়াইয়া আপনার শক্তি-শেষে তার লীলা-ক্ষেত্র শ্মশান করিয়া যায়, যাহা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আর এক প্রেম, যাহা বন্ধনে মুক্ত, বাধাতে পুষ্ট, যাহার সকল সৌন্দর্য্যের অবসান মঙ্গলে, সকল বেদনার-পূর্ণতা কল্যাণে।

ভারতবর্ষের শিল্পীরা এই শেষ শ্রেণীর প্রেমকে আদর্শ করিয়াছেন। তাই কুমার সম্ভবের অকাল বসন্তের মন্মথ-জাগরিত প্রেম ধ্বংস হইয়া, কঠিন তপস্যায় পুনঃ প্রাণ-লাভ করিয়াছে; তাই শকুন্তলার ক্ষণিক মোহ জাত আবেশ বিস্মৃতিতে লোপ পাইয়া, বিরহে, দুঃখে, অনুতাপে সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাই ভাবিতে আনন্দ হয়, পশ্চিমের বাতাস সর্ব্ব প্রথম এদেশের যে নারীদের অবরোধ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়াছিল, জড়তার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়াছিল, তাঁহারা বাহির হইয়াও এদেশের অন্তরের সে আদর্শের অনন্ত-গৌরব ভোলেন নাই, কবি বলিয়াছেন—

> তবে কিগো ভালবাসা, বাঞ্ছিত উদ্দেশে ভাসা,
> ফেলি কূল, ভুলি দিক্‌ গতি নিরুদ্দেশ?
> প্রবৃত্তি-পাষাণে ঠেকি, পুণ্যের বিনাশ-থেকে
> অকালে অকূলে হই জীবনের শেষ?
> মরণ-সঙ্কুল ভবে লাগে ভালবাসা তবে
> কোন্‌ কাজে?

আগুনের যে টানে পতঙ্গ মরে, তাহার তীব্রতা, সে মরণের মধুরতা, স্রোতে ভাসিবার আরাম তিনি যে জানেন না তাহা নহে।

> আছে হেথা বাসনার ক্লেশ,
> নিতে মৃত্যু অভিমুখ, আছে ভাসিবার সুখ

আত্মার জড়তা আছে কত ভীরু ভয়,—
দেখায়ে সুখের লোভ, হৃদয়ে বাড়াতে ক্ষোভ,
নরের দেবত্বটুকু করিবারে ক্ষয়,—
বাড়াতে ধরার ভার আছে কত কিছু আর,
এই ভালবাসা পুনঃ নহিলে কি নয় ?

তাই বলিতেছেন এ নয়, যে ফুলে ফল নাই, যে ধারার সাগর-কামনা নাই, সেই পরিণামহীন আত্মবিস্মৃত হৃদয়াবেগ সত্য বস্তু নয়।

আমি ভাবি ভালবাসা ভাল হইবার আশা,
পরের ভিতরে পেয়ে ভালর সন্ধান,
তার ভালটুকু নিয়া সঞ্জীবিত রাখি হিয়া
আপনার ভাল যাহা, সব তারে দান ;
তাহারে নিকটে আনি, অথবা নিকটে টানি,
পূর্ণ করা জীবনের যত শূন্য স্থান

যেটুকু তাঁহার বাকী ছিল 'একদিনের ছুটীতে' তাহা শেষ করিয়াছেন। এখানে উপেক্ষিত হৃদয় একটিবার আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে চাহিতেছে, শুধু একদিনের জন্য অবসন্ন প্রাণ সকল নিয়মের বাহিরে আপনার প্রেম রচিত স্বর্গখণ্ডে ভুলের শান্তি ভুলিতে চাহিতেছে, অতৃপ্ত ক্ষুধা মনে বিদ্রোহ জাগাইতেছে—সবি বুঝি ছেঁড়ে বুঝি ভাঙ্গে।

যদি একদিন শুধু জীবনে ছুটী পাই,
জগতের সীমা শেষে দুইজন মিলে যাই ;
বিধাতার আঁখি ছাড়া দ্বিতীয় নাহি কেহ,
সন্ধ্যারূপে ঘিরে রবে দুজনে তাঁর স্নেহ,
জানিব দুজনে দোঁহে, জগৎ কিছু নয়,
কিসের বা অভিমান—সন্দেহ লাভ ভয় ?
মাঝখানে কিছু নাই, মিলিত হিয়া দুটি,
যত আবরণ বাঁধ সহসা গেছে টুটি ;
কোথায় দুজনে দোঁহে খুলিয়া দিব প্রাণ—
চিরতরে ভুল ভ্রান্তি করিতে অবসান।
*　　*　　*　　*
ঝেড়ে ফেলি প্রেম হতে উপেক্ষা পাংশুজাল
ছিঁড়ে ফেলি একটানে মাঝের অন্তরাল।

কিন্তু তাহা হইবার নহে। শুধু নিজের হৃদয়কে বিচারক ও বিধাতাকে সাক্ষী করিয়া চলিবার অনেক বাধা, অনেক বিপদ্। সংসারের সকল সম্বন্ধ হইতে প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহাতে মঙ্গল থাকে না। তাই

কি জানি নীতির ডর কাহার ছুটে যায়
কর্ত্তব্য কঠিন বন্ধ কাহার টুটে যায়।
যদি জগতের গ্রন্থে লেখাজোখা না থাকে,
ভুলায়ে বিপথে যদি কাহারেও না ডাকে,
এ সুখ না কাড়ে যদি কাহারো সুখ-ভাগ,
এ প্রেম হৃদয়ে কারো না রেখে যায় দাগ,
ধরণীর রীতিনীতি অক্ষত রাখি যায়,
তবে গো মিলন সুখ চাহি এ ধরায়।

সে আশা মিটিবার নয়, তাই

সে দিন হবে না হায়, জীবনে নাই ছুটী,
নিতান্তই পর হোক আত্মীয় মোরা দুটি।

রবার্ট ব্রাউনিং তাঁর The Statue and the Bust কবিতায় এ প্রসঙ্গ অন্যভাবে সমাপ্ত করিয়াছেন। আধুনিক নরনারী হয়ত বলিবে মানুষের সৃষ্ট বাধাকে ভগবানের অভিপ্রায় বলিয়া কেন মনে করি ? কোথায় এর অপরাধ ? কিন্তু সমাজ যেমনই হোক তাহা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া কবি দেখেন নাই। জীবনের প্রতি সম্বন্ধের দায়িত্ব তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাই এই অনাত্মীয়তার ব্যথা শেষ হইবার নহে, বস্তুতঃ তাঁহার কাব্যে আপাত দৃষ্টিতে রক্ত মাংসের কিছু উপেক্ষা যেন দৃষ্ট হয়। ফুলকে পূজা করিতে গিয়া তিনি যেন মূল একবারে ভুলিয়াছেন। কোথায় সে ব্রাউনিঙের Summum Bonumএর তরুণীর প্রথম চুম্বনের অনন্ত মধু, কোথায় টেনিসনের "লান্স্‌লট ও গ্যুইনিভিয়র এর সেই প্রাণভরা প্রাণ-আকুল-করা চুম্বন, যাহাতে দুইটি হৃদয় আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে, কোথায় সে মৌন অনুরাগ যাহাতে দেহ-মনে স্থূল-সূক্ষ্ম বিলীন হইয়া, রাখিয়া গিয়াছে একটি সর্ব্বগ্রাসী চিরঅতৃপ্ত ক্ষুধা।

ভালবাসার এদিক্‌টা বর্ণনা করার শক্তি যে তাঁর ছিল না তাহা আমার মনে হয় না। বস্তুতঃ তাঁহার রচনায় যে অসীম সংযমের, শক্তির মিতব্যয়িতার ও স্বল্পভাষিতার পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয়, যাহা তাঁহাকে এদিকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই, সেটি তাঁহার নারীসুলভ সংযম ও শুদ্ধশীলতা।

তাই পূর্ণ মিলনেও যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে সে এই—

মোরে প্রিয় কর না জিজ্ঞাসা,
সুখে আমি আছি কিনা আছি।
ডরি আমি রসনার ভাষা ;
দোঁহে যবে এত কাছাকাছি,

মাঝখানে ভাষা কেন চাই
বুঝাবার আর কিছু নাই ?
হাত মোর বাঁধা তব হাতে,
শ্রান্ত শির তব স্কন্ধোপরি,
জানি না এ সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাতে
অশ্রু কেন উঠে আঁখি ভরি।
দুঃখ নয়, ইহা দুঃখ নয়
এইটুকু জানিও নিশ্চয়।

কেন কথার আড়াল ? নারী-হৃদয়ের পরিচয় কি কথায় মেলে ? তা'র আত্ম-সমর্পণ বুঝাইবার বিশেষ ভাষা ভগবান্ তাহাকে দিয়াছেন। অভাবের আর্ত্ততা, প্রতীক্ষার দীর্ঘতা, পরাজয়ের ব্যথা, প্রত্যাখানের অপমান সবই তা'র নিরুদ্ধ অশ্রুর কোমলতায় মধুর। প্রকাশের বাহুল্য নাই। তাই কামিনী রায়ের কবিতায়, সে সুরে রক্ত চঞ্চল করে, ধমনী উদ্দাম হয়, তাহা নাই। আছে যেন গোধূলি-কোমল দূরাগত নদীতীরের উদাস করা করুণ বাঁশী, যাহা আভাসেই ব্যক্ত। হেনার মাদকতা ইহাতে নাই, আছে রজনীগন্ধার নম্র সৌরভ।

এ ফুলের প্রতি পাঁপড়িটির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করি এত স্থান এ-প্রবন্ধে নাই। তবু আরও দুএকটির উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

"পদধ্বনিতে" কবি আপনার মন হইতে পলাইবার স্থান খুঁজিতেছেন।

সেথা পদধ্বনি নাই, কোথা সেই স্থান ?
সেথায় বাঁধিব আমি ঘর,
সৃষ্টির আরম্ভ হতে প্রলয় অবধি
পশে নাই, পশিবে না নর।
শব্দহীন, জনহীন, সন্ধ্যাহীন দেশে
ভুলি যাব এক চিন্তা—'ঐ আসিছে সে!'

আবার 'এসো একবারে' একটিবার শেষ দেখার জন্য কি ব্যাকুল, কাতরতা।

—না ছাইতে মৃত্যুর আঁধার
এসো তুমি, এসো একবার।

'ফিরিবে না' কবিতায় অমোঘ অদৃষ্টের, করুণাহীন কর্ম্মফলের কি কঠিন চিত্র।

নিকটে আছিল যবে দেখিলে না চেয়ে,
দূরে গিয়ে আজ তারে চাহ,
ভাসাইয়া দিলে তরী, চলিয়াছে ধেয়ে,
ফিরিবে না ঘটনা প্রবাহ।
আর ফিরিবে না তরী, ফিরায়ো না মুখ,—
চলে যাও, যথা চলেছিলে
ভুলে যাও যারে তুমি দিয়াছিলে দুখ,
স্নেহ যার পায়ে দলেছিলে
যেদিকে চলিয়াছিলে চল সেই দিক,
ইতস্ততঃ কর'না আবার,
ভুল যদি ক'রে থাক, ভুলে থাকা ঠিক,
ভুল হ'তে ভুলেতে যাবার
নাহি কাজ।......

* * * *

ভুলে একে একে
কত বর্ষ হয়েছে তো পার,
এ-যাত্রার আর যত ভুল চুক থেকে
এক ভুল করুক উদ্ধার।

এরই পাশে "আধ ঘুমে অটল, বিশ্বস্ত, প্রতীক্ষার কি করুণ, কি মধুর ছবি। সে ফিরিবেই, শুধু ভয় এতদিনে যদি না চিনিতে পারে।

তুমি যে ফিরিবে তাহা জানিতাম মনে,
সে বিশ্বাস চিরদিন আছিল নিশ্চয়,
চিনিতে পারিবে কিনা পুনঃ এই জনে
আমার আকুল প্রাণে ছিল এই ভয়।
বিরহ সন্তাপে সখে, সব শুকাইল
আমার সৌন্দর্য্য, অতি সামান্য যা ছিল।

বসন্ত শেষে ঝরা ফুলের শুকানো মালায় যদি পুরাতন কথা মনে না পড়ে

আজ এই বড় দুঃখ, তুমি ফিরে এসে
আমায় হেরিলে রূপে আরও হীনতর,
তবু তো এসোছো তুমি আমি অনিমেষে
দেখিতেছি শতগুণে তোমারে সুন্দর
কর বাড়াইলে আমি পাই তব কর,—
তোমার সান্নিধ্যে পূর্ণ আমার অন্তর।

'আমি অনিমেষে দেখিতেছি শতগুণে তোমায় সুন্দর', ইহার মধ্যে একটি যেন গোপন কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোমার রূপ ত ফুরায় নাই। আমার কাছে তুমি আরো সুন্দর। যা তোমাকে আমার কাছে এত সুন্দর করিয়াছে, এত প্রতীক্ষার পরে সেই সোনার কাঠিতে তোমার চোখে আমার যৌবন আবার জাগিবে না ?

তা'র পর প্রথম-যৌবনের সদ্যপ্রবুদ্ধ হৃদয়ের সব গোপন কথা—

কে যেন সে ভালবাসে, আমি নাহি জানি তায়।
কে যেন সে ভালবেসে লুকায়ে থাকিতে চায়।

*　　*　　*

বুঝি তার ভালবাসা, চিনি তার হিয়া খানি—
কিবা নাম, কোথা ধাম, কতদূরে নাহি জানি।

তার পরে লজ্জার সেই সলজ্জ লোভ

—চুপি চুপি আয়রে হৃদয়
প্রাণে তা'র উঁকি দিয়ে আসি
বলিবার হয়নি সময়—
আমরা যে তা'রে ভালবাসি ?

উৎসব সভায় যোগ দিতেই হইবে। তাই

আজ হেথা আনন্দ উৎসব
আজ হেথা হরষের রব
থাম্ অশ্রু থাম্

কিন্তু নিশীথের নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতায় আর ত হৃদয় প্রবোধ মানে না। তাই

হাসির আগুন জ্বালি,, দহিয়াছি শুষ্ক প্রাণ—
সারাদিন করিয়াছি শুষ্ক হরষের প্রাণ—

*　　*　　*

......আয় অশ্রু আয়
ঘুমাইছে এ আলয় একা এই উপাধান
জানিবে দেখিবে তোরে, আয় অশ্রু জুড়া প্রাণ
আয় অশ্রু আয়

ভালবাসার বিস্তৃতির উপর সমাজের কঠোর দৃষ্টি তাঁর অন্তরে বাজিয়াছে

—একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা
চলে যাই এই উপেক্ষার ছলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

তাঁহার রচিত পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা খণ্ড কাব্য, তাহার সম্যক্ আলোচনা করিবার স্থান নাই। কিন্তু এই মহাশ্বেতাই তাঁর মানসলোকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এই-ই তাঁর প্রেমের আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি। মহাশ্বেতারই মত যেন সে প্রেম কত কাল, কত যুগ, কত জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া আছে, শুধু তা'রই আশায় যে তাহাকে সফল করিতে পারে। কত বসন্ত, কত আয়োজন লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কত শিথিল বকুল, শুক্ল সন্ধ্যা, কত বাঁশী, কত হাসি, কত গান, কিন্তু অল্পে তার তৃপ্তি নাই, ভোগে তার পরিণতি নাই, বিলাসিনী তাই তপস্বিনী সাজিয়াছে। কত সাধনার ধন, কত অপেক্ষার বর সে বস্তু, কত সংযম, কত ব্যথা, কি বিশ্বাস কি নির্ভর তাহা লাবণ্যে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ করিয়াছে —ছায়ালোকে বসিয়া সেই তপশ্চারিণী চিরবিরহিণী যেন আজো বলিতেছে

'অন্ধকার মরণের ছায়
কত কাল প্রণয়ী ঘুমায় ?
চন্দ্রাপীড় জাগ এইবার,
বসন্তের বেলা চলে যায়—
বিহগেরা সান্ধ্য গীত গায়—
প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।

গৃহ

সজ্জা-সাজের কী বাকী আর ?—
কইবি আমায়, গৃহ !
পাত্-বাহারের সারির সাড়ী—
নয় কি রমণীয় ?
দোর তোর বুক, ঐ যে দোরে
দু'-ঝাড় গুলাব—বুকের 'গোড়ে',
অপ্‌রাজিতার সুর্ম্মাতে নীল
তোর বাতায়ন-আঁখি।
ঐ, আঙিনার অশোক-তলায়
আল্‌তা-পরা পা—কি ?

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আবার

আধেক দেওয়া ঘোম্‌টা মুখে
মোর নবীনা প্রিয়া
সলজ্জ যৌবনের সুখে
সাজালো তোর হিয়া।...
কী চা'স্ আরো ?...কী তোর প্রিয় ?...
মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে গৃহ
মূকের ভাষায়,—"বল্‌তে পারো
বন্ধু তুমি, কবে
'কচি'র কল-কথায় আমার
কণ্ঠ মুখর হবে ?"

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য-সম্মিলন

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন আমরা কোনো সত্যবস্তুকে পাই তাহাকে রক্ষণ-পালনের জন্য বাহির হইতে উপরোধ বা উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কোলের ছেলে মানুষ করিবার জন্য মাতাকে গুরুর মন্ত্র বা স্মৃতিসংহিতার অনুশাসন গ্রহণ করিতে বলা অনাবশ্যক।

বাঙালী একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ব স্বতই বাঙালীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ একটি সাধারণ প্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক ঐক্য দেয়, এমন আর কিছুই না। স্বদেশে বিদেশে আজ যেখানে বাঙালী আছে সেখানেই বাংলা সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সম্মিলন ঘটিতেছে। তাহার মতো অকৃত্রিম আনন্দকর ব্যাপার আর কি আছে?

ভিক্ষা করিয়া যাহা আমরা পাই তাহা আমাদের আপন নহে, উপার্জ্জন করিয়া যাহা পাই, তাহাতেও আমাদের আংশিক অধিকার; নিজের শক্তিতে যাহা আমরা সৃষ্টি করি, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের আত্মপ্রকাশ, তাহার 'পরেই আমাদের পূর্ণ অধিকার। যে-দেশে আমাদের জন্ম সেই দেশে যদি সর্ব্বত্র আমাদের আত্মা আপন বহুধা শক্তিকে নানাবিভাগে নানারূপে সৃষ্টিকার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে দেশকে ভালোবাসিবার পরামর্শ এত উচ্চস্বরে এবং এমন নিষ্ফলভাবে দিতে হইত না। দেশে আমরা আত্মপ্রকাশ করি না বলিয়াই দেশকে আমরা অকৃত্রিম আনন্দে আপন বলিয়া জানি না।

বাংলা সাহিত্য আমাদের সৃষ্টি। এমন-কি, ইহা আমাদের নূতন সৃষ্টি বলিলেও হয়। অর্থাৎ ইহা আমাদের দেশের পুরাতন সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে-খাতে বহিত, বর্ত্তমান সাহিত্য সেই খাতে বহে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নির্জ্জীব পুনরাবৃত্তি। বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসঙ্গতির সীমা নাই, এইজন্য তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে আপন যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালীকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক্ হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্ব্বিচার অভ্যাসের দাসত্ব-পাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি। বাহিরে যখন সে জড় পুত্তলীর মতো হাজার বৎসরের দড়ির টানে বাঁধা কায়দায় চলা-ফেরা করিতেছে, সেখানে কেবল সাহিত্যেই তাহার মন বে-পরোয়া হইয়া ভাবিতে পারে, সেখানে সাহিত্যেই অনেক সময়ে তাহার অগোচরেও জীবন-সমস্যার নূতন নূতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে। সেই মুক্তিই তাহার দেশের মুক্তির সত্যকার ভিত্তি। চিত্তের মধ্যে যে মানুষ বন্দী, বাহিরের কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা সে কখনোই মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের নব সাহিত্য সকল দিক্ হইতে আমাদের মনের নাগপাশ-বন্ধন মোচন করুক; জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে শক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সাহস দিক, তাহা হইলেই একদা কর্ম্মের ক্ষেত্রেও সে সত্যের বলে স্বাধীন হইতে পারিবে। ইন্ধনের নিজের মধ্যে আগুন প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই বাহিরের আগুনের স্পর্শে সে জ্বলিয়া ওঠে, পাথরের উপর বাহির হইতে আগুন রাখিলে সে ক্ষণকালের জন্য তাতিয়া উঠে, কিন্তু সে জ্বলে না। বাংলা সাহিত্য বাঙালীর মনের মধ্যে সেই ভিতরের আগুনকে সত্য করিয়া তুলিতেছে; ভিতরের দিক্ হইতে তাহার মনের দাসত্বের জাল ছেদন করিতেছে। একদিন যখন এই আগুন বাহিরের দিকে জ্বলিবে, তখন ঝড়ের ফুৎকারে সে নিবিবে না, বরং বাড়িয়া উঠিবে। এখনি বাংলা দেশে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বর্ত্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে মত্ততার তাড়নায় বাঙালী যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি ভারতবর্ষের কোথাও

জ্বলিয়া থাকে সে বাংলা দেশে, কোথাও যদি দলে দলে দুঃসাহসিকেরা দারুণ দুঃখের পথে আত্মহননের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলা দেশে। ইহার অন্যান্য যে-কোনো কারণ থাক্, একটা প্রধান কারণ এই যে, বাঙালীর অন্তরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য অনেক-দিন হইতে অগ্নিসঞ্চয় করিতেছে,—তাহার চিত্তের ভিতরে চিন্তার সাহস আনিয়াছে, তাই কর্ম্মের মধ্যে তাহার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালীই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, ভোজন-পংক্তির বন্ধনচ্ছেদন, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বাধামোচন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালীই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি করিয়া আপন ধর্ম্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার চিন্তার জ্যোতির্ম্ময় বাহন সাহিত্যই সর্ব্বদা তাহাকে বল দিয়াছে। সে যদি একমাত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়াই আবহমান কাল সুর করিয়া পড়িয়া যাইত, মনের উদার সঞ্চরণের জন্য যদি তাহার মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলো, মুক্ত ক্ষেত্র না থাকিত, তবে তাহার মনের অসাড়তাই তাহার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল বেড়ি হইয়া তাহাকে চিন্তায়.ও কর্ম্মে সমান অচল করিয়া রাখিত।

মনে আছে আমাদের দেশের স্বাদেশিকতার একজন লোকপ্রসিদ্ধ নেতা একদা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া লিয়াছিলেন, যে, বাংলা সাহিত্য যে ভাবসম্পদে এমন হমূল্য হইয়া উঠিতেছে, দেশের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যের ক্ষণ। অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই কারণে াঙালীর মমত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে—সাধারণ দেশহিতের দেশেও বাঙালী এই কারণে নিজের ভাষাকে ত্যাগ রিতে চাহিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারতের ক্যসাধনের উপায়স্বরূপে অন্য কোনো ভাষাকে আপন াযার পরিবর্ত্তে বাঙালীর গ্রহণ করা উচিত ছিল। শের ঐক্য ও মুক্তিকে যাঁহারা বাহিরের দিক্ হইতে খেন, তাঁহারা এম্নি করিয়াই ভাবেন। তাঁহারা ানো মনে করিতে পারিতেন যে, দেশের সকল লোকের বিভিন্ন দেহগুলিকে কোনো মন্ত্রবলে একটিমাত্র প্রকাণ্ড দৈত্যদেহ করিয়া তুলিলে আমাদের ঐক্য পাকা হইবে, আমাদের শক্তির বিক্ষেপ ঘটিবে না। শ্যামদেশের জোড়া যমজ যে দৈহিক শক্তির স্বাধীন প্রয়োগে আমাদের চেয়ে জোর বেশি পায় নাই, সে-কথা বলা বাহুল্য। নিজের দেহকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিলেই তবে অন্য দেহধারীর সঙ্গে আমাদের যোগ একটা বন্ধন হইয়া উঠে না। বাংলা ভাষাকে নির্ব্বাসিত করিয়া অন্য যে-কোনো ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্ব্বল করা হইবে। সেই দুর্ব্বলতাই যে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে, এ-কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন, সেখানেই আমাদের মুক্তি। বাঙালীর চিত্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলাভাষায়, একথা বলাই বাহুল্য। কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জ্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই-জাতীয় মূঢ়তা। বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালীর মন যতই বড়ো হইবে, ভারতের অন্য জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আপনাকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে না পারার দ্বারাই মনের পঙ্গুতা মনের অপরিণতি ঘটে; যে অঙ্গ ভালো করিয়া চালনা করিতে পারি না, সেই অঙ্গই অসাড় হইয়া যায়।

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলা দেশের কয়েকজন মুসলমান, বাঙালী-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলা-দেশের শতকরা ৯৯য়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণ-ঠেষা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দ্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি? চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্য্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্ব্বতা ঘটিবে।

বস্তুতই খর্ব্বতা ঘটে যদি জবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা হয় তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী, তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষাতে তাঁহারা মুসলমানী মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরো জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলা ভাষার মধ্যে ত সেই উপাদানের কম্‌তি নাই—তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই ত। যখন প্রতিদিন মেহন্নৎ করিয়া আমরা হয়রান্ হই, তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে? যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ৎ তাহার হিন্দু জমিদারের প্রতি আল্লার দোওয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দু হৃদয় স্পর্শ করে না? হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ঝগড়া করিয়া যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই ভালো হয়? বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে-ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষা-সাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রস্তাব কখনো চলে?

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানী বাংলা, কেতাবী বাংলা নয়। স্কটলণ্ডের চল্‌তি ভাষাও ত কেতাবী ইংরেজি নয়, স্কটলণ্ড কেন, ইংলণ্ডের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ইংরেজি নয়। কিন্তু তা লইয়া ত শিক্ষা-ব্যবহারে কোনো দিন দলাদলির কথা শুনি নাই। সকল দেশেই সাহিত্যিক ভাষার বিশিষ্টত্ব থাকেই। সেই বিশিষ্টতার নিয়ম-বন্ধন যদি ভাঙিয়া দেওয়া হয়, তবে হাজার-হাজার গ্রাম্যতার উচ্ছৃঙ্খলতায় সাহিত্য খান্ খান্ হইয়া পড়ে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশেও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে। কিন্তু দুই তরফের কেহই একথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের অন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র আজো প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌স্‌কে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তা'র পরে পলিটিক্‌স্ সত্য হইতে পারে। খানকতক বে-জোড় কাঠ লইয়া ঘোড়া দিয়া টানাইলেই যে কাঠ আপনি গাড়িরূপে ঐক্য লাভ করে একথা ঠিক নহে। খুব একটা খড়্‌খড়ে ঝড়্‌ঝড়ে গাড়ি হইলেও সেটা গাড়ি হওয়া চাই। পলিটিক্‌স্‌ও সেইরকমের একটা যানবাহন। যেখানে সেটার জোয়ালে ছাপ্পরে চাকায় কোনোরকমের একটা সঙ্গতি আছে সেখানে সেটা আমাদের ঘরের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দেয়, নইলে সওয়ারকে বহন না করিয়া সওয়ারের পক্ষে সে একটা বোঝা হইয়া উঠে।

বাংলা দেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে-প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়কিতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীক্ সাহিত্যে গ্রীক্ দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্ম্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান ছিলেন। তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর যে বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক বন্দনা, তাহাতে কবির ঐহিক পারত্রিক কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নাই। একদা নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরাও মুসলমান-আমলে আর্‌বী ফার্সি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের ফোঁটা ক্ষীণ বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রের মতো, সেখানকার ভোজে কাহারো জাতি নষ্ট হয় না।

অতএব সাহিত্যে বাংলা দেশে যে একটি বিপুল মিলন-যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তর্য্যামীই জানেন তাঁহারা ধর্ম্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্ম্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন। কিন্তু আশা করিতেছি তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কারণ, প্রথমেই বলিয়াছি বাংলা

দেশের সাধনা একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে ; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ব বোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসঙ্গত। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনোই ইহাদের আক্রমণে পরাভূত হইবে না।

অরূপ-রূপ

শ্রী কালিদাস নাগ

প্রথম সেদিন পড়্ল তোমার মধুর দৃষ্টিখানি
আমার মুখের পরে,
ক্ষণকালের তরে
আমার দেহ আমার চিত্ত আমার সকল পরাণখানি ব্যেপে,
উঠ্‌ল ছেপে
তোমার রূপের তোমার রসের নির্ঝরিণী ধারা ;
এক নিমিষে মনে হ'ল
ধন্য আমি পূর্ণ আমি—তোমার মাঝে হয়ে সকল-হারা।
আপনা থেকে টুটে গেল
সকল দ্বিধা সকল বাধা সকল লজ্জা ভয় ;
উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগ,
তরুণ প্রেমের স্থির নিঃসংশয়
ছুটিয়ে দিল আমার ছোট্ট হৃদয়খানি হ'তে
তোমায় দেবার তোমায় পাবার আশা অসম্ভব ;
প্রীতি আমার ভক্তি আমার সব
চাইল দিতে সাজিয়ে তোমায় অপূর্ব্ব এক ডালি
যেটি নিছক্ আমার, যেটি আমিই তোমায় দিতে পারি খালি
আর পারে না কেউ,
যত বড়ই হোক্ না তাদের শক্তি সাধ্য রাশি ;—
আমার প্রেমের অসম্ভব এই ঢেউ
সব ছাপিয়ে ঘিরবে তোমায়—তোমার পায়ে আসি।
তাই ত সেদিন আমি
বলনু তোমার অনুপম ঐ মুখের পানে চেয়ে,
ক্ষণেক মুখর ক্ষণেক নীরব হয়ে তোমার পায়ের কাছে থামি—
এই যে তোমার সুব-এড়ান রূপটি আমার পরাণ গেছে ছেয়ে,
এরে আমি ছন্দে ছন্দে রাখ্‌ব বন্দী করি
মর্ম্মরে মন্দিরে সৌধে বিপুল প্রাসাদ বিরাট্ নগর ভরি।
দিকে দিকে খেল্‌বে তোমার চপল রূপের নিশ্চঞ্চল ঢেউ ;
হয়ত বুঝ্‌বে কেউ—
তোমায় আমি সাধ্‌ছি আমার পাষাণ-কাটা ঘায়ে
আফ্রডিটি উর্ব্বশীদের তরঙ্গিত অরূপ-রূপের কায়ে।
যখন হবে সাধ
চিরনূতন রূপটি তোমার রেখায় রঙে করব অনুবাদ,
আমার তুলিকায়
উঠ্‌বে ফুটে রঙ-বেরঙের আলোছায়ার খেলা
বুঝ্‌বে কি কেউ ? কেমন ক'রে হায়
চাইছি আমি দেখ্‌তে বারেক স্নিগ্ধ সে মুখখানি
যেটি আমি দেখেছি ভোরবেলা।

আবার হবে অন্য খেলার পালা ঃ
অসীম সেবায় অমর ভাষায় গাঁথ্‌ব তোমার নতুন বরণমালা;
আমার কাজে আমার কাব্যে পেয়ে তোমার স্বাদ
বিশ্বমানব তৃপ্ত হ'য়ে আমায় সুখে করবে আশীর্ব্বাদ।
কাজের সেবা কথার সেবা ছেড়ে আর-এক দিন
পরাণ আমার উধাও হ'য়ে পড়্‌বে সীমাহীন
সুর-সাগরের মাঝে,
গানে গানে ডুবিয়ে দেব অসুন্দর আর অসঙ্গতির স্তূপ,
ঘুচ্‌বে হিংসা ঘুচ্‌বে দ্বন্দ্ব ; তোমার প্রেমের রূপ
ফুটবে প্রতি মানব-প্রাণে,
বুঝ্‌বে সবে আমার পাগল-গানে
সুন্দরেরই নিত্যরূপের বন্দনাটি বাজে।

এম্‌নি ধারা কতই স্বপন জেগেছিল সোনার আলো সাথে
সেই সে ভোরের বেলা!
উঠ্‌ল রবি মাঝ গগনে—মৃদু চরণ পাতে
কখন তুমি স'রে গেছ! আর-এক নতুন খেলা
আড়াল থেকে খেল্‌বে বুঝি? তাই
একলা আমি ভেসেই চ'লে যাই
তোমা হ'তে অনেক অনেক দূরে,
মৌন করুণ স্বরে
কাঁদে আমার সঙ্গীহারা প্রাণ
নিঠুর জীবন-সংগ্রামেতে ত্রস্ত কম্পমান।
মানুষ হেথা অনেক—শুধু মনের মানুষ নাই,
রাত্রি দিবস তাই
শ্রান্ত প্রাণে সেই মানুষে হাজার ঠাঁয়ে খোঁজা,
হাজার লক্ষ বোঝা
বেড়ে উঠে দিনে দিনে, শান্তি নাহি পাই।
শক্তি আছে প্রীতি হ'তে দূরে
সিদ্ধি আছে, তৃপ্তি কিন্তু তফাৎ থেকে ঘুরে
বাড়ায় রুগ্ন ক্ষুধা,
লড়ি সবে মরি সবে দানব দলের মত
মেলে না হায় অমর-করা পুণ্য স্বর্গ-সুধা।
যুদ্ধ বাড়ে যুঝি আমরা যত
ক্ষোভ-নিরাশার রুক্ষ ধূলায় প্রাণটা ওষ্ঠাগত।

এম্‌নি ক'রে মধ্য দিনের নিঠুর আলোয় দেখি
অনেক গেছে খোয়া,
আছে শুধু গোপন প্রাণের গভীর অন্তরালে
চোখের জলে ধোয়া
সেই সকালের মূর্ত্তি তোমার—হে মোর প্রিয়তম!
সকল আশা সকল স্বপ্ন মম
মিলিয়ে গেছে প্রথম উষার স্বুবর্ণরাগ সম।
তবু আছে পূজার স্পৃহা, সেবার আকিঞ্চন,
ওগো আমার চিরকালের ভালোবাসার ধন!

শিল্প দিয়ে কাব্য দিয়ে তোমার আরাধনা
রইল তোলা আর-এক জীবন-তরে,
এই জীবনের 'পরে
থাকুক্ শুধু ব্যর্থ প্রয়াস রুদ্ধ অশ্রু আশার বিড়ম্বনা।
অপটু হাত অক্ষম প্রাণ রুক্ষ কণ্ঠ হ'তে
উঠ্‌ছে শুধু একটি ভিক্ষা মোর;
প্রথম উষার প্রাণমাতান সেই যে স্বপ্ন-ঘোর
ছোঁয়ায় যেন পরশমণি প্রাণে,
সেই স্বপনের টানে
চলি যেন শান্ত মুখে ক্লান্ত পন্থা ধরি'
নৈরাশ্যময় জীবন-মরু তরি'।

হঠাৎ মনে হ'ল যেন রওনি সদা দূরে
কোন্ রহস্য-পুরে।
আমার ওঠা আমার পড়া, মোর জীবনের ভাঙা-গড়া মাঝে
আমার সকল কাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা অতৃপ্তি মোর অসীম দুরাশায়,
নীরব বেদনায়—
তুমিই ছিলে সাক্ষী হ'য়ে বন্ধু হ'য়ে মোর;
তাই ত যবে সকল মোহের ডোর
যায় গো টুটে জীবন হ'তে—তবু
ওগো আমার প্রভু!
আমার প্রাণের শেষ মোহটি ধায়
তোমার চরণ ছায়।

হয়ত যবে সন্ধ্যা হবে নিব্‌বে আলোরাশি
আঁধার-সাগর মাঝে,
দেখ্‌তে পাব কেমন তোমার সকৌতুক হাসি
আকাশ ভ'রে রাজে!
যে গান আমার হয়নি গাওয়া—সুর মেলেনি ব'লে—
তোমার আঙিনায়,
সবগুলি তা'র শুন্‌ছ তুমি, আমার চোখের জলে,
অগণ্য তারায়॥

আত্মদর্শন

শ্রী রম্যাঁ রলাঁ

[রম্যাঁ রলাঁ মহাশয়ের যে মূল ফরাসী রচনাটি হইতে এই প্রবন্ধ অনুবাদিত, তাহা এপর্য্যন্ত ফরাসীতেও প্রকাশিত হয় নাই। রলাঁ মহাশয় ভারতবর্ষে ইহা কেবল বাংলায় অনুবাদ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইংরেজী বা পাশ্চাত্য অন্য কোন ভাষায় ইহার অনুবাদ নিসিদ্ধ—প্রবাসীর সম্পাদক]

ভূমিকা

১৮৮৮ সাল, ৪টা মে, শুক্রবার সন্ধ্যা :

বাইশ বছরে পড়িয়াছি। আমার বয়সের যে কোন যুবক তার যৌবনকে যতখানি সাফল্যে মণ্ডিত করে আমি তার প্রায় কিছুই করি নাই। জগতের ত কোন খবরই রাখি না; তবু এ জগৎটা কি, এখানে বাঁচিবার সার্থকতা কি, সে সম্বন্ধে আমার কিছু লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে; আমার বিশ্বাস কি? প্রতিষ্ঠাভূমি কোথায়? বুঝিবার পথে অনেক বাধা আছে জানি; কিন্তু এটাও জানি যে নিজেকে নিজে এই প্রশ্ন করার মধ্যে আমার কোন অসারল্য নাই। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যত সামান্যই হোক আমার জীবন, তার মধ্যেই আমার বিশ্বাসের ভিত্তি; অভিজ্ঞতা পর-জীবনে যতই বাড়ুক তাহাতে সে বিশ্বাস নির্ম্মূল হইবে না, শুধু তার রংটা বদলাইবে মাত্র। মানুষকে সামান্যই বুঝি; তার সম্বন্ধে কত অপরিজ্ঞাত তথ্য প্রতিমুহূর্ত্ত বহন করিয়া আনিবে। সুতরাং আজিকার এই আত্ম-জিজ্ঞাসা কতখানি অসম্পূর্ণ প্রমাণ হইবে তাহা জানি; কিন্তু এটাও ভুলিতে পারি না যে এ সুযোগ আমার আর বহুকাল আসিবে না। এই যে আমার নিঃসঙ্গ উদ্বেগ-কাতর বেদনাবিধুর প্রাণ, এই যে জ্ঞানের প্রেমের অসীম ক্ষুধা, এই যে আমার বিদেহী সত্তা, আমার আত্মার অতল হইতে কত জিনিষের আসা-যাওয়া—এই সব মিলিয়া আমার যে ব্যক্তিত্ব—ইহাকে আর ফিরিয়া পাইব না। মানুষের বিষয়ে ভাল করিয়া লেখা ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিতে চাই, যদিও জানিনা সেই ভবিষ্যৎ কোনো দিন আমার আসিবে কি না! সুযোগ হয়, তখন দেখাইতে চেষ্টা করিব, এই লক্ষ লোকের আসা-যাওয়ার হাটে কেমন একটি মানুষও আর একজনের সঙ্গে মেলে না, প্রত্যেকেই কেমন তার নিজত্বে অনুপম, এবং কত হাজার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য মানুষ ও মানুষের মধ্যে লুকাইয়া আছে! শিল্পের ভাষায় এই অপূর্ব্ব রহস্যকে ফুটাইয়া তুলিবার সময় এখনও আসে নাই। জীবনের অভাব, অভিজ্ঞতার অভাব আছে; বিরাট্ বাস্তবের (Reality) বিচিত্র রূপ এখনও দেখি নাই, তাহার ভিতরকার অসংখ্য ছায়াছবি, অগণ্য বর্ণগ্রাম (nuance) লক্ষ্য করি নাই; তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া নিখুঁৎ করিয়া পট-ভূমিকায় বসাইবার মত পাকা হাত আমার তৈয়ারি হয় নাই। আমার হাতে তেমন সূক্ষ্ম তুলিই বা কোথায়? এমন অবস্থায় যদি আঁকিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমার কাজে মস্তিষ্কের অভাবটা ত ধরা পড়িবেই উপরন্তু শিল্পের প্রাণ যে সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা তাহাতেও কম পড়িবে। জীবনের অসীম বৈচিত্র্যটি শুধু বুঝিতেই এ জীবন কুলায় না, তাহার প্রতিকৃতি আঁকিয়া দেখাইবার স্পর্দ্ধা আসিবে কি করিয়া? যাহা কিছু এই প্রাণের স্রোতে ভাসিয়া উঠিতেছে সবই ত ক্ষণিকের জন্য দেখা দেয়; তাদের বৈশিষ্ট্য যতই প্রকট তাদের ক্ষণভঙ্গুরত্বও তেমনই স্পষ্ট। তাহারা জীবন নহে, জীবনের স্ফুলিঙ্গমাত্র। দেখিতেছি ঐ শিখা জ্বলিয়া উঠে, কাঁপিতে-কাঁপিতে কখনও মিলাইয়া কখনও নিভিয়া যায়, হঠাৎ আবার প্রদীপ্ত হইয়া দেখা দেয়, যেন এই নেভা-জ্বলার ঘূর্ণীপাক কখনও থামিবে না! জীবনই সেই শাশ্বত হুতাশন; ইহা হইতে লক্ষ-লক্ষ স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে,—আমারই আত্মার কত সহোদর সহোদরা চকিতে যেন প্রদীপ্ত হইয়া কোন্ শূন্যে মিলাইতেছে, করুণ ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া দেখিতেছি। জীবনকে যদি

বুঝিতে চাই তাহা হইলে ঐ স্ফুলিঙ্গবৃষ্টির ক্ষণস্থায়ী লীলায় মুগ্ধ হইলে চলিবে না—অচপল স্থায়ী মধ্য-শিখাটির ধ্যান করিতে হইবে। ঐ ত প্রাণসবিতা! উহার মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া দিতে হইবে—তাপ আহরণ করিতে হইবে; ঐ প্রাণ-উৎস হইতেই ত এই বিশ্ব-প্রাণের অসীম স্রোত উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই বিশ্বের কারণ-নির্দ্দেশ যদি করিতে যাই তাহা নিজেদের মধ্যেই পাইব; খুঁজিয়া ফিরিতে হইবে জানি, কিন্তু শেষে বুঝিতেই হইবে যে অস্তিত্বের চরম রহস্যটি রহিয়াছে আমাদের আমিত্বেরই মধ্যে।

এই অন্বীক্ষার জন্য ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকার প্রয়োজন নাই; আমি এই মুহূর্ত্তেই উপযুক্ত, ইহা বিনয়ের অমান্য না করিয়াও বলিতে পারি। আমার 'আমি'কে লইয়া এতগুলা বছর ত কাটাইয়াছি। সত্য রম্যা রলাঁকে এখনও চিনি নাই, হয়ত কখনও চিনিব না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বের তলদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যতটুকু সত্য দেখিয়াছি ততটুকু বলিয়া যাওয়াও যথেষ্ট। আত্মার সেই অতলে দুএকবার ঠেকিয়াছি, সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়াছি, সর্ব্বজয়ী প্রাণের স্রোতে স্নান করিয়াছি। বহুদিন পরে-পরে ক্ষণকালের জন্য যে অনুভূতির স্পর্শ পাইয়াছি, তাহা ক্রমশঃ যেন অভ্যাসগত হইয়া আসিতেছে। এই অধ্যাত্মসঙ্কটের কথা অনেকবার লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছি; আমার ভগবান্ আমায় স্পর্শ করিয়াছেন, সজ্ঞানে সপ্রেমে তাঁহাতে যেন মিলাইয়া গিয়াছি। চক্ষু মুদিয়া কখনও মনে হইয়াছে যেন কোন্ অদৃশ্য স্বর্গ-সঙ্গতের গায়কশিশুর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সেই সুদূর হইতে নীচে—এত নীচে যে দেখিতে মাথা ঘুরিয়া যায়—দেখিতেছি এই পৃথিবীর স্নিগ্ধশ্যামল বিস্তার, তার বুকে কত রূপের নৃত্য কত রঙের ঢেউ! আমার ভগবান্—যাঁর স্ফুলিঙ্গমাত্র আমার মধ্যে রূপ ধরিয়াছে—তিনি যেন তাঁর চোখ দিয়া আমায় সব দেখাইতেছেন,তিন-পা দূরের জিনিষ যেন দূর দূরান্তরের রহস্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দিতেছে। চকিতে দেখিতেছি, স্পষ্ট চোখ খুলিয়া সব দেখিতেছি। নৃত্য গীত আনন্দোৎসবের মধ্যে আমার চারিদিকের মানুষের ভিড় ও জীবনের তরঙ্গ যতই প্রবল হইয়া উঠে ততই দেখি **তাঁর দৃষ্টি** যেন নিবিড় হইয়া আসে। বুঝিতেছি আমার ধর্ম্ম পরিণত রূপ লাভ করিতেছে—ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়াস জাগিতেছে।

প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প কেন করিলাম? আমার ভগবান্ যে সকল আত্মার আত্মা; তাঁহাকে দিয়া সুরু করিলে ঐ অসংখ্য আত্মার প্রাণে অনুপ্রবেশ আমার সহজ হইবে; সম্মুখের জীবন তাহাদের পরিচয় লাভ করিতে উৎসর্গ করিব। তাছাড়া এই অনুভূতিটি ভাষায় প্রকাশ করার মধ্যে আমি মুক্তির আস্বাদ পাইতেছি; মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে আমার হৃদয় যেন মুক্ত হইতেছে। মৃত্যু বুকের মধ্যে দুর্গ গড়িবার জোগাড় করিয়াছিল, তাহাকে উৎখাত করিয়াছি, মৃত্যুকে জয় করিয়াছি। আমি বাঁচিয়া আছি, বাঁচাইতে চাই, মৃত্যুর পরও বাঁচাইয়া তুলিতে চাই! যে কেহ আমার মত বেদনায় মুমূর্ষু হইয়াছে সকলকে বাঁচাইবার, সাহায্য করিবার আমার যে স্পর্দ্ধা ও দুঃসাহস তাহা যেন মানুষে ক্ষমা করে—মানুষকে ভালোবাসি বলিয়াই আমার এই দুঃসাহস।

দুঃখপথের সহযাত্রী!

হে আমার দুঃখ-অভিহত ভাইবোন! জীবন তোমাদের মধুময় হয় নাই, আমারও না। আমি দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু সেই সঙ্গে হৃদয়ে শান্তির সন্ধানও মিলিয়াছে; সেই শান্তি তোমাদের প্রাণে পৌছিয়া দিতে চাই; যে কেহ রুগ্ন, দরিদ্র, দুর্ব্বল, অথবা ধনী, বলবান্, সুখী, এ জগতে সকলকেই ঐ শান্তির সন্ধান দিতে চাই। তোমাদের সম্বন্ধে আমার ঈর্ষা দ্বেষ নাই বলিয়া আমি বেশ অনুভব করি যে, ঐ দুঃখীদের মতন, সুখী তোমরাও, কষ্ট পাও, অসহ্য নিশ্চেষ্টতা ও নিষ্ঠুর মানসিক উৎকণ্ঠা হইতে কষ্ট পাও। অন্তহীন অলস কল্পনাই তোমাদের সাথী। যে কেহ দুঃখ পায় এবং যে দুঃখের স্বাদ পায় নাই সকলকেই আমি ভালোবাসি; আমার হৃদয়ে সত্য যতটুকু আছে তোমাদের দিতে চাই—বিশেষভাবে তাদের দিতে চাই যাদের প্রয়োজন আছে।

পৈতৃক সম্পত্তির মত বিশ্বাস যাদের কাছে প্রথম

হইতেই প্রস্তুত সেই সব সুখী নিরুদ্বেগ মানুষদের বলি—তোমাদের ভগবান্, ভক্ত, সাধু ও পুরোহিতগণকে ধ্যান ও পূজার্চ্চনা করিয়া যাও, সেই বিশ্বাস তোমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের সত্য, তাহাই তোমাদের আনন্দ। আমি যাহা কিছু দিতে চাই তাহাতে তোমাদের হয়ত কোন কাজ নাই। সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়া যাও—তোমাদের দেবতা আমারও দেবতা। শুধু স্মরণ করাইয়া দিই যে, যে চোখে তোমাদের দেবতাকে দেখিতেছ সেই চোখই তাঁকে আপন সীমায় যেন সঙ্কীর্ণ না করে। করিলে ক্ষতিই বা কি? তোমাদের দেবতা তোমাদের আদর্শের নীচে যাইতে পারেন না। তোমাদের আনন্দ সেই-খানেই।

আমার দেবতা তাঁর বৃহত্তর রূপে আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন—আমার দেবতা তোমাদের সকলের। আমার দেবতাকে দেখিতে আমার নিজের চোখে কুলায় না, তোমাদের চোখ আমার দরকার; তাই আমার অহম্‌কে চাপিয়া আমি তোমাদের সঙ্গে সেই গভীর রহস্য-নিকেতনে যাইতে চাই যেখানে তোমাদের ও আমার জীবন ধারার মূল উৎস। সকলেরই জীবনের তলদেশে আমাদের দেবতাকে দেখিতেছি,—এই সহজ আবিষ্কারটি আমার সমস্ত দুঃখবেদনাকে সার্থক করিয়াছে, আমায় আনন্দে পূর্ণ করিয়াছে—ইহাই আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাদের উপহার দিতে আসিয়াছি।

(১)

সত্যের অভিসারে বাহির হইতে হইলে যতটুকু ইচ্ছা-শক্তি ও আত্মশক্তির প্রয়োজন তাহা সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিলে দেকার্ত্তের (Descartes) পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে; এই বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে অন্যলোকের যত ধারণা ব্যাখ্যাদি আছে তাহা যেন নাই এইভাবে সমস্ত পূর্ব্বসংস্কার মুক্ত হইয়া সুরু করিতে হইবে। যে কোন বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে সমস্তকেই সন্দেহ করিতে হইবে; থাকিবে শুধু একটিমাত্র অসন্দিগ্ধ অটল প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র "Minimum quid quod certum sit et inconcussum."

যদি সেই কেন্দ্রটির সত্য অবস্থান কোথাও থাকে, যদি তাহাকে কোথাও স্থির-নিবদ্ধ করা যায়, সে আমার এই আমিত্বের মধ্যে, কারণ যাহা কিছু আছে সমস্তই এই 'আমি'র সাহায্যে আমার মধ্যেই দেখিতে পাই। সুতরাং যাহা কিছু আমার বাহিরে আছে ও বাহির হইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হয় সমস্তকে এড়াইয়া আমার আমিত্বের মধ্যে ঝাঁপ দিতে হইবে। তবেই শুদ্ধতম সত্যতম সত্তার উপলব্ধি সম্ভব। সার সত্য যদি কোথাও থাকে সে ঐখানেই।

এই অনুসন্ধানের যে ফল পাইয়াছি তাহা প্রথমে দুই এক কথায় ইঙ্গিত করিব, পরে তাহার বিকাশটি দেখাইতে চেষ্টা করা যাইবে।

(ক) নিরপেক্ষ বাস্তব কোথাও নাই, আছে শুধু বর্ত্তমানের ইন্দ্রিয়চেতনা (sensation)। ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কোন যুক্তি বা তর্ক ইহাকে টলাইতে পারে না, Sganarelle এর ডাণ্ডার সামনে সন্দেহবাদী Marphurius এর কোন সন্দেহই দাঁড়াইতে পারে না। (মলেয়ারের 'দায়ে প'ড়ে দারপরিগ্রহ' দ্রষ্টব্য।)

(খ) নিরপেক্ষ নিশ্চয়তা কোথাও নাই, আছে শুধু আমাদের আমিত্ব ও আমিত্বের ভিতর দিয়া "সত্তা"র উন্মেষ। Spinoza তাঁহার নীতিগ্রন্থের (Ethics) প্রারম্ভে ইহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। এই নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে কোন বাস্তবই টিঁকিতে পারে না; এই নিশ্চয়তা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও আমাদের চিত্তবৃত্তির প্রেরণা; ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ন্যায় ইহা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।

সমস্ত দার্শনিক তর্ক এই দুইটি বিচার ধারায় উপনীত করে; ইহাদের মধ্যেই সমস্ত চিন্তার পর্য্যবসান। কিন্তু এই দুইটি বিযুক্ত হইলেই অসম্পূর্ণ। আমিত্বের মধ্যে সত্তার বিকাশ যুক্তিকে বাদ দিয়া বুঝা যায় না; বর্ত্তমানের ইন্দ্রিয়চেতনা আবার সর্ব্বদা নিশ্চয়তার অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। যুক্তি আসিয়া তাহাদের সন্দেহ করিতে পারে। কিন্তু কোনই সন্দেহ নাই এইখানে যে, আমাদের একদিকে আছে **নিশ্চয়তা** আর একদিকে **বাস্তব**। এই দুই এর কোন **একটির** কাছে আত্মসমর্পণ করিতে

মানুষ তখনই পারে যখন সে স্বেচ্ছায় অন্ধ হইতে চায়। কিন্তু পূর্ণভাবে সহজ সুস্থ ও অকপট চিত্তের লক্ষণ দুইটিকেই যুগপৎ স্বীকার করা, কোনটিকে বাদ না দেওয়া। নিশ্চয়তা না থাকিলে বাস্তব কিছুই না; বাস্তবকে বাদ দিলে নিশ্চয়তার কোন অর্থই থাকে না; এই দুইটির মধ্যে বিরোধভঞ্জন করিয়া উভয়কে মিলাইতে চাই—কারণ এই মিলনেই বিশ্বের তাৎপর্য্যটি পাই।

(২)

অনুভব করিতেছি সুতরাং আছি।

আমিত্বের মধ্যে আমি নিজেকে বন্দী করিলাম; এই আমিকে নিস্তব্ধতায় আবৃত করিলাম, আমার চক্ষু বজিয়া গেল—**দৃষ্টি** শুধু অন্তর্মুখী। বাহিরের কোলাহলের নিকট কর্ণ বধির করিয়া শুধু আত্মার অস্ফুট কাকলী শুনিতে উন্মুখ করিলাম। সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রায় সংহত হইয়া শুধু একটি বস্তুর প্রতীক্ষা করিতেছে। অতীতের ঘটনাবলী ও অস্পষ্ট প্রত্যাশা সব ভুলিয়াছি। শুধু এক স্বপ্ন যেন বাতাসে ভাসিতেছে আবার মিলাইতেছে। "**আমি কে**?" যদি কোন দিন জানিতাম তাহাও ভুলিয়াছি। ঐ যে বিদ্যুৎ চকিতে আকাশ চমকিত করিয়া অন্ধকারের বুকে মিলাইয়া গেল—তেমনই আমার সম্বন্ধে সব চেতনাই যেন লোপ পাইয়াছে। নিজেকে না ভাবিয়া না অনুভব করিয়া যেন আমি আছি। আমি আছি, কারণ আমি ছিলাম। কে বলিবে আমি ছিলাম কি না? স্মৃতি আসিয়া অতীতের কথা বলে; কিন্তু অতীতকে দেখি ত এক অস্পষ্ট ছায়া যতই দেখি ততই যেন মিলাইয়া যায়। বর্ত্তমানই দেখি যেন একমাত্র বাস্তব; বর্ত্তমানকে আঁকড়াইয়া ধরা যাক্!

আমার অস্তিত্বের স্তব্ধ অন্ধকারে যেন কি একটা জোয়ার-ভাঁটা নিয়মিত আসা-যাওয়া করে। তার তরঙ্গ-সঙ্গীত আমার কানে পৌছে—যেন ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর একটানা কলধ্বনি—মানুষ শুনিয়াও শুনে না—কারণ তা'র শেষ নাই। এই স্রোতের বুকে মুহূর্ত্তের জন্য একটি আলোকরেখা নাচিয়া উঠে—এবং তখনি কোন অজানা অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। কখন উজ্জ্বল কখন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ-তরঙ্গ আকাশে ভাসিয়া আসে আবার কখন নিঃশব্দে গলিয়া মিলাইয়া যায়। কত ইন্দ্রিয়-চেতনা, কত ভাব, কত ভাবরূপ অবিশ্রাম ভাসিয়া আসিতেছে, যাইতেছে, আর সেটি ফিরিতেছে না। সেই প্রবাহের দুএকটি কণা মাত্র ধরা যাক—বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্—কিন্তু হায় আঙ্গুলের ভিতর দিয়া যে এড়াইয়া গেল!…

আমার ইন্দ্রিয়-চেতনা! দুঃখ সুখের লক্ষ এলোমেলো প্রবাহ লক্ষ পলাতকা আলোক-শিখা চেতনার দ্বারে আঘাত করিতেছে—কখনও বুঝি কখনও বুঝি না! তবু সহজবোধে সেই সমস্তকে আমার 'আমি'র সঙ্গেই জুড়িতেছি। বেদনা যদি জাগে তখনই বলিতেছি এ যে আমার বেদনা। কিন্তু এই যে '**আমি**', এ যে কতকগুলি সন্দিগ্ধ স্মৃতির জড়পুঞ্জমাত্র; কে ইহার উপর ঐ বেদনার আরোপ করিবে? যে মুহূর্ত্তে বর্ত্তমানকেই স্থায়ী বাস্তব বলিয়া ধরিয়াছি, সে মুহূর্ত্তে আমার বাহিরে আর কোন জিনিষের বোধ থাকে কি? তা হ'লে আমিত্বও নাই অনামিত্বও নাই? তাহা ছাড়া যাহাকে বেদনা বলিতেছি তাহা কি? সে বিষয়ে আমার বোধ কি অবিসংবাদী? মধ্যে মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ এমনভাবে পাইয়াছি যে সন্দেহ না করিয়া উপায় নাই। বেদনার সম্বন্ধে আমার ধারণা যতই পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছি ততই বিষয়টি যেন জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। এমন-কি, মধ্যে-মধ্যে ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রয়োগে বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছি—"আমি বেদনা পাইতেছি না।" এবং ক-এক মুহূর্ত্ত ধরিয়া বেদনাবোধ লোপ পাইতেছে তাহা দেখিয়াছি।

যদি ব্যক্তিত্বের সমস্ত ছাপ উঠাইয়া লই তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-চেতনার কি থাকিবে? ঐ চেতনার চিরন্তন প্রবাহটি থাকিবে; সেই সজাগ চেতনা অপেক্ষা স্থায়ী বাস্তব আর কিছু নাই—'আমি আছি' এই বোধের দীপ্তি অপেক্ষা স্থির নিশ্চয় আর কি আছে?

এই **আমি আছির** অর্থ কি?

অস্তিত্ব বা সত্তা

বর্ত্তমান ও পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়-চেতনা আমায় বুঝাইয়া দিল যে, একটি "সত্তা"কে আশ্রয় করিয়া সমস্ত হইতেছে। যে ইন্দ্রিয়-চেতনার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, যাহাকে দেশে কালে সুনির্দ্দিষ্ট করা যায় না, তাহাকে সত্তা বলা চলে না। সমস্ত চেতনার মধ্য হইতে এক অসীম নির্ব্বিকল্প অস্তিত্ব প্রকট হইতেছে; সমস্তই যেন এই অস্তিত্বকে প্রমাণ করিবার জন্য। একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে আর অস্তিত্বকে উড়াইবার জো নাই। যখন বলি, "কিছু অনুভব করি, সুতরাং আছি" তখন 'কিছু' বস্তুটার উপর জোর দিই না, আসল জোর পড়ে "আছি"র উপর। এই অস্তিত্ব একটি নির্ব্বাধ সহজ সত্য। যখন বেদনা পাই, তখনই আমার চৈতন্য বুঝাইয়া দেয় যে, "আছি"; পরে অনুসন্ধান করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া ক্রমশঃ (হয়ত তাড়াতাড়িই বুঝি, কিন্তু তখনি বুঝি না) বুঝি **কী** আছে; 'আছি' এই বোধ কিন্তু প্রথমেই থাকে। যে আমি আছি, তা'র বিশেষক চিহ্নগুলি লইয়া সর্ব্বদাই নানা প্রশ্ন-সন্দেহাদি উঠিতে পারে, কিন্তু অস্তিত্ব-বোধটি কোন ক্রম বা পর্য্যায় মানিয়া জাগে না। অস্তিত্বের রূপ ও গুণ বিচিত্র আকার ধারণ করে, কিন্তু তার পরিমাণ বদ্‌লায় না। শারীরিক যন্ত্রণা ও রসবোধের আনন্দ দুই সমানভাবে **বর্ত্তমান।**

অস্তিত্বটা চেতনার সমষ্টি—যে-কোন চেতনাই অস্তিত্বের অংশ, অথচ কোন চেতনাই অস্তিত্বের নামান্তর হইতে পারে না। কারণ চেতনার জাতি-কুল লইয়া নানা সন্দেহ জাগিতে পারে। এমন-কি এটাও বলা চলে যে, সমস্ত চেতনাই 'হইতেছে' (being) এমন নয়, 'হইয়াছিল' (had been) বলিয়া স্বীকার করি। শীত বা উষ্ণ, শাদা অথবা কালো যাহা-কিছু বিশিষ্ট (particular) ও আপেক্ষিক (relative), সেই সমস্তকেই অবাস্তব বলিয়া তর্ক তোলা যাইতে পারে। কিন্তু অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বলা চলে না যে, সে এটা বা ওটা—সে যাহাই হোক্ অস্তিত্ব অস্তিত্ব; ইহার চেতনার উপাদান-বস্তু কি, এ-প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয়; একটা উপাদান আছে, এটা স্বীকার করিতে হইবে; শূন্য নিরবলম্ব চেতনা নিছক কল্পনামাত্র। অস্তিত্বের উপাদান-সম্বন্ধে আমরা মনোযোগ না দিতেও পারি, কিন্তু উপাদান যে আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে; সেই উপাদানের অংশ-বিশেষ ও অস্তিত্বের ক্রম-বিশেষ এক্ষেত্রে উপেক্ষণীয়, কারণ ইহাদের সকলকে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে অস্তিত্বের চেতনা। অথচ কেন যে এই চেতনাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারে না, ইহাও একটা সমস্যা; হয়ত ইহা বাস্তবের সংজ্ঞা নির্দ্দেশেরই ফল। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, কিছু-একটা হইবার চেতনা নিশ্চয়তামূলক নহে, কিন্তু অস্তিত্বের চেতনা তাহা বটে; ইহাই একমাত্র অচঞ্চল, অন্য সকলই অস্থির অস্থায়ী। সুতরাং অস্তিত্ব-চেতনার বিশেষ-বিশেষ অংশ অসীম অখণ্ড অস্তিত্বের মধ্যেই চরম পরিণতি লাভ করে। কিছু-একটা **হইবার বোধ** অনবরত অতীতের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে, তেমনি একটা-কিছু **হইবে এ-বোধ**ও ভবিষ্যতের দিকে ছুটিতেছে—দুটি ধারাই সমানবেগে ছুটিতেছে, দুটিই জীবনের উপর সমান দাবী রাখে। কিন্তু যে-সত্তা মাত্র অতীত বা ভবিষ্যৎ নয়, যাহা শাশ্বত—যাহা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূঃ, সেই নিখিল-চৈতন্যই ভূমা বা ভগবান্; সেই চিরন্তন বর্ত্তমানের বুকে অতীত ও ভবিষ্যৎ-ধারা নিজেদের হারাইতেছে; যেন কোটি-কোটি চেতনা-বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিতেছে, মিলাইতেছে, আবার নূতন করিয়া ভাসিতেছে ঐ বিরাট্ সত্তা-সাগরের বুকে! সাগর ত বুদ্বুদে পূর্ণ, কিন্তু বুদ্বুদ সাগরকে পূর্ণ করিতে পারে না; তাহারা শুধু ভূমা-সমুদ্রের অগণ্য উচ্ছ্বাসমাত্র। আমি সেই বিরাট্ সমুদ্রের ধীর গম্ভীর স্পন্দন আমার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছি। *

---

* চেতনার যে সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা সাধারণতঃ দেওয়া হইয়া থাকে, আমি সে অর্থে চেতনা (sensation) ব্যবহার করি নাই; আমি ইহার মধ্যে যুক্তি-বৃত্তি (reason), ইচ্ছা-বৃত্তি (volition), আকাঙ্ক্ষা, ঝোঁক (tendencies) পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়াছি। যাহা অতীতের উত্তরাধিকার নহে, যাহা বর্ত্তমান-রাজ্যের আদিম অধিবাসী (autochthon), যাহা প্রত্যক্ষ (immediate) তাহাই একমাত্র সত্য চেতনা। ভাব ও ইচ্ছাবৃত্তি পর্য্যন্তকেও আমি চেতনা বলিয়া মনে করি; ত্রিকোণ অথবা সমতা (equality)র ধারণাও আমার কাছে হাত তোলা অথবা কোন কাজ করিবার ইচ্ছার মতনই প্রত্যক্ষ অনুভূতিগম্য এবং আমি বোধ করি যেন তাহাদের **স্পর্শ** করিতেছি।

সহজ জ্ঞান (Intuition)

আমার বিরুদ্ধে একটা তর্ক উঠিতে পারে; সাধারণ বাস্তব ঘটনা হইতে হঠাৎ **ভূমাকে** (ভগবানকে) আবিষ্কার করিয়া বসাটা অনেকের কাছে বোধ হইবে যেন সেটা আমার বুদ্ধির ভিতরকার **ধার করা** কোন একটা জিনিস। এই সমালোচনার যে ক্ষেত্র আছে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছি; যে সত্তা স্বরাট্ ও স্বয়ম্ভু, তাঁহাকে মিলাইয়াছে আমার সহজ জ্ঞান (intuition), কিন্তু সহজজ্ঞান বস্তুটা কি? ইহা আমার কাছে বর্ত্তমানের চেতনা (সুতরাং বাস্তব) এবং দুরবগাহ ও শাশ্বত (সুতরাং অচঞ্চল); ইহা **একের** বোধ।

সাধারণের ধারণা যেন মানুষ বিচিত্র ও বিভিন্ন উপাদানে গড়া একটা মোসেইক (mosaic); অখণ্ড আত্মার নানা বৃত্তি যেন খণ্ডিত হইয়া নানা মানুষের মধ্যে ফুটিয়াছে। কিন্তু যদি বিচিত্র বিকাশের মধ্যে জীবনের মূলগত ঐক্যটি অনুভব করিতে চেষ্টা করা যায়, যদি বুঝিতে প্রয়াস করা যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তি (reason) অনুভূতিরই (sensibility) একটা ভঙ্গীমাত্র—দুইএর মধ্যে আছে শুধু একটু পর্য্যায়-ভেদ বা স্তর-ভেদ—তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক ও অপ্রত্যক্ষবাদী তাত্ত্বিকদের কাল ক্রমাগত পরস্পর-উপেক্ষার ও অবিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। এক দিন আসিবে যখন চোখ খুলিয়া যাইবে, এবং আমরা আবিষ্কার করিব যে সহজ-জ্ঞানের পথও বৈজ্ঞানিক পন্থার চেয়ে কম সুসংবদ্ধ নয়, বরং অন্য দিকে অধিক ফলপ্রসূ। বিজ্ঞান দেখাইয়াছে দুইটা শুষ্ক প্রণালী:—নিগমন (Deduction) ও অনুগমন (Induction); প্রথমটা যেন মনে হয় সাপ নিজের ল্যাজ কামড়াইতেছে, দ্বিতীয়টা যেন কচ্ছপের মন্থর-বন্ধুর পদবী! বাস্তবকে ধরিতে হইবে ইহা ঠিক, কিন্তু আমাদের সত্তার **সমস্ত** শক্তি দিয়া ধরিতে হইবে। বর্ত্তমানের এই চকিত ও শাশ্বত **দীপ্তিতে** যদি আমরা শুধু নানা ভেকধারী বহুর খণ্ড রূপই দেখি, তা হইলে আমরা ঠকিব এবং সার সত্যেরও অমর্য্যাদা করিব, কারণ বহুকে এক করিয়া দেখিতে না পারিলে, না থাকে তার অর্থ, না থাকে তার অস্তিত্ব। চিরপ্রাণকে **সমস্ত** প্রাণ দিয়াই ধরিতে হইবে এবং তাহার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে হইলে কিছুই বাদ দিলে চলিবে না; যুক্তি এবং অনুভূতি দুইটি বৃত্তির দ্বারাই দেখিতে হইবে; তবেই ভূমাকে দেখা যাইবে।

জীব-পর্য্যায়

বিশ্বের চরম অধিষ্ঠান যে চিরন্তন ঐক্য, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ভূমা নিখিল চরাচর, ভূমা সর্ব্বব্যাপী, ভূমা ব্যষ্টিভাবে পৃথক্ পৃথক্ চেতনা, আবার সমষ্টিভাবে সমগ্র চেতনার সমন্বয়। জীবনের ক্ষুদ্রতম স্পন্দনের মধ্যেও তাঁর অব্যাহত প্রকাশ। এই বোধটি অটুট রাখিয়া অনুসন্ধান করা যাউক **জীবনের** কোন্ অংশ আমাদের দিকে পড়িয়াছে; চিরন্তনের পাশে চিরভঙ্গুর এই জীবনকে রাখিয়া দেখা যাউক।

সমস্ত ইন্দ্রিয়-চেতনার মধ্যেই বিভিন্ন মাত্রায় অহম্-বোধ আছে। প্রত্যেক চেতনা-গ্রামেরই একটা বিশেষ বোধ আছে; এই বিশিষ্ট অহং-বোধ বিভিন্ন চেতনা-পর্য্যায়ে বিভিন্নভাবে প্রকট হয়। প্রত্যেক পর্য্যায়টি স্বপ্রতিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ—যেন একটি জলবিম্বের মধ্যে বিশ্বের প্রতিবিম্ব! এই যে আমার 'আমি', আমার ব্যক্তিগত জীবন—ইহার কথা ভাবা যাক্। এই কথাগুলি লিখিতে লিখিতে **'আমি'** ভাবিতেছি। **কেমন করিয়া** ভাবনা হইতেছে এ প্রশ্ন এখন আমার কাছে বড় নয়; আমার ক্ষুদ্র ভাব-জগতের ঐক্যটা হয়ত অলীক, আমার অতীত ও বর্ত্তমান চেতনাকে সংবদ্ধ করিয়া আছে যে বাঁধন তাহা টুটিয়া যাইতে পারে, তবু এ-সমস্ত যে **আছে** সে বোধ জাগিতেছে মূল ঐক্য-বোধ হইতে। স্থায়ী হোক অস্থায়ী হোক, সত্য হোক, মায়া হোক, আমার এই অস্তিত্বের ঐক্য সব-কে বিধৃত করিতেছে। **এই অহংবোধেও ভূমা আছেন কারণ ভূমা সর্ব্বাশ্রয়।** সুতরাং অহম্ই ভূমা (Le Moi est Dieu), অহম্ ভূমার অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ। আমি আমার প্রত্যেক খণ্ড-চেতনার মর্ম্মস্থলে ভূমাকে দেখিয়াছি এবং প্রত্যেক চেতনা-সমষ্টির মধ্যেও দেখিব—প্রত্যেক আমির মধ্যে (আমার আমি হইতে সুরু করিয়া) দেখিব; নানা সমষ্টির মণ্ডল-পরিক্রমায় ভূমাকে দেখিব; সেই যে বিরাট্ সমন্বয়ের মধ্যে নিসর্গ-জগতের খণ্ড ভগ্নাংশগুলি

লোপ পাইতেছে—দেশ ও কালের মিলনের সেই কল্প-মুহূর্ত্তে—নিখিলবিশ্বের ছন্দ-নৃত্যে ভূমাকে দেখিব।

এই আমার সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে—এই ক্ষুদ্র আমিত্বের বুকেই নির্ব্বিকল্প-অহং, ভূমা-অহম্ ঘুমাইতেছেন। এই একক অহম্ রমঁ্যা রলাঁর মধ্যে আছে, এবং তাহার প্রত্যেক খণ্ড-চেতনার মধ্যেও আছে, কিন্তু সমস্তকে ছাড়াইয়াও আছে। সেই বিরাট্ আমি, রমঁ্যা রলাঁর বাহিরে যাহা কিছু আছে—সেই সকল আত্মা ও দেহ সবকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। আমার এই মহান্ চলনধর্ম্মী বর্ত্তমানের মধ্যে আমি অগণ্যরূপে বিকশিত হইতেছি—এই বিবর্ত্তনের মধ্যে ছেদ নাই ইহার শেষ নাই।

আমার অসংখ্য রূপের মধ্যে একটা রূপ একটা পদবী হইতেছে রমঁ্যা রলাঁ। তবে কেমন করিয়া নির্ব্বোধের মত ভুলিয়া আছি যে ইহাই আমার একমাত্র সত্তা নয়, আমার নিখিলকে প্রাণে পূর্ণ করিয়া আছেন সেই ভূমা? এই ভ্রম আমার বড়-আমির নহে; এই **ভূমা** আমি দূরে এবং অন্তিকে, একই কালে ইহা এই খণ্ড-জীব এবং সমস্ত জীব-গোষ্ঠি। সুতরাং ভ্রম করিতেছে রমঁ্যা রলাঁ। কারণ সে ভূমার অংশমাত্র, পূর্ণ ভূমা নহে।

কিন্তু ইচ্ছা করিলে এই সঙ্কীর্ণ-আমি ভূমা-আমিতে পৌছিতে পারে, সেই সর্ব্বব্যাপীর সর্ব্বানুভূত্ব লাভ করিতে পারে, পূরা মাত্রায় অনুভব করিতে না পারিলেও আভাসে বুঝিতে পারে। আমার মধ্যে ভূমা কেমন করিয়া আছেন? নিখিল সত্তার সঙ্গে আমার মৌলিক যোগ রহিয়াছে অস্তিত্বানুভূতির মধ্যে; ইহা অব্যবস্থিত (indeterminate) হইলেও ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তির (reason) শৃঙ্খলায় পর্য্যবসিত হয়। প্রত্যেক খণ্ড আমি ও তাহার মধ্যে আবদ্ধ খণ্ডিত বিশ্বের প্রত্যেক আংশিক প্রকাশ, একটি পথ দিয়া অনন্তের সঙ্গে কারবার করিতে পারে। ইহা বুদ্ধিবৃত্তির পথ—ইহাই অনন্তের দিকের বাতায়ন (fenetre de l'Eternite)। এই পথ দিয়াই সহজ-জ্ঞান (Intuition) প্রত্যেকের কাছে আইসে, প্রত্যেকের মূল প্রকৃতির রূপটি চকিতে দেখাইয়া দেয় এবং তখনি আমরা আপন আপন সঙ্কীর্ণ সীমাগুলি চিনিয়া লই—অথচ সেইসঙ্গেই, যে বিরাট্ জীবন হইতে দূরে পড়িয়া আছি, তাহার অসীম বিস্তারটিও দেখিতে পাই। ভূমার বোধ জীবন্ত জাগ্রত হইলে আর বুদ্ধির যেন কাজ থাকে না—শুধু 'স্ব'-ভাবটির বোধ বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এই আত্মবোধের অতল সমুদ্র এবং তাহার অসীম চাঞ্চল্য ভেদ করিয়া আছে শাশ্বত শান্তি! বুদ্ধি এই অখণ্ড ভূমা-চৈতন্যের একটি নিম্নস্তরের রূপমাত্র—ইহা **আপেক্ষিক** সত্তার রূপ—ইহা বস্তুত দেবরূপ নহে, নরদেব অবতার। অখণ্ড পূর্ণ চৈতন্যই ভূমা ভগবান।

ভূমাই জীবাত্মাসমূহের যোগসূত্র

পরমাত্মার সহিত প্রত্যেক জীব কি বন্ধনে যুক্ত তাহা আমরা দেখিয়াছি; এক্ষণে দেখা যাক্ জীবসকল কোন্ যোগসূত্রে গ্রথিত এবং কিভাবে ভূমাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মাসকল প্রত্যেকের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে।

যাহা-কিছু জীবন্ত, সকলই যদি আমার আমির রূপান্তর হয়, তাহা হইলে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় যখন আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনের মোহ কাটিয়াছে—তখন কেন আমি আমার ইচ্ছামত যে-কোন জীবে প্রবেশ করিতে পারি না? সমস্তই কি ভূমা নয়? এবং ভূমা কি আমার এই আমি নন? তবে কেন আমার এই চারিদিকের জীবদের বুঝিতেও পারি না? তাহারা কি আমারই অংশ মাত্র নয়? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার; আমাদের প্রত্যেকেই ভূমার অর্থাৎ চিরন্তন একের অংশ, কিন্তু আমাদের রূপ যে আপেক্ষিক ও ব্যক্তিগত। ভূমাই কেন্দ্র এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যেক খণ্ড চেতনা ও সম্ভাব্যতার সমষ্টিই সংযুক্ত। অন্য কোন প্রকারের সংযোগ আর সম্ভব নহে; এই যে সঙ্কীর্ণ দেহ-ভাণ্ড, যাহার মধ্যে আমাদের আত্মা আবদ্ধ হইয়া অন্য আত্মা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, এই দেহভাণ্ডটি চূর্ণ করিয়া সমস্ত অন্তরাল দূর করিতে পারে শুধু মরণ।

কিন্তু এই জীবনেই আত্মায়-আত্মায় যোগ কত দূর অবধি যাইতে পারে? আমার এই ছদ্মবেশের মোহ কাটাইয়াছি; আমার যথার্থ সত্তার স্মৃতি জাগিয়াছে, প্রজ্ঞার সাহায্যে আমার ভূমা-স্বরূপ অবধি অধিরোহণ করিতে পারি; তাহা হইলে অবরোহণ-ক্রমে

যে-কোন জীবাত্মার মধ্যে নূতন অবতার (incarnation nouvelle) হইতে পারি না কি ?

সহজ অবস্থায় এটা যে অসম্ভব তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। তথাপি যদি আমার আত্মাকে সম্পূর্ণ শূন্য করিতে পারি, যদি আত্ম-সম্মোহন (auto-hypnotism) অথবা যোগ-বলের মত কোন উপায়ে আমার আত্মার ভিতরকার সমস্ত সঞ্চিত বস্তু নিষ্কাষিত করি, তাহা হইলে আমার এই বিশিষ্ট আমিত্ব বর্জ্জন করিয়া আমার নির্ব্বিশেষ আমিত্বে উপনীত হইতে পারি না কি ? সেই অবস্থায় আমার চেতনা তাহার জীবন্ত বৈচিত্র্য ছাড়িয়া নিজস্ব ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; এক দিক্ দিয়া দেখিলে এই অবস্থায় আমি যেন শূন্য ও অবাস্তব, কিন্তু এই নির্ব্বিশেষ-আমি কি আপন ইচ্ছামত অন্য বিশিষ্ট গুণাদি গ্রহণ করিতে পারে না ? ইহা কি অন্য-রূপে নিজেকে গড়িতে বা অন্য পদবীতে নিজেকে নামাইতে পারে না ? আত্ম-সম্মোহনের অবস্থায় আত্মাকে প্রাচীন সংস্কারশূন্য করিলে নবীন সংস্কার-ইচ্ছাদি বাহির হইতে আসিয়া ত প্রভুত্ব করে; কিন্তু এটা জানি যে, তাহা শুধু পুরাতন দাসত্ব-শৃঙ্খলের স্থানে নূতন শৃঙ্খল জড়ান; একটা মোহ কাটাইয়া আর একটা মোহের কবলে পড়া। একটা নূতন মায়ার দাসত্ব করা ত বন্ধ হইল না !

ইহাই দেখাইতে চাই যে প্রত্যেক আত্মায় প্রত্যেক খণ্ডাত্মায় নিখিল বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়। প্রত্যেকেই ভূমাকে নিজের মধ্যে অনুভব করিতে পারে এবং নিজেকে ভূমার সঙ্গে ভেস্তাইয়া বসে। কিন্তু আমাদের আমিত্বের যে চারিটি মুখ্য অবস্থা আছে, তাহার অনুসরণ করিয়া ঐ চেতনা বিভিন্ন আকার ধারণ করে :—

(১) মৃত্যু আসিয়া এই জীবন-নাট্যের উপর যবনিকাটি টানিয়া দিলে আমি যে বিরাট্-আমির মধ্যে প্রবেশ করি, তাহাতে আমার চেতনা সর্ব্বানুপ্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্তর-ভেদ থাকে; যথা—তাহার মধ্যে থাকে আমার ব্যক্তিগত আমি "ক," (যাহাকে এই মাত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি) এবং "খ" "গ" ইত্যাদি করিয়া প্রত্যেক বিশিষ্ট সত্তা যাহা অসীমে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে; তাহা ছাড়া এই অগণ্য অসীম সত্তাদের সঙ্ঘবদ্ধ সমগ্রতার চেতনাও থাকে।

(২) কিন্তু সহজ জীবিত অবস্থায় দেখি এই সর্ব্বব্যাপী চেতনা অন্যভাবে প্রকট; ইহার মধ্যে আছে আমার ব্যক্তিগত চেতনার আধার (ক), এবং অন্যসকল সত্তার সঙ্গে একাত্ম হইবার একটা অস্পষ্ট উপাদানশূন্য চেতনা। মোট হিসাবটা ঠিক আছে, কিন্তু কোন্ বাবদে কতটা আছে সেই খণ্ড-হিসাবের বোধ নাই।

(৩) এই জীবনেই আত্ম-সম্মোহনের অবস্থায় দেখি এই বিশিষ্ট-আমিত্বের বোধ লোপ পায়; চেতনা কম-বেশী থাকেই, কিন্তু সেটি অস্পষ্ট অরূপ—যেন সমুদ্রের মত সকলকে লইয়া আছে, অথচ সকলকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইতেছে না।

(৪) এই নির্ব্বিশেষ সত্তার দ্রবমান প্রবহমান নিঃসীম অবস্থায় ইহাকে অন্য-এক ইচ্ছার ছাঁচে এক অপরিচিত আত্মার মধ্যে ঢালা যাক্; তখনি দেখিব এই নূতনের এই অপরিচিতের ছাপ লাগিয়া যায়। যে নূতন ইচ্ছা জয়ী হইল আমার নির্ব্বিশেষ সত্তা তাহার চেতনায় সচেতন হইয়া উঠে, সুতরাং ইহার সঙ্গে যেন একাত্ম হয় এবং এক নূতন মায়া আসিয়া পুরাতন মায়ার আসন অধিকার করিয়া বসে।

কিন্তু মরণের পরই মায়ার অবগুণ্ঠন (voiles de Maya) ছিন্ন হয়, মোহের দাসত্ব শেষ হয়; জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, তাহার শাশ্বতত্বের বোধ জাগে; এই অবস্থায় 'অহম্'এর মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, দুইই সমন্বয় লাভ করে; তখন একটি দৃষ্টিতে 'অহম্' খণ্ড ও অখণ্ডকে অসীম তাৎপর্য্যে মণ্ডিত দেখে।

এই চারিটি অবস্থা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি :—

(ক) ১। সহজ অবস্থা (Etat normal)—মায়া; বিচ্ছিন্ন সংরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের মায়িক চেতনা।

২। ভাব-সমাধি (Extase)—সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইবার অসংবদ্ধ চেতনা; বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের লোপ বা বিস্মৃতি। নামরূপের দাসত্ব হইতে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি। (নির্ব্বাণের স্তর-ভেদের সঙ্গে তুলনীয়।)

(খ) ৩। ভাব-সম্মোহন (suggestion)—বাহির হইতে

অন্য-এক ব্যক্তিত্বের চাপে তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাইবার মায়িক ভাব।

৪। মৃত্যু—নিখিলের ব্যষ্টি ও সমষ্টি সত্তার সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাইবার সুস্পষ্ট পূর্ণ চেতনা; শুধু সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বের দাসত্ব-শৃঙ্খল খসিয়া যাওয়া নয়, তাহার সমস্ত অলীক অহম্-বোধ হইতে মুক্তি; নির্ব্বিকল্প অহম্—অসীম মোক্ষ-লোকে তাহার অনন্ত উন্মেষ-লীলা।

ভাব সমাধির অহম্ ও মৃত্যুঞ্জয়ী অহম্এর মধ্যে একটা ঐক্য আছে যদিও পার্থক্যও যথেষ্ট—প্রথমটি শূন্য, দ্বিতীয়টি পরিপূর্ণ—কারণ জীবন্ত যোগসমাধি মৃত্যু, কিন্তু শেষ অবস্থার মৃত্যুই অসীম জীবন। যাহা হউক ইহারা যেন মোক্ষের দুটি ধাপ।

স্বাতন্ত্র্য

জীবাত্মা সম্বন্ধে সামান্য যাহা-কিছু আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া লওয়া যাক; যাহা আপেক্ষিক ও পরিবর্ত্তনশীল তাহা অপেক্ষা নিরপেক্ষ সত্তাকে ভূমাকে আমারা যেন বেশী বুঝি! যাহা হউক জীবাত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে নিয়ম আবিষ্কার করা যায় তাহা সকল মানুষের পক্ষেই অত্যাবশ্যক, কারণ যদি আমরা বাঁচাটাকে সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টের খেয়াল বলিয়া হাল ছাড়িয়া না দিই তাহা হইলে বাঁচার মত বাঁচার একটা আদর্শ ও পদ্ধতি দাঁড় করান দরকার। (নিম্নে দ্রষ্টব্য)

প্রথমেই দেখি স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের সমস্যা আমাদের সম্মুখে। কেমন করিয়া বাঁচা উচিত এটা ভাবিবার পূর্ব্বেই জানা দরকার বাঁচা সম্বন্ধে আমাদের কোন আত্মকর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য আছে কি না। সত্যই কি আমরা স্বাধীন? এই ভীষণ প্রশ্নটি আমাদের যুগের সমস্ত যুবকদের মত আমাকেও অনেক দিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে—কিন্তু এখন যেন সে কথা ভাবিতে হাসি পায়। এমন-ভাবে ঐ প্রশ্নটি করা হয় যে, তা'র জবাব দেওয়া ও না-দেওয়া দুইই অসম্ভব হয়। বস্তুতঃ প্রশ্নটি ঐভাবে নাই। স্বাধীনতা, প্রয়োজন ইত্যাদি শূন্যগর্ভ কথা মাত্র—কোন বাস্তবের সঙ্গে তা'দের যোগ নাই।

ভাবা যাক, ভূমা যেন এক সঙ্গীত শিল্পী, তিনি নিজের কাছে নিজে একটি রাগিণীর তান লইয়া আলা[illegible] করিতেছেন; সেই তানের প্রত্যেক স্বরটি পরমাত্মার এ[illegible] একটি চেতনা; অন্য দিকে রম্যাঁ রলাঁও এমনি কতকগু[illegible] চেতনার সমষ্টি—একটি স্বর-সন্ধি (accord) যাহা ভূমা[illegible] তানের সম্বাদীরূপে তাহার অনুবর্ত্তন করিতেছে। ভূমা শি[illegible] সেই স্বরসন্ধিটি তাঁর আলাপে জুড়িয়া তা'কে পরিস্ফুট [illegible] করিতেও পারেন; তবু আমি রলাঁ আমার তানটি আলা[illegible] করিয়া যাইতেছি; এ ক্ষেত্রে তোমরা বলিবে কি [illegible] আমার ঐ আলাপের ঐ স্বরসন্ধিটার স্বাতন্ত্র্য নাই? [illegible] আলাপ যে আমারই অনুপরমাণুতে গড়া; আমি [illegible] নিজেকে ঐ আলাপের ভিতর দিয়া এক অভিনব চেতনা জাগাইয়াছি; উহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ যে আমার উপর নির্ভর করিতেছে; এই আমিই ত মুক্ত; আমার কো[illegible] খণ্ড ভগ্নাংশ মুক্ত নয়—কারণ মুক্তি কি এ বিষয়ে তা[illegible] কোন চেতনাই নাই—ইহা শুধু **আছে**। তেমা[illegible] আপেক্ষিক আমির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের কোন অর্থ নাই—নিরপেক্ষ আমির মধ্যেই তা'র আসল তাৎপর্য্য।

কোন মানুষ নিজেকে স্বাধীন মনে করে, কারণ প্রবৃত্তি তাড়নাকে নিজের ইচ্ছার বলে ঠেকাইয়া যাহা যুক্তি-সঙ্গ[illegible] তাহাই সে করে। অপর একজন নিজেকে নিয়তি-চালি[illegible] ভাবে কারণ সে প্রবৃত্তির হুকুমকে ঘাড় পাতিয়া লয়[illegible] উভয়ের কেহই না স্বাধীন না পরাধীন। ইহাদে[illegible] মধ্যে একজন যুক্তিপ্রধান আর-একজন প্রবৃত্তি অথ[illegible] কামনাপ্রধান, ইহা শুধু কথার মারপ্যাঁচ; একটি আপেক্ষি[illegible] সত্তা কেমন করিয়া স্বাধীন হইতে পারে? ইহা ত অপ[illegible] একটি মহত্তর সত্তার খণ্ড মাত্র, খণ্ড পূর্ণ হইতে না পারি[illegible] ত মুক্ত হইতে পারে না। অন্য পক্ষে প্রাচীন নিয়তি[illegible] বাদীদের নির্ব্বেদ-পূর্ণ ঔদ্ধত্যের অর্থ কি? এই [illegible] আমাদের সত্তা নিজেকে নিজে চালাইতে পারে কে ইহা[illegible] সম্পূর্ণ নিয়তির দাস বলিবে? জুলিয়েতের প্রতি প্রেমে যে দাস্যভাব রোমিও দেখাইল তাহার মধ্যেই ত [illegible] প্রচুর মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে।

নির্ব্বিকল্প সত্তা ব্যতীত পূর্ণ মুক্তি আর কাহার নাই। তিনিই ভূমা এবং নিয়ম তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ছন্দ। স্বাধীনতা ও নিয়তি তাঁর দুই পত্নী।

জীবাত্মার কাছে মুক্ত হইবার ছুটি উপায় আছে :—(১) যাহা সাধারণ মানুষের ;—আমি যাহা তাহাই হইব—অন্য বিষয়ে মাথা ঘামাইব না, যাহা আমি ইচ্ছা করি, আমি যাহা করি, সংক্ষেপতঃ আমি যাহা, তাহাই মানিব ; অনুগ্রহ করিয়া নানা মতবাদের বোঝা যদি আমার ঘাড়ে চাপান না হয় তাহা হইলে জমির ঢালুটা যেমন নদীকে আপনি একদিকে গড়াইয়া লইয়া যায় তেমনি আমি ও আমার প্রকৃতির টানে ছুটিব—কার অধীন কার ক্রীতদাস আমি সে কথা ভাবিবই না।

(২) যাহা ভাবরসিকদের :—চির সত্য ভূমার দিকে নিজেকে তুলিবার প্রচেষ্টা ; খণ্ডকে পূর্ণের তাৎপর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখা। সঙ্গতের মধ্যে একটা বিবাদী সুরকে পৃথক্ করিয়া শুনিলে তাহা কানটাকে আঘাত করে ; কিন্তু তা'র আসল জায়গায়, তানের বিকাশে, সেই বিবাদী সুরটাই কানকে খুসী করে ; ভূমার বীণায় আমি যেন সেই বিবাদী সুর ; তবে আমি সেই অবস্থায় আসিয়াছি যেখানে নিজেকে বিচার করিতে পারি, নিজের সম্বন্ধে বিরক্তও হইতে পারি ; কিন্তু আমি সমগ্র রাগিণীটি শুনিতে পাই, বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে আমার বিবাদী সুরগুলি কেমন যেন গ্রন্থির কাজ করে। এই চোখে দেখিলে গানের প্রত্যেক অংশটিই আমাদের ভাল লাগিবে। বাহিরে যে "বহু" আছে তাহাকে আমার আত্মার ভিতরে খুঁজিতে হইবে ; অন্তরকে বাহিরে খুঁজিলে চলিবে না। তাহা হইলে দেখিব শুধু বেসুর ও অসামঞ্জস্য—স্বাধীনতা একদিকে অনন্ত পূর্ণ অন্য দিকে খণ্ড চূর্ণ সঙ্কীর্ণতায় অনন্ত। এই নির্ব্বোধ দ্বৈতবোধ একটা মরিয়া-রকমের স্ফূর্ত্তি জাগাইতে পারে কিন্তু সে উদ্ধত স্ফূর্ত্তির আবরণ ভেদ করিয়া দেখা যায় নিয়তির নিগড় মাথা পাতিয়া লওয়া হইয়াছে।

দার্শনিকদের প্রতি

আমার সাধ্যমত আদিতত্বটা যেমন বুঝিয়াছি তাহার আভাস দিলাম। দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত মনস্তত্ত্ব পর্য্যায়ের যাবতীয় তথ্যের কারণ নির্দ্দেশ আমার কাছে আশা করা উচিত নয় ; সেটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ব্যাপার। আমি শিল্পী মাত্র। আমার শিল্পের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া জীবনের বিচিত্র লীলা তন্ময় হইয়া দেখিবার পূর্ব্বে আমি জীবনের অর্থ কি তাহা বুঝিবার প্রয়োজন অনুভব করি ; সৌধ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভিত্তিটার সম্বন্ধে নিশ্চয়তার দরকার হয়। সেই ভিত্তির ছুইটা দিক এখন (কারণ সৃষ্টির লীলায় ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য আমি চঞ্চল) আমার দৃষ্টির সম্মুখে ছুইটি প্রকাণ্ড প্রশ্ন হইয়া দেখা দিতেছে :—

(১) আমরা কি ? আমাদের অসীম বৈচিত্র্য ও স্থির মূলপ্রকৃতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে আমাদের কি মনে হয় ?

(২) কেমন করিয়া আমাদের বাঁচা উচিত ? এই ছুটি প্রশ্ন ছাড়া বাকী সমস্তই উপস্থিত অবান্তর মনে হয়। আমি একথা বলি না যে পর জীবনে সময়-সুযোগ পাইলে আমার এ জীবনের এই তরুণ বিশ্বাসের সাহায্যে তৎ-সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন সমস্যাদির কারণ সন্ধান আমি করিব না। এই বিশ্বাস সমস্ত তত্ত্বের মূল বলিয়া নানা তত্ত্বের মধ্যে ঐক্য খুঁজিয়া বাহির করা সহজ, কিন্তু উপস্থিত সে কাজে নামিবার ইচ্ছা বা ধৈর্য্য নাই, কারণ শিল্প আমায় টানিতেছে।

বর্ত্তমানের চেতনা হইতে ক্রমশঃ অতীতের স্মৃতি, বাহ্য জগতের কারণ, অহম্ এর সত্য বোধ ইত্যাদির ভিতর দিয়া অনন্ত দেশ অনন্ত কালরহস্যে উপনীত হওয়া যায়। প্রত্যেক চেতনার মধ্যে **ভালর** দিকে ঝোঁক ও **মন্দের** বিরুদ্ধে ও ছুঃখের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়া উঠে ; সজীব সহজ জ্ঞানের প্রধান ও প্রায় একমাত্র ধর্ম্মই এই ; ইহা হইতেই বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান জন্মায়। এ স্থলে মানুষ সচেতন নয়। ইহা একপ্রকার আদিম বিশ্বাস যাহা কোন এক অস্পষ্ট চেতনা এক অপূর্ণ প্রয়াস হইতে উদ্ভূত হয়। সত্তা যখন সচেতন হইয়া আবির্ভূত হয় এবং বিশ্লেষণ করিয়া সবটা বুঝিতে চেষ্টা করে তখন তাহার চেতনা যেন এক বাহ্য প্রক্রিয়া বলিয়া বোধ হয় এবং জীবনের রহস্যার্থটি সে হারাইয়া ফেলে। আর সে চেতনাকে তেমন প্রাণদীপ্ত বলিয়া অনুভব করে না, সুতরাং তাহা হইতে আর বেশী কিছু পায় না ; কারণ এই হওয়া-এবং-সুখী হওয়া ব্যাপারটা **বুঝিবার** জিনিষ নয় **অনুভব** করিবার।

আত্মগঠনের যমনিয়মাদি

১। জীবনের একটি লক্ষ্য স্থির করা; নিজের কর্ত্তব্য নিজে পালন।

২। সমস্ত প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রিত করা; ইচ্ছাশক্তিকে জীবনের লক্ষ্যসাধনে একান্তভাবে নিয়োগ।

। কোন জিনিষ শুধু তাহার জন্যই না-খোঁজা; জীবনের জন্যই জীবনটাকে আঁকড়াইয়া না থাকা, জীবনের লক্ষ্যের জন্যই জীবনকে আদর করা।

৪। অস্পষ্ট বা খাপছাড়াভাবে অথবা অনুগ্রহ করিবার জন্য লোকহিত করা নয়—সুনির্দ্দিষ্ট ও সরলভাবে লোক-সেবা করা। মানুষের ভাল করিবার কোন সুযোগই না ছাড়া; দান, সহানুভূতি, শুভেচ্ছার দ্বারা জীবনের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে কোন মানুষ বা মানবসমষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা; সর্ব্বোপরি ধোঁয়াটে ভাবুকতায় নিজের করুণা ও প্রেমকে আচ্ছন্ন না করা।

৫। সত্যের অভিসারে আমরণ অপরিশ্রান্ত থাকা। (সত্যের পূর্ণতা ও সুসঙ্গতি শিল্পে সৌন্দর্য্যে কর্ম্মে কারুণ্যে) যদি সেই সত্য-সম্পদ মিলে—যতটুকু মেলে অপরের সঙ্গে যথাসম্ভব উপভোগ করা। অপরের ঘাড়ে তাহা জোর করিয়া চাপান নয়; তাহারা যেটুকু চাহিতেছে দেওয়া; মানুষের আত্মসন্তোষে আঘাত না দেওয়া। সত্যকে যে হইয়াছে (দুঃখেরই হোক আর সুখেরই হোক) তাহার সঙ্গে অপরের সঙ্গে বনাইয়া চলা কঠিন নয়।

আমার মতে সকল তরুণ প্রাণই এইভাবে তাদের ধ্যাত্ম জীবনের অনুশাসন পত্র অবিলম্বে লিখুক, তাদের তার উপযোগী আয়োজন করুক। যত শীঘ্র সম্ভব সমস্ত কাজ সারিবার জন্য লাগিতে হইবে, ভাবিতে হইবে যেন ্য আসিয়া পড়িল। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব আসল কাজ করিতে চেষ্টা করা। অন্তরের গভীর বাণীটির সঙ্গে নিজের সুর বাঁধিয়া লওয়া; তা'র পর সাম্‌নের পথ ছোট বড় কিছু না ভাবিয়া আগাইয়া চলা।

আমার জীবনের অনুশাসন-পত্র আমি লিখিয়া গেলাম। হয়ত অকিঞ্চিৎকর কিন্তু ইহার পিছনে আমার তিন-বছরের প্রয়াস ও সংগ্রাম আছে; তাহা আমার কাছে ব্যর্থ নয়: তাহা যে আমার প্রথম যৌবনের তিন বছর।

"কাজে লাগ্! কাজের ভিতর দিয়া মানুষকে ভালো বাস্। মানুষের সবচেয়ে বড় গৌরব, সবচেয়ে বড় পুণ্য কাজ দিয়ে প্রেমকে সার্থক করা। আজই জীবনের প্রথম কাজ সুরু কর্; কাজের ক্ষেত্রটা ক্রমশঃ বাড়িয়ে যা; আজই তোর ভাইদের ভালোবাস, কাল আত্মীয়দের, পরে দেশকে এবং ক্রমশঃ বিশ্বমানবকে; বুঝেছিস্? সত্যি স্বর্গটা হচ্ছে এই জীবন। ওরে ভাই, এই মুহূর্ত্তেই সকলে যে স্বর্গে রয়েছি। কিন্তু আমরা বুঝতে পার্‌ছি না, কারণ প্রাণে যে আমাদের প্রেম নেই। সেই জন্যই ত স্বর্গ হয়েছে আমাদের নরক—যারা ভালবাস্‌তে পারে না তাদের যাতনাই ত নরক..." দস্তয়এভ্‌স্কি; (Dostoievsky—Brothers Karamazov).

বহির্জগৎ

কেমন করিয়া বাঁচিতে হইবে সেটা ঠিক করিবার পূর্ব্বে আর একটা প্রশ্ন জাগে **কোথায়** বাঁচিয়া আছি? আমাদের কাজের ক্ষেত্রটা কিরূপ? বহির্জগৎটা কি?

আমার শাশ্বত-আমি ত অসংখ্য লীলা-নাট্যের অধিকারী; খণ্ড আমি ত একজন সামান্য নটমাত্র; তাঁর বিরাট্ সুর-সঙ্গতির মধ্যে আমি ত একটি সমবাদী সুর; আমার পর্দ্দার স্বরবিন্যাস অন্যান্য সমবাদী সুরের পর্দ্দার অনুরণন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আমার তাৎপর্য্যটি নির্ভর করিতেছে এই নাট্যের অপর নটদের ভূমিকায়; অথবা আমরা কেহই ভাল করিয়া জানি না অভিনয়ের চরম সার্থকতা কোথায়। প্রত্যেকেই আমরা একদিকে বিশেষ-বিশেষ সত্তা, অন্যদিকে যেন কোন এক মহান্ বিয়োগান্ত নাট্যের অভিনেতা। অথচ আমরা পূর্ণভাবে না বুঝি নিজেদের না বুঝি অন্যদের।

বহির্জগতে একটা জিনিষ স্পষ্ট; আমরা অন্য জীবদের আমাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে দেখি—ভূমার হৃদয় দিয়া দেখি না; আমাদের ব্যক্তিগত সত্তা যেসব ভাব অনুভাবাদি লিখিয়া যায় তাহাই বুঝি, অন্যান্য সত্তাদের প্রাণে যিনি **প্রাণস্বরূপ** হইয়া আছেন তাঁহাকে অনুভব করি না;

তাঁর দৈবী শক্তি প্রণোদিত বলিয়া বিচিত্র কর্ম্মসাধনাকে বুঝি না, বিশেষ বিশেষ কার্য্যের প্রভাবেই আমরা বিচার করিয়া বসি। অথচ সত্য এই যে তাঁর শক্তিই আমাদের সকলের মর্ম্মস্থল হইতে উৎসারিত হইতেছে। আমার অস্তিত্বের মধ্যেই যে সীমার সঙ্কীর্ণতা; কিন্তু সেই সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা যে প্রাণের আদি উৎসে পৌছিতে পারি।

প্রকৃতির বুকে এমন কিছুই থাকিতে পারে না যাহা আমার কাজের জিনিষ না হইতে পারে; সে মানুষই হোক আর বৃক্ষলতাদিই হোক। আমার সাম্‌নেই একটি গাছ দেখিতেছি অথচ সে সম্বন্ধে আমি উদাসীন। কিন্তু যাকে ভালোবাসি সে মানুষ যদি সাম্‌নে আসে, তাহইলে কোথায় থাকে ঔদাসীন্য? আসল কারণ এই যে, আমার দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর গাছটার প্রভাব ক্ষীণ, কিন্তু আমার বন্ধু অবিরতভাবে আমার সমস্ত সত্তাকে যেন সঙ্গীত-মুখর করিয়া রাখে, সুতরাং দেখিতেছি **আমার** উপর অপরে কি রকম এবং কতটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা দিয়াই অপরের জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ করি। এ যেন প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি! কিন্তু সত্যভাবে অপরকে দেখিতে, বুঝিতে, ভালোবাসিতে হইলে আত্মার মধ্যে সকলকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিতে হইবে। সুতরাং প্রেমেই সকলের সত্যপ্রকাশ, সত্য প্রতিষ্ঠা—প্রেমই সব; (Tout est Amour) এই চোখে দেখিলে বুঝিব আমার প্রিয়তম বন্ধু এবং ঐ যে গাছটি উদ্যানে শ্যামশ্রীতে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছে উভয়েই তুল্যমূল্য। দুইটিই ত শাশ্বত প্রাণের ক্ষণিক রূপতরঙ্গ—ক্ষণিকত্বে দুজনেই সমান-ধর্ম্মী।

তবুও এ জীবনে যে আমি আমার আপনার জনদের, বন্ধুদের, আমার দেশমাতৃকাকে, আমার বিশ্বমানব, আমাদের এই পৃথিবী—এই ব্রহ্মাণ্ডকে যে বিশেষ করিয়া ভালোবাসি তা'রও একটা সার্থকতা আছে। জীবনের বিরাট্ লীলানাট্যে এরা সকলেই আমার মত "ক্ষণিকের অতিথি।" সকলেই কোথায় চলিয়া যাইতেছে! তবু আমি ত বিশেষভাবে ওদের সঙ্গেই রঙ্গমঞ্চে নামিয়াছি—একই অঙ্কে অভিনয় করিতেছি, উহাদের হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিবার নির্ব্বোধ প্রয়াসে কি হইবে? বিচ্যুত হইতে যে পারি না। জীবন-নাট্যের প্রথম পটক্ষেপের সময় হইতেই অনুভব করিতেছি যে আমার বিশেষ ভূমিকায় আমার বোধ, আমার অনুভূতি, আমার ভালবাসা সবই ততক্ষণ সজাগ ও সক্রিয় যতক্ষণ আমার সাথীরা আমার সঙ্গে অভিনয় করিতেছে। এই সঙ্গতের এই একত্র অভিনয়ের আনন্দ ছাড়িয়া হঠাৎ যদি আমার ও ঐ-সব সত্তাদের মধ্যে যে নিঃসীম নিরয় ভীষণ ব্যবধান হইয়া আছে তাহার ছবি আঁকিবার ব্যর্থ প্রয়াস করি, তাহা হইলে ধ্রুবকে ছাড়িয়া ছায়ার পিছনে ছোটা হইবে। জানি ঐ নিরয়ও একটা সত্য এবং তাহার মধ্যে তলাইয়া তাহাকে পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব—নিখিল প্রাণের ঐক্যতানে নিরয় কোন স্থান অধিকার করে সমগ্রতার দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে প্রয়াস পাইব।

নিখিল বিশ্বই ভূমা। ভূমার মধ্যে আমাদের প্রেম নির্ম্মলতায় ও গভীরতায় অনুপম। কিন্তু সেই ভূমার প্রেম আমাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-সত্তার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; আমাদের এই আপন-মানুষ কাছের মানুষদের শরীরে সেই প্রেম শরীরী; তাহাদের চোখের দীপ্তি, অধরনৃত্যের ছন্দ, তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গীটি যে সেই ভূমার প্রেমকে প্রতিমুহূর্ত্তে পরিস্ফুট করিতেছে; তাহাদের কণ্ঠ যে ভূমার ব্যঞ্জনায় পূর্ণ; ভূমা আমার হইবেন বলিয়াই ত বঁধুর নিবিড় বাহুবন্ধনে ধরা দিতেছেন; কিন্তু সেই আলিঙ্গনের মধ্যে ত মনে থাকে না যে, বক্ষে যে প্রিয়তমকে ধরিয়াছি সে শুধু সেই ছোট্ট মানুষটি নয় সে এক ব্রহ্মাণ্ড। অথবা সে ও আমি এই দুজনের নিবিড় মিলনই সেই ব্রহ্মাণ্ড।

সুতরাং দেখিতেছি, বাহিরের জগৎ বলিয়া কিছু নাই, আছে তাহার মায়া এবং এ মায়া আমাদের চিত্তকে দখল করিয়া বসে। সত্য শুধু এক ভূমা, অসংখ্যরূপের সহস্রদল পদ্ম। প্রত্যেক দলটিকে মনে হয় যেন একটি ক্ষুদ্র পুষ্প-পাত্র, আবার বোধ হয় যেন একটি ছোটখাট ব্রহ্মাণ্ড,—তেমনি সমস্তই দেখি; কখনও পদ্মকে ভুলি কখনও দলকে ভুলি; এইভাবে বাহিকতার মোহিনী মৃগতৃষ্ণিকা আমাদের বিভ্রান্ত করে।

কেমন করিয়া বাঁচিতে হয়।

হাস্য-পন্থী

এখন সবচেয়ে বড় ও কাজের প্রশ্নটার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাক্; কেমন করিয়া বাঁচিতে হয়।

মানুষ ত ভূমার ক্ষণিক অবতার; সেই ক্ষণিক আবির্ভাবের স্থায়িত্বটুকু লইয়া সে কত মায়াজাল রচনা করে। সে অপূর্ণ হইলেও নিজের সঙ্গে নিজে খেলা করে, অথচ কেমন যেন একটা সঙ্কীর্ণতার চাপে কষ্টও পায়…। বন্ধু আমার! মস্ত একজন নট তুমি; নিজের সৃষ্টিতে নিজে এমন মজিয়াছ যে রঙ্গমঞ্চে কোন একজন মানুষের জীবন বলি দিলে তুমি শোকে মুহ্যমান হও! তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার মহান্ সৃষ্টি-প্রেরণারই খেলনা, তাই ত তোমার বিকাশের অন্ত নাই। তোমার নিজের তৈরি খেলায় নিজেকে ধরা দিয়াছ; তোমার নিজের সৃষ্টির কাছেই নিজে ঠকিতেছ! তুমি যেন মূনে স্যুলী (Mounet Sully) হাম্লেটের ভূমিকায় নামিয়াছ। বেচারা ভাবিতেছে সে যেন সত্যই হ্যামলেট! বুঝিতেই পারিতেছে না যে যত বড়ই হোক তা'র বীরত্ব, সেই একটা চরিত্রের মধ্যে নিজেকে বন্দী করিলে নিজেকে ছোট করা হয়; তবু অতখানি সহানুভূতি ও পরের প্রাণে অনুপ্রবেশও ওরই মধ্যে বড় জিনিষ; এক জন নট দুই তিন কত চরিত্রের জীবনে নূতন করিয়া জীবন্ত হইতেছে। কিন্তু অসংখ্য জীবন-বৈচিত্র্যের কাছে দুই তিনটা জীবনের ছবি আর কি?

তাহা হইলে কি উল্টা ঝোঁকে পড়িয়া Spinozar মত বলিতে হইবে—শুধু জ্ঞানের সাহায্যে, জ্ঞানের মধ্যে বাঁচিতে হইবে? তাহাতে কি ঘটিবে? অহম্‌কে বলি দিয়া ভূমা হওয়া। কিন্তু এখানে আমার প্রকৃতিও স্বাভাবিক জ্ঞান বিদ্রোহ করিতেছে; এমন-কি, যদি শুধু জ্ঞানীই হইয়া উঠি তাহা হইলেও ত চিরন্তন জীবনের অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ আভাস ছাড়া আর কিছুই পাইব না; আর সেই অস্পষ্টতার কাছে আমার নিজের জীবনের অপরোক্ষ দৃষ্টি ও অনুভূতিকে বলি দিব? সেটাও ত এক-রকম ক্ষতি; প্রজ্ঞা বলে যে জ্ঞানের যথার্থ কাজ সর্ব্বদা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মর্ম্মস্থলে ভূমাকে উপলব্ধি করা—তাঁহাতে জীবনের দুঃখ বেদনা ছাঁকিয়া লওয়া—তাঁহাতেই আবার জীবনের যত আনন্দকে ধৌত-বিশুদ্ধ করা।

তাহা হইলে আমরা যাহা-তাহা বুঝিয়া বাঁচিতে শিখিতে হইবে। এই ক্ষণিকের নটভূমিকায় সমস্ত মন দিয়া নামিতে হইবে। কখন ইহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা, আবার কখন প্রলয়ের তাণ্ডব দুইটাকেই আয়ত্ত করিতে হইবে। **সমস্ত শক্তির** সঙ্গে ভাবা, অনুভব করা, কাজ করা—এই ত জীবন! কিন্তু সর্ব্বদা এমনি একটা শান্তিহীন উদ্দাম জীবন যাপন করিতে হইবে না, স্বভাবকে সংযত করিয়া সময় সময় তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবার প্রয়োজনও আছে। আমি যাহা তাহাই হইব, কিন্তু আমার **পূর্ণ** আমি হইতে হইবে এবং (তদপেক্ষা কঠিন সাধন) আমার কাছে আমি যেন প্রতারিত না হই।

এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে টাল সাম্‌লাইয়া ওজন ঠিক রাখিয়া চলা কি কঠিন ব্যাপার! ইচ্ছা করিলেই মানুষ পারে না; কিন্তু তবু চেষ্টা করারও মূল্য আছে। ঐ **মধ্যম পন্থা** ধরিয়া চলিতে পারিলে সকলই সুন্দর সকলই কল্যাণকর বোধ হইবে; কারণ সমস্তই যে এক অনুপম শিল্পীর চোখে দেখা রঙ্গনাট্যের মতন। হাস্যরসিকের হাসির স্পর্শমণি যেন সমস্ত সুখকে অনুপম ও সমস্ত দুঃখকে জ্যোতির্ম্ময় করিতেছে! হাসি যাদুমন্ত্রের আংটিটা পৃথিবীর কপালে ছোঁয়াইল আর মাটি যেন সোনা হইয়া গেল! সূর্য্যের আলো যেমন চাষার কুঁড়ে ঘর ও তা'র তুচ্ছ পোষাক সুন্দর করিয়া তোলে, তেমনি যা কিছু নীচ, যা কিছু আমাদের বিতৃষ্ণা জন্মায়, সব যেন আলোর অভিষেকে জ্যোতির্ম্ময়! নিখিল বিশ্বের মর্ম্মগত প্রশান্তি যেন তাহাদিগকে এক অপূর্ব্ব সুরলালিত্যে ডুবাইয়া দেয়। হাসি! এই ত বিশ্রামের অমৃতরস, এই ত নিজেকে দেবতার মত মুক্ত সর্ব্বশক্তিশালী মনে করা। নিষ্ঠুরতম জীবনের লৌহশৃঙ্খলকে উপেক্ষা করিয়া যন্ত্রণার মধ্যেই অনুপম আনন্দ—মৃত্যুর মধ্যেই অমৃত আস্বাদ করা। এই বিশ্বাস আত্মার মধ্যে যেন শান্তির

সূর্য্যকিরণ আনে; গ্রীক দেবতাদের মহান্ সুন্দর আত্মসংবরণ—হাস্যরস ও ভাবাবেগের অপূর্ব্ব সমাবেশ—যাহা এই জীবনের মধ্যে থাকিয়াই জীবনের উপরে উঠিতে শিখায়।

কেমন করিয়া বাঁচিতে হয়।

প্রেম

আমার বিশ্বাসের ভিত্তি এখনও অসম্পূর্ণ; **পর**কে আপন করিবার সাধনা কই? আমারই মতন পরও যে সমান অধিকারে এ পৃথিবীতে রহিয়াছে, আমারই মতন পরও যে ভূমার অংশ। জ্ঞান আসিয়া পরকে ভালোবাসিতে উপদেশ দেয়। টলষ্টয় বলিয়াছেন "অধ্যাত্ম সাধনের সব চেয়ে স্পষ্ট এবং বড় প্রমাণ এইখানে: মানুষের সবচেয়ে বড় মুক্তি বড় আনন্দ বড় সৌভাগ্য যদি কোথাও থাকে ত সে **ত্যাগে ও প্রেমে**।" শুধু আপনার মধ্যে ভূমাকে ভালোবাসিলে হইল না। ইহা পূর্ণরূপে, সত্যরূপে বাঁচা নয়; সবল জীবনের ভোগতৃপ্তি হইতে নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিয়া এই স্বর্গ-নাট্যের (Divine Comedy) একটি অঙ্কে অপরের ভূমিকার মধ্যে নিজেকে পূর্ণভাবে মিলাইয়া দিতে হইবে! জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ কোন্‌টা? অপরকে ভালোবাসা ও অপরের ভালোবাসা পাওয়া নয় কি?

নিরুদ্বেগ হাসির মধ্যে একরকম স্বার্থপরতা লুকাইয়া আছে। স্বার্থপরতাটাকে লোকে যথেষ্ট ছোট করিয়াছে। আমি স্বার্থপরতাকে অতটা নামাইতে চাই না; হয়ত ইহা প্রেমেরই একটা উৎস। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) কিন্তু স্বার্থের মধ্যে প্রাণকে সীমাবদ্ধ করাটা প্রাণকে অঙ্গহীন করারই নামান্তর। "সকলই ত মায়া! কি হইবে ভালোবাসিয়া? যাদের ভালোবাসি তাহারা ত মায়া—মায়াই ত সব, প্রেম কোথায়?"—এমনিভাবে সবটাকে "হাস্যমুখে পরিহাস" করাই কি চরম? বিচার করা আর হাসা? একা স্বয়ম্ভুর মত বিশ্বনাট্যটা দূর হইতে উপভোগ? আপনাকে লইয়াই আপনার অন্তহীন উৎসব? অথচ এই 'আপনি' নিঃসঙ্গ নিরানন্দ—কেহই ভোগে-উপভোগ করিবার নাই।

ভোগ-সম্রাটদের এই স্বার্থপূর্ণ নিরানন্দ আত্ম-বিযুক্তি (detachment) আমায় খুব পীড়া দিয়াছে। তাহার উপর ১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসে শিল্পকেন্দ্র ফ্লান্‌ডার্স্-(Flanders) এর মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিবার সময় এ সম্বন্ধে সমস্যা ঘনীভূত হইয়া উঠিল; বিচিত্র চেতনার ভোগ-চক্রে একটা বিষম অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম—যেন কি একটা অসুখ করিয়াছে! একটা অপ্রীতিকর উষ্ণতায় ভরা আবদ্ধ গুহা-গৃহে যেমন সন্ন্যাসীরা থাকে তেমনি একটা উৎকট অথচ মায়িক বৈরাগ্যের অন্তরালে সৌখীন শিল্পীরা সব তারিফ করিতেছেন! আমার মন কপট বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; সেই সুযোগে প্রবল অনুরাগ-বৈরাগ্যের দরজা ভাঙিয়া ঢুকিল; প্রেম আমায় জয় করিয়া লইল। আমি চকিতে দেখিলাম আমার বিশ্বাসের সত্য ভিত্তি কোথায়; সে ত প্রাণকে অস্বীকার করা বা প্রতিবাদ করায় নয়, কর্ম্ম চেষ্টার নিরোধে নয়, মানুষ হইতে তফাৎ হওয়ায় নয়—পরন্তু প্রেমে সকলকে এক করায়। এই প্রেমই কি বিশ্বাসের ভিত্তি নয়? ইহাই কি আমাকে মায়া কারাগার হইতে মুক্তি দিয়া ভূমার মধ্যে অবগাহন করিতে শিখায় নাই? সেই ভূমাকে আমি আবার নিজের এবং অপরের অনুভূতির মধ্যে পাইলাম। ইহাতেই ত বুঝিলাম অপরকে ভালোবাসা ভূমাকেই ভালোবাসা। তাঁহাকে অপরের মধ্যে ত ভালোবাসি এবং তিনি এই অপরের মধ্যে যতখানি আছেন ততখানিই তাঁকে পাই; মানুষের মধ্যে জ্ঞান যত উদার, অনুভূতি যত তীক্ষ্ণ, প্রেম যত গভীর ও উন্নত ততই মানুষ ভূমাকে পাইয়াছে, ততই মানুষ বেশী প্রাণবান্। এই মানুষদের ভালোবাসা আমার ও অপরের পক্ষে স্বাস্থ্য-কর, কল্যাণকর।

অবশ্য এই মানব-অস্তিত্বকে আমি ততটাই বিশ্বাস করি যতটা করি একটি মহানাটকের বিচিত্র নটভূমিকায়; হ্যাম্‌লেটকে ইসোল্‌ড্‌কে যেমন ভালোবাসি তেমনি দুএক-জন মানুষকেও বাসি; অসংখ্য-রকমে ভালোবাসা সম্ভব নয়। তবে এই মানব-শরীরের দৈবী সৃষ্টি ও মানব আত্মার দৈবী সৃষ্টির (শিল্পাদি) মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। আমার ভালোবাসা যখন শিল্পাদির উপর পড়ে তখন সে প্রেম শুধু আদর্শ-গত ও অশরীরী, কিন্তু মানুষের

সঙ্গে ভালবাসা অনেকটা শরীরগত ; তাহারা যে আমার সঙ্গে এক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে নামিয়াছে। সহস্রবার জীবন্ত সুখের আদান প্রদানে যে ইহাদের সঙ্গে আমার প্রেম নিবিড়ভাবে সম্বন্ধপূর্ণ। শিল্পের মধ্যেও আমি এবং এই বহির্জগৎ সম্বন্ধ-সাদৃশ্যে জড়িত—আমার মতি যেন বিশ্বরূপে রূপান্তরিত ; কিন্তু বিশ্ব নিছক আমার নয় ; আমি ইহার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ করিতে সৃষ্টি করিতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না।

অথচ জীবনগত সম্বন্ধের চরম সত্যটি হইতেছে এই **আত্মোৎসর্গ** ;—যে সব প্রাণী আমায় ঘিরিয়া আছে তাহাদের জন্য স্বার্থত্যাগ। সামান্য একটু আরাম বর্জ্জন হইতে প্রাণোৎসর্গ পর্য্যন্ত এই স্বার্থত্যাগের অসংখ্য রকমভেদ আছে। এই ত্যাগের সাহায্যে আমরা আমাদের মায়িক সত্তাকে লুপ্ত করিয়া ভূমার প্রেমে অমর হইতে পারি। কারণ আমার মধ্যে ও অপরের মধ্যে যে ভূমা আছেন তাঁহাকে বিশুদ্ধ ভাবে আমরা সাধারণতঃ ভালবাসি না। এমন-কি যখন ভাবি তাঁহাকেই ভালবাসিতেছি, তখনও আমরা ভিতরে ভিতরে স্বার্থ ও মায়ার ঝোঁকেই ছুটিয়াছি। এই আপাত-মুগ্ধকর দার্শনিক সৌখীনতার আবরণ ভেদ করিলে দেখিব সেখানেও অহম্! সুতরাং মানব-জীবনের আদর্শ হইতেছে নিম্নলিখিত ভাবগুলির সমন্বয় সাধন।

১। সংস্থিত প্রশান্ত শান্ত-হাস্য—প্লেটো (Plato), গ্যয়েটে (Goethe), রেণা (Renan)।

২। ভাবের উদ্দামতা (ইতালিয় রনেসাঁস যুগের)।

৩। টলষ্টয়ের করুণা।

এইগুলি সমন্বয় করিয়া চলাই সত্য বাঁচা।

মনে রাখিতে হইবে যে, আমি ভূমার অংশ এবং সেই অংশে ভূমার লীলায় তাঁর ক্রীড়নক। নির্ম্মল গভীর দৃষ্টি-ও সরাগ শান্ত হাস্য লইয়া সমস্ত দেখিতে হইবে। সে দৃষ্টি শুধু ভক্তের (St. Thomasএর মত) দৃষ্টি নহে, সব দেখিতে হইবে, ছুঁইতে হইবে, সন্দেহ করিতে হইবে।

উদ্দাম প্রবল জীবনের যত শক্তি আছে সব নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের নটভূমিকায় চূড়ান্ত অভিনয় করিয়া যাইতে হইবে।

অপরেও অভিনয় করিতেছে ; তাহাদের আদর্শসিদ্ধিতে সাহায্য করিতে হইবে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে প্রত্যেক নটকে ও সমগ্র নাট্যখানিকে সার্থক করিতে সাহায্য করিতে হইবে। নিজেকে অপরের মধ্যে বিলাইয়া দিতে হইবে। খাটা, ভালবাসা, দান করা, আত্মোৎসর্গ করা—এই ত জীবন। অপরকে দেওয়া ভূমাকেই দেওয়া সুতরাং নিজেকেই বাড়াইয়া তোলা।

পরিশিষ্ট

(ক) স্বার্থপরতা—

উদার আত্মপ্রীতি স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সত্তায় সত্তায় যে-প্রীতি আছে ইহা তাহারই প্রকার ভেদ। ভূমার মধ্যে নিজেকে ভালবাসা, ভূমাকে ভালবাসা, প্রকৃষ্টতর বটে কিন্তু সে-ভাব মুষ্টিমেয় ভক্ত সাধকের, যারা ধর্ম্ম বা শিল্পের ভিতর দিয়া সাধন করেন। অন্য পক্ষে আত্মপ্রীতি যদিও নিকৃষ্ট শ্রেণীর তথাপি তার ভিতরের ঐশী ভাবটি সকলেরই হৃদয়ে দেখি ; যে যত জীবন্ত, আত্মপ্রীতি তার ততই বেশী। ইহাকে স্বার্থপরতা বলিয়া ঘৃণা করা অন্যায়। ইহা অধিকাংশ মানুষের প্রাণে ভূমার একমাত্র রশ্মি—তার মহান্ প্রেমের একমাত্র স্ফুলিঙ্গ। এই স্বার্থবোধটুকু বাদ দিলে জগতে বাকী থাকে কি? প্রাণের লোপ—গতি-প্রবাহের লোপ—মৃত্যু! স্বার্থবোধই ত জগতের চালন-শক্তি। ভূমা যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর স্বার্থপর! তার কাছে আত্মপ্রীতিই যে পর-প্রীতি। তিনিই যে একমাত্র সত্তা ; তাঁহার বাহিরে যে কিছুই নাই। তাঁহার সত্তা কোন সংগ্রাম না করিয়া বিস্তৃত হইতেছে। ভূমার প্রেম তাঁর সর্ব্বশক্তিমান প্রাণেরই যে প্রকাশ, ইহার কোন সীমা নাই—আছে শুধু সচেতন সজ্ঞান পরিপূর্ণতা।

(খ) শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, আমাদের শিক্ষা দেওয়া কিরূপে এই বিশাল সৃষ্টি-পরিক্রমায় আমাদের নিজ নিজ স্থানটি অধিকার করিয়াও ভূমাতে প্রাণস্ফূর্ত্তি করা যায়। ধর্ম্ম আমাদের শিখায় যে, এ জীবন একটি মহা পরীক্ষা ; এখানে সচেতনভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে, অথচ আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমার্ঘ্য তাঁকেই দিতে হইবে যিনি শাশ্বতরূপ (l' Eternel)।

শিল্প আমাদের আত্মার সমস্ত ব্যবধান চূর্ণ করিয়া অন্য আত্মার সহিত একাত্ম হইতে, ভূমার অন্য অন্য রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইতে সাহায্য করে। সেই যে মহান পরিপূর্ণ প্রাণস্রোত, যাহা আমাদের খণ্ড জীবনকে সম্পূর্ণ করে—সেই স্রোত হইতে নূতন প্রাণশক্তি আহরণ করিতে শিল্প শিক্ষা দেয়।

নীতি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে অপরের জন্য (অল্প বিস্তর) উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দেয়; ইহা এ জীবনে স্থায়ী মূল্য নির্দ্ধারণের ক্রমটি দেখায় এবং ক্ষণিকত্ব হইতে অমরত্বে লইয়া যায়।

বিজ্ঞান মানুষী ও অমানুষী সত্তাদের ভিতরকার নিয়মগুলির অন্বেষণ করিতে শিখায়; এই দিব্য জীবন-নাট্যে—স্থায়ী অস্থায়ী যত জিনিষ যত অভিনেতা আছে—সব বুঝিতে এবং বুঝিয়া তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে শিক্ষা দেয়। ভূমা যে নিয়মের অধীন তাহা নয়; কিন্তু তাঁর লক্ষ লক্ষ পদবী ও সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম থাকা অনিবার্য্য যাহা লোপ পাইলে সৃষ্টিও লোপ পায়।

(গ) প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝিয়া পালন করা, এবং তাহাদের উপর উঠিবার প্রয়োজন।

আমার প্রিয় বন্ধু স—লিখিতেছেন—"আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির চমৎকার সংগ্রাম চলিয়াছে!" সত্য বটে বন্ধু! কিন্তু এযুদ্ধে আত্মা যেন চিরদিনই পরাজিত! এই পরাজয় বেশী নিষ্ঠুর, কারণ ইহার মধ্যে কোনই গৌরবের লেশ নাই। মহত্তম আত্মার মধ্যেও এই সংগ্রামের ভীষণ নিদর্শন পাই। মহাত্মা হইয়াও যাঁহারা প্রকৃতিকে অস্বীকার করিতে চান "প্রকৃতির প্রতিশোধ"টা প্রচণ্ডভাবে তাঁহাদের উপরই পড়ে—বিশেষভাবে তাঁদের শরীরে।

"ভীষণ দেহ-নির্য্যাতন চলিতেছে; ধীরে ধীরে যেন নিজেকে হারাইতেছি……

আত্মা শরীরকে ঘৃণা করিয়াছিল এখন সে শরীরেরই ক্রীতদাস!

"আমার স্বপ্নের মধ্যে পাগ্‌লামী কতটা ছিল এখন বুঝিতেছি; আমি এখন যেন বলির পশু…"

স্বভাবকে অপমান করিয়া খেদাইলে সে দ্বিগুণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাহার হুকুম তামিল করাইয়া লয়।

"নিষ্পাপ হইবার উৎকট আগ্রহ শেষে আমার বিষম অনিষ্ট করিল—তাহা হইতেই আমার সমস্ত অবনতি…"

অত্যধিক আত্মশাসন, সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি, শেষে আত্মার মর্ম্মস্থলে কাল সন্দেহের প্রবেশ। তাহা হইতেই নাস্তি-বাদ ও তৎপ্রসূত পঙ্গু ভগবৎ-আক্রোশ।

প্রকৃতি আমাদের হাতের যন্ত্র, মানুষ আমরা তাহার উপর আছি, কিন্তু তাহার সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন কাজ করিতে পারি না। কর্ম্মের জন্য প্রাণের জন্য আত্মার বিকাশের জন্য কত শক্তিপূর্ণ উপকরণ প্রকৃতি আমাদের দেয়; যদি সেগুলি আমরা প্রত্যাখ্যান করি প্রকৃতি আমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়। সুতরাং তাহাকে দলে টানিয়া লইতে হইবে। **অসম্ভবের** ব্যর্থ সাধনা ছাড়িয়া **সম্ভবকে** সাধিতে হইবে; ঐ অসম্ভবকে যত বড় করিয়াই দেখান হউক না কেন, স্বাস্থ্যবান সুসঙ্গত আত্মার কাছে তাহা অস্বাভাবিক এবং উৎকট, সুতরাং অসুন্দর। সম্ভবও যে সীমাহীন, তাহার মধ্যে যে সব আছে, শুধু দৈবী নিয়মের ছন্দ রক্ষা করিয়া আছে। গ্যয়টের মতে সত্য মনুষ্যত্ব এই মহান্ ছন্দজ্ঞান ও আত্মসঙ্গতিরই নামান্তর।

সত্য মানুষ হইতে চেষ্টা কর! দেবত্বলাভের প্রকৃষ্টতম উপায় ঐখানেই।

মৃত্যু

এখন বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্ মরণ কি?

মরণ! তোমার জন্যই যে প্রাণ ধারণ করিতেছি, তোমার জন্যই ত লিখিতেছি রচনা করিতেছি; তুমি যে আমার সকল কর্ম্মের প্রণালী, সকল চিন্তার উৎস। আমার এই স্থূল অসুন্দর ভাষার আবরণ ভেদ করিয়া দেখাইতেছ যে, তুমি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; তুমি যে আমার সকল সৃষ্টি সারা হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছ, তুমি যে নিখিলের আত্মা।

হে মরণ! তুমি যে পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান প্রাণরূপ; তুমি আমার আসল সত্তাকে আনিয়া দিয়াছ; একমাত্র তুমিই ত মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে পার; মায়াকে জয়

করিতে আমাদের কি সংগ্রাম! তুমি আমায় মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সচেতন আনন্দে বিশ্বপ্রাণের স্রোতে ঝাঁপ দিতে সাহায্য করিতেছ......

"বিশ্বসঙ্গীতের অসীম প্রবাহ—ঐ তরঙ্গায়িত স্বর-প্লাবনের মধ্যে ঝাঁপ দাও—আপনাকে ডুবাইয়া দাও; সেই মহান অচৈতন্যই সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা!" (R. Wagner : *Tristan* and *Isolde*) মুমূর্ষু ইসোলডের শেষ উক্তির মধ্যে 'অচৈতন্য কথাটা বিষম ব্যথা দেয় তাদের যাহারা তুচ্ছ স্বার্থের সমস্ত নৈরাশ্য দ্বারা বর্ত্তমানের নীচতাকে আঁকড়াইয়া আছে। সেই বেদনাকাতর হতভাগ্যদের ভরসা দিতে হইবে। যাহারা নিজ নিজ খেলার সাজগুলিকে নিজেদের সত্তার সঙ্গে ভ্রম করে—তাহার উপরে উঠিতে পারে না—তাহাদের পক্ষে মৃত্যু কি বুঝিতেই পারি না! যে মায়ায় আবদ্ধ হইয়া তাহারা জীবন কাটাইল, সে মায়াজাল ছিন্ন হইবে; এবং যাহাকে তাহারা স্থায়ী সত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল তাহা ধূলার দেহের সঙ্গেই ধূলা হইবে। কিন্তু তাদের চেতনা বেদনার অনুরণন, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের স্বর সব দূরাগত প্রতিধ্বনির মত স্তনিত হইবে না কি? যে সচেতন প্রাণ-স্রোত ঐসব মানুষগুলিকে প্রাণবান করিয়াছিল, সেই স্রোতের সঙ্গীত নিয়ে ভীষণ নিরয়-গহ্বরকে মুখরিত করিয়া উর্দ্ধে কোনো দিব্য সঙ্গীত-শিল্পীর নক্ষত্র-বীণায় ঝঙ্কার তুলিবে না?

বিশ্বাস যাহাদের আছে তাহারা বলিবে—এই সঙ্কীর্ণ প্রাণ হইতেই মানুষ অনন্তের আভাস পাইয়া যায়; মানুষের সত্তা যে অনন্তের উপাদানে গড়া। সুতরাং মরণ আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করে না—করিতে পারে না; অনন্ত জীবনকে সে স্পর্শই করিতে পারে না। যে-সমস্ত আবরণ নিখিল সত্তার দৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করিয়াছে, মরণ তাহা ছিন্ন করিয়া আমাদের শক্তি ও আনন্দকে বাড়াইয়া দেয়। মরণ সমস্ত ব্যবধান চূর্ণ করিয়া মুক্তি দেয় বলিয়া সত্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আর কোন জিনিষই ঠেকাইতে পারে না; সত্তার সত্যলোকে যাহা কিছু ভাবি, ইচ্ছা করি, কার্য্যে পরিণত করিতে চাই, সবই নির্ব্বাধ ভাবে সম্পন্ন হয়; পূর্ণ সত্তার সঙ্গে খণ্ড সত্তা এক হইয়া যায়, আমাদের ও ভূমার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

ভালবাস!

হে আমার দুঃখ-সুখের সাথীগণ! তোমরা আমার আত্মা, এস পরস্পরকে ভালবাসি। যে অপরকে দেয় সে ভূমাকে দেয়, যে ভূমাকে দেয় সে ভূমা হইয়া যায়।

যৌবনারম্ভে রম্যাঁ রলাঁ

কিন্তু বন্ধুগণ! গূঢ় সাধনের প্রলোভন হইতে সাবধান! আগুন লইয়া খেলা করিও না, আত্মা ত উৎসুক কিন্তু শরীর যে দুর্ব্বল। পরকে ভালবাস, কিন্তু ভুলিও না যে তোমার আমার ব্যক্তিগত জীবনটাও সত্য; সত্যের অংশ মাত্র বলিয়া আমাদের পদবীগুলি মায়িক নয়। জগতের নিয়মগুলি মানিয়া চলিও; সেই নিয়ম অনুসারে প্রাণ ধারণ করিয়া ভূমার নিয়মও পালন করিতে হইবে। আমরা কে জানিতে চেষ্টা কর; যে যে ভূমিকায় এই জীবননাট্যে নামিয়াছি তার নিখুঁৎ অভিনয় করিতে হইবে;

শুধু মনে রাখিলেই যথেষ্ট যে, আমি একজন নট মাত্র! কিন্তু এমন যেন না হয় যে ঐ চিন্তাটা মধ্যে মধ্যে ভুলিতে না পারায় সমস্ত স্থিরবিশ্বাস ধ্বংস হয়—সমস্ত কর্ম্ম-চেষ্টা বন্ধ্যা হইয়া যায়।

গূঢ় সাধনের বিকৃতি হইতে আত্মরক্ষা কর, সেই সন্দেহ-ধর্ম্মী আত্মম্ভরিতা হইতে যে-বন্যা ছোটে তাহা যেন হৃদয়ে প্রবেশ না করে। উহা হইতেই এক বিতৃষ্ণাপূর্ণ রুগ্ন সাহিত্য বাহির হইয়াছে। তাহার এক দিকে বিকট বাস্তব অন্য দিকে মনুষ্যত্বহীন আদর্শ! * ইহার ইচ্ছা মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের গারদে বন্ধ করিয়া রাখা। যে-সব মানুষ কখনও ভালবাসে নাই সে-সব অতিবুদ্ধি লোকেদের তিক্ত চিন্তাকে সন্দেহ করিতে হইবে :—

"ঘটনার স্রোত বাহিয়া মানুষ পাশাপাশি চলিতেছে, দুইটি প্রাণী কখনও এক হইয়া মিলিল না। যাত্রা পথ ছোটই হউক আর বড়ই হউক সহযাত্রীরা সব উদাসীন। এক ও অন্যের মধ্যে যে অলক্ষ্য ব্যবধান আছে তাহা কিছুতেই ভাঙিবে না; সুতরাং একটি মানুষ অন্য মানুষ হইতে এতটা দূরে যে আকাশের একটি নক্ষত্র হইতে আর-একটি নক্ষত্র ততটা দূর হইতে পারে কি না সন্দেহ…" (মপাসাঁ) †

এ জগতে বীরত্ব শুধু এক প্রকারের সম্ভব—জগত যেমন ঠিক তেমনই দেখা এবং তাহাকে ভালবাসা।

সন্দেহবাদী মপাসাঁর সঙ্গে তুলনায় টলষ্টয় ও দস্তয়ভস্কী বড় কিসে? প্রেমের এতটুকু রশ্মি, মৈত্রীর দিব্য জ্যোতি রূপে এদের শিরে অমরত্বের মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। যে গারদের মধ্যে মানবাত্মা বন্দী হইয়া চিরকাল নিজের সঙ্গে নিজে ব্যর্থ বিতর্কে মগ্ন ছিল সে গারদের দ্বার প্রেম আসিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে। সমাধি-কক্ষ ভেদ করিয়া যেন মৃত আত্মা পুনর্জীবিত হইল—আমাদেরই আত্মার মত আর-একটি আত্মাকে চিনাইল। একই আত্মা সকলের সঙ্গে প্রাণের খাদ্য বণ্টন করিয়া উপভোগ করিতেছে। নিজের হাত হইতে—নিজের শরীর হইতে—এই খাদ্য বণ্টন—এই ত ভগবান!

বন্ধুগণ! খৃষ্ট বলিয়াছেন, "স্বর্গ নির্ম্মলহৃদয় মানুষদেরই"; স্বর্গ আমাদের সকলের হৃদয়েই রহিয়াছে। শুধু চাই একটি প্রেমের দৃষ্টি—তাহা হইলেই দেখিতে পাইব——বুঝিতে পারিব——যাহাকে-তাহাকে নয়—ভগবানকে; তিনিই যে আমাদের চলার পথগুলির মিলনভূমি; ঐখানে সকল আত্মা যে পরস্পরকে স্পর্শ করিতেছে; যতবার কোন একটি জীবন্ত আত্মা দুঃখ বা সুখ অনুভব করিতেছে—আমার প্রাণে তার প্রত্যেকটি সাড়া আসিতেছে! সেও আমার হৃদয়ের সাড়া পাইতেছে। আমরা যে দুইয়ে এক! এই ক্ষণিকের নিগূঢ় উদ্বাহের ফলে ঐক্যবোধ গোপনে জন্মগ্রহণ করে। এক বিরাট আত্মার বিচিত্র সুর-সঙ্গীত আমাদের প্রাণ পূর্ণ করিতেছে; প্রেম তাহার সুর-সন্ধির যোগসূত্র—তাহাতে এক সঙ্গে সংগ্রাম ও আলিঙ্গনের সমন্বয়! প্রেম বাদ পড়িলে চির-অন্ধকার **প্রেমই প্রাণ-শিখা!**

জয়! প্রেম! চির প্রেম!

(সমাপ্ত)

[**অনুবাদকের নিবেদন**—১৯২৩ সালের শেষে রমাঁ রলাঁ মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া ইউরোপ ছাড়িবার পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে তার কাছে শুনি, যে, যৌবনের প্রারম্ভে তিনি তার তরুণ জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও মূল সিদ্ধান্ত-গুলি লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রবন্ধের নাম দেন লাটিন ভাষায় "*Credo quia Verum*", "সত্যই বিশ্বাসের ভিত্তি"। এই প্রবন্ধের মূল ফরাসী অথবা কোন অনুবাদ রলাঁ প্রকাশ করিতে দেন নাই; কেমন একটা সঙ্কোচ বরাবর প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। অথচ তার ঐ প্রথম রচনা—প্রথম আত্মজিজ্ঞাসাটি পাঠ করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় উহা দেখিবার অনুমতি চাই। স্নেহবশতঃ তিনি সে অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারেন নাই; এবং ক্রমশঃ

* ১৮৮৮-৮৯এর মধ্যে প্যারিসে এই সাহিত্যের বন্যা বহিতেছিল। তাহার অলীক আদর্শবাদ ও বিকৃত বস্তুতান্ত্রিক রসবোধ আমার মনে বিষম বিতৃষ্ণা আনে। এই সাহিত্যকে আমি কয়েক বৎসর পরে ভীষণ আক্রমণ করি। "আদর্শ মিথ্যাবাদ" নামক সেই প্রবন্ধ Revue de l' Art Dramatiqueএ প্রকাশিত হয়।

† আমার এসময়ের চিন্তা পরে পরিস্ফুট হইয়া আমার মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

বাঙলার পাঠকদের এটি উপহার দিবার অনুমতিও তাঁর কাছে পাইয়াছি। সেজন্য রলাঁ মহোদয়ের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রবাসীর পঞ্চবিংশতি বৈজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই গভীর প্রবন্ধটি আমার মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া উপহার দিতেছি।

সত্যসুন্দরের উপাসক কিশোর রলাঁ যৌবনের শিল্প-সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার ঠিক্ পূর্ব্বে এই প্রবন্ধটি লেখেন। ১৮৮৬ সালে কুড়ি বছর বয়সে রলাঁ Ecole Normale নামক প্যারিসের প্রসিদ্ধ শিক্ষাভবনে প্রবেশ করেন; এবং তিন বছরে সেখানকার শিক্ষা শেষ করিয়া ১৮৮৯ সালে বৃত্তি লাভ করিয়া রোমে যান এবং সেখানকার ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মধ্যে থাকিয়া তাঁর "ইউরোপীয় অপেরা"র উপর থীসিস্ প্রস্তুত করেন।

১৮৮৬—১৮৮৯ রলাঁর জীবনের সৃষ্টি-পর্ব্বের যেন সান্ধ্যক্ষণ। এই Ecole Normaleএ এক সময় ঐতিহাসিক মিশলে (Michelet), বৈজ্ঞানিক পাস্তর (Pasteur), সমালোচক ব্রুনেতিএয়ার (Brunetiere), দার্শনিক বুত্রু (Boutroux) প্রভৃতি অধ্যাপনা করিয়াছেন; Taine, Jaures, Bergsonএর ন্যায় কৃতকৃত্য ছাত্র বাহির হইয়াছেন। রলাঁর সহপাঠী ছিলেন প্রসিদ্ধ চীন-তত্ত্ববিৎ শাভান্ (Chavannes) ও গ্রীক্-বৌদ্ধ শিল্পের ঐতিহাসিক ফুশে (Foucher)। এই আবহাওয়ার মধ্যে আত্মদর্শন লেখা, সম্ভবতঃ ১৮৮৮তে ইহার আরম্ভ। এই বৎসর তাঁর একটি সহপাঠী বন্ধুর অকাল মৃত্যু হয়। তাকে মনে মনে ইহা উৎসর্গ করেন।

সেই তরুণ বয়সেই আদর্শপিপাসা তাঁর কী তীব্র, তাহা প্রতি পত্রে অনুভব করা যায়; আর-একটি প্রমাণ পাই তাঁর টলষ্টয়ের সঙ্গে পত্রালাপে: এই পত্রব্যবহার চলে ১৮৮৭ সালে; টলষ্টয় যে উত্তর দেন তার উপর তারিখ আছে অক্টোবর ১৮৮৭; প্রবাসীর পাঠকদের এই চিঠিখানি উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

১৯২৩ সালে আমাকে রচনাটি দিবার সময় যে কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ দিলাম:—

"আমার এই রচনায় না আছে চিন্তার তেজ, না আছে মৌলিকতা; কিন্তু একটি ভাব তীব্র ভাবে ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করিয়াছে, যাহা পরবর্ত্তী কালের আমার সমস্ত রচনার ভিত্তি।

অনেকে দেখিবেন, যে, Bergsonএর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই আমার লেখায় Bergsonismএর ছায়া পড়িয়াছে! উদার চিন্তার ধারাগুলি যে একই গভীর উৎস হইতে উঠে এবং পরস্পরকে না জানিয়া না চিনিয়াও যে মানুষ সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, তাহার আর-একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।"

বিংশবর্ষীয় যুবক যে মূল সুরটি ধরিয়া গুন গুন করিয়া আলাপ সুরু করেন, আজ তাঁর ষষ্টি বৎসরের জন্মোৎসবের দিনে দেখি সেই সুরই নানা ছন্দে তানে লয়ে অপূর্ব্ব মহান্ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই বিরাট সঙ্গীত প্রাসাদ নির্ভর করিয়া আছে সেই দুই চারটি মূল সুরের উপর। রলাঁর সমস্ত রচনা, সমস্ত সাধনার ভিত্তি **সত্য** ও **প্রেম**।

শ্রী কালিদাস নাগ

প্রেমের ব্যাপ্তি

(জ্যাশুয়া সিল্‌ভেসটার)

শ্রী অমিয়া চৌধুরী

আমি যদি হইতাম নীচ ওই নিম্ন ভূমিতল,
　তুমি হ'তে সুদূর গগন,
তবু মোর হৃদয়ের বাণী হে আমার প্রিয়, প্রিয়তম,
　তত উর্দ্ধে করিত গমন;
তবু মোর প্রণয় অসীম পরশিত তোমার হৃদয়,
　প্রেম মোর চির অমলিন,
তুমি যথা তথা থাক প্রিয়, এই প্রেমে ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
　তোমা ঘেরি' রবে চিরদিন।

তুমি যদি হইতে ধরণী, আমি অই স্বরগ স্যন্দন,
　মোর প্রেম সর্ব্বকাল শেষ,
সহস্র উজ্জ্বল নেত্রে মুখ তব চির-মনোহর
　চাহিয়া রহিত অনিমেষ—
শতদীপ্ত ভাস্করের সম; আমি এই বুঝিয়াছি সার,
　উচ্চ নীচ স্থান-নির্ব্বিশেষে,
সুদূর বা সন্নিকটে হোক, সেথা তুমি রহ প্রাণ ধরি',
　মোর প্রাণ রবে তব পাশে।

"প্রবাসী"র জন্মের সমসাময়িক কথা

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

প্রবাসীর বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হইল। আজ ইহার পাঠক, লেখক, সম্পাদক এবং পরিচালকবর্গের আনন্দ-উৎসবের দিন। এপর্য্যন্ত আমরা কেবল প্রবাসীর অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি, তাহার অন্তর বাহিরের সুষমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি। কবে কোন্ রত্ন বুকে লইয়া, কোন্ অলঙ্কার স্বীয় সুকুমার অঙ্গে ধারণ করিয়া, কোন্ নূতন বেশে সে বাহির হইল, তাহাই দেখিয়া আসিয়াছি; তাহার কীর্ত্তি, তাহার যশ কোথায় কোথায় ছড়াইল, তাহারই তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই জীবন-সংগ্রামের দিনে সংসারের কত কত বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া, কত বিপত্তির হাত এড়াইয়া প্রবাসী এই মধ্যাহ্ন-যৌবনে পদার্পণ করিল, তাহার সংবাদ শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারিবেন। কিন্তু প্রবাসীর উদ্ভবের সময় যাঁহারা প্রয়াগে ছিলেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম। সুতরাং যৌবনের এই দীপ্ত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত প্রবাসীর জন্মকথা কিছু কিছু আপনাদের শুনাইতে পারিব।

সে আজ ৩১ বৎসরের কথা, ১৮৯৫ অব্দের ২১শে কি ২২শে সেপ্টেম্বর প্রবাসীর ভাবী জন্মদাতা ২৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি কাটরা-নিবাসী বাবু কেদারনাথ মণ্ডলের গৃহে আসিয়া নামেন ও দিনকয়েক পরে অর্থাৎ ৬ই অক্টোবর মেও রোডের দুই নম্বর বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। বাড়ীটি বাবু বাঁকে বিহারী লালের। ঐ বাড়ীতে রামানন্দবাবুর অনেক পরে স্বনামখ্যাত গণিতবিদ্ ডাঃ গণেশপ্রসাদ বিলাত হইতে ফিরিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই বাড়ী ছাড়িয়া রামানন্দবাবু কর্ণেলগঞ্জের দক্ষিণ মোড়ে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর হিন্দুস্থানী খৃষ্টিয়ান্ মিষ্টার্ উইলিয়ম্ জেম্‌সের বাড়ী ভাড়া করেন। পরে কর্ণেলগঞ্জ ও লরেন্স-গঞ্জের সন্ধিস্থলে অধুনা রোজ-ভিলা নামক যে বাড়ীতে কায়স্থ কলেজের বর্ত্তমান ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় বাস করিতেছেন, সেই বাড়ীতে থাকেন।

যে-সময়ের কথা হইতেছে সে-সময় এলাহাবাদে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চার দ্বিতীয় যুগ চলিতেছিল। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে "প্রয়াগ-দূত" নামক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় মধুসূদন মৈত্র মহাশয়, প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্যোৎসাহিনী সভার প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, এংগ্লো-বেঙ্গলী স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বাবু শীতলচন্দ্র গুপ্ত, "অপচয় ও উন্নতি" প্রণেতা স্বর্গীয় বাবু বিষ্ণুচরণ মৈত্র এবং তাঁহাদের সমসাময়িক সাহিত্যানু-রাগী কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালী প্রথম যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম যুগের প্রধান প্রধান কর্ম্মীর স্থানান্তর গমনে সাধারণের যে উৎসাহ এবং জাতীয় সাহিত্যের প্রতি একটা অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়ে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ এই যুগের অবসান হয়, পুস্তকালয় ও সভার কার্য্য বন্ধ হয়, তাহার পূর্ব্বেই 'প্রয়াগ-দূত' উঠিয়া যায়, এবং সভা সমিতি সাহিত্যচর্চ্চা প্রভৃতি নিবিয়া যায়।

এঅবস্থা যে বহু বৎসর স্থায়ী হইতে পায় নাই, তাহার কারণ আমার দুইজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর বিশেষ চেষ্টা। তাঁহারা বাবু অধরচন্দ্র মিত্র, বি-এ, এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ দেব, এম-এ। অধর-বাবু এপ্রদেশের নানাস্থানে গবর্ণমেণ্ট্ স্কুলের শিক্ষকতা করিতে-করিতে সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন, সুরেন্দ্রবাবু কায়স্থ কলেজের উপাধ্যক্ষতা করিতেছেন। ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভার পুনরুদ্ধার করিয়া এবং তাহার সহিত বান্ধবসমিতি নামক একটি বিতর্ক-সভার সংযোগ স্থাপন করিয়া নূতন উৎসাহে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অধরবাবু সভা ও সমিতির প্রথম সম্পাদক হন। বাবু

বিষ্ণুচরণ মৈত্র সভায় যোগ দেন এবং ক্রমে আমিও সহযোগী সম্পাদকরূপে তাঁহাদের সহিত কাজ করিতে থাকি। এই সভা এক সময় স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালীর মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৩০৩ সালের ১লা বৈশাখ জনষ্টনগঞ্জে প্রয়াগ-বঙ্গসাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার বেশ মনে আছে, বান্ধব সমিতির এক অধিবেশন কর্ণেলগঞ্জে পুত্র হাউসের প্রশস্ত হলে হইয়াছিল। সেদিন আমি "জাতীয় সাহিত্য ও উন্নতি" নামক একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। প্রবন্ধটি ছিল দীর্ঘ। বহু বৎসর পরে তাহাকে ছোট করিয়া "বঙ্গদর্শনে" দিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় প্রচারের শেষ সংখ্যার পূর্ব্ব সংখ্যায় তাহা বাহির হইয়াছিল। সভাভঙ্গ হইলে রামানন্দবাবু আমায় অভিনন্দিত করেন। সেই তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারপর কর্ণেলগঞ্জে বান্ধব সমিতির আর-এক অধিবেশনে আমরা তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ করি। এই সময় তিনি "দাসী" নামক মাসিক পত্রখানি সম্পাদন করিতেন। তাহার কিছুদিন পরে "প্রদীপ" সম্পাদন করেন। আমার মনে পড়ে, একদিন "Scientific Instrument Company"র প্রবর্ত্তক আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু (এক্ষণে রায় বাহাদুর) বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত রামানন্দ-বাবুর বাড়ী যাই। তখন তিনি জেম্সের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। সেদিন বেণী-বাবু তাঁহার "রঞ্জেন আলোক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'দাসী'তে প্রকাশ করিবার জন্য দিয়া আসেন। তখন এক্স্ রে সংজ্ঞার তত প্রচলন হয় নাই। প্রবন্ধটি দাসীতে বাহির হইয়াছিল।

রামানন্দবাবু কর্ণেলগঞ্জ হইতে উঠিয়া ব্যারিষ্টার রোষনলালের বাড়ীর নিকট সাউথরোডের ২।১ নম্বর বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। এই বাড়ীতেই প্রবাসীর জন্ম হয়। ইহার এবং আশপাশের কোন বাড়ীর এখন চিহ্ন মাত্রও নাই। এই সময় আমি ইণ্ডিয়ান প্রেসের জন্য "চরিত্রগঠন" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলাম। বইখানি "প্রবাসী" বাহির হইবার এক বৎসর পরে বাহির হইয়াছিল, এবং রামানন্দবাবু তাহার প্রুফ সংশোধন করিয়া ও ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। একদিন ইণ্ডিয়ান্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় রামানন্দবাবু কতকগুলি ছবি এবং কাগজ পত্র লইয়া আসিলেন। সেইদিন জানিলাম, তিনি শীঘ্রই একখানি সচিত্র মাসিক পত্র বাহির করিবেন এবং আমাকেও
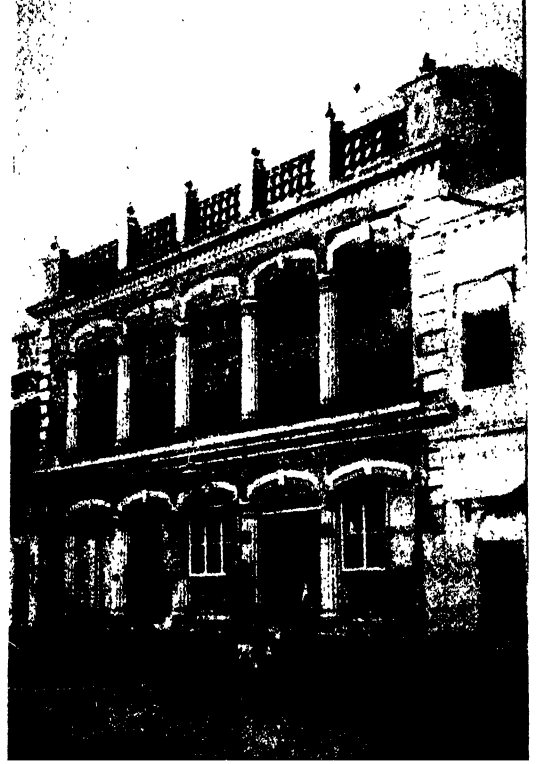
১৩০৮ সালে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস
[ফোটোগ্রাফ ডাঃ ললিতমোহন বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

তাহাতে লিখিতে হইবে। পত্রিকার নাম হইবে "প্রবাসী"। তার পর একদিন এখানকার পাব্লিক লাইব্রেরীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমায় "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যায় রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ "ক্ষীরাংকুম্ভ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিলেন এবং Rousseletএর বই হইতে "ক্ষীরাংকুম্ভে"র চিত্রটি দেখাইয়া বলিলেন, এই চিত্রই প্রথম সংখ্যার পুরশ্চিত্র হইবে। ছবি ও প্রবন্ধ প্রথম সংখ্যাতেই বাহির হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রবাসী বাঙালীদের গৌরব স্বর্গীয় রাও কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের ছবি কর্ণেল-

গঞ্জের ৺দীননাথ মুখোপাধ্যায় রায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়ায় তাহাই "প্রবাসীর" প্রথম সংখ্যার পুরশ্চিত্র হইয়াছিল, এবং ভারতের নানা প্রদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত স্থাপত্য-শিল্পের গৌরব স্বরূপ সৌধাঙ্কের চিত্র শোভিত প্রচ্ছদপটে আবৃত হইয়া ১৩০৮ সালের প্রথম বৈশাখের শুভমুহূর্ত্তে জনসমাজে "প্রবাসী" বাহির হইয়াছিল। প্রচ্ছদপট প্রথমে কলিকাতায় ছাপা হইতেছিল। ভাদ্রের সংখ্যা অর্থাৎ পঞ্চম সংখ্যা হইতে তাহা এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতেই ছাপা হইতে লাগিল। প্রথম সংখ্যা "প্রবাসীতে" ক্রাউন কোয়ার্টো আকারের পাঁচ ফর্ম্মায় চল্লিশ পৃষ্ঠা মাত্র কাগজ ছিল। দুই এক জন লেখকের বিজ্ঞাপন ছাড়া বিজ্ঞাপন ছিল মাত্র দুইটি। প্রথম সংখ্যার লেখকগণ ছিলেন, শ্রী কমলাকান্ত শর্ম্মা, শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, বি-এল, শ্রী নিত্য-গোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, এফ-এইচ-এ-এস, শ্রী যোগেশ চন্দ্র রায় এম-এ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক। প্রবাসের কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনই দ্বিতীয় কমলাকান্ত রূপে "প্রবাসী"র জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময় কার্য্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক ছিলেন বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী। যে-যন্ত্রে "প্রবাসী" প্রথম প্রথম ছাপা হইয়াছিল তাহার নাম ছিল, "Grand Jesus Machine," Made in Belgium। উহা ডবল ক্রাউন আকারের কাগজ ছাপিবার যন্ত্র ছিল। এক বৎসর পরে এই মেশিনেই "চরিত্র-গঠন" ছাপা হইয়াছিল, এবং প্রবাসী ও "চরিত্র গঠন" লইয়া ইণ্ডিয়ান্ প্রেসের বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের স্থায়ী কার্য্য-বিভাগের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই সময় ইণ্ডিয়ান্ প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন বাবু গিরিজাকুমার ঘোষ। গিরিজাবাবু হিন্দী ভাষায় সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি "প্রবাসী"তেও মধ্যে মধ্যে লেখা দিতেন। তিনি আর ইহজগতে নাই, কিন্তু তৃতীয় সংখ্যার প্রবাসী তাঁহার প্রতিকৃতি স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিয়াছে। কবি দেবেন্দ্রবাবুর লিখিত "বিংশ শতাব্দীর বর" শীর্ষক কবিতার সঙ্গে যে-চিত্র আছে, তাহাতে দড়াদড়ি বাঁধা দশ হাজার টাকার বরের ভি পি পার্শেলটি কন্যাকর্ত্তার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া যে স্থূলকায় পিয়নটি দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিই গিরিজাবাবু। আর যিনি পার্শেলে বাঁধা পড়িয়া আছেন, তিনি কলিকাতা হইতে সেই সময় এলাহাবাদে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর পর ৮ম ও ৯ম সংখ্যা অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা হইতে বাবু অনাথনাথ ঘোষ কার্য্যাধ্যক্ষ হন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এই সংখ্যায় বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, পঞ্জাব, মধ্য ভারত ও ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী সম্বন্ধে প্রতিযোগী প্রবন্ধের জন্য পদকচতুষ্টয় বিজ্ঞাপিত করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাস উদ্ধারে প্রবর্ত্তনা দান করেন। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" তাহারই ফল। প্রবাসী বাঙ্গালীর ধারাবাহিক ইতিহাস "প্রবাসীর" বিশেষত্ব বলিয়া সাধারণ্যে বিবেচিত হইতে থাকে।

যুক্ত প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদে বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভা ও বান্ধব সমিতি, প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির, ইণ্ডিয়ান প্রেস এবং সাময়িক সাহিত্যানুরাগী প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ যে দ্বিতীয় যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তথায় শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর আবির্ভাব ও "প্রবাসীর" প্রভাব সে যুগকে গৌরবোজ্জল করিয়াছিল। তখন এখানে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য; স্বনামধন্য ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন, কাব্যানন্দ জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, পাণিনি কার্য্যালয়ের প্রবর্ত্তক পণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্যার্ণব শ্রীশচন্দ্র এবং মেজর বামনদাস বসু, সাহিত্যিক বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র, বাবু সর্ব্বেশ্বর মিত্র, কবিরাজ নীলমাধব সেনগুপ্ত, বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং বাবু ইন্দুভূষণ রায় প্রমুখ অনেকেই প্রবাসে বঙ্গ সাহিত্যের এই নব-জাগরণের দিনে বর্ত্তমান ছিলেন এবং সাহিত্যসেবা না করিলেও প্রয়াগের বিশিষ্ট প্রবাসী এবং ঔপনিবেশিক বহু বাঙ্গালী তাহাতে অনুরাগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। রামানন্দ-বাবুর প্রবাসবাস তাঁহাদের সকলেরই আনন্দ ও উৎসাহবর্দ্ধনের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল এবং "প্রবাসী" শুদ্ধ তাঁহাদের কেন সমগ্র প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীর পরম আদরের ও গৌরবের সামগ্রী হইয়াছিল। প্রবাসীর কার্য্য দিন দিন এমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে সাউথরোডের বাড়ীতে আর স্থান সংকুলান হইতেছিল না, সুতরাং

রামানন্দবাবু এডমনষ্টোন্ রোডের একটি বাংলায় উঠিয়া গেলেন। পরে লায়েল রোড ও কুপার রোডের দুটি বাড়ীতে বাস করিবার পর সিটিরোডের উকীল দেশী খৃষ্টিয়ান্ সিমিয়ন্ সাহেবের বাড়ী উঠিয়া যান। এলাহাবাদে তিনি আর একবার বাসা পরিবর্ত্তন করেন। তখন গিয়াছিলেন মেঘরাজ লুনিয়ার বাংলায়। উহাতে এখন ক্রস্থোয়েট গার্লস্ কলেজ অবস্থিত। শেষবারে শ্রীযুক্তা ফুলমণি দাস নাম্নী এক শিক্ষিতা ধাত্রীর বাড়ী ভাড়া করিয়া প্রবাসের শেষ কয়েক বৎসর বাস করেন। এই বাড়ী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত এবং এই বাড়ীতেই মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার জন্ম হয়। অতঃপর ১৯০৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে "প্রবাসী"কে আট বৎসরের করিয়া রামানন্দবাবু এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। আজ "প্রবাসী"র জন্মকথা মাত্র বলিলাম। "প্রবাসী" সম্বন্ধে অনেক কথাই বাকী রহিল। তাহার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের কথা, "প্রবাসী" বাঙ্গালীকে কি দিয়াছে, এবং জগতে কি প্রচার করিয়াছে, তাহার কথা ক্রমে ক্রমে বলিব। আজ "প্রবাসীর" পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়ার আনন্দের দিনে তাহার এবং ধন্যবাদার্হ শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের আরও গৌরবোজ্জ্বল দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। ইতি।

১৫৮ কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ।
১৩ই মার্চ্চ, ১৯২৬।

বাঙ্‌লার উৎকর্ষ ও 'প্রবাসী'

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৩৩৩ সাল প'ড়লো, 'প্রবাসী' তার পঁচিশ বছর পূর্ণ ক'র্‌লে, এইটি তার প্রথম 'জুবিলী' বা বৈজয়ন্তীর বছর। এই পঁচিশ বছরের মধ্যে বাঙালী তার আধুনিক ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে পৌছেচে, বাঙালীর পক্ষে নানা কারণে এই শতক-পাদিকা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে। নোতুন আশা আর আশঙ্কা, নোতুন কৃতকারিতা আর বাধাবিপত্তি,নোতুন সমস্যা আর চিন্তা, নোতুন, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থার প্রতিকূলতা—এই-সবের মধ্যে দিয়ে বাঙালী জাত চ'লেছে;—রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, আর্থিক, আধ্যাত্মিক, সব দিকে উন্নতি লাভ কর্‌বার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছে। জীবনের নানা দিকে বাঙালী গত পঁচিশ বছরের মধ্যে যতটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে, তার সব চেয়ে পূর্ণ পরিচয় এক 'প্রবাসী'ই দিতে পারে; আর অনেক বিষয়ে বাঙালী যে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চ'ল্‌তে পারেনি বা পার্‌ছে না, বাঙালীর চোখের সাম্‌নে 'প্রবাসী' তাও ধ'রে দিয়েছে। গত পঁচিশ বছর ধ'রে উৎকর্ষকামী বাঙালীর মানসিক চেষ্টা, চিন্তাশীল বাঙালীর মনন, কল্পনাশীল বাঙালীর সত্য-শিব-সুন্দরের দর্শন, কবি আর শিল্পী বাঙালীর সৃষ্টি, কর্ম্মী বাঙালীর সাধনা আর সিদ্ধি,—এক কথায়, বাঙালীর 'ক্যলচর' বা সর্ব্বাঙ্গীন্ উৎকর্ষের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হ'য়ে আছে এক এই 'প্রবাসী'র দর্পণে।

প্রত্যেক যুগকেই তার আগেকার যুগের চেয়ে আশ্চর্য্যতর ঠেকে—এ কথা বিশ্বমানবের অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর সমগ্র মানব-সমাজের বিষয়ে ভেবে ব'ল্‌লে খাটে বটে, কিন্তু কোনও বিশেষ জাতির সম্বন্ধে এ কথা সব সময়ে না খাট্‌তেও পারে। ঢেউয়ের ভঙ্গীতে, 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' ধ'রে সমষ্টিময় মানব-সমাজের গতি; আর এই গতি উন্নতির দিকে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু এই পতন আর অভ্যুদয় ব্যাপারটা বিশেষ-বিশেষ জাতির ব্যষ্টির উপর দিয়েই ঘ'টে যায়। সমস্ত মানব-সমাজ বা সুদূর

ভবিষ্যতের মানব-সমাজ কল্যাণটুকুর অধিকারী হয়, কিন্তু কোনও বিশেষ মানব-সমাজ বা জাতি নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির পথের পথিক নয়। জন্ম, মৃত্যু, উত্থান, পতন, আরোহণ, অবরোহণ, ক্ষণিক অব্যাহত অবস্থান; এই নিয়ে জাতির জীবন; আর এইগুলি ধ'রে বিচার ক'র্‌লে কোনও জাতির জীবনের বিভিন্ন যুগগুলি আমাদের কাছে বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। নানা উৎকর্ষ-সম্ভারে পরিপূর্ণ কোনও যুগের কথা আমরা আনন্দের সঙ্গে খুঁটিয়ে আলোচনা ক'র্‌তে ভালো-বাসি, আবার জাতীয় অগৌরবের কথা দুঃস্বপ্নের মতন কোনও যুগকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার কারণে তার বিষয়ে আলোচনা ক'র্‌তে আমরা মনে-মনে অস্বস্তি অনুভব করি, আর তাকে বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন ক'র্‌তে পার্‌লেই সাধারণ বুদ্ধিতে পরম জাতীয় লাভ ব'লে মনে করি।

বাঙালীর জীবনে যে পঁচিশ বছর কেটে গেলো, সব দিক দিয়ে তার বিচার ক'রে আমরা আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি বা প্রবণতা অনুসারে তাকে ভালো-বাস্‌তে পারি বা মন্দ-বাস্‌তে পারি—কিন্তু এই পঁচিশ বছর নিয়ে যে কালটা কেটে গেলো আর যার জের এখনও পুরোপুরি চ'ল্‌ছে সেটা যে বাঙালীর পক্ষে বিশেষ এক 'সাংঘাতিক' যুগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নানা সংঘাত বাঙালীর জীবনে এসে প'ড়েছে—বিভিন্ন ভাবের বিচার আর চিন্তা-প্রণালীর সংঘাত, ভিতরের আর বাইরের নানা জাতের সংঘাত—এ-সবে বাঙালীকে অস্থির ক'রে তুলেছে, তার ভবিষ্যৎ অতি অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। কিন্তু এই কাঁটা বনে একটি মিষ্টি ফল—বাঙালীর মন এখনও সতেজ আছে—এই পঁচিশ বছরের নানা অক্ষমতার অবিমৃষ্যকারিতার মধ্যে, প্রতিকূল অবস্থার কঠিন পাথরের দেয়ালে পথ না পেয়ে মাথা ঠুকে বেড়ানোর মধ্যে, সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় নানা বিপত্তির মধ্যে এক রকম হাতা-পা-বাঁধা হ'য়ে থাক্‌লেও, সব চেয়ে বড়ো কথা বাঙালীর পক্ষে এই যে বাঙালী মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্র বিশ্বের দশ-জনের একজন হ'তে পেরেছে; সে যে বড়ো ঘরের ছেলে, আর পাঁচ-জনের সম্বন্ধে তার দায়িত্ব আছে, সে নিঃস্বের মতন খালি গ্রহণ ক'রে খুশী থাক্‌তে পারে না, তাকেও নিজে যথাশক্তি কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রে পাঁচ-জনকে বিতরণ ক'র্‌তে হবে,—এইরূপ একটি ভাব তার মনের মধ্যে এসেছে। অবস্থাগতিকে প'ড়ে রাজনৈতিক বা আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালীর উন্নতি হয়নি, কিন্তু বিজ্ঞান, দর্শন, রূপ-সাধন, সাহিত্য এইসবের আসরে বাইরে থেকে যে নিমন্ত্রণ সে পেয়েছে তা সে সাদরে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছে; তার বাহ্য ঐশ্বর্য্যের আর শক্তির অভাবের জন্য অবশ্যম্ভাবী দৈন্য তাকে পদে-পদে বাধা দিলেও সে আর পাঁচটি সভ্য জাতির সমাজে উচ্চ আসন পেয়েছে। বাঙালীর আধুনিক ইতিহাসের প্রথম কল্পে, নবীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতের সাম্‌নে যে আদর্শ ধ'রেছিলেন, গত পঁচিশ বছরের মধ্যে সে আদর্শ নোতুন ক'রে বাঙালীর সাম্‌নে এসেছে; সব বিষয়ে বাঙালীর সাধনাকে তার যে বিশেষত্ব—জাতীয়তার সঙ্গে বিশ্বজনীনতা, তার দ্বারা উজ্জীবিত ক'রে দিচ্ছে। বিদ্যায়, বিজ্ঞানে, রসসৃষ্টিতে আধুনিকের মধ্যে প্রাচীনকে পূর্ণতর ক'রে তুল্‌তে হবে, আধুনিককে বর্জ্জন ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না, কারণ তা-হ'লে প্রাচীন তার যথার্থ স্বরূপে দেখা দেবে না—এই যুগে বাঙালী এই কথা তার শ্রেষ্ঠ মতির দ্বারা বুঝেছে। যুগধর্ম্মের আহ্বান বাঙালী শুনেছে, তার বাণী বাঙালী হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পেরেছে;—তার আহ্বানের কথা আর তার প্রত্যুত্তরে বাঙালীর কর্ত্তব্য, চেষ্টা আর সাফল্য, এই দুইটি কথা 'প্রবাসী' গত পঁচিশ বছর ধ'রে বাঙালীর কাছে ব'লে আস্‌ছে। এইরূপেই 'প্রবাসী' বাঙালী জাতের সেবা ক'রেছে—আর এই সেবা 'প্রবাসী' যে খালি বাঙালী জাতকেই ক'রে এসেছে তা নয়, এই সেবা বাঙালী জাতের মধ্য দিয়ে 'প্রবাসী' বিশ্বমানবকেও ক'রে এসেছে। কারণ মানসিক উৎকর্ষ এখন কেবল জাতি-বিশেষের মধ্যে বদ্ধ নয়, কোনও একটা জাত এ ক্ষেত্রে যদি কিছু লাভ ক'র্‌তে পারে তার সুফল এখন গিয়ে পৌঁছয় সমগ্র মানব সমাজে; আর যদি কোনও ব্যক্তি বা আয়তন বা পত্রগোষ্ঠী একটি কোনও জাতিকে তার শ্রেষ্ঠ বিচার বা ভাবসম্ভারকে আবিষ্কার ক'রে মানব-সমাজকে দান ক'র্‌তে আহ্বান করে, বা সাহায্য করে, তা-হ'লে তার এই সাধুচেষ্টার ফল কেবল সেই জাতি-বিশেষের মধ্যেই বদ্ধ রইলো না, একথা ব'ল্‌তে পারা যায়।

'প্রবাসী' পত্রিকা মুখ্যতঃ সুকুমার সাহিত্য আর কলা, আর সমাজোন্নতি আর রাষ্ট্রোন্নতির আলোচনা নিয়ে। অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে 'প্রবাসী'র পরম শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের নির্ভীক প্রতিবাদ, 'প্রবাসী'কে আর তার সংধুর্য্য 'মডার্ণ-রিভিউ'কে ভারতবর্ষের তাবৎ পত্র-পত্রিকার মধ্যে অনন্যসাধারণ শক্তি দিয়েছে। এ বিষয়টি এতই সর্ব্বজনবিদিত যে তা নিয়ে এখন আলোচনা করার আবশ্যকতা নেই। 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শীর্ষক আলোচনা-মালা বাঙ্‌লা দেশের তথা ভারতবর্ষের মুক্তি অর্জ্জনের পথে এই পঁচিশ বছর ধ'রে অবিশ্রান্ত সহায়তা ক'রে এসেছে।

এখন থেকে বারো-পনেরো বছর আগে আমাদের ছাত্র-জীবনে 'প্রবাসী' যে বাঙ্‌লার একমাত্র মানসিক-উৎকর্ষ-বর্দ্ধক পত্রিকা ছিল, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়; আর এখনও 'প্রবাসী' তার সেই উচ্চ আদর্শ আর উচ্চ স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' পুরাতন 'ভারতী', 'সাধনা'—এইসব পত্রিকার ভাবের ধারা 'প্রবাসী'ই বহন ক'রে এনেছে। অধুনা-লুপ্ত 'প্রদীপ' বোধ হয় বাঙ্‌লায় সর্ব্বপ্রথম একাধারে সাহিত্য আর চিত্র-কলার সমাবেশ করতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু 'প্রবাসী' যখন ১৩০৮ সাল থেকে প্রচারিত হ'লো, তখন থেকেই বাঙ্‌লা সাময়িক সাহিত্যে একটি নোতুন জিনিস এলো। কলেজে পড়বার সময়ে আর কলেজ থেকে বেরিয়ে, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ দু-চার-জন পুণ্যশ্লোক অধ্যাপকদের দুর্লভ সংস্পর্শ, আর কলেজের পুস্তকাগার—এই দুইয়ের বাইরে, মাতৃভাষার সাহচর্য্যে যে এক 'প্রবাসী'ব কাছ থেকেই সব বিষয়ে মানসিক পুষ্টি আর রসায়ন পেয়ে এসেছি, এ কথা 'প্রবাসী'র পঞ্চবিংশ বৈজয়ন্তী উপলক্ষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দার্শনিক নিবন্ধ; সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তের কবিতা; আর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সুকুমার কলা, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, বাঙালীর কৃতিত্ব যার কথা প'ড়ে আমাদের কাজে উৎসাহ আস্‌তে পারে—এইসব বিষয়ে বাঙ্‌লার সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকদের নিবন্ধ, 'প্রবাসী'র মধ্যে দিয়েই প্রচারিত হ'য়ে এসেছে; সাধারণ্যের মধ্যে নোতুন তথ্য আর ভাব বিতরণের জন্য নানা স্বদেশী আর বিদেশী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা শিক্ষাপ্রদ সংবাদ আর সন্দর্ভ 'প্রবাসী' বাঙালী পাঠককে এনে দিয়েছে; আর 'প্রবাসী'র যে সব-চেয়ে বড়ো আকর্ষণ যার জন্য বরাবরই আমাদের 'প্রবাসী'র জন্য প্রতিমাসের শেষে উদ্‌গ্রীব ক'রে রাখে সেটী হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখা, তাঁর গল্প, তাঁর কবিতা, তাঁর গদ্য লেখা, তাঁর আলোচনা। ইদানীং 'প্রবাসী'কে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত লেখকের প্রধান প্রকাশ-ভূমি আখ্যা দিতে হয়; রবীন্দ্রনাথের এদিক্‌কার রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা আর অন্য লেখা 'প্রবাসীর' পৃষ্ঠাকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে বাঙালী পাঠকের কাছে পৌছেচে। তাঁর 'গোরা' আর 'জীবন-স্মৃতি'র মতন দুখানা বড়ো বই, যে দুটিকে আধুনিক যুগের সাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ রত্ন বলতে পারা যায়, আমরা মাসের পর মাস অধীর অপেক্ষায় থেকে 'প্রবাসী' বার হ'লে তবে প'ড়ে আনন্দ লাভ করেছি। সকল দিক্ দিয়েই 'প্রবাসী' এখন শিক্ষিত বাঙালীর নিজস্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি বিষয়ের জন্য প্রবাসীর কাছে বাঙালীকে বিশেষ-ভাবে ঋণ স্বীকার করতে হবে—সেটি হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ রূপকারদের প্রতিভার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগের জন্য, আর সাধারণতঃ রূপকলা-সম্বন্ধে উন্নত মনোভাব গঠনের জন্য। বাঙালীর মধ্যে সুকুমার শিল্পের জ্ঞান আর আদর বাড়াবার জন্য 'প্রবাসী' যতটা করেছে, এতটা আর-কেউ করতে পারে নি। এ দিকে 'প্রবাসী'র প্রথম সংখ্যা থেকেই তার বিশেষত্ব নজরে পড়ে। 'প্রবাসী'র প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় অজণ্টার চিত্রের উপর একটি চমৎকার সচিত্র প্রবন্ধ বা'র হয়, সেই প্রবন্ধটির সহায়তায় আমাদের দেশের এই প্রাচীন কীর্ত্তি, যা জগতের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ শিল্পভাণ্ডার, তার খবর ইস্কুলে পড়বার সময়ে প্রথম আমার কাছে আসে, আর আমার পরিচিত অন্য বহু বাঙালীর কাছেও 'প্রবাসী'র এই প্রবন্ধটির মারফৎই এর সংবাদ এসেছিল শুনেছি। বাঙালী জাত যে ছবি ভালো-বাসে এই আবিষ্কার প্রবাসীই ভালো ক'রে করেছিল—কিছু কাল ধ'রে তখনকার দিনের রুচির অনুকূল রবিবর্ম্মার

ছবি আর অন্য-অন্য দু-চারজন চিত্রকারের ছবি প্রবাসী প্রথম-প্রথম প্রকাশ করেছিল। কিন্তু অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই 'প্রবাসী' রূপকর্ম্ম বিষয়ে আমাদের দেশে যে নবীন সাধনা চল্‌ছিল, তা'র খবর পায়, আর প্রবাসী তখনই পূর্ণভাবে তাকে গ্রহণ ক'রে বাঙালী জাতকে তা গ্রহণ কর্‌তে আহ্বান করে।

ইংরিজী ১৯০৪ কি ১৯০৫ সাল, ইস্কুলে চতুর্থ কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন একদিন আমি কল্‌কাতার সরকারী আর্ট্-ইস্কুলে বিলিতী আর এ-দেশী ছবির সংগ্রহের মধ্যে হ্যাভেল সাহেবের কীর্ত্তি আমাদের দেশের প্রাচীন রাজপুত আর মোগল শৈলীর ছবির সংগ্রহটি প্রথম দেখি। আর সেই সময়ে ঐ আর্ট্-ইস্কুলের চিত্রশালায় অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার নিদর্শন আটখানি চিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। সেই সময় থেকেই অবনীন্দ্রনাথের আর তার কিছু পরে নন্দলালের অপূর্ব্ব রূপদক্ষতা আমার ব্যক্তিগত জীবনে এক শ্রেষ্ঠ আনন্দ দান ক'রে আস্‌ছে। যে দিন 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যদের আঁকা ছবি 'প্রবাসী' আর 'মডার্ণ-রিভিউ'তে প্রকাশ ক'রে তাঁর সাহিত্য-সাধনা আর সমাজের হিতৈষণার অন্তরালে নিভৃতে অবস্থিত রসোপভোগ শক্তির পরিচয় দিলেন, আর আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের কৃতি রাজপুত মোগল আর অন্য অন্য রূপ-কর্ম্মের প্রতিলিপি দিতে লাগ্‌লেন, সে দিন আধুনিক যুগে বাঙ্‌লার আর ভারতবর্ষের সুকুমার শিল্পের উজ্জীবন-বিষয়ে এক পরম শুভদিন। পারিপার্শ্বিক আর বাহ্য-সঙ্গতি, আর আলো-ছায়ার বিজ্ঞানানুমোদিত সমাবেশ, আর আপাত-দৃষ্টি-আকর্ষণকারী সৌষ্ঠব,—শিল্পের এইসব ব্যাকরণের বুলি আর শিল্প-সম্বন্ধে প্রাকৃতজনোচিত ধারণা নিয়ে, রাফেলের পরের যুগের অতি খেলো চিত্রশিল্পকে মাথায় পেতে নিয়ে, আমাদের দেশের শিল্পের উৎসগুলি যে শুখিয়ে যাচ্ছে সে দিকে একটিবারও দৃক্‌পাত না ক'রে বা উপেক্ষা-ভরে তাকে বিদেশী শিল্পের বৈঠকে অস্পৃশ্য ক'রে দূরে তাড়িয়ে দিয়ে আর আমাদের জাতির মধ্যে অন্তর্নিহিত সাধারণ সৌন্দর্য্য-বোধ আর কল্পনা শক্তিকে অশিক্ষিত ব'লে বর্জ্জন করে, আমরা মহোল্লাসে আমাদের দেশকে ইউরোপের অধীন ক'র্‌তে চ'লেছিলুম শিল্প আর রূপকর্ম্ম বিষয়েও—এমন সময়ে সহৃদয় বিদেশী হ্যাভেল আর আমাদের অবনীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন, তাঁরা আমাদের ব'লে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন যে ওদিকে নয়,—বিলিতী আর্টের টবের গাছ এনে জাতীয় রূপ-সাধন চলে না, সে টবের গাছকে চারাবাড়ীতে পূ'রে ঝড় জল থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয়, দেশের মনের ভাবের প্রকাশ যে জাতীয় শিল্পের দ্বারায় হ'য়েছে সেই শিল্পকে জীইয়ে তুল্‌তে হবে, প্রাণসঞ্চার ক'রে তাকে সময়োপযোগী করে নিতে হবে। এঁদের এই নিবেদন আমাদের দেশবাসীর কাছে বড়োই অদ্ভুত ঠেক্‌লো; আমাদের অশিক্ষিত চোখ ভারতীয় শিল্পের অপূর্ব্ব সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখ্‌তেই তো পেলে না, বরং সৌন্দর্য্যবোধের শক্তির অভাব বিরোধ আর বিদ্রূপের দ্বারা পূরণ কর্‌বার চেষ্টা হ'লো। এর মধ্যে 'প্রবাসী' অবিচলিতভাবে ভারতের নবসঞ্জীবিত শিল্পের পক্ষ গ্রহণ ক'রে দাঁড়ালো। মাসের পর মাস ধ'রে 'প্রবাসী' যে নবীন রূপকার-মণ্ডলীর আঁকা ছবি প্রকাশ ক'রে এসেছে তার ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে এঁদের উদ্দেশ্য আর পদ্ধতি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর গা-সহা হ'য়ে গিয়েছে, আর তার তথা-কথিত শিল্প-জ্ঞানে বা শিল্প-বোধে এর নবীনত্ব আর তেমন ক'রে ঘা দেয় না,—পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ'কে বোঝ্‌বার চেষ্টাও কিছু কিছু হ'তে আরম্ভ ক'রেছে, আর অল্পে-অল্পে দু'চার জন ক'রে এর গুণগ্রাহীর সংখ্যাও বাড়্‌ছে। শিক্ষিত বাঙালীর মানসিক উৎকর্ষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের আদরও বেড়ে চ'লেছে; ইউরোপের সমজদার মহলে আধুনিক বাঙালী রূপকারদের দ্বারায় পুনরধিষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হ'য়েছে, তাই দেখাদেখি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এর প্রসার হ'চ্ছে। পৃথিবীর সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ রূপকৃৎদের মধ্যে নন্দলাল আর তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথকে ধরা যেতে পারে, এ কথা ব'ল্‌লে এখন আর শিল্পের অপমান হ'চ্ছে ব'লে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের বাঙালী হাতুড়ে বা মোক্তারেরা আগেকার মতন এখন আর চ'টে ওঠে না। বাঙ্‌লা দেশের এই নবীন শৈলীর রূপকারদের কেন্দ্র শান্তিনিকেতনের এখন কলাভবনে বাঙ্‌লার বাইরে থেকেও ছাত্রেরা গুরুকুলবাস ক'র্‌তে আস্‌ছে,

বাঙ্‌লার বাইরেকার সজ্জনদের পূর্ণ সহানুভূতি আর সাহায্য এই কলাভবন লাভ ক'রতে পেরেছে। ভারতীয় শিল্পের আদর সাধারণ্যে বাড়াতে 'প্রবাসী' বাঙ্‌লা দেশে সবচেয়ে বেশী কাজ ক'রেছে। বাঙালীর মানসিক উৎকর্ষের ইতিহাস লিখ্‌তে হ'লে 'প্রবাসী'র এই কাজ পূর্ণ ভাবে ব'ল্‌তে হয়। এ বিষয়ে 'প্রবাসী'র প্রদর্শিত পথ এখন বাঙ্‌লার আর বাঙ্‌লার বাইরেকার তাবৎ পত্র-পত্রিকা গ্রহণ ক'রেছে।

ইস্কুল-জীবনে ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য্য আমার মনের উপর তার মোহ বিস্তার ক'রেছিল,—তখন রাজপুত আর মোগল ছবি আর অবনীন্দ্রনাথের বুদ্ধ ও সুজাতা, অভিসারিকা, গ্রীষ্ম ঋতু, বসন্ত ঋতু প্রভৃতি ক-খানি ছবি দেখ্‌তে আমি বহুবার চৌরঙ্গী রোডে আর্ট-ইস্কুলে গিয়েছি। এইসব ছবি ক্রমে ক্রমে যে জনপ্রিয় হ'য়ে উ'ঠবে, আর পরে এমন রসজ্ঞ প্রকাশকও পাওয়া যাবে যিনি ঐ সব ছবি ছাপাবেন, আর ঘরে ব'সে ব'সে ঐসব ছবির মুদ্রিত প্রতিলিপি দেখ্‌তে পাওয়া যাবে—এ কথা তখন আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ১৯০২ সালে আর তার দু তিন বছর পরে বিলাতের 'স্টুডিও' পত্রিকায় হ্যাভেল সাহেব যে অবনীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, আর তাঁর কতকগুলি ছবির একরঙা আর অনেক-রঙা প্রতিলিপিও দিয়েছিলেন, সে কথা ইস্কুলের প'ড়ো আমার তখন জানা ছিল না। যখন প্রথম 'মডার্ণ-রিভিউ' আর 'প্রবাসী'তে অবনীন্দ্রনাথের দুই-চার-খানি ছবি যা আমার বিশেষ প্রিয় ছিল তা বা'র হ'লো, তখন আমার মনে যে উল্লাস যে আনন্দ হ'য়েছিল সেরূপ উল্লাস আর আনন্দ খুব কম জিনিসেই আমি অনুভব ক'রেছি—এ হ'চ্ছে কোনও ভাবরাজ্যে অরসিক আর বে-দরদীদের মধ্যে সমান-ধর্ম্মার খবর পাওয়ার উল্লাস। 'প্রবাসী' আর 'মডার্ণ-রিভিউ' দু-ইই তখন লাইব্রেরীতে গিয়ে প'ড়ে আস্‌তুম—কিন্তু কেবল এই দুই পত্রিকাতে প্রকাশিত ছবির লোভে এই পত্রিকা দুটির অনেকগুলি সংখ্যা কিনেছি। এইসব ছবির জন্য ক্রমে ক্রমে সাধারণের মধ্যে একটা যে আগ্রহ হ'য়েছে, তা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে; আর এই আগ্রহের ফলেই এইসব ছবি এখন স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সংগৃহীত হ'য়ে, 'প্রবাসী'র প্রকাশিত 'চ্যাটার্জ্জীস্ পিক্‌চার এল্‌বামস্', আর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত 'মডার্ণ্ ইণ্ডিয়ান্ আর্টিস্‌ট্‌স্' নামে মনোহর গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হ'য়েছে আর সকলের পক্ষে সহজলভ্য হ'য়েছে। কিন্তু দশ বছর আগে আমাদের তো এই সুবিধা ছিল না। আমাদের মধ্যে দু-চার-জন শিল্পানুরাগী 'প্রবাসী' আর 'মডার্ণ-রিভিউ' থেকে প্রাচীন আর আধুনিক ভারতীয় ছবিগুলি ছিঁড়ে নিয়ে একটি প্যাডের মধ্যে রেখে দিতুম। এই ছিল আমাদের কাছে এক উৎকৃষ্ট চিত্রশালা, অবসরের বহু সময় আমাদের এখনও এই চিত্রশালার সংগ্রহ দেখে-দেখে কাটে, এই সৌন্দর্য্যের, চিত্রময় কবিতার ভাণ্ডার আমাদের এখনও আগেকার মতনই আনন্দ দেয়। ইউরোপ-প্রবাসের সময় আমি আমার এই চিত্রশালাটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলুম। অনিসন্ধিৎসু কলানুরাগী বিদেশীর কাছে আধুনিক ভারতের মানসিক উৎকর্ষের একটী ধারা রূপকর্ম্মের মধ্যে দিয়ে কিরূপে প্রকাশ পেয়েছে, পাচ্ছে, তা দেখাবার জন্য লণ্ডনে আর পারিসে, আর ইটালী গ্রীস্ আর জার্‌মানীতে আমার সমস্ত ভ্রমণের সাথী 'প্রবাসী' আর 'মডার্ণ-রিভিউ' থেকে কেটে নিয়ে তৈরী এই চিত্র-সংগ্রহ সবচেয়ে বেশী কাজ ক'রেছিল। আমাদের ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের মাত্র এই কয়টি নাম, ইংলণ্ডের বাইরের জগতের সাধারণ উচ্চ-শিক্ষিত ইউরোপীয় মাত্রেই জানে—ঋগ্বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ-মহাভারত, বুদ্ধ, গান্ধী, আর 'তাগোরে' বা রবীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে যাঁদের ভারতীয় সাহিত্যের আর ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে, আর যাঁরা নিজেদের দেশের আর চীন প্রভৃতি দেশেরও শিল্প সম্বন্ধে বেশ রস [illegible], তাঁদের আধুনিক ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন দেখিয়েছি, তাঁরা স্বীকার ক'রেছেন যে এ-যুগে একমাত্র আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা রূপকর্ম্ম বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত নামগুলির মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে পেরেছে, একাধারে বিশিষ্ট ভারতীয়ত্ব আর বিশ্বজনীনত্ব বজায় রাখ্‌তে পারায় এই শিল্প এক অপূর্ব্ব বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশের মনীষীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আর আমার মতন অনেকের ঐকমত্য দেখে বিপুল আনন্দ লাভ ক'রেছি। যখন এদেশে 'ইণ্ডিয়ান্ সোসায়টী অভ্

ওরিয়েণ্টাল আর্ট' নামক নূতন স্থাপিত সভার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত আর অর্থশালী বিদেশী আর দেশী সজ্জনের মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখের গঠিত শিল্পি-গোষ্ঠীর কৃতি আলোচিত আর আদৃত হ'চ্ছিল, তখন যে 'প্রবাসী' আর 'মডার্ণ্-রিভিউ'তে সাধারণ বাঙালী আর অন্য ভারতীয়দের সাম্‌নে এই রূপরসের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল, এটা দেশের মধ্যে উৎকর্ষ-বিস্তারের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকর হ'য়েছিল। এর দ্বারা শিল্প-বিষয়ে আমাদের মধ্যে 'গদাই-পাল'দের গতানুগতিকতাকে বেশ জোরে নাড়া দেওয়া হ'য়েছে। তাতে বাইরে একটু বেশ চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হ'য়েছে। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের শিল্পের সৌন্দর্য্য উপভোগ করানো ছাড়া এর আর একটি ফল এই দেখা যাচ্ছে যে এখন বাঙালী ছবি সম্বন্ধে একটু সচেতন হ'য়েছে, একটু চোখ খুলে দেখ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। আর আমাদের মত যারা এই নব-সঞ্জীবিত শিল্পের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির রেখার আর রঙের অনির্ব্বচনীয় সুষমার দ্বারা মুগ্ধ হবার সৌভাগ্য পেয়েছে, তারা 'প্রবাসী'র এই চেষ্টাকে শত সাধুবাদ দ্বারা স্বাগত ক'রেছে;—উষাদেবীর সম্বন্ধে বেদমন্ত্রে যা বলা হ'য়েছে, এই নবীন শৈলীর রূপকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতির সম্বন্ধে, আর তাঁদের আমাদের কাছে এনে দেওয়ার জন্য 'প্রবাসী'র সম্বন্ধেও সেই কথায় মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে শত বার ব'লেছি—'নোধাঃইব আবির্ অকৃত প্রিয়াণি'—এরা আমাদের প্রিয়বস্তুকে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে, কবি যেমন-ক'রে ক'রে থাকেন তেম্‌নি ক'রে।

নিজ বাসভূমে আমরা প্রবাসী হয়ে আছি, 'প্রবাসী' তার নামের দ্বারায় এই কথা আমাদের অহরহঃ মনের গোচর কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছে—'প্রবাসীর' আকাঙ্ক্ষা, যেন আমরা আমাদের জাতীয়তা, সভ্যতা, সমাজ-হিতৈষণা, রাষ্ট্রীয় মুক্তি সব বিষয়েই আমাদের দেশকে সত্য-সত্যই নিজের দেশ ক'রে নিতে পারি—কোনও-রূপ মিথ্যা সংস্কার-বশে প'ড়ে আমাদের মনকে যেন আমরা পরাঙ্মুখ না করি। 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' আর 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—এই দুই ঋষি-বচন 'প্রবাসী'র শীর্ষ-দেশে তার উদ্দেশ্যকে ঘোষণা ক'র্‌ছে। সত্য শিব আর সুন্দরের সাধনা 'প্রবাসী' ক'রে এসেছে, আর আত্মলাভের জন্য যাতে বলহীন আমরা বল পাই, 'প্রবাসী' সেদিকেও সাধনা ক'রে এসেছে। আমাদের বাঙ্‌লার তথা ভারতের জীবনে আর উৎকর্ষে সত্য শিব সুন্দর প্রকাশিত হোক্, আমরা যেন দেহে, মনে আত্মশক্তিতে বলীয়ান্ হ'তে পারি—আর 'প্রবাসী'ও যেন এই সত্য শিব সুন্দরের প্রকাশে, এই বল-লাভের প্রয়াসে বহুকাল ধ'রে আমাদের জাতির সাহচর্য্য ক'র্‌তে পারে।

কুং-ফু-ৎসু

(মূল চীন ভাষা হইতে অনুবাদিত)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১। মহা শিক্ষার ধর্ম্ম (তাও) সমুজ্জ্বল পুণ্যকে উজ্জ্বল করা, জাতিকে নবীন করা, শ্রেষ্ঠ মঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করা।

২। আশ্রয়কে জানা হইলে,পরে উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইবে। উহা স্থিরীকৃত হইলে পরে শান্ত ভাব আসিবে, শান্ত ভাব আসিলে পরে অচঞ্চলতা আসিবে। অচঞ্চলতা আসিলে পরে স্থিরতা আসিবে। স্থিরতা আসিলে বিচার বুদ্ধি আসিবে। বিচার বুদ্ধি আসিলে অভীষ্টসিদ্ধ হইবে।

৩। বস্তুমাত্রেরই মূল ও শাখা আছে। কর্ম্ম

মাত্রেরই আরম্ভ ও শেষ আছে। প্রথম ও পর (শেষ) এর জ্ঞান ধর্ম্ম বা 'তাও'-তে পৌছাইবে।

৪। প্রাচীনদের ইচ্ছা আকাশতলে (পৃথিবীতে) সমুজ্জ্বল পুণ্যকে উজ্জ্বল করা। (সেইজন্য) প্রথমে তাঁহারা রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহাদের রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার ইচ্ছায় প্রথমে তাঁহাদের পরিবার সুব্যবস্থিত করেন। তাঁহাদের পরিবার সুব্যবস্থিত করিবার ইচ্ছায় প্রথমে তাঁহাদের দেহের চর্চ্চা করেন। তাঁহাদের দেহের চর্চ্চার ইচ্ছায় প্রথমে তাঁহাদের হৃদয় পবিত্র করেন। তাঁহাদের হৃদয় পবিত্র করিবার ইচ্ছায় প্রথমে তাঁহারা চিন্তায় সরল বা সুন্দর হন। তাঁহাদের চিন্তায় সুন্দর করিবার ইচ্ছায় প্রথমে তাঁহারা জ্ঞান বিস্তারিত করেন।

জ্ঞানবিস্তৃতি হইতেছে বস্তর মর্মানুসন্ধান।

৫। বস্তর অনুসন্ধান হইলে, পরে জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান লাভ হইলে, পরে চিন্তা সরল বা সুন্দর হয়। চিন্তা সুন্দর হইলে, পরে হৃদয় পবিত্র হয়। হৃদয় পবিত্র হইলে, পরে দেহের চর্চ্চা হয়। দেহের চর্চ্চা হইলে, পরে পরিবার সুব্যবস্থিত হয়। পরিবার সুব্যবস্থিত হইলে, পরে রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত হইলে, পরে মর্ত্ত্যলোকে শান্তি আসে।

৬। দেবপুত্র (সম্রাট্) হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য জন অর্থাৎ সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলেই দেহ-চর্চ্চাকে সমস্তের একমাত্র মূল বলিয়া বিবেচনা করেন।

৭। (বস্তর) মূল নষ্ট হইয়াছে,—শাখাপ্রশাখা সুনিয়ন্ত্রিত—কখনই হয় না। যাহা পুষ্ট তাহার শাখা শীর্ণ, —এবং যাহা শীর্ণ তাহার শাখা পুষ্ট (এরূপ হয় না)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১। [সম্রাট বু তাঁহার ভ্রাতা কাঙ্‌কে এক স্থানের সামন্ত-পদে বরণ করিবার কালে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই এই স্থানে কুং-ফু-ৎসু উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন] কাঙের প্রতি অনুজ্ঞাপত্রে বলা হইয়াছে, (যে তাঁহাদের পিতা) পুণ্যকে সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

২। [মন্ত্রী ইয়িন শাঙ্গ্ বংশের (খৃঃ পূঃ ১৭৫৩-১৭১৯) দ্বিতীয় সম্রাট্ তাই-চিয়াকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, নিম্নলিখিতটি তাহা হইতে উদ্ধৃত]

তাই-চিয়াকে বলা হইয়াছে, 'যে (পূর্ব্ব সম্রাট্) ইহাকে দৈবের সমুজ্জ্বল ব্যবস্থা বলিয়া দেখিতেন।'

৩। [সম্রাট্] ইয়া ও-এর বিধিতে আছে, 'যে তিনি মহাপুণ্যকে সমুজ্জ্বল করিতে পারিতেন।'

৪। সকলে আপনাকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

৫। টাঁ'ঙ (রাজার) স্নানপাত্রে খোদিত আছে, 'যদি দৈনিক নবীন হইতে চাও ত' দিনদিন নবীন হও; (তাহা হইলে) পুনরায় দৈনিক নবীন হইবে।'

৬। কাঙের প্রতি উপদেশে 'লোক বা জনসঙ্ঘকে নবীন করিতে।'

৭। [কুঙ্-ফু-ৎসু সংগৃহীত আছে] কবিতায় বলিয়াছে, 'চৌ যদিও প্রাচীন রাজ্য, ইহার বিধিবিধান নূতন গড়া।'

৮। ইহার কারণ মহামানবগণ সর্ববিষয়ে তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। কাব্য-সংগ্রহে আছে 'রাজ্যের রাজধানী সহস্র লি (চীনা মাইল) বিস্তৃত; সেখানেই প্রজার আশ্রয়।

২। কাব্য-সংগ্রহে আছে, 'হলদে পাখী মিং মাং করে। পাহাড়ের বনভূমে তার আশ্রয়;' গুরু বলিতেছেন 'বিশ্রামকালে, সে জানে কোথায় তাহার আশ্রয়। মানুষ কি পাখীর সমানও নয়?'

৩। কাব্য-সংগ্রহে আছে, 'কী গভীর উদার ছিলেন রাজা বেন (Wen)! কী নিরবচ্ছিন্ন উজ্জ্বল শ্রদ্ধায় তাঁহার আস্থা ছিল!' সম্রাট্‌রূপে তিনি মানবতার শরণ লইয়াছিলেন। মন্ত্রীরূপে তিনি শ্রদ্ধার শরণ লইয়াছিলেন। পুত্ররূপে তিনি ভক্তিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পিতারূপে তিনি দয়ার আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং প্রজার সহিত সম্বন্ধে তিনি বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াছিলেন।

৪। কাব্য-সংগ্রহে আছে, 'তাকিয়ে দেখ ঐ চি (আঁকাবাঁকা) নদী—(পাশে) সবুজ বাঁশে কত প্রচুর।

এই ত' মধুর-স্বভাব ভদ্রলোক! যেমন কাটা তেমনই পাৎলা করা; যেমন খোদাই করা তেমনই ঘষিয়া পালিশ করা। তিনি কী সংযমী! কী পৌরুষ, কী মহত্ত্ব, কী বৈশিষ্ট্য। মধুর-স্বভাব ভদ্রলোকটিকে কথ'নো ভুলা যায় না। 'যেমন কাটা তেমনই পাৎলা করা কথাটির অর্থ হইতেছে জ্ঞানার্জন। যেমন খোদাই তেমনই পালিশ করা' ইহার অর্থ আত্মকর্ষণ বা উন্নতি। 'কী সংযম, কী পৌরুষ' ইহার অর্থ সংযত সম্ভ্রম। 'কী মহত্ত্ব, কী বৈশিষ্ট্য ইহার অর্থ ভীতি। মধুর-স্বভাব ভদ্র লোকটিকে ভুলা যায় না'—ইহার অর্থ এই যে পুণ্য পরিপূর্ণ হইলে, মঙ্গল পরম হইলে লোকে তাহাকে আর ভুলিতে পারে না।

৫। কাব্য-সংগ্রহে আছে, আহা পূর্বতন রাজাদিগকেও (বেন রাজা ও বু-রাজা) ভুলে নাই! (তাঁহাদের পরে) ভদ্রলোকগণ যাহা মূল্যবান্ তাহারই মূল্য দিয়াছেন, যাহা ভালবাসার তাহাকে ভাল-বাসিয়াছেন। সাধারণ লোক যাহাতে সুখ পাওয়া যায় তাহাতে সুখী হইয়াছে, ও যাহাতে তাহাদের উপকার বা লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে লাভবান্ হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুরু বলিলেন 'অভিযোগ শুনিতে আমি অন্য লোকের মত, নিশ্চয়ই তাহাই। অভিযোগ দূর করা কি প্রয়োজন নহে? যে কামনারহিত তাহার পক্ষে অভিযোগ বাক্য প্রয়োগ করা অসম্ভব। মহৎ ভয় লোকের মনে থাকিবে। ইহাকে বলে মূলকে জানা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহাকে বলে মূলকে জানা। ইহাকে বলে জ্ঞানের সফলতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১। 'তাঁহাদের চিন্তার সরলতা' বলিতে বুঝা যায় এই (তাঁহাদের মধ্যে) আত্ম-প্রবঞ্চনা নাই—যেমন (আমরা) দুর্গন্ধকে মন্দই বলি, সুন্দর বর্ণকে ভালই বলি। ইহার নাম আত্মরতি। সুতরাং ভদ্রলোকে তাহাদের ক্ষুদ্র বিষয়েও সতর্ক হইবেন।

২। হীন ব্যক্তি একাকী বাস করে অর্থাৎ স্বার্থপর, অমঙ্গল করে; অসাধ্য (তাহার কিছুই) নাই। ভদ্রলোক দেখিলে পরে আত্মগোপন করে; তাহার অসাধু-(ভাব) কে ঢাকা দেয়; তাহার সাধুতা বাহিরে দেখায়। লোকের দেখাতে সে যেন দেখায় ফুসফুস ও যকৃতের মত (চীনাদের বিশ্বাস ছিল যে ফুসফুস ন্যায়পরায়ণতার কেন্দ্র ও যকৃৎ পরোপকারের স্থান)। ইহার কি ফল হইবে? ইহাকে বলে যে সরলতা অন্তরে থাকিলে বাহিরে প্রকাশ পায়; সুতরাং যিনি ভদ্রলোক তাঁহাকে ক্ষুদ্র বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

৩। ৎসেঙ্-ৎস্ বলিয়াছিলেন, 'দশ চক্ষু যাহা দেখায়, দশ হস্ত যাহা গড়ে, তাহা কি শ্রদ্ধেয় নহে?'

৪। ঐশ্বর্য্য গৃহকে উজ্জ্বল করে; পুণ্য দেহকে উজ্জ্বল করে। হৃদয় উদার হইলে দেহ শান্ত হয়। সুতরাং ভদ্রলোক তাঁহার চিন্তাধারাকে নিশ্চয়ই সরল করিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১। দেহের চর্য্যা বলিতে বুঝায় চিত্তের শোধন। ক্রোধরিপু বশবর্ত্তী দেহ (মনুষ্য) যাহা ন্যায় তাহা প্রাপ্ত হইবে না; ভয়-আতঙ্কিত যাহা ন্যায় তাহা প্রাপ্ত হইবে না; সুখলিপ্সু যাহা ন্যায় তাহা প্রাপ্ত হইবে না; উৎকণ্ঠিত চিত্ত যাহা ন্যায় তাহা প্রাপ্ত হইবে না। মন যখন নাই (কাজে) তখন দেখি বটে, কিন্তু লক্ষ্য করি না; শুনি বটে, কিন্তু গ্রহণ করি না; আহার করি, কিন্তু তাহার স্বাদ পাই না। ইহাকে বলে যে দেহচর্য্যা মন শোধন করার উপর নির্ভর করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১। 'পরিবার সুব্যবস্থিত করা লোকের দেহ চর্য্যার উপর নির্ভর করে।' ইহার অর্থ এই যে লোকে স্নেহ ও ভালবাসার নিকট পক্ষপাতদুষ্ট; যাহা হেয় তাহাকে ঘৃণা করিয়া পক্ষপাতদুষ্ট হয়; লোকে যাহা ভয় করে তাহার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়; যেখানে দয়া ও প্রীতি করে সেখানে পক্ষপাতদুষ্ট হয়! লোকে দাম্ভিক ও রূঢ় হইয়া পক্ষপাতদুষ্ট হয়।

সুতরাং ভালবাসে অথচ তাহার মন্দগুণকে জানে; ঘৃণা করে অথচ জানে তাহার সুন্দর গুণকে,—পৃথিবীতে (সেইরূপ লোক) অল্প।

২। সেইজন্য জনপ্রবাদ আছে, 'লোকে জানে না তাহা ছেলের মন্দ। জানে না তার শস্যের ডগা কেমন বড়।'

৩। সেইজন্য বলা হইয়াছে যে দেহের চর্য্যা বিনা পরিবার সুব্যবস্থিত হইতে পারে না।

নবম পরিচ্ছেদ

১। রাজ্য সুশাসন বলিতে ইহাই বুঝায় যে নিশ্চয়ই প্রথমে পরিবার সুব্যবস্থিত হইয়াছে। পরিবার সুশিক্ষিত না হইলে কি লোককে শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে?—তাহা হয় না। সুতরাং সম্রাট্ পরিবারের বাহিরে না গিয়া রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন।

ভক্তির দ্বারা সম্রাট্কে সেবা কর, ভ্রাতৃস্নেহের (শ্রদ্ধার) দ্বারা বয়োবৃদ্ধদের সেবা কর, প্রীতি দিয়া সকলের সহিত ব্যবহার কর।

২। কাঙ ঘোষণায় বলিয়াছেন, 'যেন শিশুকে পালন করিতেছ,' (এম্নিভাবে কাজ করিবে)। অন্তঃকরণ সরলভাবে সন্ধান কর; যদিও অন্তঃস্থলে না পৌছায়, কাছাকাছি (যাইবে)। (এমন মেয়ে) কখনো হয় না (যাহাকে) সন্তান পালন শিখিতে হয়, (যেহেতু) পরে সে বিবাহিতা হইবে।

৩। একটি পরিবারের মানবতার (উদাহরণে) একটি রাজ্য মানবিক হয়। একটি পরিবারের শিষ্টাচারে একটি রাজ্য শিষ্টাচারী হয়। একটি লোকের লোভে একটি রাজ্য অসংযমী হয়। ইহার গতি যেন এই।

কথায় বলে, 'একটি বাক্য (সকল) কর্ম ধ্বংস করিতে পারে; একজন লোক একটি রাজ্য ঠিক করিয়া দিতে পারে।

৪। ইআও ও শুন্ (খৃঃ পূঃ ২৩ শতাব্দীতে) পৃথিবী (রাজ্য) চালনা করিয়াছিলেন মানবতার সহিত, এবং লোকে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছিল। চিয়ে ও চউ (রাজারা) পৃথিবী (রাজ্য) চালনা করিয়াছিলেন নিষ্ঠুর-ভাবে, এবং লোকেও তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছিল (অর্থাৎ লোকেও নিষ্ঠুর হইয়াছিল)। তাহাদিগকে যাহা আদেশ করা হইয়াছিল তাহা তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত, এবং লোকে উহা অনুসরণ করে নাই। সেইজন্য রাজার সেইসব (গুণ) নিজের থাকা চাই, যেগুলি তিনি লোকের মধ্যে চাহেন; স্বয়ং মন্দ বিবর্জিত হইলে পরে লোকে মন্দ বিবর্জিত হয়।

নিজের যাহা অনুচিত (যাহা অন্যের প্রতি করা উচিত নহে এমন সব ব্যবহার) তাহা (গোপনে) সঞ্চয় করিবে এবং অপর সকলে (উল্টা) বুঝাইতে সমর্থ হইবে—কাহারও এমন হয় নাই।

৫। সুতরাং রাজ্যশাসন নির্ভর করে নিজ পরিবারের সুব্যবস্থার উপর।

৬। কাব্যসংগ্রহে আছে, "ঐ 'পীচ' গাছের কি তাজা ভাব; উহার পল্লব কি ঘন! এই যে মেয়েটি বিবাহ করিয়াছে—তাহার পরিবারের লোকদের সহিত কেমন মিশিয়া গিয়াছে!" নিজ পরিবারের লোকের সহিত এক হইলে, পরে রাজ্যবাসীদিগকে শিক্ষা দান করা যায়।

[উক্ত কবিতাটি সম্রাট্ বেন-এর রাণীর উদ্দেশ্যে লিখিত; তিনি আদর্শ স্বামীর উপযুক্ত পত্নী ছিলেন]

৭। কাব্য-সংগ্রহে আছে, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত এক হইয়া যাইতে পারে, কনিষ্ঠের সহিত এক হইতে পারে।" রাজা জ্যেষ্ঠের সহিত এক হউন, ও কনিষ্ঠের সহিত এক হউন ও পরে রাজ্যবাসীদিগকে উপদেশ করুন।

৮। কাব্য-সংগ্রহে আছে, "তাঁহার চালচলনে নাই কিছু অন্যায়; (সেইজন্য) রাজ্যের লোক সুনিয়ন্ত্রিত হয়।" (রাজা) নিজে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতারূপে আদর্শ হইলে, পরে লোকে তাহার অনুকরণ করে।

৯। ইহাকে বলে "রাজ্যশাসন নির্ভর করে নিজ পরিবার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উপর।"

প্রথম দশ বৎসরের প্রবাসী

১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে বাংলা দেশের বাহিরে প্রবাসে এলাহাবাদ সহরে প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত হয়। "বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিক পত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম," পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদক-মহাশয় যখন এই কথা লেখেন, তখন বাংলাদেশেও সচিত্র মাসিক পত্রের বাহুল্য ছিল না। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত 'প্রদীপ' বোধ হয় ছিল একমাত্র সচিত্র মাসিক। আর ছিল "সখা" "মুকুল" প্রভৃতি শিশুসাহিত্য-বিষয়ক কয়েকটি মাসিক পত্র। বলিতে গেলে ঠিক সেই সময় বাংলা দেশেও প্রবাসীর মত মাসিক পত্র বিরল ছিল। বহুকাল পূর্ব্বে কতকটা ঐজাতীয় মাসিক পত্র ছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" প্রভৃতি।

প্রবাসীর সূচনায় দেখি, "প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভাল। এইজন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।" মানুষ যতখানি আশা করে তাহা জীবনে কচিৎ ফলবতী হয়, সুতরাং প্রবাসীর আশা সকল দিক্ দিয়া ফলবতী হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু তাহার পঁচিশ বর্ষব্যাপী জীবনে সে তাহার আশা ও উদ্দেশ্য যে কি তাহা সম্ভবত স্বদেশবাসী ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের বুঝাইতে পারিয়াছে। আমরা আজ আনন্দের সহিত বলিতে পারিতেছি যে এই পঁচিশ বৎসরের ভিতর প্রবাসীকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া বার-বার নবজন্মলাভ করিতে হয় নাই। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সে একই জীবনে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

পরলোকগত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বৈশাখের প্রবাসীর পৃষ্ঠায় প্রথম ভারতীর আবাহন রূপ মাঙ্গলিক কার্য্য করেন। তিনিই প্রয়াগের কমলাকান্ত বেশে উপন্যাস, গল্প, ব্যঙ্গ কবিতা, ও সরস নিবন্ধাদি দিয়া প্রথম সংখ্যা হইতে প্রবাসীকে সাজাইয়াছিলেন। আজ আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

আজ পঁচিশ বৎসর পরে "প্রবাসী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, প্রবাসীর প্রথম সংখ্যাকেও এমনই করিয়া তিনি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সুবিখ্যাত "প্রবাসী" কবিতা দিয়া অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন :—

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব বুঝিয়া!
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই
কোথা দিয়ে সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া!
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়;
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া!

* * *

এ সাত-মহলা ভবনে আমার
চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চিরজনমের ভিটাতে?

* * * *"

প্রথম সংখ্যা প্রবাসীর সপ্তম প্রবন্ধ "জীববিদ্যা" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত। আজও তিনি প্রবাসীতে লিখিয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "কীর্ত্তিস্তম্ভ" (চিতোরের জয়স্তম্ভ)। অষ্টম স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছিল। প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানেন্দ্র-বাবু প্রবাসীর সহিত যুক্ত। তাঁহার "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" প্রবাসীর পৃষ্ঠাতেই বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আজও তাহাতে নব-নব পৃষ্ঠা সংযোজিত হইতেছে।

প্রথম সংখ্যার প্রবাসী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে আমরা বীজরূপে যে-যে উদ্দেশ্যের দেখা পাই, আজীবন তাহা বিকশিত করিয়া তুলিতে প্রবাসী যত্ন পাইয়াছে।

কাব্য, উপন্যাস, রসনিবন্ধ, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং শিল্পব্যবসায় সংক্রান্ত (শর্করাবিজ্ঞান) রচনা সকলই প্রথম সংখ্যায় দেখা যায়। উপরন্তু দেখিতেছি 'অজন্টাগুহা চিত্রাবলী" বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ। তখনকার দিনে বাংলাদেশে অজন্টাগুহা ও ভারতীয় চিত্র-কলার নামই অল্প লোক জানিত। সে যুগে সম্পাদকের এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ অভিনব। ইতিপূর্ব্বে ভারত-চিত্রকলা বিষয়ক এরূপ প্রবন্ধ বাংলাভাষায় কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর তখন ভারতের লোকেরা করিতে শিখেন নাই। অতীতেও তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন। এই প্রবন্ধটি-সম্বন্ধে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, 'প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। * * * 'সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল, অজন্টাগুহা চিত্রাবলী। * * এরূপ প্রবন্ধ আর কোথাও দেখিয়াছি মনে হয় না। * * এইরূপ প্রবন্ধ পড়িলে আমাদের স্বদেশ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য কত কাছে, তাহা বুঝা যায়। * * প্রবাসীর চিত্র-নির্ব্বাচনও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।'

শ্রীযুক্ত (এখন স্যর) অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "'সকল প্রবাসীর পক্ষেই প্রবাসী গৌরবের কারণ হয়েছে। 'অজন্টাগুহা'র মতন প্রবন্ধ বোধ হয় বাঙ্গলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব"।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন, "অজন্টাগুহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা শত সহস্র বৎসর পুর্ব্বের হিন্দু সমাজের একটি অপূর্ব্ব স্তর উদ্‌ঘাটন করিতেছে। এই প্রবন্ধটি শুধু ভারতের শিল্পকলা হিসাবে নয়, সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতির দিক দিয়াও একখানি মূল্যবান্ ও শিক্ষাপ্রদ ইতিবৃত্তের সূচনা। লেখা অনাড়ম্বর ও কৌতূহলোদ্দীপক।"

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস লিখিয়াছিলেন "চিত্রসম্বলিত 'অজন্টাগুহা' প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইয়াছে।"

বসুমতী লিখিয়াছিলেন, "অজন্টাগুহা প্রবন্ধটি চিত্র ও লিপি সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি নৈপুণ্যের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শন লিখিয়াছিলেন, "অজন্টাগুহা চিত্রাবলী মনোহর সচিত্র প্রবন্ধ।"

বিবিধপ্রসঙ্গ প্রবাসীর আর-একটি বিশেষত্ব। প্রথম সংখ্যাতেই ইহার দর্শন পাওয়া যায়; যদিও পরে কিছুকাল 'বিবিধপ্রসঙ্গ' নামটি আর ব্যবহৃত হয় নাই। প্রবাসী যে আজন্ম বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে অনুরাগী তাহার প্রমাণ প্রথম সংখ্যা হইতেই পাওয়া যায়। এই সংখ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল, তাহাতে বাঙ্গালী ছাত্রের অনুপাত ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত দুইজন বাঙ্গালীর (শ্রী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) বিষয় প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পঞ্জাব প্রভৃতির বিজ্ঞান-পরীক্ষাপ্রণালী আলোচনা করিয়া সম্পাদক লিখিতেছেন, "পরীক্ষার নিয়ম হিসাবে কলিকাতা পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। কলিকাতার পরীক্ষা-প্রণালীর সংস্কার প্রার্থনীয়।"

প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রবাসী দেখিয়াই তাহার লেখা, ছাপা, চিত্র, প্রবন্ধগৌরব, কাগজ, মলাট, বৈচিত্র্য, রচনানৈপুণ্য প্রভৃতির বহুলোকে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার ভিতর ঔপন্যাসিক শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাহিত্যরসিক স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন, কবি শ্রী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত (এখন স্যার) অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, কবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রামেন্দ্রসুন্দর "প্রবাসী সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইতেছে" ইত্যাদি লিখিবার পর বলিতেছেন, "বিদেশে থাকিয়াও আপনি যে এরূপ উচ্চ আদর্শের পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে বাস্তবিকই শ্লাঘার বিষয়। বাঙ্গালা মাসিক পত্রে হাস্যরসের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। এবিষয়ে আপনার একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়াও প্রীত হইলাম।"

প্রবাসীতে হাস্যরসের উপাদান যোগাইতেন 'কমলাকান্ত শর্ম্মা' বেশে কবি দেবেন্দ্রনাথ। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের প্রবাসীতে তাঁহার লিখিত সচিত্র কবিতা বিংশ শতাব্দীর 'বর' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবাসী বাহির করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উহার সম্পাদক একটি বাংলা সাপ্তাহিকে ভ্যালুপেয়েব্‌ল ডাকে বর প্রেরণ সম্বন্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক গল্প লেখেন। তাহার বিষয় তাঁহার মুখে শুনিয়া কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এই কবিতাটি লেখেন। ভ্যালুপেয়েব্‌লে বর পাঠাইবার সংকেতটি ছাড়া আর সমস্তই কবির নিজের। "বিংশ শতাব্দীর বর" লইয়া আসিয়া—

"সহাস্যে পিয়ন কহে, ডাকের পেয়াদা
আমি। বাবু! আপনারা নুতন কায়দা
শোনেননি? এবৎসর হইয়াছে জারি।
আমায় বক্‌শিশ দাও, যাই অন্য বাড়ি!
সন্ধ্যা হবে; লও এই নুতন দুলাহা!
তৃষ্ণায় বরের মুখ শুকায়েছে আহা!
দশ হাজার টাকা দিয়া, ভি, পি, প্যাকেট
লও বাবু; আমি যাই, হইতেছে লেট।"
* * * * * * *
দীর্ঘশ্বাস ফেলি কর্ত্তা, কহিলা গম্ভীরে
ডাকের পেয়াদাটিরে, অতি ধীরে ধীরে,
"প্যাকেটে জামাই আসা এ বড় অদ্ভুত!
পাঁচটি হাজার টাকা কেবল প্রস্তুত
আছে আজি; কালি দিব ধারধোর করি;
জামায়েরে খুলে দাও, কাটি দড়াদড়ি।"
ডাকের পেয়াদা ছিল ইংরাজীনবিশ।
সে বলিল, দেখ বাবু কি strict notice,
To your address, the bridegroom is sent
Can't be delivered without full payment"

এইজাতীয় বহু গদ্য ও পদ্য নিবন্ধে দেবেন্দ্রনাথ প্রবাসীকে সাজাইতেন। 'গ্রন্থকার মাহাত্ম্য' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮,) প্রভৃতি রচনা দ্বারাও এবিষয়ে সাহায্য হইত। যথা:—

"জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্‌! আপনি যে গ্রন্থকার নামক অপূর্ব্ব মনুষ্য জাতির উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা ধরিত্রীর কোন্ খণ্ডে আবির্ভূত হইবেন, এবং জগতের কোন্ মহাকার্য্য সাধন করিবেন? * * * * "বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্‌! গ্রন্থকারগণ কলিযুগের সন্ধ্যা-মুহূর্ত্তে এই ভারত ভূমিতেই অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহারা নানা স্থানে, নানা প্রকারে প্রকটিত হইবেন। তাঁহাদিগের চক্ষু কোটরগত, কেশ রুক্ষ, বসন মলিন ও জীর্ণ, তাঁহাদিগের কটাক্ষ কুটিল, গতি কুটিল, এবং চিত্তও কুটিল। যিনি মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ এবং অপরভাষা যাঁহার পক্ষে বিষবৎ তিনিই গ্রন্থকার। যাঁহার রসনাগ্র ক্ষুরধার ও যাঁহার লেখনীর অগ্রভাগ সম্পূর্ণ ধারশূন্য তাঁহাকেই গ্রন্থকার বলিয়া জানিবেন।

* * * *

যিনি স্বরচিত পুস্তকের স্বয়ং সমালোচনা করেন এবং সেই সমালোচনা অপরের নামে অন্য পত্রে প্রকাশ করেন, তিনিই গ্রন্থকার।

* * * * *

যিনি স্বপ্রণীত পুস্তকে কোনো ব্যক্তির যশোগান করিয়া তাহার নিকট কিছু প্রত্যাশা করেন তিনিই গ্রন্থকার।"

প্রবাসী প্রথম হইতেই দেশে শিক্ষাপ্রচার-বিষয়ে উৎসাহী। ইহার বিবিধ প্রসঙ্গে প্রথম সংখ্যাতেই শিক্ষা-বিষয়ক নানা আলোচনা উত্থাপন করা হয়, দ্বিতীয় সংখ্যায় "শিক্ষার উন্নতি ও তন্নিমিত্ত দান" নামক স্বতন্ত্র সচিত্র প্রবন্ধে সম্পাদক শিক্ষার সহিত অর্থের সম্পর্ক ও ধনীদের শিক্ষার্থে সদ্ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধে বিখ্যাত দাতা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, জামসেদজী তাতা, শিবরাম আপ্তে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নাথুভাই, জিজিভাই, পাচেয়াপ্পা মুদালিয়ার, গঙ্গাধর পটবর্দ্ধন, মুন্সী কালীপ্রসাদ কুলভাস্কর প্রভৃতির দানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তাঁহাদের চিত্র প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন, কবি যোগীন্দ্রনাথ বসু, ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পত্র লিখেন।

১৩০৮এর জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে "বাঙ্গালী" প্রবন্ধে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পুরাকালে বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা ও উপনিবেশ স্থাপন, বলিদ্বীপ ও যবদ্বীপ প্রভৃতি পুরাতন জনপদে বঙ্গদেশের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মিথিলা, গুর্জ্জর ও কাশ্মীর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বহু বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়-মহাশয় প্রথম যুগে প্রবাসীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাহার বহু মূল্যবান্ রচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

পঁচিশ বৎসরের প্রবাসীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার মত করিয়া পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং সে চেষ্টা করিব না। কেবল দুই সংখ্যারই একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া গেল। অতঃপর প্রথম দশ বৎসরের প্রবাসীর একটা মোটামুটি ইতিহাস দিয়া যাইব। তাহাতে সকল লেখক, সকল বিষয় ও সকল চিত্রাদির পরিচয় থাকিবে না। তবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদি ও অধিকাংশ লেখকের পরিচয় থাকিবে।

এই কয় বৎসরে প্রবাসীর লেখক ছিলেন—

(১) কবি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন (ইনি প্রথম সংখ্যা হইতে বহুকাল প্রবাসীতে কবিতা, গল্প ও রস নিবন্ধাদি লিখিতেন। কয়েক বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(২) বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় (ইনি প্রথম কয়েক বৎসর ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে বহু বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন দেশীয় শিল্প ও প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এখনও ইনি প্রায়ই প্রবাসীতে লিখিয়া থাকেন।)

(৩) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রথম সংখ্যা হইতে আজ পর্য্যন্ত) রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে প্রবাসীতে লিখিয়া আসিতেছেন। ১৩১৪ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মাসিক প্রকাশিত তাঁহার অধিকাংশ রচনা অর্থাৎ কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক প্রবাসীতেই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার ভিতর কতক-গুলির নাম উল্লেখ করিব ;—মাষ্টারমশায়-গল্প, গোরা-উপন্যাস, জীবনস্মৃতি, অচলায়তন-নাটক, মুক্তধারা-নাটক, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রক্তকরবী-নাটক, পূরবীগ্রন্থের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য কবিতা, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, শিক্ষার বাহন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, সমস্যা, বিশ্ববোধ প্রভৃতি বিখ্যাত প্রবন্ধ, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ," "সুদূর" "প্রবাসী" ইত্যাদি কবিতা। নাটকগুলি এক-এক সংখ্যাতে সমগ্রভাবে বাহির হইয়াছে। স্বদেশীর যুগের তাঁহার অনেক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা যেমন,- -পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, যজ্ঞভঙ্গ, ব্যাধি ও প্রতিকার, সমস্যা ইত্যাদি প্রবাসীতে প্রথম মুদ্রিত হয়। এগুলি পরে "সমূহ" প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

(৪) বাঙ্গলা ভাষার অভিধান ও 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। এই দ্বিতীয় পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধ অযোধ্যায় বাঙ্গালী, পঞ্জাবে বাঙ্গালী ইত্যাদি নামে প্রবাসীর জন্যই প্রথমে লিখিত ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। প্রবাসী বাঙ্গালীর কীর্ত্তির কথা প্রকাশ করা প্রবাসীর একটা বিশেষ অঙ্গ। জ্ঞানবাবুই বিশেষ-ভাবে ইহার উপাদান সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। ইনি প্রবাসীর বিশেষ হিতৈষী। মাসিক পত্রের জন্য লিখিত ইঁহার প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা রচনা প্রবাসীতেই মুদ্রিত হইয়াছে।

(৫) ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (ইনি প্রথম যুগের প্রবাসীতে ১৩০৮ হইতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও কপিলবস্তু,পাটলিপুত্র, লক্ষ্মণাবতী, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, মালদহ, গৌড় প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পরেও ইঁহার বহু রচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৬) ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। (ইনি প্রথম বর্ষ হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত প্রবাসীতে গল্প ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। অনেক পরেও ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।)

(৭) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ। (ইনি প্রথম বর্ষ হইতে প্রবাসীতে মাঝে-মাঝে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ও মূল গ্রীক হইতে বহু মূল্যবান্ রচনা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।)

(৮) সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, এল্-এল্, ডি। (ইনি এলাহাবাদপ্রবাসী একজন সুপ্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি প্রথম বর্ষ হইতে প্রবাসীর প্রয়াগবাসকালে আইন ইতিহাস ও অন্যান্যবিষয়ে প্রবাসীতে লিখিতেন। কয়েকবৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৯) শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী (ইনি ১৩০৮ হইতে প্রথম যুগের প্রবাসীতে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিতেন।

(১০) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, (ইনি ১৩০৮ হইতে প্রথম যুগের প্রবাসীতে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।)

(১১) ঐতিহাসিক শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (ইনি ১৩০৮ হইতে প্রবাসীতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। সম্ভবত প্রবাসীতেই ইনি প্রথম বাংলা প্রবন্ধাদি লেখেন।)

(১২) কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার (ইনি প্রথম বর্ষ হইতে প্রবাসীতে বহু কবিতা ; প্রহসন, গল্প, নাটক, তপস্যার ফল প্রভৃতি উপন্যাস, এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমালোচনা, প্রাচীনসাহিত্য, বেদ, থেরীগাথা, বৌদ্ধসাহিত্য, ছন্দ, রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃতকাব্য, সংস্কৃতসাহিত্য, পুরাণ, সমাজতত্ত্ব, ক্রীড়া, কাব্য-আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান্ রচনা দিয়াছেন। বিজয়বাবুর মত এত বিচিত্র বিষয়ে এত বেশী রচনা প্রথম যুগের প্রবাসীতে আর কাহারও প্রকাশিত হয় নাই।

(১৩) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (ইনি ১৩০৮ হইতে সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, স্ত্রীশিক্ষা, জাতীয়তা, ভক্ত চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রবাসীতে লিখিতেন। ইঁহার অনেক কবিতাও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের পর কংগ্রেসের উপকারিতা, জাতীয় স্বাবলম্বন, একতা, বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ ও স্বদেশী অতীতের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তির হিতকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে বহু সুলিখিত ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শেষ জীবনে ইনি সাহিত্য চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ; নতুবা আরও অনেক সৎসাহিত্য ইঁহার নিকট প্রবাসী পাইতে পারিত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যু হয়।)

(১৪) বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় (ইনি ১৩০৮ হইতে বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রবাসীতে লিখিয়াছেন। এখনও মাঝে মাঝে লিখিয়া থাকেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের Plant Response প্রকাশিত হওয়ার পর ১৩১৩ হইতে কয়েক বৎসর ইনি বসু মহাশয়ের আবিষ্কারের বিষয় বহু সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়া আচার্য্য বসুর উদ্ভিদ্‌বিষয়ক আবিষ্কারগুলিকে প্রবাসীর সাহায্যে বাংলা পাঠক-সমাজে প্রচার করেন।)

(১৫) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস (ইনি প্রবাসীতে ১৩১১ সালে একটি উপন্যাস লেখেন। তা ছাড়া দ্বিতীয় বৎসর হইতে কয়েক বৎসর নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতেন।)

(১৬) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ (ইনি আগ্রায় বাসকালে ১৩০৮ সালে আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবাসীতে সচিত্র প্রবন্ধ লিখিতেন। পরে অন্যান্য প্রবন্ধও লিখিয়াছেন।)

(১৭) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র সুলেখক যোগীন্দ্রবাবু জীবিতকালে প্রবাসীতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন।)

(১৮) সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (ইনি প্রথমযুগের প্রবাসীতে ১৩০৯ হইতে নানাবিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতেন ও সঙ্কলন করিতেন। ১৩১০ সালে ইঁহার প্রথম গল্প প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে ইঁহার প্রায় সমস্ত ছোট গল্প ও অধিকাংশ উপন্যাস প্রবাসীতেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বহু বৎসর প্রবাসীর সহকারী সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন।)

(১৯) সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক মেজর শ্রী বামনদাস বসু (ইনি প্রবাসীর জন্যই ১৩০৯ হইতে পুরাতন মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও পশ্চিম

সোনালী ফেজেন্ট্ পাখী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

ভারতের নানাপ্রদেশের বিষয় বহু ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এইসকল প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত নানা ঐতিহাসিক চিত্র তিনি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্র সাহিত্য, রণতরী প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান্ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদিও তিনি লিখিয়াছেন। হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী-বিষয়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধগুলিতে বহু চিত্র ও বর্ণনার সাহায্যে ভারতবর্ষের নানা-গাছগাছড়ার অতি প্রয়োজনীয় বিবরণ তিনি দিয়াছিলেন। ইহার সাহায্যে চিকিৎসক ও ঔষধব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেকে বহু জ্ঞান এবং অর্থসঞ্চয় ও শিল্পোন্নতি করিতে পারিবেন। এরূপ প্রবন্ধ বাংলায় এরকম সম্পূর্ণভাবে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। বসু-মহাশয় অন্যান্য বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও সুযুক্তিপূর্ণ মূল্যবান্ বহু প্রবন্ধ বরাবর প্রবাসীতে লিখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বাংলা প্রবন্ধ বোধ হয় সকলগুলিই প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

(২০) সুলেখক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ইঁহার কতকগুলি গল্প ১৩০৯ হইতে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

(২১) সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রকর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (ইনি ১৩০৯ হইতে প্রাচীনকালের জন্তু বিষয়ে প্রবাসীতে কতকগুলি সচিত্র ও সরস প্রবন্ধ লেখেন। পরে তাহা 'সেকালের কথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহার পর সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে ইঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর হাফটোন ব্লক প্রভৃতি ইঁহার সাহায্যে বহুদিন হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার অঙ্কিত একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রাদিও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

(২২) গল্পলেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৩১০ হইতে প্রথম কয় বৎসরের প্রবাসীতে ইঁহার অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে।)

(২৩) শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ (ইনি ১৩১০ হইতে প্রবাসীর লেখক। চন্দননগর নিবাসী এই লেখক-মহাশয়ের চন্দননগর সংক্রান্ত বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রবাসীতে বহু দিন ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত হওয়ার পর অন্যান্য কাগজেও তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। ইনি প্রবাসীতে এখনও লেখেন। চন্দননগরের নানাবিষয়ক ইতিহাস ছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধও দিয়া থাকেন।)

(২৪) কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (ইনি ১৩১০ হইতে প্রথম কয়েক বৎসর প্রবাসীতে কবিতা, স্বদেশীগান ও স্বদেশী প্রবন্ধাদি লিখিতেন।)

(২৫) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল (ইনি ১৩১০ হইতে 'গীতাধর্ম্ম' 'আচার ও প্রচার', ধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বে প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন।)

(২৬) কবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী (ইনি পূর্ব্বে ১৩১০ সাল হইতে প্রবাসীতে কবিতা ও নাট্য কাব্যাদি লিখিতেন। প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছেন।)

(২৭) শিল্পরসিক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (ইনি ১৩১০ সাল হইতে কয়েক বৎসর র‍্যাফেল ও ম্যাডোনা চিত্র, চিত্রে দর্শন, অজন্টাগুহায় ছই দিন, য়ুরোপের প্রাচীন যুগের চিত্র, স্বদেশী চিত্র, স্বদেশী বনাম বিদেশী চিত্র, ইত্যাদি শিল্পবিষয়ক বহু উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ লেখেন। অবনীন্দ্রের চিত্রকলা ও প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের বিশেষত্ব বিষয়ে রচনা ইনিই প্রবাসীর সাহায্যে প্রথম প্রথম বাংলা পাঠক-সমাজে প্রচার করিতেন। ভারতীয় চিত্র কলার পুনরভ্যুদয়-কালে তাহার নানা সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া ও তাহাকে সমর্থন করিয়া ইনি প্রবাসীতে প্রবন্ধ লিখিতেন। তখনকার কালে প্রবাসী ছাড়া অন্য দেশীয় কাগজ ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অনুরাগী ছিলেন না; এবিষয়ে তাঁহাদের শ্রদ্ধার একান্ত অভাব ছিল। এইজাতীয় চিত্র-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রবাসীতেই কেবল বাহির হইত।)

(২৮) ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর (ইনি জীবিতকালে ১৩১০ হইতে প্রবাসীতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি লিখিতেন।)

(২৯) ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী (ইনি পূর্ব্বে প্রবাসীতে মাঝে-মাঝে লিখিতেন)।

(৩০) বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ইনি ১৩১০ সাল হইতে অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবাসীতে বিজ্ঞান, সমাজ হিতৈষণা, শিল্পোন্নতি, জাতীয় উন্নতি, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত লিখিতেন। ইংলণ্ডবাসকালেও প্রবাসীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি পাঠাইতেন।)

(৩১) সুপণ্ডিত ও দার্শনিক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ—(ইনি ১৩১০ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রবাসীতে নিয়মিতভাবে উপনিষদ, বেদ, পারসীক শাস্ত্র, প্রাচীন সভ্যতা, বৈদিক ভারত, দর্শনশাস্ত্র, বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র, বৌদ্ধ-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে লিখিয়া আসিতেছেন। প্রবাসীর দার্শনিক পুস্তক ও সংস্কৃত, গ্রীক, পালি ইত্যাদি পুস্তকের সমালোচনা ইনি করিয়া থাকেন। ইঁহার বহু মূল্যবান্ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদ, উপনিষদ্ ইত্যাদিতে ইঁহার অগাধ অধিকার। ইঁহার অধিকাংশ বাংলা প্রবন্ধ প্রবাসীতেই প্রকাশিত হইয়াছে।)

(৩২) সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী (ইনি ১৩১০ সাল হইতে কিছু কাল সাহিত্যাদি বিষয়ে প্রবাসীতে লিখিতেন।)

(৩৩) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (ইনি বৌদ্ধ-সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে ১৩১১ হইতে প্রবাসীতে লিখিতেন। কিছুদিন হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৩৪) অধ্যাপক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি ১৩১১ সাল হইতে কয়েক বৎসর প্রবাসীতে শিক্ষা-নীতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিতভাবে লিখিতেন। শিক্ষা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্ট ও দেশের কর্ত্তব্য এবং কার্য্য বিষয়ে ইনি বহু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পরে বর্ণমালার অভিযোগ ইত্যাদি ইঁহার বহু হাস্যরসাত্মক নক্সা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৩৫) চীনপ্রবাসী শ্রীযুক্ত রামলাল সরকার (ইনি চীন প্রবাস কালে ১৩১১ সাল হইতে চীনদেশ-বিষয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ও মূল্যবান্ পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। প্রবন্ধগুলিতে তাঁহার গৃহীত চিত্রের প্রতিলিপি থাকিত। সেইসকল চিত্র সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। ইনি অন্যান্য বিষয়েও প্রবন্ধ লিখিতেন। সম্প্রতি ইনি স্বদেশে আছেন।)

(৩৬) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (ইনি ১৩১১ সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রবাসীতে নিয়মিতভাবে বহু উচ্চাঙ্গের ফরাসী গল্পের ও মূল্যবান্ ফরাসী প্রবন্ধের অনুবাদ জোগাইয়া আসিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর পরও ইঁহার অনুবাদ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩৭) শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় (ইনি স্বদেশীর যুগে প্রবাসীতে মাঝে মাঝে স্বদেশী প্রবন্ধ লিখিতেন।)

(৩৮) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ইঁহার অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা ১৩১১ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু তাহা সংগ্রহ করিয়া দেন।)

(৩৯) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার (১৩১১ সাল হইতে ইঁহার বহু ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও অন্যান্য প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইঁহার শাহজহান, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ ও কবি-বচন-সুধা প্রভৃতি মূল ফারসী হইতে সংগৃহীত। এইসকল প্রবন্ধের উপাদান অনেক ফারসী হস্তলিপি প্রভৃতি হইতে তাঁহার দ্বারা উদ্ধৃত। বাংলা ভাষায় তাঁহার দ্বারাই সেগুলি প্রথম সঙ্কলিত। ইনি এখনও প্রবাসীর হিতৈষী লেখক।)

(৪০) ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ইনি ১৩১১ সাল হইতে প্রবাসীতে ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর বহু বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে ইনি প্রবাসীতে গল্প লেখেন। ইঁহার দেশী ও বিলাতী গ্রন্থের প্রায় সমস্ত গল্প ও ফুলের মূল্য, পুনর্মূষিক, বিবাহের বিজ্ঞাপন, বলবান্ জামাতা, রসময়ীর রসিকতা, প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গল্পগুলি প্রবাসীর জন্যই লিখিত হয়। ১৩১৭ সালে ইঁহার প্রণীত উপন্যাস নবীন সন্ন্যাসী প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইনি প্রবাসীতে প্রবন্ধাদিও লিখিতেন।)

(৪১) শ্রী ইন্দিরা দেবী (ইনি পূর্ব্বে প্রবাসীতে গান ও কবিতা মাঝে-মাঝে লিখিতেন।)

(৪২) কবি শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায় (ইঁহার অনেক সুলিখিত প্রবন্ধাদি ১৩১২ হইতে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। ভক্ত চরিত্র প্রভৃতি বিষয় ইঁহার প্রিয় ছিল। ইনি এলাহাবাদ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে লিখিতেন। কয়েক বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৪৩) কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩১২ হইতে প্রবাসীতে কবিতা ও কাব্য সমালোচনা ইত্যাদি লিখিতেন। ১৩১৬ সালে ইঁহার স্বরচিত স্বরলিপিও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৪৪) সুলেখিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবী (১৩১৩ সাল হইতে ইনি নেপাল-সম্বন্ধে নানাজাতীয় প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রবাসীতে লেখেন। পরে সেগুলি "নেপালে বঙ্গনারী" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইনি এখনও মাঝে-মাঝে সাধু চরিত্র ও সাহিত্য সমালোচনাদি বিষয়ে প্রবাসীতে লিখিয়া থাকেন।)

(৪৫) মুকুলের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু (ইনি ১৩১৩ সাল হইতে পৌরাণিক বিষয়ে এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী ইত্যাদি প্রবাসীতে লিখিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(৪৬) ভগিনী নিবেদিতা- (ইনি ১৩১৩ হইতে দেশী ও বিদেশী বহু প্রসিদ্ধ চিত্রের চিত্রপরিচয় প্রভৃতি প্রবাসীতে ইংরাজীতে লিখিতেন। তাহার বাংলা অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইত। কিছুকাল পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৪৭) কবি শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি ১৩১৩ হইতে প্রবাসীতে প্রবন্ধ ও কবিতা প্রভৃতি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে লিখিতেন। আমেরিকা-বাসকালে সেখানকার কলেজ, বিদ্যালয় ও রীতিনীতি বিষয়ে বহু চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। স্বদেশ প্রত্যাগমনের পথে জাহাজডুবিতে ইঁহার মৃত্যু হয়।)

(৪৮) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৩ সাল হইতে প্রবাসীতে ইনি নানা বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি-বিষয়ে চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মাপজোখ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় নিয়মানুসারে ইঁহার শিষ্য নন্দলাল বসুর দ্বারা চিত্র ও নক্সা আঁকাইয়া ইনি কতকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রবাসীর জন্য লিখেন। পরে তাহা ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইনি এখনও প্রবাসীতে লিখিয়া থাকেন। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইঁহার অঙ্কিত চিত্র প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাসী ভিন্ন অন্য কোনো দেশী কাগজে সেকালে স্বদেশী চিত্রের সমাদর ছিল না।)

(৪৯) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী (১৩১৩ সাল হইতে ইনি প্রবাসীর লেখক। এখনও লিখিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মূল পালি হইতে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ, জাতকের গল্প ইত্যাদি নানা বিষয় তিনি সঙ্কলন করিয়া দিতেন। বৈদিক ভারত ও বৌদ্ধভারত বিষয়ক বহু প্রবন্ধও তিনি প্রবাসীতে লিখিয়াছেন।)

(৫০) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ (১৩১৪ হইতে ভারতের স্বরাষ্ট্র, বয়কট্, প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়ে ইনি প্রবাসীতে লেখেন। এখনও মাঝে-মাঝে ইনি প্রবাসীতে লিখিয়া থাকেন।

(৫১) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (ইনি ১৩১৪ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলন ও লোকশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবাসীতে লিখিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৫২) দার্শনিক শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য (১৩১৪ সালে ইনি শঙ্করাচার্য্যের বিষয় প্রবাসীতে লেখেন।)

(৫৩) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। (১৩১৪ সালে ঐতিহাসিক বিষয়ে প্রবাসীতে লেখেন।)

(৫৪) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীলেখক কবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রবাসীতে কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ইনি মাইকেলের অনেক অপ্রকাশিত কবিতা প্রবাসীর জন্য সংগ্রহ করিয়া দেন।)

(৫৫) সুলেখক শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত (১৩১৪ সালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয় লেখেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৫৬) সুলেখক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত (১৩১৫ হইতে কাব্য ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রবাসীতে লেখেন। ১৩১৭ সালে মহাত্মা কেশবচন্দ্রের বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবাসীর জন্য ইঁহার লেখা এখনও মজুত আছে।)

(৫৭) সুচিকিৎসক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক (মিশরের পুরাতত্ত্ব, সাংসারিক অপচয় প্রভৃতি বিষয়ে ১৩২৫ সাল হইতে লেখেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৫৮) কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক (ইনি ১৩১৫ হইতে প্রবাসীতে কবিতা লিখিতেছেন।)

(৫৯) কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (১৩১৫ হইতে প্রবাসীতে কবিতা লিখিতেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৬০) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৫ হইতে দার্শনিক ও অন্যান্য বিষয়ে প্রবাসীতে নিয়মিত লিখিতেন। "জাতীয়তা", সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়েও ইনি প্রবাসীতে লিখিয়াছেন। পরে "গীতা পাঠ" বিষয়ে বহুদিন ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। ইঁহার অন্যান্য প্রবন্ধ ও কবিতাও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত্যুর পরও ইঁহার দুইটি কবিতা গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। ৯/১০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি প্রায় প্রতিমাসেই প্রবাসীতে লিখিতেন। গত ৪ঠা মাঘ ১৩৩২ ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৬১) ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৩১৫ হইতে ইঁহার রচিত প্রবন্ধ, গল্প, অনূদিত উপন্যাস ও সঙ্কলন প্রভৃতি প্রবাসীতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত। ইঁহার প্রথম যুগের রচনা প্রবাসীতেই অধিকাংশ প্রকাশিত হইত। ইনি ভাগ্যচক্র নামক উপন্যাস প্রবাসীর জন্য অনুবাদ করেন।)

(৬২) কবি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোস (১৩১৫ হইতে ইঁহার কবিতাদি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৬৩) শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু (ইনি ১৩০৯ হইতে প্রবাসীতে কবিতাদি লিখিতেন।)

(৬৪) সাংবাদিক সন্তনিহাল সিং (১৩১৫ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইঁহার ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি সমগ্র পৃথিবীর বহু মূল্যবান্ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।)

(৬৫) কবি শ্রীমতী হেমলতা দেবী (১৩১৫ হইতে প্রবাসীর সঙ্কলন বিভাগে ব্রাহ্মধর্ম্ম, পারসী ধর্ম্মসমাজ, ইসলাম ও জাতিভেদ প্রভৃতি বিষয়ে লিখিতেন। ১৩১৬ হইতে ইঁহার কবিতা প্রভৃতি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

(৬৬) সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৩১৫ সালে প্রবাসীতে লেখেন।)

(৬৭) রসায়নশাস্ত্রবিদ্ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী (১৩১৬ হইতে আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে লিখেন।)

(৬৮) ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (১৩১৬ হইতে ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রবাসীতে নিয়মিত লেখেন।)

(৬৯) সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩১৬ হইতে ইঁহার স্বরচিত ও নানাভাষা হইতে অনূদিত অধিকাংশ কবিতাই প্রবাসীতে প্রায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইনি তখন হইতে প্রবাসীর সঙ্কলন বিভাগের জন্যও বহু চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান্ বিষয় লিখিতেন। প্রবাসীর জন্য ইনি গ্যেটে 'জন্মদুঃখী' নামক উপন্যাস অনুবাদ করিয়া দেন। ইনি প্রবাসীর বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি মেটারলিঙ্কের 'দৃষ্টিহারা' প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ নাটক প্রবাসীর জন্য অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্বরচিত উপন্যাস ইঁহার মৃত্যুর পর অসমাপ্তভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৭০) ত্রিপুরার রাজকুমারী শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী (ইনি ১৩১৬ হইতে প্রবাসীতে কবিতা প্রভৃতি লিখিতেন।)

(৭১) 'জাপান' লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৬ হইতে জাপান ও অন্যান্য বিষয়ে প্রবাসীতে লিখিতেন। ইনি অনেক জাপানী গল্প প্রবাসীতে অনুবাদ করিয়া দেন। এখনও মাঝে-মাঝে প্রবাসীতে ইঁহার রচনা প্রকাশিত হয়।)

(৭২) বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত (১৩০৮ হইতে প্রবাসীতে বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিষয়ে লিখিতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়েই ইনি প্রধানত লিখিতেন।)

(৭৩) শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৩১৬ হইতে নেতৃত্বের দায়িত্ব ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখিতেন।)

(৭৪) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার (১৩১৬ হইতে স্বদেশ ও বিদেশ নানাস্থান হইতে বহু আধুনিক তথ্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সংবাদসাহিত্য প্রভৃতি প্রবাসীতে লিখিয়া আসিতেছেন। ইনি এখনও প্রবাসীতে প্রায়ই লেখেন।)

(৭৫) সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৬ হইতে ইঁহার স্বরলিপি ও কবিতা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। ইনি স্বয়ং অথবা ইঁহার শিষ্যেরা রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি এখনও নিয়মিতভাবে দিয়া থাকেন।)

(৭৬) কথাসাহিত্য লেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (ইঁহার সচিত্র ব্রতকথা প্রভৃতি ১৩১৬ হইতে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

(৭৭) সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী (১৩১৬ হইতে ইঁহার রবীন্দ্র-সমালোচনা, নানাবিষয়ক সঙ্কলন ও অন্যান্য কাব্য ও সাহিত্য সমালোচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইত। মৃত্যুকালপর্য্যন্ত ইনি প্রবাসীতে লিখিতেন। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(৭৮) ৺অক্ষয়কুমার দত্ত (ইঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের তৃতীয় ভাগের অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে কিয়দংশ ১৩১৭ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৭৯) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন (১৩১৬ হইতে ইঁহার সঙ্কলন প্রভৃতি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ইঁহার বহু মৌলিক প্রবন্ধ ও ভক্তচরিত্র সঙ্কলন প্রভৃতি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি এখনও প্রবাসীর জন্য লিখিয়া থাকেন।)

(৮০) কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী (ইঁহার কবিতা ১৩১৭ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৮১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (১৩১৭ সালে ইনি প্রবাসীতে গ্রন্থ সমালোচনাদি করেন।)

(৮২) কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন (১৩১৭ সালে ইঁহার কবিতা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৮৩) শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত ও অন্যান্য বিষয়ে ১৩১৭ হইতে ইনি প্রবাসীতে লেখেন।)

(৮৪) হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় (১৩১৭ হইতে ইঁহার আলোচনা, হাস্যরসাত্মক নাটক ও চিত্রবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। ইনি প্রভাত-বাবুর নবীন সন্ন্যাসী ও স্বীয় রচনা প্রভৃতির জন্য হাস্যোদ্দীপক ছবিও প্রবাসীতে আঁকিয়া দিতেন। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

(৮৫) সুলেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৩১৭ হইতে ইনি প্রবাসীতে লিখিতেছেন।)

(৮৬) সুলেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় (১৩১৭ হইতে ইনি প্রবাসীতে প্রবন্ধ কবিতা গল্প ইত্যাদি লিখিতেছেন।)

(৮৭) কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৭ হইতে প্রবাসীতে কবিতা লিখেন।)

(৮৮) কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় (১৩১৭ হইতে প্রবাসীতে কবিতা লিখেন।)

(৮৯) উপন্যাসলেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী (১৩১৭ হইতে প্রবাসীতে কবিতা গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি লিখেন। পরে ইঁহার দিদি ও শ্যামলী উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৯০) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত (১৩১৭ হইতে প্রবাসীতে নানা বিষয়ে লেখেন।)

আমরা প্রবাসীর প্রথম দশ বৎসরের লেখকদের ভিতর ৯০ জন লেখকের নাম ও রচনার সামান্য পরিচয় দিলাম। ইঁহারা ছাড়া আরও বহু সু-

পরিচিত, স্বল্পপরিচিত ও অপরিচিত লেখক প্রবাসীতে এই দশ বৎসরেই লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যায় তাঁহাদের সকলের নাম দেওয়া সম্ভব নহে। আমরা তাঁহাদের সকলের নিকটই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই লেখকগণ ছাড়া প্রবাসীর সম্পাদক স্বয়ং বিবিধপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য বহু স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রতিমাসে লিখিয়া আসিতেছেন। আমরা তাহার পরিচয় পরে দিব। প্রবাসী ভারতীয় চিত্রকলার পুনরভ্যুদয় কাল হইতেই তাহার অনুরাগী। প্রথম যুগের ভারতীয় চিত্রকরদের চিত্র প্রবাসী ভিন্ন অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইত না। প্রবাসী সাধারণের নিকট তাহাকে সুপরিচিত করিয়া দিবার পর এখন সকল মাসিক পত্রই এই চিত্রকলা পদ্ধতির অল্লাধিক অনুরাগী হইয়াছেন। আমরা লেখক ব্যতীত প্রথম দশবৎসরের দশজন শিল্পীর নাম এখানে দিয়া দশবৎসরের প্রবাসীর শতজন হিতৈষীর নামতালিকা সম্পূর্ণ করিব।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ত্রয়ের নাম স্বতন্ত্র লিখিলাম না,কারণ লেখকশ্রেণীতে তাঁহাদের নাম পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ১৩০৯ সাল হইতে অবনীন্দ্রের 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' 'বিরহী যক্ষ' 'সাজাহানের মৃত্যু' 'ভারতমাতা' 'দীপান্বিতা' 'বন্দিনী সীতা' 'প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে' 'সুজাতা ও বুদ্ধ' 'সিদ্ধগণ' 'শাজাহানের তাজনির্ম্মাণ স্বপ্ন' 'গণেশজননী' 'কাজরী' 'তিষ্যরক্ষিতা,' 'শেষ বোঝা' প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ চিত্র প্রবাসীতে প্রকাশিত হইতেছে। এখনও প্রায় প্রতিসংখ্যাতেই তাঁহার অঙ্কিত উচ্চাঙ্গের চিত্র থাকে।

অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর 'সুজাতা ও বুদ্ধ' প্রভৃতি রঙীন ছবি ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৯১) শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু (ইঁহার 'সতী', 'সতীর দেহত্যাগ', 'অহল্যা', 'জগাই মাধাই', 'দময়ন্তীর স্বয়ম্বর' 'ভরতের রাজ্যশাসন' প্রভৃতি চিত্র ১৩১৩ হইতে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইতেছে। এখনও ইঁহার অঙ্কিত চিত্র প্রবাসীতে প্রায় থাকে।

(৯২) শ্রীমতী সুখলতা দেবী (ইঁহার 'বেহুলা' প্রভৃতি বহুচিত্র ১৩১৭ হইতে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

(৯৩ শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাপ্পা। (ইঁহার চিত্র প্রবাসীতে ১৩১৬ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

(৯৪) শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ('দিনমজুর' প্রভৃতি ইঁহার অনেক চিত্র ১৩১৭ হইতে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

(৯৫) হাকিম মহম্মদ খাঁ (ইঁহার অঙ্কিত নাদির শাহের চিত্র ১৩১৭ সালে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৯৬) শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার (১৩১৭ সাল হইতে ইঁহার বীণা প্রভৃতি বহুচিত্র প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৯৭) শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৩১৬ হইতে ইঁহার চিত্র প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।)

(৯৮) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩১৫ হইতে ইঁহার অঙ্কিত 'কারাগারে শিশুকৃষ্ণ,' 'ভোজরাজা ও পুত্তলিকা', 'মহাভারত-লিখন', 'কার্ত্তিক' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্র প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। ইনি অতি প্রতিভাবান্ শিল্পী ছিলেন। ১৩১৬ সালে অকালে ইঁহার মৃত্যু হয়।)

(৯৯) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ (ইঁহার যম ও নচিকেতা প্রভৃতি চিত্র ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়।)

(১০০) শ্রীযুক্ত লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ (১৩১৫ সালে ইঁহার 'অন্তঃপুরিকা' প্রভৃতি চিত্র প্রকাশিত হয়।)

ইহা ছাড়া মোলারাম প্রভৃতির অনেক প্রাচীন চিত্র ও অজন্তাগুহাবলীর বহু চিত্রের প্রতিলিপিও প্রথম বৎসর হইতে প্রবাসী প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি-অনুযায়ী চিত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মা ও মহারাষ্ট্র শিল্পী বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের বহু চিত্রও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইত। এজন্য তাঁহাদের নিকটও প্রবাসী কৃতজ্ঞ।

প্রবাসী প্রথম সংখ্যা হইতেই তাহার চিত্র ও প্রবন্ধ বিভাগের মুদ্রণের জন্য প্রশংসা পাইয়া আসিয়াছে। প্রবাসীর মত সুচিত্রিত মলাটও আগেকার অন্য কাগজে বাহির হইত না। প্রবাসীর প্রথম বৎসরের ছবি ও মলাটের ব্লক করিতেন কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পরে সেই বৎসরই শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা হইতে এই বিভাগের ভারগ্রহণ করেন। প্রবাসীর অনেক মলাট তিনি আঁকিয়াও দিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় এ কার্য্যে তাঁহার সহায় ছিলেন। সুকুমার-বাবু ক্যামেরার সাহায্যে প্রবাসীর জন্য সুদৃশ্য মলাট প্রভৃতি করিয়া দিতেন, হাফটোন ব্লকেরও অনেক উন্নতি তিনি স্বীয় পিতার মতনই করিয়াছিলেন। এই পিতা ও পুত্রের মৃত্যুর পরও ইঁহাদের স্থাপিত ব্লকবিভাগ প্রবাসীর কাজ করিতেছেন। আমরা ইঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রথম বৎসর হইতে প্রবাসী এলাহাবাদে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত হইত। তৎকালের প্রবাসী উৎকৃষ্ট মুদ্রণের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। পরে কয়েক বৎসর ইহা এইচ্ বসু প্রতিষ্ঠিত কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত হয়। তাহার পর আর কয়েক বৎসর ইহা ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। প্রবাসী ইঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। এখন ১৩৩১ সালের আষাঢ় মাস হইতে প্রবাসী তাহার নিজস্ব প্রবাসীপ্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এই দশ বৎসরে প্রবাসীতে কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতির সাধারণ প্রবন্ধ বিভাগ ছাড়া বিবিধ প্রসঙ্গ, সংকলন, পুস্তক সমালোচনা, স্বরলিপি প্রভৃতির বিশেষ বিভাগ দেখা দেয়। ১৩১৬ সাল হইতে সংকলন বিভাগ বিশেষ উন্নতিলাভ করে। এই সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় তাঁহার আশ্রমের অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ক্ষিতিমোহন সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, শরৎকুমার রায়, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমলতা দেবী, অতসী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং কলিকাতায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে এই বিভাগের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। অনেক সংকলন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়া দিতেন ; যেগুলি তিনি নির্ব্বাচন করিয়া অপরকে দিয়া লেখাইতেন তাহার ভিতরও অনেকগুলি আগাগোড়া কাটিয়া আবার নিজে লিখিতেন। এই বিভাগ এখন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া পঞ্চশস্য-বিভাগে পরিণত হইয়াছে।

১৩১৭ সালের পরে প্রবাসীতে ক্রমশঃ কষ্টিপাথর, পঞ্চশস্য, হারামণি, বেতালের বৈঠক, দেশবিদেশের কথা, মহিলামজলিস, ছেলেদের পাততাড়ি প্রভৃতি নানা বিভাগের উৎপত্তি হয়। ক্রমশ অন্যান্য মাসিকপত্রেও এই বিভাগগুলি অন্য নামে দেখা দিতে লাগিল। ইহাতে মাসিক পত্রের বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে।

এই দশ বৎসরে প্রবাসীতে চিত্র ও প্রবন্ধাদির সংখ্যা যাহা ছিল পরে তাহা অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। প্রথম বৎসরের প্রবাসীর পত্র সংখ্যা ছিল ৪৬৬, ১৩১৭ তে হয় ৭০৮ ; কিন্তু ১৩৩২এ ছয় মাসেই ইহার পত্র-

সংখ্যা হয় ৯০৪. সমস্ত বৎসরে ১৮৩২ অর্থাৎ প্রতিসংখ্যায় ১৫২ পৃষ্ঠারও অধিক। প্রবাসীর মূল্য কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়ে নাই। প্রথম বৎসরে প্রবাসীর মূল্য ছিল বাৎসরিক ২॥০, ১৩৩২ সালে ৬॥০, প্রথম বৎসরে প্রতি-সংখ্যার মূল্য ছিল ।৵০, এখন ॥০ আট আনা মাত্র।

১৩১৮ হইতে ১৩৩২ সাল পর্য্যন্ত প্রবাসীতে আরও বহু নূতন লেখক-লেখিকা ও বহু নবীন শিল্পী দেখা দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পরিচয় পরে দিতে চেষ্টা করিব। আপাতত সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রী—

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

বাহির বাড়ীতে বড়কর্ত্তার বৈঠক বসিয়াছিল। দেনাদার, পাওনাদার, উমেদার, মোসাহেব, বন্ধু, পোষ্য ইত্যাদির ভীড়ে কর্ত্তা চাপা পড়িবার যোগাড়; কিন্তু হাস্যমুখে সকলেরই বক্তব্য তিনি শুনিয়া যাইতেছেন। তাঁহার স্মিতহাস্যের অন্তরাল হইতে আপন-আপন ভাগ্য-লিপি খুঁজিয়া বাহির করা কাহারও পক্ষে বড় সম্ভব নয়।

নানা মানুষ নানা আশা লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, মনের কথা সব নিবেদন করিয়া যাইত; কিন্তু শ্রোতার মনে যে কি ছাপ পড়িল তাহা জানিতে পারিত না। তাই দায় থাকিলে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য বারে বারেই আসা যাওয়া চলিত। এমনি করিয়া বৈঠকে ভীড়ের কম্‌তি একদিনের জন্যও ছিল না। মানুষগুলি ছিল নানা-রকম; শাস্ত্রবিধি লইতে বড় কর্ত্তার আসরে ভিন্ন বন্ধুবর্গের গতি ছিল না; আবার শাস্ত্রের পেষণ এড়াইতেও তাঁহাকেই সহায় বলিয়া ডাকিতে হইত। অর্থ যাহার না থাকিত সে ভাবিত বড়বাবুর মনে দয়ার সঞ্চার করিলে হয়ত কিছু মিলিতে পারে; যাহার থাকিত সে মনে করিত ধার দিলে বড়বাবুর কাছেই একটু উঁচু হারে সুদ যোগাড় করিতে পারিব। নানা জনের এম্‌নি নানা মনোবাঞ্ছা সকল দিনের মত আজও বাহির বাড়ীর হাওয়া ভরপূর করিয়া রাখিয়াছিল।

ভিতর বাড়ীতে কর্ত্তার জননী "বড় ঠাকরুণ" একা তিনটি রন্ধনশালা তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন; আঁষ হেঁশেল, নিরামিষ হেঁশেল ও তোলা উনানের দুধ মিষ্টির ঘর, কোথায়ও যেন বউ ঝী দাসী চাকরে ফাঁকি দিয়া কাজ না নষ্ট করে এবং অজ্ঞতার দোষে খাদ্যকে অখাদ্যে পরিণত না করিয়া বসে। এঘর ওঘর হাসি মস্করা করিয়া বেড়াইবার লোভে তাহারা আঁষ নিরামিষ ছোঁওয়া নাতাও করিয়া ফেলিতে পারে, সেটাও একটা মস্ত ভয়। সুতরাং সকল দিকে দৃষ্টি প্রখর রাখা দরকার। এই রান্নাঘরই ছিল তাঁহার সংসারের সবচেয়ে বড় বন্ধন। সংসারে পাঁচ-জন কি লইয়া কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছে তাহা ভাবিবার তাঁর আর বয়স ছিল না, মনও যাইত না, তাই সেদিক্ হইতে তিনি অবসর লইয়াছিলেন।

উঠানে পেয়ারা ও পেঁপেতলায় শিশুরা জটলা করিতেছিল। উঁচু নীচু জমির উপর রাস্তার ধূলা দিয়া তিন ইঞ্চি চওড়া চার হাত লম্বা প্রাচীর তুলিয়া তাহারই ভিতর দুর্ব্বাঘাস, নিমপাতা ও ঝুম্‌কোজবা কাঠির সাহায্যে বসাইয়া গৌরী, ময়না, শৈল, টিনি, ট্যাবা, হাবু পাঁচুর বিশাল সুরম্য উদ্যান হইয়াছিল; বাগানের মাঝখানে ছয় খানা ইটের ও বড়-বড় খবরের কাগজের আকাশস্পর্শী স্বর্ণপুরী গড়িয়া উঠিয়াছিল; পাশ দিয়া বাল্‌তির জলের স্বর্গমন্দাকিনী দেশ দেশান্ত ছাড়াইয়া বহিয়া চলিয়াছিল। শিল্পী গৌরী মুগ্ধ নয়নে আপনার সৃষ্টি দেখিতেছিল ও নূতন-নূতন অলঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিয়া তুলিতেছিল। ছেঁড়া চিঠির কাগজের নৌকা তাহার মন্দাকিনী বাহিয়া ময়ূরপঙ্খীর মত সাত সমুদ্র তের নদীর পারেই বুঝি-বা ভাসিয়া যায়, ভাবিয়া গৌরীর অন্তর আনন্দে বিস্ময়ে দুলিয়া উঠিতেছিল। নৌকার অধিষ্ঠাত্রী মুড়ি পুতুলগুলি যেন জীবন্ত হইয়া হাসিয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিতেছিল। তাহাদের

ছোপানো ন্যাকড়ার পোষাক তখন কিংখাব হইয়া উঠিয়াছে, পুঁতির মালা হইয়াছে গজমোতী ও পদ্মরাগমণির মালা।

গৌরী নৌকার মাথায় পাতলা কাগজের একটা রঙীন ছত্রি দিয়া বলিল, "আমার রাজকন্যা মেঘমালার মুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়্‌বে, তাই ভাই ওর রাজছত্রটা দিয়ে দিলাম।"

গৌরীর খুড়তুতো বোন শৈল উঠানের উল্টা কোণ হইতে পূজার অবশিষ্ট দুইটা ফুল কুড়াইয়া আনিয়া বলিল, "মেঘমালা শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে, ওকে ফুলের গহনা পরিয়ে দাও।"

গৌরী বিরক্ত হইয়া বলিল, "না, ও শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে না; ও ফুল পর্‌বে না। ও সাগরদীঘির তলায় পাতালপুরীতে বাসুকীর দেশে ত্রিকালের সাপের মাথার মণি আন্‌তে যাচ্ছে। তারির গয়না পরে ও ঘুমিয়ে থাক্‌বে। তার পর আকাশজোড়া কালো পাখা নেড়ে দৈত্য এসে ওকে চীনরাজার দেশে নিয়ে যাবে, সেইখানে পরীরা ওর বিয়ে দিয়ে দেবে আলোয়-আলোয় পৃথিবী ছেয়ে।"

শৈলর দিদি ময়না বলিল, "না ভাই, সে বড় হ্যাঙ্গাম। ওসব উপকথার মত অত আমরা কর্‌তে পার্‌ব না।"

গৌরী বলিল, "না পার নাই পার্‌লে! আমি ট্যাবাকে নিয়ে গোয়ালঘরের পাশ থেকে পাথর আর ইট কুড়িয়ে আন্‌ব। তাই দিয়ে কেমন চীনদেশ তৈরি হবে দেখো। হাবুও যাবে আমার সঙ্গে।"

ট্যাবা পরম উৎসাহিত হইয়া কোমরে কাপড় বাঁধিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ভাই, আমি আলাদিনের দৈত্য; চীনদেশ-সুদ্ধ মাথায় করে আন্‌ব। বেশ মজা হবে।" পুলকে বিস্ময়ে গৌরীর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রখর রৌদ্রে সারা উঠান উদ্ভাসিত। শীতের দিনে চক্‌মিলানো বাড়ীর রৌদ্রদীপ্ত বারান্দায় ঝী, বৌ ও দাসীরা কুচোকাচা ছেলেদের গরম সরিষার তেল মাখাইতে বসিয়া ক্রন্দনের কলরোল তুলিয়া দিয়াছে। ইস্কুলের পোড়ো-ছেলেরা রোদে পিঠ দিয়া উঠানের কলে দ্রুত স্নান সমাপনে এ উহাকে হার মানাইবার উৎসাহে এবং শরীরটা একটু গরম করিয়া লইবার ইচ্ছায় ঠেলাঠেলি দাপাদাপি লাগাইয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে "ওমা, ভাত; পিসিমা আমাকেও" ইত্যাদি অনুরোধ রান্নাঘরের দিকে উচ্চকণ্ঠে প্রেরিত হইতেছে। বাহির বাড়ীর মজলিস ভাঙ-ভাঙ; সেখান হইতে চটির শব্দ ক্রমশ অন্দরের দিকে আসিতেছে; ভৃত্যদের প্রতি হাঁকডাকও পড়িয়া গিয়াছে; তাহারা চঞ্চল পদক্ষেপে গাড়ু গামছা তেল লইয়া ছুটিয়াছে।

চারিদিকে মুখর দিবসের প্রখর উগ্ররূপ। তাহারই মধ্যে উঠানের পেয়ারাগাছের আধ-ছায়াজালের তলায় বসিয়া গৌরী তাহার মেঘমালাকে তখনও সাগরদীঘি, পাতালপুরী, চীনদেশ, চন্দ্রলোক, পরীস্থান সকলই নির্ব্বিবাদে ঘুরাইয়া আনিতেছে। তাহার সঙ্গী সাথী হাবু, ট্যাবা, ময়না, শৈল প্রভৃতি কেহবা ক্ষুধার তাড়নায়, কেহবা রন্ধনশালার বেগুনী ভাজার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। মেঘমালার খেলা তাহাদের কাছে আর নূতনত্বের মায়াজাল বিস্তার করিতে পারিতেছে না। কিন্তু গৌরীর নেশা তখনও টুটে নাই। ডুরে শাড়ীখানা কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া পায়ের ঝাঁঝমল হাঁটুর কাছে টানিয়া তুলিয়া সে বাহির উঠানের গোয়ালঘরের এলাকা হইতে চীনদেশ-সৃষ্টির সরঞ্জাম কুড়াইয়া আনিতে ব্যস্ত; কারণ তাহার অনুগত দৈত্যরূপী ট্যাবা তখন পলাতক।

খাটো তসরের থান কাপড় পরিয়া গৌরীর ঠাকুরমা "বড়ঠাকরুণ" নিরামিষ হেঁশেল ও পূজার ঘরের মাঝামাঝি বারান্দায় দাঁড়াইয়া পুত্রবধূকে ডাকাডাকি করিতেছেন। তাঁহার স্নানশুচি দেহ পাছে কোনো অশুচির হাওয়ায় অপবিত্র হইয়া যায়, এই ভয়ে বারান্দার সীমানা অতিক্রম করিয়া যাইতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না। পা দুইটা পূজার বারান্দায় রাখিয়া এবং দেহের উপরার্দ্ধ যতদূর সম্ভব আঁশ হেঁশেলের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তিনি ডাকিলেন, "ওগো বড় বৌমা, হ্যাঁ বাছা, তোমার মেয়ের কি আজ আর নাওয়া-খাওয়ার দরকার নেই? রান্না কর্‌ছ ত কর্‌ছই, এদিকে সূয্যি যে মাথার উপর উঠ্‌লেন,

মেয়ের গায়ে তেলজল পড়বে কখন? শেষকালে কি অবেলায় চান ক'রে একটা ভালমন্দ বাধাবে? মেয়েও ত তোমার তেম্‌নি! যেটের কোলে দশবছর পেরিয়ে গেল, এখনও ধূলো ঘাঁটা, পুতুল খেলা ঘুচল না। শ্বশুর-ঘর করবে কি করে?"

বধূ তরঙ্গিণী মাছের তেলঝাল রাঁধিতে ব্যস্ত; শাশুড়ী রান্নাবান্না ছাড়া অন্যকাজে বড় ডাকেন না; আজ তাঁহাকে অকস্মাৎ ডাকাডাকি করিতে দেখিয়া কোনো-প্রকারে মাথার কাপড় সাম্‌লাইতে-সাম্‌লাইতে বধূ উঠিয়া বলিলেন, "সত্যি বলেছ মা। আমি এই ছিষ্টির রান্না নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি; শীতের বেলা, কোথায় নিজে যোগাড় ক'রে চানটা আরটা ক'রে রাখবে, তা না কোন্ চুলোয় নাচতে গেছেন!"

বড় ঠাকরুণ জিভ কাটিয়া বলিলেন, "মুখখানা অত আল্‌গা দিও না, বৌমা। জামাই আস্‌ছে, আজকের দিনে অমন ক'রে কথা কইতে আছে?" বৌমা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "সাত ঝঞ্ঝাটে আমার কি মাথার ঠিক আছে, মা? যাই, মেয়েটাকে ধ'রে এনে কলতলায় বসাই। এদিকে মুড়ি-ঘণ্ট, দইমাছ, পটোলের দোলমা, সব বাকি প'ড়ে রয়েছে। কি ক'রে যে পাত সাজিয়ে সামনে দেব জানি না।"

ছোট বৌ মৃণালিনীর আজ মেজাজ ভাল ছিল। সে বলিল, "তুমি যাও ভাই, মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করে এস। গায়ের চার পুরু তুল্‌তেই তোমার বেলা ব'য়ে যাবে। আমি ততক্ষণে তিনটে রান্না নামিয়ে ফেল্‌ব।"

তরঙ্গিণী মাছের হাত ধুইয়া মেয়েব সন্ধানে চলিলেন। তিনি ভিতর বাড়ীর গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরের উঠানে কখনও পা দেন না। বয়স হইয়াছে, পুত্র কন্যাও অনেক-গুলি, কিন্তু শাশুড়ী বর্ত্তমানে আজও তাঁহাকে বধূর মতনই এ-সকল দিক্ সমঝিয়া চলিতে হয়। ভিতরের উঠানে গৌরীর দেখা নাই, বাহিরের দরজায় গিয়া যে ডাকাডাকি করিবেন তাহারও উপায় নাই; কে আবার কোথা হইতে গলা শুনিতে পাইবে! লক্ষ্মী ঝী সদর দরজায় ধুলার উপর সেজ ঠাকুরঝির কোলের মেয়েটাকে বসাইয়া জগু বেহারার সহিত হাসি ও গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছে; এতদূর হইতে তরঙ্গিণীর মৃদু আহ্বান ও ইঙ্গিত তাহার কানেও পৌঁছিতেছে না।

বড় ঠাকরুণের মামাতো বিধবা বোন সংসারে সকলকে হারাইয়া এই দিদির সংসারে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স সত্তরের কাছাকাছি; সচরাচর অন্দরের বাহিরে তাঁহারও গতিবিধি ছিল না। তবে দরকার পড়িলে থান কাপড়ে ঘোমটা টানিয়া কুব্জপ্রায় দেহে তিনি এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া কখনও-সখনও বাহিরের উঠান কি বৈঠকখানা ঘর ঘুরিয়া আসিতেন।

তরঙ্গিণী কোনো সহায় না পাইয়া ছোট ঠাকরুণেরই শরণ লইলেন। তিনি তখন নাত-জামাইকে ঠকাইবার জন্য পিটুলির ক্ষীরের ছাঁচ, কাঁকরের সিঙাড়া, লঙ্কাগোলার সরবৎ ইত্যাদি সুস্বাদু জিনিষ তৈয়ারীতে ব্যস্ত ছিলেন। তরঙ্গিণী গিয়া ডাকিলেন, "ছোটমা, গৌরীকে ত এ মুল্লুকে দেখছি না; বোধ হয় বার বাড়ীর উঠোনে আছে। এক-বারটি না ডেকে দিলে ত তার হুঁস হবে না। নতুন জামাই আসছে; মেয়ে ত আমার পুতুলখেলায় ডুবে আছেন। এখন থেকে নাইয়ে ধুইয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে না রাখলে কি যে কাণ্ড ক'রে বসবে তা'র ত ঠিক নেই? ভয়ে মরছি মা, মেয়ে না জানে ঘোমটা দিতে, না জানে গলা নাবিয়ে কথা কইতে, না জানে সমঝে চল্‌তে। কুটু-মবাড়ী নিন্দে রট্‌লে আর কি রক্ষে আছে! এই বেলা একবারটি ডেকে দাও, ভুলিয়ে ফুস্‌লিয়ে দেখি।"

ছোট ঠাকরুণ গল্পের গন্ধ পাইয়া উঠিবার তত তাড়া দেখাইলেন না; বলিলেন, "সত্যি মা, তোমার যা মেয়ে, ও আজ রাতে তোমার ঘর ছেড়ে নড়লে হয়! সকাল বেলা আমায় বল্‌লে কি! চাই বর! আমাকে মার কাছ থেকে আবার নিয়ে যাবে! আমি ওকে রাস্তায় ঠেলে ফেলে দেব।—আমি কত বোঝালুম—ঠাকুর বর এনে দিয়ে-ছেন, মেয়েমানুষের বরই সব, অমন কথা মুখে আনে না। তোমার মেয়ের কথা শুনেছ? সে বলে,—ঠাকুরকে বল্‌ব আমার বিয়ে ফিরিয়ে দিতে। আমি ধুতি পরব, চুল কেটে ফেল্‌ব; মেয়েমানুষ হব না। আমি ঘরে-ঘরে বিয়ে করব। বাড়ীতে ত কত লোক রয়েছে। পরের বাড়ীর বিয়ে আমি চাই না।"

তরঙ্গিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কবে যে মেয়ের বুদ্ধি হবে, ভগবান্‌ই জানেন! এ ক'টা দিন কেটে গেলে আমি বাঁচি। বেয়ানকে ব'লে ক'য়ে যদি আর দুটো বছর কাছে রাখ্‌তে পারি, ত ভাবনা কেটে যায়। তখন আপনি আপনার ঘর সংসার চিন্‌বে। মেয়ের এই কচি বয়েস, আর কেউ না বুঝুক, জামাই যদি বোঝে, তবু মেয়েটা একটু কম ভয় পায়।"

ছোট ঠাকরুণ অবজ্ঞাভরে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাছা, তুমিও যেমন! একে পুরুষ মানুষ, তায় পরের ছেলে। সে আবার বুঝ্‌বে?"

তরঙ্গিণী গল্প ছাড়িয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কপালে যা আছে, তাই হবে মা। তুমি একবার মেয়েটাকে ডেকে দাও।"

অগত্যা বৃদ্ধাকে উঠিতে হইল। গৌরীকে গোয়াল ঘরের দরজার কাছ হইতে ধরিয়া আনিয়া ছোট ঠাকরুণ তাহার মার হাতে সঁপিয়া দিলেন। আপাদমস্তক ধূলি-ধূসরিতা গৌরীর রূপ দেখিয়া মা ত অবাক্‌। এ মেয়েকে বধূবেশে সাজাইতে তাঁহার পরিশ্রম যে কিছু কম হইবে না, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন। এ যেন ভৈরবী মূর্ত্তি।

* * * *

গৌরীর পিতা হরিকেশব বন্দ্যোপাধ্যায় ভালমন্দ নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের মনেই সিদ্ধান্ত করিয়া গৌরীর বিবাহ দিয়াছিলেন আট বৎসর বয়সে। এ-বিষয়ে কাহারও পরামর্শ তিনি লন নাই! সেই কচি বয়সে গৌরীকে যখন মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন পিতামাতার প্রাণ কাঁদিলেও প্রথমটা সে বিশেষ-কিছু বুঝিতে পারে নাই। শানাইন বতের আনন্দ কোলাহলে উৎসবের জাঁকজমকে তাহার শিশুচিত্ত বেশ ভুলিয়াছিল। এত আদর, এত গহনা কাপড়, এত মিঠাইমণ্ডা কাহার না ভাল লাগে?

শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় মা-বাবা সকলে যখন তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষের জলে তাহার মুখখানা স্নান করাইয়া দিয়াছিলেন তখন সে কাঁদে ত নাই, ইহাদের ব্যবহারে বিস্মিতই হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর সেই দূরগ্রামে রাত্রি যখন গভীর হইয়া উঠিল, আত্মীয়স্বজন উৎসব-আনন্দ সমাপন করিয়া আপন-আপন গৃহে কপাট দিল, সানাইয়ের সুর থামিয়া গেল, আলো নিভিয়া গেল, ভাঙাহাটের মতন সেই অপরিচিত অন্ধকার মস্ত বাড়ীটা তাহাকে যেন আপনার নিস্তব্ধ বিরাট্‌ শূন্যতার গহ্বরে টানিয়া লইতে লাগিল, তখন সে মা মা করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহার চোখের ঘুম কোথায় ছুটিয়া গেল। কাছে একমাত্র পরিচিত মুখ ছিল তাহার বাপের বাড়ীর দাসীর। গৌরী তাহারই বুকে মুখ লুকাইয়া তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, "আমাকে মার কাছে নিয়ে চল।"

শাশুড়ী-ননদ যত কাছে টানিতে চান, ঘুমাইতে লইয়া যান ততই তাহার ভীতি বাড়িয়া উঠে। এ কোথায় কাহার ভরসায় মা তাহাকে বিসর্জ্জন দিল? এ অন্ধকারে কার কোলে আপনাকে নিশ্চিন্তে সঁপিয়া দিয়া নির্ভয়ে সে চক্ষু মুদিবে? এরা ত তাহার কেহ নয়।

এম্‌নি করিয়া একরাত্রি নয় আট রাত্রি এই অজানা পুরীতে ভয়ে শোকে দুঃখে অনিদ্রায় অর্দ্ধনিদ্রায় মাতৃ-ক্রোড়চ্যুতা গৌরীর প্রাণ কাঁদিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া আজ দুই বৎসরেও তাহার মন হইতে শ্বশুরবাড়ীর সে বিভীষিকাময় ছবি মুছে নাই।

বিবাহের একবৎসর পরে জামাই একবার আসিয়াছিল; কিন্তু থাকে নাই। এই প্রথম সে শ্বশুরবাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া চার পাঁচদিন কাটাইবার জন্য আসিতেছে। তাই সমস্ত বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু গৌরীর সম্বন্ধে সকলেরই মনে অল্পবিস্তর ভয় আছে।

গৌরী বাড়ীর বড় আদরের মেয়ে। সে হরিকেশবের একমাত্র কন্যা। হরিকেশব বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার লইয়া বাস করেন। বাড়ীর কর্ত্তা এখন তিনিই, কারণ পিতা আজ বহুদিন হইল চারটি কন্যা ও দুইটিপুত্রকে এই জ্যেষ্ঠের হাতেই সঁপিয়া দিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা হরিমাধব নিঃসন্তান; হরিসাধনের দুইটি পুত্র তিনটি কন্যা। ময়না, শৈল ও টিনি তিনজনই গৌরীর পর এ সংসারে দেখা দিয়াছিল। গৌরীর সহোদর পাঁচ ভাই যখন স্কুলে-কলেজে পড়ে, যখন তরঙ্গিণীর কোলে নূতন একটি কচি শিশুকে আবির্ভূত হইতে দেখিবার কল্পনা ও

কেহ করে নাই, তখন হঠাৎ গৌরী একদিন সংসার উজ্জ্বল করিয়া ফুলের গুচ্ছের মতন মা'র কোল জুড়িয়া বসিল। একে পিতামাতার শেষ বয়সের সন্তান, তায় বাড়ীর প্রথম মেয়ে, তাহার উপর আবার এত রূপ! বাড়ীতে মেয়ে লইয়া যেন কাড়াকড়ি পড়িয়া গেল।

বাড়ীও ত নিতান্ত ছোট নয়; লোকে জনে চারিদিক্ গম্ গম্ করিতেছে। বারমাসই সেখানে যজ্ঞিবাড়ী লাগিয়া আছে। বড়ঠাকরুণ যখন সাতটি সন্তান লইয়া বিধবা হন, তখন তাঁহার যে ত্রিসংসারে কেহ আত্মীয় স্বজন আছে এমন কথা বিশ্বে কাহারও মুখে শোনা যায় নাই। দুই কন্যার বিবাহ স্বামীই দিয়া গিয়াছিলেন; পিতৃবিয়োগের পর তাহারাও যেন অকস্মাৎ পর হইয়া গেল। কুড়ি বৎসরের ছেলে হরিকেশবের মুখ চাহিয়া চারটি কচি ছেলে-মেয়েকে গড়িয়া তুলিতে ও সংসারে দাঁড় করাইয়া দিতে তাঁহার যে কত দুঃখ কত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় করিয়া বহিতে হইয়াছে, তাহার হিসাব আজ কেহ রাখে না।

কিন্তু তাহার পর দেখিতে-দেখিতে হরিকেশব যখন ওকালতি মুন্সেফির পদ অতিক্রম করিয়া সব-জজিয়তির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, হরিমাধবও চিকিৎসায় পসার করিতে লাগিলেন এবং এমন কি হরিসাধনও একটা কলেজের অধ্যাপক হইয়া বসিলেন, তখন কোথা হইতে জানি না দলে-দলে মামা, কাকা, জ্যাঠা, মাসি, পিসি, মামীরা দেখা দিতে লাগিলেন।

হরিসাধনের দুধের যোগাড় করিতে যখন বড়-ঠাকরুণকে দুই মাস অন্তর-একখানা করিয়া গহনা কি তৈজস বিক্রয় করিতে হইত, তখন কোনো আত্মীয় তাহার এক পোয়া দুধের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই হরিসাধনেরই বিবাহের সময় ৫৲।১০৲ টাকা যৌতুক লইয়া বিবাহের প্রণামীগুলা অনেকে আদায় করিয়া লইয়া গেল। কেহ-বা হরিসাধনকে দিয়া চিকিৎসা করাইবার অছিলায় ছেলেটিকে সেখানে রাখিয়া গেল; কেহ-জামাই-এর চাকরীর আশায় হরিকেশবের হাতে মেয়ে-জামাই দুইটিই সঁপিয়া দিয়া গেল। মা-ভাইকে কত কাল দেখি নাই বলিয়া শৈশবে বিবাহিতা বোন-দুটিও পিতৃসংসারে এত দিন পরে আবার আসিয়া দেখা দিল। তাহাদের স্বামীরা বলিল, "সহরে থাক্‌লে মেয়ে-গুলোর বিয়ের ব্যবস্থা করা সহজ হবে, ছেলেগুলোরও পড়াশুনার একটু সুবিধা হবে; এখন দিনকতক এখানেই থাক।"

সুতরাং এই মধ্যবয়সে মেয়েরা আবার বছরে ছয় মাস করিয়া বাপের বাড়ীতেই বাসা বাঁধিলেন। যখনও বা শ্বশুরবাড়ী যান, তখনও ছেলেদের এখানেই রাখিয়া যান; না হইলে তাহাদের পড়ার ক্ষতি হইতে পারে। ১০।১৫ বৎসর বাপের বাড়ীর সঙ্গে এই মেয়েদের যে কোনো সম্পর্ক ছিল না বলিলেও কেহ তা বিশ্বাস করিবে না।

এম্‌নি করিয়া ছয় জনের সংসার আজ পঞ্চাশ জনের হইয়া উঠিয়াছে। দুই বেলায় চাকর দাসী লইয়া প্রত্যহ সওয়াশ পাতা পড়ে। দোতলাবাড়ী ক্রমশ চারতলা হইয়া উঠিয়াছে, বড়-বড় ঘরের মাঝখানে কাঠের দেওয়াল দিয়া একখানা ঘরকে দুইখানা করা হইয়াছে। তবু অতিথি-অভ্যাগত আসিলে তরঙ্গিণীকে মাসে দশ দিন ভাঁড়ার ঘরে তক্তা পাতিয়া শুইতে হয়। অতিথিকে যেমন-তেমন ঘরে থাকিতে দিয়া বাড়ীর বড়বৌ ত সুখশয্যায় নিদ্রা যাইতে পারেন না।

এই আজই বাড়ীতে জামাই আসিবে বলিয়া তরঙ্গিণীকে ঘর ছাড়িয়া ভাঁড়ার ঘরে শুইতে যাইতে হইবে; হরিকেশব পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়দের সঙ্গে বাহিরের ঘরেই রাত কাটাইবেন। নিজের ঘর খালি থাকিলেও বাহিরের ঘরের ঘরজোড়া তক্তাপোষের ফরাসের উপর পুঁথিপত্র লইয়া এম্‌নিই তাঁহার বছরে ছয় মাস কাটিয়া যায়; পড়িতে-পড়িতে প্রায়ই মাঝরাত কাটে শেষ রাতে ফরাসের তাকিয়ার উপর মাথা রাখিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়েন ভোর না হইলে নিজেই জানিতে পারেন না। বাহির বাড়ীতে দেবর, ভাগিনেয় ও পুত্রদের সাম্‌নে স্বামীকে ডাকিতে আসিতে অথবা ডাকিয়া পাঠাইতে তরঙ্গিণী এত বয়সেও সঙ্কোচ বোধ করেন; সুতরাং হরিকেশবের নিজে না মনে পড়িলে ঘরে উঠিয়া গিয়া শয্যাগ্রহণ করা তাঁহার আর হইয়া উঠে না।

দুই পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বড় বৌটি আজ বছর তিন ঘর সংসার করিতেছে। তাহার কোলে ছয়

মাসের একটি ছেলে। এই প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশনের সময় সকলেরই ইচ্ছা মেজ বৌটিকে দ্বিরাগমন করাইয়া লইয়া আসা হয়। তাহার বয়স তের বছর পার হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী বলেন আর বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখা চলে না। কিন্তু বৌ আসিয়া থাকিবে কোথায়? ছেলে ত এখনও বাহিরের ঘরে যত পোড়ো ছেলেদের সঙ্গেই ঢালা বিছানায় গড়াইয়া কোনো-প্রকারে রাত কাটায়। গত বৎসর তাহারই জন্য যে নূতন ঘরখানা উঠিয়াছিল, তাহাতে মেজ বোন ভুবনেশ্বরীর মেয়ে-জামাই আজ পাঁচ মাস হইল আসিয়া রহিয়াছে। জামাইটির ডাক্তারখানায় একটা কম্পাউণ্ডরের কাজ হইবার আশা আছে; সুতরাং সে যে শীঘ্র আর কোথাও যাইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। হরিকেশব ভাবনায় পড়িয়াছেন। ভাগ্নে-জামাইকে অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে ত আর বলা চলে না, এদিকে পুত্রবধূকেও আর না আনিলে নয়।

এই সংসার-সমুদ্রের মাঝে কর্ণধার হইয়া তাঁহাকে হাজার সমস্যার মীমাংসা-সাধনে দিবারাত্র মাথা ঘামাইতে হয়! তাহার উপর আছে তাঁহার আপিষ আদালত, উমেদার, দেনাদার, পাওনাদার, তাঁহার যশখ্যাতি বিদ্যা-বুদ্ধির সৌরভে আকৃষ্ট মধুকর বৃন্দ। কেহ চায় দান, কেহ চায় মান, কেহ চায় সুবিচার, কেহবা পরামর্শ। কেহবা কিছুই না চাহিয়া বড়-রকম একটা-কিছুর আশায় তাঁহার আশে-পাশে অহরহ ঘুরিয়া ফেরে।

এইসকলের দাবীদাওয়া মিটাইয়া এড়াইয়া জীবনে অবকাশ খুঁজিয়া মেলা ভার। ঘরে বাহিরে স্থানে কালে সর্বত্র যেন ঠাসাঠাসি টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে। হাত-পা মেলিবার যেমন স্থান নাই, দুদণ্ড বিশ্রামের যেমন অবকাশ নাই, মনটা মেলিয়া ধরিবারও তেমনই ঠাঁই নাই। তবু জীবনের রসপাত্র একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। এই অন্তর বাহিরের ভীড়ের ভিতর একটি কচিমুখ ঘিরিয়া এখনও একটু আলো-বাতাস খেলা করে, একটি কচি মুখ স্মরণ করিয়া মন অকস্মাৎ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠে। ভীড়ের ভিতর সে মুখখানা হারাইয়া যায় না; অন্তরবাহিরের সমস্ত কলরোলের উপর গৌরীর সে শিশুমুখ পদ্মের মতন ফুটিয়া থাকে।

* * * *

বেলা দ্বিপ্রহরে জামাই আসিবার কথা। হরিমাধবের গাড়ীতে হরিকেশবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবপ্রসাদ ছোট কাকার ছোট মেয়ে টিনি ও রামটহল দরোয়ানকে লইয়া ষ্টেশনে ভগ্নীপতিকে আনিতে গিয়াছে। বাড়ীতে সকলকে তাড়া দিয়া গিয়াছে যেন জামাই আসিয়া পড়িবার আগে তাহার অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত সব পূরাপূরি হইয়া থাকে। শেষ মুহূর্ত্তে "এটা কইরে" "ওটা কইরে" যে করিবে তাহাকে সে দেখিয়া লইবে। কাজেই সবাই সন্ত্রস্ত। তরঙ্গিণী মেয়েকে ঘসামাজা ও উপদেশ দেওয়ার পালা শেষ করিয়া তাহাকে আপন পুত্রবধূ লাবণ্যলতার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন প্রসাধন করিয়া দিবার জন্য। সন্ধ্যার আগে জামাইএর সহিত তাহার সাক্ষাৎ না হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু কি জানি মেয়ের যা বুদ্ধি! কখন হয়ত হুট করিয়া বাহির বাড়ীতে এই বেশেই গিয়া সাম্‌নে হাজির হইবে। তা ছাড়া সঙ্গে লোক জনও ত দুই-এক জন থাকিতে পারে। তাহাদের বাড়ীর বৌকে তাহারা যদি যেমন-তেমন বেশে ধূলাকাদা-মাখা অবস্থায় দেখিয়া যায় তাহা হইলে বাড়ী গিয়া কি বলিবে? সেও আবার যেমন-তেমন বাড়ী নয়, সেকেলে জমিদারের বাড়ী। সুতরাং শাশুড়ী লাবণ্যলতাকে অনুরোধ করিলেন মেয়েকে যেন সমস্ত গহনাগাঁটি পরাইয়া বেশ আধুনিক রুচিমত চুল ও শাড়ীর বাহার করিয়া নিখুঁৎভাবে সাজাইয়া দেওয়া হয়।

লাবণ্য বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নব্য বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িয়াছিল; সে জুতা মোজা পরিয়া সাবানে চুল ঘসিয়া মাথায় রঙীন ফিতা বাঁধিয়া হাল ফ্যাশানে সাজসজ্জা করিয়া প্রত্যহ গাড়ী চড়িয়া ইস্কুল যাইত। সুতরাং বেশভূষা-সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানের উপর তাহার একটা শ্রদ্ধা ছিল। প্রসাধন-শাস্ত্রে তাহার মতকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা চলিত তাহাদের অনভ্যস্ত হস্তের শিল্প-সৃষ্টিকে সে করুণার চক্ষে দেখিত কিন্তু গায়ে পড়িয়া কিছু বলিত না। কিন্তু যাহারা তাহার বিদ্যাকে মানিয়া চলিত, তাহাদের সাহায্যে লাবণ্য সমস্ত মন ঢালিয়া দিত।

আজ ঠাকুরঝিকে সাজাইবার ব্যাপারে লাবণ্যের উৎসাহের অন্ত ছিল না। পাউডার, এসেন্স্, ক্রীম, তেল,

আল্‌তা, সিন্দুর, চন্দন যাহার ঘরে যাহা-কিছু ছিল সব সে জড়ো করিয়াছে, তাহার উপর ফিতা কাঁটা ব্রোচ পিনও অসংখ্য জুটিয়াছে। শাড়ীর উপর জামা এবং জামার উপর শাড়ী ফেলিয়া তাহার মাঝখানে গৌরীকে দাঁড় করাইয়া সে বারবার দেখিতেছে কোন্ রঙের সঙ্গে কোন্ রং দিলে তবে গৌরীর রূপটা সবচেয়ে ভাল করিয়া ফুটে। গৌরী বিরক্ত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। "বৌদি বড় জ্বালাতন কর্‌ছে, আমি যাচ্ছি মাকে ব'লে দিচ্ছি।"

বৌদি বলিল, "যাও না, মাকে বলগে না, মা চড় মেরে আবার এখানে পাঠিয়ে দেবে। ওঁর আস্‌ছে বর, আর অপরাধ হ'ল আমার! ধন্যি মেয়ে বাপু!"

গৌরী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আমি বাবাকে বলে দেব।"

লাবণ্য খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া বলিল "মাগো মা, কি বেহায়া মেয়ে ভাই তুই! বাবাকে কি বল্‌তে যাবি শুনি?"

গৌরীর পিস্‌তুতো বোন শোভনা বলিল, "নাও ভাই বৌদি, একটা ক্ষ্যাপা মেয়ের পেছনে তোমায় আর লাগ্‌তে হবে না। দাও না যেমন-তেমন ক'রে সাজিয়ে; একরত্তি ত মেয়ে, তাঁকে আর অপ্সরা সেজে বরের মন ভোলাতে হবে না!"

লাবণ্য মুখ নাড়িয়া বলিল, "ওগো, তুমিও একরত্তি ছিলে, তা ব'লে কিছু কম যাওনি।"

শোভনা গালে হাত দিয়া বলিল, "মাগো, বৌদি, কি যে বল তার ঠিক নেই! আমাতে আর গৌরীতে এক হ'ল? আমি তখন এগারো পেরিয়ে বারোয় চল্‌ছি।"

গৌরী কিছু না বুঝিয়া এতক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া ছিল। এইবার পরম গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল, "আমিও পৌষ মাসে এগারোয় পা দিয়েছি।"

লাবণ্য বলিল,"দেখ্‌লে ত তোমার বোন কেমন ছেলেমানুষ! নিজেই বয়স গুন্‌ছে। আজকালকার মেয়ে, বাবা, পেটে পেটে ঝানু! দেখো এখন বাইরে যতই লম্ফানি দেখাক্, দুদিনে বরকে হাতের মুঠোয় পুর্‌বে।"

গৌরী নির্ব্বাকবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। বরনামক ব্যক্তিকে হাতের মুঠোয় পূরিয়া তাহার যে কি লাভ, ভাবিয়া পাইল না। শোভনা বলিল, "আচ্ছা সে হবে এখন। এখন গয়নাগুলো তাড়াতাড়ি পরাও ত দেখি। তা'রা ত এসে পড়্‌ল ব'লে।"

লাবণ্য বলিল, "মার যেমন কাণ্ড! এই ছত্রিশ অলঙ্কার পরিয়ে নাকি কখনও সাজ খোলে! তাঁর মেয়েকে মেম-সাহেব সাজাতে হবে, আবার গয়নাও একটি বাদ পড়্‌বার জো নেই। আচ্ছা বিপদ্ যাহোক।"

শোভনা বলিল, "তা বাপু, মামীমা ত ভালই বলেছেন। ও ত আর তোমার খৃষ্টান ইস্কুলে পড়্‌তে যাচ্ছে না যে বিবি সেজে ব'সে থাক্‌বে। গায়ে দু-দশখান গয়না না থাক্‌লে নতুন ক'নেকে মানাবে কেন?"

শোভনা গৌরীর বাকী গহনা-গুলি একে-একে তাহার মাথায় গলায় হাতে পরাইয়া দিল। গহনার ভারে গৌরীকে তখন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। লাবণ্য ননদের কাজে বাধা দিয়া তাহাকে আর চটাইতে সাহস করিল না। কিন্তু ক'নেকে বেগুনী কাপড়ের সহিত সবুজ পাথরের গহনাগুলি পরানোতে তাহার মন অত্যন্তই খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিল।

সাজসজ্জা সমাপন করিয়া শোভনা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বাহিরের দিকে দৌড়াইয়া চলিল, "ওমা, আড়াইটে যে বেজে গেছে ভাই! ওরা এতক্ষণ নিশ্চয় এসে পৌঁছেছে। আমার দেখাই হ'ল না।"

লাবণ্য বৌমানুষ ঘরেই উৎসুক হইয়া দাড়াইয়া রহিল। গৌরী কিন্তু ঝমর-ঝমর করিতে-করিতে শোভনার পিছনে ছুটিল! লাবণ্য তাহার আঁচল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "এই বোকা মেয়ে! তোমাকে বর তুল্‌তে যেতে হবে না। এখানে চুপ ক'রে বোসো।"

বাড়ীর যত ঝীচাকর তাহাদের সাধ্যমত পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া এবং সস্তার সুগন্ধি তৈলে মাথার চুল চক্‌চকে ও মুখ মসৃণ করিয়া রাস্তার ধারে নূতন জামাইকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া ছিল। বাড়ীর পুরুষেরা সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া ঘরে বাহিরে ছুটা-ছুটি করিয়া ও মিনিটে দশবার ঘড়ি দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছোট ছেলে মেয়েরা তাহার চেয়েও ব্যস্ত। তাহারা বারান্দার সীমানা অতিক্রম করিয়া

একেবারে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়া হাজির। তাহা হইলে রাস্তার বাঁক হইতে সহজেই গাড়ীটা আসিতে দেখিতে পাইবে। একমাত্র অন্তঃপুরেই এতক্ষণ ততটা ব্যস্ততা ছিল না। জামাই যত দেরীতে আসে ততই তাঁহাদের পক্ষে ভাল, কারণ তাঁহাদের সাত শ'-রকম আয়োজন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর শেষ হয় নাই, তাহা ত বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ক্রমশ এতটাই দেরী হইয়া গেল যে অন্তঃপুরেও চঞ্চলতা দেখা দিল। তরঙ্গিণীর হাতের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি বাহিরের ঘরের দুয়ারে আসিয়া একবার উঁকি দিলেন; আবার ছোট ঠাকরুণের দরজায় গিয়া ডাকিলেন, "হ্যাঁ ছোটমা, জামাই আস্‌বার সময় কি হয়-নি নাকি মা? শিবুত কই গাড়ী নিয়ে এখনও ফির্‌ল না! আমি ত মনে করেছিলুম কাজ না চুক্‌তেই ওরা এসে পড়্‌বে।"

ছোটঠাকরুণ আপনার দরজায় মালা হাতে করিয়া ঢুলিতেছিলেন, জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাই ত বাছা, কই দেখে আসিগে ত একবার বারদিকের দোর-গোড়াটা।"

বড়ঠাকরুণ আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, ইষ্টিশানে আর একটা লোক পাঠাও না বাছা। কি জানি গাড়ীর কিছু গোলমাল যদি হ'য়ে থাকে পথে; শেষে কুটুমবাড়ীর ছেলে চ'টে-ম'টে একখানা কাণ্ড ক'রে বস্‌বে। শিবুর যা বুদ্ধি! হয়ত রাস্তায় গাড়ী সার্‌ছে ত গাড়ীই সার্‌ছে।"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "টহল দরোয়ানটা বুড়ো হ'য়ে ভীমরতি হ'তে চল্‌ল; সে কি আর বুদ্ধি করে একখান গাড়ী জোগাড় ক'রে নিয়ে যাবে না! শিবুই না হয় ছেলেমানুষ আছে, তা ব'লে ত আর সবাই ছেলেমানুষ নয়।"

কথা বলিতে-বলিতে গাড়ীর তীক্ষ্ণ শিঙা একবার বাজিয়া উঠিল। ছেলে-মেয়ে চাকর-বাকর হৈ হৈ করিয়া উঠিল, "ওরে গাড়ী আস্‌ছে রে!" জগু বেহারা ছুটিয়া বড়বাবুকে খবর দিয়া আসিল। তিনি পুঁথি গুটাইয়া চোখের চশমা নামাইতে-নামাইতে মাটিতে বালাপোষ লুটাইতে-লুটাইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন।

বিস্মিত দর্শকমণ্ডলীর মাঝখানে গাড়ী আসিয়া থামিল। সকলের আগে ছোট ছেলেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "একি ভাই!" তাহার পর ঝী-চাকর, পাড়াপড়শী সকলের মুখে বিস্ময়ধ্বনি নানা-ভাবে ফুটিয়া উঠিল। "গাড়ীতে জামাই কই!" সেই শিবপ্রসাদ টিনি ও রামটহল তিনজন যেমন গাড়ীতে গিয়াছিল তেম্‌নি তিনজনই ত ফিরিয়া আসিয়াছে।

শিবপ্রসাদ বিরক্তমুখে গাড়ী হইতে তড়াক্ করিয়া নামিয়া পাড়য়া বলিল, "এই দুপুর-রোদে নাওয়া-খাওয়া ফেলে, আমার যেমন দুর্ভোগ তাই, গিয়েছিলাম গেঁয়োটাকে আন্‌তে। দুখানা গাড়ী এক ঘণ্টা অন্তর ছিল; হাঁ ক'রে দুখানার যত বোঁচকা-ওয়ালার মুখই দেখ্‌ছি তখন থেকে; শ্রীমানের টিকিও কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না। নাই যদি আস্‌বি ত একটা খবরই না হয় দে, কি আট গণ্ডা খরচ ক'রে একটা লোকই পাঠা; তা কোনো বুদ্ধি যদি আছে!"

শিবপ্রসাদ সিঁড়ি দিয়া দুড় দাড় করিয়া উঠিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে হরিকেশব আপনার চশ্‌মা সাম্‌লাইতে-সাম্‌লাইতে তাহার পিছনে চলিলেন। তাঁহার মুখে অর্দ্ধস্ফুট কি একটি প্রশ্ন শিবপ্রসাদের উগ্রতা দেখিয়া বাহির হইবার আর ভরসা পাইতেছিল না। ভৃত্য এবং শিশুবাহিনীও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কর্ত্তার পিছন লইল। রামটহল মেয়েমহলে আসিয়া বহু দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া বুঝাইয়া দিল যে ষ্টেশনে দুঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিয়াও তাহারা জামাইবাবুর দর্শন পায় নাই। সে অনেক মুসাফিরকে প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাদের জামাইবাবু সংক্রান্ত কোনো ইতিহাসের খবর রাখে না। অগত্যা বাড়ী ফিরিয়া আসা ছাড়া তাহারা আর কি করিতে পারে?

(ক্রমশঃ)

মৃত্যু-দূত

সেল্‌মা লাগর্‌লফ্

[সেলমা লাগরলফ একজন বিখ্যাত সুইড লেখিকা। মানব-মনের বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত অঙ্কনে ইনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচনায় তিনি সর্ব্বত্র সদ্‌ভাবেরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে পাপ মানুষকে কিছু দিনের মত মোহাবিষ্ট রাখিতে পারে কিন্তু তাহা শাশ্বত নহে; প্রীতি, মৈত্রী, প্রেম, সত্য ও সুন্দরই মানুষের চিরন্তন সম্পত্তি। সম্ভবতঃ মানুষের উজ্জ্বল দিক্‌টি এমন করিয়া আর কোনো বর্ত্তমান লেখকই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি ১৯০৯ সালে সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধের পরে লিখিত তাঁহার 'দি আউট কাস্‌ট' পুস্তকখানি বিশেষ পরিচিত।

সেল্‌মা লাগর্‌ল্‌ফ

ইনি সুইডেনের অন্তর্গত ভার্ম্‌ল্যাণ্ডে, মারবাকা এস্‌টেটে ১৮৫৮ সালের ০শে নবেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন, স্‌টক্‌হলমের উইমেনস্ সুপিরিয়র ট্রেনিং কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া ল্যাণ্ডস্ক্রোনা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ১৮৮৫—১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯০৭ সালে লিন্নেউস জুবিলীতে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান-মূলক ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি লিখিয়াছেন; যথা, ঝেটা, ব্যারলিং (১৮৯৫); ইন্‌ভিজিবল লিঙ্ক্‌স্ (১৮৯৪); মিরাক্‌লস্ অভ অ্যান্টিক্রাইস্‌ট্ (১৮৯৭); ফ্রম্ এ সুইডিশ হোম্‌স্‌টেড (১৮৯৯) জেরুসালেম্ (১) (১৯০৬); লেজেণ্ড্‌স্ অব ক্রাইস্‌ট (১৯০৪); দি অ্যাড্‌ভেঞ্চার অব নিলস্ (১৯০৬); দি গার্ল ফ্রম দি মার্শ (১৯০৮); জেরুসালেম্ (২) (১৯১৬)। ইনি বহুকাল বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ইজিপ্ট ও প্যালেস্‌টাইনে বহু বৎসর যাপন করিয়াছেন।

অনুবাদে সিস্‌টার, শ্লাম্-সিস্‌টার, ক্যাপ্টেন প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। সালভেশন আর্ম্মি (মুক্তি-ফৌজ) আমাদের দেশে সুপরিচিত। ইঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন ও প্রভূত পরিশ্রম ও দৈহিক কষ্টের মধ্য দিয়া সমাজ-পরিত্যক্ত দুর্ব্বৃত্ত নর-নারীদের সংস্কার-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। এই সেবাব্রত-ধারিণীদের সিস্‌টার নামে অভিহিত করা হয় ও তাঁহারা বস্তিতে-বস্তিতে হতভাগ্য বিপথগামীদের সমাজে ফিরাইতে চেষ্টা করেন বলিয়া কখনো কখনো তাহাদিগকে স্লাম-সিস্‌টারও বলা হয়। ক্যাপটেন বলিতে মুক্তি-ফৌজের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলের নায়ক বুঝিতে হইবে।

এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার বাস্তবতা বা অলৌকিকতা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিষয় নহে। ইহা অন্তর্লোকের দ্বন্দ্বের ইতিহাস; আত্মার অনন্ত মুক্তি ও পুণ্যের জয়ের ইতিহাস সুতরাং সাধারণ বিচারবুদ্ধির নিক্তিতে ইহার মাপ চলে না। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে আমাদের মত সুইডেন-বাসীরাও যথেষ্ট কুসংস্কার-পরায়ণ।

অনুবাদক]

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত

সিস্‌টার ঈডিথ্ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাহার ক্ষুদ্র দেহখানিতে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, চারিদিকে দারিদ্র্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভীষণ ক্ষয়রোগের আক্রমণে বৎসর-কালের মধ্যেই তাহার জীবন-শক্তি নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। সে এই দুর্দ্দান্ত দানবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মৃত্যুকে শরণ করিতে বসিয়াছে। তবু এই রোগাক্রান্ত শরীরে যতক্ষণ শক্তি ছিল সে তাহার আরব্ধ কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। শরীর যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল তখন নিরুপায় হইয়া সে এক সাধারণ

স্বাস্থ্যাগারে আশ্রয় লইয়াছিল। কয়েক মাসের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় কোনোই ফল হয় নাই। যখন সে বুঝিতে পারিল যে সে সকল চিকিৎসার অতীত, তখন তাহার চিরপরিচিত মাতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। সহরের বাহিরে তাহার মায়ের ক্ষুদ্র কুটীরের একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে তাহারই আপন শয্যায় শুইয়া সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। এই ঘরেই তাহার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে; আজ বুঝি জীবনও অতিবাহিত হইতে চলিল।

শয্যাপার্শ্বে ব্যথিত ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া তাহার মা বসিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত হৃদয়-নিংড়ানো যত্ন ও সেবা দিয়া মেয়েকে বাঁচাইয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তিনি এত ব্যস্ত যে কাঁদিবার অবসর পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। রোগিণীর সেবাকার্য্যে সহযোগিনী একজন সিস্টারও শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সপ্রেম দৃষ্টি রোগিণীর মুখের উপর নিবদ্ধ ছিল;—অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া আসিলেই তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করিয়া লইতেছিলেন। একটু দূরে একটি ভগ্ন জীর্ণ চেয়ারে এক স্থূলকায় নারী উপবিষ্ট। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের কলারে সম্ভ্রান্ত পদবী-সূচক একটি চিহ্ন অঙ্কিত। যে চেয়ারখানিতে তিনি বসিয়া আছেন সেটি রোগিণীর পরম আদরের সামগ্রী এবং একমাত্র ওই বস্তু-টিকেই সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। মহিলাটিকে অন্য-একটি আসনে বসিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সেই জীর্ণ চেয়ারে বসিয়া যেন মুমূর্ষুর স্মৃতিকে সম্মানে করিতে-ছিলেন।

সেটি একটি বিশেষ পর্ব্বদিন—নববর্ষের জন্ম উৎসব। বাহিরে আকাশ ধূম্রাভ ও মেঘ-ভারাক্রান্ত; গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া মনে হইতেছিল বাহিরে প্রকৃতি উদ্দাম—বাতাস তুষার-শীতল। কিন্তু বাহিরে আসিলেই মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণের প্রলেপ শরীর ও মন পুলকিত করিয়া তুলিতে ছিল। সুকৃষ্ণ ধরণী-গাত্রে তুষার-পাতের চিহ্নমাত্র নাই; কদাচিৎ দুই-এক কণা তুষার পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যাইতেছিল। মনে হইতেছে যেন ঝঞ্চা ও তুষার প্রান্ত। বৎসরকে উত্যক্ত না করিয়া আসন্ন বর্ষকে অভি-নন্দন করিবার জন্য বলসঞ্চয় করিতেছে।

বাহিরের উদাস প্রকৃতির মতন মানুষের মনেও কেমন একটা অবসাদ আসিয়াছে; কিছু করিবার প্রবৃত্তি কাহারো নাই। রাস্তার লোক-চলাচলের চিহ্ন নাই—ভিতরে লোকের হাতে যথেষ্ট অবকাশ।

মুমূর্ষুর ঘরের ঠিক সম্মুখের খোলা জমিতে একটি নতুন অট্টালিকার ভিত্তির জন্য খুঁটি পোতা হইতেছিল। সকালে গুটি-কয়েক মজুর আসিয়া খুঁটি-পোতার বিরাট্ যন্ত্রটিকে যথারীতি সশব্দে তুলিয়া ও ফেলিয়া অল্পক্ষণেই ক্লান্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

চারিদিক্ কেমন-একটা অবসন্নতার আবেশে মূর্চ্ছাপন্ন। মেয়েরা চুপ্ড়ী লইয়া ছুটির দিনের হাট-বাজার করিয়া বহুক্ষণ বাড়ী ফিরিয়াছে; পথে লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। ছেলেরা রাস্তায় খেলা ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরিবার লোভে বাড়ী আসিয়াছে; আর বাহির হইতে পারে নাই। গাড়ীর ঘোড়াগুলিকে খুলিয়া দূর সহরতলীর আস্তাবলে বিশ্রামের জন্য পাঠানো হইয়াছে। রৌদ্র যতই পড়িয়া আসিতেছে ধীরে-ধীরে সমস্তই কেমন যেন শান্ত হইয়া পড়িতেছে। এই নীরব শান্তি এই গুমোটের পক্ষে বেশ আরামপ্রদ মনে হইতেছে।

এতক্ষণ সকলেই নীরব রহিয়া রোগীকে লক্ষ্য করিতে-ছিলেন। জানালার বাহিরে উদাসভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মা বলিলেন,—"এম্নি-একটা ছুটির দিনে ঈডিথকে কোলে তুলে নিয়ে ভগবান্ ভালোই কর্‌ছেন। বাইরের সব গোল-মাল থেমে আস্‌ছে। ঈডিথ পরম শান্তিতে যেতে পার্‌বে।"

প্রাতঃকাল হইতেই রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু একেবারে অসাড় সংজ্ঞাশূন্য নহে। বৈকালের দিকে তাহার মুখের ভাববিপর্য্যয় দেখিয়া মনে হইতেছিল যে তাহার অন্তরে নিদারুণ দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছে। নানা ভাবের ঘাতপ্রতি-ঘাতের চিহ্ন মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। কখনো কিছু দেখিয়া সে বিষম আশ্চর্য্য হইতেছিল; কখনো মুখভাব চিন্তাক্লিষ্ট, মিনতিকাতর অথবা অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর। সম্প্রতি তাহার মুখে চরম বিরক্তি ও প্রত্যাখ্যানের ভাব সুস্পষ্ট। এই ভাবান্তরে রোগীর স্বাভাবিক কমনীয়তা নষ্ট

হইয়া তাহাকে এক অপরূপ উগ্র সৌন্দর্য্যে মহিমাময়ী করিয়া তুলিয়াছে।

ঈডিথের মুখের এই অস্বাভাবিক জ্যোতি ও উগ্রতা দেখিয়া সিস্টার মেরী উপবিষ্টা মহিলাটির কানে-কানে বলিলেন, "দেখুন ক্যাপ্টেন, সিস্টার ঈডিথকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক রাণীর মতন দীপ্তিময়ী!"

স্থূলকায়া মহিলাটি রোগিণীকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ঈডিথের নম্র ও আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রীই বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন। এমন-কি দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত তাহার সে সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই আজিকার এই পরিবর্ত্তনে তিনি এমনই আশ্চর্য্য হইলেন যে পুনরায় আসন পরিগ্রহ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কি যেন এক অধীর আবেগে রোগিণী বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল। এক অবর্ণনীয় বিরক্তিতে তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত। ওষ্ঠাধরে কম্পন ছিল না বটে, কিন্তু মনে হইতেছিল, যেন সে কাহাকেও অনুযোগ করিতেছে।

মহিলা-দুইটিকে আশ্চর্য্য হইতে দেখিয়া ঈডিথের মা ধীরে-ধীরে বলিলেন, "অন্য দিনও আমি ঈডিথের এই অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করেছি; ঠিক এই সময়েই না সে তা'র উদ্ধার-কাজে বের হ'ত?"

সিস্টার মেরী পাশের টেবিলের উপরকার ঘড়িটির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ এই সময়েই সে হতভাগ্য পতিতদের পাড়ায় তাদের সাহায্য করতে যেত," বলিতে-বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল; তিনি রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিলেন। ঈডিথের আসন্নমৃত্যু তাঁহাকে এম্নি ব্যথিত করিয়াছিল যে তাহার সম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে গেলেই কান্নায় তাঁর বুক ভরিয়া উঠিতেছিল।

কন্যার একটি অসাড় হাত আপনার মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মা ধীরে-ধীরে তাহাতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন,—

"বোধ করি এই হতভাগাদের নোংরা বস্তি পরিষ্কার ক'রে দিতে ও তাহাদের বদঅভ্যাস ছাড়াতে তা'কে খুবই বেগ পেতে হ'ত। এমন-ধারা কঠিন কাজে লোকে যখন হাত দেয় তখন তা'র ভাবনাও তা'র কাজকে সর্ব্বক্ষণ অনুসরণ ক'রে ফেরে। ঈডিথ বোধ হয় ভাব্ছে যে ও সেই নোংরা পল্লীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" তাঁহার নিজের মুখও ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কাপ্তেন শান্তভাবে বলিলেন, "যে কাজকে লোকে ভালোবাসে তা'র জন্যে এমন হওয়াই ত স্বাভাবিক।"

হঠাৎ তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে রোগিণীর নিশ্বাস অতি ঘন-ঘন পড়িতেছে, ভ্রূ দ্রুত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে, কপালের রেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠ ঘৃণায় কম্পিত হইতেছে। বোধ হইল যেন সে এখনই চক্ষুরুন্মীলন করিবে ও তাহা দিয়া অগ্নিজ্বালা নির্গত হইবে।

স্থূলকায়া মহিলাটি আবেগকম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঈডিথকে ঠিক রোষদীপ্ত দেবীর মতন দেখাচ্ছে।"

"ঈডিথের মন এখন বস্তির বীভৎসতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, না জানি সেখানে কি দেখে সে এমন করছে!" এই বলিয়া সিস্টার মেরী অন্যদুইটি নারীকে সরাইয়া দিয়া মুমূর্ষুর কপালে হাত বুলাইতে-বুলাইতে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঈডিথ, বোন, তুমি কেন ওদের জন্যে এত ভাব্ছ। ওদের জন্যে তুমি ত চেষ্টার ত্রুটি করোনি।"

এ-কথায় যেন ফল ফলিল। রোগিণীর মনের মেঘ ক্রমশঃ যেন কাটিয়া গেল; রোষদীপ্ত ভাব অনেকটা তিরোহিত হইল। তাহার স্বাভাবিক কমনীয়তা ও মাধুর্য্য ফিরিয়া আসিল।

সে ধীরে-ধীরে চক্ষু মেলিল। সিস্টার মেরীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহার একটি ক্ষীণ হাত তাঁহার কাঁধে ফেলিয়া তাঁহাকে আরো কাছে টানিয়া লইল।

ঈডিথের মিনতি-কাতর দৃষ্টি দেখিয়া সিস্টার মেরী ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। ঈডিথের কপালে সস্নেহ করস্পর্শ করিয়া আবেগ-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈডিথ, কেমন আছ?"

ঈডিথ অতি মৃদুস্বরে তাঁহার কানে-কানে শুধু বলিল "ডেভিড্ হল্ম্।"

ভুল শুনিয়াছেন ভাবিয়া সিস্‌টার মেরী মাথা নাড়িয়া জানাইলেন যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

রোগিণী পরিশ্রান্ত বোধ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। তা'র পর আবার অতি কষ্টে থামিয়া-থামিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "ডেভিড হল্‌ম্‌কে ডেকে দিতে বলুন না।"

সে সিস্‌টার মেরীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যখন বুঝিতে পারিল যে সিস্‌টার মেরী তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন তখন সে আশ্বাসে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতে মুখে আবার সেই ভাবান্তর হইতে লাগিল। ক্রোধ ঘৃণা প্রভৃতির দ্বন্দ্বে তাহার আত্মা পীড়িত হইতে লাগিল।

কি যেন এক মানসিক আন্দোলনে সিস্‌টার মেরীর কান্না থামিয়া গেল; তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কাপ্তেনের সম্মুখে গিয়া তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "ঈডিথ ডেভিড্ হল্‌ম্-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়!"

ঈডিথ যেন সাংঘাতিক-কিছু করিতে বলিল। বিপুলকায় মহিলাটি বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

"ডেভিড্‌হল্‌ম্! সে যে একেবারে অসম্ভব; মুমূর্ষু-রোগীর কাছে ডেভিড্‌হল্‌ম্‌কে ত কিছুতেই আস্‌তে দেওয়া হ'তে পারে না।"

কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মা এতক্ষণ তাহার মুখের ভাববিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিচলিতা মহিলা-দুইটির দিকে চাহিলেন।

কাপ্তেন বলিলেন, "ঈডিথ ডেভিড্‌হল্‌ম্‌কে ডাক্‌তে বল্‌ছে। আমরা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে সেটা ঠিক হবে কি না।"

ঈডিথের মা তবুও কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডেভিড্‌হল্‌ম্? কে সে?"

"সে এক হতভাগা জীব—তা'কে শোধ্‌রাবার জন্য ঈডিথ কি চেষ্টাটাই না করেছে কিন্তু ভগবান্ তা'কে সফলকাম কর্‌লেন না; তা'র সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।"

সিস্‌টার মেরী দ্বিধাজড়িতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ক্যাপ্তেন, ভগবান্ বোধ করি এই শেষ মুহূর্ত্তে ঈডিথকে দিয়ে সে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।"

রোগিণীর মা একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "যদ্দিন আমার মেয়ে বেঁচেছিল তদ্দিন আপনারা তা'কে নিয়ে যা খুসী করেছেন। আজ সে মর্‌তে বসেছে—এখন আমাকে তা'র সম্বন্ধে কি কর্‌তে না-কর্‌তে হবে বিচার কর্‌তে দিন।"

ইহা শুনিয়া অপর দুইজনে নিশ্চিন্ত হইলেন। সিস্‌টার মেরী রোগীর পায়ের দিকে বিছানার উপর বসিলেন; ক্যাপ্তেন সেই জীর্ণ চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিয়া একাগ্রচিত্তে অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার দুই চারিটি কথামাত্র স্পষ্ট বোঝা গেল;—ঈডিথের আত্মা শান্তিতে বাহির হইয়া যাক্—কর্ম্মজীবনের দুঃখ যন্ত্রণা ও চিন্তা দ্বারা এই মৃত্যুকালে যেন তাহা পীড়িত না হয়।

সিস্‌টার মেরী তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতেই তিনি চোখ খুলিলেন।

রোগিণীর আবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বের মতন কাতর ও বিনীত ভাব নাই; ক্রোধোজ্জ্বল উদ্দীপ্তমুখে যেন আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বাভাস।

মেরী ঈডিথের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন। ঈডিথ একটু ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিল, "সিস্‌টার মেরী, ডেভিড হল্‌ম্‌কে কি ডাক্‌তে পাঠাননি?"

খুব সম্ভব অপর দুইজনের ঈডিথকে যাহোক-কিছু বলিয়া শান্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মেরী ঈডিথের চোখে এমন-কিছু দেখিলেন যাহাতে মিথ্যা প্রবোধবাক্য তাঁহার মুখে জোগাইল না। বলিলেন, "ঈডিথ আমি তা'কে যেমন ক'রে পারি ডেকে আন্‌ছি।" ঈডিথের মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাপ করুন, আমি জীবনে ঈডিথের কোনো কথাই ঠেল্‌তে পারিনি আজ তা কেমন ক'রে করব?"

ঈডিথ আশ্বস্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সিস্‌টার মেরী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ঘরে আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। মুমূর্ষু অতি কষ্টে নিশ্বাস লইতেছে দেখিয়া মা বিছানার নিকটে

সরিয়া বসিলেন যেন কন্যাকে বক্ষপুটে নিবিড় করিয়া ধরিয়া মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবেন।

কিছুক্ষণ পরে ঈডিথ চোখ খুলিল; তাহার চোখে সেই অধীর চাঞ্চল্য। সিস্‌টার মেরীর আসন শূন্য দেখিয়া তাহার মুখভাব শান্ত লইয়া আসিল। সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। তখন তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে—ঘুমের ভাবটাও কাটিয়া গিয়াছে।

বাহিরে একটি দরজা খুলিবার শব্দ হইল। রোগী চকিত হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নিঃশব্দে সেই ঘরের দরজা খুলিয়া সিস্‌টার মেরী ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসন দয়া ক'রে এখানে একবারে আসুন! আমি ঘরের ভিতর ঢুক্‌ব না। বাইরের হাওয়ায় আমার জামা কাপড় ভিজে গেছে। আমি কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।" রোগিণীর দিকে চোখ পড়িতেই দেখিলেন সে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঈডিথ, আমি এখনো তা'কে খুঁজে বের কর্‌তে পারিনি; তবে গুস্তাভাস্তনের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে আর আমাদের দলের আরো দুজন যেমন ক'রে পারে ডেভিডকে খুঁজে আন্‌বে।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঈডিথের চক্ষু বুজিয়া আসিল; সে আবার সেই দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া গেল। সিস্‌টার মেরী ঈডিথের এই তন্দ্রা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলন, "ঈডিথ বিকারের ঘোরে নিশ্চয়ই হল্‌মকে দেখ্‌তে পাচ্ছে। দেখ্‌ছেন না, তা'র দৃষ্টি কেমন অভিমান-ক্ষুব্ধ। শান্তি শান্তি—তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে চলিয়া গেলেন; ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসন তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সেই ঘরের মাঝখানে একটি নারী দাড়াইয়াছিল। বয়স ত্রিশের বেশী হইবে না। রং ফ্যাকাশে ও বিশ্রী হইয়া গিয়াছে; মাথার চুল অধিকাংশ উঠিয়া গিয়াছে। গায়ের চামড়া কুঞ্চিত; বৃদ্ধাদের শরীরও এত ভাঙিয়া পড়ে না। তাহার পরিধেয় বস্ত্র এমনই জীর্ণ ও সামান্য যে মনে হয় সে ইচ্ছা করিয়া অতিরিক্ত ভিক্ষা পাইবার লোভে বাছিয়া-বাছিয়া এই বস্ত্র পরিয়াছে।

ক্যাপ্টেন সভয়ে মেয়েটির দিকে চাহিলেন। তাহার জীর্ণবেশ ও নষ্ট-স্বাস্থ্যই যে ভয়াবহ তাহা নহে; মনে হইতেছিল যেন তাহার দেহ জমাট বাঁধিয়া পাষাণ হইয়া গিয়াছে; সজীবতার লেশমাত্র নাই। সে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতন চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে; কোথায় আসিয়াছে কেন আসিয়াছে জানে না। সম্ভবতঃ সে প্রাণে নিদারুণ আঘাত পাইয়া সকল বুদ্ধিবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। বদ্ধ উন্মাদ হইতে বুঝি আর বাকী নাই। সিস্‌টার মেরী বলিলেন, "ও ডেভিড হল্‌মের স্ত্রী। ডেভিড হল্‌মের বাড়ীতে গিয়ে দেখি সে নিরুদ্দেশ; এই বেচারা মূঢ়ের মতন ব'সে আছে। আমি যা জিজ্ঞেস করি কিছু বুঝ্‌তে পারে না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে। ওকে সেখানে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আস্‌তে প্রবৃত্তি হ'ল না।"

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "ডেভিড্ হল্‌মের স্ত্রী! আমি যেন ওকে আগে কোথায় দেখেছি। ওর কি হয়েছে? এমন-ধারা হ'ল কেন?"

হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া সিস্‌টার মেরী উত্তর করিলেন, "আজ কেন? স্বামী দুর্ব্বৃত্ত দুর্দ্দান্ত হ'লে যা হয় ওর তাই হয়েছে। সে যন্ত্রণা দিয়ে-দিয়ে ওর এই অবস্থা করেছে নিশ্চয়ই।"

ক্যাপ্টেন মেয়েটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার চক্ষু কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতে চায়; চোখের তারা স্থির, নিশ্চল। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ, মাঝে-মাঝে একটা অন্তর্গূঢ় বেদনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ক্যাপ্টেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "না জানি কি বিষম অত্যাচারে ওর এমন অবস্থা হয়েছে।"

সিস্‌টার মেরী বলিলেন, "কি জানি? ও আমার কোনো কথারই জবাব দিতে পার্‌লে না কেবল থরথর ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল। শুন্‌লাম ওর ছেলেরাও কোথায় গেছে; এমন কোনো লোক ছিল না যাকে জিজ্ঞেস ক'রে খবর কিছু জান্‌তে পারি। হায়, ভগবান্ এমন দিনে কেন এর দুরবস্থা চোখে দেখালে। সিস্‌টার ঈডিথের আসন্ন অবস্থা; এই উন্মাদকে নিয়ে এখন করি কি!"

"সম্ভবতঃ লোকটা এ'কে মারধোর করেছে।"

"না, আরো সাংঘাতিক কিছু ঘটে থাক্‌বে। আমি অনেক মেয়ে দেখেছি যারা স্বামীর প্রহারে অভ্যস্ত কিন্তু এমনটি ঘট্‌তে দেখিনি। না, আরো ভয়ানক কিছু হবে। সিস্‌টার ঈডিথের মুখের ভাব দেখেও তাই মনে হচ্ছে।"

কাপ্তেন বলিলেন, "তাই ঠিক। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি সিস্‌টার ঈডিথকে কিসে এত যন্ত্রণা দিচ্ছিল। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে ঈডিথ তোমাকে জোর ক'রে সেখানে পাঠালে, নইলে এই হতভাগিনীর কি দুর্দ্দশাই না হ'ত! ঈশ্বর ওর উপর দয়া কর্‌ছেন!"

"কিন্তু ক্যাপ্টেন ওকে নিয়ে এখন কি করব? আমার কথা বোঝে না বটে, কিন্তু ওর হাত ধর্‌লেই আমার পিছু নিচ্ছে। ওর সমস্ত বোধশক্তি নষ্ট হ'তে বসেছে,—ওকে জ্ঞান ফিরে দেওয়া যায় কি ক'রে? আমিও হতাশ হয়েছি। দেখুন আপনি কিছু করতে পারেন কি না।"

স্থূলকায়া মহিলাটি পরম স্নেহে দুর্ভাগিনীর হাত ধরিয়া অতি মৃদুস্বরে তাহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন; সে কিছু বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না।

তাঁহার এই নিষ্ফল প্রয়াসের মধ্যে ঈডিথের মা ব্যস্ত-সমস্তভাবে দরজার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "ঈডিথ বড্ড অস্থির হ'য়ে পড়্‌ছে। আপনারা বরং ভিতরে আসুন।" উভয়েই অর্দ্ধোন্মাদ রমণীটির কথা বিস্মৃত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঈডিথ ছটফট করিয়া শয্যার এপাশ ওপাশ করিতেছিল; বোঝা যাইতেছিল তাহার যন্ত্রণা শারীরিক নহে, মানসিক। সিস্‌টার মেরী ও ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসনকে দেখিতে পাইয়া সে একটু শান্ত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ক্যাপ্টেন সিস্‌টার মেরীকে রোগিণীর কাছে থাকিতে বলিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় মুক্ত দ্বার-পথে ডেভিড্‌ হল্‌মের স্ত্রী সেখানে প্রবেশ করিল।

সে ধীরে-ধীরে রোগীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া এক-দৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার শরীর কাঁপিতেছিল—ভিতরের হাড়গুলিতে পর্য্যন্ত যেন কাঁপুনী ধরিয়াছে।

কিছুক্ষণ সে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ; কিছু বুঝিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার দৃষ্টি শান্ত হইয়া আসিল। সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে রোগীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল।

একটা কঠোর পৈশাচিক উগ্রতা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল; হাতের মুঠা খুলিতে ও বন্ধ করিতে লাগিল। সিস্‌টার মেরী ও ক্যাপ্টেন সভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন—এই বুঝি সে ঈডিথে উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

ঈডিথ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সেই ভীষণ অর্দ্ধোন্মাদ নারীকে সম্মুখে দেখিয়া চকিতে উঠিয়া বসিল এবং দুর্দ্দমনীয় আবেগে সেই দুর্ভাগিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল এবং তাহার কপালে ওষ্ঠে ও গালে চুম্বন করিতে-করিতে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—

"হায় দুর্ভাগিনী—হায় অভাগিনী!"

উন্মাদিনী প্রথমটা সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল! কিন্তু সহসা কি যেন এক অননুভূত আবেগে তাহার সমস্ত-দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং হাঁটু গাড়িয়া শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ঈডিথের বুকে মাথা রাখিল। তাহার চোখ হইতে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

উভয়েই এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সিস্‌টার মেরী তাঁহার অশ্রুসিক্ত রুমালখানি দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "শুধু সিস্‌টার ঈডিথই এমন অসম্ভবকে সম্ভব কর্‌তে পারে। সে চ'লে গেলে আমাদের গতি কি হবে?'

ঈডিথের মায়ের এইসব উচ্ছ্বাস ভালো লাগিল না। তাঁহারা তাহার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া শান্ত হইলেন। ক্যাপ্টেন বলিলেন, "ওর স্বামী ওকে নিয়ে যেতে এখানে এসে উপস্থিত হ'তে পারে। তা কিছুতেই ঘট্‌তে দেওয়া হবে না। সিস্‌টার মেরী তুমি ঈডিথের কাছে থাকো। আমি দেখি হল্‌মের স্ত্রীর কি ব্যবস্থা কর্‌তে পারি।"

(ক্রমশঃ)

দেশের কর্ত্তব্য ও সেবা সম্বন্ধে দু'টো কথা

আচার্য্য শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আন্দুলে একটা নূতন জিনিষ দেখ্‌লাম। প্রায় সব জায়গায় দেখি জমিদারেরা নিজ নিজ গ্রাম ত্যাগ করে' সহরে এসে বাস করেন, নানা-প্রকার বিলাসিতার স্রোতে গা ঢে'লে দিয়ে গাড়ী, ঘোড়া, মোটর প্রভৃতি চড়েন, রসনা-তৃপ্তিকর চপ কাট্‌লেট্‌ ভক্ষণ ও অপরাপর ধনীদের সহিত বিলাসিতায় প্রতিযোগিতা কর্‌তে-কর্‌তে জীবনটা এক-প্রকারে কাটিয়ে দেন। দেশ যে দিনের পর দিন ম্যালেরিয়া ও পানীয় জলাভাবে শ্রীহীন হ'তে চল্‌ছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রজাদের দুঃখকষ্ট, হাজা শুখা অগাহ্য ক'রে অসময়ে চাষীদের দাদন দেওয়ার পরিবর্ত্তে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য উৎপন্ন শস্য সস্তা দরে বিক্রয় ক'রে কিম্বা ঘরবাড়ী নিলাম ক'রে সহরে চ'লে আসেন বিলাসিতার খরচ জোগাতে। জমিদার ও প্রজায় সম্বন্ধ কেবল টাকাকড়িতে; স্নেহের যে একটা বন্ধন আছে, তাঁরা সেটা অগ্রাহ্য করেন। আর এখানে দেখি যে, কুণ্ডু চৌধুরী রাজা প্রভৃতি জমিদারেরা ইচ্ছা কর্‌লেই চৌরঙ্গীতে বড়-বড় বাড়ী ভাড়া ক'রে মোটর চ'ড়ে বেড়াতে পার্‌তেন, তাঁরা সে লোভ সংবরণ ক'রে প্রজাদের সহিত গ্রামে বাস কর্‌ছেন। এইটিই বড় সুখের বিষয়। আমি ব'লে থাকি যে, যে-সব জমিদারেরা দেশছাড়া তা'রা প্রকৃতই লক্ষ্মীছাড়া।

যদি একটা দেশকে সম্যক্ বুঝ্‌তে চান, তবে সহরের দুচারটা বাড়ী দেখ্‌লেই চল্‌বে না। জাতির মেরুদণ্ড, জাতির শক্তি, জাতির প্রাণ, পল্লীর ওই নিরক্ষর চাষীদের দিকে তাকান। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক কয়টি। বাংলা দেশের লোক সংখ্যা এখন সাড়ে চার কোটির উপর। দেশের শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর। তাদের বাদ দিলে ত কিছুই থাকে না সুতরাং তাদের আগে চাই। কথায় বলে A nation lives in huts, কুটীর ফে'লে গেলে চল্‌বে না। শিক্ষিত আমরা আমাদের উচিত আমাদের অজ্ঞ ভাইদের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তা'রা রোগে শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, অনাহারে প্রপীড়িত হ'য়ে মর্‌তে বসেছে, এখন কি আমাদের নিজ-নিজ সুখভোগে মত্ত হওয়া সাজে? আমাদের কর্ত্তব্য, যারা পশ্চাৎপদ তাঁদের সকলকে হাত ধ'রে টেনে তোলা—তাদের সকলকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করা। এখনও বাংলাদেশ শিক্ষিত বাবুদের কথা শোনে; পরে আর শুন্‌বে ব'লে বোধ হয় না। ভাই ব'লে তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে; তা'রা যে আমাদের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা তাদের শিরায় ও ধমনীতে আমাদেরই রক্ত প্রবাহিত।

যাক্ এখন যৌথ-সমবায় ভাণ্ডার (Co-operative Stores) সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলি। শেষবারে যখন আমি মাঞ্চেস্‌টারে ছিলাম, তখন তাঁদের কোঅপারেটিভ ষ্টোরস্ দেখ্‌তে যাই। সে যে কত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপার তা দেখ্‌লে আপনারা মূর্চ্ছা যাবেন। তাঁরা আমাকে ও আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধু-দুটিকে সাদরে মোটর ক'রে নিয়ে গেলেন। বল্‌লে আশ্চর্য্য হবেন যে, তাদের ৯৫ কোটি টাকা চা, বিস্‌কুট জেলি প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রতি-বৎসর বিক্রয়ে। সারা ইংলণ্ডব্যাপী তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র। সিংহলে তাঁদেরই চা-বাগান আছে। এমন প্রকাণ্ড ব্যবসায় কেমন সুন্দরভাবে চালাচ্ছেন দেখুন ত। আর আমাদের যুবকদের কাছে ব্যবসার কথা তুল্‌লেই ব'লে বসেন, মূলধন পাই কোথা? ব্যবসাতে মূলধন জোগাড় কর্‌বার পূর্ব্বে কিছু দিন শিক্ষানবিশী করা বিশেষ দর্‌কার। কোথায় কোন্ জিনিষটার কি দর, কোথায় কোন্ জিনিষ প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যায়, কোন্‌খানে কি ব্যবসা কর্‌লে বেশ চল্‌বে ইত্যাদি নানা খবরাখবর জানা না থাক্‌লে ব্যবসায়ে উন্নতি করা দূরে থাকুক অবনতির সম্ভাবনাই অধিক। এই যে ব্যবসায় মাড়োয়ারীদের একচেটে, তার কারণ তা'রা ছেলে বেলা থেকে ব্যবসা-সম্বন্ধে অনেক কথ

জানে শোনে, অনেক গূঢ় তথ্য তাদের দে'খে ও ঠে'কে শেখা। আমাদের মধ্যে গন্ধবণিক, তিলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে। তাই বল্‌ছি শুধু ব্যবসা-ব্যবসা করে চীৎকার কর্‌লে কিছুই হবে না। আজকাল যুবকদের মুখে এই রবই শুন্‌তে পাওয়া যায়। আমি বলি ব্যবসা-সম্বন্ধে তোমরা ত কিছুই জানো না। জগতের মধ্যে most pitiable creatures (সর্ব্বাপেক্ষা দয়ার পাত্র) যদি কেউ থাকে তবে সে আমাদের বাংলা দেশের গ্রাজুয়েটগণ। তাদের দুরবস্থার সীমা নেই—চাক্‌রি ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নাই। আবার এই চাক্‌রিজীবীদের সংখ্যা কত, তা মুখে বল্‌বার দর্‌কার নেই, একবার যদি কেউ সকাল-বিকাল হাওড়া কিম্বা শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে দাঁড়ান, তবে সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এ-দৃশ্য এত মর্ম্মস্পর্শী যে দুঃখে আর্ত্তনাদ কর্‌তে ইচ্ছে হয়। হাজার-হাজার লোক ডেলী প্যাসেঞ্জার। এরা সকলেই কোনো-না-কোনো জায়গায় চাক্‌রি করে। একবেলা রোজগার না হ'লে হাঁড়ি ঠন্‌ঠন্, স্ত্রীপুত্রের সহিত অনাহারে কাটাতে হয়। এর চেয়ে অধঃপতন আর কি হ'তে পারে?

অনেকে মনে কর্‌তে পারেন আমি একজন বৈজ্ঞানিক হ'য়ে ব্যবসায়াদি বিষয়কর্ম্মের কি ধার ধারি? তাঁরা হয়ত জানেন না, আমি বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং পাঁচ-ছয়টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কলকার্‌খানার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ব্যবসায়াদি বিষয়কর্ম্মের অভিজ্ঞতা আমার কিঞ্চিৎ আছে এবং জলে বাস কর্‌তে হ'লে যেরূপ কুমীরের সঙ্গে ভাব রাখা চাই, বিষয়কর্ম্মাদি কর্‌তে হ'লেও সেইরূপ উকিল ব্যারিস্টার প্রভৃতি necessary evils এর সহিত পরিচয় থাকা দর্‌কার। সুতরাং আপনাদের মতো আমার বিষয়াদি না থাক্‌লেও, আমি একজন বৈষয়িক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই আমাদের যুবকদের পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ কর্‌ছি, যে, তা'রা যেন ব্যবসায়াদি সকল কাজ কর্‌বার পূর্ব্বে কিছুদিন শিক্ষানবিশি করে। এইরূপ কো-অপারেটিভ সোসাইটি (Co-operative Society)তে কাজ ক'রে তা'রা ত অনেক অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌তে পারে, elementary principles of economics শিখ্‌তে পারে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে স্কুলমাষ্টার ও দু'একজন ডাক্তার ও উকিল ছাড়া বাকী সবই কেরাণী। এই কেরাণীগিরিতে তাদের জাত যায় না—জাত যায় স্বাধীন নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়। রাজার বাজার থেকে আরম্ভ ক'রে হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকান পর্য্যন্ত দুধারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পান বিড়ি সরবৎ প্রভৃতির অনেক দোকান দেখা যায়, কিন্তু সেইগুলির মধ্যে একটিও বাঙ্গালীর নহে। বাঙ্গালী ব্যবসা ভুলে আফিসে সাহেবের গালাগালি খেয়ে সে গালাগালির চোটটা দেখান নিরীহ গৃহিণীর উপরে; অবশ্য সেসব বিষয়ে আমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

আর নাগরিক শ্রীবৃদ্ধির তুলনা কর্‌লে কলিকাতা বোম্বাই অপেক্ষা অনেকাংশে হীন। কলিকাতার চৌরঙ্গীতে কালা আদমীর স্থান নেই, তাদের জন্য নেটিভ কোয়ার্টার আছে, সেগুলি অতি জঘন্য ভিজে স্যাঁৎসেঁতে, বিধাতার অযাচিত দান আলো ও বাতাস ভ্রমেও সেখানে প্রবেশ করে না। আর অনেকের বেতন ৪০।৫০, কিম্বা ১০০৲ টাকা বটে, কিন্তু তা'তে তাঁদের খাওয়াদাওয়া ও বাড়ীভাড়া দিয়ে কিছুই থাকে না; শেষে বুঝি দিগম্বরের সাজ না সাজ্‌লে আর চলে না। আর বোম্বাইয়ে দেখুন, স্যার দোরাব তাতা, স্যার বিঠলদাস ঠাকর্‌সী, স্যর ফজল-ভাই করিমভাই প্রভৃতি সেখানকার সুন্দর রমণীয় প্রদেশের একরূপ মালিক। তাঁদের বিশেষ পরিচয় আর কি দেবো? তাঁরা সময়ে-সময়ে দু'কোটি টাকা নিয়ে ক্রীড়া কর্‌তে বসেন।

এখনকার দিনে 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি' ব'লে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না। আলস্য ত্যাগ ক'রে উন্নতির জন্য উঠে-প'ড়ে লাগা চাই; ভালো ক'রে খাওয়া-পরা চাই। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আগে তোরা পেট পূরে খা।' বাস্তবিক পেট পূরে খেতে না পেলে কোনো কাজই সুচারু-রূপে সম্পন্ন করা যায় না, উন্নতি ত দূরের কথা। পুঁইশাক আর চিংড়ী মাছ খেয়ে দিন কাটালে চল্‌বে না। উদরটা ত একটা গর্ত্তবিশেষ নয়, যে মিউনিসিপ্যাল রাবিশের মতন যা তা দিয়ে পূর্ণ কর্‌বে। ভালো-ভালো জিনিষ খেতে

হবে, যাতে শরীরের পুষ্টিসাধন হবে তবে ত কাজ কর্‌বার শক্তি জন্মাবে।

তা'র পর আর-এক কথা এই, যুবকেরা হচ্ছে দেশের ভাবী আশা, তাদের বাদ দিয়ে কোনো কাজই করা চলে না। প্রবীণ লোকেরা হচ্ছে সমাজের মাথা আর যুবকেরা তা'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশেষ। সুতরাং সকল কাজেই তাদের সহায়তা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই ছেলেদের ডাক আমার কাছে বড় পবিত্র। লাটসাহেব ডাক্‌লে ছল ক'রে অনেক সময়ে যাইনে, কিন্তু ছেলেদের ডাক শুন্‌লে আর কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পারিনে। আমরা আর ক'দিন! আমাদের ত জীবন-সন্ধ্যা; যুবকেরাই দেশের সব, তা'রাই দেশের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুল্‌বে।

আর-একটা কথা হচ্ছে, স্ত্রীশিক্ষার কথা। মা, ভগ্নী সহধর্ম্মিণীকে মূর্খ ক'রে রাখ্‌লে কি লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হয়, তা আমরা পদে-পদে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কলিকাতায় নারীশিক্ষাসমিতি আছে, আমি তা'র সঙ্গে কিঞ্চিৎ সংশ্লিষ্ট; তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে প্রত্যেক পাড়ায়-পাড়ায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে একটা ক'রে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তা'র চেষ্টা করা। আর স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে গভর্ণমেণ্ট ও সাহায্য ক'রে থাকেন। একটা কথা সকলে নিজে-নিজেই ভেবে দেখ্‌তে পারেন। মনে করুন কারুর স্বামী বিদেশ থেকে তা'র নিরক্ষর স্ত্রীকে একখানা পত্র লিখেছে; এখন সেই চিঠিখানি হয় রাস্তার লোক ডেকে পড়িয়ে নিতে হবে, নয়ত ছোট দেবরকে পড়্‌বার জন্যে খোসামোদ কর্‌তে হবে। যদি তাই হয়, তবে কি লজ্জার কথাই হবে বলুন ত। সারাদিনের মধ্যে মেয়েদের এক ঘণ্টা লেখা পড়া কর্‌বার সময়ও কি হয় না? একটা সাপ্তাহিক পত্র প'ড়ে জগতের অনেক খবর ত তা'রা রাখ্‌তে পারে? সময় ক'রে নিলেই হয়; আগে ত গৃহস্থালীর কর্ম্ম সেরে চর্‌কায় সুতো কাটা হ'ত।

আমার শেষ কথা যে মুরশিদাবাদ কাহিনীর মতন, আন্দুলের ও অন্য-সব প্রাচীন গ্রামের একটা ইতিহাস লেখা খুবই দর্‌কার। কতকগুলি বাড়ীর এক-একটা 'ফোটো' তু'লে রাখা শীঘ্রই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে, যেগুলি ইতিহাসের সহিত সন্নিবেশিত করা চলে। এই ইতিহাস লেখার ভার, যার-তা'র উপর দিলে হবে না কিম্বা টাকা দিয়ে লিখিয়ে নিলেও ভালো হবে না। এমন লোকের উপর ভার দিতে হবে, যিনি দরদের সহিত কাজ কর্‌তে পার্‌বেন।

গৌড়ের অধঃপতন

শ্রী রমাপ্রসাদ চন্দ

এই প্রস্তাবে জনপদবাচক গৌড় শব্দ কতকটা মন-গড়া অর্থে, বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত প্রাচ্য ভারত অর্থে ব্যবহৃত হইল। গৌড়ের অধঃপতন অর্থ বিদেশাগত মুসলমান আক্রমণকারিগণ কর্ত্তৃক এই ভূভাগের অধিকার। এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্গত দক্ষিণ বিহার (মগধ) এবং বরেন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে বিনা-যুদ্ধে বিজিত হইয়াছিল। বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ) আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল পরবর্ত্তী শতাব্দীর শেষভাগে। মিথিলার পতন হয় আরও পরে। কামরূপ এবং উড়িষ্যা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে মুসলমানের পদানত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন তুরুষ্ক এবং পাঠান আক্রমণ-কারিগণের তুলনায় হিন্দুরা হীনবল ছিলেন বলিয়া সহজে বিজিত হইয়াছিলেন। একথা সম্পূর্ণ রূপে সত্য বলিয়া মনে হয় না। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুরা হীনবল হইত, তবে পুনঃপুনঃ আক্রমণ-সত্ত্বেও সমস্ত গৌড়মণ্ডল জয় করিতে মুসলমানগণের আড়াই শতবৎসর লাগিত না। এই

১নং চিত্র
শঙ্খলাঞ্ছন তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি
(খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী)

আড়াই শত বৎসরের ইতিহাস ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় বাহুবলের অভাব গৌড়ীয় হিন্দুর পতনের কারণ নহে ; গৌড়ীয় হিন্দুর অধঃপতনের কারণ একতার অভাব, একযোগে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সামর্থ্যের অভাব। এই সামর্থ্যের অভাবই তৎপূর্ব্বে হিন্দুস্থানের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গজনীর সুলতান মামুদ গান্ধার ও পঞ্জাব জয় করিয়াছিলেন। গজনী হইতে বিতাড়িত হইলেও মামুদের উত্তরাধিকারিগণ পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ থাকিতে প্রস্তুত ছিলেন না, পূর্ব্বদিকে হিন্দুস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। আজমীরের চৌহান এবং কান্যকুব্জের গাহড়বাল রাজগণ এই দেড়-শত বৎসর কাল এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইলেও এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কখনও যে তাঁহারা উভয় রাজ্যের সেনাবল একত্র মিলিত করিয়া শত্রুকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কোন বিরাট্ কার্য্য সাধনের জন্য প্রতিযোগিগণের একযোগে একমনে চেষ্টা করিতে হইলে সকল পক্ষেরই পরিণাম-দৃষ্টি, আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি এবং সংযম থাকা আবশ্যক। এইপ্রকার পরিণাম-দৃষ্টি এবং সংযম সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। যাঁহারা বুদ্ধিবলে এবং চরিত্র বলে, (morally and intellectually) এক-কথায় আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভবে। এক-সময় আমাদের দেশের লোক যে বুদ্ধিবলে এবং চরিত্র-বলে এইরূপ উন্নত ছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে এ দেশের শাসন-রীতি এ-কালের মতন লাটের বা রাজার সরকারে কেন্দ্রীভূত ছিল না, সমগ্র দেশ কতকগুলি ছোট-বড় সামন্ত-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এইসকল সামন্তরাজা অনেক বিষয়ে রাজাধিরাজের আজ্ঞার অপেক্ষা করিত না, স্বাধীন পথে চলিত ; এই-সকল সামন্ত বা মাণ্ডলিকগণকে সংযত রাখিতে সমর্থ রাজাধিরাজের অভাব হইলে দেশে অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হইত, সামন্তরাজগণ আপন-আপন অধিকার বিস্তারের জন্য পরস্পরের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিত। গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন পাঠ করিলে জানা যায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে গৌড়দেশে এইরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা (মাৎস্যন্যায়) দমন করিবার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজাধিরাজ-পদে বরণ

করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ অর্থ এখানে অবশ্য প্রজাসাধারণ বুঝিতে হইবে না, সামন্তরাজবর্গ অথবা ছোট-বড় ভৌমিক-বর্গ বুঝিতে হইবে। পরস্পরের সহিত বিরোধে রত সামন্তচক্র বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া গোপাল-দেবকে রাজাধিরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে তাহাদের সকলকে অবশ্য ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ বিসর্জ্জন করিতে এবং হিংসাদ্বেষ সংযত করিয়া লইতে হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দ হইতে আর্য্যাবর্ত্তের সামন্ত বা দেশনায়কবর্গের মধ্যে এইরূপ দূরদৃষ্টির, ত্যাগের এবং সংযমের অভাব হওয়ায় তাহারা মুসলমান আগন্তুকগণের গতিরোধ করিবার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করিতে পারেন নাই। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের অধঃপতনের জন্য শুধু পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র, লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহাদের সেনাগণ দোষী নহেন, দোষী সেইসকল দেশনায়ক বা সামন্তবর্গ যাঁহারা একজন রাজার পরাজয়ের বা—পলায়নের পর আর-একজন যোগ্য-ব্যক্তিকে রাজাধিরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার নেতৃত্বাধীনে আক্রমণকারিগণের সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, গৌড়ের, তথা আর্য্যাবর্ত্তের, ক্রমশঃ অধঃপতনের কারণ জননায়ক সামন্তগণের এবং, আরও এক স্তর নামিয়া বলা যাইতে পারে জনসাধারণের বুদ্ধির এবং চরিত্রের বলের অথবা আধ্যাত্মিক বলের অভাব।

এ-দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার উপর নির্ভর করিয়া এতবড় একটা সিদ্ধান্ত গড়ন অনেকের নিকট দুঃসাহসের কার্য্য বিবেচিত হইতে পারে; এই গণতন্ত্রের যুগে এমনও কথিত হইতে পারে যে এই অধঃপতন-ব্যাপারে জনসাধারণের কোন দোষ নাই—যতদোষ তাহাদের স্বেচ্ছাচারী, প্রজাপীড়ক, প্রজার স্বাধীনতা-নাশক নৃপতিবর্গের। রাজ্যের উত্থান-পতন রাজার এবং রাজপুরুষবর্গের লীলাখেলা-মাত্র, ইহাতে জনসাধারণের দায়িত্ব নাই। কিন্তু শিল্পের উত্থান-পতন-সম্বন্ধে এইরূপ বলা চলে না। ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্প শুধু শক্তিশালী বা ধনী লোকের খেয়াল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। শিল্পে গণচিত্তের (mass mind) অন্তর্নিহিত ভাবাভাবের আভাস পাওয়া যায়, এবং শিল্পের উত্থান-পতনের জন্য জনসাধারণও কতক-পরিমাণে দায়ী, এ-কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। শিল্পের ইতিহাস

চিত্র নং ২
শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী
(খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী)

গৌড়ের অধঃপতন-সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দান করে, অতঃপর তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গৌড়মণ্ডলে এবং তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশে মৌর্য্য এবং শুঙ্গ-যুগের ভাস্কর্য্যের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই প্রাচীন যুগে শিল্পের মধ্যে ভাস্কর্য্য প্রাধান্য বা স্থাপত্যের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই, স্থাপত্যের

৩নং চিত্র
ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ
(খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী)

অনুগত আভরণ-স্বরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছিল। প্রাচ্য-ভারতে ভাস্কর্য্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল গুপ্তযুগে, যখন বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবগণ আপন-আপন আরাধ্য দেবতার প্রতিমা গড়িয়া মন্দিরে-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধের আরাধ্য গৌতমবুদ্ধ, জৈনের আরাধ্য ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা জিন, বৈষ্ণবের আরাধ্য বিষ্ণু, শাক্তের আরাধ্য ভগবতী। এই যুগে এইসকল আরাধ্য দেবতার নানা আকারের এবং নানা প্রকারের প্রতিমাতে আরাধনার লক্ষ্যরূপে একই ভাব-বস্তু লক্ষিত হয়। এই ভাব-বস্তু একনিষ্ঠ সাধনার ভাব, ধ্যানমগ্ন যোগীর ভাব। সেকালের দ্বিভুজ বুদ্ধ বা জিন, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, নানা প্রহরণধারিণী দশভুজা ভগবতী-সকলের প্রতিমাই যেন সশরীরী ধ্যান-ধারণা সমাধি; সকল সম্প্রদায়ের প্রতিমাই যেন সমস্বরে ঘোষণা করিতেছে, "নেতি যদিদমুপাসতে।"

গুপ্তযুগ বা খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শিল্পের ইতিহাসের গতিবিধির দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকখানি জিন-মূর্ত্তির পরিচয় দিব। মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজ (রাজগৃহ) নগরের চতুর্দিকস্থ পাঁচটি পাহাড় জৈনদিগের মহাতীর্থ। এই পাঁচপাহাড়ের উপরে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে ও আধুনিক মন্দির-নিচয়ে এবং বর্ত্তমান রাজগির গ্রামের জৈন মন্দির-নিচয়ে গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দ পর্য্যন্ত সকল যুগের নির্ম্মিত অনেক তীর্থঙ্কর প্রতিমা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে চারিখানি প্রতিমার চিত্র প্রদর্শন করিয়া আমাদের অধঃপতন-সম্বন্ধে শিল্পের সাক্ষ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১নং চিত্র চুণারের বেলে পাথরের নির্ম্মিত কায়োৎসর্গ-ব্রতপরায়ণ তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি। লাঞ্ছন লুপ্ত হওয়ায় ইনি যে কোন্ তীর্থঙ্কর, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। পৃষ্ঠফলকে অঙ্কিত আভামণ্ডলের আকার দেখিয়া এবং অন্যান্য কারণে মনে হয় মূর্ত্তিখানি গুপ্তযুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কায়োৎসর্গ একপ্রকার তপস্যা। দণ্ডায়মান অবস্থায় হস্তপদ একেবারে স্থির রাখিয়া সমস্ত শারীরিক ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া দিবাভাগে কায়োৎসর্গ সাধন করিতে হয়। আমাদের এই প্রতিমায় গড়নের দোষ যাহাই থাক, ইহার আপাদমস্তকে সাধনার ভাব, সাধন-কার্য্যে সমস্ত শরীর ঢালিয়া দেওয়ার ভাব, জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে এবং

৪নং চিত্র
ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ
(খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী]

মুখমণ্ডল সমাধি সূচিত করিতেছে। এই প্রতিমার নিকট-বর্ত্তী হইলে ভক্তের ত কথাই নাই, সাধারণ দর্শকের চিত্তেও ক্ষণেকের জন্য কায়োৎসর্গ করিয়া ধ্যানস্থ হইবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। এইরূপ প্রতিমার উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলা যাইতে পারে না।

২ নং চিত্র কষ্টিপাথরের নির্ম্মিত বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্ত্তি। পাদপীঠের লিপি দেখিয়া অনুমান হয় এই মূর্ত্তি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভক্তির নেত্রে এই মূর্ত্তির দিকে চাহিলে যাহা সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম যাহা পরাৎপর প্রস্তর ভেদ করিয়া তাহার দিকে চিত্ত-ধাবিত হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের এই যুগের প্রতিমাও এইরূপ উচ্চ ভাবোদ্দীপক। গুপ্তযুগের পরে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশে ভাস্কর্য্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। গৌড়ে পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠার পরে (খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দে) ভাস্কর্য্য নবজীবন লাভ করিয়াছিল। গৌড়ে ভাস্কর্য্যের অধঃপতনের সূচনা হয় একাদশ শতাব্দে। তদবধি পৃষ্ঠফলকে কারুকার্য্যের বাহুল্য এবং মূল প্রতিমায় ভাবসম্পদের হ্রাস লক্ষিত হয়। গুপ্তশিল্পের ধারা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিলেও লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু মুসলমান আধিপত্য-স্থাপনের পরে সহসা যেন সেই ধারা একেবারে শুকাইয়া গেল; পাষাণের প্রতিমা দেবত্ব হারাইয়া পুত্তলিকায় পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৩নং এবং ৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

২ নং চিত্র রাজগৃহের অন্তর্গত বৈভারগিরির উপরকার একটি মন্দিরে স্থিত তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পাদপীঠে যে লিপি ছিল, তাহা এখন লুপ্তপ্রায়। মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

৪ নং চিত্র রাজগৃহের অন্তর্গত রত্নগিরির উপরকার একটি মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালের গায়ে বসান আছে। এই মূর্ত্তির পৃষ্ঠফলকে এবং পাদপীঠে খোদিত লিপিতে উক্ত হইয়াছে ইহা সংবৎ ১৫০৪ বর্ষে অর্থাৎ ১৪৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ের এবং পরবর্ত্তী কালের কৃষ্ণমূর্ত্তি এবং দেবীমূর্ত্তিও এইরূপ ভাবহীন এবং প্রাণহীন পাষাণপিণ্ড-মাত্র। সমসময়ের চিত্রকলা এবং হিন্দু দেবদেবীর চিত্র এমন নির্জ্জীব এবং ভাবহীন নহে। কিন্তু মুসলমান আমলের দেবদেবীর এবং তীর্থঙ্করগণের চিত্রে কায়োৎসর্গের বা ধ্যান-ধারণার ভাব দেখা যায় না, দেখা যায় লীলা-খেলার ভাব। গুপ্ত ও পালযুগের প্রতিমার সহিত মুসলমান যুগের প্রতিমার তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে, শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিমার উপাসকগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনুসৃত উন্নত সাধনপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৌত্তলিকের দশায় অধঃপতিত হইয়াছিলেন। মুসলমান যুগে ভাস্কর্য্যের এইপ্রকার অধঃপতনের কারণ কি? প্রতিমা-নির্ম্মাণ-শিল্পের অধঃপতনের কারণ যে আধ্যাত্মিক অধোগতি এ-কথা বলাই বাহুল্য। তবেই দেখা যাইতেছে হিন্দুর রাষ্ট্রের এবং শিল্পের অধঃপতনের মূলে একই কারণ নিহিত রহিয়াছে। হিন্দুর সর্ব্বনাশের কারণ আধ্যাত্মিক অধোগতির সূচনা যখনই হউক, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহার ফলের সূচনা দেখা যায় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে। এখন জিজ্ঞাস্য, হিন্দুর এই আধ্যাত্মিক (moral and intellectual) অধোগতির কারণ কি?

এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা উপমান-প্রমাণের (analogy) আশ্রয় লইব। ইউরোপের ভাস্কর্য্যের ইতিহাসের একটা যুগে এতদূর না হউক এই-প্রকার অধঃপতন দৃষ্ট হয়। এই অধঃপতনের সূচনা হইয়াছিল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে এবং ইহার স্থিতি দ্বাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত। এই অধঃপতনের এক কারণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের যোগে মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ইহুদী-সভ্যতার সহিত সংস্রব, এবং আর-এক কারণ ইউরোপের উত্তরাংশ হইতে আগত রোমীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসকারী বর্ব্বরগণের সংসর্গ। আমার মনে হয়, বর্ব্বর সংসর্গই হিন্দুরও আধ্যাত্মিক অধোগতির কারণ। আমাদের দেশের একদিকে কোল, সাঁওতাল, ওঁড়াও প্রভৃতি জাতির বাস, আর-একদিকে গারো, মিকির, কাছারী, খাসিয়া প্রভৃতির বাস। এই উভয় শ্রেণীর মানুষই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। একসময়ে বোধ হয় এইসকল জাতির মানুষ সংখ্যায় আরও অনেক বেশী ছিল এবং

বাঙ্গালা দেশের সমতল ভাগ পর্য্যন্ত ইহাদের বাসস্থান বিস্তৃত ছিল। আমার অনুমান হয় এইসকল জাতির সংসর্গে, কতক-পরিমাণে ইহাদের শোণিতমিশ্রণে, হিন্দুর অধঃপতন ঘটিয়াছে।

যাহারা আমার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবেন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি অসভ্যতার সংসর্গে আসিয়া হিন্দু সভ্যতার, হিন্দুর চরিত্রের এমন অধঃপতন ঘটিয়া থাকে, তবে হিন্দুর পুনরুত্থানের আর আশা কি? ইউরোপের ইতিহাস এক্ষেত্রে আমাদের পথ পদর্শক হইতে পারে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে নিকলো পিসানো প্রাচীন গ্রীক-শিল্প-নিদর্শন অনুকরণ করিয়া হাত পাকাইয়া লইয়া ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যে নবজীবন দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রীক সাহিত্যের ও শিল্পের অনুশীলন করিয়া ইউরোপ মধ্যযুগের বর্ব্বতার প্লাবন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। আমাদিগকে যদি পুনরায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হয় তবে শুধু ইউরোপীয় বিদ্যার এবং ইউরোপীয় রীতিনীতির অনুশীলন করিলে যথেষ্ট হইবে না, এদেশের প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন শিল্প, প্রাচীন ইতিহাস যথাবিধি অনুশীলন করিতে হইবে; এমনভাবে অনুশীলন করিতে হইবে যেন তাহার ফলে শিল্পের সাহিত্যের ও দর্শনের ক্ষেত্রে রিনাসেন্স্ বা প্রাচীনের যে অংশ উৎকৃষ্ট তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত নূতন সৃষ্টির সূচনা হইতে পারে!

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

দিল্লীতে 'ফাল্গুনী'

(বেঙ্গল ক্লাব দ্বারা অভিনীত)

সূচনা:—বাঙ্গলার চৌকাট পেরিয়ে এসেই আমরা আমাদের 'চন্দ্রহাস' ছাড়া; তাই পিয়ালবনের সবুজ পাতার কথা আর মনেই পড়ে না, মনে পড়ে কেবল চোখের সাম্‌নে 'দাদার তুলট কাগজের চৌপদীগুলো'। প্রবাসে থেকে প্রাণের নবীনতাকে কেবল পাগ্‌লামি ব'লেই মনে হয়, কারণ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল উপার্জ্জন করা, তাই উপলব্ধির পথের দিক্ দিয়েও যাইনে। সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যের ডুব-জলে প'ড়ে কেবল 'দাদা', 'কোটাল' আর মাঝির আশ্রয় ভিক্ষা করি, কারণ আমরা শিখেছি কেবল উপার্জ্জন, আমরা জানি কেবল কর্ত্তব্য। তাই সকল বিষয়ে ফলের আশা রাখি এবং বোঝ্‌বার ও আশা করি। "কাজটা"ই এখন আমাদের কাছে বড়, আর 'খেলাটা'ই চুরি বলে মনে হয়, কারণ আমাদের "সময় কাজেরই বিত্ত", তাই "মান্ধাতার আমলের বুড়োটার" ছোঁয়াচ আমাদের লাগে এবং সেইটেই সত্য ব'লে আমাদের ধারণা হয়। আমরা আমাদের প্রাণের "চন্দ্রহাস"কে শীতবুড়োটার মতন দুঃখের কাঁথা দিয়েই ঢেকে রাখি, তাই বাঁশীর সুরগুলো ও "মেয়েমানুষের কান্না"র সুর ব'লে মনে হয়, আর জ্যোছনা যেন দুপুর রাতের চোখের জলের মতো ঠেকে। কেউ হাস্‌ছে দেখ্‌লে মনে হয় "আপনি এত খুসী হন কেন?" এই ত প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবন!

শীতের ঝরা গাছের মতো আমাদের প্রাণের ফুর্ত্তি সব ঝ'রে গিয়েছিল। একদিন মাঘ মাসের গোড়ায় দুপুরবেলা দুজনে ব'সে গল্প কর্‌তে-কর্‌তে ফাগুন হাওয়ার পাগ্‌লামির-মতন হঠাৎ আমাদের প্রাণে এক পাগ্‌লামির উদয় হ'ল এবং সেই ক্ষ্যাপামির তালে নেচে উঠে স্থির করা গেল 'ফাল্গুনী' করা যাক্। বাউলের আশ্বাসবাণী পেয়েই দেখ্‌লাম, আমাদের দুঃখের দ্বারের সম্মুখে কাঁটা গাছে বাসন্তীরঙের ফুল ফুটেছে। আনন্দে তখনই দুখানি তাম্রখণ্ডের সাহায্যে বিশ্বভারতী আফিসে খবর দিলাম চারখানি

'ফাল্গুনী'র জন্য, এবং সেই দিন সন্ধ্যায় ক্লাবে সকলকে বসন্তের দূতের মতো জানান দিলাম 'ফাল্গুনী' আস্‌ছে, আমাদের প্রাণটাকে জাগাতে। শু'নে সকলেরই প্রাণের মাঘ ম'রে তখনই ফাগুন হ'য়ে উঠ্‌ল। যথাসময়ে দখিন হাওয়ার মতন 'ফাল্গুনী' এসে হাজির। কিন্তু গানের সুর ত জানা নেই, ভীষণ ভাবনায় প'ড়ে হতাশ হ'য়ে পড়্‌লাম। আমাদের তখন 'গান এসেছে, সুর আসেনি চোখওয়ালার দৃষ্টির মতো আমরা আমাদের বহির্দৃষ্টির সাহায্যে অনেক-প্রকারে গানের সুরের খোঁজ কর্‌লাম কিন্তু পেলাম না; তখন চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই—অন্ধের দৃষ্টির উদয় হ'ল, অতএব বোলপুরের আশ্রয় নিতে হ'ল। প্রবীণ-প্রাচীনদের মানা সত্ত্বেও আমাদের বাউলকে বোলপুরে পাঠানো গেল, কারণ তা'র গান তা'কে ছাড়িয়ে যায়। বোলপুরে কবিশেখর আমাদের বাউলকে বলেছিলেন, "ওরে, তুই কি তিন দিনের ভিতর আমাদের ফাল্গুনীকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাস? এত সহজ মনে করিস্‌নে, এতদিন ত পশ্চিমের সাড়া পাইনি।" আমাদের বাউল তাই তা'র দেহ মন প্রাণ দিয়ে যত্ন ক'রে সত্যই তিন দিনের ভিতর গানের সুরগুলি ঘূর্ণিহাওয়ায় উড়িয়ে সুদূর, মরুময় দিল্লীতে এনে হাজির কর্‌লে অরুণ আলোয় খেয়া নৌকাটির মতো। আমাদের প্রাণে আশা হ'ল। বাউল গাহিল, "হবে জয়, হবে জয় হবে জয় রে, হে বীর হে নির্ভয়।"

রিহার্স্যাল। সমস্ত ফাল্গুনীটাই একটা সুরের মতন, তাই এর ভিতর বেসুরের কিছু ঠেক্‌লেই প্রত্যেক অভিনয়ের রিহার্স্যালের সময় আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হ'ত। "ফাগুন লেগেছে বনে বনে" না হ'য়ে আগুন মনে-মনে লাগ্‌ত। প্রত্যহই সন্ধ্যায় রির্স্যালের সময় মনে হ'ত আজই ফাল্গুনীর সংক্রান্তি, কিন্তু দ্বিতীয় দিনই আবার নবউৎসাহে রিহার্স্যাল সুরু হ'ত, আবার মতদ্বৈধও হ'ত। তখন আমাদের মনে হ'ত, "তোমায় নূতন ক'রে পাবো ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণে।" রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনীতে যেমন প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন, তেম্‌নি আমরাও আমাদের মীমাংসার জন্য প্রকৃতিকে যিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন, সেই সারদাচরণ উকিলের আশ্রয় নিলাম। তাঁর প্রাণের শীতের বসনটা কেড়ে নিতেই দেখি তাঁর প্রাণ চিরনবীনতায় ভরা, তখন তাঁর গোপন প্রাণের পাগ্‌লামি আমাদের কাছে প্রকাশ হ'ল। সারদা-বাবুর উৎসাহ এবং ফাল্গুনীর গানের সুরগুলি আমাদের ফসল-ক্ষেতের গোড়ায় রস জুগিয়ে এসেছে।

অভিনয়।—ফাল্গুনীকে গ্রহণ ক'রে অবধি আমরা এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে আমরা আমাদের নবপল্লবিত ছেলেমেয়েদেরও ফাল্গুনীর ফাগ মাখিয়ে গীতিভূমিকায় টেনে এনেছিলাম। তাদের কচি-কচি হাত-পা নাড়া, কচি গলায় গানের সুরে, দর্শকের কথা জানি না, আমাদের প্রাণ আনন্দের আবীরে রঙীন ক'রে তুলেছিল। কচির শোভাই বসন্তের শোভা। ফাগুন মাসের সংক্রান্তির দিন ফাল্গুনীর অভিনয় হ'ল। যারা-যারা করেছিলাম অভিনয়কালে কেহই মর্ত্ত্যের নই, অন্ততঃ এ ধারণা আমাদের হয়েছিল। ফাল্গুনীর সূচনা, গীতিভূমিকা এবং নাট্যাংশের প্রত্যেক দৃশ্য সারদাবাবু প্রকৃতির অনুকরণে রকমারি ফুলের গাছ, লতা, পাতা কচি ঘাস, ফল, কুটীর নৌকা, গুহাদ্বার ইত্যাদির দ্বারা এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন যে প্রত্যেক দৃশ্যটিই এক-একটি নিখুঁৎ ছবির মতন ফুটে উঠেছিল। দর্শকমণ্ডলী এ-দৃশ্যগুলির ভিতরকার সৌন্দর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছিলেন কি না তা জানিনে। গান ত অনেকেই গায়, কিন্তু কান ক'জনের আছে। চোখ ত সকলেরই আছে, কিন্তু দৃষ্টি ক'জনের আছে? কিন্তু আমরা জানি ফাল্গুনীর সাজসজ্জা এবং দৃশ্যগুলির ভিতর দিয়ে সারদাবাবুর কতখানি শিল্প-চাতুর্য্য ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বকবির ভাবকে মূর্ত্ত কর্‌বার চেষ্টা সফল হ'ত না, যদি-না এ অপূর্ব্ব সৃষ্টির উপকরণগুলি সংগ্রহ হ'ত;—এ দায়টি ছিল নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্যের। পাখী যেমন তা'র বাসা তৈরি কর্‌বার সময় কত ঘু'রে কত কষ্ট ক'রে, কত যত্নে, কত দিনে এক-একটি ক'রে কুটো এনে অত বড়ো বাসা তৈরি করে, আমাদের ফাল্গুনীর দৃশ্যের প্রত্যেক কুটোটি নৃত্যগোপাল ঐরূপেই সংগ্রহ করেছিলেন। ফাল্গুনীকে পেয়ে আপন বেগে পাগলপারা হ'য়ে আনন্দের স্রোতে

ভেসে চলেছিলাম, অনেক বাধা বিঘ্ন এসে আমাদের গতিরোধ কর্‌ছিল, কূলে গিয়ে ঠেক্‌ব এভরসা বড় ছিল না, তখন আমাদের সকল কাযের কাণ্ডারী সকল সুপরামর্শের ভাণ্ডারী রাসবিহারী সেন সফলতার ডাঙ্গায় আমাদের টেনে তুলেছিলেন।

আধুনিকেরা অনেকে ফাল্গুনীর নাম শুনেই দেখ্‌তে আসেননি, আবার টিকিট কিনে নিয়েও কেউ কেউ আসেননি—এঁদের ওজর 'ফাল্গুনী' বুঝতে পার্‌ব না। ফাল্গুনী ত উইল করা সম্পত্তি নয়, যে বুঝে-পড়ে নিতে হবে,এতে তো উপার্জ্জনের কথা কিছুই নেই যে বুঝ বেন। বিশ্বের সৃষ্টি কি বোঝবার জন্য? গানের সুর বোঝবার জন্য? ফুলের গাছ কি বোঝবার জন্য? তাই ফাল্গুনীতে বোঝবারও কিছু নেই। যাঁরা কেবল ফলের আশা করেন তাঁরাই কেবল বোঝবার আশা রাখেন। কিন্তু যাঁরা ফলের আশা না ক'রে কেবল ফল্‌তে চান, তাঁরা কখনও বোঝ্‌বার আশা রাখেন না। ফাল্গুনীতে আছে ফোটা ফুলের আনন্দ; ফাল্গুনীর ভিতরকার কথা—চুকিয়ে দেওয়া, বিলিয়ে দেওয়া, ফুল যেমন ক'রে তার গন্ধ বিলোয়।

দর্শক।—আমরা দর্শক পেয়েছিলাম চার রকম।

প্রথম,—যাঁরা ফাল্গুনীকে সাধারণ নাটক মনে ক'রে এতে ঘটনা-বৈচিত্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতের আশা করেছিলেন। তাঁদের আশা-ক্ষেত্রে ফাল্গুনী ঠিক ফালের মত বিঁধেছিল এবং যথার্থই ফাল্গুনী তাঁদের ঘুমের বিশেষ ব্যাঘাত করেছিল।

দ্বিতীয়,—যুবকের দল! তারা শিংওঠা হরিণ শিশুর মত ফুলের গাছকেও গুঁতিয়ে বেড়ায়! তাই তারা ফাল্গুনী দেখে ঠাট্টা করেছিল!

তৃতীয়,—অগাধ বিদ্যার টোকা যাঁদের মাথায়, জ্ঞানের চশমা যাঁদের চোখে, তাঁরাই ব'সে ব'সে অভিনয়ের সমালোচনা করেছিলেন, এটা এরকম হওয়া উচিত নয়, এটা এরকম কেন হ'ল? 'যবনিকা উঠ্‌তে এত দেরী হচ্ছে কেন?" ইত্যাদি। খুঁত ধর্‌ব মনে কর্‌লে সকলেই কিছু না কিছু খুঁত পাওয়া যায়। অদ্ভুত কিছু দেখলেই এঁদের চোখে ঠেকে এবং বুকেও শেলের মত বাজে; কারণ এঁরা কোটাল; কিন্তু আমরা জানি জ্যোৎস্নার বুকের উপর দিয়ে যদি ভাঙা মেঘ ভেসে যায় তাতে জ্যোৎস্নার কোন ক্ষতি হয় না; আর বাদুড়ের ডানায়ও জ্যোছনা ঢাকা পড়ে না, সে বিশ্বাস আমাদের আছে। উক্ত সমালোচকদের জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মনে পড়ে—

কে বুঝে কে নাহি বুঝে,
ভাবুক তা নাহি খুঁজে;
ভাল যার লাগে তার লাগে!

চতুর্থ,—যাঁরা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে ফাল্গুনীকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই কেবল চিরদুঃখের আয়োজনের মাঝে থেকেও ফাল্গুনীর ফাগে নিজেদের মনটাকে রঙিয়ে নিয়েছিলেন, ফাল্গুনীর অমৃত-পানে তাঁরাই তাঁদের প্রাণটাকে অমর করতে পেরেছিলেন। আমাদের এপরিশ্রমের সার্থকতা তাঁদের কাছে।

দিল্লীর বঙ্গভাষাভাষীর কাছে এই দিনটি চিরস্মরণীয় থাক্‌বে।

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বেঙ্গলী ক্লাব, দিল্লী

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

বাংলা দেশের বাহিরে এলাহাবাদে অনেক বাঙ্গালীর বাস। কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলরতন ধর ও তাঁহার ছাত্রবৃন্দের কার্য্যাবলীর কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি অধ্যাপক ধরের একজন ছাত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন রসায়ন-বিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিলেন। ইনি গত বৎসর মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য (D. Sc.) ডিগ্রি লাভ করিয়া সমস্ত বাঙ্গালী ছাত্রের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহার গবেষণাগুলির পরীক্ষক ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডনান্ (Donnan) এবং অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সডি (Soddy)। অধ্যাপক ডনান্ এই ছাত্রের থীসিস্ (Thesis) পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন, যে এই মৌলিক গবেষণা পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে প্রকৃত উন্নতি ("It is a distinct advance in physical and

chemical sciences")। অধ্যাপক সডিও ইঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক ডনান্ এক-খানি পত্রে লিখিয়াছেন, "ডাক্তার কে, সি সেনের প্রকাশিত গবেষণাগুলি সম্বন্ধে আমার অতীব উচ্চ ধারণা হইয়াছে। তাঁহার D. Sc. ডিগ্রীর জন্য এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করায় এইসকল কার্য্যাবলী আলোচনা করিবার আমার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল, এবং আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি, যে, আমি তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য লিখিতে পারিয়াছিলাম। ইঁহার প্রায় ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৭টি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রচিত।" ("I have a high opinion of the research work which Dr. K. C. Sen has published. I have had a special opportunity of making myself acquainted with the details of this work since I was asked to examine his thesis and application for the D. Sc. degree of the Allahabad University. I am glad to say that I was able to report favourably and recommended Mr. Sen for the degree. He has published about 14 original papers, of which 7 represent independent work of his own".)

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের লিখিত প্রবন্ধগুলি জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার ফ্রয়েণ্ড্লিখ্ (Dr. Freundlich) তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—"আপনার প্রণীত প্রবন্ধগুলি আমার সুপরিচিত এবং আমার মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন দিকে এইগুলি অতীব উন্নতির পরিচায়ক। বাস্তবিক, Kolloid Zeit পত্রিকায় আপনার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।" ("Your works are well known to me and they seem to point in different respects a very valuable progress. Specially I have been struck with your treatise in the *Kolloid Zeit. 34*, 226 in which you make researches in the still very neglected influence of same charged ions on colloid particles.")

বাংলা দেশের বাহিরে বাঙ্গালী ছাত্রের এইরূপ কৃতিত্ব অতিশয় আনন্দের বিষয়।

ডাক্তার ক্ষিতীশচন্দ্র সেন

৺নিস্তারিণী দেবী

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা স্বর্গত জজ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম অবগত আছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিগত ১৭ই ফাল্গুন সোমবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় প্রয়াগধামে দেহত্যাগ

নিস্তারিণী দেবী

করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণা, আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। পরোপকারে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তিনটি স্বনামখ্যাত পুত্ররত্ন সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখপানে চাহিয়া সেই দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু একে একে তিন পুত্রকেই অকালে হারাইলেন। তিনি পুত্রদিগের এই অভাবনীয় আকস্মিক মৃত্যুতে একেবারে ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িলেন। কয়েক মাস হইল তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের স্ত্রীও পরলোকে গমন করিয়াছেন। বার্দ্ধক্যজনিত রোগ ও এই দারুণ শোকই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

শ্রী বিজয়চন্দ্র চৌধুরী

বাঙালীর উচ্চ পদ

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, বি-এস্-সি (মাইনিইং ও মেটালার্জ্জি; হার্ভাড) সম্প্রতি বিহার গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিস্ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনো বাঙালী এই সম্মানিত পদ পান নাই; কয়েকজন ইংরেজও এই পদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন।

ইনি স্বর্গীয় স্যার কে,জি গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আত্মীয়। ১৯০৪ সালে ১৭ বৎসর বয়সে সিটি কলেজে এফ-এ পাঠের সময় ইনি উচ্চাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া আমেরিকা পলায়ন করেন। সেখানে কিয়ৎকাল ৺রমাকান্ত রায় মহাশয়ের নিকট অর্থ-সাহায্য পান; রায়-মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে সেই সাহায্য বন্ধ হওয়াতে কঠোর পরিশ্রম করিয়া নিজের ব্যয় নিজেই নির্ব্বাহ করেন। কয়েকটি টেকনিকাল ইনষ্টিটিউটে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনিং ও মেটালার্জ্জির বি-এস্-সি ডিগ্রী লইয়া ১৯১২ সালে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন ও টাটার লৌহকারখানায়

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, বি এস্-সি [হার্ভার্ড]

সামান্য ফ্যায়ারম্যানের কার্য্য করেন; পরে উপরওয়ালার সহিত মনোমালিন্য হওয়াতে ঐকাজ ছাড়িয়া দেন। ১৯১৪ সালে যুদ্ধারম্ভের পর তাঁহাকে আবার সাদরে টাটার কারখানায় নিযুক্ত করা হয়। তিনি এতাবৎ কাল সেখানে দক্ষতার সহিত কোক্ ও ওভেন্ বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার উদ্যম বাঙালী যুবকদের অনুকরণীয়।

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

এক

বাসর-ঘরে মোটেই ভিড় ছিল না। কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে মেয়ের সংখ্যা ছিল খুব কম; তা'র উপর ক্রমাগত তিন-দিন-ব্যাপী দুর্য্যোগের জন্যে নিমন্ত্রিতাদের সংখ্যা বাড়্‌তেই পায়নি; কেবল ক'নের সই সেবাব্রতা ক'নের পাশে ব'সে বরের দিকে চেয়ে এক-আধটি ঠাট্টা-তামাসা কর্‌ছিল; আর মধ্যে-মধ্যে নীরব রসিকতাকেও ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিল। ক'নে প্রিয়ব্রতা নেহাৎ ছোটটি নয়, এবয়সে সে অনেকগুলি বাসর জেগে ক'নের জীবনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে; সুতরাং আধ-ঘোমটার ভিতর হ'তে ফিস্‌ফাস্ ক'রে সইএর রসিকতার জবাব দিতে সেও ছাড়্‌ছিল না। আর ওপাড়ার ঠান্‌দি ত একাই একশো হ'য়ে বর-ক'নে আগ্‌লে বিপুল দেহখানি নিয়ে সভা সাজিয়ে বসেছিলেন। পাড়াগাঁয়ে হঠ্ ক'রে নতুন জামাইএর সাম্‌নে বেরোনো রীতি নয়; কাজেই ক'নের মা দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়েই মেয়ে-জামাইকে একটু ঘুমুতে দেবার জন্যে ঠান্‌দিদিকে অনুরোধ কর্‌লেন। ঠান্‌দিদি কিন্তু চড়া গলায় ব'লে উঠ্‌লেন—এই তো রাত্তির বারোটা বাছা, জামাই তোমার কচি খোকা নয় যে, এক্ষুনি ঝিমুতে লেগেছে। কত ভাগ্যে জন্মের মধ্যে এই বাসরের রাতটি জোটে, এ রাত কি ভগবান ঘুমুবার জন্যে দিয়েছেন? কি বলিস্ লো নাত্‌নীরা?

ক'নের মা আর উচ্চ-বাচ্য না ক'রে নিজের কাজে চ'লে গেলেন।

ঠান্‌দি তখন একটু ন'ড়ে ব'সে বরের চিবুকটি নেড়ে দিয়ে বল্‌লেন—এইবার একটি গান গেয়ে শোনাও ত ভাই, নইলে-পরে নেহাৎ ফিকে লাগছে। সন্ধ্যে-রাত্তিরে বল্‌লে, উপোস ক'রে গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আছে, তার পর সরবৎ, রসগোল্লা, এতো রকম ফল এইসব খেয়ে নিশ্চয় গলা ভিজে উঠেছে, এখন আর কোনো আপত্তি খাটবে না।

বর কেদার বেশ সপ্রতিভভাবেই জবাব দিলে—আমার নেহাৎ সা, রে, গা, মা সাধা গলা, একি আপনাদের ভালো লাগ্‌বে?

ঠান্‌দি বল্‌লেন—আমরার মধ্যে তো তোমারই ক'নে আর ক'নের সই—ওদের মনে এখন যে সুর বাজ্‌ছে তাতে তোমার সুর বেসুরো হ'লেও চাপা প'ড়ে যাবে, আর আমার কথা?—এ বয়সে আমার নতুন গলার সব সুরই ভালো লাগে, ভাই!

কেদারের গান-বাজনার দিকে ঝোঁক ছিল খুব। তা'র বন্ধু প্রবাল এবিষয়ে বেশ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল; আর তা'র কাছ হ'তে কেদার একটু-আধ্‌টু শিখেও ছিল, আর শেখা বিদ্যার পরিচয় দিতে আগ্রহের তা'র মোটেই অভাব ছিল না, বিশেষ ক'রে পুরুষ-জীবনের মস্ত বড় রঙ্গভূমি এই বাসর-ঘরে জীবনে এই রঙ্গমঞ্চের নায়ক সেজে প্রবেশ কর্‌বার সুযোগ এখনকার দিনে পুরুষের ভাগ্যে একবারের বেশী আর মেলে কই? যাদের একবারের বেশী দু'তিন বার মিলে যায় তা'রা হয়ত সৌভাগ্যবান্; তবে বাসর-ঘরে অসংখ্য নারীগণের মধ্যে ব'সে সঙ্গীতচর্চ্চা অতি-বড় বীর পুরুষের পক্ষেও সহজ-সাধ্য নয়। যেহেতু বাঙলা দেশের মেয়েদের কোমল করাঙ্গুলি বর বেচারীকে বাজনার দলে ফেলে কান মোচড়াতে খুব বেশী অভ্যস্ত—তা'র ওপর সুর ভুল হ'লে তো কথাই নেই। তবে কি না কেদার বেশ পরিষ্কার চোখে চেয়ে দেখলে যে এ-ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চ একেবারেই দর্শকশূন্য—যে দু'টি তরুণী নারী উপস্থিত তা'দের প্রাণের মধ্যেই এখন এমন সুর বাজছে যা সহজেই কেদারের সঙ্গীতকে ছাপিয়ে বিরাজ কর্ত্তে পার্‌বে, আর আছেন বৃদ্ধা ঠান্‌দি; তিনি তো নিজেই অনুরোধ

করছেন সুতরাং তাঁকে ভয় কি? যাই হোক্ কেদারের নীরবতায় অধৈর্য্য হ'য়ে ঠান্‌দি অভয় দিয়ে আবার বল্‌লেন—ভয় কি দাদা, নির্ভয়ে গান ধরো, বৃষ্টির জ্বালায় মেয়েরা যে আস্‌তে পায়নি, ন'লে তোমার সঙ্গে তা'রাও নেচে গেয়ে একশা ক'রে দিত। ও সই—তুই না হয় ভাই ঝাঁঝর মল পরে' তোর সয়ার সাম্‌নে দু'পা নেচে দে না, দিদি!

ঠান্‌দি কি দুষ্টু! আর কি যে অসভ্যের মতন কথা বল্‌ছ! তোমার সখ হ'য়ে থাকে তুমিই নাচো না, বাপু, কে মানা করছে? পাঁইজোর চাই, এনে দেবো? ব'লেই সেবা সইএর গা ঘেঁসে বস্‌ল।

ঠান্‌দি হাসিমুখে বল্‌লেন—তা বাপু এ বয়সে অথর্ব্ব হয়ে পড়েছি তাই; নইলে বাসরে যে নাচিনি তা নয়। তোরা এখন সভ্য হয়েছিস্, আমাদের মতো বুড়ীকে অসভ্য বল্‌বি বই কি! ও ভাই বর, আর কথায় কাজ নেই; তোমার যেমন কপাল তুমি শুক্লোতেই গান ধর। ঐ শোনো পুকুর-পাড়ের ব্যাঙ্‌গুলো দোহর গাইছে।

কেদার প্রথমটা একটু গুনগুন ক'রে সুর ভেঁজে নিয়ে তার পর মুক্ত-কণ্ঠে গান ধর্‌লে—

> আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু
> পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা,
> জীবন যৌবন সফল করি মানিনু
> দশ দিক্ ভইল মহানন্দা!

প্রিয়া-মিলন-বিমুগ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মধুর কণ্ঠের মধ্য দিয়ে যেন মূর্ত্তি ধ'রে ফুটে উঠেছিল। কেদার সঙ্গীতজ্ঞ না হ'লেও তার গলা বেশ মিষ্টি ছিল; সুতরাং গানটি বেশ জ'মে উঠল। কর্ম্ম-বাড়ীর দু'একজন পুরুষ এদিকে-সেদিকে ছুটো-ছুটীর ফাঁকে বাসর-ঘরের জানালা-দরোজায় উঁকি দিয়ে গান শুনে যেতে লাগলেন। পাড়ার ছোট-লোকদের ছেলে-মেয়েরা বৃষ্টি-বাদলে ভিজেও প্রসাদ-প্রার্থী হ'য়ে এতো রাত্রে কর্ম্মবাড়ীতে অপেক্ষা করছিল। তা'রা আপাততঃ লুচি-মণ্ডার কথা ভুলে দুয়ারে দাঁড়িয়ে গান শুন্‌তে লাগল। এই সময়ে হঠাৎ কে একজন ত্বরিত-গতিতে একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই সঙ্গে-সঙ্গে কেদারের গান থেমে গেল। ঠান্‌দি অম্‌নি ব'লে উঠলেন—ও ভাই বর, হঠাৎ থেমে রসভঙ্গ করলে কেন? নেহাৎ বেরসিক তুমি—কানে মোচড় দিতে হবে না কি?

যে ঘরে ঢুকেছিল সে বল্‌লে—ওহে কেদার, বেশতো গাইছিলে, বন্ধ করলে কেন? এবয়সে স্কুলের ছেলের শাস্তিটা নেহাৎ গায়ে প'ড়ে নিতে চাও না কি?

কেদার ঠান্‌দির দিকে চেয়ে বল্‌লে—দেখুন, গান শুন্‌তে চান তো এই লোকটিকে পাকড়াও করুন। গান শুনে খুসী হ'তে পার্‌বেন। এটি আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু শ্রীপ্রবালচন্দ্র। গান-বাজনায় এঁর খুব দখল।

প্রিয়ব্রতা ঘোমটার ফাঁক্ থেকেই বড় বড় চোখ মেলে বরের বন্ধুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল, আর ঘোম্‌টা-হীনা সেবাও সে-দৃষ্টির অনুকরণ করছিল। প্রবালের চেহারা বেশ দীর্ঘায়ত, বলিষ্ঠ। বরের চাইতে রঙ তার অনেকটা মলিন হ'লেও সে সুঠাম চেহারার দিকে তাকিয়ে সহজেই বল্‌তে ইচ্ছে হয়, হাঁ, পুরুষের চেহারা বটে। তবে কি না ঘোম্‌টার আড়াল হ'তে পুরুষ মানুষের দিকে চেয়ে দেখা যতটা সহজ, ঘোম্‌টার বাইরে থেকে মোটেই ততটা সুবিধা নয়; কাজেই সেবার সঙ্গে বার দুই তিন প্রবালের চোখোচোখী হ'য়ে না গিয়ে পার্‌লে না।

ঠান্‌দি প্রবালের পরিচয় পেয়ে ব'লে উঠলেন—তা বরের বন্ধু যখন তখন বরের হ'য়ে গান গাইলে মোটেই দোষ নেই। বর তো থাম্‌লেন, এখন প্রবাল এসে আসরটা জমিয়ে তোলো ভাই, নইলে নেহাৎ ফিকে লাগছে।"

প্রবাল বল্‌লে—আমি কোথায় বল্‌তে এসেছি যে, ভোরের ট্রেণেই আমায় ফিরে যেতে হবে। বর-ক'নে তো যাবে বেলা ন'টার ট্রেণে। বাড়ীতে বাবার অসুখ, আমি না গেলে তাঁর ওষুধপত্রের বন্দোবস্ত হবে না। তা না আপনি কিনা আমার গান শুন্‌তে চাইছেন। যখন কুটুম্বিতাই হ'ল তখন কেদারের ল্যাজ ধ'রে মাঝে মাঝে আস্‌তেই তো হবে। শুন্‌বেন তখন যত ইচ্ছে। শেষে অরুচি না হ'য়ে যায়।"

ঠান্‌দিদি তাঁ'র কাঁকন-পরা হাতখানি কপালে ঠেকিয়ে মধুর স্বরে বল্‌লেন—আ—কপাল, আমার কি ভাই সেই

অদেষ্ট, যে মধ্যে মধ্যে এসে তোমাদের গান শুনব? এক্কেবারে তিন ক্রোশ দূরে বাড়ী; বউ-বেটা সব থাকে কলকাতায়, বুড়োবুড়ীতে ভিটে আগলে প'ড়ে আছি। কর্ত্তাটি আবার চোখে দেখেন না; তাঁকে ফেলে কোথাও কি আমার এক পা যাবার জো আছে? প্রিয়র বাবা নেহাৎ গিয়ে ধ'রে আন্‌লে, তাই আসা। বল্‌লে, পিসী, তুমি না গেলে কিছুতেই আমার কাজ উদ্ধার হবে না। তাতেই না এসে থাক্‌তে পার্‌লেম না। গান গল্প শুন্‌তে আমার চিরকালই খুব সখ, কিন্তু অদৃষ্টে এখন রাতে শেয়াল কুকুরের আর দিনে ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ব্যাঙের গান শুনেই কাটে। ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে তো আর মানুষ নেই যারা আছে তারা আমাদেরই মতো বুড়োবুড়ী। ভিটেতে সন্ধ্যে জাল্‌বার জন্যে মাটি কাম্‌ড়ে সব প'ড়ে আছে।

সেবা বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠল—কি ঠান্‌দি বাজে ব'কে যাচ্ছ? ঠান্‌দি নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—বাজে বকুনীই বটে! অতীতের সিন্দুক এম্‌নি বোঝাই হ'য়ে উঠেছে যে, কথার ফাঁকে তা'রা কেবল খানিক ক'রে বেরিয়ে প'ড়ে বোঝা হাল্কা কর্‌তে চায়। তা বোসো দাদা এই খানটিতে, ব'সে গান ধর।"

ঠান্‌দিদির শুক্ল কেশের অমান্য কর্‌তে প্রবালের আর সাহস হ'ল না। দুটি তরুণীর নীরব আবেদনও যে ঠান্‌দির অনুরোধের পিছনে উঁকি মার্‌ছে তাও সে মেনে নিলে। তা ছাড়া ফুটন্ত গোলাপের মতো সেবার ঢল্‌ঢলে মুখখানি কিছুক্ষণ ব'সে দেখবার প্রলোভনও সে দমন কর্‌তে পার্‌লে না। রূপ বিশ্ব-বিধাতার একটি বিশেষ দান। সে রূপ যারই অধিকারে থাক্‌না কেন, সৌন্দর্য্যের উপাসক যারা তা'রা তা' দেখে তৃপ্ত হবেই। প্রবাল ছেলেটির হৃদয় ছিল বড় মধুর; স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা সবেতে তার অন্তরটি পরিপূর্ণ ছিল। সংসারের যা-কিছু সুন্দর জিনিষ সবই তা'র মনে সহজেই বেশ একটি ছাপ রাখতে পার্‌ত। সে তখন বাসর-ঘরে আসন গ্রহণ ক'রে সাধা গলায় গান ধর্‌লে—

সখি নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

কোন্ অতীত যুগে প্রেম-পরিপূর্ণ একখানি হৃদয় হ'তে এই আবেগ-ভরা বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। বহুযুগ ধরে' সারা দেশে সে ত'ার চিরন্তন বিজয়বারতাকে একটি অখণ্ড সুরে ভ'রে রেখেছে। পুরাতন হ'লেও তা' নিত্য-নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশের দাবী রাখে।

প্রবালের সরল মধুর কণ্ঠস্বর ঘরখানি জম্ জম্ ক'রে তুল্‌লে। বাইরে অশ্রান্ত বাদল-ধারা তা'র মধুর রাগিণীর ঝঙ্কারে মানবশিশুর কণ্ঠের সঙ্গে অমর্ত্ত্যলোকের একটি অপূর্ব্ব সুর মিলিয়ে সঙ্গত কর্‌তে লাগল। একটার পর দু'টো গান গেয়ে প্রবাল উঠে দাঁড়াল; যদিচ শ্রোতারা তা'কে এত শীগ্‌গীর মুক্তি দিতে চাইছিল না। ঠান্‌দিদি প্রবালের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন—আহা গান গাইলে না তো ভাই যেন মধু-বৃষ্টি কর্‌লে। বেঁচে থাক, দাদা; আমার চুলের মতন অগুন্তি বছর তোমার পরমাই হোক্। এই চাঁচা গলায় গান গেয়ে সবাইকে যেন চিরদিন তৃপ্তি দিতে পার।

প্রবালের সঙ্গে কেদারও একবার কি দর্‌কারে উঠে বাইরে চ'লে গেল। ঠানদিদি এই ফাঁকে রাত্রের আহার সেরে নেবার জন্যে উঠে পড়্‌লেন। প্রিয় ঘোমটার বালাই থেকে মুক্তি পেয়ে সেবাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠল, আহা ভাই সই এই প্রবালের সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হ'তো তা হ'লে কি মজাই না হ'ত। সেবা গুম্ ক'রে সইয়ের পিঠে একটা কীল বসিয়ে দিয়ে সেবা শুধু বল্‌লে—রাক্ষুসী—

প্রিয় ব'লে উঠ্‌ল—উঃ আচ্ছা জোর তোর কব্জীতে—বিয়ে হ'লে ভালো হ'ত এই জন্যেই বল্‌ছি যে, তা হ'লে দুই সইয়ে এক জায়গায় থাক্‌তে পেতাম। কি এক পাগল মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে!

দু'জনেই সংসার-জ্ঞানহীনা তরুণী, কোন্ কথাটা ভাবা উচিৎ আর কোন্‌টা না, কোন্‌টাই বা মুখ ফুটে বলা অন্যায় এসব সাংসারিক বা ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্রের কথা এখনও তাদের জ্ঞান-রাজ্যের সম্পূর্ণ বাইরে। নইলে বিবাহিতা সইকে প্রিয় একথাটি কখনই বল্‌তে সাহস কর্‌তে পার্‌ত না। অবশ্য কেবল ভাবনাটুকু তা'র মনের মধ্যে উঁকি মার্‌লে ত ক্ষতি ছিল না।

মাস কয়েক আগেই সেবার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল। সেবার বাপ মা অবশ্য জান্‌তেন না সে জামাইএর মাথা খারাপ। আর জামাইএর বাপ মা?—ছেলের মাথা খারাপ ব'লেই তাঁরা তাড়াতাড়ি একটি বউ কর্‌বার জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা জান্‌তেন যে, পাগল মানুষ এক বাপ-মার স্নেহপাত্র হয়, আর স্ত্রী তা'কে যত্ন আদর করে; সংসারের বাকী লোক তা'কে অবহেলা কর্‌বেই, কিন্তু সেবার বাপ-মা বিয়ের পর জামাইএর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে এমন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন যে, মেয়েকে তাঁ'রা আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাননি। সেবা বেচারীর নিজের ভালো-মন্দ যাচাই কর্‌বার বুদ্ধি তখনও ততটা হয়নি। তবে সে পাড়াপ্রতিবাসীদের কাছ থেকে অজস্র সহানুভূতিরূপে "আহা, এমন রূপের ডালি মেয়ে অমন পাগলের গলায় পড়্‌ল," এই কথাটি শুন্‌তে খুব বেশী অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। সেইজন্যেই একথাটা শুন্‌লেই তা'র মনে একটা তীব্র বিরক্তির সঞ্চার হ'ত।

দুই

কেদারের বিয়ের মাস ছয় পরের কথা। হুগলী ষ্টেশন থেকে পোয়াটাক্ রাস্তা দূরেই কেদারের মস্ত বাড়ী, বাগান, পুকুর সারা গ্রামখানার বুকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিচ্ছে। কেদার তিন ভাইএর মধ্যে ছোট। চারিটি বোন্, সবারি বিয়ে হ'য়ে গেছে। বাড়ীর গিন্নি মধুমতীর নামও যেমন, মনের ভিতর আর বাইরের ব্যবহারটিও ঠিক্ তাই। নিজে তিনি বড় ঘরেরই মেয়ে, পড়েছিলেনও জমিদারের ঘরে। কিন্তু, দুঃখীর দুঃখ, অভাবের বেদনা তিনি খুব বুঝ্‌তেন। যেন একটু বেশী ক'রেই বুঝ্‌তে চাইতেন। সেইজন্যে দু'হাত তুলে দান কর্‌বার অভ্যাসটা তাঁ'র বেশী রকম ছিল। কিন্তু গৃহস্বামী সেটা মোটেই ভালো চোখে দেখ্‌তেন না। তিনি এর জন্যে গৃহিণীকে বরাবর অনুযোগ ক'রে এসেছেন। মধুমতী কখনো সে অনুযোগের প্রতিবাদ করেননি।' তবে তাঁ'র দানধ্যানও বন্ধ হয়নি। ইদানীং বাড়ীতে মেয়ে-বউ হওয়ায় তিনি তা'দের গৃহিণীর এই অতিরিক্ত মুক্তহস্ততার ওপর সতর্ক নজর রাখতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন; তিনি আর কদ্দিন? সত্যি কিছু তাঁর কুবেরের ভাণ্ডার নয় যে, অতিরিক্ত দান খয়রাতের পরও পুঁজি থাক্‌বে। বিশেষ ক'রে সংসারটি তো দিন দিন বেড়েই চলেছে। থাক্‌লে পরে বউদের ছেলে-পুলেরাই ভাল খাবে পর্‌বে। বউমারা শ্বশুরের এই সদুপদেশ বেশ কান পেতেই নিয়েছিল। তাতে মধুমতীর নিতান্ত গোপন দানের কথাও কর্ত্তার কানে গিয়ে উঠতে দেরী হ'ত না। গৃহিণী যে এইসব গোয়েন্দাগিরী না বুঝতেন তা নয়। তবে গোয়েন্দার পেছনে খোদ কর্ত্তার কলকাঠিই যে কাজ কর্‌ছে, তা বুঝে তিনি এইসব খুদে গোয়েন্দাদের মোটে গ্রাহ্যই কর্‌তেন না। ছোট-বউ প্রিয়ব্রতাকে তিনি গোড়া হ'তেই একটু বেশী রকম সুনজরে দেখেছিলেন, যদিও সে বড়-জা নয়নতারা ও মেজ-জা চঞ্চলকুমারীর চাইতে রূপে ঢের খাটো। প্রিয়র রঙের জেল্লা ওদের কাছে ছিল মাটো রকমই। তাতেই বিয়ের ক'নে এবাড়ীতে পা দেবা-মাত্রই জা'রা বর-বউ বরণ কর্‌তে এসেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, ওমা দেখে যাও, ঠাকুর-পোর বউ এসেছে কি রকম কালো!

ননদের দল ভীড় ক'রে বউএর সাম্‌নে এসে বড় ভাজদের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠল—ওমা কালো বউ যে! মধুমতী তখন প্রতিবাসিনীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বর্ষার সেই গুমোট গরমেও সর্ব্বাঙ্গে হীরা জহরৎ চাপিয়ে, তাঁর শাশুড়ীর আমলের খুব বড়-বড় সাচ্চা জরীর ফুল-তোলা সেকালের দামী বেনারসী সাড়ীখানাকে সাম্‌লে নিয়ে পর্‌ছিলেন। তাঁর এই শেষ কাজ। তাই বড় সাধ ছিল খুঁজে-পেতে এমন একটি ঘর-আলো-করা বউ আন্‌বেন যে বিয়ের ক'নে এসে দুধে-আলতায় পা দিয়ে দাঁড়ালে পায়ের রঙে দুধে-আল্‌তার রঙ বেমালুম মিশ খেয়ে যাবে। বউদের কাছে এ মনের সাধ তিনি মাঝে মাঝে ব্যক্তও কর্‌তেন। বউরা কিন্তু তাতে খুসী হ'য়ে উঠত না, তবে মধুমতীর তাতে কিছু যেত আস্‌ত না! তাঁর আদরের ছোট ছেলে, রূপ ও তার চাঁদের মতো, পড়া-শুনোও করে ভালো, আর স্বভাব-চরিত্রের কথা তো বলাই বাহুল্য। পাড়ার দেবীর মা যে বলে—হীরেতে দাগ আছে তো

কেদারের স্বভাবে দাগটি নেই, সেটা মোটেই খোসামুদে কথা নয়।

এখন সবার চীৎকার শুনে তাঁর বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠল। সাধ তাঁ'র অপূর্ণ থাকুক তাতে বিশেষ দুঃখ নেই। কিন্তু বিয়ের ক'নে কচি মেয়ে এখনি মনে ব্যথা পাবে। আহা! এখানে তা'র আপন জন বল্‌তে এখন কেই বা আছে? দুটো মিষ্টি কথাই তা'র এখন সান্ত্বনা। তা'র পর কেদারেরও মুখ কালো হ'য়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি বরণ-ডালা হাতে নিয়ে গিন্নী ছেলে-বউকে বরণ করতে গিয়ে একটি সিঁদুর-ভরা সোনার কৌটা বউএর হাতে দিয়ে তা'র মুখের কাপড় খুল্‌লেন। এদিকে গরম আর মানুষের হুড়োহুড়ি তা'র উপর সকলকার চীৎকার শুনে বেচারী বউ তখন ঘেমে উঠেছে। ক'নের কপালের চন্দনের টিপের উপর ঘামের ফোঁটা যেন মুক্তোর মতন ফুট্‌ফুট করছে। প্রিয়ব্রতা রূপসী নয়, তবে তেমন কালোও নয়, বরং তার মুখের একটি কোমল শ্রী ছিল যা অনেক সময় নিখুঁৎ সুন্দরীদের মুখেও দুর্ল্লভ! মোট কথা, ক'নে দেখে মধুমতী অপ্রসন্ন হলেন না, বরং বল্‌লেন—কী সব চেঁচিয়ে সোর-গোল করছিস্—ডাক-সাইটে সোন্দর না হোক্, ছিরিখানি তো মন্দ না। তখন সাহসে বুক বেঁধে ক'নের সঙ্গেকার ঝি ব'লে উঠল—আমাদের মা ঠাক্‌রুণ পাউডার আর ঘসে দিতে জানেননি, তাতেই রঙ মাটো-মাটো দেখাচ্ছে, মা। তার ওপর এই তো সে-দিন জ্বর থেকে উঠল, বারো মাস বাপ কলকাতায় থাকে, দু'চার মাসের জন্যে দেশে আসা। এলেই জ্বরজ্বাড়ির ছাড়ান্ নেই। মুখে আগুন দেশের জোরো হাওয়ার! যাকে ছোঁবে তার রঙে এক পোঁচ কালী লাগিয়ে তবে তা'কে ছাড়বে।"

কেদারের ছোট বোন প্রীতি ব'লে উঠল—ওমা—দেখছ তোমার বউএর নাক কেমন টিকলো, ঠিক যেন টিয়াপাখীর মতো, না ভাই মেজ-দি?

গিন্নী মেয়ের পরিহাস বুঝতে পেরে আবৃত্তি করলেন,

নাক খাঁদা-খাঁদা চোক ভাসা
সেই মেয়েটির মুখ খাসা।

ওরে তোরা সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন? উলু দে, না! বড় বউ মা, শাঁকে ফুঁ দাও, দেবীর মা ছিরিখানা লক্ষ্মীর ঘর থেকে বের ক'রে আন্ না ভাই।"

এম্‌নি ভাবে প্রথমেই প্রিয়ব্রতা তার শাশুড়ীর সুনজরে প'ড়ে গেল। তা'র বড়-জা, মেজ-জা এটা মোটেই পছন্দ করলে না। বিয়ের পর এক সপ্তাহ প্রিয় শাশুড়ীর কাছে ছিল; মার ও ঠান্‌দির উপদেশ মতো সে দুপুর-বেলা আস্তে-আস্তে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে তাঁর মাথার চুলগুলিতে হাত বুলিয়ে দিত, সন্ধ্যার পর তাঁর পায়ে হাত বুলোত। তা'তে তা'র কচি হৃদয়ের শ্রদ্ধার ভাব সেই ছোট সেবা-গুলির মধ্যে বেশ ফু'টে উঠত। মধুমতীর দাসী চাকরাণীর অভাব ছিল না। কিন্তু মেয়ে বা বউদের কাছ থেকে এধরণের সেবা তিনি কখনো পাননি; তাতেই নব-বধূর সেবায় তিনি যেন একটি নূতন আনন্দের স্বাদ পেয়ে ছিলেন। একদিন চঞ্চলা শাশুড়ী জা-দের সঙ্গে খেতে ব'সে কথায় কথায় প্রিয়ব্রতাকে বলেছিল, তোমাদের কলকাতার বাসায় ঝি আছে তো বউ, না নিজেদেরই কাজকর্ম্ম ক'রে নিতে হয়?

প্রিয়ব্রতা বল্‌লে—ঠিকের ঝি আছে; আর দেশের একজনদের বাড়ীর একটি স্ত্রীলোক কেউ কোথাও নেই ব'লে আমাদের কাছেই থাকেন; এক বেলা তিনি রাঁধেন, আর এক বেলা মা রাধেন।"

চঞ্চলা ভ্রূ কুঁচকে বল্‌লে—মোটে একটি ঝি! তা' গেরস্ত লোক এর বেশী আর রাখবেই বা কোত্থেকে? আর আমাদের সব শুদ্ধো ক'জন ঝি-চাকর ঠাকুর-ঝি, বারোজন, না? মাকে তেল মাখায় যে নাপ্তিনী সে ছাড়া। প্রিয়ব্রতা বুঝতে পারলে তা'র বাপের দরিদ্রতার উল্লেখ করবার জন্যেই এই বড়মানুষীর পরিচয়-প্রসঙ্গ। সে উত্তর দিলে না, চুপ-চাপ খেয়ে যেতে লাগল।

চঞ্চলা আবার বল্‌লে—তোমার মাকে তেল-টেল কে মাখিয়ে দেয়, ঝিই বুঝি?

প্রিয়ব্রতা বল্‌লে—আমার মাকে তেল মাখাবার দরকার হয় না; তিনি নিজেই মাখেন। তবে সন্ধ্যের পর তিনি একটু যখন শুয়ে পড়েন তখন আমি কি আমার ছোট বোন তাঁর পা টিপে দিই। নয়নতারা একটু স্বর-টেনে বল্‌লে—তাতেই পায়ে তেল দেওয়া তোমার

অভ্যেস আছে।” মধুমতী বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রিয়-ব্রতাকে খোঁচা দেবার জন্যেই এ-প্রসঙ্গ ওরা তুলেছে, তিনি তাই বল্‌লেন—“হাজার ঝি-দাসী থাক, বউঝির সেবা মা-শাশুড়ীদের একটা মস্ত বড় পাওনা। এ পাওনা যার আদায় হয় না তার দুর্ভাগ্যি আর যারা এটা বাকীতে ফেলে রাখে তাদেরও কপালে শেষ-দশায় এটা বাকীই থেকে যায়, কেননা যেমন শিক্ষা নিজেরা করবে অন্যদেরও ত তেম্‌নি দেওয়া হবে।”

মাস ছয় পরের কথা। প্রিয় সেই সাত দিন মাত্র বিয়ের ক'নে এ-বাড়ীতে থেকে গিয়েছিল আর দু মাস পরে এই ঘর করতে এসেছে। ডাগর মেয়ে,তাই বিয়ের ক'নেকেই ধূলো-পায়ে দিন করা হয়েছিল যাতে ঘর করতে আস্‌বার জন্যে বছরখানেক না অপেক্ষা করতে হয়। প্রিয় সাতদিন শ্বশুরবাড়ীতে বাস ক'রেই বুঝতে পেরেছিল যে যদিও তা'র অপরাধ কোনো কিছু নেই তবু মোট চারিটি রাতের আলাপ হ'লেও এক শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ তা'র উপর প্রসন্ন নয়। আর-একজনেও অবশ্য তা'র প্রতি খুবই প্রসন্ন। এই ছ' মাসে খান-চল্লিশ চিঠিতে তা'র সঙ্গে আলাপ যা জমেছে পাঁচ বছর মুখোমুখি থাক্‌লেও বোধ হয় এত কথা বলা-কওয়া হ'ত না; অন্ততঃ প্রিয়র মুখত ফুটতই না।

প্রিয়র মা প্রিয়কে ব'লে দিয়েছিলেন—“গরীবের মেয়ে বড়লোকের ঘরে পড়েছ মা, তাদের দু-পাঁচ কথা স'য়েই নিও; তা'তে কিছু গায়ে ফোস্‌কা পড়বে না। কাউকে হিংসে-বাদ কোরো না। জা'দের ননদের ছেলেমেয়েকে সমান যত্ন কোরো, শাশুড়ী-শ্বশুরের সেবা কোরো, বাপের বাড়ীর গরীবানির কথা টেনে যদি দু' কথা কেউ বলেও তা'তে ব্যথা পেও না। সত্যিই ত আমরা গরীব মা, তবে কারুর দুয়ারে ভিক্ষে না মেগেও খাওয়া-পরাটা যে চ'লে যাচ্ছে এই ঢের মনে করি—” প্রিয় এ উপদেশটি মন্ত্র-জপা ক'রে জপতে-জপতে শ্বশুরবাড়ী এসে পা দিয়েছে।

তিনটি ননদই এখন শ্বশুরবাড়ী। কেবল সেজটিই এখানে আছে; দুই ভাজের সঙ্গে সেই সুর মিলিয়ে ছোট বউএর গরীব বাপের দেওয়া আস্‌বাব বিছানা-পত্র বাসন-কোসন ইত্যাদি নিয়ে হেসে কুটি-কুটি হচ্ছে, আর কথায়-কথায় প্রিয়কে উদ্দেশ ক'রে বল্‌ছে “হ্যাঁ ভাই ছোটবৌ, তোমাদের দেশের মেয়েকে এইরকম খেলো জিনিষ পত্তর দেওয়ারই বুঝি প্রথা?” মধুমতী দুই-একবার মেয়ে-বউদের ধমক-ধামক দিলেন। কিন্তু মায়ের মেজাজটা নেহাৎ ঠাণ্ডা, তা'রা সে ধমককে মোটেই গ্রাহ্য করলে না। তা'র পর একদিন একটা ব্যাপার ঘট্‌ল যাতে একেবারে যেন আগুনে এক্-কলসী ঠাণ্ডা জল প'ড়ে যাবার জো হ'ল।

সেদিন ছিল শনিবার, খাওয়া-দাওয়ার পর প্রিয়র হাতেব সেবা নিতে-নিতে মধুমতী একটু চোখ বুজেছেন। সেজ-মেয়ে বীণা মাকে একখানা গল্পের বই প'ড়ে শোনাচ্ছিল; মাকে ঘুমুতে দেখে সে হঠাৎ বড়বৌ নয়নতারার সঙ্গে প্রিয়র বাপের বাড়ীর তত্ত্বতালাসের খুঁৎ ধ'রে খোঁচা দিতে সুরু করলে। পাঁচ-ছয় দিন যাবৎ হাসি টিট্‌কিরী সহ্য ক'রে-ক'রে বেচারী প্রিয় আজ আর পারেনি, কেঁদে ফেলেছে। ঠিক এই সময় কলেজ ফেরৎ কেদার এসে ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে। তা'র শ্বশুর-বাড়ীকে উল্লেখ ক'রে দুই বউদিদি আর বোনেরা যখন-তখন যা-তা যে ব'লে যায় তা সে জান্‌ত। মা যে ছোটবউএর পক্ষ নিয়ে লড়াই করেন এই জেনেই সে নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু হঠাৎ এখন প্রিয়ার অশ্রু-সজল মুখখানি দেখে তা'র পৌরুষের আগুন দপ ক'রে জ্ব'লে উঠতে এক মিনিটও দেরি হ'ল না। সে রুক্ষকণ্ঠেই ব'লে উঠল—“রাতদিন একটা মানুষের পিছনে টিক্ টিক্ করা। নেহাৎ বাড়ীতে টিক্‌তে দেবে না দেখছি, রইল তোমাদের ঘড়-বাড়ী চল্‌লাম আমি।”

এই চীৎকারে প্রিয়র কান্না তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। নয়নতারা আর বীণার ভয়ে হৃৎকম্প হ'তে লাগল। আর মধুমতী সাধের ঘুম ছেড়ে তখনি উঠে ব'সে ডাক্‌তে লাগলেন “কি হ'ল রে কেদার? কোথা যাস্ বাপ্, ফি'রে আয়! সব বল শুনি—এ ছুঁড়ীগুলো নেহাৎই জ্বালালে দেখ্‌ছি।”

কেদারের চ'লে যাবার চাইতে ফের্‌বার ইচ্ছেই ছিল পাঁচগুণ বেশী; কেননা সবে আজ ছদিন হ'ল বাপের বাড়ী থেকে বউটি এখানে এসেছে, প্রথম যৌবনে এই প্রথম প্রিয়া-মিলন-সম্ভোগের অবসর জুটেছে, নূতন প্রণয়-রসমুগ্ধ প্রাণ এখন রসপূর্ণ আঙুরের ন্যায়

নিটোল। জীবন-বসন্তের এই সোহাগ-সুধা-সিঞ্চিত দিন-গুলির একটি মুহূর্ত্তও কি অবহেলা-উপেক্ষায় হারাবার জিনিষ? সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রিয়ার মুখখানি দেখবার জন্যে সর্ব্বদাই কত ব্যাকুল। রাত্রে কয় ঘণ্টার জন্য মাত্র নিরালা মিলনের অবসর জোটে, সারাদিন ত ঠিক চখা-চখীর দশা। দুই পারে দুটি মিলন তৃষ্ণাতুর প্রেমিক হৃদয়—মধ্যে টল-টল বারিরাশি—পরিপূর্ণ দীর্ঘিকার ন্যায় বিপুল সংসারের অবস্থান।—ত যে চোখোচোখি হবার অবসর ঘটে সেটা কিছু কম লাভ নয়। এই লোভের কথা মনে রেখেই কেদার আজ শনিবারের এক বেলার ছুটিতে বন্ধুদের বোটানিকেল গার্ডেন যাবার অনুরোধ এড়িয়ে চ'লে এসেছে। প্রবাল ঠাট্টা ক'রে বলেছিল—

হঠাৎ বাড়ীর ওপর তোমার এতটা অনুরাগ মন্দ লোকে সন্দেহের চোকে দেখ্‌তে পারে হে বন্ধু। আর আমার মতো সৎলোক যারা—তা'রাও বল্‌বে যে রাতের ভাগ দিনে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে রাতের অংশে শূন্য প'ড়ে যাবে।

কেদার সে পরিহাসটুকু গায়ে মাখেনি; চ'লে এসেছে ছুটো পানের খিলি চাইবার অছিলায় বা মার ভাঁড়ারের কুঁজো থেকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জলের ছুতোয় ও এম্‌নি আরও দু-একটা টুকিটাকি কাজে সে মার কাছে এলেই প্রিয়র সঙ্গে অন্ততঃ বার-দুই চোখোচোখি হ'য়ে না গিয়ে ত পার্‌বে না। সেই এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টি-বিনিময়ে যে কাজ হবে তা বেতার টেলিগ্রাফের চাইতে মোটেই কম না। কিন্তু এসেই দেখ্‌তে হ'ল কি, না প্রিয়ার কান্না-ভরা চোখ-দু'টি!

মার আহ্বানে তখনি কেদার ফিরে এসে বল্‌লে—"হ্যাঁ মা, যদি কুটুমের ধনে এতই লোভ তা হ'লে গরীবের ঘরে সম্বন্ধ না কর্‌লেই পার্‌তে। যখন করেইছ, তখন রাতদিন বেচারীর বাপ-মার দেওয়া-থোওয়া নিয়ে খুঁৎ পাড়বার কী দর্‌কার শুনি? বড়বউই তোমার কোন্ বড়-মানুষের ঘরের মেয়ে? ভাই তো এক দালালের দালালি ক'রে বেড়ায়। বাপের বাড়ী থেকে কত ধনদৌলৎ যে যৌতুক এনেছিলেন তা ত সবাই জানে। আর বীণা যে এত ফটফট কর্‌ছে তা তোমরা ত দেওয়া-থোওয়ার কিছু কসুর করনি তবু কি ওর শ্বশুরশাশুড়ীর মন পেয়েছে? সাতজন্মে ত ওকে নিয়ে যায় না, নিয়ে গেলেও যত্নটত্ন কিছু করে?"

কথাগুলার এক অক্ষরও মিথ্যা ছিল না। তা ছাড়া কেদারের রাগের মুখে নয়নতারা কি বীণা কেউ আর টুঁ টাঁ কর্‌তে সাহস পেলে না। মধুমতী বল্‌লেন—"সত্যি বাছা, তোরা ছোটবৌমাকে রাতদিন অমন খিট্‌মিট্ করিস্‌নে। আমিও এসব মোটেই ভালো বাসিনে। কেদার তুই বইগুলো রেখে কিছু খাবি আয়, আজ তাড়াতাড়িতে ভালো ক'রে খাওয়া হয়নি। ছোটবউমা, ও-ঘর থেকে বঁটিখানা আর আখ পেঁপে নিয়ে এস ত, ছাড়িয়ে দিই। প্রিয় শাশুড়ীর হুকুম পালন কর্‌তে গেল। বীণা—"বড়বউদি, তুমি যে কার্পেটটা বুন্‌ছিলে একটু দেখাবে চলো না" ব'লে নয়নতারার সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। কেদার বেশ খুসী হ'য়েই বইগুলো রেখে আস্‌তে চল্‌ল। এসে মার কাছে সাকার-নিরাকার দুই আহারই জুটবে এই মধুর ভাবনায় মনটা তার দুলে-দুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

এম-
সিংহ

করা হইল, বৈশ্য যাহা ছিল, তাহা তাহার উরুদ্বয় হইল এবং শূদ্র যাহা ছিল তাহা পদের জন্য (পদ্‌ভ্যাম্) হইল (অজায়ত)।

গ্রন্থকার পদ্‌ভ্যাম্ পদটিকে চতুর্থীবিভক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ঋক্‌সমূহে অনুরূপ স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—মনসঃ, চক্ষোঃ, মুখাৎ, প্রাণাৎ ইত্যাদি। সুতরাং বলিতে হইবে ১২শ ঋকের 'পদ্‌ভ্যাম্' শব্দেও পঞ্চমী বিভক্তি। আর পঞ্চমী বিভক্তি হইলেই 'অজায়ত' শব্দের অর্থ হইবে উৎপন্ন হইয়াছিল।

আর যদি স্বীকারই করা হয় যে পূর্ব্বোক্ত অংশের অর্থ—শূদ্র যাহা ছিল, তাহা পদের জন্য হইল, তাহা হইলেও শূদ্রের হীনত্ব ঘুচিল না। ব্রাহ্মণাদি পুরুষের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ এবং শূদ্র হীন অঙ্গ।

লেখকের দ্বিতীয় বক্তব্য এই—

প্রশ্ন যে-প্রকার উত্তর ও সেই প্রকার হওয়া উচিত। এ স্থলে প্রশ্ন —বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ কি ছিল? উত্তর হওয়া উচিত— অমুক ছিল ইহার মুখ, অমুক ছিল ইহার বাহু, অমুক ছিল ইহার উরু এবং অমুক ছিল ইহার পদ। পদের বিষয় বলিতে হয় 'শূদ্র ছিল ইহার পদ। পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল এ-প্রকার বলিলে প্রশ্নের উত্তর হইল না। সুতরাং অজায়ত ক্রিয়ার অর্থ হইবে 'ছিল'।

আমাদিগের বক্তব্য এই ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের বিষয়ে এক-প্রকার উত্তর দেওয়া হইল, আর শূদ্রের বিষয়ে যে অন্য প্রকার বলা হইল তাহার একটি নিগূঢ় কারণ আছে। পুরুষ সুক্তে ঋষি বিকৃত সত্তা এবং অবিকৃত সত্তা—এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ পুরুষের অবিকৃত রূপ। কিন্তু শূদ্র এতই হীন যে ইহাকে পুরুষের নিকৃষ্ট অঙ্গরূপে বর্ণনা করিতেও ঋষি হীনতা মনে করিয়াছেন। তাঁহার মতে শূদ্র পদ নহে, কিন্তু পদের বিকার। ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে শূদ্র পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা উৎপন্ন তাহাই বিকার, শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং শূদ্র পদের বিকার। প্রশ্ন হইয়াছিল—"পুরুষের পদ কি ছিল?"—উত্তরে যাহা বলা হইল তাহার অর্থ এই—ব্রাহ্মণাদি সাক্ষাৎভাবে পুরুষের মুখাদি। এইপ্রকার সাক্ষাৎভাবে কোন জাতি দ্বারা পুরুষের পদ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু শূদ্র জাতি পুরুষের পদের বিকার; সাক্ষাৎ কিংবা অবিবৃত পদ নহে।

লেখক বলেন অজায়ত শব্দের অর্থ=ছিল। তিনি বলেন অনেক স্থলে প্রকাশিত হইয়াছিল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল—ইত্যাদি অর্থেও অজায়ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাঁ, এপ্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা দ্বারা লেখকের মত সমর্থিত হয় না। অস্ ধাতু এবং 'জন্ ধাতু একার্থবচন নহে। 'অস্' ধাতু 'অস্তিত্ব, প্রকাশক; ইংরেজী to be, এবং গ্রীক্ einai দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করা যায়। কিন্তু 'জন' ধাতু উৎপত্তি-মূলক, ইংরেজীতে to become এবং গ্রীক genesthai দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করা যায়। ইংরাজীতে যে ভাবে 'to be' ও to become' এবং গ্রীক ভাষায় einai ও 'genesthai-এর মধ্যে পার্থক্য করা যায়— বাংলা ভাষায় সে-প্রকার পার্থক্য করা সহজ নহে। তবে বলা যাইতে পারে 'আসীৎ' ক্রিয়ার অর্থ=ছিল; 'হইয়াছিল' দ্বারা ইহার অর্থ প্রকাশ করা যায় না। 'জন্ ধাতুর অর্থই 'হইয়াছিল', 'হইয়াছিল' বা উৎপন্ন 'হইয়াছিল' 'প্রকাশিত হইয়াছিল' 'প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল' 'উৎপন্ন

হইয়াছিল' প্রভৃতি সমপর্য্যায় কথা। ইহার কোনটি দ্বারাই 'আসীৎ' ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করা যায় না। 'অজায়ত' শব্দের অর্থ "উৎপন্ন হইয়াছিল"; "ছিল' এই অর্থে ইহা গ্রহণ করা যায় না।

গ্রন্থকার এক আশ্চর্য্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি একদিকে প্রমাণ করিতে চাহেন ঐ দুইটি ঋক্ প্রক্ষিপ্ত। আবার প্রমাণ করিতে চাহেন, অজায়ত=ছিল। এই দুইটী যুক্তি পরস্পরবিরোধী। ঋক্ দুইটি যদি প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে "অজায়ত" শব্দের অর্থ "উৎপন্ন হইয়াছিল', ইহাই করিতে হইবে, কারণ এই অর্থ করিলেই শূদ্রদিগকে হীনতর করা হয় এবং ইহাতেই প্রক্ষেপের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

প্রকৃত কথা এই যে বৈদিকযুগ সুবিস্তীর্ণ। এই যুগের প্রথম ভাগে যে জাতিভেদ ছিল না। তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে কিন্তু ইহাও সত্য যে এই যুগের শেষ-ভাগে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই যুগের শেষ ভাগেই অপরাপর বেদের অনেক মন্ত্র রচিত বা সংগৃহীত হইয়াছিল। অপরাপর বেদে যে জাতিভেদের কথা আছে তাহা গ্রন্থকারও স্বীকার করিয়াছেন। তবে ঋগ্বেদের যুগের শেষ ভাগে জাতিভেদ প্রচলিত হইয়াছিল ইহা বলিতে কি আপত্তি হইতে পারে?

লেখক মনে করেন সতীদাহ প্রথার বৈদিক প্রমাণ নাই। ইহা সত্য নহে। অথর্ব্ববেদে সতীদাহ বিষয়ক কয়েকটি মন্ত্র আছে (১২।৩।১।১২।৩২, ১২।৩।৩; ১৮।৩।১, ১৮।৩।২); প্রবাসী ১৩২৬ কার্ত্তিক 'বৈদিক ভারতে সতীদাহ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। একটি মন্ত্রে (১৮।৩।১) এই প্রথাকে 'ধর্ম্মং পুরাণম্' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের একটা মন্ত্রে (১০।১৮।৮) লিখিত আছে যে বিধবা স্বামীর পার্শ্বে চিতার উপর শয়ন করিয়াছিল। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে সহমরণ-প্রথা একসময়ে প্রচলিত ছিল।

গ্রন্থকারের সহিত সব বিষয়ে একমত হইতে পারিলাম না। কিন্তু পুস্তিকাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত। প্রকাশক শ্রী রামেশ্বর দে, চন্দননগর। পাঁচ সিকা।

নলিনী-বাবু বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার চিন্তাশীল প্রবন্ধাবলী অল্পদিনেই তাঁহার জন্য সাহিত্য সমাজে একটি বিশেষ স্থান কায়েমী করিয়া দিয়াছে। এই পুস্তকে নলিনী-বাবু ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম দশটি সূক্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাঁ দিকের জোড় পৃষ্ঠায় সূক্তের মূল মন্ত্র ও বাংলা টীকা এবং ডান দিকের বিজোড় পৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদ দিয়া প্রত্যেক সূক্তের পরে তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকে লেখক বেদের যৌগিক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা—psychological interpretation—নাম দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়া নলিনী-বাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুইজন চিন্তাশীল মনীষীর সম্মিলিত চেষ্টার ফল এই বেদব্যাখ্যা। এই নূতন ভাষ্যের মধ্যে প্রভূত চিন্তাশীলতা ও নবভাবের আলোক-সম্পাত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের মধ্যে আর্য্যসমাজের শ্রেষ্ঠ মনন ও কৃষ্টি নিহিত আছে; ব্যাখ্যাকারেরা সেই আর্য্যসংস্কৃতি আবিষ্কার করিয়া নিজেদের মনীষা ও অনুসন্ধিৎসার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার মধ্যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও আর্য্যমননে অভিনিবেশ প্রকাশমান দেখা যায়। উপক্রমণিকায় গ্রন্থকার বেদ কি, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কি, বেদ বুঝিবার উপায় কি, বেদ শুধু একখানা সাহিত্য পুস্তক নয়, বেদ হইতেছে অধ্যাত্ম-সাধনার মন্ত্রাবলী, বেদের মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিষয় নূতন দিক্ হইতে নূতনভাবে বিশেষ বিচক্ষণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে; ৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ উপক্রমণিকা বেদপাঠের ভূমিকাস্বরূপ। বেদ আমাদের ভারতবর্ষীয়দের সাধনলব্ধ মহাসম্পদ্; ইহার সহিত পরিচিত হওয়া, ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সকল ধর্ম্মের ভারতীয় নরনারীর একান্তকর্ত্তব্য। এই গ্রন্থে বেদের অসাম্প্রদায়িক তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ সন্নিবিষ্ট থাকাতে ইহা সকল সম্প্রদায়েরই আদরযোগ্য হইয়াছে। উপক্রমণিকার উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বেদের বাহিরের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য বেদের অন্তরের পরিচয় দেওয়া। এতকাল বেদ প্রত্নতাত্ত্বিকেরই গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বেদের আছে একটা জীবন্ত সত্তা যে দেশে যে কালে হউক না কেন মানুষকে একটা বৃহত্তর জীবনে উঠিয়া দাঁড়াইবার লক্ষ্য ও সাধন যে বেদ দিতেছে, তাহাই বেদের আসল পরিচয়। অজ্ঞানের অশক্তির নিরানন্দের কবলগত মানুষ চিরকাল যে স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে, সকল বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া যে মহান্ আদর্শের পিছনে সে ছুটিয়া চলিয়াছে—'যাহাতে আমি অমৃতত্ব পাইব না, তাহা দিয়া আমি কি করিব?'—মানুষের অন্তরাত্মার এই অমৃতত্ব-পিপাসা, তাহার পূর্ণ তৃপ্তি যেখানে ও যাহা দিয়া, সেই রসের বৃহৎ আধার—রায়ো অবনিঃ—সেই মহান্ অর্ণব—মহো অর্ণঃ—হইতেছে বেদ। বেদমন্ত্রে যাহার অন্তরে এই দিব্যতৃষ্ণা জাগিয়া উঠে, তাহারই বেদপাঠ সার্থক।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণীদের অন্তরের কথা।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের বুদ্ধি, স্নেহমমতা, নৈতিকজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে ইংরেজী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায় অনেক বৈজ্ঞানিক ও সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য বহি আছে; বাংলায় কম। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস যে বহিটি লিখিয়াছেন, তাহা এই কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অল্পবয়স্ক ও অধিকবয়স্ক সকলেই ইহা পড়িয়া আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকার ইহা কেবল ইংরেজী বহি পড়িয়া লেখেন নাই; তাঁহার নিজের পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে আছে। যাঁহারা ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল বহি চান, তাঁহারা এই বহিখানি বাড়ীতে রাখিলে নিজেও পড়িতে পারিবেন, ছেলেমেয়েদেরও কাজে লাগিবে। ইহার ছাপা, কাগজ ও মলাট সুদৃশ্য ও উৎকৃষ্ট।

বাঁকুড়া জেলার বিবরণ—শ্রীরামানুজ কর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। বাঁকুড়া। প্রবাসীর-সম্পাদকের লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য বার আনা। এই বহিটি সম্বন্ধে আমার মত ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছি। আমিও গ্রন্থকারের মত বাঁকুড়ার মানুষ; তথাপি এই বহিখানি হইতে এমন অনেক জ্ঞাতব্য কথা জানিতে পারিয়াছি, যাহা পূর্ব্বে আমার জানা ছিল না। বাঁকুড়া জেলার প্রত্যেক লেখাপড়া জানা লোকের ইহা ইহা ক্রয় করিয়া পড়া উচিত। অন্য জেলার যে-সব লোক বাঁকুড়ার বিষয় জানিতে চান, কিংবা ঐ জেলার বা ঐ জেলার সহিত ব্যবসাবাণিজ্য করিতে চান, তাঁহারা এই বহি হইতে খুব সাহায্য পাইবেন।

কীটপতঙ্গ—৺ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক এম্, সি সরকার এণ্ড সন্‌স, ৯০।২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

৺ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু শিশু-সাহিত্যের সুলেখক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তিনি যাহা লিখিতেন তাহার একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহা ছেলেমেয়েদের পাঠ্য হইলেও বিজ্ঞানবিদ্‌দের বিবেচনাতেও যথাসম্ভব নির্ভুল। এই বহিখানির লেখা বেশ সহজ ও মনোরম। ছবিগুলিও বেশ। ছেলেমেয়েদের ত ভাল লাগিবেই, বড়দেরও ইহা পড়িতে ভাল লাগিবে ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে। এই বহিটিতে দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিজের পর্য্যবেক্ষণের ফল অনেক আছে।

র. চ.

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১)

জমিতে শেওলা-নিবারণ

ধান্যের জমিতে বর্ষাকালে শেওলা হইলে তাহার নিবারণের উপায় কি? নিড়ান করিলেও এই শেওলা দূরীভূত হয় না পুনরায় ২।৪ দিবস পরে গজাইয়া উঠে। কোনরূপ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না?

শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(২)

লক্ষ্মীবার

বাংলায় বৃহস্পতিবারকে 'লক্ষ্মীবার' বলে কেন? এবং সেই দিন টাকা পয়সা বা শস্যাদি দেওয়া-নেওয়া করে না কেন? বৃহস্পতিবার না হইলে লক্ষ্মীপূজা হয় না, এর মানে কি?

শ্রী অপর্ণা দেবী

(৩)

বাংলায় অশৌচ-প্রথা

বাংলায় অশৌচ প্রথা তিনরকম যথা—ব্রাহ্মণ দশদিন, বৈদ্য পনের দিন, এবং শূদ্র একমাস। কিন্তু পশ্চিমে এ-প্রথা নেই, সে দিকে ব্রাহ্মণ থেকে মেথর পর্য্যন্ত দশদিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে। একই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই দু'রকম প্রথা হ'ল কেন? বাংলার এ অশৌচ প্রথার বিভাগ করলে কে?

শ্রী অপর্ণা দেবী

(৪)

বাংলার ব্যবসায়

(ক) কলিকাতায় "হাড়ের কারখানা" থাকিলে কোথায় এবং কি দরে হাড়ের গুঁড়া পাওয়া যায় এবং সাধারণ জমির প্রতি একার কতটা সারের প্রয়োজন। হাড়ের গুঁড়ার সার আমাদের দেশে এত কম প্রচলিত কেন?

(খ) বাঙ্গালায় বাঙ্গালী পরিচালিত কোনও পক্ষী-পালন (poultry-firm) আছে কি না? থাকিলে তাহাদের সহিত পত্র-আদান-প্রদানের উপায় কি?

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

গাছের পোকা

অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসের উপ্ত কতকগুলি লাউগাছে ফল ধরিয়াছে। প্রায় সবগুলি ফল শুকাইয়া যাইতেছে। দুই একটি ফল গাছ প্রতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোনটি ।।০ সের বা /১ সের পর্য্যন্ত হইয়া ভিতরে পোকা ধরিয়া নষ্ট হইতেছে। ইহার কারণ কি? কি-কি উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত ফল শুকাইতে না পারে এবং উক্ত পোকা দ্বারা লাউ নষ্ট হইতে না পারে বা পোকা নষ্ট করিতে পারা যায়?

সম্পাদক,
পাঠাগার, খোদামবাড়ী

(৬)

দেহের ওজন

ঘুমের পর দেহের ওজন কমিয়া যায় কি, কেন?

শ্রী সুমতি দেবী

(৭)

হিন্দুসমাজে বিবাহ

হিন্দুসমাজে অবিবাহিত অগ্রজ (জ্যেষ্ঠ বিবাহিত) বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে কি না? পারিলে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোন বিশেষজ্ঞ দিলে বাধিত হইব।

শ্রী সুমতি দেবী

(৮)

অস্ত্র পালিশ

ছুরী ও কাঁচি বিলাতীর মতন পালিশ কি দ্রব্য দিয়া বাহ্যিক-মত ক্রিয়ায় করা সম্ভব হইতে পারে? অথচ পালিশ স্থায়ী ও সুলভ হওয়া আবশ্যক।

শ্রী সুরেন্দ্রমোহন হাজরা

—

মীমাংসা

(ফাল্গুন মাসের প্রথম প্রশ্নের উত্তর)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন-চরিত

ইংরাজীভাষায় লিখিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকায় শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনী প্রাপ্তব্য :—

(১) Lord Gourang (Vols I & II) by Sishir Kumar Ghosh. প্রাপ্তিস্থান N. K. Dutt, C/O Universal Stationery Hall, 80, Radha Bazar Street, Calcutta.

(২) Hibbert Journal for July 1921, pp. 666-78, by Dr J. E. Carpenter. প্রাপ্তিস্থান Williams & Norgote, 14, Henrietta Street, Covent Garden, London, W. C. 2

শ্রী কান্তিচন্দ্র পাল

১। ইংরেজী ভাষায় অধ্যাপক যদুনাথ সরকার রচিত পাটনায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। বইখানি চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে অনুবাদ-বিশেষ। মডার্ণ রিভিউ বিজ্ঞাপন অংশে বিশেষ পরিচয় আছে।

২। (হিন্দী ভাষায়) রাধাচরণ গোস্বামী কৃত। শ্রীবৃন্দাবনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। এখানিও চরিতামৃতের অনুবাদ।

৩। (উর্দ্দু ভাষায়) রাওলপিণ্ডির ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার কৃষ্ণগোপাল ডুগ্‌গন কৃত। অতি সুললিত গদ্য ও গজলে পূর্ণ—বইখানির নাম কৃষ্ণ প্রেম ইয়া গৌরাঙ্গলীলা।

৪। (গুজরাতী ভাষায়) বরোদা মানসর প্রবাসী বাঙ্গালী উদাসীন বৈষ্ণব মাধবদাস রচিত। অতি সুন্দর কাগজে সুন্দরভাবে বোম্বেতে ছাপা, বোম্বে বরোদার যে-কোন গুজরাতী পুস্তকালয় ও মানসরে পাওয়া যায়।

৫। (উড়িয়া ভাষায়) হৃষীকেশ দাস কর্ত্তৃক কটকে ছাপা—কটকে বা কেন্দ্রপাড়ায় গ্রন্থকার হৃষীকেশ দাসের নিকট পাওয়া যায়। নবাক্ষরী ছন্দে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অনুবাদ বলা যায়।

৬। অপার বর্ম্মা মান্দালয়বাসী অচিন্ত্যরাজ পণ্ডিতের নিকট বা তাঁহার সঙ্গের মহিলাগণের নিকট বর্ম্মার ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের রচিত বা লীলা-বিষয়ক বই দেখি। ছাপা ঐ দেশেরই হইতে পারে। ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে পুরীতে ঐ মান্দালয়বাসী ভদ্রলোক ও মহিলাগণকে দেখি। অচিন্ত্য রাজপণ্ডিতই কেবল ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গলা ও হিন্দী বলিতে পারিতেন এবং সংস্কৃত বেশ ভাল মত বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন।

শ্রী গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র

কায়স্থ শব্দের বুৎপত্তি কি?

নং ২ প্রশ্নের (ফাল্গুন সংখ্যার) উত্তর যাহারা অক্ষরজীবী বা লেখক ক "কেরাণী" বা "Writer or Clerk বলে; তাঁহাদিগের তাই কোবাকার পণ্ডিত হলায়ুধ বলিয়াছেন যে—

"লেখকঃ স্যাৎ লিপিকরঃ, কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ।" সুতরাং কায়স্থ শব্দের যোগরূঢ়ার্থ—

কায়েন কায়সাধ্য পরিশ্রমেণ (লিখনেন) তিষ্ঠতীতি কায়স্থঃ। কায়—স্থা+ডঃ।

অর্থাৎ যাঁহারা লিখনরূপ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগের নাম কায়স্থ।

এবং এই কারণেই আমরা প্রাচীন সংহিতাদিতে—"কায়স্থ" শব্দ লেখক বুঝাইতে প্রযুক্ত হইতে দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সময়ে ও "পুরকায়স্থ" বা "পুরকায়েত" এবং "ভাণ্ডার কায়স্থ" প্রভৃতি উপাধিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ইহাই উপলব্ধি হয়।

লেখক অর্থ ব্যতীতও কায়স্থ শব্দটি বৈশ্যশূদ্রা-প্রভব "করণ" জাতি-বিশেষকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে আমরা প্রমাণ অধ্যাহার করিলাম—

১। শব্দ কল্পদ্রুম—করণঃ পুং শূদ্রাবৈশ্যয়োজাতজাতিবিশেষঃ ইত্যমরঃ। অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থ ইতি (তট্টীকায়াম্) ভরতঃ।

২। অমরকোষ—শূদ্রাবিশোস্ত করণোম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী—শূদ্রায়াং বৈশ্যাৎ জাতঃ করণোলিপিলেখনবৃত্তিঃ।

৩। অমরের "রথকারাস্তু মাহিষ্যাৎ করণ্যাং যস্য সম্ভবঃ" ইহার টীকা করিতে যাইয়া মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক মহাশয় বলিয়াছেন—করণ্যাং কায়স্থাম্।

৪। শব্দকল্পদ্রুম—কায়স্থঃ—পরজাতি বিশেষঃ ইতি মেদিনী। তৎপর্য্যায়ঃ—কূটকৃৎ, পঞ্জীকর। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

৫। মেদিনী—করণং হেতুকর্ম্মণোঃ।

কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে॥ ক্লীব লিঙ্গ করণ শব্দের অর্থ হেতু, কর্ম্ম ও সাধন এবং পুংলিঙ্গ করণ শব্দের অর্থ বৈশ্য-শূদ্রাপ্রভব কায়স্থ জাতি।

৬। ইহা ছাড়া মেদিনী "কায়স্থ' শব্দের আর অর্থের নিকাশ দিয়াছেন

"ক্ষরথূর্ণা ক্ষতে কাসে কায়স্থ পরমাত্মনি।"

"কায়স্থ অর্থ "পরমাত্মা (যিনি সর্ব্ব কায়ে স্থিতি করেন)

৭। শব্দরত্নাকরকোষ—করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।

যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি—জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্॥

অর্থাৎ করণং শব্দের অর্থ সাধন, যুদ্ধ, ও বৈশ্য শূদ্রাপ্রভব জাতি-বিশেষ ও একপ্রকার কায়স্থ।

শ্রী ললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ

গৌরীশঙ্কর ও মাউণ্ট এভারেস্ট্‌

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন মহাশয় ১৩২৫ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে "এভারেস্ট্‌—গৌরীশঙ্কর" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে "গৌরীশঙ্কর" এবং "এভারেস্ট্‌" দুইটি বিভিন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গ। এই বিষয়ে আরও নিশ্চিত হইবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন মহাশয় বর্ত্তমান কালের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিমালয় পর্য্যটক ডাক্তার হেডিন (Dr. Sven Hedin of Sweden) এবং বিলাতের ভৌগোলিক মহাসভার (Royal Geographical Society of London) সহিত পত্রব্যবহার করেন; পত্রোত্তরে তাঁহারাও নিশ্চিত করিয়া জানাইয়াছেন যে "গৌরীশঙ্কর" ও "এভারেস্ট্‌" দুইটি বিভিন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গ। কবে হইতে এবং কি সূত্রে Col. Everest এর নাম হইতে এভারেস্ট্‌ পর্ব্বতের নামকরণ হয় সেসব বিষয় প্রবাসীতে লিখিত

উক্ত প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এভারেস্ট্ পর্ব্বতশৃঙ্গ তিব্বতীয় ভাষায় "Tomo-Kang-Kar," "Lap-chikang" ইত্যাদি নামে অভিহিত। বাংলা-সাহিত্যে এভারেস্ট্ পর্ব্বতের কোন নাম প্রচলিত নাই, এ বিষয়ে লেখক উক্ত প্রবন্ধে বাংলার সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ অথবা অন্য কোন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান অথবা বাংলার কোন ব্যক্তি ও এবিষয়ে সামান্য একটুকু সাড়াও দেন নাই।

"গৌরীশঙ্কর" পর্ব্বতশৃঙ্গ "এভারেস্ট্" হইতে অনেক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এবং উচ্চতায় প্রায় এক মাইল কম ইহার উচ্চতা (২৩৪৪৭ ফুট)। গৌরীশঙ্কর নামের মূল কোথায় তাহা আমরা জানি না। দেশীয় ভৌগোলিকেরা বোধ হয় এই নাম পাইয়াছেন ইওরোপীয়দের নিকট হইতে। তাঁহারা পাইয়াছেন কাঠমাণ্ডু নিবাসী হিন্দু নেপালীদের নিকট হইতে। তবে "গৌরীশঙ্কর" নামকে দেশীয় নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি হইবার কথা নয়।

শ্রীমতী মিনি সেন

কুমার দারার বেদান্ত চর্চ্চা

শ্রী যদুনাথ সরকার

সম্রাট শাহ্ জহান ও মহিষী মমতাজ মহলের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার দারা-শুকোর ২০এ মার্চ্চ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে আজমীরে জন্ম হয়। তিনি পিতার প্রিয় ধন এবং রাজসভার আদরের বস্তু ছিলেন, কারণ স্বভাবতঃ তাঁহারই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবার কথা। শাহ্ জহানের চারি পুত্রই এক স্ত্রীর সন্তান, তাঁহারা বয়সে ক্রমে ক্রমে কনিষ্ঠ ছিলেন, এরূপ স্থলে এক বাড়ীতে সর্ব্বজ্যেষ্ঠই মান্যও প্রতিপত্তিতে প্রধান হয়; ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

দারার হৃদয় উদার, তাঁহার মন পরমার্থতত্ত্বের জন্য উধাও হইল, যেন তিনি প্রপিতামহ আকবরের ছাঁচে গড়া। যখন তিনি এলাহাবাদ প্রদেশের সুবাদার ছিলেন, তখন তাঁহার এলাকাভুক্ত কাশী নগরী হইতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আনাইয়া তাহাদের সাহায্যে পঞ্চাশখানি উপনিষদ্ ফারসীতে অনুবাদ করাইয়া লন, এবং নিজের ভূমিকা সহ তাহা হস্তলিপিতে প্রকাশিত করেন। গ্রন্থের নাম দিলেন সির্‌ই আস্‌রার্ অর্থাৎ "গুহ্যরহস্যের মধ্যে গুহ্যতম"। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে এই লেখা সমাপ্ত হইল। তাহার পর এক শতাব্দী চলিয়া গেল, দারার জীবনসূর্য্য রক্ত-সন্ধ্যায় অস্তমিত হইল, তাঁহার পিতা বংশ পুত্তলিকামাত্র হইয়া রহিল। এমন সময় একজন অসমসাহসী ফরাসী যুবক পার্সীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ইউরোপে প্রচার করিবার মহাব্রত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ ও কষ্ট তুচ্ছ করিয়া ফরাসী সৈন্যদলের সামান্য সৈনিকরূপেভর্ত্তি হইয়া, ভারতে আসিলেন (১৭৫৫)। এই মহা-পুরুষের নাম নাম আঁকেতিল দ্যুপেরঁ (জন্ম ১৭৪৩ খৃঃ)। ফার্সী ভাষা শিখিবার পরে সুরট বন্দরে আসিয়া ঐ ভাষার সাহায্যে পার্সী জাতির পুরোহিত "দস্তর"-দের নিকট পড়িয়া "ভেন্দিদাদ" প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিলেন, এবং তাহা "জেন্দ অবেস্তা অর্থাৎ জুরুথাষ্ট্রের গ্রন্থাবলী" এই নামে ৩ ভলুমে ১৭৭১ সালে প্রকাশিত করিলেন।

তাহার পর দারা শুকোর ফার্সী গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ করিয়া *Oupnekhat* নামে ১৮০২-৪ খৃষ্টাব্দে দুই কোয়ার্টো ভলুম মুদ্রিত করিলেন।

৫০ খানি উপনিষদের সারাংশের ফার্সী অনুবাদের এই লাতিন অনুবাদ জর্ম্মান পণ্ডিত শোপেনহবার পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং লেখেন—

"In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life—it will be the solace of my death" (Schopenhauer)—অর্থাৎ "উপনিষদের মত পরম উপকারী ও উন্নত জ্ঞানভাণ্ডার আর সমস্ত জগতে নাই।

ইহা আমার জীবনে শান্তি দিয়াছে, মৃত্যুসময়েও শান্তি দান করিবে।"

দারাও উপনিষদে সর্ব্বশেষে উপনীত হন এবং চরম শান্তি পান। তত্ত্বজ্ঞানের পিপাসায় তিনি নানা ধর্ম্মের গ্রন্থ পাঠ করেন এবং নানা সম্প্রদায়ের সাধুর চরণে শরণ লন। কাশ্মীরবাসী মুল্লা শাহ মুহম্মদ নামক সুফী কবি, লাহোরের বিখ্যাত পীর মিয়ানমিরের শিষ্য মুহম্মদ শাহ লিসানুল্লা, ইহুদী ফকির সরমদ্—ইঁহারা সকলেই দারার ধর্ম্মগুরু ছিলেন। কিন্তু সুফীধর্ম্ম, খৃষ্টীয় আদিগ্রন্থ, কিছুই কুমারের চিত্তের পিপাসা মিটাইতে পারিল না। দারা নিজ গ্রন্থ সির্-ই-আস্‌রার্ এক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"আমি মুসা-রচিত প্রথম পাচ গ্রন্থ (ওল্‌ড্ টেস্‌টামেন্টের প্রথমাংশ) খৃষ্ট-চরিত (নিউ টেস্‌টামেণ্ট), গাথা (ছামুস্) এবং অন্যান্য অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। কিন্তু বেদে, বিশেষতঃ বেদের সার বেদান্তে অদ্বৈতবাদ [তৌহিদ্] যেমন পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে, এমন আর কোথাও পাই নাই।"

দারা হানিফি সম্প্রদায়ের মুসলমান, সুতরাং বেদান্তের অন্বেষণে তিনি সুফীমত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীদের সংবাসে যখন জানিলেন যে সুফীমত এবং বেদান্তের মধ্যে পার্থক্যটা শুধু কথাগত, তখন তিনি আর-একখানি গ্রন্থ লিখিয়া ঐ দুই ধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন। এই ফার্সী পুস্তকের নাম "মজমুয়া উল-বহারয়েন্" অর্থাৎ দুই সমুদ্রের সঙ্গম। ইহাতে হিন্দু বেদান্তে যে সব শব্দ ব্যবহার হয়, তাহার প্রতিশব্দ সুফী সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ফার্সী শব্দাবলী হইতে দিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বাবা লালদাস নামক একজন হিন্দু যোগীর সেই সময়ে বড় নাম ছিল। কুমার দারা তাঁহার চরণে উপনীত হইয়া ধর্ম্মপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন—আত্মার স্বরূপ কি? পর-লোক কি? কিসে সদ্‌গতি হয়? চিত্তশুদ্ধির উপায় কি? ইত্যাদি। যোগী এইসব প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন তাহা কুমারের অনুচর, শাহজাহানের সভার মুন্সী দক্ষ ফারসী লেখক চন্দ্রভাণ নামক ব্রাহ্মণ, ফরাসীতে লিপিবদ্ধ করিলেন। গ্রন্থের নাম হইল "প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ দারাশুকো ও বাবা লালের সওয়াল্-জবাব।" এই তিন গ্রন্থেরই নকল খুদাবখ্‌শ পুস্তকালয়ে আছে।

কিন্তু দারা ইস্‌লামধর্ম্ম হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন নাই। তিনি ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে সফিনৎ-উল্-আউলিয়া নামক এক ফার্সী গ্রন্থ লিখিয়া তাহাতে মুহম্মদ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিজ সময় পর্য্যন্ত সকল ইস্‌লামীয় সাধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী দেন, এবং তাঁহারা সকলেই যে একই ঈশ্বর-প্রেমিক পরিবারের অন্তর্গত তাহা প্রমাণ করেন। তিন বৎসর পরে সকিনৎ-উল-আউলিয়াতে সাধু মিয়ান্ মীরের জীবনকাহিনী বর্ণনা করেন। দারা এই সাধুর সম্প্রদায়ে শিষ্যরূপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার চারি বৎসর পরে আরব ও পারস্য দেশীয় সুফীধর্ম্মের এক সরল ব্যাখ্যান "রিসালা-এ-হকুনুমা নামে রচনা করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানির এবং সফিনতের ভূমিকার ইংরাজীতে মর্ম্মানুবাদ ৺শ্রীশচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর এলাহাবাদে ১৯১২ সালে প্রকাশিত করেন।

দারার ভগিনী জহানারা ও ফার্সী ভাষায় "মুনীস্-উর্-আর্‌ওয়া" নামে শেখ মুইনুদ্দীন চিশতীর একখানি ছোট জীবনী লেখেন, এবং এই চিশতী সম্প্রদায়ে দীক্ষিতা হন। নিজগ্রন্থে তিনি দারাকে নিজের ধর্ম্মগুরু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এইসকল গ্রন্থপাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে দারা বৈদান্তিক ছিলেন, কখনও হিন্দু বা পৌত্তলিক হন নাই। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন পিতৃসিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিল, তখন আওরংজীব গোঁড়া মুসলমান জনতা ও সৈন্যদলকে নিজপক্ষে আনিবার জন্য ঘোষণা করিয়া দিলেন যে দারা বিধর্ম্মী অর্থাৎ কাফির হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয়! আওরংজীবের আজ্ঞায় রচিত এবং তাঁহার দ্বারা সংশোধিত সরকারী ফার্সী ইতিহাস "আলমগীরনামা"তে বলা হইয়াছে যে দারা ইস্‌লাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ (১) তিনি ব্রাহ্মণ যোগী ও সন্ন্যাসীর সহিত মিশিতেন, তাহাদের ধর্ম্ম-উপদেষ্টা ও তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া গণ্য করিতেন' এবং বেদ-(অর্থাৎ বেদান্ত) কে দৈব গ্রন্থ মনে করিয়া তাহার চর্চ্চা ও অনুবাদে দিন যাপন করিতেন।

(২) তিনি নাগরী অক্ষরে খোদিত "প্রভু" শব্দযুক্ত অঙ্গুরীয় ও বস্ত্র পরিধান করিতেন।

(৩) নমাজ ও রমজানের উপবাস করিতেন না, এই বলিয়া যে ওগুলি শুধু অপরিপক্ক সাধকের জন্য, কিন্তু তিনি পরমতত্ত্বজ্ঞ সাধক, তাঁহার পক্ষে এইসব বাহ্য ক্রিয়া অনাবশ্যক।

ইহাতে পৌত্তলিকতা, বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস, অথবা কুরাণের সভ্যতায় অনাস্থা কোথায়? তবে তিনি কাফির হইলেন কেমন করিয়া? "প্রভু" কোন দেবতা-বিশেষের নাম নহে, উহা পরমেশ্বরের উপাধিমাত্র। সংস্কৃত কোষে উহার ব্যাখ্যা "নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ", অর্থাৎ কুরাণে ঈশ্বরের "রব-উল্—আলমীন্" বলিয়া যে-উপাধি আছে, ঠিক তাহার অনুবাদ।

এই দারার জীবনী লিখিবার অনেক সমসাময়িক উপাদান বিদ্যমান আছে। এমন-কি তিনি প্রিয় পত্নী নাদিরাবানুকে যে ছবির বই উপাহার দেন তাহা বৃটিশ মিউজিয়মে আশ্রয় পাইয়াছে, এবং তাহা হইতে কয়েকখানি অতি মনোহর চিত্র V. A. Smith's *History of Fine Art in India and Ceylon*এ মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের বিষাদময় অবসান দুখানি অ-সরকারী ফার্সী ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে—(ক) মাসুমের সুজা-চরিত্র এবং (খ) পদ্যে আউরঙ্গ নামা। আর জয়পুর দরবারে পঞ্চাশের ও অধিক দারার লেখা পত্র পাইয়াছি।

সুর ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ধ্রুপদ

বাগীশ্বরী—চৌতাল

তু হি আদি দেবী ধরণী অনন্ত ভামিণী
অনগিন * যুগ গয়ে কহি অন্ত নহি পাবে।
অচল ঔর সচল জীব তুমসে জনন হোত সব,
ঔর জব লৈ হো জাত তুম্মা অঙ্গমে মিল জাবে।
কোউ হোত নরবর, কোউ হোত গুণসাগর।
কোউ ফিরত দ্বার দ্বার, দুখ মে দিন কটাবে।
গোপেশ কহত মাত; জো কছু তুম্মা সুত স্বরূপ,
কিস্‌লিয়ে † কোউ পাবে দুখ অজহু জ্ঞানমে নহি আবে।

আস্থায়ী।

০		৩		৪		১´		০		২		০		৩	
র্সা	র্সা	ণা	া	ধা	মা	ধপা	ণা	া	মজ্ঞা	জ্ঞা	রা	সা	সা	-া	া ণ্
তু	হি	•	•	আ	•	দি•	দে	•	বী	ধ	র	ণী	অ	•	• ন

* অনগিন—অগণিত অর্থাৎ যাহা গণনায় আসে না।

† কিস্‌লিয়ে—কি জন্য।

আভোগ।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
{মা ণা | ধা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা
{গো ০ ০ পে ০ শ ক হ ত মা ০ ত

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা র্রসা | র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্ণা | ধা ধা}
জো ০০ ক ছু তু আ সু ত ম্ব রু ০ প}

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ধা পা | ধা ণা | ণা ণা | ধঃ পঃ | ধাঃ ণঃ | র্সা র্সা |
কি স্ লি য়ে কো উ পা ০ য়ে ০ ছু খ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা র্সা | র্সা র্সণা | ণধা ধা | পধা পণা | । ণা | ধা মা |
ত্য জ ছুঁ জ্ঞা০ ন০ মে ন০ ০০ ০ হি ০ ০

১´ ০ ২
মধা পণা | মা জ্ঞা | রা সা ॥
অ'০ ০০ ০ ০ বে

*নটিকা—ধ্যান।

চিরংনটন্তী শুভরঙ্গমধ্যে,
বিচিত্ররত্নাভরণা কৃশাঙ্গী।
সুগীততালেষু কৃতাবধানা,
নাটী সুশাটীপরিধানশীলা॥

ভাবার্থ—বিচিত্ররত্নভূষণ ভূষিতা, কৃশাঙ্গী শুভরঙ্গ মধ্যে চিরকাল নট্যশীলা, সুগীততালে কৃতাবধানা নাটী রাগিণী সুশাটী পরিধান করিয়া আছেন।

নাটিকা—আলাপ।

ঔড়ব জাতি।
রি ও ধ বিবাদী।
প—বাদী।
ম—সংবাদী।
দুই গ ও দুই-নি।

অস্থায়ী।

ণ্া সা জ্ঞা পা -া পমা পা -া মা জ্ঞা -া সা -া ণা সা -া
তে ০ না ০ ০ তো০ ০ ম না ০ ০ ০ ০ তে ০ ০

জ্ঞা সা -া ণ্া প্া -া ণ্া মা -া ম্া -া পা জ্ঞা মা মা -া
রি ০ ০ রে ০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নে ০

* চলিত কথায় ইহাকে "নাট" বলা যায়। ইহার অপভ্রংশ আর-একটি নাম "তিলক"।

পা ণা পা নর্সা -া ণা পা -া া র্সা ণা পা মজ্ঞা -া
তা ০ ০ ০০ ০ না ০ ০ ০ তে রে নে রি০ ০

মা জ্ঞা সা -া সা সা সা সণ্া সণ্া সা জ্ঞা -া সা -া ॥
০ রে না ০ তে রে না তে০ না০ ০ তো ০ ০ ম্

অন্তরা।

মা -া মা পা -া গা মা পা ণপা না র্সনা র্সা -া র্সা র্সা -া
তা ০ ০ না ০ ০ ০ তে ০০ রি ০ ০ ০ রে না ০

র্সা ণা র্জ্ঞা র্সা -া ণা মা পা -া র্সা ণা পা মা জ্ঞা
তো ০ ০ ০ ম্ না ০ ০ ০ তে না ০ ০ ০

মজ্ঞা -া সা -া ণা সা জ্ঞা -া পমা পা -া মা জ্ঞা
০০ ০ ০ ০ তে ০ না ০ ০০ ০ ০ নে রি

ণ্া সা জ্ঞা সা -া সা সা সা সণ্া সণ্া সা জ্ঞা -া সা -া ॥
০ ০ রে না ০ তে রে না তে০ না০ ০ তো ০ ০ ম্

সঞ্চারী।

পা -া মা জ্ঞা পা -া পা মা জ্ঞা -া সা া- সা ণ্া প্া -া ণ্া সা
তে ০ না ০ ০ ০ নে তো ০ ০ ০ ম্ না ০ ০ ০ তে ০

জ্ঞা সা -া জ্ঞা মা পা -া ণা পা র্সা -া ণা পা মা জ্ঞা -া মা -া
০ ০ ০ না ০ ০ ০ তে ০ রি ০ রে ণা ০ ০ ০ ০ ০

জ্ঞা পা মা জ্ঞা -া সা -া ॥
তা ০ না ০ ০ না ০

আভাস।

পা মগা মা পা র্সা -া া র্জ্ঞা ণা র্সা -া র্সা র্সা
আ না০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে না

া । র্সনা র্সা র্জ্ঞা র্পা র্মা র্জ্ঞা -া র্সা -া র্জ্ঞা র্সা
০ ০ তো০ ম্ না ০ তে ০ ০ না । তে ০

নর্সা ণা প্া । ণা পা মগা পা মা -া জ্ঞা -া সা -া
০০ না ০ ০ তে রে নে০ রি রে ০ না ০ ০ ০

সা সা সা সণ্া সণা সা জ্ঞা া সা -া ॥
তে রে না তে০ না০ ০ তো ০ ০ ম্

পঞ্চশস্য

একাই একশ—

পাশে একজন সিসিলীর ভ্রাম্যমাণ বাজনদারের ছবি দেওয়া হইয়াছে। সিসিলীতে এইরূপ বহু ভবঘুরে বাদ্যকর দৃষ্ট হয়। ইহাদের অঙ্গে দশবারটি বাদ্যযন্ত্র সজ্জিত থাকে; ইহারা সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালনে একাই এগুলি বাজাইতে পারে;—মাথা নাড়িলে ঘণ্টা বাজে; পা নাড়িলে জয়ঢাকটি বাজিয়া উঠে; মুখে পাইপে আওয়াজ করে; হাতে একর্ডিয়ন বাজায়; এইরূপে ইহারা একাই একশ জনের কাজ করে।
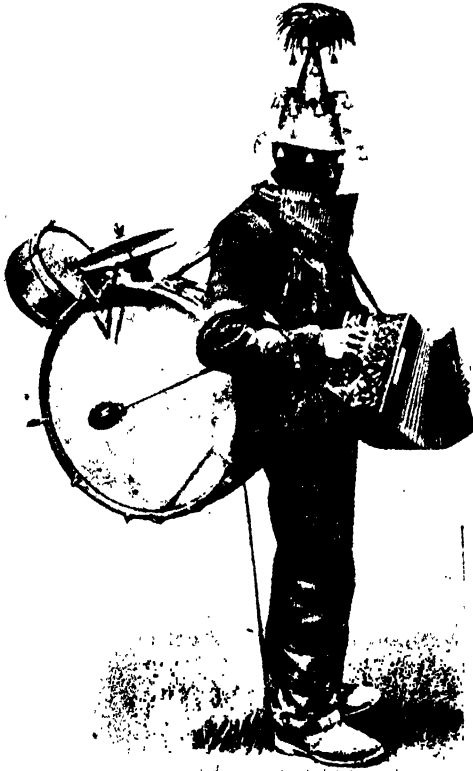
সিসিলীর ভবঘুরে বাদ্যকর

আমেরিকার প্রথম বৈজ্ঞানিক—

আমেরিকাকে আমরা নূতন-মহাদেশ বলি। আমাদের ধারণা প্রায় শত বৎসরের পূর্ব্বে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে সে-দেশে সভ্যতার পত্তন হয় নাই; সেখানে অসভ্য অশিক্ষিত বর্ব্বর রেড্ ইণ্ডিয়ান্ জাতি বনচরদের ন্যায় বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। এ ধারণা যে সত্য নয় সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ডাক্তার হার্বার্ট, জে, স্পিণ্ডেন তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার ফলে জানা যাইতেছে, ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা মহাদেশে একজন অতিপ্রসিদ্ধ মহাপ্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু চমকপ্রদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অনেক তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে প্রাচীন মহাদেশের পণ্ডিতদের আবিষ্কার এই সব আবিষ্কারের নিকট তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়। সেই মহাপণ্ডিতের নাম এতাবৎকাল স্থিরীকৃত হয় নাই। হয় ত তাহা জানিবার উপায়ও নাই। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্য ও যন্ত্রগুলি তাঁহাকে চির-প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিবে।

প্রস্তর-পঞ্জিকা
ইহার সাহায্যে বর্ত্তমান পঞ্জিকা অপেক্ষা নিখুঁতভাবে কালাকাল নির্দ্ধারিত হয়।

গোয়াতেমালা ও হন্দুরাসের ভগ্ন মন্দিরগাত্রে খোদিত তাঁহার আবিষ্কারগুলি স্পিণ্ডেন সাহেব বহু গবেষণার পর উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে এইটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐসকল মন্দির-নির্ম্মাতা 'মায়া'জাতি জ্ঞান ও সভ্যতায় বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিল। ইহাও স্থির যে, উহারা কলম্বসের আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে নূতন মহাদেশে বসবাস করিত। ইহাও স্পিণ্ডেন সাহেব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই জাতি উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল,

ইনি 'মায়া'দের শুক্র-পঞ্জিকার গণনা যথাযথ উদ্ধার করিয়াছেন; শুক্র-গ্রহের গতির সহিত তাহাদের দিন-পঞ্জিকা নির্দ্ধারিত হইত।

মায়াদের সূর্য্য-পঞ্জিকা
এক চিহ্ন হইতে আর-এক চিহ্নে সূর্য্যের ছায়া দেখিয়া বৎসরের সময় নির্দ্ধারণ করিবার যন্ত্র

ডাক্তার স্পিণ্ডেন ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই অজ্ঞাতনামা বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত গণিত-গণনায় ও নক্ষত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে সময়ের গতি-বিভাগ করিয়াছিলেন যাহা প্রচলিত পদ্ধতি হইতেও বিশুদ্ধতর। বস্তুতঃ এই আশ্চর্য্য ব্যক্তি একটি ঘটিকা-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যাহা দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সঠিক সময় জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু স্পেন-অভিযানের সময় ধর্ম্মযাজক লাণ্ডার নেতৃত্বাধীনে কয়েকজন উন্মত্ত পুরোহিত কর্ত্তৃক এই যন্ত্রটি বিনষ্ট হয়। ইনি 'মায়া' সভ্যতার বহু নিদর্শন ধ্বংস করিয়াছেন। এই পাশবিক কার্য্যের জন্য ইঁহাকে স্পেনে আহুত করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়।

ডাক্তার স্পিণ্ডেন 'মায়া'-পঞ্জিকার সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত গ্রীগোরীয় পঞ্জিকার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, এইসমস্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়, এই অদ্ভুত পুরুষের অসীম ক্ষমতার কথা। ইঁহাকে স্পিণ্ডেন সাহেব জেয়োরাষ্টার ও বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষ আখ্যা দিয়াছিল।

'মায়া'রা সেই সময় প্রান্তরে বাস করিত। বৎসরের অর্দ্ধেক সময়ের বৃষ্টিপাতে জমি উর্ব্বর হইয়া বৎসরে দুইবার ফসল দিত; এই বপন ও কর্ত্তন কাল সঠিক নির্দ্ধারিত করিবার জন্য সময়-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় ও এই বৈজ্ঞানিক তাহার অপূর্ব্ব বুদ্ধি-কৌশলে এই অভাব পূর্ণ করেন।

ডাক্তার স্পিণ্ডেন লিখিয়াছেন, "মায়াদের মন্দির ও স্তম্ভগাত্রে খোদিত শত শত দিন-পঞ্জিকার তারিখ হইতে বর্ত্তমান পঞ্জিকার তারিখের সহিত একটি সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে; এবং নিত্য নূতন গবেষণায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহাদের পদ্ধতি বর্ত্তমান পদ্ধতি হইতে অনেক শুদ্ধ ছিল। তাহাদের বৎসর-কাল প্রায় আমাদের বৎসর-কালের সমান ছিল। আমাদের যেমন চার বৎসরে এক দিন বাড়িয়া যায় উঁহাদের তেমনি ৩৩০০ বৎসর পরে একদিন বাড়িত।"

এই সুসভ্য জাতি কি কারণে অধঃপতিত হইল প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; তবে ইহাদের এই সর্ব্বাঙ্গীন লোপ বিশেষ দুঃখের কারণ, সন্দেহ নাই। এই বৈজ্ঞানিকের সমসাময়িক যুগে য়ুকাটান ও মধ্য-আমেরিকায় যেখানে ১৪,০০০,০০০ লোক বাস করিত সেখানে আজ মাত্র ৪০০ দুর্দ্দশাক্লিষ্ট হতভাগ্য রেড্ ইণ্ডিয়ান্ অবশিষ্ট আছে।

হন্দুরাসের কপানে প্রাপ্ত ৫২৩ খৃষ্টাব্দের প্রতিমূর্ত্তি

অতিকায় যন্ত্র ও আসবাব—

পর পৃষ্ঠায় কতকগুলি অতিকায় যন্ত্র ও আসবাব প্রভৃতির ছবি দেওয়া হইয়াছে। এইসব জিনিষ ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর কেহ দেখিয়াছেন কি?

১। পৃথিবীর সব-চাইতে বড় বই:—নিউইয়র্কে এই পুস্তকখানি দর্শিত হইয়াছিল। মইয়ে চড়িয়া বইখানি পড়িতে হয়, ইহার প্রত্যেকটি পাতা ১০ ফুট লম্বা ও সাতফুট চৌড়া।

২। ব্যাঞ্জোর রাজা:—ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান জোসের রায় কিয়ার্ণ ও এ, ক্যারো মিলার নির্ম্মিত এই ব্যাঞ্জোটি নাকি বৃহত্তম ব্যাঞ্জো। ইহা দশ ফুট লম্বা।

৩। পৃথিবীর সব-চাইতে বড় আপিস-চেয়ার—এই চেয়ারে উপবিষ্ট মহিলাটি সাধারণ ভাবের লম্বা চৌড়া একটি মানুষ। তিনি যেন এই চেয়ারে বসিতে গিয়া হারাইয়া গিয়াছেন। চেয়ারটি ১১ ফুট উচ্চ। দুইজন লোকের সাহায্যে তিনি এই চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

৪। সব-চাইতে বড় কম্বল:—এই কম্বলটি চীনের একটি কম্বল-কারখানায় 'সিন্‌সিনাটি বিজিনেশ মেনস্ ক্লাবের জন্য বোনা হইয়াছিল। কারখানার দেয়াল ভাঙ্গিয়া কম্বলটি বাহির করিতে হয়। ইহার আয়তন ৯২০ বর্গফুট। ইহার উপর তিনটি উপবিষ্ট লোককে দেখিলেই ইহার আয়তন উপলব্ধি হইবে।

বেপরোয়া মোটর-চালকের শিক্ষা—

আমাদের কলিকাতায় মোটর ও বাসের সংখ্যা দিনদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ও আমরা প্রতিদিন অধিকসংখ্যক মোটর-দুর্ঘটনার কথা শুনিতেছি। মোটর-চালকেরা যদি এখন হইতে সাবধান না হয় তবে দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। অবশ্য সুসভ্য আমেরিকা মোটর-দুর্ঘটনায় প্রথম স্থান পাইয়াছে। সেখানকার তুলনায় আমাদের এখানে দুর্ঘটনা কিছুই হয় না; তবে সেখানকার মোটর-সংখ্যা অসংখ্য আর ট্রেন ও মোটরের রাস্তা সর্ব্বত্র পাশাপাশি ও বহু স্থানে মোটরের রাস্তা ট্রেনের লাইনের উপর দিয়া
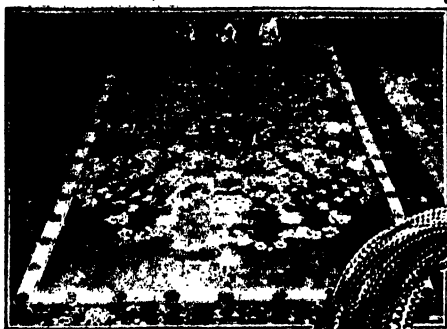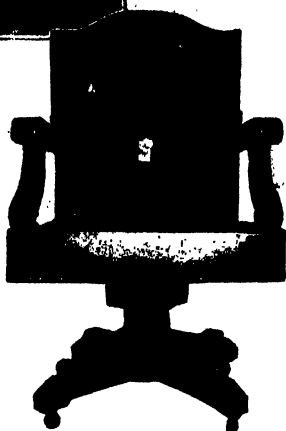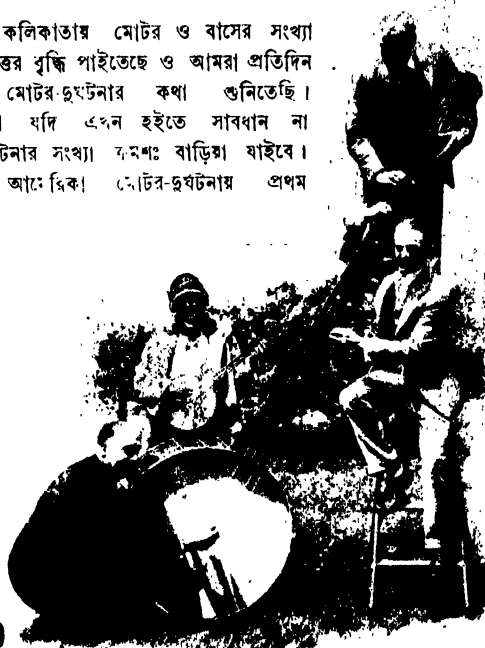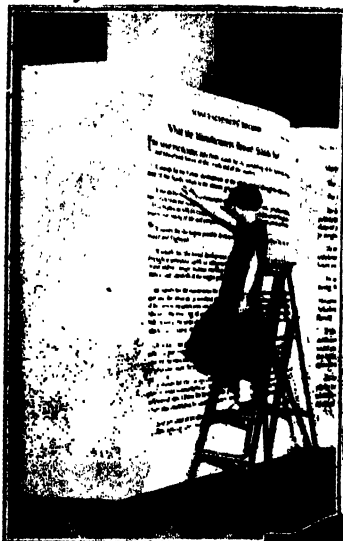
৫। সব-চাইতে লম্বা ইস্পাতের সরুপাত :—নিউ-ইয়র্কের শেনেকটাডির জেনারাল ইলেকট্রিক্ কোম্পানীর একটি দোকানে ইহা পাওয়া গিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫৭ ফুট; ইহার ব্যাস ১ইঞ্চি।

৬। সব-চাইতে বড় অর্গ্যান-পাইপ :—ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে একটি পার্কের বাদ্যযন্ত্ররূপে এই অতিকায় পাইপটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ফুট লম্বা ও দেখিতে একটি চিমনীর মতন।

মজার হুসিয়ারী বিজ্ঞাপন

গিয়াছে। বিশেষ ফটকেরও ব্যবস্থা নাই। বেপরোয়া চালকগণ ট্রেনের সহিত পাল্লা দিতে গিয়া বহুস্থলে বিপন্ন হয়। এইরূপ চালকদের জন্য আমেরিকার এক রেল কোম্পানী ট্রেন ও মোটর রাস্তার সংযোগের মোড়ে মোড়ে এক মজার হুসিয়ারী বিজ্ঞাপন জারী করিয়াছে। দুর্ঘটনায় ভগ্ন মোটরগাড়ীগুলি একটি করিয়া এইসব জায়গায় বড় বড় থামের উপর রাখিয়া একটি বিজ্ঞাপন এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে—

'থাম, দেখ ও শোন,'
'এই গাড়ীখানির চালক তাহা করে নাই।'

এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা আশ্চর্য্য রকম কমিয়া গিয়াছে।

—

ননীর পুতুল—

কথায় বলে 'ননীর পুতুল'; কিন্তু ওয়াশের স্পোকেন মেলায় একটি ননীর পুতুল দেখান হইয়াছে, এটি আপাদমস্তক মায় সাজসজ্জা শুদ্ধ মাখন দিয়া তৈয়ারী। পোর্টল্যাণ্ডের হাওয়ার্ড ফিশার এই পুতুলের শিল্পী। তিনি এইটি দিয়া মেলার কারুশিল্প-প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন।

—

ননীর পুতুল

আশ্চর্য্য দৈহিক পরিবর্ত্তন—

একটি দশবৎসর বয়স্ক জীর্ণশীর্ণ বালক তাহার পিতার সহিত রোমের একটি মন্দিরে দেবতাদের মার্ব্বেল প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবা[ক] হইয়া ভাবিতেছিল যে, ঐরূপ নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠব লাভ করা সম্ভব কি না। সে নিজের ক্ষীণ শরীরের সহিত প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলির তুলনা করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়াই হউক একদি[ন] এইরূপ গঠন ও অঙ্গসৌষ্ঠব লাভ করিতে হইবে।

এটি পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। এই সেদিন ইংলণ্ডে ৬০ বৎস[র] বয়সে সেই বালকের মৃত্যু হইয়াছে। সে আপন প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। বালকটির নাম ইউজিন স্যাণ্ডো। ভবিষ্যতে এই বালকই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী লোক বলিয়া সম্মানি[ত] হইয়াছিল।

অতি অল্পকালের অধ্যবসায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অনুশীলনের ফলে সে[ই] ক্ষীণ বালক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে ও হারকিউলিসেরে ন্যায় শক্তি[র] পরিচয় দেয়। সে খালি হাতে একটি প্রকাণ্ড সিংহকে কাবু করিয়াছে,

একটি প্রকাণ্ড ঘোড়াকে কাঁধে লইয়া অক্লেশে চলাফেরা করিয়াছে; হাতের তালুর উপর একটি সবল মানুষকে লইয়া মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছে; ৮০ মণ ওজনের জিনিষ স্বচ্ছন্দে তুলিয়া ধরিয়াছে। এইসব অমানুষিক কার্য্যের জন্য তাহার নাম থাকিবে না। সে সমস্ত দুর্ব্বলের বুকে আশা জাগাইয়াছে যে অনুশীলন করিলে ও অধ্যবসায় থাকিলে একজন শীর্ণ লোকও মহাপ্রতাপশালী হইতে পারে। এই ধারণা কথায় ও কাজে সে সমস্ত জীবন সকলের মনে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া দিয়াছে, ও নিজে শারীরিক ব্যায়ামে এক নিখুঁত পদ্ধতি প্রচার করিয়া জগতের উপকার করিয়াছে। তাহার প্রচলিত প্রাথমিক আটটি পদ্ধতি চিত্র সহযোগে এখানে প্রদর্শিত হইল।

স্যাণ্ডোর অষ্ট-পদ্ধতি

১। **পার্শ্ব-পুষ্টি পদ্ধতি**:—কোমর হইতে নীচের দিক অকম্পিত রাখিয়া ডাইনে ও বাঁয়ে ঈষৎ বাঁকিতে হইবে ও হাত গুটাইতে ও প্রসারিত করিতে হইবে।

২। **কাঁধ ও বুক পুষ্টি**:—মুখের সহিত সমান্তরাল করিয়া দুটি হাত দৃঢ় রাখিয়া সংযোজিত ও প্রসারিত করিতে হইবে।

৩। বাহুপুষ্টি:—কনুই ভাঙিয়া **হস্ত সঞ্চালন** করিতে হইবে।

৪। কাঁধ ও বাহুপুষ্টি:—কাঁধের দুইপাশে হাত সরল রেখায় প্রসারিত রাখিতে হইবে ও কনুই ভাঙিয়া হস্তচালনা করিতে হইবে।

৫।৬। **বুক বাহু ও পেটের ব্যায়াম**:—হস্ত ও পদ সঞ্চালন করিলেও হাতের জোরে ওঠা-নামা করিতে হইবে।

কাঁধের **পুষ্টি**:—কনুই হইতে উর্দ্ধে হস্তচালনা করিতে হইবে।

৮। **মণিবন্ধ-পুষ্টি**:—হাত সোজা রাখিয়া মণিবন্ধ ঘরাইতে হইবে।

লোহায় খাদ :—

আমরা লোহা জিনিসটাকে যত শক্ত মনে করি আসলে তাহা তত শক্ত নয়; খাঁটি লোহা খুব নরম ও অতি অল্প আয়াসেই একটি খাঁটি লোহার মোটা ডাণ্ডাকে বাঁকাইয়া দেওয়া যায়। ইস্পাত বা সাধারণ ব্যবহৃত লোহার সহিত মাটি, কার্ব্বন প্রভৃতি খাদ মিশ্রিত থাকে। খাঁটি লোহার সহিত সামান্য পরিমাণ ইরিডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ বা মোলিবডেনাম ধাতু

লোহার শক্তিপরীক্ষা

যোগ করিয়া যে ইস্পাত প্রস্তুত হয় তাহা অসম্ভব-রকম শক্ত হয় এবং এই খাদ-মিশ্রিত লোহার সরু তারের সাহায্যে হাজার-হাজার মণ ভারী জিনিষ সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়। সম্প্রতি আমেরিকার মোলিবডেনাম ইস্পাতের শক্তি পরীক্ষার একটি অদ্ভুত প্রতিযোগিতা হইয়াছে। ওভারল্যাণ্ডে মোটর গাড়ীর চক্রদণ্ডটি এই ধাতু মিশ্রিত। একটি মেলায় ওভারল্যাণ্ড মোটর-কোম্পানী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এইরূপ একটি চক্রদণ্ড হাতুড়ী দিয়া যে ভাঙিতে পারিবে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হইবে। দুইদিকে দুইটি লোহার উপর দণ্ডটি রাখা হয়। পুরস্কারের লোভে এক সন্ধ্যায়ই প্রায় ৫০০ শত পালোয়ান একটি প্রকাণ্ড হাতুড়ী দিয়া উহা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। কোনো মোটর দুর্ঘটনায় এই দণ্ডটি ভাঙিতে দেখা যায় নাই।

—

ডুবুরির নিরাপদ্ আচ্ছাদন :—

এতাবৎকাল ডুবুরিরা কি অসম-সাহসিকতার সহিত সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিত ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহাদের বিশেষ কিছু নিরাপদ্ আচ্ছাদন ছিল না। কত হতভাগ্য ডুবুরি যে হাঙর-কুমীরের মুখে প্রাণ দিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। ডুবুরিদের জন্য নিরাপদ্ আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিতে জার্ম্মানীর কিয়েলের নিউফেল্‌ডট ও কুন্‌কে ছয়বার অকৃতকার্য্য হইয়া সপ্তমবারে সফলকাম হইয়াছেন। পার্শ্বে আচ্ছাদনটির একটি ছবি দেওয়া হইল, ইহা মিশ্র অ্যালুমিনিয়ম ধাতু নির্ম্মিত। ভিতরে বৈদ্যুতিক আলো ও টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে। ইহার ভিতরের কলকব্জা প্রায় একটি সাবমেরিনের মতন। ভিতরে জল ভরিয়া যন্ত্রটিকে ভারী করা হয় ও ইহাতে ডুবুরি মিনিটে ২৫০ ফুট ডুবিতে পারে। উপর হইতে বাতাসের নল দেওয়া হয় না। ভিতরে যে অক্সিজেন থাকে তাহাতেই তিন ঘণ্টা স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। মাথার উপরে প্রশ্বাসের কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস শুষিয়া লইবার একটি যন্ত্র আছে। আগে ডুবুরির ৪৫ মিনিটে যত নীচে যাইতে পারিত এই অদ্ভুত যন্ত্র-সাহায্যে সেখানে দুই মিনিটে যাওয়া যায়। এই যন্ত্রটি সর্ব্বপ্রথম একটি ব্রিটিশ সাবমেরিন (M-I) উত্তোলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

—

চীনের বিশ্বকর্ম্মা—

চীনদেশে বিশ্বকর্ম্মা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা আছে, তাহা এই ছবিটি হইতে বুঝা যাইবে। ইহা আমরা শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামলাল সরকার মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের পাঠকেরা জানেন, তিনি বহুবৎসর চীনদেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাহার সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার আরও লেখা ভবিষ্যতে ছাপা হইবে।
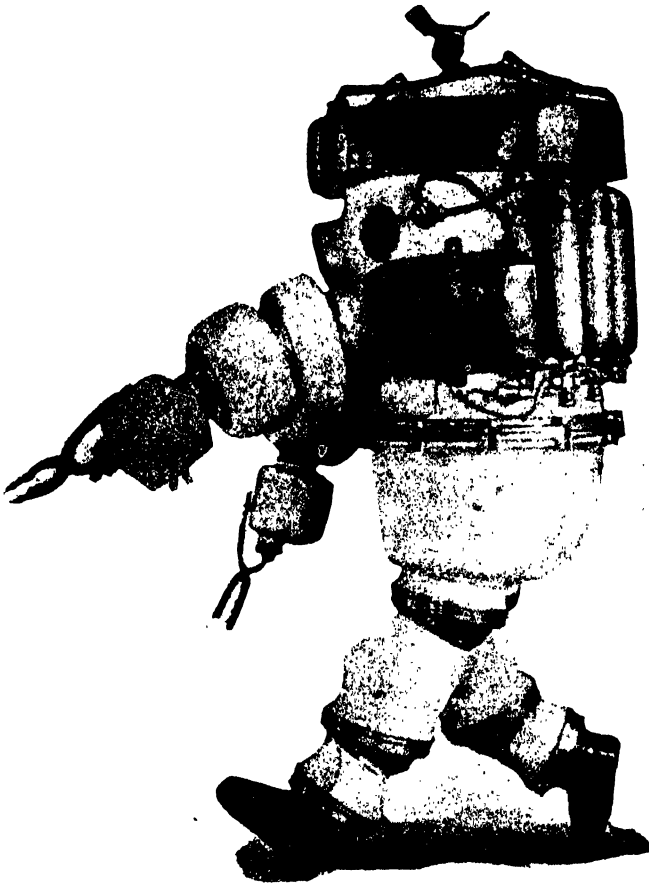
ডুবুরির নিরাপদ আচ্ছাদন

চীনের বিশ্বকর্ম্মা

রোমে এক পক্ষ

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

১৯২১ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভিয়েনা হইতে ভেনিস্, পাডুয়া, ভেরোনা ও বোলোনায় কয়েক দিন করিয়া বাস করিয়া রোমে উপস্থিত হইলাম। যুদ্ধের পরে ইয়োরোপের নানা দেশের মুদ্রার মূল্য যে আজ একপ্রকার ও কাল আর-একপ্রকার হইত, তাহার ফলে বহু লোকের অল্প-বিস্তর লাভ ও ক্ষতি হইয়াছিল। আমারও এই কারণে কিছু লাভ ও কিছু ক্ষতি হয়। যথা, অস্ট্রিয়াতে ভ্রমণ-কালে আমার কাছে যত অস্ট্রিয় করোনা (যুদ্ধের পূর্ব্বে এক পাউণ্ড=২৪ করোনা; তৎকালে এক পাউণ্ড=৪০০০ করোনা) ছিল, আমি ভেনিসে পৌছাইয়া শুনিলাম

কারাকল্লার স্নানাগার।

লণ্ডনের ব্যাঙ্কে পত্র লিখিয়া রোমে কোনপ্রকারে টাকা আসা পর্য্যন্ত জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করাই আমার একমাত্র পন্থা। যে-কয়টি লিরা পকেটে ছিল তাহা দিয়া এক ইটালীয়ান্ পরিবারে একটা ঘর সাত দিনের জন্য ভাড়া লইলাম এবং বাড়ীর কর্ত্তার সহিত বন্দোবস্ত করিলাম যে, আমার খাবারের বিল তিনি সপ্তাহের শেষে করিবেন। ভাড়া দিয়া পকেটে প্রায় দশ-পনেরো লিরা (সে সময়ে প্রায় ২॥০) অবশিষ্ট রহিল। পাছে ব্যাঙ্কের টাকা যথা-সময়ে না পাই সেই ভয়ে প্যারিসের এক বন্ধুকেও কিছু অর্থ আমায় অবিলম্বে পাঠাইবার জন্য লিখিলাম। লণ্ডন হইতে টাকা আসিতে প্রায় ১০ দিন ও প্যারিস হইতে ছয় দিন লাগিবে। এ কয়দিন উক্ত দশ-পনেরো লিরা-মাত্র সম্বল। এইরূপে অর্থহীন দশা প্রাপ্ত হওয়ায় আমার তাহার মূল্য এত কমিয়া গিয়াছে যে, আমি শুধু রেলের টিকিট ক্রয় করা ছিল বলিয়াই সাহস করিয়া উক্ত করোনার পরিবর্ত্তে লব্ধ অল্প-কিছু ইটালীয়ান্ লিরা পকেটে করিয়া ভেনিস্, পাড়ুয়া, ভেরোনা ও বোলোনাতে সাত আট দিন কাটাইয়া রোমে গমন করিলাম। রোমে বন্ধু কালিদাস নাগের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথা ছিল। এবং রোম হইতে লণ্ডনে টেলিগ্রাম বা পত্র পাঠাইয়া আমার ব্যাঙ্ক্ হইতে টাকা আনাইবারও সুবিধা ছিল। সুতরাং পকেটস্থ লিরার পুঁজি পথে খরচ করিতে আমার দ্বিধা বোধ হয় নাই। কিন্তু রোমে পৌঁছিয়া যে-স্থলে বন্ধুবরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথা সে-স্থলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াও যখন তাঁহার দর্শন লাভ হইল না (মাসখানেক পরে জানিয়াছিলাম তিনি আমার আগমনের দুইতিন দিন পূর্ব্বে রোম ত্যাগ করিয়াছিলেন), তখন আমি বুঝিলাম যে, অতঃপর

যিশু
মর্ম্মর-মূর্ত্তি—রোম

রোমদর্শন অতি উত্তমরূপেই হইয়াছিল। পদব্রজে সকল স্থান ভাল করিয়া দেখা যায়। ক্ষতির দিকে হইয়াছিল অল্প খরচের স্থানে বাস ও আহার করিয়া শরীর কিছু অসুস্থ।

রোমে, শুধু রোমে নহে,ইটালীর সর্ব্বত্রই,প্রাচীন গির্জ্জা, চিত্রশালা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য স্থানে প্রবেশ করিতে হইলে এক লিরা দুই লিরা প্রবেশিকা দিতে হয়। আমি স্থির করিলাম, ট্রাম কিম্বা অন্য-প্রকার যান ব্যবহার করিয়া অর্থ নষ্ট করিব না; যাহা আছে তাহা দর্শনীর জন্যই রাখিব। এই দর্শনী দিবার নিয়মটি খুবই ভাল। ইহাতে দর্শক-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থেই বহুল-পরিমাণে প্রাচীন শিল্পকলার যত্ন ও রক্ষণ-কার্য্য সাধিত হয়। আমাদের দেশে অধিক স্থলেই মন্দির প্রভৃতির অশেষ দুর্গতি হয়। সে-সকল স্থানে যাঁহারা গমন করেন তাঁহারা পূজারী বা পাণ্ডাদিগকে যে-অর্থ দান করেন তাহার অতি অল্পাংশই স্থাপত্য বা শিল্প-সৌন্দর্য্য রক্ষার্থ ব্যয়িত হয়। এই অর্থে শুধু পাণ্ডাদিগের দৈহিক পুষ্টিই সাধিত হইয়া থাকে।

রোমে প্রথম কয়েক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু স্থান দেখিলাম। সে-সকলের সম্পূর্ণ বর্ণনা একটি প্রবন্ধে সম্ভব হয় না। কয়েকটি স্থানের বর্ণনা কিছু-কিছু করিয়াই এই বৃত্তান্ত শেষ করিব।

সৃষ্টি কাহিনী
মাইকেল এঞ্জেলো অঙ্কিত—কাপেলা সিষ্টিনা, ভ্যাটিকান, রোম

ইটালীর প্রাচীন শিল্পদর্শনের দর্শনী টিকিট।

রোম, ইতিহাসে "চিরনগরী" বা The Eternal City বলিয়া খ্যাত। রোমের সাম্রাজ্য এক সময়ে পশ্চিমজগৎ জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। এই নগরী প্রথমে টাইবার নদের বাম তীরে সাতটি পাহাড়ের (অথবা ঢিপির) উপরে অধিষ্ঠিত ছিল। পরে নগর আরো বড় হয় এবং বর্ত্তমানে রোমের সাতটির পরিবর্ত্তে দশটি পাহাড় আছে। রোম খৃঃপূর্ব্ব ৭৫৩ অব্দে স্থাপিত হয়। এই তারিখ যথার্থ কি না এবিষয়ে সন্দেহ আছে। অনেকের ধারণা, রোম আরও প্রাচীন। সুতরাং রোমের ইতিহাস ২৫০০ বৎসরেরও অধিককালব্যাপী। এই দীর্ঘকালের অধিকাংশ সময়ই রোম পাশ্চাত্য সভ্যজগতে শক্তি ও শিল্পের কেন্দ্র-

পিয়েটা
মেরীর ক্রোড়ে ক্রুশ হইতে আনীত যীশুর দেহ,ভাস্কর—মাইকেল এঞ্জেলো।
—সেণ্ট পিটারের গির্জ্জায় রক্ষিত

রূপে পরিগণিত হইয়াছে। রোমে একত্র এত বিভিন্ন যুগের মন্দির, গির্জ্জা, প্রাসাদ, স্তম্ভ ইত্যাদির সমাবেশ দেখা যায় যে, এক শতাব্দী হইতে আর-এক শতাব্দীতে গমন করিতে অনেক সময় কয়েক মুহূর্ত্তের অধিক সময় লাগে না।

রোমের ফোরাম্, প্যান্‌থিয়ন্, সেণ্টপিটারের গির্জ্জা, ভ্যাটিকান প্রাসাদ, কাপিটোলাইন মিউজিয়াম,কারাকালার স্নানাগার ইত্যাদি জগৎ-বিখ্যাত। এইগুলিই ভাল করিয়া দেখিতে হইলে বহু সময় অতিবাহন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত রোমে শতশত দেখিবার জিনিস আছে এবং রোমের নিকটবর্ত্তী বহু স্থানও দেখিবার বিশেষ উপযুক্ত।

পালেটিন ও এস্‌কিলীন পর্ব্বতের মধ্যে অনেকখানি সমতল জমি আছে। এইখানে অতি পুরাকালে রোমের ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান ছিল এবং ইহারই এক পার্শ্বে রোমানগণ সভাসমিতি করিত। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ফোরাম্ সম্পূর্ণরূপে সভাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতেই এইখানে স্তম্ভ, বিজয়-তোরণ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। জুলিয়াস্ সিজারের সময় হইতে অগষ্টাসের সময় অবধি চলিয়া ফোরাম্ গঠন সম্পূর্ণ হয়। বিরাট্ অট্টালিকা, তোরণ, স্তম্ভ ও নানান-প্রকার প্রস্তর-মূর্ত্তিতে ফোরাম্ ভরিয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী অবধি এইসকল অভগ্ন অবস্থায় ফোরামে বিরাজ করে। তা'র পর এক সহস্র বৎসর ধরিয়া ফোরামের চরম দুর্গতি হয়। এইখান হইতে প্রস্তর ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ইটালীয়ানগণ নিজেদের নূতন নূতন গৃহ ও গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিত এবং শেষ অবধি ফোরামের ধ্বংসাবশেষ ২০।৩০ হাত মাটির নীচে চাপা পড়িয়া যায়। ইটালীয়ানগণ ফোরামের নামও ভুলিয়া যায়

ভ্যাটিকানে রক্ষিত, ক্যানোভা রচিত একটি মূর্ত্তি।

এবং এই স্থানে গরু চরাইয়া ও ইহাকে কাম্পো ভাক্কিনো বা সেকালের মাঠ নাম দিয়া প্রাচীন রোমের গৌরব রক্ষা করে। অষ্টাদশ বিগত শতাব্দীতে ফোরামের পুনরুদ্ধার করে এবং বর্ত্তমানে ইহা আবার মাটির তলা হইতে নিজের ক্ষতবিক্ষত দেহ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। চিত্রে ফোরামের দৃশ্যের একাংশ দেখা যাইতেছে। রাস্তাটি ক্যাপিটোলের পাদমূল দিয়া গিয়াছে। সম্মুখে পুরাতন শনি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আটটি স্তম্ভ। তাহার বামে সেপ্টিমিয়াস সেভেরাসের বিজয়-তোরণ। দূরে চিত্রের দক্ষিণে কলোসিয়ামের ভগ্নাবশেষ। শনি-মন্দির ও কলোসিয়ামের মধ্যের সমতল স্থলেই পুরাতন ফোরাম্।
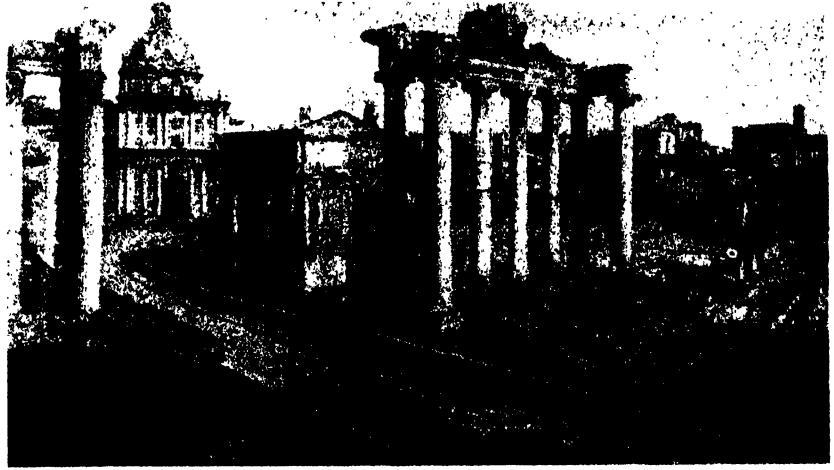
ফোরামের দৃশ্য

কলোসিয়ামের বিরাটত্ব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর থিয়েটার বা সাধারণের আমোদের স্থান আর কখনও নির্ম্মিত হয় নাই। ইহার পরিধি এক মাইলের একতৃতীয়াংশ। ইহা ঠিক গোলাকৃতি নহে। ইহার বৃহত্তম ব্যাস ২০৫ গজ ও ক্ষুদ্রতম ব্যাস ১৭০ গজ। উচ্চে ইহা ১৫৮ ফিট। মধ্যে একটি প্রায় গোলাকৃতি স্থলে ক্রীড়ার স্থান এবং তাহা বেষ্টন করিয়া স্তরে স্তরে সিঁড়ির ন্যায় বসিবার স্থান। সর্ব্বসমেত কলোসিয়ামে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক বসিয়া ক্রীড়া দেখিতে পারিত। এইখানে শতশত গ্লাডিয়েটার পরস্পরের সহিত ও বন্য জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া রোমান্‌গণের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রাণ দিয়াছে। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে কলোসিয়ামের ক্রীড়াক্ষেত্রের একখণ্ড ভগ্ন প্রস্তরের উপর বসিয়া এই

মরনাপন্ন গল—কাপিটোলাইন মিউজিয়ামে রক্ষিত।

স্বষ্টি কাহিনী
মাইকেল এঞ্জেলো অঙ্কিত—কাপেলা সিষ্টিনা, ভ্যাটিকান, রোম

কথাই আমার মনে বিশেষ করিয়া জাগরূক হইয়া উঠিল।

কলোসিয়ামে একজন আমেরিকান্ আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রোম একদিনে কি করিয়া দেখা যায়। সে-ব্যক্তি একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন অথবা আর কিছু। নেপল্‌সে তাহার জাহাজ কয়েকদিন থাকিবে। সে এই সুযোগে রোম ও ফ্লোরেন্স দেখিয়া ফেলিবে স্থির করিয়া বাহির হইয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে, "রোম এক দিবসে নির্ম্মিত হয় নাই" এবং রোম এক দিবসে দেখাও যায় না, সুতরাং তাহার পক্ষে কোন উচ্চ স্থান উঠিয়া একবার রোম দেখিয়া লওয়া ব্যতীত অন্য উপায় আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। সে-ব্যক্তি অবশেষে ফ্লোরেন্সের আশা ত্যাগ করিয়া সমস্ত সময়ই রোমের জন্য খরচ করিতে মনস্থ করিল।

কাপিটোলাইন মিউজিয়ম ফোরামের অতি নিকটেই। এক পোপের প্রাসাদ ভ্যাটিকানস্থিত মিউজিয়ামে ব্যতীত রোমে অপর কোন স্থানে কাপিটোলাইন্ মিউজিয়ামের সমতুল্য ভাস্কর্য্য-সম্ভার নাই। এইখানে অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পৈশ্বর্য্য রক্ষিত আছে। প্যান্থিয়ন্ বা রোটাণ্ডা রোমের পুরাতন স্থাপত্যের একমাত্র সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত নিদর্শন। ইহার আকৃতি বৃত্তাকার ও ইহার গম্বুজের শীর্ষদেশে একটি আলোক আসিবার জন্য ২৯ ফুট ব্যাসের ফুকর আছে। এইখানে দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ও প্রথম হাম্বার্টের কবর আছে।

সেণ্টপিটারের গির্জ্জা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গির্জ্জা। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই গির্জ্জা প্রথম নির্ম্মিত হয়। কিন্তু সেই গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়াতে বর্ত্তমান গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান গির্জ্জার ইতিহাস দীর্ঘ এবং ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে প্রায় দুই শতাব্দী লাগিয়াছিল। যে-সকল প্রসিদ্ধ স্থপতির নাম সেণ্টপিটারের বর্ত্তমান গির্জ্জার সহিত জড়িত আছে, তাহার মধ্যে ব্রামান্তে, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো ও বার্নিনীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার জগদ্বিখ্যাত গম্বুজটি মাইকেল এঞ্জেলোর সৃষ্টি। কিন্তু পোপ পঞ্চম পলের কৃপায় স্থপতি কার্লো মদের্না গির্জ্জার সম্মুখভাগে খৃষ্টের ও তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের মূর্ত্তি সহ একটি দেয়াল তুলিয়া দেওয়ায় মাইকেল এঞ্জেলোর গম্বুজটি গির্জ্জার নিকটে আসিলে আর দেখাই যায় না। শুধু দূর হইতেই তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। সেণ্টপিটারের গির্জ্জায় প্রবেশের পূর্ব্বে পিয়াজা দি সান পিয়েত্রো নামক একটি ডিম্বাকার স্থানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই স্থানে দুইটি ৪৫ ফুট উচ্চ ফোয়ারা ও একটি ৮৭ ফুট উচ্চ মিশর হইতে আনীত ওবেলিস্ক বা সুচ্যাকৃতি একখণ্ড প্রস্তর হইতে গঠিত স্তম্ভ আছে। পিয়াজার দুইধারে ৩৭২টি স্তম্ভ বিশিষ্ট দুইটি ঢাকা পথ আছে।

গির্জ্জার মাপ-জোক দেখিলে ইহার আয়তন কিছু বুঝা যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে ২১৩ গজ এবং ক্ষেত্রে ১৮,০০০ বর্গ গজ।

উচ্চতায় ইহা ৪৩৭ ফিট। ইহার গম্বুজের ব্যাস ১৩৮ ফিট। গির্জ্জাটি প্রস্তুত করিতে প্রায় পনেরো কোটি টাকা ব্যয় হয়। গির্জ্জার ভিতরে বহু মূল্যবান, মূর্ত্তি, চিত্র ইত্যাদি আছে। মাইকেল এঞ্জেলোর পিয়েটা নামক এই গির্জ্জাস্থিত মূর্ত্তিটি জগদ্বিখ্যাত।

খৃষ্টীয় ১৩৭৭ অব্দ হইতে ভ্যাটিকান্ পোপদিগের আবাস হইয়াছে। এখানে যত শিল্পসম্ভার আছে, রোমে আর কোথাও সেরূপ নাই। এই প্রাসাদে ২০টি অঙ্গন ও ১০০০টি বৃহৎ বৃহৎ কক্ষ উপাসনাগৃহ ইত্যাদি আছে। ভ্যাটিকানের অতি অল্প জায়গাই পোপ নিজে ব্যবহার করেন।

ভ্যাটিকানের উপাসনা-গৃহ সিষ্টিন চ্যাপেলের ভিতরে ছাদের গায়ে অঙ্কিত বাইবেলের সৃষ্টিকাহিনীর চিত্রগুলি মহাশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর অঙ্কিত। এইসকল চিত্র ঘাড় উঁচাইয়া দেখিতে কষ্ট হয় বলিয়া আয়নার সাহায্যে দেখিতে হয়। মানুষের প্রতিকৃতি এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও জোরালো করিয়া আঁকিতে আর-কোন শিল্পী কখনও পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

যুদ্ধরত গ্লাডিয়েটার—কাপিটোলাইন মিউজিয়ামে রক্ষিত।
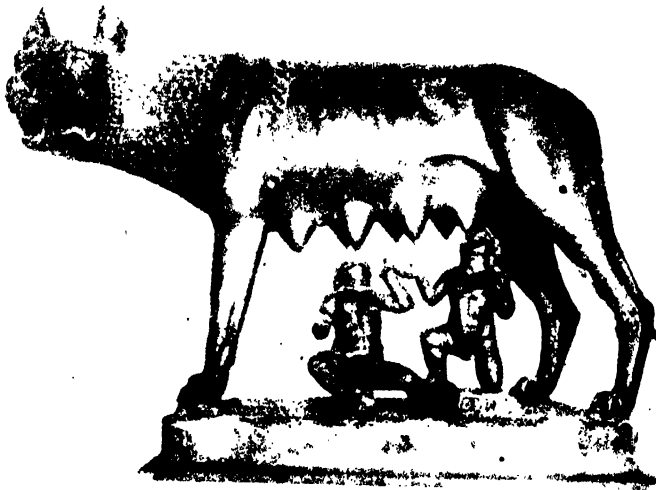
ক্যাপিটোলের নেকড়ে বাঘিনী।
(খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর ভাস্কর্য্য—শিশু রিউমাস ও রেব মিউলাসের মূর্ত্তি পরে যোগ করা হইয়াছে)—কাপিটোলাইন মিউজিয়ামে রক্ষিত।

ভ্যাটিকানের অপর একস্থানে কয়েকটি ঘরে দেয়ালের গায়ে র‍্যাফেলের অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র আছে।

ভ্যাটিকানে রক্ষিত মিশর-দেশীয় এবং গ্রীক ও রোমান শিল্পের নিদর্শনের সংখ্যা এত অধিক যে সে সকলের বর্ণনা এখানে সম্ভব নহে। মর্ম্মর মূর্ত্তির মধ্যে প্রসিদ্ধ লাওকুন, অ্যাপোলো বেলভেডিয়ার, অট্রিকোলি জয়স্, ডিস্কবোলাস্, এবং চিত্রের মধ্যে র‍্যাফেলের ও টিশিয়ানের কয়েকটি চিত্র বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

আমি প্রায় ৬।৭ দিন ধরিয়া উপরে উল্লিখিত স্থানগুলি পরিদর্শন

করি। আমার টাকা তখনও আসে নাই। সাত দিনের দিন প্রাতে খাবারের বিল ও পুনর্ব্বার বাড়ী ভাড়া দিতে হইবে বলিয়া আমি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সপ্তম দিবসের প্রাতেই প্যারিসের বন্ধুর নিকট হইতে আমি প্রায় ২০০ লিরা পাইলাম। সেই সময় আমি অল্প অসুস্থ হইয়া পড়ি। যাহা হউক, একটি ডিস্‌পেন্‌সারীতে গিয়া নিজেই নিজের চিকিৎসা করিয়া আবার ঘুরিয়া বেড়ান আরম্ভ করিলাম।

ইটালিয়ানগণ অতিশয় ধার্ম্মিক। তাহাদের মধ্যে ক্যাথলিকগণ যিশুর জন্য সোণা-রূপার তৈরী হৃদয়, বহু বৎসর জ্বালিবার উপযুক্ত রাক্ষুসে মোমবাতি ইত্যাদি দান করিয়া গির্জ্জাগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। রোমের সাণ্টা মারিয়ার গির্জ্জায় একটি প্রসিদ্ধ যিশুর মর্ম্মর-মূর্ত্তি আছে। তাহার এক পায়ে একটি পিতলের পাদুকা পরানো আছে। এই অপূর্ব্ব সমাবেশের কারণ এই যে, পদচুম্বন করিয়া করিয়া ইয়োরোপীয়গণ এই যিশুমূর্ত্তির পা ক্ষয়াইয়া দিয়াছে। আমাদের দেশে চুম্বন যে ভক্তি প্রকাশের অঙ্গ নহে, ইহা সৌভাগ্যের বিষয়।

আর দুই একটি স্থানের বর্ণনা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। কারাকালার স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ এক আশ্চর্য্য স্থাপত্য-লীলা! খৃষ্টীয় ২১২ অব্দে কারকালা এই স্নানাগার নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; এবং আলেক্‌জাণ্ডার সেভেরাস্ ২২২-৩ খৃঃ অব্দে ইহা শেষ করেন। ইহার ভিতর ১৮০০ স্নানার্থীর বসিবার জন্য মর্ম্মর-বেদী ছিল এবং গরম ঘর, ঠাণ্ডা ঘর, মর্দ্দনের ঘর ইত্যাদি নানাপ্রকার স্নান ও আরাম-দানের বন্দোবস্ত ছিল। আধুনিক ইটালিয়ানগণ স্নান-সম্বন্ধে বিশেষ উদাসীন। যেখানেই অধিকসংখ্যক ইটালিয়ান্ একত্র হয়, সেখানেই এ কথার সত্যতা সুস্পষ্ট হইয়া হইয়া উঠে। প্রাচীনগণ স্নানের জন্য এত করিয়াছিলেন দেখিয়াও ইটালিয়ানগণের স্নানের উৎসাহ বাড়িতেছে না।

রোমে প্রায় ১২-১৩ দিন হইল আসিয়াছি। লণ্ডনের টাকা এখনও পাই নাই। ১৩ দিনের বৈকালে টাকা আসিল—শুধু নোটের একার্দ্ধগুলি। আমি হতাশ হইয়া অপরার্দ্ধের জন্য বসিয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে একদিন লা পারিওলা নামক থিয়েটারে গমন করিলাম। মুক্ত বাতাসে ও চন্দ্রালোকে বসিয়া থিয়েটার দেখিলাম। শুধু ষ্টেজ আছে, বসিবার স্থান সব খোলা মাঠের উপর। ইটালিয়ানগণ স্বভাবতই সুগায়ক।

নোটের অপরার্দ্ধ শেষ অবধি পাইলাম। রোমে পক্ষাধিক বাস করিয়া নেপল্‌সে চলিলাম।

শেষ

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

হেথা উৎসব শেষ ক'রে চল, হোথায় নূতন আয়োজন।
হেথা ফুল-ফোটা সৌরভ-লোটা, হোথায় ফলের প্রয়োজন ॥
হেথা মোরা দোঁহে পথের যাত্রী, হোথায় বিরাম-সুখনীড়।
হেথা নদী-বুকে বাহিলাম তরী, হোথায় শ্যামল মধু তীর ॥
হেথা দীপ জেলে নয়নে নয়নে রূপ-সুধাপানে ছিনু রত।
হোথা জোছনায় গভীর নিশীথে নিবিড় আবেশ আছে কত ॥
হেথা নিশি হ'ল অবসান প্রিয়ে, পেয়ালার সুরা হ'ল শেষ,
হোথায় প্রভাতে গঙ্গার নীরে স্নিগ্ধ-জীবন-উন্মেষ।

ছেলেদের পাততাড়ি

ব্যাবিলোনিয়া ও আসীরিয়ার উপকথা

আমাদের এই ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কত পুরাতন তা'র কোনো ইতিহাস ছিল না। সম্প্রতি পুরাতত্ত্ববিদেরা নানারকম গবেষণা ক'রে তা'র বিচার করতে বসেছেন। আজকাল পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাস সংগ্রহ করতে গিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেকখানি পাওয়া যাচ্ছে। মিশর, পারস্য, আরব; গ্রীস; চীন, জাপান, জাভা, কাম্বোডিয়া, শ্যামদেশ প্রভৃতির যে-ইতিহাস পুরাতত্ত্ববিদেরা সংগ্রহ করছেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা বর্ত্তমানে যতটা কুণো ঘরমুখো হ'য়ে পড়েছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মোটেই তা ছিলেন না—ঠিক এর উল্টোটি ছিলেন। তাঁরা সমুদ্রপথে নিজেদের তৈরী জাহাজে কিম্বা গিরিপথে অনেক দেশে বাণিজ্য ও সভ্যতা বিস্তার ক'রে ফিরেছিলেন এবং অনেক স্থলে আমাদের দেশের লোকই সেই সকল দেশের অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁদের অনেকে সেইসব দেশে বসবাস ক'রে সেখানকার সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছেন। এইসব ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে ভবিষ্যতে যে ভারতবর্ষের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তৈরী হবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্যাবিলোনিয়া, আসীরিয়া বর্ত্তমান এশিয়া মাইনরের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ভূমধ্য সাগর, আরব্য ও পারস্যোপসাগরের কূলে তখন বিশাল জনপদ ছিল। বর্ত্তমানে শুষ্ক ইউফ্রেটিস্ ও তাইগ্রীস্ নদীর উভয় তীর তখন ধনজনসমৃদ্ধিতে গম্‌গম্ করত। সে অন্ততঃ খৃষ্টজন্মের চার হাজার বছর আগের কথা। ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলে তখন কেবল-মাত্র মিশরদেশ ও এই দুই দেশই সভ্যতার লীলানিকেতন ছিল। এই দেশের অধিবাসীরা শিল্পকলায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি ক'রে ইউরোপে আপনাদের সভ্যতা বিস্তার করে। আজ তাহাদের সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন প্রায় লোপ পেয়েছে; প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরগুলি মৃত্তিকাস্তূপে মাত্র পর্য্যবসিত। জ্ঞানী, অধ্যবসায়ী, পুরাতত্ত্ববিদেরা অশেষ পরিশ্রম ক'রে সেই-সব মৃত্তিকাস্তূপ তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে সম্প্রতি সেই প্রাচীন দেশের ইতিহাস সংগ্রহ করছেন। তাঁরা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে যে-রত্ন উপহার দিচ্ছেন তা'র মূল্য হয় না। তাঁরা সকলেই আমাদের নমস্য।

তাঁদের গবেষণার ফলাফল থেকে যতটুকু স্থির হয়েছে তা'তে বেশ বোঝা যাচ্ছে, যে, সুমেরীয় জাতি ব্যাবিলোনীয়া ও আসীরিয়ার সভ্যতার গোড়াপত্তন করে। এই সুমেরীয় জাতি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হ'তে এদেশে আসে। তা'র পর সেমিটিক্ জাতি এই সুমেরীয়দের সভ্যতাকে গ্রাস ক'রে খৃষ্টজন্মের ২০০০ বৎসর আগে প্রবলতম জাতিরূপে পরিগণিত হয়। তখন মিশরদেশও সভ্যতা ও জ্ঞানে প্রবল। তা'র পর পূর্ব্বে পারস্য ও পশ্চিমে গ্রীক সভ্যতার অভ্যুত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে এই সেমিটিক সভ্যতাও বিলুপ্ত হয়; এবং সেখানে মেসোপটামিয়ান্ সভ্যতা মাথা তুলে ওঠে।

স্যার এ এইচ লেয়ার্ড্ সাহেব ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেন। তাঁর পূর্ব্বে এম্, পি, সি বোটা নিনেভা-স্তূপ সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করেন। ১৮৫৪ সাল হ'তে স্যার হেন্‌রী রলিন্‌সন গবেষণা সুরু করেন। তা'র পর বিখ্যাত জর্জ্জ স্মিথ ব্রিটিশ যাদুঘরের রলিন্‌সন্ সাহেবের কাছে উপদেশ নিয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর অশেষ পরিশ্রমে আজ আমরা আসীরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেক জিনিষ জানতে পেরেছি। নিনেভা, উর, ব্যাবিলোন, প্রভৃতি নগরের স্তূপ অনুসন্ধান করার ফলে বহু প্রাচীন শিলালিপি ও ইষ্টকলিপি সংগৃহীত হয়েছে। তখনকার সেই

ভাষা পড়্‌বার লোকেরও অভাব নেই। সেইসব লিপি থেকে অনেক অদ্ভুত তথ্য জানা যাচ্ছে। তাদের আচার-ব্যবহার, শিল্প-বাণিজ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা নিদর্শন সেইসব শিলালিপিতে আছে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির ছেলেদের সৌভাগ্য এই যে, সেদেশের প্রচলিত উপকথাগুলিও পাথরে খোদাই ক'রে রাখা হয়েছে। সে উপকথাগুলি ভারি চমৎকার; এবং মিশর, গ্রীস ও ভারতবর্ষের উপকথার সঙ্গে সেগুলির আশ্চর্য্য-রকমের মিল আছে। আমাদের পুরাণে গরুড় যেমন বিষ্ণুর বাহন সুমেরীয়ার জাও তেম্‌নি ইতনা দেবতার বাহন; ব্যাবিলোনের ইয়া ঠিক আমাদের বরুণ। এইরকমের অনেক মিল সেই দেশের পুরাণ-কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়।

এই উপকথাগুলি যে শুধু ছেলেদের গল্পের খোরাক্ জোগাচ্ছে তা নয়; এ থেকে তাদের সঠিক্ আচার-ব্যবহারের ইতিহাসও পাওয়া যায়; এর অনেক গল্পের সঙ্গে বাইবেলের কথার মিল আছে। বাইবেল যখন লিখিত হয় তখন বাবিলোনের সভ্যতা অবনতির শেষ স্তরে নেমেছে। সম্প্রতি পুরাতত্ত্ববিদদের আবিষ্কার থেকে যতটা ইতিহাস জানা গেছে আসিরিয়া ও ব্যাবিলেনিয়ার উপকথাগুলি সঠিক বুঝ্‌তে গেলে সেগুলি পড়া বিশেষ আবশ্যক। এই উপকথাগুলি প'ড়ে আমাদের দেশের ছেলেদের মনে এই প্রাচীন ইতিহাস জান্‌বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌বে, এই ভরসাতে এগুলি লিখিত হচ্ছে। এতে আমাদের দেশের অনেক আশ্চর্য্য নতুন তথ্য তা'রা জান্‌তে পার্‌বে ও প্রাচীন ইতিহাস জান্‌বার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি গ'ড়ে উঠ্‌বে।

নিনেভার অসুর-বাণী-পাল-মন্দিরে এই দেশের সৃষ্টির ইতিহাস সাতটি প্রস্তরখণ্ডে লিপিবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি সেই প্রস্তরখণ্ডগুলি ব্রিটিশ যাদুঘরে রাখা হয়েছে। স্থানে-স্থানে কালের প্রকোপে এই উপকথাটি নষ্ট হ'য়ে থাক্‌লেও যতটুকু পাওয়া গেছে তা নীচে দেওয়া হ'ল।

সৃষ্টি-কাহিনী

এই মাটির পৃথিবী যখন তৈরী হয়নি তখনকার কথা। তখন পাহাড়-পর্ব্বত, গাছপালা কিছুই ছিল না। চারিদিকে অথই সমুদ্র। মাথার ওপরে অনন্ত নীলাকাশের কোনো নাম ছিল না; নীচের অগাধ জলও পরিচয়হীন। অপসু ছিলেন উপরের ও নীচের এই দুই সমুদ্রের সৃষ্টিকর্ত্তা, আর অন্ধকারের দেবতা তারামাত ছিলেন এদের মা। তখন শস্যশ্যামল প্রান্তর সমুদ্রের বুক থেকে আকার নিয়ে ওঠেনি; নদ, নদী, হ্রদ, সরোবরের কোনো চিহ্ন ছিল না। অন্য কোনো দেবতার তখনো সৃষ্টি হয়নি; তাদের অদৃষ্টও অন্ধকারে ছিল।

তা'র পর একদিন এই অথই নিথর জল উঠল ন'ড়ে; দেবতারা তা'র থেকে বেরিয়ে এলেন। সবচাইতে আগে মাথা তুল্‌লেন প্রথম পুরুষ লাচমু আর প্রথম নারী লাচামু। বহুযুগ অতীত হ'য়ে গেল। দেবতা আনশার ও দেবী কিশার জন্মালেন। দিনগুলো তখন ভারি ছোট; নিবিড় অন্ধকারের তখন প্রবল রাজত্ব। তা'র পর দিনের গতি বেড়ে গেল; অসীম আকাশের দেবতা অনু তাঁর সঙ্গিনী অনাতুকে নিয়ে প্রকাশ পেলেন। তা'র পর এলেন ইয়া। ইনি প্রচণ্ড শক্তিমান্ ও পরমজ্ঞানী; দেবতাদের ভিতর তাঁর সমান কেউ ছিল না। ইয়া হলেন অতল সমুদ্রের দেবতা; আবার এঙ্কি কিনা পৃথিবীরও দেবতা হলেন; তাঁর সঙ্গিনী ডাম্‌কিনা গাসান্‌কি অর্থাৎ ধরণীর দেবী হলেন। ইয়া আর ডাম্‌কিনার এক ছেলে হ'ল; তার নাম হ'ল বেল বা মেরোডাক্। এই বেল মানুষ সৃষ্টি কর্‌লেন; দেবতারা শক্তিসামর্থ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

এদিকে বিশৃঙ্খলতার ও নিবিড় অন্ধকারের দেবতা অপ্‌সু আর তারামাত ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লেন। তাদেরই বংশধরেরা প্রবল হ'য়ে নিখিল বিশ্বকে বশ কর্‌তে চায়; সেখানে শৃঙ্খলা আন্‌তে চায়। কি সর্ব্বনাশ! অপ্‌সু তখনো ভারি তেজী আর বলীয়ান্। তিনি গেলেন ক্ষেপে, তারামাতও রাগে গর-গর কর্‌তে লাগলেন; দেবতাদের রাজ্যে বিষম ঝড় উঠল। মহা-বিশৃঙ্খলা! কিন্তু দেবতাদের বিশেষ কিছুই হ'ল না; তামায়তই নিজে যন্ত্রণায় অধীর হ'লেন।

অপ্‌সু তাঁর ছেলে মুম্মুকে ডাক্‌লেন। সে তাঁর ভারি বশ! তাঁকে মন্ত্রণা-টন্ত্রণা সব সেই দেয়। বল্‌লেন, "বাবা

মুম্মু—তুমি ত আমার অবুঝ ছেলে নও, চল তামায়তের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করি।”

দু’জনে গেলেন অন্ধকারের অধিষ্ঠাত্রীদেবী তামায়তের কাছে, এই আলোর দেবতাদের বাড়াবাড়ি বন্ধ কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌তে গিয়েই তাঁরা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর্‌লেন। অপ্‌স্থ বল্‌লেন, “হে বিশালকায়া তামায়াত, দেবতাদের মতলবে আমরা ভয় পেয়েছি; আমার দিনে-বিশ্রাম রাত্রে নিদ্রা নেই। আমি তাদের শাস্তি দিয়ে এই বাড়াবাড়ি বন্ধ করব। তাদিকে শোকে দুঃখে ডুবিয়ে দেবো তা হ’লে আমাদের আর বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে না।”

এই কথা শুনে তামায়াত গর্জ্জন ক’রে উঠলেন। সেই গর্জ্জনে প্রবল ঝড় যেন ফুঁসে উঠল। আর সেই আন্দোলনের ব্যথায় তিনি সমস্ত আলোকপ্রার্থী দেবতা-দলকে অভিসম্পাত ক’রে অপস্থকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, “স্বামিন্, এদের সমস্ত কাজ পণ্ড ক’রে নির্ব্বিঘ্নে অন্ধকার-বিশৃঙ্খলার দেশে আমাদের রাজত্ব বজায় রাখতে হ’লে কি কর্‌তে হবে?”

অপস্থকে লক্ষ্য ক’রে মন্ত্রী মুম্মু ব’লে উঠল, “বাবা, এরা শক্তিমান্ হ’লেও তোমার কাছে পরাভূত হবেই। তা’রা যতই কেন তপস্যা করুক তোমার কাছে মাথা নত কর্‌তেই হবে। তখন তুমি দিনে বিশ্রাম ও রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা দিতে পার্‌বে।”

মুম্মুর কথা শুনে অপস্থর মুখ আশায় উজ্জ্বল হ’য়ে উঠল বটে, তবু শত্রুর ভীষণ পরাক্রমের কথা মনে ক’রে ভয়ও হ’তে লাগল, তা’র পর তাঁরা তিন জনে মিলে নানা-রকমের সর্ব্বনেশে ফন্দী আঁটতে লাগলেন। এরা যেভাবে সমস্ত জিনিষকে ওলটপালট কর্‌তে সুরু করেছে সে ভীষণ ভয়ের কথা। সেই ছোক্‌রা দেবতাদের দমন করাই চাই।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে সবজান্তা ইয়া হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হ’য়ে তাদের দুষ্ট মন্ত্রণা টের পেয়ে এক পবিত্র শ্লোক আওড়িয়ে অপস্থ আর মুম্মুকে বন্দী ক’রে নিয়ে গেলেন।

কিংগু ছিল তামায়াতের প্রাণের বন্ধু। সে তামায়াতকে বললে, “অপস্থ আর মুম্মু ত বন্দী হ’ল; আমাদের শান্তি চিরতরে বিনষ্ট হ’ল। হে ঝড় ও বজ্রের দেবী, প্রতিশোধ নাও”

সেই সয়তান দেবতার পরামর্শ শুনে তামায়াত উত্তর কর্‌লেন, “তুমি আমার শক্তিতে বিশ্বাস কর্‌তে পারো; লাগাও যুদ্ধ।”

অন্ধকার নিরাকার দেশের ও অতল সমুদ্রের দেবতারা সমবেত হ’য়ে আলোর দেবতাদের বিরুদ্ধে নানা পরামর্শ আঁটতে সুরু কর্‌লে; সমুদ্রে প্রবল ঢেউ উঠল; এরা সব যুদ্ধের উল্লাসে মত্ত; চারদিক্ তোলপাড়।

আদিজননী গুবের অদম্য অস্ত্র-সব এনে দিলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণাকার এগারো-রকমের দৈত্য সৃষ্টি ক’রে দিলেন—অতিকায় সাপগুলো চোখা-চোখা দাঁত ও বিষের থলি নিয়ে কিলবিল ক’রে উঠল। তাদের শরীরের রক্ত হচ্ছে বিষ। কি তাদের ফোঁসফোঁসানি! দেখতেই বা কি ভয়ঙ্কর! যে তাদের সেই পর্ব্বতপ্রমাণ শরীর দেখবে ভয়ে এম্‌নি অভিভূত হ’য়ে পড়্‌বে যে, তার বাঁচবার আশা নেই। কালসাপ, অজগর সাপ, ভয়ঙ্করী লাচামু, ঝড়ের দৈত্য, ভীষণ কুকুর, কাঁকড়াবিছের মতন দৈত্য, মাছের মতন দৈত্য আর পাহা’ড়ে ভেড়া প্রভৃতি সৃষ্টি হ’ল। এদের হাতে চোখা-চোখা অস্ত্র দেওয়া হ’ল। এরা সবাই বুক ঠুকে যুদ্ধ কর্‌বার জন্যে তৈরী হ’ল।

তামায়াত ছিলেন ভারি তেজী। তাঁর, হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না; তিনি, কিংগু তাঁহার সাহায্যে এসেছিল ব’লে তাঁকে অভিষিক্ত ক’রে শয়তান দেবতাদের সেনাপতি করে দিলেন; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তা’র হুকুমই সবাইকে তামিল কর্‌তে হ’বে। কিংগুকে রাজবেশ পরিয়ে উচ্চাসনে বসিয়ে বল্‌লেন, “আমি তোমাকে দেবতাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্‌লাম; তুমি তাদের ওপর রাজত্ব করো। আমি তোমাকে স্বামীরূপে বরণ কর্‌ছি; তুমি শক্তিমান্ হও এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সমস্ত দেবতাদের অতিক্রম ক’রে তোমার নাম জয়যুক্ত হোক।”

তামায়াত কিংগুকে অদৃষ্টের লিখনলেখা তাবিজ দিলেন, কিংগু সেটি তা’র জামার ভিতরে বুকের ওপর রেখে বল্‌লে, “তোমার আদেশ অমান্য করে কার সাধ্যি; তোমার হুকুম শিরোধার্য্য কর্‌লাম।”

কিংগু তামায়াতের শক্তিতে মহা শক্তিমান হ'য়ে উঠল। দেবতাদের অদৃষ্ট নির্দ্ধারণ করার শক্তিকে পেলে অসুর কাছে। সে ব'লে উঠল, "হে দেবতাবৃন্দ, তোমাদের মুখ আলো ও অগ্নির দেবতাকে গ্রাস করুক; তোমরা মহা-পরাক্রমশালী হও।"

এদিকে ইয়া সমস্তই জান্‌তে পার্‌লেন; কেমন ক'রে তিনি সৈন্য সংগ্রহ কর্‌ছেন ও অপসুকে বন্দী করার জন্যে প্রতিশোধ নিতে কেমন উঠে-পড়ে লেগেছেন। এই জ্ঞানী দেবতা এইসব দেখে দুঃখে জর্জ্জরিত হ'য়ে বহু দিন শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন। তা'র পরে তাঁর বাবা আন্‌শারের কাছে গিয়ে বল্‌লেন, "আমাদের আদি জননী তামায়াত রাগ ক'রে আমাদের বিরুদ্ধে লেগেছেন; তিনি সব দেবতাদের বশ করেছেন; আপনার সৃষ্টি করা দেবতারাও ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছে।"

ইয়ার মুখে তামায়াতের এই যুদ্ধোদ্‌যোগের কথা শুনে আন্‌শার রাগে কাঁপতে লাগলেন; তার মহা দুঃখও হ'ল। তিনি রাগে-দুঃখে বল্‌লেন,"বেশ হয়েছে। তুমি যেমন আগে খোঁচা দিতে গিয়েছিলে! মুম্মুকে আর অপসুকে বন্দী করার ফল ভোগ করো; কিংগু যেমন বলী হ'য়ে উঠেছে, তামায়াতের দলকে হঠানো অসম্ভব!"

আন্‌শার অনুকে ডেকে বল্‌লেন, "বাবা, তুমি নির্ভীক মহাবীর, বিক্রমে অজেয়; যাও তামায়াতের কাছে। গিয়ে তারে ঠাণ্ডা কর্‌বার চেষ্টা করো। যদি তোমার কথা তিনি না শোনেন, আমার নাম ক'রে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করো; দেখি যদি তিনি শান্ত হন।"

অনু আন্‌শারের আদেশ পালন কর্‌তে গেলেন। তামায়াতের বাড়ীর পথে যেতে-যেতে দূর থেকে দেখলেন তিনি ভয়ঙ্কর রূপ ধ'রে গর্জ্জন কর্‌ছেন। আর এগুতে ভরসা না পেয়ে অনু ফিরে এলেন।

তা'র পর ইয়া গেলেন ক্ষমাভিক্ষা চাইতে, কিন্তু তিনিও ভয়ে পেছিয়ে এলেন।

আন্‌শার তখন ইয়ার ছেলে মেরোডাককে ডেকে বল্‌লেন, "বৎস, তোমাকে দেখে আমার হৃদয় স্নেহসিক্ত হয়। তুমি যাও তামায়াতের সঙ্গে যুদ্ধ কর গিয়ে। তোমার পরাক্রমে সবাই পরাজিত হবে।" এই কথা শুনে মেরোডাক ভারি খুসী হ'ল। সে আন্‌শারের কাছে গিয়ে তা'র চুমো খেলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তা'র মন থেকে সমস্ত ভয় তিরোহিত হ'ল। সে বল্‌লে, "হে দেবতাদের রাজা, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার ইচ্ছা পালন ক'রে আস্‌তে পারি। এখন বলুন, কোন্ দেবতা আপনাকে অপমান করেছে।"

আন্‌শার বল্‌লেন, "বৎস, কোনো দেবতা নয়; দেবী তামায়াত আমাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন। তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধে যাও; কারণ, আমি জানি তুমি তার মাথা নত কর্‌তে পার্‌বে। তোমার বজ্র আর আলো দিয়ে তুমি তা'কে হঠাতে পার্‌বে। তুমি শীঘ্র যাও। তিনি তোমার কিছুই কর্‌তে পার্‌বেন না; তুমি বিজয়ী হ'য়ে ফিরে আস্‌বে।"

আন্‌শারের এই কথা শুনে মেরোডাক আনন্দিত হ'য়ে বল্‌লে,"হে দেবরাজ,হে দেবতাদের অদৃষ্ট-নিয়ন্তা, আমাকে যদি যুদ্ধে গিয়ে তামায়াতকে পরাজিত ক'রে দেবতাদের রক্ষা কর্‌তেই হয়, তা হ'লে তুমি সমস্ত দেবতাদের সাম্‌নে আমাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করো। সমস্ত দেবতাদি উপসুকিনাকুতে (মন্ত্রণাগারে) সানন্দে সমবেত হ'য়ে আমাকে অভিষিক্ত করুন এবং ভবিষ্যতে দেবতাদের অদৃষ্ট পরিচালনার ক্ষমতা আমার হাতে দেওয়া হোক।"

আন্‌শার তাঁর মন্ত্রী গাগাকে ডেকে বল্‌লেন, "হে গাগা, তুমি আমার সুখ-দুঃখের ভাগী, তুমি আমার সমস্ত উদ্দেশ্য বুঝতে পারো, যাও। লাচমু ও লাচামু প্রভৃতি সমস্ত দেবতাকে নিমন্ত্রণ ক'রে এস, তা'রা আজ আমার সাম্‌নে রুটি ও মদ খাবে। তামায়াতের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ-যাত্রার কথা তাদেরকে বলো। অনু ও ইয়ার দুরবস্থার কথা তাদেরকে জ্ঞাপন করো এবং মেরোডাকের কথা বলে বলো যে, সে সমস্ত দেবতাদের আশীর্ব্বাদ ও তাদের অদৃষ্ট পরিচালনার কথা পেলে তবে যুদ্ধ-যাত্রা কর্‌বে।"

আন্‌শারের আদেশ-মত গাগা,লাচমু ও লাচামুর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে বিনীতভাবে তাঁদের পিতার প্রেরিত সংবাদ জ্ঞাপন কর্‌লেন, "আপনারা শীগগির মেরোডাক-সম্বন্ধে ব্যবস্থা করুন। আপনাদের প্রবল শত্রুকে জয় করার জন্যে তাকে যুদ্ধ-যাত্রা কর্‌তে অনুমতি দিন।"

লাচমু ও লাচামু গাগার কথা শুনে ভারি শোকার্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন এবং ইগিগিরা (স্বর্গের দেবতারা) কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে বল্‌লেন, "হায়, হায়, এমন কি ঘটল যাতে জননী তামায়াত তাঁর নিজের সন্তানদের বিরুদ্ধে লেগেছেন? তাঁর মতলব ত বুঝতে পারছিনে।"

দেবতারা সবাই আন্‌শারের কাছে গিয়ে মন্ত্রণাগারে সমবেত হলেন ও পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন ক'রে রুটি ও মদ খেলেন। যখন তাঁরা একটু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছেন, তখন মেরোডাককে আশীর্ব্বাদ ক'রে জয়যুক্ত কর্‌লেন ও তাঁকে দেবতাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার ক'রে বল্‌লেন, "মহান্ দেবতাদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। তোমার আদেশ আলোকের দেবতা অনুর আদেশ ব'লে মেনে নেওয়া হবে। দেবতাদের অদৃষ্ট এখন থেকে তোমার হাতে। তোমার অধিকারে কেউ বিরোধী হবে না। হে অরিন্দম মেরোডাক, সমস্ত বিশ্বের সম্রাটের আসনে তোমাকে আজ বসাচ্ছি। তোমার অস্ত্র অদম্য হোক। যারা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবে তাদিকে শাস্তি দাও, কিন্তু যারা তোমার বশীভূত তাদিকে নিরন্তর রক্ষা করো।"

তা'র পর দেবতারা একটা গাত্রাবরণ মেরোডোকের সাম্‌নে রেখে বল্‌লেন, "তুমি হুকুম করো এখনি এই বস্ত্র ভস্মীভূত হোক। তুমি আদেশ করো আবার তা যেমনকার তেম্‌নিটি হ'য়ে যাক।"

মেরোডাক আদেশ করা-মাত্র কাপড়খানি ভস্মসাৎ হ'য়ে গেল। সে বলামাত্র আবার সেটি আগেকার মতন হ'ল।

দেবতারা আনন্দ কর্‌তে লাগলেন ও মেরোডাককে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বল্‌তে লাগলেন, "মেরোডাক রাজা হ'ল।"

তা'র পরে তা'র হাতে রাজদণ্ড দিয়ে তা'কে সিংহাসনে বসানো হ'ল, রাজটীকা পরানো হ'ল ও তাকে তার অস্ত্র-স্বরূপ ভয়ঙ্কর বজ্র দেওয়া হ'ল। দেবতারা বল্‌লেন, "যাও, এই অস্ত্রে শত্রু নিপাত করো গিয়ে। শীঘ্র তামায়াতকে ধ্বংস করো। বাতাসকে আদেশ করো, তাঁর রক্ত যেন কোনো গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে ফেলে।"

মেরোডাকের হাতে সমস্ত ভার অর্পণ করা হ'ল। তা'র ক্ষমতা হ'ল অপরিসীম। ঐশ্বর্য্য ও শান্তির অবধি রইল না।

তার পর সে যুদ্ধযাত্রা কর্‌ল। ধনুকে টঙ্কার দিয়ে কাঁধে তূণ ঠিক ক'রে নিলে; বাঁ হাতে এক দিব্যাস্ত্র; ডান হাতে ভীষণ বজ্র; সম্মুখে বজ্রপাত ক'রে সমস্ত শরীর জলন্ত বিদ্যুতে পূর্ণ ক'রে নিলে। অনু তা'কে একটা প্রকাণ্ড জাল দিলেন শত্রুদের তা'তে বন্দি কর্‌তে। তা'র পর মেরোডাক সপ্ত পবন সৃষ্টি কর্‌লে;—বিষ বায়ু, অদম্য বাত্যা, বালুঝঞ্ঝা, ঘূর্ণীবায়ু, চতুষ্পদীবায়ু, সপ্তপদী বায়ু ও অতুলন বায়ু। তা'র পর ডান হাতে তা'র কালান্তক বজ্র নিয়ে তা'র ঝড়ের রথে চেপে বস্‌ল। বায়ুবেগসম্পন্ন চারটি সর্ব্বধ্বংসী ঘোড়া ঝড়ের বেগে রথ নিয়ে ছুট্‌ল। ঘোড়ার মুখে বিষ-ফেনা ভাঙতে লাগল; দাঁতের বিষ পড়তে লাগল। যুদ্ধের জন্যে শিক্ষিত ঘোড়া তা'রা, শত্রুকে পায়ে দ'লে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে পথ ক'রে চল্‌ল। মেরোডাকের মাথায় প্রদীপ্ত শিখা। তা'র পরিধানে ভয়ঙ্কর বেশ। সে রথ হাঁকিয়ে দিলে; তা'র পূর্ব্বপুরুষেরা তার অনুগমন কর্‌লেন। সমস্ত দেবতারা তা'র পিছনে দলবদ্ধ হ'য়ে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন।

বায়ু-বেগে রথ ছুটিয়ে শেষে মেরোডাক তামায়াতের গুপ্ত গুহায় উপস্থিত হ'ল। দেখলে তিনি তাঁর নতুন স্বামী কিংগুর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌ছেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যে মেরোডাক ভয়ে শিউরে উঠল। তাই না দেখে অন্য দেবতারাও ভয় পেলেন।

গর্জ্জন ক'রে তামায়াত মুখ ফিরিয়ে দেখলেন; অভি-সম্পাত দিতে-দিতে বল্‌লেন, "ওরে মেরোডাক, তোর আক্রমণে আমি ভয় পাইনে। আমার সৈন্যেরাও উপস্থিত আছে। তা'রা তোকে অবিলম্বে পরাভূত কর্‌বে।"

মেরোডাক হাত তু'লে তার ভীষণ বজ্র উদ্যত ক'রে বিদ্রোহী তামায়াতকে বললে, "তোমার ভারি বাড় বেড়েছে! তুমি আত্মগর্ব্বে সব্বাইকে তুচ্ছ ক'রে কুটিল মন নিয়ে দেবতাদের ও আমার পূর্ব্বপুরুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছ। তুমি তাদের উপর ঘৃণা ক'রে শয়তান কিংগুকে অনুর শক্তি, দেবতাদের অদৃষ্ট নির্দ্ধারণের শক্তি, সমর্পণ করেছ। যা ভালো তুমি তা ঘৃণার চক্ষে দেখ, কদর্য্যতাকে তুমি ভালোবাসো। তুমি তোমার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ ক'রে সুসজ্জিত হ'য়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধে এস।"

এই তেজস্বী কথা শুনে তামায়াত ক্ষেপে আগুন! তিনি ভূতে-পাওয়া লোকের মতন ছটফট করতে আর চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। তিনি এক পাশবিক মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। দেবতারা অস্ত্র ধরলেন।

তামায়াত আর মেরোডাক্ যুদ্ধে অগ্রসর হ'য়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলে। আলোকের দেবতা মেরোডাক্ অসুর দেওয়া জাল ফেলে তামায়াতকে বন্দী করলে; তামায়াতের নড়বার শক্তি রইল না। তাঁর সাতমাইল-ব্যাপী মুখ হাঁ ক'রে দম নিতে লাগলেন। মেরোডাক তখন ধ্বংসবায়ুদের আদেশ করলেন, তামায়াতকে আক্রমণ করতে। তাদিকে তা'র মুখে ঢুকে ঝড় তুলতে বললে, যেন তাঁর হাঁ-করা মুখ আর বন্ধ না হয়। সমস্ত ঝড়, ঝঞ্ঝাবায়ু ভিতরে ঢু'কে তা'রি বুকের আর পেটের মধ্যে তোলপাড় সুরু ক'রে দিলে; তামায়াত নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ল। বিধ্বস্ত হ'য়ে সে খাবি খেতে সুরু করলে। তখন মেরোডাক তাঁর পেটে ভীষণ বজ্রাঘাত করলে। তার পেট চিরে বজ্র ভিতরে ঢু'কে তাঁর হৃদযন্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিলে। তায়ামাতের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

সেই অতিকায় মৃতদেহ উল্টিয়ে দিয়ে মেরোডাক্ তা'র উপর দাঁড়াল। তামায়াতের দুষ্টবুদ্ধি অনুচর দেবতারা ভয়ে চারদিকে পালাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু মেরোডাক তার বিরাট্ জালে সব্বাইকে বন্দী ক'রে ফেললে। তা'রা সকলে হুমড়ী খেয়ে সেই জালে আটক পড়ল আর যন্ত্রণায় দারুণ চীৎকার সুরু ক'রে দিলে। তাদের চীৎকারে সমস্ত শূন্য আলোড়িত হ'তে লাগল। তাদের অস্ত্রশস্ত্র চুরমার ক'রে তাদেরকে বন্দী করা হ'ল। তা'র পর মেরোডাক তামায়াতের সৃষ্ট দানব আর দৈত্যদের উপর প'ড়ে তাদেরকে বিধ্বস্ত ও পদদলিত করতে লাগল। কিংগুও নিষ্কৃতি পেলে না, তা'র কাছে থেকে অদৃষ্টলিখন কেড়ে নিয়ে তা'র উপর নিজের ছাপ দিয়ে বুকের ভিতর রাখ্লে।

আলোকের দেবতাদের শত্রু নিপাত হ'ল। আনুশারের আদেশ প্রতিপালিত হ'ল। ইয়ার ইচ্ছা অপূর্ণ রইল না।

বন্দী দেবতাদের বেশ ভালো ক'রে বেঁধে মেরোডাক তামায়াতের মৃত দেহের কাছে এল। সেই প্রকাণ্ড দেহের উপর লাফিয়ে উ'ঠে তার প্রকাণ্ড লাঠি দিয়ে মাথার খুলি খু'লে ফেললে; শিরাগুলো সব কেটে দিলে আর তা'র রক্তের ধারা উত্তরদিকের সমস্ত গুহা-গহ্বরে যেয়ে পড়তে লাগল। আলোকের দেবতারা সমবেত হ'য়ে জয়ধ্বনি ক'রে আনন্দ করতে লাগল। শত্রুনিপাতকারী মেরোডাককে তা'রা অজস্র উপহার ও পূজা দিতে লাগল।

মেরোডাক বিশ্রাম করতে-করতে সেই মৃতদেহের দিকে চেয়ে দেখলে। তামায়াতের দেহ ছিন্ন ক'রে তা'র ফুস্ফুসটি খেয়ে সে কূটবুদ্ধি লাভ করলে।

তা'র পর দেবতারা তামায়াতের দেহ দু'ভাগে ভাগ করলেন। মেরোডাক একভাগ নিয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করলে; সেটাকে ঠিক জায়গায় রেখে ওপরের বৃষ্টি আটকাতে পারে সেইজন্যে একজন প্রহরী রেখে দিলে। বাকী অর্দ্ধেকটা দিয়ে এই পৃথিবী সৃষ্টি হ'ল। ইয়ার বাড়ী তৈরী হ'ল সমুদ্রের ভিতর। ওপারের আকাশে অনুর থাকবার জায়গা হ'ল। এন্‌লিল্ রইলেন বাতাস-রাজ্যে।

মেরোডাক সব দেবতাদের ঠিক-ঠিক জায়গা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলে। প্রত্যেক দেবতাদের নামে তারা সৃষ্টি ক'রে শূন্যে বসিয়ে দিলে। সময়কে বছর আর মাসে ভাগ ক'রে দিলে। প্রত্যেক মাসের জন্যে তিনটি ক'রে তারা ঠিক রইল। তারা সৃষ্টি করার পর বছরের প্রত্যেক দিনকে এক-এক দেবতার অধীন ক'রে দিলে। নিবিরুকে (বৃহস্পতি) করলে তা'র নিজের নামের তারা, আর নিবিরুই সমস্ত তারার গতি ও পথ নির্দ্দেশ করতে লাগল। নিজের জায়গা ছাড়িয়েও এন্‌লিলেরও জায়গা হ'ল এবং প্রত্যেকের আবাসস্থলের দরজায় রীতিমত খিলের ব্যবস্থা করা হ'ল। মধ্য-চক্রবালবিন্দু হ'ল এই তিন বাড়ীর ঠিক মধ্যবিন্দু।

মেরোডাক নির্দ্ধারিত ক'রে দিলে যে, চন্দ্রদেব রাত্রে রাজত্ব করবেন, দিনের অবস্থানকাল ঠিক ক'রে দেবেন। প্রত্যেক মাসে তাঁকে একটি আলদা মুকুট পরতে হবে, বিভিন্ন সময়ে চাঁদের বিভিন্ন আকার স্থির ক'রে দিলে এবং পরি-

উজ্জ্বলতার দিন তা'কে ঠিক সূর্য্যের উল্টোদিকে থাকতে আদেশ করা হ'ল।

আকাশে নিজের ধনুক রেখে মেরোডাক ছায়াপথ সৃষ্টি করলে। জালটিও আকাশে রেখে দেওয়া হ'ল।

ইয়ার মতলব হ'ল, মানুষ সৃষ্টি করা হোক। মেরোডাক তা'র মতলব বুঝে বললে, "আমি নিজের শোণিত পাত ক'রে মানুষের হাড় সৃষ্টি করব, পৃথিবীতে বাস করার জন্যে মানুষও সৃষ্টি করব যাতে ক'রে দেবতারা তাদের পূজো পেতে পারেন; তাঁদের নামে মন্দির গ'ড়ে উঠবে।"

এর পরের শিলালিপি আর পড়া যায় না। বেরোসাসের লেখা থেকে বোঝা যায় যে, এর পর বেল-মেরোডাক মেরোডাকের কাঁধ থেকে তা'র মুণ্ডুটি কেটে ফেলেন। তা'র রক্ত গড়াতে থাকে আর দেবতারা সেই রক্ত দিয়ে মাটিকে কাদা ক'রে প্রথম মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু সৃষ্টি করেন।

ছয়টি প্রস্তরখণ্ডে এই সৃষ্টি-কাহিনী লেখা আছে। সাতেরটিতে মেরোডাকের উদ্দেশে দেবতাদের স্তুতি ও নানা স্তোত্র লেখা। তা'র মধ্যে মেরোডাকের একান্নটি নাম পাওয়া যায়। মেরোডাক যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছিল, তেমনি চাষ-আবাদেরও পত্তন করে এবং পূর্ব্বপুরুষ দেবতাদের রক্ষা করেছিল ব'লে তাদের চেয়েও শক্তিমান্ হয় ও ভবিষ্যতে তুতু কি না সৃষ্টিকর্ত্তা নাম প্রাপ্ত হয়।

সোনালি ফেজেণ্ট্ পক্ষী

ফেজেণ্ট্ পক্ষী জাতিতে আমাদের দেশের তিত্তির পক্ষীর জ্ঞাতি। অবশ্য তিত্তির পক্ষী অপেক্ষা ইহার আকৃতি অনেক সুন্দর। তিত্তির পক্ষীর ডানা অনেকটা ফেজেণ্টের মতন হইলেও ফেজেণ্টের পুচ্ছের দৈর্ঘ্য তিত্তির অপেক্ষা অনেক অধিক। তিত্তির ও ফেজেণ্ট উভয়েরই পায়ে পালক নাই এবং তীক্ষ্ণ নখর আছে।

ফেজেণ্ট্ পক্ষী নানা দেশে অতি উত্তম শিকারের জিনিস বলিয়া গণ্য হয়। ফেজেণ্ট্ শিকার ইংলণ্ডের লোকদের একটি বিশেষ প্রিয় কর্ম্ম।

ফেজেণ্ট্ বহুপ্রকারের হয়। তাহার মধ্যে সোনালি ফেজেণ্ট্ বর্ণ-সৌষ্ঠবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইজাতীয় ফেজেণ্টের বাস পূর্ব্ব তিব্বত এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ চীন দেশের পর্ব্বতে। ইয়োরোপের নানা স্থানে এই পক্ষী চীন হইতে আমদানি করিয়া পালন করা হয় এবং দেখা যায় যে, ইহারা বেশ সুখেই ইয়োরোপে বাস করে। ছবিতে দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে, ইহার পালকের রং কত সুন্দর।

আমাদের দেশে কলিকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় সম্ভবত এই পক্ষী আছে। অতঃপর আলিপুর যাইলে সোনালি ফেজেণ্ট্ খুঁজিয়া বাহির করিলে আমোদ পাওয়া যাইবে।

অ

বাঘমুখো মাছ

ছবি দেখিলে মনে হইবে, এটি একটি বাঘের মুখ। কিন্তু এটি বাঘের ছবি নয়, মাছের ছবি। এই মাছ সমুদ্রে জন্মে।

বাঘমুখো মাছ

এই মাছের মুখটা দেখিতে ঠিক বাঘের মুখের মতন। ইহাদের দেহ নানা-রকম রং-এ চিত্রিত। ইহাদের দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, এত সুন্দর যে, এমন মাছ খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কফাব্ মাছ নামে পরিচিত। জলের মধ্যে প্রবাল-প্রাচীরের নিকটে ইহারা বাস করে। ইহারা যেখানে থাকে সেখানকার আশপাশের সঙ্গে ইহাদের দেহের রং চমৎকার মিলিয়া যায়। সেইজন্য ইহাদের শত্রুগণ সহজে ইহাদিগকে খুঁজিয়া পায় না।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের গ্রেট ব্যারিয়ার রীফে গভীর জলভাগে প্রবাল-প্রাচীরের নিকট ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের ঠোঁট টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতন। এই ঠোঁট দিয়া খুঁটিয়া-খুঁটিয়া ইহারা প্রবাল-কীট খাইয়া থাকে।

গুপ্ত

হালুম বুড়ো

এক যে আছে হালুম বুড়ো, নাকটা যে তা'র খেঁদা;
(আর) সেই নাকেতে আছে একটা মস্ত বড় ছেঁদা;
(আর) সেই ছেঁদাতে ঝুল্‌ছে যে এক বাল্‌তি এত বড়,
বাল্‌তির ভেতর আছে তিনটে কাঁকড়া করা জড়ো,
কাঁকড়াগুলো বাড়িয়ে দাড়া ক'রেই আছে হাঁ,
চুপটি ক'রে ঘুমোও সবাই, হাতটি নেড়ো না;
নড়লে পরে হালুম বুড়ো দেখতে যদি পায়,
হালুম ব'লে বাল্‌তি ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়;
বাল্‌তি থেকে কাঁকড়া তখন কামড় লাগায় কট্;
ঘুমোও ঘুমোও দুষ্টু ছেলে, ঘুমোও গো চটপট।
না না না দুষ্টু ত নয়, লক্ষ্মী ছেলে যে,
পালা হালুম, এই ত খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে॥

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সনেট

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়

এ জীবন ল'য়ে আমি কি করিব, প্রভু?
ইচ্ছা করে, দিয়ে যাই কালের ভাণ্ডারে;
এর ছায়া বেঁচে থাক্ ইতিহাসে। তবু
তৃপ্তি কোথা? চিরপ্রাণ ভবিষ্যৎ তা'রে
স্থান দেবে এক কোণে যাহার মাঝারে
সে ত শুধু প্রাণহীন বর্ণমালা ছাওয়া
বর্ণহীন শুষ্ক শ্বেত পাতা। আমি তা'রে
বলিব না বেঁচে থাকা, অমরত্ব-পাওয়া।
প্রতিক্ষণে ভ'রে দাও যদি উচ্ছ্বসিত
আনন্দ-বেদনা-মেশা প্রেমের অমৃতে,
প্রতিক্ষণে ভ'রে দাও যদি লীলায়িত
অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের রূপে গন্ধে গীতে,
মুহূর্তে ঝরিয়া যাক দেহ; মুহূর্তেই
উ'বে যাক্ স্মৃতি। তবু মৃত্যু মোর নেই

কাচ

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমরা প্রায় সকলেই কাচের আবিষ্কার-সম্বন্ধে এই গল্পটি পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি, যে, কতকগুলি ফিনিসীয় বণিক কোনও কারণে সিরিয়া দেশের বেলুস্-নদীর মোহানায় বালুকাময় সমুদ্রকূলে কিছুদিন যাপন করে। সেই সময় তাহারা বালির উপর* নাট্রনখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত চুল্লী স্থাপন করিয়া সহজলব্ধ কাঠ, গাছ, খড় ইত্যাদি দ্বারা রন্ধন করিত। কিছুদিন পরে তাহারা দেখিল, যে, চুল্লীর তলদেশের বালুকা, ও নাট্রনখণ্ডের ক্ষার অগ্নির উত্তাপে এক অভিনব স্বচ্ছ কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে। ইহাই কাচ। নাট্রনকে হিন্দীতে পাপড়ী বলে।

মোহেন-জো-দড়োয় প্রাপ্ত কাচের বালা (খৃঃ পূঃ ৫০০০-৩০০০ বৎসর)

ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ইহা বলা যায় যে গল্পটি বেশ।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিবেন যে, ফিনিসীয়দিগের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে কাচ ও কাচের ইতিহাস পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক বলিবেন যে, কাচ প্রস্তুত করিবার জন্য যে-প্রকার প্রচণ্ড তাপের প্রয়োজন, তাহা রন্ধনের চুল্লীতে পাওয়া অসম্ভব।

তবে এ গল্পের সৃষ্টি হইল কিরূপে? এই গল্পটি আমরা পাইয়াছি ইয়োরোপ হইতে। এবং ফিনিসীয় [illegible] প্রাচীনকালে প্রাচ্য সভ্য জগতের সহিত সমুদ্রপথে ইয়োরোপের বাণিজ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে, তাহারাই প্রথমে পাশ্চাত্য জগতে কাচের ব্যবহার বিস্তার করে।

এই গল্পের আরম্ভ হয় প্লিনির প্রাকৃতিক ইতিহাসে (Pliny, Nat. Hist., xxxvi, 96)। উক্ত পুস্তকে এইরূপ আবিষ্কারের পরে কাচশিল্পের ক্রমবিকাশ কিরূপে হইয়াছিল, তাহারও বিস্তারিত বিবরণ আছে।
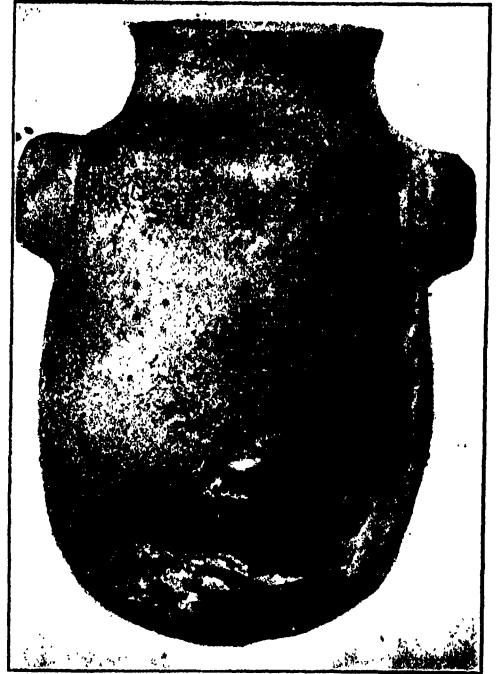
সারগন নামাঙ্কিত কাচের পাত্র (নিমরুদে প্রাপ্ত খৃঃ পূঃ ৭০০ অথবা ৩০০০ বৎসর)

টাসিটস্-নামে ঐ যুগের অন্য-একজন ঐতিহাসিকও প্রায় ঐ একই গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি রন্ধনের চুল্লী ইত্যাদি বাদ দিয়া কেবলমাত্র ইহাই বলিয়াছেন যে বেলুস্-নদীর মোহানায় প্রাপ্ত বালুকা, সোরার সহিত মিশাইয়া অগ্নি-সাহায্যে গলাইলে পরে কাচ উৎপন্ন হয়।

* নাট্রন প্রকৃতিজাত সোডা
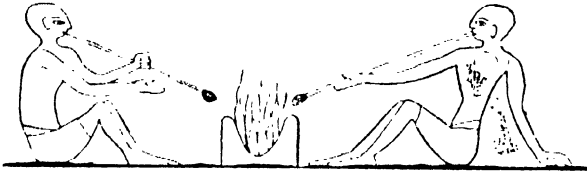
প্রাচীন মিশরের কাচ-শিল্পী। মিশরের বেনি হাসান নামক স্থানের সমাধি-গাত্রে চিত্র (খৃঃ পূঃ ১৬০০)

ফিনিসীয়দিগের সমসাময়িক অনেক সভ্য জাতির মধ্যে কাচ বা কাচের প্রকৃতির পদার্থের (যথা মিনা (enamel) স্বচ্ছ প্রলেপযুক্ত ইঁট (glazed bricks) ব্যবহার ছিল। পরে ক্রমবিকাশ-সূত্রে সেইসকল দেশে কাচ একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুরূপে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব।

প্রথমে কোন্ জাতি কেবলমাত্র শুদ্ধ কাচনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব। সুতরাং এইমাত্র বলা যায়, যে, কাচ আবিষ্কারের সময় প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্গত। এবং প্রথমে কাচ অন্য দ্রব্যের উপর প্রলেপ বা কঠিন ও দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রঙীন কারুকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এখন দেখা যাউক, ভিন্ন ভিন্ন দেশে কাচের ক্রমবিকাশ কিরূপে হয়।

মিশর (ঈজিপ্ট)

মিনার কাজ মিশরে অতি প্রাচীন কালে আরম্ভ হয়। রাজা মেনা (Mena) প্রথমে এই কাজ আরম্ভ করেন, এইরূপ কিম্বদন্তী পাওয়া যায়। মোটামুটি খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বের সময়কার মিশরে মিনার কাজ করা ও রঙীন কাচের প্রলেপ দেওয়া (colour glazed) মাটির ও চীনামাটির জিনিষ পাওয়া যায়। যথা—সাক্কারাহ্ পিরামিডের একটি ঘরের দ্বারপথ। ইহার দেওয়াল সবুজ রঙের কাচের প্রলেপ দেওয়া টালিতে ঢাকা। এই ঘরটি মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্যের (Ancient Empire) সময় তৈয়ারি (খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর)।

মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের সময় (খৃঃ পূঃ ১৬০০ বৎসর) সেই দেশে সম্পূর্ণভাবে কাচদ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং সেই সময় হইতে ক্রমেই কাচের প্রচলন ও সঙ্গে-সঙ্গে ঐ শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে। পেট্রীর (Flinders Petrie) আবিষ্কৃত টেল্ এল্ আমারনার (Tell-el-Amarna) কাচের কারখানার ভগ্নাবশেষে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে বোঝা যায় যে সেই সময়ে (খৃঃ পূঃ ১৪৫০-১৪০০) কাচশিল্প বিদ্যায় মিশরীয়দিগের বিশেষ দখল ছিল এবং তাহারা কাঁচা মাল হইতে কাচ প্রস্তুত করিতে পারিত।

প্রাচীন মিশরের কাচশিল্পের নমুনা সভ্যজগতের প্রায় প্রত্যেক মিউজিয়মে আছে। ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট নমুনাগুলির রঙ ও কারুকার্য্য ভেনিসের অত্যুৎকৃষ্ট কাচের অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বা রঙবিহীন কোনও কাচের নমুনা মিশরে এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

মোটামুটি ভাবে মিশরের কাচশিল্পের ইতিহাস এইরূপ দেওয়া যায়। কাচের প্রলেপযুক্ত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ—খৃঃ পূঃ ৩৫০০ ৪০০০।

কাচ তৈয়ারি করার অনুরূপ কোনও শিল্পের বিষয় চিত্রে প্রদর্শন* (সাক্কারাহ্ সমাধি চিত্র)—খৃঃ পূঃ ২৯০০-৩০০০

মিশরে কাচশিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের প্রমাণ—নৃপতিদিগের নামাঙ্কিত ও তাঁহাদিগের সমাধিসকলে প্রাপ্ত উৎকৃষ্ট কাচশিল্পের নিদর্শন, খৃঃ পূঃ ১৫৪০-১৫০০।

কাচের কারখানার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার—ডাক্তার পেট্রীর মতে এই কারখানার সময় খৃঃ পূঃ ১৪৫০-১৪০০।

ইহার পরে রোমকর্তৃক মিশর জয়ের পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ঐদেশে কাচশিল্পের বিস্তার ও উন্নতি হয়। অগষ্টস্ সীজার যখন মিশর জয় করেন (খৃঃ পূঃ ২৬), তখন সে দেশের কাচ এতই বিখ্যাত ছিল যে, তিনি আদেশ করেন যে, ঐ দেশের করের অংশরূপে কাচের দ্রব্যাদি রোমে প্রেরিত হইবে।

মিশরে কাচশিল্পের উত্তমরূপ প্রতিষ্ঠা ও মিশরীয় জাতির সীরিয়া ও ব্যাবিলন জয়ের সময় একই(খৃঃপূঃ ১৫৪০-

* Lepsius Denkmaeler, vol. iii, plates XIII to XLIX
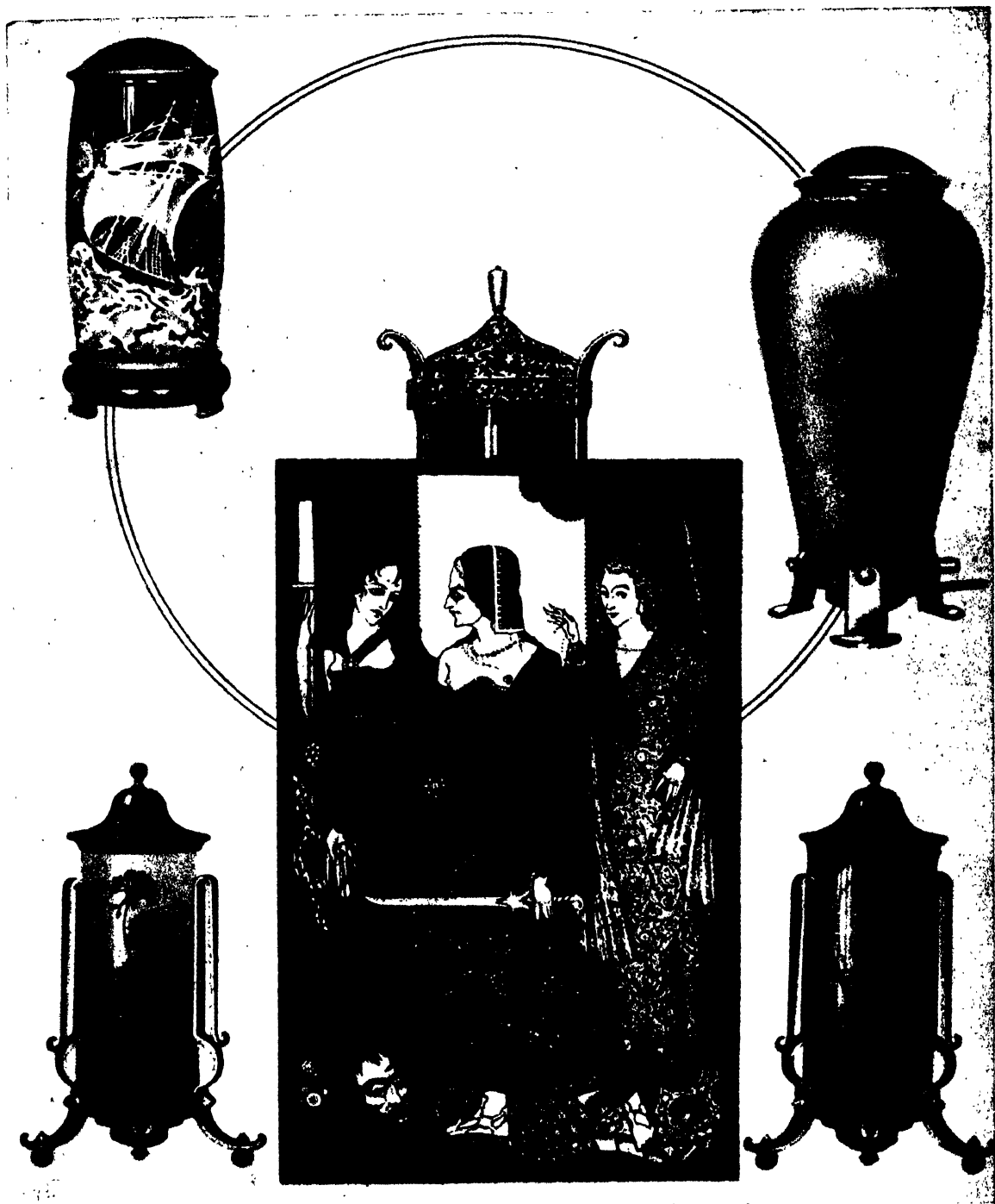
চারিপাশে। নানা-প্রকার কারুকার্য্যযুক্ত কাচের আলোকাধার

মধ্যে। আয়র্লণ্ডের একটি লাইব্রেরীর রঞ্জিত কাচের জানালা

শ্রীযুক্ত হেরি ক্লার্ক কর্তৃক অঙ্কিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রাচীন মিশরের কাচ-শিল্পী। মিশরের বেনি হাসান নামক স্থানের সমাধিগাত্রে চিত্র (খৃঃ পূঃ ১৬০০)

১২০০)। ইহাও সত্য যে, ঐ সময়ের বহুপূর্ব্ব কালেও (খৃঃ পূঃ ৩০০০-৩৫০০, ঈজিপ্টের প্রথম রাজবংশের সময়) অন্যদেশে প্রস্তুত কাচের দ্রব্যাদি মিশরে আমদানি হইত। মিশরের সম্রাট আখেনাটেনের (Akhenaten খৃঃ পূঃ ১৫০) সহিত সীরিয়া ও বাবিলনের বিবাহসূত্রে ও অন্যরূপে সম্পর্ক ছিল এবং তিনিও বিশেষ উৎসাহের সহিত নিজদেশে বহু কাচের কারখানা স্থাপন করেন। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, মিশর বাবিলোনীয় বা অন্য কোন প্রাচ্য সভ্য জাতির নিকট হইতে কাচশিল্প শিক্ষা করে।

আসীরিয়া ও ব্যাবিলন

এই অতি প্রাচীন ও মিশরের সমসাময়িক সভ্যদেশে নানাশিল্পের বিকাশ মিশরের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনো বিশুদ্ধ কাচশিল্পের বিশেষ প্রাচীন নিদর্শন এখানে কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে সেরূপ নিদর্শন পরে আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

ব্যাবিলনে রঙীন কাচ-প্রলেপের (coloured glaze) ব্যবহার অতি প্রাচীন সময় হইতেই ছিল, এবং এই বিষয়ে ব্যাবিলনীয় জাতি বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ দেশের প্রাচীন কাচের জিনিষের একটিমাত্র নিদর্শন এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সার্ হেন্‌রী ল্যায়ার্ড ১৮৫০ খৃঃ নিমরুদ-নামক স্থানে একটি কাচের পাত্র আবিষ্কার করেন। ইহার গাত্রে কীলক লিপিতে 'সার্গন' (Sargon) এই নাম ও একটি সিংহমূর্ত্তি খোদিত আছে। নৃপতি সারগন খৃঃ পূঃ ৭২২ সালে আসীরিয়ায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং এই পাত্রটি সেই সময়ের। * কেহ কেহ কীলক লিপির রূপ দেখিয়া অনুমান করেন যে এই সার্গণ খৃঃ পূঃ ৩৮০০ সালের আক্কাদিয় সারগন। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই পাত্রটি অতি প্রাচীন।

যাহাই হউক এই পাত্রটি প্রাচীনতম নির্ম্মল কাচ- নির্ম্মিত দ্রব্যের নিদর্শন। এই পাত্রটি নিরেট ঢালাই করিয়া পরে ভিতরের অংশ কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে।

সুমেরিয়া-আক্কাদিয় জাতি ব্যাবিলনের সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই এখনো জানা যায় নাই।

* Chambers's Ency. Vol. v, 242.

প্রাচীন চীন

চীনদেশের অতি প্রাচীন যুগের কাচের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা মিশর বা ফিনিসিয়ার কাচ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

প্রাচীন ফিনিসীয় কাচ-পাত্র (খৃঃ পূঃ ২০০-৩০০ বৎসর)

ফিনিসিয়ার কাচশিল্প

পুরাকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত এইজাতি কাচের আবিষ্কারক বলিয়া ইয়োরোপে খ্যাতি পাইয়া আসিতেছে।

বোধ হয় তাহা সত্যমূলক নহে। কেননা, ফিনিসীয় নগরী সকলের পত্তনের পূর্ব্বে মিশরে কাচ শিল্পের বিস্তার হয়।

ফিনিসীয়গণের এই খ্যাতির কারণ বোধ হয় এইজন্য যে, যখন ইয়োরোপে গ্রীকজাতি আদিম স্বল্পসভ্য অবস্থায় ছিল, সেই সময় হইতে এইজাতি সমস্ত ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে কাচ সরবরাহ করিত। ক্রেতাগণ শিক্ষার অভাবে বণিক্‌কেই নির্ম্মাতা মনে করিত। অসভ্য গ্রীকেরা ফিনিসীয়দিগকে অলৌকিক কারু-কৌশলী মনে করিত। স্থতরাং তাহারা যে ঐ নানা আকৃতির ও বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণের পরম আশ্চর্য্য কাচের বস্তু সকল ফিনিসীয়দিগের নির্ম্মিত বলিয়া ভাবিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?* মিশরের
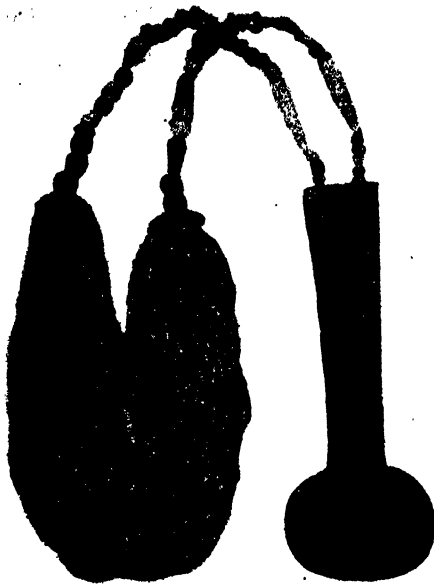
মিশরের সমাধিতে প্রাপ্ত কাচের পুতির মালা
(খৃঃ পূঃ ১২০০-১৪০০ বৎসর)

রামেসেস ও থথমেস নৃপতিগণের সময়ে (The Rameses and Thothmes) ফিনিসীয়রা প্রথমে সরবরাহকারী ও পরে শিক্ষার্থীরূপে মিশরীয় কাচশিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। কিন্তু আবিষ্কারক যেই হউক, ফিনিসীয়গণ কাচ শিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও বিস্তার যেরূপ ভাবে করিয়াছিল, জগতের অন্য কোন জাতি সেরূপ করে নাই। ফলে ইয়োরোপ ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেশ সকলে এই জাতি কাচদ্রব্যাদি বিষয়ে প্রায় একাধিপত্য লাভ করে।

কাচের উপকরণ সকলের মধ্যে ক্ষার দ্রব্যাদি এবং বালুকা সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক। ফিনিসীয়দিগের পূর্ব্বে উদ্ভিদ্‌ভস্ম জাত ক্ষার এবং অশুদ্ধ বালুকার ব্যবহার ছিল। ইহারাই বোধ হয় প্রথমে খনিজ ক্ষার ও সোরা (natural Sodium Carbonate—Natron—and Saltpetre) এই কার্য্যে ব্যবহার করেন। ফিনিসীয়ায় মিশর হইতে অনেক বেশী শুদ্ধ বালুকাও পাওয়া যাইত।

ফিনিসীয়গণ বর্ণহীন স্বচ্ছ, বর্ণযুক্ত স্বচ্ছ, ও বর্ণযুক্ত অস্বচ্ছ, এই তিন প্রকার কাচই প্রস্তুত করিতে পারিত। তাহাদের প্রস্তুত সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ কাচের তুল্য পদার্থ এখনও অন্য কোন জাতি প্রস্তুত করিতে পারে নাই। তাহা প্রস্তুত-করণের গুহ্য প্রক্রিয়া কাহারো জানা নাই। ফ্রান্সে মঁসীয় গ্রোয়ার (M. Greau) নিকটে একটি প্রাচীন ফিনিসীয় পাত্র আছে। তাহা একপ্রকার অদ্ভুত কাচে প্রস্তুত, যাহাতে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ব্রঞ্জ (Bronze) ধাতু মিশ্রিত আছে।*

ফিনিসীয় কাচ দ্রব্যাদিতে যে-সকল বর্ণ ব্যবহার করা হইত, তন্মধ্যে নীলই প্রধান। শ্বেত, পীত, হরিৎ ও ধূসর রংও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। ক্বচিৎ বিশুদ্ধ লোহিত বর্ণের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

ফিনিসীয় কাচশিল্প খৃঃ পূঃ ১৩০০ বৎসর হইতে খৃঃ ১২০০ পর্য্যন্ত ২৫ শতাব্দী ধরিয়া সতেজে চলিয়াছিল। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর † শেষেও টায়ার নগরীতে (Tyre) বহু কাচের কারখানা ছিল।

* History of Art in Phoenicia and Cyprus, Vol. II. Article on glass by Perrot and Chepiez.

* Perrot and Chepiez Hist. of Art in Phoenicia and Cyprus.

† Voyages de Rabbi Benjamin, Filsde Iona de Tadele en Europe en Asie et en Afrique.

চীনদেশ

চীনদেশে কাচ কখনও চীনা মাটির সমান আদর পায় নাই বা বহুপ্রচলিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ অদ্ভুত শিল্পনিপুণ জাতি যাহা-কিছু কাচশিল্প চর্চ্চা করিয়াছে, তাহা অতি প্রাচীনকালেই প্রাচীন ফিনিসীয় বা মধ্যযুগের ভেনিসীয় কাচ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। এখনও চীনদেশের স্থানে-স্থানে অতি উৎকৃষ্ট কাচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

ভারতবর্ষ

আমাদের দেশে কাচের ব্যবহার কতদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া প্রায় অসম্ভব। অন্ততঃপক্ষে এই প্রবন্ধলেখকের বিচারে তাহা এখন পর্য্যন্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাহার কারণ প্রধানতঃ যে-কয়টি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

কোনও দেশের কোনও শিল্পের ইতিহাস উদ্ধারের উপায় এই কয়টি যথা :—

১। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্য, যথা :—প্রাচীন নগরী, মন্দির বা সমাধিতে প্রাপ্ত সেই শিল্পের নিদর্শনসকলের উদ্ধার, তাহার যথাযথ বিবরণ প্রকাশ ও তাহার সময় নির্দ্ধারণ।

২। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্য, যথা—অন্য কোন সমসাময়িক দেশের প্রাচীন ইতিহাস, শিল্পসম্বন্ধীয় পুস্তক বা ভ্রমণবিবরণ হইতে সেই দেশের শিল্পের বিবরণ সংগ্রহ।

৩। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সেই শিল্পের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ।

এদেশে উপরোক্ত তিনটি উপায়ের একটিও প্রশস্ত নহে। কেননা—

১। অন্যান্য দেশে প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ ও সেই সম্বন্ধে বিচার নানা সভ্য দেশের জ্ঞানীরা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় করেন এবং তাঁহারা নিজ-নিজ দেশের নিকট হইতে বিপুল অর্থ-সাহায্য পাইয়া থাকেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রসিদ্ধ "পোর্টলাণ্ড ভাস" (গ্রাকো-রোমক খৃঃ পূঃ ১০০)

ফলে তথ্যনির্ণয় অতি সূক্ষ্ম এবং সমীচীন ভাবে হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এই কার্য্য ভারত-সরকারের এক বিভাগের হাতে। সেই বিভাগের বিধাতা-পুরুষগণ নিজের ইচ্ছামত কাজ করেন। এবং সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রবল জ্ঞান-লিপ্সা বা তীক্ষ্ণ মেধা শক্তির প্রকাশ কদাচিৎ কখনও দেখা যায়। সাধারণতঃ নিম্নতর ভারতীয় কর্ম্মচারী কিছু আবিষ্কার করিলে পরে প্রভুদের চৈতন্য হয় এবং তখন তাঁহারা দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত

উক্ত কাচ-পাত্রের গাত্রের উদ্‌গত চিত্রের অংশ

হইয়া নানা ভঙ্গিমার সহিত এই আবিষ্কারে তাঁহাদের নিজের প্রতিভা এবং চেষ্টা কতটা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্বকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে জগৎকে জ্ঞাপন করেন। পরে, আবিষ্কৃত লিপি ও নিদর্শনসকলের কতক নষ্ট হইলে এবং অবশিষ্ট যেটুকু থাকে, তাহার মধ্যে যেসকল বস্তু প্রামাণ্য তাহা ব্রিটিশ মিউজিয়াম্-নামক ভারতীয়দিগের পক্ষে অতলস্পর্শ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইলে, তাঁহারা অটল গাম্ভী-

র্য্যের সহিত এই মত প্রকাশ করেন, যে, এই নূতন আবিষ্কারে এইমাত্র প্রমাণ হইতেছে যে, যেমন আজকাল ইংরাজেরা অসভ্য ভারতবাসীকে শিক্ষাদান করিতেছেন, সেইরূপ প্রাচীনকালে অন্যান্য সভ্যজাতি অসভ্য ভারতবাসীকে শিক্ষাদান করিয়াছিল।

ফলে যে কোন শিল্পের ইতিহাসে প্রাচীন ভারতের কীর্ত্তি-সম্বন্ধে কোনও তথ্য আধুনিক পাশ্চাত্য পুস্তক-সকলে প্রায় স্থান পায় না বলিলেই চলে।

খৃঃ ১১শ শতাব্দীর ইউরোপীয় কাচের কারখানা

এই ত গেল দেবতাদের কথা। ইংরাজীতে প্রবাদ বচন আছে, "For small mercies the good Lord be thanked"; যেটুকু কৃপা হয়, তাহার জন্য প্রভু দেবতাকে ধন্যবাদ দাও। আবার নকল দেবতাদের কাণ্ড আরও অদ্ভুত। সম্প্রতি দিল্লীতে লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লীতে (Legislative Assembly) কোন-কোন দেশপ্রতিনিধির তরফ হইতে প্রায় এইরূপ ইঙ্গিত হইয়াছিল, যে, প্রত্নতত্ত্ব পুরাতন ঘর-বাড়ী খুঁড়িয়া বাহির করা মাত্র; অতএব ঐ বিভাগে বেশী খরচ করিবার দরকার নাই। বেশী খরচটা হইতেছে বার্ষিক ২॥০ লক্ষ টাকা! আমরা নিজেদের সভ্য বা শিক্ষিত বলিলে, সভ্য-জগৎ যে হাসিয়া উঠে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

২। এদেশে পুরাতত্ত্ব-বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা এবং গবেষণা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা এইকার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই এখনও বিশেষভাবে শিল্পবিষয়ে গবেষণা করেন নাই।

৩। অন্যদেশীয় প্রাচীন পুস্তকাদির আধুনিক সংস্করণ সকল স্থানীয় পুস্তকাগার সকলে বিশেষ কিছুই নাই। এদেশীয় পুস্তক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু সে-সকলে কি আছে, তাহা জানিতে হইলে সংস্কৃত ও পালি ভাষা অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত ও পালি এই দুই সাগর মন্থন করিতে হয়। ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্পকলা-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের অবস্থা কি ছিল, সে বিষয়ে কোনও আধুনিক পণ্ডিত (দেশী বা বিদেশী) বিশেষ কিছুই লেখেন নাই। যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা বিপদ্‌জনক।

লেখকের ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা দেওয়া যাইতেছে।

প্রাচীন ভারতে কাচশিল্পের নিদর্শন

১। মোহেন্-জো-দাড়োতে কাচনির্ম্মিত বলয় (বালা) সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা কিরূপ কাচের তৈয়ারি (বিশুদ্ধ কাচ বা এনামেল—মিনা-জাতীয় "প্রাথমিক" কাচ) সে-সম্বন্ধে কিছুই বিশদভাবে প্রকাশিত হয় নাই। বলয়-নির্ম্মাতা প্রাগৈতিহাসিক যুগের "অনার্য্য" ভারতবাসী (দ্রাবিড় ?) ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। বলয়-নির্ম্মাণের সময় এখনো ঠিক হয় নাই। তবে ইহা বলা যায় যে তাহা খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে নিশ্চিত; খুবই সম্ভব খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর, এবং সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৫০০০ হইতে ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়।

২। মগধদেশে প্রাপ্ত কাচনির্ম্মিত "শিলমোহর" (glass seal), ইহা খৃঃ পূঃ ২০০ হইতে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের জিনিষ। ব্রাহ্মী অক্ষর অঙ্কিত।

অন্য কোনও প্রাচীন কাচের দ্রব্যের কথা লেখক অবগত নহেন। সম্ভবতঃ অনেক-কিছুই আছে।

প্রাচীন পুস্তকাদিতে ভারতীয় কাচের কথা

১। শতপথ ব্রাহ্মণের ১৩শ কাণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অষ্টম মন্ত্রে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিবরণ মধ্যে (১৩৷২৷৬৷৮) কাচ শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। বচন, কাচানাবৰ্ত্তি—কাচ সকল বয়ন করে—এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ (Prof. Eggling. Sacred Books of the East) এইরূপ—

But even as some of the offering material may get spilled.......of the victim is here spilled in that the hair of it when wetted. When they (the wives)

weave pearls (into the mane and tail) they gather up its hair. They are made of gold : The significance of this has been explained. A hundred and one pearls they weave into (the hair of each part…)

এগ্‌লিং 'কাচান্‌' অর্থে pearls (অর্থাৎ মুক্তারাজি) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্যই মুক্তা হইলে কাচ শব্দের স্থলে মৌক্তিক বা মুক্তা শব্দের প্রয়োগ হইত না কি? সম্ভবতঃ ইহার অর্থ কাচনির্ম্মিত নকল মুক্তা (পুঁতি)। (পরে "তাহা স্বর্ণনির্ম্মিত হইত"—এই কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে কি বুঝায়? স্বর্ণ-নির্ম্মিত "মটর-দানা"? না অশ্বলোম স্বর্ণখচিত হইত?)

এই স্থলে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ বিরাট ব্যাপার। তাহাতে মেধ্য পশুর লোম কাচের "পুঁতি"র ন্যায় সামান্য জিনিষদ্বারা কি প্রকারে সজ্জিত করা যায়? ইহার উত্তর এই যে, শতপথব্রাহ্মণ রচনার প্রায় ৭-৮ শতাব্দী পরেও কাচ মহার্ঘ্য বস্তু বলিয়া পরিচিত ছিল (কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র)। সুতরাং শতপথব্রাহ্মণের সময় ইহা আরও মহার্ঘ্য হইবার কথা। এই পুস্তক প্রায় খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসরে রচিত হয়।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রম্‌

২-১১-২৯-কোষপ্রবেশ্যরত্নপরীক্ষাপ্রকরণে রাজকোষে রক্ষণোপযুক্ত মণি-মাণিক্যসকল গুণানুসারে বর্ণনা করিয়া অবশেষে "শেষাঃ কাচমণয়ঃ" বলিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, তখন কাচের নকল মণিও রাজকোষে স্থান পাইত; যদিও ইহা মণিমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ বা অল্পগুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত।

অর্থশাস্ত্রম্‌,

২-১৩-৩১, অক্ষ শালায়াম্‌ সুবর্ণাধ্যক্ষপ্রকরণে "ক্ষেপণ" শব্দের অর্থে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"ক্ষেপণঃ কাচার্পণাদীনি" অর্থাৎ কাচের পুতি স্বর্ণে সংযুক্ত (**setting glass beads in gold** "পুতিদ্বারা" "জড়োয়া" কাজ) করাকে ক্ষেপণ বলে। ইহাতেও বোঝা যায় যে, সে-সময়ে কাচের মূল্য কিরূপ ছিল। এই পুস্তক রচনার সময় আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসর।

মৃচ্ছকটিক।

এই নাটকে একটি বিচারালয়ে বিচারের অঙ্ক আছে।

খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর ইউরোপীয় কাচের কারখানা।

কতকগুলি মণি কৃত্রিম বা অকৃত্রিম তাহা লইয়া এইভাবে কথোপকথন আছে।

প্রশ্ন। "তুমি এই অলঙ্কারগুলি চিনিতে পার?"

উত্তর। "আমি কি সেকথা বলি নাই? এইগুলি ভিন্ন বস্তু হইতে পারে, যদিও দেখিতে একইরূপ।

"আমি ইহার অধিক বলিতে পারি না। ইহা সকলই কোনও নিপুণ শিল্পীদ্বারা প্রস্তুত মণির অনুকরণ (কৃত্রিম মণি) হইতে পারে।"

প্র। "ঠিক বলিয়াছ।……(**Provost**) এইগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা কর। ইহা যদিও দেখিতে একই প্রকার, তথাপি ভিন্ন বস্তু হইতে পারে। সেইসকল (অনুকরণকারী) শিল্পীর কার্য্যকৌশল অতি আশ্চর্য্য ইহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহারা কোনও অলঙ্কার একবার-মাত্র দেখিলে তাহার এরূপ অনুকরণ করিতে পারে যে, কৃত্রিম ও অকৃত্রিমে প্রভেদ প্রায় লক্ষ্য করা যায় না।"

কৃত্রিম মণি কাচেরই দ্বারা নির্ম্মিত হইত এবং এখনও হয়। সুতরাং মৃচ্ছকটিকের সময় কাচ শিল্পের একটি

শাপা অন্ততঃ পক্ষে এই দেশে অতি উচ্চস্তরে স্থাপিত হইয়াছিল। মৃচ্ছকটিকের রচনার সময় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই ; সম্ভবতঃ ইহা আরো অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

প্লিনির "প্রাকৃতিক ইতিহাস" (Pliny, Nat. Hist) ৩৬ কাণ্ড, ৩৬ অধ্যায় (Book xxxvi. 66), বলেন, ভারতীয় কাচ অন্য সকল দেশীয় কাচ অপেক্ষা উত্তম, যেহেতু ইহা স্ফটিকচূর্ণ হইতে প্রস্তুত।

খৃঃ ২০শ শতাব্দীর সাবেকি ফুকাশিশির কারখানা

৩৭-২০ তে আরও আছে যে, ভারতীয়েরা স্ফটিকে বর্ণ যোগ করিয়া কৃত্রিম মণি প্রস্তুত করণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। স্ফটিকে (Rock crystal) বর্ণ সংযোগ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং প্লিনি কাচনির্ম্মিত মণির কথাই বলিয়াছেন।

প্লিনির সময় ২৩ হইতে ৭৯ খৃঃ অব্দ।

সুশ্রুত

১-২-৮-৫ এইরূপ পাত্রের বিবরণ আছে,যথা কাচস্ফটিক-পাত্রেষু।

পেরিপ্লস্। (The Periplus of the Erythraen sea)।

এই প্রাচীন গ্রীক পুস্তকে ভারতবর্ষের কাচের আমদানির কথার উল্লেখ অনেক আছে। ইহার সময় খঃ পুঃ ১ম শতাব্দী।

অমর কোষ,

বৈশ্যবর্গ, ৯৯তম শ্লোকে আছে,

ক্ষারঃ কাচোহথ…

নানার্থ বর্গ, ২৮ শ্লোক।

—কাচাঃ শিক্য মৃদ্ভেদ দৃগ্‌ রুজঃ।

সুতরাং অমরের সময় কাচ শব্দের নানা অর্থের মধ্যে ক্ষার এবং মৃৎ-ভেদ (ভিন্ন অবস্থাপ্রাপ্ত মৃত্তিকা) এই দুই অর্থ ছিল।

কাচের একটি প্রধান উপাদান ক্ষার এবং ক্ষার ও বালুকার সংমিশ্রণে কাচের উৎপত্তি। তাহা যে মৃত্তিকার ভিন্ন রূপ মাত্র এরূপ জ্ঞান করা আশ্চর্য্য নহে ; কেন না বালুকা মৃত্তিকার রূপান্তরমাত্র।

অমরের সময় খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে নহে বা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পরে নহে।

পরিশেষে সংক্ষেপে এইরূপ বলা যায় যে, আর্য্য ভারতবর্ষে কাচের ব্যবহার খৃঃ পূঃ ১০-১২ শতাব্দী পূর্ব্বেও নিশ্চয়ই ছিল। কাচ প্রস্তুত হইত কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ কিছু এখনো পাওয়া যায় নাই। সভ্য অনার্য্য (দ্রাবিড় ?) ভারতে ইহারও বহুপূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৫০০০-৩০০০ বৎসর) কাচের ব্যবহার ও নির্ম্মাণ প্রথা দুই বর্ত্তমান ছিল। তবে সেই শিল্প পরবর্ত্তী আর্য্যদিগের সময় পর্য্যন্ত ধাবাবাহিক-রূপে বর্ত্তমান ছিল বা তৎকালে-অসভ্য আর্য্যদিগের অত্যাচারে লোপ পায়, তাহা বলা কঠিন।

খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত কাচ এদেশে মহার্ঘ্য বস্তু ছিল। অর্থশাস্ত্রের কথা আগেই লিখিত হইয়াছে। সুশ্রুতও এক নিশ্বাসে কাচ ও দুর্মূল্য স্ফটিকনির্ম্মিত পাত্রের কথা বলিয়াছেন। অমরের সময় ইহা এদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত বলিয়া বোধ হয় এবং সেই কারণেই ইহা সুলভ হইয়া অর্থশাস্ত্রের "কাচমণয়ঃ"র উচ্চস্থান হইতে অমরের "মৃদ্‌ভেদ" মাত্রের স্থানে পতিত হয়।

অমরের পরবর্ত্তী অভিধানলেখকগণ অমরেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র "মহাব্যুৎপত্তি" গ্রন্থে "কাচক"

ই শব্দের অর্থে কৃত্রিম মণি, প্রকৃতিজাত স্ফটিক-বিশেষ, ই দুই সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে কাচের পরবর্ত্তী ইতিহাসও বিশেষ এখনো উদ্ধার হয় নাই। বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ বিহার-গত বিজ্ঞানের অবনতির সঙ্গে-সঙ্গে কাচশিল্প অন্য অনেক শিল্পের ন্যায় ক্ষীণপ্রাণ হইয়া যায়। পরে মুসলমান-বিজেতার ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার অবস্থা এমন হয় যে, যে-দেশ প্লিনির সময় কাচের জন্য জগদ্‌বিখ্যাত ছিল, সেই দেশে হুমায়ুন বাদশার রাজ্ঞীর কাচের চুড়ী পরিবার সখ মিটাইবার জন্য সুদূর আরব দেশ হইতে কারিগর আনাইয়া তাহাকে রাজ-প্রাসাদ-মধ্যে স্থান দিতে হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় মাহেন-জো-দড়ো অঞ্চলে প্রাচীনতম কাচশিল্পের শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। নিমরুদে (Nimroud Nineveh) প্রাপ্ত সারগন (Sargon) নামাঙ্কিত পাত্র দি (Akkadian Sargon) আক্কাদিয় সারগনের সময়ের হয়, তাহা হইলে তাহাও এই অনার্য্য (?) অতি ভারতীয় কাচশিল্পের সমসাময়িক।

যাহাই হউক ইহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়, যে, মশরীয় বা ফিনিসীয় কাচশিল্পের বিকাশের বহু পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে স্থিত বা পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী দেশে স্থিত লুপ্ত সভ্য অঞ্চলসমূহে এই শিল্প জন্মলাভ করিয়া অন্যান্য দেশে ক্রমে-ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে।

ভেনিসীয় কাচের জলাধার। খৃঃ ১৮শ শতাব্দী।

ইয়োরোপে কাচ।

ইয়োরোপে প্রাচীন গ্রীস্ দেশে কাচের আদর বা বিশেষভাবে কাচশিল্পের চর্চ্চা বড় একটা হয় নাই। গ্রীস্ রোমক সাম্রাজ্যাধীন হইলে পরে গ্রীক-রোমক (Graeco-Roman) জগতে কাচের আদর এবং ঐ শিল্পের উন্নতি হয়। এবং ঐ সময়ের কয়েকটি নিদর্শন যাহা এখনো বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, যে, ঐ যুগে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে ঐ শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত । এই নিদর্শনগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ পোর্টল্যাণ্ড্ ভাস্ (The Portland vase, British Museum) নামক পাত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহার দুই স্তর কাচে নির্ম্মিত। নীচের স্তরটি গাঢ় নীলবর্ণ, উপরেরটী অস্বচ্ছ বিশুদ্ধ শ্বেত-বর্ণ। প্রথমে ইহার গাত্র সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ ছিল। কেন না নীচের নীল কাচের স্তরকে শ্বেত স্তর সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া ছিল। পরে শিল্পী পরম দক্ষতার সহিত স্থানে স্থানে শ্বেত স্তরটি যথাযোগ্য ভাবে কাটিয়া নীচের নীল স্তর প্রকাশ করিয়া তাহার উপর শ্বেত স্তরের অবশিষ্টাংশদ্বারা অতি সুন্দর চিত্র করিয়াছেন। এই অপরূপ দ্রব্যটি খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

রোমকগণ সুন্দর কাচ দ্রব্যের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। উত্তমরূপে কর্ত্তিত কারুকার্য্যযুক্ত (decorated by relief work undercut by hand) কাচ দ্রব্যাদি রোমক ধনী-গণের নিকট বিলাস-দ্রব্য রূপে আদৃত হইত। নানা বর্ণ-ভূষিত কাচদ্রব্যের—বিশেষে যদি বর্ণ-যোজনা সুললিত

হইত—মূল্য অত্যন্তই বেশী ছিল। কিন্তু সকলের অপেক্ষা মূল্য সম্পূর্ণ বর্ণহীন, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল কাচেরই ছিল। শোনা যায়, সম্রাট নীরো ঐরূপ একজোড়া কাচের পান-পাত্র ৬০০০ সেস্তেরুটিয়া (6000 sestertia) অর্থাৎ প্রায় ৭৫০,০০০টাকা মূল্যে ক্রয় করেন।

রোমকগণ এই বিষয়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করেন এবং বহুদেশে—যথা গল্, ব্রিটেন ইত্যাদিতে, ইহার প্রচার করেন। রোম প্রথমে মিশর এবং সীরিয়া হইতে কাচ আমদানি করে। পরে ঐ সকল দেশ রোম-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে, ঐ সকল দেশ হইতে বহু কারিগর রোমে আসিয়া কাচশিল্পে রোমকদিগকে শিক্ষা দেয়। বিশেষে সম্রাট্ টাইবেরিয়সের (Tiberius, 14 A. D.) সময় এই কাচের বিস্তার হয়। রোমকগণ বিশেষ খরবুদ্ধি ও কলানিপুণ ছিলেন। সুতরাং অল্প সময় মধ্যেই তাঁহারা তাঁহাদিগের শিক্ষকগণের সমকক্ষ হইয়া উঠেন।

রোমের ধ্বংসের পর সেই সাম্রাজ্যের এক ভূতপূর্ব্ব অংশ বাইজান্টিয়ামে (Byzantium) বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় তুর্কীদেশে কাচের কার্য্য বহুকাল সতেজে চলিতে থাকে। পরে এই রাজ্যের পতনের সহিত তথাকার কাচশিল্প প্রায় লোপ পায়। কিন্তু ইতিমধ্যে ভেনিসীয় জাতি বাইজান্টিয়ামের রাজধানী কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল ১২০৪ খ্রীঃ জয় করেন। এই বিজয়ের ফলে ভেনিসে কাচশিল্প দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং তাহার ক্রমে এরূপ উন্নতি হয়, যে, এখনো ভেনিসীয় কাচদ্রব্যাদি জগৎময় বিখ্যাত ও আদৃত।

ভেনিসীয়গণ তদ্দেশীয় কাচশিল্পের নানা তথ্য ও গুহ্য প্রণালী, সংঙ্কেত প্রক্রিয়াদি অতি সন্তর্পণে গুপ্ত রাখা সত্ত্বেও ধীরে-ধীরে ইয়োরোপের অন্যান্য জাতি ইহা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। ভেনিস এই সময়ে কাচ দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে জগতে সর্ব্বপ্রধান ছিল। সত্যসত্যই সেই সময়ে এই কাচশিল্পই ভেনিসের সমৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ ও উপায় ছিল। বিশেষে মার্কো পোলো (Marco Polo) ১২৯৫ খৃঃ ভেনিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চীন ও ভারতে ভেনিসের কাচনির্ম্মিত মুক্তা ও কৃত্রিম মণি-মাণিক্যের বিশাল বিক্রয়স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ভিনিসীয়গণ অসমসাহসিক সামুদ্রিক বাণিজ্যদক্ষ জাতি ছিল। সুতরাং মার্কো পোলোর নির্দ্দেশ তাহারা অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য বাণিজ্যক্ষেত্রে কাচ বিক্রয় করিয়া বিপুল অর্থলাভ করিতে থাকে।

ফলে যতই অন্য সকল জাতি কাচ-সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে লাগিল, ততই ভিনিসীয়গণের ভয় হইতে লাগিল, যে, বুঝি বা তাহাদের একাধিপত্য যায়। এই ভয়ে প্রথমে সেদেশে এইরূপ সকল আইন করা হইল যাহা দ্বারা কেহ বিদেশে কাচের উপাদান বা কাচ-প্রস্তুত করণের সঙ্কেত (formulae) বিক্রয় করিলে বা বিদেশীকে শিক্ষাদান করিলে এই অপরাধের শাস্তিরূপে তাহার যথা-সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করা হইত। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পরে ১২৮৯খৃঃ নিয়ম করা হইল যে, সকল কাচশিল্পী ও সমস্ত কাচ কারখানা ভেনিসের নিকটবর্ত্তী মুরানো (Murano) নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে থাকিবে, অন্য কোথাও থাকিতে পারিবে না। দ্বীপে স্থান নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে এইমাত্র যে, তাহাতে রাষ্ট্রীয় পুলিস প্রহরী, গোয়েন্দা ইত্যাদি "রক্ষক"দিগের কার্য্যের সুবিধা হয় এবং লুকাইয়া নিষিদ্ধ কার্য্য করার অসুবিধা হয়, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ হইল যে এই সকল বিধান, কেবল মাত্র কাচ প্রস্তুতকারক এবং শিল্পীদিগকে উপযুক্তভাবে "রক্ষণ" করার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। এইরূপে ক্রমেই কঠিন নিয়ম সকল গঠিত হইতে লাগিল।

শেষে এই সুসভ্য ইয়োরোপীয় জাতি নিম্নলিখিত আইন প্রণয়ন করিলেনঃ—"যদি কোন কাচশিল্পী বিদেশে যাইয়া আপন কার্য্য করে তাহা হইলে তাহাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করা হইবে।"

"যদি সে এই আদেশ অমান্য করে তবে তাহার দেশস্থ আত্মীয় স্বজনকে কারারুদ্ধ করা হইবে।" "যদি ইহাতেও সে ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে গুপ্ত-ঘাতক প্রেরণ করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইবে * ।"

* 26th article of the statutes formed by the State Inquisition of the Council of ten on or about 1547 A. D.
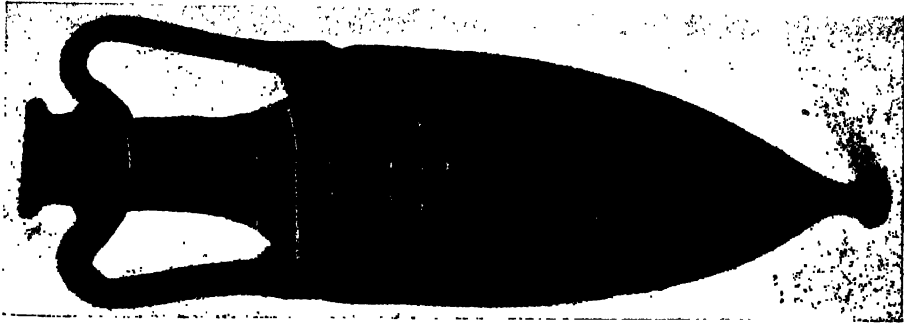
প্রাচীন মিশরের কাচপাত্র

প্রাচীন রোমের কাচপাত্র (উপরে)
মধ্যযুগের চীনদেশের কাচপাত্র (নীচে)

মধ্যযুগের চীনদেশের কাচপাত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]
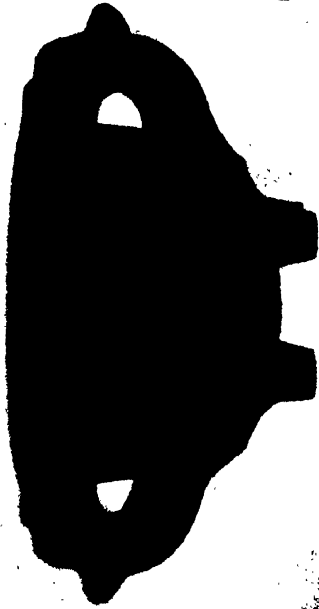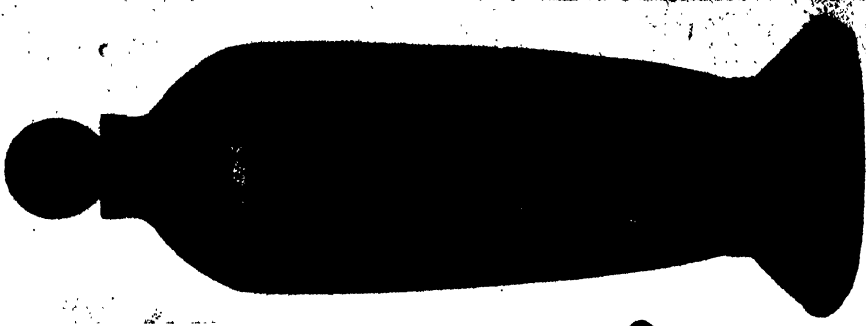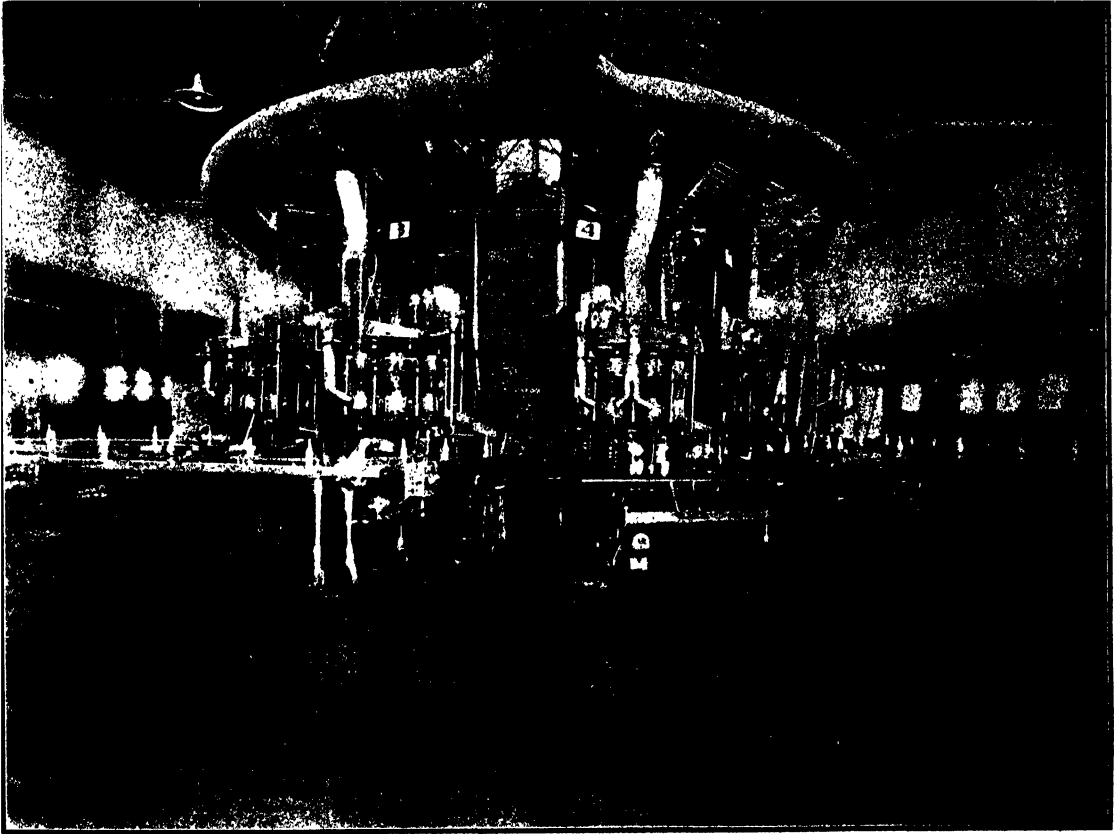
আমেরিকান শিশির কারখানা। দুইটি স্বয়ংবহ আওয়েন্ (Owen) যন্ত্রে বোতল তৈয়ারী হইতেছে। ছবিতে দুইপার্শ্বে বোতলের সারি বাহক যন্ত্রে (Automatic carriers) তাপ নিষ্কাশন চুল্লীশ্রেণীতে যাইতেছে।

উপরোক্ত "ন্যায় বিধান" ১৫৫০ খৃঃ কাছাকাছি লিপি-বদ্ধ করা হয়। বিধানকার বিখ্যাত ভেনিসীয় "দশের সংসদ" (Council of Ten, Venice)। এই আইন যে শুধু "ভয় দেখাইবার" জন্য হয় নাই, তাহার প্রমাণ যে, কিছুদিন পরে জর্ম্মন সম্রাট্ লিয়পোল্ড-নিযুক্ত দুইজন ভেনিসীয় কাচশিল্পী এইরূপে গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক হত হয়। আরও আশ্চর্য্য এই, যে, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে ভেনিসীয় রাষ্ট্রীয় ন্যায়-সংসদ (High Council) এই সকল চিঠি পুনরনুমোদন (confirm) করেন।

শিল্পক্ষেত্রে সুসভ্য "ইয়োরোপীয় শ্বেত" জাতির এই কীর্ত্তি অমর ও অপরূপ!

যাহা হউক ভেনিসের এইরূপ চেষ্টা সত্বেও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশে কাচের কারখানা স্থাপন ও কাচ নির্ম্মাণের চর্চ্চা চলিতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্ম্মানী বেশ কুশলী হইয়া উঠে। তাহার পরেই বোহেমিয়া (Bohemia) এবং বর্ত্তমান চেকো-স্লোভাকিয়া (Czecho-Slovakia) এই কার্য্যে অদ্ভুত কুশলী হইয়া উঠে। এই দেশে ভেনিস বা জার্ম্মানী অপেক্ষা বহুঅংশে নির্ম্মলতর কাচ প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং এই দেশেই সর্ব্ব প্রথমে কাচের উপর যন্ত্র সাহায্যে কারু কার্য্য খোদনের প্রথা আবিষ্কৃত হইল।

ইংলণ্ডে কাচের কারখানা প্রথমে বিজেতা রোমকগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। কিন্তু পরে সে সমস্তই লোপ পায়। খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবার কাচের কারখানার কথা

শোনা যায়। কিন্তু আসলে পুঃ ষোড়শ শতাব্দীতেই, বিদেশ (ফ্রান্স ও হলাণ্ড) হইতে আনীত কারিগরের সাহায্যে, ইংলণ্ডে কাচশিল্পের প্রতিষ্ঠা উত্তমরূপে হয়।

ফ্রান্সে কাচের ইতিহাস ও ইংলণ্ডের মধ্যে কেবল প্রভেদ এই যে, সেখানে কিছু আগে বিদেশীর কাছে কার্য্য শিক্ষারম্ভ হয়, এবং এই বিদেশী সকল ইটালীয় ছিল। এখন কাচের দ্রব্যাদিতে খ্যাতিবিশিষ্ট জাতি এই কয়টি (প্রত্যেক দ্রব্যের পর গুণানুসারে নাম লিখিত হইয়াছে)—কাচের বোতল। জর্ম্মানী, আমেরিকা, চেখো-স্লোভাকিয়া, বেলজিয়ম ও জাপান। যন্ত্র দ্বারা বোতল নির্ম্মাণ কার্য্যে আমেরিকা (U. S A.) সর্ব্ব প্রধান।

জানালা, আলমারী ইত্যাদিতে ব্যবহার্য্য "সার্সি" কাচ (Sheet glass)। বেলজিয়ম, আমেরিকা, জর্ম্মনী।

আয়নার কাচ (Plate and Polished glass)। জর্ম্মানী, চেখো-স্লোভাকিয়া, আমেরিকা।

বীক্ষণ যন্ত্রাদিতে ব্যবহার্য্য কাচ (Optical glass)। জর্ম্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড।

কাচের পাত্রাদি। এই বিষয়ে কয়েকটি দেশের ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত্ব আছে যথা :—

খোদিত ও কর্ত্তিত কাচ (Cut and Engraved glass), চেখো-স্লোভাকিয়া, জর্ম্মনী, ভেনিস। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং বিশেষ পাতলা কাচের কাজ। ভেনিস, (ফ্রান্সে অতি অল্প)।

ভিন্ন বর্ণের স্তরযুক্ত কাচের উপর কারুকার্য্য। ফ্রান্স, জর্ম্মনীতে কিছু, আমেরিকায় অল্প।

নানাবর্ণের কাচের "পুঁতি" বা গুলি এবং বর্ণযুক্ত কাচ-খণ্ড (Coloured raw glass)। চেখো-স্লোভাকিয়া। কাচের উপর মিনার (enamel) কাজ করা "পুঁতি"—ভেনিস। কাচ পাত্রের উপর মিনার কাজ—জর্ম্মানী। তাপ-সহ (heat rasisting) কাচ—জর্ম্মানী, আমেরিকা। কাচের কৃত্রিম মুক্তা (Imitation pearls)—ফ্রান্স।

জগতে কাচের ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে জর্ম্মানী, জাপান, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম এবং চেখো-স্লোভাকিয়া এই কয়টি প্রধান। তন্মধ্যে জর্ম্মানী ও চেখো-স্লোভাকিয়া এই দুইটিই এখন ক্রমোন্নতি সাধন করিতেছে। সুতরাং যাঁহারা কাচ-শিল্প শিক্ষা বা চর্চ্চা করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ দুই দেশই শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

কাচ বিষয়ক অনেক কিছুই ত লেখা হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে কাচ পদার্থটি কি প্রকার? অনেকে মনে করিতে পারেন, যে, এই প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক, কেননা নিতান্ত অশিক্ষিত এবং অসভ্য বর্ব্বর ভিন্ন কাচ যে কি তাহা সকলেই জানে। জানালার সার্সি, ঔষধের শিশি, মুখ-দেখা আয়না, জলের গেলাস, চক্ষের চশমা, লণ্ঠনের আবরণ বা চিম্নি, পরণের চুড়ি, রোগশয্যার তাপমানযন্ত্র (thermometer), কালির দোয়াত, এ সকল তৈয়ারী হয় যে স্বনামধন্য কাচে, সেই কাচের আবার পরিচয় কি? পরিচিত ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত নিষ্প্রয়োজন। তবে কাচ কি প্রকার বস্তু তাহার বিশেষ আর কি বর্ণনা করা যায়?

কাচ একপ্রকার স্বচ্ছ, স্বভাবত মসৃণ, কঠিন, ভঙ্গুর, রাসায়নিক প্রক্রিয়া-বিহীন (chemically inert), অস্থিতিস্থাপক (non-elastic), স্ফটিকভাবাপন্ন (crystal-like), ঘন (solid) পদার্থ। ইহা প্রবল উত্তাপ বা আঘাত ভিন্ন সহজে নষ্ট হয় না। লৌহের মত মরিচা ধরা, পিতলের ন্যায় কলঙ্ক পড়া, কাঠের মত উই বা অন্য পোকায় ধরা, এই সকল "বালাই" কাচের জিনিষে নাই।

কাচের এই গুণ-বিবরণ এক হিসাবে ঠিক, অন্য হিসাবে বেঠিক। যথা :—কাচের স্বচ্ছতা চিরস্থায়ী নহে, কেননা কালে স্বচ্ছ কাচও ধীরে অস্বচ্ছ হয়; কোনটা ২০।২৫ বৎসরেই কোনওটা কয়েক শত বা সহস্র বৎসরে। আবার অনেক প্রকার কাচ আছে যাহা প্রথম হইতেই অস্বচ্ছ, যথা টেবল-ল্যাম্পের দুগ্ধ বর্ণ (Milky white) বা উপরে নীল, নীচে শ্বেত বর্ণ "শেড্" (shade)। আবার কাচের কাঠিন্যেরও বিস্তর তারতম্য আছে। কোনটার, যথা "পলকাটা" শিশির কাচ, বা সহজেই আঁচড় পড়ে আবার অন্যতে—যথা নকল মণি—অতি কঠিন ইস্পাত অস্ত্রেও আঁচড় কাটিতে পারে না। এইরূপে বিভিন্ন প্রকার কাচে বিভিন্ন প্রকৃতির গুণাবলী পাওয়া যায়। কাচ স্থিতিস্থাপক নহে এবং ভঙ্গুর-প্রকৃতি ইহা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কিন্তু এক প্রকার কাচ আছে যাহা অল্প মাত্রায় স্থিতিস্থাপক এবং মোটেই ভঙ্গুর বলা চলে না।

এক কথায়, কেবল সাধারণ, ভৌতিক বা জড় গুণাবলী (physical properties) বর্ণনা করিয়া কাচ যে কি পদার্থ তাহা ব্যাখ্যা বা নির্দ্দেশ করা যায় না। কেননা, যেমন ভারতবাসী বলিলে নানা জাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মের, নানা প্রকৃতির ও নানা শ্রেণীর এক বিশাল জনসমষ্টি বুঝায়, তেম্‌নি কাচ বলিতে একটি বৃহৎ পদার্থসমষ্টি বুঝায়, যাহার মধ্যে নানাপ্রকার বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন বস্তু আছে। তবে কাচ বলিলে যাহা বুঝায় সে সকল বস্তু-মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে।

কাচজাতীয় পদার্থ মাত্রই কতকগুলি বিভিন্ন ক্ষার পদার্থের সহিত বালু-সার বা সিলিকা (Silica SiO_2) অথবা সোহাগার রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন বস্তুর একাধিকের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। যথা, সাধারণ শিশি বোতলের কাচ সোডা, চূন ও এলুমিনা এইতিন ক্ষার পদার্থের সহিত বালুসারের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তিনটি বস্তু সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে কাচ প্রকৃত পক্ষে ঘন (solid) পদার্থ নহে। উহা অতি গাঢ় তরল পদার্থ (congealed liquid) মাত্র। ইহা কিরূপে হইতে পারে তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝান যায়।

রাস্তার ঢালিবার জন্য যে এক প্রকার কঠিন আলকাতরা বা পিচ ব্যবহার করা হয় সেইরূপ পদার্থ বা অপরিষ্কৃত মোম, এইসকল বস্তুর একটি বিশেষ গুণ আছে। অধিক উত্তাপে এইসকলবস্তু গলিয়া তরলভাব ধারণ করে। এইরূপ তরল অবস্থায় যদি তাহা ক্রমশঃ শীতল করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে শীতল হইবার সঙ্গে উহা ক্রমে অল্পে-অল্পে আঠালো ভাব ধারণ করে। তরল অবস্থায় এই সকল পদার্থকে জলের ন্যায় এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা যায়। ক্রমে যেমন তাহা শীতল হয়, ততই তাহাকে ঢালা কঠিন হয়। ততোধিক শীতল হইলে তাহা আরও গাঢ় এবং আরও আঠালো হয়। শেষে তাহা শীতল হইলে অর্থাৎ শরীরের সমান শীতল হইলে (at body temperature). তাহা এতই গাঢ় এবং আঠালো হয় যে, এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা অতিশয় সময়-সাধ্য, একেবারে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও যে তাহার তরল

বোহেমীয় হস্তে ক্ষোদিত (Engraveo) কাচ পাত্র

ভাব থাকে তাহার প্রমাণ এই যে, যে-পাত্রে তাহা আছে সেই পাত্র উল্টাইয়া বা কাৎ করিয়া রাখিলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় যে, এই বস্তুরাশি অল্প গড়াইয়া পড়িয়াছে। আলকাতরার পিচ (pitch) কঠিন দৃঢ় পদার্থ। ঘন পদার্থের (solid) সকল বাহ্যিক লক্ষণই তাহাতে আছে। অথচ কেম্ব্রিজের পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে এক খণ্ড পিচ একটি কাচের ফানেলে (Funnel) রাখিলে বিনা উত্তাপে, বিলাতের মত শীতল দেশেও উহা অতি ধীরে প্রবাহিত (flow) হইয়া ফানেলের সংকীর্ণ অংশে প্রবেশ করে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে অতি কঠিন প্রস্তরবৎ পিচখণ্ড চৌদ্দ বৎসরে কিঞ্চিদাধিক এক ইঞ্চি প্রমাণ

প্রবাহিত হইয়াছে। প্রবাহ-শক্তি একমাত্র তরল পদার্থেরই আছে। সুতরাং ঐ পিচখণ্ডও গাঢ়ভাবাপন্ন তরল পদার্থ মাত্র!

কাচও ঐ প্রকার গাঢ় তরল পদার্থ। যথার্থ ঘন পদার্থের নিয়ম এই যে তাহা কোন এক বিশেষ ডিগ্রি উত্তাপে (fixed temperature) সহসা ঘন হইতে তরলভাব ধারণ করে। যেমন বরফ শূন্য হইতে এক ডিগ্রি সেন্টি-গ্রেড উত্তাপের মধ্যে কঠিন অবস্থা হইতে সহসা সম্পূর্ণ তরল অবস্থায় উপস্থিত হয়।

জগতের যাবতীয় পদার্থই অণুর (Molecule) সমষ্টি মাত্র। তন্মধ্যে প্রকৃত ঘন পদার্থের শরীরে অণুবৃন্দের বিশেষ গঠন আছে (Molecular group, structure)। তরল পদার্থের কোনও প্রকার অণুর গঠন নাই। যেমন ইঁট বিশেষ ভাবে স্থাপন ও যোজন করিলে তাহা গৃহের আকার ধারণ করে, কিন্তু ইঁটের স্তূপের কোনও বিশেষ গঠন বা আকৃতি নাই। এই বিশেষ গঠনের কি প্রমাণ বা তাহার কি পরীক্ষা, তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নহে। যাহাই হউক, সেইসকল পরীক্ষায় অনুমান হয় যে, কাচ তরল পদার্থের ন্যায় সংস্থানযুক্ত (liquid in structure).

যে সকল ক্ষারের সহিত বালুসার বা সোহাগার রাসায়নিক সংযোগে কাচ উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এই কয়টি, যথা—সোডা (Sodium Carbonate), পটাশ (Potassium Carbonate), চূণ, সীসকভস্ম (lead oxide), এলুমিনা (Aluminium oxide or Aluminum), ইহা ছাড়া বেরিয়ম, দস্তা, টিন বা রসাঞ্জন, এই ধাতুগুলির ভস্ম (oxide) অল্পবিস্তর ব্যবহার হয়। কাচের রং পরিষ্কার বর্ণহীন করিবার জন্য ম্যাঙ্গানিজ এবং শঙ্খিয়া (arsenic সেঁকো বিষ) ও ব্যবহার করা হয়।

এই সকল ক্ষার ও বালুসার ইত্যাদি অম্লভাবাপন্ন পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে এবং পরস্পর মধ্যে দ্রাবণ (mutual solution) করিয়া কাচ প্রস্তুত করার এক মাত্র উপায় প্রচণ্ড উত্তাপ।

কাচ একবার প্রস্তুত হইয়া গেলে তাহাকে গলাইতে (melting) বিশেষ প্রচণ্ড উত্তাপের প্রয়োজন হয় না। সেন্টিগ্রেড ১০০০° ডিগ্রি হইতে ১১৫০° ডিগ্রির মধ্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত তাপসহ কাচ (resistance glass) ভিন্ন অন্য সকল কাচ গলিয়া যায়। কিন্তু স্থূল উপাদান হইতে কাচ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায় সেন্টি ১৪০০°, ১৫০০° ডিগ্রি উত্তাপের প্রয়োজন। ইহার কমে কাচ ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে কাচের উৎকর্ষেরও হানি হয়।

এইরূপ প্রচণ্ড উত্তাপ যে সাধারণ চুল্লীতে হয় না তাহা সহজেই অনুমেয়। কাচ গলান চুল্লী সাধারণ বালুসার (silica) অথবা তাপসহ মৃত্তিকা (fireclay) নির্ম্মিত ইট এবং বৃহৎ চাপ (blocks) দ্বারা গ্রথিত হইয়া থাকে।

এই প্রকার চুল্লী একটি লম্বা ঘরের মত দেখিতে। ঘরের ছাদ নীচু এবং খিলান করা (concave উত্তান)। ইহার এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র দরজা। তাহা দিয়া উপাদান সকল ভিতরে ঢালা হয়। এক এক পার্শ্বে ছোট জানালার মত দুই তিনটি বা ততোধিক ফুকর যাহা দ্বারা এক পাশে ঘরের ভিতর অগ্নিদান এবং অন্য পার্শ্ব দিয়া ধূম এবং অগ্নিজাত বাষ্পাদি নিষ্ক্রামণ হয়। ঘরের মধ্যভাগে আড়া-আড়ি একটি নীচু দেওয়াল। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, অসংস্কৃত কাচ ঘরের সম্মুখভাগে যাহাতে না যাইতে পারে। বিশুদ্ধ কাচ অসংস্কৃত কাচ অপেক্ষা ভারী এবং সেইজন্য তাহা নীচে ডুবিয়া যায়। ঘরের মধ্যবর্ত্তী দেওয়ালের নীচে কয়েকটি ফুকর থাকে যাহা দ্বারা বিশুদ্ধ কাচের প্রবাহ সম্মুখভাগে প্রবাহিত হইয়া যায়। ঘরের সম্মুখভাগের দেওয়ালে কয়েকটি ফুকর থাকে তাহার ভিতর দিয়া উত্তপ্ত তরল কাচ সংগ্রহ করা যায়।

অগ্নিসংযোগ সাধারণতঃ প্রোডিউসার গ্যাস জ্বালাইয়া করা হয়। জলন্ত অঙ্গারের উপর জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ু চালন করিলে এই প্রকার গ্যাস জন্মায়।

কাচ প্রস্তুত করার উপাদানগুলি যদি বিশুদ্ধ হয় তবে কাচও ভাল হয়। সুতরাং প্রতি কারখানায় উপযুক্ত পরীক্ষক থাকা উচিত (এবং বিদেশে তাহা আছেও) যিনি রাসায়নিক এবং বীক্ষণ-যন্ত্রাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেক উপাদানের শুদ্ধতা এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করিতে পারেন। উৎপন্ন কাচও তাঁহার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

স্থূল উপাদান সকল পরীক্ষিত হইলে, তত্ত্বাবধায়ক

(Manager) কোন্‌টির কি পরিমাণ লইতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করেন। সেই অনুযায়ী বালি, সোডা, চুণ, আলুমিনা ইত্যাদি ওজন করিয়া মিশ্রণাগারে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে এইসকল পদার্থ উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবার পরে সেই মিশ্রের কয়েকটি নমুনা একবার পরীক্ষা করা হয়, উদ্দেশ্য এই যে, মিশ্রমধ্যে প্রত্যেকটি উপাদান নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আছে কি না। এই সময় কাচ যদি বর্ণহীন "সাদা কাচ" করা উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এই মিশ্রের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ "বর্ণশোধক" (Decoloriser), যথা শঙ্খিয়া চূর্ণ বা মাঙ্গানিজ পেরোক্সাইড, মিশানো হয়। পরে এই মিশ্র চুল্লীতে ঢালা হয়। উত্তমরূপে পরিচালিত চুল্লীতে সমস্ত দিনরাত্রই ক্রমাগত এই মিশ্র ঢালা হয়।

সাধারণ চুল্লীতে প্রস্তুত কাচ অতি শুদ্ধ হয় না। কারণ অগ্নির সহিত ছাই, চুল্লীর দেওয়াল গাত্র হইতে ইষ্টক চুণ ইত্যাদি পদার্থ কাচকে দূষিত করে। সেইজন্য অতি শুদ্ধ কাচ প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার মিশ্রিত উপাদান সকল উপরোক্তভাবে চুল্লীর মেঝেতে (floor) না ঢালিয়া, চুল্লীমধ্যে স্থাপিত তাপসহ মৃৎপাত্রে (fireclay pots) ঢালা হয়। মৃৎপাত্রে স্থিত উপাদানের মধ্যে বাহিরের আবর্জ্জনা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

বিভিন্ন প্রকার কাচের জন্য বিভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হয় ও তাহাদের পরিমাণেরও যথেষ্ট তারতম্য হয়। কয়েক প্রকার কাচের উপাদান ও পরিমাণ নীচে দেওয়া গেল।

কি প্রকার কাচ	বালি sand	সোডা Soda Ash	পটাশ Pot-carb Anhy-drous	সোডা সল্‌ফেট Sod. Sulphate	চুণ Lime	চুণ পাথর Lime stone	সীসক ভস্ম Lead oxide	সোরা Salt-petre	সোহাগা Borax	এলুমিনা alumi-na	শঙ্খিয়া Arseni-ous oxide	ম্যাঙ্গানিজ Manga-nese Dioxide	কয়লা Coal or char coal
বোতোলের কাচ দেশী	৪০	১৫-১৭	—	—	৫	—	—	১/২	—	২	—	১/১৬ আন্দাজ	—
ঐ বোহেমিয়	১০০	—	৫০	—	—	২২ ৫	—	১.৫	—	১	.২৫	১.৫	
বর্ণহীন	১০০	—	৬০	—	১০	—	—	১		—	.২৫	—	—
ঐ সাধারণ বিদেশী	১০০	—	—	২৫		৩৪				২			৩
জানালার কাচ	১০০০	—	—	৪০০		৩৫০							১০
সাধারণ আয়না	১০০০	৪০		৪০০		৪১০							১১
ভোজনপাত্রাদির কাচ	১০০		২৬				৭০	৩.৩	৪				

মিশ্রিত উপাদান সকল গলিয়া প্রথমে "দানাদার" তরল কাচ হয়। অর্থাৎ তরল কাচ রাশির মধ্যে অসংখ্য বুদ্‌বুদ এবং, গাওয়া ঘি বা উৎকৃষ্ট মধুর মধ্যে যেরূপ দানা থাকে, সেইরূপ পদার্থ থাকে। কিছুক্ষণ আরও উত্তাপ পাইলে সমস্ত কাচরাশি নির্ম্মল ও জলের মত তরল ভাব ধারণ করে। এই সময় ইহা কার্য্যোপযোগী হয়।

শিশি, বোতল, চিম্‌নি, পুষ্পাধার ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে কাচশিল্পী একটি ৫ বা ৫।।০ ফুট লোহার নলের মুখ এই কাচরাশিতে ডুবাইয়া এবং ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া নলের অগ্রভাগে একতাল প্রায় তরল কাচ সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করিবার পরেই কাচ শীতল ও গাঢ় হইতে থাকে। কাচ অল্প গাঢ় হইলেই শিল্পী ঐ কাচের তাল

একটি মসৃণ লৌহপাতের উপর গড়াইয়া তাহার উপরিভাগ সমান করিয়া এবং কাচের পরিমাণ নলের সর্ব্বদিকে সমান করিয়া লয়, যাহাতে নলের মুখ কাচের তালের ঠিক কেন্দ্রে থাকে। ইহার পর শিল্পী নলের অন্য দিক্ মুখে দিয়া ধীরে ফুঁ দেয়। তাহাতে কাচের তালের ভিতর বাতাস প্রবেশ করিয়া তাহা অল্প ফাঁপাইয়া দেয়। ইহার পর ঐ কাচযুক্ত

জার্ম্মান কর্ত্তিত এবং মিনাকার্য্যে (enamel) চিত্রিত কাচপাত্র

নলমুখ একটি লৌহ কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছাঁচের ভিতর স্থাপন করিয়া শিল্পী নলের অন্যমুখে সজোরে ফুঁ দেয়। কাচের তাল ইহাতে ফুলিয়া ছাঁচের ভিতরভাগে সমান ভাবে লাগিয়া ছাঁচের ভিতরের আকৃতি ধারণ করে। তৎপরে কাচ কঠিন হইলে শিল্পী তাহা নলের মুখ হইতে কাটিয়া পৃথক করে। এখনও ঐ কাচের দ্রব্যটির যে অংশ নলের সহিত সংযুক্ত ছিল, সে অংশ অসমান ও বিকৃত। সুতরাং এই দ্রব্যটি অন্য একজন শিল্পী পুনর্ব্বার উত্তপ্ত করিয়া বা ঘষিয়া, যন্ত্রসাহায্যে উপযুক্তভাবে আকৃতিযুক্ত করে।

এই সকল কার্য্যের পর কাচের দ্রব্যটি দেখিতে ঠিক্ হয়, কিন্তু তাহা ব্যবহারোপযুক্ত হয় না। তাহার কারণ এই কাচ শীঘ্র শীতল হইলে তাহার উপরিভাগ প্রথমে কঠিন এবং সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ভিতরে কাচ তখনও উত্তপ্ত থাকে এবং এই উত্তাপ বাহির হইবার পথে উপরের কাচকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে উপরের কাচ সঙ্কোচন ও ভিতরের কাচ প্রসারণ করার চেষ্টা করায় কাচের স্থানে স্থানে অসমান চাপের (unequal stress)এর উদয় হয় যাহার ফলে দ্রব্যটি শীঘ্রই ফাটিয়া যায়। ইহার প্রতিষেধের জন্য ঐ দ্রব্যটি একটি অন্য চুল্লীতে পুনর্ব্বার উত্তাপের সাহায্যে নরম করিয়া লইয়া অতি ধীরে শীতল করা হয়, যাহাতে সমস্ত কাচ সমভাবে শীতল হইয়া চাপশূন্য হয়। এই প্রকার চাপনিষ্কাশনের (annealing) উপর কাচের দ্রব্যটির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, এবং এইজন্য চাপনিষ্কাশন চুল্লী বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত হয়। শ্রেষ্ঠ চাপনিষ্কাশন চুল্লী সুড়ঙ্গের মত। সুড়ঙ্গের এক প্রান্ত কাচ নরম হইবার মত উত্তপ্ত এবং অন্য প্রান্ত শীতল থাকে। ইহার মধ্যে কাচ-দ্রব্য-বাহক পাত্র (continuous carrier) সকল ক্রমাগত চলিতে থাকে এবং তাহার উপর স্থাপন করিলে কাচের দ্রব্যাদি প্রথমে উত্তপ্ত এবং পরে ধীরে ধীরে শীতল হইয়া অন্যদিকে বাহির হয়।

এইদেশে কাচের চুল্লীতে অগ্নি প্রদান, তন্মধ্যে কাচের স্থূল উপাদান নিক্ষেপ, কাচ সংগ্রহ করা এবং "ফুঁকা," তাহার উপরি ভাগ নির্ম্মাণ এবং তৎপরে চাপ নিষ্কাশন চুল্লীতে স্থাপন, সকলই "হাতের কাজ" অর্থাৎ শিল্পী ও শ্রমজীবীরা করে। ইহাতে কাচ উৎপাদন এবং ফুঁকা ইত্যাদি সমানভাবে (uniformly) হয় না এবং বিস্তর জিনিষ নষ্ট হয়। ফলে সমস্ত দিনে তিনদলে বিভক্ত ত্রিশজন শিল্পী প্রায় ১৬০।১৭০ জন সাহায্যকারী ও শ্রমজীবীর সাহায্যে ১২ হইতে ১৫ হাজার শিশি নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইহাতে নির্ম্মাণে

খরচই প্রায় ১৫০টাকা পড়ে। নির্ম্মিত শিশিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুগঠিত, সমাকৃতি বা সম্পূর্ণ চাপশূন্য হয় না। বিদেশে এইজন্য ক্রমে এইসকল কাজই স্বয়ংবহ (automatic) যন্ত্রে হইতেছে।

এইপ্রকার স্বয়ংবহ যন্ত্রমধ্যে আমেরিকার আওয়েন্স (Owen's)যন্ত্র শিশি বোতল গ্লাস ইত্যাদি প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০ অর্থাৎ ১৮ ঘণ্টায় প্রায় ২৫০০০ হইতে ৩০০০ খণ্ড নির্ম্মাণ করিতে পারে। অথচ এই সমস্তক্ষণ যন্ত্র-চালনের খরচ মাত্র ১১৫ টাকা আন্দাজ অর্থাৎ হাতের কাজে১৫০০০ বোতলের খরচ ১৫০টাকা, যন্ত্রে ২৭০০০-৩০০০০ বোতলের খরচ ১২০ টাকা। অন্য অনেক দিকেও এইরূপে খরচ কমান হয়। তদ্ভিন্ন কাচের জিনিষগুলি যন্ত্রনির্ম্মিত হইলে এক মাপের এবং একাকৃতি হয়। আয়নার কাচ, জানালার কাচ ইত্যাদিও আজকাল প্রায় সমস্তই যন্ত্রে নির্ম্মিত হয়।
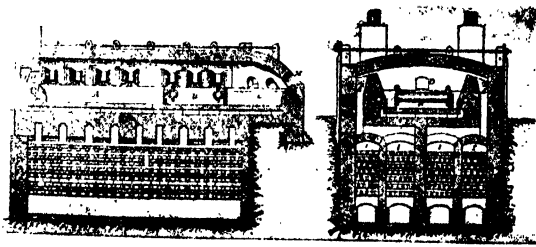
কাচের চুল্লার ছেদ নক্সা

রঙ্গীন কাচ

কাচের উপর নানাপ্রকার পদার্থের প্রধানতঃ ধাতু বা ধাতুলবণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাচ বর্ণযুক্ত হয়। যথা—তাম্র—ইহাদ্বারা সাধারণতঃ গাঢ় হরিৎবর্ণ হয়, কিন্তু অন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির, বিশেষে টিন, যোগে রক্তবর্ণও উৎপন্ন হয়। অধিক প্রয়োগে এবং কৌশলে উত্তাপ দিলে "গোল্ড ষ্টোন"(এদেশে দার্জ্জিলিংয়ের পাথরের চুড়ি যাহাতে হয়) উৎপন্ন হয়।

স্বর্ণ। ইহা অতি কৌশলের সহিত প্রয়োগ করিলে প্রসিদ্ধ কৃত্রিম পলা বা উজ্জ্বল রক্তবর্ণ কাচ উৎপন্ন হয়।

গন্ধক—রক্তাভ "পীত" অম্বর (amber)বর্ণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্রোম—উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণ।

লৌহ—অল্প প্রয়োগে পীতাভ হরিৎ, অধিক প্রয়োগে কৃষ্ণাভ হরিৎবর্ণ উৎপাদন করে।

কোবল্ট—ইহাতে অতি গাঢ় নীল বর্ণ উৎপন্ন হয়। য়ুরানীয়ম—ইহাতে অতি সুন্দর আভাযুক্ত পীত বর্ণ (fluorescent yellow) উৎপন্ন হয়।

তাপসহ কাচ (heat resitsing glass)—

এই প্রকার কাচে বালির কিয়দংশ সোহাগা দ্বারা পূরণ করা হয়। ইহার মধ্যে অন্য উপাদানও থাকে।

বীক্ষণ-যন্ত্রাদির কাচ (optical glass)।

প্রত্যেক বীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাতার এইরূপ কাচ-সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা আছে এবং সেইজন্য অসংখ্য প্রকার সূত্র সংকেত (formulae) এই প্রকার কাচ প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয়। সীসক, বেরিয়ম, সোহাগা ইত্যাদি নানা প্রকার উপাদান ইহাতে ব্যবহৃত হয়। এরূপ কাচ অতি সযত্নে অতি শুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত করা হয়। বেরিয়মযুক্ত "ক্রাউন" (Barium crown) কাচই এই কার্য্যে অতিশয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ললিত কলায় কাচ (glass in Art)

কর্ত্তিত কাচ (cut glass):—কাচের দ্রব্যাদিতে ডায়মণ্ড কাটা বা "পল কাটা" অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহার মধ্যে অধিকাংশই ছাঁচে ঢালা।" কিন্তু অনেক অধিক মূল্যে ঝাড়, পুষ্পাধার ইত্যাদি পাওয়া যায় যাহা কর্ত্তিত স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং প্রভাযুক্ত। এই প্রকার দ্রব্যে কর্ত্তিত অংশের পার্শ্বদেশ অতি মসৃণ এবং সূক্ষ্ম কোণযুক্ত। এই প্রকার কর্ত্তন ঠিক মণি-কর্ত্তনের ন্যায় অতি দ্রুত ঘূর্ণায়মান চক্রের সাহায্যে হয়। শিল্পী প্রথমে তুলি এবং তৈল রংএর দ্বারা নক্সা আঁকিয়া কাচের দ্রব্যটি হস্তে ধারণ করিয়া দ্রুত ঘূর্ণায়মান লৌহ বা তাম্র চক্রের উপর "ছুরি শান" দেওয়ার মতন ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরেন। চক্রের উপর বিন্দু বিন্দু জলে মিশ্রিত সূক্ষ্ম বালুকা বা এমেরি (emery) চূর্ণ পড়িতেথাকে। চক্রের ঘূর্ণনে কাচের নিরূপিত অংশ সকল কাটিয়া যাওয়ায় সেই দ্রব্যটির অঙ্গ উদ্গত কার্য্যে (in relief) ভূষিত হয়। প্রথম চক্রে
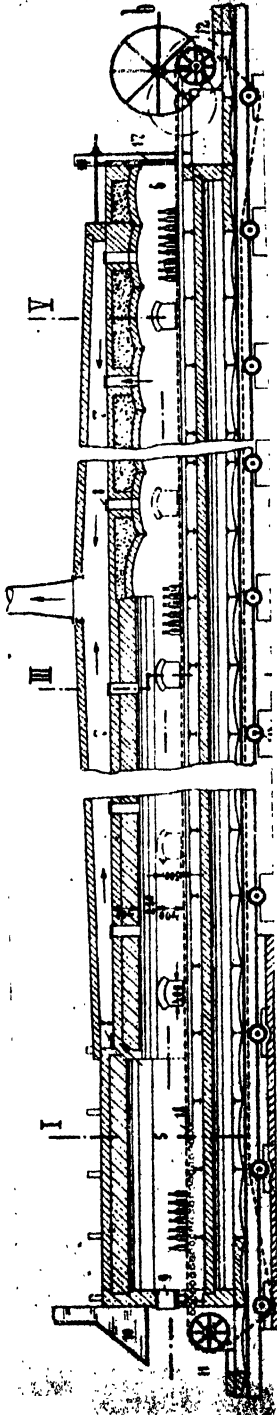
কাচের তাপনিষ্কাশন সুড়ঙ্গ চুল্লী (Canal lehr)

মোটা কাজ হইলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র লোহ বা তাম্র চক্রে "মিহি কাজ" করা হয়। তৎপরে কর্ত্তিত অংশ পুনর্ব্বার বালুকা-প্রস্তর প্রস্তুত নির্ম্মিত চক্রের দ্বারা কর্ত্তন করিয়া সমান করা হয়। (ধাতু চক্রের কার্য্যে বিস্তর আঁচড় থাকে)। এই প্রস্তুত চক্রও জলমিশ্রিত বালুকা বা এমেরি চুর্ণে সিক্ত থাকে। কিন্তু এই চূর্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর। প্রস্তর চক্রের পর কাষ্ঠচক্রে এবং তাহার পর কর্ক (cork) বা পশমযুক্ত চক্রে কর্ত্তিত অংশ সকল পালিশ করিলে পরে কার্য্য শেষ হয়। বলা বাহুল্য, এই কার্য্যে নানারূপ ব্যাসের (diameter) চক্রাদি ব্যবহৃত হয়।

কর্ত্তিক কাচ পাত্র

ক্ষোদিত কাচ

ক্ষোদিত এবং কর্ত্তিত কাচে প্রভেদ এই যে কর্ত্তিত কারু কার্য্য কাচ দ্রব্যের অঙ্গে উদ্গত অর্থাৎ "জমি" হইতে উচ্চে স্থিত থাকে এবং ক্ষোদিত কারুকার্য্য অন্তর্গত অর্থাৎ জমির ভিতর বসান থাকে। এই প্রকার কার্য্য দুই উপায়ে করা হয়। প্রথম উপায়—শিল্পী পূর্ব্বে

ন্যায় দ্রব্যটি হাতে লইয়া ঘূর্ণায়মান তীক্ষ্ণ কোন ধাতু-শলাকা বা তীক্ষ্ণপার্শ্ব ক্ষুদ্র ধাতু-চক্রের উপর চাপিয়া ধরেন এব সূক্ষ্ম বালুকা বা এমেরি চূর্ণের সাহায্যে ঐ চক্রের বা শলাকা-কোণের দ্বারা কাচ-গাত্র ক্ষোদনাঙ্কিত করেন। পরে পালিশ করিয়া কার্য্য শেষ করা হয়।

দ্বিতীয় উপায়—কাচের গাত্র মোম বা পিচ দ্বারা আবৃত করিয়া পরে তীক্ষ্ণ ধাতু-শলাকায় মোমের উপর চিত্র বা নক্সা অঙ্কিত করা হয়। অঙ্কিত স্থানের মোম উঠিয়া গিয়া কাচগাত্র অনাবৃত থাকে। পরে ফ্লুয়োর দ্রাবকের (Hydrofluoric acid) ক্রিয়ায় অনাবৃত অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষোদিত হয়।

দ্রাবক-ক্ষোদিত কার্য্য, যন্ত্র-ক্ষোদিত কার্য্যের ন্যায় সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল এবং সমান হয় না।

কর্ত্তিত কাচ পাত্রের একটি মাছের ছবি কাটার ক্রমবিকাশ (various stages) ও প্রত্যেক ক্রমে ব্যবহৃত চক্রের ছবি

চুল্লী মধ্যে বিভিন্নবর্ণস্তরযুক্ত কাচ

এই প্রকার কার্য্যে শিল্পী চুল্লী মধ্যে ৪।৫টিপাত্রে বিভিন্ন বর্ণের গলিত কাচ রাখেন। তন্মধ্যে একটিতে অস্বচ্ছ শ্বেত বর্ণের কাচ থাকে, শিল্পী ফুকনলের অগ্রদেশে প্রথমে অল্প অস্বচ্ছ কাচ সংগ্রহ করেন। পরে কোনও এক বর্ণের কাচ প্রথমে সংগৃহীত কাচের উপরই সংগ্রহ করেন,তাহার উপর পুনর্ব্বার ভিন্ন বর্ণের কাচ, তাহার উপর অস্বচ্ছ কাচ, এইরূপে শিল্পী ফুকনলের অগ্রে ভিন্ন বর্ণের স্তরযুক্ত কাচের তাল নির্ম্মাণ করেন। তৎপরে ফুঁকন-শুদ্ধ ঐ কাচের তাল অগ্নিমধ্যে স্থাপন করিয়া নরম করিয়া যথাযথভাবে 'ছাঁচে' স্থাপন করিয়া ফুঁক দিয়া ঈপ্সিত দ্রব্য নির্ম্মাণ করা হয়। দ্রব্যটির উপরিভাগ সংস্করণ, চাপ নিষ্কাশন ইত্যাদি হইয়া গেলে তাহার আকৃতি ঠিক্ হয়। ইহার পর ঐ দ্রব্য কর্ত্তনকারী বা ক্ষোদনকারীর হস্তে প্রদত্ত হয়। এই প্রকার দ্রব্যের গাত্রের যে কোন স্তর কাটিলেই নীচের স্তরের বর্ণ প্রকাশ পায়। সুতরাং শিল্পী চিত্রের যেখানে যেরূপ বর্ণ প্রয়োজন সেরূপ বর্ণের স্তর পর্য্যন্ত কাটিয়া তাহা প্রকাশ করেন। সাধারণতঃ এই প্রকার ক্ষোদন ফ্লুয়োর দ্রাবক দ্বারা করা হয়।

কাচের উপর মিনার কাজ (enamelling) এবং কাচের উপর ভিন্ন বর্ণের কাচের প্রলেপ বা ধাতুপাত্রের (পাতের) প্রয়োগ দ্বারা কারুকার্য্য।—এই প্রকার কার্য্যে কাচের দ্রব্য গাত্রে তৈল দ্বারা মিনার রং লাগাইয়া চিত্রাঙ্কন করা হয়। পরে অতি সন্তর্পণে দ্রব্যটি অগ্নিমধ্যে স্থাপন করিয়া ধীরে উত্তাপ দ্বারা উক্ত মিনা কাচের অঙ্গমধ্যে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়। ভিন্ন বর্ণের কাচ বা ধাতুর পত্র বা সূত্রও এই ভাবে সংযোজনা করা যায়।

রঞ্জিত কাচের কার্য্য (stained glass)

এই প্রকার কার্য্য সাধারণতঃ জানালা ইত্যাদি আলোক-পথে স্থিত কাচে হয়। ইহার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথমে অতি নিপুণ চিত্রকর সাধারণ উপায়ে নানাবর্ণে একটি চিত্রাঙ্কন করেন। তিনি যতদূর সম্ভব চিত্রের সকল অংশেই শুদ্ধবর্ণ (pure tints) ব্যবহার করেন এবং এইটুকু লক্ষ্য রাখেন যে, যে-সকল বর্ণ তিনি ব্যবহার করিতেছেন সেই সকল বর্ণের কাচ সহজে পাওয়া যায়। অঙ্কিত চিত্র পরে বর্ণানুসারে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়। পরে নির্দ্দিষ্ট জানালায় উপযুক্ত ধাতুময় "কাঠামের" (frame) উপর উপযুক্ত বর্ণ ও আকৃতির কাচখণ্ড যোজনা করিয়া চিত্র রচনা করা হয়। এই প্রকার কার্য্যে কাচশিল্পী অপেক্ষা চিত্রকর এবং যোজকের নিপুণতা অধিক প্রয়োজন।

কাচের ক্ষেত্রে ললিতকলা বা কারুকার্য্য আরও অনেক প্রকার আছে। কাচের ব্যবহারও অসংখ্য প্রকার কার্য্যে হয়। মাসিকপত্রে প্রবন্ধাকারে তাহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যাহা এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে তাহাও ঐ কারণে অনেকস্থলে অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ রাখিতে হইয়াছে।

আমাদের দেশ প্রাচীন সভ্যজগতে কাচের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। সেই সময় হইতে ১৯০৬-৭ খৃঃ পর্য্যন্ত এদেশে এই শিল্প অতি ক্ষীণভাবে চলিতেছিল। ঐ সময় হইতে এদেশে দুই একটি করিয়া আধুনিক প্রথা-সম্মত কারখানা স্থাপিত হইতে থাকে। এখন এদেশে অনেকগুলি কাচের কারখানা হইয়াছে। কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ আদর্শভাবে সজ্জিত বা পরিচালিত নহে। বিদেশে প্রত্যেক বৃহৎ কাচের কারখানার একটি প্রধান অংশ তাহার বিজ্ঞানাগার,যেখানে পরীক্ষা ভিন্ন অন্য অনেক গবেষণা হয়। এখানে কোনও কারখানায় উপযুক্ত পরীক্ষাগারও নাই, বিজ্ঞানাগার ত দূরের কথা। তবে ক্রমে কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ ব্যবসাতে শিক্ষালাভ করিবেন এবং তখন এ-সকলদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে।

কল্লোল

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

তিমির রাত্রির বক্ষে সাড়া দিয়া সচকিয়া দিক্,
কা'রা সব নির্ম্মল পথিক
যাত্রার আনন্দ-গানে ধরণীরে দিয়ে গেল দোল ;
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল।
জমিছে বন্ধনরাশি ; অন্ধকারে
বারে-বারে তাই
মোরা সবে পথ ভুলে যাই।
নিশার আকাশ চি'রে বিদ্যুতের কটাক্ষ বিলোল;
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল।

প্রশ্ন বাড়ে দিনে-দিনে ; কেহ নাই
নাহি পাই সাড়া ;
ভীতি জাগে ; প্রাণ দিশাহারা ;—
এ নিবিড় যবনিকা তোল্ আজি তোল্ তোরা তোল্!
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল।

কুসুম ফুটেছে আজ—হের ঐ ;
মধু কই হায় ?
তৃষ্ণায় যে বুক ফেটে যায়!
কোথা তোরা ? আয় সবে ; কোষাগার খোল্ আজি খোল্
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল।

ব্যথায় দহিছে প্রাণ ; কোথা শান্তি ?
ভ্রান্তি-রাশি আজ
পদে-পদে করিছে বিরাজ।
আলোক-তরণী আসে ; রাত্রি যায় ; ব্যথা সবে ভোল্ ;
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল।

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে, উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক ; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তকপরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

"ওকথা আর বোলো না" গানের রচয়িতা

১৩৩২ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" আপনি লিখিয়াছেন যে, "ও কথা আর বোলো না আর বোলো না।" ইত্যাদি গানটি পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত। কিন্তু ১৩২১ সালের 'ভাদ্র' মাসের প্রবাসীর ৫৯১ পৃঃ "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, উহা তাঁহার [অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের] রচনা।

শ্রী বিমলাকান্ত সরকার

—

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক্ ও প্রাথমিক সমিতি

গত চৈত্রের 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতির নিন্দা করিয়াছেন এবং তাহাদের ও প্রাথমিক সমিতিগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহার মূল বক্তব্য এই যে, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা-ভার দেনদারগণের অর্থাৎ প্রাথমিক সমিতিগুলির প্রতিনিধিবর্গের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাদিগের ব্যাঙ্কগুলির স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কোনও 'দায়ীত্ব' বা 'দরদ' নাই।

তাঁহার কথা একেবারেই ঠিক নহে ; বরং কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ঠিক বিপরীত। প্রাথমিক সমিতির অংশীদারগণের দায়ীত্ব "অসীম"।—যৌথ কোম্পানীর আইনে তাহার অংশীদারগণের দায়ীত্ব তাহাদের খরিদা শেয়ারে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কো-অপারেটিভ আইনে প্রাথমিক সমিতির ঋণের জন্য তাহার অংশীদারগণের শেয়ারগুলিই একমাত্র দায়ী নহে, পরন্তু তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিই দায়ী। কোনও গ্রাম্য সমিতি উঠিয়া গেলেও সেই সমিতির নিকট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পাওনা টাকা সেই কারণে অনাদায়ী হয় না।

প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারগণের কিন্তু সেরূপ কোনও বালাই নাই। তাহাদের দায়ীত্ব যৌথ কোম্পানীর অংশীদারের ন্যায়। লাভের বেলা তাঁহাদের তাহা সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্য, কিন্তু লোকসানের বেলা তাঁহারা তাহাদের অংশের টাকা ছাড়িয়া দিয়াই নিস্তার পাইতে পারেন। বস্তুতঃ প্রাথমিক গ্রাম্য সমিতির অংশীদারগণের "অসীম" দায়ীত্বের কারণেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক-গুলি কারবার হিসাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। এবং সেইজন্যই সেগুলি কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় পাঁচকোটি টাকা টানিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণের কার্য্যকুশলতা বা ত্যাগের মাত্রা তাহার কারণ নহে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মরণ-বাঁচনের জন্য দরদ কাহার বেশী তাহাও ইহা হইতে বেশ অনুমিত হইবে। গ্রাম্যসমিতিগুলি কদাচিৎ কোনও কোনও স্থলে সেণ্ট্রালব্যাঙ্ক হইতে ধারকরা টাকায় তাহার অংশীদার হয় সত্য, কিন্তু তাহাও আংশিক পরিমাণে। কিন্তু ২।১ বৎসর পরেই সে-টাকাও নিজের অংশগত মূলধনের সামীল হইয়া পড়ে। কিন্তু ধারকরা টাকা হইলেও তাহার দায়ীত্ব তাহাদের খসে না—এবং তাহার পরিমাণও "অসীম"। সুতরাং "আঁচড়ের" ভাগ প্রায় সবই তাহাদের আর ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকার প্রেফারেন্স্ শেয়ার-হোল্ডারদিগেরই বেশী।

ক্রেডিট্-ব্যাঙ্কগুলি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত। জার্ম্মানীর অর্থনীতিজ্ঞগণ "আজ যে খাতক, পরে সেই তাহার মহাজন হইবে" এই অসম্ভব সাধনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সঙ্ঘবদ্ধতা, সমবেত চেষ্টা, স্বাবলম্বন এবং মিতব্যয়িতা, প্রভৃতি গুণে তাহাদের সেই স্বপ্ন আজ ইউরোপে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। সেই মহান্ উদ্দেশ্য সম্মুখে করিয়া বহুঅভিজ্ঞতাসঞ্জাত নিয়মাবলীর দ্বারা সমবায় সমিতিগুলি এদেশে চালিত হইতেছে। উহা আইনের নাগপাশ নহে বা কাহারও খামখেয়াল-প্রসূত নহে। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাধারণ অংশীদাররূপে গ্রাম্যসমিতিগুলি প্রথম হইতেই মোটা ডিভিডেণ্ডের দাবী করে না এবং "নিয়ম হইয়াছে যে, শতকরা ১২র বেশী (লভ্যাংশ) পাইবে না" বলিয়া অনুযোগ করে না। প্রথমাবস্থায় লাভের পুরা বা অধিকাংশ সংরক্ষিত (reserved) বা অন্যান্য তহবিলে জমা করিয়া কার্য্যকারী মূলধন (working capital) বৃদ্ধি করিতে সম্মত থাকে। ফলে ব্যাঙ্কের কার্য্যকারী মূলধনে (অংশগত মূলধনের অনুপাতে) অনেক লাভের টাকা জমিয়া যায় এবং ব্যাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম সুদে আমানত পাইতে এবং গ্রাম্য সমিতিগুলিকে কম সুদে টাকা ধার দিতে সমর্থ হয়। এইরূপ অবস্থাই পরিণামে গ্রাম্যসমিতিগুলির পক্ষে বিশেষ লাভজনক। পরন্তু তাহাতে প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণের পক্ষে প্রথম হইতেই মোটা ডিভিডেণ্ড পাইবার এবং আমানতের উপর মোটা সুদে পাইবার পথে কাঁটা পড়ে। এইজন্য প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণের এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে একটি প্রকৃতিগত স্বার্থের বিরোধ আসিয়া পড়ে। সমবায়কে সফল করিতে হইলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির 'বিশুদ্ধীকরণ' অপরিহার্য্য। এই ব্যাঙ্কগুলিকে কেহ exploit করিতে না পারেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখা সমবায়ের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। দেখা গিয়াছে যে, মিশ্রচাচের একটি সেণ্টাল ব্যাঙ্কে বিক্রীত প্রেফারেন্স্ শেয়ারের সংখ্যা বেশী থাকায় তাহা চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল ; পরে তাহা কমাইয়া দেওয়ায় ব্যাঙ্কটি অচিরকাল মধ্যেই সজীবতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিশুদ্ধীকরণ প্রচেষ্টা সম্প্রতি আরব্ধ হয় নাই, গত দশ বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পরীক্ষায় অধিকতর সুফল প্রদান করিয়াছে।

প্রত্যেক কারবারের কর্ত্তৃত্বভার তাহার অংশীদারগণের উপর ন্যস্ত থাকে। অংশীদারগণ উপযুক্ত ব্যক্তিগণের হাতে সেই ভার অর্পণ করিলেই কারবারটি সুপরিচালিত হয়। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাধারণ অংশীদার স্বরূপে গ্রাম্য সমিতিগুলি অবিবেচক, আপাত-লাভাকাঙ্ক্ষী বা প্রভুত্বপ্রয়াসী নহে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যাপারেই অভিজ্ঞের পরামর্শমত তাহারা নিজেদের কার্য্যপ্রণালী ব্যবস্থিত করে এবং কৃতী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিতে কখনই নারাজ

হয় না। ভিতর হইতে সমবায় গড়িয়া উঠে ইহা সকলেই ইচ্ছা করেন। হইতেছেও তাহাই। সমবায়ের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং যাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় সমবায় এদেশে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অধিকাংশ আমানতকারীই স্বয়ং তাঁহারা এবং তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত ব্যক্তিগণ। তদ্ভিন্ন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি যবনিকার আড়ালে কাজ করে না। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যই প্রকাশ্যে নির্ব্বাহ হয় এবং সাধারণে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছে। সাধারণে বুঝিয়াছেন, যে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা আমানত করা সম্পূর্ণ নিরাপদ। সেইজন্য অনেক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে আজকাল এত টাকা আমানত আসিতেছে যে, সব সময়ে তাঁহারা তাহা লইতে পারেন।

শ্রী পূর্ণচন্দ্র দত্ত
(ডেপুটী চেয়ারম্যান, কাল্না সেন্ট্রাল্
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক)

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ইণ্টার্মীডিয়েট্ সাহিত্যসংগ্রহ

সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষার্থীকদিগকে বাঙ্গালায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হইবে এবং ঐ পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একখানি নির্ব্বাচিত সাহিত্য-সংগ্রহ (Selections) প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সাহিত্য-সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট একটি কবিতা হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত"। উহার এক স্থলে আছে :—

"কোথা আমেরিকা-নব-অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।
মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপুজিতা
চির বীর্য্যবতী বীরপ্রসবিতা,
অনন্তরে বিনা যুনানী-মণ্ডলী,
মহিমাছটাতে জগৎ উজলি'
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।
আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি ?
চীন, ব্রহ্মদেশ, নবীন জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় stanzaটি অর্থাৎ মধ্য স্থলে হেথা আজন্মপুজিতা-ইত্যাদির যে কি অর্থ হইতে পারে তাহা আমরা ঠিক করিতে পারিলাম না। "অনন্তরে বিনা যুনানী-মণ্ডলী, ইহার অর্থ কি হইতে পারে ? অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রদাস চৌধুরী মহাশয় তাঁহার মিতভাষিণী নামক টীকাতে বলেন, যে, তিনি ঐ স্থলটির অর্থ করিতে পারিলেন না। কারণ-স্বরূপে তিনি বলেন, যে, যুনানী বলিয়া একটা শব্দই দুষ্প্রাপ্য, সেইজন্য তিনি ইহার অর্থ ঠিক করিতে পারেন নাই। কিন্তু উদ্ধৃত স্থলটির অর্থ না করিতে পারার কারণ তাঁহার ও আমাদিগের এক নহে। প্রকৃতিবাদ অভিধান অথবা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কৃত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান হইতে জানিতে পারা যায় যে, "যুনানী" শব্দটি Ionian শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং "যুনানী-মণ্ডলী"র অর্থ গ্রীসের পশ্চিমে অবস্থিত আইয়োনিয়া দ্বীপ সাতটির সমষ্টি। অভিধান দেখিলেই টীকাকার "যুনানী"-শব্দ পাইতেন; অথচ "অনন্তরে বিনা" সম্বন্ধে তিনি কোনো কথাই বলেন নাই। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিলাম না "অনন্তরে বিনা" এইটুকুর অর্থ কি!

ইহাতে কোন লিপিকরপ্রমাদ আছে কি না দেখিবার জন্য আমরা বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৩১২সালে প্রকাশিত হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী দেখি। তাহাতেও অনন্তরে বিনা যুনানী-মণ্ডলী আছে, কিন্তু 'মহিমাছটাতে জগৎ উজলি' ইহার পর আর-একটি পংক্তি আছে "সাগর ছেঁচিয়া মরুগিরি দলি"। এই পংক্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে নাই। কিন্তু ইহার সাহায্যেও আমরা উদ্ধৃত স্থলটির অর্থ করিতে পারিলাম না। অতঃপর বহুস্থলে অনুসন্ধান করিয়া আমরা হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একখানি অপেক্ষাকৃত পুরাতন সংস্করণে দেখি যে, তাহাতে 'অনন্তরে বিনা স্থলে' অনন্তযৌবনা আছে। যদি অনন্তযৌবনা পাঠ হয়, তাহা হইলে বেশ অর্থ করা যায়।

উল্লিখিত পুরাতন সংস্করণে প্রথম stanzaতে 'কোথা আমেরিকা' স্থলে 'হোথা আমেরিকা' আছে; এবং মধ্যস্থলে হেথার সহিত হোথা আমেরিকাই সুসঙ্গত।

উভয় স্থলেই ১৩১২ সালের বসুমতী-কার্য্যালয়ের গ্রন্থাবলীর সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ-পুস্তকের পাঠ মিলিয়া যায়। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, বসুমতী-কার্য্যালয়ের উক্ত গ্রন্থাবলী দেখিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় তদনুসারে কবিতাটি মুদ্রিত করিয়াছেন। কেবলমাত্র তৃতীয় stanzaতে, বসুমতী করিয়াছেন "সুসভ্য জাপান", তাহাতে কবির উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন হয় দেখিয়া বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন "নবীন জাপান"। কিন্তু আমাদের মনে হয় "নবীন জাপান" রাখিলেও কবির উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন হয়। কবির "অসভ্য জাপান" রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাছে কেহ আপত্তি করেন সেইজন্য, পাদটীকায় কিছু লিখিয়া দিলেই বোধ হয় ভাল করিতেন।

বসুমতীর "সুসভ্য জাপান"কে বিশ্ববিদ্যালয় "নবীন জাপান" করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় না যে, বিশ্ববিদ্যালয় না দেখিয়াই বসুমতীর পাঠ অনুসারে কবিতাটি মুদ্রিত করিতে দিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের মনে হয় যে, "হোথা" স্থলে "কোথা" ও "অনন্তযৌবনা" স্থলে "অনন্তরে বিনা" বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বকই করিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় কিজন্য এরূপ করিয়াছেন ও "অনন্তরে বিনা"র কি অর্থ হইবে তাহা কেহ আমাদিগকে জানাইলে সুখী হইব। আর তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কলিত পুস্তকে এরূপ ভুল থাকে। পরন্তু কবি যদি "হোথা", "অনন্তযৌবনা" ও "অসভ্য" করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পাঠ পরিবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শ্রী ললিতমোহন ইন্দ্র,
কৃষ্ণনগর (জেলা নদীয়া)

দেশ-বিদেশের কথা

বিহার বিদ্যাপীঠ

শ্রী প্রভাত সান্যাল

গত মাসে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারীর সভাপতিত্বে বিহার বিদ্যাপীঠের াৎসরিক উপাধি-বিতরণ-সভা হইয়া গিয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা াান্ধী বিহারের নীল চাষীদের দুর্দ্দশা মোচনের নিমিত্ত চম্পারণে আসেন। সই সময়ে বিহারের কতিপয় নেতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটি াতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। উদ্যোগীদের সঙ্কল্প ছিল যে, প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ের সাহায্যে দেশ-সেবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী াড়িয়া তোলা। বলা বাহুল্য, মহাত্মাজী প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন রেন এবং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তৎকালে কিছু অর্থও সংগৃহীত য়। কিন্তু নানা কারণে ঠিক সেই সময়েই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি স্থাপিত য় নাই।

১৯২০ সালে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার কলিকাতার বিশেষ াধিবেশনে সরকারের সহিত অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ স্তাবের একটি ধারার নির্দ্দেশানুসারে সরকারকর্ত্তৃক স্থাপিত অথবা রকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীগণকে স্ব-স্ব স্কুল-কলেজ াড়িয়া আসিবার জন্য আহ্বান করা হয়। ঐ আন্দোলনের ফলে ভারতের ভিন্ন প্রদেশে বহুসংখ্যক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯২১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী পাটনা শ্রীরাষ্ট্রীয় মহা-দ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সেই সময় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি-াতাগণ ঘোষণা করেন যে, "যে-সমস্ত শিক্ষার্থী সরকারী ও সরকারী াহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহ ত্যাগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে াতীয় শিক্ষা প্রদান এবং বিহারের যুবকবৃন্দকে দেশ-সেবায় উপযুক্ত করিয়া ড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইল"। মৌলানা মজরুল ক; শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ বিহারের তৃবর্গকে লইয়া বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি গঠিত হয়। বিহার দ্যাপীঠের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বলা যায় যে, উদ্যোগীদের উদ্দেশ্য নেক-পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিহার বিদ্যাপীঠের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় আছে। ধ্যে পাটনা শ্রীরাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয় প্রধান। ইহা ভিন্ন ২৫টি মধ্য ও চ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ৩০টি জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ইহার ন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত স্থাপিত বিদ্যালয়সমূহে র্ত্তমানে ১৮৩ জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ৩১০১ ছাত্র অধ্যয়ন করে। এই দ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থি-দের মনে ঈশ্বরে ভক্তি ও দেশাত্মবোধ জাগাইবার জন্য প্রয়োজনীয় স্তকাদি পাঠ করানো হয়। কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদিগের কারু-শিল্প-শিক্ষার ও যথেষ্ট মনোযোগ দেন।

পাটনা শ্রীরাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয় সহরের হট্টগোল হইতে দূরে গঙ্গানদীর র দিঘাঘাটের নিকট স্থাপিত। ইহার সম্মুখ দিয়া গঙ্গা-নদী প্রবাহিত এবং অপর তিন দিকে আম্রকুঞ্জশোভিত বহুদূরব্যাপী শ্যামল মাঠ। হঠাৎ দেখিলে বিদ্যালয়-গৃহ প্রাচীন কালের আশ্রম বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে আশ্রম করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বর্ত্তমানে অধিকাংশ ছাত্র এবং শিক্ষক মহাবিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসেই থাকেন। ছাত্রগণ ভোর ৪টায় শয্যাত্যাগ করে। তৎপরে স্নানান্তে তাহারা প্রার্থনা-গৃহে সমবেত হয়। প্রার্থনান্তে কিছুকাল ব্যায়াম করিবার পর তাহারা পড়াশুনা আরম্ভ করে। সকালে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কলেজ বসে। ১১টার পর স্নানাহার করিয়া বিশ্রামান্তে ছাত্রগণ পাঠাগারে সমবেত হয়। সেখানে সাময়িক পত্রিকাদি পাঠ হয় এবং ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগের সহিত বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি লইয়া আলোচনা করে। এখানকার ছাত্রগণ শুধু পুঁথিগত বিদ্যা আহরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রকে কারখানা-গৃহে কাজ শিখিতে হয়। সেখানে সূত্রধরের কাজ, লোহার কাজ ও তাঁতবুনান শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধা-রণ শিক্ষার সহিত কার্য্যকরী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া মহাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই ছাত্রগণকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার প্রয়াসী। সন্ধ্যার পর ২।৩ ঘণ্টা অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রগণ আহারাদি করে। তৎপরে তাহারা কিয়ৎকাল রামায়ণ পাঠ শুনিয়া বিশ্রাম করিতে যায়।

বিদ্যালয়-গৃহের সংলগ্ন মাঠে গাছের নীচেই সাধারণতঃ পড়াশুনা করান হয়। বর্ষাকালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। এখানকার ছাত্রগণের নিকট হইতে কোনরূপ বেতন অথবা আশ্রমে থাকিবার জন্য কোনরূপ খরচ লওয়া হয় না। অধিকন্তু দরিদ্র ছাত্রগণ যাহাতে নিজ-নিজ হাত-খরচ চালাইতে পারে, সে-ব্যবস্থাও কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয় বিহার বিদ্যাপীঠের অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে বিদ্যাপীঠের নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম-অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে ৫০ জন ছাত্র আছে, তন্মধ্যে ১২ জন বাঙালী। এখানে হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দ্দু) ভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান করা হয়। ছাত্রদিগকে অন্যান্য ভাষা চর্চ্চা করিবারও সুযোগ দেওয়া হয়। উপাধি-পরীক্ষার নিমিত্ত তিন বৎসর পড়িতে হয়। মহাবিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অধ্যাপনা করা হয়—ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃত, ইংরেজী, গণিত, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, হিন্দী, উর্দ্দু ও বাংলা। ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষা (অনার্স কোর্স) পাঠক্রম হইতে এখানকার পাঠক্রম সহজ নহে। এখানে দুই-একটি বিষয় নূতন-ধরণে শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজনীতি শিক্ষা-সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন ও ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় জীবনের তুলনামূলক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের নামে যে সকল মিথ্যা এবং কল্পিত কথা এযাবৎকাল প্রচারিত হইয়া আসিতেছে সেগুলি অপনোদন করিবার চেষ্টাও করা হয়।

মহাবিদ্যালয়ের পাঠাগারে বর্ত্তমানে ন্যূনাধিক চার হাজার পুস্তক

আছে। ইহা ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকাও ছাত্রদের জন্য পাঠাগারে আছে।

ছাত্রদের জন্য মহাবিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি ছোটো রাসায়নিক পরীক্ষাগার আছে। সুখের বিষয়, এই পরীক্ষাগারের কতকগুলি যন্ত্র মহাবিদ্যালয়ের কারখানাতেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-প্রণালী একটু নূতন ধরণের। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে সুশিক্ষিত এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দেশ-সেবক রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। বিগত ৪ বৎসরে মহাবিদ্যালয় হইতে ২৪ জন ছাত্র উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা কর্ম্মজীবনেও এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অনেক উপাধিপ্রাপ্ত ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; কেহ বা সংবাদপত্র সেবা করিতেছেন এবং কেহ-কেহ নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

ছাত্রগণকে ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইলে শিক্ষকগণকেও ত্যাগী হইতে হয়। রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-মণ্ডলীর অনেকেই ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান্ ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করিতেছেন। তাঁহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে দিলাম :—

১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম্-এ, এম্-এল অধ্যক্ষ
২। শ্রীযুক্ত রামচৈতন্য সিংহ, এম্-এস্-সি, বি-এল
৩। শ্রীযুক্ত বদরীনাথ সহায়, এম্-এ
(বিহার কলেজে ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক)।
৪। শ্রীযুক্ত রামদাস গৌড়, এম্-এস্-সি
(হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক)
৫। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, প্রভৃতি।

মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ অসহযোগ-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী গত ২০শে মার্চ্চ বিদ্যাপীঠের উপাধি-বিতরণ-সভায় বলিয়াছেন, "জাতীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ হইতেছে অস্ত্রাগার। ঐখানে তাহারা অস্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতেছেন এবং ঐসকল অস্ত্রপাতি দ্বারা তাঁহারা যুদ্ধ চালাইবেন। এইসকল প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। ঐখানেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অন্ন—দেশের দরিদ্রদিগকে ভালোবাসা শিখিতে হইবে। এই শিক্ষার ফলেই তাঁহারা আত্মশক্তি লাভ করিতে পারিবেন।

"দাসত্বের প্রতি ঘৃণার উদ্রেকের জন্যই তাঁহারা এই বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা হইতেই তাঁহারা প্রেরণা লাভ করিতেছেন। বিদ্যাপীঠ হইতে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটগণ নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যেন অন্যকেও দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন এবং চরকা সমিতি-গঠনমূলক প্রণালীতে যেন তাঁহারা কাজ করেন। ইহা করিতে পারিলেই ভারতের মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী।"

কাশীধামে নারী-জাগরণ

বেনারস সিটী হইতে শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী আমাদিগকে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠাইয়াছেন :—

বাঙ্গালার রমণীকুলের প্রাণের উচ্ছ্বাস-প্রবাহ ক্রমে-ক্রমে উধাও হইয়া অবাধে পশ্চিমের শুষ্ক ভূমিকে প্লাবিত করিয়া কূলে কূলে স্নিগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই সুপবিত্র বারাণসী-ধামের বঙ্গীয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নারীগণের হৃদয়ে যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, উহা যদি চিরস্থায়ী হয়, তবে এক-দিন আশাজনক ফলপ্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কাশীধামে বহুবিধ হিন্দু রমণীর বাস তন্মধ্যে বিধবার সংখ্যাই সমধিক। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কেহ উচ্চশিক্ষিতা বা গ্রাজুয়েট নহেন, কিন্তু বলিতে আনন্দ হয় সামান্য শক্তি সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা এরূপ উচ্চ সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন-বাবুর পত্নী শ্রীমতী প্রতিরূপা দেবীর সংস্থাপিত একটি বিধবাশ্রম কয়েকটি বালবিধবা লইয়া সাধারণের সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরিচালিকা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী। এখানে প্রায় ১২।১৩ জন অনাথা বিধবাকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বয়ন-কার্য্য সূচীশিল্প ও কিছু-কিছু লেখা-পড়া শেখানো হয়। ইহার পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান এবং সকল কার্য্যকলাপ শিক্ষা প্রভৃতি স্থানীয় ভদ্রমহিলাগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। উক্ত আশ্রমে প্রতি রবিবারে একটি নারী-সম্মিলনী হইয়া থাকে। সমবেত রমণীগণ আশ্রমস্থ বিধবাগণের শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহা
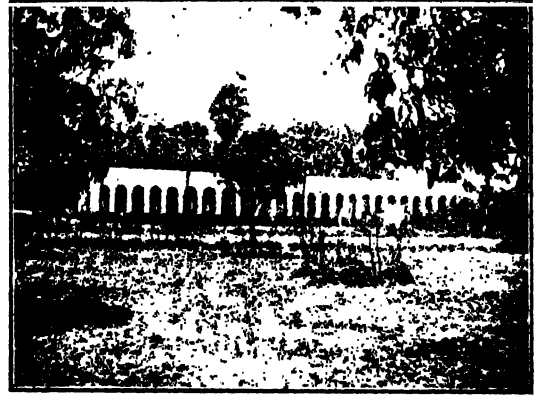
বিহার বিদ্যাপীঠের ছাত্রনিবাস

ছাড়া শ্রীমতী প্রমীলা দেবী আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রীর নামে একটি বিধবা-আশ্রম পরিচালিত হইতেছে। এই বিধবা-আশ্রমের উদ্দেশ্য মহিলা-কবিরাজ প্রস্তুত করা। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় দয়া করিয়া আশ্রম স্থাপনের জন্য একটি বাড়ী ও বাৎসরিক ১০০৲ শত টাকা দান করিয়া সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যদিও আশ্রমগুলি ক্ষুদ্রাকারে সংস্থাপিত তথাপি বিধবাগণের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যয় সংকুলান যথেষ্টরূপে হয় না। ইঁহারাও প্রতিমাসে "পূর্ণিমা মিলন"-নামে প্রতিপূর্ণিমার সন্ধ্যায় স্থানীয় সকল ভদ্রমহিলাগণ মিলিত হইয়া সময়োপযোগী নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবারে স্থানীয় অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জ্জেনের স্ত্রী শ্রীমতী মনোরমা দেবী "বরপণ-নিবারণ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন এবং রায় সাহেব এস, পি সান্যালের ভগ্নী শ্রীনিস্তারিণী দেবী অতি সদযুক্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারায় উক্ত বিষয়ের দেশকালপাত্রানুসারে অনুপযোগিতা প্রতিপন্ন করেন। যদিও এই সমাজ সংস্কারক বিষয় বহুবার আলোচিত হইয়াছে, তথাপি রমণীগণের অন্তঃকরণে এইপ্রকার অভাব-অভিযোগ জাগরূক হওয়া সুলক্ষণ নিশ্চয় বলিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত প্রবাসিনী রমণীগণের দ্বারা নারী-সভা করিয়া তাঁহারাও নিজেদের জাতীয় নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কারের উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছেন এই উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা আশ্চর্য্য কথা নহে কিন্তু সুবাতাস ও সুলক্ষণ এই যে ইঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইপ্রকার হিতানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অতএব সকল ভদ্রমহিলাগণের নিকট সানুনয়ে নিবেদন

শ্রী রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৃক্ষতলে পাঠরত

তাঁহারা যেন এই প্রবাসিনীগণের কার্য্যে উৎসাহ দানকরতঃ যথাবিধানে যখন যিনি কাশীধামে শুভাগমন করিবেন নদীয়া সত্রস্থ এই বিধবা আশ্রম ও শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর এবং দুর্গাকুণ্ডস্থ শ্রীমতী প্রমীলা দেবীর জগদম্বা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া উপকৃত করিবেন। দেশীয়া ভগ্নীগণ প্রবাসিনীগণের পরস্পরের সহিত মেলামেশা ও সুপরামর্শ দান করিয়া পরস্পরের উন্নতির পক্ষে সহায়তা করাই পরস্পরের প্রীতিবন্ধনের উপায়। বাস্তবিক খুঁটাইয়া দেখিতে গেলে, আমাদের নারীগণের শিক্ষার উন্নতি বহু দূরে। এই কাশীধামে এইপ্রকার নিঃসহায়া বিধবার সংখ্যা নমধিক। ইঁহাদের দ্বারায় অনেক কাজ হইতে পারে যদি শেখান যায়। ইঁহারা শিক্ষয়িত্রী হইতে পারেন, নার্স হইতে পারেন। স্বদেশ হইতে গৃহ-সংসার-অপহৃতা বিচ্যুতা অথবা বিতাড়িতা হইয়া আসিয়া অনেকে কুপথে ও প্রলোভিতা হইয়া সর্ব্বনাশের পথে পড়িতেছেন, এইসকল বিধবাকে রক্ষা করা একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বিষয়। ইহাতে সমগ্র বঙ্গীয় ভগিনীর সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

—

বাংলা

যশোহরে নমঃশূদ্র সভা—

এমন একদিন গিয়াছে, যখন নমঃশূদ্রগণ বাংলার প্রধান ও পরাক্রমশালী অধিবাসী ছিল এবং তাহারা বাংলার উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডে বাস করিত। যুগে-যুগে বাংলাদেশ নানা শ্রেণীর লোকের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। আদিম অধিবাসিগণ তাহাদের আক্রমণ পর্য্যুদস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রমে বনে জঙ্গলে জলাভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। নমঃশূদ্রগণও আততায়ীদের আক্রমণ হইতে আপনাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুর্গম জলাভূমিতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলায় নমঃশূদ্রগণ যেখানে জলাভূমি, যেখানে পথ দুর্গম, সেই স্থানে গ্রাম স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে। ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জেলাতেই নমঃশূদ্রদের বাস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঐসকল জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়, নমঃশূদ্রগণ বিল-অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং এক-এক স্থানে ২৫।৩০ খানি গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়াছে।

সম্প্রতি যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার অধীন মালিয়াট গ্রামে নমঃশূদ্রদের দুই বৃহতী সভা হইয়াছিল। বেলা দুইটার সময় মালিয়াট মধ্যইংরাজী স্কুলের ও বালিকাবিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ-উপলক্ষে প্রায় তিন সহস্র নমঃশূদ্র পুরুষ ও প্রায় ৪ শত নারী সমবেত হইয়াছিলেন। বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহটি বহুদিন হইল ভগ্ন-প্রায় হইয়া গিয়াছে। অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবিধায়িনী সভা স্কুলগৃহের জন্য কয়েক শত টাকা দিয়াছেন। স্কুল-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর্‌স্ বলেন, যদি স্থানীয় লোকেরা আড়াই শত টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে তিনিও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আড়াই শত টাকা লইয়া দিবেন। সভাস্থলে শিক্ষার প্রয়োজন-সম্বন্ধে অনেকে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। খুলনা জেলার অন্তর্গত কাইমালী গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সাধুচরণ বিশ্বাস-নামক একজন স্বদেশহিতৈষী নমঃশূদ্র ঘোষণা করেন যে, তিনি দুই শত টাকা প্রদান করিবেন। সভাস্থলেই এক শত ত্রিশ টাকা তিনি প্রদান করেন। সমবেত লোকদিগকে অবশিষ্ট ৫০ টাকা দান করিতে

অনুরোধ করা হয়। তৎক্ষণাৎ ৫০ টাকার পরিবর্ত্তে ১০৩ টাকা সংগৃহীত হয়। নমঃশূদ্র জাতি শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, এই ঘটনা তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

তৎপরে যশোহর জেলার নমঃশূদ্রদের এক মন্ত্রণা-সভা হয়। সভায় যশোহর সদর, মাগুরা, ঝিনেদহ ও নড়াইল মহকুমা হইতে প্রায় আড়াই হাজার লোক আসিয়াছিলেন। প্রায় তিন শত স্ত্রীলোকও উপস্থিত ছিলেন। আগন্তুক ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনার জন্য এক কমিটি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সমাদ্দার সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন। গ্রামবাসীরা আগন্তুকদিগের আহারের জন্য একমণ চাউল, তদুপযুক্ত ডাইল, তরকারী, তৈল, লবণ ইত্যাদি দান করিয়াছিলেন এবং ভলান্টিয়ারগণ সমবেত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত আহার করাইয়াছিলেন। বেলা ১টার সময় মন্ত্রণাসভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই সভায় ইহা ধার্য্য হয় যে, যশোহর জেলার নমঃশূদ্রগণ ৭ হইতে ১২ বৎসরের বালক ও বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য হইবে এবং যে-গ্রামে ২৫টি ছাত্র ও ছাত্রী আছে, তথায় বালক ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিবে। বিদ্যালয়সমূহের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেক গৃহস্থ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য দিবে। গৃহিণীগণ প্রতিদিন একটি ভাণ্ডে চাউল দান করিবেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কার্য্যে যে-ব্যয় হইবে, তাহা হইতে টাকা প্রতি এক আনা বিদ্যালয়ের জন্য দান করিবেন।

এখন নমঃশূদ্রদের মধ্যে দুই-তিন বৎসরের মেয়ের সহিতও দশ এগার বৎসরের ছেলের বিবাহ হয়। এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য সমবেত নমঃশূদ্রগণ এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ১২ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার ও ২০ বৎসরের পূর্ব্বে পুত্রের বিবাহ দিবেন না। অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া যাহাতে অল্পব্যয়ে নির্ব্বাহ হয়, সকলেই তাহার জন্য যত্নবান হইবেন। গবর্ণমেণ্ট্ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে-বিল উপস্থিত করিয়াছেন, এই সভা সম্পূর্ণরূপে তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ইউনিয়ান-বোর্ড, লোক্যাল্ বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ও ব্যবস্থাপক সভায় যাহাতে নমঃশূদ্র সভ্য মনোনীত হইতে পারে, তজ্জন্য এই সভা গবর্ণমেণ্ট্‌কে অনুরোধ করিয়াছে। নমঃশূদ্র ছাত্রদিগকে মেডিক্যাল্, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ও শিল্প-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার সুবিধা করিয়া দিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইবে। যশোহর জেলার সমস্ত নমঃশূদ্র নরনারীকে সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে সংঘবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে জেলাসমিতি গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য তাহার সভাপতি; বাবু রসিকচন্দ্র বিশ্বাস বি-এ, মালিয়াট বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মজুমদার, বি-এ প্রভৃতি তাহার সম্পাদক; শ্রীযুক্ত কালিদাস বিশ্বাস ধনাধ্যক্ষ; শ্রীযুত রাসমোহন মিশ্র প্রভৃতি কয়েক জন ধন-সংগ্রহকারী; এবং প্রত্যেক মহকুমার কতিপয় প্রধান লোক কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

—সঞ্জীবনী

বাঁকুড়া-জেলা ডাক-সমিতির পঞ্চমবার্ষিক অধিবেশনে রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, এম-এ, বিদ্যানিধি, সভাপতির সম্বোধনের সারমর্ম্ম

যে-ডাকঘরের সহিত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের সম্পর্ক, তাকে চিনি না, জানি না বলা চলে না। যদি বা না জানি, জানা কর্ত্তব্য মনে করি। কারণ, ডাকঘর আমার দেশের, কর্ম্মচারিগণ আমার দেশের। শুধু আমার নয়, ডাকঘরের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক পরোক্ষও নয়, প্রত্যক্ষ। সরকারী অপর কোনও বিভাগের সহিত জনসাধারণের এমন প্রত্যক্ষ ব্যবহার আবশ্যক হয় না। যারা লিখতে পড়তে জানে, তাদের ত কথাই নাই; যারা জানে না,—কোন্ নিভৃত পল্লীর অজানা কোণে কোন্ দুঃখী বিধবা, কোন্ মাতা, কোন্ ভগিনী বাস করছে, তারাও ডাকঘর দিয়ে দূরস্থ প্রিয়জনের সংবাদ পাচ্ছে। কত লোকের কত জিনিষ যাচ্ছে-আসছে; টাকা-কড়ির লেন-দেন হ'চ্ছে; কর্ম্মচারিগণের সত্যে নির্ভর ক'রে এক বৃহৎ মহাজনি চলছে। অপর কথা কি, মেলেরিয়া-রোগে কুইনীন চাই, ডাকঘর যাও, ডাকঘর যেন ডাক্তার-খানা! সরকারী আর-একটি বিভাগ নাই, যেখানে এত রকমের কাজ, এত অসংখ্য লোকের কাজ স্থানীয় দুই-চারিজন কর্ম্মচারীদ্বারা চলছে। এই যে ডাকঘর ইহা নূতন অনুষ্ঠান, পূর্ব্বকালে ছিল না। অবশ্য রাজার দূত থাকত; বণিককে হাটের বার্ত্তা পেতে দূত পাঠাতে হ'ত। প্রজা-সাধারণের পক্ষেও সেই অবস্থা, দুই-এক পয়সা ব্যয়ে সংবাদ পাওয়া ঘটত না। কতকগুলি লোক বার্ত্তা বহন করত। তাদিকে বলত 'ধাঅড়িয়া', অর্থাৎ ধাবক, বর্ত্তমান কালের "রানার্"। পথ দুর্গম; দস্যু ও শ্বাপদ পশু হ'তে ভয় ছিল। ধাঅড়িয়ারা অস্ত্রধারী হ'য়ে দৌড়াইত; রাত্রি হ'লে মশাল জ্বেলে চীৎকার করতে-করতে যেত। সে-অস্ত্রের চিহ্ন এখন রানারের বর্ষাতে, এবং ডাক-হাঁকের চিহ্ন শিকলের ঝন্‌ঝনে আছে। সেই ডাক হ'তে চিঠিপত্রাদি প্রেরণের কার্য্য-বিভাগের নাম ডাকঘর হ'য়েছে। বর্ত্তমান ডাকঘর গবর্ণমেণ্টের হাতে। আমরা ভুলে যাই, অন্য লোকেও ডাকঘরের কাজ ক'রতে পারত। দেশের সব রেল সরকারের হাতে নাই, তারের সংবাদ এক এক কোম্পানী পাঠাচ্ছেন। কিন্তু ডাকবিভাগ গবর্ণমেণ্টের হওয়াতে প্রজাবর্গের সুবিধা হয়েছে, অন্যের যা অসাধ্য হ'ত, ইহাতে তা সাধ্য হয়েছে। বর্ত্তমান ডাকঘর এক অভাবনীয় ব্যাপার। রেল হওয়ার পর ডাকবিভাগের কর্ম্ম-বাহুল্য হয়েছে। আমাদের জীবন-যাত্রার সহিত এমন জড়িত যে, বন্ধ হ'লে বর্ত্তমান কালকে অতীতে প্রবেশ ক'রতে হ'বে, সভ্যতার গতি রুদ্ধ হবে।

যাঁরা এই ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন, আমরা তাঁদের খবর রাখি না, তাঁদের কষ্টের কথা ভাবি না। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বাঁকুড়ায় প্রথম আসি, তখন এক ঘটনায় আমার এইরূপ উদাসীনতায় প্রবল ধাক্কা লাগে, আমার নিকট ডাকঘরের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। বেলা একটা হ'তে তিনটা পর্য্যন্ত বাঁকুড়ার ডাকঘরের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কার্য্যকলাপ লক্ষ্য ক'রেছিলাম, গবাক্ষের অন্তরালে যাঁরা বাহিরের লোকের কাজ করছিলেন, তাঁদিকে কলের যন্ত্র মনে হ'য়েছিল। সেই একই মণি-অর্ডার, একই রেজিষ্টারি, একই সেভিংসব্যেঙ্ক—সব পুরাতন, প্রত্যহ পুরাতন, প্রতি মিনিটে পুরাতন, নূতন কোথাও নাই, ভাববার নাই, বুদ্ধি খেলাবার নাই, অথচ সর্ব্বদা সাবধান থাকতে হয়, অন্যমনস্ক হ'বার যো নাই, ভুল হ'লে বিপত্তির সীমা নাই। নূতনত্বে আনন্দ, সে-আনন্দ কই? আর আনন্দ ব্যতীত জীবনে রস কই? সত্য কথা বলতে কি, আমি এইরকম কাজ দশ দিন ক'রতে পারতাম কি না সন্দেহ। আমরা ডাকঘরের ও রেলের টিকিট-বেচা কেরাণীর অশিষ্ট ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হই; কিন্তু ভাবি না, ধৈর্য্য অসীম না হ'লে কর্ম্মদোষে মেজাজ খিট্‌খিটা হ'য়ে পড়ে। রেলের টিকিট-বেচা কেরাণীর কর্ম্মের বিরাম আছে, কিন্তু ডাকঘরের কেরাণীর নাই। কাহাকে-কাহাকেও ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খাটতে হয়, দশটার আগে স্নানাহারের ছুটি আছে বটে, কিন্তু সেটা ছুটি নয়, ছুটাছুটি। হৃদয়বান ও চিত্ত-সম্পন্ন মানবকে কলে পরিণত করলে তার মানবত্ব লুপ্ত হয়। শ্রম ও বিশ্রাম,—দুই নইলে মানুষের স্বাস্থ্যের ও আয়ুর হানি হয়। জানি না, ডাকঘরের কর্ম্মচারিগণের পরমায়ু কত। অবশ্য ডাকঘরের কাজ বন্ধ করা যেতে পারে না, কিন্তু আরও লোক নিযুক্ত করা যেতে পারত।

যে-কর্ম্মে বিশ্রাম পাই না, নিজের বলতে একটু সময় পাই না, সে-কর্ম্মের বেতন যতই হ'ক, বাঞ্ছনীয় নয়।

এইরূপ আরও কত কষ্ট আপনাদের থাকতে পারে, ভুক্তভোগী
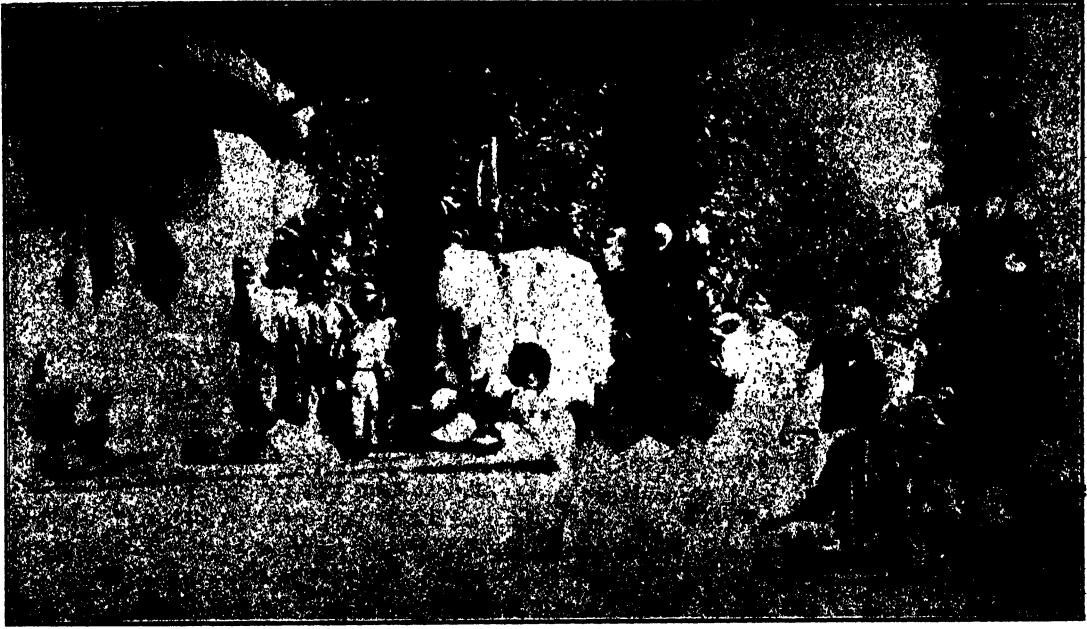
বাঁকুড়া অমরকানন আশ্রমের বক্তৃতা-মঞ্চে মহাত্মা গান্ধী

[শ্রী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে

নইলে অন্যের বুঝা সাধ্য নয়। সেইসব কষ্ট গবর্ণমেণ্টের গোচর ক'র্‌তে আপনারা যে সমিতি ক'রেছেন, ভালই ক'রেছেন; কারণ রাম-হরি-যদুর কষ্ট নয়, সমগ্র ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীর কষ্ট। একা একা নানা দুঃখ বোধ ক'র্‌তে পারি; সে-দুঃখ নিজের নিজের কাছে অতিশয় বোধ হ'তে পারে, অন্যের নিকট সেরূপ নাও হ'তে পারে। কিন্তু সমষ্টির কষ্ট কখনও হেতুহীন হয় না। তা' ছাড়া এ-সংসারে যে ঠেল্‌তে পারে, সেই পথ মুক্ত পায়। অন্যে কেহ কারও কষ্টের বার্ত্তা নেয় না। আরও কথা, এখানে দাতা এক, প্রার্থী বহু। গবর্ণমেণ্টের কানে আপনাদের কষ্টের কথা পৌঁছাতে বহুজনের চীৎকার আবশ্যকও বটে। সংহতি কার্য্য-সাধিকা, সমিতি ও সংহতি একই। নিখিল ভারতীয় ডাক-সমিতি গবর্ণমেণ্টের কাছে যে-সকল প্রার্থনা ক'রেছেন, সে-সবের কোন্‌টা ন্যায্য কোন্‌টা অন্যায্য, সে-বিচারের যোগ্য আমি নই। কিন্তু প্রভুর নিকট ভৃত্যের প্রার্থনা কর্‌বার অধিকার আছে।

আপনাদের দুঃখ-কষ্টসত্ত্বেও আপনারা কর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌লে নূতন লোকের অভাব হয় না, অতএব সে-সব কষ্ট কাল্পনিক, প্রকৃত নয়, এই যে হেতুবাদ ইহা ঠিক নয়। কারণ, কে না বোঝে, অনশন অপেক্ষা অর্দ্ধাশন শ্রেয়ঃ, এবং অর্দ্ধাশনে থেকে ভৃত্যের কর্ম্ম কখনও সুচারু হয় না। সে যা হ'ক আমরা বাইরের লোক, ডাকঘরের কর্ম্মচারিগণকে সন্তুষ্ট দেখতে চাই। কারণ তাঁদের অসন্তোষের ফল, আমাদিকেও ভুগ্‌তে হয়। তাঁরা প্রসন্ন থাক্‌লে ডাকঘরে আমাদেরও প্রসন্নতা।

যাবতীয় সমিতির উদ্দেশ্য, স্বার্থ-রক্ষা ও স্বার্থ-বৃদ্ধি। পূর্ব্বকালে এই প্রয়োজনে জাতির সৃষ্টি হ'য়েছিল। জাতিভেদের মূলে গুণ, এবং গুণভেদে কর্ম্মভেদ ঘটে। আপনাদের গুণ আছে, যে-গুণের জন্য ডাকঘরের কর্ম্ম ক'র্‌তে পার্‌ছেন। যে-সে লোক আপনাদের কর্ম্ম ক'র্‌তে পারেন না। তাঁদের আবশ্যক গুণ নাই। যে কর্ম্ম-নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিশেষ শিক্ষা ও পরীক্ষা আবশ্যক হয়, সে-কর্ম্ম সহজ ব'ল্‌তে পারি না। যে-গুণে আপনারা কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌ছেন, সে-গুণের নামান্তর নৈপুণ্য। অতএব ডাকঘরের কর্ম্ম ক'র্‌তে নৈপুণ্য আবশ্যক হয় না, এই যে আর-এক হেতুবাদ, ইহাও ভ্রান্ত মনে করি।

এতকাল আমার ধারণা ছিল, ডাক-বিভাগ হ'তে গবর্ণমেণ্টের আয় দাঁড়ায়। কিন্তু এখন শুন্‌ছি, এই বিভাগ হ'তে আয় না হ'য়ে ক্ষতি হচ্ছে। হয়ত হিসাব-নিকাশে কোথাও ভুল হচ্ছে। হয় ত বা প্রকৃত পক্ষে ক্ষতিই হচ্ছে। যদি বা ক্ষতিই হচ্ছে, তা হ'লেও এত সর্ব্বজনহিতকর অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সে-ক্ষতি, হিতের তুলনায় তা ক্ষতি ব'লে স্বীকার কর্‌তে পারা যায় না। সর্‌কারী আরও অনেক বিভাগ আছে, যাতে আয় হয় না। উদাহরণ-স্বরূপে শিক্ষা-বিভাগ ধরুন। এই বিভাগ হ'তে রাজকোষের কপর্দ্দকও বৃদ্ধি হচ্ছে না; বরং লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় হ'য়ে যাচ্ছে। ডাকবিভাগের দ্বারা দেশে যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার হচ্ছে, তার মূল্য অবশ্য আছে। টেলিগ্রাফ-বিভাগ ধরুন। এই বিভাগে ব্যয় যত, আয় তত নয়। অথচ ডাক বিভাগের তুলনায় দেশের ক'জন সেই বিভাগের দ্বারায় উপকৃত হচ্ছে? কই টেলিগ্রাফ বিভাগের আয়-ব্যয় সমান কর্‌বার প্রস্তাব শুন্‌তে পাই না। আমরা চাই, চিঠিপত্রের মাশুল কম হ'ক, আরও ডাকঘর হ'ক। কোথা হ'তে টাকা আস্‌বে, সে-কথা রাজস্ব-মন্ত্রী ভাববেন।

আপনাদের কাছে আমার এক নিবেদন আছে। আপনাদের কষ্ট যতই থাক্, মনে রাখ্‌বেন, আপনারা দেশভৃত্য। আমাদের দেশ শিক্ষিত নয়। সময়ে-অসময়ে নানা প্রকারে আপনাদের বিরক্তি জন্মাতে পারে। সে সময়ে যিনি ধীরভাবে কর্ম্ম কর্‌তে পারেন, তাঁর কর্ম্মই সার্থক। কারণ, তাতে একদিকে তাঁর মনের শান্তি, অন্যদিকে দেশের লোকের সহানুভূতি লাভ হ'বে। আপনাদের প্রার্থনা-পূরণের পক্ষে লোকমত প্রধান পৃষ্ঠবল। প্রত্যেক চাকরীর দুইটা দিক আছে, একটা নিজের,

অন্যটা পরের। যখন নিজের দিক ও পরের দিক, নিজের জীবিকায় ও পরের সেবায়, বিসম্বাদ না ঘটে, তখন কষ্টের পরিমাণ লঘু হয়।

—একতা

দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষা—

দেশবন্ধু স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, সর্ব্বসাধারণের অর্থদ্বারা স্ত্রীলোকদের জন্য যে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প ছিল, তাহার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। দেশবন্ধুর শেষ দান তাঁহার কলিকাতার রসারোডের বাড়ীটি হাঁসপাতালের উপযুক্ত করিয়া সংস্কার করা হইয়াছে। হাঁসপাতালের জন্য উপযুক্ত ডাক্তার ও ধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাংলার মিউনিসিপ্যালিটী—

বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের ১৯২৪-২৫ সালের সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৩১৭৮৯৫ জন করদাতা ছিল। বাংলার অধিবাসীর সংখ্যানুপাতে করদাতার সংখ্যা শতকরা ১৫৭ জন। প্রত্যেক করদাতাকে ৩৲ টাকা ৪ পাই করিয়া কর দিতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৪৯টি মিউনিসিপ্যালিটিতে নূতন করিয়া কর ধার্য্য করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বৎসর ৫৯ লক্ষ টাকা কর আদায় হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, গতবৎসরের জেরসহ এই বৎসর ১০৬০৩৩৮০ টাকা আয় এবং ৮৬১৩৭১৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শিক্ষার জন্য গতবৎসর ২৯৪৩২১ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ—

গতমাসে কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব হইয়া গিয়াছে। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তাহাতে প্রকাশ যে, পরিষদ ধীরে-ধীরে নানা দিকে তাহার কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তার করিতেছে। এই সভায় শ্রীযুক্তা আনিবেশান্ত সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

দান—

ডাক্তার তারিণীচরণ সাহার নিবাস ঝালকাটীর অন্তর্গত চণ্ডীকাটি গ্রামে। তাঁহার বয়স সম্প্রতি ৬০ বৎসর। তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি—মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা—বরিশাল মেডিক্যাল স্কুলের একটি হাঁসপাতাল খুলিবার জন্য দান করিয়াছেন। তাঁহার যোগ্যা পত্নীও সমস্ত স্ত্রী-ধন ঐ-উদ্দেশ্যে লিখিয়া দিয়াছেন।

বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা—

মৌলানা হাজী শাহ সুফী পীর আবুবকর ও পীর বাদশা মিঞা সাহেবের আহ্বানে গত ১৩ই মার্চ্চ শনিবার সকাল ৭॥ ঘটিকার সময় জমিয়তে-ওলামায়ে হিন্দের মণ্ডপে বঙ্গ ও আসামের বে-সরকারী মাদ্রাসাসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বাঙ্গালা ও আসামের আলেম-মণ্ডলীর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে বাঙ্গালা ও আসামের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিস্থানীয় দেশমান্য আলেম ও কর্ম্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য কার্যের পর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়:—

"জমিয়তে-ওলামায়ে-হিন্দের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে স্যর্ আবদর রহিম সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষাকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন স্বরূপে ব্যবহার করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালা ও আসামের আলেম ও কর্ম্মীবৃন্দের এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে; এই সভার মতে বাঙ্গালাই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা এবং বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাদান-পদ্ধতি প্রচলিত হইলে তাহা বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষার্থীদিগের চিন্তাশীলতা ও জ্ঞানচর্চ্চা বৃদ্ধির পক্ষে অতীব কল্যাণকর হইবে।"

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতসচিব আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলাকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

আর্য্য বিধবা আশ্রম—

লাহোরের আর্য্য বিধবা শ্রমের নবদ্বীপে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শাখা প্রায় ৫০টি বিধবাকে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

অমর-কানন আশ্রম ও গঙ্গাজলঘাটী জাতীয় বিদ্যালয়—

এই আশ্রম ও বিদ্যালয় বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। গত বৎসর মহাত্মা গান্ধী আশ্রমস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মানুশীলন মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। তদুপলক্ষে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন:—

"আজকাল দেশে আশ্রম করার একটা হাওয়া চলিয়াছে। আমার ভারতব্যাপী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এই, যে, শতকরা ৯৫টি আশ্রম উঠিয়া গিয়াছে। আশ্রমের পরিচালকদিগের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—অজ্ঞতা, দম্ভ ও কপটতা। আশ্রমের পরিচালকদিগকে এই তিনটি দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইবে; এবং তাঁহাদের মধ্যে পবিত্রতা, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা ও শান্তিময়তা,—এই চারিটি গুণের অনুশীলন আবশ্যক। এই আশ্রমের সেবকবৃন্দ একসঙ্গে বহুকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমি যদি এই আশ্রমের পরিচালক হইতাম, তবে একটি কি-দুইটি, কি তিনটি কার্য্য ধরিয়া থাকিতাম। আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রভৃতি অবস্থার আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, যে, এখন কৃষিদ্বারা দেশ উদ্ধার হইবে না। ত্রৈরাসিক অঙ্ক যেমন বুঝান যায়, তেমনই আমি এই সত্য বুঝাইতে পারি। উপসংহারে আমি এই আশ্রমের মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করি। কিন্তু কামনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না; আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী চেষ্টা আবশ্যক। আশা করি এই আশ্রমের সেবকগণ সেইরূপ চেষ্টা করিবেন।"

এই আশ্রমে দৈহিক শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা, (মাতৃভাষার সাহায্যে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ও প্রাথমিক বিজ্ঞান), বৃত্তিশিক্ষা (সূতাকাটা, কাপড় বোনা, সেলাই, ইত্যাদি), নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রগণ ও ত্যাগী শিক্ষকগণ বিদ্যার্থী-আশ্রমে একত্র জীবনযাপন করেন। গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে বিপন্ন লোকদের সাহায্য, মেলা উৎসব প্রভৃতিতে শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্ত্তসেবা, রোগীদিগকে ঔষধপথ্যদান প্রভৃতি সেবার কার্য্য এই আশ্রম করিয়া থাকেন। গান্ধী মহাশয় আশ্রমের সেবকদিগের বিনয় ও সরলতা গুণ লক্ষ করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের নূতন অবস্থান-ভূমিতে নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ, কূপ-খনন প্রভৃতি কার্য্যে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে বিশেষভাবে খাটিতে হইয়াছে। কাঠ, খড়, বাঁশ, চাউল অর্থ প্রভৃতি সংগ্রহ; নিজ হস্তে ইটফেলা, দেওয়াল নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করা—এইসমস্ত কাজ করিতে হইয়াছে। এক বৎসর এই ব্যাপারেই শিক্ষক ও ছাত্রগণের অবশিষ্ট শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ
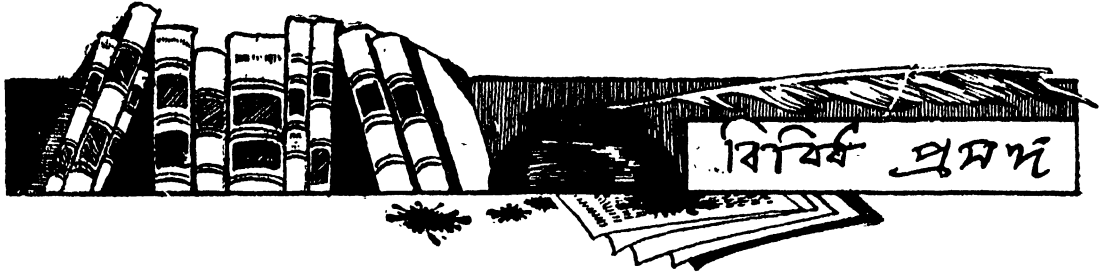
প্রণতি

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া ১৩০৮ সালের বৈশাখে প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাঁহার কৃপায় ইহার জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসর পূর্ণ ও অতীত হইল। দ্বিতীয় পঁচিশ বৎসরের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইতেছি।

—

প্রবাসীর প্রশংসা

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রবাসীর যে-সকল প্রশংসা ছাপিয়াছি, তাহা অনেক দ্বিধার পর ছাপিয়াছি। প্রবাসীর প্রশংসা ছাপা অপেক্ষা আমার ব্যক্তিগত প্রশংসা ছাপিতে আমার অধিকতর সংকোচ বোধ হইয়াছে। কারণ, প্রবাসী যতটা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র আমার চেষ্টায় হয় নাই; অন্য যাঁহাদের চেষ্টায় হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য, এবং সর্ব্বসাধারণের ও আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র।

আমার ব্যক্তিগত যেরূপ প্রশংসা প্রবাসীর হিতৈষীগণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সমুদয় দোষ ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা জানিলে সেরূপ প্রশংসা করিতেন না। কিন্তু সম্পাদক কিরূপ হইলে এবং নিজের কাজ কিভাবে করিলে তাঁহাদের প্রশংসার যোগ্য হন, তাঁহাদের প্রশংসা হইতে আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের লেখা হইতে সম্পাদকীয় আদর্শ সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর হওয়ায় আমি উপকৃত হইয়াছি এবং তাহার জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার পার্থিব জীবন ও সম্পাদকীয় [জীব]ন শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই কারণে, আমার [হিতৈ]ষীদিগের আদর্শের মত হইতে চেষ্টা করিবার জন্য [আ]মি বেশী সময় পাইব না। যে-সকল সম্পাদকের বয়স আমা অপেক্ষা অনেক কম, উক্ত আদর্শ তাঁহাদের কোন কাজে লাগিলে সুখী হইব।

প্রবাসীর উন্নতির জন্য যিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমি শ্রদ্ধার সহিত মন দিয়া পড়িয়াছি ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি। উপদেশগুলি আমার নিজের ব্যবহারের জন্য বলিয়া মুদ্রিত করিলাম না। কিন্তু আমার বুদ্ধি বিবেচনা ও শক্তি অনুসারে আমি হিতৈষী-দিগের উপদেশের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব।

"আশীর্ব্বাদ ও স্বস্তিবাচন" ছাপা হইয়া যাইবার পর শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাশালী ও শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর চিঠি পাইয়াছি। তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালন আমি ভাল করিয়া করিতে পারি নাই। আমার যত দোষ ত্রুটি ও ভ্রম হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কুণ্ঠিত আছি।

—

ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ

বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে হিন্দু সমাজের যেসকল জাতি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন, তাঁহাদের কেহ কেহ অনেক বৎসর হইতে আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ জাতির অধিকাংশই আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিতে উৎসুক। তাঁহারা যে-সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, তাহা হিন্দু সমাজের অনুমোদিত হইলে আমরা সুখী হইব।

যাঁহারা আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া প্রমাণিত করিতে চান, তাঁহাদের নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কি, তাহা তাঁহাদের অবিদিত নহে। ক্ষত হইতে যিনি ত্রাণ করেন, তিনিই

ক্ষত্রিয়। কিন্তু "স্বয়ম্ অসিদ্ধঃ কথম্ পরান্ সাধয়েৎ"? নিজে যিনি সিদ্ধ হন নাই, তিনি পরকে কেমন করিয়া সিদ্ধি দিবেন? যিনি দুর্ব্বলকে, অত্যাচরিতকে রক্ষা করিবেন, সাহস, আশ্বাস ও আশ্রয় দিবেন, তাঁহার আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া গোড়াতেই চাই। অতএব যাঁহারা ক্ষত্রিয়, এবং ক্ষত্রিয়ত্বের সম্মান দাবী করেন, তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে হইবে এবং দুর্ব্বল ও অত্যাচরিতকে রক্ষা করিতে ও আশ্রয় দিতে হইবে। অবশ্য তাহাদিগকে রক্ষা করিলে ও আশ্রয় দিলেই কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হইবে না; তাহাদিগকেও আত্মরক্ষায় সমর্থ করিয়া তুলিতে হইবে।

আত্মরক্ষার সামর্থ্য দৈহিক শক্তির উপর এবং অস্ত্র-ব্যবহারে দক্ষতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যাহার মনের জোর নাই, সাহস ও দৃঢ়তা নাই, কোনপ্রকারে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সম্মানের সহিত মৃত্যু শ্রেয়ঃ এই বিশ্বাস নাই, তাহার দৈহিক বল ও অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অধিক হইলেও, সে সকল সময় আত্মরক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা করিতে সমর্থ না হইতেও পারে। অতএব, সর্ব্বাগ্রে নির্ভয় হইতে হইবে। নানা কারণে শৈশব ও বাল্যকাল হইতেই কাহারও কাহারও ভয় বেশী বা কম থাকে। কিন্তু আত্মপরীক্ষা দ্বারা ও পুনঃ-পুনঃ অবিরাম চেষ্টা করিয়া ভয়াতুর লোকেও যে খুব সাহসী হইয়া উঠিতে পারে, তাহার অনেক প্রমাণ ইতিহাসে ও বিখ্যাত লোকদের জীবনচরিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহারা বলিয়াছেন, যে, ভয় খুব কমাইয়া আনা যায়।

এই কথা কেবল যে ব্যক্তির পক্ষে সত্য তাহা নহে, জাতির পক্ষেও সত্য। ইতিহাসের কোন সময়ে যে-জাতি ভীরুতার প্রমাণ দিয়াছে, পরবর্ত্তী যুগে তাহারাই সাহসেরও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে।. সেইজন্য, আমরা সকলেই, ফললাভ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া, সম্পূর্ণরূপে ভয়শূন্য হইবার চেষ্টা করিতে পারি। একাগ্রতার সহিত সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহার প্রমাণের জন্য দূরদেশে যাইতে হইবে না, অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে না। আমরা এখন কলিকাতায় বসিয়া দেখিতেছি, ভীরু বলিয়া যাহাদের নিন্দা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘোষিত হইয়াছিল, তাহারা অনেকে আত্মরক্ষায় অন্য কাহারও চেয়ে কম সাহস ও দক্ষতা দেখায় নাই, দেখাইতেছে না।

পাঠকেরা সকলেই জানেন, আমাদের দেশে আত্মরক্ষার প্রয়োজন কিরূপ এবং তাহার উপলক্ষ কত বেশী। অসহায়, দুর্ব্বল ও অত্যাচরিতের সাহায্য করিবার প্রয়োজন গ্রামে নগরে গৃহে পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র প্রত্যহ ঘটিতেছে। অতএব ক্ষাত্রধর্ম্মের আচরণ করিবার অবসর খুবই রহিয়াছে। সকল ক্ষত্রিয়ের নিকট নিবেদন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুসরণ করুন।

ক্ষাত্রধর্ম্মাচরণে অধিকার কেবল যে ক্ষত্রিয়েরই আছে, তাহা নহে; অন্যেরও আছে। যাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ চান, তাঁহারা জানেন, দ্রোণের মত পরশুরামের মত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কাজ করিয়াছিলেন; আবার যাঁহারা জাতিতে বৈশ্য বা শূদ্র এরূপ লোকেরও ক্ষত্রিয়ের মত আচরণের দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে ও ইতিহাসে আছে। যাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ চান না, তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না, যে, ইতর প্রাণীরাও যখন আত্মরক্ষা ও আশ্রিতের রক্ষা করিয়া থাকে, তখন প্রত্যেক মানুষের তাহা করিবার অধিকার অবশ্যই আছে। ইহা সকলেরই অধিকারভুক্ত ও কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির গুণ ও ধর্ম্ম রহিয়াছে। জ্ঞানোপার্জ্জন ও সাত্ত্বিকতা লাভ, আত্মরক্ষা ও আর্ত্তরক্ষা, পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ দ্বারা উপার্জ্জন ও সমাজসেবা, এবং নানাপ্রকারে অপরের আজ্ঞা-পালন ও সেবা প্রত্যেক মানুষই করিতে পারেন এবং অনেকেই করিয়া থাকেন।

—

কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুনাখুনি

কলিকাতায় কয়েক দিন ধরিয়া যে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুনা-খুনি চলিতেছে, তাহা সাতিশয় শোচনীয় এবং হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই ঘোরতর লজ্জার বিষয় এবং বিশেষ অনিষ্টকর। কোন্ সম্প্রদায়ের দোষ কতটুকু, তাহা নিক্তির ওজনে স্থির করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, ইচ্ছা-ও নাই, বোধ হয় সে-চেষ্টা করিয়া এখন কোন লাভও নাই।

ধর্ম্মের নামে এবং ধর্ম্মাচরণকে উপলক্ষ করিয়া ঘোরতর অধর্ম্ম পৃথিবীতে শত শত বৎসর হইয়া আসিতেছে। বক্ষ্যমাণ ব্যাপারটিও এই-জাতীয় অধর্ম্ম। আর্য্যসমাজীরা এমন একটি রাস্তা দিয়া বাজনার সঙ্গে-সঙ্গে ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে-গাহিতে যাইতেছিলেন যাহার উপর একটি মসজিদ ছিল। মসজিদের নিকট তাঁহারা পৌছিলে মুসলমানেরা তাঁহাদের গান-বাজনায় আপত্তি করেন। এই বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইতে হইতে মারামারি আরম্ভ হয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামার আরম্ভ এইরূপে হয়।

আমরা অনেক বার বলিয়াছি, কোনও সম্প্রদায়ের লোক যখন তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরে আরাধনা প্রার্থনাদি করেন, তখন তাহার নিকটে কোনপ্রকার গোলমাল না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেহ যদি এরূপ পূজা-অর্চ্চনায় ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্যই কোন-প্রকার গোলমাল করে, তাহা অত্যন্ত গর্হিত ও তাহা বন্ধ করিবার আইনসঙ্গত উপায় অবলম্বন করা উচিত।

কিন্তু যদি এইরূপ-উদ্দেশ্যবিহীন সাধারণ গোলমালে কোন সম্প্রদায় আপত্তি করেন, তাহা হইলে হয় সকল-রকম গোলমালেই আপত্তি করা তাঁহাদের উচিত, নতুবা সকল-রকম গোলমালেই সমান ঔদার্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। অতীত কালে মুসলমানেরা শেষোক্ত প্রশংসনীয় পন্থাই অবলম্বন করিতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাঁহারা অন্য সব গোলমাল সহ্য করেন, কেবল হিন্দুদের গীতবাদ্যসংযুক্ত শোভাযাত্রার গোলমাল সহ্য করেন না। ইহা আমাদের বিবেচনায় অযৌক্তিক। মুসলমানদিগের মহরমের সময় তাঁহারা নিজেদের মসজিদ ও অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরের সম্মুখে ঢাক বাজাইয়া থাকেন। তাহা মুসলমানেরা অন্যায় মনে করেন না। অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাতে আপত্তি করেন না। আপত্তি না করাই উচিত। কারণ, যদিও জ্ঞানী অনেক মুসলমান মহরম শোকের ব্যাপার বলিয়া তদুপলক্ষে তাজিয়া লইয়া শোভাযাত্রা ও বাদ্যের বিরোধী, তথাপি যে-সকল মুসলমানের মত অন্যরূপ, তাঁহারা বিষাদের পর্ব্বকে উৎসবে পরিণত করিলে, অন্যের তাহাতে বাধা দিবার অধিকার নাই।

অনেক মসজিদ কলিকাতার ও অন্য অনেক বড় বড় সহরের বড় বড় রাস্তার উপর অবস্থিত। সেইরূপ অনেক রাস্তায় প্রত্যহ ভোর হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জনকোলাহল এবং নানা-প্রকার গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি এবং ভেঁপুর ও ঘণ্টার আওয়াজ লাগিয়াই থাকে। এই যে প্রাত্যহিক গোলমাল, ইহা কালেভদ্রে হিন্দুদের নগরকীর্ত্তন বা অন্যবিধ গানবাজনা ও শোভাযাত্রা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে, বরং বেশী। কিন্তু রোজকার এই গোলমালে কোন আপত্তি না করিয়া মুসলমানেরা খুবই সুবিবেচনার কাজ করিয়া থাকেন; এই সুবিবেচনা ও সহিষ্ণুতা যদি তাঁহারা হিন্দুদের গীতবাদ্যসহকৃত শোভা-যাত্রা সম্বন্ধেও প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে বিবাদের ও রক্ত-পাতের কোন কারণ ঘটে না।

আমরা জানি না, মুসলমানদের ধর্ম্মে মসজিদের সম্মুখে বিশেষ করিয়া হিন্দুদেরই গীতবাদ্যে বাধা দিবার কোন বিধি ও আজ্ঞা আছে কি না। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত কোন মুসলমান এবিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিলে বাধিত হইব।

কোনও দেশে যদি কেবল মুসলমানের বাস হয়, তাহা হইলে তথাকার সমুদয় ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবস্থা মুসলমান ধর্ম্ম অনুসারে হইতে পারে, যদিও সেই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও মতভেদ থাকায় ঠিক্ একরকম ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ভারতবর্ষের মত যে-সব দেশ নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বাসভূমি,সেখানে কেবল কোন একটিসম্প্রদায়ের সুবিধা দেখিলে চলিবে না। হিন্দুরা যদি বলেন, এদেশে মুসলমানদের পর্ব্ব উপলক্ষে গোবধ হইতে পারিবে না, তাঁহাদের সে-ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না—এবং দেখাও যাইতেছে, যে, ঈদ্ বক্‌রীদে গোবধ লইয়া হিন্দুরা যতই গোলমাল করুন না, প্রত্যহ যে শত শত গোবধ কেবল-মাত্র খাদ্যের জন্য হইতেছে, হিন্দুরা তাহা নিবারণের যথেষ্ট চেষ্টা করেন না এবং নিবারণে সমর্থও হন নাই। অন্য দিকে মুসলমানরা যদি বলেন, হিন্দুদের দেবমন্দির ও দেবদেবী-মূর্ত্তি থাকিতে দিব না, কিম্বা মসজিদের সম্মুখে বা নিকটে তাঁহাদের গীতবাদ্য ও শোভাযাত্রা হইতে দিব না, সে-আপত্তিও টিকিবে না।

সকল দেশের ও সকল জাতির জ্ঞানী জনেরা পরমত-সহিষ্ণু, এবং অন্যকেও এই পরমতসহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে তাঁহারা উপদেশ দেন। যাঁহারা বুঝিয়া-সুঝিয়া অন্তরের সহিত এই উপদেশ গ্রহণ করেন ও তাহার অনুসরণ করেন, তাঁহারা সুবিবেচক। সকলে এইরূপ আচরণের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে নাও পারেন। কিন্তু পরমতসহিষ্ণুতা যে সাংসারিক সুবিধাজনক, তাহা বুঝিতে গভীর দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কলিকাতায় এই যে শোচনীয় ব্যাপারটি ঘটিল, তাহাতে হিন্দু বা মুসলমান কাহার লাভ হইল বা কীর্ত্তির ধ্বজা চিরস্থায়ী হইল? বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান হত ও আহত হইয়াছে, তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক লোকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, শত শত হিন্দু ও মুসলমান কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে কোন সম্প্রদায়েরই লাভ, সুবিধা বা সুখ্যাতি হয় নাই। যাঁহারা হিন্দু বা মুসলমান কিছুই নহেন, এরূপ লোকদেরও খুব ক্ষতি ও কাজের অসুবিধা হইয়াছে। কয়েক দিন ধরিয়া কলিকাতার উত্তরাংশের সহিত ডাক ও টেলিগ্রাফ দ্বারা বাহিরের জগতের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিলেও হয়।

অথচ অন্য সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল হিন্দু ও মুসলমানদের বিষয় বিবেচনা করিলেও দেখা যায়, যে, কতকগুলি হিন্দুর অপকার্য্যের জন্য সব হিন্দু দায়ী নহে, কতকগুলি মুসলমানের অপকার্য্যের জন্য সব মুসলমান দায়ী নহে। যাঁহারা দাঙ্গা মারামারি খুনাখুনি ধর্ম্মমন্দির-বিনাশ প্রভৃতি কোন অপকর্ম্ম করেন নাই, তাঁহাদের কাহারও কাহারও মনে প্রতিহিংসার ভাব এবং ঐরূপ অপকর্ম্মের সহিত সহানুভূতি থাকিতে পারে। কিন্তু কাহার মনে কি আছে, তাহার বিচার অপরে করিতে পারে না; বিচার বাহিরের আচরণেরই হয়। তাহা হইলেও আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের হৃদয়মন পরীক্ষা করা উচিত, এবং তাহা হইতে প্রতিহিংসা ও পরমত-অসহিষ্ণুতা দূর করা কর্ত্তব্য।

হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের যে-সকল লোক ধর্ম্মান্ধতা, উত্তেজনা, প্রতিহিংসা বা লুটের লোভে নানা অপকর্ম্ম করিয়াছে, কেবল তাহারাই যদি দল বাঁধিয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে তাহাও দুঃখের বিষয় হইলেও, যাহা ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা উহা ভাল হইত। কারণ, তাহা হইলে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এত লোক হত ও আহত হইত না, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এত লোক ক্ষতিগ্রস্ত ও কোন কোন স্থলে সর্ব্বস্বান্ত হইত না, এবং সম্পূর্ণ নিরপরাধ বহু সহস্র হিন্দু ও মুসলমানকে ভয়ে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইত না।

যাহার সহিত কখনও কোন বিবাদ বা মনোমালিন্য হয় নাই, কোন কালে যাহাকে হয়ত চোখেও দেখা হয় নাই, এরূপ অনেক লোককেও প্রতিহিংসা ও ধর্ম্মান্ধতায় বিকৃতমস্তিষ্ক অনেক লোক হঠাৎ অতর্কিতে আঘাত ও বধ করিতেছে, ইহা অতি ঘৃণ্য কাপুরুষতা। বিবাদ বা চাক্ষুষ পরিচয় যাহার সহিত আছে, তাহাকে অতর্কিতে বধ করা যে ভাল, তাহা বলিতেছি না। নরহত্যা এরূপ ক্ষেত্রেও দূষণীয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বিবাদ ও শত্রুতা থাকিলে ও না থাকিলে উভয় ক্ষেত্রে অপরাধের প্রকার-ভেদ ও কিছু তারতম্য হয়।

ঈশ্বর বিশেষ করিয়া কোন একটি স্থানে বাস করেন না, কেবলমাত্র কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরেই যে তিনি থাকেন, তাহাও নহে। সকল আস্তিক ধর্ম্মেই বলে, যে, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সর্ব্বাশ্রয়। সুতরাং কোন এক সম্প্রদায়ের ভজনালয় ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে খুশি করিবার চিন্তা কোন সম্প্রদায়েরই প্রকৃত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোকেরা করিতে পারেন না। বাস্তবিকও আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে, যদিও ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে মামুদ গজনবী ও অন্য কোন কোন রাজা হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন, তথাপি আলিগড়ের ইতিহাসাধ্যাপক মিঃ হবীব্, কলিকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি জ্ঞানী মুসলমান এরূপ কার্য্যের নিন্দাই করিয়াছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর ভজনালয় ধ্বংস করিবার ইচ্ছারূপ মানসিক ব্যাধি হিন্দুর ছিল না। ইহা আধুনিক ব্যাধি। হিন্দুর ইতিহাসে এরূপ অপকর্ম্মের নজীর নাই বা কম আছে। এই কারণে এরূপ গর্হিত কাজ যে-সকল হিন্দু করিয়াছে, আমরা মন্দির-ধ্বংসকারী মুসলমানদের চেয়ে তাহাদের নিন্দা বেশী

করিতে বাধ্য। মন্দিরধ্বংসকারী মুসলমানদের কাজের নিন্দা যে করি না, তাহা নহে। আমরা কেবল এই কথাই মনে রাখিতে চেষ্টা করিতেছি, যে, এরূপ মুসলমানদের দোষক্ষালকেরা বলিতে পারে যে, তাহাদের কোন কোন রাজার দৃষ্টান্ত তাহাদিগকে বিপথচালিত করিয়াছে ; কিন্তু এরূপ কিছু বলিয়া মসজিদধ্বংসকারী হিন্দুদের দোষক্ষালন করিবার বা তাহা লঘুতর প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

এইসকল দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে যাঁহারা ভাল কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

মন্দির ও মসজিদ রক্ষা করিবার জন্য যে-সকল হিন্দু ও মুসলমান প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নহে দেশবাসী সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। কাগজে দেখিলাম, স্থল বিশেষে হিন্দুর মন্দির রক্ষার ভার মুসলমানের এবং মুসলমানের মন্দির রক্ষার ভার হিন্দুর উপর অর্পিত হইয়াছিল। পরস্পরের এই সহযোগিতার ভাব অতীব প্রশংসনীয় ও আশাপ্রদ। কোন কোন মন্দির নষ্ট করিবার চেষ্টা বার বার হইয়াছে, কিন্তু স্বেচ্ছারক্ষীদের সতর্কতা সাহস ও দলবদ্ধনৈপুণ্যে আততায়ীরা বার বার তাড়িত হইয়াছে। ঠনঠনিয়া কালীতলার কালীমন্দির রক্ষা ইহার একটি দৃষ্টান্ত। এই মন্দির ধ্বংস করিবার চেষ্টা শত শত ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে অনেক বার করিয়াছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস ও নন্দলাল ঘোষের নেতৃত্বে বাঙালী যুবকেরা আক্রমণকারীদিগকে হটাইয়া দিয়াছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ডাকঘরের নিকটবর্ত্তী শিবমন্দির, প্রেমচাঁদ বড়ালষ্ট্রীটের নিকটবর্ত্তী শিবালয়, গড়পারের বারোয়ারী কালীপূজার স্থান প্রভৃতিও এইভাবে রক্ষিত হইয়াছে। পুলিস কোথাও কিছু সাহায্য করে নাই বলিতেছি না : কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য, যে, স্থানীয় বাঙালী যুবকেরা আত্মনির্ভরপরায়ণ ও সাহসী না হইলে মন্দিরগুলি ত রক্ষা পাইতই না, অধিকন্তু মন্দির বিনাশে সফলকাম বিকৃতমস্তিষ্ক লোকদের দ্বারা পাড়াপড়শী ও পথিকদের উপর সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার অবাধে অনুষ্ঠিত হইত। প্রত্যেক জায়গায় কে কি সাহসের কাজ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই, এবং যাহা দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে তৎসমুদয় এখানে লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কালীতলার মন্দির রক্ষার জন্য সিটি-কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রেরা যেরূপ সাহস ও দলবদ্ধতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

বিপন্ন অনেক লোককে যাঁহারা নিজের প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। শত্রু-ভাবাপন্ন মুসলমান-পরিবেষ্টিত অনেক হিন্দু পরিবারকে যেসব হিন্দু আশ্রয় দিয়াছেন ও উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহারা মহৎকাজ করিয়াছেন। মৌলানা আবুল কলাম আজাদ দৈনিক কাগজের মারফৎ জানাইয়াছেন, যে, কোন কোন স্থলে মুসলমানেরাও হিন্দুদিগকে এইরূপ সঙ্কট অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এরূপ সংবাদ সার্ভ্যাণ্ট কাগজেও দেখিলাম। হিন্দুরাও মুসলমানদের এইরূপ সাহায্য বহু বহু স্থলে করিয়াছেন।

কোন কোন পাড়া রক্ষা করিবার জন্য পাড়ার যুবকেরা দলবদ্ধ হইয়া দিনের বেলা এবং রাত্রেও পাহারা দিয়াছেন, এবং রাত্রে টহল দিয়াছেন ; যেমন গড়পাড়ে। ইহাতে পাড়াগুলি রক্ষা পাইয়াছে। শান্তির সময়ে সব পাড়াতেই যুবকেরা তাঁহাদের পাড়া রক্ষার ব্যবস্থা আরও সুশৃঙ্খল করিবার সুযোগ পাইবেন। যে-সব পাড়ায় হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বাস, সেখানে উভয়ের সম্মিলিত রক্ষীদল গঠন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, শান্তিরক্ষায় উভয়েরই সুবিধা, সুনাম ও কল্যাণ। সম্প্রদায়বিশেষের জয়পরাজয়কে এসব স্থলে মনের মধ্যে প্রধান স্থান দিলে তাঁহারও কল্যাণ হয় না, দেশের হিত ত হয়ই না।

কাগজে দেখিলাম, যখন বড়বাজারে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতানের বাড়ী আক্রান্ত হয়, তখন তাঁহার পরিবারস্থ মহিলারা কয়েকবার গুলি চালাইয়াছিলেন, এবং তাহাতে আক্রমণকারীরা কতকটা নিরস্ত হইয়াছিল। ইহাঁরা রাজপুতানার নারীদের উপযুক্ত কাজ করিয়াছেন। সকল পরিবারের নারীদের এইপ্রকারে আত্মরক্ষা করিতে শিখা উচিত।

দাঙ্গাহাঙ্গামা, পুলিস্ ও গবর্মেণ্ট

দাঙ্গাহাঙ্গামা থামাইবার জন্য এবং প্রতিহিংসা বা লুটের আশায় উন্মত্ত জনতাকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত

পুলিসের লোকেরা যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পুলিসের ইংরেজ ফিরিঙ্গী ও দেশীলোকেরা নিজের কর্ত্তব্য করিয়াছে, বলিতে পারি না। কাগজে পড়িয়াছি এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, যে, কোন কোন স্থলে পুলিসের চোখের উপর লুট অত্যাচার হইয়াছে, তাহারা নিবারণের চেষ্টা করে নাই। একটি থানার লোকেরা স্বয়ং লুটও করিয়াছে, শুনা যায়। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শীতলা বস্ত্রালয় ও আর্য্যসমাজ মন্দিরের সম্মুখে কয়েক জন পুলিশ কনষ্টেবল বসিয়াছিল। তাহাদের চোখের উপর একটা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান ও আরোহীদের উপর কয়েক জন ছোকরাকে লাঠি চালাইতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কনষ্টেবলরা বাধা দেয় নাই। একাধিক প্রবীণ হিন্দু ছোকরাদিগকে তিরস্কার করিলেন এবং একজনের কান ধরিয়া চড় মারিলেন, তাহাও দেখিলাম।

টেলিফোনে পুলিসের সাহায্য চাহিলে অনেক স্থলে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কখন কখন পুলিস তামাসার ভাব দেখাইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছে। একদিন রাত্রে গড়পার হইতে কতকগুলি পশ্চাদ্ধাবিত পলায়নপর লোকের কথা অনুসারে বেলিয়াঘাটা থানায় টেলিফোন করিয়া সাহায্য চাওয়ায় সাহায্য ত পাওয়াই যায় নাই, অধিকন্তু ব্যাপারটা যে বিশেষ কিছু নয় উত্তরদাতা ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আর্য্যসমাজীদের গীতবাদ্যসমন্বিত যে শোভাযাত্রা উপলক্ষে এই দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত হয়, তাহার জন্য উক্ত সমাজের নেতারা পুলিসের অনুমতি লইয়াছিলেন। অনুমতি দিবার পূর্ব্বে পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা যে যে রাস্তা দিয়া হইবে, তাহার একটির উপর যে মসজিদ ছিল, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার জানা ছিল। জানা না থাকিলে এরূপ অজ্ঞলোকের উপর এরূপ অনুমতি দিবার ভার থাকা উচিত নহে। যাহা হউক, তিনি যে অজ্ঞ নহেন, ইহা ধরিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। অনুমতি দিবার সময়, মুসলমানদের রমজানের উপবাস চলিতেছে এবং উপবাসে মানুষের মেজাজ সহজেই বিগড়াইয়া যায়, একথাও কর্ত্তপক্ষের অগোচর ছিল না। মসজিদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুরা গান বাজনা করিয়া গেলে মুসলমানেরা কিছু দিন হইতে আপত্তি করিতে আরম্ভ করিতেছেন এবং তাহার ফলে অনেক জায়গায় দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তপাত নরহত্যা হইয়াছে, ইহাও পুলিসের জানা আছে। অতএব আমাদের বিবেচনায় শোভাযাত্রার অনুমতি দিবার সময় পুলিসের এই বন্দোবস্তও করা উচিত ছিল, যে, মস্‌জিদের সম্মুখে বা নিকটে কোথাও যথেষ্টসংখ্যক অস্ত্রধারী ও অশ্বারোহী পুলিস প্রস্তুত থাকিবে। সচরাচর মিছিলের সঙ্গে যেমন ২।১ জন কনষ্টেবল থাকে, এক্ষেত্রেও তাহা ছিল। দৈনিক কাগজে তাহাই লেখা আছে। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। সুসজ্জিত ও সশস্ত্র এত বেশী লোক রাখা উচিত ছিল, যাহাতে তাহাদিগকে দেখিয়াই গুণ্ডারাও ভয় পায়।

এইসকল কারণে আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বাহ্নেই যাহা করা উচিত ছিল, পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করেন নাই। তাহা করিলে সম্ভবতঃ এত অশান্তি, লুট্, রক্তপাত, ও নরহত্যা হইত না।

দাঙ্গা ও লুট আদি আরম্ভ হইবার পরও, ব্যাপারটা যেরূপ গুরুতর; পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিকার ও নিবারণ-চেষ্টা সেরূপ যথাযোগ্য পরিমাণে প্রথম হইতেই করেন নাই। আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে, প্রথমেই জনতার প্রতি অবিচারিতভাবে বুব গুলি চালাইয়া কতকগুলা লোককে জখম ও খুন করা উচিত ছিল, এবং তাহা হইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, যে, কাল ও পাত্র এবং অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া গোড়াতেই সরকার পক্ষের যথেষ্টসংখ্যক অস্ত্রধারী পুলিস ও সৈনিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত ও প্রদর্শন করিয়া উগ্রপ্রকৃতির লোক-দিগের মনে ভয় জন্মান উচিত ছিল। তাহার পর সহরের ও উত্তর দিকের সহরতলীর অনেক রাস্তা দিয়া সৈনিক ও কামানের প্যারেড্ করাও উচিত ছিল। ইহাতে ফল না হইলে অগত্যা গুলি চালাইতে হইত। যাহারা ধর্ম্মান্ধতা ও প্রাতহিংসাজাত উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহারা আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জানোয়ার এবং নিহত হইবারই যোগ্য, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। তাহাদের অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি

এবং ভিন্নমতাবলম্বীকে আঘাত ও বধ করিবার ইচ্ছার আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত হইলেও কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগকে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। তাহাদের যে মতগুলি আমরা ভ্রান্ত মনে করি, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস যেরূপ দৃঢ়, আমরা আমাদের যে মতগুলি সত্য বলিয়া মনে করি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হয়ত তত দৃঢ় নয়। তাহারা নিজের মত ও বিশ্বাসের খাতিরে যে অন্যের প্রাণবধ পর্য্যন্ত করিতে পারে, ইহা সাতিশয় নিন্দনীয়। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ নিজেদের বিশ্বাসের প্রেরণায় নিজেদের প্রাণকে পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিতে প্রস্তুত হয়; আমরা অনেকেই তাহা পারি না। স্বীকার করিতে হইবে, যে, এই বিষয়ে শিক্ষিত ও ভদ্র আমরা অনেকে তাহাদের চেয়ে নিকৃষ্ট। যাহা হউক, মোটের উপর কোন্ শ্রেণীর লোক শ্রেষ্ঠ ও কোন্ শ্রেণীর লোক নিকৃষ্ট, তাহার বিচার না করিয়া ইহা অনায়াসেই বলিতে পারি, যে, হিংস্র প্রকৃতির লোকদিগকেও নিরস্ত করিবার অন্য সব উপায় অবলম্বন করা হইয়া গেলে ও তাহাতে ফল না হইলে তবে গুলি চালান উচিত। অবশ্য মারপিট ও উত্তেজনার সময় পুলিসের পক্ষেও মাথা ঠিক্ রাখা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু মাথা ঠিক রাখিয়া কাজ করাই যে তাহাদের কর্ত্তব্য, ইহাও ভুলিলে চলিবে না। গুলি চালানর একান্তবিরোধী দলের লোকও আমরা নহি। গোড়াতেই অশান্তি ও অরাজকতা থামাইবার যথেষ্ট চেষ্টা না হওয়ায়, অন্ততঃ পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা শীঘ্র শেষ না হওয়ায়, লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার নষ্ট হইয়াছে; ডাক ও টেলিগ্রাম প্রায় বন্ধ হওয়ায় কলিকাতার অধিকাংশ ভারতীয় লোককে কলিকাতার বাহিরের লোকদের সহিতে যোগশূন্য অবস্থায় বাস করিতে হইয়াছে; বিস্তর নিরপরাধ লোক আহত ও হত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কতকগুলি লোকের জখম ও খুন হওয়া যদি অনিবার্য্যই ছিল, তাহা হইলে, যাহারা দল বাঁধিয়া অন্যের ক্ষতি ও প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, নিরপরাধ লোকদের পরিবর্ত্তে, গোড়াতেই গুলিবর্ষণে তাহাদের প্রাণ গেলে যে আপেক্ষিক অবিচার বেশী হইত, তাহা আমরা মনে করি না। বরং মনে করি, তাহাতে আপেক্ষিক সুবিচার হইত ও ফল ভাল হইত।

সব বিষয়ে ঠিক্ খবর পাওয়া কঠিন। কিন্তু খবরের কাগজে যাহা পড়িয়াছি, তাহাতে মনে হয়, একটি বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। দেখা গিয়াছে যে, পুলিস ভারতবর্ষের বৃহত্তম শহরে, বঙ্গের রাজধানীতে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজধানীতে, মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বেসরকারী স্বেচ্ছারক্ষীদের দল গঠনে উৎসাহ দেওয়া, কিংবা গঠিত তদ্রূপ দলের কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া ও তাহাদের সাহায্য লওয়া গবর্মেণ্টের উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বরং প্রকারান্তরে তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিবার ভাবই দেখা যায়। অবশ্য, বিদেশী গবর্মেণ্টই যে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, আমরা যে নিজে কিছুই করিতে পারি না, এইরূপ বিশ্বাস আমাদের ও জগদ্বাসীর মনে জন্মাইবার স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি বিদেশী আমলাগণের আছে। কিন্তু এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষের ধনপ্রাণ সঙ্কটাপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে।

—

দাঙ্গায় গবর্মেণ্টের শক্তিহীনতা, বুদ্ধিহীনতা, না অবহেলা ?

এত বড় সহরে অলিগলিতে গুপ্ত ঘাতকেরা যাহা করিতেছে, শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে তাহা নিবারণ করা অসম্ভব বা কঠিন হইতে পারে; কিন্তু এমন কিছু কিছু কাজ আছে, যাহা গবর্মেণ্টের করা উচিত ছিল, না-করায় তাহার শক্তিমত্তা, বুদ্ধিমত্তা বা উদ্যোগিতায় লোকের সন্দেহ হইতেছে।

একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

কলিকাতায় রাজাবাজারে একখানা মোটরডাকগাড়ীর চালক তথাকার কোন কোন মুসলমানের দ্বারা হত হইয়াছে। আম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীট ডাকঘর আক্রমণের চেষ্টাও একাধিক বার হইয়াছে। হয়ত আরো কোথাও এরূপ আক্রমণ-চেষ্টা হইয়া থাকিবে, যদিও তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাহার জন্য উত্তর কলিকাতার সমুদয়

ডাকঘর অনেক দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। যখন উল্টাডিঙ্গী ডাকঘর লুট হয়, যখন ওয়েলিংটন স্কোয়্যার ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার হত হন, তাহার পরও ত কোন ডাকঘর বন্ধ করা হয় নাই। উত্তর কলিকাতার ডাকঘরগুলির, অন্ততঃ প্রধান প্রধান ডাকঘরগুলির, সংখ্যা এত বেশী নহে, যে, তাহাতে কিছুদিনের জন্য যথেষ্ট সশস্ত্র পাহারা বসান গবর্মেণ্টের অসাধ্য। উত্তর কলিকাতায় মোট সতের (১৭)টি-ডাকঘর আছে। এইরূপ পাহারা বসাইয়া এই ১৭টি ডাকঘর খোলা রাখিলে লোকদের সাহস বাড়িত, গবর্মেণ্টের ক্ষমতার ও প্রজাহিতৈষিতার উপর আস্থা অটুট থাকিত ও বাড়িত, এবং দুর্ব্বৃত্তরা আস্কারা পাইয়া দুঃসাহসী হইত না। কিন্তু কিছুদিনের জন্য উত্তর কলিকাতার ডাকঘরগুলি বন্ধ করিয়া রাখায় এই ধারণা জন্মান অসম্ভব নহে, যে, কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত লোক ইচ্ছা করিলে গবর্মেণ্টকে, অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে, সহজেই কিছু কালের জন্য পঙ্গু করিয়া দিতে পারে। বিদেশী আমলাতন্ত্র নিজেদের প্রেস্‌টীজ বজায় রাখার জন্য প্রভূত চেষ্টা অবিরত করিয়া থাকেন কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রেস্‌টীজ নষ্ট হইয়াছে, উচ্ছৃঙ্খল জনতার বা গুণ্ডারাজের জয় হইয়াছে।

সরকার পক্ষের কথাটা আগে বলিলাম। সর্ব্বসাধারণের অসুবিধা খুব হইয়াছে। ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী সকলেরই খুব অসুবিধা ও ক্ষতি হইয়াছে।

সরকারী হুকুম হইয়াছিল, যে টেলিগ্রাম বিলী হইবে না, তাহা প্রধান টেলিগ্রাফ আফিস হইতে আনাইয়া লইতে হইবে। যাহারা কোন টেলিগ্রাম পাঠাইয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষায় আছে, তাহার জন্য না হয় তাহারা বা তাহাদের লোকেরা বার বার উক্ত আফিসে যাইতে পারে, কিন্তু অন্য লোকরা কেমন করিয়া জানিবে যে, তাহাদের নামে টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল যে প্রধান ডাকঘর হইতে চিঠিপত্র আনাইয়া লইতে হইবে। আমাদের প্রধান কর্ম্মচারী এক দিন স্বয়ং তথায় গিয়া অল্প কয়েক খানা চিঠি ও কিছু খবরের কাগজ পাইয়াছিলেন। তাহা আমাদের ৪।৫ দিনের ডাকের সমান হওয়া দূরে থাক্‌, একদিনের ডাকেরও সমান নহে। রেজিষ্টরী চিঠি ও প্যাকেট মনিঅর্ডার প্রভৃতি ত তখন পাওয়াই যায় নাই।

সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছাপূর্ব্বক অসুবিধা ঘটাইতেছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু উত্তর কলিকাতার সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাহাও বলিবার উপায় নাই। উত্তর কলিকাতায় দেশী লোকদের বাস বলিয়াই কি এইরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইয়াছে?

—

ঘটনাবলীর যোগসাজশ, না মানুষের কারসাজি ?

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাহা দেখা যায়, অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও তাহা লক্ষিত হয়—ভারতবর্ষ সৃষ্টিছাড়া দেশ নহে। কিন্তু আমরা আপাততঃ ভারতবর্ষেরই আধুনিক ইতিহাসের একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

কোন ঘটনা হঠাৎ ঘটিলে, তাহার কোন কারণ আমরা না জানিলে বা আবিষ্কার করিতে না পারিলে, তাহাকে বলি আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু বাস্তবিক আকস্মিক কিছু নাই। সব ঘটনার মধ্যেই কারণ আছে ও কোন একটা ফলোৎপাদনের দিকে গতি আছে (যাঁহারা খাঁটি বৈজ্ঞানিক, এবং জগৎকারণ ও জগতের নিয়মশৃঙ্খলায় ব্যক্তিত্ব বা পুরুষত্ব আরোপ করিতে চান না, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ইহাকে উদ্দেশ্য বলিলাম না)। এই কারণ ও ফলোৎপাদন-অভিমুখতা মানবীয় হইতে পারে, কিম্বা অজ্ঞাত, অদৃষ্ট কিছু হইতে পারে।

আমরা আগে-আগে দেখিয়াছি ও লিখিয়াছি, যে, অনেক সময় ভারতবর্ষের লোকেরা যখন একটা কিছু চায়, সেই সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পরে এমন কিছু ঘটে, যাহা হইতে তাহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ না করিবার একটা যুক্তি বিদেশী শাসনকর্ত্তারা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। যেমন, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা হয়ত প্রস্তাব করিলেন, যে, কোন একটা দমন-আইন উঠাইয়া দেওয়া হউক বা

রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দেওয়া হউক, অমনি সেই সময়ে কোথা হইতে বিপ্লবোত্তেজক রক্তবর্ণ পত্রী বা পুস্তিকা বিতরিত হইতে লাগিল, এবং প্রমাণ হইয়া গেল, যে, দেশের অবস্থা তখনও দমন-আইন উঠাইবার বা রাজনৈতিক বন্দীদের খালাস দিবার মত ঠাণ্ডা হয় নাই। দেশের লোক সভা করিয়া চাহিল, যে, সুভাষ বসু প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দেওয়া হউক। তাহার পরেই দক্ষিণেশ্বরে বোমা ও বিপ্লবকারী আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণ করিল, যে, দেশে তখনও বিপ্লববাদ থাকায় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দেওয়া যাইতে পারে না। ইত্যাদি।

এ সকল স্থলে ঘটনাবলীর যে যোগাযোগ, তাহাদের যে প্রায় যুগপৎ আবির্ভাব, তাহা আকস্মিক, কিম্বা কোন কারণে ঘটিলে কি কারণে ঘটে, বলা যায় না। ইহাতে মানুষের কোন কারসাজি আছে বলা কঠিন, নিশ্চয়ই নাই বলাও অসম্ভব। যদি প্রবল ও প্রভুত্ববিশিষ্ট পক্ষের স্বার্থরক্ষার অনুকূল ও সুবিধাজনক ঘটনা যখন যেমন দরকার তখন তেমনিটি বার বার ঘটে, তাহা হইলে তাহাতে মানুষের কারসাজি আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। এরূপ সন্দেহ অমূলক হইতে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

কলিকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার অব্যবহিত কারণ যাহা তাহা আমরা খবরের কাগজে পড়িয়াছি। কিন্তু উহা যে এতটা ব্যাপ্তিলাভ করিল ও গুরুতর আকার ধারণ করিল কেন ও কি প্রকারে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। আমাদের অর্থাৎ দেশের অনেক লোকের ইহার জন্য দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। অনেকে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে বক্তৃতা, তর্কবিতর্ক ও কাগজে লেখালেখি এমনভাবে করিয়াছে, ও করিতেছে যাহাতে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে অসদ্ভাব, রেষারেষি ও বিদ্বেষই বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। কিন্তু ইহা কলিকাতায় আবদ্ধ নহে, এবং ইহা আজ নূতনও নহে। এই জন্য কলিকাতার অরাজকতাটা ঠিক্ বিনামেঘে বজ্রাঘাত না হইলেও, মেঘের বিস্তৃতি ও ঘনঘটা অপেক্ষা বজ্রের নিনাদ ও প্রলয়তাণ্ডব অতিরিক্ত রূপ বেশী মনে হইতেছে।

যাহা হউক, এখন অন্য কথা বলি।

দেশের শিক্ষিত রাজনৈতিকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা চান স্বরাজ এবং দেশ তাহার জন্য অনেকটা প্রস্তুত হইয়াছে মনে করেন। বিদেশী আমলাতন্ত্র ও তাঁহাদের সমর্থক বেসরকারী ইংরেজরা তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা স্বরাজে বহু বিলম্ব ও বিঘ্ন দেখেন। একটা অন্তরায় দেখেন, আমাদের হিন্দু মুসলমানের মারামারি কাটাকটি। তাঁহারা বলেন, যে, ইহা নিবারণের জন্য তৃতীয় পক্ষ তাঁহাদের থাকা উচিত;—যদিও তাঁহাদের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও মারামারি কাটাকাটি না কমিয়া কেন বাড়িয়াই চলিতেছে, তাহার কোন সদুত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি যত করিব, বিদেশী প্রভুদের যুক্তি ততই প্রবল হইবে, এইরূপ তাঁহারা ও তাঁহাদের পক্ষাবলম্বী অন্য পাশ্চাত্যেরা মনে করেন। অধিকন্তু, এখন একজন নূতন বড়লাট সবে-মাত্র দেশে পদার্পণ করিয়া কার্য্যভার লইতেছেন। তাঁহার মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রথম যে ধারণা হইবে, তাহাতে তাঁহাকে, ভারতের স্বরাজপ্রাপ্তি শীঘ্র বা বিলম্বে হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে একটা মত গঠনে প্রবৃত্ত করিবে। তাঁহার শাসনকালের গোড়াতেই এত বড় একটা অশান্তি ও অরাজকতার দৃষ্টান্ত ঘটায় ভারতীয়দিগের আত্মশাসন-ক্ষমতার অভাব বা ন্যূনতা যে প্রমাণিত হইতেছে, বিদেশী আমলাতন্ত্রের মত তিনিও তাহা অবশ্যই স্বভাবতই বিশ্বাস করিবেন।

এখন কথা হইতেছে এই, যে, এই বিশ্বাস কি সত্য ? এবং ইহা জন্মাইবার জন্য কি বিধাতা, বা জগৎ-কারণ, বা বিশ্বনিয়ম, বা ঘটনাচক্র দাঙ্গা ঘটাইলেন, না ইহার মধ্যে মানুষের কারসাজিও কিছু আছে ?

অন্য দিকে স্মর্ত্তব্য ও বিভাব্য, এই, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলির নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন এবং তদুপলক্ষে স্বরাজ্য-লাভে প্রবলতম-ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপক হইবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে; ৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত "জাতীয় সপ্তাহ" নামে অভিহিত সাতটি দিনে শীঘ্র স্বরাজ্যলাভ-কল্পে হিন্দুমুসলমানের মিলন সাধন ও অন্যান্য জাতিগঠনমূলক কার্য্য করিবার ব্যবস্থা ছিল; এবং অনেকগুলি রাজনৈতিক দলকে সম্মিলিত করিয়া একটি জাতীয় দল গঠনপূর্ব্বক স্বরাজ্যলাভ-চেষ্টা সংহত করিবার প্রয়াস বোম্বাইয়ে হইতেছিল। কলিকাতার দাঙ্গা-

হাঙ্গামা যে এই সমুদয় প্রযত্নে অল্প বা অধিক ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন এই, বিধাতা, জগৎকারণ, বিশ্বনিয়ম, কি আমাদের আত্মকর্তৃত্ব লাভের বিরোধী এবং সেইজন্য ঠিক্ সময় বুঝিয়া প্রতিকূল ঘটনা ঘটান? না, ইহার মধ্যে মানুষের কারসাজি আছে?

বিধাতা আমাদের প্রতি বিরূপ, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু ইহাও ঠিক্, যে, আমাদের কর্ম্মফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। এইজন্য ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের স্বরাজ্যকামী লোকদিগকে কায়মনোবাক্যে এরূপ চেষ্টা সতত করিতে হইবে, যাহাতে স্বরাজ্যের প্রতিকূল এবং বিদেশী শাসক ও শোষকদের অন্যায় অভিলাষের অনুকূল কিছু না ঘটে। বিধাতা আমাদের সমুদয় বৈধ ইচ্ছার সহায়, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু কারণ নাই। যদি আমাদের প্রতিকূল কোন ঘটনাবলীর উৎপাদনে আমাদের নিজেদের দোষ ছাড়া অন্য মানুষদেরও কোন কারসাজি থাকে, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সর্ব্বদা মন বাক্য ও কার্য্যের উপর সাত্ত্বিক ও সংযত ভাবে কড়া পাহারা রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা আত্মকর্তৃত্ব লাভের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব না।

—

দাঙ্গার সময়ে ও পরে কর্তব্যাকর্তব্য

আত্মরক্ষা ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে দুর্ব্বল অসহায়ের রক্ষা সকলেরই কর্তব্য, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। ইহার জন্য সুস্থ সবল দেহ চাই, সাহস চাই, মানুষের প্রতি প্রীতি চাই, দল বাঁধিবার ও নিয়ম মানিবার ক্ষমতা ও অভ্যাস চাই, অন্ততঃ পক্ষে লাঠি চাই এবং তাহা চালাইবার শিক্ষা ও অভ্যাস চাই। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস লাঠিখেলার উপযুক্ত শিক্ষক। অন্য শিক্ষকও তিনি হয়ত দিতে পারিবেন।

সুসভ্য স্বাধীন দেশের অস্ত্র-আইন যেরূপ, আমাদের দেশের অস্ত্র-আইন তেমন না হইলেও, আইনের বাধ্য লোকদের পক্ষে বন্দুকের পাস্ পাওয়া আগেকার চেয়ে কিছু সোজা হইয়াছে। অতএব যাঁহাদের উক্ত আইন অনুযায়ী যোগ্যতা আছে, তাঁহারা যথাসাধ্য বন্দুক রাখিলে ও তাহা চালাইতে শিখিলে ভাল হয়।

মানুষ শক্তিশালী হইলে একদিকে তাহার যেমন কতকগুলি সদ্‌গুণ বিকশিত হয়, তেমনি কিছু দোষ জন্মিবারও সম্ভাবনা ঘটে। শক্তির অপব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি একটা দোষ। "আমাদের জোর আছে, আমরা দলে পুরু আছি, অতএব অন্য লোকগুলাকে কিছু 'শিক্ষা' দেওয়া যাক্, তাহা হইলে তাহারা আর কখনও কোন অসদাচরণ করিবে না," কাহারও কাহারও এরূপ মনে হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ 'শিক্ষা'দেওয়া প্রথমতঃ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও গর্হিত, দ্বিতীয়তঃ 'শিক্ষা"টা মানুষ যত শীঘ্র ভুলে প্রতিহিংসার ইচ্ছা তত শীঘ্র লুপ্ত হয় না। সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার ভীষণ "শিক্ষা" উভয় পক্ষই ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতিহিংসার ভাবটা এখনও যায় নাই; জালিয়ানওয়ালা বাগের "শিক্ষা" পঞ্জাবকে নির্বীর্য্য করিতে পারে নাই। শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যবহার দুর্ব্বল ও অসহায়ের রক্ষা এবং আত্মরক্ষা; তারপর অত্যাচারী ও দুর্বৃত্তকে শাস্তি দেওয়াও কখন কখন বৈধ বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু কোন স্থলেই নিরপরাধ লোকদিগের উপর অত্যাচার করিয়া একটা আতঙ্ক জন্মাইবার চেষ্টা করা উচিত নয়। ডায়ার জালিয়ানওয়ালা বাগে তাহাই করিয়াছিল।

দেশের লোককে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, যে, কোন সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক অন্যায় কাজ করিলে তাহা উক্ত সম্প্রদায়ের সমুদয় লোকের দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। হিন্দুরা কতকগুলি মুসলমানের দোষে যেন সমুদয় মুসলমানকে, মুসলমানেরা কতকগুলি হিন্দুর দোষে যেন সমুদয় হিন্দুকে দোষী মনে না করেন। অধিকন্তু, যখন দেখা যাইতেছে, যে, ন্যূনকল্পে সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেরই হিতাকাঙ্ক্ষী একজন মুসলমান এবং একজন হিন্দুও আছেন, তখন এই উদার ভাব সকলের মধ্যে বিকশিত বা সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং কোনও সম্প্রদায় সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া উচিত নহে।

খবরের কাগজওয়ালাদের মধ্যে স্বভাবতই বেশী পরিমাণে নূতন নূতন খবর দিবার ঝোঁক থাকায় এবং

অনুসন্ধান করিবার যথেষ্ট সময় না থাকায় অনেক মিথ্যা খবর বাহির হইয়া যায়। মুখে মুখে যে-সব গুজব ও খবর রটে, তাহার মধ্যে মিথ্যার ভাগ আরও বেশী। অতএব, উত্তেজনার সময় যাহা পড়া যায় বা শুনা যায়, তাহাই প্রচার না করা ভাল। যথাসম্ভব চুপ করিয়া থাকিবার অভ্যাস অনেকের থাকিলে, হুজুক, উত্তেজনা ও আতঙ্ক বাড়িতে পায় না। অবশ্য লোককে সাবধান করিবার জন্য যতটুকু সত্য সংবাদ বলা দরকার, তাহা বলা উচিত।

বিপদের সময়ও যাহারা দলাদলি ভুলিতে পারে না, তাহারা শ্রদ্ধার পাত্র নহে। দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় কোন্ রাজনৈতিকদল কি করিল না, তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং লঘুচিত্ততা ও পক্ষপাতদুষ্ট বিকৃত-চিত্ততার পরিচায়ক। ভাল কাজ কে কি করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই লেখা উচিত। কেহ ভাল কাজ করিয়া থাকিলেও, তাহার অপলাপ করিয়া অধিকন্তু তাঁহার নিন্দা করা ঘৃণ্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

—

মানহানির মোকদ্দমায় সুভাষ বসুর জিৎ

সুভাষচন্দ্র বসুকে যখন বিনা বিচারে বন্দী করা হয়, তখন ইংলিষম্যান ক্যাথলিক্ হেরাল্ড হইতে নকল করিয়াছিল, যে, তাঁহার পিতা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন, যে, সুভাষচন্দ্র বিপ্লববাদীদের দলে থাকিয়া বিপ্লব-চেষ্টা করিতেন। সুভাষবাবু এই মিথ্যা কথার প্রতিকার কল্পে ইংলিষম্যানের নামে মানহানির মোকদ্দমা রুজু করেন, এবং ক্ষতিপূরণ চান। তিনি মোকদ্দমায় জিতিয়া ২০০০ টাকা খেসারৎ এবং মোকদ্দমার খরচার ডিক্রী পাইয়াছেন।

সরকার সুভাষবাবুকে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার বিরুদ্ধে যাহার যাহা মন চাইবে, সে অবাধে তাহাই বলিবে, ইহা অসহ্য। সুভাষবাবু ইংলিষম্যান কাগজকে শিক্ষা দিয়া কেবল যে আপনাকে অখ্যাতিমুক্ত করিয়াছেন, তাহা নহে, সর্ব্বসাধারণেরও উপকার করিয়াছেন। কারণ, আশা করা যাইতে পারে, যে, বিদেশীদের যে-সব কাগজ ভারতবর্ষে অন্ন করিয়া খায়, তাহারা অতঃপর জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে যা-তা বলিবার আগে কথাগুলার প্রমাণ আছে কিনা ভাবিয়া দেখিবে।

—

সুভাষবাবুর নির্ব্বাসনের কারণ সম্বন্ধে গুজব

সুভাসবাবুর নির্ব্বাসনের কয়েক দিন পরে আমরা শুনিয়াছিলাম, যে, কলিকাতা নগরের কোন জনভৃত্যের এবং রাজনৈতিক দলবিশেষের কোন বিশ্বাসঘাতক সভ্যের সাহায্যে সুভাষবাবুর অজ্ঞাতসারে উত্তোলিত একটি ফোটোগ্রাফ ইহার কারণ। এই গুজব আমরা সম্প্রতি আবার শুনিয়াছি। গুজবটি এই প্রকার যে, ঐ সভ্য সুভাষবাবুর কামরায় তাঁহাকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র দিতে যাইতেছে, এমন সময় ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ পরমুহূর্ত্তেই সুভাষবাবু যে উহা না লইবার মুখভঙ্গী ও হস্তভঙ্গী করিয়া উহা লইতে অস্বীকার করেন, ফোটোগ্রাফে তাহা উঠান হয় নাই। গুজবটি সত্য কিনা, জানি না। কিন্তু উহা বাংলা দেশের অন্তর্গত দূরবর্ত্তী দুটি জায়গায় দীর্ঘকাল পরে পরে শুনায় উল্লেখ-যোগ্য মনে হইল। ফোটোগ্রাফী বিদ্যার আজকাল এরূপ উন্নতি হইয়াছে, যে, এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মধ্যে সুস্পষ্ট ফোটোগ্রাফ তোলা যায়। সুতরাং কোন মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য উহা চাতুরীর সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। যদি কোন রাজনৈতিক নেতা কোন সময়ে বলিয়া থাকেন, "আমি রাজনৈতিক হত্যায় রাজী নহি," কিন্তু তাঁহার কথাগুলি গ্রামোফোনে ধরিবার সময় "রাজী" পর্য্যন্ত ধরিয়া কল থামাইয়া দিয়া "নহি" কথাটা বাদ দিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত মতের ঠিক্ বিপরীত প্রমাণ তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ন্মেণ্টের নিকট কেহ উপস্থিত করিতে পারে। উল্লিখিত ফোটো-গ্রাফের গুজবটি সত্য হইলে তাহা ঠিক্ এই প্রকারের প্রমাণ। এরূপ প্রমাণের সৃষ্টি লাট সাহেবদের ও শাসন-পরিষদের সভ্যদের সম্পূর্ণ অগোচরে হওয়া অসম্ভব নহে। সুভাষবাবুকে যাঁহারা ভাল করিয়া জানেন, তাঁহারা তাঁহার নির্ব্বাসনের সময় বিশ্বাস করেন নাই, যে, তিনি রিভল্‌ভার বোমাআদির দ্বারা বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন; এখনও বিশ্বাস করেন না। আমরা তাঁহাকে না জানিলেও কখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই, যে, তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ কোন লোক এরূপ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন। ইংলিষ-

ম্যান্ তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করিতে না পারায় তাঁহার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবে।

—

সুভাষবাবুর বিচার কেন হইতেছে না।

সম্প্রতি পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন হইয়াছিল, যে, সুভাষবাবুর কেন বিচার হয় নাই এবং কখন্ তাহা হইবে। উত্তরে লর্ড উইণ্টার্টন্ সেই পুরাতন অসত্য কারণের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সুভাষবাবুর বিচার প্রকাশ্য আদালতে করিতে হইলে যে-সব সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেওয়াইতে হইবে, বিপ্লবপ্রয়াসীরা তাহাদিগকে খুন করিবে। ক্যালকাটা উইক্লী নোটসে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বহুপূর্ব্বে বিপ্লবচেষ্টা অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য বিচারের একাধিক দৃষ্টান্ত হইতে দেখাইয়াছেন, যে, ঐ প্রকাশ্য বিচারের ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু কোন সাক্ষী হত হয় নাই। পরে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু ও অন্য কোন কোন সভ্য ব্যবস্থাপক সভাতেও সাক্ষী খুন হইবার আশঙ্কারূপ বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহভাজন লোকদের প্রকাশ্য বিচার না করিবার ওজুহাত যে নিতান্তই বাজে, তাহা একাধিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেন। কিন্তু যেমন অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে দেখা গিয়াছে, যে, ভারতশাসনসংশ্লিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষেরা তর্কে পরাজিত হইলেও তর্ক করিতে ছাড়েন না, এক্ষেত্রেও তেমনি তাহারা পুরাতন বুলি ছাড়িতেছেন না। তাঁহাদের কবি গোল্ডস্মিথ একজন গুরুমহাশয়ের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়া গিয়াছেন,

> "Even though vanquished he could argue still."
> "তর্কে হারিলেও তিনি তর্ক করিতে পারিতেন।"

বক্ষ্যমাণ রাজপুরুষেরাও ঐ ছাঁচে ঢালা।

তবে একটা কথা সত্য হইতে পারে। সুভাষ বাবুর বা অন্যান্য রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে যাহারা মিথ্যা প্রমাণ সংগ্রহ বা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা হয় ত এমন লোক, যে, তাহাদিগকে একবার সাক্ষীরূপে হাজীর করিলে গোয়েন্দা-বিভাগ আর তাহাদের নিকট হইতে কাজ পাইবে না। কারণ, তাহারা একবার গোয়েন্দা-বিভাগের নিমকহালাল বলিয়া পরিচিত হইলে আর এখনকার মত অসন্দিগ্ধভাবে সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিয়া গোয়েন্দা-বিভাগের সেবা করিতে পারিবে না।

—

অনিলবরণ রায়ের মুক্তি

যখন সরকার বাহাদুর বিচার না করিয়া অনিলবরণ রায় মহাশয়কে মুক্তি দিয়াছেন, তখন আশা করা যায়, তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহারা হয় নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার মত নিরপরাধ লোককে যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে বন্দী করিয়াছিলেন, সে প্রয়োজন এখন আর বিদ্যমান নাই। এখন তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের সেবা করিতে থাকুন। বাঁকুড়ার লোকেরা তাঁহার যে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বথা তাহার যোগ্য।

যদি সুভাষবাবুর ও অন্যান্য বন্দীদের সম্বন্ধেও সরকার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন, কিম্বা যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাঁহাদের মত নির্দ্দোষ লোকদিগকে বন্দী করা দরকার মনে হইয়াছিল, সে প্রয়োজন আর না থাকে, তাহা হইলে, আশা করা যায়, যে তাঁহারাও অচিরে বন্ধনমুক্ত হইবেন।

দেশের জন্য যাঁহারা এত কষ্ট পাইলেন, তাঁহারা আবার অবাধে দেশহিতব্রত পালনে নিযুক্ত হউন, ইহা প্রকৃত দেশহিতৈষী মাত্রেরই হৃদ্গত অভিলাষ।

—

স্যার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিলাত গিয়া সিবিল সার্বিসের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি নানা সরকারী কাজ খুব যোগ্যতার সহিত করিয়া রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য, আবগারী কমিশনার ও উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর হন। যোগ্যতা অনুসারে এবং প্রবীণতম সিভিলিয়ান বলিয়া তঁহাকে বাংলাদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বা ছোটলাট করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি ভারতীয় বলিয়া গবর্মেণ্ট এতটা ন্যায়পরায়ণ হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে সরকার লাটসাহেব না করিয়া মাছধরা বিভাগের কর্ত্তা করিয়াছিলেন! পরে তাঁহাকে লণ্ডনে
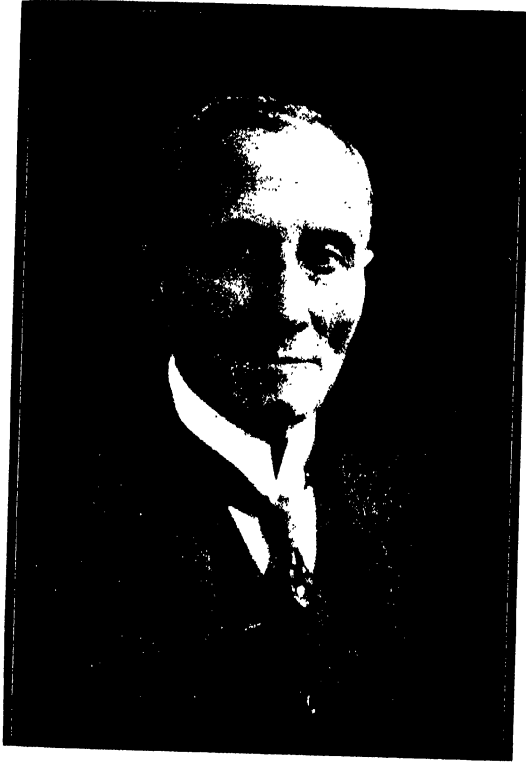
স্যার্‌ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

ভারতসচিবের কৌন্সিলের সদস্য করা হইয়াছিল। এই কাজ তিনি এরূপ যোগ্যতার সহিত করিয়াছিলেন, যে, লর্ড মর্লী ভারতসচিবরূপে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পেন্স্যন লইবার পর গুপ্ত মহাশয় ভারতীয় সৈন্যদল সম্বন্ধে যে এশার কমিটি (Esher Committee) বসিয়াছিল, তাহার সভ্য হইয়াছিলেন, এবং উহার অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্টে সায় না দিয়া স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার স্বাধীনচিত্ততার ও দেশহিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

তিনি অনেকের নিকট তাঁহার এই মত বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, ভারতীয়েরা সৈনিক বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত না হইলে এবং সৈন্যদল আগাগোড়া ভারতীয় না হইলে, ভারতবর্ষ প্রকৃত আত্মকর্তৃত্ব পাইয়াছে, কখনও ইহা বলা চলিবে না।

তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন, এবং ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে উহার প্রতি নিজের আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেন।

—

বাঁকুড়ায় সরোজনলিনী দত্ত মাতৃস্বাগার

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত যখন স্বামীর সহিত বাঁকুড়ায় ছিলেন, তখন তিনি সেখানে মহিলাসমিতি গঠন করিয়া তাঁহাদের সহযোগে অনেক সৎকার্য্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাঁকুড়ার মহিলারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তথাকার মেডিক্যাল স্কুলের হাঁসপাতালে একটি সূতিকাগার স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যেখানে যেখানে কাজ করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র তাঁহার নামে এইরূপ কোন-না-কোন লোকহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে।

—

কানপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন

গত মাসে কানপুরে যে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তাহার সভাপতির কার্য্য করিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অতুল প্রসাদ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। উভয় সভাপতির বক্তৃতার পর কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। অধিবেশনের শেষে স্থির হয়, যে, অতঃপর দিল্লীতে আগামী বড়দিনের সময় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সকলেই যখন ছুটি পান, সেরূপ কোন সময় ভিন্ন সম্মিলনের অধিবেশন হইতে পারে না বটে। কিন্তু বড় দিনের সময় কংগ্রেস এবং আরও এত বেশীসংখ্যক সভা-সমিতির অধিবেশন হয়, যে, সে সময়ে বঙ্গসাহিত্যোৎসাহী লোকদিগের পক্ষেও দিল্লী যাওয়া সহজ না হইতে পারে। সম্ভবত কোন বিশেষ কারণে পূজার ছুটির সুযোগ গ্রহণ করা হয় নাই।

যে সকল বাঙালী বঙ্গের বাহিরে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া সহজ নহে। এক দিকে তাঁহাদিগকে বাংলার সাহিত্য এবং বাঙালীর হৃদয়মন হইতে উদ্ভূত সভ্যতার পরিচায়ক অন্য সব জিনিষের সহিত যোগ রাখিতে হয়, অন্যদিকে তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে-প্রদেশে বাস করেন তথাকার নিজস্ব সভ্যতাজ্ঞাপক ও প্রাগতিক সকল জিনিষের সহিতও যোগ রাখিতে হয়। কারণ, কোন স্থানেরই প্রবাসী বাঙালী সমাজের পক্ষে সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপের মত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যেখানকার জলমাটী হাওয়ার উপর নির্ভর, তাহার সহিত নাড়ীর টান থাকা স্বাভাবিক ও আবশ্যক। অতীত কালে দেখা গিয়াছে এবং এখনও কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে, যে, বাঙালী যেখানেই থাকুন তথাকার সার্ব্বজনিক ব্যাপারের সহিত তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় কতকগুলি ব্যক্তির যোগ আছে। এই জন্য প্রবাসী বাঙালীদের উভয় কর্ত্তব্য সম্পাদন ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন কঠিন নহে। তাঁহাদের অনেকে যে উভয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন তাহার অন্যতম প্রমাণ।

—

বীরভূমে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন

বীরভূম সিউড়ীতে এবার বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি হইবেন এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু চিকিৎসকদিগের পরামর্শে তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিলে কি বলিতেন, তাহার কতকটা আভাস প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার "সাহিত্য সম্মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠকেরা পাইবেন।

সিউড়ীর সাহিত্যিক সম্মিলনের বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। প্রথমেই যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, সাহিত্য শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরানীর বক্তৃতায় স্যার আবদুর রহীমের বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় উক্তির সমালোচনা ও প্রতিবাদ ছিল। রহীম সাহেবের কথা যে বাঙালী মুসলমান সমাজের কথা নহে, তাহার অন্তর্গত চাকরীপ্রার্থী ক্ষুদ্র একটি দলের কথা, তাহা মুসলমানেরাও প্রতিবাদ দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন অনেক বৎসর ধরিয়া হইয়া আসিতেছে। ইহার দ্বারা স্থায়ী কাজ কি হইতেছে এবং কি সুফল ফলিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া কেহ এখন একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ রচনা করিলে ভাল হয়। তাহার সময় হইয়াছে।

—

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যা

কোন জিনিষ আদর্শের অনুরূপ করা দুঃসাধ্য। তাহার উপর কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়ায় আমাদিগকে নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে। প্রবন্ধাদি আগে হইতেই বিস্তর সঞ্চিত ছিল, এবং বর্ত্তমান সংখ্যার জন্যও আসিয়াছে অনেক। কিন্তু ডাকবিভাগের কাজ কিছুদিন স্থগিত থাকায় এই সংখ্যার জন্য অভিপ্রেত কোন কোন লেখা বিলম্বে পাইয়াছি, কোন কোনটি এখনও হস্তগত হয় নাই। অবশ্য সবগুলি যথাসময়ে পাইলেও ইহাতে ছাপিতে পারিতাম না, যদিও ইহা খুব বড় করা হইয়াছে। ইহার জন্য অভিপ্রেত অনেক লেখা ও ছবি ইহাতে ছাপিতে পারা গেল না।

—

ভারতবর্ষের প্রাচীন সীমা

ভারতবর্ষের ও ভারত-সাম্রাজ্যের সীমা প্রাচীন কালে মধ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানে মরুভূমির বালুকার মধ্য হইতে অনেক ভারতীয় পুঁথি, চিত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে বর্ত্তমান আফগানিস্তানের ও বালুচীস্তানের অনেক অংশও ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল। এখন যাঁহারা পাঠান বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সম্প্রতি পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব নামজাদা লাট স্যার মাইকেল ওডোয়াইয়ার লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটী অব আর্ট্‌সের সমক্ষে পঠিত একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার রাজপুতবংশীয়; যেমন মালিক

[প্রবাসীর জন্মের কাছাকাছি সময়কার]

প্রবাসীর সম্পাদক

[বর্ত্তমান সময়ের]

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]
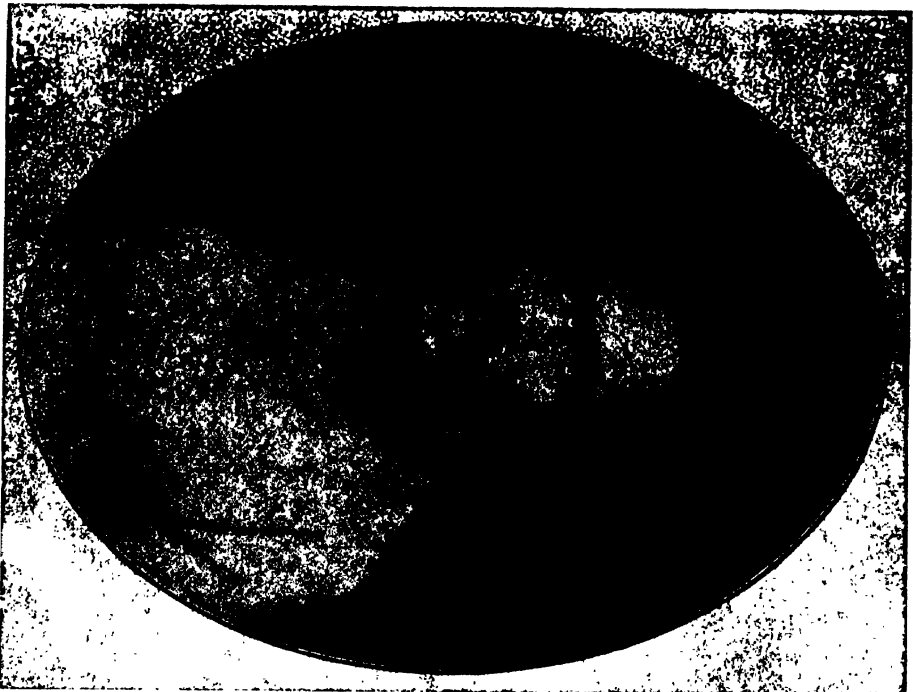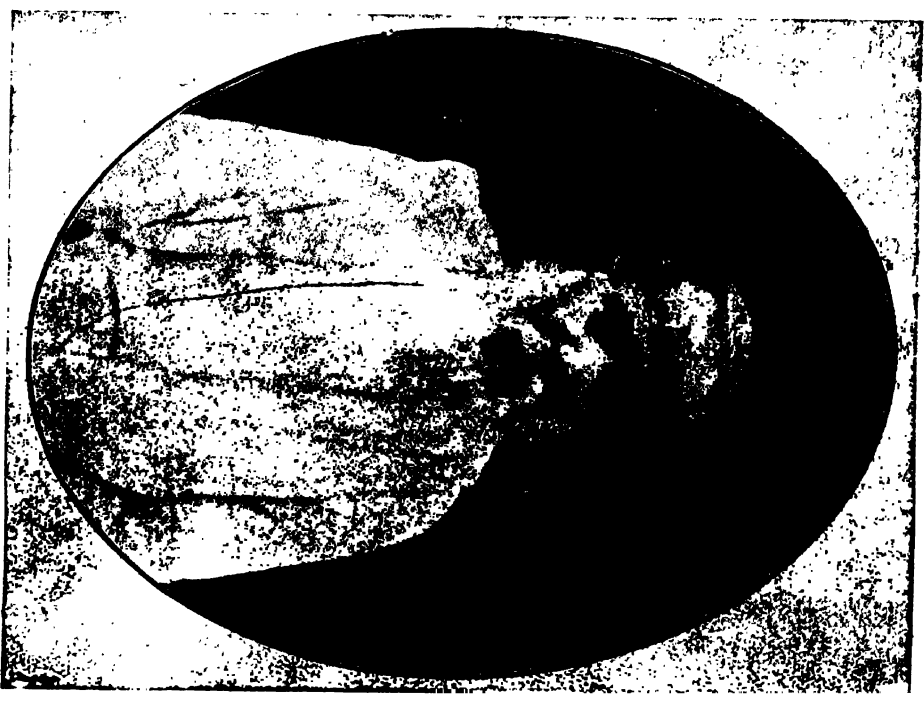
স্যার উমার হাইয়াৎ খাঁ। তিনি লিখিয়াছেন, যে, ইহাঁদের কাহারও কাহারও কুলজী আনাইয়া তিনি দেখিয়াছেন, যে, তাহাতে কেবল বিদেশী নামই আছে; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদের অনেকের "রাজা" উপাধি এবং পারিবারিক বিবাহাদি নানা অনুষ্ঠানে হিন্দু আচার ও পদ্ধতির অনুসরণ প্রমাণ করে, যে, তাহারা হিন্দুবংশীয়, রাজপুতবংশীয়। এইরূপ সব পরিবারের পূর্ব্বপুরুষেরা কেন হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, হিন্দু মহাসভা তাহা ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। কারণ, ইহা নিশ্চিত, যে, কেবল 'অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" লোকদের মধ্য হইতেই মুসলমান সম্প্রদায় পুষ্টি লাভ করে নাই, অন্যান্য শ্রেণীর মধ্য হইতেও করিয়াছে।

—

অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অবশিষ্ট প্রমাণ

এযাবৎ প্রস্তর মূর্ত্তি, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রমাণ ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থ ছাড়া আর যাহা ছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব সহস্র বৎসর পূর্ব্বেরও নহে। কিন্তু শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশের মোহেন-জো-দড়ো নামক স্থানে এবং শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী পঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে যখন অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ অট্টালিকা, সীলমোহর, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করিলেন, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও মতে ঐ সভ্যতার বয়স খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর অনুমিত হইল। বালুচীস্তানেও এইরূপ সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোহেন-জো-দড়োতে এপর্য্যন্ত যত দূর খনিত হইয়াছে, তাহাতেই তত্রত্য ভারতীয় সভ্যতার বয়স এখন হইতে ৫০০০ বৎসর আগেকার বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের দ্বারা অনুমিত হইয়াছে। তাঁহারা ভারতীয় কোন জিনিষকে যথাসম্ভব আধুনিক প্রমাণ করিতে যতটা উৎসাহী, প্রাচীন বলিয়া প্রচার করিতে ততটা উৎসাহী নহেন। অতএব এক্ষেত্রে তাঁহাদের কথা পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা আরও বলেন, যে, মোহেন্-জো-দড়োর বর্ত্তমান স্তরের আরও অনেক নীচে পর্য্যন্ত প্রাচীনতর সভ্যতার নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে প্রাচীনতমগুলি হয় ত ৮।৯ হাজার বৎসর পূর্ব্বের।

সীলে যুগ্ম হরিণ-মুখ-যুক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষ

যাহা হউক, ৫০০০ বৎসর আগে যে সভ্যতা সিন্ধুদেশে ছিল, তাহা বেশ উচ্চ রকমের ছিল বলিয়াই মনে হয়। কারণ, দেখা যাইতেছে, যে, তখন লিপি প্রচলিত ছিল। আমরা যে তিনটি সীল মোহরের প্রতিলিপি দিলাম, তাহা হইতে তখনকার অক্ষরের চেহারা বুঝা যাইবে। উহা একপ্রকার চিত্রলিপি (Pictograph)। ঐ লিপি ও তাহার ভাষা এখনও পঠিত হয় নাই। মোহেন্-জো-দড়োতে একটি ছোট রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন বাবিলোনীয় লিপি আছে। যদি প্রাচীন বাবিলোনীয় এবং প্রাচীন সিন্ধুদেশীয় উভয় অক্ষরে লিখিত একই কথা কোন প্রাচীন জিনিষে অতঃপর পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাচীন সিন্ধু দেশের লিপি পড়িবার সুবিধা হইবে।

প্রাচীন সিন্ধুদেশের বাসভবন বেশ প্রশস্ত ও ইষ্টক-নির্ম্মিত ছিল। কামরাগুলি বড় বড় ছিল, এবং এক একটি কুঠরী সংলগ্ন আলাদা কূপ ও পাকা স্নানাগার ছিল। তা ছাড়া, রাস্তার দুপাশে প্রায় দুই হাত নীচে ইটের পাকা নর্দ্দামা ছিল। নর্দ্দামাগুলি ইটে আচ্ছাদিত। প্রত্যেক বাড়ী হইতে সংকীর্ণতর নর্দ্দামা দিয়া জল আসিয়া রাস্তার নর্দ্দামায় পড়িত। বর্ত্তমান কালে ত আমরা খুব সভ্য হইয়াছি মনে করি, কিন্তু এখনও আমাদের অধিকাংশ শহরে পাকা ইষ্টকাবৃত ভাল নর্দ্দামা নাই, গ্রামে ত নাই-ই;

এবং অধিকাংশ বাড়ীতেই স্নানাগার নাই। পাকা স্নানাগার এবং প্রত্যেক বাসকক্ষসংলগ্ন স্নানাগার ভারতীয় ধনী লোকদের গৃহেও দুর্ল্লভ। অতএব ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের লোকেরা কতদূর সভ্য হইয়াছিল, তাহা অনুমেয়। তাহাদের গৃহে যে সব বিলাসদ্রব্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও তাহাদের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত কূপ ও স্নানাগার

মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত রাস্তা, গৃহ ও নর্দ্দামা

তাহারা কিন্তু তখনও লোহার ও তাহার ব্যবহারের সহিত পরিচিত ছিল না; তামা, সোনা, রূপা, সীসা ও পারার ব্যবহার জানিত। অস্ত্রশস্ত্র পাথরের বা তামার হইত। সোনার এমন চমৎকার গড়নের ও এমন সুন্দর পালিশ-করা অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, যে, স্যার্ জন মার্শ্যালের মতে তাহা লণ্ডনের উৎকৃষ্ট স্যাকরার দোকানের গয়নার সমতুল্য।

সীলমোহরে অঙ্কিত অনেক জন্তুর মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, যে, তখনকার লোকেরা সুনিপুণ শিল্পী ছিল। আমরা যে তিনটি সীলের ছবি দিলাম, তাহার একটিতে উৎকীর্ণ ককুদবিশিষ্ট বৃষের মূর্ত্তি দেখিলেই আমাদের মতের সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন, যে, এই ভারতীয় সভ্যতা "আর্য্য" সভ্যতা ছিল না, ইহা প্রাগ-আর্য্য, সম্ভবতঃ দ্রাবিড়, ছিল, এবং ইহা সুমেরীয় সভ্যতার মত। তাঁহারা লিপি হইতে, সীলমোহরে বৃষমূর্ত্তির বাহুল্য হইতে, এবং এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত দুটি প্রস্তর মূর্ত্তির মুখের ছাঁচ হইতে এইরূপ অনুমান করেন। যাহা হউক, এই প্রাচীন ভারতীয়েরা আর্য্য হউক বা না হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বর্ত্তমানেও সমুদয় ভারতীয়, এমন কি সমুদয় সভ্যতম ভারতীয়, আর্য্য-বংশোদ্ভব নহে। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আর্য্য সভ্যতা ছিল না, তাৎকালিক আর্য্য সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্টও ছিল না। উহা ছিল দ্রাবিড়। যাহারা আর্য্য নহে, তাহারাও মানুষ; তাহাদের মধ্যেও খুব সভ্য ও প্রতিভাশালী মানুষ জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে।

সিন্ধুদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপি সুমেরীয় লিপির মত বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা সিন্ধুদেশ হইতেই অন্যত্র গিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পৃথিবীর সমুদয় লিপিই মূলে চিত্রলিপি হইতে উদ্ভূত। ভারতবর্ষে যত লিপি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ও যুগে প্রচলিত হইয়াছে

তাহারাও সম্ভবতঃ চিত্রলিপি হইতে উদ্ভূত। সিন্ধুদেশের প্রাচীন চিত্রলিপি যে ভারতীয় অন্যান্য কোন কোন তদপেক্ষা আধুনিক লিপির "পূর্ব্বপুরুষ" নহে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

সীলমোহরে বৃষমূর্ত্তির প্রাচুর্য্য "শৈব" ধর্ম্মের প্রাগৈতিহাসিক প্রকার-ভেদের অস্তিত্ব সূচনা করে কি না, তাহা অনুসন্ধেয়।
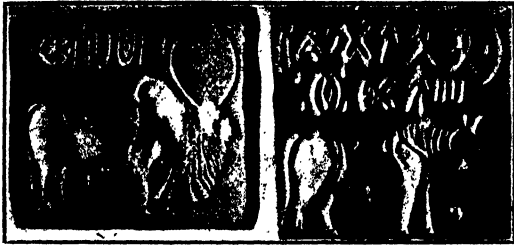
বৃষের ছবি যুক্ত দুটি সীল

প্রস্তরমূর্ত্তি দুটির মধ্যে যেটির ছবি প্রকাশিত হইয়াছে ও যাহার প্রতিলিপি আমরা দিলাম, তাহা হইতে জোর করিয়া বলা যায় না যে, প্রাচীন সিন্ধুদেশবাসীরা আর্য্য ছিল না। ভারতবর্ষে পরবর্ত্তী বহু যুগে প্রস্তর মূর্ত্তি বাস্তব মানুষের সদৃশ (realistic) ছিল না। এদেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক সেকালের কোন মানুষের মত নহে, তাহা কল্পিত কোন না কোন আদর্শ অনুযায়ী। সিন্ধুদেশে প্রাপ্ত প্রাচীন দুটি মূর্ত্তিও ঠিক তাৎকালিক বাস্তব জীবিত মানুষের মত কি না, বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ঐরূপ মুখাবয়ব ভারতবর্ষে এখনও অনেক মানুষের আছে। তাহাদের মুখ আর্য্য ছাঁচের বলিবেন কি না, সে আলাদা কথা।

আমরা যে মূর্ত্তিটির ছবি দিলাম, তাহা চূণ পাথরের (limestoneএর) তৈরী। তাহার উপর মিহি শাদা আস্তর আছে। চোখ দুটি ঝিনুক-খণ্ড দ্বারা খচিত। পোষাকে যে ছিটের নক্সা দেখা যাইতেছে, তাহা গৈরিক মাটীর রঙের। মূর্ত্তিটির গোঁফ কামান। তখন বোধ হয় দাড়ী রাখা ও গোঁফ কামান ফ্যাশন ছিল। মূর্ত্তিটি যে কাহার, তাহা বলিবার উপায় নাই।

মোহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত মানুষের প্রস্তরমূর্ত্তি

এই প্রাচীন সিন্ধুদেশবাসীদের ধর্ম্ম কি ছিল, এখনও নির্ণীত হয় নাই। কাচের মত মসৃণ ও চিক্কণ জিনিষের আস্তরে ঢাকা একটি নীল রঙের মৃণ্ময় চিত্রিত ফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে একটি মূর্ত্তি (সম্ভবতঃ উপাস্য দেবতার) সিংহাসনে বসিয়া আছেন। উপবেশন-ভঙ্গী পদ্মাসনের মত। তাঁহার দক্ষিণে ও বামে একজন করিয়া

উপাসক নতজানু হইয়া উপবিষ্ট; প্রত্যেকের পশ্চাতে একটি নাগ অর্থাৎ সর্প। ফলকের পৃষ্ঠদেশে তাৎকালিক লিপিতে কিছু লেখা আছে। পরবর্ত্তী ভারতীয় ধর্ম্মমত-সমূহ এবং পরবর্ত্তী শিল্পের সহিত এই প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম্ম ও শিল্পের সম্পর্ক নির্ণীত হইলে ভারতের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হইবে।

একটি সীল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অশ্বত্থবৃক্ষের চিত্র আছে। পাতাগুলি যে অশ্বত্থের তাহা সুস্পষ্ট। বৃক্ষের কাণ্ড হইতে দুদিকে দুটি হরিণের মুখ বাহির হইয়াছে। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ ভারতবর্ষে অনেক প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্ম ও পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সীলটিও কোন ধর্ম্মের পরিচায়ক হইতে পারে।

প্রাচীন অট্টালিকা, নর্দ্দামা, স্নানাগার প্রভৃতিতে যে সব ইট ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া চাঁছা-ছোলা। সেকালে চুণ-সুরকির বা অন্য কোন রকমের মশলা গাঁথনীতে ব্যবহৃত হইত না। এইজন্য ইটগুলির পৃষ্ঠদেশ খুব সমতল ও মসৃণ করিতে হইত, এবং জোড়-গুলিও খুব নৈপুণ্যের সহিত খাপ খাওয়াইতে হইত।

—

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক মতের পরীক্ষা

বিলাতের রাগবী শহর হইতে গত ১৩ই জানুয়ারী প্রেরিত একটি বে-তার সংবাদ ভারতের কোন কোন কাগজে ছাপা হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই, যে, গত ৩০শে পৌষের সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে সুমাত্রা দ্বীপে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই এ মিল্‌নের গ্রহণকালীন সূর্য্যের 'করোনা' বা আভামণ্ডলরূপ কিরীট সম্বন্ধীয় মতের সত্যতা পরীক্ষা করা। অধ্যাপক মিল্‌নের মত আবার অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার কতকগুলি মতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে বিষয়ে অধ্যাপক মিল্‌ন্ নিজে গত বৎসর ৩০শে অক্টোবর নেচার্ (Nature, October 30, 1925, page 530) কাগজে লিখিয়াছেন :—

"Six years ago, practically no explanation existed why some lines appear in stellar spectra, and not others, why some lines always decrease in intensity through the stellar sequence and others appear, reach a maximum, and then fade away. It is to Saha that we owe the key which has unlocked these mysteries. Saha showed that elementary thermodynamics, considered in connection with Bohr's theory of origin of spectra, demands that atoms pass through successive stages of ionisation as the temperature increases and produces the phenomena observed in stars. At the hands of Saha and others (others include Prof. Milne himself), this simple physical idea has received quantitative treatment which allows a wealth of detailed deductions to be made concerning pressures and temperatures in the stars."

এই কথাগুলির দুর্ব্বোধ্য বাংলা অনুবাদ দিয়া কোন লাভ নাই। পরে এ-বিষয়ে একটি সচিত্র প্রবন্ধ ছাপিবার ইচ্ছা রহিল।

—

কৃষি-কমিশন

আমরা মডার্ণরিভিউ ও প্রবাসীতে একাধিক বার লিখিয়াছি যে, বহুব্যয়সঙ্কুল একটি রাজকীয় কৃষিকমিশন বসাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্যার্ রেজিন্যাল্ড ক্রাডক্ ব্রহ্মদেশের এবং ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং দুই প্রদেশে তিনি কৃষিবিভাগের কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। তিনিও বিলাতী এশিয়াটিক রিভিউতে লিখিয়াছেন, যে, ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য যাহা করা দরকার তাহা ইতিপূর্ব্বেই নানা কমিটি ও কনফারেন্সের রিপোর্টে এবং প্রাদেশিক কৃষিবিভাগগুলির রিপোর্টে নিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার মধ্যেই সব উপায়ের উল্লেখ প্রাপ্তব্য। সেগুলি একত্র করিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিলেই হইত। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন, যে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভূমির রাজস্ব প্রভৃতি কমিশনের তদন্তের বিষয় হইতে বাদ দিলে কমিশনের কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে না। কিন্তু প্রথমতঃ ইহা তদন্তের বিষয়সমূহ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। পরে বলা হইয়াছে, যে, কমিশন এবিষয়েও অনুসন্ধান করিতে পারিবেন, কিন্তু মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না! কৃষির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবশ্য খুবই প্রয়োজন আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা রয়্যাল কমিশনের কাজ নয়, এবং যে-দেশের অধিকাংশ কৃষক নিরক্ষর, তথায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতে লাভবান্ হইবার লোকও যথেষ্ট থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, বহুব্যয়সংকুল কমিশন ত নিযুক্ত হইল। এখন তাহার দ্বারা ভাল কাজ হইলেই মঙ্গল। আমাদের দুটি আশঙ্কা আছে। ১ম, কমিশন বসার ফলে কতকগুলি উচ্চ-বেতনভোগী ইংরেজ কৃষিবিৎ নিযুক্ত হইবে; ২য়, কমিশন যদি বা ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য ভাল কিছু প্রস্তাব করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট টাকা মিলিবে না।

কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন, একজন ইংরেজ লর্ড; নাম মার্কুইস্ অব লিন্‌লিথ্‌গো। তিনি ৪২৬০০ একার্ অর্থাৎ প্রায় একলক্ষ ত্রিশহাজার বিঘা জমীর মালিক. এডিন্‌বরার রয়্যাল এশিয়াটিক্ সোসাইটির সভ্য, ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইউরোপীয় যুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতার কোন লক্ষণ ত দেখিতেছি না। জমী থাকিলে কৃষিবিদ্যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের সুবিধা হয় বটে; কিন্তু বাংলাদেশে বিস্তৃত জমীদারীর মালিক অনেক আছেন যাঁহারা কৃষিবিদ্যার "ক"ও জানেন না।

ইংরেজরা নিজেই যতটুকু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা হইতেই জানা যায়, যে, কৃষিতে তাঁহারা পাশ্চাত্য অনেক দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। যথা চেম্বার্সের নূতন এন্‌সাইক্লোপীডিয়াতে দেখিতে পাই লিখিত হইয়াছে—

"Although agricultural research has never received in this country the attention that has been paid to it in many Continental states and in America, the United Kingdom possesses the oldest of all agricultural stations, and one that has done the most to lay the foundations of agricultural science".

কৃষিগবেষণায় ইংলণ্ড আমেরিকার ও ইউরোপের অনেক দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে, স্বীকার করিয়াও বলা হইতেছে, যে, ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রাচীন কৃষিচর্চ্চার প্রতিষ্ঠান আছে এবং তাহাতে কৃষিবিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপনের জন্য সকলের চেয়ে বেশী কাজ করা হইয়াছে। তাহা মানিয়া লইলেও, একথাটা ত সত্য, যে, সেই ভিত্তির উপর কৃষি-বিজ্ঞানকে স্থাপিত করিয়া অন্য জাতিরা উহাকে যত উন্নত করিয়াছে, ইংরেজরা তাহা করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের ওয়েল্‌ফেয়ারে বিখ্যাত জার্নালিষ্ট অর্থাৎ সাংবাদিক সেণ্ট নিহাল সিংহ (ইহা তাঁহার ছদ্ম নাম, আসল নাম লাল সিংহ) লিখিয়াছেন, এখন কোন কোন সুবুদ্ধি ইংরেজ স্বীকার করিতেছেন, যে, কৃষিবিদ্যা শিখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অন্য কোন কোন জাতির পাদমূলে শিক্ষার্থীরূপে উপবেশন করিতে হইবে। বিলাতের সরকারী কৃষিমন্ত্রীর অধীন ষ্টাটিষ্টিক্যাল বিভাগের কর্ত্তা টম্‌সন্ সাহেব একটি প্রবন্ধে কৃষিবিষয়ে ডেন্মার্কের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

According to that authority, agricultural production in Britain falls short of such production in Denmark by more than fifty per cent. One hundred acres in Denmark yield £954, while in Great Britain the return from the same area is only £612.

Not only does the Dane get more out of his land than does the Briton. But the Dane is also able to provide employment to a greater number of persons on a given measure of land than the British farmer can do. In Denmark 57 cultivators find profitable employment on 1,000 acres of land, while in Britain the same area gives work to only 40 persons.

ইংলণ্ড যদিও অন্য অনেক পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা কৃষিতে অনুন্নত, তথাপি কৃষি-কমিশনে যে-সব বিদেশী লোক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সবই ইংরেজ। দেশী সভ্যদের মধ্যেও কেহ কৃষিতে বিশেষজ্ঞ নহেন। কয়েক জন ডেন্‌কে কিম্বা কৃষিবিদ্যায় কার্য্যতঃ পারদর্শী অন্য কোন জাতীয় কয়েকজন লোককে নিশ্চয়ই কমিশনের সভ্য নিযুক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহাতে ইংরেজের ইজ্জৎ থাকিবে না! কিন্তু ইজ্জতের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি কাজের কথা ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, শুধু কৃষিতে নহে, অন্য অনেক বিদ্যাতেই মাঝারী রকমের বা নিরেস রকমের ইংরেজ বিশেষজ্ঞকে যত বেতন দিতে হয়, তাহার চেয়ে কম বেতনে ইংরেজের চেয়ে সরেস অন্যজাতীয় বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায়। আমেরিকার বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক রস ভারত-ভ্রমণানন্তর দেশে ফিরিয়া গিয়া সেঞ্চুরী ম্যাগাজিনে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন, ভারতবাসী ইংরেজ চাকর্যেরা যত বেতন পায় তাহা তাহাদের মত লোকদের স্বদেশে রোজগারের দ্বিগুণ!

যাহা হউক, দুঃখ করিয়া লাভ নাই। পরাধীনতার শাস্তি এই, যে, টাকা বেশী দিয়া ফল মোটেই পাওয়া যায় না কিম্বা কম পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশে শতকরা যত লোক গ্রামে বাস করে, অন্য কোন প্রদেশে শতকরা তত লোক গ্রামে বাস করে না। মোট গ্রাম্য জনসংখ্যাও বঙ্গে সর্ব্বাধিক,—৪,৩৫,০৯,২৩৬। তাহার নীচেই আগ্রা-অযোধ্যায় গ্রাম্য লোক বেশী,—৪,০৫,৭০,৩২২। কৃষি-কমিশন সুফলপ্রদ হইলে বাংলা দেশের উপকার অন্য কোন অঞ্চল অপেক্ষা কম হইবে না। অতএব এই সুযোগে বংলার কি দরকার তাহা কমিশনকে প্রমাণসহ জানাইবার সুবন্দোবস্ত দেশনায়কদের অবিলম্বে করা উচিত।

—

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের প্রতি অমনোযোগ।

পণ্ডিত চন্দ্রিকা প্রসাদ তেওয়ারী এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে রেলওয়ে বোর্ড কর্ত্তৃক প্রকাশিত সর্ব্বাধুনিক যে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতে রেলওয়ে কর্ম্মীর মোট সংখ্যা ৭,২৭,০৯৩। সেন্সস্ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সৈন্যদল ও পুলিস্ বাদ দিয়া সরকারী চাকরী করে ব্রিটিশ ভারতে ১০,০৮,-০৬১ জন। নানারকম সরকারী চাকরীতে দেশী লোকদের দাবী দাওয়া অভাব অভিযোগের কথা খবরের কাগজে যত লেখা হয়, রেলওয়ের দেশী চাকরেদের দাবী দাওয়া অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তাহার দশ ভাগের এক ভাগও লেখা হয় না। পুলিশের চাকরী করে ৬,৭৯,৭৭১ জন। ইহাদিগকে ধরিলেও সরকারী চাকরেদের সংখ্যা সতের লাখ হয় না। এই ১৭ লাখের জন্য যত লেখা হয়, রেলের সাত লাখের জন্য অন্ততঃ তাহার সিকিও ত লেখা উচিত। কিন্তু তাহা করা হয় না।

রেলে বেশী বেশী মাহিনার চাকরী অনেক আছে। অন্য সরকারী বড় বড় চাকরীতে দেশী লোক যতটুকু ঢুকিতে পারিয়াছে, রেলের বড় চাকরীতে ততটুকুও পারে নাই। অতএব এসব দিকে খুব দৃষ্টি রাখা দরকার। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা যদি সাংবাদিকদিগকে ঠিক্ ঠিক্ খবর ও তথ্য জানান, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাঁহাদের বিষয়ে আরও অনেক বেশী লেখা খবরের কাগজে বাহির হইতে পারে।

ভারতায় রাজনৈতিক নানা দল।

বোম্বাইয়ে রাজনৈতিক নেতাদের একটি মন্ত্রণাসভা ডাকিয়া, স্বরাজ্যদল ও পূরা অসহযোগী গান্ধীর দল ছাড়া, আর সব রাজনৈতিকদলকে সম্মিলিত করিবার যে-চেষ্টা হইয়াছে, কার্য্যতঃ তাহা সফল হইলে ভাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া আভ্যন্তরিক বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইলে আপাততঃ গান্ধীজির দল পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এইরূপ ক্ষমতা পাইবার নিমিত্ত **সকল** দলকে লইয়া সম্মিলিত চেষ্টা হওয়া কি অসম্ভব?

নিজের দলের মত প্রচার করিয়া তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অন্যান্য দলের কিছু সমালোচনা করা অপরিহার্য্য। কিন্তু দলাদলি এবং ব্যক্তিগত নিন্দা অপরিহার্য্য নহে। কলিকাতার উদারনৈতিকদের সভায় স্যার মোরোপন্ত জোশী সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দলাদলির ভাব, পরনিন্দা ছিল না; অথচ তিনি উদারনৈতিকদের মত বেশ ভাল করিয়া বুঝাইতে ও তাহার সপক্ষে সুযুক্তি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

—

মহারাজা হোলকারের সিংহাসনত্যাগ

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত হোল্‌কার-বংশের যে সন্ধি আছে, তদনুসারে ভারত-সরকার ইন্দোরের মহারাজার বিচারের জন্য কমিশন বসাইতে পারেন কিনা, জানি না। কারণ আমরা ঐ-সব সন্ধি পড়ি নাই। কিন্তু ইহা ঠিক যে, ভারত-সরকার দেশী রাজাদের গতি-বিধির স্বাধীনতা, কর্ম্মচারী-নিয়োগের স্বাধীনতা এবং আরও অনেক বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বরাবর করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে হোল্‌কার বা অন্য কোন রাজা সিংহাসনত্যাগান্ত গুরুতর প্রতিবাদ করেন নাই, মৃদুতর কোন প্রতিবাদ গোপনে করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। সেইজন্য, এখন কমিশন বসাইলে হোল্‌কারের সহিত সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইত বা তাঁহার অপমান হইত, মহারাজের সিংহাসনত্যাগ যুক্তিসঙ্গত হইলেও, উহাই যে তাঁহার রাজপদ ত্যাগের এক মাত্র বা প্রধান কারণ, লোকের এই বিশ্বাস জন্মিবে না।

ইহাও বিবেচ্য, যে, ব্রিটিশ ভারতে আসিয়া যদি কোন দেশী রাজার প্রজা নরহত্যা করে, ও যদি সেই অপরাধে তাহার ফাঁসী হয়, এবং এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকে, যে, উক্ত রাজারও ইহার সহিত যোগ ছিল, তাহা হইলে কি তিনি রাজা বলিয়াই অপরাধের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে কি না সেবিষয়ে কোন অনুসন্ধানও হইবে না ?

অন্য দিকে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, যে, যদি ভারতবর্ষের বাহিরের কোন বাস্তবিক স্বাধীন দেশের রাজার এদেশী কোন লোককে খুন করাইবার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলিয়া ভারত সরকার সন্দেহ করিতেন, তাহা হইলে গবর্ন্মেণ্ট কি করিতেন বা করিতে পারিতেন ? অবশ্য ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, যে, ভারতীয় রাজারা ত বাস্তবিক স্বাধীন নহেন। তাঁহারা যে নিজ-নিজ গদীতে বসিয়া আছেন, তাহাও ব্রিটিশ বেয়নেটের জোরে। সুতরাং স্বাধীন নৃপতিদের সহিত তাঁহাদের তুলনা করিয়া কোন কথা বলা বৃথা।

মহারাজা হোল্‌কারকে আমরা বাওলার হত্যার সহিত নিশ্চয়ই জড়িত বলিয়া মনে করি না। কিন্তু ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে, যে, মমতাজকে, জোর করিয়াও, ইন্দোরে আনিবার হুকুম হয়ত মহারাজের ছিল ; কিন্তু কেহ তাহাতে বাধা দিলে খুন পর্য্যন্ত করিতে হইবে, এরূপ হুকুম থাকা না-থাকা দুই-ই সম্ভব। এমনও হইতে পারে, যে, কতকগুলি লোক মহারাজকে খুসী করিবার জন্য মমতাজকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে আসিয়া উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় দেখিয়া খুন পর্য্যন্ত করিয়া বসিয়াছে। প্রকৃত কথা যাহাই হউক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, যে, দাম্পত্য-সম্বন্ধে মহারাজের নিষ্ঠা থাকিলে এবং চরিত্রে সংযম থাকিলে, এই-সব গর্হিত ও লজ্জাকর ব্যাপার ঘটিত না। তাঁহার পদত্যাগ বস্তুতঃ পদচ্যুতি। অসংযত চরিত্রের রাজাদের পদচ্যুতির দণ্ড কোন আইনে থাক্ বা না থাক্, হোল্‌কারকে যে নিজের কর্ম্মফল ভুগিতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে আমরা দুঃখিত। কারণ, শিক্ষার উন্নতি সাধন, বিদ্যোৎসাহিতা, প্রজাদিগকে কোন-কোন রাষ্ট্রীয় অধিকারদান, শিল্প-বাণিজ্যের উৎসাহ-দান, সমাজসংস্কারার্থ কোন-কোন আইন-প্রণয়ন প্রভৃতি কারণে মহারাজা লোকপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটিল, তাহা হইতে অন্য মহারাজারা সাবধান হইয়া চরিত্র সংশোধন করিলে তাঁহাদের ও দেশের মঙ্গল হইবে।

—

এংলো-ইণ্ডিয়ান্‌দিগের সুবুদ্ধি

লক্ষ্ণৌর লা-মার্টিনিয়ার কলেজের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণের সময় আগ্রা ও অযোধ্যার গবর্ণর স্যার উইলিয়ম ম্যারিস এক বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলেন, যে, তিনি ভারতবর্ষে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল আছেন, এবং এই দীর্ঘকাল এ-দেশে অবস্থান-কালে তিনি এক বিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন। পূর্ব্বে এংলো-ইণ্ডিয়ান্ ও এদেশের অধিবাসী ইংরেজগণ নিজেদের ভারতের অপরাপর লোক হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং গবর্ণমেণ্টের উপর তাহাদের বিশেষ কতকগুলি দাবী আছে বলিয়া মনে করিত। এখন তাহারা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রে তাহাদের যে পদমর্য্যাদা, তাহা শুধু তাহাদের নিজেদের গুণাগুণ ও কর্ম্মক্ষমতার উপরেই নির্ভর করে এবং এই নব-উপলব্ধ জ্ঞানের আলোকে তাহারা বিশেষ করিয়া নিজেদের উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। স্যার্ উইলিয়ম্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সুখের বিষয়। ভারতে নানা জাতির বাস। তাহাদের নানা প্রকার ধর্ম্মমত, আচার, ব্যবহার ও গুণাগুণ। ইহাদের মধ্যে ফিরিঙ্গী ও ইংরেজও যদি জনকতক বসবাস করে, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু ইহারা ইংরেজ-শাসনের আরম্ভ হইতেই রাজার জা'তের সহিত রক্ত-সম্পর্কের গুণে নিজেদের প্রাপ্যের অধিক পাইয়া আসিয়াছে। আজ যদিও স্যার উইলিয়ম্ ম্যারিস্ বলিতেছেন, যে, ফিরিঙ্গী ও ইংরেজগণ এখন সকলের সহিত সমান অধিকারে থাকিতে প্রস্তুত হইতেছে, তথাপি আজও অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, যে, সহস্র-সহস্র উপরোক্তজাতীয় লোক শুধু ভাষা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর দোহাই দিয়া যোগ্যতার তুলনায় অধিক বেতন ভোগ করিতেছে। স্যার্ উইলিয়ম্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে খাটিতে পারে, কিন্তু

বর্ত্তমানে তাহা বেশী পরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। এখনও ফিরিঙ্গীরা ভাবিয়া থাকে, যে, তাহাদের ভারতবর্ষের উপর ভারত-সন্তানদিগের অপেক্ষা অধিক দাবী আছে। ইহার মূলে তাহাদের নিজেদের কোন ইতিহাস-সংক্রান্ত ভুল ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু এ ধারণা তাহাদের আছে। বহুকালাবধি অতিরিক্ত আব্‌দার পাইয়া আসিলে যেমন ছেলেদের ন্যায্য অধিকার কি তাহা বুঝান শক্ত হইয়া উঠে, ফিরিঙ্গী ও ভারতের ইংরেজ অধিবাসীদিগকেও সেইরূপ তাহাদের যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া শক্ত হইবে। অ

—

মন্দির ও মস্‌জিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা

সম্প্রতি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যে সব মন্দির ও মস্‌জিদ ভগ্ন বা অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহার সভ্যগণের নাম :—

মাননীয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ (প্রেসিডেণ্ট), মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎ কুমার; হাজী এ, কে, এ গজনবী এম, এল, সি; রাজা জানকীনাথ রায়; বাবু হরিশঙ্কর পাল; মিঃ জি, ডি, বিরলা; রায় বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা বাহাদুর; রাজা হৃষিকেশ লাহা; বাবু মৃণালকান্তি বসু; ডাক্তার আর আমেদ; পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী এবং সাম্‌সজাহাঁ বেগম।

সেক্রেটারী মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী, ডাক্তার আবদুল্লা সুরাবার্দ্দী।

সাময়িক কোষাধ্যক্ষ, মিঃ আবদুল রহিম, সি, আই, ই, ৯২ নম্বর রিপন ষ্ট্রীট এবং মিঃ টি, বি, রায় এম, এল, সি, ৬ নম্বর অভয়চরণ মিত্রের ষ্ট্রীটের ঠিকানায় টাকা পাঠাইতে হইবে।

যদি যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হয় তবে মন্দির প্রভৃতি সংস্কার করিবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ক্ষতিগ্রস্তদিগকে সাহায্য করা হইবে। এই সাহায্যে জাতি-ধর্ম্ম বিচার করা হইবে না।

যাঁহারা সদ্ভাব স্থাপনের পক্ষপাতী তাঁহাদের এই তহবিলে মুক্ত-হস্তে অর্থ সাহায্য করা উচিত। মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এই তহবিলে ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

—

ভারত-সভার চেষ্টা

ভারত-সভা দাঙ্গায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগকে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

যাঁহারা আহত, লাঞ্ছিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অবিলম্বে ৬২ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীটে ভারত-সভার সম্পাদকের নিকট সকল বিবরণ জানাইলে যথোচিত প্রতীকারের ব্যবস্থা করা হইবে। নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি অনুসন্ধান কমিটী গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলের নিকট হইতে লিখিত অথবা মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

যতীন্দ্রনাথ বসু সলিসিটার; সুধাংশুমোহন বসু ব্যারিষ্টার; সতীনাথ রায় উকীল, রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত কাউন্সিলর, কৃষ্ণকুমার মিত্র ভারত-সভার সম্পাদক।

—

ভীষণ পৈশাচিক অত্যাচারের অভিযোগ

আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে—

"দামামদিয়া, বাউরনামান এবং গনাইলজুরী, আসামের বড়পেটা জেলার এই তিনখানি গ্রাম মৈমনসিংহ ও পাবনা জেলা হইতে আগত প্রবাসী বাঙ্গালীদের দ্বারা অধ্যুষিত; ইহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান কৃষক। দামানদিয়ার নিকটস্থ একটি বিলের মাছ ধরিবার অধিকার লইয়া বাঙ্গালী ও আহমদিগের মধ্যে একটা দাঙ্গা হয়। আহমেরা সরভোগ পুলিশ ষ্টেশনে নালিশ দায়ের করে। ইহাতে কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী ১৬জন গুর্খা সিপাহী এবং ৫০ জন কনষ্টেবল লইয়া তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী পল্লীতে যায়। গুর্খা ও পুলিশেরা বাঙ্গালী গ্রামবাসীদিগকে নির্ব্বিচারে মারধর করে এবং প্রায় সমস্ত পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়া একটা জায়গায় তালাবদ্ধ করিয়া রাখে।"

"রাত্রিকালে কতকগুলি গুর্খা ও পুলিশ পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে যাইয়া স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। প্রায় কোন স্ত্রীলোকই এই অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি পায় নাই; কন্যার সম্মুখে মাতা, বধূর সম্মুখে শাশুড়ী এবং শাশুড়ীর সম্মুখে পুত্রবধূ পিশাচের হস্তে ধর্ষিতা হয়। স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করিয়া তাহাদের কাপড় কাড়িয়া লওয়া হয়। অত্যাচারের ফলে একজন স্ত্রীলোক রক্তস্রাব হইয়া মারা গিয়াছে।"

এই অত্যাচার-কাহিনী সত্য কি না তাহার অনুসন্ধান আসামের জননায়কদের ও সার্ব্বজনিক সভাসমিতিসমূহের অতি শীঘ্র করা উচিত। সংবাদ সত্য হইলে প্রতিকারের যতপ্রকার উপায় আছে সমুদয়ই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এরূপ অত্যাচার যে আমাদের দেশে স্বদেশী লোকদের দ্বারাও হওয়া অসম্ভব নহে এবং তাহা সহ্য করিবার মত অসহায়তা ও ভীরুতাও যে আমাদের দেশে আছে, ইহা ঘোরতর লজ্জা ও অপমানের বিষয়। এরূপ ঘটনা অসম্ভব করিয়া তুলিবার জাতীয় চেষ্টা ও সাধনা কে করিবে? পুরুষ ও নারী উভয়কেই এই সাধনায় রত হইতে হইবে।

—

মাদারীপুরে ঘূর্ণিবাত্যা

মাদারীপুর মহকুমার অনেকগুলি গ্রাম ঝড়ে বিধ্বস্ত হইয়াছে। ৬০ জনের অধিক লোক মারা পড়িয়াছে, এবং অনেক শত লোক আহত হইয়াছে। প্রায় এক

হাজার ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেক হাজার লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। মাদারীপুরের কংগ্রেস কমিটি ও অন্যান্য জনসেবকেরা বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতাতেও কমিটি গঠিত হইয়াছে। এরূপ বিপদে কেবল স্থানীয় লোকদের অর্থে যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া যায় না। অর্থ ভিন্ন, স্থানীয় কর্ম্মী ছাড়া বাহিরের কর্ম্মীরও প্রয়োজন হয়। কলিকাতার দাঙ্গা হাঙ্গামায় লোকদের চিত্তবিক্ষেপ হইয়াছে। কিন্তু মাদারীপুরের সংবাদ সর্ব্বত্র পৌঁছিলে নিশ্চয়ই অর্থ ও কর্ম্মী দুই-ই যথেষ্ট জুটিবে। বর্ত্তমান বিপদে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন লোকেরা প্রায় সকলেই মুসলমান চাষী। বরাবর যেমন হিন্দুরা জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সাহায্য করিয়া থাকেন, এক্ষেত্রেও তাহা করিবেন। কিন্তু মুসলমান নেতারাও অগ্রসর হইলে ভাল হয়। একত্র সৎকাজ করিলে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব জন্মে।

—

"কারো সর্ব্বনাশ, কারো পৌষমাস"

হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া খুনাখুনি হইবামাত্র এদেশের ও বিলাতের ইংরেজ-চালিত কাগজগুলা তৎক্ষণাৎ তাহা নিজেদের কাজে লাগাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা ও উদ্যোগিতা দেখায়। ভারতীয়েরা যে স্বায়ত্তশাসন লাভের কিরূপ অনুপযুক্ত, ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা ও গোরা সৈনিকেরা এদেশে না থাকিলে যে ভারতীয়দের আরও কত দুর্দ্দশা ও বিপদ ঘটিত, তাহা এই সব কাগজ অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছে। একটা বিলাতী কাগজ ইহাও বলিতেছে, যে শাসনসংস্কার-আইন দ্বারা ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের সূত্রপাত করিবার চেষ্টা করাতেই এইরূপ ঝগড়া ও রক্তপাত হইতেছে।

ইংরেজদের কাগজে যাহা লিখিত হয়, সভ্য জগতে তাহার প্রচারই অধিক হয় এবং তাহাই সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় ভারতীয়গণ যে আত্মরক্ষা এবং শান্তি ও সদ্ভাব পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, তাহার উল্লেখ এসব কাগজে দেখা যায় না। ইহারা এই ধারণাই জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে, যে, পুলিশ ও গোরা সৈন্যেরাই যাহা কিছু করিবার করিতেছে, এবং তাহার দ্বারা আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্বের অযোগ্যতা প্রমাণের প্রয়াস পাইতেছে।

এক শ্রেণীর মানুষ যেরূপ ঘটনা ও অবস্থাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাইতে সর্ব্বদা উন্মুখ থাকে, সেরূপ ঘটনা ও অবস্থা প্রয়োজন মত ঘটাইবার ও উৎপাদন করিবার চেষ্টা করা যে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, এমন ত মনে হয় না।

এইরূপ কথা বলিয়া আমরা হিন্দুমুসলমানকে বেকসুর খালাস দিয়া তৃতীয় পক্ষের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইতে চাহিতেছি না। আমরা জানি, ছিদ্র না পাইলে শনি ঢুকিতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মত, আচার ব্যবহার, এবং পরস্পরের প্রতি মনের ভাবে এরূপ খুঁৎ আছে যাহা অবলম্বন করিয়া উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধান সহজ হয়। আমাদের বক্তব্য কেবল এই যে, এই খুঁৎগুলা দূর করা এবং সে গুলা সত্ত্বেও সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপন ও রক্ষা করিবার চেষ্টা করা সৎলোকের কাজ। খুঁৎগুলা আছে বলিয়া সেই সু (?) যোগে ঝগড়া বিবাদ আরো বাড়াইয়া তুলা কিম্বা ঝগড়া বিবাদ বাধিলে তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া তাহা নিজেদের কাজে লাগান, শয়তানী ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা দোষ দিব আপনাদিগকেই। সর্ব্বপ্রযত্নে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপন আমাদেরই কর্ত্তব্য। অন্যেরা আমাদের দোষ-ত্রুটির সুযোগে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে না, তাহাদের এ প্রকার সদাশয়তা ও সাধুতার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

—

হিন্দুমুসলমানের ঝগড়ার নির্বুদ্ধিতা

সাম্প্রদায়িক ঝগড়া খুনাখুনি যে অধর্ম্ম, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু যদি বুঝিতাম, যে, ইহাতে কোন পক্ষের সাংসারিক লাভ আছে, যদি বুঝিতাম এরূপ ঝগড়ায় শেষ পর্য্যন্ত হয় মুসলমান নয় হিন্দু দেশের মালিক হইবে, তাহা হইলে না হয় কেহ কেহ বলিতে পারিত, "রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম! পার্থিব প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যটাই আসল জিনিষ; সেটা ত পাওয়া গেল"! কিন্তু বাস্তবিক হিন্দু মুসলমানের

ঝগড়ায় শেষ ফল হয় কি? কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ নাকাল হইবার পর ইংরেজ আসিয়া চড়চাপড় লাথি লাঠি গুলির জোরে সকলকেই ঠাণ্ডা করিয়া নিজের প্রভুত্ব আরো দৃঢ়তর করে। হইতে পারে, যে, হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে কোন কোন নীচমনা লোক লাভবান্ হয়। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অল্প। হিন্দুসমাজ বা মুসলমান সমাজ সাম্প্রদায়িক বিবাদ দ্বারা কখনও লাভবান হয় না। কথামালায় সিংহ ও ভালুক শিকারের ভাগ লইয়া যুদ্ধ করিয়া কাবু হওয়ায় শৃগালের যেরূপ সুবিধা হইয়াছিল, ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক ঝগড়াতে তৃতীয় পক্ষের সেইরূপ সুবিধা ঘটে।

আমাদের নির্বুদ্ধিতা বশতঃ বিদেশীরাই প্রত্যেক বিবাদের শেষ মীমাংসক হয় ও আমাদের ভাগ্যবিধাতা হয়। দুঃখের বিষয় এই লজ্জা বিবাদপরায়ণ কোন পক্ষই অনুভব ও উপলব্ধি করে না। তৃতীয় পক্ষ মীমাংসকের কাজ যে বন্ধুভাবে করে, তাহাও নহে। এক মনিবের অনেকগুলা কুকুর খাওয়াখাওয়ি করিলে মনিব যেমন চাবুক দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করে, তৃতীয় পক্ষ ভারতবর্ষে তাহাই করে।

—

ভারতে রাজনৈতিক দলাদলি

গান্ধীজির দল ও স্বরাজীদল ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দলের এক হইয়া যাইবার প্রয়াসের মূলে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, স্বরাজীদিগকে কাহিল করিবার ইচ্ছা কতটা আছে এবং গবর্মেণ্টের হাত হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকার জিনিয়া লইবার ইচ্ছাই বা কতটা আছে, তাহা বলা কঠিন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের লক্ষ্য করিবার ও চিন্তা করিবার শক্তি আছে; যাহা তিনি সত্য মনে করেন তাহা বলিবার সাহস তাঁহার আছে; দেশের জন্য তিনি ঘাটিয়াছেন, ভুগিয়াছেন, ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্বরাজীদিগকে জব্দ করিবার প্রবৃত্তি এই মিলনের চেষ্টার মধ্যে লক্ষিত হয়। তাহা হইলে দুঃখের বিষয়।

ইংলণ্ডে বা তদ্বিধ প্রজাতন্ত্র স্বাধীনদেশে রাজনৈতিক দলাদলির যে সার্থকতা আছে, আমাদের দেশে তাহা নাই। বিলাতে শ্রমিক, উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল দল অন্য সব দলকে কাবু করিতে পারিলে নিজেরা পার্লেমেণ্টে দলে পুরু হইয়া গবর্মেণ্ট নাম লইয়া নিজেদের আদর্শ অনুসারে দেশের কাজ করিতে পারে, এবং তাহাদের বুদ্ধি ও সদিচ্ছা থাকিলে তাহার দ্বারা দেশের উপকারও হয়। আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক দলই জয়ী হউক, রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ও অপকর্ম্ম করিবার মালিক থাকিবে ইংরেজই। সুতরাং রাজনৈতিক দলাদলিতে পাশ্চাত্য রকমের মাতামাতি এদেশে আমদানী করা আমরা সমীচীন মনে করি না। ব্যবস্থাপক সভায় ভোটে হারিলেও ইংরেজের হার নাই। ব্যবস্থাপক সভা টাকা নামঞ্জুর করিলে লাট সাহেব তৎসত্ত্বেও খরচ মঞ্জুর করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারিত প্রস্তাবগুলি গবর্মেণ্টকে কোন কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে না;—অনেক লোকের স্বাক্ষরযুক্ত হুজুরের নিকট দরখাস্ত যে-জাতীয় জিনিষ, এই প্রস্তাবগুলিও সেই-জাতীয়। অবশ্য কোন কোন প্রস্তাব অনুসারে কাজ সরকার বাহাদুর করেন;—সেটা তাঁহাদের মর্জ্জি। আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতাও ব্যবস্থাপক সভার নাই। রাষ্ট্রের নীতি স্থির ও নির্দ্দেশ করিবেন সরকার বাহাদুর। তাহার সহিত অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য বা বিরোধ যাহার নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর বিষয়ে সরকার দেশী সভ্যদের এমন কোন কোন কথা কানে তুলিতে পারেন ও তুলিয়া থাকেন। সুতরাং সরকারী অভিধানে "সহযোগিতা"র মানে বাস্তবিক যে আত্মসমর্পণ, তাহা স্বেচ্ছান্ধ বা বুদ্ধিহীন ভিন্ন অন্য সব লোকের বুঝিতে পারা উচিত। ইংরেজ জাতির বর্ত্তমান ব্যবস্থা এই, যে, আমাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রত্যেক ধাপের সময় ও মাপ তাঁহাদের পার্লেমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন; আমাদের যোগ্যতা তাঁহাদের বিবেচনা ও সুবিধা অনুসারে নির্ণীত হইবে। এই লজ্জাকর চিরপরাধীনতা মানিয়া লইয়া আমাদিগকে সহযোগিতা করিতে হইবে! এবং তাহা করিতে হইবে স্বাধীনতার জন্য!!

এ অবস্থায় দেশহিতৈষী ভারতীয় সকল রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ যে ইংরেজকে কার্য্যতঃ এই সর্ব্বেসর্ব্বার আসন হইতে টলান, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যবস্থাপক সভাগুলি দ্বারা দেশের কোন উপকারই হয় না, বলিতেছি না। যাহারা ঐগুলির দ্বারা অল্পস্বল্প

দেশহিত করিতে চান ও পারেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনই ঝগড়া নাই। কিন্তু এইভাবে সহযোগিতা এবং মধ্যে মধ্যে গবর্মেণ্টের সমালোচনা ও বিরোধিতা করিয়া যে ইংরেজকে ভাগ্য-বিধাতার পদ হইতে সরান যাইবে না, ইহাও আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। ইহাও আমরা মনে করি, যে, ইংরেজের আসন টলাইতে হইলে খুব প্রবল সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন। এরূপ চেষ্টা একবার দুবার দশবার ব্যর্থ হইলেও আবার করিতে হইবে। তাহা ভিন্ন উপায় নাই। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, ইংরেজ যখন যখন দেশের কোন দলের মারফৎ ভারতবর্ষকে কিছু ইনাম, বখশিশ বা বর দিয়াছে, তখন প্রবলতর অন্য দলের অস্তিত্বের জন্যই তাহা করিয়াছে, এবং তাহার উদ্দেশ্য পূর্ব্বোক্ত দলকে হাত করা।

এই সকল কারণে আমরা এরূপ একটি প্রবল রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আবশ্যক মনে করি, যাহাদের প্রধান কাজ ও উদ্দেশ্য হইবে বিদেশীদিগকে সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিতে না-দেওয়া। এই কারণে স্বরাজীদের শত দোষ সত্ত্বেও আমাদের সহানুভূতি তাহাদের মূল নীতি ও লক্ষ্যের সহিত অধিক আছে, ইহা গোপন রাখা অনাবশ্যক মনে করি। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে সভ্যদের ঐ নীতি অবলম্বন করা অন্য নীতি অপেক্ষা আমরা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু ইহা বলাও দরকার মনে করি, যে, ব্যবস্থাপক সভায় না-যাওয়াই আমরা শ্রেষ্ঠনীতি মনে করি। ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া সভ্যের কাজ করিবার নিমিত্ত যত সময় দিতে হয় ও পরিশ্রম করিতে হয়, সেই সময় ও শক্তি স্বাধীনভাবে দেশহিতসাধনে নিয়োগ করিলে সুফল অধিক হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।

যাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে "ক্লীন্ ফাইট্" (ইহা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও মিস্টার জিন্নার ব্যবহৃত কথা) করিবার জন্য অস্ত্র শানাইতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সমুদয় যুদ্ধোৎসাহ, রণদক্ষতা ও সামরিক শক্তি আমলাতন্ত্রের অব্যাহত শক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিলে দেশের হিত বেশী হইবে, এবং অধিকন্তু তাঁহারা এই যুদ্ধটা স্বরাজীদের চেয়ে বেশী উৎসাহ ও উদ্যোগিতার সহিত চালাইতে পারিলে দেশের লোকদের হৃদয়সিংহাসন হইতে স্বরাজীদিগকে চ্যুত করিয়া নিজেরা তথায় অধিরূঢ়ও হইতে পারিবেন।

"ক্লীন্ ফাইট" বলিতে এরূপ যুদ্ধ বুঝায়, যাহাতে যাহার জন্য যুদ্ধ সে বিষয়টার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় এবং শত্রুপক্ষে আর লড়িবার ইচ্ছা বা লড়িবার লোক বাকী থাকে না।

—

রাজনৈতিক দলের কাগজ

ভারতবর্ষে বাস্তবিক বলিতে গেলে রাজনৈতিক দল দুটি; এক বিদেশী প্রভুদের দল, দ্বিতীয় দেশী অধীন লোকদের দল। দ্বিতীয় দলের উপদলগুলির মধ্যে যে মতভেদ, তাহা অবান্তর। কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যায়, যে, উপদলগুলির মতের, কার্য্যপ্রণালীর ও তাহাদের নেতাদের ব্যক্তিগত অনেক কথার আলোচনা উপদলসমূহের মুখপত্র খবরের কাগজগুলিতে যতটা এবং যত চোখে পড়িবার মত উৎকৃষ্ট জায়গা পায়, প্রভুদের দলের সমালোচনা অনেক সময় তাহা পায় না। আমরা নিজেদের মধ্যে যত কথা কাটাকাটি করিয়া ও পরস্পরের দোষোদ্ঘাটন করিয়া ক্লান্ত হই ও প্রভুদের আমোদ উপভোগের ব্যবস্থা করিয়া দি, প্রভুদের কাগজগুলি পরস্পরের দোষোদ্ঘাটনে দিনের পর দিন তেমন করিয়া ব্যাপৃত থাকে না। আমাদের উপদলগুলির পরস্পরের সমালোচনার কোন আবশ্যক নাই বা তাহা সম্পূর্ণ অকর্ত্তব্য, বলিতেছি না; কিন্তু তাহা মাত্রা রাখিয়া সংযম ও মিতভাষিতার সহিত করা উচিত। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত, আমরা দেশহিতার্থে সাধারণ যুদ্ধে লিপ্ত সহযোদ্ধা। আমরা স্বয়ং সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, কৃষি, সাহিত্য, ধর্ম্ম এবং আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য কি করিতে পারি, তাহার আলোচনার ও তাহার উপায় ও প্রণালী আবিষ্কারে আমাদের সকলের চেয়ে বেশী মন দেওয়া উচিত। তৎপরে গবর্মেণ্টের কাজ ও অকাজ, এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের কৃতিত্ব ও ত্রুটি আলোচিত হইতে পারে। তাহার পর

আলোচ্য দেশী রাজনৈতিক উপদলগুলির পরস্পরের মতভেদ ইত্যাদি।

—

লর্ড রেডিঙের সিদ্ধি লাভ

ইংরেজ মহলে জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে লর্ড রেডিঙের ভারতশাসনের সাফল্যে। তিনি চঞ্চল বিক্ষুব্ধ ভারতকে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছেন, অসহযোগ আন্দোলনের শক্তি হরণ করিয়াছেন; আর করিয়াছেন, জগতে টাকার বাজারে ভারত-গবর্মেণ্টের আসন্ন-দেউলিয়াত্বের অখ্যাতির পরিবর্ত্তে আর্থিক সচ্ছলতার খ্যাতি স্থাপন। অতএব তাঁহার প্রশংসার সীমা নাই। তাঁহার আমলে রাজনৈতিক অবস্থার ও আর্থিক-বাণিজ্যিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা অনেকটা তাঁহার চেষ্টা নিরপেক্ষ। কিন্তু সমস্ত পরিবর্ত্তনটাই তাঁহার চেষ্টার ফল বলিয়া ধরিয়া লইয়াও সংক্ষেপে দেখা যাক্ তিনি আর কি কি করিয়াছেন।

ভারতীয়দের বিশ্বাস অর্জ্জন ও হৃদয় জয় করিবার অনেক সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল, কিন্তু সবগুলিই তিনি হারাইয়াছিলেন; তাঁহার আমলে দমননীতির প্রয়োগ খুব বেশী মাত্রায় হইয়াছে; অনেক আইন যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার লজ্জাকর অপপ্রয়োগ হইয়াছে। তিনি ভারতীয় সকল দলের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের ন্যূনতম দাবী অবজ্ঞার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং অসম্ভব রকমের "সহযোগিতা" অর্থাৎ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা সব ভারতীয় রাজনৈতিক দলের নিকট হইতে চাহিয়াছেন। ফরিদপুরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জাতীয় দাবীকে এতটা কম করিয়াছিলেন যে অনেক মডারেট ও তাহাতে রাজী ছিলেন না। তথাপি রেডিংএর সহযোগিতার সর্ত্ত নাকি পালিত হয় নাই! মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের ইতিহাস তিনি যে ভাষায় বর্ণনা করেন, তাহা ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ।

দিল্লীতে ও সিমলায় প্রায়ই শুনা যাইত, যে, তিনি কাগজপত্র ও নানা প্রশ্ন ও সমস্যা সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশে খুব বেশী বিলম্ব করিতেন।

চতুর ইংরেজরা বলিয়া থাকে, যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলাদলির বাইরে। তাহারা ইহা দ্বারা ভারতকে ও জগৎকে বুঝাইতে চায়, তাহাদের সব দলই ভারতের হিত করিতে ইচ্ছুক ও উদ্‌গ্রীব। আমরা কথাটার মানে বুঝি অন্য রকম;—বুঝি এই, যে, সব দলের ইংরেজই ভারতকে চিরকাল প্রভুত্ব করিবার ও অর্থ আহরণ করিবার জায়গা রাখিতে চায়। ভারত যে অর্থেই ব্রিটিশ দলাদলির বাহিরে হউক, তাহার একটা দৃষ্টান্ত লর্ড রেডিং দেখাইয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ তিনটি রাজনৈতিক দলের পাঁচ জন প্রধান মন্ত্রী ও চার জন ভারত-সচিবের অধীনে কাজ করিয়াছেন। এই সব দলের ও রাজপুরুষের মতামত ভিন্ন; তবুও তিনি সকলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করিতে পারিয়াছেন। ইহার এক মাত্র মানে এই, যে, তিনি এবং ঐ সব দল ও দলের রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষকে প্রভুত্ব ও শোষণের স্থান জ্ঞান সম্বন্ধে একমত ছিলেন। সে বিষয়ে অবশ্য ভারতীয় ইংরেজ সিবিলিয়ানদের প্রভাব সকলকে সর্ব্বদা অভিভূত করিতে ও রাখিতে পারিয়াছে।

সেইজন্য লী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সিবিলিয়ান ও অন্যান্য সমগ্রভারতীয় চাকর্যেদের বেতন ও অন্যরূপ পাওনা ও সুবিধা তাঁহার আমলে ত ব্যবস্থাপক সভাসমূহের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও খুব বাড়িয়াছেই, অধিকন্তু প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসকলের অধীনস্থ ইউরোপীয় চাকর্যেদেরও পাওনা আদি বৃদ্ধিতে প্রথমে আপত্তি করিয়া পরে তিনি নরম ও অনুকূল ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। অথচ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস্ সম্বন্ধে লী কমিশনের সুপারিসগুলি ইংরেজদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে বলিয়া সেগুলি অনুসারে সব স্থলে কাজ হইবে না! ভারতশাসনসংস্কার-আইন অনুসারে উচ্চ সব শ্রেণীর চাকরীতেই ক্রমশঃ ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়াইবার কথা; কিন্তু তাহা করা হয় নাই।

সুবিচার এবং জাতিনির্ব্বিশেষে সমান বিচার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রকাশ্য অঙ্গীকার তিনি করিয়াছিলেন; কিন্তু এই অঙ্গীকার প্রধানতঃ অপালিত রহিয়া গিয়াছে। নিগ্রহ ও দমনেচ্ছাপ্রসূত প্রধান প্রধান আইন ও আইনের ধারা রদ না হইয়া বলবৎ রহিয়াছে। অধিকন্তু নূতন দমনসৌকর্য্যসাধক আইন বঙ্গের হিতার্থ

প্রণীত হইয়াছে। সতর্ক না করিয়া দিয়া জনতার উপর গুলি চালান বন্ধ করিবার জন্য সরকার প্রথমে নিজেই একটি বিল পেশ করিয়া পরে তাহা প্রত্যাহার করেন। তাহার পর বেসরকারী সভ্যদের সেইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার চেষ্টা সরকার ব্যর্থ করিয়াছেন। শাসন ও বিচার কার্য্য একই শ্রেণীর কর্ম্মচারীর হাতে থাকায় জুলুম ও অবিচার হয়; কিন্তু বহুবৎসর পূর্ব্বে হইতে এই দুই কার্য্যের পৃথক্‌করণ আবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি রেডিঙের আমলেও এই সংস্কার সাধিত হয় নাই।

ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলে ভারতীয়দের অবস্থা ও অধিকার সম্বন্ধে লর্ড রেডিং লর্ড হার্ডিঙের মত দৃঢ়তা দেখাইতে পারেন নাই। মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর চেষ্টায়, অষ্ট্রেলিয়ায় যে অল্পসংখ্যক ভারতীয় আছে, তাহাদের কিছু সুবিধা হইয়াছে। অন্য কোন উপনিবেশে সুবিধা ত হয়ই নাই, দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থা খুব খারাপ হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা হইয়াছে। ব্রিটিশ গিয়ানাতে কুলী-চালান ভারতীয় কোন রাজনৈতিক দলের অনুমোদিত নহে। তাহা কিন্তু রেডিং সাহেবের আমলে মঞ্জুর করা হইয়াছে। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা প্রণীত ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের প্রতি প্রতিশোধের আইন জারী করেন নাই, এবং উহার প্রস্তাব অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর আমদানী করও বসান নাই। একজন বিখ্যাত ভারতীয় জনসেবক দক্ষিণ আফ্রিকার খৃষ্টীয় সভাসমিতিগুলিকে ভারতীয়দিগের পক্ষসমর্থন করাইবার নিমিত্ত তৎ[illegible]বার পাস্‌পোর্ট (ছাড়পত্র বা অনুমতিপত্র) চাহিয়াছিলেন। তাহা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।

ভারতবর্ষের সৈন্যদলকে "ভারতীয়" করিবার জন্য যে আন্তরিক চেষ্টা কার্য্যতঃ হওয়া উচিত, লর্ড রেডিং তাহা করেন নাই। উচ্চ সেনানায়কদের সকল বা অধিকাংশ পদে ভারতীয়ের নিয়োগ সুদূরপরাহত হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় রণতরি বিভাগের বহ্বাড়ম্বর পূর্ব্বক সূচনা কেবল হাস্যোদ্দীপনই করে। ইঞ্চকেপ কমিটি যে ভারতের সৈনিক ব্যয় পঞ্চাশ কোটি করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা রেডিঙের আমলে প্রধান সেনাপতি অসম্ভব বলিয়াছেন।

লবণশুল্ক বৃদ্ধি প্রভৃতি কত কর বৃদ্ধি এবং কত নামঞ্জুর বরাদ্দ পুনর্মঞ্জুর যে রেডিং ভারতশাসনার্থ অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়া করিয়াছেন, তাহার লম্বা তালিকা এখানে দিবার স্থান নাই।

বেসরকারী সভ্যদের প্রস্তাবিত অনেক অত্যাবশ্যক বিল রেডিংএর গবর্ন্মেণ্ট বর্জ্জন করিয়াছেন।

নূতন ট্যাক্স যে কত প্রকারের কত বসিয়াছে, তাহার পূরা ফর্দ্দ দিবার জায়গা নাই, এখন সময়ও নাই। নানা প্রকার ডাকমাশুল বৃদ্ধি ইহার একটা সর্ব্বজনবিদিত দৃষ্টান্ত। মোটের উপর বলা যায়, যে, প্রায় গত ছয় বৎসর ধরিয়া পঞ্চাশ কোটি টাকার উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় হইয়া আসিয়াছে। এমন করিয়া দরিদ্রপেষণ ও দরিদ্রশোষণ দ্বারা ভারতগবর্ন্মেণ্টের আসন্ন-দেউলিয়া বদ্‌নাম দূর করা কোন্ শ্রেণীর বাহাদুরী, বলা অনাবশ্যক।

পুরাতন আইনের বেআইনী অপব্যবহারের দ্বারা এবং নূতন বেআইনী আইন প্রণয়ন দ্বারা দেশের লোকদের উপর কত যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রবাসীর সমস্ত পাতাগুলাতেও কুলাইবে না। গান্ধীজি, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, লাজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতীলাল নেহ্‌রু, জবাহেরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, প্রভৃতি কত দেশনায়ক তথাকথিত বিচারের পর কারারুদ্ধ হইয়াছেন, কোন নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য নহে কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনে। বহুসংখ্যক জনসেবক বিনাবিচারে বন্দী হইয়া আছেন। রেডিংএর আমলে যত হাজার লোক কোন দুর্নীতির কাজ না করিয়াও জেলে গিয়াছে, আর কোন বড়লাটের আমলে তত যায় নাই। মোপ্‌লা বিদ্রোহ দমনার্থ অত্যাচার হইয়াছে। নিরপরাধ, প্রতিশোধসমর্থ অথচ স্বেচ্ছায় প্রতিশোধে পরাঙ্মুখ আকালী শত শত বীরকে কাপুরুষের মত নিষ্ঠুর প্রহার এবং জেলে অমানুষিক নির্য্যাতন, রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও তাহার ফলে তাহাদের অনেকের প্রায়োপবেশন: সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা নির্দ্দোষ লোকদের সম্পত্তি লুট, চরমনাইরের অত্যাচার, অনেক কংগ্রেস ও খিলাফৎ আফিস্ ও তৎসমুদয়ের কাগজপত্র ধ্বংস, জাতীয়

অনেক বিদ্যালয়ের উচ্ছেদ সাধন, ইত্যাদি আরও কত কি হইয়াছে, কত লিখিব ?

লর্ড রেডিঙের আমলে ভাল কিছুই হয় নাই বলিতেছি না। কোন কোন বিষয়ে ভাল কাজ কিছু হইয়াছে। কিন্তু অতি অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী রাজারাও অনেক সময় নিজেদের ক্ষমতা ও স্বার্থ-রক্ষার জন্য কিছু ভাল করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সুসভ্য ইংরেজের রাজত্বে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি যে কিছু ভাল কাজ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তাঁহার আমলে মূল ও প্রধান কোন বিষয়ে ভারতের কোন মঙ্গল, উন্নতি, অগ্রগতি সাধিত হয় নাই ; অনিষ্ট, করবৃদ্ধি, দমন, নিগ্রহ, জুলুম, অত্যাচার অনেক হইয়াছে।

—

হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু সংগঠন

হিন্দু মহাসভার গত অধিবেশনে অস্পৃশ্যতা বিষয়ক প্রস্তাব লইয়া খুব গোলমাল হইয়াছিল। বংশানুক্রমিক সংস্কার বর্জ্জন করা অতি কঠিন। এইজন্য যাঁহারা অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা ও প্রথা বজায় রাখিতে চান, তাঁহাদিগকে কটু কথা বলা অনুচিত তাহাতে কোন লাভও নাই। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, কোন মানুষই ঘৃণিত ও পদদলিত হইতে চায় না, এবং যে অপরকে অবজ্ঞা করে ও লাঞ্ছিত করে, তাহার নিজেরও অধোগতি হয়। হিন্দু নামে অভিহিত সকল শ্রেণীর ও জাতির লোক মনুষ্যোচিত সামাজিক অধিকার না পাইলে, যে হিন্দু সংগঠন মহাসভা করিতে চাহিতেছেন, তাহা কখনও সম্পূর্ণ হইবে না।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তাঁহারা এখন হইতে ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার না করিলে সংখ্যাবহুল অন্যজাতির হিন্দুদের হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া দিবার কোনই কারণ নাই। কারণ সংখ্যাবহুল যাঁহারা এবং ন্যায় ও যুক্তি যাঁহাদের পক্ষে, কালক্রমে তাঁহাদেরও শক্তিশালী হওয়া অনিবার্য্য।

হিন্দু মহাসভা নারীজাতিকে সমুদয় ন্যায্য অধিকার না দিলে সামাজিক নারীবিদ্রোহও অবশ্যম্ভাবী।

বাধ্য হইয়া কোন পরিবর্ত্তনে সম্মতি দেওয়ায় সম্মান বৃদ্ধি হয় না। সামাজিক বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আগেই ন্যায়ানুগত ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ।

—

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন প্রাচীনপন্থী স্বদেশপ্রেমিক লোক হারাইলেন। তিনি উদারচরিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার সক্রিয় যোগ ছিল। অনেক জমীদার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকেন। রায় যতীন্দ্রনাথের এবিষয়ে সৎসাহস ছিল।

—

"নারিকেল ঘৃত"

বিশুদ্ধ ঘৃত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ায় বাজারে চর্ব্বি ও নানাবিধ তৈলমিশ্রিত ঘৃত বিক্রী হয় ; "উদ্ভিজ্জ ঘৃত" (vegetable ghee) নামধারী নানা প্রকার জিনিষও বাজারে চলিতেছে। এই সমুদয় সামগ্রীতে স্বাস্থ্যহানিকর জিনিষ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু তাতা অয়েল্ মিল্স্ "কোকোজেম" নাম দিয়া যে নারিকেল-ঘৃত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কেবল পুষ্টিকর বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল হইতে প্রস্তুত, অথচ নারিকেল তৈলের কোন গন্ধ তাহাতে নাই। ইহা ঘৃত অপেক্ষা সস্তা, এবং রন্ধনের জন্য ব্যবহার করিলে কোন জিনিষের স্বাদ বা ঘ্রাণ বিকৃত হয় না।

—

এই মাসের প্রবাসী প্রকাশে বিঘ্ন

কলিকাতায় অশান্তি প্রযুক্ত প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যা যথাসময়ে বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবাসী কার্য্যালয়ের ও ছাপাখানার কর্ম্মচারীগণ, ছবির ব্লক-নির্ম্মাতাগণ এবং দপ্তরী, সকলে সময়ে অসময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

—

গত ষাণ্মাসিক সূচী

১৩৩২ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় মাসের প্রবাসীর সূচী প্রস্তুত আছে। উহা কোন কারণে বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত না দিয়া আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সহিত দেওয়া হইবে।
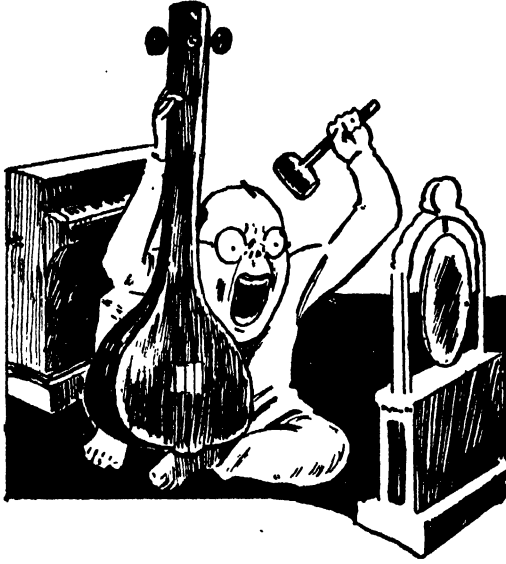
আবেদন পাকড়াশী

শ্রীভাব কুমার কাঞ্জিলাল লিখিত
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গুড় চিত্রিত

(ভূমিকা)

এই বৎসর কলিকাতায় যতগুলি বাঙ্গালী শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় কুড়িজনের নাম রাখা হইয়াছে আবেদন। অকস্মাৎ বাঙ্গালী-সমাজে এই নামটির প্রতি এইরূপ পক্ষপাতিত্বের যে সূচনা হইয়াছে তাহা যে অকারণ নহে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। গত দুই-তিন বৎসর যাবৎ বঙ্গসমাজের চোখের মণি, হৃদয়ের ধন, প্রাণের প্রাণ রূপে যিনি আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীআবেদন পাকড়াশির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপই বাঙ্গালী আজ তাঁহার নামে নিজ সন্তানের নাম রাখিয়া তাঁহার নাম বাঙ্গালাদেশে চিরধ্বনিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। বাঙ্গালার সকল পাঠশালা ও স্কুল খুঁজিয়া বেড়াইলেও দুই একটির অধিক রামমোহন, রামকৃষ্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র কিম্বা কেশবচন্দ্র পাওয়া যাইবে না; কিন্তু দুই চার বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালার স্কুলে স্কুলে বিভিন্ন 'আবেদন'দিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখিয়া পুরস্কার ও শাস্তি বিতরণ করা যে এক নিদারুণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে বীর-পূজার অদম্য তাড়নায় আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারের অর্দ্ধেক লোক আজ 'হনুমান' এবং উড়িষ্যার অর্দ্ধেকের অধিক 'জগন্নাথ' সেই বীর-পূজার আবেগই আজ আবার বাঙ্গালার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ও ঘরে ঘরে 'আবেদন' নামোচ্চারণের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। গঙ্গোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, সান্যাল ও মিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পিতুড়ি, নন্দন ও ভড় সকল প্রকারের 'আবেদনে'ই যে অচিরাৎ বাঙ্গালা পূর্ণ হইয়া উঠিবে এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে পুণ্যস্মৃতি ও মহাদ্যুতিমান্ অতিমানবের নাম কোন এক ভাগ্যবান্ জনকজননী সর্ব্বাগ্রে আবেদন রাখিয়াছিল তাঁহাকে মনে মনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কাহিনীর ভূমিকায় নিযুক্ত হই।

/০

আবেদনের পিতা নীলাম্বর পাকড়াশি-মহাশয় একদা আফিস হইতে গৃহে আসিবার পথে অকারণ পুরাতন

পুস্তকের দোকানে ঢুকিয়া সস্তায় ডারউইনের জগদ্‌বিখ্যাত "জীবজাতির উৎপত্তি"(Origin of Species)নামক পুস্তকখানি ক্রয় করেন। ঘরে পৌছিয়াই শুনিলেন, পত্নী একটি পুত্র-সন্তানের জননী হইয়াছেন। নীলাম্বর-বাবু ভাবিলেন, তাই ত, কখনো ত আমার পুস্তক ক্রয়ের ইচ্ছা হয় না। তবে আজই বা কেন এইরূপ ইচ্ছা হইল? ইহার কি তাহা হইলে কোন গূঢ় অর্থ আছে? ঈশ্বর কি আমায় এই অকারণ পুস্তক ক্রয়েচ্ছার ভিতর দিয়া গোপনে কোনো আদেশ জানাইতেছেন।

নীলাম্বর-বাবু সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া পুস্তকখানি পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া বুঝিলেন, মানুষের যে উন্নতি, তাহার যে ব্রহ্মের সহিত মিলনের পথে অনন্ত উদ্দাম গতি, তাহার সমস্তটিই ভবিষ্যতের বুকে নিহিত রহিয়াছে। অতীতে যে মানব বানর ছিল, ভবিষ্যতে সে হইবে দেবতা। যুগে-যুগে, পলে পলে নিত্য নূতন ব্যক্তির জন্ম ও জীবনের ভিতর দিয়া কোনো এক অজানা সৃজন শক্তি নিরবচ্ছিন্ন আবেগে আপন আত্ম-প্রকাশে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণতি কি, কোন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই বিশ্বশক্তি অগ্রসর হইতেছে তাহা অচিন্তনীয়। আমরা জানি শুধু আমরা এই ক্রমবিকাশ লীলা-উন্মত্ত সর্ব্বনিয়ন্তার ক্রীড়নক মাত্র। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে সম্মুখে চলিয়াছি, অতীত আমাদের পায়ের নীচে—অতীতের ধাপ বাহিয়া আমরা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছি। সন্তান যে, সে পিতার তুলনায় ব্রহ্মের নিকটতর।

সৃষ্টিশক্তি সন্তানের ভিতর দিয়া তাহার যে আবেদন (আকাঙ্ক্ষা), তাহা প্রকাশ করিতেছে। নীলাম্বর-বাবু শিহরিয়া উঠিয়া বুঝিলেন, যশোদা কেন কৃষ্ণের মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। আজ এই যে সন্তান তাঁহার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহার মধ্য দিয়া ভগবান্ আপনার আদর্শের আরও কতখানি প্রকাশ করিবেন তাহা কে বলিতে পারে? নীলাম্বর-বাবু একবার এই সন্তানের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

পাশের ঘরে সদ্যোজাত সন্তানের ক্রন্দনে নীলাম্বর-বাবুর চমক ভাঙিল। তিনি উঠিয়া পাশের ঘরে গমন করিলেন। কিছুকাল সন্তানের দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া নীলাম্বর-বাবু যখন তাহাকে ক্রোড়ে না লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তখন বৃদ্ধা ধাই কাত্যায়নী ওরফে কাতু "ওমা কি হ'ল গো" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বাহিরের দালানে দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল এবং গোলমাল করিয়া বাড়ীর অপরাপর লোকদিগকে আঁতুড়ঘরের দরজায় আনিয়া জড় করিল। নীলাম্বর-বাবু স্মিতহাস্যে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে, ব্যাপার কিছুই নহে, তাঁহার মস্তিষ্ক ঠিক পূর্ব্ববৎই আছে; শুধু তিনি ভগবানের আদেশেই অনন্তের আদর্শকণিকা এই শিশুকে ভক্তি-নিবেদন করিতেছেন। সবাই অবাক্! নীলাম্বর-বাবু সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই শিশুর মধ্যে যে সৃষ্টির আবেদন নিহিত রহিয়াছে, তাহার তুলনায় শঙ্করের দর্শন, গৌতম বুদ্ধের দিব্যবাণী, চৈতন্যের প্রেমের আহ্বান অতি নিম্নস্তরের ব্যাপার। নূতন যে আসিয়াছে সে ত অতীতের সকল সঞ্চিত উন্নতির আধার বটেই—তা ছাড়া তাহার ভিতর রহিয়াছে অনন্তের আলোক, ঝরণার পুণ্যনীরের আর-এক অঞ্জলি। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানব ভগবানের চরণে তমসো মা জ্যোতির্গময় বলিয়া যে প্রার্থনা জানাইয়াছে বর্ষে বর্ষে নিত্য-নূতন শিশুর জন্মের ভিতর দিয়া ভগবান্ মানুষকে সেই প্রার্থিত পূর্ণজ্যোতি এক-এক রশ্মি করিয়া দান করিতেছেন। নীলাম্বর-বাবুর মুখ হৃদয়ের আবেগে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সকলে তন্ময় হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। তিনি সম্ভবত আরো অনেকক্ষণ সমান তোড়ে কথা বলিয়া যাইতেন; কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা পিসিমাতা এইসব শুনিয়া হঠাৎ হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তা'র পর তীর-বেগে ছুটিয়া পাশের ঘর হইতে একটা শাঁখ আনিয়া জোরে জোরে বাজাইতে লাগিলেন ও অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে উলু দিবার জন্য দম লইবার ফাঁকে-ফাঁকে আদেশ করিতে লাগিলেন।

(সশব্দে)

"ওরে, ঘরে দেবতা এসেছেন, উলু দে, উলু দে!"

"ও খেঁদীর মা, শাঁখটা বাজানা মা, বুকে যে আর জোর নেই।"

সন্তানপূজা

(রাগত)

"ওরে পোড়াকপালে দরোয়ান মিন্‌সে গেল কোথায় ? ডোমপাড়া থেকে একটা শানাই আন্‌তে যাক্‌ না।"

(আবেগভরে)

"ও নীলু, তুই কি পুণ্যি করেছিলি রে !"

(ফুঁপাইয়া)

"দাদা, দাদা, তুমি দেখে যেতে পার্‌লে না !"

(হাঁপাইয়া)

"উঃ ওরে, ওমা খেঁদী একটা মোড়া এনে দে না, আর ত পারি না।"

পিসিমা একাই নানান্ আবেগের ঐক্যতানে আঁতুড়ঘর এমন সরগরম করিয়া তুলিলেন যে, স্বয়ং নীলাম্বর-বাবুও মিনিট পনের ডারউইন ও ক্রমবিকাশ ভুলিয়া "থ" অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রহিলেন। তা'র পর দুই দিন ধরিয়া বাড়ীতে পাড়ার লোকের ভীড়ে ইঁদুর-বিড়ালেরও স্থান রহিল না। নীলাম্বর-বাবুর পিসিমা সর্ব্বত্র রটাইয়া দিলেন যে,"আমাদের নীলু"কে স্বয়ং মা দশভুজা স্বপ্ন দিয়াছেন যে তাহার বাড়ীতে এক অবতারের আবির্ভাব হইবে। ফলে গিনি, হাফগিনি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুলি ও কিং এডওয়ার্ডের দুয়ানি অবধি সকল-প্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় নবজাত শিশুর তক্তপোষের পাদদেশ ভরিয়া উঠিল।

৵০

নীলাম্বর-বাবু আফিসের ডেস্‌প্যাচ ক্লার্ক ধরণীনাথের সহিত পুত্রের নামকরণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া তাহার নাম রাখিলেন আবেদন। ধরণীনাথ বলিল, সে অনেক নামে অদ্যাবধি চিঠিপত্র প্যাকেট ইত্যাদি পাঠাইয়াছে, কিন্তু আবেদন নামটি কখনো তাহার চোখে পড়ে নাই। সৃষ্ট জগতের আবেদন শিশুর জীবনের ভিতর দিয়া প্রস্ফুট হইয়া উঠিবে বলিয়াই নীলাম্বর-বাবু এই নামটি নির্দ্ধারিত করিলেন।

আবেদন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। চারিপাশে তা'র পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া দূর সম্পর্কের কাকা মামা ও মাসীরা তাহাকে একাধারে পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া তাহার মনোভাব চাকরীতে সদ্যো-নিযুক্ত ইংরেজ ছোকরা-সিভিলিয়ানের সমতুল্য করিয়া তুলিল। ভবিষ্যতে সে কমিশনার বা গভর্ণর হইবে, এই কথা স্মৃতিতে চিরজাগ্রত রাখিয়া যেমন বৃদ্ধ ডেপুটি ও সাব্ ডেপুটিগণ ছোকরা-সিভিলিয়ানের সকল দোষত্রুটি ও ধৃষ্টতাকে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে গুণ ও অমায়িকতা বলিয়া ভ্রম করে, আবেদনের সকল অন্যায় আবদার ও অশোভন ব্যবহার তেম্নি তাহার গুরুজনদিগের স্নেহ ও ভক্তিকাতর চক্ষে সরলতা নামে অভিহিত হইয়া আবেদনকে বাচালতা ও অশিষ্টতার ক্রমবিকাশ-মার্গে দ্রুত অগ্রগামী করিয়া তুলিল।

নীলাম্বর-বাবু কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন যে, প্রাচ্যের কোনো এক মহাশক্তিশালী জাতির লোকেরা পূর্ব্বপুরুষের পূজা করে। তিনি ডারউইনের কেতাবখানি পাঠ করিবার পরে স্থির করিয়াছিলেন যে, নির্বুদ্ধিতার ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট উদাহরণ আর পাওয়া সম্ভব নহে। যে পূর্ব্বপুরুষ-গণের অন্বেষণে অধিকদূর যাইলে বৃক্ষে আরোহণ করিতে হয় সেই পূর্ব্বপুরুষের পূজা! হায় মূঢ় নর! এতকাল কি নিদারুণ অজ্ঞানতার মধ্যেই ডুবিয়া ছিলে! নীলাম্বরবাবু বলিলেন "মানুষকেই যদি পূজা করিবে তবে যাহার মধ্যে ভগবানের ছায়া গাঢ়তম হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে পূজা কর।" তিনি আবেদনের জন্মের তিন চার মাস পর হইতেই গৃহে নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া "সন্তান-পূজা" করিতে লাগিলেন। শিশু অবস্থায় আবেদন পিঁড়িতে শায়িতভাবে পূজা গ্রহণ করিত, পরে তাহাকে একখানা আবলুশ কাষ্ঠের চৌকিতে বসাইয়া পূজা করা হইত। সে ফুল আলো শাঁখ ও ঘণ্টা যতটা পছন্দ করিত, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পছন্দ করিত নিজের ভোগটি। আবেদনের প্রসাদ অনেক সময় পিঁপিড়ার পক্ষেও যথেষ্ট হইত না।

এইরূপে আবদার ও পূজা পাইয়া সন্তান-দেবতা আবেদন ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল। দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সে শিশু-অবস্থা হইতেই নির্ব্বিকার-চিত্তে ছোটবড়নির্ব্বিশেষে সকলকে সর্ব্বপ্রকার উপদেশ দিতে পারিত। খৃষ্টীয়ানদিগের ভগবান্ যখন অনন্ত অন্ধকারে বসিয়া-বসিয়া হায়রান্ হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আলো হউক" তখন যেমন তাঁহার চিত্তে এরূপ কোন সন্দেহ জাগে নাই যে, তাঁহার অভ্রান্তবাণীতে আলো না হইয়া একটি ঊর্দ্ধ-লাঙ্গুল গো-বৎসও হইতে পারে; আবেদনও তেম্নি যখনই কিছু উচ্চারণ করিত তখন কদাপি তাহার নিজের মত বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটিতে পারে এরূপ কল্পনাও করিতে পারিত না। সেই যে সে সকল মতামত ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার একমাত্র নিয়ন্তা এই ধারণা আবেদনের অন্তরে দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল। আবেদন বাড়িতে লাগিল।

জিনের কোটের উপর অশ্বতরের ক্ষুরের একটি ছাপ—

৶০

আবেদনের যখন আট বৎসর পাঁচমাস বয়স সেই সময় একদিন সন্তান-পূজা-নিযুক্ত অবস্থায় নীলাম্বরবাবু জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন ভুগিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুসরণ করিলেন। এই ঘটনার ফলে সকল বিষয়েই একটা বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল। আবেদনের এক কাকা বিলাত-প্রত্যাগত ও কুসংস্কার-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি এতদিন নীলাম্বরবাবুর কার্য্যকলাপ দেখিয়া শুধু দূর হইতে নাক সিঁট্‌কাইতেন। আজ নীলাম্বরবাবুর মৃত্যুতে তিনি যেন একটা উঁচুদরের সুবিধা পাইয়া গেলেন। তিনি নীলাম্বরবাবুদের বাড়ীতে আসিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান সুরু করিলেন। আবেদন প্রথম দিনই তাঁহাকে বলিল, "তুমি যে ভারি। আমায় প্রণাম করলে না?"

কাকা বিষাক্তকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার পূজা ভাল ক'রে করব ব'লে একটা চাবুক আনতে পাঠিয়েছি"।

আবেদন বলিল, "চাবুক কা'কে বলে?"

কাকা তাহাকে বলিলেন, যে, সে এক-প্রকার জিনিস যাহার স্বাদ একবার পাইলে আর কখনো ভুলা যায় না। এতদিন আবেদনের অক্ষরপরিচয়ও হয় নাই। কাকা তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য লইয়া যাইবেন বলায়

আবেদন বলিল, "লেখাপড়া ত যারা চাকরী করে তা'রা করে; আমি কেন লেখাপড়া করতে যাব?"

কাকা তাহাকে কানে ধরিয়া হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

অতঃপর কিছুকাল আবেদন স্কুলের সহপাঠিদিগের নিকট প্রহার ও মাষ্টারদের কাছে তাড়া খাইয়া সন্তান-দেবতা ভাব কথঞ্চিৎ ভুলিবার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু শিশুকালে যে ভাব মনের উপর গভীর হইয়া একবার বসিয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসৃত কোন কালেও হয় না। আবেদন আগের ন্যায় আর আজকাল সকল কথায় কথা বলিত না বটে, কিন্তু যখন কথা বলিত তখন তাহার প্রতি অক্ষরে বড়লাট ও তারকেশ্বরের মোহন্ত-মিশ্রিত একটা ভাব পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিত। এইরূপে আবেদন স্কুলজীবন অতিবাহন করিয়া সংসারযাত্রার সেই চৌরাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল যেখানে দাঁড়াইয়া মানুষ স্থির করে সে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, হাতুড়ে, লেখক, নিষ্কর্ম্মা, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, ধর্ম্মপ্রচারক, সেয়ারের দালাল, প্রফেসর, আই সি-এস্, মোটর ড্রাইভার, অর্ডারসাপ্লায়ার, স্বরাজিষ্ট্ ইত্যাদি নানা প্রকার জীবের মধ্যে কোন্ যূথের অনুসরণ করিবে।

কাকা বলিলেন, আবেদনের যেরকম উৎকৃষ্ট-ধরণের মগজ, তাহাতে তাহার লেখাপড়ার দিকে না যাইয়া কোনো হাতের কাজে মনোনিবেশ করা উচিত। পিসিমা বলিলেন, "ও এল্-এ পাশ দিয়ে ওকালতি করুক। ও পরে ঠিক ডেপুটি হবেই হবে।" জ্যাঠা বলিলেন, "দিদি তুমি যা বোঝ না সে-বিষয়ে কথা বলো কেন? ওরকম ক'রে ডেপুটি মহাভারতে নকুল-সহদেব হয়েছিল শুনেছি, আজকাল ওরকম হয় না। দেখ, আবেদনকে তা'র চেয়ে ডাক্তারি পড়াও।" কাকার আপত্তি সত্ত্বেও আবেদন ডাক্তারী পড়িবে ঠিক করিয়া আই-এস্-সি, পড়িতে আরম্ভ করিল। তবে দুই বৎসর পরে যখন তা'র নাম পাশ-লিষ্টে রেজিষ্ট্রারের সহির অতি নিকটেই দেখা গেল তখন সকলে তাহার ডাক্তার হওয়ার আশা ত্যাগ করিয়া তাহাকে ভেটেরিনারী কলেজে গরু-ঘোড়ার চিকিৎসক হইতে পাঠাইলেন। কাকা বলিলেন, যাহার যে-জাতীয় জীবের সহিত সাদৃশ্য ও সহানুভূতি অধিক তাহার পক্ষে সে জাতীয় জীবের সহিত কারবার করাই শ্রেয়।

।০

আবেদনের মাতামহ বড় পাখোয়াজী ও গাইয়ে ছিলেন। আবেদনের জীবনে বংশানুক্রমিতার জন্য সঙ্গীত ও নিজ প্রতিষ্ঠালব্ধগুণে হোমিওপ্যাথি, এই দুইটি জিনিসের বিশেষ প্রভাব তাহার বাল্যকাল হইতেই দৃষ্ট হয়। জনন-বিজ্ঞানে বলে যে বংশানুক্রমিক গুণাগুণ এক পুরুষ ছাড়িয়া তৃতীয় পুরুষেই অধিক প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে এই ধারণার নির্ভুলতা প্রমাণ হইয়াছিল। অতি বাল্যকাল হইতেই আবেদন সকল আবদার ও ক্রন্দন সুর করিয়া করিত। যথা সে ভাত খাইবার সময় হইলে চীৎকার করিত

॥	॥ ১ A	॥	॥ + A	॥	॥ ৩	⩶
র	গ	র	গ	র	গ	র
আ	মি	ভা	ত	খা	বব......	

তাহার পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সে "ওরে নীল আকাশের পাখী; আমার খাঁচায় আস্‌বি না কি" বলিয়া একটা গান বাঁধিয়া সকাল হইতে রাত্রি অবধি গাহিত। এই গানের সুরটাকে রামকেলি-মিশ্রিত বেহাগ বলিলে ভুল হইবে না। তাহার এত অল্প বয়সে এরূপ সুরসিদ্ধতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। অতি অল্প বয়সে একবার ভুল করিয়া হোমিওপ্যাথিক গ্লো-বিউল এক মুঠা খাইবার পর হইতেই হোমিও-প্যাথির প্রতি আবেদনের একটা বিশেষ ভালবাসার সূচনা হয়। এই ভাব ক্রমে বাড়িয়া তাহাকে বাল্যে গোঁড়া হোমিওপ্যাথি-ভক্ত করিয়া তুলে। এমন-কি, সে হাতপা কোথাও কাটিয়া-কুটিয়া গেলে কদাপি আর্ণিকা ছাড়িয়া টিংচার আইয়োডিন ক্ষত স্থানে লাগাইতে দিত না। স্কুলে পাঠের সময়েও সে পাঠ্য ও অপাঠ্য জাতীয় সকল পুস্তক ফেলিয়া চিলে কোঠায় বসিয়া "সরল হোমিওপ্যাথিক শিক্ষায়" মনোনিবেশ করিত। আবেদন যে সময়ে ভেটেরিনারি কলেজে ভর্ত্তি হইল সে-সময়ে তাহার হোমিওপ্যাথি-প্রীতি বিশেষ গভীরতা লাভ করিয়াছিল।

।৵০

কিছুকাল ভেটেরিনারি কলেজে পাঠের পরে আবেদনের অন্তরে একটা দারুণ সমস্যা ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। তাহার আজন্ম-সঞ্চিত জ্ঞানে আবেদন বুঝিয়াছিল যে, অ্যালোপ্যাথি মতে চিকিৎসা ও ঈশ্বরের সযত্নে সৃষ্ট প্রাণিগণকে বিষ পান করান একই কথা। তাহা ব্যতীত সার্জ্জারির উগ্রস্বভাব তাহার কোমল প্রাণে বড়ই অসহ্য ঠেকিত। কিন্তু ঘোড়ার হাঁসপাতালে সবই অ্যালোপ্যাথি ও সার্জ্জারি; কথায় কথায় বিষবৎ ঔষধ-প্রয়োগ ও ছুরিকাঁচি সঞ্চালন। বেচারা অবলা জীবজন্তুদিগের প্রতি এ অবিচার ও অত্যাচার দেখিয়া আবেদনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

একদিন সে দেখিল, একটা অশ্বতরের ক্ষুর কাটিয়া চাঁছিয়া কি যেন করা হইতেছে। সেখানে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ উপস্থিত ছিলেন না। আবেদন বলিল, "আরে, কেন শুধু শুধু জানোয়ারটাকে কষ্ট দিচ্ছ; একটু থুজা থার্টি লাগিয়ে দাও, আর এক ডোজ ঘাসের সঙ্গে মেখে খাইয়ে দাও, ব্যাস্, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

তাহার মুখের আত্মবিশ্বাসপর ভাব দেখিয়া অল্পবেতনভোগী নিরক্ষর যে লোকটি অশ্বতরের চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিল সে অবাক্ হইয়া বলিল, "সে কিরকম ওস্থদ্ মসাই? তাও আবার হয় নাকি? কই, দিন ত দেখি, কেমন খুব ঠিক হ'য়ে যায়।"

আবেদন তাড়াতাড়ি বাইসিকল্ চড়িয়া নিকটবর্ত্তী এক হোমিওপ্যাথিক দোকান হইতে ঔষধটি আনিয়া দিল। খাওয়ান হইল। ক্ষুরে লাগাইবার সময় লোকটি আবেদনকে বলিল, "নিন মসাই আপনার ওস্থদ আপনিই লাগান। সেসে বল্‌বেন লাগাবার ভুলের জন্যে ব্যায়রাম সার্‌ল না।" আবেদন অগত্যা অশ্বতরের নিকটে গিয়া তাহার ক্ষুরে থুজা থার্টি ঘসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু হঠাৎ কি হইল বলা যায় না, কার দোষে হইল তাহাও বলা যায় না, দেখা গেল পায়ের বাঁধন চামড়ার ষ্ট্রাপটি পা হইতে খুলিয়া ফেলিয়া অশ্বতরটি সবেগে আবেদনের প্রতি পদসঞ্চালন করিল। আবেদন তীব্রবেগে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য থুজার শিশি মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া তির্য্যক্‌গতিতে পলায়নপর হইল বটে, কিন্তু তাহার পৃষ্ঠে জিনের কোটের উপর অশ্বতরের খুরের একটা ছাপ, একটা মাঝারী গোছের পতন ও তজ্জাত কয়েকদিনস্থায়ী গাত্রবেদনা হইতে সে নিজকে বাঁচাইতে পারিল না।

এই ঘটনার পর হইতে কলেজে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। সে সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইল, কলেজের প্রিন্সিপাল তাহাকে ডাকাইয়া এবিষয়ের জন্য তিরস্কারও করিলেন, কিন্তু আবেদনের নিজের হোমিওপ্যাথির প্রতি বিশ্বাস ইহাতে টলিল না।

তা'র পর কিছুকাল আবেদন বিবেকের দংশন সহ্য করিয়াও চুপচাপ রহিল; কিন্তু যেদিন আসন্ন-বাছুর একটি রুগ্ন গাভী করুণনেত্রে তাহার দিকে তাকাইল, সেদিন সে নিজের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সকল কথা ভুলিয়া গাভীটিকে খড়ের সহিত এক ডোজ পাল্‌সেটিলা সিক্স্-এক্স্ দিয়া ফেলিল। ঘটনাচক্রে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী সেই দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আবেদনকে এদিক্-ওদিক্ তাকাইতে দেখিয়া তাহাকে জেরা করিয়া ঔষধ দেওয়ার কথা বাহির করিয়া ফেলিলেন। আবেদনের নামে রিপোর্ট্ হইল—আবেদন গরু-ঘোড়ার হাঁসপাতাল হইতে বিতাড়িত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

।৶০

দিন-কতক আবেদন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিল। হোমিওপ্যাথির জন্য জগতের নিকট এইরূপ অবিচার পাইয়া ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহার মনটি বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে হোমিওপ্যাথির ফ্যামিলি বক্স্ ও পুস্তকাদি একটা ভাঙ্গা টেবিলের দেরাজে বন্ধ রাখিয়া তাহার জীবনের অপর অবলম্বন সঙ্গীতের উন্মাদিনী সুরতরঙ্গে সকল-কিছু ভুলিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সে সঙ্গীতকে অন্তরের বেদনা ব্যক্ত করিবার শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া বুঝিয়াছিল। তাই তা'র হোমিওপ্যাথির জন্য আত্মবলিদানের ব্যথা আজ সে ভৈরবী ও যোগিয়ার সকরুণ মূর্চ্ছনায় ভোরের পাখীর সঙ্গে-সঙ্গেই একতানে ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করিল। সেই একই বেদনার উচ্ছ্বাস আবার শুনা

যাইত গভীর নিশীথে চন্দ্রিকাচকিত তিনতালার ছাদে নিদ্রাহীন আবেদনের আবেগক্লিষ্ট কণ্ঠের বেহাগ-নিনাদে। সেই কম্পমান কড়ি-মধ্যমের ঢেউ জ্যোৎস্নাসিক্ত পবন-হিল্লোলে বাহিত হইয়া যখন অর্দ্ধসুপ্ত প্রতিবেশীদিগের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিত, তখন তাহারা যাহা বলিত তাহা এ কাহিনীর অন্তর্গত নহে।

ছয়মাস ২২৲ টাকা মূল্যের একটি হারমোনিয়াম্ ও মাতামহের আমলের একটি তানপুরাকে প্রতিবেশীদিগের সহিত সমবেদনায় কাঁদাইয়া আবেদন অবশেষে তাহার কাকাকেও সজাগ করিয়া তুলিল। তিনি বল্লিলেন, "ছোঁড়াকে চাব্‌কিয়ে আমি সিধে করব।" কিন্তু কার্য্যের বেলা দেখা গেল, আবেদনের মাতা, পিসিমাতা, ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি আবেদনকে আমেরিকায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। আমেরিকা হোমিওপ্যাথির তীর্থস্থান। ছেলেটির যখন হোমিওপ্যাথির দিকেই এতটা টান রহিয়াছে, তখন না হয় ও হোমিওপ্যাথিই শিক্ষা করুক। আবেদন অতঃপর একদিন দুইটি চাঁদনীর "হাল ফ্যাসনের" সুট এবং একটি গোলাপী রঙের পাগ্‌ড়ি লইয়া আমেরিকার পথের পথিক হইল, সঙ্গে লইল সে তা'র তানপুরাটি।

।৶০

নিউইয়র্কের এক হোমিওপ্যাথিক কলেজের পুরাতন খাতাপত্র ঘাঁটিলে এখনও আবেদনের নাম পাওয়া যাইবে। সেখানে সে বেশী দিন ছিল না, কিন্তু এখনও কলেজের কেহ কেহ তাহার নাম করিলে সহাস্যমুখে তাহার কথা স্মরণ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। যেদিন সে প্রথম গোলাপী পাগ্‌ড়িটি পরিধান করিয়া কলেজে যায়,সেই দিন হইতে কলেজের সকলে তাহাকে দেখিলেই অকারণে মুচ্‌কি হাসি হাসিত। ইহাতে আবেদন মনে বড় ব্যথা পাইল। সে হোমিওপ্যাথির জন্য সব সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু অপরে যে তাহাকে লইয়া অযথা তামাসা করিবে, ইহা তাহার পক্ষে সহ্য করা একটু দুরূহ হইয়া দাঁড়াইল। কলেজের একটা ক্লাবের সেক্রেটারী তাহাকে একদিন বলিল, "মিষ্টার পাকড়াশী, তুমি একদিন আমাদের ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে কিছু বলো না?"

আবেদন বলিল, "আমি আর কি বল্‌তে পারি বলো না? কোনো বিশেষ বিষয় বল্‌লে চেষ্টা কর্‌তে পারি।"

ইয়াঙ্কি ছোকরাটি বলিল, "এই ভারতীয় সঙ্গীত ও হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধেই কিছু বলো।"

আবেদন বলিল যে, সে চেষ্টা করিবে। সেদিন বাসায় ফিরিয়া আবেদন অনেক চিন্তা করিল, এবিষয়ে কি বলা যায়। অনেক ভাবিয়া সে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। পরদিন কলেজে গিয়া সে ক্লাবের সেক্রেটারীকে বলিল, "আচ্ছা, তুমি যে বিষয়ের নাম করেছ, সেই বিষয়েই আমি কিছু বল্‌ব।" যেদিন বিকালবেলা আবেদনের বলিবার কথা সেদিন সে কলেজে যাইবার পূর্ব্বে দেশ হইতে আনীত একখানা সঙ্গীত সংক্রান্ত পুস্তক হইতে অনেক-কিছু একটা কাগজে টুকিয়া লইল। কলেজেও সে কাগজখানা বাহির করিয়া মধ্যে-মধ্যে পড়িয়া লইতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা সকলে একজোট হইলে পর আবেদনকে তা'র বক্তৃতা দিবার জন্য একটা বড় টেবিলের উপর সকলে উঠাইয়া দিল। আবেদন যাহা বলিল, বাংলা ভাষায় তাহার সারমর্ম্ম এই:—

"সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই সঙ্গীতের আরম্ভ। প্রথমে ছিল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড প্রবাহের শব্দহীন তরঙ্গ-সংঘাতের অশব্দ সঙ্গীত। তা'র পর সৃষ্টির বস্তু-ঝঞ্ঝার উন্মত্ত আলাপ। তা'র পর এসেছিল নানান প্রাণীর জয়-পরাজয়; আনন্দ-বেদনার নিনাদ। সর্ব্বশেষে এসেছিল মানুষ, আর এসেছিল তার কণ্ঠনিঃসৃত মনোভাবের অভি-ব্যক্তি। এই যে নাদ বা স্বর ভাবব্যঞ্জক শব্দ ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করে। আমাদের শাস্ত্রে বলে—

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবম্।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী স্বয়ং হরিঃ॥

অর্থাৎ নাদ বিনা জ্ঞান ও মঙ্গল অসম্ভব, নাদের মধ্যেই পরজ্যোতি ও হরিরূপ প্রকাশ পাইতেছে। সৃষ্টির অসংখ্য শব্দের মধ্যে সকলই নাদ নহে। মাত্র তেরটি শব্দই নাদ বা স্বর। উহা সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি ও উহাদের কড়ি ও কোমল ছয়টি। এই তেরটি স্বরের

কাঁধে করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল ও গাহিতে লাগিল, "Bong, Bong, Bong"

ভিতর দিয়াই সৃষ্টিশক্তি আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। ইহাদের এক-একটি করিয়া লইলে ইহারা এক-একটি ভাব প্রকাশ করে। এক-একটিকে প্রাধান্য দিয়া অপরগুলি দিয়া তাহাকে হাল্কা বা ডাইলিউট (dilute) করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন রাগ-রাগিণী রচিত হয়। হোমিওপ্যাথিতে যেরূপ মাদার টিংচার যত অধিক ডাইলিউট করা যায়, ততই তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়; সঙ্গীতে সেইরূপ যে রাগ-রাগিণীতে মূল বা প্রধান বা বাদী স্বরের সহিত অন্য স্বরের মিশ্রণ যত অধিক দেখা যায়, তাহা তত ভাব-উদ্দীপনায় শক্তিশালী। এইরূপে অধিক স্বরবর্জ্জিত রাগরাগিণী অল্প স্বরবর্জ্জিত বা সম্পূর্ণ রাগ-রাগিণী অপেক্ষা অল্পশক্তিশালী; কিন্তু হোমিওপ্যাথির লোয়ার ডাইলিউশনের ন্যায় তাহাদের ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতা দ্রুত কার্য্য-করী। যথা যোগিয়া ও বঙ্গালী নামক রাগিণীদ্বয়ের মূল স্বর একই। কিন্তু বঙ্গালীতে মা ও নি ব্যবহার না হওয়াতে উহার মিশ্রণ বা ডাইলিউশন অল্প। সুতরাং মনের ভাব প্রকাশে যোগিয়া ও বঙ্গালী একইরূপে উপযোগী। যোগিয়াতে উহা সময়-সাপেক্ষ, কিন্তু গভীর; বঙ্গালীতে উহা শীঘ্র হয়, কিন্তু যোগিয়ার ন্যায় গভীররূপে হয় না।"

ইয়াঙ্কিরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "Give us a Yogi! Give us a Yogi!" (একটা যোগী গাও! একটা যোগী গাও!)

আর একদল ভীষণ টেবিল চাপড়াইয়া গাহিয়া উঠিল, Bong, Bong, Bong, (বং বং বং), give us a song! (একটা গান গাও)।

আবেদন আকুলকণ্ঠে বলিল, "আরও বল্‌বার আছে, থামো। রাগ-রাগিণীর ডাইলিউশন-সম্বন্ধে আরও আছে, একটু গোলমাল থামাও!"

কিন্তু কেইবা কার কথা শুনিবে? সকলে আবেদনকে কাঁধে করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল ও গাহিতে লাগিল, "Bong, Bong, Bong."

ইয়াঙ্কিরা হুজুগ করিতে আসিয়াছিল; হুজুগ করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু আবেদন মর্ম্মাহত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আর তিন দিন কলেজে গেল না। তা'র পর

একদিন সে নিউ ইয়র্কের হাওয়া অসহ্য দেখিয়া কালিফোর্নিয়ার টিকিট কিনিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিউইয়র্কে হোমিওপ্যাথির ছাত্রদের লঘুচিত্তের পরিচয় পাইয়া আবেদন আমেরিকা-সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালিফোর্নিয়ায় যখন সে পৌঁছাইবার দুই ঘণ্টার মধ্যে একটা সিনেমা কোম্পানীতে ভারতীয় হাবভাব শিখাইবার কাজ পাইয়া গেল, তখন তা'র মনের হারানো শান্তি কতকটা ফিরিয়া আসিল। সে, সিনেমার কার্‌খানায় যে-সকল লোক ভারতীয় কোনো ভূমিকায় অভিনয় করিত, তাহাদের পোষাক ও হাবভাব ঠিক হইত কি না দেখিত।

সিনেমার 'ষ্টার', শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর নাম ছিল, মাদমোয়াজেল ফিফি। তাঁর চেহারাটা দোহারা ও বয়স ২১ হইতে ৫২র মধ্যে কিছু-একটা। তিনি আবেদনকে দেখিয়া ও তাহার নিকট ভারতীয় দর্শন, বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা, অসহযোগ আন্দোলন, অহিংসা, ভারতীয় নাট্যকলার আদর্শ ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক বহুমূল্য কথা শুনিয়া তাহাকে বড়ই পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রণয়ের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন, ইহা ঠিক তাহা নহে। আবেদনের মতে ইহার ভিতর ছিল প্লেটোর নিস্পৃহতার আদর্শ, আর ছিল দুইটি জিজ্ঞাসু আত্মার পরস্পর-পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা।—আবেদন ফিফিকে ভারতীয় রাজকন্যা সাজাইয়া একটি সতীদাহ ও জ্বলন্ত প্রেমের দুঃসাহস-সংক্রান্ত নাটিকা "রিলিজ" (প্রকাশ) করায়, তাহাতে নায়িকা মোটরকার ও এয়ারোপ্লেন যোগে কলিকাতায় কেওড়াতলার ঘাট হইতে রাজা রামমোহন রায়ের পরিচিত বন্ধু এক কাশ্মীরী রাজপুত্রের সহিত সমস্ত পথ অশ্বারোহী সৈনিকদিগের দ্বারা অনুসৃত হইয়া শ্রীনগরে পলায়ন করিলেও উক্ত সিনেমা-চিত্র চিকাগো বুষ্টার নামক সংবাদপত্রে প্রশংসিত হইয়াছিল। সেই কাগজেই ঐ উপলক্ষে আবেদনের একটি ছবি বাহির হয়; তাহাতে তাহাকে ভারতীয় নাট্যকার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, গায়ক ইত্যাদি নানা আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

এইরূপ আরও কয়েকটা ছবি প্রস্তুত করাইতে পারিলেই আমেরিকায় আবেদন প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিত। তাহাকে অনেকে তখনই স্বামীজি বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এমন সময় আর-একটি দুর্ঘটনার ফলে আবেদনকে কালিফোর্ণিয়া ত্যাগ করিতে হইল। আবেদন এই সময় আর-একটি চিত্রনাটিকা লইয়া ব্যস্ত ছিল। একজন ইয়াঙ্কি কলিকাতার ঠন্‌ঠনিয়া কালীবাড়ীর কালীর গহনাপত্রের মধ্য হইতে একটি নারিকেলের সমান বৃহৎ হীরক অপহরণ করে। তাহার ফলে দুই জন দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসী তাহাকে জাহাজের খালাসী সাজিয়া নিউইয়র্ক অবধি অনুসরণ করে ও শেষ অবধি তেরজন স্ত্রীলোক ও আঠারজন পুরুষের জীবন বিপন্ন করিয়া হিপনটিজ্‌মের সাহায্যে হীরকটি পুনরুদ্ধার করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসে। এই ঘটনাটি লইয়াই নাটিকাটি রচিত। যেদিন শ্রীমতী ফিফি হীরক-চোর ইয়াঙ্কির সহযোগিনীরূপে জৈন সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া বহুঘণ্টা চিত্রে ছটফট করিবেন সেই দিন চিত্র উঠাইবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁর নিদারুণ মাথা ধরিল! তিনি অ্যাস্‌পিরিন খাইয়া শুইয়া থাকিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁর দেখা হইল আবেদনের সহিত। আবেদন ব্যাপার কি শুনিয়াই বলিল, "আরে করছ কি? ওতে কিছু হবে না। তুমি এক ডোজ নক্স ভমিকা সিক্স খেয়ে শুয়ে থাকো, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" ফিফি তা'র কথায় নক্স ভমিকা সেবন করিয়া শুইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁর মাথা-ধরা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। সব বন্দোবস্ত ঠিক, এক্‌ট্রা লোকেরা ষ্টেজে আসিয়াছে। ম্যানেজার ব্যস্তসমস্ত হইয়া ফিফির খোঁজ করিতে পাঠাইলেন। ফিফির তখন নড়িবারও শক্তি নাই। সেদিন ছবি তোলা হইল না এবং তাহাতে ফিফির কিছু আর্থিক ক্ষতি হইল। ইহাতে ফিফির সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল আবেদনের উপর। তিনি আবেদনকে একটা প্রকাশ্যস্থলে নির্ব্বোধ ও হাতুড়ে বলিয়া খুব গালি দিয়া দিলেন। আবেদন পুনর্ব্বার হোমিওপ্যাথির জন্য লাঞ্ছিত হইয়া শোকে আজ আত্মহারা হইয়া উঠিল। সে সিনেমার কার্য্যে তখনি ইস্তফা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার আর কালিফোর্ণিয়ায় থাকিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা রহিল না। সে সেইদিনই কোথাও চলিয়া যাইত; কিন্তু

তু মিনিত্ কিওস্

যাইবেই বা কোথায় ? তাহা ব্যতীত কয়েক দিন হইতেই তাহার বুড়ো আঙ্গুলে একটা ভীষণ ব্যথাও হইয়াছিল। তাহাতেও সে বিশেষ কাবু ছিল।

আঙ্গুলে আঙ্গুলহাড়া লইয়া আবেদন একাকী কালিফোর্ণিয়ার এক নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া আছে। ভীষণ টন্‌টনে ব্যথা। যাতনায় বেচারার মুখখানা নীল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কিছু না বলিয়া সে একমনে দূরের কতকগুলি গাছপালার দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিতেছে কেন সে এই নিজদেশে হতাদর হোমিওপ্যাথির জন্ম এত কষ্ট করিল। তা'র আঙ্গুলটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। মনে হইল, বেলাডোনা থার্টি। কিন্তু না, আর এ-জীবনে হোমিওপ্যাথির সে ছায়াও মাড়াইবে না। এমন সময় পিছন হইতে মজার গলায় কে বলিল, "হিন্দু ম্যান ভেলি সলি ?" (হিন্দু মানুষ অতিশয় দুঃখিত ?)

আবেদন কপালকুণ্ডলার আহ্বানে সচকিত নবকুমারের ন্যায় চম্‌কিয়া উঠিয়া দেখিল একজন চীনা তাহাকে সম্বোধন করিতেছে। অল্প আলাপেই লাং চি ফং বুঝিয়া ফেলিল যে আবেদন আমেরিকায় কুব্যবহার পাইয়া

মর্ম্মাহত ও আঙ্গুলে তাহার আঙ্গুলহাড়া হইয়াছে। লাং চি ফং বলিল, "মি দক্‌তল্ গিব মেদিসিন" (আমি ডাক্তার ঔষধ দিব)।

আবেদন তাহার সহিত চলিল। কিছুদূর গিয়া লাং চি ফং চীনা ভাষায় আনন্দজ্ঞাপক একটা চীৎকার করিয়া রাস্তা ছাড়িয়া প্রান্তরের মধ্যে দৌড়িয়া চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বেই কয়েকটা গাছগাছড়া হাতে করিয়া আবেদনের নিকট আসিয়া বলিল, "তু মিলিৎ কিওল্" (দু মিনিটে রোগশান্তি)। লাং চি ফং পাতাগুলি চিবাইয়া আবেদনের আঙ্গুলে লাগাইয়া দিবার দুমিনিটের মধ্যে সত্য-সত্যই তা'র ব্যথা একেবারে সারিয়া গেল। আবেদন অবাক্! সে লাং চি ফং-কে অনেক ধন্যবাদ দিল এবং অন্য কোন কাজ না থাকায় তাহার সহিত তাহার বাসায় চলিল। আবেদন দেখিয়া শুনিয়া বুঝিল যে চীন দেশটি খুব প্রকাণ্ড, তাহার সভ্যতা অতি প্রাচীন এবং দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সকল বিষয়েই চীনারা পৃথিবীতে 'অগ্রগামী'। সে স্থির করিল চীন-দেশে গমন করিবে।

লাং চি ফং আবেদনকে চীনা ভাষায় কয়েকটি কথা, একটি চীনা পোষাক ও কয়েকজন চীনা ভদ্রলোকের নিকট পরিচয়পত্র দিয়া তাহাকে দুইতিন সপ্তাহ পরে একদিন চীন-দেশে রওয়ানা করিয়া দিল। যাত্রার পূর্ব্বে আবেদন কাকাকে লিখিল, "যে চীন সভ্যতার চরমে পৌছাইয়া সহস্রাধিক বৎসর হিমালয়ের মতন স্থিরভাবে চঞ্চল বহির্জগৎকে কৃপা-কটাক্ষে দেখিতেছে, সেই চীন আজ আমায় ডাক দিয়াছে। আমি চলিলাম। পিতা সন্তান-পূজা করিয়া আজ আমায় জগতের চক্ষে হাস্যাস্পদ করিয়া গিয়াছেন, আবার ভ্রাম্যমাণ হইলাম, দেখি পূর্ব্বপুরুষ-পূজা-নিমগ্ন চীন আমায় কোন্ শিক্ষা দান করে।"

॥৴০

পিকিংএ পৌছিয়া আবেদন দিন-কতক ঘোরাঘুরি করিয়া দেখিল যে চীনাদিগের কোন-কোন মহাপুরুষের মধ্যে জাতীয়তার প্রাণ জাগ্রত রহিয়াছে। নবীন চীনা-দলের প্রাণ লিয়াং চি চাও, দার্শনিকশ্রেষ্ঠ কু হুং মিং এবং নাট্যকার ও অভিনেতার রাজা বর্ত্তমান চীনের শেক্‌স্‌পিয়ার মে লাং ফং প্রথমতঃ আবেদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। আবেদন একটা কার্ডে নিজের নাম ও তাহার নীচে "ভ্রমণকারী ও ঔৎকর্ষিক স্বেচ্ছাসেবক" (Tourist and Volunteer Servant to the Cause of Culture) এই কথাগুলি ছাপাইয়া লইয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার মহাপুরুষ-দর্শনের কাহিনী সে নিয়মিত-রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি বাংলা সাপ্তাহিকে প্রকাশ করিতে লাগিল। লিয়াং চি চাও তাহাকে বলিয়াছিলেন, "হে নবীন ভারতবাসী, তোমরা ব্রাহ্মণ ও মন্দির তুলিয়া দাও এবং প্রতিগৃহে মন্দির ও প্রতিপ্রাণে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠিত করো।"

আবেদন তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ, তবে **আমি** বলি দুইপ্রকার বন্দোবস্তই থাকুক।"

মেলাং ফং কে ভারতীয় নাট্যকলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, যে উহা শুধু ভারতীয় নহে এবং নাট্য নহে আর সকল কিছুই উহা হইতে পারে। তাঁহাকে আবেদন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আপনি ভারতীয় নাট্যের উপর গ্রীক্ সভ্যতার প্রভাবে বিশ্বাস করেন?" মেলাং ফং বলিলেন, "কোন প্রভাবের কথা আমি বলিতেছি না, কথা হইতেছে অভাবের।"

কু হুং মিংকে আবেদন সাংখ্যদর্শনের বেদনার চিরনিবৃত্তির চেষ্টা ও টাও দর্শনের "পথ" সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলায় তিনি কিছু বলেন নাই, শুধু শিরঃসঞ্চালন করেন। আবেদন তাঁহাকে বলিয়াছিল যে তিনি যদি এই দুই দর্শনের মিশ্রণে টাংখ্য-দর্শন নাম দিয়া কোন নূতন মত প্রচার করেন তাহা হইলে সে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে। কু হুং মিং পুনর্ব্বার উভয় দিকে শিরঃসঞ্চালন করিলেন।

এইরূপ অনেক "ইণ্টারভিউ"- (সাক্ষাৎকার) এর কাহিনী আবেদন বাংলা দেশের পাঠকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পাঠাইয়াছিল।

সে সুপ্রসিদ্ধ চীনা অঙ্ক ও দর্শনবিদ্ বেতলাং লাশেং-কে কেমন তর্কে কোণঠাসা করিয়াছিল, চীনের সর্ব্ব-

প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক লোমাং লোলাং তাঁহাকে কেমন করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া সোইয়া শিম সিদ্ধ খাওয়াইয়াছিলেন ও চীনা অভিনেতা কা চা লং কি কারণে জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, এই সকল কথা আবেদনের লিখিত বিভিন্ন ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে প্রাপ্তব্য। কিন্তু চীন দেশের সকল-কিছুর মধ্যে আবেদনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল চীনা সঙ্গীতটি ভাল করিয়া আয়ত্ত করা।

॥৵০

চীন-সম্রাট্ ফুসি খৃঃ পূঃ ২৮৫২ অব্দে সঙ্গীতের আবিষ্কার করেন। চীনারা সঙ্গীতকে জীবনে যত উচ্চ স্থান দিয়াছে পৃথিবীর অপর কোন জাতি সেরূপ দেয় নাই। তাহাদের মতে সুস্বর-লহরীর ক্ষমতার অতীত কিছুই নাই। স্বরবিন্যাসের সাহায্যে মানব-হৃদয়কে যে-কোন দিকে লইয়া যাওয়া যায়। এমন-কি, এই যে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চীনারা নিজেদের সভ্যতার ক্ষেত্রে অচল স্থির ও শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে, চীনার চিত্তবিকারের মহৌষধ চীন-সঙ্গীত। আবেদন এই সঙ্গীতের নাকি সুরের সাময়িক কষ্টকারিতা ও ঘণ্টা ও ঢক্কা নিনাদের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ইহার অন্তরের মাধুর্য্যের স্বাদ গ্রহণ করিবেই বলিয়া মনস্থ করিল। সে তিন মাস কাল চীনা স্বর ও তাল সাধন করিল এবং স্ত্রীলোক-বর্জ্জিত চীনা রঙ্গমঞ্চের আটঘাট আরও দুই মাস ধরিয়া চিনিয়া লইল। তা'র ইচ্ছা ছিল সে চি'ন, শে, লাপা, পিপা প্রভৃতি চীনা বাদ্য-যন্ত্রগুলিও আয়ত্ত করিবে, কিন্তু একদিন যখন সে মহামতি লোমাং লোলাংএর কাছে যাইবে এরূপ মনস্থ করিতেছে, ঠিক সেই সময় একটা কেবল্‌গ্রাম আসিল যে তাহার কাকা গতায়ু হইয়াছেন। আবেদন ছিল তাহার কাকার একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুতরাং তাহাকে প্রথম যে জাহাজটি পাওয়া যাইল তাহাতেই দেশে ফিরিতে হইল। সঙ্গে রহিল কয়েকটি চীনা বাদ্যযন্ত্র ও কয়েক খাতা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-পূর্ণ ডায়েরী।

॥৶০

জাহাজে আবেদনের একটি বান্ধবী জুটিয়া গেল। তাঁহার বাস ফিলিপাইন দ্বীপে। আবেদন প্রত্যহ তাঁহার সহিত জাহাজের ডেকে বসিয়া নানাপ্রকার গল্প ও আলোচনা করিত। সে যে কেন বিদেশে আসিয়াছিল, দেশে ফিরিয়াই বা সে কি করিবে ইত্যাদি সকল কথা সে এই ফিলিপাইন-দেশীয় মহিলাটিকে বলিত। ফিলিপিনো মহিলাটির মতে আধুনিক জগতের সকল দুঃখের মূলে রহিয়াছে পরের উপর প্রভুত্ব করিবার চেষ্টা ও পরদাসত্ব দোষ।

আবেদন বলিল, "না, আমার মনে হয় এই যে সকল দেশের সকল মানুষের ভিতরেই দেখা যাইতেছে যে প্রাণের যা আকাঙ্ক্ষা ও আবেদন তাহা উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করিতে কেহই পারিতেছে না, সকলেই অন্তরে নিহিত অব্যক্ততার বোঝা বহন করিয়া গুম্‌রাইয়া মরিতেছে, ইহাই আমাদিগের সকল শোকের মূল। উপযুক্ত অভিব্যক্তির উপায় ও পথ পাইলেই মানব সুখের চরমে পৌছাইবে।"

বান্ধবী বলিলেন, "এ উপায় কি তুমি মানুষের ভাষার প্রসার ও নববৈচিত্র্যের ভিতর পাইবে, না নৃত্যে পাইবে, না, কর্ম্মে পাইবে?" আবেদন বলিল, "না, ও-সকলের ভিতর মানুষ শুধু তা'র ব্যর্থতার বেদনামাত্র প্রকাশ করিতে পারে। মনের অর্গল উহাতে সম্পূর্ণ খোলে না। উপযুক্ত সঙ্গীতেই একমাত্র মুক্তির পন্থা। স্বরসাধনের ভিতর দিয়াই মানুষ আত্মাকে সৈনিকের ন্যায় শিক্ষিত ও গতিদক্ষ করিয়া তুলে।"

বান্ধবী বলিলেন, "তবে কি তুমি সঙ্গীতের সাহায্যে বিশ্বে নবজাগরণ আনিতে পারিবে ভাবো?"

আবেদন বলিল, "হাঁ, সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই আত্মাকে যে-কোন দিকে লইয়া যাওয়া যায়। চীন-দেশে দেখ, সঙ্গীত সাগরের ন্যায় কখন চঞ্চল, কখনও উচ্ছৃঙ্খল, কখন শান্ত, কখন নিঃশব্দপ্রবাহিত, এম্‌নি নানাভাবে চির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চীনা আপনার হৃদয়ের সকল আবেগের নিবৃত্তি তাহার সঙ্গীতেই পাইতেছে। তাই বাহি-

মহাত্মা গান্ধী হাস্য করিলেন—
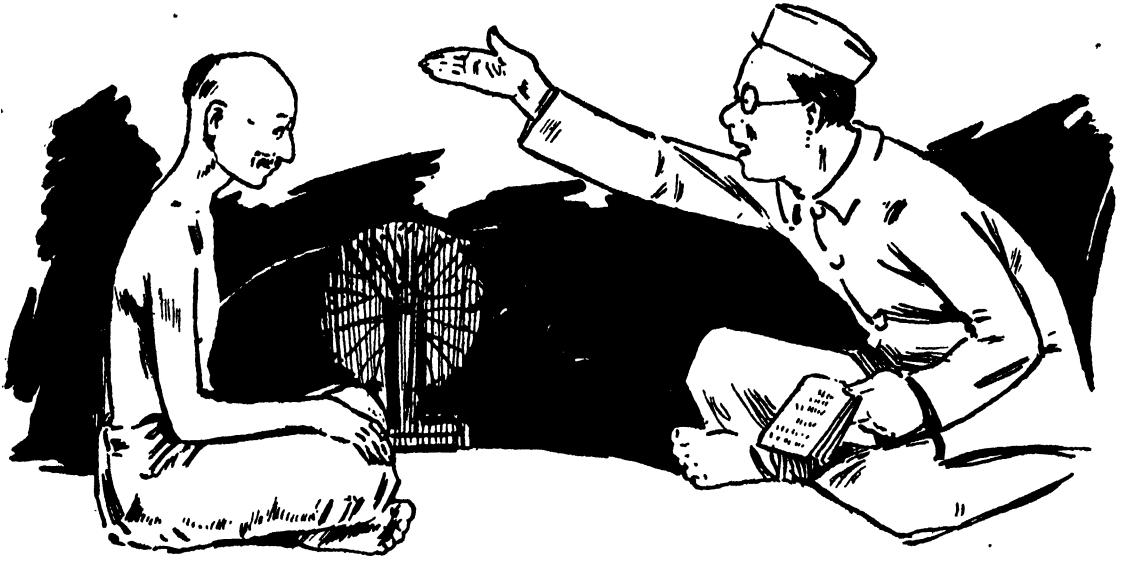
রের সকল ঝঞ্ঝাকে উপহাস করিয়া সে জীবনযাপন করিতে পারে।"

বান্ধবী তাহার কথা এইরূপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনিতেন ও আবেদন অনর্গল বলিয়া যাইত। জাহাজ ভারতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

৮০

দেশে ফিরিয়াই আবেদন একেবারে ননকোঅপারেশনের আবর্ত্তে পড়িয়া গেল। সে দিন-কতক এখানে-ওখানে বক্তৃতা দিল; দুই-একটা ভারতীয় ও চীনা সঙ্গীত মিশ্রিত গানের মজলিসও করিল; কিন্তু দেখিল যে দেশের প্রাণ যে মহাত্মা গান্ধী, তাঁহাকে জাগ্রত করিতে না পারিলে কোন লাভ হইতেছে না। অসহযোগের আদর্শ তাহার ভালই লাগিয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট্ হিন্দু সঙ্গীত ও হোমিওপ্যাথি উভয়ের প্রতিই আবহমানকাল হইতে দারুণ অনাদর দেখাইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং সেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি আবেদন যে সহজেই বীতরাগ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

আবেদন একটি হাণ্ডব্যাগ লইয়া আহমেদাবাদ যাত্রা করিল। সেখানে অল্প চেষ্টা করিতেই একদিন সে গান্ধীজির সাক্ষাৎলাভে সক্ষম হইল। তিনি আবেদনকে বৈকাল পাঁচ ঘটিকার সময় আসিতে বলিলেন। আবেদন সেদিন একটি খদ্দরের ধুতির উপর একটি খয়ের রংএর খদ্দরের কোট এবং মস্তকে বাসন্তী রংএর একটি গান্ধী-ক্যাপ পরিধান করিয়া নোট বই ও পেন্সিল পকেটে গান্ধীজির আশ্রমে উপস্থিত হইল। প্রণাম ইত্যাদির গোলমাল মিটিলে পরে মহাত্মাকে আবেদন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সঙ্গীতের শক্তিতে বিশ্বাস করেন?"

মহাত্মা বলিলেন, "হাঁ, সঙ্গীত মানুষকে সুখ দুঃখ উভয়ই দানে বিশেষরূপে ক্ষমতাপন্ন, একথা আমি স্বীকার করি।" আবেদন বলিল, "না, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারেন নাই। সঙ্গীতই যে মানুষকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার ও তাহাকে চরিত্রে ও কর্ম্মে অটল ও সক্ষম করিয়া তুলিবার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, একথা কি আপনি মানেন?"

মহাত্মা বলিলেন, "কি-রূপে ইহা সম্ভব আমায় বুঝাইয়া বলুন।"

আবেদন বলিল, "ধরুন, আপনার অসহযোগ আন্দোলন। ইহার জন্য আপনি কত বক্তৃতা, কত লেখা, কত তর্ক করিতেছেন। এ সকল, প্রথমত, সর্ব্বক্ষেত্রে মানুষকে অসহযোগী করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় না; দ্বিতীয়ত যদি

কোন উপায়ে মানুষের **অন্তরেই** আপন হইতেই অসহযোগী আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা বাহির হইতে অসহযোগ প্রচার করিয়া অর্দ্ধসক্ষম হওয়া নিশ্চয়ই শ্রেয় নহে—।"

মহাত্মা বলিলেন, "উত্তম কথা। কিরূপে এই অসহযোগ-আবেগ মানুষের মনে যুক্তিতর্ক না দিয়াই জাগাইয়া তোলা সম্ভব, তাহা বলুন।"

আবেদন বলিল, "হিন্দু -সঙ্গীতের এক-একটি স্বর এক-একপ্রকার আবেগ প্রাণে জাগ্রত করিয়া তোলে। যথা সা শান্ত ভাব, রে করুণা, গা তন্ময় প্রেম, মা ভয়, পা সৎসাহস, ধা পরার্থপরতা, নি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা, এবং এই সকল স্বরের কড়ি কোমল ও পরস্পর মিশ্রণের সাহায্যে যে-কোন-ভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলা যায়। তাহার জন্য যুক্তি লাগে না, তর্কও লাগে না। আমি নি-বর্জ্জিত পা-গা- প্রধান একটি রাগিণী রচনা করিয়াছি। ইহার নাম দিয়াছি অসহযোগিয়া রাগিণী। ইহার স্বরতরঙ্গে যে একবার পড়িবে সে আর কখন বিদেশীর সহিত সহযোগে কিছু করিতে চাহিবে না। যেমন বহ্নি ঊর্দ্ধগামী ও জল নিম্ন-গামী স্বভাবতই হয়, তেম্‌নি এই রাগিণীর স্পর্শে মানব-হৃদয় স্বভাবতই এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে তাহার পক্ষে স্বভাবতই ব্যথার ব্যথী ব্যতীত আর কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা সম্ভব হয় না। আমার অনুরোধ, আপনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি এই সুরের আঁগুন জ্বালাইয়া দিন। দেখুন, অচিরে কি অপরূপ ফল আপনি পাইবেন।"

মহাত্মা আবেদনের সকল কথা শুনিয়া উদ্ভাসিত-বদনে একবার হাস্য করিলেন।

তা'র পর নিজের টেকোটি বাহির করিয়া কিয়ৎকাল কোন কথা না বলিয়া সস্মিতমুখে সূতা কাটিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই আবেদনকে তিনি একগাছি সূতা স্বহস্তে উপহার দিলেন। একজন চেলা আবেদনকে বলিল, "বাবুজি, এইবার চলুন।"

আবেদন মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া ব্যাগ লইয়া বাহির হইয়া গেল।

আহ্‌মেদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবেদন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাসায়নিকশ্রেষ্ঠ প্রফুল্লচন্দ্র তাহার অসহযোগী রাগিণীর কথা শুনিয়া তাহার বুকে জোরে-জোরে কয়েকটা ঘুসি মারিয়া বলিলেন, "ইয়ংম্যান্, তোমার ত দেখ্‌ছি গায়ে বেশ জোর আছে—তুমি খদ্দর বিক্রী ক'রে বেড়াও; পার্‌বে।" আবেদন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষুণ্নমনে চলিয়া গেল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নিকটে সে খদ্দর ছাড়িয়া রেশমের একটি চীনা কোট পরিয়া গমন করিল। আচার্য্যকে আবেদন অনুরোধ করিল, যে, তিনি যেন উদ্ভিদের উপর রাগ-রাগিণীর প্রভাব তাঁহার আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফের সাহায্যে যাচাই করিয়া দেখেন। আচার্য্য সেকথায় বিশেষ কান না দেওয়াতে আবেদন রাগতভাবে বাহিরে গিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, এমন সময় প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসুর সহিত তাহার দেখা হইল। আবেদন তাঁহার সহিত বহুক্ষণ গাড়ীতে বসিয়া আলাপ করিল এবং শেষ অবধি তাঁহাকে বলিল যে প্রত্যেকটি সুরের মানুষের শরীরের আভ্যন্তরীণ ডাক্টলেশ গ্লাণ্ডের কার্য্যের উপর বিভিন্ন-প্রকার প্রভাব আছে, তিনি এবিষয়ে "এক্সপেরিমেণ্ট" করিয়া দেখিলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। অমায়িক ডাক্তার-বাবু তাহাকে বলিলেন, "অবশ্যই হইতে পারে। তবে কিনা এবিষয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করা কঠিন।" আবেদন তাঁহাকে এ বিষয়ে আর পীড়াপীড়ি না করিয়া নিজ স্থানে গমন করিল।

মহাত্মা গান্ধীর ও অন্যান্য লোকদিগের নিকট কোন উৎসাহ না পাইয়া আবেদন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। সেখানে বিশ্বকবি তাহার ভ্রমণ প্রভৃতির কথা শুনিয়া তাহাকে সাদরে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "আপনি ত আমেরিকা ও চীন অনেক ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, জগতের অনেক সমস্যার কথাও শুনিলেন; এখন এই যে জগদ্ব্যাপী দুঃখ ও দৈন্যের তাণ্ডব লীলা, ইহার শেষ কোথায় বলিয়া আপনি অনুমান করেন?"

আবেদন বলিল, "হিন্দু সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত আলাপ,

তাহার সহিত চীনের ভাবমাত্রিক ছন্দের তালে তালে ঘণ্টাধ্বনি, এতদুভয়ের ঐক্যতানে যদি বিশ্বকে প্লাবিত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এবং শুধু তাহা হইলেই এই দুঃখদৈন্য প্রশমিত হইবে।”

রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, “সে কি ?”

আবেদন বলিল, “যেমন আলোকের সম্মুখে অন্ধকার আপনা হইতেই মিলাইয়া যায়, তেম্‌নি এই ঐক্যতানের স্বরজ্যোতিঃপ্রসূত হৃদয়াবেগের সম্মুখে অপরাপর মনোভাব কোথায় যে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার কূলকিনারা মিলিবে না। আমরা যদি যথাযথ স্বরবিন্যাসে নূতন নূতন ভাবোদ্দীপক রাগরাগিণী সৃজন করিতে এবং ভারতীয় সঙ্গীতের তালের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাহা চীনা তালে গাহিতে পারি, তাহা হইলে কি না হইতে পারে ?”

রবীন্দ্রনাথ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী গায়ক বলিয়া উঠিলেন, “মশায়ের দেখ্‌ছি তালের উপর বড় রাগ। কেন, অপরাধ ?”

আবেদন বলিল, “ভারতীয় তাল ভাবকে, মনের দরদকে তা’র শেষ সীমা অবধি যাইতে দেয় না। উদ্দীপনার অর্দ্ধপথে তাল তাহার মস্তকে সমের মুগুর বসাইয়া সকল-কিছু ভণ্ডুল করিয়া দেয়। চীনারা সুরকে খেলাইয়া খেলাইয়া চরমে লইয়া যায় ; স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে এ সুরের নেশা চরমে পৌছিতে কম-বেশী সময় লাগিয়া থাকে। যখন চীনা তালজ্ঞ ভাব চরমে পৌছিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে, শুধু তখনই সে ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ভাবের ঢেউ নিম্নগামী করিয়া দেয়। আবার ভাবের অভাব যখন চরমে পৌছায় তখন সে আবার ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ঢেউএর গতি পুনর্ব্বার ফিরাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে সুর-ফাঁক্তার ধা ঘেনে নাগ্ দিগ্ বা চৌতালের ধা ধা দিন্ তা, এ জাতীয় কোন বন্ধনের উৎপাত নাই।”

আবেদনের কথা শুনিয়া তাহার আলোচকের মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া কবি তাঁহাকে অন্য কথায় ভুলাইবার জন্য বলিলেন, “ঢেউও ত তার নিজের নিয়মে বাঁধা। সে কি কখন নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়া সমচতুষ্কোণ আকার ধারণ করিতে পারে ? যেমন তা’র নিজের স্বভাবের বন্ধনের মধ্যেও ঢেউ পূর্ণতা পাইয়া থাকে, তালের বন্ধনের মধ্যেও সুর তেম্‌নি বিকাশের চরমে পৌছাইতে পারে।”

আবেদন বলিল, “আপনার উপমা চমৎকার ; কিন্তু আমার যুক্তি আপনি বুঝিলেন না। যুক্তি ও উপমা এক নহে। তাল সুরের স্বভাব নহে……”

সঙ্গীতজ্ঞ লোকটি কথা শুনিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া বলিলেন, “আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত !” বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেই সকলে আবেদনকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া সন্দেশ রসগোল্লা সরবৎ ইত্যাদিতে তুষ্টকরিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আবেদন প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর প্রসিদ্ধ লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না ; নিজেই সে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে।

৸৵০

বাঙ্গালীর একটি গুণ আছে। সে সকল ব্যক্তি ও মতকেই কিছু দিনের মত আকাশে তুলিয়া ধরিতে কখনও নারাজ হয় না। আরব্যোপন্যাসে কে যেন শুধু একদিনের জন্য রাজা হইতে চাওয়াতে সম্রাট্ হারু-উন-আল্-রসিদ তাহাকে সানন্দে একদিনের জন্য নিজের সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে সম্রাটের ঔদার্য্যই প্রমাণ হয়। বাঙ্গালীও এই ঔদার্য্য-গুণে গুণী। যে কেহ উচ্চকণ্ঠে যাহা হইতে চায়, সে তাহাকে ক্ষণতরে তাহাই হইতে দেয়। এইরূপে বাঙ্গলায় নিত্যই নব নব বাল্মীকি, তানসেন, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, কালিদাস, ভবভূতি, হুইটম্যান, গর্কি ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। তাঁহারা আসেন যান মাত্র দুদিনের জন্য। কাজেই বাঙ্গালী তাঁহাদের আশায় নিরাশ করে না। এই সকল ক্ষণপূজিত মহাপুরুষদিগের মধ্য হইতেই আবার কেহ কেহ চিরকালের দেবতারূপে থাকিয়া যান। সে কথা থাকুক।

আবেদন যখন কয়েকটি মেস ও কলেজ হোষ্টেলে যাইয়া নিজের মত প্রচার এবং তৎসঙ্গে হারমোনিয়াম তানপুরা ও চীনা ঘণ্টা সহযোগে স্বরচিত সঙ্গীত ও পররচিত সঙ্গীতের নূতন সুর আলাপন করিয়া সকলের চিত্তের উৎকর্ষ সাধনে
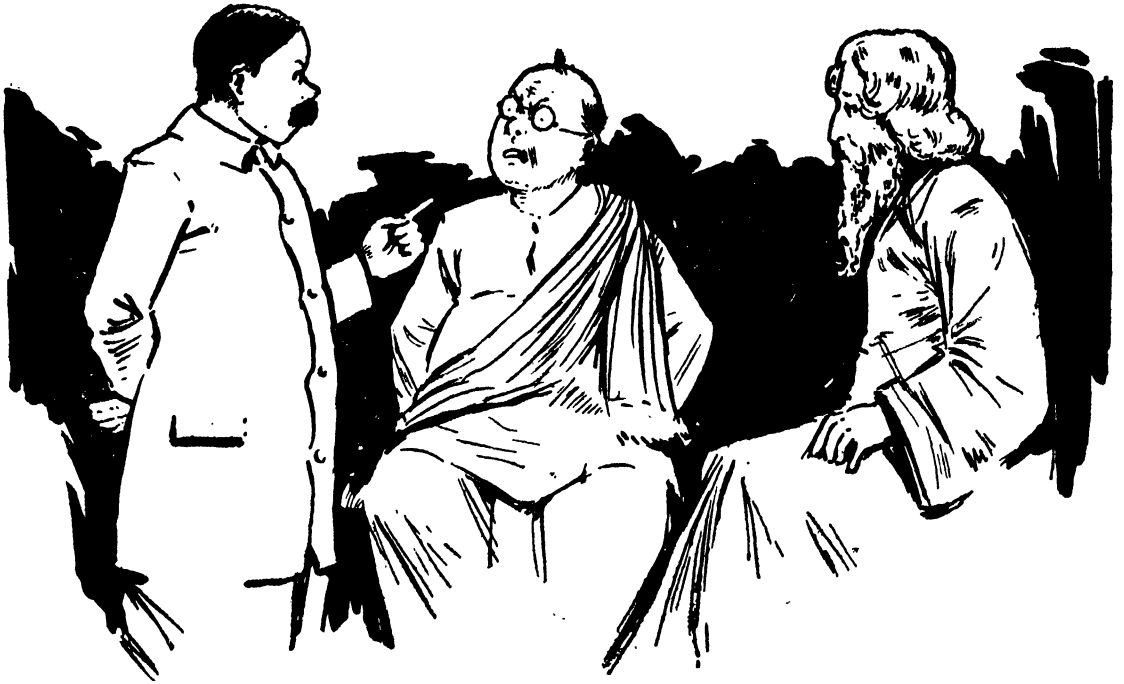
রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত…ওস্তাদটি বলিলেন, "আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।"

যত্নবান্ হইয়া উঠিল, তখন অতিশীঘ্রই সে ছাত্রমহলে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। এমন-কি, কয়েক মাসের মধ্যেই সে রাস্তায় বাহির হইলে লোকে তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিত, ঐ ঐ দেখ আবেদন পাকড়াশী যাচ্ছে। মফস্বল হইতেও ছোকরারা আসিয়া তাহার গান শুনিত এবং কলিকাতার ছোকরাদিগের সহিত একজোটে হাততালি দিত। আবেদনের গানের মজলিস শীঘ্রই সহরে ও বাহিরে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। সা রে পা মা পা ধা নি নির্ব্বিশেষে সে যে-কোন স্বরপ্রধান রাগিণীরই আলাপ করুক না কেন, তাহার ফলে শুধু দেখা যাইত শ্রোতাদিগের উদ্দাম উৎসাহ ও আবেদনের প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তিপ্রকাশ। একজন ইতিহাসের ছাত্র বলিয়াছিল, "বর্ত্তমান কালকে আবেদনের যুগ (The Age of Abedan) বলা যাইতে পারে।"

৸৶০

চারিদিকে স্কুলকলেজের ছাত্রদের ভিড়! সকলেই ঘাড় উঁচাইয়া কি যেন দেখিতেছে, কাহার যেন আশায় রহিয়াছে। হঠাৎ বৃহৎ হলের দরজা খুলিয়া গেল এবং নানা বর্ণের পাঞ্জাবী পরিধান করিয়া ও দীর্ঘ কেশকলাপে মুখশ্রী বাড়াইয়া কয়েকজন ভক্ত আবেদনকে ঘিরিয়া বক্তৃতা-মঞ্চের উপর আনিয়া বসাইল। সকলে করতালি দিয়া উঠিল। আবেদন ঈষৎ লজ্জায় মুখ আলোকিত করিয়া শ্রোতাদিগের দিকে চাহিয়া একবার তাহাদের অভিবাদন করিল। সকলে নিস্তব্ধ হইলে আবেদন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ আমরা……"

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "গান, গান"। আবেদন পার্শ্বের একজন ভক্তকে ইঙ্গিত করিল, একটি হারমোনিয়াম "পোঁ" করিয়া উঠিল, দুটি তানপুরা "ঘ্যাঁও ঘ্যাঁও" করিয়া সুর ধরিল—আবেদন তাহার নবরচিত সরমিয়া রাগিণীতে (পা নি বর্জ্জিত ঔড়ব, গা বাদী, মা সম্বাদী, দুই গা ইত্যাদি) গান ধরিল :—

সরমে গরম হইল গাল,
কপাল ও কর্ণমূল লাল,
হায় সখা মোর ঘোমটা খুলিয়া দেখো না।
পায়ে ধরি সখা অধরে অধর রেখো না॥

সকলে "বা ভাই, বা ভাই," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আবেদন অধিক দরদ দিয়া গাহিল,

অধরেঁ এঁ এঁ এঁ অঁ…ধঁ…রঁ…রেখো না

অম্‌নি ঢং করিয়া একজন ভক্ত ঘণ্টাটি বাজাইয়া দিল।

আবার তুমুল করতালি। আবেদন উঠিয়া দাঁড়াইল। কি বলিতে গেল, কিন্তু সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "গান, গান"। পিছনের বেঞ্চিতে জায়গা লইয়া তিন চার জনে মারামারি হইয়া গেল। সকলে বলিল, "মার, মার, বের ক'রে দাও, দূর ক'রে দাও!" আবেদন গান ধরিল

আমার হৃদয়-সরসে কি ফুটালে সখি
রক্ত কমল-কলিকা, ইত্যাদি।

গান থামিতেই হলের এক প্রান্ত হইতে কে বলিয়া উঠিল, "একটা রবি-ঠাকুরের গান হোক।"

আবেদন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ব্যাপার হচ্ছে কি, তাঁর গানে অনেকস্থলে কথার সহিত সুরের সামঞ্জস্য নাই। আমি কিছু সুর বদ্‌লাইয়া একটি গান গাহিতেছি।" এই কথা বলিয়া সে গান ধরিল

"গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে"

এবং বলিল, "এই যেরকম সুরে গাহিলাম, ইহাতে আসন পাতার ভাব ঠিক প্রকাশ পাইতেছে না। 'আসন-খানি পাতি' এই কথাগুলি **এই**-রকম সুর করিলে ভাবটা অনেক পরিষ্কার হয়।"

নূতন সুরটি করিতেই একজন লম্বা চৌড়া কৃষ্ণবর্ণ ও বৃষস্কন্ধ যুবক আস্তিন গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি কোন্ অধিকারে এ-রকম অপরের গানের সুর বিকৃত করিয়া গাহিতেছেন।" সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল এবং ধস্তাধস্তি করিয়া যুবকটিকে হল হইতে বাহির করিয়া দিল।

এইরূপে দিনের পর দিন মজলিস, সভা, আড্ডা ইত্যাদির ভিতর দিয়া আবেদন বাঙ্গালীর বুকে নিজের আসন চিরস্থায়ী করিয়া লইতেছিল। তা'র পর এক অশুভক্ষণে সে কয়েকটি রঙ্গমঞ্চপাগল বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া নাট্যের দিকে মন নিয়োগ করিল।

১২

বন্ধুরা বলিল, "আবেদন, যদি সমাজকে তাহার ভিত্তি অবধি নাড়া দিয়া দিতে চাও, তাহা হইলে রঙ্গমঞ্চের দিকে মন দাও। নাট্যে বাঙ্গালী যেমন মজিবে, আর কিছুতে তেমন হইবে না।"

আবেদন বলিল, "কিন্তু আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চ আর নাট্যকলা না ভারতীয়, না নাট্য; তাহার ভিতর যাওয়া কি আমার পক্ষে সমীচীন হইবে?"

বন্ধুরা বলিল, "রঙ্গমঞ্চ ত তোমার হাতে, তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া ঠিক করিয়া লও। সীন, ষ্টেজ, নাটক, অ্যাক্টর, অ্যাক্ট্রেস সব নিজে ঠিক করো।"

আবেদন বলিল, "অ্যাক্ট্রেস? অ্যাক্ট্রেস ত একেবারে বাদ। চীন-জাপানে নটীর স্থান নাই। কা চালং, যাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাশালী অভিনেতা চীনে গত তিনশত বৎসরের মধ্যে জন্মায় নাই, তিনি আমায় নিজে বলিয়াছেন, যে, স্ত্রীলোক স্বভাবতই সকল কার্য্যে অভিনয় করিয়া থাকে বলিয়া তাহার পক্ষে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অভিনয় করা সম্ভব নহে। নাট্য আমাদের নিজেদের লিখিয়া লইতে হইবে এবং সীন প্রয়োজন নাই। ষ্টেজ এবং বাদ্যকর-দিগের বসিবার স্থান থাকিলেই চলিবে। প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্ব্বে একজন চীৎকার করিয়া দর্শকদিগকে বলিয়া দিবে, কি-প্রকার অবস্থায় দৃশ্যস্থিত ঘটনাবলী ঘটিতেছে। দর্শক-গণ সীন কল্পনা করিয়া লইবে।"

সকলে বলিল, "ঠিক বলিয়াছ। এই ত যথার্থ আর্ট। ইহাতেই মনেরপ্রসার বাড়িবে। কি বিষয়ে নাটক লিখিবে?" আবেদন "বলিল, প্রণয়। প্রণয়ের উচ্চ আদর্শ মানুষের নিকট খাড়া করিতে পারিলে সমাজের বহু উন্নতি হইবে।" বন্ধুরা বলিল, "ঠিক বলিয়াছ; প্রণয়ই ঠিক হইবে। সীতা, সাবিত্রী, সতী, ইহার মধ্যে একটা কিছু লও।"

উত্তর হইল, "উহুঁ।"

"তবে বেহুলা, ফুল্লরা, খুল্লনা কিম্বা সংযুক্তা?"

"উহুঁ"।

"দময়ন্তী, শকুন্তলা, কপালকুণ্ডলা?"

"উহুঁ, ওসবে হবে না। নির্য্যাতন সহ্য করা চাই, প্রণয়ের জন্য পাগল হওয়া চাই।"

তখন এক বন্ধু গাণ্ডীবপ্রসাদ বলিল, "তবে সূর্পনখার লক্ষ্মণ-প্রেমের বৃত্তান্ত লইয়া তোমার নাটক লিখ। সূর্পনখার ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনীতে পাষাণও গলিয়া যায়। কর্ত্তিতনাসা ও কর্ত্তিতকর্ণ সূর্পনখা যখন পাগলের ন্যায় বিলাপ করিবে, তখন দর্শকগণ নিশ্চয়ই বিশেষরূপে মুভ্‌ড্‌ (moved) হইবে।"

আবেদন উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ঠিক বলিয়াছ! স্থূর্পনখাই ঠিক হইবে।"

তা'র পর কিছুদিন ধরিয়া নাটকলিখনকার্য্য চলিল। আবেদন স্থূর্পনখার প্রণয়ের জন্য নির্য্যাতন সহ্য করা লইয়া অনেকগুলি নূতন গান ও স্থর রচনা করিল। তাহার মধ্যে কোমল গান্ধার ও কড়ি মধ্যমে রচিত একটা আর্ত্তনাদের স্থর শুনিয়া গাণ্ডীব বলিল, "নিছক মার্টারডমের (আত্মবলিদানের) আওয়াজ।"

ইহার পর আরম্ভ হইল রিহার্স্যাল। আবেদন নিজে স্থূর্পনখা সাজিল; গাণ্ডীব সাজিল লক্ষ্মণ।

অভিনয়ের প্রথম রাত্রি ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। আবেদন "চন্দ্রমা" থিয়েটারটি ভাড়া লইয়া ষ্টেজটি সকল সীনবিমুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইল। কয়েক জন চীনাকে সে অভিনয় কালে অর্কেষ্ট্রা বাজাইবার জন্য নিযুক্ত করিল।

আবেদন স্ত্রীলোক সাজিয়া অভিনয় করিবে এবং নাসিকা-কর্ত্তিত রূপে গান করিবে শুনিয়া দলে দলে স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ টিকিট কিনিয়া থিয়েটারে হাজির হইল। প্রথম দৃশ্যে স্থূর্পণখা লক্ষ্মণকে দেখিয়া প্রেমে পড়িয়াছে। তাহার হৃদয় উত্তেজনা ও অবসাদের আবেগে মুহুর্মুহু কম্পিত। চীনা অর্কেষ্ট্রার বাদকগণ সঘনে বেতালা ঘণ্টা-নিনাদ আরম্ভ করিল। টং, টং, ঢঙা ঢং, ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং শব্দে সকলের কর্ণ বধির হইয়া যাইবার সূচনা হইল। সকলে চীৎকার করিয়া চীনাদিগকে থামিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সে চীৎকারকে প্রশংসা ভাবিয়া আরও জোরে ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। প্রথম দৃশ্য শেষ হইল। সকলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইণ্টারভ্যালের সময় সকলেই বলিতে লাগিল, "একে সীন নেই, তা'তে এই ঘণ্টার গোলমাল, এ যেন দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে।" দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভেই একজন আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, "ভাবুন, গভীর অরণ্যের দৃশ্য। কাঁটা বন ও শাল বৃক্ষ। পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র নদী। তাহাতে দুইটি কুম্ভীর ভাসিতেছে।" সকলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। তা'র পর আবেদন স্থূর্পনখার ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে আসিয়া বিলাপ আরম্ভ করিল। তাহার ঈষৎ নাকি স্থরের—

"কোথায় লক্ষ্মণ, কোথায় লক্ষ্মণ,
নিরাশা বুক করছে ভক্ষণ
অন্তরে আজ জলছে আমার ক্ষুব্ধ প্রেমের তৃষা।
কেমনে কাটিবে বলো এ বিরহনিশা?"

সঙ্গীতে থিয়েটার পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে যখন আবার সদরদে "হায় কেমনে এঁ এঁ এঁ" বলিয়া তান ধরিল এবং চীনারা ঘণ্টার সহিত একটা রেশমের স্থতা-বাঁধা যন্ত্রে "কোঁও, কোঁও" আওয়াজ স্থরু করিল, তখন গ্যালারীর একদল ছোকরা ষ্টেজে কতকগুলি কদলী ও লেবু নিক্ষেপ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যেই কে একজন কাছাকাছি একটা বাড়ী হইতে টেলিফোনে ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়া দিল, যে, চন্দ্রমা থিয়েটারে আগুন লাগিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া পড়িল। থিয়েটারের সামনের ছোকরার দল ব্রিগেডের লোকদিগকে বলিল, "হাঁ, থিয়েটারের ষ্টেজে আগুন লাগিয়াছে এবং ভিতরে সীন ইত্যাদি পুড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।" ফায়ারম্যানরা তখন জলের পাইপ-হস্তে জল চালাইয়া থিয়েটারে ঢুকিতে আরম্ভ করিল।

ভিতরে তখন দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। স্থূর্পনখা কর্ত্তিত-নাসা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে ও চীনারা উন্মত্তের ন্যায় ঘণ্টা ইত্যাদি বাজাইতেছে। প্রায় আগুন লাগারই মতন আওয়াজ চারিদিকে। কে একজন, "আগুন আগুন", বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। তা'র পর প্রলয়। আছাড় খাইয়া, জল খাইয়া লোকে দরজার দিকে ছুটিল। একদল ষ্টেজে গিয়া উঠিল, চীনারা উর্দ্ধশ্বাসে সব-কিছু ফেলিয়া পলায়ন করিল। রহিল শুধু ষ্টেজের এক কোণে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আবেদন। ফায়ারম্যানরা আগুন না পাইয়া চলিয়া গেল। বাহিরে টিকিট আফিসে দারুণ মারামারি টিকিটের পয়সা ফেরত লইবার জন্য। গাণ্ডীব আসিয়া বলিল, "আবেদন, বাড়ী চলো।" আবেদন কলের পুতুলের মতই তাহার সহিত বাহির হইয়া গেল।

(সমাপ্ত)

থিয়েটারের ঘটনার পরদিন সকল কাগজেই এই ব্যাপার লইয়া খুব হৈ চৈ করিল। এ নাটিকার সাফল্যের আর কোন আশা রহিল না। আবেদন দেবতার পদ হইতে কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়া শিলংএ চলিয়া গেল। একদিন সে দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল তা'র পর একদিন সেই সাপ্তাহিকটিতে দেখিলাম—

"আবার উধাও"

শ্রী আবেদন পাকড়াশী।
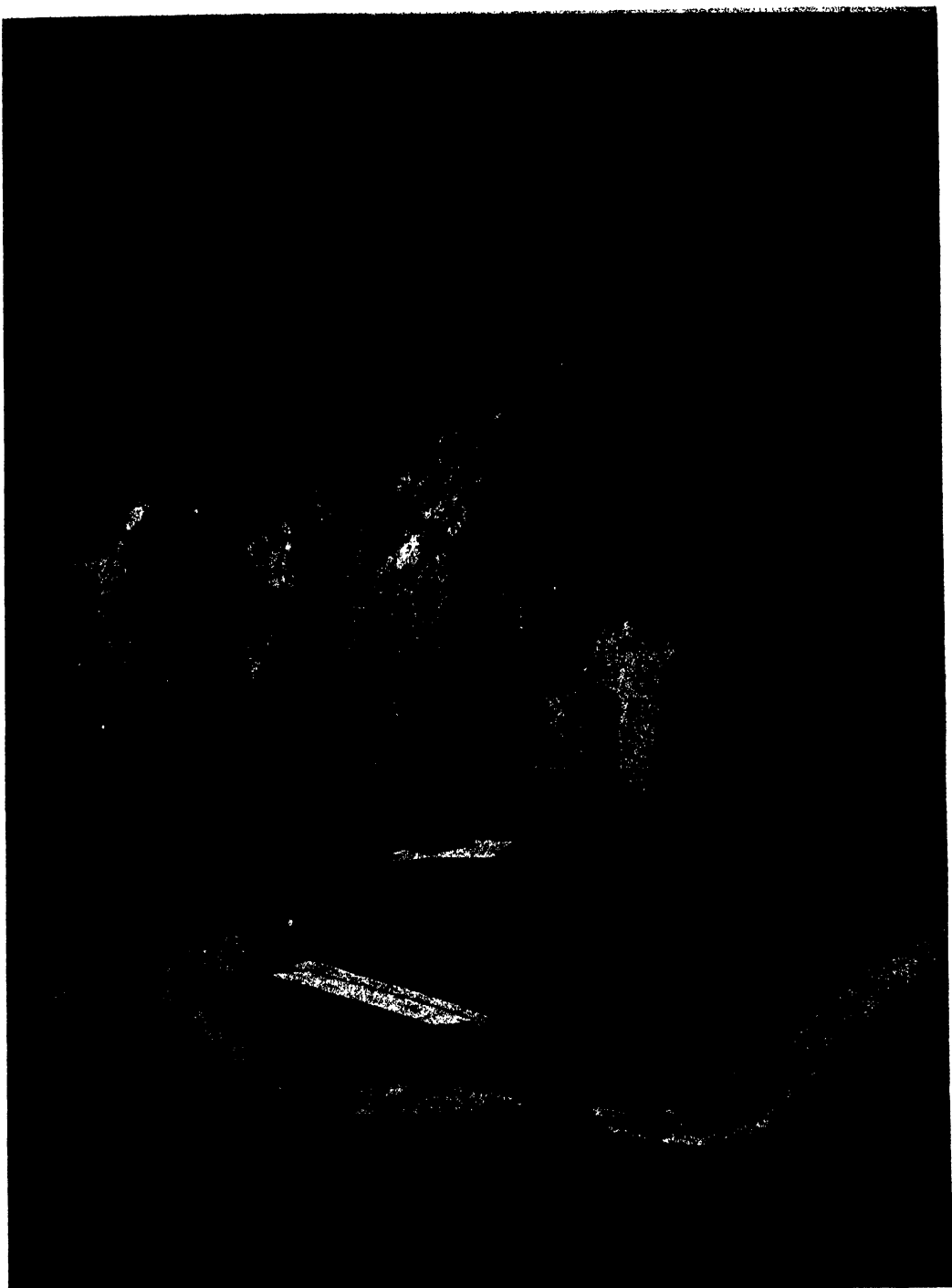
পাণিনি
শিল্পী শ্রী বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী
শান্তিনিকেতন

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

২য় সংখ্যা

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

পত্র-পরিচয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন অল্প বয়স ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙীন। তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ; আত্ম-প্রকাশের স্রোত নানা বাঁকে বাঁকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল; তীরের বাঁধ কোথাও ভাঙচে কোথাও গড়চে; ধারা কোথায় গিয়ে মিশ্‌বে সেই সমাপ্তির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়েনি। নিজের ভাগ্যের সীমারেখা তখনো অনেকটা অনির্দ্দিষ্ট আকারে ছিল বলেই নিত্য নূতন উদ্দীপনায় মন নিজের শক্তির নব নব পরীক্ষায় সর্ব্বদা উৎসাহিত থাকৃত। তখনো নিজের পথ পাকা করে বাঁধা হয়নি; সেইজন্যে চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল।

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেন নি। পূর্ব্ব উদয়াচলের ছায়ার দিক্‌টা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্ত্তি-সূর্য্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিস্ফূরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার পরে যখন মধ্যাহ্নকাল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে দাবী করে বসে। তখন কা'র কাছে কি আশা করা যেতে

পারে তা'র মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ডাক্ জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্যচন্দন, পূজা-অর্চ্চনা সবই জুটতে পারে; কিন্তু প্রথম পথযাত্রার রিক্তপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে করস্পর্শ নির্জ্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে, তার মত মূল্যবান আর কিছুই পাওয়া যায় না।

তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বতোৎচিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাক্‌তে পারে, কিন্তু মানব মনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্ত্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদ্ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। তা ছাড়া, যাঁর চিঠি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, গোপনতার অন্ধ রাত্রি তাঁকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সাম্‌নে প্রকাশিত। সেই কারণে তাঁর চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তার সমগ্র জীবন-ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরব লাভ কর্‌বার যোগ্য।

এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্ব্বাংশে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার আজ মনে জেগে উঠ্‌চে। সেই তাঁর ধর্ম্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের নির্জ্জন পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের ক'রেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশির-স্নিগ্ধ সূর্য্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখে-ছিলুম। আমি গর্ব্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্ব্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা ক'রে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর; বর্ত্তমানের সাক্ষ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব্ব ক'রে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তাহ'লে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
২২ চৈত্র, ১৩৩২।

(১)

৮৫ নং অপার সারকুলার রোড
২৫ এপ্রিল, ১৮৯৯।

সুহৃদ্বরেষু—

এ কয়দিন ডাক্তারের অনুসন্ধানে ছিলাম। এজন্য ইতিপূর্ব্বে উত্তর দিতে পারি নাই।—বাবুর নিকট এজন্য কয়বার গিয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। প্লেগের ধূমধামে তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে এক (মৃত) প্লেগরোগী সৎকার করিতে লইয়া যান। সৎকার করিয়া গৃহে প্রবেশ করি-বার পথে তাঁহার জন্যে বিশেষ অভ্যর্থনার আয়োজন ছিল। প্রথমে করোসিব্ সাব্লিমেট্ জলে তাঁহাকে অপাদমস্তক স্নান করান হয়, তার পর সমস্ত বহিরাবরণ (জুতা পর্য্যন্ত) রাজপথে কেরোসিন তৈলে দাহ করা হইয়াছিল। পৃথি-বীতে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যের নিয়ম আছে। এদিকে এত সাবধানতা, অন্যদিকে মৃত রোগীর আত্মীয়েরা মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র অন্ধ আতুরদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন!

—বাবুর সহিত আজ পুনরায় দেখা করিতে যাইব। ডাক্তার—এর সহিত দেখা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তিনি চাইবাসা গিয়াছেন, কবে আসিবেন জানি না। ডাক্তার—এর নিকট চিঠি লিখিয়াছি।

রেশমের কীটের শোচনীয় পরিণাম শুনিয়া দুঃখিত হইবেন। কয়দিন হইল একটি প্রজাপতি সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পর ২।৩টি অর্দ্ধমৃত অবস্থায়

জন্মিয়াছে, আর কয়টি অর্দ্ধেক বাহির হইয়া রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কি করিতে হইবে জানি না। যে একটি সুস্থ শরীরে বাহির হইয়াছিল, তাহাকে কি আহার দিতে হইবে জানিনা। অনেক পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, কিন্তু মধু সঞ্চয় করিতে তাহার কোন আগ্রহ নাই। কোন বন্ধু আমের চাট্‌নী দিতে বলিয়াছেন।

Mrs. কথাটা বাঙ্গলাতে অতি বীভৎসজনক। আপনি একটি নূতন কথা বাহির করিবেন। আপাততঃ গৃহলক্ষ্মী বলিতে পারেন। কারণ, আমার সহধর্ম্মিণী একান্ত সেকালের। আধুনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-মণ্ডিতা হইলে গৃহসরস্বতী লিখিতে বলিতাম।

ভারতী কবে বাহির হইবে?

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

(২)

দার্জ্জিলিং।
২০ এ মে, ১৮৯৯।

বন্ধুবরেষু—

এখানে একেবারে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় জীবন কাটাইতেছি। যেখানে আছি সেখানে কোন লোকের সাড়াশব্দ নাই (বার্চ্চ্ হিলের পশ্চাতে); কেবল পাখীর গান ও সম্মুখে হিমাচল। আপনি যদি আসিতে পারিতেন তবে ভাল হইত। কয়দিনের জন্য আসিতে পারেন কি? একভাবে আপনার গ্রন্থাবলী পড়িতেছিলাম। আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন? এখন ভারতীর বোঝা গিয়াছে। মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন। একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণ-মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। আপনার কুশল-সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

(৩)

দার্জ্জিলিং
২১ এ জুন, ১৮৯৯

বন্ধুবরেষু—

আপনার পত্র পাইলাম। আমাকে বন্ধুভাবে স্মরণ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখী হইয়াছি। আপনার সুখ ও উৎফুল্লতার সময় সহভাগী করিয়া যেরূপ সুখী করেন, অন্য সময়ে স্মরণ করিলে বন্ধুতার নিদর্শন দেখি।

আপনি যে গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই সম্পাদককে এতৎ-সম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। তবে এরূপ বিষয়ে একান্ত উপেক্ষা করাই সমুচিত কিনা মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমি লিখিব কিন্তু অধিক importance দিতে চাহি না। আপনি অনেক উচ্চে আছেন; এসব কর্দ্দম আপনাকে স্পর্শ করিবে না।

আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি, যাঁহারা কাব্যে ব্রতী তাঁহারা অনেকের ভালবাসা দ্বারা উন্নীত না হইলে কাব্য সমাধা করিতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার ভক্তের অভাব নাই। যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে করুণার পাত্র মনে করি। আর যাঁহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পবিত্র করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্ব্বচন কি আপনার নিকট পৌঁছে না? আমি ত কখন কখন আপনার ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। কোন কোন স্বর শুনিয়া মনে হয়, একি একজনের কণ্ঠ? না এই দুঃখসুখময় সময়ের অগণিত অশান্ত উচ্ছ্বাস? আমরা ত একেবারে অলস নই, একেবারে হৃদয়হীন নই; আমরা করিতে চাই, কেবল পথ দেখি না। "A mightier power than we can forfend has defeated our intent." আমাদের এই ব্যর্থ উদ্যম পরবর্ত্তী সময়ের লোকেরা কি বুঝিতে পারিবে? এই

জীবন ঢালিয়া দিবার ইচ্ছা, এত তিতিক্ষা, সবই নিরুক্ত থাকিবে? আপনি এই সব অব্যক্ত অভিলাষ স্ফুটিত করিয়াছেন। বৃহত্তর জীবন আপনার জীবনকে পরাস্ত ও অধিকার করিয়াছে।

আপনার অসমাপ্ত গল্পটি শেষ হইলে আপনার নিকট পুনরায় শুনিবার জন্য উৎসুক আছি। আপনি কবে কলিকাতা আসিবেন? আমরা আগামী কল্য কলিকাতা রওয়ানা হইব। আপনার নূতন দেশে আমার মন আকৃষ্ট থাকিবে। সুবিধা পাইলে আসিব।

আপনার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

(৪)

শুক্রবার

সুহৃদ্বরেষু—

আঁধারে আলোক দেখিতে গিয়া আমার আলোকে আঁধার হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দু'একটি নূতন কথা দেখা হইলে বলিব।

আপনারা (লোকেন এবং সুরেন) আশা করি রবিবার দিন সকালে চার টার সময় আসিবেন। এবার আপনার পালা।

যদি পারেন, তাহা হইলে সকালে ৮টার সময় প্রেসিডেন্সী কালেজ হইয়া আসিবেন। বঙ্কেন্-কলে একজন রোগী দেখিতে হইবে, তাহার পৃষ্ঠভঙ্গ হইয়াছে। আপনি বলিতে পারেন, এরোগ সাংঘাতিক নয়; কারণ এদেশে ম্যালেরিয়ার ন্যায় ইহা একরূপ সার্বজনিক হইয়াছে। আমিও একথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু ডাক্তার নীলরতন সরকারের কথা এড়াইতে পারিলাম না।

যদি কালেজ হইয়া আসিতে না পারেন তবে একেবারে ৮৫ নং এ ৯টার সময় আসিবেন। আমি সে সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।

আপনার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

সুবিধা হইলে চিঠির উত্তরে একখানা post card পাঠাইবেন। Pierre Lotiর নিকট ডাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম. আর লেফাফার উপর পোষ্টমাষ্টার-বাবুকে চিঠিখানা গন্তব্য স্থানে পাঠাইবার জন্য সানুনয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এপর্য্যন্ত চিঠির কোন উত্তর পাই নাই। বোধ হয় তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছেন।

(৫)

৮৫নং অপার সার্কুলার রোড।
২রা মার্চ্চ, ১৯০০।

সুহৃদ্বরেষু—

শুনিলাম, পরিবারের অসুখ বলিয়া আপনাকে শিলাইদহ যাইতে হইয়াছে। আশা করি, আপনাদের সর্ব্বথা কুশল। সেদিন লোকেনের সহিত কবিতা নির্ব্বাচন লইয়া অনেক কথা হইল। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে inartistic লোকেনের প্রিয় কোন কবিতা থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাহারা অতিমাত্রায় আধুনিকত্ব দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সেকেলে পুরাতন ও সরল, সকল art এর মূলে স্থিত, কতকগুলি স্নেহবৃত্তি ও স্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। জানি না কেন সে সব এত আকর্ষণ করে। লোকেন বলিল, আপনি তাহার নিকট unconditional আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। তাহা হইলে আর বলিবার কিছু নাই।

গত মঙ্গলবার দিন Belvedereএ গিয়াছিলাম। Sir J. Woodburn আমার জয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী সোমবার দিন Laboratory তে আসিয়া experiment দেখিবেন ও আমার ছাত্রদিগের কার্য্য দেখিবেন বলিয়া দিলেন। আপনারা আমার Paris Congressএ যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ দেখিয়া আমি সেকথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে সেকথা উল্লেখ করিলাম। Lt. Governor বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবেন, তবে এ বিষয় Secretary of State এর হাত।

গত সপ্তাহ আমার বিশেষ উৎসাহে গিয়াছিল, আর আজ কোন নূতন experiment আশাতীতরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই মূহূর্ত্তেই Directorএর নিকট হইতে পত্র পাইলাম যে—"I am informed

you had an interview with the Lt. Governor and have asked to be deputed to Paris Exn., to attend a meeting of European Scientists. May I ask you to inform me of the reasons for making your request to His Honor?"

এরূপ দুরাশা করিবার reason কি, ইহার explanation কি দিতে হইবে জানি না।

আমাদের কর্ম্মফল অনেক এবং অনেক দুরাশা আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে।

কতদূর মন সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে? কতদূর কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হইবে? ইহার শেষ কোথায়?

আপনি এসব শুনিয়া কষ্ট পাইবেন জানিয়াও না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন্ দিন কোন্ অপ্রত্যাশিত পতন আছে জানি না।

আর এক কথা। আপনারা আমার সম্বন্ধে যে interest লইয়াছেন তাহা আমার না জানিলেই ভাল হইত, কারণ এসম্বন্ধে information তলব হইলে আমার কি বলিতে হইবে জানি না। আর এক সময়ে যে অনেক কাজ করিবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা আমার দ্বারা যে হইবে এমন আশা করি না। অনেকগুলি বিষয়ের সূত্র ধরিয়াছিলাম; সে সবগুলি এখন পাক লাগিয়া গিয়াছে। সেগুলির পুনর্ব্বার উদ্ধার হইবে কিনা বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক আপনাদের স্নেহ স্মরণ থাকিবে এবং তাহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পুরস্কার।

আপনি ত্রিপুরা যাইতেছেন। মহারাজাকে আমার সসম্মান সম্ভাষণ জানাইবেন। আমি ছুটী পাইলে আসিতাম। ছুটী পাইলাম না। সেই crossএর একটি কল ত্রিপুরা পাঠাইব। আপনি মহারাজাকে দেখাইবেন।

আপনার

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

(৬)

কলিকাতা।

৬ই মার্চ্চ, ১৯০০।

সুহৃদ্বরেষু—

এ কয়দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম। এজন্য লিখিতে পারি নাই। আমি এ কয়দিন 'মেঘ ও রৌদ্রের' মধ্য দিয়া গিয়াছি। মেঘের মধ্যে রজতরেখা কখন কখন দেখা দিয়াছে। সেই যে চিঠি তলব হইয়াছিল, তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে L. G. অনেককাল হইতে আমার কার্য্যে একটু একটু উৎসাহ দান করিয়াছেন। এজন্য আমার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহার জন্য আমার নিবেদন জানাইয়াছি। ইতিমধ্যে Sir J. Woodburn আমার Laboratoryতে আমার experiment দেখিতে আসিয়াছিলেন। কি কারণে জানি না, বাজারে রাষ্ট্র যে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার নিকটও বিশেষ সন্তোষ ও experiment দেখিয়া আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করিলেন; এবং বলিলেন যে আমার ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্যই তিনি কতকগুলি scholarship সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আরও বলিলেন আমি যাহাকে মনোনীত করিব তাহাকে ১০০৲ টাকা করিয়া ৩ বৎসর বৃত্তি দিবেন। আমাদের Principal এসব দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়াছেন এবং আমার উপর একটু ভাল ভাব দেখাইয়াছেন। আর Director লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে 'তুমি আমার চিঠি ভুল বুঝিয়াছ'!!! 'Governor তোমাকে পারিস পাঠাইতে চান। এবিষয় report চাহিয়াছেন, এসম্বন্ধে তোমার সহিত আলাপ করিতে চাহি।' আজ গিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম বড় stiff এবং formal; তারপর excited হইয়া বলিলেন, যে 'এসব অতি আশ্চর্য্য, আমি আমার বন্ধু দু'একজনকে এসব দেখাইতে চাহি, কবে Laboratory তে আসিলে সুবিধা হইবে,' ইত্যাদি!

বড় উৎসাহিত দেখিলাম, আর এসব যে অতি important একথাও বলিলেন। তবে পারিস যাইবার কথা উঠিলে দেখিলাম পূর্ব্ব ভাব অল্প অল্প ফিরিয়া আসিতেছে। বলিলেন যে ইহার পরে গেলে হয় না? 'The only difficulty is that there is no one who can take up your work during your absence, the college will suffer', etc. আমি যে ইতিপূর্ব্বে গিয়াছিলাম এবং তখনও কালেজ একপ্রকার চলিয়াছিল, এ কথা জানা থাকিতেও যখন আপত্তি করিলেন, তখন আমি আর কি করিব? তারপর বলিলেন যে, send me

your letter of invitation from Paris and I will send a report। বলিতে লজ্জিত হইতেছি যে সেই নিমন্ত্রণ-পত্র অনেকদিন আমার পকেটে থাকিয়া সম্ভবত হয়ত ধোপাবাড়ী গিয়াছে—অন্ততঃ আমি খুজিয়া পাইতেছি না। এরূপ অবস্থা কিরূপ শোচনীয় মনে করিতে পারেন। আমি বলিলাম, 'যদি পাঁচ সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে পারেন, তবে নূতন একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র হাজির করিতে পারি।' কিন্তু সেই চিঠি এখন না হইলে নাকি চলিবে না। যাওয়ার কোন সম্ভব দেখিতেছি না।

গত Mailএ আমার Royal Societyর এক Paper ছাপা হইয়া আসিয়াছে। Electricianকে সেই কাগজের একখানা copy পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহার কাগজে লিখিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছিলাম। ভয় ছিল যে ইহাতে editor দুঃখিত হইবেন। নিম্নলিখিত extract হইতে বুঝিবেন যে তাহারা generous হইতে পারে।

'I am delighted with the most interesting and lucid abstract of your Royal Society Paper. The subject is of such extreme interest, both scientifically and practically, at the present time, that I hope to be able to give prominence to the abstract at an early issue. I am writing to the Secretaries of the Royal Society to obtain their sanction to the publication of your abstract.

'I sincerely trust that your energetic effort to improve the physical department of the Presidency College is meeting with great success. I hope that the authorities are more favourably disposed than heretofore, to the extension of higher Science teaching. Should there be any matter which it would be of utility to publish in the '*Electrician*', I should be very pleased if you will let me have early information about it.'

আমি সম্প্রতি একটি অত্যাশ্চর্য্য কৃত্রিম চক্ষু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই চক্ষে অনেক আলো দৃষ্ট হয় যাহা আমরা দেখিতে পাই না। তা ছাড়া ইহা রক্তিম ও নীল আলো অতি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা slightly green-blind। আপনার চক্ষু ইহা কি করিয়া অনুকরণ করিল বুঝিতে পারি না।

আমার দৃষ্টি সম্বন্ধে theory র যাহা একটু অসম্পূর্ণতা ছিল এই কৃত্রিম চক্ষু তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবে। ইহার আশ্চর্য্য developement হইতে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। তবে তাহা সম্পূর্ণ করিতে সময় পাইব কিনা জানি না।

আমার শরীর মন একটু অবসন্ন আছে। আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সুখী হইব। আপনি যদি শিলাইদহে থাকেন তবে শুক্রবার দিন রাত্রে এখান হইতে রওয়ানা হইব। শনিবার দিন সকালে পৌছিব। রবিবার দিন বৈকালে ফিরিয়া আসিব। সোমবার দিন যদি ছুটী পাই তাহা হইলে আর একদিন থাকিব। যা যা করিয়াছি, আপনাদের ওখানকার শান্তির মধ্যে থাকিয়া লিখিয়া লইব।

যদি শুক্রবার দিন না আসিতে পারি তবে Telegram করিব। নতুবা শুক্রবার দিন আসাই স্থির। যদি পারেন তবে এক লাইন লিখিবেন।

আপনার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

পুঃ। দুজন Scholar নিযুক্ত করিয়াছি।

(৭)

কলিকাতা।
১৬ই মার্চ্চ, ১৯০০।

সুহৃৎ—

আপনার চিঠি ও পুস্তক পাইলাম। সেই লেখাটি ইতিমধ্যে পড়িয়াছি। পরে দীর্ঘ চিঠি লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখনই দুএক কথা লিখিতেছি।

আপনার লেখাতে অনেক বিজ্ঞান-সম্মত মত দেখিলাম। Sympathetic vibration কতদূর পাঠান যাইতে পারে তাহা বলা যায় না। এতদিন জড় জগতে এই নিয়ম আবদ্ধ ছিল, কিন্তু আমার নূতন কার্য্যে জানিতেছি যে চেতন ও অচেতনের মধ্যে রেখা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। আমার নিকট অনেকবার শুনিয়া থাকিবেন যে এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবির্ভূত হন নাই; কারণ যত দিন একাধারে এই দুই জ্ঞানের সমাবেশ না হইবে, ততদিন উভয়ই অসম্পূর্ণ

থাকিবে। তবে কবির জ্ঞান যতই সীমাহীন হইবে, যতই বিস্তারিত হইবে, কবিত্ব ততই অনন্তকালের হইবে। এসম্বন্ধে পরে কথা হইবে।

আমি এই দুই দিন অতি সুখে কাটাইয়াছি। আপনারা যদি আমার আসাতে কিঞ্চিন্মাত্র উৎকণ্ঠিত না হইয়া আপনাদেরই বাড়ীর একজন বলিয়া মনে করেন (এবং এইবার যেন তাহা বোধ করিয়াছি) তাহা হইলে যখন তখন আসিব। বন্ধুজায়ার অমায়িক ব্যবহারে অতিশয় সুখী হইয়াছি, এবং আপনাদের স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন, সহরের গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া পুত্রকন্যা-পরিবেষ্টিত হইয়া, নীরবে অথচ কর্ম্মঠভাবে যেরূপ কাটাইতেছেন, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। আর সেই সুন্দর নদী, বালুচর, পল্লীগ্রাম ইত্যাদিতে আমার একরূপ নেশা জন্মিয়াছে। জানি না, স্বভাবের আকর্ষণে জীবন ছাড়িয়া দেওয়া উচিৎ কিনা।

দেখিবেন, সদরের অনুগ্রহে যেন আমি অন্দরের বিরাগভাজন না হই।

লেখার জন্য আমার উপর বিশেষ তাড়া। আমি বলিয়াছি যদি আমার গৃহিণী আগামী বারে আমার সহিত শিলাইদহে উপস্থিত হন, তাহা হইলে যতদিন থাকিব ততদিন মুকুলের জন্য আপনার একএকটি লেখা পাঠাইব। Journalistic instinct অতিশয় প্রবল দেখিতেছি; বিশেষতঃ শ্রীযুক্তা সরলা দেবী নির্ব্বাপিত অগ্নিতে ইন্ধন দিয়া গিয়াছেন।

আমার কার্য্যে আরও কতকগুলি নূতন সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু the spirit is willing but the flesh is weak; পরিশ্রমে একেবারে শ্রান্ত হইয়াছি। University হইতে আমার নাম নাকি পারিস্ যাইবার জন্য উঠিয়াছিল; কিন্তু প্রভুদের তাদৃশ ইচ্ছা নাই। Lt. Governorএর এখনও ইচ্ছা দেখিতেছি। তবে অনেক প্রতিবন্ধক হইবে। বলিতে পারিনা কি হয়।

আপনার

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

(৮)

কলিকাতা
১লা বৈশাখ

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। এখানে চারিদিকের গোলমালে মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে, আপনার চিঠি পাইয়া আপনার উন্মুক্ত দেশের কথা মনে হইল। বিস্তৃত আকাশ, নদী ও সাদা বালুর চর, এসব মিলিত সুখের ছবি আমার চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে। কখনও মনে হয়, আপনাদের ওখানে কোন নদীশাখার তীরে একখান ঘর বাঁধিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া বাস করি।

সেদিন আশানুরূপই ফল পাইয়াছিলাম। আমার আসিবার কয়েক ঘণ্টা পরে আমার চিঠিখানা এখানে পৌঁছে। আমার গৃহিণী পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, ভৃত্যরাও নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল (তখন সাড়ে সাত টা), আপনাদের আবহাওয়ার গুণে আমার বিলক্ষণ ক্ষুৎ-পিপাসা হইয়াছিল; যাহা হোক উপবাস করিতে হয় নাই। পরে আমাকে, টেলিগ্রাফ কেন করি নাই, এজন্য জবাবদিহি দিতে হইয়াছিল। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছি যে, শিলাইদহে টেলিগ্রাফ আফিস নাই। কোনরূপ সত্যের অপলাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব না, কিন্তু এসম্বন্ধে যদি কিছু অনুসন্ধান হয়, তবে দেখিবেন যাহাতে আমার মান বজায় থাকে!

প্রজাপতিগুলি এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। গত শনিবার হইতে প্রত্যহ গুটিগুলিকে নাড়িয়া দেখিতেছি, ভিতরে যেন পূর্ণতর হইয়া আসিতেছে। আশঙ্কা হয় এত ঘন ঘন কম্পনে কীটের প্রাণবায়ু হয়ত বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও একরূপ নিশ্চিন্ত হইতাম, কারণ যে এরণ্ড বৃক্ষের কথা বলিয়াছিলাম তাহার পাতাগুলি একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষের সময় সহসা প্রজাবৃদ্ধি মনে করিয়া ভীত আছি। বিশেষতঃ লরেন্স সাহেবের নিকট আমি কি করিয়া মুখ দেখাইব জানি না।

আপনার

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

পুঃ। আপনার সেই দুইটি গল্প কি শেষ হইয়াছে? প্রথমটি বৃহদাকারে প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

(৯)

139 Dhurrumtalla Street.
১৮ই এপ্রিল, ১৯০০।

সুহৃৎ—

আসিবার দিন সুন্দর জ্যোৎস্না ছিল। আপনাদের দেশ ও এদেশে অনেক প্রভেদ।

আপনার লেখা গল্প মাঝে-মাঝে পাঠাইবেন। প্রথম কয়টা দিন আপনি ফাঁকি দিয়াছেন। অন্ততঃ সে কয়টা গল্প আমার পাওনা আছে।

সুরেনকে বলিবেন যে ভেক বলির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। এ কয়মাস ধরিয়া যাহা করিয়াছিলাম, এবারকার Natureএ দেখিলাম যে Royal Societyতে Dr. Waller "On the Electric Current in the Frog's Eye Produced by Light" সম্বন্ধে প্রবন্ধ শীঘ্রই পাঠ করিবেন। ইহাকেই বলে চক্ষুস্থির!

আমার ক্ষুদ্র বন্ধুর খবর দিবেন।

এবার আমেরিকা হইতে —বাবুর একখানা চিঠি দেখিলাম। তাঁহার সহিত নিবেদিতার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছে। —বাবু এবং নিবেদিতা Mrs. Bull এর বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। সেখানে —বাবু বিবিধ প্রকার pleasant কথাই বলিতেছিলেন, কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ! সেখানে একটি meetingহয়, তাহাতে নিবেদিতা জাতিভেদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন, —বাবু চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নিবেদিতার মনে হইল যে, ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানে না এবং বিবেকানন্দ-স্বামীর প্রতি তাহাদের ভক্তি অপরিমিত নহে। অমনি বলিলেন, "আমি জানি যে এই meetingএ একজন আছেন যিনি জাতিভেদ মানেন না এবং সনাতন ধর্ম্মের উপর যাহার আস্থা নাই।" তাহার পর —বাবুকে রণং দেহি বলিয়া challenge করিলেন। এইরূপ আকস্মিকরূপে আক্রান্ত হইয়া —বাবু বলিলেন যে, জাতিভেদের অনেক সদ্ গুণ আছে। তবে কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। It keeps down men of genius; for example, Swamiji could not have had so much influence যদি জাতিভেদ থাকিত, ব্রাহ্মণের আধিপত্যে নিম্নজাতির উত্থান দুরূহ হইত। আর কোথা যায়! মনে করিতে পারেন (বিবেকানন্দ) স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ কথা! অমনি এক scene। পরিশেষে ঘোরতর ঘৃণার সহিত নিবেদিতা বলিলেন যে, ব্রাহ্মরা হিন্দুও নহে, খৃষ্টানও নহে, আর —বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মৎস্যও নহ, মাংসও নহ!!!!"

আপনাকে সমস্যা দিতেছি; —বাবু তবে কি?

সে যাহা হউক, এরূপ অসাধারণ ভক্তি অতি দুর্ল্লভ।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

(১০)

কলিকাতা
৮ই জুন, ১৯০০

সুহৃৎ—

আপনার পৌঁছতত্ত্ব পাই নাই। ভাল আছেন ত? আমার বিদেশযাত্রার আর কিছু সংবাদ এখনও পাই নাই।

সেই Theoryর নূতন নূতন অর্থ দেখিতেছি। সংকেতে ২।১ টি লিখিতেছি, 'পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু'চার দিবসে'; আপনার বুঝিতে ১৭ মিনিটও লাগিবে না।
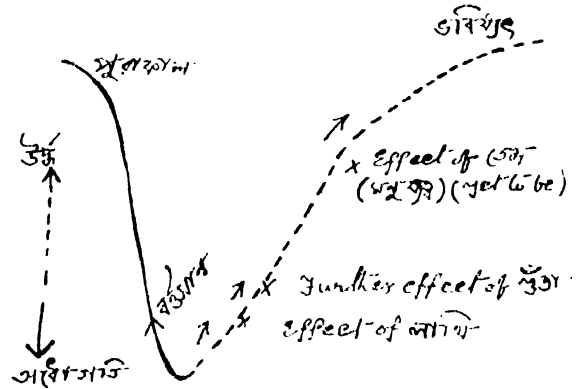
Curve of Our National Condition.
["পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা"।]

এই Theory অতিশয় পুরাতন। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন। কিন্তু he was in advance of the time। সুতরাং রূপকে এই মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু
[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ভিক্ষু আনন্দ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

আনন্দ গোতম বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য এবং অনুচর ছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে ইঁহার স্থান অতি উচ্চ। আমরা অদ্য এই মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

শুদ্ধোদনের এক ভ্রাতার নাম শুক্লোদন; আনন্দ এই শুক্লোদনের পুত্র। সুতরাং আনন্দ গোতমের পিতৃব্যপুত্র। ইনি গোতমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর গোতম পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রথম কুড়ি বৎসর ইঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট অনুচর ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষু ইঁহার পরিচর্য্যা করিত।

যখন গোতমের বয়স পঞ্চান্ন বৎসর, তখন তিনি একদিন ভিক্ষুগণকে বলিলেন—'এতদিন নানা ভিক্ষু আমার পরিচর্য্যা করিয়াছে। এখন আমার বয়স অধিক হইয়াছে। ভিক্ষুগণের মধ্যে কি এমন কেহ নাই যে নিত্য আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারে?'

সারিপুত্র বলিলেন, 'আমি ভগবানের অনুচর হইতে ইচ্ছা করি'। গোতম তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। ইঁহার পরে প্রধান প্রধান শিষ্য সকলেই ঐ প্রকার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রহণ করিলেন না। আনন্দ ঐ সময়ে নীরবে একপ্রান্তে উপবেশন করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'আনন্দ, যাও, ভগবানের নিকট যাও, অনুচর হইবার জন্য প্রার্থনা কর।' গোতম বলিলেন, 'না, না, ওভাবে তোমরা আনন্দকে উত্তেজিত করিও না: আনন্দ কি করিতে চাহে, তাহা আনন্দই ভাল জানে।'

তবুও ভিক্ষুগণ আনন্দকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন আনন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—'ভগবান্ যদি আমার ৮টী প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তবে আমি ভগবানের অনুচর হইব।

(১) ভগবান্ আমাকে সুন্দর বস্ত্র অর্পণ করিবেন না।

(২) লোকে ভগবান্‌কে যে খাদ্য অর্পণ করিবে, তাহার অংশ আমি গ্রহণ করিব না।

(৩) আমার জন্য স্বতন্ত্র কুটীর নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না।

(৪) ভগবান্‌কে যখন কেহ নিমন্ত্রণ করিবে, আমি সে নিমন্ত্রণে ভোজন করিব না।

(৫) আমি যে স্থলে নিমন্ত্রিত হইব, ভগবান্‌ও সেই স্থলে গমন করিবেন।

(৬) যাঁহারা ভগবানের দর্শনাভিলাষী হইয়া আগমন করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইতে পারিব।

(৭) আমার যখন মন চঞ্চল হইবে, বা কিছু জ্ঞাতব্য থাকিবে, তখন আমি ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইতে পারিব।

(৮) ভগবান্ পূর্ব্বে একবার যে উপদেশ দিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ তাহার পুনরুক্তি করিবেন।'

ভগবান্ বলিলেন—'আনন্দ, আমি তোমার এই আটটি প্রার্থনাই পূর্ণ করিব।'

এই সময় হইতে আনন্দ পঁচিশ বৎসর ছায়ার ন্যায় বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন।

উপযুক্ত অনুচরই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আনন্দ ছিলেন নিরীহ, নিঃস্বার্থ, কর্ম্মদক্ষ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রকৃতি ছিল অতি মধুর।

কোমল প্রকৃতি

মহা পরিনির্ব্বাণের কিছু দিন পূর্ব্বে আনন্দ বিহারে প্রবেশ করিয়া 'কপি-শীর্ষ' অবলম্বন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছিলেন—

"আমি এখনও শিক্ষার্থী, এখনও আমার অনেক

করণীয় আছে। যিনি আমাকে অনুকম্পা করেন, যিনি আমার শিক্ষক, তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।"

আনন্দকে না দেখিয়া ভগবান্ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আনন্দ কোথায়?' তখন তাঁহারা সমুদায় ঘটনা বলিলেন। ইহা শুনিয়া ভগবান্ একজন ভিক্ষুকে আনন্দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আনন্দ যখন নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

বুদ্ধের প্রশংসাবাণী

এই সময়ে বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"হে আনন্দ! বহুকাল তুমি মৈত্রীপরিপূর্ণ, হিতকর, সুখকর, অদ্বয় এবং অপরিমিত কার্য্য, বাক্য এবং চিন্তা দ্বারা তথাগতের সমীপে বাস করিয়াছ। তুমি কৃতপুণ্য হইয়াছ।" মহাপরিঃ ৫।১৩,১৪।

ইহার পরে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ! আনন্দ পণ্ডিত এবং মেধাবী। তথাগতকে দর্শন করিবার জন্য কখন ভিক্ষুগণের উপযুক্ত সময়, কখন ভিক্ষুণীগণের, এবং কখন উপাসক, বা উপাসিকা, বা রাজা, বা রাজার প্রধান অমাত্য, বা অপর সম্প্রদায়ের নেতৃগণের বা অপর সম্প্রদায়ের শ্রাবকগণের উপযুক্ত সময়, আনন্দ তাহা জানে।

"হে ভিক্ষুগণ! আনন্দের চারিটী আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত গুণ। কোন্ চারিটি?

"যদি ভিক্ষুগণ আনন্দকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহারা তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হয়, যখন আনন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে, তাহারা তাহা শুনিয়া আনন্দিত হয়; আর যদি আনন্দ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করে, তবে তাহারা অতৃপ্ত হয়।

"এইরূপ যদি ভিক্ষুণীগণ…উপাসকগণ…উপাসিকাগণ আনন্দকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহারা আনন্দকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, আনন্দ যখন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে, তাহা তাহারা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হয়, আর আনন্দ যখন তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করে, তখন তাহারা অতৃপ্ত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, রাজচক্রবর্ত্তীর চারিটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ। যখন (১) ক্ষত্রিয়গণ, (২) ব্রাহ্মণগণ, (৩) গৃহপতিগণ বা (৪) শ্রমণগণ রাজচক্রবর্ত্তীকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, তিনি যখন কথা বলেন, তখন তাহারা সেই কথা শুনিয়া আনন্দিত হয়, এবং তিনি যখন তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করেন, তখন তাহারা অতৃপ্ত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ! আনন্দেরও এই প্রকার চারিটি গুণ।"

মহাপঃ ৫।১৬।

ভিক্ষুণীসম্প্রদায়

আনন্দের কথা বলিতে হইলেই ভিক্ষুণীসম্প্রদায় সংগঠনের কথা বলিতে হয়। মহাপ্রজাপতী গোতমী গোতমের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'নারীগণকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অনুমতি দেওয়া হউক।' গোতম তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। ইহার পরে একদিন মহাপ্রজাপতী কেশ ছিন্ন করাইয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, বহু শাক্যনারী সহ গোতমের বিশ্রাম-কাননে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদ স্ফীত হইয়াছিল, গাত্র ধূলিপূর্ণ হইয়াছিল, চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল, এইভাবে তিনি বহির্ভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন।

আয়ুষ্মান্ আনন্দ এই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হে গোতমি! তুমি কেন এই অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছ?"

গোতমী বলিলেন—

"নারীগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন, ইহাতে ভগবান্ অনুমতি দেন নাই।"

আনন্দ বলিলেন:—

"গোতমি! তুমি মুহূর্ত্ত কাল এই স্থলে অপেক্ষা কর, আমি ভগবান্‌কে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্ সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে অবস্থিতি করিলেন। তদনন্তর ভগবান্‌কে বলিলেন—

"মহা প্রজাপতী গোতমী স্ফীতপদে ধূলিপূর্ণ-গাত্রে, দুঃখী, দুর্মনা ও অশ্রুমুখী হইয়া বহির্ভাগে দ্বারকোষ্ঠ-প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কারণ ভগবান্ নারীগণকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে অনুমতি দেন নাই। এবিষয়ে ভগবান্ যদি অনুমতি দেন, ভাল হয়।"

ভগবান্ বলিলেন—

"আনন্দ! এ বিষয়ে তোমার অভিরুচি না হউক।'

আনন্দ দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার ঐপ্রকার বলিলেন, কিন্তু ভগবান্ ঐ একই উত্তর দিলেন।

তখন আনন্দ মনে মনে চিন্তা করিলেন—"ভগবান্ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইহাদিগকে অনুমতি দিলেন না, আমি অন্য কারণে অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারি।" এই রূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভগবান্‌কে বলিলেন—

"নারীগণ যদি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তবে তাঁহারা কি স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃতাগামি-ফল, অনাগামি-ফল এবং অর্হত্ত্ব-ফল লাভ করিতে সমর্থ হন্ না?"

আনন্দ যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার একটুকু ব্যাখ্যা আবশ্যক। বুদ্ধ সাধনমার্গকে স্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যিনি এই স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার নাম স্রোতাপন্ন; তাঁহার অবস্থার নাম স্রোতাপত্তি। সাধনের ইহাই প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থার সাধকের নাম সকৃতাগামী; সকৃতাগামী সাধককে পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তৃতীয় অবস্থার সাধকের নাম 'অনাগামী'; ইহাকে আর পৃথিবীতে আগমন করিতে হয় না। যিনি চতুর্থ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার নাম 'অর্হৎ'। ইনিই নির্ব্বাণ লাভ করেন।

নারীগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে তাঁহারা এই চারিটি অবস্থা লাভ করিতে পারিবেন কিনা এবং এই চারি অবস্থার ফল প্রাপ্ত হইবেন কি না—ইহাই আনন্দের প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন, "আনন্দ, ইহারা এই সমুদায় ফল লাভ করিতে সমর্থ।"

তখন আনন্দ বলিলেন, "মাতৃজাতি যখন এইপ্রকার ফললাভে সমর্থ, এবং মহাপ্রজাপতী গোতমী যখন ভগবানের মাতৃস্বসা এবং জননীর মৃত্যুর পরে যখন তিনি ভগবান্‌কে পালন করিয়াছিলেন এবং শুন্যদুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন, তখন মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অনুমতি দিলে ভাল হয়।"

আনন্দের অনুরোধ যে কেবল যুক্তিপূর্ণ তাহা নহে, ইহা হৃদয়স্পর্শী। ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—

"আনন্দ! মহাপ্রজাপতী গোতমী যদি আটটি 'গুরুধর্ম্ম' প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে উপসম্পদা (অর্থাৎ দীক্ষা) দিতে পারি।"

ইহার পরে আনন্দ মহাপ্রজাপতীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"এই আটটি প্রধান নিয়ম প্রতিপালন করিতে আমি প্রস্তুত।"

ইহার পর তাঁহাকে ভিক্ষুণীরূপে গ্রহণ করা হইল। মহাপ্রজাপতীই প্রথম ভিক্ষুণী। এইরূপে ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। (বিনয় পিটক, চুল্লবগ্‌গ ১০, অঙ্গুত্তর নিকায় ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪-২৭৯)।

নির্ব্বাণ লাভের জন্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন প্রকৃষ্ট উপায় কিনা এবং নারীগণের এই প্রব্রজ্যা অবলম্বন উচিত কিনা—আমরা এসমুদায় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইতেছি না। তবে আনন্দ মনে করিতেন 'প্রব্রজ্যা' আবশ্যক এবং প্রব্রজ্যাবলম্বন করিলে নারীগণ যখন 'অর্হত্ত্ব' লাভ করিতে পারে, তখন তাহাদিগকেও ঐ অধিকার দেওয়া আবশ্যক। আনন্দ সাহায্য না করিলে মাতৃজাতি এই অধিকার পাইতেন কিনা সন্দেহ।

আনন্দ ও উদেন

এক সময়ে আনন্দকে কৌশাম্বী নগরীতে গমন করিতে হইয়াছিল। সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া তিনি এক বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উদেন রাজার অন্তঃপুরস্থ নারীগণ সেই স্থলে গমন করিলেন, এবং আনন্দের উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহারা আনন্দকে পাঁচ শত খানা বস্ত্র প্রদান করিলেন।

রাজা এই বস্ত্রদানের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন—

'শ্রমণ আনন্দ এত বস্ত্র লইয়া কি করিবে? বস্ত্র লইয়া বাণিজ্য করিতে যাইবে, না, বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলিবে?'

ইহার পরে তিনি নিজেই আনন্দের নিকটে গমন করিয়া নারীগণের আগমনের কথা উত্থাপন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁহারা কি কিছু উপহার দিয়াছেন?" আনন্দ বলিলেন, "তাঁহারা পাঁচ শত বহির্ব্বাস দান করিয়াছেন।" তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি পাঁচ শত বহির্ব্বাস দ্বারা কি করিবেন?"

আনন্দ বলিলেন—"মহারাজ, যে সমুদায় ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিব?"

রাজা। পুরাতন জীর্ণ চীবর দ্বারা কি করিবেন?

আনন্দ। এ সমুদায় দ্বারা উত্তরাস্তরণ (সম্ভবতঃ বালিশের ওয়াড়) করিব।

রাজা। পুরাতন উত্তরাস্তরণ দ্বারা কি করিবেন?

আনন্দ। বালিশের খোল করিব।

রাজা। পুরাতন বালিশের খোল দ্বারা কি করিবেন?

আনন্দ। ভূমির আস্তরণ করিব।

রাজা। পুরাতন ভূমির আস্তরণ দ্বারা কি করিবেন?

আনন্দ। পাদপুঞ্ছনী (অর্থাৎ পা পুঁছিবার কাপড়) করিব।

রাজা। পুরাতন পাদপুঞ্ছনী দ্বারা কি করিবেন?

আনন্দ। রজোহরণ (অর্থাৎ ঝাড়ন) করিব।

রাজা। পুরাতন রজোহরণ দ্বারা কি করিবেন?

আনন্দ। পুরাতন রজোহরণ কর্ত্তন করিয়া সেই সমুদায়কে মৃত্তিকার সহিত মর্দ্দন করিব এবং তাহা দ্বারা প্রাঙ্গণ লেপন করিব।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সমুদায় বস্তুরই সদ্ব্যবহার করেন, কোন বস্তুরই অপচয় করেন না।"

ইহার পরে তিনি আনন্দকে আরও পাঁচ শত খানা বস্ত্র প্রদান করিলেন।

আনন্দ ও ভিক্ষুসঙ্ঘ

বুদ্ধ মহাকশ্যপকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বলিয়া মনে করিতেন। সম্ভবতঃ এই জন্যই বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পরে ভিক্ষুগণ তাঁহাকেই নেতৃরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় তাঁহার উপদেশসমূহ মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পরে সকলেরই মনে হইল যে তাঁহার উপদেশসমূহ সংগ্রহ করা আবশ্যক এবং সংগ্রহ করিয়া সম্মিলিত ভাবে সেই সমুদায় কীর্ত্তন করাও আবশ্যক। ভিক্ষুগণ মহাকশ্যপকে এই কার্য্যের জন্য ভিক্ষু নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে চারি শত নিরানব্বই জন নির্ব্বাচিত হইল। কিন্তু তিনি আনন্দকে নির্ব্বাচন করিলেন না। ইহা দেখিয়া ভিক্ষুগণ মহাকশ্যপকে বলিলেন :—

"আয়ুষ্মান্ আনন্দ এখনও অর্হত্ত্ব লাভ করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি আসক্তি, দ্বেষ, মোহ, বা ভয়বশতঃ বিপথে গমন করিতে পারেন না এবং তিনি ভগবানের নিকটে থাকিয়া ধর্ম্ম ও বিনয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং আয়ুষ্মান্ আনন্দকেও নির্ব্বাচন করা হউক।"

তখন মহাকশ্যপ আনন্দকেও নির্ব্বাচন করিলেন।

এই সময়ে বুদ্ধের উপদেশকে দুইভাগে ভাগ করা হইত। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের আচার ব্যবহারের জন্য যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম তাহাকেই 'বিনয়' নাম দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতামত এবং ধর্ম্মজীবন গঠন করিবার জন্য যে উপদেশ তাহার নাম "ধর্ম্ম"।

উপালি 'বিনয়' বিষয়ে এবং আনন্দ 'ধর্ম্ম' বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ছিলেন। এই জন্য ইঁহাদিগকেই প্রশ্ন করিয়া ঐ ঐ বিষয়ে বুদ্ধের মতামত স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

আনন্দকে নিগ্রহ

এই সময়ে মহাকশ্যপপ্রমুখ ভিক্ষুগণ আনন্দকে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। যে যে বিষয়ে তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া মনে করা হইয়াছিল তাহা এই—

মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ আনন্দকে বলিয়াছিলেন—সঙ্ঘ যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে ক্ষুদ্র ও অনুক্ষুদ্র নিয়মসমূহ বর্জ্জন করিতে পারিবে। কোন্ কোন্ বিধি ক্ষুদ্র ও অনুক্ষুদ্র আনন্দ তাহা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। এখন মহাকশ্যপপ্রমুখ ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিলেন,

"আবুষ আনন্দ! তুমি ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা ক

নাই—ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিধি কি। তুমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। তুমি অপরাধ স্বীকার কর।"

ইহাতে আনন্দ বলিলেন, "ভুলক্রমে আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে আমি ইহা মনে করি না। তবে আপনাদিগকে শ্রদ্ধা করি, এইজন্য আপনাদিগের কথাতেই বলিতেছি আমার অপরাধ হইয়াছে।"

অপরাপর অভিযোগ এই :—

এক সময়ে আনন্দ বুদ্ধের জন্য বর্ষাকালের বস্ত্র সেলাই করিয়াছিলেন। কিন্তু সেলাই করিবার সময় কাপড়ের এক ধার পায়ের নীচে রাখিয়া সেলাই করিতে হইয়াছিল। এই তাঁহার দ্বিতীয় অপরাধ।

বুদ্ধের মৃত্যুর পরে স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের দেহ দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই তৃতীয় অপরাধ।

এক সময়ে বুদ্ধ আনন্দকে বলিয়াছিলেন যে, সিদ্ধপুরুষগণ এবং তথাগত যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এককল্প এই পৃথিবীতেই থাকিতে পারেন। এ সময়ে আনন্দ প্রার্থনা করেন নাই যে "ভগবান্ দেব-মানবের হিতাকাঙ্ক্ষায় এককল্প জীবন ধারণ করুন।" কিন্তু মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে আনন্দ তিন বার তাঁহার নিকট ঐ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ অবশ্য এ প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই, প্রত্যুত বলিয়াছিলেন—"প্রথমে আমি যখন ঐ প্রকার বলিয়াছিলাম তখন যদি প্রার্থনা করিতে, তথাগত তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন।" এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিলেন—যথা সময়ে ঐ প্রকার প্রার্থনা করা উচিত ছিল, তুমি তাহা কর নাই। ইহা আনন্দের চতুর্থ অপরাধ।

আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধদেব মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের মতে আনন্দের পক্ষে এই প্রকার অনুরোধ করা অন্যায় হইয়াছিল। ইহা আনন্দের পঞ্চম অপরাধ।

এই সমুদয় ঘটনা এক একটি করিয়া উল্লেখ করিয়া ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "তুমি অপরাধ করিয়াছ, অপরাধ স্বীকার কর"।

প্রত্যেক ঘটনার বিষয়েই আনন্দ এক একটি কারণ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ইহাতে কোন অপরাধ দেখিতেছি না। তবে আপনাদিগকে শ্রদ্ধা করি, সেইজন্য আপনাদিগের কথাতে অপরাধ স্বীকার করিতেছি।"

আনন্দ ও মহাকশ্যপ

গোতমের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পরে মহাকশ্যপ ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অবশ্যই অনেক গুণ ছিল, গোতম নিজেও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তিনি আনন্দের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহা প্রীতিকর নহে। নিম্নে তদ্বিষয়ক দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১)

এক সময়ে মহাকশ্যপ জেতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন পূর্ব্বাহ্ণে আনন্দ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত কশ্যপ! আসুন, ভিক্ষুণীদিগের এক আশ্রমে গমন করা যাউক।"

কশ্যপ বলিলেন,

"আবুষ আনন্দ! তুমিই যাও, তোমার বহু কার্য্য, তোমার বহু করণীয়"।

আনন্দ দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন, তাহাতেও কশ্যপ ঐ উত্তরই দিলেন।

তৃতীয়বার অনুরোধ করিবার পর কশ্যপ আর আপত্তি করিলেন না। কশ্যপ অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং আনন্দ তাঁহার পশ্চাতে অনুগমন করিলেন। ভিক্ষুণীদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কশ্যপ তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং তাহার পরে উভয়েই প্রস্থান করিলেন।

'থুল্লতিস্‌সা' নামিকা একজন ভিক্ষুণী ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কশ্যপ-বিষয়ে এই প্রকার সমালোচনা করিয়াছিলেন—"আর্য্য আনন্দ 'পণ্ডিত মুনি'; তাঁহার সম্মুখে আর্য্য কশ্যপ ধর্ম্মোপদেশ দেন! সূচীবণিক সূচী বিক্রয় করেন সূচীকারকে!"

এই কথা কশ্যপের কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—

"আবুষ আনন্দ! আমি সূচীবণিক, তুমি সূচীকার; না, তুমি সূচীবণিক, আমি সূচীকার?"

আনন্দ বলিলেন—

"ভদন্ত কশ্যপ! মাতৃজাতি অবোধ, ক্ষমা করুন।"

কিন্তু কশ্যপ ইহাতে শান্ত হইলেন না; বরং আনন্দের চরিত্র-বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "দেখ, আবুস আনন্দ! সঙ্ঘ যেন তোমাকে লইয়া আর আলোচনা না করে।"

এস্থলে বলা যাইতে পারে আনন্দের বয়স তখন প্রায় সত্তর বৎসর কিংবা তদূর্দ্ধ।

ইহার পরে কশ্যপ নিজের গুণগরিমা ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিলেন—

"আমার যে ছয়টী 'অভিজ্ঞা', তাহা কি কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? হস্তীকে এক তালপত্র দ্বারা লুকান যায় না" (সংযুত্ত নিকায়, ১৬।১০, কশ্যপ সং)।

(২)

কশ্যপ যখন নেতা, তখন নিম্নলিখিত ঘটনাও ঘটিয়াছিল।

এক সময়ে আয়ুষ্মান্ আনন্দ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সহ দক্ষিণাগিরিতে বিচরণ করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ত্রিশ জন অল্পবয়স্ক শিষ্য বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া সংসার-পথে চলিয়া যায়। ইহার পরে আনন্দ একদিন মহাকশ্যপের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আনন্দকে দেখিয়া কশ্যপ বলিলেন—"তুমি কেন এই নূতন ভিক্ষুদিগকে লইয়া বিচরণ কর? ইহারা জিতেন্দ্রিয় নহে, ইহাদের জীবন উদ্যমশীল নহে। আমার মনে হয়, তুমি শস্য-ঘাতী। তুমি কুলের উপহন্তা। তোমার নূতন শিষ্যগণ চলিয়া যাইতেছে, খসিয়া পড়িতেছে।"

ইহার পরে আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"এ বালকটা নিজের মাত্রা জানে না।"

ইহা শুনিয়া আনন্দ বলিলেন, "ভদন্ত কশ্যপ! আমার মস্তক পলিত-কেশ হইয়াছে; এ বয়সেও আয়ুষ্মান্ মহা-কশ্যপ আমাকে 'বালক' বলিলেন। তবে ইহাতে আমার মনে ক্রোধ হইল না।"

ইহার পরে কশ্যপ আবার বলিলেন—"এ বালকটা নিজের মাত্রা জানে না।"

কিন্তু 'থুল্ল-নন্দা' নামিকা এক ভিক্ষুণী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল—এবং এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিল—"আর্য্য মহাকশ্যপ ছিলেন পূর্ব্বে বিধর্ম্মী, আর আর্য্য আনন্দ 'পণ্ডিত-মুনি'; ইহাকে তিনি বলেন বালক!"

এই কথা কশ্যপের শ্রুতিগোচর হইল। তখন তিনি আনন্দের নিকট থুল্ল-নন্দার সমালোচনা করিলেন এবং অতি বিস্তৃতভাবে আত্মমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। সর্ব্ব শেষে বলিলেন—"আমার যে ছয় অভিজ্ঞা, তাহা কি কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? এক তালপত্র দ্বারা হস্তীকে লুকান যায় না" (সংযুত্ত নিকায়, ১৬।১১; কশ্যপ সং)।

আনন্দের উক্তি

থেরগাথার একটি অধ্যায় আনন্দ-রচিত। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

যে ব্যক্তি অল্পশ্রুত, সে বলীবর্দ্দের ন্যায় বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার মাংস বর্দ্ধিত হয়, প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত হয় না।১০২৫।

যে বহুশ্রুত ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া অল্পশ্রুত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে,আমার মনে হয়, সে প্রদীপধারী অন্ধের ন্যায়।১০২৬।

পঁচিশ বৎসর আমি শিক্ষার্থীরূপে রহিয়াছি, আমার প্রাণে কামনার উৎপত্তি হয় নাই। ধর্ম্মের সুধর্ম্মতা দেখ।১০৩৯।

২৫ বৎসর আমি শিক্ষার্থীরূপে রহিয়াছি, আমার প্রাণে দ্বেষের উৎপত্তি হয় নাই। ধর্ম্মের সুধর্ম্মতা দেখ।১০৪০।

২৫ বৎসর মৈত্রীপরিপূর্ণ কার্য্য সহ নিত্যানুগামিনী ছায়ার ন্যায় ভগবানের অনুগমন করিয়াছি।১০৪১।

২৫ বৎসর মৈত্রীপরিপূর্ণ বাক্যসহ নিত্যানুগামিনী ছায়ার ন্যায় ভগবানের অনুগমন করিয়াছি।১০৪২।

২৫ বৎসর মৈত্রীপরিপূর্ণ মনের সহিত নিত্যানুগামিনী ছায়ার ন্যায় ভগবানের অনুগমন করিয়াছি।১০৪৩।

বুদ্ধ যখন ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতাম। তিনি যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তখন আমার জ্ঞান উৎপন্ন হইত।১০৪৪।

আমার এখনও অনেক করণীয় আছে, আমি

এখনও শিক্ষার্থী ও অপ্রাপ্ত-মানস। যিনি আমাকে অনুকম্পা করিতেন, সেই শিক্ষক পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।১০৩৫।

মৃত্যুর সময়ে আনন্দ এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

শাস্ত্রীর (অর্থাৎ উপদেষ্টা গোতমের) পরিচর্য্যা করা হইয়াছে, বুদ্ধের অনুশাসন পালন করা হইয়াছে ; গুরু ভার বহন করা শেষ হইয়াছে, পুনর্ভব বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ১০৫০।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তাদেবী

(২)

দুইমাস পরের কথা। শীত কাটিয়া গিয়াছে ; ফাল্গুনের উষ্ণপ্রায় বায়ু পত্রবিরল গাছে গাছে কচি পাতার আহ্বান গাহিয়া চলিয়াছে। হরিকেশব শুইবার ঘরের পাশের খোলা ছাদে পাইচারি করিতেছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, কিন্তু কি একটা গভীর চিন্তা তাঁহাকে শয্যায় স্থির হইতে দিতেছিল না। চিন্তাজাল বারবার ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, কিছুতেই যেন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যখন ভাবিতেছেন অনেকখানি সমস্যার মীমাংসা করিয়া আনিয়াছেন, তখনও হঠাৎ চমকিয়া দেখেন চিন্তাস্রোত বাধাবন্ধময় পথে বেশীদূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া সম্পূর্ণ অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। সমস্যার মীমাংসা একটুকুও হয় নাই, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি কি এক স্বপ্নজালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। হরিকেশব আপনাকে আপনি ফাঁকি দিবার লজ্জায় বিব্রত হইয়া বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। ঘরের বদ্ধ বাতাসে মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, পথ চলিতে চায় না। বাহিরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় সে যেন শক্তি ফিরিয়া পায়, দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকেও অতিক্রম করিবার জন্য যুঝিতে চায়।

হরিকেশবের চিন্তার স্রোত যত নূতন নূতন বাধায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, ততই তাঁহার সমস্ত শরীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া পড়িতেছিল। যেমন করিয়া হউক সিধা পথে চলিয়া মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে। সংসারের কাজ শেষ করিয়া অনেক রাত্রে ঘরে আসিয়া তরঙ্গিণী দেখিলেন গৌরী খোলা জান্‌লার পাশে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সুখস্বপ্নের দীপ্তিতে তাহার মুখখানি আলোকিত, কিন্তু হরিকেশব ঘরে নাই। হরিকেশবকে তিনি উপরে আসিতে দেখিয়াছিলেন, তাছাড়া বাহিরের অশান্ত পদধ্বনি শুনিয়া তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে হরিকেশব কোথায় কি কাজে ব্যস্ত। গৌরীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তরঙ্গিণী ধীরপদক্ষেপে খোলা ছাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরিকেশব তখনও তেমনি ঘুরিতেছেন। তরঙ্গিণী ধীরে তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "রাত যে অনেক হ'ল, তুমি শোবে কখন ?"

হরিকেশব একবার "হ্যাঁ, যাই" বলিয়া আবার তেমনি ভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। চিন্তাসূত্র পাছে এলো মেলো হইয়া পড়ে তাই যেন তিনি কথা বলিবার কি দাঁড়াইবার অবসর-টুকুকেও ভয় পাইতেছিলেন। তরঙ্গিণী কিন্তু যেন তাঁহার চিন্তাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবার জন্যই বদ্ধ-পরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আবার স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহার হাতখানা ধরিয়া একটু জোর দিয়াই বলিলেন, "তুমি কি ভেবে ভেবে নিজের মাথাটা শুদ্ধ খারাপ কর্‌তে চাও ? কি লাভটা এতে হবে আমায় বল্‌তে পার ?"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্বর কোমল ও গাঢ় হইয়া আসিল, দৃষ্টি অশ্রুজলে রুদ্ধ হইয়া গেল ; তিনি আর বেশী-কিছু বলিতে পারিলেন না।

হরিকেশব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মাথাটা খারাপ করেও যদি মেয়েটার দুঃখ ঘোচাতে পারি, তবে ত জন্ম সার্থক হয়। ওর শিশু মুখের মিষ্টি হাসি নিয়ে ও যখন এসে কাছে দাঁড়ায়, তখন আমার বুকটা যে দু-খানা হয়ে যায়। মা আমার জানেও না যে বাপ হয়ে ওর কি সর্ব্বনাশ করে রেখেছি।"

তরঙ্গিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "এ তোমার অন্যায় কথা। বিধাতা ওর কপালে দুর্ভাগ্য লিখেছেন, তুমি কি তার জন্যে দায়ী হলে নাকি? আমাদের অদৃষ্ট খারাপ, মুখ বুজে সইতেই হবে।"

হরিকেশব বলিলেন, "অদৃষ্টের চাকা ঘোরালে কে? মূর্খ আমি যদি আট বছরের মেয়েটাকে দান করে পুণ্য সঞ্চয় না কর্‌তে যেতাম, তাহলে ত আর এমন হত না।"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "আজ না হোক কাল ত হতে পার্‌ত? পৃথিবীতে দুঃখের হাত থেকে মানুষ কি কখনও মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পেরেছে? দুরদৃষ্ট কোন্ ছল ধরে কার ভাগ্যে কখন যে আসে কেউ কি বল্‌তে পারে?'

হরিকেশব স্ত্রীর মাথায় হাত রাখিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "কেন বৃথা আমায় সান্ত্বনা দাও, তরু? দুঃখ যত বড় শক্তিমান্‌ই হোক, মানুষের কান্নাকে জয় কর্‌তে পারে নি, মানুষের আশা মানুষের চেষ্টাকে সে দমাতে পারে নি! আমাকে তুমি হাল ছাড়তে বোলো না, তাহ'লে আমি বাঁচ্‌ব না। এর একটা প্রতিকার আমায় কর্‌তেই হবে।"

তরঙ্গিণীর তর্কযুক্তি অশ্রুজলে পর্য্যবসিত হইল। তিনি অন্ধকারে ছাদের আলিসার উপর মাথা রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; আর কথা তাঁর মুখে আসিল না। হরিকেশবই এবার তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া বুঝাইয়া ঘরে লইয়া চলিলেন।

ঘরে তখনও গৌরীর মুখের হাসিটি তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। গৌরীর ঘুম বাঁচাইয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহারা দুজনে শয্যা আশ্রয় লইলেন; কিন্তু শয্যা তাঁহাদের দুঃখক্লিষ্ট দেহমনকে শান্তি দিতে পারিল না। রুদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ও নীরব অশ্রুবর্ষণে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়া গেল। যাহার বেদনায় এই দুটি হৃদয় কাঁদিতেছিল অন্ধকারের এই নিঃশব্দ শোকগাথার কোনো সাড়া সে পাইল না; কিন্তু রজনীর নিস্তব্ধতার ভিতর অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়াও তাঁহারা দুজন পরস্পরের উদ্বেলিত বক্ষের প্রতিটি স্পন্দন গণিয়া যাইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া দুজনার হাত দুজনার উত্তপ্ত ললাট ও অশ্রুসিক্ত মুখের উপর স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিতেছিল, আবার উচ্ছ্বসিত অশ্রু-উৎস পরস্পরের বক্ষ অভিষিক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

এম্‌নি করিয়াই আজ দুইটি মাস বিনিদ্রভাবে তাঁহাদের রাত্রি কাটিয়াছে। দিনের কাজের ভিড়ে শোক-দুঃখের সময় পর্য্যন্ত মিলে না; পরস্পরের দেখা পাওয়াও শক্ত; রাত্রির কোলের নিভৃত মিলনে তাই বেদনার বন্ধু দুটি এম্‌নি করিয়া আপনাদের ক্ষত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে চায়।

দুই মাস আগের সেই উৎসবের আয়োজন করিবার সময় কে জানিত যে তাহার অবসান এমন করিয়া হইবে? শিবপ্রসাদ শূন্য গাড়ী লইয়া লইয়া ফিরিয়া আসিবার পরও সারাদিন ধরিয়া মেয়েরা অপেক্ষা করিয়াছিল, হয়ত জামাই সন্ধ্যার দিকের কোনো গাড়ীতে আসিয়া পড়িতে পারে। গৌরীর সাজসজ্জা খোলা হয় নাই; সে যে মেয়ে, একবার মুক্তি পাইলে আবার যে সহজে প্রসাধনের সহস্র বন্ধনে ধরা দিবে, তা কিছুতেই বলা চলে না। রাত্রি যখন বাড়িয়া চলিল, তখন মেয়েদের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ফল ফেলাছড়া করিয়া কোনো রকমে দুটি-দুটি মুখে দিয়া অপেক্ষাক্লান্ত পরিজনসকলে অবসন্নচিত্তে নিরাশহৃদয়ে ঘুমাইতে চলিয়া গেল। শুধু হরিকেশবের চোখে ঘুম আসিল না। কি একটা আশঙ্কায় তিনি রাত্রে দারোয়ানকে দৌড় করাইলেন টেলিগ্রাফ করিতে। এই ব্যর্থ উৎসবের আয়োজন যেন তাঁহার মনে কি একটা অমঙ্গলের ইঙ্গিত করিতেছিল।

পরদিন শরীর খারাপের ছুতা করিয়া আধঘণ্টার ভিতর তিনি কাছারী ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন, পাছে অপর কেউ টেলিগ্রাম-সম্বন্ধে কিছু জানিয়া ফেলে, কিম্বা জবাব-খানা অকস্মাৎ হাতে পাইয়া বসে। বাড়ী আসিতেই গৌরী ছুটিয়া রাস্তার ধারের সিঁড়ির কাছে হাজির, "ওকি বাবা! তুমি ঠিক দুক্কুর বেলা কেন কাছারী থেকে পালিয়ে এলে?

মাকে বলি গিয়ে ?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চুল দুলাইয়া আঁচল লুটাইয়া ঝাঁঝমলের শব্দে দিক্ প্রকম্পিত করিয়া সে আবার অন্তঃপুরে ছুটিতেছিল। কিন্তু হরিকেশব ব্যগ্রহস্তে তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন, "না, না, মা মণি, তোমায় এখন মা'র ঘুম ভাঙাতে যেতে হবে না; তুমি ছোট ঠাকুমার ঘরে গিয়ে রামায়ণের ছবি দেখ।"

গৌরী দুই হাতে বাবার গলা জড়াইয়া মাথাটা পিছন-দিকে উল্টাইয়া ঝুলিয়া পড়িয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি কিচ্ছু জান না, বাবা। মা বুঝি দুপুর বেলা ঘুমোয়? এত এত বড়ি আর আচার শুকোতে হয় না? আর ছোটঠাকুমা পড়তেই জানে না, তার আবার রামায়ণ কই? সে ত মেজ পিসিমার আছে। শৈল আর ময়না দিনরাত টানাটানি করে বলে' বাক্সে তালাচাবি বন্ধ করে' রেখেছে। আমি চাইলেই অমনি দিলে কি না! ইস্, তা আর দিতে হয় না।"

গৌরীর অনর্গল বাক্যস্রোতের কাছে হরিকেশবকে হার মানিতে হইল। কিন্তু তাহাকে কোনোপ্রকারে খেলা-ধূলায় লাগাইয়া দিবার জন্য তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, পাছে গৌরীর সাম্‌নেই তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে কোনো টেলিগ্রাম আসিয়া পড়ে। অকস্মাৎ শৈল, ময়না, টিনি ও ট্যাবা আসিয়া তাঁহার সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল। তাহারা একটা নূতন বিড়াল-ছানা আবিষ্কার করিয়াছে। শীতে পাছে সে কষ্ট পায় তাই তাহার একটা ঘর তৈয়ারী করা দরকার। গৌরী দলের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

একলাটি বাহিরের ঘরের দরজার কাছে হরিকেশব উত্তরের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। ক্ষণে ক্ষণে ভয় হইতে-ছিল, পাছে তাঁহার অসংখ্য অনুচর, পার্শ্বচর, কি ভক্তের ভিতর কেহ আসিয়া পড়ে। রক্ষা এই যে, এ সময়ে তাঁহার বাড়ী-থাকার সম্ভাবনার কথাও কেহ কল্পনা করে নাই।

ঘণ্টা দুই পরে রাস্তার মোড়ে বাইসিক্‌ল্ আরোহী পিয়নের মূর্ত্তি দেখা দিল। সে যে কাহার বাড়ীতে কি সংবাদ লইয়া আসিতেছে, তাহা কেন জানি না, হরিকেশবের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। একবারও তাঁহার মনে হইল না যে হয়ত কোনো কারণে রাগ কি অভিমান করিয়া বেয়াই-বেয়ান জামাইকে আসিতে বাধা দিয়াছেন অথবা আকস্মিক দৈব ঘটনার চক্রে পড়িয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে নাই। তাঁহার মন বলিতে লাগিল, সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, আর টেলিগ্রাম খুলিয়া কি হইবে?

পিয়নটা তাঁহারই দুয়ারে দাঁড়াইল। তিনি হাত বাড়াইয়া কাগজখানা এমন করিয়া লইলেন যেন উহার দিকে চোখ দেওয়া-না-দেওয়া একই কথা। খুলিয়া, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই দেখিলেন। মুখখানা এক নিমিষে তাঁর কালো হইয়া গেল; এত শীতেও গা বাহিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দুই দিনের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে তাঁহার এত সাধের জামাই চিরবিদায় লইয়াছে। কাল হইতেই তাঁহাকে কে যেন বলিতেছিল গৌরীর কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ সে সংবাদ তাঁহার কাছে নূতন লাগিল না; কিন্তু কাগজের উপরের ঐ কয়টা অক্ষর তাঁহার শরীরের সমস্ত শক্তি যেন হরণ করিয়া লইল। কেমন করিয়া একথা তিনি গৌরীর মাকে বলিবেন কেমন করিয়া গৌরীর মুখের দিকে আর তিনি তাকাইবেন!

হরিকেশব ভয়বিহ্বল চিত্তে ধীরে তাঁহার গাড়ীখানা ডাকাইয়া পলাতকের মত বাড়ী ছাড়িয়া গঙ্গার ধারে গোপনে পলাইয়া গেলেন। গাড়ীর হুড্ তুলিয়া এমন অসময়ে বড়বাবুকে হঠাৎ গঙ্গার ধারে যাইতে দেখিয়া গাড়ীর চালক বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে ঠিক শুনিয়াছে কিনা তাহার নিজেরই সন্দেহ হইতে লাগিল। আজ পাঁচ বৎসর সে এবাড়ীতে কাজ করিতেছে, বৎসরে একবার পূজার সময় শেষরাত্রে বাবুকে সে গঙ্গাস্নান করিতে লইয়া গিয়াছে, তাছাড়া কখনও ত সে তাঁহাকে গঙ্গার ধারে যাইতে দেখে নাই। সন্দিগ্ধ মনেই সে গাড়ী চালাইল, বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

ষ্ট্রাণ্ড রোডের পাট গুদামের পাশ দিয়া গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গাড়ী লইয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সে হয়রান হইয়া গেল কোনো ঘাটে বা খানিকক্ষণ দাঁড়াইল। কৌতূহলী

খালাসীরা কি ফিরিঙ্গীর ছেলেমেয়েরা আরোহীকে নামিতে না দেখিয়া যখন গাড়ীর আশে-পাশে উঁকি মারিতে লাগিল, তখন বড়-বাবু আদেশ দিলেন, "আর এক ঘাটে চল।" চালক অবাক্ হইয়া গেল। তাহার বাবু ত কোনো দিন নেশা করেন না, তবে আজ তাঁর কি হইল?

অনেক রাত্রে হরিকেশব বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আজ তিনি বাহিরের ঘরে বসিলেন না। চাকর চটি জুতা লইয়া দৌড়াইয়া আসিল, তাহার দিকে তাকাইলেন না। রান্নাবাড়ীতে ছেলে মেয়েদের আহারের পর তরঙ্গিণী খাবার আগলাইয়া বসিয়াছিলেন, পুত্রবধূ লাবণ্যও শ্বশুরশাশুড়ীর অপেক্ষায় সেইখানে বসিয়া সকালের তরকারী কুটিয়া গাম্‌লার জলে ধুইয়া তুলিতেছিল। বিস্মিত ভৃত্য সেখানে আসিয়া বলিল, "মা, বড়বাবু জুতো জামা ছাড়লেন না। একেবারে উপরে চলে' গেলেন। আপনি একটু দেখবেন আসুন।"

তরঙ্গিণী বিস্মিতনেত্রে একবার তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহার পর লাবণ্যকে বলিলেন, "বৌমা, তুমি বাছা খেয়ে নাও, তোমার কোলে কচি। আমি দেখি গে আবার উপরে কি হ'ল?" গৃহিণী চঞ্চলচরণে উপরে চলিয়া গেলেন।

হরিকেশব ঘরে ঢুকিয়াই আল্‌নায় ও মেজেতে কাপড় জামা ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি শয্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন। তরঙ্গিণীর কাছ হইতে কি করিয়া লুকাইবেন ইহাই হইয়াছিল তাঁহার ভাবনা। তরঙ্গিণী স্বামীকে নাড়া দিয়া বিস্মিত স্বরে বলিলেন, "হ্যাগা, বাড়া ভাত পড়ে রইল, তুমি এসেই শুলে যে বড়? শরীর খারাপ লাগ্‌ছে নাকি?"

ব্যস্তভাবে তিনি হরিকেশবের মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দেখিলেন। হরিকেশব কোনো সাড়া দিলেন না। স্ত্রী আবার ডাকিলেন, "ওগো শুন্‌চ? কথার উত্তর দাও না কেন?"

হরিকেশব স্ত্রীর হাতখানা বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন, "কি উত্তর দেব তরু? বল! উত্তর দেবার যে কিছুই নেই।"

এমন আদরের স্বরে অথচ এমন বিষাদমাখা স্বরে তরঙ্গিণী বহুকাল স্বামীকে কথা বলিতে শোনেন নাই। সহস্র কাজের মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে একটা কথার উত্তর দেওয়াই স্বামীর অভ্যাস বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়া গিয়াছিল। এমন একান্ত কাছের মানুষের মত প্রেম ও ব্যথাজড়িত স্বর তাঁহার মনটাও কেমন বেদনার সুরে কাঁপাইয়া দিল। কি হইয়াছে? কিসের ব্যথায় বিশ্বভোলা স্বামীটি তাঁহার আজ এতকাল পরে তাঁহাকে এমন করিয়া কাছে টানিতেছেন? তরঙ্গিণী স্বামীর বুকের উপর মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আর প্রশ্ন করিতে তাঁহার ভয় করিতেছিল। অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছিল। না জানি ইহার পর কি শুনিবেন ভাবিতেও সাহস হইতেছিল না।

হরিকেশব সহসা উঠিয়া বসিয়া তরঙ্গিণীকে বাহিরে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "তরু, তোমার কাছে যা লুকিয়ে রাখতে পারব না, তা' আজকেই বলে' ফেলা ভাল। বল, আমার কথা শুনে কাঁদ্‌বে না, চোখের জল পড়তে দেবে না; বল, একথা গৌরীকে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দেবে না। পাষাণ হ'য়ে তার কাছে হাসিমুখে থাক্‌বে।"

তরঙ্গিনীর বুকের ভিতর 'ধড়াস্' করিয়া উঠিল। কেন, কেন, কি হইয়াছে?

তবে কি যাহা ভাবিতে নাই, গৌরীর কপালে সেই নিদারুণ দুঃখ আসিয়াছে? তরঙ্গিণী দৃঢ় করিয়া স্বামীর হাতটা চাপিয়া ধরিলেন; ঠোঁট দুখানা বেদনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নীল হইয়া গিয়াছে; তিনি কোনো কথা কহিতে পারিলেন না। হরিকেশব বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার গৌরী আবার তোমারই ঘরে আজন্ম বাঁধা পড়ল। ওর আর কেউ নেই। একথা কোনো দিন তুলো না। তার কচি মনে যেন—"

তরঙ্গিণীর কাণে যে শেষকথাগুলি আর যায় নাই তাহা হরিকেশব সহসা বুঝিলেন যখন তরঙ্গিণীর মূর্চ্ছিত দেহভার তাঁহারই অঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। তরঙ্গিণী স্বামীর কথা রাখিয়াছেন, অশ্রুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু হৃদয়কে জয় করিতে পারেন নাই। অসহ্য ভারে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত গৌরী কিছুই জানে না। হরিকেশবের কড়া শাসনে সমস্ত পরিবার গৌরীর নিকট

হইতে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা লুকাইয়া রাখিয়াছে। গৌরীর বেশভূষা আহার-বিহার কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু এমন করিয়া আর কত কাল চলিবে?

স্নেহোন্মত্ত পিতা ভাবিয়াছিলেন, আপনার বক্ষের ছায়ায় তিনি সকল দুঃখ ব্যথা হইতে গৌরীকে বাঁচাইয়া দূরে রাখিবেন। কিন্তু তিনি অন্ধ নন, তাঁহার এ সংগ্রাম যে কত কঠিন, সংসার নিত্য তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিতেছে। দুর্ভাগ্যকে লইয়া এ লুকোচুরি খেলা যে বেশী দিন চলিবে না সে নির্ম্মম সত্য বুঝিতে তাঁহার বাকী নাই। আর তারপর, তিনি যখন এই ধরণী হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার আদরিণী গৌরীকে সংসারে অসহায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন তখন আর তাহাকে কে এমন আড়াল করিয়া বেড়াইবে?

(৩)

হরিকেশবের বৈবাহিক মহীধর-বাবু পুরাতন জমিদার বাড়ীর বংশধর। তাঁহার ঘরবাড়ী, মান-মর্য্যাদা, কি অর্থ-সম্পদ কোনোটা লাভ করিবার জন্যই তাঁহাকে নিজেকে পরিশ্রম করিতে হয় নাই। জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই এবাড়ীর ভাল-মন্দ বহু পৈতৃক সম্পদ ও বিপদ তিনি অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন। যাহা অনায়াস-লব্ধ তাহার দোষগুণ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা মানুষ সহজে ভাবে না। সুতরাং এই আজন্মের আবেষ্টনের ভালমন্দ বিচার করিবার কি লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিবার ইচ্ছাই কখনও মহীধরের মনে জাগে নাই। তিনি জানিতেন মুখুজ্যে বাড়ীর ইহাই সনাতন প্রথা। তাঁহার পিতৃ-পিতামহগণ এমনিভাবে সংসারে দিন কাটাইয়া গিয়াছেন, অতএব তাঁহাকেও সেই পথে চলিতে হইবে। নূতন রাস্তা কাটিয়া চলায় প্রাচীন বংশের শুধু যে মর্য্যাদার হানি হয় তাহা নহে তাহার অন্যান্য বহু ঝঞ্ঝাটও আছে। মাথা খাটাইয়া পথের দোষগুণ বাছিয়া প্রতি পায়ে পায়ে কে অত চোখ মেলিয়া চলে? পূর্ব্বপুরুষেরা পাকা সড়ক বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন চোখ বুজিয়া নিদ্রাসুখে মশগুল হইয়াও তাহার উপর দিয়া বংশ-পরম্পরায় বেশ চলিয়া যাওয়া যায়। শৈশব হইতে এমনি চলাই তাঁহাদের অভ্যাস, বার্দ্ধক্যেও তাহার পরিবর্ত্তন হইবার কোন আশা নাই।

মুখুজ্যে পরিবার বলিতে যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহারা যে সংখ্যায় খুব বেশী তাহা নয়। কিন্তু তবু গৃহস্থালী বিশাল। কারণ পুরাতন সংসারের চারদিকে বহুকাল ধরিয়া আগাছা-পরগাছা জন্মিয়া আসিয়াছে, তাহা সরাইয়া ফেলিবার সময় কোনাদিন কাহারও হয় নাই, উপরন্তু প্রকৃতির কৃপায় বাড়িয়া চলিয়াছে।

মহীধর ও সৃষ্টিধর মাত্র দুই ভাই। তাছাড়া তাঁহাদের খুড়তুতো ভাই কীর্ত্তিধরও বাড়ীর এক অংশীদার। কিন্তু মহীধরের পিতামহের এক ভগিনীর বংশও এই পরিবারকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। তার উপর সৃষ্টিধরের স্বর্গগত পত্নীর বিধবা ভগিনী সপুত্র এই গৃহেই থাকেন; আবার কীর্ত্তিধরের স্ত্রীর ভগিনীপতি এক বিধবা কন্যা লইয়া এই আশ্রিতবৎসল কুটুম্বের অন্নেই প্রতিপালিত হইতেছেন। তিনচার পুরুষের কত সম্পর্ক ধরিয়া কতজন এমনি ভাবে এখানে ভিত্তি গাড়িয়া বসিয়াছে। কেহ বা রক্ত সম্পর্কের দাবী রাখে, কেহ বৈবাহিক সম্পর্কের জোরেই চাপিয়া আছে, কেহ কোনো সম্পর্কের বালাই না মানিয়া আপনার মুখের জোরে কি গুপ্ত আর কোনো অস্ত্রের জোরেই টিঁকিয়া গিয়াছে। পৈতৃক অধিকারের দাবী ইহাদের কাহারও নাই বলিয়াই ইহারা আপন আপন ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য দিবারাত্রি সজাগ হইয়া বসিয়া আছে। কে কোথায় কাহাকে ডিঙ্গাইয়া ছোটবাবু কি বড়বাবুর সুনজরে পড়িল, কে কোন অছিলায় দু পয়সা আপনার সিন্ধুকে পুরিল, তাহা পিছন হইতে ধরিয়া ফেলিবার জন্য বাকি দশজন সর্ব্বদাই সহস্রচক্ষু হইয়া পাহারা দিতেছে, এবং সুবিধা বুঝিলেই পরস্পরের মুণ্ডপাত করিবার আয়োজন করিতেছে। আলস্যে যাহাদের দিন কাটে, তাহারা খোসামোদ, ষড়যন্ত্র, কুৎসা, বিলাসব্যসন ও ভূয়া আত্ম-গরিমা ছাড়া আর কিছু লইয়া থাকিবার খুঁজিয়া পায় না। এ সকল বিষয়েও তাহাদের সমস্তই পুরাতন পন্থা; নূতনত্বের চিহ্ন নাই।

এমনি ঘরে অকস্মাৎ কেন জানিনা মহীধরের দ্বিতীয় পুত্র একটা নূতন কিছু করিয়া ফেলিয়াছিল; ইস্কুলের হেড মাষ্টারের প্ররোচনায় সে আর দার ধরিয়া পরীক্ষা দিয়া

বসিল এবং বেশ ভাল করিয়াই পাশ করিল। কাজেই মহীধর যখন হরিকেশবের সুন্দরী কন্যা গৌরীকে পুত্রবধূ করিতে চাহিলেন তখন অলস জমিদার-গোষ্ঠীর ব্যূহের উপর শ্রদ্ধা না থাকিলেও ছেলের রূপ ও গুণ দেখিয়া হরিকেশব রাজি হইয়া গেলেন। ধনের দিকটা শুনিয়া বাড়ীর আর পাঁচজনে ত আনন্দে দিশাহারা। গৌরীর কপাল-জোর আছে বটে।

গৌরীর কপালে অবশ্য ধন-দৌলত রূপ-গুণ কিছুই টিঁকিল না; কিন্তু গৌরীর বিবাহের সূত্র ধরিয়া সেই ধন-দৌলতের দিকে আর পাঁচজনের দৃষ্টি পড়িল। গৌরীর বিবাহের আগে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় হরিসাধন দাদার সঙ্গে কুটুম্ব বাড়ী গিয়াছিলেন, আবার বিবাহের পর গৌরীকে শ্বশুর বাড়ী হইতে আনিতেও হরিসাধনই গিয়াছিলেন। একে মহীধরের অতুল ঐশ্বর্য্য, তাহাতে কুটুমবাড়ীর লোক আসিয়াছে, সুতরাং ঐশ্বর্য্যের ছটা হরিসাধনকে দেখিয়া যে দিকে বিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। সোনার ডিবায় পান, রূপার গাড়ুতে জল ত আসিলই, বৈবাহিকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য জমিদারী কায়দায় সহর হইতে বাই আসিল নাচিতে গাহিতে, গ্রাম হইতে যাত্রা কীর্ত্তন আসিল ধর্ম্মকথা শুনাইতে। বাবুর ছেলের বিবাহ, বেহাই আসিয়াছেন, কাজেই বাইজী পাওনা টাকার উপর কিছু বক্‌শিশও দাবী করিল। বাবুর হাতের হীরার আঙ্‌টিটার প্রশংসায় সে কেন যে মাতিয়া উঠিল বলা যায় না। দেখা গেল বাবু বিদায়কালে নিতান্ত হেলাভরে হাস্যমুখে সেই আংটিটাই বাইজীকে বক্‌শিশ করিয়া ফেলিলেন।

আহারের সময় পঞ্চাশ না হোক পঁচিশ ব্যঞ্জন ত ধরা ছিলই, তাহার উপর ছিল মিষ্টান্ন ও ফল আরো পঁচিশ রকম। হরিসাধন এক সপ্তাহে অনেক চেষ্টায় যা খাইয়া উঠিতে পারেন না, এক বেলায় তাহা তাঁহার সম্মুখে সাজানো হইত। তাহার পর সেই বিপুল আয়োজন দাস-দাসীদের ভোগেই বেশীর ভাগ যাইত। গোপনে কিছু আশ্রিত কুটুম্বজনের ঘরে ঘরেও পৌঁছিত; তবে সেটা প্রকাশ্যে বলা বারণ, কারণ মুখুজ্যে বাড়ীর লোকে ত আর উচ্ছিষ্ট খাইতে পারে না।

কুটুমবাড়ীতে তিন বেলার বেশী তিনি থাকেন নাই; কিন্তু ইহাতেই তাঁহার চমক লাগিয়া গিয়াছিল। বনিয়াদী বাড়ীর সব বনিয়াদী চাল যে তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল তাহা বলা যায় না, অনেক জিনিষ তাঁহাকে চোক কান বুজিয়া না দেখার ভাণ করিয়া সহিয়া যাইতে হইয়াছিল, কিন্তু তবু সোনারূপার জৌলুষটা তাঁহার চোখের সম্মুখে তিনবেলা যে নৃত্য করিয়া বেড়াইয়াছিল, সেটা তিনি সহজে ভুলিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহারও যে তিনটি মেয়ে আছে এবং ময়না মেয়েটি যে দেখিতে বেশ সুন্দরীই একথা তাঁহার বারবারই মনে পড়িতেছিল।

কিন্তু হরিসাধন অধ্যাপক মানুষ, দাদার মতন তাঁহার টাকা নাই, তাঁহার কাছে যাচিয়া মেয়ে কেউ চাহেও নাই। এমন অবস্থায় বড় ঘরের সঙ্গে কথাটা পাড়েন কি করিয়া? তবে একটা সুবিধা এই ছিল যে, বাড়ীর তখনকার বিবাহ-যোগ্য ছেলেটির বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। এখনই যে তাহাকে চট্ করিয়া কেহ লুফিয়া লইয়া যাইবে এমন নাও হইতে পারে। হরিসাধন তলে তলে-খোঁজ রাখিতে লাগিলেন এবং যথাসাধ্য টাকারও জোগাড় করিতে লাগিলেন। একেবারে শুধু হাতে প্রস্তাবটা করিতে তাঁহার ভরসা হইল না। মুখুজ্যে বাড়ীর লোকে মুখে তাঁহার কাছে টাকা চাহিবে না তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু তাহাদের মর্য্যাদা অনুযায়ী আদর, অভ্যর্থনা, উৎসব, যৌতুক, বর ও কন্যা সজ্জার আয়োজন না করিয়া একথা তাহাদের কাছে আপনা হইতে তোলা যে তাহাদের অপমান করা তাহাও তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। তাঁহার আশা ছিল হাজার দশেক টাকা জোগাড় করিতে পারিলে আর কয়েক হাজার দাদার কাছেই চাহিয়া পাওয়া যাইবে। দাদা সদাশিব মানুষ, ছোট ভাইটির কন্যাদায়ে কি আর সাধ্যমত সাহায্য না করিয়া পারিবেন?

জল্পনা কল্পনা ও জোগাড় যন্ত্রেই দুই বৎসর কাটিয়া গেল। হরিসাধন মহীধরের ভ্রাতা যষ্টিধরের কাছে চর পাঠাইয়া খোঁজ লইতে লাগিলেন তাঁহার ছেলেটির জমিদার বাড়ীর বাহিরে বিবাহ দেওয়ায় তাঁহার আপত্তি

আছে কি না। ঘটক যে গিয়াছিল সে ঘটক সাজিয়া যায় নাই; যেন নিতান্তই খোস-গল্প করিতে গিয়া কথাটা বলিয়া বসিয়াছিল। হরিসাধন খুব নিরাশ হইবার কারণ দেখিলেন না। ইতিমধ্যে আর একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। কোথাকার মেয়েযজ্ঞিতে সহরে আসিয়া সৃষ্টিধরের বিধবা শ্যালিকা ময়নাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য ময়নাকে তাঁহার চোখের সাম্‌নে আনিয়া ফেলায় এবং তাহার রূপের তারিফ করায় যে আর কাহারও হাত ছিল না একথা বলা যায় না। যাহাই হোক বিধবা শ্যালিকা সৃষ্টিধরের কাছে কথা তুলিলেন, মেয়েটিকে তাঁহার বোন্‌পো-বৌ করিতে সাধ হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সৃষ্টিধর শ্যালিকার কথায় ওঠেন বসেন। তাঁহার বিবাহ করিবার বয়স যায় নাই, কিন্তু ছেলেমেয়ের সৎমা আনিয়া দিলে শ্যালিকা পাছে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন এই ভয়ে নাকি তাঁহার দ্বিতীয় বার বিবাহ করাই হয় নাই।

অনেক যত্নে ও কষ্টে উদ্যোগপর্ব্ব সমাপন করিয়া এইবার হরিসাধন দাদাকে দিয়া কথাটা তোলাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সৃষ্টিধরের ছেলে লেখাপড়া করে নাই। সৃষ্টিধরের নিজেরও নানা কারণে সুনাম নাই বলিয়া দাদা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু হরিসাধন নাছোড়বান্দা, বড় লোকের ছেলে নাই বা করিল লেখাপড়া! আর বাপের দুর্নাম, অমন ত অনেক লোকের থাকে। অল্প বয়সে বিপত্নীক হইয়াছে, তাহার বিচার অত কড়া করিলে চলেনা। দৈবক্রমে যাহাদের স্ত্রী মরে নাই, তাহারা না হয় সুনাম রাখিয়া চলিতেছে; কিন্তু অমন অবস্থার পড়িলে কে কি করিত কিছু বলা যায় না। ভ্রাতার যুক্তিতে হরিকেশব মোটেই খুসী হইলেন না, কিন্তু পাছে সাধন মনে করে যে তিনি ময়নার ঐশ্বর্য্য লাভে বাধা দিতে চাহিতেছেন তাই তিনি সৃষ্টিধরের কাছে কথা তুলিতে রাজি হইলেন।

ঠিক এমনই সময় গৌরীর কপাল ভাঙিল। মুখুজ্যে বাড়ীর কুল-প্রদীপ নিভিয়া গেল। হরিকেশবের আশা ছিল এই ছেলেটি সে বাড়ীতে প্রথম লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ ভঞ্জন করিবে, পুরাতন বংশের খোপে খোপে সঞ্চিত যত কলুষ ও আবর্জ্জনা হয়ত ক্রমে দূর করিবে। কিন্তু সে আশা অকালে ভাঙিয়া গেল। হরিসাধন অগত্যা কিছু দিনের জন্য নীরব হইতে বাধ্য হইলেন।

ক্রমশঃ

সেরপুরের প্রাচীন মূর্ত্তি

শ্রী হরগোপাল দাস কুণ্ডু

সেরপুরের ইতিহাসে কয়েকটি প্রাচীন মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দিয়াছি, উহাদের স্বরূপ ঠিকমত নির্ণীত হয় নাই। অদ্য সেরপুরের আরও কয়েকটি প্রাচীন মূর্ত্তির প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল। প্রথমোক্তটি দশভূজ চতুর্ম্মুখ (চতুর্ম্মুখের একমুখ পশ্চাতে) শস্ত্রপাণি, মুদ্রা এবং আসনসংযুক্ত। মস্তক জটা-মুকুট-শোভিত। পদ্মাসনের নীচে একটি বৃষ অঙ্কিত দেখা যায়। এসকল লক্ষণ দ্বারা মূর্ত্তিটিকে শিবের প্রকারভেদ বলিয়া মনে হয়। মূর্ত্তিটি সেরপুর জগন্নাথ-বাড়ীতে প্রাপ্ত। পিত্তলের মূর্ত্তি দীর্ঘ ৬ইঞ্চি, প্রস্থে ৩ইঞ্চি পরিমাণ।

শিব—যাহাতে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান আছে, তিনি শিব, অথবা যিনি সকল অশুভ খণ্ডন করেন, তিনিই শিব, বা যাহাতে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য অবস্থিত, তিনিই শিব।

(ভরত)

পর্য্যায়—শম্ভু, ঈশ, পশুপতি, শূলী, মহেশ্বর, ঈশ্বর,

সর্ব্ব, ঈশান, শঙ্কর, চন্দ্রশেখর, ভূতেশ, খণ্ডপরশু, গিরীশ, গিরিশ, মৃড়, মৃত্যুঞ্জয়, কৃত্তিবাস, পিনাকী, প্রথমাধিপ, উগ্র, কপর্দ্দী, শ্রীকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ, কপালভৃৎ, বামদেব, মহাদেব, বিরূপাক্ষ, ত্রিলোচন, কৃশানুরেতাঃ, সর্ব্বজ্ঞ, ধূর্জ্জটি, নীল-লোহিত, হর, স্মরহর, ভর্গ, ত্র্যম্বক, ত্রিপুরান্তক, গঙ্গাধর, অন্ধকরিপু, ক্রতুধ্বংসী, বৃষধ্বজ, ব্যোমকেশ, ভব, ভীম, স্থাণু, রুদ্র, উমাপতি, বৃষপর্ব্বা, রেরিহাণ, ভগালী, পাংশুচন্দন, দিগম্বর, অট্টহাস, কালঞ্জর, পুরদ্বিট,

সেরপুরে প্রাপ্ত শিবমূর্ত্তি

বৃষাকপি, মহাকাল, বরাক, নন্দিবর্দ্ধন, বীর, খরু, ভূরি, কটপ্রু, ভৈরব, ধ্রুব, শিবিবিষ্ট, গুড়াকেশ, দেবদেব, মহানট, তীব্র, খণ্ডপশু, পঞ্চানন, কণ্ঠেকাল, ভরু, ভীরু, ভীষণ, কঙ্কালমালী, জটাধর, ব্যোমদেব, সিদ্ধদেব, ধরণীশ্বর, বিশ্বেশ, জয়ন্ত, হররূপ, সন্ধ্যানাটী, সুপ্রসাদ, চন্দ্রাপীড়, শূলধর, বৃষভধ্বজ, ভূতনাথ, শিপিবিষ্ট, বরেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনাথ, কাশীনাথ, কুলেশ্বর, অস্থিমালী, বিশালাক্ষ, হিণ্ডী, প্রিয়তম, বিষমাক্ষ, ভদ্র, ঊর্দ্ধরেতা, যমান্তক, নন্দীশ্বর, অষ্টমূর্ত্তি, অধীশ, খেচর, ভৃঙ্গীশ, অর্দ্ধনারীশ, রসনায়ক, পিনাকপাণি, ফণধরধর, কৈলাস-নিকেতন, হিমাদ্রি-তনয়াপতি।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে ১৭ অধ্যায়ে শিবের সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে।

বেদ-সংহিতায় যিনি রুদ্র, রামায়ণ, মহাভারতে এবং পুরাণসমূহে সেই রুদ্রই শিবনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে, যজুর্ব্বেদে, অথর্ব্ববেদে, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে এবং উপনিষদেও রুদ্র-দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রুদ্রই পরবর্ত্তীকালে শিব এবং মহাদেব প্রভৃতি নামে এদেশে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

শিব বীরগণের বরদাতা। পুরাণ-পাঠে জানা যায়, কত শত দৈত্য, শৌর্য্য-বীর্য্য ও বিজয়লাভের নিমিত্ত শিবের উদ্দেশে তপস্যা করিতেন, শিবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইতেন। বাণ, রাবণ, শাল্ব প্রভৃতি সহস্র-সহস্র যোদ্ধা শিবের অনুচর ছিলেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে জানা যায়, শিব বীরগণের বীর, শিব সুখশান্তি ও মঙ্গলদাতা এবং রণদুর্ম্মদ যোদ্ধা ও যুযুৎসুগণের বরদাতা।

শিবপুরাণে লিখিত আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র কারণ-স্বরূপ এই তিনজন মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ইঁহারাই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তের হেতু। তাঁহারা সেই পরমেশ্বরকর্ত্তৃক চালিত এবং পরম ঐশ্বর্য্য-সংযুক্ত। তাঁহারা সেই পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা নিত্য অধিপতি এবং তাঁহার কার্য্য-করণে সমর্থ। পিতা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রথমে তাঁহারা তিনজন তিন কর্ম্মে নিয়োজিত হন,—ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে, বিষ্ণু পালনকার্য্যে এবং রুদ্র সংহার-কার্য্যে। অনন্তর তাঁহাদের পরস্পরের উপর মাৎসর্য্য হেতু পরস্পর পরস্পরের উপর আধিক্য লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া তপস্যা দ্বারা আপনাদিগের পিতা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা সর্ব্বাত্মতা লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত রুদ্র প্রথম এক কল্পে ব্রহ্মা ও নারায়ণকে সৃজন করিয়াছিলেন; অন্য এক কল্পে জগন্ময় ব্রহ্মা রুদ্র ও নারায়ণকে সৃজন করেন এবং পুনর্ব্বার অপর কল্পে বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্রকে সৃজন করেন। কোন কল্পে ব্রহ্মা নারায়ণকে

সৃজন করেন, আবার কল্পান্তরে রুদ্রই ব্রহ্মাকে সৃজন করেন; এইরূপ কল্পে-কল্পে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর পরস্পরকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়া উৎপন্ন হন।*

বৌদ্ধধর্ম্মেও এই ত্রিতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। নেপালের রেসিডেন্ট হডসন সাহেব বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"দার্শনিক চক্ষুতে বুদ্ধ বা ধর্ম্মের প্রাধান্য যথাক্রমে ঈশ্বরবাদ ও অনীশ্বরবাদ সূচিত করে। ঈশ্বরবাদের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, **বুদ্ধ** বিশ্বসৃষ্টির মোক্ষকারণ ও ইহার মনোময় তত্ত্বের বিকাশ এবং অনাদি **ধর্ম্ম** এই সৃষ্টিরই ভৌতিক তত্ত্ব; ইহারই অনাদি গৌণ কারণ—সমতা সূত্রে বুদ্ধের সহিত সংযোজিত অথবা বিশ্বেরই গৌণ কারণ রূপে বুদ্ধ হইতে আবির্ভূত ও বুদ্ধেরই নির্ভরশীল। **সংঘ** বুদ্ধ এবং ধর্ম্মের যোগ এবং তদুভয় হইতে আবির্ভূত। এতদুভয়ের কর্ম্মপ্রবণ সংঘশক্তির বিকাশ সৃষ্টির অতি সন্নিধ কর্ম্মময় কারণ, সৃষ্টির রূপ অথবা ইহারই প্রতিনিধি।

অবিনশ্বরবাদের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে **ধর্ম্ম**ই সেই এক অনাদি দেবাত্মার সত্ত্বা, নৈসর্গিক কর্ম্মে কর্ম্মশীল ও নৈসর্গিকজ্ঞানে জ্ঞানশীল—বিশ্বসৃষ্টির মোক্ষ ও ভৌতিক কারণ **বুদ্ধ** ধর্ম্ম হইতে আবির্ভূত, প্রকৃতির, কর্ম্মময়ী ও জ্ঞানময়ী শক্তি, প্রকৃতি হইতে পৃথকীকৃত ও তৎপরে প্রকৃতির উপর কার্য্যকরী; প্রচ্ছন্ন সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন আকারের রূপ ও সমষ্টি। এই আকার-সমষ্টিই বুদ্ধ এবং ধর্ম্মের সম্মিলন হইতেই **সংঘ** নৈসর্গিক উপায়ে অবির্ভূত।" †

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৮শ ভাগ ৩য় সংখ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব সম্বন্ধে অতি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তত্ত্বপিপাসুগণের অবশ্য পাঠ্য।

মহাদেবের অনন্ত মূর্ত্তি ও অনন্ত ভাবের কথা মহাভারতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"একবক্ত্রো দ্বিবক্ত্রশ্চ ত্রিবক্ত্রোঽনেক বক্ত্রকঃ"

অপিচ—

সম্মুখো বৈ বহুমুখস্ত্রিনেত্রো বহুশীর্ষকঃ
অনেক কটিপাদশ্চ অনেকোদরবক্ত্রধৃক্ ॥
অনেক পাণিপার্শ্বশ্চ অনেকগণসংবৃতঃ ॥

সেরপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুর মৎস্যাবতার মূর্ত্তি

নানা তন্ত্রে আমরা শিবের নানামূর্ত্তির পরিচয় পাই। সারদাতিলক তন্ত্রের ১৯ ও ২০ পটনে তাঁহার নিম্নলিখিত প্রধান কয়েকটি মূর্ত্তির নাম লিখিত হইল। ঐ তন্ত্রে মূর্ত্তিগুলির ধ্যান বর্ণিত আছে। ১। সদাশিব, * ২। ঈশান, ৩। তৎপুরুষ, ৪। অঘোর, ৫। বামদেব, ৬। সদ্যোজাত, ৭। হরপার্ব্বতী, ৮। মৃত্যুঞ্জয়, ৯। মহেশ, ১০। দক্ষিণামূর্ত্তি, ১১। নীলকণ্ঠ, ১২। অর্দ্ধনারীশ্বর, ১৩। পঞ্চানন, ১৪। অঘোর, অপর রূপ, ১৫। পশুপতি, ১৬। নীলগ্রীব, ১৭। চণ্ডেশ্বর।

---

* মহাশিবপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৮৭ পৃঃ)।

† J. A. S. B. 1836. P. 37.

* সারদাতিলকবর্ণিত সদাশিবে ধ্যানের সহিত বায়ু-পুরাণোক্ত ধ্যানের ঐক্য দেখা যায় না।

সারদা তিলকে—"মুক্তা পীতপয়োদ মৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভি-
স্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিত মীশবিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং।
শূলং টঙ্ককৃপাণ বজ্রদহনান্নাগেন্দ্র ঘণ্টাঙ্কুশান
পাশং ভীতিহরন্দধান মতীগা কল্পোজ্জ্বলং চিন্তয়েৎ ॥

বায়ুপুরাণে— পঞ্চবক্ত্রো বৃষারূঢ় প্রতি বক্ত্রেং ত্রিলোচনঃ।
কপাল শূল খর্দ্ধাঙ্গী চন্দ্রমৌলী সদাশিবঃ ॥

আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটির সহিত বর্ণিত মূর্ত্তিগুলির কোন ধ্যানই মিলে না। কিন্তু নর্ত্তনশীল দশভুজ শিবের মূর্ত্তি দেখা যায় বটে। *

মূর্ত্তিটি যে শিবের একটি প্রকার-ভেদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে প্রকার-ভেদটি নির্ণয় আবশ্যক। এ মূর্ত্তি অন্যত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না।

দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি বিষ্ণুর মৎস্যাবতার মূর্ত্তি। বিষ্ণুর মৎস্যাবতার কাহিনী অনেকেরই সুবিদিত। এই মৎস্যাবতারের অতি অল্প মূর্ত্তিই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় সকল মূর্ত্তি এক আদর্শে গঠিত নহে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মূর্ত্তিতে কেবল মৎস্যমূর্ত্তিই উৎকীর্ণ দেখা যায়, ঊর্দ্ধ-নরাকৃতি চতুর্ভুজ তাহাতে নাই। বাঙ্গালাতেই ঊর্দ্ধনর চতুর্ভুজ এবং অধঃ-মৎস্যাকৃতি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় এক ঢাকা মিউজিয়ম ব্যতীত এ মূর্ত্তি আর আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না। আমাদের বিশ্বাস আলোচ্য মূর্ত্তিটির মূল্য অন্য সকল মৎস্যমূর্ত্তি হইতে অনেক বেশী। কি ভাব-সম্পদে, কি গঠন পারিপাট্যে ইহার আর তুলনা হয় না। কি মধুর সাম্যসমাহিত ভাব! ইহাকেই বলে পাথরে প্রাণ-সঞ্চার। ইহার সূক্ষ্মশিল্প-সৌন্দর্য্যে যে কেহ আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। আর যে কষ্টি-পাথরের মূর্ত্তিটি উৎকীর্ণ এমন নিকষকৃষ্ণ কষ্টি-পাথর ক্বচিৎ দেখা যায়।

মূর্ত্তিটি সেরপুরের নিকটবর্ত্তী পেঙ্গ নামক গ্রামে হলকর্ষণকালে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পেঙ্গের জমিদার সেরপুর-নিবাসী মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কুমুদলাল চৌধুরী মহাশয় মূর্ত্তিটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়া সেরপুরস্থ তাঁহার ঠাকুর-বাড়ীতে স্থাপিত করিয়াছেন।

মূর্ত্তিটি উচ্চে সওয়া হস্ত পরিমাণ। দুইদিকে যে দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে, তাহার দক্ষিণ দিকের স্ত্রী-মূর্ত্তির বাম হস্তের নীচে দুইটি অক্ষর উৎকীর্ণ দেখা যায়। আমরা তাহা সোহং রূপে পাঠোদ্ধার করিয়াছি।

* Indian Image. P. 20.

কবি-বরণ

শ্রী বুদ্ধদেব বসু

দিগন্তের প্রান্তখানি উদ্ভাসিয়া আলোর উল্লাসে
যেদিন জাগিলে, কবিবর,
সেদিন পাষাণ কারা চূর্ণ করি' অদম্য উচ্ছ্বাসে
বহেছিল অমৃত-নির্ঝর।
নিশার ললাটে তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী ঊষার আশীষ
আনন্দ-তরঙ্গ তাই তোমা ঘিরি' নাচে অহর্নিশ,
বেদনার অশ্রুবাষ্প মিলাইল শূন্যস্বপ্ন প্রায়
তোমার প্রভায়।
সেদিন শিশির-স্নাত স্নিগ্ধশ্যাম তৃণের পল্লবে
জেগেছিল সুখ-শিহরণ,
গগনের পাণ্ডুবক্ষে অনবদ্য অপূর্ব্ব গৌরবে
লেগেছিল দীপ্তির স্পন্দন।
কমল-কলির শোভা-সৌরভের শুভ্র নিবেদন
পেলব পল্লব-দলে নীড় বাঁধি' ছিল সঙ্গোপন,
তোমার সুন্দর হাসি ভালোবেসে জাগালো তাহারে
অর্ঘ্যের সম্ভারে!
সুরের বন্ধনে তুমি বিনন্দিত করেছিলে, কবি,
শিশিরের করুণ-ক্রন্দন,
ধরণীর বর্ণালোয় এঁকেছিলে নন্দনের ছবি
কুসুমের মুক্তি-জাগরণ।
ধরিত্রীর চিত্রলেখা ছন্দে গাঁথি' রাখিলে যতনে,
মদির মন্থর করি সমীরণ প্রণয়-গুঞ্জনে,
মানবের সুখদুঃখ, হৃদয়ের নিভৃত অর্চ্চনা
করিলে বন্দনা।

মধ্যদিন এল যবে দুর্নিবার, উত্তপ্ত, প্রখর,
　　ম্লান হ'য়ে এলো পুষ্পদল,
উদ্দাম বেদনা তব সঞ্চারিয়া সুপ্ত পৃথ্বী'পর,
　　চঞ্চলিয়া শান্ত বনতল,
তখন সুরের ধারা মন্ত্রসম রুদ্ধ বেদনায়
দীর্ণ করি' আপনারে ছুটেছিল সহস্র শাখায়,
প্রজ্বলন্ত ভানু-সম অগ্নিময় সঙ্গীত মহান্
　　করেছিলে দান।

সহসা রক্তের স্রোতে সিক্ত হ'ল ক্ষিতি-বক্ষতল
　　বহ্নিশিখা চুম্বিল গগন,
অশ্রুবারি শুষ্ক করি' নিয়ে গেল উদ্দীপ্ত অনল
　　হাসা হ'ল তমিস্রা-মগন।
হিংসার আঘাত যত নিষ্করুণ, নিষ্ঠুর, বর্ব্বর,
লুপ্ত করি' নিয়ে গেল জীবনের যা-কিছু সুন্দর,
সত্যের মন্দির মাঝে সংস্থাপিল স্বার্থের দেবতা,
　　মিথ্যার বারতা।

তখন আনিলে তুমি সান্ত্বনার অভিষেক-বারি,
　　প্রেমের পবিত্র পাত্র ভরি',
শান্তির সুস্নিগ্ধ নীর মানবের কল্যাণে বিথারি'
　　গ্লানির গরল সব হরি';
হে তাপস! অন্তরের উৎসুক গভীর ব্যাকুলতা
সার্থক করিয়া পেলে দেবকাম্য সত্যের বারতা,
চিরন্তন জ্যোতির্ম্ময় অমৃতের লাভলে সন্ধান
　　পূর্ণ করি' প্রাণ।

অমরার সুধাসম মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গীত তোমার
　　বিশ্বমাঝে চলিল বহিয়া,
ভগ্ন খিন্ন ধরণীরে সঞ্জীবিত করি' পুনর্ব্বার,
　　রসোন্মত্ত করি' জীর্ণ হিয়া।
হে প্রেমিক, মরুভূমে বহাইলে পূত মন্দাকিনী,
স্বর্গের কল্যাণী দেবী নিয়ে এলে মর্ত্ত্যের সঙ্গিনী,
ঝড়ের তাণ্ডব মাঝে উন্মোচিলে বিদ্যুৎ-লেখায়
　　প্রেম-প্রতিমায়।

নিবিড় আঁধার-মাঝে আলোকের ক্ষীণরেখা-সম
　　তোমার সরল সত্য বাণী,
আনন্দের মুক্তিপথ নির্দ্দেশিল শুভ্র অনুপম
　　যেন স্বচ্ছ ছায়াপথখানি।
সে পথ চলিয়া গেছে অশ্রুমাখা সন্ধ্যাতারা-পানে
দিনান্তের লাজনম্র গোধূলির মায়ার সন্ধানে,
বিশ্ব খুঁজে পেল পথ, ঘুচি' গেল সকল সংশয়,
　　জয়, তব জয়!

বিধির কুহেলি হ'তে সত্যদীপ করিলে উদ্ধার,
　　অনাবৃত, প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল,
বিশ্ব-মানবের তরে শাশ্বত তোমার উপহার
　　প্রেমের অঞ্জলি সুনির্ম্মল।
উপেক্ষি' সাগর গিরি, দুরূহ বর্ণের ব্যবধান,
বিস্মরি' সহস্র ব্যথা, পরস্পর-নিত্য-অসম্মান,
মহাজীবনের কূলে দাঁড়াইবে মহান্ মানব,
　　বিশ্বর বান্ধব।

হে সাধক! এই তব হৃদয়ের নিবিড় বেদনা,
　　এরি লাগি' সাধনা তোমার,
রক্তের প্রণয়-সূত্রে বিশ্ব ভরি' হইবে আপনা
　　স্নেহের অমৃতে সবাকার।
হে কবি! ভারতে তাই বিশ্ব জগতের আমন্ত্রণ,
বিশ্ব-ভারতীর বুকে সত্যের পরম উদ্বোধন,
সত্যের সন্ধানী যত এক হবে প্রেমের সভায়
　　প্রসন্ন প্রভায়!

দীন ভক্ত তরুণের নবীন আশার চিহ্ন-মাখা
　　অর্ঘ্য-পুষ্প তোমার চরণে
গোপন পূজার ব্যথা-চন্দনের রক্ত-রেখা-আঁকা—
　　নিবেদন করিনু যতনে।
হানো বজ্র, ইন্দ্রবর, ডেকে আনো রসের শ্রাবণ,
অনাগত মানবের তৃষ্ণার অমৃত চিরন্তন,
অনাগত ক্রন্দনের উৎস তুমি চির-সান্ত্বনার—
　　লহ নমস্কার।

মৃত্যু-দূত

সেলমা লাগরলফ্

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নববর্ষের উদ্বোধন

সেই উৎসব রজনীতে তিনটি লোক নগরের গির্জ্জার পাশে একটি ঝোপের ভিতরে বসিয়া তাড়ি খাইতেছিল। রাত্রি তখন গভীর হইয়া আসিয়াছে; অন্ধকার নিবিড় হইয়াছে। গোটা কয়েক নেবুগাছ সেই ঝোপের উপর শাখা বিস্তার করিয়া স্থানটিকে আরো অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। নীচের ঘাসগুলি শীতের প্রকোপে শুখাইয়া গিয়াছে। নেবুপাতার উপর শিশির জমিয়া সেই ক্ষীণ আলোকেও ঝক্ ঝক্ করিতেছে। লোকগুলি সেই শীতের মধ্যেই বেশ আরাম করিয়া বসিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা তাড়িখানায় জমায়েত হইয়া বেশ একটুখানি মশগুল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সন্ধ্যার খানিক পরেই দোকান বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাহারা নির্জ্জনে গির্জ্জার এই ঝোপের ভিতর আসিয়া বসিয়াছে। সেটি যে নববর্ষের পর্ব্বদিন মদ খাইলেও সে জ্ঞানটুকু তাহাদের ছিল। তাহারা রাত্রি বারটা বাজিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। গির্জ্জার কাছাকাছি বসিলে নিশ্চয়ই গির্জ্জার ঘণ্টার আওয়াজ তাহারা শুনিতে পাইবে ও নববর্ষকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তিন জনে একত্রে এক পাত্র করিয়া তাড়ি খাইবে।

তাহারা একেবারে অন্ধকারে ছিল না। রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে আসিয়া পড়িতেছিল। ইহাদের মধ্যে দুই জনের বয়স হইয়াছে; কোমর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই দুর্ভাগা জীব-দুইটি সহরের বাহিরে গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করিয়া ফেরে। আজ সহরে আসিয়া সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থে মদ খাইয়া একটু স্ফূর্ত্তি করিতে আসিয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তির বয়স ত্রিশের কিছু বেশী হইবে। অপর দুই জনের মত সেও কুৎসিৎ জীর্ণ বেশ পরিয়া আপনাকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল বটে কিন্তু সে আসলে দীর্ঘকায় সুপুরুষ, তাহার শরীর সবল ও সুস্থ।

তাহাদের ভয় ছিল যে পুলিশে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলে তাড়াইয়া দিবে; তাই তাহারা খুব ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিয়া নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছিল। কম বয়স্ক লোকটি একাই বকিয়া যাইতেছিল। অন্য দুজনে এমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাহার কথা শুনিতেছিল যে বহুক্ষণ তাহারা মদের বোতল স্পর্শ করে নাই।

নানা রকমের হাসির গল্প বলিতে-বলিতে সে হঠাৎ একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল; যেন কোনো অপদেবতার কথা স্মরণ করিয়া সে ভয় পাইল। যেন তাহার গা ছমছম্ করিতে লাগিল; কিন্তু চোখের কোণে একটু দুষ্টামির হাসি। সে গম্ভীর ভাবে একটি নূতন গল্প সুরু করিল। "আজ হঠাৎ আমার এক দোস্তের কথা মনে প'ড়ে গেল; সে আমার বহুদিনের প্রাণের বন্ধু। এই পরবের দিনে সে যেন ভিন্ন মানুষ হ'য়ে যেত। সেদিন তা'র সারা বছরকার লাভ লোকসান হিসেব নিকেশ খতিয়ে লোকসান দেখে যে সে গুম হ'য়ে পড়ত তা' নয়। সে কার কাছ থেকে একটা ভয়ঙ্কর গল্প শুনেছিল আর তাই মনে ক'রে সেদিন তা'র সোয়াস্তি থাকৃত না। সেদিন তার ভাবটা হ'ত—কি জানি কি হয়! সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত প্যাচার মত গুম হ'য়ে থাকৃত—কারু সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত বল্‌ত না। অথচ অন্যদিন সে বেশ সাদাসিধে প্রাণ-খোলা ইয়ার লোক। কিন্তু এই পর্ব্বদিনে তা'কে একটু ফূর্ত্তির জন্যে ঘরের বার ক'রে কার সাধ্যি! এই তোমরা পুলিশের কর্ত্তাকে দেখলে যেমন জুজু বুড়িটি হ'য়ে পড়' সেই রকম সেও জুজু হ'য়ে ব'সে থাকত।"

"তোমরা নিশ্চয়ই ভাব্‌ছ সে কিসের ভয়ে এমনটি করৃত। তা'র এই ভয়ের কথা সে কাউকেই বল্‌ত না;

আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে একবার তা'র কাছে থেকে কথাটা আদায় করেছিলাম। সে—না থাক্‌গে বাপু, আজ রাত্রে আর সে কথা বল্‌ব না। জায়গাটা বড় ভালো নয়; এই গঞ্জের আশেপাশে এই সব ঝোপঝাপের নীচেই ত আগে গোরস্থান ছিল। এখানে ও-সব কথা বলা কি ভালো—তোমরা কি বল হে?"

অন্য লোক দুটি নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বুক ঠুকিয়া বলিল "আরে যাও, ওসব ভূত টুতের আমরা তোয়াক্কা করি না। তুমি ব'লে যাও না।"

"আমি যার কথা বল্‌ছি সে বেশ বড় ঘরের ছেলে। টাসালার কলেজে সে দস্তুর মতো লেখা-পড়া শিখেছিল আমাদের মতো গো-মুখ্যু ছিল না। নতুন বছরের পর্ব্বদিনে স এক ফোঁটাও মাল টান্‌ত না, পাছে পেটে কিছু পড়লে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে কারু সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যায় আর বেঘোরে মার-টার খেয়ে সেই রাত্রেই সে মারা যায়। অন্যদিনে সে পাঁড় মাতাল হ'য়ে পড়ত আর যমকে একটুও তোয়াক্কা কর্‌তনা। কিন্তু এই দিনে—সর্ব্বনাশ! কিছুতেই দিনে মরা হতে পারে না কারণ আজ ঠিক রাত বারোটার সময় মর্‌লেই তা'কে যমের মড়াঠেলা গাড়ীর কোচোয়ান হ'তে হবে যে—অবিশ্যি আমি তা'রই বিশ্বাসের কথা বল্‌ছি।"

অন্য দুজন তাহার আর একটু কাছ ঘেঁসিয়া সভয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া উঠিল, "যমের গাড়ী?"

দীর্ঘকায় লোকটি আর দুইজনের কৌতূহল আর ভয় দেখিয়া মনে-মনে বেশ একটু মজা অনুভব করিতেছিল। সে বলিল, "থাক্ আর বল্‌বনা, তোমরা ভয় পাচ্ছ দেখছি।"

দুজনে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "না না কিছু না, তুমি বল।"

"আমার এই দোস্তটির বিশ্বাস ছিল যে ময়লা-ফেলা গাড়ীর মত যমেরও একটা ভাঙ্গা পুরোণো গাড়ী আছে। সে গাড়ীটার যা বর্ণনা করত তাতে ঘোড়াশুদ্ধ গাড়ীটি বেশ অদ্ভুত ব'লেই মনে হয়। সেটার অবস্থা নাকি এমনই হয়েছে যে সহরের রাস্তায় তা'কে বের করাই চলে না। আর ধুলোতে এমনি ঢাকা যে কি দিয়ে তৈরী বোঝবার জো নেই। তার জোয়াল হল-হল কচ্ছে—চাকাগুলো খ'সে পড়ল ব'লে। চাকায় বাপের জন্মে কখনো তেল পড়েনি। দুপাক ঘুর্‌লেই এমন বিশ্রী আওয়াজ হয় যে শুন্‌লে মানুষ ক্ষেপে যায়। গাড়ীর তলা প'চে ধ'সে গেছে। কোচবাক্সের অবস্থা সাংঘাতিক। গাড়ীটাতে একটা এক চোখো মান্ধাতার আমলের ঘোড়া জোতা আছে;—সেটা শুকিয়ে শুধু হাড় কখানায় ঠেকেছে; বেতো শক্ত পা। ছোটোছেলের হামাগুড়ি দেওয়ার মতো ক'রে বহু কষ্টে চলে! ঘোড়ার সাজে শ্যাওলা পড়েছে আর অর্দ্ধেক সাজ ত নাই-ই। কোনো রকমে দড়ি বেঁধে জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। লাগামটি সব চাইতে চমৎকার—আগাগোড়া খালি গিট; একেবারে কাজের বাইরে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া মদের পাত্রটি টানিয়া লইল ও তাহার শ্রোতাদের ভাবিবার একটু অবসর দিল।

"তোমরা ভাবছ এ গল্প কথা। হবেও-বা। কিন্তু সে বেচারা এটা খুব বিশ্বাস কর্‌ত। হ্যাঁ গাড়ীর কোচোয়ানের কথা বললাম না। সে সেই ভাঙা কোচবাক্সে কুঁজো হ'য়ে ব'সে ধীরে সুস্থে গাড়ী চালায়। তা'র ঠোঁট কালো হ'য়ে গেছে, গালে কালশিরে পড়েছে, চোখ দুটো আয়নার মতো জ্বলজ্বলে। একটা ভীষণ মিশকালো বাদুরে আলখাল্লা গায়ে; মাথায় একটা মুখঢাকা টোপর। হাতে ভোঁতা মরচে-ধরা কাস্তে। সাজটা এমন হ'লে কি হয় লোকটি সাধারণ নয়—যমের দূত, দিন নাই রাত নাই কর্ত্তার হুকুম তামিল ক'রে ফির্‌তে হয়। যেমনি কারু মর্‌বার সময় হ'ল তা'কে হাজির থাক্‌তেই হবে, ক্যাঁচর কোঁচর শব্দে তা'র কাণা ঘোড়া আর ক্যাঁটোগাড়ী চালিয়ে সেখানে তা'কে যেতেই হবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে তাহার সঙ্গীদের মুখের অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিল; তাহারা সভয় মনোযোগে একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছে।

"তোমরা নিশ্চয় কোথাও না কোথাও যমের ছবি দেখে থাক্‌বে—সব জায়গাই তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন কিন্তু এঁর দূত চলেন গাড়ীতে। কর্ত্তা বোধ করি বেছে-বেছে বড়বড় লোকের বাড়া হোম্‌রা চোম্‌রা লোকের

তদারকে ফেরেন আর এই বেচারীকে যত সব বস্তাপচা রদ্দিমাল কুড়িয়ে ফিরতে হয়। সব চাইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে কোচোয়ান বরাবর একজন নয়; শোনা যায় সেই মান্ধাতার গাড়ীখানা আর ঘোড়া ঠিক আছে বটে কিন্তু গাড়োয়ান বদ্‌লি হয়। কে কোচোয়ান হবে তাও ঠিক করা আছে। বছরের শেষদিন ঠিক রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যে মারা যাবে তা'কেই যমের গাড়ীর গাড়োয়ান হ'তে হবে। তার লাস সব্বাইকার মতো পুঁতে ফেলা হয় কিন্তু তার পাতলা শরীর সেই বাঁদুরে পোষাক প'রে কাস্তে হাতে লাগাম ধ'রে গাড়ীতে বসে, আর লোকের দরজায়-দরজায় মড়া কুড়িয়ে ফেরে। ফের নতুন বছরের রাত বারটায় কেউ ম'রে যতক্ষণ না তা'কে রেহাই দিচ্ছে ততক্ষণ তাকে এই ভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়।"

তাহার গল্প শেষ হইল। সে গম্ভীর হইয়া তাহার সঙ্গীদের অবস্থা উপভোগ করিতে লাগিল; তাহারা জড়সড় হইয়া ভয়ে-ভয়ে গির্জ্জায় ঘড়ির দিকে চাহিতে লাগিল কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না।

সে বলিল, "বারটা বাজতে এখনো এক কোয়ার্টার বাকী আছে। সেই সাংঘাতিক ক্ল্যাণ এল ব'লে, এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ আমার সেই বন্ধু ভয় পেত কেন। কিছুতেই যেন আজ রাত বারোটায় ম'রে এই জঘন্য কোচোয়ান না হয়—এই ছিল তা'র ভয়। সম্ভবতঃ আজ-কের সমস্ত দিনটা সে ব'সে-ব'সে ভাবত যে সে যমের সেই গাড়ীর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। সব চাইতে মজার কথা—সে নাকি গত বছর নতুন বছরের পর্ব্ব দিনেই মারা গেছে।"

"তাই নাকি, এ ত ভারী আশ্চর্য্যি। সে কি ঠিক রাত বারোটায় ম'রেছিল।"

"শুনেছি সে এই পর্ব্বদিনেই মরেছে তবে ঠিক সময়টা জানি না। আমি কিন্তু এ না জান্‌লেও বল্‌তে পার্‌তাম সে এই দিনই মর্‌বে। সবসময় মনগুম্‌রে এখন মরব না মর্‌ব না ভাবলে ওই সময়েই মর্‌তে হবে। সাবধান, এ-রোগে যেন তোমাদেরও না পেয়ে বসে তাহলে তোমাদেরও ওই দুর্গতি হবে।"

শ্রোতা দুজন একসঙ্গে দুটি বোতল তুলিয়া লইয়া এক ঢোকে অনেকখানি মদ গিলিয়া ফেলিয়া অল্পক্ষণেই বিষম মাতাল হইয়া পড়িল। তাহারা টলিতে-টলিতে উঠিয়া দাঁড়াতেই লম্বা লোকটি তাহাদের হাত ধরিয়া বলিল,

"আরে যাও কোথায়? রাত বারটা না বাজতেই বেরিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?" সে দেখিল তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে—দুজনেই বেশ একটু ভয় পাইয়াছে। "তোমরা এই ঠাকুমার গল্পে বিশ্বাস কর্‌লে নাকি? আমার সে বন্ধু ছিল ভারী রোগা, আমাদের মত জোয়ান নয়। এস, এস, ব'সে প'ড়ে আর একপাত্র ক'রে খাওয়া যাক।" সে দুজনকেই টানিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, "এখন আরো খানিকটা ব'সে থাকাই সুবিধাজনক। এখানে এসে সমস্ত দিনের পর একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। নইলে যেখানে গেছি মুক্তি-ফৌজের চর ব্যাটারা তো আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে। সিস্‌টার ঈডিথ না কে মর্‌তে বসেছে, আমাকে তা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে। কেনরে বাপু? আমি ত যাব না' ব'লেও রেহাই পাইনি। এমন ফুর্ত্তির সময়টা মরার রোগীর কাছে কে ধর্ম্মকথা শুন্‌তে পারে! তোমরাই বল।" অন্য দুই জনের বুদ্ধি তখন মদের ঘোরে ঘোলাইয়া উঠিয়াছে। সিস্‌টার ঈডিথের নাম শুনিবামাত্র তাহারা লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গরীব দুঃখীদের ভালোর জন্যে সহরে তাঁরি না একটা আখড়া আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক সেই বটে। সমস্ত বছর ধ'রে মাগী আমার ওপর কি করুণাটাই না ঢাল্‌ছে। আশা করি সে তোমাদের বিশেষ বন্ধু নয়। তা হ'লে তা'র মরার খবরে তোমাদের খুব কষ্ট হবে হয় ত।"

খুবসম্ভব হতভাগ্য দুইজন সিস্‌টার ঈডিথের কোনো দয়ার কথা মনে রাখিয়াছিল। তাহারা জোর দিয়া বলিতে লাগিল, যে যদি সিস্‌টার ঈডিথ কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে চান, সে যে কেউ হোক না কেন তাঁহার কাছে তাহার অবিলম্বে যাওয়া উচিত।

"বটে তোমাদেরও এই মত নাকি? আচ্ছা আমি যাব, যদি তোমরা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার আমার সঙ্গে দেখা হ'লে তার কি পরমার্থটা লাভ হবে।"

যমুনা ও কৃষ্ণ

শিল্পী—শ্রী পুলিনবিহারী দত্ত

লোক দুটি এ প্রশ্নের উত্তর না করিয়া বারবার তাহাকে সিস্‌টার ঈডিথের নিকট যাইতে বলিল, সেও হাসিয়া তাহাদের কথা উড়াইয়া দিল এবং শেষে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে কদর্য্য গালি দিতে সুরু করিল। মাতাল দুইজনেও ততক্ষণে রাগিয়া আগুন হইয়াছে। তাহারা বলিল সে নিজে হইতে এখনই সেখানে না গেলে তাহারা তাহাকে শিক্ষা দিবে। তাহারা আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

দীর্ঘকায় লোকটির বিশ্বাস ছিল সে সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তাহাদের ক্রোধ সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে লাগিল বরং বেচারীদের উপর তাহার করুণা হইল। সে বলিল,

"তোমরা এভাবে যদি ব্যাপারটার মীমাংসা করতে চাও বল্‌ত আচ্ছা। কিন্তু মশাইরা ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে ফেললেই ভাল হয় নাকি? বিশেষ ক'রে এখনই যে গল্পটা শুনলে সেটার কথাও ত ভেবে দেখা উচিত। কিছু ত বলা যায় না।"

কিন্তু মাতাল দুই জনের তখন বিচারের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। তাহারা কেন মারামারি করিতে যাইতেছে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের পাশব প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে—এখন তাহাদিগকে নিরস্ত করা অসম্ভব। প্রতিপক্ষের অসুর-শক্তির কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মুষ্টি দৃঢ় করিয়া তাহাদের সঙ্গীকে আক্রমণ করিল। কিন্তু আক্রান্ত লোকটি ব্যস্ত না হইয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া বসিয়াই তাহাদের আঘাত প্রতিরোধ করিতে লাগিল—আত্ম শক্তিতে তাহার এতই বিশ্বাস! তাহারা তাহার নিকট যেন এক জোড়া কুকুর-ছানা। কিন্তু তাহারাও নিরস্ত হইল না; কুকুরছানার মতই গোঁ ধরিয়া তাহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। এই ধস্তাধস্তির মধ্যে একজন অতর্কিতে উপবিষ্ট লোকটির বুকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। পরক্ষণেই তাহার চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল; মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন তপ্তরক্ত স্রোত বুক হইতে মুখে উঠিতেছে—বুঝি তাহার ফুস্‌ফুস কাটিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সে মূর্চ্ছাহতের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গেল; তাহার মুখ দিয়া অবিশ্রাম রক্তস্রাব হইতে লাগিল।

বেচারার দুর্ভাগ্য; তাহার অবস্থা আরো সাংঘাতিক হইল যখন সম্বিত হইয়া সে দেখিল মাতাল দুইজন রক্ত দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়া তাহাকে একদম খুন করিয়াছে ভাবিয়া পলায়ন করিয়াছে। সে একাকী সেখানে পড়িয়া আছে। রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু একটু নড়িলে চড়িলেই আবার তাহা দেখা দিতেছে।

সেরাত্রে বিশেষ শীত ছিল না কিন্তু সেই ভিজা মাটিতে পড়িয়া থাকিয়া তাহার কেমন শীত শীত করিতে লাগিল; হাত পা যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সে কেমন একটা অদ্ভুত অসোয়াস্তি অনুভব করিতে লাগিল। তাহার ভয় হইল যদি কেহ সে দিকে আসিয়া তাহাকে সাহায্য না করে তবে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। অথচ সে-সহরের একেবারে বুকের উপরে বসিয়া। উৎসব উপলক্ষ্যে দলে-দলে লোক রাস্তায় বাহির হইয়াছে; তাহাদের পায়ের শব্দ তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছে; তাহাদের হাস্য কৌতুকালাপ সে স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে। কিন্তু কেহ নিকটে আসিল না। হায়, সাহায্য এত কাছে থাকা সত্বেও কি তাহাকে এমন ভাবে মরিতে হইবে! সেই ভয়াবহ অসহ্য চিন্তায় সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সে পরম আগ্রহে সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শীতের প্রকোপ ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এই দুর্ব্বল শরীরে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা বৃথা। সে প্রাণ-পণে বলসঞ্চয় করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চীৎকার করিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার মাথার উপরে গির্জ্জার ঘড়িটি ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল—সে যেন মৃত্যুর আহ্বান। সে শিহরিয়া স্তব্ধ হইল।

সেই বিরাট ধাতুযন্ত্রের শব্দে তাহার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ডুবিয়া গেল; কেহই সাহায্য করিতে আসিল না। আবার প্রবল বেগে শোণিতস্রাব সুরু হইল। যদি অবিলম্বে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে না আসে তাহা হইলে বুঝি তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত এমনি ভাবে নিঃশেষিত হইবে।

সে ভাবিল, না, না, এ-কখনই হইতে পারে না; এই বারোটার ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে! অথচ তাহার দুর্ব্বল চিত্তে কেবলি আশঙ্কা হইতে লাগিল সে বুঝি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত হইয়া আসিয়াছে।

সে হতাশ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। ঘড়ির শেষ ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হইল। বাহিরে তখন নূতন বৎসরকে অভিনন্দন করিবার জন্য আনন্দ ও কোলাহলের বান ডাকিয়াছে।

ক্রমশঃ

গারোদের কথা

শ্রী হরিপদ রায় বি, এস্‌-সি

ব্রহ্মপুত্র নদ আসামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এক সুন্দর উপত্যকা-ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই উপত্যকার দক্ষিণ সীমায় যে পর্ব্বতমালা সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারই পশ্চিমাংশে গারো-পাহাড় জেলা অবস্থিত। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে গোয়ালপাড়া—দক্ষিণে মৈমনসিংহ জেলা ও পূর্ব্বে খাসিয়া পাহাড় বিরাজ করিতেছে। ইহার আয়তন প্রায় ৩১৪০ বর্গমাইল। এখানেই অধিকাংশ গারো বাস করিয়া থাকে। ইহার সন্নিকটস্থ জেলাতেও সময়-সময় গারোদের দেখা যায়।

গারোদের দৈহিক গঠন সাতিশয় মনোরম। তাহারা সুগঠিত, বলবান্ ও কর্ম্মঠ। তাহাদের নাসিকা খর্ব্বাকার, চক্ষু ক্ষুদ্র ও তারকার রং সাধারণতঃ নীল; ললাট অপ্রশস্ত ও চক্ষুর ভ্রূ যেন সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাদের মুখ-গহ্বর বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু, মুখ-মণ্ডল গোলাকৃতি ও ক্ষুদ্র। তাহাদের গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ না হইলেও খাসিয়াদের অপেক্ষা কিছু ময়লা।

গারোদের পরিচ্ছদ অতি প্রাচীন ধরনের। ইহারা ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত ও প্রায় ৬।৭ ফুট লম্বা নীল ডোরা-ডোরা দাগবিশিষ্ট বাদামী রঙের কাপড় কটিতটে নেংটীর মত ব্যবহার করে আর তাহাদের সম্মুখভাগে প্রায় ১॥ ফুট কাপড় ঝুল্‌-ঝুল্ করিয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাকে তাহারা "গাণ্ডো" বলে, কখনও-কখনও গারোরা "গাণ্ডোর" এই ঝুল্‌ঝুলে অংশ নানা কারুকার্য্যখচিত করিয়া থাকে। কখনও বা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিত্তলের ফলক দিয়া, কখনও আবার সাদা গোল শঙ্খ বা ক্ষুদ্র শ্বেত-প্রস্তর দ্বারা ইহাকে তাহারা সুশোভিত করিতে চেষ্টা করে। গারোদের ভিতরে পুরুষেরাও গহনা ব্যবহার করে। সময় সময় তাহাদের মস্তকেও ৪।৫ ইঞ্চি চৌড়া ও পূর্ব্বোক্তরূপ কারুকার্য্য-খচিত অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। লম্বা-লম্বা চুলগুলি মুখে পড়িয়া পাছে; তাহাদিগকে ভয়ানক দেখায়, এই ভয়ে তাহারা চুলগুলিকে যথাস্থানে রাখিবার জন্যই এই গহনা ব্যবহার করে। সর্দ্দাররা কিন্তু রেশমের পাগ্‌ড়ী ব্যবহার করে। আর তাহাদের কোমরবন্ধের সহিত একটি থলি ও একটি জাল ঝুলান থাকে। থলির ভিতরে তাহাদের টাকা পয়সা থাকে, আর জালের ভিতরে তাহাদের তামাকের নল ধরাইবার সরঞ্জাম থাকে। তাহারা তাদের কানেও দুই রকম রিং ব্যবহার করে—এক রকম কানের নিম্নে কোমল অংশে ও আর-এক রকম কানের উপরের দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। উপর-কানের গহনার নাম "নাদিরং" ও নিম্নের গহনার নাম "নাডংবি"। এগুলি সাধারণত পিত্তল নির্ম্মিত। তাহারা প্রত্যেক কানে এই প্রকার প্রায় ৩০।৪০টি রিং ব্যবহার করিয়া থাকে। গারোদের গলাতেও গোল-গোল লাল কাচের মালা দেখিতে পাওয়া যায়।

গারো পুরুষ অনেকটা সুশ্রী হইলেও গারো-রমণী দেখিতে ভয়ানক কুৎসিত। তাহারা স্থূল ও খর্ব্বাকৃতি। তাহাদের মুখে কমনীয়তা নাই বলিলেই হয়। তাহাদের

একদল গারো রমণী

পরিচ্ছদের ভিতরে একখানা ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত ময়লা লাল কাপড়। কাপড়ের মধ্যে-মধ্যে অনেকগুলি সবুজ বা সাদা ডোরা দাগ আছে। ইহাই তাহাদের কটিতট আবেষ্টন করিয়া থাকে। সম্পূর্ণ উরুদেশও তাহাতে ঢাকা থাকে না। মেয়েরাও পুরুষদের মত গলায় গহনা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই গহনাগুলি দেখিতে অনেকটা পুরুষদের গহনার মতই। পুরুষদের মত কানেও তাহারা পিত্তলের রিং ব্যবহার করে। তাহাদের নীচের কানে প্রায় ৫০।৬০টি রিং দেখিতে পাওয়া যায়। রিংগুলির ভারে যখন কান কাটিয়া যাইয়া রিংগুলি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন তাহারা সরু দড়ি দিয়া সেগুলিকে মাথার সাথে বাঁধিয়া দেয়। সর্দ্দার-পত্নীর বেশ অন্যান্য মেয়েদের অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র, তাহারা সাধারণত ১৩।১৪ ইঞ্চি প্রশস্ত ও প্রায় ২ ফুট লম্বা কাপড় দিয়া তাহাদের মস্তক আবৃত করিয়া রাখে। সেই কাপড়ের শেষভাগ তাহাদের পিঠের উপর বেণীর ন্যায় লম্বিত হইতে থাকে। গারোদের ভিতরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই কর্ম্মঠ। মেয়েরাও পুরুষদের মত ভার বহন করিতে পারে ও নানারকম শক্ত কাজ করিয়া থাকে।

গারোরা প্রায় সবরকম জন্তুই খাইয়া থাকে—এমন কি কুকুর, ব্যাঙ, সাপ প্রভৃতি কোনটাই তাহাদের অখাদ্য নয়। তাহারা অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া থাকে। শিশুরা গিলিতে শিখিবামাত্রই তাহাদের মদ্য পান করান হয়। তাহারা অনেক রকম মদ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে ভাত পচাইয়া যে মদ্য হয় তাহাই তাহারা সাধারণত পান করে। তাহারা খাদ্যদ্রব্যকে আমাদের মত রান্না করে না, সামান্য একটু গরম হইলেই খাদ্য তাহাদের আহারের উপযুক্ত হয়। তবে তাহারা ভাতকে খুব সুসিদ্ধ করে; আর মাংস এক রকম কাঁচাই ভক্ষণ করে।

প্রত্যেক গারোরই প্রায় দুখানা বাড়ী আছে—একখানা

গ্রামের ভিতরে—আর একখানা তাহার মাঠে। যে সময়ে শস্য উৎপন্ন হয়, সে কয়মাস তাহারা মাঠে বাস করে। যাহাতে বন্য জন্তুরা শস্য নষ্ট না করিয়া ফেলে, সেই জন্যই তখন তাহারা সেখানে বাস করে। তারপর শস্য সংগৃহীত হইলে তাহারা আবার গ্রামে ফিরিয়া আসে ও সেখানে আর-এক শস্যকাল পর্য্যন্ত বাস করে। পাছে বৃহৎ-বৃহৎ হস্তী শস্য খাইতে আসিয়া তাহাদের কোন ক্ষতি করে, এই ভয়ে তাহারা মাঠের গৃহগুলিকে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বৃক্ষের মাথার উপরে নির্ম্মাণ করে। এই গৃহগুলিকে তাহারা "বোরাং" বলে। তাহাদের গ্রামের গৃহগুলি "ছাউং" নামে পরিচিত। তাহারা মাটির উপরে আবর্জ্জনাদি ফেলিয়া ৩।৪ ফুট উঁচু করে এবং তাহার উপরে এগুলি নির্ম্মাণ করে। এগুলি দৈর্ঘ্যে ৩০ হইতে ১৫০ ফুট পর্য্যন্ত ও প্রস্থে ১০ হইতে ৫০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উভয় প্রকার গৃহই ঘাস-খড় বা মাদুর দিয়া ছাওয়া হয়। সর্দ্দারদের গৃহগুলি দেখিতে অতি মনোরম।

গারোরা প্রধানত কৃষিকার্য্যের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

তাহাদের চেহারা দেখিয়া মনে হয় যেন তাহারা খুব ক্রোধী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তাহারা খুব শান্ত ও নম্রস্বভাব। তাহাদের ব্যবহারে কোনরকম কৃত্রিমতা নাই। তাহারা কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। যখন তাহারা মদ্য পান করে, তখন তাহাদিগকে অতিশয় প্রফুল্ল বলিয়া মনে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান বিলুপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা ছেলেমেয়ে, স্ত্রীপুরুষ সবাই একসঙ্গে মদ্য পান করিতে থাকে, আর একযোগে নাচিতে আরম্ভ করে।

তাহাদের নাচও অদ্ভুত রকমের। ২৫।৩০ জন লোক একজনের পশ্চাতে আর-এক জন এই রকম করিয়া দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের কোমরবন্ধ ধরিয়া রাখে। তারপর এক পায়ে ভর দিয়া লাফাইতে-লাফাইতে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, আর বাজনার তালে-তালে গান করে। বাজনা সাধারণত বুড়োরা ও ছেলেরা বাজায়। পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের নাচ আর-একটু ভিন্ন রকমের। মেয়েরা নাচিবার সময় একজনের পশ্চাতে আর-এক জন দাঁড়ায় না—তাহারা সারি দিয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্বোক্তরূপ লাফাইতে থাকে—গানের তালে-তালে তাহারা একহাত নামায়, আর সঙ্গে-সঙ্গে অন্য হাত তোলে। পর্ব্ব উপলক্ষে তাহাদের এই নাচ দুই-তিন দিন ব্যাপিয়া থাকে। সেই সময় তাহারা খুব মদ্য পান করে ও ভূরি-ভোজন করিয়া থাকে।

গারোদের ভিতরেও নকল যুদ্ধ-প্রথা চলিত আছে। তাহাদের যুবারা সময় সময় ঢাল ও তরবারি লইয়া সকলের সাম্‌নে নিজ-নিজ সমর-শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। গারোরা ভৌগলিক বিভাগ অনুসারে তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছে, তদ্ব্যতীত তাহাদের ভিতরে ৩টি বিভিন্ন গোত্র পরিদৃষ্ট হয়—যথা, মমীন (Momin), মারাক (Marak) ও সঙ্গম (Sangma)। আমাদের ন্যায় গারোদেরও বিভিন্ন গোত্র ব্যতীত বিবাহ হয় না!

২।৪টি ব্যতিক্রম ভিন্ন সাধারণতঃ বিবাহের প্রস্তাব মেয়ের পক্ষ হইতেই উপস্থিত করা হয়, ছেলের পক্ষ হইতে হয় না। মেয়ে প্রথমত একটি ছেলেকে পছন্দ করে ও তাহা তাহার পিতা, ভ্রাতা বা খুল্লতাতের গোচরীভূত করে। তখন তাহারাই বিবাহ ঠিক করে। কন্যা নিজে কখনও বিবাহ ঠিক করে না। গারোদের বিবাহ বিষয়ক আর একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। এপ্রথা কেবল গারোদের দুইটি ভৌগলিক বিভাগ—আবেং ও মেটাবেংদের ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়ের বাড়ী হইতে যখন প্রথম বিবাহের প্রস্তাব আসে, তখন প্রথমত ছেলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া পলায়ন করে ও গ্রামের বাহিরে কোথাও লুকাইয়া থাকে। তার-পর তাহার একদল বন্ধু-বান্ধব তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে ও তাহার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাহারা তাহাকে টানিতে-টানিতে পুনরায় গ্রামে লইয়া আসে। তারপর আবার দ্বিতীয়বার সে পূর্ব্বোক্তরূপ পলাইয়া যায় ও পুনরায় ধৃত হইয়া গ্রামে আনীত হয়। কিন্তু তৃতীয় বার যদি ছেলে পলায়ন করে, তবে বুঝিতে হইবে তাহার এই বিবাহে সম্মতি নাই; আর

যদি এবার না পালায় তবে বুঝিতে হইবে যে, সে সম্মত।

গারোদের বিবাহে পিতা-মাতার বিশেষ সম্মতির প্রয়োজন হয় না। যুবক-যুবতীরা তাহাদের ইচ্ছামতই বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়। তবে পিতামাতার সম্মতি একটা প্রথামাত্র। যদি পিতা-মাতারা সন্তানের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহে সম্মতি না দেয়, তবে গ্রামের অন্যান্য লোক আসিয়া যেমন করিয়া হউক পিতামাতাকে সম্মত করে। এমন-কি অনেক সময় প্রহার করিয়াও তাহাদের সম্মতি লওয়া হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গারো-দের ভিতরে অনেকগুলি বিভাগ আছে। এক এক বিভাগে এক-এক রকম বিবাহপ্রথা। তবে আমি আমার জনৈক আসামী বন্ধুর নিকট যে-রকম বিবাহ প্রথা শুনিয়াছি, তাহাই এ-স্থলে বিবৃত করিব।

বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়ে সম্মত হওয়ার পর একটা দিন ঠিক হয়। সেইদিন কন্যাপক্ষের লোক বরকর্ত্তার বাড়ীতে আসিয়া বিবাহের দিন, তারিখ ও ফলাহার ভোজনের দ্রব্যাদি ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নামের তালিকা ঠিক করে। তার পর সেই রাত্রে তাহারা খুব আমোদ-আহ্লাদ করিবার পর বিদায় লয়। বিবাহের দিনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা প্রথমে কন্যা-পক্ষের বাড়ীতে যায়। বর-কন্যার বাড়ীতে আসিয়া বিবাহ করাই অধিকাংশ গারোদের প্রথা। খাদ্য, পানীয়াদি প্রস্তুত হইলে ও সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে পর তাহারা একযোগে গান ও নাচ

গারোদের বৃক্ষের উপর নির্ম্মিত গৃহ "বোরাং"

আরম্ভ করে, আর মধ্যে-মধ্যে মদ্য পান করে। আর এক দল মেয়ে কনেকে নদীর ধারে লইয়া যায়, তাহাকে উত্তম-রূপে স্নান করায় ও পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সুন্দর সুন্দর গহনা দ্বারা তাহাকে সাজাইয়া দেয়। সাজান শেষ হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জানান হয়। তখন তাহারা গান বন্ধ করে। তারপর তাহাদের একদল মদ, খাবার, বাদ্য, ভাণ্ড ও একটী মোরগ ও একটি মুরগী লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া কন্যার বাড়ী হইতে বরের বাড়ীতে

যায়। পুরোহিত মোরগটি ও মুর্গীটি বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাদের পশ্চাতে-পশ্চাতে কন্যাও একদল স্ত্রীলোক-পরিবেষ্টিত হইয়া বরের বাড়ীতে যায়। সেখানে কন্যা ও তাহার সঙ্গের মেয়েরা চাউংএর এক কোণে ঠিক দরজার নিকটে বসে। তারপর ধীরে-ধীরে অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও বরের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। মেয়েদের ঠিক বিপরীত দিকে ঘরের আর-এক কোণে পুরুষেরা বসে। পুরুষেরা তখন পুনরায় গান ও নাচ আরম্ভ করে, তারপর বরকে আহ্বান করা হয়। বর কিন্তু অন্য-এক কুঠরীতে থাকে। কাজেই সে যেন হারাইয়া গিয়াছে, এরূপভাবে তাহার অনুসন্ধান করা হয় ও তাহাকে খুঁজিয়া পাইবামাত্র লোকেরা চীৎকার করিয়া ওঠে। তখন তাহারা তাহাকে নদীর ধারে লইয়া যায়, উত্তমরূপে স্নান করায় ও তারপর গৃহে ফিরিয়া তাহাকে সুন্দ-সজ্জায় সজ্জিত করে। ইহা শেষ হইলে মেয়েরা পুনরায় কন্যাকে তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া যায় ও সবাই একত্রে কন্যাকে বেষ্টন করিয়া বসে। বরের বাড়ীতে অবস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কন্যার এই পৌঁছান সংবাদ পাইবামাত্র মদ্য ও খাদ্যাদি লইয়া বরসমেত কন্যার বাড়ীতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করে। ইহাতে বরের পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিতে থাকে —বরকে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য কিছুক্ষণ বল-প্রয়োগ করিয়া থামিয়া যায়। তৎপর কন্যার পিতা অগ্রে পথ-প্রদর্শকরূপে, তার পর বর ও তাহার পশ্চাতে কন্যা-পক্ষীয় অন্যান্য লোক বরের বাড়ী হইতে যাত্রা করে; কন্যার বাড়ীতে তাহারা ঢুকিবামাত্রই সবাই চীৎকার করিয়া ওঠে ও বরকে লইয়া গিয়া কন্যার ঠিক দক্ষিণ পাশে বসাইয়া দেয়। তারপর পুরোহিত যে পর্য্যন্ত থামিতে না বলে, সে পর্য্যন্ত তাহারা সকলেই গান করিতে ও নাচিতে থাকে। ইহার পর সকলে নিস্তব্ধ হইলে পুরোহিত বর-কনের সাম্‌নে যাইয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাহাতে সেখানে উপস্থিত সকলেই "সুমা সুমা" এই বলিয়া উত্তর দেয়। এইরকম করিয়া কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইবার পর মোরগ ও মুর্গী দুইটিকেই তথায় আনা হয়। তখন পুরোহিত তাহাদের ডানা ধরিয়া শূন্যে উঁচু করিয়া ধরে ও তাহাদের দিকে চাহিয়া আবার কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাহার উত্তরেও সকলেই "সুমা সুমা" বলিয়া উত্তর দেয়। তারপর কতকগুলি শস্য আনিয়া মোরগ ও মুর্গী উভয়ের সাম্‌নে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তখন তাহারা তাহা খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। এই সুযোগে পুরোহিত একখণ্ড যষ্টি দ্বারা ঠিক তাহাদের মস্তকে আঘাত করিয়া তাহাদের মারিয়া ফেলে। উপস্থিত ব্যক্তিরা তখন তাহার দিকে তাকাইয়া থাকার পর চীৎকার করিয়া ওঠে, তারপর পুরোহিত একখানা ছুরি দিয়া প্রথমে মোরগের ও তৎপরে মুর্গীর পশ্চাদ্দেশ কাটিয়া ফেলিয়া নাড়ী বাহির করিয়া ফেলে। সকলেই তখন "সুমা সুমা" বলিয়া হর্ষধ্বনি করিতে থাকে। গারোরা মনে করে, তাহাদের বিবাহের শুভাশুভ এই শেষোক্ত প্রথাটির ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে। যদি যষ্টির আঘাতের সঙ্গে মোরগ ও মুরগীর দেহ হইতে রক্তপাত হয়, বা যদি নাড়ী বাহির করিবার সময় কোন নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়, তবে তাহারা সে বিবাহকে অশুভকর বলিয়া আশঙ্কা করে। পূর্ব্বোক্ত প্রথাগুলি যথারীতি সম্পন্ন হইলে পর বর ও কন্যা একপাত্রে মদ্য পান করে ও সেই মদ্যপাত্র উপস্থিত অন্যান্য লোকদিগকে দেয়। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া ভোজন ও ফূর্ত্তি করিতে থাকে।

গারোদের ভিতরে স্ত্রীলোকেরই প্রাধান্য বেশী। গারোরা মারা গেলে তাদের নিজের ছেলেরা উত্তরাধিকারী হয় না, উত্তরাধিকারী হয় তাহাদের ভাগিনেয়রা।

গারোরাও হিন্দুদের মত মৃতদেহের সৎকার করিয়া থাকে। সাধারণ গারোদের মৃতদেহ সৎকারের মধ্যে কোন বিশেষ নূতনত্ব নাই। তবে উচ্চপদস্থ গারো বা গারো সর্দ্দার বুনিয়াদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের কেহ যদি মারা যায়, তবে তাহার সৎকারের সময় একটি বৃষ বলি দেওয়া হয় ও মৃতদেহের সহিত ঐ বৃষ-মুণ্ডটিও দাহ করা হয়। কখনও-কখনও বৃষ-বলির পরিবর্ত্তে নর-বলিও দেওয়া হয়।

"রুগা" ও "ছিবক" ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সকল গারোদের ভিতরেই আর-একটী অদ্ভুত প্রথা আছে কোন বাড়ীতে কেহ মারা গেলে প্রথমে গারোরা

তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করে ও তৎপরে মৃত ব্যক্তির বাড়ীর সাম্‌নে তাহার স্মৃতি-রক্ষার্থ কাষ্ঠের স্মৃতি-স্তম্ভ প্রোথিত করে। এই স্মৃতি-স্তম্ভগুলি তাহাদের নিকট "কিমা"-নামে পরিচিত। এই "কিমা"তে মৃত মনুষ্যটির মুখের প্রতিকৃতি খোদিত করা হয়।

গারোরা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে, কোন-কোন গ্রামে গারোরা সূর্য্য ও চন্দ্রের পূজা করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অন্য-কোন ক্রিয়া-কলাপের পূর্ব্বে তাহাদের ধর্ম্মে বলির ব্যবস্থা আছে। এই বলির পশু সাধারণত বৃ ছাগল, শূকর, মোরগ বা কুকুর—এই বলি তাহাদে দেবতার সাম্‌নে হইয়া থাকে, গারোরা ভূত-প্রেতে বিশ্ব করিয়া থাকে।

দোষ করিলে গারোদের সাধারণত জরিমানা দিতে হয়। গারোদের সর্দ্দাররা "বুনিয়া"-নামে পরিচিত এই বুনিয়ারাই প্রায় সব বিবাদের মীমাংসা করি থাকে।

সাধনার বিড়ম্বনা

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ছাত্র-জীবন সমাপ্ত করিয়া ঘরে আসিয়া অমিতা মনে মনে ভাবিল, এইবার সত্যকার কাজ করিতে হইবে। কলেজে ছাত্রীদিগের নিকট তাহার খ্যাতি ছিল,—সে লিখিত। ঘরের আলো বাহিরেও যেমন খানিকটা ছড়াইয়া পড়ে, তাহার লেখার কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়া সেই খ্যাতি কলেজের বাহিরেও তেমনি খানিক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেখানে অমিতাকে ঘিরিয়া সহপাঠিনী সঙ্গিনীগণের যে সকল মজলিস্ বসিত সে-সবের আলোচনার বিষয় ছিল অমিতার ভবিষ্যৎ। বাহিরে সমস্ত বাংলাদেশ জুড়িয়া তাহার জন্য আসন পাতা রহিয়াছে, বাহির হইয়া গ্রহণ করিতেই যা দেরি।

গৃহে আসিয়া অমিতা দেখে পড়া নাই, পরীক্ষা নাই, সঙ্গিনীদের অশ্রান্ত স্তবগুঞ্জনধ্বনি চিরদিনের মতন থামিয়া গিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, অখণ্ড অবসর ব্যাপিয়া রঙ্গিন আলো ঝল্‌মল্ করিতেছে—কোথায়ও বিশ্রামহীন বিচিত্র কর্ম্মজীবন চোখে পড়ে না। আজ প্রথম যৌবনের বান ছুটিয়াছে, মনে কবিত্বের রং ফুটিয়াছে, বিশ্বের সম্মুখীন্ হইয়া অপূর্ব্ব কিছু একটা করিবার ইচ্ছা অজ্ঞাতে অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। অথচ, কই করিবার মতন কাজ কি আছে? কিছুই ত চোখে পড়ে না। তাহার যখন সময় হইল, তখন সংসারের প্রয়োজনও সব যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। কোথায়ও কাহারও অপেক্ষা নাই।

অমিতা পিতার কাছে প্রস্তাব - কাগজ বাহির করিবে।

অমিতার পিতা নন্দ-বাবুর একটা দৈনিক কাগ আছে। সেই কাগজখানিই তাঁহার সমস্ত অবসর ঢাকি রাখিয়াছে। কন্যার উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, লেখা পড়া সমাপ্ত, সুতরাং পিতার মনে স্বভাবতই তাহার বিবাহে কথা উঠে। কিন্তু তিনি সেদিকে কিছু করিয়া উঠি পারেন নাই। একে ত অবসর নাই, তার উপরতে শিক্ষিতা কন্যার পাত্র নিরূপণের ভার কতটা পিত উপর আর কতটা তাহার নিজেরই হাতে, সে বিষয়ে তিনি কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। জানাশো কৃতবিদ্য ছেলেদের নাম মনে মনে আলোচনা করেন, কাহাকেও দিব্য মনে ধরে,—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বিরল ছোট সংসারে একমাত্র কন্যা শূন্য নৌকার মতন ভাসিয়া-বেড়ায়, হঠাৎ এক এক সময়ে অত্যন্ত বেশী করিয়া তাহা নজরে পড়ে। এমনি সময়ে কাগজ বাহির করিবার প্রস্তাবে তিনি একটা কূল দেখিতে পাইলেন। কিন্তু আবার কাগজ! কেন এইটে—

অমিতা কহিল, দৈনিক না, মাসিক। নাম দেব 'মন্দির'। তোমাকেই সম্পাদক হ'তে হবে।

আমার ত সময় নেই। তা ছাড়া, বাংলা মাসিক পত্রকে আমি—

আমি সব ঠিক ক'রে নেব।

কন্যার কাজকর্ম্মশূন্য সাদাজীবনে বিয়ের প্রশ্নটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছিল। এই কাগজের আড়ালে সেটা যেন অনেকটা ফিকে হইয়া গেল।

* * * *

অমিতা মনে করিয়াছিল, সে লিখিবে, একটু-আধটু সম্পাদকীয় গুনিবে, আর মাসান্তে পূর্ণচন্দ্রের মতন পত্রিকাখানি সাহিত্যাকাশে উদয় হইবে। কিন্তু কাগজ হাতে লইয়া দেখে গ্রাহক জোটে না, লেখা মিলে না, ছাপাখানা অগস্ত্য-মুনির সমুদ্র গণ্ডূষ করিবার মতন সমস্ত কাপি উদরসাৎ করিয়া বসিয়া থাকে—মাস কাটিয়া গেলেও নির্ব্বিকার। খরচ পত্র হিসাব নিকাশ সমস্তই বিভীষিকা-ময়, কেবল আতঙ্কই উৎপাদন করে। নানা রকম আঘাতে মন্দির উঠিতে না উঠিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি! বিব্রত হইয়া অমিতা পিতাকে কহিল, বাবা, ভাল একজন লোক চাই।

অনেক সন্ধান করিয়া চন্দ্র-বাবু শিশিরকে আনাইয়া মন্দিরের ভার দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। এখন শিশির হিসাব দেখে, দেনা মেটায়, প্রুফ্ সংশোধন করে। সব কিছু ঝঞ্ঝাট বিনাবাক্যে মৃদু হাসির সহিত বহন করে। এক সময়ে সারা রাত্রি জাগিয়া নন্দ-বাবুর দৈনিক কাগজে শিশির সংবাদ এডিট্ করিত। নন্দবাবুর মুখে তার প্রশংসা ধরে না। কিন্তু দৈনিক সংবাদ-পত্র আর সাহিত্য ত এক কথা নয়, অমিতা কেমন করিয়া সে কথা পিতাকে বোঝায়? শিশিরের সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু তাহার চেহারায় কবির কমনীয়তা চোখে পড়ে না। বেশভূষায় কবিজনোচিত অভিনিবেশ বা ঔদাসীন্য কোনটাই নাই। কাব্যকলায় মুগ্ধ হইবার বয়সই তাহার বটে, কিন্তু সেদিকে তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ আছে, অমিতা তাহা মনে করিতে পারে নাই। তাই সংবাদ-পত্রারণ্যের এই বীরটির হাতে তাহার সাহিত্যপুষ্পো-দ্যানের ভার সমর্পণ করিতে প্রথমে অমিতার ভরসা হয় নাই।

কিন্তু ক্রমে জানিল, শিশিরও সংবাদ সাজানর ফাঁকে-ফাঁকে চমৎকার কবিতা লিখিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার বিশেষ অনুরাগ এবং লেখিকা বলিয়া অমিতার নিজের যে খ্যাতি, ততখানি তাহার না থাকিলেও কবি শিশিরকুমারও সাহিত্যজগতে বেশ সুপরিচিত।

এই লোকটিকে নিতান্ত অকারণেই অবজ্ঞা করিয়া-ছিল মনে করিয়া অমিতা কুণ্ঠিত হইল। শেষে, 'মন্দির' সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়া ঘটা করিয়া একদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, এবং শিশিরের প্রকাশিত কবিতার বই এবং অপ্রকাশিত কবিতার খাতা চাহিয়া আনাইয়া পড়িয়া শতমুখে সে-সকলের প্রশংসা করিল। ক্রমে অমিতা একে একে মন্দিরের সমস্ত ভার ইঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। মন্দিরের ইঁট কাঠ পাথরের ভার শিশিরের উপর—সেই গড়িয়া তোলে। সেই-গড়া মন্দিরে আল্পনা দিবার কাজটুকু অমিতার। এখন কাগজ করিবার রস পাওয়া যাইতেছে। সরস্বতীর কমলবনের পঙ্ক ঘাঁটা ত দূরের কথা, এখন তাহা চোখেও পড়ে না। পদ্মের মতন দোল খাওয়া চলিতেছে।

কলেজ ছাড়িয়া আসিয়া অমিতার মন নিরাশায় ভরিয়া গিয়াছিল—ভবিষ্যতের স্বপ্ন-জগৎ যেন স্বপ্নেই মিলাইয়া যায়। গৃহস্থালীর অতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মাঝে বৃহৎ কিছুর ছায়াও দেখা যায় না। কিন্তু এবার যেন পথ পাওয়া যাইতেছে। তাহার মন্দির ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তার চূড়া যে অসীমের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে।

* * * *

মন্দির দিব্য চলিতেছে, উপন্যাসও একে একে কতক-গুলি বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তবু সাহিত্যে, কাব্যে-কর্ম্মে অপূর্ব্ব কিছুর আভাস মিলে না। নিভৃত গৃহকোণে নিতান্ত স্থূল আব্‌হাওয়ার মাঝে অবসর মতন একটু লিখিবার সঙ্গেই সব যেন শেষ হইয়া যায়। শয্যায় গড়াইয়া অলসভাবে পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া জ্ঞান সঞ্চয়ে সাহিত্যের রস জমাট বাঁধিয়া উঠে না।

বাহিরে পাঠক অগণ্য, ভক্ত অনেক, সমালোচকেরও অভাব নাই। কিন্তু সাহিত্যের সেই বিপুল ক্ষেত্রটি দূরেই রহিল। তার হাওয়া আসে, কিন্তু দেখা মিলে না।

সৃষ্টির আনন্দে জীবনের ভিতরে বাহিরে দুকূল ছাপাইয়া কোথায় পরিপূর্ণতার বান ডাকিয়া যাইবে! কিন্তু এ যেন একটি ক্ষীণস্রোত-রেখা তর তর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে—দুইধারে বিস্তৃত বালুর চড়া ধূ ধূ করিতেছে। সংসারে ধোবার হিসাব, ঝীর সঙ্গে বকাবকি দিন ভরিয়া যেন থাকে থাকে সাজান। দিনান্তে শিশির 'মন্দিরে'র আলোচনা লইয়া আসিলে, তবেই একটু পরিত্রাণ। সমস্ত দিন বর্ষার জল-কাদা আঁধারের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার পরে একবার একটুখানি আলোর আভাস।

প্রতিদিনকার তুচ্ছতার উপরে তাহার যে কল্পনা, যে সাধনা অমিতা শিশিরের নিকটে তারই একটা পূর্ণানুভূতি পাইতে চাহে। সে যখন ঘরে চাল ডাল, ধোবা ঝী লইয়া মগ্ন ছিল, সেই সময়ে বাহিরে যেন অপূর্ব্ব কিছু একটা ঘটিয়া গিয়াছে। সেই ইতিহাসটি সে ইহার নিকট অবগত হইতে চাহে। তাহার সাহিত্যসাধনা বাহিরে যে আলোর চমক প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করিতেছে, সেই রূপটি বাহিরের প্রতিনিধিস্বরূপ অন্ততঃ একটি মানুষের মাঝেও প্রতিফলিত হউক।

কিন্তু শিশিরের কথায় ত সারাদিনেরই সুর, অপূর্ব্ব কিছুর ধ্বনি নাই। সে কথায়বার্ত্তায় ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠে না, সরস কথার সূক্ষ্ম স্তবে রঙ্গিন মায়ার সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার আলাপে অর্চ্চনার মন্ত্র নাই। এ-হেন সাহিত্যিকের সঙ্গে রসপিপাসু তরুণী কবির কাব্যগুঞ্জনে ঝঙ্কার উঠে না—কেবলই ছন্দভঙ্গ হয়। অমিতা কল্পনার হাওয়ায় মাটির পৃথিবী ছাড়াইয়া বহু ঊর্দ্ধে উড়িতে চাহে। শিশির প্রতিপদবিক্ষেপে কঠিন মাটিতে ঠোক্কর খায়। অমিতা যা মনে করে তা হয় না। সেজন্য শিশিরকে দোষও দেওয়া যায় না, অথচ তাহার উপরে রাগও ধরে।

*　　　*　　　*　　　*

অমিতা বৈষ্ণবকাব্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিতেছে। বিষয় পুরাতন হইলেও সে রং ফলাইয়াছে নূতন। শিশিরের কাছে তাহার মৌলিকতা যাচাই করিবার জন্য সে আগ্রহে অধীর। কিন্তু শিশির আসি 'মন্দিরে'র আয় ব্যয়ের হিসাব আলোচনা সুরু কা দিল। একটু শুনিতে না শুনিতেই অমিতার বির ধরিল। অথচ বিষয়টা গুরুতর—উড়াইয়া দিলে দায়ি হীনতার পরিচয় দিবার আশঙ্কা। শিশির থামে না এদিকে বৈষ্ণব-রস টাকা-পয়সায় ভরাট হইয়া ওঠে (অমিতা শেষে অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, যেমন দেনা পাওন মিল করছেন, তাতে কবিতা না লিখে হিসেব নিয়ে থাক তাতেই নোবেল প্রাইজ পেতেন।

অমিতার কথায়-বার্ত্তায় প্রায়ই এমনি রহস্যের সুরে সঙ্গে খোঁচার তীক্ষ্ণতা জড়াইয়া যায়। শিশির বিস্মি হইল না। সহাস্যে বলিল, আপনার কাছে শুনে-শু এখন বুঝতে পারছি আমার আগাগোড়াই ভুল। বোধ হ বিধাতার ভুলেই আমার সৃষ্টি।

শিশিরকে আক্রমণ করিয়াও সুখ নাই। অমনি (আত্ম-সমর্পণ করিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া বসে তাহাতে আক্রমণ-বৃত্তি চরিতার্থ হয় না, আঘাত করিয় সুখ হয় না—ঝোঁক বাড়িয়া যায় মাত্র। অমিতা মনে করিল খুব একটা শক্ত জবাব দিবে, কিন্তু উপযুক্ত কি মুখে আসিল না। শুধু বলিল, আগাগোড়া ভুল হ'লে তবু ত সে একরকম ঠিক হ'ত। এযে আধখানা ভুল, আ আধখানা ঠিক।

—আচ্ছা, আপনার প্রবন্ধটা ঠিক—আধখানাকেই শোনান। অমিতা পড়িতে লাগিল। রস সৃষ্টি করা তাহার কাজ, সমালোচনায় তাহা নিংড়ানো এই তাহাতে আবার শিশিরের বৈষ্ণবসাহিত্যে চমৎ দখল। অমিতা সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হইতেছে মাঝে মাঝে বক্তব্য পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যাখ্যা টিপ্পনী করিতেছে, হঠাৎ লক্ষ্য করিল শিশির পুনঃ দেয়ালের ঘড়িটার দিকে চাহিতেছে। পড়ার আবেগ থামিয়া গেল। খাতাটা সরাইয়া রাখিয়া অমিতা কহিল, কোন্ কাজের সময় হ'ল? ল' কলেজের? —না। সে ত সকালে। অন্য একটু কাজ ছিল। পরে গেলেও চলবে। তাড়া নেই কিছু। কি পড়ছিলেন—?

—দুনিয়ায় যত কাজ সমস্ত বঝি আপনার আপনার

যায়। থাকে। আপনি যদি এক দিন মনোযোগ না দেন, যায়'লে তৎসঙ্গে সংসার বোধহয় অচল হ'য়ে যায়!

শিশির হাসিয়া বলিল, সংসার বস্তুটি অমন নিরীহ ক'। তিনিই ঢেউ নিয়ে তাড়া ক'রে ফিরছেন। দুই ত ঠেকিয়েও পার পাওয়া ভার।

অমিতা বলিল, এখন থা—ক; আপনি যান। এ ও হয় নি। আরও অনেকখানি লিখ্‌তে হবে।

—তা হোক। কি বল্‌ছিলেন? বৈষ্ণবসাহিত্যে শেষ ক'রে কি লক্ষ্য হয়?

—আপনার অমনোযোগ।

শিশির হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিশির চলিয়া গেলে অমিতা সেইখানে অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের শীতল বাতাস ধীরে যেন সমস্ত উৎসাহের বাষ্প জল করিয়া দিল। কোথায় যেন একটা অভিযোগ ঘনাইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কাসের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ধরা পড়ে না। সমস্ত দিনের সহস্র রকম তুচ্ছ, মিথ্যা কাজের মাঝে একটা প্রত্যাশা জাগিয়া থাকে—দিনান্তে 'মন্দিরে'র পূজারী আসিয়া আলো জ্বালিয়া সব কালিমা দূর করিবে। তখন জীবনের সত্য আরাধনার উদ্বোধন হইবে। সারা দিনের বাসন মাজা দীপঘষা সেই আরতিরই আয়োজন। কিন্তু সে রকম কিছুই হয় না। পূজারীর না আছে সে মন, না আছে সে অবসর।

অমিতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, মানুষ পশ্চাৎদিশের সন্ধান পেয়েও তা লাভ কর্‌বার চেষ্টা না চারিপাশের তুচ্ছতায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকে কেন?

নন্দ-বাবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। কবি মেয়ের অনেক কথা শোনাই তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। বলিলেন, কি রকম?

—এই যেমন সাহিত্য-সাধনা। যাদের শক্তি আছে তারাও ষোল আনা খরচ কর্‌তে চায় না। সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি চুকিয়ে যদি ফুরসুৎ হয় তবে অবসর-বিনোদনের মতন একটু নাড়ে চাড়ে। আর কাব্য যেন পোষাকী কাপড়। রোজকার জীবনে তার ঠাঁই নাই, শুধু সখ্‌ মেটাবার জন্যে দরকার।

নন্দ-বাবু বলিলেন,—হাঁ, কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে,—বলিয়া বিশুদ্ধ কাব্য ও সৎসাহিত্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ 'সারমনের' আয়োজন করিলেন। হিসাবের অঙ্কপাত তবুও সহিয়াছিল, কিন্তু সৎসাহিত্য সহিল না। অমিতা উঠিয়া গেল।

* * * *

কালই লেখা চাই শিশিরের তাগিদ, অমিতা লেখা লইয়া বসিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা প্রবল বেগে ধাক্কা দিতেছে, কোনও কিছুতে মনসংযোগ করাই দুষ্কর। বিশেষ সাহিত্য-রচনা। চারিদিককার আবেষ্টন যেন পাথরের ভার লইয়া অমিতার এই জীবনটাই পিষিয়া ফেলিতে উদ্যত। স্থূল, অতি স্থূল বস্তুপুঞ্জ স্তূপাকার উপলখণ্ডের মতন রসনির্ঝরের মুখ আঁটিয়া প্রবাহের গতি রোধ করিয়া বসিয়া আছে। একাকী তার সঙ্গে সংগ্রামে তাহার ক্ষুদ্রশক্তির হার যেন হয় হয়।

বাহিরে শীতের সন্ধ্যা সবে ঘোর হইয়াছে। শহরের উপর কুয়াসা ও ধূমের কালো পরদা। তারই ভিতর দিয়া আকাশের তারার সঙ্গে গ্যাসের আলোর মিটিমিটি ইসারা চলিয়াছে। দিনের পরিশ্রম-অন্তে জনস্রোত ক্লান্ত-চরণে গৃহে ফিরিতেছে। সেই ঘন ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করিয়া দোতলার জানালা হইতে রাস্তার মানুষ স্পষ্ট চেনা যায় না। শুধু একটা অবসন্ন শিথিল গতি দৃষ্টি পীড়িত করে। যেন উৎসাহ নাই, প্রাণ নাই, সহজ জীবনান্তের বিকাশ নাই। সংগ্রামকাতর সংসার কোনোও রকমে আপন ভার বহন করিয়া চলিয়াছে। সত্য-সুন্দরের সাধক, 'মন্দিরে'র উপাসকও একটু আগে বাহির হইয়া ঐ জনস্রোতে মিশিয়া গিয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া সেই অপরিচিত পথিক শ্রেণীর কাহাকেও কাহাকেও অমিতার শিশির বলিয়া ভুল হইল।

এই নিদারুণ দস্যুর দাবী ঠেকাইবে কে? এই প্র টানা-হেঁচড়ার কাছে, বাঁশীর ক্ষীণ আহ্বান যতই হোক না কেন, কত দুর্ব্বল! এ যেন হিড়-হিড় ক টানিয়া লইয়া যায়, হাতছানির সাধ্য কি ফেরায়!

অমিতা পিতার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শিশির-বাবু ত আইন পড়েন শুনেছি। আর 'ম

বেকার খাটেন। ওঁর খরচ পত্র চলে কেমন ক'রে?

—খরচ পত্র? ও কত কাজ করে তার কি কিছু ঠিক আছে? অদ্ভুত কর্ম্মী।

—কি, আর কি করেন? চাক্‌রী? ব্যবসা?

নন্দ-বাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, চাক্‌রী করে না ত। ব্যবসা করবার মতন মলধনও আছে ব'লে ত শুনিনি। তবে—।

—তবে অদ্ভুত কর্ম্মটা কি করেন? বলিয়া অমিতা হাসিল।

—কি যে করে শিশির?—কিন্তু ব্যবসায় ওর বেশ মাথা। সেবারে কেমন আগে থেকে আমার কাগজের কণ্ট্রাক্টটা ক'রে দিলে? সাহিত্যেও প্রগাঢ় ঝোঁক।

অমিতা হাসিয়া বলিল, ব্যবসায় মাথা আর সাহিত্যে ঝোঁক। হায়রে! কোথায় মধুলোভী ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন আর কোথায় অন্নের জন্য কোলাহল!

অমিতার নিশ্চিত ধারণা হইল সংসারের চাপে শিশির কাতর। তারই গুরুভারে তাহার সাহিত্যিক শক্তি চাপা। সে যদি মুক্তি পাইত তবে সেই শক্তি আগুনের শিখার মতন উর্দ্ধপানে জ্বলিয়া উঠিত। অমিতা স্পষ্ট দেখিল শিশির যেন ছাইচাপা আগুন। ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ করাইতে হইবে।

আহা! শিশির যদি ধনী, যদি অক্ষয় কুবেরের ভাণ্ডারের অধিকারী হইত। সরস্বতীর একাগ্র আরাধনায় লক্ষ্মীর বিরূপতাই যে ওর বড় বিঘ্ন; ক্ষণে-ক্ষণে যে ধ্যান ভঙ্গ হয়।

সম্মুখে কত বৃহৎ কাজ পড়িয়া আছে। তার তুলনায় ক্ষুদ্র একখানি পত্রিকার পরিচালনা তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। অথচ শিশির অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ফুল তুলিতে বাহির হইয়া উত্তরীয়ের কাঁটা ছাড়াইতেই যে তাহার দিন চলিয়া গেল।

ব্যবসাতে ওর মাথা আছে। তাই করিয়া একটু গুছাইয়া লইয়া—কিন্তু ব্যবসা!

ব্যবসা বস্তুটাকে অমিতা ঘৃণাই করিত। শিশির-বাবুর যদি ব্যবসাই করিতে হয় তবে এমন কিছু করা উচিত যাহাতে অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে একটা কোনও সুকুমার শিল্পও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। উনি যদি জয়পুর মার্ব্বেলের বুদ্ধমূর্ত্তি গড়িয়ে জাপানে চালান দেন তবে নিশ্চয়ই খাসা চলে, কিম্বা—।

শিশিরকে অভাব হইতে মুক্ত, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে অমিতার ভাবুক মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার স্বস্থানটা কি, সে সম্বন্ধে অমিতার মনে কোনও স্পষ্ট ছবি নাই। কেবল, সেখানে বাস্তব জগতের কর্কশ কোলাহল নাই। সে আইডিয়ালের আকাশ। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো সেখানে অবাধ ওড়া। তার বিচিত্র রূপ দেখিয়া মাটির মানুষের মন মুগ্ধ হইবে।

শিশিরের সাহিত্যে উদাসীনতা দেখিয়া অমিতার মনে যে অভিযোগ ঘনাইয়া আসিতেছিল তাহা গলিয়া গেল। শিশিরের দোষ কি! সে যে জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত। সে যে ভাগ্যকর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত।

* * *

পরদিন শিশির আসিলে একটা পরিপূর্ণ আত্ম-প্রসাদের সহিত অমিতা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ব্যবসাতে বেশ মাথা, না?

শিশির ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ। যা কিছু আমার সাধ্যাতীত তাইতেই আমার বেশ মাথা। সাধ্যাতীত হবে কেন? বলিয়া অমিতা নানা রকম রুচিমার্জ্জিত কবিজনোপযুক্ত ব্যবসায়ের অসম্ভব অসম্ভব প্ল্যানের খসড়া হাজির করিল।

শিশির হাসিয়া বলিল, ব্যবসাতে আমার চাইতে আপনার মাথা ঢের বেশী দেখছি। কিন্তু অকস্মাৎ সাহিত্যচর্চ্চা থেকে ব্যবসাতে মাথা খুলে গেল কেন বলুন ত? আমার ত রাতারাতি বড়লোক হবার ফরমাস্ ছিল না, কাপির তাগিদ ছিল।

কিন্তু আপনাকে এমন ভাবে আট্‌কে রাখা কি উচিত। আপনার সাহিত্যচর্চ্চা যে টিম্ টিম্ করছে।

তেলের অভাবে ত টিম্ টিম্ করছে না। দপ্ দপ্ করবার মতো শক্তিই নেই যে। ভগবানের কৃপায়, পিতৃপিতামহের বুদ্ধিতে সে অভাব আমার তেমন নাই।

অমিতা বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিল। শিশিরের

অনটন কল্পনা করিয়া তাহার যত না কষ্ট হইয়াছিল তাহার সচ্ছলতার সংবাদ জানিয়া তদপেক্ষা যেন বেশী দুঃখ বোধ হইল। এর সাধনার পথে ত জঞ্জালের বন্ধন নাই। এ বন্ধ নয়। এ যে অন্ধ। শিশিরের কাছে তাহার যত কিছু আশা ভরসা ছিল আজ হঠাৎ যেন সে-সমস্ত শূন্যে মিলাইয়া গেল। এই ধূলির ব্যাপারীর কাছেই সে রত্নের আশা রাখিয়াছিল।

শিশির বলিল, ব্যবসা দু'দিন বাদে খুল্‌লেও কারো কাছে জবাবদিহি নাই। কিন্তু কাপি যে আজই চাই। নতুবা—

অমিতা নিতান্ত সাদাভাবে বলিল, নাই বা থাক্‌ল এবারে আমার লেখা।

—ওঃ সর্ব্বনাশ! তাহ'লে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ চিঠির বানে আমাকে উড়িয়ে দেবেন।

এমন সময়ে সুশান্ত প্রবেশ করিল! বিলাত হইতে বিজ্ঞানে ডাক্তার উপাধি লইয়া সুশান্ত অল্পদিন হইল দেশে ফিরিয়াছে। কলিকাতায় নামিয়াই অসহ্য গরম বোধ হওয়ায় দার্জ্জিলিংএ ছিল। সম্প্রতি পাহাড় হইতে ফিরিয়া কলেজের কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। অমিতা নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, এই যে এসেছেন। তারপর শিশিরের পরিচয় দিয়া কহিল, ইনিই 'মন্দিরে'র পুরোহিত। এঁরই কথা কাল আপনাকে বলেছিলাম। শিশির-বাবুর কবিতা পড়েন নি?

সুশান্ত চিন্তা করিয়া কতকটা আপন মনে কহিল, শিশিরকুমার! শিশিরকুমার! হাঁ। পড়েছি বই কি! তবে কি জানেন, কাব্যরস যে টেষ্ট-টিউবে ভ'রে পড়া যায় না তাই বৈজ্ঞানিকের তা নিয়ে নাড়াচাড়া কেমন যেন অনধিকারচর্চ্চা ব'লে ঠেকে।

শিশির পূর্ব্বে সুশান্তকে দেখে নাই। অমিতার সঙ্গে পরিচয় আছে তাহাও জানিত না। তাহার অঙ্গে বিলাতী পোষাক পরিপাটি করিয়া পরিহিত। উজ্জ্বল মুখে সৌজন্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কথায়-বার্ত্তায়, কায়দা-কানুনে দুরস্ত। শিশির সমীহের সহিত কহিল, আজ্ঞে, কাব্যের জাতিভেদজ্ঞান নেই। সকলেরই সমান অধিকার কিন্তু আপনার বিজ্ঞানের দরজা আমাদের কাছে একবারে রুদ্ধ। বিদ্রোহ ক'রে অনধিকার প্রবেশের জন্য মাথা ঠুক্‌লে মাথা ফেটে যাবে তবু একটু ফাঁক হবে না।

সুশান্ত হাসিল। ইউরোপে একাধারে কেমন কবি ও বৈজ্ঞানিক, ঔপন্যাসিক ও গণিতজ্ঞ দেখিয়া আসিয়াছে তাহা বলিল এবং তাহারই রেশ টানিয়া ক্লাসিক-রোমান্টিক আধুনিকতম সমস্ত সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল।

সুশান্ত কথায়-বার্ত্তায় কেমন একটা উচ্চ স্বর ফুটাইয়া তুলিল। অমিতা তাহারই সঙ্গে তাল রাখিতে, ভাবিয়া চিন্তিয়া দিব্য গুছাইয়া উত্তর দিতেছে। সুশান্ত হঠাৎ অমিতাকে কহিল আপনার লেখায় একটা জিনিষ বিশেষ ক'রে লক্ষ্য হয়—

অমিতা উদ্‌গ্রীব হইল, শিশিরও মনোযোগ দিল এবং অমিতার লেখার বিশেষত্বের প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত কোন্ কোন্ বিশ্বসাহিত্যিকের সঙ্গে তাহার কি আলাপ হইয়াছিল তাহাও উভয়ে শুনিল।

সাহিত্যের এমন গভীর আলোচনা অমিতা পূর্ব্বে কখন শোনে নাই। উৎসাহে আনন্দে তাহার মন নাচিয়া উঠিল; তাহার মন সাহিত্যের হাওয়ায় ফানুষের মতন ভাসিতে চায়। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ তুলিয়া, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আলোচনাটা টানিয়াই রাখিল এবং বর্ত্তমান সাহিত্য-বিচার-অন্তে ভাবী সাহিত্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পর্য্যন্ত চলিল। তারপর সুশান্ত বিদায় লইল।

কিছুপূর্ব্বে অমিতার মনটা ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। এই কথায়-বার্ত্তায় তাহা কাটিয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে শিশিরকে কহিল এদেশে বৈজ্ঞানিক কাব্যের ধার ধারে না। আর কবি বিজ্ঞানের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলে। এমন দেশে সুশান্ত-বাবুর মতন লোক ভারী আশ্চর্য্য, না?

শিশির বলিল, আমাদের কাগজের জন্য ওঁর লেখা চাই।

* * * * * *

পরদিনই সুশান্ত যখন অমিতাকে ইনষ্টিট্যুটে তাহার 'ব্যোম' বিষয়ক প্রবন্ধ-পাঠ-সভায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। তখন সঙ্কোচ কাটাইয়া চট্ করিয়া অমিতা রাজী হইতে পারিল না। অমিতার বাহিরের পথ বন্ধ

ছিল না, সে-জগৎটির প্রতি লোভও বিস্তর, কিন্তু সেদিকে পা বাড়াইবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। যাইবার আগ্রহই যেন বাধা হইয়া পা জড়াইতেছে! শিশির যাইবে কি না তাহাও বুঝা যাইতেছে না। অমিতা উদাসীনভাবে কহিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-কথা আমরা অব্যাপারী কি বুঝব? কি বলেন শিশির বাবু?

সুশান্তই জবাব দিল, অব্যাপারীই ত আমি চাই, আপনারাই ত আমার আসল শ্রোতা। শিশির-বাবু, আপনি কি সময় ক'রে—

শিশির ব্যস্ত হইয়া কহিল, যাব বৈকি, নিশ্চয়ই যাবো। আমি মেয়েদের মতন ভীরু নই। উনি 'ব্যোম' শুনেই আকাশ থেকে পড়লেন। আমি হর হর ব্যোম ব্যোম ব'লে, যাত্রা করব।

নিতান্ত কিছু বলিবার জন্যই অমিতা বলিল, যুদ্ধ যাত্রা নাকি? দেখবেন—

শিশির বলিল, দেখতে কিছু হবে না। ব্যোম বিজ্ঞানে যাই হোক, মোটের উপর শূন্য। সুতরাং এ নিরুদ্দেশ যাত্রা।

অমিতার কথাটা ভাল লাগিল না। শিশির-বাবু মাঝে মাঝে এমন এক-একটা কথা ব'লে বসেন;—ওঁর যদি কোনো কালেও ভেবে চিন্তে কথা বলার অভ্যেস হয়! তাড়াতাড়ি সে সুশান্তকে বলিল, যোদ্ধা-ব্যক্তির সঙ্গে ত ভীরু মেয়েদের যাওয়া চল্‌বে না। আপনার কি—

সুশান্ত বলিল, এই পথেই ত যেতে হবে। আমি তুলে নিয়ে যাবো।

সুশান্ত অমিতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া সভামঞ্চের উপর বিশেষ আসনে বসাইয়া দিল। সভারম্ভের পূর্ব্বে সেইখানে কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলার সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। তাঁহাদের অনেকেরই নাম অমিতা শোনে নাই। কিন্তু দেখিল তাঁহারা সকলেই তাহাকে পরোক্ষভাবে চেনেন যে!

সভাঘর বিদ্যুতের আলোয় ঝক্‌মক্ করিতেছে। সম্মুখে তরুণ ছাত্রদের সার দেওয়াল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাহাদের কেহ বা চলা-ফেরায় খেলোয়াড়ের মতন ক্ষিপ্রতায় কেহ কেহ বা কবির মতন বেশভুষায় নিজেকে নিজের দশগুণ ফুলাইয়া তুলিয়াছে। দূরে একটা চেয়ারে শিশির বসিয়া। অমিতা সুশান্তকে বলিল, শিশির-বাবু আমাদের আগেই এসেছেন দেখছি।

সুশান্ত বলিল এইখানে ডেকে নিয়ে আসি।

অমিতা বলিল, থাক্, মিছে আবার একটা গণ্ডগোল।

একটা ছোট টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কখন বা তাহার উপর ঝুঁকিয়া সুশান্ত প্রবন্ধ পাঠ করিল। শেষ হইলে করতালিতে করতালিতে 'হল' যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

একে ত সে সভাসমিতিতে অনভ্যস্ত তাহার উপর প্রবন্ধ সরল হইলেও মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে কণ্টকাকীর্ণ, অমিতা সকল শুনিতেও পায় নাই, বুঝিতেও পারে নাই। তবু উত্তেজনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ফিরিবার পূর্ব্বে সুশান্তর প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত সেটা 'মন্দিরের' জন্য চাহিয়া ফেলিল।

সুশান্ত বলিল আপনার ভাল লেগেছে, সেই আমার যথেষ্ট। আপনার কাগজের সমস্ত পাঠকের যদি না লাগে তাতে দুঃখ করব না। দিতে আমার আপত্তি কি! কিন্তু এ কি মাসিক পত্রে চল্‌বে?

অমিতা জোর দিয়া বলিল, নিশ্চয়ই চল্‌বে। কেমন শিশির-বাবু, চল্‌বে না?

শিশির বলিল, হাঁ, একটু ছেঁটে-কেটে।—

অমিতা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, ছেঁটে-কেটে কেন? বাংলা দেশের সমস্ত পাঠক বুঝি কেবল কবিতার জন্যই মাসিক কাগজ পড়ে? এ নিশ্চয়ই চল্‌বে। চালাতেই হবে।

'মন্দিরে'ই তাহা প্রকাশিত হইল। সুশান্তের অনুরোধে অমিতা যতটা পারে ভাবটা সংশোধন করিয়া জড়-বিজ্ঞানের শুষ্কতায় কাব্যের রস ঢালিয়া প্রবন্ধটা সরস করিয়া দিল।

*　　*　　*

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের উপর কলম চালাইয়া অমিতার মনে কেমন ছোঁয়াচ লাগিয়া গেল। উপন্যাস লেখা ভাল লাগে না। কাল্পনিক নরনারীর অলীক সুখ-

দুঃখ লইয়া মিথ্যা হাসি কান্নার সৃষ্টি। তাহাতে না দরকার হয় চিন্তাশীলতার, না লাগে গবেষণা। তরল, অত্যন্ত তরল।

সুশান্তও আজকাল উক্ত সাহিত্য-সম্বন্ধে অমিতার সহিত রীতিমত আলোচনা করিতেছে। 'মন্দিরে' তাহার প্রবন্ধ বাহির হইয়া গিয়াছে, সে এখন লেখক। ইহার পরে সুশান্ত কি লিখিবেন সেই বিষয়-নির্ব্বাচন লইয়া পরামর্শ চলিতেছে।

সুশান্ত বলে, সিরিয়াস্ লিটারেচরের উপযোগী ক'রে, পাঠকের মন গ'ড়ে নিতে হয়। উপন্যাস বলুন আর কাব্যই বলুন, পাঠক ক্রমাগত চায় ব'লেই যে ক্রমাগত দিতেই হবে সে ঠিক নয়। এ বিষয় ইউরোপে বেশ—

অমিতা বলিল, আমি এসম্বন্ধে কিছু লিখব মনে করেছি। হাঁ, লিখ্‌বেন ত নিশ্চয়ই। কিন্তু বল্‌লে আরও ভাল হয়।

ওঃ সর্ব্বনাশ! আমি কি আপনার মতো সভাতে বক্তৃতা করতে পারি?

—বক্তৃতা করিনি ত! প্রবন্ধ পড়েছিলাম। আপনি মিথ্যা আশঙ্কা কর্‌ছেন। প্রবন্ধ লেখাই শক্ত, পড়া ত কঠিন নয়।

* * *

অমিতা দেখিল সত্যই প্রবন্ধ পড়া কঠিন নয়। তরুণ ছাত্রদের ছোট সভাটিতে প্রথম যেদিন সে সাহিত্য-প্রবন্ধ পাঠ করে সেদিন অবশ্য উত্তেজনায় আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সঙ্কোচে কণ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া বাধিয়া বাধিয়া গিয়াছিল। এখন সে কথা মনে পড়িলে হাসি আসে। সভা-সমিতি লাগিয়াই আছে। প্রবন্ধ-পাঠ ত দূরের কথা, প্রয়োজন হইলে নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থাতেও উপস্থিত-মতো ঘণ্টাখানেক বলিয়া যাইতেও এখন ঠেকে না।

সুশান্ত কাজের লোক;—যাহা প্রয়োজন বলিয়া বুঝে তাহা না করাইয়া ছাড়ে না। শিশিরের সঙ্গেও কতদিন এই সকল করণীয় বিষয় লইয়া অমিতার আলোচনা হইয়াছে কিন্তু সে 'ইজি' চেয়ারে পড়িয়া সাহিত্য-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি সমস্ত চুকাইয়া দেয়। অলস নিতান্ত অলস। আলাদিনের প্রদীপের মতো একটা প্রদীপ হাতে পাইলে তবেই শিশির কাজ করিতে পারে। তাহার অভাবে কবিতাতেই দুঃখের অশ্রু বহাইয়া সন্তুষ্ট। অথচ সুশান্ত-বাবুর সঙ্গে কদ্দিনেরই বা আলাপ! তা ছাড়া পূর্ব্বে ঠিক তিনি সাহিত্যসেবীও ছিলেন না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এ-দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে অম্‌নি অমিতাকে দিয়া লিখাইয়া বক্তৃতা করাইয়া তন্দ্রালস সাহিত্যের ঝিম্ ভাঙ্গিয়া তাহাকে আপন কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। এখন বিভিন্ন মতের সাহিত্যরথীদের মুখে ও কলমে সাহিত্যের অবয়ব লইয়া খই ফুটিতেছে।

সুশান্তর মত, সাহিত্যে ও সমাজে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এক-টিকে বাদ দিয়া অন্যটির পুষ্টিসাধন অসম্ভব। সুতরাং সমাজের দিকেও অবহিত হওয়া দরকার। অমিতাও তাহা স্বীকার করে। সুশান্ত বলিল, আমি জাতিভেদ কুসংস্কার ইত্যাদির দিকে যথাশক্তি করতে পারি। কিন্তু মেয়েদের মঙ্গল আপনি যেমন বুঝ্‌বেন অন্যে ত তা পারবে না। স্ত্রীশিক্ষা স্বাধীনতা ইত্যাদিও আপনাকেই হাতে নিতে হয়?

অস্বীকার করা চলে কেমন করিয়া? কাজেই, সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য সেগুলিও হাতে লইতে হইল। তাই লইয়া দুটো একটা মিটিং-বৈঠক করিতে না করিতে মায়ের পিছনে পিছনে ছেলের মতো স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার আঁচল ধরিয়া শিশুরক্ষা, শিশুমঙ্গল ইত্যাদি আসিয়া হাজির। বিব্রত হইয়া অমিতা সুশান্তকে বলিল, এত কাজ কি আমরা পেরে উঠ্‌ব?

সুশান্ত বল্‌লে, কেন পারবেন না? নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস করতে পারাই সব চাইতে পারা। সেইটে যদি পারেন দেখ্‌বেন আর কোথায়ও আট্‌কাবে না।

কাজ বাড়িয়াই চলিয়াছে। একটির পর একটি যেন স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া পাহাড় পরিমাণ হইয়া উঠিতেছে। অমিতা আশা করে, শিশির সাহায্য করিয়া একটু ভার লাঘব করে। কিন্তু সে যেন ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে। প্রত্যহ পুঞ্জীভূত কর্ম্মসমূহের আড়ালে সে যেন একটু-একটু করিয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সারাদিন কত কি করিয়া এক প্রহর রাত্রির সময়ে ক্লান্ত অবসন্ন

শরীরে গৃহে ফিরিয়া অমিতা দেখিয়াছে, শিশির দিব্য আরামে নন্দবাবুর ঘরে চায়ের সঙ্গে সান্ধ্য আলাপ চালাইতেছে আর উড়ো জাহাজ কি গঙ্গার ইলিশ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিতেছে। যেন দুনিয়ায় সভা-সমিতি কাজ-কর্ম্মের কোনও বালাই নাই।

রাগে অমিতার গা জলিয়া উঠে। এ ত অক্ষমতা নয়। এযে নেহাৎ উদাসীনতা। সে আজ কর্ম্মের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে আর দুদিন পূর্ব্বেকার কর্ম্মের সাথী তীরে দাঁড়াইয়া উদাস দৃষ্টিতে তাই দেখিতেছে। একটা চাপা ক্রোধ বুকের মাঝে ঢেউয়ের মতন হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া অভিমান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

শিশির আসিয়া বলিল, একটা মুস্কিল হয়েছে—অমিতা উষ্ণভাবে বলিল, হোক্‌গে। একটা সামান্য কাগজের একটু মুস্কিলের চাইতে ঢের বড় জিনিষ সংসারে নিত্য হচ্ছে।

শিশির হাসিয়া বলিল, তাইত দেখ্‌ছি। সাহিত্যচর্চ্চা থেকে সমাজ সেবায় উঠেছেন, এইবার বোধ হয় পলিটিক্‌সে প্রমোশন। 'মন্দিরকে' নাটমন্দিরে পরিণত কর্‌তে না পার্‌লে আর সুবিধে নেই দেখ্‌ছি।

অমিতা চুপ করিয়া গেল। কথার ফুঁয়ে যে সমস্ত উড়াইয়া দিতে চাহে তাহাকে আর বলিবার কি থাকে! সংসারে বড় কিছু করিবার ঝঞ্ঝাট, আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ যে দেখিয়াও দেখে না তাহাকে চোখে আঙুল দিয়া তাহা দেখাইতে যাইবার মতো লজ্জা আর কি আছে?

সংস্কারপরায়ণ লোক পাঁজি না দেখিয়া যাত্রা করিলে তাহার সমস্ত সফলতার তলে তলে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ থাকিয়া যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে এই আড়ম্বরপূর্ণ মাত্রায় শিশিরকে বাদ দিয়া অগ্রসর হওয়াতে অমিতার সকল কাজ-কর্ম্মের তলে-তলে তেমনি একটা কাঁটা থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দেয়। সরস্বতীর আরাধনায় শিশির যেন সংস্কারের মতো আঁটিয়া গিয়াছে তাহার আবশ্যকতাও চোখে পড়ে না, অথচ অনাবশ্যক বোধে তাহাকে বাদ দিয়াও স্বস্তি নাই।

*   *   *   *

এক রাশ ফুল পাতা সম্মুখে করিয়া অমিতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সুশান্তর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ যেন বাতাসে উঠিয়া পড়িয়াছে। সে মুখোমুখি কাহারও নিকট কিছু শোনে নাই, অথচ দুই কানে অবিশ্রান্ত ভাবে এই কথাটাই ধ্বনিত হইতেছে। পিতার উৎসাহ-আনন্দ লক্ষ্য করিতেছে, বাহিরেও অনেকের কাছে আপন সৌভাগ্যের আভাস ইঙ্গিত পাইয়াছে। মিউজিয়াম প্রাচীন চিত্র-পরিদর্শন, পরিষদে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি-পাঠ ইত্যাদি কত কি কাজে সমস্ত দিনটা সুশান্তর সঙ্গেই হুটপাট করিয়া কাটিয়াছে। ঘরে আসিয়া বসিতে না বসিতে তাহারই প্রেরিত এই উপহার যেন একটা প্রশ্ন হইয়া জবাব চাহিতেছে।

অমিতা এ প্রশ্নটা কোনও দিন ভাবে নাই। নিজের এই বিস্তৃত জীবন একদিন কোনও অন্তঃপুরে গুটাইয়া লওয়া হইতে পারে, এ চিন্তা তাহার মন স্পর্শ করিত না। সংসারের উপরে তারার মতন ফুটিয়া আকাশে তাহার আলো ছড়াইয়া দিবে এম্‌নি একটা রঙ্গিন কল্পনা তাহার চিত্তকে উৎসাহিত করিত। আজ হঠাৎ দেখে, নানা পথ ঘুরিয়া অবশেষে সেই অন্তঃপুরের সম্মুখে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছে। মন যেন আশাভঙ্গের ভার বোধ করিতেছে। অথচ কি যে আশা করিয়াছিল; কি যে হইবে ভাবিয়াছিল অথচ হইল না তাহাও ঠিক বুঝিল না। তথাপি রূপে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, ধনে, মানে খ্যাতিতে, সুশান্তর দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল, তাহাকে লাভ করা যে-কোনও নারীর পক্ষেই যে সৌভাগ্যের কথা মোটামুটি এ-কথাটাও অমিতার মনে উদয় হইল।

এম্‌নি সময়ে নন্দবাবু আসিয়া ঠিক এই প্রসঙ্গটাই তুলিলেন। অমিতার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার সোজা প্রশ্নের জবাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রদান করিয়া সে উঠিয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে জানিতে পারিল শিশির আসিলে পিতা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই শুভ সংবাদ তাহাকে দিলেন। সেও আনন্দ প্রকাশ করিল। এই মানুষটার কাছে অমিতা জীবনে অনেক বৃহৎ কাজ, উচ্চ আদর্শ মহৎ সাধনার কথা বলিয়া আসিয়াছে। তাহার বস্তুতান্ত্রিক স্থূল ভাবের বিরুদ্ধে অনেক রহস্য বিদ্রূপ

করিয়াছে। তাহারই সহিত নিজের বিবাহের কথাটা আলোচিত হইতেছে। জীবনের গতি ঘুরাইয়া সে কোথায় কাহার ঘরণী হইতে চলিয়াছে শিশিরের কাছে সেই সংবাদটা প্রচারিত হইল দেখিয়া সে কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। তাহার এতদিনকার কথা-বার্ত্তা কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে এই বিবাহটা যেন খাপ খাইতেছে না, অত্যন্ত বেসুরা বোধ হইতেছে। যতই নিজের মনকে বুঝাইল এ কথা ঠিক নয়, দুইয়ের মাঝে বিরোধ নাই, ততই যেন সঙ্কোচটা চাপিয়া-চাপিয়া ধরিতে লাগিল। তবু সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলিয়া ফেলিয়া সে শিশিরের সম্মুখে আসিয়া কহিল, কতক্ষণ এলেন? আপনার মন্দিরের মুস্কিল আসান হ'ল?

নন্দবাবু উঠিয়া গিয়াছিলেন। শিশির একা-একা বসিয়া বোধহয় অমিতারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার প্রশ্নটা শুনিয়া সে অবাক্ হইল। "মন্দির" যেন তাহারই, অমিতার যেন কোনও সংস্রব তাহাতে নাই। কহিল, কই আর হ'ল? তবে আপনি একটু দয়া কর্‌লেই হয়।

অমিতা নিতান্ত একটা কিছু বলিবার জন্যই কথাটা বলিয়াছিল, ভাবিয়া বলে নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, বেশ, আমি দয়া কর্‌লে কি রকম! দয়া-অদয়ার কথা এল কিসে?

অমিতার কথায় ঝাঁজ ছিল। শিশির সে-কথার জবাব না দিয়া কহিল, চমৎকার ফুলগুলি ত। সুশান্ত-বাবু পাঠিয়েছেন বুঝি? খাসা পছন্দ তাঁর।

অমিতা কহিল, হাঁ বড় বড় গোলাপ ফুল এক রাশ কিন্‌তে খুব পছন্দের দরকার হয়। বলিয়া সেগুলি এক দিকে ঠেলিয়া দিয়া পুনরায় কহিল, বাবা বল্‌ছিলেন কোথায় নাকি আপনি যাবেন? শিশির কহিল হাঁ, সেই জন্যই ত বল্‌ছি, কাগজটা এইবার আপনাকে একটু দেখ্‌তে হবে। বেশী কিছু—

—কোথায় যাচ্ছেন?

—মফস্বলে কাজ পেয়েছি?

—কল্‌কাতায় বুঝি কাজ পাওয়া যায় না?

—কই যায়। যদি বা ভাগ্যগুণে হঠাৎ বেকার কিছু জোটে শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টে টেকে না। সে যা-হোক্, আপনার বাবার আফিসের যদু-বাবুই সব করেন। আপনি শুধু একটু নজর রাখ্‌বেন লেখা-টেখাগুলো একটু গুছিয়ে—

অমিতা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, আমি পার্‌ব না। আপনি ও আপদ্ তুলে দিয়ে যান।

—সে কি, দিব্যি চল্‌ছে।

—চলুক্‌গে। বলিয়া অমিতা উঠিয়া চলিয়া গেল। শিশির অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। কিন্তু অমিতা আর আসিল না।

* * *

অমিতা বসিয়া-বসিয়া ভাবিতেছিল দিব্য আরম্ভ করা গিয়াছিল। একটা জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যৎ ধীরে-ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ যেন তাহার সম্মুখে চিরদিনের মতন কালো পর্‌দা ঝুলিয়া পড়িল। জীবনের সব কিছু যেন হু হু করিয়া বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব জীবনের শেষ স্মৃতি ঐ 'মন্দির' ক্ষণপূর্ব্বে নিজেই ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া অতীত গৌরবের সমস্ত চিহ্ন যেন আপন হাতে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সেদিন রাত্রে পিতা অনেক সুখ-দুঃখের কথার পর অমিতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শুইতে গেলেন। অমিতাও শয্যায় পড়িয়া নিজের ভাগ্যের কথাটাই ভাবিতেছিল। কিন্তু সেই অন্ধকারে সুশান্তর মূর্ত্তি কিছুতেই চিন্তার মাঝে ফোটে না। সে যেন সভামঞ্চে ঝক্ ঝক্ করিবার মতো মুখ—নিশীথ রাত্রে নির্জ্জনে শয়ন করিয়া অন্ধকারে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। অমিতা ভিতরে-ভিতরে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

উঠিয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ, নিঝুম রাত্রি। গলির মোড়ের শিশিরাচ্ছন্ন গ্যাসের আলোটা ঘুমন্ত রাত্রির শিয়রে দাঁড়াইয়া যেন ঝিমাইতে ঝিমাইতে পাহারা দিতেছে। সম্মুখের শ্রেণীবদ্ধ বাড়ীগুলির সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। সেই নিশীথ রাত্রির গভীর প্রশান্তির মাঝে অমিতার অন্তরতম সাধনার ধ্যানরূপটি তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল। সে অবাক্ হইয়া দুই চোখ ভরিয়া দেখিল, কোথায় সাহিত্য, কলা, সমাজ, শিক্ষা, কোথায় সুশান্ত। পথ-চলার মুখে যাহাকে পথের পাশে ফেলিয়া গিয়াছে, সে অলক্ষ্যে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত অন্তর

পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। আজ তারই আসনে টান পড়িয়া বেদনায় হৃদয়ের সমস্ত শিরা উপশিরা যেন ছিঁড়িয়া আসিতেছে।

ভিতরে-বাহিরে, বাস্তবে-কল্পনায়, সত্য-মিথ্যায় নিজের ভাগ্য এমন জটিল পাকেও মানুষে পাকায়। আজ এই রাত্রিতে প্রাণে যে ব্যথার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল অনতিদূরে এম্‌নি আর এক রাত্রে আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহা নিবাইয়া ফেলিতে হইবে। জীবনস্রোত সমুদ্রাভিমুখে ছুটিয়াছে বলিয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল। আজ দেখে তার মুখ পাতালের দিকে, আর একটি বাঁক ঘুরিয়া অতল ভূগর্ভে প্রবেশ করিবে। সেখানে পথ নাই, আলো নাই—অনন্ত অন্ধকার, জীবন্ত সমাধি। মৃত্যু ভিন্ন মুক্তি নাই।

লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! নিদারুণ অসত্যকে এখন অসত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই লোকলজ্জার সীমা নাই। সে আকাশের চাঁদ গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে, কেমন করিয়া কোন্ মুখে এখন বলে, আকাশ-প্রদীপই তাহার আলো, চাঁদ তাহার জীবনে অক্ষয় অমাবস্যা?

জানালার গরাদে ধরিয়া অমিতা অবসন্ন দেহ এলাইয়া দিল। সুপ্ত গভীর রাত্রি থম থম করিতে লাগিল, তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে হইল একধারে সে, আর বহুদূরে অন্য প্রান্তে শিশির, মাঝখানে এই অন্ধকাররাশি অনন্ত বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অমিতার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগল। ভোরের শীতল বাতাস নিঃশব্দ-সঞ্চরণে তাহার উত্তপ্ত মুখে সান্ত্বনার হাত বুলাইয়া দিল, পূর্ব্ব-আকাশে গ্যাসের আলোর ওধারে আঁধারের রং ফিকা হইয়া গেল, অমিতা একইভাবে চোখের জলে রাত্রির বুক ভাসাইতে লাগিল। আপনার মর্ম্মান্তিক ভ্রান্তির উপর তাহার হৃদয় যেন উপুড় হইয়া পড়িয়া সমানে মাথা কুটিতে লাগিল।

* * *

নন্দ-বাবু আশা করিয়াছিলেন বিবাহ সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাপারটা চাপা থাকিবে, সেদিকে কন্যার অগোচরে চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে শিশিরেরই সহিত অমিতার বিবাহ। চারিদিকে একটা ঢি ঢি পড়িয়া গেল। পুরুষেরা বলিলেন মেয়েটার মাথা ত বরাবরই খারাপ। সঙ্গে সঙ্গে বাপও পাগল হইয়াছে। অমিতার সাহিত্য-সখী ও সমাজ-সেবায় সহকর্ম্মিণীগণ অবাক্ হইয়া ধিক্কার দিল, সোনা ফেলে আঁচলে গেরো। ছিঃ! সমস্ত দুর্নাম ধিক্কার মাথা পাতিয়া লইয়া অমিতা নিভৃতে শিশিরকে হাসিয়া কহিল, এতও কপালে ছিল!

"সব চেয়ে মিষ্টি"

শ্রী রাধারমণ বিশ্বাস, বি-এ

সব চেয়ে মিষ্টি কি সব চেয়ে মিষ্টি
শরতের সন্ধ্যা—কি জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টি?
সাততলা রাজপুর মর্ম্মর প্রস্তর,
হিরকের ঝিলিমুলি মুকুতার থর থর,
চক্‌মক্ বিদ্যুৎ সজ্জিত কক্ষ,
স্ফূর্ত্তির হিল্লোল তৃপ্ত যে বক্ষ;
অশ্বের হ্রেষারব সৈন্যের সঙ্গীন
মন্দির মস্‌গুল—অঞ্চল রঙ্গীন!
—মরতের মাঝে এই স্বর্গের সৃষ্টি
সব চেয়ে মিষ্টি কি সব চেয়ে মিষ্টি?
মালিনীর তীরে ঐ শান্তির কুঞ্জ,
পুষ্পের গন্ধ ও ভোমরার পুঞ্জ;
তপোবন অনুখন—সামগান ঝঙ্কার,
সৌম্য সে ঋষিমুখে প্রণবের ওঙ্কার,
মৃগ চরে পাশে তার শান্ত যে সিংহ
প্রহ্লাদ আছে হেথা—নাইত নৃসিংহ;
—রাগদ্বেষ বর্জ্জিত শান্তির সৃষ্টি
সব চেয়ে মিষ্টি কি সব চেয়ে মিষ্টি?
পল্লীর কোলে দোলে বকুলের পল্লব
সারি গায় ডালে তার শোনে তার বল্লভ।
তলে চাষী দম্পতী অল্পই সংসার
তুলসীর তলা মোছা হাসি-ভরা ঘরদ্বার।
সন্ধ্যায় এল স্বামী দেহ অতি ক্লান্ত
পাখা নিয়ে পাশে বসে স্ত্রী উদ্ভ্রান্ত;
—স্বেদসিক্তের পরে সেই স্মিত দৃষ্টি
সব চেয়ে মিষ্টি গো সব চেয়ে মিষ্টি।

কষ্টিপাথর

বিশ্বভারতী-পরিচয়

(বিশ্বভারতী পরিষৎ—১ পৌষ, ১৩৩২, বক্তৃতা)

একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেক দিনের কথা। আমাদের একটি পূর্ব্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠি-পত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সাম্‌নে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার ছিন্ন-লিপি যখন প'ড়ে দেখ্‌ছিলুম তখন মনে প'ড়ল, কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে-মূর্ত্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারো কল্পনাতেও আস্‌তে পার্‌ত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনাদিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্য্যদের আহ্বান-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম যে-মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, "আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা"; বলেছিলেন, "জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেম্‌নি ক'রে সকলে এখানে মিলিত হোক্।" তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে। সেদিন সেই বেদ-মন্ত্র আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আজ যে-প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব ক'র্‌ছি সুস্পষ্টভাবে সেটা আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছন্ন অন্তস্তর থেকে সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঙ্কুরিত হ'য়ে বিশ্বভারতী রূপে যে বিস্তার লাভ ক'র্‌বে, ভরসা ক'রে এই কল্পনাকে সেদিন মনে স্থান দিতে পারিনি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাত্‌বে; এই ভারতবর্ষ—যেখানে নানা জাতি—নানা বিদ্যা, নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা, কোনো আঘাত থাক্‌বে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে, ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখ্‌তে পাই, কিন্তু এখানে আমরা মুক্তির রূপকেই যেন স্পষ্ট দেখি। যে-বন্ধন ভারতবর্ষকে জর্জ্জরিত করেছে সে তো বাইরে নয়, সে আমাদেরই ভিতরে। যাতেই বিচ্ছিন্ন করে তাই যে বন্ধন। যে কারারুদ্ধ সে বিচ্ছিন্ন ব'লেই বন্দী। ভেদ-বিভেদের প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অসংখ্য চক্র সমস্ত ভারতবর্ষকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্নতায় পীড়িত ক্লিষ্ট ক'রে রেখেছে, আত্মীয়তার মধ্যে মানুষের যে-মুক্তি সেই মুক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্ছে, পরস্পর-বিচ্ছিন্নতাই ক্রমে পরস্পর-বিরোধিতার দিকে আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে বাক্য-কুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষা অবজ্ঞা আত্মপর ভেদবুদ্ধি কেবলি যখন কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাবোধ পর্য্যন্ত থাকে না। এম্‌নি ক'রে, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

যে-অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো ক'রে দেখ্‌তে পাইনে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্ব্বলতার কারণ। রাতের বেলায় আমাদের ভয়ের প্রবৃত্তি প্রবল হ'য়ে ওঠে, অথচ সকালের আলোতে সেটা দূর হ'য়ে যায়। তার প্রধান কারণ, সকালে আমরা সকলকে দেখ্‌তে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখি। ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরন্তন হ'য়ে রয়েছে। মুসলমান ব'ল্‌তে কী বুঝায় তা সম্পূর্ণ ক'রে, আপনার ক'রে, অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন ক'রে জান্‌তেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বল্‌তে কী বোঝায় তাও বড়ো ক'রে, আপনার ক'রে অর্থাৎ দারাশিকো একদিন যেমন ক'রে বুঝেছিলেন তাও অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এইরকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগজে প'ড়ে আস্‌ছি পাঞ্জাবে আকালী শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, যার প্রবর্ত্তনায় তারা দলে দলে নির্ভয়ে বধ-বন্ধনকে স্বীকার করেছে। কিন্তু অন্য শিখদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, কোন্‌খানে তারা এত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে ও কোন্ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা সেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম ক'রে জয়ী হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দূরে থাক, আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি পর্য্যন্ত জাগেনি। অথচ কেবলমাত্র কথার জোরে এদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যতন্ত্র সৃষ্টি করব ব'লে কল্পনা করতে কোথাও আমাদের বাধে না। দাক্ষিণাত্যে যখন মোপ্‌লা-দৌরাত্ম্য নিষ্ঠুর হ'য়ে দেখা দিল তখন সে সম্বন্ধে বাংলা দেশে আমরা সে-পরিমাণেও বিচলিত হইনি যতটা হ'লে তাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও আর্থিক কারণ ঘটিত তথ্য জান্‌বার জন্য আমাদের জ্ঞান-গত উত্তেজনা জন্মাতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দু ও মোপ্‌লাদের নিয়ে মহাজাতিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধে অন্ততঃ বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্ব্বদাই প্রকাশ ক'রে থাকি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। একথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানিনে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন ক'রতে পারি কেননা সেটা বাহ্য, তাকে বন্ধু-সম্ভাষণ ক'রে অশ্রুপাত ক'র্‌তে পারি কেননা সেটাও বাহ্য, কিন্তু "উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ" আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্য্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারিনে। কারণ যাদের আমরা নিবিড় ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনি তারা মহাজাতি হ'তে পার্‌বে।

সেই জান্‌বার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেল্‌বার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। একদা যেদিন সুহৃদ্বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বিদ্যাগুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ, শাস্ত্রী-মশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যে-সকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'র্‌তে পার্‌ত তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হ'তে পারে, তাঁর মুখে এ-কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে

আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম এই ঔদার্য্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান-আতিথ্য— এইটিই হ'চ্ছে যথার্থ ভারতীয়—সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক রোমকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্লেচ্ছগুরুদের ঋষিকল্প বলে স্বীকার ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হননি। আজ যদি এসম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে তবে জান্‌তে হবে আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এদেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে, এখানে কোনো এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক্, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ ক'র্‌ছে। কিন্তু আমার সাধ্য কী! সাধ্য থাক্‌লেও এ যদি আমার একলারই সৃষ্টি হয় তা হ'লে এর সার্থকতা কী! যে-দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা ক'রে থাকে সেই দীপটুকু জ্বেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেবো এইটুকু-মাত্রই আমার ভরসা ছিল।

তার পরে অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে একে বহন ক'রে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে করতে আজ আমাদের সামনে অনেকটা পরিমাণে সুস্পষ্টরূপ ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এল। আজ আপনারা এই যে সমবেত হয়েছেন, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য। এর সদস্য, যাঁরা নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত, এর সঙ্গে তাঁদের যোগ ক্রমে ক্রমে যে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য।

এই কর্ম্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর যেদিন সকলের হাতে সমর্পণ কর্‌লুম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে, সকলে একে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ ক'র্‌বেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনো আছে। তবুও সংশয় ও সঙ্কোচ থাকা সত্ত্বেও এ-কে সম্পূর্ণ ভাবেই সর্ব্বের কাছে নিবেদন ক'রে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন, এটা একজন লোকের কীর্ত্তি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত ক'রে জড়িয়ে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত ক'রে পালন ক'রে এসেছি, তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় ক'রে থাকি সে আমার সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সেদিন আজ এসেছে বলিনে, কিন্তু সেদিনের সূচনাও কি হয়নি? যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাইনি, অথচ এই ভবিষ্যৎকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেম্‌নি ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যয় করব না কেন? সেই প্রত্যয়ের দ্বারাই এর প্রকাশ বল পেয়ে ধ্রুব হ'য়ে ওঠে একথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এতো কম কথা নয়। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এর ভার দুঃসহ। এই ভারকে বহন করবার অনুকূলে আমার আন্তরিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈন্য কোনোদিনই ভুলতে অবকাশ পাইনি, কত অভাব কত অসামর্থ্যের দ্বারা এতো কাল প্রত্যহ পীড়িত হ'য়ে এসেছি, বাইরের অকারণ প্রতিকূলতা এ-কে কত দিক থেকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু এর সমস্ত ত্রুটি অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও আপনারা একে শ্রদ্ধা ক'রে পালন করবার ভার নিয়েছেন,—এ-তে আমাকে যে কত দয়া করেছেন তা আমিই জানি, সেজন্য ব্যক্তিগত ভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'র্‌ছি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ কর্‌বার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা ব'লতে পারিনে, শরীরের দুর্ব্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গ-বন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার ক'র্‌বে? সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে, কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণ-ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহ-ব্যবস্থা অতি-জটিলতার দ্বারা চিত্ত ব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় একথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কায়ারূপটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর চিত্তরূপটির প্রসার আমি বিশেষ ক'রেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রমের বাইরে দূরে দূরে বারবার ভ্রমণ ক'রে থাকি। কতবার মনে হয়েছে, যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্ত্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা-হ'লে জান্‌তে পারতেন কোন বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তা-হ'লে বিশেষ দেশ-কাল ও বিধি বিধানের অতীত এর মুক্তরূপটি দেখ্‌তে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে তাদের সেই প্রকাশ, সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা দেখেছি যা ভারতের ভূসীমানার মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে পারে না, যা আলোর মতো দীপকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই বুঝেছি, ভারতের এমন-কিছু সম্পদ আছে যার প্রতি দাবী সমস্ত বিশ্বের। জাত্যাভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরস্ত ক'রে নম্রভাবে সেই দাবী পূরণ কর্‌বার দায়িত্ব আমাদের। যে-ভারত সকল কালের, সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ কর্‌বার ভার বিশ্বভারতীর।

কিছুদিন হ'ল যখন দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে রুগ্নকক্ষে বদ্ধ ছিলাম তখন প্রায় প্রত্যহ আগন্তুকের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের ভিতরকার কথাটা এই যে পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য্য ভারতবর্ষের আছে? ভারতের ঐশ্বর্য্য বল্‌তে এই বুঝি যা কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আতিথ্যের অধিকার পায়; যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ ক'র্‌তে পারে—অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়—তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপার একটা আছে, সেটাতে বিশেষ ভাবে তার আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তার সৈন্যসামন্ত অর্থ-সামর্থ্যে আর কারো ভাগ চলে না। সেখানে দানের দ্বারা তার ক্ষতি হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয় প্রভৃতি এমন সকল ধনী জাতির কথা শোনা যায় যারা অর্থ-অর্জ্জনেই নিরন্তর নিযুক্ত ছিল। তারা কিছুই দিয়ে যায়নি, রেখে যায়নি, তাদের অর্থ যতই থাক তাদের ঐশ্বর্য্য ছিল না। ইতিহাসের জীর্ণ পাতার মধ্যে তারা আছে, মানুষের চিত্তের মধ্যে নেই। ঈজিপ্ট, গ্রীস, রোম, প্যালেষ্টাইন, চীন, প্রভৃতি দেশ শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে। বিশ্বের তৃপ্তিতে তারা গৌরবান্বিত। সেই কারণে সমস্ত পৃথিবীর প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষ, শুধু নিজেকে নয়, পৃথিবীকে কী দিয়েছে? আমি আমার সাধ্য মতো কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি তাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। তাই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্য সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্ত্তি ধ'রে কিন্তু একদিন প্রকাশ হ'য়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোটো বিদ্যালয়রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুষ্টিভিক্ষা আহরণ ক'রছিল। আজ সে দানের ভাণ্ডার খুল্‌তে উদ্যত। সেই ভাণ্ডার ভারতের। বিশ্বপৃথিবী আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, আমি এসেছি। তাকে যদি বলি, আমাদের নিজের দায় নিয়ে ব্যস্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারিনে, তার মতো লজ্জা কিছুই নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বর্ত্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাহ্যিক নয়। তার কারণ, যে-বর্ব্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে, য়ুরোপ তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সে এমন কোনো সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্ব্বকালীন, সর্ব্বজনীন। যা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ ক'রে অক্ষয়ভাবে উদ্বৃত্ত থাকে। এই হ'চ্ছে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে, তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হ'তে পারবে না। মানুষকে চিরদিনের মতো সে সম্পদশালী ক'রে দিয়েছে, এই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব, এই তার অমরতা। অথচ এই য়ুরোপ যেখানে আপনার লোভকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড়ো করেছে সেখানেই তার স্বভাব প্রকাশ পায়, সেখানেই তার খর্ব্বতা, তার বর্ব্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনটুকুর মধ্যে মানুষের সত্য নেই,—পশুধর্ম্মেই সেই বিচ্ছিন্নতা, বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে-পশুর আর কোনো প্রাণ নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা আপনার জীবনে সেই অনির্ব্বাণ আলোককেই জ্বালেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি ক'রতে পারে।

পশ্চিম মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখ্‌তে পাই তা-হ'লে দেখ্‌ব, আত্মম্ভরী পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ,—কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে; আর তার সর্ব্বভুক্ ক্ষুধিত পলিটিক্স্ তার বিনাশকেই সৃষ্টি ক'রছে; কেননা পলিটিক্সের শোণিত-রক্ত উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো ক'রে দেখে, সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্ত্তিত ক'রে তোলে।

আমরা অত্যন্ত ভুল ক'রব যদি মনে করি সীমাবিহীন অহমিকা দ্বারা, জাত্যাভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি দ্বারাই য়ুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হ'তে পারে না। বস্তুত সত্যের জোরেই তার জয়যাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধঃপতন, যে রিপুর প্রবর্ত্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে, আমাদের কি দেবার জিনিষ কিছু নেই? আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্ব্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে, ঐশ্বর্য্য নেই? বিশ্বসংসার আমাদের দ্বারে এসে অভুক্ত হ'য়ে ফির্‌লে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হ'তে পারে? দুর্ভিক্ষের অন্ন আমাদের উৎপাদন ক'র্‌তে হবে না, এমন কথা আমি কখনই বলিনে, কিন্তু ভাণ্ডারে যদি আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে আমরা বাঁচতে পার্‌ব?

এই প্রশ্নের উত্তর যিনিই যেমন দিন্ না, আমাদের মনে যে-উত্তর এসেছে, বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হ'তে থাক্, এই আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়। "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং।" যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাত্‌ব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সঙ্কীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা সবাইকে বসাতে চেয়েছি, সে-কাজ কি এখনি আরম্ভ হয়নি? অন্য দেশ থেকে যে-সকল মনীষী এখানে এসে পৌঁচেছেন, আমরা নিশ্চয় জানি তাঁরা হৃদয়ের ভিতরে আহ্বান অনুভব করেছেন। আমার সুহৃদ্বর্গ যাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত তাঁরা সকলেই জানেন, আমাদের দূরদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষেরই আতিথ্য পেয়েছেন, পেয়ে গভীর তৃপ্তিলাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা যে, কিছু পরিবেষণ করছি তার প্রমাণ সেই অতিথিদের কাছেই। তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই বল্‌ছি কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। বিশ্বভারতীর যে সত্য তা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্ বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতো হ'চ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান বিভাগে কিছু কাজ হচ্ছে, এসমস্তকেই যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিষ ব'লে না মনে করি। এসমস্ত আজ আছে কাল না থাক্‌তেও পারে। আশঙ্কা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হ'য়ে ওঠে পাছে একদিন আগাছাই ধানের ক্ষেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখী বাসা বাঁধতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ পাখীর বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্য প্রকৃতির যে সত্য পরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

পূর্ব্বেই বলেছি, ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয়, সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা কর্‌ব এই হচ্চে আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম মহাদেশে আমি কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে-কথা বলতে আমি কুণ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক গ্রহণ কর্‌বেন না, এমন-কি, পরিহাস-রসিকেরা বিদ্রূপও কর্‌তে পারেন। কিন্তু সেটাও কঠিন কথা নয়—আসলে ভাবনার কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আমাদের দেশ যে শ্রদ্ধালাভ করে পাছে সেটাকে কেবলমাত্র অহঙ্কারের সামগ্রী ক'রে তোলা হয়। সেটা আনন্দের বিষয় সেটা অহঙ্কারের বিষয় নয়। যখন অহঙ্কার করি তখন বাইরের লোকদের আরো বাইরে ফেলি, যখন আনন্দ করি তখনই তাদের নিকটের ব'লে জানি। বারম্বার এটা দেখেছি, বিদেশের যে সব মহদাশয় লোক আমাদের ভালোবেসেছেন আমাদের অনেকে তাঁদের বিষয়-সম্পত্তির মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদর কর্‌তে পেরেছেন সেটুকু আমরা ষোলো-আনা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের তরফে তার দায়িত্ব স্বীকার কর্‌তে অক্ষম হ'য়ে আমরা নিজের গভীর দৈন্যের প্রমাণ দিয়েছি। তাঁদের প্রশংসাবাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ ব'লে স্পর্দ্ধিত হ'য়ে উঠি, এই শিক্ষাটুকু একেবারেই ভুলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠতা আছে সেটাকে অকুণ্ঠিত আনন্দে স্বীকার

করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ব আছে। আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্র করেছে যে, ভারতের যে-পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন ক'রে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয়নি। আমাকে যাঁরা সম্মান করেছেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি পৃথিবীতে না থাকব, তখনো যেন তার ক্ষয় না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ ক'রে ভারতের অমৃতরূপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক, অতিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হ'য়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হৃদয় দান করুন, হৃদয় গ্রহণ করুন, সত্যের ও প্রীতির আদান প্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূর-প্রসারিত হোক, এই আমার কামনা।

(শান্তিনিকেতন পত্র, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খেলনা-শিল্প

আমাদের দেশে এপর্যন্ত খেলনা-শিল্প বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প নাই। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে অথবা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে সূত্রধর, মালাকার, কাঁশারী, কুম্ভকার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা কয়েক প্রকার খেলনা প্রস্তুত করে এবং সেগুলি গ্রাম্য মেলা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। বড় বড় সহরে অবশ্য খেলনা-প্রস্তুতকারী বিশেষ শিল্পী দুই চারি জন আছে; কিন্তু খেলনা-শিল্প অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের একটি উপজীবিকা মাত্র। আবশ্যক কার্য্যের অবসরে এবং বিশেষ বিশেষ পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে ইহারা পুতুল তৈয়ারী করিয়া যৎসামান্য রোজগার করে। আজকাল বঙ্গদেশের মধ্যে কেবলমাত্র বীরভূম জিলায় কাঠ ও ধাতব এবং নদীয়া জিলায় মাটির খেলনা ভূরিপরিমাণে প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে পুতুল-শিল্পেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে যে-সমুদয় খেলনা প্রচলিত, সেগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—

চীনামাটি ও কাচের খেলনা, কাষ্ঠপিণ্ড অথবা কাগজের খেলনা, কাঠের খেলনা, ধাতু-নির্ম্মিত খেলনা, প্রস্তর-নির্ম্মিত খেলনা, যান ও যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি, কাপড় ও বনাতের খেলনা, সেলুলইড খেলনা, বৈজ্ঞানিক খেলনা। মনুষ্য ও পশ্বাদির প্রতিকৃতি এরূপভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, সেগুলি তরুণ-তরুণীগণের পক্ষে যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই শিক্ষাপ্রদ হইয়া থাকে।

জগতের সমস্ত উন্নতিশীল এবং সুসভ্য দেশেই খেলনাশিল্পের অল্প-বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে জর্ম্মণীই সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং তৎপরেই জাপান। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মণীতে ১৪ কোটি মার্ক মূল্যের খেলনা উৎপাদিত হইত। আমাদিগের দেশে খেলনা-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জর্ম্মণীতে খেলনা-শিল্পের সংগঠন ও বিক্রয় প্রণালী সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। জর্ম্মণীর শিল্পিগণ এত দক্ষ হইয়াছে যে, সামান্য ব্যয়ে ভূরি-উৎপাদন (mass production) করিতে তাহারা সমর্থ।

কুটীর-শিল্প হিসাবে জর্ম্মণীতে বহু পরিমাণ খেলনা প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন খেলনা প্রস্তুতের বড় বড় কারখানাও আছে।

আমাদিগের দেশে বিভিন্ন সহরে যে তথা-কথিত Technical স্কুলসমূহ আছে, সেগুলি সংখ্যায়ও যথেষ্ট নহে এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উপযোগী কলাবিদ্যা উক্ত স্কুলসমূহে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়াও হয় না। খেলনা প্রস্তুত কোন স্থানেই শিক্ষা দেওয়া হয় না। যে খেলনা-শিল্প আজকাল দেশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লুপ্ত রহিয়াছে, তাহাকে শৃঙ্খলার সহিত সংগঠনপূর্ব্বক বিকশিত করিয়া তুলিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান দ্বারা প্রথমেই শিল্পী প্রস্তুত করা আবশ্যক। জর্ম্মণী ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াই খেলনা-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি স্কুল স্থাপন করিয়াছে। এইরূপ স্কুলের মধ্যে তিনটি প্রধান এবং উহাদের প্রত্যেকের সহিত এক একটি প্রাথমিক (preparatory) স্কুল সংযুক্ত রহিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর খেলনা প্রস্তুতের জন্য আবশ্যক উপাদান পরীক্ষা ও নির্ব্বাচন, প্রতিকৃতি গঠনের আদর্শ-রচনা, কাঠের কাজ, কাচ, চীনামাটি প্রভৃতির ব্যবহার, পুতুলের অঙ্গ-যোজনা ইত্যাদি বিষয় এইসমস্ত স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্দেশে এই প্রকারের স্কুল স্থাপন করা আবশ্যক হইলেও উহা কার্য্যে পরিণত করিতে কিছু সময়পাত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আপাততঃ যে-সমস্ত টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে, তৎসমুদয়ে বিশেষভাবে খেলনা প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। যদি প্রতি স্কুলে দেশীয় ও বিদেশীয় উৎকৃষ্ট খেলনা-সমূহের নমুনা রাখা হয় এবং ছাত্রদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিদেশীয় খেলনার উৎকর্ষ আছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া, কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে উক্তরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা দেখাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী বালক সহজেই ঐরূপ শিল্প কৌশল (technique) আয়ত্ত করিতে পারে। এই প্রকারের কতিপয় সুদক্ষ খেলনা-শিল্পী প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাদিগের সাহায্যে গ্রামে অথবা নগরে অনেকে আবার খেলনা প্রস্তুত শিক্ষা করিতে পারে।

(মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

একটি তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন

মিয়ানোয়ালি জেলা পঞ্চনদ প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। এই জেলার বিবরণীতে একস্থানে লেখা আছে যে:—

"The above, together with two sentrybox-like buildings supposed to be dolmen midway between Nammal and Sakesar—comprise all the antiquities above ground in the district." (Dist. Gazett. 24p.)

গত পূজার সময়ে শাকেশ্বরে যাওয়ার সুযোগ হইয়াছিল, এবং সেই সুযোগে এই dolmen দুইটি দেখার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া একদিন ইহাদিগকে দেখিতে গিয়াছিলাম ও সেখানে গিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শাকেশ্বর হইতে নামাল পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার উপরে ঢোক মিয়ানি নামক গ্রামের নিকটে পাহারাওয়ালার ঘাটির ন্যায় গৃহ দুইটি অবস্থিত। স্থানীয় লোকগণ এই গৃহ দুইটিকে 'গুমতান' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে ও যে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে এই ক্ষুদ্র দুইটি কোঠা নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই পাহাড়কে গুমতাওয়ালা ঢেরি নাম দেওয়া হইয়াছে।

কোঠা দুইটি দেখিয়া মনে হয় যে, জেলার বিবরণীতে ইহাদিগকে যে dolmen বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। গৃহ দুইটি আকৃতিতে ছোট ও দুইটির গঠনই প্রায় একরূপ, গৃহের উপরে একটি গম্বুজ ও চারি কোণে চারটি ছোট মিনার। এই কোঠা দুইটির মধ্যে একটি বড় ও একটি ছোট এবং প্রত্যেকটির গৃহতল মাপে

প্রায় একটি বর্গক্ষেত্র। একটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ১৫ ফিট ও অপরটির প্রায় ১৯ ফিট। এই গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য একটি অতি ক্ষুদ্র দরজা আছে। কিন্তু এই দরজা সরু, ইহার বিস্তার ১ ফুট ৯ ইঞ্চি মাত্র। একজন লোক আড়াআড়িভাবে এই দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিতে পারে।

এই কোঠার অভ্যন্তরে তিন দিকের দেওয়ালে তিনটি কুলুঙ্গি আছে। যে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে এই কোঠা দুইটি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই পাহাড়ের ঢালুক্ষেত্রে কতকগুলি পুরাতন গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ও বোধ হয় যে, যখন পাহাড়ের এই প্রদেশে কোনও সমৃদ্ধিশালী জনপদ বিদ্যমান ছিল তখন এই জনপদ যাহাতে শত্রু কর্ত্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত না হইতে পারে, সেই হেতু প্রহরীদের আবাসের জন্য এই গৃহ দুইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। Dolmenএর সহিত এই দুইটি গৃহের কোনও সম্পর্ক নাই।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

রেশমের চাষ

বঙ্গ মহিলাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মহেশ-তলা গ্রামের শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী রেশম চাষের কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার সুন্দর সুবর্ণময় গুটিকাগুলি দেখিলে এই কার্য্যে তাঁহার যত্ন এবং কৌশলের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

রেশম-কীট প্রতিপালনের জন্য জাল প্রস্তুত বিধবাগণের অবলম্বনের উপযোগী একটি সহজ এবং লাভজনক ব্যবসায়। রেশমকীটের উপর পাতিয়া দেওয়ার জন্য এই জালের প্রয়োজন হয়। এই জালের মধ্য দিয়া পতঙ্গেরা তুঁতের পাতা খাইতে উঠে। তখন সেগুলিকে আস্তে আস্তে জাল সমেত একটি পরিষ্কার পাত্রের উপর রাখা হয়। পাত্রটি অপরিষ্কার হইলে জালের সহিত কীটগুলিকে তুলিয়া লইয়া পাত্রটি পরিষ্কার করা হয়। যে-সকল জেলায় অধিক পরিমাণে রেশমের চাষ হয়, তথায় প্রচুর পরিমাণে এই জালের প্রয়োজন হয়। সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত রেশমের কারখানা-গুলিতেও এই জালের যথেষ্ট চাহিদা আছে। অতএব দরিদ্রা বিধবারা এই জাল প্রস্তুতের কার্য্য অবলম্বন করিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারেন।

বর্ত্তমান সময়ে ফরাসী, ইটালী, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সর্ব্বত্র অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা, বিধবা এবং বালিকাগণ অতি শিশুকাল হইতেই রেশমকীটের প্রতিপালন এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। যখন সকল দেশের স্ত্রীলোকগণ এই কার্য্য করেন, তখন বাঙ্গালী মহিলাগণ ইহা আরম্ভ করিতে বিরত হইবেন কেন?

বঙ্গদেশে নানা প্রকারের রেশমকীট পাওয়া যায়। এদেশের প্রত্যেক প্রকারের রেশমকীট হইতে অতি সুন্দর এবং আশ্চর্য্যজনক তন্তু পাওয়া যায়। চরকার এক সের সূতা কাটিলে মাত্র ২৲ হইতে ২৷৹ আনা মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু এক সের রেশম সূতার মূল্য ১০৲ টাকা হইতে ১৪৲ টাকা। সাধারণতঃ র-সিল্ক্ বা সাধারণভাবে গুটান সরু সূতা ১৫৲ টাকা হইতে ৪৫৲ টাকা সের দরে বিক্রয় হয়।

একমাত্র দক্ষিণ চীন ব্যতীত অন্য স্থান অপেক্ষা বঙ্গদেশে বৎসরের মধ্যে অনেকবার রেশম উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এক সময়ে বঙ্গদেশ রেশম-শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল।

শীতকালে বঙ্গদেশে যে কাঁচা-রেশম (Raw silk) প্রস্তুত হয়, তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় উৎকৃষ্ট। শীত ঋতুতে অন্যান্য দেশে রেশম-কীট প্রতিপালনের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। কারণ ঐসকল দেশে শীতঋতুতে রেশম উৎপাদন নৈসর্গিক কারণে অসম্ভব।

বাংলা দেশে যে কাঁচা রেশম প্রস্তুত হয়, তাহা বিশেষ মূল্যবান জিনিষ। সম্প্রতি জাপান ভাল রেশমের চাহিদা বুঝিতে পারিয়া প্রত্যেক উপযোগী ভূমিখণ্ডে এবং প্রত্যেক গৃহসংলগ্ন উদ্যানে তুঁতের চাষ এবং প্রত্যেক পরিবারে এক-একটি ঘর রেশম-কীট প্রতিপালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় মহিলাগণ এই কার্য্য শিল্পহিসাবে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের পরিবারস্থ বেকার যুবকগণের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। এই লাভজনক শিল্প-কার্য্যে তাঁহারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা দেশের দারিদ্র্য-সমস্যারও সমাধান হইবে। রেশম-শিল্প সংক্রান্ত জাল প্রস্তুত প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যও বিশেষ উপযোগী।

রেশম-চাষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য শিল্প-সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় কলিকাতার ১২ নং আলিপুর রোডে রেশম বিভাগের সুপারিন্টে-ণ্ডেণ্ট মিস এম, এল, ক্লেগহর্ণের নিকট জানাইলে সমস্ত সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

(বঙ্গলক্ষ্মী, ফাল্গুন ১৩৩২) (কুমারী) অলিভ ক্লেগহর্ণ

সংস্কৃত সাহিত্যে বিদুষী কবি

সংস্কৃত সাহিত্যের সারস্বতকুঞ্জে যে-সকল বিহঙ্গিনীর মধুর কাকলী বহু শতাব্দী পূর্ব্বে নীরব হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে "বিজ্জকা"র রসময়ী কবিতা আলঙ্কারিকেরা সাদরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি চণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছেন :—

"নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং
মাম্ অজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥"

ইহাতে বিজ্জকার পাণ্ডিত্যাভিমান স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার দ্বারা আরও প্রমাণ হইতেছে যে, বিজ্জকা দণ্ডীর উত্তরকালে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। বিজ্জকার যে-কয়েকটি কবিতা কালের হস্তাবলেপ হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই সরস্বতীপদাকাঙ্ক্ষিণী রমণীর হৃদয়ে কবিত্বের ভাণ্ডার ছিল। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, এই শ্যামাঙ্গী বিদুষীর সম্পূর্ণ রচনা বর্ত্তমানে আর পাওয়া যায় না।

ভট্টমুকুল, ধনিক প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ বিজ্জকার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিজ্জকাকে কোথাও বিজ্জকা কোথাও বা বিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে বিজ্জকা চালুক্যবংশীয় প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্রবধূ ছিলেন। পুলকেশীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রাদিত্যের রাণী বিজয়ভট্টারিকার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে; বিজ্জকা এই নামের সহিতও তাঁহার নামের কতকটা সাদৃশ্য আছে; আরও তাঁহাকে ঐসকল পণ্ডিতেরা কর্ণাটী বিজয়া বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া-ছেন। রাজশেখরের শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে কর্ণাটী বিজয়ার বৈদর্ভী রীতির প্রশংসা আছে এবং তাহাকে কালিদাসের নীচেই স্থান দেওয়া হইয়াছে।

"সরস্বতীব কর্ণাটী বিজয়াঙ্কা জয়ত্যসৌ।
যা বিদর্ভ গিরাং বাসঃ কালিদাসাদনন্তরং॥"

কর্ণাটী বিজয়া ও মহারাণী বিজয়-ভট্টারিকা অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিজ্জকা, মহারাণী বিজয়ভট্টারিকা হইতে পারে না।

কারণ মহারাজা চন্দ্রাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভকালের লোক ছিলেন। দণ্ডী সপ্তম শতকের শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বিজ্জকা দণ্ডীর পরবর্ত্তী, সুতরাং বিজ্জকার সময় উক্ত মহারাণীর সময়ের অনেক পরে। এই কারণে তাঁহারা অভিন্ন হইতে পারেন না। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, বিজ্জকা দক্ষিণদেশীয়া ছিলেন। তাঁহার যে কবিতাগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহাতে শৃঙ্গাররসের অভিব্যক্তি অতীব সুন্দর ও মধুর। বিরহিণী নায়িকার অবস্থা বর্ণনে তিনি সিদ্ধহস্তা ছিলেন। তাঁহার স্বভাব-বর্ণনা অতি স্বাভাবিক ও কষ্টকল্পনা-দোষশূন্য। ভাষার লালিত্যে ও ভাবের মাধুর্য্যে তাঁহার কবিতা অতি উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য।

সুভদ্রা।—সুভদ্রার স্থান বিজ্জকার বহু নিম্নে। তথাপি তিনি যে সুকবি ছিলেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু অপরের প্রশংসা-পানের উল্লেখ ভিন্ন তাঁহার কবিতায় আর কিছুই পাওয়া যায় না। বল্লভদেবের "সুভাষিতাবলীতে" সুভদ্রার একটি মাত্র পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার অপরাপর রচনার কোন উদ্দেশ নাই। পরন্তু তাঁহার যে অনেক রচনা ছিল ইহা নিশ্চিত, কারণ তাহা না হইলে রাজশেখর তাঁহার "সুক্তিমুক্তাবলীতে" বলিতেন না যে—

"পার্থস্য মনসি স্থানং লেভে খলু সুভদ্রয়া।
কবীনাঞ্চ বচোবৃত্তি চাতুর্য্যেণ সুভদ্রয়া॥"

সুভদ্রার জীবনীও অতীতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আবৃত। তাঁহার দেশ বা কালের কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

"ফল্গু হস্তিনীর" নাম সংস্কৃত সাহিত্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। "সুভাষিতাবলীতে" তাঁহার দুইটি কবিতা উদ্ধৃত আছে। প্রথমটি "সুকৃতি তাবদশেষগুণাকরং" ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি "শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে" দেখা যায়। যথা—

"ত্রিনয়ন জটাবল্লীপুষ্পং মনোভবকার্মুকং
গ্রহকিসলয়ং সন্ধ্যানারী নিতম্বনখক্ষতং।
তিমির ভিদুরং ব্যোম্নঃ শৃঙ্গং নিশাবদনস্মিতং
প্রতিপদি নবস্যেন্দোর্বিম্বং সুখোদয়মস্তু বঃ॥"

প্রতিপদের চন্দ্রের কি সুন্দর বর্ণনা! এই রমণীর অপর কোন রচনা আছে কি না, ইনি কোন্ দেশে এবং কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার নির্ণয় হয় না।

"মোরিকা"র নাম "সুভাষিতাবলী" ও "শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে" পাওয়া যায়। এইসকল গ্রন্থে তাঁহার চার পাঁচটি মাত্র কবিতা দৃষ্ট হয়। কবি ধনদেবের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, মোরিকা কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারও ইতিহাস ঘনতমসাচ্ছন্ন।

"ইন্দুলেখা" ও "পারুলার" নাম "সুভাষিতাবলী" ও "শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে" দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের অতি অল্পসংখ্যক কবিতার উল্লেখ আছে। তবে ধনদেবের মতে দ্বিতীয়া প্রবীণা কবি বলিয়া উল্লেখযোগ্যা।

যদিও পূর্ব্বোক্ত বিদুষীদিগের সময় নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। যেদিন তরাইনের শোণিত-প্লাবিত সমরাঙ্গনে বীরশিরোমণি পৃথ্বীরাজ মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন, সেইদিন ভারতের স্বাধীনতার সহিত হিন্দুর বড় আদরের সংস্কৃত কাব্যের দেউটী চিরদিনের জন্য নিভিয়া গেল।

(সুবর্ণবণিক সমাচার, চৈত্র ১৩৩২)　শ্রীমতী বাসনা দেবী

—

বাঙ্গালা ভাষার শিশুপাঠ্য পুস্তকের অভাব

সুসভ্য দেশ মাত্রেই মাতৃভাষার বড় আদর। ছোট বড় সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সকল প্রকার শিক্ষাই সভ্যদেশে মাতৃভাষার যোগে দেওয়া হইয়া থাকে।

সম্প্রতি প্রবেশিকা এবং মধ্যপরীক্ষার বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইতিহাস, গণিত, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন।

ইংরেজী ভাষার শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলির তুলনায় বাঙ্গালা ভাষার সুন্দর শিশুপাঠ্য পুস্তকের বড়ই অভাব লক্ষিত হয়। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা পুস্তকখানির আদর্শ লইয়া ঐ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলি রচিত হইয়া থাকে। ইংরেজী স্কুলের নবম হইতে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য সাহিত্য-পুস্তকগুলির ভাষা এত কঠোর যে, উহাদের যথাযথ উচ্চারণ করাই কঠিন হইয়া পড়ে,—অর্থ বা মর্ম্মগ্রহণের ত কথাই নাই। কতকগুলি বিদ্যালয়ে নবম হইতে সপ্তম শ্রেণীতে যে বাঙ্গালা বহি পড়ান হয়, তাহাদের পাঠের অর্থ বা মানে করান হয় না। দাঁত-ভাঙ্গা কঠোর সন্ধি-সমাস-সমন্বিত সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্ভার সমুচ্চয়ে সৃষ্ট এই ভাষার আড়ম্বর দেখিয়াই সম্ভবতঃ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। অথচ ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিলেই তাঁহাকে ৺তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ পড়ান এবং তাঁহার পদ পদার্থ সন্ধি সমাসাদি লইয়া বিব্রত করা হয়। এইরূপ প্রথায় কোন ভাষায়ই অধিকার লাভ করা আদৌ সম্ভব কি না, তাহা এই বিদ্বজ্জন-সম্মিলনের শিক্ষাব্যবসায়ী সভ্যমহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন।

ইংরেজী শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলির অধিকাংশই যেরূপ ছোট ছোট শব্দ বাছিয়া বাছিয়া রচিত হইয়া থাকে, আমাদের শিশুপাঠ্য পুস্তকে সেরূপ হয় না। ক্রমশঃ ছোট হইতে বড় শব্দ এবং সরল হইতে জটিল রচনা-প্রণালী ইংরেজী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। একইরূপ স্বরবর্ণের উচ্চারণ অভ্যাস করাইবার জন্য নানারূপ কৌশল তাঁহারা করিয়াছেন। জটিলতর সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ শিখাইবার ব্যবস্থাও তাঁহাদের বেশ সুন্দর। ভাষার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য (Idiom) প্রথম হইতেই শিখাইবার চেষ্টা আছে। আমাদের দেশে বাঙ্গালা ভাষার শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলিতে ঐরূপ মূলতত্ত্বের প্রয়োগ কি চলে না? এদেশে এখনও সেই সনাতন নিয়মে বড় বড় তেতালা-চৌতালা সংযুক্তবর্ণের অতিব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে।

সরল এবং সহজ ভাষায় বাঙ্গালা শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনার প্রতিকূলে এক বাধা আছে। পশ্চিম, পূর্ব্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ বাঙ্গালার প্রাদেশিক পৃথক্ পৃথক্ ছোট ছোট ঘরোয়া কথা আছে। কলিকাতার কক্নী ভাষায় বই লিখিলেই ঢাকার শিশুরা বুঝিতে পারিবে না এবং পক্ষান্তরে কোচবিহার রঙ্গপুরের চলিত কথায় পুস্তক রচনা করিলে কলিকাতা এবং ঢাকা উভয় স্থলেই অচল হইবে।

আমি একটি নিবেদন করিতে চাই। বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বিভাগের অধিবাসী এবং এসম্বন্ধে উৎসাহ-শীল ১০।১২ জন মহাশয় ব্যক্তি একত্র হইয়া যদি একটি সাবকমিটি করিয়া বঙ্গের সর্ব্বদেশে প্রচলিত, সহজবোধ্য, সরল অথচ সাধু শব্দকোষ একটি সংগ্রহ করেন, তবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এই শব্দকোষে দুই কি আড়াই হাজার নিত্য ব্যবহার্য্য (গৃহস্থালী চাষ-বাস জন্তু-জানোয়ার, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি সম্বন্ধে) শব্দ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। ঐ শব্দকোষের সাহায্যে নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক রচনা করা অনায়াসসাধ্য হইবে। ম্যাক্‌মিলানের King

Primerএ সর্ব্বশুদ্ধ দুইশতের অধিক শব্দ নাই। আমার মনে হয়, দুই হাজার সহজ সহজ standard শব্দ সংকলন করিতে পারিলে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতভাবের তিন-চারিখানি পুস্তক রচিত হইতে পারিবে।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

(প্রতিভা, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩৩২)

—

তিব্বত-নারী

তিব্বত-নারী অশিক্ষিতা ও অজ্ঞ, তাহা সত্য; কিন্তু তাহারা অন্যান্য দেশের নারীর মত নহে। তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা স্ফূর্ত্তি না পাইয়া অবহেলায় নষ্ট হইতেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও রাজসেবা ব্যতীত আর সকল কার্য্যেই তিব্বতের নারী পুরুষের সঙ্গে সমভাবে নিযুক্ত আছে। সমস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রে, বিশেষতঃ লাশা নগরীতে অনেক রমণীর দোকান আছে। কখন কখন অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ও তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। কৃষিকর্ম্মে তিব্বতনারী পুরুষদের মতই কর্ম্মক্ষম এবং শ্রমসহিষ্ণু। তাহারা যে কেবল কাজ-কর্ম্মেই পটু, তাহা নহে; দেশময় যখন উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়, তখন তাহারাও পুরুষদের মতই আনন্দে মত্ত হইয়া উঠে।

তিব্বত-নারীর বিশেষত্ব তাহাদের সাহস এবং বলবীর্য্য। তিব্বতের সর্ব্বত্রই সুন্দরী নারী দেখা যায়। তাহাদের গোলাপী রং অনেক পাশ্চাত্য রমণীর ঈর্ষ্যার কারণ হইতে পারে। যাহাদের বর্ণ ঈষৎ মলিন, তাহাদেরও দীর্ঘায়ত এবং ঋজু দেহ দেবীর মত।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরিবারের লোকেরাই বিবাহ ঠিক করে। বর বা বরের অভিভাবক কন্যাপণ প্রদান করেন। এই প্রথা অবশ্য-প্রতিপাল্য; ইহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। কত টাকা পণস্বরূপ দিতে হইবে, তাহা কন্যাপক্ষের বংশ-মর্য্যাদা, ধনগৌরব ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কন্যার রূপগুণ দেখিয়া অবধারিত হইয়া থাকে। পিতা-মাতা কন্যাপণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কন্যাকে গরু, ঘোড়া, অলঙ্কার, এইরূপ অনেক যৌতুক দেন।

তিব্বতে প্রায় দেখা যায় যে, ১৩।১৪ বৎসর বয়সের বালিকা টাকা ধার দিতেছে, উট ভাড়া দিতেছে। এইরূপে তাহারা তাহাদের নিজেদের সম্পত্তি বর্দ্ধিত করিয়া তোলে এবং বিবাহান্তে সঞ্চিত অর্থরাশি স্বামিগৃহে লইয়া যায়। কিন্তু স্বামী এই সম্পত্তির অধিকারী হন না। তবে স্ত্রী নিঃসন্তান হইলে অথবা চরমপত্র (উইল) সম্পাদন করিয়া দিলে অধিকার করিতে পারেন।

বিবাহের একটা চুক্তিপত্র লেখাপড়া করা হয়। সাক্ষীর সমক্ষে বিবাহ সম্পাদন দ্বারা ইহার মূল্য বাড়াইয়া লওয়া হয়; তারপর বিবাহান্তে লামাগণ ধর্ম্মের নামে আশীর্ব্বাদ করেন; কিন্তু এইসকল সত্ত্বেও বিবাহ-বন্ধন যে ছিন্ন করা যায় না, এমত নহে। বস্তুতঃ তিব্বতে সকল সময়েই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যায়। সে-দেশে কদাচিৎ কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে।

তিব্বতের নারী স্বামীর বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহায়। সে-দেশের অনেক ব্যবসায়ী, ভূম্যধিকারী ও রাজকর্ম্মচারী স্ত্রীর সহায়তায় আপনাদের সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন।

কিন্তু তিব্বত সর্ব্বোপরি এক কুহেলিকার দেশ। বিবাহ কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহারও আদর্শ নয়; ইহাদের আদর্শ—ধর্ম্ম। অনেক ধর্ম্ম-নারীর গাথা তিব্বতে প্রচলিত। এদেশে অনেক সাবিত্রী আছেন। তিব্বতে লামাধর্ম্ম অধঃপতিত হইয়াছে; কিন্তু সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে তিব্বত-নারীর যে-জ্ঞান আছে, তাহাতেই এইসকল কাহিনী তাহাদের মনে ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি করে। তিব্বতের এক ধর্ম্মনারী মংশা। মংশা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চিরতুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের অধিবাসী গুরুর পদে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই দেশে কত নির্জ্জনে গুহায় কত সাধ্বী নারী ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেছেন। ইহাই তিব্বতের গৌরব।

(বঙ্গলক্ষ্মী, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

—

তুলসী

তুলসী আমাদের মহোপকারী বৃক্ষ। পল্লীভূমির নিরক্ষর মায়েরা কোলের দুলালের মুখে তুলসীতলার মাটী দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিকরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে. তুলসী-তলার মাটী-খেকো পাড়াগাঁয়ের ছেলেগুলোর ইনফ্যাণ্টাইল লিভার একবারেই হয় না।

আয়ুর্ব্বেদমতে তুলসীর গুণ ;—ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, সুরভি, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ ও পিত্তনাশক, বাতশ্লেষ্মানাশক এবং কাস, ক্রিমি, বমি, কুষ্ঠ, রক্তস্রাব, জীর্ণজ্বর, পার্শ্ববেদনা ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

এলোপ্যাথিক মতে তুলসীর গুণ ;—তুলসী কফনিঃসারক ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিবিধ সংক্রামক পীড়া-নাশক। সর্দ্দিঘটিত বিবিধ পীড়ায়, কাস, পার্শ্ববেদনা, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, এজমা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্রভৃতি পীড়ায় উপকারী; সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের ইহা মহৌষধ, প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস হইলে মূত্র করণার্থ ও স্নিগ্ধ করণার্থ ইহার বীজ প্রয়োজিত হয়।

আমি নিম্নোক্ত তিন প্রকার প্রয়োগরূপ প্রস্তুত করিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীগণকে প্রয়োগ করিয়াছিলাম।—

১। তুলসীর অরিষ্ট (টীংচার ওসাইনাম্ স্যাঙ্কটেটাম্ বা টীংচার হোলি বেসিল) তুলসীর পত্র ও বীজ চূর্ণ ২॥০ আউন্স, শোধিত সুরা ১ পাইণ্ট—এক সপ্তাহ কাল ইহা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০—১ ড্রাম।

২। তুলসীর ফাণ্ট, (ইনফিউজন্ ওসাইনাম্ স্যাঙ্কটেটাম্ বা ইনফিউজন্ হোলি বেসিল) শুষ্ক তুলসীর পত্র ১ আউন্স, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ১ পাইণ্ট, অর্দ্ধঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০—১ আউন্স।

৩। সিরাপ ওসাইনাম্ স্যাঙ্কটেটাম্ (তুলসীর পাক) তুলসী পাতার রস ১২ আউন্স, বিশুদ্ধীকৃত শর্করা ২ পাউণ্ড, পরিশ্রুত জল ৮ আউন্স বা যথা প্রয়োজন। তুলসীর রস ও পরিশ্রুত জল একত্রে মিশাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সামান্য উত্তাপে ফুটাইবে। পরে তাহাতে চিনি সংযোগ করিয়া ক্রমশঃ সিরাপের আকারে পরিবর্ত্তিত করিবে। সর্ব্ব সমেত ৩ পাউণ্ড ওজন হইবে। মাত্রা—১—২ ড্রাম।—

ছেলেদের সর্দ্দি কাসিতে অধিকাংশ সময়ে আমি তুলসীর সিরাপ বা নিম্নোক্ত চাটনী প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছি।

তুলসী পত্রের রস—৪ ড্রাম
বিশুদ্ধ মধু—১ আউন্স
আদার রস—২ ড্রাম
যমানী চূর্ণ—২ ড্রাম

একত্রে মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ৩০—৬০ ফোঁটা।

ম্যালেরিয়া জ্বরে তুলসী পত্রের রস ১ তোলা ও আদার রস অর্দ্ধ তোলা মধু সহ সেবনে বেশ উপকার হয়।

তুলসীর মূল পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে রক্তামাশায় আরোগ্য হইয়া থাকে।

কর্ণশূলে ইহার রস বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তপ্রস্রাব বা হিম্যাচুরিয়া রোগে তুলসীর রস চিনি সহ সেবনে তাহা নিবারিত হইয়া থাকে।

তুলসীপত্রের রস প্রয়োগে প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনা আরোগ্য হইয়া থাকে।

জ্বরকালীন বমনে জলমিশ্রিত সিরাপ তুলসী অথবা মিছরীর সরবতের সহিত তুলসীপত্রের রস হিতকর।

যমানী ও তুলসী নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিলে ও বসন্তকালে প্রয়োগ করিলেও পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

দদ্রু বা দাদ রোগে ইহার পত্র ঘর্ষণে উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে কাগজী বা পাতী লেবুর রসে পিষিয়া দাদে লাগাইতে বলেন।

ছেলেদের হামজ্বরে তুলসীমঞ্জরী ও যোয়ান, ও আদা একত্রে বাটিয়া প্রয়োগ করিলে হাম বাহির হইয়া রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে।

তুলসীমঞ্জরী এক আনা, মেথি এক আনা ও কুড় এক পাই ওজন করিয়া কিঞ্চিৎ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই অবশিষ্ট ক্বাথ পান করিলে হামজ্বর নিবারিত হয়।

অনেক সময় তুলসীপত্র উত্তম বায়ু-নাশক হইয়া অজীর্ণ, পেট-ফাঁপা, মন্দাগ্নি প্রভৃতিতে উপকার করে।

প্রত্যহ প্রাতে তিনটি তুলসী পত্র, তিনটী গোলমরিচ একত্রে সেবন করিলে শরীরে প্রায় কোন ব্যাধি আক্রমণ করে না।

বাড়ীর মধ্যে বেশী পরিমাণে তুলসী-বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

তিন

কেদারের গান-বাজনার দিকে ঝোঁক থাকলেও গৃহ-কর্ত্তার ও জিনিষটা মোটেই পছন্দসই ছিল না। কাজে কাজেই কেদার বাড়ীতে মোটেই সঙ্গীতচর্চ্চা ক'রে উঠ্‌তে পারেনি; প্রবাল এ-বিষয়ে বেশ পাকা হ'য়ে উঠেছিল। তার কাছ থেকে অবসর মতো কেদার একটু যা শিখ্‌তে পারত কিন্তু কর্ত্তা আবার তাঁর বিনানুমতিতে ছেলেদের বাড়ীর বাইরে থাকা পছন্দ কর্‌তেন না। স্কুল কলেজের সময় ছাড়া সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে থাকা নিষেধ, অথচ এই সময়টাই গান বাজনার চর্চ্চার জন্য প্রশস্ত। ছাত্রদের তা ছাড়া আর সময়ই বা কই? বিয়ের পর থেকে হঠাৎ কর্ত্তার এসব কড়া আইন-কানুন শিথিল হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। বর-বেশে মুখ দেখানোর টাকায় যখন কেদার একটি ডোয়ার্কিনের ভালো বাজনা কিনে বস্‌ল গৃহস্বামী একটুও প্রতিবাদ কর্‌লেন না বরং কেদারকে বল্‌লেন "প্রবালকে দিয়ে ভালো করে বাজিয়ে নাও। শেষে জুচ্চুরির মাল না হয়, ও বিজ্ঞাপন ফিজ্ঞাপন কোন্নে কাজের না বাপু। কলকাতার লোকদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।"

কেদারের শয়নমন্দির ছিল দোতলার একেবারে এক টেরে—তাতে কেদারের সঙ্গীত সাধনার বেশ সুবিধাই হ'য়ে গেল; প্রবাল আবার তার ওপর রসানদিয়ে বল্‌ল "ভালই হোলোরে, কেদার, বউ এলে বউকেও শেখাতে পারবি অথচ কেও জান্‌তে পার্‌বে না।

প্রিয়ব্রতা এসে কিন্তু কেদারের বড় বেশী খাটুনি বেড়ে গেল নিজের পড়াশুনা ত আছেই তার ওপর বধূর শিক্ষকতার আসন তাকে সাধ ক'রে গ্রহণ কর্‌তে হ'লো।

মোটে আখ্যান-মঞ্জরী প'ড়ে প্রিয়ব্রতা তার পাঠলীলা সাঙ্গ করেছে। কথার পিঠে যদি কেদার ফস্ ক'রে একটা ইংরেজী কথা কিছু ব'লে ফেলে তা হ'লেই ত সে হক্‌-চকিয়ে চেয়ে থাকে। আজকালকার দিনে এ সব বউ নিয়ে নেহাৎ হাঁড়ি হেঁসেলের কাজই চলে ভালো। কালিদাসের

অজবিলাপে বর্ণিত, "গৃহিনীসচিবকলামিথঃ" পদটি নিতান্ত মাঠে মারা যায়। তাতেই কেদার স্ত্রীকে বল্‌লে তোমায় ভালো ক'রে পড়া শিখ্‌তে হবে"—

প্রিয় প্রথমটা সলজ্জ ভাবে বল্‌লে "বুড়ো-বয়সে আবার পড়া শিখ্‌বো। ছিঃ।" কিন্তু তার বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ ভালই ছিল। তার পর স্বামীর মোটা-মোটা বইগুলোর দিকে তাকিয়ে সেগুলোকে আয়ত্ত কর্‌বার আশায় সে পড়্‌তে রাজী হ'য়ে গেল। তবে বাজনা শিখ্‌তে সে মোটেই উৎসাহ দেখালে না, বল্‌লে ওটি আমি পার্‌ব না। কেদার তাতে হাল ছাড়্‌লে না। একটা থেকেই ত সুরু করা যাক্, এই ভেবে সে অধ্যপনাটাই আরম্ভ ক'রে দিলে। রাত্রি ৯টার পর আহারাদি সেরে প্রিয় ঘরে এসে স্বামীর কাছে ব'সে বই খুলে সুবোধ ছাত্রীর মতো 'he is on সে হয় উপরে' 'I am in আমি হই ভিতরে' আবৃত্তি কর্‌তে লেগে যেত। কিন্তু আর সে ক'মিনিটের জন্যে? একটু পরেই বেচারীর শ্রান্ত-ক্লান্ত চোখ দুটি কেদারের পাঁচবার নিষেধ সত্ত্বেও ঘুমের ঘোরে ঢুলে পড়ত আর তার নিদ্রালস দেহখানি সুকোমল শয্যার উপরে লুটিয়ে যেত। অগত্যা কেদার শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে, ছাত্রের আসন নিয়ে পাঠ্য পুস্তকে মনোনিবেশ কর্‌ত। ঢং ঢং ক'রে দেওয়ালের ঘড়ীতে দশটার পর এগারোটা বেজে যেত। অদূরে হুগলীর বিখ্যাত ইমাম্‌-বাড়ীর প্রকাণ্ড ঘড়ীতে তার প্রতিধ্বনি সশব্দে জেগে উঠে বাতাসকে কাঁপিয়ে তুল্‌ত।

অগ্রাণের শেষে শিউলী ফুলের তখন পুরো রাজত্ব; বাতাস তারই মদির-গন্ধ ব'য়ে এনে অধ্যয়ন-রত যুবকের নাসারন্ধ্রের ভিতর সহজে পথ ক'রে নিয়ে তার হৃদয়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এক অজানা পুলক-স্পন্দন জাগিয়ে তুল্‌ত। কেদার বেচারীর পড়া আর এগোতে চাইত না; বইএর অক্ষরগুলো যেন সব হঠাৎ সঙ্গীন-হাতে-করা সেপাই মূর্ত্তিতে পরিণত হ'য়ে তার চোখে খোঁচা দিতে চাইত। তাদের আয়ত্ত কর্‌বার দুরাশা পরিহার ক'রে কেদার তখন চেয়ার ছেড়ে শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াত। পালঙ্কের উপর গভীর সুপ্তিমগ্ন কি সুন্দর, সুকোমল প্রিয়ার সেই মুখখানি—কি মধুর লাবণ্যজড়িত তার সুঠাম দেহবল্লী! বাতির আলোয় স্বভাবসুন্দর স্ত্রী যেন দ্বিগুন ঝল্‌মল্ কর্‌ছে।

সপ্তমীর চাঁদের মতো প্রিয়ার সুবঙ্কিম ললাট, ঘন কৃষ্ণ নিবিড় চুলগুলির মাঝে শুভ্র সিঁথির দাগ—যেন কবি-বর্ণিত নীল আকাশের বুকে ছায়াপথের রেখা; তার পুরোভাগে সিন্দুরের রক্তরাগ চিহ্ন। কেদার সব ভুলে প্রীতি-বিহ্বল-মুগ্ধচিত্তে সুপ্তা প্রিয়ার মুখে বার-বার অনুরাগের চিহ্ন এঁকে দিয়ে তার পাশে স্থান গ্রহণ ক'রে অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হ'য়ে পড়্‌ত। প্রিয়ব্রতাকে সে আদর ক'রে প্রিয়া ব'লেই ডাক্‌ত।

সত্যি কথা বল্‌তে কি কেদার বেচারীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা—দুটিই দিনের পর দিন আর অগ্রসর না হ'য়ে মধ্যপথে স্থিতিশীল হবার জোগাড় কর্‌তে লাগল।

চার

তখন ফাল্গুনের শেষ, কেদারদের প্রকাণ্ড বাগানে আম গাছগুলো মুকুলে মুকুলে ভ'রে গেছে। তার গন্ধে পাগল কোকিলগুলো সবে মাত্র গলার জড়তা দূর কর্‌বার জন্যে সুর-সাধা সুরু করেছে। দুপুর বেলা চারদিক্ কেমন একটা নির্জ্জনতার আভাসে থম্‌থমে হ'য়ে দাঁড়িয়ে। গৃহস্থ বাড়ীর কাজ-কর্ম্মগুলো এই সময় খানিকক্ষণের জন্যে এক রকম ছাড়া পায়; তাই কর্ম্ম-কর্ত্তা বা কর্ত্রীরাও একটু বসে জিরিয়ে বাঁচেন, আর দস্যি ছেলের মতো গোলমালগুলো একটু ঘুমিয়ে প'ড়ে চারিদিকের থম্‌থমে ভাবটাকে জমিয়ে তোলে।

কেদার আপনার ঘরে জান্‌লার সাম্‌নে চেয়ার টেনে নিয়ে চুপ-চাপ বসেছিল; বাইরে সিঁড়িতে চটি জুতার ফট্‌ফট শব্দ হ'তেই সে যার আগমন সম্ভাবনাকে মেনে নিল, তার আসা তার কাছে মোটেই অনাদরের বস্তু নয়। তবু সে আগন্তুককে মুখ ফিরিয়ে দেখে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'ল না। আগন্তুক ঘরে ঢুকেই একটু থম্‌কে দাঁড়াল, তার পর চটি জোড়া খুলে রেখে, সতরঞ্চের উপর দিয়ে পা টিপে-টিপে হেঁটে গিয়ে পিছন থেকে কেদারের চোখ দুটো টিপে ধর্‌ল। কিন্তু সে এক লহমার জন্যে মাত্র, তখনি চোখ ছেড়ে দিয়ে সে সাম্‌নে এগিয়ে দাঁড়াল। কেদার বল্‌লে "ধর্‌লি না কেন, ছেড়ে দিলি যে! ওরে

দিত ; তোর হাত আর বউএর হাতে আস্‌মান জমিন তফাৎ। তোর ডাম্বেল ভাঁজা, কুস্তীলড়া পাঞ্জার সঙ্গে বউএর কচি নরম হাতের কি তুলনা হয়।” প্রবাল হেসে বল্‌লে—“তা হ’লে প্রেমিকদের নামের লিষ্ট থেকে তোর নাম কেটে দে। যদি প্রিয়ার কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে এমনি মশগুল না হ’লি, কঠিনকে কোমল না ভাবলি তবে আর তন্ময়তা হ’ল কি ? কবি বিরহীর মুখ দিয়ে কি সব বলিয়েছে জানিস্ তো! লতা দেখে তাঁর প্রিয়ার অঙ্গলাবণ্য মনে হ’ত, ফুল দেখে প্রিয়ার ঠোঁটের কথা স্মরণ হ’ত। পুরূরবার প্রেমোন্মাদ পড়েছিস্ ত ?” কেদারও হেসে বল্‌লে “আমার ত প্রেমোন্মাদ হ’বার অবস্থা নয়, প্রিয়া আমার কাছে ; সুতরাং মলয়-বসন্তে আমি ত বিরহী নই ভাই।”

একখানা চৌকী টেনে নিয়ে ব’সে প্রবাল বল্‌লে—“শুনেছিস্ আমি পড়া ছেড়ে দিলাম।”

কেদার বল্‌লে—“বাঃ কবে থেকে ?”

“আজ সকাল থেকে। বাবার শরীর বড্ড খারাপ, উনি আর পড়াতে পার্‌বেন না। অথচ দুমাস ছুটি নিয়ে-নিয়ে কাট্‌ল, আর ছুটী পাওয়া যাবে কেন ?”

“তা—তুই কেন পড়া ছাড়লি ? এফ, এ-টা ও বি, এ-টা কোনোরকমে পাশ ক’রে নিলেই ভাল হ’ত।”

“ভাল হ’ত কিনা বিচার কর্‌বার যে সময় পাওয়া গেল না। বাবার অসুখে চার্ দিকে ধার কর্জ্জ দাঁড়িয়েছে আমিও তাই মাষ্টারী নিলাম। তবে তোর মাষ্টারীতে আর আমার মাষ্টারীতে ঢের তফাৎ। তোর মাত্র একটি ছাত্রী, আর সে ছাত্রীটির পড়া ভুল হ’লেও তোকে চোখ রাঙ্গাতে হয় না ; আমার কিন্তু দণ্ডধারী যমরাজের মতন বেত্রধারী মাষ্টার মশায় হ’তে হবে।”

কেদার হেসে বল্‌লে ;—“তা আর দুঃখু কিসের ? আমার মতন তুইও এইবার একটি ছাত্রী আমদানী করিস্। তোর মা বলেছিলেন ছেলে চাকরী না কর্‌লে বিয়ে দেবেন না। এইবার ত চাকরী কর্‌তে চল্‌লি।”

“ভারী চল্লিশ টাকার চাক্‌রী। না রে, বিয়ে টিয়ে এখন কিছুতেই কর্‌ছি না। তা তুইত রাত্রিতে মাষ্টারী কর্‌বি, সঙ্গীত চর্চ্চা কর্‌বি, প্রেম চর্চ্চা কর্‌বি, দুপুর বেলা ক্লাসে ব’সে ঢুল্‌বি, কোনোদিন বা কলেজ পালাবি এম্‌নি ক’রে মা সরস্বতীর সঙ্গে কদ্দিন লুকোচুরী খেল্‌বি ভাই ? আজ ছুটীর দুপুরটাতেও ত বই খুলে বসিস্‌নি, দিব্যি আম বাগানের দিকে তাকিয়ে কোকিলের কুহু ডাক শুনে প্রাণ ভরাচ্ছিস্।”

কেদার প্রথমে এই অনুযোগ শুনেই একটু নড়ে-চড়ে বস্‌ল, ক’ড়ে আঙ্গুলটা দাঁত দিয়ে চেপে মনে-মনে কি যেন একটা ভাবলে, তারপর হঠাৎ ব’লে উঠ্‌ল “তুই না পড়িস্ ত আমিও আর পড়্‌ছি না। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হ’তে যাবে? সেই ছোট বেলা থেকে এদ্দিন এক সঙ্গে পড়ে এসে—” কেদার থেমে গেল, বাকী কথাটা আর শেষ কর্‌লে না। প্রবাল বন্ধুর পিঠে আদরের চাপড় মেরে বল্‌লে—“আহা বন্ধু-বৎসল বটে, দেখিস্ ভাই শ্লোকটা ভুলিস্‌নি যেন, ‘রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ।’ তা শোন বলি, চল্ স্কুলে তুইও মাষ্টারী কর্‌বি।”

মাথা নেড়ে কেদার বল্‌লে, “দাদারা রাজী হবেন না ; তবে পড়া ছেড়ে এ বয়সে শুধু-শুধু ঘরে ব’সে থাকাটাও ভালো দেখাবে না।” প্রবাল বল্‌লে,—“পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়া তোর ঠিক্ হবে না কেদার। তবে একথা ঠিক যে, যে ভাবে তুই পড়াশুনো কর্‌ছিস্ এতে তোর কিচ্ছু হবে না। পরীক্ষা তো এগিয়ে এল, পাশ ত হবিই না ; আর বাড়ী শুদ্ধো লোক বউটাকে অপয়াবউ ব’লে দোষ দেবে। বেচারী লজ্জায় ম’রে যাবে।”

কথাটি খুব ঠিক্। এই কিছুক্ষণ আগে নির্জ্জনে বসে কেদার ঠিক এই কথাই ভাব্‌ছিল। তার সময়ে অসময়ে কলেজ হ’তে চ’লে আসাটা দাদাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তারাও নবীন দাম্পত্যজীবনের ভুক্তভোগী, সে জন্য কেদারকে কাল একটু কটাক্ষ ক’রেই বড়দাদা মাকে বলেছে “ছোট বউমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও মা, আর কেদার, তুমি একটু মন দিয়ে পড়, result যেন ভাল হয়। নেহাৎ থার্ডডিভিসনের পাশ লিষ্টে নামটা রেখো না যেন।” মধুমতী আর কেদারকে কিছু না ব’লে প্রিয়ব্রতাকে বলেছিলেন “বউ মা, কেদার রাত্তিরে যাতে পড়াশুনোতে একটু মন দেয় তার ওপর চোখ দিও ত”—এই সামান্য কথা কয়টির আড়ালে যে কত প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে তা’

প্রিয়ব্রতা ও কেদার দুজনেই বুঝতে পেরেছিল। তাতেই সে রাত্রে প্রিয়কে পড়া দিতে বল্‌তেই সে ছলছল চোখে বলে উঠল "আমায় আর পড়াতে হবে না, গুরুমশাই; নিজের পড়া ভাল ক'রে মুখস্থ কর। আজ বাদে কাল এগ্‌জামীন আস্‌ছে—নিজে পড়াশুনো না ক'রে ফেল হবে—আর সবাই তখন আমার দোষ দেবে। কেন গো, আমি বুঝি তোমায় পড়া করতে মানা করি!"

কেদারের চমক্ ভাঙ্‌ল, সত্যিই ত পড়াশুনো তার মোটেই এগোচ্ছে না। গেল ক'মাসে যে লেক্‌চারগুলো সে এটেণ্ড করেছে সে শুধু শরীর দিয়েই; মনের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। অবশ্য প্রিয়র কথা শুনে সে হেসে তার চুল নেড়ে দিয়ে তার চাবী কেড়ে নিয়ে, নানা রকম ক'রে তাকে ভুলিয়ে ব্যাপারটাকে বেশ লঘু ক'রে দিয়েছিল। এখন কিন্তু দুপুর বেলা ছুটীর দিনে বই খাতা খুলে ব'সে সে বেশ বুঝতে পেরেছে এ-বছর পরীক্ষায় তার 'ফেল' হওয়া অবশ্যম্ভাবী। হয়তো এটা "অদৃষ্টেরই লিখন", কিন্তু লোকে তা না বুঝে গলা জাহির ক'রে কত কি বল্‌বে। এই রকম সাত পাঁচ কথাই সে ব'সে-ব'সে ভাবছিল, কোকিলের কুহুস্বর শোন্‌বার দিকে তার মোটেই মন ছিল না। প্রবালের পড়া ছেড়ে দেবার কথা শুনে সে বরং একটা পথ দেখতে পেলে। এই অজুহাতে সেও পড়া ছেড়ে দিয়ে এক রকম নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারে। মানুষ কি নিষ্ঠুর, বইএর ভিতর দিয়েই যত কিছু মানব জীবনের নূতন-নূতন ভাবগুলির আস্বাদ পায়, সেগুলোকে সাক্ষাৎ জীবনে পরখ করতে গেলেই অম্‌নি সর্ব্বনাশ! সবারি চোখ তাতে টাটিয়ে না উ'ঠে আর যায় না। কেউ বা আবার লগুড় হাতে ছুটে আস্‌বে। কবিরা যৌবনকে স্বর্ণযুগ ব'লে উল্লেখ করেছেন। এই যৌবন যখন মানুষের জীবনে তার রঙীন জয় পতাকা উড়িয়ে এসে গর্ব্বভরে বল্‌ছে "এ এখন আমার" তখন কি না সংসারের দশ দিক্ থেকে দশ রকম ব্যাপার চীৎকার ক'রে বল্‌ছে "এই কোথা যাও, এ কাজটা হয়নি, এটা শেষ ক'রে যাও ইত্যাদি"।

যাই হোক কেদার অতঃপর একেবারে মন ঠিক ক'রে ফেল্‌লে যে সে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে বরং একটা কোনো কাজে কর্ম্মে লেগে যাবে। আল্‌সে কুঁড়ের মতন জমীদারী চাল চেলে বাপের ভাত যে পায়ের ওপরে পা দিয়ে ব'সে ধ্বংস করতে থাক্‌বে না এ ঠিক্।

পাঁচ

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি বেলা দুপুর—রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে, গরমে প্রাণ আই-ঢাই, বাতাস সোঁ সোঁ ক'রে আগুনের হল্কা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। পল্লীর গৃহিণীরা এই রোদেই তাঁদের সাধের কাসুন্দি; আমসী প্রভৃতি আচারগুলি নিয়ে নাড়া চাড়া করছেন। প্রবালের মা যশোদাও বাদ পড়েননি; দশ বছরের মেয়ে সুমতি[?] মার কাজে সাহায্য করছে। দুদিন আগে একটা বড় ঝড় হ'য়ে গিয়ে বিস্তর আম পড়েছিল। এই সুযোগে সকলেই সেই আম সংগ্রহ ক'রে আচার করতে ব্যস্ত হয়েছেন। প্রবালের প্রৌঢ় রুগ্ন পিতা কাশীনাথ ঘরের মধ্যে শুয়ে এই গরমেও কাস্‌ছেন, আর মাঝে-মাঝে "সুমি জল দিয়ে যা" "এক ছিলিম তামাক দেরে" বলে ডাক দিচ্ছেন। প্রবালদের সাংসারিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল না। বাড়ীতে কাশীনাথ আর তাঁর স্ত্রী; ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রবাল আর সুমতি। কিন্তু কাশীনাথের বৃদ্ধা মা আর একটি বিধবা বোন্ তিন চারটি ছেলে মেয়ে নিয়ে চিরকাল তাঁর ঘরই পূর্ণ করেছিলেন! কাশীনাথ স্কুল মাষ্টারী ক'রে মাসিক পঞ্চাশটি টাকা মাত্র তন্‌খা পেতেন তাও কিছু বরাবর অতটাও ছিল না; গোড়ায় কুড়ি থেকে সুরু হয়েছিল। সামান্য কিছু জমি-জমা ছিল বটে কিন্তু বিধবা মা বোনের বার ব্রত-উপবাস-পার্ব্বণ, ব্রাহ্মণ ভোজন পুরোহিতে দক্ষিণা বাবদ তাঁকে বিনা বাক্যব্যয়ে মাহিনার এক অংশ ছেড়ে দিতেই হ'ত সুতরাং সাধারণ গৃহস্থদের অবশ্যম্ভাবী যা পরিণাম তার হাত থেকে তিনি মুক্তি পান্‌নি। অল্প-অল্প ক'রে ঋণের বোঁঝা বেড়ে চলেছিল। বছর খানেক পূর্ব্বে তাঁর মার পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাঁর শ্রাদ্ধ-শান্তি উপলক্ষেও আবার কিছু ঋণ হয়েছে মেয়েটির ইতিমধ্যে বিবাহ দিতে হয়েছে। ধান, জমী আর বসত বাটীর সংলগ্ন বাগানটি তার জন্যে মহাজনের কাছে বন্ধক পড়েছে। এগুলো অবশ্য শতকরা সত্তর জন বাঙালী গৃহস্থের সাধারণ জীবনের নক্সা—এতে নূতনত্ব কিছু নেই

এই সব বোঝার ভারে বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সেই কাশীনাথ স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'য়ে কাস রোগীতে পরিণত হয়েছেন। মনে ক'রেছিলেন কষ্টে স্থষ্টে আরও দু পাঁচ বছর ছেলেটিকে পড়িয়ে একটা মানুষ ক'রে তুল্‌বেন; কিন্তু সে পর্য্যন্ত আর স্বাস্থ্য টিক্‌ল না। অগত্যা তাঁকে চাকরীর মায়া কাটাতে হয়েছে। প্রবাল বাপের সেই মাষ্টারীটুকু দখল করেছে, প্রবালের পিসিমা যতদিন তাঁর মা বেঁচেছিলেন তত দিন ভাসুর দেওরদের ভিটে আগলাবার জন্যে যেতে রাজী হননি। সে একেবারে অজ পাড়াগাঁ, দিনের বেলা শেয়াল ডাকে; সুতরাং সেস্থানে মা কোন্ প্রাণে মেয়েকে যেতে দেন?

মার মৃত্যুর পর মেয়ে কিন্তু নিজেই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সেই খানেই যাত্রা করেছেন; যেহেতু প্রবাল পরামর্শ দিয়েছিল যে ছেলেরা জন্মে যদি বাপ জেঠার ভিটেতে না গিয়ে দাঁড়ায় তা হ'লে ভবিষ্যতে সেখানে এদের চিন্‌বেই বা কে? তা ছাড়া সেখানকার জমা জমী পুকুর বাগান যা আছে তার কিছুরই এরপর তারা অংশ পেতে পার্‌বে না। কাশীনাথ আগে-আগে দু'চার বার যে মা বোনের সাম্‌নে এ রকম কথার উল্লেখ করেননি, তা নয়। কিন্তু মা বোন এর উল্টো অর্থ ক'রে কপাল চাপড়ে বল্‌তেন, "এক মুঠো পেটের ভাত, তাও কেউ দিতে চায়নারে—এম্‌নিই কলিকাল। সাধে কি শোলকে বলে—"বাপ রাজা তো রাজার ঝি, ভাই রাজাতো আমার কি?"

অগত্যা কাশীনাথ রাজা না হ'লেও নিজের সাধ্যমত বোন-ভাগ্নেদের ভার এ-যাবৎ বহন করেই এসেছিলেন। তবে ইদানীং ভাইপোর পরামর্শটা পিসীর কানে নেহাৎ খারাপ লাগেনি। তাই তিনি সে পরামর্শের উল্টো অর্থ না ক'রে পোঁট্‌লা পুঁটুলী বেঁধে শ্বশুরের ভিটামাটীর উদ্দেশেই যাত্রা করেছিলেন। খবর পাওয়া গেছে, সে স্থান অজ-পাড়াগাঁ হ'লেও সেখানে দুধ ঘি পুকুরের মাছ জমীর চাল গুড় তরিতরকারী বেশ সুপ্রচুর। ছেলেরা হুগলী সহরের বিরহে উন্মনা হ'লেও তেমন খাদ্য-পেয়র সুপ্রাচুর্য্যে সহরের বিরহটা বেশ স'য়ে নিতে পেরেছে।

যশোদা রোদে কাসুন্দী, আম্‌সী ইত্যাদি নেড়ে-চেড়ে শুকোচ্ছিলেন। এমন সময় দেবীর মা একখানা ভিজা গামছা মাথায় দিয়ে এদের বাড়ীতে এসে ঢুকেই বলে উঠ্‌লেন—"কি রদ্দুর মা কি রদ্দুর। কাঠ মাটী চুলোয় যাক্ পাথর ফেটে চৌচীর ক'রে দিচ্ছে। সেদিন অমন ঝড় জল হ'য়ে গেছে, তবু মাটী ফেটে হাঁ ক'রে আছে, সব জল কোথা দিয়ে শুষে নিয়েছে।" যশোদা বল্‌লেন, "এসো ঠাকুরঝি ঘরের ভিতরে বস্‌বে চল। যে রোদের তাত, বারান্দায় বস্‌বার জোকি!" দেবীর মা বল্‌লেন, "তা তুইও আয় বউ, তোর সঙ্গেই একটা কথা কইতে এসেছি।"

যশোদা বল্‌লেন—"এই আমি আস্‌ছি ঠাকুরঝি; নেড়ে-চেড়ে আম্‌সীগুলো শুকিয়ে নিই। বাগানের সব আম প'ড়ে গেছে; এবছর গাছপাকা আম আর খেতে হবে না, কুড়িয়ে বাড়িয়ে এখন যা পাওয়া যায়, সোম-বছরের টকের জোগাড়টাও তো হ'য়ে থাক্‌বে।"

দেবীর মা বল্‌লেন;—"তা খুব হবে, পাড়া প্রতিবেশীকে বিলুতেও পার্‌বি। তোকে আর নাড়াচাড়া ক'রে শুকুতে হবে না, যে রোদ মানুষকে কেটে চারখানা ক'রে ফেলে রাখ্‌লে, এখুনি শুক্নো খট্‌খটে হ'য়ে যাবে তা তোর আম্‌সী!"

সুমতি এমন মজার কথাটা শুনে খিল-খিল ক'রে হেসে ব'লে উঠ্‌ল, "হ্যাঁ পিসী, মানুষ-আম্‌সী তা হ'লে খাবে কে?" পিসী বল্‌লেন—"যদি আম্‌সীই ত'য়ের হয় তা হ'লে খাবারও লোক জুটে যাবে।"

অতঃপর ননদ ভাজে ছায়া-শীতল বারান্দায় এসে ব'সে আঁচল নেড়ে বাতাস খেতে লাগলেন। সুমতি কিন্তু সেই রোদে দাঁড়িয়েই ভাবতে সুরু কর্‌ল যে সত্যই যদি মানুষ আম্‌সী হয় তা খাবার জন্য মানুষ জুটবে কারা? ছিঃ ছিঃ মানুষকে শুকিয়ে খাবে? কি ঘেন্না কি ঘেন্না।

দেবীর-মা হাওয়া খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে যশোদাকে বল্‌লেন "দিন-দিন তোর কি ছিরি হচ্ছে বউ। দেহ যে কালী হ'য়ে গেল।" যশোদা নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—"দেহের আর বিশেষ অপরাধ কি, ঠাকুরঝি, উদয়াস্ত খাটুনি খাট্‌ছি, তার ওপর নানা ভাবনা। কর্ত্তা এই বয়সে এমন রোগে একেবারে অথর্ব্ব হ'য়ে পড়লেন, চারিদিকে ঋণ-কর্জ্জ—"

কথার শেষটাও তিনি আর একটা নিঃশ্বাসের উপর দিয়েই করলেন। দেবীর-মা একটু ভেজা গলায় ব'লে উঠলেন,—"সবই তোর কপাল বউ! তা এখন একটি হাত মুড়কুৎ বউ না হ'লে কিছুতেই আর তোর চলে না। আজ বাদে কাল মেয়েটিও শ্বশুর-ঘর চ'লে যাবে, হাতের কাছে জল-বাটনাটি এগিয়ে দেবারও ত একটি কাউকে চাই। ছেলেটির পানটি, জলটি দিতে হ'লেও সেই নিজে। ষেটের কোলে তেইশ চব্বিশ বছর বয়সও হ'লো তার, এখন ঘরে একটি বউ না আন্‌লে মানাবেই বা কেন?" যশোদা বল্‌লেন—"আমার কি অসাধ বোন যে ঘরে বউ না আনি? তা এই কর্জ্জ-ঋণের ওপর এখন পরের মেয়েকে আনি কি করে? কর্ত্তার মত না, ছেলেরও মত না।" দেবীর-মা বল্‌লেন—"ছেলের মত আবার একটা কথা। ছেলেতে আর এ বয়সে কবে কোথায় বেহায়ার মতন ব'লে থাকে যে আমার বিয়ে দিয়ে দাও। তবে কর্ত্তার অমত—তা দাদা মিছে অমত করছেন এখুনি সোণার চাঁদ ছেলের বিয়ে দিয়ে করকরে দেড়টি হাজার টাকা তুমি গুণে নাওনা! দেনা কর্জ্জ সব শোধ হ'য়ে যাবে, ঘর-আলো-করা একটি বউও হবে।" যশোদা যে এ কল্পনা করেননি তা নয় তবে কি না নিজের সাধের কল্পনার বর্ণনা পরের মুখে শুন্‌লে রূপটা তার প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে; সুতরাং যশোদা বেশ একটু উৎসুক হ'য়ে ব'লে উঠলেন, "তা বেশত ঠাকুর-ঝি, তুমি একটু দেখে শুনে সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রে দাও না; ভেতরে-ভেতরে সব ঠিক ক'রে তার পর প্রবালকে বল্‌লেই হবে।"

দেবীর-মা খুসী হ'য়ে বললেন "তা না ত কি? কেদারের-মা রোজই জিজ্ঞেস করেন প্রবালের বিয়ের কি হ'ল। দুটিতে সমজুটী পড়াশুনো চিরকাল এক সঙ্গেই করলে এক সঙ্গেই পড়া ছেড়ে কাজ সুরু করলে; অথচ একটি বে থা ক'রে সংসারী হয়েছে আর তোমার প্রবাল সন্ন্যাসী হ'য়েই রইল।"

তার পর দেবীর-মা নিজের দূর-সম্পর্কীয়া এক ভাইঝির সঙ্গে প্রবালের বিয়ের কথা তুল্‌লেন। মেয়ের বাপ হাজার দেড় টাকা নগদ দিতে চান, মেয়েটিও সুশ্রী। প্রবালের স্বভাব চরিত্র খুব ভালো জেনে গরীবের ঘরেই তিনি মেয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছেন; তার পর তাঁর মেয়ের বরাতে থাকে এই গরীব ঘরেই লক্ষ্মীর কৃপায় সে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। এ সব কথার একটা নিষ্পত্তি হবার পর যশোদা জিজ্ঞেস করলেন---"কেদারের বউটি এখন কোথা, ছেলে পিলে কিছু হবে না কি?

দেবীর-মা বল্‌লেন—"তা তো কিছু বোঝাচ্ছে না, কর্ত্তা-গিন্নীর কিন্তু ভারী সাধ শীগগীর বউটির কোল জোড়া হয়। বউ এখন এইখানেই আছে; কেদার নূতন কাজ নিয়ে যে কল্‌কাতা যাবে শুনচি।"

যশোদা বললেন—"বউ ত নেহাৎ ছেলে মানুষ, ছেলে পিলে দুবছর দেরীতে হ'লেই ভালো। কেদার কি তবে পুলিশের কাজেই ঢুক্‌ল না কি? প্রবাল বল্‌ছিল ও সব ঝকমারীর কাজে কেদার ঢুক্‌তে রাজী নয়।"

"তা ত কই কিছু শুনিনি, এখন আজ উঠি তবে" ব'লে দেবীর-মা গা তুল্‌লেন। সুমতি এই সময় তাঁর গা ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—"হ্যাঁ পিসী, মানুষ-আম্‌সী কি সত্যিই হয় না কি?" মা ধমক দিয়ে বল্‌লেন "এই এক পাগল মেয়ে যা কিছু শুনবে তার অম্‌নি তদারক তদন্ত না ক'রে ওর আর সোয়াস্তি নেই। এই বুদ্ধি নিয়ে শ্বশুর ঘরে যে কেমন ক'রে ও দিন কাটাবে আমি তাই ভাবি?

দেবীর-মা হেসে সুমতির মাথাটি নেড়ে দিয়ে বল্‌লেন "চালকুমড়ীর গল্প শুনেছিস তো তুমি। ঐ যারা বাপ-মা মরবার সময় হ'লে চালে ছুঁড়ে ফেলে মেরে ফেল্‌ত, তার পর তাকে আমসী শুক্‌নো করে শুকিয়ে তবে খেতো; তারাই মানুষ-আমসী করে।"

"ওঃ সে ত রাক্ষসদের কথা; তাদের দেশ কোথায় পিসি?" পিসিমা আর সে খবরটি বল্‌তে পার্‌লেন না; "বাড়ীতে কাজ আছে" ব'লে চলে গেলেন। বেচারী সুমতি রাক্ষসদের দেশ কোথায় জান্‌বার জন্যে বিশেষ উৎসুক হ'লেও বকুনী খাবার ভয়ে মাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলে না। ভেবে রাখলে দাদা কাদের ছেলে পড়াতে গেছেন তিনি এলে তাঁর কাছ থেকে জেনে নেবে।

ছয়

কেদারের রুদ্ধদ্বার একটু ঠেলা দিতেই আপনার হৃদয় খুলে দিয়ে প্রবালকে আস্‌তে ইঙ্গিত কর্‌লে ; কিন্তু প্রবাল ঘরে ঢুকে কেদারের পাশে প্রিয়ব্রতাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। দুপুর বেলা যে কেদার আপনার ঘরে একলাটিই বিরহ অবসর যাপন করে আর বউটি শাশুড়ীর কাছে আশ্রয় নেয় তা সে ভাল রকমই জান্‌ত ; তাই সে সরাসর আস্‌তে সাহস করেছিল। প্রিয়ব্রতা প্রবালকে দেখে তখনি উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ঘোম্‌টা তুলে দিয়ে চটপট পালিয়ে গেল। প্রবাল নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছিল তাই চেঁচিয়ে বল্‌লে—"শুধু পালালে হবে না, বৌ-ঠান, কর্ত্তার চাকুরী হচ্ছে, একেবারে 'ইন্‌স্পেকটার-সীপ,'—খাওয়াতে হবে। বিশেষ ক'রে দুর্ম্মুখদের মিষ্টি-মুখ করানোর প্রথা সংসারের চিরন্তন রীতি। নইলে নিন্দেয় কান পাতা যায় না।"

প্রিয়ব্রতা প্রবালকে দেখে ঘোমটা দিলেও আল্‌গোছে ঠাট্টা-তামাসা খুব চালাত। তাই সে পালাতে-পালাতেও একটি ছোট্ট কীল পেছন দিকে তু'লে দেখিয়ে গেল ; যেন বল্‌লে "দুর্ম্মুখদের জন্যে মিষ্টিমুখ নয়—মুষ্টিমুখই হচ্ছে উপযুক্ত ব্যবস্থা।"

প্রবাল হাস্‌তে-হাস্‌তে কেদারকে বল্‌লে "তোর বউএর ভাই কারেজ আছে বটে, এক মুহূর্ত্তে সনাতন রীতিকে ডিঙিয়ে মিষ্টির বদলে মুষ্টির ব্যবস্থা ক'রে দিলে। তা কেদার—দিনের বেলায় মুখোমুখী কর্‌বার পার্‌মিশন কবে থেকে পেলিরে ?"

কেদার হেসে বল্‌লে—"সাবালক হ'য়েও কি নাবালকের নিষেধ মেনে' চল্‌তে হ'বে নাকি ? বই যখন ছাড়লাম তখন বউটির নাগাল ত চাই। তুই যেমন এখনও আইবুড়ো কার্ত্তিক হ'য়ে রইলি।"

প্রবাল কৃত্রিম নিঃশ্বাস ফেলে' বল্‌লে—"আমার সাক্ষাৎ-ভোজন আর কপালে জুট্‌ল না দেখ্‌ছি। ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজনেই তৃপ্ত হ'তে হ'বে। তোদের ভালবাসার যে সুগন্ধ ভুর-ভুর ক'রে বেরুচ্ছে তাতেই আমি খুসী ভাই, তাতেই খুসী।"

কেদার বল্‌লে—"দেবীর-মা যে সম্বন্ধ এনেছেন শুন্‌লাম বেশ ভাল সম্বন্ধ। তোর বাপ-মা সবারই খুব ইচ্ছে, তবে তোরই বা এত অমত কেন ভাই ?"

প্রবাল এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল, এইবার একটু ভাল ক'রে ব'সে বল্‌তে লাগ্‌ল—"না ভাই বিয়ে এখন আমি কিছুতেই কর্‌তে পার্‌ব না। জান্‌ছিস ত শুধু মাষ্টারীতেই আমার দৃষ্টি লেগে নেই। পড়াতে-পড়াতে যাতে পরীক্ষা গুলো দিয়ে ফেল্‌তে পারি তার চেষ্টাও কর্‌ছি ; তারপর যদি অবস্থার কিছু উন্নতি কর্‌তে পারি তখন বিয়ে কর্‌ব। এখন কিছুতেই ওদিকে মন দিতে পার্‌ছিনা। মা বল্‌ছেন বিয়ে ক'রে দেনা শোধ কর। কিন্তু নিজের আয় থেকে সংসার খরচ যদি বারো মাস না চল্‌তে পার্‌ল তাহ'লে আবার সেই দেনা দেনা। তখন কি আবার বিয়ে ক'রে দেনা শোধ কর্‌তে হবে না কি ? না ভাই, শ্বশুরের টাকা নিয়ে ঋণ শোধ ! এযেন ভাবতেও হাসি আসে, পুরুষ হ'য়ে জন্মেছি কি ঘুষ পাবার জন্যে ? শ্বশুরের মেয়েকে ত বিয়ে কর্‌লাম অলঙ্কার বস্ত্র না হয় যৌতুক নিলাম, কিন্তু নগদ টাকা নিয়ে নিজের পৈতৃক ঋণ-শোধ ! এটা একটা হাসি আর লজ্জার ব্যাপার নয় কি ?"

কেদার বল্‌লে—"তোমার মতন অতো খুঁৎ ধ'রে ব্যাপারটা সংসারে কেউ দেখেনা প্রবাল। নগদ টাকাটা যৌতুক ব'লেই ধ'রে নেয়, আর প্রয়োজন মতো নিজেদের কাজে লাগায়। প্রবাল বল্‌লে—"আমারি মতন একদিন সবাই এটাকে হাসির আর লজ্জার ব্যাপার বলেই মেনে নেবে, আর তখন এমন ভাবে পণ নেওয়া সমাজ থেকে উঠেও যাবে।"

কেদার বল্‌লে—"সে সুদূরের কথা, এখন কোন্ ভবিষ্যতের কুক্ষিগত—তা কে জানে ? তোমার আইবুড়ো নাম তা হ'লে এখন তুমি খণ্ডাতে রাজী নও।' দৃঢ়স্বরে প্রবাল বল্‌লে—"মোটেই না—বাড়ীতে বাপ রোগে ধুঁকছে দেনদার ক্রমাগত পাওনার জন্যে উত্ত্যক্ত কর্‌ছে, আর আমি ছুটি—টোপর মাথায় বিয়ে কর্‌তে ! না ভাই ও-সব বাজে দিকে মন দেবার এখন আমার অবসর নেই। এখন তোর কাছে কি বল্‌তে এসেছি তাই শোন। আজকার কাগজে যে রকম পড়লাম তাতে পুলিস বিভাগের অবস্থা বড় জটিল হ'য়ে দাঁড়াবে। কলকাতায় মাণিকতলায়–

বাগানের ব্যাপার ধরা পড়েছে, ছেলে ছোকরারা অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে তা ত জানিসই। সর্‌কার সন্দেহ কর্‌ছেন এখনও অনেকে ধরা পড়বে, আর বেছে বেছে যত বাঙ্গালী-দেরই ডিটেক্‌টিভ আর দারোগা ইন্‌স্পেক্টার এই সব পদে বাহাল কর্‌ছেন। আমি বলি কি, তুই এ চাকরীর ওপর লোভ করিস্‌না, তোদের অন্নের ভাব্‌না ভাবতে হবে না। এরপর বরং অন্য কোনো কাজে লেগে পড়িস্‌।"

কেদার বল্‌লে "আমি ত ভাই, একাজে কিছুই দোষ দেখছিনা; পুলিশের লোকদের একটু দুর্ণাম অছে বটে, কিন্তু শুধু অর্থ আর ঘুষের ওপর লক্ষ্য না রেখে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি নিয়ে যদি আমরা একে-একে এ-লাইনে ঢুক্‌তে পারি হয় ত অল্পকালের মধ্যেই পুলিশ বিভাগের দুর্ণাম দূর হ'য়ে যেতে পারে। ঘুষ অবশ্য মানুষ অনেক সময় অভাব-গ্রস্ত হ'য়ে নিয়ে থাকে। ঈশ্বর-কৃপায় অর্থাভাব যে আমার নেই তা তুমি জান্‌ছ।"

প্রবাল একটু যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে বল্‌লে—"কে জানে ভাই আমার বড় ভাল ঠেক্‌ছে না, তুমি প্রাণের বন্ধু তাই বলছি এ সময়টা যে রকম ধর-পাকড় চারদিকে আরম্ভ হয়েছে কে জানে ব্যাপার কদ্দূর গড়াবে?" বাধা দিয়ে কেদার বলে "আমারপ্রতি তোমার অন্ধ স্নেহই তোমায় মিছে ভাবিয়ে তুলেছে, ব্যাপার আর কদ্দূর গড়াবে কি? গোটা কত মাথা ক্ষ্যাপা বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলে জুটে মাণিকতলায় কি বোমা-বারুদ তুবড়ী ত'য়ের করেছে তাতে কি আর ইংরেজ বাহাদুরের সিংহাসন ভাঙ্‌বে না কেল্লা ফাট্‌বে? সর্‌কার ছেলেগুলোকে ধ'রে এনে দিনকতক খাঁচায় ভ'রে রেখে দিলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" বলা বাহুল্য তখন স্বদেশী হাঙ্গামা সবে সুরু হয়েছে।

প্রবাল কিছু উত্তর দিলে না দেখে কেদার আবার বল্‌লে—"পুলিশে নতুন এপয়েণ্টমেণ্ট দিচ্ছে বেশী-বেশী মাইনে দিয়ে—নইলে আমার মতন কাঁচা লোককে এক কথায় একশ টাকা দেবে কেন? আমার ইচ্ছে ছিল দুই বন্ধুতেই যাই; তা তুই বল্‌ছিস্‌ দেশ ছেড়ে যাবি না। পুরুষ হ'য়ে দেশের মায়া কাটিয়ে চাকরীর খাতিরে বিদেশ যাবি না এ কেমন গোঁ তোর বুঝি না।" প্রবাল বল্‌লে "না বোঝাই তোর মূর্খতা। বাড়ীতে বাবা ঐ রুগ্ন; মা একা—এঁদের ফেলে কোথা যাব আমি? তা ছাড়া পড়ে আর পড়িয়ে আমি যথেষ্ট আনন্দ পাই। নালিশ দাঙ্গা, মারপিট আর তার উল্টো বিচার এ-সব ঝঞ্ঝাট আমি মোটেই সইতে পার্‌ব না। আর আনন্দ যে ভুলেও এ-সবের ত্রিসীমায় পা দেবে না তা আমি খুব বিশ্বাস করি।"

এই সময় রুণ-ঠুন্‌ ক'রে চুড়ি বাজিয়ে ও চাবীর গোছা নেড়ে প্রিয়ব্রতা নিজের আবির্ভাব ঘোষণা কর্‌তেই দুই বন্ধু চেয়ে দেখলে রেকাবী-ভরা মিষ্টি ফল ও ডিবা-ভরা পান এনে প্রিয় টেবিলে রাখছে। কেদার ব'লে উঠ্‌ল, "ঐ দ্যাখ তোর কি রকম মিষ্টি মুখের জোগাড় হ'য়েছে। আচ্ছা ভাই তুই যে এত আনন্দ খুঁজে বেড়াস নতুন বউ-এর নতুন হাতের এই সেবাগুলিতে যে আনন্দ আছে তাকে তুই তবে আমল দিতে চাস না কেন?"

প্রিয় আর একবার ছুটে পালিয়ে গেল। প্রবাল মিষ্টি সুরে গান ধর্‌লে—

"নূতন প্রেমে নূতন বধূ
আগা গোড়া সবই মধু
হুলের খোঁচা কেবল রে ভাই অভাব অনটনে।"

ক্রমশঃ

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায়

অনেকে আমার নিকট ধন-বিজ্ঞানের বাংলা পারিভাষিক শব্দগুলি জানিতে চাহিয়াছেন। আমি আমার প্রবন্ধ-গুলি ও পুস্তকে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি তাহারই কতকগুলি প্রকাশ করিলাম। সবই যে আমার স্বকপোল-কল্পিত তাহা নহে। এই গুলির মধ্যে (১) কতক-গুলি অপর লেখকদিগের উদ্ভাবিত (২) কতকগুলি ব্যবসা-

পাড়ায় চল্‌তি শব্দ একটু আধটু ঘষিয়া মাজিয়া তৈরী করিয়' লওয়া (৩) আর কয়েকটি অবশ্য আমার নিজের সৃষ্টি। এই পারিভাষিক শব্দগুলি সবই যে যথোপযুক্ত হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু উপযুক্ত পরিভাষা নাই বলিয়া ভাব প্রকাশ তো আর বন্ধ রাখা যায় না। মধুর অভাবে গুড়েও তো কাজ চলে। বিভিন্ন লেখক নানা প্রকারে ভাব প্রকাশ করিতে করিতেই উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু লেখক, বণিক, দালাল, হাটুয়া, ব্যাঙ্কার প্রভৃতির সঙ্ঘবদ্ধ আলোচনা ব্যতীত ধন-বিজ্ঞানের উপযুক্ত পরিভাষার সৃষ্টির আশা করা যায় না। কারণ, ধন-বিজ্ঞানের প্রাণ হইল ব্যবসা-পাড়ায়। ব্যবসায়ীদিগকে বাদ দিয়া, অর্থাৎ ব্যবসা-পাড়ায় বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক চল্‌তি শব্দগুলিকে 'একঘরে' করিয়া ধন-বিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি করা শোভন ও সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয় না। আশা করি ধন-বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত ও ব্যবসায়ীগণ এই বিষয় লইয়া 'প্রবাসী'তে আলোচনা সুরু করিবেন।

Economics = ধনবিজ্ঞান।
Economist = ধনবিজ্ঞানবিদ্‌।
Wealth = ধন।
Money = অর্থ।
Coin = মুদ্রা।
Paper money = কাগজের অর্থ।
Metallic monev = ধাতু মুদ্রা।
Exchange = বিনিময়; অদল-বদল।
Exchangeable = বিনিময়সাধ্য।
Capital = মূলধন, পুঁজি।
Production = উৎপত্তি; প্রস্তুতি।
Want = অভাব।
Demand = টান; চাহিদা।
Supply = জোগান; সরবরাহ।
Value = মূল্য; দর।
Price = দাম; পণ।
Commodity = সামগ্রী; পণ্য।
Labourer = শ্রমিক।
Capitalist = ধনিক; মহাজন।
Creditor = মহাজন।
Debtor = খাতক।
Consumption = ভোগ:
Surplus = উদ্বৃত্ত।
Business = বাণিজ্য।
Entrepreneur = কর্ম্মকর্ত্তা; ধুরন্ধর।
Right = স্বত্ব।
Interest = সুদ।
Raw material = কাঁচামাল; ভুয়িমাল।
Sale = কাটতি; বিক্রয়।
Purchase = খরিদ; ক্রয়।
Export = রপ্তানী।
Import—আমদানি।
Customer / Purchaser } —খরিদ্দার, গ্রাহক।
Average—গড়পড়তা।
Monopoly—একচেটিয়া।
Free trade—অবাধ বাণিজ্য।
Protection—সংরক্ষণ।
Cost—খরচ; খরচা।
Loss—লোকসান।
Trader—ব্যবসায়ী; সওদাগর।
Wage—মজুরী; বেতন।
Skilled labour—নিপুণ শ্রম।
Risk—ঝুঁকি।
Law of diminishing return—ক্রমিক আয়হ্রাসের নিয়ম।
Internal trade—অন্তর্বাণিজ্য।
External trade—বহির্বাণিজ্য।
International trade—আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য।
Baster—জিনিষের বদলে জিনিষের বিনিময়; সামগ্রী বিনিময়; জিনিষের অদল-বদল; প্রতিপণ।
Medium of Exchange—বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তী।
Representative paper money—গচ্ছিত অর্থের নিদর্শনপত্র।
Fiduciary paper money—প্রতিজ্ঞাসম্বলিত কাগজের অর্থ।
Conventional paper money—অপরিশোধনীয় কাগজের অর্থ।

Bimetallism—দ্বিধাতু পারিমাণ।
Standard coin—আদর্শ মুদ্রা।
Token coin—নিদর্শক মুদ্রা।
Legal tender money—চলত সিক্কা।
Unlimited tender—আম্‌হুকুম।
Depreciated—হতাদর।
Quantity theory of money—অর্থের পরিমাণবাদ।
Credit—পসার; বাজার-সম্রম।
Bank—ব্যাঙ্ক।
Cheque—চেক্‌।
Deposit—আমানত।
Endorse—পৃষ্ঠে দস্তখত।
Bill of Exchange—মূল্যপত্র, আদেশপত্র, বিদেশীমুদ্দতি হুণ্ডি, বরাত চিঠি।
Payee—প্রাপক।
Drawee—দায়ক।
Bill on demand—দর্শনী হুণ্ডি।
Accept (a bill)—সাকরিয়া দেওয়া।
Establishment—সরঞ্জামী খরচ।
Carrying charge—বহনী খরচ।

Money in circulation—চলতি টাকা।
Change in money market—টাকার বাজারে ওলটপালট।
Rate of exchange—বিনিময় হার।
To compete—টক্কর দেওয়া।
Flexibility—আকুঞ্চন-প্রসারণ।
Index numbur—সূচক সংখ্যা।
Counterfoil—মুরি চেক্ (?)
Rise and fall—তেজীমন্দা।
To speculate—ফাটকা খেলা।
Speculation—ফাটকাবাজী।

"উর্ব্বশী"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপাতীত যে সৌন্দর্য্য তাকে উপলব্ধি করা যায়, উপভোগ করা যায় না। এই কথাই শেলী তাঁর Hymn to Intellectual Beauty—অনুভব-বেদ্য সৌন্দর্য্য-বন্দনা নামক কবিতায় বলেছেন

Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form, where art thou gone?

ওগো সৌন্দর্য্যের লক্ষ্মী, আপন প্রভাতে
মণ্ডিত করো গো তুমি মহামহিমাতে
মানবের রূপ রাগ যা-কিছু সুন্দর।
কোথায় রয়েছো তুমি ওগো মনোহর ?

ব্রাউনিঙের প্যারাসেল্‌সাস্ প্রথমে বিষম বস্তুতান্ত্রিক লোক ছিলেন, তিনি চান প্রয়োজন-সাধন বস্তু মাত্র, বস্তু-ব্যতিরিক্ত সৌন্দর্য্য উপাসনা কর্‌বার লোক তিনি নন; তাই তিনি বল্‌ছেন—

I cannot feed on beauty for the sake
Of Beauty only, nor can drink in balm
From lovely objects for their loveliness.

আমি কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের জন্যই সৌন্দর্য্যের উপাসনা করে' তৃপ্ত থাক্‌তে পারি না; সুন্দর বস্তু সুন্দর বলে'ই আমি তাকে নিয়ে তুষ্ট হই না।

এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অন্তর্গূঢ় ভাবটি সকল দেশেই অতি আদিমকাল থেকে ধরা পড়েছিলো এবং সকল দেশের পুরাণে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট crude উপাখ্যানে এটিকে ব্যক্ত কর্‌বার চেষ্টা দেখা যায়।

প্রাচীন ইজিপ্টে এক দেবতা ছিলেন অসিরিস; তিনি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র, ইসিস্ বা চন্দ্রকলার ভ্রাতা ও স্বামী, এবং হোরা বা মহাকালের পিতা। এই দেবতা চৌদ্দ ভুবনে বিভক্ত হয়ে একবার মরেন আবার প্রিয়ার প্রেম-মন্ত্রে জীবন লাভ করেন। এই অসিরিস অনন্তপ্রাণ ও চিরন্তন সৌন্দর্য্যের দেবতা।

সিরিয়া, লিডিয়া, ফ্রিজিয়া ও ফিনিসিয়া দেশে এক দেবতা ছিলেন অতীশ (Attis)। তিনিও পর্য্যায়ক্রমে মরেন বাঁচেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকেন।

এই দেবতা রোম ও গ্রীসে গিয়ে নাম ধরেছিলেন এডোনিস। ইনি অ্যাফ্রোদিতে বা ভিনাস নাম্নী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর প্রেমাস্পদ, নিজেও অপরূপ সুন্দর; তাঁর দেহের রক্তবিন্দু ফুল হয়ে ফোটে। অ্যাফ্রোদিতে আকাশ ও সাগরের কন্যা, কিউপিড বা প্রেম-দেবতার মাতা; এডোনিসের অনুরাগে অ্যাফ্রোদিতে স্বর্গ ছেড়ে বনবাসিনী হয়েছিলেন। এডোনিসের অপঘাতে মৃত্যু হ'লে অ্যাফ্রোদিতে এত বিরহব্যাকুলা হয়েছিলেন যে, যমপুরী এডোনিসকে বন্দী করে' রাখ্‌তে পারেনি। কিন্তু যমের প্রেয়সী পার্সিফোনিও এডোনিসের প্রেমে এমন আসক্ত হয়েছিলেন যে, পৃথিবীর ও যমপুরীর দুই প্রিয়ার কাছেই এডোনিসকে পালা করে' থাক্‌তে হয়। তাই পৃথিবীতে ঋতুপর্য্যায় ঘটে, তাই সকল সৌন্দর্য্য মরে' আবার বাঁচে, ধরা দিতে দিতে পালায়।

গ্রীক্ পুরাণে আর একটি বনদেবতা আছেন প্যান। তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও প্রাণ-স্বরূপ, পরমানন্দপূর্ণ।

প্লুটার্ক একটি প্রবাদের উল্লেখ করে' গেছেন যে যখন যিশুখৃষ্টের জন্ম হয় তখন দৈববাণী হয় যে "প্যান মারা গেছেন"। ঐ প্যান্ স্বর্গে মরে' গিয়ে মর্ত্ত্যে প্রাণ পেয়েছিলেন সকলকে প্রাণ দান কর্‌বার জন্যে। এই প্রবাদটি অবলম্বন করে' জার্ম্মান কবি শীলার "গ্যোট্টের গ্রীশেন-লাণ্ট্‌স্" গ্রীস দেশের দেবতা নামক কবিতায় আক্ষেপ করে' বলেছেন সে এককাল ছিলো যখন দেবতারা মূর্ত্তি ধরে' মর্ত্ত্যে এসে মানবের সঙ্গে দেখা কর্‌তেন, মানবকে সাহায্য কর্‌তেন; কিন্তু এই কলিকালে দেবতারা সব উবে গেছেন—

Beauteous world ! where art thou gone ? Oh thou,
Nature's blooming youth, return once more !

হে সৌন্দর্য্যলোক! তুমি কোথায় হারিয়ে গেছো?
ওগো তুমি প্রকৃতির নবযৌবন, আবার তুমি ফিরে এসো।

কিন্তু কিছুই চিরন্তন নয়, আবার কিছুই চিরকালের জন্য হারায় না; প্রকৃতি নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীলা সে মর্‌বার জন্য বাঁচে এবং বাঁচবার জন্যই মরে—

That to-morrow she herself may free
She prepares her sepulchre to-day.
All that is to live in endless song
Must in life-time first be drowned.

আগামী কল্য রূপের বন্ধন হতে মুক্তি লাভের জন্য প্রকৃতি-দেবী আজ নিজে নিজের চিতা রচনা করেন; অনন্ত মাধুর্য্যে বিদ্যমান থাক্‌বার জন্য প্রত্যেক বস্তুকেই তার বর্ত্তমান রূপে বিদ্যমানতাকেই প্রথমে নষ্ট কর্‌তে হয়।

মিল্টন প্যানের মৃত্যুর প্রবাদের উল্লেখ করে' লিখেছেন—

Full little thought they than
That the mighty Pan
Was kindly come to live with them below.

তারা জান্‌তে পারেনি যে মহান্ প্যান্ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন যিশুরূপে।

শীলারের কবিতা পাঠ করে' এলিজ্যাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং দুটি কবিতা লেখেন—

The Dead Pan এবং A Lament for Adonis.

শেষোক্ত কবিতাটি গ্রীক্ থেকে অনুবাদ; এই কবিতায় অ্যাফ্রোদিতে বিলাপ করে' বল্‌ছেন—

Thou fliest me, mournful one, fliest me far
My Adonis.

সম্ভোগ-স্বরূপিনী অ্যাফ্রোদিতে সৌন্দর্য্যস্বরূপ এডোনিস্‌কে নিজের কাছে ধরে' রাখ্‌তে চেয়েছিলেন; কিন্তু পারেননি; তাই তাঁর বিলাপ—

I mourn for Adonis—the Loves are lamenting,
He lies on the hills, in his beauty and death.

যখন এডোনিস কাছে ছিলো তখন অ্যাফ্রোদিতেও সুন্দর ছিলো, কিন্তু কেবল সম্ভোগের মূর্ত্তি অতি কুৎসিত—

When he lived she was fair, by the whole
worlds consenting
Whose fairness is dead with him ! Woe worth
the while.

পারস্য সুফী কবিগণ—হাফিজ, শম্‌স্-ই-তাব্রিজ, রুমী, নিজামী, আত্তার প্রভৃতি সকলেই বারম্বার বলেছেন সকল-সুন্দর ভগবানের সৌন্দর্য্যপ্রভায় নিখিলবিশ্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, এবং সমস্ত খণ্ড সৌন্দর্য্যের শেষ পরিণতি ও পরিসমাপ্তি সেই বিরাট অসীম সৌন্দর্য্যসাগরে। ওমর খায়য়াম বিশেষ করে' দেখিয়েছেন যে, সৌন্দর্য্য চিরচঞ্চল, যা এখন একস্থানে একটি রূপে আবদ্ধ হয়ে আছে তা পরক্ষণে রূপান্তর পরিগ্রহ কর্‌ছে—বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে—

গুল্ গুফ্‌ৎ দস্‌ৎ-ই জর্ ফিশান্ আওর্‌দম্,
খন্দাঁ খন্দাঁ সর্ বজহান্ আওর্‌দম্,
বন্দ আজ সর্-ই কিসা বর গিরিফ্‌তম্ রফ্‌তম্;
হর নক্‌দ্ কে বুদ দর্ মিয়ান্ আওর্‌দম্।

গোলাপ কহিল—আনিয়াছি আমি এ সোনা-ছড়ানো হাতে,
হাসিয়া হাসিয়া ছড়াই স্বর্ণ সারা জগতের মাথে;
স্বর্ণ-থলির মুখ-বন্ধন খুলিয়া যেমন মেলি,
নগদ পুঁজি যা সকলি বিলায়ে নিজেরে হারায়ে ফেলি।

আঁ মাহ্ কে কাবিল্ সবর হাস্‌ৎ বজাৎ
গাহা হায়ওয়ান্ শবদ ও গাহ্ নবাৎ,
তা তন্ নব্‌রী কে নিস্‌ৎ গর্‌দদ্ হায়হাৎ,
মু স্তফ্ বজাতস্‌ৎ আগর্ নিস্‌ৎ সিফাৎ।

ঐ যে চন্দ্র চেহারা বদলে স্বভাবতঃ ওস্তাদ—
কখনো ধরে সে জন্তুর রূপ কখনো বস্তুজাত,
ভেবো না কখনো হইবে ইহার একেবারে তিরোধান,—
রূপ খোয়ালেও ভাবের ভিতরে থাকে সে বিদ্যমান।

হর্ জা কে গুলী ও লালাহ্ জারী বুদস্‌ৎ
আজ্ সুর্‌খী খুন্-ই শহর্‌ইয়ারী বুদস্‌ৎ ;
হর্ শাখ্-ই বনক্‌শা কজ্ জমীন্ মী-রবীদ,
খালীস্‌ৎ কে বর্ রুখ্-ই নিগারী বুদস্‌ৎ।

যেখানে যেখানে গোলাপ অথবা
লাল ফুল ফুটে হাসে,
নগর-বন্ধু রাজার রক্ত
ফুল-রূপ ধরে' আসে ;
জমীর বুকেতে শাখায় শাখায়
ফুটে গো অপরাজিতা,
তিলরূপে তারে রেখেছিলো গালে
রূপসী অপরিচিতা।

হর্ সব্‌জাহ্ কে দর্ কিনার্-ই জুয়ী রুস্‌তস্‌ৎ,
গুয়ী কে লব্-ই ফিরিশ্‌তাহ্ খুয়ী রুস্‌তস্‌ৎ ;
হাঁ বর সর্-ই সব্‌জাহ্ পা বখ্‌বারী ননহী
কাঁ সব্‌জাহ্ জে খাক্-ই লালাহ্-রুয়ী রুস্‌তস্‌ৎ।

স্রোতস্বতীর কিনারে কিনারে
যা কিছু সবুজ দেখিবে তুমি,
জেনে রেখো তাহা হয় তো এসেছে
পরীতুল্যার অধর চুমি ;
খবরদার রে, অবহেলা-ভরে
ফেলো না ফেলো না সবুজে পা,
রূপান্তরিত হয়েছে সবুজে
ডালিম-ফুলী সে যাহার গা।

ইঁ কুজাহ্ চু মন্ আ'শিক জারী বুদস্‌ৎ,
ও আন্দর্ তলব্ রুয়ী নিগারী বুদস্‌ৎ ;
ইঁ দস্‌তা কে দর্ গর্‌দন্-ই উ মী-বিনী,
দস্‌তীস্‌ৎ কে দর্ গর্‌দন্-ই ইয়ারী বুদস্‌ৎ।

এই যে কুঁজাটি, আমারি মতন
আছিল বিরহী প্রেমিক বুঝি,
দর্শনীয়ার ছবি হেন মুখ
দেখিতে পিয়াসী বেড়াতো খুঁজি ;
এই যে হাতল ইহার গলায়
লগ্ন রয়েছে দেখিছো তায়,
একদা ছিল এ হস্ত কোমল
প্রিয়ার কণ্ঠে লগ্ন হায় !

ওমর খায়াম সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে যে নিশাপুর-রূপসী শিরিন্ তাঁর প্রণয়িনী ছিলেন ; তিনি রাত্রির গোপনতার বোর্‌কা ঢাকা দিয়ে প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় অভিসারে চলেছিলেন ; পথে সুলতানের চরেরা তাঁকে হরণ করে' নিয়ে গিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে বন্দী করে। বিরহবিধুর ওমর একদিন একটি ছিন্ন গোলাপ-ফুলের মধ্যে আপনার প্রেয়সীকে দেখতে পেয়ে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন।

পারস্য সাহিত্যে য়ুসুফ-জুলেখা শিরিঁ-ফর্‌হাদ ও লয়লা-মজ্‌নু প্রভৃতির প্রেমাগ্রতা নিয়ে বহু কাব্য রচিত হয়েছে ; ফিরদৌসী নিজামী জামী এই প্রেম-আখ্যায়িকা লিখে যশস্বী হয়েছেন। ঐ প্রেমিক প্রেমিকারা প্রিয়বিরহে তন্ময় হয়ে সর্ব্বত্র প্রিয়ের মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি দেখেছেন। বিশেষ করে' জামী তাঁর কাব্যে এই ভাবটিকে চমৎকার রকমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুন্দরী জুলেখা সর্ব্বসৌন্দর্য্যস্বরূপ য়ুসুফকে স্বপ্নে দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হলো। এই য়ুসুফ যে কে ও কোথায় থাকে তা জান্‌তে না পেরে জুলেখা প্রণয়াবেগে উন্মত্তবৎ হয়ে পড়্‌লো। তৃতীয় স্বপ্নে তাকে য়ুসুফ দেখা দিয়ে বল্‌লে যে মিশর দেশের উজীরকে বরণ কর্‌লে আমাকে পাবে। জুলেখা উজীরকে বিবাহ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়ে সকল দেশের রাজা ও রাজপুত্রদের পাণিপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কর্‌লে ; এবং ধাত্রীর দ্বারা পিতাকে নিজের মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করালে। জুলেখার পিতা মিশর দেশের উজীরের কাছে ঘটক পাঠালেন। উজীর রাজকন্যা জুলেখাকে বিবাহ করতে সম্মত হলেন, কিন্তু নিজে প্রভুকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বিবাহ কর্‌তে যেতে পার্‌লেন না, জুলেখাকেই মিশরে আন্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন।

জুলেখার সঙ্গে উজীরের বিবাহ হয়ে গেলো। শুভ-দৃষ্টির সময় জুলেখা দেখে শিউরে উঠ্‌লো—এ উজীর তো তার স্বপ্নদৃষ্ট সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি নয় ! জুলেখা মনকে বোঝালে যে, আদর্শকে তো কখনো পাওয়া যায় না, আদর্শের প্রতিভাস নিয়েই জীবন যাপন কর্‌তে হয়। (এই রকম চিন্তা করে' থিওফিল্ গ্যতিয়ে বিরচিত মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোপ্যা উপন্যাসের নায়ক সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছিলো।) জুলেখা চেয়েছিলো য়ুসুফকে, কিন্তু পেলে উজীরকে।

জুলেখা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সুন্দরকে পেতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলো ; কিন্তু সুন্দর য়ুসুফ আবাল্য ক্রীতদাস। সে শৈশবে মাতৃহীন হয়েছিলো ; তার পিতা য়ুসুফের মাসীর কাছে পুত্রকে প্রতিপালনের জন্য রেখে দেন। য়ুসুফ বড়ো হলে তার পিতা পুত্রকে ফিরে চান। তখন য়ুসুফের মাসী য়ুসুফের অজ্ঞাতে তার কোমরে একটি রত্নহার পরিয়ে দিয়ে য়ুসুফকে চোর বলে' অভিযুক্ত করেন এবং

দেশের আইন অনুসারে চোরের উপর প্রভুত্ব লাভ করে' যুসুফকে স্নেহের ক্রীতদাস করে' নিজের কাছে রাখেন। মাসীর মৃত্যুর পর যুসুফ পিতার কাছে আসে। কিন্তু তার ভাইএরা ঈর্ষান্বিত হয়ে যুসুফকে এক মরুভূমির মধ্যে শুষ্ক কূপের ভিতর ফেলে দেয়। দাসবণিকেরা তাকে উদ্ধার করে' মিশর দেশে তাকে বেচতে নিয়ে যায়।

মিশর রাজ্যে যুসুফের সৌন্দর্য্যের জনরব ছড়িয়ে পড়লো। রাজা সুন্দরকে দাস-রূপে ক্রয় করতে চাইলেন।

যুসুফের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনে জুলেখা গোপনে তাকে দেখেই তো চিনতে পারলে এই সেই তার স্বপ্নদৃষ্ট মনোহরণ!

> জমালী দীদ্ বেশ্ আজ্ হদ্-ই ইদ্‌রাক্।
> চু জাঁ জ আলুদ্‌গী আব্ ও গিল্ পাক্॥
> দেখ্‌লে সে রূপ চমৎকারী অতীন্দ্রিয় অতীত ধারণার—
> যেমন জীবের আত্মা পূত কাদা-জলের কলুষতার পার॥

জুলেখা উজীরকে দিয়ে রাজার অনুমতি নিয়ে যুসুফকে দাসরূপে ক্রয় করলে।

জুলেখা মনে করলে সুন্দরকে যখন আমি দাস-রূপে পেয়েছি তখন তাকে আমার পাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু দাসের দেহই বিক্রীত হয়, তার চিত্ত তো স্বাধীন থাকে। যুসুফ সৌন্দর্য্যস্বরূপ, জুলেখা ভোগাকাঙ্ক্ষা; জুলেখা যুসুফকে ভোগ্য রূপে চায়, আর যুসুফ পালায়,— ভোগাকাঙ্ক্ষায় সৌন্দর্য্য ক্লিষ্ট হয়।

> ঘম্ চীজে রগ্ জাঁ রা খরাশদ্।
> কে গাহী বাশদ্ ও গাহী ন-বাশদ্॥
> এই তো রে দুখ প্রাণকে যেনো কাঁটার ঘায়ে জ্বালায়—
> রূপরঙ্গ এই রয়েছে, পলক ফেল্‌তে পালায়।

জুলেখা স্বামী উজীরের কাছে যুসুফের নামে মিথ্যা অপবাদের অভিযোগ করে' যুসুফকে বন্দী করলে। যে ছিলো দাস সে হলো কারাগারে বন্দী। জুলেখা নিত্য রাত্রে কারাগারে গিয়ে বন্দীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করে, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু সেই হতাশার দুঃখের মধ্যেও তার এই সান্ত্বনা যে সে তার মনোহরণকে চোখে তো দেখে আসছে।

জুলেখার মিথ্যা অভিযোগ ধরা পড়ে' গেলো। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে উজীরকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করলেন; যুসুফকে মুক্তি দিয়ে উজীরী দিলেন।

জুলেখা বিধবা হলো; এখন দারিদ্র্য, দুঃখ তার অনুচর। বৈধব্যের দুঃখ প্রিয়বিরহের দুঃখ ও নিজের আচরণের অনুতাপ ও লজ্জা তাকে পীড়া দিতে লাগলো। (রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের সুদর্শনাও অন্ধকার ঘরের রাজা ভ্রমে সুবর্ণকে বরণ করে' এম্‌নি অনুতাপ ও লজ্জা ভোগ করেছিলেন।)

জুলেখা পথের ধারে পর্ণকুটীর বেঁধে বাস করছে, যদি কোনো দিন এই পথ দিয়ে মনোহরণ যুসুফ যায় তো সে শুধু তাকে একবার দেখে নয়ন সার্থক করবে। সে পথিক মাত্রকেই নিজের কুটীরে আহ্বান করে' আতিথ্যসেবা করে কি জানি তারই মধ্যে যদি তার যুসুফ ছদ্মবেশে এসে থাকে।

জুলেখা শোকে একেবারে নীল হয়ে উঠলো—মিশরের শোক-প্রকাশক বস্ত্র নীল রঙের। জুলেখা বিরহে শোকে বিগত-যৌবনা শ্রীহীনা জীর্ণা শীর্ণা হয়ে গেলো। কাঁদতে কাঁদতে শেষে অন্ধ হলো।

এই দুঃখের তপস্যায় জুলেখার মিশর দেশী নীল শোক-বাস ভারতবর্ষীয় শুভ্র শোকবাসে পরিণত হলো—অর্থাৎ জুলেখার চিত্তের ভোগবাসনার কলুষ দূর হয়ে তার অন্তর শুচি নির্ম্মল শুভ্র হয়ে উঠলো।

তখন একদিন এই পথের ধূলার পরে অন্ধতার অন্ধকারে যুসুফের সঙ্গে তার মিলন ঘটলো। (এম্‌নি মিলন ঘটেছিলো অন্ধকার ঘরের রাজার সঙ্গে সুদর্শনার। পার্ব্বতী যখন মদনকে সহায় করে' শিবকে পেতে চেয়েছিলেন তখন তিনি প্রত্যাখ্যানের দুঃখই পেয়েছিলেন শেষে তপস্যার দ্বারা শিবকে উপযাচক রূপে আকর্ষণ করেছিলেন। শকুন্তলাও যখন ভোগাকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাজাকে পেতে চেয়েছিলেন তখন প্রত্যাখ্যানের অপমানই পেয়েছিলেন, কিন্তু তপস্যার পরে অনুতপ্ত রাজাকে চরণতল থেকে তুলে নিয়েছিলেন।)

এই আখ্যায়িকাটিকে সুফী ভক্তগণ ভগবান ও ভক্তের মিলনের রূপক রূপে ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু সে ব্যাখ্যা জানবার প্রয়োজন এখন আমাদের নেই।

এই কাব্যের মধ্যে বস্তুনিরপেক্ষ absolute abstract সৌন্দর্য্যের একটি চমৎকার বন্দনা আছে। কবি জামী সেই কেবলা শ্রীকে স্তুতি করে' বলেছেন—

স্থষ্টির অস্তিত্ব যবে ছিলো
নাস্তিত্ব-মগন চিহ্নহীন,
অব্যক্তের কুঞ্জগৃহে ধরা
আত্মহারা অস্ফুট বিলীন,
এক মাত্র ছিলো সত্তা তবে—
দ্বিত্বের সম্পর্ক হতে দূরে ;
আমি ও তুমির কোনো ভেদ
ছিলো নাকো বচনেরে জুড়ে ;
কেবল-সৌন্দর্য্য তবে নাহি
ছিলো বন্দী বস্তু-কারাগারে,
স্বকীয় প্রভায় ছিলো সেই
প্রভাস্বর করি আপনারে ॥

একা সেই মনোরমা প্রিয়া
অদৃশ্যের যবনিকা-আড়ে,
পবিত্র সারাৎসার তারে
পারে নাই খুঁৎ স্পর্শিবারে ॥

আয়নার মাঝে কভু তার
মুখচ্ছবি বন্দী নাহি হয়।
চিরুণীর হস্ত সহ তার
কুন্তলের নাহি পরিচয়।
প্রভাত-সমীর কভু তার
চূর্ণালক করেনি হরণ।
কজ্জলের কালিমারে কভু
তার চোখ করেনি বরণ ॥
পুষ্প। মঞ্জরী সম কেশ
পুষ্পোদ্যান মুখের পড়শী
হয় নাই। হরিতেরে তবে
বিঁধে নাই পুষ্পের বঁড়শী ॥
গাল দুটি অকলঙ্ক সাদা
তিলচিহ্ন-বর্জ্জিত নিখুঁৎ,
কারো দৃষ্টি লাগিয়া অমল
রূপ তার হয় নাই ছুৎ ॥
গাহিত সে প্রাণহরা গান
আপনার স্তুতি বিরচিয়া।
একাকিনী নিজের সহিত
খেলে জুয়া প্রেম-পাশা নিয়া ॥

অপরূপ স্বপ্রকাশ সেই
সুন্দরের প্রকৃতি এমন—
চাহে না থাকিতে কভু সে তো
যবনিকা-আড়ালে গোপন,—
সুন্দর সহিতে নাহি পারে
অবরোধ ক্লেশ এতটুকু,—
কপাট থাকিলে রুদ্ধ কভু,
জানালায় দেখায় সে মুখ ॥

পর্ব্বত-নিবাসী ফুলকলি
শিলাতলে রহিলে গোপন,
আনন্দিত বসন্তের সাড়া
প্রাণপুরে পায় সে যেমন,
অমনি বিকশি' উঠে হাসি'
পাপ্‌ড়ি বিদীর্ণ করি দিয়া—
জগতেরে সৌন্দর্য্য বিলায়
মুক্ত করি অবরুদ্ধ হিয়া ॥
তোমার মনের মাঝে যবে
হেন ভাব হয় সমুদিত—
সদ্ভাবের মালার নরীতে
সুদুর্লভ রত্ন সে গ্রথিত,
তারে তুমি চিন্তারাজ্য হতে
পারিবে না নির্ব্বাসন দিতে,—
বাক্যে বা লেখায় হবে তারে
কোনো রূপে প্রকাশ করিতে ;
তেমনি সৌন্দর্য্য যেথা থাকে
সেথা তার তাগাদা অপার—
অনাদি সৌন্দর্য্যখনি হতে
এ ব্যগ্রতা হয়েছে প্রচার।
কালের শিবির হতে সে যে
পবিত্র মুর্ত্তিতে দেয় বার,
চারিদিকে সর্ব্ব জীবে জড়ে
প্রস্ফুরিত হয় জ্যোতি তার ॥
স্থষ্টি আর অপ্সরাব 'পরে
তার এক জ্যোতিশিখা স্ফুরে ;
অপ্সরারা আকাশের মতো
মত্ত হলো, মাথা গেলো ঘুরে ॥
আয়নার আদর্শ করিয়া
প্রকাশে সে শ্রীমুখ আপন ;
স্থান কাল ব্যাকুল হইয়া
মাগে তার সহ আলাপন ॥

বন্দনায় ব্রতী হলো যতো
অপ্সরী কিন্নরী দেবনারী,
আত্মহারা হয়ে তারা হলো
পূত শ্রীর সন্ধান-ভিখারী ॥

বিরাট্ সাগর সমতুল
আকাশের ডুবারী অপ্সরা
গাহিয়া উঠিলো—জয় জয়
জয় জয় বিশ্বমনোহরা।
জগতের অণু-পরমাণু
করিলো সে আয়না আপন,
প্রতিটির উপরে নিজের
প্রতিচ্ছায়া করিলো ক্ষেপণ ॥

সেই রূপ-শিখা হতে ছুটি
রশ্মি এক ফুলে শোভা দিলো ;
ফুল হতে একটি কিরণ
বুল্‌-বুল্-হৃদয় বিঁধিলো ॥

মোম-বাতি নিজ কালামুখ
　　করিলো প্রদীপ্ত তার রূপে ;
গৃহে গৃহে পতঙ্গ হাজার
　　সেই রূপে ঝাঁপ দেয় চুপে ॥
তারি রূপ-কিরণ-সম্পাতে
　　হলো সূর্য্য মহাজ্যোতিষ্মান।
নীলোৎপল জল ছাড়ি' উঠে
　　তারি রূপে করিবারে স্নান ॥
তারি মুখ আদর্শ করিয়া
　　লয়লী গড়িলো নিজ মুখ ;
চরণ-রেণুর লাগি' তার
　　মজ্‌নু যে প্রমত্ত উৎসুক।
শিরীঁর অধরে মধুধারা
　　সেই তো করিলো বরিষণ ;
পবিত্রের মন করে চুরি—
　　ফর্হাদের জীবন হরণ ॥
তার রূপ বিতত বিছানো
　　সকল বস্তুতে সব স্থানে ;
ধরার প্রেমিক যত সব
　　ফিরে সদা তাহারি সন্ধানে ॥
য়ুসুফ কনান্‌দেশ-শশী
　　রূপবান্ রূপ পেয়ে তার ;
সেই করে জুলেখার প্রাণে
　　সর্ব্বনাশা প্রণয় সঞ্চার ॥
আবরণ যতো কিছু আছে
　　সকলের সেই আবরক।
হৃদয়হারিত্ব যেথা যাহা
　　সকলের সেই প্রণোদক ॥
ওরি প্রেম লাভ করি আহা
　　হৃদয়ের জীবন সফল ;
তাহার আগ্রহ করি লাভ
　　কৃতার্থ যে প্রাণের সম্বল ॥
প্রতিটি হৃদয় করে যেই
　　রূপ ও প্রেমের উপাসনা,
সে হৃদয় তারেই যাচিছে—
　　জানো তুমি অথবা জানো না ॥
সাবধান ! ভ্রম করিয়ো না—
　　বলো তুমি ইহাই এখন—
প্রণয়ের আমি, আর সেই
　　সৌন্দর্য্যের মূল প্রস্রবণ ॥
তুমি শুধু আয়না রূপের,
　　সে-ই শোভা আয়নার মাঝে।
তুমি গুপ্ত তুচ্ছ অপ্রকাশ,
　　সুব্যক্ত সে এ বিশ্ব-সমাজে ॥
এমন মধুর সুধাধনি
　　প্রশংসিত উত্তম প্রণয়
তা থেকে নির্গত হয়ে পুনঃ
　　তাহাতেই হয় গো বিলয় ॥
ভেবে দেখো, বুঝিতে পারিবে—
　　সেই তো আয়না আপনার ;
অমূল্য সম্পদ শুধু নয়,
　　সেই সব ধনের ভাণ্ডার ॥
তুমি আর আমি দুজনায়
　　কাজ বলে' মরীচিকা খুজি,—
নিরর্থক চিন্তা মাত্র শুধু
　　আমাদের দুজনার পুঁজি ॥
অতএব চুপ দাও ভাই,
　　অন্তহীন দীর্ঘ এ কাহিনী—
হেনো বাক্যবাগীশ কোথায়
　　বর্ণিবে যে সে বরবর্ণিনী ॥
এই ভালো এই শ্রেয় প্রেয়
　　তার প্রেমে ঘুরপাক খাই ;
এ ছাড়া অপর কথা মিছা
　　তুচ্ছ অতিতুচ্ছ ভস্ম ছাই॥

বায়োলজি বা জীববিদ্যার দিক্ দিয়েও এই তত্ত্বের যাথার্থ্য বিচার করা যায়। জীবদের মধ্যে সৌন্দর্য্য-স্বরূপিনী হচ্ছে স্ত্রী, মানুষের চক্ষে মানবী "সৃষ্টির্ আদ্যেব ধাতুঃ" বিধাতার প্রথম সৃষ্টি, "চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগাঃ" বিধাতা আগে ছবি এঁকে পরে তাতে জীবন সঞ্চার করে' নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন "একস্থ সৌন্দর্য্যাদি দৃক্ষয়েব" সব সৌন্দর্য্য একটি আধারে রেখে দেখ্‌বার জন্যে; রবীন্দ্রনাথ নারী-রহস্য বিশ্লেষণ করে' বলেছেন—

> যে ভাবে রমণী-রূপে আপন মাধুরী
> আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
> যে ভাবে সুন্দর তিনি বিশ্বচরাচরে,
> যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,—
>
> *　　*　　*　　*
>
> হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
> চিত্ত ভরি' দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

এরূপ নারী-বন্দনা সকল দেশের ও কালের কবিরা করে' গেছেন। বঙ্কিম-বাবুর কমলাকান্ত-রূপী মানুষের চোখে ইতর জীবের স্ত্রীজাতি পুরুষের তুলনায় অসুন্দর হলেও পুরুষের সব সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য ঐ স্ত্রীর মনোহরণের চেষ্টাতেই। এই স্ত্রী বাস্তবিকই জীবজগতে "সৃষ্টির্ আদ্যেব ধাতুঃ" বিধাতার প্রথম সৃষ্টি ; স্ত্রী-জীবের আদর্শে বহু পরে পুরুষ-জীবের সৃষ্টি হয়।—

"The male was created at a comparatively late period in the history of organic life, but soon began to assume more or less the form and character of the primary organism, which is then

called the female. This is called the Gynœcocentric theory of the biological development of the male."—

(Text book of Sociology by Deaby and Ward.)

সৃষ্টির আদিম স্ত্রী-জীবকে সম্বোধন করে' বলা যেতে পারে—"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী!

এই স্ত্রীরূপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, এই Spirit of Beauty, Spirit of Nature, Loveliness of lovely objects. হচ্ছে উষসী উর্ব্বশী।—

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী!

এই উর্ব্বশীর আভাস আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্ররূপে পাই—

সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী!
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা!

এই উর্ব্বশীকে পাওয়ার চেষ্টাই জগৎব্যাপারের চিরন্তন সমস্যা; বিশ্বপ্রকৃতি সেই অ-ধর উর্ব্বশীকে ধরতে না পেরে ক্রন্দসী হয়ে আছে—

"জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।"
"ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী,
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশী!"

একদিন কোনো এক শুভলগ্নে প্রকৃতির প্রাণস্বরূপিনী সৌন্দর্য্যময়ী উর্ব্বশী মূর্ত্তি ধারণ করে' জীব-রূপী প্রত্যেক পুরুরবাকে কৃতার্থ করে, আবার অকস্মাৎ একদিন সেই মূর্ত্ত সৌন্দর্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হয়ে যায়—যে এক সময়ে একটি বিশেষ স্থান কাল ও রূপকে আশ্রয় করে' সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, সেই পরক্ষণে অসীমে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন পুরুরবার প্রাণে জেগে থাকে কেবল অন্ত-বিহীন আশা আর শ্রান্তিবিহীন অন্বেষণ, আর তার অন্তর হাহাকার করে' বল্‌তে থাকে—

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।

* * * *

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অগ্নি অবন্ধনে!

সনেট

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি চ'লে গেলেও তো থাকিবে সংসার।
পাখীরা গাহিবে গান আজিকার মতো।
ফুল ফোটা, ফুল ঝরা, নিত্য লীলা যত
সবি রবে অনাহত প্রকৃতি মাতার।
শুধু আমি যাব চ'লে। আমারি মতন
কত আসিবে তরুণ। তরুণীর মুখে
চাহি ঝঞ্ঝা ব'হে যাবে তাহাদেরো বুকে।
তাহাদের পদধ্বনি করেছি শ্রবণ,
তাহাদের প্রেমস্বপ্ন পেয়েছি অন্তরে।
হে তরুণ, হে তরুণী, তোমরা যখন
এ পথের এইখানে ফেলি'ব চরণ
পূর্ব্বগামী পথিকেরে স্মরো ক্ষণতরে।
এই ঝরাফুলে তার রেখে গেছে স্মৃতি;
পথের বাতাসে তার মিশে আছে গীতি

ছেলেদের পাততাড়ি

পল্লীতে এক দিন *

শ্রী অমিয় বসু

তখন সকাল ৮টা ৯টা হবে। কালো শিশে-রঙের মেঘ সমস্ত আকাশটায় বিছিয়ে গিয়ে সূর্য্যটাকে গিল্‌তে চলেছে; তার মাঝে মাঝে এখানে সেখানে লাল আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠছে। যেন বহু দূর থেকে একটা গুড় গুড় শব্দ আস্‌ছে। গরম জোরালো একটা বাতাস ঘাসের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে, গাছ-পালা সব দুম্‌ড়ে দিচ্ছে আর ধূলো-বালি উড়িয়ে চলেছে। এখনই ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি সুরু হবে।

ফীয়কলা,—ছ' বছরের এক ছোটো ভিখারী-মেয়ে সে—, গ্রামের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে টেরেন্‌টী মুচিকে খুঁজতে খুঁজতে। মাথায় এক রাশ কটা চুল, পা-দুটো খালি, মেয়েটার চেহারা ফ্যাকাশে; চোখ-দুটো তার যেন বেরিয়ে এসেছে, ঠোঁট-দুটো তার কাঁপছে।

যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকে সে জিজ্ঞেস করে—"কাকা, টেরেন্‌টী কোথায় জানো?" কেউ তার জবাব দ্যায় না। তারা সকলেই যে ঝড় আস্‌ছে বুঝে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে, আর যে যার কুঁড়েতে আশ্রয় নিচ্ছে। অবশেষে সে দেখতে পেলে গির্জ্জার তোষাখানার রক্ষী টেরেন্‌টীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিলান্‌টী সিলিচ বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে আস্‌ছে। মেয়েটা জিজ্ঞেস্ করল,—"কাকা, টেরেন্‌টী কোথায়?" সিলান্‌টী বল্‌লে,—"শজ্জীর বাগানে।"

ভিখারী-মেয়ে কুঁড়ে ঘরগুলার পিছন দিয়ে ছুটতে ছুটতে শজ্জী-বাগানে গিয়ে টেরেন্‌টীকে দেখতে পেলে। ঢ্যাঙা বুড়ো লোকটির সরু মুখখানা বসন্তের দাগে ভরা, পা দুটো তার খুব লম্বা; খালি পায়ে, মেয়েদের একটা ছেঁড়া জ্যাকেট গায়ে দিয়ে, তরকারি-বাগানের কাছে সে দাঁড়িয়ে আধ-ঘুমন্ত মাতালের মতো চোখে সেই কালো ঝড়ো মেঘের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার সেই লম্বা বকের মতন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সে শালিখের বাসাটির মতোই দুল্‌ছে।

কটা চুলো সেই ভিখারী-মেয়েটা তাকে ডাক্‌ল,—"টেরেন্‌টী-কাকা! আমার কাকা!"

টেরেন্‌টী ফীয়কলার দিকে ঝুঁকে পড়ল, তার কঠিন মাতালে মুখটা হাসিতে ভ'রে উঠল; এমন হাসি আমাদের মুখে কেবল তখনই আসে যখন আমরা একটা ছোটো নির্ব্বোধ অর্থশূন্য অথচ অতি প্রিয় কোনো জিনিষের দিকে তাকাই। আদর করে' অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে সে বল্‌লে,—"ও! ফীয়কলা? কোথা থেকে আস্‌চিস্‌রে?" কাঁদতে কাঁদতে মুচির কোটটায় টান দিয়ে ফীয়কলা বল্‌লে, "টেরেন্‌টী-কাকা, চলো তুমি, ডানিল্‌কা-দাদা ভারি বিপদে পড়েছে, চলো।"

"কি বিপদ্ রে?......উঃ কী বাজই পড়ছে! প্রভু দয়াময়।...উ, কি বিপদ্ রে?"

"জমিদারদের সেই জঙ্গলে একটা গাছের গর্ত্তে ডানিল্‌কা হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল, আর বার করে' আন্‌তে পারছেনা; এস, কাকা, লক্ষ্মীটি, তার হাত টেনে বার করে' দাও।"

"কি রকম? সে গর্ত্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল? কেন, কিসের জন্যে?"

"গর্ত্ত থেকে আমার জন্যে একটা কোকিলের ডিম বার করতে গিয়েছিল।"

"সকাল সবে হয়েছে কি না-হয়েছে আর এরি মধ্যে সব হ্যাঙ্গামে পড়েছ......?" এই না বলে' টেরেন্‌টী মাথা নাড়তে লাগল আর 'থু থু' করে' থুতু ফেল্‌তে লাগল।

---

* শেখভের ইংরেজী অনুবাদ থেকে।

"তোমাকে নিয়ে এখন কর্‌তে হবে কি? আচ্ছা, আমি যাচ্চি……যাচ্চি, নেকড়েতে গিলে খায় যেন তোমাদের, দুষ্ট ছেলে মেয়ে সব! চল, দেখি!"

টেরেন্‌টী শব্জী-বাগান থেকে বেরিয়ে এসে তার লম্বা-লম্বা পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হন-হন করে' হেঁটে চল্‌ল। খুব তাড়াতাড়ি সে হাঁট্‌তে লাগল, হাঁট্‌তে-হাঁট্‌তে কোথাও থামে না এপাশ-ওপাশ দ্যাখেও না, যেন তাকে কেউ পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে চলেছে বা তার যেন কেউ পিছু নিয়েছে আর তারই ভয়েই সে চলেছে। ফীয়কলা অতি কষ্টেই তার সঙ্গে-সঙ্গে চল্‌তে পার্‌ছিল।

তারা গ্রামের বাইরে এসে মোড় ফিরে জমিদারের জঙ্গলের দিকে একটা ধূলো-ভরা রাস্তা ধরে' বরাবর চল্‌তে লাগল। দূর থেকে জঙ্গলটা দেখতে গাঢ় নীল রঙের; দূর হবে প্রায় মাইল দেড়েক। এতক্ষণে সূর্য্য মেঘে ঢেকে গেছে, কিছু পরেই আকাশে এক বিন্দুও নীল আর রইল না; আঁধার ক্রমে ঘনিয়ে আস্‌ছিল।

টেরেন্‌টীর পিছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফীয়কলা আস্তে-আস্তে বল্‌তে লাগল, "প্রভু দয়াময়! প্রভু!…"

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো—বড় বড় ও ভারী—ধূলো-ভরা রাস্তায় কালো-কালো বিন্দুর মতো পড়ছে। একটা বড় ফোঁটা ফীয়কলার গালে পড়ল, সেটা অশ্রুর মতোই তার চিবুক বেয়ে গড়িয়ে গেল।

মুচি তার হাড়-বেরনো খালি পা দিয়ে ধূলো উড়িয়ে বিড় বিড় করে' বল্‌লে, "বিষ্টি সুরু হ'ল; এ বেশ সুন্দর রে ফীয়কলা বুড়ী। ঘাস আর সব গাছ বিষ্টি খেয়েই বাঁচে রে, আমরা যেমন রুটী খাই না! আর ঐ বাজ? ওতে ভয় পাস্‌নে যেন খুকী; তোর মতন একটা ছোট্টো জিনিসকে ও মেরে ফেল্‌তে যাবে কেন?"

বৃষ্টি আরম্ভ হ'তে না হ'তেই ঝড় থেমে গেল। একমাত্র শব্দ যা শোনা যাচ্ছিল তা ঐ নতুন রাই-গাছে ও তৃষ্ণার্ত্ত রাস্তায় তীক্ষ্ণ গুলি বর্ষণের মতো বৃষ্টি-পড়ার ঝুপ-ঝুপ শব্দ।

টেরেন্‌টী আস্তে বলে' উঠল, "আমরা ভিজে জাব হ'য়ে যাব ফীয়কলা, আমাদের শরীরের একটুও শুক্‌নো থাকবে না……হোঃ হোঃ খুকী, আমার ঘাড় বেয়ে বিষ্টি পড়েছে দ্যাখ। কিন্তু ভয় পাস্‌নে যেন রে বোকা……ঘাস আবার শুক্‌নো হবে, মাটি আবার শুকোবে, আমরাও আবার শুক্‌নো হবো। ঐ একই সূর্য্য আমাদের সবার জন্যে।"

প্রায় ১৪ ফুট লম্বা এক ঝিলিক্ বিদ্যুৎ তাদের মাথার উপর দিয়ে খেলে গেল, ঘন-ঘন বাজের খুব জোর এক চোট শব্দ হ'ল; ফীয়কলার মনে হ'ল যেন একটা বড় ভারী আর গোলাকার কিছু আকাশে গড়িয়ে বেড়াচ্চে, আর ঠিক মাথার উপরেই আকাশটাকে যেন ছিঁড়ে খুলে ফেল্‌ছে।

হাত দিয়ে ক্রুসের চিহ্ন করে' টেরেন্‌টি বলে' উঠল, "প্রভু, দয়াময়!……তুই ভয় পাস্‌নে খুকু; ভাবিস্ নি যেন আমাদের উপর ভগবানের কোনো রাগ হয়েছে বলে' এ রকম বাজ পড়ছে।"

টেরেন্‌টী ও ফীয়কলার পা ভারী-ভারী ড্যালা-ড্যালা ভিজে কাদায় ঢেকে গেছে; রাস্তাও পিছল হয়েছে, তার উপর দিয়ে হাঁটা কঠিন, কিন্তু টেরেন্‌টী ক্রমেই দ্রুতবেগে লম্বা লম্বা পা ফেলে চল্‌তে লাগল। দুর্ব্বল শিশু সেই ভিখারী-মেয়েটা একদম হাঁপিয়ে গেছে, এমন হয়েছে যে এখনি বুঝি বা সে মাটিতে পড়ে' যাবে।

অবশেষে তারা জমিদারের জঙ্গলটায় এসে পৌছল। বর্ষণ-ধৌত গাছগুলো একটা দম্‌কা হাওয়ায় নড়ে' উঠে তাদের উপর একটা নিখুঁত জল-ধারা ঝরিয়ে দিল। টেরেন্‌টী কাঁটা-গাছের গোড়ায় হোঁচোট খেয়ে' খেয়ে' এখন আস্তে হাঁট্‌তে সুরু কর্‌ল। সে বল্‌লে, "কৈ, কোথায় ডানিল্‌কা? চল্ তার কাছে নিয়ে চল্ আমাকে।"

ফীয়কলা তাকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রায় সিকি মাইল্‌টাক্ ঢুকে, ডানিল্‌কাকে দেখিয়ে দিল। তার ভাই, আট বছরের ছোটো একটি ছেলে,—চুলগুলো তার গেরীমাটির মতোই লাল, আর মুখখানা তার রুগ্ন পাণ্ডুর—একটি গাছে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে, এক পাশে মাথা ফিরিয়ে আকাশের দিকে দেখছে। এক হাতে সে তার ছেঁড়া পুরোণো টুপিটা ধরে' রয়েছে, আর একটা হাত তার একটা বুড়োলেবু গাছে ঢাকা। ছেলেটি ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ

আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে সে তার নিজের কষ্টের কথা ভাবছে না। পায়ের শব্দ শুনে, মুচিকে দেখে সে একটি ক্ষীণ হাসি হেসে বল্‌লে, "উঃ কী ভীষণ কতগুনো বাজ পড়ল টেরেন্‌টী…… আমার সমস্ত জীবনেও এতগুনো বাজ পড়তে শুনিনি।"

"কিন্তু হাতটা তোর কোথায়?"

"এই গর্ত্তে, টেনে বার করে' দাও না, টেরেন্‌টী লক্ষ্মীটি।"

গর্ত্তের ধারে-ধারে কাঠ ভেঙে গিয়েছে, আর তাইতেই ডানিল্‌কার হাত এঁটে ধরে' রয়েছে; হাতটা সে ভিতরে আর-খানিকটা ঢুকিয়ে দিতে পারে, কিন্তু বার করে' আন্‌তে পার্‌ছে না। টেরেন্‌টী ঐ ভাঙা অংশটাকে মট করে' একেবারে ভেঙে ফেল্‌লে। ছেলেটির হাতটাও বেরিয়ে এল; হাতটা তার ছেঁচে গিয়ে লাল হ'য়ে উঠেছে।

হাতটা ঘস্‌তে ঘস্‌তে ছেলেটা আবার বলে' উঠল, "কি রকম ভয়ানক বাজ পড়ছে!……বাজ কেন পড়ে, টেরেনটী?" মুচি জবাব দিল, "একটা মেঘ আর একটা মেঘের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে কিনা তাই।" দলটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তার ধার দিয়ে ধার দিয়ে আঁধার-ঢাকা রাস্তার দিকে এগিয়ে চল্‌ল। বাজ পড়া ক্রমে কমে আস্‌তে লাগল; তার গুড়গুড় শব্দ বহুদূরে গ্রামের ওপার থেকে শোনা যাচ্ছিল।

ডানিল্‌কা তখনও তার হাত ঘস্‌তে-ঘস্‌তে বল্‌লে, "হাঁসগুনো সেদিন ওখান দিয়েই উড়ে গিয়েছিল টেরেন্‌টী, তাদের বাসা নিশ্চয়ই গ্নিলিয়া-জাইমিষচা জলায় ফিয়কূলা, একটা নাইটিঙ্গেলের বাসা দেখবি?"

টেরেন্‌টী তার টুপি থেকে জল নিংড়তে নিংড়তে বল্‌লে, "না না, ওতে হাত দিও না ওদের ব্যতিব্যস্ত কোরো না; নাইটিঙ্গেল গায়ক-পাখী, নিষ্পাপ ও। গলায় ও স্বর পেয়েছে ভগবানের স্তব গাইবার জন্যে আর মানুষের হৃদয়ে আনন্দ দেবার জন্যে। ওকে জালাতন করা পাপ।"

ডানিল্‌কা বল্‌লে, "আর চড়ুইয়ের বেলায়?"

"না চড়ুইয়ের বেলায় ক্ষতি নেই। ওটা একটা বজ্জাৎ হিংসুটে পাখী; ওর ব্যবহার ঠিক গাঁটকাটার মতো, মানুষের সুখ ও দেখতে পারে না। যখন যীশুকে ক্রুসে বিঁধেছিল, তখন ঐ চড়ুই-পাখীই ইহুদীদের পেরেক এনে দিয়ে বলে' উঠেছিল,—বেঁচে রয়েছে রে, বেঁচে রয়েছে!"

এতক্ষণে এক খাবলা উজ্জ্বল নীল রং আকাশে দেখা দিল।

টেরেন্‌টী বল্‌লে, "এই ত্যাখ উই ঢিবি একটা, বিষ্টিতে ফেটে খুলে গেছে। সব ভেসে গেছে পাজী গুনো।"

তারা উই ঢিবির উপর ঝুঁকে দেখতে লাগল। মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়ে' এর অনিষ্ট করে' দিয়ে গেছে। পোকা-গুলি বিচলিত হ'য়ে কাদায় এদিক্ ওদিক্ তাড়াতাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তাদের জলমগ্ন সঙ্গীদের বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে চেষ্টা কর্‌ছে।

টেরেন্‌টী দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লে, "অত হাঙ্গাম আর কর্‌তে হবে না, মর্‌বিনি এতে! রোদ্দুরে গরম হোলেই তোরা আবার চাঙ্গা হোয়ে উঠ্‌বি। এ তোদের একটা শিক্ষা হোলো হাঁদাগুনো; দ্বিতীয়বার আর নীচু জমিতে বাসা বাঁধবি নি।"

তারা আবার চল্‌তে লাগল। ডানিল্‌কা একটা ছোট ওক্ গাছের ডালের দিকে দেখিয়ে বল্‌লে, "এখানে কতক গুনো মৌমাছি রয়েছে।"

মৌমাছিগুলি জলে ভিজে ও ঠাণ্ডায় কাতর হ'য়ে ডাল-টার উপর গাদাগাদি করে' বসে' রয়েছে; এত মাছি রয়েছে যে ডালের ছাল বা পাতা কিছুই দেখা যাচ্ছে না, অনেকে আবার এর ওর ঘাড়ের উপরেই বসে' পড়েছে।

টেরেন্‌টী তাদের বল্‌লে, "একটা ঝাঁক মৌমাছি; ওরা বাসার খোঁজে উড়ে বেড়াচ্ছিল, এমন সময়ে যখন বিষ্টি এসে পড়ল ওদের ওপোর, ওম্‌নি ওরা বসে' পড়ল। এক ঝাঁক মৌমাছি যখন ওড়ে, তখন তাদের ওপোর শুধু জল ছিটিয়ে দিলেই হোলো, তখুনি তারা বসে' পড়বে। এখন ধর যদি তোমরা এই ঝাঁক-টাকে নিতে চাও তা হ'লে ঐ ডালটাকে বেঁকিয়ে একটা বোরার ভেতর পূরে দাও, তারপর নাড়া দিতে থাক, ওরা সব ভেতরে পড়ে' যাবে।"

ছোট্টো ফীয়কূলা হঠাৎ ভুরু টুরু কুঁচকে খুব জোরে

জোরে নিজের ঘাড়টা ঘস্‌তে লাগল। তার ভাই ঘাড়ের দিকে চেয়ে দেখল অনেকটা ফুলে উঠেছে।

মুচিটি হেঃ হেঃ করে' হেসে উঠে বল্লে, "কি করে' ওটা হ'ল তা জানিস্ ফীয়কুলা, বুড়ী? ওগুনো 'স্পেনের মাছি,' এই বনে কোনো গাছে বসে ছিল; তাদের ওপোর দিয়ে বিষ্টি ঝরেছে তারই এক ফোঁটা তোর ঘাড়ে পড়েছে, আর তাইতেই ফুলিয়ে দিয়েছে।"

মেঘের ভিতর থেকে হঠাৎ সূর্য্য বেরিয়ে এলো, তার গরম আলোয় মাঠ আর তিন বন্ধুকে ভাসিয়ে দিয়ে গেলো। দেখলে ভয় হয় ঐ যে কালো মেঘটা, সেটা বহুদূরে চলে' গেছে, সঙ্গে করে' ঝড়টাকেও নিয়ে গেছে। বাতাস এখন বেশ গরম আর সুরভিযুক্ত; বার্ড্-চেরী, মেডো-সুঈট্ আর লিলী অভ্-দি-হ্যালির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

পশমের মতো দেখতে একটা ফুলের দিকে দেখিয়ে টেরেন্‌টী বল্লে, "নাক দিয়ে রক্ত পড়লে ওরই পাতা দিতে হয়, তাতে বেশ উপকার হয়।"

তারা একটা বাঁশির আওয়াজ আর একটা গুড়গুড় শব্দ শুনতে পেলে, কিন্তু ঝোড়ো মেঘ যে রকম গুড়গুড় শব্দ বয়ে' নিয়ে গেছে এটা সে রকম নয়। টেরেন্‌টী, ডানিল্‌কা ও ফীয়কুলা দেখল যে একটা মালগাড়ী পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। এন্‌জিন্‌টা হাঁপাতে হাঁপাতে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তার পিছনে খান কুড়িরও বেশী গাড়ী টেনে নিয়ে চলেছে। এর ক্ষমতা বিশাল। ছেলে মেয়ে দুটোর জান্‌তে ভারী আগ্রহ যে কি করে' এই এন্‌জিন্,—যার প্রাণ নেই—, ঘোড়ার সাহায্য না নিয়ে, চলে ও এত মাল টেনে নিয়ে যায়। টেরেন্‌টী এটা তাদের বুঝিয়ে দিতে অগ্রসর হ'ল, সে বল্‌তে লাগল, "বাষ্পই এ সব কর্‌চে রে,......বাষ্পই কাজটা করে......দেখচিস্, চাকার কাছে ঐ জিনিসটার নীচে কি রকম জোরে ধাক্কা দিচ্ছে বাষ্প? আর এটা,......এই দেখছিস্,......এই চাকাটা চল্‌ছে......"

তারা রেল লাইন পার হ'য়ে গিয়ে বাঁধ থেকে নাবতে-নাবতে নদীর দিকে যেতে লাগল। তারা যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা নয়, এলো মেলো ভাবে এদিক্ ওদিক্ ঘুরছে, আর সমস্ত রাস্তায় গল্প করতে করতে চলেছে......। ডানিল্‌কা প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ করে আর টেরেন্‌টী সে সবের উত্তর দ্যায়।

টেরেন্‌টী তার সব প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছে, প্রকৃতিতে এমন কোনো রহস্য নেই যা তাকে পরাস্ত করতে পারে। সে সব জানে। যেমন ধর, বনের সমস্ত ফুল, পাখী ও পাথরের নাম সে জানে। কোন্ লতাপাতায় অসুখ সারে তা সে জানে। ঘোড়া বা গরুর বয়স বল্‌তে তার আট্‌কায় না। সূর্য্যাস্তের দিকে, চাঁদের দিকে বা পাখীর দিকে দেখে' সে বলে' দিতে পারে পরের দিন আকাশের অবস্থা কি রকম থাক্‌বে। আর বাস্তবিক শুধু যে টেরেন্‌টীই এত বিজ্ঞ তা নয়; সিলান্‌টী সিলিচ, সরাই-ওয়ালা, বাগানের মালী, মেষপালক, আর সাধারণ ভাবে বল্‌তে গেলে সকল গ্রামবাসীই, ও যতটা জানে, তা সবই জানে। এ সব লোক বই পড়ে' শেখেনি, এরা শিখেছে মাঠে বনে নদীর কূলে; এদের শিক্ষক ছিল, ঐ পাখীরাই যখন তারা এদের গান গেয়ে শোনাতো, ঐ সূর্য্যই যখন সে অস্ত গিয়ে রেখে যেতো একটা টক্‌টকে লালের আভা, ঐ গাছগুলোই, ঐ বুনো লতাপাতা গুলোই।

ডানিল্‌কা টেরেন্‌টীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল আর তার প্রতি কথাটি পেটুকের মতো গিল্‌ছিল। বসন্তকালে মানুষ যখন গরমে এবং মাঠের একঘেয়ে সবুজে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েনি, যখন সব জিনিস তাজা ও সুগন্ধে ভরপুর, কে এই সোনালি মে-বীট্‌লের কথা, এই সারস পাখীর কথা এই কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর কথা আর ধান গাছে শীষ ধরার কথা শুন্‌তে না চাইবে?

তাদের মধ্যে দুজন, মুচি আর ঐ বাপ-মা-মরা ছেলেটা মাঠে মাঠে বেড়াচ্ছে আর অনবরত কথা বলে' চলেছে। তারা শ্রান্ত হয়নি, এ রকম লক্ষ্যহীন হ'য়ে সারা জগৎটাময় তারা ঘুরে বেড়াতে পারে। তারা হাঁট্‌ছে আর হাঁট্‌ছে, আর জগতের শোভা নিয়ে গল্প করতে-করতে লক্ষ্যই করছে না যে সেই ক্ষীণ ছোট্টো ভিখারী-মেয়েটি তাদের পিছনে হোঁচোট খেতে খেতে চলেছে। হাঁপিয়ে পড়েছে সে, আর কেবলই পিছিয়ে পড়ছে। চোখে তার জল টল্‌টল্ করছে; শ্রান্তিহীন এই পর্য্যটকদের থামাতে পারলে সে সুখীই হবে, কিন্তু

কার কাছে, কোথায় সে যাবে ? তার তো কোনো বাড়ী নেই, কোনো আপনার লোক নেই ; তার ভালো লাগুক্ আর নাই লাগুক্ তার যে এমনি চল্‌তেই হবে আর তাদের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে যেতে হবে।

দুপুর নাগাদ তারা তিন জনেই নদীর পাড়ে বসে' পড়্‌ল। ডানিল্‌কা তার ব্যাগ থেকে এক টুক্‌রো রুটী বার কর্‌লে, জলে ভিজে তা একেবারে কাদা হ'য়ে গেছে ; তাই তারা খেতে সুরু করে' দিল। খাওয়া হ'লে পর টেরেন্‌টী একটি প্রার্থনা করলে, তার পরে বালুকাময় এই নদীর কূলে লম্বা হ'য়ে গা এলিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। যতক্ষণ সে ঘুমচ্ছিল, ছেলেটা একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। তার নানা রকম জিনিস ভাববার ছিল। এই খানিক আগেই তো সে ঝড়, মৌমাছি, উই আর রেল-গাড়ী দেখেছে। আর এখনই তো তার চোখের সাম্‌নে মাছ-গুলো ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্চে ; কতকগুলো মাছ ইঞ্চি দুয়েক বা তার বেশী লম্বা, আর কতক-গুলো আবার আমাদের নখের চেয়ে বড় হবে না। একটা ঘ্রাইপার্ সাপ তার মাথা উঁচুতে তুলে নদীর এপার ওপার সাঁৎরে বেড়াচ্চে।

পর্য্যটকরা গ্রামে ফির্‌ল সেই সন্ধ্যের দিকে। রাত্রের জন্যে ছেলে-মেয়ে দুটো একটা পরিত্যক্ত গোলাবাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিল, যেখানে আগে পল্লীমণ্ডলীর শস্য রাখা হ'ত। আর টেরেনটী তাদের ছেড়ে একটা মদের দোকানে গিয়ে ঢুক্‌ল। তারা দুজনে খড়ের উপর ঠাসা-ঠাসি করে' শুয়ে পড়্‌ল।

ছেলেটা ঘুমল না ; সে আঁধার ভেদ করে' যেন দেখ্‌তে লাগ্‌ল ; তার মনে হ'ল আজ সারাদিন ধরে' যা দেখেছে তা সব চোখের সাম্‌নে সে দেখ্‌তে পাচ্ছে ; সেই ঝড়ো-মেঘ, সেই উজ্জ্বল সূর্য্যালোক, সেই পাখী, সেই মাছ আর সেই পাত্‌লা ছিপ ছিপে টেরেন্‌টী। আজকের সমস্ত ঘটনা তার মনে যত রকম ছাপ রেখে গেছে সে সব অবসাদ ও ক্ষুধার সঙ্গে জড়িত হ'য়ে তার পক্ষে বড় বেশী হ'য়ে পড়েছে; তার এত গরম বোধ হচ্ছে যেন সে আগুনের উপর রয়েছে, কেবলি পাশ ফির্‌ছে আর ছটফট কর্‌ছে। এখন এই আঁধারে যে-সব কথা তাকে একেবারে পেয়ে বসেছে আর তার মনকে আলোড়িত কর্‌ছে সে-সব কথা যে সে কারুকে বল্‌তে চায়, কিন্তু কেউ নেই তো এমন, যাকে সে বলে। ফীয়ক্‌লা বড় ছোটো, সে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না। ছেলেটা ভাব্‌ল—কাল আমি টেরেন্‌টীকে বল্‌ব।

ছেলে মেয়ে দুটো গৃহহীন সেই মুচির কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। রাত্রে টেরেন্‌টী তাদের কাছে এল ; তাদের উপর ক্রুসের চিহ্ন করে', মাথার নীচে তাদের রুটী রেখে দিল। তার ভালোবাসা কেউ জান্‌ল না। এ শুধু দেখ্‌ল ঐ চাঁদ, যে আকাশে ভেসে ভেসে বেড়ায়, আর ঐ পরিত্যক্ত গোলাবাড়ীর দেয়ালের ছ্যাঁদা দিয়ে সোহাগ-ভরে উঁকি দিয়ে দিয়ে যায়।

—

কাঁচির সাহায্যে চিত্রাঙ্কণ

ইণ্ডিয়ানার ভ্যালপারাইসোর লিউস মায়ার এণ্ড কোম্পানী চিত্রবিদ্যা প্রতিযোগিতায় একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ২০০০ হাজারের উপর প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইয়াছিল। জর্জ্জিয়ার আগাষ্টার জো ক্র্যান্‌স্‌টাউন জোন্‌স্ এই পুরস্কার পাইয়াছে। তাহার বয়স মাত্র

জো ক্র্যান্‌স্‌টাউন জোন্‌স্—১৬ বৎসরের বালক-প্রতিভা
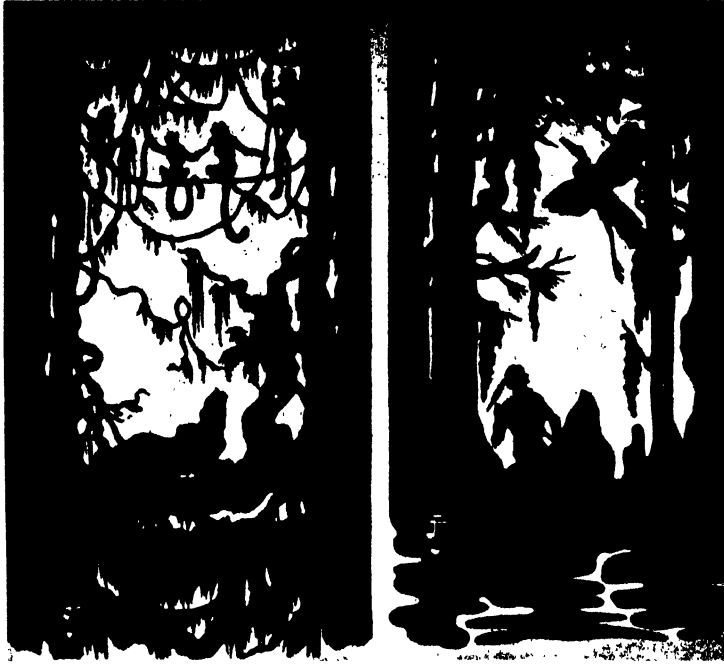
ষোল বৎসর। সে তুলি বা পেন্সিল দিয়া ছবি আঁকে না। কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া নৈসর্গিক শোভার চিত্র তৈয়ারা করে। সে চিররুগ্ন, জীবনের অধিকাংশ কাল তাহাকে হাসপাতালে বা গৃহে রোগশয্যায় শুইয়া থাকিতে হইয়াছে। বাহিরের সহিত তাহার তিলমাত্র পরিচয় নাই। অথচ এই অদ্ভুত প্রতিভাশালী বালক রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া আপনার কল্পনার সাহায্যে কাঁচি দিয়া যে কতরকমের ছবি আঁকে তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্য্য এই যে, অনেক স্বভাবের শোভা না দেখিয়াই এই বালক যথাযথ অঙ্কিত করে। ইহা ছাড়া সে নানা সাময়িক পত্রাদিতে লিখিয়া থাকে; লেখাগুলি সব শিকার ও জঙ্গল-সংক্রান্ত। জীবনে বালক যাহার আস্বাদ পা

জোয়ের কল্পনায় জঙ্গলের চিত্র

রাখালের দল—জোয়ের কল্পনায়

জীবজন্তুর মধ্যে জো নিজে

হরিণের লড়াই

নাই, কল্পনায় তাহা পোষাইয়া লইয়াছে। সে ছয় বৎসর হইতে কাঁচি দিয়া ছবি তৈয়ারী করিতে সুরু করে। ১৪ বৎসর বয়সে একটি হাঁসপাতালে তাহার এই প্রতিভা সাধারণের গোচর হয় ও দলে দলে লোকে তাহাকে ও তাহার ছবি দেখিতে আসে। সে এখন এই কাজ করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছে। জীবজন্তুই হইতেছে তাহার ছবির বিষয় ও তাহাদের সে এমন নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত করিয়াছে যে, সকলে চমৎকৃত হইয়াছে; অথচ ইহার অনেক জানোয়ারই সে চোখে দেখে নাই। ইহার নীচের অঙ্গ একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত তবু এই প্রতিভাশালী বালকের মুখে কেহ কোনো দিন ব্যথার চিহ্ন দেখে নাই। ছবিগুলি দেখিলেই এই বালকের অলৌকিক প্রতিভার কথা স্বীকার করিতে হয়। এখানে এই বালকের ও বালকের অঙ্কিত কয়েকটি ছবির প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

ছাতার মতো পাখী

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম পাখী আছে, ইহাদিগকে ঠিক খোলা ছাতার মতো দেখায়। ইহাদের মাথায় প্রচুর পালক। ইহাদিগের গলা হইতে নীচের দিকে একটি উপাঙ্গ ঝুলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ লাঠির মতো একটি লম্বা মাংস নামিয়া গিয়াছে, ঠিক যেন বটের শিকড় ঝুলিতেছে; এইটি ছাতার বাঁট, আর পাখীর মাথাটি যেন ছাতা। ইহারা মাথার পালক মাঝে মাঝে উড়াইয়া দেয়। তখন সুন্দর দেখায়। স্ত্রী পক্ষীর গায়ে এত পালক থাকে না ও তাহার গলার উপাঙ্গ কিছু ছোট হয়। ইহারা গভীর জঙ্গলে বাস করে। সেইজন্য ইহাদিগকে ধরিয়া আনা কষ্টকর। ইহাদের গলার আওয়াজ ভেঁপুর আওয়াজের মতন। ইহারা যখন ডাকে তখন ইহাদের উপাঙ্গে রণিত হইয়া শব্দ আরো গভীর হয়। ইহাদের কাহারো কাহারো গলার ডাঁটার চামড়া লাল ও হলদে রঙের

ছাতার মতো পাখী

আয়ার্ল্যাণ্ডের কাছাকাছি সমুদ্রভাগে এই বানমাছ জন্মায়। বান মাছ দেখিতে লম্বা সাপের মতন। ইহারা যখন ছোট থাকে তখন দেখিতে অন্য রকম থাকে। ছবিতে উপর হইতে নীচে অবধি ক্রমে ক্রমে বানমাছের দেহের পরিবর্ত্তন দেখান হইয়াছে। উপরের আকারটাই প্রথম আকার। তখন ইহাদের দেহ চওড়া-রকম ও স্বচ্ছ। দেহের রক্ত তখন শাদা। যত দিন যাইতে থাকে ততই তাহারা গভীর জল হইতে উপর দিকে উঠিয়া আলোকের দিকে আসিতে থাকে ও তীরের দিকে অগ্রসর হয়। এই

বানমাছ

শরীর বাড়ে না কমে ?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বা জন্তু জানোয়ারের শরীর বাড়িতে থাকে। ইহা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অর্থাৎ, এমন প্রাণী আছে যাহাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ছোট হয়। সমুদ্রে এক রকম বান মাছ আছে, তাহাদের শরীর এই রকম হয়।
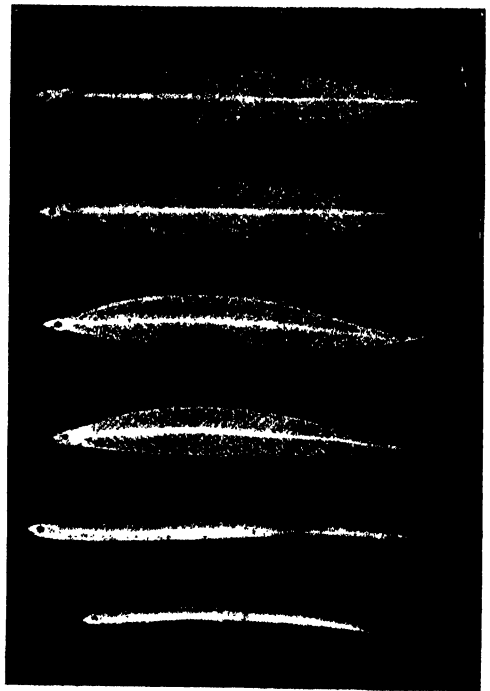
সময়ে তাহারা একটু একটু করিয়া বড় হয়। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ইহাদের মুখ হয় না এবং মুখ হয় না বলিয়া ইহারা খাদ্যও সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং এই উপবাসের সময় দেহ শুকাইয়া শুকাইয়া সঙ্কুচিত হইতে থাকে। কাজেই ইহারা ছোট হইতে থাকে। এই সময়ে মুখ, চোয়াল, দাঁত গঠিত হইতে থাকে। দেহের পাতলা চাম্‌ড়ার ভাগ গুটাইয়া সাপের আকার হইতে থাকে। রক্ত

দুয়োরাণী
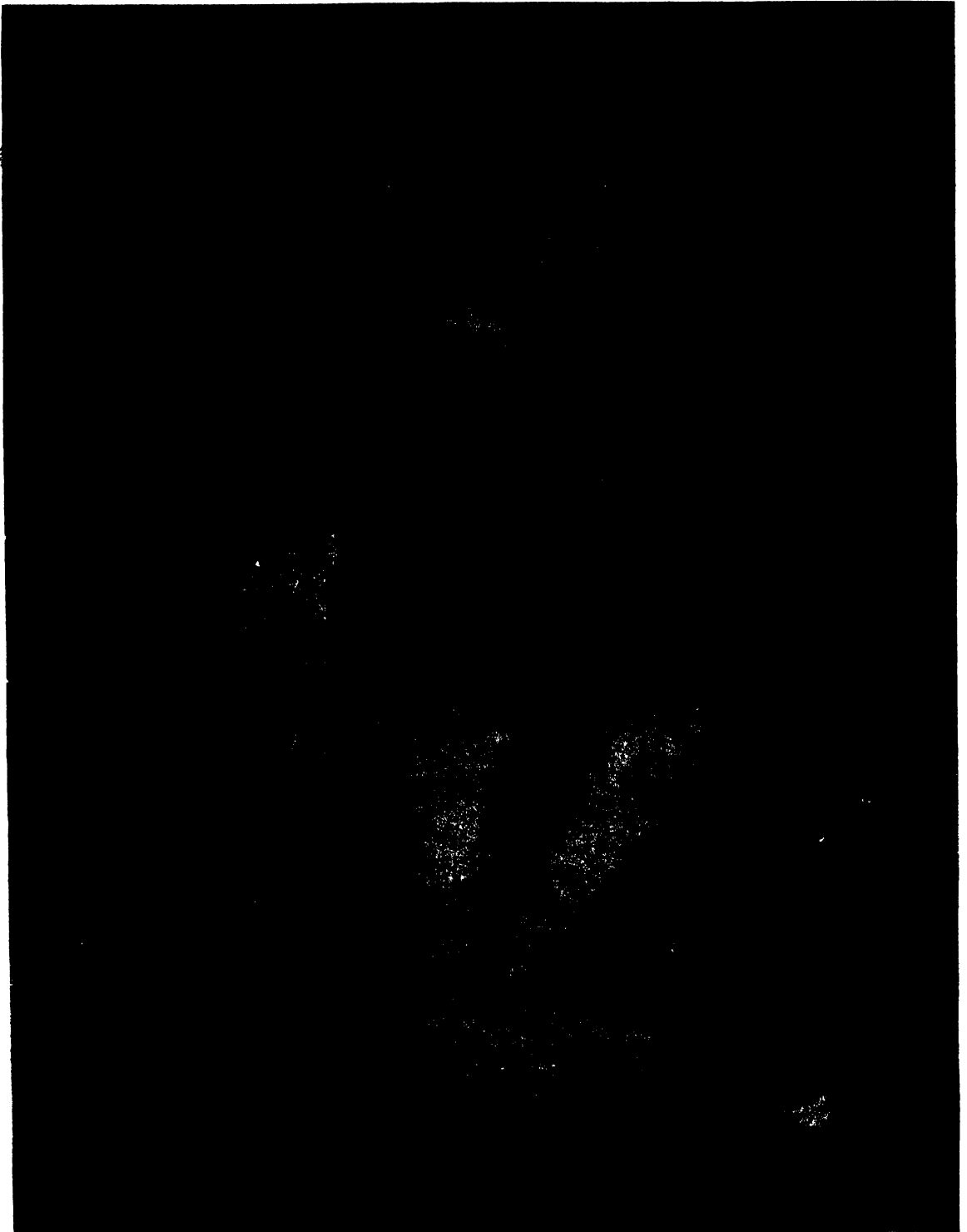
শিল্পী শ্রী অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্ভুত ব্যাঙ

ক্রমে ক্রমে লাল হইতে থাকে। তীরের দিকে আসিতে আসিতে ইহারা দলে দলে নদীর মধ্যে প্রবেশ করে। আল ও কপাটিকল পার হইয়া ইহাদের কেহ কেহ পুকুরেও হাজির হয়। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে দেহের আকার ঠিক বান মাছের যাহা স্বাভাবিক আকার তাহা হইলেই ইহাদের ডিম পাড়িবার সময় হয়। তখন ইহারা আবার সমুদ্রের দিকে ফিরিতে থাকে, এবং সমুদ্রে আসিয়া ডিম পাড়িয়া মরিয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকায় এক রকম ব্যাঙ আছে, তাহারাও বড় হইতে ছোট হয়। ছোট বেলায় ইহারা প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা থাকে। যতই বয়স বাড়ে ততই ইহাদের ল্যাজ সঙ্কুচিত হইতে থাকে। ল্যাজ খসিয়া যখন ইহারা ঠিক স্বাভাবিক বর্দ্ধিত অবস্থা লাভ করে তখন ইহারা লম্বায় আড়াই ইঞ্চি।

দুয়োরাণী

এক যে ছিলেন রাজা তাহার বিরাট রাজ্যপাট,
হাতীশালায় বহুত হাতী, ঘোড়ার যেন হাট ;
রং বেরংয়ের পোষাক-পরা সান্ত্রী পাহারওলা,
জম্‌জমে তাঁর প্রাসাদ ওঠে আকাশে বিশ তলা।
আদুরে তাঁর সুয়োরাণীর সাতমহলা বাড়ী,
পাল্কী করে' বাগানে যান, রাস্তাতে চাই গাড়ী,
গোলাপ-জলে সাঁতার কাটেন, সোনার খাটে ঘুম,
হাই তুল্‌লে ঝি যায় ছুটে, নিত্য গানের ধুম।
রাজার যিনি দুয়োরাণী "দূর হও" তাঁয় বলে'
তাড়িয়ে দিলেন রাজা তাঁরে ; গিয়ে গাছের তলে
কাদেন তিনি আপন মনে, কেউ দেখে না তাঁরে,
কেউ বলে না—"খাও গো দুটি," কেউ ডাকে না দ্বারে।
সেই প্রাসাদে তাঁরও ছিল সাতমহলা ঘর
ছিল শতেক দাস ও দাসী, আজকে সবই পর !
ভাবেন রাণী বসে' বসে' দুঃখেতে মুখ কালো—
"রাণীর চেয়ে ভিখারিণী হতাম যদি, ভালো।"

গুপ্ত

নদী ও তীর

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সেন

তটিনী আছাড়ি' তীরে বলিছে অধীর
"তোমার বাঁধনে আমি বাধা পাই তীর।"

তীর বলে, "আমি আছি, তাই তুমি নদী ;
কোথা যেতে, দুই দিকে নাহি বাঁধি যদি ?"

পক্কশস্য

তরল কাচ :—

ইংলণ্ডের বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ডাঃ ভ্রেডার্ণবুর্গ সম্প্রতি একটি অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কাচ জিনিসটি আমরা বিশেষ কাঠিন্যগুণসম্পন্ন বলিয়াই জানি। কিন্তু উনি নমনীয় জৈব কাচ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই কাচ সাধারণ কাচ অপেক্ষা দশ গুণ অধিক পরিষ্কার এবং তরল অবস্থাতেও ইহা পাওয়া যায়। উপরে ডাঃ ভ্রেডার্ণবুর্গের ছবি দেওয়া হইল, তিনি এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে শীতল তরল কাচ ঢালিতেছেন।

ডাঃ ভ্রাডার্ণবুর্গ ও তরল কাচ

—

গুলিসহ (Bullet-proof) কাচ :—

সাধারণতঃ আমরা কাচের যে সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিতে পাই ও ব্যবহার করি, (গেলাস, শিশি, শার্সি প্রভৃতি) সেগুলি অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ ও অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। আমেরিকায় সম্প্রতি গুলিসহ কাচ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আঘাত সহ্য করিবার শক্তি এই কাচের এত বেশী যে ইউনাইটেড ষ্টেটস্ সৈন্যদলে ব্যবহৃত অটোমেটিক পিস্তলের বৃহদাকার গুলির আঘাত ইহা সহ্য করিতে পারেই এমন কি জার্মান মৌজার পিস্তলের গুলিও ইহাতে ঠিকরিয়া পড়ে, অথচ এই গুলি পর পর সজ্জিত নখানি পাইনতক্তা ভেদ করিতে সক্ষম। এই কাচের উপর গুলি ছুড়িয়া দেখা গিয়াছে যে গুলি মাত্র এক অষ্টমাংশ ইঞ্চি কাচ ভেদ করিতে পারে। ধাতু আবৃত একটি গুলি শুধু যে ঠিকরিয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে ধাতু আবরণটি চেপটাইয়া কাচের গায়ে বসিয়া গিয়াছিল। অবশ্য এই আঘাতে কাচে ফাট ধরে। পাশের ছবিতে উপর্য্যুপরি দুইটি গুলি খাইবার পর কাচের অবস্থা দেখান হইয়াছে। আমেরিকাতে সম্প্রতি এই কাচ বাড়ীর শার্সি ও গাড়ীর জানালা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হইতেছে।
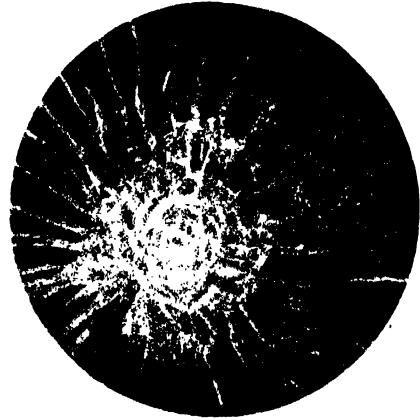
বুলেট-প্রুফ কাচ

—

পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু :—

পরপৃষ্ঠার ছবিটি পৃথিবীর সব চাইতে বড় সেতুর একটি নক্সা। ইহা নিউইয়র্ক নগরীর ওয়াশিংটন কেল্লা হইতে হাডসন নদীর উপর দিয়া নিউ জার্সির লীকেল্লার সহিত সংযুক্ত হইবে। ইহা কোন থাম বা খুঁটির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে না। এপারে একটি এবং ওপারে একটি, মাত্র এই দুইটি আশ্রয়ের উপর ইহা নির্ম্মিত হইবে, মধ্যকার দৈর্ঘ্য হইবে ৩৪৬৮ ফুট। শীঘ্রই এই সেতু নির্ম্মাণ সুরু হইবে। শেষ হইতে ৪ বৎসর সময় লাগিবে এবং প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

—

চূড়ান্ত ফ্যাশান ঃ—

বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির দরুণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অনেক সাচ্ছন্দ্য আসিয়াছে। পুরাতন তৈজসপত্রের যে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে ৫০ বছর আগের তৈজসপত্রাদির সহিত তুলনা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, মানুষের সাজসজ্জাও অদ্ভুত রকম বদলাইয়া গিয়াছে। পুরুষের পক্ষে পূর্ব্বে যে ফ্যাশান রেওয়াজ ছিল আজ তাহা অচল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে স্ত্রীলোকের সাজসজ্জায় ও গহনা প্রভৃতিতে। তাহাদের পক্ষে সকালের ফ্যাশান বিকালে চলিতেছে না। অবশ্য আমাদের দেশ এখনো ততদূর অগ্রসর হয় নাই। আমেরিকার মহিলারা বেতার-যোগে ফরাসী দেশের নিত্য নূতন ফ্যাশানের খোঁজ লইতেছেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু
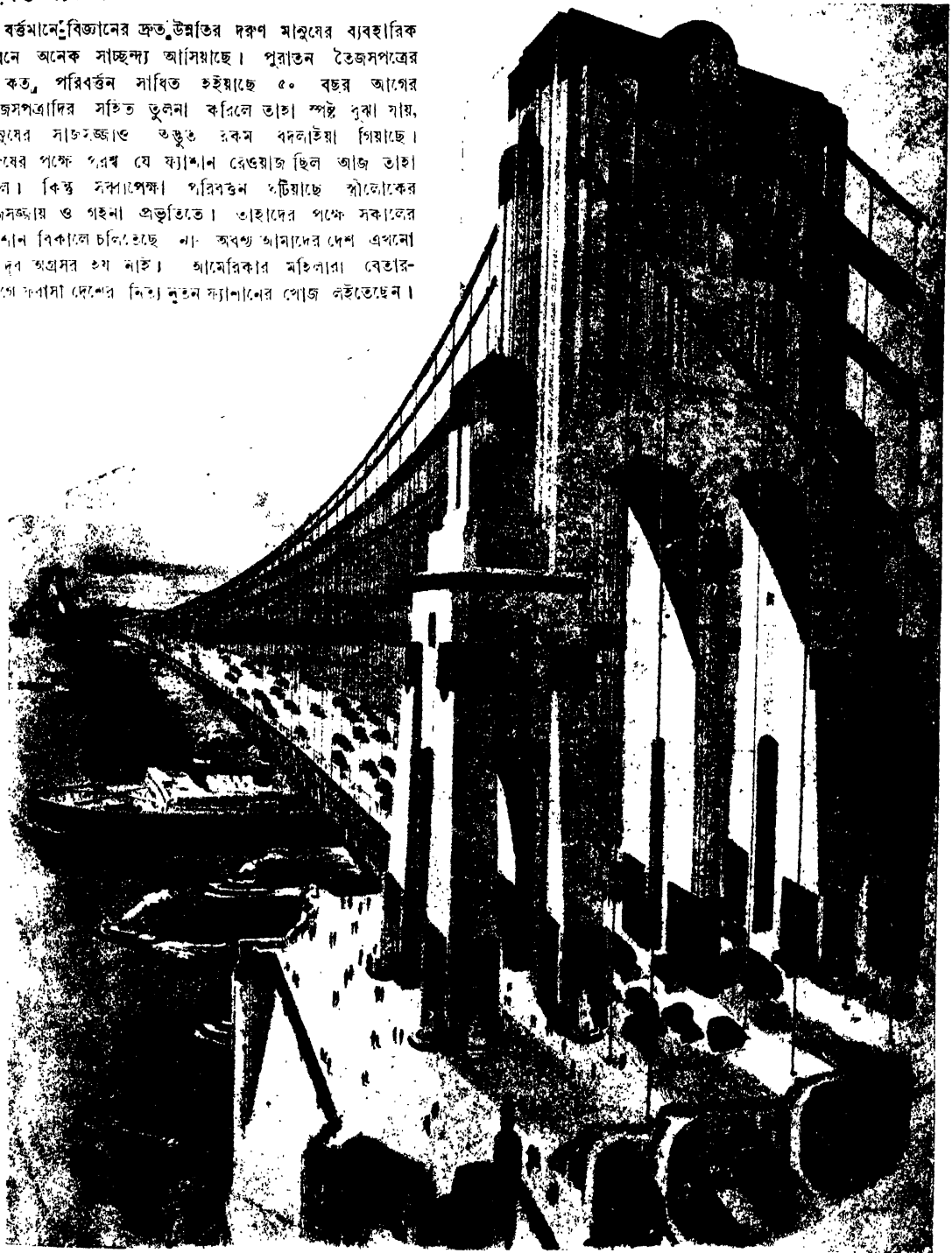
ফ্যাশানের এই পরিবর্ত্তন যে সর্ব্বত্র সাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখিয়া হইতেছে না তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমেরিকার একটি আধুনিকতম 'অনন্তের' ছবি দেওয়া হইল। সম্প্রতি আমেরিকাতে ধনী মহিলা-সমাজে এই গহনার অত্যন্ত চলন হইয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন হাতের এপারে ওপারে একটি তীর ফুঁড়িয়া রাখা হইয়াছে। রূপার তারের

অদ্ভুত অনন্ত

উপরে হীরা বসাইয়া এই গহনাটি নির্ম্মিত। বাহিরের দিকে তীরের মত দেখাইলেও ভিতরের দিকে হাত বেড়িয়া একটি সরু রূপার তার আছে।

—

মিশরের স্ফিংক্স্ মূর্ত্তি :—

বহুশতাব্দী ধরিয়া বালুগর্ভে নিহিত থাকিবার পর সম্প্রতি এই বিখ্যাত মূর্ত্তিটির স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। কালের কোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মিশর সরকার মূর্ত্তিটি পরিস্কার করিয়া মেরামত

স্ফিংক্স্ মূর্ত্তির সংস্কার

করাইতেছেন। এতকাল লোকে কল্পনা করিয়াছে বালির নীচের অংশটা দেখিতে না জানি কেমন। এখন আর কল্পনার প্রয়োজন নাই। স্ফিংক্স্ এর বিরাট থাবাও আমাদের গোচরীভূত হইল। অচিরে মেরামত না করিলে এই অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকার্য্যটি নষ্ট হইয়া যাইত। মেরামতের অবস্থায় ছবিটি তোলা হইয়াছে। মেরামত সম্পূর্ণ হইতে আরো একবছর লাগিবে।

দেওয়াল-নড়া :—

আমরা কথায় বলি "দেওয়ালের মত অচল," আসলে কিন্তু দেওয়াল অচল নয়; সামান্য একটু ঠেলা দিলেই দেওয়াল নড়ে;

দেওয়াল-নড়া-মাপার যন্ত্র

সে যত শক্ত পাথরের বা ইঁটের দেওয়ালই না হোক কেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কে একটি অতি সূক্ষ্ম মাপযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে অতি সামান্য আঘাতেও দেওয়ালের যে কম্পন হয় তাহা মাপা যায়; যন্ত্রটির ছবি দেওয়া হইল। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে ঠেলা দিলে দেওয়াল যে শুধু নড়ে তাহা নহে অনেক সময় বেশ একটু বাঁকিয়া যায়। মাপযন্ত্রটি দেওয়ালের গায়ে ঠেকাইয়া রাখা হয় ইহার সহিত একটি আলোক-রেখাপাতযন্ত্র সংযুক্ত থাকে। দেওয়ালের কম্পনে আলোকরশ্মি স্থানান্তরিত হইয়া দেওয়ালের কম্পন বহুগুণ বর্দ্ধিতাকারে কোনো স্থানে প্রতিফলিত করে। ইহা হইতে দেওয়াল কতটুকু নড়িল তাহাও মাপা যায়।

সাইকেলের অসম্ভব গতি :—

একটি মোটর সাইকেলের পিছনে সাইকেল চালাইয়া ফরাসী দেশের একটি লোক পৃথিবীর সব চাইতে দ্রুত সাইকেল চালাইয়াছেন। তিনি ঘণ্টায় ৭৪ মাইল সাইকেল ছুটাইয়াছেন, অবশ্য সম্মুখে মোটর সাইকেল না থাকিলে এত অধিক বেগে সাইকেল চালানো সম্ভব হইত না কারণ

সাইকেল-দৌড়

বাতাসের বিরুদ্ধে এত বেগে গাড়ী চালানো শুধু পায়ের জোরের কর্ম্ম নয়। সম্মুখে মোটর সাইকেল বাতাস কাটিয়া গিয়াছে ও চালক মুখের সহিত সংযুক্ত পিঠেস্থিত চোঙার সাহায্যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে নতুবা এই বেগের মুখে পথের সামান্য বাধাও বিপজ্জনক হইতে পারিত। মোটর সাইকেল ও সাইকেল চালক দুজনকেই টুপি পরিতে হইয়াছিল ও দুজনেরই মুখে একটি করিয়া স্বচ্ছ ঢাকনি ছিল। প্যারিসের সন্নিকটবর্ত্তী মজটসেরীর ঘোড়দৌড় মাঠে এই সাইকেল দৌড় হইয়াছে, পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সেই ঘোড়দৌড়-মাঠে মোটর সাইকেল ও সাইকেলের দৌড়াইবার সময়কার ছবি দেখানো হইল।

রপ্তানীর বাহার :—

ছবিতে প্রদর্শিত জাহাজখানির নাম "সিটি অব ব্যাঙ্গর"। এই বিরাট জাহাজখানির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাঁচশত 'ভইলিস নাইট' মোটরকার সজ্জিত করিয়া আমেরিকার বিশাল হ্রদের একপার হইতে অপর পারে চালান দেওয়া হয়। এই মোটর গাড়ীগুলির প্রত্যেকটি ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় ছিল অর্থাৎ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াই সমবেত বিরাট দর্শকমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া এই নিঃশব্দ 'নাইট' গাড়ীগুলি একটির পর একটি রাস্তায় চালান হয়। গাড়ীগুলিতে নিঃশব্দ সলিভ ভালভ এঞ্জিন বসান ছিল। এই এঞ্জিনের উপকারিতা দেখিয়া বর্ত্তমানে প্রত্যেক মোটরকার-নির্ম্মাতা ইহা ব্যবহার করিতেছেন। মোটরকার রপ্তানীর এরূপ বিরাট বাহার আর কখনো দৃষ্ট হয় নাই।

রপ্তানীর বাহার

পোষা পশুরাজ :—

মানুষে অর্থোপার্জ্জনের জন্য গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া প্রভৃতি পালে; এবং খামার করিয়া দিয়া তাহাদিগকে যত্নে রাখে কিন্তু লোকে সিংহ পালিয়া টাকা উপার্জ্জন করে শুনিলে অবাক হইতে হয়। আমেরিকা লস এঞ্জেলেসে চার্লস্ গে ও তাঁহার স্ত্রী একটি খামার নির্ম্মাণ করিয়া, সিংহ পুষিতেছেন। কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী মাত্র ১০টি ডলার (৪০ টাকা) হাতে লইয়া লস এঞ্জেলেসে আগমন করেন এবং বার বৎসর পূর্ব্বে একটি সিংহ ও দুইটি সিংহী লইয়া এই অপূর্ব্ব ব্যবসা সুরু করেন, সম্প্রতি তাঁহার পোষা ৮০টি সিংহ, সিংহী ও শাবক আছে এবং যাদুঘরে ও সার্কাসওয়ালাদের তিনি এক শতের উপর সিংহ বিক্রয় করিয়াছেন। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ ছাড়া অন্য উপায়েও তাঁহার অর্থাগম হয়। চলচ্চিত্রের জন্য তিনি সিংহ ভাড়া দিয়া থাকেন ও সিংহ পাছু প্রত্যহ ২০০ শত টাকা ভাড়া লন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই হিংস্র জানোয়ারকে বশে রাখিতে তাঁহারা এক গাছি ছড়ি পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। সিংহ শাবকেরা ছাগলের দুধে পরিপুষ্ট হয় ও বড় হইলে মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে।

সিংহের-আদর

মোটের উপর শুধু এই ব্যবসা করিয়া তাঁহারা লাখপতি হইয়াছেন ও প্রতিদিন তাঁহাদের ধন সম্পত্তি বাড়িতেছে। একটি সিংহ শাবকের দাম ১৫০০ টাকা। আজকাল আমেরিকায় অনেকের কুকুরের ন্যায় সিংহ পোষারও বাতিক হইয়াছে, সুতরাং গে সাহেবের কারবারেরও দ্রুত উন্নতি ঘটিতেছে।

সিংহশাবক হাতে চার্লস গে ও তাঁহার স্ত্রী

পুরুষ জগদ্ধাত্রী গে সাহেব

সিংহের কুস্তীলড়া

জন্মের পরেই ঘটা করিয়া প্রত্যেকটি শাককের নামকরণ করা হয় এবং গে সাহেব গুরুমশায়ের মত তাহাদিগকে নানা ভাবে শিক্ষা দেন। শাবকদের ভার তাঁহার স্ত্রীর উপর; বড় সিংহদের তিনি নিজেই গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করেন। মোটের উপর এই অদ্ভুত লোকটি এক অদ্ভুত ভাবে অর্থোপার্জ্জনের উপায় করিয়াছেন।

গে সাহেবের পোষা কয়েকটি সিংহের ছবি দেওয়া হইল। দ্বিতীয় ছবিটিতে তিনটি শাবক লইয়া গে সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে দেখান হইয়াছে।

লণ্ডন যাদুঘরে অজগর সাপ :—

সম্প্রতি সিঙ্গাপুর হইতে একটি সুবৃহৎ অজগর সাপ লণ্ডন যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে, সাপটির দৈর্ঘ্য ২০ফুট। আটজন শক্ত লোকে এই সাপটিকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিতে যাইতেছে—ছবিতে তাহাই দেখান হইয়াছে। ছবিটি দেখিলেই সর্পরাজের দৈর্ঘ্য উপলব্ধি হইবে।

লণ্ডন যাদুঘরে অজগর সাপ

রেশমের চাদরে বুদ্ধের জীবনী :—

তিব্বতের ধর্ম্মমন্দিরে বুদ্ধ ভগবানের একটি বিরাট চিত্র ও রেশমের চাদরে তাঁহার চিত্রিত জীবনী রক্ষিত আছে। রেশমের উপর বিচিত্র কারুকায্য করিয়া বুদ্ধের জীবন চিত্র সহযোগে বর্ণিত হইয়াছে। এই

রেশমী চাদরে বুদ্ধের জীবনী
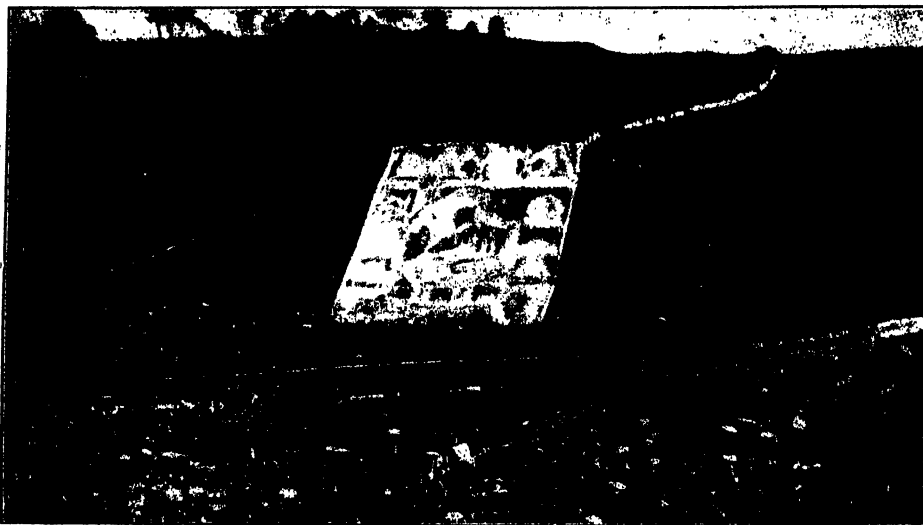
চাদর খানি আয়তনে ত্রিশ হাজার বর্গফুট। বৎসরের মধ্যে একদিন আকাশের অবস্থা বুঝিয়া লামারা এই চাদরটি পর্ব্বতের ধারে বিছাইয়া দেয় ও দলে দলে ভক্তেরা বহু দূর-দেশ হইতে ইহা দর্শন করিতে আসে, ইহাদের বিশ্বাস যে এইরূপ করিলে ভগবান বুদ্ধ খুসী হইবেন। ছবিতে সেই চাদরটি ও দর্শনার্থীদের ভিড় দেখান হইয়াছে।

—

বিচিত্র কসরৎ :—

রুষিয়ায় একদল কসাক রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচিত্র কসরৎ দেখাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে বসিয়া আরোহীরা একটি

বিচিত্র কসরৎ ৩৮

কাঠের তক্তা ধরিয়া থাকে ও এই কসাকেরা সেই ছুটন্ত তক্তার উপর নানা প্রকারের খেলা, নাচ প্রভৃতি দেখায়, এই জিনিসটি করা অত্যন্ত কঠিন ও বহু অভ্যাসসাপেক্ষ।

—

হাল ফ্যাশানের মাক্‌ড়ি :—

কান ফুঁড়িয়া দুল কি মাক্‌ড়ি পরা-কিম্বা কানকে অনাবৃত রাখা হালে বর্ব্বরতার পরিচায়ক। সুতরাং আমেরিকার আধুনিক মহিলাদের জন্য
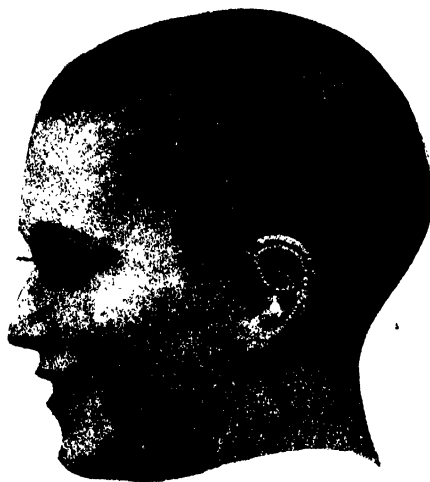
হাল ফ্যাসানের মাক্‌ড়ি

এক নূতন মাক্‌ড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ঠিক কানের মতই দেখিতে এবং কান না ফুঁড়িয়াও আট্‌কাইয়া রাখা যায়। পাশে সেই হালী মাক্‌ড়ির একটি ছবি দেওয়া হইল, আমেরিকান মহিলার চুলের বাহারও লক্ষ্য করিবার বিষয়!

লোমহর্ষণ ঃ—

ভয় বা আতঙ্কে লোমহর্ষণের কথা আমরা শুনিয়া থাকি কিন্তু আসলে লোমহর্ষণ কিরূপ হইতে পারে পাশের ছবিতে দেখুন। ওরেগের

লোম-হর্ষণ

পোর্টল্যাণ্ডে একটি মেলায় একটি ছাত্রের শরীরে ষ্ট্যাটিক বিদ্যুৎ সঞ্চার করাতে তাহার এই অবস্থা হইয়াছে।

—

নূতন ইস্পাত ঃ—

দামাস্কাসের ইস্পাত বহুকাল হইতে বিখ্যাত ছিল। সম্প্রতি ওহিওর এক বৈজ্ঞানিক দামাস্কাস ইস্পাত নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছেন। লৌহ ও কার্ব্বনের পরিমাণ তিনি বহু গবেষণার পর স্থির করিতে পারিয়াছেন।

অদ্ভুত ইস্পাত
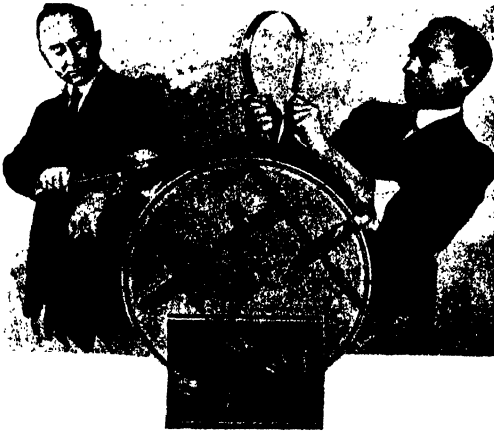
তাহার নির্ম্মিত ইস্পাত স্বচ্ছন্দে বাঁকান চোরান যায়, ক্ষুরের মতন তীক্ষ্ণধার হইতে পারে, এবং এত শক্ত যে অন্য যে কোনো ইস্পাতের পাতের ভিতর দিয়া অবলীলাক্রমে চালান যায়, এমনকি এই ইস্পাতের দ্বারা কাচ পর্য্যন্ত কাটা যায়। এই ইস্পাত-নির্ম্মাণে কিছুপরিমাণ ভ্যানেডিয়ামও ব্যবহৃত হয়। ছবিতে নানাভাবে এই ইস্পাতের গুণগুলি দেখান হইয়াছে।

—

মাকড়শার জাল ঃ—

মাকড়শার জালকে আমরা জঞ্জাল বলিয়া মনে করি কিন্তু টাইরোলের একজন সাধারণ পটো এই জঞ্জালকেই কাজে লাগাইয়াছেন। তিনি এই সূক্ষ্মজালের উপর অতীব নিপুণতার সহিত নানা প্রকারের চিত্র আঁকিয়া থাকেন, জালের সূক্ষ্মতা হেতু দুই পিঠেই ছবি পরিষ্কার দেখা যায়।

মাকড়শার জালে ছবি

সামান্য বাতাস লাগিলেই নষ্ট হয় বলিয়া তাঁহার ছবিগুলি অতি যত্নে রক্ষিত হয়। উপরের ছবিটি দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না বটে কিন্তু আসলে ইহা মাকড়শার জালের উপর অঙ্কিত।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিসন ঃ—

জন, আর, ম্যাকমোহন সাহেব লিখিয়াছেন,—৭৯ বৎসর বয়সে, সময়ের অভাবে এডিসনের বড় কষ্ট হইতেছে। তাঁহাকে ঘুমের জন্য এত সময় ব্যয় করিতে হয় যে তিনি দিনে মাত্র ১৭।১৮ ঘণ্টা কাজ করিতে পান; তাঁহার কাজের চাপ এত বেশী যে তাহার এক মুহূর্ত্তও তিনি অযথা ব্যয় করিতে পারেন না; কোনো লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। এই সময়ের অভাব দূর করিবার জন্য তিনি ঘুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঘুম জিনিষটি বাদ দেওয়া যায় কি না তাহারও পরীক্ষা চলিতেছে। এই বয়সেই তিনি একদিনে সাধারণ

লোকের দ্বিগুণ কাজ করেন এবং তাঁহার দুঃখ এই যে তিনি একদিনে তাঁহার যৌবনকালের মত সাধারণের তিন গুণ কাজ করিতে পারিতেছেন না।

এডিসনের আবিষ্কারগুলি যেমন চমৎকার আসল লোকটি আরো চমৎকার। তিনি যদি জীবনের অবশিষ্টাংশ কোনো কাজ না করিয়া কেমন করিয়া কাজ করিতে হয় এ সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদিগকে উপদেশ প্রদান করেন তাহা হইলেও আমেরিকার প্রভূত উপকার সাধিত হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গীভূত আবিষ্কারগুলির অর্দ্ধেকের জন্মদাতা এডিসন, শুধু দিনের খাওয়া পরা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেও উপকার কম হইবে না।

অরেঞ্জ, এন, জে গবেষণাগার হইতে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মনে হয় যেন একসঙ্গে মোজেস, কলম্বাস ও ডারউইনের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিলাম। ঐতিহাসিক জগতেও তিনি বর্ত্তমানের সব চাইতে প্রসিদ্ধ লোক। তাঁহার সম্বন্ধে উপকথা পর্য্যন্ত রচিত হইতেছে, তাঁহাকে অনেক স্থলে দেবতার পদে বসান হইয়াছে। তবে টম এডিসন যে বেশ সাদাসিধে সাধারণ লোক তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা লিখিতেছি। তাঁহার গবেষণাগারের কর্ম্মীদের তিনি নিত্য সঙ্গী ও বন্ধু।

টমাস এডিসন

তাঁহার চেহারা ছবিতে হয় ত সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। এখানেও তাঁহার ৭৯ বৎসর বয়সের একটি ছবি দেওয়া হইল। গম্বুজের মতো প্রকাণ্ড মাথায় বরফের মতো সাদা চুল। লালচে রঙ; কটা চক্ষুর দৃষ্টি অনির্দিষ্ট ও স্বপ্নময়। মাঝারি গোছ চেহারা, পোষাক পরিচ্ছদ খামখেয়ালী রকমের; টুপীর ব্যবহার করেন না বলিলেই হয়, গলার স্বর খুব চড়া। এডিসন যেন কারুণ্যের অবতার, শিশু-সুলভ স্বভাব, প্রায়ই অসংবদ্ধ কথা বলিয়া থাকেন এবং সব মহাপুরুষদের মতই তিনি আত্মভোলা সদাশিব গোছের লোক।

তিনি প্রায় এক হাজার আবিষ্কার পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছেন এবং তাহার অধিকাংশই মানব-সভ্যতার বহু উন্নতি সাধন করিয়াছে। এখনও তাঁহার মাথায় অনেক গুলি আবিষ্কারের মতলব আছে। আমি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একথা তাঁহার নিকট হইতে বাহির করিয়া লই। আরো আবিষ্কার নাই বা করিবেন কেন? যিনি জীবনে মানুষকে এত দিয়াও এখনো দৈনিক সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতেছেন তিনি মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারে আরো দুই একটি রত্ন উপহার দিতে না পারিবেন কেন? এবং তদ্দ্বারা আমি, আপনি, সমস্ত পৃথিবী কি লাভবান হইবে না?

শোনা যায় যে একজন ভ্রমণকারী, একজন এস্কিমো ও একজন দক্ষিণ মেরুদেশবাসীকে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সএর্ প্রেসিডেণ্টের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দুজনেই এডিসনের নাম বলিয়াছিল।

আমি তাহাকে সর্ব্বপ্রথমেই প্রশ্ন করিলাম, "আপনার কোন্ আবিষ্কারটি আপনার সব চাইতে প্রিয়?" তিনি উত্তর করিলেন, "ফনোগ্রাফ—বায়স্কোপ," মধ্যে একটি 'এবং' কিম্বা 'ও' বলিবার খেয়াল পর্য্যন্ত নাই!

অনেকেই হয়ত জানেন না যে এই অদ্ভুত বৈজ্ঞানিকই চলচ্চিত্রের জন্মদাতা। সম্ভবতঃ ১৮৮৭ সালে প্রথমে ইনিই তাহা আবিষ্কার করেন; তখন লোকে কল্পনাও করিতে পারিত না যে ছবি দিয়া 'গতি'কে প্রকাশ করা যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি ফোনোগ্রাফ ও বায়স্কোপকে পছন্দ করেন কেন?"

তিনি বলিলেন "আমি গান ভালবাসি বলিয়াই ফোনোগ্রাফকে ভালবাসি; এই যন্ত্রের আরো অনেক উন্নতি করিবার আছে। চলচ্চিত্রের দৃশ্যগুলিই অবসরকালে আমার চিত্ত বিনোদন করে। আমি যে বদ্ধকালা—শ্রবণ-সুখে বঞ্চিত।"

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে গ্রামোফোনের আবিষ্কর্ত্তা শুধু যে সঙ্গীত-প্রিয় তাহা নহে তিনি গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈয়ারীর জন্য নিজে গায়ক ও গান নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন; তাঁহার বধিরতা তাঁহাকে কিছুমাত্র দমাইতে পারে নাই। তিনি বহুদিন যাবতই বধির। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বেত্তা বেঠোফেনও নাকি জীবনের অধিকাংশকাল বধির ছিলেন। একেবারে সূর্য্য হইতে বরাবর তাপশক্তি সংগ্রহ করার সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সেই সূর্য্যযন্ত্রের কি হইল?"

তিনি সেই যন্ত্রের একটি নমুনা তৈয়ার করিয়া সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপের কিয়দংশ ধরিতে সক্ষমও হইয়াছেন।

তিনি বলিলেন " জ্বালানি দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলেই সেটি সংসারে প্রচারিত হইবে।"

কোনো হাস্যরসিক হয়ত বলিতে পারেন কয়লাখনিতে বর্ত্তমানে যেরূপ ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে তাহাতে এই যন্ত্র বাজারে চালানো দরকার। কিন্তু এটা ঠিক যে জিনিষটি অসম্ভব নহে; মরুভূমিতে কিম্বা মেঘবিহীন দিনে আমরা সূর্য্যতাপ সহজেই সংগ্রহ করিতে পারি। দৈনিক সংবাদপত্রের খবর যদি সত্য হয় গত গ্রীষ্মকালে ওয়াসিংটনের ফুটপাতের উপরে সূর্য্যতাপে একটি ডিম সিদ্ধ করা হইয়াছিল। এই যন্ত্রের নামে আমরা এখন হাসিতে পারি কিন্তু আমাদের পরবর্ত্তীয়েরা হয়ত আমাদেরই অজ্ঞতায় হাসিবে —. ......

[মিঃ ম্যাকমোহন তাঁহাকে তাঁহার অন্যান্য গবেষণা বিষয়ে আরো অনেক প্রশ্ন করেন ও তাহার যথাযথ উত্তর পান। তাঁহার অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের আরো দুই একটি তুলিয়া দিতেছি।]

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সম্প্রতি কি কোনো নূতন আবিষ্কারে মন দিয়াছেন?"

তিনি বলিলেন; "অনেক গুলিতে, মাছ ডাঙ্গায় না তোলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, জানিতে পারিবে।"

"কোন্ নূতন আবিষ্কার এখন পৃথিবীর সব চাইতে কাজে লাগিবে?"

"যতদিন পর্য্যন্ত অধুনা-আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলি ঠিকভাবে ব্যবহার করিবার মত বুদ্ধিশক্তি মানুষ না লাভ করিবে ততদিন নূতন আবিষ্কারের প্রয়োজন নাই।"

এডিসনের এ উত্তর একটু কঠোর এবং তাঁহার নিজের কাজের সঙ্গেও এই কথার সামঞ্জস্য নাই কারণ তিনি এখনও পৃথিবীকে নূতন জিনিষ দিতে চেষ্টা করিতেছেন……

আমি মিঃ এডিসনকে তাঁহার বর্ত্তমান পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন "আমি খুব কম পরিমাণে আহার করি। সামান্য এক্ টুকরা রুটি হইতে যে কত অধিক পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আর কি খাই? দেড় গ্লাস দুধ, বড় চামচের এক চামচ তৈরী ওট; প্রত্যেক বেলায় একটি করিয়া সার্ডিন মাছ। ওজন সমান আছে—১৮৬ পাউণ্ড।"

ইহাই তাঁহার খাদ্য তালিকা এবং তিনি দুই বেলা দিনের পর দিন ইহাই খাইয়া থাকেন। প্রত্যহ নিজেকে ওজন করার তাঁহার এক বাতিক আছে এবং এই ওজনের কম বেশী হিসাবে তিনি খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া কমাইয়া থাকেন।

"বর্ত্তমানের কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "কোনো কাজের নহে।"

তাঁহার গবেষণাগারে স্কুল কলেজে শিক্ষা পায় নাই এমন সব লোকদের কার্য্য ও কলেজের শিক্ষিত ছাত্রদের কার্য্য দেখিয়া তিনি কলেজের শিক্ষার বিরোধী হইয়াছেন।

"সৃজনীশক্তির উৎকর্ষতা লাভ করিতে হইলে যুবকদের কি করা আবশ্যক এ সম্বন্ধে আপনি কিছু উপদেশ দিন।"

এডিসন গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "যুবকেরা উপদেশ চাহে না। এবং সৃজনীশক্তি পরিশ্রম দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গত পঞ্চাশ বছরে মানুষের কি মানসিক ক্ষমতার উন্নতি হইয়াছে?"

তিনি বলিলেন "হঁ্যা, প্রত্যেকজাতির ভিতর সাধু, সৎ ও বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা অল্পে অল্পে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সংখ্যাধিক্যই আমাদের সভ্যতার পরিমাপ; তবে ভগবান বোধ হয় খুব ধীর উন্নতির পক্ষপাতী।"

"নূতন নূতন যন্ত্র-সাহায্যে, সূর্য্য, সমুদ্র ও নদী এবং আণবিক-শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া মানুষ কি চরম সাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে?"

এডিসন উত্তর করিলেন "যন্ত্র আবিষ্কারের শেষ নাই। মানুষের শারীরিক ক্লেশ দিনে দিনে কমিতেছে।"—

মাতেও ফাল্‌কোনে*

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

কর্সিকার পোর্টো-ভেট্‌চো বন্দর থেকে বেরিয়ে যদি উত্তর-পশ্চিম মুখে বরাবর ভিতর দিকে যাও, তা হ'লে মনে হবে জমিটা হঠাৎ উঁচু হতে আরম্ভ করেছে; বড়-বড় পাথরের ঢিপি আর গভীর 'খদ' পার হ'য়ে, প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে' আঁকা-বাঁকা পথ হেঁটে যেখানে এসে পৌছবে, সেখান থেকে এক রকম জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে—দেশী ভাষায় তাকে 'মাকী' বলে। যারা ভেড়া চরিয়ে দিন গুজরান করে তারাই এখানে বাস করে,আবার যারা ফেরারী আসামী তাদেরও আড্ডা এইখানে। এরকম জঙ্গল হওয়ার একটু কারণ আছে। ও-দেশের চাষারা বনে আগুন লাগিয়ে জমিতে সার দেয়। ফসল কেটে নেওয়ার পর যে-সব গাছের শিকড় মাটিতে থেকে যায়, অথচ মরে না, সেইগুলো থেকে পরের বছর মোটা-মোটা ডাল গজিয়ে কিছু কালের মধ্যেই সাত-আট ফুট উঁচু হয়ে ওঠে। এই রকমের ঝোপ-জঙ্গলকেই 'মাকী' বলে। হরেক রকমের গাছ গুল্ম লতা এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে' এমন ঘন হয়ে ওঠে যে, একখানা দা' হাতে না করে' কেউ এর ভিতর পা বাড়াতে পারে না, জায়গায়-জায়গায় ঝোপ এত বেশি যে বুনো ছাগলও তার ভিতর ঢুক্‌তে পারে না।

যারা মানুষ খুন করে তারাও এই 'মাকী'তে এসে বাস করে; একটা ভালো বন্দুক, কিছু বারুদ আর গুলি থাক্‌লেই হ'ল, আর তার সঙ্গে চাই একটা লম্বা আংরাখা, আর মাথায় দেবার কাপড়—তা'তে পেতে-শোওয়া আর গায়ে-ঢাকা-দেওয়া, দুই কাজই চলে। যারা ভেড়া চরায় সেই সব রাখালেরা দুধ, পনির আর চেষ্ট্‌নাট্ ফল দিয়ে যায়। এখানে আইনের ভয় নেই, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনও এত দূর ধাওয়া করতে পারে না। কেবল, যখন গুলি-বারুদের পুঁজি ফুরিয়ে যায়, তখন শহরে যেতে হ'লে একটু বিপদের ভয় আছে।

আমি যখন কর্সিকায় ছিলাম, তখন মাতেও ফাল-

* ফরাসীলেখক Prosper Mériméeর ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে।

কোনে বলে' একটি লোক এই 'মাকী' থেকে মাইল দেড়েক দূরে বাস করত। ও অঞ্চলের মধ্যে লোকটার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলতে হবে, কারণ তার খেটে খেতে হ'ত না। বিস্তর ভেড়া ছিল, সেইগুলোকে একরকম বেদে-জাতের রাখাল দিয়ে পাহাড়ের এখানে সেখানে চবিয়ে—তাইতে লোকটার বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেত। যে ঘটনাটির কথা বলতে যাচ্ছি, তার প্রায় দু'বছর পরে লোকটাকে দেখি,—তখন তার বয়েস বড় জোর পঞ্চাশ; বেশ বেঁটে-খাটো জোয়ান চেহারা, চুলগুলি ঘন আর মিশ-কালো, চোখ যেমন বড় তেমনি দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ, গায়ের রং জুতোর চামড়ার মতন কটা। সে-দেশে পাকা শিকারীর অভাব নেই, সে-দেশেও এই লোকটার বন্দুক-শিক্ষা একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার ছিল। সে কখনো ছর্‌রা দিয়ে বুনোছাগল শিকার করত না—একশো কুড়ি হাত দূর থেকে সে, জানোয়ারটার মাথায় বা কাঁধে যেখানে খুসী গুলি বসিয়ে দিয়ে, তাকে পেড়ে ফেল্‌ত। আবার তার বন্দুক দিনে রাতে সমান চল্‌ত। তার ওস্তাদীর এই প্রমাণ, যাঁরা কখনো কর্সিকায় যাননি, তাঁরা বিশ্বাস করবেন না। প্রায় আশী হাত তফাতে একখানা প্লেটের সমান এক টুক্‌রো গোল কাগজ আট্‌কে রেখে তার পিছনে একটা বাতি জ্বালা হ'ল। তারপর, মাতেও লক্ষ্য ঠিক্ করলে পর বাতিটা নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। মিনিট খানেক পরে সেই ঘোর অন্ধকারে সে গুলি ছুড়বে—যদি চার বার ছোড়ে, অন্ততঃ তিনবার সে সেই কাগজটাকে ফুটো করবে।

এহেন ক্ষমতা যার আছে, তার পশার প্রতিপত্তি একটু বেশি হবারই কথা। লোকে বল্‌ত, মাতেও বন্ধুর পক্ষে যেমন ভালো, শত্রুর পক্ষে তেমান যম। সে লোকের উপকার করত যেমন, তেমনি তার হাত ছিল দরাজ। পোর্টো ভেট চোর আশপাশের সকলের সঙ্গে সে নির্ব্বিবাদে বাস করত। তার কেবল একটা দুর্নাম ছিল। যে গাঁয়ে সে বিয়ে করেছিল সেখানে এক দুর্দ্দান্ত লোক তার প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই লোকটাকে সে নাকি জোর করে সরিয়ে দিয়ে নিজের পথ খোলসা করে। লোকের বিশ্বাস,—সেই প্রতিপক্ষটি একদিন একখান আয়না নিয়ে জান্‌লায় ব'সে যখন ক্ষৌরী করছিল, তখন হঠাৎ কোথা থেকে একটা যে গুলি এসে তাকে লাগে—সে নাকি মাতেওর কাজ। ব্যাপারটা যখন চাপা পড়ে' গেল, তখন মাতেও বিয়েটা সেরে ফেল্‌লে। তার স্ত্রী জিসেপা প্রথমে পর-পর তিনটি মেয়ে প্রসব করায় সে ভারী চটে গিয়েছিল; তার পর যখন শেষে একটি ছেলে হ'ল, তখন মহা খুসী হয়ে তার নাম রাখ্‌লে, 'ফর্চুনাতো'—সে হ'ল তার বংশের বাতি, সে যে তার বাপ-দাদার নাম বজায় রাখ্‌বে। মেয়েগুলির বিয়ে সে ভালোই দিয়েছিল—বিপদে আপদে জামাইদের ছোরা-বন্দুকের সাহায্য পাওয়াটা নিশ্চিত। ছেলেটির বয়েস তখন দশ, কিন্তু এর মধ্যেই সে বেশ চালাক চতুর হয়ে উঠেছে।

তখন শরৎকাল। সেদিন মাতেও খুব সকাল সকাল স্ত্রীকে সঙ্গে করে', জঙ্গলের মাঝে মাঝে যে সব ফাঁকা জমি আছে, তারি একটাতে ভেড়ার তদারক করতে বেরিয়ে গেল। ফর্চুনাতো সঙ্গে যাবার জন্যে আবদার করেছিল, কিন্তু সে মাঠটা নাকি একটু বেশি দূর, তাছাড়া, বাড়ীতেও একজনের থাকা দরকার, তাই বাপ রাজী হয়নি। এই রাজী-না-হওয়াটা যে কতখানি আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা একটু পরেই বোঝা যাবে।

মাতেও তখন ঘণ্টাকতক হবে বেরিয়ে গেছে। ফর্চুনাতো বাইরে রোদ্দুরে চুপচাপ চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবছে—এই রবিবারে, তার যে-কাকা কর্পোরাল তাঁর বাড়ী বেড়াতে যাবে। এমন সময় হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনে তার ভাবনা ঘুরে গেল। ঝাঁ করে' দাঁড়িয়ে উঠে, মাঠের যেদিকটা থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও গোটাকতক আওয়াজ হ'ল—ঠিক পর-পর না হ'লেও সেগুলো যেন ক্রমশঃ আরও কাছে শোনা যেতে লাগল। শেষকালে, মাঠ থেকে তাদের বাড়ীর দিকে আস্‌বার যে রাস্তা, তার উপর একটা মানুষের মূর্ত্তি দেখা গেল। পাহাড়ীরা যে রকম টুপী পরে, তার মাথায় সেই রকম চুড়ো-ওলা টুপী, দাড়ী আছে, কাপড়-চোপড় বেজায় ছেঁড়া; লোকটা

বন্দুকের উপর ভর করে অতি কষ্টে এগিয়ে আস্‌ছে, তার উরুতে এই মাত্র একটা গুলি ঢুকেছে।

লোকটা একজন ফেরারী। রাত্রে শহরে গিয়েছিল বারুদ আন্‌তে, পথে একদল সর্‌কারী পাহারা-সৈন্যের ঘাঁটির সাম্‌নে পড়ে গিয়েছিল। রীতিমত লড়াই করে' তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তারা বরাবর পিছু নিয়েছে; তাই গুলি চালাতে চালাতে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে পড়ে' এতখানি পথ এসেছে। এখন তারাও খুব কাছে এসে পড়েছে, আর এদিকে বেচারার পাও জখম হয়ে গেছে, তাই ধরা পড়বার আগেই 'মাকী'তে পৌছনো এখন অসম্ভব।

সে ফর্চুনাতোকে দেখে তার কাছে এসে বল্‌লে, "তুমি মাতেও ফালকোনের ছেলে না?"

"হ্যাঁ"

"আমার নাম জানেত্তো সান্ পিয়েরো। আমায় শিগগির কোনোখানে লুকিয়ে ফ্যালো—পাহারা-সৈন্য আমায় তাড়া করেছে, আমার আর একটুও চল্‌বার ক্ষমতা নেই।"

"বাবাকে জিজ্ঞেস না করে' ত কিচ্ছু করতে পারিনে।'

"তোমার বাবা তাতে রাগ কর্‌বে না, বরং বল্‌বে—তুমি ঠিকই করেছ।"

"তা বলা যায় না।"

"শিগ্‌গির লুকিয়ে ফ্যালো—ওরা এল বলে'!"

"একটু দাঁড়াও না, বাবা আগে আসুক।"

"দাঁড়াব কি! কচুপোড়া খেলে যা!—ওরা যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে! শিগগির লুকো' আমাকে, নইলে খুন করব।"

ফর্চুনাতো বেশ ধীর নির্ব্বিকার ভাবে বল্‌লে—

"তোমার বন্দুক ত' ঠাসা নেই, থলিতেও একটা টোটা দেখছিনে।"

"তুমি ত বাপু মাতেও ফাল্‌কোনের ছেলে নও! বাড়ীর দরজা থেকে আমায় ধরিয়ে দেবে?"

কথাগুলো শুনে ছেলেটার প্রাণে যেন একটু লাগল, তাই এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, তোমায় যদি লুকিয়ে রাখি ত কি দেবে বল?"

তখন লোকটা তার কোমরে যে চামড়ার গেঁজেটা ঝুল্‌ছিল তার ভিতর হাত চালিয়ে দিলে, দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে একটি পাঁচ-ফ্রাঙ্ক টাকা বের করলে—সেটা বোধ হয় তার বারুদ কেন্‌বার টাকা। তাই দেখে ফর্চুনাতোর মুখখানা হাসি-হাসি হয়ে উঠল। সে খপ করে টাকাটা জানেত্তোর হাত থেকে নিয়ে বল্‌লে—"কিছু ভয় নেই তোমার।"

—তখনি বাড়ীর পাশে যে খড়ের গাদাটা ছিল তার মধ্যে একটা মস্ত গর্ত্ত করে ফেল্‌লে। জানেত্তো তার ভিতর আসন-পীড়ি হ'য়ে বস্‌ল। ছেলেটা তাকে এমন করে' ঢেকে দিলে, যাতে নিঃশ্বাস নেওয়ার একটু পথ থাকে, অথচ বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে না, যে একটা মানুষ তার ভিতর লুকিয়ে আছে। এই সঙ্গে তার মাথায় একটা খুব পাকা রকমের দুষ্টবুদ্ধি জোগাল—সে একটা বাচ্ছা-সমেত ধাড়ী-বেড়াল নিয়ে এসে খড়ের উপর চাপিয়ে দিলে, দেখলেই মনে হবে, খড়গুলো অন্ততঃ কিছুকাল নাড়াচাড়া করা হয়-নি। তার পর বাড়ীর কানাচে, পথের উপর যে সব রক্তর দাগ ছিল, তার উপর বেশ করে' ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে—সে আগে যেমন করে' শুয়েছিল—তেমনি রোদ্দুরে হাত-পা ছড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।

মিনিট কতক পরেই, হল্‌দে-কুর্ত্তি-পরা ছ'জন সৈনিক আর তাদের সঙ্গে একজন হাবিলদার মাতেওর বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল। এই কর্ম্মচারীটির সঙ্গে মাতেওর কি একটা দুর-সম্পর্ক ছিল। সকলেই জানেন, কর্সিকায় আত্মীয়-সম্পর্কের জের যতদুর টেনে চলে, এমন আর কোথাও নয়। লোকটার নাম তিয়োদোরো গাম্বা; খুব কাজের লোক, ডাকাতরা তাকে ভারী ভয় করে—সে তাদের অনেককেই গ্রেপ্তার করেছে।

ফর্চুনাতোকে দেখেই সে বলে' উঠল, "কি ভাগ্যে, ভালো ত?—আরে, এরি মধ্যে বেশ বড়-সড় হ'য়ে পড়েছিস্ যে!—এখখুনি এখান দিয়ে একটা লোককে যেতে দেখেছিস্?"

"কই মামু, তোমার মতন বড় এখনো হইনি ত?"

"হবি বৈকি, ক্রমেই হবি!—এখান দিয়ে একটা লোককে যেতে দেখেছিস্?"

"একটা লোককে যেতে দেখিছি ?"

"হ্যাঁরে হ্যাঁ ! তার মাথায় একটা চুড়ো-ওলা টুপী, গায়ে লাল আর হল্‌দে রঙের ফতুয়া।"

"মাথায় চুড়ো-ওলা টুপী, গায়ে একটা লাল আর হল্‌দে রঙের ফতুয়া ?"

"ওরে হ্যাঁ !—বল্‌ না শিগগিরি ! কেবল আমার কথাগুলোই আওড়ায় দ্যাখো !"

"আজ সকালে আমাদের পাদ্রীমশাই এইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন বটে,—সেই যে তাঁর 'পিয়েরো' বলে' ঘোড়াটা ?—তারই উপর চড়ে'। আমাকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—তোর বাবা কেমন আছে রে ? আমি বল্‌লাম..."

"নে নে, তোর ন্যাকামী এখন রাখ ! জানেত্তো কোনদিকে গেল তাই বল দিকি ? আমরা তারই খোঁজে এসেছি—সে নিশ্চয় এই দিক দিয়ে গেছে।"

"তার আমি কি জানি ?"

"তুই কি জানিস ! তুই তাকে নিশ্চয় দেখেছিস্‌।"

"মজার লোক ত ! লোকে ঘুমিয়ে থাক্‌লে—রাস্তা দিয়ে কে কোথায় গেল তার খোঁজ রাখে বুঝি ?"

"ওরে ছুঁচো ! তুমি ঘুমুচ্ছিলে বটে ? আমার বন্দুকের আওয়াজ শুনেও জেগে ওঠনি ?"

"ওঃ ! তাই বুঝি মামু !—তুমি মনে কর তোমার বন্দুকের বড্ড আওয়াজ ? আমার বাবার বন্দুকের আওয়াজ কখনো শোননি বুঝি ?"

"ব্যাটা কি বজ্জাত !—জানেত্তোকে তুই না দেখে থাকিস ত কি বলেছি ! হয়ত তুইই তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিস্‌ !—ভাই সব ! তোমরা এসো ত আমার সঙ্গে, একবার বাড়ীর ভিতরটা খুঁজে দেখা যাক—কোথাও আছে কি না। ব্যাটা ত শেষটায় একপায়ে হাঁটছিল—এমন অবস্থায় সে যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে 'মাকী' পর্য্যন্ত যাবে, তেমন বোকা সে নয়। তা ছাড়া রক্তর দাগ ত এইখানে এসে শেষ হয়েছে।"

ফর্চুনাতো এবার যেন খুব খুশী হয়ে বলে' উঠল, "আচ্ছা বেশ ত ! বাবা এখন নেই—জোর করে' বাড়ীতে ঢোক' না দেখি। বাবা এসে যখন শুনবে, তখন ?"

এবার গাম্বা তার কাণটা ধরে' বল্‌লে, "শয়তান ! জানিস্‌, এখুনি ইচ্ছে করলে তোর বোল ফিরিয়ে দিতে পারি ? তলোয়ারের পিঠটা দিয়ে ঘা কতক দিলেই সত্যি কথা বল্‌বার পথ পাবিনে।"

তবুও ফর্চুনাতো মজা দেখবার জন্যে বলে উঠল, "হুঁ, আমার বাবার নাম মাতেও ফাল্‌কোনে।"

"তবে রে উল্লুক !—জানিস্‌, তোকে এখ্‌খুনি চালান করে' দিতে পারি ? জানেত্তো কোথায় আছে যদি না বলিস্‌, তা'হলে তোর পায়ে শিকল দিয়ে গারদে পুরে, খড়ের বিছানায় শুইয়ে রাখব, শেষে মাথাটি দেব উড়িয়ে।"

শাসনের এই ভঙ্গি দেখে ছেলেটা হো হো করে' হাস্‌তে লাগল, বল্‌লে—"আমার বাবার নাম মাতেও ফাল্‌কোনে।"

তখন সৈনিকদের মধ্যে একজন দলপতির কাণে কাণে বল্‌লে, "কাজ নেই কর্ত্তা, মিছিমিছি মাতেওর সঙ্গে ফ্যাসাদ বাধিয়ে।"

গাম্বা যে ভারী মুশকিলে পড়েছে তা কারু বুঝতে বাকি রইল না। এর মধ্যে লোকগুলো যখন বাড়ীর ভিতর থেকে ঘুরে এল, তখন সে তাদের নিয়ে চুপি চুপি পরামর্শ কর্‌তে লাগল। বাড়ীর ভিতরটা ঘুরে আস্‌তে বেশীক্ষণ লাগেনি, কারণ কসিকায় বাড়ী বল্‌তে কেবল একখানা বড় চারকোণা ঘর। আসবাবের মধ্যে একটা টেবিল, খানকতক বেঞ্চি, গোটা তিন-চার সিন্দুক, কিছু তৈজস-পত্র, আর শিকারের অস্ত্রশস্ত্র ! ফর্চুনাতো তখন খড়ের গাদার পাশে দাঁড়িয়ে বেড়ালটার গা চাপড়াচ্ছিল,—মামু আর মামুর দলবলের এই দুর্গতি দেখে তার ভারী ফুর্ত্তি

একজন সৈনিক খড়ের গাদাটার কাছে এসে দাঁড়াল, দেখলে তার উপর একটা বেড়াল রয়েছে, তবু খড়ের ভিতর বেয়োনেটের একটা খোঁচা দিয়ে—কাজটা যে কত অনাবশ্যক ও হাস্যকর তাই ভেবে—নিজেই বিরক্তি প্রকাশ করলে। ভিতরে কিছুই নড়ে' উঠল না, ছেলেটার মুখেরও একটু ভাবান্তর হ'ল না।

তখন সকলেই হতাশ হয়ে, যাত্রাটাই অশুভ বলে' দুঃখ কর্‌তে লাগল। সকলেই আবার মাঠের দিকে ফিরে যাবার উদ্যোগ কর্‌ছে, এমন সময় দলপতির মাথায় একটা

ফন্দি জুটে গেল। ভয় দেখিয়ে ত' কিছু হ'ল না, এখন আদর করে' আর লোভ দেখিয়ে যদি কিছু হয় তারি একটা শেষ চেষ্টা করা যাক না। তখন ফর্চুনাতোকে সে বল্‌লে,

'বাপধন! তুমি ত একটি পাকা ঘুঘু হ'য়ে উঠেছ দেখ্‌ছি—এর পর তুমি একটা সামান্য লোক হবে না! তবে, আমার সঙ্গে এই যা' করছ, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। মাতেও আমার কুটুম্বু, তাকে চটাবার ভয়ে কিছু করতে পারছিনে, নইলে, কোন্‌ শালা আজ তোমাকে এইখান থেকে পাকড়ে নিয়ে না যেত!"

"বা রে!"

আচ্ছা, মাতেও ফিরে' আসুক, তার পর দেখাচ্ছি তোমাকে। এইসব মিথ্যা কথা বলার দরুণ এমন চাবুক খাবি, যে পিঠে রক্ত ফুটে বেরুবে।"

"আমার কথা যদি শোনো মামু, তবে এখানে বসে' বসে' সময় নষ্ট কোরো না; এই বেলা বেরিয়ে পড়; নইলে, জানেত্তো যদি একবার 'মাকী'তে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তখন আর তাকে খুঁজে বার করে' ধরা তোমার সাধ্যিতে কুলোবে না।"

তখন দলপতি পকেট থেকে একটা রূপোর ঘড়ি বার করলে, তার দাম খুব কম হ'লেও পঞ্চাশ টাকা। তাই দেখে ফর্চুনাতোর চোখ দুটো একটু ডাগোর হ'য়ে উঠেছে লক্ষ্য করে', সে তার চেনটা ধরে' দোলাতে-দোলাতে বল্‌লে—

"কি বলিস্‌ রে ছোঁড়া! এই রকম ঘড়ি একটা গলায় ঝুলিয়ে বেড়াতে কেমন লাগে? তা হ'লে, পোর্টো ভেট্রোতে গিয়ে, রাস্তায়-রাস্তায়, মাথাটা উঁচু করে' বেড়াস্‌, না? লোকে জিজ্ঞেস করবে 'কটা বেজেছে মশাই?' আর তুই অমনি গম্ভীর হ'য়ে বল্‌বি, 'দেখনা আমার ঘড়িতে।'"

"আমি যখন বড় হ'ব, আমার কাকা আমায় একটা ঘড়ি দেবে বলেছে।"

"বটে! তা' তোর খুড়তুত ভাই ত এর মধ্যেই একটা ঘড়ি পেয়ে গেছে—এত ভালো ঘড়ি নয় যদিও, তবু তুই ত' এখনো পাস্‌নি, সে তোর চেয়ে কত ছোট!"

শুনে ছেলেটা একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

"সে যা' হোক গে। এখন বল্‌দিকিন, ঘড়িটা তোর বেশ পছন্দ হয় কি?"

বেড়ালকে একটা আস্ত মুরগীর ছানার লোভ দেখালে, তার যে ভাবটা হয়, ফর্চুনাতোর ঠিক তাই হ'ল—সে কেবল আড়-চোখে ঘড়িটার পানে চাইতে লাগল। বেড়াল ঠাট্টা মনে করে' থাবা বাড়াতে ভরসা করেনা, আবার পাছে লোভটা বেশী হয়ে পড়ে বলে' মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে নেয়; কিন্তু ক্রমাগত জিভ দিয়ে মুখ চাটতে থাকে, আর যেন মনিবকে বল্‌তে থাকে—"এ কিরকম নিষ্ঠুর ঠাট্টা তোমার?"

কিন্তু এক্ষেত্রে দলপতি গাম্বা সত্যি-সত্যিই ঘড়িটা তাকে দিতে চাইছে। ফর্চুনাতো হাত বাড়ালে না বটে, তবু একবার বল্‌লে "ঠাট্টা কর কেন!"

"ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি, ঠাট্টা নয়। শুধু, জানেত্তো কোথায় আছে বলে' দিলেই ঘড়িটা তোকে দিয়ে দেবো।"

ফর্চুনাতো তাই শুনে' অবিশ্বাসের হাসি হাস্‌লে। সে দলপতির চোখের ভিতর কি যেন বেশ করে' দেখে নিতে লাগ্‌ল—অর্থাৎ তার কথায় যে বিশ্বাসের ভাব আছে, তার চোখেও তাই আছে কি না।

তখন দলপতি বলে' উঠ্‌ল,

"আমি যদি আমার কথা না রাখি, তা' হলে চাকরিতে আমার যেন অধঃপতন হয়। এই সব আমার লোকেরাই সাক্ষী রইল, যা বলেছি তা' আর ঘুরিয়ে নেওয়ার যো নেই।—বল্‌তে বল্‌তে ঘড়িটা তার মুখের এত কাছে নিয়ে গেল যে, প্রায় তার গালে ঠেকবার মত হ'ল। তার গাল দু'খানা তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ছেলেটার প্রাণে তখন, ধর্ম্ম আর লোভ—এই দু'য়ের লড়াই চলেছে। বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে, গলার স্বরও যেন বন্ধ হয়ে' আস্‌ছে। এদিকে ঘড়িটা তার চোখের ঠিক উপরেই দুল্‌ছে, এক-এক বার ঘুরতে-ঘুরতে নাকের ডগায় এসে ঠেক্‌ছে। শেষকালে তার ডানহাতখানা একটু-একটু করে' ঘড়িটার দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তারপর আঙুলের ডগা দিয়ে সেটা ছুঁয়ে রইল, ক্রমে ঘড়িটার সব ভারটুকু তার হাতের উপর পড়্‌ল—তখনও দলপতি চেনটা

ছেড়ে দেয়নি। ঘড়ির মুখটা নীল, ডালাটি সদ্য পালিশ-করা—রোদ্দুর লেগে দপ-দপ করে' জ্বলে' উঠল। লোভ আর সাম্‌লানো গেল না।

ফর্চুনাতো তখনও খড়ের গাদায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বার শুধু বাঁ-হাতটা তুলে' বুড়ো-আঙুল দিয়ে পিঠের দিকে ইসারা কর্‌লে। দলপতি তখ্‌খুনি বুঝে নিলে—সঙ্গে-সঙ্গে ঘড়ির চেনটাও ছেড়ে দিলে। এতক্ষণে ফর্চুনাতোর বিশ্বাস হ'ল যে ঘড়িটা তারই বটে। তড়াক করে' একটি লাফ দিয়ে সে খড়ের গাদাটা থেকে দশ হাত সরে' দাঁড়াল, কারণ সৈনিকরা এর মধ্যেই সেটাকে ভেঙ্গে ফেল্‌তে সুরু করেছে।

একটু পরেই খড়গুলো নড়তে লাগল, আর অম্‌নি ভিতর থেকে একটা রক্তাক্তদেহ পুরুষ বেরিয়ে এল—তার হাতে একখানা ছোরা। উরুতের রক্ত জমাট হয়ে ঘা-টা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, তাই দাঁড়াতে গিয়ে সে পড়ে গেল। তখন দলপতি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' অস্ত্রখানা হাত মুচড়ে কেড়ে নিলে। খুব ধ্বস্তাধ্বস্তি করা সত্ত্বেও তাকে আচ্ছা করে' বেঁধে ফেলা হ'ল।

জানেত্তো যেন এক-আঁটি কাঠের মত বাঁধা-অবস্থায় প'ড়ে আছে, এমন সময় ফর্চুনাতো তার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে, চেয়ে বল্‌লে—

"—র বাচ্ছা!"—কথাটায় রাগের চেয়ে ঘৃণাই ছিল বেশি। ছেলেটা তখন ভাবলে, টাকাটা আর রাখা ঠিক নয়, তাই সেটা সে ছুড়ে ফেলে' দিলে। লোকটা কিন্তু সেদিকে ফিরেও চাইলে না। সে তখন খুব সহজ গলায় দলপতিকে ডেকে বল্‌লে—

"ভাই গাম্বা, আমি ত' আর হাঁটতে পার্‌ব না, আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।"

গাম্বা এখন বিজয়ী, তাই নির্দ্দয়—কথাটা শুনে সে বলে' উঠল—

"কেন?—এই একটু আগে ত বুনো-ছাগলের মত ছুট্‌ছিলে! আচ্ছা, তা হ'বে এখন, ভাবনা নেই। তোমাকে ধরে' আজ যে-রকম আহ্লাদ হয়েছে, তাতে নিজেই তোমাকে কাঁধে করে' দশ ক্রোশ পথ নিয়ে যেতে পারি, একটুও কষ্ট হবে না। আচ্ছা, ভায়া, তার আর কি?—ডাল-পালা দিয়ে একখানা খাটুলি না হয় বানিয়ে নেওয়া যাবে, তারপর ক্রেস্‌পলিতে পৌঁছে একটা ঘোড়া নিলেই হবে।"

"সেই ভালো, আর দেখ—খাটুলিতে চারটি খড় বিছিয়ে দিও, তাতেও একটু আরাম পাব।"

সৈনিকেরা যখন নানান কাজে ব্যস্ত—কেউ জানেত্তোর পায়ের ঘা বেঁধে পরিষ্কার করে' দিচ্ছে, কেউ চেষ্ট্‌নাট্ গাছের ডাল কেটে খাটুলি বাঁধছে—সেই সময়, 'মাকী'তে যাবার যে পথ, তারি মোড়ের মাথায় হঠাৎ মাতেও আর তার স্ত্রীকে আস্‌তে দেখা গেল। স্ত্রী আস্‌ছে আগে-আগে—একটা প্রকাণ্ড চেষ্ট্‌নাট ফলের বস্তা ঘাড়ে করে' সে ঝুঁকে পড়েছে; তার স্বামী বেশ সোজা হয়ে' গট্-গট্ করে' পিছন-পিছন আস্‌ছে—একটা বন্দুক তার হাতে, আর একটা পিঠের উপর ঝুলিয়েছে। সে বোধ হয় মনে করে যে, পুরুষ-মানুষের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর কোনোরকম বোঝা বওয়া বড়ই লজ্জাকর।

দূর থেকে সৈন্যদের দেখে মাতেওর প্রথমটা মনে হ'ল, তাকেই বুঝি গ্রেপ্তার কর্‌তে এসেছে। কিন্তু ঐরকম মনে হওয়ার কারণ কি? সে ত কোনো বে-আইনি কাজ করেনি। এবিষয়ে তার বরং সুনামই আছে। কিন্তু লোকটা জাতে যে কর্সিকান! এই পাহাড়ী জাতটার মধ্যে এমন মানুষ খুব কমই আছে, যার মন হাতড়ালে একটা-না-একটা ছোরা-ছুরির ব্যাপার উঁকি দেয় না। অবিশ্যি আর পাঁচজনের তুলনায় মাতেওর মনটা অনেকটা সাঁচ্চা বৈকি, কারণ মানুষ-মারা কাজ সে এই দশ বছরে আর একটিও করেনি। তবু বলা যায় কি? যদিই ব্যাপারটা সেরকম কিছু দাঁড়ায়, তার জন্যে গোড়া থেকে একটু সাবধান হওয়ায় দোষ কি? তাই জিসেপাকে ডেকে বল্‌লে—

"গিন্নী, থলেটা এখন নাবাও, নাবিয়ে তৈরী হ'য়ে নাও।"

স্ত্রী তখনি সে আদেশ পালন করলে। পাছে নিজের কোনও অসুবিধে হয় বলে' সে তার কাঁধের বন্দুকটা স্ত্রীকে ধর্‌তে বল্‌লে। তারপর যে-বন্দুকটা হাতে ছিল তার ঘোড়া তুলে, আস্তে-আস্তে গাছগুলোর আড়াল দিয়ে

বাড়ীর পানে এগুতে লাগল; এমন সতর্ক হয়ে রইল, যে শত্রুতার একটু আভাস পেলেই, যে-গাছটার গুঁড়ি সবচেয়ে মোটা তার আড়াল থেকে গুলি চালাতে থাকবে। স্ত্রী ঠিক পিছন পিছন আস্‌তে লাগ্‌ল—তার হাতে বাড়্‌তি বন্দুকটা আর টোটার বাক্স। সতী স্ত্রীর কাজই হচ্ছে—যুদ্ধের সময় স্বামীর বন্দুকে টোটা ভর্ত্তি করে' দেওয়া।

এদিকে মাতেওর এই ভাব দেখে দলপতির বড় ভাবনা হ'ল। সে ভাবতে লাগল—

"জানেত্তো যদি মাতেওর কোনোরকম জ্ঞাতি বা বন্ধু হয়, আর যদি সে তাকে রক্ষা করতে চায়, তাহ'লে ওই দুই বন্দুকের দুই গুলি আমার দলের দুটিকে এসে পৌঁছবে —একেবারে ডাকের চিঠির মতন! আর যদি কুটুম্বিতা অগ্রাহ্য করে আমাকেই লক্ষ্য ক'রে—"

—তখন এই বিপদে সে একটা অসমসাহসের সঙ্কল্প করলে; নিজেই একা এগিয়ে গিয়ে মাতেওকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সবকথা খুলে বলাই যুক্তিসঙ্গত বলে' মনে হ'ল। কিন্তু দু' জনের মাঝখানে সেই অল্প পথটুকুও তখন ভয়ানক লম্বা বলে' বোধ হ'তে লাগল।

"আরে এই যে! শুনছ হে ভায়া! বলি, কেমন আছ বন্ধু? আমি গাম্বা—তোমার কুটুম্বু হে!"

মাতেও কথা না কয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যতক্ষণ এ লোকটা চেঁচাচ্ছিল, ততক্ষণ সে আস্তে-আস্তে বন্দুকের নলটা উঁচু করতে লাগল, শেষে যখন লোকটা কাছে এসে পৌঁছল, তখন নলটা আকাশ-মুখো হয়ে' গেছে।

দলপতি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে "ভালো ত?"

"হাঁ, ভালো?"

"এইখান দিয়েই যাচ্ছিলাম কি না, তাই ভাবলাম কুটুম্বুর সঙ্গে একবার অম্‌নি দেখাটা করে' যাই। আজ অনেকখানি পথ মার্চ্চ করে' এসেছি; তবে সে কষ্ট পুষিয়ে নিয়েছি—একটা খুব বড়দরের কাতলা ডাঙ্গায় তুলেছি আজ। এই একটু আগে জানেত্তো সান্‌-পিয়েরোকে পাক্‌ড়াও করেছি।"

শুনে জিসেপা বলে' উঠল, "বাঁচা গেল! আর হপ্তায় ওই হতভাগা আমাদের একটা দুধ-দেওয়া ছাগল চুরি করেছিল।"

এতক্ষণে গাম্বা যেন বাঁচল।

মাতেও বল্‌লে, "আহা বেচারী! নিশ্চয় পেটের জ্বালা ধরেছিল।"

দলপতি একটু থম্‌কে গিয়ে আবার বল্‌তে লাগল, "বেটা যা লড়াই করেছে! –যেন বাঘের মতন! কর্পোরাল শার্দোঁর একটা হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, তার উপর আমার একটা লোককেও খুন করেছে। তা ক্ষতি বিশেষ হয়নি, লোকটা ছিল জাতে ফরাসী। তারপর বেটা এম্‌নি লুকোন লুকিয়েছিল যে, কার বাবার সাধ্যি খুঁজে বের করে। ওই আমার বাচ্ছা ভাগ্নেটি যদি না থাক্‌ত, তা হ'লে সব পণ্ড হয়ে গিয়েছিল আর কি!"

মাতেও বল্‌লে, "কে? ফর্চুনাতো!"

জিসেপাও সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ফর্চুনাতো!"

"হাঁ, জানেত্তো ওই খড়ের গাদায় লুকিয়েছিল, ভাগ্নেই ত চালাকিটা ধরিয়ে দিলে। ওর সেই কর্পোরাল-কাকাকে খবরটা দেবো অখন, তিনি ওকে একটা ভালো উপহার পাঠিয়ে দেবেন। আমিও বড়-দারোগাকে যে রিপোর্ট পাঠাব, তাতে তোমার নাম আর তোমার ছেলের নাম দিয়ে দেবো।"

শুনে মাতেও চাপা গলায় ব'লে উঠল, "চুলোয় যাক্‌!"

এতক্ষণে তারা সৈন্যদের কাছে এসে পৌঁছল। জানেত্তোকে খাটুলির উপর শুইয়ে দিয়ে তারা তখন যাত্রার আয়োজন করছে। জানেত্তো গাম্বার সঙ্গে মাতেওকে দেখে একটা অদ্ভুত হাসি হাস্‌লে, তারপর বাড়ীর দরজার দিকে মুখ করে' চৌকাঠের উপর থুতু ফেলে বলে' উঠল—

"বেইমানের বাড়ী!"

যার মরণের ভয় নেই, সেই কেবল এমন কথা মাতেওকে বল্‌তে পারে। ছোরার একটি খোঁচায় এ অপমানের শোধ হ'য়ে যেত, দ্বিতীয়বার ছোরা তুল্‌তে হ'ত না। কিন্তু মাতেও তাই শুনে'—ভয়ানক আঘাত পেলে লোকে যেমন করে—তেম্‌নি করে' নিজের কপালটা হাত দিয়ে টিপে ধর্‌লে।

বাপকে আস্‌তে দেখেই ফর্চুনাতো বাড়ীর ভিতর চলে' গিয়েছিল, এখন একবাটি দুধ নিয়ে সে ফিরে' এল, এসে

ঘাড় হেঁট করে' বাটিটা জানেত্তোর মুখের সাম্‌নে ধর্‌লে।

জানেত্তো, "নিয়ে যা' তোর দুধ!"—বলে' ভয়ানক চীৎকার করে' উঠল; পরে একজন সৈনিককে ডেকে বল্‌লে—

"একটু জল খাওয়াও না ভাই!"

—বল্‌তেই সৈনিক নিজের বোতলটি তার হাতে দিলে; একটু আগে যাদের সঙ্গে গুলি চল্‌ছিল, তাদেরই এক-জনের দেওয়া জল সে অসঙ্কোচে পান কর্‌লে। তারপর সে এই অনুরোধ জানালে যে, হাতদুটো পিঠমোড়া করে' না বেঁধে যেন বুকের উপর আড়াআড়ি করে' বেঁধে দেওয়া হয়—বল্‌লে, "একটু স্বচ্ছন্দ হয়ে' থাক্‌তে চাই।"

লোকটাকে যতটা খুসী করা যায় তা কর্‌তে তারা কুণ্ঠিত হ'ল না। তারপর দলপতি সবাইকে যাত্রা কর্‌তে বলে' মাতেওকে বিদায়-অভিবাদন কর্‌লে, মাতেও কথাটি কইলে না,—তারাও চট্‌পট্‌ মাঠের পথ ধরে' বেরিয়ে পড়ল।

প্রায় দশমিনিট মাতেও নির্ব্বাক হয়ে' রইল। কেবল বন্দুকের উপর ভর দিয়ে সে ছেলের পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—সে চাউনিতে একটা ভীষণ ক্রোধ যেন জমাট হয়ে' উঠেছে! ছেলেটা একবার বাপের পানে তাকায়, আবার মার পানে চেয়ে থাকে—সে যেন ছটফট কর্‌তে লাগল।

কতক্ষণ পরে মাতেও বলে' উঠল—

"এই বয়েস থেকেই বেশ আরম্ভ করেছিস্‌ তুই!"

'বাবা!' বলে' কাঁদ-কাঁদ হয়ে' ছেলেটা যেই বাপের দিকে এগিয়ে পা'দুটো জড়িয়ে ধর্‌তে যাবে, অম্‌নি মাতেও গর্জ্জে' উঠল—

"দূর হ আমার সাম্‌নে থেকে!"

ছেলেটা থম্‌কে গেল; বাপের কাছ থেকে দু'চার পা তফাতে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগল।

এইবার জিসেপা ছেলের কাছে এগিয়ে এল, সে ঘড়ির চেনটা দেখতে পেয়েছিল—তার একদিকটা ফর্চুনাতোর সার্টের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। খুব কঠিনস্বরে মা জিজ্ঞেস কর্‌লে—

"এ ঘড়ি তোকে কে দিলে?"

"আমার মামু—ওই পাহারাওয়ালার সর্দার।"

ফাল্‌কোনে ঘড়িটা কেড়ে নিয়ে একটা পাথরের এমন উপর জোরে আছাড় দিলে, যে সেটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে' গেল। তারপর স্ত্রীকে ডেকে বল্‌লে—

"ঠিক করে' বল—এ ছেলে কি আমার?"

জিসেপার মেটে-রঙের গাল দু'খানা ইটের মত লাল হয়ে' উঠল।

"কি বল্‌ছ মাতেও? কার সঙ্গে কথা কইছ, সে হুঁস নেই?"

"ওঃ! তা' হ'লে এই হ'ল আমার বংশের প্রথম বিশ্বাসঘাতক।"

ফর্চুনাতোর গোঙানি আর ফোঁপানি আরও বেড়ে উঠল—ফাল্‌কোনে তার মুখের দিকে ভীষণ চোখ করে' চেয়ে রইল। শেষে বন্দুকের বাঁটটা মাটিতে একবার ঠুকে সেটা আবার কাঁধে কর্‌লে, করে' আবার 'মাকী'তে যাবার যে পথ—সেই পথ ধরে' বেরিয়ে পড়ল। ফর্চুনাতোকে পিছু পিছু আস্‌তে হুকুম কর্‌লে—সেও সঙ্গে চল্‌ল।

তখন জিসেপা ছুটে গিয়ে মাতেওর হাতখানা চেপে ধর্‌লে। মাতেওর মনের ভিতরটা বুঝে দেখবার জন্যে সে তার কালো চোখদুটি দিয়ে স্বামীর চোখের পানে চাইলে, চেয়ে বলে' উঠল—

"ও তোমার ছেলে যে!"

মাতেও বল্‌লে, "হাত ছেড়ে দাও—আমিও ওর বাপ।"

জিসেপা ছেলের মুখে চুমু খেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘরে ফিরে গেল। ঘরের ভিতর যীশু-জননীর একখানি ছবি ছিল, সে তারি সাম্‌নে হাঁটু পেতে বসে' কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর্‌তে লাগল। এদিকে ফাল্‌কোনে সেই পথ ধরে' প্রায় দুশো হাত চলে' গেল, শেষে একটা ছোট খদের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বন্দুকের বাঁটটা দিয়ে জমিটা পরীক্ষা করে' দেখলে—বেশ নরম, সহজেই গর্ত্ত খোঁড়া যাবে। জায়গাটা তার পছন্দ হ'ল।

"ফর্চুনাতো, ওই বড় পাথরখানার পাশে গিয়ে দাঁড়া।" ছেলেটা বাপের কথামত সেইখানে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বস্‌ল।

"এইবার ভগবানের নাম কর্।"

"বাবা! বাবা গো!—আমায় মেরে ফেলো না বাবা!"

মাতেও একটা ভীষণ ধমক্ দিয়ে আবার বল্লে—

"ভগবানের নাম কর্ বল্ছি।"

ছেলেটা কাঁদ্তে-কাঁদ্তে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথায় ছুটি স্তব আবৃত্তি কর্লে। প্রত্যেকটি শেষ হ'বার সময় বাপ বেশ জোর গলায় 'প্রার্থনা পূর্ণ হোক্' বলে' স্বস্তিবাচন কর্লে।

"আর কোনো স্তব তুই জানিস্ নে?"

"জানি, বাবা। আমি 'আভে মারিয়া'-স্তবটিও জানি, আরও একটা জানি—মাসীর কাছে শিখে'ছিলাম।"

"ওটা বড্ড বড়—অনেকক্ষণ লাগ্‌বে। আচ্ছা—তা হোক্, তুই বল্।"

বালক রুদ্ধকণ্ঠে স্তবগানটি শেষ কর্লে।

"হয়েছে?"

"বাবা! বাবা! আমায় মেরে ফেলো না। এবারটা আমায় মাফ কর। আর কখনো এমন কাজ কর্ব না, জানেত্তো যাতে খালাস পায়, তার জন্যে আমার কর্পোরাল কাকাকে হাতে পায়ে ধরে' রাজী কর্ব।"

তার কথা তখনো শেষ হয়নি, মাতেও বন্দুকের ঘোড়া তুলে' লক্ষ্য স্থির কর্তে-কর্তে বল্লে—

"ভগবান্ যেন তোকে মাফ করেন!"

ছেলেটার বড় ইচ্ছে হ'ল, একবার উঠে গিয়ে বাপের হাঁটু দুটো জাপটে ধরে, কিন্তু তার আর সময় পেলে না। মাতেও ঘোড়া টিপে দিলে—ফর্চুনাতো একটা পাথরের মত ধুপ করে' পড়ে' গেল, তখখুনি তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

মাতেও মৃতদেহটা একবার তাকিয়েও দেখ্লে না। তখনি ছেলেকে গোর দেবার জন্যে একখান কোদাল আন্তে বাড়ীর দিকে চল্ল। খানিক দূর যেতেই পথে জিসেপার সঙ্গে দেখা হ'ল,—সে বন্দুকের আওয়াজ শুনেই ছুট্তে-ছুট্তে আস্ছে।

"কি কর্লে তুমি?" বলে' সে কেঁদে উঠ্ল।

"বিচার।"

"কোথায় সে?"

"খদের মধ্যে পড়ে' আছে। এইবার তাকে গোর দেবো। সে ভগবানেয় নাম কর্তে-কর্তে পুণ্যবানের মতন মরেছে। তার জন্যে গির্জ্জেয় একটা ভালোরকমের শান্তিপাঠ করাতে হবে। এবার থেকে জামাই তিয়োদোরো বিয়াঙ্কি যেন আমার ঘরে এসে বাস করে।"

সন্ধান

(কবীর হইতে)

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

হে সেবক মোরে খুঁজিছ কোথায়,
আমি যে তোমারি পাশে;
নহি মন্দিরে, মস্‌জিদে নহি,
না তীর্থে, কৈলাসে!
কর্ম্ম, ক্রিয়ায়, যোগে, বৈরাগে,
কোথাও ত আমি নহি;

খুঁজিতে জানিলে, মিলিবে আমারে—
পলক তালাসে, কহি।
কবীর কহিছে, শুন ভাই, সাধু,
শুধু এই জানি আমি,—
আছেন সবার নিশ্বাসে তিনি,
আর কোথা নাহি স্বামী।

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৯)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায়কে নাকি সেরেস্তাদার করিবার সময় অনেক আপত্তি হইয়াছিল, তাহার কারণ কি? তিনি নাকি রংপুর মাহিগঞ্জের এক নাবালকের এষ্টেট ম্যানেজার হইয়াছিলেন? তাহার কোন প্রমাণ আছে কিনা? মাহিগঞ্জেই নাকি তাঁহার বসতবাটী ছিল, সেই বাড়ীটিকে নাকি ব্রাহ্মণের বাড়ী বলা হইত? তিনি নাকি রংপুর হইতে যশোহর বদ্‌লি হইয়াছিলেন, তিনি তথায় কোন্ সন হইতে কোন্ সন পর্য্যন্ত কার্য্য করেন?

শ্রী জ্যোৎস্নাময় দাশগুপ্ত

(১০)

ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা

ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা (Archaeology) শিখিবার জন্য কোন স্কুল বা কলেজ আছে কি? না থাকিলে ভারতে থাকিয়া কিরূপে উহা শিখা যায়?

(১১)

জামার যুদ্ধ

'জামার যুদ্ধের (Battle of Zama) অব্যবহিত পূর্ব্বে 'হানিবল' রোমক সেনাপতি 'সিপিও আফ্রিকানাস'কে কোন পত্র লিখিয়াছিলেন কিনা? ঐ পত্রের 'সম্পূর্ণ-পাঠ' (full text) কোন্ কোন্ প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে? ইঁহাদের সমসাময়িক কোন্ বিশ্বাস-যোগ্য ইতিহাসে ঐ পত্র সম্বন্ধ প্রথম উল্লেখ এবং তাহা উর্দ্ধৃত আছে?

কাজী মোহাম্মদ বক্‌স্

(১২)

আঙ্গুরের চাষ

আমাদের দেশে যে আঙ্গুর-ফল হয়, তাহা টক ভিন্ন মিষ্টি হয় না কেন? এই আঙ্গুর ফলের চাষ কিরূপভাবে করিলে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি ফল পাওয়া যায়?

শ্রী যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী

(১৩)

বিছা

ফুলের এবং ফলের বাগানে 'বিছার' আবির্ভাবে সমস্ত গাছ নষ্ট হইলে কি করিলে বা কি ঔষধ দিলে 'বিছা' দূরীভূত হয় কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী অমিয়া রায়।

(১৪)

ম্যালেরিয়ার মশক

ত্রিফলার্জ্জুন পুষ্পানি ভল্লাতকশিরীষকম্।
লাক্ষা সর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্‌গুলুঃ ॥
এতৈ-র্ধূপে মক্ষিকাণাম্ মশকাণাং বিনাশনম্।
ইতি গারুড়ে ১৮১ অধ্যায়:—

আমাদের দেশে ম্যালেরিয়াবীজবাহী মশক ধ্বংসের জন্য যখন সর্ব্বত্র এত আন্দোলন, তখন আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত উপায়টি একবার অবলম্বন করিলে হয় না। যদি কেহ পরীক্ষা করিয়া থাকেন যেন দয়া করিয়া জানান নচেৎ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

শ্রী চণ্ডীচরণ ঘোষাল

(১৫)

তুলসী চন্দনং চক্রং শঙ্খো ঘণ্টাঞ্চ চক্রকম্।
শিলা তাম্রস্ত পাত্রস্ত বিজ্ঞোর্ণাম পদামৃতম্ ॥
পদামৃতস্ত নবভিঃ পাপরাশি প্রদাহকম্।

উক্ত ৯টি দ্রব্য কি কি যদি কেহ কৃপা করিয়া জানান তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।

শ্রী চণ্ডীচরণ ঘোষাল

—

মীমাংসা

(চৈত্র ১৩৩২)

কাগজী-লেবু রক্ষার উপায়

যখন কাগজী-লেবুর গাছগুলিতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে যদি গাছের গোড়ায় পরা কাটিয়া পচা গোময় এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া হয়, তাহা হইলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের কতকগুলি গাছের ঐরূপ ফল অপুষ্ট অবস্থায় ঝরিয়া পড়িত; আমরা উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট সুফল পাইয়াছি।

শ্রী কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

লেবু রক্ষা করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়টি নিম্নে বিবৃত করা গেল :—

প্রথমে কাগজী লেবুর কলম এমন জায়গায় লাগাইতে হইবে, যেখানে সর্ব্বদা রৌদ্র ও বাতাস পায়। যখন গাছ বড় হইতে থাকে, তখন (কার্ত্তিক মাসে হইলে ভাল হয়) গাছের গোড়া হইতে ৮ আঙুল ফাঁক রাখিয়া চারিদিকে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ৫।৬ সের পুঁঠি-মাছ পুঁতিয়া রাখিবেন। ঐ-সঙ্গে কিছু টাটকা গোবরও দিতে পারেন এবং ৫।৭ দিন অন্তর গোড়ায় জল দিবেন। তাহা হইলে লেবু আর গাছ হইতে ঝরিয়া পড়িবে না। এই প্রক্রিয়া আমার পরীক্ষিত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(চৈত্র ১৩৩২)

গেঁদো আগাছা

খোদামগাড়ী পল্লী পাঠাগারের সম্পাদক মহাশয় রোয়া জমীতে গেঁদো আগাছা জন্মায় বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন ;—এই প্রশ্নটিই ঠিক হইয়াছে কিনা সেই বিষয়েই আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্ষাকালে রসুনিয়া জন্মে—সেঁতসেঁতে মাঠে মজা পুকুর বা খানা-ডোবার ধারে ছায়াযুক্ত সেঁতসেঁতে জঙ্গলে। গরু অনেক সময় এই ঘাস খায়, বিশেষ করিয়া গাই গরু খাইলে দুতিন দিন তাহার দুধ খাওয়া অসম্ভব হয়। রোয়া জমি সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে কোথাও আমি ইহাকে ধানের জমিতে জন্মিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। তবে শ্রাবণ-ভাদ্রে এক রকম ঘাস ও শেওলা হয় যাহাতে ধান-গাছ বাড়িতে না পারিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই আগাছাগুলির কোন পাতা নাই ; লম্বা সরু এক-একটা কাঠির মত ; রং সবুজ। এইগুলি রোয়া ধান-গাছের পক্ষে খুব অনিষ্ট-কারী। জমির জল ছাড়িয়া দিয়া পা দিয়া মাড়াইয়া এগুলিকে কাদায় বসাইয়া দিতে হয়। তারপর চার পাঁচ দিন বাদে পুনরায় জমিতে জল দিলে ঐ ঘাসগুলি পচিয়া ধান-গাছের সারের কাজ করে। জন্মাইবার প্রথমাবস্থাতে এরূপ করিতে হয়. বেশী জন্মাইলে এর নিবারণের কোন উপায় নাই। অনেক সময় কৃষকেরা রান্নার মেটে হাঁড়িতে চুণ মাখিয়া ও শামুকের মালা গাঁথিয়া জমির মাঝখানে একটা বাঁশে ঝুলাইয়া রাখিয়া আসে। এতে সময় সময় আপন হইতেই ঘাস নষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। তবে এই হাঁড়ি ও মালার সঙ্গে ঘাসের কি সম্বন্ধ আছে বলিতে পারিনা আর যে-সব আগাছা জন্মায় তা জমিতে সময়মত ও উপযুক্ত চাষের অভাবে।

(চৈত্র ১৩৩২)

ঘরের মেঝে শুষ্ক করা

মেটে ঘরের মেঝে ও ভিত্তি সেঁতসেঁতে হওয়ার কারণ (১) ঘরের অতি নিকটে জলাশয় থাকা ; (২) চারি পাশের জমি সর্ব্বদা ভিজা থাকা ; (৩) অতি পুরাতন গৃহ যার মেঝে ও ভিত্তিতে লোনা ধরিয়াছে ; (৪) উপযুক্ত পরিমাণ হাওয়া ও রৌদ্র চলাচলের অভাব। প্রতিকার।—জলাশয়ের ধারের ঘরের মেঝে যথাসম্ভব (জল হইতে অন্ততঃ তিন হাত) উঁচু হওয়া দরকার এবং তাহার চারি ধারে যাহাতে জল জমিতে না পারে ও গাছপালা রৌদ্র আসার পথ বন্ধ করিতে না পারে তা করা। ঘরে উপযুক্তসংখ্যক জানালা রাখা। যে-ঘরের মেঝে ও ভিত্তিতে লোনা ধরিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তৈরী করা।

এসব কিছু না করিয়া শুধু চুণ দিলে সাময়িক শুকনো করা হয় বটে, স্থায়ী কোন কাজ হয় না। যে-জল উপরে ওঠে, চুণ দিলে চুণ তা চুষিয়া লইয়া কিছুক্ষণের জন্য মেঝে শুক্‌না রাখে মাত্র।

শ্রী ভবানীচরণ দত্ত

(২)

লক্ষ্মীবার

সিংহে ধনুষী মীনেচ গুরুবারে শীতে শুভে
যত্নতঃ পুজয়েল্লক্ষ্মীং সর্ব্বাভিষ্টফলপ্রদাং। ইতি স্কন্দপুরাণে।

স্কন্দপুরাণে বিহিত আছে, সিংহ ধনু ও মীন রাশিস্থ সূর্য্যে অর্থাৎ ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র এই তিন মাসে শুক্লপক্ষে শুভ তিথি নক্ষত্রাদিতে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করিলে সর্ব্বাভিষ্ট-ফল লাভ হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে ঐসকল মাসে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা প্রচলন আছে এবং বৃহস্পতি সুরগুরু এজন্য বৃহস্পতিবারকে "গুরুবার" বা "লক্ষ্মীবার" বলা হইয়া থাকে।

শ্রী ভবকালী দত্ত

(৩)

বাংলায় অশৌচ প্রথা

শুদ্ধেদ্ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্য পঞ্চদশাহেন শূদ্র মাসেন শুধ্যতি॥ ইতি স্মৃতি।

স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে ব্রাহ্মণের দশরাত্র, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ রাত্র, বৈশ্যের পঞ্চদশ রাত্র ও শূদ্রের মাসশৌচ বিধান আছে। "স্মৃতিস্তু ধর্ম্ম-সংহিতা" ইহা বহু প্রাচীন ঋষি প্রণীত বটে অতএব সর্ব্ব দেশে এই স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে হিন্দুর সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে। যদি কেহ বা কোন স্থানে অনভিজ্ঞতাবশতঃ সর্ব্ববর্ণের সমান অশৌচ প্রতিপালন করে বা প্রতি-পালিত হয়, তাহা অশাস্ত্রীয় এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তার্হ।

শ্রী ভবকালী দত্ত

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে, উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তকপরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

কলিকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামা

(১)

বর্ত্তমান মাসের প্রবাসীতে কলিকাতায় "দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুনা-খুনি"-শীর্ষক প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কোন্ সম্প্রদায়ের দোষ কতটুকু, তাহা নিক্তির ওজনে স্থির করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, ইচ্ছাও নাই, বোধ হয় সে-চেষ্টা করিয়া এখন কোন লাভও নাই।"

কিন্তু তৎপরেই যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে প্রকারান্তরে মুসলমান সম্প্রদায়কেই দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন, যে, "কোনও সম্প্রদায়ের লোক যখন তাঁহাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে আরাধনা, প্রার্থনাদি করেন, তখন তাঁহার নিকটে কোনপ্রকারে গোল-মাল না হওয়া বাঞ্ছনীয়।" মুসলমানদের কথা এই যে, তাঁহাদের জুম্মা নামাজের সময় আর্য্য-সমাজীরা বাদ্যসহকারে মসজিদের নিকট উপস্থিত হয় এবং মুসলমানদের অনুরোধ-সত্ত্বেও বাদ্য বন্ধ করিতে অস্বীকার করে। এসম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই সম্পাদক মহাশয় মুসলমান-দিগকে অনুদার, অসহিষ্ণু ও অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া-ছেন, অথচ আর্য্য-সমাজীদিগের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

অন্যত্র "দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পুলিশ ও গবর্মেণ্ট"-শীর্ষক প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "মুসলমানদের রমজানের উপবাস চলিতেছে, ও উপবাসে মানুষের মেজাজ সহজেই বিগড়াইয়া যায়, একথাও কর্ত্তৃপক্ষের অগোচর ছিল না।" ইহা হইতেও ধরিয়া লওয়া হইয়াছে উপবাসে খাপ্পা মেজাজ-বিশিষ্ট মুসলমানেরা এই হাঙ্গামার মূল এবং আর্য্য-সমাজীরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃপক্ষকে উপদেশ দিয়াছেন, যে, কিছু দিন হইতে মসজিদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুরা গান-বাজনা করিয়া গেলে মুসল-মানেরা আপত্তি করিতে আরম্ভ করিতেছেন, ইহাও পুলিশের জানা ছিল। লেখকের অভিজ্ঞতায় কলিকাতায় মসজিদের সম্মুখে গান-বাজনায় আপত্তি মুসলমানেরা বরাবর করিয়া আসিতেছেন এবং এসম্বন্ধে কলিকাতা পুলিশের শোভাযাত্রার গত ২৫ বৎসরের ছাড়পত্রের নকল যদি পুলিশ আফিসে সংরক্ষিত থাকে, ত তাহা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, পুলিশ মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বন্ধের অনুজ্ঞা বরাবর দিয়া আসিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন, পূর্ব্বে হিন্দুরা এবিষয়ে আপত্তি করিতেন না। সম্পাদক মহাশয়ের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি উপদেশ নিরপেক্ষ হইত, যদি তিনি লিখিতেন, যে, পুলিশের জানা উচিত ছিল যে, কিছু দিন হইতে হিন্দুরা বিশেষতঃ শুদ্ধি ও সংগঠন-আন্দোলন-উদ্ভাবন-কারী আর্য্য-সমাজীরা মুসলমানদিগের মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বন্ধ করিতে আপত্তি আরম্ভ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, মসজিদের সম্মুখে বা নিকটে সুসজ্জিত ও সশস্ত্র এত বেশী লোক রাখা উচিত ছিল, যাহাতে গুণ্ডারা তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় পায়। ক্ত মন্তব্যে হয় মুসলমান নামাজকারীদিগকে প্রকারান্তরে গুণ্ডা বলা হইয়াছে, নয়, ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মুসলমানেরা আগে হইতে বিবাদের নিমিত্ত গুণ্ডা যোগাড় করিয়া মসজিদের নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অন্যথা বিবাদের প্রথম অবস্থায় মসজিদের নিকট গুণ্ডার আবির্ভাব কল্পনা করা যায় না। আর যদি পথে-ঘাটের সাধারণ গুণ্ডার কথা ধরা হয়, তাহা হইলে বিশেষ করিয়া মসজিদের নিকটই সশস্ত্র পুলিশের বাহুল্যের আবশ্যক কি?

মুসলমানদের মাসিক বা অন্যান্য কাগজ সংখ্যায় অতি সামান্য। হিন্দুরা তাঁহাদের পরিচালিত কাগজে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে খুব কম সময়েই মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করেন, এইরূপ মুসলমানদের ধারণা। "প্রবাসী"র প্রতি বর্ত্তমান লেখকের শ্রদ্ধা আছে। সেইজন্যই এত কথা বলিলাম। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় যদি সাম্প্রদায়িক বিষয়-সম্বন্ধে লিখিবার কালে দুইটি কথা মনে রাখেন ত বাধিত হইব:—

(১) প্রবাসীর অনেক মুসলমান পাঠকপাঠিকা আছে এবং (২) সাম্প্রদায়িক বিষয়ে তাঁহারা তাঁহাকে হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন।

নুরুজ্জমান

(২)

কলিকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুনাখুনি-প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় মন্দির-ধ্বংসকারী মুসলমানদের চেয়ে মসজিদধ্বংসকারী হিন্দুদের বেশী নিন্দা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কারণ, ইতিহাসে মুসলমানদের এই অধর্ম্মের নজীর আছে, হিন্দুদের নাই। ইহা সুযুক্তি নহে। সম্পাদক মহাশয় এই যুক্তির আশ্রয় করিয়া মুসলমানদের দোষ লঘুতর করিয়াছেন, ইহা পরিতাপের বিষয়।

নজীরের দ্বারা কোন দুষ্কার্য্যের সমর্থন, দোষক্ষালন বা লঘুকরণ করা যায় না। যদি কেহ একই অধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ করে, তবে বুঝিতে হইবে, তাহার অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়াছে এবং উহা উচ্ছেদ করিবার জন্য গুরুতর নিন্দা বা দণ্ড আবশ্যক। যাহা ব্যক্তির পক্ষে বলা হইল, তাহা সম্প্রদায়ের পক্ষেও প্রযোজ্য। মুসলমানেরা অনেক দিন হইতে এইরূপ অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। খুন-জখম, লুটতরাজ, মন্দির-ধ্বংস প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের প্রকৃত কারণ ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে পারে না। বিদ্বেষ, কুপ্রবৃত্তি ও পার্থিব লাভের আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মবিশ্বাসের আবরণের ভিতর থেকে এইসকল দুষ্কার্য্য করায়। এইরূপ কার্য্য বহুসংখ্যক মুসলমানের স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই দৌরাত্ম্যের স্পষ্ট নির্ভীক প্রতিবাদ ও নিন্দা করা ন্যায়নিষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য।

নজীর বা দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিলেই যদি কাজ লঘুতর হয়, তবে কলিকাতায় মন্দির-ধ্বংসকারী মুসলমানদের চেয়ে মসজিদধ্বংসকারী হিন্দুদের পাপ আরও লঘু। হিন্দুরা বহুদিন অত্যাচারিত হইয়াছে। এবারেও প্রথমতঃ হিন্দু-মন্দির ধ্বংস হওয়ায় উত্তেজিত হইয়া প্রতিহিংসা-

বশে মুসলমানদেরই অনুকরণ করিয়াছে (Paid them back in their own coin)। ইহাই হিন্দুদের অপরাধ লঘুতর করিবার যথেষ্ট ও উপযুক্ত কারণ। সম্পাদক-মহাশয় প্রসঙ্গের প্রারম্ভে নিক্তির দ্বারা পক্ষদ্বয়ের দোষ ওজন করিবেন না বলিয়াও তাহাই করিয়াছেন ও উৎপীড়িত হিন্দুর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। যদি এই অল্প নিন্দার দ্বারা দুর্ব্বৃত্তেরা একটু উৎসাহ পায়, তবে বিস্মিত হইবার কারণ থাকিবে না।

শ্রী কুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—

সম্পাদকের মন্তব্য

কলিকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামা-সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার দুইটি প্রতিবাদ আসিয়াছে। একটি মুসলমানের, অপরটি হিন্দুর লিখিত। ইহা হইতে অনুমান হয়, সকল মুসলমান ও সকল হিন্দু আমার সহিত একমত নহেন। তাহা না হইবারই কথা, এবং সেরূপ ঐকমত্যের আশা আমি করি না।

মুসলমান লেখক-মহাশয় বলেন, যে, আর্য্য-সমাজীরা যখন মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহকারে যাইতেছিল, তখন ভিতরে নামাজ চলিতেছিল। দাঙ্গার উৎপত্তি-সম্বন্ধে সকল কাগজে প্রকাশিত বৃত্তান্ত পড়িতে পারি নাই, কোন কোন কাগজের বৃত্তান্তই পড়িয়াছিলাম, এবং একজন বিশ্বস্ত লোকের নিকটও এ-বিষয়ে কোন বেসরকারী অনুসন্ধানের ফলও শুনিয়াছিলাম। তাহাতে আমার এখনও এই ধারণা আছে যে, আর্য্যসমাজীদের মিছিল যখন মসজিদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার পূর্ব্বেই নামাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন কাগজে আমরা ইহাও পড়িয়াছি যে, আর্য্য-সমাজীদের সঙ্গে কোন ব্যাণ্ড্ ছিল না, তাহারা ভজন গান করিয়া যাইতেছিল। ইহা সত্য কি না বলিতে পারি না। অনেক কাগজে প্রকাশিত বৃত্তান্তে ইহা দেখিয়াছি যে, মুসলমানগণ আপত্তি করিবামাত্র আর্য্যসমাজীরা সঙ্গীত বন্ধ করে, এবং উভয় পক্ষে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে মিছিলের নেতাদের মীমাংসা বা আদেশের অপেক্ষা না করিয়া একজন হঠাৎ পুনর্ব্বার সঙ্গীত আরম্ভ করে। তাহাতে মুসলমান পক্ষ হইতে মিছিলের উপর আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং মিছিলের লোকেরা প্রত্যাক্রমণ করে। আমার পঠিত ও শ্রুত বৃত্তান্ত এইরূপ।

আমি দাঙ্গার উৎপত্তির বৃত্তান্ত যেরূপ পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি তদনুসারে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতেও আমার ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কিন্তু আমার পঠিত ও শ্রুত বৃত্তান্ত যদি ঠিক্ না হয়, এবং লেখক মহাশয়ের বৃত্তান্তই ঠিক্ হয়, তাহা হইলেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি নিজে যে-আদর্শে বিশ্বাস করি ও যাহা কোন কোন স্থলে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে জানি, তদনুসারেই আমার বক্তব্য বলিব।

আমার ধারণা, ঈশ্বরের আরাধনা মানুষকে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, শান্ত ও ক্ষমাশীল করে। এই জন্য মুসলমানদের নামাজের সময় এবং অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পূজা-উপাসনাদির সময় কেহ গোলমাল করিলেও শান্ত-ভাবে তাহাদিগকে বুঝান ও ক্ষমা করা উচিত, মারামারি করা উচিত নহে। আমি কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরের ভিতরে বসিয়া অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, বাহিরে কীর্ত্তনের দল যাইতেছে এবং মন্দিরের সম্মুখে রাস্তায় উৎসাহের সহিত খোল, করতাল ও শিঙ্গা বাজাইয়া কীর্ত্তন চলিতেছে, কিম্বা মহরমের ঢাক বাজিতেছে ও লাঠিখেলা প্রভৃতি চলিতেছে; কিন্তু মন্দিরের ভিতরে উপাসনায় নিরত আচার্য্য ও উপাসকগণ তাহাতে কোন প্রকারে উত্তেজিত হন নাই বা মারামারি করেন নাই, কিয়ৎক্ষণ উপাসনা বন্ধ রাখিয়া বাহিরের জনতা চলিয়া গেলে আবার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কোন-কোন স্থানে নগর-কীর্ত্তনাদির সময় কীর্ত্তনকারীদের দলের লোকদিগকে প্রহারাদি করা সত্ত্বেও তাহারা উল্টিয়া প্রহার করে নাই, এরূপ দৃষ্টান্তও আমি অবগত আছি। আপত্তি হইতে পারে, যে, উক্ত কীর্ত্তনকারীদের দল ভীরু বলিয়া এইরূপ করিয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশে সাহসী ও শক্তিমান লোকদেরও ধর্ম্মের জন্য শারীরিক ও অন্যবিধ নির্য্যাতন সহ্য করা নূতন নহে। যখন নবদ্বীপের কাজী শ্রীচৈতন্যদেবকে নগর সংকীর্ত্তন বন্ধ করিতে হুকুম করেন, তখন চৈতন্যদেব সে নিষেধ না শুনিয়া নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে, রাজ-শক্তির প্রতিনিধির অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করিবার মত সাহস ও শক্তি তাঁহার ছিল। কিন্তু এই সাহসী পুরুষ ক্ষমাশীল এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। জগাই মাধাইয়ের দল তাঁহাকে কলসীর কানা দিয়া আঘাত করিয়া রক্তপাত করাতেও তিনি প্রতিশোধ না লইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং প্রেম দিয়াছিলেন।

আধুনিক সময়ে পঞ্জাবের অকালীরা সাহস এবং শক্তি সত্ত্বেও প্রতিহিংসাপরায়ণ হন নাই। গুরু-কা-বাগের পথে যে অকালীরা বার বার অহিংসভাবে নিষ্ঠুর প্রহার সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বীরত্ব-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, যাহার যাহা আদর্শ, সে তদনুসারেই মত প্রকাশ করিবে। দুর্ব্বল ও কাপুরুষের ক্ষমা ও শান্তভাব প্রকৃত ক্ষমা ও শান্তভাব নহে, তাহা আমি জানি। কেহ কোন ধর্ম্মমন্দির বা অন্য কোন গৃহ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে বাধা দেওয়া ও আক্রমণ ব্যর্থ করা আমার আদর্শের বিপরীত নহে।

উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, আমার আদর্শ-অনুসারে ধর্ম্মের নামে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ "খাপ্পা মেজাজে"রই কাজ।

মসজিদের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া গান-বাজনার মিছিল-সম্বন্ধে আপত্তি আমি অধিকাংশ স্থলে আধুনিক বলিয়া এখনও বিশ্বাস করি। এবিষয়ে লেখক মহাশয়ের জ্ঞানের সহিত আমার জ্ঞানের মিল নাই।

মুসলমান নামাজকারীদিগকে আমি গুণ্ডা বলি নাই, মনেও করি না। কলিকাতায় হিন্দু ও মুসলমান গুণ্ডা অনেক আছে। কোন-কোন অঞ্চলে, যেমন বড়বাজারের কাছাকাছি, তাহাদের সংখ্যা বেশী। কোন একটা গোলমাল হইলেই তাহারা অবিলম্বে লুট-তরাজ দ্বারা লাভবান্ হইবার চেষ্টা করে। এইরূপ লোকেরা যাহাতে ভয় পায়, সেইজন্য সুসজ্জিত ও সশস্ত্র পুলিশ বেশী করিয়া রাখা উচিত ছিল, বলিয়াছিলাম। ইহাও আমি গোপন রাখিতে চাই না, যে, আমার মতে অনেক মুসলমান ও অনেক হিন্দু পেশাদার গুণ্ডা না হইলেও উত্তেজনার সময় গুণ্ডামি করিয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতির লোক কোন্ সম্প্রদায়ে হাজারকরা কয় জন আছে, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা অসম্ভব।

লেখক বলেন, হিন্দু কাগজে মুসলমানদের প্রতি সুবিচার সাম্প্রদায়িক বিষয়ে খুব কম সময়েই হয়। সব সময়ে হয় না, ইহা ঠিক্। কিন্তু আমি যতটা জানি, মুসলমানদের কাগজে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে হিন্দুদের প্রতি সুবিচার আরও কম সময়ে হয়। এবিষয়ে উভয় পক্ষের একমত হইবার আপাততঃ সম্ভাবনা নাই।

আমি জানি, প্রবাসীর মুসলমান পাঠকপাঠিকা আছেন, এবং আমি হিন্দুবংশোদ্ভব ও হিন্দু। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু এবং অনেক ব্রাহ্ম আমাকে হিন্দু মনে করেন না, ইহাও ঠিক্। কিন্তু

যিনি যাহাই মনে করুন, আমি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে নিরপেক্ষ ভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। ইহার বেশী কিছু দাবী করি না।

কাপুরুষতা ও পৌরুষ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছি, তাহাও এই মন্তব্যের সহিত পঠিতব্য।

হিন্দু প্রতিবাদক মহাশয় আমার মন্তব্যের একটি অংশের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছেন, সেরূপ অর্থ কোন প্রকারেই করা যায় না, এরূপ বলিবার কোন ইচ্ছা আমার নাই। কিন্তু যাহা বলা আমার অভিপ্রেত ছিল, তাহা জানাইতেছি। আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আগেই বলিয়া রাখি, দৃষ্টান্তটি দ্বারা আমি হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের সকল লোককেই অপরাধী বলিতেছি না।

মনে করুন, বিচারকের নিকট একই রকমের এক-একটা অপকর্ম্মের নিমিত্ত বিচারের জন্য "ক" ও "খ" দুজন অপরাধীকে হাজির করা হইল। "ক" এই প্রথম বার অপরাধ করিয়াছে ও তাহার বংশে কেহ ঐরূপ অপরাধ আগে করে নাই। "খ" কিন্তু অনেকবার ঐরূপ অপরাধ করিয়াছে, ও তাহার সম্পর্কিত লোকেরাও অনেক বার করিয়াছে। এক্ষেত্রে বিচারকের পক্ষে আইন অনুসারে "খ"-কেই বেশী শাস্তি দিবার সম্ভাবনা, এবং তাহা অন্যায়ও হইবে না। কিন্তু যদি স্থির করিতে হয়, যে, আলোচ্য একটিমাত্র অপকর্ম্ম কোন্ আসামীর বেশী ও অধিকতর শোচনীয় নৈতিক অধঃপতন সূচিত করে, তাহা হইলে আমরা বলিব "ক"এর। কারণ ঐরূপ কাজ করা "খ"এর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, "ক"এর তাহা নহে। যে দশবার অপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহার একাদশ অপকর্ম্ম নূতন কোন অধঃপতন সূচনা করে না, কিন্তু "ক"এর প্রথম সেইরূপ অপকর্ম্ম অধঃপতনের সূচনা করে। অবশ্য, ইহার দ্বারা বলা হইতেছে না, যে, "খ"এর একাদশ অপকর্ম্ম দূষণীয় বা দণ্ডনীয় নহে; অবশ্যই দূষণীয় ও দণ্ডনীয়।

লেখক যে paying them back in their own coinরূপ প্রতিহিংসা-নীতির উল্লেখ করিয়াছেন, লৌকিক ব্যবহারে তাহা অনুসৃত হইয়া থাকে, স্বীকার করি। কিন্তু অক্রোধ ও ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে এবং প্রীতি দ্বারা বিদ্বেষকে পরাজয় করিবার নীতি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই নীতির সমর্থন করাই উচিত মনে করি। আত্মরক্ষা এবং দুর্ব্বলের রক্ষা করিবার সময়ও যথাসম্ভব ক্রোধ, বিদ্বেষ ও উত্তেজনা দমন করিতে পারিলে ধর্ম্মের আদর্শ অনুসৃত হয় এবং আত্মরক্ষা ও দুর্ব্বলের রক্ষার কাজও ভাল করিয়া হয়।

—

কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের বিশুদ্ধীকরণ

বৈশাখ সংখ্যার আলোচনার উত্তর

আমার নামকরণটাই বলিয়া দিবে যে, আমি "কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কগুলির বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতির নিন্দা করি" নাই। পূর্ণ-বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, বিশুদ্ধীকরণ "গত দশ বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে," কিন্তু আমরা জানি এখনও শেষ হয় নাই। আমি এই সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়াছি, সুতরাং উহা বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতির নিন্দা হইতে পারে না। অধিকাংশ ব্যাঙ্কই এখনও মিশ্রধরণের, সুতরাং আমি বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতির সমর্থন করি, সংস্কারের বিরোধী কেন? তাই বলিতেছি:

১। পূর্ণবাবু প্রাথমিক সমিতির অংশীদারগণের "অসীম" দায়িত্বের কথা বলিয়াছেন। এই "অসীমত্বের" সীমাটা কত, কোন্ কুঁড়ে ঘরের কোণে আবদ্ধ তাহাই logically ও historically বিচার করিয়া দেখা যাক্; যখন কোন কো-অপারেটিভ্ সমিতি লিকুইডেশানে যায়, কেবল তখনই অসীম দায়িত্বের প্রশ্ন উঠিতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে। সুতরাং কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক টাকার বাজারের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার পাকে পড়িয়া যদি দুরবস্থায় পতিত হয়, তখন তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য যদি দায়ীক গ্রাম্য সমিতিগুলিকে লিকুইডেশানে তুলিয়া দিয়া টাকা আদায় করিতে হয়, তাহা হইলে কি অবস্থা দাঁড়াইতে পারে পূর্ণবাবু একটু বিচার করিয়া দেখিবেন। বলা বাহুল্য যে, গ্রাম্য সমিতিগুলির অসীম দায়িত্বযুক্ত মেম্বরদিগের নিকট চাওয়া মাত্রই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দুর্দ্দিনে তাহাকে রক্ষা করার জন্য টাকা পাওয়ার আশা করা বৃথা। কিন্তু প্রেফারেন্স্ শেয়ার-হোল্ডারগণের অবস্থা অন্যরূপ। তাঁহাদের নিকট খরিদা শেয়ারের মূল্যের রিজার্ভ অর্দ্ধাংশের টাকা আদায় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। বাস্তবিক দুর্দ্দিনে তাঁহারাই ব্যাঙ্ক রক্ষা করিবেন।

২। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ণবাবু তো একটি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরিচালক। তিনি অবশ্যই রেজিষ্ট্রার সাহেবের ১৯১৯ সনের ১০নং বাংলা সার্কিউলারের মর্ম্ম অবগত আছেন। সেই সার্কিউলার-অনুসারে কোনও গ্রাম্য সমিতির অসীম দায়িত্বসম্পন্ন মেম্বরেরা কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এপর্য্যন্ত তাঁহাদের সমিতির প্রাপ্য অনাদায়ী টাকা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া তুলিয়া দিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত পূর্ণবাবু একটিও দেখাইতে পারিবেন কি? সুতরাং খাতাপত্রের অসীম দায়িত্ব ঐ খাতাপত্রের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার মূল্য অতি অল্প।

৩। তৃতীয়তঃ, পূর্ণবাবু যে প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থপরতার ওজুহাতে তাহাদিগের প্রতি যে "বনং ব্রজেৎ" ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কাগজপত্রে অতীব সুশোভন। সে শুভদিন উপস্থিত হইলে আমার মত আর কেহ সুখী হইবে না, এই কথাটা আমি অতি স্পর্দ্ধার সহিতই বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'বনং ব্রজেৎ' কথাটা আমার যেমন সত্য, "পঞ্চাশোর্দ্ধং" কথাটা তেমনই খাঁটি। সাধারণ মেম্বরগণ স্বহস্তে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারিলে প্রেফারেন্স্ শেয়ার-হোল্ডারগণ স্বইচ্ছায়ই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। ইচ্ছায় না হউক অনিচ্ছায় নিশ্চয়ই। এ-তো সেই স্বরাজের দাবীর পুনরভিনয়। কিন্তু আজ যদি হঠাৎ প্রেফারেন্স্ শেয়ার-হোল্ডারগণ হাত গুটাইয়া লন, কয়টা ব্যাঙ্ক টিকিয়া থাকিবে এবং কতজন ডিপজিটার টাকা আমানত রাখিবেন, পূর্ণবাবু তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি? সেইজন্যই অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছি। সুতরাং সাধারণ মেম্বরগণের স্বরাজ্যলাভে আমার কোনই ঈর্ষা নাই।

৪। চতুর্থতঃ, আমার কথার পরিপূরক এবং পূর্ণবাবুর "প্রত্যেক কারবারের কর্ত্তৃত্বভার তাহার অংশীদারগণের উপর ন্যস্ত থাকে" এই বলিয়া যে দীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার উত্তরস্বরূপ আমি রেজিষ্ট্রার সাহেবের একটা অতি সুচিন্তিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ সতর্ক বাণী উপস্থিত করিতেছি। ১৯২৩-২৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টে তিনি বলিতেছেন:—"অপ্রীতিকর হইলেও আমাকে পুনঃ-পুনঃ একথা সেণ্টাল ব্যাঙ্কগুলিকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে যে, তাহাদের অধীনস্থ ক্রেডিট্ সমিতিগুলিকে গঠন ও সংশোধন না করা পর্য্যন্ত তাহারা যেন ব্যাঙ্কের টাকা ঐ সমিতিগুলিকে এত মুক্তহস্তে বিলাইয়া না দেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ক্রেডিট্ সমিতি পরিচালনের জন্য যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক, সমিতির পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে তাহার একান্ত অভাববশতঃ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হইতেছে। সাধারণ মেম্বরগণের, বিশেষতঃ পঞ্চায়েৎগণের শিক্ষার অভাবই যে ইহার মূলীভূত কারণ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

অনুবাদিত)। ক্রেডিট্ সমিতিগুলির ভিতরের নানাবিধ গলদ্ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া তিনি উক্ত রিপোর্টে আরও বলিয়াছেন, এইসকল বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে, যে, কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য-প্রণালী ক্রমে-ক্রমে যাহাতে অধিকতরভাবে Commercial Bankingএর আদর্শ ও কার্য্য-প্রণালীর অনুসরণ করে, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কগুলি বর্ত্তমানে যে-অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে আমানতকারীদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া লিতে হইবে, (অনুবাদিত)। এখন পাঠক বুঝিয়া দেখুন, যাহারা সামান্য ক্রেডিট সমিতি চালাইতে যাইয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে, হঠাৎ তাহাদের হাতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক পড়িলে উহা কতদিন সাধারণের বিশ্বাসভাজন থাকিবে এবং ঐ ৫ কোটি টাকার কি দশা হইবে?

৫। পূর্ণবাবু কি জানেন না, যে, সাধারণ অংশীদারগণ যে-প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদের দ্বারা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কার্য্য সুপরিচালিত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই অনেক স্থলে রেজিষ্ট্রার নিজেই বাহিরের লোক নিযুক্ত করেন, যাঁহাদের ব্যাঙ্কের ইষ্টানিষ্টের সঙ্গে কোন যোগ নাই। কোন-কোন স্থলে সাধারণ মেম্বরদের দ্বারা উক্তপ্রকার লোক নিযুক্ত করাইয়া লয়েন। সুতরাং "কারবারের কর্ত্তৃত্বভার তাহার অংশীদারগণের উপর ন্যস্ত" করার ওজুহাতে কারবারটি সরকারের হাতে যাইয়াই পড়ে। দুই বিড়াল মাখনখণ্ড লইয়া যে বানরের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ণবাবু তাহারই অভিনয় করিতে যাইতেছেন। সুতরাং ধনিককে বাদ দিয়া শ্রমিকের উন্নতি সাধন করার কল্পনা সমবায়ের উদ্দেশ্যের মধ্যেই আসিতে পারে না, কেননা, তাহা উভয় পক্ষেরই অনিষ্টকর।

৬। পূর্ণবাবু কত কথাই বলিয়াছেন; তাঁহার আরও একটি অপসিদ্ধান্তের উল্লেখ না করিয়া পারা গেল না। সাধারণ আমানতকারীর ধারণা এই, যে, সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পশ্চাতে সরকার রহিয়াছেন। সেইজন্য লোকে ভাবে, উহাতে টাকা আমানত করা সম্পূর্ণ নিরাপদ; সেইজন্যই টাকার এত আমদানি। যেদিন এই ভ্রান্ত ধারণা ঘুচিয়া যাইবে, আমদানিও থামিবে, তখন বর্ত্তমান অবস্থার এই বিশুদ্ধীকরণের চেষ্টাই অধিকতরভাবে ব্যাঙ্কগুলির সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তাই পূর্ণবাবুকে বলি—রজনী ধীরে।

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

—

"দিল্লীতে 'ফাল্গুনীর' অভিনয়"

গত বৈশাখের প্রবাসীতে দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের উদ্যোগে যে ফাল্গুনীর অভিনয় হয়েছিল, তার সম্বন্ধে উহার প্রধান উদ্যোগ-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী দিল্লীতে 'ফাল্গুনী' অভিনয় করতে সাহস করেছিল এবং সে-অভিনয় সুন্দর হয়েছিল একথা শুনে ভারতে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আনন্দ হয়। যাঁরা এর উদ্যোগী ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র; কিন্তু গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধটি পড়ে' দু'একটি কথা যা মনে হয়েছে তা না লিখে পারছি না।

প্রথম কথা, আজ পর্য্যন্ত কোন অভিনয়—কোথাও কি হয়েছে যাকে perfect বলা চলে এবং যার কোন সমালোচনা সম্ভব নয়? রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিনীত 'ফাল্গুনীর' সমালোচনা করতে লোকে ছাড়েনি এবং আমি বিশ্বাস করি কবি রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করবেন যে, তাঁর অভিনয়ও আরও ভাল হ'তে পারে। এর কোন standard নেই, মানুষ নিজের রুচির অনুযায়ী অভিনয়ের ভাল-মন্দ বিচার করে' থাকে। যদি ধরে' নেওয়া যায় যে, দিল্লীর অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল, তবুও কি আমরা আশা করি যে, প্রত্যেক দর্শকের সর্ত্ত এক হবে? যদি তা' না হয়, তবে হয় তাঁরা অর্ব্বাচীন "হরিণ-শিশুর দলের" অথবা "জ্ঞানের চশমাধারী" পণ্ডিতের দলের। গুপ্ত মহাশয় চাবুক হাতে করে' তাঁদের শাসন করতে এসেছেন দেখে হাসিও পায় এবং দুঃখও হয়। হাসি পায় এইজন্য যে, দিল্লীতে 'ফাল্গুনী'র রসগ্রহণ করতে হয়ত একা গুপ্ত মহাশয়ই পেরেছেন, এই ভাবটির প্রকাশ দেখে দুঃখ হয়, যে, তিনি দৈব কারণে দিল্লীতে না থাক্‌লে এমন জিনিসের ভাব ও রস গ্রহণের লোক থাক্‌ত না দিল্লী-সহরে! হায় ভগবান্! মানুষ যদি বুঝ্‌তে পার্‌ত কোথায় তার নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা এবং সে-প্রকাশের জন্য সে কি না করতে পারে!

দ্বিতীয় কথা। যাঁরা সমালোচনা করেছেন, তাঁরা যে শুধু দোষ বের করার জন্যই করেছেন এ ধারণা কি করে' গুপ্ত মহাশয়ের মাথায় প্রবেশ করল, তা বুঝ্‌লাম না। কর্ম্মকর্ত্তারূপে তিনি চাবুক হাতে করে' শিক্ষা দিতে না বেরিয়ে যদি তিনি ভাল ভাবে সমালোচনা গ্রহণ করতেন, এবং ত্রুটিগুলি স্বীকার করতেন তবে ভাল হ'ত। একথা তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে, জ্ঞানের চশমা যাঁরা নাকে দিয়েছিলেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'কে তাঁর চেয়ে কম বোঝেন না। তাদেরও বাঙ্গালীর প্রাণ এবং সে প্রাণ "ফাগুন লেগেছে"'র সুরে মেতে ওঠে। সমস্ত বুঝ বারও রস-গ্রহণের ক্ষমতা একজনের, এ কথা ভাবা অসৌজন্য ছাড়া অন্য-কিছু নাম দেওয়া যায় না, বিশেষতঃ তিনি নিজে অধ্যক্ষ হ'য়ে নিজের প্রশংসা করা নিতান্ত অশোভন হয়েছে।

তৃতীয় কথা, যদিও সামান্য কথা, তবুও না বলে' দিলে হয়ত পাঠকবর্গ ঠিক ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পার্‌বেন না, তাই বল্‌ছি। বেঙ্গলী ক্লাব পয়সা নিয়ে অভিনয় করেছেন। দু'টাকার কম খরচ কারও হয়নি এবং যাঁরা বেঙ্গলী ক্লাবের সভ্য নন তাঁদের ঠিক্ দু'টাকার উপযুক্ত অভিনয় হয়েছে কি না একথা বলার নিশ্চয় অধিকার আছে। "সিন্ উঠ্‌তে বিলম্ব কেন হ'ল" এ সমালোচনা শুনে চটে' না গিয়ে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ার দরুণ ত্রুটী স্বীকার করে' নেওয়া উচিত ছিল। বাঙ্গালী আমরা, সবাই জানি কত কষ্ট করে' এই অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। ত্রুটী হওয়াই স্বাভাবিক এবং সেজন্য কেউ কিছু মনে করেনি বা কেউ অসৎ অভিপ্রায়ে সমালোচনা করেনি। একথা মনে ভেবে নিয়ে কতকগুলি অর্ব্বাচীন ছেলেকে শাসন করতে চেষ্টা করা অত্যন্ত অশোভন হয়েছে এবং আমি বাঙ্গালী ক্লাবের সভ্যরূপে তাঁর এই ছেলেমানুষীর প্রতিবাদ করছি। আমাদের অভিনয়কে আমরা defend না করাই সঙ্গত ছিল। ভাল বলাবার এ উপায় নিশ্চয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নয়, এই কথা বলে' আমার বক্তব্য শেষ করছি।

দিল্লীপ্রবাসী বেঙ্গলী ক্লাবের জনৈক সভ্য

—

পরিচ্ছদ-বিপ্লব

এই বৎসরের চৈত্রের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় যে পরিচ্ছদ-বিপ্লব-শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে কিছু প্রতিবাদ করিতে চাই।

(১) তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছেন যে, এদেশে আর্য্যগণের আসিবার পূর্ব্বে কি কোল, ভিল প্রভৃতি, কি দ্রাবিড় কেহই পরিচ্ছদ ব্যবহার জানিত না। উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত?

কিন্তু দ্রাবিড়গণ যে আর্য্যগণের আসিবার পূর্ব্বেই এক উচ্চ সভ্যতায় ভূষিত ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঐতিহাসিকগণের মত হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে।

ভিন্সেন্ট স্মিথ্ তাঁহার ইতিহাসে একস্থানে Distinct Dravidian Civilisation শীর্ষক অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"When the Brahmans succeeded in making their way into the kingdoms of the peninsula, including the realms of the Andhras, Cheras, Cholas and Pandyas, they found a *civilised society*, not merely a collection of rude barbarian tribes·····Tradition as recorded in the ancient Tamil literature indicates that from very remote times wealthy cities existed in the south and that many of the refinements and luxuries of life were in common use·····Choice cotton goods attracted foreign traders from the earliest ages. Commerce supplied the wealth required for life on civilised lines."

ইহা হইতেই কি আমরা দ্রাবিড়দের এক অতি উচ্চ সভ্যতা এবং বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্প-জ্ঞানের পরিচয় পাই না ?

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার ইতিহাসে দ্রাবিড়-জাতি-সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন—

"But there were other original tribes who could boast at least of the elements of civilisation. Agriculture and cattle rearing were not unknown to them."

শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় তাঁহার এক হিন্দী ইতিহাসে লিখিতেছেন, "উস্ সময় (আর্য্যগণের আসার সময়) ভারতমে দ্রাবিড় জাতি আপ্‌নি সভ্যতাকে উচ্চতম শিখরপর থী"······এই ইতিহাসে লেখক নিজেই আবার একস্থানে লিখিতেছেন যে, রাবণ যখন সীতা অপহরণের জন্য আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরিধানে গৈরিক বস্ত্র ছিল, সে-সময় লঙ্কা যে আর্য্য উপনিবেশ ছিল না, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই যে আর্য্যদের পূর্ব্বেও বস্ত্রশিল্পের প্রচলন আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে ছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

২। পরে তিনি আর-এক স্থানে প্রাচীন মিশরের সহিত বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "১৬৪২ বৎসর পূর্ব্বে মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের পরিসমাপ্তি।" এই কথায় কিছু ভুল আছে। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশ খৃঃ পূঃ ষোড়শ হইতে ১৪ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ইহার সমাপ্তি হয় খৃঃ পূঃ ১৩২১ সালে (Ancient Near East, Hall).

শ্রী রাখালচন্দ্র মাইতি

অনুনাসিক ও সংযুক্তবর্ণ

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

প্রাকৃত ও আমাদের প্রাদেশিক আর্য্য ভাষাগুলির সাধারণত এইরূপ একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোনো সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বের অংশটি লুপ্ত হয় তবে তাহার স্থানে একটি অনুস্বার আসে (বররুচি, ৪-১৫ ; হেমচন্দ্র ২-১৬ ; লক্ষ্মীধর (ষড় ভাষাচন্দ্রিকা) ১-১-৪২ ; Pischel §74), এবং এই অনুস্বার কখনো কখনো চন্দ্রবিন্দু আকারে অথবা পরে কোনো স্পর্শ থাকিলে তদনুসারে বর্গের পঞ্চম বর্ণরূপে অবস্থান করে। দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক :—

সং. (=সংস্কৃত) ক ক্ষ > প্রা (প্রাকৃত) ক কখ> হি. (=হিন্দী) বা. (=বাঙ্‌লা) কাঁ খ ; সং. অ ক্ষি> প্রা. অ ক্‌খি> বা আঁখি, হি গুঃ (=গুজরাতী) আঁ খ ; সং অ র্চি স্> প্রা. অ চ্চি> হি. বা. গু. ম. (=মরাঠী) আঁচ ; সং. অ স্থি> প্রা. অ. ট ঠি > বা. আঁ ঠি, হি. আঁ ঠী ; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সং উ চ্চ হইতে উঁ চ. ই ষ্ট কা হইতে ইঁ টা. ইঁট. উ ষ্ট্র হইতে উঁ ট পক্ষী ; প ঙ্খী (ময়ুর পঙ্খী নৌকা) ইত্যাদি শব্দ বাঙ্‌লায় এইরূপেই হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলি। বাঙ্‌লা দেশেই শুনিতে পাই কোথাও কোথাও বলা হয় সাঁ প, কোথাও-কোথাও সা প ; কেহ-কেহ বলেন হাঁ সি, কেহ-কেহ হা সি। আলোচ্য নিয়মটি মনে রাখিলে এই জাতীয় শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণকে অমূলক বলিয়া মনে হইবে না। সং. স র্প> প্রা. স প্‌ প, ইহা হইতে হিন্দীতে সাঁ প, সা প নহে ; হা স্য হইতে হ স্ সি, ইহা হইতে হাঁ সি (হি. হাঁ সী বা হঁ সী) ও হা সি উভয়ই সম্ভব ; অ ক্ষ র হইতে আঁ খ র, আ খ র দুইই হইতে পারে।

বাঙ্‌লায় স্থান ভেদে অনুস্বারের যোগ বা বিয়োগ উভয়ই দেখা যায় (দ্রষ্টব্য হেমচন্দ্র ১-২৯)। এই জাতীয় শব্দযুগলের কোন্‌টি প্রথমে কোন্‌টি বা পরে অথবা উভয়ই

একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, কিংবা কোনো একটি অপর কোনো ভাষার সংসর্গে উৎপন্ন ইহা আলোচনার বিষয়।

প্রাকৃতের মধ্যে এই নিয়মে যে কত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে উল্লেখ করিলাম না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি দেখিতে পারেন। প্রাকৃত ও তৎসম্বন্ধ প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে আমরা ভাষার এই যে বিচিত্র গতিটি দেখিতে পাইতেছি, তাহার মূল কতদূরে এবং সংস্কৃতেরও মধ্যে ইহা কিছু কাজ করিয়াছে কি না, করিলেইবা তাহা কিরূপ তাহাই আজ আমরা এখানে একটু আলোচনা করিয়া দেখিব।

গ্রীক ভাষায় g (gamma) অক্ষরের উচ্চারণে এই নিয়মটি দেখা যায় যেমন, ággelos, agkón, ágkhó, sphigx। এখানে প্রথম শব্দে প্রথম g'র উচ্চারণ ইংরেজী *thing* শব্দের *n*-এর মত (=ঙ্), আর অপর কয়টি শব্দের g'র উচ্চারণ *think* শব্দের *n*-এর মত (=ঙ্)।

প্রাকৃত ব্যাকরণগুলিতে বলা গিয়াছে, সং. ব্ক্র > প্রা. বক্ক > বঙ্ক (অথবা বংক)। হি. বা. প্রভৃতির বাঁক এই বঙ্ক হইতেই। বক্র বৈদিক সাহিত্যেও (অথর্ববেদ ৪.৬.৪. ৭.৫৮.৪) আছে। অতএব বক্র হইতে বঙ্কের উৎপত্তিতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। তবে এখানে একটু ভাবিবার আছে। বৈদিক সাহিত্যেই 'বক্রগামী' অর্থে বঙ্কু শব্দ আছে (ঋ. ১.১১৪.৪, ৫.৪৫.৬)। এস্থলে আমাদের বর্ত্তমান 'বঙ্কু বিহারীকে' মনে করিতে পারা যায়। 'উভয় পার্শ্বের অস্থি' বুঝাইতে বেদে (ঋ. ১.১৬২. ১৮; বাজস. ২৫, ৪১) বঙ্ক্রি। সন্দেহ নাই,'বক্র' বলিয়াই পার্শ্বের অস্থির নাম বঙ্ক্রি করা হইয়াছে। এই ব্ঙ্কু ও বঙ্ক্রি হইয়াছে বচ্ বা বন্চ্ ধাতু হইতে। ইহা হইতেই কুটিলগতি অর্থে বৈদিক সাহিত্যে বঞ্চতি প্রভৃতি পদের প্রচুর প্রয়োগ আছে। লৌকিক সংস্কৃতেও ইহার প্রয়োগ আছে, তবে অধিকাংশ স্থলেই ণিজন্তরূপে। যেমন শুচ্+র=শুক্র (=শুক্র) তেমনি বচ্+র =বক্র; এবং ঐ ধাতুরই রূপান্তর বন্চ্+উ=বঙ্কু, +রি=বঙ্ক্রি, এই দুই শব্দের ন্যায় বন্চ্+অ=বঙ্ক হইতে পারে। ইহাতে কোনো বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না।' অতএব ইহা নিঃসংশয়ে বলা শক্ত যে, প্রাকৃত বঙ্ক তৎসম বা তদ্ভব।

বৈদিক সাহিত্যে (অথর্ব্ব. ১৪.২.৬) কণ্টক শব্দ দেখা যায় (দ্রষ্টব্য বাজস. ৩০.৮)। যাস্ক বলিয়া না দিলেও স্পষ্ট বুঝা যাইত ইহার আদি রূপ হইতেছে কর্ত্তক। আলোচ্য নিয়মানুসারেই সং. কর্ত্তক প্রাকৃত প্রভাবে কট্টক হইয়া ক্রমশ কণ্টক হইয়াছে।

চর্ অভ্যস্ত হইয়া চর্চর 'চরণশীল' (ঋ. ১০,১০৬ ৭)। চর্চর > প্রা. চচ্চর > চঞ্চর > চাঁচর। বাঙলায় চাঁচর কেশ সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ভুলে অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শব্দটি যখন গত্যর্থক চর্ হইতে তখন তাহার যৌগিক অর্থ 'চঞ্চল' ভিন্ন কিছু হইতে পারে না। তাহার অর্থ কুঞ্চিত হয় না, যদিও, অভিধানে তাহা লিখিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম, মসৃণ, সুপরিষ্কৃত যে চুল বাতাসে ফুর-ফুর করিয়া নড়ে তাহাই চাঁচর। মনে হয় মূলত এইরূপই অর্থ হইবে।

সং. চর্চরী 'রাগ' এইরূপই হিন্দীতে চাঁচরী, চাঁচর আকার ধারণ করিয়াছে। ঋগ্বেদে পাই চর্ হইতে চর্চূর্যমাণ (১০.১২৪.৯), কিন্তু ঐতরেয় আরণ্যকে (২. ৩.৫) ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া চঞ্চূযমাণ হইয়াছে আলোচ্য নিয়মেই। 'ভ্রমর' অর্থে পরবর্ত্তী সংস্কৃতে চঞ্চরীক শব্দ এই প্রসঙ্গে মনে করা যাইতে পারে। সংস্কৃতে চর্=চল, চঞ্চর=চঞ্চল।

পাণিনি এইরূপ অনেক পদ লক্ষ্য করিয়াছিলেন (৭.৪.৮৫-৮৬)—যদিও তিনি আমাদের আলোচ্য নিয়মটি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, এবং বলিবার উদ্দেশ্যও তাঁহার ছিল না। দ্রষ্টব্য—দহ্ হইতে দন্দহ্যতে। ফল্ হইতে পফল্যতে; জপ্ হইতে জঞ্জপ্যতে; ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই ধাতুগুলি অভ্যস্ত হওয়ায় এইপ্রকার রূপ হইয়াছে।

বাণের নীচে যে পাখীর পালক বাঁধা হয় সংস্কৃতে তাহার নাম পুঙ্খ। শব্দটি কিরূপে হইল? সং. পক্ষ > প্রা. পক্ষ > * পুক্খ > পুঙ্খ। (অথবা পক্ষ হইতে

সাক্ষাৎ ভাবেই প ক্‌ খ ও * পু ক্‌ খ হইতে পারে।) প ওষ্ঠ বর্ণ বলিয়া তাহার প্রভাবে প ক্ষ শব্দের পকারস্থিত অকারটি উকার হইয়া গিয়াছে। তুলনীয় পু চ্ছ। ইহাও খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নহে; পশ্চাদ্ভাগ বাচী সং. প শ্চ ▷ প্রা. চ্ছ, পরে পকারস্থ অকার পূর্ব্বোক্ত কারণে উকার হওয়ায় তাহা হইতে পু চ্ছ। (প শ্চাৎ হইতেছে প শ্চ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির রূপ। স্মরণীয় প শ্চা র্দ্ধ=(পশ্চ+অর্দ্ধ।) প ক্ষ হইতে প্রাকৃতে প ক্‌ খ ছাড়া আর একটি রূপ হয় প চ্ছ এবং এই প চ্ছ হইতে পি চ্ছ। এখানে পরে তালব্য বর্ণ চ্ছ থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী পকারস্থ অকার ইকার হইয়া গিয়াছে। পাখীর 'পালক' অর্থে পু ঙ্খ শব্দের ন্যায় পি চ্ছ শব্দও সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে। পি চ্ছি কা শব্দও আছে। আবার পি চ্ছ হইতে আলোচ্য নিয়মে পি ঞ্ছ শব্দও সংস্কৃত অভিধানে স্থান পাইয়াছে।

সংস্কৃতে 'চিহ্ন' অর্থে লা ঞ্ছ ন শব্দ সুপ্রসিদ্ধ। কিরূপে ইহা হইল বৈয়াকরণিকেরা স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা লা ঞ্ছ ধাতু কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বামন বলিয়া গিয়াছেন, ধাতুগণ বাড়িয়াই চলিয়াছে ("বর্দ্ধিত এব ধাতুগণঃ")। এই ধাতুটি তাহার একটি উদাহরণ ধরা যাইতে পারে। লা ঞ্ছ ন শব্দটি সংস্কৃত নহে, ইহা ল ক্ষ ণ হইতে ক্রমশ আমাদের আলোচ্য নিয়ম অনুসারে হইয়াছে:— ল ক্ষ ণ ▷ প্রা. ল চ্ছ ণ ▷ লা ঞ্ছ ন। লা ঞ্ছ নে র ঞ পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দু-(ঁ) রূপে উচ্চারিত হইতেছিল (লাঁ ছ ন)।

পরবর্ত্তী সংস্কৃতে গ ঞ্জ ন শব্দটি খুবই প্রচলন দেখা যায় ("নেত্রে খঞ্জনগঞ্জনে")। এই গ ঞ্জ ন, গ ঞ্জ না প্রভৃতি কোথা হইতে আসিল? উপায়ান্তর না থাকায় সংস্কৃত ধাতুগণে আর একটি ধাতু যুক্ত হইল গ ঞ্জ। কিন্তু মূলত ইহা গর্জ্‌। গ র্জ ন ▷ প্রা. গ জ্জ ণ ▷ গ ঞ্জ ন। আমাদের আলোচ্য নিয়মেই এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এইরূপেই মা র্জ ন ▷ প্রা. ম জ্জ ণ ▷ ম ঞ্জ ন ▷ মা জ ন। ম ঞ্জ ন মোটেই সংস্কৃত নহে। ম ঞ্জু প্রভৃতি শব্দেরও মূলে মনে হয় বস্তুত মৃ জ ধাতুই রহিয়াছে। কিন্তু বৈয়াকরণিকগণকে ম ঞ্জ্‌ ধাতু কল্পনা করিতে হইয়াছে।

'দ্রুত' অর্থে বৈদিক সংস্কৃত ম ক্ষু (অবেস্তা মো ষু লাতিন mox) কিন্তু লৌকিক সংস্কৃত ম ঙ ক্ষু; ম জ্জ হইতে মি ম ঙ ক্ষু, ম ঙ ক্ষ্য তি; ন শ্‌ হইতে ন ঙ্‌ ক্ষ্য তি, ইত্যাদি (পাণিনি ৭.১.৬)। এতাদৃশ স্থলে উকার বা অনুস্বার কিরূপে হইল? আলোচ্য নিয়মটির কিছু কাজ কি এখানে দেখা যাইতেছে না?

'আকর্ষণ' অর্থে বাঙলায় আঁ ক ড়া আঁ ক ড়া ন প্রভৃতি শব্দ আছে। ইহাদের মূল শব্দ বা ধাতুটি কি, কোথা হইতে আসিল? সং. আ কৃ ষ্ট (অ+কৃ ষ্‌+ত) ▷ প্রা. আ ক ট্‌ঠ, ইহার শেষ অংশটি ঘোষ বা মৃদু হইলে আ ক হইয়া যায় আ ক ড্‌ ঢ। পরে ক্রমশ এই আ ক ড্‌ ঢ শব্দের আকারে ঝোঁক দেওয়ায় *ইহা অ ক্ক ড় হইয়া (তুলনীয়—স ক লে, স ক্ক লে; ক কৃ খ নো, ক ক্ষ নো; ইত্যাদি) আলোচ্য নিয়মে আঁ ক ড় হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি শব্দের উল্লেখ করিব। সংস্কৃতে অ ঙ্কু শ শব্দটি কি খাঁটি সংস্কৃত? ব্যুৎপত্তি কি? মনে হয় আ কৃ ষ ▷ * অ ক্কু শ, পরে আলোচ্য নিয়মেই * অ ক্কু শ ▷ অ ঙ্কু শ।

* দুই রকমে ইহা হইতে পারে; (১) চ ঞ্চ র শব্দের রকার লকার হইলে চ ঞ্চ ল অথবা (২) চ ল্‌ ধাতুর অভ্যাসে চ ল্‌ চ ল্‌ হইতে চ ঞ্চ ল।

সত্য

শ্রী জানকীনাথ দত্ত

সত্যেরে পিছনে রাখি' এগোতে যে চায়
মিথ্যার শতেক বাধা বাঁধে তার পায়।

আলোকে পিছনে রাখি' যে চলে, তাহার
পথ রোধে আপনারি ছায়ার আঁধার।

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

বাগদাদে বন্যা:—

বিগত ৯ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল এই এক সপ্তাহকাল ইরাকের রাজধানী বাগদাদ সহর প্রবল বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল। এরূপ বন্যা বাগদাদ সহরে অনেকদিন হয় নাই।

৯ই এপ্রিল তারিখে টাইগ্রিস নদীর বামকূলের বাঁধ সামান্য একটু
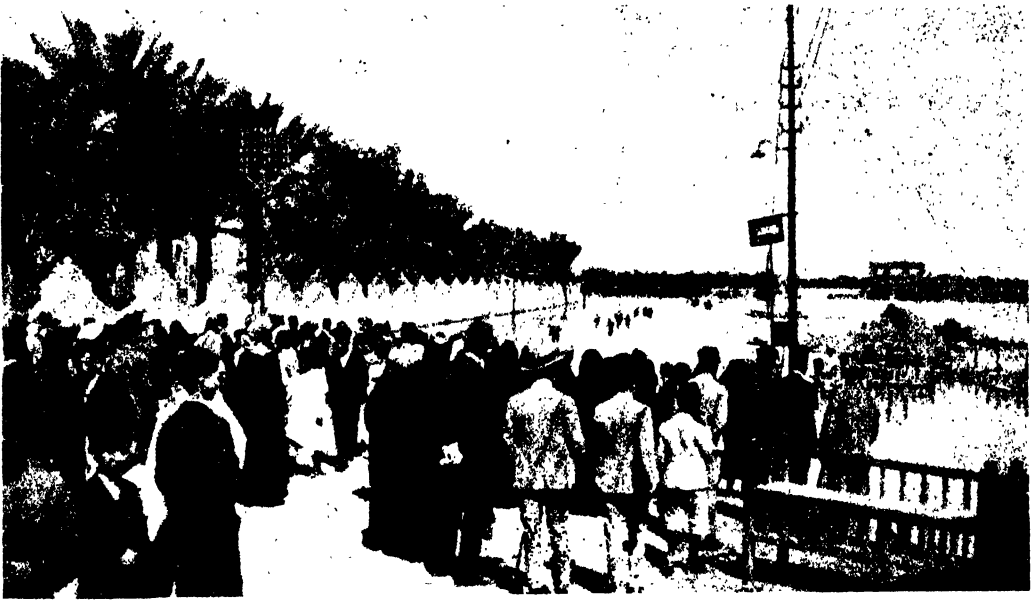
জলমগ্ন রাজপ্রাসাদ ও সামরিক বিদ্যালয়, বাগদাদ

রাজা ফজল জল-প্লাবিত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিতেছেন

জলপ্লাবিত স্থানসমূহ হইতে গুফা ও বুলাম নৌকাযোগে জিনিসপত্র বহন

ভাঙ্গিয়া যায়। রাজা ফজলের প্রাসাদ বাঁধের এই অংশেই অবস্থিত জলস্রোতের বেগে বাঁধের ভাঙ্গন ক্রমশঃ এত বেশী হইল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজপ্রাসাদ, সামরিক বিদ্যালয়, উত্তর বাগদাদ রেল ষ্টেশন ও সহরতলীর প্রায় চারিশত মাইল পরিমিত স্থান জলে ডুবিয়া যায়। এই বন্যার ফলে সহস্র সহস্র লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং কয়েক জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বন্যার দরুণ ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এন, কটলীর সৌজন্যে বন্যার যে ছবিগুলি আমরা পাইয়াছি তাহা ছাপা হইল।

বিহার বিদ্যাপীঠের অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মকারশাল

ভারতবর্ষ

লর্ড রেডিঙের ভারত-শাসন—

ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড রেডিঙের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় গত মাসে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁর পাঁচবৎসর ব্যাপী শাসনকালে তিনি ভারতের স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি সুবিন্যস্ত (well laid) করিয়া যাইতেছেন। লর্ড রেডিঙের সুশাসনের (!) নমুনাস্বরূপ কয়েকটি তালিকা সম্প্রতি নানা সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। আমরা নিম্নে একটি তালিকা দিলাম :—

১। অর্ডিন্যান্স, ২। লবণকর বৃদ্ধি; ৩। ডাকমাশুল বৃদ্ধি; ৪। লী-কমিশনের নির্দ্দেশানুযায়ী উচ্চ-কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা; ৫। ব্রহ্মের ভারতীয় বহিষ্কার আইন; ৬। ৩নং রেগুলেশান অনুসারে ধর-পাকড়; ৭। মহাত্মাজী ও দেশবন্ধু প্রভৃতিকে কারাগারে প্রেরণ; ৮। আদালত অবমাননা আইন; ৯। সামন্তরাজ রক্ষা আইন; ১০। পুলিশ রক্ষা আইন; ১১। সর্ব্বপ্রকার জাতীয় উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠান দলন; ১২। দেশের সর্ব্বত্র দমননীতি প্রবর্ত্তন; ১৩। পাঞ্জাবে শিখ নির্য্যাতন; ১৪। নাভা নরেশের রাজ্যচ্যুতি।

তালিকা আরও বাড়ান যায়, কিন্তু আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট।

বিহার বিদ্যাপীঠ—

গত মাসে আমরা বিহার বিদ্যাপীঠের একটি বর্ণনা দিয়াছি। আমরা পরে অবগত হইলাম বিদ্যাপীঠে অনেক বাঙালী ছাত্র অধ্যয়ন করে। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যাপীঠের নূতন বৎসরের কাজ আরম্ভ হইবে। বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষ এইখানে শিক্ষালাভের জন্য ভারতের সমস্ত প্রদেশের ছাত্রদের আমন্ত্রণ করিয়াছেন। বিদ্যাপীঠের কতকগুলি চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

ভারতে বিধবা-বিবাহ—

লাহোর ও কলিকাতা বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা এবং ইহার শাখা সমূহের গত মাসের কার্য্য-বিবরণী ;—

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ ১৯২৬ তিন মাসে ৬২৬টি বিধবা-বিবাহ সভার সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঞ্জাব ৪১৪, বাংলা ১৩, আগ্রা অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ ১২৩, সিন্ধুদেশ ৩৬, দিল্লী ১৯, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ ৬, আসাম ১, বোম্বে ১, মাদ্রাজ ১।

বাংলা

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিরক্ষার জন্য সাধারণের নিকট হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা দ্বারা মহিলা হাঁসপাতাল (চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গতমাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সেবাসদনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। দেশবন্ধু দাশের গৃহটি হাঁসপাতালের উপযোগী করিয়া সংস্কার করা হইয়াছে ও উপযুক্ত

বিহার-বিদ্যাপীঠের রাসায়নিক গবেষণাগার

বিহার-বিদ্যাপীঠের ছুতারের কাজ শিক্ষা করিবার কারখানা

চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্ত করা হইয়াছে। সেবা-সদনে ধাত্রীবিদ্যা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতা দিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলিকাতার দাঙ্গায় মৃত বীর বাঙ্গালী যুবকদ্বয়—

গত মাসের কলিকাতার দাঙ্গার সময় ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দ্বিসহস্র মুসলমান যখন বাজাবাজার হইতে অগ্রসর হইয়া মেছুয়া-বাজারের হিন্দু পল্লী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন ৪।৫ শত হিন্দু যুবক কেবল লাঠি লইয়া অকুতোভয়ে তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পুলিশ আসিয়া পড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি ইঁহারা এই ক্ষিপ্তপ্রায় আক্রমণকারীগণকে ঠেকাইয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে তাহারা হত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডবলীলা করিতে পারিত।

ধন্য তাঁহারা—যাঁহারা গুণ্ডাদের বলাৎকার লাঞ্ছনা হইতে পল্লীর সম্মান রক্ষার জন্য

বিহার-বিদ্যাপীঠের অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ

অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অসম-পরাক্রমে চতুর্গুণ অধিক আততায়ীকে তাড়িত করিয়াছিলেন।

এই রক্ষীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীমান চন্দ্রকুমার দেব ও শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ সুর পুরোভাগে থাকিয়া যখন দুর্ব্বৃত্তদিগকে বাধা দিতেছিলেন তখন অকস্মাৎ তাঁহারা গুলির আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই মারা যান। আত্মোৎসর্গের পূর্ণ অবদানে জননী ও জন্মভূমিকে কৃতার্থ করিয়া এই বীর যুবাদ্বয় বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিলেন।

চন্দ্রকুমার দেবের বাড়ী ত্রিপুরা জেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে। বিধবা মাতা ও দশবর্ষ বয়স্ক ভ্রাতার ভরণ পোষণের একমাত্র তিনিই অবলম্বন ছিলেন। ২৪ নং ঝামাপুকুর লেনের, যোগেশ নিটিং মিলে চন্দ্রকুমার কার্য্য করিতেন। যতীন্দ্রনাথ সুরের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার কুলশী গ্রামে (রেলষ্টেশন বাগিলা)। ইঁহার বাড়ীতে এক বিধবা ভগ্নী ও দুই ভাই

২ বিহার-বিদ্যাপীঠের কলেজ-গৃহ
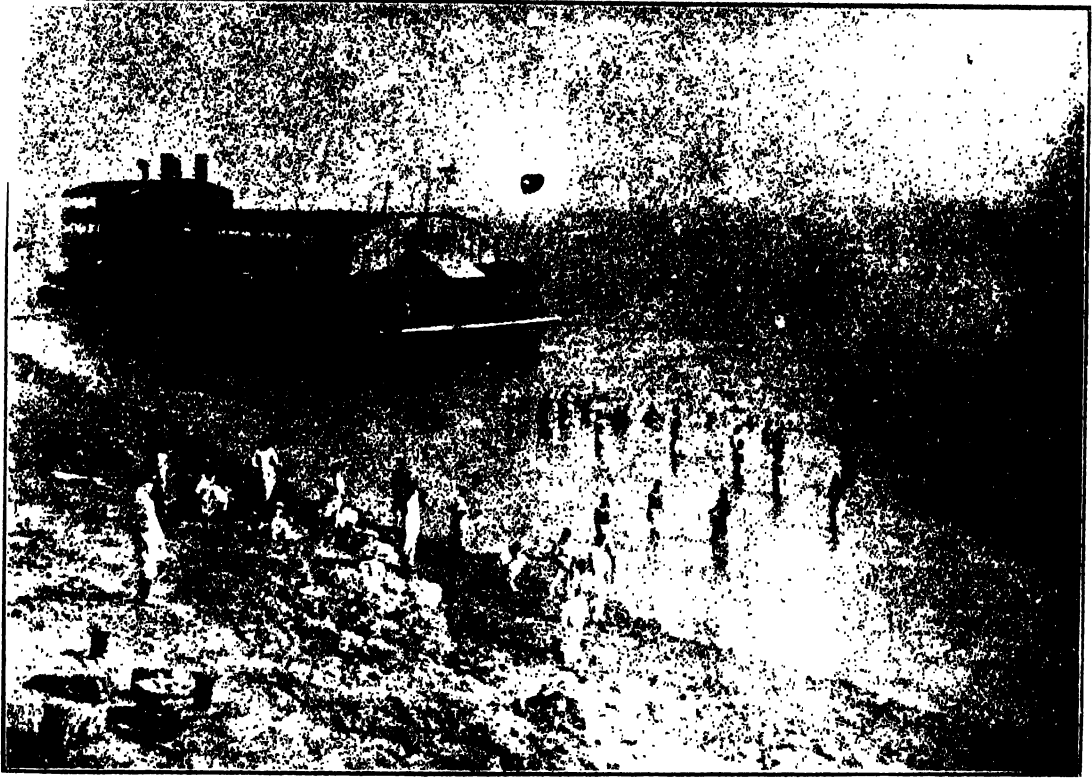
বিহার-বিদ্যাপীঠের স্নানরত ছাত্রগণ

বিহার-বিদ্যাপীঠের তাঁতশাল

আছে। ইনি জেমস্ ফিন্‌লের অফিসে কাজ করিতেন এবং ১৯নং রাজা লেনে থাকিতেন।

এই পরিবারদ্বয়কে যথাসাধ্য সাহায্য করা সমাজের কর্ত্তব্য।

পাবনা নারী শিল্পাশ্রম—

প্রায় চারি বৎসর হইল পাবনায় কতকগুলি উদ্যোগিনী মহিলাদ্বারা "নারী শিল্পাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আশ্রমে চরকা তাঁত প্রভৃতি নানা প্রকার অর্থকরী কুটির-শিল্প এবং সূচী-শিল্প, সীবনশিল্প প্রভৃতির প্রচার ও তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি বিশেষতঃ শিশুপালন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মালোচনা, সৎগ্রন্থ পাঠ নানা প্রকার প্রবন্ধ এবং মহিলাদের রচনা পাঠ হয়।

সম্প্রতি পাবনা নারীশিল্পাশ্রমের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র
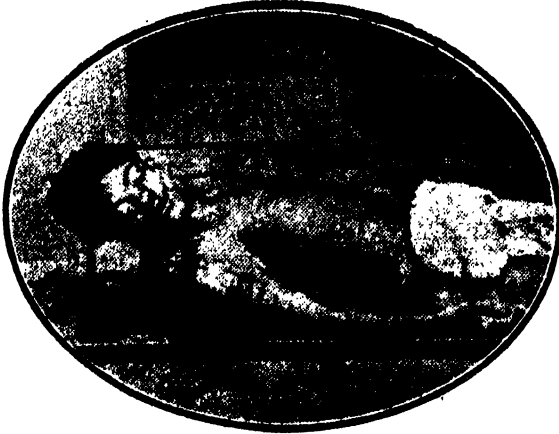
চন্দ্রকান্ত দেব
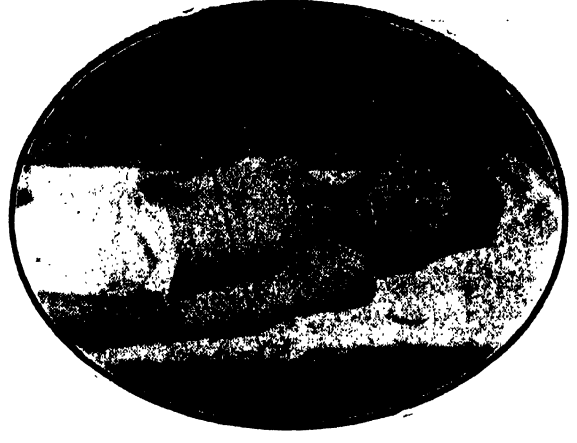
যতীন্দ্রনাথ সুর

ঘোষ ও খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় বহু মহিলা ঐ সভায় যোগদান করিয়া বিশেষ উৎসাহের পরিচয় দেন। এই সমিতির উদ্যোগে বালিকাগণের মধ্যে চর্‌কা-কাটার প্রতিযোগিতারও অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। স্থানীয় ৫০টি বালিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। চর্‌কা পারদর্শী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ঐসময়ে উপস্থিত থাকিয়া চর্‌কা কাটিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী বালিকাগণকে ও তাহাদের শিক্ষকদিগকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই উৎসবের সংশ্লিষ্ট মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রায় ১০০ শিল্প-দ্রব্য ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিভিন্ন রকমের সীবন কার্য্য, সূচীকার্য্য, কার্পেটের উপর নক্সা ও ছবি সুনিপুন উল ও জরির কাজ ইত্যাদি দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আশ্রমের সভ্যগণের সূতায় প্রস্তুত বহুবিশুদ্ধ ও অর্দ্ধ-খদ্দরের ধুতি, শাড়ী প্রদর্শনীর শোভা বর্দ্ধন করে।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন—

নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে নারী-শিক্ষা-সমিতি যখন গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় খুলিবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অনেক গ্রামেই দেখা গেল যে, লেখাপড়া এবং কিছু কার্য্যকরী গৃহশিল্প শিখিতে ইচ্ছুক বিধবার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আমাদের দেশে শিক্ষকতা করিবার জন্য শিক্ষা-প্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা খুবই অল্প। নারীশিক্ষা সমিতি স্থির করিলেন যে, গ্রামে গ্রামে যে-সব বিধবারা অবসর সময় পান, অথচ শিক্ষার অভাবে সে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া যদি শিক্ষয়িত্রীর কাজে, সেবার কাজে এবং অর্থকরী শিল্পকাজে নিযুক্ত করা যায় তবে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়া ১৯২২ খ্রীঃ অব্দের ২৯শে জুলাই কলিকাতায় "বাণী-ভবন" নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে যাঁহারা এখানে শিক্ষার্থিনী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই যে বিধবা ছিলেন তাহা নহে, বিধবা, সধবা ও কুমারী সকলকেই এই বিদ্যায়তনে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছিল, এখনও হয়। তবে অধিবাসিনী শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই বেশী ও বিধবারা সকল প্রকার আচার নিয়ম যাহাতে পালন করিয়া চলিতে পারেন, সে বিষয়ে পূর্ণদৃষ্টি রাখা হয়। বিধবাদের দুঃখমোচনার্থই এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত সেইজন্য বাঙ্গলাদেশের বিধবাদের দুঃখকাতর ও হিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে।

প্রথমে এখানে অল্প লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সূচীশিল্প, ও জ্যাম, জেলি, আচার ইত্যাদি তৈয়ার করিবার প্রণালী এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বোতলজাত করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন যাঁহারা ভর্ত্তি হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা সামান্য লেখাপড়া জানিতেন,আবার এমনও কেউ কেউ ছিলেন যাঁহাদের বর্ণপরিচয়ও ছিল না। এখানে প্রথমে কিছুদিন লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া তাঁদের মধ্যে অনেকে ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষাদান প্রণালী শিখিতেছেন ও কেহ কেহ কার্‌মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে সেবার কাজ বা নার্শিং শিখিতে গিয়াছেন। নারীশিক্ষাসমিতির প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কয়েকজন ডাক্তার সকল শিক্ষার্থিনীকেই আহতের সদ্য প্রতিকার ও বাড়ীতে সাধারণ রোগের ও সংক্রামক রোগের সেবার সম্বন্ধে শিক্ষিতা করিয়া তুলিবার শিক্ষা দেন। নারী শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে ছায়াচিত্র সাহায্যে মাতৃমঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতাদি হইত বাণীভবনের ছাত্রীরা নিয়মিতভাবে তাহাতে যোগ দিতেন।

এখন এখানে জ্যাম, জেলি, আচার, বড়ি ও নারিকেলের নানাপ্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ারী করার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। চর্‌খার সূতায় তোয়ালে ও গামছা-বোনা, কাট ছাঁট শেখানো ও জামা ইত্যাদি তৈয়ারী করা, পুঁতির কাজ ও নানারকমের সূক্ষ্ম সূচীশিল্প কাটায় বোনা, সোনা বাঁধান শাঁখা তৈয়ারী, সোনার পাত, পালিশের কাজ এ-সমস্ত নিয়মিতভাবে শেখান হয়, এবং এই সমস্ত কাজ করিয়া শিক্ষার্থিনীরা আপনাদের হাত-খরচের টাকা উপার্জ্জনও করেন। এখানে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী ভাষা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূবৃত্তান্ত ও ভূগোল, মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য গণিত, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, রচনা লেখা নিয়মিতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি বাণী-ভবনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির আরও উন্নতি করিবার চেষ্টা হইতেছে। মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাদান প্রণালী, প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক তথ্য, বিদেশের ইতিহাস, ছিটের কাপড় তৈরি, রংকরা ও ছাপা, নক্সা প্রস্তুত করা, সতরঞ্চি ও গালিচা প্রস্তুত করা, কাপড়-বোনা ইত্যাদি শিখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভবনের দুইটি ছাত্রী সুরুল শ্রীনিকেতন হইতে কাপড় রং করা ও ছাপার এবং গালিচা, সতরঞ্চি-বোনার প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছেন।

বাঁকুড়া গঙ্গাজলঘাটি অমরকানন আশ্রমের কর্ম্মিবৃন্দ

[শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহীত ফটো হইতে

বিদ্যাসাগর বাণীভবন শীঘ্রই একটি বড় বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইবে—কারণ বর্ত্তমান গৃহে স্থানাভাব অত্যন্ত বেশী বলিয়া সমস্ত কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইতেছে না এবং বেশী সংখ্যায় শিক্ষার্থিনীও ভর্ত্তি করা যাইতেছে না। বর্ত্তমানে অধিবাসিনী শিক্ষার্থিনীদের সংখ্যা বাইশ, আরও ৩০।৪০টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। অনেকে যাহাতে দুপুর-বেলা বাড়ী হইতে আসিয়া শিক্ষালাভ করিয়া যাইতে পারেন সে ব্যবস্থাও আছে। শিক্ষার্থিনীদের আসা যাওয়ার বন্দোবস্ত ভবন এতদিন করিতে পারেন নাই; শীঘ্রই সে বিষয়েও সুবন্দোবস্ত হইবে।

বিশ্ব-ভারতী ব্রতীবালক সম্মিলনী—

গত ৬ই এপ্রিল শান্তিনিকেতনে ব্রতীবালক সম্মিলনীর ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। হেতমপুরের রাজা শ্রীযুক্ত সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

বীরভূম জেলার নানা স্থান হইতে ৩০০ শত ব্রতী-বালক এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে
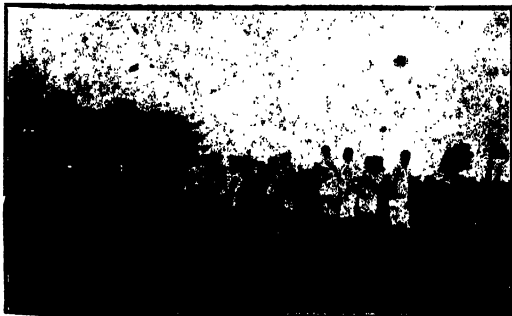
বিশ্বভারতী ব্রতী বালকদলের বড় ছেলেদের সিকি মাইল দৌড়

জলমগ্ন লোকের প্রাথমিক চিকিৎসা

ব্রতী বালকদলের ছোট ছেলেদের ক্যাঙ্গারু দৌড়

বালকগণ সমগ্র পল্লীর সহিত নিজেদের প্রকৃত সম্বন্ধ অনুভব করিতে শিক্ষা করিবে। প্রতিবেশীদিগের দুঃখে বিপদের সময় সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবা দ্বারা তাহাদের মধ্যে এই অনুভূতি প্রসারিত হইবে। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বালকদিগের চিত্তবিকাশের সহায়তা করাই ব্রতীবালক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্রতী বালকদের লাঠি ও কম্বলের সাহায্যে তৈরী তাঁবু

এই সম্মিলনীতে ব্রতীবালকগণ অগ্নি-নির্ব্বাপণ কৌশল, ম্যালেরিয়া-প্রতিকার, আহত ও আর্ত্তের সেবা, নানাবিধ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রণালী ইত্যাদি অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছিল। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ

মোর অপরিষ্কৃত ডোবা বোঁজান

ব্রতী বালকদলের বাঁশে চড়া

পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে বালকদিগকে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

'এ কথা আমার বলা বাহুল্য এই যে, তোমাদের কাজের একটি রূপ দেখলুম এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার আর নেই। মানুষ বাষ্প, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা শক্তিকে আবিষ্কার করেছে। মানুষ বাইরে বাইরে হাতড়েছে। অনেক শতাব্দী ধ'রে নিজের মধ্যে তার বিধাতা তাকে যে শক্তি দিয়েছেন তাকে সে খুঁজে পায়-নি। সে রাজপুত্র সে ভিক্ষা ক'রে ফিরেছে। আমাদের ভিতরে কল্যাণের যে-শক্তি নানা জঞ্জালে নানা বাধায় প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে, তাকে আবিষ্কার করার মতন আনন্দ আর কিছুতে নেই। সেই শক্তিকে জাগ্রত করা তোমাদের সাধনা হোক।

"সত্য নিজের আনন্দে নিজেকে বহন করতে পারে, এর জন্যে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

এই যে ছেলেরা আজ বিপন্নদের সেবা করছে, চিকিৎসার সহায়তা করছে, দূষিত জলকে শোধন করছে, আগুন নিবুচ্ছে,—এ তারা প্রাণের আনন্দে করছে। বহুকালের বিস্মৃত পৈতৃক ধন আজ যেন লুকানো তারা খুঁজে পেয়েছে। নিজের শক্তির সংস্পর্শ লাভ ক'রে নিজের কাছে

টাইপরাইটারের সাহায্যে অঙ্কিত পাখী ও পাখীর বাসা

তোমাদের প্রতিদিন পূর্ণ হোক্, হৃদয় প্রশান্ত হোক্, চরিত্র উন্নত হোক্—এর আনন্দে আমরা সকলে শক্তিলাভ করব। আমাদের সব যে আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তার মানে জীবনে আনন্দ কমে' গেছে। দুঃখের দিন একলা বহা বড় কঠিন, পরস্পরের সম্মিলনে-সহায়তায় যা বড় কঠিন তাও সহজ হয়, আনন্দের হয়। সত্য আপনাকে আপনি রক্ষা করে, বিস্তার করে। অল্প কয়েক দিন আগে একাজের পত্তন; দেখ এরই মধ্যে পরমুখাপেক্ষী ছিল যারা, যত অল্পই হোক্ তারা কোমর বেঁধেছে, নিজের কাজ নিজে করবার চেষ্টা করছে, নিজের বোঝা নিজে তুলে নিচ্ছে। ভিতর থেকে আনন্দ না পেলে একি হ'তে পারত? ছেলেদের কাছে এ সব কাজ তো উৎসব। আনন্দ জাগুক্, প্রাণ থেকে প্রাণে, এক জেলা থেকে আর-এক জেলায় এ ছড়িয়ে যাবে। ছেলেরা এই যে নিজেদের গ্রামকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, এই চেষ্টা দ্বারাই তারা দেশকে পাবে। বড় হ'য়ে এরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এরা অনুভব করেছে, দেশ এদের দিকে তাকিয়ে আছে। গ্রাম বল্‌লে ছোট কিছু বলা হয় না। পল্লীকে এতদিন আমরা সামান্য মনে করে' ব্যর্থ হচ্ছিলুম।

পল্লীর গৌরব সমস্ত দেশের গৌরবকে প্রকাশ করবে এইটাই আমার অনেক দিনের কামনা ছিল। যাবার পূর্ব্বে এইটিকে যে আমি দেখে গেলুম—শক্তির উদ্বোধন হয়েছে, পুণ্য কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেছ তোমরা—এ যে দেখ্‌তে পেলুম, এর বিকাশ যে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, এ আমার পরম আনন্দের বিষয়। যারা একে কাজে পরিণত করবার ভার নিয়েছে, তাদের প্রত্যেককে অন্তরের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের মত আমি তাদের কাছে থেকে বিদায় নিচ্ছি।

টাইপরাইটারে ছবি আঁকা—

শ্রী গোপীনাথ ঘোষ কলিকাতার একটা অপিসে টাইপিষ্টের কাজ করেন। তিনি ঐ কলের সাহায্যে শুধু লেখা ছাপিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। টাইপরাইটারের সাহায্যে তিনি বেশ সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা তাঁহার টাইপরাইটারের সাহায্যে-আঁকা একটি পাখীর বাসার ছবি দিলাম। তাঁহার এই প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

প্র

নব তীর্থঙ্কর

(বীর যুবক যতীন্দ্রনাথ সুর ও চন্দ্রকান্ত দেবের অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ উপলক্ষ্যে)

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

(১)

মরণ দিতেছে হানা অনুদিন দুয়ারে-দুয়ারে—
আমরা নয়ন মুদি' ভয়ে তারে দিই না যে সাড়া,
জীর্ণ কন্থা দিয়ে ঢাকি কম্পমান প্রাণপক্ষীটারে—
পঞ্জর-পিঞ্জর টুটি' কখন সে হয় দেহ-ছাড়া!
জানি এই পূতিপঙ্ক-অন্ধকূপ হ'তে বাহিরিয়া
দাঁড়াতে শকতি নাই তরীহীন তমসার পারে—
যেথায় মিলিছে আসি' দলে-দলে মর-দেবতারা,
উষার উষ্ণীষ মাথে, লোকালোক-গিরিরে ঘিরিয়া!

(২)

প্রাণ নাই, ভাণ আছে—জন্ম মৃত্যু দু'-ই বিড়ম্বনা,
মরণ যে হত্যা শুধু, বেঁচে-থাকা বিধাতার গ্লানি!
শাস্ত্র আছে—শিখিয়াছি ভালোমতে করিতে বঞ্চনা
মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বার্থত্যাগে অতি সাবধানী।
দিবসে তারকা খুঁজি দীপ্ত রবিরশ্মি পরিহরি'!
ধর্ম্ম জানে পুরোহিত—মোরা জানি তাঁহারি অর্চ্চনা,
ভুলেছি ওঙ্কার-নাদ—আত্মার সে আদি ব্রহ্মবাণী,
মুক্তা নাই শুক্তি আছে, মুক্তি নয়—মন্ত্র জপ করি!

(৩)

হে সুপর্ণ! হে গরুড়! কোথা হ'তে সুধা সঞ্জীবনী
হরিয়া করিলে পান মৃত্যুবিষ-মথন পাথারে?
আমরা শুনেছি শুধু আঘাতের আশু বজ্রধ্বনি,—
আহুতির হোমশিখা হেরি নাই নিকষ-আঁধারে!
কোন্ শাস্ত্র শিখাইল অবহেলে আত্ম-বলিদান?—
মোক্ষ সে কি?—স্বর্গ-লোভ?-বলে' দাও ওগো বীর-মণি!
ধর্ম্ম-ধ্বজী নরপশু হঠে' যাক্ কাতারে-কাতারে,
পুঁথি আর পৈতা-পূজা চিরতরে হোক্ অবসান।

পুস্তক পরিচয়

[পুস্তক-পরিচয়ের বা পুস্তক-সমালোচনার সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম—সম্পাদক]

ভারতীয় স্বাস্থ্যবিদ্যা—কবিরাজ শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ভিষগাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাতঃকৃত্য, স্নান, আহার, বিশ্রাম, নিদ্রা, ব্যায়াম, ঋতুচর্য্যা, শরীর বিজ্ঞান, মাদক-দ্রব্য সেবন, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত কতিপয় স্বাস্থ্যতত্ত্ব গ্রন্থকার এই পুস্তকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় হইলেও এবং গ্রন্থ মধ্যে অনেক ভাল কথা থাকিলেও তিনি স্থানে স্থানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার সমালোচনা-কালে যেরূপ সদ্বিচারের অভাব ও এক-দেশদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ভয় হয়, যে, এই গ্রন্থ আমাদের সমাজে সুশিক্ষা বিস্তার না করিয়া কুশিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিবে। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার মতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা এদেশে কিছুমাত্র উপকার করে নাই এবং কখন করিতে পারিবে না। পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান তাঁহার মতে এ দেশের উপযোগী নহে এবং উক্ত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানু-মোদিত যাহা কিছু কার্য্য এ দেশে হইতেছে তাহা দ্বারা দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্বাস্থ্যতত্ত্ব ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার (Personal hygiene) পক্ষে অনুকূল একথা কেহই অস্বীকার করিবে না, কিন্তু জনসংঘের স্বাস্থ্যরক্ষা (Public Health) সম্বন্ধে [যেমন বিস্তৃত জনপদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল কনসার্ভেন্সি (Conservancy) ড্রেনেজ (Drainage) প্রভৃতির সুব্যবস্থা, সংক্রামক রোগের কারণ নির্দ্ধারণ এবং তাহার প্রতিষেধের ব্যবস্থা, মহামারী নিবারণ ইত্যাদি বিষয়ে] প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকদিগের জ্ঞান ও দৃষ্টি নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আমাদের জ্ঞান এসকল বিষয়ে যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহার ফলে ব্যবহারিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কার্য্যক্ষেত্র যে বহুপ্রসার লাভ করিয়া মানবজাতিকে রোগ ও অকাল-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করি-তেছে, ইহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে রোগের যে এত প্রাদুর্ভাব, আমাদের স্বাস্থ্য যে এত হীন, আমাদের মধ্যে অকালমৃত্যু যে এত প্রবল, তাহার কারণ কেবল আমরা ভারতীয় স্বাস্থ্যবিদ্যা-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলিয়া নহে। তাহার মূল কারণ—পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এবং তৎপ্রতিপালনে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ও ও পরাঙ্মুখতা। আমরা এমনই নির্ব্বোধ যে, যে জল আমরা পান করি তাহার সহিত মনুষ্য ও পশুর মলমূত্র মিশ্রিত হইবার যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিই; যে-গৃহে আমরা বাস করি, তাহার চতুষ্পার্শ্বে আবর্জ্জনা সঞ্চিত রাখা ও জঙ্গল জন্মাইতে দেওয়া দোষজনক বলিয়া মনে করি না; কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে পানীয় জলের পুষ্করিণীতে রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি ধৌত করা আপত্তি-জনক বলিয়া মনে করি না। সংক্রামক রোগীর মলমূত্রাদি বিশেষ রূপে বিশোধিত না হইলে ঐসকল রোগের বিস্তৃতি অনিবার্য্য, ইহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আসে না। ইহা বলা বাহুল্য, যে, এই-সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানানুমোদিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব অথবা তৎপ্রতিপালন সম্বন্ধে ঔদাসীন্যহেতু আমাদের স্বাস্থ্যের আজ এই বিষম দুর্দ্দশা। পুরাকালে ভারতবর্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি অন্য অনেক বিষয়ে জ্ঞানের উচ্চ সোপানে উপস্থিত হইলেও জড়বিজ্ঞান, জীবাণুতত্ত্ব ও বীজাণুতত্ত্বের আলোচনায় বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা যে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল, তাহা অস্বীকার করিলে সত্যের অবমাননা করা হয় এবং অপ্রাকৃত স্বদেশপ্রেম ও আত্মশ্লাঘার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থে অনেকস্থানে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি-সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। বর্ত্তমান বিজ্ঞানা-লোকোদ্ভাসিত যুগে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যে এরূপ মত পোষণ বা প্রচার করিতে পারেন, তাহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে রক্ত দূষিত হইলে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু তন্মধ্যে আপনাআপনি উৎপন্ন হয়। বাহির হইতে আসে না। তিনি লিখিয়াছেন—ডাক্তারগণ "যাহাকে ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের বীজাণু (?) বলিয়া থাকেন, সেই বীজাণু রোগীর শরীরের বাহির হইতে আসিয়া রোগীকে আক্রমণ করে না। উহার উৎপত্তি রোগীর শরীরের দূষিত রক্তের মধ্যে—কুচিকিৎসায় ও আহারাদির অনিয়মে রোগীর রক্ত দূষিত হইলে ঐ দূষিত রক্তে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের বীজাণু জন্মিয়া থাকে।" এই বৈজ্ঞানিক যুগে যে-গ্রন্থে এরূপ ভ্রান্ত মত প্রচারিত হয়, তাহা দ্বারা জনসমাজের উপকার না হইয়া অপকার হইবার কথা, কারণ এইরূপ ভ্রান্ত মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া লোকে রোগ-প্রতিষেধের প্রকৃত উপায় অবলম্বন বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থকার কেবল কবিরাজ নহেন, তিনি একজন এম্-এ উপাধিধারী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। এরূপ অযুক্তি-পূর্ণ অসার মতবাদ প্রচারিত হইলে সাধারণের বুদ্ধি-বিভ্রম উপস্থিত হইয়া অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই দায়ীত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মতো লোকের যে-কোন পুস্তক প্রচার করা কর্ত্তব্য।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তিনি যে-সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও যুক্তি-সঙ্গত অথবা দেশকাল-পাত্র বিবেচনায় বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। তিনি দেশের লোককে একখানি মাত্র ধুতি পরিধান করিয়া নগ্ন গাত্রে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং শীতকালে কেবলমাত্র কোঁচার খুট অথবা পাতলা কার্পাসবস্ত্র গায়ে দিয়া শীত কাটাইতে পারিলেই স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধা হইবে, বলিয়াছেন। আমরা বিলাসব্যঞ্জক পরিচ্ছদ বা বস্ত্রবাহুল্যের একেবারেই পক্ষপাতী নহি। কিন্তু তাহা বলিয়া দেশকাল পাত্র বুঝিয়া ঋতুপযোগী আবশ্যক মত উপযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি এবং সেইরূপ উপদেশই লোককে দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করি। গ্রন্থকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে বিদ্যালয়ে শুদ্ধ ধুতি ও উত্তরীয় ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে জামা, পায়জামা ইত্যাদি "অস্বাস্থ্যকর পরিচ্ছদ পশমী জামা গায়ে দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টজনক। "৫ গায়ে দিলে এ দেশে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়," "জামা গায়ে দেওয়া অ

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে, ইত্যাদি। [বাংলাদেশের বাহিরে গেলে লেখক পাশ্চাত্য প্রভাবের লেশমাত্র যেখানে নাই, এরূপ নানাপ্রদেশে ও দেশী রাজ্যে হিন্দু ভদ্রমহিলাদের গায়ে জামা দেখিতে পাইবেন।] কি স্বাস্থ্য-রক্ষার, কি দেশকালপাত্রোপযোগী ব্যবহার এই দুইয়ের কোনটির পক্ষ হইতে আমরা গ্রন্থকারের এইসকল স্বকল্পনা-প্রসূত মতের পোষকতা করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, যে, আড়ম্বরবিহীন উপযুক্ত পরিচ্ছদ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, ভদ্রতার পরিচায়ক এবং দেশকাল-পাত্র বিবেচনায় আবশ্যক।

আমরা পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানমূলক গবেষণার ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, মক্ষিকা কলেরা প্রভৃতি কত সাংঘাতিক রোগের বীজ পদাদি দ্বারা বহন করিয়া ঐ সকল রোগের বিস্তৃতির কারণ হয় এবং তজ্জন্য খাদ্য-দ্রব্যাদি যাহাতে মক্ষিকাস্পৃষ্ট না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বসাধারণের বিশেষভাবে সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু গ্রন্থকার ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "মক্ষিকা ও বিড়ালের মুখ দেওয়া খাদ্য অশুচি ও দোষজনক নহে।" আমরা গ্রন্থকারের এই অদ্ভুত মতবাদ উপেক্ষা করিয়া পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপদেশ দিতে বাধ্য হইতেছি যে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট এবং মক্ষিকা-স্পৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণে মহা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।

গ্রন্থকার যদি তাঁহার স্বীয়মত ও মন্তব্য অপ্রকাশিত রাখিয়া শুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদসম্মত স্বাস্থ্যতত্ত্বগুলি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে যে-উদ্দেশ্যে তিনি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কতকপরিমাণে সফল হইত।

সমালোচনা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং বোধ হয় কিছু তীব্র হইল। সত্য ও সামাজিক মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া "প্রবাসীর" ধৈর্য্যশীল পাঠক-পাঠিকাগণ সমালোচকের এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীচুণীলাল বসু।

সুখের আকর—স্বাস্থ্যবিষয়ক পুস্তক—শ্রীসতীশচন্দ্র ভৌমিক প্রণীত, ২য় সংস্করণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, এম্-ডি লিখিত ভূমিকা। প্রকাশক—দি বুক কোম্পানী, ৪।৫ এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ။০।

স্বাস্থ্য ও নীতি বিষয়ক এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া প্রকাশক ও গ্রন্থকার দেশের যথার্থ অভাব দূর করিয়াছেন। অনেক জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে আছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়া উচিত। অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তকখানির ২য় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

ফুলঝুরি—কবিতা-পুস্তক—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল প্রণীত। প্রকাশক ষ্টুডেণ্ট লাইব্রেরী পাবনা। প্রাপ্তিস্থান বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন আনা।

৩২টি ছোট ছোট কবিতা ইহাতে আছে। কয়েকটি কবিতা সুন্দর।

বঙ্গবালা—নাটিকা—শ্রীকিরণবালা দাস গুপ্তা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান শ্রী যতীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত পিরোজপুর বরিশাল, ৫২ পৃষ্ঠা মূল্য ।৹ আনা।

এই নাটিকা ছোট ছোট বালিকাদের অভিনয়ের উপযুক্ত এবং সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। ছন্দোবদ্ধভাবে অনেক নীতি-কথা ইহাতে আছে।

বনফুল—শিশুপাঠ্য পুস্তক—বনবাসিনীবিরচিত। প্রাপ্তিস্থান মাধবী প্রেস মেদিনীপুর, ৫৪ পৃষ্ঠা মূল্য পাঁচ আনা।

কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতার সমষ্টি। বইখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত। মুড়ি প্রবন্ধটি বিশেষ উপভোগ্য।

স্বর্গীয় ডাক্তার বলাইচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবন—শ্রী নির্ম্মলচন্দ্র সেন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন, ৮নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন ৩৫ পৃষ্ঠা, মূল্য দেওয়া নাই।

স্বর্গীয় বলাইচন্দ্র সেনের জীবনে যে কর্ম্মকুশলতা ও একাগ্রতা ছিল তাহা সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া গ্রন্থকার সাধারণের উপকার করিয়াছেন।

সিন্ধু-সরিৎ—কবিতা-পুস্তক—শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। এন এম রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা।

অতি সুন্দর কয়েকটি কবিতা ইহাতে আছে। অভয়মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, প্রলয়রূপ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি কবিতায় এই নির্জ্জীব জাতিকে জাগাইবার চেষ্টা কবি করিয়াছেন। তাঁহার ভাব ও ভাষায় একটা সহজ তেজ আছে। এরূপ কবিতা আদৃত হইবে।

শেষখেয়া—উপন্যাস। শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড। মূল্য দেড় টাকা, ১৭৯ পৃষ্ঠা

এই উপন্যাসখানির ভাষা সুসংযত ও জোরাল হইলেও গল্পাংশ পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট-হইতে পারিলাম না, পড়িলে মনে হয় যেন বহিখানি সমাপ্ত হয় নাই। বেচারা নবীনের সংসারটি গ্রন্থকার চমৎকার চিত্রিত করিয়াছেন। পুত্র ও পুত্রবধূর অত্যাচারের চিত্রটি বড় মর্ম্মান্তিক। কিন্তু পুস্তকের শেষাংশে নবীনের সংসার সম্বন্ধে একেবারে উল্লেখ না থাকাতে বহিখানি অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

প্রবাদ-পদ্ম—১মভাগ, শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল প্রণীত। চাগুলী নিবাসী ডাঃ শ্রী সুবর্ণকৃষ্ণ চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত; ৭৮ পৃষ্ঠা; মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থকার কয়েকটি বহু প্রচলিত প্রবাদ গল্পচ্ছলে মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। বহিখানি সুখপাঠ্য।

ফরাসী ষোড়শী—গল্প—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত। এন এম রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, মূল্য এক টাকা। ১৩০ পৃষ্ঠা।

একটি মূল গল্প ও ১৫টি ফরাসী গল্পের অনুকরণ ও অনুসরণ। গল্পগুলি চমৎকার; বাঙলার গল্প-লেখকগণের আদর্শ হইবার যোগ্য। তবে গ্রন্থকারের ভাষায় কেমন যেন বিদেশী গন্ধ আছে। খুব সম্ভবত তিনি ফরাসী বর্ণনা-ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়াছেন। তাহাতে বইখানিতে লালিত্যের অভাব ঘটিয়াছে।

মহাত্মা তুলসীদাস—জীবনী—শ্রী শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, দি বুক কোম্পানী, ৪।৪ এ কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য দুই টাকা, ২২১ পৃষ্ঠা।

মহাত্মা তুলসীদাস সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলির অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার তুলসীদাসের জীবনী ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বহিখানি হিন্দুশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান পাঠকের অতীব প্রীতিপ্রদ হইবে। বহিখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। তুলসীদাসের রঙীন চিত্র দেওয়াতে বইটির সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের বর্ণনা প্রশংসনীয়।

সপ্তপুরা—কথা-সাহিত্য—শ্রী সুকুমার দত্ত প্রণীত। প্রকাশক

শ্রী সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু ন্যাশন্যাল পাবলিশার্স, ৬৫, সারপেন্টাইন লেন, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

বৌদ্ধযুগের সাতটি উপাখ্যান অতি মধুর সুললিত ভাষায় গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের কল্পনা ও রচনাভঙ্গী বিশেষ প্রশংসনীয়। পড়িতে পড়িতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই অতীত যুগের আবেষ্টনীর মধ্যে চলিয়া যাইতে হয়।—কালিদাসের উজ্জয়িনী, জাতকের রাজগৃহ, নালন্দা চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। প্রচ্ছদপটের চিত্রটি চিত্রকরের কল্পনা-কুশলতার পরিচায়ক। বহিখানির চমৎকার ছাপাই ও বাঁধাইয়ের জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

সপ্তমীর বলিদান—কাব্য—শ্রী চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহেরম্বজীবন চট্টোপাধ্যায়, বাঁশবেড়িয়া হুগলী, মূল্য ১টাকা ১৪৫ পৃষ্ঠা।

এই কাব্যগ্রন্থখানিতে সুললিত ছন্দে মহারাষ্ট্রকেশরী রাজা শিবাজী ও আফজল খাঁয়ের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

স—

মৃতের কথোপকথন—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। প্রকাশক আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য অনুল্লিখিত।

এই পুস্তকে বহুকাল মৃত ঐতিহাসিক বা ঔপন্যাসিক ব্যক্তিদের কাল্পনিক কথোপকথন স্থলে দেশের ও সমাজের বহু সমস্যা আলোচনা করা হইয়াছে। এই বইখানি ল্যাণ্ডরের লিখিত ইমাজিনারী কন্‌ভার-সেসান্‌স্ পুস্তকের অনুরূপ। ইহাতে ১৪টি কথা আছে—(১) শিবাজী, জয়সিংহ, (২) মাটসীনি, কাভুর, গারিবালদি, (৩) আকবর, আওরঙ্গজেব (৪) মিরাবো, দান্তন, রোবস্‌পীয়ের, নেপোলিয়ন, (৫) রাণা কুম্ভ,—মীরাবাঈ, (৬) অশোক, আলেকসান্দর, পুরু (৭) ঈশাখাঁ, কেদার রায় (৮) সুলতান মামুদ, ফেরদৌসী, (৯) চন্দ্রগুপ্ত, অশোক (১০) শান্তি, সূর্য্যমুখী কপালকুণ্ডলা (১১) সাবিত্রী, দ্রৌপদী (১২) বুদ্ধ, লাওৎস, কংফুৎস (১৩) স্ত্রী-পুরুষ (১৪) দীনশাহ, পরীজাত।

এইসব কথোপকথনের ভিতর দিয়া লেখক গভীর চিন্তাশীল অভিনিবেশের সহিত দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যার ধর্ম্মজীবনের ও পারিবারিক জীবনের আদর্শের বিরোধ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "ধর্ম্ম হচ্ছে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত জীবনের কথা, কিন্তু সমষ্টিগত জীবনের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে দেশবোধ।" "মানুষের ভালবাসা সেত অধিকারের লোভ—দুজনা দুজনাকে পরস্পর গিলতে চেষ্টা করা।" "আমি বলি স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ; পরের সাথে মিলতে মিশতে যাওয়ার আগে চাই নিজেকে পাওয়া। নিজেকে পাওয়ার জন্যে যদি পরের সংস্রব সব ত্যাগ করতে হয় তাও ভাল। ক্ষুদে-নিজত্ব বৃহৎ-পরত্বের অপেক্ষা অনেক গরীয়ান্‌। আমি সাম্রাজ্যের সাধক নই, আমি সাধক স্বারাজ্যের।" "বাহুর শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়—সে ত পশুর শক্তি। কবির যা সুন্দর, তারই মধ্যে নিহিত—শক্তির উচ্চতম নিবিড়তম প্রকাশ। স্রষ্টারই তপঃশক্তি কবির সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূলে, তারই এক কণা নীচে নেমে এসে তোমাদের মত বীরকর্ম্মীর বাহুকে শক্তিমান ও উদ্ধত করে তুলেছে।" "প্রকৃতির জয় করাই মানুষের সাধনা তাতেই প্রকৃতির যথার্থ পরিপূরণ।" 'নারী শক্তি—নারী তপঃশক্তি। কপালকুণ্ডলা! তুমি বোধ হয় নারীকে জ্ঞানের পথ দেখিয়ে দিচ্ছ। সূর্য্যমুখী তুমি দেখিয়ে দিচ্ছ প্রেমের পথ। কিন্তু আমি (শান্তি) সবার উপরে শক্তিরই মাহাত্ম্য দেখছি নারীর নারীত্বে।" "জগতের জীবনের কোন সম্বন্ধই বন্ধনের নয়, যদি সকল সম্বন্ধের মধ্যে রয়েছে যে বৃহত্তর সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধাতীত সম্বন্ধ—তার খোঁজ পাই; জীবনের একান্ত ভিতরেও নয়, আবার একান্ত বাইরেও নয়; মানুষের সমস্যা এ দুটির মধ্যে যুগপৎ লীলা খেলা।" এমনি সব তত্ত্বমীমাংসা প্রত্যেক কথার মধ্যে ছড়ানো আছে।

এই বইখানি কথ্যভাষায় লেখা। দু-এক স্থানে প্রাদেশিক প্রভাব ও অসঙ্গতি চোখে পড়িলো—"রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির চাতুরির উপর আমি নির্ভর করি নাই। দেশের অঙ্গচ্ছেদ করে' আমি স্বাধীনতার মূল্য দেই নি" (১২ পৃষ্ঠা) করি নাই স্থলেও 'করি নি' হওয়া উচিত ছিলো। "সে ভীষণ রাত্রির ছবি আমি এখনও ভুলতে পাচ্ছি নে..." (৪৫ পৃষ্ঠা) পাচ্ছি স্থলে 'পারছি' হইবে; পাচ্ছি শব্দের পা ধাতুর অর্থ পাওয়া, লাভ করা; আর পারছি শব্দের পার ধাতুর অর্থ সক্ষম হওয়া 'তোমরা যাদেকে বল ঋষি' (৫০ পৃষ্ঠা)। যাদেকে স্থলে যাদেরকে লিখিলে ভালো হয়। ইত্যাদি।

স্থানে স্থানে ভাষায় মোচড় দেওয়া লেখকের একটি মুদ্রাদোষ; ইহাতে শব্দের সম্বন্ধ ও ভাবসঙ্গতি নির্ণয় করিতে পাঠকের বেগ পাইতে হয়।

নলিনীবাবু বঙ্গসাহিত্যের শক্তিমান লেখক। তাঁহার রচনা নিখুঁৎ সর্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মাষ্টার টেইলর—ন্যাসন্যাল কমার্শিয়াল কলেজের টেলারিং-এর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত প্রণীত "মাষ্টার টেইলর" সচিত্র সেলাই ও কাটিং শিক্ষা পুস্তক, মূল্য ২৲। প্রকাশক দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার খুব সরল ও সহজ ভাষায় অতিশয় দুর্ব্বোধ্য বিষয়টিকে শিক্ষার্থিগণের সৌকর্য্যার্থে প্রনয়ণ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক পাঠে বোঝা যায় তাঁহার পরিশ্রমের সার্থকতা হইয়াছে। এই পুস্তকের এই একটি বৈশিষ্ট্য যে, শিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত নরনারী এই পুস্তক পাঠ করিয়া,কোন শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত, সকল রকমের জামা কাটা শিক্ষা করিতে পারিবেন। ইহাতে পুরুষ এবং মেয়েদের সকল প্রকার জামার কাটিং শিক্ষা প্রণালী অতি সরলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদুপরি গ্রন্থকার সুন্দর চিত্রদ্বারা ইহাকে আরও সহজ ও সরল করিয়া তুলিয়াছেন। যাঁহাদের নিজ হস্তে সেলাই করার সখ আছে তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযুক্ত। আবশ্যকতা হিসাবে দাম অত্যধিক হয় নাই।

ক. খ. গ

গীতা—শ্রীব্যোমব্রহ্ম গীতাধ্যায়ী। দেড় টাকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গীতার সুন্দর অভিনব সংস্করণ। ব্যাখ্যাও বেশ সরল হইয়াছে। গীতার তত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা চিন্তার পরিচায়ক। গীতাখানি সাধারণের নিকট আদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ছাপা, কাগজ ও বাঁধানো সুন্দর।

ভারতে হিন্দু ও মুসলমান—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। আট আনা। আর্য্য পাবলিশিং কোং, পি ৫৭ রসারোড সাউথ, কলিকাতা।

চিন্তা-বৈশিষ্ট্যে ও সমালোচনা-নৈপুণ্যে লেখক বহু দিন ধরিয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। যে-বিষয়ে তিনি আলোচনা করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান ভারতবর্ষের প্রধানতম সমস্যা। হিন্দুর শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও দুর্ব্বলতা কোথায় এবং মুসলমানের শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা লেখক শক্তির সহিত আলোচনা করিয়াছেন। মুসলমান যতক্ষণ না

পাহাড়ী মেয়ে
শিল্পী শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কর
শান্তিনিকেতন

ভারতবর্ষকে আপনার দেশ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের সহিত হিন্দুর ঐক্য কল্পনাতেই থাকিবে। পরস্পরের ঐক্যের উপায় হইতেছে—"অতীতে এক গর্ব্ব, বর্ত্তমানে এক বেদনা, ভবিষ্যতে এক আকাঙ্ক্ষা (the pride in the past, the pain at the present, and the passion of the future)"। বইটি সকলের পাঠ করা উচিত।

শিক্ষায় প্রকৃতির পন্থা—শ্রীকুঞ্জবিহারী হার, এম-এ বি-এল, বি-টি। নর্ম্মাল স্কুল, চট্টগ্রাম। দেড় টাকা।

বাল্যকাল হইতে স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতে পারিলে যে মানুষকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করা যাইতে পারে—এইটিই বইখানির আলোচ্য বিষয়। আলোচনা চিন্তাপ্রসূত বটে, কিন্তু অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্যের সহিত আমরা একমত, এবং তাহা প্রশংসার্হ। বর্ত্তমান শিক্ষকগণ বইটির নির্দ্দেশ-অনুযায়ী শিক্ষা দান করিলে দেশের উপকার হইবে। বইটিতে ছাপার ভুল প্রচুর।

শিবাজী—শ্রীনবগোপাল দাস। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভক্ত-কবি তুলসীদাস—শ্রীমনোরমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুইটি পুস্তিকাই শিশুপাঠ্য তিন আনা সংস্করণের অন্তর্গত। দুইটি জীবনচরিতই সুন্দর হইয়াছে।

প্রাথমিক ব্যাকরণ—শ্রীগিরিশচন্দ্র পাল। মডেল লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা। সাড়ে চার আনা।

লেখক অভিজ্ঞ পণ্ডিত। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের প্রয়োজন তিনি বোধ করিয়াছেন। ভূমিকায় আছে—"বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত হইলে…প্রথম শিক্ষার্থী শিশুদিগের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়ে।…সূত্রসকল সাধারণত বালকগণ না বুঝিয়াই কণ্ঠস্থ করে; তাহাতে তাহাদের স্মৃতিশক্তি অযথা ভারাক্রান্ত হয় মাত্র; চিন্তা ও বিচারশক্তির অনুশীলন হয় না।" ইহার প্রতিবিধান স্বরূপ লেখক যে-পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা বালকদের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত হইয়াছে।

পল্লী-সংস্কার ও গঠন—শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস্। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা। চারি আনা।

লেখক মহাশয় সরকারী কাজে থাকিয়াও দেশহিতমূলক বহু সংকার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। পল্লীর উন্নতি বিষয়ে তিনি যে-সব নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা তাঁহার অভিজ্ঞতা-প্রসূত। সুতরাং পুস্তিকাটি সকলের পাঠ করা উচিত।

ঋতম্ভরা বা সত্যপ্রতিষ্ঠা—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা। শ্রীগুরু মন্দির, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া। দুই টাকা।

ধর্ম্মগ্রন্থ। হিন্দু ধর্ম্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা আছে। পুস্তিকটি আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পর্য্যায়ে অনায়াসে স্থান পাইবে।

প্রশান্ত—শ্রী মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাণিকবাবুর রচনা সরল, স্বচ্ছ, মর্ম্মস্পর্শী। আলোচ্য পুস্তকটিতেও এই গুণ বর্ত্তমান আছে। বইটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। চরিত্রগুলি বেশ ফুটিয়াছে।

ষোল আনা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। এক টাকা বারো আনা।

লেখক গল্পচ্ছলে বাংলার আধুনিক গ্রাম্য সমাজের একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। গ্রামের ষোল আনা বলিতে যে, কয়েকটি স্বার্থপর মোড়লকে মাত্র বুঝায় এবং তাহাদের অঙ্গুলিচালনেই যে গ্রামে নানাবিধ অনাচার, অত্যাচার সাধিত হয় তাহা বিবৃত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। তাঁহার আর-এক উদ্দেশ্য—বীরভূমী গ্রাম্যভাষাকে সাহিত্যের আসরে ধরিয়া রাখা। তাহার এই দুই উদ্দেশ্যই সফল হইয়াছে। কিন্তু সে সাফল্যের চাপে গল্প তেমন জমে নাই বলিয়া মনে হয়। রাখাল ও রুক্মিণীকে শেষ অবধি দেখিতে ইচ্ছা করে। তবুও বলি, লেখকের স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে-মুগ্ধ করিয়াছে। তবে তাঁহার রচনায় আর-একটু কল্পনার রং থাকা বাঞ্ছনীয়।

ছায়াপথ—শ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বারো আনা।

কবিতাপুস্তক। যতীন্দ্রপ্রসাদ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। শব্দচয়ন, শব্দযোজন, ছন্দের নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণ বইটিতে আছে। কিন্তু এই গুণগুলিই এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, মাঝে মাঝে কবিত্ব খর্ব্ব হইয়াছে। কবি খুঁটিনাটির দিকে ঝোঁক দিয়া ভাবকে মাথা তুলিতে দেন নাই। বইটির ছাপা ও বাঁধান ভালো।

মরীচিকা—শ্রী পঞ্চানন মজুমদার। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। একটাকা বারো আনা।

উপন্যাস। রচনা সরল ও ঝরঝরে। বইটি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

গুপ্ত

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (সচিত্র) ১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য প্রতিখণ্ড ১৷০। প্রাপ্তিস্থান মনোমোহন লাইব্রেরী ১৯৮,২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। (১৩৩২)।

বাংলা-ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামিজী সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব নাই। স্বামী বিবেকানন্দ সহোদর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-বাবু এই পুস্তকে স্বামিজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতা ও ভক্তদিগের জীবনের অনেক ঘটনা সাধারণ্যে উপহার দিয়াছেন। কাশীপুরের বাগান, আলমবাজার মঠের সাধকদের কথা, বরাহনগরের মঠের সাধনার কথা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তমণ্ডলীর অনেক কথার আভাষ তিনি এই দুইখণ্ড পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর নিকট আমরা স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক বেশী জানিবার প্রত্যাশা রাখি। আশা করি পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

প্র

টাকার কথা—শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায় তত্ত্বনিধি, বি-এ, এফ, আর, ইকন, এস্ (লণ্ডন); ধন-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা ১। গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ॥০+৮০, দাম দেওয়া নাই।

বাঙলা সাহিত্যে অর্থনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "অর্থনীতি" ছাড়া একেবারে নাই বলিলেই হয়। এই হিসাবে গ্রন্থকারের উদ্যম ও উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি সুলিখিত তবে প্রথম কয় পরিচ্ছেদের লিখিবার ধারা এমন-কি উদাহরণগুলি পর্য্যন্ত বিখ্যাত ফরাসী অর্থশাস্ত্রবেত্তা জিডের Political Economyর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

গ্রন্থকার পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, টাকার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিতে সাময়িক ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান হয়, কিন্তু সমগ্রভাবে লোকসান কিছুতেই হইতে পারে না। যাহা লাভ-লোকসান হয় তাহা ব্যক্তিগত ও সাময়িক। সমগ্র দেশের কোনও লাভ কি লোকসান হয় না। গ্রন্থকারের এ সিদ্ধান্ত আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। গ্রন্থের ছাপাই ও বাঁধাই ভাল।

গ

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী

কাশীর নারী-সম্মিলনী

ইতিপূর্ব্বে কাশীতে নারীগণের উন্নতির চেষ্টা-সম্বন্ধে যে-সংবাদ দিয়াছিলাম, এই স্বল্প কালের মধ্যে তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এজন্য বর্ত্তমান কার্য্য সম্বন্ধে কিছু না বলা ভুল হয়। অধুনা বিধবা-আশ্রমগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে; কিছু অর্থাভাব ও কিছু সুপরিচালনার অভাবে। কিন্তু বিগত ভাদ্র, ১৩৩২ সাল হইতে অত্রস্থ কতিপয় ভদ্রমহিলার সাহায্যে "কাশী স্ত্রী-মহামণ্ডল"-নামে একটি স্ত্রী-সভা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহার সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা চৌধুরী ও সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী শোভনা নন্দী। এই স্ত্রী-সভার উদ্দেশ্য, স্থানীয় নারী-সমাজের শিক্ষার উন্নতি ও মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে মেলা-মেশা ও প্রীতি-স্থাপনের চেষ্টা। যে-সকল স্থানে অন্তঃপুরিকারা অবরোধের বাহিরে আসিতে অক্ষম, তাহাদের লইয়া সাহিত্য ও শিল্প এবং সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার চর্চ্চা করাই এই কাশী-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য প্রতিমাসে একটি স্ত্রী-সম্মিলনী হইয়া থাকে। মহিলাগণ স্ব-স্ব রচিত প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা স্বীয় মনোভাব বলিতে ও সে-বিষয়ে অপরের মন্তব্য শুনিতে পারেন। এই সভার সভানেত্রী শ্রীনিস্তারিণী দেবী সরস্বতী। এতদ্ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে শিল্পশিক্ষার একটি অধিবেশন হয়। মহিলাগণ নিজ-নিজ সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া অবসরকালে নানাবিধ সেলাই, কুটীর-শিল্প ও ইচ্ছামত সঙ্গীতও শিক্ষা করেন। আর-একটি বিশেষ কাজেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে-সকল বালিকারা বিবাহের পর আর স্কুলে যায় না ও যাহাদের শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, সেজন্য শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ করিয়া সেই বালিকাদিগকে লেখা-পড়া শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। ইহারই সংলগ্ন একটি বালিকা-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসের স্মৃতি-রক্ষার্থে কৃষ্ণভাবিনী বাণী-ভবন বালিকা বিদ্যালয় এখন সংস্থাপিত। এই স্কুলটির ছাত্রী-সংখ্যা একশত পঁয়ষট্টি। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শোভনা নন্দীর প্রাণগত চেষ্টা, একান্ত অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে নানা বিঘ্ন-বাধা ঠেলিয়া শত অভাবসত্ত্বে বিদ্যালয়টি বাঁচিয়া আছে। তিনিই স্থানীয় কতিপয় ভদ্র বিধবাগণকে শিক্ষকতা-কার্য্যের উপযোগী করিয়া চালাইতেছেন। কিন্তু আরও কয়েকটি উচ্চশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর অভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে এই স্কুলটি একেবারেই অবৈতনিক ছিল। এক্ষণে ১৯২৫ সাল হইতে যৎসামান্য ফী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিছু সাহায্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে সংকুলান হয় না। অতএব দেশহিতৈষী নরনারীগণের সাহায্য চাই। সাহায্য অর্থে যে কেবল অর্থ-সাহায্য তাহা নহে, বঙ্গের সুশিক্ষিতা সুরুচিজ্ঞানসম্পন্না ভদ্র মহিলাগণের সহানুভূতি ও প্রবাসিনী ভগিনীগণের প্রবন্ধাদি ও সৎপরামর্শ দান, যদ্দারা এই প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, সে-বিষয়ে পত্রাদি আদান-প্রদান ও যাঁহারা এই বারাণসী নগরীতে পদার্পণ করেন তাঁহাদের শুভাগমন ও আলাপ-পরিচয়ে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন ও প্রীতিবন্ধন করাও আমরা সহায়তা-লাভ মনে করি। বিগত আশ্বিন মাসে পূজার সময় সুকবি মানকুমারী বসু আসিয়া সভাতে যোগদান করেন ও প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। পরে শ্রীমতী লেডি বসু, শোভনা নন্দীর বালিকা বাণীভবন বিদ্যালয়ে সমবেত মহিলাগণকে আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী শ্রীমতী ইরাবতী মেহতা গুজরাটী মহিলা হইলেও যথেষ্ট সহানুভূতি রাখেন। একদিন তিনি কাশী-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সভায় যোগদান করিয়া হিন্দী ভাষাতেই তাঁহার মনোগত ভাব বর্ত্তমান নারী-সমাজের জন্য যাহা আবশ্যক ব্যক্ত করেন। বিগত চৈত্রে স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয় (কৃষ্ণভাবিনী বাণী ভবন) পুরস্কার বিতরণী-উপলক্ষে তিনি স্বামী সহ যোগদান করেন এবং দুইটি স্বর্ণ-লকেট দুইটি বালিকাকে আবৃত্তি শুনিয়া পুরস্কার দেন।

শ্রী নিস্তারিণী দেবী

মহিলা-মজলিস
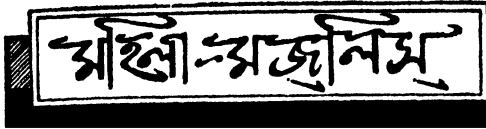
সুইডেনের নারী কর্ম্মীর চিঠি

[নরওয়ে ও সুইডেন ভ্রমণের সময় যে-জিনিষটি সবচেয়ে বেশী করিয়া মনকে আকৃষ্ট করে সে হইতেছে স্কান্দিনাভীয় নারীদের সহজ স্বাধীনতার বোধ। ইউরোপে নারী-স্বাধীনতার সংগ্রামে ইঁহারাই অগ্রণী; আলো-বাতাসের মতই স্বাধীনতা ইঁহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং নিজেদের চেষ্টায় সেটিকে ইঁহারা সহজলভ্য করিয়াছেন। স্বাধীনতার সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক দায়ীত্বের যেন একটা স্বতবিরুদ্ধতা আছে বলিয়া যাঁহারা সেই কুসংস্কার-বশে নারীর মুক্তি-যজ্ঞে বাধা দিয়া আসিতেছেন তাঁ'দের শুধু একবার নরওয়ে-সুইডেনের নারীসঙ্ঘ ও তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আসা উচিত। নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার ইবসেন এই যজ্ঞের একজন প্রধান পুরোহিত; তাঁহার প্রভাব সারা ইউরোপের নারী-সংঘকে জাগাইয়া তোলে; আবার আজ সুইডেনের যে প্রসিদ্ধ নারী কর্ম্মীর চিঠিখানি ভারতের নারীদের উপহার দিতেছি, তিনিও নরওয়ের কবিগুরু Bjornson (বিয়রন্‌সন)-এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছেন। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ বাধিলেও আদর্শ জীবনের ক্ষেত্রে এই দুই দেশের নারী-কর্ম্মীরা পরস্পরের হাত ধরিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ সতেজে রোধ করিয়া শান্তভাবে সেই সংঘর্ষের সমাধান করেন; এটি ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি মহান্ অধ্যায়; ইহা পাঠ করিলে শান্তি-ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন সন্দেহবাদীদের উপকার হইবে; এই সংঘর্ষের সময় কোন-কোন সুইডিস্ নারী নরওয়ের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় সহানুভূতি বশতঃ নিজ দেশ ছাড়িয়া নরওয়েতে বাস করিতে আসেন। এমনি একজন মহাপ্রাণা নারীর সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হয় যখন ক্রিস্‌চিয়ানিয়া (Kristiania)-তে যাই; মাদাম বুটেন্‌স্থন্ (Madam Butenschon) সযত্নে আমায় তাঁর অতিথি হইয়া থাকিতে অনুরোধ করেন—ভারতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখিয়া অবাক্ হই; তাঁরই অনুগ্রহে নরওয়ের ভাস্করশিরোমণি Gustav Wigelandএর অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শনগুলি দেখিতে পাই ও এদেশের বিখ্যাত নারী কর্ম্মীদের সঙ্গে পরিচয় হয়; সেজন্য Madam Butenschonএর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ভারতের নারীদের সঙ্গে পাশ্চাত্য নারীসঙ্ঘের যোগসাধন কতটা দরকার তাহা তাঁরই গৃহে অতিথি হইয়া প্রথম অনুভব করি, তিনিই ভারতীয় নারীদের প্রতি সুইডেনের নারীসঙ্ঘের জননী মাদাম হল্‌ম্‌গ্রেনের এই সহানুভূতিপূর্ণ পত্রখানি লিখাইয়া পাঠান; মাদাম হল্‌ম্‌গ্রেন্ সংক্ষেপে তাঁর জীবনের পরীক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া সুইডেনে নারীশক্তির জয়বার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। যে-দেশে তাঁর মত একনিষ্ঠ স্বাধীনতার পূজারিণী, ও এলেন কেইর (Ellen Key) মত গভীর চিন্তাশীলা নারীর আবির্ভাব হইয়াছে সে-দেশে সেল্‌মা লাগ্‌রলফ্‌এর মত শিল্পী যে কথা-সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া নবেল প্রাইজ পাইবেন তাহা আর বিচিত্র কি?

মাদাম্ হল্‌ম্‌গ্রেনের চিঠিখানি দিয়া ভারতের নারীসঙ্ঘের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের নারীসঙ্ঘের মিলনের উদ্বোধন হইবে এই ইচ্ছায় তাঁর সুন্দর চিঠিখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা গেল। ক্রমশঃ অন্যান্য দেশের নারী-শক্তির ইতিহাস সেই সেই দেশের কর্ম্মীদের কথায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রী কালিদাস নাগ]

প্রিয় ভারতীয় ভগিনীগণ,

তোমাদের পত্র লিখিবার সুযোগ পাইয়া আমি কতখানি সুখী হইয়াছি বলা যায় না। আমাকে লোকে "সুইডেনের নারী-আন্দোলনের জননী" বলে বলিয়া শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয়ের বন্ধু শ্রীমতী ব্যুটেন্‌স্থন্ আমাকে তোমাদের কাছে নারী-আন্দোলনের কথা ও আমার নিজের কথা কিছু বলিতে বলেন। আশা করি, আমার কথায় তোমাদের কিছু সাহায্য হইবে; যদিও আমার নিজের পক্ষে অন্য নারীর কথা বলাই বেশী তৃপ্তিকর হইত।

আমি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে একটি গ্রাম্য ভবনে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতামাতা একটি পুরাতন বনিয়াদী ঘরের লোক ছিলেন। পিতা পারিবারিক জমিদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন এবং এই সূত্রে অন্যান্য দেশকে ভালবাসিতে শিখেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু নারীর অধিকার-বিষয়ক ব্যাপারে তিনি নানাভাবেই স্বীয় যুগ অপেক্ষা আগাইয়া চলিতেন। তাঁহারই কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে আমি রাজনীতিতে অনুরাগ এবং মানবপ্রীতি পাই। সতের বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে আমি হারাই। তিনি কেবল আমার প্রিয়তম পিতা ছিলেন না, শ্রেষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এ বন্ধুত্ব ঘটিয়াছিল।

উনিশ বৎসর বয়সে উপসালা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন শরীর-তত্ত্বের অধ্যাপক হল্‌মগ্রেন্‌কে (Holmgren) আমি বিবাহ করি। তিনি অতি বুদ্ধিমান ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন, সে-রকম মানুষ অনেক নাই। তাঁহারই প্রভাবে

জীবনকে বৃহত্তরভাবে দেখিতে আমি শিখিয়াছিলাম এবং তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই ভাবেই দেখিয়া আসিতেছি। বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও আমার সে-দৃষ্টির প্রসারতা আরও বাড়িয়াছে।

আমি নয়টি সন্তানের জননী। বৃহৎ একটি সংসার পরিচালনার উপর এতগুলি সন্তানের ভারবহন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রচুর শক্তিসাধ্য ব্যাপার; এক-এক সময় ইহা আমার কাছে সাধ্যাতিরিক্ত হইয়া উঠিত। আমার সংসারের অন্যান্য কর্ত্তব্যের উপর মাসে দুইবার করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের বাড়ীতে আনার আর-এক কর্ত্তব্য ছিল। আমি কিন্তু সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে নিজেকে তলাইয়া যাইতে দিই নাই; বরঞ্চ সঙ্গীত, সাহিত্য ও সমাজহিতৈষণার কার্য্যে আত্মাকে মুক্তির আনন্দ পাইতে দিতাম। নরওয়ের স্বর্গীয় কবি Bjornson (বিয়র্ন্সন্) ও তাঁহার পত্নীর সহিত বন্ধুত্বের বন্ধন আমার আধ্যাত্মিক জীবনের অমূল্য সম্পদ ছিল।

পুরুষেরাই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। এবিষয়ে দুইটি ব্যতিক্রম ছিল। একটি আমার ভগিনী আর একজন ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবিকা এলেন কেই (Ellen Key)।

আমার দৃষ্টির প্রসারতা দানে কবি বিয়র্ন্সনের কৃতিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্ত্রীজাতি ও তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁহার বিশ্বাসই আমাকে আত্মপ্রত্যয় দিয়াছিল। জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার কার্য্য যে গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে এই আত্ম-প্রত্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং ঠিক এই জিনিষটিরই অভাব বিশেষ ভাবে আমার মধ্যে ছিল। অনেককাল পর্য্যন্ত আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি কোনো কর্ম্মেরই নই।

স্বামীর মৃত্যুর চার বৎসর পরে আমি সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহল্‌মে বসবাস সুরু করি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমি মহিলা শান্তি সমিতির (Woman's Peace Association) সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হই। পরের বৎসর মেয়েদের ভোট পাওয়ার আন্দোলন আমার স্কন্ধে বিষম এক কাজের বোঝা চাপাইয়া দিল, কারণ সেই বৎসর ষ্টকহল্‌মের মেয়র কার্ললিণ্ডহাগেন্ পার্লামেণ্টে মেয়েদের ভোট পাওয়ার অধিকার বিষয়ে একটি বিল উপস্থিত করাতে এই সমস্যাটি তখন লোক-সমক্ষে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। মেয়েদের একটি সংঘ (Woman Suffrage League) গঠিত হইল, আমি হইলাম তাহার সহকারী সভানেত্রী। আমরা বুঝিলাম যে, লক্ষ্য-স্থানে পৌছিতে হইলে এবিষয়ে দেশব্যাপী সমস্ত নারীর আগ্রহ ও উৎসাহ জাগাইতে হইবে। কিন্তু টাকা না থাকিলে এবং দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় আছে এমন বক্তা না থাকিলে একাজ করা সম্ভব হয় কি প্রকারে?

তখন আমার আটটি সন্তানই বড় হইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। কাজেই আমাকে বাধা দিবার কিছু ছিল না; তবে আমি নিজেকে বক্তৃতা দিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে করিতাম, এই একটা কারণ ছিল। বক্তৃতার মঞ্চে আরোহণ করা আমার কাছে বধ্যমঞ্চে ওঠার মতই ভয়ঙ্কর বোধ হইত; অথচ আমার মনের ভিতর হইতে কে যেন কেবলি বলিত—চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, পুরুষের সহিত সমান দায়িত্ব লইয়া দেশশাসন কার্য্য ও জনসাধারণের অন্যান্য কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইলে রাজনীতি-ক্ষেত্রে মেয়েদের ভোটের অধিকারই সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। এবং এই সর্ব্বসাধারণের কার্য্যে মেয়েদের যোগদান তাহাদের নিজেদের পক্ষে এবং রাষ্ট্রের উন্নতির পক্ষে যে সমভাবেই প্রয়োজনীয় তাহা আমার স্থির বিশ্বাস ছিল।

আমি একটা বক্তৃতার খসড়া তৈয়ারি করিলাম, আশা করিলাম সেটা জ্ঞানগর্ভ ও ভাবোদ্দীপকই হইবে। তাহার পর ছেলেবেলায় যেমন করিয়া গানের জন্য গলা সাধিতাম, তেমনি করিয়া গলার স্বরটা ঠিক করিয়া লইতে লাগিলাম। কয়েক মাস পরে মনে হইল কাজের উপযুক্ত হইয়াছি; তখন নানা সহরে পরিচিত ও অপরিচিত বহু লোককে চিঠি লিখিলাম, তাহাদের সহরে আমার বক্তৃতার জন্য একটি হল ঠিক করিয়া দিতে এবং

আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে। বেশীর ভাগ জায়গায়ই প্রায় জবাব পাইলাম যে, আমার কষ্ট করিয়া যাইবার কোনো দরকার নাই, কারণ ওবিষয়ে সে জেলায় কাহারও কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কিন্তু আমি দমিবার পাত্রী ছিলাম না; আবার লিখিলাম যে, মেয়েদের অবস্থা যদি এমনই সঙ্গীন হয় যে, এ-বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র আগ্রহই নাই, তাহা হইলে ত আমার সে-সব জায়গায় যাওয়া আরোই অধিকতর প্রয়োজনীয়। সুতরাং সেই সব জায়গায় আমার যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল।

এইরূপে আমি সুইডেনের নারীর অধিকার আন্দোলনের অগ্রণী হইলাম। আমাকে যথাসাধ্য সস্তায় ঘোরা-ফেরার কাজ করিতে হইত, কারণ মহিলা-সংঘের কাছে কিছুই সাহায্য পাইবার আশা ছিল না; কাজেই আমার ভঙ্গুর স্বাস্থ্য আরোই ভাঙ্গিয়া পড়িল। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পথে ঘুরিতে লাগিলাম, অনেক দুঃখ ভোগ করিলাম, কিন্তু সর্ব্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলাম। কখনও বা মস্ত বড়লোকের ঘরে অতিথি হইতাম, আবার কখনও বা কোনো দরিদ্র অসহায় রমণী তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত। এই প্রকারে আমি নানা সামাজিক অবস্থার ও নানা কর্ম্মে ব্রতী মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে ও তাহাদের চিনিতে শিখিলাম; বুঝিলাম কত বাধা-বিপত্তির সহিত তাহাদের সংগ্রাম করিতে হয়; ফলে নিজের কাজে নিষ্ঠা আমার আরোই বাড়িয়া গেল। সর্ব্বত্রই শ্রোতা ও সমালোচক উভয় দলেই আমার বক্তৃতা সাদরে গ্রহণ করিতেন। রক্ষণশীল কাগজগুলি অবশ্য আমাদের বিরোধী ছিল, কিন্তু কখনও একটিও শত্রু-জনোচিত কথা বলে নাই। লোকের মনে যাহা আঘাত দিতে পারে অথবা যাহা আক্রমণের মত শোনাইতে পারে, বক্তৃতায় এমন সকল কথা আমি সযত্নে এড়াইয়া চলিতাম। মেয়েদের ভোটের অধিকার দিলে সকলেরই যে মঙ্গল এবং এই অধিকার দেওয়া যে প্রয়োজন এই বিষয়ে আমার আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত আমি বলিয়া যাইতাম। এইরূপে অনেককে দলে টানিতে সক্ষম হইয়াছিলাম; এবং ষাটটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংঘ স্থাপন করিয়াছিলাম।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের উত্তরতম এক প্রদেশে বক্তৃতা দিতে যাইবার আয়োজন করিতে করিতে যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রীয় রেলপথের এক উচ্চ কর্ম্মচারীর পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। এই শীতের গোড়ায় মেরুবৃত্তের চেয়েও উত্তরে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি শুনিয়া তিনি ত আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে হয়ত কয়েকদিনের জন্যই তুষার বর্ষণের জন্য আট্‌কাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে, এ বিপদের কথা কি আমি বুঝিয়াছি? তিনি আরো বলিলেন যে, অল্প দিন আগেই মাতাল নাবিকদের চালান দিবার সময় ট্রেনে বিষম দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব শেষে তিনি বলিলেন, "বৎসরের এমন সময় স্বয়ং সয়তানও এ-পথে যাইবার কথা স্বপ্নেও ভাবে না।"

কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা এমন, যে, তাড়াতাড়ি যাহা করা যায় তাহাই করা দরকার। তখন কাহারও দূরদৃষ্টিতে চোখে পড়িত না যে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদিগকে আরও আঠারো বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।

আপাদমস্তক মুড়ি দিবার জন্য পশুলোম সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইলাম, তুষারপাতে আটক পড়ার ভয়ে এক ঝুড়ি খাবার যোগাড় করিলাম। ট্রেন ছাড়িল, কিন্তু পথে একদল বল্‌গা হরিণ রেললাইনের উপর আসিয়া পড়ায় এক ঘণ্টা আটক হওয়া ছাড়া আর কোনো দুর্ঘটনার সাক্ষাৎ আমাদের পাইতে হয় নাই। কিন্তু এই দারুণ শীতে আর নিরানন্দময় অন্ধকারে বার ঘণ্টা যাত্রা আর যাহাই হউক সুখকর নয়। কিন্তু আমার মন যখন নারীর অধিকারের ন্যায্য দাবীর আগুনে জ্বলিতেছে, তখন ইহাতে কিবা আসে যায়? অবশ্য এই সব দুর্গম পথে এমন ভাবে ঘোরাফেরার জন্য পরে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং এমন কষ্টকর যাত্রায় আর বাহির হইতে পারি নাই।

এই কয়েক বৎসরে আরো অনেকগুলি বক্তার আবির্ভাব হয় এবং প্রায় ২৫০ (আড়াই শত) সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকে যে আমার কথা শুনিতে এবং

আমাকে দেখিতে চাহিত তাহার অনেক তৃপ্তিকর প্রমাণ আমি পরে পাইয়াছি।

সময় ও মানুষ কি দ্রুত গতিতে পরিবর্ত্তিত হয়! যখন সেই সব কষ্টের ও পরিশ্রমের দিনের দিকে ফিরিয়া তাকাই তখন আমাদের দেশের স্ত্রী ও পুরুষের নিকট কত উৎসাহ পাইয়াছি মনে করিয়া হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আমার সহকর্ম্মীরা আমার হাতে কতই সহ্য করিয়াছে। একথা আমার স্বীকার করা উচিত যে যাহাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না তাহাদের সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে কিছু শক্ত। কোনো একটা বন্ধন স্বীকার করিয়া কাজ করিতে হইবে মনে করিলেই আমি কেমন যেন সঙ্কুচিত ও বুদ্ধিহীন হইয়া পড়ি। নিজের মতে অবাধে চলিতে পাইলে, তবেই আমার পক্ষে নিজ শক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব।

আমার কাছে স্বাধীনতা ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতাই মূল বস্তু, সুতরাং কি ব্যক্তির, কি জাতির ভিতর এই গুণগুলি আমি বুঝি ও শ্রদ্ধা করি। নারীর অধিকার ও পুরুষের সহিত সাম্য লাভের জন্য আমি এখনও উৎসাহে কাজ করি। কিন্তু সিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদের আরো অনেক পথ চলিতে হইবে এবং স্ত্রীজাতির নিজেদের উন্নতি নিজেদেরই সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে।

আমার ইচ্ছা ছিল যে নারীর-অধিকার-সংগ্রাম শেষ হইয়া যাইবার পরও মহিলাদের এই দলবদ্ধ সংঘগুলি নিজ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু অন্যদের আমি এ বিষয়ে আমার মত লওয়াইতে পারি নাই। কাজেই কেন্দ্রগুলি একে একে উঠিয়া যাইতে লাগিল; আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব ইহার জন্য শোক করিব। মেয়েরা যত দিন না একত্র দলবদ্ধ হওয়ার মূল্য বুঝিবে ততদিন তাহাদের দ্বারা কোনো কাজের মত কাজ হইবে না। জগতের হৃদয় পরিবর্ত্তনের মহৎকার্য্য ততদিন তাহাদের পক্ষে করা সম্ভব হইবে না। এই হৃদয় পরিবর্ত্তনেই মনুষ্য-জাতির চরম কলঙ্ক যুদ্ধ ও অত্যাচার দূর করিতে পারে।

পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতি যদি শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার জন্য প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে ভগিনীভাবে বদ্ধ হন, তাহা হইলে মাতৃত্বের অপেক্ষাও বড় কাজ আমরা করিতে পারিব।

তোমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রয়াসে আমি সর্ব্বান্তঃ-করণে জয় ইচ্ছা জানাইতেছি।

অ্যান্ মার্গারেট হল্‌ম্‌গ্রেন্

জন্মোৎসবের দিনে

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান্ বেলা তাসে পাশায়,
নাইবা হোলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো!

নাই ঘনালো দল বেদলের
কোলাহলের মোহ ॥

আমি জানি, মনে মনে,
সেঁউতি যূথী জবা
আন্‌বে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।
বর্ষা শরৎ বসন্তেরি
প্রাঙ্গনেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরী
বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমার আসন পরে
স্নিগ্ধ শ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তরে স্তরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখীর কলরবে ॥

জানি আমি এই বারতা
রইবে অরণ্যেতে—
ওদের স্বরে কবির কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে।
ফাগুন হাওয়ায় শ্রাবণ ধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বারে দ্বারে
উঠ্‌বে হঠাৎ বাজি;
কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে,
কভু অরুণ আলোক লেগে,
এই বারতা উঠ্‌বে জেগে
রঙীন বেশে সাজি!
স্মরণ সভার আসন আমার
সোনায় দেবে মাজি ॥

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এজীবনে।
সেই যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশ-নীলিমাতে।
রইল গভীর স্বখে দুখে,
রইল সে যে কুঁড়ির বুকে
ফুল ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুন চৈত্র রাতে।
রইল তারি রাখী বাঁধা
ভাবীকালের হাতে ॥

আমার স্মৃতি থাক্‌না গাঁথা
আমার গীতি মাঝে,
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
মর্ম্মরিয়া বাজে।
যেখানে ঐ শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
কিরণ-কণা-মালী;
যেথায় আমার কাজের বেলা
করে কতই কাজের খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি'
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
ভরে রূপের ডালি ॥

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ, ১৩৩৩।

বিবিধ প্রসঙ্গ
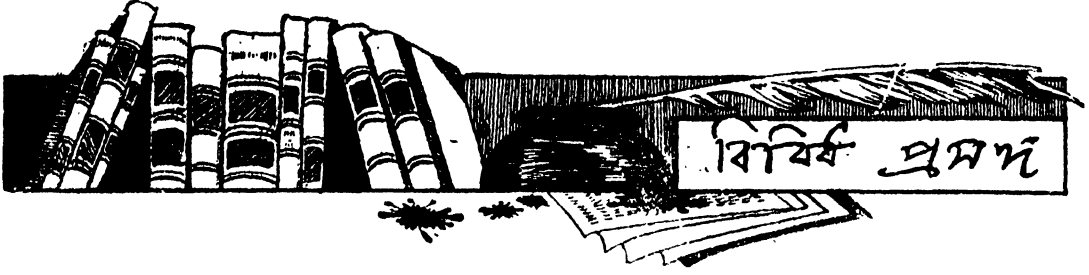
সম্পাদকির দায় বিপদ্

দেশে যখন কোন সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন উহার মাথাল লোকেরা চুপ করিয়া থাকিলেও কেহ কিছু বলিতে পারে না। তাঁহারা অন্ততঃ মনে মনেও বলিতে পারেন, "আমাদের কিছু ব'ল্‌তে কি দায় প'ড়েছে, মশায় ?" মাথাল লোকেরা নানা শ্রেণীর। কেহ কেহ রাজনৈতিক নেতা, কেহ কেহ বা প্রতিভা, মনস্বিতা, বা জ্ঞানরাজ্যে কৃতিত্বের জন্য কীর্ত্তিমান্‌। দেশের সঙ্কট অবস্থায় ইঁহারা সঙ্কট হইতে উদ্ধারের পরামর্শ উপদেশ দিতে বাধ্য নহেন। এবং বাস্তবিক অনেক সময় আশুফলপ্রদ কোন পরামর্শ উপদেশাদি দেওয়াও হয়ত অসম্ভব বা দুঃসাধ্য।

কিন্তু বেচারা পেশাদার সম্পাদকেরা এই সকল সময়ে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা পরামর্শ ও উপদেশ দিতে, অন্ততঃ নিজেরা ছাড়া অন্য সবাইকে দোষ দিতে ও তিরস্কার করিতে, বাধ্য। সকলের চেয়ে বিপন্ন ও দায়গ্রস্ত দৈনিক কাগজের সম্পাদকেরা। দুপর রাত্রে বা শেষ রাত্রেও একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিলে যদি প্রাতঃকালেই কোন দৈনিকে একটা বিজ্ঞজনোচিত মন্তব্য-তিরস্কারাদি না থাকে, তাহা হইলেও লোকে বলিতে পারে, সম্পাদক ওয়াকিফ-হাল নহে, কিম্বা ভীরু; কিম্বা অন্য কিছু বদনাম রটাও আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদকদের দায় ও বিপদ্ কিছু কম। তার চেয়ে কম সেই সব মাসিক কাগজের সম্পাদকদের যাহারা সমসাময়িক ঘটনা ও অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লেখে। সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ অবস্থা সেই সকল মাসিক-পত্রসম্পাদকদিগের যাহাদের কাগজ বৎসরের যে-কোন মাসে ও তারিখে ছাপা হইলেও নূতন বলিয়া দাবী করিতে পারে।

—

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে কি বলিতেন

পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্ম্মের লোক ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে "ধর্ম্মবিষয়ক" দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রধানতঃ হিন্দুমুসলমানের মধ্যেই হয়। অন্য ধর্ম্মের লোকদের সহিত যে একেবারেই হয় না, তাহা নহে। শিখদের সহিত হয়। গত এপ্রিল মাসে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এক জায়গায় খৃষ্টিয়ানদের রথযাত্রা উপলক্ষেও খৃষ্টিয়ানে মুসলমানে মারামারি হইয়াছিল। হিন্দুতে হিন্দুতে মুসলমানে মুসলমানে দাঙ্গা মারামারিও "ধর্ম্ম" লইয়া হইয়া থাকে।

"ধর্ম্ম" লইয়া যখন মারামারি হয়, তখন স্বভাবতই মনে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়, যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রথম ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ এখন জীবিত থাকিলে কি বলিতেন। বৈদিক ঋষিগণ, উপনিষদের ঋষিগণ এখন বাঁচিয়া থাকিলে কি বলিতেন, কি পরামর্শ দিতেন ? যে ব্যাসদেব মহাভারতের এত বড় যুদ্ধের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, তিনি এখন বাঁচিয়া থাকিলে কি বলিতেন ? লঙ্কাকাণ্ডের রচয়িতা বাল্মীকি জীবিত থাকিলে কি বলিতেন ? অহিংসাবাদী জৈনদিগের তীর্থঙ্কর মহাবীর কি বলিতেন ? বুদ্ধদেবের মত, পরামর্শ ও উপদেশ কি হইত ? যিশুখৃষ্টের মুখ হইতে কি বাণী নিঃসৃত হইত ? অধিকাংশস্থলে যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্য অনেক মুসলমান দৈহিক বল ও অস্ত্রবল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ জীবিত থাকিলে তিনিই বা কি বলিতেন ?

এরূপ কৌতূহল সম্পূর্ণ নিষ্ফল তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মোপদেষ্টাদের উপদেশ হইতে যাহা অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীকে কাপুরুষোচিত অতর্কিত হত্যা করার সমর্থন কেহই করিতেন না, চোরের মত ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্ম-মন্দির নষ্ট বা অপবিত্র করার সমর্থন কেহ করিতেন না, এবং অনেক মুসলমান যেরূপ কারণে এখন দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হন, তাহার সমর্থন স্বয়ং মহম্মদ করিতেন না, অন্য ধর্ম্মোপদেষ্টারাও করিতেন না। এই অনুমানের জন্য আমাদের সামান্য জ্ঞান ও প্রভূত অজ্ঞতা দায়ী। যাঁহারা কোন-না-কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের অনুরূপ অনুমান করিবার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা আমাদের কোনটিই নাই।

—

কাপুরুষতা ও পৌরুষ, এবং প্রত্যাক্রমণ

কেহ যদি আমাদিগকে আক্রমণ করে, কিম্বা আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ কাহাকেও আমাদের সাক্ষাতে বা গোচরে আক্রমণ করে, এবং যদি সে ক্ষেত্রে আমাদের আত্মরক্ষার ও দুর্ব্বলের রক্ষার সাহস না থাকে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ভীরু ও কাপুরুষ। আমাদের বা অন্যের ধর্ম্ম-মন্দির কিম্বা বাসগৃহ বা অন্য সম্পত্তি আক্রান্ত হইলে তৎসম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

অবশ্য সাহস থাকিলেও আক্রমণ নিবারণ বা প্রতিরোধ করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমাদের না থাকিতে পারে, এবং সেই কারণে আমাদের চেষ্টা সফল না হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টা নিষ্ফল হইলে তাহার জন্য কাপুরুষতাজনিত নৈতিক অধোগতি ও অপযশ জন্মে না।

আক্রমণ নিবারণ ও প্রতিরোধ করিবার সাহস থাকিলে এবং তদর্থ যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলে মানুষ কেবল আত্মরক্ষা ও দুর্ব্বলের রক্ষা করিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারে, কিম্বা প্রত্যাক্রমণও করিতে পারে। আত্মরক্ষা ও দুর্ব্বলের রক্ষা কোন কালে কোন অবস্থাতেই অনুচিত বা নিন্দনীয় নহে, বরং সাধারণতঃ তাহাই কর্ত্তব্য। আক্রমণের পর আত্মরক্ষা ও দুর্ব্বলের রক্ষা করিয়া তদনন্তর প্রত্যাক্রমণ না করাই ভাল; কিন্তু তাহা যদি কেহ করে, তাহা কাপুরুষতার মত লজ্জাকর ও নিন্দনীয় নহে।

আততায়ী হইয়া, গায়ে পড়িয়া, চড়াও করিয়া, দুর্ব্বলকে আক্রমণ অতিশয় ঘৃণ্য, গর্হিত ও নিন্দনীয়; ইহা এক প্রকারের কাপুরুষতা বই আর কিছু নয়।

ঐ প্রকারে কেহ যদি সবলকে আক্রমণ করে, তাহা সাহসের হিসাবে ভীরুতা অপেক্ষা ভাল হইলেও, অন্য কোন রকম প্রশংসা তাহার করা যায় না; তাহাও নিন্দনীয়।

ভীরুতা ও কাপুরুষতা অতি অধম অবস্থা। সাহস ও পৌরুষ তাহা অপেক্ষা ভাল। সাহস ও পৌরুষের ন্যায্য প্রয়োগ যাহা হইতে পারে, তাহার কিছু আভাস উপরে দিলাম।

সাহস ও মনুষ্যত্বের সর্ব্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক ব্যবহার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আততায়ীকে, বিরোধীকে, শত্রুকে ক্ষমা। ভীরু কাপুরুষ এইরূপ ক্ষমা করিবার অধিকারী নহে; কারণ, তাহার বাধা দিবার সাহসই যে নাই।

নারীর অপমান ও চূড়ান্ত অনিষ্ট যে করিতে আসে, তাহার ক্ষমা নাই; তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করাই একমাত্র ধর্ম্ম। অন্য উপায়ে তাহা সম্ভব না হইলে, তাহাকে এরূপ আঘাত করা একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হয়। আঘাত হঠাৎ গুরুতর বা সাংঘাতিক হইয়া গেলে তাহা অনভিপ্রেত এবং দুঃখের বিষয় হইলেও তাহার উপায় নাই।

খুব দৃঢ়চেতা সাহসী মানুষই প্রকৃত সত্ত্বগুণ লাভ করিতে পারেন, ভীরু কাপুরুষ পারে না। দৃঢ়চেতা সাহসী মানুষের মানবপ্রেম বন্দনীয় এবং মানবজাতির অশেষ কল্যাণের কারণ।

যে জাহ্নবীযমুনা আর্য্যাবর্ত্ত, মগধ ও বঙ্গদেশকে ধনধান্যে কবিত্বে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, দৃঢ় কঠিন পাষাণের হৃদয় হইতেই তাঁহাদের উৎপত্তি, কাদার ঢিবি হইতে নহে।

—

ধর্ম্ম-যুদ্ধ ও পুণ্য আহরণ

মানব ইতিহাসের অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম্মযুদ্ধের মহিমা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মযুদ্ধ অর্থে যে শুধু ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া যে-যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহাই বুঝাইয়াছে, তাহা নহে। যুদ্ধের নিয়মকানুন মানিয়া যে-কোন কারণেই যুদ্ধ করিলে মানুষ অনেক স্থলে তাহাকে ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়াছে। যুদ্ধই এক প্রকার ধর্ম্ম বলিয়া এক শ্রেণীর লোকের নিকট গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। তবে অন্যায়ের প্রতিকার, আত্ম-সম্মান রক্ষা ইত্যাদি কোন কারণ বর্ত্তমান থাকিলে তবেই যুদ্ধ ধর্ম্মত করা যায়, এই ধারণা সর্ব্বত্রই যোদ্ধাদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মরক্ষা বা অধর্ম্মের বিনাশের জন্য বিশেষ করিয়া যে যুদ্ধ হয়, শুধু তাহাকেই কেহ কেহ ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া থাকেন। যে অর্থেই আমরা কথাটি গ্রহণ করি না কেন, ন্যায়যুদ্ধ বলিয়া যে কথাটি চলিত আছে, তাহার বিপরীত প্রকারে যে যুদ্ধ হয়, তাহাকে সকলেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ধর্ম্মযুদ্ধে ও ন্যায়যুদ্ধে হত হইলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, এ ধারণা কুরুক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ অবধি সকল যুদ্ধেই যোদ্ধা-হৃদয়ে পোষিত হইয়াছে।

যোদ্ধার জন্য বিশেষ বিশেষ স্বর্গের বন্দোবস্তও প্রায় সকল ধর্ম্মেই দেখা যায়। কিন্তু ন্যায়যুদ্ধের নিয়ম রক্ষা করিয়া যুদ্ধ না করিলে সে স্বর্গে যোদ্ধার স্থান হয় না, একথাও সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছে।

কলিকাতার গত হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার সময় কোন কোন দাঙ্গার সেনাপতি দাঙ্গাকারীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য একথা প্রচার করেন, যে, উক্ত দাঙ্গা "ধর্ম্মযুদ্ধ" এবং দাঙ্গায় "শত্রুপক্ষের" লোকের প্রাণ নাশ করিতে পারিলে অক্ষয় স্বর্গলাভের পথ উন্মুক্ত হইবে, দাঙ্গায় মরিলে স্বর্গলাভ এবং নরহত্যা করিয়া বাঁচিয়া যাইলে বিশেষ পুণ্যলাভ হইবে। এ সকল কথা যাঁহারা প্রচার করেন,

তাঁহারা ফন্দিবাজ দেশশত্রু ব্যতীত আর কিছু নহেন। এই সকল মিথ্যা ধারণা নিরক্ষর লোকের মধ্যে প্রচার করিয়া তাঁহারা অনন্ত নরক বলিয়া কিছু থাকিলে তথায় গমনের পথ নিজেদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া লইয়াছেন। শুধু অধর্ম্ম করা অপেক্ষা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করা অধিক পাপ। ইঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নরহত্যা করিতে সকলকে উত্তেজিত করিয়া বিশেষ অপকর্ম্ম করিয়াছেন। যদি বা ধরা যায় যে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া নিহত হইলে অথবা অপরকে নিহত করিলে পুণ্য লাভ হয়, তাহা হইলেও গত দাঙ্গার "যোদ্ধা"-গণের ক্ষেত্রে সে কথা খাটে না।

ন্যায়যুদ্ধ বা সম্মুখসমর এবং দাঙ্গার "যুদ্ধ" পরস্পর-বিরোধী। দাঙ্গার সময় সশস্ত্র লোক নিরস্ত্র লোককে হত্যা করিয়াছে। ইহা ন্যায়যুদ্ধ নহে। পশ্চাৎ হইতে আচম্‌কা কাহাকেও ছুরিকাঘাতে হত্যা করাও ন্যায়যুদ্ধ বা সম্মুখসমর নহে। এবং এইরূপে অপরকে হত্যা করিতে গিয়া নিজে হত হইলে তাহা ন্যায়যুদ্ধে দেহত্যাগ নহে, তাহা গুপ্ত ঘাতকের উপযুক্ত পুরস্কার মাত্র। দাঙ্গার "যোদ্ধা"গণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যায় উপায়ে "যুদ্ধ" করিয়াছে। সুতরাং দাঙ্গার দ্বারা কোন যোদ্ধা স্বর্গে যাইবার উপায় করিতে পারিয়াছে কিনা, ইহা সন্দেহস্থল। বরং স্বর্গের বিপরীত কোন স্থানেই এই যোদ্ধাগণের যাওয়া সম্ভব।

অবশ্য যে-সকল বীরপুরুষ আত্ম-রক্ষা বা অপরকে রক্ষা করিবার জন্য আততায়ীর সহিত যুদ্ধে হতাহত হইয়াছেন, তাঁহারা ন্যায়যোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হইবেন, এবং দাঙ্গার পুণ্যের সকলটুকুই তাঁহাদের প্রাপ্য। অ।

—

বীরের কর্ত্তব্য

শত্রু যখন বিধ্বস্ত হয়, তখন তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শনই বীরের ধর্ম্ম। যদিও বিগত হিন্দুমুসলমানের কলহে পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই মূঢ় প্রমাণিত হইয়াছেন এবং দেশের বহুল ক্ষতি সাধন করিয়াছেন, তথাপি ধরা যাউক, যে, তাঁহারা পরস্পরের শত্রুই ছিলেন। এই কলহে পুলিশের সাহায্যে হিন্দুগণই "জয়ী" হইয়াছেন বলিয়া অনেকের ধারণা। এরূপ জয় হইয়া থাকিলেও তাহার কোন সার্থকতা আছে কিনা, সে কথা বিবেচ্য নহে। তাঁহারা জয়ী হইয়া থাকিলেও বীরোচিত ভাবে সে জয়শ্রী রক্ষা করিয়াছেন কিনা, তাহা দেখা যাউক। দাঙ্গার পরে শিখেদের শোভা-যাত্রার সহিত মিলিত হইয়া অনেক হিন্দু গমন করেন। প্রচার এই, যে, এই শোভা-যাত্রার লোকেরা মসজিদের সম্মুখে বিশেষ করিয়া বাদ্য বাজাইয়া কলরব করিয়াছেন ও "হিন্দু-কি জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন। এ কথা সত্য কিনা, আমরা জানি না। মুসলমান "নেতা" দিগের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা গুজব ইহা হইতে পারে। কিন্তু একথা সত্য হইলে বিশেষ আক্ষেপের বিষয়। কারণ, প্রথমত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের শত্রু নহেন, যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে "জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত "জয়" সম্পূর্ণরূপে হিন্দুর নিজ চেষ্টা ও পৌরুষ দ্বারা লব্ধ নহে। উহার মধ্যে "বৃটিশের জয়" অধিক মাত্রাতেই রহিয়াছে। তৃতীয়ত, "জয়" হইয়া থাকিলেও যথার্থ বীরের ধর্ম্ম বিজিতের সম্মুখে গিয়া চীৎকার করা নহে। ইহাতে কাপুরুষতা দেখান হয়। এইরূপ কার্য্য সত্যই যদি হিন্দুরা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের অপকার করিয়াছেন। শিক্ষিত হিন্দুদের উচিত মুসলমানদিগের নিকট এজন্য দুঃখ প্রকাশ করা। নিরক্ষর হিন্দু ও নিরক্ষর মুসলমানের রেষারেষি ও দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্য যাহাতে হিন্দুমুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীর মধ্যে বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিয়া আমাদের সদ্যোজাত জাতীয়তার সর্ব্বনাশ সাধিত না হয়, তাহা দেখিতে হইবে। অ।

—

স্বাধীন মুসলমানের সংখ্যা

পৃথিবীতে ২৩,০০,০০,০০০ মুসলমানের বাস। ইহা-দিগের মধ্যে উনিশ কোটি পরাধীন অর্থাৎ ইয়োরোপীয়ের অধীন। সুতরাং সমগ্র মুসলমান-জগতে মাত্র চার কোটি স্বাধীন লোক আছে। যে-ক্ষেত্রে মুসলমানগণের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র স্বাধীন, সে-ক্ষেত্রে মুসলমান নেতাদিগের কর্ত্তব্য অপরকে মুসলমানের দৈন্য ও দুর্দ্দশার জন্য দায়ী করিয়া মনের ভার লাঘব করিবার চেষ্টা না করিয়া, বিশেষ অন্বেষণ করিয়া এই দৈন্য ও পরাধীনতার কারণ নির্ণয় করা। নিজেদের মধ্যে গলদ না থাকিলে এরূপ অবস্থা কেহ প্রাপ্ত হয় না। হিন্দুগণ যে পরাধীন, তাহাও তাহাদের নিজেদেরই দোষে। মুসলমানের তুলনায় হিন্দু যে-যে দিকে যতটুকু উন্নত, তাহাও তাহাদের নিজগুণে। হিন্দুর কর্ত্তব্য আত্মসংস্কারের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করা। মুসলমানের উচিত হিন্দুর আর্থিক ও বিদ্যাবুদ্ধি-সংক্রান্ত উন্নতি দেখিয়া হিংসা না করিয়া নিজেরা উন্নত হইবার চেষ্টা করা।

অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মুসলমানদের কথা ধর্ত্তব্য নহে ; কিন্তু কোন কোন মুসলমান নেতাও এরূপ ভয় দেখাইয়া থাকেন, যে, প্রয়োজন হইলে বিদেশী মুসলমানদের সাহায্য লইয়া তাঁহারা ভারতে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করিবেন। স্বাধীন মুসলমানদের সংখ্যা মোটে চারি কোটি, ভারতে হিন্দুর সংখ্যা একুশ কোটি সাতষট্ট লক্ষের উপর। ভারতের ছয়

কোটি সাতাশি লক্ষ মুসলমানের সঙ্গে স্বাধীন চারি কোটি মুসলমান সবাই যোগ দিলেও এগার কোটির বেশী হয় না। এই এগার কোটি মানুষ একুশ কোটি হিন্দুকে নিশ্চয়ই পরাজিত করিতে পারিবে বলা যায় না। অবশ্য ইংরেজ রাজা থাকিতে এরূপ যুদ্ধ ত হইবেই না। ভবিষ্যতের কথাই হইতেছে। আজকাল যুদ্ধে বিজ্ঞানের খুব দরকার। তাহাতে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ ইংরেজদের প্রভু হইবার আগেই মরাঠা ও শিখেরা কার্য্যতঃ করিয়াছিল। সুতরাং সব হিন্দুই কাপুরুষ নহে এবং যুদ্ধে অনিপুণ নহে। বলা বাহুল্য, আমরা কাহারও সহিত কাহারও যুদ্ধ চাই না; কোন কোন মুসলমান নেতা ধমক দেন বলিয়াই এই কথাগুলি লিখিলাম।

—

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উক্তি

লক্ষ্ণৌএ অযোধ্যার দ্বিতীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অস্পৃশ্যতা ও নিম্নজাতির পক্ষে স্কুল, কলেজ, মন্দির ও কূপ ইত্যাদি ব্যবহার-সংক্রান্ত অবিচার দূর করিবার জন্য যে প্রস্তাব উঠে, তাহার সমর্থন করেন। শুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে স্বামীজি মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপ্রচার প্রণালী বিষয়ে বহু কথা বলেন এবং নিজের কথা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণ করেন। স্বামীজি বলেন যে, এখনও ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটি মুসলমান ও চৌত্রিশ লক্ষ খৃষ্টিয়ান রহিয়াছে, যাহারা জীবনযাত্রা-প্রণালী ও সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম্মত্যাগ করিবার পূর্ব্বের ন্যায়ই হিন্দুদিগের অনুসরণ করিয়া থাকে। শুদ্ধির প্রথম কার্য্য এই সকল লোককে হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে ফিরাইয়া আনা। হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ উদার ও বিশ্বব্যাপী, সুতরাং সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় ইহারা পাইবেই।

—

বঙ্গীয় মুসলমান "পার্টি"

স্যর আব্‌দার রহিম ও তাঁহার দলের অন্যান্য সকলে মিলিয়া একটি নূতন "পার্টি" গঠন করিয়াছেন। এই পার্টির নাম বঙ্গীয় মুসলমান পার্টি। মুসলমানদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ স্যর আব্‌দার রহিমের ন্যায় মুসলমানের পক্ষে, এইরূপ কার্য্য করায় কেহই আশ্চর্য্য হন নাই। কিন্তু এই পার্টির যথার্থ উদ্দেশ্য যাহা, তাহা গোপন করিয়া লোকের মনে অন্য প্রকার বিশ্বাস জন্মাইবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা সত্যই হাস্যকর। পার্টির উদ্দেশ্য এইরূপ বলা হইয়াছে :—

"স্বায়ত্ত শাসন লাভের প্রথম ধাপ গভর্ণ্‌মেণ্ট্ অফ ইণ্ডিয়া এক্টের কার্য্য দেখিয়া ইহা বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, এংলোইণ্ডিয়ান, রায়ত, কুলিমজুর, অস্পৃশ্যজাতি, নিম্নশ্রেণী সকলের হইয়া চিন্তা করিবার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় দলের প্রয়োজন আছে। এই দলের কার্য্য হইবে সকল শ্রেণীর লোকের আর্থিক ও মানসিক উন্নতির চেষ্টা করা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এরূপ করিয়া সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যাহাতে উহা কোন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্ষুদ্র গণ্ডীর একাধিপত্যের মধ্যে থাকিতে না পারে।"

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে এইরূপ একটি পার্টি হইলে তাহা আদর্শ পার্টিই হইবে। কিন্তু স্যর আব্দার রহিম এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গেরা তাঁহাদের কোন্ গুণ, ক্ষমতা ও অতীত কার্য্যের সাহায্যে প্রমাণ করিবেন, যে, সকল শ্রেণীর লোকের হইয়া তাঁহারা চিন্তা করিতে সক্ষম হইবেন? অন্য সব শ্রেণীর লোকের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু বাংলার শুধু মুসলমান মজুর ও চাষাদিগকেই কি এই সকল মহাপুরুষগণ দুর্দ্দিনের বন্ধুরূপে দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, ঝড়ে বা ভূমিকম্পে কোন দিন সাহায্য করিয়াছেন? ইঁহারা কি শুধু মুসলমানদিগের উপকারের জন্যও কোন বেসরকারী স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়া অমুসলমানের মুসলমানদিগকে প্রদত্ত সাহায্যের সমতুল্য সাহায্যও মুসলমানকে কখনও করিয়াছেন?

আমরা যদি দেখি, যে, স্যর আবদার রহিম তাঁহার প্রসিদ্ধ আলিগড়ের বক্তৃতার পরে অকস্মাৎ নবরূপ প্রাপ্ত হইয়া উদার ও উন্নতমনা হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের সুখের সীমা থাকিবে না। কিন্তু যদি তিনি নব গুণে গুণী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার উচিত অগ্রে সে গুণের কোন পরিচয় দেওয়া ও তৎপরে বড় বড় কথা বলা। তিনি শ্রেণীবিশেষের একাধিপত্য দমন করিবার কথা বলিতেছেন। এরূপ একাধিপত্য এক বৃটিশ ও এংলোইণ্ডিয়ানদিগেরই ভারতে আছে। কিন্তু মেদিনীপুরের নাইটপ্রবর যে বৃটিস ও এংলোইণ্ডিয়ানদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত দুঃসাহসের কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। সুতরাং মনে হয় শিক্ষিত হিন্দুগণই তাঁহার লক্ষ্য। কিন্তু স্যর আবদার যদি চক্ষু মেলিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন কোন কোন প্রদেশে হিন্দুগণ সংখ্যা ও শিক্ষার তুলনায় অল্প সরকারী কাজই পাইয়া থাকেন। যথা, যুক্ত-প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় মাত্র শতকরা ১৪ জন; কিন্তু অনেক বিভাগের সরকারী চাকরী তাঁহারা ইহার তুলনায় অনেক অধিক পাইয়া থাকেন। বিহারে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা দশ এগার জন, কিন্তু সরকারী চাকরীর শতকরা একুশটি তাঁহারা দখল করিয়া আছেন। সুতরাং তিনি এমন কোন প্রদেশের কথা লইয়াই মাথা ঘামাইতেছেন যেখানে মুসলমানগণের চাকরীর সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা কম।

সম্ভবত বাংলার কথাই তিনি ভাবিতেছেন; কিন্তু বাংলা দেশেও চাকরীতে হিন্দুর একাধিকার নাই।

আব্‌দার রহিম সাহেব বুদ্ধিজীবী শিক্ষিতের "রাজত্ব" দূর করিতে চান; তবে কি তিনি বুদ্ধিহীন অশিক্ষিতের রাজত্ব স্থাপন করিতে ইচ্ছুক? এইরূপ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহ একটা নূতন কিছু করা হইবে। কেননা, এমন কি সভিয়েট রুশিয়াতেও লেনিন বা ট্রট্‌স্কি প্রমুখ শিক্ষিতগণেরই রাজত্ব। স্যর আব্দার রহিমের অতি বড় বন্ধুও তাঁহাকে নিরক্ষরতা গুণে গুণী বলিবেন না। তিনি অশিক্ষিত বা বুদ্ধিহীনও নহেন। সুতরাং তাঁহার আদর্শে গঠিত নবতন্ত্রে তাঁহার নিজেরই স্থান হইবে না বলিয়া মনে হয়। কেননা, তিনি নিশ্চয় নির্ব্বোধ সাজিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগী হইতে চাহিবেন না।

তাঁহার ইস্তাহারে আর একটি রত্ন পাওয়া যায়। উহা নিম্নলিখিত রূপ।

"এই (স্বায়ত্বশাসন) কার্য্য উত্তমরূপে করিতে হইলে সকল রাষ্ট্রীয় ও শাসনসংক্রান্ত কার্য্য দেশবাসীর নানান্ শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম, সামাজিক সংস্কার ও ইতিহাস অনুযায়ীরূপে চালাইতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভারতে একটি আত্মনির্ভরশীল শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী জাতি গড়িয়া তুলা সম্ভবপর হইবে না।"

উপরোক্ত বাণী অনুযায়ী কার্য্য করিলে তাহার অর্থ এই দাঁড়াইবে, যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বর্ত্তমান উন্নততম রাষ্ট্রনীতির ও সভ্যতার উচ্চ আদর্শের স্থান আর থাকিবে না, এবং এই ব্যাপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর কুসংস্কার, নির্বুদ্ধিতা, খেয়াল, কুরুচি ও কুপ্রথাই প্রাধান্য লাভ করিবে। একথা বলাই বাহুল্য, যে, সকল শ্রেণীর লোকের বুদ্ধি, রুচি ও সুবিধা এক প্রকার হইবে না। সুতরাং আব্দারী আমলে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি বলিতে বিশেষ কিছু বুঝাইবে না। রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে যত প্রকার নাম পাওয়া যায়, তাহার কোনটিই এ অপূর্ব্ব রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে খাটিবে না।

স্যর আব্‌দারের উদ্দেশ্য অবশ্য এই, যে, বাংলার মুসলমানগণ গুণাগুণ নির্ব্বিশেষে যাহাতে সরকারী চাকরীর অধিকাংশ পাইতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা। অর্থাৎ কিনা হিন্দু ও খৃষ্টিয়ানগণ মুসলমান অপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত এবং যোগ্য হইলেও তাঁহাদের নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে এবং বাংলায় "অশিক্ষিতের রাজত্ব" আরম্ভ হইবে। এই দিক্ দিয়া দেখিলে স্যর আবদারের শিক্ষিতের প্রতি অভক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন নহে বলিয়া বুঝা যাইবে।

স্যর আব্‌দার জাতিগঠনের আদর্শ ও উপায় বলিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র তাঁহার অজ্ঞতার পরিচায়ক। এ অজ্ঞতা অবশ্য শুধু ভাণ মাত্র হইতে পারে। কেননা শ্রেণীগত বিভিন্নতা বজায় রাখা জাতিগঠনের উপায় যে কোন মতেই নহে, তাহা স্যর আবদার রহিমের মত শিক্ষিত লোকের জানিবারই কথা।

স্যর আব্‌দারের পার্টির ইচ্ছা ভারতে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব স্থাপন করা। ইহা অতি উত্তম কথা। কিন্তু শুধু ভোটের বেলা লোকের ধর্ম্ম না দেখিয়া তাহার ক্ষমতা গুণাগুণ দেখার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রথার উচ্ছেদ না হইলে ভারতে জাতীয়তার কোন আশা নাই।

অ

স্বর্গীয়া সরোজকুমারী দেবী

যে-সকল বাঙালী ভদ্রলোক ও মহিলা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাংলা দেশের বাহিরে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন এবং তাহাকে সমৃদ্ধ করেন, প্রবাসী বাঙালীদের মোট সংখ্যা ধরিলে তাঁহাদের সংখ্যা কম বলা যায় না। বঙ্গের বাহিরে থাকিয়া যাঁহারা বাঙালীর আন্তরিক জীবনস্রোতের সহিত এই প্রকারে যোগ রক্ষা করিতেন, শ্রীযুক্তা সরোজকুমারী দেবী তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি ইং ১৮৭৫ সালের ৪ঠা নবেম্বর ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান ১৯২৬ সালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। সম্বলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার স্বামী। ইং ১৮৮৬ সালে তাহাদের বিবাহ হয়। এইরূপ অল্প বয়সে বিবাহিত হইবার পর সরোজকুমারী নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এবং ভারতীয় সাংবাদিকদিগের মধ্যে সুপরিচিত।

স্বর্গীয়া সরোজকুমারী দেবীর নানা প্রকারের অনেক বাংলা লেখা প্রধান-প্রধান মাসিক পত্রে বাহির হইত। তাঁহার কতকগুলি কবিতা ও গল্প পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। কবিতার বহিগুলির নাম 'হাসি ও অশ্রু' 'অশোকা' এবং 'শতদল'। গল্পের বহিগুলির নাম 'অদৃষ্টলিপি', 'ফুলদানি' এবং 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প' মাসিক পত্রের ভাষায় যাহাকে ছোট গল্প বলে, তাঁহার অনেকগুলি গল্প সেরূপ নয়, তাহা অপেক্ষা বড়। সেগুলি ছোট উপন্যাস আখ্যা পাইবার যোগ্য। শ্রীযুক্ত

স্বর্গীয়া সরোজকুমারী দেবী

ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহার 'কাহিনী' বা ক্ষুদ্র গল্পে'র ভূমিকায় অনেক বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন :—

"কোরকের মধুরতা ফুটন্ত ফুলকে পরাস্ত করে। যে নবেল লিখিতে পারে, সেই নবেলেট লিখিতে পারে না! ক্ষুদ্র গল্পে সরোজকুমারী নিপুণতা দেখাইয়াছেন, পূর্ণবিকশিত নবেল রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত হইবেন, আশা করা যায়।"

শেষোক্তরূপ কোন গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়া থাকিলে তাঁহার স্বামী তাহা নিশ্চয়ই প্রকাশিত করিবেন।

স্যার আল্‌বিয়ন্ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যার আল্‌বিয়ন্ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার আল্‌বিয়ন্ নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে সিবিল সার্বিস প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চাক্‌রী পান। পরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোচীন-নামক দেশী রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিয়া রাজ্যশাসনকার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি বৃহত্তর দেশী রাজ্য মহীশূরের শাসনপরিষদের সভ্য এবং তৎপরে ঐ রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধান

স্যার্ আল্‌বিয়ন্ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
Photo by R. Venkoba Rao, Srirangam

মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যকাল সম্পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে মহারাজা তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, যে, তিনি মহীশূরের আর্থিক সংকটের সময় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমত্তা ও রাজকার্য্যে নৈপুণ্য দ্বারা রাজ্যকে সচ্ছল অবস্থায় স্থাপন করিয়া অবসর লইতেছেন। মহারাজা তাঁহাকে মাসিক পাঁচশত টাকা বিশেষ পেন্সন্ দিয়াছেন।

নারীর সার্ব্বজনিক কাজে প্রবেশলাভ

ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলের মহিলারা দু'একজন করিয়া সার্ব্বজনিক কাজে অগ্রসর হইতেছেন। কুমারী সোম্বুতাই চবন কোলহাপুর মিউনিসিপালিটীর অন্যতম সভ্য হইয়াছেন। কুমারী চবন ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া বর্ত্তমানে কোলহাপুর অহল্যাবাঈ বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করিতেছেন। এই সকল মহিলা প্রসূতি-মঙ্গল ও শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থায় বিশেষ করিয়া মন দিলে সমাজের বহু কল্যাণ হইবে।

Photo by R.] কুমারী সোম্বুতাই চবন [Venkoba Rao

"হিন্দুমুসলমান-কি জয় !"

কলিকাতার "দি গার্ডিয়ান্" নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকে হিন্দু-মুসলমান কি প্রকারে নিজ-নিজ মান-ইজ্জৎ বজায় রাখিয়াছে, চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা তাহার একটি চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র বাহির হইয়াছে। তাহার প্রতিলিপি এখানে দিলাম। এরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামার আত্মঘাতিতা সকলেরই বুঝা উচিত।
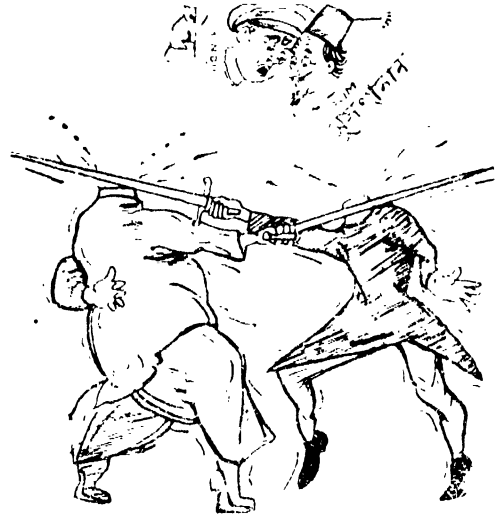
"হিন্দুমুসলমান-কি জয়"

স্যার্ ত্যাগরাজ চেট্টিয়ার্

পরলোকগত স্যার্ ত্যাগরাজ চেট্টিয়ার্ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অব্রাহ্মণ দলের নেতা ছিলেন, এবং ঐ দলের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর

স্যার্ ত্যাগরাজ চেট্টিয়ার্

প্রথম বার্ষিক স্মৃতিসভার অধিবেশন সেদিন সমারোহের সহিত মান্দ্রাজে হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া ও বিদ্বেষ না জন্মাইয়া অন্যান্য জাতির লোকদের সকল বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করিলে মান্দ্রাজের অব্রাহ্মণ দলের প্রতিকূল সমালোচনার কোন কারণ থাকিবে না।

—

মহীশূর রাজ্যের নূতন দেওয়ান

মহীশূরের মহারাজা আমান্‌উলমুল্ক মির্জা এম্ ইস্মাইল্‌কে তাঁহার দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে মহারাজার খাস্ মুন্‌শী বা প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। মহীশূরেই ইঁহার নিবাস। ইঁহার নিয়োগে রাজ্যের নানাস্থান হইতে লোকেরা ইঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। চিতলদ্রুগ হিন্দুপ্রধান জেলা। তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য সেখানেই প্রথমে সভার অধিবেশন হয়।

মহীশূরের নৃপতি হিন্দু এবং তাঁহার রাজ্যের ৫৯,৭৮,-৮৯২ জন অধিবাসীর মধ্যে ৫৪,৮১,৭৫৩ জন হিন্দু এবং কেবলমাত্র ৩,৪০,৪৬১ জন মুসলমান। তিনি একজন মুসলমানকে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া নিজের উদারতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

Photo by] আমান্‌-উল্‌-মুল্ক মির্জা এম্ ইস্মাইল [R. Venkoba Rao

—

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। ১৩৩২ সালে এই তারিখে যে উৎসব শান্তিনিকেতনে হইয়াছিল, পঞ্চবট রোপণ ও প্রতিষ্ঠা তাহার অঙ্গীভূত ছিল, এবং গত বৎসর সে সময়ে কলিকাতায় কোন দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয় নাই। এই জন্য গত বৎসর বর্ত্তমান বৎসরের জন্মোৎসব অপেক্ষা জনসমাগম অধিক হইয়াছিল। কিন্তু এবারের জন্মোৎসবও সম্পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছিল, এবং শান্তিনিকেতনের সকলে এবং বাহির হইতে আগত অতিথিবর্গ অনুষ্ঠানের নানা অঙ্গ হইতে সাতিশয় আনন্দ ও উপকার লাভ করিয়াছিলেন। দুই একদিন আগে হইতেই অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শঙ্খধ্বনি ও নহবতের বাদ্যের সহিত জন্মোৎসবের দিবারম্ভ হয়। আম্রকুঞ্জে আলিপনায় চিত্রিত একটি স্থানের চারিপার্শ্বে সকলে সমবেত হইলে কার্য্যারম্ভ হয়। কবির নির্দিষ্ট স্থানে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে লইয়া গিয়া বসাইবার পর শঙ্খধ্বনির পর সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ এবং কবির রচিত গান গাওয়া হয়। তদনন্তর প্রাচীন প্রথা অনুসারে জন্মতিথির ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহিত হয়। শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা ও পুরন্ধ্রীগণ কবিকে পুষ্পফলাদি নানা অর্ঘ্য ও উপহার একে একে দেন। অন্যবিধ উপহারও কেহ কেহ দেন। তাহার মধ্যে নিকটবর্ত্তী বল্লভপুর গ্রামের একটি সচিত্র হস্তলিখিত বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য। উহা বিশ্ব-ভারতীর গ্রাম সংগঠন ও পুনরুজ্জীবন বিভাগ কর্ত্তৃক রচিত। উহা মুদ্রিত হইলে অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামহিতৈষী কর্ম্মীদেরও কাজে লাগিবে।

অতঃপর পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সংস্কৃতে অনুষ্ঠানোপ-যোগী একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া ইটালীয় বাণিজ্য-দূতকে কিছু বলিতে আহ্বান করেন। অতিথিদিগের মধ্যে কাহাকেও কিছু বলিতে আহ্বান করিবার বন্দোবস্ত আগে হইতে করা হয় নাই বলিয়া কার্য্যপদ্ধতিতে উহার উল্লেখ ছিল না। তথাপি তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সময়োপযোগিতা ও আন্তরিকতা মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। ইটালীর কন্সাল মহাশয় ইটালীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, তাহা বলিলেন, নিজের হৃদয়ের ভাবও প্রকাশ করিলেন; ইটালীর লোকেরা কিরূপ আগ্রহের সহিত তাঁহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে,
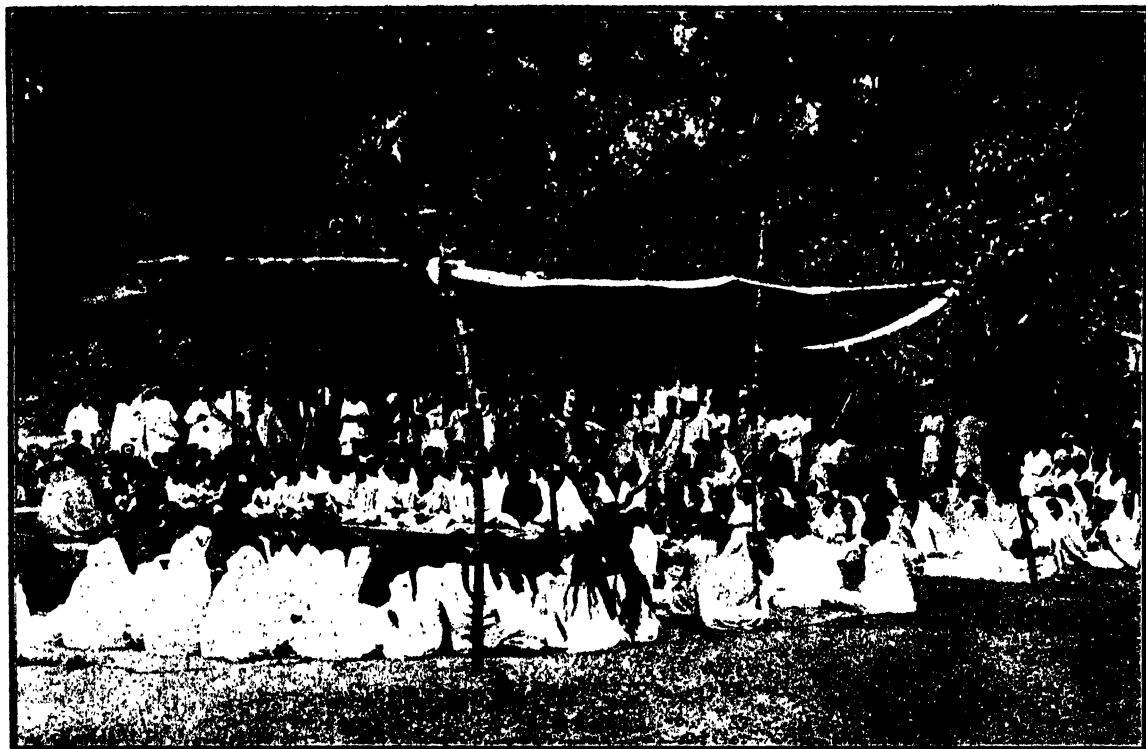
Photograph by] জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ [Krishnalal Ghosh

Photograph by | রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের প্রারম্ভে সকলে দণ্ডায়মান [Krishnalal Ghosh.

তাহা বলিলেন। তাহার পর তাঁহার পত্নী ইটালীয় প্রথায় নতজানু হইয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদনপূর্ব্বক একটি সুন্দর পুষ্পপাত্রে পুষ্পোপহার দিলেন। অতঃপর ফ্রান্সের বাণিজ্যদূতও রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিজের ও ফরাসী জাতির মনোভাব আবেগের সহিত বলিলেন। তিনিও সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব-ভারতীর চৈনিক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এবং চীন ও ইটালীয় ভাষার অধ্যাপক ইটালীবাসী অধ্যাপক টুচ্চী অতঃপর ভাবাবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করিলেন, এবং ইটালীয় প্রথায় নতদেহে তাঁহার হস্তচুম্বন করিলেন। তদনন্তর বিশ্ব-ভারতীর চীনদেশীয় অধ্যাপক লিম্ ভো চিয়াং চীন দেশে রবীন্দ্রনাথের গমনের ফল ও মূল্য এবং তথায় তাঁহার জন্মদিনে তাঁহাকে নূতন চৈনিক নাম দান, প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন, ও ভারত-প্রবাসী চীনদিগের পক্ষ হইতে কিছু অর্থ উপহার দিলেন। অতঃপর এণ্ড্রুজ সাহেব কবিকে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে আনীত একটি উপহার দিলেন। তিনি বলিলেন, যে, কেবল আফ্রিকার ভারতীয়েরা নহে, ডাচ্ বংশোদ্ভূত বোয়ারেরাও কবিকে ভক্তি করে, এবং তথাকার আদিম নিবাসী বাণ্টুরা অতীতের অজ্ঞানান্ধকার হইতে নিষ্ক্রমণ করিবার পথে ভারতবর্ষের কবির বাণী হইতে আলোক পাইতেছে। অতঃপর অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বলিলেন, যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পোরবন্দরের মহারাজা কবিকে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে পাঁচ হাজার টাকা উপহার পাঠাইয়াছেন। ইহার পর মান্দ্রাজপ্রবাসী আইরিশ কবি, লেখক, অধ্যাপক এবং ভারতীয় শিল্পের গুণগ্রাহক ও গুণব্যাখ্যাতা ডাঃ জেম্‌স্ কাজিন্স্ কবির ইংরেজী গীতাঞ্জলির ভূমিকা যে আইরিশ কবি ইয়েট্‌স প্রণীত তাহার উল্লেখ করিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডকে কবির দেশ বলিলেন এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা বলিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য বলেন। তাহা কেহ লিখিয়া লইয়া থাকিলে পরে প্রকাশিত হইবে, যদিও রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা এরূপ রিপোর্টে রক্ষা করা দুঃসাধ্য।

সন্ধ্যার পর কবির সম্প্রতি লিখিত বিম্বসার ও
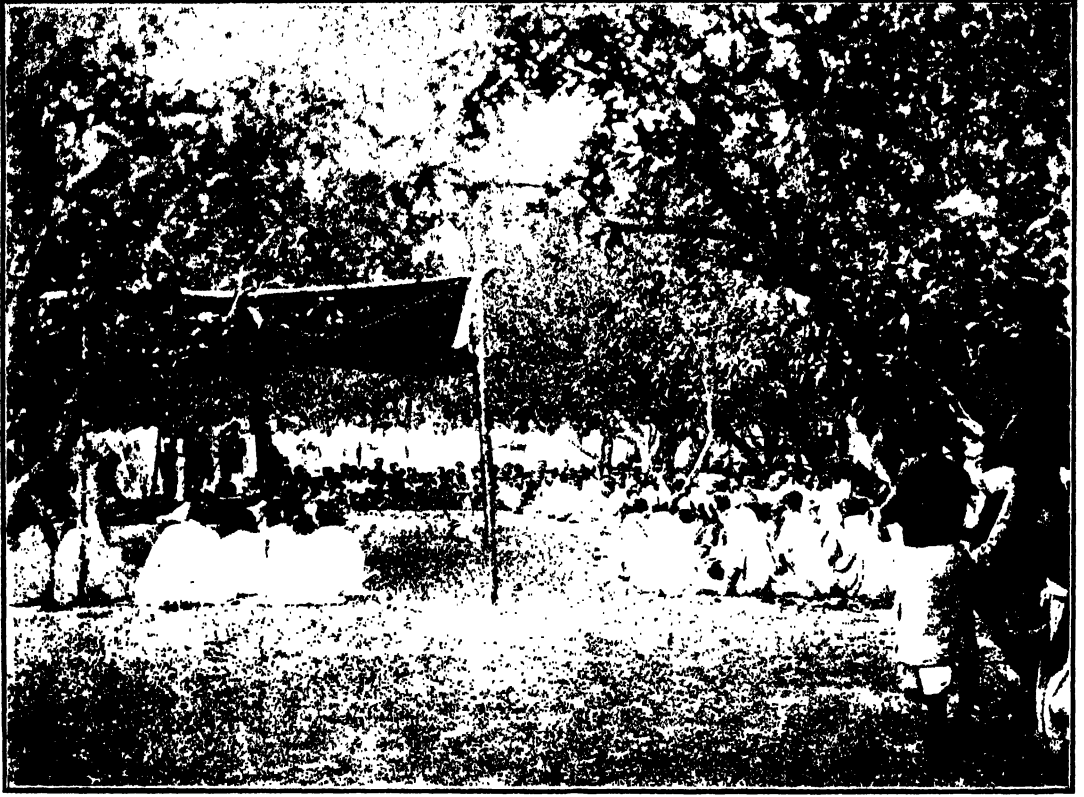
Photograph by | রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের আর একটি দৃশ্য | Krishnalal Ghosh

অজাতশত্রুর যুগের আখ্যায়িকার ছায়া অবলম্বনে রচিত একটি নাটক অভিনীত হয়। ইহা আশ্রমের বালিকাদের জন্য লিখিত হয় এবং কেবল তাহারাই ইহার অভিনয় করিয়াছিল। তাহাদের সাজসজ্জা অতি চমৎকার হইয়াছিল। আলোকের বন্দোবস্ত এরূপ হইয়াছিল, যে, যখন যেরূপ উজ্জ্বল বা মৃদু আলোক, অথবা কম বা বেশী অন্ধকার আবশ্যক, তখন সহজেই তাহা করিতে পারা গিয়াছিল। অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ নায়িকা শ্রীমতীর অভিনয় একেবারে নিখুঁত এবং স্বাভাবিক ত হইয়াছিলই, অধিকন্তু ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যে, ওরূপ অভিনয় প্রত্যক্ষ করিলে মানুষ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও উন্নততর লোকে অবস্থিত হয়। সাধারণতঃ মনে হইতেছিল, যে, বালিকারা অভিনয় করিতেছে না, যে যাহা সাজিয়াছে বস্তুতই সে তাহাই। বিশেষতঃ "শ্রীমতী"কে তাহার মুখের মাধুরী ও শান্ত শ্রী এবং ভক্তিভাবে ভিক্ষুণী শ্রীমতীই মনে হইতেছিল। অভিনেত্রী বালিকা ভিক্ষুণী শ্রীমতীর মর্ম্মকথা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য কবির প্রতিভার প্রভাবই এরূপ আশ্চর্য্য অভিনয়েও ছিল। কিন্তু যাঁহারা নাটকটি শুধু পড়িবেন, অভিনয় দেখিবার সুযোগ যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহারা উহার রস ও উৎকর্ষ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

অভিনয়ের পর আশ্রমস্থ সকলের ও অতিথিবর্গের আহার হইয়া গেলে বায়োস্কোপ দ্বারা আশ্রমজীবনের অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি সমুদয় অঙ্গ প্রদর্শিত হয়।

কবি নিজের এই জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

—

রবীন্দ্রনাথের নূতন রচনা "বৈকালী"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন রচনা "বৈকালী" ইউরোপ-যাত্রার দিনে প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। উহা আগামী সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

Photograph by | রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে মন্ত্র পাঠ | Krishnalal Ghosh

কলিকাতায় শিখ মিছিল

গত এপ্রিল মাসে শিখদিগের একটি মহোৎসব উপলক্ষে যে মিছিল বাহির হইবার কথা ছিল, দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য তাহা বন্ধ ছিল। তাহা সম্প্রতি মহা সমারোহে হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের যে সঙ্গতটি আংশিক ভাবে দগ্ধ ও তন্মধ্যস্থ গ্রন্থসাহেব অংশতঃ নষ্ট হইয়াছিল, তাহার সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাও হইয়া গিয়াছে। কাণ্ডটি যে নির্ব্বিবাদে সুশৃঙ্খল ভাবে হইয়া গিয়াছে, ইহা খুব সন্তোষের বিষয়। যদি ইহা বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র দেশী সকল সম্প্রদায়ের সুবিবেচনার সাহায্যে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলেই উৎফুল্লতার কারণ হইত। নতুবা, ইহা ভুলিতে পারা যায় না, যে, বিদেশীর সাহায্যের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার মধ্যে ঘোরতর জাতীয় অপমান ও লজ্জার বিষয় রহিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে একটা কথা রটিয়াছে, যে, মিছিল কোন কোন মস্‌জিদের সম্মুখে বাদ্য বন্ধ করে নাই, কিন্তু ইংরেজদের একটি গির্জ্জার সামনে বন্ধ করিয়াছিল। ইহা মিথ্যা হইলে অবিলম্বে প্রতিবাদ হওয়া দরকার। সত্য হইলে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। কারণ, বাদ্য বাজাইতে বা বন্ধ করিতে হইলে সকল ধর্ম্মের ভজনালয়ের সম্মুখেই তাহা করা উচিত।

—

হিন্দুমুসলমান সমস্যা

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে, তাহাদের অধিবাসী জাতিদের মধ্যে, যুদ্ধ একেবারে বন্ধ কেমন করিয়া করা যায়, তাহার চিন্তা অনেকদিন হইতে চলিতেছে। এমন একটি কোন উপায় এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রত্যেক জাতিকে যদি নিরস্ত্র করা যায়, তাহা হইলে কি যুদ্ধ চিরকালের জন্য বন্ধ হইতে পারে? যদিই বা হয়, তাহা হইলে এই সার্ব্বজাতিক নিরস্ত্রীকরণ হইবে কাহার দ্বারা? অধিকাংশ জাতি, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যাধিকারী দস্যু-জাতিরা, অন্য জাতিদিগকে সন্দেহ করিবে, যে, তাহারা নিজে নিরস্ত্র হইলেই অন্যেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া শৃঙ্খলিত করিবে। যুগপৎ সকলের নিরস্ত্রীভবন বা নিরস্ত্রীকরণ সম্ভবপর নহে।

অনগ্রসর অশ্বেত জাতিদিগকে তাঁহারা শৃঙ্খলিত রাখিতে ও করিতে পারিবেন। এইজন্য তাঁহাদের তথাকথিত নিরস্ত্রীভবনে আমাদের কোন লাভ নাই।

যুদ্ধ নিবারণের আর একটা ব্যবস্থা আছে, তাহার বয়স বড় কম নয়। তাহাকে ইংরেজীতে বলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুততা (preparedness)। অর্থাৎ কোন জাতি যদি যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে অন্যেরা তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না, এবং এইরূপে শান্তিরক্ষা হইবে। কিন্তু সকলেই, অন্ততঃ প্রবলতম জাতিরা, এইরূপে প্রস্তুত থাকিতে চেষ্টা করিবে। যুদ্ধ-সজ্জার এই প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকিলে রাষ্ট্রে সেনানায়কদের প্রভাব খুব বেশী হওয়া অনিবার্য্য। এবং তাহারা যে অকেজো অনাবশ্যক এক শ্রেণীর লোক নহে, তাহা প্রমাণ করিতে তাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবে। ফলে, কোন না কোন জাতির সহিত যুদ্ধ বাধিবেই। ইহা ইতিহাসে বার-বার ঘটিয়াছে। সহজ বুদ্ধিতেও ইহা বুঝা যায়। ছোট ছেলেদের হাতে একটা ছড়ি দিলে তাহারা যাহাকে তাহাকে ঠেঙাইয়া বেড়ায়, ছুরি দিলে ঘরের আসবাবপত্র দুয়ার জানালার দুর্দ্দশা করে। সুতরাং সেনানায়ক ও সৈনিকগণও যে তাহাদের রণদক্ষতা ও অস্ত্রসম্ভারের কার্য্যকারিতা দেখাইতে ব্যস্ত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কলিকাতার শিখ মিছিল

কিন্তু যদি তাহা হয়ও, তাহা হইলেও লাঠি, ছড়ি, ইট পাটকেল, কয়লার চাপ, হাত পা নখ দাঁত প্রভৃতির সাহায্যেও যুদ্ধ চলিতে পারিবে।

সেইজন্য মনে হয়, যে, নিরস্ত্রী-করণের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা হউক, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি যত উপায়ে হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত।

দুর্ব্বল জাতিরা দলবদ্ধ ও সবল হইলে তাহাদের উপর আক্রমণ কম হইতে পারে। এইজন্য সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার।

বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহ নিজেদের যে-অবস্থাকে **নিরস্ত্রীভবন** বলিতেছেন, সে অবস্থা ঘটিলেও তাঁহাদের যত যুদ্ধসজ্জা থাকিবে, তাহার দ্বারা বিজ্ঞানে ও যুদ্ধসরঞ্জামে

যাহা হউক, এবিষয়ে আর বেশী লেখা উচিত হইবে না। ইতিমধ্যেই পাঠক হয়ত অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এসব বিষয়ের সহিত হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধানের সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক এই—

হিন্দুমুসলমানে মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ ঘটায় উভয় পক্ষই ভাবিতেছেন, তাঁহারা বলিষ্ঠ ও ভাল করিয়া দলবদ্ধ হইলেই অপর পক্ষ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইবে না, এবং করিলেও পরাজিত হইবে। কিন্তু ইহা

উপরে বর্ণিত সেই প্রস্তুততার যুক্তি। এইরূপ সাম্প্রদায়িক প্রস্তুততার একটা অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মারামারিতে নিপুণ শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি। তাহারা নিজেদের বাহাদুরী দেখাইতে ব্যগ্র থাকিবে। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিবে।

তা ছাড়া, যুক্তির দিক্ দিয়াও ইহাতে ভুল আছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে, জেলায়, নগরে ও গ্রামে হিন্দু বা মুসলমানের আপেক্ষিক সংখ্যা ও বল এক নহে, এক হইতে পারে না। কোথাও কোথাও হিন্দু, কোথাও কোথাও মুসলমান, সংখ্যায় ও বলে নিকৃষ্ট হইবে। বর্দ্ধমানে দাঙ্গা হইলে চট করিয়া আকাশপথে দিল্লীর মুসলমান সধর্ম্মীদের সাহায্যার্থে আসিতে পারিবে না, চট্টগ্রামে দাঙ্গা হইলে তৎক্ষণাৎ কাশীর হিন্দুরা এরোপ্লেনে হিন্দু সধর্ম্মীদের সাহায্য করিতে আসিবে না।

অবশ্য আমরা কোন পক্ষকেই দুর্ব্বল ও ছত্রভঙ্গ অবস্থায় থাকিতে পরামর্শ দিতেছি না। পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা না থাকাই ভাল; কিন্তু তাহা না থাকিলেও দৈহিক ও মানসিক বলের অন্য প্রয়োজন আছে। সম্প্রদায়নির্বিশেষে দুষ্টের দমনের জন্য ও তাহাদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার ও দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য শক্তির প্রয়োজন। অন্য সকল প্রকার সিদ্ধির জন্যও শক্তি আবশ্যক। সুতরাং আমরা শক্তিচর্চ্চার বিরোধী নহি।

আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, বলিষ্ঠ ও দলবদ্ধ হইলেই শুধু তাহার দ্বারাই হিন্দুমুসলমানে শান্তি স্থাপিত হইবে না। তাহাতে নিশ্চয়ই কিছু সুফল হইবে। কিন্তু তাহাকে একমাত্র বা প্রধান উপায় মনে করিলে উল্টা ফল ফলিতে পারে। যেমন দেশে দেশে যুদ্ধ কেবলমাত্র "প্রস্তুততা" দ্বারা নিবারিত হয় নাই, তেমনি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংঘর্ষ কেবলমাত্র "প্রস্তুততা" দ্বারা নিবারিত হইবে না। যেমন দেশ ও জাতির মধ্যে সামরিক দলকে সংযত রাখা অন্তর্জাতিক শান্তির জন্য আবশ্যক, তেমনি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও অশান্তি নিবারণের জন্যও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গাদক্ষ ও গোঁড়া এই দুই দলকে সংযত রাখা দরকার।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিবারণের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রধান উপায় পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা। সদ্ভাব বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে আগে আগে অনেক কথা লিখিয়াছি, পরেও হয়ত লিখিব। এখানে কেবল ২।১টি কথা বলি।

মানুষকে প্রধানতঃ হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান বা অন্য কিছু মনে করিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা কু বা সু ধারণা পোষণ না করিয়া মানুষ হিসাবেই তাহার বিচার করা উচিত। ইহা কঠিন কাজ, বিশেষতঃ গোঁড়াদের পক্ষে, কিন্তু অসাধ্য নহে। অনেক মুসলমান নিশ্চয়ই প্রাত্যহিক ব্যবহারে অনেক হিন্দুকে সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য দেখিয়াছেন; অনেক হিন্দুও অনেক মুসলমানকে এইরূপ দেখিয়াছেন। গোঁড়ামি ও ধর্ম্মোন্মত্ততা পরিহার না করিলে মানুষকে কেবল মানুষ হিসাবে বিচার করিবার অভ্যাস জন্মে না।

কেবল নিজেদের জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা না করিয়া, অন্যের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সামাজিক প্রথা অনুসারে যাহা প্রয়োজন, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

পরস্পরের ইতিহাসে, ধর্ম্মে, ও সভ্যতায় ভাল যাহা আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। সম্ভবতঃ হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অধিকতর হওয়ায় যত হিন্দু লেখক মুসলমান সভ্যতার গুণগ্রহণ যতটা করিয়াছেন, কোন মুসলমান লেখক হিন্দুসভ্যতার গুণগ্রহণ ততটা করেন নাই। অথচ অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান হিন্দুবংশজাত; সুতরাং হিন্দুসভ্যতার শ্রেষ্ঠ অংশের জন্য আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ইহা সহজে বুঝা যাইবে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা খৃষ্টিয়ান্ ছিলেন না; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক বহুদেবদেবীপূজক এবং অল্পসংখ্যক লোক একেশ্বরবাদী ছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সকলেই, অন্ততঃ নামে, খৃষ্টিয়ান হইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্ম জুডিয়া-দেশ-জাত। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রীক ও রোমকেরা খৃষ্টিয়ান হইলেও প্রাচীন সভ্যতার অহঙ্কার করিতে হইলে জুডিয়া দেশের ইহুদীসভ্যতার অহঙ্কার করেন না, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতারই অহঙ্কার করেন, যদিও সে সভ্যতা খৃষ্টিয়ান সভ্যতা নহে। অন্যদিকে, ভারতীয় মুসলমানেরা সাধারণতঃ প্রাচীন সভ্যতার অহঙ্কার করিতে হইলে ভুলিয়াও ভারতীয় হিন্দু বা বৌদ্ধ যুগের সভ্যতার অহঙ্কার করেন না, যদিও তাঁহারা অধিকাংশ হিন্দুবংশজাত। তাঁহারা অহঙ্কার করেন প্রাচীন আরবীয় সভ্যতার কিম্বা পারস্য বা তুরস্কের সভ্যতার, যদিও তাঁহাদের অধিকাংশের দেহে একবিন্দুও আরব, পারসীক বা তুর্ক রক্ত নাই। তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার হইলে হয় ত তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইবেন।

হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধানের জন্য যতগুলি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহার মধ্যে দুটির উল্লেখ করিয়াছি। প্রথম ও প্রধান উপায়, পরস্পরকে বুঝা এবং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি। দ্বিতীয় উপায়, নিজ নিজ দুর্ব্বলতা দূর করিয়া সবল হইয়া অপরের অবজ্ঞা ও আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার শক্তি অর্জ্জন। আমরা শুধু দৈহিক বল ও অস্ত্রবলের কথা বলিতেছি না।

জ্ঞানবল, নৈতিক বল ও আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধিও একান্ত আবশ্যক।

তৃতীয় একটি উপায়ের উল্লেখও এখানে করা দরকার। রাষ্ট্রীয় সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে ভেদবুদ্ধি দূর হয়। রাষ্ট্রীয় অধিকার, সরকারী চাকরীতে অধিকার, শিক্ষার সুযোগ পাইবার অধিকার কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার উপর নির্ভর না-করা উচিত। যতদিন কোন একটি ধর্ম্মের লোক হইলেই কোন দিকে কাহারও বিশেষ ও পৃথক্ অধিকার থাকিবে, ততদিন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও ঈর্ষ্যাকে প্রবলভাবে জীবিত রাখা হইবে। অবশ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইলে সত্বর বা বিলম্বে গবর্মেণ্ট তাহা দমন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ব্যাধির জড় না মারিয়া, বরং তাহাকে প্রবল রাখিয়া, তাহার বাহ্যলক্ষণ বা উপসর্গ নিবারণের চেষ্টা মাত্র। মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন, আপেক্ষিক যোগ্যতা অধিক বা সমান না হইলেও চাকরীতে তাহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র ভাগ রক্ষা, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য আলাদা কর্ম্মচারী ইত্যাদি নিয়োগ, প্রভৃতি বজায় রাখিলে সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাব জন্মিবেই, এবং তাহা হইতে দাঙ্গাও হইতে পারে। অতএব সকল রকম সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি তুলিয়া দিয়া সমস্ত অধিকার ও সুবিধাকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত সুনির্দ্দিষ্ট যোগ্যতা বা প্রয়োজন-সাপেক্ষ করা কর্ত্তব্য। যে-সব শ্রেণীর লোক শিক্ষায় অনগ্রসর, তাহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী উভয় রকমেরই হওয়া অবশ্যই উচিত। কিন্তু ইহা ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে হওয়া উচিত নহে; যে-কোন ধর্ম্মের যে-কোন শ্রেণীর লোক শিক্ষায় অনগ্রসর, তাহাদের জন্যই হওয়া উচিত। বাংলাদেশে চর্ম্মকার, বাউরী, বাগদী প্রভৃতি হিন্দুজাতি এবং সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতি মুসলমানদের চেয়েও শিক্ষায় অনগ্রসর। এইজন্য অনগ্রসর শ্রেণী মাত্রেরই সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তাহাদের ধর্ম্ম কি তাহার বিচার অকর্ত্তব্য।

এরূপ গবর্ণমেণ্টেরও প্রয়োজন, যে, সংঘর্ষ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিলে তাহা নিরপেক্ষভাবে অবিলম্বে দমন করিবার শক্তি ও আন্তরিক ইচ্ছা তাহার থাকে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের শক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেরূপ আন্তরিক ইচ্ছা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

—

লেখকগণের প্রতি

১। (ক) প্রবাসীতে নানারকম লেখার সমাবেশ করিতে হয়। এইজন্য দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপিতে আমাদের অসুবিধা হয়। সাধারণতঃ একটি প্রবন্ধে আড়াই হাজার হইতে তিন হাজার অপেক্ষা অধিক শব্দ না-থাকা বাঞ্ছনীয়। ছোট গল্পের দৈর্ঘ্যও ঐরূপ হইলেই ভাল হয়। চারি হাজার অপেক্ষা বেশী শব্দ কোন গল্পে না-থাকা বাঞ্ছনীয়।

(খ) লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে বাধিত হইব।

(গ) এখন হইতে তাঁহারা প্রত্যেক রচনার উপর উহার শব্দের সংখ্যা লিখিয়া দিলে অনুগৃহীত হইব।

২। (ক) যাঁহারা "আলোচনা" বিভাগের জন্য কিছু পাঠাইবেন, তাঁহাদের লেখায় সাড়ে চারিশত অপেক্ষা বেশী শব্দ না-থাকা বাঞ্ছনীয়।

(খ) তাঁহাদের লেখার উপর শব্দ-সংখ্যা লিখিয়া দিতে হইবে।

২। আমাদের হাতে নানাবিধ বহুসংখ্যক লেখা মৌজুদ থাকায় অনেক লেখা ছাপিতে বড় বিলম্ব হয়। প্রকাশে বিলম্বের জন্য কোন লেখক তাঁহার লেখা ফেরত চাহিলে তাহা অবিলম্বে কৃতজ্ঞতার সহিত ফেরত দেওয়া হইবে।

—

"প্রাচ্য আর্টের ভারতীয় সমিতি"

কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী অব্ ওরিয়েণ্ট্যাল্ আর্ট অর্থাৎ প্রাচ্য আর্টের ভারতীয় সমিতি নামক একটি সমিতি আছে। লর্ড্ রোনাল্ডশে বঙ্গের গবর্ণর থাকা কালে যখন তাহাকে সরকারী সাহায্য দিবার বন্দোবস্ত করেন, তখন আমরা মডার্ণ রিভিউ কাগজে এই ব্যবস্থার অনিষ্টকর দিক্‌টা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমাদের সমালোচনা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের ভাল লাগে নাই। লর্ড্‌-রোনাল্ড্‌শেও ইহা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ভারত-বিষয়ক একটি বহিতে আমাদের এই সমালোচনার সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমরাও তাহার জবাব দিয়াছিলাম। কিছুদিন হইল বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর কথা-প্রসঙ্গে স্বীকার করেন, যে, আমরা ঠিক কথা লিখিয়া-ছিলাম। সম্প্রতি "শান্তিনিকেতন পত্রিকা"র জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"Oriental Art Societyকে সম্বল ক'রে চল্‌তে চল্‌তে একটা দিন এমন এল, যে, দেখ্‌লেম, আমি যে-ভয়ে আর্ট্‌স্কুল ছেড়ে বা'র হলেম সেই ভয়ই গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ হ'য়ে এককালের স্বাধীন Art Societyকে আর্টিষ্ট-পাখী-পোষার একটা খাঁচারূপে পরিণত ক'রে দিয়ে গেল।"

অবনীন্দ্রনাথের লেখা হইতে বোধ হইতেছে, সত্যের জয় কখন-কখন হইয়া থাকে।

—

ঢাকায় কয়েকজন হিন্দুর ভীরুতা

ঢাকা সহরে নিশীথ রাত্রে একটি গোখানার সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহকারে একদল হিন্দু বিবাহের বরযাত্রী যাইতেছিল। কতকগুলি মুসলমান তাহাদিগকে বাজনা থামাইতে বলায় তৎক্ষণাৎ তাহা থামান হয়। মুসলমান পক্ষের উক্তি এই, যে, ঐখানে মসজিদ আছে ও নামাজ পড়া হয়। তাহা সত্য হউক বা না হউক, যখন বলিবামাত্র বাজনা থামান হইয়াছিল, তখন ব্যাপারটা ঐখানে শেষ হইলেই ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইল না। এক সভায় কয়েক হাজার মুসলমান একত্র হইয়া বিবাহসম্পৃক্ত জনকয়েক হিন্দুকে মাফ চাইতে এবং জরিমানাস্বরূপ পঁচিশ টাকা মুসলমান অনাথালয়ে দিতে বাধ্য করিল, এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সভায় উপস্থিত জনকতক তথাকথিত হিন্দু-নেতাকেও সর্ত্তহীন ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিল। এই ব্যাপারটা মুসলমান ও হিন্দু উভয় পক্ষেরই পক্ষে লজ্জাকর। রাত্রে যখন নামাজ হয় না, তখনও গানবাজনায় আপত্তি করা ধর্ম্মান্ধতা বই আর কিছু নয়। তাহার পর, যাহারা বলিবামাত্র বাজনা বন্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া মাফ চাইতে ও জরিমানা দিতে বাধ্য করা, এবং অন্য কয়েকজন হিন্দুকেও মাফ চাওয়ান জুলুম ভিন্ন আর কিছু নয়। যে-সব হিন্দু মাফ চাহিয়াছিল, তাহাদের ব্যবহারেও মনুষ্যত্বের অপমান হইয়াছে। সভায় উপস্থিত থাকিয়া পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডের এরূপ জুলুমের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নাই।

আমরা কোনপ্রকার অশান্তি ও উত্তেজনা উৎপাদন করিতে চাই না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঢাকার হিন্দু জনসাধারণের প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া কেবল এইটুকু বলা উচিত, যে, মুসলমানদের সভায় উপস্থিত অল্পসংখ্যক হিন্দু যাহা করিয়াছে, তাহার সহিত হিন্দু সর্ব্বসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। কোন বক্তৃতা না করিয়া সভাপতি এই মর্ম্মের একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলে এবং সভা তাহা গ্রহণ করিলেই চলিবে। অন্ততঃ এইটুকু না করিলে ঢাকার মনুষ্যত্বের অপমান হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীমতী হেমলার জন্ম এই ঢাকা জেলাতেই হইয়াছে।

সংখ্যায় বেশী হইলেই বীরত্ব জন্মে না; অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকেও বহুসংখ্যক বিরোধীর সম্মুখে মানুষের মত কাজ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে শ্বেতকায়েরা সংখ্যায় খুব কম, অশ্বেতরা খুব বেশী। কিন্তু জ্ঞান, দলবদ্ধতা ও পৌরুষের বলে তাহারা নিজেদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অবশ্য যদি ঢাকার হিন্দুরা সংখ্যাবাহুল্য ব্যতীত মানুষের মত আচরণে রাজী না হন, তাহা হইলে বলি, ঢাকা সহরের মোট ১,১৯,৪৫০ জন অধিবাসীর মধ্যে ৬৯,১৪৫ জন অর্থাৎ অধিকাংশ হিন্দু। পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী; কিন্তু সব সহরে মুসলমানের সংখ্যা বেশী নহে। ঢাকার কথা আগেই বলিয়াছি। বরিশাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাদারিপুর, মৈমনসিং, নারায়ণগঞ্জ ও রামপুর বোয়ালিয়ায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান যাহাদের সংখ্যাই বেশী হউক, সকলেরই শান্তভাবে নিজের নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া চলা উচিত।

—

বন্য জন্তুর আক্রমণ ও সরকারী সাহায্য প্রার্থনা

"বাঁকুড়া দর্পণ" লিখিয়াছেন :—

আমরা সেদিন বাঁকুড়ার দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকটী পল্লীতে গিয়াছিলাম। জামজুড়ি, কিয়াবতী, রাওতড়া, ভুলুনপুর প্রভৃতি গ্রামের কৃষকগণের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে, বন্য জন্তুর অত্যাচারে তাহারা অত্যন্ত প্রপীড়িত। তাহারা কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের জমি আছে কিন্তু রবিশস্য উৎপাদন করিলেই বন্য শূকর আসিয়া শস্যক্ষেত্র নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। স্থানে স্থানে দাঁতাল বন্য শূকরেরা মানুষকেও আক্রমণ করিতেছে। কৃষকেরা গৃহে বাস না করিয়া শস্যক্ষেত্রে "কুমা" করিয়া রাত্রি যাপন করে তথাচ তাহাদের কাঁকুড়, ঝিঙ্গে, কুমড়া প্রভৃতি ফসল রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সরকার স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া বর্ষে বর্ষে বহু টাকা ব্যয় করিতেছেন। সেই টাকায় যদি কৃষকগণকে বন্য জন্তুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে প্রজাগণের উপস্থিত বহু উপকার সাধন হইবে।

দেশের প্রতি কর্ত্তব্য বিদেশী গবর্ন্মেণ্ট যে অনেক বিষয়েই করেন না, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দেশের লোকেরা যে পৌরুষহীন ও অসহায় হইয়াছে, তাহার জন্য অস্ত্রআইন যে অনেকটা দায়ী, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে প্রজাদের কৃষিক্ষেত্র রক্ষা সরকারের কর্ত্তব্যও বটে। বাঁকুড়াদর্পণ এই কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। তা বলিয়া, সকল বিষয়েই সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। অনেক লোক আরসুলা ও ইন্দুর দেখিলেও ভয় পায়। তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে-সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা একজন পাহারাওয়ালা থাকিলে তাহাদের ভয় অনেকটা কমিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে কিনা, এবং দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে কি না, সন্দেহ করা যাইতে পারে।

আমরা জানি বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত জামজুড়ী গ্রামের কোন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-মহিলা (তিনি এখন পরলোকগতা) জ্বালানী চেলাকাঠের সাহায্যে বাঘ

তাড়াইয়াছিলেন। এরূপ মহিলা আরও অনেক গ্রামে ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ এখনও আছেন। এই সেদিন ঢাকা জেলার শ্রীমতী হেমলা ডাকাতদের সহিত যুদ্ধে ভ্রাতাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, অস্ত্র জোগাইয়া, মশাল দ্বারা আলো দেখাইয়া সরকারী পুরস্কার ও প্রশংসা পাইয়াছেন। এখন অস্ত্র-আইন আগেকার চেয়ে কিছু সুবিধাজনক হইয়াছে। অতএব, আমাদের মনে হয়, বন্য জন্তুর উপদ্রব যে-সব গ্রামে হইতেছে, তথায় প্রকৃত পুরুষ না থাকিলে শ্রীমতী হেমলার মত মহিলাদের হাতে অস্ত্র দিলে সুবিধা হইতে পারে। অস্ত্র-আইন অনুসারে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে গ্রামবাসীরা না পারিলে, অন্ততঃ সকল গ্রামে প্রাপ্য কুঠার, টাঙ্গী, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র গ্রামের হেমলাদের হাতে দিয়া পুরুষজাতীয় জীবেরা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারিবেন।

—

নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার

এপর্য্যন্ত আইন এই প্রকার ছিল, যে, যে-যে প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় পুরুষ নির্ব্বাচকদিগের সমান যোগ্যতাবিশিষ্ট নারীদিগকে ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইবে, তথাকার ঐরূপ নারীরা নির্ব্বাচনাধিকার পাইবেন। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট্ এই নিয়ম করিয়াছেন, যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব-অনুসারে সভ্যপদপ্রার্থী পুরুষদের সমান যোগ্যতাবিশিষ্ট নারীরাও সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন, এবং নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও হইতে পারিবেন।

দেশের প্রকৃত ও সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য আবশ্যক অনেক বিষয়ে পুরুষ সভ্যেরা যথেষ্ট মন দেন না। নারীরা সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া অন্ততঃ এইরূপ বিষয়গুলিতে মনোযোগ করিলে তাঁহাদের নূতন অধিকার লাভ সার্থক হইবে এবং দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

—

বিশ্বভারতী

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে বিশ্বভারতীর একটি ইংরেজী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। গ্রীষ্মাবকাশের পর উহার নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে, এবং তখন নূতন ছাত্র ও ছাত্রী লওয়া হইবে। শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা ও সুযোগ আছে, তাহা বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইবে। তাহা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সাধারণ শিক্ষার সহিত অন্যান্য নানাবিধ শিক্ষার বন্দোবস্তের একত্র সমাবেশ সেখানে যেমন আছে, বাংলা দেশের অন্য কোথাও সেরূপ নাই। চীন, তিব্বতী, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান্ ও ইতালীয় ভাষা শিখিবার, এবং সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনে আছে। গ্রন্থাগার উৎকৃষ্ট। ছাত্রীদের থাকিবার স্বতন্ত্র সুবন্দোবস্ত আছে। স্বাস্থ্য ভাল।

—

বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী আমেরিকানের ভারত-আগমন-ইচ্ছা

শুভ লক্ষণ বলিয়া এখানে একটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির আলোচনার জন্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদেশী পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীদের এদেশে আগমন অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত বিদেশীদের ভারত-আগমনের ইচ্ছা জগদীশ-চন্দ্র বসু মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার যশ বিদেশে বিস্তৃত হওয়ার পর উৎপন্ন হয়। অন্য কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তাঁহার সমান কৃতী ও যশস্বী না হইলেও, তাঁহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ অন্য একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অধীন একটি শিক্ষায়তনে একজন আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক বিদ্যার্থী গবেষণার জন্য আসিতে চাহিয়াছেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগ অধ্যাপক ডাঃ নীলরতন ধরের অধীন। জার্ণ্যাল্ অব্ ফিজিক্যাল্ কেমিষ্ট্রিতে তাঁহার Studies in Absorption বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমেরিকার ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী ও রাসায়নিক সহকারী লে-রয় ডি ক্লার্ক নামক একটি যুবক এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চ্চা বহু বিস্তৃত হইবার পর এরূপ সামান্য বিষয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক হইবে। কিন্তু এখন ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন নহে।

—

ভারতীয় ও বৃটিশ ডাকমাশুল হ্রাসের চেষ্টা

সস্তা ডাকমাশুল সভ্যতা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের একটি প্রধান উপায়। ডাকমাশুল বৃদ্ধি করিলে যে ব্যবসাবাণিজ্য ও সভ্যতা বিস্তার কার্য্যের প্রভূত অবনতি সাধিত হয়, একথা সর্ব্বজনগ্রাহ্য। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময় ডাক মাশুল বাড়ান হইয়াছিল, তাহার পর কিছু কমিয়াছে। বর্ত্তমানে বহু পুরাতন হারে চিঠি পত্র প্রেরণের বন্দোবস্ত যেন পুনর্ব্বার

হয় সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র পূর্ব্বের ন্যায় অল্প খরচে চিঠি পত্র যাতায়াত করিতে পারে তাহার জন্য বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্‌গণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু দরিদ্র ভারতবর্ষে ডাক মাশুল কমার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের সময় যে ডাক মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, তাহা বজায় রাখিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট ব্যস্ত, কেন না ডাক মাশুল কমাইলে সামরিক বিভাগের জন্য অপব্যয় করিবার জন্য অর্থের কিছু কম্‌তি হইতে পারে।

জাপানের লোকেরা ভারতবাসীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক ধনবান। তাহারা আমাদিগের তুলনায় অল্প ডাকমাশুল দিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এই জ্ঞানালোকবর্জ্জিত দরিদ্র দেশে সস্তায় চিঠিপত্র প্রেরণ করা যাইবে না; কেননা সরকার বাহাদুর এ জন্য অর্থ "নষ্ট" করিতে রাজি নহেন। রাজি না হইবার কারণ সম্ভবত এই যে, সস্তা ডাকমাশুল না হইলেও ভারতে তাঁহাদের ব্যবসা ও রাজস্ব পূরামাত্রায় বজায় থাকিবে।

গভর্ণমেণ্ট ১৮৫০-৫১ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৩-২৪ খৃঃ অব্দ অবধি ৩২২.৮ কোটি টাকা রেলওয়ের জন্য লোকসান্ দিয়াছেন। অর্থাৎ বৎসরে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা রেলওয়ের জন্য আমাদের ভারত গভর্ণমেণ্ট লইয়াছেন। কিন্তু ডাকমাশুল হ্রাস করিবার বেলা গভর্ণমেণ্ট অর্থাভাব বোধ করিতেছেন, যদিও এই কার্য্য সাড়ে চার কোটির তুলনায় অতি অল্প খরচেই হইতে পারে। রেলওয়ের সাহায্যে ভারতের ধনসম্পদ গ্রাস ও ভারতবাসীকে অধীন করিয়া দাবাইয়া রাখা সুসিদ্ধ হয়। সেইজন্যই রেলের জন্য সরকারী টাকা অবাধে ব্যয় করা হয়। ডাকমাশুল হ্রাসের সহিত দেশের লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি আরও ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাহার সামরিক গুরুত্ব নাই এবং বৃটিশ বাণিজ্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রগাঢ় নহে। সুতরাং আমরা অধিক ডাকমাশুল দিতে থাকিব। ইহার নাম বৃটিশ বদান্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা।

—

৺পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী

ত্রিবন্দরমের পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর নাম সংস্কৃতের বিদ্যার্থী মাত্রেরই বিদিত আছে। ত্রিবন্দরমের রাজপ্রাসাদ-লাইব্রেরীর, সংস্কৃত কলেজের ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগের অধ্যক্ষরূপে ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগের সংস্কৃত গ্রন্থমালা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থমালার নব্বইটি পুস্তক অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে।

৺গণপতি শাস্ত্রী কবি ভাসের নাটকগুলি আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিত-মহলে ধারণা ছিল যে মৃচ্ছকটিকই সংস্কৃত ভাষার পুরাতনতম নাটক। মৃচ্ছকটিক সম্ভবতঃ (আন্দাজ) খৃঃ পূর্ব্ব ২০০ অব্দে শূদ্রক রাজার দ্বারা লিখিত হয়। ৺গণপতিশাস্ত্রী প্রমাণ করেন যে ভাসের নাটকগুলি আরও পূর্ব্বে রচিত। তিনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া টুবিন্‌গেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি লাভ করেন। ভারত গভর্ণমেণ্টও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সংস্কৃত ভাষার জন্য পরিশ্রমের মূল্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করেন।

—

বর্ত্তমান উন্নতিশীলতা ও মধ্যযুগের জ্ঞানালোকবিরোধিতা

বঙ্গীয় মুসলমান পার্টির ইস্তাহারে দেখা যায়, মুসলমান নেতৃবৃন্দ বলিতেছেন:

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস্ এই যে, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ইয়োরোপের সহিত একত্র অগ্রসর হইয়া চলিবার চেষ্টা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং ভারতবর্ষকে বর্ত্তমান জগতের উন্নতিশীলতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রাচীনকালের বা মধ্য যুগের জ্ঞানালোক-বিরোধিতার (-obscurantismএর) পথে চালাইবার আমরা সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধে।

আমরাও তাই।

কিন্তু মুসলমান নেতাগণ ভুলিয়া যাইতেছেন, যে, ধর্ম্ম-অনুযায়ী রূপে ভোটের ব্যবস্থা, ধর্ম্মসমাজের জনসংখ্যা দেখিয়া চাকুরী বণ্টন, বিশেষ ধর্ম্মমতবিশিষ্ট লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য উন্নতি-শীলতার ঠিক উল্টা; এবং এই প্রকার কার্য্যের ফলেই ভারতবর্ষ প্রাচীন কালের অন্ধকারাচ্ছন্নতার ভিতর অনেকটা থাকিবে বা গিয়া পড়িবে। স্যর আব্দার রহিমের উচিত প্রথমতঃ এরূপ একটি আধুনিক উন্নত জাতি খুঁজিয়া বাহির করা যাহারা ধর্ম্মমতকে রাষ্ট্রীয় নানাবিধ ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের ন্যায় বড় বলিয়া ধরিয়াছে। তাহার পর তিনি উন্নতির কথা আলোচনা করিতে পারেন।

ইয়োরোপীয় জাতিগণের সহিত সমকক্ষতা রক্ষা বিষয়ে আমরা বলিতে চাই যে, পারিলে এরূপ করা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু মুসলমানগণ যখন দেশবাসী হিন্দুগণের সহিতই চাকুরীর যোগ্যতামূলক প্রতিযোগিতায়

অসমর্থ হইয়া, সমকক্ষ হইবার জন্য অন্যায় উপায়ে ধর্ম্মের ফিকির দেখাইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন ইউরোপীয় জাতির সমকক্ষ হইবার কথা তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না। যে স্থলে আব্দার রহিম সাহেবের সাহায্যে মুসলমান যুবকগণ, শুধু মুসলমানগণ বাংলায় সংখ্যায় হিন্দু অপেক্ষা অধিক, এই দোহাই দিয়া অধিকসংখ্যক চাকুরী উপযুক্ততর হিন্দুদিগকে বঞ্চিত করিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, সে স্থলে তাঁহারা অন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যথার্থ ক্ষমতা দেখাইয়া অপর জাতির সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবেন, এরূপ কল্পনা করাও বাতুলের কার্য্য।

—

জনসাধারণের জন্য ও জনসাধারণের দ্বারা জনসাধারণের শাসন

রহিম সাহেবের ইস্তাহারে দেখা যায়, যে, তিনি বলিতেছেন

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা বাংলার মুসলমানগণ, যাহাদের সংখ্যা এই প্রদেশে ২.৬০,০০,০০০, বঙ্গীয় মুসলমান পার্টিতে সংগঠিত হইলাম। আমরা কোন সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা বা পৃথক থাকিবার ভাব হইতে এই পার্টি গঠন করি নাই। আমরা এক বিরাট সামাজিক সাম্যবাদের উত্তরাধিকারী, আমাদের দৃষ্টি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতায় আবদ্ধ ও কলুষিত নয় এবং আমরা জনসাধারণের জন্য ও জনসাধারণের দ্বারা গভর্ণমেন্টের কার্য্য পরিচালনার যে আদর্শ তাহা সফল করিবার জন্য আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, এই বোধেই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।

আত্ম-প্রবঞ্চনার ইহা এক অপূর্ব্ব উদাহরণ। এই পার্টি গঠনের মূলে সঙ্কীর্ণতা ব্যতীত আর কিছু নাই বলিলেও চলে। যে সাম্যবাদের গৌরব রহিম সাহেব ও তাঁহার দলের অপরাপর লোকেরা করিতেছেন, ইসলামের সে সাম্যবোধ শুধু মুসলমানদিগের মধ্যেই আবদ্ধ। মুসলমানের সাম্যবোধ জগতের, এমন কি শুধু এদেশেরও, সকল অধিবাসীর সহিত নাই। মুসলমান অমুসলমানকে অতিশয় নীচ মনে করে—ইহাকে বিরাট সাম্যবাদ বলা যায় না। ইহা ব্যতীত বাংলায় মুসলমানদিগের ভিতরেও জাতিভেদ দৃষ্ট হয়, এবং কোন কোন নিম্নজাতির লোকেদের কূপব্যবহার নিবারণ ইত্যাদি সামাজিক অত্যাচারে মুসলমানেও যোগদান করিয়া থাকে।

আবদার রহিম সাহেবের উদ্দেশ্য শুধু মুসলমান-প্রভুত্ব স্থাপন—দেশে সাধারণের জন্য ও সাধারণের দ্বারা গভর্ণমেণ্ট স্থাপন নহে। একথার সত্যতা প্রমাণ সহজেই হইবে। স্যর আবদার রহিমকে বলা যাউক, যে, মুসলমানগণ শুধু বাংলায় নহে, সকল প্রদেশেই সমগ্র জনসংখ্যার সহিত মুসলমানের সংখ্যা তুলনা করিয়া সেই অনুপাতে চাকুরী পাইবে। তিনি কি এই বন্দোবস্তে রাজি হইবেন? আমাদের তাহা বোধ হয় না। তাঁহার মতলব সকল দিক দিয়াই মুসলমানের প্রাধান্য রক্ষা করা। যে স্থলে মুসলমানের সংখ্যা অধিক সে স্থলে তিনি বলিবেন, "সংখ্যার অনুপাতে আমাদের অধিক চাকুরী দেওয়া হউক।" আবার সংখ্যায় যে স্থলে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীরা কম, সে স্থলে স্যর আব্দার আবদার করিবেন, "আমরা সংখ্যায় কম বলিয়া কি আমাদের কোনই দাবী নাই? আমাদের স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য কিছু অধিক করিয়া চাকুরী দেওয়া হউক।" কথা এই যে, এই দ্বিতীয় দাবী প্রদেশবিশেষে সংখ্যায় ন্যূন হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদিরা করিবে না কেন? যদি অন্য প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহাদের দাবী বজায় থাকে তাহা হইলে যে স্থলে তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য আছে সে স্থলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দাবী থাকিবে না কেন?

এই সকল কারণেই ধর্ম্ম দেখিয়া ভোট ও চাকুরীর বিভাগ আমরা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি। এই দুষ্ট আদর্শের আমূল উচ্ছেদ প্রয়োজন।

যে সকল কারণে বাংলার মুসলমানগণ দৈন্য ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া আছেন, সে সকল কারণ দূর করা দরকার নিশ্চয়ই। কিন্তু এই কার্য্য আরাম করিয়া ও আবদার করিয়া সিদ্ধ হইবে না। অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত মুসলমানদিগকেও সমানে খাটিতে হইবে, লেখাপড়া শিখিতে হইবে এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

—

স্যর আব্দারের ইস্তাহারের কয়েকটি ভাল কথা

স্যর আবদার রহিমের ইস্তাহারে দুই চারিটি ভাল কথাও আছে। যথা, মুসলমান পার্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে দেখা যায়:—

মেষ্টন এওয়ার্ড বা লডমেষ্টনের রাজস্ববিভাগ পাল্টাইয়া বাংলা ও সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্টের রাজস্ব ভাগের ব্যবস্থার মধ্যে সুবিচার আনয়ন ও এতদ্দ্বারা বাংলাকে উপযুক্তরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে যথেষ্ট রাজস্ব বাংলা গভর্ণমেন্টের হস্তে রাখার চেষ্টা করা।

বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি প্রচেষ্টা এবং বাংলার স্বাস্থ্য উন্নত করিবার চেষ্টা ও গ্রামের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দান করা। বাংলার কৃষি ও ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা। রায়তের প্রতি অবিচার দূরীকরণ ও তাহাদের যাহাতে জমী হইতে সহজে নিষ্কাসিত করা আর সম্ভব পর না হয় তাহার চেষ্টা করা এবং তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নততর করা।

ফ্যাক্টরীর কুলি মজুরের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা এবং উৎকৃষ্ট ফ্যাক্টরী ও ট্রেড ইউনিয়ন আইন উত্তমরূপে প্রবর্ত্তিত করা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

—

মুসলমান পার্টির ইস্তাহারের কয়েকটি বর্জ্জনীয় কথা

আমরা চাই যে "শীঘ্র যাহাতে 'গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট' পরিশোধিত করিয়া ভারতের 'কনষ্টিটিউশন' এমন ভাবে গঠিত হয় যে ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে 'ডোমিনিয়ন' রূপে পরিগণিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হয়।" বৃটিশ সাম্রাজ্যে থাকিব কি না থাকিব সে কথা পরে বিবেচ্য; কিন্তু উপস্থিত অবস্থায় যে থাকিতে চাহি না, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু আমরা ধর্ম্মগত পার্থক্যের দ্বারা ভোটের অধিকার প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হওয়ার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। ইহাতে আমাদের জাতির মধ্যে ভেদ বাড়িবে বই কমিবে না। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই কেহ হউন না, তাঁহার উচিত জাতির সকলের সহিত সমান অধিকারে মিলিত হইয়া, ধর্ম্মের পার্থক্য ভুলিয়া, জাতিগঠনকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করা।

—

ভোটারের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

যদিও বা প্রতি ধর্ম্মসমাজের জন্য বিশেষ করিয়া কাউন্সিলে প্রতিনিধি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করাই স্থির হয়, তাহা হইলেও এক একটি ধর্ম্মসমাজ কয়জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় দেখিতে হইবে কোন ধর্ম্মসমাজে **যথার্থ ভোটের অধিকারী কয় জন আছে;** শুধু জনসংখ্যা দেখিয়া প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা উচিত হইবে না। সুতরাং যে সকল মুসলমান নিজেদের সঙ্কীর্ণতার তাড়নায় ধর্ম্মসমাজ রূপে সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য প্রথমতঃ নিজেদের সমাজে কতজন ভোট দিবার অধিকারী লোক আছে তাহা স্থির করা ও তৎপরে নিজেরা কতজন প্রতিনিধি কাউন্সিলে পাঠাইবেন তাহা নির্ণয় করা। যদি তাঁহারা শুধু জনসংখ্যা দিয়া প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহারা যেন সর্ব্বাগ্রে একদিবসের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ বৃদ্ধা অবধি নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলকে ভোটের অধিকারী করিবার জন্য একটি আইন "পাস" করান। নতুবা তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা কমিয়া যাইবে। শিশুদিগকে বাদ দিয়া শুধু পূর্ণবয়স্কদিগকে শিক্ষিত অশিক্ষিত এবং রোজগারী ভিখারী-নির্ব্বিশেষে ভোট দিবার ক্ষমতা দিলেও কতকটা কার্য্য হইতে পারে। তাহারও চেষ্টা দেখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য!

—

ধর্ম্মসমাজের জনসংখ্যার অনুপাতে চাকুরী বিভাগ

বঙ্গীয় মুসলমান পার্টির মতে মুসলমান সমাজের সমগ্র সংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের মধ্যে সরকারী চাকুরী বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত।

যদি গভর্ণমেণ্টের সকল দেশবাসীকে (শিশু, বালক বালিকা, পূর্ণবয়স্ক নরনারী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা ইত্যাদিকে) চাকুরী দিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য মুসলমানগণ ২,৫৪,৮৬,১২৪টি এবং হিন্দুগণ ২,০৮,০৯,১৪৮টি চাকুরী পাইতেন। ইহাতে মুসলমানগণ খুসী হইতেন। কিন্তু সরকার বাহাদুরের এতগুলি চাকুরী দিবার ক্ষমতাও নাই এবং শুধু কবি-প্রেরণার সাহায্যেই লোকে শিশুদিগকে তকমা পরাইয়া আদালতের কার্য্যে নামাইবার কথা কল্পনা করিতে পারে। শুধু সকল সাবালক লোককে চাকুরী দিবার পক্ষেও যথেষ্ট চাকুরী গভর্ণমেণ্টের হস্তে নাই। যদি শুধু সকল বয়সের সমুদয় লিখনপঠনক্ষম নরনারীর জন্যই চাকুরীর বন্দোবস্ত করা যায় (আজকাল মুসলমানদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কনেষ্টবলের কাজের জন্যও অক্ষরপরিচয় থাকা প্রয়োজনীয় বলিয়া ধার্য্য হইতেছে), তাহা হইলে বাংলার মুসলমানগণ মাত্র ১২,৯৯,৫৪৮টি চাকুরী পাইবেন। **হিন্দুগণ পাইবেন ২৯,১৬,৯৯৮টী** অর্থাৎ মুসলমানের দ্বিগুণেরও অধিক।

সচরাচর নাবালকদিগকে চাকুরী দেওয়া হয় না এবং নারীদিগের জন্যও অল্পই চাকুরী আছে। চাকুরী ২০ ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষগণই পাইয়া থাকেন। নীচের তালিকাতে ২০ ও তদূর্দ্ধবয়স্ক লিখনপঠনক্ষম হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা দেওয়া হইল।

	লিখনপঠনক্ষম	ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম
হিন্দু	১৮,৫৫,৫৭৬	৩,৭৭,৮৫৬
মুসলমান	৯,১৭,৬৩০	৮১,৮০৩

সুতরাং যে সকল চাকুরীর জন্য অন্ততঃ অক্ষরপরিচয় প্রয়োজন, তাহার মধ্যে শতকরা ৬৬টি হিন্দুগণ ও ৩৩টি মুসলমানগণ পাইবেন। যে চাকুরীতে সামান্য ইংরেজী জানাও দরকার, তাহাতে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় এক পঞ্চমাংশ মাত্র হইবে।

কিন্তু সকলেই জানেন, যে, অধিকাংশ গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর জন্য শুধু ইংরেজী অক্ষরপরিচয় থাকিলেই চলে

না। কিছু উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন অনেক চাকুরীতেই থাকে। এই সকল চাকুরীর জন্য উচ্চশিক্ষিত হিন্দু যথেষ্ট রহিয়াছে। মুসলমানের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার কম। সুতরাং যদি জোর করিয়া কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু তাঁহার ধর্ম্মের খাতিরে চাকুরী দিবার জন্য উপযুক্ততর ব্যক্তিকে চাকুরী না দেওয়া হয়, তাহা হইলে অতি ঘোরতর অবিচার করা হইবে। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল মুসলমান চাকুরী পাইবে বলিয়া যদি হিন্দু গ্রাজুয়েট নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে, তাহা হইলে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে তাহাতে রাজ্যের মঙ্গল হইবে না।

এই কারণে বঙ্গীয় মুসলমান পার্টির দাবী অতিশয় দূষণীয় এবং উহা অগ্রাহ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে ইংরেজ রাজের প্রজাদের পরস্পরের সহিত মনোমালিন্য ঘটাইয়া রাজত্ব করার যে পন্থা আছে, সেই পন্থা অনুসারে মুসলমানের দাবী সাময়িকরূপে গ্রাহ্য হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। কিন্তু মুসলমানেরও দুয়োরাণী হইবার দিন আসিবে। চাকরী দিবার শ্রেষ্ঠ ও ন্যায্য উপায় হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত উমেদারকে চাকরী দেওয়া। এই উপযুক্ততার পরীক্ষা কি ভাবে হইবে, তাহা বিধিবদ্ধ করা হউক এবং হিন্দু, মুসলমান, দেশী খ্রীষ্টান, ইংরেজ সকলেই উপযুক্ততা দেখাইয়া চাকরী লউন। ফিকির করিয়া অথবা লোক-দেখান কাউন্সিলে আইন পাশ করাইয়া চাকরী লইয়া কোন ধর্ম্মসমাজের উন্নতি হইতে পারে না। রাষ্ট্র জনসাধারণের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান নহে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্ম্মের কথা তোলা এবং হিন্দুশাস্ত্রের অথবা মুসলমানের কোরানের নূতন সংস্করণ আইন পাশ করিয়া প্রচার করা এক ধরণের কথা। ধর্ম্মসমাজ ও রাষ্ট্র আজ বহু কাল হইতে সভ্যজগতে পরস্পর বিচ্ছিন্নরূপে রহিয়াছে। এই বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে যাওয়া উন্নতির পথ ত্যাগ করিয়া অবনতির পথ অবলম্বন করার সামিল। যে সকল স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতে হইলে শিক্ষা ও শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় ও যে সকল জীবিকাতে হিন্দুগণের চাল চালিয়া সক্ষম হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, সে সকল জীবিকাতে দেখা যায় যে, হিন্দুগণেরই প্রাধান্য। ইহাতে মুসলমানদিগের তুলনামূলক অক্ষমতা ব্যতীত আর কি প্রমাণ হয়? নিম্নের তালিকা হইতে একথার সত্যতা প্রমাণ হইবে।

জীবিকা	হিন্দু	মুসলমান
ডাক্তারী কবিরাজী ও হাকিমী	১,৪১,৩২৫	৩৪,৭১৮
আইন	৫০,৭৩১	৫,৬০২
ধর্ম্মযাজকতা	২,৭৫,৬০৪	৩৮,০৯৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শক্তি, সামর্থ্য ও ন্যায্য প্রতিযোগিতায় মুসলমানগণ হিন্দু অপেক্ষা অনেক কম সক্ষমতা দেখাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের আবদার করিয়া কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা করা কখনও উচিত নহে। অধিকতম উপযুক্ততা দেখাইয়া যদি তাঁহারা বাংলার সকল চাকুরী ও সকল সম্পদের অধিকারী হন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না। করিলে তাহাকে হিংসুক ও দুষ্ট অপবাদ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হইবে।

শুধু সংখ্যাধিক্য দ্বারা অধিকার বিচার চেষ্টা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। হিন্দুদের মত মুসলমানদিগের নিজেদের ভিতরেও নিরক্ষর মূর্খেরা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে যদি অধিকসংখ্যক চাকুরী দেওয়া হয় ও মুসলমান গ্রাজুয়েটদিগকে বেকার বসাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ স্বয়ং স্যর আবদার রহিমও এরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদ করিবেন।

—

হাইকোর্টের কর্ম্মচারী নিয়োগ ক্ষমতা

বঙ্গীয় মুসলমান পার্টি চান যে, হাইকোর্টের উপর যেন আর মুন্সেফ প্রভৃতি নিয়োগ বা বিচার ব্যতীত অপর কোন কার্য্যের ভার না থাকে। ইহার অর্থ এই, যে, হাইকোর্টের বিচারকগণ মুন্সেফাদির নিয়োগকার্য্য করিতে অক্ষম। (অথবা তাঁহারা কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলে তাঁহাদের বিচার করার অভ্যাসের ফলে অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত মুসলমানগণের অধিক চাকুরী লাভ অদৃষ্টে ঘটিবে না)। যদি হাইকোর্টের জজেরা মুন্সেফ প্রভৃতি যথাযথ মনোনীত করিতে না পারেন, তাহা হইলে কে পারিবে? অতঃপর সম্ভবত মুসলমানগণ বলিবেন, যে, পুলিশ কমিশনারের দ্বারা শিক্ষা বিভাগের ও আবগারী বিভাগ দ্বারা জজ ও মুনসেফগণের নিয়োগ কার্য্য সাধিত হইবে। পশুচিকিৎসা বিভাগ হইতে ইঞ্জিনিয়ারদিগের ও হাইকোর্টের জজদিগের নিয়োগ হইলে আরও উত্তম হইবে। এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য হইবে খিলাফত কমিটির হস্তে গভর্ণমেণ্টের ভার অর্পণ করিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে।

—

বাংলায় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা বাংলায় একটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিপক্ষে। আমরা কোন প্রকার ধর্ম্মসমাজসংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ইহা চাই না। অবশ্য এইরূপ

কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাহা সহ্য করা ব্যতীত অপর উপায় নাই। কিন্তু আমাদের উচিত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বাল্যকাল হইতে একত্র বাস করিয়া পরস্পরের সহিত সখ্যে ও সৌহার্দ্দ্যে জীবন যাপন করিতে শিখা। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও উন্নত জাতীয়তা কখন একত্র থাকিতে পারে না।

মুসলমান ছাত্রদিগের যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা উচিত। বিনা বেতনে পাঠের ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। কিন্তু একটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া অর্থ নষ্ট করা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে। মুসলমানগণ অনায়াসে সকল কলেজে উপযুক্ততা দেখাইয়া প্রবেশ করিতে পারেন।

মুসলমান পার্টি চান যে "মুসলমান ছাত্রগণ মুসলমান সমাজের জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষার সুবিধা লাভ করেন।" উত্তম কথা, কিন্তু সুবিধার কি তাঁহাদের কোন অভাব আছে? এবং অনেকগুলি (অর্দ্ধেকেরও অধিক) স্থান স্কুল কলেজে মুসলমানদিগের জন্য খালি রাখিলেই কি সেই সকল স্থান মুসলমান ছাত্রে ভর্ত্তি হইয়া উঠিবে? সম্ভবত স্থানগুলির অধিকাংশই খালি থাকিবে। কারণ মুসলমানের যে নিরক্ষরতা, তাহা স্কুল কলেজের অভাবে নহে—অর্থনৈতিক, মানসিক ও জীবনের আদর্শের দারিদ্র্যের জন্যই।

আমরা জ্ঞাত হইলাম, যে, মুসলমানগণের ইচ্ছা যে গবর্ণমেণ্টের যে পরিমাণ অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়, তাহার অন্তত শতকরা ৫৪ টাকা যেন মুসলমানের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। ইহা প্রথমতঃ হইতে পারে না এই জন্য যে এই অর্থ প্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অবধি নানা প্রকার শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। মুসলমানগণ ইহার মধ্যে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার জন্য যাহা ব্যয়িত হয় তাহার শতকরা ৫৪ টাকা পরিমাণ পাইতে হইলে যতগুলি উচ্চশিক্ষিত মুসলমান ছাত্র সরবরাহ করিতে হইবে তাহা করিতে এখন অক্ষম। সুতরাং তাঁহাদিগকে শিক্ষার জন্য ব্যয়িত সকল অর্থের শতকরা ৫৪ টাকা দিতে হইলে উচ্চ শিক্ষা তুলিয়া দিয়া প্রায় সকল অর্থই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ করিতে হইবে। ফলে বহুসংখ্যক উপযুক্ত হিন্দু উচ্চ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট বহু হিন্দু কর্ত্তৃক স্থাপিত স্কুলকলেজকে আংশিক সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৫৪টি (অথবা শতকরা দুই চারিটিও) মুসলমান-স্থাপিত নহে। সুতরাং এক্ষেত্রেও মুসলমানের আব্দার রক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ততর ও দীর্ঘকাল স্থাপিত হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিকে বঞ্চিত করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার জন্য ব্যয়িত রাজস্বের শতকরা ৫৪ টাকার উপর মুসলমানগণের কোন ন্যায্য দাবী আছে কিনা দেখা দরকার। তাঁহারা কি সমুদয় রাজস্বের শতকরা ৫৪ টাকা দিয়া থাকেন? তাহা যদি না দেন, তাহা হইলে কোন্ অধিকারে তাঁহারা এরূপ দাবী করিতেছেন? হিন্দু দিবে টাকা এবং তাঁহারা লুটিবেন, এইপ্রকার বন্দোবস্ত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেকালের সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায়কারী কোন রাজা বাদশাহকে মৃতসঞ্জীবনী সেবন করাইয়া ভারতসম্রাট খাড়া করা প্রয়োজন।

বাংলার শিক্ষাকার্য্যের অল্পাংশই গবর্ণমেণ্টের অর্থে সাধিত হয়। অধিকাংশ অর্থ আইসে ছাত্রদিগের ও দেশের সদাশয় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে। শতকরা ৫৪ টাকা মুসলমানের ভাগে ফেলিতে হইলে বাংলার শতকরা ৫৪ জন ছাত্র ও শিক্ষার জন্য অর্থদাতা মুসলমান হওয়া দরকার। তাহা হইবে কি?

—

হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

হিন্দু মহাসভার পক্ষে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি খাড়া করা কখনও উচিত হইবে না। নানা প্রকার রাষ্ট্রীয় মতামতের লোক হিন্দু মহাসভার সভ্য রহিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে যদি মহাসভা কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় মতের কোন সভ্যকে প্রতিনিধিরূপে খাড়া করেন, তাহা হইলে এই লইয়া সভার সভ্যদের মধ্যে কলহের সূচনা হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কোন ধর্ম্মসভার উচিত নহে। যদি কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার রাষ্ট্রীয় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়, তখন অবশ্য ধর্ম্মসভা হইতে সে

বিষয়ে নানাবিধ চেষ্টা হইতে পারে। হিন্দু মহাসভা যদি কোন বিষয়ে কাউনসিল বা এ্যাসেম্ব্রীর সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে হিন্দু সভ্যদের নিকট সে সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু মহাসভা যদি হিন্দুত্বকে রাষ্ট্রীয় মার্কা করিয়া কাউন্‌সিলের বাজারে বাহির করেন তাহা হইলে উচিত করিবেন না, কেন না **হিন্দুত্ব রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নহে।** ইহার ফল এই হইবে, যে, যথার্থ রাষ্ট্রীয় সমস্যার সময় তাহার ধাক্কায় হিন্দুতে হিন্দুতে মতভেদ হইয়া হিন্দুত্বই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

—

দাঙ্গাহাঙ্গামা ও তাহার দমন-ক্ষমতা

বৃটিশ জাতির লোকেরা যে দাঙ্গা দমন করেন, তাহা তাঁহাদের রক্তের গুণে নহে—অস্ত্রের গুণে। কাজেই যখন ইংরেজী কাগজে বক্তৃতায় ভারতবাসীর স্কন্ধে দাঙ্গা করার অপবাদটুকু চাপাইয়া দাঙ্গা দমনের সকল যশটুকু ইংরেজগণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা অন্যায় করেন। কারণ, উপযুক্ত ক্ষমতা ও অস্ত্র পাইলে ভারতবাসীরাও দাঙ্গাহাঙ্গামার নিবৃত্তি ইংরেজ অপেক্ষা সহজেই করিতে পারে; এবং ইংরেজ যে দাঙ্গা দমন করেন তাহাও অধিক ক্ষেত্রে এবং প্রধানত ভারতীয় পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যে। জাতিগত কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলে আজ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র দাঙ্গা হইত না; এবং তাহাও **ধর্ম্মের জন্য নহে, অর্থের জন্য।**

—

ভারতীয়েরা কি অধিক মাত্রায় ধর্ম্মসংক্রান্ত দাঙ্গার ভক্ত ?

বৃটিশ ভারতে ৫০০০৪২টি সহর ও গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে একশতটিতেও কোন বৎসর ধর্ম্মসক্রান্ত দাঙ্গা হয় না। অর্থাৎ জোর প্রতি পাঁচহাজার সহর ও গ্রামের একটিতে হয়ত দাঙ্গা হয়। তদ্ভিন্ন, দেশী রাজ্যসকলের মোট ১৮৭৮৯৩ গুলি গ্রামে ও নগরে "ধর্ম্ম"দাঙ্গা ত হয় না বলিলেই হয়। ইহা হইতে ভারতবাসীর ধর্ম্মসংক্রান্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রীতি খুব প্রবল বলিয়া বোধ হয় না।

—

বৃটিশের মুসলমান-প্রীতি

ভারতে বৃটিশগণের কেহ-কেহ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই অধিক ভক্ত। ইহার কারণ, তাঁহাদের মুসলমান না হইলে খানা বন্ধ হইয়া যায়। কে একজন বলিয়াছেন, যে, সৈন্যগণ পায়ে হাঁটিয়া অগ্রসর হয় না, হয় পেটে হাঁটিয়া। অর্থাৎ খানা না পাইলে সৈন্যদলের অবস্থা বিশেষ খারাপ হয়। ভারতে যে সকল বৃটিশজাতীয় লোকেরা অর্থনৈতিক ও সামরিক সেনা রূপে আস্তানা গাড়িয়াছেন, তাঁহাদের খাদ্য সরবরাহ করে মুসলমানে। অতএব.........।

—

মস্‌জিদের সাম্‌নে গীতবাদ্য ও গোলমাল

কলিকাতায় শিখদিগের যে মিছিল হইয়া গেল, তাহার পথ ও কার্য্যপ্রণালী আলোচনার জন্য লাট সাহেবের সহিত যে আলোচনা হয়, তাহাতে মুসলমান নেতারা দাবী করেন, যে, তাঁহাদের সমুদয় মস্‌জিদে চব্বিশ ঘণ্টাই নামাজ হয়, সুতরাং দিনরাত কোন সময়েই তাহার সাম্‌নে গীতবাদ্য বা কোনরূপ উচ্চ শব্দ হওয়া নিষিদ্ধ। এমন কোন মস্‌জিদ থাকিতে পারে যাহাতে সর্ব্বদাই নামাজ হয়; কিন্তু সাধারণতঃ মস্‌জিদগুলিতে চব্বিশ ঘণ্টা নামাজ হয় না। খলিফা হজরত ওমারের যে ফর্মান কিতাব-উল-খেরাজ গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠা হইতে মৌলবী ওয়াহেদ্‌ হোসেন আগামী জুনের মডার্ণরিভিউ কাগজে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয়, যে, উক্ত খলিফা অমুসলমানদিগকে নামাজের সময় ছাড়া অন্য সময়ে শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, মস্‌জিদে সর্ব্বদা নামাজ হয় না; হইলে উক্ত ফর্মানের কোন মানে থাকে না। যদি দিনরাত্রি কোন সময়েই মস্‌জিদের নিকট কোন উচ্চ শব্দ নিষিদ্ধ, তাহা হইলে মুসলমানরা মহরমের সময় তথায় ঢাক বাজান কেন? মুসলমান রাজত্বে খলিফা অমুসলমান-দিগকে যে অধিকার দিয়াছিলেন, পরাধীন মুসলমানেরা সমপরাধীন অমুসলমানদিগকে তাহাও দিতে রাজী নন দেখিতেছি! অথচ প্রিভি কৌন্সিলে শিয়াসুন্নির ঝগড়ায় চূড়ান্ত এই রায় হইয়া গিয়াছে, যে, এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠানের খাতিরে অন্য কোন সম্প্রদায় তাহাদের

ধর্ম্মানুষ্ঠান অল্প সময়ের জন্যও বন্ধ রাখিতে আইনতঃ বাধ্য নহে। অবশ্য আপোসে তাহা রাখা যাইতে পারে। অতএব মুসলমান নেতাদের বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক হওয়া দরকার।

খিলাফৎ সমিতির লম্বা চৌড়া কথা

দিল্লীতে খিলাফৎ সমিতির অধিবেশনে খুব লম্বা চৌড়া গরম গরম কথা হইয়া গেল। উষ্মাটা এই ভাবে বাহির হইয়া গিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা হইলে সুখের বিষয় হইবে।

বালকেরা আঁধারে পথ চলিতে চলিতে কোথাও ভূত আছে বলিয়া অমূলক ভয় পাইলে কখন কখন উচ্চস্বরে কথা বলিয়া বা জোর গলায় গান করিয়া সাহস দেখাইতে বা ভয় ভুলিতে চায়। খিলাফতীদের লম্বাচৌড়া কথা এই জাতীয় নহে ত?

মহম্মদ আলী গান্ধীকে সধর্ম্মী করিবেন

খিলাফৎ সমিতির অধিবেশনে মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, তিনি সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, যে দিন তিনি গান্ধীকে কল্মা পড়াইয়া মুসলমান করিবেন। আর্য্যসমাজী কেহ সেই দিনে গান্ধীর "বিশাল ভাই" শৌকৎ আলীকে শুদ্ধি দ্বারা হিন্দু করিবার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

শুদ্ধি ও সংগঠনের উদ্দেশ্য

অহিন্দুকে হিন্দু করা নূতন নহে, প্রাগ্‌ঐতিহাসিক সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে; যদিও ইহার প্রণালী খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান প্রণালী হইতে ভিন্ন ছিল। ইহাতে মুসলমান-দের রাগ করা উচিত নহে। তাঁহাদের পক্ষে অন্যধর্ম্মা-বলম্বীকে মুসলমান করা যদি গর্হিত না হয়, তাহা হইলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষেও মুসলমানকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করা অন্যায় নহে। মুসলমানেরা যদি বহুশতাব্দীব্যাপী স্বধর্ম্মবিস্তার-চেষ্টা দ্বারা হিন্দুত্বের উচ্ছেদ সাধন প্রয়াস না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হিন্দুত্বের প্রসার চেষ্টাও ইস্লামের উচ্ছেদ সাধনের জন্য করা হইতেছে না।

হিন্দু সংগঠন

হিন্দু সংগঠনের খুব প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই চেষ্টাকে সফল করিতে হইলে যাহা করা দরকার, সে সম্বন্ধে নেতারা ও অনুচরেরা যেন আত্মপ্রতারিত না হন। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা ত সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতেই হইবে, অধিকন্তু পঞ্জাব প্রাদেশিক হিন্দু সভার অধিবেশনে সভাপতি ডাক্তার মুঞ্জে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও পূর্ণ মাত্রায় করিতে হইবে। যথা, "হিন্দুসমাজভুক্ত সকল জা'তের সামাজিক অধিকার, বিশেষ সুবিধা এবং সামাজিক মর্য্যাদা সমান হওয়া উচিত, যাহাতে কোন জা'ত অন্য কোন জা'ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বিবেচিত না হয়।" এতদ্ভিন্ন তিনি বাল্যবিবাহের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চান, এবং আখাড়া প্রতিষ্ঠা ও তথায় লাঠিখেলা অসিশিক্ষা আদি চান। নিঃসন্তানা অল্পবয়স্কা বিধবাদের বিবাহ দেওয়াও অত্যাবশ্যক।

ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য জরুরী আইন

কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়ায় গবর্ন্মেণ্ট একটি জরুরী আইন করিতে চাহিতেছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই:—সরকার যদি মনে করেন, যে, গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা-আদি কারণে কলিকাতা ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানে লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কা হইয়াছে, তাহা হইলে তিন মাসের অনধিক কালের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তখন এই জরুরী আইন জারী হইবে। তাহার বলে পুলিশ কমিশনার ও জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টিকারী বা উত্তেজনাকারী ব্যক্তিকে দুই বৎসরের অনধিক কালের জন্য প্রেসিডেন্সী-এলাকা হইতে কিম্বা, সে ব্যক্তি বাংলার অধিবাসী না হইলে, বাংলাদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিবেন। তাহা করিয়া ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাংলা গবর্ন্মেণ্টের কাছে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

এরূপ জরুরী আইনের প্রয়োজন স্বীকার করি না। পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এবং এরূপ আইনের অপব্যবহারের খুব সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যদি সর্ব্বসাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইন করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিধিও করা উচিত, যে, বহিষ্কার বাংলা গবর্ন্মেণ্টের অনুমোদনের পর হইবে, এবং বহিষ্কারের আগে বহিষ্কৃত ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবে এবং সেই আপীল হাইকোর্টকে অবিলম্বে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

বিলাতে ধর্ম্মঘট ও শ্রমিকধনিকের দ্বন্দ্ব

বিলাতে কয়লার খনির ইংরেজ কুলিদের ও মালিকদের মধ্যে বেতন এবং শ্রমের সময়ের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল। তাহার সুনিষ্পত্তি না হওয়ায় খাদের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদের সহিত দরদ বশতঃ অন্য কোন কোন রকম শ্রমিকেরাও কাজ ছাড়িয়াছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছে। এত বিরাট না হইলেও এরূপ ধর্ম্মঘট এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং "ধর্ম্ম"-দাঙ্গাও বিলাতে আগেও হইয়াছে, পরেও হইবে। কিন্তু ইহা ইংরেজদের আত্মশাসন-অক্ষমতার প্রমাণ নহে; কেবল মাত্র ভারতের দাঙ্গাতেই ভারতীয়দের আত্মশাসনে অসামর্থ্য প্রমাণিত হয়।

—

ব্যতিহারিক সহযোগী ও স্বরাজীদের মিলন হইল না

বোম্বাইয়ে যে সর্ত্তটিতে স্বরাজী ও ব্যতিহারিক সহযোগীদের মিল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, সবরমতীতে সেই সর্ত্তটির অর্থ সম্বন্ধে নেতাদের মতভেদ হওয়ায় মিল হইল না। আমাদের বিবেচনায় পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, কোন অভিধান বা ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে তাহা হইতে পারে না।

—

চমৎকার শ্রমবিভাগ

অর্থনীতিবিদ্যায় বর্ণিত আছে, যে, পণ্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন করিতে হইলে তাহার এক একটি অংশ ও প্রক্রিয়া এক একজনের বা দলের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ায় কাজ শীঘ্র হয় ও নৈপুণ্যের সহিত হয়। ভারতবর্ষে অন্য রকম প্রয়োজনে অন্যবিধ চমৎকার শ্রমবিভাগ প্রচলিত আছে। যাহাতে সাম্প্রদায়িক ভেদ ও রেষারেষি স্থায়ী হইতে পারে, প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন, চাকরীর ভাগ, শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তদনুরূপ বন্দোবস্ত করা ইংরেজদের কাজ। সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপন বা রক্ষা করার ভার ভারতীয়দের। তাহারা তাহা করিতে না পারিলে বদনাম একমাত্র তাহাদেরই। ভেদবুদ্ধির দরুন দাঙ্গা হইলে তাহার জন্য দায়ী ভারতীয়েরা; শান্তিস্থাপন চট করিয়া করিতে না পারিলে অপযশ ভারতীয়দের। শান্তি স্থাপনের যশটা প্রাপ্য পুরামাত্রায় ইংরেজের, যদিও শ্রমবিভাগটা আছে এইরূপ, যে, সরকারী ক্ষমতা ও অস্ত্র থাকিবে ইংরেজদের হাতে এবং "ঢালনাই খাঁড়া নাই ভারতীয় নিধিরাম সর্দার"দিগকে দাঙ্গা নিবারণ বা দমন করিতে হইবে।

—

শৌকৎআলীর আবিষ্কার

মৌলানা শৌকৎআলী আবিষ্কার করিয়াছেন, যে, কাফেররা মরিতে ভয় করে, মুসলমানেরা মরিতে ভয় করে না। মুসলমানদের মধ্যে খুব সাহসী লোকের অভাব নাই। কিন্তু কাফেরদের মধ্যেও সেরূপ লোকের অভাব কখন ছিল না, এখনও নাই। দুর্দ্ধর্ষতা ও হিংস্রতাই যদি বীরত্বের লক্ষণ হয়, তাহা হইলেও কাফের জঙ্গীস্ খাঁ কি করিয়াছিল, এবং কাফের হরী সিং নালুয়ার নাম এখনও আফগানিস্তানে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, মৌলানা সাহেব তাহা শুনিয়াছেন কি?

—

চন্দ্রকান্ত দেব ও যতীন্দ্রনাথ সুর

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে সহস্রাধিক দাঙ্গাকারীকে হটাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ কলের কামানের গুলিতে চন্দ্রকান্ত দেব ও যতীন্দ্রনাথ সুর যুবকদ্বয়ের মৃত্যু আত্মীয়-বিয়োগের শোকের মত মর্ম্মে বিঁধিয়াছে। ধন্য তাঁহাদের সাহস, ধন্য তাঁহাদের স্বতঃউৎসারিত মানবপ্রেম, যাহা তাঁহাদিগকে হেলায় প্রাণ দিতে সমর্থ করিল। ধন্য তাঁহাদের লাঠিখেলার নৈপুণ্য যাহার ভয়ে এতগুলা উত্তেজনা-উন্মত্ত লোক হটিয়া পলাইতেছিল। তাঁহাদিগকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তাঁহাদের "কুলং পবিত্রম্ জননী কৃতার্থা।"

—

"গ্রন্থকার-মাহাত্ম্য"

বৈশাখের প্রবাসীর ১০৭ পৃষ্ঠায় ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী হইতে "গ্রন্থকার মাহাত্ম্য" নামক যে প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
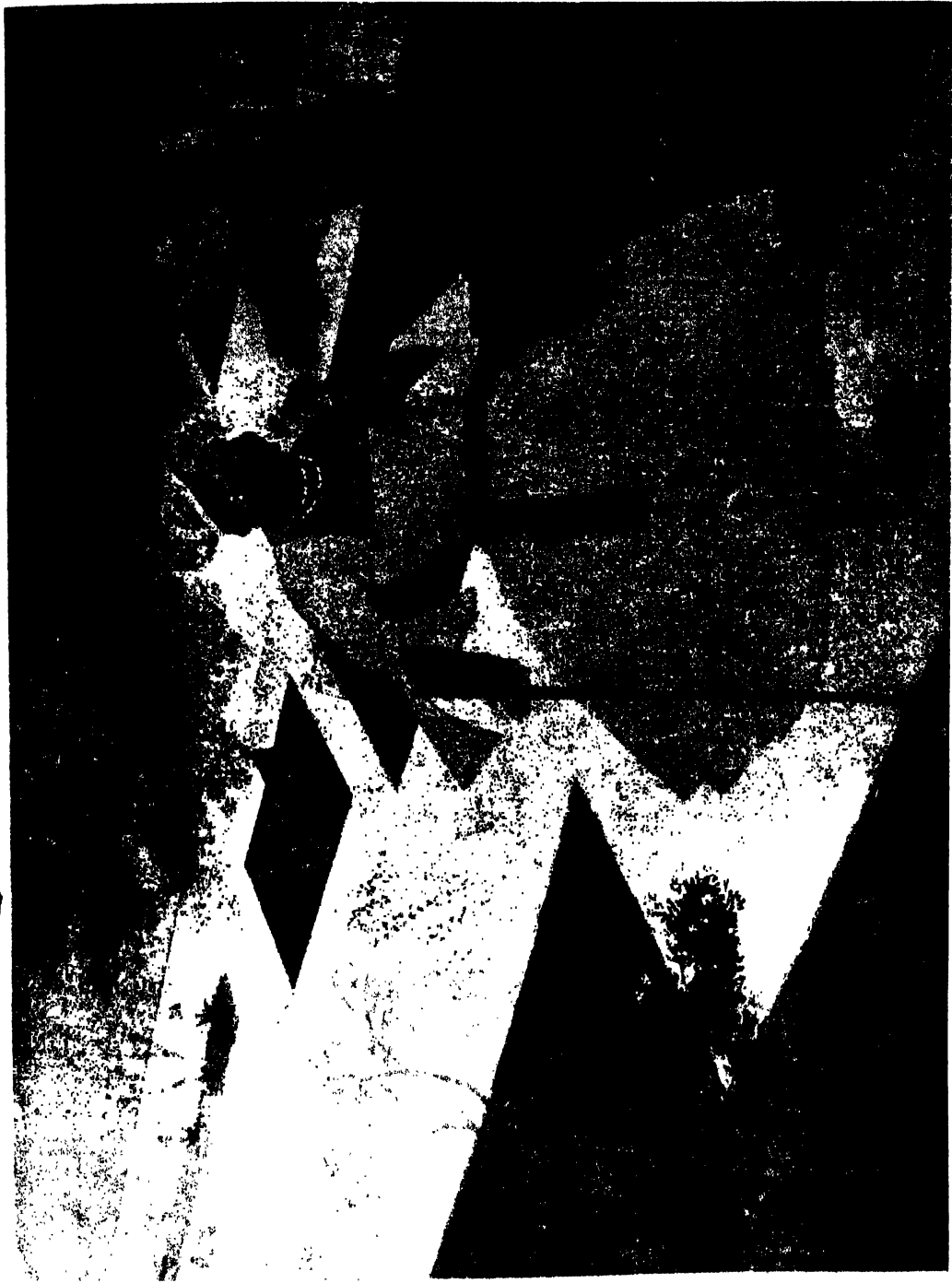
জাহাঙ্গীর

শিল্পী শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩৩

৩য় সংখ্যা

বৈকালী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সহসা যত বাঁধন হ'তে
আমারে দিলো ছুটি।
হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি',
সুদূর বন-গন্ধ আসি'
করিল কোলাকুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া নিভৃত তরুছায়ে
চুপি চুপি কী করুণ কথা
কহিল সারা গায়ে।
আমের বোল্, ঝাউয়ের দোল,
ঢেউয়ের লুটোপুটি,
বুকের কাছে সবাই এলো জুটি' ॥

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
যা-কিছু মোর ভাবনা ছিলো
সকলি নিলো লুটি'।
ডাকিয়া মোরে আনিল লীলাভরে
সকল-ভোলা দুয়ার-খোলা
পুরানো খেলা-ঘরে,—
যেখানে ছিনু সবার কাছাকাছি,
অজানা ভাবে অবুঝ গান
যেখানে গাহিয়াছি।
প্রাণের মাঝে বানের মতো
ক্ষ্যাপামি এল ছুটি'।
কাজের বাঁধ সকলি গেল টুটি' ॥

চপল তব নবীন আঁখি দুটি,—
সে আঁখি-পাতে আকাশ উঠে
ফুলের মতো ফুটি'।
ইসারা তার চমক দেয় চিতে,
অশোক-বন বাজিয়া উঠে
রঙীন রাগিণীতে।

অলস হাওয়া আধেক জেগে জেগে
গগনপটে কী ছেলেখেলা
খেলায় মেঘে মেঘে।
কমল-কলি বুলায় বুকে
কোমল কচি মুঠি,
পরাণে মনে নিখিলে জেগে উঠি॥

---

(২)

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি,
আমার মন কয়, চিনি চিনি।
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে
মাধবী বিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে—
কলসে কঙ্কণে কিনি কিনি,
আমার মন কয়, চিনি চিনি॥

পারুল শুধাইল, "কে তুমি গো,
অজানা কাননের মায়ামৃগ।"
কামিনী ফুলকুল বরষিছে,
পবনে এলোচুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে,
ঝিল্লী ঝনকিছে ঝিনি ঝিনি,
আমার মন কয়, চিনি চিনি॥

---

(৩)

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হ'তে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে॥

তোমারি সে ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে॥

---

(৪)

জানি, তোমার অজানা নাহি গো
কি আছে আমার মনে।
আমি গোপন করিতে চাহি গো,
ধরা পড়ে দুনয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চ'লে যাই কেবলি,
পথপাশে দিন বাহি গো,
দেখে যাও আঁখি-কোণে
কী আছে আমার মনে॥

চির তিমির নিশীথ গহনে
আছে মোর পূজা-বেদী;
তুমি চকিত হাসির দহনে
সে তিমির দাও ভেদি'।
বিজন দিবস রাতিয়া
কাটে ধেয়ানের মালা গাঁথিয়া,
আনমনে গান গাহি গো;
শুনে যাও খনে খনে
কি আছে আমার মনে॥

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

(১১)

কলিকাতা
২১এ জুন, ১৯০০।

সুহৃৎ—

আমি তরঙ্গরেখার বি-বিন্দুর অধস্তম স্থান অধিকার করিয়া আছি। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তরঙ্গের প্রভাব দূরে প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল, কোন প্রকারে এই অবস্থা দূর করি। বিলাত হইতে এখনও কোন খবর আসে নাই। দিব দিব করিয়া আর কয়দিন দেরী করিলেই আমার পারিসে যাওয়া না যাওয়া তুল্য। আমার প্রবন্ধ পড়িতে হইলে অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে দিন স্থির করিতে হয়, নতুবা শেষ অবস্থায় সময় কোন প্রকারে পাওয়া যায় না। আপনি এসম্বন্ধে 'ত্রিশঙ্কুর স্বর্গগমন' বলিয়া একটি কবিতা লিখিবেন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে থাকা অতিশয় আরামজনক। সে যাহা হউক, আপনার ও অঞ্চলে ২।১ দিন যাইয়া সুস্থ মন লইয়া আসিতে অতিশয় ইচ্ছা হয়।

পুরীর বর্ণনা শুনিয়া আমার মন সেখানে আছে। সমুদ্র-গর্জ্জন ও বাতাস ও ঢেউ আমাকে ঘেরিয়া আছে। এই কীর্ণ নগর ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজকে হারাতে চাহি।

আপনার পুস্তক কবে বাহির হইবে? দেরী হইলে াতের লেখার খাতা পাঠাইবেন। সেইরূপ আরও নেকগুলি গ্রাম্য কবিতা চাই।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

পুঃ—লোকেনের কোন খবর পাওয়া গেল?

(১২)

১৩৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
শনিবার।

স্নেহবরেষু—

উপরের ঠিকানা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, আমি পলাতক—প্লেগের অনুগ্রহে। আমার একজন ভৃত্য ছুটী লইয়া একদিন বড়বাজার গিয়াছিল। সেখান হইতে আসিয়া একদিন পরেই প্লেগ হয়। আর ৩০ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু। বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া উক্ত ঠিকানায় আছি—কতদিন পলায়ন চলিবে জানি না। আমার কেমন মনে হইতেছে যে, কাগজগুলি লেখা শেষ হইল না। এখানে থাকিলে লেবরেটরীতে না আসিয়া থাকিতে পারি না, সুতরাং লিখিবার সময় পাই না। এজন্য মনে করিতেছিলাম, যে, দিন চার জন্য আপনাদের ওখানে থাকিয়া অন্ততঃ লেখাটা শেষ করিব। মঙ্গলবার কলেজ হইয়া তারপর সোমবার পর্য্যন্ত ছুটী। আপনি যদি থাকেন তবে আসিতে চেষ্টা করিব। লোকেনকে খবর দিয়া আনিতে পারিবেন কি?

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

(১৩)

১৩৯ ধর্ম্মতলা
২৯এ জুন, ১৯০০।

সুহৃৎ—

সেক্রেটারী অব ষ্টেটের মঞ্জুর টেলিগ্রাম পাইয়াছি। আমাকে সত্বরেই রওয়ানা হইতে হইবে। হয়ত এই বৃহস্পতিবার কিম্বা তার পরের বৃহস্পতিবার। পরে জানাইব।

সম্মুখে অনেক আশা ও নৈরাশ্যের কারণ আছে। দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া অবসাদে মন আক্রান্ত।

এ সময়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব চলিয়া চায়। কখনও মহীয়সী মাতৃদেবীর অনুজ্ঞা শুনিতে পাই। তাঁহার ভৃত্য পদধূলি মস্তকে লইয়া যাত্রা করিবে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, ভৃত্য যেন কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে পারে, তাহার ক্ষুদ্র শক্তি যেন বৰ্দ্ধিত হয়। তিনি যদি এই অধমকে ডাকিয়া থাকেন, তবে কি করিয়া সে কৃতজ্ঞতা

জানাইবে? আপনাদের শুভ ইচ্ছায় আমার উৎসাহ বর্দ্ধিত করুন।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

(১৪)

S. S. Arabia, Aden
19 July, 1900

সুহৃদ্‌বরেষু—

কবির কল্পনা ও সত্যে কত প্রভেদ! আপনাদের রচিত সমুদ্রবর্ণনা পড়িয়া সাগ্রহে সমুদ্রযাত্রা প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। জাহাজে উঠিয়া কেবলমাত্র এক পেয়ালা চা পান করিয়াছিলাম, আর অমনি সমুদ্র-গর্জ্জনে জাগিল, দাও, দাও, দাও! অমনি সুদসমেত প্রতিদান করিতে হইল। ইহাকেই বলে আতিথেয়তা! তাহার পর এই পাঁচ দিন ক্রমাগত একই আদেশ বাণী শুনিতেছি। যাহা ছিল সবই দিয়াছি, আর কিছুমাত্র দিবার শক্তি নাই। এ কয়দিন রবি কখনও উদয়, কখন অস্ত গিয়াছে। হয়ত উদয়ই হয় নাই। কিছুই জানি না। বায়ু, উল্কাপাত, বজ্র-শিখা, বাত, কি হইয়াছে কিছুই অবগত নহি। দূরে বেদুইন-ভূমি দেখা যাইতেছে। এখন ভাবিতেছি, কবে সমুদ্র পার হইব।

এই চিঠি পাইয়া যদি পত্র লেখেন (অর্থাৎ ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত) তাহা হইলে "6 Place Etates Unis, Paris" ঠিকানায় লিখিবেন। তাহার পর—

C/o. Messrs Henry S. King & Co.,
65 Cornhill,
London, E. C.

মনে রাখিবেন। আর সর্ব্বদা নূতন লেখা পাঠাইবেন।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

(১৫)

London
C/o. Messrs. Henry S. King & Co.
65 Cornhill, London, E. C.
31st Aug., 1900.

সুহৃৎ—

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। সর্ব্বদা যেন পত্র পাই। আমি নানাবিধ stress and strainএর মধ্যে; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও দীর্ঘ পত্র লিখিতে সময় পাই না। আজ না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। পারিসে যা যা দেখিলাম, তাহাতে যেমন নূতন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তেমনই দেশের কথা মনে করিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছি। এই ভয়ানক জীবনসংগ্রাম নির্ম্মম বিরামহীন—এই সংগ্রামে যাহারা একটু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তাহারা একদিন নির্ম্মূল হইবে। এখানে কি ব্যগ্রতা! একটি নূতন আবিষ্কার হইল, আর অমনি তাহা কাজে লাগিল। যাহারা সর্ব্বপ্রথমে তাহার ব্যবহার শিখিল, তাহারা অন্য জাতিকে ব্যবসায়ে এবং manufactureএ পরাস্ত করিল। পৃথিবী ব্যাপিয়া এই সংগ্রাম অহোরাত্র চলিতেছে। নির্ম্মম প্রকৃতি! আমাদের ন্যায় উদ্যমহীন, অকর্ম্মণ্য জাতি আর কতকাল বাঁচিয়া থাকিবে? এসব মনে করিয়া মনের জ্বালা সম্বরণ করা অসম্ভব। কি করিয়া মন দমন করা যায় বলুন। সম্মুখে আশার আলো দেখিলে মনে উৎসাহ আসে, কিন্তু ব্যর্থ উদ্যম লইয়া কে জীবন বহিতে পারে?

এসব কথা এখন থাকুক। আমার কাজের কথা জানিবার জন্য উৎসুক আছেন; সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

প্রথমতঃ, আমি দেরীতে পৌছিয়াছি এবং আমি যে বিষয় বলিব মনে করিয়াছিলাম তাহা Royal Societyতে শেষ মুহূর্ত্তে পৌছিয়াছিল, সুতরাং তাহা publish এখনও হয় নাই। এজন্য সে-বিষয়ে বলিতে পারি কি না জানিতাম না। সে যাহা হউক, একদিন Congressএর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তারপর Congressএর Secretary (তিনি ইংরাজী জানেন) আমার নিকট আমার বিষয়টির পূর্ণ account চাহিলেন, তিনি ফরাসী ভাষায় তর্জমা করিবেন। এই উপলক্ষে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। একঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But, monsieur, this is very beautiful (but এর অর্থ আমি প্রথম বিশ্বাস করি

নাই।) তারপর আরও তিন দিন এ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited—শেষদিন আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Congress-এর অন্যান্য Secretary এবং Presidentএর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য্য-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, তাহার মধ্যে tres jolie magnifique ইত্যাদির বহু সমাবেশ ছিল। পরিশেষে আমাকে বলিলেন যে, আপনার বিষয়টি প্রত্যেক অক্ষরে নূতন; এই theory প্রচার করিতে অন্ততঃ দু'বৎসর লাগিবে। সব একেবারে প্রচার করিবেন না—এত surprise একেবারে লোকে মনে ধারণা করিতে পারিবে না—it is human nature. A বিন্দু পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তারপর হঠাৎ মন ভাঙ্গিয়া B বিন্দুতে নামিয়া যায়। তারপর আরও বলিলেন, যে, physicistরা physiology জানেন না; vice versa। তার পর আপনি যদি psychologyর সমাবেশ করেন, তাহা হইলে একেবারেই বুঝিতে পারিবে না। আর psychology, memory ইত্যাদি beyond physical science। এসব আনিলে লোকে আপনাকে dreamy মনে করিবে। এজন্য প্রথমে purely physical বিষয় প্রকাশ করা উচিত।

এখানে German, Russian, American ইত্যাদি অনেক বৈজ্ঞানিকের সহিত দেখা হয়। তাঁহারা সকলেই আমার পূর্ব্ব কার্য্য অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন।

Helmholtzএর পদে Berlinএ এখন যিনি অধ্যাপক আছেন (Prof. Warburg), তিনি আমাকে বলিলেন, তাঁহার Laboratoryতে আর একজন বৈজ্ঞানিক নূতন গবেষণা করিতে আসিয়াছিলেন।

"The subject of coherer is very obscure and very interesting. I wish to work on it." তাহাতে Warburg তাঁহাকে বলিলেন, "It is undoubtedly very interesting; but it is no longer obscure—there is a man called Bose who has left nothing more to be done."

আর একদিন Eiffel Towerএর উপরে উঠিতেছিলাম। আমি delegate বলিয়া বিনামূল্যে যাইবার অধিকারী। আমার সহধর্ম্মিণী delegate নহেন, সুতরাং তাঁহার জন্য ৫ ফ্রাঙ্ক দিতে হইল। ফরাসী ভাষায় আমার অধিকার ত জানেন। আমার অবস্থা দেখিয়া একজন ইংরাজী ভাষায় দক্ষ ফরাসী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, Can I be of any service? এবং নিজের কার্ড দিলেন। আমার কার্ড দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, Bose? Surely not Jagadish Bose? এদেশে আমি জগদীশ বসু বলিয়া পরিচিত, কারণ আরও জার্ম্মান্ বসু আছে। পরে যখন জানিলেন আমিই তিনি, তখন যে-ব্যক্তি আমার নিকট হইতে বসুজায়ার জন্য টিকিটের মূল্য লইয়াছিল, তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন—আমাদের অতিথি বিখ্যাত বিদেশী, তাহার নিকট টিকিটের মূল্য প্রার্থনা একান্ত দোকানদারী, ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে আরও লোকসমাগম। তাহাদের টিকিট বিক্রেতাকে যৎপরোনাস্তি অপমান, ইত্যাদি।

Dr. Wallerএর ভেকের চক্ষুতে বিদ্যুতের স্রোত-সম্বন্ধে paper এবং আমার উক্ত বিষয়-সম্বন্ধে কার্য্য এক সময়েই হয়। আশ্চর্য্য, তিনিও জীবনের 'অনুভূতির' রেখা পরিসর করিতে প্রয়াসী। তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে, বৃক্ষেও অনুভূতি আছে, বীজেও রোপণ করিবার কয় দিন পর হইতে অনুভূতি-শক্তি বিকাশ পায়। এই স্থানেই জীবন ও মরণের প্রভেদ-রেখা। এস্থলে বলা আবশ্যক, অন্যান্য physiologistরা এই সামান্য বিষয়টি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছেন না। Wallerকে বাতুলশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন। এইসব কারণে উক্ত Wallerএর স্বভাব অতিশয় কোপন হইয়াছে। কাহারও সঙ্গে তর্ক হইলেই হাতাহাতির কাছাকাছি। উক্ত Wallerএর একজন সহকর্ম্মীর সহিত আমার একজন ভক্তের অল্পদিন হইল ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছে।

Waller-ভক্ত একস্থানে বলিতেছিলেন, "দেখ 'অনুভূতির রেখা' কতদূর প্রসারিত—জীবন ও মরণের রেখা ৪র্থ দিন মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজে আবদ্ধ।" তখন বসু-ভক্ত বলিলেন, তাহা নহে—বীজের রেখায়, এমন কি মৃত্তিকায় পর্য্যন্ত, উক্ত রেখা প্রসারিত। তাহার পর যাহা হইল, তাহা মনে করিতে পারেন। বন্ধুরা বলিলেন, যে অন্ততঃ কয়েকমাস পর্য্যন্ত Waller কিংবা তাহার ভক্তের সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইবে। দৈবের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে, উভয়ের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। আমার নিবেদন জানাইলাম তাঁহাকে। তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াছেন।

এই গেল পারিসের পালা। তাহার পর লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্য্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন, যে, কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the living and non living। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদানুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic! this is magic! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এইসব সময়ে accepted হইবে; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory পূর্ব্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন-কোন physicists, কোন-কোন chemists এবং অধিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন-কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে। সুতরাং তাঁহারা বিশেষ প্রতিবাদ করিবেন। এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমন্যু বধ হইবে; আপনারা আমোদ দেখিবেন; "বাহবা জান্টিপি, বাহবা সক্রেটিস"; কিন্তু আপনাদের গরীব প্রতিনিধির প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনশ্চক্ষুতে দেখিবে, যে, তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপাততঃ রহিয়াছে।

আমি সময়াভাবে সকলকে লিখিতে পারিলাম না, আমার বন্ধুজনকে সংবাদ দিবেন। আমি আসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মহারাজ ত্রিপুরাধিপের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম—পত্র লিখিলে তাঁহাকে আমার সংবাদ দিবেন। বন্ধুজায়াকে আমার বিশেষ সম্ভাষণ জানাইবেন।

আপনার

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

(১৬)

British Association
Reception Room
Bradford.
10. 9. 00

সুহৃৎ,

গত পত্রে আপনাদের প্রতিনিধিকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। শুনিয়া সুখী হইবেন, সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করিয়া আপনাদের আশা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

ভয়ের বিশেষ কারণ ছিল। আমার পূর্ব্ব Research সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক পত্রে অতিপ্রশংসাবাদ ছিল (Save me from my friends)! এবং সেই সঙ্গে Prof. Lodgeএর theory সম্বন্ধে অপ্রশংসা ছিল। বুঝিতেই পারেন। ইহাতে Prof. Lodge অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন এবং আমার theoryর প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহার বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন, অন্যদিকে আমার পরিচিত কেহ ছিল না। আমার theory বুঝাইতে হইলে অন্যূন তিন ঘণ্টা আবশ্যক। অতিকষ্টে এক ঘণ্টায় যতটুকু হয় তাহা ভাবিয়া গিয়াছিলাম। সেদিন ৮টি প্রবন্ধ ছিল, গড়ে ১৫ মিনিট করিয়া বলিতে দেওয়া হইবে, হঠাৎ এই সংবাদ শুনিলাম। ১৫ মিনিটে কি বলিব?

আমার প্রবন্ধের মুখবন্ধেই দুই theory লইয়া বাদানুবাদ, আর আমার সম্মুখেই Lodge! কি করিব?

From the results of previous experiments Prof. Lodge was *led* to suppose, etc.—But these new investigations *seem* to point to the theory of molecular strain. Strain theoryর ফল এই; দেখুন ইহাতে সব মিলিয়া যায় কি না। ১৫ মিনিটের অধিক সময় নাই, কেবল কয়জন expertকে

উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলাম। সকলেই Lodgeএর মুখের দিকে তাকাইতেছিল, আমিও এক-এক বার দেখিতেছিলাম। জন বুলের মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। তবে যখন শেষ হইল, বহু প্রশংসাধ্বনি শুনিলাম। President বলিলেন, কলিকাতার চন্দ্র বসু আমাদের সকলেরই সুপরিচিত, ইত্যাদি। তার পর বলিলেন, যদি কাহারও কিছু প্রতিবাদ করিবার থাকে, তবে এই সময়।

না, প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। তার পর Lodge উঠিয়াও প্রশংসা করিলেন এবং বসুজায়ার নিকট যাইয়া বলিলেন,

"Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work."

আমি মনে করিলাম, এই শেষ। আমার পূর্ব্ব স্থানে বসিয়া আছি, Lodge আসিয়া আমাকে দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বুঝিতে পারিলাম, আস্তে আস্তে মন ভিজিতেছে। John Bullএর Love of Fair Play অতি আশ্চর্য্য। তারপর হঠাৎ দেখিলাম, যে, Lodge Presidentকে কি বলিতেছেন। তখন President বলিলেন, যে, অধ্যাপক বসুর অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টি-সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের বিষয়ে অনেকে শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, পুনর্ব্বার তিনি যদি কিছু বলেন, তবে সুখী হইব। তারপর যখন বলি, তাহাতে সকলেই অতি বিস্মিত হইয়াছেন। বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার stereoscopeএ M E R O ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "You have a very fine research in hand, go on with it"। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others—all very important"। আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।

তার পরের দিন Prof. Barret আমাকে বলিলেন, "We had a talk last night (Lodge was one of us). We thought your time is being wasted in India, and you are hampered there. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldom vacant here, and there are many candidates. But there is just now a very good appointment (কোন সুপ্রসিদ্ধ Universityর নূতন Professorship) and should you care to accept it, no one else will get it."

এখন বলুন কি করি? এক দিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি—যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspirationএর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?

এবার এইখানে শেষ করি। সর্ব্বদা পত্র লিখিবেন। বন্ধুদিগকে আমার কথা জানাইবেন।

যাঁরা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে, আমি ভুলি নাই। বন্ধুজায়াকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবেন।

আপনার
শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

(১৭)

লণ্ডন ৫ই অক্টোবর, ১৯০০।
C/o. Messrs. Henry S. King & Co.
65, Cornhill, E. C.

সুহৃৎ,

অনেক কাল আপনার পত্র পাই নাই। চিঠি না পাইলে কি লিখিতে নাই?

আমি কি রকম ব্যস্ত আছি, বুঝিতে পারেন। আমার অনেক নূতন বিষয় সংগ্রহ হইয়াছে। কি করিয়া লিখিয়া উঠিব, স্থির করিতে পারি না। আমি যা বলিয়াছি, তাহাতেই সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কিন্তু আরও

যাহা বলিবার আছে, তাহা আরও বিস্ময়জনক। একটা সু-খবর এই যে, আমি প্রথম প্রথম ভয় করিয়াছিলাম যে, কেহ বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার কার্য্যের উপর লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কিন্তু তা বলিয়া অতি সাবধানে একটু-একটু করিয়া অনেক নূতন experiment দিয়া আমার পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। আমি যখন Parisএ প্রথম বলি, তখন কাহারও মনে একটু-একটু সন্দেহ হইয়াছিল। তারপর Secretary যখন ৪ দিন সমস্ত শুনিলেন, তখন বলিলেন যে, সব সত্য, কিন্তু লোকের বুঝিতে সময় লাগিবে; একেবারে বলিতে গেলে অবিশ্বাস হইবে; আপনি জানেন এদেশে Crankএর সংখ্যা অতি বেশী; একটা বিষয় দিনরাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া লোকের মাথা গরম হইয়া যায়, শেষে একই ধ্যান, একই জ্ঞান। এরূপ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, সুতরাং লোকের যে সন্দেহ হইতে পারে, তাহার জন্য সাবধান হইতে হইবে। আর এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা নানা বিভাগে বিভক্ত। Chemist and Physicistএর মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম, Physiologistsরাও সেইরূপ। সেদিন আমাদের Physical Sectionএ Chemistদিগকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। আমাদের President তাঁহাদিগের মন আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ স্তুতিগান করিলেন। তাহার উত্তরে Chemistপ্রবর উঠিয়া বলিলেন, "আমাদের ঝগড়া করিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু আপনাদের J. J. Thompson সেদিন বলিয়াছেন যে, atom অবিভাজ্য নহে, তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র অণু আছে। যাহারা আমাদের atomএর উপর হাত তোলে, তাহাদিগের সহিত আমাদের চির সংগ্রাম, There will be trouble if you lay your hands on our indivisible and inviolate atom."

তারপর একজন Physiologistএর সহিত দেখা হয়। তিনি আমার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, "আশা করি আপনি অন্যান্য Physicistএর ন্যায় আমাদের সুবৃহৎ Physiologyকে Physicsএর শাখা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন না। একটা formula দিয়া সব explain করা, একি চালাকি? দেখুন, আমি আজ দশ বৎসর যাবৎ নানা curve সংগ্রহ করিতেছি। কখন উর্দ্ধে উঠিতেছে, কখন নিম্নে গমন করিতেছে, কি আশ্চর্য্য! কেন উঠে কেন নামে, কেহ জানে না এবং কেহ জানিবেও না। আসল কথা, উর্দ্ধে উঠে এবং নিম্নে নামে!"

সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, আমাকে কিরূপ সন্তর্পণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে।

আমার দু-একজন Physicist বন্ধু বলেন, যে, Psychology Science নহে, সুতরাং ও বিষয়টা বাদ দিবেন। অর্থাৎ মনে হয়ত সন্দেহ হইয়াছে যে, এ লোকটা Oriental, যদি ওদিকে একবার ঝোঁক যায়, তাহা হইলে Physics ছাড়িয়া ওদিকে চলিয়া যাইবে। Lodge লিখিয়াছেন, Many congratulations on your very important and suggestive experiments, but go slowly, establish point by point and restrain inspiration.' Lord Rayleigh লিখিয়াছেন, "বড় তাড়াতাড়ি হইতেছে, ধীরে ধীরে!" Lodge এবং Rayleighএর নিকট এখনও সব কথা খুলিয়া বলিতে সময় হয় নাই। একজনকে বলিয়াছি, তিনি বলিলেন, "How can you sleep over all this? Are you so certain of life? Write night and day and publish them at once!"

জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না? তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইত। জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না, যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিওরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অদ্ধপরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি, যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে।

যে দিকে দেখি, সে দিকেই অনন্ত আলোক-রেখা। জন্ম-জন্মান্তরেও আমি ইহার শেষ করিতে পারিব না। আমি কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা ধরিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে। মনে করিয়াছিলাম যে, Royal Institutionএ কত দিন experiment করিব এবং সেজন্য কতকগুলি নূতন কল প্রস্তুত করিতেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাহাতে বাধা পড়িয়াছে। এখানে আসিয়া Dr. Crombieর সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, যে, আভ্যন্তরিক কি গোলমাল হইয়াছে, শীঘ্র চিকিৎসা না করিলে আশঙ্কার কারণ। কঠিন operation আবশ্যক, তাহাতে বিশেষ ভয় নাই, তবে প্রায় ৫ সপ্তাহ শয্যাগত থাকিতে হইবে। সুতরাং আমার কার্য্যে বড় বাধা পড়িল। এখন experiment করার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। যদি আমার যে-সব কার্য্য হইয়া গিয়াছে তাহা লিখিয়া যাইতে পারিতাম, তবে কিছুই ভাবিতাম না। আমি লিখিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বেশী লিখিতে পারি না। আর ৪টি নূতন বিষয়ে লেখা আবশ্যক, তাহার জন্য দেরী হইতেছে। দেরী করাও ভাল নয়।

উপরোক্ত বিষয়টি কেবল দু-এক বন্ধুকে জানাইবেন। বৃথা চিন্তা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই।

সর্ব্বদা পত্র লিখিবেন।

আপনার
জগদীশ—

(১৮)

লণ্ডন
১২।১০।১৯০০

সুহৃৎ

আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম।

আমার theory আস্তে আস্তে প্রচলিত হইতেছে। অনেকে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম প্রথম সকলে অবাক্ হইয়াছিলেন, এখন বুঝিতে পারিতেছেন। একখানা বৈজ্ঞানিক পত্রে লেখা হইয়াছে, যে,

........by far the most striking contribution to electric science for the year was the paper by Prof. J. C. Bose. This remarkable paper goes to the heart of physical things in a way that makes the reader gasp *and hold on to something lest he should fall into the infinite.* When it is stated that Dr. Bose actually treats of his successful experiments with an artificial retina, which responds to invisible as well as visible lights, it is unnecessary to say more for the astounding character of his researches. One of our electrical contemporaries goes so far as to remark of Dr. Bose's results, that they seem to bring us to the brink of a stupendous generalisation in the physical sciences; and the observation is no exaggeration."

"Falling into the Infinite" is good!

তারপর কাগজে coherence theory ভুল, আর আমার theory ঠিক্, এ-বিষয় লইয়া লেখালেখি চলিতেছে। মহাশয় লজ সাহেব এরূপ ধৃষ্টতা আর যে বেশী দিন সহ্য করিবেন, তাহা মনে হয় না। আমি নির্দ্দোষী—আমি কেবল বলিয়াছিলাম, "হুজুর যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্; আর আসামী-পক্ষ হইতেও কিছু বলিবার আছে।" একটা cutting পাঠাই। কলিকাতায় যে বৈদ্যুতিক আলো-বিভ্রাট মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, তাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। আমার theoryতে তাহার মর্ম্ম বোঝা যায়। তাহাই লইয়া correspondence.

যেরূপ গোলমেলে বিষয় লইয়া আছি, তাহার সব সূত্র মূল সূত্রে মিলিয়াছে। তবে একটি-একটি করিয়া বাহির করা কি বিপদ বুঝিতে পারেন। সমস্তক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া একটি বিষয়ের কূলকিনারা করি, সেই বিষয় তখন তখন শেষ না করিলে পুনরায় গোলমাল লাগিয়া যায়। অনেক দিন সাধনা করিলে একদিক জ্যোতির্ম্ময় হয়, কিন্তু কোন distraction আসিলে আর কিছু দেখিতে পারি না। এখন কয়েকদিন কাজ করিলে অনেক বিষয় লেখা হইবে। আবার এদিকে ডাক্তার কি লিখিয়াছেন, দেখিবেন *। সেই রুগ্নশয্যা হইতে

[* ইহা বসু মহাশয়ের চিকিৎসার জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ-সম্বন্ধে। অনাবশ্যক বোধে ছাপিলাম না। প্রবাসীর সম্পাদক।]

'লে আমার এই সমস্ত vision ফিরিয়া আসিবে কিনা জানি না। কি করিব এখনও স্থির নাই।

আপনার

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

সর্ব্বদা চিঠি লিখিবেন।

(১৯)

লণ্ডন
২রা নভেম্বর ১৯০০

বন্ধু,

তোমার দুখানা পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আজ প্রায় দুমাস যাবত অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব, কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে?

ভাবিয়া দেখ। যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে?

আরও মনে করিয়া দেখ, তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তার পর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম। আমার নিজের আশা ও দুরাশা অনেক কাল পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্নেহের প্রতিদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি অনেক সময়ে একেবারে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি; কিন্তু তোমাদের জন্য আমি বিশ্রাম করিতে পারি না। তোমরা আমাকে এরূপ বাঁধিয়াছ। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে-সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।

সাধারণতঃ লোকের যে-সব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল-ডোর ছেদন করিতে পারি না।

আমি অনেক সময়ে না ভাবিয়া লিখি। অনেক সময় বিনা চেষ্টায় মনে অনেক ভাব আসে। শেষে আশ্চর্য্য হই। সে-সব আমার অতীত; কে আমাকে এ-সব কথা শুনাইতেছেন?

আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।

গতকল্য Sir William Crookesএর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছি; তিনি লিখিয়াছেন, 'I have read the most interesting account of your researches with extreme interest. I wonder whether I could induce you to deliver a lecture on these or kindred subjects of research before the Royal Institution. If you could do so, I shall be very glad to put your name down for a Friday Evening Discourse after Easter of 1901. I have a vivid recollection of the great pleasure you gave us all on the occassion when you lectured a few years ago."

Royal Institutionএ Friday **Ev**ening Discourse দিতে পারিলে আমি অতিশয় গৌরবান্বিত হইতাম। বিশেষতঃ সেস্থানে experiment দেখাইতে পারিলে আমার সমস্ত theory বুঝাইতে পারিতাম। অনেকে এইরূপ নূতন theory দেখিয়া এখন সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহ বলিলেন, "Why, if this goes on, we shall have to write entirely new text-books of Physics!" সুতরাং এখন experiment দিয়া বুঝাইলে নূতন মত প্রচারের সুবিধা হইবে। নতুবা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে Easterএর পূর্ব্বেই আমার ছুটী ফুরাইয়া আসিবে। ছুটী চাহিতে ইচ্ছা করে না, আর চাহিলেও পাইব কিনা সন্দেহ। এদিকে সেই Dr. Waller, the great physiologistএর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি এখানকার প্রধান Physiological

Societyতে বক্তৃতা করিতে আহুত হইয়াছি। Dr. Waller প্রথম প্রথম অতিশয় বিরোধী ছিলেন। পরিশেষে কতক কতক বুঝিতে পারিয়া অতিশয় excitedly বলেন, "It appears that your work will probably upset mine. Truth is truth and I don't care a d—, if I am proved to be in the wrong. So come and work; I will place my laboratory at your disposal. Teach me or let us work together."

আমার সম্মুখে কত কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে বলিতে পারি না। এপর্য্যন্ত কিছু করিতে পারি নাই। কল প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগিতেছে। এতদিনে অনেকের সহিত আলাপ হওয়াতে কার্য্য আরম্ভ করিবার সুবিধা হইতেছে। এখন দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা শেষ করিতে পারিতাম। Physiological Laboratory ইত্যাদি দেশে পাইব না। আমি কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সময়ে বাধা পড়িলে পুনরায় কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে। আর এই সময়ে লোকের interest হইয়াছে, এখন করিতে পারিলেই ভাল হইত। আমি মনে করিতেছি যে, দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দুবৎসর ছুটী লইয়া এদেশে থাকিব। তারপর প্রতি তিন বৎসর পর এক বৎসর ছুটী লইয়া এদেশে থাকিব। যদি অপরের মুখাপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে এইরূপে অনেকটা কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিব।

আমার যে অসুখ হইয়াছিল, তাহা এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে। কিন্তু দেশে যাইবার পূর্ব্বে operation করা আবশ্যক হইবে। আমি আমার কতকগুলি paper শেষ করিয়া ডাক্তারের হস্তে জীবন অর্পণ করিব।

এখন তোমার বিষয়ে দু-একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ, তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, **আমি** তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs. Knightকে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। তার পর লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।

তোমার নূতন লেখা অনেক দিন যাবৎ পাঠাও নাই, পাঠাইও। আমি মনে করি, তোমার কবিতা চিরকালের জন্য। তোমার লেখা আমাকে যেরূপ জ্বলন্ত করে, সেরূপ যেন অসংখ্য লোককে করিতে পারে।

তোমার

জগদীশ

বন্ধুজায়া এবং তোমার পুত্রকন্যাকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

(২০)

২৩এ নবেম্বর ১৯০০

সুহৃৎ,

আমার সঙ্গে বিশেষ সংবাদদাতা পাঠাইলে পারিতে; অনেক কথা, লিখিবার সময় নাই। এখানকার আর-এক Wireless Telegraphyর লোকেরা আমার প্রথামত কল প্রস্তুত করিয়া আশাতীত ফল পাইয়া আমাকে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তা ছাড়া Royal Institution হইতে Friday Evening Discourse দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ আসিয়াছে। Sir William Crookes বিশেষ প্রশংসাবাদ করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে Londonএর full season সময়ে অর্থাৎ এপ্রিলের শেষে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিয়াছেন—তখন আমার ছুটী ফুরাইয়া যাইবে। সকলে বলিতেছেন, যে, আমার কার্য্য শেষ না করিয়া যেন না যাই। ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছি; জানি না

পাইব কি না। আমার চিকিৎসার জন্য ১৫ দিন পর যাইব।

তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না। publisherরা ফাঁকি দিতে চায়। সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল Glory, লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অর্দ্ধেক তরজমাকারীর, আর অর্দ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি? আমি অনেক castles in the air প্রস্তুত করিতেছি।

এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knightকে দেই নাই। অন্যরূপে চেষ্টা করিব।

তোমার
জগদীশ

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

জন্মদিনে

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধুগণ, আমি নানা দেশে নানা উপলক্ষ্যে সমাদর লাভ করেছি—কিন্তু আপনাদের কাছে সত্য ক'রেই বল্‌তে পারি, আমি এখনও এই সমাদরে অভ্যস্ত হ'য়ে যাই নি, প্রত্যেকবার এতে আমি সঙ্কোচ অনুভব ক'রে থাকি। আজ আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে, যাঁদের আমার প্রতি প্রীতি অকৃত্রিম, তাঁদের মধ্যেই আছি এবং তাঁদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদনে আমার গভীর তৃপ্তিও আছে। তৎসত্ত্বেও আমার দীনতা এই উপলক্ষ্যে অনুভব না ক'রে থাক্‌তে পারি না।

মানুষের ভিতরে সৃষ্টি করার একটা ইচ্ছা আছে, সে উপলক্ষ্য খোঁজে সৃষ্টি কর্‌বার জন্য। ভালবাসা হচ্ছে সৃষ্টির মূলশক্তি। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মানুষ যাকে ভালোবাসে তার উপরে আপনার রচনা-শক্তিকে খাটাতে চায়, তাকে নানা ভূষণে সাজায়, নানা গুণের তাতে আরোপ করে, তার সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার মানসীমূর্ত্তিকে সুন্দর ক'রে, সম্পূর্ণ ক'রে নিজের আনন্দকে প্রকাশ করে।—এ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবার শক্তি কারও নেই। বিশেষভাবে কাউকে যখন শ্রদ্ধা করি, তখন আপন কল্পনা দিয়ে তাকে আপনার অন্তরের সামগ্রী ক'রে নিতে চাই। মায়ের মন সন্তানকে সহজেই সুন্দর ক'রেই জানে, মা তবু তাকে নানা ভূষণে সাজাতে ছাড়ে না। মায়ের আনন্দ শিশুর মধ্যে বিশেষ প্রকাশ খোঁজে। এ হ'ল মানুষের স্বভাব। এইজন্য মানুষ সৃষ্টি করার যে উপলক্ষ্য ইচ্ছা করে, তাকে স্বীকার করা উচিত শ্রদ্ধারই সঙ্গে।

মানুষের মনে উৎকর্ষের যে আদর্শ আছে তার প্রতি তার প্রীতি। তাকে মানুষ মূর্ত্তিমান ক'রে দেখতে ইচ্ছা করে। মানুষের সেই ইচ্ছাকে পাত্ররূপে বহন কর্‌বার শক্তি যদি আমার থাকে, তবে আমার মত সৌভাগ্য কার? এত বড় ভার বহন কর্‌বার শক্তি আমার আছে কি না কালেতে তার প্রমাণ হবে। অনেক দেবমূর্ত্তি মানু গড়ে, যা ক্ষণকালের জন্য, তার পরেই তার বিসর্জ্জন আমার ক্ষেত্রেও যদি তাই হয়, তাতেই বা দোষ কি ভক্তি যেখানে পৌঁছচ্চে, আমি তার নীচে। মাটি সম্মুখে মানুষ প্রণাম করে, কিন্তু ভক্তি মাটিকে ন

দেবতাকে। মাটি যেমন ক'রে ভক্তের ভক্তিকে গ্রহণ করে, আমিও তেমনি ক'রেই আপনাদের শ্রদ্ধা-নৈবেদ্য গ্রহণ করব। তাই সঙ্কোচ পরিহার ক'রে এখানে এসেছি।

আনন্দের শঙ্খধ্বনি মানুষের জন্মকালে বেজে ওঠে। প্রত্যেক জন্মের মধ্যে আনন্দময় একটি মহৎ প্রত্যাশা আছে। মানুষের চিরকালের যে আকাঙ্ক্ষা তাই পূর্ণ হবে, যুগযুগান্তের এই প্রত্যাশা বারে বারে নবজাত শিশু বহন ক'রে আনে; আমাদের ভিতর যা কিছু অসম্পূর্ণ তাই সম্পূর্ণ হবে, এই সম্ভাব্যতা তার মধ্যে আছে। কিন্তু আজ আমার জন্মদিন তেমন নূতন জন্মদিন নয়, নূতন প্রত্যাশা জাগাবার সম্ভাবনা তার আর নেই। আমার কর্ম্ম প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। যদি কোনও আনন্দ দিয়ে থাকি, কোনও সান্ত্বনা এনে থাকি, তবে সে দেওয়া হ'য়ে গেছে, সাম্‌নে আর কিছু নেই।

কিন্তু তবু মন ত বলে না, সকল প্রত্যাশার প্রান্তে এসেচি। এখন কি কেবলই পুরাতন, অভ্যাসের দ্বারা বাঁধা, সংস্কারের দ্বারা কঠিন, নিত্য ব্যবহারের দ্বারা অসাড়? এখনো জীবনে অভাবনীয় কি কিছু নেই? তা তো বল্‌তে পারিনে। অজানার ডাকে এখনো প্রাণ সাড়া দেয়, নূতনের ভাষা এখনো বুঝ্‌তে পারি।

বিশ্বমানুষ বারে বারে যেমন শিশু হ'য়ে জন্মায়, তেম্‌নি প্রত্যেক মানুষ বারে বারে শিশু হ'য়ে না জন্মালে বিশ্বের দেওয়া নেওয়া তার কাছে শুষ্ক হ'য়ে যায়। বারম্বার সীমা-ভাঙার দ্বারা, আপনার মধ্যে যে অসীম আছে তাকে পাই। প্রাচীন বয়সের দুর্গের পাষাণ ভিত্তির মাঝখানে আজ যে বাসা বেঁধেছে, সে আমি কেউ নয়।—আমি কবি, একটি পরম সম্পদ বহন ক'রে এনেছিলুম। কি আনন্দ ছিল, আমার সঙ্গে আমার চারিদিকের যোগে। আমার সেই ঘরের সাম্‌নে নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী, শরতের আলোতে তার পল্লবের ঝালর ঝলোমলো; শিশিরসিক্ত তৃণাগ্রগুলির 'পরে প্রভাতসূর্য্যের কিরণ বীণা-তন্ত্রীতে সুরবালকের আঙুলের স্পন্দনের মতো। এই শ্যামলা ধরণী, এই নদী, প্রান্তর, অরণ্যের মধ্যে আমার বিধাতা আমাকে অন্তরঙ্গতার অধিকার দিয়েছেন, এর মধ্যে নগ্ন শিশু হ'য়ে এসেছিলুম! আজও যখন দৈবীবীণা অনাহত সুরে আকাশে বাজে, তখন সেদিনকার সেই শিশু জেগে ওঠে, শিশু জেগে উঠে বল্‌তে চায় কিছু, সব কথা ব'লে উঠতে পারে না। আজ আমার জন্মদিন সেই কবির জন্মদিন, প্রবীণের না। আমি কিছু কর্ম্ম করেছি, সেবা করেছি, কিছু ত্যাগ করেছি—কিন্তু সে বড় কিছু নয়। সকলের চেয়ে যে বড় দান, সে আপনিই আপনাকে দেয়; পুষ্পের গন্ধ প্রকাশ পেলে বাতাস ভ'রে ওঠে; সে গন্ধ ফুলের অন্তর থেকে আপনি প্রবাহিত। ভাণ্ডার থেকে তাকে চাবি খুলে আন্‌তে হয় না। সে তার সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। সেই রকমের সত্যদান যদি আমার কিছু থাকে, আনন্দলোকে যার সহজ অনুভূতি, যার মধ্যে ক্লান্তি নেই, ছুটীর দাবী নেই, বেতন প্রার্থনা নেই, সমস্ত বিশ্বের সেই জি'নস পাথরের মূলে উৎসের মতো আমার মধ্য দিয়ে যদি উৎসারিত হ'য়ে থাকে, তবে তাই রইল। তা ছাড়া বাইরের গড়া জিনিসের, ইঁট-কাঠের ইমারতের, নিয়মে বাঁধা প্রতিষ্ঠানের কালের হাতে নিস্তার নেই।—ফুল প্রতি বসন্তে ফিরে ফিরে আসে, তার মধ্যে ক্ষতি নেই—সে বিশ্বের সহজ সামগ্রী। আমার কাজের মধ্যেও সত্যের যদি সুন্দররূপ কিছু আপনি দেখা দিয়ে থাকে, তবে ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্ধানের মধ্য দিয়েও সে থাকবে। অনেক কিছু আছে যা জীর্ণ হ'য়ে যাবে, বাকি কিছু রইল ভাবী কাল যা তুলে নেবে। তা হোক; কি থাক্‌বে কি না থাক্‌বে, তা ভাববারও দরকার নেই। দরকার আপনাকে পাওয়া, বারে বারে নতুন ক'রে পাওয়া। আজ সেই অপর্য্যাপ্ত নতুনকে অনুভব করচি। যাঁর হুকুম নিয়ে এসেছি, একদিন তিনি যে বাণী আমার প্রাণে সঞ্চার ক'রে দিয়েছেন, দেখ্‌ছি আজো তা শেষ হয় নি, অথচ দিন শেষ হ'য়ে এল। ভিতরকার যে প্রকাশ অসমাপ্ত র'য়ে গেল, রাত্রির অন্ধকারেই কি তার একান্ত অবসান? হয়ত প্রত্যূষ এসেছে বা, আর এক জন্মের জন্য পাথেয় আজ হয় ত এসে পৌছল। এই কথা চিন্তা ক'রে আপনাদের সকলকে আমার নমস্কার জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।

১৩৩৩ সালের ২৫ বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক অনুলিখিত এবং কবির দ্বারা সংশোধিত।

ধর্ম্ম ও জড়তা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ প্রভাত কার ঘরে তিমির-দ্বার খুলে গিয়েছে? যে চোখ খুলে আছে। সব চেয়ে দুঃখ তার, যে আলোকের মধ্যে থেকেও চোখ বুজে আছে; যার চারিদিকে আঁধার নেই; যে আপন আঁধার আপনি সৃষ্টি ক'রে ব'সে আছে।

আজ পশ্চিমদেশ য়ুরোপ নানাজ্ঞান নানাবিধ কর্ম্মশক্তিতে নব-নব বলে চোখ খুলে এগিয়ে চলেছে, তার নিত্য নব-জাগরণ চলেছে। ভারত যে তার চোখ খুলতেই চাচ্ছে না। আপন চোখ বুজে মিথ্যা অন্ধকার সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে ব'সে ভাবচে, সে এমনি ক'রে তার আধ্যাত্মিক স্বর্গ পাবে।

য়ুরোপের পন্থা হ'ল জ্ঞানবিজ্ঞান; সেই পথটি সত্য ও বিশুদ্ধ রাখবার জন্য কত যত্নে, কত ধীরে, কত সাবধানে যুক্তি ও বিচার পরখ ক'রে ক'রে সে তার তত্ত্ব নির্ণয় করচে।

আমরা নাকি ধর্ম্মপ্রাণ জাতি! তার পরিচয় হ'ল কেমন ধারা? আজ ভারত তার ধর্ম্মের পন্থাকে পবিত্র রাখতে পারেনি ব'লে তার সব চেয়ে কঠিন সমস্যা তার ধর্ম্মে। যা-কিছু ঘাড়ের উপর এসে পড়চে তাই নির্ব্বিচারে ধর্ম্মের নামে মেনে নেওয়ার নাম উদারতা নয়, তা হ'ল ভয়ঙ্কর অন্ধতা, জড়তা। এই জড়তাকে যখন কোনো জাতি উদারতা মনে ক'রে পূজা করে তখন তার মরণ আসন্ন। ধর্ম্মের যথার্থ সত্য স্বরূপটিও অতি সাবধানে বৈজ্ঞানিকের সত্যের মত নানাদিক্ থেকে যাচিয়ে পরখ ক'রে নিতে হয়। ধর্ম্ম যদি কোনো জাতির প্রাণ হয়, তবে সেই জাতির এই বিষয়ে যেন সাবধানতার ও শুচিতার শেষ না থাকে, কারণ একটু অন্ধ হ'লেই তার মৃত্যু এই দিক্ থেকেই আসবে। যদি এ বিষয়ে একটুও জড়তা থাকে, তবে যত মিথ্যা সংস্কার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-বুদ্ধি, নিরর্থক-আচার, অন্ধ-আবর্জ্জনা এসে ধর্ম্মের সিংহাসনকে অধিকার ক'রে ধর্ম্মকে চেপে মেরে ফেলে।

ভারতের আজ এই দশা। সে আজ ভাল-মন্দ, মহৎ-ক্ষুদ্র সবই এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে মেনে নিচ্চে। ভারতের সমস্যা এইখানে; এই দিক্ থেকেই তার মৃত্যুর আয়োজন চলেছে। তাইতে আজ দেখচি ধর্ম্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে। বিধাতার নাম নিয়ে একে অন্যকে নির্ম্মম আঘাতে হিংস্র পশুর মতো মারচে। এই কি হ'ল ধর্ম্মের চেহারা! এই আধ্যাত্মিকতা দিয়েই ভারত সব বিজ্ঞানবাদের উপর মাথা তুলে অমৃততত্ত্ব লাভ করবে?

একে অন্যকে মারচে, এই কথাটিই সব চেয়ে দুঃখের কথা নয়—যদি এই মারাটা জীবনের প্রাচুর্য্য, জীবনের চঞ্চলতা থেকে হ'ত। যেখানে জীবনের প্রাচুর্য্য-শক্তির অজস্র লীলা, সেখানে চঞ্চলতা দৌড়ধাপ মারামারি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমে সব ঠিক্ হ'য়ে আসে। শিশুর জীবন-লীলার প্রাচুর্য্যে সে ওঠে পড়ে ভাঙে, আঘাত পায় ও আঘাত দেয়; তাতেই ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আসে। কিন্তু এতো তা নয়, এ যে নির্জ্জীবের হঠাৎ প্রচণ্ড হ'য়ে নির্ম্মম হ'য়ে ওঠা। অচল পাথর যেমন হঠাৎ স্খলিত হ'য়ে সর্ব্বনাশ করে। সেই বুদ্ধিহীন জড়ধর্ম্মী নৃশংসতাকে দৈব-পূজার উপলক্ষ্যে ধর্ম্মের নামে পরিচিত ক'রে আপনাকে ও বিশ্বশুদ্ধ সকলকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। এর কি কোনো কৈফিয়ৎ থাকতে পারে?

এই মোহমুগ্ধ ধর্ম্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভাল। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্ম্মের নামাবলী পরালে যে কি বীভৎস হ'য়ে ওঠে, তা' চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ দেখা যায়। এর চেয়ে ভীষণ, এর চেয়ে কলুষিত আর কি হ'তে পারে?

সত্যের সঙ্গে মিথ্যা এসে জুটেছে। খাঁটির সঙ্গে কলঙ্ক মিশে গেছে। য়ুরোপ তার জ্ঞান-সাধনার পথে কোনো কলঙ্ককেই, কোনো মিথ্যাকেই সহ্য করতে পারে না, তাকে পরখের আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। তাই তারা বেঁচে আছে।

বিজ্ঞানের আহ্বান তাদের কাছে সত্য আহ্বান, তাই তাদের সাধনাও কঠিন সাধনা। পরখের পর পরখ চলেছে, বারবার হার্‌তে হচ্চে—তবু হার মান্‌চে না। পরাস্ত হ'লেও সাধনা ছাড়্‌চে না; চেষ্টার পর চেষ্টার সাধনার বলে বিজ্ঞানের রাজ্যে খাঁটি সত্যকে বাজিয়ে নিচ্চে। সত্যের সাক্ষাৎ লাভ ক'রে সাধনাকে ধন্য কর্‌বে। আর আমাদের ধর্ম্ম নাকি প্রাণ! সেই ধর্ম্মের সাধনায় আমাদের কতটুকু নিষ্ঠা! জড়তার আর অন্ত নেই। যত ধূলো, যত আবর্জ্জনা, সবই আমরা মাথা পেতে নিয়ে পূজা কর্‌তে ব'সে গিয়েছি। এই কি বাঁচবার সাধনা? এতে যদি কোনো জাতি বাঁচে, তবে জাতি মরে কিসে তাতো বল্‌তে পারিনে।

খাঁটির সঙ্গে নকল যদি মেশে, তবে আগুনে পুড়িয়ে সব কলঙ্ক দূর কর্‌তে হয়। আজ তার এই মিছে ধর্ম্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি একবার সত্যিই নাস্তিক হয়, তার পর সাধনা ক'রে যদি খাঁটি ধর্ম্ম, খাঁটি আস্তিকতা পায়; তবে ভারত সত্যিই নবজীবন লাভ কর্‌বে। নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্ম্মবিকারকে দগ্ধ করা ছাড়া, একেবারে নূতন ক'রে আরম্ভ করা ছাড়া আর কি পথ আছে, বুঝ্‌তে তো পাচ্ছিনে। সব আবর্জ্জনা, সব মিথ্যা, সব জঞ্জালকে পুড়িয়ে ফেলে সত্য জীবন ভালো ক'রে পেলেই মঙ্গল। ভয় নেই, সত্য দগ্ধ হবে না, খাদই পুড়ে যাবে। সব মিথ্যা আবর্জ্জনার রাশি দগ্ধ হ'য়ে গেলে, প্রাণের বিকাশের পথ খুলে যাবে।

আসলে, মোহই হচ্চে সকল রিপুর কেন্দ্রস্থল ও তা অজ্ঞানের আবেশ, তা জড়তা, তা আলস্য, তা অবসাদ, তা কুৎসিতকে অপসারিত কর্‌তে জানে না, তা মৃত্যুকে রাশীকৃত ক'রে তোলে, কলুষ-সঞ্চয়ের প্রতি তার অন্ধ আসক্তি। এই মোহের ভারে যতদিন মাথা নত হ'য়ে থাক্‌বে, ততদিন সত্যের সাক্ষাৎ মিল্‌বে না—আর সত্যের অভাবে বীর্য্য হবে গোঁয়ার্ত্তামি, ধর্ম্ম হবে সাম্প্রদায়িক দাম্ভিকতা।

রুদ্র এসে মোহের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিন। কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ও দুঃখের মধ্যে মোহের ক্ষয় হ'তে থাকুক। আজ দয়াময়কে নয়, আজ রুদ্রকে চাই—তাঁর প্রলয় আগুনে সব দগ্ধ হ'য়ে বিশুদ্ধ হ'য়ে যাক্‌। তাঁর কাছেই প্রার্থনা আমাদের 'অসতোমা সদ্গময়।

৮ই বৈশাখ, ১৩৩৩, শান্তিনিকেতন মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও কবির দ্বারা সংশোধিত।

ভক্তি-পরীক্ষা

অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল

ভক্তের সহিত ভগবান কথা বলেন একথা কেবল ভারতের ভক্তেরাই বলেন তাহা নহে। এককালে ইহুদিদিগের মধ্যেও ভক্তের অভাব ছিল না। তবে ইহুদার ভক্তগুলি সকলে একবংশজাত। সেই একই বংশে যিশু ও মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ভক্ত-বংশে তপস্বী ইব্রাহিম প্রধান। তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই। তখন তিনি তাঁহার অপেক্ষা দশ বৎসর মাত্র কনিষ্ঠ অতএব আধুনিক মতে বৃদ্ধা স্ত্রীর অনুরোধে ঐ স্ত্রীর পরিচারিকার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ইহার বংশে ইসলাম ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের জন্ম হয়। তের বৎসর পরে ঈশ্বরের দূত মনুষ্যাকারে ইহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া বরদান করেন যে তাঁহার স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিবেন। তাঁহার স্ত্রী অতিথির জন্য আহারীয় প্রস্তুত করিতে করিতে এই কথা শুনিয়া অবিশ্বাস করিয়া মনে মনে হাসিয়াছিলেন বলিয়া তিরস্কৃতা হন। তার পর বৎসর তাঁহার একটি পুত্র হইল। ঈশ্বরাদেশে তাহার নাম রাখা হইল ইসহাক। ইহার বংশে যিশুর জন্ম হয়। ইহার ২।৩ বৎসর পরে

দাসী ও দাসীপুত্রকে বর্জ্জন করিয়া একমাত্র পুত্র ইসহাককে লইয়া ইঁহারা সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

একবার ঈশ্বর তাঁহার ভক্তি-পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে আজ্ঞা করেন "কাল প্রাতে অমুক পর্ব্বতে যাইয়া তোমার একমাত্র পুত্রকে—যাহাকে তুমি বড় ভালবাস—হোম-বলি দিবে।" প্রথমে বলি দিয়া পরে মেদ মাংস ইত্যাদি অগ্নিতে আহুতি দেওয়াকে হোম-বলি বলিত। প্রাতে উঠিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে বৃদ্ধভক্ত আপনার দুইজন অনুচরকে ডাকিয়া একটি গর্দ্দভে হোমের জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠভার চাপাইলেন। পুত্রকে কেবল এইমাত্র বলিলেন "আমার সহিত চল।" দুইটি ভৃত্য, পুত্র, কাষ্ঠভারবাহী গর্দ্দভ একখানি শাণিত ছুরি ও অগ্নি-আধার লইয়া বৃদ্ধ পর্ব্বতের দিকে চলিলেন। ভক্তপিতার বিশ্বাসীপুত্র একবার জিজ্ঞাসা করিল না, কোথায় ও কি কার্য্যে তাহাকে পিতা লইয়া যাইতেছেন। পর্ব্বতের নিম্নে উপস্থিত হইয়া তিনি ভৃত্যদের অপেক্ষা করিতে বলিলেন ও পুত্রকে কাষ্ঠভার দিয়া স্বয়ং ছুরি ও অগ্নি লইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। কতক দূর যাইবার পর পুত্র জিজ্ঞাসা করিল "পিতা! হোম-বলির উদ্যোগ দেখিতেছি কিন্তু মেষ ত দেখিতেছি না, আপনি ভুল করেন নাই ত?" বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিলেন "না বৎস, ভুলি নাই, ঈশ্বর বলির মেষ যোগাইবেন।" যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া অগ্নিকুণ্ড সাজাইলেন, পরে পুত্রকে বলিলেন "বৎস এইবার প্রস্তুত হও। ঈশ্বরাদেশে এ পূজায় তুমিই বলি, তোমাকে বলি দিয়া হোম করিতে হইবে।" ভক্তপিতার উপযুক্ত পুত্র হাসিমুখে প্রস্তুত হইল। পিতা তাহাকে নিয়ম মত বন্ধন করিয়া যখন বলি দিতে যান তখন শুনিলেন, কে তাঁহাকে ডাকিতেছে। তিনি ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে পাইলেন "হে ভক্ত আমি কেবল তোমার ভক্তি-পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম যে তুমি আমার কাছে তোমার প্রিয়তম একমাত্র পুত্রকে বলি দিতে কষ্ট পাও কি না। এখন বুঝিয়াছি আমার প্রতি তোমার একান্ত বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি আছে। বালককে ছাড়িয়া দাও।" বৃদ্ধ ভক্তের দেহে আনন্দে পুলক দেখা দিল। তিনি চক্ষু ফিরাইতেই দেখিলেন যেখানে পূর্ব্বে প্রাণিমাত্র ছিল না সেখানে একটি ঝোপ, ও ঝোপের মধ্যে একটি মেষ রহিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশ ইঙ্গিতে বুঝিয়া তিনি বালকের পরিবর্ত্তে ঐ মেষ বলি দিলেন।

মুসলমানেরা ভক্ত তপস্বী ইব্রাহিমকে খলীল-অল্লা কিম্বা কেবল খলীল (বন্ধু) নামে স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অদ্যাবধি খলীলের বলি স্মরণ করিয়া বৎসরের শেষ মাস জিহিজ্জের দশ তারিখে ঈশ্বরের কাছে বলি দিয়া থাকেন। সাধারণে ঐ দিনকে ইদ-উল-জুহা বা বলির উৎসব অথবা বকরা-ইদ বা বকরীদ বলে।

যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে বকরা ছাগলের প্রতিশব্দ। দক্ষিণে (হায়দ্রাবাদে) মেষের প্রতিশব্দ। কোষ-মতে বকরা অর্থে যে কোন ছোট চতুষ্পদ যাহার মাংস "হলাল" বা ধর্ম্মতঃ শুদ্ধ। বাইবেল মতে [জেনেসিস ২২ অধ্যায় ১৩ শ্লোক] ইব্রাহিম মেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন অতএব বকরীদে মেষ কোরবানিই প্রশস্ত। যে কোন উৎসবকে ইদ বলে।

ভক্ত-হৃদয়

(রুমী)

নিখিল অখিল বিরাটবিশ্বে—
না কুলায় যার স্থান,
ভক্তহিয়ার রক্ত সরোজে,
বিরাজে সে ভগবান।

'সবুজ'

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(৪)

কিছুকাল কাটিয়া গেল। বাড়ীর অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই হরিসাধনের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ময়নার বিবাহের কল্পনায় জমীদার-বাড়ীর অংশটা তিনি মন হইতে বাদ দিতে পারিলেন না। ব্যস্তভাবে আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; কি জানি যদি ইতিমধ্যে প্রজাপতি অন্যত্র কিছু ঘটাইয়া বসেন। তলে-তলে আবার সকল রকম চেষ্টা চলিতে লাগিল, কিন্তু হরিকেশবকে লুকাইয়া। দৈবাৎ সব জানাজানি হইয়া গেল।

সেবার পূর্ণবসন্তের মাঝখানে ভরা বর্ষা নামিয়া সাতদিন ধরিয়া আকাশের ক্রন্দনের বিরাম ছিল না। সেদিনও সকাল বেলা টিপি টিপি বৃষ্টি ও অন্ধকার আকাশ দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে, আকাশে এত শীঘ্র হাসি দেখা যাইতে পারে। ছোট ছেলেমেয়েরা অন্ধকার ঘরে বন্ধ থাকিয়া থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, গৃহিণীদের ঘর-সংসার পচিয়া যাইবার যোগাড়। এমন সময় দুপুর বেলা মেঘ সরিয়া গিয়া চারিদিক রৌদ্রে ভরিয়া গেল। তরঙ্গিণী ভাত খাইয়া উঠিয়া ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতিয়া পাঁচ মিনিটের জন্য একটু গড়াইয়া লইতে ছিলেন। উঠানে রৌদ্র পড়িয়াছে দেখিয়া তাঁহার আর বিশ্রাম হইল না। তিনি ব্যস্ত হইয়া ভাঁড়ার ঘরের দিকে ছুটিলেন; রোদ দেখিয়া গত সপ্তাহে পাঁচসের তেঁতুলের আচার সাজাইয়াছিলেন, দুই দিন রোদ না পাইতেই তাহা ঘরে তুলিতে হইল, সবটা বুঝি পচিয়া যায়। আজ একবার যেমন করিয়া হউক রোদের মুখ দেখাইতেই হইবে।

বাড়ীর বৌঝিরা তখন প্রায় সকলেই এক পালা নিদ্রা সারিয়া লইতে ব্যস্ত। মায়েদের শাসনে শিশুরাও ঘরে বন্ধ, পুরুষেরা যে যাহার কাজে বাহিরে ঘুরিতেছে। এত বড় বাড়ীটা নিস্তব্ধ জনহীন পড়িয়া খাঁ খাঁ করিতেছে। তরঙ্গিণী ভাঁড়ার ঘরের শিকল খুলিয়া কালো পাথরের বড় বড় খোরাগুলি পূজার ঘরের সাম্‌নে বাঁধানো সানের উপর নামাইতেছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়িল ভিতরের উঠান পার হইয়া খিড়কির দরজা দিয়া কে যেন নিঃশব্দে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছে। মাথায় উবুঝুঁটি বাঁধা, মোটা-মোটা গালাভরা গহনায় গা ঢাকা, চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরা, কাঁধে একখানা গামছা, মুখে একমুখ পানদোক্তা, বেশ মোটাসোটা সপ্রতিভ এ মেয়ে-মানুসটিকে তরঙ্গিণী ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছিলেন বলিয়া ত মনে পড়ে না। তাঁহাদের গৃহে এ প্রাণীটির আবির্ভাব কি কারণে কোথা হইতে হইল ভাবিয়া না পাইয়া তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাছা, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

মানুষটি একটু যেন চম্‌কাইয়া উঠিল, উঠানে কাহারও সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা তাহার বোধ হয় মনে আসে নাই; কিন্তু তারপরই মিশিমাখা কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই মা, আস্‌ছি ছোটমার মামা-বাড়ী থেকে; তেনার কাছেই একটু কাজ ছেল।"

তরঙ্গিণীর কেমন একটু সন্দেহ হইল; তিনি বলিলেন, "সেই বাড়ীতেই থাকা হয় বুঝি! আগে ত কোনো দিন দেখিনি।"

মেয়েটি গামছার খুঁট হইতে আর একটা পান লইয়া আলগোছে মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "না মা, সেখানে থাকি না; এই যাওয়া আশা করি। তা তোমার কাছে আর মিথ্যে বল্‌ব কেন মা? তুমি হলে বাড়ীর গিন্নি। ছোট মার মেয়েটির একটি সম্মন্ধের কথা মামাবাড়ীর ওঁরা বলেছিলেন, তাই খপর দিতে আসা। আমরা ওই করেই ত খাই মা। মা বলেছিলেন খুব গোপনে আসা-যাওয়া কর্‌বে, এখনই যেন লোক জানাজানি না হয়; তাই

বর্ষার ফাঁকে একটু রোদ পেতেই টপ্ করে কাজটা সেরে যাচ্ছিলুম। পড়্‌বি ত পড় তোমার কাছেই ধরা পড়ে গেলুম। তা কি কর্‌ব বল মা, শুভকর্ম্ম কি চাপা থাকে? তাতে তুমি হ'লে বাড়ার মাথা।"

তরঙ্গিণীর বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল। মেয়ের বিবাহ যে শুভকর্ম্ম তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, অশুভ পর্ব্বটাই তখন তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়াছিল। আজ যদি তাঁহার মেয়ের বিবাহ না হইয়া যাইত তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যে এত বড় অশুভ ঘটনাটা ত বিধি ঘটাইতে পারিতেন না। তাঁহার মনের এমন অবস্থায় ছোট জা যে তাঁহার কাছে নিজের মেয়ের বিবাহের কথা পাড়ে নাই, এটা খুব স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইল; তবু লুকাইয়া ঘট্‌কী আনাগোনার খবরে একটু যে অভিমান তাঁহার মনে আসে নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু কোথাকার কে ঘট্‌কীর কাছে তিনি সে কথা বলিতেই বা যাইবেন কেন আর কৌতূহলই বা দেখাইতে যাইবেন কেন? তাই ঘট্‌কীকে কিছু না বলিয়া বিদায় দিবার জন্যই তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আজ তবে এস বাছা। শুভ কাজে দশবার আসা-যাওয়া ত আছেই।"

গোপনীয় খবরটার অর্দ্ধেক প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া ঘট্‌কীর কিন্তু সবটা বেশ সালঙ্কারে বলিবার জন্য প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। সে তরঙ্গিণীর কথার জের টানিয়া চাকাপারা মুখখানা নাড়িয়া বলিল, "আস্‌ব বই কি মা, হাজার বার আস্‌ব; বিশেষ যখন বড় ঘরে কাজ হচ্ছে তখন আমরা গরীব দুঃখী কত আশা করেই আস্‌ব। তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি মা! এত ধন দৌলত দেখিনি কখনও। মেয়ের বিয়ে দিতে হয় ত এমনি ঘরেই হয়। কি বল্‌ব মা, বরের যে মাসী বিধবা মানুষ, তা সেও ছাপর খাট থেকে নেমে বসে না। গলায় হার দিয়েছে ষোল ভরির কম হবে না, ধোবো কাপড় ছাড়া ত পরেই না; দাসী-বাঁদী অষ্ট প্রহর পিছন-পিছন ঘুর্‌ছে। আর জেঠি খুড়ার ত কথাই নেই। তেনাদের গয়নার ভারে দেহ নড়ে না। আর মা, সুখের শরীর, দুধে ঘিয়েই তৈরি, বল্‌তে নেই, কিন্তু গড়ন সব যা। এই, এই—"

ঘট্‌কী হাত নাড়িয়া নিজের বিশাল দেহ দুলাইয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে সে বাড়ীর মেয়েদের মাংসল বর্ত্তুল দেহের একটা পরিষ্কার ছবি দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তরঙ্গিণীর এত দুঃখেও হাসি পাইল। তিনি বলিলেন, "বাপ রে, অত মোটা শরীর নিয়ে বেঁচে থাকাই যে দায়।"

ঘট্‌কী হাসিয়া বলিল, "কি যে বল মা, রাজা-রাজড়ার ঘরে কি তা না হ'লে মানায়? ও সব ছিনে-পড়া হাত পায়ের রূপ ক্যাঙ্গাল গরীবের ঘরেই শোভা পায়। ভগবানের ত বিচার নেই মা, নইলে তোমার মেয়েকে ও ঘরে যেমন সেজেছিল, তেমন সাজন্ত কেউ হবে না।"

তরঙ্গিণী চমকিয়া উঠিলেন। তবে কি সেই ঘরেই আবার দুইদিন না যাইতে দেওর জা লোক হাঁটাইতে সুরু করিয়াছে? মানুষ এমনি স্বার্থপর বটে! কিন্তু এই আনা-গোনা কথাবার্ত্তার মাঝখানে গৌরীকে যে আর তেমন করিয়া সব লুকাইয়া সধবা মেয়েটির মতই রাখা চলিবে না, সেই ভাবনাটাই তাঁহার সব চেয়ে প্রবল হইল। ঘট্‌কী তখনও বকিয়া চলিয়াছে,

"তোমার অমন দুগ্‌গোঠাকরুণের মতো মেয়ে মা, তা শাশুড়ী মাগী বলে কিনা—রাক্কসের ঝাড় ছেলেটাকে নাম করতেই চিবিয়ে খেলে! কি কর্‌বে বল মা? সবই তোমার অদেষ্ট। ছোট মা নেহাৎ ধ'রে পড়েছে নইলে এমন দিনে তাদের মুখের সাম্‌নে কি আমি এগুই! কত কুকথাই না শুন্‌তে হয়।"

ঘট্‌কীর বর্ণনায় তরঙ্গিণী ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। তিনি সেখানে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া ভাঁড়ার ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। হায়! তাঁহার নিষ্পাপ দুধের মেয়েটার কপালে বিধাতা কি কিছু কম দুঃখ লিখিয়া দিয়াছেন যে, তাহার নামে এই সব কথাও তাঁহাকে শুনিতে হইবে। স্ত্রী হইয়া মা হইয়া যে সংসারের সুখের স্বাদ পাইয়াছে সে কি বোঝে না যে সংসার না চিনিতে না বুঝিতে শুধু তার কাঁটা আর জ্বালাটুকু যে মূঢ় শিশুকে মুখ বুজিয়া আজীবন সহিয়া যাইতে হইবে, তাহাকে গালি দিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই?

তার বাড়া পাপ যে নাই! এই মানুষের কোলেই একদিন কন্যারূপে আপনার বক্ষের ধনটিকে তরঙ্গিণী তুলিয়া দিয়াছিলেন, নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। আজ পুত্র হারাইয়া সেই কন্যারূপিণী অভাগিনী শিশুর জন্য তাহার মাতৃহৃদয় ত কাঁদিল না, বুকে তুলিয়া বুকের জ্বালা জুড়াইতে চাহিল না; বিষাক্ত বাক্যের বাণে দহিতে চাহিল। হায়, এই তাঁহার আদরিণী গৌরীর ভবিষ্যৎ!

তরঙ্গিণী মনের ভয় চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আজ না হউক দুইদিন বাদে গৌরীর কথা ত সেখানে পৌঁছিবেই। এই ঘট্‌কীই এখানে গৌরীর জন্য সহানুভূতি দেখাইয়া গেল, সেখানে গিয়া গৃহিণীদের কুটুম্বদ্বেষের খোরাক জোগাইবার জন্য পাঁচকথা রং চড়াইয়া কি আর বলিবে না? তখন না জানি তাহারা কি নিষ্ঠুর বিধান করিবে?

সারাদিন অসোয়াস্তিতে তাঁহার সময় কাটিল। কোনো কাজে মন লাগে না। যতবার গৌরীকে দেখেন ততবার সমস্ত বুকটা যেন কাঁদিয়া উঠে। কতবার ভাবিলেন ছোট বৌকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করিবেন; কিন্তু কথা মুখের ডগায় আসিয়া থামিয়া গেল। কি বলিবেন তিনি? নিজের মেয়ের লাঞ্ছনার ভয়ে তাকে কি সে বাড়ীতে কন্যা দিতে মানা করিবেন? এমন কথা কি কখনও বলা যায়?

রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসিল। ছোট ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামে, শাশুড়ী ননদদের জল খাবারের ব্যবস্থা করিতে, কুচোকাচার দুধ জোগাইতে, পুরুষদের খাবার সাজাইয়া রাখিতে সময়টা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল তিনি টের পাইলেন না। সারাদিন কাজের চাপ হাল্কা ছিল তাই থাকিয়া থাকিয়া মনটা হাঁপাইয়া উঠিতেছিল দিন বুঝি আর কাটে না; মনের বোঝাটা নামাইয়া হাল্কা করিবার একমাত্র অবসর সেই গভীর রাত্রি এখনও কত দূরে পড়িয়া। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের গতি যেন কাজের টানে দশগুণ বাড়িয়া গেল, মনটাকে চাপা দিয়া কলের মত শরীরটা কোনো-প্রকারে সময়ের দাবী মিটাইয়া ছুটিতেছিল।

তখন অনেক রাত্রি; গ্রীষ্মাধিক্যে কেহ খোলা ছাদে, কেহ বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কেহ বা পরীক্ষার পড়া পড়িতে পড়িতে খোলা জানালার পাশে মৃদু হাওয়ায় শ্রান্ত মাথাটা টেবিলের উপরই দিয়া ঝিমাইতেছে। কচি ছেলের মাদের ঘরের আলো অনেকক্ষণ নিভিয়া গেছে। পথের চলাচলও কমিয়া আসিয়াছে; রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া পাশের গলির সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত খোট্টা পসারীদের রামায়ণ গান চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এমন সময় নির্জ্জন কক্ষে সারাদিনের পর তরঙ্গিণী প্রথম বিশ্রাম পাইলেন, হরিকেশবেরও দেখা এই প্রথম মিলিল।

ঘরে না ঢুকিতেই তরঙ্গিণী রুদ্ধ নিশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, "ওগো শুনেছ, ময়নার ওরা আবার ওই বাড়ীতে বিয়ের কথা তুলেছে। কি হবে বল ত?"

হরিকেশব বিছানার উপর জামাটা ফেলিয়া পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "সত্যি? সাধন ত আমাকে কিছু বলে নি?"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "তুমিও যেমন! আগে-ভাগে তোমাকে বল্‌তে যাবে কেন? দরকার বুঝে ঠিক সময় বল্‌বে; এদিকে দিনও কিছু কেটে' যাবে।" হরিকেশব তাড়াতাড়ি বলিলেন, "হ্যাঁ, তা এ সময় আমাকে বাঁচিয়ে চলাই সাধনের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আমি যে বড় ভাবনায় পড়্‌লাম দেখ্‌ছি। গৌরীর কথা জানা-জানি হ'লে সাধনের মেয়ের বিয়ের আবার অসুবিধা হ'তে পারে। কি করা যায় বলত?"

তরঙ্গিণী অশ্রুউচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলেন, "করা যাবে ছাই; ওদের ত ভারি অসুবিধা! আমারই দুধের মেয়েটার প্রাণ যাবে। ওর কি এই নিয়ম আচার কর্‌বার বয়স না বুদ্ধি! চিরটা কাল আদর পেয়ে' এসেছে, আজ এই বিয়ে বাড়ীর মাঝখানে সবাই ওকে 'দূর দূর' কর্‌লে আর শ্বশুরবাড়ীর গালমন্দ কানে গেলে মেয়ে কি আমার বাঁচবে? ও মেয়েও যাবে।"

হরিকেশব মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "নাঃ, সে কখন হ'তেই পারে না। গৌরীকে আমি ওদের কথা পালতে দেব না। সে যা হয় হোক্। আমার মেয়ে নিয়ে আমি চ'লে যাব।" তরঙ্গিণী বলিলেন, "দেখ, হিসেব ক'রে কথা বল। মেয়ের জন্যে কেউ কি কখনও

দেশত্যাগী হয় না হয়েছে যে তুমি একটা অসম্ভব কথা ব'লে বস্‌লে ?"

হরিকেশব বলিলেন, "কেউ কি করেছে না করেছে জানি না। আমি যা বুঝি, তা আমি করব। একটা মস্ত পাপ করেছি, আর পাপ বৃদ্ধি কর্‌তে পারব না। শিশুহত্যার মহাপাতক আর যেন এ জন্মে না কর্‌তে হয়। আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে এমনি ক'রে। তার জন্যে যা দণ্ড নিজেকে দিতে হয় আমাকে তা দিতে হবে। পুণ্যের লোভে ধনের লোভে সখের খেলায় মত্ত হ'য়ে নিজের সন্তানকে বলি দিয়েছি, তার দণ্ড না দিলে চল্‌বে কেন ?"

তরঙ্গিণী আর কিছু বলিলেন না। দেখিলেন স্বামী এদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাবিয়া মনে মনে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার মনে কি একটা দৃঢ়সংকল্প জাগিয়াছে; যত বাধা-বিপত্তির মধ্যে পড়িবে, ততই তাহা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

(৫)

গৌরীর পিতামাতা যখন তাঁহাদের আসন্ন পরীক্ষা ও কন্যার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ভাবনায় ভাঙিয়া পড়িতে ছিলেন, হরিসাধন তখন সস্ত্রীক অচিরভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে মাতিয়া কাজে কথায় ও চিন্তায় যেন চারিদিকে আনন্দ বিকীরণ করিতেছিলেন। সে আনন্দচ্ছটার তাপে পাছে গৌরীর মনে হঠাৎ আঁচ লাগিয়া যায় এই আশঙ্কায় তরঙ্গিণী শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমনি ভাবে একই পরিবারের মধ্যে সুখ দুঃখ আশা আশঙ্কার খেলা নানারূপে নানাদিন দেখা দিতে লাগিল। সে খেলা আর লুকোচুরির খেলার মত আড়ালে আড়ালে চলে না, সুস্পষ্ট প্রয়োজন তাহাকে মুখোমুখি আনিয়া ফেলিল।

সেদিন সন্ধ্যায় হরিকেশবের আপিসঘরে বাহিরের লোক ছিল না। একলা ঘরে বসিয়া তিনি টেবিলের উপর রাশীকৃত ছিন্ন-মলাট কতকগুলি কি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ উল্টাইতে ছিলেন। এমন সময় হরিসাধন পায়ের চটিজুতা দরজার কাছে খুলিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে নতমস্তকে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ঘরে লোক আসাটা নূতন ব্যাপার মোটেই নয়, সুতরাং কে যে কখন কি উদ্দেশ্যে আসিতেছে, হরিকেশব নিতান্ত বাধ্য না হইলে প্রায়ই তাড়াতাড়ি চোখ্ তুলিয়া দেখেন না। হরিসাধন অগত্যা দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থই দুচারখানা টানিয়া কিছুক্ষণ মন দিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে রসের সাগরে তাঁহার মন ডুবিয়াছিল, হরিকেশবের ছিন্ন-মলাট জীর্ণ পুঁথির স্থান সেখানে কোনো দিন হয় না। কাজেই বেশীক্ষণ পারা গেল না। বই হইতে মুখ তুলিয়া তিনি দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন, কখন অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়া যায়। মনের কথাটা বলিয়া মনটা হাল্‌কা করিয়া না ফেলিলে আর চলে না।

হরিকেশব স্খলিত চশমাটা ঠিক করিয়া লাগাইতে লাগাইতে হঠাৎ একবার চোখ চাহিয়া ভ্রাতার উদ্‌গ্রীব মুখ দেখিয়া বলিলেন, "সাধন, কিছু চাও ?"

সাধন মাথাটা একটু নীচু করিয়া একবার ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "দাদা, আপনাকে এতদিন কি যে বল্‌ব ভেবে' পাচ্ছিলাম না। হ্যাঁ, আমার বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। কিন্তু কি করি বলুন, উপায় ছিল না।"

হরিকেশব তাঁহার ভূমিকার কিছু মাত্র অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি অন্যায় হয়েছে সাধন ? আমি ত কিছু অন্যায়ের কথা শুনি নি।"

হরিসাধন ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "অন্যায় বই কি ! আপনাকে আমার আগেই বলা উচিত ছিল। ময়নার বিবাহ দেবার কথা কি আর আমার ? সেত আপনারই কাজ। আপনার অনুমতি ব্যতীত কোনো কাজ কর্‌তে যাওয়াই আমার বাতুলতা। তবে আপনার মনের এমন অবস্থাতে বাধ্য হ'য়ে আমাকেই ভার নিতে হয়েছে। যাক্, ভগবানের কৃপায় একরকম প্রায় সব ঠিক হ'য়ে এসেছে। এখন দুটো চারটে যা বাধা বিপত্তি আছে, সেগুলোকে কোনোরকমে কাটিয়ে উঠতে পার্‌লেই হয়।"

হরিকেশব ব্যাপারটা বুঝিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি যখন অল্প বয়সেই বিবাহ দিতে চাও তখন নিজে অগ্রসর হ'য়ে ভালই করেছ। আমার পক্ষে এজীবনে ও কাজটা আর শোভন হ'ত না। কিন্তু তবু তোমার সুবিধা অসুবিধাগুলো আমাকেই দেখতে হবে ত। খরচপত্রের জন্য আমি ভাবছি না; সে আমরা ক'ভাই মিলে' যেমন

ক'রে হোক্ চালিয়ে নেব। ভাবছিলাম অন্য কথা। গৌরীর জন্য তোমায় নানান্ অসুবিধায় পড়তে হ'তে পারে। এসময় সব জিনিষ আগের মতো যদি না চালাই, তাহ'লে গৌরী শিশু হ'লেও বুঝ্বে, বুঝে আঘাত পাবে। এমন একটা আনন্দোৎসবের মাঝখানে তাকে এমন আঘাত দেওয়া বড় কঠিন হবে, নিষ্ঠুরও হবে। কিন্তু যদি যেমন আছে তেমনি চলি, তবে বিবাহে বাধা পড়তে পারে, মেয়ে-মহলের কথায়-বার্ত্তায় গৌরীকে নিয়েও গোল বাধবে। সুতরাং এটা ভাববার বিষয়।"

এই ঢাকাঢাকি চাপাচাপি ব্যাপার আনন্দের দিনে হরিসাধনের আর ভাল লাগিতে ছিল না। তাঁহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস মাঝপথে বাধা পাইয়া তাঁহার সকল আয়োজন আড়ম্বরের সরসতা যে নষ্ট করিয়া দিবে, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলেন। এখন সুযোগ দেখিয়া হরিসাধন বলিলেন, "আপনি যেমন পরিষ্কারভাবে আগাগোড়া সব বুঝছেন, তেমন আর অন্যে কি বুঝ্বে? দেখ্তেই ত পাচ্ছেন যে পথেই যাওয়া যাক্ না কেন গৌরীমাকে আমরা শেষ পর্য্যন্ত আঘাতের হাত থেকে বাঁচাতে পারব না। কাজেই পরের হাতের আঘাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে এ নিষ্ঠুর কাজটা যথাসাধ্য মোলায়েম ক'রে আমাদেরই ক'রে রাখ্তে হবে। দুর্ব্বল মনকে শক্ত করতে হবে, দেরী ক'রে কোনো লাভ নেই। ভগবান যে দুঃখ দিয়েছেন, মানুষ তা কি রোধ করতে পারে?"

হরিকেশব যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, "না, না, সে হতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত ঠেকাতে পারব না জানি, কিন্তু বেদনা দেবার বয়সের ত একটা সীমা আছে। সে বয়স তার আগে আসুক, এই শিশু বয়সটা তাকে আমায় আগ্‌লে রাখতেই হবে।" হরিসাধন হতাশ হইয়া বলিলেন, "কিন্তু ইতিমধ্যে যদি একটা গণ্ডগোল বেধে' যায়?"

হরিকেশব বলিলেন, "তার জন্যে তুমি ভেবো না। আমি তার ব্যবস্থা করব।"

হরিসাধন খুব যে নিশ্চিন্ত হইলেন তাহা বলা যায় না। নিজের মেয়ের ভাবনায় দাদা যে তাঁহার মেয়েটির কথায় মোটে আমলই দিতেছেন না ইহাতে তাঁহার অভিমান হইল। বিধবা মেয়ের কপালে দুঃখ ত আছেই তার জন্যে অপরের সুখের পথে কি কাঁটা হওয়া উচিত? কিন্তু এমন বিষয়ে ত আর জেদ করা চলে না। বিশেষত তিনি যখন গৌরীর জন্য কিছুই করেন নাই, করিবেনও না; কিন্তু হরিকেশবকে ময়নার জন্য চিরকাল ত করিতে হইয়াছেই, আজও যথেষ্ট পরিমাণেই হইবে, এই বিবাহ ব্যাপারে। একা বড়ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করিবার সাহস সাধনের ছিল না। অগত্যা তাঁহাকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল।

(৬)

হরিসাধন যা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল; গণ্ডগোল সত্য সত্যই বাধিল। লোকজনের আনাগোনা ত ক্রমাগতই চলিতেছে। তাহার উপর ছোট বৌএর মামাবাড়ী ছিল দুইবাড়ীর মধ্যবর্ত্তী। সৃষ্টিধরের শ্যালিকার দেবর ছিলেন এই বাড়ীর কর্ত্তা। সুতরাং পল্লবিত সুরঞ্জিত নানা গল্পের আমদানী রপ্তানী এই বাড়ীর সাহায্যে দুই কুটুম্ব বাড়ীতে বেশ যাওয়া আসা করিত। তাহাতে একবাড়ীর লোকে ভয়ে কাঁটা হইয়া উঠিত, আর এক বাড়ীর লোক রাগিয়া জলিয়া মরিত।

মহীধরের অন্তঃপুরে খবর পৌছিল যে বিধবা মেয়েকে হরিকেশব সধবা বেশেত রাখিয়াছেনই তাহার বৈধব্যের খবর পর্য্যন্ত তাহাকে জানিতে দেন নাই; উপরন্তু বাহাদুরি দেখাইবার জন্য তাহাকে দিয়া যত অনাচার করাইতেছেন। অন্তঃপুরে রাগ ও বিদ্বেষের একটা ঝড় বহিয়া গেল। এই স্পর্দ্ধার একটা প্রতিবিধান করিবার জন্য সেখানে এক মন্ত্রণা সভা জাঁকিয়া বসিল। ক্ষমতায় কুলাক্ বা না কুলাক্ মুখে "ধর্ কাট্" করিতে কেহ ছাড়িল না।

নূতন বরের মাসী বলিলেন, "মাগো মা, বিধবা কি আর জগতে কেউ হয়নি! মা বাপের অমন সোহাগের মুখে ঝাঁটা। এইত আমরাই কচি বয়সে একটি মাত্র ছেলে কোলে করে বিধবা হয়েছি, সব সাধ আহ্লাদই বাকি থেকে গেছে। তা বলে কি রোজ হবিষ্যি করছি না,

না ব্রত উপোষই কর্‌ছি না। গয়না কাপড়ই কি আমার বড় হ'ল, না ধর্ম্ম বড় হ'ল? বলুক দেখি কেউ কখনো হাতে সেই ইস্তক একগাছা চুড়ি দেখেছে। ছেলের অকল্যাণ হবে তাই নেহাৎ গলায় এই সোনাটুকু আছে। এককালে বাপ মা আমারও ছিল। কিন্তু অমন কথা কখনও মুখে আন্‌ত না।"

কীর্ত্তিধরের বিধবা আশ্রিতা মোহিনী বলিল, আর মাসি তুমিও যেমন! ওরা আর আমরা এক হলাম নাকি! তোমার বেয়াই মেয়েকে কল্‌মা পড়াবে, নিকে দেবে, তারি এত আয়োজন হচ্ছে তাও বোঝ না বুঝি? এখুনি ত শুন্‌লাম গাউন কিনে দিয়েছে। আর আমাদের ভূধর যে গিয়েছে সে কথা ও মেয়ে জানে না মনে করেছ? জেঠিমারও যেমন কথা! ও ডাইনী মেয়ে সব জানে, সব বোঝে। ছল ক'রে ন্যাকা সেজে থাকে, যাতে গায়ে একটু না আঁচ লাগে। আর দু বছর যাক্ না, দেখো এখন কি রঙ্গিণী মূর্ত্তি ধর্‌বে!"

মাসী বল্‌লেন, "সেত হ'ল! কিন্তু আমার ক্ষিতির বিয়েটা এই অনাচারের মধ্যে হয় কি ক'রে শুনি! ও মেয়েকে ধ'রে কেউ মাথা মুড়িয়ে দেয় না! আদুরীপনা ক'রে ত সব ছোঁয়ান্যাপা ক'রে এক ক'রে রাখবে।"

মহীধরের বিবাহিতা কন্যা মালিনী বলিল, "শুধু তাই বা কেন,মাসি? আমাদের বাড়ীর বৌ ত ও হাজার হ'লেও! আমাদের কি একটা মান সম্ভ্রম নেই! এ বাড়ীর বিধবা বৌ হ'য়ে ভাবন ক'রে বেড়াবে আর লোকে যে আমাদের গায়ে থুথু দেবে। চিরকাল ত আর বাপ পুষবে না; এই ভিটেতেই ত থাক্‌তে হবে। মুখুজ্যে বাড়ীর বৌ কখনও কেউ ভিন্‌গাঁয়ে মরে নি। বুড়ো বয়সে ধেড়ে হ'য়ে এসে ওসব ঢং কি আর ছাড়্‌তে পারবে! তার চেয়ে মা'র উচিত এই বেলাই ওকে বাড়ী এনে ঢিট ক'রে রাখা।"

মা বলিলেন, "তুমি ত খুব ব'লে দিলে! আমার ছেলে গেল, সেই জ্বালাতে বাঁচি না, ও আহ্লাদি দুধের খুকীকে এখন ঘাড়ে ক'রে বেড়াই। আমার অত সাধ দরকার নেই। তোমরা ওবাড়ীতে বিয়ে দিতে চাও দাও, ঘাড়ে ধ'রে আচার বিচার করিয়ে নেবে, তবে না বলি মুখুজ্যে গুষ্টি! তার পর বেশী বাড় দেখায় ত নিজেরাই টের পাবে। আর একটা মেয়ে ত আমাদেরই হাতে আস্‌ছে, সে ভয় কি আর নেই?"

পাশের মহল হইতে ভূধরের দূর-সম্পর্কীয়া কাকীমা আসিয়াছিলেন; তিনি হাত নাড়িয়া বলিলেন, "কি তোর বুদ্ধি বাছা মালিনী! দিদি বাঁচে না নিজের জ্বালায়। এখন ওই চোখের কাঁটাকে সারাক্ষণ আগ্‌লে বেড়াক্ আর কি! ভাবুনী মেয়ে এসে এখানে একটা কীর্ত্তি করুন, তারপর সে দায় কে সাম্‌লাবে শুনি! ও বাপু, যার ঘরের পাপ, সেই বুঝুক, সেই ভাল।"

নূতন বর ক্ষিতিধরের মাসী বলিলেন, "তা সে বাড়ীতে যদি আবার বিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বিয়ের সময় এক বার আস্‌তে বল্‌তে হবে ত! পাঠাক্ বা না পাঠাক্ সে আলাদা কথা!"

ঠোঁট উল্টাইয়া মালিনী বলিল, "আমরা বল্‌লে পাঠাবে না! বড় আস্পর্দ্ধা! আচ্ছা, ব'লেই দেখ না একবার! ক'দিনের জন্যেই আনাও না কেন, কার যে কেমন আচার-ব্যাভার কর্‌তে হয়, সেটা একবার বুঝিয়ে দেব।"

মোহিনী বলিল, "সে ত ঠিক কথা। সম্পর্ক ত আর মেয়ে মানুষের চোকে না। যে ঘরে পড়েছ তার মান মর্য্যাদা রাখ্‌তে শিখ্‌তে হবে ত! তারা যদি না শেখায় কি ঢং ক'রে মেয়েকে হাবা সাজিয়ে রাখে ত আমাদেরই শেখাতে হবে।"

* * * *

এদিকে এমনি জল্পনা কল্পনা তর্জ্জন গর্জ্জন চলিতে লাগিল, ওদিকে মেয়ে দেখার দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। সৃষ্টিধর যদি মেয়ে পছন্দ করেন ত আশীর্ব্বাদ ও বিবাহের দেরী হইবে না।

কথাটা বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িল। ছেলে-বুড়ো, ঝি-বউ, চাকর-বাকর সকলেরই মুখে এক কথা।—ময়নার বিয়ে, জমিদার বাড়ী থেকে ঘটা ক'রে মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে। নূতন একটা উত্তেজনা ও আনন্দের খোরাক পাইয়া সকলেই স্ফূর্ত্তিতে আকুল। গৌরীও তাহাদের সঙ্গেই ভিড়িয়াছে। কিন্তু গৌরীর এই উৎসাহ দেখিয়া গৌরীর মা ভয়ে কাঁটা হইয়া আছেন। না জানি কখন কি ঘটিয়া বসে। ময়নার মাও যে গৌরীর এই মেলা-মেশাটা

বিশেষ পছন্দ করিতেছেন তাহা বলা যায় না। এখন হইতে তাহাকে যদি সাবধান না করা যায় তাহা হইলে যথাকালে সে যে তাঁহার মেয়ের সুখের পথে হঠাৎ বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া উঠিবে না তাহা কে বলিতে পারে? আর তা ছাড়া শাস্ত্রে দেশাচারে এতকাল যে কাজটা মানা করিয়া আসিতেছে, তাহার ভিতর কিছু গলদ আছে বৈকি! মেয়েকে ভালবাসা দেখাইতে গিয়া বড়ঠাকুর ও দিদি না হয় আপন কল্যাণ অকল্যাণের কথা না ভাবিলেন! কিন্তু মৃণালিনী ময়নার মা হইয়া তাহার কল্যাণের কথাটা ত আগে না ভাবিয়া পারেন না। গৌরীকে লইয়া এত মাখামাখি তাঁহার যে ভাল লাগিবে না এবং সেইজন্য ভাসুর ভাসুরঝি ও জা সকলের প্রতিই যে তাঁহার মনটা বিরূপ হইয়া উঠিবে ইহা আর বিচিত্র কি? দিন যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ভাসুরের পরিবার-পরিজনের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা ততই সংক্ষিপ্ত ও গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। তরঙ্গিণীর মন এবিষয়ে সজাগ ছিল, সুতরাং তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিত না। কিন্তু কিছু করিবার উপায় ছিল না। গৌরীকেও বলিতে পারেন না ছেলেবেলার সাথীদের হঠাৎ অকারণে ছাড়িয়া নিজের ঘরে একলা খেলাধূলা করিতে, জাকেও বলিতে পারেন না আপনার মেয়ের অকল্যাণের ভয়ে অতটা উতলা হইয়া না উঠিতে।

এই সমস্যার কি সমাধান করা যায় ভাবিয়া আকুল হইয়া তরঙ্গিণী যখন স্বামীর পরামর্শ লইতেছেন এবং সেই সঙ্গে ভাল করিয়া না ভাবিয়াই হঠ করিয়া একটা কাজ না করিতে স্বামীকে উপদেশও দিতেছেন তখন অকস্মাৎ একদিন খবর আসিল সৃষ্টিধর কালই মেয়ে দেখিতে আসিবেন, সব ব্যবস্থা যেন করিয়া রাখা হয়। এমন আচম্‌কা আসিয়া পড়ার মধ্যে মেয়ে দেখা ছাড়া আর একটা উদ্দেশ্যও যে রহিয়াছে তাহা সকলেই বুঝিল এবং বুঝিয়া ভয়ও পাইল। কিন্তু ভয় পাইয়া বসিয়া থাকিবার আর সময় কই? আয়োজন করিতে হইবে।

পরদিন রাত না শেষ হইতে কাক-কোকিল ডাকিবার আগেই মৃণালিনী উঠিয়া লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঘরসংসার তদারক করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সৃষ্টিধর স্বয়ং মেয়ে দেখিতে আসিবেন, তক্তাপোষের উপর সাদা ফরাস পাতিয়া ত তাঁহাকে বসিতে দেওয়া যায় না; হরিসাধন বলিয়াছেন জরির কাজ করা চাদর ও মকমলের তাকিয়া চাই। গৃহিণী যদিও বলিলেন, "ওমা, জরি গায়ে ফুটবে যে," তবু কর্ত্তা তাঁহাকে তাড়া দিয়া আপনার জেদ বজায় রাখিলেন। বাড়ীতে ভাল তাকিয়া দুটা ছিল, কিন্তু ওরকম কোনো চাদর ছিল না। অগত্যা শেষ রাত্রে পুলিশের হাতে পড়িবার ভয় থাকা সত্ত্বেও জগু বেয়ারাকে নারিকেল ডাঙ্গায় ছুটিতে হইল লাবণ্যর বাপের বাড়ী হইতে একটা জরিদার আস্তরণ সংগ্রহ করিবার আশায়। নূতন কুটুম্বকে রূপাবাঁধানো হুঁকায় সুগন্ধি তামাক দিতে হইবে; কিন্তু হরিকেশবের বাবার আমলের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন রূপার হুঁকাটি অব্যবহারে ভাঁড়ারে পড়িয়া কলঙ্কে এমন কালো হইয়া গিয়াছে, যে তাহা লোহা কি রূপা বোঝা যায় না। মৃণালিনী ভাগিনেয়ী শোভনার শেষ রাত্রির সুখ-নিদ্রাটি ভাঙাইয়া তাহাকে তেঁতুল দিয়া হুঁকা মাজিতে বসাইয়াছেন। তাহার নিদ্রালস চোখে সে ভাল করিয়া না দেখিয়াই শিথিল হাতে ঘসিয়া যাইতেছে, কালো কালো দাগ-গুলা তাহাতে উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইতেছে না। মৃণালিনী আবার ব্যস্ত হইয়া নিজে খানিকটা খড়ি গুঁড়া লইয়া সেটা দ্বিতীয়বার ঘসিতে বসিলেন। জলখাবারের রূপার বাসন কতকগুলি তরঙ্গিণীর আলমারীতে তোলা ছিল, তাই সেগুলি বিশেষ কালো হয় নাই; কিন্তু তাহাও ত বাহির করিয়া রাখা হয় নাই। অথচ ভাসুরের শয়ন-গৃহে গিয়া তিনি ডাকাডাকিই বা করেন কি করিয়া? শৈলটাকেই বাধ্য হইয়া ঘুম হইতে টানিয়া তুলিতে হইল জ্যাঠাইমাকে ডাকিবার জন্য। সে ত কাঁদিয়া-চটিয়াই অস্থির, "দিদিকে দেখ্‌তে আস্‌বে, তাঁকে পাঠাও না; বাঁরে, আমায় কেন মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে?"

মা চটিয়া তাহাকে ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিলেন; "বোকা মেয়ে, বড় মুখ হয়েছে তোমার না? ফের একটি কথা বল্‌বে ত নোড়া দিয়ে সব কটা দাঁত ছেঁচে দেব।"

শৈল ঝাঁঝিয়া বলিল, "আমি যাবই না, মারো দেখি কেমন পার!" অকস্মাৎ তাহার সমস্ত ঘুম কোথায়

ছুটিয়া গেল ; সে বিছানা ছাড়িয়া অর্দ্ধপরিহিত ছোপানো শাড়ীখানা মাটিতে লুটাইতে-লুটাইতে একেবারে বাহির বাড়ীতে দৌড় দিল। শৈলর বিদ্রোহের কোলাহলে ময়না, ট্যাবা, টিনি সবাই বিস্ময়ে বড় বড় চোখ মেলিয়া ঝাঁকড়া মাথা তুলিয়া বিছানার উপর সার দিয়া উঠিয়া বসিল। মা শৈলর পিছনে তাড়া করার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া নিদ্রা-কাতর ও বিস্মিত ট্যাবাকেই টানিতে-টানিতে জ্যাঠাইমার দরজায় দাঁড় করাইয়া নিজের শিক্ষিত বুলি আবৃত্তি করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীছাড়া ছেলে-মেয়েগুলার জ্বালায় তাঁহার কাজের বেলা হইয়া যাইবার জোগাড় হইল।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কাজ করিবার লোক বিছানা ছাড়িয়া অনেকেই উঠিল বটে, কিন্তু কাজ যেন তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ বাড়িয়া গেল। চাকরগুলা একটা জিনিস আনিতে বাজারে যায় ত আর ফেরে না, অন্য অন্য জিনিস যে কে আনিয়া দেয় তাহার ঠিক নেই। চাকরদের ডাকিয়া আনিতে বাড়ীর ছেলে-গুলা পর্য্যন্ত একে একে বাহির হইয়া গিয়াছে। দরজার গোড়ায় উৎকণ্ঠিত দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যদি বা তাহারা দল বাঁধিয়া ফেরে ত অর্দ্ধেকগুলারই শুধুহাত! কারণ কিনা, ঠিক যে জিনিসটি ও যে দামটি বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বাজারে তাহা মিলে নাই। হতভাগাদের যদি মাথায় এক ফোঁটাও বুদ্ধি থাকে! একটা না পাইলে যে আর একটা আনিতে হইবে ইহাও আবার তাহাদের বলিয়া দিতে হইবে! বলা হয় নাই বলিয়া এত ঝঞ্ঝাটের উপর আবার কর্ত্তার মুখনাড়া! মৃণালিনীর চোখে জল আসিয়া গেল।

এদিকে দেখা গেল তুচ্ছ জিনিষের জন্য সব কটা খুচরা টাকা খরচ করিয়া সব কয়জন লোককে বাহিরে পাঠাইয়া আসল ফরমাসী মিষ্টান্ন ও অসময়ের ফল আনিবার জন্যই কর্ত্তা টাকা ও লোকের ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সে ব্যবস্থা হউক বা না হউক গৃহিণী এই সুযোগে কর্ত্তার পুরুষালি বুদ্ধিকে বেশ দুই চারিটা চোখা চোখা কথা শুনাইয়া লইলেন। যত দোষ মেয়ে মানুষের, আর বুদ্ধির ধ্বজা পুরুষের সাত খুন মাপ!

যাহা হউক, ছেলে বুড়া বউঝি চাকর বাকর সকলের মিলিত চেষ্টায় গণ্ডগোল অনেক বাড়িল বটে, কোনো আয়োজন হিসাবের ভুলে দুইবার হইল, কোনোটা মোটেই হইয়া উঠিল না ; তবু মোটের উপর বেলা তিনটার আগে বহিরের ঘরের উৎসব সজ্জা একরকম সমাপন হইল। তাহাতে রুচির পরিচয় থাকুক বা না থাকুক আড়ম্বরের পরিচয়টা নিতান্ত কম হয় নাই। ভিতর বাড়ীতেও বৈকা-লিক আহারের জন্য ফল, মিষ্টান্ন, সরবৎ লুচি তরকারিতে যাহা জমিয়া উঠিল, বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন গৃহিণী ও কর্ত্তার মনোমত ফর্দ্দের সব কটি তাহাতে না থাকিলেও এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে ষষ্ঠীধর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গকে তাহার সব কটি কেবল আস্বাদন করিতেই গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইত, এবং বাড়ী ফিরিবার সময় প্রত্যেকের ওজন অন্তত পক্ষে দুই সের করিয়া বাড়িয়া যাইত।

ভোর হইতে তরঙ্গিণী যেন পক্ষীমাতার মতন গৌরীকে বুকের আড়ালে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আদুরে ছোট মেয়েটিকে কি আটক করিয়া রাখা যায়? মা বার বার ডাকাডাকি করিয়া তাহাকে একটা বাজে খেলা কি কাজে লাগাইতে যান, সে বার বারই মলের শব্দে পথ কাঁপাইয়া ভিড়ের মাঝখানে গিয়া হাজির হয়।

ময়নাকে সাজানো হইতেছিল। আজিও সেই কয়মাস আগেকার উৎসবের দিনের মত প্রসাধন-নিপুণা লাবণ্যের হাতেই ময়নার রূপের উৎকর্ষসাধনের ভার পড়িয়াছিল। ঠিক তেমনই গহনা কাপড়ের স্তূপে ও তেল এসেন্সের শিশির অরণ্যে লাবণ্যের গৃহতল ও পালঙ্ক কণ্টকিত, তেমনই সখীজনের মন্তব্যে গৃহ মুখরিত, হাস্যে কলহে ও বচসায় আসল কাজের গতি রুদ্ধপ্রায়। সেদিনকার কথা হয়ত এক আধবার কাহারও মনে পড়িতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান আনন্দের স্রোতের মাঝখানে অতীত দুঃখ শোকের দিকে মানুষ সহজে ফিরিয়া তাকাইতে চায় না। হাসির হিল্লোলে তরুণীরা বিশেষ করিয়া অতীতকে যেন জোর করিয়া ঠেলিয়া ভাসাইয়া দিতেছিল। শুধু লাবণ্যের মুখখানা থাকিয়া থাকিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল। সে যে নিজের হাতে নিজের ক্ষুদে ননদটিকে এমনি করিয়াই

সাজাইয়াছিল। সে বালিকাও এমনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া এমনি নড়িয়া-চড়িয়া কথা বলিয়া একবারের সাজ দশবার খুলাইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল; এমনি বিদ্রোহ ও বিরক্তির মাঝখানেও মাঝে মাঝে আপনার কচি মুখের ও ক্ষুদ্র দেহের আড়ম্বরপূর্ণ প্রসাধন দেখিয়া সুখগর্ব্বে ছোট ঠোঁটখানি উল্টাইয়া নধর ঘাড়টী বাঁকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

তরঙ্গিণী একবার ঘরে ঢুকিয়া উদ্গত অশ্রুর উচ্ছ্বাস কোনো প্রকারে রোধ করিয়া ঘরের বাহিরে অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। কি জানি যদি মৃণালিনীর চোখে ধরা পড়েন!

ময়নার জন্য গহনা কিছু গড়ানো হয় নাই। অথচ আজ তাহাকে গাভরা গহনা ত পরাইয়া দেওয়া চাই। মা জ্যেঠির গহনা তাহার গায়ে বড় হয়; সুতরাং কিছু কিছু লাবণ্যর বিবাহের গহনা কিছু বা ময়নার মামাবাড়ী হইতে ধার করিয়া আনা গহনায় আজকার কাজ চালানো হইতেছিল। সেগুলি সবই প্রায় তাহার অঙ্গে একটু বেমানান দেখাইতেছিল। গৌরী প্রথম হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ময়নার সাজ সজ্জা দেখিতেছিল ও তাহার মা তাহাকে তিন চার বার ডাক দেওয়াতেও, সে নড়ে নাই। বাকী দু তিন বার কাজের ফরমাস করিয়াও দেখিলেন সে তাহা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আবার তখনই ফিরিয়া আসিল। ময়নার সাজ যখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে তখন লাবণ্য তাহাকে খাটের উপর বসাইয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ গৌরী ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর একটু পরেই ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া ময়নার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল। দুই তিন জন "হাঁ" "হাঁ" করিয়া উঠিল, "এই গৌরী, কি কচ্ছিস্ ওখানে? সরে যা ওখান থেকে, সব মাটি করিস্ না।" গৌরী সরিল না, কেবল বলিল, "দেখ না, ভালই কর্‌ছি।" সে টান মারিয়া ময়নার হাতের ঢিলাবালা জোড়া খুলিয়া ফেলিয়া নিজের জড়োয়া বালা জোড়া তাহাকে পরাইয়া দিল এবং মুক্তার একছড়া সরস্বতী-হার তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিল।

ময়নার মামী ও মাসী আজ এই সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। গৌরীর বিষয়ে সাবধান হওয়া তাঁহাদের অভ্যাস নাই। তাঁহারা দুইজনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আ পোড়াকপালী মেয়ে, কি কর্‌লি?" গৌরী চমকিয়া উঠিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। লাবণ্য মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "গৌরী, কেন তুমি সবতাতে হাত দিতে যাও! ছেলে মানুষ যা পার না তা কর্‌তে গিয়ে অন্যের কাজ বাড়িয়ে দেওয়া!" লাবণ্যর কথার সুরে একটু সহজ ভাবের চিহ্ন পাইয়া গৌরী সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "কেন, কি খারাপ করেছি? তোমরা ঢাকের মত গয়না পরাচ্ছিলে, আমি আমার কেমন ভাল গয়না পরিয়ে দিলাম!" ময়নার মা রাগ চাপিতে না পারিয়া বিরক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ভাল গয়না না ছাই গয়না।" বলিয়া টান দিয়া গৌরীর গহনা খুলিয়া খাটের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ময়না বেচারী ভয় পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এমন করিয়া সকলের কাছে কঠিন কথা শোনা গৌরীর জীবনে কখনও ঘটে নাই। সে অভিমান ভরে গহনাগুলা মেঝেতে আছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া রান্নাঘরে মা'র ঘাড়ের উপর পড়িয়া আক্রোশে অপমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মা অনেক করিয়া সান্ত্বনা দিয়া যখন আসল কথাটি শুনিলেন, তখন তিনিও বলিলেন, "আ আমার পোড়া কপাল, এই কর্‌তে তুমি আমার চাবি টেনে নিয়ে গেলে? কেন বাছা পরের কাজে অবুঝের মত হাত দিতে যাস্! তোকে নিয়ে আমার কি দুর্গতি যে হবে?"

গৌরী অবাক হইয়া গেল। আজ সকলেই তাহার উপর এমন বিরূপ কেন? ময়নার বিবাহ হইবে বলিয়া সে কি এমনই একটা হেয় জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ও ত বরং বেশী ঘটা করিয়াই বিবাহ হইয়াছিল। না ইহার ভিতর আর কিছু আছে। গৌরী কাঁদিয়া দিন কাটাইল। গৌরীর মা কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল চোখ মুছিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

যথাকালে ডবল ব্রেষ্ট সার্টের উপর হীরার বোতাম লাগাইয়া দুইহাতে চারিটা হীরার আংটি পরিয়া এবং

গলায় চুনট করা ঢাকাই চাদর দড়ির মত করিয়া পাকাইয়া জড়াইয়া আতরের গন্ধে দিক আমোদিত করিয়া সদলে সৃষ্টিধর আসিয়া উদিত হইলেন। উঠাইয়া, বসাইয়া, হাঁটাইয়া, চলাইয়া, রুমাল দিয়া মুখের পাউডার ঘসিয়া তুলিয়া, সামনে পিছনে ঘুরাইয়া নানারকমে ময়নাকে পরীক্ষা করা হইল, তারপর তাহাকে দুই চারিটা প্রশ্ন করিয়া বিদায় দিয়া বিপুল আহারপর্ব্ব চলিল। হরিসাধন ও হরিকেশব যখন হাঁপ ছাড়িয়া মনে করিতেছেন যে, এইবার বুঝি তাঁহাদের ব্রত উদ্যাপন হইয়া মুক্তি লাভ হইবে তখন সৃষ্টিধর হঠাৎ বলিলেন, "আমাদের বৌমাকে একবার দেখে যাব।" হরিসাধন শিহরিয়া উঠিলেন, হরিকেশব কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া শেষে বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন্, আন্‌ছি।"

তরঙ্গিণীর কাছে গিয়া হরিকেশব যখন বেহাইএর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, গৌরী তখনও কাঁদিতেছে। হরিকেশব তাহার কান্নার কারণ সংক্ষেপে শুনিয়া মুখটা বিকৃত এবং আরো গম্ভীর করিলেন। তারপর গৌরীকে বলিলেন, "এস মা, তোমাাক একবার ওরা দেখতে চাইছেন। প্রণাম ক'রে চ'লে আস্‌বে। তরঙ্গিণী বলিলেন "রোসো, একটু ঠিকঠাক ক'রে দি।" তিনি গৌরীর পায়ের ঝাঁঝ মল জোড়া খুলিয়া লইলেন, গায়ের গহনাও কিছু কমাইয়া লইলেন।

গৌরী নিজের গহনা দিয়া ময়নাকে সাজাইতে গিয়া আজ বড় অপমানিত হইয়াছে। তাহাকেও ইহারা দেখিতে চাহিয়াছেন শুনিয়া সে সুখী হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সে বলিল, "মা, ময়নাটা নাই বা পর্‌ল আমার গয়না! ওর বিচ্ছিরি গয়নাই থাক্; আমার সব ভালগুলো আমাকে পরিয়ে দাও।"

মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না, মা, আজ থাক্। আর একদিন দেব।" গৌরী চটিয়া কাঁদিতে লাগিল, "কেন তোমরা সবাই মিলে আজ আমার সঙ্গে লাগ্‌ছ? অমন কর্‌লে আমি থাক্‌ব না তোমাদের বাড়ীতে।"

মা কিছু না বলিয়া একখানা সাদাসিধা কাপড় আনিয়া গৌরীকে পরাইতে গেলেন। গৌরী টান মারিয়া সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। হরিকেশব মুখখানা ফিরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তারপর বলিলেন, "ও যা চাইছে, তাই না হয় দাও পরিয়ে।"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "সে হয় না।" আবার একখানা সাদা কাপড়ই বাহির করিলেন। গৌরী কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। হরিকেশব নিজের হাতে আলমারি হইতে একখানা দামী রঙ্গীন শাড়ী বাহির করিয়া গৌরীকে পরিতে দিলেন। গৌরী যথেষ্ট খুসী না হইলেও উঠিয়া সেইখানা পরিল। তরঙ্গিণী স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "ওগো, অমন কোরো না বল্‌ছি।"

হরিকেশব সে কথা না শুনিয়া গৌরীকে তুলিয়া লইয়া ভুলাইয়া বলিলেন, "আজ তারা এক্ষুণি চ'লে যাবে, গয়না টয়না থাক্‌গে মা; আর একদিন হবে।"

গৌরী গম্ভীর হইয়া পিতার সঙ্গে চলিল। পিছনে শুনিল, কে যেন বলিল, "বাবা, এত সাজ কিসের?"

সৃষ্টিধর গৌরীকে দেখিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, সঙ্গীরা মুচ্‌কিয়া হাসিল। গৌরীকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল সে ভাল করিয়া কিছুরই উত্তর দিল না, মুখ হাঁড়ি করিয়া রহিল। শেষ পর্ব্বটা কেমন যেন সব বেসুরা বাজিতে লাগিল। সৃষ্টিধর তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। হরিসাধন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "মেয়ে কি পছন্দ হয়েছে?" সৃষ্টিধর পরম গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলেন, "পরে ব'লে পাঠাব।" হরিসাধনের মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেল। গৌরী ঘরে আসিয়াই আবার হাত পা ছুঁড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

হরিকেশব তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া হরিসাধনের কাছে গিয়া বলিলেন, "সাধন, আমি কালই রাত্রে গৌরীদের নিয়ে তীর্থে যাচ্ছি। ময়নার বিয়ের জন্য যত টাকা দরকার হবে আমায় জানিও, আমি চেক দেব। কোনো রকম চেষ্টার ত্রুটি কোরো না। আমার জন্য যদি বাধে ত, আমাকে অনায়াসে সামাজিকভাবে প্রকাশ্যে বাদ দিতে পার।"

(ক্রমশঃ)

হজরত মোহম্মদ ও মোস্‌লেম জগতের ইতিহাস।*

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

পাদ টীকায় উল্লিখিত দুইখানি গ্রন্থের রচয়িতা খান বাহাদুর হাজি আহ্‌ছান উল্লা সাহেব শিক্ষাবিভাগের সহযোগী অধ্যক্ষ এবং বিশেষ ভাবে এদেশীয় মোসলমানগণের শিক্ষার তত্ত্বাবধাণের ভারপ্রাপ্ত।

তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ মোসলমান। স্বীয় গুরুর আদেশে গ্রন্থকার হজরত মোহম্মদের জীবনের ঘটনাবলী বিশেষভাবে অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং "বঙ্গবাসী মোসলমানের উপর হজরতের পবিত্র জীবনের বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না" বলিয়া তিনি ব্যথিত আছেন। বাঙ্গলার দরিদ্র এবং সাধারণ লোক যে এক সময় বহু পরিমাণে ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল (ইতিহাস ৩০০ পৃঃ) এবং বাঙ্গালা ভাষা যে তাঁহার "মাতৃভাষা" একথা স্বীকার করিতে গ্রন্থকার কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহার মার্জ্জিত এবং সুখপাঠ্য গদ্য রচনা, ভাষা-জননীর প্রতি তাঁহার সুদৃঢ় ভক্তির পরিচয় প্রদান করে। এই রচনায় নিবদ্ধ মূল্যবান তথ্য ছাড়াও এইরূপ একজন ব্যক্তির কথার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। দুই কোটির অধিক বাঙ্গালী মোসলমানের যাহা প্রাণের কথা যে কথা তাঁহারা সচরাচর ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ, হাজি আহ্‌ছন উল্লা সাহেবের গ্রন্থে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই নিমিত্তই অনধিকারী হইলেও আমি তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় দিতে সাহসী হইলাম।

এই দুইখানি গ্রন্থ স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইলেও এই দুইখানিকে একখানি গ্রন্থের হিসাবে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। মোসলেম জগতের ভিত্তি হজরত মোহম্মদ। মোহম্মদের জীবন-বৃত্তান্তও মোসলেম জগতের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় এবং প্রধান অধ্যায়। মোহম্মদের জীবন-বৃত্তান্তে মোসলেম জগতের ইতিহাসের সকল নীতি-সূত্র নিহিত আছে।

ইতিহাস আলোচনার উপকারিতা-সম্বন্ধে গ্রন্থকার দ্বিতীয় গ্রন্থের মুখবন্ধের গোড়ায় লিখিয়াছেন—

'ইতিহাস জাতীয়-জীবনের প্রধানতম উৎস এবং স্বীয় ইতিহাস-আলোচনা জাতীয় উন্নতির সুপ্রশস্ত সোপান। ইতিহাস অতীতের আবরণ উন্মোচন করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনযুদ্ধের ধারার সন্ধান বলিয়া দেয়, এবং তাঁহাদের গুণগরিমার এবং বীরত্ব ও মহত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদিগকে সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিবার শক্তি প্রদান করে। বঙ্গদেশে কোটি কোটি মোসলমানের বাস, অথচ মোসলেম ইতিহাস-সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় কোন বিশ্বস্ত পুস্তক দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রধানতঃ ইহারই অভাবে বঙ্গীয় মোসলমান অন্য দেশীয় মোসলমান অপেক্ষা অনুন্নত ও হীনবল।'

ইতিহাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ইতিহাসচর্চ্চা জাতীয় আত্মজ্ঞান লাভের, জাতীয় জীবনের গতিবিধির সহিত সুপরিচিত হইবার প্রধান উপায়। যে জাতি আপনাকে চিনে না, জাতীয় জীবনের ধারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কোন্ খাতে প্রবাহিত হইতেছে তাহা জানে না, সেই জাতি আপনার ভবিষ্যতের পথও ঠিক চিনিয়া লইতে পারিবে না। পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ-গরিমার এবং বীরত্ব ও মহত্বের আদর্শই যে শুধু আমাদিগকে জীবন-যুদ্ধে জয় লাভ করিবার সহায়তা করিতে পারে তাহা নয়, পূর্ব্বপুরুষগণের স্খলন-পতনের কথাও আমাদিগকে স্খলন-পতন হইতে রক্ষা করিতে পারে। মুখবন্ধের অপর অংশে গ্রন্থকার ভারতবাসী হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের ইতিহাসের আলোচনার উপকারিতা-সম্বন্ধে আরও একটি গুরুতর কথা লিখিয়াছেন। যথা—

"ভারতে হিন্দু ও মোসলমানের একতা লইয়া ইদানীং চতুর্দ্দিকে একটা বিষম রোল উঠিয়াছে। যে পর্য্যন্ত হিন্দু ও মোসলমান পরস্পরের ইতিহাস ও পূর্ব্বগৌরব অনবগত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত হিন্দু-মোসলমানের মধ্যে প্রীতি সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। উহারা যে একই মাতৃগর্ভজাত যমজ ভাই, উহাদের প্রত্যেকেরই যে উজ্জ্বল গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস আছে, তাহা পরস্পরের জানা একান্ত আবশ্যক। উভয়েরই এক আর্য্য আদি-পুরুষের বংশধর এবং মধ্য-এশিয়া যে উভয়েরই আদিম আবাস ভূমি, এ কথা স্মরণ করিয়া পরস্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস করাই উভয়ের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে বিমুখ হইলে বিধাতার বিধানেরই প্রতিকূল আচরণ করা হইবে এবং তাহাতে ভারতের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল সংঘটিত হইবে না।" (থ পৃঃ)

হিন্দু মোসলমানের একতা সম্বন্ধীয় বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে একটা কথা বেশ বুঝা যায়। কথাটা এই, হিন্দু মোসলমানের মধ্যে একতার অভাব এখন অনেকেই তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এইরূপ অবস্থা কি বরাবরই ছিল? আমাদের পিতৃপিতামহেরাও কি হিন্দু-মোসলমানের একতার অভাব অনুভব করিয়া গিয়াছেন? আমাদের এবং আমাদের পিতৃপুরুষদিগের হিসাবকিতাবের (angle of vision) মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সহরবাসী, স্বরাজ-প্রয়াসী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন পল্লীবাসী, পল্লীর বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন, পল্লীর প্রচলিত বাদ-প্রবাদ ও রীতি-নীতির একান্ত অনুরক্ত। এই রীতি-নীতির মধ্যে পল্লীর স্বরাজ একটা জীবন্ত পদার্থ ছিল। হিন্দু-মোসলমানের শাস্ত্রমূলক ধর্ম্ম পৃথক্ হইলেও একই গ্রাম্য লৌকিকধর্ম্মে উভয় সম্প্রদায়ের অল্পবিস্তর আস্থা ছিল। গ্রামের গাজন, গ্রামের গাজীর গীত, গ্রামের পীরের সিন্নি, গ্রামের বারোয়ারী কালীপূজা, গ্রামের শীতলা-পূজা উভয় সম্প্রদায়ের সহায়তাই সম্পন্ন হইত। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া এদেশীয় মোসলমানগণকে গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা বিষয়ে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনকালে গ্রামের একতার ভিত্তি ছিল "গ্রাম-সম্বন্ধ"। গ্রামের সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোক আপনাদিগকে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত একপরিবারভুক্ত জ্ঞান করিতেন এবং কোথাও কোথাও এখনও করেন। বাঙ্গালার প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থে দেখা যায় এই গ্রাম-সম্বন্ধ একবার নবদ্বীপ নগরকে গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে সোলতান সৈয়দ হুসেনশাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন যে মহাপুরুষ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, নবদ্বীপের সেই নিমাইপণ্ডিত নবদ্বীপে খোল

---

* (১) 'ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' (২) 'মোছলেম জগতের ইতিহাস,' বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য, খান্ বাহাদুর আল্‌হজ্জ মৌলবী আহ্‌ছান উল্লা এম্-এ; এম্, আর, এস, এ; আই, ই, এস্ প্রণীত, ১৯২৫।

করতাল বাদন সহ হরিসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। প্রতি রাত্রিতে শ্রীবাসের অঙ্গনে সংকীর্ত্তন চলিতেছিল। সংকীর্ত্তনের কোলাহলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং শেষে নিমাই পণ্ডিত এবং তাহার ভক্তগণের সহিত নবদ্বীপের কাজীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দুইখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ—বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত" (মধ্য খণ্ড, ২৩ অধ্যায়) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য চরিতামৃত" (আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ) মিলাইয়া পড়িলে এই বিরোধের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস বিবাদের সূচনার এই প্রকার বিবরণ দিয়াছেন—

একদিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥
হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিগে মাত্র।
শুনিঞা স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বোলে "ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য্য॥"

আথেব্যাথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বোলে "হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাঙ আজি, দৈবে হৈল রাতি।
আরদিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি॥"
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥

অন্যান্য হিন্দুরা কাজির এই দৌরাত্ম্যে বরং সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলাবলি করিতে লাগিলেন—

কেহো বোলে "হরিনাম লৈব মনেমনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কেমন পুরাণে॥
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
'জাতি' করিয়াও এ-গুলার নাহি ভয়॥
নিমাঞিপণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥

নিমাই পণ্ডিত ভক্তগণের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—

"নিত্যানন্দ! হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন্ জন॥
দেখ আজি কাজির পোড়াও ঘরদ্বার।
কোন্ কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥
* * * *
ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিমু, দেখোঁ কোন্ কর্ম্ম করে॥"

সন্ধ্যার পর নিমাই পণ্ডিত বিরাট এক দল লইয়া নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। ইহা দেখিয়া অবৈষ্ণব বা পাষণ্ডীগণ বিশেষ দুঃখিত হইলেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

সকল পাষণ্ডী মেলি গণে' মনে মনে।
"গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখনে॥
কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ, কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় নাট গীত, কোথা যায় জাঁক॥
* * * *
গণ্ডগোল শুনিঞা আইসে কাজি যবে।
সভার গঙ্গায় ঝাঁপ দেখিবাও তবে॥"
* * * *
কেহো বোলে "চল যাই কাজিরে কহিতে।"
কেহো বোলে "যুক্ত নহে এমত করিতে॥"

ক্রমে, সংকীর্ত্তনের দল লইয়া,

কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
কাজি বোলে "জান' ভাই! কি গীত বাদন,
কিবা কারো বিভা', কিবা ভূতের কীর্ত্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি আর তবে চলিব আপনি॥"

কাজির দূতগণ ফিরিয়া সংবাদ দিল—

"যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
আজি 'কাজি মার' বলি আইসে তাহারা॥
একো যে হুঙ্কার করে নিমাঞি-আচার্য্য।
সেই সে হিন্দুর ভূত, এ তাহার কার্য্য॥"

এখানে 'ভূত' শব্দ বোধ হয় ফারসী 'বুত' শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজি এই সংবাদ শুনিয়া বিচলিত হইলেন না। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

কাজি বোলে "হেন বুঝি নিমাঞি পণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত॥
এবা নহে—মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সভার নগরে॥"
(এই মত যুক্তি কাজি করে সর্ব্ব-গণে।
মহাবাদ্য কোলাহল শুনি ততক্ষণে॥)

ক্রমে, নিমাই পণ্ডিতের বিরাট সংকীর্ত্তনের দল আসিয়া কাজির বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কাজি এবং তাহার অনুচরগণ ভয়ে পলায়ন করিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, নিমাই পণ্ডিত তখন ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "কাজিকে ধরিয়া আনিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেল, তাহার ঘর দুয়ার ভাঙ্গ, বাড়ীর ভিতর আগুন দিয়া সর্ব্বগণ সহ কাজিকে পোড়াইয়া মার," ইত্যাদি—নিমাই পণ্ডিতের ভক্তগণ প্রথমতঃ কাজির ঘর ও বাগান ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তারপর গলবস্ত্র হইয়া স্তবস্তুতি করিয়া প্রভুর ক্রোধ শান্ত করিল। তখন তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতে সদলবলে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কাজি যে তখন কি করিলেন সে বিষয়ে বৃন্দাবন দাস কিছুই লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ অসম্পূর্ণ। বৃন্দাবন দাস কাজির দণ্ডসম্বন্ধে নিমাই পণ্ডিতের মুখে যে সকল বাক্য আরোপ করিয়াছেন তাহা তাঁহার চরিত্রের সহিত খাপ খায় না। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই ঘটনার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অধিকতর সুসঙ্গত। তিনি (তৎকালে চৈতন্যমঙ্গল নামে পরিচিত) চৈতন্য-ভাগবত হইতে যতটা গ্রহণ করিবার যোগ্য তাহা গ্রহণ

করিয়াছেন এবং স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া তথ্য নিরূপণ করতঃ এই ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

এইমত কীর্ত্তন করি নগর ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কাজির বহির্দ্বারে গেলা॥
তর্জে গর্জে নগরিয়া করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্রে বলে লোক প্রশ্রয় পাগল॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনি কাজি লুকাইল ঘরে।
তর্জন-গর্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজির ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্য লোক পাঠাই কাজিরে বোলাইলা॥
দূরে হৈতে আইসে কাজি মাথা নোওাইয়া।
কাজিরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু কহে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলে এ ধর্ম্ম কেমত॥
কাজি কহে শুনি তুমি আইস ক্রুদ্ধ হৈঞা।
তোমা শান্ত করাইতে রহিলাঙ লুকাইঞা॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে আমি মিলিলাঙ।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাঙ॥
গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥

কাজি সাহেব এবং নিমাই পণ্ডিত পরস্পরের মধ্যে দেহ-সম্বন্ধ হইতে সাচা গ্রাম-সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া পরস্পরের বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে বসিলেন। কাজি ও নিমাই পণ্ডিতের কথোপকথনের যে বিবরণ চৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায় তাহাতে নানাপ্রকারে যে বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইবে এবং কোন কোন অলৌকিক ঘটনারও উল্লেখ থাকিবে এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহার অন্তর্গত লৌকিক ঘটনার বিবরণ প্রকৃত ইতিহাস। কাজি বলিলেন কীর্ত্তনে যে সুধু মোসলমানেরাই আপত্তি করিয়াছেন তাহা নয় হিন্দুদেরও আপত্তি আছে। যথা—

"হেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥
আসি কহে হিন্দু ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কাহো শুনি নাই॥
মঙ্গল চণ্ডী বিষহরী করি জাগরণ।
তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালাল বিপরীত॥
উচ্চকরি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাইয়া মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
নিমাই ছাড়ি এবে বলায় গৌরহরি।
হিন্দু ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজার॥
হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সভে তোমার জন।
নিমাই-বোলাঞা তারে করহ বর্জ্জন।
তবে আমি প্রীত বাক্য কহিল সভারে।
সব ঘরে যাহ আমি নিষেধিব তারে॥ (১২৫ পৃঃ)

উপসংহারে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন—

"প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়।
কীর্ত্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়॥
কাজি কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজি উল্লাসিত মন॥
কাজিরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইল আপন ভবন॥
এই মত কাজিরে প্রভু করিল প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥ (১২৬ পৃঃ)

কাজি যদি নিমাই পণ্ডিতের অনুরোধ রক্ষা না করিতেন তবে যে কি হইত তাহা বলা যায় না।

চৈতন্য দেবের জীবনচরিত গ্রন্থনিচয়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার হিন্দু-মোসলমানের পরস্পরের সম্বন্ধের যে চিত্র পাওয়া যায় এই বিংশ শতাব্দেও বাঙ্গলার অনেক নিভৃত পল্লীতে সে দৃশ্য দেখা যাইতে পারে। কিন্তু গোল উপস্থিত হইয়াছে ইংরেজী-নবীশ হিন্দু-মোসলমানের মধ্যে। শিক্ষিত হিন্দু-মোসলমানের মন পল্লীর সঙ্কীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করিয়া এখন অনেক বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং এই বিস্তৃতির টানে সাবেকী 'দেহ সম্বন্ধ হইতে সাচা গ্রাম-সম্বন্ধ' বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। গ্রাম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্যভাব ত্যাগ করিয়া আমরা সিটিজেন বা রাষ্ট্রীয় মানুষ হইতে চলিয়াছি। এখন এই রাষ্ট্রীয় পথ হইতে মনকে গ্রাম্যভাবে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার কোনও উপায় নাই। আবার সহরের হাওয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামের ভাবের হাওয়াও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছে। সুতরাং সহর ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া গেলেও সে দিন আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। বর্ত্তমান হিন্দুমোসলমানের মধ্যে ঐক্য এবং অনৈক্য যমজ ভাই। যে দিন কথা উঠিয়াছে, হিন্দুমোসলমানে ঐক্য আছে, তাহারা উভয়ে মিলিয়া এক নেশ্যান, সেই দিনই সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি উঠিয়াছে হিন্দুমোসলমানের ঐক্য নাই তাহারা স্বতন্ত্র দুইটি নেশ্যন। তারপর ঐক্যবাদীদিগের প্রার্থনা বা আন্দোলন অনুসারে যখন যে নূতন বিধিব্যবস্থা হইয়াছে তখন সঙ্গে সঙ্গেই অনৈক্য-জনিত অপকারের প্রতীকারের বিধানও করা হইয়াছে। এখন স্বরাজের উদ্যোগ-পর্ব্বে একদিকে চলিয়াছে কালনেমির লঙ্কাবাঁটের মোসাবেদা, আর এক দিকে চলিয়াছে পরস্পরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহের পরামর্শ। মূলতঃ এসকল প্যাক্ট বা পরামর্শ ভোট ধরিবার ফাঁদ হইলেও ফল উৎপন্ন করিতেছে বিষময়। এখন একদল কর্ম্মীর

স্বরাজ্যের ভাগ-বাটোয়ারার কথা ছাড়িয়া দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের বিলুপ্ত প্রায় আত্মীয়তা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্ব-আত্মীয়তা পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে পরস্পরের পূর্ব্বকথা, পরস্পরের ইতিহাস, পুনরায় স্মরণ করা উচিত, পরস্পরকে আরও ভাল করিয়া চিনিতে চেষ্টা করা উচিত। হাজি আহ্‌ছান উল্লা সাহেবের গ্রন্থাবলী বাঙ্গালী হিন্দুকে বাঙ্গালী মোসলমানকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ দিয়া এই মহৎকার্য্যের সহায়তা করিবে।

"ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ" গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইসলামের স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। ইসলাম শব্দের অর্থ নিবেদন বা সমর্পণ। যে ভগবানে আত্ম-নিবেদন করে সে মোসলেম বা মোসলমান। ইসলামের ভক্তি বৈষ্ণবের দাস্য ভক্তির অনুরূপ। ইহুদীর ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ইসলাম তত্ত্বজ্ঞানের একই মূল প্রস্রবণ সেমিটিক জাতির স্মৃতি (tradition) হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন ধারায় বা একই ধারার বিভিন্ন ভাগের আকার ধারণ করিয়াছে। এই ধারা আদমের সময় উৎপন্ন হইয়া ইব্রাহিম (Abraham), মুসা (Moses) ঈশার (Jesus) সময়ে ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া হজরত মোহম্মদের সময়ে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

হজরত মোহম্মদের জীবনের দুইদিক। একদিকে তিনি পরম সাধক ছিলেন এবং আপনার শিষ্যগণকে সাধনমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতে রত ছিলেন। আর একদিকে, ঘটনাচক্রে তিনি আরব-জাতির নায়কতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং নায়করূপে তিনি আরব-জাতিকে ঐহিক উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মোহম্মদের সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"অনেক সময় তাঁহার "রূহানী গলবা" (আধ্যাত্মিক প্রেরণা) এত অধিক হইত যে, তাহাতে মাসাধিক কাল তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য থাকিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেন ও আত্মহারা হইতেন। যখন তিনি অত্যধিক অস্থির হইয়া পড়িতেন, তখন হজরত খোদেজার নিকট দৌড়িয়া আসিতেন ও স্বীয় উদ্বিগ্নতার কথা প্রকাশ করিতেন। কখনও কখনও তিনি উন্মত্তের ন্যায় পড়িয়া যাইতেন, কখনও কখনও বা স্পন্দহীন হইতেন। অতি শীতের দিনেও তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িত ও চেহারাতে রওনক (জ্যোতিঃ) আসিত। বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিত।" (ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ, ৭৭-৭৮ পৃঃ)।

মোহম্মদের এইপ্রকার অবস্থার কারণ লইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকদিন যাবৎ বাদানুবাদ চলিতেছে। স্প্রেঙ্গার, নোল্দিক, পামার, মার্গোলিথ, ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে মোহম্মদের এই অবস্থা অপস্মার বা এই শ্রেণীর ব্যাধির ফল। গোজে (de Goege) এবং স্নুক হুরগ্রোঞ্জে (Snouck Hourgrounge) এই মতের সমর্থন করেন না। শেষোক্ত পণ্ডিত বলেন, মোহম্মদ কর্ত্তৃক ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ, দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষার স্বাভাবিক ফল। অল্প দিন হয় (১৯২৪) জন ক্লার্ক আর্চার নামক একজন এমেরিকা দেশীয় পণ্ডিত (John Clark Archer) Mystical Elements in Mohammed নামক একখানি পুস্তকে এই বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার সিদ্ধান্ত এই, তৎকালে আরবদেশের পার্শ্ববর্ত্তী সভ্যদেশ-নিচয়ে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সাধুসন্ন্যাসীরা এমন সকল ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন যাহার ফলে তাঁহাদের সমাধি হইত এবং ভাবাবেশ হইত। মোহম্মদও এই প্রকার অনুষ্ঠানের ফলে ভাবাবিষ্ট হইতেন এবং তখন তিনি পরমেশ্বরের বাণী শুনিতে পাইতেন। বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবেরা এই প্রকার অবস্থাকে বলে "প্রেম-ভক্তি-বিকার" বা মহাভাব। নিমাই পণ্ডিতে যখন এই সকল লক্ষণ প্রথম লক্ষিত হইয়াছিল তখন—

> কেহো বোলে "হইল দানব অধিষ্ঠান।"
> কেহো বোলে "হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥"
> কেহো বোলে "সদাই করেন বাক্য ব্যয়।
> অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়॥"
>
> চৈতন্যভাগবৎ, ১.৮

তারপর বায়ু-রোগের চিকিৎসাও আরম্ভ হইয়াছিল। চৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন জীবনের শেষ বার বৎসর কাল চৈতন্যদেব এইরূপ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায়ই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যথা—

> "শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
> কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর॥
> নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে।
> হাসে কাঁদে নাচে গায় পরম বিষাদে॥"

মোহম্মদের ন্যায় প্রেমভক্তির সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষের চরিত্র মানব সমাজের সাধারণ আইন কানুনের দ্বারা বিচার করা যাইতে পারে না। যাঁহারা তাঁহার জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী জানিতে চাহেন তাঁহারা হাজি আহ্‌ছান উল্লা সাহেবের প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। যাঁহারা মোহম্মদের জীবনী সম্বন্ধে অতি আধুনিক পাশ্চাত্য মতের সার কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা অধ্যাপক বেভেন সঙ্কলিত বিবরণ (The Cambridge Medieval History, vol. II, chapter x) পাঠ করিতে পারেন। মোহম্মদ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগের বিরোধী ছিলেন এবং বিবি খোদেজার মৃত্যুরপর তিনি ৮ জন রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি ভোগসুখ-বিরাগী ত্যাগী-পুরুষ ছিলেন। আর্চার লিখিয়াছেন—

"Goldziher is doubtless right when he says that Muhammad's thoughts certainly lay nearer those sayings in which zuhd, abestention from every thing wordly, is commended as a great virtue...... Both his thoughts and his conduct—save in the matter of his frequent marriages—did lie nearer Zuhd.(p. 55)

মোহম্মদের বহু বিবাহ এখনকার হিসাবে বিচার করিলে সুবিচার করা হইবে না, সপ্তম শতাব্দীর আরবগণের হিসাবে বিচার করিতে হইবে। এ-বিষয়ে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন (১৬০—১৬২ পৃঃ) অমোসলেমের পক্ষে তাহার সকল কথা স্বীকার করা কঠিন হইলেও, অনেক কথাই বিবেচনার যোগ্য। মোহম্মদ আপনার অন্তর্নিহিত বৈরাগ্যের ভাব আপনার প্রধান শিষ্য শহাবা বা সহচরগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া ছিলেন। মোহম্মদের দেহত্যাগের পর মহাত্মা আবু বকর খলিফা বা মোসলেমগণের নেতার পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আবুবকর অন্তিম সময়েওমরকে স্বীয় উত্তরাধিকারীর পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ওমর একদিকে যেমন ত্যাগী ভক্ত ছিলেন, আর একদিকে তেমনি সাম্রাজ্য-গঠন এবং লোক-শাসন বিষয়ে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিল। ইতিহাসে একাধারে এরূপ মহৎগুণের একত্র সমাবেশ সুলভ নহে। ওমর ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজর্ষিগণের অগ্রণী।

যদি মোহম্মদ, আবু বকর, ওমর এমন অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন, তবে তরবারির সহায়তায় ইসলাম প্রচার করিতে গেলেন কেন এবং লোক ক্ষয় করিয়া সাম্রাজ্য গড়িতে আরম্ভ করিলেন কেন? বস্তুতঃ এই সকল

মহাপুরুষ তরবারির সহায়তায় ইস্‌লাম প্রচার করেন নাই এবং স্বেচ্ছায় তাঁহারা লোকক্ষয় করিয়া সাম্রাজ্য গড়িতেও চাহেন নাই। আমাদের আলোচ্য প্রথমোক্ত গ্রন্থে হাজি আহ্‌ছান উল্লা সাহেব অসি-সাহায্যে ইসলাম বিস্তৃতির অপবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন (১৭৭-১৭৮ পৃঃ; ২২১-২২৪ পৃঃ)। মোহম্মদের প্রচারক-জীবনের দুই যুগ। প্রথম যুগে (৬১০-৬২২ খৃষ্টাব্দ) তিনি মক্কায় শত্রু কোরায়েশগণের মধ্যে থাকিয়া ইস্‌লাম প্রচার করিয়াছিলেন। তখন যাঁহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই প্রাণের ভয়ে ইস্‌লাম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াই ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। হিজরা বা মদিনায় আশ্রয় লওয়ার পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত (৬২২-৬৩২ খৃষ্টাব্দ) মোহম্মদের প্রচারক-জীবনের দ্বিতীয় যুগ। মদিনাবাসী অন্সার বা সহায়কারিগণ স্বেচ্ছায় মোহম্মদ এবং তাঁহার সহচর মুহাজিরুন বা হিজরাকারিগণকে আশ্রয় দিয়া গুরুতর বিপদ স্কন্ধে লইয়াছিলেন। মোহম্মদ মদিনায় আশ্রয় লইয়া কোরায়েশগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু সে যুদ্ধ ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য নহে প্রাণের দায়ে। ছয় বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর মোহম্মদ মক্কার কোরায়েশগণের সহিত হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি (সোল্‌হে) করিয়াছিলেন তাহা বিজয়ী যোদ্ধার সন্ধি নহে, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" সম্পাদিত সন্ধি ("ইছ্‌লাম ও আদর্শ মহাপুরুষ," ১৪৭-১৪৯ পৃঃ)। ওমর এই সন্ধির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বিচক্ষণ আবুবকর বলিয়াছিলেন, "আমাদের বুদ্ধি এ বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার গূঢ় কৌশল আল্লা ও তাঁহার রসুলই জানেন।" হোদায়বিয়ায় সোল্‌হেনামা নির্ব্বিবাদে মক্কা অধিকারের এবং কোরায়শগণের মধ্যে ইস্‌লাম প্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। কথিত আছে হোদায়বিয়ায় সন্ধির পর মোহম্মদ রুমের (Constantinople) সম্রাট, পারস্যের সাহ এবং অন্যান্য নৃপতিগণের নিকট দূতের মারফত ফারমাণ পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে ইস্‌লাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন (১৪৯,১৫০ পৃঃ)। এই প্রবাদ সম্বন্ধে অধ্যাপক বেভেন লিখিয়াছেন,—

"But the evidence for this story is by no means satisfactory, and the details present so many suspicious features that it may be doubted whether the narrative rests on any real basis."

এই ফারমাণের সহিত হোদায়বিয়ায় সোল্‌হেনামার সামঞ্জস্য বিধান করাও কঠিন।

মোহম্মদের উত্তরাধিকারী খালিফাগণও ইস্‌লামের বিস্তারের জন্য তরবারি ধারণ করিতেন না। অধ্যাপক বেকার (C. H. Becker, Professor of Oriental History in the Colonial Institute of Hamburg, The Cambridge Medieval History, vol. II, chapter X I.) লিখিয়াছেন—

"It was not the religion of Islam which was by that time disseminated by the sword, but merely the political sovereignity of the Arabs. The acceptance of Islam by others than Arabians was not only not striven for, but was in fact regarded with disfavour."

অর্থাৎ তরবারির সহায়তায় ইস্‌লাম প্রচারিত হয় নাই; তরবারির সহায়তায় আরবগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। খলিফাগণের সময়ে আরব ছাড়া অন্য কোন জাতির লোকের মধ্যে ইস্‌লামের বিস্তার কর্ত্তৃপক্ষ পছন্দ করিতেন না। আরবগণের আধিপত্য বিস্তৃত করিবার জন্যও মহাত্মা আবুবকর ও ওমর ব্যস্ত ছিলেন না। যে সকল যুদ্ধের ফলে পারসীক সাম্রাজ্য এবং সিরিয়া (সাম) খলিফার পদানত হইয়াছিল, সেই সকল যুদ্ধ আদৌ সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য আরম্ভ করা হয় নাই। সিরিয়া বিজয় সম্বন্ধে অধ্যাপক লিখিয়াছেন—

"It was not the sagacity of the Caliphs, wanting to conquer the World, that flung Muslim host on Syria, but the Christian Arabs of the Border districts who applied to the powerful organisation of Medina for assistance."

ইস্‌লামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাবধিই মরুবাসী আরবগণ দলে দলে গিয়া রোমের সম্রাটের বা পারস্যের শাহের এলাকার অন্তর্গত উর্ব্বর প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উভয় সাম্রাজ্যের সীমান্তবাসী আরবগণের সহিত সীমান্তরক্ষকগণের বরাবরই বিবাদ বিসম্বাদও চলিতেছিল। মদিনার মোসলেম শক্তির অভ্যুদয়ের এবং আরব জাতির মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভের পর সীমান্তবাসী আরবগণ সর্ব্বদাই মদিনার দরবার হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। পারসীক সাম্রাজ্যের (ইরাকের) সীমান্তবাসী বানুসাইবান বংশীয় আরবগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও অনেক ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষে খালিফা ওমর পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। খালিফা ওমরের পর খিলাফতে বংশগত স্বার্থপরতার কীট প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং তখনকার ইতিহাসের ধারা স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই ইতিহাসের আলোচনার অবকাশ আমাদের নাই। মোসলেম অভ্যুদয়ের যুগের মোসলেমগণের সহিত য়ুরোপীয়গণের তুলনা করিয়া অধ্যাপক বেকার দেখাইয়াছেন, য়ুরোপ অপেক্ষা মোসলেম জগতে তখন পাপাচারণের মাত্রা কোনও ক্রমে বেশী ছিলনা, কিন্তু মোসলেম জগতে তখন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল য়ুরোপে তাহা লক্ষিত হইত না। য়ুরোপে তৎকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কিছু চর্চ্চা ছিল, তাহার জন্য য়ুরোপ মোসলেমজগতের নিকট ঋণী ছিল। য়ুরোপের ইতিহাসের যে যুগকে মধ্য-যুগ বলে সেই যুগে সভ্যতার বা শিক্ষাদীক্ষার হিসাবে মোসলেম-জগৎ য়ুরোপ অপেক্ষা উন্নত ছিল। তার পর—

"It was later on that the western land produced from its own inner self a new world, whilst the East has never since attained a higher pitch of excellence than that which immediately followed the Saracen expansion." (Cambridge Medieval History, vol. II, Chapter XII)

খৃষ্টীয় ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ওস্‌মান বংশীয় সোলতান্‌ দ্বিতীয় মোহম্মদ কর্ত্তৃক কনষ্টাণ্টীনোপল অধিকৃত হইবার পর গ্রীক্‌ শিল্প, গ্রীক্‌ সাহিত্য, গ্রীক্‌ দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুশীলন ফলে পশ্চিম য়ুরোপে যে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহার প্রেরণায় গত চারি শত বৎসর যাবৎ য়ুরোপ উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু মোসলেম-জগৎ তৎপূর্ব্বে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল এখনও যেন সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে। তদবধি যে তুর্ক জাতি মোসলেম জগতে প্রাধান্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা সামরিক বিদ্যায় য়ুরোপের সমকক্ষ হইলেও, অসামরিক বিদ্যা-নিচয়ের (arts of peace) অনুশীলনে য়ুরোপের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। যদি মোসলেম জগৎ আবার অভ্যুদয় কামনা করে তবে যে য়ুরোপ এক সময় অসামরিক বিদ্যার অনুশীলনে তাহার সাগরেদী করিয়াছিল, মোসলেম জগৎকে বর্ত্তমানে শ্রদ্ধা-সহকারে সেই য়ুরোপের সাগরেদী করিতে হইবে।

মোসলেম জগতের ভাগ্য চক্রের সহিত আর্য্যাবর্ত্তের মোসলমানগণের ভাগ্যচক্রের কতটা সম্বন্ধ সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া এ সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনটি স্বতন্ত্র শক্তি মানুষের ভাগ্যচক্র নিয়মিত করে। তন্মধ্যে প্রথম মানুষের জন্ম-কর্ম্ম-ক্ষেত্রের মাটি, জল, বায়ু, ফল, ফুল, ইত্যাদি অর্থাৎ নৈসর্গিক আবেষ্টন (physical environment); দ্বিতীয়, বংশগত ধাত বা প্রকৃতি (heredity), তৃতীয় শিক্ষা-দীক্ষা। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটি একত্রে নিয়তি নামে অভিহিত হইতে পারে, কারণ শিক্ষা দীক্ষার সহায়তায় ঐ দুটি শক্তির শাসন লঙ্ঘন করা সকল সময় অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য। ইসলাম এক প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা। পৃথিবীতে যত প্রকার শিক্ষা-দীক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তন্মধ্যে মানব চরিত্রের উপর ইসলামের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর হইলেও ইসলাম যে নিয়তির বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিতে পারে একথা স্বীকার করা যায় না। ইসলাম নৈসর্গিক আবেষ্টনের প্রভাব ধ্বংস করিয়া, বংশগত মতিগতি উন্মূলিত করিয়া মক্কার কোরায়েশ সমাজে বনু হাসিম বংশের সহিত উম্মায়া বংশের ঐক্য সাধন করিতে পারে নাই, ইস্লাম আরব দেশে বেদুইনকে কোরায়েশের সহিত মিশাইতে পারে নাই, উম্মায়া খালিফার সাম্রাজ্যে পারসীককে আরবের সহিত মিশাইতে পারে নাই, আব্বাস খালিফার সাম্রাজ্যে তুর্ককে পারসীকের সহিত মিশাইতে পারে নাই। আমি এখানে শোণিত-মিশ্রণের কথা বলিতেছিনা, সভ্যতার মিশ্রণের কথা বলিতেছি, পুরুষ পরম্পরাগত মতি গতির সামঞ্জস্যের কথা বলিতেছি। কোরায়েশ সমাজে বনু হাসিম বংশীয় হজরত মোহম্মদের প্রধান প্রতিযোগী ছিলেন উম্মায়া বংশীয় আবু সুফিয়ান্। মোহম্মদের পর বনু হাসিমের নায়ক, মোহম্মদের খুল্লতাত পুত্র এবং জামাতা আলির প্রতিযোগী দাঁড়াইলেন আবু সুফিয়ানের পুত্র মারিয়া। ইসলামের শিক্ষা, এবং মহাত্মা আবুবকরের ও রাজর্ষি ওমরের মহৎ দৃষ্টান্ত কোয়ায়েশ-গণের পুরুষ পরম্পরাগত দলাদলি মিটাইতে পারিল না। মোসলেম জগতের ইতিহাসে নিয়তির লীলা চলিতে লাগিল। আর্য্যাবর্ত্তের মোসলমানগণ যদি অতীতের এই ইঙ্গিত, নিয়তির নীতি বিস্মৃত হয়েন, তাঁহাদের দেহ যে গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধুর ধারে বিগলিত, জননী-জন্ম-ভূমির স্তন্যে পরিপুষ্ট, তাঁহাদের চিত্ত যে উত্তরাধিকারী-সূত্রে আগত আর্য্যসভ্যতার ধারায় স্নাত, এই কথা বিস্মৃত হইয়া যদি তাঁহারা কেবল মোসলেম জগতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন, তবে তাঁহারা যে উন্নতির পথে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিবেন, এমন মনে হয় না।

সত্যেন্দ্র প্রসঙ্গ

শ্রী সুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আজ তিন বৎসর হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার দান বাংলা সাহিত্যের একটি মণি-কোঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠ প্রেমের গভীরতা কতখানি ছিল, তাঁহার স্থান বাংলা সাহিত্যের দরবারে কোথায়, তাঁহার বৈশিষ্ট্য কি—এসব যথাক্রমে নানা আলোচনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিবে আশা করা যায়। আজ হঠাৎ তাহা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা উচিত হইবে না। বছরে বছরে অনেক বর্ষার পলি পড়িবে, অনেক কিছুই ধুইয়া মুছিয়া যাইবে, কালের মাপকাঠি তাহার পর একদিন জানাইয়া দিবে যে, তাঁহার স্থান কোথায়।

ভবিষ্যতে যিনি রবীন্দ্র-যুগ-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন এ গৌরবময় গুরুভার তাঁহাকেই লইতে হইবে। কারণ রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রশিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট আসন দখল করিয়াছিলেন।

দেশের ও বিদেশের এমন অনেক কবি ও সাহিত্যিকের নাম করা যাইতে পারে, পরিণত বয়সে ক্ষমতার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে নানা ধারায় যাঁহাদের লেখনী-মুখে মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িয়াছে,—তাঁহাদের বাল্যে বা কৈশোরে সে উৎস কোথায় লুকান ছিল এবং কি উপায়ে কখন কোন্ সাহচর্য্যে তাহার মুখ খুলিল, তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিয়া তাহা জানিতে পারা গিয়াছে।

সে-যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে, কবির মর্ম্মকথাটি বুঝিতে পারা অনেকটা সহজ হইয়া আসে। উত্তর কালে প্রতিভার অম্লানদীপ্তিতে যে জীবন মহিমা-মণ্ডিত হইয়াছে বাল্যে সে প্রতিভার বীজ কোথায় সংগোপনে ছিল এবং কোন্ অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার উষ্ণ-উত্তাপে বীজ গাছে বাড়িয়া উঠিয়াছে ইহা চিরদিনই সাহিত্যক্ষেত্রে আলোচনার সামগ্রী, ইহাতে কবির ঠিক স্বরূপ ধরিবার সাহায্য হয়।

এই দিক হইতে সত্যেন্দ্রনাথের জীবনী এখানে কিছু আলোচনা করিব।'

অনেকেই জানেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম জন্মদাতা অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। রক্তের ভিতর দিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামহের সাহিত্য-স্পৃহা হয়ত পৌত্রের মধ্যে বর্ত্তাইয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার সুযোগ পান নাই, যদিও বৃদ্ধ পিতামহ শিশু পৌত্রকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই গৃহে পিতামহের বড় লাইব্রেরী দেখিয়াছেন এবং পরে তাহা হইতে জ্ঞান-সঞ্চয়ের সুবিধা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু গৃহে বড় লাইব্রেরী থাকা এবং বিখ্যাত লেখক পিতামহের কথা শোনা কবিত্ব বিকাশের ঠিক সহায়ক বলা চলে না।

পিতা রজনীনাথ পিতামহের "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা" পরিবর্দ্ধিত আকারে লিখিলেও তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা বিশেষ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পিতা কিংবা পিতামহ হইতে সত্যেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ প্রেরণা তেমন কিছু পান নাই।

কিন্তু গৃহেই অপর দুইএকজন ছিলেন যাঁহাদের নিকট হইতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে এমন কিছু পাইয়াছিলেন যাহা বাল্যে তাঁহার চিত্তবৃত্তির উদ্বোধক ও সহজাত কবিত্বশক্তির উদ্দীপক হইয়াছিল।

ইঁহাদের মধ্যে একজন সত্যেন্দ্রনাথের পিসিমা। ইনি জীবিত আছেন, এখন অত্যন্ত বয়ঃবৃদ্ধা। ইনি সেকালের লোক বটে, কিন্তু সেকেলে লোক নন। আধুনিক কালের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে যদিও সেকালের ভাষায়। তাঁহার সময়ে মেয়েদের মধ্যে কালে-ভদ্রে এক-আধজনের অক্ষর-পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনি সেকালে জন্মিয়াও বাংলা ঘরোয়া লেখাপড়া ভালো রকম শিখিয়াছিলেন। কবিতা রচনা তাঁহার অল্প বয়স হইতেই অভ্যাস ছিল। নানা সময়ে মনের নানা ভাব সুখ-দুঃখ বিয়োগ-ব্যথা তিনি ছন্দে রূপ দিতেন। সেগুলি এখন রক্ষিত নাই। ইদানীং যে-সকল কবিতা লিখিয়াছেন তাহারই কতকগুলি আছে।

সেগুলির কোনোটি তাঁহার জন্মভূমি দত্তদিগের বাস-ভূমি নদীয়ার চুপীগ্রাম লক্ষ্য করিয়া—কোনোটি 'ভাই ফোঁটা' উপলক্ষ্য করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের পিতা রজনী-নাথের প্রসঙ্গ। কোনটি একমাত্র কৃতী ও ধনবান জামাতার অকালমৃত্যুতে, কোনোটি প্রিয় দৌহিত্রের বিয়োগে, কখনও বা তরুণী দৌহিত্রীর সদ্য-বৈধব্য উপলক্ষ্য করিয়া রচিত।

গত ১৩২৭ সালে সত্যেন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হইয়া ইঁহার কতকগুলি কবিতা লইয়া যান। এবং নিজ ব্যয়ে কান্তিক প্রেস হইতে 'অশ্রু-পাথার' নাম দিয়া একখানি বই ছাপান। উপর্য্যুপরি লেখিকা যে শোকগুলি পাইয়াছিলেন তাহাই কবিতার বিষয়। সেইজন্যই বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ 'অশ্রুপাথার' নাম দিয়া থাকিবেন। গ্রন্থকর্ত্রীর নাম না দিয়া 'শোকসন্তপ্তা বিরচিত' ইহাই সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়া দিয়াছিলেন। কবিতাগুলি বই আকারে ছাপাইতে রচয়িত্রীর আপত্তি ছিল—যাহা গৃহ-কোণে বসিয়া সুখ-দুঃখে গাথিয়াছেন তাহা লোক-চক্ষুর আড়ালেই—থাকুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের নিকটে এ-আপত্তি টেঁকে নাই। সত্যেন্দ্র বলিয়াছিলেন,"পিসিমা, যা চোখের জলে ভিজে লিখেছ তা অপরে পড়লেও চোখের জল ফেল্‌বে এতে তোমার লজ্জা কি বল তো?"

'অশ্রু-পাথার'-এর ভূমিকায় প্রকাশকের নাম দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ নিজে 'অশ্রু-পাথার'-রচয়িত্রীর যে-পরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম।—

"এই কবিতাগুলির রচয়িত্রী বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের গৌরবস্থল স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা। ইঁহার জননী স্বর্গীয়া মেনকাসুন্দরী নিজে কখনও কিছু রচনা না করিলেও তাঁহার সাহিত্য-পিপাসা ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। কাশীদাস, কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তদ্ভিন্ন আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের গল্প, প্রচুর স্তোত্র, কবিতা এবং অসংখ্য রূপকথা ও ব্রতকথা তিনি জানিতেন। নব্বই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি এইসমস্ত উৎসাহের সহিত আবৃত্তি করিতে

ভালবাসিতেন। পঁচাশী বৎসর বয়সেও নূতন কবিতা শুনিয়া তাহা ভালো লাগিলে সাগ্রহে মুখস্থ করিয়া লইতেন। 'অশ্রু-পাথার'-প্রণেত্রীর দুই পুত্রই সাহিত্যিক। পুরাতন সাময়িক পত্রের বিশেষ করিয়া সাহিত্য-কল্পদ্রুমের পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষের স্বাক্ষরযুক্ত বিস্তর গদ্য-পদ্য রচনা ছড়াইয়া আছে। প্রকাশচন্দ্র এখন মধ্যপ্রদেশের অমরাবতী নগরে জজিয়তী করেন, সাহিত্যচর্চ্চা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছেন।

গ্রন্থকর্ত্রী ন্যূনাধিক এক বৎসরের মধ্যে উপর্য্যুপরি ছয়টি শোক পাইয়াছেন। জামাতা (ইনি নাগপুরের জজ স্বর্গীয় বীরেশ্বর দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, জব্বলপুরের সুবিখ্যাত উকীল হরিশ্চন্দ্র দত্ত ওরফে বান্ধা সাহেব), পৌত্র, দৌহিত্রা ও সদ্যবিবাহিত দৌহিত্রকে হারাইয়াছেন, এক দৌহিত্রীর বৈধব্য দেখিয়াছেন। এরূপ দুর্ঘটনায় মানুষের মনের অবস্থা যে কি হইতে পারে তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কবিতাগুলি এই দুর্ঘটনার দুই বৎসরে রচিত, দুর্নিয়তির ইতিহাস।

সহজ সরল মর্ম্মস্পর্শী অশ্রুনিষিক্ত এই রচনা সমষ্টির সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা মরমী তাঁহারাই ইহার মর্য্যাদা বুঝিবেন।"

ইহাই গেল ভূমিকা।

সত্যেন্দ্রনাথ-লিখিত এই ভূমিকায় কয়েকটি কথা দেখিবার আছে—

(ক) গ্রন্থকর্ত্রী ও তাঁহার মাতার পরিচয়।

(খ) রচয়িত্রীর দুই পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্রের পরিচয়।

(গ) 'অশ্রু-পাথার' সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের নিজের মত—"সহজ সরল মর্ম্মস্পর্শী অশ্রু-নিষিক্ত এই রচনা সমষ্টির সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা মরমী তাঁহারাই ইহার মর্য্যাদা বুঝিবেন।"

এই কবিতাগুলিতে অতি উঁচু কল্পনার জমির উপর ছন্দের মিহি কাজ নাই, শুধু নির্ম্মল ঘরোয়াভাবে ব্যথার কথা আছে,—যে-ভাবের কবিতার উচ্চতম বিকাশ দেখা গিয়াছে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতায়।

সত্যেন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই এই ঘরোয়া লেখাপড়া-জানা বুদ্ধিমতী অসীমধৈর্য্যশীলা ও প্রিয়ভাষিণী পিসি রস-পিপাসু কবি-হৃদয়ের সংস্পর্শে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন ইহা উত্তরকালে তাঁহার পক্ষে কম লাভের বিষয় হয় নাই

১৩১৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার পিসিমার আরো কতকগুলি কবিতা 'পুরাণো স্মৃতি' নাম দিয়া নিজ ব্যয়ে কান্তিক প্রেস হইতে ছাপাইয়া দেন। ইহাতে তেরটি কবিতা আছে। 'অশ্রু-পাথার' ও 'পুরাণো স্মৃতি' এই দুই নাম সত্যেন্দ্রনাথেরই দেওয়া, ছাপাইবার ব্যয় সত্যেন্দ্রনাথের—'অশ্রু পাথার'এর ভূমিকাও সত্যেন্দ্রনাথের, যত্ন ও উৎসাহ তো সত্যেন্দ্রনাথের বটেই।

'পুরাণো স্মৃতির' দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' সত্যেন্দ্রনাথের পিতা ৺রজনীনাথ বয়সে লেখিকার ছোট ছিলেন, ভাইফোঁটার দিন ছোট ভাই-এর অভাব তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন তাহাই কবিতায় গাঁথা রহিয়াছে।

ইহার সব-শেষের কয়টি ছত্র—

আর ত ছিল না ভাই,
তুমি একা শত ভাই--
বাপের ভিটায় মোর প্রদীপ শোভন,—
নিবে গেলে অন্ধ ক'রে;
ফোঁটা দিয়ে মন্ত্র প'ড়ে—
হ'ল না যমের দ্বারে কণ্টক-রোপণ।

তৃতীয় কবিতাটি 'শিবপূজা'—ইহাতে সত্যেন্দ্রনাথের ছেলেবেলার একটি ছবি পিসিমার তুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিতাটির বিষয় এই—

পিসিমা শিবপূজা করিবেন, শিশু সত্যেন্দ্র পূজার ফুল তুলিয়া আনিতেছেন, ফুলের কাঁটা লাগিয়া শিশু সত্যেন্দ্রের দুই-একটি আঙুল ছড়িয়া গিয়াছে এবং রক্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও বালকের দৃক্‌পাত নাই, তাহার পর পিসিমা শিবপূজায় বসিলেন। বালক সত্যেন্দ্রনাথও অপর একটি আসনে পিসিমার অনুকরণে বসিলেন।

এখানে রচয়িত্রীর কয়টি ছত্র তুলিয়া দিলাম।--

বসিল দু'জনে পৃথক্ আসনে
পূজিবারে আশুতোষে,
শিশুর বসার ভঙ্গি দেখিয়া
পিসি মনে মনে হাসে।

পূজার আসনে বসি' যোগাসনে
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে—
গহন কাননে যেন বসিয়াছে
ধ্রুব হরি-আরাধনে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখককে সত্যেন্দ্রনাথের পিসিমা বলিয়াছেন যে, ছেলেবেলায় দেবদেবীর পূজাই সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় খেলা ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে সত্যেন্দ্রনাথকে দেখা গিয়াছে, তিনি স্বভাবত লাজুক ছিলেন, যদিও অন্তরনিহিত তেজস্বিতার সহিত তাঁহার এই বিনয়নম্র ব্যবহার বেশ খাপ খাইত।

প্রবাসী-সম্পাদকের ভাষায় "যশের জন্য ভীড় ঠেলিয়া জনতার সাম্‌নে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না, আত্ম-গোপন তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল, কিন্তু যশ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিল"—ইহা সত্যই সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রের keynote.

ছেলেবেলাতেও সত্যেন্দ্রনাথ সাধারণ ছেলেদের দলে মিশিয়া খেলাধূলা করিতেন না। কতকটা কোণ-ঘেঁষা ছিলেন। সেই সময় নানা দেবীর পূজাই তাঁহার খেলা ছিল—যিনি পরবর্ত্তীজীবনে নিজকে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়-বাদী বলিয়া প্রকাশ করিতেন।

সত্যেন্দ্র-পরিচয়—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯]

বাল্যে সেই সত্যেন্দ্রনাথ পূজা উপলক্ষ্য করিয়া নৈবেদ্য সাজাইতেন, চন্দন ঘষিতেন, পূজার অন্যসব উপকরণ যোগাড় করিতেন; তারপর নিজেই পুরোহিত সাজিয়া পূজা করিতে বসিতেন। এবং মাঝে মাঝে পুরোহিত-দিগের ন্যায় চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইতেন। সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য বাড়ীর অভিভাবকদিগের নিকট হইতে দক্ষিণাও আদায় করিতেন। তাঁহার এই নকল পূজায় আসল পূজার সমস্তই থাকিত—নৈবেদ্য, চন্দন, ফুল, বেলপাত, ধূপ, ধুনা, পুরোহিত, এমনকি তাঁহার টিকিটি পর্য্যন্ত—দড়ি কিংবা সূতা বা ঐ প্রকারের কিছু মাথার পিছনে চুলের সঙ্গে বাঁধিয়া টিকির কাজ চালাইতেন —সায় শেষ দক্ষিণা। এসবই পরিপাটি করিয়া তিনি করিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে যে মার্জ্জিত রুচি তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব হইয়াছিল অতি ছোট বেলাতেই এই-সব ছোট ছোট টুক্‌রা টুক্‌রা কাজেই তাহা দেখা গিয়াছে।

ছন্দ-শিল্পে সত্যেন্দ্রনাথ অসাধারণ ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। ভারতচন্দ্রের পর এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেহ এবিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। এক্ষেত্রে তাঁহার যথেষ্ট মৌলিকত্ব ছিল—তিনি নূতন পথের পথিক ছিলেন। তাই কবিতার চাষে লাউ কুমড়া বা আগাছা না জন্মিয়া তাঁহার ক্ষেতে ফলের ফসল ফলিত। তাঁহার কবিতার সহিত যাঁহাদের সামান্য পরিচয়ও ঘটিয়াছে, তাঁহারাও জানেন যে, পাল্কী বেহারার গান, পিয়ানোর গান, এমন-কি চর্‌কা-চালান দেখিয়া তাহার মর্ম্ম-নিহিত সুরটি তিনি ছন্দে বাঁধিয়াছিলেন। অবশ্য আজকাল নানা ছন্দে নানা ধাঁচে কবিতা রচনার রেওয়াজ হইয়াছে, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথই এবিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান। চোখের এই তীব্র দৃষ্টি, শ্রবণশক্তির এই অতি-মাত্র দক্ষতা, ইহা শৈশবেও তাঁহার ভিতরে বিদ্যমান ছিল। উত্তর কালে তিনি যে-যে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া-ছিলেন, শৈশবে সেগুলি তাঁহার মধ্যে থাকিতেই হইবে, সেকথা এখানে বলা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ঐসব তাঁহার ভিতরে এত বেশী পরিমাণে ছিল যে, অমনোযোগী দর্শকের চোখেও তা পড়িত।

বাড়ীর অমুক ঝি কি-রকম করিয়া ধামা লইয়া হাটে, তাহা তিনি অনুকরণ করিয়া হাটিয়া দেখাইতেন। চাকর কেমন করিয়া কথা কয় তাহা তিনি অনুকরণ করিয়া কহিতেন। তখন তাঁহার বয়স ছয় সাত বছর মাত্র। ইহাতে বাড়ীময় কৌতুকের সৃষ্টি করিত। কোন্ বুড়ী কুঁজো হইয়া হাটিতেছে তাহাও দেখাইতে হইবে, ভিখারী কেমন করিয়া কি বলিয়া ভিক্ষা চায় ইহাও দেখান চাই। শুধু তাই নয় সত্যেন্দ্রনাথের পিসিমার মাতা 'অশ্রু-পাথার'-এর ভূমিকায় উল্লিখিত ৺ মেনকাসুন্দরীর নিকট তিনি যে-সব রূপকথা, ব্রতকথা, শ্লোক-স্তোত্রাদি একান্ত মনে শুনিতেন তাহা তাঁহার শৈশব-চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এবিষয়ে তাঁহাকেই সত্যেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-গুরু বলা যায়। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার গল্প শুনিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সাজিতে ইচ্ছা হইত

এবং তাহা সাজিয়া সকলকে দেখাইতেন। শৈশবে এই-রূপে তাহার কল্পনাবৃত্তি খোরাক পাইয়া প্রসারতা লাভ করিয়াছিল।

ছেলেবেলায় তাহার আর একটি খেলা ছিল। তিনি বাড়ীর সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। পিতার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া খাবারের যোগাড় করিতেন। তারপর যাইয়া বলিতেন, 'মা তোমার নেমন্তন্ন,' 'পিসিমা তোমার নেমন্তন্ন' চাকর দাসীরাও নিমন্ত্রিত হইত এবং সকলেই আহার্য্য হইতে অংশ পাইত। এবিষয়ে শিশু সত্যেন্দ্রের গিন্নিপনা ও উদারতা অতুলনীয় ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের পিসিমার রচিত 'পুরানো স্মৃতিতে' 'আমার জন্মভূমি' কবিতাটি সরল সৌন্দর্য্যে ভরা। ইহা সত্যেন্দ্রনাথের পিতৃভূমি চুপী গ্রাম লক্ষ্য করিয়া লেখা।

দুই চারিটি ছত্র এই দীর্ঘ কবিতা হইতে তুলিয়া দিলাম।—

চৈতন্যের জন্মস্থান
সেই যে নদীয়া ধাম
চুপীগ্রাম ছিল তার কাছে;
এমন শান্তির স্থান
নহে বুঝি কোনও গ্রাম
লক্ষ্মী দেবী সতত বিরাজে।

গ্রামবাসীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

না চাহে পরের ধর্ম্ম,
না করে পরের কর্ম্ম,
আপনার বৃত্তি লয়ে থাকে;
স্ত্রীলোকের রীতি নীতি
কুলবধূ সুপ্রকৃতি
বালিকার শিক্ষা সেই থেকে।

সেই চুপী গ্রাম গঙ্গা-গর্ভে লুপ্ত হইয়াছে। গঙ্গা চুপী গ্রাম ভাঙ্গিয়া লইতেছেন—

দত্তদের সিংহদ্বার
বিপুল পর্ব্বতাকার
জলসই হ'ল মুহূর্ত্তেকে,
দেউল প্রাচীর আদি
প্রাসাদ অমরাবতী
দিনে দিনে জলে গেল ঢেকে।
চুপী গ্রাম হল নাশ—
গঙ্গার গর্ভেতে বাস
লুপ্ত হ'ল মম জন্মস্থান,
ধ্বংস হল কত জীব
অন্তর্ধান বুড়া শিব (গ্রামের বিগ্রহ)
জাহ্নবীর বাড়াইতে মান।

কবিতাটির শেষ ক'টি ছত্র—

আমার সে জন্মভূমি
জগতে প্রধান,
আমার সে জন্মভূমি
স্বরগীয় স্থান,
নদীয়ার সহোদরা
পুণ্য চুপীগ্রাম—
শত কোটী তারপদে
করি যে প্রণাম।
জন্মভূমি মহিয়সী
স্বর্গাদপি গরিয়সী
প্রণিপাত চরণে তোমার।
যদি পুন জন্ম ঘটে,
চুপী গ্রাম গঙ্গা-তটে
জন্ম যেন লভি পুনর্ব্বার।

সে কালের ঘরোয়া লেখাপড়া-জানা মেয়ের পক্ষে এ-কবিতা লেখা সামান্য কৃতিত্ব নয়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এই ছত্রগুলি তুলিয়া দিবার প্রধান সার্থকতা এই যে, সত্যেন্দ্রনাথ যে কবিহৃদয়ের সংস্পর্শে শৈশব কাটাইয়াছিলেন তাহার পরিচয় ইহাতে পাই।

দেখা গেল সত্যেন্দ্রনাথ শৈশবে তাঁহার পিসিমার ও তাঁহার মাতা ৺মেনকাসুন্দরীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

ইহার পরই তাঁহার পিসতুত দুই ভাইএর প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথের উপরে পড়ে।

'অভ্রপাথারে'র ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার দুই পিসতুত ভাই শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষের পরিচয় দিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের পরলোক গমনের পর তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র যে-প্রবন্ধ লিখেন (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯) তাহাতেও পূর্ণচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"বালকের অনুরোধে প্রকাশচন্দ্রকে নিত্যই হয় এক নূতন ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া, নয় একখানা ছবি আঁকিয়া দিতে হইত। নিজস্ব সম্পত্তি ভাবিয়া বালক তাহা লইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ আনন্দ-মুখরিত করিয়া তুলিত। পূর্ণচন্দ্র বালক সত্যেন্দ্রের প্রথম শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।"

পূর্ণচন্দ্র গত যুগের সাময়িক পত্রাদিতে বিশেষত সাহিত্য-কল্পদ্রুম, অনুসন্ধান প্রভৃতিতে বহু রচনা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহার অনুজ প্রকাশচন্দ্র এখন মধ্য-প্রদেশে আকোলায় জজিয়তী করেন। প্রকাশচন্দ্রের বয়স যখন ষোল সতেরো বছর মাত্র তখন 'রমণী' নাম দিয়া একটি বড় কবিতা ক্ষুদ্র বই আকারে ছাপিয়াছিলেন। কবিতার বইটি ছোট হইলেও মাধুর্য্যে অনেক স্থলে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবিতার যোগ্য আসন পাইবার অধিকারী। এবং পড়িবার সময় অনেক স্থানেই মনে হয় যে, লেখক নিশ্চয়ই পরিণতবয়স্ক। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের পিসিমা (প্রকাশ চন্দ্রের জননী) বলিয়াছেন, "তখন প্রকাশের বয়স ষোল সতেরো বছরের বেশী নয়। কবিতাটির ছত্রগুলি অনেক স্থানে শব্দ গরীয়ান্ ও শ্রীসম্পন্ন। কিশোর-কবি প্রকাশচন্দ্র সেই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকার উপহারে লিখিয়াছেন—

আধ আলো আধ ছায়া
　মনের মতন কায়া,
প্রেমের মতন মধু মন,
রমণি, তোমার ছবি
　যতনে এঁকেছে কবি,
দেখ দেখি ফুটেছে কেমন!

ইহার পর 'রমণী' কবিতাটির আরম্ভ হইয়াছে এই ভাবে—

ধরণী নয়ন-মণি রমণী রতন,
　কেমনে বুঝিব তুমি যে কি!
কণ্টকী-লতিকা-কোলে কুসুম শোভন,—
দাঁড়াও নয়ন ভরে' দেখি!

ইহার পর কয়েকটি ছত্র পাঠে মনে হয় যে, প্রাপ্তবয়স্ক কোনোও প্রথিতযশা কবির লেখনী হইতে বাহির হইলেও তাহার অগৌরব হইত না।

কিশোর কবি রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

তোমা ধ্রুব তারা ধ্যানে বাহি প্রেম-তরী,
　তব স্তুতি কবিতার ভাষা।
যখন মানসে আনি
　ও সুধা প্রতিমাখানি
কুসুমিতা সুষমার সাজে,
সুখদ বসন্ত জাগে হৃদয়ের মাঝে!

আর একস্থানে—

সৌন্দর্য্যের পূজা করি, সৌন্দর্য্যের দাস,
　সৌন্দর্য্য এ হৃদয়ের ধ্যান,
তাহারে নয়নে রাখি মত্ত বার মাস,
　মত্ত তাই উন্মাদের গান!

*　　*　　*

কিশোর কবি যুক্তিতর্কেরও অবতারণা করিয়াছেন—

রূপের কারণ যদি হৃদয় চঞ্চল,
　রূপহীনে কেন পূজি তবে?
যৌবন করিত যদি পরাণ পাগল
　অযৌবনে স্নেহ কেন রবে?

*　　*　　*

কবি ভক্তের ন্যায় তন্ময় হইয়া রমণীকে পূজার অর্ঘ্য দান করিতেন। সে ছত্র কয়টি সুন্দর ও নির্ম্মল।—

স্নেহময়ী, শুভাননা,
বনহার বিভূষণা,
ধর তুলি প্রেমের মূরতি,
ত্রিসন্ধ্যা করুক ধরা ও পদে আরতি!

শেষের দিকে কয়েকটি লাইন উঠাইয়া দিয়া ইহা শেষ করিলাম। এ কয়েকটি ছত্র এত উপভোগ্য যে, পাঠকের চিত্ত সরসতায় ভরিয়া ওঠে—

তুমি যাও দূরে দূরে নাম ধ'রে ডেকে
　ধীরে ধীরে বাজাইয়া বাঁশী,
আমরাও পায় পায় চলি একে একে
　বাঁশী-গানে আপনা উদাসী।

*　　*　　*

সব-শেষের চার ছত্র—

যতন করিয়ে আমি
আঁকি তব ছবিখানি,
তুমি তাহে ঢেলে দাও প্রাণ।
প্রাণময়ী ধরণী হউক প্রেমগান।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সত্যেন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত পিতামহের পৌত্র হইয়া তাহার নিকট হইতে কিংবা পিতার নিকট হইতে বিশেষ কোনও প্রেরণা না পাইলেও তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সঙ্গ এমন ছিল যাহার দ্বারা তাঁহার সহজাত কবিত্বশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। এবং উত্তর কালে সেই শক্তি যথেষ্ট প্রখরতা লাভ করিয়া বিমল জ্যোতি বিস্তার করিয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের দান শুধু বর্ত্তমানকে নয়, অনাগত ভবিষ্যতকে আপন করিয়া লইয়াছে। কবিগুরুর ভাষায়—

অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানা সূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি!

পুরাতনী

শ্রী হরিহর শেঠ

(১)

ভারতের কয়েকটি প্রাণান্তকর প্রথা

বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে যে-সকল প্রাণান্তকর সংস্কার বা প্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে সতীদাহ সর্ব্বাপেক্ষা বহুজনবিদিত হইলেও, নবজাতকন্যাহত্যা, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জ্জন, সাগরে ও গঙ্গায় স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ অথবা দেব-সমীপে নরবলি দান প্রভৃতি যে-সকল ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাও নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতায় কম নহে।

এইসকলের মধ্যে শিশুকন্যাবধ ভিন্ন অপর সব-গুলিকেই প্রায় ধর্ম্মমূলক বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল।

যমুনায় শিশুকন্যা ভাসাইয়া দিতেছে

এইসকল নিষ্ঠুর প্রথা কবে এবং কিরূপে প্রথম প্রচলিত হয় তাহা অজ্ঞাত। ইহার সকলগুলিই বৃটীশশাসন প্রতিষ্ঠার সহিত ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ নারীদের সহমরণকে একটা নিষ্ঠুর ও বর্ব্বরোচিত প্রথা ভিন্ন আর কিছু বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু এই প্রথা ভারতের বহু স্থানেই হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (১)

হিন্দুদের রাজত্বকালে এই প্রথা রহিত করার উদ্দেশে কোন রাজা কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না বরং ইহা যে গৌরবের ব্যাপার বলিয়া আদৃত ছিল, এইরূপই অবগত হওয়া যায়। কোন কোন স্থানে সতী রমণীর মৃতস্বামীর সহিত আত্মবিসর্জ্জনের পবিত্র স্মৃতি জাগরূক রাখার চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃত স্বামীর সহিত সহমরণের জন্য সতী অগ্রসর হইতেছেন

মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের বাটির কিছু উত্তরে যে-স্থানকে সতীচৌড়া বলে, তথায় ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি মহারাষ্ট্রীয় সতীর সহমরণ-স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে একটি মন্দির নির্ম্মিত

(১) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাইয়ের কলিকাতা গেজেটে মুরর্শিদাবাদে এক মুসলমান রমণীর মৃতস্বামীর সহিত কবরের মধ্যে নিজ দেহ-ত্যাগের কথা জানা যায়। The Musnad of Murshidabad

হইয়াছিল। কানপুরের সতীঘাটও এইরূপ একটি স্মৃতি-চিহ্ন।

কানপুরে সতীচৌড়া ঘাট

মুসলমান রাজত্বকালে শাসনকর্ত্তারা এই প্রথার সমর্থন করিতেন না এবং বাধা দিতেন বলিয়া কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন। (২) আবার অপরে বলিয়াছেন, সরকারের কোন বাধা না থাকিলেও উপযুক্ত কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে এজন্য অনুমতি লইতে হইত। (৩) তৎপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে, শ্রীরামপুরের উইলিয়ম্ কেরি প্রথম এবিষয় রোধ করিবার জন্য তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে লিখিয়াছিলেন। পরে তদীয় বন্ধু জজ্ উদ্‌নে (Mr. George Udny) ইহা রহিত করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি তখন ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন; তিনি এই প্রথা উঠাইয়া দিবার স্বপক্ষে তাঁহার মন্তব্য পুস্তকে লিখিয়াছেন। (৪)

এতাবৎ অতি সামান্য ভাবে চেষ্টা হইতেছিল। পঁচিশ বৎসর পরে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড এমহার্ষ্টের সময় ইহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। সে-সময় যে-স্থলে কোন রমণী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সহমৃতা না হন, সে-স্থলে বাধা দিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দিগের নিকট
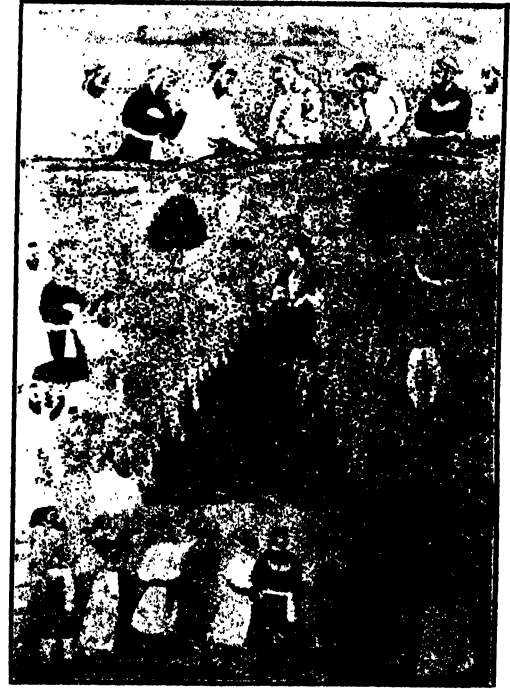
মুসলমান রাজত্বকালে সহমরণ

সহমরণে হিন্দু সতী

হুকুমজারি হয়। ইহার ফলে প্রত্যেক সতীদাহ-স্থলে দেশীয় পুলিশ কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিয়া, যে-কোন রমণী ঐ কার্য্যে কোন যন্ত্রণা অনুভব করিবেন, জীবনের

(২) Hindu Manners, customs and ceremonies—by Abbé J.A. Dubois.

(৩) The administration of the East India Company —by John William Kaye.

(৪) History of India, Vol. III. Marshman.

মমতা, সন্তান-স্নেহ প্রভৃতিতে অভিভূতা হইবেন, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য আদেশ প্রচারিত হয়। সেই বৎসরেই এই আদেশের কার্য্যকারিতা বহু স্থানে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সরকারের এই কার্য্যে হিন্দুদের কোনরূপ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায়, রাজকীয় বিপত্তির কোনরূপ সম্ভাবনা না দেখিয়া, সেই সময় হইতেই গভর্ণমেণ্ট ইহা রহিত করিবার কথা ভাবিতে থাকেন। পরিশেষে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের শাসন-কালে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর স্যার চার্লস্ মেটকাফ (Sir Charles Metcalf) ও মিঃ বাটারওয়ার্থ বেলে (Mr. Butterworth Bayley) নামক দুই জন কাউন্সিলের সদস্যের ঐকান্তিক যত্নে সতীদাহ আইন-বিরোধী বলিয়া বিধিবদ্ধ হয়।

হস্তিপদতলে অপরাধীর দণ্ড

এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় তৎকালীন ধনী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। রাজা রামমোহন রায় এই সময় গভর্ণমেণ্টকে অনেক সাহস দিয়াছিলেন এবং কলিকাতার উদারনৈতিক সম্প্রদা দ্বারা লাট সাহেবকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদা করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। (৫)

সতীদাহের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি কিছু আছে কি না বা কি আছে তাহা জানি না। সেলুকাস (Deodorus Selucus) আলেকজেণ্ডারের ভার অভিযান-বর্ণনার মধ্যে লিখিয়াছেন যে, রাজপুতনার অসভ্যদের মধ্যে একজন রমণী তাহার স্বামীকে বি প্রয়োগে বিনাশ করে; তাহার অপরাধের দণ্ড দেওয় হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। (৬) একজন বৈদেশিক প্রদ এই বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে-সন্দেহ হয়, কারণ বেদে সহমরণের উল্লেখ আছে।

পুরাকালের চড়ক

অতি পূর্ব্বকালে কি পরিমাণে সতীদাহ অনুষ্ঠিত হই তাহা বলা যায় না। মুসলমান রাজত্ব-কালেও ইহার কো সংখ্যা রাখা হইত বলিয়া জানা যায় না। দেশ ইংরাজ শাসনাধিকারে আসার পর তাহাদের দ্বারা সময় সময় ইহার সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইহা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ১৮০৩-৪ খৃষ্টাব্দে সতীদাহের কথায় একজন লেখক বলিয়াছেন, সমগ্র হিন্দুস্থানে তখন বৎসরে মোট ৫০০০ রমণী সহমৃতা হইতেন। ঐ

(৫) The Life and times of Carey, Marshman and Ward, vol II.

(৬) The Good old days of Honourable John Company.

সময় কলিকাতা ও উহার চতুষ্পার্শ্বে ৩০মাইলের মধ্যে ৪৩৮টি সতীদাহ হয়। (৭) ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ,বাঙ্গলায় ৭০৬ (৮) এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৬৫০, তন্মধ্যে কলিকাতা বিভাগে ৪২১টি রমণী সহমৃতা হন। (৯) এই প্রথা এত ভয়ানক ছিল যে, একজনের মৃত্যুতে সময় সময় বহু নারীর প্রাণনাশও ঘটিত। জানা যায়, বাগনাপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের একশত স্ত্রী ছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার ৩৭টি স্ত্রী সহমৃতা হন। এই ব্যাপারে উপর্য্যুপরি তিন দিন ধরিয়া চিতাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। (১০) হুগলী জেলায় শেষ সতীদাহ হয় ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যালিডে সাহেবের সময়; তিনি উহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

দেবতার কাছে নরবলি একটা কথার কথা। ইহা অনেকেরই শুনা আছে। এখন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কখন এক-আধটা ঘটনার কথা জানা যায়। কিন্তু শত বৎসর পূর্ব্বেও উহা বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইত। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি কেবল মাত্র পাঞ্জাব প্রদেশেই পূর্ণিমা-উৎসবে ২৪০টি নরবলি হইয়াছিল। (১১) কালীঘাটে দেবী-সমীপে বহু দিন হইতেই নরবলি হইত। ডাক্তার ডফের সময়ও তথায় একজনকে বলি দেওয়ার জন্য ফাঁসি হইয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও বাগাঘাটে নরবলি হইত।

যাইট বৎসর পূর্ব্বে (১৮৬৫-৬৬) যশোর, হুগলী ও বীরভূমে ভূত-প্রেত পূজা ও(১২)নরবলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ছোট ছেলেদেরই প্রায় এসব স্থানে বলি দেওয়া হইত।(১৩) উড়িষ্যায় মহানদীর দক্ষিণে গুমসর প্রদেশে খণ্ড নামক এক-প্রকার পার্ব্বত্য জাতি, তাহাদের ভূমি-দেবতার সন্তোষার্থ নরবলি দিত। ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইবে, এই বিশ্বাসে একজনকে বলি দিয়া গ্রামস্থ সকলে সেই দেহখণ্ড লইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রোথিত করিত। (১৪) বিষ্ণুপুর, শান্তিপুর ও নদীয়ার নিকট ব্রামনিতলার দুর্গা-মন্দিরে নরবলি প্রচলিত ছিল। (১৫)

এই প্রথা বিদূরিত করিবার জন্য যাঁহারা প্রথম চেষ্টা করেন,তাঁহাদের মধ্যে লেপ্টন্যান্ট হিকস্ (Lieut. Hicks) এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শেষে (১৬) যাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইহা দেশ হইতে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়, তাঁহাদের নাম ক্যাপ্টেন্ ক্যাম্বেল্ (Captain Campbell) ও মেজর ম্যাক্ফারসন্, (Major Macpherson) ১৮২৯ নাগাইদ ৩৪ সাল পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া ইঁহারা ইহা উঠাইয়া দিতে সমর্থ হন।

নরবলি ও সহমরণ উভয়ই শাস্ত্রীয় বা ধর্ম্মমূলক বিবেচিত হইলেও, প্রথমটি স্বেচ্ছাকৃত অনুষ্ঠান, অর্থাৎ যাহাকে বলি দেওয়া হইত সে স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে অগ্রসর হইত এরূপ জানা যায় না। আর সহমরণ প্রথম যে-ভাবেই আরম্ভ হউক উহা শেষে স্বেচ্ছায় যত না পালিত হইত সামাজিক ব্যবস্থা ও লোক-লজ্জা-ভয়ে তদপেক্ষা অধিক হইত। কিন্তু তীর্থ-সলিলে, পুণ্যতোয়া নদীতে বা সাগরে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ধর্ম্মার্থ আত্মবিসর্জ্জনও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে,গঙ্গা-সাগরে এবং ভাগিরথী-বক্ষেই অনেকে জীবন বলি দিত। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের মধ্যেই এ কার্য্য প্রচলিত ছিল। পুরুষেরা গোঁপদাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং রমণীরা কেবলমাত্র স্নান করিয়া, যাহাতে দেবতা তাহাকে ভাল ভাবে গ্রহণ করেন সেই-জন্য মন্দিরে দেবোদ্দেশে প্রার্থনা ও নিবেদনাদির পর সমুদ্রে এক বুক জলে গিয়া যতক্ষণ না কোন ভয়াবহ জন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করিত।

পূর্ব্বকালে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন বহু-প্রচলিত ছিল। আবুল ফাজেল্ তাঁহার গ্রন্থে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে নিজের গলা কাটিয়া বা কুম্ভীরের মুখে আত্মদান করিয়া জীবন-

(৭) Historical Account of Discoveries and Travels in Asia, vol. II.

(৮) Hindu manners, customs and ceremonies.

(৯) The administration of the East India Company.

(১০) The Banks of the Bhageerathi—Calcutta Review, vol. VI. 1840

(১১) Half Hours in the Far East.

(১২) The Antiquities of Kalighat.

(১৩) The Annals of Rural Bengal.

(১৪) The History of India Vol. III—Marshman.

(১৫) The Calcutta Review, Vol.VI.—The Banks of Bhagirathi.

(১৬) Half hours in the Far East.

দানের কথা বলিয়াছেন। নভেম্বর ও জানুয়ারি মাসের পূর্ণিমা তিথিই একার্য্যের প্রশস্ত সময় বিবেচিত হইত। (১৭)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এই প্রথা নিবারিত হয়। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই অগ্নিতে, জলে বা অনশনে আত্মদান প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক ব্রত বলিয়া বেদাদি গ্রন্থে উল্লেখ আছে বলিয়া শুনিয়াছি। জহর-ব্রতের কথা অনেকেই জ্ঞাত আছেন।

নিজের সন্তানকে গঙ্গায় বা অন্য কোন পবিত্র নদীতে অথবা সাগরে উৎসর্গ করা আর-একটি নৃশংস প্রথা। ভারতের কোন-কোন অংশে বিশেষতঃ উড়িষ্যা ও পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় ইহা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ইহা ঠিক ধর্ম্মার্জ্জনার্থ নহে। ইহার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়। স্ত্রীলোকদের বিবাহের পর বহুদিন অপুত্রক থাকিলে সে বা তাহার স্বামী বা উভয়ই মানসিক করিত যে, প্রথম সন্তানটিকে গঙ্গায় উৎসর্গ করিবে। সন্তান হইলে প্রথমটীকে ৩, ৪ বা ৯ বৎসর বয়সে একটি শুভ দিন স্থির করিয়া গঙ্গায় বা কোন পূত-সলিলা নদীতে লইয়া যাইয়া, যতক্ষণ না তাহাকে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায় ততক্ষণ সন্তানটিকে স্নানার্থ অধিক জলে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিত। যদি উহাতে আপনা হইতে শিশুটিকে ভাসাইয়া লইয়া না যাইত তাহা হইলে পিতামাতা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত। (১৮) গঙ্গাসাগরেও অনেকে এইরূপ সন্তান বিসর্জ্জন দিত। কেহ কেহ বলেন, লোকে পঞ্চম সন্তানটিকে গঙ্গায় দিবার জন্য মানত করিত। (১৯)

মারে (Hugh Murray, F. R. S. E.) বলিয়াছেন, অনেকে ৩৷৪ বৎসরের সন্তানকে জলে ভাসাইয়া দিত বা নিক্ষেপ করিত এবং অন্য দয়াবান ব্যক্তিরা কখন কখন শিশুটিকে লইয়া যাইত। দুই বৎসরে প্রায় ৫০০ শিশু-বলির কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। (২০) সময় সময় শিশুকে জলের কাছ হইতে কুম্ভীরে টানিয়া লইয়া যাইবার অভিপ্রায়েও রাখা হইত বলিয়া জানা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। বারুণীর সময় ঢাকা যশোহর প্রভৃতি স্থান সকল হইতে আসিয়া লোকে অগ্রদ্বীপে সন্তান বিসর্জ্জন দিত। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আইন দ্বারা এই প্রথা নিবারিত হয়। আইনের ধারায় সাহায্যকারীকেও হত্যাকারী বলিয়া গণ্য করা হইবে স্থির হয়। (২১)

সদ্যোজাত শিশু-কন্যা হত্যা বিষয়ে যে লোমহর্ষণ বিবরণ জানা যায় তাহাও কম বীভৎস নহে। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাকিলেও বহুকাল হইতে বহু স্থানে বিশেষ ভাবেই প্রচলিত ছিল। গরুড়-পুরাণ, মনুসংহিতা, শ্রীমৎভাগবৎ, গর্গসংহিতা, কাশীখণ্ড, প্রায়শ্চিত্তমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। (২২)

বঙ্গের ঝারিজা জাতির মধ্যে, কাটিয়াবাড়ের নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে, কটকের খণ্ডদের মধ্যে, গোয়ালিয়রে, রাজপুতনায়, উড়িষ্যায়, বেরারে, গুজরাটে, বেনারসের রাজবংশী নামক জাতিদের ও জেহারজিসদের মধ্যে ও পাঞ্জাবের বহুস্থানে ইহা প্রচলিত ছিল। পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যেও এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। (২৩)

এই নৃশংস কাণ্ডের যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। জানা যায় কাচ ও কাথিয়াবাড়ে বৎসরে ন্যূন সংখ্যা ৩০০০; মালওয়া, রাজপুতনায়, যোধপুর, বিকানির, জয়পুর জেসলমিরে বাৎসরিক ২০০০০ এর কম ছিল না। (২৪) কাটিওবাড়ে বৎসরে মাত্র ৬৩টি জীবিত ছিল বলিয়া জানা যায়। (২৫) গাঞ্জাম ও কটকের খণ্ডদের মধ্যে এবং গুমসরের মালিয়াদের মধ্যে ইহা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। (২৬) গাঞ্জামের কোন কোন জেলায়

(১৭) Bengal Past and Present, Vol. XII.
(১৮) *Ward* on the Hindoos.
(১৯) Bengal Past and Present, Vol XII.
(২০) Historical accounts of Discoveries and Travels in Asia, Vol II.

(২১) Bengal Past and Present, Vol XII.
(২২) The Calcutta Review, Vol IV.
(২৩) The History of India, Vol VI. Marshman.
(২৪) The Three Presidencies of India গ্রন্থে ২০০০ লেখা আছে।
(২৫) Cassells' Illustrated History of India, Vol II.
(২৬) Calcutta Review, Vol VI (1846)

খুব কম করিয়া ধরিলেও বৎসরে ১০০০।১২০০ হত্যা হইত। একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ৩ বৎসরে নাগাইদ ২০ হাজার কন্যা এই ভাবে হত হইত। (২৭) ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ফারসন্ কুরি নামক প্রদেশে একটিও কন্যা সন্তান দেখিতে পান নাই, কেবল নাভাকোন নামক স্থানে ২।১টি মাত্র দেখিয়াছিলেন। (২৮)

এই ব্যাপারটির সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কিছু আছে বলিয়া প্রকাশ নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয় একটি সামাজিক সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ এই নৃশংস কার্য্য সাধিত হইত। কন্যার বিবাহে অত্যধিক ব্যয়, জামাতার নিকট মস্তক অবনত হওয়া প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি পাওয়াই ইহার কারণ।

ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে জানা যায়, অধিকাংশ স্থলেই এই হত্যাকাণ্ড প্রায় প্রসূতির দ্বারা সাধিত হইত। রাজকুমার জাতিদের ভিতর জন্মাবধি না খাইতে দিয়া, গোয়ালিয়রে দোক্তাপাতা, ধুতুরা বা অন্য কোন বিষ দ্বারা, রাজপুতনায় অহিফেন দ্বারা এবং স্থানে স্থানে অন্যবিধ উদ্ভিদজাত বিষ-রস পান করাইয়া বা গলা টিপিয়াও মারা হইত। (২৯)

মুসলমান রাজত্বকালে বাদসাহ জাহাঙ্গীর কোন গ্রামে এই ঘটনার কথা জানিয়া এই কু-প্রথা রহিত করিবার জন্য আদেশ করেন। (৩০) কিন্তু তাহাতে উহা বন্ধ হয় নাই। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বেনারসের রেসিডেন্ট্ ডান্‌কন (Jonathan Duncan, ইনি পরে বোম্বাইয়ের গভর্ণর্ হন) সর্ব্বপ্রথম রাজপুতদের মধ্যে শিশুকন্যা দলনের প্রথা সরকারী ভাবে প্রথম লক্ষ্য করেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আইন দ্বারা স্থির হয়, এইরূপে শিশুহত্যা নরহত্যার সমান গণ্য হইবে এবং ফলে হত্যাকারীর তদনুরূপ দণ্ড হইবে। পরে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাল্‌হাউসির দ্বারা উহা একেবারে রহিত হয়।

এইসকল প্রথা ভিন্ন এদেশে চড়কের সময় পিঠ ফোঁড়া একটি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বহু বৈদেশিক ভ্রমণকারীর বর্ণনার ভিতর এবং প্রাচীনদের কাছে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। যাহারা চড়কে ঝুলিবার জন্য নিজেদের পৃষ্ঠদেশে বান ফুঁড়িতে দিত তাহারা প্রায়ই মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া একার্য্যে অগ্রসর হইত। ইহাতেও তাহাদের মনে যে-ধর্ম্মভাব থাকিত না তাহা-মনে হয় না।

এই প্রথা রহিত করিবার প্রথম চেষ্টা হয় ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে। শেষে ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে লেপ্টন্যান্ট-গভর্ণর্ বিডন্ সাহেবের সময় আইন করিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (৩১)

উক্ত সকল প্রথা ভিন্ন আর যে প্রাণহারী প্রথা এখনও বিদ্যমান আছে তাহা রাজদণ্ড; আইনের বিধিতেই উহার ব্যবস্থা। ইহার জন্য বৃটীশ ভারতে ফাঁসি এবং অনেক দিন দেখা না হইলেও ফরাসী ভারতে গিলটিন্ নামক যন্ত্রদ্বারা শিরচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। উহা ইংরেজী ১৯০৭ সালে শেষবার চন্দননগরে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালে রাজ-আজ্ঞায় প্রাণদণ্ডের জন্য শূলে দেওয়া এবং হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করা হইত।

(২৭) Historical Accounts of Discoveries and Travels in Asia, Vol II.

(২৮) The Calcutta Review, Vol. X.

(২৯) The Calcutta Review, Vol I (1844)

(৩০) The Calcutta Review, Vol I (1844)

(৩১) Bengal Under the Lieutenant Governors, Vol I

কষ্টিপাথর

সেকালের কথা

দ্বিজেন্দ্রনাথ চলে' গেলেন।

উত্তরায়ণ আরম্ভে সৌরমকরে শুভ মাঘমাসের চতুর্থ দিনে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বর্ষীয়ান, বিদ্যাবান্, পুণ্যপূর্ণপ্রাণ, সংযমীশ্রেষ্ঠ বঙ্গদেশের সত্যব্রত ভীষ্মসম দ্বিজেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করেছেন।

ভীষ্মের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু বলে' অনুমান হয়; নইলে সরস্বতী পূজার দিনে এঘটনা ঘটবে কেন? যিনি আজীবন সরস্বতীর সেবা করেছেন, যষ্ঠাধিক অশীতি মাঘ যাঁর শিরে অনুরাগে বাণী-চরণ-চুম্বিত আশীর্ব্বাদী ফুল বর্ষণ করেছে, সেই সারস্বত-ব্রত-ধারী মহাপুরুষের জন্য সারস্বতোৎসবের দিন ভিন্ন বিষ্ণুলোক হ'তে পুষ্পরথ আর কোন্ দিন আসবে!

পার্ব্বণপ্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ গেছেন পৌষে, সর্ব্বসুন্দর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গেছেন ফাল্গুনে, বাক্‌পাত্মিক দ্বিজেন্দ্রনাথ গেলেন মাঘে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কৌলিক উপাধি ঠাকুর। এই ঠাকুরবংশে ধনে মানে দানে পুণ্যে পাণ্ডিত্যে মহত্ত্বে কবিত্বে কলানৈপুণ্যে অনেক বরেণ্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন, আমরা যাকে ঠাকুর বলি, ঠাকুর-ঘরের সেই ঠাকুরটি—শান্তোজ্জ্বল শ্যাম অচল শিলাখণ্ড, কিন্তু চক্রে চক্রে তেজ, চক্রে চক্রে শক্তি, চক্রে চক্রে মঙ্গলের দীপ্তি।

গত শতাধিক বর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে যত শুভানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে তার অনেকগুলির সূত্রপাত বা সাহায্যপ্রাপ্তি হ'য়েছে জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্র-ভবন হ'তে।

বৃটিশ-বঙ্গে রামমোহন রায় যে মঙ্গল-প্রদীপ জ্বেলেছিলেন, সেই প্রদীপ স্নেহদানে প্রোজ্জ্বল করেছিলেন প্রধানতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বংশধরগণ।

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্মকে মন্দির গ'ড়ে', এই কলিকাতা নগরীতে প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁরই আগ্রহ উদ্যোগ ও যত্নে সমাজে পূজামন্ত্র, উপাসনা-প্রণালী ও সঙ্গীতাদির অভিব্যক্তি হয়। তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা কেবল ধর্ম্মপ্রচার করে' ক্ষান্ত হয় নি, পরন্তু সংস্কৃতের রত্নাগার হ'তে হাল্কা হাল্কা মানানসই গহনা বেছে নিয়ে বাঙলা ভাষাকে প্রথম ক'নে দেখার সাজে সাজিয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী।" অধিক-কি বাঙলার গদ্য-জনকদের মধ্যে যিনি মাতৃভাষার জীবনে একটা উদ্দীপনা প্রথমে দিয়ে গেছেন সেই চিরপূজ্য অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে তৈরী ঐ তত্ত্ববোধিনী।

আজ জাতীয়তার সঙ্গে মৌখিক আত্মীয়তা নেই এমন ছেলে মেয়ে এদেশে দেখাই যায় না; কিন্তু একদিন দেশানুরাগ বৃত্তির ঐ শুভনাম-করণ-সংস্কার প্রথমে সম্পন্ন হয় পবিত্র দেবেন্দ্রভবনে। আজ দেশের রাজনৈতিক গগনে বড় বড় সূর্য্যপ্রকাশে অনেক নক্ষত্রেরই দীপ্তি লুপ্ত হ'য়েছে। সেই লুপ্ত-দীপ্তি নক্ষত্ররাজির মধ্যে আত্মহারা তারা নবগোপাল মিত্র বোধ হয় ১৮৬৮ অব্দে দুটি ভাব বুকের ভেতর নিয়ে, আর-একখানি কাগজ হাতে করে' মহর্ষির চরণতলে উপস্থিত হন। কাগজখানির নাম 'ন্যাশানাল পেপার' আর ভাবদুটির আখ্যা বাহুবল ও মিলন—একতা।

তখনকার ছোকরারা ল্যাঙট পরে' মাটি মেখে পালোয়ানী কুস্তি করতে বড় প্রস্তুত নয়, তাই যুবকদের ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্য নবগোপালের উদ্যোগে জিমন্যাষ্টিক বন্দোবস্ত হ'ল, আর মিলনের বর্ণ-পরিচয় শিক্ষার পাঠশালাস্বরূপ জাতীয় মেলা বা চৈত্রমেলা বলে' একটি বার্ষিক প্রদর্শনী খোলা হয়। বাঙালীর বারোমাসে তের পার্ব্বণের ভেতর ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের করুণায় চড়কের বাণফোঁড়া সম্প্রতি উঠে গিয়ে চৈত্র-সংক্রান্তিটা কেমন ফাঁকা ঠেকে, সেইজন্য ঐ দিনটি বেছে নবগোপাল মিত্র একটি নূতন পার্ব্বণ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেন। ঐ মেলা প্রথমে বেলগেছে ডন্‌কিন্ সাহেবের বাগানে হয়। ছোট বড় সকলেরই প্রবেশ অধিকার, প্রবেশদ্বারে কিছু দিতেও হ'ত না। হায়, আজ বলতে লজ্জা হয়, শেষাশেষি ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম হিন্দুমেলা দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ খরচের সাহায্যের জন্য কর্তৃপক্ষেরা যখন দ্বার-প্রবেশের জন্য এক আনা টিকিট ধার্য্য করেন, তখন অনেক সেয়ানা ভদ্রলোক চটে গেলেন—বাজে খরচের কথা শুনে, মেলাটি বন্ধ হ'য়ে গেল আর আজ 'কিং কার্ণিভ্যাল' দেখতে বাবু, বিবি, বাবালোকের কি ভিড়! ঐ মেলাতে কিছু কিছু কৃষিপ্রদর্শনী থাকত, মহিলাশিল্পের অনেক বিচিত্র নমুনা প্রদর্শিত হ'ত আমাদের ন্যায় যুবকেরা জিমন্যাষ্টিক্ ও এ্যাক্রোব্যাটিক কৌশল দেখাত, আর বর্দ্ধমান অঞ্চল থেকে রায়বেঁশে নামক বাঙালী কসরৎ খেলোয়াড়ের দল ঢাক ঢোল বাজিয়ে এসে যে শরীরের বল ও ক্রীড়া-কৌশল দেখাত তা আজ পর্য্যন্ত কোনো য়ুরোপীয় সার্কাসের দলে দেখিনি।

উদ্যোগ ছিল নবগোপাল ও তাঁর সহকারীগণের, কিন্তু শক্তির সঞ্চার করতেন প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভৃতি জোড়া-সাঁকোর জ্যোতিষ্কগণ।

> "মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান, মনপ্রাণ
> গাও ভারতের যশোগান ;—"

ভারত-মাতার এই আদি বন্দনা-কবিতার উদ্দীপনাপূর্ণ করুণ আবৃত্তি ঐ মেলাতেই প্রথমে আমরা সুপাঠক গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের মুখে শুনি।

এদেশে নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়কলার ঠিক প্রবর্ত্তক না হ'লেও, শোনা গেছে বহুদিন পূর্ব্ব হ'তেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পারিবারিক প্রমোদচ্ছলে সামাজিক রঙ্গলীলাদি রচিত ও অভিনীত হ'ত। পরে—সেও বোধ হয় ১৮৬৮ অব্দে ঐ স্থানে 'নবনাটক' নামে একখানি সম-সাময়িক চরিত্রাবলী-সংযুক্ত সামাজিক নাটক অতি উৎকৃষ্টভাবে অভিনীত হ'য়েছিল। ঐ নাটকে নট-নটী ছিল এবং নটী সেজেছিলেন স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। আহা কি রূপ! কি রূপ! বঙ্গদেশের রঙ্গমঞ্চের এমন সৌভাগ্য কবে হবে যে সেই সৌন্দর্য্যের রাশি বিকসিত করে' কোনো রমণী দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করবে। আর কণ্ঠ—গানটি "জয়দেবী" সংস্কৃতে রচিত, আর বীণার ঝঙ্কারে গীত। যাঁর সঙ্গে একমঞ্চে অভিনয় করে' একদিন গৌরবান্বিত হয়েছি, সেই প্রবীণ নট ৺অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেজেছিলেন কর্ত্তা—গবেশ বাবু; প্রিয়সুহৃদ অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী বরাবর বলত যে, অক্ষয়বাবুর ঐ অভিনয় দেখেই সে তার নিজের অনমুকরণীয় বৃদ্ধ কর্ত্তার ভূমিকা-অভিনয়-প্রণালী সৃষ্টি করে।

পূজ্যপাদ নাট্যকার গুরু স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় ঐ নাটকগুলি লিখে ঠাকুর-বাড়ী থেকে একখানি রূপার থালায় সাজানো পাঁচশোটি টাকা মর্য্যাদাস্বরূপ প্রাপ্ত হন। আজ তর্করত্ন মহাশয় ঐরূপ নাটক লিখ্‌লে অন্ততঃ দুই সহস্র-মুদ্রা লাভ করতে পারতেন; তবে এখন হ'লে সেটা বেতন, তখন ছিল সেটা মর্য্যাদা। সাহিত্য-জগতে অপরিচিত গিরীশচন্দ্রের নাট্যরচনা-প্রণালীর প্রশংসা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত 'ভারতী'তেই প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিবরের 'মায়াতরু'র কল্পনা ও গীত, সাগরবালা, স্বপ্নসঙ্গিনী প্রভৃতি অশরীরী চিত্রের সৃষ্টি ও তাঁহার নাট্যছন্দের সুখ্যাতি প্রথমে ঐ 'ভারতী' মুক্তকণ্ঠে করে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত, আজকাল এদেশে অভিনয়ের যে এত বৃদ্ধি, এত আদর আর সঙ্গীতবিদ্যার যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, তার মূলেও ঐ মহান ঠাকুর-মহীরুহের অন্যতম শোভাময় শাখা—মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁর অনুজ স্যার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

যখন দেশের সৌন্দর্য্যবোধ-বুদ্ধি বিকৃত হ'য়ে রূপের পরিচয় 'দিব্য ছেলেটি, যেন নাদুস্‌নুদুস গণেশটি,' 'আহা মেয়েটি নয় যেন আহ্লাদী পুতুলটি' দাঁড়াচ্ছিল; যখন কলসীর কাণা বাউটি আর কাণভরা মাকড়ির সাথে রূপের লহরে প্রলয়ের তুফান তুল্‌ছিল তখন জোড়াসাঁকোই সাময়িক শিক্ষিত অধিবাসিগণের মধ্যে অঙ্গসৌষ্ঠবের ও পরিচ্ছদের একটা আদর্শ ধরে' দেয়। দেবেন্দ্র-মন্দিরে সৌন্দর্য্য-পূজার পারিপাট্যের এদেশে এত প্রসিদ্ধি যে, আজ যদি রবীন্দ্রনাথ কবিকুলেন্দ্র বলে' সম্মানিত হবার শক্তিলাভ না কর্‌তেন তবে তাঁর নামে অনায়াসে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করা চল্‌ত।

মহর্ষির পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে এক-একজন এক-একটি রত্ন। লোক ধনে দীন, রত্ন কথাটি কাণে শুনেছে, অক্ষরে দেখেছে, প্রত্যক্ষ পরিচয় কখনও হয় নি সুতরাং সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, হীরে, পান্না, চুনী প্রভৃতি কিসের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের তুলনা দেবে তা ঠিক কর্‌তে পার্‌ছে না। তবে রত্ন বললেই যে একটি জ্যোতিঃপূর্ণ স্বচ্ছোজ্জ্বল, বিমল,—মহারাজেন্দ্রশিরোভূষণোপযোগী অমূল্য পদার্থের ছবি চক্ষের সাম্‌নে ফুটে ওঠে, দ্বিজেন্দ্রনাথের নামেও তেম্‌নি একটি মানব-প্রকৃতির প্রতিভার শান্ত সৌন্দর্য্যের, অতুল ঐশ্বর্য্যের আভা যেন নয়ন-পথে প্রদীপ্ত হয়।

আমাদের ইংরাজীশিক্ষিত পণ্ডিতগণ ইদানীং ফিলজফারের অনুবাদে 'দার্শনিক বলে' একটা কথা সৃষ্ট করেছেন, সেজন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক নামে অভিহিত হতেন। কিন্তু প্রাচীন যুগে দর্শন শব্দ আত্মদর্শন অর্থে প্রযোজিত হ'ত, আর সেই শক্তির অধিকারীকে জ্ঞানচক্ষুউদ্ভাসিত ঋষি বলে' সম্মান করত। ক্রিশ্চান ধর্ম্মগ্রন্থে ঐরূপ মনীষীকেই বোধ হয় Wise man of the East বলে' উল্লেখ করে। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, পারস্য প্রভৃতি ভাষায় দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বৈয়াকরণিক, দার্শনিক, ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ ও কবি ছিলেন। কিন্তু আত্মদর্শন-শক্তির গভীরতায় তাঁকে যুগপ্রভাবের তুলনায় ঋষি বললে অত্যুক্তি হয় না।

প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করে'ও তিনি একপ্রকার সর্ব্বত্যাগী ছিলেন। পারিবারিক ইতিহাসের উজ্জ্বল পবিত্র পৃষ্ঠায় তাঁর ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেবার্চ্চনা-পূত চন্দনের অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

অনুমান ছিয়াশী বৎসর বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করেছেন। যে প্রতিভাবান পুরুষের জীবন-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে, তাঁর মস্তিষ্কে অন্ততঃ এক শত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে অঙ্কিত থাকা সম্ভব।

প্রায় দেড়শত বৎসরের আখ্যায়িকার লিপিপূর্ণ এই জীবন্ত গ্রন্থখানি এতদিন পরে কালের সকয়শালায় চলে' গেল! পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি লোকলোচন হ'তে অন্তর্হিত হ'ল! জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত হ'ল!

ঠাকুরবাড়ীতে রবির আলো, বহু বিজলীর দীপ্তি, স্বর্ণ প্রদীপের শান্ত শোভা, সবই রইল বটে, কিন্তু ঠাকুরঘরের ঘৃতসিক্ত মঙ্গলদীপটি নিবে গেল।

(ভারতী, চৈত্র ১৩৩২).　　শ্রীঅমৃতলাল বসু

বর্ব্বরজাতির বিবাহপ্রথা

সকল অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে যে-সকল নিয়ম ও প্রথা প্রচলিত, কে বলিতে পারে সভ্যজাতির আদিপুরুষেরাও একদিন এই-সকল প্রথার অনুসরণ করেন নাই?

কেপ্‌ অব্‌ গুড্‌ হোপের হটেন্‌টটেরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি বা অনুরাগের চক্ষে দেখে না, বরং পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে ভালবাসে। কাউসাবাসী কাফ্রীদের বিবাহে প্রণয় বা অনুরাগের কোনও আভাস পরিলক্ষিত হয় না।

মধ্য আফ্রিকার আরিবা প্রদেশের অধিবাসিগণ পরিণয় ব্যাপারে নিতান্তই উদাসীন। তাহাদের নিকট দারপরিগ্রহণ করা ও একগাছ ধানের ছড়া কাটা সমান কথা। ম্যান্‌ডিন্‌ জাতি বিবাহ অর্থে দাসত্ব বুঝিত—স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বাস বা হাসি তামাসা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় বা অনুরাগ মোটেই নাই। যুবকগণ রমনার পরিচর্য্যা পাইবার জন্য উহার পাণিগ্রহণ করে।

আমাদের দেশেও নীচ ঘরের মেয়েদের এইপ্রকার দুর্দ্দশা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী উহাদের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত; তাই তাহাদের যথেচ্ছ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এত লাঞ্ছনা যন্ত্রণা পাইয়াও তাহারা স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে বিমুখ হয় না।

সুমাত্রা দ্বীপে পূর্ব্বে তিন প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল:—

১। জুগুর বিবাহ—এই বিবাহে স্বামী স্ত্রীকে ক্রয় করিত।
২। আম্বেনানক—স্ত্রী স্বামীকে এই প্রথানুসারে ক্রয় করিত।
৩। সিমাণ্ডো—অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী পরস্পর সাম্যভাবে পরিণয়ে আবদ্ধ হইত।

আম্বেনানক বিবাহে কন্যার পিতা একটি যুবককে কন্যার বর বলিয়া মনোনীত করিত; প্রায়ই কন্যার পিতার বংশ হইতে যুবক নিম্নবংশোদ্ভূত হইত এবং সেই বংশের ছেলের উপর বিবাহের পর কোনও অধিকার থাকিত না। পরে যুবককে শ্বশুরালয়ে আনা হইত। কন্যার পিতা একটি মহিষ বলি দিত এবং যুবকের আত্মীয় স্বজন কন্যার পিতাকে বিংশ ডলার যৌতুক স্বরূপ দান করিত। বিবাহের পর হইতে যুবকের ভরণপোষণ ও ভালমন্দ সকলই কন্যার পিতার উপর ন্যস্ত হইত।

সিমাণ্ডো বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্পষ্টই নির্ণীত হইয়াছে। এই বিবাহে বর কনের আত্মীয়কে বার ডলার যৌতুক দান করে। বর কনে সম্পত্তির সমান অংশী হয়। বরের অর্থের কনে সমান ভাগ পায়; আবার কনের অর্থেও বরের সমান অংশ থাকে।

জুগুর বিবাহে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয়।

সিলোনে দুইপ্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে—(১) ডিগা বিবাহ, (২) বীনা বিবাহ। প্রথম প্রথানুসারে স্ত্রী স্বামীর আশ্রয়ে গমন করে; কিন্তু দ্বিতীয় প্রথানুসারে স্বামী স্ত্রীর আশ্রয়ে চির-জীবন অতিবাহিত করে। সিলোনের বিবাহ অস্থায়ী বিবাহ বলিলেই চলে। কারণ, স্ত্রী স্বামীর সহিত প্রথম পনর দিন সহবাস করে। ইহার পর যদি উহাদের মতের মিল হয় তবে চিরজীবন একত্রে অতিবাহিত করে; যদি গরমিল হয় তবে তখনই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।

জাপানে উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র বিবাহ করিয়া কনে ঘরে আনে এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহ করিয়া বর ঘরে আনে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বর পরিবারভুক্ত হয়। অতএব একবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র অপর বংশের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না।

দক্ষিণ ভারতের রেড়ি জাতির প্রথাটি উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ বা বিংশ বর্ষীয়া একটী যুবতী পাঁচ কি ছয় বৎসর বয়সের এক বালকের সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়। কিন্তু যুবতী বালকের ভ্রাতা, মাতুল বা বালকের পিতার সহিত বাস করে এবং ফলে যদি সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানের পিতৃত্ব এই বালককেই গ্রহণ করিতে হয়।

টারকোম্যানরা বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যে বর কনের সহিত একদিনও দেখা করিতে পায় না।

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জাতির দম্পতী বিবাহের সাত দিনের মধ্যে একত্র বাস করে না।

হিন্দুস্থানের রাওলান জাতির বিবাহপদ্ধতি মোটেই নাই। নীলগিরি পর্ব্বতস্থ কুরুম্ব জাতির ভিতরও কোন পরিণয়-প্রথা প্রচলিত নাই। মধ্য-ভারতের কোটীয়া জাতির ভাষায় 'বিবাহ' শব্দের সমানার্থক পদ নাই। ভুটীয়ারা নারীজাতির সম্মান মোটেই করে না। যুক্তরাজ্যের রেডস্কিন্ জাতির বিবাহ-পদ্ধতি অন্যরূপ। বর-কনের মত হইলেই উহাদের বিবাহ হইল, কোনও নিয়ম মানিতে হয় না বা কোন উৎসবও হয় না।

কুইন্ চারলটী দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। মেয়েরা, পুরুষ মাত্রকেই স্বামীর চক্ষে দেখে বটে, কিন্তু তাহারা অপেক্ষাকৃত সংযমী।

নীলগিরি পর্ব্বতের টোডাজাতির মধ্যে একটি আশ্চর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে। যখন কোনও যুবক একটি যুবতীকে বিবাহ করে, যুবতী যুবকের অন্যান্য ভ্রাতাদেরও লালসার ইন্ধন যোগাইতে বাধ্য হয়; এবং যুবতীর অন্যান্য ভগিনীগণও তাহাদের সহিত পরিণীত হয়।

ভারতের টোটীয়া জাতির মধ্যে একই রমণীকে যুগপৎ ভ্রাতা, ভাগ্নেয়, পিতৃব্য, পিসা ইত্যাদি অনেকে বিবাহ করিতে পারে এবং রমণীর উপর প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের গন্দ জাতি স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিতে পারে না; কিন্তু পিতামহী বা মাতামহীকে বিবাহ করিতে পারে।

কোলদের মধ্যে বালিকার মূল্য ধার্য্য করা হয়।

গারোদের বিবাহপ্রথা অন্যপ্রকার। যুবক ও যুবতী বিবাহে সম্মত হইলে, যুবতী কয়েক দিনের আহার্য্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া পর্ব্বতে প্রস্থান করে; যুবক তাহার পশ্চাদানুসরণ করে। কয়েকদিন পরে স্বামী স্ত্রী পর্ব্বত হইতে চলিয়া আসে এবং মহাসমারোহে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়।

মালয় পেনিন্সুলাতে বিবাহ-সভায় একটি বৃত্তাকার মণ্ডপ তৈয়ারী করা হয়। জনৈক বৃদ্ধ কনেকে সভাতে লইয়া আসে এবং কনে সেই বৃত্তের চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে থাকে। যদি বর কনেকে স্পর্শ করিতে পারে, তবেই তাহাদের বিবাহ হয়।

ভারতবর্ষের খন্দ জাতি রমণীগণের সতীত্বের মর্য্যাদা রাখে না। দশ কি বার বৎসরের বালক পনের কি ষোল বৎসরের যুবতী বিবাহ করে এবং যুবতারা নারীর মর্য্যাদা রাখে না।

খন্দগণ বিবাহ ব্যতীত স্ত্রী পুরুষভাবে বাস দোষের বলিয়া মনে করে না এবং বিবাহের পূর্ব্বে যুবতীগণ সন্তানের জননী হইলে যুবতীর কোনও অপমান নাই, যদিও তাহাদের বিবাহ করিতে খন্দদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না।

ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের মেরিস জাতির ভিতর বহু-স্বামিকা প্রথা বর্ত্তমান আছে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পিতার সকল স্ত্রীর স্বামীত্বে বৃত হয়, কেবল নিজের প্রসূতি বাদে। প্রত্যেক বালিকা নিজ নিজ মূল্য ধার্য্য করে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বালিকার মূল্য অনুন ত্রিশটি শূকর। আরবদেরও বহু-স্বামিকা প্রথা প্রচলিত আছে। তবে আরবদের বর-কনের অভিভাবকগণই সম্বন্ধ ঠিক করে। বিবাহে কোন উৎসব হয় না, কেবল একটি ভোজ হয়। এই ভোজের জন্য বর ইন্দুর ও কাটবিড়াল ইত্যাদি তৃপ্তিকর খাদ্য সংগ্রহ করে।

মিশমীদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। যার যত বেশী স্ত্রী আছে সে তত বড় ধনী বলিয়া গন্য হয়।

ক্যারিবদেশীয়েরা নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রমণীগণকে ধরিয়া আনিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দিত এবং তাহাদের সহিত অন্য কোনও সম্বন্ধ রাখিত না।

(প্রকৃতি, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৩২) শ্রী রাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর বড় বড় চিড়িয়াখানা

এশিয়া

১। জালালাবাদ চিড়িয়াখানা, আফগানিস্থান; পৃষ্ঠপোষক কাবুলের আমির

২। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পার্ক, রেঙ্গুন (ব্রহ্মদেশ); স্থাপিত ১৯০৬ খৃঃ অব্দ

ক্যাণ্টন চিড়িয়াখানা, চীন; স্থাপিত ১৯১১ খৃঃ

পিকিং চিড়িয়াখানা, চীন; স্থাপিত ১৯০৬ খৃঃ অব্দ

পাবলিক গার্ডেন, জ্যাকুয়েন (চীন); স্থাপিত ১৯০৯ খৃঃ

বটানিক্যাল গার্ডেনস, হানোই (টোকিন; ফারদার ইণ্ডিয়া)

সাইগন চিড়িয়াখানা, কোচিন চায়না (ফারদার ইণ্ডিয়া)

বাঙ্গালোর চিড়িয়াখানা (ভারতবর্ষ); স্থাপিত ১৮৫৫ খৃঃ অব্দ

৯। ষ্টেট গার্ডেনস্, বরদা (ভারতবর্ষ)

১০। ভিক্টোরিয়া গার্ডেনস্, বোম্বাই (ভারতবর্ষ); স্থাপিত ১৮৭০ খৃঃ অব্দ

১১। আলিপুর চিড়িয়াখানা, কলিকাতা (ভারতবর্ষ); স্থাপিত ১৮৭৫ খৃঃ অব্দ

১২। জয়পুর চিড়িয়াখানা (ভারতবর্ষ); স্থাপিত ১৮৭৫ খৃঃ অব্দ

১৩। করাচী চিড়িয়াখানা (ভারতবর্ষ); মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত

১৪। লাহোর চিড়িয়াখানা (ভারতবর্ষ); গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত

১৫। মান্দ্রাজ মিউনিসিপাল চিড়িয়াখানা (ভারতবর্ষ); স্থাপিত ১৮৫৮ খৃঃ অব্দ

১৬ মহীশূর চিড়িয়াখানা (ভারতবর্ষ) ; স্থাপিত ১৮৯২ খৃঃ অব্দ
১৭ নাগপুর ,, (ভারতবর্ষ)
১৮ পেশোয়ার ,, (ভারতবর্ষ)
১৯ হায়দ্রাবাদ ,, (ভারতবর্ষ) ; পৃষ্ঠপোষক হায়দ্রাবাদের নিজাম।
২০ লক্ষ্ণৌ ,, (ভারতবর্ষ) ; ১৯২৩ খৃঃ অব্দ
২১ ত্রিবান্দ্রম (ভারতবর্ষ) ; ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ
২২ ওকাজ্যাকি পার্ক, কাইটু (জাপান) ; স্থাপিত ১৯০৩ খৃঃ অব্দ
২৩ সিনমো চিড়িয়াখানা (জাপান) ; স্থাপিত ১৯১০ খৃঃ
২৪ ওসাকা ,, ,,
২৫ টোকিও ,,
২৬ সাইবিরিয়া ,, (রুষিয়া)
২৭ ব্ল্যাডিবসটক্ চিড়িয়াখানা

ইউরোপ

১। লণ্ডন চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮২৮ খৃঃ অব্দ
২। বেলভিউ গার্ডেনস্, মাঞ্চেষ্টর ; স্থাপিত ১৮৩৬ খৃঃ অব্দ
৩। ক্লিফ্টন, ব্রিষ্টল ; স্থাপিত ১৮৩৫ খৃঃ অব্দ
৪। ওবর্ণ, বেডস্ ; ডিউক্ অফ্ বেড্‌ফোর্ডের নিজস্ব
৫। অটারস্পুল, লিভারপুল ; স্থাপিত ১৯১৪ খৃঃ অব্দ
৬। এডিন্‌বরা চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৯১৩ খৃঃ অব্দ
৭। ফেনিক্স পার্ক, ডব্‌লিন্ ; স্থাপিত ১৮৩০ খৃঃ অব্দ
৮। স্তাইনা, স্কনবার্ণ ; স্থাপিত ১৭৫২ খৃঃ অব্দ
৯। এণ্টোযাপ চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮৪৩ খৃঃ অব্দ
কোপেনহেগেন ,, স্থাপিত ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ
১১ জারডিন ডি প্লানটেস্, প্যারিস ; স্থাপিত ১৭৯৩ খৃঃ অব্দ
১২ য়্যাক্লিমেটিজেসন্ চিড়িয়াখানা, প্যারিস ; স্থাপিত ১৮৫৮ খৃঃ অব্দ
১৩ বার্লিন চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ
১৪ ব্রেসলিউ চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮৬৫
১৫ কলোন ,, স্থাপিত ১৮৬০ খৃঃ অব্দ
১৬ ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন্-মেন্ ; ,, ১৮৫৪ ,,
১৭ হামবার্গ চিড়িয়াখানা ; ,, ১৮৬৩ ,,
১৮ ষ্টেলিন্‌জেন চিড়িয়াখানা, হামবার্গ ১৯০২ ,,
১৯ হানোভর ,, ,, ১৮৬৩ ,,
২০ এমসটার্ডম্ ,, ,, ১৮৩৮
২১ রথার্ড্ম্ ১৮৫৭
২২ হিলভাসন্ ,, মিঃ এফ, ই, ব্লাউজের নিজস্ব
২৩ এস্‌কোনিয়া নোভা ; এফ্, ফ্যালৃজ্-ফীনের নিজস্ব
২৪ বেল্ চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ

আফ্রিকা

১। গিজা চিড়িয়াখানা, কাইরো ; স্থাপিত ১৮৯১ খৃঃ অব্দ
২। প্রিটোরিয়া ,, ,, ১৮৯৮ ,, ,,

আমেরিকা

১। সেন্‌ট্রাল পার্ক, নিউইয়র্ক ; স্থাপিত ১৮৬৫ খৃঃ অব্দ
২। ব্রঙ্ক পার্ক, ,, ; ,, ১৮৯৮ ,, ,,
৩। ন্যাসনাল জুলজিকাল্ পার্ক, (স্মিথসোনিয়ান্) ওয়াসিংটন ; স্থাপিত ১৮৯০ খৃঃ
৪। বিউনোজ আয়ারস মিউনিসিপাল চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮৭৪ খৃঃ

অষ্ট্রেলিয়া

১। এডিলেয়ার চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮৭৯ খৃঃ অব্দ
২। মেলবোর্ন ,, ; ,, ১৮৫৭ ,, ,,
৩। সিডনি ,, ; ,, ১৮৭৯ খৃঃ অব্দ

(প্রকৃতি, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৩২)

শ্রী ভূদেবচন্দ্র বসু

—

সাহিত্য-সভানেত্রীর অভিভাষণ

পণ্ডিতগণের অনুমান এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা মানুষের সহজাত। প্রাগ্‌বৈদিকযুগের বঙ্গভূখণ্ডবাসী আদিম মানুষের সহজাত যে ভাষাবীজ ছিল, তাই ক্রমে অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হ'য়ে বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় পরিণত হয়েছে, এই তাদের সিদ্ধান্ত।

বুদ্ধদেবের সময়ে, অর্থাৎ অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গলিপির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যে-ভাষার লিপি এত প্রাচীন তার সাহিত্য প্রাচীনতর হবে সন্দেহ নেই। আজ পর্য্যন্ত সবচেয়ে পুরাণ যে বাঙ্গালা রচনা পাওয়া গেছে তার বয়স অনুমান এক হাজার বৎসরেরও অধিক। সেটি রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপুরাণ বা শূন্যপুরাণ। সে বাঙ্গালা আধুনিক বাঙ্গালীর দুর্ব্বোধ্য নয়। তার একটুখানি নমুনা দিই :—

নহি রেক নহি রূপ নহিছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জলথল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
দেউল দেহেরা নহি পূজিবার দেহ।
মহাপুন্ন মাঝ পরভুর আর অছি কেউ॥
ঋষি যে তপস্বী নহি নহিক বাম্ভন।
পর্ব্বত পাহাড় নহি নহিক স্থাবর জঙ্গম।
সুন্নথল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আম্বার॥
বারবত্ত ন ছিল ঋষি যে তপস্বী।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী
পৈরাগ মাধব নহি কি করি বিচার।
স্বগগ মত্ত নহি ছিল সব ধুন্ধুকার .
দস দিগ্‌পাল নহি মেঘ তারাগণ।
আউ মিত্ত নহি ছিল যমর তাড়ন॥
চারি বেদ ন ছিল ন ছিল সাস্তর বিচার।
গোপত বেদ কৈলন পরভু করতার॥
ছিধর্ম্ম পদারবিন্দ করিবাক নতি।
রামাঞি পণ্ডিত কহে সুনরে ভারতী॥

বিদেশী মুল্লাদের সততভাষণে অনেকগুলি পার্শি ও আরবী শব্দ তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ ক'রে তাদের বাঙ্গলাকে কিছু বিকৃত করেছে বটে, কিন্তু তা বাঙ্গলাই রয়েছে, উর্দ্দু হয়নি। হিন্দুমুসলমান দুয়েরই দরবারী ভাষা হ'ল ফার্সি, ঘরের ভাষা উভয়েরই রইল বাঙ্গলা এবং সেই বাঙ্গলায় হিন্দুমুসলমান দু'জনের প্রাণ হ'তেই নিঃসৃত হ'ল বাঙ্গালা সাহিত্য।

ভাষার ঐক্যের উপরই জাতীয়তা নির্ভর করে। বালিকা জোয়ান্ অব্-আর্ক ফ্রান্সের মুক্তিকল্পে এই কথাটাই হৃদয় হ'তে অনুভব করেছিল। মূর্খ, গ্রাম্য ষোড়শী স্বদেশের দাসত্ব-মোচনে অনুপ্রেরিতা হয়ে, ভাবের আবেগে এই একটি সত্যের দর্শন পেয়েছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারে যখন ফরাসী সেনাধ্যক্ষ জোয়ান-অব-আর্ককে জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার দেশ কোথায়? লোরেনের অন্তর্গত ডোমরেমিতে না?"

জোয়ান উত্তর দিল—"হাঁ, তাতে কি আসে যায়? আমরা সবাই ফরাসীভাষী।"

সেনাপতি যখন জিজ্ঞাসা করলেন—"ইংরেজ সৈনিক কি ভীষণ লড়াই করে দেখেছ?"

বালিকা বললে—"তারা ত মানুষ। বিধাতা আমাদেরই মত তাদেরও সৃষ্টি করেছেন। তাদের নিজের দেশ ও নিজের ভাষা দিয়েছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রেত কখন নয় যে তারা আমাদের দেশে আসবে আর আমাদের ভাষা বলতে চেষ্টা করবে।"

সেনাধ্যক্ষ উষ্ণ হ'য়ে বললেন—"এসব গাঁজাখুরি কে তোমার মাথায় ঢোকালে? সৈনিকরা তাদের প্রভুর অধীন, সে প্রভু বার্গাণ্ডির ডিউক, ফ্রান্সের রাজা বা ইংলণ্ডের অধীশ্বর যখন যেই হোক! তাদের নিজের ভাষার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?"

জোয়ান উত্তর দিল—"আমি তা বুঝিনে। আমরা সবাই বৈকুণ্ঠের রাজার অধীন। তিনিই আমাদের আপন দেশ ও আপন ভাষা দিয়েছেন, আমাদের তাতেই নিষ্ঠা চান। তা যদি না হ'ত, তবে যুদ্ধক্ষেত্রেও ইংরেজকে মারা নরহত্যা হ'ত, আর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবার ভয় থাকৃত তোমার। নরপ্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভেবো না, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভাবো।" "ঈশ্বর তাদের জন্যে যে-দেশ সৃষ্টি করেছেন, এবং যে দেশের জন্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন সেই স্বদেশে ফিরে গেলে ইংরেজেরা ঈশ্বরের সুবোধ শিশু হবে। আমি ব্ল্যাক প্রিন্সের কথা শুনেছি। সে যে মুহূর্ত্তে আমাদের দেশে পাদক্ষেপ করে শয়তান সেই মুহূর্ত্তে তার ভিতর প্রবেশ করে' তাকে দানব বানিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের দেশে—যেখানকার জন্যে সে সৃষ্ট—সে অতি ভাল মানুষ। সব ঘটেই এই কথা। আমিও যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দখল করতে যেতুম, সেখানে বাস করতে ও সেখানকার ভাষা বলতে চেষ্টা করতুম, আমারও ভিতর শয়তান-প্রবেশ করত।"

মুসলমানদের মধ্যে যত শিক্ষার প্রচার হবে ততই "মুসলমানী বাঙ্গালা" উৎকর্ষ লাভ করবে, প্রাঞ্জল ও সুললিত হবে। বাঙ্গালায় উর্দ্দু বা ফার্সি শব্দের প্রবেশাধিকার যথেষ্ট আছে—কিন্তু জায়গা বুঝে এবং কায়দা করে' তাহাদের প্রবেশ করাতে হবে যাতে বাঙ্গালার ধাতে মিলে যায়, কিম্ভূতকিমাকার না দেখায়, শ্রুতিমধুর হয়।

এমন আরও অনেক হিন্দু কবি ও লেখক আছেন যাঁরা প্রচলিত ফার্সি শব্দের ভাণ্ডার থেকে অপর্য্যাপ্তভাবে গ্রহণ করেও বাঙ্গালার কায়দাতি নষ্ট করেননি, কিন্তু মুসলমান লেখকেরা প্রায়ই ওজন ঠিক রাখতে পারেন না, তাঁদের হাতে আরবী ফার্সির অযথাভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে বাঙ্গালার শ্রী অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে যায়।

দেশ, বেশ ও ভাষা এই তিনে এক হ'য়ে বঙ্গমাতার সব সন্তানগুলি যেদিন পাশাপাশি সৌভ্রাত্রভাবে দাঁড়াবে, ধর্ম্মভেদ যেদিন আর তাদের মর্ম্মচ্ছেদ করতে পারবে না, সেদিন বঙ্গসাহিত্যের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হবে।

(মাতৃমন্দির, বৈশাখ ১৩৩৩) শ্রীমতী সরলা দেবী

—

প্রাচীনকালের ক্রীড়াকৌতুক

এই প্রবন্ধে প্রাচীন কালের কতকগুলি ক্রীড়াকৌতুক বর্ণনা করিবার প্রয়াসী হইয়াছি। আমি যেগুলি বর্ণনা করিব, তৎব্যতীত আর ক্রীড়াকৌতুক ছিল না—এ-কথা কেহ মনে করিবেন না।

১। ঘটানিবন্ধন—দেবগণের উদ্দেশে যাত্রা মহোৎসবই ঘটা। সেখানে সকল নাগরিক সমবেত হইয়া গণধর্ম্মানুসারে ব্যবস্থা করিতেন। পক্ষের বা মাসের কোনও-একটি প্রজ্ঞাত দিবসে সরস্বতী-গৃহে নিযুক্ত নটগণের সমাজ বা মিলন হইত। যেদিন যে-দেবতার পূজা প্রসিদ্ধ তাহাই তাহার প্রজ্ঞাত দিবস; যেমন গণেশের চতুর্থী, সরস্বতীর পঞ্চমী, দুর্গার অষ্টমী। সরস্বতী বিদ্যাকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া তাঁহার মন্দিরে পূজানুষ্ঠানে ক্রীড়ানিযুক্ত নটগণের মিলন হইত। অন্য দিনে ধূপ বিলেপন ঘটা হইত। প্রথম দিনে নটগণ নিজেদের প্রয়োগ সাধারণকে দেখাইত। দ্বিতীয় দিনে টাকা আদি প্রাপ্ত হইত।

২। সমস্যা ক্রীড়া—

(ক) যক্ষরাত্রি বা সুখরাত্রি—কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে প্রায়শঃ দ্যূতক্রীড়া হইত। ঐ দিনে দীপালিও দেওয়া হইত।

(খ) কৌমুদীজাগর—আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার আধিক্য হয় বলিয়া তাহাকে কৌমুদী বলে। সে-সময়ে দ্যূতক্রীড়া করিয়া রাত্রি জাগরণ করা হইত এবং দোলায় আন্দোলন করা হইত।

(গ) সুবসন্তক বা মদনোৎসব। এই সময় নৃত্যগীত-বাদ্যাদি হইত।

৩। সহকারভঞ্জিকা—আম্রফল পাড়িয়া তাহা (দল-বলের সহিত আম্র-বাগানে গমন করিয়া) খাওয়া।

৪। অভ্যূষখাদিকা—দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষস্থ ফল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা ভোজন করা।

৫। বিসখাদিকা—সরোবরের তীরবাসী লোকগণের দলবদ্ধ হইয়া মৃণাল তুলিয়া ভোজন করা।

৬। নবপত্রিকা—প্রথম বৃষ্টির পর বৃক্ষে নবপল্লবের সঞ্চার হইলে বনস্থলীতে ক্রীড়া।

৭। উদকক্ষেড়িকা—সে-ক্রীড়ায় বাঁশের নালী লইয়া তাহাতে জলপূর্ণ করিয়া খেলা হয়; পিচকারী খেলা।

৮। পাঞ্চালানুমান—নানাপ্রকার আলাপ ও নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দেখাইয়া সে-ক্রীড়া করা যায়। পাঞ্চাল দেশে ভাঁড়ের নাচ তামাসা হইত।

৯। একশাল্মলী—একটি মহান্ পুষ্পপূর্ণ শিমুল-গাছকে অবলম্বন করিয়া তাহার পুষ্পের আভরণ দ্বারা ক্রীড়া করা।

১০। কদম্বযুদ্ধ—কদম্ব কুসুমকে প্রহরণ করিয়া (ফুটবলের ন্যায়) নিজের বলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পরস্পর ক্রীড়া করা।

১১। মেষযুদ্ধ।

১২। কুক্কুট-যুদ্ধ—দশকুমারচরিতে কথিত আছে, নালিকের জাতি প্রাচ্যবাট কুক্কুট বলাকাজাতি তাম্রচূড় অপেক্ষা বলীয়ান্।

১৩। ষণ্ডযুদ্ধ।

১৪। দংষ্ট্রী-যুদ্ধ।

১৫। প্রেক্ষা বা থিয়েটার।

১৬। যাত্রা ও প্রবহণ; জন্মাষ্টমীর সঙের ন্যায়।

১৭। কন্দুক-ক্রীড়া—ভাঁটা লইয়া খেলা। ভাঁটাতে স্থানে স্থানে লাল রং দেওয়া থাকিত। তাহাকে ভূমিতে লীলা-শিথিল-হস্তে প্রক্ষেপ

করা হইত। পরে আস্তে আস্তে উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া এবং অন্য অঙ্গুলি বিচার করিয়া হস্তদ্বারা আঘাত করিয়া হস্তপৃষ্ঠে উন্নীত করিয়া গ্রহণ করা হইত। পরে ভিন্ন ভিন্ন বেগে অগ্রপশ্চাৎ ধাবন করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বামদক্ষিণ তুণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হইত। এইরূপে নানামণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া ক্রীড়া করা হইত।

১৮। অক্ষক্রীড়া—দশকুমারচরিতে কথিত আছে যে, দ্যূতাশ্রয় কলা পঞ্চবিংশতি প্রকার। এই খেলাতে অক্ষভূমি ও হাতের কারসাজিতে অনেক চাতুর্য্যও করা হইত; তাহা সহজে ধরার উপায় ছিল না। অর্থ বা পণ অঙ্গীকার করিয়া খেলা হইত। লোক-ব্যবহার যুক্তি ও প্রগল্‌ভতা অবলম্বন করিয়া অনেকে কার্য্য উদ্ধার করিত। দুর্ব্বল দেখিলে তাহাকে ভর্ৎসনা করা হইত; অনেকপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়াও কার্য্য সাধন হইত এবং সর্ব্বলোককে নিজপক্ষে আনয়ন করা হইত। সে-সময়ে অনেক অশ্লীল বাক্যও প্রযুক্ত হইত। যে-স্থানে অক্ষক্রীড়া হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং রাজা একজন দ্যূতাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন; সেই দ্যূতাধ্যক্ষ অক্ষশালার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কেহ লুকাইয়া খেলিলে দণ্ডিত হইত। পণের উপর শতকরা ৫৲ টাকা রাজা পাইতেন। আবার খেলায় জুয়াচুরি ধরা পড়িলে দণ্ডও হইত।

১৯। ক্রীড়োপস্কর—পূর্ব্বে কাঠনির্ম্মিত মেষ, ঘোটকাদির ক্রীড়া করা হইত।

২০। জলক্রীড়া—মহাভারত আদি পর্ব্বে ১২৮ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা আছে।

২১। ঘোড়দৌড়—ইহা অতি প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

২২। ইন্দ্রজাল—ভোজবিদ্যা। প্রবাদ—বিদ্যানুরাগী ভোজরাজ এই অপূর্ব্ব বিদ্যার প্রকৃষ্টতাসাধন জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারই আশ্রয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী-কর্ত্তৃক অথর্ব্বাদি বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া ইহা পৃথক্ বিদ্যায় পর্য্যবসিত হয়। প্রবাদ—রাজা ভোজ-প্রবর্ত্তিত এই অদ্ভুত কলাবিদ্যায় তাঁহার কন্যা ভানুমতীই বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' নামক পুস্তকে এই ভোজবিদ্যার নিদর্শন আছে।

২৩। তাসখেলা—আবুল ফজল বলেন, প্রাচীন ঋষিদের আমলেও তাস খেলা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ঋষিগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রতি প্রস্থ তাসে ১২খানি করিয়া তাস থাকিবে, কিন্তু তাঁহারা বারো রঙের ভিন্ন প্রকারের বারো জন রাজা করিতেন না।

এইসকল খেলার মধ্যে পাশাখেলা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে ঋষি বলিয়াছেন—'বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হয়। মুজবান্ নামক পর্ব্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে তাহার রসপান করিয়া যেমন প্রীতি জন্মে, বিভিত্রককাঠনির্ম্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎসাহিত করে।" ঋষি এই কথা বলিয়া কিন্তু পাশার অনেক দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন—অক্ষক্রীড়ক তাহার রূপবতী পত্নী পরিত্যাগ করে। যে-ব্যক্তি পাশা-ক্রীড়া করে তাহার শ্বশ্রূ তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ব্যঙ্গ করে, যদি কাহারও কাছে সে কিছু যাচ্ঞা করে দিবার লোক কেহ নাই। পাশার আকর্ষণ বড়ই কঠিন, যদি কাহারও ধনের প্রতি পাশার লোভ-দৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে অন্যে উহার পত্নীকে স্পর্শ করে। তাহার পিতামাতা, ভ্রাতাগণ তাহাকে চিনিতে পারে না। পাশাগুলি অঙ্কুশমুক্ত বাণের ন্যায় বিদ্ধ করিতে থাকে, ছুরিকার ন্যায় কর্ত্তন করিতেও তপ্ত দ্রব্যের ন্যায় সন্তাপ দিতে থাকে। যে জয়ী হয় তাহার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য মধুময় মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করে। তাহার স্ত্রী দীনহীনা, পুত্র নিরুদ্দিষ্ট।

বৈদিকযুগে তিপ্পান্নটি পাশার দল ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। পাশাগুলি স্পর্শ করিতে শীতল,কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে। অপ্সরাগণ দ্যূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অথর্ব্ববেদে অপ্সরাগণ দ্যূতকুশলা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৈদিকযুগে নৃত্যগীতাদিরও প্রচলন ছিল। শৈলূষ শব্দের উল্লেখ শুক্ল যজুর্ব্বেদে আছে। নট শব্দ পাণিনিতে আছে। প্রাচীন সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেক্ষা শব্দের কথা বিশদভাবেই আছে। সকলেই তাহাতে যোগদান করিত এবং সকলেই তাহাতে চাঁদা দিত।

পূর্ব্বে দণ্ডি-প্রণীত দশকুমারচরিতের উল্লেখ করিয়াছি। অধ্যাপক পিটার্সন্ বলেন, তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় তৎপূর্ব্বেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য ক্রীড়ার বিবরণ বাৎস্যায়নের কামসূত্র এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত আছে। বাৎস্যায়ন ও চাণক্য অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ বলেন; কিন্তু তাঁহারা এপ্রবাদের কি মূল তাহা বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু ডাক্তার জুলিয়স্ জলি বলেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে এবং কামসূত্র চতুর্থ শতকে বিরচিত হইয়াছিল। ফলতঃ তাহারা যে খৃষ্ট জন্মের বহু পরে বিরচিত, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুতরাং আমি যে-সকল ক্রীড়ার কথা বলিয়াছি তাহা খৃষ্ট জন্মের পরবর্ত্তী অষ্টম শতকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কতকগুলি তৎপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

(ভারতী, চৈত্র ১৩৩২)　　　　শ্রী মনীষিনাথ বসু

—

প্লেগের ইতিবৃত্ত

খৃষ্টের জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীস, লিবিয়া, মিশর ও সিরিয়ায় ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়। বাইবেলোক্ত রাজা সলোমনের সময়েও একবার প্লেগ হইয়াছিল। ইহা ইয়োরোপে অনেক বার দেখা দিয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিশর দেশ হইতে তুরস্কের কনষ্টান্টিনোপল হইয়া ইয়োরোপে গিয়া তুরস্ক, ফ্রান্স ও ইটালী জনশূন্য করিয়াছিল। ৫৪৬ খৃঃ ফ্রান্সে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়। তৎপরে ৬৫১ খৃঃ ইটালীতে লোকক্ষয় করে। ৫৯০ খৃঃ ইহা রোমরাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীতে ইয়োরোপে ইহার ভয়ঙ্কর উপদ্রব হয়। ১৩৪৫ খৃঃ ইহা সিসিলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৩৪৬ খৃঃ কনষ্টান্টিনোপল, গ্রীস, ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন, জার্ম্মাণী, সুইডেন ও নরওয়েতে ইহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ১৩৪৮ খৃঃ লণ্ডন সহরে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়, ১৩৬৮ খৃঃ স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৫৪২

খৃঃ মিশরে আরম্ভ হইয়া ইহা কনষ্টাণ্টিনোপল হইয়া পুনরায় ইয়োরোপে গিয়াছিল। ১৬৬৫ খৃঃ ইংল্যাণ্ডে মহামারীরূপে ইহা আত্মপ্রকাশ করে। তদ্রূপ প্লেগ তথায় আর কখন হয় নাই; লণ্ডন সহরেই লক্ষাধিক লোক মারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার প্রাদুর্ভাবে ইয়োরোপে ভয়ঙ্কর মড়ক হইয়াছিল। ১৭৬৯ খৃঃ রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের পর বৎসর, রুষিয়া দেশে আবির্ভূত হইয়া ইহা বহু লোকক্ষয় করিয়াছিল। তদবধি ইয়োরোপ ইহার বিশেষ লীলাভূমি। অধুনা মধ্যে মধ্যে ঐ মহাদেশে ইহা সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

৫৪২ খৃঃ প্লেগ মিশরদেশে আরম্ভ হইয়া আফ্রিকা মহাদেশে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ছিল। ক্রমে সমগ্র আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়া এসিয়া মহাদেশের চীন, পারস্য ও আরব দেশে ইহা আবির্ভূত হয়। ১৮৮২ খৃঃ চীনদেশে ভয়ঙ্কর মড়ক হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃঃ হংকং হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া ক্রমে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

অতি পুরাকালে প্লেগ এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিল। অনেকে বলেন চীনদেশ হইতেই প্লেগ প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে প্লেগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ১৩৩৪ খৃঃ দিল্লীর পাঠান নরপতি মহম্মদ তোগলকের সময় ভারতে প্লেগ প্রবেশ করে। ১৩৯০ খৃঃ আফগান সর্দ্দার টাইমুর যখন দিল্লীনগরে নরশোণিত প্রবাহিত করেন, সেই সময় দুর্ভিক্ষের সহিত প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৫৭৫ খৃঃ প্লেগ বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ১৬১০ খৃঃ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় দিল্লীতে মহামারীরূপে ইহা দেখা দিয়াছিল। ১৬৬৪ খৃঃ সুরাট বন্দরে আবির্ভাব হয়। ১৬৮৯ খৃঃ বোম্বাই সহরে ইহার লীলার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। ১৮১২ খৃঃ কচ্ছ, কাথিয়ার, গুর্জ্জর এবং সিন্ধুদেশ ইহার দৌরাত্ম্য হয়। ১৮১৫ খৃঃ ইহা হিমালয় প্রদেশের কুমায়ন অঞ্চলে উৎপাত করিয়াছিল। ১৮২৩ খৃঃ কুমায়ুনের অন্তর্গত গাড়োয়াল প্রদেশে প্লেগ বহুদিন অবস্থিতি করে। ১৮২৯ খৃঃ দিল্লী, রোহিলখণ্ড ও তৎনিকটবর্ত্তী প্রদেশে ইহার আবির্ভাব হয়। ১৮৩১ খৃঃ মাড়োয়ারের অন্তর্গত পার্শি এবং রাজপুতানার অন্যান্য স্থানে ইহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ১৮৩৬ খৃঃ ভারতের পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে প্লেগ আবির্ভূত হইয়া, তথা হইতে রাজপুতনার পালিনগর ধ্বংস করে। সেই সময় এই মহামারী হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে চীনদেশে ব্যাপ্ত হয়। ১৮৯৫ খৃঃ চীনদেশ হইতে পুনরায় ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল। ১৮৯৬ খৃঃ ইহার আবির্ভাব হইলে ভারতের প্রায় ২৫০০ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৯৭ খৃঃ বোগদাদ নগর হইতে প্লেগ ষ্টীমারযোগে বোম্বাই সহরে আগমন করে। উক্ত বৎসর প্লেগ কলিকাতা সহরে আবির্ভূত হইয়া ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সেই সময় বহু লোক সহর পরিত্যাগ করেন। ঐ বৎসর সমগ্র ভারতে প্রায় ৫৬০০০ লোক ক্ষয় হয়। ১৮৯৮ খৃঃ ১,১৮,০০০ জন; ১৮৯৯ খৃঃ ১,৩৪,৮০০ জন; ১৯০০ খৃঃ ৯২,১৫০ জন; ১৯০১ খৃঃ ২,৭৩,৬৭৯ জন; ১৯০২খৃঃ৫,৭৫০০০ জন; ১৯০৩ খৃঃ ৮,৫০,০০০ জন; ১৯০৪ খৃঃ ১০,২২,২৯৯ জন; ১৯০৫ খৃঃ ১২,৮৬,০০০ জন; ১৯০৬ খৃঃ ৩,৩২,০০০ জন প্লেগে মারা পড়ে এবং ১৯০৭ খৃঃ প্লেগ প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রায় ১৫ লক্ষ ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছে। তদবধি ভারতে প্লেগ চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে প্লেগে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় দেড় লক্ষের উপর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অধুনা বীরজননী পঞ্চনদ প্লেগের লীলাভূমি। ভারতে প্লেগ আত্মপ্রকাশ করিবার পর হইতে, এই প্রদেশে যত লোকক্ষয় হইয়াছে, তদ্রূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই। তথায় প্লেগ এত অধিক পরিমাণে হয় যে, সময়ে সময়ে আদালতের কার্য্যাদি বন্ধ করিতে হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, দিল্লী, সুরাট, পুনা, পাটনা, ভাগলপুর, করাচী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে মধ্যে মধ্যে ইহার প্রকোপ হইয়া থাকে। অধুনা ইহা পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে শীতের শেষে ও বসন্তকালে অর্থাৎ জানুয়ারী হইতে এপ্রেল পর্য্যন্ত ইহার প্রকোপ অধিক হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক এই রোগে মরিতেছে। আর ম্যালেরিয়ার ত কথাই নাই !!

অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইন্দুর হইতে প্লেগের পরিব্যাপ্তি হয়। এক জাতীয় কীট বা পিশু ইন্দুরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাদের দংশন দ্বারা প্লেগবীজ ইন্দুরের দেহ হইতে মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হয়। ইংরাজ পণ্ডিতেরা বলেন, যে-স্থানে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ সেই স্থানেই ইহার আধিপত্য। রোগীর বস্ত্রাদি অবলম্বনপূর্ব্বক প্লেগ দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন করে। চীনা পণ্ডিতেরা বলেন, যাহার মুখ ভূমির যত নিকট, সে তত শীঘ্র প্লেগ রোগাক্রান্ত হয়। ডাক্তার রসেল বলেন, ইহা সংক্রামক এবং পালাজ্বরের ন্যায় বিস্তারিত হইয়া সময় বিশেষে প্রবল হয়।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, চৈত্র ১৩৩২) শ্রী সুরেন্দ্রমোহন বসু

—

ক্রীতদাসের 'ফারক'-পত্র

সম্প্রতি ময়মনসিং জেলায় কিশোরগঞ্জ থানার অধীন মৌজা ঘোষ-পাড়ার একটি জমী সংক্রান্ত মামলা কিশোরগঞ্জের হাকিম শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সরকার মহাশয়ের এজলাসে বিচারের জন্য উপস্থিত হ'য়েছিল। এই মামলার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে-সকল কাগজপত্র ও দলীল প্রভৃতি দাখিল হয়, তার মধ্যে একশত বৎসর পূর্ব্বের এমন একখানি দলীল পাওয়া গেছে, যা থেকে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে, এত অল্প দিন পূর্ব্বেও এদেশে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় ও মুক্তি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।

এই দলীলটি একখানি 'ফারক'-পত্র অর্থাৎ ছাড়-পত্র। এতে দেখা যায় যে, ১২৩২ সালে ৬ই মাঘ তারিখে নন্দীপুর নিবাসী শ্রীরামশঙ্কর দেব, শ্রীরামকিশোর দেব ও শ্রীরামরতন দেব তাঁদের পৈতৃকমনুষ্য অর্থাৎ ক্রীতদাস শ্রীরণরাম ঘোষকে তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে 'ফারক'-পত্র লিখে দিচ্ছেন। এই রণরাম ঘোষের সহিত শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ নন্দী মহাশয়ের ক্রীতদাসী শ্রীমতী অময়া দাসীর শুভ বিবাহ স্থির হওয়ায় উপরিউক্ত রামাদি দেবগণ তাঁদের মনিবীর দস্তুরী বুঝে নিয়ে তাঁদের মনুষ্যটিকে এই ছাড়পত্র লিখে দিয়েছেন।

মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালাদেশে যে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর অস্তিত্ব ছিল—এই দলীলখানি থেকে সেটা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়; এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট‌ও যে সে-সময় এই দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন করিতেন এবং এসংক্রান্ত দলীলপত্রও যে তখনকার আদালতে গ্রাহ্য হত, এসংবাদটাও জান্‌তে পারা যায় আলোচ্য দলীলখানির উপর ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণের ১৮২৫ খৃঃ অব্দের শীলমোহর ছাপ দেখে।

দলীলটী এইরূপ :—

শ্রীরাম

ইয়াদিকিদ্দ শ্রীরাজকৃষ্ণ নন্দি
সদাসয়েষু লিখিত শ্রীরামসঙ্কর ঘোষ ও
শ্রীরামলোচন ঘোস কষ্য ফারখতি পত্র মিদং
কার্জ্জ আগে আমারদিগের পত্রিক স্মনুষ্য
শ্রীরণরাম ঘোসে আপনার খরিদা দাসি শ্রীমতি সময়া
কে বিভায় করিবার স্তির হৈয়াছে য়ামরার স্মনিবি দস্তোরি
পাইয়া সন্তানের ফারক দিলাম দাসি মজঙ্গরা বিভাহ
দিয়া সন্তানাদিক্রমে দান বিক্রয় সর্ত্তাদিকারি হৈয়া
পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দাসত্ব করাহ আমারও পুত্রপৌত্রাদি
ক্রমে কাহার সর্ত্ত নাই এতধার্ত্থে ফারক লিখিয়া দিলাম
ইতি সন ১২৩২ সন তেরিখ ৬ মাহে মাঘ

শ্রীরামসঙ্কর ঘোষ
শ্রীরামলোচন ঘোষ

ইসাদি—

শ্রীগকুলচন্দ্র সাধা
সাং ঘুমপাড়া—১

শ্রীরামসঙ্কর দেব
সাং নন্দিপুর—১

শ্রীরামকিশোর দেব—১
শ্রীরামরতন দেব—১
সাং নন্দিপুর

(ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৩) শ্রীনরেন্দ্র দেব

—

তাঁত ও কুটীর-শিল্প

আমাদের দেশে শতকরা ৭৫ জনেরও অধিক লোক কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু কৃষকদিগকে বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৪ মাস কার্য্যাভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও আলস্যে বা নাটক-নভেল পড়িয়া অবকাশ সময় অতিবাহিত করেন। এই অবকাশ-সময় কোন কুটীর-শিল্পে নিয়োগ করিতে পারিলে কৃষকের অনেক অভাব দূর হইতে পারে এবং অনেক স্ত্রীলোক, পরের গলগ্রহ না হইয়া স্বাধীনভাবে ঘরে বসিয়া কিছু আয় করিতে পারেন। সুতরাং স্থান-কালানুযায়ী কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন করা আমাদের পল্লীসংস্কারকের এক প্রধান কর্ত্তব্য।

মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু, অন্ন ও বস্ত্র। এই দুইটীর মধ্যে অন্ন কৃষকেরা নিজ নিজ জমিতে উৎপন্ন করিয়া থাকে। যদি বস্ত্রের অভাবটাও দূর হইয়া যায়, তবে কৃষকদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ থাকে না।

বোম্বাইয়ের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর (Director of Industries) অল্পদিন হইল বলিয়াছেন যে, বোম্বাই প্রদেশে কুটীর-শিল্পে যে-সকল লোক নিযুক্ত আছে, তাহাদের একতৃতীয়াংশ তাঁতের কাজে নিযুক্ত। ভারতবর্ষে যত কাপড় ব্যবহৃত হয় তাহার একের তিন অংশ অন্য দেশ হইতে আমদানী হয়, একের তিন অংশ এখানকার মিলে প্রস্তুত আর বাকী একের তিন অংশ হাতের তাঁতে প্রস্তুত।

হাতের তাঁতে যে বয়ন প্রণালী ব্যবহৃত হয়, তাহার সামান্য উন্নতি করিলে উৎপন্ন কাপড় অনেক সস্তা হয়। আসাম ও বঙ্গদেশের কোন-কোন স্থানে মাকু হাতে চালান হয়; কিন্তু ফ্লাই সাট্‌ল্ (fly shuttle) বা কলের মাকু চালাইলে উৎপাদন ১॥০ গুণ বাড়িয়া যায়, বেশী চওড়া কাপড় বোনা যায় এবং আরও নানারূপ সুবিধা হয়। এইরূপ হাতে চালান কলের সাহায্যে অন্যান্য কার্য্য (winding, warping, sizing) করিলে কাজ আরও তাড়াতাড়ি হয়। মেকানিকাল্ ডবি ব্যবহার করিলে নানারূপ পাড় বা প্যাটার্ণ বোনা যায়। এইসকল বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিবার জন্য বোম্বাইয়ে একটি পরীক্ষাগার বা ইনষ্টিটিউট্ খুলিবার কথা হইতেছে। আমাদের শ্রীরামপুর ইনিষ্টিটিউট্ এবিষয়ে কি কিছু করিতে পারেন না? বাঙ্গালাদেশেও ত তাঁতী ও জোলার সংখ্যা কম নয়।

বোম্বাই প্রদেশে হাতের তাঁতের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টার সঙ্গে যাহাতে তাঁতীরা সমবায়-প্রণালীতে সূতা প্রভৃতি কিনিতে এবং প্রস্তুত কাপড় ইত্যাদি বিক্রয় করিতে পারে তাহার চেষ্টা হইতেছে। তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্যবসায়ীরা অনর্থক ঠকাইতে পারিবে না। ইহাতে তাঁতীদের খুব সুবিধা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে কাল্নাপাড়ায় সমবায় প্রণালীতে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে কয়েকখানি তাঁত চালান হইতেছে এবং তন্তুবায় সমিতিও কয়েকটি আছে বটে, কিন্তু উৎসাহী লোকের অভাবে তন্তুবায় সমিতিগুলির প্রয়োজনানুযায়ী প্রসার ঘটে নাই। যাঁহারা খদ্দর-প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন, তাঁহারাও সমবায়-প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে তাঁতীদিগকে তুলা সরবরাহ এবং খদ্দর বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। যদি খদ্দর বা হাতের তাঁত চলিবার কোন সম্ভাবনা থাকে ত সমবায়-প্রণালীতে কার্য্য করিলে সে-সম্ভাবনা নিশ্চয়তায় পরিণত হইবে। সুতরাং যে-সকল উৎসাহী স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি জনসাধারণের মধ্যে কুটীর-শিল্প প্রচলন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টি এই দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতেছি।

(ভাণ্ডার, বৈশাখ ১৩৩৩)

—

দক্ষিণ ভারত ও আর্য্য-উপনিবেশ

অতি পূর্ব্বকাল হইতে বিন্ধ্যগিরিমালাকে বিভাগরেখা স্বীকার করিয়া আর্য্যগণ বিন্ধ্যের উত্তরভাগকে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণভাগকে দক্ষিণ ভারত বা উত্তরাপথ এবং দক্ষিণাপথ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বিন্ধ্য-হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং বিন্ধ্য হইতে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে দক্ষিণাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্য এই নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে আর্য্যদিগের বহু পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ কোলারিয় জাতির বাস ছিল। তাহারা ছিল বর্ত্তমান আন্দামান দ্বীপের অসভ্য জাতিদের স্বজাতি বা সদৃশ জাতি। এই আদিম অধিবাসীদের অনেক পরে উত্তর ভারত হইতে দ্রাবিড় জাতি এখানে প্রবেশ লাভ করে। তাহারও বহু পরে রামায়ণ-যুগের অনতিপূর্ব্ব হইতে এতৎ প্রদেশে আর্য্যবাসের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষের ফলে কোলারিয়গণ ক্রমে দ্রাবিড় ও আর্য্য

জাতির মধ্যে অদৃশ্য এবং কতক মধ্যভারতাদির নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। উত্তর ভারতে আর্য্য-প্রাধান্য এবং দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়-প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কলিঙ্গের দক্ষিণ হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভূভাগ দ্রাবিড় দেশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ও আর্য্য ভাষা প্রচলিত হয়।

খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণাপথের অশ্বক ব্যতীত বৈয়াকরণ পাণিনি আর কোন স্থানের নাম সম্ভবতঃ শুনেন নাই; কারণ, তিনি কচ্ছ, অবন্তী, কোশল, করুষ এবং কলিঙ্গকে ভারতের দক্ষিণতম দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির সার্দ্ধ তিন শতাব্দী পরবর্ত্তী কালের (৩৫০ খৃঃ পূঃ) কাত্যায়ন মুনি দক্ষিণাপথের নানা স্থানের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার বার্ত্তিকে পাণিনি-কৃত পাণ্ড্যচোলাদির অনুল্লেখের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার দুই শতাব্দী পরে মুনি পতঞ্জলি (১৫০ খৃঃ পূঃ) মাহিষ্মতী, বিদর্ভ প্রভৃতি বিন্ধ্যের দক্ষিণস্থ প্রদেশের নাম করিয়াছেন, এমন কি তিনি দক্ষিণের প্রায় শেষ সীমাস্থ কাঞ্চিপুরম ও কেরলের পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বহু পূর্ব্ব হইতেই যে দক্ষিণে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। রামায়ণের যুগে দক্ষিণাপথের নানা স্থানে আর্য্য-নিবাসের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

যাঁহারা দক্ষিণ ভারতে আর্য্য-সভ্যতা প্রথম প্রচার করেন, মহর্ষি অগস্ত্য সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণ গুরু বভরিণ, ঋক্-রচয়িতা ঋষি-বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ তাঁহাদের অন্যতম, কিন্তু অগস্ত্য ঋষিই সকলের অগ্রণী।

সুগ্রীব সীতান্বেষণে যে সকল অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দক্ষিণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া মধ্য-দেশস্থ সরাবতী নদীর উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে যাইতে বলেন। তিনি এই অংশ তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—(১) দণ্ডকারণ্যের উত্তর এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের সন্নিহিত দেশ, (২) সমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূল হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ এবং (৩) কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ ভাগ। তিনি বিন্ধ্যের দক্ষিণে দ্বিতীয় ভূভাগের এক দিকে বলেন বিদর্ভ, ঋষিক, মাহীষক এবং অন্যদিকে বলেন কৌশিক, কলিঙ্গ ও বঙ্গ। তৎপরে বর্ণন করেন দণ্ডকারণ্য যাহার মধ্য দিয়া নদী গোদাবরী প্রবাহিতা। এই দণ্ডকারণ্য বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস।

(আরতি, পাবনা, শিশির-সংখ্যা, ১৩৩২)

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

সাত

কেদার নতুন চাকরী নিয়ে কল্‌কাতা চ'লে যেতেই মধুমতী প্রিয়ব্রতাকে মাস চার-পাঁচের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। প্রিয়র মা সে-সময় দেশে আম খাবার জন্যে এসেছিলেন। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ছেলেদের স্কুলের ছুটিতে তাঁরা দেশে আম-কাঁঠাল খাবার জন্যে এসে থাকেন; বৎসরের বাকী সময় কলকাতাতেই কাটে। প্রিয়কে তাঁরা দেশের বাড়ীতেই আনিয়ে নিলেন। পাড়া প্রতিবাসিনীরা ভিড় ক'রে বড় লোকের বউকে সব দেখ্‌তে আস্‌তে লাগল; বিয়ের জল পেয়ে প্রিয়র দেহ যে কেমন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, আর রঙের জেল্লা যে কেমন বেড়ে গেছে, সবাই তাই বল্‌তে সুরু করলে। প্রিয়র গা-ভরা গয়না আর জামা-কাপড়ের ঘটা দেখে মেয়ের ভাগ্যকে খুব প্রশংসাও করলে। মধুমতী বউএর সঙ্গে আধ মন সন্দেশ দিয়ে ছিলেন তার অংশ উপহার পেয়ে প্রিয়র মার কুটুম্ব-ভাগ্যকেও তারা ধন্যবাদ দিলে (যদি চ সেই ধন্যবাদের আড়ালে ঈর্ষার ছায়া লুকিয়ে রইল)।

সেবা ছিল প্রিয়র ছোট বেলার সই, প্রিয় এত দিন পরে দেশে আসায় তার যেমন আনন্দ হ'ল তেমন অবশ্য আর কারুর হয় নি, কেন না সইকে সে খুবই ভালবাস্‌ত; তা ছাড়া আর এখন সেই বয়স—যে বয়সে ছেলে মেয়েরা তাদের সঙ্গী-সাথীদের প্রাণ ঢেলেই ভালবাসে, সাংসারিক লাভ-লোকসান খতিয়ে নিজের স্বার্থের দিকটা বেশ ক'রে কসে ধ'রে ভালবাসা বা লোক-লৌকিকতা সুরু করে না।

তার ওপর বেচারীর সে-গ্রামে আর কেউ সঙ্গী ছিল না। ঘরে আর একটি ভাইবোনও ছিল না যে তার অবসর-যাপনের দোসর হয়; তাতেই সে দুবেলা ঠাকুর প্রণাম করবার সময় ঠাকুরের কাছে মানৎ করত যেন শীগ্‌গীর তার সই শ্বশুর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ীর দেশে

ফিরে আসে। ঠাকুর এদ্দিনের পরে সে মানৎ পূর্ণ করায় তার মন আজ ভারী খুসী।

প্রিয় যখন সই-মাকে প্রণাম করতে গিয়ে ডাকলে "সই নাইতে যাবি না কি ?"

সেবা তখন তাড়াতাড়ি হাতের কুটনো ফেলে রেখে গামছা খানা টেনে দিতেই তার মা ব'লে উঠলেন—"অত তাড়াতাড়ি কিসের ? পুকুর কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না, মাথায় গায়ে তেল মেখে নাইতে যা। প্রিয় তুই একটু ব'সে শ্বশুর বাড়ীর গল্প কর্।" সেবা খুব চট্‌পট্ তেল মেখে নিয়ে "আয় সই" বলে সই-এর হাত ধ'রে নাইতে চলে গেল। এত দিন পরে দেখা দু'জনে একটু নিরিবিলিতে কথা কইতে হবে ত।

তখন আষাঢ় মাসের প্রথমে সবে বর্ষা সুরু হয়েছে। নতুন মেঘের ডাক হাঁকে চারদিক জম্‌জম্ ক'রে উঠেছে। চাষীদের আনন্দ দেখে কে ? মাঠের কাজের কামাই নেই। আনন্দের রোমাঞ্চ স্বরূপ কচি-কচি সবুজ ঘাসগুলি, পথ ঘাট সব ছেয়ে ফেলেছে। মাটীর রোদ-পোড়া তামাটে রঙ মুছে দিয়ে যেন কে এক পোঁচ সবুজ রঙ লাগিয়ে দিয়েছে। পুকুরগুলোর জল বড্ড কমে গিয়েছিল, তিন চার পশলা জোর বৃষ্টিতেই জল বেড়ে উঠেছে। দুই সই ঝপ ঝপ ক'রে জলে লাফিয়ে পড়েই সাতার কাটতে লাগল। খানিকক্ষণ মনের আনন্দে সাতার কাটা, জল ছোঁড়া ছুঁড়ি খেলা হবার পর দুজনেই গলা জলে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। সেবা বল্‌লে, "তোর জন্যে আমার যে ভাই কী মন কেমন করত তা' আর কী বলব, কেবলি মনে হ'ত যদি পাখী হতাম ত একদণ্ডে উড়ে তোর কাছে চলে যেতাম।"

প্রিয় বল্‌লে—"আর আমারি বুঝি করত না ? কতদিন দুপুর বেলায় জানালার ধারে একলাটি দাঁড়িয়ে ভাবতাম সই হয়ত এতক্ষণ মার কাছে বসে কাঁথা সেলাই করছে নয় ত বই পড়ছে, নয়ত আমার কথা ভাবছে।

সেবা বল্‌লে,—"ইস্! কই, আমি কিন্তু একদিনও দুপুর বেলা বিষম খেয়েছি ব'লে ত মনে হয় না। তোর কথা মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না! তুই নিজের বর নিয়েই অস্থির থাকতিস্ তা আমার কথা ভাববি কি; চিঠির জবাব দিতিস্ দশদিন বিশদিন পরে—আর এদিকে আমি তীর্থির কাকের মতন তোর চিঠির জন্যে হাঁ ক'রে থাকতাম।"

প্রিয় সইয়ের গালে একটা ঠোক্কর দিয়ে বললে—"আর একজনের চিঠি যদি পাবার আশা থাকত তা হ'লে কি আর আমার চিঠির জন্যে তীর্থির কাক হ'য়ে পথ চাইতিস্ সই !"

সেবা উত্তর দিলে না। মুখখানা তার বর্ষার আকাশের মতন ম্লান হ'য়ে উঠতেই প্রিয় ব্যথা পেয়ে বল্‌লে—"হ্যাঁ সই পাগলের খবর টবর পাওয়া গেল ?" সেবা মুখের কথার উত্তর না দিয়ে শুধু ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে যে পাওয়া যায়নি। সেবার স্বামীর পাঠ্যাবস্থায় মাথা গরম হওয়ায় হিতৈষী বাপ মা বুদ্ধি ক'রে ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেলেছিলেন। অবশ্য তাঁরা ভালর দিকটাই ভেবে নিয়েছিলেন; মন্দর দিকটা তাঁদের ভাববার দরকারই ছিল না। যদিই ছেলে এর পর পাগল হ'য়ে যায় তা হ'লেও বিয়ে করা স্ত্রী কিছু তার পাগল স্বামীকে অযত্ন করবে না। বাঙালা দেশে কানা হোক্ খোঁড়া হোক্ কুঁজো হোক্ রুগ্ন হোক্ অক্ষম হোক্ পুরুষ সে পুরুষ এই পরিচয় নিয়ে অনায়াসে কনের বাজারে বেরুলেই বাজী মাৎ। সুতরাং ঘরবাড়ীর অবস্থা ভাল, একটা-পাশ-করা ছেলে——কি নাকি, একটু মাথা গরম মাত্র হয়েছে বলে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে সেবার বাপ মা একটুও পেছ-পা হলেন না। বিয়ের মাস দুই পরে পাগল যখন ঘোর উন্মাদগ্রস্ত হ'ল তখন সেটা ক'নের অদৃষ্ট ব'লেই সবাই মেনে নিলে। তার পর হঠাৎ একদিন পাগল নিরুদ্দেশ! পাগলের বাপ মা অপয়া বউএর মুখ দেখতে চাইলেন না। সেবার মা চোখের জলে ভেসে রূপের ডালি একমাত্র মেয়েকে নিজেরই বুকের উপর টেনে নিলেন। পেটে যখন ঠাঁই দিয়েছেন, হাঁড়িতেও স্বচ্ছন্দে ঠাঁই দিতে পারবেন বল্‌লেন। এই হচ্ছে সেবার স্বামী ভাগ্য !

হঠাৎ প্রিয় ব'লে উঠল "আমার সেই প্রবাল ঠাকুরপো সই, এখনো বিয়ে করেনি, আশ্চর্য্য মানুষ ভাই! এক ঝলক হাসির আভায় সেবার ম্লান মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল,

সে বল্‌লে—তোর প্রবাল ঠাকুরপোর কি বড় বড় চোখ সই, মানুষকে যেন গিল্‌তে আসে।"

প্রিয় হেসে বল্‌লে—"চোখ দুটো তার খুব ডাগর বটে! তোর দিকে বিয়ের সময় বরযাত্র এসে খুব চেয়ে চেয়ে দেখ ছিল, তাই বুঝি বল্‌ছিস। তা ভাই মানুষ সে ভারী ভালো, তার চাউনীর অন্য কোনো অর্থ নেই। সে সুন্দর জিনিষ দেখতে খুব ভালবাসে, তুই কত সুন্দর, তাই বার বার দেখ ছিল। নইলে তার মন বড় সরল।"

সেবা উত্তর দিলে না। একটু থেমে প্রিয় বল্‌লে—"সত্যি সই, তোর সঙ্গে যদি প্রবাল ঠাকুরপোর বিয়ে হ'ত কী ভালই হ'ত, দুই সইএ কেমন একজায়গায় থাক্‌তাম—" প্রিয় আর কথাটা শেষ করতে পার্‌লে না, পুকুর পাড় থেকে সেবার মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক দিয়ে বল্‌লেন,—"হ্যাঁরে সেবা এক বুক জলে বেহুঁস হয়ে দাঁড়িয়ে এত কিসের গল্পরে? বাড়ীতে ব'সে গল্প কর্‌লে কি হ'ত না? প্রিয় তোর মা যে বাড়ীতে তোকে ডাক্‌ছেন, ছোট ভাইটি দিদি দিদি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। উঠে আয় না মা, নতুন জলে এতক্ষণ ক'রে গা ভিজিয়ে অসুখ কর্‌তেও ত পারে।

দুই সই তাড়াতাড়ি তখন স্নান সেরে নিয়ে পুকুর পাড়ে উঠে পড়্‌ল।

আট

বছর চার পরের কথা—কেদার চাকরী নিয়ে বীরভূমে বদ্‌লী হ'য়ে এসেছে। প্রিয় এখন শুধু কেদারের 'প্রিয়া' নয় সে এখন খোকাখুকির মা। মাঝখানে ঘটনাও অনেক ঘটে গেছে, স্বদেশী হাঙ্গামা সমস্ত ভারতবর্ষ, বিশেষ ক'রে বাঙ্গলাদেশকে যে কেমন ক'রে চম্‌কে দিয়েছিল তা সবাই জানেন। নরেন গোঁসাইএর হত্যা, কানাই, সত্যেন আর ক্ষুদিরামের ফাঁসী দেশের মনে একটা মস্ত আতঙ্ক এনে দিয়েছিল। পুলিশ কর্ম্মচারীদের মধ্যে দু এক জনের গুপ্ত-হত্যার ফলে কেদারের মা বার বার ক'রে ছেলেকে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ঘরে থাকার জন্যে অনুরোধ করেন। অগত্যা কেদার বিনা বেতনে দুই বৎসর ছুটি নিয়ে বাড়ীতেই ব'সে থাকে। তারপর চারদিক বেশ শান্ত সুস্থির হ'য়ে উঠলে সে আবার চাকরী নিয়ে অস্থায়ী ভাবে দু এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এইবার স্থায়ীভাবে কিছু দিনের জন্যে বীরভূমে বদ্‌লী হ'য়ে এসেছে। সঙ্গে স্ত্রী পুত্রও নিয়ে এসেছে। কেদারের বাবা ইতিমধ্যে স্বর্গ লাভ করেছেন, প্রিয় ছেলেমেয়ের মা হ'লেও এতদিন শ্বশুর বাড়ীর বউ আর বাপের মেয়ে হয়েই বাস কর্‌ছিল, এবারে সে সংসারের গিন্নী হ'য়ে এসেছে। বিশেষ ক'রে বীরভূম অঞ্চলে চোদ্দ বছরের বধূদেরও গিন্নি আখ্যা পাওয়াটা ভারী সহজ। গৃহস্বামী নবীনই হোন আর প্রবীণই হোন দাসদাসী থেকে পাড়া প্রতিবাসী সবাই তাঁকে কর্ত্তা বিশেষণটি দিবেই। ঘরে তাঁর বয়স্কা মা থাক্‌লেও তিনি কর্ত্তার মা ব'লেই পরিচিত হবেন, আর বাড়ীর বালিকা বধূই তার গৌরবসূচক "গিন্নি" নামটি লাভ কর্‌বে। ছোট ছোট বউ-ঝিরা যদি চ এ-নামটি মোটেই পছন্দ করে না। প্রিয় নতুন জায়গায় এসে নতুন দাসী জয়ার কাছে গিন্নি সম্ভাষণ শুনে ত হেসেই অস্থির। জয়া তার হাসি দেখে একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কি হ'ল ঠাকরুণ হাস্‌চেন কেন?"

একে গিন্নিতে রক্ষে নেই, তার ওপর ঠাক্‌রুণ, আবার এক চোট হেসে নিয়ে প্রিয় বল্‌লে—"ওগো বাছা, আমি বাড়ীর গিন্নি নই।"

জয়া একটু চম্‌কে উঠে বল্‌লে,—"তা হ'লে গিন্নি কই? কর্ত্তা আপনার কে হন্ তবে?"

পাড়ার বাবুদের নন্দ বলে একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল, সে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলাতে প্রিয় গিন্নি নামটিই মেনে নিলে।

দিনকতক বীরভূমের নতুন উচ্চারণ আর শব্দগুলি শুন্‌তে ও বুঝতে প্রিয়র ভারী কৌতুক বোধ হ'তে লাগল। নতুন ঘরকন্নার গৃহস্থালী গোছাতেও সে ভারী ব্যস্ত রইল। বধূর সাজ খুলে ফেলে অনভ্যস্ত গৃহকর্ত্রীর পোষাকটা গায়ে জড়িয়ে সেটাতে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তার আনন্দের সীমা ছিল না। তারপর প্রতিবাসিনীরা একে একে এসে আলাপ পরিচয় ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। প্রিয় জয়ার কাছে তাদের পরিচয় একে একে জেনে নিয়ে পাল্‌টে তাদের বাড়ী যেতে লাগল। এম্‌নি ক'রে কয়েক বাড়ী যাওয়া আসার সূত্রে অনেকের সঙ্গেই আলাপ জ'মে উঠল। তার মধ্যে

শিখরের দিদি রমার সঙ্গে যে ভাবটা জম্‌ল সেটা বেশ গাঢ়।

প্রিয়র বাসার আঙ্গিনায় বেশ একটি বড় কুলগাছ ছিল। সেই গাছটির সুপক্ক নারকুলে-কুল পাড়ার ছোট বড় সবারি লোভের জিনিষ, তবে ছোটরা সে লোভ অকপটে প্রকাশ কর্‌তে সঙ্কোচবোধ করে না, বড়দের সঙ্কোচ লোভকে ছাপিয়ে যায়। একদিন সকালবেলা শীতের প্রথম রোদে বসে প্রিয় কি-একটা সেলাই কর্‌ছে, নন্দা এসে আঙ্গিনায় দাঁড়াল, সঙ্গে তারই সমবয়সী একটি বছর দশেকের ছেলে। প্রিয় জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "ছেলেটি কে রে নন্দা? বেশ ফুটফুটে তো।" নন্দা বল্‌লে—"মিত্তির গিন্নির ছোট ভাই, কুল খেতে এসেছে।" এক ঝলক রোদ কুলগাছের ফাঁক দিয়ে ছেলেটির মুখের ওপর পড়েছিল। প্রিয়র ছোট ভাইটি প্রায় অত বড়ই হবে, তবে সে সুন্দর না—শ্যামবর্ণ। প্রিয়র চোখে ছেলেটিকে ভারী ভাল লেগে গেল। সে সেলাই রেখে কাছে গিয়ে ছেলেটির চিবুকে হাত দিয়ে স্নেহমাখা সুরে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—"তোমার নাম কি ভাই?"

ছেলেটি মিষ্টিগলায় বল্‌লে "শিখর।"

রমার সঙ্গে ইতিপুর্ব্বে প্রিয়র দু' চারবার দেখাশুনা হ'য়ে গেছে। রমা প্রিয়র চাইতে বয়সে বছর দুয়ের বড়ই হবে। তাতেই রমাকে প্রিয় দিদি বল্‌তে চাইত। রমার ভাইকে সহজেই সে নিজের ভাই বলেই স্বীকার কর্‌লে। শিখরকে কুল পেড়ে খাবার হুকুম দিতেই তার আর আনন্দ দেখে কে?

প্রিয়র বড় মেয়ে মিনা এসে মার আঙুল ধরে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে "ও কে মা?" মা পরিচয় দিলেন "মামাবাবু।" মিনা খুসী হ'য়ে তখনি মামাবাবুর সঙ্গে ভাব ক'রে নিলে। এই পরিচয়-সূত্রটি ধ'রে বিশেষ ক'রে কুলের টানে সকালে বিকালে রোজই শিখর নূতন দিদির বাড়ী আসা যাওয়া সুরু ক'রে দিলে। একা বিদেশে প্রিয় এম্‌নি ক'রে চারদিক থেকে, ভাই-বোন প্রভৃতির অভাব পূরিয়ে নিতে লাগল।

কিন্তু প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে প্রিয়র খুব বেশী খাপ খেলে না, কেননা সে পল্লীবধূ, পল্লীবালা হলেও পরচর্চ্চা, পরকুৎসা প্রভৃতি অভ্যাসগুলো মোটেই ক'রে উঠতে পারেনি। তার আনুষঙ্গিক ব্যাপার তাস্ টাস্ খেলা ও পান দোক্তার শ্রাদ্ধ করাতেও সে অভ্যস্ত ছিল না, কাজেই সবার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় প্রাণখুলে যোগ দিতেও পার্‌ত না, হাসাহাসিও জমিয়ে তুল্‌ত না। এদিকে তার চেষ্টাও কিছু ছিল না সুতরাং দু'দশদিনের মধ্যে "ইনিস্‌পেক্টার-গিন্নির যে বেজায় দেমাক," এই তথ্যটি চার দিকে র'টে গেল। প্রিয়র গায়ে কতকগুলি দামী দামী গহনা ছিল। সেগুলো কেঁদারের দেওয়া মোটেই নয়, জমিদার শ্বশুরের দান। পল্লীগৃহিণীরা মেনে নিলেন "দামী দামী অমন গহনা তো পাড়ার কারুর নেই, তাতেই বড়মানুষের-গিন্নি তাদের সঙ্গে ভাল ক'রে মিশতে চান্ না।" প্রিয় বাড়ীতে বসেই সবার মন্তব্যগুলি সহজেই শুন্‌তে পেতো; কারণ নন্দা পাড়ারই মেয়ে আর প্রতি গৃহে তার সান্ধ্য-সকাল ভ্রমণ নিয়মিতভাবে হ'তে থাকে, যেখানে যা শোনে সে আবার নিয়ম মতন সে খবরগুলি "ইনিস্‌পেক্টার-মাসী"কে শুনিয়ে যায়। আবার খিড়কীর পুকুরে জয়া যেখানে বাসন মাজতে বসে, সেখানেও পাঁচ ছয় বাড়ীতে দাসীরা সমবেত হ'য়ে হাতের কাজের সঙ্গে সমানে মুখের গল্প চালায়। সেই গল্পগুজবের মধ্যে নিজেদের ঘরাও সুখ দুঃখের কথা থেকে আপন আপন মনিবদের বাড়ীর সংবাদ-পত্রও দেওয়া নেওয়া করে।

এত গেল নতুন দেশে নতুন গৃহিণী প্রিয়র নতুন সংসার স্থাপনের কথা। এইবার কেদারের অবস্থার সঙ্গেও একটু পরিচয় কর্‌তে হয়। কেদারকে এখন দেখলে আগেকার সেই গৌরবর্ণ ছিপছিপে দীর্ঘাকায় যুবক ব'লে চেনা যায় না, এখন তার শরীরটি বেশ স্থূলাকার হ'য়ে উঠেছে, গোঁফ কামিয়ে মুখের শ্রী বদ্‌লে গিয়েছে।

বড়লোকের ছেলে হ'লেও চালচলন তার খুব সাদাসিধে ছিল। প্রবালের স্বভাবের প্রভাব সে বেশ একটু মেনে চল্‌ত, সেইজন্যে যুবা বয়স পর্য্যন্ত তামাক-সিগারেটটিও ধর্‌তে পারেনি। এখন দিনে সে এক বাক্স সিগার ত নিত্যই খায়, বরং সিগারের ওপর আর কিছু যায় না ব'লে পুলিশে তার নাবালক নাম র'টে গেছে। নতুন দেশে আস্‌তেই দলে দলে বাবুরা এসে তার সঙ্গে আলাপ ক'রে

যেতে লাগল। কেদার বিনয়ী, মিষ্টভাষী, সুতরাং নবীন প্রবীণ সবাই তার সঙ্গে আলাপ ক'রে খুসী হ'ল।

সহরে নবীন আর ভূধর নামে দুটি যুবক ছিল। তারা উচ্চ বংশের সন্তান ব'লে পরিচয় দেবার গর্ব্ব রাখ্‌ত। একজন ছিল ব্রাহ্মণ আর একজন ছিল কায়স্থ। দুটিতেই আদালতের চাকুরী করত; সুতরাং এক সঙ্গে ওঠা বসাটা তাদের বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই চল্‌ত। তারপর দুজনের লক্ষ্যও ছিল এক। সে লক্ষ্য হচ্ছে, সহরে নতুন কোনো কর্ম্মচারী এলেই তার ধাত বোঝ্‌বার জন্যে নাড়ী টিপে ধরা। রোগ বুঝে ব্যবস্থা যোগাতে তারা ছিল অদ্বিতীয়। ঐ জায়গাটির আবহাওয়াটা এম্‌নি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ব্যভিচার, মদ-খাওয়া প্রভৃতি চরিত্রদোষগুলি সেখানে শতকরা নিরানব্বই জন লোক একটুও দোষের মনে করতেন না। নবীন, ভূধর তারই মধ্যে মানুষ হ'য়ে উঠে নিজেদের মধ্যে ঐ-সবের বীজ বেশ ভাল ক'রেই সঞ্চয় করেছিল। আর তাতেই তাদের প্রবৃত্তি এমন হীন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল যে, কোনো যুবতী-কিশোরী ভদ্রকুলনারীও তাদের কুৎসিত আলোচনার বাইরে থাক্‌তে পার্‌ত না। পাড়ার ছেলে ব'লে প্রায় পুরাতন বাসিন্দা সবার ঘরেই তাদের অবাধ গতিবিধি ছিল; এবং এই সুযোগটির প্রত্যেক অংশটিকে তারা তাদের কার্য্য অভিপ্রায়-সিদ্ধির অনুকূলভাবে গ্রহণ করতে এতটুকু অবহেলা করত না।

কেদার বড় লোকের ছেলে, যুবাপুরুষ, দেখ্‌তে সুন্দর, সৌখীন; সুতরাং দুই বন্ধুই একটা মস্ত মক্কেল পাওয়া গেছে ভেবে খুব খুসী হ'য়ে উঠল। সেদিন সন্ধ্যার পর দুই বন্ধু থানার ধারের প্রকাণ্ড একটি পুকুরের পাশে গল্প কর্‌ছে। গল্পের বিষয় আমাদের কেদারেরই চরিত্র সমালোচনা। ভূধর বল্‌লে,—বিশেষ সুবিধে হবে ব'লে তো মনে হয় না ভাই, নেহাৎ নিরমিষ্যি গোছেরই ঠেক্‌ছে যে।"

নবীন বল্‌লে,—"রাখনা তোর নিরমিষ্যি, একে দাদা পুলিশের লোক তাতে এই ভরা যৌবন—ভেতরে ভেতরে সব আছে হে! ঘাবড়াও কেন? আস্তে আস্তে গুণ প্রকাশ হবে।"

"না হে, লোকটা ভালই। সেদিন মতি-বাবু, দ্বিজেন-বাবু দু'চারটে বেফাঁস কথা বল্‌তেই কেদারবাবুর মুখ কালো হ'য়ে উঠল। দিদির কাছে শুনেছি, পরিবারটি নাকি কালীবাবু মদ খান আর বাইরে রাত কাটান শুনে অবাক্ হ'য়ে বলেছেন, 'বাড়ীর মেয়েরা এর জন্যে শাসন করে না? দিদি তখন দুকথা খুব শুনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল হিন্দু ঘরের মেয়ে হয়ে স্বামীকে আবার কে কোথায় শাসন ক'রে থাকে? ওসব নষ্ট-দুষ্ট মেয়েরাই ক'রে থাকে। মুখের মতন জবাব পেয়ে তখন গিন্নী একেবারে ঠাণ্ডা।"

নবীন বল্‌লে—"গান বাজনার বেশ সখ আছে। প্রমোদার কাছে একদিন নিয়ে যেতে পার্‌লে মন্দ হয় না। না ভাই শুক্‌নো মেহনৎ আর পোষায় না দেখ্‌ছি।" ভূধর বল্‌লে—"অত তাড়াতাড়ি কর্‌লে সব মাটি হবে তা ব'লে রাখ্‌ছি। এই ত সবে পনের দিন হ'ল এসেছে। সেবার বিষ্ণু বাবুর কথা কি ভুলে গেলি? সোনার চাঁদ ভদ্রলোক বিড়িটি পর্য্যন্ত ছুঁতেন না তারপর কালাপানি সাঁতরে পার হ'তে লাগ্‌লেন, মতি-বাবু টতিবাবু সবাইকেই ছাপিয়ে গেলেন।"

থানা থেকে একটা বড় আলোর জলুস রাস্তায় পড়তেই নবীন ভূধরের গা টিপে ব'লে উঠ্‌ল—"এই দিকেই আস্‌ছে হে, উঠে পড়।"

তারপর দুজনে সোজা গিয়ে রাস্তায় পথ হেঁটে চল্‌তেই কেদারের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। দুজোড়া হাত এক সঙ্গেই উঠে কপালে ঠেকে ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে সম্মান জানাতেই কেদারও তা ফিরিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বল্‌লে—"কোথা যাচ্ছেন?"

নবীন বল্‌লে—"এই এদিকে একটু বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী যাচ্ছি, মাঘমাসের শীতটা এবার বেশী কনকনে হ'য়ে পড়েনি, বুঝ্‌ছেন কি না—"

কেদার বল্‌লে—"চলুন না আমার বাসায় একটু গান-টান শোনাবেন।"

ভূধর বললে, "মতি-বাবুর বাড়ী যে আজ যাবেন বলে-ছিলেন পাশা খেল্‌তে?"

কেদার তাচ্ছিল্যের স্বরে বল্‌লে না "না, সেখানে যত

বাজে কথার আড্ডা। আচ্ছা দেখুন এ-সহরে অনেক ভদ্রলোকের বাস দেখ্‌ছি, একটা লাইব্রেরী কি-কিছু এখানে নেই কি ? ভদ্রলোকরা সন্ধ্যের পর সময় কাটান কি ক'রে ?"

নবীন উৎসাহের সহিত বল্‌লে.—"কেন মশাই, থিয়েটারের আখ্‌ড়া ঘর রয়েছে, ধর্ম্মকথা কইতে ইচ্ছে করেন হরিসভা রয়েছে, বার লাইব্রেরী রয়েছে, আমাদের দেশে নেই কি ?"

কেদার বল্‌লে,—"হরিসভার ঠাকুর ত ঐ রাধারমন গোসাই ? তা তিনি ত সন্ধ্যে সাতটা না বাজ্‌তেই পাশার আড্ডায় এসে জোটেন ; ঠাকুরের সন্ধ্যারতি শীতল এ-গুলো কখন সারেন ?"

ভূধর বল্‌লে—"তার একটুও ত্রুটি করেন না। সব ঠিক ঠিক পুজো সেরে তবে আড্ডায় আসেন।"

কথা কইতে কইতে সকলে কেদারের বাসার কাছে এসে গিয়েছিল। বাবুকে পৌছে দিয়ে সেলাম ঠুকে থানার কনেষ্টবল আলো নিয়ে চ'লে গেল। কেদার বাইরের ঘরে ঢুকে ভূধর ও নবীনকে বসিয়ে বাড়ীতে পোষাক ছাড়্‌তে গেল। রমা তখন প্রিয়র কাছে বেড়াতে এসেছিল কেদারের সাড়া পেয়েই প্রিয়র মেয়ে মিনা 'বাবা বাবা' ব'লে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাপের কাছে ছুট্‌ল। রমা একটু মুচকে হেসে প্রিয়কে ঠেলে দিয়ে বল্‌লে—"মেয়ের সঙ্গে মেয়ের মা না দৌড়লে ভাল দেখাচ্ছে না যে।"

প্রিয় হাসির পাল্টা জবাব দিয়ে বল্‌লে—"মাসির বুঝি দৌড়মারার অভ্যেসটি বেশ পাকা ?" রমা বল্‌লে—"পাকা হ'লেও ত পিছিয়ে র'য়ে গেছি। নাগাল আর পেলাম কই ? তবে নতুন নতুন যে না পেয়েছি তা নয়।"

প্রিয় একটু অবাক্ হ'য়ে বল্‌লে—"আচ্ছা ভাই সত্যিই কি কর্ত্তাটি তোমার—"

প্রিয় লজ্জায় আর কথাটি শেষ করতে পার্‌লে না। মতি-বাবুর চরিত্র-সম্বন্ধে এদিকে সেদিকে অনেক কথাই সে শুন্‌তে পাচ্ছে ; কিন্তু রমা যেমন সদা হাস্যমুখে ঘরকন্নার কাজ করে, প্রিয়র সঙ্গে কৌতুক তামাসা করে, তাতে প্রিয়র একটুও বিশ্বাস হয়নি যে, তার স্বামী কুচরিত্র। তাহ'লে কি সে এমন ভাবে হেসে খেলে দিন কাটাতে পারে ? যার বুকে জগদ্দল পাথরের বোঝা—তার সাধ্য কি সহজভাবে চলা ফেরা করে ? গল্প উপন্যাস প্রিয়র অনেক পড়া হয়েছিল ; তাতেই সে প্রথমে মনে কর্‌ত বুঝি রমার হাসির আড়ালে অশ্রুর অফুরন্ত ধারা লুকিয়ে আছে। কিন্তু নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও তা সে কোনো দিন ধর্‌তে না পেরে ভাব্‌ত তবে এসব বাজে গুজব।

প্রিয়র কথার অর্থ সহজেই ধ'রে নিয়ে রমা বল্‌লে—"আচ্ছা ভাই, তোমার বরটির যদি বাইরের টান থাকে তা হ'লে তুমি কি কর ?"

"কি করি ?" ফস্ ক'রে এই কথাটা ব'লে ফেলেই প্রিয় চুপ হ'য়ে গেল। সে যে কি করে তা ত সে নিজেই জানে না, তবে অন্যকে তার কি জবাব দেবে ? তবে সইতে যে পারে না এইটে খুব ঠিক্ কথা ; রমার মতন হাসিখুসি নিয়ে সে দিন কাটাতে কিছুতেই পারে না, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কথাটা ভাব্‌বামাত্রই প্রিয়র চোখ দুটি জলে ভ'রে এলো। রমা তা দেখে খপ্ ক'রে প্রিয়র হাতখানা ধ'রে ফেলে বল্‌লে—"ছি ভাই, হাসির কথায় কি কাঁদ্‌তে আছে ? আমি একটু ঠাট্টা করেছি বইত না।"

ব'লেই রমা থেমে গেল। একবার নিজের অতীত জীবনের দিকে চাইতেই নিজের বধূ-জীবনের একদিনকার ছবি মনের চোখে ভেসে উঠ্‌ল—স্বামীর চরিত্র-দোষের কথা প্রথম জান্‌তে পেরে কি কান্নাটাই সে কেঁদেছিল। আজ ভাব্‌তে গেলে সে কান্নাটাকে ছেলেমানুষী ব'লেই মনে হয় ; অথচ সেদিন সে ননদদের ডাকাডাকি, শাশুড়ীদের হাঁকাহাঁকি সব উপেক্ষা ক'রে একটা কোণের-ঘরের মেঝেতে মুখ গুঁজে পড়েছিল। পিস্‌শাশুড়ী খন্‌খনে গলায় বলেছিলেন—"এসব কেমন সোয়ামীকামড়া মেয়ে গো ? পুরুষ মানুষ কোথায় কি করে সেদিকে তোর চোখ দেওয়ার কি দর্‌কার ? তোরা ঘরের খা পর্, সোয়ামী এখন যদি পাঁচ জায়গায় যায় তোর তাতে কি দুঃখু ? এমন নয় যে ঘরে আসে না, বসে না—"

খুড়শাশুড়ী বলেছিলেন—"আমাদের কালে এমনটি ছিল না বাপু। এমন কেঁদে ঢলাঢলি, ছিঃ ম্যাগো !"

তখন এসব যুক্তির সার অর্থ না বুঝলেও পরের জীবনে রমার এসব বেশ স'য়ে গিয়েছে বরং এখন সে উপদেশ দেবারও দাবী রাখে।

কেদার ও-ঘর থেকে ডাক্‌লে—"জয়া, একবার এদিকে আস্‌তে বল ত?"

'কাকে' সে কথাটা উহ্য থাক্‌লেও বুঝ্‌তে কারু একটুও ভুল হ'ল না। প্রিয় তাড়াতাড়ি উঠে—"একটু বোসো দিদি এখখুনি আস্‌ছি" এই কথাটি ব'লে মুখের ম্লান ছায়া হাসির আভায় উজ্জ্বল ক'রে নিয়ে কেদারের কাছে চ'লে গেল। ক্রমশঃ

কাব্যকথা

শ্রীসত্যসুন্দর দাস

প্রতিভা ও কবি-কল্পনা (১)

কবি ও কাব্য সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা এ পর্য্যন্ত করিয়াছি তাহা ঠিক তত্ত্বালোচনা নয়; যদি কেহ সে ধারণা করিয়া থাকেন তবে নিরাশ হইতে হইবে। কাব্য যেমন কোনও তত্ত্বকথা নয়, তেমনি কাব্যপরিচয় ঠিক তত্ত্বানুসন্ধানের মত হইলে, কাব্যবস্তু উহ্য হইয়া যাইবে। রসিক পাঠকের মনে, কাব্যপাঠ কালে, কবি ও কাব্যকলা সম্বন্ধে যে কতকগুলি ধারণা আপনা হইতে গড়িয়া উঠে, অথচ খুব স্পষ্ট করিয়া তুলিবার আবশ্যক বা সুবিধা হয়না, সেই ধারণাগুলিকেই একটু সাজাইয়া গুছাইয়া দেওয়া আমার অভিপ্রায়, তার বেশী কিছু করিবার অভিমান বা সাধ্য আমার নাই। আমার আলোচনায় যদি কোনও থিয়রী থাকে, তাহা কোনও তত্ত্বসিদ্ধান্ত নয়,—যাঁহাদের ওইরূপ কোনও সিদ্ধান্ত আছে, তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্তকে পাকা করিয়া তুলিবার জন্য গৌণভাবে সাহায্য করিলেই আমার আলোচনা সার্থক হইবে। আমার কোনও নিজ মত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। কাব্যপাঠ করিয়া কবি ও কাব্য সম্বন্ধে যে একটি প্রত্যক্ষ ধারণা অনিবার্য্য, তাহার যতটুকু—পণ্ডিত নয়—রসিক সমাজে আলোচনার যোগ্য, তাহাই বিবৃত করা আমার অভিপ্রায়। তাই বার বার বলিয়া রাখিতে চাই যে, আমার লক্ষ্য কাব্য-মীমাংসা নয়, কাব্য-পরিচয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় কবি-কল্পনা। বিষয়টির নামোল্লেখ মাত্রেই একটা কিছু ধারণা সকলের মনে জাগিয়া উঠা সম্ভব। দেখা যাক, এই ধারণা কার্য্যতঃ কতখানি ও কিরূপ।

ইংরেজীতে Imagination বলিতে যাহা বুঝায় কল্পনা অর্থে আমরা শেষ পর্য্যন্ত তাহাই বুঝিব। ইংরেজী শব্দটির ক্রমশঃ যে ব্যাপক অর্থ দাঁড়াইয়াছে, সে অর্থে কোনও দেশী শব্দ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ, কারণ কবিপ্রতিভার ঠিক এই শক্তির আবশ্যকতা দেশীয় কাব্য-বিচারে কার্য্যতঃ কখনও স্বীকৃত হয় নাই। 'কল্পনা' শব্দটির অর্থ;—'রচনা' বা 'আরোপ'—পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, ইহার অধিক কোনও অর্থ এই শব্দটির মধ্যে ছিল না। কবিকর্ম্মের যে দিকটি লক্ষ্য করিয়া অধুনা এই শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য দেখা যাইতেছে সেই দিকটির যেমন বিশেষ আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তেমনি 'কল্পনা' কথাটির অর্থও সুনিরূপিত হয় নাই।

কাব্যবিচারে কবিকর্ম্মের ধারণা, কাব্যের ধারণা হইতেই জন্মে। তথাপি কবিকর্ম্মের ধারণা আগে, ও কাব্যের ধারণা তদনুযায়ী হওয়ায় স্বাভাবিক। উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি না পড়িলে কবিপ্রতিভার কোনও ধারণা হইতে পারে না। প্রশ্ন উঠিবে—উৎকৃষ্ট কাব্য কি? ইহার উত্তরে, জগতের কাব্যসাহিত্যে যেগুলি সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের রসিক সমাজে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে—সেই-

গুলির নাম করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আমাদের দেশেও উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ-বিচার করিয়া, কাব্যের একটি আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই আদর্শ ও তদনুযায়ী কবিকর্ম্মের ধারণা একটু বুঝিবার চেষ্টা করিলে ভালো হয়, কারণ পুরাতনের সহিত নূতনের প্রভেদ কোথায় তাহা স্থিরীকৃত না হইলে, কাব্যপরিচয়ের ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। এসম্বন্ধে যতটু বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহার জন্য আমি প্রধানতঃ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের বহু গবেষণাপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থের নিকট ঋণী। * অবশ্য এই আলোচনায় আমার মতামতের জন্য সেই পণ্ডিত ব্যক্তিকে দায়ী করা যাইবে না।

কাব্যের মূলে কবিকল্পনা, এবং কবিকল্পনার কারণ কবির প্রতিভা—এমন কথা বলিতে কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু, এই কবিকল্পনা কি এবং কতটকু জিনিষ, তাহার নির্ণয়ের উপর কবিশক্তির মূল্য বা গৌরব নির্ভর করিতেছে। আমরা যাহাকে কবিকল্পনা বলি কবির সেই অন্তর্গত ভাবকর্ম্মকে সংস্কৃত আলঙ্কারিক 'কবিব্যাপার' কবিকর্ম্ম' বা 'কবিকৌশল' বলিয়াছেন। 'কল্পনা' এই শব্দটি কুত্রাপি এই সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ, আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসার যে প্রধান বিষয়—কবিমানস ও কাব্যবস্তু, তাহা সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের প্রয়োজনের বহির্ভূত। এ সম্বন্ধে ডাঃ দে তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে পাদটীকায় বলিতেছেন—

The Indian theorists have almost neglected an important part of their task, viz., to find a definition of the nature of the subject of a poem as the product of the poet's mind; this problem is the main issue of Western Aesthetics.

[অর্থাৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কাব্যশাস্ত্র আলোচনার একটা দিক প্রায় লক্ষ্যই করেন নাই,—প্রত্যেক কাব্যই কবিমানসপ্রসূত অতএব তাহার বিষয়-বস্তুর যে বিশেষত্ব নির্দ্দেশের প্রয়োজন সে দিকে তাঁহারা যত্নবান হন নাই; পাশ্চাত্য সুন্দর-তত্ত্বের ইহাই প্রধান সমস্যা।]

এসম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার পূর্ব্বে কাব্য ও কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না প্রথমেই কবিপ্রতিভা বিষয়ক কয়েকটি উক্তি চয়ন করিয়া দিলাম।

ভামহ ও দণ্ডী এই প্রতিভাকে 'নৈসর্গিকী' ও 'সহজা' বলিয়াছেন। বামনের মতে এই প্রতিভা—"জন্মান্তরগত সংস্কারবিশেষঃ কশ্চিৎ", ইহারই মধ্যে কাব্যের বীজ নিহিত থাকে। মম্মট ইহাকে 'শক্তি' বলিয়াছেন। অভিনব গুপ্ত ইহার নাম দিয়াছিলেন 'প্রজ্ঞা' বা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, ইহাই 'অপূর্ব্ব বস্তুনির্ম্মাণক্ষম', ইহার প্রধান পরিচয়—"রসাবেশ-বৈশদ্য-সৌন্দর্য্য কাব্যনির্ম্মাণক্ষমত্বং।" ইহাই ভরতনির্দ্দিষ্ট কবির অন্তর্গত ভাব। এই প্রতিভাকেই অভিনব গুপ্তের গুরু ভট্ট তৌতের একটি শ্লোকে "প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখশালিনী" বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক-গণ এই শ্লোকটিকে শাস্ত্রবাক্যের মত মানিয়া লইয়াছেন, কেবল কেহ কেহ ইহার উপর আর একটি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন—'লোকত্তর'; এবং ইহা রচনার বৈচিত্র্য 'বিচ্ছিত্তি' 'চারুত্ব' 'সৌন্দর্য্য' বা 'রমণীয়ত্ব' সম্পাদন করে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসায়' কবি সম্বন্ধে, শক্তি, প্রতিভা (রচনাকৌশল) ব্যুৎপত্তি,(culture) ও অভ্যাস—এই চারিগুণের উল্লেখ আছে। এই চারিটি ছাড়া 'সমাধি' বা চিত্তের একাগ্রতাও একটি গুণ বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। যাযাবরীয়গণের মতে, কবিত্বের কারণ 'শক্তি'—এই শক্তির ফলেই'প্রতিভা' ও 'ব্যুৎপত্তি'র উন্মেষ হয়। এই প্রতিভার আবার দুই দিক আছে—একদিকে ইহা 'কারয়িত্রী', আর এক দিকে ইহা 'ভাবয়িত্রী'।

অলঙ্কারশাস্ত্রের এই বচনগুলিতে প্রতিভার যে পরিচয় আছে তাহা এক হিসাবে যথার্থ। কবি প্রতিভা 'দিব্য প্রযত্ন' হইলেও, এমন কি প্রাক্তন-সংস্কার বলিয়া মানিলেও ইহা যে অভ্যাস ও ব্যুৎপত্তি দ্বারা মার্জ্জিত হয়, একথাও সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু 'কবিব্যাপার' বা 'কবি-কর্ম্মে'র স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে হইলে, ওই 'নবনবোল্লেখ শালিনী' ও 'অপূর্ব্ব বস্তু নির্ম্মাণক্ষম' বিশেষণ দুইটি ভালো করিয়া বুঝিতে হয়। এজন্য সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের যে ধারণা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। কোনও মতবাদের মূল্য নিরূপণ আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই,

* Studies in the History of Sanskrit Poetics. Vol. II.

কবিকল্পনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার কতটুকু ধারণা এই বিচারে ধরা পড়ে, তাহা বুঝিয়া লইতে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই—'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং' —কাব্যের এই সংজ্ঞানির্দ্দেশ অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রচলিত আছে। কাব্য অর্থে মূলতঃ শব্দ ও অর্থের মিলনাত্মক রচনা। শব্দার্থের ব্যাকরণ ও দর্শন ঘটিত মীমাংসা হইতেই কাব্যালোচনার আরম্ভ—তাই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের যতকিছু মতবাদ সব এই শব্দার্থের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। 'সাহিত্য' শব্দটিও এই 'শব্দার্থৌ সহিতৌ' হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে। ইহার পর শব্দার্থ ঘটিত অলঙ্কারই কাব্যের নিদান বলিয়া এ সম্বন্ধে বহুতর সিদ্ধান্ত অলঙ্কার শাস্ত্রের পুষ্টি বিধান করে। ইতিমধ্যে অলঙ্কার ব্যতীত 'রীতি' ও 'দোষ-গুণ' কাব্যকলায় স্থান পাইল। 'রীতি' অর্থে বিশিষ্ট পদরচনা বা বাক্যবিন্যাস (diction)। ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্য্য এই তিনটিই কাব্যের প্রধান গুণ এবং কতকগুলি দোষও সেই সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট হইল। এজন্য, অতঃপর কাব্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশে অলঙ্কারের সঙ্গে রীতি ও দোষ-গুণ ধরা হইত। বিশ্বনাথের মতে, যাহা "গুণালঙ্কার সহিতৌ শব্দার্থৌ দোষবৰ্জ্জিতৌ" তাহাই কাব্য। শব্দার্থকে কাব্যশরীর ধরিয়া তাহার অঙ্গশোভা দোষ-গুণ ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া, শেষে কাব্যের আত্মা কি, তাহার সন্ধান আরম্ভ হইল। বামনের মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'—রীতিই অর্থাৎ এই বাক্যবিন্যাস ভঙ্গিই কাব্যের আত্মা। 'বক্রোক্তিজীবিত'-কার কুন্তলের মতে অলঙ্কার নিহিত বক্রোক্তিই কাব্যের জীবিত বা প্রাণ। অর্থাৎ সোজা কথাকে বাঁকা করিয়া বলিবার যে ভঙ্গি হইতে কাব্যের অলঙ্কারগুলির সৃষ্টি হয়—তাহাই কাব্যের মূল উৎস, কাব্যের সর্ব্বস্ব। 'রস' নামক আর একটি উপাদান পূর্ব্ব হইতেই (ভরতের 'নাট্যসূত্র' হইতে) কাব্যের প্রাণ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, উত্তরকালে তাহার যে মূল্য দাঁড়াইয়াছিল এখনও তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই; 'রস'কে, অন্য সকল উপাদানের উপজীব্য বলিয়া, কাব্যবিচারে একটা সাধারণ মূল্য দেওয়া হইত। অলঙ্কার, রীতি ও দোষগুণই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়, এবং তাহা লইয়া জটিল সিদ্ধান্তের অবধি ছিল না। ক্রমশঃ যখন 'ধ্বনি', বা ব্যঙ্গ্যার্থ, কাব্যের আত্মা বলিয়া একটা নূতন মত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন কবি-কৌশলের সকল অঙ্গই ধ্বন্যাত্মক বলিয়া ধারণা হইল; উৎকৃষ্ট কাব্যের বস্তু, অলঙ্কার, রস প্রভৃতির উৎকর্ষের শেষ প্রমাণ হইল এই ধ্বনি। পরিশেষে সকল ধ্বনিই এক রসধ্বনিতে আসিয়া দাঁড়াইল; তখন এক আলঙ্কারিকের মতে কাব্যের স্বরূপ হইল—"বাক্যং রসাত্মকং", অর্থাৎ রস যে-বাক্যের আত্মা, তাহাই কাব্য।

উপরি-উদ্ধৃত অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল না, জানি। 'রস' কথাটির তাৎপর্য্য যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিব। 'ধ্বনি' কথাটির মোটামুটি অর্থ—ব্যঞ্জনা, বা suggested sense। এই সকল সিদ্ধান্ত, কাব্যের আদর্শ-বিচারে, তত্ত্ব-হিসাবে যতই মূল্যবান হউক—কবিকল্পনা বা কবিকর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মূল জিজ্ঞাসা, এই অলঙ্কারাদির বাহিরে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিবে না। শেষ পর্য্যন্ত কাব্যের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে আলঙ্কারিক যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে কাব্য "রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দ"; অর্থাৎ, কাব্যে শব্দার্থের রমণীয়ার্থ প্রতিপাদন আবশ্যক। তথাপি কার্য্যতঃ সেই সালঙ্কার ও নির্দ্দোষ পদরচনাই কবির প্রত্যক্ষ কীর্ত্তি। এই কৌশল যে অভ্যাসের দ্বারাও আয়ত্ত করা যায়, আলঙ্কারিক তাহা স্বীকার করেন; কারণ, শব্দার্থগত কবিকর্ম্মকে যে রীতিমত শিক্ষাশাস্ত্রে পরিণত করা যায়, অলঙ্কার-শাস্ত্র রচনার একটি প্রধান কারণই এই। আলঙ্কারিকগণের মতে কবি প্রতিভা 'সহজা' হইলেও 'ঔপদেশিকী'ও বটে। কবি-প্রতিভার "নবনবোল্লেখ-শালিনী" শক্তি ও 'অপূর্ব্ব বস্তুনির্ম্মাণক্ষমত্বে'র পরিচয় স্বরূপ একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হইতে আলঙ্কারিকের মতে কবিকর্ম্মের প্রসার যে কতটুকু, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

> হৃতসারমিবেন্দুমণ্ডলং
> দময়ন্তীবদনায় বেধসা।
> কৃতমধ্যবিলং বিলোক্যতে
> ধৃতগম্ভীরখনিখনীলিম॥

[দময়ন্তীর মুখনির্ম্মাণ জন্য বিধি চন্দ্র হইতে কিয়দংশ হরণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগে অতি গভীর আকাশ নীল

গহ্বর দেখা যাইতেছে অর্থাৎ গহ্বর এত গভীর যে ওপিঠে আকাশ দেখা যাইতেছে, তাহা না হইলে উহা নীল দেখাইত না, আলোক পড়িয়া শুভ্র হইয়া যাইত।]

—ইহাও যে নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভার নিদর্শন, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রস ও ধ্বনিবাদ অনুসারে, কবিকর্ম্মের কোনও বিচারযোগ্য বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধনের মতে—কবির একমাত্র চেষ্টা হইবে, কেমন করিয়া রচনার দ্বারা রসোদ্রেক হয়। বারবার এই কথাই বলা হইয়াছে যে, শব্দ ও অর্থের যোজনায় কেবলমাত্র রস-ধ্বনিই লক্ষ্য হওয়া উচিত—এমন কি আখ্যান-বস্তু ও অলঙ্কার গৌণ উপাদান মাত্র। অর্থাৎ কাব্যবস্তু ও অলঙ্কারের মধ্যেও যে কৃতিত্বটুকু ছিল, তাহা ঐ রসের অধীনে আরও নির্ব্বিশেষ হইয়া উঠিল। কবি নিপুণ পদরচনার ব্যপদেশে সেই 'লোকোত্তর', 'লোকাতিক্রান্তগোচর' আনন্দ-বিধান যদি করিতে পারেন তবেই তাঁহার কৃতিত্ব—কাব্যে তাহার ভাব বা আখ্যান বস্তুর কোনও স্বতন্ত্র মূল্য নাই।

আসল কথা, পদরচনা সালঙ্কার ও নির্দ্দোষ হইলেই, বক্রোক্তি বা ব্যঞ্জনামূলক চারুত্বের সৃষ্টি হয়, এবং তাহা রসরূপে উদ্ভাসিত হইয়া সহৃদয় পাঠকের মনে, এক অপূর্ব্ব উপায়ে, অনুরূপ রসের অভিব্যক্তি ঘটায়। এই রস "পরিত্যক্ত বিশেষঃ"—অর্থাৎ কাব্যবস্তু তখন নামধামহীন হইয়া একটি সাধারণ ভাববস্তুতে পরিণত হয়। রত্যাদি স্থায়ীভাব সাধারণীকৃত হইয়া, অর্থাৎ, বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষ-সংশ্লিষ্ট না হইয়া, একটি অলৌকিক আনন্দ আস্বাদনে পরিণত হয়। এই রসব্যঞ্জনার উপযোগী পদ-নির্ম্মাণই কবিকর্ম্ম। কাব্যের এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়া, শব্দ অর্থ লইয়া কবি ইহারই কসরৎ করিবেন।

কিন্তু কাব্যবিচারে এই রসব্যঞ্জনার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিলেই আধুনিক কাব্য জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয় না। রস ও রসের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের গবেষণা ঠিক কাব্যবিচার নয়; উহা নিখিল কলাশিল্পের বা সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের অন্তর্গত তাই কাব্যকে আশ্রয় করিয়াও উহা কাব্যকলার মূল সমস্যার সমাধান করে না। কাব্যবিচারে, কেবল বিশিষ্ট পদরচনা নয়—সেই পদরচনার অন্তরালে কবির মনোগত যে ভাব-কল্পনা—যে কাব্যবস্তুর প্রেরণা রহিয়াছে, তাহার বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব কবিকল্পনার প্রধান গৌরব। কবি যদি রাম ও সীতাকে লইয়া কাব্যরচনা করেন তবে তাঁহার উদ্দেশ্য কোনও স্থায়ীভাবকে বিভাবাদি দ্বারা রসরূপে পরিণত করাই নয় সেই সকল উপকরণ পরিণামে পরিত্যক্ত-বিশেষ ইহার রসমাত্র হইয়া দাড়াইবে—অতএব রামসীতার কল্পনার মধ্যে কবিকল্পনার কোনও কৃতিত্ব থাকিবার প্রয়োজন নাই, থাকিবে কেবল রসপুষ্টির জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ছাচের পুতুল-নাচ—একথা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য-গুলির সম্বন্ধে কতটা খাটে, বলা কঠিন। কবিকর্ম্ম প্রত্যক্ষভাবে বিশিষ্টপদরচনা বটে, এবং পরিণামে তাহার ফল রস-ব্যঞ্জনাও বটে; তথাপি কাব্যবস্তুই কবি-কল্পনার প্রধান উপজীব্য, সেই বস্তুরচনাতেই কল্পনার যত কিছু কৃতিত্বের পরিচয় আছে,—কবিসৃষ্টির মৌলিকতাও এইখানে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে কাব্য যেন রেখা ও বর্ণবিন্যাসমূলক পরিকল্পনার মত একটি কারুকর্ম্ম (artistic design)। তাহার বিন্যাসকৌশলে এমন একটি বিচ্ছিত্তি ('strikingness) ফুটিয়া উঠিবে, যাহাতে 'লোকোত্তর' আনন্দলাভ হয়। অথবা নিসর্গশোভা দেখিয়া যখন আনন্দ হয়, তখন যেমন সেই শোভার অন্তরালে কোনও বিশিষ্ট ভাবকল্পনার বা অভিপ্রায়ের সন্ধান করিতে হয় না, তেমনি কাব্যসৃষ্টির মূলে কবির ভাব-প্রেরণার মূল্য নিরূপণের প্রয়োজন নাই। এই যে কাব্যনির্ণয়, ইহা সাধারণ Aesthetics বা সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের সমস্যা। আমরা কাব্যের 'রস' নামক 'আত্মা'র সন্ধানের ভার তত্ত্ববাদীদিগের উপর দিয়া, কাব্যকে কবির ভাব-বিগ্রহরূপে ধারণা করিয়া, সেই বিগ্রহ-নির্ম্মাণে কবিপ্রতিভার শক্তি বা কৌশলের মূল্য বুঝিতে চাই। রসই যে "সকলপ্রয়োজন মৌলীভূতং"—একথা কোনও রসিক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু এই রসকে কাব্যবিচারে একান্ত করিয়া তুলিলে, কাব্যকথা যে কেমন নির্ব্বিশেষ তত্ত্ববিচারে পরিণত হয়, এবং কবি-কল্পনার প্রসার যে কত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে তাহাই দেখাইবার জন্য এত কথার অবতারণা করিলাম, নতুবা

এ-প্রবন্ধে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র লইয়া এই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন ছিল না।

এক্ষণে আমাদের 'কল্পনা' কথাটিতে ফিরিয়া আসা যাক। সাধারণতঃ বাংলায় 'কল্পনা' শব্দ বাস্তবের বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয়। যাহা বাস্তব-বিরোধী বা মন-গড়া, যাহার কোনও ঘটনা-প্রমাণ নাই, তাহাকেই আমরা 'কাল্পনিক' বলি। ইংরেজী fancyful বা imaginary কথার অর্থও তাই। সংস্কৃত অলঙ্কারের 'কল্পনদুষ্ট', 'কল্পিতোপমা' প্রভৃতি নামকরণে এই অর্থের আভাস আছে, কিন্তু কল্পনা-শব্দটি কবিপ্রতিভার লক্ষণ-নির্ণয়ে কুত্রাপি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। আমাদের মধুসূদন তাঁহার মহাকাব্যের মঙ্গলাচরণ করিতে গিয়া যখন কল্পনাকে বাক্‌দেবীর সঙ্গে আবাহন করিলেন—

> তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
> কল্পনে! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
> লয়ে রচ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
> আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

—তখন কবিশক্তিরূপিণী কল্পনার একটি বিশিষ্ট অর্থ সূচিত হইল। এই যে 'মধুকরী' বিশেষণটি এবং তৎসঙ্গে কল্পনার কার্য্যপ্রণালীর ইঙ্গিত—ইহা দ্বারা কল্পনার যে অর্থ বুঝায়, ইংরেজীতে তাহাকে Invention বলে। কবি বলিতেছেন, কল্পনা তাঁহার চিত্তফুলবনের মধু সংগ্রহ করিয়া (অথবা অপর কবিগণের কাব্য হইতে কিছু কিছু মধু আহরণ করিয়া) একটি মধুচক্র রচনা করিবে, অর্থাৎ নানা ভাবরাজি আবশ্যক মত সাজাইয়া বা গ্রহণ করিয়া একখানি নূতন কাব্যরচনা করিবে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে কবিপ্রতিভাকে যে 'অপূর্ব্ববস্তুনির্ম্মাণক্ষম' প্রজ্ঞা এবং ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী দুই শক্তির আধার বলা হইয়াছে, তাহাতে কল্পনার এই ধারণা কতকটা সূচিত হয়। ইহাই কবি-কৌশল। মেঘনাদবধ কাব্যখানিতে কল্পনা এই কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছে—পুরাতনকে নূতন করিয়া বলা এবং অনুকরণমূলক উদ্ভাবন-কর্ম্মের পরিচয় এই কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। মধুসূদন পাশ্চাত্য-কাব্যের যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এই যে, আর্ট—Imitation বা অনুকৃতি। এই Imitation কথাটি আমি ইতিপূর্ব্বে (কবি ও কাব্য) গভীরতর অর্থে গ্রহণ করিয়াছি—ঠিক এই অর্থে নয়। এই অনুকরণ দ্বিবিধ; প্রকৃতির অনুসরণ, (যাহাকে সংস্কৃত অলঙ্কারে জাতি বা স্বভাবোক্তি নামে কোনওরূপে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে); আর একরূপ অনুকরণ অপর কবির অনুকরণ, এই অনুকরণ নিকৃষ্ট। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র এই অনুকরণ স্বীকার করে, কাব্যকলা রীতিমত শিক্ষণীয় বা আভ্যাসিক বলিয়া মনে করে, কারণ শব্দ ও অর্থেই কাব্যের আরম্ভ, এবং এই শব্দার্থের যত কিছু কারুকলাই কবিকর্ম্ম। এ অর্থে ইংরেজী Invention কথাটির অর্থ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মজার কথা এই যে প্রকৃতির অনুকরণই পাশ্চাত্য কাব্যের আদর্শ হইলেও, এবং সেই আদর্শে অতি উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা সম্ভব হইলেও, সেখানে সেকালে সুন্দর-বোধ বা রসের কোনও সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত হয় নাই—সে দেশে Aesthetics একটা অতিশয় আধুনিক শাস্ত্র। কিন্তু যাহারা প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুকরণ না করিয়া, কাব্যকে খাঁটি সাহিত্য অর্থাৎ সালঙ্কার শব্দার্থরচনা বলিয়াই মনে করিত, তাহারা এই রসের সন্ধান বহুপূর্ব্বে পাইয়াছে, এবং ইহাকে কাজের শেষ প্রয়োজন বলিয়া স্থির করিয়াছে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ভাবনা তুলনায় সমালোচনা করিবার ইহাও একটি দৃষ্টান্ত। ভারতীয় ভাবনা, কাব্যবিচারে—প্রকৃতি, কবিতার বিষয়, কবিমানস প্রভৃতিকে পাশ কাটাইয়া অলৌকিক রসবস্তুকে আশ্রয় করিয়াছে—সে ভাবনা বিশেষকে বাদ দিয়া নির্ব্বিশেষের প্রয়াসী, তাহার নিকট বস্তুমাত্রই শূন্য ও নস্যাৎ হইয়া যায়।

এক্ষণে ইয়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই 'কল্পনা'র প্রসার সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ সম্বন্ধে ইংরেজী 'রোমান্টিক' শব্দটির অর্থবিপর্য্যয়ের ইতিহাস লক্ষ্য করিলেই ব্যাপারটি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, তাই এ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া নিম্নে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিলাম। *

---

* Logan Pearsall Smith কৃত Words and Idioms নামক গ্রন্থে Four Romantic Words. শীর্ষক সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে, প্রাচীন কাব্যকলার যে Imitation অথবা অনুকৃতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাই কবিকল্পনার আদর্শ ছিল। মধ্যযুগের কাব্য ও আখ্যান-আখ্যায়িকায় কবিকল্পনা কোনও নিয়ম মানে নাই, অবাধে আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে,—ভাববিলাসের আতিশয্য এবং অবাস্তবের যাহা কিছু আনন্দ, তাহাকেই বরণ করিয়াছে। কল্পনার এই স্বাধীন স্ফূর্ত্তি মানবমনের অতি সহজ ও আদিম প্রবৃত্তি। পরবর্ত্তীকালে এই অতিচারী কল্পনাকে রোমান্টিক(Romantic) বলা হইত—তাহার কারণ, এ সাহিত্য যে-ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহা (য়ুরোপের‘সংস্কৃত’) ল্যাটিন নহে; এ সাহিত্য ‘ভাষা-সাহিত্য’—রোমান্টিক শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থও তাই। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, এ-সাহিত্য পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত সরল লোকসাহিত্য, এবং এ-কল্পনা স্বাভাবিক কবিব্যাপার। সর্ব্বদেশের লোকসাহিত্যে এই কল্পনার প্রসার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ক্রমে এই ‘রোমান্টিক’ শব্দটির অর্থ দাঁড়াইল—অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত, বালকোচিত, এমন কি ছন্নমতি বা উন্মাদ পর্য্যন্ত। ইয়ুরোপীয় সভ্যতায় যখন বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ প্রবল হইয়া উঠিল, তখন সাহিত্যের আদর্শও বদলাইয়া গেল। তখন কবিকল্পনাকে যুক্তিবিচারের শাসনে সংযত রাখাই উৎকৃষ্ট প্রতিভার পরিচয় বলিয়া গণ্য হইল। এই বিচারবুদ্ধিই হইল কবিতার প্রাণ, ‘কল্পনা’ অলঙ্কারাদি দ্বারা কাব্যের প্রসাধন করিবে মাত্র। তখনকার কবি ও দার্শনিক উভয়েরই মতে, কল্পনা একটি উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি, উহার ফলে বাতুলতা, ভ্রান্তি ও চিত্তদাহ উপস্থিত হয়; কিন্তু এই বৃত্তিকে বিচারবুদ্ধির শাসনে রাখিলে, স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে নানা দৃষ্টান্ত ও উপমা আহরণ করিয়া জ্ঞান-গর্ভ রচনার শোভা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তখন উৎকৃষ্ট কাব্যকে ‘যুক্তিযুক্ত ও সুবুদ্ধিসম্মত’ (reasonable and judicious) বলিয়া প্রশংসা করা হইত। কিন্তু ক্রমশঃ প্রায় একই কালে, কবিকল্পনা সম্বন্ধে আর একটি ধারণা স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছিল—আর্টে কল্পনার যথার্থ স্থান ও প্রকৃত মূল্য নিরূপণ আরম্ভ হইয়াছিল। যাহা অসঙ্গত বা অপ্রাকৃত—অথচ মনোমুগ্ধকর, তাহারই নাম হইল ‘রোমান্টিক’। প্রাচীন কথা, কাব্য ও কাহিনীর মধ্যে যে ধরণের কল্পনা ছিল তাহাই উপাদেয় বলিয়া স্থির হইল। জ্যোৎস্না রাত্রি, নির্জ্জন বনভূমি, সমুদ্র সৈকত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের যেখানে যাহা কিছু অবাস্তব-রমণীয় এবং চিত্ত-চমৎকারী বলিয়া বোধ হইল, তাহা প্রাচীন কাব্যোদ্ধৃত রসরাগে রঞ্জিত বলিয়া ‘রোমান্টিক’ শব্দটি নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। যুক্তি-বিচার দ্বারা প্রকৃতির অনুসরণ কাব্যের আদর্শ বলিয়া আর গ্রাহ্য হইল না। কল্পনা প্রকৃতির মধ্যে একটা চমৎকারের সন্ধান পাইল—যাহা সুন্দর তাহার মধ্যে একটা ‘কি-জানি-কি’-ভাব (সংস্কৃত আলঙ্কারিকের ‘অবিচারিতরমণীয়’) রহিয়াছে দেখা গেল। জ্ঞানবুদ্ধির অতীত এই সুন্দর-রহস্য কল্পনার প্রধান উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইল। মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্য হইতেই কল্পনার এই অঞ্জন মানুষের চোখে নূতন করিয়া লাগিল, কাব্য প্রকৃতিকে অনুসরণ না করিয়া যেন প্রকৃতির উপরেই আপন প্রভাব বিস্তার করিল। এখন হইতে প্রকৃতিই যেন কল্পনার বশ হইল। কল্পনার এই স্বাধীন বৃত্তি, কবিগণের অন্তরগত বাসনা-সংস্কারের প্রভাব, কাব্য-সৃষ্টিতে যে নূতনত্ব আনিল, তাহা তত্ত্বের দিক দিয়া নয়, কবি কল্পনার দিক দিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকের ‘রস’ নামক বস্তুরই প্রেরণা। অতঃপর ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে যুক্তিবাদী ও ভাববাদীর মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, Romanticism ও Classicism নামক সেই দ্বন্দ্ব কাব্য-সমালোচনায় আজিও অব্যাহত রহিয়াছে—তাহার ইতিহাসে এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই।

ইয়ুরোপীয় কাব্যের এই আদর্শই বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কাব্যকলার এই আদর্শের পরিচয় ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই আদর্শ কোনও মতবাদ নয়, ইহা জাতিযুগ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দিব্যশক্তি-দায়িনী—ইহার প্রভাবে কবিকল্পনা উদার, উন্মুক্ত ও ‘নবনবোল্লেখশালিনী’। যাহা সার্ব্বজনীন, যাহা সর্ব্ব মানবের রসপিপাসা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত, সেই স্বাভাবিক ভাব-প্রেরণা বাংলা কাব্যকে বিশ্বসাহিত্যের

সহিত যুক্ত করিয়াছে। প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এখন অচল। এখনকার কাব্যে অলঙ্কার আছে, কিন্তু ব্যাকরণ নাই; যে গুণদোষসমন্বিত রীতি আছে তাহা কবির ব্যক্তিগত ভাবপ্রেরণার অনুগত, শাস্ত্রনিয়মের অধীন নয়; যে রস আছে, তাহাতে পদে পদে রসাভাস ঘটিয়াছে। আধুনিক রুচি 'বিশ্ববিদ্যাবার্ত্তাবিধির' দ্বারা মার্জ্জিত। সর্ব্বদেশের সর্ব্বযুগের সাহিত্য-সম্ভার এক্ষণে রসিকচিত্তের গোচরীভূত। কালিদাস ভবভূতির কবি-প্রতিভা এখন আর সংস্কৃত অলঙ্কারের মানদণ্ডে যাচাই হইবার নয়, নিখিল রসিকচিত্তের রসবিলাসে তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। তাই কাব্য সমালোচনায় নূতন আদর্শের—কবিকল্পনার—নূতন করিয়া মূল্য নিরূপণের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হইল জানি না। কবিকল্পনার স্বরূপ-পরিচয়ই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক যত কথা বলিয়াছি, তাহাতে ব্যাপারটা অন্ততঃ কতক পরিমাণে পাঠকের মনে ধরিয়াছে বলিয়া আশা করিতে পারি। কোনও তত্ত্বালোচনা বা মনস্তত্ত্ব ঘটিত বিশ্লেষণ আমার সাধ্য নয়। 'কল্পনা' কথাটির প্রচলিত পরিচিত অর্থ সকলের জানা আছে। কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট শক্তিরূপে ইহার যে ধারণা আধুনিক কাব্য-বিচারে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাই আমার আলোচনার বিষয়। ইহার সঙ্কীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেরই ইঙ্গিত আমি ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র অনুসারে এই বস্তুর মূল্য কতটুকু দাঁড়ায় তাহার আভাস দিয়াছি। ইয়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যে ইহার স্বরূপ কি, তাহারও একটু পরিচয় দিয়াছি। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত আলঙ্কারিকের ধারণা ও ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের যুগ বিশেষের ধারণা তুলনা করিয়া দেখিবার ভার পাঠকের উপরেই রাখিলাম। এক্ষণে 'কল্পনার' কোনো সংজ্ঞা নির্দ্দেশের চেষ্টা না করিয়া মানব মনের এই আদিম প্রবৃত্তি সাহিত্যে কতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মূলে কাব্যসৃষ্টির কত বিভিন্ন প্রেরণা রহিয়াছে, সেই সঙ্গে কবিপ্রতিভার বৈচিত্র্য ও তাহার পরিচয় স্বরূপ, কবিকল্পনার কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন উদ্ধৃত করিব—এই নিদর্শন সমুদ্র হইতে জল-গণ্ডূষের মত। কারণ মানবের মনোজগৎ বিশাল বর্হিজগৎ অপেক্ষা বিস্তৃত; মানুষের জ্ঞান-অজ্ঞানের যত দিক ও যত পথ আছে সর্ব্বত্র এই কুহকিনী কল্পনার অবাধগতি। মনুষ্যচিত্তের সেই বিরাট বিশ্বরূপ দেখিয়া কবিও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন—

> Not chaos, not
> The darkest pit of lowest Erebus
> Nor aught of blinder vacancy scooped out
> By help of dreams—can breed such fear and awe
> As fall upon us often when we look
> Into our minds into the Mind of Man."

> প্রলয়ের একাকার
> তলাতল পাতালের অন্ধতম গুহা,
> কিম্বা সেই অনাসৃষ্টি আরো শূন্যময়
> খুঁড়ে তুলি স্বপনের খনিত্র সহায়ে—
> সেও নাহি পারে হেন করিতে বিহ্বল
> ভয়ত্রাসে, যথা যবে করি আঁখিপাত
> আপনার চিত্তমাঝে, মানব-মানসে।]

—এই অখিল মানব-চেতনার উপরেই কাব্য-লোক প্রতিষ্ঠিত; ইহা যেমন আদিঅন্তহীন, কল্পনার সৃষ্টিও তেমনি বহুবিচিত্র। আমি এই কল্পনার পরিচয় স্বরূপ কয়েকটি কাব্যাংশ এখানে উদ্ধৃত করিব—কোনোরূপ মনস্তত্ত্বঘটিত বিশ্লেষণ অথবা অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত শ্রেণী-নির্দ্দেশ আমার কর্ম্ম নয়।

প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলির মূর্ত্তিকল্পনা, জড়বস্তুতে চিদ্‌বুদ্ধির আরোপ—মানবমনের অতি আদিম প্রবৃত্তি। রূপকথার সোণার কাঠি, রূপার কাঠি, পক্ষীরাজ ঘোড়া প্রভৃতি বোধ হয় এই কল্পনারই আর এক স্তর। দশমুণ্ড রাবণ, কচ্ছপীর দুগ্ধ—এমন কি অতি পরিচিত অশ্বডিম্বের কথাও এই সূত্রে স্মরণযোগ্য। আমাদের কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীর রূপ বর্ণনা মনে করুন—কল্পনা যে কেমন অঘটঘটনপটিয়সী তাহা বুঝিতে পারিবেন। পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ-কল্পনায়, রূপ-বিবর্জ্জিতের যে রূপ ধ্যানের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে তাহাতেও এই কবিমানসক্রিয়া বর্ত্তমান। আবার কোনও জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, চিন্তাকে ভাবে এবং ভাবকে রূপে ধরিতে গিয়া এই কল্পনাবৃত্তি কেমন বিরোধাভাস ফুটাইয়াছে!—

"শিবের গলে সর্প, নিকটেই সর্পভূক ময়ূর; মস্তকে শীতলময় গঙ্গা,

ললাটে প্রজ্বলিত বহ্নি ; জীবনস্বরূপ সুশুভ্র রজতকান্তি, কণ্ঠে মরণচিহ্ন—বিষ-নীলিমা। খাদ্য বলদ সহ খাদক সিংহ ; বোকা লক্ষ্মী, সেয়ানী সরস্বতী ; ধনপতি কুবের ভৃত, অথচ দিগম্বর ; দগ্ধমদন, অথচ ঔরসজাত পুত্র কার্ত্তিকেয় ; অন্নপূর্ণা গৃহিণী, উপজীবিকা ভিক্ষা।"

সত্যসুন্দররূপী শিবের স্বরূপকল্পনায় সকল দ্বন্দ্বের লোপ করিয়া, একটি যে ভাব-সত্যের ইঙ্গিত এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ—কল্পনার সেই অঘটনঘটনপটুত্ব। কাব্যের রূপক রচনা ও উপমায় এই শক্তি এখনও সমান প্রবল রহিয়াছে—এই শ্রেণীর চিত্রাঙ্কণী-কল্পনার একটি পরিচয় উদ্ধৃত করিলাম। কবি আপনার কল্পনাকেই বলিতেছেন—

কখনো বা দাঁড়াইয়া আকাশ-প্রাচীরে,
হস্তে শূল, অট্টহাসি ভৈরবীর মত
দিতে দেখা, উলঙ্গিনী ঝটিকার বেশে!
মেঘ-ঐরাবত-শুণ্ড সাপটিয়া ভুজে
দোলাইতে মুহুর্মুহু ; চৌদিকে ঘুরায়ে
বিদ্যুৎ-অঙ্কুশাঘাতে করিতে অস্থির
মাতঙ্গেরে, বিন্দু বিন্দু খসিত অজস্র
গজমুক্তা, প্রসারিত যামিনী-অঞ্চলে!

উৎকৃষ্ট উপমা যেন কবিগণের স্বাভাবিক বাক্-ভঙ্গি—সে যেন ভাবের অলঙ্কার নয়, তাহার যথাযথ প্রকাশ—যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহাকে ভাষায় চিত্রিত করিবার একমাত্র উপায়। উপমা শব্দটি আমি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি—এক বস্তুকে অপর বস্তুর দ্বারা, রূপকে ভাবে এবং ভাবকে রূপে, সাদৃশ্যযোগে ফুটাইয়া তোলার যে কাব্য সৃষ্টি, তাহাকেই উপমা বলিতেছি। এই উপমার মধ্যে কবিকর্ম্মের একটি সনাতনরীতি ও কাব্য-প্রেরণার একটি মূল প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় এই জাতীয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিতে বাংলা-কাব্য মণ্ডিত হইয়াছে—রূপ-রূপক ও অরূপ-রূপকের গাঢ়তম রসে তিনি রসিকচিত্ত আপ্লুত করিয়াছেন। এখানে তিনটি মাত্র এই শ্রেণীর কবিতা উদ্ধৃত করিলাম যথা,—

কালিদাসের—

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্র তারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥

[ছদ্মবেশী শিব উমার তাপসী-মূর্ত্তি দেখিয়া বলিতেছেন—এই নবীন বয়সে সকল আভরণ ত্যাগ করিয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কল পরিলে কেন? বল দেখি, স্ফুটচন্দ্রতারকা সন্ধ্যা যদি হঠাৎ অরুণোদয়ে ধূসরকান্তি ধারণ করে, তবে সে কিরূপ হয়!]

রবীন্দ্রনাথের—

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে,
ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির মগন,
শিহরিল দেওদার বন।

দেবেন্দ্রনাথের—

কি জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি
প্রথম চুম্বন!
কুহরিয়া উঠে পিক,
শিহরিয়া উঠে দিক,
ভরে যায় ফলে ফুলে শ্যামল যৌবন ;
বন-তুলসীর গন্ধে বায়ু হয় মাতোয়ারা,
বিটপীর গায়ে গায়ে চাঁদের কিরণ!

* * * *

কে আনিল আলোরাশি হৃদয়-আঁধারে।
অধরের ফাঁক দিয়া
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া
দম্পতীর শয্যার আগারে!
রঙ্গীন বার্ণিশ পেয়ে খাটপালা হেসে উঠে!
কে রে এ চতুর কারিগর?
দেওয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হ'ল—
কে রে সুনিপুণ চিত্রকর?
কনক-পারদ লেগে মলিন দর্পণখানি
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর!

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের কতকগুলি বিশিষ্ট অলঙ্কারের মধ্যে এক ধরণের কল্পনা রহিয়াছে। 'ভ্রান্তিমান' নামক অলঙ্কারের একটি নমুনা এইরূপ—

জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনায় কবি কল্পনা করিতেছেন, গোপবধূগণ শুভ্র জ্যোৎস্নাধারাকে দুগ্ধভ্রম করিয়া ব্যস্ত-

সমস্ত হইয়া ঘট-হস্তে গোগৃহে চলিল; বিলাসিনীগণ নীলপদ্মকে কুমুদভ্রমে কর্ণাভরণ করিল, ইত্যাদি। এই আলঙ্কারিক কল্পনার একটি অতি উপাদেয় দৃষ্টান্ত আধুনিক কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কৃষ্ণের লুকাচুরী খেলার উল্লেখ করিয়া সখাগণ বলিতেছে—

গগনে যখন লুকাস্ তখন দেখিতে যে পাই মেঘে মেঘে—
হয় ঘনশ্যাম তোর তনুটির
রঙ লেগে।
চিনি চিনি ব'লে যদি দেরী হয়, তবে তায়
হাসিয়া ফেলিস্ রে চপল তুই চপলায়,
মেঘ-আবরণে শিখিচূড়া ঢাকা নাহি যায়—
ইন্দ্রধনুতে মাঝে মাঝে তাই
উঠে জেগে।—
চপল আপন তনুটি গোপন কেমনে করিবি মেঘে মেঘে ?

এই সূত্রে আর একটি অতি সুন্দর কবিতা মনে পড়িতেছে—

তার সীঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর-টিপে, খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগল ভুল!
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান লাগল মেঘে,
কানে জোড়া দুল্ দেখে তার
ঝুম্‌কো জবা দোলায় দুল্,
তার সরু সীঁথার সিদুর মেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল!

কল্পনার আর একটি শক্তি প্রায় দেখা যায়;—যাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার কৌশল কবি জানেন। 'শকুন্তলা' নাটকে দুষ্মন্তের বিমান-যাত্রা-বর্ণনায় আছে—

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভির্
হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ॥

[রথ যে এখন বারিগর্ভ মেঘপুঞ্জের উপর দিয়া চলিয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; কারণ, অরবিবরের মধ্য দিয়া চাতক যাতায়াত করিতেছে, অশ্বপৃষ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতালোক বিলসিত হইতেছে, এবং সর্ব্বশেষে—গতিশীল রথের আলোড়নে মেঘবাষ্প বারীভূত হওয়ায় চক্রনেমি শীকরক্লিন্ন হইয়াছে।]

উপরি-উদ্ধৃত কল্পনা-কীর্ত্তিগুলির অলঙ্কার নির্দ্দেশ করিতে পারিব না; কিন্তু তদ্‌পরিবর্ত্তে একটি নূতন অলঙ্কারের সন্ধান দিব, ইহার নাম দিয়াছি—'কাব্যোক্তি' (যেমন 'স্বভাবোক্তি')। একরূপ কল্পনা আছে তাহাতে 'বহুদিনের লুপ্তাবশিষ্ট আতর ও মাথাঘসা'র গন্ধের ন্যায়, প্রাচীন কাব্যবর্ণিত নায়ক-নায়িকা বা স্থানবিশেষের নামসঙ্কেতে অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়। ইংরেজ কবি কীট্‌স্ একদা নাইটিঙ্গেল্ পাখীর গান শুনিয়া ভাববিহ্বল হইয়া লিখিয়াছিলেন—

—Perhaps that selfsame song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when sick for home
She stood in tears, amid the alien corn.

ইহার অনুবাদ অসম্ভব, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইহার প্রায় অনুরূপ একটি বাংলা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের একটি আধুনিক গানে, এই ধরণের কাব্য-সংস্কার অপূর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইংরেজী কবিতাটির মধ্যে যে কল্পনার হঠাৎ উংন্মেষে রস গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ষার আকাশ প্রথম হইতেই সেই কল্পনায় অনুরঞ্জিত, তাই কবি গাইতেছেন—

বহুযুগের ওপার হ'তে আষাঢ় এল আমার মনে,
* * *
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈল-শিরে।
মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে।

এই কল্পনারই আর একটি অতি সুন্দর প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী কবিতাটি—সেই যে

অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণী যেদিন
নামিল স্নানের তরে—

তারপর ঐ এক 'অচ্ছোদ' ভিন্ন আর কোনও নামের উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহাতেই যেন সমগ্র কবিতাটির রস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ওই একটি নামের সঙ্কেতে, কাদম্বরী কাব্যের মদন-মোহিনী নায়িকার যাহা কিছু রূপ তাহার দেহ মনের অনবদ্য রূপভঙ্গি, কবিকল্পনার ইন্দ্রজালে ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

কবিকল্পনার পরিচয় হিসাবে যে কয়েকটি উদাহরণ সঙ্কলন করিলাম, তাহাতে 'কল্পনা' বলিতে কি বুঝায় তাহা কতকটা ধরিতে পারা যাইবে। ইহাতে অবাস্তব

প্রীতি, মনঃকল্পিত কাব্যশোভা, রূপ-অরূপের দ্বন্দ্ব, বর্ণনাভঙ্গি, কবির অন্তর্গত ভাবোল্লাস প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ কবি-ব্যাপারের নমুনা আছে। কিন্তু কবি-প্রতিভার যে আর একটি লক্ষণ আধুনিক কাব্যবিচারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সেই সৃষ্টি-শক্তির একটু পৃথক আলোচনা না করিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সে আলোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া দিলাম।

বাংলার নূতন চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

আজকাল বাংলার মাসিক পত্রে ছবির ছড়াছড়ি। প্রতি-মাসেই রঙিন ছবি অন্ততঃ একখানা করে' না থাকলে চলে না। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল-প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পীগণ প্রথম যখন ভারতীয় চিত্রকলার পুনঃপ্রবর্ত্তন করেছিলেন, তখন মাসিক পত্রে একেবারে ঢি ঢি পড়ে' গিয়েছিল। 'প্রবাসী' ছাড়া অধিকাংশ কাগজই মুখ-বিকৃতি করেছিল; নব-প্রচলিত চিত্রকলা তাদের মনোমত না হওয়ার দরুণ বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিল। এখন দেখি সব সয়ে' গেছে। তথাকথিত 'ভারতীয় চিত্রকলার' ছবি সব কাগজই ছাপ্‌তে আরম্ভ করেছে। এই বৈপরীত্যের কারণ কি? একি আর্টের প্রতি ভালবাসা, না ফ্যাসান?

এখন সকল আর্টিষ্টই চেষ্টা করে, "ইণ্ডিয়ান আর্ট" আঁকতে হবে। তারা চার পাশে যা দেখে, যা ভাবে, তা আঁক্‌বে না; আঁক্‌বে কষ্টকল্পিত কিছু। ঘর-দুয়ার, গ্রাম, লোকজন, যারা আমাদের আশে-পাশে নিত্য নিয়ত চলাফেরা করছে, তার ভিতর থেকে কিছু আঁক্‌লে কি 'ইণ্ডিয়ান আর্ট' হয় না? আমাদের আশে পাশে যে জীবনের প্রবাহ চলেছে, তা কি আমাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে না? সকলেই চায় জোর করে' কবিত্ব কর্‌তে, প্রথমেই একেবারে লিরিক্যাল বিষয় আঁক্‌তে। লিরিক্যাল বিষয়ই বা কি?—নিতান্ত মামুলি ধরণের ছবি; যাতে মৌলিকতার ছিটে-ফোঁটা নেই। যেমন—এক মেয়ে, কোমর বাঁকা কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে আছে। ছবির নীচে নাম লেখা 'যমুনার তীরে'। ওমরখায়াম, সাকি, পেয়ালা প্রভৃতির শ্রাদ্ধও কম হয় না। অনেক ছবির নীচে দু'ছত্তর কবিতা আছে তা না হ'লে 'ছবিত্ব' পূর্ণ হয় না। দু লাইন নীচে থেকে যেন, চোখে আঙুল দিয়ে পরিষ্কার বলে' দিচ্ছে 'এ ছবি যে-সে ছবি নয়, এর ভিতর অনেক কবিত্ব আছে'।

ছবির সঙ্গে ওরকম কাব্যের সম্বন্ধ থাকা উচিত কি না ভেবে দেখবার বিষয়। আর্টিষ্টদের যে কবিদের অনুসরণ করে' বা হাত ধরে' চলতে হবে, তার কোনো মানে নেই। তাদের ভিন্ন একটা ব্যক্তিত্ব আছে। আর্টিষ্ট কবির সৃষ্টিকে অনুসরণ না ক'রেও আর্ট সৃষ্টি কর্‌তে পারে। প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগে আদি শিল্পী যখন গিরিগহ্বরে ছবি এঁকেছিল, তখন কোনো কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তখন চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ডেকোরেশন্‌ বা অলঙ্কার। অবসর-সময়ে মনোরঞ্জন করার জন্যে প্রস্তর-যুগের মানবেরা তাদের গুহার দেওয়ালে ছবি এঁকেছিল। এদের চিত্রের বিশেষত্ব হ'ল সামঞ্জস্য, রং ও রেখা। এরা তাদের চারপাশে জন্তু-জানোয়ার যা দেখেছিল তাই এঁকেছিল। মানুষ ঢুকেছিল পরে। সৌন্দর্য্য-বোধ ছাড়া এদের আর্টের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। চারদিকে প্রকৃতির নানা রহস্য অবলোকন করে', যখন আদি মানবের মনে একটু-একটু করে' ধর্ম্মবোধের উৎপত্তি হ'তে লাগল তখন থেকে আর্টের ভিতর চিহ্নাত্মক বা সিম্বলিক্যাল ব্যাপার ঢুক্‌তে আরম্ভ করেছিল।

প্রাচীন মিশর বা চীনের সাহিত্য অনুধাবন কর্‌লে দেখতে পাব, তাদের সাহিত্য চিত্র থেকে আরম্ভ হয়েছে। মিশরের হায়রোগ্লিফিক্ লিপি, আইডিওগ্রাফ্ বা চিত্রলিপি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই লিপির কোনো ধ্বনি ছিল না, এবং তার আকার বিশেষ-বিশেষ বস্তুর সাদৃশ্য অনুযায়ী ছিল। বহুপরে ইহা ধ্বনিদ্যোতক এবং চিত্র থেকে পৃথক্ হয়েছিল। কাজেই আমরা বলতে পারি চিত্র সাহিত্যকে অনুসরণ করে নিই; পরন্তু সাহিত্যই চিত্রকে অনুসরণ করেছে। আমরা যদি চিত্রকে সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে' আঁকি, তাতে কিছু গৌরবের বাড়্‌তি বই কম্‌তি হবে না।

চীনের চিত্র বিশেষ করে' টেঙ্ যুগ থেকে কাব্যের পাশাপাশি চল্‌তে থাকে। তার কারণ আছে; চীনের চিত্রকরেরা শুধু শিল্পী নয়, তারা দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং কবিও বটে। টেঙ্-যুগের প্রতিভাবান শিল্পী ওয়াং ওয়ে, লিটারারী স্কুল অব আর্টিষ্টস্ বা 'সাহিত্যিক শিল্পী-সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। ওয়াংওয়ে শুধু চিত্রকর ছিলেন না, কবি এবং দার্শনিকও ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে চীনের সমালোচকেরা লিখেছে 'তার ছবি হ'ল কবিতা, আর কবিতা হ'ল ছবি।' শিল্পীরা যে-পরিবেষ্টনের ভিতর, যে-দর্শনের ভিতর, এগনস্‌টিসিজম্ বা শূন্যবাদের ভিতর গড়ে' উঠেছে, সে অনুযায়ী ছবি এঁকেছে। চীনা চিত্র এবং কবিতা পাশাপাশি চলার আর-এক কারণ, সেখানে লেখনী বা কলম হচ্ছে তুলি; কাজেই কবি যারা কবিতা লেখে, তুলি ব্যবহারের জন্যে নানা প্রকার রেখা অঙ্কনে দক্ষতা লাভ করে। এই লিপি-কৌশলের ইংরেজী নাম ক্যালিগ্রাফী। এই কৌশলের জন্যে কবি সহজেই চিত্রকর হ'য়ে পড়ে। চিত্রকরও অনেক সময় কবি হয়। ছবি এঁকে তার উপরেই কবিতা লেখে। চীনের শিল্প রসিকেরা অনেক সময় ভাল হাতের-লেখাকে ছবির সমান মূল্য দেয়।

আমাদের চিত্রের ভিতর ক্যালিগ্রাফীর অভাব খুব বেশী। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের অনেক চিত্রে ক্যালিগ্রাফীর পরিচয় পাই। এবারকার ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট সোসাইটির এক্‌জিবিশনে প্রদর্শিত বসু মহাশয়ের আঁকা বুদ্ধার ছবি এই বিষয়ের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

আমরা অনেক সময় আর্টের প্রধান গুণগুলি গ্রহণ না করে' তার বহিরঙ্গ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি। এইজন্যেই ছবির ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেক নীচে নেবে গেছে। অনেক ছবিই ইণ্ডিয়ান্ আর্ট বলে' চলে' যাচ্ছে; বিশেষ করে' অনুধাবন কর্‌লে দেখা যাবে যে, তার ভিতর ইণ্ডিয়ানত্ব কিছু নেই, আছে শুধু তার খোলস। এর ভিতর অন্য কিছু না থাকুক ভারতীয় চিত্রকলার শীলমোহরটা আছে জোর। এ যেন কলকাতার বড়বাজারে বিলাতী মাল আমদানীর মত, বিলাতী মাল কলকাতার দোকানে এসে 'Made in India' ষ্ট্যাম্পে স্বদেশী বলে' পরিচিত হ'য়ে যায়। 'ইণ্ডিয়ান আর্ট' আঁক্‌তে অনেকে সহজ পন্থা অবলম্বন করে' থাকেন। যেমন অজন্তার ষ্টাইল—বুকে কাপড় জড়ানো, কোমর থেকে কতকগুলি ন্যাকড়ার ফালি ঝুলিয়ে দেওয়া, পটল-চেরা চোখ, এবং বাঁকা চাহনী। এ যেন ইণ্ডিয়ান আর্ট আঁকার সহজ ফরমুলা। ইণ্ডিয়ান আর্টের—অর্থাৎ অজন্তা, রাজপুত, মোগল প্রভৃতি চিত্রকলার রঙের এবং রেখার যে জোর আছে, তা চিত্রকরেরা অনুসরণ করবে না। হালের অধিকাংশ ছবির রঙ এত ফিকে যে, ছবি জল দিয়ে আঁকা বল্‌লেই হয়। ছবিতে যেন গোধূলির ধোঁয়াটে অন্ধকার। এ জাতীয় ছবি যেন লবণহীন ব্যঞ্জন, কোনো রকম স্বাদ নেই। দিন রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর কত রংয়ের খেলা চলেছে; আকাশে, জলে, অরণ্যে, গাছের পাতায়, ফুলে ফলে, পাখীর ডানায়, কীট পতঙ্গে কত বিচিত্র রঙের ব্যঞ্জনা! আর্টিষ্টের তুলিকায় রংএর সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কি প্রকাশিত হবে না?

আমরা এ রকমের পাতলা রংয়ের ছবি শিখেছি বিলাতি বুক ইলাষ্ট্রেশন এবং জাপানী ছবি থেকে। অবনীন্দ্রনাথ অনেক সময় পাতলা রংয়ের ছবি এঁকে থাকেন। অনেকে তাঁর ষ্টাইল নকল করতে গিয়ে অর্থহীন অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেন। অবনীন্দ্রনাথের ছবি লক্ষ্য করলে এটা বোঝা যাবে যে, তাঁর ছবি পাতলা রংয়ের বা মোনোক্রোম (monochrome) অর্থাৎ একরঙা ছবি হ'লেও তার ভিতর এমন দু একটি উজ্জ্বল রংয়ের "টাচ"

সাঁওতাল বাদ্যকর

শিল্পী শ্রী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শান্তিনিকেতন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

আছে যে, তা সমস্ত ছবির সুর অনেক উচ্চগ্রামে তুলে ফেলে। ছবির রং বেশী রকমের একঘেয়ে হওয়ার জন্যে রংয়ের টাচে সে জোর আস্‌বে না মনে করে' তিনি কোন-কোন ছবিতে ছুরি দিয়ে চেঁছে কাগজের শাদা রং বের করেছেন। অন্যদের ছবি এই টাচের অভাবে নিতান্ত মিয়োনো এবং খেলো দেখায়।

বিলাতের চিত্রকর এড্‌মণ্ড ডুলাক্ বাংলার অনেক আর্টিষ্টের কাছে গুরুর পদ পেয়েছে। ডুলাক্ গল্পের বইর জন্যে ছবি এঁকে থাকে। তার ছবি ওরিয়েণ্টাল বিষয় নিয়ে। ডুলাকের দোষ এই যে, ঘরবাড়ী গাছপালা অনেক সময় অর্ণামেণ্ট্যাল করে' থাকে, কিন্তু তার ভিতর মানুষগুলি হ'ল স্বাভাবিক, কাজেই দু রকমের বিরুদ্ধ জিনিষে খাপ খেতে পারে না। তার রঙে বা রেখায় কোন জোর বা বিশেষত্ব নেই। বুক ইলাষ্ট্রেশনের কোঠায় এর কাজ পড়ে' যায়; ডুলাক্ কখনো আর্টিষ্ট বলে' গণ্য হ'তে পারে না। অজন্তা, বাঘ, কাঙরা, মোগল প্রভৃতি চিত্রকলার উদাহরণ আমাদের সাম্‌নে থাক্‌তে শিল্পীরা কেন যে ডুলাকের মত একজন নগণ্য চিত্রকরকে আদর্শ বলে' গ্রহণ কর্‌লে জানি না। এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, যারা ডুলাক-জাতীয় চিত্রকর তারা বাংলায় পপুলার বেশী। এর কারণ বোধ হয় এদের কাজের ভিতর সেণ্টিমেণ্টালিজম্‌র বা ভাবপ্রবণতার মাত্রা বেশী। বাঙ্গালীর চিত্ত সহজেই এজাতীয় চিত্রে বেশী আলোড়িত হয়।

ছবিতে দুটো জিনিষ রঙ ও রেখা, অথবা ওর অন্তত একটা থাকা চাই। রং ও রেখা নিয়েই ছবির প্রাণ। এ দুটোর একটাও যদি না রইল, তবে ছবির ভিতর থাক্‌ল কি? হালের অনেক চিত্রকরদের মধ্যে দুয়েরই অভাব আছে।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের চিত্রে রেখার প্রাধান্য, এবং অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে রংয়ের বিশেষত্ব।

অজন্তার চিত্রে সব রকমই পাওয়া যায়। কোনো চিত্রে রং ও রেখা দুইই আছে, আবার ওর একটি নিয়েও ছবি আঁকা হয়েছে। বাঘ-গুহার চিত্রে রংয়ের বিশেষত্ব শেড লাইট দিয়ে শরীরের ডৌল দেখান হয়েছে।

'ছবির পরখ' নামক প্রবন্ধে নন্দলালবাবু লিখেছেন, "কোনো বস্তু যখন দেখি, এই কয়টি লক্ষণ দ্বারা পরিচয় পাই। ১ম, ঘের, (outline drawing) ২য়, ঘনত্ব বা ব্লক, ৩য়, রং। চিত্রকরের মনোমত দু'একটি লক্ষণ নিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে।"

নবীন শিল্পীদের আর্টের টেক্‌নিকের উপর অবজ্ঞা; যেন তেন প্রকারেণ একটা ছবি দাঁড় করাতে পার্‌লেই হ'ল। তার কারণ পরিশ্রমে পারাঙ্মুখতা। টেক্‌নিক্ ভালভাবে আয়ত্ত করা আয়াসসাধ্য। যদিও খালি টেক্‌নিকে ছবি হয় না, ভাব চাই, তবুও টেক্‌নিক্ অপরিহার্য্য। ভাল গাইয়ে যে শুধু সুর তান লয় ঠিক রেখে গান গায় তা নয়, তার গানের ভিতর দরদ বা ভাব আছে। কোনো গাইয়ে যদি ভাবের ঘোরে মাথা নাড়ে, আর সুর তান লয়ের কোনো তোয়াক্কা না রাখে, তবে তার গান, গাইয়ের নিজের কাছে যতই ভাল লাগুক না কেন, অন্যের কাছে তা সুশ্রাব্য হওয়া দূরে থাকুক অতিশয় হাস্যজনক হ'য়ে ওঠে। ছবিও তেম্‌নি। তার কেবল ভাব থাক্‌লে চলবে না; রং রেখা বিষয়-সংস্থান (composition) প্রভৃতি ঠিক ঠিক হওয়া চাই। ওস্তাদ গাইয়ের বোধ হয় গলা-খেকারিতেও সুর ভাল থাকে। ওস্তাদ শিল্পীরও তেমনি হিজিবিজি একটা পেন্সিলের টানেও সৌন্দর্য্য আছে। সে কাগজে যাই টানুক না কেন, তার ভিতর কোনো-না-কোনো সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হবেই। হাত যখন দোরস্ত থাকে, তার সঙ্গে ভাবের যোগ হ'লে ভাল ছবি না হ'য়ে পারে না।

আর্টিষ্টের বিশেষ করে' আশে পাশের জিনিষ পর্য্যবেক্ষণ এবং ষ্টাডি করা দর্‌কার। 'ষ্টাডি' ভাল না থাক্‌লে, খালি কল্পনার জোরে ভাল আঁকা যেতে পারে না। সকল দেশের শিল্পীরাই এই উপদেশ দিয়ে থাকেন। চীনের বিখ্যাত লাওট্‌সে বলেছেন, "প্রথম তুলি-সকল কবর দিতে হইবে, এবং সমাধিস্তূপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে (অর্থাৎ তুলির কাজ এত করিতে হইবে যে, রাশি রাশি অব্যবহার্য্য তুলি ফেলিয়া দিলে, এক জায়গায় জমিয়া মস্ত এক স্তূপ হইবে) কালি গুলিবার লোহা এমন ঘষিতে হইবে, যে তাহা গুঁড়া হইয়া একেবারে তলানি হইয়া

যায়; (কালি এত ঘষিতে হইবে যেন ঘষিবার পাত্র নিঃশেষ হইয়া তলানি হইয়া যায়; অর্থাৎ কিনা খুব কাজ করিতে হইবে)। দশ দিন ধরিয়া জলের অনুশীলন করিতে হইবে। পাহাড় পাঁচ দিন আঁকিতে হইবে। দশহাজার পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইবে, এবং দশ হাজার লি হাঁটিতে হইবে। (শিল্পীকে অনেক গ্রন্থ পড়িতে হইবে, এবং বহু দেশভ্রমণ করিতে হইবে। তাহাতে সে শিল্পের সমালোচনা অথবা চিত্রের ইতিহাস জানিতে পারিবে। প্রকৃতির সে স্বাভাবিক আকৃতির অনুশীলন করিবে। ইহাতে তাহার জ্ঞানের চর্চ্চা হইবে)। *

বিরুদ্ধবাদী হয়ত বলিবেন, ওকি! আর্টের উপর ব্যাকরণ, আর্টিষ্ট কোন দিনই ব্যাকরণ মেনে চলে না। কারণ বাহিরের প্রকৃতি ও আর্টিষ্টের সৃষ্টি এক নয়। আর্টিষ্ট প্রকৃতি থেকে উপাদান গ্রহণ করে' কল্পনার রংএ রঙিয়ে একেবারে নূতন জিনিষ সৃষ্টি করে, যার সঙ্গে প্রকৃতির কোনো সম্বন্ধ নেই।

বিখ্যাত আর্ট-ক্রিটিক্ অস্কার্ ওয়াইল্ড বলেছেন, 'আর্ট' ভিতরে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে; বাহিরে নহে। বাহিরের কোনো সাদৃশ্যের পরিমাপ দ্বারা তাহাকে বিচার করিলে চলিবে না। আর্ট মুকুর নহে বরঞ্চ অবগুণ্ঠন। তার যে পুষ্প, তা কোনো কাননে ফোটে না, তার যে পাখী, তার সন্ধান কোনো বনভূমিতে মিলে না। আর্ট বহু জগৎ ভাঙ্গে এবং গড়ে। নির্ব্বাচন এবং বাহুল্য দ্বারা আর্টের রূপ প্রকটিত হয়। আর্ট আমাদের স্বকীয় আত্মার ঘনীভূত রূপ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

কথাটা খুবই সত্য। আমিও মানি, আর্ট মানে নকল করা নয়। কিন্তু কল্পনার ফুল ফোটাতে হ'লে বস্তুর গঠন (form) এবং তার বিশিষ্টতা (character) বিশেষ করে' জানা দর্‌কার। আর্টিষ্ট যদি ফুলের আকার-প্রকার না জান্‌ল, তবে তার লালিত্য ফোটাবে কি রকমে? চীনা বা জাপানী আর্টিষ্ট তুলির দুই টানে ফুল, লতা, পাতা, আকাশে উড্ডীয়মান পাখীর ঝাঁক অবলীলা-ক্রমে এঁকে ফেল্‌লে। এটা কি কেবল নিছক কল্পনার জোরেই সে আঁক্‌ল, তা নয়; আগে তার ওসকল বস্তু ভাল 'ষ্টাডি' করা ছিল, আকার এবং বিশিষ্টতার ভাল জ্ঞান ছিল, তাই এত সহজে এরকমে এঁকে ফেল্‌তে পেরেছে। আমাদের না আছে বস্তুর জ্ঞান, না আছে ষ্টাডি, অথচ রাতারাতি একটা নাম-করা আর্টিষ্ট হ'য়ে যেতে বাসনা।

একজন ইংরেজ সমালোচক কবিদের সম্বন্ধে লিখেছেন, "কবিদের কবিতার ভিতর যে কেবল inspiration বা অনুপ্রেরণা আছে, তাহা নহে; তার ভিতর কিছু perspiration বা ঘর্ম্মও আছে"—অর্থাৎ কিনা কবি হ'তে গেলে পড়াশুনা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে; চিত্রকরদের সম্বন্ধেও একথা ঘাটে।

আমাদের এখনকার আর্টিষ্টদের কাজের ভিতর inspiration আছে কি না জানি না, কিন্তু perspiration একেবারেই নাই।

র‍্যাফেল পাটরুসি লাওট্‌সের লিখিত 'চিত্রকলার মূল-সূত্রের' উপর যে টিপ্পনি করেছেন, তাতে লিখেছেন "প্রথম হইতেই শাস্ত্রকার (লাওট্‌সে) অঙ্কন-রীতিকে (technique) অনুপ্রেরণা (inspiration) হইতে নিম্নে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু আবার এই কথাও তিনি প্রথম হইতে বলিতেছেন যে, অঙ্কন-রীতিকে যথেষ্ট পরিমাণে আয়ত্ত করিতে হইবে। যে তাহা পারে না, সে নিজেকে প্রকাশ করিতে অক্ষম, এবং তার কাছে অনুপ্রেরণার কোন মূল্য নেই। প্রথম উচিত এক মূল নীতি অবিচলিতভাবে অনুসরণ করা, এবং পরে বিচার পূর্ব্বক সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ করা।" (লাওট্‌সে) লিওনার্ডও তাঁর চিত্র-সম্বন্ধীয় পুস্তিকায় বিশেষভাবে বলেন যে, 'এই রূপের জগতের তত্ত্বগুলি আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়া, ইহাকে অনুশীলন করিতে হইবে, এবং যে উপায় সমূহ দ্বারা শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করিবে, তাহাই প্রথম দেখিতে হইবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা জানি যে দৃষ্টিশক্তি দ্রুতগামী এবং এক মুহূর্ত্তে অসংখ্য রূপ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কিন্তু এক সঙ্গে একটা

* Raphael Petrucci কর্ত্তৃক সম্পাদিত Encyclopedia de la Peinture Chinoise হইতে অনুদিত।

জিনিষ মাত্র আমাদের দৃষ্টি অনুভব করিতে সক্ষম হয়। কারণ পাঠক যদি অক্ষরে ঢাকা বইর এক পাতার উপর দৃষ্টি দেন, তবে সেই মুহূর্ত্তে জানিতে পারিবেন পাতাটি অক্ষরে ভরা, কিন্তু বুঝিতে পারিবেন না, সে-সমস্ত অক্ষর কি? এবং তার অর্থ কি? কাজেই সে-সমস্ত অক্ষর কি বলিতে চায়, যদি জানিতে চান, তবে শব্দের পর শব্দ এবং পংক্তির পর পংক্তি পড়িতে হইবে। উচ্চ অট্টালিকার উপর আরোহণ করিতে হইলে, ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, নহিলে শেষ সীমায় গিয়া পৌছান যাইবে না।' আমি তাই বলি যে, প্রকৃতি এইরূপেই আর্টের দিকে চালনা করিয়া লয়।

বস্তুর আকৃতি জানিতে হইলে, তার বিশিষ্টতাসকল প্রথম জানিতে হইবে। প্রথমটা ভাল না বুঝিয়া এবং আয়ত্ত না করিয়া দ্বিতীয়টাতে যাওয়া উচিত নয়। এই রকম না করিলে অযথা সময় নষ্ট হইবে এবং অনুশীলন করিবার কাল দীর্ঘ হইয়া যাইবে। মনে রাখিতে হইবে বস্তুর স্বকীয় রূপের যথার্থ জ্ঞান প্রয়োজনীয় প্রথম, পরে কাজে নিপুণতা।......নিঃসন্দেহ অঙ্কনরীতির জ্ঞান চিত্রবিদ্যার অপরিহার্য্য উপায়। চিত্রবিদ্যায় বিশেষ ভাবে মৌলিক উপাদান অঙ্কন-রীতি। অতএব ইহাকে অবহেলা করিলে মুস্কিলে পড়িতে হইবে, অন্ধগলিতে পড়িতে হইবে; তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। সেই কারণেই 'প্রথম উচিত এক মূল-নীতি অবিচলিত ভাবে অনুসরণ করা।' একবার দখল হইয়া গেলে, ইহাকে ভুলিবার জন্য ইহার উপর প্রভুত্ব করিতে হইবে। গুণীর যথার্থ নিপুণতা এই কথার ভিতর রহিয়াছে, "অঙ্কনে কোনো পদ্ধতি না থাকা খারাপ, কিন্তু একমাত্র নিয়ম-পদ্ধতির উপর নির্ভর করা আরও খারাপ।" "কোনো সম্প্রদায় বা শিক্ষালয়ের পদ্ধতিতে শিক্ষা পাইলে আর্ট চির-প্রথাগত ধারা অনুসারে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে; তাহাতে জীবনের অনুপ্রেরণা থাকে না।" *

লাওট্সের এবং পাটরুসির উক্তিসকল ভাল করে' অনুধাবন করে' দেখা প্রয়োজন।

বল্‌তে সাহস হয় না, আমাদের নবীন শিল্পীদের ভিতরে জীবনের ধারা যেন বন্ধ হ'য়ে গেছে; কাজ একেবারে stereotyped রকমের Mannerismএ পর্য্যবসিত হয়েছে। কেবল permutation and combination চলেছে। ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্ত্তন অবনীন্দ্রনাথ ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ (স্বর্গীয়), নন্দলাল, অসিতকুমার প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত শিল্পীকে তিনি দান করেছেন। নবীনদের ভিতরে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্ম্মার নাম করা যেতে পারে। তাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু বর্ত্তমানে এডেয়ারে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয়ে ভারতীয় চিত্রকলার অধ্যাপক। এঁদের কাজে mannerismএর ছাপ নেই, আর বাজারের সস্তা sentimentalism ও এঁদের কাজে নেই। এঁদের রঙে ঔজ্জ্বল্য আছে, রেখায় জোর আছে। বাংলার গ্রাম্য জীবনের চিত্র এঁদের তূলিকায় সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে local colour তাই এঁদের কাজে দেখ্‌তে পাই।

প্রতিবৎসর যে চিত্রকলার প্রদর্শনী হচ্ছে তা, যেন একঘেয়ে রকমের হ'য়ে যাচ্ছে। বৎসর বৎসর কাজের উন্নতি হচ্ছে বলে' মনে হয় না। শিশুদের উপর আইন-কানুন প্রয়োগ করা উচিত নয়। তাকে স্বাধীনভাবে বাড়্‌তে দিতে হয়। কিন্তু তার বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শাসন করার প্রয়োজন হয়। ভারতীয় চিত্রকলা যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন অবনীন্দ্রনাথকে সব্যসাচীর মতন এই শিশুতরুকে বিরুদ্ধ সমালোচনা থেকে রক্ষা কর্‌তে হয়েছিল, চিত্রকর এবং সমালোচক দুয়ের কাজই তাঁর কর্‌তে হয়েছিল।

এখন এপদ্ধতি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং বাল্য অতিক্রম করে' যৌবনে পড়েছে। এখন বোধ হয় একটু সমালোচনার প্রয়োজন আছে

* Encylopedia de la Peinture Chinoise.

আমাদের আর্টের ভিতর যে ভেজাল ঢুকেছে, তাকে মুক্ত করবে কে? তার ভিতর নবীন প্রাণের স্পন্দন দিবে কে?

প্রকৃতির ভিতর, জীবনের ভিতর ফিরে যেতে হবে; তার রং ও রেখা শিল্পীকে ফোটাতে হবে। তবেই আমাদের আর্টে আবার নবীন প্রাণের চেতনা জাগবে।

মৃত্যু-দূত

সেল্‌মা লাগরলফ্

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-যান

গীর্জ্জাচূড়ার ঘড়িটি বারোবার ঢং ঢং করিয়া দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিতে না তুলিতেই একটি তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ শ্রুত হইল; তাহা যেন আকাশকে চিরিয়া ফেলিতেছিল।

শব্দটি ঘন-ঘন শোনা যাইতে লাগিল; অল্প একটু অবকাশের পর দ্বিগুণ তীব্র হইয়া কানে বাজিতে লাগিল; ঠিক যেন কোন গাড়ীর তৈলহীন চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ; এত তীব্র ও এমন বীভৎস যে মনে হইতেছিল, এখনই গাড়াখানি চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। ঠিক যেন ব্যথিতের তীব্র আর্ত্তনাদ। এ শব্দ কল্পনাতীত ব্যথা ও অনাগত যন্ত্রণার আশঙ্কা মনে জাগাইয়া দেয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই বিজাতীয় শব্দ সকলের কানে পৌঁছিল না; পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিয়া নূতন বৎসরকে অভিনন্দিত করিবার জন্য যাহারা পথে-ঘাটে সমবেত হইয়াছিল তাহারা কেহ এই শব্দ শুনিল না। যে আনন্দোন্মত্ত যুবকেরা পথে-পথে, বাজারের ধারে কিম্বা গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে কোলাহল করিয়া পরস্পরকে নূতন বৎসরের শুভকামনা জ্ঞাপন করিতেছিল, এই শব্দ শুনিতে পাইলে তাহাদের আনন্দ-কলোচ্ছ্বাস বিষাদ-সম্ভাষণে পরিণত হইত; নিজেদের ও আত্মীয়স্বজনের সমূহ বিপদাশঙ্কায় তাহারা শিহরিয়া উঠিত।

গীর্জ্জামণ্ডপে যে ধর্ম্মধ্বজীদল 'অহোরাত্রে' মাতিয়াছিল, ও এইমাত্র যাহারা ভগবানের প্রশংসায় ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নববর্ষের বন্দনা-গান সুরু করিয়াছিল তাহারা এই শব্দ শুনিতে পাইলে সভয়ে স্তব্ধ হইত ও ইহাকে নরক-বাসীদের বীভৎস আর্ত্তনাদ ও ক্রূর পরিহাস মনে করিয়া চমকিয়া উঠিত।

নগরের আনন্দ-সম্মিলনে মদের পাত্র-হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া যে বক্তা নব-বৎসরের উদ্বোধনে হর্ষধ্বনি করিয়া মদের পাত্র ওষ্ঠে তুলিতেছিলেন, এই কদর্য্য শ্মশান-ধ্বনি কর্ণগোচর হইলে স্তব্ধ হইয়া তিনি সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার বিফলতা ও ভবিষ্যতের ভগ্নোদ্যমের চিত্র স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন; গৃহে বসিয়া যাহারা নীরবে নববর্ষকে অভিনন্দিত করিয়া পুরাতন বৎসরের ন্যায়, অন্যায়, বিফলতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেছিল তাহারা নিজেদের অসহায় অবস্থা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া বিদীর্ণ বক্ষে গভীর হতাশা অনুভব করিত।

সৌভাগ্যের বিষয় সেই শব্দ মাত্র একটি প্রাণীর কর্ণগোচর হইল; বিবেকদংশন ও আত্মগ্লানিতে পীড়িত হইবার তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল।

প্রচুর শোণিত-ক্ষয়ে লোকটি মৃতের মতন পড়িয়াছিল ও সজ্ঞানে আসিবার জন্য ছট্‌ফট করিতেছিল। সহসা সে অনুভব করিল যেন কেহ তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে—যেন, কোনো নিশাচর পাখী কিম্বা ওই ধরণের কিছু তাহার মাথার উপরে উড়িয়া-উড়িয়া চীৎকার করিতেছে। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—হয়ত ইহা স্বপ্নও হইতে পারে।

অল্পরেই সে বুঝিতে পারিল সেই চীৎকার কোনো পাখীর নহে; তবে নিশ্চয়ই সেই যমের গাড়ী! ইহারই

যখা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে ভিক্ষুক দুই জনের নিকট গল্প করিয়াছে। গাড়ীটি খুব ধীরে ধীরে আসিতেছিল এবং থাকিয়া থাকিয়া তাহার চাকায় বীভৎস ক্যাচ-কোঁচ শব্দ হইতেছিল। ডেভিডের ঘুম চটিয়া গেল।

অৰ্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় সে নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগিল—খুব সম্ভব তাহার নিজের গল্পই তাহার মনের মধ্যে স্বপ্ন হইয়া দেখা দিতেছে ; যমের গাড়ীটাড়ী নয়। সে নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু আবার সেই শব্দ!—গাড়ীখানি যে তাহার দিকেই আসিতেছে। তাহার বিশ্রামের আশা দূর হইল। এইবার তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, যে বাস্তবিক গাড়ীর শব্দই বটে—স্বপ্ন বা ভ্রান্তি নহে। সেই শব্দ থামিবে বলিয়া বোধ হইতেছিল না, ডেভিড জাগিয়া বসা ছাড়া গত্যন্তর দেখিল না।

সে লক্ষ্য করিল, ঠিক সেই স্থানেই সেই নেবুগাছের তলায় সে পড়িয়া আছে। কেহ তাহার সাহায্য করিতে আসে নাই। যেমন ছিল সবই ঠিক তেমনই আছে ; শুধু থাকিয়া থাকিয়া সেই বীভৎস আওয়াজ আসিতেছে। সম্ভবতঃ শব্দটি বহুদূর হইতে আসিতেছে। ডেভিড বুঝিতে পারিল এই সর্ব্বনেশে শব্দই তাহার নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

তাহার প্রথমে সন্দেহ হইল বুঝি বা সে বহুক্ষণ অচৈতন্য ছিল ; তারপরই বুঝিতে পারিল যে, রাত্রি বারোটার পর খুব বেশী সময় অতিবাহিত হয় নাই ; লোকেরা এখনও দল বাঁধিয়া চলা-ফেরা করিতেছে ; এই মাত্র সে তাহাদিগকে পরস্পর নববৎসরের শুভকামনা জ্ঞাপন করিতে শুনিয়াছে।

আবার সেই কর্কশ শব্দ! ডেভিড্ জোর আওয়াজ একেবারেই সহ্য করিতে পারিত না। সে সেখান হইতে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া সেই শব্দের হাত এড়াইতে মনস্থ করিল,—চেষ্টা করিয়া দেখাই যাক্ না। ঘুমভাঙ্গার পর হইতেই সে নিজেকে বেশ সুস্থ মনে করিতেছিল। বুকের ভিতরে ক্ষতের মুখ সম্ভবতঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; তাহার শ্রান্তি কাটিয়া গিয়াছে। কনকনে শীতের ভাবও আর নাই। সাধারণ সুস্থ লোকের মতন দেহের অস্তিত্ব সে ভুলিয়া গিয়াছে। নিজেকে তাহার ভারী হাল্কা মনে হইতেছিল।

সে একপাশ ফিরিয়া পড়িয়াছিল ; রক্তস্রাব সুরু হইতেই এই ভাবে মাটিতে পড়িয়া যায়। সে প্রথমে পাশ ফিরিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া নাড়াচড়া করাটা বর্ত্তমান অবস্থার ঠিক হইবে কিনা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! নিজেকে একটু তুলিয়া পাশ ফিরিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার শরীর অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল ; একটুও নড়িল না ; তাহা যেন জড় পাষাণে পরিণত হইয়াছে!

হয়ত বা ঠাণ্ডায় পড়িয়া থাকিয়া তাহার শরীর বরফের মতন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বা কি করিয়া হয়? তাহা হইলে সে বাঁচিয়া আছে কি করিয়া? এবং বাঁচিয়া যে আছে তাহাতে তাহার তিল মাত্র সন্দেহ নাই। সে সব কিছু দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছে। তাছাড়া সে-রাত্রে এমন কিছু বেশী শীত ছিল না ; মাথার উপরের গাছের পাতা হইতে টিপটাপ করিয়া শিশিরবিন্দু গলিয়া পড়িতেছে।

যতক্ষণ অবাক হইয়া সে এই অদ্ভুত পক্ষাঘাতের কথা ভাবিতেছিল ততক্ষণ সেই বীভৎস শব্দের কথা তাহার মনে ছিল না।

—আবার তাহা কানে আসিল।

সে ভাবিল, "দূর ছাই, এই সঙ্গীতসুধা থেকে আত্ম-রক্ষা করার কোনো উপায়ই নেই দেখ্‌ছি,—সহ্য কর্‌তেই হবে।"

অল্পকিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে সুস্থ শরীরে 'বহালতবিয়তে' ঘুরিয়াছে ফিরিয়াছে, নির্ব্বিবাদে এমন জড়ের মতন সে পড়িয়া থাকিতে পারে না। সে একটু নড়িবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু একটি আঙুল এমন কি চোখের পাতা পর্য্যন্ত নড়ান তাহার সাধ্যাতীত বোধ হইল। আগে কেমন করিয়া হাত পা নাড়িত ভাবিয়া সে অবাক হইল। সে অপূর্ব্ব কৌশলটি যেমন করিয়াই হউক সে ভুলিয়া গিয়াছে।

শব্দ ক্রমশঃ কাছে আসিতে লাগিল। সে অনুভব

করিল তাহা লং ষ্ট্রীট দিয়া বাজারের দিকে আসিতেছে। গাড়ীখানির যে জীর্ণ দশা সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখন শুধু চাকার কঁ্যাচকোঁচ নয়, কাঠের কাঠামোটির ঘট্ ঘট্ শব্দও শোনা যাইতেছে; কাঠের রাস্তায় ঘোড়ার পা পিছ্‌লাইবার শব্দ পর্য্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাইতেছে; যমের গাড়ীখানির শব্দও বুঝি ইহা অপেক্ষা কদর্য্য হইবে না। যমের গাড়ীর কথা মনে হইতেই জর্জ্জের ভয়ের কথা মনে পড়িল।

ডেভিড ভাবিল, "একটা পুলিশও আসে না ছাই! তাদের ওপর আমার খুব ভালবাসা নাই বটে, কিন্তু বাবাজাদের কেউ এসে যদি এই অশান্তিকর শব্দটা বন্ধ ক'রে দেয় তবে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দি।"

নিজের মনের জোরের উপর ডেভিডের খুব আস্থা ছিল, কিন্তু তাহার ভয় হইতে লাগিল, আজিকার রাত্রির ঘটনায় বিশেষ করিয়া এই জঘন্য শব্দে তাহার সমস্ত শক্তি ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া যদি কেহ মৃতদেহ-সন্দেহে তাহাকে গোরস্থানে লইয়া গিয়া কবর দিয়া ফেলে! সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

বাপ রে! তাহার দেহের চারিপাশে লোকে হা-হুতাশ করিবে, মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করিবে আর সে সজ্ঞানে তাহাই শুনিবে। এই চাকার আওয়াজের অপেক্ষা তাহা বেশী মিষ্ট শুনাইবে না।

হঠাৎ তাহার সিস্‌টার ঈডিথের কথা মনে পড়িল। তাহার বিন্দুমাত্র আত্মগ্লানি হইল না, সিস্‌টার ঈডিথের উপর ভীষণ রাগ হইতে লাগিল; সেই বেটীই তো তাহার এই দুরবস্থার কারণ; তারই জন্য তো তাহাকে এই ভাবে জব্দ হইতে হইতেছে।

আবার সেই বাতাস-চেরা কর্কশ শব্দ! তাহার কানে তালা লাগিয়া গেল। এই হতাশ অবস্থায়, জীবনে অন্যের প্রতি সে যত অন্যায় করিয়াছে তজ্জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করিল না। অন্যে তাহার প্রতি যত অন্যায় করিয়াছে সেই কথাই মনে করিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া তাহার মন তিক্ততায় ভরিয়া গেল। সে মিনিটখানেক স্তব্ধ হইয়া মনোযোগসহকারে সেই শব্দ শুনিতে লাগিল,—না, নিশ্চয়ই সে মরে নাই; গাড়ীখানি লং ষ্ট্রীট ছাড়িয়া বাজারের দিকে তো যায় নাই; শান-বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ হইতেছে না; খোয়া-বিছানো রাস্তার উপর ঘোড়ার পায়ের শব্দ আসিতেছে। তাই তো, তাহার দিকেই গাড়ীখানি আসিতেছে—এই ঝোপের পথেই তাহা প্রবেশ করিল।

সাহায্য পাইবার আশায় খুশী হইয়া সে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহ পূর্ব্ববৎ অচল। শুধু তাহার চিন্তারই গতিশক্তি আছে, দেহ অসাড়। সে স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে সেই কালজীর্ণ গাড়ীখানি নিকটে আসিতেছে। তৈলহীন চাকার কান্না, কাঠামোর কাঠগুলির আর্ত্তনাদ, ঘোড়ার সাজের খট্ খট্ ঝন্ ঝন্ শব্দ, সমস্ত মিলিয়া গাড়ীখানির এমন দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল যে, মনে হইল বুঝিবা তাহার কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

গাড়ীখানির গতি মৃদু। গাড়ীটি তাহার নিকটে আসিতে আসলে যতখানি সময় লাগিল একা পড়িয়া থাকার দরুণ মানসিক অসহিষ্ণুতায় ডেভিডের কাছে সময়টা তাহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হইল। সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না এই পর্ব্বদিনে গীর্জ্জার ভিতরের একটা ঝোপের ধারে গাড়ী চালাইয়া আনার কি কারণ ঘটিতে পারে। কোচোয়ান নিশ্চয়ই মাতাল হইয়া থাকিবে —না হইলে এই বেপথে সে গাড়ী হাঁকাইত না। হায় হায়, মাতালের কাছে তো সাহায্যের প্রত্যাশা নাই!

সে নিজেকে নিজেই আশ্বস্ত করিতে লাগিল— "সম্ভবতঃ এই চাকার কান্না শুনেই আমি এমন হতাশ হ'য়ে পড়ছি; গাড়ীটা এদিকেই আস্‌ছে; সাহায্যও পাওয়া যাবে নিশ্চয়।"

গাড়ীখানি তাহার কয়েকগজের মধ্যে আসিয়া পড়িল; চাকার শব্দে আবার তাহার মন খারাপ হইতে লাগিল, "আজ অদৃষ্টটা দেখ্‌ছি ভারী খারাপ, গাড়ীটা যেমন ভাবে

আস্‌ছে—আমাকে দেখ্‌ছি মাড়িয়েই যাবে, সেটা খুব সুখের হবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।"

পরমুহূর্ত্তে গাড়ীখানি দৃষ্টিগোচর হইল—ভয়ে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইতে বসিল।

শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো তাহার চোখের তারাও নিশ্চল হইয়া গিয়াছে—ঠিক সাম্‌নের জিনিষ ছাড়া সে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। গাড়ীখানি পাশের দিক হইতে আসিতেছিল। প্রথমে তাহার একটিধার মাত্র দেখা গেল—একটি অতিবৃদ্ধ ঘোড়ার মুখ—কপালের চুলগুলি কটা হইয়া গিয়াছে; এক চোখ কাণা; তার পর দেখা গেল শুক্‌নো রলার মত একখানি পা—গিঁঠের উপর গিঁঠ দেওয়া একটা লাগাম—অদ্ভূত জোড়াতাড়া দেওয়া ঘোড়ার সাজ!

ক্রমে ঘোড়াসমেত সমস্ত গাড়ীখানি নজরে পড়িল; সেটিতে আর কোনো পদার্থ নাই; চাকাগুলি ঢল-ঢল করিতেছে; ঠিক সাধারণ ময়লা-ফেলা-গাড়ীর মতো। এত পুরাণো ও জীর্ণ যে কোন ভদ্রলোক সেটিকে কাজে লাগাইতে পারে না।

কোচবাক্সে গাড়োয়ান বসিয়া ছিল। কিছুক্ষণ আগে সে নিজে চালকের যে বর্ণনা দিয়াছে মানুষটা হুবহু তাই; গাড়ীখানিও তার বর্ণনামাফিক। গাড়োয়ানের হাতে আপাদমস্তক গ্রন্থিবিশিষ্ট সেই লাগাম—মাথায় সেই বাঁদুরে টুপী। সে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে; নিদারুণ ক্লান্তিতে মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অপর্য্যাপ্ত বিশ্রামেও যে তাহার বিশেষ কিছু উপকার হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পরই একবার তাহার মনে হইয়াছিল নির্ব্বাপিত দীপশিখার মত তাহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়াছে। এখন সে ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আত্মা দেহের মধ্যে বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে বলিয়া মনে হইতেছে না; নাড়াচাড়া খাইয়া সব উলটপালট হইয়া গিয়াছে। মনের এমন অবস্থায় অদ্ভূত অলৌকিক কিছু দেখা বিচিত্র নয়—ডেভিডও এই ধরণের কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। তবে এই দুর্ব্বলতাকে বেশীক্ষণ সে আমল দেয় নাই। এখন নিজের বর্ণিত অপদেবতাকে স্বচক্ষে দেখিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

সে ভাবিতে লাগিল, "আরে, আমি কি ক্ষেপে গেলুম নাকি? দেখছি আমার শরীরটাই শুধু অসাড় হয়নি—মনের অবস্থাও ভাল নয়।"

চালকের মুখখানি তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেই ভয়ে সে আঁৎকাইয়া উঠিল। ঠিক তাহার সাম্‌নে আসিয়া ঘোড়াটি থামিয়াছে। গাড়োয়ান যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। শীর্ণ হাত দিয়া মুখের আবরণ সরাইয়া সে কিসের সন্ধানে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। চোখোচোখি হইতেই ডেভিড্ তাহার বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সে মনে মনে বলিল, "আরে এ যে দেখ্‌ছি জর্জ্জ, —সাজপোষাক অদ্ভূত হ'লেও—জর্জ্জই বটে! আশ্চর্য্য—লোকটা আস্‌ছে কোত্থেকে? বছর খানেকের ওপর ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নাই। বিদেশ ভ্রমণ ক'রে ফির্‌ছে হয় ত। আমার মতন স্ত্রী পুত্র পরিবার দিয়ে তো আর ওকে বেঁধে রাখা হয় নি; ওরা স্বাধীন লোক। উত্তর-মেরু হ'তেই বেড়িয়ে ফির্‌ছে বোধ করি; দারুণ শীতে খুব শুক্‌নো আর ফ্যাকাশে ব'লেই মনে হচ্ছে।"

ডেভিড্ গভীর মনোযোগের সহিত জর্জ্জকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার মুখে কেমন একটা অদ্ভূত অস্বাভাবিক ভাব ছিল। কিন্তু, এ তাহার দোস্ত জর্জ্জ না হইয়াই যায় না! সেই বাঁধাকপির মত মাথা, খাঁড়ার মত নাক, সেই বিপুল গোঁফ! কিন্তু লোকটার মুখে এমন একটা জাঁদরেলী ভাব আছে যে দোস্ত বলিয়া ইহাকে সম্বোধন করিতেও ভয় হয়।

সহসা তাহার মনে হইল পাগলের মতো সে ভাবিতেছে কি? সে কি শোনে নাই, গত বৎসর ঠিক নববর্ষের পর্ব্বদিনে ষ্টকহল্‌মের হাসপাতালে জর্জ্জ মারা পড়িয়াছে; এই গাড়োয়ানটিও জর্জ্জ ছাড়া কেউ নয়; জীবনে জর্জ্জকে চিনিতে এই প্রথম গোলমাল ঠেকিতেছে। আচ্ছা, দেখাই থাক্, লোকটাতো উঠিয়া দাঁড়াইল। না, আর কেউ নয়, সেই শীর্ণ ক্ষীণ শরীর, সেই মাথা, ওই সে কোচবাক্স হইতে লাফাইয়া মাটিতে নামিল;

সেই শতছিদ্র পুরাতন আলখাল্লা—একেবারে গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা; গলায় সেই আগের মত লাল রুমাল জড়ানো। ভিতরে সার্ট কিম্বা ওয়েষ্ট কোট আছে বলিয়াও বোধ হইতেছে না; এ একেবারে নির্ঘাত জর্জ্জ!

পক্ষাঘাতগ্রস্ত ডেভিড খুসী হইয়া উঠিল, যদি তাহার হাসিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটার অদ্ভুতত্বে সে অট্টহাস্য করিয়া উঠিত।

সে ভাবিল, "একবার এই ব্যারামটা থেকে সেরে উঠি, বাছাধনের এই রসিকতা করার মজাটা টের পাইয়ে দেব। বাপ রে, ওর লাখটাকার গাড়ীখানার শব্দে আমাকে পাগল ক'রে দিয়েছিল আর কি! ব্যাটা যেন গাড়ীর তলায় ডিনামাইট নিয়ে বেরিয়েছে! ওই হতভাগা ছাড়া আর কারো এমন একখানি পক্ষীরাজের পেছনে অমন নবাবী গাড়ী একখান জুতে রাতদুপুরে গীর্জ্জার হাতায় হাওয়া খেতে আসার অদ্ভুত খেয়াল হ'ত না। ওকে কাবু-করার সুবিধা কখনো পাইনি বটে; তবে এবার একবার দেখে নেব; লোকটা কিন্তু ভারী চালাক।"

জর্জ্জ ডেভিডের কাছে আসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহাকে দেখিতে লাগিল; তাহার চেহারায় একটা কঠোর উগ্রভাব। বোধ হইল যেন সে ডেভিড্‌কে চিনিতে পারে নাই।

ডেভিড ভাবিল, "কিন্তু ছুটো ব্যাপারে ভারী খট্‌কা লাগছে যে! লোকটা টের পেল কি ক'রে যে আমি আমার ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে এই জায়গাটাতেই স্ফূর্ত্তি করতে এসেছিলুম। আর যে যমের গাড়ীর কোচোয়ানের গল্প শুনে নিজে অত ভয় পেত সেই আবার ভূতের মতো সাজপোষাক পরেই এসেছে কেন?"

জর্জ্জ ডেভিডের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি অদ্ভুত। ডেভিড্ ভাবিল, "বাছাধন যখন দেখ্‌বেন যে আমাকে চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে তখন নিজের রসিকতার চেষ্টায় খুসী হবেন না নিশ্চয়ই।"

কাঠেখানিতে ভর দিয়া জর্জ্জ তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল ও সহসা যেন বন্ধুকে চিনিতে পারিল। সে আরো নত হইয়া মাথার আবরণটি সরাইয়া ফেলিয়া বিশেষ করিয়া ডেভিডকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই সে ব্যথিত আর্ত্তনাদের সহিত বলিয়া উঠিল, "হায় হায়, এযে দেখ্‌ছি ডেভিড্ হলম্। ও বেচারা যেন কখনো এই দুর্দ্দশায় না পড়ে এইটেই আমি নিরন্তর কামনা কর্‌তুম্।"

সে কাঠেখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বন্ধুর পাশে হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া গভীর আবেগ ও বেদনা-কম্পিত স্বরে বলিল, "ডেভিড্ একি সত্যই তুমি! সমস্ত গত বছরটা তোমাকে মাত্র একটি কথা বল্‌বার জন্যে কত চেষ্টাই না করেছি; কিন্তু তার সুবিধা হয়নি; এখন দেখ্‌ছি বড্ড দেরী হ'য়ে গেল! একবার মাত্র আমি তোমার দেখা পেয়েছিলুম; কিন্তু তুমি আমাকে এড়িয়ে গিয়েছিলে। এখন বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, তোমাকে সাবধান করার সময় উৎরে গেছে। আমার কাজ শেষ হ'য়ে এসেছে; এবার তোমার বন্দীজীবন সুরু হবে।"

ডেভিড অবাক হইয়া জর্জ্জের কথা শুনিতে লাগিল। "লোকটা ব'লে কি? ও যেন ভূত হ'য়ে কথা বল্‌ছে। ওই বা কখন আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাইলে—আমিই বা কখন ওকে এড়িয়ে এলুম!' সহসা সে এই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইল যে জর্জ্জ নিজের ভূমিকায় অভিনয় স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটার কেরামতী আছে!

আবেগ কম্পিত স্বরে জর্জ্জ বলিতে লাগিল, "আমি জানি ডেভিড যে, আমারই দোষে আজ তোমার এই দুর্দ্দশা। যদি কখনো আমার সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ না হ'ত তা হ'লে তুমি ভদ্র-সাধু-জীবন যাপন করতে পার্‌তে। তুমি ও তোমার স্ত্রী পরিশ্রম ক'রে কালে ধনীও হ'তে পার্‌তে। তোমাদের দুজনেরই অল্প বয়স, শক্তি ও বুদ্ধি ছিল; তোমাদের উন্নতির কিছু বাধা ছিল না। ডেভিড্, তুমি বিশ্বাস কোরো যে গত বছর এমন একটি দিনও আমার কাটেনি যে দিন আমি গভীর অনুতাপের সঙ্গে তোমার কথা মনে না করেছি। আমার খালি মনে পড়ত যে আমিই তোমাকে সৎপথ থেকে ভুলিয়ে বিপথে টেনে

এনেছি ; আমার কুৎসিৎ অভ্যাসগুলো তোমাকে শিখিয়েছি।"

তারপর ডেভিডের মুখে হাত বুলাইয়া জর্জ্জ বলিল, "হায় বন্ধু, আমার ভয় হচ্ছে পাপের পথে তুমি আমার চাইতেও বেশী এগিয়ে গিয়েছিলে ; তোমার মুখের শীর্ণতা ও কালিমা তারই সাক্ষী দিচ্ছে।"

রসিকতা হইতেছে ভাবিয়া এতক্ষণ ডেভিড্ নিশ্চিন্ত ছিল কিন্তু ক্রমশঃ তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। সে বিরক্ত হইয়া বিড়-বিড় করিয়া বলিল, "ঢের হয়েছে জর্জ্জ, তোমার গাড়োয়ানী ইয়ার্কী একটু রাখ দেখি বাপু। শীগ্‌গীর ছুটে গিয়ে আর কাউকে ডেকে এনে তোমার গাড়ীতে তুলে আমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে চল দেখি।"

জর্জ্জ বলিল, "ডেভিড, তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছনা সমস্ত বছরটা আমার কি পেশা ছিল ; কি ধরণের গাড়ী আর ঘোড়ায় চেপে আমি এখানে এসেছি, তা টের পাওনি কি? হায়; বন্ধু, তোমাকেই এর পর কাস্তে আর লাগাম ধ'রে গাড়ী হাঁকাতে হবে। ডেভিড, বিশ্বাস করো, ইচ্ছে ক'রে তোমাকে এই দুরবস্থায় ফেল্‌ছি না। গত বছর থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার কোনো স্বাধীনতা নাই। অনিচ্ছাসত্বেও এখানে তোমার কাছে আজ আমায় আস্‌তেই হ'ত, নিজে যে শাস্তি আমি পেয়েছি তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার উপায় থাকলে আমি নিশ্চয়ই বাচাতুম।"

ডেভিড ঠিক করিল—জর্জ্জের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, নতুবা এমন বক্তৃতায় সময় না কাটাইয়া সে তাহার মরণাপন্ন বন্ধুকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিত।

জর্জ্জ ডেভিডের দিকে চাহিয়া দুঃখিত মনে বলিল, "ডেভিড হাঁসপাতালে যাবার কথা ভেবে আর মন খারাপ করো না। আমি যখন কোনো রোগীর পাশে হাজির হই তখন অন্য ডাক্তার ডাকার সময় পার হ'য়ে গেছে।"

হলুম্ ভাবিল, "আজ দেখছি সমস্ত ভূতপ্রেতগুলো ছাড়া পেয়ে চারদিকে তাণ্ডব নাচতে সুরু করেছে ; নইলে, এমন একটা লোক কাছে এল যে আমার কিছু উপকার করতে পারত, অথচ পাগলামী ক'রেই হোক আর সয়তানী ক'রেইহোক কিছু চেষ্টাই সে করছে না কেন? আমি মরি কি বাঁচি তাতে যেন ওর কিছু যায় আসে না।"

জর্জ্জ বলিল, "শোন ডেভিড, গত গ্রীষ্মের সময়কার একটা কথা তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি ; সেদিন রবিবার, পাহাড়তলীর সদর রাস্তা দিয়ে তুমি চলেছিলে। চার দিকে বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত্র, চমৎকার বাড়ী আর বাগান। সেদিন ভারি গুমোট করেছিল! চল্‌তে চলতে হঠাৎ তোমার খেয়াল হ'ল যে তুমি একা, আর কেউ কোথায়ও নেই, চারদিক মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে ; মাঠে গাছের ছায়ায় গরুগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে, জনমানবের চিহ্ন নাই ; সেই দারুন গরম থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সবাই ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছে। তোমার মনে পড়ছে কি?"

ডেভিড বলিল, "হ'তে পারে, শীত গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য ক'রে এতবার আমি ঘরের বার হয়েছি যে সব কথা আমার মনে নেই।"

জর্জ্জ বলিতে লাগিল, "চারদিক যখন খুব নিঝুম নিস্তব্ধ হ'য়ে এসেছে তখন তোমার পেছনে ঠিক আজকের মতো একটা একটানা কর্কশ আওয়াজ তুমি শুনতে পেয়েছিলে। পেছনে কেউ আস্‌ছে মনে ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে তুমি কাউকেই দেখতে পেলে না। তুমি অবাক হ'য়ে এদিক ওদিক চেয়ে কি ভাব্‌লে জানি না। শব্দটা তুমি শুনেছিলে ; সেটা এল কোত্থেকে? চতুর্দ্দিকে এমন নিস্তব্ধ ছিল যে ভুল শোনা অসম্ভব। কোনো গাড়ী নেই অথচ গাড়ীর চাকার শব্দ! অলৌকিক কিছু ঘটেছে ব'লে তুমি মনে মনে স্বীকার করনি। সমস্ত ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌লে। তখন আমিই এই গাড়ী চালিয়ে তোমার পাছু নিয়েছিলুম। তোমার মন যদি এই শব্দের দিকে দেত তা'হলে আমাকে দেখ্‌তে পেতে, কিন্তু, দুর্ভাগ্য তোমার, তা ঘটেনি।"

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাটা ডেভিডের মনে পড়িয়া গেল। বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়া, এমন-কি খাদের নীচে পর্য্যন্ত তাকাইয়া সে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল শব্দটা কোথা হইতে আসিতেছে। শেষে সে ভয় পাইয়া উহা এড়াইবার জন্য এক গোলাবাড়ীতে আশ্রয়

লইয়াছিল। সেখান হইতে যখন বাহির হইয়া আসে তখন শব্দও থামিয়াছে।

জর্জ্জ বলিল, "সমস্ত বছরের মধ্যে সেই একবারমাত্র আমি তোমায় দেখেছিলুম, আমার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তোমার আরো কাছে যাওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল। তুমি অন্ধের মতো আমার পাশে পাশেই চলেছিলে।"

ডেভিড্ ভাবিল, "সেই শব্দ যে আমি শুনেছিলুম এটা ঠিক। কিন্তু এ লোকটার মতলব কি? ওই আমার পেছনে অদৃশ্যভাবে গাড়ী হাকিয়ে চলেছিল এটা বিশ্বাস করতে হবে, না, এমন হওয়াটা সম্ভব? গল্পটা হয় ত আমি কারো কাছে করেছি কিন্তু এ সেটা জানলে কেমন ক'রে?"

জর্জ্জ তাহার উপর আরো ঝুঁকিয়া পড়িয়া পীড়িত শিশুকে লোকে যেমন মৃদু ভর্ৎসনা করে—ঠিক তেমনি ভাবে বলিল, "দেখ ডেভিড, অমন অবুঝ হ'য়ো না। তখনকার ঘটনাটা কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিল সেটা তোমার না জানাই ভাল ছিল। কিন্তু, আমি যে জীবিত লোক নই এটা তুমি জেনেও অস্বীকার করছ কেন? এর আগে তুমি আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনেছ, অথচ তবুও তুমি অবিশ্বাসের ভাব দেখাচ্ছ। আর তা যদি না শুনেও থাক, এই সাংঘাতিক গাড়ীখানি হাঁকিয়ে আসতেও ত দেখেছ আমাকে। এই গাড়ীতে কোনো জীবিত ব্যক্তি কখনো স্থান পায়নি।"

পথমধ্যস্থিত জীর্ণ গাড়ীখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিল, "গাড়ীখানির দিকে চাও আর তার পেছনের গাছগুলোও দেখ, বুঝতে পারবে।"

ডেভিড্ আর অমান্য করিতে সাহস করিল না। সে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে, সে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছে যাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। রাস্তার অপর পার্শ্বের গাছগুলিকে সে গাড়ীর ভিতর দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল—গাড়ীখানি যেন একেবারে স্বচ্ছ।

জর্জ্জ বলিল, "তুমি বহুবার আমার গলার স্বর শুনেছ—আমি যে এখন ভিন্ন স্বরে কথা বলছি এটাও তুমি লক্ষ্য ক'রে থাকবে।"

ডেভিড্কে তাহাও স্বীকার করিতে হইল। জর্জ্জের গলা ভারী মিষ্ট ছিল। অবশ্য এ কোচোয়ানের গলার স্বরও কর্কশ নয় কিন্তু দুজনের স্বরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহার স্বর যেন তীব্রতর; কথা বেশ স্পষ্ট নহে। একই যন্ত্রে যেন দুই বিভিন্ন পরদায় বাজান হইতেছে।

জর্জ্জ তাহার হস্ত প্রসারিত করিল, ডেভিড্ সভয়ে দেখিল যে উপরের নেবু গাছের শাখা হইতে একফোঁটা শিশির তাহার হাতের ভিতর দিয়া মাটিতে পড়িল—হাতে আটকাইল না।

রাস্তার উপর একটা ভাঙ্গা ডাল পড়িয়াছিল। জর্জ্জ কাস্তেখানি নীচে হইতে ডালের ভিতর দিয়া সোজা উপরে তুলিল; ডালটি অবিকৃত রহিল, দ্বিখণ্ডিত হইল না।

জর্জ্জ বলিল, "ডেভিড্, এসব দেখে অবাক হয়ো না। তুমি হয় ত আমাকে দেখে সেই আগেকার জর্জ্জ ব'লেই মনে করছ; কিন্তু আসলে আমি তা' নই। কেবল মরণাপন্ন ও মৃত লোকেরাই আমাকে দেখতে পায়। রক্তে-মাংসে গড়া স্থূলদেহ এখন আর আমার নাই। আমার বাইরের আবরণ এখন শুধু আত্মার আশ্রয়; অবিশ্যি সকল মানুষের শরীরই তাই। আমার শরীরের এখন কোনো ওজন নাই; জীবিত জগতের সঙ্গে কারবার করার ক্ষমতাও নাই। এযেন ঠিক আয়নায় আমার প্রতিচ্ছবি—আয়না ছেড়ে বাইরে এসে পড়েছে; শুধু নড়তে চড়তে আর কথা বলতে পারে।"

ডেভিড্ হল্মের বিদ্রোহ ভাব একেবারেই প্রশমিত হইল। সে সমস্ত ঘটনাটি পূর্ব্বাপর বুঝিয়া দেখিতে লাগিল—অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল না। সে কোনো মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার সহিত কথা বলিতেছে নিশ্চয়ই এবং সে নিজেও আর জীবিত নাই। মনে মনে এই কথা স্বীকার করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ ক্রোধ ও বিরক্তি আসিয়া তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি কিছুতেই মরব না। রক্ত মাংসহীন শরীর নিয়ে আমি থাকতে পারব না।"

বিষম ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল; বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু সে পৈশাচিক রাগ শুধু আত্মনিগ্রহেরই কারণ হইল।

জর্জ্জ শান্তভাবে বলিল, "আমাদের আগেকার বন্ধুত্বের খাতিরে তোমাকে একটি কথা শুধু বুঝিয়ে বল্‌তে চাই ডেভিড্‌। তুমি জানো যে প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তার স্থূলদেহ নষ্ট হয় অথবা এমন জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয় যে দেহবাসী আত্মা দেহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এক অজানা নতুন রাজ্যে প্রবেশ করার আগে আত্মা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে থাকে; ঠিক শিশুরা তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউ দেখে জলে নাম্‌তে ভয় পেয়ে যেমন কাঁপে তেম্‌নি। জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার আগে তারা অজানা কারো কাছ থেকে যেন আশ্বাসবাণী শুন্‌তে চায়—কেউ যেন বল্‌বে, 'এস ঝাঁপ দাও, কোনো ভয় নাই',—তারপরে সে জলে ডুব দেবে। মৃত্যুতীর্থ পথের পথিকদের কাছে আমি গত বৎসর সেই অজানা আশ্বাসবাণী ছিলাম ডেভিড্‌,—এই বছরে তোমাকে সেই আশ্বাস জোগাতে হবে। আমার একমাত্র অনুরোধ যে নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না ক'রে শান্তভাবে তা মেনে নাও—না হ'লে তোমার দুঃখের অবধি থাক্‌বে না। আমারও কষ্ট হবে।"

এই বলিয়া জর্জ্জ নত হইয়া ডেভিডের চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সে দৃষ্টিতে নিদারুণ ক্রোধ ও বিদ্রোহ দেখিয়া সে ভয় পাইল।

সে আরো নম্রভাবে বলিল, "তুমি শত চেষ্টা করলেও এর থেকে আর নিষ্কৃতি পাবে না এটা মনে রেখো! ইহলোকের পরপার রাজ্যের সমস্ত খবরাখবর আমি এখনো ঠিক জানিনা, আমি সবে মাত্র দুই রাজ্যের সন্ধিস্থলে এসেছি। যতটুকু এখানকার সঙ্গে আমার পরিচয় তাতে দেখছি এখানে দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ মমতা নাই—ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এখানে তোমাকে তোমার অদৃষ্টের হুকুম মেনে চল্‌তেই হবে।"

ডেভিডের চোখের দিকে চাহিয়া জর্জ্জ তখনো অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখিল না। সে বলিল,"স্বীকার করছি যে, ওই গাড়ীতে বসে লোকের বাড়ীর দরজায় ঘোড়া হাঁকিয়ে ফেরার মত জঘন্য কাজ মানবের পক্ষে আর কিছু হ'তে পারে না। এই দুর্ভাগ্য চালক যেখানে যাবে সেখানে চোখের জল আর হাহাকার তাকে অভ্যর্থনা কর্‌বে, তাকে অহরহ দেখতে হবে—রোগ-যন্ত্রণা, ধ্বংস, ক্ষত, রক্ত আর বীভৎসতা। এই পেশার মধ্যে এইটেই সব চাইতে কম ভয়ানক; চালকের অন্তরের মধ্যে যে বীভৎস ভাব তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না—ভবিষ্যতের গভীর বেদনা অনুতাপ আর ভয় নিরন্তর তাকে পীড়া দেবে। আমি বলেছি যে মৃত্যু-যানের চালক দুই রাজ্যের সন্ধিস্থলে আছে—সে মানুষের মত কেবল, অবিচার, হতাশা, ভগ্নোদ্যম আর অরাজকতা দেখে। অন্ধকার পরলোক রাজ্যের ততদূর সে দেখ্‌তে পায় না যাতে সে ভগবানের কার্য্যের অর্থ বুঝে তাঁর সুবিচার বুঝ্‌তে পারে। কচিৎ কখনও হয়তো সে তার আভাস পায় কিন্তু প্রায়ই তাকে অন্ধকার ও সন্দেহের ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়; আরো মনে রেখো ডেভিড, মাত্র এক বৎসর তার এই মেয়াদ হ'লেও এখানে পৃথিবীর হিসাবে ঘণ্টামিনিট গোণা হয় না—নির্দ্দিষ্ট সমস্ত জায়গায় একে যেতে হয় বলে এর পক্ষে সময়ের অসীম বিস্তৃতি—মানুষের এক বছর এর কাছে সহস্র সহস্র বৎসরের সমান। গাড়োয়ানকে যদিও সমস্তই উপরওয়ালার আদেশ অনুসারে করতে হয় তবু তার মনে মনে যে ঘৃণা ও যন্ত্রণা হয় তা বর্ণনাতীত—সে নিরন্তর এই কাজের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়! আর সব চাইতে তার যন্ত্রণার কারণ হয় তখন, যখন কর্ত্তব্য সমাধা করতে গিয়ে সে নিজের কৃত পাপের ফল প্রত্যক্ষ করে; নিজের ঐহিক জীবনের অনুষ্ঠিত কাজের ফলকে সে এড়াতে পারে না।"

জর্জ্জের স্বর অস্বাভাবিক রকম সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল, বেদনায় তাহার দেহও কম্পিত হইতে লাগিল; কিন্তু ডেভিডের ভাবান্তর হইল না সেই ঘৃণা, ক্রোধ ও বিরক্তিতে সে এখনও জ্বলিতেছে। জর্জ্জ যেন শীতার্ত্ত হইয়া তাহার মাথার আবরণ টানিয়া দিয়া বলিল "ডেভিড্‌, তোমার কপালে যত দুঃখই থাক্‌ তুমি বিদ্রোহ করো না, তাতে তোমার দুঃখের মাত্রা বাড়্‌বে বই

কম্‌বে না ; আর আমাকেও তার জন্যে শাস্তি পেতে হবে, তোমাকে ছেড়ে যাবার ক্ষমতা আমার নাই ; তোমাকে তোমার কাজ শেখানো আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে আর আমার পক্ষে সেটা খুব সুখের কাজ নয়। তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে এখানে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এমন কি আস্‌ছে বছরেব নববর্ষের পর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্‌তে পার। তবে আমি ইচ্ছা কর্‌লে, কয়েদীর মতো তোমাকে আমার হুকুম মেনে চল্‌তে হবে। আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে বটে কিন্তু তোমাকে তোমার কাজ ভালো মনে কর্‌তে না শেখানো পর্য্যন্ত আমার ছুটি নাই।"

জর্জ্জ এতক্ষণ ডেভিডের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কথা বলিতেছিল এবং গভীর স্নেহের সহিত কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছিল। সেই অবস্থায় ক্ষণেক থামিয়া সে ডেভিডের মুখের উপর তাহার কথায় কোনো ভয়ের লক্ষণ ফুটিতেছিল কিনা দেখিয়া লইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বতন বন্ধুর মুখে তাহাকে অবজ্ঞা করার ভাব ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে পাইল না।

ডেভিড্ ভাবিতেছিল—"না হয় আমি ম'রেই গেছি, তাতে আমার কোনো হাত নেই, কিন্তু, ওই গাড়ী আর ঘোড়ার সঙ্গে আমার বাপু কোনো কারবার নাই! কেন, আমাকে অন্য কোনো কাজ দিক্ না—একাজ আমি কিছুতেই কর্‌ছি না।"

জর্জ্জ নত অবস্থা হইতে উঠিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া সে বলিল "মনে রেখো বন্ধু, এতক্ষণ জর্জ্জ তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ছিল কিন্তু এখন মৃত্যুযানের চালকের সঙ্গে তোমাকে লড়্‌তে হবে। আর অনুরোধ উপরোধ নয়, তোমার উপর দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে, প্রহরীর আদেশ তোমাকে মান্‌তেই হবে।"

জর্জ্জ কাস্তে হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তীব্রস্বরে সে আদেশ করিল, "বন্দী, কারাগার থেকে বের হ'য়ে এস।" চক্ষের নিমিষে ডেভিড হল্‌ম্ উঠিয়া দাঁড়াইল ; কেমন করিয়া যে ইহা সম্ভব হইল সে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে টলিতে লাগিল, তাহার চারিদিকে সমস্তই—গাছপালা, গীর্জ্জা দুলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে স্থির হইল।

আবার আদেশ হইল "ওই দেখ, ডেভিড্ হল্‌ম্।" ডেভিড্ মূঢ়ের মত চাহিয়া দেখিল। তাহার সম্মুখে মাটির উপর জীর্ণসজ্জা পরিহিত একজন সবলকায় ব্যক্তির দেহ—ধূলি ও রক্তের মাঝে পড়িয়া আছে—আশে পাশে খালি বোতল। লোকটির মুখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে—মুখাবয়ব দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। দূরের রাস্তার আলোর একটি ক্ষীণ রশ্মি তাহার চক্ষু তারকার প্রতিফলিত হইতেছিল। সেই দৃষ্টিতে এক কঠোর বীভৎস ভাব।

সেই ধূলিশায়ী দেহের সম্মুখে সে নিজে এখন দাঁড়াইয়া—দীর্ঘ সুন্দর দেহ—সেই জীর্ণ পরিচ্ছদ। নিজের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে যেন সে দাঁড়াইয়াছে—এক ডেভিড দুই জনে পরিণত হইয়াছে।

অথচ উভয়ে কি স্বতন্ত্র!—দণ্ডায়মান ব্যক্তি ধূলি-শয়ান শরীরের ছায়া মাত্র—যেন দর্পণ হইতে এইমাত্র বাহির হইয়া আসিল।

সে চমকিত হইয়া জর্জ্জের দিকে চাহিল—সেও তাহার স্থূল দেহের ছায়া মাত্র।

জর্জ্জ বলিল—"হে আত্মা তুমি নববর্ষের রাত্রি বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ, তুমি আমাকে কাজ থেকে অবসর দেবে। এক বৎসর কাল তুমি মরণাপন্ন দেহ হ'তে পীড়িত আত্মাকে মুক্তি দেবে।"

এই কথা শুনিয়া ডেভিডের নিদারুণ ক্রোধ ফিরিয়া আসিল। সে সবেগে জর্জ্জের দিকে ধাবিত হইয়া তাহার কাস্তেখানি ভাঙিতে চাহিল, তাহার মস্তকাবরণ ছিঁড়িতে চাহিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হাত অবশ হইয়া আসিল, তাহার পাদুটিও অবশ চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িল। কে যেন তাহার হাত দুইটি অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, পাও শৃঙ্খলিত করিয়াছে। তারপর তাহাকে অসাড় মৃতদেহের মত শূন্যে উঠাইয়া নির্ম্মম ভাবে কে যেন মৃত্যুযানের মধ্যে নিক্ষেপ করিল—সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল।

পরমুহূর্ত্তেই গাড়ীখানি চলিতে সুরু করিল।

ক্রমশঃ

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৬)

বাংলার কৌলিন্য-প্রথা

সত্যই কি বল্লাল সেন বঙ্গীয় সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন তবে এইরূপ প্রশংসনীয় কর্ম্ম তিনি কিংবা তাঁহার বংশধরগণ তাম্রশাসন লিপিতে উৎকীর্ণ করেন নাই কেন? দান-সাগর ও অদ্ভুত-সাগর গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ নাই। তাঁহার কৌলিন্য-প্রথা স্থাপনের প্রকৃত প্রমাণ কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী রাধানাথ শিকদার

(১৭)

প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যে হিমালয় পর্ব্বতের নাম।

প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যে হিমালয় পর্ব্বতের অনেক ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রচলিত দেখা যায় যথা—Parnasus, Paropamisos, Hemodus, Emodus, Imaus, Himaus ইত্যাদি কোন স্থলেও "হিমালয়" নামের উল্লেখ দেখা যায় না—ইহার কারণ কি?

শ্রীমতী কল্যাণী সেন

(১৮)

আয়তীর চিহ্ন

আয়ত্বের চিহ্নস্বরূপ আর্য্যরমণীরা "শাঁখা," "সিন্দূর"ও "লৌহবলয়" ধারণ করেন কেন? দেখা যায় কোন কোন বিধবা তাঁহাদের বৈধব্যের প্রথমাবস্থায় দুচারখানা গহনা, দুএকখানা ভাল কাপড় পরিলেও "শাঁখা" "সিন্দূর" ও "লোহা" ধারণ করিতে পারেন না। শুনা যায় স্বামীর পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা ঐ-তিনটি জিনিস ধারণ করেন, কিন্তু হিন্দুদের ভিতর দুর্গোৎসব বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। সেই দুর্গোৎসবে দেবীর ষোড়শোপচার পূজায় সিন্দূর নিবেদন করিবার মন্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বামীর প্রাণ সম্বন্ধে মঙ্গল করিবার জন্যেই সিন্দূর দান করা হয়।

মন্ত্রটি এই—"ওঁ শিরোভূষণ সিন্দূরং ভর্ত্তুরায়ুর্ব্বর্দ্ধনম্
সর্ব্বরত্নাধিকং দিব্যং সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্।"

কতকাল হইল আর্য্যরমণীরা "শাঁখা," "সিন্দূর" ও "লোহা" ধারণ করিয়া আসিতেছেন? ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা আয়তীর চিহ্নস্বরূপ কি ধারণ করিতেন?

বর্ত্তমানে দুর্গোৎসবের যে-মন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা কতদিনের এবং মহারাজ সুরথ ও রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবীর যে পূজা করিয়াছিলেন তাহা কোন্ মন্ত্রে ও সেই সব মন্ত্র যদি পাওয়া যায় ত কোথায়?

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ যায়গায় কোন্ কোন্ জাতির মধ্যে "শাঁখা" "সিন্দূর" ও "লোহা" প্রচলিত আছে?

শ্রী সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯)

তেলের রং

বেশী ভাগ জলের সহিত অল্প তেল মিশ্রিত করিলে অনেকগুলি রংয়ের সৃষ্টি হয়। কেন হয় এবং কি কি রং তাতে থাকে?

শ্রী সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(২০)

মগের মুল্লুক

'মগের মুল্লুক' এ-প্রবাদের সৃষ্টি কখন এবং কেন হইয়াছে? ইহাতে কোন ঐতিহাসিক তথ্যের সংশ্রব আছে কি না?

শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী

(২১)

জল ও বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব

সকল পদার্থই তরল অবস্থা হইতে ঘন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। জল বরফ হইলে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়, ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে কি?

শ্রী রামদুলাল সেন

(২২)

ভারতবর্ষের আর্ট স্কুল

সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে কয়টি আর্ট স্কুল (Art School) আছে

এবং তন্মধ্যে কোন্‌টা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ; তাহাদের নাম, সবিস্তার বিবরণ এবং পরীক্ষা কিরূপ হয়, কেহ জানেন ত জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডা

(২৩)

আল্লা

আল্লা-নাম হজরত মহম্মদ প্রচলন করিয়াছেন কি তৎপূর্ব্বেও ছিল? থাকিলে কোন্ জাতি এই নাম করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিত?

শ্রী বিনোদবিহারী রায়

(২৪)

সাঙ্খ্য ও বেদান্ত সম্বন্ধীয় পুস্তক

সাঙ্খ্য ও বেদান্ত বিষয়ে বঙ্গ-ভাষায় কি কি ভাল পুস্তক আছে এবং কাহার রচিত বা অনুবাদিত এবং কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীমতী অমলকুমারী দে

(২৫)

সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ, দেশী এবং বিদেশীয় ভাষায়

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে কোন্‌খানা বিদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত হইয়াছে? কোন্‌খানা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভাষায় দেশীয় এবং বিদেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ ভাষায়?

শ্রীমতী বাণী সেন

মীমাংসা

(৫)

গাছের পোকা

শুধু পুরান গাছ বলিয়াই যে লাউতে পোকা ধরে তাহা নহে। অনেক সময় নূতন গাছের লাউতেও পোকা ধরিতে দেখা যায়। লবণজলের প্রয়োগে এই পোকা-লাগা দূর হইতে পারে। লাউ একটু বড় হইলেই পোকা ধরিবার পূর্ব্বে বোঁটার কাছে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটি সলিতার একমুখ প্রবেশ করাইতে হইবে এবং অন্য মুখ কোন পাত্রস্থিত লবণজলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। পাত্রটি লাউ হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে রাখা বাঞ্ছনীয় এবং যাহাতে জল নিঃশেষ হইয়া না যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শ্রীমতী পীযূষকণা দেবী

(৬)

দেহের ওজন

আমাদের শরীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই ক্ষয় হইতেছে। নিদ্রার সময় বাহির হইতে আহার্য্যরূপে কোনও দ্রব্য না যাওয়ায়, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য্য সমানে চলিতে থাকায়, ওজনের কিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে ওজন লইলে, ওজনের হ্রাস দেখা যায়, কিন্তু তাহা এত কম, যে সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যতীত তাহা ধরা সম্ভব নহে। অবশ্য নিদ্রার পূর্ব্বে আহার করিলে, ক্ষয় ও পুষ্টির সমতা হইয়া গিয়া ওজনের হ্রাস ঘটিতে পারে না। বস্তুতঃ ওজনের হ্রাসের কারণ নিদ্রা নহে. শরীরকে অনেকক্ষণ খাইতে না দিয়া কাজ করানই প্রকৃত কারণ।

শ্রী সরসী চট্টোপাধ্যায়

(৭)

হিন্দুসমাজে বিবাহ

হিন্দুসমাজে অকৃতদার জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহ করা নিষিদ্ধ : হারীত-সংহিতায় আছে—

"জ্যেষ্ঠেহ নির্ব্বিষ্টে কনীয়া নির্ব্বিশন পরিবেত্তা ভবতি।
পরিবিন্নো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা পরদায়ী দাতা
পরিকর্ত্তা যাজকঃ তে সর্ব্বে তত্তৎ সংসার্গিনশ্চ পতিতাঃ।

কিন্তু যদি—

"দেশান্তরস্থ ক্লীবৈ বৃষাণী ন সহোদরান্।
বেশ্যাভিসক্ত পতিত শূদ্র তুল্যাভিরোগিনঃ।
জড়মূকান্ধবধিরকুব্জবামনকুণ্ঠকান্
অতিবৃদ্ধান্ ভার্য্যাংশ্চ কামতঃ করিণস্তথা।
কুলটোন্মত্তস্বৈচ্ছরাংশ্চ পরিবিন্দন্ন দুষ্যতি।

উক্ত দোষগুলির যে কোন একটা জ্যেষ্ঠে বর্ত্তমান থাকে তবে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। জ্যেষ্ঠের অনুমতি পাইলেও কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারে। (ইতি উদ্বাহতত্ত্ব)।

শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী

জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিবাহিত থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ করে সে নরকগামী হয়। কন্যা, কন্যাকর্ত্তা ও যে ব্যক্তি ঐ-বিবাহে পৌরোহিত্য করে, সকলেই পাতকগ্রস্ত হয়। সুতরাং জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি কুব্জ, অন্ধ, জড় ইত্যাদি হয় বা সহোদর না হয়, কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিয়া যদি স্বয়ং বিবাহে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে কনিষ্ঠ তাঁহার অনুমতি লইয়া বিবাহ করিতে পারে। পরাশর বলেন :—

"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদিতিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥

পরাশর সংহিতা ৪র্থ অধ্যায় ২৫শ শ্লোক।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়।

অবিবাহিত অগ্রজ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহ দূষনীয়। মন্বাদি সংহিতাকারগণ এইরূপ বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। পরাশর-সংহিতা কলিযুগের ধর্ম্ম-নির্ণায়ক ; অতএব মাত্র পরাশর-বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেই যথেষ্ট প্রমাণ হইবে।

পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়াচ পরিবিদ্যতে।
সর্ব্বেতে নরকং যান্তি দাতৃযাজক পঞ্চমাঃ॥
দারাগ্নিহোত্র সংযোগং যঃ কুর্য্যাদগ্রজেসতি।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ॥

পরা-সং ৪র্থ অঃ ২০।২১

অর্থ—পরিবিত্তি পরিবেত্তা এবং যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয় যে ঐ কন্যাদান করে, যে সেই বিবাহের পৌরহিত্য করে, এই পাঁচ ব্যক্তি নিরয়-গামী হয়।

অগ্রজ অবিবাহিত থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিহোত্র করে তাহাকে পরিবেত্তা বলে আর সেই অবিবাহিত অগ্রজকে পরিবিত্তি বলে।

কুব্জ বামন ষণ্ঢেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ।
জাতান্ধে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে॥
জ্যেষ্ঠোভ্রাতা যদি তিষ্ঠেদাধানং নৈবচিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥

পরাশর-সংহিতা

অগ্রজ যদি কুব্জ, বামন, ক্লীব, গদ্গদ, জড়, জন্মান্ধ, বধির ও মূক হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার দারপরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্র দোষাবহ নহে। আর যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বয়ং বিবাহ বিষয়ে অনিচ্ছুক থাকেন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে; শঙ্খের এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

(৯)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

"সে সময়ে (রামমোহন রায়ের) জজের ও কালেক্টরের সেরেস্তাদারি (তখন দেওয়ানি বলিত) দেশীয়দিগের পক্ষে উচ্চতম পদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং রামমোহন রায়ের ভাগেও তদপেক্ষা উচ্চতর পদ জুটে নাই। কিন্তু তাহাও তিনি একেবারে পান নাই। দেওয়ানি পাইবার আশায় প্রথমে তাঁহাকে সামান্য কেরাণীর কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।"

"রামমোহন রায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এ প্রকার যত্ন ও উদ্যম সহকারে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, সাহেব তাঁহার প্রতি দিন দিন অধিকতর সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই রামমোহন রায় দেওয়ানি পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে রামমোহন রায়কে সেরেস্তাদার করিবার সময় কোনই আপত্তি হয় নাই বরং সাদরে ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"রামমোহন রায় ১৮০০ সাল হইতে ১৮১১ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশবৎসর রংপুর, ভাগলপুর, রামগড় এই কয়েক জিলায় কালেক্টারের অধীনে দেওয়ানি কর্ম্মোপলক্ষে বাস করেন।" অতএব দেখা যাইতেছে যে তিনি রংপুর মাহিগঞ্জের কোন নাবালকের এষ্টেট-ম্যানেজার হইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। তবে "রামগড় জিলায় অবস্থিতি কালে তিনি সহরঘাটিতে বাস করিতেন" বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, মাহিগঞ্জে তাঁহার বসতবাটীর কোন প্রমাণ নাই। পরে স্থায়ীভাবে, লাঙ্গুলপাড়ার সন্নিকটবর্ত্তী 'রঘুনাথপুরে এক শ্মশান ভূমির উপর বাটী প্রস্তুত করেন।' এবং সেইখানে বসবাস করেন।

উদ্ধৃত অংশগুলি শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত হইতে সংগৃহীত।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(১০)

বিছা

যে গাছে বিছার উপদ্রব হইবে প্রথমতঃ একটা লাঠী বা ঐরূপ একটা কিছু দ্বারা ঐ গাছ হইতে সমুদয় বিছা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। তৎপর ঐ গাছের কাণ্ডের চারিদিকে ৮।১০ ইঞ্চি পরিসরে চূণ দিয়া প্রলেপ দিবেন। আম প্রভৃতি বড় গাছে মাটী হইতে আড়াই বা তিন হাত উপরে চূণ দিলে ভাল হয়। যে গাছের বিছা দূরীভূত করিতে চান, সেই গাছের সঙ্গে আগার দিকে অন্য কোন নিকটবর্ত্তী গাছের পাতা বা ডাল মিলিত হইলে ঐ সব নিকটবর্ত্তী গাছগুলির গোড়াতেও উক্তরূপে চূণ দিবেন। কিছুদিন পরে বৃষ্টিতে ভিজিয়া বা রৌদ্রে শুকাইয়া চূণ উঠিয়া গেলে আবার নূতন করিয়া চূণ দিতে হইবে। এইরূপ করিলেই সমুদয় বিছা দূরীভূত হইবে। ইহা পরীক্ষিত।

শ্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দে গুপ্ত

ভ্রম সংশোধন

গত চৈত্র মাসে, বেতালের বৈঠকে প্রকাশিত, "নৌ-বিদ্যা" সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ষষ্ঠ পঙক্তিতে "ওয়ালাদিদের" স্থানে "ও খালাসীদের" হইবে।

ভূমিকম্প

শ্রী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-ই

খৃষ্টীয় ১৯১৮ শতাব্দীর ৮ই জুলাই অপরাহ্ণ-কালে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ যথারীতি চলিতেছিল,—কাছারীতে উকীল, মোক্তার, মোহুরীর ও মক্কেলের ভীড়, রেল-ষ্টীমারে সর্ব্বপ্রকার যাত্রীর ভীড়, হাটবাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার ভীড়, সহরের রাস্তায়-রাস্তায়, অলি-গলিতে পথিকের ভীড়, কোথায়ও কোনো বৈচিত্র্য নাই, সহসা দারুণ কম্পনে ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠিলেন। অট্টালিকাবাসী সন্ত্রাসে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইল। সকলে কিন্তু তাহাও পারিয়া উঠিল না। কোনো কোনো স্থানে কম্পনের বেগাধিক্যবশতঃ অগ্নিদাহ ঝটিকা ও চৌর্য্যভয় শূন্য ধনীর অট্টালিকা দেখিতে দেখিতে ভূমিসাৎ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ধনীকেও ইষ্টকস্তূপে প্রোথিত করিয়া ফেলিল। অট্টালিকাবাসী অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল দরিদ্রের পর্ণকুটীর রচনা করিয়া বাস করিতে লাগিল। পর্ণকুটীর তার পক্ষে পূর্ব্ববৎ ঘৃণ্য রহিল না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন অপরাহ্ণের ভীষণ ভূমিকম্পে

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষতি ও দুর্ঘটনা হইয়াছিল। শিলং সহরের নিকটই ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া ভূতত্ত্ববিদেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; কাজেই ইহার অধিকাংশ বলই জনশূন্য পার্ব্বত্য-প্রদেশে ব্যয়িত হইয়াছিল। মহরমের দিন; এক শ্রেণী মুসলমানগণ লাঠি-খেলাদি নানা প্রকার আমোদ-আহ্লাদে ব্যস্ত, এমন সময় কম্পনের বেগে সমস্ত স্তব্ধ করিয়া দিল। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অনেক স্থানে একটিও অট্টালিকা রহিল না, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া বিদেশস্থ আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ গ্রহণও দুষ্কর করিয়া তুলিল, দুই এক স্থানে রেলের

পূর্ব্ব ভূমণ্ডলার্দ্ধের ভূমিকম্প প্রবণ স্থান সমূহ (কাল অংশ)

গাড়ী লাইনচ্যুত হইয়া পড়িল। শ্রীহট্ট জিলার প্রায় সর্ব্বত্র মাটি ফাটিয়া পৃথিবী, বালি, ছাই, জল প্রভৃতি উদ্গীরণ করিতে লাগিল এবং তাহারই ফলে ২।৩ বৎসরকাল ম্যালেরিয়ার ভয়ানক প্রকোপ হইল। বোম্বাই সহরে প্লেগের প্রথম আগমনে হাজার-করা ১৮ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, কিন্তু শ্রীহট্টে ১৮৯৮ সালে কেবল জ্বরেই হাজার-করা ২৬ জনকে শমন-সদনে গমন করিতে হইল। কাহারও কাহারও পুষ্করিণী বালিতে ভরিয়া সমৎস্য জল বাড়ীতে ঠেলিয়া উঠিল, স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমি নিম্ন জলায় পরিণত হইল। তাহার ৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই কাঙ্গরা উপত্যকায় যে-ভূমিকম্প হয় তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূমিকম্পের ন্যায় ভীষণ না হইলেও তাহাতেও প্রায় ২০,০০০ লোকের মৃত্যু ঘটে।

কাঙ্গরা উপত্যকায় ইহার কেন্দ্র ছিল বলিয়া ইহা 'কাঙ্গরা-ভূমিকম্প' নামেই বিজ্ঞানজগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা কি নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় সহসা এই ভীষণ কম্পনে স্বীয় বক্ষোবাসী সন্তানগণের সমূহ বিপদ ঘটাইয়া তুলেন তাহার কারণ জ্ঞাত হইবার আকাঙ্ক্ষা অন্তত তৎসময়ে অনেকেরই মনে উদয় হয়। রেলওয়ে ট্রেন চলিয়া যাইবার কালে নিকটে দাঁড়াইলে ভূমিকম্পন অনুভব করা যায়। কোন ভারী জিনিষ উপর হইতে মাটিতে নিক্ষেপ করিলেও স্থানীয় কম্পন অনুভূত হয়। কিন্তু এইসব অনৈসর্গিক সামান্য কম্পন ভূমিকম্প নামে অভিহিত হয় না। অতি পুরাকালে বিসুবিয়স্ নামক আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে ইটালীর অন্তর্গত হার্কুলেনিয়াম্ ও পম্পীআই নামক দুইটি সমৃদ্ধিশালী নগরী ভস্মস্তূপে একেবারে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। অধুনা ঐ নগরীদ্বয় আংশিকরূপে খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। সেই অগ্ন্যুৎপাতের সময় মুহুর্মুহু ভূমিকম্প হইয়াছিল। সেই ভূমিকম্প এবং অন্যান্য আগ্নেয়গিরির আলোড়নেও ভূমিকম্প হইতে দেখিয়া পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের সহিত ভূমিকম্পের একটা নিকট সম্বন্ধ তৎকালীন পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এমনকি গন্ধক মাটিতে প্রোথিত করিয়া অগ্নিসংযোগ করিলে তাহা দহন কালে স্থানীয় কম্পন, দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল। ভূমিকম্পের স্থান ও তাহার কেন্দ্র সম্বন্ধে আধুনিক জগৎ যে-সব জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, কোনও স্থানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও ভূমিকম্পন একই সময় সংঘটিত হইলেও ইহাদের পরস্পর-সম্বন্ধ অতিশয় বিরল। অগ্ন্যুদ্গমকালে অনেক সময় সামান্য ভূমিকম্প হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাতে যে বহুদূর ব্যাপক ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হইতে পারে না এই কথা একরূপ নিশ্চিত।

জাপান যখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা-বিস্তারের

[illegible] পশ্চিম হইতে পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া হয়, তখন সেই পণ্ডিতগণের দৃষ্টি সেই ভূমিকম্পপ্রপীড়িত দেশের এই নিদারুণ উৎপাতের দিকে আকৃষ্ট হয়। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ভূমিকম্প সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনাদির জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। যন্ত্রাদিরও উন্নতিসাধিত হইয়া বর্ত্তমানে কম্পনের পরিমাণ-মাপক অতি উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। তাহার সাহায্যে দেখা যায় যে, ভূমিকম্পের সংখ্যা পূর্ব্বে যাহা অনুমান করা যাইত প্রত্যেক বৎসরই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সংঘটিত হইয়া থাকে। জাপানে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ প্রতি বৎসর গড়ে ১০০০ হাজার বার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে; অবশ্য তাহার অনেকগুলিই অতি সামান্য।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পের পর হইতে ইহার কারণ সম্বন্ধে নানা প্রকার মতামত প্রকাশ হইতে লাগিল। কোনো বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদক লিখিলেন যে, ভূমিকম্প যে কারণেই হউক দেশে দুর্ভিক্ষে (তখন মধ্য ভারতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ বিরাজমান) অনাহারে বহুলোক প্রাণত্যাগ করিতেছে; করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদের জন্য কাজ যোগাইবার নিমিত্তই ভূমিকম্পের সাহায্যে ধনীর অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া বহুলোকের খাটিয়া অন্নসংস্থান করিবার পথ সুগম করিয়া দিলেন। গরীবের পর্ণকুটীর অবিকৃতই রহিয়া গেল। অধ্যাপক স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সেই সময় ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে এই কথার প্রতিবাদে ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিলেন যে, যদি অনাহারীর আহার-সংস্থানই ভূমিকম্পের কারণ হইত তবে বিধাতার দয়ার প্রকোপটা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মধ্য ভারতে পতিত না হইয়া আসামের বিজন পার্ব্বত্য দেশে এতটা পতিত হইল কেন তাহা বুঝা যায় না।

এই ভূমিকম্পের পর হইতেই ইউরোপ ও আমেরিকায় ভূমিকম্প সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা আরম্ভ হয়। তাহার ফলে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ দুই-একটি সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বলিয়া ভূপৃষ্ঠ কোথায়ও সমতল নহে, কিন্তু কোনো কোনো দেশে এই বক্রতাজনিত ভূপৃষ্ঠের ঢাল (curvature) প্রতি ২০ ফুট হইতে ৩০ ফুট মধ্যে এক ফুট পরিমাণ; আবার কোথাও ৭০ফুট হইতে ২৫০ ফুটের মধ্যে এক ফুট মাত্র। যে-সব স্থানে এই বক্রতা অত্যধিক সে-সব প্রদেশেই ভূমিকম্পের কেন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানের উচ্চ প্রদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে ও আন্দিয়ান পর্ব্বত হইতে পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত ১২০ মাইলের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে যে ঢাল রহিয়াছে পৃথিবীর আর কোথাও এত খাড়া ঢাল নাই। ভূমিকম্পও এত বেশী আর কোথাও সংঘটিত হয় না।

পশ্চিমে ভূমণ্ডলার্দ্ধের ভূমিকম্প-প্রবণ স্থান সমূহ (কাল অংশ)

যে-শক্তির প্রভাবে ভারতের হিমালয় ও ইউরোপের আল্পস্ পর্ব্বতমালা ভূপৃষ্ঠ হইতে এত উচ্চে শির উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা এখনও বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সন্দেহ করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। হিমালয়ের উপরে সমুদ্র সমতল হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চে সমুদ্রবাসী ঝিনুক (shellfish) নির্ম্মিত চা-খড়ীর স্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে-শক্তি সমুদ্রের গর্ভ-স্থিত স্তরাবলী ঠেলিয়া এত উচ্চে সাজাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার পরিমাণ যে অসামান্য তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই পর্ব্বতদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূমিকম্পও সেই আভ্যন্তরিক শক্তির প্রভাবেই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ভূপৃষ্ঠ উচ্চ পর্ব্বতে কিম্বা নিম্ন সাগর বা হ্রদে পরিণত হইলে স্তরগুলিও সেইসব স্থানে বক্র হইয়া আসে। ১০।১২ হাজার ফুট

উপরে কিম্বা নীচেও সেইসব স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব স্তরের বক্রতার উপর অধিকাংশ ভূমিকম্প নির্ভর করে। অনেক ভীষণ ভূমিকম্পের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার কেন্দ্র-স্থলের নিকটবর্ত্তী ভূস্তর ফাটিয়া যায়, তখন দুই ধারের স্তর-নিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিয়া অনেক উচ্চ নীচ হইয়া যায়। ভূস্তরের এইপ্রকার স্থানচ্যুতিকে Fault বলে। অনেক ভূমিকম্পের কেন্দ্র আবার এইপ্রকার Fault সমূহের এক সরল রেখা-ক্রমেই অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপ-বিকীরণ হেতু গলিত পদার্থ কঠিন আকার ধারণ করিবার সময় পরিমাণে সঙ্কোচিত হইয়া পড়ে, কারণ তাপ পদার্থের আকার বৃদ্ধি করে। সেই হেতু স্তরগুলি কখনও উঁচু কখনও নীচু হইয়া যায় এবং কখনও বা এপাশে ওপাশে সরিয়া যায়। স্তরের এই স্বাভাবিক গতি সময় সময় অত্যধিক হইয়া পড়িয়া ভূমিকম্প সংঘটিত করিয়া তুলিতে পারে। তরল আভ্যন্তরিক পদার্থ উত্তাপ-বিকীরণ হেতু কাঠিন্য লাভ করিয়া অনেক সময় সঙ্কোচনের জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুবৃহৎ গহ্বরের (void) সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইসব গহ্বরের উপরের স্তর নীচে কোনরূপ ভর রাখিতে না পারিয়া উপর হইতে নামিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াও অনেক সময় ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়। কারণ কোন ভারি দ্রব্য তাহার স্থায়ী অবস্থান হইতে পড়িয়া গেলে যে-পরিমাণ মাধ্যাকর্ষণ-বলে নীচে আকৃষ্ট হয় তাহার অবস্থানকেও সেই পরিমাণ বলের সহিত উপরে ঠেলিয়া দেয়।

ভূমিকম্পে পৃথিবীতে দুই প্রকারের কম্পন সংঘটিত হইতে দেখা যায়। ভূস্তরের আকস্মিক পরিবর্ত্তনই ভূমিকম্পের কারণ হইলেও এই দুই রকমের কম্পন দেখিয়া মনে হয় যে, ভূমিকম্প-উৎপাদক ভূস্তরের পরিবর্ত্তনও ঠিক একই ভাবে ঘটে না। একপ্রকার ভূমিকম্পে পৃথিবী কেবল অগ্রপশ্চাৎ নড়া চড়া করে মাত্র। অধিকাংশ ভূমিকম্পই এই জাতীয়। আর এক প্রকার ভূমিকম্পে এই নড়া চড়া ছাড়াও ভূপৃষ্ঠে জলতরঙ্গের ন্যায় এক তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়া বহু দূর প্রবাহিত হয়। বড় বড় ভূমিকম্পগুলি এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। কোনো নূতন Fault সৃষ্টি কিম্বা পুরাতন Faultএর পরিবর্ত্তন ঘটিলেই সম্ভবতঃ প্রথমোক্ত ভূমিকম্পগুলি অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে ভূস্তর কোথাও বিশেষ স্থানান্তরিত হয় না। এবং কাজেই এইসব ভূমিকম্পের বেগও সামান্যই হইয়া থাকে। ভূগর্ভস্থ ভূস্তরের সুবৃহৎ অংশ ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরিত হইয়া পড়িলেই দ্বিতীয় প্রকার ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া থাকে।

আধুনিক পণ্ডিতগণ আবার পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভিতরের উত্তপ্ত গলিত পদার্থ বাহিরের একটি নাতি-স্থূল কঠিন আবরণে আবৃত থাকায় পুরাতন মত আর তাঁহারা সমর্থন করেন না।

ভস্‌জেস্ ও ব্ল্যাকফরেষ্ট পর্ব্বতের আভ্যন্তরীণ মৃত্তিকাস্তরের মানচিত্র

পৃথিবীর অভ্যন্তরে ছিদ্র করিলে ক্রমশঃই অধিক উত্তাপের প্রমাণ পাওয়া যায়, আবার উষ্ণ প্রস্রবণ ও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎগম প্রভৃতি দেখিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে অত্যুষ্ণ গলিত পদার্থের অবস্থিতির ধারণা পোষণ করিবার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে পদার্থনিচয় যতই উত্তপ্ত হউক না কেন এত চাপে থাকিয়া কিছুতেই তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। উত্তাপে কঠিন পদার্থ গলিয়া তরল হইবার কালে উপরের বায়ুর চাপ যত বৃদ্ধি করা যায় তাপও তত বেশী আবশ্যক হয়। ইহা বিজ্ঞানের একটি সর্ব্ববাদিসম্মত মত। দার্জ্জিলিং, শিমলা প্রভৃতি উচ্চ স্থানের বায়ুর তাপ নীচ সমতল ভূমি অপেক্ষা অনেক কম; কাজেই এইসব স্থানে খোলামুখ পাত্রে জ্বাল দিলে গোলআলু সিদ্ধ হয় না কারণ সেইসব স্থলে জল অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপেই ফুটে এবং একবার ফুটিতে আরম্ভ করিলেই আর জলের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় না এবং আলু সিদ্ধ হওয়ার মত উত্তাপ সৃষ্টিই হয় না। পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিলে ভিতরের বায়ুর তাপ বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে

সঙ্গে জলের উত্তাপও বৃদ্ধি করাইয়া আলু সিদ্ধ করিয়া ফেলে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর তরল হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ সমুদ্রজলের ন্যায় তাহারও জোয়ার-ভাটা হইয়া সমস্ত পৃথিবীটিকে স্থান-বিশেষে ফুলাইয়া তুলিত এবং তাহা হইলে জোয়ারের জোরে সমুদ্র-জলের আস্ফালন পরিলক্ষিতই হইত না। এইসব দেখিয়া পণ্ডিতগণ ঠিক করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর কাচ কিম্বা ইস্পাতের ন্যায় কঠিন। ইহা গলিত তরল পদার্থ হইলে ভূপৃষ্ঠ স্তর কোনো-না-কোনো কারণে কোনো স্থানে ভাঙ্গিয়া যাইত এবং ভিতরের তরল পদার্থ ঠেলিয়া উপরে আসিত এবং উপরের কঠিন পদার্থও নীচে যাইত। অর্থাৎ পৃথিবী বাসোপযোগীই হইত না। আগ্নেয়গিরি এবং উষ্ণ প্রস্রবণও ভূপৃষ্ঠস্থ স্তরের স্থানীয় উত্তাপের কার্য্য মাত্র। Radio-activityই এই স্থানীয় উত্তাপের কারণ; এবং ইহাই সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের অতীব আশ্চর্য্যজনক ভীষণ উত্তাপের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া একটা মত পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত, তবে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ ভীষণ উত্তাপ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, ভিতরের পদার্থনিচয় কঠিন হইলেও ঐ উত্তাপে এক অভিনব অবস্থা ধারণ করিয়া আছে। ইহা ঠিক পিচের (Pitchএর) মত, হঠাৎ কোন ভার চাপাইলে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। ভার কম হইলে কোনো পরিবর্ত্তনই ঘটে না। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া চাপে থাকিলে তরল পদার্থবৎ নীচু হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া যায়। এইপ্রকার অবস্থাপন্ন পদার্থের উপরই পৃথিবীর বাসোপযোগী বাহ্যস্তর অবস্থান করিতেছে। কিন্তু উচ্চ পর্ব্বত হইতে অহরহ নদনদীগুলি নানাপ্রকার পদার্থ সমুদ্রে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। বহুকালের এই প্রক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের দিকে যেমন স্তরের ভার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, পর্ব্বতের দিকেও প্রায় সেই পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে। এই অসমান ভারের চাপ ভিতরের অত্যুষ্ণ পদার্থ-নিচয়কে অধিক ভারাক্রান্ত স্থান হইতে তরল পদার্থবৎ সরাইয়া দিয়া বাহ্যস্তরকে নীচে নামাইয়া দিতেছে এবং পর্ব্বত-পৃষ্ঠস্তরও সেই পরিমাণ উপরে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই বলের বেগ বৃদ্ধি পাইতে-পাইতে একদিন হঠাৎ ভূস্তর ফাটিয়া ভীষণ বেগে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিয়া ফেলিতেছে এই ফাটলও একটি স্থায়ী Faultএ পরিণত হইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ প্রস্তর এই কম্পন বহুদূরে বহন করে। বাহিরের পদার্থও সেই কম্পন বহনে কোন ত্রুটি করে না, ফলে দূর দেশে দুইটি কম্পনই অনুভূত হয়। আভ্যন্তরিক কম্পনটি কিছু পূর্ব্বে গিয়া পৌছে। চতুর্দ্দিকে ভূমিকম্পন পরিমাপক যন্ত্রে (Seismograph) কোথায় কোন্ সময় কম্পনদ্বয় পৌছিল তাহা দেখিয়া কম্পনের কেন্দ্র নির্ণীত হইয়া থাকে।

ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে এইসব মতই চলিয়া আসিতে-ছিল। সম্প্রতি কালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ A. C. Lowson (এ, সি, লোসন)
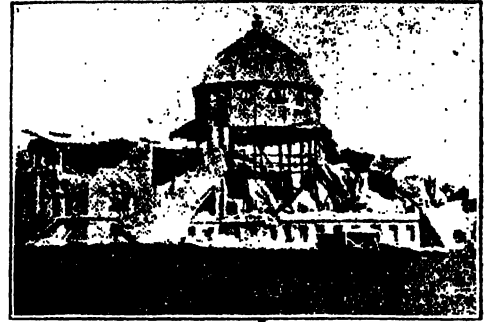
কালিফোর্নিয়ার ষ্ট্যানফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার
১৯০৬ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংসীভূত

একটি মত প্রচার করিয়াছেন তাহাতে এ বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার মতটি এই :— পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রতি মুহূর্ত্তে ১৯ মাইল বেগে ঘুরিবার কালে ঠিক ঋজুভাবে অর্থাৎ at right-angles to the axis না ঘুরিয়া একটু তির্য্যক্ ভাবে ঘুরে; তাহাতে উত্তরমেরুবিন্দু ৬০ ফুট ব্যাসের একটি বৃত্ত অঙ্কিত করে। পৃথিবী মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঋজুভাবে ঘুরিলে উত্তরমেরুবিন্দুর স্থানচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। যদিও এই ৬০ ফুট ব্যাস পৃথিবীর আকারের তুলনায় নগণ্য তথাপি এই তির্য্যক গতির ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ স্তর সমুদয় আস্তে আস্তে উত্তর দিকে চালিত হইতে বাধ্য। এই মন্থরগতির বলে স্তর-সমুদয় মধ্যে

একটা ভয়ানক টান পড়িতেছে। এই টানের বল যখন ভূপৃষ্ঠস্থ স্তরসমূহের সংহতি-বলকে অতিক্রম করে তখন কোনো স্থানে স্তরগুলি ছিঁড়িয়া দুইভাগ হইয়া যায় এবং একভাগ উত্তর দিকে যেমন সজোরে সরিয়া পড়ে অপর ভাগ বিপরীত দিকে সেই পরিমাণ জোরেই সরিয়া আসে এবং Inertiaর বলে কয়েক বার এদিক ওদিক দুলিয়া স্থির হয়; এই দোলনই ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের প্রথম কারণ যাহা বলা হইয়াছে এই মতের সহিত তাহার কোনো পার্থক্য নাই বলিলেই চলে, কারণ ভূপৃষ্ঠের ঢাল (curvature) যেখানে বেশী সেখানেই ভূস্তরের উভয়-মুখী মন্থরগতির প্রভাবে বেশী টান পড়িবার কথা।
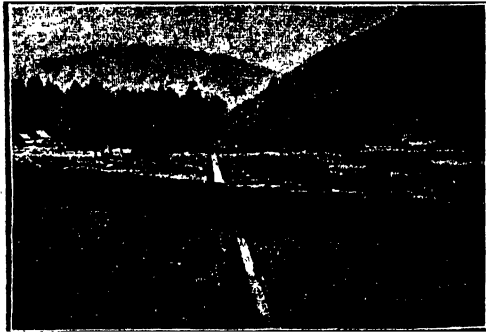
জাপানের ১৮৯১ সালের ভূমিকম্পের ফলে বিদীর্ণ ভূমিখণ্ড

এবং সেখানেই ভূস্তর ছিঁড়িয়া ভূমিকম্প উৎপন্ন করিতে পারে এবং faultও সৃষ্টি করিতে পারে। তবে পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকারের ভূমিকম্পই এইভাবে উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। কারণ, এইপ্রকার নৈসর্গিক ব্যাপারেই ভূস্তরের অগ্রপশ্চাৎ নড়াচড়া করিবার কারণ দেখা যায়। ডাঃ লোসন বলেন যে, তিনি যন্ত্রদ্বারা কোথায় কোনো সময় ভূমিকম্প ঘটিতে পারে, তাহা বলিয়া দিতে পারিবেন।

ভূমিকম্প-সম্বন্ধে এইসব গবেষণাদির ফলে ভূমিকম্প-প্রপীড়িত দেশে গৃহাদি নির্ম্মাণ-বিষয়ে অনেক রীতি পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভূমিকম্পনের গতির প্রকৃত পরিমাণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় তাহার সংহারিণী শক্তির পরিমাণও নির্ণীত হইয়াছে। এবং কি ভাবে গৃহাদি নির্ম্মিত হইলে কম্পনবেগে ভূমিসাৎ হইবে না তাহা গণিতশাস্ত্র-সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে। জাপানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পবিধ্বস্ত গৃহাদি পুনর্নির্ম্মাণ-কালে সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণও উত্তর বঙ্গে ও আসামে লৌহ দণ্ড-পাত প্রভৃতি ইষ্টক নির্ম্মিত দেওয়ালের ভিতরে পূরিয়া ভূমিকম্পের ধ্বংসকারী ক্ষমতার বেগ সহনোপযোগী করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সেইরূপ ভূমিকম্প পুনরায় না ঘটিলে তাঁহাদের এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হইবে না; তবে এইপ্রকার দেওয়াল যে শুধু ইষ্টক-নির্ম্মিত দেওয়াল অপেক্ষা অধিক সহনক্ষম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জাপানে সম্প্রতি যে ভূমিকম্প হইয়াছে তাহাতে steel frmeযুক্ত আধুনিক বাড়ী একটিও ভাঙ্গে নাই।

ভারতের প্রাচীন মনীষীগণ ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন বলিয়া সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পাতালখণ্ড নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের নামোল্লেখ অনেক স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থখানি এখনও উদ্ধার হয় নাই, সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ ভূতত্ত্ববিষয়ে লিখিত হইয়াছিল। ভূমিকম্পের কারণাদি সেই গ্রন্থে মীমাংসিত হইয়াছিল বলিয়া আশা করা যায়। বৃহৎ সংহিতায় বিভিন্নমুখীন বায়ুর সংঘর্ষেই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ভূমিকম্পের ফলাফল সম্বন্ধে অনেক কথা ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কোন্ লগ্নে ভূমিকম্প হইলে কোন্ কোন্ দেশের শুভাশুভ ও কোন্ কোন্ পীড়া বিস্তার লাভ করিবে প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তবে পুরাণে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রূপকের সাহায্য নেওয়ার যে একটি রীতি দেখা যায় এবিষয়েও তাহার অভাব হয় নাই। পুরাণে কথিত আছে যে, পৃথিবী বাসুকীর সহস্রফণার উপর অবস্থিত। কোন-একটি ফণা ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য অবনত হইলে তাহার উপরিস্থ প্রদেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এই গল্পের প্রকৃত ভাব উদ্ধার করা সংস্কৃতজ্ঞ গবেষণা-প্রবণ মনীষীগণের চেষ্টার বিষয়। ধৃষ্টতা জ্ঞানে আমি এই বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই।*

* সাহিত্য পরিষদের কুমিল্লা শাখায় পঠিত।

তৃষিত আত্মা

শ্রী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

সীতাপতি মারা গেলেন বড় হঠাৎ। খামার-বাড়ী হইতে বেলা অনুমান সাড়ে এগারটার সময় বাড়ী ফিরিয়া মণ্ডপ-ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া যখন তিনি ভৃত্যকে তামাক দিতে বলিলেন তখনো তাঁর শরীরে বাহ্যিক কোনো গ্লানি ছিল না, কিন্তু তামাক সাজিয়া আনিতে যে অত্যল্প সময়টুকু লাগিল তাহারই মধ্যে দেহের কোথায় যে কি কাণ্ড ঘটিয়া গেল বোঝা গেল না। ভৃত্যের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়াই প্রথমে তাঁর হাত, পরে সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হস্তচ্যুত হইয়া হুঁকা পড়িয়া যায় দেখিয়া ভৃত্য তাড়াতাড়ি হুঁকাটি লইয়া লোক ডাকিতে-ডাকিতে সীতাপতিকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিল; সীতাপতি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই পুত্রপরিজন-পরিবেষ্টিত সীতাপতি স্বর্গারোহণ করিলেন।

যে বহুকাল রোগে ভুগিয়া-ভুগিয়া শয্যায় শুইয়া ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইয়া প্রাণত্যাগ করে তাহার মৃত্যুতে তাহার অধিকৃত স্থানটিই কেবল শূন্য হইয়া যায়—সে যেন নিশ্চিত এবং নিঃশেষ অনুপস্থিতি; কিন্তু, যে-মানুষ এই ছিল এই নাই সে কাছে না থাকিয়াও কোথায় যেন থাকে; তার অভাবে গৃহের প্রত্যেক কক্ষ, প্রত্যেক অঙ্গন, প্রত্যেক দ্বার,প্রত্যেক মোড়, প্রত্যেক অংশ,—গৃহের সমগ্র মর্ম্মস্থলটিই যেন শূন্য হইয়া হা হা করিতে থাকে; কিন্তু ঠিক্ সেই কারণেই আবার জীবিতের সংকিত ভীতির অন্ত থাকে না,—ঐ বুঝি সে আসনে বসিয়া, ঐ বুঝি সে দুয়ারে দাঁড়াইয়া, ঐ বুঝি তার কণ্ঠস্বর—এম্‌নি ভুল সহস্র বার ঘটিয়া মনোরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া মৃতের দৈহিক অস্তিত্বের -মৃণালটুকুর নিশ্চিহ্নরূপে ও নিঃশেষে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে বহু বিলম্ব ঘটে।

এটা বোধ হয় সাধারণ। কিন্তু সীতাপতির অকস্মাৎ মৃত্যুর পর পুত্রবধূ লক্ষ্মীর প্রাণে যে-আতঙ্কের সঞ্চার হইল তাহা যেমন দুঃসহ প্রবল তেম্‌নি নিরেট অব্যক্ত; তাহা মুখ ফুটিয়া পরের কাছে বলিবার নয়, নিজেরই মনের সঙ্গে সে-কথা লইয়া বুঝি তর্ক করাও চলে না।

প্রথম রাত্রি তার নির্ব্বিঘ্নেই কাটিল।

দ্বিতীয় দিন স্বামী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মৃৎপাত্রে বায়সভোজ্য ক্ষীরোদক দিতেছেন, তিন মাসের শিশুপুত্রটিকে কোলে করিয়া অদূরে বসিয়া উদক্-দান দেখিতে-দেখিতে লক্ষ্মীর সহসা আশ্চর্য্য দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়া গেল—সে দেখিল, উদকাধারের উর্দ্ধস্থিত বায়ু যেন জৈবিক একটা আকার ধারণ করিতে-করিতে একখানা স্বচ্ছ অথচ সুস্পষ্ট মুখাবয়বে রূপান্তরিত হইয়া শূন্যে ভাসিতে লাগিল; আর সে মুখখানা—

লক্ষ্মী সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিল; ক্রোড়স্থ শিশু কাঁদিয়া উঠিল; পরক্ষণেই চোখ মেলিয়া লক্ষ্মী দেখিল মুখ অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইহার পর দিনমান নিরুপদ্রবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু লক্ষ্মীর প্রাণের উপর যে-ছায়াপাত হইয়াছিল সেটা মুছিল না।

সন্ধ্যা, অজ্ঞাতলোকের সমস্ত প্রচ্ছন্নতার কুহকপীড়ন লইয়া ঘনাইয়া আসিল, আবছায় অন্ধকারের দিকে ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেও ভয়ে লক্ষ্মীর গা ভারি হইয়া উঠিতে লাগিল;—পল্লী-আবাসের চতুর্দ্দিকের অনিবিড় বিস্তৃত জঙ্গল অন্ধকারের বাঁধনে একাকার হইয়া ক্রমে জমাট কঠিন হইয়া উঠিল; তার উর্দ্ধেই আকাশের খানিকটা নক্ষত্রের দুর্ব্বল আলোকে আর বাষ্পের আবরণে রহস্যগভীর দীর্ঘদেহ নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছের শ্রেণীবদ্ধ মাথাগুলি দুলিয়া-দুলিয়া পাতায় পাতায় একটা সির্ সির্ শব্দ উঠিতেছে—যেন কাদের কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ কথা। বাড়ীর উত্তর

কোণে ঘনপত্র বৃহদাকার একটি গাবগাছ—তাহার সর্ব্বাঙ্গে জোনাকি হাজারে হাজারে অদৃশ্য জীবের অসংখ্য চক্ষুর মত টিপ্ টিপ্ করিয়া নিবিয়া-নিবিয়া জ্বলিতেছে; আলোকের ঐটুকু স্পর্শে সেই স্থানের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আছে; সে যেন কি বলিতে চায়—কিন্তু না বলিতে পারিয়া প্রাণপণ ব্যাকুলতায় হাঁপাইতেছে।

লক্ষ্মীর স্নায়ুকেন্দ্র নিরতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়া এই নিঃশব্দ অন্ধকারের ভিতর হইতে গুপ্ত অথচ অবিশ্রান্ত একটি চঞ্চলতার আঘাত গ্রহণ করিতে লাগিল।—প্রত্যেক অলক্ষিত স্থানেই যেন একটি অতীন্দ্রিয় গতিবিধি চলিতেছে; কি একটা যেন গা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া আছে—সে ছায়া নয়, বস্তু নয়, অথচ যেন তা' ছায়া বস্তু দুই-ই; ঐ সে সরিয়া গেল, ঐ অগ্রসর হইতেছে, ঐ দেখা যায়, ঐ মিলাইয়া গেল—এম্নি একটা লুকোচুরি লক্ষ্মীর চোখের সাম্নে অবিরাম চলিতে লাগিল।

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে যাইয়া শ্বশ্রূর গা ঘেঁসিয়া বসিল। কিন্তু সেস্থান হইতেও ওদিক্‌কার শুইবার ঘরখানার ভিতর পর্য্যন্ত তাহার চোখে পড়িতেছিল। লক্ষ্মীর মনে হইল, সেখানেও একটা নড়াচড়া, চলাফেরা, উঁকিঝুঁকি চলিতেছে—ঘরের বদ্ধ বাতাসে যেন কার মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাসের তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। আর কোনো দিকে না চাহিয়া সুমুখের প্রজ্জ্বলিত বাতিটার দিকে লক্ষ্মী অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল।

রাত্রে খুব সতর্ক হইয়া সকলে শয়ন করিলেন।

মানুষ মনে করে, পরলোকের যে-স্তর পর্য্যন্ত সংসারিক বন্ধন-মায়ার আকর্ষণলীলা চলিতে থাকে তাহার গণ্ডী অতিক্রম করিতে মৃতাত্মা সহজে পারে না; সুতরাং আসক্তির দুর্ণিবার টানে তাহার পক্ষে নিকটতম প্রিয়তম জনের একান্ত সমীপবর্ত্তী হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অনেকগুলি তুক্ আছে—তাহারা নাকি মৃতাত্মাকে দূরে দূরে রাখে।

সে-রাত্রি ও পরের দিবাভাগটি অম্নিই কাটিল। কিন্তু চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীর মনে হইল বায়ুমণ্ডল যেন সেই অমানুষিক চঞ্চলতার তাড়নে চিড় খাইয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীর অন্ধকার যেন ঠিক অন্ধকার নয়—যেন বিশালপক্ষ একটা পক্ষী বাড়ীর এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ডানায় ঢাকিয়া গোপন ও অগণ্য আনাগোনার একটা ষড়যন্ত্রের উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে—সে যেন উঠি-উঠি করিতেছে, সে উঠিয়া গেলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ভগ্নস্তূপ ক্রিমির মত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে।

এম্নি ধারা ভয়ঙ্করের দুশ্ছেদ্য একটা মোহ আছে; সে যেন মন্‌টাকে ফাঁদে জড়াইয়া ফেলে। আবিষ্ট বন্দী মনের প্রাণান্তকর ছট্‌ফটানির শেষ হয় কেবল তখন যখন এই দুঃসহ শীতল আব্‌হাওয়ার মধ্যে সে মূর্চ্ছিতের মত এলায়িত শ্লথ অসাড় হইয়া আসে। লক্ষ্মীর মনও এম্নি বাঁধা পড়িয়াছিল—হঠাৎ স্বামীর খক্ খক্ কাশীর প্রচণ্ড শব্দে তাহার মন একটানে বন্ধনজাল ছিঁড়িয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ধক্ ধক্ শব্দে দুলিতে লাগিল। সে জোর করিয়া নিজেকে সবেগে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে ছেলের কাছে যাইয়া শুইয়া পড়িল।

নিকটেই আড়ালে স্বামী ও শ্বশ্রূ বসিয়া শ্রাদ্ধ-সম্পর্কীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, কিন্তু তবু লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিল না। অত্যল্পকাল পরেই সে ছেলেটিকে লইয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া শাশুড়ীর পাশে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কাশীশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বৌমা?

লক্ষ্মী কথা কহিতে পারিল না।

কাশীশ্বরী বলিলেন—অমন ক'রে চ'লে এলে যে?

লক্ষ্মী কষ্টের সহিত বলিল,—কিছু না, মা, অম্নি।

তাহার বুকের মধ্যে কি করিতেছিল তাহা সেই জানে—ঘোম্‌টার মধ্যেও তাহার চোখের দু'পাতা যেন এক হইতে চাহিল না।

লক্ষ্মীর এই সত্রাস পলায়ন অকারণ নহে।

ছেলের পাশে শুইয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল—ওদিক্‌কার খোলা জানালাটির ঠিক্ ও-ধারে আসিয়া কে যেন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবলি গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া-মারিয়া ঘরের ভিতর তাহাদেরই উপর দৃষ্টি ফেলিতেছে। লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইত জানালায় কেহই নাই; কিন্তু এই

নিদারুণ অনিশ্চিতকে ভালমন্দ যে-কোনো প্রকার সুনিশ্চিতে পরিণত দেখিবার মত দৃঢ়তা তার অবশ মনের ছিল না। আতঙ্কটা উত্তরোত্তর উৎকট হইয়া লক্ষ্মীর শ্বাসপ্রশ্বাসের রন্ধ্রপথটি চাপিয়া-চাপিয়া তাহাকে যেন অজ্ঞান করিয়া ঠেলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিল।

কাশীশ্বরী মনে মনে বুঝিলেন, বধূ ভয় পাইয়াছে। তিনি লক্ষ্মীর পিঠের উপর সস্নেহে হাত রাখিয়া বলিলেন,—শ্রাদ্ধটি না শেষ যাওয়া পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর এক্‌লা কোথাও থেক না, মা।

সীতাপতি শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন আলো। সেই রাত্রে সীতাপতিরই কণ্ঠের শব্দে লক্ষ্মীর ঘুম ছ্যাঁৎ করিয়া ভাঙিয়া গেল। লক্ষ্মী যেন শুনিল, সীতাপতি বাহির হইতে গভীরস্বরে ডাকিতেছেন, আলো? ঐ একটিবার মাত্র,—লক্ষ্মী ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল,—মা?

শাশুড়ী জবাব দিলেন,—কি, বৌমা?

—কে যেন খোকাকে ডাক্‌লে, শোননি?

—না, আমি ত শুনিনি, জেগেই আছি।

লক্ষ্মী বলিল,—আলো ব'লে ডাক্‌লে।

বাড়ীর অপরাপর সবাই শিশুকে খোকা বলিয়া ডাকে কেবল সীতাপতি ডাকিতেন আলো বলিয়া। লক্ষ্মীর কথা শুনিয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বরে অপরিমিত একটি উদ্বেলতা লক্ষ্য করিয়া কাশীশ্বরী উঠিয়া তেলের প্রদীপটি জ্বালিলেন এবং দ্বীপ হস্তে লক্ষ্মীর শয্যাপ্রান্তে যাইয়া শিশুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, শিশুরা যেমন ঘুমায় সেও তেম্‌নি নিশ্চিন্ত আরামে সুস্থ নিদ্রায় অভিভূত।

কাশীশ্বরী খোকার ও লক্ষ্মীর শিয়রে বসিয়া রহিলেন, সে-রাত্রি তাঁহাদের জাগিয়া কাটিল।

পরদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ একবার শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কাশীশ্বরী চম্‌কিয়া উঠিলেন; শিশুর চোখে জ্ঞানের ও ধারণাশক্তির অভাবের যে সহজ স্বচ্ছ সরল নিস্তেজ দৃষ্টি থাকে খোকার চোখে তাহা যেন নাই।—জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি তার সম্যক্ বিকশিত জাগ্রত কর্ম্মক্ষম হইয়া পৃথিবীর সঙ্গে শিশু আত্মাটির পরিচয় সম্পূর্ণ দিয়া গেছে, এম্‌নি তার সজ্ঞান দৃষ্টি। দেখিয়া কাশীশ্বরী যেমন বিস্মিত হইলেন তেম্‌নি ভীতও হইলেন, কিন্তু মুখে তিনি মনের ভয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না। সেই-দিনই তিনি গোপনে একটি মাদুলি সংগ্রহ করিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলেন।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল,—মাদুলী কিসের, মা?

কাশীশ্বরী নিস্পৃহস্বরে বলিলেন,—তুমি যে কাল ভয় পেয়েছিলে, বৌমা, তাই।

কথাটি ঠিক পরিষ্কার হইল না, কিন্তু লক্ষ্মী মনে মনে বুঝিল অকল্যাণকর একটি ভয়ের ছায়াপাত শাশুড়ীর প্রাণেও হইয়াছে। বুকটি তার হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

রাত্রের প্রথমভাগে লক্ষ্মীর চোখে ঘুম আসিল না। প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছিল। রাত্রির অন্ধকার যেন এই দুর্দ্দিনে তার অন্তরস্থ শূন্য ক্ষুধিত মহাগহ্বরটির মুখের আবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে আর পৃথিবীর কঠিন অকঠিন সমুদয় বস্তু বায়ুবেগে ক্ষয় হইয়া তাহারই মধ্যে হুহু শব্দে ঢলিয়া পড়িতেছে। দূরে কোথায় একটি কুকুর তারস্বরে চীৎকার করিয়া থামিয়া-থামিয়া কাঁদিতেছিল—সে-শব্দটা যেন আসন্ন অনিবার্য্য বিনাশের শঙ্কায় আতুরা ধরণীরই সবিরাম আর্ত্ত হা হা রব।

ঘরে দীপশিখাটি নাচিতেছিল, সে-দিকে চাহিয়া লক্ষ্মীর সহসা মনে হইল যেন কাহার রক্তাক্ত লেলিহান্ জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া বায়ুর স্তরপ্রান্ত লেহন করিতেছে। সে পাশ ফিরিয়া শুইল। শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে লক্ষ্মীর কখন ঈষৎ একটু তন্দ্রার ঘোর আসিয়াছিল---ঘোর ভাঙ্গিয়া হঠাৎ সে জাগিয়া দেখিল ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেছে এবং ঘোর অন্ধকারেও সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল কে যেন দ্বারের বাহির হইতে চৌকাঠের ফাঁক দিয়া হাত বাড়াইয়া ঘরের ভিতরকার মাটি হাত্‌ড়াইতেছে।

---মা, আলো!---বধূর ভীত চীৎকারে কাশীশ্বরী, 'কি হ'ল কি হ'ল' বলিতে শশব্যস্ত উঠিয়া বসিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন, দেখিলেন, বধূ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাতাটির মত হি হি করিয়া কাঁপিতেছে, তার চক্ষু মুদ্রিত, মুখ বিবর্ণ,

দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া বাজিতেছে। শিশু নিদ্রামগ্ন।

কাশীশ্বরীর অধীর জিজ্ঞাসার উত্তরে লক্ষ্মী বলিল,—ঐ ফাঁক দিয়ে কে হাত বাড়িয়ে মাটি হাতড়াচ্ছিল।—বলিয়া সে কম্পিতহস্তে চৌকাঠ দেখাইয়া দিয়া 'মাগো' বলিয়া বসিয়া পড়িল।

কাশীশ্বরী জানিতেন ভয় তাড়াইবার উপায় তর্ক নয়। কাজেই বধূকে কিছু না বলিয়া তিনি ছেলেদের ঐ ঘরে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা দু'ভাই আদি-অন্ত অবগত হইয়া একেবারেই হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহারা যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই—স্ত্রীলোকের দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সবই সম্ভব, বিভীষিকা দেখাও আশ্চর্য্য নয়। বাড়ীতে মৃত্যু ঘটিলে মানুষে ভয় পাইয়াছে এ কথা ইতিপূর্ব্বেও শোনা গেছে। তারপর তাঁহারা উপসংহারে বলিলেন—ও সেরে যাবে।

সারিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে। কাশীশ্বরী বা তাঁর ছেলেরা বুঝিতেই পারেন নাই যে, আতঙ্ক লক্ষ্মীর প্রাণে সময় সময় দম্‌কা হাওয়ার মত ছুটিয়া আসিয়া বহিয়া যাইত না—সেটি তার মস্তিষ্কের চারিপ্রান্ত জুড়িয়া অহরহ ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিতেছিল।···লক্ষ্মী দিবারাত্র বিভীষিকা দেখিতেই লাগিল—শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, চোখ বুজিলেই তাহার মনে হইত কে যেন ঘরের সহস্র ছিদ্র-পথে অসংখ্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কি যেন টানিয়া টানিয়া লইতেছে।

ষষ্ঠ দিনে সকলেই লক্ষ্য করিল যে, শিশুর দেহ একরাত্রেই যেন কাঠির মত শুষ্ক হইয়া গেছে। প্রাণপণে চুষিয়া অভ্যন্তরের সমস্ত রস বাহির করিয়া লইলে রসাল ফলটির যেমন আকৃতি হয় শিশুর সর্ব্বাবয়বের আকৃতি ঠিক্ সেইরূপ বিকৃত---মাথাটি ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ যেন নীরস হইয়া চুপ্‌সিয়া আয়তনে একেবারে অর্দ্ধেক হইয়া গেছে। কাশীশ্বরীও দেখিলেন, দেখিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; শিশুর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল বিশাল চক্ষুদুটির দিকে চাহিয়া কাশীশ্বরী ও লক্ষ্মীর বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল।---এত বড় মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে বুঝি দুটি ঘটিতে পারে না; চোখের উপর শিশুহনন চলিতেছে—অথচ ত্রিভুবনের কুত্রাপি তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই মানুষের জানা নাই, বাধা দিবার সাধ্য নাই, সান্ত্বনা নাই! হেতু যতই অনির্দ্দেশ্য হোক্ ফল সম্বন্ধে কাহারও মনে তিলমাত্র সংশয় রহিল না এবং হেতুটাকেও সাধারণ রোগ বলিয়া এমন দিনে কিছুতেই মনে হইল না। তাই নিরুপায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় কাশীশ্বরীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; তিনি অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রটিকে বুকে করিয়া লক্ষ্মী নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সে-রাত্রিতে কেহ কাহারও কাছছাড়া হইল না। স্তিমিত প্রদীপটিকে ঘিরিয়া বসিয়া একটি অজ্ঞাত ত্রাসে সবাই নিঃশব্দ—রাত্রি নীরব, মানুষের কণ্ঠ নীরব।

লক্ষ্মীর আর্ত্তনাদে সহসা সেই কঠিন নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া মায়াজগৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল; কাশীশ্বরী কাঁপিয়া উঠিয়া শিশুর বুকের উপর হাত রাখিলেন; দেখিলেন নিঃশেষিততৈল শিশু-দীপটি নিভিয়া গেছে।—

লক্ষ্মী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল তখন প্রকৃতির অপ্রাকৃতিক সমস্ত সংক্ষোভ শান্ত হইয়া গেছে।

শিশু-বিধবা

শ্রী কৃষ্ণধন দে

তুই কেন মা কাঁদিস্ এত
আমার দিকে চেয়ে ?
আমায় দেখে শিউরে উঠিস্
চোখের জলে নেয়ে ?
সকল কথা লুকাস্ কেন,
ধরিস্ কেন ছল্,
কিসের ব্যথা বাজ্‌ল বুকে
বল্ না মাগো বল্ ?

শ্যাম্‌লী গা'য়ের বাছুর সেদিন
গেছেই যদি মারা,
তাইতে কি মা ঘরের কোণে
কাঁদিস্ অমন ধারা ?
পুষিটা হায় ! পালিয়ে গেছে,
কাঁদিস্ বুঝি তাই ?
সে বারে সে পালিয়ে ছিল,
তুই ত কাঁদিস্ নাই ?

দিদি ত মা শ্বশুর-বাড়ী
সেদিন গেল চ'লে,
এই মাসেরি শেষের দিকে
আস্‌বে গেছে ব'লে ;
তবে কেন কাঁদিস্ মা তুই
সত্যি ক'রে বল্,
দেখ্‌লে আমায়, চোখের কোণে
আস্‌ছে ভ'রে জল !

আর কেন মা দিস্ না আমার
সিঁদুর সিঁথির 'পরে ?
লাল পেড়ে ওই নতুন সাড়ী
রাখ্‌লি তুলে' ঘরে ?

সেদিন মাগো দুপুর বেলায়
দিলি না চুল বেঁধে',
হাতের নোয়া খুল্‌লি আমার
অমন ক'রে কেঁদে।

কাল্‌কে মাগো, "বকুল ফুলের"
বাসর-ঘরের কাছে,
যেতেই মোরে দিলে নাক,
ছুঁয়েই ফেলি পাছে !
বল্‌লে সবাই মুখ খিঁচিয়ে
"তুই এখানে কেন ?"
হাত ধরে মোর তাড়িয়ে দিলে
শেয়াল কুকুর যেন !

"বকুল ফুলের" বিয়ে, যে মা,
"বকুল ফুলে"র বিয়ে,
কেমন ক'রে শেষ হো'ল যে
আমায় ফাঁকি দিয়ে !
মুখ নেড়ে' সব বল্‌লে আমায়
"সব্ বিধবা মেয়ে—
অলুক্ষণে হাস্‌ছে দেখ,
স্বামীর মাথা খেয়ে—"

আমার বিয়ে পড়্‌ছে মনে
স্বপন দেখার মত,
সেই যে মাগো বাজ্‌ল সানাই,
লোকেরি ভিড় কত !
সেই ও-পাড়ার মুক্ত-দিদি
সাজিয়ে দিলে মোরে,
অনেক রাতে মালা-বদল
ঘুমের ঘোরে ঘোরে !

সেই যে মাগো, চিনি নাক
কাদের ছেলে এসে,
পাল্কী চড়ে' চল্‌ল নিয়ে
আমায় তাদের দেশে ;
সব অচেনা লোকের মাঝে
কান্না কেবল আসে,
তো'রি মাগো, মুখটি শুধু
চোখের 'পরে ভাসে !

বল্‌লি সেদিন সেই ছেলেটি
হঠাৎ গেছে মারা ;
আছ্‌ড়ে কি তাই পড়্‌লি মাগো,
কেঁদেই হলি' সারা !
তার জন্যে কান্না মা তোর
বুঝ্‌তে পারি হায় !
আমায় দেখে কাঁদিস্ কেন
সেইটে বোঝা দায় !

সিঁথেয় সিঁদুর না দিলে মা
তাই বিধবা হয় ?
সিঁদুর যদি দিস্ মা গো তুই,
তা' হলে ত নয় ?
হাতের নোয়া ভাঙলে যদি
অলুক্ষণে হই,
পর্‌লে আবার হাতের নোয়া
আর বিধবা নই ?

অমন ক'রে কাঁদিস্ না মা,
আমায় চেপে বুকে,
অমন ক'রে চোখের জলে
খাস্‌নি চুমু মুখে ;
খেল্‌তে আমায় ডাক্‌ছে মুটু
পুতুল খেলায় তা'র,
লক্ষ্মীটি মা অমন ক'রে
কাঁদিস্ না ক আর !

ধ্রুবতারা

শ্রী সীতা দেবী

(১)

সন্ধ্যা হইতে তখনও কিছু দেরী আছে, তবে রাজধানীর দুই একটি গলির মধ্যে এখনই যেন রাত্রির ছায়া আসিয়া নামিয়াছে। এই রকম একটি গলির ভিতর দিয়া একটি দীর্ঘকায় যুবক হন্‌হন্ করিয়া চলিতেছিল। তাহার কাপড়, জামা, চাদর সবই মলিন ও ছিন্ন, কিন্তু তাহার মুখশ্রী দেখিলে সে যে ভদ্র-লোকের সন্তান, সেবিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ থাকে না। মুখে ইহারই মধ্যে দারুণ দুশ্চিন্তার চিহ্ন এমন গভীর দাগ কাটিয়া গিয়াছে যে, একেবারে কাছে আসিয়া না দেখিলে বুঝিবার উপায় থাকে না যে, সে যুবক কি প্রৌঢ়।

গলির প্রায় সব শেষের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। সদর দরজা বন্ধ। অন্যান্য দিন জীর্ণ কপাটের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া কয়েকটি আলোর ফোঁটা বাহিরের অন্ধকারের গায়ে জরীর বুটীর মতন ঝিক্‌মিক্ করে আজ কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নাই। যুবক কপাটে আঘাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—"চারু, চারু।"

কোন সাড়া শব্দ নাই। যুবক গলার স্বর আর একটু উচ্চে তুলিল, দরজায় আঘাতও আর একটু জোরে করিয়া আবার ডাকিল—"মা, ওমা।" এইবার ভিতর হইতে দরজাটা হড়াৎ করিয়া খুলিয়া গেল। যুবক অতি সাবধানে ভিতরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, "আলো জ্বালেনি কেন মা? যা অন্ধকার!"

চাপা গলায় গর্জ্জন করিয়া মা বলিলেন, "আলো জাল্‌ব কি আমার হাড় ক'খানায় আগুন দিয়ে? মিন্‌সে নিজে ম'রে জুড়িয়েছে, আমাকে রেখে গেছে তিল তিল ক'রে দগ্‌ধে মর্‌বার জন্যে।"

পরলোকগত পিতার উল্লেখ এমন শ্রদ্ধার সহিত হইতে দেখিয়া ছেলেটি আর কোনো কথা না বলিয়া হাৎড়াইতে হাৎড়াইতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল। দোতলার ছোট একটা ঘরের কোণে একটা মোমবাতির টুক্‌রা জ্বলিতেছে। তাহারই কাছে ছেঁড়া-ময়লা বিছানায় একটি তেরো চৌদ্দ বৎসরের ছেলে শুইয়া। পাশে বসিয়া একটি আট দশ বৎসরের মেয়ে মোমবাতি গলিয়া তলায় যে চাপ বাঁধিয়া যাইতেছে সেইগুলি সংগ্রহ করিতেছে।

যুবক ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি কর্‌ছিস্ রে চারু?"

চারু বলিল, "নূতন বাতি তৈরি করব ব'লে মোম নিচ্ছি।"

"নূতন বাতি তৈরি কর্‌বি? মস্ত লোক দেখ্‌ছি যে তুই! কি ক'রে কর্‌বি?"

মেয়েটি বলিল, "ওমা, তুমি জাননা বুঝি দাদা? ভারি ত শক্ত! সেই যে ছোড়্‌দার পায়ের মলমের বাটিটা সেইটাতে এই টুক্‌রোগুলো রেখে উনুনের পাশে রেখে দেব, তারপর গ'লে গেলে বেশ মোটা ক'রে ন্যাকড়া পাকিয়ে তার মধ্যে দিয়ে বাটিটা উনুনের ধার থেকে সরিয়ে নেব। জমে গেলে চারপাশ দিয়ে ঠুকলেই বেশ বাটির মতন গোল মোমবাতি বেরিয়ে আস্‌বে।"

যে ছেলেটি বিছানায় শুইয়া ছিল, সে এই সময় পাশ ফিরিয়া নিদ্রাজড়িত স্বরে বলিল, "দাদা, আমার জন্যে কিছু খাবার এনেছ?"

যুবক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কেনরে, তুই এখনও কিছু খাস্‌নি নাকি?"

তাহাদের মা ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে আবার ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "কি খাবে শুনি? ওবেলার বাসি ভাত ছিল, তাই চারু খেয়েছে, আর তোর জন্যে আছে। এতটুকু বার্লির গুঁড়ো পড়ে ছিল, তাই সেদ্ধ ক'রে দিলাম, তা নবাবপুত্রের মুখে রুচ্‌ল না, তিনি আঙুর বেদানা খাবেন।"

যুবকের মুখ বেদনায় বিকৃত হইয়া উঠিল। সে কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘর হইতে মা বলিলেন, "কোথা যাস্ নরু, খাবি না?"

নরেন বলিল "ধীরু খায়নি, আমি আর কি খাব? চারু তোর তৈরি একটা মোমবাতি জ্বাল্‌ত, নীচে এসে দরজা বন্ধ ক'রে যা, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

চারু বাতি জ্বালিয়া দিল, নরেন আস্তে আস্তে নামিয়া গেল। গলির মুখের কাছে দাঁড়াইয়া সে একবার আকাশের দিকে তাকাইল, কলিকাতার ধূমাচ্ছন্ন আকাশ তাহাকে কোনই সান্ত্বনার কথা কহিল না। সে চলিতে আরম্ভ করিল।

এবার সে যে বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার অঙ্গেও দারিদ্র্যের চিহ্ন তাহার নিজের বাড়ী অপেক্ষা কম পরিস্ফুট নয়। তবে নীচে রান্না ঘরে হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে, রান্না চড়িয়াছে, এক পাশে বসিয়া তরকারি কুটিতেছে একটি মেয়ে। তাহার বয়স চৌদ্দও হইতে পারে, আঠারও হইতে পারে ঠিক করিয়া বলা শক্ত। পরণের কাপড় মলিন, ছিন্ন, গায়েও কোন গহনার চিহ্ন নাই, হাতে দুগাছি হাতীর দাঁতের চূড়ী, বহুদিন ব্যবহার করার জন্য সেগুলির রং ম্লান হইয়া গিয়াছে। মেয়েটিকে সুশ্রী লাগে না, কিন্তু সে কুৎসিতও নয়। আদর-যত্নে থাকিলে ও যৌবনের উপযোগী বেশভূষা করিতে পাইলে তাহাকে দেখিতে যে কিছুই মন্দ হইত না, সে বিষয়ে দর্শকের সন্দেহ থাকে না।

নরেন রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "সতীশ কোথায় সরযূ?"

মেয়েটি মুখ তুলিয়া বলিল "ওমা, আপনি কখন এলেন? আমিত শুনতে পাইনি? সদর দরজাটা খোলাই রয়েছে বুঝি?"

নরেন বলিল, "হ্যাঁ খোলাইত দেখ্‌লাম। বেশ সাবধান মানুষ তোমরা, আমি না হ'য়ে যে কোনও চোর

ডাকাত হ'লেও বেশ স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়তে পারত। এ রকম ক'রে দরজা খুলে রেখো না।"

মেয়েটি একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "চোর ডাকাত আসবে কিসের লোভে এখানে? তাদের কষ্টই সার হবে। থাকবার মধ্যেও কয়েকটা ছেঁড়া কাপড় আর দু চারটে ভাঙ্গা বাসন। আর একটা হাঁড়িতে সের দুই মোটা চাল আছে।"

যুবক কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। তাহার পর বলিল তবু শুধু শুধু চোর বা বদমাইসের দর্শন লাভ করবার সুবিধা না রাখাই ভাল। তারা ত আর তোমার হাঁড়ির খবর আগে জেনে আসবে না? কিন্তু সতীশ কোথায় তা ত বল্‌লে না?"

মেয়েটি বলিল, "তিনি আর বাড়ী থাকেন কখন? কাজের চেষ্টায় বেরিয়েছেন। শ্যামবাজারে না কোথায় একটা ছেলে-পড়ানোর কাজের সন্ধান পেয়েছেন, সেইটাই জোটে কিনা তাই দেখতে গেছেন।"

নরেন বলিল, "কেন সে অফিসের কাজটা তার হয়নি নাকি? আমি ত মনে ক'রে ব'সে আছি যে সে রোজ অফিস যাচ্ছে।"

সরযূ বলিল, 'আপনি আমাদের এমনি খবরই রাখেন বটে। তাঁর কাজ হ'ল কবে যে, যে যাবেন? এ ক'দিন যা আমাদের কাট্‌ছে! খাওয়া, পরা, থাকার সব দুঃখ আমার গায়ে স'য়ে গিয়েছে, কিন্তু যে সে এসে যখন বাড়ী চড়াও হয়ে টাকার তাগাদা করে, আর দিতে না পারলে মুখের উপর যা খুসি ব'লে যায়, তখন আমার সত্যি ইচ্ছে ক'রে বাড়ীঘর ছেড়ে যে দিকে দুচোখ যায় পালিয়ে যাই।"

নরেনের পাংশু মুখও লাল হইয়া উঠিল, সে একটু-ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,"দুনিয়ায় তোমাদের চেয়েও দুভাগার অভাব নেই সরযূ। তোমার তবু রাগ হয়, আমার সে অধিকারও আর নেই। ঘরে সবাই না খেয়ে মরছে, রুগ্ন ভাইটা গলা শুকিয়ে প'ড়ে আছে। যদি দুবেলা জুতো মেরেও আজ কেউ আমায় টাকা ধার দেয় ত আমি নিই। যাক, তুমি নিজের কাজ কর, অমি চল্‌লাম।"

সরযূ বলিল, "দাদা এখুনি আসবেন। পাঁচ মিনিট বস্‌লেই তা'র সঙ্গে দেখা হ'ত।"

নরেন বলিল, "আমাকে দেখে সে খুসি হবে না। আমি কেন এসেছিলাম, তা কি এখনও বোঝনি?"

সরযূ একটু ইতস্তত করিয়া নীচুগলায় বলিল, "না।"

নরেন তাহার সত্য গোপন করিবার প্রয়াস দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, না বুঝে থাকত ভালই। সতীশ এলে বোলো, আমি এসেছিলাম, সে ঠিক বুঝবে কেন। তার জন্যে যে অপেক্ষা করিনি তাতে সে দুঃখিত হবে না।"

সরযূ একেবারে অন্য কথা পাড়িয়া বসিল। নরেন সতীশের কাছে যে টাকার চেষ্টায় আসিয়াছিল কত দুঃখে, তাহা বুঝিতে তাহার বাকি ছিল না। চাহিতে তাহার যত বেদনা, সতীশের না দিতে পারার বেদনা তাহার অপেক্ষা কিছু কম হইবে না। কিন্তু উপায় নাই। দুটি পরিবারই দারিদ্র্য-রাক্ষসীর কবলে এমন ভাবে গিয়া পড়িয়াছে, যে বন্ধুত্ব স্নেহ, লজ্জা, ভদ্রতা, কিছুই তাহাদের রক্ষা করিয়া চলিবার উপায় নাই।

সরযূ বলিল, "ধীরুর জন্যে কিছু চিঁড়ে দিয়ে দেব? চিঁড়েভাজা অসুখের মধ্যেও খেতে পারে।"

নরেন বলিল, "তোমাদের কম পড়বে না?" সরযূ বলিল, "না না, কম কেন পড়বে, অনেক আছে। আপনি দাঁড়ান, আমি নিয়ে আস্‌ছি।" মিনিট দুই তিনের মাধ্যই সে ফিরিয়া আসিল, পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বাঁধা একটি ছোট পুঁটলি নরেনের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "এই যে।"

নরেন পুঁটলি পকেটের মধ্যে রাখিয়া, দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিল। আর কোনোও ছুতায় যদি কিছুক্ষণ থাকা যায়। তাহার দারিদ্র্যক্লিষ্ট অন্ধকার জীবনাকাশে এই মেয়েটিই তারার মতন ফুটিয়াছিল, ইহার সান্নিধ্যটাই ছিল তাহার একমাত্র আনন্দের সম্বল। জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সরযূ, তোমার পড়াশুনো বুঝি ভাঙ্গা হাঁড়ি-কড়ার তলায় একেবারে তলিয়ে গেল?"

সরযূ বলিল, "না তলিয়ে আর করে কি? বিনা পয়সায় কেউ পড়াবে না,আর ভাঙ্গা হাঁড়িতে ভাত না রাঁধলে কেউ খেতে পাবে না। কাজেই বাড়ীর সবাইকার খাওয়াটা

যখন আমার পড়ার চেয়ে দরকারি তখন খাতা বই ফেলে হাঁড়ি কুঁড়ি নিয়েই বসেছি।"

পাশের ঘর হইতে নারীকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাত নাম্‌ল নাকি সরযূ?"

"এই যে নাম্‌ল ব'লে" বলিয়া সরযূ হাতা-বেড়ী লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নরেন লজ্জিত হইয়া বলিল "এই দেখ, শুধু শুধু তোমার কাজ মাটি করছি।" সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

বড় রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া সে একটু ভাবিয়া লইল। শূন্য হাতেই বাড়ী ফিরিবে না, আর একটু ঘুরিয়া দেখিবে। ধীরুর শীর্ণ মুখ মনে করিয়া ফিরিয়া যাইতেও তাহার মন উঠিতেছিল না, কিন্তু যাইবেই বা সে কোথায়? বিশ্ব-জোড়া লোক তাহারই কাছে টাকা পাইবে, সে কাহারও কাছেই কি কিছু পাইবে না?

ভাবিয়া দেখিল দুইটি মাত্র লোক তাহার কাছে টাকা ধারে। এক সতীশ, সে তাহারই মতন অভাবগ্রস্ত, তাহার নিকট টাকা আদায় করিবার চেষ্টা নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর একটি মানুষ আছে, জগতে তাহার অভাব মাত্র অভাবের,' কিন্তু এইজন্যই সে অন্যের অভাবকে একেবারে আমল দিতে চায় না। তাহারই কাছে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, "নরেন যে! রাত্তিরে চলেছ কোথায়? এস না, সাম্‌নের রেস্তরাঁতে এক পেয়ালা চা খেয়ে যাবে।"

ক্ষুধায় নরেনের পা টলিতেছিল; চায়ের মতন সৌখীন পানীয় তখন তাহার প্রয়োজন ছিল না। তবু ইহাও যথালাভ ভাবিয়া সে বন্ধু অমরের সঙ্গে সঙ্গে রেস্তরাঁর ভিতরে গিয়া বসিল। অমরের বুদ্ধি কিছু ছিল, সে চায়ের সঙ্গে চপ্‌ কাট্‌লেট প্রভৃতি অনেক কিছু ফরমাশ করিয়া বসিল। ধীরুর মুখ একবার নরেনের মনে পড়িল, কিন্তু সে না খাইলেই কি ধীরুর পেট ভরিবে? বরং সে কিছু খাইয়া শরীর-মনের শক্তি একটু ফিরিয়া পাইলে ধীরুর কাজে লাগিতে পারে।

অমর বলিল, "চপের মধ্যে কি এমন দার্শনিকতত্ত্ব পেলে হে? একেবারে যে তন্ময় হ'য়ে ভাবতে ব'সে গেছ?"

নরেন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "যারা আসল 'জিনিয়াস' তাদের কি আর বড় উপলক্ষ্যের দরকার হয়? কেট্‌লির নল দিয়ে ধুঁয়ো বার হচ্ছে দেখেই তারা ট্রেন আবিষ্কার ক'রে বসে।"

অমর বলিল, "তা বটে, কিন্তু চপ্‌টা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

নরেন ভাবনা রাখিয়া আহারে মন দিল। অমর তাহার কানের কাছে বসিয়া অনর্গল বকবক করিয়া চলিল, তাহার কতক বা নরেনের কানে গেল, কতক বা গেল না।

আহারাদি শেষ করিয়া তাহারা যখন বাহির হইয়া আসিল, তখনও রাত বেশী গভীর হয় নাই। নরেনের বন্ধু শীঘ্রই নিজের কাজে চলিয়া গেল, নরেন রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিল, সে বাড়ী ফিরিবে, না, অভয় নন্দীর সন্ধানেই যাত্রা করিবে। বাড়ী ফিরিবার উৎসাহের তাহার কোনোই কারণ ছিল না, আলো বাতাসহীন ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে সুখনিদ্রার সম্ভাবনাও খুব বেশী ছিল তা বলা যায় না। কিন্তু অভয় নন্দীর কাছে গেলেই বা লাভ হইবে কি? স্বভাব মরিলেও যায় না বলিয়া বাংলা ভাষায় প্রবাদ আছে, কাজেই বাঁচিয়া থাকিতেই কি নন্দীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে? কিন্তু কোনো চেষ্টারই ত্রুটি রাখিবে না স্থির করিয়াই নরেন পথে বাহির হইয়াছিল, সুতরাং ভাবনায় বেশী সময় খরচ না করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল।

অভয় নন্দীর সদর দরজা সন্ধ্যা হইতে না হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। তবে দুতলার একটি ছোট জান্‌লা খোলা থাকে, সেইখানে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিলে কর্ত্তা ঘরে আছেন কিনা তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াই নরেন লক্ষ্য করিল যে সে জান্‌লাটিও বন্ধ। তবু দরজায় বার কতক ঘা না দিয়া যাইতে তাহার মন উঠিল না।

কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিবার পর ভিতর হইতে কাংস্যকণ্ঠে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

নরেন বলিল, "অভয়বাবু বাড়ী আছেন ?" সেই গলার স্বরেই উত্তর হইল, "বাবু বাড়ী নেই, আরো ঘণ্টা দুই পরে আস্‌বেন।"

নরেন আবার পথে হাঁটিতে সুরু করিল। তাহার সঙ্গে ঘড়ি ছিল না, কাজেই পাঁচ মিনিটকে তাহার কখনও আধ ঘণ্টা বোধ হইতে লাগিল, কখনও বা আধঘণ্টাকেই পাচ মিনিট বোধ হইতে লাগিল। পথে পথে অকারণে একটা মানুষকে ঘুরিতে দেখিয়া পাহারা-ওয়ালা, চায়ের দোকানের ম্যানেজার পথের পথিক সকলেই যেন একটু সন্দেহাকুল চোখে তাকাইতে আরম্ভ করিল। নরেনের অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল, দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, বাড়ীই ফিরিয়া যাইবে না কি।

নিকটের কোনো একটা স্কুলের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। নরেন প্রথম কখন যে অভয় নন্দীর বাড়ী গিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার তাহার কোনো উপায় ছিল না, তবু আন্দাজে সে স্থির করিল আটটার সময়ই সে গিয়া থাকিবে। এখন গেলে হয়ত গৃহস্বামীর দেখা মিলিলেও মিলিতে পারে। না মিলিলেও আর তাহার পথে পথে ঘুরিবার সাধ্যি ছিল না, শারীরিক শ্রান্তি তাহার মনের অশান্তির তাগিদকেও অতিক্রম করিয়া তাহাকে ক্রমাগত ঘরে ফিরিতে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

পাঁচ মিনিট জোরে জোরে পা চালাইয়া আসিয়া সে অভয় নন্দীর বাড়ীর সাম্‌নে পৌছিল। তাকাইয়া দেখিল দোতলার ছোট জান্‌লাটি খোলাই আছে। দরজায় সজোরে আঘাত করিয়া সে ডাকিল, "অভয়বাবু!"

দরজাটা খোলাই ছিল, নরেনের হাতের ঠেলায় সেটা হড়াং করিয়া খুলিয়া গেল। অভয় নন্দীর বাড়ীতে এহেন ঘটনা বোধ হয় এই প্রথম। বার-পঁচিশ ধাক্কা না মারিলে এবং চীৎকারে পাড়াপ্রতিবেশীর ঘুম এবং আহ্বানকারীর গলা না ভাঙ্গিলে এবাড়ীর দরজা সন্ধ্যার পর কেহ কখনও খোলাইতে পারে নাই। সেই দরজা এমনভাবে খুলিয়া যাওয়াতে নরেন বেশ খানিকটা অবাক হইয়া গেল, এবং দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল তাহার ভিতরে ঢোকা উচিত কি না। ভিতরে অন্ধকার, কোন সাড়া শব্দও নাই।

মিনিট দুই ইতস্তত করিয়া নরেন ঢুকিয়া পড়িল। অভয় নন্দীর সংসারে মানুষের মধ্যে তিনি এবং দুইটি বৃদ্ধা নারী। অতি বৃদ্ধাটি তাঁহার জননী, অন্যটি ঝি। সে সারাদিন থাকিয়া বাড়ীর রান্নাবান্না, বাসন মাজা, বাজার করা প্রভৃতি সব কাজই করে, রাত্রে বাড়ী চলিয়া যায়। সুতরাং ভিতরে ঢুকিয়া কাহারও সাড়াশব্দ বা চিহ্ন না পাইয়া নরেন বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না। ঝি নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাড়ী গিয়াছে। বাড়ীর বৃদ্ধা গৃহিণী চোখেও দেখেন না, কানেও শোনেন না, তিনি এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিতেছেন। কিন্তু অভয়বাবু থাকিতে তাঁহার বাড়ীর দরজা রাত্রিকালে খোলা, এ বড় আশ্চর্য্য। আর তিনি যদি বাড়ীতে নাই থাকেন, তাহা হইলেই বা দরজা খোলা কেন ?

ভাবিতে ভাবিতে নরেন দোতলায় উঠিয়া আসিয়াছিল। অভয় নন্দীর ঘরের ভিতরও আলো নাই, কিন্তু দরজা একটুখানি খোলাই রহিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল। পকেট হাতড়াইয়া দেখিল একটা দেশলাইয়ের বাক্স তখনও পকেটে বিরাজ করিতেছে। তাহার সিগারেট খাইবার অভ্যাসটা খুব বেশীই ছিল এককালে, কিন্তু পয়সার অভাবে এখন আর সিগারেট তাহার জুটিত না, কেবল দেশলাইয়ের বাক্সটাই অকারণে তাহার জামার পকেটে ফিরিত।

দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া সে ফশ করিয়া একটা কাঠি জ্বালিল। ঘরের ভিতরের জমাট অন্ধকার আলোর আঘাতে নিমেষে টুটিয়া যাইতেই, নরেন ভয়ানক চম্‌কাইয়া একলাফে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেশলাইয়ের কাঠি তখনই পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল, কিন্তু আর একবার আর একটা কাঠি জ্বালাইবার সাহস সে আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। ঘরের ভিতরের দৃশ্যটি ঐ দুই তিন মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার স্মৃতি-পটে কাটিয়া কাটিয়া যেন বসিয়া গেল।

ঘরের মেজেতে জিনিষ পত্র, কাগজ বই চারিদিকে ছড়ানো। ভাঙা টেবিলটা তাহার উপরের পুরানো

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা লইয়া পা উপর দিকে করিয়া উল্‌টাইয়া পড়িয়া আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা খোলা ক্যাশবাক্স দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া একটি মানুষ পড়িয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন, দুই চোখ খোলা, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি নাই।

ব্যাপার বুঝিতে নরেনের কিছু মাত্রও দেরি হইল না। অভয় নন্দীর ধনের খ্যাতি এবং তাহার কৃপণতার অখ্যাতি কলিকাতায় সকল চোর এবং গুণ্ডারই জানা ছিল। কেবল মাত্র অতিরিক্ত সাবধানতায় এতকাল সে ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজ কোন্ ছিদ্রপথে শনি প্রবেশ করিয়া একসঙ্গে দুইই হরণ করিয়া লইয়া গেল, নরেন ভাবিয়াও পাইল না। রাত্রি এমন বেশী কিছু নয়, অল্পভাড়ার বাড়ী বলিয়া, বাড়ীখানি ভদ্রপাড়ায় নয়, তবু চারিদিকে মানুষ ত আছে? একটা মানুষের প্রাণবধ করিয়া কি এমনই নিঃশব্দে পলায়ন করা যায় যে, কেহ তাহা জানিতেও পারিল না?

কিন্তু ভয়ে ও উত্তেজনায় তাহার পা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। সে আর দেরি না করিয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া হুড়মুড় করিয়া নীচে নামিয়া পড়িল এবং একছুটে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, লোকজন বড় কেহ কোথাও নাই। হন্‌হন্ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল, নিহত বৃদ্ধের মূর্ত্তি যেন পিছন হইতে তাহাকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিল। তাহাদের পরিবারের সহিত নন্দীর বিবাদ বহু দিনের এবং তাহা সকলেরই জানা। এ হেন সময় নন্দীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাহাকে পথে দৌড়াইতে দেখিলে লোকের মনে প্রথমেই যে কি সন্দেহ হইবে তাহা বুঝিতে নরেনের বাকি ছিল না।

গলি প্রায় ছাড়াইয়া আসিয়াছে এমন সময় একজন লোক হুম্‌ড়ি খাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। নরেন ভয়ে একেবারে দশবারো হাত ছিট্‌কাইয়া গিয়া একটা ল্যাম্প পোষ্ট ধরিয়া কোনোক্রমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। যে লোকটি তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল সে বলিয়া উঠিল, "আরে নরেন যে! আজ ফিরে ফিরে কেবল তোমারই দেখা মিল্‌ছে। এত রাতে এখানে কি মনে ক'রে? নন্দীর সন্ধানে এসেছিলে বুঝি, মিল্‌ল কিছু?"

অমরের কথায় অস্ফুট স্বরে "না" বলিয়াই নরেন একরকম দৌড় দিল। প্রায় আধমাইল পথ এই রকম দ্রুত গতিতে চলিয়া সে শেষে একেবারে শ্রান্তিতে অভিভূত হইয়া ফুটপাথের উপর গড়াইয়া পড়িল। একটা ঔষধের দোকানের সিঁড়িতে ঠেস দিয়া কিছু পরে সে উঠিয়া বসিল। মাথার ভিতর তখনও যেন তাহার ঝড় বহিতেছে। এ তাহার হইল কি? তিন ঘণ্টা আগে সে যখন পথে বাহির হইয়াছিল, তখন দারিদ্র্য ছিল তার একমাত্র দুঃখ। কিন্তু কিছুমাত্র অপরাধ না করিয়া সে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফেরারী আসামীর স্থানে আসিয়া পৌঁছিল কি করিয়া? নন্দীর খুন এতক্ষণ নিশ্চয়ই জানাজানি হইয়া গিয়াছে, না হইলেও আর রাত্রিটুকু শেষ হওয়ার মাত্র অপেক্ষা। সে যে সন্ধ্যারাত্রে একবার নন্দীর খোঁজে গিয়াছিল তার সাক্ষ্য অনেকেই দিতে পারিবে, অন্ততঃ বুড়ীঝি ত দিবেই। সে নরেনের গলার স্বর চিনে, এবং সদর দরজার কপাট দুটি ছিদ্র পথে সকল আগন্তুককে দেখিয়া রাখিবার হুকুমও তাহার উপর ছিল। সাড়ে দশটার সময় গলির মুখে অমর তাহাকে দেখিয়াছে, এবং নরেনের চেহারা নিশ্চয়ই তখন প্রকৃতিস্থ দেখায় নাই! সুতরাং পুলিশ হইতে আরম্ভ করিয়া সব মানুষেই এই হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে তাহাকে নিঃসংশয়িতরূপেই জড়িত করিবে। নরেনের কপাল বাহিয়া দর-দর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল, সে এখন করিবে কি, যাইবে কোথায়?

পলায়ন ছাড়া তাহার নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু সে যে কপর্দ্দকহীন, নিঃসম্বল। আর তাহার সহায়হীন বিধবামাতা, ছোট ভাইবোন? তাহাদেরই বা উপায় হইবে কি? পলায়ন না করিলেও আর সে তাহাদের কোনো কাজে আসিবে না? ফাঁসীর আসামীর কাহাকেও সাহায্য করিবার কোনো পথ ত থাকিবে না? ভগবান তাহাদের দেখিবেন।

নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। মা ভাই বোনের সঙ্গে আর

একটি তরুণ মুখ তাহার মনে পড়িল। সরযূর মুখ মনে হইতেই তাহার বুকের ভিতরটা ব্যথায় টন্-টন্ করিয়া করিয়া উঠিল। এই শেষ। জীবনে আর কোনো দিন তাহাকে চোখেও দেখিবে না, দৈবগতিকে যদি কখনও দেখা হয় তাহা হইলেও সরযূর কাছে গিয়া দাঁড়াইবার, কথা বলিবার, অচির ভবিষ্যতে তাহাকে নিজের একান্ত করিয়া পাইবার অধিকার এ জন্মের মতন তাহার গেল, তাহা আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই।

মাতালের মতন টলিতে টলিতে সে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে পালাইতে হইবে, আজ রাত্রেই, কাহাকেও না জানাইয়া, কাহারও জানিবার পথ না রাখিয়া, কিন্তু কি উপায়ে? মাথার ভিতর তাহার যেন কামারে হাতুড়ি পিটাইতেছে মনে হইতে লাগিল। চিন্তা না করিয়া উপায় নাই, কিন্তু চিন্তা করিয়াই বা উপায় পাওয়া যায় কই।

তাহাদের বাড়ী যে-পাড়ায়, তাহার পা দুইটা তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহাকে সেই দিকে আনিয়া ফেলিয়াছিল। সরযূদের বাড়ীর কাছে আসিতেই কে যেন অদৃশ্য হাতে তাহাকে প্রবল বেগে সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার গৃহের দিকে টানিতে লাগিল। আর একবার শুধু চোখের দেখা দেখিয়া যাওয়া। তাহার সম্মুখে চির অন্ধকার রাত্রি; পথ চলিবার মতন একটু খানি আলোর শিখা যদি সে সংগ্রহ করিতে যায় তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি নাই।

জীর্ণ দরজায় ছিদ্র পথে তখনও প্রদীপের মৃদু রশ্মি দেখা যাইতেছে। ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া নরেন ডাকিল, "সরযূ সরযূ।"

সরযূ তখনও নীচে রান্নাঘরে বাসন মাজার কাজে ব্যস্ত ছিল। গলার স্বর চিনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। অকৃত্রিম আনন্দের হাসিতে সারা মুখ ভরিয়া বলিল, "আপনি গুন্‌তে জানেন নাকি?"

নরেন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তোমাদের বাড়ী আসবার জন্যে কি গুন্‌তে জান্‌বার দরকার হয়?"

"বাড়ী আসবার জন্যে নয়, বাড়ী এলে কিছু লাভ হবে, সেটা জান্‌বার জন্যে? কিন্তু আপনার চেহারা অমন হ'য়ে গেল কেন? না খেয়ে তখন থেকে পথে পথে ঘুরছেন বুঝি?"

"না, সারাক্ষণই পথে ঘুরিনি। কিন্তু কি লাভের কথা তুমি বল্‌ছিলে?"

সরযূ হাসিতে হাসিতেই বলিল, "ভিতরে এসে না বস্‌লে বল্‌ব না।"

মিনিট খানেক ইতস্তত করিয়া নরেন ঘরের ভিতরই আসিয়া বসিল। সরযূ বলিল, "আপনি এক মিনিট বসুন, আমি আস্‌ছি উপর থেকে।"

উপর হইতে সে চট্ করিয়া ঘুরিয়া আসিল। নরেনের সাম্‌নে গোটা কয়েক নোট ধরিয়া বলিল, "দাদা এই গুলো আপনাকে দিতে ব'লে গেছে।"

নরেন যন্ত্রচালিতের মতন নোটগুলি হাতে লইয়া গুণিয়া দেখিল ষাট টাকা। একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ টাকা এল কোথা থেকে?"

সরযূ বলিল, "অনেক কাল আগে কে একজন বাবার কাছে ধার নিয়েছিল, দুর্দ্দিনে ভগবান তার শুভমতি দিয়েছেন সে নিজে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। দাদা বল্‌লে, অর্দ্ধেক আমাদের খরচের জন্যে রাখ্‌তে, অর্দ্ধেক আপনাকে দিতে।"

নরেন বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। জগতে দয়া-মায়া বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা সে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল, এখন দেখিল করুণার উৎস শুকাইয়াও শুকায়না। দশটি টাকা নিজের জন্য রাখিয়া পঞ্চাশ টাকা সে মায়ের হাতে দিয়া যাইবে, তাহাতে অন্তত একমাস তাহাদের চলিয়া যাইবে। তাহার পর ভগবান আছেন।

চলিয়া যাইবার জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সরযূর দিকে চাহিয়া নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না। দুই হাতে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সরযূ, আমাকে মনে রেখো। জগতের চোখে আমি দোষীই হব, তুমি কিন্তু আমাকে দোষী মনে কোরোনা।"

সরযূ তাহার স্পর্শে একবার কাঁপিয়া উঠিয়া স্থির হইয়া গেল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছেন আপনি?"
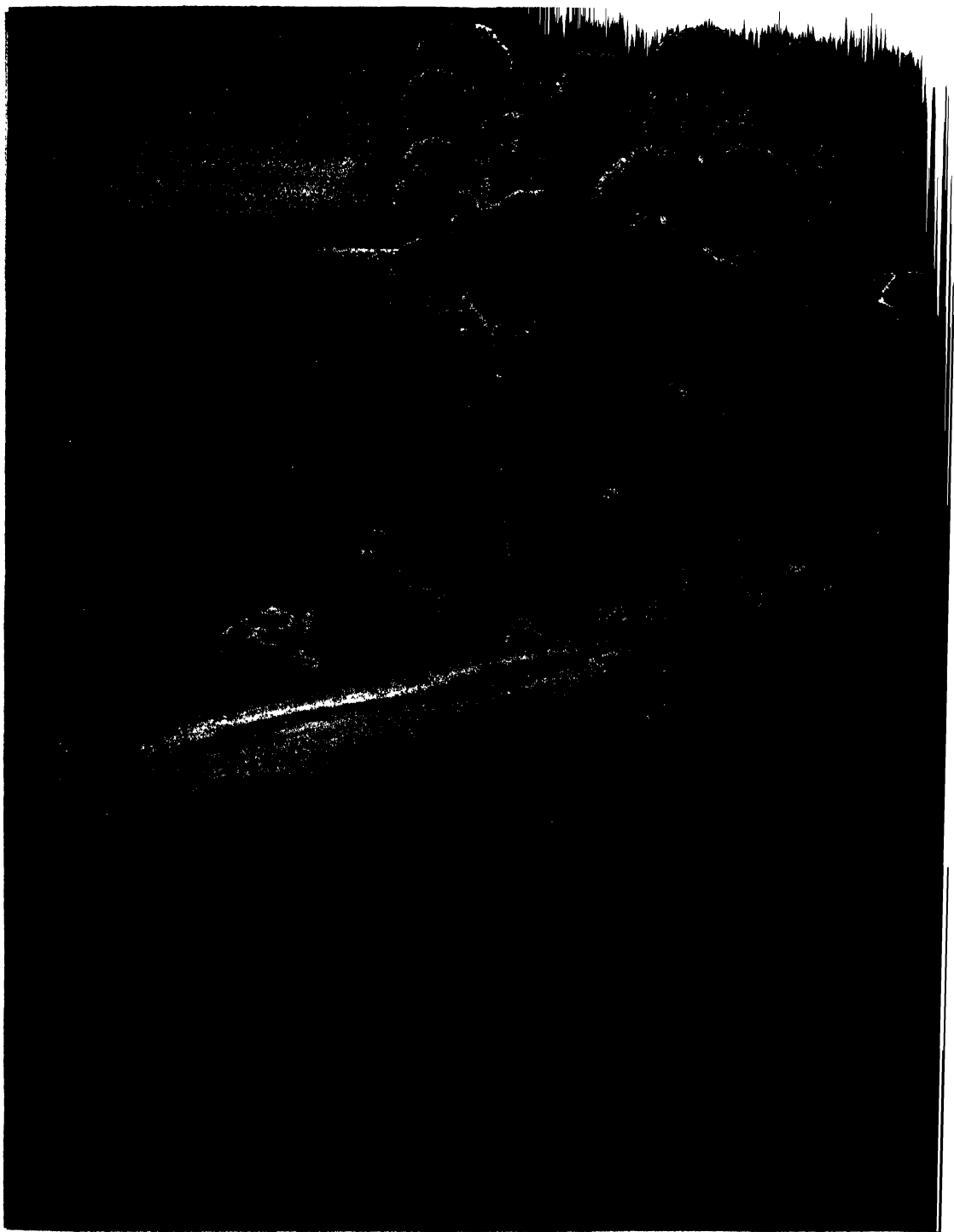
বর্ষাস্নাত বীথিকা

শিল্পী শ্রী অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

"জানিনা, অদৃষ্ট যেদিকে নিয়ে যায়," বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। সে চলিয়া যাইবার পরও সরযূ অনেকক্ষণ সেই অন্ধকার ঘরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দুই চোখ বার বার জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

সেই গভীর রাত্রেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক-বস্ত্রে প্রায় রিক্ত হস্তে নরেন তাহার আজন্ম পরিচিত সংসার ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। পরদিন বন্ধু ও শত্রু মিলিয়া তাহার খোঁজে দেশ তোল পাড় করিয়া তুলিল, কিন্তু তাহার আর কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না।

(২)

"সরযূ, ও সরযূ। দোর খোলনা। তখন থেকে ডাকা ডাকি করছি, মেয়ের কানে যেন যায়ই না।"

ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলিয়া সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "চাই কি তোমার, যে দুপুরবেলা এত চেচামেচি সুরু করেছ? খাটতে খাটতে ত মানুষের একটু বিশ্রামেরও দরকার হয়। আমার বুঝি সেটুকুতেও অধিকার নেই?"

মেয়ের কথার সুরে মায়ের মেজাজের উত্তাপও কিছু বাড়িয়া গেল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে চটিয়া লাভ নাই নিজের পেটেরই মেয়ে, চটিয়া হইবে কি? সে অবুঝ হইলেও, তাঁহাকেও তাহার মঙ্গল চেষ্টা করিতেই হইবে। কাজেই মনের ঝাঁঝ মনেই রাখিয়া তিনি বলিলেন, "বলি বিকেল বেলা যে দেখতে আসবে তার খোজ রাখিস্? বেলা গড়িয়ে এল, এখুনি ওবাড়ীর সুকি আসবে তোকে সাজাতে। তাই ডাকছি, তা না হ'লে তোকে বিশ্রাম করতে দিতে কি আর আমার অসাধ?"

অতি দুঃখের হাসি হাসিয়া সরযূ বলিল, "আমাকে সাজাবে মা? কি দিয়ে সাজাবে? সাজালেই কি কুরূপকে সুরূপ করা যায়?"

"কেন রে? তোর কুরূপ কোন্‌খানটায়? খাটুনি একটু কমে আর একটু ভালমন্দ খেতে পাস ত রূপ কেমন না বেরয় দেখি।"

সরযূ বলিল, "আচ্ছা মা, আমার না হয় রূপ আছেই ধ'রে নিলাম, কিন্তু তোমার টাকা কোথায়? বাংলা দেশে হাজার সুন্দরী মেয়েরও টাকা না হ'লে বিয়ে হয় না, আর আমি ত কোন্ ছার! দাদার মাইনে ত পঞ্চাশ টাকা, তাতে আমাদের খেতেই কুলোয় না, তবে কিসের ভরসায় তুমি সম্বন্ধ করতে সাহস করছ?"

"না ক'রে করিই বা কি? জাতের বাড়া মানুষের কিছু নেই, সেই জাতই যেতে বসেছে। লোকের কাছে বয়স ত চারবছর কমিয়ে বলি, কিন্তু তোমাকে কি আর চৌদ্দ পনেরো বছরের ব'লে চালাবার যো আছে? যা তাল গাছের মত চেহারা! টাকা হয়ত তারা চাইবেও না, যদি মেয়ে তাদের পছন্দ হয়। পছন্দ হ'তেও পারে, তারা বেশ একটি ডাগর মেয়েই খুঁজছে। ছেলের ঘরে খাবার কোনো ভাবনা নেই, কষ্ট হবে না বেশী বৌয়ের।"

সরযূ কিছু আর বলিল না। এই বরের ইতিহাস সে প্রতিবেশিনী সুকুমারীর নিকট ভাল করিয়াই শুনিয়াছিল। ছেলেটির চরিত্রের বিশেষ কিছু খ্যাতি ছিল না, তাহার উড্ডীয়মান মনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই একটি বড়সড় বধূর প্রয়োজন। তাহাকেই কি না শেষে এই প্রয়োজনে বলি দেওয়া হইবে মনে করিয়া ঘৃণায় সরযূর শরীর বারবার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে সে এখন প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠিয়াছিল। সুখের সম্ভাবনা তাহার জীবনে আর নাই একথা সে একান্ত ভাবে বিশ্বাস করিত বলিয়া, আপনাকে বলি দিয়া আত্মীয় স্বজনের সুবিধার ব্যবস্থা করিতে সে বিশেষ কিছু আপত্তি অনুভব করিল না। তবুও সমস্ত দেহ মনে যে ঘৃণার শিহরণ তাহার জাগিয়া উঠিত এই বিবাহের নামে তাহাকে সে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিত না। পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য জীবন বলি দিতে বলিলেও এতটা আপত্তি তাহার হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু হিন্দুর কন্যা সে, একজনকে ভালবাসিয়া হৃদয় দান করিয়াছিল, এখন পারিবারিক প্রয়োজনে তাহাকে এক চরিত্রহীন মদ্যপায়ীর কাছে আত্মদান করিতে হইবে, ইহার গভীর লজ্জা তাহাকে তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিল। কিন্তু ইহা সে বলিবেই বা কার কাছে এবং বলিয়া লাভই বা হইবে কি? যে দেশে স্বয়ম্বরা সাবিত্রী সতীত্বের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, সেইদেশেই কন্যার স্বয়ম্বরা হওয়া এখন সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জার কথা। কাজেই

সে এখন একরকম হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। মা তাহাকে বিক্রয় করিয়া যদি অন্য সন্তানগুলিকে কিছু সুখ সুবিধা দিতে পারেন, তাই না হয় দিন। নরেন বাঁচিয়া নাই বলিয়াই সে ধরিয়া লইয়াছিল, কারণ এ দুবছর তাহার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। ধীরেন আজকাল এক প্রেসে কাজ করে, তাহার মা পাড়ায়-পাড়ায় সেলাই শিখান, দেশের কোনো এক আত্মীয় কিছু সাহায্য করেন, এমনি করিয়া তাহাদের দিন কোনো প্রকারে চলিয়া যায়। তাহারাও নরেনকে ফিরিয়া পাইবার আশা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে।

মায়ের কথায় সরযূ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আচ্ছা মা, সুকুমারী আসুক, তখন উঠে সাজগোজ করা যাবে, এখন একটু শুয়ে নিই আমার বড় মাথা ধরেছে।" তাহার মাতা আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেলেন।

সুকুমারী খানিক পরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাজসজ্জার সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জাম সে সঙ্গে করিয়াই আসিয়াছিল। সরযূর মা কেবল পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া গুটিকয়েক গহনা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

সুকুমারীর সাজাইবার হাত ছিল ভাল। বাহার করিয়া চুল বাঁধিয়া, পাউডার রুজ ঘষিয়া হাল্‌কা বাসন্তী রঙের শাড়ী, জামা পরাইয়া সরযূকে সে দিব্য সুশ্রী করিয়া সাজাইয়া তুলিল। সরযূর মায়ের ইচ্ছা ছিল যে ধার করিয়া আনা সব গহনাগুলিই সরযূর অঙ্গে চড়ানো হোক, কিন্তু সুকুমারীর প্রবল আপত্তিতে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "সে হবে না মামীমা। এত করে সাজালাম, এখন একরাশ সোণা রূপো চড়িয়ে আপনি ওকে মাড়োয়ারীন্ বানিয়ে দিতে চান ?"

সরযূর মা অগত্যা গহনা তুলিয়াই রাখিলেন। সরযূর মাড়োয়ারীন সাজিতে বিশেষ কিছু আপত্তি ছিল না, আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে তাকাইয়া ভয়েই তাহার প্রাণ শুকাইয়া উঠিতেছিল। তাহার কুরূপ তাহাকে শেষ অবধি বর্ম্মের মতন রক্ষা করিবে বলিয়া তাহার একটা ভরসা ছিল, সে ভরসাও যাইতে বসিয়াছে বা।

বরপক্ষ আসিয়া পৌছিল এবং কন্যাকে পছন্দ হইতেও তাহাদের বিলম্ব হইল না। পাড়ার দু এক জন ভদ্রলোককে সরযূর মা কন্যাপক্ষ হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, কারণ সতীশের সাংসারিক বুদ্ধির উপর তাঁহার বিন্দুমাত্রও আস্থা ছিল না। রূপে পছন্দ হইবার পর সরযূকে লইয়া যাওয়া হইল। দেনা-পাওনার কথা তখন উঠিয়া পড়িল। বরপক্ষ পূর্ব্ব হইতে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কিছুই দাবী করিবেন না, কিন্তু তাহারা বিবাহের খরচ স্বরূপ এখন কয়েক শত টাকা দাবী করিয়া বসিলেন। মেয়ে দিব্য বয়স্থা দেখিয়া তাহাদের এই আশাটা হইয়াছিল যে, নিতান্ত অসম্ভব না হইলে যে কোনো সর্ত্তেই রাজী হইবে, কারণ ইঁহাদের জাত যাইতে বসিয়াছে। মেয়ে তাহাদের পছন্দও হইয়াছিল; এতটা তাহারা আপনাদের গুণবান পাত্রের জন্য আশা করে নাই, কিন্তু সে কথা তাহারা প্রকাশ করিল না।

অন্তত চারিশত টাকা চাই শুনিয়া সরযূর মা প্রথমে কপাল চাপড়াইয়া কাঁদিবার জোগাড় করিলেন। সরযূর আশা হইল হয়ত বা এই সূত্রে সে নিষ্কৃতি পাইতেও পারে। কিন্তু দু'একবার সুর তুলিয়াই তাহার মা চুপ হইয়া গেলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, চারিশত তাঁহার ক্ষমতার অতীত হইলেও তিন শত দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। বরপক্ষ আর দ্বিরুক্তি করিল না, মহোল্লাসে প্রস্থান করিল।

ধার-করা সাজসজ্জা খুলিয়া ফেলিয়া, এতক্ষণে সরযূ জিজ্ঞাসা করিল,"রাজী ত হ'লে, তিনশ' টাকা পাবে কোথা থেকে ? আমাদের সকলকে বেচলেও ত হবে না।"

তাহার মা বলিলেন, "রাজী না হ'য়ে কি করব ? জাত যে যেতে বসেছে ? দেখি ভাসুর ঠাকুরের কাছে লিখে, এমন বিপদে পড়েছি জান্‌লে কি আর কিছু সাহায্য না করবেন ?"

সরযূ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তবেই হয়েছে মা জাত যাওয়া যত বড় বিপদই হোক, সেটা না খেয়ে

মরার চেয়ে বড় নয়। তার সম্ভাবনাও আমাদের হয়েছিল, তবু জ্যাঠামশায় পাঁচটা টাকা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেননি, আর তোমার আশা, যে জাত যাচ্ছে বল্লেই অমনি এক থোকে তোমায় তিন শ' টাকা দিয়ে ফেলবেন। কথা দেওয়াটা তোমার উচিত হয়নি। জাত ত যাবেই, তার উপর অপমানও হবে।"

তাহার মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কথা দেব না ত করব কিরে, বে-আক্কেল ছুঁড়ি? সব কথায় তোর কথা বলা কেন? এমন বেহায়া মেয়েও বাপের জন্মে দেখিনি।"

সরযূ পুনর্ব্বার একটুখানি হাসিয়া চলিয়া গেল। রান্নাঘরের হাঁড়িকুঁড়ি এতক্ষণ তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। সে এখন তাহারই তদারক করিতে বসিল।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং তাহাদের অবস্থায় যতটুকু সম্ভব সে রকম আয়োজন চলিতে লাগিল, অর্থাৎ প্রায় কোনো আয়োজনই হইল না। অতি দরাদরের একটি চেলীর দশহাত শাড়ী আসিল। প্রতিবেশিনী সুকুমারী দয়া করিয়া একটি লাল ব্লাউস্ উপহার দিল। সরযূর মায়ের হাতের দুগাছি সরু বালাই হইল তাহার একমাত্র স্বর্ণালঙ্কার। সতীশ চাহিয়া চিন্তিয়া, একরকম ভিক্ষা করিয়াই একশত টাকা ধার করিল, বরযাত্র খাওয়াইবার জন্য। কিন্তু বরপণের তিন শত টাকা কোনো উপায়েই জোগাড় করা গেল না। তবুও সরযূর মা সম্বন্ধ ভাঙিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। কোন্ অসম্ভবের আশায় জানি না, তিনি সতীশ সরযূ সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করিয়া সম্বন্ধ বজায়ই রাখিলেন। সরযূ দিন দিন শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে সহানুভূতির বদলে তাহার অদৃষ্টে জুটিল গালাগালি। সতীশ হয়ত বা বোনের হৃদয়ের কথা খানিকটা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সংসারের অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতেই তাহার সকল শক্তি শেষ হইয়া আসিয়াছিল, মায়ের সহিত যুদ্ধ করিবার আর তাহার শক্তি ছিল না।

(৩)

"মা, এইবার তুমি সাম্লাও, আমার দ্বারা আর হ'য়ে উঠবে না। তুমিই এ বিপদ বাঁধিয়েছ, এখন তুমি যেমন ক'রে পার ব্যবস্থা কর।"

মা তখন কপাল চাপড়াইয়া কাঁদিতে ব্যস্ত। ঘরের কোণে লাল চেলীর কাপড়ে সজ্জিতা সরযূ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার জাত গেলে, তাহার আপনার হৃদয়ের ধর্ম্ম রক্ষা হয়। কোন্‌টা যে তাহার স্পৃহণীয় তাহাই যেন সে নির্ণয় করিতে ব্যস্ত ছিল। বিবাহের লগ্ন গভীর রাত্রে, নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও বিশেষ কিছু নাই, বাড়ী একরকম নিঃঝুম। বরযাত্রীর দল বর লইয়া আসর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কারণ তাহাদের প্রতিশ্রুত টাকার এক পয়সাও তাহাদের দেওয়া হয় নাই। অবশ্য তাহারা পাড়া ত্যাগ করিয়া যায় নাই, কয়েকটা বাড়ী পরে, একই রাস্তার উপর আর একটা বাড়ীতে তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের আশা ছিল যে, চাপ দিলেই বিধবার লুকানো পুঁজি হইতে টাকা বাহির হইয়া আসিবে।

সতীশের কথায় তাহার মা কান্নার সুর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া বলিলেন, "আমি মেয়েমানুষ, কোথা দিয়ে কি করব? তুই এত বড় বেটা-ছেলে ঘরে থাক্‌তে জাতটা মারা যাবে? বাপ নেই মেয়ের, তুই বড় ভাই ত রয়েছিস? তোরই ত এখন দায়।"

সতীশ চাপা গলায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, "উৎপাত বাধাবার বেলা ত কোনো বড় ভাইয়ের ডাক পড়েনি, এখনই তোমার সে কথা মনে পড়েছে। হাজার বার বারণ করিনি তোমায় এ সম্বন্ধ করতে! আমার কি আছে যে এখন এ দায় থেকে উদ্ধার হব? এক আমায় কিনে নিয়ে যদি কেউ টাকা দেয়। তারই চেষ্টায় চল্লাম।"

সতীশ বাহির হইয়া গেল। সরযূ বলিল, "কি সর্ব্বনাশই করলে মা। এর চেয়ে জাত যাওয়াই ভাল ছিল। দাদা কোথায় গেল জান?"

মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কোথা থেকে জান্‌ব?"

সতীশ নির্জ্জন পথ বাহিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছিল। কোথায় যে সে যাইতেছিল তাহা সে নিজেই জানিত না।

হঠাৎ পিছন হইতে তাহার পিঠের উপর হাত দিয়া কে চাপা গলায় ডাকিল, "সতীশ।"

ভয়ানক চম্‌কাইয়া সতীশ স্থির হইয়া দাঁড়াইল সে যেন নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কয়েক মিনিট পরে বলিল, "নরেন! এতকাল পরে তুমি কোথা থেকে?"

নরেন বলিল, "কোথা থেকে যে তা ত বলা শক্ত। দুনিয়ায় কম জায়গা আছে যেখানে আমি যাইনি। কিন্তু টিঁক্‌তে পারলাম না। জানি যে এখানে ফাঁসীর কাঠ আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, তবু না এসে পার্‌লাম না। কে যেন অদৃশ্য হাতে আমায় টেনে নিয়ে এল। তোমরা সব ভাল ত?"

সতীশ হাসিয়া বলিল "ভালই বটে। আমাদের মধ্যে যার ভাল থাকাটা তুমি সব চেয়ে চাও, তাকেই উদ্ধার কর্‌তে এই রাত একটায় কলকাতার পথে ভূতের মত ঘুর্‌ছি।"

নরেনের মুখ কালো হইয়া গেল, সে বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে সরযূর?"

সতীশ বলিল, "তাকে নিয়ে আমাদের জাত যেতে বসেছে। আজ তার বিয়ের রাত্রি। সভার থেকে বর উঠিয়ে নিয়ে তারা চ'লে গিয়েছে, আমরা টাকা দিতে পারিনি ব'লে। আর একটা লগ্ন আছে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেও যদি নিজেকে বেচেও টাকার জোগাড় কর্‌তে পারি তারই চেষ্টায় চলেছি।"

নরেন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তোমাকে এত রাতে কিন্‌বে কে?"

সতীশ বলিল, "একটি মাত্র মানুষ আছে যে কিন্‌তে পারে। এ গলির ভিতর এক ভদ্র লোকের বাড়ী, তাঁর একটি বোবা এবং এক-চোখ-কানা মেয়ে আছে। তাকে কেউ নামে মাত্র বিয়ে কর্‌লেই তিনি সে পাত্রকে এক হাজার টাকা দিতে রাজী আছেন। আমার কাছে তিনি ইতিপূর্ব্বেও লোক পাঠিয়েছেন, কিন্তু বিয়েকে ব্যবসা ব'লে মনে করি না ব'লে আমি রাজী হইনি। আমি ঐ মেয়েকে বিয়ে ক'রে আবার চোখ কানওয়ালা অন্য বউ ঘরে নিয়ে এলে প্রথম কন্যার বাবা কিছুই মনে করবেন না, কিন্তু আমি তা পার্‌ব না। একে বিয়ে কর্‌লে একে নিয়েই আমার চির জীবন সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে। এমন ক'রে নিজের গলায় নিজে ফাঁসী দিতাম না, কিন্তু উপায় নেই। সমাজটি আমাদের রক্তপিপাসু দেবতা, তাঁর চরণে নিজেকে বলি দিতে চল্‌লাম।"

নরেন বলিল, "তুমি ভদ্র লোকের বাড়ী ঘুরে এস, এই রাস্তার মোড়ে আমি তোমার জন্যে দাঁড়াচ্ছি।"

সতীশ দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। নরেন একটা বাড়ীর দেয়ালে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিসের যেন বেদনায় তাহার জীর্ণ বক্ষপঞ্জর থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসে দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সতীশ ফিরিয়া আসিল। নরেনের সাম্‌নে আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "আমার বলি গ্রাহ্য হ'ল না নরেন, সে ভদ্রলোক অন্য পাত্র ঠিক ক'রে ফেলেছেন, বল্‌লেন। ঘরে ঢুক্‌তে শুদ্ধ আমায় দিল না, কুকুরের মতন পথ থেকে বিদায় ক'রে দিল। এখন গলায় দড়ি দিয়ে পরিবার শুদ্ধ মর্‌তে যদি পারি সেইটাই একমাত্র বুদ্ধির কাজ হবে। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে হাড় গুঁড়ো হ'য়ে এসেছে, সমাজের চাবুক আর এ পিঠে সইবে না।"

নরেন এতক্ষণ পরে কথা বলিল, "আমার সঙ্গে চল সতীশ, আমি টাকা জোগাড় ক'রে দিচ্ছি।"

সতীশ অবাক হইয়া বলিল "তুমি দেবে? কি করে?" রাস্তা দিয়া একখানা খোলা ভাড়াটে গাড়ী যাইতেছিল নরেন তাহাকে ডাক দিল। দুই বন্ধুতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে দরজাটা বন্ধ করিয়া নরেন বলিল, "চলো, লালবাজার থানামে।"

গাড়োয়ান একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে আরোহীদের প্রতি তাকাইয়া গাড়ী চালাইয়া দিল। সতীশ চীৎকার করিয়া উঠিল "এই রোকো, রোকো। নরেন তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি কি আমাকে জল্লাদের assistant কর্‌তে চাও? আমি যাব না।"

নরেন বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,

'এই চালাও।" গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। তখন সতীশের দিকে ফিরিয়া নরেন বলিল, "সতীশ বোকামী করোনা। আমি ধরা দিতেই এসেছিলাম। ঝোপে-ঝাড়ে মাথা লুকিয়ে জানোয়ারে থাকৃতে পারে, সহরের মানুষ পারে না। এ জীবন রেখেও আমার লাভ নেই, আমি সাপ নই,যে গর্ত্তে লুকিয়ে চিরটাকাল কাটিয়ে দেব। আমার মৃত্যু দিয়ে সরযুর যদি কোনো উপকার হয়ত আমার মরাটাও সার্থক হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, এসো, তাহ'লেও আমি সোজা থানাতেই যাব, স্থতরাং গোলমাল ক'রে তুমি আমায় বাঁচাতে পারবে না।"

থানার সম্মুখে গাড়ী আসিয়া দাড়াইল। একটুখানি হাসিয়া নরেন সতীশের হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিল। বলিল, "বেশী দুঃখ কোরো না, তাকেও করতে বারণ কোরো। যেমন ক'রে বেঁচে ছিলাম, তার চেয়ে মরা আমার স্থখের হবে।"

আধ ঘণ্টা পরে সতীশ বাহির হইয়া আসিল। যে নরেনকে ধরিয়া দিতে পারিবে সরকার হইতে সে ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। সেই টাকা তখন সতীশের পকেটে।

কিন্তু সরযূর সে রাত্রে বিবাহ হওয়া অদৃষ্টে ছিল না। বাড়ী ফিরিবামাত্র প্রচণ্ড কান্নার শব্দে চকিত হইয়া সতীশ প্রায় দরজার কাছেই বসিয়া পড়িল। তাহার ছোট ভাই আসিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। বলিল, "যাক্‌গে দাদা জাত, যাকে প্রাণ বলি দিয়েও রাখা যায় না, তা নাই হ'ল। আমরা সব শুদ্ধ খ্রীষ্টান হব।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল "কিন্তু কি হয়েছে তাই যে বুঝলাম না?"

"ঐ বরকে নিয়ে গিয়ে হাজার টাকা দিয়ে রাধিকাবাবু মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন। এর উপর কি আমরা দিদির বিয়ে দেব? আর দিতে চাইলেও লগ্ন নেই।"

সতীশের মুখ দিয়া যেন আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিল, "বৃথাই আমি নরেনকে বিক্রী ক'রে টাকা আন্‌লাম।"

"সে কি রে?" বলিয়া তাহার মা ছুটিয়া আসিলেন। সরযূকে আর কিছু বলিতে হইল না। সে শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া গড়াইয়া পড়িল।

(৪)

চার পাঁচ দিন পরের কথা। সরযূ ম্লান মুখে উপরের ঘরে শুইয়াছিল। সেইদিন হইতে তাহার অসুখ, ডাক্তারে নড়াচড়া বারণ করিয়া দিয়াছে। তাহার মা নীচে রান্না করিতেছিলেন।

এমন সময় সতীশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইয়া সরযূ ডাক্তারের নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, কোনো ভাল খবর আছে?"

সতীশ হাসিয়া বলিল "সত্যি, ভগবান আছেন রে! অনেককালের কয়েদী একটা চুরির দায়ে জেল খাটছিল, ভগবান তাকে শুভ মতি দিয়েছেন, সে স্বীকার করেছে অভয় নন্দীকে খুন সেইই করেছিল। তার সাক্ষীও জুটে গেছে। নরেন বিকালে ছাড়া পাবে।"

সরযূর দুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

কয়েকটি শ্লোক *

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শব্দ স্পর্শ আদি বেদ্য বিষয় সকল জাগ্রতকালে বিচিত্রতাপ্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত, কিন্তু তৎতৎ বিষয়ক সম্বিৎ একরূপকতাপ্রযুক্ত একই অভিন্ন।

স্বপ্নকালেও সেইরূপ। এখানে বিষয় সকল অস্থির,

* স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব্বে একবার "পঞ্চদশী"র শ্লোকগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে তাহার সবিশদ ব্যাখ্যা করাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। নানা কারণে তখন তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। মুখে মুখে যে-কয়টি শ্লোক তিনি বাংলায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, তাহার অনুলিখন সকলের নিকট উপস্থিত করিলাম।

জাগ্রতকালে স্থির—এই যা দুয়ের মধ্যে প্রভেদ। উভয় সংক্রান্ত সম্বিৎ একরূপী, সুতরাং ভেদ-বর্জ্জিত।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হয় যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, সুষুপ্তিকালে তৎকালীন আনন্দ আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত ছিল, কারণ ভূতকালে যে-বিষয় সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করা হইয়াছে সেই বিষয়ই বর্ত্তমানকালে স্মরণে উদ্বোধিত হয়।

সেই যে সুষুপ্তিবোধ তাহা স্বপ্নবোধের ন্যায় বিষয় হইতেই ভিন্ন, বোধ হইতে ভিন্ন নয়। এইরূপে স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি, তিন স্থানেই একই অভিন্ন যে সম্বিৎ তাহা দিনের পর দিন একই অভিন্নভাবে চলিতে থাকে।

মাস, বৎসর, যুগ, কল্প, অনেকটা গমনাগমন করিতেছে, একা কেবল সম্বিৎ উদয়ও জানে না, অস্তও জানে না।

এই যে সম্বিৎ ইহাই আত্মা, ইনি পরমানন্দ, যেহেতু পরম প্রেমাস্পদ; আমি বর্ত্তিয়া থাকি ইহাই সকলে চায়, কেহই চায় না যে, আমি অবর্ত্তমান হই।

এত দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে আমি বর্ত্তিয়া থাকি, যেন লোপ না পাই, আত্মার প্রতি এইরূপ প্রেম কিছুতেই রোধ মানে না।

সেই যে আত্মার প্রতি প্রেম তাহা আপনারই জন্য অন্যেতে প্রসারিত হয়, অন্যের জন্য আপনাতে প্রসারিত হয় না, এইজন্য আত্মা পরম্ শব্দেই বাচ্য।

এইরূপ যুক্তির দ্বারা আমরা পাইতেছি যে, আত্মা চিৎস্বরূপ, সৎস্বরূপ এবং পরমানন্দ স্বরূপ। আর পরমব্রহ্মও যে সেইরূপই সচ্চিদানন্দস্বরূপ তাহা বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে।

আত্মা প্রকাশ না পাইলে তাঁহার প্রতি প্রেম বর্ত্তিতে পারে না, আর প্রকাশ পাইলে বিষয়স্পৃহা থাকে না; কিন্তু জীবজগতে, যেহেতু আত্মাতে বিষয়স্পৃহা জড়িত থাকে, এইজন্য জীবে আত্মা প্রকাশ পাইয়াও পায় না।·····

কথা কও

হে মৃত্যু, হে অন্ধকার, হে অনন্ত রাতি!
এ ধরা ত দুদিনের
তুমি চিরসাথী।
জানিনা তোমার কোলে,
জীবন কেমন দোলে,
দুখ পায় সুখ পায়,
ভুলে যায় ব্যথা?
হে অপার অন্ধকার
কও কও কথা!
পায়ে চলা পথ যবে
সীমান্তের অন্তে হবে
শেষ,
যবে
হারাইবে রেখা!

তোমার আঁধার বুকে
নাহি যাবে দেখা!
নিমিষের শেষ টান
ভেঙ্গে দিবে দেহ খান
তার হাওয়া নিবাইবে
এ জীবন বাতি।
তাহাকে গ্রহণ ক'রে,
রাখিবে কেমন ঘরে—
কও কও সে বারতা
হে কালান্ত রাতি!
এ ধরা ত দুদিনের
তুমি চিরসাথী!

একলিমুররাজা

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তকপরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

"ছাতনায় চণ্ডীদাস"—প্রতিবাদ

গত বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"তে "ছাতনায় চণ্ডীদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় মল্লভূমে "মনসা মঙ্গল" গান, "মনসার ঝাপান" এবং মনসাদেবীর পূজার জন্য মল্লরাজগণ কর্ত্তৃক মনসার পূজকদিগকে নিষ্কর ভূমি দানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বীর-হাম্বির ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মল্লরাজগণ মনসাদেবীর উপাসক ছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বীরহাম্বিরের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেও বীরহাম্বির বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মল্লরাজাদিগকে মনসাদেবীর উপাসক অপেক্ষা বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বলিয়া অনুমান করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেন না, মল্লরাজারা, শুধু মনসাদেবী কেন, শিব বিষ্ণু বা শক্তির উপাসনার জন্যও অনেক নিষ্কর দেবত্র দান করিয়া গিয়াছেন, এমন-কি মুসলমানদিগকে পীরত্ত দান করিতেও তাহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই বলিয়া বোধ হয়। রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা এবং পীরযাত্রাও কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনসার ঝাপানের মতই প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোন-কোন স্থানে আছে। সুতরাং কোন স্থানের প্রচলিত লৌকিক উৎসব হইতে বা কোন বিশেষ দেবতার পূজার জন্য নিষ্কর ভূমি দান হইতে সেই স্থানের রাজাদিগকে সেই দেবতার উপাসক অনুমান করা কতদূর ঠিক্? ইংরাজ রাজত্বে হিন্দু ও মুসলমানদের অনেক প্রকার উৎসব প্রচলিত রহিয়াছে—এখনও হিন্দুরা দেবত্র ব্রহ্মত্র এবং মুসলমানরা পীরত্ত ভোগ করিতেছে—তাই দেখিয়া কেহ যদি অনুমান করেন যে, ইংরাজরা হিন্দু বা মুসলমান ছিলেন তাহা হইলে সেই অনুমান কতদূর ঠিক হইবে? এতদ্ব্যতীত মল্লভূমে মল্লরাজাদের এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত যত উল্লেখ-যোগ্য বিষ্ণুমন্দির আছে, মনসাদেবীর সে-প্রকার মন্দির কয়টি আছে? মনসাদেবীর পূজা হিন্দু মাত্রেই করিলেও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ইহার যত ঘটা দেখা যায়, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তত নয়। বীরহাম্বির বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা যে বৈষ্ণব ছিলেন তাহা বীরহাম্বিরের জীবিতাবস্থায় রচিত "প্রেম-বিলাস" (খৃঃ অব্দ ১৬০০ রচিত) গ্রন্থ হইতেও অনুমান করা যাইতে পারে।

মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের নামেও মল্লরাজাদের বৈষ্ণবত্ব সূচিত হইতেছে। বীরহাম্বির বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যদি নিজের রাজধানীর নাম বিষ্ণুপুর রাখিতেন তাহা হইলে (বৈষ্ণব মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্য) বৈষ্ণব গ্রন্থকার "প্রেম-বিলাসে" সে-কথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। কিন্তু "প্রেম-বিলাসে" সে-কথার উল্লেখ না থাকায় যদি আমরা অনুমান করি যে, বীরহাম্বিরের পূর্ব্বেও মল্লরাজধানীর নাম বিষ্ণুপুরই ছিল তাহা হইলে সে অনুমান কি অসঙ্গত হয়? (মল্লিখিত "বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ সন ১৩২৩ সালের ১৪ই পৌষ তারিখে 'নায়কে' দ্রষ্টব্য)।

শুনা যায় যে, বীরহাম্বিরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা শিবসিংমল্ল বৈষ্ণব ছিলেন এবং তিনি পদাবলীও রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রমল্ল নামক অপর এক রাজার সময় নাকি শলদার শ্রীশ্রীগোকুল দেবের মন্দির নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। মল্লভূমির অন্তর্গত শালতোড়া গ্রামের নিত্যাদেবীর সহচরী বাসলীদেবীর আদেশে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের 'রাধাকৃষ্ণ' মন্ত্রে দীক্ষার প্রবাদ হইতেও মল্লভূমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে।

অপহৃত বৈষ্ণবগ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বীরহাম্বিরের রাজসভায় উপস্থিত হন তখন তিনি তথায় শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী অংশ পঠিত হইতে দেখেন। (প্রেম-বিলাসের ১৩শ বিলাস দ্রষ্টব্য।) বীরহাম্বির যদি মনসাদেবীরই উপাসক হইতেন তাহা হইলে সেই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের যুগে নিজ সভায় ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করিতেন কি?

শ্রীনিবাস আচার্য্য আনুমানিক খৃঃ অব্দ ১৫৮২তে বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মল্লভূম-নিবাসী বাবা আউলিয়া মনোহর দাস ১৫৭৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই জাহ্নবা গোস্বামিনীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। (গৌরপদতরঙ্গিণী-উপক্রমণিকা পৃঃ ১৪১) এই আউলিয়া মনোহর দাস বীরহাম্বিরের ভক্তিগ্রন্থের ভাণ্ডারী ছিলেন। সুতরাং এইসকল বিবরণ হইতে আমাদের মনে হয় বীরহাম্বির বা পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক মল্লরাজা মনসাদেবীর অপেক্ষা বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় অধিকতর মনোযোগী ছিলেন এবং মনসাদেবীর পূজা উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর প্রজাবর্গের মধ্যে অধিকতর প্রচলিত ছিল। আর মল্লরাজারা প্রজাবর্গের ধর্ম্ম-বিষয়ক স্বাধীনতায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না; বরং তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তাহাদের দেবতার উৎসবে যোগ দিতেন এবং সেবার জন্য নিষ্কর ভূমিও দান করিতেন।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

—

'ছাতনায় চণ্ডীদাস" সম্বন্ধে বক্তব্য

বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে শীর্ষোদ্ধৃত নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, এম-এ, তাঁহার পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন। প্রবন্ধের সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বে ইহা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, সাহানা মহাশয় ইচ্ছা করিয়া যে সত্য গোপন করিয়াছেন এবং রায় বাহাদুর বীরভূমের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া যে রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহা আমাদিগকে আঘাত করিয়াছে। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় সাহানা মহাশয় ও রায় বাহাদুর পরস্পর পরস্পরকে এমন দুই একটি বিরুদ্ধ মতবাদের ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন যাহা বালকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অথচ প্রবন্ধ পড়িয়া বুঝা যায় দুই জনেই দুই জনের লেখা দেখিয়া-শুনিয়া তবে ছাপিতে পাঠাইয়াছেন। আমার "বক্তব্যে" এইসব প্রমাণিত হইবে।

গত বৎসর ভাদ্রমাসে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আমি যখন বাঁকুড়ায় যাই, সেই সময় শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় দয়াপরবশ হইয়া সাহানা মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাক্ষাতেই সত্যবাবুর সঙ্গে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা হয়—তখন বিদ্যানিধি মহাশয় স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে, "ছাতনার লোকে বলে—চণ্ডীদাস ও দেবীদাস দুই ভাই বীরভূমের মামুরিয়া গ্রাম হইতে ছাতনায় আসিয়া ছিলেন"। এখন দেখিতেছি সত্যবাবু লিখিতেছেন, "বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া গ্রামের নিকটে তাঁহাদের বাসস্থল; জীবিকার্জ্জনের জন্য মল্লভূমের রাজধানীর পথে তাঁহারা চলিয়াছিলেন"। আর বিদ্যানিধি মহাশয়ের অতি কষ্টে স্মরণ হইয়াছে, জীবনচন্দ্র দেঘরিয়া কষ্টে যে গ্রামের নাম করিয়াছিলেন "তাহার আদ্যে 'ম' ছিল"। সত্যবাবু বিষয়ী লোক; বহু মামলা মকদ্দমা লইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, নিজ মুখেই তিনি স্বীকার করিলেন, 'ফুরসৎ বড় কম'। সুতরাং তাঁহার লেখায় ইচ্ছাকৃত হৌক আর অনিচ্ছাকৃত হৌক এরকম গোলমাল স্বাভাবিক, কিন্তু, বিদ্যানিধির এই স্মৃতি-ভ্রংশতা কি বার্দ্ধক্যের প্রমাদ?

সত্যবাবু আবার লিখিতেছেন—"আমরা ছাতনার অনেক লোককে চণ্ডীদাস ও বাসলী সংক্রান্ত অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা চণ্ডীদাস-বিষয়ক বীরভূম-সংক্রান্ত প্রথম মত সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না"। এদিকে আমি যখন ছাতনায় যাই তখন উঁহাদেরই জীবনচন্দ্র দেঘরিয়া-মহাশয় "আনন্দময়ী চতুষ্পাঠীর" অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতির সমক্ষে যেন একটু সচকিত এবং কাতর ভাবেই স্বীকার করিলেন যে—"চণ্ডীদাস ও দেবীদাস বীরভূম হইতেই ছাতনায় আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের বাসগ্রামের নাম আমি যেন মামুরিয়া বলিয়াই শুনিয়াছি।" "নান্নুর" "মামুরি" শুনিবার গোলেও হইতে পারে।

সত্যবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"নিত্যের আদেশে বাসলী চলিল
সহজ জানাবার তরে"

ইহার পরের 'কলি' উদ্ধৃত করেন নাই—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে"।

যাহা হউক কি সত্যবাবু আর কি রায় বাহাদুর নান্নুরকে কেহই অস্বীকার করেন নাই, অপিচ নান্নুর লইয়া নানা গবেষণা করিয়াছেন। নান্নুর চণ্ডীদাসের জন্মভূমি, বীরভূমে নান্নুর আছে, এখন এইটাকে উড়াইয়া দিতে পারিলেই কাজ হাসিল হয় তাই উভয়েই নান্নুর লইয়া দড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়াছেন। সাহানা মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "ছাতনায় রাজার ছেলেকে নান্নু বা নুনু বলে।" অতএব এই অর্থে যুবরাজের কিনা নুনুর খোরপোশের খাস খামার এক সময় নুনুর মাঠ বা নান্নুর মাঠ রূপে পরিচিত ছিল। অপূর্ব্ব গবেষণা—অসাধারণ সিদ্ধান্ত! আবার ইহা হইতেই ভাষাতত্ত্ববিদ কোমকার রায় বাহাদুর নান্নু—আদরে নন্দু তাহা হইতে নান্দুপুর পরে "স্বচ্ছন্দে" নান্দুর ও নান্নুরে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। ছেলেকে নুনু অনেক স্থানের মুসলমানেরা বলে, তথাকথিত ইতর জনসাধারণেরা বলে, বীরভূম বর্দ্ধমান বাঁকুড়া মানভূম যে-কোনো জেলায় ইহার দৃষ্টান্ত মিলিতে পারে। সুতরাং বিশেষ করিয়া রাজ-বংশের নাম লইয়া ইহা হইতে এত বড় জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত "স্বচ্ছন্দে" হয় কি না বিবেচনার বিষয়।

নান্নুর গ্রামখানি যে বহু পুরাতন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সাঁকুলিপুর পৃথক্ একখানি গ্রাম। পূর্ব্বে এই সাঁকুলিপুরে থানা ছিল, পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই হইয়াছে যে, আপনার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া নান্নুর হইয়াছে। ইহা হইতে এমন বুঝায় না যে, নান্নুর নামে গ্রাম কস্মিন কালে ছিল না বা নান্নুর সাঁকুলিপুরের একটা পাড়া। চণ্ডীদাসের জন্মভূমির নাম নাহুর কি নান্নুর তাহার কোনো অভ্রান্ত প্রমাণ নাই। উহা নাহুরও হইতে পারে নান্নুরও হইতে পারে। অথবা উহা নান্নুরই বটে, সাধারণ লোকে নাহুর বলে, ভদ্র লোক নান্নুর বলে। কিম্বা বর্গের তৃতীয় বর্ণ স্থানে লেখকদের হাতে কালে পঞ্চম বর্ণ আসিয়া পড়িয়াছে। বৈয়াকরণ বিদ্যানিধি মহাশয় নাহুর ও নান্নুর লইয়া কেন যে এত মাথা ঘামাইয়াছেন মোটা বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। বীরভূম ভিন্ন নান্নুর যে বাঙ্গালার কোথাও নাই।

রায় বাহাদুর ইঙ্গিত করিয়াছেন, "বীরভূমে সাকালীপুর স্বচ্ছন্দে শাঁখারি-পুকুর হইতে পারে। হয়ত ইতিমধ্যে হইয় গিয়াছে, এবং বিশালাক্ষীর শংখ ধারণ প্রমাণিত হইয়া নান্নুরের পোত দৃঢ় হইয়া গিয়াছে।" রায় বাহাদুরের জানিয়া রাখা ভাল সাকালীপুর নাম নহে, নাম সাঁকুলিপুর। তা ছাড়া রায় বাহাদুরের মত সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন নবনবোন্মেষশালিচিত্তচাতুর্য্যশালী মনীষী তথাকথিত সাকালীপুরে এমন-কি সমগ্র বীরভূমে একজনও নাই। তবে অতঃপর কি হয় বলা যায় না, প্রবাসীর পৃষ্ঠায় রায় বাহাদুরের এই নব আবিষ্কার বার্ত্তা পাঠে লোকে হয় তো এবিষয়ে চেষ্টিত হইতে পারে।

সত্যবাবু ছত্রি রাজাদের বাসলী পাওয়ার প্রবাদ কাহিনী লিখিয়াছেন। এদিকে রায় বাহাদুর লিখিতেছেন, 'বাসলী ছাতনার রাজার কুলদেবী।' বাস্তবিক ছাতনায় যখন ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন তখন কোনো দেবীই তাঁহার কুল-দেবী ছিলেন না। ছত্রি রাজা ব্রাহ্মণকে মারিয়া রাজা হন। যে-অস্ত্রে ব্রাহ্মণকে বধ করা হইয়াছিল সেই খঞ্জরখানি আজিও রাজবাড়ীতে আছে এবং কোনো শোভা-যাত্রায় রাজাকে সেই খঞ্জর-হস্তে আজিও বাহির হইতে হয়। হইতে পারে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী রাজা শেষে বাধ্য হইয়া কোনো বিদেশী ব্রাহ্মণের হাতে বাসলী পূজার ভারার্পণ করেন। হয় তো ব্রাহ্মণদের মনোরঞ্জন করা দরকার হইয়াছিল, এদিকে বাঁকুড়ার কোনো ব্রাহ্মণ হয় তো সে-কাজে ব্রতী হইতে চাহে নাই। তাই বিদেশী ব্রাহ্মণকে ধরিতে স্বপ্ন-কাহিনীর সৃষ্টি! পূজক* ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে বাসলীর প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না, তাই ভোগের চাউল ভিন্ন পৃথক্ ভাবে কয়েক সের চাউলের সিধা তাঁহাকে দেওয়া হইত, আজিও দেঘরিয়াগণ সেই চাউল পাইয়া থাকেন। এই সব সংবাদ না রাখিয়াই বাসলীকে নিত্যকালী জয় দুর্গার আসনে বসাইয়া সত্যবাবু সিদ্ধান্ত করিতেছেন, "কাজেই ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির পূজারী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।" এ-দিকে রায় বাহাদুর মহাশয় বলিতেছেন—"আমরা জানি ধর্ম্মঠাকুর ও তাঁহার গণ ব্রাহ্মণের পূজা পাইতেন না। বাসলী দেবী কাজেই গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে হয় বৃক্ষতলে কিম্বা খড়ের কুটিরে নিম্নশ্রেণীর লোকের পূজায় তুষ্ট থাকিতেন। আদি সামন্তরাজ বিদেশী ছিলেন। তাহার পক্ষে বাসলী জাগ্রত দেবতা, প্রজা বশ করিতেই হউক আর বিশ্বাসেই হউক তিনি বাসলীকে কুলদেবী করিয়া লইলেন। কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ কই?

---

* সত্যবাবু তরুণ ব্রাহ্মণ দুইটির কথা লিখিয়াছেন, আমরা কিন্তু দুইটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবাদ শুনিয়া আসিয়াছি। পূজায় নিযুক্ত হওয়ার অল্প দিন পরে পরিতুষ্টা বাসলী দেবীদাসকে বিবাহের কথা বলিলে দেবীদাস বলিয়াছিলেন, 'বুড়াকে কে মেয়ে দিবে? বাসলী বর দিলেন, "মেয়ে ও মেয়ের বাপ তোমাকে তরুণ দেখিবে।" সুতরাং দুই ভাই বুড়া বয়সে আসিয়াছিলেন।

এমন সময় কোথাকার কে একজন আসিয়া জুটিলেন। তিনি চণ্ডীদাস।" যে-জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সত্যবাবু লিখিলেন, শালতোড়ার নিকটে চণ্ডীদাসের বাসস্থল, সেই জনশ্রুতি শুনিয়াই রায় বাহাদুর লিখিলেন "কোথাকার কে।"* ব্রাহ্মণ-পূজারী সম্বন্ধেও দুইজনের গবেষণা পড়িবার বিষয়! বীরভূমকে এড়াইবার কৌশলও দ্রষ্টব্য।

বিদ্যানিধি মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"আমার মনে হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কীর্ত্তন আদৌ নহে, ঝুমুর।" বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, আমিই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম এ কথা নিবেদন করি এবং আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়াই (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে আদৌ কীর্ত্তন নহে, ঝুমুর) ইহা তাঁহার "মনে হইয়াছে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার বাসবাটীর অতি নিকটেই ঝুমুরের দল থাকা সত্ত্বেও এপর্য্যন্ত তিনি সে সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান করেন নাই। অথবা করিলেও "মন্তব্যে সে-বিষয়ে কোনো আলোচনা লিখেন নাই। বীরভূমে কেন চণ্ডীদাসের এত পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বীরভূমের স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি-এ, মহাশয়ের একনিষ্ঠ সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সংবাদপত্রে তাড়াতাড়ি জাহির হইতে না দিয়া তিনি কি সত্য-বাবুকে একার্য্যে সাধনার উপদেশ দিতে পারিতেন না? বাঁকুড়ায় এখনো এত পুরানো পুঁথি পাওয়া যায় যে, খুঁজিলে সেইসমস্ত কাষ্ঠচাপের কবলবদ্ধ কীট-দষ্ট পুস্তক-স্তূপ হইতে অনেক রহস্যের সন্ধান মিলিতে পারে। সত্যবাবু অর্থশালী ব্যক্তি, বহু উকিল মোক্তারের সঙ্গে আলাপ; এইসমস্ত উকিল-মোক্তারগণের মক্কেলদের সাহায্যে, বাঁকুড়ার স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের সাহায্যে ও বিদ্যানিধি মহাশয়ের পরিচিত ও গুণমুগ্ধ লোকদের সাহায্যে, এবং সর্ব্বোপরি নিজের বেতন-ভোগী (বিশেষ ভাবে এই কার্য্যে নিযুক্ত) কর্ম্মচারীর সাহায্যে অতি অনায়াসে তিনি এই কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারেন। উপযুক্ত উপকরণ ও প্রমাণাদি সংগৃহীত হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমক্ষে পরিষদ-মন্দিরে অথবা অপর কোথাও এবিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে এবং তখনই সেইসমস্ত উপকরণ ও আলোচনাদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে তবে সত্য নির্দ্ধারণের উপায় সহজ ও সুগম হইয়া আসে।

অতি অল্প মাত্রায় হইলেও বাঁকুড়ায় আমি অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছি। বিষ্ণুপুরের সাব্‌ ডেপুটি কালেক্টার প্রিয় সুহৃদ্‌ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র শীলের সহায়তায় এবং তথাকার ভদ্রলোকগণের আনুকূল্যে আমি যতদূর সম্ভব বিষ্ণুপুরের ঘরে ঘরে পুরাণো পুঁথির সন্ধান করিয়াছ। দুই এক ব্যক্তি নানারূপ ছল করিয়া বিদায় দিলেও অনেকেই আগ্রহ সহকারে পুঁথিগুলি দেখাইয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের একটি পদ এমন-কি প্রচলিত পদাবলীর কোনো উল্লেখযোগ্য পদ প্রাপ্ত হই নাই। যে দুই একটি পদ পাইয়াছি তাহা "দীন চণ্ডীদাসের" ভণিতাযুক্ত। নীলরতন-বাবুর সংগ্রহে দীন চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদ আছে, এগুলি যে পদাবলী-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের নহে তাহা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় এ বিষয়ে পদাবলী সাহিত্যে সুপরিচিত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম-এ মহাশয়ের সহিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সত্যবাবুর একবার সে-সব পড়িয়া লওয়া উচিত।

ইতিপূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চণ্ডীদাস দুইজন বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় কি জন্য এই মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না আমাদের মনে হয়, চণ্ডীদাস দুই বা ততোধিক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনন্ত নামধারী গায়ক চণ্ডীদাস, পূর্ব্বকথিত দীন চণ্ডীদাস, রাগাত্মিকা পদের ভণিতার চণ্ডীদাস ইঁহারা একজন না হওয়াই সম্ভব। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে-চণ্ডীদাসের পদের রসাস্বাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারই পদ বৈষ্ণব-সংগ্রহ-গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে; আমাদের মতে তিনিই বীরভূম নান্নুরের সুপ্রসিদ্ধ পদাবলী রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। এই পদাবলী-প্রণেতার গানে একটা নিজস্ব চণ্ডীদাসত্ব আছে, এবং তাহা কি কীর্ত্তনীয়াগণের মুখে মুখে প্রচলিত, আর কি সম্পূর্ণ নূতন অধুনা আবিষ্কৃত সকল গানেই পাওয়া যাইতেছে। এই ছাপ নীলরতন-বাবুর সংগৃহীত প্রায় নয় শত গানের মধ্যে অন্ততঃ ছয় শত গানে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন কুড়িটি গানও পাওয়া যাইবে না, যাহা চণ্ডীদাসের বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় চণ্ডীদাসের যে নবাবিষ্কৃত পদ প্রকাশ করিয়াছিলাম, জনৈক ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ তাহা না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার সম্পাদিত বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি কি এইরূপ কোন পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পদ কয়টির মধ্যে একটি পদের প্রথম কয়েকটি চরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়। দক্ষিণাবাবু না কি অনেক বাছিয়া পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য নবাবিষ্কৃত পদগুলি তাঁহার বাছাইয়ের মধ্যেই পড়িয়াছে, সুতরাং এই পদে চণ্ডীদাসের ছাপ যে সুস্পষ্ট তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলেই তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলীর মধ্যে ব্যবধান যে কত বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আর বিশদ না করিলেও চলে। এখন হয়তো সত্যবাবু বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল ছাতনা, বাসলী, শুশু, নান্নুর লইয়া প্রবন্ধ রচিলেই সত্য আবিষ্কৃত হইবে না। পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সমস্যা আরো জটিল। পণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয় তাহা জানেন, আর জানেন বলিয়াই মন্তব্যে সে-প্রসঙ্গটার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি যে, আমি তথা-কথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্মভূমি কাঁকিনায় গিয়াও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কোনো পদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ছাতনা রাজবাড়ীতেও গিয়াছিলাম, কিন্তু কপাল-দোষে রাজবাড়ীতে যে-ভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম তাহাতে কবিকঙ্কণের সেই "তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান" কবিতাটি বারবার মনে পড়িয়াছিল, ইহার অধিক আর পাঁচজনকে ডাকিয়া শুনাইবার মত নহে। অতএব খোদ বাসলীর অধিষ্ঠান ভূমিতেও চণ্ডীদাসের পদের কোনো সন্ধান মিলে নাই। জীবন দেঘরিয়া মহাশয়ও স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছিলেন যে-চণ্ডীদাসের পদ-লিখিত কোনো পুরানো পুঁথি-পাতার সন্ধান তিনি জানেন না। এখন পাদটীকায় চণ্ডীদাসের মাবাপের নাম লেখা যে কাগজপত্রের বিষয় বিদ্যানিধি মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন সে-সব একটু সাবধানে গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। অবশ্য "প্রমাণ" যখন "বিচারাধীন আছে" এবং "পরে প্রকাশ করা যাইবে" তখন সে-সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে কিছু না বলাই ভাল। তবে এ অনুরোধ দশবার করিব যে বিচার যেন তিনি সত্যবাবুকে লইয়াই না করেন, একলা করেন সে বরং ভাল, কিন্তু লোক লইতে হইলে যেন অন্য লোক বাছিয়া লয়েন। অন্যথায় সাকালিপুর শাঁখারি-পুকুরের ইঙ্গিতটা হয়তো ঐ বিচারেই সত্য হইয়া উঠিবে, আর লোকে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভাষায় বলিবার অবসর পাইবে—

"সে করে নাই 'তিন কর্ম্ম' এই বা ক'রে যায়"।

আর-একটি নিবেদন, বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনে চণ্ডীদাসের পদাবলা

---

* রায় বাহাদুর ও সত্যবাবু একসঙ্গেই ছাতনায় গিয়াছিলেন। সত্যবাবু শুনিলেন শালতোড়ার নিকটে, আর রায় বাহাদুর শুনিলেন গ্রামের আশে ম! কত মিল!!

ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আলোচনার জন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কলিকাতার হাঙ্গামা মিটিলেই সম্ভব হইলে এই গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যেই পরিসদমন্দিরে এই কমিটির প্রাথমিক বৈঠক বসিতে পারে। বিদ্যানিধি মহাশয় যেন তৎপূর্ব্বেই তাঁহার বিচার-কার্য্য শেষ করেন। যিনি যেরূপ কর্ম্মের যোগ্য তিনি সেই কার্য্য করিলেই লোকের বলিবার কথা থাকে না, এই হিসাবে সত্যবাবুকেও একটা অনুরোধ করিতেছি। একাজ তাঁহারই উপযুক্ত এবং হঠাৎ প্রবন্ধ লিখিয়া সিদ্ধান্ত প্রচার না করিয়া এই সব কাজই এখন তাঁহার করা উচিত। কাজের কথা বলিতেছি—মানভূমের দূর নিভৃত পল্লীতে আজিও ঝুমুর গান প্রচলিত রহিয়াছে, তিনি যদি দয়া করিয়া ঐ অঞ্চল হইতে প্রাচীন ঝুমুর গান সংগ্রহ করেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা মহাপকার সাধন করিবেন। কাঙ্গালের এ অনুরোধ তিনি রাখিবেন কি? বক্তব্য বড় হইয়া গেল, তাই এবার নান্নুরের বাশুলী, ছাতনার বাসলী ও উভয় দেবতার ধ্যানাদির আলোচনায় বিরত রহিলাম। বীরভূম-সম্মিলনে প্রস্তাবিত কমিটির নাম দিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি।

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম এ, সি-আই-ই, (সভাপতি)

২। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি, এম-এ

৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম-এ,

৪। মৌলভী শ্রীযুক্ত সহিদুল্লাহ, এম এ,

৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ,

৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, বিদ্বদ্বল্লভ,

৭। এবং এই দীন লেখক।

শীঘ্রই এই কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন ও সংবাদপত্রে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।*

শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

উত্তর

অনুসন্ধান করিয়া যে-সকল জনশ্রুতির ও অন্যান্য প্রমাণের সন্ধান পাইয়াছি, তাহাই অবলম্বন করিয়া "ছাতনায় চণ্ডীদাস" বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঐসম্বন্ধে একটি বক্তব্য লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি মহাশয় ও আমি যে দুই পৃথক্ ব্যক্তি "ছাতনায় চণ্ডীদাস" সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের যে পৃথক্ মত থাকিতে পারে, একথাটা একেবারে আমল না দিয়াই, তিনি নিশ্চিতরূপে স্থির করিয়া লইয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে উকীল-মক্কেল সম্বন্ধ, আমরা ষড়যন্ত্র করিয়া ইচ্ছা করিয়া সত্যগোপনের দ্বারা "চণ্ডীদাস" "ছাতনা" ও "বাসলী" সম্বন্ধে একটা মিথ্যার মন্দির গড়িতে প্রয়াস করিয়াছি, এবং কোন-কোন স্থানে আমাদের মতের মিল না থাকায় আমরা বালকেরও হাস্যাস্পদ হইয়াছি। ইহা হরেকৃষ্ণ-বাবুর ন্যায় বড় পণ্ডিতের যোগ্য হইলেও দুঃখ হইতেছে যে, 'ফুরসৎহীন মামলাবাজ' আমার স্থূল বুদ্ধি ইহার সারবত্তা গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি আমাদের ঐ মিলের অভাব যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন সেইটাকেই বড় করিয়া ধরিয়া প্রথমেই গম্ভীরভাবে 'আমার বক্তব্যে এইসব প্রমাণিত হইবে' বলিয়া আশা দিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার বক্তব্যে কোথাও যুক্তির সন্ধান পাইলাম না। তাহাতে পাইলাম উষ্মা, উপহাস ও উপদেশ, আর এরূপ কতকগুলি উক্তি যাহা শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়াই শিষ্টজনে মনে করিবেন। জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ বিদ্যানিধি মহাশয়কে অযাচিত পণ্ডিত-মশায়ী উপদেশ দিয়া তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

তিনি যে সুরসিক তাহারও বহু প্রমাণ দিয়াছেন। যখন নীরস-বিজ্ঞান-সেবায় শুভ্রকেশ, কঠোর যুক্তিমার্গানুসারী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মধ্যে রসিকতার আবিষ্কার করিয়াছেন 'বিষয়ী ও অর্থশালী' বলিয়া সারস্বত-কুঞ্জের দ্বারে আমার প্রবেশ নিষেধ, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়াও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার নিজের গবেষণাপূর্ণ পদতত্ত্ব আলোচনা পাঠ করিবার জন্ম আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, এবং আমার যোগ্য স্থানও নির্দ্দেশ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, নিশ্চিতরূপে আমাকে ঘোর মামলাবাজ সাব্যস্ত করিয়া এবং এখানকার বহু উকীল মোক্তারের সহিত আমার বন্ধুত্বের কথা জানিয়াও তিনি 'বার্দ্ধক্যের প্রমাদ'গ্রস্ত বিদ্যানিধি মহাশয়কে আমার উকীল স্থির করিয়া দিয়াছেন তখন তাঁহাকে সুরসিক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? বর্ত্তমান 'বক্তব্য' সম্বন্ধে বলিবার আর কিছু আছে বলিয়া মনে করি না। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় লিখিয়াছেন, "বক্তব্য" বড় হইয়া গেল তাই এবার নান্নুরের 'বাশুলী' ছাতনার 'বাসলী' ও উভয় দেবতার ধ্যানাদির আলোচনায় বিরত রহিলাম। ইহা হইতে আশা হয় পরে ঐ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিবেন। তাঁহার সেই ভবিষ্যৎ বক্তব্যের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা

"বক্তব্যে"র বিজ্ঞপ্তি

ছাতনায় চণ্ডীদাস,—এই প্রবন্ধ প্রবাসীপত্রে প্রেরণের পূর্ব্বে আমরা প্রতি-বাদের আশা করিয়াছিলাম, কোপের সম্ভাবনা করি নাই। কোপের বাচিক প্রকাশ, বকুনি,—অর্থাৎ "বক্তব্য"কে ভৎসনা, স্বকৃতিত্ব ঘোষণা, এবং স্বদৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ করা। সম্প্রতি আমরা দুইজনে "বক্তব্য" হইয়া পড়িয়াছি। আমরা বীরভূমে চণ্ডীদাস, এই বাদে সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছি।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, মাত্র আমরা সংশয়ী হইয়াছি এবং অল্পদিন হইয়াছি। তাঁহাদের বিদিতার্থে সংশয়ের একটু ইতিহাস দিতেছি।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু তাঁহার বিশ্বকোষে ছাতনার বিবরণে লিখিয়াছেন—"প্রবাদ এইরূপ, বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস (ঐ) বাশুলীর উপাসক ছিলেন এবং প্রাচীন মন্দিরের নিকট বাস করিতেন।" ডাঃ দীনেশবাবু বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থে ছাতনার উল্লেখ করিয়াছেন। বাঁকুড়া "ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে" প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বেগল্লার সাহেবের রিপোর্টে ছাতনার বাসলী ও চণ্ডীদাসের ঐতিহ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রকাশ করেন। ইহার সম্পাদক বিদ্বৎ-বল্লভ বসন্তবাবু ছাতনার জনশ্রুতি শুনিয়া সেখানে বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জনশ্রুতিতে "নিঃসংশয় হন নাই, কিন্তু সংশয়ী না হইলে ছাতনা যাইতেন না। ১৩২৬ সালের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমার "সংশয়" প্রকাশিত হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম (৪৫ পৃঃ) "রামী-

---

* আমরা বারবার বলিয়াছি, আলোচনার কোন প্রবন্ধ যেন ৫০০ শত শব্দের বেশী না হয়। তাহা সত্ত্বেও দীর্ঘ আলোচনা পাইয়া আমরা অসুবিধায় পড়িতেছি।—প্রবাসীর সম্পাদক

রজকিনী ও সহজিয়া মত ও নান্নুরের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি, সব কি পোতহীন ভিত্তি? বাঁকুড়া-ছাতনার জনশ্রুতি আকাশে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে?" আমি কটকে "সংশয়" লিখিয়াছিলাম। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের মাস কয়েক পরে বাঁকুড়ায় আসি। প্রত্নজিজ্ঞাসু দুইজন শিক্ষিত লোকের নিকট ছাতনার জনশ্রুতি শুনিতে যাই। "হাঁ লোকে বলে, কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায় না।" একদিন "বাঁকুড়াদর্পণ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে দেখি, ছাতনার এক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাস ছাতনায় থাকিতেন, বাসলী মন্দিরের ইটে শক লেখা আছে, ইত্যাদি। তিনি খেদও করিয়াছিলেন, সমুদায় প্রমাণ কেহ অন্বেষণ করিতেছেন না, কালে বর্তমান চিহ্নগুলিও লুপ্ত হইবে। তিনি খ্রীষ্টান মিশনরী ইস্কুলের এক শিক্ষক এবং নিজে খ্রীষ্টান। তাঁহার দেশপ্রীতি দেখিয়া তাঁহাকে বাঁকুড়াদর্পণে প্রমাণগুলি প্রকাশ করিতে লিখি। তিনি স্বীকৃত হইয়াও কিন্তু লেখেন নাই।

আমি তখন বাঁকুড়ায় প্রবাসী, স্থির হইয়া বসিতে পারি নাই। ১৩২৯ সালের চৈত্র মাসে একদিন অপরাহ্নে, সত্যকিঙ্কর-বাবুর সহিত কথায় কথায় ছাতনায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কথা উঠে। দেখি, তিনি নানা বিষয়-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও যৌবনে আরব্ধ সাহিত্যচর্চ্চা ছাড়েন নাই এবং আমি যে-পথের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, তিনি সে-পথে অনেক দূর গিয়াছেন, ছাতনায় বহুবার গিয়াছেন, সেখানে বহুজনের নিকট জনশ্রুতি শুনিয়াছেন। পরদিনই তাঁহাকে পাণ্ডা করিয়া ছাতনা যাই। সেখানে বাসলী, মন্দির ও ইট দেখিলাম, শ্রীজীবনচন্দ্র দেঘরিয়া ও রাজা-সাহেবকে পাইলাম, কিন্তু বাঁকুড়াদর্পণের সেই পত্র-প্রেরককে পাইলাম না, রাজবংশের ইতিহাসজ্ঞ রামকিঙ্কর-বাবুকেও পাইলাম না। তখন তাঁহারা স্থানান্তরে ছিলেন। ছাতনার টোলের অধ্যাপক শ্রীহরগোবিন্দ স্মৃতিরত্ন পরে আসিয়া জুটিলেন। দেঘরিয়া ও অধ্যাপক মহাশয়কে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, "চণ্ডীদাস কোথা হ'তে এসেছিলেন?" "তা জানিনা।" "কখনও কিছু শোনেন নি?" অধ্যাপক মহাশয় নির্ব্বাক্। দেঘরিয়া মহাশয় বলিলেন, "ছাপা বইতে যেন কি লেখা আছে।" "ছাপা কথা শুনতে চাই না, সে আমরা জানি।" "কেউ কেউ বলে মামুরিকা গ্রামে তাঁর জন্ম। বীরভূম অঞ্চলে না কোথায় তা' স্মরণ হচ্ছে না।" পাঁচশত বৎসর পূর্বের কথা, যাহার সহিত বর্তমান জীবনযাত্রার সম্বন্ধ নাই, সে কথা কে বা স্মরণ করিয়া রাখে? আমিও গ্রামের নামটি স্মরণের যোগ্য মনে করি নাই। দেঘরিয়ার মনের অবস্থানটি স্মরণ করিয়া রাখিলাম। তিন বৎসর পূর্বে দেখা ও শোনা-কে আধার করিয়া বৈশাখের প্রবাসীতে মন্তব্য লিখিয়াছি। আজ ১৩৩৩ সাল ১২ই জ্যৈষ্ঠ ছাতনা আবার যাই। আমাদের বক্তার "বক্তব্য" উত্তররূপে পড়িয়া গিয়াছিলাম, দেঘরিয়া মহাশয়কে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর পাইলাম "কিছুই জানি না।" "আপনি যে মামুরিকা, এই নাম করেছিলেন?' "এমন কথা কেমন করে্য বলব।" অর্থাৎ আমার ভাবনাই ঠিক। তিনি প্রথমবার কোথা হইতে মামুরিকা ও বীরভূম পাইয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতেছি। তাঁহার মনে ছাপা বই জাগিতেছিল, তাহা অগ্রাহ্য করিতে বলিলে, তিনি বাক্যে অগ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু মনে পারিলেন না। ছাপা বইর নান্নুর, তাঁহার বিস্মৃত নান্নুর, কথায় মামুরিকারূপ পাইয়াছিল, "লোকে বলে বীরভূম" ও আসিয়াছিল। আর একবার এইজন বলিয়াছিল, মীর্জাপুর! এইরূপ, সত্যকিঙ্কর-বাবুও শুনিয়া থাকিবেন, শালতোড়া। এটা ত নগণ্য কথা। ১৭ বৎসর পূর্বে বসন্তরঞ্জনবাবু ছাতনায় "কবির মাতামহকুলের ভদ্রাসন সংস্থিতি" দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি "ইচ্ছা করিয়া সত্যগোপন করেন নাই" সকল গ্রামবাসী পুরাতন ভিটাও দেখায় নাই। অত কথায় কাজ কি, আমাদের "বক্তা" যিনি আমাদের দুজনকে বকিতে কসুর করেন নাই, তিনিই লিখিয়াছেন, সত্যকিঙ্কর বাবু 'ইচ্ছা করিয়া সত্যগোপন করিয়াছেন", আমি "তাহার পক্ষে ওকালতী" করিয়াছি, "যে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সত্যবাবু লিখিলেন" "শালতোড়ার নিকট চণ্ডীদাসের বাসস্থান" "সেই জনশ্রুতি শুনিয়াই" আমি লিখিয়াছি, "কোথাকার কে"; ইত্যাদি। গোপন একটা কর্ম্ম; প্রযত্ন ব্যতীত কর্ম্ম অসম্ভব, আর ইচ্ছা ব্যতীত প্রযত্ন অসম্ভব। অমুক অসত্য লিখিয়াছেন ইহা বলিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে বাস্তবিক সত্য কি। তারপর দেখিতে হইবে জানিয়া সত্যগোপন, কি না-জানিয়া গোপন। মনোব্যাকরণের ভাষায় প্রথমস্থলে ইচ্ছা "জ্ঞাত", দ্বিতীয় স্থলে "অজ্ঞাত"। "বক্তা"র অসত্য লিখন ইচ্ছা ব্যতীত হইতে পারে নাই, যদিও সে ইচ্ছা তাঁহার অজ্ঞাত। তাঁহার মনের ভিতরে এরূপ ইচ্ছা কেন হইল তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। সত্য বস্তুটা এত সুলভ নহে যে, যার ইচ্ছা তারই প্রাপ্তি ঘটে। প্রত্যক্ষ ঘটনার কত সাক্ষী আদালতে নিত্য নিত্য হাজির হইতেছে, ধর্মভীরু সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যা বলিয়া আসিতেছে। বৃথাভিমানী উকীল মনে করেন তাঁহার জেরার জোরে সত্যটা মিথ্যা হইয়া পড়ে, দুই সাক্ষীর উক্তিতে বিরোধ প্রদর্শন এক অসামান্য নৈপুণ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কয়জন দেখিতে জানে, শুনিতে জানে, দেখা ও শোনা যথাযথ বলিতে ও লিখিতে পারে। যখন প্রত্যক্ষ ঘটনাতেই মিথ্যার জাল জড়াইতে দেখি, তখন জনশ্রুতি বা লোকের কথায় ভূরি ভূরি মিথ্যা ও বিরোধ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বক্তা কে, শ্রোতা কে; জ্ঞাতব্যের সহিত বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্ক কি; কতজন বক্তা, কতজন শ্রোতা, মাত্র একবার শোনা, না বহুবার শোনা; একজন না বহুজনের নিকট শোনা; ইত্যাদি না জানিলে সত্যমিথ্যার তৌল করিতে পারা যায় না। জনশ্রুতির মূলে হয় সত্য থাকে, না হয় নাম-সাদৃশ্য থাকে, কিংবা উপাখ্যানের অংশবিশেষের সাদৃশ্য থাকে। ছাতনায় বাসলী আছেন, চণ্ডীদাস বাসলীর ভক্ত ছিলেন, এখন নয় বহুকাল পূর্বে; অমনি কথাটা রটিল ছাতনায় চণ্ডীদাস থাকিতেন; এই দেখ বাসলীর মন্দির, এই দেখ ধোবাপুকুর। চণ্ডীদাস নান্নুরে থাকিতেন, বীরভূমে নান্নুর নামে গ্রাম আছে অতএব চণ্ডীদাস সেখানে থাকিতেন। এই দেখ বাসলীর মন্দির, ধোবাপুকুর। দৃঢ় প্রমাণ "বীরভূম ছাড়া বাঙ্গলার কোথাও এই নামের গ্রাম নাই।"

বসন্তরঞ্জন-বাবু ছাতনায় গিয়া "নিঃসংশয়" হইতে পারেন নাই। তিনি নান্নুরে গিয়া "নিঃসংশয়" হইয়া ছিলেন কি না লেখেন নাই। কিন্তু লিখিয়াছেন, নিত্যাসহচরী বাশুলী চণ্ডীদাসকে নান্নুরে দেখিয়া-ছিলেন। নান্নুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর (পূর্বনাম সাঁকুলীপুর) থানার অদূরে * *। ইহা হইতে মন্তব্যে আমার সন্দেহের উৎপত্তি। এখন বুঝিতেছি থানার পূর্বনাম সাঁকুলীপুর ছিল পরে নান্নুর রাখা হইয়াছে। এই তথ্য আমার যুক্তির বাহ্য ছিল। তথাপি এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসলুব্ধদিগকে বিভ্রান্তপ্রবণ মনে করা আমার অন্যায় হইয়াছে। কারণ পরে পরে আরও উদাহরণ তুলিয়া দিবার স্থান ছিল না, এবং আমার বক্রোক্তি বক্তাকে "আঘাত করিয়াছে", কাহাকেও আঘাত করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। আমি ইহার জন্য দুঃখিত হইলাম।

এখন সংক্ষেপে আমার সংশয়ের পরিণাম বলিয়া যাই। ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে আমি কলিকাতা যাই। সেখানে মাস চারি ছিলাম। এই সময়ে হরেকৃষ্ণবাবু দয়া করিয়া আমার সহিত দেখা করিতে দুইদিন আসেন। আমি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "সংশয়ী"। কথায় বুঝিলাম, এই গ্রন্থ যে চণ্ডীদাসের নয় এই বিশ্বাসে তিনি প্রমাণ

খুঁজিতেছেন। ইতরজনসুলভ বাক্য প্রযুক্ত হইতে দেখিয়া ইহা যে ঝুমুর, তাহাও বলিয়াছিলেন। আমার "সংশয়ে" আমি কবির গ্রাম্যতা-দোষ দেখাইয়াছি, ঝুমুর, এই নাম কবি নাই। গত বৈশাখের মন্তব্যে লিখিয়াছি "আমার বোধ হইয়াছে "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" কীর্ত্তন আদৌ নহে ঝুমুর।" ইহাও সেই পুরাতন কথা, ঝুমুর নামটি মাত্র নূতন। ইহার অর্থ এমন নয় যে "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পদগুলি ঝুমুরের সুরে রচিত। হরিনাম কীর্ত্তন হইতে কীর্ত্তন শব্দ চলিয়াছে। এই হেতু যে পদে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশ না থাকে তাহাকে কীর্ত্তন বলা চলে না। এখন কীর্ত্তনের একটা সুর হইয়া গিয়াছে, অশ্লীল পদও সে সুরে গাহিতে নিষেধ নাই। তা বলিয়া সেটা কীর্ত্তন নয়। ঝুমুরের পদ-মাত্রেই যে অশ্লীল কিম্বা কবিত্ব-বর্জ্জিত তাহাও নয়। কীর্ত্তন গান ও ঝুমুর গান, দুই জাতি (species) কি একজাতি, যাঁহারা আমাদের দেশের গীতের বিবর্তনের ইতিহাস জানেন তাঁহারা বলিতে পারেন। আমি সে ইতিহাস জানি না।

কলিকাতায় থাকিবার সময় আমি প্রত্নবিৎ রাখালবাবুর কাছে ছাতনার মন্দিরও ইটের লেখা সম্বন্ধে জানিতে যাই। তিনি কিছু বলিতে পারেন নাই, কিন্তু একখানি পত্র দিয়াছিলেন। সে পত্র লইয়া "আর্কিয়োলজিকাল ডিপার্টমেন্টের" আপিসে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে কোন কর্ত্তা ছিলেন না।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সত্যকিঙ্কর-বাবুকে আমাদের ছাতনা ভ্রমণ লিখিতে বলি। তিনি এক খাতায় খসড়া লিখিয়া দেন। তখন আমি বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত ছিলাম, খাতাখানি আমার কাছে পড়িয়া রহিল। মাস কয়েক পরে ১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসে আমাকে আবার কলিকাতা যাইতে হয়। এবারও প্রায় তিন মাস ছিলাম। খাতাখানি সঙ্গে ছিল। কলিকাতায় আমাদের দেশের কবির ঐতিহাসিকের সহিত ছাতনায় চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কলিকাতার অরণ্যে এক পথের পথিক আবিষ্কার সোজা কথা নহে। যে দুই এক জনের সহিত কথা হইল, তাহাদের মুখে সেই পুরাতন বুলি, "প্রমাণ পাওয়া যায় না।" স্মরণ হইতেছে কেবল শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন "প্রমাণ কেহ খোঁজে নাই।" এবারেও আমাদের "বক্তা"র সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে খাতাখানি পড়িতে দিই এবং তিনি পরে "ভারতবর্ষে" এক প্রবন্ধে আমার অনুসন্ধানের উল্লেখ করেন। সেটা ছাতনায় চণ্ডীদাস নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস যে চণ্ডীদাস ছিলেন না, সেই পুরাণ কথা। গত বৎসর ভাদ্র মাসে তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, তখনও সেই কথা। তাঁহার নিকট শুনি, নান্নুরের বিশালাক্ষী নাকি বাগীশ্বরী, গ্রামের নাম নাদুর, সেখানেও পূজকেরা আপনাদিগকে চণ্ডীদাসের [?] বংশধর বলেন, সেখানেও ধোবাপুকুর আছে, থানার না গ্রামের নামের একটা পরিবর্তন করা হইয়াছে, ইত্যাদি।

তিন বৎসর পূর্বে সেই একবার ছাতনা গিয়াছিলাম। তখনকার দেখা ও শোনা-কে আধার করিয়া আমার মন্তব্য লেখা। সত্যকিঙ্কর-বাবুও তাঁর খসড়া আধার করিয়া তাঁহার অপর দৃষ্টশ্রুত বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি ও আমি একই তীর্থের যাত্রী, দুই এক মাসের নয়, অন্ততঃ ছয় বৎসরের। ইহাও বলি যদি "প্রমাণ পাওয়া যায় না", এই বুলি পুনঃ পুনঃ না শুনিতাম তাহা হইলে ব্যাপারটা কি তাহা জানিবার আগ্রহ হইত না। "বক্তব্যে"র মধ্যে কাজের কথা একটি আছে, সেটা গ্রামের নাম, নাদুর বা নান্নুর। এ কথাটা আমার দ্বিতীয় মন্তব্যে বিচার করা যাইবে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

ভ্রম সংশোধন

বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত ছাতনায় চণ্ডীদাস মন্তব্যে কয়েকটি ভুল হইয়াছে।

(১) ছাপার ভুল,—

৩১ পৃঃ ১২৫ পং প্রকৃত স্থানে প্রাকৃত হইবে।

৩৪ পৃঃ ১৪ পং সখীসংবাদ, পদ, কর্ত্তা স্থানে
সখীসংবাদপদকর্ত্তা হইবে।

(২) তথ্যের ভুল,—

/০ পণ্ডিত কৃত্তিবাস ১৩৫৫ সালের দশ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই; ১৩৫৪ সালে করিয়াছিলেন। (১৩২০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যা)

৵০ ছাতনার বাসলী রাজবংশের কুলদেবী নহেন। বাসলীর বর্তমান মন্দির রাজবাড়ীর সংলগ্ন, তাঁহার রাজপ্রদত্ত ভূমি-সম্পত্তি আছে এবং রাজা তাঁহার সেবায়ৎ। ইহা হইতে ভুলের উৎপত্তি। রাজবংশ বৈষ্ণব, কুলদেবতা মদনগোপাল। বাসলী ছাতনার গ্রামদেবী।

৶০ ছাতনার রাজা, মল্লভূমের রাজার সামন্ত ছিলেন, এবং এই হেতু রাজ্যের নাম সামন্তভূম,—একথা রাজা স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান রাজবংশ ছত্রী। বাঁকুড়ায় সামন্ত নামে এক জাতি আছে। সে জাতির সহিত রাজবংশের সম্পর্ক নাই।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

—

বাঁকুড়ার মেডিক্যাল স্কুল

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকার ১ম সংখ্যার ৭২ পৃষ্ঠায় মিশনরী ব্রাউন সাহেব সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে, যে, তিনি বাঁকুড়ার "প্রাণস্বরূপ" এবং বাঁকুড়ার 'মেডিকেল স্কুলেরও উদ্ভব এবং স্থিতি তাঁরই জন্য"। ব্রাউন সাহেব সৎকর্ম্মশীল এবং প্রশংসার্হ ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহাকে বাঁকুড়ার "প্রাণস্বরূপ" বলা নিতান্তই অত্যুক্তি। বাঁকুড়ার মেডিক্যাল স্কুলের উদ্ভব ও স্থিতি কেবল তাঁহারই জন্য নহে। উহা বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। উহা চালাইবার জন্য এবং উহার নিমিত্ত চাঁদা তুলিবার জন্য তিনি খাটিয়াছেন ইহা অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার্য্য; কিন্তু বাঁকুড়া সম্মিলনীর ও তাহার কোন কোন কর্ম্মীর উল্লেখ ইহার সংশ্রবে না করিলে ভ্রম ও নিমকহারামী হইবে।

"বাঁকুড়ার মানুষ"

—

গারোদের কথা

জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসীতে" "গারোদের কথা" হরিপদ-বাবু তাঁহার "আসামী বন্ধুর" প্রমুখাৎ যেমন শুনিয়াছেন, তেমনই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই অনুমান হয়।

গারো পুরুষরা সচরাচর যে বস্ত্র পরিধান করে, উহাকে "গান্দু" বলে, "গাণ্ডো" নহে। স্ত্রীলোকদের পরিধেয় বস্ত্রের নাম—"রীথিং"। স্ত্রীলোকেরাই পুরুষদের তুলনায় বরং সুশ্রী; বিপরীত নহে। ইহাদের ভিতর সুন্দরী পদবাচ্যা স্ত্রীলোকও একান্ত দুর্লভ নহে। বর্ণে ও শারীরিক গঠনাদিতে তাহারা শ্যামাঙ্গী খাসিয়া রমণী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

গারোরা খাদ্যদ্রব্য "আমাদের মত রান্না করে না" সত্য, কিন্তু "সামান্য একটু গরম হইলেই উহা তাহাদের আহারের উপযুক্ত হয়" বলিলে অবিচার হয়। প্রত্যেক পাচ্য-দ্রব্যই তাহারা সুসেদ্ধ করিয়া ভোজন করে। তাহারা মশল্লাদির ব্যবহার জানে না, কিন্তু একরাশ লঙ্কা না হইলে কোনটাই আবার তাহাদের মুখরোচকও হয় না। ঘৃত ও তৈলের পরিবর্ত্তে তাহারা বৃক্ষক্ষার (খাড়চি) ব্যবহার করে।

গ্রামের বহির্ভাগে শস্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বৃক্ষের উপর যে মঞ্চ নির্ম্মাণ করে, উহাকে "গোমদারণ" বলে। ভূমির উপরের পাকের ঘরগুলিকেই "বোরাং" বলা হয়। নৃত্য ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকলাপের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। মৃত ব্যক্তির পারত্রিক মঙ্গলার্থ গারোরা সাধারণতঃ উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পর্ব্বাদি (পাবন) উপলক্ষ্যেও কখনো কখনো নৃত্য হয় বটে, কিন্তু তাহা মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ-কামনায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মমীন, মাড়াক্ ও সাঙমা গারোদের "গোত্র" নহে; বর্ণ-বিভাগ মাত্র। গোত্রও আছে, যথা—মোড়ঙ, চিড়াঙ, দোফ্ক ইত্যাদি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সহিতই মমীন্ সম্প্রদায়ের বৈবাহিক সম্বন্ধাদি চলিতে পারে। মাড়াক্ এবং সাঙমাদের মধ্যেও অধুনা সবর্ণে বিবাহ হইতেছে, কিন্তু উহা দূর্ণীয় বলিয়া কথিত। মোড়ঙ, দোফক, চিড়াঙ, চিসিম্, রিচিল প্রভৃতির সগোত্রে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

গারোদের মধ্যে একমাত্র ভাগিনেয়ই মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সূত্রে ওয়ারিশ হয়—পুত্র নহে।

পিতা পুত্রীকে ভাগিনেয়ের সহিত বিবাহ দিয়া "ঘর-জামাই" করিয়া রাখে। একাধিক কন্যা বর্ত্তমান থাকিলে তন্মধ্যে পিতার মনোনীতা একজনের সহিতই ভাগিনেয়ের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং অবশিষ্ট দুহিতৃগণ সময়ে অন্য পাত্রস্থা হইয়া থাকে। ভাগিনেয়ের এতটা কদর যে, কখনো কখনো জীবিত অবস্থান-কালেই সে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাতুল বোনের কর-পীড়ন করিবার নিমিত্ত মনোনীত হইয়া থাকে।

গারোদের বিবাহ তিন প্রকার যথা—(১) দোদক্কা অথবা প্রাজাপত্য বিবাহ; (২) দোনাবা অথবা গান্ধর্ব্ব বিবাহ; এবং (৩) সেক্কা অথবা বিবাহ। কোন্ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বিবাহের দিবস কনেকে নদীর ধারে লইয়া যায়, তাহাকে উত্তমরূপে স্নান করায়" ইত্যাদি হরিপদ-বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই। আমি যতদূর জানি —আবেঙ, দোআল, চিবক্, বাড়াক্, জারি-আদম্, বাচচু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভিতর এ-প্রথার প্রচলন নাই।

ইহাদের বিবাহে প্রতিজ্ঞা উচ্চাঙ্গের। "চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, দেবতা এবং বাঘ ও ভাল্লুককে" সাক্ষী রাখিয়া বর-কন্যাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, "আপদে-বিপদে, রোগে-শোকে সকল সময়েই পরস্পর পরস্পরের সহায় হইবে' ইত্যাদি। পুরোহিত বিবাহ-সভায় এই প্রতিজ্ঞা আবৃত্তি করিলে পর বর ও কন্যা উভয়কেই যথাক্রমে "ওয়ে" "ওয়ে" বলিয়া আপন আপন স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে হয়। দেবতা এবং চন্দ্রাদির সঙ্গে বাঘ ভাল্লুককেও জুড়িয়া দেওয়া হয় এইজন্য যে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে বাঘ-ভল্লুক তজ্জনিত পাপের সদ্য সাস্তি বিধান করিতে পারিবে।

পুরাকালে মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় "নর-বলি" হইত না; তবে একটা "ডাইন" বা "ডাইনী" আখ্যাপ্রাপ্ত মানুষকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া "ওয়ালচাথ্যা" করা হইত। সে এক অতি নিষ্ঠুর এবং বীভৎস ব্যাপার! হতভাগ্য মানুষটাকে চিতার সংলগ্ন একটা খুঁটীর সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া চিতাতে অগ্নি-সংযোগ করা হইত এবং তদবস্থায় আর্ত্তনাদ করিতে-করিতে সে পলে পলে পুড়িয়া মরিত। বলা বাহুল্য যে, এক্ষণে এই নিষ্ঠুর প্রথা লুপ্ত হইয়াছে। "ওয়ালচাথ্যার" পরিবর্ত্তে স্থান বিশেষে এখনও "বৃষোৎসর্গের" ব্যবস্থা আছে। একটা বৃষকে কুঠার বা বর্ষার প্রচণ্ড আঘাতে হনন করা হয় এবং তাহাতেই তাহাদের বিশ্বাস যে মৃত-ব্যক্তির স্বর্গ-লাভ হইয়া থাকে। বৃষ-বলির প্রথাও আছে বটে, কিন্তু উহা একমাত্র সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধিক ব্যাপারেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরলোকগত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার্থ যে "বৃষ"টি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখা হয়, উহাকে গারোরা "দেলাঙ" বলে।

গারোরা যে শুধু মহাদেবরই পূজা করিয়া থাকে, তাহা নহে। তাহাদের নিজস্ব বিধি-ব্যবস্থানুযায়ী অনেকেই দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, কামাখ্যাপূজা, বাস্তুপূজা প্রভৃতিও করিয়া থাকে। হিন্দুর আজন্মসঞ্চিত আত্মম্ভরিতা, মজ্জাগত নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্যের দোষে এবং অক্লান্তকর্ম্মা মিশনারীদের চেষ্টায় ও উদ্যোগে এই শক্তিশালী জাতটা আজকাল দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিতেছে। তাহারা শুধু একটু সহানুভূতির কাঙ্গাল।

শ্রী শশীভূষণ পাল

—

ঢাকার হিন্দু "নেতা"গণ

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে আপনি লিখিয়াছেন, যে, হিন্দুনেতাগণ ২৫৲ জরিমানা স্বরূপ মুসলমান অনাথ আশ্রমে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে! প্রস্তাবটা তদ্দূর গড়ায় নাই। রায় বাহাদুর প্যারীলাল দাস মহাশয় ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য দয়াপরবশ হইয়া হিন্দুদের পক্ষ হইতে এ অপমানজনক প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন; কিন্তু তাহার অন্য দুইজন হিন্দু সহযোগী অনিচ্ছা প্রকাশ করায় প্রস্তাবটির অকালমৃত্যু হয়।

আপনি আরও লিখিয়াছেন, যে, ঢাকার হিন্দুদের সভা করিয়া "নেতা'দের কার্য্যের প্রতিবাদ করা উচিত। শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মিঃ আর, কে, দাস, ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সভাপতিত্বে হিন্দুগণ 'নেতা'-ত্রয়ের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া এবং তাহাদের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, 'নেতা'ত্রয় তাহাদের কার্য্যদ্বারা ঢাকার হিন্দুসমাজের মুখে যে কালী মাখাইয়াছেন, তাহা ঢাকা জেলার অধিবাসী বলিয়া আমি বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে ইহা কেবল ঢাকার হিন্দুসমাজের কলঙ্ক নয়, সমগ্র বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের কলঙ্ক। মনে হয়, এইরূপ গণ্ডা-কয়েক হিন্দু 'নেতা' জন্ম গ্রহণ করিলেই হিন্দুমুসলমান বিরোধের চির অবসান হইবে; কারণ, ক্ষমা এবং প্রেমের বলে অচিরেই হিন্দুগণের মোক্ষলাভ নিশ্চিত।

শ্রী সতীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

—

ঢাকায় হিন্দু মিছিল ও মস্‌জিদের কথা

জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে দেখিলাম আপনি "হাসান্-মঞ্জিলে"র সভা ও হিন্দুদের ক্ষমা-প্রার্থনা করার কথা আলোচনা করিয়াছেন। আপনার আলোচনা সুযুক্তিপূর্ণ এবং আপনি ঢাকাবাসীর যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা করিয়াছেন। ঢাকা মুসলমান-প্রধান স্থান। এখানকার হিন্দুরা স্বভাবতঃই যেন মুসলমানদের কেমন একটু অতিরিক্ত

সমীহ করিয়া চলেন আর সেই খাতিরের আতিশয্যেই অমন একটা জঘন্য ঘটনা ঘটিয়াছে। এজন্য প্রত্যেক ঢাকাবাসীরই অনুতপ্ত হওয়া উচিত আর শুধু এই অপমান স্মরণ করিয়া তাহার যথাযুক্ত প্রতিবিধান করা উচিত। ঢাকায় মস্‌জিদ যে কয় শত আছে তাহা জানি না। এই সহরের যে কোনো রাস্তায় বাহির হইলেই ডাইনে বাঁয়ে শুধু মস্‌জিদই চোখে পড়ে। মন্দির ক্বচিৎ দু'একটা। এই ঢাকা শহরে যদি মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দু-মিছিল (Highlanderদের বাজনা তাঁহাদের বিরক্ত করে না) চির তরে বন্ধ হইয়া যায়। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট-হাউসে যে উভয় সম্প্রদায়ের মন্ত্রণা বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে নাকি মিঃ গাজ্‌নভী চৌদ্দটি প্রধান মস্‌জিদের খস্‌ড়া দাখিল করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই চৌদ্দটি মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা থামাইতে হইবে। এই চৌদ্দটি নাকি তাঁহাদের principal mosques। এখন এই principal mosques-এর মানে কী? বড় মস্‌জিদ যদি House of God হয় তো ছোট মস্‌জিদ ও তো তাই সুতরাং—"এই কয়টা মস্‌জিদের সম্মুখে বাজাবে আর কয়টার সম্মুখে বাজাবে না"—এই পরোয়ানা জারীর absurdity self-evident. তাঁহাদের শরিয়তে যদি সত্যই মস্‌জিদের সুমুখে বাজনার নিষেধাজ্ঞা থাকিয়া থাকে, তো সব মস্‌জিদের সম্মুখেই বাজনা বন্ধ করিতে হইবে। মিঃ গজ্‌নভীর এই Prinicipal আর nor-Principal mosque আখ্যা হইতেই মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিতে হইবে, এর অলীকত্ব প্রমাণ হয়। মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিতে হইলে vehicular trafficও যে বন্ধ করিতে হয়। চাই কী বাঙলা দেশটা মক্কা-শরীফ্‌ করিয়া নিন্‌ আমাদের মুসলমান ভাইরা; কিন্তু কথাটা হইতেছে এই যে, ভায়ে ভায়ে সম্প্রীতি থাকে ততদিন যতদিন বড় কী ছোট এই দুই ভা'য়ের একজনের আবদার চরমে না ওঠে। হিন্দুদের নিজেদের বাড়ী হিন্দুস্থান হইতে তাড়ানো "প্রচণ্ড কল্পনা"; তার চেয়ে তাঁহারা যখন তুর্কীস্থানের আদিম বাসিন্দা, তখন সেইখানেই তাঁহারা গেলে বুদ্ধিমানের উপযুক্ত কাজ করিবেন। ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ খুবই strained। এখানে সংগঠন দরকার আর তার আগে এ-জেলার হিন্দু জনসাধারণের মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়া যাইবার দাবী করিতে হইবে। এবিষয়ে চুপ করিয়া থাকিলে ঢাকায় হিন্দুর অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য ডুবিবে এ নিশ্চিত। হিন্দু জনসাধারণ তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী ত্যাগ না করিয়া এটা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হোন্‌, এই আমার কামনা।

শ্রী জ্যোৎস্নানাথ চন্দ

—

মস্‌জিদের সম্মুখে সঙ্গীত

'প্রবাসীর' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কলিকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ পড়িয়া আমার দু'একটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। সকলেই জানেন যে, এই হাঙ্গামার প্রধান কারণ কোনও মস্‌জিদের সম্মুখে আর্য্য-সমাজীদিগের গানবাজনা করা এবং তাহার বিরুদ্ধে মুসলমান-দিগের প্রতিবাদ। সম্প্রতি গভর্ণর লিটন্‌ সাহেব এই গোলমাল মিটাইয়া ফেলিবার জন্য উভয় পক্ষ হইতেই প্রতিনিধি আহ্বান করিয়া এক সভার অধিবেশন করান। সংবাদপত্রে প্রকাশ, কতিপয় মুসলমান প্রতিনিধি বলেন যে, দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে-কোনও সময়ে হৌক না কেন কোনও মস্‌জিদের সম্মুখে কোন-প্রকার গান-বাজনা বা শব্দ করা ইস্‌লাম ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধ। তাহাই যদি হয়, তবে মুসলমানগণ ট্রামকোম্পানী বা মোটরবাসগুলির স্বত্বাধিকারিগণকে বাদ দিয়া শুধু হিন্দুদিগের উপরই এত বিদ্বেষভাবাপন্ন কেন? তাঁহারা যদি জনসাধারণকে তাঁহাদের এই নূতন নিয়মের কথা বিশেষরূপে জানাইতে চান, তবে অগ্রে কলিকাতার মস্‌জিদ্‌গুলির সম্মুখে ট্রামগাড়ী ও মোটরবাসগুলির চলাচল বন্ধ করিয়া দিন। তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, কীর্ত্তনের বা ভজনের সঙ্গীত ধ্বনি অপেক্ষা ট্রামগাড়ী বা মোটরবাসের ঘড় ঘড় শব্দ আর শ্রুতিসুখকর নহে।

শ্রী নির্ম্মল সেন

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষা

পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে 'ধর্ম্ম' শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কি না বা থাকিলে তাহার স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অভিজ্ঞতা আমার নাই। পৃথিবীর সমগ্র অথবা অধিকাংশ শিক্ষা-সঙ্ঘের সহিত পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই তাহা করিবার অধিকারী। আমি নিতান্ত নগণ্য সাধারণ মানুষ—সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার সঙ্গে আমি পরিচিত, সেইজন্য সাধারণভাবে একথা আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি—ধর্ম্মহীন শিক্ষা শিক্ষাই নহে, যদি চরিত্রগঠনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয় তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হওয়া চাই যে 'ধর্ম্ম'—একথা কেমন করিয়া অস্বীকার করা যায়? এই অবশ্য-স্বীকার্য্য বিষয়টি স্বীকার করিয়া লইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে 'ধর্ম্ম' অবশ্য পঠিতব্য বিষয় হওয়া উচিত একথা স্বতঃই মনে হয়। কিছু দিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইবেল শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা খৃষ্টান শিক্ষার্থীর পক্ষে সুসঙ্গত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় অপরাপর ধর্ম্মমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নাই। খৃষ্টানাতিরিক্ত পাঠার্থীকে নিজের ধর্ম্মমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না করিয়া পরন্তু অপর একটি ধর্ম্মের আলোচনায় বাধ্য করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কতদূর সমদর্শিতার পরিচায়ক তাহা বুঝিতে দুঃখ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষীয় সকল ধর্ম্মশিক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া শিক্ষার্থীকে স্বেচ্ছামতে যে-কোন একটি ধর্ম্ম শিক্ষায় বাধ্য করা উচিত। আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা ব্যবস্থা করা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাধ্যায়ত্ত না হইলে বর্ত্তমান পঠিতব্য বিষয়গুলির মধ্য হইতে কোনটিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া সংক্ষিপ্ত করিয়া সেই স্থানে ইহার স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে কি না? এসম্বন্ধে জনমত কি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—

সেরপুরের প্রাচীন মূর্ত্তি

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে (পৃ ২৭৫—৭৮) শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেরপুরে প্রাপ্ত দুইটি মূর্ত্তির সচিত্র পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি পিতল-নির্ম্মিত চতুর্ম্মুখ দশভুজ "শিবমূর্ত্তি," অপরটি কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত চতুর্ভুজ মৎস্যাবতার মূর্ত্তি। প্রথমোক্ত মূর্ত্তি সম্বন্ধে হরগোপাল-বাবু লিখিয়াছেন, "মূর্ত্তিটি শিবের একটি প্রকারভেদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে প্রকারভেদ নির্ণয় আবশ্যক। এ মূর্ত্তি অন্যত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না।"—সম্প্রতি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘরে সেরপুর হইতে এইরূপ একটি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে এবং ইহার বিবরণ Ann

Report of the Varendra Research Society for 1925-26 এর অন্তর্গত আমার লিখিত যাদুঘরের "বার্ষিক সংগ্রহ তালিকার' পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত শিবমূর্ত্তির চিত্র দেখিয়া মনে হয়, হরগোপাল-বাবুর-বর্ণিত মূর্ত্তিই সম্ভবতঃ রাজসাহীতে আনীত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি যে সদাশিবের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সদাশিবের একটি ধ্যান গোপনাথীরাও লিখিত Elements of Hindu Iconography গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্টে (পৃ ১৮৭) উদ্ধৃত আছে। তদনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় সদাশিবের পঞ্চ মুখ, (১) এবং তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও দশভুজ-সমন্বিত। দক্ষিণের হস্তপঞ্চকে যথাক্রমে অভয় মুদ্রা, প্রসাদ মুদ্রা, শক্তি, ত্রিশূল ও খট্বাঙ্গ এবং বামভাগের করপঞ্চকে যথাক্রমে ভুজঙ্গ, অক্ষমালা, ডমরু, নীলোৎপল ও 'বীজাপুর' ধারণ করিয়া থাকেন। এই বর্ণনার সহিত বাঙ্গালাদেশে প্রাপ্ত এক-শ্রেণীর শিবমূর্ত্তির অনেকাংশে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই-প্রকার মূর্ত্তি সেনরাজগণের কতিপয় তাম্রফলকে সংলগ্ন মুদ্রায় উৎকীর্ণ আছে। কোন-কোন তাম্রশাসনে এই মুদ্রা "সদাশিব-মুদ্রা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সদাশিবের প্রস্তরমূর্ত্তি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘরে এবং কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হইতেছে। সদাশিব তন্ত্রোক্ত ষট শিবের অন্যতম। ইহার পূজা-পদ্ধতি রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

মৎস্যাবতারের মূর্ত্তিটি দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তবে আমাদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী মধ্যে শ্রীযুত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের বরেন্দ্র-ভ্রমণ বিবরণের ৫ পৃষ্ঠায় উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। হরগোপাল-বাবু এই সুন্দর মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিয়া মূর্ত্তিতত্ত্ব-চর্চ্চার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এই চিত্রে অবশ্য মূর্ত্তির সকল অংশ পরিস্ফুট হয় নাই। তবে দেবতার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও গদা এবং বাম ভাগের একটি হস্তে চক্র, নিঃসন্দেহরূপে রহিয়াছে দেখা যায়। বাম ভাগের দ্বিতীয় হস্ত কটিদেশ স্পর্শ করিয়া সম্ভবতঃ একটি সনাল পদ্মের মূল ধারণ করিয়া আছে। মূর্ত্তির দক্ষিণে চামর-ধারিণী লক্ষ্মী ও বামে বীণা-হস্তে সরস্বতী। বিষ্ণুর নিম্নার্দ্ধ মৎস্য পুচ্ছাকৃতি এবং তিনি পদ্মপীঠের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় স্থাপিত। পদ্মপীঠের নিম্নস্থ কারুকার্য্যগুলি অস্পষ্ট বলিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। বিষ্ণু-মূর্ত্তির মাথার উপরে, মধ্য স্থলে কীর্ত্তিমুখ ও তাহার উভয় পার্শ্বের দুইটি মাল্যধারী মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে।

শ্রী ননীগোপাল মজুমদার

১ এই পাঁচটি মুখের মধ্যে শিল্পে তিনটি বা চারিটি মাত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

আলো-ছায়া

শ্রী পরেশনাথ চৌধুরী

আজিকে বাদলের বেলাশেষে
গোধূলি ম্লান হাসি গেল হেসে।
সজল যূথিকার পরিমলে
আঁধার ঘিরে আসে বনতলে।
উতল বহে বায়ু চারিভিতে
ঘনায়ে আসে স্মৃতি মোর চিতে।
আজিকে বরষার তমসারে
বিজলী গেল হেনে বারে বারে।

২

আজিকে মনে পড়ে পাশাপাশি
দুজনে চলেছিনু কোথা ভাসি'।
সেদিন জোছনায় বিভাবরী
জোয়ারে কূলে কূলে ছিল ভরি'।
সেদিনো ফুলে ফুলে ভরা নিশি
স্বপনে জাগরণে গেছে মিশি'।
আজিকে মনে পড়ে মেঘ হেরি'
কেন যে সব কথা সেদিনেরি।

অকূলে ভেসে গেল যত আশা
মিলায়ে গেল যত কাঁদা হাসা,
কেন যে ফিরে আসে আঁখিভরা
করুণ রূপে হায় মনোহরা!
হৃদয়ে শেল হানি' গেল যেবা
ধেয়ানে তারো আজ করি সেবা।
যাহারে ছেড়েছিনু আঘাতিয়া
তারেও চেয়ে আজ কাঁদে হিয়া।

৪

আজিকে সুনিবিড় বরষায়
ভরেছে নীপ-বন সুষমায়।
মেঘের ছায়াভরা নদীজল
আজিকে আঁখি মম ছলছল্।
আজিকে মেঘে বাঁধা দুটি তীর
মিশেছে হাসি আর আঁখি-নীর।
চেয়েছে বাদলের বেলাশেষ
রোদন সাথে আজ গীতরেশ।

পুস্তক পরিচয়

[পুস্তক-পরিচয়ের বা পুস্তক-সমালোচনার সমালোচনা বা প্রতিবাদ না ছাপাই আমাদের নিয়ম।—সম্পাদক]

সঙ্কলন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৸৵০। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১৭ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠার সংখ্যা ৩৮৫+১০।

রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'র সহিত বাঙালী পাঠক সুপরিচিত। তাহাতে তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে সঙ্কলন করিয়া ঐরূপ একটি বহি বাহির করিলে ভাল হয়, এ-চিন্তা অনেকের মনেই অনেকবার দেখা দিয়াছে। এখন তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন আর সকল রকম গদ্য রচনাই ইহাতে আছে। শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে-সকল প্রশ্ন ও সমস্যা ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই-সকল বিষয়ে কি বলিয়াছেন জানিবার জন্য তাঁহার নানা গ্রন্থের পাতা উল্টাইতে হইবে না, অনেক বিষয়ে তাঁহার চিন্তা এই সঙ্কলন বহিটিতেই পাওয়া যাইবে। গোড়ার কয়েকটি লেখা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে ;— যথা, শিক্ষার হেরফের, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, শিক্ষার বাহন, শিক্ষার মিলন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, নববর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশী সমাজ, সমস্যা, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কিরূপ বহুমুখী তাহাও এই একখানি বহি হইতেই অনেকটা বুঝা যায়।

কোনও বহিতে যাহা এখনও বাহির হয় নাই, এমন লেখাও 'সঙ্কলনে' কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে।

চিরকুমার সভা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১৭ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০। এণ্টিক্ কাগজে ছাপা। পৃষ্ঠার সংখ্যা ২২০+১০

এই পুস্তকের পাঠ-পরিচয় হইতে জানা যায় যে, ইহা প্রথমে উপন্যাসরূপে ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক বাহির হয়। তাহার পর ১৩১১ সালে হিতবাদী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে ইহার নাম হয় 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ'। ১৩১৪ সালে গদ্য-গ্রন্থাবলীর ৮ম ভাগে ইহা যখন একটি আলাদা বহি করিয়া প্রকাশ করা হয়, তখনও ইহার ঐ নামই ছিল। ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসে কবি উপন্যাসটিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া নাটকের আকার দেন। তাহাতে তিনি অনেক অংশ নূতন করিয়া লিখিয়া দেন, এবং অনেকগুলি নূতন গানও যোগ করেন ; কিন্তু উপন্যাসের কিয়দংশ বাদ পড়ে। বর্ত্তমান বহিটিতে নাটকের আকারই রাখা হইয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের যে যে অংশ নাটকে বাদ পড়িয়াছিল তাহার প্রায় সমস্তই যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইসব কারণে এই বহির আগেকার সংস্করণ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেও বর্ত্তমান সংস্করণ সংগ্রহ করিতে হইবে। নির্ম্মল হাস্যরসের উৎস এই বহিটির নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ফল্গুনদীর মত করুণরসও যে ইহার নিম্নে প্রবাহিত, তাহাও মর্ম্মজ্ঞ পাঠক মধ্যে মধ্যে বুঝিতে পারেন, নারী-জাতিকে 'বয়কট' করিবার প্রয়াস কিরূপ ব্যর্থ, তাহা মানবচরিত্রজ্ঞ সমজদার সন্ন্যাসীও ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন।

পূরবী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ২৲ ; বাঁধান ২॥০ মোটা এণ্টিক কাগজে—২৸০ ও ৩৷০। বড় আকারের পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৫৪+॥০

এই পুস্তকে ১৩২৯ হইতে ১৩৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতাগুলি "পূরবী" অংশে এবং ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখা কবিতা "পথিক" অংশে দেওয়া হইয়াছে। যে-সব পুরাতন কবিতা এতদিন কোনও বহিতে বাহির হয় নাই। সেগুলি "সঞ্চিতা" অংশে মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহার একটি বিস্তারিত সমালোচনা গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে।

প্রবাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় মূল্য ১॥০ ; বাঁধান—২৲ ; মোটা এণ্টিক কাগজে—২৲ ও ২॥০।

প্রবাহিনীতে যে-সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই গান, সুরে বসান। এই কারণে কোন কোন পদে ছন্দের বাঁধন নাই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে। রচনাগুলি গীতগান, প্রত্যাশা, পূজা, অবসান, বিবিধ ও ঋতুচক্র এই কয়টি খণ্ডে বিভক্ত।

র

শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ—ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ হেড মাষ্টার, ফেণী হাই স্কুল, প্রকাশক। ৪০৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও ৬ খানি সুন্দর ব্লক ছবিতে সুসজ্জিত।

শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথ গোরখ সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত সাধু ছিলেন এবং গোরখমঠে শেষ বয়সে কিছুদিন মোহান্ত না হইয়াও মোহান্তের দায়িত্বভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক বাঙ্গালী শিষ্য ছিল বাঙ্গালী বিখ্যাত সাধু শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দ্বারা বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার পরিচয় পায়। গ্রন্থকার তাঁহার একজন বাঙ্গালী শিষ্য। আমাদের দেশে এইরকম কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের শিষ্য-গোষ্ঠীর মধ্যেই পরিচিত হইয়া তাহাদের মধ্যেই অবসান হন। পরে তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক কিম্বদন্তী ছাড়া আর কিছুই জানিবার উপায় থাকে না। এইসব সাধু মহাত্মারা প্রায়ই তাঁহাদের নিজ জীবন সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন না এবং সদা আত্মসমাহিত এইসব মহাত্মাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার ভাব সেই অবস্থায় উপনীত না হইলে শিষ্যদেরই বা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা কোথায়? তবু তাঁহাদের সান্নিধ্যে যে প্রেম, ক্ষমা উদারতা ও শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহা তাঁহার শিষ্যগণ উপভোগ করিবার সুবিধা পান।

এই সাধনাই ভারতবর্ষের প্রধান সম্পদ এই সম্পদ্ লোকালয় হইতে

পরে পর্ব্বতগহ্বরে সঞ্চিত হইয়া দুই-একটি ব্যক্তির মধ্যে কিছু বিতরিত হইয়া পর্ব্বতকন্দরেই লোপ পায়। এইসকল মহাত্মাদের অপূর্ব্ব জীবন তাঁহাদের শান্ত সমাহিত যোগমগ্ন অবস্থার কথা সকলেরই জানা উচিত, কিন্তু তাহা জানিবার একমাত্র উপায় তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্যদের হাতে। তাঁহাদের উচিত যে এইসমস্ত মহাত্মাদের সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের শিক্ষিত চিন্তার সাহায্যে সঙ্কলন করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়া দেন। এই গ্রন্থে তাহা অতি সুচারুরূপেই সম্পাদিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। ইহা ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর নিকট সমাদর লাভ করিবে।

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

নীতিপাঠম্—শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, এম্-এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক পণ্ডিত সীতানাথ বিদ্যাবিনোদ, সারস্বত মন্দির, বাংলা বাজার, ঢাকা। ৫৬ পৃষ্ঠা, ছয় আনা।

উচ্চ বিদ্যালয়ের আধুনিক অষ্টম ও প্রাচীন তৃতীয় শ্রেণীর বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী সংস্কৃত গদ্যপদ্যময় আখ্যান ও উপদেশমালা। পাঠগুলি সংক্ষিপ্ত, ক্রমকঠিন এবং পাদটীকা দ্বারা দুরূহ স্থান ব্যাখ্যাত। বিদ্যাপুরন্ধরদিগের ব্যবস্থায় সংস্কৃত এখন অবশ্যশিক্ষণীয় নয়, বিদ্যার্থীর স্বেচ্ছাধীন বিষয় হয়েছে। কিন্তু ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন বা অন্য যে কোনো ধর্ম্মাবলম্বীই হোক যদি সংস্কৃত না জানে তবে সে ভারতের যে ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য তার সঙ্গে যোগযুক্ত হ'তে পারে না; সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষা বিনা ভারতবাসী সম্পূর্ণ ভারতবাসী হয় না। আমার মতে প্রত্যেক ভারতবাসীর অল্পবিস্তর সংস্কৃত ও ফার্সী এবং ইংরেজী প্রভৃতি একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা তার কর্ষণা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হ'তে পারে না। অধিকন্তু আমাদের ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রচলিত ভাষাই সংস্কৃতমূলক ও ফার্সী, ইংরেজী-শব্দ-ভূয়িষ্ঠ। সুতরাং সংস্কৃত না জানলে কেউ নিজের মাতৃভাষাও শুদ্ধ করে' জানতে ও লিখতে পারে না। আজকাল সংস্কৃত অবশ্য শিক্ষণীয় না থাকাতে স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা যে বাংলা লেখে তা দেখলে লজ্জায় দুঃখে ও ভবিষ্যতের ভাবনায় অভিভূত হ'তে হয়। এইসব দেখে শুনে পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাচীন রচনাবলীর মধ্যে থেকে বেছে বেছে পাঠগুলি ক্রমবিন্যস্ত করেছেন; সঙ্কলয়িতা নিজে শিক্ষক ও দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক এবং সংস্কৃত ও বাংলা দুই বিষয়ে এম-এ, সুতরাং তিনি শিক্ষার্থীদের অভাব ও আবশ্যক বুঝে, এই সঙ্কলনটি প্রকাশ করেছেন। এই বইখানি বিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হ'লে ছাত্রছাত্রীগণ অনায়াসে কিছু সংস্কৃত শিখতে পারবে। বইখানির ছাপা কাগজ উত্তম ও দাম স্বল্প। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের কথা—ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার প্রণীত। ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মূল্য অনুল্লিখিত। পৃঃ ৯৫।

ডাক্তার সরকার মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিয়া বাংলা মাসিক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনোব্যাকরণ মনোব্যাধির চিকিৎসায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কি উপায়ে আমাদের অজ্ঞাত প্রবৃত্তিগুলি আমাদিগকে নানাদিকে চালিত করে, আমাদের মনের নানাস্তরের স্থান নির্দ্দেশ, মনের উপরের স্তরের অজানিত ইচ্ছা, প্রভৃতি মনোব্যাপারের নানাবিধ রহস্য সরসী-বাবু এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী চমৎকার এবং এই পুস্তকের সাহায্যে আমরা মনোবিদ্যার কতকগুলি রহস্য বুঝিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। পুস্তকখানি পাঠক সমাজে নিশ্চয়ই আদৃত হইবে। পুস্তকের ছাপাও বাঁধা চমৎকার ও প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে।

চীন-যাত্রী (সচিত্র)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, এলাহাবাদ। মূল্য ১৷৷০, পৃঃ ১৮৭ (১৩৩২)।

এই সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী এতই সহজ সরল যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ না করিয়া পারা যায় না। অধুনা প্রকাশিত ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি প্রায়শই শুষ্ক বিবরণে ভরা, সেই কারণে সেগুলি সুখপাঠ্য নহে। কিন্তু বর্ত্তমান লেখক জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি এমন সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন যে, তাঁহার বিবরণ পাঠ করিতে করিতে শ্রান্ত হইতে হয় না। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

ছিন্নতার—শ্রীনির্ম্মল দেব প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০। ১৩৩২।

এই নবীন উপন্যাস-লেখকের লেখাপাঠ করিয়া আমরা আনন্দ পাই। যদিও আলোচ্য পুস্তকখানির প্লট স্থানে স্থানে ভাল জমে নাই, তথাপি তাঁহার লিখিবার ধরণ ভাল। আমরা ইঁহার লেখনী-প্রসূত আরও উচ্চধরণের লেখা প্রত্যাশা করি।

প্র

গীতালি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান আজ সমস্ত জগতের লোকের আনন্দের সামগ্রী হইয়াছে; তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সম্প্রতি কলিকাতার বিশ্বভারতীর শাখা রবীন্দ্রনাথের অনেক পুস্তকের নূতন সংস্করণ বাহির করিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকটি এই শাখা হইতে প্রকাশিত। দুঃখের বিষয়, গীতালির এই নব সংস্করণ আশানুরূপ হয় নাই। ইহাতে ছাপার ভুল আছে এবং ইহার মলাট, বাঁধন ইত্যাদি ভাল হয় নাই। এই হিসাবে ইহার পাঁচ সিকা দাম বেশীই হইয়াছে।

মহম্মদ-চরিতামৃত—শ্রীহেমচন্দ্র আগা। মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য বারো আনা।

হজরত মহম্মদ জগতের মহাপুরুষদিগের অন্যতম ছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। এমন এক অসাধারণ ব্যক্তির জীবনের সহিত পরিচিত থাকা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে মহম্মদের জীবনকথা সংক্ষেপে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যাখ্যানের সহিত বিবৃত হইয়াছে। মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও মুসলমান পর্ব্বাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও ইহাতে আছে। সুতরাং বইখানি সুন্দর হইয়াছে। বইখানি সাধারণের নিকট আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

মাটীর নেশা—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। দুই একটি গল্পকে 'মন্দ নয়' বলা চলে; বাকীগুলি মোটেই ভাল লাগে না। রচনা অসরলতা ও বাগাড়ম্বর দোষে দুষ্ট। এ-জাতীয় গল্পে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে, ঋজু সরল ভাষা ও ভঙ্গীর প্রয়োজন তাহা লেখকের জানা উচিত। ইহার অভাব এই পুস্তকে এত বেশী যে, কয়েক পাতা পড়িয়া আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয় না।

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র—শ্রীবিনয়কুমার সরকার। রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ২৷০।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জার্ম্মাণীর কাল মার্ক্‌স্ ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স্‌এর ধন-বিজ্ঞান-ব্যাখ্যানের অভিনবত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই দুই মনীষী হরিহর-আত্মা ছিলেন, এবং ইঁহাদের সম্মিলিত চিন্তা জগতের মানব-মনের বহুবিষয়ক সংস্কারকে পরিশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি মনীষী এঙ্গেলসের নৃতত্ত্ব ও ধন-বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থের অনুবাদ। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ ইহার মুখ্য প্রতিপাদ্য। "এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ ভারতীয় সমাজে প্রচারিত হইলে ভারতবাসী নিজ নিজ স্মৃতি-নীতি-ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষশাস্ত্রগুলার দিকে এক নূতন চোখে দৃষ্টিপাত করিতে সুরু করিবে। ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সম্বন্ধে যুবক-ভারত বহু বুজরুকি এবং কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে শিখিবে। তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান-বিদ্যা কিছু কিছু করিয়া ভারত-সন্তানের পেটে পড়িতে থাকিবে।" বাস্তবিকই এই অনুবাদ খুব সাময়িক হইয়াছে। মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌সের চিন্তাধারা কেবল নব যুগেরই সূচনা করে নাই, বর্ত্তমান অভাবদৈন্যগ্রস্ত মানব-সমাজের বহু সমস্যার সমাধান করিয়াছে। "প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় মানব-সভ্যতার উপর ভাত-কাপড়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্ বর্ত্তমান জগৎকে 'আত্মিক ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিকামি এবং অতীন্দ্রিয়ামির কবল হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা এই পুস্তকটি পড়িতে অনুরোধ করি।

গুপ্ত

যক্ষাঙ্গনা-কাব্য বা নব-মেঘদূত (কাব্য-গ্রন্থ)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, বার-এট্-ল প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য এক টাকা, ৮৯ পৃষ্ঠা।

নিবেদনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "যক্ষাঙ্গনা কাব্যটি মাইকেলের ছন্দে আমার হাতেখড়ি।" গ্রন্থটি আগাগোড়া কবিত্ব রস-মণ্ডিত হইলেও 'হাতেখড়ি' বলিয়া শব্দ-বিন্যাস ও শব্দ-যোজনায় মাঝে মাঝে লেখক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে। তবে মোটের উপর বহিখানি ভালই হইয়াছে। কালিদাসের ভারতবর্ষের চমৎকার একখানি চিত্র গ্রন্থকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আশা করি তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলি অধিকতর সুন্দর হইবে। মধ্যে মধ্যে ছন্দ-পতন হওয়াতে বহিখানি কষ্টপাঠ্য হইয়াছে।

রাবেয়া (কাব্য-গ্রন্থ)—শ্রীহেমমালা বসু। প্রকাশক—শ্রীরাখাল-গোপাল চক্রবর্ত্তী, ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ ১৫৫ পৃষ্ঠা।

স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'শ্রীমতী হেমমালা বসুর গদ্য পদ্য রচনা আমার ভাল লাগিয়াছে।' এই সরল সুন্দর পবিত্র কাব্যখানি আমাদেরও ভালো লাগিল। কোথায়ও অযথা বাগাড়ম্বরে কবিত্ব করিবার চেষ্টা নাই; সমস্তই সহজবোধ্য ঝর-ঝরে তকতকে। গল্পাংশে মহিয়সী রাবেয়ার পবিত্র চরিত্র চমৎকার উপভোগ্য হইয়াছে। কল্পনার সহিত কবির কথোপকথন মাঝে মাঝে 'একঘেয়ে' হওয়াতে বইটির একটু সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে।

স্কন্দ গুপ্ত (পঞ্চাঙ্ক নাটক)—শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স, ১২।১ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

অভিনয় উপযোগী নাটক। ভারত-সম্রাট কুমারগুপ্তের আমলে হূনরায়ক খিঙ্খিলের অভিযান—নাটকটির বিষয়। গ্রন্থকারের দেশপ্রীতি লক্ষ্য করিবার বিষয়, কিন্তু নাটকের আগে 'ঐতিহাসিক' কথাটি না লিখিলেই ভাল হইত।

কোরাণ-শরিফ-আমপারা—শ্রীকিরণ সিংহ কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক শ্রীকালিপ্রসন্ন সিংহ, ২৫এ নূর আলি লেন, এণ্টালি, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

কোরাণ শরিফের শেষ খণ্ড আম-পারার পদ্যানুবাদ। পরিশিষ্টের টীকাগুলিতে গ্রন্থকার কোরাণ-শরিফ ও ইস্‌লাম ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। মোটের উপর বহিখানি অমুসলমান পাঠকেরও সহজবোধ্য হইয়াছে।

স

বেদনা-সুখ

শ্রী সজনীকান্ত দাস

বেদনা মম গোপন সঞ্চয়,
তাই—বসিয়া নিরালায়—
আঁধার মনের গোপন পুঁজি যত
যতনে খুঁজি তায়।

ব্যথার ভার নিবিড় হ'য়ে উঠে,
অশ্রু জমাট পাষাণ-বক্ষ-পুটে,
হৃদয় চাহে অসহ-দুখ-ভারে
ফাটিতে শতধায়।
বেদনা মম গোপন সঞ্চয়—
যতনে রাখি তায়।

আপনারেই আপনি নিপীড়িয়া
অসহ্য সুখ লভি,
গোপন মনের গোপন দাহ-দুখে
সুখী সে কোন্ কবি।

অসীম আঁধার আমারে ঘিরি রবে,
মনের সাথে মনের কথা হবে,
হৃদয় মোর পুলকে শিহরিবে
তীব্র বেদনায়,—
বেদনা মম গোপন সঞ্চয়—
গোপনে রাখি তায়।
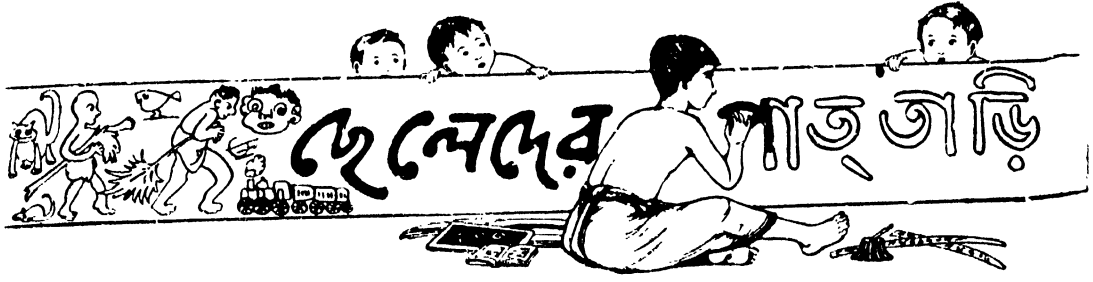
ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা

ছেলেদের জন্য লেখা বহিতে, এবং অনেক সময় বড়দের জন্য লেখা বহিতেও, ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা থাকে যাহা সত্য নহে। এখানে আমি এরূপ দুটা মিথ্যা ধারণার বিষয়ে কিছু বলিব।

পৃথিবীতে বোল্‌তা নানারকম আছে, মাকড়সাও নানারকম আছে। কোন কোন বোল্‌তা কোন কোন মাকড়সা শিকার করিবার জন্য তাহার শরীরে হুল ফুটাইয়া তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলে। এইরূপ একজাতীয় বোল্‌তাকে ইংরেজীতে ডিগার ওয়াস্প্‌ বা খনক বোল্‌তা, এবং তাহারা যে-সব মাকড়সা শিকার করে তাহাদিগকে ইংরেজীতে জাম্পিং স্পাইডার্‌ বা লম্ফপ্রদানকারী মাকড়সা বলে। প্রাণীদের বিষয়ে লিখিত অনেক বহিতে দেখা যায়, যে, এই বোল্‌তারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া মাকড়সাদের সেই জায়গাটিতে হুল ফুটায় যেখান হইতে তাহাদের স্নায়ু-সকল সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানুষের শরীরেও স্নায়ু আছে। তাহাদের সাহায্যেই সুখ ও যাতনা বোধ হয়। মাকড়সার স্নায়ু-গুলের কেন্দ্রে হুল ফুটাইয়া বোল্‌তা তাহাকে অসাড় করে, ইহা সত্য নহে; তাহার শরীরের যেখানে-সেখানে হুল ফুটাইয়াই বোল্‌তা তাহাকে মারিয়া ফেলে। মাকড়সার স্নায়ুমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলটি ঠিক করিবার মত বুদ্ধি বোল্‌তার নাই।

এখানে যে ছবি দিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইবে, বোল্‌তা যে-কোন একটা জায়গায় হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

সাপ ও পাখীদের সম্বন্ধেও এই একটা ধারণা চলিত আছে, যে, সাপ পাখীর দিকে তাকাইয়া তাহাকে জাদু করিয়া ফেলে। এইরূপ জাদু করাকে ইংরেজীতে হিপ্নটিজ্‌ম্‌ ও বাংলায় সম্মোহন বলে। এইরূপে সম্মোহিত হইলে পাখী আর নড়িতে-চড়িতে বা উড়িতে পারে না, এবং সাপ তাহাকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। ইহা কিন্তু সত্য নহে। সাপ পাখী বা পাখীর বাসা আক্রমণ করিলে,

বোল্‌তা হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে

অনেক সময় তাহার ভ্যাবাচাকা লাগিয়া যায়। সে নিজের বা নিজের সঙ্গী ও ছানাদের জন্য ভয় পাইয়া ঠিক্‌ করিতে পারে না, যে, পালাইবে না সাপটাকে আক্রমণ করিবে। ইহা হইতেই জাদু করার গল্প কেহ বানাইয়া থাকিবে। বাস্তবিক অনেক স্থলেই পাখীরা সাপের সঙ্গে খুব যুদ্ধ করে। ছবিতে দেখ, দুটি চড়ুই পাখী নিজেদের বাসা ও ছানা রক্ষা করিবার জন্য সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।

চড়ুই পাখী সাপের সহিত যুদ্ধ করিতেছে

সাপটা মস্ত বড় ও পাখী দুটি খুব ছোট। তবুও চড়ুই দুটি ভয় পায় নাই।

ছোট-পাখীরা যখন এমন ভয়ানক বিপদে ও ভয়ে জড়সড় হয় না, তখন মানুষদের মধ্যে শিশু, জোয়ান, বুড়ো কাহারও ভয় পাওয়া উচিত নয়। যে ভয় পায় তাহাকে কা-মানুষ বলে;—কা-পাখী বা কা-চড়ুই বলিলে কেমন হয়?

সমুদ্রের বোয়াল

বাংলাদেশের পুকুরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ থাকে। নিরীহ দুর্ব্বল মাছগুলাকে ধরিয়া তাহারা খাইয়া থাকে। এই বোয়ালের অপেক্ষা অনেকগুণ বড় অতি-প্রকাণ্ড বোয়াল সমুদ্রে থাকে। পুকুরের বোয়ালের সহিত ইহার আকারেও কিছু বিভিন্নতা আছে।

সামুদ্রিক বোয়ালের পেটের দুই পাশে যে-দুইটি পাখনা আছে তাহা মাছের পাখনার মত নয়, অনেকটা শিল মাছের পাখনার মত। মাটীতে শুইয়া থাকিবার পর উঠিতে হইলে এই পাখনা দুইটির উপর ভর দিয়া ইহারা উঠে। ইহাদের চামড়া মাগুর মাছের চামড়ার মত নরম হড়হড়ে, আঁশ নাই। ইহারা দৈর্ঘ্যে পাঁচ হইতে ছয় ফুট হইয়া থাকে।

ইহারা অত্যন্ত অলস। জলের নীচে আগাছার মধ্যে শরীর ছড়াইয়া দিয়া হাঁ করিয়া ইহারা পড়িয়া থাকে। ইহাদের নাকের উপরে তীরের মত একটি লম্বা রোঁয়া আছে। ইহারা শুইয়া সেই রোঁয়া উঁচু করিয়া রাখে। কোন মাছ সেদিকে আসিয়া রোঁয়ায় ঠেকিলেই ইহারা জানিতে পারে ও মুখ বাড়াইয়া খাইয়া ফেলে। শরীর নাড়িয়া শীকার ধরিতে ইহারা একেবারে নারাজ। ইহারা কষ্ট করিতে পারে না। "গোঁফ-খেজুরে" লোকটি যেমন খেজুর-গাছের তলায় শুইয়া আশপাশের খেজুর কুড়াইয়া খাইতে পারিল না, গোঁফের উপর খেজুর পড়িলে তবে খাইবে ভাবিয়া শুইয়া রহিল, তেম্‌নি এই সামুদ্রিক বোয়ালটি গোঁফ-খেজুরে। শীকার মুখের কাছে না আসিলে আর ইহাদের খাওয়া হইবে না। ইহারা দ্রুত সাঁতার কাটিতে পারে না।

দূর হইতে ইহাদের মুখ ও হাঁ বাঘের মত দেখায়। একবার সমুদ্রের তীরে এই বোয়াল একটা মৃত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মুখে এক মৃত শেয়ালও দেখা

সমুদ্রের বোয়াল

যায়। ঢেউর ধাক্কায় মাছটি বোধ হয় তীরের উপর আসিয়া পড়ে ও আর জলে যাইতে পারে নাই, এবং শৃগাল মহাশয় কাঁকড়া খাইতে আসিয়া বোয়ালের মুখে প্রাণ হারান। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই বোয়ালের হাঁ কত বড়।

গুপ্ত

—

বাদুড়-বৌ

ভুবড়ো-মুখো গুব্‌রে পোকার সাধ হোলো সে কর্‌বে বিয়ে,
ঠিক হোলো সব, ঠেক্‌ল শুধু মনের মতন পাত্রী নিয়ে।
অ্যাংএর মেয়ে ব্যাংএর মেয়ে নিজের চোখেই দেখ্‌ল কত,
বোঁচকা বোঁচা হাড়গিলে সব,—কেউ হোলো না মনের মত।
ঘটক এল গঙ্গা-ফড়িং তিড়িং তিড়িং লম্ফ দিয়ে,
ঘট্‌কালীতে চল্‌ল সে তো ক'নের খোঁজে গ্রাম পেরিয়ে।
অনেক ঘুরে আদুর-পুরে বাদুড় পাড়ার বনেদ ঘরে
সুন্দরী বৌ জুট্‌ল এবার গুব্‌রে পোকার বরাৎ জোরে।
বাদুড় বাপের আদুরী সে—যেম্‌নি গড়ন তেম্‌নি গঠন,—
যা হোক হোলো এক্কেবারে গুব্‌রে পোকার মনের মতন।

বিয়ের রাতে আসর উজল—জোনাক-পোকা জালায় বাতি,
ধর্‌ল ছুঁচো বরের মাথায় মস্ত বড় ব্যাঙের ছাতি।
ঝিঁঝির দলে ঝাঁঝর বাজায়, ওস্তাদী গায় ভোম্‌রাগুলো,
নাচ জুড়েছে ড্যাং ড্যাঙা ড্যাং ঠ্যাংতুলে ব্যাং গালটি ফুলো,
বরের মামা নেংটি ইঁদুর লম্বা গোঁফে দিচ্ছে চাড়া,
অন্দরেতে শঙ্খ বাজায় বাড়ীর মেয়ে আর্‌সোলারা।
ছাদ্‌নাতলায় বর বসেছে টিক্‌টিকিতে মন্ত্র পড়ে,—
হঠাৎ একি! ব্যাপারটা কি! উড়্‌ল কনে ফুড়ুৎ করে'—
ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌, কোথায় গেল, ছুট্‌ল সবাই ক'নের পাছে,
দেখ্‌লে খুঁজে ঝুল্‌ছে ক'নে ক্যাওড়াতলার শ্যাওড়া-গাছে।

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

বর্ষা-সখা

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

হে গম্ভীর!
আজি হেরি নভতলে তব বেগ উদ্দাম, অধীর!
একান্ত নিঃশব্দ তব পুঞ্জপুঞ্জ বিপুল সঞ্চার
সুকৃষ্ণ নিবিড় ঘনে ছেয়ে দিল অম্বর আঁধার।
তিমির রাত্রির মাঝে দিগঙ্গনে ডম্বরু তোমার
প্রাণে মোর ধ্বনে অনিবার।

আমার পরাণ-শিখী আজি হেরি করিছে নর্ত্তন।
তব গুরু গরজনে বনে বনে নামিল বর্ষণ;
দেবদারু-তরুশিরে, প্রাসাদের শিখরে শিখরে,
বিপুল ঝঞ্ঝার বেগে কলশব্দে ঝর-ঝর ঝরে;
সুদূরের শ্যাম সীমা লুপ্ত করি' শব্দিত সঙ্গীতে
বিরাট্ এ স্বপ্নপুরী মুছি' দিয়া একটি ইঙ্গিতে
নেমে এল তব অনুচর।
প্রাণে যে ফুটিল কেয়া;—মেতে উঠে অন্তর-প্রান্তর।

নীলাভ্রের আঁখি 'পরে টানি' দিলে সুশ্যাম অঞ্জন
—নয়ন-রঞ্জন!

বিচিত্র এ ধরণীর নানাদ্বন্দ্ব-শ্রান্ত কোলাহল
একটি নিমেষ মাঝে মু'ছে দিলে; করিলে নির্ম্মল;
আমার এ হিয়াখানি মুছে দাও, প্রার্থনা আমার,
হে বাদল, উদ্দাম, দুর্ব্বার!

ক্লান্ত নগরীর বুকে বহে তীব্র পূরব-বাতাস—
যেন তব ব্যাকুল নিঃশ্বাস।
হে প্রেমিক, শ্রান্ত বড়; চিত্ত মোর তৃষায় বিকল;
কমণ্ডলু হ'তে তব ঢাল' ঢাল' করুণাশীতল
সরস, সরল, স্নিগ্ধ, শান্তি-বারি-ধারা।
নীরসমারোহ মাঝে আমি আজি হ'ব দিশাহারা।

ধরারে করিছ শ্যাম, প্রাণদাতা—তুমি হে বাদল!
শ্রান্তিহীন তাই অবিরল
চলে তব সৃষ্টিলীলা পল্লবের কোমল জীবনে।
তাই ক্ষণে ক্ষণে
মোদের কঠোরচিত্তে লাগে তব চকিত পরশ,
অমৃত-সরস!
যাঁর আশীর্ব্বাদরূপে নিত্য তুমি ঝরিছ দেবতা,
শুনি' যাঁর কথা,
তোমার কর্ম্মের পথে বার-বার আসিছ একেলা,
খেলিতেছ চিরন্তনী খেলা;—
তাঁহারি কোমল স্পর্শ আজি যেন করি অনুভব;
প্রশান্ত নিশীথে তাই নিঃস্তব্ধ, নীরব—
বসে' আছি বাতায়ন-পাশে।

তুমি আজি সঙ্গী মোর; আজি তাই ভাসে
তোমার সঙ্গীতধ্বনি অন্তরে আমার!
আজি প্রিয়, তব সাথে তাঁরে আমি করি নমস্কার।

প্রাচীন রোমের লুপ্ত কীর্ত্তি—

প্রাচীন রোম ও পম্পিয়াই নগরীর ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে সম্প্রতি দুইটি অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খুব সম্ভব, এই দুইটি মূর্ত্তি প্রাচীন কালের দুইটি প্রসিদ্ধ শিল্পীর হাতের কাজ। এই নূতন আবিষ্কার দুইটি হইতে ইহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ধ্বংস-স্তূপের অন্তরালে আরো অনেক অপূর্ব্ব রত্ন লুক্কায়িত আছে। আমেরিকার সৌভাগ্য যে, প্রাচীন যুগের নূতন আবিষ্কৃত অধিকাংশ শিল্পনিদর্শনগুলি তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছে। সেই নূতন আবিষ্কার দুইটির চিত্র দেওয়া হইল। প্রথমটি, দেবী ডিমিটারের একটি শ্বেতপ্রস্তরে (মার্ব্বল্) নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। ইহা সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বিখ্যাত ভাস্কর প্রাক্সাইটেলেস (Praxiteles) কর্ত্তৃক খোদিত হয়। ইহা রোমের ধ্বংসা-

দেবী ডিমিটার (মার্ব্বল্)

ফিডিয়াস্-নির্ম্মিত ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি

:শষের মধ্যে প্রোথিত ছিল। 'লণ্ডন স্ফিয়ারে' লখা হইয়াছে—"এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন যুগের কজন বিখ্যাত ভাস্করের শিল্প, নমুনা হসাবে অতীব মূল্যবান। এই ভাস্করের মে যদিও আজকাল ছোটখাটো অনেক শল্পকার্য্যই চলিয়া আসিতেছে, তথাপি একটি তীত (১৮৭৭ সালে আবিষ্কৃত 'হারমির । ডায়োনিসাস') আর কোনোগুলিই প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই মূর্ত্তিটি ফিলাডেল্‌ফিয়ার একটি ভদ্রলোক ১০৫০০০০ টাকায় ক্রয় করিয়া ফিলাডেল্‌ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে উপহার দিয়াছেন। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি পম্পিয়াই নগরীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ছিল। ইহা খুব সম্ভব মহাপ্রসিদ্ধ ফিডিয়াসেরই (Phidias) কীর্ত্তি। ইহা ব্রোঞ্জ ধাতুনির্ম্মিত। রোডস নগরের ইতালীর প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ ম্যাউরি উহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক গালভার লিখিয়াছেন, "এই মূর্ত্তিটি ৫ ফুট লম্বা এবং প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আছে; এমন-কি ইহার পাদপীঠটি পর্য্যন্ত ঠিক আছে। এনামেল কিম্বা কাচ নির্ম্মিত চক্ষু তারকা দুইটি নষ্ট হইয়াছে।" ডাঃ ম্যাউরি বলেন যে, পম্পিয়াইএর আবিষ্কারে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর কারুশিল্প আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাও খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

—

শক্তির মুখোস—

প্রাচীন শিল্পকলা ও সভ্যতার ক্রীড়াভূমি গ্রীসের ডেলফিতে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিল্পকলা প্রদর্শনের এক বিরাট আয়োজন হইতেছে। ১৯৩০ সালের মে মাসে এই প্রদর্শনী আরম্ভ হইবে। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি নাট্যাভিনয়ের ও ব্যবস্থা হইতেছে। সেই নাটকের সাজসজ্জার জন্য শিল্পীরা এখন হইতে চেষ্টিত আছেন। বিখ্যাত ভাস্কর হেলেন সারভিউ ভয়ঙ্করী-শক্তি-নির্দ্দেশক একটি মুখোস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছবিতে তাহাই দেখান হইল।

শক্তির মুখোস

—

ডাকটিকিটের সৌন্দর্য্য—

পৃথিবীর অনেক দেশের ডাকটিকিটেই দেশের স্বভাবসৌন্দর্য্যের, পশু-পক্ষীর অথবা জাতীয় ইতিহাসের কোনও গৌরবজনক ঘটনার ছবি থাকে। ক্ষুদ্র ডাকটিকিটকেও সুশ্রী করিয়া তৈরী করিতে স্বাধীন জাতি কার্পণ্য করে নাই! দুই চারি পয়সার ক্ষুদ্র ডাকটিকিটেও যে সৌন্দর্য্যচর্চ্চা চলিতে পারে তাহা পার্শ্বে মুদ্রিত বিভিন্ন দেশের ডাকটিকিটগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। উহার মধ্যে আবার কতকগুলি টিকিট আছে যাহা ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি বহন করিয়া দেশবিদেশের লোকের নিকট জাতির গৌরব-গাথা নীরবে গাহিয়া বেড়ায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত এবং সেল ভাডোরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত 'কলাম্বাস্ টিকিট' এই শ্রেণীর অন্তর্গত।
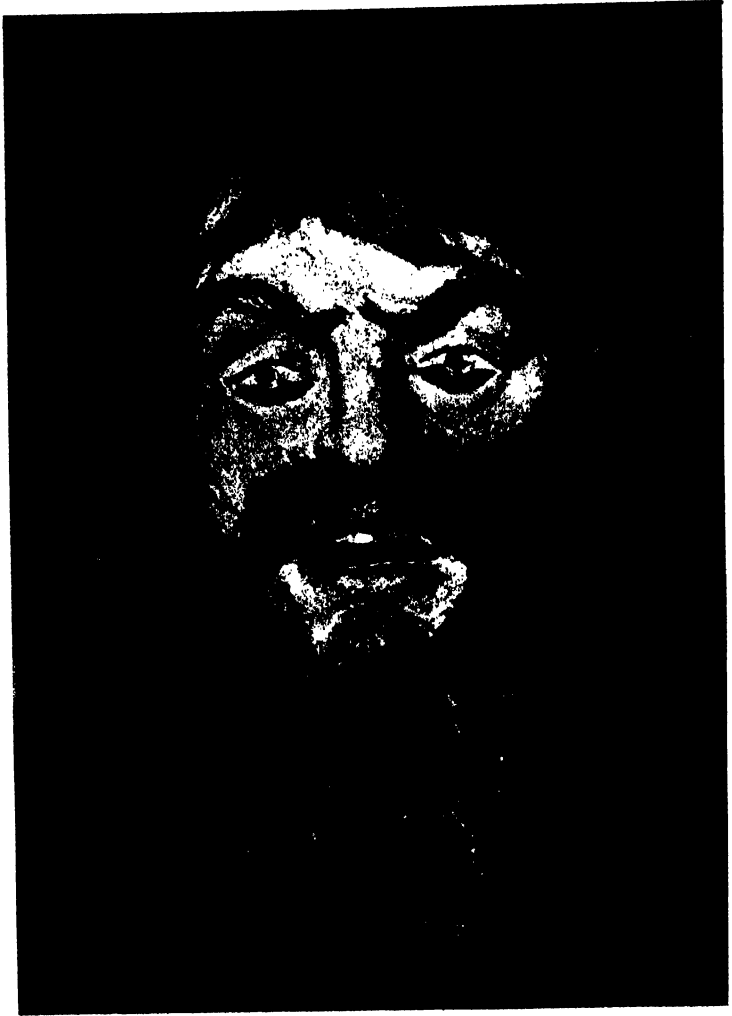
আমাদের দেশে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম যখন ডাকটিকিট সিন্ধু প্রদেশে জন্ম নিল তখন তাহার রূপ দেখিয়া কেহ তাহাকে সাদরে বরণ করিল না। কাজেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সে সরিয়া পড়িল। সেই প্রথম আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত কত সাজেই সাজিয়া সে বাহির হইয়াছে। কালের সঙ্গে চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে ঢের; আজকাল বেশীদামের ডাকটিকিটের সৌন্দর্য্যও যে কিছু না বাড়িয়াছে তাহা নহে। কিন্তু রূপকারের চরম কৃতিত্ব উহাতেও প্রকাশ পায় নাই—মনোহারী হয় নাই।

ভারতের সীমান্তে আফগানিস্থান, তিব্বত ও নেপালেরও এই দুর্দ্দশা। তিব্বতের ডাকটিকিটের সৌন্দর্য্য পার্শ্বে মুদ্রিত আফগানিস্থানের ডাকটিকিটকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। নেপাল সরকার তাহাদের ডাকটিকিটকে সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিবার জন্য উহাতে তুষারাবৃত হিমালয়

২ ৩ ৪ ৫
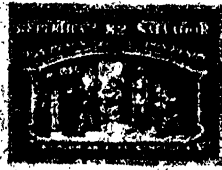
১০ ১১ ১২ ১৩

১৭

১৮ ১৯ ২০
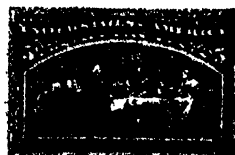
গিরিশৃঙ্গে মহাদেবের মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। ওস্তাদ শিল্পীর হাতে পড়িলে উহার সৌন্দর্য্যও শতগুণ বাড়িতে পারে।

যে কয়খানা বিদেশী ডাকটিকিটের ছবি এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল তাহাদের অনেকগুলির সহিত তুলনা করিলে সৌন্দর্য্য হিসাবে ভারতীয় ডাকটিকিটের স্থান যে কত নীচে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আগার, ভারতের বনজঙ্গল সুন্দর পক্ষীতে পরিপূর্ণ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবজনক ঘটনা যে না তাহা নহে। কিন্তু ভারতীয় ডাকটিকিটকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ক
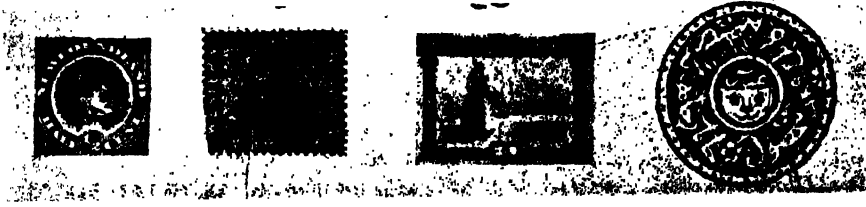
২১ ২২ ২৩ ২৪

তুলিবার গরজ গভর্ণমেণ্টের রূপকারের হয় নাই, দেশবাসীও দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন নাই। এখন হইতে আমরা যদি এই বিষয়ে সচেষ্ট হই তবে হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের ডাকটিকিটগুলিও সৌন্দর্য্য হিসাবে পৃথিবীর যাবতীয় ডাকটিকিটের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে। [ইরাকের টিকিটখানা ব্যতীত আর বিদেশী ডাকটিকিটের সকল ছবিগুলিই দশবারো বৎসর পূর্ব্বে "Little Folk" পত্রিকায় প্রকাশিত Mr. Ernest H. Robinson, Stamp Editor of "Chums" লিখিত "Picture Stamps নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষের প্রথম ডাকটিকিটের ছবি Geoffrey Clarke প্রণীত "The Post Office of India and Its Story" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত।]

১ নং ডাকটিকিট ইরাকের; ২ নং সুদানের; ৩, ৮, ১৫, ১৯ নং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের; ৪, ৫, ৭, ১৩, ১৬ নং সেল্‌ভাডোরের; ৬, ৯, নং নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের; ১০ নং নীয়াসার; ১১ নং উত্তর বোরনিওর; ১২ নং বার্‌বাডোসের; ১৪ নং গ্রেনাডার; ১৭ নং বারমুডার; ১৮ নং সিরমুরের; ২০ নং কেনাডার; ২১ নং নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের; ২২ নং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার; ২৩ নং লর্টুগ্যারো; ২৪ নং আফগানিস্থানের।

হেলেন্ উইল্‌সের ছবি

হেলেন্ উইল্‌সের রেখাচিত্র—

সকলেই অবগত আছেন যে, পৃথিবীতে বর্ত্তমানে দুইটি মহিলা টেনিস্ খেলায় অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়াছেন; এমন কি ইঁহাদের কেহ পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী আছে বলিয়াও অনেকে স্বীকার করেন না। একজন বিখ্যাত ফরাসী খেলোয়াড় মাদমোয়াজেল ল্যাংলেন ও অন্যজন, আমেরিকার প্রসিদ্ধ হেলেন উইল্‌স্। সম্প্রতি এই দুই মহিলাই টেনিস্ খেলা ছাড়া অন্য বিষয়েও প্রতিভা দেখাইতেছেন। মাদমোয়াজেল ল্যাংলেনের একটি উপন্যাস বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। হেলেন উইল্‌স্ কম যান না। 'দি ওয়ালর্ড' নামক কাগজে তাঁহার কয়েকটি রেখাচিত্র প্রকাশিত করিয়া ইনি বিখ্যাত চিত্রকরদের চমকিত করিয়াছেন। তাহারা তাঁহার রেখাঙ্কণে অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন। এখানে তাঁহার একটি চিত্র দেওয়া হইল। হেলেন্ উইলসের সহিত টেনিস্ প্রতিযোগিতার জন্য মাদমোয়াজেল ল্যাংলেন প্রতীক্ষা করিতেছেন—এইটিই হইল ছবির বিষয়। চিত্রবিদ্‌গণ বলিতেছেন যে, এই ছবির প্রত্যেক রেখায় শক্তি ও সুষমা পরিস্ফুট।

বিখ্যাত সার্কাস-শিক্ষক এডি ওয়ার্ড্—

ইলিয়নস্—ব্লুমিংটনের সার্কাস শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাদাতা বিখ্যাত এডি ওয়ার্ডের ১১ বৎসর বয়সের ছবি এখানে দেওয়া হইল। তাঁহার বয়স এখন ৩৮ বৎসর, তিনি কশাইয়ের ছেলে ছিলেন, শিশুকাল হইতেই অদ্ভুত অসমসাহসিক কাজ করিবার একটা ঝোঁক ইঁহার ছিল। ওই বয়সেই তিনি সার্কাস পার্টিতে ঢুকিয়া ট্রেপিজের খেলায় অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখাইতে থাকেন। এই খেলায় পারদর্শী হইয়া তিনি একটি শিক্ষাগার স্থাপিত করেন; এখান সেখানে বহু বালক-বালিকা প্রাণান্তক ট্রেপিজের খেলায় শিক্ষালাভ করে। এইরূপে বহুসংখ্যক বালক-বালিকা এই বিদ্যার্জ্জন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিতেছে।

এডিওয়ার্ড—১১ বৎসর বয়সে

রুষিয়ার রাজকন্যা আনাস্টাসিয়া—

রুষিয়ার সম্রাট 'জার'-দিগের অমানুষিক ও নিদারুণ অত্যাচার রুষিয়ার ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছে। এই অত্যাচারের ফলে 'নিহিলিজম' মাথা খাড়া করিয়া উঠে ও শতাব্দী ব্যাপিয়া রাজতন্ত্র ও নিহিলিষ্ট দ্বন্দ্বে লড়াই চলিতে থাকে। এই সময়ে কত গুপ্ত হত্যা যে সাধিত হইয়াছে, কত নিরীহ মহাপ্রাণ সাইবিরিয়ার নির্ব্বাসনে প্রাণ হারাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। টুর্গেনিভ, ডষ্টয়েভস্কি, টলষ্টয় প্রভৃতির লেখার ছত্রে ছত্রে এই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বিগত মহাযুদ্ধের শেষ দিকে 'নিহিলিষ্ট' দল বর্ত্তমানের 'রেড'-আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্য জুড়িয়া অশান্তির মহামারী ছড়াইতে থাকে। অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দ দলে দলে 'রেড'দলে নাম লিখাইয়া রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; বস্তুতঃ রুষিয়ার বুনিয়াদগণ ছাড়া প্রত্যেকেই সম্রাটের অত্যাচারের প্রতীকার করিতে বদ্ধপরিকর হয়। তারপর ১৯১৮ সালের প্রারম্ভ হইতে রুষিয়ার সহরে সহরে পথে ঘাটে যে লোমহর্ষক শোণিততর্পণ চলিতে থাকে, তাহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প হয়। সম্মিলিত 'রেড' শক্তি লেলিন ও ট্রটস্কির নেতৃত্বাধীনে রাজতন্ত্রকে ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী, সম্রাট্‌-বংশ সম্রাটের সহিত রক্ত-সম্বন্ধযুক্ত প্রত্যেক লোক ও রাজতন্ত্রাভিলাষী বুনিয়াদ সম্প্রদায়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সমস্ত 'রেড' আন্দোলন এই শোণিত-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ পেট্রোগ্রাদ্ হইতে সম্রাট বংশকে নির্ব্বাসিত করা হয়। তারপর ১৯১৮ সালের ১৭ জুলাই তারিখে একাতারিনবুর্গে নির্ব্বাসিত জারবংশের প্রত্যেককে, পুরুষ, স্ত্রী, বৃদ্ধ-শিশু নির্ব্বিশেষে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের এই পৃষ্ঠা মানব-পাশবিকতার দ্বারা কলঙ্কিত পৃষ্ঠা।

এতাবৎকাল সকলেরই ধারণা ছিল যে, জারবংশের আর কেহই জীবিত নাই। সোভিয়েট রুষিয়া সকল কাঁটারই উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি বার্লিনের এক স্বাস্থ্যাগারের এক রোগিণী নিজেকে জারকন্যা আনাস্টাসিয়া বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। ইহাতে ইউরোপের সমস্ত রাজকুল আন্দোলিত হইয়াছে। রাজবংশীয় স্ত্রীপুরুষ বিখ্যাত রাজপুরুষগণ দলে দলে বার্লিনে উপস্থিত হইয়া এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। ইঁহাদের অধিকাংশই এই হতভাগ্য নারীকে সগোত্র বলিয়া বরণ করিয়া লইতে দ্বিধা করিতেছেন না; আবার দুই একজন ইঁহাকে জুয়াচোর বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তবে বিচারে নানা পরীক্ষার পর দুই একজনের বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও সকলেই বিশ্বাস করিতেছেন যে, এই রোগিণীই জারের চতুর্থ ও কনিষ্ঠা কন্যা আনাস্টাসিয়া।

এই মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে গুলি ও সঙ্গীনের আঘাতচিহ্ন বর্ত্তমান। ইঁহার আটটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে; পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের আর কিছুই

রাজকন্যা আনাস্টাসিয়া

অভাব ও অত্যাচারের তাড়নায় বর্ত্তমান নাই। তবে এই দুঃস্থ ভিক্ষুককে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়া চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। ভূতপূর্ব্ব জার-ভগিনী গ্র্যাণ্ডডাচেস্ ওল্‌গা এই বালিকাকে বহুবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শৈশবকালের এমন সমস্ত কথা সে বলিয়াছে যাহা রাজ-পরিবার ছাড়া আর কাহারো জানা সম্ভব নয়; এমন সব রীতিনীতির কথা এ অবগত আছে যাহা অন্য কাহারো পক্ষে জানা অসম্ভব। বিশেষ করিয়া এই বালিকার ধাত্রী ও পারিবারিক ডাক্তার শারীরিক পরীক্ষা করিয়া এমন সব চিহ্ন ও বিশেষত্ব দেখিয়াছেন যে, তাঁহারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে, ইনিই রাজবংশের শেষ কুলপ্রদীপ। জার্ম্মানির যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী এই বালিকাকে দেখিতে গিয়া তাঁহাদেরই সগোত্রীয় জ্ঞানে ইহার সহিত একত্রে আহার করিয়াছেন।

বার্লিন হাঁসপাতালে রোগিণী

জার রোমানফ্ বংশের হত্যাকাণ্ড ইউরোপের রাজকুলের লোকেরা আত্মীয়হননেরই সমতুল্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা ১৯১৮ সাল হইতে এতাবৎকাল নানা উপায়ে জারবংশের কেহ জীবিত আছে কি না নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। তাঁহারাও এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইলেই আদরে এই দুর্ভাগিণীকে নিজেদের গোষ্ঠীতে স্থান দিবেন।

সেই হত্যাকাণ্ডের পর হইতে কি কি ঘটিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করাতে সে যাহা বলিয়াছে তাহা এই—

১৯১৮ সালের ১৭ই জুলাই রাত্রিতে একদল রেডসৈন্য আসিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে থাকে; গুলির আঘাতে ও সঙ্গীনের খোঁচায় সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। জ্ঞান ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারে তাহাকে গরুর গাড়ীতে করিয়া কোথায়ও লইয়া যাওয়া হইতেছে। সেই গাড়ীতে রেডসৈন্য দলের দুইটি যুবক ছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের নিকট সে জানিতে পারে যে, রাজবংশের অন্য সকলে নিহত হইয়াছে ও গোর দিবার জন্য মৃতদেহগুলি মোটর লরীতে করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে চালান দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে তখনো জীবিত দেখিয়া তাহারা গোপনে সরাইয়া আনিয়াছে। রাজ-সৈন্যদলের আগমনে ভয় পাইয়া পলায়নকালে অন্য সকলে ইহা লক্ষ্য করে নাই। রাজ-সৈন্যদল আসিয়া দেখে যে, মৃতদেহগুলিকে কবর না দিয়া দাহ করা হইয়াছে সুতরাং কেহ বাঁচিয়া আছে কি না তাহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। সৈন্য দুইজন নানা ভাবে চিকিৎসা করিয়া বালিকার জীবন রক্ষা করে। তিন মাস এই ভাবে চলিয়া তাহারা রুমানিয়ায় উপস্থিত হয়। বুখারেষ্টের এক মালীর কুটিরে তাহাকে বাস করিতে দেওয়া হয়। তারপর সেখানে সে প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। যুবকেরা তাহাকে মৃত মনে করিয়া একদিন বরফের মধ্যে কবর দিয়া আসে। কিন্তু সে মরে নাই, বরফের মধ্যে কেমন করিয়াই সে বাঁচিয়া উঠে ও পুনরায় সেই মালির ঘরে বাস করিতে থাকে। এখানেই সৈন্য দুইজনের একজনের সহিত তাহার বিবাহ হয় ও একটি পুত্রসন্তানও হয়। কিছুকাল পরে তাহার স্বামী বুখারেষ্টের রাস্তায় বলশেভিকদের গুলিতে নিহত হয়।

ইহার পর সে আবার অসুস্থ হয় ও তাহার দেবরের সাহায্যে বার্লিনের হাঁসপাতালে আসে। তাহার সন্তান কোথায় আছে সে জানে না। তাহার সন্তানের খোঁজ করা হইতেছে।

ইউরোপের সমস্ত রাজকুল-নিযুক্ত সমিতি এই মহিলার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। বাহিরের কোনো লোককে এখন ইহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইতেছে না ও বলশেভিকদের ষড়যন্ত্র কল্পনা করিয়া ইহার প্রত্যেক খাদ্য-দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হইতেছে।

এখানে রাজকুমারী আনাস্টাসিয়ার ষোলবৎসর বয়সের ও বার্লিন হাঁসপাতালের এই রোগিণীর ছবি দেওয়া হইল। প্রথম ছবিটি ৯ বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত।

দেশ-বিদেশের কথা

ইতালীতে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা—

নেপলস্ সহরে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আদরের সহিত সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে একখানি স্পেশাল ট্রেণে করিয়া রোমে লইয়া যাওয়া হয়। সিনর মুসোলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন। ইতালীর আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি সম্বন্ধে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত সরকারী ভাবে এ-পর্য্যন্ত ঘোষিত না হওয়ায় অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। ভারতসচিব নাকি 'ভারত সরকারের' উপর—শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি অনুমোদন ক্রমে আসামের গভর্ণরী শাসন-সম্বন্ধে (status) বিবেচনার ভার দিয়াছেন। এই দুই বিষয় এক সঙ্গেই বিবেচনা করা চাই; সুতরাং ভারতসরকার একটু গোলমালে পড়িয়া গিয়াছেন। বেসরকারী ভাবে যে খবর আসিয়াছিল তাহার সরকারী ভাবে সমর্থন অথবা প্রত্যাহার কিছুই এ-পর্য্যন্ত হয় নাই। শ্রীহট্ট বঙ্গভুক্ত হইলে আইন পরিষদে মাত্র চার জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে। এখন ১২ জন প্রতিনিধি আসাম কাউন্সিলে যাইতে পারে। কাউন্সিলের নির্ব্বাচন সমাগত, কাজেই শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি প্রস্তাব সত্বর গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলায় অস্পৃশ্যতা পরিহার—

কুমিল্লা

প্রায় দেড় বৎসর হইল কুমিল্লা অভয় আশ্রম কর্ত্তৃক একটি মেথর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহার ছাত্র-সংখ্যা আটাশ জন। তন্মধ্যে মেথর কুড়ি জন। মেথর ছাত্রদের মধ্যে এগার জন খদ্দর ব্যবহার করে। এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া মেথর পাড়ায় অন্য অন্য কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। মেথরদের কঠোর শ্রমলব্ধ সামান্য আয়ের অধিকাংশই কঠোর কুসীদজীবীদের সুদ দিতেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। মেথরদের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে নাম-মাত্র সুদে ইহাদের ঋণ দিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কাজে প্রায় ৪০০০৲ চার হাজার টাকা মূলধন প্রয়োজন। জনৈক উদারচেতা ধনী এই টাকার জন্য ব্যাঙ্কে আশ্রমের পক্ষে জামিন দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন, অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যেও ইহার কার্য্য শীঘ্রই বিস্তার লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

আশ্রম-সেবকগণের অক্লান্ত সেবা ও চেষ্টার ফলে মেথর-পাড়া পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। তাহারা অনেকে মদ খাওয়া বন্ধ করিয়াছে এবং অনেকে মদ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বাঁকুড়া

গত মাসে ডাঃ নীলমাধব সেন এম, বি মহাশয়ের সভাপতিত্বে অভয় আশ্রম কর্ত্তৃক বাঁকুড়ায় মেথর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩০ জন ছাত্র লইয়া এই বিদ্যালয় আরম্ভ হইয়াছে।

ত্রিপুরা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ভাদুগড় গ্রামে চামার বালকদিগকে শিক্ষা দান করিবার জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৫০জন চামার বালককে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

বালবিধবাদের উষ্ণশ্বাসে হিন্দু-সমাজ অভিশপ্ত। যাঁহারা বিধবাদের দুঃখমোচনার্থ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা প্রকৃত সমাজসেবী। আমরা নিম্নে গত মাসে অনুষ্ঠিত কয়েকটি বিধবা-বিবাহের সংবাদ দিলাম :—

(১) চন্দ্রকান্ত ভুঁইমালী নামক বরিশাল জিলার তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর একজন লোক একমাস পূর্ব্বে তাহার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পাঁচদিন পরেই বালিকার স্বামী মারা যায়। চন্দ্রকান্ত গত ৩০শে এপ্রিল রতনপুর নিবাসী জনৈক যুবকের সহিত বিধবা বালিকাকে পুনরায় বিবাহ দিয়াছে।

—বরিশাল-হিতৈষী

(২) গত মাসে নারায়ণগঞ্জে মোক্তার বাবু জ্ঞানচন্দ্র দাসের বাড়ীতে একটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। বালিকাটি ১১ বৎসর বয়সে বিধবা হয়; এক্ষণে তাহার বয়স মাত্র ১৩। আসানসোলের ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু পবিত্রকুমার ঘোষ, উক্ত কন্যাটির পাণিগ্রহণ করেন। পবিত্রবাবু বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

(৩) স্থানীয় হিন্দু-হিত-সাধিনী সভার প্রচেষ্টায় মৈমনসিংহ জিলায় স্থানে স্থানে বিধবা-বিবাহ হইতেছে। সম্প্রতি থানা বাজিতপুরের অন্তর্গত নান্দিনা গ্রামের নবীনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান জয়চন্দ্র বিশ্বাসের সহিত ত্রিপুরা জিলার চারতলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র মণ্ডলের বালবিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি ঐ অঞ্চলে বিধবা-বিবাহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

—চারুমিহির

আসাম কাউন্সিলে মহিলা-সদস্য—

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি ইতিপূর্ব্বেই মহিলাদিগকে নির্ব্বাচনাধিকার দিয়া মহিলাদের ন্যায্য দাবী গ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহার ফলে সম্প্রতি ভারত-শাসন সংস্কার আইনের সংশোধন হইয়াছে এবং ভারতীয় মহিলাগণ কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার পাইয়াছেন। আসাম প্রাদেশিক আইন সভা এ পর্য্যন্ত এ

ব্যাপারে নীরব; সেইজন্ত আসাম সরকার আসামের নির্ব্বাচন বিধি এইভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন যে, আসাম কাউন্সিল যদি এক মাসের নোটীশ দিয়া এই মর্ম্মে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, আসামের মহিলাদিগকে বা মহিলাদের কোন শ্রেণীবিশেষকে কাউন্সিল নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার দেওয়া হউক তাহা হইলে আসাম সরকার সেই ভাবে নিয়ম জারি করিবেন। আমরা আশা করি, আসাম কাউন্সিলের ও ভারতের অন্যান্য কাউন্সিলের সদস্যগণ নারীদের ন্যায্য দাবীর সমর্থন করিবেন।

বাংলায় শিক্ষা—

বাঙ্গলার ডিরেক্টার্ অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্‌শন্ ১৯২৪ ও ২৫ সালের যে-রিপোর্ট্ বাহির করিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায়—সমগ্র বঙ্গে অনুমোদিত ও অনমুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯২৪ সালে ছিল ৫৬০০১, ১৯২৫ সালে হইয়াছে ৫৭১৭৩; সুতরাং এক বৎসরে ১১৭২টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৫ সালে পুরুষদিগের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩৪১৫, স্ত্রীলোকের ১৩৭৫৮; কিন্তু ১৯২৪ সালে পুরুষদিগের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪২৭৬১ এবং স্ত্রীলোকের ছিল ১৩২৪০। ১৯২৫ সালে সমগ্র বাঙ্গলায় ছাত্র-সংখ্যা ২১৫০৯৪২; ১৯২৪ সালে ছিল, ২০৫৭০৬২। অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯২৪ সালে ৫৪৬৪৯; ১৯২৫ সালে ৫৫৮৯০। ১৯২৪ সালে অনমুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩৫২, ১৯২৫ সালে হইয়াছে ১২৮৩।

১৯২৫ সালে সারা বাঙ্গলায় পুরুষ ছাত্রের সংখ্যা ১৭৭০৪৭২, ছাত্রীর সংখ্যা ৩৮০৫৭০। ১৯২৪ সালে পুরুষ ছাত্রের সংখ্যা ছিল, ১৬৯২৬৮৮; ছাত্রীর সংখ্যা ৩৬৪৩৭৪।

শিক্ষার ব্যয়

১৮২৪ সালে সাধারণ শিক্ষার ব্যয় হইয়াছিল ৩৪৪৪৮৩০৭৲ টাকা; ১৯২৫ সালে হইয়াছে ৩৫৬৪৫৯৩৯৲ টাকা। ১৯২৫ সালের ব্যয়ের টাকার মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ১৩৩৮২৯৬২৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে যথাক্রমে ১৫৪৫৮০৫৲ টাকা ও ৩০৫৯৮৮৲ টাকা। ছাত্রদের বেতনস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল ১৪৬৩৭১২৬৲ টাকা এবং বে-সরকারী দান ৫৭৭৫০৫৮৲ টাকা। ১৯২৪ সালের ব্যয়ের টাকার মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড হইতে যথাক্রমে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল ১৩০০৯৪৮৬৲ টাকা, ১৪৮৯২৩৪৲ টাকা ও ৩৩০৩৫৪৲ টাকা।

১৯২৪ সালে ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন পাওয়া গিয়াছিল,—১৪০১৬৩৬৪৲ টাকা এবং বে-সরকারী দান পাওয়া গিয়াছিল,—৫৬০২৮৬৯৲ টাকা।

১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট্ গ্রাজুয়েট বিভাগের আর্টস্ ও সায়েন্স্ ক্লাসে যথাক্রমে ছাত্র ছিল ৯৯৪ জন, ২০৫ জন। ১৯২৪ সালে ছিল ১০৫১ ও ১৯৯ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্শ ক্লাসে ১৬৮ জন ছাত্র ছিল।

১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ ও সায়েন্স্ ক্লাসে ছাত্র ছিল ৭৫৫ জন (তন্মধ্যে ২২ জন রিসার্চ্চ স্কলার)। ১৯২৪ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৬১। ইহা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্শ ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬১।

বাংলায় রাজবন্দীদের সাহায্য ভাণ্ডার—

বঙ্গীয় স্বরাজ্য দলের সম্পাদক ১১৫নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জানাইতেছেন—নিখিল-ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য সমিতির সম্পাদকের অনুরোধ-মত যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর আত্মীয়-স্বজন আর্থিক সাহায্য চান তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে—(১) বন্দীর নাম,(২) গবর্ণমেণ্ট্ পরিবারের জন্য কত সাহায্য দিয়া থাকেন, (৩) বন্দীর পরিবারে কতজন লোক আছে, (৪) গবর্ণমেণ্ট্ সাহায্য না দিয়া থাকিলে পরিবারের অধিক সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী—

গত মাসে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাংলার জেলা কংগ্রেস কমিটিসমূহ কর্ত্তৃক মেদিনীপুরের বিখ্যাত কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নদীয়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের দিন সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে কয়েকটি আপত্তিজনক মন্তব্য করায়—সভাস্থ অধিকাংশ প্রতিনিধি তাঁহার মন্তব্যগুলি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত শাসমল তাহা করিতে অস্বীকার করিয়া সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে সভায় কিছু গোলযোগ হয়, কিন্তু অবশেষে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাব-সমূহ গৃহীত হয়।—

১। বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক রাষ্ট্রগুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মবলিদান করিয়া গত ১৬ই জুন দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্মিলনী সমস্ত বাঙ্গলার জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে এবং ভগবানের চরণে তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছে।

২। বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ নেতা এবং কংগ্রেসের একজন প্রধান নায়ক স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এই সম্মিলনী বাঙ্গলার জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছে।

৩। বাঙ্গালার একজন কংগ্রেস-নেতা রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর মৃত্যুতে এই সম্মিলনী শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট দেশের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

৪। এই সম্মিলনী বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে-বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য আন্তরিক ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং উহা স্থির করিতেছে যে, বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইয়া উভয় ধর্ম্মাবলম্বী একত্রে এক-যোগে জাতীয় উদ্বোধনের কার্য্য না করিলে বাঙ্গলায় স্বরাজ্য স্থাপন হওয়া অসম্ভব।

উপরোক্ত কারণে এই সম্মিলনী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতিকে অনুরোধ করিতেছে যে, উক্ত সমিতির হিন্দু-মুসলমান সভ্যগণকে লইয়া কতকগুলি দল বাঁধিয়া প্রতি দলে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী সভ্য লইয়া মফঃস্বলে বাহির হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা স্থাপনে হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্দ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবেন। বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের বর্ত্তমানে ইহা একটি প্রশস্ত উপায় বলিয়া এই সম্মিলনী সিদ্ধান্ত করিতেছে।

৫। এই সম্মেলনের মত এই যে, বাঙ্গলার কোন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই কোন-প্রকার হিংসাবাদী দল দ্বারা প্রভাবান্বিত, বা পরিচালিত হয় না। সুতরাং সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অভিভাষণে উল্লিখিত "যাঁহারা এখনও Violence বিশ্বাস করেন" কংগ্রেস হইতে "সরিয়া পড়ুন" পর্য্যন্ত অংশের সহিত এই সভা একমত নহেন এবং ঐ মতের নিন্দা করিতেছেন।

৬। এই সম্মিলনী বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য আন্তরিক ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং ইহা স্থির করিতেছে যে, বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইয়া উভয় ধর্ম্মাবলম্বী সাম্প্রদায়িকতা (Communalism) ত্যাগ করিয়া জাতীয়তার (Nationalism) ভাব লইয়া একযোগে জাতীয় উদ্বোধনের কার্য্য না করিলে বাঙ্গালায় স্বরাজ স্থাপন হওয়া অসম্ভব। অতএব সিরাজগঞ্জ হিন্দু-মুসলমান চুক্তিপত্র (Hindu-Moslem Pact) সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই সম্মিলনী উক্ত চুক্তিপত্র বর্জ্জন করিতেছে।

কৃষ্ণনগরে অন্যান্য সভা-সমিতি—

গত মাসে কৃষ্ণনগরে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মিলনী ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় যুবক সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। বাংলার যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

"সমাজকে এমন করিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়, সমাজ আত্মরক্ষা করিতে সামর্থ্য লাভ করিতে পারে। ইহাই সমাজ-সেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যেখানে এই প্রকৃত উদ্দেশ্যের অভাব, সেখানে বন্যা-বা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের দুঃখের লাঘব করিয়া আত্মতুষ্টি বা আত্মার সদ্গতি হয় ত হইতে পারে, কিন্তু সমাজের স্থায়ী উপকার হয় না। সমাজকে সবল ও আত্মরক্ষাসমর্থ করিয়া তুলিতে পারিলে প্রকৃত রাজনীতি চর্চ্চার স্ফুরণ হইবে ও এতদিনের পরাধীনতার গ্লানি কাটিয়া যাইবে।

এইভাবে সমাজসেবা যদি এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি আপনাদের শরীর, মন ও বুদ্ধির মধ্যে শক্তির ধারা প্রবাহিত করেন। লক্ষ্য যদি আপনাদের স্থির হয়, সংকল্প যদি দৃঢ় হয়, তাহা হইলে নিষ্ফলকাম হইবার কোনই কারণ নাই। জগতে এমন কোন বাধাই নাই যাহা সাধনার বলে অতিক্রম করা যায় না।"

ঢাকা জেলা সম্মিলনী—

গত মাসে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে ঢাকা জেলা সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অভিভাষণে শ্রীযুক্তা নাইডু বলিয়াছেন—হিন্দু জাতির সংহতি-শক্তি নাই, হিন্দুদের সংগঠিত হওয়া উচিত। মুসলমানদের সংগঠিত হওয়া কর্ত্তব্য, তবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে নহে,—যে-দেশে উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে একত্রে বাস করিতে হইবে, সেই দেশের কার্য্য উভয়কেই করিতে হইবে।

খদ্দর সম্বন্ধে শ্রীমতী নাইডু বলেন, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বয়ন-শিল্প-কার্য্যে ঢাকার অধিবাসীবৃন্দের অঙ্গুলির কৌশল দেখান উচিত। সভানেত্রী অস্পৃশ্যতা নিবারণ জন্য সকলকে অনুরোধ করেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

এই কনফারেন্স দেশবন্ধু দাশ, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার কে জি গুপ্ত, রাজা শ্রীনাথ রায় ও বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে।

যে-সকল ব্যক্তিকে অর্ডিনান্স ও ৩নং রেগুলেসন্ অনুসারে আটক রাখা হইয়াছে, তাহাদের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন এবং ঐ-সকল যুবককে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য গবর্ণমেণ্টকে নিন্দা করা যাইতেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বিরত থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং উভয়দলের নেতৃগণ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

অপর এক প্রস্তাবে অস্পৃশ্যতা দোষ নিবারণ, খদ্দর পরিধান, স্বদেশী পরিধান, স্বদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা, কূপ খনন প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান কলিকাতার হাঙ্গামায় যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

স্মৃতি-বার্ষিকী—

গত মাসে পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও আশুতোষ চৌধুরীর দ্বিতীয় স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তেজস্বিতা, স্বদেশপ্রেম, নির্ভীকতা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য বাংলার জাতীয় জীবনের সম্পদরূপে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

পরলোকগত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা অসাধারণ ছিল। তাঁহার বাণী "পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই" জগতে আমাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ও বাংলার কৃষ্টির মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে তিনি চিরকাল আমাদের পূজা পাইবেন।

এই দুই তেজস্বী পুরুষের চরিত্র যতই আলোচিত হইবে আমাদের ততই মঙ্গল। শীঘ্রই ইঁহাদের স্থায়ী স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হিন্দু-মুসলমান—

বাংলার মফঃস্বল হইতে প্রত্যহ হিন্দুদের দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গার অথবা মন্দির অপবিত্র করার সংবাদ আসিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, নোয়াখালী, বরিশাল, উত্তর-বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রধান স্থানসমূহ হইতে এইরূপ পৈশাচিক লীলার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান মোল্লারাও নানা স্থানে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। সহযোগী আনন্দবাজার এই সম্পর্কে মৈমনসিংহের কয়েকটি সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, "সমস্ত জিলা জুড়িয়া যে-ভাবে নিত্য একই ভাবে মন্দিরাদি ধ্বংস হইতেছে, তাহাতে সকলেরই এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইতেছে যে, শিক্ষিত মুসলমানগণ অজ্ঞ গ্রাম্যমুসলমানদের দ্বারা এই-সমস্ত কার্য্য করাইতেছে। মোল্লা-মৌলবীগণ, বিশেষতঃ নোয়াখালী জিলার মৌলবীগণ এই জিলার গ্রামে গ্রামে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।" দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার কেবল হিন্দুর মূর্ত্তি ও মন্দির ভাঙ্গাতেই শেষ হইতেছে না। তাহারা নূতন নূতন উপায় তাহাদের পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে। প্রকাশ, "সিরাজগঞ্জের সন্নিহিত বালিয়াজান গ্রামে জনৈক মুসলমান গো-হত্যা করিয়া তাহার নাড়ীভুঁড়ি ফেলিয়া নমঃশূদ্রদের কূপগুলি অপবিত্র করিয়াছে। এই কূপগুলিই পানীয় জলের জন্য নমঃশূদ্রদের একমাত্র সম্বল।"

বাংলা সরকার এসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রগুলির স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ—"অনেক ক্ষেত্রেই যে-সব স্থানে ঐ-সব ব্যাপার ঘটিতেছে, সেইসব ব্যাপারের প্রতি তথাকার লোকের যতটা দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়াছে, সংবাদ-পত্রে তদপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং যে-সব দেবমূর্ত্তি ভঙ্গ হইয়াছে, বা স্থানান্তরিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই এইরূপ দেবমূর্ত্তি, যেগুলি একদিন পূজার পর বাঙ্গলার কোন-কোন অঞ্চলে জলে বিসর্জ্জন করা হইয়া থাকে, কিন্তু কোন-কোন অঞ্চলে পরবর্ত্তী উৎসব পর্য্যন্ত অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, ঐরূপ ক্ষেত্রে গোপনে ঐসব দেবমূর্ত্তি অপসারণে কিম্বা ভঙ্গ করাতে বাধা দেওয়া

পুলিশের ক্ষমতার অতীত এবং পুলিশ আইন অনুসারে অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগেও এ-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

"পূর্ব্ববঙ্গের একজন জেলামেজিষ্ট্রেট্ এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই যে-সব লোকের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সংবাদপত্র-সমূহে বর্ত্তমানে যে-সব খবর অতিরঞ্জিত আকারে বাহির হইতেছে যদি সেগুলি বন্ধ হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক অবস্থা সত্বরই ফিরিয়া আসিতে পারে। অনেকেরই মত এইরূপ।"

আশা করা যায় যে, অত্যাচরিত স্থানসমূহের সংবাদপত্রগুলি এই ইস্তাহারের যথাযথ উত্তর দিবেন।

হিন্দুর কর্ত্তব্যপালন—

কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকার মুসলমানদের জিদ ও ভীতি প্রদর্শনের ফলে ঢাকার তিনজন হিন্দু ভদ্রলোক তথাকার সমগ্র হিন্দুর পক্ষ হইতে মসজেদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। গত ১৪ই মে তারিখে ঢাকার হিন্দু জনসাধারণের এক সভাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

বিগত ৩০শে এপ্রিল তারিখের আসানমঞ্জিলের সভায় উপস্থিত হইয়া যে তিন জন হিন্দু ঢাকার হিন্দুদের পক্ষ হইতে গায়ে পড়িয়া মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্য ভাণ্ড সহ বিবাহের মিছিল লইয়া যাওয়ার জন্য মুসলমানদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, এই সভা তাঁহাদের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছেন।

অধিকন্তু এই সভা প্রচার করিতেছেন যে, উক্ত তিনজন ভদ্রলোক মোটেই ঢাকার হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নহেন। সুতরাং হিন্দুদের পক্ষ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করার কোনই অধিকার তাঁহাদের নাই।

ঢাকা-প্রকাশ

হিন্দুর ত্রুটি—

সহযোগী আনন্দবাজার সংবাদ দিতেছেন—

"কলিকাতা সহরেও এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার জন্য হিন্দুদের লজ্জায় মাথা হেঁট করা উচিত। নারিকেলডাঙ্গার হিন্দু পোষ্ট মাষ্টার নিজের বাড়ীতে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া সত্যনারায়ণ পূজা করিতেছিলেন। এমন সময় পাড়ার জনকয়েক মুসলমান আসিয়া বলে, নিকটেই মসজিদ—তাহাদের নমাজের ব্যাঘাত হইতেছে। অতএব পোষ্টমাষ্টার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইতে পারিবে না। পোষ্টমাষ্টারটি ভয়ে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করিলেন এবং অশাস্ত্রীয় ভাবেই পূজার কার্য্য শেষ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে জামালপুরেও এইরূপ একটি ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এইসব ব্যাপার হইতে কি বুঝিতে হইবে যে হিন্দুদের নিজের বাড়ীতে বসিয়াও শঙ্খ-ঘণ্টাদিবাদ্য-সহকারে পূজার্চ্চনা করিবার অধিকার নাই, মুসলমান গুণ্ডাদের জিদ ও ভীতি প্রদর্শনে তাহাও বন্ধ করিতে হইবে?"

পোষ্টমাষ্টারের ধর্ম্মবিশ্বাস মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাসের বা জিদের সমান দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল।

পাবনা হিন্দুসভা—

গত মাসে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে পাবনা হিন্দু সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় (১) যতীন্দ্র-চন্দ্রকান্তের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া, (২) মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংসের প্রতিবাদ করিয়া, (৩) হিন্দু-মুসলমান চুক্তির প্রতিবাদ করিয়া, (৪) এবং মুসলমান-প্রধান স্থানে হিন্দু কনেষ্টবলের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া ৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্র

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন—

আমরা ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের একখণ্ড বার্ষিক বিবরণ পাইয়াছি। বিবরণে মিশনের কর্ম্মীগণের সেবা-কার্য্যের তালিকা, হিসাবনিকাশ ইত্যাদি আছে। আলোচ্য বর্ষে মিশনের কার্য্যের প্রসার হইয়াছে।

বাংলায় খদ্দর বিক্রয়—

বাংলায় খাদির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলা যে খাদি চায়, বাংলা যে পুরাতন বস্ত্রশিল্প পুনরুদ্ধার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে তাহা বুঝা যায় তাহার খাদি গ্রহণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে। খাদিপ্রতিষ্ঠান ১৯২৪ সালে ১২ মাসে মোট খাদি বিক্রয় করিয়াছেন ৮৫, ৩৫৮৲ টাকার এবং ১৯২৬ সালের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত মাত্র চারিমাসে খাদি বিক্রয় হইয়াছে মোট ৮৬, ৮৩০৲ টাকার। ইহাতে বাংলার প্রাণের স্পন্দনই অনুভূত হইতেছে। যে-হারে বাংলায় খাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৯২৫ সালের বিক্রয়-অঙ্ক যে ১৯২৬এর অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। খাদি-প্রতিষ্ঠান প্রেরিত তুলনা-মূলক বার্ষিক বিক্রয় নিম্নে দেখান যাইতেছে।

	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
জানুয়ারী	৩২৯৬৲	৬৬৪৮৲	২১৭১০৲
ফেব্রুয়ারী	৩৭১০৲	৬০৮২৲	২০৬০৪৲
মার্চ্চ	২৬৬২৲	৮৫০৪৲	২৪৬৪৭৲
এপ্রিল	৪১৬৫৲	১৭৬৯০৲	১৯৮৬৯৲
			৮৬৮৩০৲
মে	৩৮৫৪৲	১৮২৭০৲	(চারি মাসে)
জুন	৬৫২৯৲	১৩৪২২৲	
জুলাই	৫৭৩১৲	১২৯১২৲	
আগষ্ট	১২৯৩০৲	১৪০৬৪৲	
সেপ্টেম্বর	১৪৩০৭৲	২৯০৮৭৲	
অক্টোবর	১২৪৩২৲	১৩৬৫৮৲	
নভেম্বর	৮৪৩৮৲	১৮৩৭৩৲	
ডিসেম্বর	৭৩০৪৲ "	২০৫১৫৲	
	৮৫৩৫৮৲	১৭৯২৫২/	

শিক্ষিত মুসলমানের হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ—

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী জামদীঘি নামক স্থানে ২১ জন মুসলমান স্বেচ্ছায় পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয় শিক্ষিত মুসলমানও আছেন। একজন মুসলমান পোষ্ট-মাষ্টার এবং আর একজন মুসলমান ওভারসিয়ার এই-সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তথায় হিন্দুসভার কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। তাই স্থানীয় হিন্দুগণ তাড়াতাড়ি একটি হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অতঃপর এই সভা বিশেষ আগ্রহের সহিত মুসলমানদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য ইঁহাদিগকে কয়েকটি দেব-ক্রিয়া করিতে হইয়াছিল। তাহা সম্পন্ন হওয়ার পর হিন্দুধর্ম্মে নবাগত মুসলমানগণ হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শালগ্রাম-শিলা স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন। যে-সভায় ইহাদিগকে দীক্ষা দেওয়া হয়, তথায় গীতাপাঠ হইয়াছিল এবং সভান্তে বিরাট্ ভোজের আয়োজন ছিল। সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুগণ এই ভোজে যোগদান করিয়াছেন।

—বরিশাল

সংবাদপত্রের মামলা—

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সংবাদপত্রের মামলা সম্পর্কে যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) "ছোলতান"—তিনমাস অশ্রম কারাদণ্ড।

(২) "দুর্ম্মুখ"—একমাস অশ্রম কারাদণ্ড এবং দুইশত টাকা অর্থদণ্ড। টাকা না দিতে পারিলে আরও দুই মাস অশ্রম কারাদণ্ড হইবে।

(৩) "ইস্‌লাম জগৎ"—সম্পাদকের প্রতি অর্থদণ্ড এবং তাহা পরিশোধ করিতে না পারিলে দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। মুদ্রাকরকে ২০০৲ টাকা জামিন মুচলিকা দিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

৪। "হানাফী জমায়েৎ"এর সম্পাদকের এবং মুদ্রাকরের এক মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ঐ-টাকা না দিতে পারিলে প্রত্যেকের দুইমাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

৫। "ভারত-মিত্র" সম্পাদককে এক বৎসর কাল ভালভাবে থাকিবার জন্য ২৫০৲ টাকার একটি জামিন মুচলিকা এবং ২৫০৲ টাকার আর একটি সিকিউরিটি দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন মুদ্রাকরকে ঐ-সময়ের জন্য ১০০৲ টাকার মুচলিকায় আবদ্ধ করা হইয়াছে।

৬। "মাতোয়ালা"-সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক মিঃ মহাদেও প্রসাদ শেঠ মহাশয়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া চারি মাস কাল বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

৭। "বসুমতী"-সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে প্রথম অপরাধ বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে আদেশ দিয়া বিচারক তাঁহাদিগকে এনাত্রা অব্যাহতি দিয়াছেন।

৮। "মোহাম্মদী"র-সম্পাদক ও মুদ্রাকর মৌলবী ফজলল হককে ৫০০৲ টাকার জামিন মুচলিকা এবং অপর ৫০০৲ টাকার সিকিউরিটি দিতে হইবে। ইহা দিতে না পারিলে তাহাকে এক বৎসর কাল বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

৯। "ফরওয়ার্ড" সম্পাদককে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বে ৬০০৲ টাকার দলিল লিখিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ হইয়াছে। মুদ্রাকর বেকসুর খালাস পাইয়াছেন।

১০। "অমৃতবাজার পত্রিকা"—সম্পাদক এবং মুদ্রাকর দোষ স্বীকার করিয়া খালাস পাইয়াছেন।

দণ্ডের বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপীল করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্য-সেবী কেদারনাথ মজুমদার—

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগে কাপাসাটিয়া গ্রামে ১২৭৭ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ কেদারনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি গচিহাটা গ্রাম। এনট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াই তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন।

১২৯৪ সালে তিনি "কুমার" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৩০৬ সালে "বাসনা" বাহির করিয়া নিজেই তাহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বে পরিচালিত "আরতি"র প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ১৩০৭ সনে।

ইহার কয়েক বৎসর পরেই তিনি বাতরোগে পঙ্গু হইয়া পড়েন। বাতব্যাধিক্লিষ্ট দেহেও তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় বিরত হন নাই। ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসে তিনি "সৌরভে"র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। "সৌরভ" চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ময়মনসিংহের বিবরণ, ময়মনসিংহের ইতিহাস, ঢাকার বিবরণ, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, শুভদৃষ্টি, স্রোতের ফুল, সমস্যা, চিত্র, প্রভৃতি বহুগ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক পাঠ্যপুস্তকও লিখিয়াছেন।

"রামায়ণের সমাজ" নামে প্রত্নতত্ত্বমূলক একখানি বিরাট্‌গ্রন্থ তিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহার মুদ্রণ-কার্য্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এই পুস্তকের প্রুফ দেখিতে-দেখিতেই তিনি সহসা পীড়িত হইয়া পড়েন। মাত্র সপ্তাহকাল জ্বরে ভুগিয়া তিনি বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। প্র

লীলা

এত যে দিতেছ মোরে
দিনে দিনে এ তুচ্ছ জীবন ভরে' ভরে',
কতটুকু ফিরে পাবে তার ?
তবু বারম্বার
কতই দারিদ্র্য তৃষ্ণা দুর্ভিক্ষের মাঝে
অযাচিত অতর্কিত প্লাবনের সাজে
চকিতে এসেছ নেমে ;
গেছে থেমে
সব দাহ সব দুঃখরাশি।

সৃষ্টি-ছাড়া এ তোমার প্রেমে
সাগরে শৈবাল সম ভাসি—
শুধু ওঠা পড়া ছোটা—শুধু বেয়ে যাওয়া
স্রোতে স্রোতে উর্ম্মির নর্ত্তনে ;
কভু কূলে কভু বা অতল তলে পাওয়া
কত জন্ম-মৃত্যু-আবর্ত্তনে !
কার দেওয়া কার পাওয়া পারি না বুঝিতে,
আছ তুমি আছি আমি আছে এ অনন্ত লীলা—
এই শুধু হেরি মুগ্ধ চিতে ॥

দীপঙ্কর

বিবিধ প্রসঙ্গ
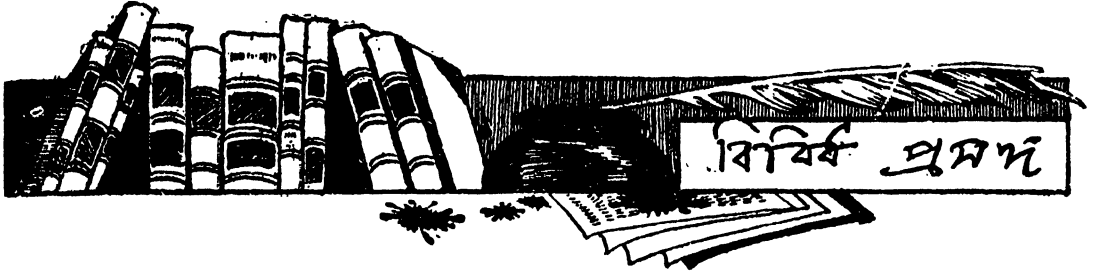
ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ও হিন্দু সম্প্রদায়

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন, এই দাবী ন্যায়সঙ্গত এবং সর্ব্বদাই করাও উচিত। কিন্তু এরূপ অপক্ষপাত ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। তাহার কারণ অনেক।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক হিন্দু। মুসলমানরা সংখ্যায় কেবলমাত্র হিন্দুদের চেয়ে কম। শিক্ষায়, বাণিজ্যে, কলকারখানায় ও কুটীরে শিল্পদ্বারা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং ললিত কলা ইত্যাদিতে মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে অগ্রসর নহে। সংখ্যাধিক্যবশতঃ এবং এইসকল কারণে ভারতে হিন্দুদের একটা স্বাভাবিক প্রাধান্য আছে। তাহার উপর যদি ইংরেজ সরকার সরকারী চাকরীতে নিয়োগের এবং ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা কেবলমাত্র যোগ্যতা অনুসারে করেন, তাহা হইলে হিন্দুদের এই প্রাধান্য আরও বাড়িবে। কিন্তু যাহারা সংখ্যায় বেশী, তাহাদের প্রাধান্য না বাড়াইয়া কমানই ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবশ্যক। এইজন্য সরকারী ব্যবস্থা এরূপ হইয়াছে, যে, সকল প্রদেশেই যোগ্যতর হিন্দু থাকিতেও বিস্তর অপেক্ষাকৃত অযোগ্য মুসলমান চাকরী পাইয়াছে ও প্রতিনিধি হইয়াছে। ইহার ফলে যোগ্যতর হিন্দুদের প্রতি অবিচার হইয়াছে, দেশ যোগ্যতম লোকদের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং হিন্দুদের প্রতি অবিচার হওয়ায় তাহাদের ও মুসলমানদের মধ্যে মনোমালিন্য জন্মিয়াছে।

শেষোক্ত ফলটি ইংরেজের ভেদনীতির পরিপোষক। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে ঐক্য হইলে এবং হিন্দুদের সকল জা'তের লোকদের মধ্যে ঐক্য হইলে ইংরেজের প্রভুত্ব টিকিতে পারে না। এই কারণে ভেদনীতি অবলম্বন দ্বারা ঐক্যের পথে বিঘ্ন উৎপাদন ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবশ্যক। কিন্তু আমাদের চেষ্টা ঠিক্ ইহার বিপরীত হওয়া উচিত।

ইংরেজরা এইরূপ ভাণ করেন, যে, তাঁহারা মুসলমানদের নিকট হইতে, দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে, ভারতবর্ষের রাজত্ব পাইয়াছেন বা কাড়িয়া লইয়াছেন। প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য এই, যে, ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তিস্থাপনের সময়ে দিল্লীর বাদশাহ্ সাক্ষীগোপাল মাত্র ছিলেন; মরাঠারাই তখন দেশে প্রবলতম শক্তি। বড় বড় যুদ্ধ তাহাদেরই সঙ্গে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে অন্য প্রবল শক্তি ছিল শিখদের। তাহাদের সঙ্গেও ইংরেজকে খুব লড়িতে হইয়াছিল। উত্তর ভারতে হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান-সকলেও ইংরেজদের বড় যুদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে হয় নাই, হইয়াছিল গুর্খাদের সঙ্গে। তা ছাড়া, ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, কোন সময়েই মুসলমানেরা **সমগ্র** ভারতবর্ষের রাজা হয় নাই।

এইসব কারণে ইংরেজরা বেশ জানে, যে, তাহাদের রাজত্ব যখন স্থাপিত হয়, তখন মুসলমানরা ভারতের প্রবলতম সম্প্রদায় ছিল না, হিন্দুরাই প্রবলতম ছিল। তাহার মানে এই, যে, মুসলমানদের ভারতবিজয়ের কুফল তখন হিন্দুরা কাটাইয়া উঠিতেছিল এবং মুসলমানরা তখন হীনবল হইয়া গিয়াছিল। ইংরেজ-রাজত্বেও হিন্দুরা যতদিকে যতটা উন্নতি করিয়াছে, মুসলমানেরা ততটা করে নাই। সুতরাং যোগ্যতমের আদর করিলে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হিন্দুদিগকেই আরও প্রবল করা হইবে। ইহা ইংরেজের স্বার্থরক্ষার অনুকূল নহে।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে হিন্দুদের পরাজয় হওয়ায়

মুসলমানগণের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে, তদ্দ্বারা আবার ভারতীয় মুসলমানদের প্রাধান্য প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা সত্য নহে। আহমদ শাহ আবদালী ভারতীয় মুসলমান ছিলেন না, এবং তিনি পানিপথে জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে রাজত্বও করেন নাই। তাঁহার জয়লাভের ফলে ভারতবর্ষ নূতন করিয়া বিদেশীর অধীন হয় নাই। কেবলমাত্র একটা যুদ্ধে বিদেশী কেহ জিতিলেই দেশটা ঐ বিদেশীর বা তাহার সধর্ম্মীদের করায়ত্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী নহে। স্কুলের ছেলেরাও জানে, যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের নৌসেনাপতি ট্রম্প- এক সমুদ্রযুদ্ধে ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়া নিজের জাহাজের মাস্তুলে ঝাঁটা বাঁধিয়া টেম্‌স্ নদী দিয়া উজান বাহিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে ইংরেজদের খুব অপমান হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংলণ্ড হল্যাণ্ডের পদানত হয় নাই। সেইরূপ পানিপথে মরাঠারা আফগানদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া থাকিলেও, ভারতবর্ষ নূতন করিয়া আফগানের পদানত হয় নাই, এবং ভারতীয় মুসলমানরাও দিল্লীতে বা অন্যত্র নূতন করিয়া দেশের রাজা হয় নাই।

ইংরেজদের হিন্দুদিগকে পছন্দ না করিবার অনেক কারণ আছে। ভারতীয়েরা কোন্ কোন্ দিকে কি পরিমাণে ইংরেজদের কতকটা সমকক্ষ হইবার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সংবাদপত্র পরিচালনে এবং আরও নানাদিকে হিন্দুরা ইংরেজদের সহিত যতটা প্রতিযোগিতা করিয়াছে, মুসলমানেরা ততটা করে নাই, করিবার সামর্থ্য তাহাদের ততটা এখনও হয় নাই। প্রতিযোগীকে কেহ পছন্দ করে না। এইজন্য শিক্ষিত হিন্দু অনেক ইংরেজের চক্ষুশূল।

ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের যে-চেষ্টা গত শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রধানতঃ হিন্দুদের চেষ্টা। পারসীরা সংখ্যায় মোটে একলক্ষ হইলেও তাঁহারাও এই চেষ্টায় যত নেতা জোগাইয়াছেন, সাত কোটি মুসলমান তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে সে পরিমাণে জোগান নাই। সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে যে একটু বেশী সংখ্যায় দেখা গিয়াছিল, তাহা দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজের জন্য নহে, বিদেশের খিলাফতের জন্য।

হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার উগ্রতম রূপ শাক্ত বিপ্লববাদ। মুসলমান নেতারা গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন, যে, ইহাতে মুসলমানেরা যোগ দেয় নাই। যাহাকে বৈধ আন্দোলন বলা হয়, তাহাতেও মুসলমানেরা তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে কখনও যোগ দেয় নাই। তাহাদের প্রবলতম আন্দোলন হইয়াছিল খিলাফৎ সম্পর্কে, যাহার সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের সম্পর্ক নাই। এইজন্য, ইহা বলিলে ভুল হইবে না যে, ভারতের বৃহৎ ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে হিন্দুরাই বিদেশী ইংরেজদের প্রভুত্ব লোপ করিয়া ভারতীয়দের অধিকার স্থাপন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছে। রাজনৈতিক প্রভুত্ব ইংরেজদের থাকায় বাণিজ্যিক সুবিধাও তাহাদের খুব হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রভুত্ব কমিলে, বাণিজ্যিক সুবিধার যতটুকু রাজনৈতিক শক্তির অপব্যবহার দ্বারা লব্ধ হইয়াছে, তাহাও কমিবে বা লুপ্ত হইবে। এই কারণে, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষতির আশঙ্কা যাহাদের হইতে জন্মিয়াছে, সেই হিন্দুদিগকে দেখিতে না পারা ইংরেজদের পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রধানতঃ হিন্দুদের চেষ্টায় যখনই কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার বা উচ্চ চাকরী ভারতীয়দের হস্তগত হইবার উপক্রম হইয়াছে, মুসলমানেরাও তখন তাহার একটা বড় ভাগ পাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে বটে; কিন্তু আন্দোলন দ্বারা অপ্রিয় হইবার সময় তাহারা তত বড় ভাগ লইবার জন্য সাধারণতঃ উপস্থিত হয় নাই। তা ছাড়া এবিষয়ে হিন্দুমুসলমানে আরও একটা তফাৎ আছে। হিন্দুরা নিজেদের দাবী প্রধানতঃ যোগ্যতার ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাহারা বলিয়াছে, সিবিলসার্ভিস্ ও অন্য সব রকম বড় চাকরীর জন্য এদেশে অবাধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হউক। তাহারা ইংরেজের বা অন্য কাহারও অনুগ্রহ চায় নাই, তাহাদের প্রতিযোগিতাকে ভয় করে নাই। কিন্তু

মুসলমানরা তাহাদের দাবীকে যোগ্যতা বা অবাধ প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্যতার উপর স্থাপিত করিতে পারে নাই। তাহাদের "রাজনৈতিক গুরুত্ব" প্রভৃতি লম্বা চৌড়া কথা যাহাই হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ইংরেজের অনুগ্রহই চাহিয়াছে। যাহারা আব্দার করে ও অনুগ্রহ চায়, তাহাদিগকে মানুষ নাপছন্দ না করিতেও পারে; কিন্তু যাহারা ন্যায্য দাবী বলিয়া কিছু চায় এবং অবাধ প্রতিযোগিতার পথ দিয়া নিজেদের সমকক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করিবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখা বা তাহাদের 'বেয়াদবী' সহ্য করা সহজ নহে।

এইরূপ নানা কারণে ইংরেজ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অপক্ষপাতিতা করিতে পারে না। তাহার উপর, ইংরেজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ মুসলমানদের উপর নির্ভর করে। তাহাদের বাবুর্চি, খানসামা প্রভৃতি ভৃত্য সাধারণতঃ মুসলমান। জাতিভেদ বশতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এই-সব কাজ সচরাচর করে না।

অবশ্য, ইংরেজ-শাসন-কালে কখন কখন মুসলমানদের প্রতি ইংরেজরা বিরূপও হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঘটিয়াছে তখনই যখন মুসলমানেরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা ধুয়া ধরিয়াছিল, "The Muhammadan religion must be suppressed," "মুসলমান ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে"; কিন্তু দূরদর্শী ও প্রভাবশালী কোন-কোন ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞের চেষ্টায় এরূপ কোন অনিষ্টকর নীতি অবলম্বিত হয় নাই। গত শতাব্দীতে ওয়াহাবীদের দ্বারা ইংরেজবিরোধী যে-সব চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাও কিছুকালের জন্য মুসলমানদিগকে ইংরেজদের অপ্রিয় করিয়াছিল।

কিন্তু সচরাচর হিন্দুদিগকে দাবাইয়া রাখিয়া মুসলমানদিগের আব্দার শোনাই ইংরেজদের প্রধান নীতি। অবশ্য যাহাতে মুসলমানদেরও ক্ষমতা বেশী বাড়িয়া না যায়, সেদিকেও ইংরেজদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে।

প্রতিযোগিতায় মুসলমানেরা কখনও ইংরেজদের বা হিন্দুদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সমকক্ষ তাহারাও হইতে পারে। তাহার প্রমাণ, কোন-কোন মুসলমান কেবলমাত্র যোগ্যতার জোরে সিবিল সার্বিসে প্রবেশলাভ করিয়াছেন এবং ব্যবস্থাপক সভাদিতে নেতৃস্থানীয় হইয়াছেন। ভারতীয় হিন্দুরা যাহা পারে, ভারতীয় মুসলমানেরাও তাহা পারে। কেন না, উভয় সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ এক জাতি হইতে উৎপন্ন।

—

ভারতীয় মুসলমানদের একটি ভ্রম

ভারতীয় মুসলমানেরা এই একটি ভ্রমকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে যে, তাহারা বিজেতা ও হিন্দুরা বিজিত। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য কথা এই, যে, যে-সব বিদেশী মুসলমান ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল, অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান তাহাদের বংশধর নহে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এবং পূর্ব্ব ভারতের (অর্থাৎ বাংলা আসাম প্রভৃতির) প্রায় সব মুসলমান ত হিন্দুবংশজাত বটেই, এমন-কি পঞ্জাবী মুসলমানদের মধ্যেও শতকরা বেশী লোক বিদেশীবংশজাত নহে—তথাকার সেন্সাস্ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আন্দাজ অনুসারে শতকরা ১৫ জন মাত্র বিদেশীবংশজাত।* কিছুদিন হইল, বিলাতের রয়্যাল সোসাইটী অব্ আর্টসের সম্মুখে পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব জবরদস্ত লাট মুসলমানদের বন্ধু স্যার্ মাইকেল ওডোয়াইয়ার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া দেখান, যে, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার রাজপুতবংশজাত, যদিও তাঁহারা নিজে বিদেশী রক্তের দাবী করেন।

প্রকৃত কথা এই, যে, মুসলমান রাজত্বের সময় যে-সব হিন্দু ভয়ে কিম্বা আর্থিক বা সামাজিক কোন লাভের আশায়, কিংবা মুসলমান ধর্ম্মকে ভাল মনে করিয়া, বিজেতাদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, বর্ত্তমান

* "......while the Muhammadans of the Eastern tracts and of Madras were almost entirely descendants of converts from Hinduism, by no means a large proportion even of the Muhammadans of the Punjab are really of foreign blood, the estimate of the Punjab Superintendent being about 15 percent." —P. 116, Vol I, *Census of India, 1921.*

ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশ তাহাদের বংশধর। যাহারা উল্লিখিত কোন কারণে হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই, তাহাদের বংশধরেরা হিন্দুই আছে। অতএব, বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় মুসলমানেরা যদি বলে, "হিন্দুরা সাত শত বৎসর আমাদের গোলাম ছিল," তাহা হইলে তাহা একটা হাস্যকর ভ্রম মাত্র। আসল কথা এই, যে, যে-সব প্রদেশ বিদেশী মুসলমানেরা জয় করিয়াছিল, তাহার কতক অধিবাসী মুসলমান হইয়াছিল, কতক হয় নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, যাহারা মুসলমান হইয়াছিল, তাহাদের বংশধরেরা শ্রেষ্ঠ।

দু একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। বাংলা দেশে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন রুদ্র, লালবিহারী দে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহারা যদি আপনাদিগকে, শুধু ইংরেজদের সধর্ম্মী মনে না করিয়া, স্বজাতি সুতরাং বিজেতাও মনে করিয়া হিন্দুদিগকে বলিতেন, "তোমরা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে দেড় শত বৎসর ধরিয়া আমাদের গোলামী করিতেছ," তাহা হইলে তাঁহাদের সেরূপ কথায় ঠিক তেম্নি হাস্যকর অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইত, যেমন হিন্দুবংশজাত ভারত-বিজয়াভিমানী মুসলমানদের কথায় প্রকাশ পায়। কিন্তু সুখের বিষয়, ভারতীয় খৃষ্টিয়ান সমাজের নেতাদের বুদ্ধি, শিক্ষা এবং স্বদেশপ্রেম থাকায় তাঁহারা এরূপ কোন হাস্যকর বেকুবী প্রকাশ করেন নাই। অবশ্য, ভারতীয় মুসলমানদের ভ্রম হইবার ও ভারতীয় খৃষ্টিয়ানদের ভ্রম না হইবার দু' একটা অন্য কারণও আছে। কেহ মুসলমান হইলে তাহার নাম একেবারে বদ্‌লাইয়া যায়। যে-ব্যক্তি হলধর রায় ছিল, তাহার নাম আবদুল হামিদ বা আবদর রহমান হইবার পর সে যে তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ বা আফগানিস্থানের আমীর আবদর রহমানের কিম্বা অন্য কোন বিদেশীর জ্ঞাতি, এরূপ ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু কালীচরণ বা প্যারীমোহন নাম থাকিতে কেহ ঐ ঐ নামধারীদিগকে রাজা জর্জ্জের বা অন্য কোন পাশ্চাত্য বিদেশীর জ্ঞাতি মনে করিবে না। আর-একটা কারণ এই, যে, মুসলমানদের নিজের মধ্যে খৃষ্টিয়ানদের চেয়ে বর্ণভেদ ও জা'ত-বিচার কম থাকায়, একজন ভারতীয় মুসলমানের বিদেশী বংশজাত বলিয়া পরিচয় দেওয়া যত সহজ, একজন ভারতীয় খৃষ্টিয়ানের পক্ষে ইউরোপীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া তত সহজ নহে।

অবশ্য ভারতীয় কোন-কোন খৃষ্টিয়ান ইউরোপীয় নাম লইয়াছে বটে, এবং কাহারও কাহারও দেহে ইউরোপীয় রক্তও আছে। কিন্তু তাহারাও ভারতবিজেতা বলিয়া গর্ব্ব করিলে লোকে তাহাদিগকে চুণাগলীর ফিরিঙ্গীদের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া মনে করিবার সম্ভাবনা থাকায়, অন্ততঃ ইউরোপীয় নামধারী শিক্ষিত কোন ভারতীয় খৃষ্টিয়ান বিজেতৃত্বের দাবী করে না। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যাহাদের বংশে কোন বিদেশী রক্তের সংস্রব আছে, হিন্দুদিগকে নিজেদের পূর্ব্বতন গোলাম মনে করিবার তাহাদের সেইরূপ অধিকার আছে, যেমন ইউরোপীয়-নামধারী অংশতঃ-ইউরোপীয়-বংশজাত ফিরিঙ্গী বা দেশী খৃষ্টিয়ানদিগের বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগকে গোলাম মনে করিবার অধিকার আছে।

ভারতীয় মুসলমানেরা যেন মনে না করেন, যে, আমরা তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ ভারতীয় বংশজাত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের সম্মান নষ্ট করিতে চাহিতেছি, কিম্বা তাঁহাদিগকে নিজেদের সমশ্রেণীস্থ প্রতিপন্ন করিয়া নিজেরা গৌরবান্বিত হইতে চাহিতেছি। কারণ, নিরপেক্ষ বিদেশীরা বলিতে পারিবেন, যে, মোটের উপর ভারতবর্ষ আরব, পারস্য, তুরস্ক বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ অপেক্ষা কম সম্মানের পাত্র নহে। ভারতবর্ষের দোষ ত্রুটি কলঙ্ক আছে, ভারতবর্ষ এখন পরাধীন ও অধঃপতিত। কিন্তু কোন দেশের বিচার করিতে হইলে তাহার অতীত ও বর্ত্তমান উভয়ই বিবেচনা করিতে হইবে। ভবিষ্যতের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহা বিবেচনা করিলেও, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কোন প্রকারেই উজ্জ্বল মনে করা যাইতে পারে না, ইহা কে বলিতে পারে?

—

"নোংরা জড়োপাসক"

কয়েক দিন পূর্ব্বে ধর্ম্মতলা ও চৌরঙ্গির মোড়ে এক ময়রার দোকানে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষ্যে কলিকাতার ডেপুটী মেয়র মিঃ শহীদ সুহ্রাবর্দ্দী হিন্দুদের প্রতি "ডার্টি আইডলেটার" অর্থাৎ "নোংরা মূর্ত্তিপূজক" কথাগুলি প্রয়োগ করেন, খবরের কাগজে এইরূপ সংবাদ বাহির হয়। তাহাতে ডাঃ আবদুল্লা সুহ্রাবর্দ্দী ঠিকই বলেন, যে, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি এরূপ অবজ্ঞাসূচক কটু বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়।

প্রবাসী ধর্ম্মমতের আলোচনার কাগজ নয়। কিন্তু ধর্ম্মমতের আলোচনা না করিয়াও এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

সত্যনারায়ণের পূজা মূর্ত্তির সাহায্যে করা হয় না; তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মুসলমান-রাজত্বকালে যে-সব চেষ্টা হইয়াছিল, সত্যপীরের পূজা, সত্যনারায়ণের পূজা তাহার অন্তর্গত। এই পূজা এখনও প্রচলিত আছে। তদুপলক্ষ্যে সত্যনারায়ণের পুঁথি পঠিত হইয়া থাকে।

মূর্ত্তির পূজা বা মূর্ত্তির সাহায্যে পূজা করিলেই মানুষ নোংরা বা অবজ্ঞেয় হয় না, এবং মূর্ত্তিপূজা বা মূর্ত্তির সাহায্যে পূজা যে-সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতের অন্তর্গত নহে, তাহাদের অন্তর্গত হইলেই যে-কোন মানুষ মূর্ত্তিপূজকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় না। চৈতন্য-দেব কোন না কোন সময়ে মূর্ত্তির সাহায্যে পূজা করিয়াছিলেন; ভক্ত রামপ্রসাদ, পরমহংস রামকৃষ্ণ প্রভৃতিও তাহা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভিন্নধর্ম্মী খৃষ্টিয়ানদেরও শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছেন। হয় ত মিঃ শহীদ সুহ্রাবর্দ্দী মনে করেন, তিনি ইঁহাদের চেয়ে উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা করিয়া থাকিলে তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না।

মুসলমান সম্প্রদায় নানা শাখায় বিভক্ত। তাহাদের প্রধান কোন কোন মত এক হইলেও অবান্তর বহু বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে মহরমের সময় তাজিয়ার প্রতি ও তদ্রূপ অন্যান্য বস্তুর প্রতি যে-সম্মান প্রদর্শিত হয়, এবং মক্কায় হজ্জ করিতে গিয়া যে কাবা প্রদক্ষিণ করা হয় এবং জম্‌জম্ নামক কূপকে পবিত্র মনে করা হয়, তাহা জড়পূজার সমজাতীয় আচরণ। বহুসংখ্যক মুসলমান কবর-পূজা করিয়া থাকে। সুলতান ইব্‌ন্ সাদ প্রমুখ ওয়াহাবী মুসলমানগণ ইহার বিরোধী। সম্ভবতঃ এই কারণে ইব্‌ন্ সাদ বা তাহার অনুচরদিগের দ্বারা হজরত মহম্মদের পরিবারবর্গের কবর ধূলিসাৎ হইয়াছে। আমরা তাহাদের এরূপ বর্ব্বরতার বিরোধী। তাহারা হয়ত অন্য মুসলমানদিগকে "নোংরা জড়োপাসক" মনে করিয়া এইরূপ করিয়াছে; কিন্তু আমরা এরূপ মনোভাব গর্হিত মনে করি।

—

মেথর, ধাঙ্গড় প্রভৃতির সমাদর

কলিকাতা প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে সে-দিন বড়ালদিগের ভবনে মেথর, ধাঙ্গড় প্রভৃতির সম্বর্দ্ধনা করা হয়। যে-সকল লোক গত দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় মন্দিরাদি রক্ষা করিয়াছিলেন, মেথর, ধাঙ্গড়েরা তাঁহাদের অন্তর্গত। ইহাই তাঁহাদের অভ্যর্থনার কারণ। এরূপ অভ্যর্থনা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ঠিকই হইয়াছে। যে-সব মেথর, ধাঙ্গড় মন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন, প্রাচীন কালে কোন হিন্দু রাজার আমলে যদি তাঁহারা এরূপ কোন ক্ষত্রিয়োচিত কাজ করিতেন, এবং যদি রাজার পরামর্শদাতা ঋষিগণ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নত করিতেন, তাহা হইলে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না।

মন্দির রক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে-সব কাজ মেথরদের দ্বারা হয়, তাহা সমাজের স্থিতি ও রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এইজন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩১৬ সালের শ্রাবণের প্রবাসীতে নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।—

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশু-জ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি;
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে,—
হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশি,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল!
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ;
আর তুমি?—তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

—

মস্‌জিদের সাম্‌নে গীতবাদ্য

মস্‌জিদের সাম্‌নে গীতবাদ্য সম্বন্ধে বঙ্গের লাট সাহেব যে-হুকুম জারী করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সমীচীন হয় নাই।

মস্‌জিদের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া কেহ গীতবাদ্য সহকারে কোন সময়েই যাইতে পারিবে না, কিম্বা কেবল নামাজের সময়েই যাইতে পারিবে না, কোরান্ শরীফ হইতে বা অন্য কোন ইস্‌লামীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ঈশ্বরের এরূপ কোন আদেশ কোন মুসলমান উদ্ধৃত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। কিন্তু যদি এরূপ কোন আদেশ থাকিত, তাহা কেবল মুসলমানেরাই পালন করিতে বাধ্য থাকিতেন; অমুসলমানরা তাহা পালন করিতে বাধ্য হইত না।

মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন মডার্ণ রিভিউ কাগজে দেখাইয়াছেন, যে, খলিফা ওমার এই আদেশ করিয়াছিলেন, যে, পাঁচ ওক্ত নামাজের সময় ছাড়া অন্য সময়ে অমুসলমানেরা মস্‌জিদের নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া গীতবাদ্য সহ মিছিল করিয়া যাইতে পারিবে। মুসলমান যে-দেশের রাজা, সেখানে অগত্যা এই নিয়ম পালিত হইয়া থাকিতে পারে; অন্যত্র হইতে পারে না।

বস্তুতঃ যে-দেশে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাস, সেখানে কেবল কোন একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সুবিধা দেখিলে চলিতে পারে না। কোন্ ধর্ম্ম ভাল, কোন্ ধর্ম্ম মন্দ, তাহার বিচারও সেদেশের গবর্ণমেণ্টের অধিকারবহির্ভূত। উহা কোন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্য কোন ধর্ম্মকে অশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে পারে না। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করিতে এরূপ দেশের গবর্ণমেণ্ট্ বাধ্য।

এইজন্য এবিষয়ে প্রিভি কৌন্সিল্ এবং তৎপূর্ব্বে ভারতীয় কোন কোন হাইকোর্ট যেরূপ রায় দিয়াছেন, তাহা অতি সমীচীন। একবার মোকদ্দমা হইয়াছিল মুসলমানদেরই শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে। শিয়ারা সুন্নীদের মস্‌জিদের সাম্‌নে দিয়া বাদ্যসহকারে তাজিয়া আদি লইয়া যাওয়ায় সুন্নীরা নামাজের ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া আপত্তি করে, এবং মোকদ্দমা হয়। তাহা বিলাতের প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত গড়ায়। রায়ে এই মর্ম্মের কথা লেখা হইয়াছে, যে, শিয়াদের পূজাও পূজা। সুন্নীদের ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাঘাত হয় বলিয়া শিয়ারা তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম স্থগিত রাখিতে বাধ্য নহে। ইহাই ঠিক্ নীতি। যদি উভয় পক্ষ আপোষে কোন মীমাংসায় উপনীত হন, তাহা ভালই। নতুবা শিয়া বা অন্য যাঁহারা মস্‌জিদের সাম্‌নে দিয়া মিছিল লইয়া যান, তাঁহারাও ত বলিতে পারেন, "আমাদের মিছিল চলিয়া গেলে তাহার পর আপনারা নামাজ সমাপ্ত করিতে পারেন, এখন স্থগিত রাখুন।" ধর্ম্মকর্ম্ম স্থগিত রাখিতে হইলে শিয়াদিগকে বা অমুসলমানদিগকেই রাখিতে হইবে, এরূপ আদেশ করিবার কোন কারণ নাই।

ভদ্রভাবে অনুরোধ করিলে ভদ্রতা ও প্রতিবেশী-উচিত সহানুভূতির খাতিরে একধর্ম্মাবলম্বী অন্যধর্ম্মাবলম্বীর অনুরোধ স্থানকালবিশেষে রক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু আইন, সর্‌কারী হুকুম, বা গায়ের জোরে অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার চেষ্টা বর্জ্জনীয়।

বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দু, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী এবং কোন কোন খৃষ্টিয়ান্ মণ্ডলী নগরকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মনে করুন, তাঁহাদের কোন কীর্ত্তনের দল হরিনাম, ব্রহ্মনাম বা যিশুর নাম ভক্তি-সহকারে করিতে করিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। কীর্ত্তন সাধারণতঃ অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে মুসলমানদের নামাজ তিন বার হয়। পথে যত জায়গায় মস্‌জিদ আছে, সব জায়গাতেই যদি ধর্ম্মসঙ্গীত বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে কখনও ভক্তিভাব-সহকারে কীর্ত্তন হইতে পারে না; তাহা হইলে রসভঙ্গ-হেতু উহা জমিতে পারে না। অথচ এইরূপ কীর্ত্তনও নিশ্চয়ই ধর্ম্মকর্ম্ম, নিশ্চয়ই ভগবানের আরাধনার অঙ্গ। তাহাতে বাধা দিবার অধিকার মুসলমানদের নাই, গবর্ণমেণ্টেরও নাই।

মুসলমানেরা যখন রাস্তার ধারে মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন, তখন ইহা জানিয়া বুঝিয়াই করেন, যে, রাস্তায় নানাপ্রকার গোলমাল হইবে ও নামাজাদিতে তজ্জনিত ব্যাঘাত সহ্য করিতে হইবে। ট্রাম, বাস্, মোটরগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, বাইসিক্‌ল্ প্রভৃতির ভেঁপু, ফেরীওয়ালার চীৎকার, মহরমের ঢাক, মাদার শার মিছিলের গোলমাল, এই সমস্ত কোলাহল বহু ছোট বড় মস্‌জিদের সম্মুখে হইয়া থাকে। মুসলমানেরা তাহা সহ্য করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। এবং এইরূপ কোন না কোন গোলমাল ভোর হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত প্রায় আঠার ঘণ্টা রোজই হয়। তাহাতে যখন মুসলমানদের ধর্ম্মহানি হয় না, তখন কখন কদাচিৎ কয়েক মিনিটের জন্য হিন্দুদের গীতবাদ্যের মিছিল গেলে তাহাতে আপত্তি করা এবং বাধা দিতে গিয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত করা ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, যুক্তিসঙ্গতও নহে; খলতা এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিদেরই লক্ষণ মাত্র।

আমাদের বিবেচনায়, শুধু ধর্ম্মসংক্রান্ত মিছিল নহে, অন্য সব মিছিলও অবাধে সব রাস্তা দিয়া যাইতে দেওয়া উচিত। পুলিশকে কেবল ইহাই দেখিতে হইবে, যে, মানুষের ভীড়ে পথিকদের ও যানবাহনের যাতায়াত বন্ধ না হইয়া যায় এবং শান্তিভঙ্গ না হয়। মিছিলের লোকেরা মস্‌জিদ মন্দিরাদির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গোলমাল যাহাতে না করে, তাহাও পুলিসের দেখা উচিত।

সকলের স্বাধীনতা ও অধিকার সমভাবে রক্ষার জন্য আমরা যেমন মুসলমানদিগকে অন্যান্য গোলমালের মত

অমুসলমানদের মিছিলের গোলমালও সহ্য করিতে বলিতেছি, হিন্দুদিগকেও তেমনই মুসলমানদের গো-বলি-দান সহ্য করিতে বলিয়া থাকি। প্রত্যহ অহিন্দু লক্ষ লক্ষ লোকের আহারের জন্য হাজার হাজার গোবধ এই ভারতবর্ষে হইতেছে। তাহা হিন্দুরা বন্ধ করিতে পারেন না। কেবল বকরীদের সময় গোবধ লইয়া ঝগড়া বিবাদ ও মারামারি করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা মৎস্যমাংসভোজী নহি। গোবধ দূরে থাকুক, ছাগবলি দেখাও আমাদের পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু সকল মানুষের মত একরকম নহে। সুতরাং অগত্যা যেমন প্রকাশ্য ছাগবলি সহ্য করি, গোবধ প্রকাশ্য ভাবে হইলেও তাহাও সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

কলিকাতায় পুলিস্ কর্ত্তৃক মিছিলের যে-অনুমতি প্রদত্ত হয়, তাহাতে লিখিত আছে, যে, মিছিলের গীতবাদ্য গির্জ্জা, মস্‌জিদ, মন্দির প্রভৃতির সম্মুখে সাধারণ উপাসনার (public worshipএর) সময় বন্ধ করিতে হইবে। লাট সাহেবের আদেশে পব্লিক্ ওয়ার্শিপের মানে মণ্ডলীগত উপাসনা (congregational worship) বলা হইয়াছে। খৃষ্টিয়ান্‌দের গির্জ্জায় এরূপ উপাসনা রবিবারে এক বা দুইবার হয় এবং ঈষ্টার, ক্রিষ্টমাস্ (বড়দিন) প্রভৃতি পর্ব্বদিনেও হয়। ব্রাহ্মদের এরূপ উপাসনা রবিবার বা বুধবারে হয়, এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবে হয়। আমরা যতদূর জানি, মুসলমানদেরও এইরূপ সাধারণ উপাসনা প্রতি শুক্রবার হয়। নিষ্ঠাবান্ মুসলমানেরা রোজ যে পাঁচবার নামাজ করেন, তাহা তাঁহারা পথে ঘাটে রেলে সর্ব্বত্র যথাসময়ে করিয়া থাকেন। তাহা ব্যক্তিগত ব্যাপার। রেলে তাহা করিবার সময় রেলগাড়ী থামান হয় না, রেলগাড়ীর শব্দ বন্ধ হয় না, যে-কামরায় কোন নিষ্ঠাবান্ মুসলমান নামাজ করেন, তাহাতে উপবিষ্ট অমুসলমান যাত্রীরা কথাবার্ত্তা বা অন্য গোলমাল বন্ধ করিতে বাধ্য হয় না। প্রত্যহ নিষ্ঠাবান্ কোন মুসলমান যে নামাজ করেন, তাহাতে অবশ্য অন্য মুসলমানও যোগ দিতে পারেন; কিন্তু এইরূপ নামাজকে পব্লিক্ ওয়ার্শিপ বলা চলে না, শুক্রবারের নামাজকেই সাধারণ উপাসনা বলা চলে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

অনেক মুসলমান নেতা যে-বলিতেছেন, যে, ২৪ ঘণ্টাই প্রত্যেক মসজিদে নামাজ চলিতে থাকে, এবং কোন মস্‌জিদের সম্মুখে (বিশেষতঃ নামাজের সময়) কখনও গীতবাদ্য হয় নাই, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা আগে আগে মনে করিতাম, ভারতীয় কোন কোন হিন্দু রাজনৈতিক প্রয়োজন মত যে-সব মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের শিক্ষানবীসিই প্রমাণ হয়, মিথ্যাকথন বিষয়ে ব্রিটিশ, আমেরিকান্ ও অন্য পাশ্চাত্য অনেক নামজাদা রাজনৈতিকদের সমকক্ষ হইতে তাঁহাদের এখনও অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু মস্‌জিদের সম্মুখে গীতবাদ্য বিষয়ে অনেক মুসলমান নেতা ও কলিকাতা খিলাফৎ কমিটি যেরূপ কল্পনা ও উদ্ভাবনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে এই বিদ্যায় জগদ্‌গুরু বলিয়া মানা ভিন্ন উপায় নাই।

লাটসাহেবের হুকুমে মস্‌জিদের কোন সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কলিকাতার কোন্ রাস্তায় কোন্ কোন্ জায়গায় কয়টি মস্‌জিদ আছে, তাহার কোন তালিকাও দেওয়া হয় নাই। এখন যে-কোন স্থানে কোন খোলার ঘরের উপর মাটির গাম্‌লা উবুড় করিয়া রাখিয়া তাহাতে চূড়া বসাইয়া দিয়া তাহাকে মস্‌জিদে পরিণত করিতে দেরী হইবে না। এই প্রকারে মুসলমানদের ইচ্ছামত সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংক্রান্ত ও লৌকিক সব মিছিলে বাধা জন্মান খুব সহজ হইবে।

বঙ্গভঙ্গের পর, কলিকাতায় আপার সার্কুলার রোডে বধিরমূক বিদ্যালয়ের পাশে যে খোলা জায়গা ছিল, তাহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী মিলনের চিহ্নস্বরূপ একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। উহাকে ফিডারেশ্যন্ হল্ নাম দিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু উহাতে একটি পূর্ব্বোক্তরূপ খোলার ঘরের মস্‌জিদ থাকায় বা অবিলম্বে খোলার ঘরের মসজিদত্ব প্রাপ্তি ঘটায়, ফিডারেশ্যন্ হল্ বানাইবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা খোলার ঘরের মস্‌জিদের পরিবর্ত্তে পাকা মস্‌জিদের জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াও, কোন কোন মুসলমানের চক্রান্তে ফিডারেশ্যন্ হল্ নির্ম্মাণ করাইতে পারেন নাই। সুতরাং দর্‌কার মত স্থানে স্থানে খোলার মস্‌জিদের হঠাৎ আবির্ভাব কেহ যেন অসম্ভব মনে না করেন।

লাটসাহেবের হুকুমে আছে, যে, কলিকাতার নাখোদা মস্‌জিদের সম্মুখে দিনরাত্রি ২৪ ঘণ্টা সব সময়ই গীতবাদ্য বন্ধ রাখিতে ও বন্ধ করিতে হইবে। ইহার বৃহত্ত্ব, ইহার মর্য্যাদা ও গুরুত্ব, এবং ইহার অবস্থিতির স্থান এই হুকুমের কারণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কারণগুলা আমাদের বেশ বোধগম্য হইল না। ছোট মস্‌জিদের নামাজও নামাজ, বড় মস্‌জিদের নামাজও নামাজ। ছোট মস্‌জিদের নামাজকারীরাও বড় মস্‌জিদের নামাজকারীদের মত ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগেরই মত কাফের-দিগকে শাস্তি দিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হইতে পারে। তবে, ছোট মস্‌জিদ্ অপেক্ষা বড় মস্‌জিদে এরূপ

লোকদের সংখ্যা বেশী হইতে পারে বটে। কিন্তু লাটসাহেব তাহাতে ভয় পাইয়া নাখোদা মস্‌জিদকে বিশেষ গৌরব দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমাদের অনুমান এই, যে, সকল মস্‌জিদের সম্মুখে দিন-রাত্রির সব সময়ে মিছিলের গীতবাদ্য বন্ধ করাইবার যে-আব্‌দার মুসলমানদের ছিল, তাহা পূর্ণ করা অসম্ভব দেখিয়া লাটসাহেব পিত্তিরক্ষা হিসাবে কেবল মাত্র একটি মস্‌জিদ সম্বন্ধে মুসলমানদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন।

লাটসাহেবের আদেশে পুলিশ কমিশনারকে মুসলমানদের নামাজের সময় জানিয়া তাহা লইয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতার খিলাফৎ কমিটি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে-কোন কারণে পুলিশ কমিশনার দর্‌কার মত মিছিল সম্বন্ধে যথোচিত আদেশ দিতে পারিবেন, এইরূপ ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যতঃ তাঁহাকে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা করা হইয়াছে। তাঁহার এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যে আপাততঃ হিন্দুদের অসুবিধার কারণ হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুরা উচ্চ জাতি ও নীচ জাতি প্রভৃতি ভেদ ভুলিয়া যদি কখন সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে পারে, তখন কি ঘটিবে, তাহা এখন অনুমান করিবার দর্‌কার নাই।

কিন্তু এখনও গবর্ণমেণ্ট এবং মুসলমানেরা জানিয়া রাখুন যে, লাটসাহেবের কথা শেষ কথা নহে; এ হুকুম রদ হইবেই হইবে। সাধারণ রাস্তায় সর্ব্বসাধারণের অধিকার এ প্রকারে লুপ্ত হইবার নহে। কোন কোন হাইকোর্ট ও প্রিভিকৌন্সিল এবিষয়ে সকল সম্প্রদায়কে অবাধে সর্‌কারী রাস্তা ব্যবহারের স্বাধীনতা দানের যে-নীতি সমর্থন করিয়াছেন, তাহাই টিকিবে।

যাঁহারা সজন স্থানে রাস্তার উপর ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা সেখানে নির্জ্জন স্থানের নিস্তব্ধতা আশা করিতে পারেন না। তাঁহারা যদি সজন স্থানের অন্য নিত্য কোলাহল সত্ত্বেও উপাসনা করিতে পারেন, তাহা হইলে অমুসলমানদের নৈমিত্তিক মিছিলের শব্দও তাঁহাদের সহ্য করা উচিত। তাহা না পারিলে, হয় তাঁহাদের মিছিল চলিয়া যাইবার পর নামাজাদি করা উচিত, নতুবা ধর্ম্মমন্দির সজন স্থান হইতে সরাইয়া লইয়া নির্জ্জন স্থানে নির্ম্মাণ করা উচিত। এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মান্ধতাপ্রসূত জিদে অন্য সকলের স্বাধীনতা ও অধিকার লুপ্ত হইতে পারে না।

কলিকাতায় যে-সব মিছিলের জন্য পুলিসের অনুমতি দর্‌কার হয় না, তাহার গীতবাদ্য মস্‌জিদের সাম্‌নে থামাইতে হইবে কিনা, সর্‌কারী কম্যুনিকেতে সে-বিষয়ে কিছু লেখা নাই। অনেক সময় খোল করতাল সহকারে কীর্ত্তন করিতে করিতে শবদাহ করিতে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার জন্য অনুমতি দর্‌কার হয় না। শোকার্ত্ত মানুষরা সাধারণতঃ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে না। এইজন্য, এবং হয় ত কোথাও কোথাও ভীরুতা বশতঃ, হিন্দুরা মুসলমানদের অশিষ্ট ও অন্যায় জিদে এরূপ কীর্ত্তনও বন্ধ করিয়াছে। তাহা করিবার হীনতা সহ্য করা উচিত নয়, এবং কীর্ত্তন বন্ধ না করিলে যাহাতে মার খাইতে না হয়, তাহার জন্যও অতঃপর প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ইতিমধ্যেই মুসলমানেরা হিন্দুদের বাসগৃহের মধ্যেও গীতবাদ্যে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। এই অন্যায় জিদে গবর্ন্মেণ্ট এবং সংঘবদ্ধ হিন্দুসমাজ বাধা না দিলে থিয়েটার, যাত্রা, কন্সার্ট, গৃহস্থের বাড়ীর পূজাপাঠ ও গানবাজনা মুসলমানদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে, এবং তদ্রূপ জুলুম ও দাসত্ব দুঃসহ হইবে।

কলিকাতার পুলিসের অনুমতির ফারমে যে-সব সর্ত্ত লিখিত আছে, তাহা বাস্তবিক এযাবৎ হিন্দুদের দ্বারা এবং মুসলমানদেরও দ্বারা পালিত হইয়া আসিতেছে কি না, তাহা লাট সাহেবের বিবেচনা করা উচিত ছিল।

—

"শ্রীরাজরাজেশ্বরী দেবী" বিসর্জ্জনের মিছিল

বড়বাজারে সুতাপটীতে গত ৬৯ বৎসর ধরিয়া শ্রীরাজরাজেশ্বরী দেবীর বারোয়ারী পূজা এবং পূজা অন্তে সমারোহের সহিত বিসর্জ্জন হইয়া আসিতেছে। এবারও পূজার পর বাদ্যভাণ্ডসহ মিছিল করিয়া বিসর্জ্জন দিবার জন্য পুলিশের অনুমতি লওয়া হয়। এই অনুমতিতে মিছিলের লোকসংখ্যা পঁচাত্তরের অনধিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু খবরের কাগজে সকল হিন্দু শিখ প্রভৃতিকে এই বিসর্জ্জন-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান করা হয়। পূজার কর্ত্তারা এই আহ্বানের জন্য দায়ী না হইলেও, এই ওজুহাতে পুলিশ কমিশনার মিছিল বাহির হইবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রথম অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া ভিন্নপথ দিয়া যাইবার অনুমতি দেন। প্রথম অনুমতির পথের ধারে কয়েকটি মস্‌জিদ ছিল, দ্বিতীয়টিতে ছিল না। ৬৯ বৎসর ধরিয়া প্রথম-নির্দ্দিষ্ট পথে মিছিল চলিয়া আসিতেছে। প্রথম অনুমতি নাকচ করিবার পূর্ব্বে কয়েকজন মুসলমান নেতা পুলিশ কমিশনারের সহিত দেখা করেন, এবং শতশত মুসলমান নির্দ্দিষ্ট পথের ফুটপাথ ও রাস্তায় অবিরত নামাজে বা নামাজের অভিনয়ে এপ্রকারে ব্যাপৃত থাকে, যে, পথিক ও যানবাহনের চলাচল বন্ধ হয়। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য সহজবোধ্য;—উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ ইহাই

ছিল, যে, পুলিস কমিশনার প্রথম পথে মিছিল লইয়া যাইবার অনুমতি দিলেও যেন হিন্দুরা তাহা লইয়া যাইতে না পারে। যাহা হউক, মুসলমান নেতা ও জনতার চেষ্টাতেই হউক, বা অন্য যে-কারণেই হউক, পুলিস কমিশনার পথ বদলাইয়া দেন। তখন দেবীমূর্ত্তিসমূহকে রাস্তায় বাহির করা হইয়াছে। বারোয়ারীর কর্ত্তারা পচাত্তর জন মাত্র লোক লইয়া মিছিল করিতে রাজী হইলেও পুলিস কমিশনার প্রথম নির্দ্দিষ্ট পথে যাইবার অনুমতি না দেওয়ায় বিসর্জ্জনের মিছিল পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিমা বাহির করিলে তাহা আবার পূজার স্থানে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিমাগুলিকে প্রথম প্রথম রাস্তাতেই রাখা হয়। তাহার পর অন্যত্র রাখিয়া পূজা করা হইতেছে। প্রতিমাগুলিকে ধর্ম্মবিশ্বাসবশতঃ রাস্তায় রাখাতেও, সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতে বাধা উৎপাদনের অভিযোগে বারোয়ারীর কার্য্যকর্ত্তার নামে মোকদ্দমা হয়। কিন্তু পুলিসের অতীব প্রশংসনীয় অপক্ষপাতিত্ব বশতঃ মুসলমানেরা যে রাস্তা আগুলিয়া বসিয়াছিল, তাহা দোষের বিষয় বিবেচিত হয় নাই, এবং তাহাদের নামে পথরোধের অভিযোগে মোকদ্দমা হয় নাই !

প্রথম অনুমতি প্রদত্ত হইবার পর কাগজে যে-ভাষায় হিন্দু ও শিখ জনসাধারণকে দলে দলে আসিতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাহা সুবুদ্ধির কাজ হয় নাই,—যদিও বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন কুমৎলব ছিল না। কিন্তু ঠিক ৭৫ জন লোক লইয়া মিছিল করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও পুলিস কমিশনারের পথ বদলাইয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। পুলিস্ কর্ত্তৃপক্ষ ত প্রথমনির্দ্দিষ্ট পথের ধারে মসজিদের অস্তিত্ব জানিয়াই অনুমতি দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, মিছিলের লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেও দর্শকদের মধ্যে অনেকেই বরাবর মিছিলে যোগ দিয়া থাকে, এবং তাহাতে অনুমতি-পত্রে নির্দ্দিষ্ট মিছিলের সংখ্যা বরাবরই অতিক্রান্ত হয়; কিন্তু তজ্জন্য কখনও মাঝ পথে মিছিল বন্ধ করা হয় না। প্রতি মিনিটে জনতার লোকসংখ্যা গণনা করিয়া অতিরিক্ত লোকদিগকে তাড়াইয়া দিবার অবসর ও ক্ষমতা কাহারও থাকে না। সুতরাং মিছিলে যোগ দিবার নিমন্ত্রণ কাগজে বাহির না হইলেও জনতা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অতিক্রম করিত। অতএব, কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়াটা মিছিলের পথ বদলাইবার একটা ছুতা মাত্র। মুসলমানদের জিদ বজায় রাখাটাই আসল কারণ বলিয়া মনে হয়। তাহাদিগকে খুশী করিয়া হিন্দুদিগকে অসন্তুষ্ট করিলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িবে ও জাগরূক থাকিবে, অতএব ইহাই শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পন্থা—এরূপ কোন চিন্তা পুলিশের কর্ত্তাদের মাথায় আসিয়াছিল কি না, বলা অসম্ভব।

মিছিল-সম্পর্কে পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদ করিবার জন্য টাউন হলে হিন্দুদের বিরাট সভা হয়। লোক খুব বেশী হওয়ায় আরও দুটা সভা করিতে হয়। টাউন হলের ভিতরের সভায় বিখ্যাত ব্যারিষ্টার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সভাপতি হন। তিনি খুব আইনজ্ঞ বলিয়াই পরিচিত, রাজনৈতিক আন্দোলনকারী বলিয়া তিনি কখনও পরিচিত হন নাই। অবশ্য এখন এরূপ লোকের কথাতেও ভেদবুদ্ধিগ্রস্ত ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট্ কান দিবেন না। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, রাজা হৃষীকেশ লাহা, প্রভৃতি রক্ষণশীল ও রাজনৈতিক আন্দোলনে নির্লিপ্ত ব্যক্তিগণ, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, যোগেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রভৃতি মস্‌জিদের সম্মুখে গীতবাদ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও কান দেন নাই। এখন সুয়োরাণীকে খুশী করা চাই-ই চাই। কিন্তু পরে ইংরেজরা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

হিন্দুরা যেন কখনও ঘৃণ্য সুয়োরাণীর পদ লাভের চেষ্টা না করেন। তাঁহারা সুয়ো দুয়ো কোন রাণীই নহেন। "আমরা সবাই রাজা"। সকল সম্প্রদায়ের লোকসমষ্টি লইয়া ভারতীয় মহাজাতি। এই মহাজাতিকে আত্মকর্ত্তৃত্ব বা স্ব-রাজ্য লাভ করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় স্ব-রাজ্য স্থাপনের দায়িত্ব প্রধানতঃ হিন্দুদেরই মনে হইতেছে। কারণ, তাঁহারা ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক অনাধ্যাত্মিক সকল অর্থেই নিজেদের দেশ মনে করেন। অধিকাংশ মুসলমান আরব তুরস্ক পারস্য আফগানিস্থান তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশকে নিজেদের প্রকৃত ও আধ্যাত্মিক পিতৃভূমি মনে করেন, ভারতবর্ষের জমী ও অন্যান্য সম্পত্তি এবং সুখসুবিধাগুলিই তাঁহারা প্রধানতঃ চান। হিন্দুরা যেরূপ ভারতপ্রেমিক ও ভারত-ভক্ত, মুসলমানেরা বহু পরিমাণে সেইরূপ হইলে স্ব-রাজ্য স্থাপনের দায়িত্ব তাঁহারাও অনুভব করিবেন। সুয়োরাণী হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টাকে তখন তাঁহারাও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে শিখিবেন।

—

নারীনির্য্যাতন ও বীরত্বের প্রমাণ

কয়েক বৎসর হইতে নারীহরণ ও নারীর উপর পাশব অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে। যাহারা এইরূপ অত্যাচার করে, তাহারা পশুর অধম। তাহারা যে এরূপ অত্যাচার

করিতে পারে, তাহার অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ এই, যে, অধিকাংশ স্থলে তাহাদের দুর্বৃত্ততায় বাধা দিবার জন্য প্রতিবেশী পুরুষেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে না। কেহই এচেষ্টা করেন নাই, বলিলে ভুল হইবে। যথাসময়ে কেহ কেহ চেষ্টা করায়, অল্পসংখ্যক স্থলে দুর্বৃত্তেরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই। দুই একজন নারী প্রাণ দিয়া নিজের সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর ইহা সত্য, যে, বাংলাদেশে যে-সব জেলায় নারীর উপর অত্যাচার বেশী, তথাকার পুরুষেরা এই অত্যাচার দমন করিবার জন্য পৌরুষ দেখাইতে পারে নাই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা ভাষার অভিধানে কাপুরুষের একটি অর্থ "যে নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না" লেখা আছে। বঙ্গের এই কাপুরুষতা দূর করিতে হইবে। মুসলমান নারীদের উপর যে অত্যাচার হয় না, তাহা নহে; কিন্তু নির্য্যাতিতা ও ধর্ষিতাদের মধ্যে হিন্দু নারীর সংখ্যাই বেশী। এইজন্য বঙ্গের কাপুরুষতার কলঙ্ক দূর করিবার দায়িত্ব হিন্দুদেরই বেশী। মৌলানা শৌকৎ আলি যখন বলিয়াছিলেন, "কাফেররা কাপুরুষ, তাহারা মরিতে ভয় করে," তখন সে কথায় অমুসলমানদের রাগ হইয়াছিল। আমরা উহার সার্ব্বজনিক ও সার্ব্বকালিক সত্যতা স্বীকার করি নাই; কাপুরুষতা যে মুসলমানদের মধ্যেও আছে, তাহাও বলিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুদিগকে মৌলানা শৌকৎ আলির কথা মিথ্যা প্রমাণ করিতে হইলে প্রাণপণ করিয়া নারীনির্য্যাতন বন্ধ করিতে হইবে।

বঙ্গের সংবাদপত্রসকলে মস্‌জিদের সাম্‌নে গীতবাদ্য সম্বন্ধে যত লেখালেখি ও আন্দোলন হইয়াছে, নারী-নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে তাহার শতাংশও হয় নাই। অথচ মস্‌জিদের সাম্‌নের রাস্তা দিয়া গীতবাদ্যসহ মিছিল লইয়া যাইবার অধিকার স্থাপন করা অপেক্ষা নারীর মর্য্যাদা রক্ষা কোনক্রমেই কম আবশ্যক নহে। এই বিষয়ে "সঞ্জীবনী" সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আন্দোলন করিয়াছেন। তাহাতে লেখা হইয়াছে, যে, গত তিন বৎসরে আনুমানিক পাঁচশত নারী অত্যাচরিতা হইয়াছেন। এই পাশব অত্যাচারের উপর আবার সমাজের অত্যাচার আছে। অত্যাচরিতা নারীরা প্রায়ই সমাজে আর. পূর্ব্বস্থান পান না। কি ঘোর অবিচার!

—

নারীনির্য্যাতন ও গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য

গবর্ন্মেণ্ট রাজনৈতিক কারণে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশ্যন বলবৎ রাখিয়াছেন, হাজার হাজার কংগ্রেস্ ভলাণ্টীয়ারকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স্ জারী করিয়াছেন—নানা বেআইনী আইন দ্বারা "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষা করিতেছেন; গুণ্ডা আইন এবং কলিকাতা অঞ্চলকে নিরাপদ করিবার জন্য নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই যে নারীর সর্ব্বনাশ বৎসরের পর বৎসর চলিয়া আসিতেছে, ইহা নিবারণের জন্য বিশেষ কোন উপায় অবলম্বিত হইতেছে না। একটি মাত্র ইংরেজ বালিকাকে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের পরপারস্থ কতকগুলা পাঠান হরণ করায় সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের টনক নড়িয়াছিল, তাহার উদ্ধার সাধন এবং উদ্ধারকর্ত্তাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া তবে ইংরেজ নিশ্চিন্ত হয়। আর ৫০০ ভারতীয় নারীর সর্ব্বনাশেও আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না, গবর্ন্মেণ্টও বেশ আরামে আছেন।

শ্বেতনারীর অপমান হইলে ইংরেজদের ও ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের কেমন টনক নড়ে, তাহার আর-একটি দৃষ্টান্ত কয়েকদিন আগেকার নিম্নলিখিত সংবাদে পাওয়া যায়।—

Violence By Natives In Kenya On White Women.

LAW TO BE TIGHTENED.

(Reuter's Service.)

Nairobi, May 31.

The Governor Sir Edward Grigg announced in the Legislature to-day, following a number of recent crimes of violence against White women by natives, that Government intended to tighten the law relating to punishment of the crimes, thus giving a greater sense of security, and also enlist the assistance of the chiefs and headmen, who themselves did not countenance such acts.

কতিপয় শ্বেতকায়া নারীর উপর আফ্রিকাস্থ কেন্যা দেশের নেটিভেরা বল প্রয়োগ করিয়াছে। এই জন্য আইন আরও শক্ত করা হইতেছে এবং নেটিভ সর্দ্দার ও গ্রামের মোড়লদেরও সাহায্য লওয়া হইতেছে। ইহার শত গুণ অত্যাচার বঙ্গনারীর উপর হওয়াতেও কিন্তু বাংলা গবর্ন্মেণ্ট ও ভারত গবর্ন্মেণ্ট নিশ্চিন্ত আছেন। সাধারণ আইনে দুর্বৃত্তেরা কখন কখন শাস্তি পাইতেছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে।

—

মন্দির ও বিগ্রহনাশ

পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কলঙ্কস্বরূপ কোন কোন লোক হিন্দুদের মন্দির ও দেবদেবীমূর্ত্তি অপবিত্র ও নষ্ট করিতেছে, এইরূপ সংবাদ কাগজে বাহির হওয়ায় গবর্ন্মেণ্ট এবিষয়ে একটু অদ্ভুত

রকমের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে একটা কম্যুনিকের' দু একটা সংবাদে ভুল ও অত্যুক্তি দেখান হয়, কিন্তু কোন্ কোন্ সংবাদ সত্য তাহা বলা হয় নাই। তাহাতে লোকের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিতে পারে, যে, এরূপ সব বা অধিকাংশ সংবাদই মিথ্যা। তাহার পর সম্প্রতি যে কম্যুনিকে বাহির হইয়াছে, তাহাতেও, অনেক সংবাদ যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত, এইরূপ ভাবটা প্রবল। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে, তিনটা জেলায় যদি ১০০টা মন্দির ও দেবদেবী অপবিত্রীকরণ বা বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা যেন বেশী কিছু গুরুতর ব্যাপার নহে, এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। একশটা যদি হইয়া থাকে, এইরূপ একটা সংখ্যা দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিয়া লওয়ায় মনে হইতেছে, যে, গবর্ন্মেণ্ট্ এইরূপ যত সংবাদ সত্য মনে করেন,তাহার সংখ্যা একশত অপেক্ষা কম হইবে না। একশত এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে তাহা কি বড় কম?

এইরূপ ঘটনা রাত্রে গোপনে হয় বলিয়া পুলিস্ তাহা নিবারণে অসমর্থ, ইহাও গবর্ন্মেণ্ট-জ্ঞাপনীর অন্যতম কথা। তাহা হইলে প্রতিকার কি? সর্‌কারী মত এই, যে, খবরের কাগজে এইসব সংবাদ বাহির হওয়াতেই যত অনর্থ ঘটিতেছে। মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত সংবাদ বাহির করা উচিত নয়, সংবাদদাতাদের ও সম্পাদকদের সত্য নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা খুব অবহিত থাকা উচিত, ইহা আমরা স্বীকার করি;—বস্তুতঃ ইহা ত সংবাদপত্র পরিচালনের ক খ গ। কিন্তু ইহা কখনই সত্য নহে, যে,অধিকাংশ স্থলে সংবাদদাতারা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রেরণ করেন এবং সম্পাদকেরা জানিয়া শুনিয়া বা লঘুচিত্ততার সহিত কিম্বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বর্দ্ধনের জন্য তাহা প্রকাশ করেন। সংবাদগুলা না ছাপিলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, এ বড় অদ্ভুত মত। কাহারও গায়ে যদি ব্রণ ফোঁড়া হইতে থাকে, তাহা হইলে শরীরটা আবৃত রাখিলেই কি সেগুলা সারিয়া যায়? চিকিৎসার কোন প্রয়োজন হয় না?

গবর্ন্মেণ্ট্ বলিতেছেন, যে, অতঃপর কোন সম্পাদক এরূপ সংবাদ কোন জেলা হইতে পাইলে সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সংবাদপ্রেরকের নাম ঠিকানাদি সহ তাহা প্রেরণ করিতে হইবে। গবর্ন্মেণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা অবিলম্বে এইসব সংবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সম্পাদকদিগকে খবর দিবেন। তখন সম্পাদকেরা ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সংশোধিত সংবাদ ছাপিতে পারিবেন। যদি কোন সম্পাদক তাহা না করিয়া কোন সংবাদ ছাপেন, তাহা হইলে সরকার মনে করিবেন, যে, সম্পাদক সংবাদটাকে সত্য মনে করেন না। অর্থাৎ কিনা, যদি সত্য মনে করিতেন, তাহা হইলে তাহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইবার ভরসা সম্পাদকের হইত! তাহার পর অবশ্য জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রচারের অভিযোগে সম্পাদকের নামে মোকদ্দমা হইতে পারিবে।

সম্পাদকদের যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার ফল অনুমান করা কঠিন নয়।

যে-সব সম্পাদক সর্‌কারী পন্থার অনুসরণ করিবেন, তাঁহারা টাটকা খবর ছাপিতে পারিবেন না; যাঁহারা যাচাই করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদগুলা না পাঠাইয়া পাইবামাত্র ছাপিবেন, তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। এই দুই কারণে, অনেক কিম্বা সব সত্য ঘটনার খবর অপ্রকাশিতই থাকিয়া যাইবে। এবম্বিধ সর্ব্বপ্রকার অনাচার দুর্বৃত্ততা দমনের একটা উপায় তাহার খবর প্রকাশ করা। সূর্য্যালোকে মুক্ত বাতাসে যেমন দুর্গন্ধ ও রোগবিষ নষ্ট হয়, তদ্রূপ দুর্বৃত্ততাও প্রকাশ দ্বারা কতকটা নিবারিত হয়। গবর্ন্মেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পন্থা তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবে। যে-সকল লেখক ও সংবাদদাতা নিজেদের নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের নাম গোপন রাখা সংবাদপত্রের শিষ্টাচারসম্মত নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করিতে কয়জন সম্পাদক রাজী হইবেন, জানি না। যাঁহারা ভঙ্গ করিবেন, তাঁহারা সহজে সংবাদদাতা পাইবেন না, সুতরাং সংবাদও পাইবেন না। যাঁহারা নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না, তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট্ দ্বারা সংবাদ যাচাই করাইতে পারিবেন না, সুতরাং সংবাদ প্রকাশেও তাঁহাদের ব্যাঘাত ও বিঘ্ন জন্মিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সংবাদ যাচাই করাইবেন পুলিসের দ্বারা। ঘটনা মিথ্যা বা গুরুতর নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি পুলিসের থাকিবার সম্ভাবনা আছে। তদ্ভিন্ন, সংবাদদাতাকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে পুলিস হায়রান পরেশান নিশ্চয়ই করিবে না, বলা যায় না। সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা সাধারণতঃ সর্‌কারী কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে থাকে না। তাহার উপর এই প্রকারে ত্যক্ত বিরক্ত হইবার দায় ঝুঁকি লোকে কেন লইবে? সংবাদ জোগান কাজটাও আমাদের দেশে এখনও রোজ্‌গারের একটা উপায় হয় নাই। এইসব কারণে সম্পাদকদের সংবাদদাতা ও সংবাদ পাওয়া কঠিন হইবে।

সংবাদ ও প্রবন্ধাদি ছাপিবার আগে তাহা সর্‌কারী কর্ম্মচারী দ্বারা পরীক্ষিত হইবার ব্যবস্থাকে সেন্সরশিপ এবং পরীক্ষককে সেন্সর বলে। এই প্রথা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিরোধী। গবর্ন্মেণ্টের এই প্রথা অবলম্বন আমরা অত্যন্ত দূষণীয় মনে করি। এক দিকে সর্‌কার দেবমন্দির ও মূর্ত্তি-ধ্বংস ব্যাপারটাকে কতকটা তুচ্ছ মনে করিতেছেন, অন্য

দিকে আবার তাহার সংবাদ প্রচারে নানা বাধা উপস্থিত করিতেছেন। হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা নিশ্চয়ই সরকারী মতে ইহা অপেক্ষা কম গুরুতর ব্যাপার নহে। অথচ তদ্বিষয়ক সংবাদ সম্বন্ধে, কিম্বা নারীহরণাদির সংবাদ সম্বন্ধে, গবর্ন্মেণ্ট, সংবাদ পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন নাই। ইহার মানে কি? মন্দির ও মূর্ত্তিভঙ্গাদির অনেক সত্য সংবাদও যে এই নিয়ম বশতঃ চাপা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাতে দুর্বৃত্তেরা আস্কারা পাইবে। ইহা কি বাঞ্ছনীয়?

যে-সব মূর্ত্তি ভগ্ন বা অপবিত্রীকৃত হইতেছে, তাহার কতকগুলি যদি পূজান্তে বিসর্জ্জিত বা বিসর্জ্জনের জন্য রক্ষিতও হয়, তাহা হইলেও সেগুলির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে ভদ্রতার অভাব এবং পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ সূচিত হয়।

—

কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে স্বরাজ্য-চুক্তি

কৃষ্ণনগরে সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের যে-অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বনির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পদত্যাগের পর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া কন্‌ফারেন্সের কাজ চালান কংগ্রেসের নিয়মসঙ্গত হইয়াছে কি না, তাহার বিচার না করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, উপস্থিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশ বঙ্গীয় স্বরাজ্যদলের প্যাক্ট বা চুক্তির বিরোধী ছিলেন। উহা নাকচ করা ঠিকই হইয়াছে। এই প্যাক্টের অযৌক্তিকতা আমরা ১৩৩০ সালের মাঘ সংখ্যায় বিবিধপ্রসঙ্গে তের পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছিলাম।

ভারতের এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থ স্বতন্ত্র, ইহা আমরা মানি না। সমগ্র জাতীয় মঙ্গল যাহা, তাহাতেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মঙ্গল। এই মঙ্গলসাধন সমবেত ভাবে করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন, সম্প্রদায় অনুসারে চাকরী ভাগ, ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থায় জাতীয় মঙ্গল সাধিত হইবে না। কিন্তু যদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থ আলাদা বলিয়া মানিয়াও লওয়া যায়, এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিধির সংখ্যা, চাকরী প্রভৃতির একটা ভাগাভাগির প্যাক্ট বা চুক্তি করিতেই হয়, তাহা হইলে তাহা সমগ্র ভারতের জন্য একসঙ্গে হওয়া উচিত। নতুবা বাংলার প্যাক্ট অনুসারে এখানে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাহারা সব বিষয়ে বেশী ভাগ পাইবে, আবার লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট অনুসারে সংখ্যার ন্যূনতা সত্ত্বেও আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে তাহারা সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশী ভাগ পাইবে। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে।

—

লর্ড লিটনের বিলাত যাত্রা

লর্ড লিটনের শাসনকাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। তবু তিনি কয়েক মাসের ছুটি লইয়া বিলাত গিয়াছেন। বিলাত যাত্রার কারণ নাকি এই যে, তিনি বঙ্গের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতসচিবের সহিত পরামর্শ করিবেন। লর্ড লিটনের বিচক্ষণতা ও রাজনীতিজ্ঞতার যে-পরিচয় বাঙালীরা পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সহিত ভারত-সচিবের মন্ত্রণা হইতে কোন সুফলের আশা করা যায় না। লিটন সাহেবকে ফিরিয়া পাইতে বাঙালীর কোন আগ্রহ নাই, অনিচ্ছাই আছে।

—

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের বিলাত যাত্রা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ভারতসচিবের কৌন্সিলের সভ্য হইয়া বিলাত গিয়াছেন। বঙ্গের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থা তিনি জ্ঞাত আছেন এবং সার্ব্বজনিক কার্য্য পরিচালনের অভিজ্ঞতাও তাঁহার আছে। তিনি দেশের হিত করিবার সুযোগ অনেক পাইবেন, কিন্তু যে-যন্ত্রের একটা অংশ তিনি হইতেছেন, ইচ্ছা থাকিলেও সেই কলকে ভারতহিতসাধক করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। আপাততঃ ভারত-সচিব লিটন বার্কেন্‌হেড্‌কে যে পরামর্শ দিবেন, তাহার অহিতকর অংশের কুফলনিবারক কোন ঔষধ তিনি প্রয়োগ করিতে পারিবেন কি না, তাহাই অনুমেয়। পরে ইহা অপেক্ষাও একটা বড় কাজে তাঁহাকে ব্যাপৃত হইতে হইবে। তিনি ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ভারতকৌন্সিলের সভ্য থাকিবেন। তাহার মধ্যে, ১৯২৯ সালে বা তৎপূর্ব্বে, ভারত শাসন-সংস্কার আইন প্রবর্ত্তনের ফলাফল বিবেচনা করিবার ব্যবস্থা হইবে, এবং ভারতীয়দিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার আরও দেওয়া হইবে কি না, তাহার বিচারও তৎপরে হইবে। এই উপলক্ষ্যে তিনি দেশহিতসাধন করিবার সুযোগ পাইবেন। ইতিমধ্যে অবশ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও রেষারেষি আরও ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। সেরূপ কিছু স্বাধীন দেশে ঘটিলে তথাকার অধিবাসীদের আত্মশাসন-ক্ষমতার অভাব বা অল্পতা প্রমাণিত হয় না, আমাদের দেশে ঘটিলেই বা ঘটাইলেই তদ্দ্বারা আমাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণিত হয়। এবম্বিধ তথাকথিত প্রমাণ খণ্ডন করিবার

ক্ষমতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের আছে ; ইচ্ছাও আছে বলিয়া অনুমান না করিবার কারণ নাই। এখন ফলেন পরিচীয়তে। তাঁহার পরিশ্রমের সাফল্য কামনা করি।

—

সপ্রু-নেহরু দাঙ্গাদমন-ইঙ্গিত।

কিরূপে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণ করা যায়, পণ্ডিত তেজবাহাদুর সপ্রু তাহার একটা সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার বৈবাহিক পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু তাঁহার উপর টেক্কা দিয়া তার চেয়েও সরেস সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছেন। সপ্রু সাহেবের সঙ্কেত এই, যে, যেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবে, তথাকার লোক-দিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার ও নির্ব্বাচন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। নেহরু মহাশয় বলেন, তাহারা যেন কোন সরকারী সম্মান ও চাকরী না পায়। উভয় প্রস্তাবই অসঙ্গত মনে হইতেছে। যাহারা দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, তাহারা সাধারণতঃ সেই সেই শ্রেণীর লোক নহে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও নির্ব্বাচকেরা যে-যে শ্রেণীর অন্তর্গত,—যদিও শেষোক্ত রকমের ২।৪ জন লোক পরোক্ষভাবে দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত থাকিতে পারে। সুতরাং একের দোষে অন্যের, কিম্বা কয়েক জনের দোষে অন্য অনেকের শাস্তি হওয়া উচিত নহে। দাঙ্গাহাঙ্গামাকারীরা সভ্য হইবার বা নির্ব্বাচন করিবার অধিকারকে মূল্যবান্ মনে করে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। সরকারী উপাধি ও চাকরী এই শ্রেণীর লোকরা সচরাচর পায় না; সুতরাং ঐ ঐ বিষয়ে তাহাদের অধিকার লোপ করিলে তাহা একটি ক্ষতি বলিয়া তাহারা মনে করিবে না। অতএব, বৈবাহিকদ্বয়ের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলেও তদ্দ্বারা দাঙ্গা নিবারিত হইবে না।

যাহারা কৌন্সিলের সভ্য ও সভ্যনির্ব্বাচক হয়, তাহারা সাধারণতঃ দাঙ্গার বিরোধী এবং দাঙ্গা নিবারণ ও দমনের চেষ্টা তাহারা করিয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও তাহাদের অধিকার লোপ করা অবিচারের চূড়ান্ত হইবে। কলিকাতায় সম্প্রতি যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে, এবং বঙ্গের সর্ব্বত্র যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি চলিতেছে, তাহার পরি-চালকেরা বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোক, অনেকে এই অনুমান করেন। কিন্তু কোন এক সম্প্রদায়ের এই লোকগুলার দোষে অন্য সব লোকের শাস্তি হওয়া কি উচিত?

আর-একটা অনিষ্টের আশঙ্কা বোধ হয় পণ্ডিতদ্বয় করেন নাই। যদি নেহরু মহাশয়ের বিরোধীরা তাঁহার কৌন্সিল প্রবেশের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এলাহাবাদে একটা দাঙ্গা মারামারি ঘটান কতক্ষণের কাজ? প্রস্তাবগুলিকে বিপজ্জনক মনে করিবার ইহাও একটি কারণ।

—

ডাক্তার কিচ্‌লুর মত ও উদ্যম

ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচলু মুসলমানদের তাঞ্জিম প্রচেষ্টা দেশব্যাপী ও সুদৃঢ় করিবার জন্য বঙ্গে সফর করিতেছেন। তিনি বলেন, তাঞ্জিমের কোন রাজনৈতিক মন্দ উদ্দেশ্য নাই। শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমান সমাজের উন্নতি করাই উহার উদ্দেশ্য। এরূপ উদ্দেশ্যের সহিত কাহারও ঝগড়া থাকিতে পারে না। শিক্ষা ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমানদের উন্নতি হইলে অন্যান্য সম্প্রদায়েরও পরোক্ষভাবে তাহার দ্বারা মঙ্গল ও সুবিধা হইবে। অবশ্য এরূপ উন্নতি হইলে তাহার পরোক্ষ প্রভাব দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অনুভূত হইবে। আমরা সেরূপ প্রভাবের বিরোধী নহি। শিক্ষা ও চারি-ত্রিক গুণ দ্বারা মুসলমানেরা যত প্রভাবশালী হইতে পারেন, হউন। কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্য বশতঃ সকল প্রকার ক্ষমতা, অধিকার ও সুবিধার সিংহের ভাগটা আলাদা করিয়া কোন সম্প্রদায় চাহিলে বা পাইলে আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারি না।

ডাঃ কিচলু হিন্দু মহাসভার কার্য্যের, শুদ্ধি ও সংগঠনের বিরোধী নহেন। মহাসভার কার্য্যে এবং শুদ্ধি ও সংগঠনে যাহা হিতকর, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রশংসা করেন। বাংলা দেশে মহাসভার কাজ এবং শুদ্ধি ও সংগঠন বিশেষ কিছু হয় নাই, পঞ্জাবে হইয়াছে। এই-জন্য এবিষয়ে পঞ্জাবী ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচলুর মতই গ্রহণীয়, বাঙালী স্যার আব্‌দার রহিমের শুদ্ধি ও সংগঠনের অবিমিশ্র নিন্দাবাদের কোন মূল্য নাই।

—

ভারতে দেশী হিন্দু রাজ্য ও মুসলমান রাজ্য

আমরা সকল সম্প্রদায়েরই অধিকার যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু ইহা মনে করি না, যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং আচার পূর্ণ মাত্রায় অক্ষুণ্ণ থাকিলেই সেই সেই সম্প্রদায় উন্নতির চরম সীমায় উঠিবে। এই মতের সমর্থক দু একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। [তাহার পূর্ব্বে, কোন-প্রকার অপক্ষ-পাতিত্বের ভাণ না করিয়া, দুএকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক; কিন্তু হিন্দুর দেব-মন্দির ও মুসলমানের মস্‌জিদ কোনটির সম্বন্ধেই আমার

মনে বিরুদ্ধ ভাব নাই। দেবমন্দির দেখিলে এবং শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শুনিলে স্বভাবতই আমার মনে শ্রদ্ধার ভাব উদিত হয়। তদ্রূপ, প্রত্যূষে এলাহাবাদে, কার্সিয়ঙে ও অন্যত্র যখনই মুসলমানদের আজান শুনিয়াছি, তখনই তাহা ভাল লাগিয়াছে এবং তাহাতে মনের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাবের উদ্রেক হইয়াছে। আমার সমালোচনায় দোষ-ত্রুটি থাকে, কিন্তু তাহা হিন্দু ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম কোনটিরই প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ প্রসূত নহে, ইহাই আমার বক্তব্য।]

কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ প্রজা মুসলমান। অথচ সেখানে গোবধ নিষিদ্ধ। কিন্তু সবাই জানে, ভারতবর্ষের সাত শত দেশী রাজ্যের মধ্যে যতগুলি রাজ্য খুব অনুন্নত, কাশ্মীর তাহার অন্তর্গত। ভূপাল মুসলমান রাজ্য। সেখানে মুসলমানী সব নিয়ম পালিত হয়। কিন্তু ভূপাল সাহিত্য, বিজ্ঞান, মুসলমানী ধর্ম্মতত্ত্ব, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতিতে কি উন্নতি করিয়াছে, নূতন কি করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর সন্তোষজনক হইবে না। নিজামের হায়দরাবাদ খুব বড় দেশী মুসলমান রাজ্য। তাহার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দু অধিবাসীদের অষ্টমাংশেরও কম! অথচ সরকারী চাকরীর খুব বেশী অংশ, শতকরা নব্বইটিরও বেশী, মুসলমানদের হাতে। এইত গেল ন্যায় বিচার। নিজামের রাজ্যে খুব জাঁকাল একটি উর্দ্দু বিশ্ববিদ্যালয় আছে—যদিও শতকরা প্রায় নব্বই জন প্রজার ভাষা উর্দ্দু নহে; কিন্তু বড় বড় দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হায়দরাবাদে সর্ব্বাপেক্ষা কম, এবং প্রজাদের কোন অধিকার নাই।

হিন্দু মুসলমানরা অপর কাহারও অধিকার খর্ব্ব না করিয়া নিজেদের আচার অনুষ্ঠান যতটা বজায় রাখিতে পারেন, তাহার চেষ্টা অবশ্যই করিবেন। কিন্তু এইসব বাহ্য জিনিষকে জীবনের সার বস্তু মনে করা মহাভ্রম। ইহা লইয়া ঝগড়া করায় প্রধানতঃ বিদেশী প্রভুদের ও ধনশোষকদেরই সুবিধা হইতেছে।

—

নূতন গুণ্ডা আইন

কলিকাতায় কিছু দিন আগে যেরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহা দমন করিবার মত ক্ষমতা গবর্মেণ্টের হাতে ছিল না, এই ওজুহাতে সরকার নূতন গুণ্ডা আইন করিয়াছেন। অনেক আইনজ্ঞ লোক লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন, যে, নূতন আইনটা হইবার আগেও ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিসের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। যাহা হউক, ঐ ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল না ধরিয়া লইলেও, ক্ষমতা যতটুকু ছিল তাহার যথোচিত ব্যবহার যে শাসকেরা ও পুলিস করে নাই, সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর মুর্শিদাবাদের নবাব, স্যার আবদার রহিম, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, স্যার প্রভাস মিত্র প্রভৃতি লোক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে সমবেত হইয়া এক-বাক্যে বলিয়াছিলেন, যে, গবর্মেণ্ট্ নিজের কর্ত্তব্য করেন নাই। ইঁহারা "পেশাদার আন্দোলনকারী" নহেন। গবর্মেণ্ট্ আত্মদোষক্ষলনার্থ নূতন আইন আবশ্যক বলিয়া-ছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু আত্মদোষক্ষালন নূতন আইন ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব নহে।

ইহা নিশ্চিত, যে, মানুষ নিজের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যত বেশী লইতে পারে, ততই তাহার উদ্দিষ্ট কাজ করিবার সুবিধা বাড়ে। কিন্তু ইহাও ঠিক্, যে, এরূপ ক্ষমতা যত বাড়ে, ভ্রমের ও জুলুমের সম্ভাবনাও তত বাড়ে।

লাট লিটন নূতন আইনটার খস্ড়া পেশ হইবার পূর্ব্বে কৌন্সিলে গিয়া বক্তৃতা করিয়া "নখর-রাজ" (rule of claw) ও "আইন-রাজ" (rule of law) সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নাগরিকদিগকে আইন অনুসারে অস্ত্রসংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে দিলে, সভ্য-সমাজ সোজাসুজি জঙ্গলের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, যেখানে নখরের রাজত্ব বিদ্যমান। কিন্তু স্বাধীন দেশ মাত্রেই নাগরিকদের অস্ত্র রাখিয়া আত্মরক্ষার্থ তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার আছে; কিন্তু সেইসব দেশ জঙ্গলের অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে, কলিকাতায় আইনসঙ্গত উপায়ে অস্ত্রসংগ্রহ সহজ না হইলেও ইহার অবস্থা একমাস ধরিয়া হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ মানুষ আত্মরক্ষায় সমর্থ থাকিলেই হিংস্র জন্তুর মত হইয়া উঠিবে, এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলেই আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, মনে করা মহাভ্রম। অবশ্য নখরের রাজত্বের উচ্ছেদ করিয়া আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা বাংলা গবর্মেণ্টের প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য কি না, পরচিত্ত সম্বন্ধে অজ্ঞ আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, যে, গবর্মেণ্ট্ চান, যে, নখরটা পুলিসের ও তদ্বিধ অন্য সরকারী লোকদেরই একচেটিয়া থাকে, এবং যে-কেহ নখর চায় ও রক্ষিত হইতে চায়, তাহাকে পুলিসের ও শাসকদের একান্ত কৃপা-প্রার্থী হইতে হয়। এরূপ ব্যবস্থায় দেশের লোকদের মনুষ্যত্ব সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা অতি কম। যে-কোন উপায়ে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা ও রাখা গবর্মেণ্টের একমাত্র বা প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে না;—তাহা মানুষদের হাত পা কাটিয়া ও দাঁত তুলিয়া দিলে সকলের চেয়ে শীঘ্র ও ভাল করিয়া হইতে পারে। কি

উপায়ে মানুষের মনুষ্যত্ব বজায় থাকে এবং শান্তিও রক্ষিত হয়, তাহা আবিষ্কার ও অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

যাহারা ধনী লোক ও ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাহারা সশস্ত্র হইলেও, স্বয়ং আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার অবসর তাহাদের কম। রক্ষী তাহাদের চাই। কিন্তু কলিকাতায় তাহারা সকলে নিজেদের জন্যও অস্ত্র পাইতেছে না, এবং অনেক রক্ষীও নূতন গুণ্ডা আইন দ্বারা তাড়িত হইতেছে। অথচ দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় দেখা গিয়াছে, যে, পুলিস তাহাদের সম্পত্তি ও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতেও যে বেশী পারিবে, এমন মনে হয় না। বস্তুতঃ পুলিসের সংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জা এরূপ করা অসম্ভব যাহাতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ সকল লোক রক্ষিত হইতে পারে। হইতে পারে, যে, অনেক রক্ষী দাঙ্গার সময় কর্ত্তব্য করিতে গিয়া লড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের অন্য শাস্তি, অপরাধ প্রমাণ হইলে, দেওয়া যাইতে পারে; বহিষ্কার অনুচিত।

লাটসাহেবের বক্তৃতা হইতে বুঝা যায়, যে, নূতন গুণ্ডা আইন প্রধানতঃ উত্তর ভারতের অবাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার জন্যই প্রণীত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে যখন অপরাধী ভারতীয় ও অন্য বিদেশীদের বহিষ্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখন বঙ্গ ও ভারতের অন্য সব প্রদেশে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়াছিল; এ কথাও বলা হইয়াছিল, যে, সাম্রাজ্যের এক অংশের অন্য অংশের লোকদের বিরুদ্ধে আইন করা উচিত নয়। কিন্তু নূতন গুণ্ডা আইনের বেলায় বাংলাদেশে ব্যবস্থাপক সভার কোন সভ্য এবং কোন খবরের কাগজের সম্পাদক আইনটার বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি তুলেন নাই। ব্রহ্মদেশের আইন তবু প্রকাশ্য আদালতে বিচারের পর দণ্ডিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। বাংলাদেশের আইনটা কোন আদালতে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বিচারের পর প্রযুক্ত হইবে না; বহিষ্কৃত ব্যক্তি কোন আদালতে আপীল করিতেও পারিবে না। আমরা এরূপ বেআইনী আইনের বিরোধী আগেও ছিলাম, এখনও আছি। বে-আইনী আইন দ্বারা আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বেশ উপভোগ্য বটে।

আত্মরক্ষার জন্য পশ্চিমা ও বাঙালী হিন্দুরা একযোগে কাজ করিয়াছে। নূতন গুণ্ডা আইন প্রধানতঃ পশ্চিমাদের জন্য অভিপ্রেত হওয়ায় রাজনৈতিক ভেদনীতি কতকটা সফল হইতে পারে কি না, তাহা বাঙালী ও পশ্চিমা হিন্দুরা ভাবিয়া দেখিবেন, এবং যাহাতে এরূপ সফলতা না জন্মে, তাহার উপায়বিধান করিবেন।

—

ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না

হিন্দু মহাসভা "হিন্দু"র যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে ব্রাহ্মরাও হিন্দু। এরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইবার পূর্ব্বেও আমরা হিন্দুবংশজাত ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুই মনে করিতাম, এবং একবার প্রবাসীর পুস্তকপরিচয়-বিভাগে তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। আইনের চক্ষে এরূপ ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না, তাহার মীমাংসা পঞ্জাবের পরলোকগত সর্দ্দার দয়ালসিং মাজিঠিয়ার সম্পত্তি ঘটিত মোকদ্দমায় প্রিভি কৌন্সিল করিয়াছিলেন। ঐ সর্ব্বোচ্চ আদালতের মতে ব্রাহ্মদের হিন্দুত্বই সিদ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পরলোকগত সম্পাদক ও সভাপতি রজনীনাথ রায় মহাশয়ের সম্পত্তির অধিকারী হইবার জন্য তাঁহার পৌত্রদের পক্ষ হইতে তাঁহার পুত্রবধূ যে মোকদ্দমা করেন, তাহাতে, গত ৫ই জুনের বেঙ্গলীতে প্রকাশিত, আদালতের রায়ে ইহাই বলা হইয়াছে, যে, রজনীনাথ রায় মহাশয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। সম্পত্তি তাঁহার পৌত্রেরাই পাইবেন। পৌত্রদের দাবীর বিরোধী ছিলেন, রায়মহাশয়ের অন্যতমা কন্যা শ্রীমতী মায়াদেবী ও তাঁহার কোন কোন ভগিনী। এই শ্রীমতী মায়াদেবীই কি খবরের কাগজে ব্রাহ্মদের অহিন্দুত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন?

—

মহাবীর আব্‌দুল করিমের আত্মসমর্পণ

ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত চেষ্টায় মরক্কোর রিফ্‌দের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আপাততঃ ব্যর্থ হইল—তাহাদের নেতা মহাবীর আব্‌দুল করিমকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর যে-কোন দেশের যে-কোন মানুষ স্বাধীনতার মূল্য বুঝেন এবং সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতার দাবী করেন, তিনিই এই মহাবীরকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিবেন, এবং স্পেন ও ফ্রান্সের কার্য্যকে নিন্দনীয় মনে করিবেন।

—

স্বামীপরিত্যক্তা ও বিধবাদের অবস্থা

বাঙালী মেয়েদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসুর সহিত "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদক অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রশ্ন—এখন আপনাকে আর-একটি বিষয়ে প্রশ্ন করিতে চাই; সেটি হচ্ছে বাঙালী মেয়েদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে।

উত্তর—তাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় হীন।

প্রঃ—কি রকম ?

উঃ—আমি বিধবাদের কথা বিশেষ ভাবে বল্‌ছি। সধবাও অনেক আছে, আমাদের দেশে সকলেরই বিয়ে হয়—অনেকে আছে, স্বামী পাগল, অনেকের স্বামী রোজগার করে না, ছেলেপুলে আছে। আমার কাছে যারা সাহায্য চাইতে এসেছিল তাদের কাছ থেকে যা জানি তা বল্‌ছি। একজন সাহায্যের জন্য এসেছিল তার স্বামী পাগল, ২টি সন্তান এখন আছে ভাইয়ের কাছে; ছেলেপিলে নিয়ে কতদিন তাদের কাছে থাক্‌তে পারে? সুবিধা হয় না। বল্লে—তার জন্য যেন একটা-কিছু বন্দোবস্ত করে' দিই। তখনো আমাদের বিধবা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আমি বলেছিলুম নার্সিং (রোগীসেবা) শিখতে। সেখানে রাত্রিতে থাক্‌তে হয়, স্বামীকে দেখবে কে? সারাদিন থাক্‌লে চলে এমন কোন কিছু কর্‌তে পারে কি না? তাতে ভেবেছিলুম—ডাক্তার রেখে সে-রকম একটা ক্লাস খোলা যায় কি না। তার যোগাড় করেছিলুম, কিন্তু গাড়ীর বন্দোবস্ত কর্‌তে পারিনি বলে' ছাড়তে হল। বাঙ্গালী মেয়ে হেঁটে কেহ যায় না। লাহোরে সুবিধা দেখলুম। সেখানে পর্দ্দা থাক্‌লেও মেয়েরা হেঁটে যায়। মুসলমানের ভিতর পর্দ্দা আছে, আমাদের মত নয়, ঘরের ভিতর পর্দ্দা, বাইরে নয়। লাহোরে কর্পোরেশনের একটি মস্ত স্কুল আছে। দেখ্‌লুম ১০০টি মেয়ে বসে' নানারকম শিল্প শিখছে। চুমকির কাজ, দরজির সেলাই, মোজা বোনা —সব শিখছে। কর্পোরেশন থেকে লোক রেখে শিখাচ্ছে। কিছু মাইনা দিতে হয় না। কলিকাতায় মেয়েদের জন্য কোন কাজ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেই গাড়ী। সেজন্য এটি হল না। গাড়ীর টাকা কোথায় পাই? অসুবিধা। নইলে সব বন্দোবস্ত করেছিলুম।

প্রঃ—আপনি বল্লেন—স্বামী পাগল।

উঃ—হাঁ, পাগল। স্বামী-পরিত্যক্তাও এত আছে, নিজে না দেখ্‌লে কেউ ভাবতে পারে না। বিয়ে করে' স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে। এই-রকম অবস্থার মেয়ে কত আসছে।

প্রঃ—স্বামী বেঁচে আছে ?

উঃ—মরে' গেছে এমন ত আর পাইনি। প্রায়ই বিয়ে করে' নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেহবা আবার ২।৩টি বিয়ে করে' আগের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে। বিধবা ছাড়া এই শ্রেণীর সধবাদের জন্যও আমাদের বন্দোবস্ত ছিল।

প্রঃ—বিধবাদের আর্থিক দুরবস্থা আপনার নজরে পড়েছে কি ?

উঃ—এই আর্থিক দুর্গতির জন্যও অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। পল্লীগ্রামে এর সংখ্যা কত বেশী আমরা ভাবি না। আমি নিজেও ভাবতুম না, কাজের সংস্পর্শে না আস্‌লে এ জ্ঞান হত না। দেখেছি বিধবার শ্বশুর-বাড়ীর কেহ সাহায্য করে না, পড়ে' রয়েছে, বাপের বাড়ীরও কেহ খোঁজ করে না। প্রতিবেশী আছে মুসলমান, সে এসে দেখ্‌ল শুন্‌ল, অবস্থা খারাপ হলে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। ছোট ছেলেপিলে আছে, মেয়ে-মানুষ একলা রয়েছে, ছেলে মানুষ করতে হবে সে ভাবনা রয়েছে, যে যত্ন দেখায় তার কাছেই যায়। এই ভাবে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। আমাদের বিধবা-আশ্রমে এই যে ২০।২২টি বিধবা রয়েছে, সকলের অবস্থাই এইরকম খারাপ। আমাদের সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ কর্‌তে হয়। জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন—এখন কেন এমন হয়, আগে কেন হত না। আগে যে খরচে চল্‌ত এখন তার চাইতে খরচ অনেক বেড়ে গেছে। আগে লোকে পাঁচ জনকে সাহায্য কর্‌তে পারত, এখন পারে না।

প্রঃ—যৌথ পরিবার বলে' যা কিছু আছে, তাতে সাহায্য হয় কতটা ?

উঃ—ইচ্ছা থাক্‌লেও তা সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ বিধবাদের যদি ছেলেপুলে থাকে। আজকাল খরচ ডবলের বেশী হয়েছে। ধরুন যার ৪টি ছেলেপুলে আছে, তাদের স্কুলের খরচ, কলেজের খরচ, খাবার খরচ কত বেড়েছে। সে কি করে' বোনের ছেলেমেয়েকে সাহায্য কর্‌বে? আগে তা ছিল না। এখন বিধবাদের অবস্থা শোচনীয়। যাদের ছেলেপুলে আছে, এমন অনেক বিধবা আসে, যেন অর্থার্জ্জন করে' তাদের মানুষ কর্‌তে পারে।

প্রঃ—তাহলে আপনি বল্‌তে চান যে,—বিধবাদের ছেলে মেয়ে মানুষ কর্‌বার জন্যই দেশের ভিতর একটা আন্দোলন হওয়া দর্‌কার। কেবল মাত্র বিধবার নয়, তাদের ছেলেমেয়েরও সাহায্য দর্‌কার ?

উঃ—হাঁ, বালবিধবা ত অনেক আছে, তা ছাড়া, যাদের ছেলেপিলে আছে তাদের ত কথাই নাই। আমাদের দেশে বাড়ী ছেড়ে আস্‌বার সাহস মেয়েদের কখনই ছিল না, কিন্তু এখন না ছেড়ে উপায় নাই। অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আসে। পশ্চিম বঙ্গের সমাজ ভয়ানক গোঁড়া। এরা কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে আস্‌তে চায় না, না খেয়ে মর্‌বে তবু আস্‌বে না। তারা শুনে সবাই আশ্চর্য্য হয়—এত মেয়ে বাড়ী ছেড়ে এখানে এসেছে।

প্রঃ—এরা কোথা থেকে এসেছে ?

উঃ—বিধবা-আশ্রমে যারা আছে তাদের অধিকাংশই কলকাতার বাইরের অন্যান্য জেলা থেকে এসেছে। কলকাতার যে ২।৪টি আছে তারা সধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা।

প্রঃ—অধিকাংশ মধ্যবিত্ত, গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্ম নাই ?

উঃ—ব্রাহ্মদের এখানে নিই না। তাদের দর্‌কার হয় না। তারা আগেই অর্থকরী একটা কিছু শেখে, এটা খালি সনাতনীদের জন্য।

প্রঃ—আপনি বলেছেন, ব্রাহ্মদের মেয়েরা এমন কিছু শেখে যাতে তারা কিছু রোজগার কর্‌তে পারে। কি উপায়ে রোজগার করে ?

উঃ—বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের শিখায়, শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে, ছেলে-মেয়েদের অভিভাবিকার কাজ করে। আজকাল দোকান পর্য্যন্ত কর্‌তে আরম্ভ করেছে।

প্রঃ—কিসের দোকান ?

উঃ—সব জিনিষের—যাকে মনিহারী দোকান বলে। যে মেয়েটির কথা বলছি সেটি খুব করিৎকর্ম্মা। এই মেয়েটি স্বামী-পরিত্যক্তা। ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে, বিয়ে করেছিল একজন পাঞ্জাবীকে—আর্য্য সমাজের আইন অনুসারে।

প্রঃ—আচ্ছা, যদি সমাজের আরও নিম্ন স্তরে যাই, তাদের আর্থিক অবস্থা কি রকম মনে করেন ?

উঃ—তাদের অবস্থাও খারাপ।

প্রত্যেক সমাজের অসহায় বিধবা ও অন্যান্য অসহায় লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করা সেই সমাজের কর্ত্তব্য। এইজন্য, কোনো কারণে অসহায় হিন্দুবিধবাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগের সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে, নানা কারণে প্রতিকূল অবস্থা বশতঃ অনেক হিন্দু-বিধবা সমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন এদিকে হিন্দুসমাজের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

যাহারা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া খৃষ্টিয়ান্ বা মুসলমান হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আবার হিন্দু করিবার চেষ্টা আজকাল হইতেছে। অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ ধর্ম্মে

আনিবার চেষ্টা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। সুতরাং ইহাতে কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নহে। কিন্তু যেমন অহিন্দুকে হিন্দু করিবার চেষ্টা হইতেছে, তেম্‌নি যাহাতে কেহ আর্থিক বা সামাজিক কারণে হিন্দুসমাজ ত্যাগ না করে, তাহার চেষ্টা করাও উচিত।

লেডী বসু যেরূপ কারণে হিন্দুবিধবাদের মুসলমান হইয়া যাইবার কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের জানা ছিল না। সম্ভবতঃ অন্য অনেকেরও জানা নাই। কিন্তু জানিবার পর হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসভা নিজের কর্ত্তব্য করিবেন, আশা করা যাইতে পারে।

নিজ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মুসলমানদের বিশেষ দৃষ্টি আছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি মুসলমানপ্রধান। মধ্যবঙ্গেও মুসলমানের সংখ্যা বড় কম নয়। এইসকল অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ঝটিকাদি কারণে লোকের অন্নকষ্ট হইলে সাহায্যদান দ্বারা ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিপন্ন লোকদের প্রাণরক্ষা করেন প্রধানতঃ হিন্দুরা; এবিষয়ে মুসলমানরা মুসলমানদের প্রতি কর্ত্তব্য সামান্যই করেন। কিন্তু যদি কোন অভাবগ্রস্ত হিন্দুবিধবাকে সাহায্য করিয়া মুসলমান করিবার সম্ভাবনা থাকে, তখন মুসলমানরা মুক্তহস্ত হন। হিন্দুদের অহঙ্কার আছে, যে, মুসলমানদের চেয়ে তাহাদের বুদ্ধি বেশী। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে মুসলমানদিগকেই বেশী বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে হয়। বিধবাদের প্রতি এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে তাহাদের খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান হইবার কোন কারণ থাকে না, সেরূপ ব্যবহার করিলে হিন্দুদের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত হইবে; নতুবা নহে।

—

পল্লীগ্রামে জলকষ্ট ও স্বাবলম্বন

বহুসংখ্যক পল্লীগ্রামের লোকদের জলকষ্টের কথা প্রতি বৎসরই খবরের কাগজে লিখিত হয়, কিন্তু তাহার যথেষ্ট প্রতিকার হয় না। এবিষয়ে গবর্মেণ্টের, ডিষ্ট্রিক্ট ও লোক্যাল বোর্ড সকলের এবং গ্রাম্য ইউনিয়নগুলির কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরাও স্বাবলম্বন দ্বারা নিজেদের জলকষ্ট কতকটা দূর করিতে পারেন। যত কষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগকে সহ্য করিতে হয় বলিয়াই গ্রামের লোকদের এবিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কারণেই ইহার বিপরীত ভাবই অনেক জায়গায় লক্ষিত হয়। পুরাতন পুকুরের বহুসংখ্যক অংশীদারদের মধ্যে মতভেদ, গ্রাম্য দলাদলি, এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে ঈর্ষ্যাও অনেক সময় জলকষ্ট দূর না-হওয়ার কারণ। আইন অনুসারে বহু মালিকের পুকুর খনন করাইবার বন্দোবস্ত গ্রামবাসীরা সচেষ্ট হইলেই করাইতে পারেন। এরূপ বন্দোবস্তে মালিকদের স্বত্বলোপও হয় না।

আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত জানি, যে, বাহিরের কোন সদাশয় লোকের টাকায় গ্রামে কূপ খনিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর টাকা ফুরাইয়া যাওয়ায় গ্রামের লোকেরা চাঁদা করিয়া বাকী সামান্য কাজটুকু সম্পন্ন করান নাই। অথচ কূপ পাকা ও স্থায়ী হইলে তাঁহারাই সকলে উপকৃত হইবেন। ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

—

"অদ্ভুত চুরি।"

গত ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে "জৈন বাগ্‌দেবী" শীর্ষক একটি সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হয়। উহা বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া প্রবন্ধের নামের নীচে লেখা ছিল। উহা প্রকাশিত হইবার পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ আমাদিগকে লেখেন, যে, উহা তাঁহার লেখা, এবং তিনি উহা ফোটোগ্রাফ্‌গুলি সমেত "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহা আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বৈশাখের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে উহার সম্পাদক সমুদয় রহস্য ভেদ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যে, বিমলকান্তি-বাবু ঐ মাসিকের আফিসে বন্ধুভাবে যাতায়াত করিতেন, ও তিনি এই প্রবন্ধটি আত্মসাৎ করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন, এবং ইহাই তাঁহার এইরূপ একমাত্র কীর্ত্তি নহে। এরূপ ব্যবহার সাতিশয় নিন্দনীয়।

প্রবাসীর গ্রাহক ও ক্রেতাগণকে চৈত্র মাসের প্রবাসীর ৭৫৬ পৃষ্ঠায় এবং মাসিক ও ষাণ্মাসিক সূচীতে বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়ের নাম কাটিয়া দিয়া তাহার জায়গায় অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এর নাম লিখিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি।

—

বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার

১৯২৪-২৫ সালে বঙ্গের সকল শ্রেণীর শিক্ষালয়-সকলে ১৭,৭০,৪৯২ জন ছাত্র ও ৩,৮০,৪৭০ জন ছাত্রী পড়িত। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার যে কত কম, ইহা হইতে তাহা বুঝা

যাইবে। মেয়েদের অধিকাংশই আবার পাঠশালার ছাত্রী। হিন্দুরা শিক্ষা-বিষয়ে এবং বিদ্যোৎসাহিতায় আপনাদিগকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন; কিন্তু সাধারণ শিক্ষালয়-সকলে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা ১,৩৮,২০৯ এবং মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ১,৮১,০৩৬ ছিল। বঙ্গে মুসলমানরাই সংখ্যায় প্রধান সম্প্রদায়। মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্যের ইহা একটা কারণ। অবশ্য মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য পাঠশালাতেই বেশী; উচ্চতর বিদ্যালয়ে ও কলেজে অমুসলমান ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাতেও হিন্দু বালিকাদের সংখ্যা এত কম হওয়া কুলক্ষণ। মুসলমানরা যে অন্ততঃ বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষাও দিতেছেন, ইহা সুলক্ষণ। বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সকলে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী ছাত্রীর সংখ্যা ২০৬, দেশী খ্রীষ্টিয়ান ৬৭৬, হিন্দু ৪৮১, মুসলমান ১২০, বৌদ্ধ ২৪, অন্যান্য ৫। ব্রাহ্মদিগকে বোধ হয় হিন্দুদের মধ্যে ধরা হইয়াছে; তাহাদের সংখ্যা আলাদা করিয়া লেখা হয় নাই।

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার খুব সামান্যই হইয়াছে। এইজন্য স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত খরচ অনেক বৎসর ধরিয়া খুব বেশী করা উচিত। কিন্তু ১৯২৪-২৫ সালে পুরুষদের শিক্ষার জন্য সরকারী বেসরকারী সব রকম খরচ হইয়াছিল ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯০২ টাকা, স্ত্রীলোকদের জন্য হইয়াছিল কেবল ৪০ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৩৭ টাকা।

ইউরোপীয়দের জন্য সকল প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ১০৬১৬ জন ছাত্রছাত্রী পড়িয়াছিল। তাহাদের জন্য মোট খরচ হইয়াছিল ৩৫,৩৬,৬১৬ টাকা। তাহার মধ্যে গবর্ন্মেণ্ট দিয়াছিলেন ৯,৭৫,৪২৭। দেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য গবর্ন্মেণ্ট মাথাপিছু এত বেশী টাকা দেন নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট শ্রেণীগুলিতে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা কত, তাহা শিক্ষা-রিপোর্টে লেখা নাই। মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা খুব কম বলিয়াই জানি। কলেজের ২১৯১৯ জন ছাত্রের মধ্যে ১৮৬৯৭ জন হিন্দু, ২৮৫৩ জন মুসলমান। ঢাকার ইণ্টারমীডিয়েট কলেজে ১৬৪ জন হিন্দু, ১৪৭ জন মুসলমান ও ২ জন ভারতীয় খৃষ্টিয়ান্ ছাত্র পড়ে।

সকল রকম বিদ্যালয়ে মুসলমান বালকদের সংখ্যা ৭৫৫৩৯৯, হিন্দু বালকদের ৮৭৬৪১০। বালিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান বালিকাদের সংখ্যা কেন বেশী, তাহার কারণ অনুসন্ধান হওয়া উচিত। মুসলমানেরা কি পুরুষশিক্ষা অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষার বেশী অনুরাগী? তাহা যদি হয়, ভাল; তাহা না হইলে, মুসলমানরা পুরুষশিক্ষায় হিন্দুদের পশ্চাদ্বর্ত্তী কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রবর্ত্তী কেন, তাহার প্রকৃত কারণ কি? মুসলমান বালিকাদের যে-সংখ্যা রিপোর্টে আছে, তাহা নির্ভুল ত? এবিষয়ে প্রকৃত তথ্যজ্ঞ কেহ কিছু লিখিলে উপকৃত হইব।

সমুদয় বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীসকলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বালকের সংখ্যা খুব কম, সিকিরও কম।

প্রাথমিক বিদ্যালয়-সকলে মুসলমানদের সংখ্যা ৬৮৭৩৯৯ হিন্দুদের ৫৯৭২৬৫।

আইন পড়ে ৩০৭৬ হিন্দু, ৫২৬ মুসলমান এবং ৩২ অন্য।

ডাক্তারী পড়ে ১৪৮৬ হিন্দু, ১৪০ মুসলমান, ৪১ দেশী খৃষ্টিয়ান, ১৫ অন্য। ইহাদের মধ্যে ১২ জন ছাত্রী।

শিবপুরে এঞ্জিনীয়ারিং পড়ে ২৬৮ জন হিন্দু, ২৯ জন মুসলমান; ২২ জন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী, এবং ২ জন দেশী খৃষ্টিয়ান। ঢাকার আহসানুল্লা এঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে পড়ে ৪৩৬ জন হিন্দু, ৩৯ জন মুসলমান, এবং ৩ জন অন্য।

কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে পড়ে ৩৪৩ জন হিন্দু, ১০ জন মুসলমান, এবং ৮ অন্য।

বাঙালীদের এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, যে, বাংলা দেশ এখনও শিক্ষায় ভারতবর্ষের অন্য অনেক অঞ্চলের নীচে রহিয়াছে। বঙ্গে প্রতি হাজারে লিখনপঠনক্ষম ১০৪ জন, ব্রহ্মদেশে ৩১৭ জন, কোচীনে ২১৪ জন, বড়োদায় ১৪৭ জন, ত্রিবাঙ্কুড়ে ২৭৯ জন। বাংলাদেশ ১৫০ বৎসরের উপর পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে; জাপান আসিয়াছে মোটামুটি ৬০ বৎসর। জাপানে হাজারকরা প্রায় সব নারী ও পুরুষ লিখনপঠনক্ষম, বঙ্গে তাহার একদশমাংশ মাত্র! ইহা হইতে আমাদের বিদ্যানুরাগের মাত্রা স্থির করিতে হইবে।

সমগ্র ভারতের নূতন শিক্ষা-রিপোর্ট বাহির হইয়াছে ১৯২৪ সালের। ঐ সালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মোট অধিবাসীর শতকরা কয়জন শিক্ষা পাইতেছিল, তাহার তালিকায় দেখিতে পাই, মান্দ্রাজে শতকরা ৪.৯, বোম্বাইয়ে শতকরা ৫.২১, এবং বঙ্গে শতকরা ৪.৪০ জন শিক্ষা পাইতেছিল।

—

বঙ্গের স্বাস্থ্য

বর্ত্তমান ১৯২৬ সালের ১৩ই মে আমরা বাংলা দেশের দুখানি সরকারী স্বাস্থ্য-রিপোর্ট প্রাপ্ত হই। একখানি

১৯২৩ সালের, তাহা ১৯২৫ সালে মুদ্রিত; অন্যটি ১৯২৪ সালের, তাহা ১৯২৬ সালে মুদ্রিত। ১৯২৩ সালের রিপোর্টটিও ১৯২৪ এর সঙ্গে এত বিলম্বে প্রেরণের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ১৯২৪ সালের রিপোর্ট হইতে নীচের তালিকাটি গৃহীত হইল।

১৯২৪ সালের হাজারকরা সংখ্যা।

প্রদেশ	জন্মের হার	মৃত্যুর হার	শিশুমৃত্যুর হার
মধ্য প্রদেশ	৪৪'২	৩২'৬	২৩৪'৯
পঞ্জাব	৪০'২	৪৩'৪	২১২'৬
বিহার-ওড়িষা	৩৫'৭	২৯'১	১৫৮'৬
বোম্বাই	৩৫'৬	২৭'৬	১৯১'২
মান্দ্রাজ	৩৪'৯	২৪'৫	১৭৯'২
আগ্রা অযোধ্যা	৩৪'৭	২৮'৩	১৯১'৯
আসাম	৩১'০	২৭'৩	১৮৪'৭
বাংলা	২৯'৫	২৫'৯	১৮৪'২
ব্রহ্মদেশ	২৭'৪	২১'৫	১৯৭'৯
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত	২৭'০	৩১'০	১৬১'৪

হাজারকরা স্বাভাবিক লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার নিম্নলিখিত রূপ:—মধ্যপ্রদেশ ১১'৬, মান্দ্রাজ ১০'৪, বোম্বাই ৮'০, বিহার-ওড়িষা ৬'৬, আগ্রা-অযোধ্যা ৬'৪, ব্রহ্মদেশ ৫'৯, আসাম ৩'৭, বাংলা ৩'৬। হ্রাস হইয়াছে পঞ্জাবে হাজারকরা ৩'৪ এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪'০।

—

বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভা

লাহোরের বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভার একাদশ বার্ষিক অর্থাৎ ১৯২৫ সালের রিপোর্টে দেখিলাম, ঐ সালে সভার চেষ্টায় মোট ২৬৬৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। এগার বৎসরের মোট সংখ্যা ৬৩৩৪। ইহা কতকটা উৎসাহজনক হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, যে, ভারতবর্ষে ২৫ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা হিন্দু বিধবার সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৪৪।

১৯২৫ সালে বিধবা-বিবাহ হইয়াছে পঞ্জাবে ২০৯৮, আগ্রা-অযোধ্যায় ৩৫৬, বিহার ও ওড়িষায় ৬, বঙ্গ ও আসামে ১০৩, রাজপুতানায় ১৭, বোম্বাইয়ে ১২, মধ্য-প্রদেশে ১১ এবং মান্দ্রাজে ২৩টি।

এই সভা হিন্দী, উর্দ্দু, গুরুমুখী, ইংরেজী, বাংলা, মরাঠী, তেলুগু ও সিন্ধীতে পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন ইহার হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরেজী মাসিক কাগজ তিনটি আছে।

বঙ্গে এইরূপ কর্ম্মিষ্ঠ একটি সভা ও তাহার বাংলা মাসিক কাগজ থাকা উচিত।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস্ কমিটির অধিবেশন

কৃষ্ণনগরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স বিধিসঙ্গত হউক বা না-হউক, তাহাতে বুঝা গিয়াছিল, যে, বঙ্গের অধিকাংশ প্রতিনিধি স্বরাজ্য-প্যাক্টের বিরোধী। কিন্তু কারণ ও কৌশল যাহাই হউক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার কলিকাতায় হয়, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, কমিটির সভ্যদের অধিকাংশ, প্যাক্ট সম্বন্ধে বিবেচনাটা যেন হয়ই নাই, এই-রূপ ভাব প্রকাশ করিয়া তাহা এখন ধামাচাপা রাখিতে ব্যগ্র। উদ্দেশ্যটা অবশ্য খুবই সহজবোধ্য। প্যাক্ট যে কৃষ্ণনগরে নাকচ হইয়া গিয়াছে, তাহা মানিয়া লইলে, কিম্বা কমিটিতে তাহা বিবেচিত হইয়া নাকচ হইলে, স্বরাজ্য দল হইতে অনেক মুসলমান সভ্যের সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচন না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাহা স্বরাজী কর্ত্তাদের মতে বাঞ্ছনীয় নহে।

কমিটির মীটিঙে প্রথমেই শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস প্রস্তাব করেন ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও খুলনার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন সমর্থন করেন, যে, কৃষ্ণ-নগরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সভাপতিত্বে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন কি না, এই প্রশ্নের আলোচনা করা কমিটি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। এই প্রস্তাব প্রথমে গৃহীত বলিয়া ঘোষিত হয়। তাহার পর উহার উপর আবার ভোট লওয়ায় উহা পরিত্যক্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। দুইবার ভোট এই প্রকারে লওয়া ঠিক হইয়াছিল মনে হয় না।

কৃষ্ণনগরে যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স নহে, এই প্রস্তাব অতঃপর অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ কৃষ্ণনগরের সভাকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া প্যাক্ট সম্বন্ধে উহার সিদ্ধান্তকে বাতিল করা। এইজন্যই ললিত-বাবুর প্রস্তাবটি

সম্বন্ধে দুবার ভোট লওয়া হয়। অধিকাংশের মতে পরিত্যক্ত বলিয়া ঘোষিত হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রস্তাব করেন, যে, দেশের লোকদের মনের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর স্বরাজ্য-প্যাক্ট নাকচ, সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে বিচার করা অনুচিত। ইহাও অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়।

তাহার পর শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বরখাস্ত করা হউক। তাহাই হইল। বাংলা গবর্ণমেণ্ট বার বার পরাজিত হওয়ায় যদি লাটসাহেব ব্যবস্থাপক সভাকে বরখাস্ত করিয়া নিজের মতানুবর্ত্তী সভ্যদিগকে নির্ব্বাচিত করাইতেন ও মনোনীত করিতেন, তাহা হইলে তাহা হইত অবৈধ ও গর্হিত জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু যেহেতু স্বরাজ্য দলের পাণ্ডারা ইহা করিলেন, তজ্জন্য ইহাকে দেশভক্তির পরিচায়ক গণতান্ত্রিকতা বলিতে হইবে। মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াই দিয়াছেন, যে, তিনি অবাধে নিরঙ্কুশভাবে কাজ করিতে চান, যেহেতু বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি থাকিতে তিনি তাহা পারেন না, অতএব সমিতিটাই বরখাস্ত হওয়া চাই। অবশ্য, সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিজের পদত্যাগটা অচিন্তনীয়।

অতঃপর নূতন সমিতির ত্রিশ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন, এবং বাকী ত্রিশজন সেনগুপ্ত মহাশয় নিজেই মনোনীত করিবেন।

—

শিক্ষিত লোকদের দেশঋণ-শোধ

বাংলাদেশের নূতন শিক্ষা রিপোর্ট পড়িতে পড়িতে শিক্ষিত লোকদের দেশঋণ-শোধ সম্বন্ধে অনেকবার যাহা লিখিয়াছি, তাহা মনে পড়িয়া গেল।

আমরা লেখাপড়া শিখিয়া যদি দেশের প্রতি, দেশের নিরক্ষর দরিদ্র রুগ্ন লোকদের প্রতি কিছু কর্ত্তব্য করি, তাহা হইলে অনেক সময় মনের কোণে এই ভাবটা প্রচ্ছন্ন থাকে, যে, আমরা যেন অনুগ্রহ করিতেছি। তাহা যে অনুগ্রহ নহে, ঋণশোধের সামান্য চেষ্টা মাত্র, তাহা আমরা অনেকবার নানা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহার মধ্যে একটা যুক্তির পুনরবতারণা সংক্ষেপে করিব।

বাংলা দেশে যে-সব কলেজে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রদিগকে মাসিক ১২ (বার) টাকা বেতন দিতে হয়। অন্যান্য কলেজের বেতন ইহা অপেক্ষা কম। শিক্ষারিপোর্টে দেখিতেছি, প্রেসিডেন্সী কলেজে এক-একটি ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় বৎসরে ৫১০৶২ হয়। ইহার মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে বৎসরে ৩৫৲৫ ছাত্রপ্রতি দেওয়া হয়। প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে এই যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা দেশের লোক ট্যাক্স রূপে দেয়, এবং ট্যাক্স দেওয়া হয় উৎপন্ন ধন হইতে। ধন উৎপাদনের জন্য জমী, পরিশ্রম ও মূলধন দরকার। ইহার মধ্যে পরিশ্রমটা প্রধানতঃ গরীব নিরক্ষর লোকে করে। সে যাহা হউক, ধন উৎপাদনের উপাদানগুলি দেশের। অতএব প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কোন-না-কোন প্রকারে দেশের সেবা করিয়া দেশঋণ শোধ করা কর্ত্তব্য।

অন্যান্য কয়েকটি কলেজের ছাত্রপ্রতি বার্ষিক ব্যয়েরও উল্লেখ করিতেছি।

ঢাকা ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের ব্যয় ৩৮৫॥৴৯। তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে দেওয়া হয় ২৯৫৷৴৬। হুগলী কলেজের ব্যয় ৪৪৭৸৪, প্রাদেশিক রাজস্বের অংশ ৩৬০৵৩। সংস্কৃত কলেজের ব্যয় ৬২৭৶৩, প্রাদেশিক রাজস্বের অংশ ৫৭৫৮৵১০। কৃষ্ণনগর কলেজের ব্যয় ৭৯৩।৵৩, প্রাদেশিক রাজস্বের অংশ ৩৯৭॥৵১। চট্টগ্রাম কলেজের ব্যয় ২৩৩॥৶৭, প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে দেওয়া হয় ১৪৫।৶৬। রাজসাহী কলেজের ব্যয় ১৭৬।৮, প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রদত্ত ৯২৸৴২১।

সকল শিক্ষিত লোকেই কোন-না-কোন প্রকারে দেশের নিকট ঋণী। সেই ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

—

অবনীন্দ্রনাথের "জাহাঙ্গীর" চিত্র

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাহাঙ্গীরের যে-ছবির রঙীন প্রতিলিপি এবার দেওয়া হইল, তাহার মূলটি এক-টুকরা ছেঁড়া কাপড়ের উপর আঁকা। তাহা সত্ত্বেও ছবিটির প্রতিলিপি যেরূপ উঠিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়।

কলিকাতা ৯১, আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
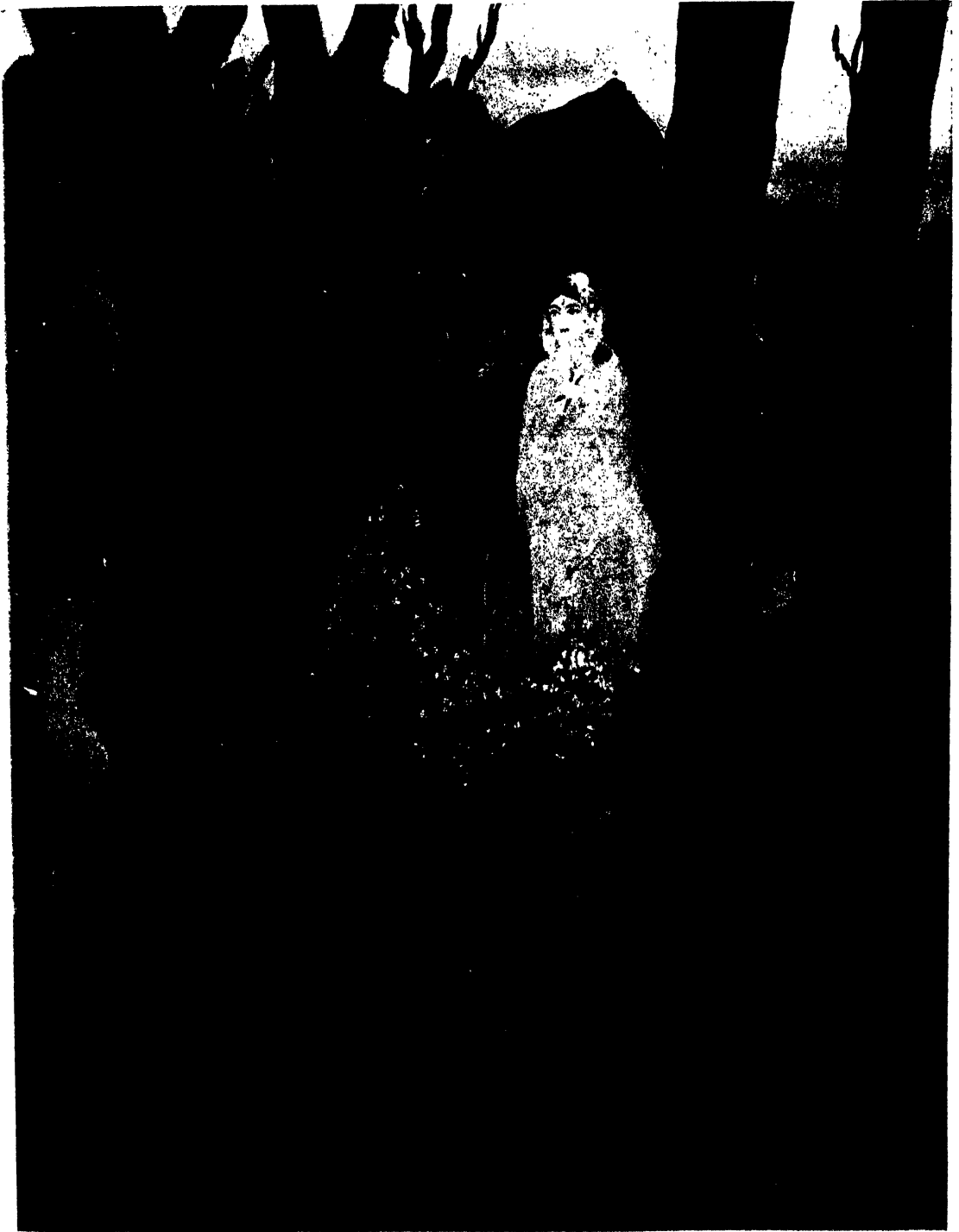
অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

শিল্পী শ্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩৩

৪র্থ সংখ্যা

বৈকালী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

শেষ বেলাকার শেষের গানে
ভোরের বেলার বেদন আনে।
তরুণ মুখের করুণ হাসি
গোধূলি-আলোয় উঠ্‌ল ভাসি',
প্রথম ব্যথার প্রথম বাঁশি
বাজে দিগন্তে কী সন্ধানে
শেষের গানে ॥

আজি দিনান্তে মেঘের মায়া
সে আঁখি-পাতায় ফেলেছে ছায়া।
খেলায় খেলায় যে কথাখানি
চোখে চোখে যেত বিজলী হানি',—
সেই প্রভাতের নবীন বাণী
চলেছে রাতের স্বপন পানে
শেষের গানে ॥

(২)

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে,
পিছন পানে চাইনে ফিরে।
কর্ম্ম আমার বোঝাই ফেলা,
খেলা আমার চলার খেলা,
হয়নি আমার আসন মেলা,
ঘর বাঁধিনি স্রোতের তীরে

বাঁধন যখন বাঁধ্‌তে আসে
ভাগ্য আমার তখন হাসে।
ধুলা-ওড়া হাওয়ার ডাকে
পথ যে টেনে লয় আমাকে,
নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে
গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে ॥

(৩)

তপস্বিনী হে ধরণী, ওই যে তাপের বেলা আসে।
তপের আসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে।
অম্বরে প্রাণের লীলা
হোক্ তবে অন্তঃশীলা,
যৌবনের পরিসর শীর্ণ হোক্ হোমাগ্নি-নিঃশ্বাসে॥

যে তব বিচিত্র তান উচ্ছ্বসি' উঠিত বহু গীতে,
এক হ'য়ে মিশে যাক্ মৌন মন্ত্রে ধ্যানের শান্তিতে :
সংযমে বাঁধুক লতা
কুসুমিত চঞ্চলতা,
সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে।

(৪)

বিরস দিন, বিরল কাজ ;
প্রবল বিদ্রোহে
এসেছ প্রেম, এসেছ আজ
কী মহা সমারোহে।
একেলা রই অলস মন,
নীরব এই ভবন-কোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ,
অপরাজিত ওহে!
এসেছ প্রেম, এসেছ আজ
কী মহা সমারোহে।

কানন 'পর ছায়া বুলায়,
ঘনায় ঘন-ঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটীর জটা।
যেথা যে রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ঐ বিজয়-রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘন ঘুমের মোহে।
এসেছ প্রেম, এসেছ আজ
কী মহা সমারোহে॥

(৫)

বিনা সাজে সাজি' দেখা দিয়েছিলে কবে,
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে?
ভালোবাসা যদি মেশে আধাআধি মোহে,
আলোতে আঁধারে হারাব দোঁহারে দোঁহে ;
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে,
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে?

ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা?
কাছে এসে তবু কেন র'য়ে গেলে দূরে,
বাহির বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে?
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করি' ল'বে?
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে?

(৬)

আমার লতার প্রথম মুকুল
চেয়ে আছে মোর পানে,
শুধায় আমারে—"এসেছি এ কোন্ খানে?"
এসেছ আমার জীবন-লীলার রঙ্গে,
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে,
এসেছ আমার স্বপ্নতরঙ্গ গানে।

আমার লতার প্রথম মুকুল
প্রভাত-আলোক মাঝে
শুধায় আমারে—"এসেছি এ কোন্ কাজে?"
টুটিতে গ্রন্থি কাজের জটিল বন্ধে,
বিবশ চিত্ত ভরিতে অলস গন্ধে,
বাজাতে বাঁশরী প্রেমাতুর দু'নয়ানে

(৭)

আমার প্রাণে গভীর গোপন
মহা-আপন সে কি?
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি।
পাগল হাওয়ার ঝড়ে
আগল খুলে পড়ে,
কার সে নয়ন 'পরে
নয়ন যায় যে ঠেকি॥

যখন আসে পরম লগন
তখন গগন মাঝে
তাহার বাঁশি বাজে।
তখন আমার গানে
তাহারি সুর আনে,
আমন্ত্রণের বাণী
যায় হৃদয়ে লেখি॥

(৮)

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে,
গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্ত-পারে।
গোধূলি-আলোকে একা এসেছিল ভুলে
পথহারা ফুল অন্ধরাতের কূলে,
অরুণ আলোর বন্দনা করিবারে।
ক্ষীণ দেহে, মরি মরি,
সে যে নিয়েছিল বরি'
অসীম সাহসে নিষ্ফল সাধনারে॥

কী যে তার রূপ দেখা হ'ল না তো চোখে,
জানিনা কী নামে স্মরণ করিব ওকে।
আঁধারের যারা পথিক গোপনে চলে,
পরিচয়হীন সেই তারাদেব দলে
এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে।
করুণ মাধুরীখানি
কহিতে জানে না বাণী,
কেন এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে॥

(৯)

এপথে আমি যে গেছি বারবার,
ভুলিনি তো একদিনো!
আজি কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার
উঠিল বনের তৃণ?
তবু মনে মনে জানি, নাই ভয়,
অনুকূল বায়ু সহসা যে বয়,
চিনিব তোমায় আসিবে সময়,
তুমি যে আমায় চিনো।

একেলা যেতাম যে-প্রদীপ হাতে,
নিবেচে তাহার শিখা।
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে
ঠিকানা রয়েচে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে ফুল
জানি জানি তারা ভেঙে দেবে ভুল,
গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল
সঙ্কেত আছে লীন॥

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

(২১)

30th Nov.,'00
C/o Messrs. Henry S.
King & Co.

বন্ধু,

আমাকে Society of Arts বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা ভারতবর্ষীয় পুরাতন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলি। অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চা আধুনিক ব্যাপার নহে।

আমি বড় ব্যস্ত আছি। আমি কিছুদিনের ছুটি পাইব কি না তাহা এখনও জানিতে পারিলাম না। India Officeএর ইচ্ছা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে এখনও সংবাদ আইসে নাই। টেলিগ্রাফ করিয়াছে,

তথাপি উত্তর পাওয়া যায় নাই। তোমার গল্পের বাকী অংশ শীঘ্র পাঠাইবে।

তোমার
জগদীশ

(২২)

31 New Cavendish St.,
10th Dec. 1900.

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম।

আমি আজ ডাক্তারের বাড়ি হইতে চিঠি লিখিতেছি। আগামী কল্য Operation হইবে। আশা করি নৌকা-ডুবি হইবে না।

আমি ভবিষ্যতে কি করিব, এসম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, লিখিও।

আমি তোমাকে যে-কথা বলিয়াছি, তাহার পর অনেক নূতন তত্ত্ব স্পষ্ট দেখিতেছি। যাহাতে কয় বৎসরে সে সব শেষ করিতে পারি, তাহাই করিতে হইবে। আমার সময়ের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, লিখিও।

আমার সম্মুখে যে অত্যদ্ভুত নূতন তত্ত্ব দেখিতেছি, তাহাতে যেরূপ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইতেছি, সেইরূপ কিরূপে সমস্ত শেষ করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয়ের ভালবাসা জানিবে।

তোমার
জগদীশ

(২৩)

C/o Messrs. Henry S. king & Co.
লণ্ডন, ৩রা জানুয়ারী ১৯০১

বন্ধু,

সীজারের জাহাজ ডুবিয়া যায় নাই বলিয়া যে আমার ক্ষুদ্র ডিঙ্গি রক্ষা পাইবে, একথা বিশ্বাস হয় নাই। এখন দেখিতেছি যে, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার উপর সীজার অপেক্ষাও সুপ্রসন্ন। কারণ যখন ব্রুটাস্ সীজারের পেটে ছুরী বসাইয়া দিয়াছিলেন, তখন উক্ত সীজার অবিলম্বে পপাত চ, মমার চ! অথচ যখন তিনজন ডাক্তার আমার উদর বিদারণ করিয়া ১॥০ ঘণ্টাকাল অতি সহর্ষে অস্ত্র-চালনা করিয়াছিলেন, তারপর যে আমি ভবধামে ফিরিয়া আসিব, ইহা কল্পনাতীত। ক্লোরোফর্ম্মের নেশা যখন চলিয়া যায়, তার পর জীবনের উপর একান্ত ধিক্কার জন্মিয়াছিল এবং আহার ত্যাগ করিয়াছিলাম। তখন তোমার বন্ধুজায়া আমার নিকট মাছের ঝোল ডাল ভাত রাখিতে আরম্ভ করিলেন,—এমন কি বিদেশী মৎস্য দেশীরূপে কর্ত্তিত হওয়াতে আমাকে ভ্রান্ত করিয়াছিল,—তখন স্বদেশ (আহার)-প্রেম জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়াছিল। এইরূপে প্রায় চার সপ্তাহ পর এখন একটু একটু করিয়া বল পাইতেছি। আরও চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে হইবে, পরে কাজ আরম্ভ করিতে পারিব।

আমি আর এক বৎসরের ছুটী চাহিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাস পাইয়াছি। সুতরাং সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে পারিব না। জার্ম্মেণী ইত্যাদি স্থানে বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না।

তুমি আমার কার্য্যের সফলতার সমস্ত খবর চাহিয়াছ। That is adding insult to injury, as the parrot said when they not only brought him from his native country, but also made him speak English! আমাকে যদি কাজ করিয়া পরিশেষে তাহার কাহিনী বর্ণনা করিতে হয় তাহা হইলে injuryর সহিত insult করা হইবে। তোমার স্বয়ং আসা উচিত ছিল, অথবা বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরণ করিলে পারিতে!

শুনিয়া সুখী হইবে, Sir William Crookes পুনঃ-পুনঃ আমাকে Royal Institutionএ Friday Evening Discourse দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে শুনিয়া লিখিয়াছেন, I am looking forward to the great treat of hearing you at the R. Institution.

তোমাকে হয়ত পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, বিখ্যাত ইলেক্‌ট্রিকাল কোম্পানী Messrs. Muirhead & Co. আমার suggestions অবলম্বন করিয়া Wireless Telegraphy সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে, এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা না

বুঝিয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছিলেন; অনেক বিষয়ে বৃথা চেষ্টা করিয়া হতাশ্বাস হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার থিওরি অনুসারে এখন ঠিক্ পথে যাইয়া অনেক উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছেন। আমি আর-একটি নূতন paper লিখিয়াছি, তাহাতে practical wireless telegraphyর অনেক প্রকার সুবিধা হইবে মনে হয়। Dr. Muirhead আমাকে নূতন আবিষ্কারগুলি গোপনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু আমার এখানে সময় অল্প, আমার আরও অনেক কাজ করিতে হইবে। একবার যদি অর্থকরী বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে আর কিছু করিতে পারিব না। তোমাকে আমি বুঝাইতে পারিব না, আমি কি এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি, কি আশ্চর্য্য নূতন তত্ত্ব একটু একটু করিয়া দেখিতে পাইতেছি। সে-সব আমি এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না; সেগুলি দিন দিন পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু একভাবে দিনের পর দিন সেই সত্যলাভের জন্য ধ্যান করিতে হইবে। সেই একাগ্রতার ভাব যদি কোনরূপে disturbed হয়, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। আর আমি এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছি, তাহা অতি সামান্য, আরও অনেক আছে। কিন্তু সে-সব করা অনেক সময় ও অর্থসাপেক্ষ। যেরূপ করিয়া, যেরূপ সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে হয় তাহা করিতে আমি সুবিধা পাই নাই। আমার কার্য্যগুলি এরূপ অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে আমার বড় কষ্ট হয়। Dr. Waller, যিনি ভেকের চক্ষু লইয়া investigate করিতেছেন, তাঁহার নিজের Laboratory দেখিতে গিয়াছিলাম; সে-সব দেখিয়া আমি ঈর্ষা-জর্জ্জরিত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং, দুইজন assistant (ইহার মধ্যে একজন Doctor of Science) এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, এই ৪জন প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রত্যহ কার্য্য করিতেছেন। সেই Laboratoryর এক কোণে আহার্য্য দ্রব্য রহিয়াছে, যেন আহারের সময় কার্য্য-বিরাম না হয়। আর সেই Laboratoryর বর্ণনা তোমাকে কি করিয়া দিব! সমস্ত সপ্তাহে ৫ঘণ্টা তাঁহাকে lecture দিতে হয় তাহাই তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে, এজন্য কাজ ছাড়িয়া দিবেন ভাবিতেছেন। Experiment-এর ফল photography দ্বারা স্বতঃ recorded হইতেছে। এইরূপ সম্পূর্ণতার সহিত কাজ চলিতেছে—আর আমার কাজ ভাবিয়া দেখ।

তোমার পূর্ব্বপত্রে, আমি যাহাতে স্বাধীনরূপে একটু কার্য্য করিতে পারি, এসম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়া, আমার মত জানিতে চাহিয়াছ। এসম্বন্ধে আমি কি বলিব? তুমি আমার হইয়া যাহা ভাল মনে কর আমি তাহাই করিব। তবে এসম্বন্ধে দু-একটি বিষয় তোমাকে জানাইতেছি।

(১) তুমি কি মনে কর যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দু-একজন ব্যতীত কেহ আমার কার্য্যে সাহায্য করিতে ব্যগ্র? দেখ, আমি দু-একজনকে সন্তুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু তাহার অধিক করিতে সমর্থ হইব না।

(২) আর এক কথা এই, যে, যদিও নিম্নকর্ম্মচারী হইতে আমি বাধা পাইয়াছি, কিন্তু Lt. Governor আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু বাইরে এই দুই রাজশক্তির বিভিন্নতা লোকে বুঝিবে না। আমি কোনরূপে অকৃতজ্ঞতা-দোষে দোষী হইতে চাহি না। যদি আমার কার্য্যে কেহ সাহায্য করেন, তবে তাহা যেন আমার কার্য্যে সন্তুষ্টি হইতে হয়, রাজপুরুষদের উপর সন্তোষ কিম্বা অসন্তোষ হইতে না হইলেই ভাল হয়।

(৩) যদি বক্তৃতা কিম্বা পুস্তক প্রকাশ করিয়া আমি তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে সুখী হইব।

আমাকে প্রতি তৃতীয় বৎসরে এদেশে আসিয়া আমার কার্য্য সম্বন্ধে প্রচার করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত সংশ্রব সহজে একেবারে কাটিতে চাহি না, কারণ তাহা হইলে আমার কার্য্যে কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ছাত্রদিগের অনুসন্ধান-কার্য্যে তাহা হইলে সুবিধা হইবে না। তবে কতদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে থাকিতে পারিব, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

আমি Society of Artsএ Science in Ancient and Modern India সম্বন্ধে বক্তৃতা করিব। তুমি এ

সম্বন্ধে Medicine, Astronomy, Chemistry যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে পার, পাঠাইও। আগামীবারে লিখিব। বন্ধুজায়াকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

তোমার
জগদীশ

(২৪)

C/0 Messrs Henry S.King & Co.
65 Cornhill, London.
১৬ই জানুয়ারী, ১৯০১

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার দাদার পুস্তকখানা পাইয়াছি।

তোমার গল্পের পুস্তক ২য় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৩টি গল্প তর্জমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সে-সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই। এদেশে এমন লোক আজকাল অধিকমাত্রায় হইয়াছে, যাহাদের কিপ্লিংই গুরু, সুতরাং popular হইবে কি না জানি না। তবে তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত জোগাইতেছি:—

প্রথম। এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান্ মহিলা—সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। "ছুটী" শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল।

দ্বিতীয়—Typical John Bull। "ছুটী" শুনিয়া বলিলেন যে, local colour ত কিছু দেখিলাম না—ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে, এরূপ দু-একজনকে আমি জানি—true to life। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষীয় ছেলেদের স্বভাব অন্যরূপ।

তৃতীয়। আমার এই বন্ধুটির সম্বন্ধে দেখা হইলে বলিব; ইঁহার জীবন অতি আশ্চর্য্য। ইনি একজন বিশেষ সম্ভ্রান্তবংশীয়—ইয়োরোপীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত। He has not seen such a fine touch in any European Literature.

সুতরাং সাধারণের নিকট কিরূপ লাগিবে জানি না।

কয়েকটি গল্প একত্র করিয়া এখানকার একজন publisherএর নিকট পাঠাইতে চাই। এদেশীয় puolisher চোর। অনেক দর-দস্তুর করিতে হইবে। প্রথমে লোকসান পূরণের জন্য টাকা চাহিবে।

অথবা কোন Magazineএ পাঠাইতে পারি।

তোমার দাদার Mssএর কপি নাই শুনিয়া বিব্রত রহিলাম। কাহারও নিকট কি সাহসে পাঠাইব? যদি হারাইয়া যায়। এদেশে বিজ্ঞান-বিভাগ এত বেশী যে, কেহ কোন শাখার অংশ ব্যতীত হস্তক্ষেপ করেন না। Physicist অনেকের সহিত আলাপ হইয়াছে, কিন্তু Mathematician কাহাকেও জানি না। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আমি অনেক বিষয়ে পরিষ্কার দেখিতেছি। এখন সমস্ত বুঝিয়া আমাদের সমস্ত আচার-ব্যবহার ইত্যাদির উপর আমার শ্রদ্ধা গাঢ়তর হইতেছে। এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে আমরা আধুনিক জাতির সমকক্ষ না হইতে পারি। তবে আমাদের একটি বিশেষ অভাব সেই শিক্ষার, সে-শিক্ষার বলে Wolf-pact একত্র হইয়া অজেয় হইয়াছে। অতি সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি একতায় মহান্ হয়। এদেশে কোন এক বিষয় কেহ আরম্ভ করিলে শত শত লোককে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিতে পারে। কোন এক হুজুকে শত শত লোক মাতিয়া উঠে।

তোমার নূতন লেখাগুলি কবে পাঠাইবে?

এবার এখানেই শেষ করি। আগামীতে লিখিব।

আমার ভাবী বধূকে আমার সম্ভাষণ জানাইবে। আর্য্যা বন্ধুজায়াকে আমার কথা স্মরণ করাইবে।

তোমার
জগদীশ

(২৫)

লণ্ডন
২১ মার্চ্চ ১৯০১

বন্ধু,

তোমার সুন্দর গল্পের পুস্তক পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি এবং বন্ধুদিগকে আনন্দিত করিয়াছি। তোমাকে

প্রত্যহ চিঠি লিখিব মনে করি। কিন্তু এত লিখিবার আছে যে, একখানা পুস্তক হইয়া পড়ে। আর আমি কিরূপ ব্যস্ত আছি বলিতে পারি না। আমি যে-সব নূতন বিষয় পাইয়াছি তাহা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, আর সে-সব বর্ণনা করিতে ভাষাও পাই না। নূতন জিনিষের নামকরণ করিতে হইল; তুমি ত আমাদের দেশীয় নাম ঠিক করিয়া দিলে না। দেশ হইতে আসিয়া আরও কত আশ্চর্য্য বিষয় পাইয়াছি যে বলিতে পারি না। আমি সে-সব মনে করিয়া স্তম্ভিত হই—সে-সব একে একে দেখাইতে না পারিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। আমি সেই ভয়ে এখনও নূতন paper লিখি নাই। গতবারে যাহা বলিয়াছি, তাহাই লোকে হজম করিতে পারে নাই। আর যে-সব পাইয়াছি তাহা বলিলে লোকে বাতুল মনে করিবে। আমি এসবের জন্য তোমার পরামর্শ চাই, আগামীতে লিখিব। আমার বর্ত্তমান কার্য্য যে কতদূর সর্ব্বগ্রাসী হইয়াছে, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। সর্ব্বদা পত্র লিখিও। তোমার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রকন্যাগণকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

তোমার

জগদীশ

(২৬)

C/o Messrs. Henry S. King & Co.
65 Cornhill, London.
3rd May, 1901.

বন্ধু,

তোমার "নৈবেদ্য" সময়মত আসিয়াছে। আমার পরীক্ষার আর ৭ দিন বাকী আছে, তখন তোমাদের প্রজ্ঞা এই পশ্চিম জগতে উত্থিত করিতে পারিব কি না, তাহার পরীক্ষা হইবে।

আমি একঘণ্টা সময়ের মধ্যে অতি দুরূহ বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিব কি না জানি না। সমস্ত বিজ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া নূতন এক মহান্ সত্য যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহা দু'একদিনে প্রচার করিবার আশা করি না।

আমি সে-বিষয় British Associationএ বলিয়াছিলাম, তাহা দুরূহ বৈদ্যুতিক নূতন বিষয়, সুতরাং Physiologistরা হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; আর physiology যে physicsএর অন্তর্গত, ইহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আমি সেই বিশ্বাস যে একদিনে দৃঢ় করিতে পারিব তাহা মনে করি না। জীবন যে একটা মহান্ সত্তা—জড়জগতের হইতে বহু উচ্চে স্থাপিত, একথা এদেশের বৈজ্ঞানিক ও খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের সহজ জ্ঞানস্বরূপ।

তবে সম্পূর্ণ নূতন উপায়ে, এক অতি আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়ার ফলে আমি সেই সত্য প্রমাণ করিতে পারিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন Physiologist বলিয়াছিলেন যে, আপনি metallic particles লইয়া experiment করিয়াছেন। আমরা solid; কোন solid metalএ চিম্‌টি কাটিয়া তাহার অনুভূতিচিহ্ন যদি দেখাইতে পারেন তাহা হইলে দ্বিধা থাকে না।

আমি এক নূতন কল প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে এই চিম্‌টি কাটিবার ফলে যে অনুভূতিরূপ স্পন্দন হয় তাহা automatically recorded হয়। সেই record আর আমাদের শরীরে চিম্‌টি কাটিলে যে record হয় (যাহার record physiologistরা পাইয়াছেন), তাহার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আর জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ী দ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনীশক্তির স্পন্দন আমার কলে লিখিত হয়।

তোমার নিকট এক অতি আশ্চর্য্য record পাঠাইতেছি। স্বাভাবিক নাড়ীর ক্রিয়া দেখিবে, তার পর বিষপ্রয়োগে নাড়ীর স্পন্দন বিলোপ হইতেছে দেখিবে। জড়ের উপর বিষপ্রয়োগ হইয়াছিল।

কি অত্যাশ্চর্য্য নূতন জগৎ আমার সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়াছে বলিতে পারি না। কি অসীম নূতন সত্য সম্মুখে রহিয়াছে।

একদিন মনে করিয়াছিলাম যে, এমন দিন কবে আসিবে যে দেশ-দেশান্তর হইতে জ্ঞান-আহরণের জন্য ভারততীর্থে লোকসমাগম হইবে। সেই আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না। আমার সমস্ত পুঁজি এদেশে রাখিয়া রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে। কারণ, আমাদের দেশবাসীরা

কেবল অতীতের গৌরবে অন্ধ হইয়া আছেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের যত অধোগমন হউক না কেন, আমরা অতীতকালের কথা স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল থাকিব। সেই কথা স্মরণ করিতে আমাদের কি অধিকার? এই নৈরাশ্যের মধ্যে তোমার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

মোর কল্পনাতীত—কি তাহার কাজ—কোন্ পথ তার পথ? বন্ধু, তুমি এই বিশ্বাস চিরকাল প্রচার করিও। আমরা জানি না, আমরা কোন ফলের আশা করি না, তবু যেন আমাদের কার্য্য করিবার শক্তি নির্ম্মূল না হয়। কোনদিনে কোনকালে আর কেহ দেখিবে। বিশ বৎসর পরে আমরা কেহ রহিব না, কিন্তু আমাদের আশার উচ্ছ্বাস যেন চিরজীবন্ত থাকে।

তোমার নিকট পরামর্শ চাই। অন্ততঃ আরও ৫ বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে এই কার্য্য কোনরূপে সমাধা হইতে পারে, দেশে ফিরিলে (যতদূর বুঝিতে পারিতেছি) সব কার্য্যের বিরাম। এদেশে আর কিছুকাল থাকিব কি? আরও ইচ্ছা হয় যে জার্ম্মেণী ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এবিষয় প্রচার করি। কি মনে কর?

ছবি পাঠাইয়াছ, বড় সুখী হইয়াছি। আমার অনেক কালের রুদ্ধ স্নেহ তোমার কন্যার মুখ দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তুমি যে দান করিবে বলিয়াছিলে, সে-কথা ভুলিও না।

তোমার সহধর্ম্মিণীকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

তোমার
জগদীশ।

(২৭)

লণ্ডন। ১৭ই মে, ১৯০১।

বন্ধু,

তুমি আমার সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত আছ। বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত কি বলিব স্থির করিতে পারি নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে Physiology, Physics, এবং Chemistryর দুরূহ শেষ মীমাংসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই নূতন বিষয় কি করিয়া বুঝাইব? আর Experimentগুলিও অতি কঠিন। কতকগুলি কল শেষ দিন মাত্র প্রস্তুত হইল। তার পর একটি ঘটনা হইল, সে-কথা স্মরণ করিলে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। আমি বৃহস্পতিবার দিন দুপ্রহরের সময় একেবারে নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম; আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল; তোমাদের এত দিনের আশা কেবল আমার শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য নির্ম্মূল হইবে একথা মনে করিয়া যে কি গভীর যাতনা পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক আশ্চর্য্য unscientific ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ ছায়াময়ী মূর্ত্তি দেখিলাম, বিধবার বেশ-ধারিণী, কেবল এক পার্শ্বের মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই অতি শীর্ণ, অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল, 'বরণ করিতে আসিয়াছি'। তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে সব মিলাইয়া গেল।

জানি না, কেন এরূপ হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার সব যন্ত্রণা দূর হইল। কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তার পর দিন যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম, তারপর যেন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল, জানি না; যাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্ত্তে পরিস্ফুট হইল।

Electrician পাঠাই, কতক সংবাদ তাহাতে পাইবে। হিন্দুর সূক্ষ্মবুদ্ধি একবার patronising রূপে পূর্ব্বে শুনিয়াছি, আমি আমার সেই জাতীয় গুণের জন্য আজ অহঙ্কার করিব। কারণ, সেই পূর্ব্বপুরুষদের গুণে বঞ্চিত হইলে আমি এত তমসাচ্ছন্ন প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারিতাম না। আমি অনেক সময়ে একেবারে আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়াছি, কে আমাকে যেন এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সত্য দেখাইতেছে! তবে হিন্দুর practical বুদ্ধি নাই, তাহার উত্তরও *Electrician*এ দেখিবে। আমার বক্তৃতার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানির ক্রোড়পতি proprietor টেলিগ্রাফ করিয়া পাঠাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ

জগদীশচন্দ্র বসু
১৯০১ সালে রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য বক্তৃতা দিতেছেন
[লণ্ডনের প্রাগ্নেল্ এণ্ড কোং (Pragnell & Co) কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে]

দরকার। আমি লিখিলাম, সময় নাই। তার উত্তর পাইলাম, "আমি নিজেই আসিতেছি"। অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বয়ং উপস্থিত। হাতে Patent form। আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আপনি যেন বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না, "There is money in it. Let me take out a patent for you. You do not know what money you are throwing away", ইত্যাদি। অবশ্য, "I will only take half share in the profit —I will finance it", ইত্যাদি। এই ক্রোড়পতি আরো কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এ দেশের টাকার উপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা—কি ভয়ানক সর্ব্বগ্রাসী লোভ! আমি যদি এই যাঁতা-কলে একবার পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই। দেখ আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপরে মনে করি। আমার জীবনের দিন কমিয়া আসিতেছে, আমার যাহা বলিবার তাহারও সময় পাই না, আমি অসম্মত হইলাম। কিন্তু সেদিন আমার

বক্তৃতা শুনিতে অনেক টেলিগ্রাফ কোম্পানীর লোক আসিয়াছিল; তাহারা পারিলে আমার সম্মুখ হইতেই আমার কল লইয়া প্রস্থান করিত। আমার টেবিলে assistant এর জন্য হাতে লেখা নোট ছিল, তাহা অদৃশ্য হইল।

আমার বক্তৃতা এখনও প্রকাশ হইবে না, কারণ Royal Society আমাকে তথায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। They made a special case, for they never accept anything read before any other Society। সে দিন যত physiological. expertরা থাকিবেন। Sir Michael Foster নিজে আমার paper communicate করিবেন। আমি experiment করিয়া দেখাইব।

তবে আমার সম্মুখে বহু বাধা আছে। প্রথম—Commercial interest। অনেক patent আমার কার্য্য দ্বারা ও আমার নূতন আবিষ্ক্রিয়াতে অকর্ম্মণ্য হইবে। দ্বিতীয়—যাঁহারা coherer theory বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিবেন। তৃতীয়—Physiologist রা জীবন বলিয়া একটা নূতন অতি মহৎ একটা কিছু বুঝেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান mere physics, একথা কোন মতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। ৪র্থ—কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা অতিশয় পুলকিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খ্রীষ্টবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকেরা কিছু তটস্থ হইয়াছেন। এজন্য আমি কোন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব।

Dr. Waller, যিনি জীবনের শেষ লক্ষণ বাহির করিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন। সুতরাং আমাকে একাকী এত বিপক্ষের সহিত যুঝিতে হইবে। কি হইবে জানিনা।

তবে যাঁহাদের কোন self interest নাই তাঁহারা অতিশয় উল্লসিত হইয়াছেন। তবে তাঁহারা বলেন, "You must remember that the greatest discovery of the last century—the mechanical equivalent of Heat by Joule—was rejected by the Royal Society as unscientific; but twenty years after the Royal Society published the same paper in their transactions. You have brought forward a great discovery having far-reaching consequences. Have you the courage and persistency to fight for it and force it to be universally accepted? You who see it so clearly alone can do it; there is none else who can take up your work. If you leave it in its present state, it will be lost.

কি করিব বল? আমার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে (আগামী September মাসে)। সেখানে সমস্ত কাজ ত বন্ধ হইবে। আমি সমস্ত মন দিয়া সমস্ত গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া যদি কার্য্য করিতে পারি, তবে আর দুই বৎসরে যদি কোন প্রকারে কার্য্য সমাধা করিতে পারি। আমাকে যে আর ছুটী দিবে এরূপ বিশ্বাস হয় না। দেশে ফিরিলে কিরূপ কার্য্যের সুবিধা হইবে তাহার নমুনাস্বরূপ একখানা চিঠি পাঠাই। উক্ত হতভাগ্য আমার recommendation এ Research Scholarship পাইয়াছিল, তাহার উপর বিশেষ জুলুম! যদি কোন বিষয় একবার race question এ দাঁড়ায়, তাহা হইলে শেষে কি হয় তাহা জান।

আমার বক্তৃতার শেষ অংশ তোমাকে পাঠাইতেছি। Sir William Crookes বলিলেন যে, Royal Institution হইতে যখন আমার বক্তৃতা প্রকাশিত হইবে, তখন যেন শেষের দুই পংক্তি quotation দিতে ভুলিয়া না যাই। "I have scarcely heard anything so grand!" Sir Robert Austen, the greatest authority on metals, আহ্লাদে অধীর হইয়া আমাকে বলিলেন, "I have all my life studied the properties of metals. I am happy to think that they have life"! তারপর বলিলেন, সে কথা আমাকে আবার শুনিতে দিন। তারপর বলিলেন, "Can you tell me whether there is a future life—what will become of me after my body dies?"

বন্ধু, আমাদের যাহা অমূল্য রত্ন আছে তাহা ভুলিয়া মিছামিছি না বুঝিয়া হিন্দুয়ানী লইয়া গর্ব্ব করি। আমাদের প্রকৃত Inheritence বুঝাইয়া দাও, প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।

আজ এখানেই শেষ করি।

তোমার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

চম্পারাজ্যে হিন্দু উপনিবেশ

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

কিছুকাল আগে অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক বড় গলায় বলতেন যে, হিন্দুরা কোনও কালে ভারতবর্ষের বাইরে যায়নি, তারা চিরকালই নিজের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন ফরাসী পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে এটা প্রমাণ হয়েছে যে, হিন্দুরা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। চম্পা রাজ্যে, শ্যামে, কম্বোজে এইরকমেই হিন্দুরা রাজ্যস্থাপন করেন।

এখানে আমরা কি করে' চম্পারাজ্যে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত হ'ল সেই কথা শুধু বলব। চম্পারাজ্য বলতে আমরা বর্ত্তমান আনাম প্রদেশকেই বুঝি। এটি এখন ফরাসীদের অধীনে।

ভারত-ইতিহাসের আলোচনার প্রথম যুগে ঐতিহাসিকরা ভারতের বাইরে বৃহত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টি দিতেন না। কিন্তু এখন সে-পন্থা অবলম্বন করা ঠিক নয়। এখন ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে হ'লে ভারতের বাইরে বৃহত্তর ভারতেরও ইতিহাস দিতে হবে, নইলে ভারতের ইতিহাস পূর্ণ হবে না।

যখন ফরাসী সেনারা আনাম কাম্বোডিয়া ও অন্য অন্য দেশ জয় করে, তখন থেকেই ভারতের ঐতিহাসিকদের নজর এদিকে পড়ল। সেখানে যিনি ফরাসী সেনাপতি ছিলেন, তাঁর নাম M. Aymonier। যদিও তিনি সেনাপতি ছিলেন, তবু তাঁর দৃষ্টি গেল সেখানকার শিলালিপির উপর। তিনি সেখানে শিলালিপি সংগ্রহ করতে লাগলেন; সেইসব শিলালিপি সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি নিজে প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন না, সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতও ছিলেন না। সেজন্য তিনি সেইসব শিলালিপি পাঠিয়ে দিলেন প্যারিসের এসিয়াটিক সোসাইটিতে তার পাঠোদ্ধারের জন্যে। প্যারিসে সে-সময় বড় পণ্ডিত ছিলেন Abel Bergaigne। তিনি তাঁর দুই শিষ্য সিলভ্যাঁ লেভি ও বার্থকে নিয়ে চম্পা দেশের ও কম্বোজের শিলালিপি পড়তে চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে তাঁরা যখন সেইসব শিলালিপির পাঠোদ্ধার করলেন, তখন বৃহত্তর ভারতের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। তখন সকলের, বিশেষতঃ ফরাসী পণ্ডিতদের, দৃষ্টি এদিকে গেল। তারপর অনেক পণ্ডিত এবিষয়ে গবেষণা করেছেন। শেষে ফরাসী পণ্ডিতরা স্থির করলেন যে, এবিষয়ে সুন্দরভাবে গবেষণা করতে হ'লে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে নামতে হবে অর্থাৎ সেই দেশে গিয়ে পুরানো মন্দির, মূর্ত্তি, প্রাসাদ পরীক্ষা করতে হবে। এই কাজের সুবিধার জন্যে তাঁরা Hanoi তে একটি ফরাসী গবেষণা পরিষৎ (Ecole Francaise d' Extreme Orient) স্থাপন করলেন। এই পরিষদের অধ্যক্ষ হ'লেন M. Finot। তাঁরই উৎসাহে এই পরিষদের কাজ সুন্দরভাবে চলছে ও ফরাসী পণ্ডিতদের গবেষণা তাঁদের পত্রিকাতে ১৯০১ অব্দ থেকে বেরুচ্ছে। এইসব ফরাসী পণ্ডিতদের গবেষণা থেকে আমরা চম্পারাজ্যের হিন্দু উপনিবেশ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি।

একটি প্রশ্ন সাধারণতঃ লোকের মনে উদয় হ'তে পারে, কখন থেকে চম্পা দেশে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। চম্পা দেশ—এই নামটি আমাদের পূর্ব্ব ভারতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর চম্পা রাজ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। হয়ত পূর্ব্বভারতের চম্পা দেশ থেকে উপনিবেশিকরা গিয়ে এই রাজ্য স্থাপন করেছিল। হুয়েনসাং চম্পার হিন্দু উপনিবেশ লক্ষ্য করেছিলেন ও সেটিকে মহাচম্পা নামে অভিহিত করেছিলেন।

এসম্বন্ধে যা আলোচনা হয়েছে, তা আমরা নীচের বইতে পাই—

(১) Georges Maspero র—La Royaume de Champa.

(২) L. Finot—Les Origines de la Colonisation Indienne en Indochine.

(৩) Sir Charles Elliotএর—Hinduism and Buddhism.

চীনা ঐতিহাসিক বই থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে, খৃঃ অঃ ১৯০-১৯৩ মধ্যে চম্পা রাজ্যের স্থাপনা হয়। চম্পা রাজ্যের স্থাপয়িতা হচ্ছেন—Kiu lien যদি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চম্পারাজ্য স্থাপিত হয়, তবে এটা নিশ্চয় যে, তার পূর্ব্ব হ'তেই চম্পায় হিন্দু উপনিবেশের স্রোত আরম্ভ হয়েছে। হিন্দু সভ্যতার প্রভাব আমরা চম্পা-দেশের শিলালিপিতে দেখ্‌তে পাই। এইসব শিলালিপি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। চম্পাদেশের সুপ্রাচীন শিলালিপি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর, তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রথম হিন্দু রাজবংশের স্থাপয়িতা শ্রীমার। M. Maspero এই হিন্দুরাজা শ্রীমার ও Kiu lien-কে এক ব্যক্তি বলেছেন। সুতরাং চম্পারাজ্যে হিন্দু-রাজ্যের স্থাপনের তারিখ আমরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফেল্‌তে পারি। তার আগে থেকেই হিন্দুরা সেদেশে বাণিজ্যের জন্যে যাতায়াত কর্‌ছিলেন। সুতরাং আমরা এটা বল্‌তে পারি যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই চম্পায় হিন্দু উপনিবেশের সূত্রপাত হয়েছে।

ভারতের কোন্ প্রদেশের লোক এ উপনিবেশ স্থাপন করেছিল? অনেকে বলেন, পূর্ব্বভারতে যে চম্পাদেশ ছিল, সেখানকারই লোক গিয়ে চম্পা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। যখন চম্পায় উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তখন ভারতের মানচিত্রে অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। প্রাচীন মৌর্য্যবংশ লোপ পেয়েছে, সুঙ্গ ও কণ্ব বংশ তার স্থান অধিকার করেছে। এই সময়ে উপনিবেশিকরা ভারত থেকে যাত্রা করেন। তাঁরা এক স্থলপথে ব্রহ্মদেশ ও আসামের মধ্য দিয়ে যেতে পারতেন বা জলপথে যবদ্বীপ পার হ'য়ে যেতে পার্‌তেন। ভারতীয় ঔপনিবেশিকরা সাধারণতঃ দুই পথেই যাতায়াত কর্‌তেন। কিন্তু পূর্ব্ব-ভারত থেকে তাঁদের যাওয়া সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। চম্পাদেশে যে-শিলালিপি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের শিলালিপির সাদৃশ্য আছে। সেজন্য M. Bergaigne বলেন যে, সম্ভবতঃ ঔপনিবেশিকরা দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান থেকে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গিয়ে তাঁরা চম্পা দেশে বসবাস আরম্ভ করেন, শেষে সেখানকার রাজশক্তি নিজেদের হাতে নিয়ে সেখানে হিন্দু সভ্যতা প্রচার করেন।

চম্পায় প্রথম হিন্দুরাজবংশ

চম্পায় যে প্রথম রাজবংশ স্থাপিত হয়, সে-সম্বন্ধে সে দেশে অনেক জনশ্রুতি রয়েছে। এখন চম্পায় অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। তারা বলে যে, প্রথম রাজবংশের উদ্ভব হয়েছে "আল্লা" থেকে। এ জনশ্রুতি ছেড়ে দিলেও, আমরা আর-একটা জনশ্রুতি পাই যার মতে প্রথম চম্পার রাজা হচ্ছেন বিচিত্রসাগর; তিনি ৫৯১১ দ্বাপর যুগে শম্ভু দেবের একটি মুখলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন; আর-একটি জনশ্রুতি আছে যে, উরোজ প্রথম রাজবংশের স্থাপয়িতা।

এইসব জনশ্রুতির উপর আমরা নির্ভর কর্‌তে পারি না। বোধ হয় চম্পার হিন্দুরাজারা এইসব জনশ্রুতির প্রচলন করেছিলেন তাঁদের সিংহাসনের দাবীকে খুব একটি প্রাচীন আবরণ দেবার জন্যে। হিন্দুরাজারা চম্পার সিংহাসন দখল কর্‌লেন বলপূর্ব্বক, তাঁদের সিংহাসনে বস্‌বার পর তাঁরা প্রচার কর্‌তে লাগ্‌লেন যে, অনেক প্রাচীন কাল থেকে তাঁরা সিংহাসনের অধিকারী। এইসব জনশ্রুতি তারই পরিচয় দেয়।

ঐতিহাসিক দিক্ থেকে আলোচনা কর্‌লে আমরা দেখি যে, এইসব জনশ্রুতির কোন মূল্য নেই। এসব ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে আমাদের আলোচনা কর্‌তে হবে।

চম্পার প্রথম হিন্দুরাজবংশের স্থাপয়িতার নাম আমরা সেদেশের প্রাচীনতম শিলালিপিতে পাই। সেই শিলালিপি Vo can নামক স্থানে পাওয়া গেছে। এই শিলালিপি যে-রাজার সময় বাহির হয়, সেই রাজা "শ্রীমার-রাজকুলে" জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং এথেকে আমরা জান্‌তে পার্‌ছি যে, "শ্রীমার" চম্পারাজ্যের প্রথম হিন্দুরাজা ও তিনিই প্রথম হিন্দুরাজবংশের স্থাপয়িতা।

এই শিলালিপির অক্ষর পরীক্ষা করে' M. Bergaigne বলেন যে, এই শিলালিপির বয়স খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী। Vo-can এর শিলালিপি যে-রাজার সময় লিখিত হয়, তিনি যদি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অবিভূর্ত হন, তবে তাঁর পিতা অথবা পিতামহ "শ্রীমারকে" আমরা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে নিয়ে যেতে পারি। এবিষয়ে চীনা ইতিহাস আমাদের সাহায্য করছে। ঠিক এই সময়ে (১৯০—১৯৩ খৃঃ অব্দে) চীনা ইতিহাসের মতে চম্পার প্রথম রাজবংশ স্থাপিত হয়। চীনা পণ্ডিতরা এই রাজবংশের স্থাপয়িতাকে বলেন Kiu lien। Maspero সাহেবের মতে এই Kiu lien ও শ্রীমার একই ব্যক্তি। একথা স্বীকার করলে, আমরা বলতে পারি যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৯০—১৯৩ খৃঃ অঃ) "শ্রীমার" চম্পায় প্রথম হিন্দুরাজবংশ স্থাপন করেন।

যখন চম্পায় এইরকমে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হ'ল, তখন তার সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুত্বের ও হিন্দু সভ্যতার অনেক চিহ্ন চম্পায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সে-সময় চম্পা অনেক অংশে বিভক্ত ছিল, যেমন—বিজয়, পাণ্ডুরঙ্গ, অমরাবতী, ইত্যাদি। অমরাবতী থেকেই হিন্দু আন্দোলন সুরু হয় ও সেটি ক্রমশঃ সমস্ত চম্পা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীমারের পর তাঁর পুত্র বা পৌত্র রাজা হন; তিনি Vo-can-এর শিলালিপি প্রচার করেন। এই শিলালিপিতে আমরা হিন্দু সভ্যতার সকল চিহ্ন দেখতে পাই। ঠিক যেমন ভাবে ভারতে হিন্দু রাজারা শিলালিপি প্রচার করতেন, চম্পায়ও সেই পদ্ধতি দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, এই শিলালিপিটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। এসময়ে সেদেশে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়েছিল। শ্রীমারের উত্তরাধিকারী একটি মন্দিরের জন্যে অনেক দান করেন, সেইসব দানের মধ্যে আমরা "রজত" "সুবর্ণ" ও "স্থাবরজঙ্গমের" কথা পাই। এ-দান যে তাঁর নিজের জন্য নয় "প্রিয়হিতে" একথা স্পষ্ট করে' শিলালিপিতে প্রচার করেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, যেন ভবিষ্যৎ রাজারা এই দান নাকচ করে' না দেন। ভারতীয় প্রথানুত শিলালিপির শেষে আছে—"বিদিতমস্তু।"

এই রকম করে' যে-সভ্যতা চম্পায় প্রবেশ করেছিল, সে-সভ্যতা মূলতঃ ভারতীয়। এর প্রত্যেক জিনিষে আমরা ভারতীয় সভ্যতার ছাপ পাই। সেদেশীয় Chamরা ক্রমশঃ ভারতীয়দের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করতে লাগল। ভারতের ধর্ম্মও তারা নিয়ে একেবারে হিন্দু হ'য়ে গিয়েছিল। এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হিন্দুধর্ম্ম কখনও বিধর্ম্মীরা গ্রহণ করত না, বা তাদের হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আসতে দেওয়া হত না। কিন্তু আমরা যখন চম্পা, কাম্বোডিয়া ও অন্য অন্য দেশে বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস পড়ি, তখনই দেখতে পাই যে, সেইসব দেশে কি করে' হিন্দুধর্ম্ম প্রসারলাভ করেছিল; কি করে' সেখানকার দেশী লোকেরাও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল, আর হিন্দুরাজাদের দেখাদেখি দেবমন্দির ও দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করতে সুরু করেছিলে। হিন্দুমন্দিরের সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিতও দেখা দিল। রাজা যখন রাজসভায় বসেন, তখনও আমরা দেখতে পাই—একটি ভারতীয় রাজসভা, সেখানেও সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত, সভাসদ অমাত্য পণ্ডিত সবাই ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃত-শিক্ষাও সেদেশে গিয়েছিল। চম্পায় যে সংস্কৃত-শিক্ষা খুব ভাল হ'ত তার প্রমাণ Vo-can-এর শিলালিপি—সেটি একেবারে নির্ভুল সংস্কৃতে লেখা হয়েছে।

সংস্কৃত শিক্ষা যে শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা পেতেন, তা নয়; সব রাজা ও রাজপুত্রেরাও সংস্কৃত শিখতেন। চম্পার এক রাজার নাম—পরমেশ্বর বর্ম্মন্। চম্পার হিন্দুরাজবংশের বিশেষত্ব এই যে, প্রায় সব রাজার নামের শেষে আছে "বর্ম্মন" উপাধি। রাজা পরমেশ্বর বর্ম্মনের এক শিলালিপিতে আছে যে, তিনি "সর্ব্বশাস্ত্রবিদগ্ধ" ও "তত্ত্বজ্ঞানে" পণ্ডিত। সেখানে "কলাবিদ্যার"ও প্রচলন ছিল। পরমব্রহ্মলোক নামে এক রাজা "চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা"তে পণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া তিনি "ব্যাকরণ-শাস্ত্রে" ও "পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানে" পারদর্শী ছিলেন। এখানে ব্যাকরণ-শাস্ত্র বলতে পাণিনি বা অন্য কারও ব্যাকরণ বোঝাচ্ছে, তা ঠিক জানা নেই।

চম্পার আর-এক রাজা শ্রীজয়ইন্দ্রবর্ম্মদেব সমস্ত শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তা ছাড়া "ব্যাকরণশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, হোরাশাস্ত্র, সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান,মহাযান-জ্ঞান" তাঁর জানা ছিল। এখানে "ধর্ম্মশাস্ত্র" বলতে নারদীয় ও ভার্গবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বোঝাচ্ছে। "সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান" বল্‌তে বোধ হয় হিন্দুদের ষড়দর্শন বোঝায়। যদিও রাজা হিন্দু ছিলেন, তবুও তিনি বৌদ্ধদের বিশেষতঃ মহাযান বৌদ্ধদের ধর্ম্মশাস্ত্র জান্‌তেন।

অপর এক রাজা শ্রীহরবর্ম্মন হিন্দুদর্শনে বিশেষতঃ মীমাংসা-দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন। তা ছাড়া "জিনেন্দ্র" বা বুদ্ধদেবের দর্শনেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। শৈবদের "উত্তরকল্প" ও "ব্যাকরণ"ও তাঁর জানা ছিল।

এথেকে আমরা জান্‌তে পারি, সংস্কৃত সাহিত্যের কি কি অঙ্গ চম্পাদেশে প্রচলিত ছিল। মোটামুটি নীচের বইগুলি চম্পাদেশে জানা ছিল :—

(১) ব্যাকরণ-শাস্ত্র
(২) কাশিকাবৃত্তি
(৩) চতুঃষষ্ঠ কলাদি।
(৪) হোরাশাস্ত্র
(৫) সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান (ষড়দর্শন)
(৬) মীমাংসা
(৭) জিনেন্দ্র-মতবাদ
(৮) মহাযানজ্ঞান
(৯) ধর্ম্মশাস্ত্র
(১০) নারাদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র
(১১) ভার্গবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র
(১২) শৈবোত্তর কল্প
(১৩) পুরাণার্থ—ইতিহাস।
(১৪) আখ্যান

এ ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতও চম্পার লোকদের পরিচিত ছিল, কারণ শিলালিপিতে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক লোকের কথার উল্লেখ পাই। যেমন রাজা হরিবর্ম্মনকে ধর্ম্মে যুধিষ্ঠিরের সদৃশ বলা হয়েছে। অনেক সময় রামকে "দশরথনৃপজ" বলা হয়েছে। এছাড়া "দ্রোণ-পুত্র" অশ্বত্থামা, "যদুরাজ" কৃষ্ণ, ও রামের উল্লেখ আমরা শিলালিপিতে পাই।

এটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চম্পায় হিন্দু-শাসন খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। চম্পায় প্রথম হিন্দুরাজবংশ স্থাপিত হয় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। তারপর আরও ১২টি হিন্দু রাজবংশ চম্পায় রাজত্ব করে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত। এইরকমে প্রায় ১২০০ বৎসর চম্পায় হিন্দুরাজত্ব বর্ত্তমান ছিল। এখানকার হিন্দু রাজাদের নামের শেষে প্রায়ই "বর্ম্মন" উপাধি পাওয়া যায়। চম্পার এইসব রাজাদের সঙ্গে ভারতের কোন রাজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল কি না বলা শক্ত। তবে সম্ভবতঃ ভারতের কোন রাজ্যের সঙ্গে চম্পার রাজনৈতিক যোগ ছিল না। মাঝে মাঝে ভারত থেকে অনেক লোক চম্পায় গিয়ে বাস করত। চম্পার একটি শিলালিপি থেকে জান্‌তে পারি যে, গঙ্গারাজ নামে চম্পার এক রাজা গঙ্গানদী দেখবার জন্যে এসেছিলেন। গঙ্গারাজ পঞ্চম শতাব্দীতে চম্পায় রাজত্ব করতেন। তিনি ভাবলেন যে, গঙ্গাদর্শনে পুণ্য ও সুখ খুব বেশী ("গঙ্গাদর্শনজং সুখং মহৎ")। সেইজন্যে তিনি চম্পা থেকে "জাহ্নবী"-কূলে এসে উপস্থিত হ'লেন। ভারত ও চম্পার মধ্যে যোগস্থাপনের এই একমাত্র চেষ্টা। এছাড়া আর কোন দৃষ্টান্ত পাই না যেখানে এই দুই দেশের মধ্যে আর-কোন উপায়ে যোগ-স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমার Indian Colony of Champa-তে পাওয়া যাবে।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(৭)

সংসারটা যেন কেমন হইয়া গেল। হরিসাধনের এত দিনের সঞ্চিত আশা একটা কথার ঘায়ে ভাঙিয়া পড়িবে কি না সেই ভাবনায় তিনি দিবারাত্রি এক মহা সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলেন। তাহারা শেষ কথাটা বলিয়া গেলে ত পারিত। কি যে হইল, কেন যে হইল, কিছুই

বোঝা গেল না। একি জমিদারী চাল ? একবার মনে হইল, হয়ত দাদার জন্যই তাহারা চটিয়া গেল, তাই বিবাহ দিবার আর ইচ্ছা নাই ; নিতান্ত সাম্‌নে কথাটা বলা ভাল শোনায় না বলিয়া এখনকার মত এড়াইয়া গেল। দাদার উপর রাগ হইল; গৌরীর ছিঁচকাঁদুনী-বৃত্তির জন্য আজকের দিনে কি তাহাকে ক'নে না সাজাইলে চলিত না ? কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁহার উপর রাগ করা যে যায় না। যে মানুষ অর্থ-সামর্থ্যের যথাসাধ্য তাহারই কন্যার বিবাহের জন্য দিতে প্রস্তুত, যে সমাজে পতিত হইয়াও তাহাকে বাঁচাইয়া চলিতে চায়, তাহার উপর রাগ করা যায় কি করিয়া ? ভাই ও ভাইঝির জন্য যে এতখানি ত্যাগ এক কথায় করিতে পারে, সে যে আপনার কন্যার চোখের জলে বিচলিত হইয়া লৌকিক বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

মৃণালিনী ত সেইদিন হইতেই গৌরীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন। স্বামীর কথায় ভাসুর যে লোক ভাল ইহা না মানিয়া পারিলেন না ; কিন্তু ওই মেয়েটা যে ময়নার কপালে সুখ ঘটিতে দিবে না ইহা তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা তীর্থ-ভ্রমণের জন্য অকস্মাৎ কেন যে চলিয়া যাইতেছে তাহার একটা কারণ অনুমান করিয়াও তাঁহার মন গৌরীর প্রতি সদয় হইল না।

তরঙ্গিণীর মনে এত দুঃখের পরও যেটুকু সুখশান্তি ছিল তাহা যেন একটা দম্‌কা হাওয়ার ঘায়ে এক নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এই পাগল স্বামীকে লইয়া তিনি আর পারেন না ! না হয় মেয়েটা কান্নাকাটি করিয়াই ছিল, না হয় অবুঝ লোকে তাহাকে দুইটা রূঢ় কথা বলিয়াই ছিল ! অভিশাপ যাহার কপালে লাগিয়াছে তাহাকে কি সকল বেদনা হইতে আড়াল করা যায় ? মানুষের মনের মত তাহার বাহিক শক্তি ত স্নেহাস্পদকে সর্ব্বাঙ্গে বর্ম্মের মত ঘিরিয়া থাকিতে পারে না। তাই বলিয়া কি অবোধ শিশুর সকল খেয়াল মানিয়া চলিতে হইবে ? আবার তাহাকেই বিশ্বের ব্যথার হাত হইতে লুকাইয়া ফেলিবার জন্য দেশত্যাগী হইতে হইবে ? কন্যাকে তিনি মা হইয়া পিতার চেয়ে কিছু কম ভালবাসেন না ; কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার এই আশৈশবের সংসার এক মুহূর্ত্তে বোঝার মত ঘাড় হইতে ফেলিয়া দিয়া এখনই পথে বাহির হইয়া পড়া কি সহজ কথা ?

কিশোর বয়সে বাপের বাড়ী যাওয়ার একটা নেশা ছিল বটে ; কিন্তু প্রথম সন্তানের জননী হইবার পর আজ এই আটাশ বৎসরের ভিতর আর কখনও তিনি এক মাসের কি পনর দিনের জন্যও বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে থাকেন নাই। দিন যতই গিয়াছে ততই বটবৃক্ষের মত এই বর্দ্ধিষ্ণু সংসারের এক একটি নূতন শিকড় তাঁহাকে আরও দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত তিনি নীরবে আপনার অস্তিত্বকে গোপন করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র তৃণ হইতে বিশাল বৃক্ষ পর্য্যন্তকে স্নেহরসসিঞ্চনে যে মানুষ জিয়াইয়া রাখিয়াছেন, আজ তিনি যদি সরিয়া যান তাহা হইলে কোন্ অতল শূন্যের ভিত্তির উপর এ সংসার দাঁড়াইয়া থাকিবে ?

কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাত্রের চাঁদের আলো ঘরের জানালা বাহিয়া বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছিল। মনটা কাল হইতেই চঞ্চল ছিল, সারারাত ঘুমের ভিতরও তাহা বিশ্রাম পায় নাই ; তাই চোখে আলো লাগিতেই তরঙ্গিণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। উঠিয়া বাহিরে যাইবার মত সময় তখনও হয় নাই, শুইয়া পড়িয়াই তিনি আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। সংসারে যাহাদের প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছেন তাহাদের ফেলিয়া যাইতে ত মন কাঁদিতেই ছিল ; কিন্তু যাহাদের বিষয় অন্তর উদাসীন ছিল, শুধু বাহিরের কর্ত্তব্যটুকু মাত্র এতদিন করা হইয়াছে আজ যেন তাহাদের বিরহেও মনটা টাটাইয়া উঠিতেছিল। কত ছোট বড় ব্যবহারে তাহাদের অবহেলা করা হইয়াছে, সেইসব ঔদাসীন্যের দোষ ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্য মনটা উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছে। সংসারের নানা জনের প্রতি সুদূর ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যগুলা পর্য্যন্ত যেন এক মুহূর্ত্তেই আজ ভিড় করিয়া তাঁহার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। এত কাজ যে তাঁহার বাকি পড়িয়া আছে, এত বন্ধনে যে তিনি দেহ-মনের শিরায় শিরায় এই গৃহতলের ধূলামাটির সঙ্গে পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছেন, তাহা ত জীবনে আগে কোনো দিন কল্পনা করেন নাই।

আজ যেদিকে চোখ পড়ে সেইদিক হইতেই যেন একটা বিরহের কান্না ধ্বনিয়া উঠিতেছে।

পশ্চিমের পেয়ারা গাছটার আড়াল হইতে চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় শাশুড়ীর শয়নগৃহ দেখা যাইতেছিল। রুগ্ন বৃদ্ধ মানুষ, দীর্ঘদিন সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া আজ তাঁহারই হাতে সংসারের সহিত আপনাকেও সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত সুখে বিশ্রাম লইতেছেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য-জীর্ণ শ্রান্ত নিদ্রিত মুখের ছবিখানা মনে পড়িতেই করুণায় তরঙ্গিণীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শুধু আজিকার দিনটা বাকি; তারপর কোথায় কত দিনের জন্য যাইতেছেন তাহার ঠিক নাই। এই শিশুর মতন নির্ভরশীল মানুষটির শেষ বয়সের অসংখ্য খামখেয়াল কে বুঝিয়া চলিবে? বাড়ীতে আরো দশজন বৌ-ঝি আছে, কিন্তু এ ভার তাঁহারই জানিয়া চিরকাল তাহারা কেবল আপন আপন স্বামীপুত্র লইয়াই নিশ্চিন্ত ছিল; সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত পূজায় আহ্নিকে স্নানে আহারে নিদ্রায় দানে ধ্যানে ব্রত পার্ব্বণে তাঁহার কখন যে কেমন ছাঁচের কি ব্যবস্থাটি দরকার তাহার খোঁজ ত কেহই রাখে না। আর তিনিও যে একরোখা কোলের সন্তানের মত এই বউটিকেই চিনিয়া রাখিয়াছেন। কেহ যদি বা কোনো কাজ করিয়া দিতে আসে ত তখনই তাহার খুঁটিনাটি দোষ ত্রুটিতে বিরক্ত হইয়া "বড় বৌমা কোথায় গেল?" বলিয়া হাঁকডাক পড়িয়া যায়। কাল তাঁহাকে না দেখিয়া হয়ত "তোমাদের দায়সারা সেবায় আমার কাজ নেই" বলিয়া অভিমান ভরে সারাদিন অনাহারেই কাটাইয়া দিবেন। তাঁহার অভিমান ভাঙাইতে তিনি ছাড়া আর কাহারও সাহস দেখা যায় না। হয়ত এমনি করিয়া কতদিন কত অযত্নেই বেচারীর দিন কাটিবে। তাঁহার অভিমান বুঝিয়া কে আর কাজ করিবে? অভিমানটা যাহাকে স্মরণ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে, সে তখন কতদূরে। তরঙ্গিণী জানিতেন আর কাহারও কাছে সেবা চাহিয়া অভাব মিটাইবার মত দুর্জ্জয় অভিমান সে নহে।

পিছনের বাগানের ভোরের পাখীর কলরবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘরের দক্ষিণ দিকের কুঠরি হইতে যে শিশুটির মধুর কাকলি ফুটিয়া উঠে আজ অন্ধকার না ঘুচিতেই সে তোতাপাখীর মত তাহার নিত্য আবৃত্তির কর্ম্মে লাগিয়াছে, তরঙ্গিণী শুনিতে পাইতেছিলেন। লাবণ্যর শিশুপুত্রের প্রশ্নাবলী ধরাবাঁধা ছিল, "মা, দাদু কই? মা থাম্মা কই?" মা নিদ্রায় অভিভূত, উত্তর দিবে কে? কিন্তু তাহাতে খোকনের কোনো আপত্তি নাই। সে বলিয়া চলিয়াছে, "মা থাম্মা কি কচ্ছে? থাম্মা খোকা দাকৃছে?" মা সাড়া দিল না। কিন্তু তরঙ্গিণীর মনের ভিত্তিতল পর্য্যন্ত হর্ষ ও বেদনার একটা হিল্লোল খেলিয়া গেল। তিনি ঘর হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই খোকারও বাহির হইবার তাড়া পড়িয়া যায়। মুখ হাত ধুইয়া রাত্রের কাপড় চোপড় বদলাইয়া গৃহকাজে লাগিবার আগে ঠাকুমা যদি খোকাকে কোলে করিয়া তাহার প্রশ্নোত্তরমালার যথাযথ অংশগুলি সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি না করেন তাহা হইলে রক্ষা নাই। এ তাঁহার এক মহা কঠিন মধুর কর্ত্তব্য। কাল সকালে যখন খোকা "থাম্মা খোকা দাকৃছে?" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিবে তখন অভাগিনী ঠাকুমা ত ছুটিয়া গিয়া খোকার ননীর মত দেহটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে ছাইয়া দিতে পারিবে না। খোকা দুই দশদিন কাঁদিবে, তারপর ঠাকুমাকে ভুলিয়া যাইবে, আর কাহারও সহিত মধুর সখ্যের সম্বন্ধ পাতাইয়া তাহার কোলে এমনি মিষ্টি হাসি হাসিয়া আপনার ভাষার সমৃদ্ধি দেখাইবে। খোকার সেই ভবিষ্যৎ বন্ধুর প্রতি তরঙ্গিণীর মনে একটুখানি বেদনাময় ঈর্ষা জাগিয়া উঠিল। ঐ কচি বাহু দুটির বন্ধন তাঁহাকে এমন নিবিড় করিয়া বাঁধিয়াছে কে জানিত?

কাল হইতে মনে শান্তি নাই, তাই শেষ রাত্রির শীতল বায়ুর স্পর্শে হরিকেশবের ঘুমটা আজ আর পাকিয়া আসিল না। তিনি সহসা উঠিয়া বসিলেন; দেখিলেন তরঙ্গিণী বিছানায় পড়িয়া চোখ মেলিয়াই কিসের যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। এই বৃহৎ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীকে এমন আলস্যভরে জাগ্রত স্বপ্নের নেশায় মাতিয়া থাকিতে তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি বুঝিলেন মনে বিচ্ছেদের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে তাই এ স্বপ্নালস।

স্বামীকে জাগিয়া উঠিতে দেখিয়া তরঙ্গিণীর স্বপ্নঘোর

কাটিয়া গেল। তিনি বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা, চট্ করে' যে তীর্থে বেরোবে বলে' বল্লে, কথাটা একবার ভাল করে' ভেবে দেখেছ?" হরিকেশব বলিলেন, "বেশী ভেবে দেখ্‌লে সংসারে কোনো কাজ করা যায় না।" তরঙ্গিণী অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "বুঝ্‌লাম হয় না; কিন্তু এই ঘর সংসার কাজকর্ম্ম আপিস আদালত সব একদিনের মধ্যে ছেড়ে বেরোনো কি কখনও সম্ভব?"

হরিকেশব হাসিয়া বলিলেন, "সম্ভব হ'বে না কেন? আজ যদি যমে ডাক দিত, তা হ'লে কি বেশ অনায়াসেই যেতাম না?"

তরঙ্গিণী রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেখ, যা নয় তাই বোলো না। তাতে এতে অনেক প্রভেদ। তোমাকে যাবার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে, ভাব্‌তে হবে সেখানে গিয়ে কেমন করে' কি ভাবে কোথায় থাক্‌বে আবার এখানকার ব্যবস্থাও তোমাকেই কর্‌তে হ'বে। যে সংসার তোমার মুখ চেয়ে আছে, সে ত তুমি যাচ্ছ বলে'ই আজই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে না। ফিরে এসে তার সব অব্যবস্থার ঝক্কি তোমাকেই ত পোয়াতে হবে। কেন তবে আগে থেকে একটু ভেবে চিন্তে কাজ কর না?"

হরিকেশব বলিলেন, "জীবনে অনেক ভেবেছি। সমস্ত সংসারের জন্য ভাব্‌তে হ'লে আজ আর আমার চল্‌বে না। আজ আমার মনে সন্তানের যে ভাবনাটা সব-চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে আমি কেবল সেই দিকেই দৃষ্টি রাখ্‌তে চাই। যদি অন্য দশ দিকে তাকাই তা হ'লে এত ভাববার এত দেখবার জিনিষ সাম্‌নে এসে পড়্‌বে যে আমার কর্ত্তব্য হ'তে আমায় তা চ্যুত না করে' ছাড়্‌বে না। সেজন্যে ওসব দিকে আমি চোখ বুজেই থাকব।"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "কিন্তু সন্তান ত তোমার আর পাঁচটিও আছে; তাদের প্রতি কি তোমার কর্ত্তব্য নেই? তাদের তুমি ফেলে যাবে কি করে'? বড় ছেলেটা সবে আদালতে বেরোচ্ছে, তাকে তুমি ফেলে গেলে সে দাঁড়িয়ে উঠ্‌বে কি করে'? মেজটার আজ ক'বছর বিয়ে দিয়েছ, কিন্তু বৌটি আন্‌বার কোনো ব্যবস্থা করে' দিলে না। তার অল্প বয়স, চারধারে সকলের সঙ্গে মিশ্‌ছে, নিজের একটা সাধ-আহ্লাদও কি হয় না? তুমি যদি তা না বোঝ ত সে কি বেহায়ার মত নিজেই সব জোগাড় কর্‌তে যাবে? আর পার্‌বেই বা কি করে' সে ছেলে-মানুষ? ছোট ছেলেগুলো বাপ মা ছেড়ে কোনো দিন থাকেনি, পড়াশুনা নিয়ে থাকে, জানে মা বাবা তাদের সব সুখ দুঃখের ভার নিয়ে রয়েছে, কোনো ভাবনা নেই। হঠাৎ তাদের এমনি আচম্‌কা ফেলে চলে' গেলে তোমার কর্ত্তব্যের কি কোনো ত্রুটি হবে না?"

হরিকেশব এককথায় বলিলেন, "কিন্তু তারা যে পুরুষ। সংসারে তারা লড়্‌তে জন্মেছে, সংসার তাদের লড়্‌বার অধিকারও দিয়েছে। আর এ অসহায় শিশু বালিকা; মেয়ে হ'য়ে জন্মানোই এদেশে তার এক পরম দুর্ভাগ্য, তার উপর নূতন একটা দুর্ভাগ্যের বোঝা আজীবনের জন্য তার কচি মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে মুক্তি পাবার কি চাইবার তার কোনো অধিকার নেই। আমি তাকে যদি তার মুক্তি অর্জ্জন করে' নেবার ক্ষমতা না দি, তাকে যদি নিজের জীবনটুকু নিজের বলে' পাবার অধিকারী হ'তে সাহায্য না করি, তা হ'লে আমার নিজ পাপের এবং পূর্ব্বপুরুষের জমানো সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত হবে না। একটা মানুষ সব কাজ কর্‌তে পারে না, তরু! ছেলেদের জন্যে আমরা অনেক পুরুষ ধরে' অনেক করেছি। আমি নিজেও কিছু কিছু করেছি। কিন্তু মেয়েকে কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের জালে জড়িয়ে ভালবাসার সব দায়িত্ব শেষ করেছি। আজ যদি আমার সে দায়িত্ব-বোধ একটু জেগে থাকে, তা হ'লে আমার অন্য কর্ত্তব্যের ত্রুটি হ'লেও তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, তরু! আমার হাতে-গড়া এই ঘর-সংসার, আমার নিজের সন্তান-সন্ততি, বৃদ্ধা মাকে ছেড়ে যেতে আমার কি কষ্ট হচ্ছে না মনে কর? আজ তীর্থ বলে পথে বেরচ্ছি, কিন্তু কবে যে ফির্‌তে পার্‌ব তা ত জানি না।"

তরঙ্গিণী নিরুপায় হইয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "ঘরে থেকে কি তুমি তোমার মেয়েকে মুক্তি দিতে, শিক্ষাদীক্ষা দিতে, সকল অধিকার দিতে পার না?"

হরিকেশব বলিলেন, "ঘরে একা সমস্ত সংসারের সঙ্গে কি আমি যুদ্ধ করতে পারব? সংসার যে আমার বিরুদ্ধে। আমার সমস্ত শক্তি ক্ষয় হ'য়ে যাবে কেবল লড়াইয়ে; মেয়ের জন্য ত কিছু করা হবে না। তা ছাড়া সেই লড়াইয়ের এক-একটি ঘা এসে তার বুকেও যে পড়্‌বে। তার থেকে সে এই কচি মনটি নিয়ে বেঁচে উঠ্‌বে কি করে'? তাকেই যদি সংসার পিশে ফেলে তবে মুক্তিই বা আমি দেব কাকে প্রায়শ্চিত্তই বা করব কাকে নিয়ে? এই আনন্দ-উৎসবের মাঝখানেই যে আঘাত আর লড়াই-এর সময় আসন্ন হ'য়ে উঠেছে তার পরিচয় কি কালকেই পাওনি? এখানে থাক্‌তে হ'লে হয় আমাকে ওই দ্বন্দ্ব-আঘাতের তলায় এই ছোট মেয়েটাকে নিয়ে তলিয়ে যেতে হবে, নয় সংসারে নানা অসুখ ও অশান্তির সৃষ্টি করে' পরকে দুঃখ ও আঘাত দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখ্‌তে হবে। তার চেয়ে চল না তরু, আমরা এই তিনটি প্রাণী কিছু দিনের মত দূরে চলে' যাই। সেখানে হয়ত শান্তি পাব, হয়ত মনটা অনেক দুঃখ ভুলে' আবার তাজা হ'য়ে কাজে নাম্‌তে পার্‌বে।"

স্বামীর বেদনা সমস্যা দ্বন্দ্ব সমস্তই তরঙ্গিণী বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার রমণীর মন সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অচ্ছেদ্য বন্ধন কি করিয়া হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না। এই সাম্‌নে ময়নার বিবাহ, একরকম স্থির হইয়াই গিয়াছে ধরা যায়। কে সে কর্ম্ম-সমুদ্রে কর্ণধার হইয়া কার্য্য উদ্ধার করিবে ভাবিয়া কুল-কিনারা মিলে না। ময়নার বাবা মেয়ের গহনা কাপড়গুলাই দিবেন, কিন্তু তাহার পর এই দীর্ঘকালব্যাপী বিরাট্ যজ্ঞ-ব্যাপার, এই তত্ত্ব-তল্লাস, বিদায়, প্রণামী, আশীর্ব্বাদী, আদর-অভ্যর্থনা, সভা-বৈঠক, যানবাহন ইত্যাদির যে অজস্র খরচ সে ত তাঁহারই স্বামীর তহবিল হইতে যাইবে। সে-সব খরচের ভার আজ পর্য্যন্ত কোনো কাজে কাহারও হাতে তিনি সাহস করিয়া ছাড়িতে পারেন নাই, তাহারা এলোমেলো করিয়া পাছে সংসারটা ডুবাইয়া দেয় এই ভয়ে। আজ অনভিজ্ঞ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন তাহাদেরই হাতে সব ফেলিয়া স্বামীকে কপর্দ্দকশূন্য করিয়া তুলিবার সাহস তাঁহার আসিবে কোথা হইতে? বাড়ীতে এই যে এতগুলি পোষ্য, ইহাদের কেহ যদি বা দুই পয়সা আনে ত নিজের পুঁজিতেই তাহা তুলিয়া রাখে। কাজেই সংসারে তাহাদের ভার যে লইয়াছে, হিসাব করিয়া তাহাদের খরচটা একটা সীমার মধ্যে রাখিবার ব্যবস্থাও তাহাকে করিতে হয়। সংসারের মাথা যদি আজ সরিয়া দাঁড়ায় তবে সকলেই কর্ত্তা হইয়া উঠিলে হয় নিঃসম্বল পোষ্যকে দুঃখ পাইয়া দূরে চলিয়া যাইতে হইবে, নয় তাঁহার স্বামীটি দানছত্র খুলিয়া যাইবেন এবং দশ জন নির্ম্মম ভাবে তাঁহার রক্তশোষণ করিয়া আপন আপন অঙ্গ পুষ্টি করিবে। নূতন যে আর-একটা সংসার গড়িয়া তাঁহারা দূরে দূরে ঘুরিবেন, তাহা অর্থ ত জোগাইবেই না বরং অনেক দাবী করিবে। কোথা হইতে আসিবে তাহার খোরাক যদি এমন উদাসীন ভাবে ভাণ্ডারের চাবি দশ জনের হাতে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া যায়?

তরঙ্গিণী স্বামীকে আর-কিছু বলিতে পারিলেন না; কিন্তু একের পর এক করিয়া শাশুড়ী, ননদ, দেবর, জা, ছেলে বৌ, নাতি-পুতি সকলকার ভাবনা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতে লাগিল। কে তাঁহার অভাবে অযত্নে দুঃখ পাইবে, কে অবিবেচনায় সংসারটা ছাইরাই করিয়া ফেলিবে, কে অভিমানে মুখ বুজিয়া কষ্ট সহিবে কিন্তু একটা কথাও জানাইবে না, কে কাঁদিয়া আকুল হইবে, সব যেন তিনি চোখে দেখিতে পাইতেছেন। ঘরের ঝি চাকর, গরু-বাছুর তৈজসপত্রগুলার জন্য পর্য্যন্ত মনটা কেমন করিতে লাগিল। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া ইহারা ঘুরিতেছিল। আজ তিনি কোন্ অজানা আবেষ্টনের ভিতর গিয়া পড়িবেন আর ইহারা এখানে ছত্রভঙ্গ হইয়া কাহাকে যে অবলম্বন করিবে ভাবিয়া পাইবে না।

(৮)

প্রতিদিনের মতই সকালের আলো ঘর দ্বার উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। খোকা ডাক দিল, "থাম্মা, খোকা দাকৃছে?" তরঙ্গিণী বাহিরে আসিলেন; কিন্তু খোকার কলোচ্ছ্বাসে দিনের আলো আজ উজ্জ্বলতর বোধ হইল না। তাঁহার রুদ্ধ অশ্রুর বাষ্পে আজ সমস্ত মলিন দেখাইতেছিল।

ঠাকুমা খোকাকে কোলে করিয়া বুকে চাপিয়া বলিলেন,

"হ্যাঁ দাদু, ডাক্‌ছি। নীচে দুধ সন্দেশ খাবে চল। কাল আর ত থাম্মা ডাক্‌বে না।"

খোকা রাগিয়া ক্ষুদ্র মুষ্টি দিয়া ঠাকুমাকে এক কিল বসাইয়া দিল। ঠাকুমার নির্ম্মমতায় তাহার আপত্তিটা সে অন্য কোনো প্রকারে জানাইতে পারিল না। তরঙ্গিণী হাসিয়া চোখের জল মুছিলেন, লাবণ্যও চোখের জল সাম্‌লাইতে না পারিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অপরাধী খোকা মনে করিল বুঝি তাহারই অতিরিক্ত শাসনে ঠাকুমা ও মার অশ্রুপ্রবাহ দেখা দিয়াছে; সে অপ্রস্তুত হইয়া ঠাকুমার গলা দুই হাতে জড়াইয়া বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তরঙ্গিণী "দাদু আমার, ধন আমার, আঁধার ঘরের মাণিক আমার" করিয়া তাহাকে ভুলাইতে বসিলেন। নিজের উপর তাঁহার নিজেরই রাগ হইতেছিল। "বুড়ো মাগী, সকালবেলা উঠে আমার সোনাকে কাঁদাতে বস্‌লাম। এমন আক্কেল না হ'লে তার এমন কপাল হবে কেন?"

লাবণ্য কথাটা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "মা, আজকেই কি তবে আস্‌তে যাবে?"

তরঙ্গিণী তাহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তোমার শ্বশুরের জেদ আজই যেতে হবে! মা লক্ষ্মী আমার, ঘর আলো করে' থেকো; তোমারই হাতে মা আমার বাছাদের সব সঁপে দিয়ে যাচ্ছি। ওরা বড় অভিমানী, বাপ মা এমন করে' ফেলে চলে' গেলে মুখ ফুটে ত কাউকে কিছু বল্‌বে না। তুমি মা কচি মেয়ে, তবু তুমি মায়ের জাত, তোমাকেই তাদের বুকের কথা টেনে বের কর্‌তে হবে; এই লক্ষ্মীর হাতে তাদের সব অভাব দূর কর্‌তে হবে। তারা যেন ভুলে থাকে যে, তাদের অলক্ষ্মী মাটা তাদের মুখের দিকে না তাকিয়েই দূরে চলে' গেছে।"

লাবণ্য সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "মা, অমন করে' বোলো না। এই ত ক'দিন পরেই আবার ঘুরে' আস্‌বে। আমি ঘর-সংসারের কি জানি যে, তোমার মত সবাইকার মন জুগিয়ে চল্‌ব? এখনও কতকাল আমায় তোমারই পায়ের কাছে বসে' শিখ্‌তে হবে।"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "না বাছা, মন ত কই বল্‌ছে না যে, সহজে আবার ফিরে এসে তোদের হাসিমুখগুলি দেখ্‌ব। শিবুকে বোলো মা, যেন বুড়ো বাপের উপর কোনো রাগ না রাখে। বড় ব্যথা পেয়েই ঘরে টিঁক্‌তে পার্‌ছে না। মেয়ে মেয়ে করে' মাথার আর কিছু ঠিক নেই। শিবু কি তা বুঝ্‌বে না? ওর ত আপনার মায়ের পেটের বোন। আর দেবুর বৌটাকে মা, যেমন করে' হোক্‌ আনিয়ে রেখো। ডাগর হয়েছে, এই ত ঘর কর্‌বার সাধ-আহ্লাদ কর্‌বার বয়স। আমার ঘর-খানাতেই থাক্‌বে অখন। দুটিতে মার পেটের বোনের মত থেকো। খুড়শাশুড়ীদের মান্যি করে' চল্‌তে শিখিও, ওদের কুনজরে ছেলেমানুষ যেন না পড়ে। আমি অভাগী কত দিনে যে তার চাঁদমুখখানি দেখ্‌ব তা ত জানি না।"

লাবণ্য ভয় পাইয়া বলিল, "মা আমি কি ওসব পারি? তুমি ফিরে এসে সব কর্‌বে।

তরঙ্গিণী তাহার ভয় দেখিয়া দুঃখের ভিতরও হাসিয়া বলিলেন, "ওরে পাগলী, অত ভয় পাচ্ছিস্‌ কেন? এই ময়নার বিয়ে আস্‌ছে; শিবুকে বল্‌বি, ঠাকুরপোর নাম করে' আন্‌তে পাঠিয়ে দেবে; সঙ্গে একটু দই মিষ্টি দিয়ে দিলেই হবে।"

হঠাৎ কখন গৌরী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। কালকার অপমানের কথা আজ আর তাহার মনে ছিল না। ময়নার বিবাহ হইবে শুনিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া নাচিয়া উঠিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, তোমরা কোথায় যা'বে মা? আমি কিন্তু বাড়ীতে বৌদির কাছেই থাক্‌ব। ময়নার বিয়েতে সবাই মজা কর্‌বে আর তোমরা বোকার মত বেড়াতে চল্লে! কি বুদ্ধি!"

মা বলিলেন, "বৌদি তোমার মত ধিঙ্গী মেয়েকে রাখ্‌বে কি না? কখন কি বোকামি করে' বস্‌বে আর ও বেচারীর প্রাণ বেরোবে।"

গৌরী মাথাটা নাড়িয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, রাখ্‌বে না বৈ কি? বড় আহ্লাদ! তা হ'লে আমি ছোট কাকীর কাছে থাক্‌ব।"

"ছোট কাকী, ও ছোট কাকী" করিয়া দুতলা হইতেই চীৎকার করিতে করিতে গৌরী চলিল।

লাবণ্য বিপদ দেখিয়া বুদ্ধি করিয়া বলিল, "আরে দূর বোকা মেয়ে, এখনি কি জন্যে ছুটেছিস্ কাকীমার কাছে? ময়নার বিয়ের এখন অনেক দেরী আছে। তুই ফাঁকতালে বেড়িয়ে আয় না, এইবেলা। আর কারুর ভাগ্যে ত জুটবে না।" গৌরীর বন্ধুপ্রীতি উথলিয়া উঠিল; সে মার আঁচল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "তা হ'লে ময়নাকেও নিয়ে চল না, মা। বেশ দুজনে কেমন বেড়াব!"

মা তাহার কথার জবাব না দিয়া তাড়াতাড়ি আঁচলটা ছাড়াইয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেলেন।

কলতলায় বিধু ঝি কোমরে আঁচল জড়াইয়া বাসন মাজিতে বসিয়াছিল; সে গিন্নিকে দেখিয়া আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পায়ে পড়িল, "হেই মা, আমাদের কার হাতে ফেলে দিয়ে যাচ্ছ মা? তুমি চলে' গেলে মেজমা ত আমাদের একটা কথা কানেও করবে না; আর ছোট মা সারাদিন খিটির্ খিটির্ করবে। তবে মা, আমাদের হিসাব চুকিয়ে দাও, আমরা চলে' যাই। তুমি না থাক্‌লে এবাড়ীতে আর কাজ করবনি।" নিশি ঝি উঠান ঝাঁট দিতেছিল, সে ঝাঁটা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বিধুর কথায় সায় দিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, জগুও তাই বল্‌ছিল; আমাদের তবে হিসাব মিটিয়েই দাও।"

তরঙ্গিণী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কেন রে, তোদের এত হৈ চৈ কিসের? আমাকে কি তোরা নিমতলার ঘাটে পাঠাচ্ছিস যে, এজন্মের মত সব হিসেব মিটিয়ে যেতে হ'বে? আমার ঘর-সংসার কি আজ থেকেই শেষ হ'ল?"

নিশি জিব কাটিয়া বলিল, "ষাট, ষাট, মা অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে? তুমি জন্ম জন্ম তোমার ঘরে রাজত্বি কর। আমরা গরীব দুঃখী, দিন আনি, দিন খাই; তাই মা দুদিনের ভয়েও মরি।"

বাহির বাড়ী হইতে তরঙ্গিণীর ছোট তিন ছেলে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে ভিতরে মুখ হাত ধুইতে আসিতেছিল। মাকে দেখিয়া তাহারা আজ পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, যেন দেখিতেই পায় নাই।

ছোট ছেলে শঙ্করপ্রসাদ অনেক দিন পর্য্যন্ত মার আদুরে কোলের ছেলে ছিল। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাত্রে মায়ের গায়ে পা না তুলিয়া দিয়া এবং মুখখানা পাখীর ছানার মত মায়ের বুকের ভিতর না গুঁজিয়া দিয়া সে ঘুমাইতে পারিত না। মায়ের আদর পাইয়া পাইয়া কান্নাকাটি মান অভিমানে সে অনেকটা মেয়েদের মতই দুরস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সেইজন্য বেশী বয়স পর্য্যন্ত "প্যান্‌সে চোখের" জন্য দাদাদের কাছে তাহাকে যতখানি ধিক্কার পাইতে হইত, ডানপিটেমির অপবাদ ততখানি জীবনে তাহাকে কখনও সহিতে হয় নাই। তাহার আট বৎসর বয়সে গৌরী যখন অকস্মাৎ মাকে বেদখল করিয়া লইল, এবং অতটুকু কচি মেয়ের পাশে তাহার আট বছরের শিশুত্বটা যখন মা বাবার চোখেও বেমানান ঠেকিতে লাগিল, তখন হইতেই গৌরীর প্রতি তাহার মনে কেমন একটা ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছিল। সে গৌরীকে আর সকলের কাছে খুব ঘটা করিয়া ভালবাসিত, আদর দেখাইত এবং নিজের একটা মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া গর্ব্বও অনুভব করিত, কিন্তু বয়সের অতখানি তফাৎ হইলেও মাকে লইয়া এবং তাঁহার ভালবাসার লঘুত্ব গুরুত্ব বিচারে গৌরীর সঙ্গে তাহার একটা রেসারেসির ভাব বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। এদুর্ব্বলতাটা সে ছাড়িতে পারিত না। গৌরী কথা বুঝিতে এবং বলিতে শিখিবার পর সে যখন তখন গৌরীকে মায়ের কোল হইতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিত, "যা, বেরো আহ্লাদী মেয়ে, কোথা থেকে একটা ঢেপ্‌সী মেয়ে এসে আমার এতদিনের মাকে কেড়ে নিয়েছে! যা, তোকে দেব না।"

গৌরী কান্না জুড়িয়া দুই হাতে চড় চাপড় চালাইলে কখনও কখনও শঙ্কর সদয় হইয়া পিতাকে গৌরীর সম্পত্তিরূপে দান করিয়া দিতে রাজি হইত, কিন্তু মাতাকে বেহাত করিতে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল।

আজ একদিনের আয়োজনে বিদায়ের কোনো ভূমিকাই না করিয়া গৌরীর জন্য মাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া শঙ্করের মনে এই উনিশ বৎসর বয়সেও শৈশবের সেই ঈর্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এবয়সে ঈর্ষা অভিমানরূপেই বেশী প্রবল হইয়া উঠে, তাই আজ সে মাকে কিছু না বলিয়া মুখ ধুইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে গিয়া জগুকে ডাকিয়া বাজারের খাবার আনিতে

দিল। তরঙ্গিণী ছেলেদের দেখিয়াই তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে ছুটিয়াছিলেন জলখাবারটা নিজের হাতে সাজাইয়া দিতে। সকলে আসিল, শঙ্কর আসিল না দেখিয়াই তিনি প্রমাদ গণিয়াছিলেন। মৃণালিনীর ছেলে ট্যাবাকে দৌড় করাইলেন শঙ্করকে ডাকিয়া আনিতে। সে আসিয়া বলিল, "শঙ্করদা, বাজার থেকে খাবার আনিয়ে খেয়েছে। সে বল্‌লে তার অনেক পড়া বাকি, এখন আস্‌তে পার্‌বে না।"

তরঙ্গিণীর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি সেজ ছেলে মহেশকে বলিলেন, "একবারটি ডেকে আন্‌, বাবা। এই কি রাগ কর্‌বার সময়! পড়া যে কত কর্‌ছে, তা আমি বেশ জানি। এতক্ষণে কেঁদে বালিশ ভেজাচ্ছে। এমন কচি ছেলেটাকে কার কাছে কোন্‌ ভরসায় যে ফেলে যাচ্ছি, ভগবান্‌ জানেন।"

মহেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি পারি না তোমার ন্যাকা ছেলেকে ডাক্‌তে। তেধেড়েঙ্গা একটা তালগাছের মত লম্বা ছেলে, একমুখ দাড়ি গজালেই হয়! তিনি এখন নোলকপরা খুকীর মত প্যান্‌ প্যান্‌ কর্‌বেন, আমার দায় পড়েছে ডাক্‌তে। তোমাদের জ্বালায় বাড়ীতে পড়াশুনো করাই শক্ত হ'য়ে উঠেছিল। আমার ত ভালই হ'ল, আমি এবার হষ্টেলে চলে' যাব, তোমাদের ওসব নাকেকাঁদা ছেলে-টেলে সাম্‌লাতে পার্‌ব না।"

মা বুঝিলেন, এই রুক্ষপথেই মহেশের অভিমানও উপচিয়া পড়িতেছে। সে যে তাঁহাদের কোনো তোয়াক্কা রাখে না এইটা জোর করিয়া দেখাইয়াই সে আপনার অভিমান চাপা দিতেছে। মহেশ এক এক গ্রাসে অনেকখানি করিয়া খাবার মুখে পূরিয়া আর বেশী বাক্য-ব্যয় না করিয়া কোনোদিকে না তাকাইয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তরঙ্গিণীর মনে হইল, মহেশের মুখখানা আজ বড় কালো আর শীর্ণ দেখাইতেছে। এতদিন তিনি ছেলের মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবারও যে অবসর করিতে পারেন নাই ইহার জন্য মনে ধিক্কার জন্মিতে লাগিল। আজ ত আর সময় নাই। আপনা হইতেই তাঁহার চোখ আর কয়টি ছেলের মুখের উপর বুলাইয়া গেল; মায়ের চোখে সকলকেই রুক্ষ বিমর্ষ নিরানন্দ বলিয়া বোধ হইল। তাহারা যেন আজ সকলেই কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তরঙ্গিণী ভুলিয়া গেলেন যে, প্রতিদিনই তাহারা প্রায় এম্‌নি নীরবেই আহার সমাধা করিয়া চলিয়া যায়। আজ তাঁহার আপনার অন্তরের ব্যাকুলতাই যে নীরবতাটাকে এত দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের রুদ্ধ বেদনা যে তাহা আরো প্রগাঢ় করিয়া তুলিতেছে সে-কথা ভাবিয়া দেখিবার শক্তি তখন তাঁহার নাই। ছেলেরা চলিয়া গেল। মা'র ইচ্ছা করিতেছিল আর কিছুক্ষণ তাহাদের চোখের সাম্‌নে বসাইয়া একটু আদর করিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া কোনোপ্রকারে আপনার বিচ্ছেদব্যথাটা তাহাদের বুঝাইয়া দেন। কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতির বিজ্ঞ ছেলেরা অনেক কাল এসব আদর-আব্দারের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাই আজ মনে ইচ্ছা জাগিলেও কাজে তিনি কিছু করিতে পারিলেন না। কেবল যাহাকে পারিতেন সেই তাঁহার উনিশ বৎসরের শিশুপুত্র শঙ্কর আজ কেবলি পলাইয়া বেড়াইতেছে। অন্য দিন হইলে সে এরি মধ্যে দুই একবার আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া যাইত।

কিন্তু আজ সমস্ত সংসার যে তাঁহার বিধি-ব্যবস্থার আশায় চা'হিয়া আছে; তরঙ্গিণীকে ছেলের মায়া ভুলিয়া উঠিতে হইল।

বধূকে দেখিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন, "মা, এই কি তোমার তীর্থধর্ম্মের সময়, মা? আমি বুড়ী ঘরে পচ্‌ব আর আমার বাছারা পথে পথে ঘুরে' বেড়াবে? ওই কেশবের হাত ধরে' কত দুঃখ সয়ে এই সংসার গড়ে' তুলেছিলাম। মা রাজরাণী যখন ঘরে এলে তখন কত আশা করেছিলুম তোমাদের কোলে মাথা দিয়ে চোখ বুজ্‌ব। আজ কার হাতে সোনার সংসার ফেলে দিয়ে জোড়ে আমার ঘর আঁধার করে' দিয়ে যাচ্ছ মা? ঐসব কচি কাচা ছেলে বৌ ঝি ওদের কার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকে বল পাব বলো ত?"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "মা, তোমার ভাবনা কি? মেজ-বৌ ছোটবৌ রয়েছে, তারা তোমার কত যত্ন-আদর কর্‌বে, দেখো তখন আমার কথা মনেই পড়্‌বে না। আজ

তুমি যদি না মা, হাসিমুখে আমাদের যাত্রা করাও তবে কি ঘর ছেড়ে' বেরোতে পারি? তোমার পায়েই ঘরসংসার সব ফেলে' যাচ্ছি; একদিন তুমিই একে গড়েছিলে, জানি আজও তুমিই একে রক্ষা করবে; আর দূরে থেকে তোমার গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করবে যেন ওর জীবনটা আমরা কোনো দিকে সার্থক করে' তুলতে পারি।"

বড় ঠাকরুণ বলিলেন, "কি আর বল্‌ব মা কচি মেয়েকে? ভগবান ধর্ম্মে ওর মতি দিন, তাঁকে চিন্‌তে শিখুক, সারাজীবনের দুঃখ আপনি জয় করতে পারবে।"

জা, ননদ সকলেই এতকাল তরঙ্গিণীর উপর নির্ভর করিয়াছে, আজ অকস্মাৎ তাঁহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সকলেই একটু বিচলিত হইয়া পড়িল—এত বড় সংসার টুক্‌রা টুক্‌রা ভাগ করিয়া ত' চলিবে না, না জানি কাহাকে সব ঝক্কি পোহাইতে হইবে? শাশুড়ী আজ আপনি ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "মেজ বৌমাকেই সব বুঝিয়ে দাও মা, যা পারে ওই করবে। টাকার ঝক্কি ত আর বইতে হবে না। সে ত আমার কেশব দূরে থেকেও সমানে মাথায় করে' বইবে জানি।"

সর্ব্বকর্ম্মে-উদাসীন মেজবৌর গৃহিণীপনায় কাহারও মন উঠিল না বটে, তবে রুদ্রমূর্ত্তি ছোটবৌ অপেক্ষা মেজবৌকে সকলেই মন্দের ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। আদর যত্ন সুবিচার না পাওয়া যাক্, তরঙ্গিণীর সর্ব্বব্যাপী স্নেহস্পর্শ আর না জুটুক, অত্যাচার অবিচারের ভয় যে বেশী নাই, ইহাই সান্ত্বনা। বালক বৃদ্ধ, দাসী চাকর সবাইকে যেন মাতৃহারা অসহায় শিশুর মত তরঙ্গিণীর মনে হইতেছিল। মেজ-বৌকে দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, "সংসারটার উপর চোখ রাখিস্ ভাই। দূর থেকে তোকে মনে করে' আমার মনটা নিশ্চিন্ত হবে, এইটুকু আশ্বাস আমায় দে।"

বারে বারে নানা জনের হাতে সংসারটা সঁপিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু দিন বহিয়া যাইতেছিল, এখন বন্ধন ছিন্ন না করিয়া গতি নাই; তাঁহাকে যাত্রার আয়োজনও ত করিতে হইবে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল; সমস্ত সংসারটার উপর যে গাঢ় অন্ধকারের কালিমা ছাইয়া পড়িয়াছে, বাতির আলোতে তাহা আরো নিবিড় দেখাইতেছিল। এতবড় সংসারের নানা প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের যত কোলাহল, শিশু ও বয়স্কের হর্ষ ও বিষাদের যত রকমের প্রকাশ সব আজ নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গিয়াছে। হাঁকডাক, কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি, গল্পগুজব কোথাও কিছুর সাড়া নাই। গৃহ-সর্ব্বস্ব এই সংসারের বাহিরের সঙ্গে বড় সম্পর্ক ছিল না। আজ বিচ্ছেদরূপে অকস্মাৎ বাহিরের হাওয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়া সকলের দৈনন্দিন সহজ জীবন-স্রোতকে হঠাৎ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বাহির পানে এই যাত্রার আয়োজন গৃহানুরাগী পুরাতন সংসারে যেন একটা দুর্দ্দৈব। জগতে এমন অঘটন যেন কখনও ঘটে না; তাই সকলেই বিস্ময়ে ও বেদনায় স্তম্ভিত হইয়া আছে।

সময় হইয়া আসিল। গাড়ীতে জিনিষপত্র উঠিয়াছে। ময়নাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে না পারায় গৌরী সান্ত্বনা স্বরূপ তাহার মেঘমালা প্রভৃতি সব পুতুলগুলি ময়নাকে দান করিয়া ফেলিল। টিনি শৈল ট্যাবাকেও সে বঞ্চিত করে নাই। কাশীর খেলনা, চিনামাটির হাঁস প্রভৃতি যা কিছু সম্পত্তি তাহার ছিল দাতাকর্ণের মত সকলকে তাহা ভাগবাটোয়ারা করিয়া দিয়া নিঃসম্বল হইয়াই সে আজ চলিয়াছে।

হরিকেশব তাঁহার লম্বা ছুটির জন্য দরখাস্তখানা পুত্র শিবপ্রসাদের হাতে দিয়া ও সেই সঙ্গে একটা বড়রকম চেকও তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া ঘরের বাহির হইলেন। কাল অকস্মাৎ যাত্রার প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলেও আজ যেন ঘর ছাড়িয়া তাঁহার পা উঠিতেছিল না। এই চির-পরিচিত গৃহদ্বার, এই তাঁহার চিরসাথী জীর্ণ পুঁথি ও পুরাতন আস্‌বাবগুলিও যেন মুখ অন্ধকার করিয়া অভিমান-ভরে বলিতেছে, "আমাদের ফেলে কোথা যাও?" মনে হইতেছে মাতা পুত্র ভাইবোন সকলের কাছে তিনি যেন অপরাধী। তাহাদের ছাড়িয়া যাইবার অধিকার কি তাঁহার আছে? সেই কল্পিত অপরাধের লজ্জায় তিনি মুখ তুলিয়া সকলের দিকে তাকাইতে পারিতেছেন না। দূরে থাকিয়াও তিনি যে তাহাদের সাহায্য যথাসাধ্য করিবেন এটা যেন কৈফিয়তের মতই সকলকে বুঝাইয়া

প্রমাণস্বরূপ এখনই সাধন ও শিবপ্রসাদকে বড় বড় চেক লিখিয়া দিতেছেন।

তার পর সঙ্কুচিতভাবে মাকে প্রণাম করিয়া "মা, এরা ত সকলেই রইল তোমার কাছে" বলিয়া তাড়াতাড়ি সবার আগে গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। তরঙ্গিণী প্রণামাদি সারিয়া শঙ্করকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিলেন। দেখিয়া গৌরীও কাঁদিয়া ফেলিল। শঙ্করের উদ্গত অশ্রু গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল, পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যটা শেষ পর্য্যন্ত সে আর রক্ষা করিতে পারিল না। হরিকেশব মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কানে শব্দ আসিল, খোকা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "মা, থাম্মা যাব, গগ যাব।"

সমস্ত ঘরসংসার চোখে যেন ঝাপ্‌সা ঠেকিতেছিল। বা হাতখানা কেমন যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ছায়ার মত ঘর দ্বার চোখের সাম্‌নে মিলাইয়া গেল। কি একটা আশঙ্কায় মনটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। বুকের ভিতর শূন্যতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। কি যেন চিরতরে হারাইয়া গেল। হরিকেশবের মনে হইল "আর কি এ গৃহে সকলের মাঝে ফিরিব না, না, আর কিছু? গৌরীকে কি হারাইয়া আসিব?" তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না।

(ক্রমশঃ)

ত্রেন্তিনোয় পাহাড় দেখা

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

(১)

স্থগানা উপত্যকায় আসিয়াছিলাম রেলে,—ত্রেন্তো হইতে পূর্ব্বদিকে। লেভিকো পর্য্যন্ত বিশ পঁচিশ মাইলে চড়াই উঠিতে হইয়াছিল মাত্র প্রায় নয় শ ফিট।

সেই পথই আবার দেখিলাম খোলা অটোমোবিলে। এই দেখা আর রেলে দেখায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মাথাটা যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে আসমানের তলে খাড়া হইতে না পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধরাতলের সম্পদ প্রায় অনধিকৃত থাকে।

আবার পায়দলেও সেই স্থগানা "তালের" উঠা-নামার সঙ্গে উঠিলাম নামিলাম। এই উৎরাই চড়াইয়ের কিম্মৎ লাখ টাকা। প্রকৃতির গতি-বিধির সঙ্গে মাংস-পেশীর যোগাযোগ যেই হইল তখনই বুঝিলাম দুনিয়াখানা একটা বিপুল ইমারত। এই বিপুল বস্তুর গড়ন-বৈচিত্র্যই একসঙ্গে হাজার "গথিক" গির্জ্জা আর "গোপুরম্" পয়দা করিয়াছে।

স্থগানা তালের কোথাও কোথাও নোন-উপত্যকার বিরাট উচ্ছৃঙ্খলতাই বিরাজ করিতেছে। পাহাড়গুলাকে দুর্গ বলিব কি দুর্গগুলাকে পাহাড় বলিব সমঝিতে পারিতেছি না। দুর্গে আর পাহাড়ে এখানে বিলকুল "প্রকৃতি-পুরুষের" সংযোগ। চিহ্নেৎ-সোনায় পাহাড়ের গা দেখিয়া কার সাধ্য বুঝে যে, এ একটা কেল্লার দেওয়াল।

বিপজ্জনক পথে কোথায়ও ঝরণার বা দরিয়ার তেজ স্পর্শ করিতেছে। সঙ্গী সেখানে গলায় ঘণ্টাওয়ালা ছাগলের দল। ঝোঁপে ঝোঁপে হয় লাল "পপি" কিম্বা "জিরানিয়াম" ফুলগুলা অথবা নীলাভ হল্‌দে "প্লাম" ফুলের গোছা পার্ব্বত্য তাণ্ডবে সুষমা ছড়াইতেছে।

পাহাড় দেখার সাধ মিটাইতেছি। নীচের দিকে পাইন-বন যদিও বিরল,—কিন্তু লিণ্ডেন বা কাষ্ঠানিয়েন গাছের শাখায় শাখায় পাখীর বৈকালী গান কানে পশিতেছে। লেভিকোর নিকট বিয়াজিয়ো পাহাড়টায়

পাখী চুঁড়িতেই বাহির হই। কিন্তু আওয়াজ মাত্র শোনা যায়। "নাইটিঙ্গেল" ও "ফিঞ্চ" ইহাদের পশ্চিমা নাম।

(২)

এই উপত্যকায় পার্জিনে পল্লী ত্রেন্তো আর লেভিকোর মাঝামাঝি। এখানে এক তাঁতী যুবার সঙ্গে আলাপ হইল। রেশমের চাষ ও কারবারে পার্জিনে এই অঞ্চলের বড় আড্ডা। যুবার বাপ, ভাই সকলেই রেশমের কাপড় তৈয়ারী করে। শুনিলাম,—চীনা পোকা আনাইয়া ইতালিয়ান্ পোকার সঙ্গে "কলম" করা হইয়া থাকে। এই বর্ণসঙ্করে যে রেশম প্রস্তুত হয় তাহাই নাকি সেরা।

এই ধরণের বর্ণসঙ্করের ব্যবস্থা দেখিতেছি আঙুরের চাষেও। একজনের কথায় বুঝিতেছি যে, ইয়াঙ্কিস্থানের আঙুরের বীজ আমদানি করিয়া ইতালিয়ানেরা স্বদেশী চাষের উন্নতি বিধান করিতেছে। ভারতেও মার্কিণ গম এবং তুলার বীজই আমাদের এই দুই প্রধান শস্যকে 'জাতে' তুলিতেছে। দুনিয়ায় আমেরিকার দান অনেক।

এক চাষীর ঘরবাড়ী দেখিতে তাহার "মধুচক্রে" গিয়া হাজির হইলাম। মৌমাছির "চাষ" করিবার জন্য যে-সকল বাক্স কায়েম হইতেছে সেগুলা মার্কিণ ওস্তাদের "পেটেণ্ট।" রোঙ্কেবেত্তোর এক লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক সেই কাঠাম নকল করিয়া ত্রেন্তিনোয় অনেক মধুর বাক্স চালাইতেছে।

(৩)

রোণবেঙ্কো, লেভিকো, পার্জিনে বা অন্যান্য পল্লী-গুলার কোনোটাই হাজার দেড়েক ফিটের উঁচু নয়। কিন্তু স্থগানা তালের গিরিশৃঙ্গ প্রায়ই পাঁচ ছয় সাত হাজার ফিট উঁচু।

কোনো কোনো পাহাড়ের উপর উঠিয়া পায়চারি করিতে থাকিলে দেখিতে পাই অপর পারের লোকালয় ও চাষের ক্ষেতসমূহ—কোনোটা পাহাড়ের কোলে কোনোটা বা পাহাড়ের ঘাড়ে বুকে বা পায়ে। কাজেই চোখের সম্মুখে মোটে কালো খোলার চালাগুলার ঢেউ সবুজ আবেষ্টনের ভিতর ভাসিতে থাকে। উপরের মাইলের পর মাইল ছোট ছোট পাইনের সমুদ্র। গিরিশৃঙ্গের পাথুরে নীরস খটখটে তরঙ্গ ত আকাশের ঐশ্বর্য্য বটেই।

কিন্তু বোধ হয় এই অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর দৃশ্য পল্লী গির্জ্জাগুলার চূড়ার লহর। মন্দিরহীন গাঁ স্থগানাতালে একটাও দেখি না। টিরোলের অষ্ট্রীয়ান ও আল্পসেও মন্দিরের শিখর-সমূহ লহরিতে থাকে। সুইস আল্পস্‌বাসীদের পল্লীজীবনেও মন্দির-চূড়ার উঠা নামা পর্ব্বত-শৃঙ্গের তরঙ্গমালারই প্রায় সমান্তরালরূপে দেখা দেয়। আল্পস্ পাহাড়ের গোয়ালা, চাষী, তাঁতী, ছুতার, বাবু, কেরাণী, ইস্কুলমাষ্টার সকলেই "ধর্ম্মহীন" জীবনকে পশুত্বেরই সমান বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত! ভারতে মন্দিরের সংখ্যা বেশী কি ইয়োরোপে গির্জ্জার সংখ্যা বেশী?

(৪)

রোদে ইয়োরোপীয়ান্ নরনারীর মুখ চোখ বুক পিঠ হাত পা পুড়িয়া লাল্‌চে হইয়া যায়। ইহারা গ্রীষ্মকালে এইরূপ কটা বা বাদামি রং পরিতে পছন্দ করে। আর, ভারতবাসীর সনাতন বাদামি খোলসে আর-একপোঁচ কালো লেপা হইয়া যায়।

এইরূপে রোদ পোড়া খাইতে খাইতেই মাঠে শুক্‌না ঘাসের গন্ধ শুঁকিতেছি। অথবা গাছে গাছে পীচ, আপেল, বা পেয়ারফলের সংখ্যা আন্দাজ করিতেছি। "দিনে দিনে" এসব "পরিবর্দ্ধমান" সন্দেহ নাই,—তবে "ছুরী নূন হাতে" ছুটিয়া আসিলেও বড় বেশী আরাম পাওয়া যায় না। জুলাই মাস,—আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা দরকার।

যাহা হউক গোয়ালার পরিবারে ছেলেপুলেদের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া গেল। গোয়ালিনী গরম দুধ ও তাজা "ঘরের মধু" দিয়া আপ্যায়িত করিল। সুখ-দুঃখের বাক্যালাপ চলিতেছে।

(৫)

প্রায় পরিবারেরই বিঘা দুইচার জমি। গোটা অঞ্চলই বেশ উর্ব্বর। প'ড়ো জমিন একছটাকও নয়। অথচ পল্লীগুলা সবই দরিদ্র কেন? স্থগানাতালে, নোনতালে, আদিজে-তালে—হাঁটিয়া রেলে বা বিনাপয়সার

বোৎসেনের এক গির্জ্জা

ত্রেল্লার অঞ্চলের পোষাক

অটোমোবিলে,—যতগুলা ঘরবাড়ী দেখিয়াছি সবই পুরানা ভাঙাচুরা, অপরিষ্কার। স্বচ্ছলতার, আরামের, জীবনানন্দের কোনো প্রকার বাহ্য লক্ষণ দেখিতে পাই না। নতুন বাড়ীঘর, মেরামত করা কপাট বা দেওয়াল, বাধানো চক্‌চকে রোয়াক, অথবা সড়কের স্বাচ্ছন্দ্য একদম বিরল।

একজন লিখিয়ে-পড়িয়ে ইতালিয়ান্ বাবু বলিলেন,—"একমাত্র চাষ আবাদের জোরে ত্রেন্তিনোর লোকেরা বড় লোক হইবে কি করিয়া? আমাদের এই জনপদে শিল্পের অভাব যৎপরোনাস্তি। ইতালিয়ান্‌দের ধাতে নয়া নয়া শিল্প কায়েম করিবার ক্ষমতা আজ পর্য্যন্ত জন্মিল না। অথচ অষ্ট্রিয়ান্‌রা শিল্পে বাণিজ্যে লক্ষ্মীমন্ত লোক।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"ত্রেন্তিনো ত এতদিন অষ্ট্রিয়ার দেশেই ছিল। অষ্ট্রিয়ান্ আমলে এখানে শিল্পের বিকাশ হয় নাই কেন?" ইতালিয়ান্ সঙ্গী বলিতেছেন:—"অষ্ট্রিয়ান্—জার্ম্মান্ জাতের একটা রোক্ বা গোঁ আছে। সেই রক্তের জোর আমাদের নাই। অন্ততঃ পক্ষে এ পর্য্যন্ত আমাদের চরিত্রে সেইরূপ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেখা দেয় নাই।"
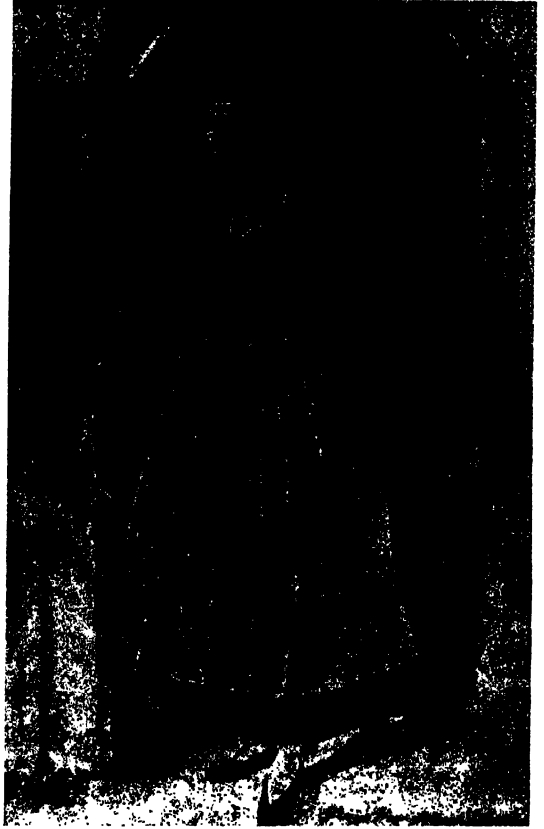
(৬)

ত্রেন্তোর বিশ পঁচিশ মাইল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্রই ইতালিয়ান্ ভাষার "মণ্ডল"। রক্তে ও ভাষায় এই জনপদের নরনারী খাঁটি ইতালিয়ান্। হ্বেনেৎসিয়া প্রদেশের যে ইতালিয়ান্, ত্রেন্তিনোর এই অঞ্চলেও ঠিক সেই ইতালিয়ান্।

তবে অষ্ট্রিয়ান্ আমলে পাঠশালার কৃপায় গোয়ালা

চাষী তাঁতীরাও কিছু কিছু জার্ম্মান্ শিখিয়াছে। সেই জার্ম্মানের জোরেই পল্লী পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব হইতেছে।

বোল্‌জানো বা বোল্‌ৎসানো
(আসল জার্ম্মান্ নাম বোৎসেন্)

ইতালিয়ান্ গবর্মেণ্ট ত্রেন্তিনোকে পুরাপুরি ইতালিয়ান্ আদর্শে গড়িয়া তুলিবার জন্য হয়রাণ। আজ অমুক "জাতীয় উৎসব, কাল অমুক স্বদেশ-সেবকের জন্মতিথি, পরশু অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অমুক লড়াইয়ের ঘোষণা দিবস, অথবা অমুক দিন অমুক শহরে ইতালিয়ান্ পল্টন প্রবেশ করিয়াছে, এইসবের স্মৃতি-রক্ষার জন্য "রাষ্ট্রীয়" পালা-পার্ব্বণ যৎপরোনাস্তি। রোজই পল্লীতে পল্লীতে একটা-না-একটা কাণ্ড উপলক্ষে "জাতীয়" পতাকা উড়িতেছে অধিকন্তু কালো কুর্ত্তাপরা ফাসিষ্ট্ যুবাদের ঘন ঘন গতিবিধি এবং সর্দ্দারি লাগিয়াই আছে।

(৭)

জার্ম্মান্ ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইতালিয়ান্ গবর্মেণ্টের "খাঁটি স্বদেশী" ইতালি সেবকদের এবং ফাসিষ্ট্-সমিতির পাণ্ডাদের জুলুম খুব বেশী। গোটা ত্রেন্তিনো প্রদেশের লোক-সংখ্যা প্রায় সাত লাখ হইবে। তাহার ভিতর খাঁটি ইতালিয়ান্ নরনারী মাত্র চার লাখ। অপর তিন লাখ লোক রক্তে ভাষায় চেহারায় মায় চুলের রঙে অষ্ট্রিয়ান্ অর্থাৎ জার্ম্মান্।

এই জার্ম্মান্ রক্তওয়ালা নরনারীদের উপর ইতালিয়ান-দের হামলা এই পাঁচ বৎসরেও থামে নাই। কোনো ইতালিয়ানের সঙ্গে রাস্তায় ঘাটে দেখা হইলে অভিবাদন দিবার সময় কোনো জার্ম্মান্ পুরুষ বা স্ত্রী ভুলিয়া হঠাৎ যদি "বোন্ জ্যোর্ণো"র বদলে "গুটেন্ টাগ" বলে তাহা হইলে সেই জার্ম্মান্ পরিবারের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন হইবার

ঝুলা রেল (বোল্‌জানো)

আশঙ্কা আছে। মারপিট, রক্তারক্তি, লুটপাট অনেক হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মান্‌রা ভয়ে জড়সড় হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা মুমূর্ষু ভাবে জীবন ধারণ করে। ভারত-সন্তানের পক্ষে এ এক নতুন দৃশ্য, কিন্তু "ঘাগী" গোলাম ভাজা গোলামদের জীবন-কথা বিনা বাক্য-ব্যয়েই বুঝিয়া লইতেছে।

অষ্ট্রিয়ান্‌রা এতদিন ইতালিয়ান্‌দের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল। ১৯১৯ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে। শাস্ত্রেই আছে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি। প্রতিহিংসা লওয়া "মানুষ" মাত্রের স্বধর্ম্ম।

(৮)

পাহাড়-ভ্রমণের এক নয়া পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি ঘণ্টা-পাঁচেকের বেশী একটানে রেলে চলা বেকুফি। আধাদিন রেলে কাটাইয়া আধাদিন রাখাল কিষাণদের সঙ্গে হামদর্দ্দি চালানোই প্রকৃষ্ট পন্থা। রাত্রিযাপন যথাস্থানে তৃতীয় শ্রেণীর মোসাফির,—বলাই বাহুল্য। রুটী দুইচার টুকরা, কিছু মাখন আর বড় জোর দুএকটা ডিম সিদ্ধ পথের সম্বল। মাঠে মাঠে ফলের ত অভাব নাই-ই আর দুধের জন্য ভাবনাই বা কি? "ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী।"

একদিন "আলবের্গোয়" বসিয়া "রিজত্তো" ভাত খাইতেছি। তিনটি অষ্ট্রিয়ান্ যুবা আসিয়া হাজির। ইতা-

ফাসসাতালের পোষাক

জার্ম্মাণ চারণ হ্বাণ্টার (বোৎসেন)
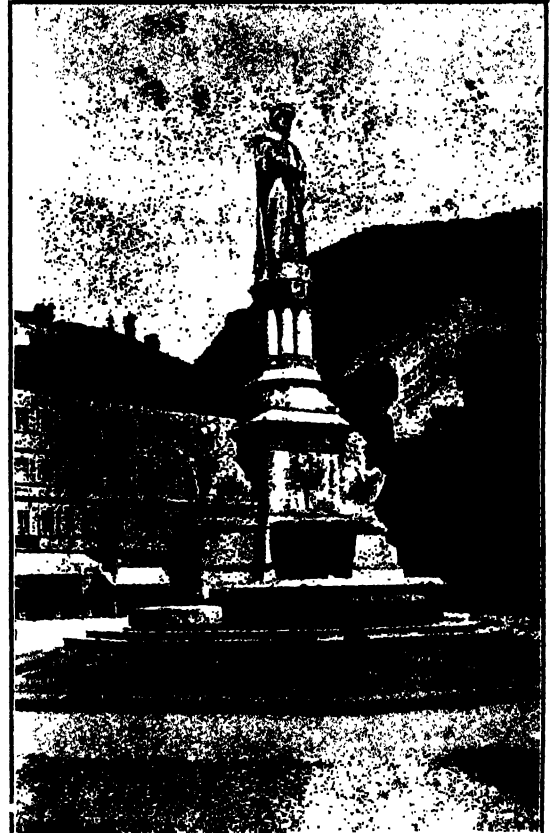
...দর হ্বিয়েনা হইতে আল্পস্ পার হইয়া ত্রেন্তিনোয় পৌঁছিয়াছে। সবই পায়দল। এখন আবার পায়দলই স্ইটজার্ল্যাণ্ড হইয়া ফ্রান্সের যাত্রী। পথে পথে ভিখ মাগিয়া খাওয়াই যুবাদের দস্তুর।

এই উপলক্ষ্যে এক জার্ম্মান্ নারী বলিলেন—"জার্ম্মানিতে এবং অষ্ট্রিয়ায় যৌবন-আন্দোলনটা এক অনর্থের কারণে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মজুরেরা, ছেলে-ছোকরারা নিষ্কর্ম্মা জীবন চালাইবার একটা ফিকির পাইয়াছে! 'ভবঘুরে', ভ্যাগাবণ্ড, জোচ্চোর ইত্যাদির দল বাড়িয়া যাইতেছে।" দুনিয়ার সকল "সু"র সঙ্গে বোধ হয় গণ্ডা কয়েক "কু"ও মাখানো থাকে।

(৯)

পথে-পথে পাহাড়ী আত্মার বাণী শুনিতেছি নির্ঝর-কণ্ঠে। আকাশ ফাটাইয়া আওয়াজগুলা পাথরের চাপের ভিতর হইতে স্বাধীনতা লাভ করিতেছে। গভীর খাদের গতিভঙ্গীর সঙ্গে-সঙ্গে গাছ-গাছড়ার অন্তরালে যাইয়া ধ্বনি-সমূহ নিঃশেষ হইতেছে।

ভাবিতেছি, ঝরণার আওয়াজকে ভারতীয় সঙ্গীতে রূপ দেওয়া সম্ভব পর হইবে কি? অন্ততঃ পক্ষে এই ধরণের ধ্বনিকে "সঙ্গতে" বসাইয়া ভারতীয় ওস্তাদজীরা যন্ত্র বাজাইতে অভ্যাস করুন না কেন? তাহা হইলে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে "হার্ম্মণি" নামক যে ধ্বনিবস্তু মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে ভারতীয় নরনারী সহজেই তাহার মর্ম্ম কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আমাদের দেশে মামুলি লোকজনও অনেকেই মেঘ বৃষ্টির বা ঝড়ের সময় গান গাহিয়া আনন্দ উপভোগ

ঝুলা গাড়ীতে পাহাড় পার (বোৎসেন)

রোজেনগার্টেন বা গোলাপ-গিরি
(বোলজানো হইতে দেখা যাইতেছে)

করিতে অভ্যস্ত। বেহালা, সেতার, হার্ম্মোনিয়াম্, বাঁশী বা অন্য কোনো যন্ত্র বাজাইবার সময়ও ঘরের বাহিরে তুফানের আওয়াজ অনেক বাদক কানে ধরিয়া থাকিবেন। সেই সময়ে কণ্ঠ-ধ্বনির অথবা যন্ত্র-ধ্বনির এক অপূর্ব্ব পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা বোধ হয় অনেকেরই অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

গলার স্বর এবং বাজনার স্বরকে "পরিপূর্ণ" করিয়া তোলাই "হার্ম্মনির" কাজ। দরিয়ার কলকলে, বর্ষার ঝমঝমে, তুফানের প্রলয়-নিঃশ্বাসে আর নির্ঝরের অফুরন্ত জলের আহ্বানে এমন অনেকগুলা স্বর আছে যেসব গান-বাজনার সুরের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্বরের "স্বাভাবিক" জুড়িদার স্বরূপ। যেই এই দুই ধরণের স্বরের দেখাদেখি হয় তেমনি দুয়ে এক আত্মিক সংযোগে মিলিয়া অপরূপ ধ্বনির সৃষ্টি করে। সুরটা যেন এই স্বর-সংযোগের জন্যই বসিয়াছিল। এইজন্যই বেহাগই হউক বা ভৈরবীই হউক, —আর গায়ক বাদক ওস্তাদই হউক বা আনাড়িই হউক, —"মেলডি" বা সুরগুলা ঝর্ণার আবেষ্টনে স্রোতের "ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে," ঝড়ের আব্‌হাওয়ায় প্রাণ পাইয়া ফুলিয়া উঠে। "মেলডি"র স্বরগুলার কি একটার যেন অভাব ছিল। অভাব পূরণ হইবা মাত্র সুর নবরূপে দেখা দিতে থাকে।

যে-সকল গুণীরা ঝড়-তুফান হইতে, নদীর আওয়াজ হইতে, নিবিড় বনের শোঁ শোঁ হইতে, পাগলা-ঝোরার উন্মাদ গর্জ্জন হইতে বাছিয়া বাছিয়া স্বরগুলা আলাদা করিতে সমর্থ আর সেইসব বাছা বাছা স্বর আমাদের তথাকথিত রাগরাগিণীর স্বরগুলার সঙ্গে গাঁথিয়া দিতে সমর্থ তাঁহারাই ভারতে "হার্ম্মনি" আবিষ্কার করিয়া বসিবেন। ইয়োরোপে "মেলডি"র অর্থাৎ রাগরাগিণীর পরিপূর্ণতা-বিধায়ক স্বরগুলা আবিষ্কৃত হইয়াছে আজ বৎসর শ দুয়েক। ভারতের রাগরাগিণীগুলা আজও "ব্যাকগ্রাউণ্ড"হীন রূপে একাকী নিজ নিজ সুর-জীবন চালাইয়া চলিতেছে।

সঙ্গীতের আসল কাঠামটাই রাগরাগিণী, গৎ, সুর অর্থাৎ "মেলডি"। "মেলডি"-হীন সঙ্গীত কল্পনা করা অসম্ভব। "হার্ম্মনি" হইতেছে "মেলডি"র সখা সখী, স্ত্রী স্বামী-জুড়িদার ইত্যাদি। "হার্ম্মনি"-হীন সঙ্গীত অসম্ভব নয়। "মেলডি" স্বরাট্‌,—'হার্ম্মনি' একলা টিকিতেই পারে না। কিন্তু "মেলডি"র সঙ্গে "হার্ম্মনি"র

পরিণয় ঘটিলে যে কোনো কণ্ঠসঙ্গীত বা বাদ্যসঙ্গীতই নবজীবন লাভ করিতে বাধ্য।

যে-কোনো ভারতীয় নরনারী যে-কোনো সুরে গান গাহিতে থাকুন, সঙ্গে যদি কোনো "পশ্চিমা" হার্ম্মণিবিৎ সঙ্গীতজ্ঞ থাকেন তিনি তৎক্ষণাৎ টকাটক আমাদের প্রত্যেক "মেলডি"র অনুরূপ যথোচিত স্বর জুড়িয়া দিতে সমর্থ হইবেন। কোন্ স্বরের সঙ্গে কোন্ স্বরের "মেল" চলে তাহা "গণিতের" "সঙ্গীতের মাপা-জোকা"র এলাকার অ আ ক খ। এই কথাটা ভারতবাসীর কানে পশিলে ভারতীয় বৈঠকে বৈঠকে হার্ম্মণি সম্বন্ধে কিম্ভূত-কিমাকার মত প্রচারিত হইবে না।

(১০)

আদিজে উপত্যকার সুবিস্তৃত সমতল ভুঁইয়ে সাদা সরু আঁকা-বাঁকা পাথুরে পথ খেলিতেছে না। মন্দির-চূড়া এখানে আর লহরায়িত নয়। নদী ছুটিয়া চলিতেছে খাড়া দক্ষিণ। সাদা ধবধবে জলের স্রোত শুইয়া শুইয়া গড়াইতেছে। দুই পাশে যতদূর নজর যায় দেখিতেছি কেবল আঙুরের ক্ষেত,—কোথায়ও কোথায়ও তামাকের চাষ চলিতেছে।

যেন এক সুবিশাল ময়দান চারদিকে যার আকাশ-স্পর্শী দেওয়ালে ঘেরা। পূবে পশ্চিমে পাহাড়ী দেওয়াল-শ্রেণী একদম প্রায় সোজা উঠিয়াছে। উত্তর দক্ষিণেও পাহাড়গুলা যেন বা পারিপ্রেক্ষিকের নিয়মেই একত্র আসিয়া মিশিয়াছে।

এই ধরণের পর্ব্বত-বেষ্টিত বিরাট্ চতুষ্কোণের পর চতুষ্কোণ নজরে পড়িতেছে। কোনো চতুষ্কোণের দেওয়ালগুলায় প্রস্তর-স্তর ধরাতলের সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে সাজানো। পরবর্ত্তী চতুষ্কোণে স্তরসমূহ ভূমির উপর সোজা দণ্ডায়মান।

চতুষ্কোণের আওতা ছাড়াইয়া পশ্চিম দিকে গেলেই নানা উপত্যকার পাথরের হুড়াহুড়ি দৃষ্টিগোচর হয়। ত্রেন্তিনো প্রদেশের এই অঞ্চলের নাম-ডাক টুরিষ্ট-মহলে খুব বেশী। প্রত্যেক পল্লীই প্রসিদ্ধ। "দোলোমিতি" শৈলমালার কাম্পিনিয়ো এবং ব্রেন্তা-শ্রেণী পশ্চিম ত্রেন্তিনোর পর্ব্বত-গৌরব। এই মুল্লুকের শিখরগুলা প্রায়ই নয় হাজার ফিট উঁচু।

মেন্দোলা পাহাড়ের গড়ানো রেল

এঞ্জিনিয়ার লান্‌সিভার্ বলিতেছিলেন:—"আগামী সপ্তাহে একটার ঘাড় মটকাইতে যাইব। ইচ্ছা হয় কি?" বলিলাম:—"এ যাত্রায় শুনিয়া রাখা গেল।"

বার হাজার ফিট উঁচু পাহাড় ইয়োরোপের পক্ষে উচ্চতম শ্রেণীরই সামিল। সেই জাতীয় পর্ব্বতমালাও ত্রেন্তিনোয় রহিয়াছে। টিরোল আর ত্রেন্তিনোর সীমান্ত প্রদেশে অর্টলার পাহাড় এই গৌরবের অধিকারী। ব্রেন্তা আর অর্টলারের সম্পদ ত্রেন্তিনোকে সৌন্দর্য্যান্বেষীদের নিকট চিরবাঞ্ছিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য অবশ্য দুর্দ্দান্ত প্রস্তরাত্মার অবাধ তাণ্ডব। দূর হইতেই কিছু কিছু সেলাম করা গেল। ছবি দেখিয়া "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্" চলিতেছে।
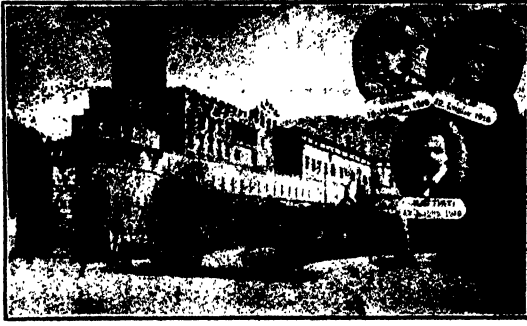
বাতিস্তি মিউজিয়াম্ (ত্রেন্তোর কাস্তেল্লো)

বোৎসেনের এক পুরানো কেল্লা

চষা জমিনের ব্যাড়ায় দেখিতেছি বুনো গোলাপের ঝোপ। রং বেরঙের গোলাপী আইল বা গলির ভিতর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে লোকালয়ে আসিয়া পৌছিতেছি। "বোলেন্তা" নামক ভুট্টার আটা সিদ্ধ খাইয়া গৃহস্থদের অতিথিসেবায় সাহায্য করা যাইতেছে। চেরি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। দুটা একটা পীচ চাখিবার সুযোগ জুটিতেছে।

আকাশ মেঘের আওতায় ধূসরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যায় মেঘগুলা পাহাড়ী খুঁটার মাথায় মাথায় শুইয়া সামিয়ানা প্রস্তুত করিতেছে। মেঘের ডাক আর "আঙুর-বাড়া গরম" ত্রেন্তিনোর গ্রীষ্ম-সাথী।

(১১)

ইতালিয়ান্ মণ্ডলে সড়কের নামগুলায় জার্ম্মান্ আর নাই। সবই ধুইয়া মুছিয়া ইতালিয়ান্ করা হইয়াছে। কিন্তু যতই উত্তরে আসিতেছি ততই ত্রেন্তিনোর জার্ম্মান্ মণ্ডল পাওয়া যাইতেছে। সীমান্ত প্রদেশের দস্তরই এই। কোথায় যে এক ভাষার খতম আর কোথায় যে অপর ভাষার সুরু তাহা মাপিয়া-জুকিয়া সাব্যস্ত করা একপ্রকার অসম্ভব।

ইতালিয়ান্ ভাষার এক গ্যাঁজ গিয়া জার্ম্মান্ মণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছে। আবার জার্ম্মান্ ভাষার এক গ্যাঁজ ইতালিয়ান্ মুল্লুকে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মান্ মণ্ডলের ইতালিয়ান্‌রা তাহাদের নিজ গ্যাজটা ইতালির সঙ্গে জুড়িয়া দিতে চাহিত। সেই গ্যাঁজ-সমস্তাকে বলা হইত "ইরেদেন্তিজ্‌ম্।"

ইতালিয়ানেরা এখন কেবল গ্যাঁজটা মাত্রই ইতালির সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে এরূপ নয়। সেই গ্যাঁজের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি জার্ম্মান্ মুল্লুকই আজ ইতালির এক প্রদেশে পরিণত।

বোৎসেন শহরে পৌছিতে পৌছিতে ত্রেন্তিনোর এই গ্যাঁজ-সমস্যা বেশ বুঝা গেল। এইখানেই ইতালির জার্ম্মান্ মণ্ডল। খাঁটি ভাষার তরফ হইতে ইতালিতে আর অষ্ট্রিয়ায় সীমানা ভাগাভাগি করিতে হইলে বোৎসেনের খানিক দক্ষিণে খুঁটা ফেলিতে হইত; কিন্তু বোৎসেনের কাছাকাছি পাহাড়-পর্ব্বত-ঘটিত প্রাকৃতিক সীমানা পাওয়া দুষ্কর। কাজেই অষ্ট্রিয়া বেচারার সীমানা যার-পর-নাই সঙ্কুচিত হইয়াছে। ইতালি ইংরেজের গুপ্ত সন্ধির ফলে বোৎসেনের বহু উত্তরে নিজ সীমানা ঠেকাইতে পারিয়াছে। ফলতঃ কমসেকম তিন লাখ খাঁটি জার্ম্মান্ আজ ইতালির গোলাম। ইহারা ইতালিতে অষ্ট্রিয়ান্ বা জার্ম্মান্ "ইরেদেন্তিষ্ট্" আন্দোলন চালাইতেছে।

ত্রেন্তিনো আগে ছিল ইতালিয়ান্ "ইরেদেন্তা।" আজ সেই মুল্লুকই অষ্ট্রিয়ান্ "ইরেদেন্তায়" পরিণত। ফরাসী জার্ম্মানের আলসাস-লোরান্ আর অষ্ট্রিয়ান্ ইতালিয়ানের ত্রেন্তিনো রাষ্ট্র-সমস্যায় একই চিজ।

(১২)

ইতালিয়ান্ সরকার বোৎসেন্ অঞ্চলে জার্ম্মান্ ভাষা পুরাপুরি তুলিয়া দিতে সাহসী হয় নাই। ইতালিয়ান ভাষাকেই রাজ-ভাষা ও ইস্কুলের ভাষা করা হইয়াছে।

কিন্তু গৃহস্থেরা ঘরে বাহিরে জার্ম্মান্ বলিতে এখনো অধিকারী !

দোকানপাটের নামে জার্ম্মান্ ভাষা আজও চলিতেছে। ত্রেন্তো ইত্যাদি শহরে ইহা অসম্ভব। এমন কি একটি খবরের কাগজও বোৎসেনে জার্ম্মান্ ভাষায় পরিচালিত হয়। কাগজটা পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে জানা যায় মাত্র যে, আজ অমুক লোকের পেটের অসুখ হইয়াছে অথবা কাল অমুক পাহাড়ে বৃষ্টি পড়'পড়' হইয়াছিল, ইত্যাদি।

স্গানাতালে, নোন-তালে, আদিজে-তালে,—ভেরোনা হইতে এপর্য্যন্ত যে-সকল ঘর-বাড়ী দেখিয়াছি সে-সব ইতালিয়ান্ ধাঁচে গড়া। রেণেসাঁসের ছায়া সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। কিন্তু বোৎসেনে পৌছিতে পৌছিতে নয়া গড়নের ইমারত দেখিতেছি—"গথিকে"র প্রভাব-সমন্বিত ছুঁচোল ত্রিকোণ ছাদবিশিষ্ট ঘর-বাড়ী জার্ম্মান্ "কুল্‌টুরে"র সাক্ষ্য দিতেছে।

বোৎসেনে চারণ-কবি হ্বাল্টারের স্মৃতিস্তম্ভ বিরাজ করিতেছে। হ্বাল্টার ছিলেন মধ্য যুগের "মিনেসিঙ্গার"। জর্ম্মান্-সাহিত্যের শেষ গাথা-কবি হিসাবে হ্বাল্টারের ইজ্জৎ খুব বেশী। বোৎসেন শহর সেই জার্ম্মান্ সভ্যতার এক বড় খুঁটা। ত্রেন্তোর দান্তে-মন্নমেণ্ট ইতালির পক্ষে যা, বোৎসেনে হ্বাল্টার-ডেঙ্কমালও জার্ম্মান্ জাতির পক্ষে তাই।

ইতালিয়ানেরা বোৎসেনের নাম বদলাইয়া দিয়াছে। নয়া নাম বোলৎসানো। এই অঞ্চলের প্রত্যেক পল্লী এবং শহরই এখন দুই নামে পরিচিত। প্রথম নাম ইতালিয়ান্। দ্বিতীয় নাম জার্ম্মান্। কেতাবে, রেলওয়ে ষ্টেশনে জার্ম্মান্ নামটা বন্ধনীর ভিতর দেখিতে পাই। ইহারই নাম "নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে"।

বোৎসেন ত্রেন্তোর মতনই অগ্নিকুণ্ড। এইখানে এক বন্ধু জুটিয়াছেন দোত্তোরে কোলমানো। সেকালে ইনি ছিলেন ইতালিয়ান্ "ইরেদেন্তিষ্ট"দের অন্যতম চাঁই। লড়াইয়ের সময়ে ইনি ইতালির পক্ষ হইতে প্যারিসে যাইয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালাইয়াছেন। এখন কোলমানো বোৎসেনে ইতালিয়ান্ শিখাইবার কাজে বাহাল আছেন। ত্রেন্তোর বাতিস্তি ছিলেন কোলমানোর এক দোস্ত।

ডোলোমিট পাহাড় (ব্রেন্নার অঞ্চলে)

বোৎসেনে বা বোল্‌ৎসানোর পূর্ব্বদিকে তাকাইলে এক অপূর্ব্ব পাহাড়-শ্রেণী চোখে পড়ে। ব্রেন্তা শ্রেণীর মতনই সে-সব পাথরের উন্মাদনা। বিশেষ কথা এই যে, শৃঙ্গগুলা লালে লাল। এই গোলাপী গিরির নাম তাই "রোজেন গার্টেন"।

এঞ্জিনিয়ারিং-ঘটিত একটা তথ্য বোৎসেনের বড় কথা। তারে-ঝোলা গাড়ীতে হাওয়ার উপর দিয়া পাহাড় পার হইতে হয়।

এখানকার এক নাক-কান-গলার ডাক্তার বলিলেন,—"সেপ্টেম্বর অক্টোবরে বোৎসেন অতি রমণীয়। তখন একবার আসা চাই।" ডাক্তারবাবু জাতে জার্ম্মান্।

স্থগানাতালের চার ইয়ার

বোৎসেনের গিরি-দুর্গ অতি "রোমাণ্টিক"। প্রধান গির্জ্জায় জার্ম্মান্ প্রাণ ই পাকড়াও করিতেছি।

(১৩)

আইজাকের জল আসিয়া বোৎসেনে আদিজের সঙ্গে মিশিয়াছে। আদিজের কিনারায় এতক্ষণ সোজা উত্তরে উজাইয়া আসিতেছিলাম। উত্তর-পশ্চিমের মেরাণো হইতে আসিয়া আদিজে বোৎসেনে দক্ষিণমুখী হইয়াছে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের তরফ হইতে মেরাণো বোৎসেন জনপদ জগদ্‌বিখ্যাত।

এইবার আইজাক তালে পা ফেলিলাম। এই দরিয়া আদিজের মতন শান্ত শিষ্ট নয়। উপত্যকা যার-পর-নাই সঙ্কীর্ণ। লাফালাফি আর ফোঁস-ফোঁস ছাড়া আইজাকের আর কোনো ভাষা নাই। আবার নোন-তালের বিপ্লব-গরিমাই উপভোগ করিতেছি।

আঙুরের রাজ্য আর নাই। চাষ আবাদও নেহাৎ কম। জমিন অতি অপ্রশস্ত। ওট্‌স শস্যের ক্ষেত দেখা যাইতেছে। টিরোলের প্রাকৃতিক দৃশ্য, টিরোলের পল্লী-জীবন, টিরোলের পাহাড়-সম্পদই এখানকার আবেষ্টনে পুনরায় পাইতেছি।

পাহাড়ের কোলে ব্রুক্‌সেন শহর বোৎসেনের চেয়েও সুন্দর দেখাইতেছে। আজকাল ইতালিয়ান্ নাম ব্রেসানোনে। সবুজ আওতায় লাল-টালিওয়ালা ছাদের ঘর-বাড়ী অতি মনোরম। সরকারী হাসপাতালের অন্যতম জার্ম্মান্ ডাক্তার অনেক দিনকার পরিচিত বন্ধু। বুঝা গেল, ইতালিয়ান্ সর্দ্দারদের প্রভুত্ব রোজই বাড়িয়া চলিয়াছে।

পুষ্টারতালের পথে (ফ্রান্‌ৎসেনস্‌ফেষ্টে)

এইসকল অঞ্চলে টিরোলী আল্পসের ধরণ-ধারণ সবই পূরা মাত্রায় বিরাজমান। কি বোৎসেন, কি ব্রুক্‌সেন, কি অন্যান্য পল্লী, কোথায়ও ইতালির ছায়ামাত্র নাই। এই মুল্লুককে ইতালির অংশে পরিণত করিতে হইলে অনেক কাঠ-খড় খরচ করিতে হইবে।

পাহাড়ের পর পাহাড়, পাহাড়ের ঘাড়ে পাহাড়, পাহাড়ী গলি, পাহাড়ী উপত্যকা, এই সবই এই অঞ্চলের একমাত্র দৃশ্য। আবার পাইন-বনের সুঘ্রাণ বিনা ক্লেশেই পাইতেছি। বিপুল তরুবর পর্ব্বতের গায়ে গায়ে সারি দিয়া অসীম রাজ্য বিস্তার করিয়া আছে।

এই আবেষ্টনেই পার্ব্বত্য পথের দুই ধার বাঁধিবার জন্য বিপুল কেল্লা তৈয়ারি করা হইয়াছিল। ফ্রান্‌ৎসেনস্‌ফেষ্টে

পল্লীর ইতালিয়ান্ নাম ফোর্ত্তেৎসা। ত্রেন্তিনো প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের গিরি-দুর্গের মতনই ফ্রান্ৎসেন্স্ ফেষ্টের দুর্গও পাহাড়ী কলেবরেরই অন্যতম অংশবিশেষ।

আইজাক-তালের সঙ্গে এইখানে পুষ্টার-তালের মেলা-মেশা আল্পসের গ্রীষ্মগৌরব ভোগ করিবার জন্য। লোকেরা ফোর্ত্তেৎসা হইতে রেলে পুষ্টা উপত্যকার সওয়ারি হয়। ত্রেন্তিনোর উত্তর-পূবে পুষ্টার উপত্যকা।

গোজনজাস্ পল্লী ত্রেন্তিনোর আর-এক "কুরট" বা স্বাস্থ্যনিকেতন। উত্তরের দিকে পাহাড়ে বরফের চাপ এখনো দেখা যাইতেছে। গোজেনজাস্ প্রায় চার হাজার ফিট উঁচু।

রেল এখানে দার্জ্জিলিং বা শিমলার পথের মতন একই পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চতর স্তরে উঠিতেছে। স্যুইটসাল্যাণ্ডে গোট হার্ড পার হইবার সময়ও এইরূপই করিতে হয়।

আইজাক গর্জ্জন করিতে করিতে নামিতেছে। অতি সরু পাহাড়ী পথ। এই পথেই অষ্ট্রিয়ান্ সেনা ত্রেন্তিনো ছাড়িয়া ইন্‌স্‌ব্রুকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়া আর ইতালির মধ্যে ইহাই একমাত্র পথ। এই পথের সঙ্কীর্ণতম অংশ ব্রেন্নার পল্লীতে অবস্থিত। সেই পল্লীতেই আজকালকার ইতালির উত্তরতম সীমানা। ইতালিয়ান্ নাম ব্রেন্নারো।

কাব্য-সাহিত্য সমালোচনা

শ্রী ক্ষেত্রলাল সাহা

হীরা ও জীরার প্রভেদ সকলেই বোঝে। হীরার দাম দিয়া জীরা কেনে এমন লোক সংসারে নাই। যদি থাকে সে পাগল। কিন্তু এই হীরা ও জীরা এক দরে বিকাইবার একটি স্থান আছে, তাহা কাব্য-সাহিত্য। নৈতিক জীবনে যেমন কাম ও প্রেম অনেকটা একরূপে প্রকাশ পায়,—অথচ দুই সম্পূর্ণ বিপরীত, কাম ভোগ, প্রেম ত্যাগ,—তেম্‌নি সাহিত্যে হেয় ও উপাদেয় কাব্য একরূপে প্রকাশ পায়—অবশ্য যাহারা সত্যকার রূপও চেনে না, রসও জানে না, তাহাদেরি চোখে। কাব্যের রূপ-রসের তত্ত্ব জানে, এমন লোক সর্ব্বত্রই খুব কম। অথচ না বুঝিয়া বুঝিয়াছি মনে করা কাব্যে যেমন সহজ আর কিছুতেই তেমন নয়। একটা অঙ্ক যে কসিতে পারে নাই সে কখনো বলিতে পারে না যে বুঝিয়াছি। কিন্তু একটা কবিতা যে কিছুই বোঝে নাই, সেও তার একটা সমালোচনা লিখিয়া মাসিকে প্রকাশ করে। এদিকে যে-সব কবিতা মাসিকে বাহির হয় তাহার অধিকাংশই যে কবিতা নয় এই সত্য কথাটি বলিলে যাঁহারা লেখেন তাঁহারাও চটিয়া যাইবেন আর যাঁহারা প্রকাশ করেন তাঁহারাও ক্রুদ্ধ হইবেন। বিশ্রী কবিতা কেন লেখা হয় তাহার কারণ অনেক; বলাও শক্ত নয়; কিন্তু কেন প্রকাশিত হয় তাহার ত একটি-মাত্র প্রধান কারণ থাকিতে পারে। বিশ্রীকে সুশ্রী এবং কুরসকে সুরস মনে করা হয় বলিয়া। কিন্তু এর মধ্যে একটি সুবিধার কথা আছে। লেখক, প্রকাশক, পাঠক, সকলেই যদি ভাল মনে করেন তবে আর আপত্তি থাকিল কোথায়? কদাচিৎ দুই-একটি সুন্দর কবিতা মাসিকে দেখিতে পাই। অবশিষ্টের অর্দ্ধেক নিতান্ত এবং একান্ত মামুলী; অর্দ্ধেক অপাঠ্য। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রবাসীতে না ভারতবর্ষে মোহিত মজুমদারের একটি কবিতা—নাম বোধ হয় "মরা মা" কি এম্‌নি কিছু—বাহির হইয়াছিল। এক রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া এর চেয়ে উচ্চ অঙ্গের কবিতা ইদানীং কোন মাসিকে দেখি নাই। এইরকম একটি কবিতা সযত্নে রক্ষা করিয়া অন্য এক শ'টি অনলে আহুতি দিলে কাহারো

কোনো ক্ষতি হইবে না। কিন্তু বহু অপদার্থ কবিতা—rubbish-কে এই কবিতাটির উপরে স্থান দিবার লোক শত শত বিজ্ঞ-বিচক্ষণের সমাজেও আছে। তবে কবিতাটি কোনো পাশ্চাত্য কবিতার অনুসরণ কি না বলিতে পারিলাম না।

তা থাক্। এপ্রবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। রবীন্দ্র-কাব্যের সাধারণতঃ চার শ্রেণীর সমালোচনা হইয়া থাকে—অন্ধ-নিন্দা-মূলক; অন্ধ-প্রশংসা-মূলক; বর্ণনা-মূলক; আর দর্শন-মূলক বা 'বিজ্ঞান'-মূলক অর্থাৎ যার নাম theoretical।* ইহার কোনটিই প্রকৃত কাব্য-সমালোচনা নহে। প্রকৃত কাব্য-সমালোচনাকে যদি বলি সৌন্দর্য্য-তত্ত্বমূলক বা রসতত্ত্বমূলক তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ ঐ 'বিজ্ঞানের' মধ্যে যাইয়া পড়িবে, কিন্তু ইংরেজী পরিভাষা ব্যবহার করিয়া যদি বলি aesthetic তবে অনেকটা অর্থ প্রকাশ হইবে। তবু এই aesthetic নামক সমালোচনারও বিজ্ঞানের কবল হইতে উদ্ধার নাই। আমার বক্তব্য এই যে, অনেক সময়ই আমাদের দেশে সর্ব্বদাই—কবি যাহা দেন সমালোচক তাহা এক দিকে আলগোছে সরাইয়া রাখিয়া তাহাই উপলক্ষ করিয়া নিজের ভাব বা রস ও চিন্তার প্রবাহ ছুটাইয়া দেন এবং মনে করেন খুব সমালোচনা করিলাম। এই শ্রেণীর লেখা আর যাহাই হোক সমালোচনা নহে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে-সব সমালোচনা আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক ভাল ভাল কথাও পাইয়াছি এবং বহু কাজের কথাও পাইয়াছি। কিন্তু রবি-বাবুর কাব্য কি পদার্থ এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর কাব্যের তুলনায় তাহার স্বাতন্ত্র্য কোথায় ইহা কেহ বুঝাইয়া দিয়াছেন, একথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। রবি-বাবুর কাব্য খুব কম লোকেই বুঝিয়াছে। ইহা কাহারো কাহারো খুব ভাল লাগে, আবার কাহারো কাহারো একেবারেই ভাল লাগে না এই মাত্র। যাঁহাদের ভাল লাগে তাঁহাদের কেহ কেহ সেই ভাল-লাগাটা আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুই চার জন ব্যক্তি, আমি দুই জনকে জানি যাঁহারা রবি-বাবুর কাব্যজ্ঞান বিচারের দ্বারা এবং প্রাণের দ্বারা ও সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই কোনো সমালোচনা লেখেন নাই। রবি-বাবুর কোনো কবিতা সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইঁহারা মুখে যাহা বলেন তাহাই শুনিয়া মুগ্ধ হই। কিন্তু যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে এবং অত্যন্ত গভীর ও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে রবীন্দ্র-নাথকে বুঝিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। ইনি স্বর্গীয় মোহিতমোহন সেন।

কাব্য-সাহিত্যের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ, শ্রেণী-বিন্যাস, সঙ্কলীকরণ, ভাষ্যকরণ, টীকা-টিপ্পনি, ব্যাখ্যাদি লিখন প্রভৃতি যত কাজ এদেশে সম্পাদিত হইয়াছে আমার মনে হয় তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা মূল্য-বান কাজ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ৺মোহিত সেনের সংস্করণ। প্যাল্‌গ্রেভ তাঁহার গোল্‌ডেন ট্রেজারিতে বিভিন্ন গীতি-কবিতা-কুসুম বাছিয়া বাছিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া যে মনোহর গীতি-মালিকা রচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি অসাধারণ নিপুণতা, বিচার-শক্তি এবং কাব্য-কলা-কুশলতারও পরিচয় দিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি দেশে দেশে অশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু মোহিত-বাবুর সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থ গোল্‌ডেন ট্রেজারির চেয়ে শুধু অনেক বৃহৎ নয় অনেক শ্রেষ্ঠ জিনিষ। এই কাব্য-গ্রন্থ সম্পাদনে তিনি যে গভীর ও গূঢ় কাব্য-রস-জ্ঞান, যে সমুচ্চ সৌন্দর্য্য-বোধ, যে অতুলনীয় কাব্য-সুষমার বিচার ও বিবেচন শক্তি, যে অপূর্ব্ব বিন্যাস নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনায় প্যাল্‌গ্রেভের অনুরূপ গুণাবলী অনেক ক্ষুদ্র বিষয়। প্যাল্‌গ্রেভ যাহা করিয়াছেন তাহার নাম সুরুচি-সঙ্গত নিপুণতা। মোহিত-বাবু যাহা করিয়াছেন তাহা সৌন্দর্য্য-জ্ঞানগম্ভীর রস-মাধুর্য্যানুভব তরঙ্গায়িত কাব্য-বিচারের এবং কাব্য-রসা-স্বাদনের মৌলিকী উদ্ভাবনী শক্তির এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। তিনি শত-সহস্র কবিতা বাছিয়া বাছিয়া গুছাইয়া গুছাইয়া ভাব রস ও রূপ সৃষ্টির কলা-কৌশলের সূক্ষ্ম তারতম্যা-নুসারে আগে পরে যথাসঙ্গতিক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া

* বিজ্ঞান বস্তু সম্পর্ক বিরহিত idea বা ধারণা।

সাজাইয়া বিভিন্ন গ্রন্থাকারে পরিণত করিয়া এবং অভিনব অভিব্যঞ্জক নামকরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থকে যেরূপ দিয়াছেন তাহা এক আশ্চর্য্য প্রকারের কাব্য-ব্যাখ্যা, এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনাপূর্ণ interpretation—যাহার শতাংশের একাংশ ব্যাখ্যাও আজ পর্য্যন্ত এদেশে হয় নাই। রবি-বাবুর কাব্যের যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা বিচার কিছু হইয়া থাকে তাহা মোহিত-বাবুর এই সংস্করণ। কবির মূল 'সোনার তরী' নামক গ্রন্থ যাহা এখন ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্ বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহার সঙ্গে মোহিত-বাবুর 'সোনার তরীর' তুলনা করিলেই মোহিত-বাবু কি ভাবের কাজ করিয়াছেন তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা হইবে। মূল 'সোনার তরীর' এই নাম হওয়ার একমাত্র কারণ এই গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিই সেই অতি পরিচিত 'সোনার তরী'। আর শেষ কবিতাটিতেও একখানি সোনার তরীর ব্যাপার। সুতরাং এই খণ্ডের এই নামের বিশেষ কোনোই সার্থকতা নাই। সাদৃশ্য-বিহীন বহু ভাবের বহু রূপের কবিতা বিশৃঙ্খলাভাবে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু মোহিত-বাবু যে কবিতারাজির নাম দিয়াছেন 'সোনার তরী', তাহা আগা-গোড়াই সোনার তরী, তিনি সোনার তরী কথাটির একটি বিশেষ রসাত্মক অর্থ ধরিয়াছেন এবং সেই অর্থ রবি-বাবুর কোন্ কোন্ কবিতায় আছে তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন এবং সেইসমস্ত কবিতা সাজাইয়া রস-সামঞ্জস্য-পূর্ণ 'সোনার তরী' গ্রন্থ গ্রথিত করিয়াছেন। সুতরাং পরপর কবিতাগুলি পড়িয়া যাইতে যাইতে বুঝিবার বিশেষ চেষ্টা না করিলেও একটা অর্থ এবং একটা ভাবের আভাস চিত্তে জাগিয়া উঠে। ইহা কি এক সুনিপুণ সুন্দর জিনিষ নয়? এই প্রকার সর্ব্বত্রই দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রথমকার দিক্ দিয়া। বহু-সংখ্যক কবিতা বাছিয়া বাছিয়া সজ্জিত করিয়া 'যাত্রা,' 'নিষ্ক্রমণ,' 'হৃদয়ারণ্য' প্রভৃতি নাম দিয়া যে প্রথমকার খণ্ডগুলি তিনি গ্রথিত করিয়াছেন তাহাতে সেই যুগে—সেই ২৫ বৎসর পূর্ব্বে, রবি-বাবুর কবি-প্রতিভার যাহা ক্রমবিকাশ-ধারা, তাহা তিনি আশ্চর্য্য সুন্দর ভঙ্গীতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা লক্ষ্য না করিয়া এই ক্রম-বিকাশ বুঝাইবার জন্য কতই যে ব্যর্থ—কতই যে হাস্যাস্পদ প্রয়াস হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রথম প্রথম যাঁহারা রবি-বাবুর কাব্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদের কাছে এই কাব্য এক বিশাল দিগ্ দিগন্তহীন ভাবারণ্য বলিয়াই মনে হয় এবং অনেকের কাছে শেষপর্য্যন্ত তাহাই থাকে। কিন্তু মোহিত-বাবু এই ভাবারণ্য ও রূপারণ্যকে শত শত সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত পুষ্পবীথিকা, তরু-কুঞ্জ ও লতা-বিতানে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। কাব্য-সৌন্দর্য্য-কাননের ভ্রমণবিলাসিগণ অনায়াসে মোহিত-বাবুর এই সুচারু-বিন্যাস বিপুল কাননে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সহস্র সহস্র কুসুমবিকাশ, ললিত লতাবলীর আন্দোলন-লীলা এবং শতশত শ্যামল নিকুঞ্জ-শোভা উপভোগ করিতে পারেন। সহজ কথায়, মোহিত-বাবুর সংস্করণের পাতা উল্টাইয়া গেলে রবি-বাবুর কাব্য সম্বন্ধে যে-জ্ঞান হয়, পাবলিশিং হাউসের যাহা মৌলিক সংস্করণ তাহা দিবানিশি আওড়াইয়াও সে-জ্ঞানটুকু বহুদিনেও লাভ করা দুষ্কর।

তারপর মোহিত-বাবু তাহার ভূমিকায় বিশেষ-ভাবে একাংশে যে সমালোচনাটুকু করিয়াছেন তাহাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক্ কাব্যবলীর যাহা মূল সূত্র তাহাই ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এবং এই কাব্য অনুশীলন করিতে হইলে কোন্ পথে অগ্রসর হইতে হইবে তাহাও তিনি স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সূত্রের এবং সেই পথের পরবর্ত্তী কোনো সমালোচকই কোনো খবর পান নাই।

আমাদের দেশের লোকের কাব্য-সাহিত্য-বোধের কি নিদারুণ দরিদ্রতা—তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রবি-বাবুর কাব্যের কত কি সংস্করণ বাহির হইতেছে, কিন্তু এই যে সংস্করণটির কথা বলিলাম, ইহা পরিবর্দ্ধিত আকারে অথবা যেমন আছে তেমনি পুনর্মুদ্রিত করা আর কেহ আবশ্যক মনে করেন না। আসল কথা, ঐ সংস্করণটি যে বাংলা কাব্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি অমূল্য সম্পত্তি তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান প্রকাশকদের নাই। মোহিত-বাবুর সংস্করণটি এখন সম্পূর্ণরূপে দুষ্প্রাপ্য হইয়া

গিয়াছে। রবি কবির আজকালকার অধিকাংশ পাঠকই উহার অস্তিত্বমাত্র অবগত নহেন। ঐ সংস্করণ-টির অভাবে মহাকবির সুবিশাল কাব্য-সাহিত্য অনুশীলনের অশেষবিধ ক্ষতি হইতেছে—এই কথাটি আমি সাহিত্যরসিকগণকে স্মরণ করাইয়া দিবার অনুমতি চাই। যিনি উহা প্রকাশ করিবেন তিনি এই নিদারুণ অভাব দূর করিয়া সাহিত্যের একটি বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের চার জাতীয় সমালোচনা হইয়াছে, বলিয়াছি। প্রথম অন্ধ-নিন্দামূলক। বহু-সংখ্যক লোক আছে যাহারা এই কাব্য বুঝিতেও পারে না এবং ইহাতে কোনো রসও পায় না। ইহার অনেক কারণ। প্রথমতঃ অন্তত পক্ষে শত করা ৬০ জন লোকের সাধারণ কার্য্য বুঝিবার প্রাণ, জ্ঞান, কল্পনাশক্তি এবং রসানুভূতির অভাব। অবশিষ্ট ৪০ জনের মধ্যে বোধ হয় অন্তত ৩৫ জনের রবি-বাবুর কাব্য যে প্রকৃতির তাহা বুঝিবার প্রাণ, জ্ঞান, কল্পনা-শক্তি এবং রসানুভূতি নাই। এই ৩৫ জনের মধ্যে পাঁচ ছয় জন সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী। এঁদের আবার কালিদাস ছাড়িয়া ভবভূতিতে গেলেই গোলমাল ঠেকে। কারণ ভবভূতি সংস্কৃত কবিদের মধ্যে সব-চেয়ে রোমান্টিক্। আবার কালিদাসেরও শকুন্তলা ছাড়িয়া বিক্রমোর্ব্বশীতে এমন কি কুমার ছাড়িয়া মেঘদূতে গেলেই বাধ-বাধ বোধ হয়। যাহা হোক্ এইসমস্ত পাঠক রবি-বাবুকে বুঝিতে না পারিয়া প্রাণ ভরিয়া গালাগালি দিয়া থাকেন। ধারণার, কল্পনার, চিন্তার ও ভাবের আমাদের যে-সমস্ত গভীর দাগ-কাটা লাইন আছে, যে-সমস্ত বাঁধা পাকা 'সড়ক' আছে—সেইসব লাইনে চলিলে রবি-বাবুর কাব্যের অর্থ পাওয়া যায় না। অথচ পণ্ডিতবর্গ এবং তৎপথগামী ব্যক্তিগণ সেইসব ধারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। এইসব লক্ষ-পদচিহ্নাঙ্কিত চিরপুরাতন চিন্তা পথনিচয় ব্যতিরেকেও আরো শত শত পথ আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে চান না। ফলে রবি-বাবু ইঁহাদের কাছে এক চিরবিরক্তিকর রহস্য-নিলয় হইয়া রহিয়াছেন। আবার বহু লোক আছেন, রবি-বাবুর এক বর্ণও না পড়িয়াই ভর্ৎসনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দেন। অধ্যয়ন করার কষ্টটুকু ইঁহারা চান না; নিন্দা করার আনন্দটুকু ছাড়িতে পারেন না।

তারপর অন্ধ-প্রশংসা-মূলক সমালোচনা। নীতি-বিচারের দিক্ হইতে দেখিলে যে-কোনো প্রকারের নিন্দার চেয়ে যে-কোনো প্রকারের প্রশংসা অনেক ভাল জিনিষ। কারণ, নিন্দা অসতের স্বভাব আর প্রশংসা সতের স্বভাব। কিন্তু সাহিত্যে দুই-ই সমান ভাবে অবহেলার যোগ্য। অন্ধ প্রশংসাটি হইতেছে 'আহা মরি মরি!' ভাব। কি সুন্দর! কি গভীর! কি ভাব! কিন্তু সৌন্দর্য্য, গভীরতা এবং ভাব কোথায় এবং কেমন, তাহার কোনো ঠিকানা পাইবার উপায় নাই। অর্থাৎ আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, সেই ভাল-লাগাটা কেন তোমাদের প্রত্যেকের ভাল লাগিবে না; তোমরা দেখ, আমার কত ভাল লাগিতেছে! এই জাতীয় সমালোচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলিকে নিম্ন-শ্রেণীর Impressionistic criticism বা বিচার-বিরহিত অনুভাবাত্মক সমালোচনা বলা যায়। কিন্তু ইহার অধি-কাংশ পাঠ করা মানে অযথা সময় হত্যা করা। এই-প্রকার সমালোচনার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ "কাব্য সুন্দরী" নামক একখানি বঙ্কিমের উপন্যাসের 'সমালোচনা'-গ্রন্থ। আমাদের দেশের মাসিক পত্রিকা-গুলির 'গ্রন্থ-পরিচয়ের' পাতা উল্টাইলে এই শ্রেণীর সমালোচনা অনেক পাওয়া যাইবে।

সমালোচনা-সাহিত্যের অনেকখানি জুড়িয়া রহিয়াছে—বর্ণনামূলক সমালোচনা, শিক্ষক-মহাশয়েরা ছেলেদের পাঠ্য কবিতাগুলির Paraphrase লিখিয়া দিতে যাহা করেন ইহা ঠিক তাই। কবি কবির ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে যাহা যাহা সুন্দর ও উত্তম ঠিক সেইগুলি বাদ দিয়া অবশিষ্ট চলনসই গদ্যের ভাষায় প্রকাশ করা এই সমালোচনার বিষয়। রবীন্দ্র-নাথের যে-সমস্ত সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহার তিন চতুর্থাংশ এই শ্রেণীতে পড়ে। উদাহরণ অনেক দিতে পারি, কিন্তু তাহা অশোভন এবং অনাবশ্যক। এই

সব সমালোচনার চৌদ্দ আনাই অনেক সময়ে নিরবচ্ছিন্ন পদোদ্ধারের লহরীমালা।

সর্ব্বশেষে বিজ্ঞান-মূলক বা theoreical সমালোচনা। এই সমালোচনাতে অনেক মূল্যবান্ জিনিষ পাওয়া যায় এবং ইহা নিশ্চয়ই পাঠের যোগ্য। ইহাতে কাব্যের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বার্থ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। এই যে একটি কবিতা তোমার সম্মুখে রহিয়াছে ইহার অন্তর্নিহিত সত্যটি কি? কোন্ গূঢ় নীতির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা? কোন্ বিশ্বজনীন ভাব ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে? এইসব দেখাইবার প্রয়াস। মূল কবিতাটিকে বা কাব্যখানিকে বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়া এবং তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে কেন্দ্র করিয়া যখন এই সমালোচনা ক্রিয়মান হয় তখন ইহা নিশ্চয়ই উপাদেয় জিনিষ। কিন্তু এই সমালোচনা অনেক সময়ই—আমাদের দেশে—শূন্য-গর্ভ ভাব-প্রবাহ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। একটা গুরু-গম্ভীর চিন্তা-পরম্পরায় যখন ঘোরাড়ম্বরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কাব্য কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার উদ্দেশ থাকে না। এই জাতীয় সমালোচনা পাঠকের পক্ষে ভয়াবহ। রবীন্দ্র-কাব্যের এইপ্রকার সমালোচনা করিয়া কোনো-কোনো ব্যক্তি অশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের অভ্যন্তরে অন্বেষণ করিলে বিশেষ কিছু পাওয়া যাইবে না। কিন্তু চেহারাগুলি এমন মাননীয় সুগম্ভীর সম্ভ্রমবান্ যে দেখিলেই শ্রদ্ধা করিতে হয়। এই সমালোচনাগুলি সেই শ্রেণীর।

একটি ছোট্ট উদাহরণ দেই।

> Hail to thee, blithe Spirit!
> Bird thou never wert.

এই দুই লাইন,কবিতার সমালোচনার নমুনা দিই।

(১) অন্ধ-নিন্দাবাচক।

(ক) একটি বিহঙ্গ সম্বন্ধে ইহাতে একটি অর্থহীন শূন্য ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ভাবের পশ্চাতে কোনো বস্তু নাই।

(খ) পাখীকে পাখী বলিলে ত আর কবিতা হয় না! তাই এখানে বলা হইয়াছে যে—হে পাখী, তুমি পাখী নও! যেন হয় কে নয় বলিলেই কবিতা হয়! কবি-তা বটে!

(গ) একটা ফাঁকা বাজে খেয়াল। না লিখিলেও চলিত।

(২) অন্ধ-প্রশংসা-বাচক।

(ক) দেখ দেখি কি সুন্দর ভাবটি! তোমার আমার কাছে পাখী, কিন্তু কবির কাছে তাহা Spirit. এই Spirit কথাটির মধ্যে কত কবিত্ব!

(খ) পাখীকে পাখী বলিয়া স্বীকার না করিয়া কবি যে গভীর ভাবের আভাস দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। এ শুধু অনুভবের বিষয়। প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হইবে।

(গ) আহা কি চমৎকার ভাবখানি! প্রাণ যেন নাচিয়া উঠে! যেন হিয়ার মাঝারে একটা অজানা ভাব ফুটিতে চাহিয়া ফুটিতে পারে না! পাখী তুমি নহ! কি সুন্দর!

(৩) বর্ণনাত্মক।

এই দুই ছত্রে কবি একটি পক্ষীকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন। ইহাকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। অদৃশ্য বলিয়া অথচ অন্য কোনো কারণে ইহাকে অশরীরী কোনো কিছু বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে। ইহা এখন ত পাখী নয়ই, যেন কোনোকালেও পাখী ছিল না।

(৪) বিজ্ঞানমূলক।

এখানে একটি ভরত পক্ষীকে অদৃশ্যমান ভাবরূপী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা কল্পনা নহে। শুধু পক্ষী নয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ মাত্রই প্রকৃত পক্ষে এক-একটি ভাব। এক-একটি idea কিংবা এক-একটি spirit ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা যে ইন্দ্রিয়দ্বারের বিষয় অনুভব করি তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমরা যাহা দেখি সবই মায়া বা illusion. এই মায়ার পশ্চাতে সত্য আছে। তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইংরেজীতে যাহাকে spirit বলা হয়, বাস্তবিক ইহা কি, বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখা উচিত। তাহার কোনো প্রকার শরীর আছে কি? না অশরীরী? তাহা কি সত্য সত্যই ভাব মাত্র? কিন্তু ভাব মনের বাহিরে কি

করিয়া থাকিবে? আমার মন ত দেহ-বিরহিত হইতে পারে না। প্লেটো প্রত্যেক পদার্থকেই এক-একটি ideaর অনুভব-যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন। কবির এই spirit কি সেই ideaর অনুরূপ? বোধ হয় ইহার মধ্যে আরও গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এস আমরা তাহাই গবেষণা করিয়া দেখি।

এই চার প্রকার সমালোচার নমুনা দেওয়া গেল। আমাদের দেশের সমস্ত কাব্য সমালোচনাই ইহার কোনো না কোনো এক শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে। কিন্তু ইহার কোনোটিই কাব্য-সমালোচনা নহে। যোগ্য ব্যক্তিগণ এই সমালোচনার প্রকৃত আদর্শ আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন, সেই প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে আমরা অযোগ্যেরা বিষয়টি খুব সংক্ষেপভাবে একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব।

নিন্দা, প্রশংসা বর্ণনা এবং দার্শনিকতা সমালোচনায় আসিতে পারে। কিন্তু এইসমস্ত কখনই সমালোচনার লক্ষ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

এই উদ্দেশ্য অতি সহজ ও স্বাভাবিক। কবি তাঁহার কাব্যে আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাই ষোল আনা বুঝিয়া লওয়াই কাব্য-সমালোচনার উদ্দেশ্য। সমালোচনা কথার মানে সম্যক্‌রূপে দেখা—ভিতরে বাহিরে—to view comprehensively and rightly কিছু যেন বাদও না পড়ে, আবার মনগড়া কিছু যেন আরোপও না করা হয়! এই দুই সীমানার মধ্যে সমালোচনার গতিবিধি। সমালোচনার 'লোচনের' ব্যবহারটা খুব সাবধানে করা আবশ্যক। কথাটির একটা ভুল মানে আমরা ধরিয়া লইয়াছি।

ছোট বড় প্রত্যেক কবিতাতেই একটি আছে প্রাণ-বস্তু আর একটি আছে তাহার দেহ। এই দেহ বহু-অবয়ব-বিশিষ্ট, বহু অঙ্গের সমাবেশ। প্রাণকে ধরিয়া অঙ্গগুলিকে বুঝিবারও চেষ্টা করা যাইতে পারে। অথবা যেখানে প্রাণটি অতিশয় গূঢ় বলিয়া বোধ হয় সেখানে অঙ্গ-সংস্থান, অঙ্গ-ভঙ্গী এবং অঙ্গের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ু-নিচয়ের স্পন্দন অনুভব করিয়া প্রাণের পরিচয় করিতে হয়। এই প্রাণটি কোনো রস-জাতীয় হইতে পারে—কোনো emotion or sentiment—কোনো ভাবাবেগ বা কোনো ভাবাদর্শ। অথবা ইহা জ্ঞানাত্মক বা বিচারাত্মক হইতে পারে—কোনো thought বা চিন্তা কিংবা কোনো সংকলন। যদি রসাত্মক না হইয়া জ্ঞানাত্মক হয় তবু প্রকৃত কবিতায় তাহা কোনো-না-কোনো প্রকার রসের দ্বারা নিশ্চয় অভিসিঞ্চিত থাকিবে। শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা কখনো কোনো কবিতা হইতে পারে না। প্রত্যেক জ্ঞান-মাত্রাকেই রসে সিক্ত করিয়া নরম করিয়া লইতে হইবে, নতুবা তদ্দ্বারা কোনো বিশেষ রূপ রচিত হইবে না। কাব্য যে 'রসাত্মকং বাক্যং' ইহা চূড়ান্ত সত্য কথা, মনে হইতে পারে, শুদ্ধ বর্ণনামূলক কবিতা-গুলিতে কোনো অন্তরঙ্গ রস থাকে না। কেবল বিষয়ের বর্ণনা মাত্র থাকে। কিন্তু তাহা নহে। কোনো বিষয় বা বস্তু যতক্ষণ কবির হৃদয়ে কোনো ভাব বা রস উদ্রিক্ত না করে ততক্ষণ তাহা কবিতার উপাদান হইতে পারে না। এই ভাবটুকুই এই জাতীয় কবিতার প্রাণ। বস্তু-বর্ণনার অভ্যন্তরে সন্তর্পণে এই ভাবের প্রবাহ খেলিতে থাকে।

এই যে কবিতার প্রাণভূত রস বা রসায়িত ভাব-বস্তুটি ইহার সঙ্গে কবিতার অবয়ববান্ দেহটির সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। মানুষের প্রাণের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ কি? প্রাণই এই দেহ রচনা করিয়া বিকসিত করিয়া তুলিয়াছে। আবার এই প্রাণই দেহের সর্ব্বত্র শিরায়-শিরায়, স্নায়ুতে-স্নায়ুতে, ধমনীতে-ধমনীতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছে। ঠিক এইরূপ কবিতার যাহা প্রাণভূত তাহাই কবিতার মূর্ত্তিখানি রচনা করিয়া তাহাকে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে। আবার এই প্রাণই ইহার অঙ্গে অঙ্গে ক্রিয়াশীল ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রত্যেক অঙ্গ সজীব সতেজ ও সরস রাখিতেছে। প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ এই দেহ-রচনায়, এবং এই অঙ্গ-সঞ্জীবনে। আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ঐ প্রাণের কার্য্যের পরিপূর্ণতা-সাধনে।

ইহাই হইল প্রত্যেক কবিতার মূলীভূত কথা। সমালোচনার প্রথম কার্য্য কবিতার প্রাণের আবিষ্কার

এবং এই প্রাণের স্বরূপ ও স্বভাব নির্ণয়। তারপর দেখাইতে হইবে—এই এক প্রাণ কেমন করিয়া বহু অঙ্গ সৃজন করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে এবং কেমন করিয়া প্রত্যেক অঙ্গই ঐ এক প্রাণের ক্রিয়ার সহায়তা করিবার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছে। যদি কোনো কবিতায় দেখা যায় যে বিভিন্ন অঙ্গ বা বিভিন্ন অংশ কোনো এক অখণ্ড কেন্দ্রীভূত শক্তির আনুগত্য না করিয়া বিভিন্ন পথে বিভিন্ন কার্য্য করিতেছে—তৎক্ষণাৎ বুঝিতে হইবে যে, ইহা কবিতা হয় নাই। যদি দেখা যায়, ঐ প্রাণ-স্বরূপ রসটি সর্ব্ব অঙ্গেই ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু এক অঙ্গে নাই। তখনি বুঝিতে হইবে যে, ঐ অঙ্গটি ব্যর্থ। উহাকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। যদি অনুভূত হয় কতকগুলি অবয়বে প্রাণ-শক্তি সতেজ ক্রিয়াশীল আর কতকগুলি অবয়বে কেবল অল্প অল্প ধিকি-ধিকি চলিতেছে—বুঝিতে হইবে কবিতায় গুরুতর দোষ আছে। ইহা উচ্চ শ্রেণীর নহে। যদি বোঝা যায় কবিতার কতকগুলি অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অত্যন্ত বড় অথবা অত্যন্ত ছোট হইয়াছে, অমনি বুঝিতে হইবে রচনার সামঞ্জস্য নাই—ইহা 'সুষমা'-বিহীন—কদাকার—সুন্দরের বিপরীত। এইভাবে একে একে বিচার করিতে আরম্ভ করিলে যে-কোনো কবিতার সমস্ত দোষ—সমস্ত ত্রুটী—সমস্ত হীনতা অনায়াসে ধরা পড়িয়া যাইবে। এদিকে প্রাণের স্বরূপ বিচারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ নির্ণয়ে, অবয়ব-সমূহের সাম্য-বৈষম্যের পরিমাপ—কোন্ কবিতার কতখানি মূল্য তাহা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করা হইয়া যাইবে। সাধারণতঃ যখন বলা হয় কবিতাটি ভাল বা সুন্দর অথবা খারাপ বা বিশ্রী তখন ঠিক কি পরিমাণে কত ডিগ্রিতে ভাল বা সুন্দর, অথচ খারাপ বা বিশ্রী তাহার কিছুই ঠিকানা থাকে না। একটা আন্দাজী হাৎড়া কথা বলিয়া দেওয়া হয়, যার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু কবিতার গুণ-দোষগুলি যতদূর সম্ভব ফুট-রুল দিয়া বা মার্কা-কাটা টেপ দিয়া মাপিয়া দেওয়া চাই—অথবা তুলা-দণ্ডে তৌল করিয়া দেওয়া চাই। সমালোচনার নির্দ্দিষ্ট বিধান—সূক্ষ্ম পরিমিত নিয়ম থাকা আবশ্যক। জোনাকিও উজ্জ্বল, কেরাসিনের প্রদীপও উজ্জ্বল, তারাও উজ্জ্বল, চাঁদও উজ্জ্বল, সূর্য্যও উজ্জ্বল। সুতরাং সবই এক প্রকার হইবে কি ?

কেহ বলে চণ্ডীদাস বড়, কেহ বলে বিদ্যাপতি বড়, কেহ বলে গোবিন্দদাস বড়, আবার কারো কারো মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সব-চেয়ে বড়। কারো বিচারে মাইকেল, কারো বিচারে নবীনচন্দ্র, কারো বিচারে হেমচন্দ্র, কারো বিচারে রবীন্দ্রনাথ সব-চেয়ে বড় কবি। আবার বহুলোকের মুখে শুনিতে পাই—পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতার অভিমানে বলিয়া থাকেন—এইপ্রকার তুলনা করাই মূর্খতা। মূর্খতা নিশ্চয়ই নয়। এপ্রকার তুলনা অবশ্য করণীয়। নতুবা প্রকৃত রসাস্বাদন হইবে না। হিসাব করিয়া অঙ্ক কসিয়া বলিয়া দেওয়া যায়—এই যাঁদের নাম করিলাম তাঁহাদের মধ্যে কে, কি পরিমাণে, কোন্ বিষয়ে, কাহার চেয়ে কি ভাবে বড়। তাহাই যদি বলা না হইল তবে সমালোচকের গণ্ডগোলের আবশ্যকতা কি ? তুলনা অনেক দূর চলিবে এবং যে যে বিষয় তুলনার যোগ্য নয় তাহা কেন নয় তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। শেষ পর্য্যন্ত দেখাইতে হইবে—এইটি আঙ্গুরের রস, এইটি বেদানার রস, এইটি আমের রস, এইটি কাঁঠালের রস। সুতরাং ইহারা বিভিন্ন। ইহাদের বিষয়ে আমের চেয়ে আঙ্গুর ভাল—এইপ্রকারের তুলনা চলিবে না। এইখানে রুচি-ভেদের বিষয়। কিন্তু এখানেও বলা চলিবে—আঙ্গুর হিসাবে ইহা কতখানি ভাল, আম হিসাবে ইহা ততটা ভাল নয়, ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্তভাবে এই সমালোচনার আদর্শ বলিলাম। এই আদর্শানুসারে আমি নিজ সমালোচনা করিতে পারিব, এপ্রকার স্পর্দ্ধা আমার নিশ্চয়ই নাই। এদেশে কত ইন্দ্র-চন্দ্র হদ্দ হইল—অবশেষে কি জোনাকি—?

এই প্রবন্ধের উপসংহারে পূর্ব্বে যে দুই ছত্র ইংরেজী কবিতায় নানা প্রকার সমালোচনার নমুনা দিয়াছি তাহারি আরো একপ্রকার সমালোচনার নমুনা দিব—যাহা ঐ চাতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত হইবে।

Hail to thee, blithe Spirit !
Bird thou never wert.

সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। আকাশ উজ্জ্বল। একটি ভরত-পক্ষী দৃষ্টির অগোচর হইয়া শূন্য-পানে উধাও উড়িয়া উঠিতেছে আর অতি মধুর কণ্ঠে কূজন করিতেছে। তাহার চারিদিকে অসীম আলোকের রাশি। তাহার মনোহর সঙ্গীত-সুস্বর সেই আলো-রাশির মধ্যে দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কবি এই বিষয়টি নিবিড়-ভাবে প্রাণের মধ্যে অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই নির্ম্মল আলোরাশির মধ্যে এই মনোবিমোহন সঙ্গীত বিহঙ্গের মত কোনো সাধারণ-শরীরী জীবের হইতে পারে না। এই কল্পনা তাঁহার অনুভূতির তীব্র গভীরতার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি মনে করিলেন—ইহা কোনো উজ্জ্বল আনন্দময় ভাব-রূপী জীব-বিশেষের গীত-ধ্বনি নিশ্চয়ই। কাজেই তিনি ইহাকে blithe Spirit বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। আলোকময় আকাশে উধাও হইয়া উড়িয়া যাওয়া—সঙ্গীত-সুধা ছড়াইতে ছড়াইতে। কবি দেখিলেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁহার প্রাণ ইহাই চায়। সুতরাং ঐ সঙ্গীতশীল বিমান-চারী বিহঙ্গের উপর তিনি নিজেরই মন-প্রাণ আরোপ করিলেন। উহাকে আপন বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। Hail to thee! বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। Hail মানেই তাই। বন্দনা করিয়া বরণ করা। ইহার পরে Bird thou never wert—বলা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে—Bird thou never art—Bird thou never will be—as thou art the immortal Spirit of a never-ending song of deathless joy!

বিজয়-যাত্রা

শ্রী মঞ্জুলা দেবী

হে তরুণ, হে চির সুন্দর,
অনাদি রূপের আলো তুমি যবে এলে
বিস্ময়-বিমুগ্ধ আঁখি মেলে
দিয়েছিল সাড়া মোর সকল অন্তর;
বিপুল স্পন্দনে থরথর
সকল চেতনাখানি উঠেছিল কেঁপে
দেহমন ব্যেপে,—
প্রলয়ের ঝঞ্ঝাহত সাগরের হিন্দোলের মত
অশান্ত উদ্ধত
রুদ্রক্ষুধা ছুটেছিল লক্ষকোটি ব্যগ্র বাহু মেলি'
আলিঙ্গনে বেঁধে নিতে উচ্ছ্বাসে উদ্বেলি'
মত্ত অসংযত।

তুমি এলে প্রশান্ত সুন্দর,
প্রথম উষার মত অনাহত আনন্দ-ভাস্বর!
তুমি এলে আসে যথা মধু সমীরণ
লঘুগতি নিঃশব্দ-চরণ
মুকুলের চিত্তখানি করে' নিতে জয়।
হে রহস্যময়,
কেমনে জিনিয়া নিলে নাহি জানি আমি।
ওগো স্বামী,
কি অমৃত মর্ম্মকোষে করিলে সঞ্চার,
কি মন্ত্রে করিলে শান্ত নৃত্যশীল চিত্ত-পারাপার!

আমি শুধু জানি
ভিখারীরে সিংহাসনে বসাইলে আনি';
শুধু জানি তুমি বুকে এলে,
হৃদয়-কমলে রাঙ্গা রাজীব চরণখানি ফেলে
জাগাইলে অপূর্ব্ব যৌবন,—
বিকাশের সুখ-শিহরণ।

প্রেম দিয়ে কামনারে জয় করে' নিলে
তবু ধরা দিলে;
হে বিজয়ী শক্তিমান, দিলে ধরা বিজিতের পাশে—
এ পুলক জাগে আজ 'বিশ্ব ভরি' আকাশে বাতাসে,
বাজে ওগো অন্তর-তন্ত্রীতে
মৌন ধ্যানে নীরব সঙ্গীতে।

মছলি-পত্তনপ্রবাসী শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

বঙ্গের যে-সকল সুসন্তান জন্মভূমির বাহিরে নানাদিক্ দিয়া বৃহত্তর-বঙ্গ গড়িয়া তুলিতেছেন, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলায় দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত প্রমোদ-কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। প্রমোদবাবু মছলিপত্তন অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় চার বৎসর অধ্যক্ষতা করিবার পর সম্প্রতি বিদায় লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। কলাশালার কর্তৃপক্ষগণ, আন্ধ্র জনসাধারণ ও ছাত্রমণ্ডলী যেরূপ বিরাট সভা করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি এবং উচ্চ সম্মান দিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বিদায় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে তদ্দেশবাসীর কতটা হৃদয় জয় করিয়া আসিয়াছেন, ভাবিলে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে। তিনি কলাশিল্পের ভিতর দিয়া দক্ষিণ ভারতে বঙ্গের সভ্যতা (culture) বিস্তার করিতে, আন্ধ্র জাতিকে বঙ্গীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে, এবং তথায় একটি স্বাধীন কেন্দ্র গঠন করিয়া বঙ্গের ভাবধারার ভিতর দিয়া আন্ধ্র জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর আন্ধ্র প্রতিভা ফুটাইয়া তুলিতে কতদূর সাহায্য করিয়াছেন এবং তাহাতে কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা তদ্দেশীয় মুখপত্রসমূহ এবং আন্ধ্র নেতৃবর্গের সকৃতজ্ঞ স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায়।

প্রমোদবাবু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স হইতেই ললিতকলার প্রতি তাঁহার চিত্ত ধাবিত হয় এবং অধিক দিন বাগদেবীর উপাসনা না করিয়া তিনি কলাশিল্পের অনুশীলনে ব্রতী হন। তাঁহার বয়স যখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর, তখন তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট্ আর্ট স্কুলে পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১১ অব্দে স্কুল ত্যাগ করেন। প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল্ সাহেবের পর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যক্ষতাকালে প্রমোদবাবু তাঁহার ছাত্র-জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিয়া পার্সী ব্রাউন সাহেবকে স্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল হইয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন। এই সময় তিনি আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য বাবু নন্দলাল বসু, বাবু অসিতকুমার হালদার ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ নব্যবঙ্গীয় শ্রেষ্ঠরূপকারদিগের সতীর্থ হইয়াছিলেন। স্কুল হইতে বাহির হইয়া প্রমোদবাবু স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় পাশ্চাত্য প্রথায় তৈলচিত্র এবং মানসমূর্ত্তি অঙ্কনে তিনি কিছু নামও করিয়াছিলেন। তখন নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা-পদ্ধতিতে তাঁহার আস্থা ও সহানুভূতি আদৌ ছিল না। কিন্তু অভাবনীয় ঘটনা-পরম্পরার আবর্ত্তে পড়িয়া তিনি অল্প কয়েক বৎসর পরেই

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই নবীন শৈলীর অনুরাগী হন এবং ইহাতেই যে তাঁহার জীবনের সার্থকতা নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করেন। পারিবারিক দুর্ঘটনাবশত এক বিষম আধ্যাত্মিক বিপ্লব আসিয়া তাঁহার চিত্ত মথিত করিতে থাকে। তিনি বলেন, তখন ছয় বৎসর ধরিয়া র‍্যাফেলের পরিবর্ত্তে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকেন। তখন বর্ত্তমানকালের অনুভূতিকে বর্ণ ও রেখার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব ভাবিয়া চিত্রানন্দ প্রমোদকুমার তাঁহার জীবনের সেই একমাত্র সাধনাও পরিত্যাগ করিয়া বসেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি সংসার ছাড়িয়া পাঁচ বৎসর কাল ভারতের নানা তীর্থ, বিশেষতঃ উত্তরাখণ্ডের প্রায় সকল রাজ্য ভ্রমণ করিয়া হিমালয়ের পরপারে গিয়া উপস্থিত হন। তথাকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী, প্রতি মঠ, প্রত্যেক কারু-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি এক অভিনব ভাবরাজ্যের সন্ধান পান। তিনি বলেন, "সেইসকল মঠ ও মূর্ত্তির অন্তর ও বাহিরে যে নিগূঢ় রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা আমার হৃদয়ে ঘোর আন্দোলন জাগরিত করে।" প্রাচ্যকলার মহিমা সেই সময় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় এবং তিন মাস তিব্বত ভ্রমণের পর তিনি যখন নূতন আলোক পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন ভারতীয় শিল্পকলা যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র হইবে তাহা অনুভব করেন। অতঃপর চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় একদিন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের নিকট গিয়া "Indian Society of Oriental Art" নামক কলাভবনে স্থানপ্রার্থী হন, এবং তথায় ছাত্ররূপে প্রবেশের অনুমতি পাইয়া নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার অনুশীলনে আত্মসমর্পণ করেন। এই সময়ের কয়েকখানি চিত্র তাঁহার বিশেষত্বের পূর্ব্বাভাস দান করিয়াছিল।

প্রমোদবাবু তিব্বত হইতে ফিরিয়া কিছুদিন সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তদবধি দেশে তাঁহার স্বাস্থ্য ভালই থাকিতেছিল না। তিনি বঙ্গের বাহিরে কর্ম্মসূত্রে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা তাঁহার গুরুদেব আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানাইলে, তিনি অন্ধ্রজাতীয় কলাশালার উল্লেখ করেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সর্ব্বপ্রধান উকীল স্বদেশভক্ত, স্বজাতিবৎসল কোপল্লে হনুমন্ত রাও গারু কর্ত্তৃক স্থাপিত। সে অক্লান্তকর্ম্মী ইহার জন্য স্বীয় সারাটি জীবন উৎসর্গ করি সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। এখানে স্কুল ও কলে বিভাগ ব্যতীত সঙ্গীত-বিভাগ, নিম্ন প্রাথমিক অঙ্ক বিভাগ, এঞ্জিনীয়ারিং, মেকানিক্‌স্‌, বয়ন, রঞ্জন, ছিটবস্ত্র মুদ্রণ, তক্ষণ প্রভৃতি শিল্পবিভাগগুলি তিনি জীবন দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রবল বাসনা ছিল। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্ত্তক অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পিগণ যে কলাশৈলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, বা হনুমন্ত রাও অন্ধ্রদেশে তাহার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশা এবিষয়ে তিনি পরিচালক-সভায় কোন সভ্যের, এমন কি তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতেও কোন উৎসাহ পান নাই। বরং তাঁহারা তাঁহার সংকল্পে বাধা দিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। পরিচালক-সভা অন্ধ্রদেশীয় সাত জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত। তন্মধ্যে জন্মভূমি নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভোগরাজু পাট্টাভি সীতা রামাইয়া এবং প্রসিদ্ধ "কৃষ্ণ পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুটিনুরী কৃষ্ণরাও এই প্রতিষ্ঠানের বিধাতা। ইহাদের প্রভাব এপ্রদেশে বহুবিস্তৃত। এই গবর্ণিং বডির অধীন "Board of Life Members" নামে একটি শিক্ষক সমিতি আছে। তাঁহারা কলাশালার কার্য্য-বিভাগে কতকটা ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাঁহারা বাঙ্গালীর শিক্ষকতা এব বঙ্গীয় নব্যকলার অনুকূল মোটেই ছিলেন না। প্রত্যেকেই Modern Indian Artএর (আধুনিক ভারতীয় ললিতকলা) বঙ্গীয় প্রচেষ্টার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের ধারণার অনুযায়ী একমাত্র বুলিই ছিল Bengal Art is no Art. It cannot be termed as an Art (বঙ্গীয় ললিতকলা ললিতকলাই নয়। ইহাকে ললিতকলা নাম দেওয়া যাইতে পারে না)। অনেকে আবার বাবু হনুমন্ত রাওয়ের মস্তিষ্ক-বিকার সন্দেহ করিতেন। কিন্তু সেই মহাপ্রাণ প্রতিষ্ঠাতা প্রাণ থাকিতে এ প্রবল আন্দোলনের বাধা অতিক্রম করিতে না পারিলে প্রাণ দিয়া উদ্দেশ্য সফল করিয়া যান। কলাশালা

উন্নতি ও স্থিতির জন্য তিনি ধনপ্রাণ ও দেহ সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের ফলেই অকালমরণ বরণ করিলেন। মৃত্যু-শয্যায় তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু গবর্ণিং বডির সভ্যগণকে তাঁহার সংকল্পিত ভারতীয় ললিতকলা বিভাগ খুলিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন এবং তাঁহারা যে বঙ্গদেশ হইতে শিক্ষক আনাইয়া এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া শান্তির সহিত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই মহাপ্রাণ আন্ধ্রকুলদীপক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা আয়প্রদ সম্পত্তি কলাশালার জন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া যান। প্রতিষ্ঠাতার এই অন্তিম অনুরোধের ফলে, একজন উপযুক্ত শিল্পশিক্ষক পাঠাইবার জন্য তাঁহারা শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র লেখেন। তদনুসারে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হনুমন্ত রাও দেহত্যাগ করিবার তিন মাস পরে, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলাশালার শিল্পাচার্য্য হইয়া মছলিপত্তন-প্রবাসী হন।

এখানে আসিয়া প্রমোদবাবু নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা বিভাগ গঠন করিয়া প্রথমে দুইটি ছাত্র লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু এই বিভাগের পক্ষে এবং এই শিল্পের অনুকূলে তখনও কেহই ছিলেন না। সুতরাং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে, এমন কি, বিদ্রূপাত্মক বিরুদ্ধ সমালোচনার বাধা ঠেলিয়া চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ছাত্রগণ নীরবে কার্য্য করিয়া কলাশালার এই বিভাগটি পুষ্ট করিতে থাকেন। হঠাৎ একদিন একটা অভাবনীয় ঘটনা হইতে প্রমোদবাবুর প্রতি আন্ধ্র জনসাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় এবং নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার নিন্দা, বিদ্রূপ, প্রচার-নিষেধ ও বিরুদ্ধ সমালোচনার স্রোত রোধ করিয়া অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। এদেশে "শারদা" নামে একখানি তেলেগু মাসিক পত্রিকা আছে। প্রমোদবাবুর অঙ্কিত সরস্বতী মূর্ত্তি এই পত্রিকার প্রচ্ছদপট শোভিত করিয়া যখন বাহির হয়, তখন অন্ধ্রদেশের এক শ্রেণীর রসজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহা অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হয়। ডাক-বিভাগের কর্ত্তারা পর্য্যন্ত "শারদা"কে এমন ছবি বুকে করিয়া বাহির হইলে, গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া প্রচ্ছদপট হইতে উহা "indecent or obscene photograph" (অশ্লীল চিত্র) বলিয়া তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল লিখিয়া বলেন :—

"The title page conveys an expression of not mere nudity but an exaggerated grossness which cannot come within the purview of true art at all."

তাৎপর্য্য—প্রচ্ছদপটটি কেবল নগ্নতার ভাব মাত্রই প্রকাশ করিতেছে না, তদুপরি ইহাতে যে অতিরঞ্জিত স্থূল অমার্জ্জিত রুচি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কখনই প্রকৃত আর্টের সীমার ভিতর আসিতে পারে না।

এমন সময় একখণ্ড "শারদা" মাদ্রাজ আদীয়ার ব্রহ্ম-বিদ্যাশ্রমের অধ্যক্ষ কলারসজ্ঞ ডাক্তার জে, এইচ্, কজিন্‌স্ সাহেবের হাতে পড়ে এবং সেইসঙ্গে ডাক-বিভাগীয় নিষেধাজ্ঞারও সংবাদ আসে। তিনি বিষয়টিকে লঘু ভাবে না দেখিয়া তাহাতে নব্যভারতীয় শিল্পকলারই দক্ষিণ ভারতে প্রবেশনিষেধরূপ বিভীষিকার আভাস পাইয়া চিত্রখানির শিল্পশৈলী, ভারতীয় সংস্কারের সহিত তাহার সঙ্গতি এবং অন্তর্দ্দৃষ্টিপরায়ণ শিল্পীর তুলিকা-মুখে ভাবস্ফুরণের সজীবতা দেখিতে পান এবং তাহার সহিত উক্ত নিষেধ-বিধির শোচনীয় অসামঞ্জস্য তাঁহার হৃদয়-বেদনা উৎপাদন করে। তিনি ১৯২৩ সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখের "New India" পত্রে চিত্রটির বিশদ সমালোচনা করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা এবং প্রতিকূল মন্তব্যের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। কজিন্‌স্ সাহেব আক্ষেপ করিয়া বলেন :—

"It is bad enough that an ancient and most worthy phase of the cultural life of India should be subject to the censorship of a single individual Eastern or Western. But it is something more than deplorable that censorship should be of such a quality that it can see only obscenity where nothing is either expressed or implied save Divine purity ; and see exaggerated grossness where there is only fineness and reserve carried to the point of introspection."

তাৎপর্য্য—ভারতীর সভ্যতার একটি প্রাচীন ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্রম যে প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাত্মক সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় ; কিন্তু পরিতাপের অপেক্ষাও গুরুতর কথা এই যে, যেখানে স্বর্গীয় পবিত্রতা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করিবার প্রয়াস নাই সেখানে সে সমালোচক কেবল অশ্লীলতাই দেখিতে পান ; এবং যেখানে সুমার্জ্জিত রুচি ও সংযম-দৃষ্টি

অন্তর্মুখী করিয়া তোলে সেখানে তিনি অতিরঞ্জিত অমার্জ্জিত স্থূলতা দেখিতে পান।"

ফলে ডাক-বিভাগ প্রতিকূল প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন, আন্ধ্র জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ পরিবর্ত্তিত হয়, কলাভবনের কর্তৃপক্ষগণ যাঁহার হস্তে তাঁহাদের জাতীয় অনুষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধান্বিত এবং বিশ্বাস-পরায়ণ হন, এবং চিত্রশিল্পীর সহিত আচার্য্য কজিনস্ সাহেব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হন, বিবিধ সংবাদ ও সাময়িক বক্তৃতামুখে তাঁহার সেই বন্ধুত্বের প্রতিদান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য কজিনস্ সাহেব, তাঁহার "সমদর্শন" নামক উচ্চাঙ্গের ও গভীর-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থে প্রমোদবাবুর চিত্রসমালোচনা এবং ভারতীয় চিত্রকলায় সমদর্শনের আলোচনা-সূত্রে প্রমোদবাবুকে অতি উচ্চ স্থান দান করিয়াছেন।

যাঁহারা নব্য বঙ্গীয় চিত্রশিল্পপদ্ধতির প্রবর্ত্তন এবং বাঙ্গালী শিল্পাচার্য্যের নিয়োগ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন, বাঙ্গালার শিল্পীদের চিত্র যাঁহাদের নয়নে অতৃপ্তিকর এবং বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতার প্রাণপণ চেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জীবনে আর তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই, তাঁহারাই প্রথম বৎসরের কার্য্য দেখিয়া প্রমোদবাবুর অনুরক্ত এবং "Neo-Bengal School"এর ভক্ত হইয়া পড়েন। একদিন শিক্ষামন্ত্রী কলাশালা এবং বিশেষভাবে ইহার আর্টবিভাগটি দেখিতে আসিলে, পাট্যাভি সীতারামাইয়া মহাশয় তাঁহার নিকট প্রমোদবাবুর পরিচয় করাইবার কালে বলিয়াছিলেন—

"Sjt. Chatterjee is an asset to us. This section is his life work."

তাৎপর্য্য—"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের একটি সম্পত্তি বিশেষ, এই বিভাগটি গড়িয়া তোলাই তাঁহার জীবনের কাজ।"

তিনি তাঁহার সম্পাদিত কাগজে লিখিয়াছিলেন—

"Our duty is to offer our thanks to Babu Promode Kumar Chatterjee, who has made himself an exile in Machlipatnam and is anxions to create a centre of Andhra art of the Oricantal School ere long."

তাৎপর্য্য—"বাবু প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য; তিনি মছলিপত্তনে নির্ব্বাসনে দিন কাটাইতেছেন এবং অচিরে প্রাচ্য শিল্পের একটি আন্ধ্র শাখার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন।"

তাঁহার সহিত যোগ দিয়া স্বরাজ্য-সম্পাদক ১৯২৩ সালের ১লা অক্টোবর লিখিয়াছিলেন—

"In Sjt. Promode Kumar Chatterjee, the artist of the Kalasala, *Andhradesa* has come to recognise a youngman of talent and accomplishment willing to dedicate himself to the services of the institution, and to develop in the coming years a new centre of Indian art capable of expressing distinctive genius of the Andhras. * * * It will be seen that young Andhra artists have placed themselves under the guidance of Sjt. Chatterjee in the true spirit of discipleship and imbibed his genius so far as to produce some exquisite picture like "Yaksha-Patni" and "Moonlit Night." It is of happy augury that the revival of Indian art which received its first impulse in Bengal has led to the growth of a new centre in all the linguistic and cultural units of the land."

তাৎপর্য্য—"কলাশালার শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অন্ধ্রদেশ প্রতিভাশালী ও কৃতবিদ্য যুবক বলিয়া জানিয়াছেন; ইনি এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক এবং অচির ভবিষ্যতে ভারত-শিল্পে আন্ধ্রপ্রতিভার বিশেষত্ব প্রকাশক একটি কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছুক। * * * তরুণ আন্ধ্রশিল্পীরা যে প্রকৃত শিষ্যের মত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় কাজ করিতেছে এবং তাঁহার প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহা "যক্ষপত্নী"ও 'জ্যোৎস্না-রাত্রি' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চিত্রগুলির সৃষ্টি হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। ভারতশিল্পের এই যে নবজাগরণ বাংলার নিকট হইতে প্রথম উদ্দীপনা পাইয়া ভারতের বিভিন্নভাষাভাষী ও বিভিন্ন সভ্যতাদ্যোতক দেশে নূতন কেন্দ্র সৃষ্টির কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে ইহা বাস্তবিকই শুভ লক্ষণ।"

কৃষ্ণ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাও মহাশয় প্রমোদ-বাবুর চিত্র-সমালোচনা-সূত্রে তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন এবং অন্ধ্র দেশকে তিনি কতটা ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারই মুখের কথা লইয়া "স্বরাজ্য" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"During his short stay of a little over a year he has been able to inspire a few Andhra youngmen with devotion to the art of painting. He has the wonderful knack of eliciting the native talent of the youngmen by his precept and example. His ultimate aim is to help to start an independent

অশোক
শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

centre in Andhradesa which should express the individuality and the distinguishing genius and traditions of the Andhras."

তাৎপর্য্য—"তাঁহার এই কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল মাত্র বাসের ভিতরেই তিনি কয়েকটি অন্ধ্র যুবককে ললিতকলার সেবায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। উপদেশ ও স্বীয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে যুবকদের স্বকীয় প্রতিভা ফুটাইয়া তুলিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। আন্ধ্র ইতিহাস ও প্রতিভার বিশেষত্ব প্রকাশ করিতে পারে আন্ধ্র দেশে এমন একটি স্বাধীন শিল্পকেন্দ্র সৃষ্টির সূচনায় সাহায্য করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

প্রমোদবাবুর উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা আর বলিতে হইবে না। কলিকাতার প্রাচ্য চিত্র-প্রদর্শনীতে এই কলাশালা হইতে প্রথম বৎসরে ১৯খানি এবং দ্বিতীয় বৎসরে ৩৬খানি চিত্র প্রদর্শিত হয়। সেইসকল চিত্র সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ এবং সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ আচার্য্য এবং বিশেষজ্ঞ শিল্পীমণ্ডলী প্রশংসাপূর্ণ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৯২৪ অব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা Modern Review এবং ১৩৩০ সালের ফাল্গুনের প্রবাসীর পাঠকগণের অবিদিত নাই। গত বৎসর ছাত্রগণের কয়েকখানি ছবি প্রদর্শনীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

প্রমোদবাবুর যে কয়জন ছাত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আন্ধ্রদেশীয়। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান (১) আডিভি বাপীরাজু, (২) এ, ভি, সুধারাও, (৩) গুরা মাল্লায়া, (৪) কাওতা আন্দনমোহন শাস্ত্রী, (৫) রামমোহন শাস্ত্রী, (৬) টি, সুন্দরমূর্ত্তি, (৭) ভি, রামমূর্ত্তি, (৮) চালাপতি রাও এবং আরও আট জন আছেন। তাঁহাদের অনেকেই বিশেষতঃ প্রথম ছয় জন আন্ধ্রদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। গুরা মাল্লায়া "কোকনাডা ফাইন্ আর্ট" প্রদর্শনী হইতে সুবর্ণ-পদক ও উচ্চপ্রশংসাপত্র এবং আনন্দমোহন শাস্ত্রী লক্ষ্ণৌ হইতে গত বৎসর রৌপ্য-পদক পাইয়াছেন। বাঙ্গালোর, মৈসুর, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতার প্রদর্শনীতে এই ছাত্রগণের অনেকেই বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন এবং প্রথমোক্তদের মধ্যে কয়েকজনের ছবি প্রতি য়ুরোপে পাঠান হইয়াছে। তাঁহাদের চিত্র প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই বিক্রয় হইতেছে। প্রমোদবাবুর সকল ছাত্র অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র শিক্ষকের কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনটি ছাত্র কলাশালা হইতে বাহির হইয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র আডিভি বাপীরাজু গ্রাজুয়েট্ এবং গুণধাম। কলাশালার ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযোগী যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক তাহা তাঁহার জন্মিয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে তাঁহারা ও তাঁহার সতীর্থদের কাজ কলিকাতার অভিজ্ঞ সমাজে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এক্ষণে প্রতি বৎসরই "Englishman", "Statesman" প্রভৃতি পত্রে তাঁহাদের ছবি সমালোচিত হইতেছে।

এইরূপে আন্ধ্রজাতীয় কলাশালার অনেকগুলি ছাত্রকে শিক্ষকতা করিবার মত তৈয়ার করিয়া দিয়া, আন্ধ্রদেশে বঙ্গীয় কলাশৈলীর প্রতি রুচি জন্মাইয়া এবং দক্ষিণ ভারতে নবীন রূপকলার সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় গৃহে ফিরিয়াছেন। কলাশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট এরূপ প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন, যে, বৎসরে অন্ততঃ এক বার করিয়াও আসিয়া তিনি তথাকার কাজ-কর্ম্ম পরিদর্শন করিয়া যাইবেন। রবিবার ২০এ এপ্রেল ১৯২৬ বিরাট সভা করিয়া তাঁহারা তাহাকে বিদায় দান করিয়াছেন। বিদায়-সম্ভাষণে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন এবং প্রমোদবাবু তাহার যে উত্তর দিয়াছেন সমস্তই অতি হৃদ্য এবং বাঙ্গালীর গৌরবের কারণ। অন্ধ্র সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ গারু ইংরেজী ও তৈলঙ্গীতে দুইটি কবিতা, ছাত্রগণ গুরু দক্ষিণা দ্বারা কলাশালার প্রস্তুত একখানি মূল্যবান কার্পেট, এবং ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল বাবু রামকোটীশ্বর রাও গারু মৈসুরে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের "গোপাল মূর্ত্তি" তাঁহাদের বাঙ্গালী শিল্পাচার্য্যকে উপহার দেন। প্রমোদবাবুও তাঁহার কয়েকখানি ভাল ভাল ছবি স্মারক-স্বরূপ কলাশালার গ্যালারীতে ও উপযুক্ত বন্ধুগণকে প্রদান করেন। বিদায়-ব্যাপার এইরূপে আনন্দোৎসবে পরিণত হইলে পর ছাত্রগণের সহিত তাঁহার আলোক-চিত্র গৃহীত হয়। বিদায় অভিভাষণের উত্তরে চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় যাহা যাহা পরামর্শচ্ছলে বলিয়াছিলেন, সভা তাঁহার প্রত্যেক কথাই গ্রহণ করিয়াছেন। অন্ধ্রদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মুটনুরী কৃষ্ণরাও গারু সাধারণের পক্ষ

হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং সভাপতি, স্থানীয় সর্ব্বপ্রধান উকীল শ্রীযুক্ত সেবিজি হনুমন্তরাও পান্তুলু গারু চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের বহুল প্রশংসাবাদ করিয়া বলেন—"চারি বৎসরের কঠোর পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত প্রমোদ-বাবু অন্ধ্র জাতীয় কলাশালাকে একটি সুগঠিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া দিয়া **সমগ্র অন্ধ্র জাতির** কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।"

কুং-ফু-ৎসু

শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মহাশিক্ষা

দশম পরিচ্ছেদ

১। 'পৃথিবী শান্তিময়' বলিলে এই বুঝায় যে, তাঁহার রাজ্যের শাসন নির্ভর করিতেছে বৃদ্ধদের শ্রদ্ধার উপর, এবং (সেইজন্য) লোকে বাৎসল্য শিক্ষা করিবে। (তাঁহার রাজ্য-শাসন নির্ভর করিতেছে) জ্যেষ্ঠদের সম্মানের উপর এবং (সেইজন্য) লোকে ভ্রাতৃস্নেহ শিক্ষা করিবে। (তাঁহার রাজ্য-শাসন নির্ভর করিতেছে) অনাথদিগের সহৃদয়তার উপর, এবং (সেইজন্য) লোকে বিপরীত (কাজ) করিবে না।

সেইজন্য শাসক বা সম্রাটের নীতি-ধর্ম্ম (তাও) মাপিবার একটি মানদণ্ড (চীনা-চতুষ্কমান) আছে।

২। যাহা উৰ্দ্ধতনে মন্দ (বলিয়া তুমি বিবেচনা কর) অধস্তনের (উপর সেইরূপ) ব্যবহার করিও না। যাহা অধস্তনে মন্দ (বলিয়া মনে কর সেইরূপ) কর্ম্ম উৰ্দ্ধতনের (উপর) করিও না।

যাহা পূর্ব্ববর্ত্তীদের মন্দ, তাহা পরবর্ত্তীদের উপর করিও না। যাহা পরবর্ত্তীদের পক্ষে মন্দ তাহা পূর্ব্ববর্ত্তীদের উপর করিও না।

যাহা দক্ষিণদিকে মন্দ, তাহা বামদিকে দিও না। যাহা বামদিকে মন্দ, তাহা দক্ষিণদিকে দিও না।

ইহাকে বলে 'নীতি-ধর্ম্ম (তাও) মাপিবার মানদণ্ড।'

৩। কাব্য-সংগ্রহে আছে, 'কত আনন্দ! রাজা প্রজার পিতামাতা।' লোকের যাহা ভাল লাগে, তিনি তাহা ভালবাসেন; লোকের যাহা মন্দ লাগে, তিনি তাহা ঘৃণা করেন; তাহাকেই বলে লোকের পিতামাতা হওয়া।

৪। কাব্য-সংগ্রহে আছে, 'উত্তুঙ্গ ওই দক্ষিণ পর্ব্বত— শিলাময়-শিখর-কিরীটিত। অতি মহান্ তুমি পণ্ডিত য়িন্! লোকে তোমার দিকে চাহিয়া আছে।' রাজ্যশাসক অমনোযোগী হইতে পারেন না; চ্যুত হইলে (অর্থাৎ রাজ্যশাসন বিষয়ে অমনোযোগী হইলে) (তাহারা) জগতে ঘৃণ্য হইবে।

৫। কাব্য-সংগ্রহে আছে, 'সাধারণ লোকদের হারাইবার পূর্ব্বে, য়িন (বংশ) (অর্থাৎ তাহাদের পতনের পূর্ব্বে) তাহারা দেবতাদের সমতুল্য ছিল। য়িন্-এর (দৃষ্টান্ত) দেখিয়া শিক্ষা কর। সৌভাগ্য স্থির থাকে না। (সুতরাং) দেখা যাইতেছে সকলকে (সর্ব্বসাধারণ লোককে) পাইলে তবেই রাজ্য পাইবে। সকলকে হারাও, রাজ্যও হারাইবে।

৬। সেইজন্য শাসক প্রথমেই সাবধান হইবেন পুণ্য বিষয়ে; পুণ্যকে প্রাপ্ত হইলে লোক-(বল) হয়; লোক (বল) হইলে ভূমি-(বল) হইবে; ভূমি হইলে ধন-(বল) হয়; ধন হইলে ব্যবহার (করিবার শক্তি) হয়)।

৭। পুণ্য মূল ; ধন শাখা।

৮। বাহিরে মূল, ভিতরে শাখা (অর্থাৎ যাহা আসল তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া অবহেলা করিলে ও শাখাকে পোষণ করিলে) সংগ্রামে লোকদিগকে লুণ্ঠন-প্রবৃত্ত (করে)।

৯। ধন সংগ্রহ কর; লোকে ছড়াইয়া পড়িবে। ধন ছড়াইয়া দাও, লোকে একত্র হইবে। (অর্থাৎ রাজা যদি ধন সংগ্রহ করিতে থাকেন ত' লোকে দরিদ্র হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এবং রাজা যদি ধন প্রজাদের মধ্যে রাখেন ত' লোকে তাঁহার রাজ্যে থাকিবে।

১০। সুতরাং অন্যায় (রাজ)-আদেশ জারি (হইলে), অন্যায় ভাবেই (তাহার উপর) ফিরিয়া আসিবে। ঐশ্বর্য্য অন্যায় ভাবে আহরিত, অন্যায় ভাবেই ব্যয়িত হইবে।

১১। কাঙএর ঘোষণায় উক্ত,—'কেবলমাত্র (রাজ্যে) ভাগ্য নিত্য (চিরস্থায়ী) নহে।' (অর্থাৎ শাসন সুন্দর হইলে রাজ্য তিষ্ঠিবে; মন্দ হইলে রাজ্য তিষ্ঠিবে না।) পথ বা ধর্ম্ম (তাও) সুন্দর (হইলে); তবেই উহার (স্থায়িত্ব) পাওয়া যাইবে। সুন্দর না হইলে, তবেই ইহা হারাইবে।

১২। চু'-গ্রন্থে (চু নামে একটি রাজবংশের ইতিহাস) আছে, "চু-রাজ্যে সৎলোককে মূল্যবান ছাড়া আর কিছুই মূল্যবান্ বলিয়া মনে করা হয় না।"

১৩। খুল্লতাত ফন (সম্রাট্ বেনের খুড়া) বলিয়াছিলেন, 'হৃত (অর্থাৎ রাজ্যচ্যুত বা বিতাড়িত) ব্যক্তি কিছুই মূল্যবান বিবেচনা করেন না; মানবতা ও প্রীতি (তিনি) মূল্যবান বিবেচনা করেন।

১৪। চিন-এর (চৌবংশের ইতিহাসের পরিচ্ছেদ) ঘোষণায় আছে—'যদি (রাজ্যে) থাকে একজনও মন্ত্রী সরল ও স্বাভাবিক,—তার অন্য গুণ নাই; (কেবল) তাহার হৃদয়টি সুন্দর, আর তাহার যদি থাকে ঔদার্য্য; অন্য লোকের দক্ষতা,—যেন নিজেরই তাহা আছে (মনে করে); লোকের মধ্যে আছে কৃতি সাধুপুরুষ;—তাঁহার হৃদয় তাহাদিগকে ভালবাসে—তাঁহার মুখ হইতে যাহা নির্গত হয় তাহা নহে (অর্থাৎ বাক্যাতীত প্রেম); (এবং) তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে যথার্থ ভাবে সক্ষম; (সেই মন্ত্রীই) সক্ষম হইবে রক্ষা করিতে আমার পুত্র, পৌত্র এবং কৃষ্ণকেশা (লোক)দিগকে। এমন-কি (রাজ্য) শক্তিশালী হইতে পারে।

(কিন্তু যে মন্ত্রী) যে-লোকের শক্তি আছে তাহাকে ঈর্ষা করে ও ঘৃণা করে, লোকের মধ্যে যে কৃতি সাধুপুরুষ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে, তাহাদিগের কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেয় না, যথার্থ সব সহ্য করিতে পারে না, (সেইরূপ মন্ত্রী) পারিবে না আমার পুত্র, পৌত্র ও কৃষ্ণকেশ লোকদিগকে রক্ষা করিতে। তবে তাহাকে কি (রাজ্যের) আপদ বলা হইবে না?

১৫। কেবলমাত্র মানব-প্রেমিক (অর্থাৎ সেই রাজা যিনি রাজা ও প্রজার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন) তাহাকে (দুষ্ট মন্ত্রীকে) নির্ব্বাসনে দিতে পারেন, চারিদিকে বর্ব্বরদের মধ্যে তাড়াইয়া দিবেন, 'চুঙ কুও'তে (মধ্যরাজ্য বা চীন) তাহার সহিত একত্র বসবাস করিবে না (বলিয়া মনস্থ করিবেন); (সেইজন্য) বলা হইয়াছে, 'কেবলমাত্র মানব-প্রেমিকই মানুষকে ভালবাসিবে এবং মানুষকে ঘৃণাও করিবে।'

১৬। সাধুপুরুষ দেখিতেছ, কিন্তু (তাঁহাকে) পারনা (উচ্চপদে) বসাইতে; (উচ্চপদে) বসাইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে হইতেই পার নাই ইহা (তাহার প্রতি) অসম্মান প্রদর্শন; অসুন্দর (দুষ্ট ব্যক্তি)কে দেখিতেছে, ও তাহাকে (উচ্চপদ হইতে) অপসারিত করিতে অসমর্থ; অপসারিত করিতেছ, কিন্তু সত্বর সক্ষম না হওয়া—অন্যায়।

১৭। (লোকে) যাহাকে ঘৃণা করে তাহাকে ভালবাসা; এবং (লোকে) যাহাকে ভালবাসে তাহাকে ঘৃণা করা,—ইহা মানুষের প্রকৃতির বিরোধী। দুঃখ তাহার দেহকে স্পর্শ করিবেই।

১৮। সুতরাং সম্রাটের আছে (একটি) মহাপথ, উহা পাইবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করিতে হইবে। ঔদ্ধত্য ও অমিতাচার উহা (হইতে) ভ্রষ্ট হয়।

১৯। ধন (শ্রী) উৎপাদনের মহাপথ আছে। উৎপন্নকারী (যখন) অনেক, গ্রাহক (আহারকারী) অল্প হয়; (তখন উদ্বৃত্ত ধন থাকে)। (সামগ্রী) প্রস্তুত-

কারকেরা দ্রুত করুক; আর ব্যবহার কর্ত্তারা ধীরে করুক। তাহা হইলে ধন সর্ব্বদাই পর্য্যাপ্ত হইবে।

২০। মানব-প্রেমিক ধন ব্যবহার করেন আপনাকে উন্নত করিবার জন্য;—অপ্রেমিক আপনাকে নিয়োজিত করেন ধন সংগ্রহের জন্য।

২১। এরূপ কখনো হয় না যে, উচ্চতনেরা (অর্থাৎ যাঁহারা উপরে আছেন) মানবতা ভালবাসেন, এবং নিম্নতনেরা ন্যায়পরায়ণতা ভালবাসে নাই। এরূপ কখনো হয় না যে, (লোকে) ন্যায়পরায়ণতা ভালবাসে ও তাহাদের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই। এরূপ কখনো হয় নাই যে, (লোকের) কোষ ও আয়ুধাগারের ঐশ্বর্য্য, তাঁহার (সম্রাটের) ঐশ্বর্য্য হয় নাই।

২২। 'মঙ্গ্-হ্সিএন্-২সু বলিয়াছিলেন, "যে অশ্ব ও যান রাখে সে মুরগীর ও শূয়রের ছানা পালে না; যে পরিবারে বরফ রাখে (রাজ্যের বড়কর্ম্মচারীরা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও পূজাদির জন্য ভাণ্ডারে বরফ সঞ্চয় করিতেন) তাহারা গোরু ও ছাগ রাখে না; যে-পরিবারে শত যান (রথ) আছে, তাহারা সংগ্রাহক লোভী মন্ত্রী রাখিবে না; লোভী মন্ত্রী রাখিবার চেয়ে ডাকাত-মন্ত্রী রাখা ভাল।" (সেইজন্য) যাকে বলা হইয়াছে যে "রাজ্যে লাভকে লাভ (সমৃদ্ধি) বলিয়া বিবেচনা করিও না; ন্যায়পরায়ণতাকেই লাভ বলিয়া বিবেচনা করিবে।"

২৩। রাজ্যবৃদ্ধ (শাসক) যখন অর্থ-সংগ্রহে আবিষ্ট হন, তিনি নিশ্চয়ই হীনব্যক্তির (দ্বারা পরিচালিত হন)। তিনি তাহাকে (হীনব্যক্তিকে) সৎ বিবেচনা করেন; হীনব্যক্তি যখন রাজ্যপরিচালনা করেন, (দৈব) বিপদ, (মানবীয়) উৎপাত উভয়ই আসে। সৎলোক আসিলেও (তাহার স্থানে) কিছুই করিতে পারে না। (সেইজন্য) বলা হইয়াছে, "রাজ্যে লাভকে লাভ (সমৃদ্ধি) বলিয়া বিবেচনা করিবে না। ন্যায়পরায়ণতাতেই লাভ বলিয়া বিবেচনা করিবে।"

[মহা-শিক্ষার দশম পরিচ্ছেদ রাজ্যশাসন ও কিরূপে রাজ্য সুখ- ও শান্তিপূর্ণ করিতে হয়—তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছে।]

মহাশিক্ষা সমাপ্ত

আকাশ-বাসর

শ্রী সজনীকান্ত দাস

ললিতমোহনের শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে; এই অল্প বয়সেই কপালে ও চুলে বার্দ্ধক্য দেখা দিয়াছে। বেচারা অনেক আশা করিয়াছিল; কল্পনার রঙীন স্বপ্নে অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত হতাশাই তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। আশার ক্ষীণালোক তাহার মনে এখনো ধিকিধিকি জ্বলিতেছে,—স্ত্রী অশোকার সহানুভূতি ও প্রীতি পাইলে সে এই ভগ্ন শরীরেই একবার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে পারে। তাহার আন্তরিক বিশ্বাস যে, অশোকা যদি এমন করিয়া তাহার প্রত্যেক কাজে বিরক্তি না দেখাইয়া তাহাকে সামান্য মাত্র উৎসাহও দেয়, তাহা হইলে সে বাহিরের সমস্ত অনাদর অকাতরে সহ্য করিয়া এখনও সবলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু, বেচারার ভাগ্যে এতটুকু উৎসাহ-বাক্যও আজ পর্য্যন্ত জুটিল না।

আজ পাঁচ বৎসর হইল সে সসম্মানে এম্-এ পাশ করিয়াছে; একটু চেষ্টা করিলেই প্রফেসারী হউক কি মাষ্টারী হউক কিছু-একটা ভালো চাকুরী সে সহজেই জুটাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করে নাই। কাব্য-সরস্বতী তাহার স্কন্ধে বহুদিন হইল ভর করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরস্বতীকে তাঁহার

ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝাইয়া দিয়া উদ্বৃত্ত সবটুকুই সে কবিতা, কাব্য ও সাহিত্যচর্চ্চাতে দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও তাই সে কবিতার কমলবন পরিত্যাগ করিয়া কমলার রত্ন-সিংহাসনের পাশে আসিয়া জুটিতে পারিল না, কাব্য-সরস্বতী ও দারিদ্র্য দুইজনকেই একসঙ্গে বরণ করিয়া লইল। সে অবিশ্রাম কাব্যচর্চ্চা করিতে লাগিল এবং মাসিকে সাপ্তাহিকে গল্প, উপন্যাস, কবিতাদি প্রকাশ করিয়া কোনো রকমে মনের আনন্দে পেটের খোরাক জোগাইতে লাগিল। আসলে, তাহার পেশা হইল সাহিত্য-সাধনা।

ইহাতে মুস্‌ড়িয়া পড়িবার কিছু ছিল না, কারণ, বন্ধন বলিতে যাহা বুঝায় আমাদের ললিতমোহনের তাহা একটিও ছিল না। অল্প বয়সেই তাহার বাবা মারা যান; মাও অনেককাল গত হইয়াছেন। এক দূরসম্পর্কীয়া বিধবা পিসীমা ছাড়া সম্প্রতি তিনকুলে তাহার আর কেহ নাই। তিনি দেশে থাকিয়া ললিতমোহনের পৈতৃক ভিটাটুকু আগলাইতেন ও তাহার পৈতৃক সম্পত্তির আয় ২১॥৶০ নিয়মিত ভাবে মাসে মাসে তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন। সুতরাং, বন্ধন না হইয়া পিসীমা তাহার এই কাব্য-সাধনায় একটু মুক্তির আনন্দই দিতেন। এই ২১॥৶০র উপর লিখিয়া-টিখিয়া সে যাহা পাইত তাহাতেই তাহার কলিকাতায় বাস ও উদরের সংস্থান দুই-ই হইত, এমন-কি মাসিক চার পাঁচ টাকার বই কিনিবার অভাবও তাহার কোনো দিন হয় নাই।

ললিতমোহনের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সে এম্‌নি করিয়া সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধনায় জীবন কাটাইবে; বাঁধা পড়িবে না। কিন্তু কেমন করিয়া যে সব গোলমাল হইয়া গেল সে ঠিক বুঝিতে পারিল না; এম্-এ পাশ করার দুই বৎসরের মধ্যে সে অশোকাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল এবং সেইদিন হইতেই তাহার দুর্দ্দশা সুরু হইয়াছে।

সাহিত্য-রোগে আক্রান্ত হইলে সঙ্গে-সঙ্গে আরো একটি মস্ত উপসর্গ আসিয়া জোটে; সেটি পাঠক বা শ্রোতা সংগ্রহ করা। রাত্রি জাগরণ করিয়া মনের আনন্দে লিখিয়া গেলাম আর সেখানেই আনন্দের সমাপ্তি হইল, এমন মনোভাব লইয়া কোনো নির্ব্বিকার সন্ন্যাসী সাহিত্যিক কোথায়ও জন্মিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু ললিতমোহন মনের সমস্ত রস দিয়া যাহা লিখিত মনের সমস্ত রস দিয়া যদি কেহ তাহা উপভোগ না করিত তাহা হইলে তাহার সব আনন্দ মাটি হইল বলিয়া মনে হইত। তাই সে রাত্রের লেখা সকালে অতি সন্তর্পণে চায়ের দোকানে লইয়া গিয়া পরিচিত লোকের অপেক্ষায় থাকিত এবং অর্দ্ধ বা সিকি পরিচিত লোক দেখিলেও কথায় কথায় তাহার লেখার কথা পাড়িয়া তাহা শোনাইতে বসিত। এখানেই অশোকার মামাত ভাই অজিতের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। অজিত ললিতের লেখার একজন ভক্ত ছিল; অশোকাকেও ললিতের কাব্য-সাহিত্যের পক্ষপাতী জানিয়া সে একদিন ললিতকে অশোকাদের বাড়ী লইয়া গিয়া তাহাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিল। ললিত মধ্যে মধ্যে অশোকাদের বাড়ী গিয়া নূতন গল্প, কবিতা বা উপন্যাসের টুক্‌রা-বিশেষ শোনাইয়া আসিত। অশোকা ভালোমন্দ সমালোচনা করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিত। অশোকার সহিত এই পরিচয় ক্রমশঃ প্রণয়, প্রেম ও পরিণয়ে পর্য্যবসিত হইল।

অশোকার পিতা রাজীবলোচনবাবু সব্-ডেপুটী হইতে পদোন্নতি করিয়া সম্প্রতি আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও রায় বাহাদুর হইয়াছেন। ধর্ম্মতলা অঞ্চলে একটি ত্রিতল বাড়ীতে সপরিবারে তাঁহার বাস। পরিবার বলিতে গৃহিণী, অবিবাহিতা তিন কন্যা, অশোকা, রেবা ও ভায়োলেট এবং গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী সুপ্রভা ও সুপ্রীতি। মেয়েরা সবাই স্কুল কলেজে পড়ে। অশোকার বড় তিন বোন হরিমতি, গৌরী ও সুশীলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; তাহারা সিম্‌লা, ঝরিয়া ও বালীগঞ্জে স্ব স্ব স্বামীগৃহে বাস করিতেছে।

অশোকা তখন বেথুন কলেজে বোটানি, হিষ্ট্রী ও বাংলা লইয়া আই-এ পড়িতেছে; সুপ্রীতি তাহার সহপাঠী। অশোকার বিবাহের কাণাঘুষা চলিতেছে; বালীগঞ্জের ব্যারিষ্টার এম্, সি, ঘোষের পুত্র অবনীমোহন ঘনঘন এবাড়ীতে গতায়াত করেন। ইতিমধ্যে

অজিতের মারফত ললিতমোহনের আবির্ভাবে সব গোলমাল হইয়া গেল। বুদ্ধিমতী বলিয়া অশোকার খ্যাতি ছিল, কিন্তু সেই-ই ললিতের 'একরাত্রি' গল্পটি শুনিয়া প্রেমে পড়িয়া গেল। ললিতমোহনের ছেলেমানুষী ও সাংসারিক জ্ঞানের অভাব তাহাকে যতই তাহার বোনেদের ও অবনীবাবুর কাছে বোকা বানাইতে লাগিল সে ততই তাহার প্রেমকে নিবিড় করিয়া তাহাকে যেন রক্ষা করিতে লাগিল।

এই অকারণ-প্রীতি দেখিয়া ভালোমানুষ ললিতমোহনের সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কাব্য-সরস্বতীর দিক হইতে তাহার আংশিক মন এই দুষ্ট সরস্বতীটির উপর আসিয়া পড়িল, সে অশোকাকে ভালবাসিল।

রাজীবলোচন-বাবু ও তাঁহার গৃহিণী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—অসম্ভব। ললিতমোহনের দুরবস্থা ও কাব্য-প্রীতির কথা শুনিয়া এই প্রস্তাবকে তাঁহারা ললিতের স্পর্দ্ধা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহারা ত ঠিকই করিয়াছেন আই-সি-এস ব্যতীত অন্য কাহারো ভাগ্যে অশোকাকে পড়িতে দিবেন না। তা ছাড়া অবনীও ত রহিয়াছে। বাধা পাইয়া অশোকার জিদ্ চড়িয়া গেল। বাবা ও মা অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন, এই নিঃস্বকে বিবাহ করিলে তাহার দুঃখের অবধি রহিবে না। আর তাঁহার রোজগারে অন্য তিন জামায়ের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে বসাইবেনই বা কি করিয়া? তাহার কাপড়-চোপড় জোগাইতেই ত ছোঁড়ার প্রাণান্ত হইবে,—ইত্যাদি। অশোকা কিন্তু টলিল না। মা কাঁদিলেন, বাবা বকিলেন, বোনেরা হাসিল।

মা বলিলেন, "অবুঝ মেয়ে, নিজের কিসে ভালো হয় তা বুঝ্‌ছিস্ না কেন? তোকে বিয়ে কর্‌বার মত যোগ্যতা কি ললিতের আছে?"

অশোকা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "কেন, ও আমার অযোগ্য কিসে?"

মা বলিলেন, "পোড়া কপাল আমার, যে জেগে ঘুমোয়, তাকে জাগান দায়!"

বাবা বলিলেন, "মেয়ে অবুঝ ব'লে কি আমাকেও অবুঝ হ'তে হবে? আমি জেনে শুনে এমন ক'রে ওকে ভাসিয়ে দিতে পার্‌ব না।"

অশোকা বলিল, তাহা হইলে সে বিবাহই করিবে না। অগত্যা গৃহিণী রাজীবলোচন-বাবুকে বুঝাইলেন, আর যাই হোক, ছোঁড়াটা ফার্ষ্টক্লাস এম্-এ। দুরবস্থায় পড়িলে ডিগ্রী ভাঙাইয়াও খাইতে পারিবে। সংসারের চাপ পড়িলেই এই কাব্য-প্রীতি ঘুচিবেই ঘুচিবে। রায়বাহাদুর মেয়েকে নাছোড়বান্দা জানিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত মত দিলেন। নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। বালীগঞ্জের জামাই অধরচন্দ্র আসিলেন। সিমলা ও ঝরিয়া হইতে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের একটি করিয়া স্বরলিপি-সম্বলিত গানের বহি উপহার আসিল। অবনী-বাবু গোল্ডস্মিথের জীবনচরিত একখানি দিয়া গেলেন।

ললিত প্রথমটা হাতে স্বর্গ পাইল। অশোকাও সাহিত্যিক স্বামীর গর্ব্বে পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবদের তাচ্ছিল্য গায়ে মাখিল না। তাহারা গড়পার খালধারে একখানা চারতালা বাড়ীর একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র সংসার পাতিয়া ফেলিল। বাড়ীখানিতে বিশ পঁচিশটি ফ্ল্যাট। পায়রার খোপের মত ছোট ছোট ঘরগুলি; বারান্দাগুলিও তক্তা দিয়া ভাগ-করা। নানা ধরণের ভাড়াটের রুচি-বৈচিত্র্যে বাড়ীখানি বিচিত্র। কোনো জানালায় সুশ্রী পরদা, কোথায়ও বা, বস্তা-ছেঁড়া, পুরোণো লুঙ্গী কিম্বা নানা বর্ণের কাপড়ের সংযোগে পরদা প্রস্তুত হইয়াছে। বারান্দায় কোথাও ছেঁড়া কাঁথা শুখাইতে, কোথায় রেলিঙের উপর ধুতি সাড়ীর অদ্ভুত সমাবেশ। ব্রাহ্ম, হিন্দু, শিখ, কেরাণী, সাহিত্যিক, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী, ডাক্তার, উকীল প্রভৃতি নানাদরের ও স্তরের ভাড়াটে লইয়া সর্ব্বদা তাহা গম্‌গম্ করিত। কাহারো সঙ্গে কাহারো বিশেষ পরিচয় নাই; আপন আপন ঘরগুলি গুছাইয়া লইয়া প্রত্যেকেই নির্ব্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সিঁড়িতে কচিৎ কখনো এ-ভাড়াটেতে ও-ভাড়াটেতে দেখা হয়; সন্ধ্যা ও সকালে উনানে কয়লা দিবার সময় উপরের ও নীচের ভাড়াটেতে প্রত্যহ দুইবার করিয়া বচসা হয় আর পাম্পে জল ওঠা বন্ধ হইলেই জল লইয়া ঝগড়া বাধে।

ললিতমোহনের চারতলায় দুটি শুইবার ঘর ও একটি রান্নাঘর। ছাতের সিঁড়িতে চাবী থাকিত, সেটি তাহারই এলাকাভুক্ত।

বেশ দিন চলিতেছিল,—কাব্যে গল্পে গানে দুটিতে 'কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচুড়ে বাঁধি' নীড় থাকে সুখে' সুখেই দিন কাটাইতেছিল। ইতিমধ্যে সিমলা হইতে হরিমতি আসিয়া গোল বাধাইল। তাহার চালচলন, পয়সার জাঁক, সাজের বাহার আর কমিসরিয়েটের বড় বাবু-কর্ত্তার খাতির সবশুদ্ধ সে একটা মূর্ত্তিমান্ বিদ্রোহের মত অশোকার সংসারে আসিয়া পড়িল। হরিমতির যখন কিশোর বয়স তখন রাজীববাবুর অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না; বাড়ীতে স্ত্রী-শিক্ষারও বেশ রেওয়াজ হয় নাই; হরিমতি পাড়া বেড়াইয়া পা ছড়াইয়া সুমতির বর কিম্বা কাজলীর নেকলেশ ছড়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটাইয়াছে—এই অবস্থায় শশুড়ী-ও অভিভাবক-হীন ঘরে পড়িয়া সে একেবারে মাতব্বর হইয়া পড়িল ও নিজের সখের মাত্রা নিরীহ স্বামীর উপর দিয়া পূরাপূরি মিটাইয়া লইতে লাগিল। যাহার কথায় অতগুলি সরকারী কর্ম্মচারী ওঠে বসে সেই কমিসরিয়েটের বড়-বাবুই উঠিতে-বসিতে তাহার মুখ চাহিয়া থাকেন—ইহাতে তাহার গর্ব্বের অন্ত নাই। স্বামীর জন্য স্ত্রীদের আত্মোৎসর্গের কথা সে ভাবিতেই পারে না। অশোকা প্রথমটা বিরক্ত হইয়া স্বামীর প্রতি দিদির খোঁটাগুলির প্রতিবাদ করিত। হরিমতি ললিতের ঘরের সামান্য অভাবগুলিকেই এত বড় করিয়া দেখাইতে লাগিল যে, প্রথমত অশোকার বিরক্তি ধরিয়া গেল; একদিন হরিমতি মাকে সঙ্গে করিয়া অশোকার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া দেখিল সে তাহার একটা পুরাতন শাড়ী সেলাই করিতেছে। মায়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরিমতি বলিল, "মা, তোমারও কি পয়সার অভাব ঘটেছে নাকি? যখন জানই ললিতের ক্ষমতা নাই মাঝে মাঝে কাপড়টা ব্লাউজটা কিনে দিলেই পার!" মা বলিলেন, "আ কপাল, মেয়ের যে দেমাক ভারী, মুখ ফুটে কি কিছু বলে? সেদিন গোয়াবাগানে নেমন্তন্ন খেতে গেল না—বল্লাম, কাপড় জামা তোর না থাকে বল, আমি আনিয়ে দিচ্ছি; মেয়ের অভিমান হ'ল, বল্লে, কাপড়-চোপড় আছে। এখনি কি হয়েছে মা, যে-লোকের হাতে ও পড়েছে আরো কত না জানি ওর কপালে আছে।"

অশোকা অভিমান-ক্ষুব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল, বলিল, "সব্বাইকার অবস্থা কি সমান হয় মা, ক্ষমতা নেই দেবে কোত্থেকে।"

মা ফোঁস করিয়া উঠিলেন, "কেন, চেষ্টা করেছে কোনো দিন—তোর জন্যে একটু কি ভাবে? খালি লেখা আর পড়া।"

অশোকার ইচ্ছা হইল বলে—বড় জামাইবাবুর মত মদে ডুবিয়া থাকা অপেক্ষা সে অনেক ভাল—কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল। ঘা খাইয়া খাইয়া তার মনেও বিরক্তি ধরিয়াছে। দিনের পর দিন এই ভাবে স্বামীর নিন্দা শুনিতে শুনিতে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সব রাগ গিয়া পড়িল ললিতমোহনের উপর, তাই ত, ও ত চেষ্টা করিলেই পারে—বিদ্যা বুদ্ধির ত অভাব নাই। তবে সে চেষ্টা করে না কেন? অথচ ললিতকে কিছু বলিতে গেলে সে হাসে। শেষে সেও স্বামীর অপদার্থতা কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি বিরূপ হইতে লাগিল। মা ও দিদি ইন্ধন জোগাইতে কসুর করিল না। আরো দুইচারিজন বন্ধু জুটিল; তাহাদের সহানুভূতি-সূচক হা-হুতাশে তাহার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। সে বুঝিল ও বিশ্বাস করিল তাহার এই অপরূপ রূপ ও গুণ একজন অপদার্থের হাতে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। ললিত একেবারে তলাইয়া গেল।

একদিকে নিজের কাব্যজীবনের হতাশ্বাস অন্যদিকে স্ত্রীর বিমুখতা ললিতমোহনকে নিত্যই পীড়া দিতে লাগিল। সে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। এখনও সে মাঝে মাঝে ভাবিতে বসে—হায়, যদি অশোকা তাহার দুঃখ বোঝে তাহা হইলে জীবনে যশ ও অর্থে সামান্য যাহা কিছু জুটিতেছে তাহা দিয়াই তাহারা স্বর্গ গড়িতে পারে। এত বিফলতার মধ্যেও তাহার ভক্তদের নিকট হইতে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক জুটিত। অশোকার প্রীতি তাহা নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী করিয়া

আর্থিক অস্বচ্ছলতার দুঃখ দূর করিতে পারে, কিন্তু মা বোনের চেষ্টায় অশোকার মনের অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে ফাঁকা আনন্দে তাহার আর মন উঠে না; সে চায় সাজ-সজ্জা, বিশ্রাম, বিলাস; এগুলি অর্থ-সাপেক্ষ এবং ললিতমোহনের আর যাই থাক্ এই অর্থজিনিসটার অভাব ছিল।

ললিতমোহনের প্রথম উপন্যাস 'কালের কোপ' বেশ কাটিয়াছিল এবং সে ভবিষ্যতের অনেক রঙ্গীন স্বপ্নও দেখিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বই 'মন্নুর মা' একেবারেই কাটিল না। সেই নিশ্চিত ২১৷৵ ও প্রথম উপন্যাসের আয় হইতে গোড়ার দিকে সংসার বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহা প্রায় অচল। বর্ত্তমানের সামান্য আয়েই স্বামীস্ত্রীর বেশ চলিয়া যাইত; কিন্তু রায়-বাহাদুরকন্যা অশোকার খরচের হাতটা বেশ একটু বেশী ছিল। ভালবাসার দিকে আজকাল যেমন সে ভালবাসার দাবী করিত, কিন্তু ভালবাসিত না, খরচের বেলায়ও খরচ করিয়া যাইত, সঞ্চয় করিত না।

সংসার আরম্ভ করিবার প্রথমদিকে মা বলিতেন, "বেবী, তোর মত এমন সুন্দরী বউ পেয়ে ললিতের আয়ের দিকে নজর দেওয়া উচিত। দামী কাপড়চোপড়ে তোকে কেমন মানায় এটা লক্ষ্য করা তার কর্ত্তব্য। এই পোড়া কাব্যি-নবেল লেখা ছেড়ে সে কোনো ব্যবসা করে না কেন?"

সাহিত্যিক-গৃহিনীর আত্মমর্য্যাদার নেশা তখনো কাটে নাই। সে মায়ের দিকে রোষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া থাকিত।

এখন তাহার মন ভাঙিয়াছে। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, মা বোন ও সঙ্গীরা সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়া তাহার ঘরে জটলা পাকায়; এই হট্টগোলে বেচারা ললিতের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে নিরিবিলিতে একবারও কাগজ কলম লইয়া বসিতে পায় না। সে ভাবে, আহা, অশোকাকে এরা ভালবাসে, তাই আসে। সে চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ এসব অসহ্য হইয়া উঠিল, তাহার কাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে; নিষ্ফল আক্রোশে তাহার মেজাজও খিটখিটে হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীর অবিবেচনায় আর মনের সঙ্গে যুদ্ধে সে আজ অসুস্থ।

সে চুপি চুপি এক ডাক্তারের কাছে গিয়া পরামর্শ চাহিল। পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন—পাড়াগাঁয়ে এই হট্টগোলের বাহিরে ফাঁকা জায়গায় কিছুদিন বাস না করিলে তাহার শরীর সারিবে না। রোগের ওষুধ শুনিয়া ললিত একটু হাসিল। স্থান পরিবর্ত্তন—হায় রে, সে না জানি কত টাকার ব্যাপার!

ডাক্তার অবাক্ হইয়া বলিলেন, "হাসির ব্যাপার না মশাই, আপনার বুকটা—"

ফ্যাকাশে শীর্ণ মুখখানি ডাক্তারের দিকে তুলিয়া ললিত আর একবার হাসিল। ডাক্তার বুঝিলেন ও মৃদুহাস্য করিলেন। ললিত বলিল—"আমার বুকটা হাসির ব্যাপার নয়—আপনার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ শুনে হাসি আস্‌ছে—আমার পক্ষে বেশ একটু রাজকীয় রকমের ওষুধের ব্যবস্থা করলেন্ কিনা।"

ললিত বাড়ী আসিল এবং হাওয়া পরিবর্ত্তন, বুকের অসুখ ইত্যাদি ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে তাহার "গদ্য-সাহিত্যে স্বরবিন্যাস" পুস্তকখানির তৃতীয় অধ্যায় লিখিতে বসিল। কিন্তু পাশের ঘরে তখন তাহার শাশুড়ী, বড়শালী, অশোকা ও তাহার দুই চারিজন প্রাণের বন্ধু মিলিয়া সশব্দে তাস খেলিতেছে। তাহাদের উচ্চ কলোচ্ছ্বাস হাঁক-ডাকে তাহার সমস্ত স্বরবিন্যাস ঘুলাইয়া গেল। সে রাগে কলম কামড়াইতে লাগিল, চুল ছিঁড়িতে সুরু করিল, এবং ভাবিতে ভাবিতে তাহার একেবারে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে সশব্দে মাঝের দরজাটি খুলিয়া দিল। মেয়েরা বিষম বিরক্তিতে তাহার দিকে চাহিল। বিরক্তি-কাতর-কণ্ঠে ললিত বলিল—"আপনারা কি আমাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন? একটু আস্তে আস্তে খেলুন না, নইলে আমার এই লেখা-ব্যবসাটা ছাড়্‌তে হবে দেখ্‌ছি।"

ক্ষণকালের জন্য সবাই চুপচাপ; তারপর সুপ্রীতি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। শাশুড়ী ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন, অশোকা ঘাড় তুলিয়া ললিতের দিকে চাহিয়া চড়া গলায় বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, তা হ'লে তো বাঁচি।"

ললিত ক্রোধে বিরক্তিতে ঘর ছাড়িয়া বারান্দায়
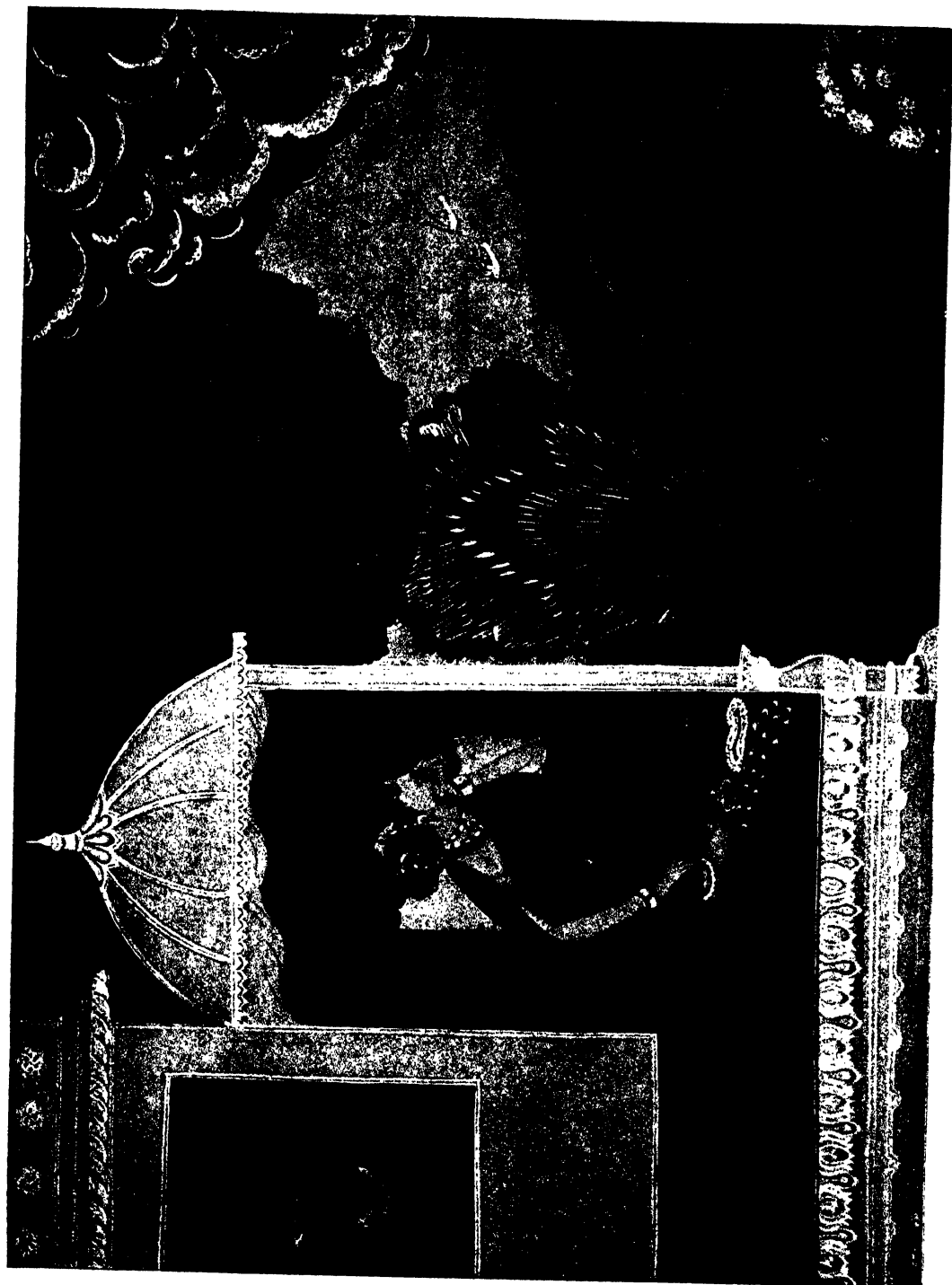
রাধিকার প্রতীক্ষা
শিল্পী শ্রীমতী সুকুমারী দেবী

আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীর বন্ধুদের হাসি তাহার বুকে তীরের মত বিঁধিতে লাগিল, সঙ্কীর্ণ বারান্দা ধরিয়া সে সিঁড়ির সামনে আসিল; ভাবিল, নীচে রাস্তায় জনতার মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার আহত মন একটু নিরিবিলি থাকিতে চায়। হঠাৎ ছাদের সিঁড়ির দিকে নজর পড়াতে সে আশ্বস্ত হইল। সঙ্গে চাবী ছিল—নিঃশব্দে বাড়ীর ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল।

ছাদে উঠিতেই একটি দূরের বাড়ীর ছাদের দিকে তাহার নজর পড়িল; বাড়ীর ছেলেরা ছাদে ব্যায়াম করিতেছে! আকাশের গায়ে মুগুর ডাম্বেল সহ তাহাদের শরীর-সঞ্চালন, ললিতের মনে হাস্য-রসের সৃষ্টি করিল। তাহার বিরক্তি-ভাব কাটিয়া গেল,—দুর্ব্বল শরীর চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

আগে সে দুই-একবার এই ছাদে উঠিয়াছে। কিন্তু তখন ইহা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল না। চারিদিক দেখিয়া তাহার মনে হইল,যেন সে একটি সম্পূর্ণ নূতন রাজ্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং সে যেন পরীর রাজ্য। কলিকাতা সহর যে কত সুন্দর সে এই প্রথম তাহা দেখিল। প্রাসাদ ও অট্টালিকার চূড়া, কলের চিম্‌নী, নারিকেল-গাছের মাথা, সব-সমেত কলিকাতা অপরূপ সৌন্দর্য্যে শোভা পাইতেছে; গীর্জ্জার চূড়ায়ও দুই-একটি বাড়ীর চিলেকোঠায় নানারঙের পতাকা উড়িতেছে। দূরে খালের জল ইস্পাতের পাতের মত ঝলক্ দিয়া উঠিতেছে। রাস্তার গাড়ী ঘোড়া ও মানুষের ভিড় যেন পিঁপিড়ার সারি বলিয়া মনে হইল। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যার মেঘে অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্য। বাতাস মৃদু বহিতেছে। ললিতের উত্তপ্ত ললাট কাহার যেন স্নেহ-করস্পর্শে শীতল হইয়া গেল। চিম্‌নীর ধোঁয়ার গন্ধই তাহার মনে পুলক-সঞ্চার করিল। শব্দ, গন্ধ, আকাশ, মেঘ, ধোঁয়া, দূরের বাড়ীর ছেলেদের কসরৎ—সবশুদ্ধ তাহাকে তাহার চার-তলার ঘরের বিরক্তিকর বাস্তবতা হইতে বহুদূরে লইয়া গেল।

ললিত বিপুল আরামে নিশ্বাস লইতে লাগিল যেন এতকাল কেহ তাহাকে অন্ধকার গুহায় আটক করিয়া রাখিয়াছিল। ছাদের আলিসায় ভর দিয়া উদাস-আগ্রহে একবার সহরের উপর চোখ বুলাইয়া লইল। পাশেই একটু নীচে একটি পাশের বাড়ীর ছাদ। চৌতলার ঘরটির স্কাই-লাইটের ভিতর দিয়া ভিতরের খানিকটা দেখা যাইতেছিল। ছবি, ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম, ইত্যাদিতে ঘরখানি ভর্ত্তি। কোনো চিত্রকরের ষ্টুডিও হইবে। চিত্রকর একটি রঙীন রেশমী লুঙ্গীর উপর পাঞ্জাবী পরিয়া আছে, গভীর মনোযোগের সহিত সম্মুখে দেখিতেছে, আনন্দে শীষ দিতেছে ও কাগজে আঁচড় কাটিতেছে। সম্ভবতঃ সে কোনো মডেলকে দেখিয়া ছবি আঁকিতেছিল। মডেলটিকে দেখা যাইতেছিল না।

আর্টিষ্টের অখণ্ড মনোযোগ, শীষের শব্দ ও কাজের তৃপ্তি দেখিয়া ললিতের বুক জ্বলিয়া উঠিল; কে যেন তাহাকে বাস্তবজগতের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। নিজের বিফলতার চিন্তায় তাহার মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। সে সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। ইহাই ত তাহারও কাম্য! কাজের মধ্যে মগ্ন হইয়া যাওয়া; নিজের সৃষ্টিকে মনের আনন্দে উপভোগ করা; সৃষ্টির মত্ততায় আত্মহারা হওয়া! স্বাস্থ্য আপনিই আসিবে। ডাক্তারের কথা তাহার মনে পড়িল—খোলা জায়গা, নিরিবিলি, বিশুদ্ধ বায়ু।

অনন্ত আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া ললিতমোহন আর-একবার চারিদিক দেখিয়া লইল। আকাশে তারা ফুটিতে সুরু হইয়াছে। বাতাসের গতি মৃদুমন্দ। ঠিক এখানেই ত সব মিলিবে—অপর্য্যাপ্ত বায়ু, বিপুল আলো, নীরব শান্তি। ডাক্তারের নির্দ্দেশ-মত ললিত হাওয়া পরিবর্ত্তন করিবে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে নয় এই ছাদের উপরে। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কয়েকটা লাইন ললিতমোহনের মনে পড়িয়া গেল—

> অনন্ত এ আকাশের কোলে
> টলমল মেঘের মাঝার,
> তোর তরে বাঁধিয়াছি ঘর
> হে মানসী কবিতা আমার!

সেও এখানে ঘর বাঁধিবে।

এই আকাশ-বাসরের কথা মনে হইতেই সে আরাম

পাইল, যাক্ শাশুড়ী শালী সমেত অশোকাকে ত ফাঁকি দেওয়া যাইবে !

ললিতমোহনের হাসি পাইল। জিনিষটা কত সহজ অথচ তাহার কাছে কি অপরূপ স্বর্গই না বহন করিয়া আনিবে! পাশের দুটি বাড়ীর চিলে কোঠার ছায়া দুপুরের দু'তিন ঘণ্টা ছাড়া সব সময় ললিতের ছাদে পড়ে, একটি মাদুর আর লেখার সরঞ্জাম আনিলেই চলিবে। পাশের বাড়ীর আর্টিষ্টের চেয়ে এবিষয়ে সে অধিক ভাগ্যবান। লিখিবার সরঞ্জাম যৎসামান্য।

একদিন তাহার প্রাণে স্বজনের যে অপার্থিব প্রেরণা টলমল করিত—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পঙ্কিলতা ও ধিক্কারে যাহা সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা আবার বুঝি ফিরিয়া আসিবে। হয় তো বা জীবনের আদর্শ ও সার্থকতা সে লাভ করিবে; সেই অদম্য শক্তির আগমনী তখনই তাহার বুকে বাজিতে লাগিল। তাহার মনে বর্ত্তমানের হতাশ্বাসকে চাপা দিয়া ভবিষ্যতের আশা পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। তাহার চিন্তা-ধারায় চেতনা সঞ্চারিত হইল। সে বাঁচিবে—তাহাকে যে অনেক কিছুই দিতে হইবে।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই ললিতমোহন চুপি চুপি একটি মাদুর, একটি ডেক-চেয়ার ও একটি ছোট্ট জল-চৌকী ছাদে রাখিয়া আসিল। সকালে চা খাইয়া সে খাতা পেন্সিল হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল এবং অতি সন্তর্পণে ছাদে উপস্থিত হইল। প্রথম কয়েক দিন সে একটি লাইনও লিখিতে পারিল না। মুক্তি ও শান্তির আনন্দ তাহার মনে উপচিয়া পড়িতেছিল। সে ডেক-চেয়ারখানিতে বসিয়া দূর দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

অশোকার কোনো সন্দেহ হইল না যে, স্বামী তাহাকে এত কাছে থাকিয়া ফাঁকি দিতেছে। কিছুকাল হইতেই স্বামীর দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। খাতা লইয়া ললিতকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া ভাবিল—লাইব্রেরীতে যাইতেছে।—এমন সে প্রায়ই যায়।

এম্নি করিয়া সাত দিন কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ললিতমোহন বরষা-বাদলের দিনে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য একটি তেরপল সংগ্রহ করিয়া লইয়া পাশের বাড়ীর চিলে-কোঠার গায়ে খুঁটি লাগাইয়া তাহা টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল।

ললিত সকাল-সন্ধ্যা বাহিরে যাইতে লাগিল। শাশুড়ী একদিন বলিলেন, "লাইব্রেরীতে বুঝি ঢের কাজ হয়!" তাঁহার স্বর শ্লেষপূর্ণ।

অশোকা আহত হইল। তাহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। সম্প্রতি স্বামীর প্রতি বীতরাগ হইলেও সে স্বামীকে ভালবাসিত ও স্বামীগর্ব্বে এখনো সামান্য গর্ব্বিত ছিল। সে নিজেও আজকাল স্বামীর বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কথার অভিমান আছে, মায়ের মত জ্বালা নাই। অবশ্য মেয়ের শুভাশুভ চিন্তায় মাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয় ও মেয়ের অমঙ্গলাশঙ্কায় মায়ের এই কটূক্তির বিরুদ্ধে বলিবারও কিছু নাই। তবু সে ব্যথিত হইল, মা মেয়ের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না।

তাসের আড্ডা নিয়মিত জমিতে লাগিল। রবিবাবুর নূতনতম গানের স্বরলিপি হইতে বালীগঞ্জের আধুনিকতম ফ্যাসন পর্য্যন্ত কথার আর শেষ ছিল না। অশোকার এসব আর ভালো লাগে না, এত গোলমাল সত্ত্বেও তাহার কাছে ঘরগুলি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। ললিতের অভাব সে এখন অনুভব করে। তাহার মনে হয় স্বামী বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে শুইবার সময় এই দূরত্বটুকু বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। ললিত তখন কাব্য-সৃষ্টির আনন্দে ভরপূর; মুখচোখ দিয়া তাহার আনন্দ ঠিক্‌রিয়া পড়ে; অশোকা তাহার ভাগ পায় না। স্বামী যেন তাহার অস্তিত্বও বিস্মৃত হইয়াছে।

স্থান-পরিবর্ত্তনের দশম দিনে ললিতমোহনের মূর্চ্ছাহত বাণী পুনর্জাগ্রত হইল; প্রকাশের বেদনায় তাহার মস্তিষ্ক টন্‌টন্ করিয়া উঠিল, সে লিখিতে সুরু করিল। বন্যার মত ভাব কলমের মুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে তাহার আংশিক লিখিত উপন্যাসখানি নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। তাহার 'অন্তর্য্যামী' তাহাকে লইয়া খেলিতে লাগিলেন। যাহা সে ভাবে নাই কেমন করিয়া তাহাই সে প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার অন্য

দুইটি উপন্যাস যে মামুলি ভাবে লেখা হইয়াছিল এটি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হইল। বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখের, আশা-আনন্দের চিরন্তন বারতা সে লিখিতে বসিল। সে যেন এক নূতন মন পাইয়াছে। কিছুদিনের রুদ্ধ আবেগ যেন অদম্য শক্তি সংগ্রহ করিয়া বন্যার বেগে বাহিরে আসিতে চায়। বঞ্চিতের ক্রন্দন, ব্যথিতের দুর্ব্বলতা এই বন্যাবেগে কোথায় ভাসিয়া গেল; রসে গানে তেজে সৌন্দর্য্যে তাহার নূতন উপন্যাসখানি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইল।

প্রত্যহ পাঁচ ছয় ঘণ্টা লেখার পর পরিশ্রান্ত অথচ সুখাবিষ্ট চিত্ত লইয়া সে বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে। সমস্তই কেমন যেন অপার্থিব আনন্দে ভরপুর। বিগত তিন বৎসর এই আনন্দ কোথায় যেন লুকাইয়াছিল। লেখা কাগজগুলি হাতের মুঠার মধ্যে ভাঁজ করিয়া সে ডেক-চেয়ারে আসিয়া বসে; সন্ধ্যার শিশিরে কাগজগুলি ভিজিতে থাকে; শীতল বাতাসের স্পর্শে তাহার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। সে উঠিয়া পায়চারি করিতে থাকে; সঙ্গে-সঙ্গে পরের দিনের লেখাগুলি মনের মধ্যে গুঞ্জন করিতে থাকে।

শীত আসিয়া পড়িল। প্রথম প্রথম সকালে ও সন্ধ্যায় কাজ করিতে ললিতের কষ্ট হইত। ক্রমে তাহা সহিয়া গেল। তাহার দেহ ও মন ভারী হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার আগে পাশের বাড়ীর ছেলেদের দেখা-দেখি সে হাত পা ছুঁড়িয়া ব্যায়াম করিয়া লয়। দৈনন্দিন জাগতিক জীবনযাত্রা হইতে সে এখন বহুঊর্দ্ধে।

তাহার এই গোপন-বিহারের কথা সে অশোকার নিকট হইতে সন্তর্পণে ঢাকিয়া রাখে। বারান্দায় দুই একদিন অশোকার সহিত তাহার দেখা হইয়াছে; সে সোজাসুজি ঘরে ঢুকিয়াছে। অশোকা অনুসন্ধিৎসু নয়—সে কিছু সন্দেহ করে নাই। না, কিছুতেই তাহাকে এই আকাশবাসরের কথা জানিতে দেওয়া হইবে না। সে তাহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থে সংসার চালাইতে থাকুক কিন্তু তাহার বড় সাধের সাধনাকে সে যখন অবহেলা করিয়াছে তখন তাহার সুখদুঃখের খবর সে নাই জানিল। তা ছাড়া তাহার আনন্দের খানিকটা এই গোপনতার জন্যই। স্ত্রীর নিকট হইতে তাহার যে এই শারীরিক ও মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ইহাতে সে দুঃখিত নয়। তাহার দিনের কাজে সঙ্গী এখন কেবল সেই পাশের বাড়ীর পরিচয়-না-জানা আর্টিষ্ট। তাহার শিল্প-সাধনা সে লক্ষ্য করে ও উপভোগ করে। লোকটি খুব পরিশ্রমী। শীষ দিয়া গান গাহিয়া সে অক্লান্ত ভাবে কাজ করিয়া যায় এবং অবসর-মত মডেলদের লইয়া চিত্তবিনোদন করে। অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের নিষিদ্ধ প্রেমাভিনয় সে দেখিয়াছে।

মাঘের এক সন্ধ্যায় তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যবিহারে বাধা পড়িল। যে সংসারকে সে নীচে ফেলিয়া আসিয়াছে ভাবিয়াছিল—তাহারই এক বেদনা-তরঙ্গ তাহার আকাশ-বাসর আলোড়িত করিয়া দিল।

সমস্ত দিন গুমোট করিয়াছিল; চারিদিকে কেমন একটা নিরানন্দ ভাব; খণ্ডমেঘ-ভরা আকাশ পাণ্ডুর; চিমনীগুলি যেন বিষোদ্গীরণ করিতেছিল। সমস্ত সহর মূর্চ্ছাপন্ন; আনন্দ-কলোচ্ছ্বাসের স্থানে সহরের কোলাহল ব্যথিতের ক্রন্দন বলিয়া বোধ হইতেছিল। খালের জল কালো হইয়া যেন আসন্ন কি-একটা দুর্য্যোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমদিকটা ললিতমোহন এসব কিছুই লক্ষ্য করে নাই; সে আপন মনে লিখিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ অস্তগামী সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি পড়াতে সে চমকিয়া উঠিল। বোধ হইল যেন সূর্য্যরশ্মি বেদনায় পাণ্ডুর; চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। সে ছাদের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। আর্টিষ্টের ষ্টুডিওর স্কাইলাইট বন্ধ ছিল; ভিতরের আলো খালি দেখা যাইতেছে। ভিতর হইতে বাঁশীর আওয়াজ কানে আসিতেছে ও বাঁশীর তালে তালে মেঝেতে পা-ফেলার শব্দ শোনা যাইতেছে। সহসা সেই মৌন সন্ধ্যায় ললিতের আকাশবাসর কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিল; সে যেন জনশূন্য মরুভূমির মাঝে পড়িয়া। তাহার লেখার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ভিতরের আগুন নিব-নিব হইয়া তাহাকে যেন ভস্মমাত্র পরিণত করিয়াছে। সে একজন সঙ্গী চায়। অনন্ত শূন্যে নিজেকে ভারী 'একাকী' মনে হইল।

হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টি পড়াতে দেখিল সে একা নহে।

আর্টিষ্টের ঘরের ছাদে একটি মেয়ে স্থির ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে; যেন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি! মেয়েটির পরণে একটি নীলসাড়ী; যেন সে বাহিরে যাইবার জন্য সজ্জিত; তাহার চেহারাটি ভারী মধুর—বিষাদ-করুণ।

ললিতের অস্তিত্ব মেয়েটি একেবারেই টের পায় নাই—সে একদৃষ্টে নীচে পথের জনতার দিকে চাহিয়াছিল। পাছে তাহাকে দেখিয়া মেয়েটি কিছু মনে করে, ভাবিয়া ললিত অন্তরালে থাকিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি সহসা আলিসার ধার হইতে সরিয়া আসিয়া অশান্তভাবে ছাদে পায়চারী করিতে লাগিল। ললিত গোপনে থাকিয়া তাহাকে দেখাটা অন্যায় মনে করিল না; কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল তাহার উপস্থিতি প্রয়োজন; মেয়েটি ঠিক প্রকৃতিস্থ নহে। সে ছাদে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। মানুষের বিয়োগান্ত নাটকের অপরার্দ্ধ—অর্থাৎ নির্য্যাতিত নারীর দিকটি সে যেন সম্মুখে দেখিতে পাইল। যে বেদনা সে অশোকার কাছে পাইয়াছে, সেই বেদনাই বুঝি ইহাকে এই ছাদে শান্তির খোঁজে টানিয়া আনিয়াছে। এই অসীম আকাশের নীরবতার মধ্যে সে বুঝি তাহারই মত ডুবিতে চায়।

ললিত অবিলম্বে বুঝিতে পারিল, মেয়েটির ব্যথা একটু ভিন্ন ধরণের; সে আরো বেশী নিঃসঙ্গতা চায়; যেন তাহার অবসাদ কিছু করিবার অভাবে নহে—সৃষ্টি-শক্তির প্রেরণায় নহে; জীবনের সহিত দ্বন্দ্বে সে ধ্বংসকেই যেন বরণ করিতে চায়। তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তি-সম্পন্ন; কানের দুলদুটি পর্য্যন্ত যেন ঠিক স্বাভাবিক ভাবে দুলিতেছে না; তাহার মুখাবয়বে ও অঙ্গুলি-সঞ্চালনে একটা উগ্রতা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

মেয়েটি চকিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া হঠাৎ আলিসার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কি করিবে ললিত ইতিপূর্ব্বেই স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিল; সে বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটিয়া আসিয়া পাশের বাড়ীর ছাদে নামিয়া পড়িল ও মেয়েটি কিছু বুঝিবার পূর্ব্বে অতর্কিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

তাহাকে ধরিয়া টানিয়া নামাইতেই সে উন্মত্তের মত ললিতকে মারিতে লাগিল; আঁচড়-কামড় সত্ত্বেও ললিত তাহাকে সবলে ধরিয়া রহিল। এই ধস্তাধস্তির পরে দুজনেই আলিসার পাশে দাড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল; মেয়েটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিষম উত্তেজনায় তাহার অধরোষ্ঠ কম্পমান। নীচের রুদ্ধ-দ্বার ষ্টুডিওতে বাঁশী তেমনি বাজিতেছিল; সশব্দ তালের শব্দ তেমনি চলিতেছিল।

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে ললিতের হাত ধরিয়া মেয়েটি বলিল,—"আপনি কেন আমায় বাধা দিলেন; আপনি কতবড় নিষ্ঠুরের কাজ করলেন তা জানেন না; আপনি কেন আমার এমন শত্রু হলেন?"

মেয়েটি কাঁদিতে লাগিল। ললিতের মনে পড়িল—বিবাহের কিছু দিন পরে তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া একদিন অশোকা শান্তির প্রত্যাশায় তাহারই বুকে মাথা রাখিয়া এম্‌নি কাঁদিয়াছিল। বেদনার সেই মূর্ত্তি। কি অল্প আঘাতেই ইহারা এমন ভাঙিয়া পড়ে!

সে বলিল, "কি হ'য়েছে আপনার? জীবনটাকে নষ্ট করতে চাইছেন কেন? কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে দেখুন—হয়ত আজকের এই অসহ্য দুঃখ আপনার আর থাকবে না; মিছিমিছি আত্মহত্যা ক'রে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেতে চাওয়া দুর্ব্বলের লক্ষণ; দুঃখ-কষ্টকে এত ভয় কেন?"

মেয়েটি কথা বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ললিত বলিল, "দুঃখ জিনিষটা বরাবর থাকে না, ওটা আসে আবার চ'লে যায়। একটু সহ্য ক'রে থাকুন, আমার বিশ্বাস আপনার যতবড় দুঃখই হোক—বেশী দিন থাকবে না।"

মেয়েটি ব্যথিত দৃষ্টি লইয়া ললিতের দিকে চাহিল; তাহার মুখের অস্বাভাবিক ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু মুখ ছাইয়ের মত সাদা! সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি জানি আমি ভীরু, কিন্তু যন্ত্রণাও বড় কম পাইনি।"

"শারীরিক যন্ত্রণা, না মানসিক? আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসেন না এই ত কষ্ট?

মেয়েটি প্রায় আত্মগত ভাবেই বলিল, "ভালোবাসেন, খুবই ভালোবাসেন, কিন্তু সে আমাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে—

তিনি আমার কাছে আসেন বাইরের সব অশুচি গায়ে মেখে; আমি সহ্য করতে পারি না! নিজেকে বড্ড অপমানিত মনে হয়।"

ললিত স্তব্ধ হইয়া গেল। ইহার উত্তরে সে কি কথা বলিবে? জীবন্ত প্রাণীকে একেবারে মারিয়া না ফেলিলে যেমন তাহার হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ করা যায় না—এই অশুচির ব্যথা ভুলাইবার জন্য সে আর কিছু বলিতে পারে না। মেয়েটি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল—"এই-সব দেখে শুনে আমার জীবনে ধিক্কার এসেছে—আমি আর পারি না।"—বুকের উপর ন্যস্ত হাত দুখানি দারুণ অবসন্নতায় তাহার পাশে ঝুলিয়া পড়িল। সে যেন সহসা বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। ভীত চকিত ভাবে বলিল—"আমি কি বল্‌ছিলাম? আপনি কে?"

ললিত তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া শান্তভাবে বলিল, "ব্যস্ত হবেন না। আপনিই ত বল্‌লেন, আমি আপনার শত্রু; ধরুন তাই। তবে আপনার জীবনটাকেও শত্রু ভাববেন না—এখন হয়ত জীবনকে ঘৃণা করুছেন কিন্তু কালই আবার জীবনটাকে ভালো লাগবে। দুঃখ-কষ্ট ত আছেই।"

বিহ্বল ভাবে ললিতের দিকে চাহিয়া মেয়েটি পূর্ব্বাপর ঘটনাটি ভাবিতে লাগিল; সবটা মনে পড়িল না। ললিতের সরল কথাবার্ত্তায় ও সহজ প্রশ্নোত্তরে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার ধীরে ধীরে নিজের মনের কথা উদ্ঘাটিত করিতে লাগিল। বলিল,—"বেঁচে থাকৃতে আর চাই না—এই ভাঙ্গা বুক আর পীড়িত মন নিয়ে।"

"আচ্ছা, আপনার স্বামীকে কেন একেবারে শেষ দেখ্‌তে দেন না; ঘা খেলেই তিনি হয়ত ফিরবেন—"

"না, না, তার চাইতে মৃত্যু ভাল। বেঁচে থেকে একেবারে তাঁকে ছাড়তে পারব না—"

"আচ্ছা, আপনার কি স্বামী ছাড়া অবলম্বন আর নেই, ছেলেপিলে?"

"না।"

"বড় কোনো কাজ, কি গান-টান কিছু?"

"ছিল, কিন্তু স্বামী সেসব পছন্দ করতেন না; তিনিও আমাকে সম্পূর্ণ নিজের ক'রে আগলে রাখ্‌তে চেয়েছিলেন।"

"স্বামীর কথায় এইসব ছেড়ে দিয়েই আপনি আত্ম-হত্যার পথ ধরছেন—মেয়েদেরও নিজস্ব একটা অবলম্বন চাই—স্বামী-সন্তানের অধিকারের বাইরে—"

অশোকার কথা মনে হইতেই তাহার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। "আপনি বুঝি গান-বাজনা পছন্দ করতেন?"

"হ্যাঁ—আমাকে দয়া ক'রে যেতে দিন; আমি বড্ড ক্লান্ত।"

ললিত সরিয়া আসিল। সেও ত ক্লান্ত। সে শুধু বলিল,"আপনি একেবারে না ম'রেও হয়তো এখনো শান্তি পেতে পারেন। নিজেকে অত সহজে ধরা দেবেন না; একটু দুষ্প্রাপ্য ক'রে তুলুন নিজকে। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। মরলেই তো সব গেল। আজকের এই মেঘ কাটতেও পারে। নিজের মধ্যেই বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পাবেন, শুধু নিজেকে একটু অবকাশ দিন।"

এতক্ষণে মেয়েটি চারিদিকে চাহিবার অবসর পাইল। "আমি কোথায় আছি ভুলে গেছলুম। আপনাদের বুঝি ওই ছাদ?"

"হ্যাঁ, ওই ছাদের কোণে আমার আকাশ-বাসর।"

নীচের ঘরের বাঁশীর সুর ও পায়ের তাল কানে আসিতেই মেয়েটির ভাবান্তর হইল। বহুকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া সে বলিল—"ওই শুনুন,—"

"এ—ত সহ্য করতেই হবে—"

"আচ্ছা, আপনি ছাদে ব'সে কি করেন?"

"আমি পৃথিবীর সুখ-দুঃখের আশা-আনন্দের কথা ভাবি আর সেই ভাবনাগুলো লিখে রাখি। দুঃখকে কাটিয়ে ওঠার এ এক সহজ উপায়। পৃথিবীর সবাইকে নিয়ে আমার কারবার, আমি, আপনি, আমার অন্ধ স্ত্রী—"

"আহা, আপনার স্ত্রী অন্ধ।"

"শুধু অন্ধ নয়, কিছু শুনতেও পায় না, বলতেও পারে না।"

"আপনি লেখক বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা,বেঁচে থাক্‌তে আপনার বেশ ভালো লাগ্‌ছে ?"

"খুব, মর্‌তে চাইব কোন দুঃখে ?"

"আমি যখন গান শিখতুম, আমারও তাই মনে হ'ত, আমি বেশ ভালো গাইতে পার্‌তুম—এস্‌রাজও বাজাতে পার্‌তুম।"

মেয়েটি কপালে হাত রাখিল, বলিল, "আমি নীচে যাই; আমার ভারী লজ্জা কর্‌ছে।"

"ভালো লক্ষণ বটে," বলিয়া ললিত সিঁড়ির দরজা পর্য্যন্ত মেয়েটিকে আগাইয়া দিল। "আর কখনও ওপরে আস্‌বেন না। যদি কখনো এস্‌রাজটিকে সঙ্গে আন্‌তে পারেন, আস্‌বেন। আমার এই নিভৃত আকাশ-বাসরে আজকের মত কোনো অনাচার আমি সহ্য কর্‌ব না।"

মেয়েটি ললিতের এত সব রুদ্ধ মনের কথা শুনিয়া কি বুঝিল জানি না। বিবর্ণ মুখের কোণে তাহার একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল—বুঝি তাহা প্রাণ ফিরিয়া পাইবার আনন্দের বিকাশ। সে নীচে চলিয়া গেল।

ললিত নিজের উচ্ছ্বাসে লজ্জিত হইল; ভাবিল—যাই হোক্ মেয়েটি আমাকে আর মুখ দেখাইবে না। কিন্তু সে ইহা ভাবিয়া সুখী হইল না। সেও ক্লান্ত মনে শ্রান্তদেহে আপনার নীড়ে ফিরিয়া আসিল।

সে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাসে পায়চারি করিল। ধোঁয়ার ভিতর দিয়া পথের আলোগুলি মিটিমিটি জ্বলিতেছে—হতাশার মধ্যে ক্ষীণ আশার মত। বাঁশীর সুর তখনও থামে নাই। কাগজপত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া সে মনে মনে বলিল—'সব ঝুটা হ্যায়'—সে শুধু শান্তিতে থাকিতে চায়। কিন্তু যাহার উপর এই অভিমান সেও তখন অভিমানে মনের কপাট রুদ্ধ করিয়াছে; ভুল দিয়া ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

ললিত সন্তর্পণে নামিয়া আসিল।

দিন পনের পরে সন্ধ্যার খানিক আগে ললিত তাহার উপন্যাসের উপসংহার লিখিতে ব্যস্ত ছিল; হঠাৎ এস্‌রাজের মৃদুগুঞ্জন-ধ্বনি শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। নিশ্চয়ই সে। লেখা বন্ধ করিয়া ললিত উঠিয়া পড়িল। কিনারায় আসিয়া দেখিল—সেই বটে। ছাদের এক-কোণে বসিয়া আপন মনে এস্‌রাজের তারে ঝঙ্কার দিতেছে। ললিতের মন খুসীতে ভরিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। তরলধারার মত সুর যেন গলিয়া পড়িতেছে। রাগিণীটি শেষ হইতেই মেয়েটি উপরের দিকে চাহিয়াই লজ্জায় মুখ নামাইল। এস্‌রাজটি ছাদের উপর রাখিয়া আলিসার ধারে আসিয়া ললিতকে ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, "আমি আবার বাজাতে চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু হাত চলে না। অনেক দিনের অনভ্যাস।"

ললিত বলিল, "কেন, আপনি তো চমৎকার বাজাচ্ছিলেন।"

"চমৎকার না ছাই! বা রে, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট কর্‌লে ত চল্‌বে না। লিখুন গিয়ে; আমি আপনার কাজে বাধা দিচ্ছি দেখছি।"

অপরিচিতার এই আগ্রহ দেখিয়া ললিত একটু হাসিল, কিন্তু তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। অশোকার স্মৃতি? সে বলিল, "না, না, আপনার ভারী ক্ষমতা, আপনি বাধা দেবেন আমাকে? এ ত আর ঘরের অন্ধকার নয়—এখানে অসীম বিস্তার, প্রচুর অবকাশ। আজকের দিনটি ভারী সুন্দর, না? তেমন শীত নেই।"

"তা হোক, আমি নীচে যাচ্ছি, আপনার কাজের ক্ষতি হ'তে দেব না। আপনার লেখা কেমন চল্‌ছে?"

"চমৎকার।—বইখানা ভালো ওৎরাবে বোধ হয়।"

"নিশ্চয়ই, ভালো হ'তেই হবে"—বলিয়া মেয়েটি এস্‌রাজের কাছে গিয়া সেটি কোলে লইয়া বসিল। ললিত ফিরিয়া আসিয়া আবার লিখিতে বসিল। কিন্তু, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া ফিরিয়া এস্‌রাজের ঝঙ্কার আর মেয়েটির শান্ত চোখ দুটি ললিতের মনে পড়িতে লাগিল।—'অশোকার চাইতে বড় না ছোট?—বড়ই হবে; সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণাতেই ত ওর বয়স ঢের বেড়ে গেছে। অশোকা ত দুঃখ কাকে বলে এখনো জানে না। সে যে কিশোরী মেয়েটির মতই চঞ্চল। যাক্‌গে ছাই, এসব ভাব্‌ব কেন?'—ললিত বেড়াইতে লাগিল।

এমনি করিয়া অনন্ত আকাশের কোলে দুটি নীরব

সাধকের সাধনা চলিতে লাগিল। ক্বচিৎ কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়—এস্‌রাজের ঝঙ্কারে তাহার আভাস পাওয়া যায়; কথাবার্ত্তা বড়-একটা হয় না। ললিত যখন উচ্ছ্বসিত মন লইয়া কথা বলিতে আসে মেয়েটি তখন প্রায়ই নীচে নামিয়া যায়।

একদিন মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "কই আপনার স্ত্রী ত কোনো দিন ওপরে আসেন না।"

ললিতের মুখের উপর হাসি ও অশ্রু এক সঙ্গে খেলিয়া গেল। সে বলিল, "না ও জানে না, আমি এখানে আসি।"

"আপনি লুকিয়ে আসেন বুঝি; ভারী অন্যায় আপনার। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী, অন্ধ বোবা কালা—সত্যি তো?

ললিত চুপ করিয়া রহিল। কি বলিবে সে?

"বলুন না।"

"আমার সম্বন্ধে ও তিনই—আমি তার অপদার্থ স্বামী; অনেক আশায় ও আমায় বিয়ে করেছিল; আমি সব আশায় ছাই দিয়েছি—"

"ও বুঝেছি, আমি কিন্তু অপদার্থ লোককে বিয়ে কর্‌লে সুখী হ'তে পার্‌তুম। জীবন-যুদ্ধে জয়ী যারা তাদের কথা আপনার স্ত্রী যদি জান্‌তেন! আচ্ছা আপনার এ বইটার যদি খুব কাট্‌তি হয়;—তা হ'লে—"

ললিতকে সে যেন কষাঘাত করিল; সে মুখ ফিরাইয়া দূরে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল, "বুঝেছি—আপনি এত দাম দিয়ে কেনা সাফল্যের বিনিময়ে তাকে আর ফিরে পেতে চান না। ছি! আপনি কি নিষ্ঠুর!"

দুই জনে বিষণ্ণ মনে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল।

ললিতের উপন্যাসখানি শেষ হইল। কিন্তু যতটা আনন্দ সে পাইবে কল্পনা করিয়াছিল তার সামান্য অংশও পাইল না। সৃষ্টির মধ্যে হয়ত পরশ-পাথরের সন্ধান ছিল, কিন্তু সমাপ্তিতে তাহা যেন নুড়ি-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কেন এমন হইল—ভাবিতে গিয়া অশোকাকেই মনে পড়িয়া গেল।

সে আর-একখানি উপন্যাস লিখিতে সুরু করিল।

প্রথম উপন্যাসখানি শেষ হইবার পর রাত্রে খাইবার সময় সে অশোকাকে তাহা জানাইল। অশোকা ক্ষুণ্ণ হইল; তাহার দাবী কি শুধু এইটুকু? বলিল, "এ ক'মাস তুমি খুবই খেটেছ দেখ্‌ছি।" তাহাকে আরো আঘাত দিবার জন্য ললিত বলিল, "হ্যাঁ, খুবই খাটুনী হয়েছে বটে।" অশোকাও খোঁটা দিয়া বলিল, "লাইব্রেরীতে খুব শান্তিতে কাজ কর্‌তে পাও বুঝি?"

"হ্যাঁ, সেখানে ভারী নিরিবিলি।"

অশোকা গম্ভীরভাবে বলিল, "বাড়ীতেও তুমি খুব নিরিবিলিতে কাজ কর্‌তে পার্‌তে।—আর কেউ এখানে আসে না।"

"সে কি? মা, দিদি এঁরা?"

"কেউ না, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি।"

"ঝগড়া? কেন?"

"ঝগড়া তোমাকে নিয়েই" বলিয়াই অশোকা অন্য কথা পাড়িল। সেই অভিমান! ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি অশোকা?" নির্লিপ্তভাবে অশোকা বলিল, "সেকথা থাক—যা হ'বার তা ত হ'য়েই গেছে।—হ্যাঁ—তোমার এই বইটা যদি ভালো চলে আমাকে দার্জ্জিলিং নিয়ে যেতে হবে। এবার গৌরীদিরা যাবে।"

ললিতের মন ভিজিয়া আসিয়াছিল; শেষের কথা শুনিয়া আবার সে কঠিন হইল। বুঝিল মিলনের চেষ্টা বৃথা; কোথায় যেন কি গোলমাল হইয়া গেছে।

স্বামীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অশোকাও বাঁকিয়া বসিল। পরস্পর আবার বহুদূর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় উপন্যাসের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অজানিত মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যে ললিতের শরীর আবার ভাঙিতে সুরু হইয়াছে। সে প্রথম বইখানি লইয়া কোথায়ও গেল না। যে যশকে সে এত কাম্য ভাবিয়াছিল হাতের কাছে তাহাকে পাইয়াও সে ছাড়িয়া দিতে দ্বিধা করিল না। কাজের জন্য প্রচুর নিভৃত অবকাশ, আলো ও হাওয়া ছাড়া আরো কিছু সে চায়, কিন্তু সে যাহা চায় তাহা তাহাকে কে দিবে? যে দিতে পারে, সে নিজের দোষে ও ললিতের হতাদরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ললিতের এমন দুর্ব্বল শরীর সে দেখিয়াও দেখিল না।

সেদিন ললিতের শরীর খুবই খারাপ ছিল, মনও

ভালো ছিল না। কিসের প্রত্যাশায় মন্ত্রচালিতের ন্যায় সে অশোকার কাছে গিয়া দেখিল সে বাক্স ইত্যাদি গুছাইতেছে। কোথায়ও যাইবার আয়োজন। ললিতের মনের আবেগ পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের মত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ছড়াইয়া পড়িল। সে বিরক্তভাবে বলিল, "কোথা যাওয়া হচ্ছে শুনি।" অশোকা সহজ ভাবেই বলিল, "দার্জ্জিলিং। গৌরীদি চিঠি দিয়েছে সেখানে যেতে।"

"বেশ!" বলিয়া ললিত ঘরের বাহির হইয়া গেল। হায় রে যশ আর খ্যাতি! একটি আঘাতেই সমস্ত বিস্বাদ হইয়া গেল।

অশোকা চলিয়া গেল। ললিত ভাঙাশরীরে ছাদের কোণে আশ্রয় লইল; এবার কিন্তু নির্ভয়েই। বুড়ী ঝি মঙ্গলার মা উপরে গিয়া তাহার খাবার দিয়া আসে। সে বেশীর ভাগ সময় ছাদেই কাটায়; কিন্তু কাজ আর বেশী অগ্রসর হয় না। সে নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকে।

কয়েক দিন হইতে পাশের বাড়ীর মেয়েটিরও দেখা নাই। ললিতের দুর্ব্বল শরীর আরো দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দ্বিতীয় উপন্যাসখানিও শেষ হইল কিন্তু সুখ, শান্তি আসিল কই? মাঝে মাঝে সে ভাবে, বুঝি অশোকার দীর্ঘশ্বাসে তাহার সাধনা অভিশপ্ত হইয়াছে; কিন্তু পীড়া যে তাহার নিজেরই মনের মধ্যে সেটুকু সে স্বীকার করে না। সে কোনো প্রকাশকের কাছে গেল না। উপন্যাস দুইখানি সযত্নে নিজের কাছে রাখিয়া দিল। কি হইবে প্রকাশ করিয়া?

তাহার আকাশ-বাসরের সঙ্গিনীটিকে একদিন দেখা গেল, বিবর্ণ বিশীর্ণ শরীর লইয়া আলিসার উপরে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া। ললিত তাহাকে কাছে ডাকিল। ষ্টুডিওতে আলো ছিল না। মেয়েটিও এস্‌রাজ লইয়া আসে নাই। ললিতের ভয় হইল। আবার বুঝি সেদিনের মত—

বলিল, "আপনার এস্‌রাজ কই?"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই। আমার স্বামীর বড় বিপদ—উদ্ধারের বুঝি কোনো উপায় নেই।"

ললিত চকিত হইয়া উঠিল। বলিল, "ব্যাপার কি?" সঙ্গিনীর কথা শুনিয়া বুঝিল,—আর্টিষ্টটি কিছুকাল যাবৎ আয়ের অধিক ব্যয় করিতেছিল—আপনার খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। কোথা হইতে হ্যাণ্ডনোট দিয়া টাকা ধার করিয়াছে। শোধ দিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। তাহার নামে ডিগ্রীজারী হইয়াছে। স্ত্রীর গহনা-পত্র যাহা ছিল ইতিপূর্ব্বেই বন্ধক পড়িয়াছে—ছবিও সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পাওনাদার হয় জিনিষপত্র সব ক্রোক করিবে—কিম্বা তাহাকে হাজতে লইয়া যাইবে।

মেয়েটির চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল, ললিতের জীর্ণ বুকের অন্তস্তল হইতে একটি গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইল। হায় রে, ওই স্বামী তাহার জন্যও কান্না! আর অশোকা?—

সে বলিল, "দুএকদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন—দেখি যদি নতুন বই দুটো দিয়ে কিছু পাই।"

মেয়েটি আবেগকম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "না না, সে কিছুতেই হবে না। আপনার বুকের রক্ত দিয়ে গড়া জিনিষ এমন ক'রে আমি নষ্ট করতে দেব না। তাড়াতাড়িতে হয়ত কিছুই দাম পাবেন না। আপনার এই রোগা শরীরে সেটা সইবে না। আর আপনার স্ত্রীরও ত একটা দাবী আছে। আমিই বা কে যে, আমার জন্যে এত করবেন?"

"আমার আর কে আছে যার জন্যে আমি কিছু করতে পারি? এই সামান্য সুখটুকু থেকে আমার বঞ্চিত করবেন না। কাল পরশু একবার খবর নেবেন।" ললিত আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। বলিল, "আপনি যান।"

ডেক-চেয়ারটিতে বসিয়া ললিত তাহার বুক-নিংড়ানো ধন দুইটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একজায়গায় চোখে পড়িল—

"মানুষের ব্যথার ইতিহাসই চিরন্তন ইতিহাস নয়। মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত বাহিরের ও ভিতরের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইবে, জীবনে বিশ্বাস হারাইবে; কিন্তু একদা রৌদ্রালোকে কুয়াশারই মত সমস্ত ব্যথা, সমস্ত দৈন্য তাহার নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে। সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্যে চিরন্তন মানব প্রতীক্ষা করিয়া আছে। হয়ত এ

জীবনে সে মুহূর্ত্ত না আসিতে পারে। পথিক মানবের পথ চলাই পথের সমাপ্তি নহে। সঙ্কীর্ণ মন দিনে দিনে প্রসার লাভ করিতেছে। একদিন সে নিঃশেষে সম্পূর্ণ অপরিচিতের হাতে আপনার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া বিগত দিনের দুঃখযন্ত্রণা ভুলিয়া ভাবিবে, পথের সন্ধান মিলিয়াছে।"

তাহারও বুঝি পথের সন্ধান মিলিবে।

ললিত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মঙ্গলাকে ডাকিয়া একটি বিখ্যাত পাব্লিশার্স-এর নামে চিঠি দিয়া তাহার প্রথম উপন্যাসখানি পাঠাইয়া দিল। চিঠিতে লিখিল— বইখানি পছন্দ হইলে তাহার প্রথম সংস্করণের জন্য যে কিছু মূল্য নির্দ্ধারণ করেন তাহা যেন কল্যই তাহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।—

মঙ্গলা ফিরিয়া আসিল। ললিত কম্পিত চিত্ত লইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যদি না মনোনীত হয়?—না, তাহার এত পরিশ্রমের ফল কখনই ব্যর্থ হইবে না।

পরদিন সুসংবাদ আসিল। বইখানি পছন্দ হইয়াছে। প্রকাশক প্রথম সংস্করণের জন্য পাঁচ শত টাকার চেক পাঠাইয়াছেন। এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত জয়শ্রী তাহার মুখে একটু শীর্ণ হাসি টানিয়া আনিল মাত্র।

পরদিন সকাল-বেলায় মেয়েটি আসিল। আসন্ন ঝড়ের ভয়ে মুখ বিবর্ণ; শরীর কাঁপিতেছে। আদালতের লোক আসিয়াছে। ললিত হাত বাড়াইয়া চেকখানি তাহার হাতে দিল। সে ছলছল চোখে ললিতের হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল মাত্র। কোনো কথাই বলিতে পারিল না। তারপর দ্রুত নীচে নামিয়া গেল।

ললিতের লেখা সার্থক হইল। ইহার চেয়ে অধিক কিছু সে প্রত্যাশা করে নাই। ভগবান তাহার পরিশ্রমের অযাচিত মূল্য দিয়াছেন। তাহার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতে লাগিল। অশোকার কথা মনে পড়িল। আজ আর তাহার বিরুদ্ধে মনে কোনো গ্লানি নাই— শাশুড়ীর বিরুদ্ধেও না।

দিন কয়েক পরে তাহার আকাশ-বাসরের সঙ্গিনী আসিল স্বামীকে সঙ্গে করিয়া। স্বামীটি বোধ হয় শোধ্রাইয়াছে। মেয়েটি বলিল, "ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার অপমান করব না। আমার স্বামী আপনার ঋণ স্বীকার করতে এসেছেন। সামর্থ্য হ'লেই শোধ দেবেন।"

আর্টিষ্ট বলিল, "আমি আমার স্ত্রীর কাছে সব শুনেছি; আপনি মহৎ লোক। আজ আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সমস্ত গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারি।"

ললিত হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গেল, কিন্তু তাহার রুগ্ন শরীর এতটা উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিল না। সে সহসা চোখে অন্ধকার দেখিল ও মূর্চ্ছাহতের মত বসিয়া পড়িল। স্বামীস্ত্রী দুজনে একসঙ্গে চমকিয়া উঠিয়া ললিতের ছাদে উঠিয়া আসিল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ডেক-চেয়ারে বসান হইল। দুজনেই সভয়ে দেখিল ললিতের গা বেশ গরম। ললিত বলিল, "ভয়-নেই; একটু অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিলুম। এখন সেরে উঠেছি।" মেয়েটি শুনিল না, তাহার স্বামীকে ঠেলিয়া ডাক্তার আনিতে পাঠাইল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া শঙ্কিত হইলেন—যক্ষ্মা। স্বামীস্ত্রী দুজনেই শিহরিয়া উঠিল। ললিতও শুনিল, কিন্তু কিছু বলিল না। তাহার ঠোঁটের কোণে সেই মৃদুহাসিটুকু ফুটিয়া রহিল।

দুর্ব্বল শরীরে সে কঠিন পরিশ্রম করিয়াছে, ঠাণ্ডা লাগাইয়াছে অথচ পুষ্টিকর আহার পায় নাই, স্ত্রীর যত্ন পাইতে পারিত, কিন্তু হতভাগ্যের ভাগ্যে তাহাও জোটে নাই। শরীর আর কতদিন টিকিতে পারে? ডাক্তার বলিলেন, "আর বেশীদিন নয়। ওঁকে নীচে নিয়ে যান আর ওঁর বাড়ীর লোকদের খবর দিন।"

ললিত বাঁকিয়া বসিল—জীবনে যাহাকে চাহিয়াও পায় নাই মৃত্যুতেও তাহাকে কাছে চাহিবে না। বলিল, "না অশোকাকে খবর দেবেন না—এইটি মাত্র আমার একান্ত অনুরোধ। বরঞ্চ পিসীমা আসুন।" আর নীচের ঘরে সে মরিবে না। এই আকাশবাসরেই তাহার জীবন শেষ হইয়া যাক—এইখানেই টিন দিয়া কিম্বা টালি দিয়া উপরে একটা আচ্ছাদন তুলিয়া দিলেই হইবে; অন্ধকার ঘরে মৃত্যুকে সে বরণ করিতে পারিবে না।

টালি দিয়া ঘর তৈয়ারী হইল। পিসীমা আসিলেন।

অশোকা দার্জ্জিলিঙে হাওয়া খাইতে লাগিল, এসবের কিছুই জানিল না।

আর্টিষ্ট সকাল সন্ধ্যা আসে। মেয়েটিতো দিনরাত্রি ললিতের সেবায় লাগিয়া রহিল। পিসীমা চিরদিন নির্ব্বাক্; আজিও নির্ব্বাক্‌ভাবে হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের শিয়রে বসিয়া থাকেন। ডাক্তার আসা বন্ধ হইল। ললিত গভীর পরিতৃপ্তির সহিত মৃত্যুকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইল। বাহির হইতে দেখাইত যেন তাহার মনে কোনো ক্ষোভ নাই, কোনো দুঃখ নাই, কিন্তু তাহার আকাশ-বাসরের সঙ্গিনী তাহার মর্ম্মকোণের ব্যাথার কাহিনী জানিত। জানিত, তাহার বেদনা কত নিবিড়; অশোকার জন্য তাহার দুঃখ হইত। হায় হতভাগিনী, রত্ন চিনিল না। তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিত। ললিত হাসিত। সে-হাসি কান্নায় ভরা।

ললিতের সাধের উপন্যাস "করুণা" বাজারে বাহির হইল। কাগজে অযাচিত প্রশংসা—হুহু করিয়া বই কাটিতে লাগিল। ললিতমোহনের খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল 'করুণা' সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে—লেখক অমর হইয়া থাকিবে।

প্রকাশক 'করুণা'র পরের সংস্করণের জন্য ও লেখকের অন্য কোনো বই লেখা থাকিলে তাহার জন্য কন্‌ট্রাক্ট্ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অসম্ভব মূল্য দিতেও তিনি পিছ্-পা নহেন। তিনি যেদিন ললিতের কাছে গেলেন তখন যমের সঙ্গে তাহার কন্‌ট্রাক্ট্ হইয়া গেছে।

দার্জ্জিলিঙে অশোকার কানে স্বামীর বিপুল খ্যাতির বার্ত্তা পৌছিল। স্বামী যে খ্যাতি-নিন্দার বাহিরে যাইতে বসিয়াছেন, সে খবরটুকু পৌছিল না। মা দার্জ্জিলিঙে ছিলেন। মা বলিলেন, "বেবী, তোর কপাল ফিরিয়াছে। আমি বরাবরই জানি, ললিত একটা কিছু করিবেই করিবে; তাহার মত খ্যাতির আর কে পাইয়াছে!" অশোকা চুপ করিয়া রহিল। মা বলিলেন, "বেবী চল্, কলকাতায় যাই, এসময় তোর তার কাছে থাকা দরকার। অনেক টাকা হাতে আস্‌বে—হয়ত সব বাজে খরচ ক'রে বস্‌বে।"

খরচের ভয়ে বা অর্থলোভে নহে, অন্য কারণে অশোকা ললিতের কাছে যাইতে চায়। নিজের সঙ্গে যুদ্ধে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। তাহাদের এই ঝগড়ার জন্য সে যত বারই স্বামীকে দোষী করিতে চাহিয়াছে তত-বারই সে স্বামীর দোষ খুঁজিয়া পায় নাই—নিজের প্রচণ্ড অভিমান ও নীচতাকেই তাহার কারণ বলিয়া মনে হইয়াছে। অভিমান তখনো পূরামাত্রায় আছে, কিন্তু ক্ষমা চাহিবার জন্য মন ব্যাকুল,—সে আর পারে না এই অকারণ দ্বন্দ্বকে জীয়াইয়া রাখিতে। হয়তো এখনো সময় আছে—শুধু তাহার নিরীহ স্বামীকে লইয়া আবার সে সুখের স্বর্গ গড়িতে পারে; মা বোন নাই-ই থাকিল।

সেদিন সকাল হইতেই আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন—গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের প্রলেপে নীলাকাশে যবনিকা পড়িয়াছে; ললিতের আকাশ-বাসর কালবৈশাখীর তাণ্ডবলীলার প্রতীক্ষা করিতেছে। ললিত মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল ও প্রলাপ বকিতেছিল। খালি অশোকার আর আকাশ-বাসরের কথা। ডাক্তার বলিয়াছেন—সেদিন কাটিবে না। মাঝে মাঝে তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরিয়া অসিতে-ছিল।—মেঘভরা আকাশের দিকে চাহিয়া তখন সে প্রবল বর্ষণ কামনা করিতেছিল। সে পিসীমার একহাত একহাতে ধরিয়া ছিল, অন্য হাত তাহার দুঃখদিনের সঙ্গি-নীর হাতের মুঠার মধ্যে ছিল। মেয়েটির চোখের জল বাগ মানিতেছিল না।

ললিত শিয়রে হাত দিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল; বালিশের নীচে তাহার দ্বিতীয় উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিল, পিসীমা তাহা বাহির করিয়া ললিতের হাতে দিলেন। ললিত পরম আগ্রহে সেটি হাতে লইয়া নীরবে কিছুক্ষণ তাহা দেখিল। তাহার চক্ষু উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাহার সঙ্গিনীর হাতে সেটি তুলিয়া দিয়া বলিল, "দুর্দ্দিনের বন্ধুর এই শেষ-দান—আর কিছুই আমার নাই।" মেয়েটি ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিল। অবিরল জলধারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অদূরে নারিকেল-শাখাগুলি বায়ু-তাড়নে হু হু করিয়া উঠিতেছিল। যেন

কাহার ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস। ছাদের টালির উপর বৃষ্টিপাতের শব্দ ললিত কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল—যেন কাহার অবিশ্রাম পদশব্দ। ললিত ব্যাকুল-আগ্রহে উঠিয়া বসিতে গিয়া সজ্ঞাশূন্য হইল।

প্রলাপের ঘোরে সে বলিয়া উঠিল—"অশোকা, এসো, এসো—দ্যাখো আমার আকাশ-বাসরে কেমন নিরিবিলি, কই তুমি এলে না? বেশ।"

সে আবার নিঝুম স্তব্ধ হইয়া পড়িল। সে-স্তব্ধতা আর ভাঙিল না। চিরন্তন মানবের চিরন্তন ইতিহাস সমাপ্ত হইল।

নবযুগের অর্থনৈতিক সমস্যা

শ্রী ফণীন্দ্রকুমার সান্যাল

সমাজবদ্ধ হ'য়ে মানুষ যখন তার সভ্যতাকে বিস্তার করবার চেষ্টা করছিল সে-সময় তার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-কল্পে সে খুঁজে বার করলে এমন একটা জিনিষ যাতে তার ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের কেনা-বেচার একটা পরিমাপ ঠিক করা যায় এবং পরস্পর আদান-প্রদানের একটা মূল ভিত্তি গড়া সম্ভবপর হয়। এই জিনিষটাকে মানুষ "অর্থ" নামে অভিহিত করলে; সেই সময় থেকে "অর্থ" দিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহের মূল্য নির্দ্ধারণ করা আরম্ভ হ'ল। অবশ্য "অর্থ" বলতে বর্ত্তমানে আমরা যা বুঝি "অর্থের" স্বরূপ চিরকালই ঠিক এরকম ছিল না। মানুষের সভ্যতা-বৃদ্ধির স্তরে স্তরে এর রূপ বদলে গেছে। আজ যে "অর্থ" বলতে আমরা "টাকা আনা পয়সা" বুঝতে পারি চিরকালই লোকে তা বুঝত না। সভ্যতা অনেকখানি এগিয়ে যাবার পর "মুদ্রার" প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। বর্ত্তমানে আমরা সভ্যতার যে-স্তরে এসে পৌচেছি এবং এখন "কাগজের মুদ্রার" যে-ভাবে প্রচলন আরম্ভ হয়েছে তাতে অনেক অর্থনীতিবিৎ মনে করেন যে-কালে কোনও প্রকার "মুদ্রারই" প্রচলন প্রয়োজন হবে না; শুধু "হাওলাতি" বন্দোবস্তে (credit system) কাজ চলবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, "অর্থের" এ স্বরূপ প্রথম থেকে বা একবারেই দেখা দেয়নি। এমন এক সময় ছিল যখন বন্য পশুর চামড়া বা লোম ছিল সে-সময়কার "অর্থ"। ক্রমে গৃহ-পালিত পশু, শস্য প্রভৃতি "অর্থ" ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যখন যে-জিনিষই ব্যবহার করা হোক্ না কেন তাকে অন্য সমস্ত পদার্থ থেকে আলাদা ক'রে একটা বিশেষরূপ দেওয়া হয়েছে; এবং দ্রব্যাদির মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু সভ্যতার আদিম যুগে যখন মানুষ এই "অর্থের" আবিষ্কার করতে পারেনি তখন সে তার জীবন যাপন করত কি ক'রে তা ভেবে দেখা দরকার। "অর্থ" ব'লে কিছু না থাকায় মানুষ তখন ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির পরস্পর বিনিময়ের দ্বারা তাদের আদান-প্রদান চালাত। চিরদিনই ব্যবহারিক দিক্ দিয়ে একটি মানুষের দুইটি পৃথক্ সত্তা দেখা যায়। মানুষ এক দিকে উৎপাদক ও আর-এক দিকে ভোগী। প্রত্যেকেই তার শক্তি-সামর্থ্যানুযায়ী কিছু না কিছু উৎপাদন করছে এবং তার জীবন-ধারণের জন্যে নানা জিনিষ ভোগ করছে। বর্ত্তমানে "অর্থের" সাহায্যে সে তার উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী করে ও এই "অর্থের" সাহায্যেই তার ভোগের জিনিষ কেনে। যখন "অর্থ" ব'লে কিছু ছিল না তখন সে তার উৎপন্ন জিনিষের বিনিময়ে তার ভোগের জিনিষ সংগ্রহ করত। এই ভাবে তখনকার দিনে মানুষের চলছিল বেশ; কিন্তু মানুষের তখন কিনা বেড়ে চলবার সময়। তাই এই ভাবে চলতে সে পদে পদে বড় বাধা পেতে লাগল। তার প্রথম অসুবিধা হ'ল এই যে, তার প্রয়োজনের দ্রব্য এমন লোকের কাছে পাওয়া চাই যে-লোক তার উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ

কর্‌বার আবশ্যকতা অনুভব কর্‌বে। এই যে পরস্পরের প্রয়োজন অনুসারে পরস্পরের সঙ্গে মিলন এইটে হ'ল বড় অসুবিধার কথা। দ্বিতীয় অসুবিধা হ'ল তার মূল্যের মাপকাঠি নিয়ে। প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় পদার্থের মূল্য নির্দ্ধারিত হবে কি ক'রে? আর তারপর অর্থের যে-রকম নানা ভাগ ক'রে নেওয়া যায় এই বিনিময়-প্রথায় তা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না।

এই উপরোক্ত অসুবিধাগুলার জন্যে মানুষ এমন একটা জিনিষের সন্ধান চেয়েছিল যাতে তার চলার পথ অনেকটা সহজ হ'য়ে আসে; এবং এই ইচ্ছা থেকেই "অর্থের" আবিষ্কার হয়েছিল। বর্ত্তমানে আমাদের সমস্ত ব্যবহারিক জীবন এই "অর্থ" ব্যবহারের সঙ্গে ওত-প্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট; এবং এর প্রভাব মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে আরম্ভ ক'রে তার জাতিগত জীবনকেও ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার আন্তর্জাতিক জীবনের উপর।

এই "অর্থ" আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে মানুষ তার সভ্যতা বাড়িয়ে তোল্‌বার অনেক সুবিধা পেয়েছে। তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন কর্‌বার পক্ষে এই "অর্থ" তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এহ "অর্থের" ব্যবহারেই মানুষের জীবন-ধারণের পদ্ধতি বদ্‌লে যায় এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্য বে'ড়ে উঠ্‌বার একটা অবাধ স্বাধীনতা পায়। দ্রব্যাদির আদান-প্রদানের একটা সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি হওয়ায় তার অর্থনৈতিক জীবনের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঝড় ব'য়ে যায় এবং তার ফলে তার ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা যুগান্তর এসে উপস্থিত হয়েছে। এইসব দেখে প্রায় অধিকাংশ অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, "অর্থ" মানুষের ব্যবহারিক জীবনের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ; এবং এই "অর্থ" না থাক্‌লে মানুষ তার রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কখনও পরিপূর্ণতা লাভ কর্‌তে পার্‌ত না এবং তার জাতীয়তার বিকাশ হওয়া অসম্ভব হ'ত।

কিন্তু "অর্থ" ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সকলেই যে নিঃসন্দেহ হয়েছেন তা নয়। স্যোশি-য়ালিষ্ট মতবাদীরা "অর্থের" প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান হয়েছেন এবং তাঁরা সম্পত্তি-মাত্রেই সাধারণের এই ব্যবস্থা দ্বারা "অর্থের" ব্যবহার দূর ক'রে দিতে চাচ্ছেন। যাঁরা স্যোশিয়ালিষ্ট মতবাদ মানেন না তাঁদের মধ্যেও দু'একজন ব্যবহারিক জীবনে "অর্থের" স্থান অনেক নীচে ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তিনি "অর্থ" সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, সামাজিক জীবনের সুবন্দোবস্ত ও পরিমিত ব্যয়ের দিক্ দিয়ে এর তুল্য বস্তুতঃ অপদার্থ জিনিষ আর হয় না।

যাই হোক্, বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেখতে হবে যে, এই "অর্থ" ব্যবহারের দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন বা জাতিগত জীবন কতখানি সুখকর হচ্ছে। এই যে আমরা আমাদের সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে ব'লে গর্ব্ব করি, এই যে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে ব'লে এবং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পেয়েছি ব'লে অহঙ্কারে আমাদের মন ভ'রে ওঠে, এর মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত রয়েছে সেইটাই আজ বিশেষ ক'রে ভাবতে হ'বে। বর্ত্তমানে আমরা দেখছি কি? আমরা দেখছি যে মানুষের প্রচুর ব্যবহার্য্য উপকরণ অসংস্কৃত অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে মানুষ তার নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রচুর ভাবে উৎপাদন কর্‌ছে এবং মানুষের উৎপাদিকা শক্তিও যথেষ্ট পরিমাণে তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ কর্‌ছে; কিন্তু এ-সত্ত্বেও দারিদ্র্যের নির্ম্মম কশাঘাতে সে নিয়ত নিপীড়িত হয়। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাকে অনশনে কাল কাটাতে হয়। এই তথাকথিত সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের দুঃখ-কষ্টও বেড়ে উঠছে। কতকগুলা লোক খুব অর্থশালী হ'য়ে পড়ছে; কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ফলে বিদ্রোহ, বিপ্লব প্রভৃতি যেন সভ্যতার চিরসাথী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্বেষ, অশান্তি প্রভৃতি আগুনের মতন মানুষকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে।

সুতারং সুখ ব'লে আমরা যা মনে করেছিলাম বস্তুত তা সুখ নয়; সভ্যতা ব'লে যাকে মেনে নিয়েছি প্রকৃত সভ্যতা তা থেকে অনেক দূরে পালিয়ে গেছে। শান্তি ব'লে যাকে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম তা অশান্তিরূপে

আমাদের দেহের আভরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্যে আজ আমাদের পুরাতন অর্থনৈতিক মতগুলাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিতে হ'বে। আজ আমাদের চোখ থেকে মিথ্যা সত্যতার অঞ্জন মুছে ফেলে দেখতে হবে যে, আমাদের অর্থনীতির বনিয়াদ সম্পূর্ণ ভুল ধারণার উপর স্থাপিত করেছি কি না। সেই-জন্যে আজ সেই অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিতের প্রয়োজন যে "অর্থ" ব্যবহার বাদ দিয়ে অর্থনীতির সৌধ গড়তে পারে। আজ আবার দেখা দর্‌কার যে, এই তথাকথিত সভ্যতার আদিম যুগের বিনিময়-প্রথা ফিরিয়ে আনা যায় কি না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মনে হয় যে, "অর্থের" ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে বিনিময়-প্রথা যদি নতুন পদ্ধতিতে চালান যায় তা হ'লে বর্ত্তমানে অর্থনীতির দ্বারা যে-সমস্ত দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি করা হয়েছে সে-সমস্ত দুর করা যেতে পারে। দুঃখ-কষ্ট যে বেড়েই চলেছে একথা বোধ হয় আজ আর কেউ অস্বীকার কর্‌বেন না। এখন এইসমস্ত দুঃখ-কষ্ট "অর্থের" ব্যবহার তুলে দিলে দূর হবে কি না সেইটেই হ'ল আসল সমস্যা।

এখন দেখা যাক্ "অর্থের" ব্যবহার তুলে দিয়ে বিনিময়-প্রথার পুনঃপ্রচলন কর্‌লে দুঃখ-কষ্টের কতখানি লাঘব হ'তে পারে। পূর্ব্বেই মানুষকে বিশ্লেষণ ক'রে আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক মানুষ একাধারে উৎপাদক ও ভোগী। এই উৎপাদক ও ভোগী হিসেবে মানুষকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। বিনিময়-প্রথা যখন প্রচলিত ছিল তখন এই উৎপাদকের সঙ্গে ভোগীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল; তাতে প্রত্যেক মানুষকেই উৎপাদক হ'তে বাধ্য হ'তে হয়েছিল। "অর্থের" ব্যবহারে বর্ত্তমানে উৎপাদক ও ভোগীর মধ্যে বহু লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্র মন্থন ক'রে এই মধ্যবর্ত্তী লোকগুলাকে উৎপাদক বলা চলে বটে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এদের মধ্যে অনেকেই উৎপাদক ব'লে পরিগণিত হতে পারে না এবং তাদের উৎপাদক ব'লে মনে কর্‌লেও তাদের এই কাজের মূল্য বাস্তবিক পক্ষে সামান্যই বল্‌তে হবে; পরন্তু এই শ্রেণীর লোকেরাই বর্ত্তমান দুঃখ-কষ্টের মূলীভূত কারণ। বিনিময়-প্রথার পুনঃপ্রচলনে এই মধ্যবর্ত্তী লোকের সংখ্যা একরকম লোপ পেয়ে যাবে এবং প্রত্যেক মানুষকেই ব্যবহার্য্য কিছু-না-কিছু উৎপাদন কর্‌তে হবে। এইটেই হবে একটা মস্ত বড় লাভ। এখন অনেকে প্রশ্ন কর্‌বেন যে, বিনিময়-প্রথা যে-সব কারণে মানুষ তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল এখনও কি সে-সব কারণ বর্ত্তমান থাক্‌বে না? সমস্ত দিক্ বিচার ক'রে মনে হয় যে, এখন পূর্ব্বের বাধা কার্য্যকরী হবে না। যখন বিনিময়-প্রথা প্রচলিত ছিল তখন মানুষের বর্ত্তমানের ন্যায় বহুল অভিজ্ঞতা ছিল না। তখন যে-সমস্ত বাধা এসে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিল মানুষ এখন সে-সমস্ত অতিক্রম কর্‌বার শক্তি অর্জ্জন করেছে। এখন তার রাষ্ট্রীয় জীবন অনেকটা সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত এবং এই রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যেই সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বিনিময় প্রথা প্রচলিত করা সম্ভবপর হবে; কারণ "অর্থ" ব্যবহার কর্‌তে হ'লেও রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য আমাদের গ্রহণ কর্‌তে হয়। বিনিময়-প্রথা চালাবার পথে যে তিনটে বাধার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি সেগুলাকে দূর ক'রে দেওয়া বিশেষ কঠিন কথাও নয়। মানুষ যদি "অর্থ" ব্যবহারের জটিলতাকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে চল্‌তে পারে তা হ'লে বিনিময়-প্রথা চালান তার পক্ষে এঅবস্থায় বিশেষ কঠিন ব্যাপার হবে না। তার পর এখন "অর্থ" ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সঞ্চিত হ'য়ে ধনীনির্ধনের মধ্যে একটা বিরাট্ প্রভেদ সৃষ্টি ক'রে, বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হ'লে এরূপ হবার আশঙ্কা অনেক কমে যাবে। আর সোশিয়ালিজম্, বলশেভিজম্ প্রভৃতি মতবাদের আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি জনসাধারণের সম্পত্তিরূপে পরিণত করার প্রয়োজন হ'বে না এবং সেই কারণে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতার উপর কোনও রকম হস্তক্ষেপ কর্‌বারও প্রয়োজন হবে না। তার পর পূর্ব্বে সভ্যতা বৃদ্ধি কর্‌বার জন্যে মানুষের মনের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল; সেইজন্যে ধীরপদবিক্ষেপে চল্‌বার মত সহিষ্ণুতা তার ছিল না। কিন্তু সভ্যতা বাড়িয়ে সে আজ দেখছে যে, সে ঠিক পথে চ'লে আস্‌তে পারেনি; তাড়াতাড়ি পথ চল্‌বার চেষ্টাটা তার ভুল হয়েছিল। আজ তাই সে ধীরে অথচ ঠিক পথে চল্‌বার সহিষ্ণুতা অনেক পরিমাণে অর্জ্জন

করেছে। আরও একটা কথা লক্ষ্য কর্‌বার আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, তথাকথিত সভ্যতার গর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়েও আমরা বিনিময়-প্রথাকে আজ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন ক'রে চল্‌তে পারিনি। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক গৃহস্থালীতে ও সাংসারিক জীবনে এখনও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে বিনিময়-প্রথা চালিয়ে থাকি এবং এ-সব ক্ষেত্রে অশান্তির কোনও কারণই উপস্থিত হয় না।

সুতরাং আজ নবযুগের এই নব প্রেরণার দিনে আমাদের যাঁরা নতুন অর্থনীতিবিৎ হবেন তাঁদের এই সমস্যাটা সমাধান কর্‌বার জন্যে এগিয়ে আস্‌তে হ'বে। আজ জগতে অবশ্য সংস্কারকের অভাব নেই। নানা বিষয় সংস্কার কর্‌বার জন্যে নানা লোক এগিয়ে আস্‌ছেন। পরের দুঃখ-কষ্ট যাতে দূর হয় তা সকলেরই প্রার্থনীয় বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রোগের কারণ নির্ণয় ক'রে তার প্রতীকারের চেষ্টা করা সকলের সামর্থ্যে কুলায় না। বর্ত্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলা এমন কুসংস্কার রয়েছে যে, কোনও কিছু যদি এসভ্যতার পরিপন্থী ব'লে মনে হয় তা আমরা গ্রহণ কর্‌তে সাহস করিনে। কিন্তু আজ আমাদের মন থেকে পুরাতন অর্থনীতির ভুলধারণাগুলা দূর ক'রে দিতে হবে; "অর্থ" ব্যবহার সম্বন্ধে যে অন্ধকুসংস্কার যুগযুগান্ত ধ'রে আমাদের মনের উপর রাজত্ব কর্‌ছে তাকে দূর ক'রে দিয়ে নতুন প্রণালীতে বিনিময়-প্রথা প্রচলনের জন্য ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। ভগীরথের মত আজ নবযুগের নবীন অর্থনীতিবিৎ তাঁর নব অর্থনীতির শঙ্খ বাজিয়ে নবভাবধারার যে-প্লাবন আন্‌বেন তাতে ভেসে যাবে সমস্ত পুরাতন যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত আবর্জ্জনরাশি ও খ'সে পড়বে মানুষের নিজ হাতের গড়া শৃঙ্খল যা সে এককালে অলঙ্কার মনে ক'রে অঙ্গে ধারণ করেছিল।

ক্ষণিকের আনন্দ

শ্রী সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

পান করি' লহ বন্ধু হর্ষ-তপ্ত সুরা
নিষ্প্রভ যৌবন তব হোক ফিরে পুরা,
ক্ষণিকের তরে বন্ধু দুই চক্ষু ভরি'
উৎসবের দীপ্তরূপ লহ পান করি'।
বিশুষ্ক অধর 'পরে নিমেষের তরে
হাস্যের নির্ঝর ধরো, পড়ুক গো ঝরে,—
অন্তর-সাহারা-ভূমে উৎসবের গান
রচুক আনন্দ যেন ওয়েসিস্ প্রাণ।

আজ প্রাতে জাগি' কাল ভূঁয়ে টুটে
পুষ্প, তবু ওষ্ঠে তার হাস্য রহে ফুটি',
গন্ধ পেয়ে তার ছুটে আসে অলিদল—
প্রশান্ত-গুঞ্জন-গীতে উদ্দাম চঞ্চল।

"ক্ষণিক" সার্থক হয় ক্ষণ-হর্ষ-বুকে,
ব্যর্থ করিও না তারে ম্লান মৌন মুখে।

নববর্ষ

১

হে চির নূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি' তোমার পানে।
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা,
চির দিবসের প্রাণময়ী ভাষা,
ক্ষয়হীন ধন ভরি' দেয় মন
তোমার হাতের দানে ॥
এ শুভ লগনে জাগুক গগনে অমৃত বায়ু,
আসুক জীবনে নব জনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা কিছু, যাহা আছে ক্ষীণ,
নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন,
ধুয়ে যাক্ যত পুরানো মলিন
নব আলোকের স্নানে ॥

২

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ
আপনারি আবরণ?
খুলে দেখ্ দ্বার—অন্তরে তার
আনন্দ-নিকেতন।
মুক্তি আজিকে নাই কোন ধারে,
আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগারে,
বিষ-নিঃশ্বাসে তাই ভরে' আসে
নিরুদ্ধ সমীরণ ॥
ঠেলে দে আড়াল, ঘুচিবে আঁধার,
আপনারে ফেল্ দূরে।
সহজে তখনি জীবন তোমার
অমৃতে উঠিবে পূরে।
শূন্য করিয়া রাখ্ তোর বাঁশী,
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি',
ভিক্ষা না নিব, তখনি জানিবি
ভরা আছে তোর ধন ॥

৩

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে;
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে ॥
যাঁহার হাতের বিজয়-মালা
রুদ্রদাহের বহ্নি জ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে ॥
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবস রাত্রি।
ডাক এল তার তরঙ্গেরি,
বক্ষে বাজে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে ॥

(শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩৩৩) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

পত্র

রবিবার

প্রিয় নন্দলাল!

আজ গোটা-কতক কথা মনে এল;—শিল্পের 'ক' 'খ' জান্‌তে হ'লে এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই:—

(ক) যে-ছবিকে লোকে পাথরে কাট্‌লে, কাঠে কুঁদ্‌লে, সূঁচ দিয়ে তুল্লে কিম্বা আঁচড়ে বার করে' আন্‌লে তারা এক জিনিষ, আর—

(খ) যে-ছবি ফুট্‌লো পটে সে আর-এক জিনিষ।

কারণ, (ক) সে মানুষের শক্তির পরিচয় ছাড়িয়ে উঠ্‌তে সম্পূর্ণভাবে পারলে না; মানুষ-ছোঁয়া হ'য়ে রইলো অনেকখানিই। যে তাদের ফোটালে তার বাহাদুরি কতকটা মনে পড়াতে থাক্‌লো—যে-ভাবে কাগজের ফুল সেই ভাবের কাজ এরা।

(খ) কিন্তু অন্যভাবে কাজ করতে থাক্‌লো, কেননা, সে সত্যি ফুট্‌লো পটে। কেউ যে তাকে ফুটিয়েছে যত্নে-চেষ্টায় এটা লোপ পেয়ে গেল কাজ থেকে।

একমাত্র চিত্রে সুকুমার সমস্ত পরশ দিয়ে এই ভাবে রস ফোটানো চল্লো—অন্য কিছুতে নয়।

কাজটি ফুট্‌লো চমৎকার। কাজ যে ফোটালে সে বাতাসে মিলিয়ে গেল পরিষ্কার—এ হ'ল চিত্র-বিদ্যার চরম সার্থকতা। সবাই এটা পারে না।

নদীর জলে মাছ থাকে কিন্তু জল আঁস-গন্ধ পায় না। কুণ্ডের জলে মাছ থাকে—জল পর্য্যন্ত মাছের গন্ধে দূষিত হয়!

(ক) তেম্‌নি একরকম ফুলও আছে যা মালি-মালি গন্ধ করে, কাজও আছে যা মানুষ-মানুষ গন্ধ করে!

(খ) আর এক রকম কাজ আছে যা ফুটন্ত ফুল—ফুল-ফুল গন্ধ করে।

(শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩৩৩) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

রায়তের কথা

আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা উর্দ্ধমূল অবাঙশাখ। উপরের দিক থেকে এর সুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলুচে। আমাদের পলিটিক্‌সও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল, এই জিনিষটি শিকড় মেলেছে উপর-ওয়ালাদের উপর-মহলে,—কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই উর্দ্ধলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে' থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে' নেওয়াই পলিটিক্‌স্। সেই পলিটিক্‌সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা;—কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলী, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগবাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্তরে বিচিত্র-বাষ্পলীলা-রচনায় নিযুক্ত, তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে, মর্‌চে, চাষ কর্‌চে, কাপড় বুন্‌চে, নিজের রক্তে-মাংসে সর্ব্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে-দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগ্‌লে অশুচি হ'ন, মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম কর্‌চে, মাতৃভাষায় কাঁদ্‌চে, হাস্‌চে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে' বল্‌চে, "অদৃষ্ট"। দেশের সেই পোলিটিশান্ আর দেশের সর্ব্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্‌স্ আজ মুখ ফিরিয়েচে, অভিমানিনী যেমন করে' বল্লভের কাছে থেকে মুখ ফেরায়। বল্‌চে, "কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী"। তখন ছিল পূর্ব্বরাগ ও অভিসার, এখন চল্‌চে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয়নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম "চাই," আজ তেম্‌নি জোরেই বল্‌চি "চাইনে"। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জন-সাধারণের অবস্থায় উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু "চাইনে, চাইনে" বল্‌বার হুহুঙ্কারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু "চাই" জুড়ি, তার আওয়াজ বড় মিহী। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি, ভদ্রসমাজের পোলিটিক্যাল্ বারোয়ারী জমিয়ে তুল্‌তেই তা ফুরিয়ে যায়, তার পরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক পলিটিক্‌সের সুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশ-প্রেমের চর্চ্চা করেচি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চ্চার অর্থ যাঁরা জোগান, তাঁদের কারো বা আছে জমিদারী, কারো বা আছে কার্‌খানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই, অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি, সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন—কী শব্দ-সম্বলে, কী অর্থ-সম্বলে। যদি দেওয়ানী অবাধ্যতা চল্‌ত, তাহ'লে তাদের ডাক্‌তে হ'ত বটে,—সে কেবল খাজনা বন্ধ ক'রে মর্‌বার জন্যে; আর যাদের অদ্য-ভক্ষ্য ধনুর্গুণ, তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ ক'রে হরতাল কর্‌বার জন্যে, উপর-ওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া করে' দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতবীই থেকে যায়। আগে পাতা হোক্ সিংহাসন, গড়া হোক্ মুকুট, খাড়া হোক্ রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার পরুক কোপ্‌নি,—তার পর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়্‌বার। অর্থাৎ দেশের পলিটিক্‌স্ আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই সুরুতেই পলিটিক্‌সের সাজ ফরমাসের ধুম পড়ে' গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দর্‌কার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আব্‌হাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে ছেঁটে বদ্‌লে জুড়ে যে-সাজ বানিয়েছে, ঠিক সেই নমুনাটা দর্‌জির দোকানে চালান কর্‌লেই হবে। সাজের নামও জানি, একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য মুখস্থ, কেন না আমাদের কার্‌খানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লেমেণ্ট্, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি; এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা কর্‌তে পারি; কেন না গায়ের মাপ নেবার জন্যে মানুষকে সাম্‌নে রাখ্‌বার কথাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ কর্‌বার জন্যেই বলে' থাকি, আগে স্বরাজ, তারপরে স্বরাজ যাদের জন্যে। তারা পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্ত্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে' তুলেচে, জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো-একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারীতে আগে স্বরাজ পাব, তার পরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে' হোক্ সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিশের পেয়াদা আছে, গলায় ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্‌সো, আর আছে ওকালতীর দ্রংষ্ট্রাকরাল সর্ব্বস্বলোলুপ আদালত।

কিন্তু ভাব্‌বার কথা এই যে, বর্ত্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে সুরু করেচেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্চেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বদেশিক হ'য়ে ওঠে তখনো দেখা যায় সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে—Made in Europe। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোস্থালিজম্, কম্যুনিজম্, সিণ্ডিক্যালিজম্ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরখ কর্‌চে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ব্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠ্‌চে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বল্‌চে পিষে ফেলো, দ'লে'ফেলো; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক্। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠী মার্‌লে সে মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বল্‌চে, শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তাহ'লেই বধূরা নিরাপদ্ হবে! ভুলে যায় যে, মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে' তুল্‌তে দেরী করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে' ম'লেই ভব-বন্ধন ছেদন করা যায় না—স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ কর্‌তে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মার-মুখো। পাপকে ভিতর থেকে মার্‌তে সময় লাগে—তাদের সে তর্ সয় না। তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে' আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্‌স্ নিয়ে পার্লামেণ্টে রাজনীতির পুতুলখেলা খেল্‌তে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্‌সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে-সাহিত্য আমাদের মন দখল করেচে, তার মধ্যে ম্যাট্‌সিনি, গারিবাল্‌ডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্ম্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরাণীকে বিসর্জ্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এক প্রজার মহিমা। তখন গান চল্‌ছিল বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়—এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানিং পশ্চিমে বল্‌শেভিজ্‌ম্, ফাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে-সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, আমরা যে তার কার্য্যকারণ, তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জম্‌ল। অম্‌নি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব-চেয়ে বড় করে' দেখ্‌তে বসেচে। বরাহ অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুল্‌তে চায় লাঠির ঠেলায়। একথা ভাব্‌বার অবকাশও নেই, সাহসও নেই

যে, গোঁয়ার্ত্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য থাকে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্যেই আজকের দিনের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্ব্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্ব্বে যে-ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল, আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে' দিয়ে যদি তাণ্ডব নৃত্য করা যায়, তাহ'লে সেটাকে বল্‌তেই হবে পাগলামী। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক-এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে' গিয়ে তাদের পাগলামী দেখা দেয়—কিন্তু সেই দেখাদেখি পাগলামী চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইসারা চল্‌চে—মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝ্‌তে পার্‌লুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্চে বাঙালীর অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেণ্টা রঙে ডোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

আমি নিজে জমিদার, এইজন্য হঠাৎ মনে হ'তে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তাহ'লে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়্‌তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখ্‌তে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি—অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্ম্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়্‌তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে কাল তারাই বনবিড়াল হ'য়ে উঠ্‌বে। হয়ত শিকারের বিষয়-পরিবর্ত্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না। আজ অধিকার কাড়্‌বার বেলা তারা যে-সব উচ্চ অঙ্গের কথা বলে, তাতে বোঝা যায় তাদের "নামে রুচি" আছে; কিন্তু কাল যখন "জীবে দয়া"'র দিন আস্‌বে, তখন দেখ্‌ব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ নামটা হচ্ছে মুখে, আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে-জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তাহ'লে তাকে দ'লে' ফেল্‌লেও সেই মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘট্‌বে। কারণ, মাটিবদল হ'ল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী। এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁক্‌ড়ে থাক্‌তে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে' উপার্জ্জন না করে' কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে' ঐশ্বর্য্য-ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে' তুলি। যারা বীর্য্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা বলে' কল্পনা কর্‌বার একটা অভিমান আছে। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্চি, রায়তদের বল্‌চি "প্রজা", তারা আমাদের বল্‌চে "রাজা",—মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারী ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলামচোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই—তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বড় জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠ্‌বে। রক্ত-পিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বল্‌তে পারিনে। জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে' তা হবে? জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? একথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারি হওয়া উচিত, যে মানুষ বই পড়ে। যে-মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি কর্‌তে কোনো বাধা না থাকে, তাহ'লে যার বইয়ের শেল্‌ফ আছে, বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কি করে' করা যায়? সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের তাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে-ছবি রচনা করে, লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল করে' বসে। অধিকার আছে বলে' নয়—ব্যাঙ্কে টাকা আছে বলে'। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হ'য়ে ওঠে। বলে—মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যত দিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আস্‌তে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পার্‌বে না।

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তাহ'লে যে-ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেন্‌বার সম্ভাবনা অল্পই; যে-লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়-যোগ্য জমি তার হাতে পড়্‌বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হ'তে থাক্‌বে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-সল্প হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চল্‌বে। এম্‌নি করে' ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড় বড় বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ৎ আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম আকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেচি, জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করিনি, কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেচি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারৎ পাবে কি না সে-তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ কর্‌বার চেষ্টায় ছিল, তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েচে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাক্‌ত, তাহ'লে নীলের বন্যায় রায়তী জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশঃ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তাহ'লে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মৎলব এদের কারো মাথায় যে কোনো দিন আসেনি, তা মনে কর্‌বার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে, তার মুনফায় বিঘ্ন ঘট্‌লেই আবদ্ধ মূলধন এইসব খাতের সন্ধান খুঁজ্‌বেই। এখন কথা হচ্চে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো? মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধন-স্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে, তাদের মত ভয়ঙ্কর জীব আর নেই। রায়ৎখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্ব্বনেশে, তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে-প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হ'তে হ'তে জমিদার হ'য়ে ওঠে, তার মধ্যে সয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘরজ্বালানো, ফসল-তছরূপ—কোনো

বিভীষিকায় তাদের সঙ্কোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হ'য়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড় বড় ব্যবসা দানবাকার হ'য়ে ওঠে, তেম্নি ক'রেই দুর্ব্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে' প্রবল রায়ৎ ক্রমেই জমিদার হ'য়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়ীতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেম্নি জমির পরিধি বাড়তে থাকে, অম্নি হাতের লাঙল খসে' গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্ত-সীমা প্রসারিত হ'তে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জ্জন-গর্জ্জন-শাসন শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাক বড়ো, ছোট মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে—এই চুনোপুটির ঝাঁক নিয়েই রায়ৎ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের করে' নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে-আঘাত মারতে আসে, সেই আঘাতের দ্বারাই উলটিয়ে মারা ওকালতী-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড় বড় পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হ'য়ে না ওঠে, ততদিক "উচল" আইনও তার পক্ষে "অগাধ জলে" পড়বার উপায় হবে।

একথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তত বড় স্বাধীনতার অধিকার তারই, যার শিশু-বুদ্ধি নয়। যে-রাস্তায় সর্ব্বদা মোটর-চলাচল হয়, সে-রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম—কিন্তু অতন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই, তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকী থাকবে?

আমি জানি, জমিদার নির্ব্বোধ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে, জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশী আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সঙ্কীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও তেম্নি, কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে' সরে' মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে জমিদারের লোকসান আছে বলে' আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া,—যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, একথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ব বৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতি-সাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছকাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবন-যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হ'লে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে' সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভাল জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানিনে—জবাব তৈরী হ'য়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে, নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া, সে তত কাল পর্য্যন্ত টি কবে কি না সন্দেহ।

(সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩৩৩) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ভিক্ষা"

বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটীর-নির্ম্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন—সেই ভূমি থেকে যে-ফসল উৎপন্ন হ'ত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত—এবং দুই-চারিটি অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে—তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল—কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হননি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের অন্নে আত্মাভিমান জন্মে—মন থেকে এই ভ্রম কিছুতে ঘুচতে চায় না যে, এই অন্নের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে' যে-অন্ন পাই সে-অন্ন ভগবানের—তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবী নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।

বাংলা দেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে অন্ততঃ ৫৫ বৎসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে' সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বর লাভ করেচি সমস্তই বাংলা দেশের ভাণ্ডারে জমা করে' দিয়েচি। এইজন্য বাংলা দেশের কাছ থেকে আমি যতটুকু স্নেহ ও সম্মান লাভ করেচি তার উপরে আমার নিজের দাবী আছে—বাংলা দেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দেয় তাহ'লে অভিমান করে' আমি বলতে পারি যে, আমার কাছে বাংলা দেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে-সমাদর যে-প্রীতি লাভ করি, তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবী নেই। এইজন্য এই দানকেই ভগবানের দান বলে' আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহঙ্কার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার আনার পয়সা নিয়েও গর্ব্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশ ভরে'যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েচেন,কোনকালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব না সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি কিন্তু গর্ব্ব করতে পারিনে। পরের দত্ত সমাদরও সেই-রকম অমূল্য—সেই দান আমি নম্র শিরেই গ্রহণ করি, উদ্ধত শিরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলা দেশের সন্তান বলে' উপলব্ধি করবার সুযোগ

লাভ করিনি। বাংলা দেশের ছোট ঘরে আমার গর্ব্ব কর্‌বার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড় ঘরে আমার আনন্দ কর্‌বার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়ীতে কেবলমাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেননি—শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটী দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হ'য়ে গেল, আমার চুল যখন পাক্‌ল তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়্‌ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হ'য়ে বসে' আছেন। তিনি আমাকে হেসে বল্‌লেন, "ওরে পুত্র, এতদিন তুই ত কোনো কাজেই লাগ্‌লি-নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকী আছে, এই শিশুদের সেবা কর্।"

কাজ সুরু করে' দিলুম। সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। কয়েক জন বাঙালীর ছেলেকে নিয়ে মাষ্টারী সুরু করে' দিলুম। মনে অহঙ্কার হ'ল, এ আমার কাজ, এ আমার সৃষ্টি। মনে হ'ল আমি বাংলা দেশের হিতসাধন কর্‌চি, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এযে প্রভুরই আদেশ—যে-প্রভু কেবল বাংলা দেশের নন, সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সমুদ্র-পার হ'তে এলেন বন্ধু এণ্ড্রুজ, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন্। আপন লোকের বন্ধুত্বের উপর দাবী আছে, সে-বন্ধুত্ব আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাঁরা যখন অনাহূত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখনই আমার অহঙ্কার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপন করে' দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে' জান্‌তে পারি।

আমার মনে গর্ব্ব জন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের জন্য অনেক কর্‌চি—আমার অর্থ, আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ কর্‌চি। আমার সেই গর্ব্ব চূর্ণ হ'য়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই বুঝ্‌লুম এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ যিনি সকল মানুষের ভগবান। এই যে বিদেশী বন্ধুদের অযাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এঁরা আত্মীয়-স্বজনদের হ'তে বহু দূরে পৃথিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজেদের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন; একদিনের জন্যও ভাব্‌লেন না, যাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা পূর্ব্বদেশী, তারা শিশু, তাঁদের ঋণশোধ কর্‌বার মত অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পণ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত উর্দ্ধ বেতন তাঁদের আহ্বান কর্‌চে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেচেন—অকিঞ্চনভাবে, স্বদেশীর সম্মান ও স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে, রাজপুরুষদের সন্দেহ দ্বারা অনুধাবিত হয়ে, গ্রীষ্ম এবং রোগের তাপে তাপিত হ'য়ে তাঁরা কাজে প্রবৃত্ত হ'লেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দুঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে বড় কর্‌লেন না, প্রভুর আদেশকে বড় কর্‌লেন, প্রেমকে বড় করলেন, কাজকে বড় করে' তুল্‌লেন।

এই ত আমার পরে ভগবানের দয়া—তিনি আমার গর্ব্বকে ছোট করে' দিতেই আমার সাধনা বড় করে' দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোট বাংলা দেশের সীমার মধ্যে আর ধরে? বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আস্‌তে লাগ্‌ল। আমি তাদের ডাক দিইনি। ডাক্‌লেও আমার ডাক এতদূরে পৌঁছত না। যিনি সমুদ্র পার থেকে নিজের কণ্ঠে তাঁর সেবকদের ডেকেছেন, তিনিই স্বহস্তে তাঁর সেবাক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশ জন গুজরাটের ছেলে এসে বসেচে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্ব্বপ্রকারে যত আনুকূল্য করেচেন, এমন আনুকূল্য ভারতের আর কোথাও পাইনি। অনেক দিন আমি বাঙালীর ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেচি—কিন্তু বাংলা দেশে আমার সহায় নেই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবী বেশী সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে ত খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি বা রাজাও হয় তবু সে হতভাগ্য, কেন না সে তার নীচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়; যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদস্তির আদায়-ওয়াশিল নয়। বাংলা দেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম যে-আনুকূল্য পেয়েচে, সেইত আশীর্ব্বাদ—সে পবিত্র। সেই আনুকূল্যে এই আশ্রম সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েচে।

আজ তাই আত্মাভিমান বিসর্জ্জন করে' বাংলাদেশাভিমান বর্জ্জন করে' বাইরে আশ্রম-জননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হয়েচি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। সেই শ্রদ্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করুবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্ব-লোকেই অমৃত-লোক। যা-কিছু আমাদের অভিমানের গণ্ডীর, আমাদের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্ত্তী। যা সকল মানুষের, তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক—সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা—তাঁর সেবকেরা পবিত্র হই—আমাদের অহঙ্কার ধৌত হোক, আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্ম্মল হোক—এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেচি—সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য, মন ও চেষ্টাকে তাঁর কল্যাণ-সৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন।

(ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বন্দর-সমূহের বিবরণ

ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে ৪১টি বন্দর অবস্থিত। কতকগুলি বন্দরে বিদেশের সহিত আদান-প্রদান হয় না।

১। করাচী—সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত। ভারতীয় বন্দর-সমূহের মধ্যে করাচী ইউরোপের নিকটবর্ত্তী। গত দেড় শত বৎসর ধরিয়া সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম ভারত, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থানের বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বাররূপে বিরাজ করিতেছে। লোক-সংখ্যা ২লক্ষ ১৭ হাজার। ইহাকে ভারতবর্ষের লিভারপুল বলে। করাচী প্রথম শ্রেণীর বন্দর এবং বন্দর-সমূহের মধ্যে ৫ম স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৪৩ খ্রীঃ ইংরাজেরা এই বন্দর অধিকার করেন; সে-সময়ে এই বন্দরে বৎসরে ১২ লক্ষ টাকার কাজ হইত। ১৮৬৩ খৃঃ ৬৬৬ লক্ষ টাকার কারবার হয়। এই বন্দরে রেলের কারখানা এবং ৩টি ময়দার কল আছে। করাচী শিল্প দ্রব্যের কেন্দ্র-স্থল না হইলেও বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর।

পোর্ট ট্রাষ্টের (Port Trust) দ্বারা বন্দরের কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৮৮৭ খৃঃ পোর্ট ট্রাষ্ট স্থাপিত হয়। ট্রাষ্টের সদস্য-সংখ্যা ১১, করাচী বণিক-সভা এবং করাচী মিউনিসিপালিটি দ্বারা কয়েক জন সদস্য নির্ব্বাচিত হন, অবশিষ্ট গভর্ণমেণ্টের মনোনীত। ১৮৮৭—৮৮সালে এই বন্দরের আয় ৪৬৩৬৯৫ টাকা এবং ব্যয় ৫১১১৫৫ টাকা ছিল। ১৯১৭—১৮ খৃঃ আয় ৬৬৭৬৯৬৫, এবং ব্যয় ৫০৭৭২৪৫ টাকা; ১৯২২-২৩ সালে আয় ৬১৯৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৬২৭২ হাজার টাকা হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে ৮৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বন্দরের কার্য্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে সুয়েজ খাল দিয়া যে-সকল পণ্য-দ্রব্য ইউরোপে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মধ্যে গমের শতকরা ৪৫ ভাগ, এই করাচী বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে ভারতবর্ষ হইতে যত গম রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার শতকরা ৯০ ভাগ করাচী হইতেই রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে ১৯২২ সাল অপেক্ষা

১৯২৪ সালে ২১৫১ হাজার টন পণ্য-দ্রব্য বেশী সুয়েজ খাল দিয়া রপ্তানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে করাচী বন্দর হইতেই ১২৫৬ হাজার টন বেশী রপ্তানী হইয়াছিল। বৎসরে প্রায় তিন হাজার জাহাজ এই বন্দরে যাতায়াত করে। শুকুর (Sukkur) জলাধার নির্ম্মাণ শেষ হইলে করাচীর রপ্তানী আরও বৃদ্ধি হইবে। ১৯১৭ খৃঃ পোর্ট ট্রাষ্টের ২৬১ লক্ষ টাকা দেনা ছিল। বর্ত্তমানে দেনা ৩৷৷০ কোটি টাকা, ট্রাষ্টের সম্পত্তির মূল্য ৬ কোটি টাকা। তিন কোটী টাকা ব্যয়ে বন্দরের উন্নতি-সাধন হইতেছে।

আমদানী দ্রব্য:—সুতা, পশমের বস্ত্র, চিনি, লৌহ, ইস্পাত, কেরোসিন তৈল, কয়লা।

রপ্তানী দ্রব্য:—গম, ছোলা, যব, ভুট্টা, সুতা, বার্লী, তৈলবীজ, পশম, চামড়া, হাড়।

২। কেটীবন্দর—সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত। ইহা একটী ক্ষুদ্র বন্দর। এখান হইতে বিদেশে পণ্য-দ্রব্য আমদানী রপ্তানী হয়।

৩। শিরগঞ্জ—সিন্ধু প্রদেশে অন্যতম ক্ষুদ্র বন্দর। সামান্য পরিমাণ মাল বিদেশে আমদানী-রপ্তানী হয়।

৪। মাণ্ডী—কচ্ছ প্রদেশের প্রধান বন্দর।

৫। দ্বারকা—বরদা রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ক্ষুদ্র বন্দর। ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বন্দরের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা হিন্দুদের তীর্থ-স্থান।

৬। পোর বন্দর—কাটীবার প্রদেশের প্রধান বন্দর। এক সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অধুনা পশ্চিম উপকূলের বন্দরের সহিত আদান-প্রদান হয়।

৭। ডিউ—পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত ডিউদ্বীপে অবস্থিত। এই স্থানে উৎকৃষ্ট জেঠী আছে।

৮। সুরাট—সমুদ্রোপকূল হইতে ১৪ মাইল দূরে নদী-তীরে অবস্থিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে প্রথমে কুঠী স্থাপন করেন। বিগত শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তুলা ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য এই বন্দর হইতে রপ্তানী হইত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এখানে দেড় কোটি টাকার কারবার হয়। ইহার একশত বৎসর পরে এই বন্দরে মোট ৩০ লক্ষ টাকার কারবার হয়। গত পনের বৎসর ইহার আরও অবনতি হয়।

৯। ডমন—পর্ত্তুগীজ উপনিবেশের রাজধানী। এই উপনিবেশের পরিমাণ ১৪৯ বর্গ মাইল। লোক-সংখ্যা ৪৭ হাজার। ভারতে পর্ত্তুগীজদের শক্তি-হ্রাস হইলেও এই বন্দর হইতে গুজরাটের তুলা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পূর্ব্ব আফ্রিকায় রপ্তানী হইত। এই বন্দর হইতে মাকাওএ আফিম রপ্তানী হইত। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। এখন আর বিদেশের সহিত আদান-প্রদান নাই।

১০। বোম্বাই—পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই দ্বীপে অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থার অনুকূল ও বহির্বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা হওয়ায় এবন্দরের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। দ্বিতীয় চার্লস্ এই দ্বীপ বিবাহে উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে এই দ্বীপ বার্ষিক ১৫০৲ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত করেন। ইহার দেড়শত বৎসর পরে ইংরাজেরা দাক্ষিণাত্য জয় করিলে বোম্বাইয়ে এই প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইহা একটি ক্ষুদ্র বন্দর ছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও বোম্বাইয়ের মধ্যে নিয়মিত ভাবে মিশর দিয়া ডাক-প্রেরণের বন্দোবস্ত হয়।

১৮৬৮-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দরে ৯২৷৷০ কোটি টাকার মাল আমদানী-রপ্তানী হয়। ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমদানী-রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ ২৪৬ কোটি টাকা।

এখানের অধিকাংশ কলকারখানা ভারতীয়ের মূলধনে ভারতীয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বোম্বাই ভারতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

বন্দরের কার্য্য পোর্ট ট্রাষ্টের দ্বারা সম্পাদিত হয়। গবর্ণমেণ্টের বন্দরের বার্ষিক আয় দুই কোটি ষাট লক্ষ টাকা। দেনা ২০৭০ লক্ষ টাকা। ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বন্দরের বিস্তৃতি সাধন হইয়াছে।

আমদানী দ্রব্য—কেরোসিন ও জ্বালানী তৈল, কয়লা, তুলা, কাপড়, ইট, টালি, বালি, চুন, শস্য, লোহা, ইস্পাত চিনি, কলকব্জা, রেলের যন্ত্রপাতি, লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য, কাঠ, জ্বালানি কাঠ, সুতা, খড়, বিচালি, পশম প্রভৃতি।

রপ্তানী দ্রব্য—কেরোসিন তেল, তুলা, বীজ, manganese ore, শস্য, চামড়া, সুতা, কাপড়, কয়লা, চিনাবাদাম, চিনি, হরিতকী, লৌহ, হাড়, আফিম প্রভৃতি।

১১। মারমোগোয়া—বোম্বাইএর দক্ষিণে কঙ্কন-উপকূলে বোম্বাইর পরেই এই বন্দর অবস্থিত। পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত পাঞ্জিম এই বন্দরের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গত কয়েক বৎসরে এই বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মহিশূর, হায়দ্রাবাদ ও দাক্ষিণাত্যের উৎপন্ন দ্রব্য প্রধানতঃ তুলা ও ম্যাঙ্গানিজ এই বন্দর হইতেই বিদেশে রপ্তানি হয়। পর্ত্তুগীজ অধিকৃত স্থানের লবণ, কাচ, নারিকেল, সুপারি রপ্তানী হয়। এই বন্দরে বৎসরে ৭২৷৷০ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হয়। এবং ১২ লক্ষ টাকার পণ্য-দ্রব্য রপ্তানী হয়।

১২। মাঙ্গালোর—গোয়ার দক্ষিণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর কানারা জেলায় গোরপুর ও নেত্রাবতী নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। মারমোগোয়া হইতে এই বন্দর ১৩০ মাইল। ইহা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের উত্তর-পশ্চিম সীমা। সহরের লোক-সংখ্যা ৫৪ হাজার। মহিশূরের কফি ও চন্দন-কাঠ এবং পার্শ্বস্থিত স্থান-সমূহ হইতে গোল মরিচ এই বন্দর হইতে ইউরোপে রপ্তানী হয়। টালি, চাল, নোনা মাছ, শুষ্ক ফল, মাছের সার, সিংহল, গোয়া, ও পারস্য উপসাগরে রপ্তানী হয়। পোজা দ্বীপ ও আমিডীভী দ্বীপের অধিবাসীরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ এই বন্দরে লইয়া আসে। ১৯১৩—১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১১৪টি জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে।

১৩। তেলিচেরী—মাঙ্গালোরের ৯৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার ১৪ মাইল উত্তরে ক্যানানোর সহর। লোক-সংখ্যা ৩০ হাজার। মাইশূর ও কুর্গের কফি, গোলমরিচ এই বন্দর হইতে রপ্তানী হয়। (Copra) নারিকেলের শাঁস, চন্দন-কাঠ ও চা এই বন্দর হইতে রপ্তানী হয়। ১৯১৩—১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২৮টি জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে। আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ ৩৮১ হাজার টন। সময়ে সময়ে এই বন্দরে বাঙলা দেশ হইতে চাউল আমদানী হয়।

১৪। মাহে—তেলিচেরীর ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা ফরাসী-অধিকৃত স্থান। পরিমাণ ৫ মাইল; লোক-সংখ্যা ১০ হাজার। মাহি নদীর তীরে একটি পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত।

১৫। কালিকট—কোচীনের ৯০ মাইল উত্তরে এবং তেলীচেরীর ৪২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মালাবার জেলার প্রধান সহর। মান্দ্রাজ হইতে রেলে এই সহর ৪১৩ মাইল। লোক-সংখ্যা ৮২ হাজার। সমুদ্রোপকূল হইতে ৩ মাইল দূরে আসিয়া জাহাজ নঙ্গর করে। নৌকা-যোগে তীরে মাল নীত হয়। এখানে লাইট্-হাউস (আলোকস্তম্ভ) আছে। সমুদ্রে ১২ মাইল দূর হইতে এই আলোক-হাউস দৃষ্ট হয়। ১৯১৩—১৪খ্রীষ্টাব্দে ১৮৭ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে।

নারিকেলের ছোবড়া, নারিকেলদড়ি, কফি, চা, গোলমরিচ, আদা,

বেবারমাছের সার আমদানী হয়। রপ্তানী দ্রব্য—ধাতু-দ্রব্য, কলকজ্জা, খাদ্যদ্রব্য। বাংলা দেশ হইতে এই বন্দরে চাউল রপ্তানী হয়।

১৬। কোচীন—বোম্বাই ও কলম্বোর মধ্যে এই বন্দরই প্রধান। মান্দ্রাজ প্রদেশে মান্দ্রাজ ও তুতীকোরীনের পরই কোচীনের স্থান। কোচীন দেশীয় রাজ্য হইলেও বন্দরটি ইংরাজের অধিকারে আছে। লোক-সংখ্যা ২১ হাজার। ইহার ২১০ মাইল দূরে কোচীনের রাজধানী এর্ণাকুলাম,লোক-সংখ্যা ২৩ হাজার। রেলষ্টেসন এই এর্ণাকুলামে অবস্থিত। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পণ্য-দ্রব্য এই বন্দর হইতে আমদানী-রপ্তানি হয়। বৎসরে ২২৫ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে। রপ্তানি দ্রব্য—নারিকেল-ছোবড়া, ঝুনা নারিকেল, নারিকেল-তৈল, চা, রবার, চিনাবাদাম। বাংলা দেশ হইতে এই বন্দরে চাউল রপ্তানী হয়।

১৭। এলেপী—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রধান বন্দর। কোচীনের ৩৫মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ৩২ হাজার। বৎসরে প্রায় ৩লক্ষ টন মাল আমদানী-রপ্তানি হয়। রপ্তানি দ্রব্য—নারিকেল, নারিকেল-ছোবড়া, দড়ি, চট, ঝুনা নারিকেল, আদা, গোলমরিচ, এলাচি।

১৮। কুইলন—এলেপীর ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্যতম বন্দর। সমুদ্র-উপকূল হইতে ৩ মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করে। আমদানী-দ্রব্য নারিকেলতৈল, ছোবড়া, দড়ি, কাঠ, মাছ।

১৯। তুতিকোরীন—দক্ষিণভারতে মান্দ্রাজের পরেই এই বন্দর। লোকসংখ্যা ৪৪ হাজার। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমা। উপকূল হইতে ৫ মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করে। বন্দরে ২টি জেঠী আছে। এক কোটী টাকা ব্যয়ে এই বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রস্তাব হইয়াছে। সিংহলের সহিত এই বন্দরে আদান-প্রদান হয়। এই বন্দর হইতে চাল, ডাল, পেঁয়াজ, লঙ্কামরিচ, অশ্ব, গবাদি পশু সিংহলে রপ্তানি হয়। বিলাতে ও জাপানে তুলা রপ্তানি হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মনিতেও তুলা রপ্তানি হইত। চা, কফি, সোনামুখির পাতা এই বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫২৬খানা জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর হয়। আমদানি-রপ্তানী পণ্য-দ্রব্যের পরিমাণ ১২ লক্ষ টন। মূল্য ১০কোটী টাকা। ইহার মধ্যে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৬৭৫ লক্ষ টাকা।

২০। ধনুষ্কড়ী—রামেশ্বরম দ্বীপে মানর উপসাগর ও পক প্রণালীর সংযোগ-স্থলে সাউথ ইণ্ডিয়ান্ রেলের সীমায় অবস্থিত। সিংহলের তলাইমানার এখান হইতে ২১ মাইল প্রত্যহ ষ্টীমার যাতায়াত করে। বন্দরে ২টি জেঠী আছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দর খোলা হয়। এই সময় হইতেই এই বন্দরের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। সিংহল-যাত্রী এই বন্দর দিয়াই যাতায়াত করে। ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮২৩ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে। এই বৎসর এই বন্দর হইতে ৩২০ লক্ষ টাকার পণ্য-দ্রব্য রপ্তানি হয়। কফি, শুষ্ক ও নোনা মাছ, চাল, রবার, চা ও কাপড় রপ্তানী হয়।

২১। নেগাপটম—তাঞ্জোর জেলার প্রধান বন্দর। লোক-সংখ্যা ৬০ হাজার। বন্দরে জেঠী আছে। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের একটি শাখার শেষ সীমা। বন্দর পর্য্যন্ত রেল-লাইন গিয়াছে। যে-সকল স্থানে তামাকের আবাদ হয় সেইসকল স্থানের সহিত নদী ও নালা দিয়া এই বন্দরে মাল আমদানি হয়। ইহার উত্তরে ৫ মাইল দূরে নাগোর অবস্থিত। ইহা মুসলমানদের তীর্থ-স্থান। ইয়োরোপের মেলবাহী জাহাজ বোম্বাই হইতে সিঙ্গাপুর যাইবার কালে এইখানে নঙ্গর করে। বৎসরে প্রায় আড়াই শত জাহাজ এখানে নঙ্গর করে। এখান হইতে মার্শেলিস্ ও ত্রিয়েট সহরে চীনাবাদাম রপ্তানী হয়।

২২। কারীকল—নেগাপটমের ১৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ফরাসীদের অধিকৃত উপনিবেশ। আয়তন ৫৩ বর্গ মাইল। লোক-সংখ্যা ৬০ হাজার। কারিকল এই উপনিবেশের রাজধানী। আরাশালায় নদীর উত্তর তীরে মোহনা হইতে ১॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই বন্দরে ১৪২ ফুট উচ্চ আলোকস্তম্ভ আছে।

২৩। কুডালোর—পণ্ডিচেরীর ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ৫৬ হাজার। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের মান্দ্রাজ তুতিকোরীন লাইনের একটি ষ্টেশন। জেঠী পর্য্যন্ত রেল লাইন গিয়াছে। উপকূল হইতে ১ মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করে। এখানে আলোক-স্তম্ভ আছে। এখান হইতে মার্শেলাসে চীনাবাদামের তেল, এবং সারের জন্য সিংহল ও জাভায় খৈল এবং প্রণালী উপনিবেশ-সমূহে রঙ্গিন কাপড় রপ্তানি হয়।

২৪। পণ্ডিচেরী—ফরাসী অধিকৃত ভারতের রাজধানী। এখানে ফরাসী বড়লাট বাস করেন। করমণ্ডল উপকূলে এই বন্দর অবস্থিত। রেল রাস্তায় মান্দ্রাজ হইতে ১০ মাইল। লোক-সংখ্যা ৪৭ হাজার। ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত আছে। জেঠী হইতে দুই তিন শত গজ দূরে জাহাজ নঙ্গর করে। এখানে বণিক-সমিতি আছে। ফরাসী-অধিকৃত এই স্থানের আয়তন ১১৫ বর্গ মাইল, লোক-সংখ্যা ২॥০ লক্ষ। এখানে লৌহ ঢালাইয়ের কারখানা আছে। চারিটি কাপড়ের কল আছে। এই কলে ১২ হাজার লোক কাজ করে। হাড় গুঁড়া করিবারও কল আছে। এই বন্দরটি ফরাসীদের হইলেও এখানের কলগুলা ইংরাজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

২৫। মান্দ্রাজ—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী। লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিমে ১০৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। গভর্ণমেণ্টের ছয় জন এবং বালক সমিতির দ্বারা নির্ব্বাচিত ৮জন সদস্য এবং সভাপতির সমবায়ে ট্রাষ্ট গঠিত। বন্দরের দেনা ১৩৬ লক্ষ টাকা। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এই দেনা পরিশোধ হইবে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বন্দরের উন্নতির জন্য কল্পনা হইতেছে। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে এই বন্দরে ১৪৯৩ লক্ষ টাকার মাল আমদানী এবং ১২৬২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হয়। এই বৎসরে বন্দরের আয় ১৯৬২ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১৪১৮ হাজার টাকা। বৎসরে ৫ শত জাহাজ নঙ্গর করে। আমদানী দ্রব্য—বস্ত্র, সুতা, ধাতুদ্রব্য, খনিজ বিভিন্ন ধাতু (Ore), রেলের দ্রব্য যন্ত্রপাতি, কলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, চিনি মসলা, তৈল, লোহার দ্রব্য, পরিচ্ছদ। রপ্তানী দ্রব্য—চামড়া বীজ, তুলা, শস্য, দাল, কফি, চা, কাপড়, নারিকেল-ছোবড়া, বিমলীপটমপাট এবং মসলা।

২৬। মছলিপটম—কৃষ্ণানদীর মোহনার বদ্বীপে অবস্থিত প্রধান বন্দর। কলিকাতা মান্দ্রাজ রেলের বেজওয়াদা হইতে এক শাখা লাইন এখানে গিয়াছে। বন্দর হইতে ৫ মাইল দূরে বড় জাহাজ নঙ্গর করে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ঝড়ে এই বন্দরের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা এখনও পূরণ হয় নাই। বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৪৪ হাজার। বৎসরে প্রায় ৩৫০ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে। রপ্তানী দ্রব্য দাল, চাউল, তুলার বীজ ও তিল।

(ব্যবসা ও বাণিজ্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)

—

গরিবের সঞ্চয় ও ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

প্রত্যেক সংসারের সামান্য সঞ্চয় একত্র করিলে এক-একটা পল্লীগ্রামে বা ছোট ছোট শহরের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ নেহাৎ কম হয় না। কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থটা কোথায় থাকে? কি ভাবে খাটে? ইহাদ্বারা টাকার মালিকের কোনও উপকার হয় কি? দেশের ধন বাড়ে কি?

যদি পল্লীগ্রামে কেহ সামান্য কিছুও জমাইতে পারে তাহা হইলেও উহা নিরাপদে রাখিয়া সকল প্রকারে লাভজনক উপায়ে খাটাইবার সুব্যবস্থা নাই। পল্লীগ্রামে (১) কেহ কেহ সঞ্চিত টাকা ঘরেই ফেলিয়া রাখেন, (২) কেহ কেহ উহা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়সীদের দুঃসময়ে বিনাসুদে ধার দেন, (৩) কোনো কোনো ব্যক্তি গ্রামেই অপরের নিকট সুদে লাগান, (৪) অনেকে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখেন, অথবা "ক্যাশ সার্টিফিকেট" কিনিয়া থাকেন।

যাঁহারা টাকা ঘরে ফেলিয়া রাখেন তাঁহাদের নিজেদেরও কিছু লাভ হয় না এবং দেশেরও কোনো উপকার হয় না।

পল্লী-বাসীর মধ্যে ডাক-ঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানতকারীর সংখ্যা বেশ বাড়িয়া যাইতেছে। তবে তাঁহাদের ঠিক কত টাকা ইহাতে থাকে তাহা বলা শক্ত। সমগ্র ভারতে এবং বাংলা ও আসাম প্রদেশে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গত তিন বৎসরে মোট আমানতের পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ :—

সমগ্র ভারত

	টাকা	আনা	পাই
১৯২১-২২	৪৩,৬৫,৩২ ১৯০	।০	৮
১৯২২-২৩	৪২,৪১,৩৫,৪২৩	/০	১১
*১৯২৪-২৪	৪৫,৩৪,২০,১৮৩	৸৶০	৮॥০

বাংলা ও আসাম প্রদেশ

	টাকা	আনা	পাই
১৯২১-২২	৯,৩২,৯২,৭৬৪	।০	৬
১৯২২-২৩	১০,২৯,৫৫৩,২০	॥/০	৯
১৯২৪-২৫	১১,৮৯,৩০,৪৩৮	৸০	৩

ইহার মধ্যে কতটা বড় বড় শহরে লোকের এবং কতটা মফস্বলীয়াদের তাহা বলা যায় না। যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারেন। আমার মনে হয়, ইহাতে একের তিন ভাগ গরিবের সঞ্চয়। ইহা ছাড়া, ক্যাশ সার্টিফিকেটের মোট বিক্রয় নিম্নলিখিতরূপ :—

সমগ্র ভারত

১৯২১-২২	৪৭,৯৮,৪৫১।০	টাকা
১৯২২-২৩	৭০,০০০৮৩॥০	,,
১৯২৪-২৫	৬,০৯,৯৪,৪৫৩॥/০	,,

বাংলা ও আসাম প্রদেশ

১৯২১-২২	১১,৪৪,৭৫২॥০	টাকা
১৯২২-২৩	১৯,৮৯,১৫৩৸০	,,
১৯২৪-২৫	১,২৩,১৭,৬১৩৸০	,,

ইহার খরিদ্দারের মধ্যে পল্লীবাসী কয়জন তাহা বলা শক্ত। আমার অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় আন্দাজ একের পঞ্চাশ ভাগ টাকা তাঁহাদের আমানত।

পল্লীগ্রামে গরিবের সঞ্চিত অর্থের এই যে কতকটা খোঁজ পাওয়া গেল ইহার মোট পরিমাণ একেবারে হেলা করিবার নহে। পল্লীগ্রামে ছোট ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া যদি এই টাকাটা এক করিতে পারা যায়, এবং তাহা সতর্ক ভাবে ব্যাঙ্কের নীতি অনুসারে খাটান যায়, তবে দেশের ধনাগমেরও সুবিধা হয় এবং গরিব আমানতকারীদিগেরও লাভ হয়। এইসকল ব্যাঙ্ক, আমানত লওয়া এবং ধার দেওয়া ছাড়াও বড় বড় শহর হইতে পল্লীগ্রামে আমদানি মালের ও পল্লীগ্রাম হইতে রপ্তানি মালের দাম শোধ দিবার ভার লইতে পারে। বর্ত্তমানে এই কাজের কতকটা হয় ডাকঘরের ইন্সিওর (বীমা) চিঠির সাহায্যে। হুণ্ডীও চলিতে পারে। এইসব ব্যাঙ্কের দৌলতে পল্লীগ্রামের লোকেরা চেকের সহিত ক্রমশঃ সুপরিচিত এবং তাহার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে পারেন। পল্লীতে যথেষ্ট পুঁজি নাই বলিয়া যাঁহারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা করিতে পারেন না, তাঁহারাও ইহাতে কতকটা সাহায্য করিতে পারেন। মোট কথা, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার যতগুলা সুবিধা তাহা সবই ভোগ করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া "ব্যাঙ্ক"-নামধারা মামুলী লোন্ আফিস্ খুলিলে চলিবে না।

আপাততঃ আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার অসুবিধা আছে অনেক। যাঁহারা ব্যাঙ্কের রহস্য বুঝেন তাঁহারা জানেন যে, পরস্পর বিশ্বাসের উপরই উহার ভিত্তি। ব্যাঙ্কের কাজ বিশ্লেষণ করিলে উহার পরতে পরতে পাওয়া যাইবে কেবল বিশ্বাস। আমরা যতই উঁচু গলায় নিজেদের উন্নত, সভ্য, ধার্ম্মিক, ও স্বরাজ-লাভের উপযুক্ত বলিয়া গলাবাজী করি না কেন, বর্ত্তমান কালে সকল প্রকার আর্থিক উন্নতির ভিত্তি—পরস্পর বিশ্বাস এবং সামাজিক "পসার" (ক্রেডিট)। আমাদের যথেষ্ট আছে বলিয়া বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি কি? এমন অবস্থায় পাড়াগাঁয়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কাজটা খুব সহজ নয়। পল্লীগ্রামে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এই কথা ভাল করিয়াই স্বীকার করিবেন।

এইসব অসুবিধা এড়াইয়া আর-এক উপায়ে পল্লীবাসীদিগকে ব্যাঙ্কের আওতায় আনিয়া ফেলা যায়। তাহা ডাকঘরের সাহায্যে। ডাকঘরে সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের প্রথা সৃষ্টি করিয়া দিয়া সুদূর পল্লীর গরিবের মনেও ব্যাঙ্কের বীজ বপন করা হইয়াছে। তাহার পর "ক্যাশ-সার্টিফিকেটের" চলন হওয়াতে পল্লীবাসীরা মেয়াদি আমানতের আওতারও আসিয়াছেন। এখন আমাদের দেশের ডাকঘরের সেভিংস্-ব্যাঙ্কের আইনটা বদ্‌লাইয়া লইলেই পাড়া-গাঁয়ে খুব কম খরচে ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হইতে পারে। লোকেরও আপন ভাইয়ের উপর যে বিশ্বাস তাহার চেয়ে বেশী বিশ্বাস আছে ডাকঘরের উপর। সুতরাং জমীন আছে ঠিক। এখন প্রশ্ন এই,—ডাকঘরের সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের আইনটা কি ভাবে পরিবর্ত্তন করিলে পল্লীবাসীদিগকে ব্যাঙ্কের আওতায় আনা যায়?

আমার মনে হয় মোটামুটি নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে—

(১) ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সুদ বর্ত্তমান হারের চেয়ে কিছু বেশী করা উচিত।

(২) সপ্তাহে একদিনের বদলে অন্ততঃ দুই দিন টাকা উঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

(৩) ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের আমানতকারীদিগকে আমানতের উপর চেক্ কাটিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। আপাততঃ পুরা টাকার কমে চেক্ চলিবে না—এইরূপ আইন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৭) ডাকঘরের উপরে উক্তপ্রকার চেক্ কাটিয়া আমানতকারীকে তাহার নিজ হিসাব হইতে অপরের হিসাবে টাকা চালান করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

(৫) আপনার নামে যদি ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, তাহা হইলে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে যাহাদের হিসাব আছে

* ভারতীয় ডাকবিভাগের বার্ষিক বিবরণী ১৯২১-২২, ১৯২২-২৩; ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের। ১৯২৩-২৪ সনের বিবরণী হাতের সামনে নাই বলিয়া সংখ্যা দেখান গেল না।

তাহাদের যে-কেহকে যে-কোনো ডাকঘরে আপনার নামে আপনার হিসাবে টাকা জমা দিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

(৬) "পাস"-বই আমানতকারীর মাতৃভাষায় লিখিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমানেও এইরূপ আইন আছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা পালিত হয় না।

এইগুলি সবই যে আমার মন-গড়া অসম্ভব কথা বলিলাম তাহা নহে। অষ্ট্রিয়া, সুইট্‌সারল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের ডাক-বিভাগে এই প্রণালীর বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং এখনো চলিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, ডাক-ঘরের সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক আইনের এই পরিবর্ত্তনদ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতির একটা কত দৃঢ় ভিত্তি গাড়া যাইতে পারে।

(আর্থিক উন্নতি, বৈশাখ ১৩৩৩)　　শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায়

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

নয়

শীতকালের দুপুরের পরমায়ু নিতান্ত অল্প হ'লেও তার সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনটি সবারই বেশ উপভোগের জিনিষ। বিশেষ ক'রে পল্লীমহিলারা মুক্তির এই সময়টুকুই একান্ত নিজস্ব ব'লে জেনে তার সদ্ব্যবহার করতে খুব ব্যস্ত। এবাড়ী ওবাড়ী বেড়িয়ে স্ফুর্ত্তিও হয়, কর্ম্মক্লান্ত দেহমন বিশ্রামও পায়; সেজন্য তাঁরা এই সময়টি পাড়া বেড়াবার কাজেই লাগাতে ভালবাসেন। কোলে-কাঁখে ছেলে মেয়ে থাক্‌লে তাদেরও সঙ্গে নেওয়ার কোনো অসুবিধা নেই, একাজটা ছেলে কোলে ক'রেও বেশ চলে। রমার প্রকাণ্ড বাড়ীখানি পাড়ার ঠিক মাঝখানে। সে নিজে কোথাও বড় বার হ'তে পার্‌ত না, কিন্তু তার বাড়ীতে সহজেই মেয়েরা সকলে এসে একত্র হ'তে পার্‌তেন, অন্ততঃ দু পাঁচজন ত নিত্য জুট্‌তেনই। দলটি মনের মতন হ'লেই খেলা-ধূলোও কিছু সুরু হ'ত। রমা কিন্তু এসবে বেশী যোগ দিতে পার্‌ত না, তবে পান-টানগুলো সে নিয়ম মতো জুগিয়ে যেত। তার তিন চারটি ছেলে মেয়ে নিয়ে আর সংসারের কাজকর্ম্ম দেখা শোনাতেই সে এত ব্যস্ত থাক্‌ত যে, দালানে উপবিষ্টা পল্লীনারীদের অবাধ আলোচনা কান পেতে শুনে যাওয়া ছাড়া বড়-একটা কিছুর জবাব দেওয়া তার হ'ত না। সেদিন হেমাঙ্গিনী, রাধারাণী, নবীনের দিদি প্রভৃতি কয়েকজনা এসে দেখ্‌লেন, ঢেঁকিশালে ধান কোটা হচ্ছে, আর রমা দাঁড়িয়ে থেকে কোটা-ঝাড়া চালগুলি মাপ ক'রে নিচ্ছে। প্রকাণ্ড উঠানের এক কোণে ব'সে রমার মেয়ে উষা, শিখর, নন্দা আর প্রিয়র মেয়ে মিনা পুতুল-খেলা উপলক্ষে খেলাধূলার হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে রান্নাবান্না কর্‌ছে। হেমাঙ্গিনী পাড়ারই ঝিউড়ী, স্বামীর সঙ্গে সে বাপের বাড়ীতেই চিরটা কাল আধিপত্য ক'রে আস্‌ছে; সুতরাং বেশ মুখরা। সে এসেই যেখানে মেয়েরা খেলাধূলো কর্‌ছিল সেখানে গিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ রে নন্দা, তুই কি বেহায়া মেয়ে রে, বর তোকে দেখ্‌তে এসেছিল তা তুই না কি তোর দিদিকে বলেছিস্ ও বরকে বিয়ে কর্‌বি না?"

নন্দা বেশ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। কাজেই আর জবাব না দিয়ে মাথাটি হেঁট ক'রে খেলাধূলোর হাঁড়িকুড়ির দিকেই মন দিয়ে রইল। নবীনের দিদি কৌতূহলী হ'য়ে বল্‌লেন, "তাই বলেছে নাকি, কার কাছে শুন্‌লি লো?"

নতুন খবর শুনতে সবারই কৌতূহল হয়। খবরটার যদি মামুলী ভাব ছাড়া আর-কিছুর ছাপ থাকে তাহ'লে ত কথাই নেই। হেমা বল্‌লে—"বল্‌ছে সবাই তাই শুন্‌ছি। ঘাটে নাইতে গিয়ে নন্দার দিদির কাছেই শুন্‌লাম, বেশ জামাই হবে। বছর চল্লিশ বয়েস, তা পুরুষ মানুষের সে কি আর একটা বয়েস গা? এই যে আমাদের এনারি বিয়াল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে তা তিনি কি বুড়িয়ে গেছেন? মাথায় একটু টাক পড়েছে বটে, কিন্তু বরটি বেশ ফর্সা। দোজবরে বর কি না তাই নিজেই মেয়ে

দেখতে এসেছিল। তা এই একরত্তি মেয়ে গলা টিপলে দুধ বেরোয়, তিনি বলেন কিনা ওকে বিয়ে করবেন না!"

সবাই খুব জোর গলায় নন্দার অন্যায়টার প্রতিবাদ করতে সুরু করলেন। রমা কিন্তু নন্দার অপরাধীর মতন ম্লান মুখ দেখে ব'লে উঠল—"আহা—ছেলেমানুষ, বুদ্ধি নেই তাই বলেছে, তাতে আর কি হয়েছে? হাজার হোক্ বর ওর চাইতে পঁয়ত্রিশ বছরের বড় তো! তাতেই ওর পছন্দ হয়নি।" রমার মনটি ছিল বড় সরল আর কাউকে দুঃখ পেতে দেখলে সে সহজেই মনে ব্যথা পেত।

হেমাঙ্গিনী গালে আঙুল দিয়ে বললে—"তুই যে বউ অবাক্ করলি লো—মেয়ে-মানুষ আবার বর পছন্দ করবে কি? কোন্ দিন শুনব বলছে—আমি স্বয়ম্বরা হ'ব। তোর মেয়েদের ভাই তুই তাই করিস্—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খেতে সাধ কেন?"

নবীনের দিদি বললে—"ওর সামনে অমন ক'রে বলা তোর ভাল হ'ল না, উষির মা—ও একে তো ধিঙ্গীমেয়ে, আস্কারা পেয়ে আরও মাথায় চড়বে। বাপের তিন-চারটে মেয়ে, পয়সা-কড়িরও তেমন জোর নেই; দোজবরে তেজবরে যার হোক্ গলায় গেঁথে পার করতে না পারলে জাত জন্ম দুই-ই খোয়াবে যে। মেয়ে-মানুষের বাড়, কলা-গাছের বাড়, দুদিনেই মাগী হ'য়ে উঠবে তখন ঠেকাবে কে?"

রমা বেচারী আর জবাব না দিয়ে চাল মাপার দিকে বেশী ক'রে মন দিলে।

সেদিন এদের আসবার একটু আগে প্রিয়ও এ বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। সে রমার ঘরের মধ্যে ব'সে রমার ছোট খোকার জন্যে এক জোড়া পশমের মোজা বুনছিল, ইদানিং মেয়েরা তাকে পুলিশ-গিন্নি ব'লেই ডাকত। রমাকে নিরুত্তর দেখে মেয়েরা ঘরের মধ্যে এসে প্রিয়কে পেয়ে বেশ খুসী হ'য়ে উঠল। হেমাঙ্গিনী বললে, "কি গো পুলিশ-গিন্নি কি হচ্ছে?"

প্রিয় বসেছিল; এদের দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সতরঞ্চিখানা একটু ভালো ক'রে বিছিয়ে সবাইকে বসতে বললে। নবীনের দিদি বললে, "কি ভাই এখানে বেড়াতে আসবার ত বেশ সময় হয়েছে দেখছি আর আমাদের বাড়ী যাবার কথা হ'লে তোমার সময়ই হয় না।" প্রিয় বললে, "আজ সময় ক'রে একটু এসেছি নইলে উষীর মা কিছুতেই ছাড়েন। উনি দু' তিন দিন গিয়েছিলেন।"

হেমাঙ্গিনী চোখ ঘুরিয়ে বললে, "আর আমি যে পাঁচ সাতবার গিয়েছি ভাই; আমাদের বেলায় বুঝি তোমার ধারাপাত ভুল হ'য়ে যায়?"

রাধারাণী বললে, "এ সোজা কথাটা আর বুঝিস্ না লা? আমাদের কোটা-বালাখানাও নেই, গায়ে পাঁচখানা সোনা-দানাও নেই।"

প্রিয় এসব টীকা-টিপ্পনির একটিও জবাব না দিয়ে মুখ নীচু ক'রে রইল। বোবার ত শত্রু নেই, এক্ষেত্রে চুপ ক'রে থাকাই ভাল। আসল কথা, প্রথম প্রথম সে দু-চার বাড়ী যাওয়া-আসা ক'রে দেখেছে যে এইসব মেয়ে-মহলে নিছক্ যে-ধরণের আলাপ-চর্চ্চা হয় তার ধাতে সে-সব আদবেই সইবে না। তার উপর কেদার এ-সব ভালও বাসে না, কাজেই সে সহজে আর কারু বাড়ী যেতে রাজী নয়। কিন্তু সে কথা তো আর তাদের বলা চলে না! অবশ্য তার বাড়ীতে কেউ পা দিলে তাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি সে কিছুই করে না। কিন্তু তাদের রসিকতার সমান সরস উত্তর দেবার মতন বাকপটুতা তার মোটেই ছিল না ব'লে তার নীরবতাটা এরা "দেমাক্" নামেই সর্ব্বত্র চালিয়েছে।

কথার ঠোকাঠুকি জমল না দেখে হতাশ হ'য়ে অতঃপর হেমাঙ্গিনী তাস খেলবার প্রস্তাব নিয়ে রমাকে ডাক দিলেন। রমা এসে বললে, "আজ ভাই বড় সময় কম—মুনিষদের পাওনা ধান আজই সব মেপে দিতে হবে। ওদিকে চাল-কোটাও শেষ হয়নি।" প্রিয় বললে, "আমি ভাই খেলা ভাল জানি না। তা ছাড়া এখুনি আমাকে বাসায় ফিরতে হবে। বাবু মফঃস্বলে গিয়েছেন, দুপুরেই আসবার কথা।" অগত্যা মেয়েরা মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে খেলুড়ীর সন্ধানে অন্য বাড়ী প্রস্থান করলেন।

সকলে চ'লে যেতেই নন্দা প্রিয়র ছোট খোকাটিকে কোলে ক'রে এসে বললে, "পুলিশমাসি, তোমার খোকা ঘুম থেকে উঠে তোমায় না দেখে কাঁদছিল, জন্না তাই দিয়ে গেল।"

প্রিয় হাত বাড়িয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"জয়া কই রে নন্দা?"

নন্দা বল্‌লে, "জয়া বল্‌লে সে ঘাটে বাসন ভিজিয়ে এসেছে মাজ্‌তে হবে ব'লে তাড়াতাড়ি ক'রে চ'লে গেল।"

নন্দাকে একলা দেখে প্রিয় বল্‌লে, "হ্যারে নন্দা, তোর বুঝি শীগ্‌গির বিয়ে—আমাদের লুচি-সন্দেশ খাওয়াবি ত?"

খুব চঞ্চল আর মুখরা মেয়েও বিয়ের কথায় একটু লাল না হ'য়ে পারে না, নন্দাও সলজ্জভাবে চোখ নীচু ক'রে আঁচলের খুঁট পাকাতে সুরু কর্‌লে। প্রিয় আদর ক'রে নন্দার কপালের চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "বর বুঝি তোকে নিজেই দেখ্‌তে এসেছিল? তোর কি তাকে পছন্দ হয়নি?"

অল্প দিনের পরিচয় হ'লেও নন্দা প্রিয়র বেশ অনুগত হ'য়ে পড়েছিল। তার এতটুকু বয়সের সামান্য যা-কিছু দৈনিক অভিজ্ঞতার পুঁজি, কোনো জিনিষ ভালমন্দ-লাগা বিষয়ে তার ক্ষুদ্র যা-সব মতামত আর এবাড়ী সেবাড়ী হ'তে সংগৃহীত ছোট খাটো যত সংবাদ সমস্তই সে তার পুলিশমাসিকে দুবেলা অযাচিতভাবে শুনিয়ে এসে তবে তৃপ্তি বোধ কর্‌ত। শ্রোতার আগ্রহের দিকে তার তত মনোযোগ ছিল না, নিজের বল্‌বার উৎসাহ ছিল ঢের বেশী। এখন প্রিয়র প্রশ্ন শুনে সে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—"দেখ মাসি, আমি নিজে হ'তে ত কিছু বলিনি। দিদি আমায় বার বার জিজ্ঞেস্ কর্‌লে পছন্দ হয়েছে কি না বল্ না—তাতেই আমি বলেছি যে পছন্দ হয়নি। আমার দোষ কি? আমায় জিজ্ঞেস কর্‌তে এসেছিল কেন?"

প্রিয় বুঝ্‌তে পার্‌লে বালিকা মনে-এক-মুখে-আর বিদ্যাটা এখনো আয়ত্ত কর্‌তে পারেনি, কাজেই সোজাসুজি মনের কথা খুলে বল্‌তে গিয়ে সবার কাছে বেচারী হাস্যাস্পদ হয়েছে। নন্দা আবার ব'লে উঠ্‌ল—"ওই যে হেমা পিসি আর নবীনের দিদি, ওরা সব কথাতেই ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়। ওদের খুরে কোটী কোটী নমস্কার বাবা,"—ব'লেই সে হাত জোড় ক'রে অনুপস্থিতাদের উদ্দেশে সত্যিই বার বার নমস্কার কর্‌লে। প্রিয় সে নমস্কারের ভঙ্গী দেখে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

হঠাৎ রমাদের প্রকাণ্ড আঙিনায়—বোল্ হরি, হরি বোল্—বল্‌তে বল্‌তে এক দল চাষাভূষোর ছেলে ঢুকে পড়্‌তেই নন্দা উৎসাহের সঙ্গে "ঘেঁটু গাইতে এসেছে, শুন্‌বে চল, পুলিশ-মাসি"—ব'লেই ছুটে আগন্তুকদের উদ্দেশে প্রস্থান কর্‌লে। প্রিয়ও খোকাকে কোলে নিয়ে ঘেঁটুর গান শুন্‌তে বেরিয়ে এল।

ঘণ্টাকর্ণের পূজা-উপলক্ষে ঘেঁটুর গান বাঙ্‌লা দেশের সব পল্লীতেই প্রচলিত, কলকাতা সহরেরও জায়গায়-জায়গায় এপর্ব্বটি বাদ পড়ে না। তবে নানা দেশে গানের ছড়াটির নানা রূপ দেখা যায়।

খুব সম্ভব জল-অনাচরণীয় জাতের ছেলেরাই পল্লীর এপর্ব্বটি সমাধা করে। বীরভূমের বাউরী, ল্যাট, কোলাই প্রভৃতি জল-অনাচরণীয় জাতের ছেলেরাই মহানন্দে পাড়ার ঘরে ঘরে তিন দিন ধ'রে ঘেঁটুর গান গেয়ে বেড়ায়। চতুর্থ দিনে গৃহস্থের ঘরে গিয়ে সিধা পয়সা প্রভৃতি যা পায় সেইগুলি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে পরের দিনে দল বেঁধে কোনো পুকুর বা দীঘির পাড়ে গিয়ে পোয়েলার চড়ুইভাতি ক'রে খায়।

ঘেঁটু অর্থাৎ ঘণ্টাকর্ণ বেচারী একদিন আমাদের মতো মানুষই ছিল; সে ছিল এক মহা শৈব, অর্থাৎ মহাদেবের একজন গোঁড়া ভক্ত। এই ভক্তির আতিশয্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে সে ভারী হীন-চক্ষেই দেখ্‌ত। হরিনাম, বিষ্ণু-নাম সে সহ্য কর্‌তে পার্‌ত না, সে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ক'রে নিত্য স্নানে শুচি হ'য়ে ধুতুরাফুল, আকন্দফুল, বেলপাতা, গঙ্গাজলে পূজা কর্‌ত। সন্ধ্যায় আরতির ঘটাও ছিল খুব। কিন্তু আরাধ্য দেবতার প্রাণ-ঢালা পূজার মধ্যেও তার তৃপ্তি ছিল না, কারণ তার পূজার সময় প্রায়ই পাড়ার কীর্ত্তনীয়ারা মন্দিরের সাম্‌নে দিয়ে কৃষ্ণনাম কর্‌তে-কর্‌তে যেত। এইসব ব্যাঘাতে মনটা তার ভারী খুঁৎ খুঁৎ কর্‌ত। একদিন কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘট্‌ল। সেই প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ মূর্ত্তিতেই স্বয়ং মহাদেব হরিহর মূর্ত্তিতে প্রকাশ হ'য়ে তাকে বল্‌লেন, "বৎস, হরি আর হরে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই, দু'য়ে আমারই এক অভেদ মূর্ত্তি;

সুতরাং দ্বেষ-হিংসা ভুলে তুমি শান্ত চিত্তে পূজা ক'রে যাও, তোমার পূজায় আমি সদা তুষ্ট।"

দেব-প্রকাশ মিলিয়ে গেল; পূজারীর অজ্ঞান কিন্তু ঘুচ্‌ল না, বরং বেড়েই গেল। সে লিঙ্গমূর্ত্তিতে যে-দিক্‌টায় হরির প্রকাশ হ'তে দেখেছিল, সেদিকটা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্যে এক হাতে চোখে আড়াল দিয়ে যে দিক্‌টায় আধজটাজুটমান, ফণীবিভূষিত, ডম্বরু-হস্ত বাঘছালবিভূষিত তুষার-শুভ্র মহাদেব-মূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েছিল সেই দিক্‌টায় ঘন ঘন ঘণ্টা নেড়ে পূজা কর্‌ত, পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে আরতি দিত। কিন্তু হায়, বেচারী ভক্তের সব পূজাই বিফল হ'ত। মনে না ছিল শান্তি, না ছিল দেবপূজার আনন্দের একটা তৃপ্তি-বোধ। সবাই তার এই অদ্ভুত-রকম পূজা দেখে তাকে চটাবার জন্যে, তাকে দেখ্‌লেই "হরি হরি "শ্রীবিষ্ণু" নাম উচ্চারণ কর্‌ত। পূজার সময় বর্জ্জনীয় দেবতার নাম শুনে পাছে পূজা অশুদ্ধ হয়, মনের শুচিতা নষ্ট হয়, সেইজন্যে পূজারী বুদ্ধি ক'রে দুই কানে দুটি ছোট্ট ঘণ্টা বেঁধে নিলে। পূজা-অর্চ্চনার সময় পাড়ার দুষ্টু লোকেরা যখন পিছনে দাঁড়িয়ে 'হরিনাম' ক'রে তার পূজার ব্যাঘাত ঘটাতে আস্‌ত তখন সে বার বার নিজের মাথা নাড়া দিত, তাতে ক'রে ছোট ঘণ্টা দুটি টুঙ টুঙ ঠুন্ ঠুন্ ক'রে বেজে উঠে পূজারীর কানে 'হরিনামের সাড়া' ঢুকতে দিত না। তখন মহাদেব ভক্তের অজ্ঞানতা দেখে রাগ ক'রে বল্‌লে, "তোর ভক্তি থাক্‌লেও এই অন্ধতার জন্যে তুই মূর্ত্তি পেলি না। পৃথিবীতে তুই ঘণ্টাকর্ণ ব'লে চিরটা কাল পূজা পাবি। কিন্তু পূজা শেষ হ'লেই তোর প্রতিমূর্ত্তি মুগুরের বাড়িতে চূর্ণ হ'য়ে যাবে।"

ইষ্ট-দেবতার শাপের বরে সেই থেকে পূজারী মানুষ পল্লীর ঘণ্টাকর্ণ দেবতায় পরিণত হয়েছে এই। হচ্ছে ঘণ্টা-কর্ণের ইতিহাস। ইনি আবার খোসপাঁচড়ার দেবতাও বটেন সুতরাং পল্লীবাসী এর অনুগ্রহ-দৃষ্টিকে খুব ভয়ের চোখেই দেখে থাকে, আর অনুগ্রহ না কর্‌বার অনুগ্রহের জন্যেই বৎসরান্তে একবার ক'রে এর পূজা ক'রেই বিসর্জ্জন দেয়।

দশ

ঘেঁটু গাইয়ের দলের মধ্যে একটি বড় ছেলে ছড়ার এক-একটি পদ সুর ক'রে গেয়ে যাচ্ছিল আর বাকী সাথীর দল প্রত্যেক বারই সমস্বরে 'বল হরি হরিবোল'—ব'লে তাল দিচ্ছিল। "এলাম রে ভাই গেরস্তর বাড়ী, ঘেঁটু যায় আজ দেশ ছাড়ি"—ইত্যাদি ব'লে লম্বা ঘেঁটুর গান শেষ ক'রে তারপর তারা সিধে-সাধ্‌বার ছড়া আরম্ভ কর্‌লে।

"ধান্ থাক্‌তে না দ্যায় ধান,
খোস্ হয় তার থান্ থান্।
বড়ি থাক্‌তে না দ্যায় বড়ি,
খোস হয় তার কড়ি কড়ি।
বেগুন থাক্‌তে না দ্যায় বেগুণ,
ছামো (সাম্‌নে) চালে তার ধর্‌বে আগুন।"—ইত্যাদি

অভিশাপ-পালা শেষ ক'রে আশীর্ব্বাদী পালা সুরু কর্‌লে।

"যে দ্যায় পাথর পাথর,
তার হবে মস্ত গতর।
যে দেবে আড়ি আড়ি,
ধন হবে তার কাঁড়ি কাঁড়ি।
যে দেবে থালা থালা,
তার হবে সোনার বালা।
যে দেবে বাটা বাটা,
তার হবে সাত ব্যাটা।"

ইত্যাদি আবৃত্তির পর—'মোষ পড়্‌ল দড়াম দিয়ে' উচ্চারণ কর্‌বা মাত্র সঙ্গে-সঙ্গে একটি ছেলে দুই' হাত জোড় ক'রে উঁচু দিকে তুলে দড়াম ক'রে মাটির ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে মোষপড়ার অভিনয় সুরু কর্‌লে—সঙ্গী সাথীরা সব চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ওগো গিন্নিমা, শীগ্‌গীর ক'রে সিধে-পত্তর দিয়ে মোষ তুলিয়ে ছান গো, অনেক ঘরকে এখন আমাদের সিধে সাধ্‌তে যেতে হবে।"

রমা হাসিমুখে ছেলেদের ডালাভরা চাল, তরীতরকারী তেল নুন প্রভৃতি সিধে দিয়ে তাদের মিষ্টিমুখে বিদেয় ক'রে প্রিয়র হাত ধ'রে ঘরে এসে বস্‌ল।

প্রিয় তখন অভিমান-ভরা সুরে বল্‌লে, "কখন্ থেকে এসে ব'সে আছি, তোমার কিন্তু আর নাগাল পাচ্ছি না।

তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাক ভাই, আমায় বিদেয় দাও।"

রমা চোখ ঘুরিয়ে প্রিয়র চিবুক ধ'রে বল্‌লে, "কি আমার আদরের কথা গো! বিদেয় দেবার জন্তেইতো এতো সাধ্যি-সাধনা ক'রে ডেকে পাঠিয়েছি।"

প্রিয় বললে, "ওদিকে কর্ত্তার যে বাড়ী আস্‌বার সময় হ'য়ে এল। তিনি এসে গৃহ শূন্য দেখে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌বেন যে।"

রমা বল্‌লে, "পুরুষ-মানুষের মধ্যে মধ্যে অমন একটু বাল্‌সানো ভাল বোন্—নইলে পরে রোগে ধব্‌লে বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।"

প্রিয় হেসে বল্‌লে, "সত্যি নাকি? তোমার ভাই অনেক রকম জানা-শোনা আছে দেখ্‌ছি।"

রমা বল্‌লে, "আজ সত্যিই এ বেলা ছাড়্‌ছি না। শিখরের আজ জন্মতিথি; তোমায় ওবেলা খেয়ে তবে যেতে দেব।"

প্রিয় বল্‌লে, "বাঃ সে কথা ত আমি কিছুই জানি না। আমি দিদি হই, আমি তাকে খাওয়াব, না উল্টে আমি নিজেই খেতে বস্‌ব।"

রমা বললে, "সে না হয় অন্য দিন তুমি তাকে খাইও, আজ তো নিজেই খেয়ে যাও।

দুই বন্ধুতে তারপর ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথা সুরু হ'ল। পাঁচটা এদিক সেদিকের কথা হ'তে হ'তে প্রিয় বললে, "উনি এখানে আর থাকৃতে চাইছেন না। এ-দেশে ওর মোটেই ভাল লাগে না; তাই বল্‌ছিলেন বদ্‌লির দরখাস্ত দেবেন। এ-দেশে এত খুন-খারাবী আর সেইসব খুনের ভেতর এত কেলেঙ্কারীর ব্যাপার যে দেখে-শুনে ওর মন ভারী খারাপ হ'য়ে গ্যাছে।"

রমা বল্‌লে, "সে সত্যি কথা—তার ওপর তোমার কর্ত্তাটি এম্‌নি আঁচল-ধরা যে, অবসর সময়ে দুদণ্ড সবার সঙ্গে মিশে যে হাসি-খুসী করবেন তার জো-টি নেই। এতে আর মন ভাল হয় কি ক'রে! আমাদের ইনি সেদিন বল্‌ছিলেন যে, তোমার বন্ধুটি নেহাৎ কর্ত্তাটিকে আঁচল ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে চান্ দেখি—সত্যি বোন্ পুরুষ-মানুষের নেহাৎ কোণ-ঘেঁসা স্বভাব ভাল না।"

কেদার কিন্তু সত্যিই অমিশুক লোক নয়; বরং মেলা-মেশা গল্পগুজব গান-বাজনা সবেই তার বেশ অনুরাগ আছে। কিন্তু কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত মন নিয়ে সে প্রথম-প্রথম মতিবাবুদের আড্ডায় এসেই যে-সব ধরণের গান-গল্প আর অশ্লীল আলোচনার পরিচয় পেয়েছিল, তাতে প্রথম থেকেই তার মন বিগ্‌ড়ে যাওয়াতে সে আর এদিকে ঘেঁস্‌তে চাইত না। স্বামীর আদর-সোহাগের যথেষ্ট অধিকারিণী হ'লেও কোনো বুদ্ধিমতী স্ত্রীই স্বামীর 'স্ত্রৈণ' আখ্যাটিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তে পারে না, সুতরাং প্রিয় মুখ কালো ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "উনি আঁচল ধ'রে ঘরের কোণে ব'সে থাক্‌বার মানুষ মোটেই নন্; কিন্তু আড্ডায় যে-সব কথাবার্ত্তা হয় তা শুনে ওর মোটেই ভাল লাগে না। কে নাকি এখানে পরাণ মণ্ডলের ভাজ আছে, তার কথা নিয়ে বাবুরা নাকি সেদিন বড় হাসাহাসি করেছেন; শুনে তিনি যেমন বলেছেন যে, কোনো স্ত্রীলোকের কথা নিয়ে এমন আলোচনা করা উচিত না, অমনি একজন বাবু বল্‌লেন,—সে মাগীর সাতকুলে কেউ নেই; তার আলোচনা কর্‌লে কারু বউঝির আলোচনা ব'লে একটা দোষের কথা ত হবে না। উনি কিন্তু এসব মোটেই পছন্দ করেন না। আচ্ছা ভাই, এখানকার পুরুষরা যে এইসব আলোচনা করে, মেয়েরা একটু বারণ করে না কেন?"

দু'টি চোখ বিস্ময়ে ডাগর ক'রে রমা ব'লে উঠ্‌ল—"মেয়েরা মানা করবে বাবুদের? বাবুরা তা শুনবেনই বা কেন? মেয়েরা আপনার ঘরসংসারের কাজ স্বামী-পুত্রের সেবা এইসব নিয়ে আছে; বাইরে পুরুষরা কি করছে, কার চর্চ্চা কর্‌ছে ও-সবে কান মেয়েরা দিতেও যায় না, যাওয়া উচিতও না।"

প্রিয় বল্‌লে,—"অনেক পুরুষদের যে নানারকম স্বভাব-দোষ আছে তার জন্যেও কি স্ত্রীদের কিছু বলা উচিৎ না, তুমি মনে কর? আমি তো ভাই মনে করি, খুব উচিত।"

রমা একটু হেসে বল্‌লে—"এটি ঠিক হিঁদুর মেয়ের মতন কথা তুমি বল্‌লে না প্রিয়। তুমিও হিন্দু-ঘরের মেয়ে, এশ্লোকটা বোধ হয় ছোট বেলা থেকেই শুনে এসেছ যে, "পুরুষ পরশমণি"; ওদের স্বভাব-দোষ যেটা,

সেটা চাঁদে কলঙ্ক মাত্র। অবশ্য যাঁরা কোনোরকম কু-অভ্যেসের বালাই গায়ে মাখেন না তাঁরা ত খুবই মহৎ। কিন্তু যাঁদের এসব দোষ আছে তাঁদেরও সেটা কিছু এমন গুরুতর দোষ নয়, যার জন্যে তাঁদের চরণের দাসী স্ত্রী পর্য্যন্ত শাসন ক'রে দু'কথা বল্‌বে।"

কথাগুলো প্রিয়র কানে একটুও ভাল না লাগ্‌লেও সে যেন একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্‌লে,—"তার জন্যেই ভাই, তুমি মতিবাবুকে কিছু বল না বুঝি! আর কর্ত্তাটিও তোমার এক শ্রীরাধার মান রেখে আবার সহস্র গোপিনীর প্রতিও খুব সদয়।"

রমা একটু উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলে,—"দ্যাখ প্রিয়, পুরাণ বোধ হয় বিশ্বাস কর। অনসূয়ার গল্প পড়েছ ত, তার স্বামী কুষ্ঠরোগী হ'য়েও সাধ্বী সতী অমন রূপবতী স্ত্রীর কত ভক্তির পাত্র ছিল; আর স্বামী তার একটা পতিতা স্ত্রীলোককে ভালবাস্‌ত ব'লে অক্ষম স্বামীকে সে নিজের কাঁধে ক'রে সেই নীচ মেয়েমানুষের কাছে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই সতীনারীর সতীত্বের তেজে সূর্য্য পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন। নিজের সেই অপূর্ব্ব সতীত্বের প্রভাবে অনসূয়া শেষে অমন কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে রোগমুক্ত পরম সুন্দর পুরুষ ক'রে তুল্‌তে পেরেছিলেন। এসব কাহিনী নেহাৎ অবিশ্বাসের বা তুচ্ছ অবহেলার বিষয় নয় বোন্। আমরা যদি বিশ্বাস করতে পারি, তা হ'লে এইসব চরিত্র-মাহাত্ম্য শুনে কত উপদেশই না লাভ করতে পারি। জীবন-যৌবন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, স্বামী আমার যেমনি দুশ্চরিত্র হোন্, আমি যদি ভগবানের নাম ক'রে সেই স্বামীর পথ চেয়ে দিনের পর দিন ব'সে থাকি, তা হ'লে একদিন-না একদিন সেই স্বামী আমার ভালবাসার ফাঁসে ধরা দেবেনই।"

রমা মনে করেছিল তার এত বড় নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ নিশ্চয়ই প্রিয়কে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য অভিভূত ক'রে ফেল্‌বে। সে কিন্তু সে-রকম লক্ষণ না দেখিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে,—"তোমার বিশ্বাস খুব উঁচু দরের; আর স্ত্রীর আদর্শটা খুব ভাল তা স্বীকার করলেও সংসারের পক্ষে যে সেটা বড় কাজের কথা নয় এ বল্‌তে ভাই, আমি কুণ্ঠিত নই। ব্যভিচার, অসংযম প্রভৃতি মেয়েমানুষের পক্ষেও যেমন দোষের, পুরুষের পক্ষেও তাই। পুরুষরা এইসকল অনাচারের ফলে অনেক সময় নিজেদের হতভাগ্য ছেলে মেয়েদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সব রোগ দিয়ে যায় যাতে নিষ্পাপ শিশুরা অনর্থক আজন্ম কষ্ট পেয়ে মরে। এই ত তোমার সঙ্গে সেদিন যতীনবাবু উকীলের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে দেখ্‌লাম, তাঁর দুটি ছোট ছেলে মেয়ে চোখের অসুখে কি কষ্টই পাচ্ছে! কোলের ছেলেটিরও গায়ে একরকম ঘা হয়েছে, কিছুতেই সারছে না। ডাক্তার কাকে এসব রোগের জন্য দায়ী করেছে জান ত! শুনে কি রকম মনে কষ্ট হ'ল বল দেখি ভাই! "আহা এইসব নিরপরাধ কচি প্রাণগুলি—" প্রিয় কথাটা আর শেষ করলে না, চুপ ক'রে গেল। রমার মনটা হঠাৎ খারাপ হ'য়ে গেল, তার একটি ছেলে, হ'য়ে পর্য্যন্ত এইরকম একটা অসুখে ভুগ্‌ছে—তারও কি তবে এইরকম কিছু কারণ আছে? হবেও বা।

রমাকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দেখে প্রিয় এ অপ্রিয় প্রসঙ্গটিকে চাপা দেবার জন্যে ব'লে উঠল—"হ্যাঁ ভাই, তুমি যে সেদিন বলেছিলে আমায় তোমাদের এদেশের আলকাটা ঝাপের গান শোনাবে তা শোনালে কই?"

প্রতিশ্রুতিটি মনে পড়াতেই রমা ব'লে উঠল—"ওমা, সে কথা যে আর মনেই নেই, তুমিও ত আর মনে করনি, ভাই। কে একজন এদেশের কোন গাঁয়ের লোক এক-রকম মেঠোসুরে সব যত অদ্ভুত-অদ্ভুত গান বের করেছে, এদেশের ছোট লোকেরা রাতদিন সেই সুরে গান করে। দাঁড়াও তোমায় এখনি শুনিয়ে দিচ্ছি। চল, আমার ঢেঁকিশালে ধান ভান্‌ছে যারা তারা ত যখন তখন গায়।" প্রিয় তখনি রমার সঙ্গে গান শুনতে উঠল। সত্যই তখন ঢেঁকিতে পাড় দিতে-দিতে স্ত্রীলোক দু'জন গান ধরেছে—

"খোকার বাবা কড়্ ফিরোছে

ভুল্‌কো তারা—

পাঁচীল পার হ'ল হে প্রাণ ভুল্‌কো তারা"।

আর-একজন যে ঢেঁকির গড়ে ধান নেড়ে দিচ্ছে সেও সঙ্গে সুর দিয়ে চলেছে। অভিমানী স্বামীকে সম্বোধন ক'রে স্ত্রীর উক্তি। রাত শেষ হয়ে এল, শুকতারা ডুবুডুবু,

এই হচ্ছে গানের.ভাব। গানের সুরে গিট্‌কিরী-মূর্চ্ছনার বালাই নেই, একটানা উদাস সুরের ভিতরেও একটা নূতনত্ব আছে। প্রিয় এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে—"হ্যাঁ গো, এটা ত এখন ঠিক দুপুর পেরিয়েছে; এখন ভোরের গান কেন? একটা অন্য কিছু গাওনা শুনি।" "ওমা, মীনুর মা, আমাদের গান শুন্‌বেন? এ গান কি ভাল লাগ্‌বে আপনার?" ব'লে তারা দ্বিতীয় গান সুরু করলে—

"লাল রঙের গাইটি আমার কেমনে হেরাইল,
হায় রে হায়, কেমনে হেরাইল—
ও তার বাছুরটি যে হামলে মরে দুধের বিহনে—
ও সে বিহেন বেলা গাইটি আমার কেমনে পেলাইল
হায় রে হায় কেমনে পেলাইল।

রাখাল-বালকের সরল প্রাণের এই মেঠো সুরের করুণ আক্ষেপ, এলোমেলো ছন্দ প্রাণ পেয়ে যেন সজীব হ'য়ে উঠেছে। প্রিয়র এ-সুরের গান ভালো লাগল। চাষার মেয়েরা উৎসাহ পেয়ে ঢেঁকির তালে-তালে এই ধরণের গান আরও অনেকগুলি গেয়ে চল্‌ল। বন্ধুর এই চাষাদের গান-শোনার আগ্রহ দেখে রমা হেসে বল্‌লে—"এই গেঁয়ো সুর তোমার এত ভালো লাগ্‌ল? আশ্চর্য্যি!"

বেদিয়া

শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

চুলিচালা সব ফেলেছে সে ভেঙে', পিঞ্জর-হারা পাখী!
পিছু-ডাকে কভু আসে না ফিরিয়া, কে তারে
আনিবে ডাকি?
উদাস উধাও হাওয়ার মতন চকিতে যায় সে উড়ে',
গলাটি তাহার সেধেছে অবাধ নদী-ঝর্ণার সুরে,
নয় সে বান্দা রংমহলের, মোতিমহলের বাঁদী;
ঝোড়ো হাওয়া সে যে, গৃহ-প্রাঙ্গণে কে তারে
রাখিবে বাঁধি'!
কোন্ সুদূরের বেনামী পথের নিশানা নেছে সে চিনে;
ব্যর্থ ব্যথিত প্রান্তর তার চরণ-চিহ্ন বিনে!
যুগযুগান্ত কত কান্তার তার পানে আছে চেয়ে,
কবে সে আসিবে উষর ধূসর বালুকা-পথটি বেয়ে
তারি প্রতীক্ষা মেগে' ব'সে আছে ব্যাকুল বিজন মরু!
দিকে দিকে কত নদী-নির্ঝর কত গিরিচূড়া-তরু
ঐ বাঞ্ছিত বন্ধুর তরে আসন রেখেছে পেতে',
কালো মৃত্তিকা ঝরাকুসুমের বন্দনা-মালা গেঁথে'
ছড়ায়ে পড়িছে দিকদিগন্তে ক্ষ্যাপা পথিকের লাগি'!
বাব্‌লা বনের মৃদুল গন্ধে বন্ধুর দেখা মাগি'
লুটায়ে রয়েছে কোথা সীমান্তে শরৎ-উষার শ্বাস!
ঘুঘু-হরিয়াল-ডাহুক-শালিখ-গাঙচিল-বুনো হাঁস
নিবিড় কাননে তটিনীর কূলে ডেকে যায় ফিরে' ফিরে'
বহু পুরাতন পরিচিত সেই সঙ্গী আসিল কি রে!
তারি লাগি ভায় ইন্দ্রধনুক নিবিড় মেঘের কূলে,
তারি লাগি আসে জোনাকী নামিয়া গিরিকন্দর মূলে,
ঝিনুক নুড়ির অঞ্জলি লয়ে' কলরব ক'রে ছুটে'
নাচিয়া আসিছে অগাধ সিন্ধু তারি দুটি করপুটে!
তারি লাগি কোথা বালুপথে দেখা দেয় হীরকের কোণা,
তাহারি লাগিয়া উজানীনদীর ঢেউয়ে ভেসে আসে সোনা!
চকিতে পরশপাথর কুড়ায়ে বালকের মত হেসে'
ছুঁড়ে ফেলে দেয় উদাসী বেদিয়া কোন্ সে নিরুদ্দেশে!
যত্ন করিয়া পালক কুড়ায়, কাণে গোঁজে বনফুল,
চাহে না রতন-মণি-মঞ্জুষা—হীরে-মাণিকের দুল্;
—তার চেয়ে ভালো অমল উষার কণক রোদের সীঁথি,
তার চেয়ে ভালো আলো ঝলমল্ শীতল শিশির বীথি,
তার চেয়ে ভালো সুদূর গিরির গোধূলি-রঙীন্ জটা,
তার চেয়ে ভালো বেদিয়া বালার ক্ষিপ্র হাসির ছটা!
কি ভাষা বলে সে, কি বাণী জানায়, কিসের বারতা বহে
মনে হয় যেন তারি তরে তবু দুটি কাণ পেতে রহে
আকাশ বাতাস আলোক আঁধার মৌন স্বপ্ন ভরে,
মনে হয় যেন নিখিল বিশ্ব কোল পেতে তার তরে!

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(২৬)

পৌরাণিক আখ্যায়িকা

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকার উল্লেখ ও কয়েকটি শব্দ আমি বুঝতে পারিনি; কেউ সেগুলি জানালে আমি উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হবো। প্রত্যেক জিজ্ঞাস্যের পাশে ধর্ম্মমঙ্গলের পৃষ্ঠা, কলম ও লাইনের অঙ্ক দিলাম।

(১) গণেশ দ্বৈমাতুর কিসে? ২।১।১

(২) শিব বৃকাসুরকে দয়া ক'রে হরিভক্তি দান করেন (৩।২।৫)

এবং শিব বল্‌ছেন—

বৃকাসুরে বর দিলাম বুঝিতে না পেরে।
হস্ত দিলে মস্তকে অমনি যেতাম মরে'।
বুদ্ধি করে' বিষ্ণু তায় বাঁচালেক মোরে। ৭১।১।৪৫-৪৭

(৩) কৃষ্ণলীলার বর্ণনায় মধ্যে আছে—
তৃণাবর্ত্ত বিনাশ তপনে তান দণ্ড। ৭৫।২,৮
তপনে কি দণ্ড দিয়েছিলেন?

(৪) সুধন্বা সঙ্কটে যেন কৃষ্ণ বলে' ডাকে। ৭৬।২।১৬
তপ্ত তৈলে সুধন্বার তনু নাই গেল। ১০০।২।৩২
সুধন্বাকে সঙ্কটে সদয়ে পদছায়া। ১২২।২।৪২
কৃষ্ণ বলে' ডাকে যেন সুধন্বার মাথা। ১৭০।২।৪৩
সুরথ সুধন্না দুই রাজার নন্দন।
সুধন্না সাজিল রণে সাক্ষাতে পবন। ১৯৬।২।১৯-২০

(৫) সত্য করে' হংসধ্বজ পুত্র কেটে দিল। ৯৮।২।৯৩

(৬) অলঙ্কার আগম নিগম অভিধান।
ভাষ্যমত ভাগবত ভারত পুরাণ॥
চিন্তামণি শ্রীকলা নাটক রামায়ণ।—৯৮।১।৭১-৭৪

শ্রীকলা কি?

(৭) আশ্রিতকে রক্ষা করলে ধর্ম্ম হয়।—এর শাস্ত্রবচন?

(৮) উরুব্যাধ-উপাখ্যান।—১২৮।২।১২

(৯) বেউশ্যাকে শুনি বলে বশিষ্ঠের শাপ।
দরশনে পুণ্য হয় পরষণে পাপ॥ ১৩৬।২।৭-৮

(১০) বিশ্বকর্ম্মার বাহন ভালুক কোথায় উল্লেখ আছে?

(১১) কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিল কুশ রাজা।—১৭৯।১।৪১

(১২) ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু।—১৮২।২।২১

(১৩) দক্ষিণার বুদ্ধি হতে দারুময় হরি।—১৮৯।২।৬২

(১৪) সতিনী সেলের কাঁটা সভে বলে তিতা।
সতা হতে রাবণ রামের হরে সীতা॥
সতিনীর সন্তাড়নে সন্ধ্যা গেল বন। ১৯৫।২।২৭-৩১

(১৫) আছিল উদ্বিপ রাজা অতি পুণ্যবান্॥
সত্য করে স্বয়ম্ভর মুনির সাক্ষাতে।
আপনি কেটেছে মাথা আপনার হাতে॥
মৈল শত্রুজিত রাজা সত্যের কারণ।—২০১।১।২৪

(১৬) জটায়ুর স্ত্রীর নাম জরাতু কোথায় আছে?

(১৭) শতকোটী সোনা রেখে সন্তাপন মল।—২১৯।১।৬৫

(১৮) অগ্নিকুশ রাজা কে?—২২২।২।৪৩

(১৯) মাণিক গাঙ্গুলির বাসগ্রাম বেলডিহা কোথায়?

(২০) মাণিক গাঙ্গুলি কয়েকটি শব্দ বারম্বার প্রয়োগ করেছেন, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই:—

অবিসার, বিসার, তৈরপ বা তৈরক, কমন্তরে, বৈনস, বিযোগ, নিরযোগ, লোটন (খোঁপা অর্থে)

এই শব্দগুলির অর্থ ও ব্যুৎপত্তি চাই।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৭)

ঈশার্থাঁর জাতিত্ব।

অনেক ঐতিহাসিক ঈশার্থাঁকে পাঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালীর বীরত্ব" নামক প্রবন্ধে তাঁহাকে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর সন্তান বলিয়াছেন। কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(২৮)

দ্রৌপদীকে পণরক্ষা

মহাভারত পাঠে আমরা জ্ঞাত হই যে যুধিষ্ঠির তাঁহার স্ত্রীকে পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মানুসারে দ্যূতক্রীড়া অতীব দোষণীয় অথচ তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ বলা হয় কেন?

শ্রী রাধাবিনোদ অধিকারী

(২৯)

বৈষ্ণব পদাবলী

যাহাতে বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রকৃত গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় কোন ভক্ত সাধকের এরূপ কোন সটীক-সংস্করণ বাহির হইয়াছে কি?

শ্রী রামকিঙ্কর যশ

(৩০)

"বাবু" ও "সাহেব" শব্দ

"বাবু" এবং "সাহেব" শব্দদ্বয় বহু ভাষায় ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত শব্দদুইটি কোন্ ভাষার এবং কখন কোন ভাষা হইতে কোন্ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, জানিতে চাই।

শ্রী মূলচাঁদ মুন্সড়া

(৩১)

সগোত্রে বিবাহ

হিন্দুদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নিষেধ, বাংলা দেশের বাহিরেও এই নিষেধ প্রচলিত আছে কি? এই নিষেধের মূলে বৈজ্ঞানিক কারণই বা কি এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসনই বা কোথায়?

শ্রীমতী রাণী সেন

—

মীমাংসা

শ্রাবণ—১৩৩১,

হিন্দু ও মুসলমানদের যুদ্ধপোষাক

প্রাচীন কালে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব সময়ে সৈন্যদলের সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও নানা গল্পসল্প হইতে অবগত হওয়া যায়—

(১) হিন্দুদের পোষাক বা হিন্দু Uniform ছিল শরীরের বর্ম্মাবরণ; অধিকাংশ স্থলে তাহাদের শরীরাবরণ কিছুই ছিল না দেখা যায়।

(২) মুসলমানদের পোষাক তাহাদের দেশীয় পোষাকই ছিল। যুদ্ধ-কালেও তাহারা তাহাদের দেশীয় পোষাক ছাড়ে নাই।

শ্রী রাকেশলোচন সেন

(১৩)

বিছা

Sulphate of Ammonia জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফুলের বা ফলের গাছে, আস্তে আস্তে রোজ ছড়াইয়া দিলে, অল্পদিনের মধ্যেই, গাছের বিছা মরিয়া বা সরিয়া যায় ও গাছ রক্ষা পায়; ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই ঔষধ প্রয়োগে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, নচেৎ Ammoniaর আধিক্যে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে; সাধারণতঃ এক বালতী জলে, বড় চামচের এক চামচ Sulphate of Ammonia মিশাইতে হইবে, এইরূপ মিশ্রিত জল গাছে নিয়মিত ছড়াইয়া দিলে, পোকা ত নষ্ট হইবেই, গাছও ক্রমে বেশ সবল হইতে দেখা গিয়াছে।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাগানে কিম্বা শস্য-ক্ষেত্রে বিছার উপদ্রব হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে নষ্ট করা যাইতে পারে। যথা—

প্রতি দশ সের তামাক-পাতা ভিজান জলের সহিত একপোয়া আন্দাজ চূণ মিশ্রিত করিয়া সেই জল দ্বারা পোকাধরা গাছের পাতা উত্তমরূপে ভিজাইয়া দিলে বিছা কিম্বা শস্যাদির অনিষ্টকারী যে কোনো পোকা নষ্ট হইয়া যাইবে। দশ সের জলে এক সের ভাল তামাক পাতা ১২।১৩ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

আম, লিচু ইত্যাদি যে সমস্ত গাছের পাতা একটু মোটা ও শক্ত সে সমস্ত গাছে বিছায় ধরিলে সামান্য কেরোসিন মিশ্রিত গরম জলের পিচকারী দ্বারা গাছের পাতা ধুইয়া দিলে সমস্ত বিছা নষ্ট হইয়া যায়।

শাক-সব্জীর বাগানে বিছা কিম্বা অন্য কোনো প্রকার পোকার উপদ্রব হইলে, এতদ্দেশীয় কৃষকগণ সাধারণতঃ ছাই ছড়াইয়া দিয়া থাকে। তাহাতে বাগানের অনিষ্টকারী এই সমস্ত পোকার উপদ্রব অনেকটা হ্রাস পাইতে দেখা যায়।

শ্রী পূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায়।

(১৬)

বাঙ্গালায় কৌলিন্য প্রথা

অনেকের ধারণা, 'কুল' ও 'কুলীন'—এই দুইটি শব্দ বল্লাল সেনের আমলেই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। 'কুল' বংশ বুঝায় এবং উত্তম বংশ-জাত লোককে বুঝাইবার জন্য 'কুলীন'-শব্দ ব্যবহৃত হয়। মহারাজ বল্লাল সেনও উত্তম কুলোদ্ভব এবং আচার বিনয়াদি নবগুণ বিশিষ্ট ("আচার বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।") ব্যক্তিকে কুলীন বলিয়া প্রচার করেন। কুক্রিয়াকারিগণের অবজ্ঞা এবং সৎক্রিয়াশীল লোকের পুরস্কার করিয়া সমাজের দোষ সংশোধন করাই কৌলিন্য মর্য্যাদা-বিধানের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। বল্লাল সেন গুণ বিচার করিয়া গুণীর সমাদর করিবার জন্য ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মধ্যে কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্ত্তন করেন।

অনেকের এই সিদ্ধান্ত যে, বল্লাল রাঢ়ী ও বারেন্দ্র-শ্রেণী বিভাগ করেন মাত্র। এই শ্রেণীবিভাগ-বিষয় তাঁহার কি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন। তবে তিনি যে গুণ বিচার করিয়াই কৌলিন্য-মর্য্যাদা স্থাপিত করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এসম্বন্ধে বিস্তৃত কারণ জানিতে হইলে, "গৌড়ীয় হিন্দুজাতি", "ব্রাহ্মণ-ইতিহাস", "কুলপঞ্জী" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করা উচিত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(১৯)

তেলের রং

তেলে আর জলে মিশ খায় না। তেল হাল্কা বলিয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। জলের উপর কিছু তেল ঢালিয়া দিলে সেগুলি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়—কচু বা পদ্ম পাতায় এক ফোঁটা জল দিলে যেরকম হয়। আলোর ভিতর সাতটা রঙ আছে। সেই সাতটা রঙ ঐ বিন্দুগুলির ভিতর দিয়া বিভক্ত হইয়া যায়. তাই নানা রকম রং দেখা যায়। যে কারণে আমরা আকাশে রামধনু দেখি ঠিক সেই কারণেই আমরা তেলে জলে নানা রকম রঙ দেখি রামধনুর মতন তাতেও সাতটা রঙই থাকবার কথা।

শ্রী সুবোধ দাশগুপ্ত

(২০)

মগের মুল্লুক

"মগের মুল্লুক"—এই প্রবাদের সৃষ্টির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সুবিখ্যাত পলাশী-যুদ্ধের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আলাম্‌-প্রা নামে জনৈক মগ ব্রহ্মদেশের একাংশে আভা-নামক স্থানে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত করেন। কালক্রমে তাঁহার অনুচরবর্গ রেঙ্গুন, আরাকান প্রভৃতি জয় করিয়া আসাম-মণিপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় এবং অত্যাচার করিতে থাকে। সেই অত্যাচারে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে আসাম-রাজ্য রাজহীন এবং গৃহ-বিবাদে লিপ্ত থাকায় মগ-জাতীয় লোকেরা তথায় আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করে এবং নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকে। তাহাদের অত্যাচারে অশান্তির সৃষ্টি হইয়া দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়ে। দেশে তখন এমন কোন রাজশক্তি ছিল না, যাহাতে সেই অশান্তির অনলে শান্তি-বারি সেচন করিয়া উহাকে সুশীতল করিতে পারে। মগদিগের এই অত্যাচার হইতেই "মগের মুল্লুক"—এই নাম প্রচলিত হইয়াছে। সেজন্য কেহ কাহারও উপর কোন অন্যায় অত্যাচার করিলে, এই প্রবাদ-বাক্যের উল্লেখ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে কোন অত্যাচারিত উপদ্রুত স্থানকেও "মগের মুল্লুক"—নাম দেওয়া হয়।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মৃত্যু-দূত

সেল্‌মা লাগর্‌লফ্‌

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব কথা

সহরের বাহিরে একখানি ছোট্ট বাড়ী; বাড়িখানিতে দুইটি কুঠ্‌রী; একটি একটু বড়—বেশ প্রশস্ত; ছাদও অনেকখানি উঁচু। অন্য ঘরখানি অপেক্ষাকৃত ছোট। বড় ঘরখানি বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়; ছোটটি শয়ন-ঘর। বড় ঘরটির মাঝখানে ছাদ হইতে ঝোলান একটি আলো জ্বলিতেছিল। সেই মৃদু-আলোকে ঘরখানি বেশ একটু তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস দিতেছিল।

ঘরখানির পরিচ্ছন্নতা দেখিলে আগন্তুকের মন খুসী হইয়া উঠে। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অধিবাসীরা গৃহখানিকে অতি যত্নে যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে। সাজাইবার কৌশল ও আসবাবপত্রাদি দেখিলে মনে হয় যে একটা পুরা সংসার সেখানে বাস করে।

বড় ঘরখানির দরজার পাশেই একটি ষ্টোভ ছিল; ইহার আশেপাশে রান্না-সংক্রান্ত আস্‌বাব রক্ষিত,যেন এই-খানেই বাড়ীর রান্না-ঘর। ঘরের মাঝখানে একটি গোল টেবিল—তাহার উপরেই খাওয়া-দাওয়া হয়; দুটি এক কাঠের চেয়ার; পাশের দেওয়ালে এক অতি পুরাতন ক্লক-ঘড়ি; চিনামাটির বাসন ও গেলাস প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটি তাক। এই স্থানটিকে বাড়ীর খাবার-ঘর বলা চলে। আলোটি ঠিক গোল টেবিলটির উপরে ঝোলানো; ঐ একটি আলোকেই ঘরের আনাচ-কানাচ পর্য্যন্ত আলোকিত, এমন কি ভিতরের শয়ন ঘরের মেহগিনী কাঠের সোফা, কারুকার্য্য-খচিত আস্তরণ-আচ্ছাদিত প্রসাধন টেবিল, একটি চমৎকার চিনাপাত্রে সজ্জিত পাম-গাছ এবং দেওয়ালের গায়ের ফোটোচিত্রগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

এই বিচিত্র গৃহে যদি সত্যই কোনো একটি পরিবার বাস করিত, তাহা হইলে সেখানে অতিথি-অভ্যাগত কেহ আসিলে যথেষ্ট আমোদ অনুভব করিতেন; তাঁহাদিগকে ভিতরের শয়ন-ঘরে বসিতে বলিয়া একলা রাখার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া গৃহস্বামিনী হয়ত রন্ধনশালায় আসিতে বাধ্য হইতেন; আহারের সময়, ষ্টোভের অতি নিকটে ভোজন-টেবিল অবস্থিত হওয়াতে গরম হাওয়া গায়ে লাগিত; এবং একটির পর একটি ডিস শেষ হইলে কায়দা বজায় রাখিবার জন্য ঝিকে ডিস তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য ঘণ্টা বাজাইবার কথা ভাবিয়া তাঁহার হাসি পাইত। কিম্বা, রান্নাঘরে যদি কোনো ছেলে কাঁদিয়া উঠিত, পাশের খাবার ঘরে স্বামী যাহাতে তাহা না শুনিতে পান তজ্জন্য

কৃষ্ণার্জ্জুনীয়ম্

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

তাহার মা তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিতেছেন এই দৃশ্য দেখিলেও হাসি সম্বরণ করা কঠিন হইত।

এই ঘর দুইখানি দেখিলে এই ধরণের হাস্যকর ছবি মনে জাগিয়া উঠা বিচিত্র নয়, কিন্তু নববর্ষের উৎসব-রজনীতে, রাত্রি বারটার অল্প পরেই যে দুইজন লোক সেখানে প্রবেশ করিল তাহাদের মনে কোনো হাল্‌কা ভাব জাগিল না। লোক দুইটি এমন জীর্ণ শীর্ণ ও শত-ছিন্ন বেশ পরিহিত যে, যদি উহাদের মধ্যে একজনের ছিন্ন পরিচ্ছদের উপর একটি কালো আলখাল্লা ও এক হাতে মরিচা-ধরা একটি কাস্তে না থাকিত তাহা হইলে তাহাদিগকে নেহাৎ পথের ভিখারী ছাড়া কিছু মনে হইত না, কারণ, ভিখারীর এই সজ্জা একটু অদ্ভুত বটে। আরো একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে ইহারা বন্ধ দরজা উন্মুক্ত না করিয়াই যেন দরজা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় লোকটির সাজসজ্জায় ভয়াবহ কিছু ছিল না, কিন্তু সে যেন স্বচ্ছন্দে চলিতেছিল না, তাহাকে তাহার সঙ্গী হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতেছিল; তাহার অদ্ভুত অস্বাচ্ছন্দ্য গতির জন্য তাহাকে প্রথম জন অপেক্ষাও ভীষণ দেখাইতেছিল। সে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় ঘরে ঢুকিতেই তাহার সঙ্গী তাহাকে গভীর ঘৃণাভরে ঠেলিয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিল; সে সেখানে দুর্দ্দশা ও বীভৎসতার স্তূপের মত পড়িয়া রহিল, তাহার চক্ষু নিদারুণ ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল, তাহার মুখাবয়বে একটা উগ্র পৈশাচিকতা ফুটিয়া উঠিল।

তাহারা যখন ঘরে প্রবেশ করিল তখন ঘরখানি নির্জ্জন ছিল না। গোল টেবিলের পাশে একটি রুগ্ন শীর্ণ যুবক বসিয়াছিল, তাহার চোখে সরল বালকোচিত দৃষ্টি; তাহার পাশে একটি প্রৌঢ়া মহিলা, কমনীয়-দর্শন, কিন্তু খর্ব্বাকৃতি। যুবকটির কোটের উপর বড় বড় অক্ষরে 'মুক্তিফৌজ' কথাটি লেখা ছিল। মহিলাটি কালো পোষাক পরিহিত, মুক্তিফৌজের সিসটারদের টুপি-ব্যতীত আর কোনো চিহ্ন তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে ছিল না। টুপিটি টেবিলের উপর থাকিয়া তাঁহার সহিত ওই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছিল।

উভয়েরই মানসিক অবস্থা শোচনীয়; মহিলাটি নিঃশব্দে কাঁদিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে অত্যন্ত অস্থির-ভাবে হস্তস্থিত অশ্রুসিক্ত রুমালে চোখ মুছিতেছিলেন, যেন তাঁহার অপরিসীম ব্যথা তাঁহাকে বিশেষ কোনো কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ করিয়াছে। যুবকটির চক্ষুও রুদ্ধ বেদনায় রক্তাক্ত; লজ্জায় সে অন্যের সম্মুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে পারিতেছিল না।

মাঝে-মাঝে তাঁহারা দুই একটি বাক্য-বিনিময় করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের চিন্তা পাশের ঘরের এক রোগীকে লইয়া—রোগীর জননীকে কন্যার সহিত নির্জ্জনে থাকিবার অবসর দিয়া ক্ষণকালপূর্ব্বে রোগীর কক্ষ তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মুমূর্ষুর চিন্তায় এরূপ মগ্ন ছিলেন যে, মনে হইল আগন্তুক দুইজনকে তাঁহারা লক্ষ্যই করেন নাই। তাহারা নিঃশব্দে আসিয়াছিল; একজন দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়া দাঁড়াইল, অন্যজন তাহার পদতলে অবশ ভাবে পড়িয়া রহিল। টেবিলের পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবক ও মহিলাটি গভীর রজনীতে বদ্ধদ্বার পথে অভ্যাগত দুইজনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেন, সন্দেহ নাই।

হস্তপদ-বদ্ধ আগন্তুক মেঝেয় পড়িয়া থাকিয়া অবাক-বিস্ময়ে দেখিল যে, গৃহস্থিত দুইজনেই থাকিয়া-থাকিয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াও যে কারণেই হউক তাহাদের উপস্থিতি টের পাইতেছে না। সে নিজে সবই প্রত্যক্ষ করিতেছিল। এমন কি, সহরের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে সে জীবিত দৃষ্টি লইয়া সহরটিকে যেমন দেখিত সকলই ঠিক তেমনই দেখিয়াছে অথচ পথে কেহ তাহাকে যেন চিনিতে পারে নাই। এ অবস্থাতেও দুষ্টবুদ্ধি বশতঃ সে বর্ত্তমান অদ্ভুত চেহারায় তাহার শত্রুদের দেখা দিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

এই ঘরে সে এই প্রথম পদার্পণ করিলেও উপবিষ্ট মহিলা ও যুবকটিকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না; সে যে কোথায় আনীত হইয়াছে, সে-বিষয়েও তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না। কাল সমস্ত দিন ধরিয়া যেখানে

না আসিবার জন্য সে প্রাণপণ করিয়াছে সেখানেই এখন সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনীত হইয়া সে রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল।

সহসা যুবকটি চেয়ারটি একটু পিছনে ঠেলিয়া বলিল, "রাত বারোটা পার হ'য়ে গেছে; তার স্ত্রী ব'লেছিল সে এই সময়ে বাড়ী ফির্‌বে; আমি গিয়ে তাকে আস্‌তে বলিগে।"

যুবকটি অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল ও চেয়ারের পশ্চাতে রক্ষিত কোটটি তুলিয়া লইল।

মহিলাটি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বহুকষ্টে বলিলেন, "আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি গুস্তাভসন, ওই লোকটির পেছনে ছোটা-ছুটি করাটা তোমার মোটেই মনঃপূত হচ্ছে না, কিন্তু মনে রেখো সিস্‌টার ঈডিথের এটা শেষ অনুরোধ।"

কোটের হাতার হাত ঢুকাইতে ঢুকাইতে যুবকটি একটু থামিয়া বলিল, "সিস্‌টার মেরী, হয়ত সিস্‌টার ঈডিথের জন্য এইটিই আমার শেষ কাজ, কিন্তু তবু আমি আশা করছি যেন ডেভিড হল্‌ম্‌ বাড়ীতে না থাকে, কিম্বা থাক্‌লেও যেন এখানে আস্‌তে স্বীকার না পায়। ক্যাপ্টেন এণ্ডারসন ও আপনার অনুরোধে আজ অনেকবার তার খোঁজে গিয়েছি; তার সঙ্গে দু' একবার দেখাও হয়েছে এবং সে প্রত্যেকবার বেঁকে বসেছে ব'লে, কিম্বা আমি কি আর কেউ তাকে আন্‌তে পারিনি ব'লে আমি সুখীই হয়েছি।"

নিজের নাম উচ্চারিত হইতে দেখিয়া ডেভিড হল্‌ম্‌ উঠিয়া বসিল; তাহার মুখে একটা কদর্য্য বিদ্রূপের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সে বিড় বিড় করিয়া বলিল, "এ লোকটার তবু একটু বুদ্ধি আছে দেখছি।"

মহিলাটি যুবকের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন, "গুস্তাভসন, আশা করি এবার তুমি তাকে আন্‌বার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে; তাকে সিস্‌টার ঈডিথের কথা এমন ভাবে বল্‌বে যে সে যেন বুঝতে পারে তাকে আস্‌তেই হবে।"

যুবকটি বিশেষ অনিচ্ছার সহিত দরজারদিকে অগ্রসর হইল। দরজার কাছ হইতে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি সে খুব মাতাল হ'য়ে থাকে তা হ'লেও কি তাকে এখানে আন্‌ব?"

"সে যেমন অবস্থাতেই থাক্‌ তাকে আন্‌বে, এই আমার ইচ্ছা। যদি সে মাতাল হয় ত এখানে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাক্‌লেই তার নেশা কেটে যাবে। তাকে এখানে আনাই এখন সব চাইতে দরকার।"

যুবকটি দরজার হাতলে হাত দিয়া কি ভাবিয়া টেবিলের নিকট ফিরিয়া আসিল, রুদ্ধ আবেগে তাহার মুখ পাংশুবর্ণ। সে বলিল, "আমার কিন্তু মোটেই পছন্দ নয় যে ডেভিড হল্‌মের মতো একটা লোক এখানে আসে। সিস্‌টার মেরী, আপনি ত বেশ ভাল ক'রেই জানেন, সে কি চরিত্রের লোক। আপনার কি মনে হয় সে এখানে আস্‌বার উপযুক্ত?" ভিতরের শয়ন-ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ওকে ওই ঘরে প্রবেশ কর্‌তে দিলে কি ঘরটা বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে না?"

সিস্‌টার মেরী বলিতে গেলেন, "তুমি কি মনে কর—" কিন্তু যুবকটি তাঁহার কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল, "সিস্‌টার মেরী, আপনি কি বুঝতে পার্‌ছেন না ও এখানে এসে আমাদের কি ঠাট্টা-বিদ্রূপই না করবে! সে বড়াই ক'রে বেড়াবে যে মুক্তিফৌজের একজন সিস্‌টার তাকে এমনই ভালবাস্‌ত যে তাকে একবার শেষ না দেখে সে মর্‌তে পর্য্যন্ত পারেনি।"

সিস্‌টার সহসা যুবকটির মুখের দিকে চাহিলেন। চট করিয়া একটা উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল কিন্তু তিনি সংযত হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

যুবক বলিল, "সিস্‌টার ঈডিথের যে ও কুৎসা গেয়ে ফিরবে তা আমি কিছুতেই সইতে পারব না—বিশেষ ক'রে তাঁর মৃত্যুর পরে।"

গম্ভীরভাবে, বিশেষ জোর দিয়া সিস্‌টার মেরী অবিলম্বে উত্তর করিলেন, "গুস্তাভসন্‌, তুমি কি জোর ক'রে বল্‌তে পার যে ডেভিড হল্‌ম্‌ যদি সে কথা ভাবে তাহ'লে সে মিথ্যা ভাববে?"

ভূমি-শায়িত বন্দী চমকিয়া উঠিল, তাহার হৃদয়ে এক

অননুভূত আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া গেল। সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জর্জ্জের দিকে চাহিয়া রহিল; জর্জ্জ তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিল কি না বুঝিতে চেষ্টা করিল কিন্তু মৃত্যুযানের চালক নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ডেভিড্‌হল্‌ম্‌ মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিল যে এই সুখকর সংবাদটি জীবন থাকিতে পাইলেই ভাল হইত; ইয়ার-বন্ধুদের কাছে তাহা হইলে বুক ফুলাইয়া বেশ একটা প্রেমের গল্প বলিয়া জমান যাইত।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে যুবকটি মুহ্যমান হইয়া পড়িল, তাহার চতুর্দ্দিকে দেওয়াল দরজা সমেত ঘরখানি যেন ঘুরিতে লাগিল। সে চেয়ারের একটা হাতল ধরিয়া কোনো রকমে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "সিস্‌টার মেরী, আপনি এমন ক'রে কথা বল্‌ছেন কেন? আপনি কি আমাকে বিশ্বাস কর্‌তে বলেন যে—"

সিস্‌টার মেরী অসহ্য বেদনায় পীড়িত হইতে লাগিলেন মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া সিক্ত রুমালখানি চাপিয়া ধরিয়া তিনি আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন তাঁহার মুখ হইতে বন্যার মত কথা বাহির হইতে লাগিল, যেন, লজ্জা আসিবার পূর্ব্বে তিনি এই ব্যথার ইতিহাস শেষ করিতে চান।

"তার ভালবাসার পাত্র আর কে ছিল, বল? গুস্তাভসন, আমরা দুজন এবং অন্যান্য যারা তার পরিচিত ছিল প্রত্যেককেই সে প্রেমের দ্বারা জয় ক'রে তার পথে টেনে নিয়েছিল; তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা তার কোনো কাজে বাধা দিইনি, তাকে কখনো সামান্য উপহাস মাত্র করিনি, আমাদের জন্যে ব্যথিত বা অনুতপ্ত হবার কারণও তার ঘটেনি এবং আজ যে ও ওই মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে ছটফট কর্‌ছে তার জন্যেও আমরা কেউ দায়ী নই—"

উচ্ছ্বাসের মুখে এই কথাগুলি বলিয়া সিস্‌টার মেরী শান্ত হইলেন, গুস্তাভসন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আমি বুঝ্‌তে পারিনি, সিস্‌টার, যে আপনি পাপীদের প্রতি প্রেমের কথা বল্‌ছিলেন।"

"আমি ত শুধু সে প্রেমের কথা বলিনি, গুস্তাভসন," এই আশ্বাস বাক্যে আগন্তুকদের মধ্যে একজনের হৃদয় অবর্ণনীয় আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু পাছে এই আনন্দের জন্যে তাহার ক্রোধ ও বিদ্রোহ ভাবের কিছুমাত্র উপশম হয় এই ভয়ে সে তাহার এই উচ্ছ্বাস দমন করিতে চেষ্টা করিল। এখানকার কথাবার্ত্তা তাহাকে হঠাৎ আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছে; ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে কেবল কল্পনা করিয়াছে যে তাহাকে শুধু ধর্ম্ম-বক্তৃতা শুনাইবার জন্যই ডাকা হইয়াছিল। ভবিষ্যতে আর এমন ভুল করা হইবে না।

সিস্‌টার মেরী তাঁহার উচ্ছ্বাস দমন করিবার জন্য দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন, সমস্ত ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক গুস্তাভসনকে বুঝাইতে হইবে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "গুস্তাভসন, এই ব্যথিত প্রেমের ইতিহাস তোমাকে বলাটা আজ অন্যায় মনে কর্‌ছি না; আজ সে বোধ হয় সবারই মায়া কাটিয়ে যাচ্ছে; তুমি যদি মিনিট কয়েক অপেক্ষা কর, আগের কথা তোমায় বল্‌তে পারি।"

যুবকটি কোটটি খুলিয়া ফেলিয়া চেয়ারে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে সুন্দর শান্ত চোখ দুটি সিস্‌টার মেরীর দিকে তুলিয়া তাঁহার কথার অপেক্ষায় রহিল।

সিস্‌টার মেরী বলিতে সুরু করিলেন, "গুস্তাভসন, বিগত বৎসরের উৎসব-রাত্রি আমরা দুজনে কেমন ক'রে কাটিয়েছিলাম আমি গোড়াতেই সে কথা বল্‌ব। সে বৎসর শীতের আগে আমাদের বড় অফিসে এই সহরে একটা আতুরাশ্রম খোলার কথা হয়েছিল। আমাদের দুজনকে এই কাজের ভার দিয়ে এখানে পাঠান হয়; আমাদের পরিশ্রমের অন্ত ছিল না; স্থানীয় সহ-কর্ম্মীরাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। নতুন বছরের আগেই নতুন বাড়ীতে আমাদের গৃহ প্রবেশ হ'ল। রান্না-ঘর ও বড় বড় শোবার ঘরগুলি তৈরী হ'য়ে গেছে। আমাদের ভরসা ছিল যে নতুন বছরের পর্ব্বদিনেই আমরা এই আতুর-আশ্রম খুল্‌তে পার্‌ব কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জীবাণু-প্রতিষেধক উনান ও ধোবাঘর তৈরী না হওয়াতে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'লনা।"

প্রথমটা কান্নায় সিসটার মেরীর চক্ষু ভরিয়া আসিতেছিল কিন্তু ধীরে ধীরে গল্প বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্ত্তমানের

দুঃখ-যন্ত্রণাময় বাস্তবতা হইতে অতীতের আনন্দ দিনগুলির মধ্যে যেন চলিয়া গেলেন। তাঁহার রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার হইয়া আসিল।

"তুমি তখনো আমাদের দলে যোগ দাও নাই। যদি দিতে তাহ'লে বড় আনন্দেই আমাদের সঙ্গে পূর্ব্বরাত্রি জাগতে পারতে, দূর থেকে ব্রাদার ও সিস্টারেরা অনেকেই আমাদের কাজ দেখতে এলেন; আমরা গৃহ-প্রবেশের ভোজ-স্বরূপ তাঁদের সকলকেই চা-খেতে বল্লাম। তুমি কল্পনাও ক'রে উঠতে পারবে না যে এইখানে আশ্রম তৈরী ক'রে সিস্টার ঈডিথের কি আনন্দ হয়েছিল; এই সহরটিই যেন তার নিজের মাতৃভূমি ছিল, এখানকার প্রত্যেক অধিবাসীকে সে চিনত; তাদের অভাব-অভিযোগ ঠিক বুঝতে পারত। সিস্টার ঈডিথ মহানন্দে কুঠরীতে কুঠরীতে লেপ, বালিশ, তোষক, নতুন রঙ-করা দেওয়াল, তৈজসপত্র সব দেখে ফিরছিল; তার ছেলেমানুষী দেখে সবারই হাসি পেয়েছিল। সে যেন ঠিক আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। আর সিস্টার ঈডিথ আনন্দে থাকলে কারো মনেই বিষাদ থাকতে পারে না!"

যুবকটি বলিয়া উঠিল, "এ কথা যে কত সত্যি তা আমি জানি।" সিস্টার মেরী বলিতে লাগিলেন, "আমাদের বন্ধুরা যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ আমাদের আনন্দও অক্ষুণ্ণ ছিল কিন্তু তাঁরা চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিস্টার ঈডিথের মন ব্যথায় ভ'রে গেল—এই পৃথিবীর সকল অন্যায় গ্লানি ও পাপের কথা চিন্তা ক'রে। সে আমাকে তার সঙ্গে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বল্লে, যেন পাপের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা পরাস্ত না হই। আমরা দুজনে নতজানু হ'য়ে আমাদের আশ্রম, আমাদের নিজেদের আত্মা ও যাদের কল্যাণ-কামনায় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল তাদের জন্যে প্রার্থনা করতে লাগলাম। এমন সময় আমাদের সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

"বন্ধুরা এই মাত্র ফিরেছেন, আমরা ভাবলাম, হয়ত তাঁহাদেরই কেউ কিছু ফেলে গিয়ে থাকবেন তাই নেবার জন্যে ফিরে এসেছেন। আমরা দুজনে গিয়ে সদর দরজা খুলে দাঁড়াতেই কোনো বন্ধুকে দেখলাম না—দেখলাম তাদেরই একজনকে যাদের জন্যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে তার বিরাট শরীর আর জীর্ণ বেশ নিয়ে দরজা ধ'রে দাঁড়িয়েছিল—এমন মাতাল হয়েছিল যে তার পা টলছিল। সে আমারদিকে এমন ভীষণ দৃষ্টিতে চাইলে যে আমি ভয়ে অভিভূত হ'য়ে গেলাম,—মনে করলাম, আশ্রম তৈরী সম্পূর্ণ হয়নি এই ওজুহাত দেখিয়ে ওকে বিদেয় ক'রে দি। কিন্তু সিস্টার ঈডিথ খুসী হ'য়ে বল্লে যে ঈশ্বর আজকেই আশ্রমে এক অতিথি এনে দিয়ে আমাদের কাজে তাঁর অপার করুণাই প্রদর্শন করছেন। সে লোকটিকে ভেতরে নিয়ে এসে তাকে কিছু খাবার দিতে গেল। লোকটা তাকে কুৎসিৎ ভাষায় গাল দিয়ে বল্লে যে সে খালি একটু শোবার জায়গা চায়। শোবার ঘরে গিয়ে তার জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা খাটের ওপর শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'ল।"

ডেভিড হল্‌ম্ খুসী হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "মাগী কি শয়তান! আমাকে দেখে উনি ভয় পেয়ে ছিলেন।" সে ভাবিল, নিশ্চয়ই জর্জ্জ তাহার কথা শুনিতে পাইবে ও ভাবিবে ডেভিড হল্‌ম্ সেই আগেকার ডেভিডই আছে। "এখন যদি বেটীকে আমার চেহারাটা দেখাতে পারতাম তা হ'লে ওর আত্মারাম নিশ্চয়ই খাঁচা-ছাড়া হ'ত।"

সিস্টার মেরী বলিতে লাগিলেন, "সিস্টার ঈডিথ তার আশ্রমের প্রথম অভ্যাগতকে দয়া ও করুণা দিয়ে ঢেকে ফেলতে চেয়েছিল, তাই লোকটাকে অত শীগগির ঘুমিয়ে পড়তে দেখে সে হতাশ হ'য়ে পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই লোকটির কোটটা দেখতে পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। গুস্তাভসন, অমন ময়লা কদর্য্য শতছিন্ন জামা আমি আর কখনো দেখিনি। তার থেকে সস্তা মদের আর ময়লার এমন একটা উগ্র দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল যে তার কাছে যায় কার সাধ্যি। যখন দেখলাম সিসটার ঈডিথ সেটাকে হাতে নিয়ে নির্ব্বিকারচিত্তে সেলাই করতে বসল তখন আমি ভয়ে আঁৎকে উঠলাম। তাকে বল্লাম, 'ওটা ফেলে রেখে দাও—বিশোধিত না ক'রে ওটা ঘাঁটাঘাটি করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।' কিন্তু লোকটাকে গোড়া থেকেই সিস্টার ঈডিথ ভগবানের দান ব'লে

মেনে নিয়েছিল। লোকটার জামা সেলাই ক'রে তার কিছু উপকার করাটা ঈডিথের কাছে এত আনন্দদায়ক হয়েছিল যে, আমি তাকে নিজে সাহায্যও কর্‌লাম না ওই কাজে—কারণ আমি ওই নোংরা জামাটার থেকে নানা রকম ছোঁয়াচে ব্যারামের ভয় করেছিলাম। সে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ ক'রে সমস্ত কাজটা নিজে কর্‌তে লাগল। তা ছাড়া সিস্‌টার ঈডিথ ছিল আমার উপর-ওয়ালা—আমাকে ছোঁয়াচে ব্যারাম যাতে না ধরে সে-দিকে তার লক্ষ্য ছিল—নিজের অবস্থা যাই হোক না কেন, সমস্ত রাত্রিটা ধ'রে সে সেই জামাটা সেলাই কর্‌লে।"

টেবিলের অপর পার্শ্বে যুবকটি দয়া ও করুণার এই ইতিহাস শুনিয়া গভীর পরিতৃপ্তির সহিত হাতদুটি তুলিয়া যুক্তকরে কাহাকে যেন নমস্কার করিয়া বলিল, "ভগবানকে ধন্যবাদ—সিস্‌টার ঈডিথের মঙ্গল হোক।"

সিস্‌টার মেরীর মুখ অপার্থিব আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি শান্তি, ভগবানকে ধন্যবাদ। সিস্‌টার ঈডিথের মঙ্গল হোক। সুখে দুঃখে আমরা যেন এই প্রার্থনাই কর্‌তে পারি। তাঁকে ধন্যবাদ। আর সিস্‌টার ঈডিথও ধন্য যে, সে তার কর্ত্তব্য পালন করেছে—। সে সমস্ত রাত্রি জেগে সেই বীভৎস কোটের উপর ঝুঁকে প'ড়ে এমন গৌরব ও আনন্দের সঙ্গে তা সেলাই কর্‌তে লাগল যেন সে রাজপরিচ্ছদ সেলাই কর্‌ছে।"

সেই দিনের সেই হতভাগ্য অতিথিটি হস্তপদ-বন্ধাবস্থায় ভূমিশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া এক অদ্ভুত শান্তি ও সান্ত্বনা অনুভব করিল। সে কল্পনায় দেখিল, একটি সুন্দরী বালিকা নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একাকী বসিয়া এক দরিদ্র ভিখারীর কদর্য্য শতছিন্ন কোট সেলাই করিতেছে। এতাবৎকাল যে বিরক্তি ও হতাশায় তাহার মন পীড়িত হইতেছিল তাহাতে যেন এই চিন্তা শান্তি-প্রলেপের মত কাজ করিল। জর্জ্জটা যদি না অমন হাঁড়িপারা মুখ লইয়া তাহার কাছে নিষ্ফল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ করিত তাহা হইলে সে বহুক্ষণ ধরিয়া এই চমৎকার চিত্রটি উপভোগ করিত।

সিস্‌টার মেরী বলিতে লাগিলেন, "ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে সিস্‌টার ঈডিথ সমস্ত রাত্রি জেগে অতিথির জামার বোতাম বসিয়ে, ফুটোতে তালি লাগিয়ে ভোর চারটে পর্য্যন্ত এইভাবে ব'সে রইল, কোনো দুর্গন্ধের বা ব্যারামের ছোঁয়াচ লাগার ভয় কর্‌লে না; পরে তার জন্যেও কখনো অনুতাপও কর্‌লে না। সেই দারুণ শীতের রাত্রে কন্‌কনে হাওয়ায় ঘরখানি যেন ঠিক বরফের ঘরের মতো ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল—তাতে ভোর পর্য্যন্ত ব'সে থাকার জন্যেও কখনো তাকে অনুতাপ কর্‌তে দেখিনি। ভগবানের অশেষ করুণা!"

যুবকটি বলিল—"শান্তি শান্তি।"

সিস্‌টার মেরী বলিলেন, "যখন তার কাজ শেষ হ'ল তখন শীতে তার শরীর যেন জমাট বেঁধে গেছে। আমি বুঝতে পার্‌ছিলাম সে বিছানায় অনেকক্ষণ ধ'রে ছটফট আর এপাশ ওপাশ কর্‌ছিল—কিছুতেই শরীর গরম হচ্ছিল না, তার ঘুমও আসে না। একটু তন্দ্রার ভাব আসার পরই সে উঠে বস্‌ল দেখে আমি তাকে আরো খানিকক্ষণ ঘুমোবার জন্যে অনুরোধ কর্‌লাম, বল্‌লাম যে, তার ঘুম ভাঙবার আগে অতিথি জেগে উঠলে আমিই তার তত্ত্বাবধান কর্‌ব।

যুবক বলিল, "সিস্‌টার মেরী, আমি জানি আপনি বরাবরই সিস্‌টার ঈডিথের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।"

সিস্‌টার মেরীর মুখে একটু শীর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "আমি জানি, এটা সিস্‌টার ঈডিথের কাছে অনেক ত্যাগ-স্বীকার করা। কিন্তু তবু সে আমাকে খুশী কর্‌বার জন্যে শুতে গেল। সে বেশীক্ষণ ঘুমোবার সুযোগ পায়নি। লোকটা সকালে উঠে কফি খাওয়া শেষ ক'রে তার কোটটা দেখে আমায় জিজ্ঞেস কর্‌লে আমি তার কোটখানা সেলাই করেছি কি না। আমি 'না' বলাতে যে সেলাই করেছে সে তাকে ডেকে দিতে বল্‌লে।

"তার নেশা তখন কেটে গেছে, সে শান্ত হ'য়ে ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা বল্‌ছিল। আমি জান্‌তাম যে, তার কাছ থেকে ধন্যবাদ পেলে সিস্‌টার ঈডিথ সুখী হবে। তাই আমি তাকে ডেকে দিলাম। যখন সে এল তখন সমস্ত রাত্রি জাগরণের

কোনো চিহ্ন তার মুখে বর্ত্তমান নেই—তার মুখখানি আশার আনন্দে উজ্জ্বল, গাল দুটি লজ্জায় লাল—তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, লোকটা প্রথমটা সে সৌন্দর্য্যে অভিভূত হ'য়ে পড়ল। সে দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। পরক্ষণেই তাহার মুখেচোখে এমন একটা বিশ্রী ভাব ফুটে উঠল যে, আমার ভয় হ'ল বুঝিবা সে সিস্টার ঈডিথকে মেরেই বসে। কিন্তু আবার মনে মনে ভাবলাম, না, ভয় নেই। সিস্টার ঈডিথের গায়ে কেউ হাত তুল্‌তে পারে না।" যুবকটি বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই!"

"লোকটা হঠাৎ ভারী গম্ভীর হ'য়ে গেল এবং সিস্টার ঈডিথ তার কাছে আস্‌তেই সে তার কোটটা নিয়ে পটপট ক'রে বোতাম আর তালিগুলো ছিঁড়তে লাগল; জামাটা সেলাইয়ের আগে যে জীর্ণদশায় ছিল সেটাকে তার চাইতেও শতছিন্ন ক'রে সে ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, "দেখ সুন্দরী, সেলাই-করা ভদ্রকোট পরা আমার অভ্যেস নেই—এই ছেঁড়া কোটেই আমাকে মানায় ভাল—সিস্টার ঈডিথ, আমি বিশেষ দুঃখিত যে তুমি মিছিমিছিই রাত জেগেছ, কিন্তু কি কর্‌ব—ছেঁড়া না হ'লে জামাটা আমি পর্‌তেই পার্‌ব না।"

মেঝের উপরে পড়িয়া থাকিয়া ডেভিড হল্‌ম্ কল্পনায় দেখিল—একটি সুন্দর আনন্দোচ্ছ্বসিত মুখ—বেদনার আঘাতে কালো হইয়া উঠিল। সে স্বীকার করিল যে, তাহার এই পশুর মতন ব্যবহার অত্যন্ত নির্দ্দয় ও অকৃতজ্ঞের ব্যবহার। জর্জ্জের কথা তাহার মনে হইতেই সে ভাবিল, "ভালই হ'ল, জর্জ্জ দেখুক, আমি কি ধরণের লোক—অবিশ্যি সে ইতিমধ্যেই হয়ত তা টের পেয়েছে; ঠিকই ত, গোড়াতেই কেঁদে গ'লে যাবার মতন লোক ডেভিড হল্‌ম্ নয়, সে শক্ত ও দুঁদে লোক; বোকা লোকের ন্যাকামি দেখে সে খুসী হয় না, বিরক্তই হয়।"

সিস্টার বলিতে লাগিলেন, "এতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকটার চেহারা কেমন, একথা আমার মনেই হয়নি; কিন্তু যখন সোজা দাঁড়িয়ে সে নিষ্ঠুরভাবে সিস্টার ঈডিথের অত যত্ন ও পরিশ্রমের কাজটাকে ছিন্ন ভিন্ন কর্‌তে লাগল তখন আমি বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখলাম—লোকটি দীর্ঘদেহ সুপুরুষ—প্রকৃতির এই সুন্দর সৃষ্টিটি দেখে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। তার ভাবভঙ্গীগুলিও সুন্দর—প্রকাণ্ড মাথাটা শরীরের ওপর বেমানান নয়, তার মুখাবয়ব নিশ্চয়ই কোনো কালে সুন্দর ছিল, কিন্তু তখন তা, নানা অত্যাচারে কলঙ্কিত হয়েছে—দেখলে বোঝাই যায় না যে, এককালে মুখখানি সুন্দর ছিল।

"যদিও এই নিষ্ঠুর কাজের সঙ্গে-সঙ্গে সে হো হো ক'রে এক বীভৎস হাসি হেসে উঠল, যদিও তার হল্‌দে চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছিল তবু আমার মনে হ'ল সিস্টার ঈডিথ রাগ না ক'রে এই ভেবে আশ্বস্ত হ'ল যে, ভগবান তার কাছে নিতান্ত এক দয়ার পাত্রকে, ধ্বংসপথের এক হতভাগ্য যাত্রীকে পাঠিয়েছেন। দেখলাম প্রথমটা সে থম্‌কিয়ে দাঁড়াল—যেন সে তাকে মার্‌লে; কিন্তু মুহূর্ত্ত কাল পরেই তার চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; সে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল।

"লোকটি চ'লে যাবার আগে সিস্টার ঈডিথ কেবল মাত্র একটি কথা বল্‌লে—পরের বছর নববর্ষের পর্ব্বদিনে তার নেমন্তন্ন রইল—সে এই আশ্রমের যেন নেমন্তন্ন রক্ষা ক'রে যায়। লোকটা অবাক্ হ'য়ে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে সিস্টার ঈডিথ বল্‌লে,—"দেখ, আমি ভগবানের কাছে রাত্রে প্রার্থনা করেছি,যেন আমাদের আশ্রমের প্রথম অতিথিকে তিনি সমস্ত বছরটা নিরাপদে রাখেন—যেন তাকে আবার পর বছরের পর্ব্বদিনে আমরা আশ্রমে অতিথি পাই—তুমি আবার এখানে এসে দেখাবে যে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন।

"সিস্টার ঈডিথের কথার মানে বুঝতে পেরেই লোকটা বিশ্রী মুখভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠল—"আহা, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক। ভগবানের দয়া! আমি আবার এসে তোমাকে দেখাব যে, তোমার এই পাগলামীতে সে ব্যাটার একটুও মাথা-ব্যথা নেই।"

ডেভিড হল্‌মের সেই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মনে পড়িয়া গেল; সে তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। আজ সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে আসিতে হইয়াছে; ক্ষণকালের জন্য তাহার নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে হইল—যেন কোন অলৌকিক শক্তির হাতে সে পুতুলের মতন চালিত হইতেছে—তাহার এই

বিদ্রোহ সম্পূর্ণ নিরর্থক। কিন্তু সে এই দুর্ব্বলতাকে দূর করিতে চেষ্টা করিল না, সে কিছুতেই এই অত্যাচার সহ্য করিবে না—সে প্রয়োজন হইলে শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত বিদ্রোহ করিবে।

সিসটার মেরী যতক্ষণ গত বৎসরের এই ঘটনার কথা বর্ণনা করিতেছিলেন যুবকটি উত্তরোত্তর অধীর হইয়া উঠিতেছিল; সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"সিস্টার মেরী, আপনি এখনো সেই পশুটার নাম করেননি বটে, কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি সেই লোকটাই ডেভিড হল্‌ম্।"

সিস্টার মেরী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

নিদারুণ হতাশায় দুই হাত প্রসারিত করিয়া যুবক বলিয়া উঠিল, "হা ঈশ্বর।—

"সিস্টার মেরী, আপনি কেন তাকে এখানে আন্‌বার জন্যে জেদ্ কর্‌ছেন—সেই ঘটনার পরে আপনি তার কোনো উন্নতি দেখেছেন? মনে হচ্ছে যেন আপনি তাকে এখানে আনিয়ে সিস্টার ঈডিথকে দেখাতে চান যে, ভগবানের কাছে তার প্রার্থনা বিফল হয়েছে। তাঁকে এত ব্যথা দিচ্ছেন কেন, বুঝতে পার্‌ছি না।"

সিস্টার মেরী অস্থির হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন, তাঁহার চোখে ক্রোধও ফুটিয়া উঠিল—তিনি বলিলেন, —"আমার কথা এখনো শেষ……"

যুবকটি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "সিস্টার মেরী, আমরা প্রতিহিংসার বশে যেন কোনো কাজ না ক'রে বসি, এটা আমাদের দেখতে হবে। আমার অন্তরের দুষ্টবুদ্ধি আমাকে বল্‌ছে আজ এই মুহূর্ত্তে ডেভিড হল্‌ম্‌কে ডেকে এনে দেখাতে যে, এক পবিত্র মহিমময়ী আত্মা শুধু তারই জন্যে আজ দেহত্যাগ কর্‌তে বসেছেন। আমি বুঝতে পার্‌ছি, সিস্টার মেরী, যে আপনি লোকটাকে বুঝিয়ে দিতে চান যে, সেই রাত্রে তার ছেঁড়া কোটটা সেলাই কর্‌তে গিয়ে সিস্টার ঈডিথ এক ছোঁয়াচে ব্যারাম ধরিয়ে আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমিও আপনাকে অনেক বার বল্‌তে শুনেছি যে, সেই রাত্রির পর একদিনও সিস্টার ঈডিথ সুস্থ ছিলেন না। কিন্তু এর কি কোনো প্রয়োজন আছে? আমরা যারা সিস্টার মেরীর সৎসঙ্গ এতকাল ভোগ করেছি স্বয়ং আজও যাঁরা তাঁর সম্মুখে বর্ত্তমান—তাদের কি এমন নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত?"

মহিলাটি টেবিলের উপরে ঝুঁকিয়া মুখ না তুলিয়াই ধীর শান্তভাবে বলিলেন, "প্রতিহিংসা? কোনো লোককে একথা বুঝিয়ে দেওয়া কি প্রতিহিংসা নেওয়া যে, সে এককালে কি অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী ছিল—আজ নিজের দোষে তা হারিয়েছে? মর্‌চে-পড়া লোহাকে আগুনের মধ্যে দিয়ে খাঁটি ক'রে নেওয়াকে কি তুমি প্রতিহিংসা মনে কর?"

যুবকটি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আপনি যা বল্‌ছেন তা আমি মেনে নিচ্ছি। ডেভিড্ হল্‌মের বিবেকের উপর অনুতাপের বোঝা চাপিয়ে আপনি তাকে পরিবর্ত্তিত কর্‌তে চান। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে, এটা আমাদেরই গোপন রাগ ও প্রতিহিংসার ফল হ'তে পারে? সিস্টার মেরী, আমরা কখন্ কি করি সব সময় ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না। ভুল করা অসম্ভব নয়।"

সিস্টার মেরীর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। অন্তরের গভীর আত্মত্যাগের প্রেরণায় উদ্ভাসিত শান্তদৃষ্টি লইয়া যুবকটির দিকে তিনি চাহিলেন—তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—আজ রাত্রে আমার নিজের অন্তর আমাকে প্রতারিত করিবে না—আমি নিজের জন্য কিছুই কামনা করি না।

যুবক লজ্জিত হইয়া উত্তর দিতে গেল, কিন্তু তাহার মুখে কথা জুটিল না। পরমুহূর্ত্তেই সে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। তার বহুক্ষণের রুদ্ধ আবেগ ফাটিয়া বাহির হইল—সে কাঁদিতে লাগিল।

মহিলাটি তাহাকে বাধা দিলেন না—তিনি নিঃশব্দে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—ভগবান, আজিকার ভয়াবহ রাত্রি শান্তিতে পার করিয়া দাও। আমি তোমার দুর্ব্বলতম সন্তান—তোমাকে অতি সামান্যই বুঝি—আমাকে শক্তি দাও যেন আমার বন্ধুদের সাহায্য করিতে পারি।

সিস্টার ঈডিথের অসুখের সে-ই যে একমাত্র কারণ,

বন্দী ডেভিড হল্‌ম্ এই অভিযোগ কানেও আনিল না। কিন্তু যখন যুবকটি উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল সে চমকিত হইয়া উঠিল; সে যেন একটা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার এই ভাব সে জর্জ্জের নিকট গোপন করিল না। তাহার হৃদয় এই ভাবিয়া আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, ওই সুন্দর যুবকটির অসীম ভালোবাসা পাইয়াও সিস্‌টার ঈডিথ তাহাকেই ভালোবাসিয়াছে।

যুবকটি ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিল। সিস্‌টার মেরী প্রার্থনা শেষ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "গুস্তাভ্‌সন্, সিস্‌টার ঈডিথ ও ডেভিড হল্‌ম্ সম্বন্ধে আমি এইমাত্র যা বললাম তোমার মনে সেই কথা জেগে তোমাকে পীড়া দিচ্ছে—তা বুঝতে পারছি।"

কোটের হাতায় মুখ লুকাইয়া যুবক শুধু বলিল, "হঁ্যা"—তাহার সমস্ত দেহ বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল।

"গুস্তাভ্‌সন্, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি তোমার ব্যথা কোথায়। আমি আর একজনের কথা জানি যে সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে সিস্‌টার ঈডিথকে ভালবেসেছে—সিস্‌টার ঈডিথও এই নিবিড় ভালোবাসার কথা জেনে অবাক্ হয়েছে। তার ধারণা ছিল যে, সে তার চাইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এমন কোনো লোক না হ'লে হৃদয় দান কর্‌তে পারে না; ভালোবাসা সম্বন্ধে তোমার মতও হয় ত তাই। দুর্দ্দশাক্লিষ্ট হতভাগ্যদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করার জন্যে আমরা প্রাণপাত কর্‌তে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের নিবিড় ভালোবাসা—যে,ভালোবাসায় পুরুষ ও স্ত্রী অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হয়—আমরা সেই অভাগ্যদের কাউকেই দিতে পারি না। তাই আমি যখন বল্‌ছি সিস্‌টার ঈডিথের মন অন্যত্র বাঁধা পড়েছে—তোমার মন ব্যথিত হচ্ছে।"

যুবকটি নড়িল না। সে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ভূমিশায়িত অদৃশ্য লোকটি আরো স্পষ্টভাবে সকল কথা শুনিবার জন্য টেবিলের কাছে যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জর্জ্জ অবিলম্বে তাহাকে নিরস্ত করিল, "ডেভিড, তুমি যদি নড়াচড়া কর তা হ'লে আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব যা তুমি কল্পনাও কর্‌তে পারনি।" ডেভিড, জানিত যে, লোকটা যাহা বলে তাহাই করে—এবং তাহার অদ্ভুত ক্ষমতাও কম নয়; সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল।

সিস্‌টার মেরী সহসা অধীর আবেগে পাংশু মুখে বলিয়া উঠিলেন, "শান্তি শান্তি। গুস্তাভ্‌সন্, আমরা কে যে তার বিচার কর্‌তে বসেছি। এটা কি সত্যি নয় যে, হৃদয় যখন গর্ব্বান্ধ থাকে তখনই সে এই পৃথিবীর মহৎ ও ঐশ্বর্য্যবান্‌কে প্রেমার্ঘ্য দেয়? কিন্তু যে-হৃদয়ে করুণা ও নম্রতা ছাড়া কিছু নেই সে—নিষ্ঠুরতা ও অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে যে পড়েছে—যে সবচাইতে বিপথে গেছে, তাকে ছাড়া আর কাকে ভালোবাস্‌তে পারে?"

এই কথায় ডেভিড হল্‌মের রাগ হইল। সে মনে মনে বলিল—"আরে এ—ত আচ্ছা মজা, তোমার সম্বন্ধে লোকে কি বল্‌ছে না বল্‌ছে, তাতে তোমার যায় আসে কি?—তোমার কি ইচ্ছা যে, ওরা তোমার খুব গুণগান কর্‌বে?"

গুস্তাভ্‌সন্ মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল, সিস্‌টার মেরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "সিস্‌টার মেরী, আমার দুঃখের শুধু এইমাত্র কারণ নয়।"

"হ্যাঁ গুস্তাভ্‌সন্, আমি তা জানি, তুমি কি বল্‌তে চাচ্ছ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—কিন্তু সিস্‌টার ঈডিথ প্রথমটা জান্‌ত না যে ডেভিড হল্‌ম্ বিবাহিত লোক,—" তারপর একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তার সমস্ত ভালবাসা ডেভিড্‌কে সৎপথে আন্‌বার জন্যে নিঃশেষিত হ'য়েছিল—না হ'লে এই অদ্ভুত ভালবাসার অন্য কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। আজ যদি ডেভিড্ হল্‌ম্ তার সামনে দাঁড়িয়ে অনুতপ্ত-চিত্তে ভগবানের করুণা প্রার্থনা কর্‌ত তা হ'লে সিস্‌টার ঈডিথ অপার্থিব সুখ পেত।"

যুবক আবেগে সিস্‌টার মেরীর হাত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিল।—তাঁহার শেষ কথায় সে আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"তা হ'লে আমি যে ভালোবাসার কথা মনে কর্‌ছি—এটা সে ভালোবাসা নয়!"

মহিলাটি যুবকের এই আত্মপ্রবঞ্চনা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "সিস্‌টার

নর-নারী

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস]

ঈডিথ তার হৃদয়ের গোপন কথা আমার কাছে কখনো প্রকাশ করেনি। হয়ত বা আমারই ভুল হচ্ছে।"

গুস্তাভসন্ গম্ভীরভাবে বলিল, "যদি সিস্টার ঈডিথের নিজের মুখ থেকে আপনি কিছু না শুনে থাকেন তা হ'লে আমার মনে হয় আপনার ভুল হচ্ছে।"

দরজার পার্শ্বে বসিয়া ডেভিড হল্‌মও গম্ভীর হইল। কথাবার্ত্তার ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া সে খুসী হইল না।

"গুস্তাভসন্, আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি না যে, প্রথম যখন সিস্টার মেরী ডেভিড হল্‌ম্‌কে দেখেছিল তখন তার মনে শুধু দয়া ছাড়া আর কোনো ভাব জেগেছিল। এবং পরেও যে তাকে ভালোবাস্‌বার কোনো বিশেষ কারণ ঘটেছিল তাও নয়। ক্বচিৎ কদাচিৎ সিস্টার ঈডিথের সঙ্গে তার দেখা হ'ত—এবং বরাবরই সে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। প্রায়ই অনেক স্ত্রীলোক এসে অভিযোগ ক'রে যেত যে, ডেভিড হল্‌ম্ তাদের স্বামীদের নানা পাপ প্রলোভন দেখিয়ে তাদিকে কাজ কর্‌তে দিচ্ছে না; সহরে অন্যায়, নিষ্ঠুরতা ও পাপ বেড়ে চলেছে। যখনই এই হতভাগ্যদের সঙ্গে সে মিশত তখনই তাদের সর্ব্বনাশ হ'ত—অধিকাংশ অন্যায়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে মূলে ডেভিড হল্‌ম্‌কেই পাওয়া গেছে। সিস্টার ঈডিথ যে, প্রকৃতির লোক—ডেভিডের এই দুর্দ্দান্তপণাই তাকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে ঈডিথকে প্ররোচিত করেছিল। এই বন্য পশুকে সে তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিয়ে তাড়া ক'রে ফির্‌ছিল—সে যতই তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল—ততই ঈডিথ উৎসাহিত হ'য়ে তাকে যেন আক্রমণ কর্‌তে চেষ্টা করেছে। তার বিশ্বাস ছিল যে, একদিন-না-একদিন সে জয়লাভ কর্‌বেই, কারণ তার নিজের শক্তি যে ডেভিডের শক্তির চেয়ে বেশী সে-বিষয়ে তার সন্দেহ মাত্র ছিল না।"

তাঁহার সঙ্গী বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সিস্টার মেরী আপনার কি সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে, সিস্টার ঈডিথ ও আপনি একটা তাড়িখানায় ঢুকে পতিত-আশ্রমের বিজ্ঞাপন বিলি ক'রে ফির্‌ছিলেন? সেদিন সিস্টার ঈডিথ ডেভিড হল্‌ম্‌কে একটা টেবিলে এক ছোক্‌রার সঙ্গে ব'সে থাক্‌তে দেখেছিলেন। ডেভিড হল্‌ম্ আপনাদের সম্বন্ধে কুৎসিৎ ঠাট্টা কর্‌ছিল, লোকটা সেই কথা শুনে ডেভিডের সঙ্গে হাস্‌ছিল। সেই যুবকটিকে দেখে সিস্টার ঈডিথ ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি তার কানে কানে বলেছিলেন অমনভাবে ধ্বংসের পথে নিজেকে ছেড়ে না দিতে। যুবকটি তাঁর কথার উত্তর দেয়নি কিম্বা তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েও যায়নি—কিন্তু তাকে বহু কষ্টে তার সঙ্গীদের কাছে একটা কষ্ট-হাসি হাস্‌তে হয়েছিল। সে তাদের মধ্যে থেকে সবারই মত গ্লাসে মদ ঢেলে নিলে, কিন্তু তার ঠোঁট পর্য্যন্ত কিছুতেই সে গ্লাস তুল্‌তে পারেনি। ডেভিড হল্‌ম্ এবং অন্যান্য সকলে তাকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিল যে, সে সিস্টারের কথায় ভয় পেয়েছে। কিন্তু সিসটার মেরী, ভয় পাওয়া দূরে থাক্ সে তাঁর করুণা দেখে অভিভূত হ'য়েছিল—তিনি যে তার ওপর দয়া ক'রে তাকে সাবধান ক'রে দিতে দ্বিধা করেননি এইটাই সে যুবকের মনে তীরের মত বিঁধেছিল; তার মনে এমন একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেল যে, সে অন্য সকলকে ছেড়ে তাঁর পথে চলাই স্থির করেছিল। এঘটনাটা যে সত্যি তা আপনি জানেন। আরো জানেন যে, সেই হতভাগ্য যুবকটি কে।"

সিস্টার মেরী শান্তভাবে বলিলেন, "আমি তাকে জানি গুস্তাভসন্, সে সেদিন থেকে আমাদের একান্ত বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। সেদিন সিস্টার ঈডিথ ডেভিড হল্‌ম্‌এর শয়তানীকে পরাস্ত করেছিল বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে নিজে পরাজিত হয়েছে। সেই পর্ব্বরাত্রে সে এমন ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল যে, তাকে সেদিন থেকে বরাবরই সর্ব্বনেশে কাশরোগে কষ্ট পেতে হয়েছে—আজও সেই রোগেই সে ভুগছে। এই অসুস্থতা তার প্রধান বাধা ছিল এবং হয়ত এইজন্যেই সে ঠিকমত লড়তে পারেনি।"

যুবকটি বাধা দিয়ে বল্লে, "সিস্টার মেরী, আপনি যা বল্লেন, তাতে ক'রে ত বোঝা যায় না যে, সিস্টার ঈডিথ ডেভিড হল্‌ম্‌কে ভালোবাস্‌তেন।"

"তুমি ঠিক বলেছ গুস্তাভসন্—প্রথমটা তা বোঝা যায়নি বটে। পরে আমি কেন এই ভালোবাসার কথা

ভেবেছি তা বল্‌ছি। তুমি সেই দর্জ্জিমেয়েটির কথা জান—সে যক্ষ্মারোগে কষ্ট পাচ্ছিল। এই ব্যারামের বিরুদ্ধে সে লড়তে ত্রুটি করেনি—পাছে আর কেউ তার ছোঁয়াচ লেগে এই ব্যারাম ধরিয়ে বসে এই ভয়ে সে সর্ব্বদা ভয়ানক সাবধানে থাক্‌ত। তার একমাত্র ছেলেকে সে এই ব্যারাম থেকে বাঁচাতে কত চেষ্টা করেছে। সে আমাদের একদিন বল্‌লে যে, একদিন রাস্তায় হঠাৎ তার বিষম কাশি পায়; সে সন্তর্পণে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়েছিল এমন সময় একটা গুণ্ডাগোছের লোক তার কাছে গিয়ে তাকে গাল দিয়ে বল্‌লে যে, তার অত সাবধানে থাকার দর্‌কার কি? সে বলেছিল, 'আমারও যক্ষ্মা আছে। ডাক্তার আমাকে সাবধান হ'তে বলে, কিন্তু আমি সাবধান হ'ব কেন? আমি সুবিধা পেলেই লোকের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কাশি, যেন তারাও ব্যারামে প'ড়ে শীগ্‌গির স্বর্গরাজ্য দেখতে পায়। অন্যলোকে আমাদের চাইতে সুখে থাক্‌বে কেন?' সে আর কিছু না ব'লে চ'লে যায়। কিন্তু দুর্ভাগা মেয়েটি এত ভয় পেয়েছিল যে, সমস্ত দিন সে জ্বরে ভুগতে থাকে। মেয়েটি বলেছিল, যে, লোকটা শতচ্ছিন্ন বস্ত্র প'রে থাক্‌লেও দেখতে লম্বা ও সুন্দর। তার মুখটা ঠিক স্পষ্ট মনে পড়ছিল না বটে, কিন্তু সমস্ত দিন ধ'রে সে দেখেছিল দুটো ভীষণ জ্বলজ্বলে হলদে চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। তার ভয়ের সবচাইতে বেশী কারণ ছিল যে, লোকটা মাত্‌াল ছিল না, আর তাকে পাগল ব'লেও বোধ হয়নি। তার কথায় বার্ত্তায় বোধ হ'য়েছিল যেন সমস্ত মানুষজাতটার ওপর তার ভীষণ ঘৃণা!

"লোকটার বর্ণনা শুনে সিস্‌টার ঈডিথ তাকে তৎক্ষণাৎ ডেভিড হল্‌ম্ ব'লে চিনে নিলে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে তার হ'য়ে তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্‌তে লাগল। সে মেয়েটিকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লে যে, সে শুধু ভয় দেখিয়েছে, আসলে তার মতলব খারাপ নয়। সে বললে, "তা ছাড়া অমন একজন সবল সুস্থ লোকের যক্ষ্মা আছে এ কখনই সম্ভব নয়। তোমাকে এমন ক'রে ভয় দেখিয়ে আমোদ করাটা তার খুবই অন্যায় হয়েছে, কিন্তু তার যক্ষ্মা থাক্‌লেও লোককে অকারণে ব্যারামের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দেবার মত রাক্ষস সে নিশ্চয়ই নয়।

"আমরা প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলাম আমরা বিশ্বাস করি যে, লোকটা এত ভয়ানক যে সে যা বলেছে তা কর্‌তে একটুও দ্বিধা কর্‌বে না। সিস্‌টার ঈডিথ আরো বেশী জোর দিয়ে তার পক্ষে কথা বল্‌তে লাগল এবং আমরা তাকে এত জঘন্য চরিত্রের লোক ভাবছি দেখে আমাদের ওপর একটু বিরক্তও হ'ল।"

নিশ্চল জর্জ্জের ভাব দেখিয়া বুঝা গেল যে, সে আশে-পাশের সমস্ত ঘটনাই দেখিতেছে। সে নত হইয়া তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ডেভিড, আমার মনে হয় এই মেয়েটির কথাই ঠিক, যে মেয়েটি তোমার বিরুদ্ধে এই অপবাদ অবিশ্বাস ক'রে তর্ক করেছে সে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।"

সিস্‌টার মেরী বলিলেন, "গুস্তাভসন্, হয়ত সিস্‌টার ঈডিথের এ ব্যবহার শুদ্ধমাত্র দয়া-প্রণোদিত এবং তার দুদিন পরের ঘটনাটাও হয়ত তাই। সে-দিন সন্ধ্যাবেলায় সিস্‌টার ঈডিথ নিতান্ত বিমর্ষভাবে বাড়ী ফিরে এল—তার কর্ত্তব্যের পথে অজস্র বিঘ্ন দেখে সে হতাশ হ'য়ে পড়েছিল এমন সময় ডেভিড হল্‌ম্ এসে তার সঙ্গে কথা বল্‌তে লাগল। সে নানারকমের ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে যে, এবার থেকে সিস্‌টার ঈডিথ শান্তিতে নিরুপদ্রবে থাক্‌তে পার্‌বে কারণ এই সহর ছেড়ে সে চ'লে যাচ্ছে।

"আমি ভেবেছিলাম, এই সংবাদে সিস্‌টার ঈডিথ সুখী হবে, কিন্তু তার উত্তর শুনে বুঝলাম যে সে ভারী দুঃখিত হয়েছে। সে সহজ ভাবে বল্‌লে, ডেভিড সহরে থাক্‌লে সে সুখীই হবে; তাতে ক'রে তাকে সৎপথে আন্‌বার জন্যে সে আরো কিছুদিন চেষ্টা কর্‌তে পার্‌বে।

"ডেভিড হল্‌ম্ বল্‌লে যে, সে এজন্যে দুঃখিত; কিন্তু এখানে আর সে কোনো রকমে থাক্‌তে পারে না—সে একটা লোকের খোঁজে—সুইডেন যাচ্ছে; লোকটাকে তার চাই-ই; তাকে না পেলে তার শান্তি নেই।"

"সিস্‌টার ঈডিথ এমন আগ্রহের সঙ্গে এই লোকটার খবর জিজ্ঞেস কর্‌লে যে, আমি সিস্‌টার ঈডিথের কানে কানে বল্‌তে গেলাম যে ওই জঘন্য পশুটার কথায় অমন

বিশ্বাস যেন সে না করে। ডেভিড হল্‌ম্ সেটা লক্ষ্য করেনি। সে বল্‌লে যে, সে সেই লোকটির খোঁজ পেলেই জানাবে, তাকে যে আর দুনিয়াভোর টোটো ক'রে ভিখিরীর মত ঘুরে বেড়াতে হবে না এ শুনে নিশ্চয়ই সে সুখী হবে।

"এই ব'লে সে চ'লে গেল এবং সম্ভবতঃ সে তার কথা রেখেছিল। অনেককাল আর তার কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। আমরা আশা করেছিলাম যে, সিস্‌টার ঈডিথ আর ওর সম্বন্ধে চিন্তা করবে না ও লোকটাও আর আমাদের কাছে আসবে না। আমার মনে হ'ত যে সে যেখানে যাবে সেখানেই শনিও সঙ্গে সঙ্গে যাবে। ইতিমধ্যে একদিন একটা মেয়ে আমাদের আশ্রমে এসে সিস্‌টার ঈডিথের কাছে ডেভিড হল্‌ম্‌এর খোঁজ করলে। সে বল্‌লে যে, সে ডেভিড হল্‌মের স্ত্রী ছিল, তার মাতলামী আর অত্যাচার সইতে না পেরে তাকে পরিত্যাগ করেছে। সে চুপিচুপি তার ছেলেপিলেগুলো নিয়ে স'রে প'ড়ে তাদের আগের বাড়ী থেকে অনেক দূরে এই সহরে এসেছে। ডেভিড হল্‌ম্‌ও বিশেষ চেষ্টা করেনি এদের খুঁজে বের করতে। এখন মেয়েটি এক কারখানায় কাজ করে, মাইনে মন্দ পায় না, নিজের আর ছেলেদের স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়। মেয়েটির পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ ভদ্র —দেখলে অভক্তি হয় না। কারখানার মেয়ে মজুরদের সে অনেকটা অধ্যক্ষের মতো এবং যা তার রোজগার ছিল তা দিয়ে বেশ ভালো বাড়ীতে দরকারী জিনিষপত্র গোছগাছ ক'রে বেশ থাকতে পারত। আগে যখন সে স্বামীর ঘর করত, তখন তার নিজের আর ছেলেদের পেটের খোরাকই ভাল ক'রে জুটত না।

"সে সম্প্রতি শুনেছে যে, তার স্বামীকে এই সহরে দেখা গেছে, আশ্রমের সিস্‌টারা তাকে জানেন—সে তাই স্বামীর খবরাখবর নেবার জন্যে এসেছিল।

"গুস্তাভসন্, তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতে আর সিস্‌টার ঈডিথের সেদিনকার মূর্ত্তি দেখতে তা হ'লে তা কখনো তুমি ভুলতে পারতে না।

মেয়েটি এসে যখন নিজের পরিচয় দিলে সিস্‌টার ঈডিথের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হ'য়ে গেল, মনে হ'ল যেন সে মৃত্যুশোক পেয়েছে; কিন্তু সে অবিলম্বে সাম্‌লে নিলে, তার মুখ-চোখ এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, মনে হ'ল সে নিজেকে সম্পূর্ণ জয় করেছে, নিজের জন্যে পার্থিব কোনো জিনিষ যেন তার কাম্য নেই। সে এমন চমৎকার ক'রে ডেভিড্ হল্‌মের স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌লে যে, মেয়েটি কাঁদতে লাগ্‌ল। সিস্‌টার ঈডিথ তাকে একটিও অনুযোগের কথা বলেনি বটে, কিন্তু সে তার স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে ব'লে তার মনে অনুতাপ জাগিয়ে দিয়েছিল। এমন কি তার কথাবার্ত্তা শুনে মেয়েটি নিজেকে নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর ভাবতে লাগল; তার স্বামীর প্রতি তার প্রথম-বিবাহিত-যৌবনের ভালোবাসা ফিরে এল। সিস্‌টার ঈডিথ মেয়েটির কাছ থেকে তাদের বিয়ের প্রথম দিককার সংসার-যাত্রাকালে তার স্বামী কেমন ছিল—সে-সব কথা জেনে নিলে—স্বামীর সহিত মিলনের বাসনা তার মনে জাগিয়ে দিলে। তুমি মনে কোরো না গুস্তাভসন্, যে সিস্‌টার ঈডিথ হল্‌মের বর্ত্তমান অধঃপতনের কথা গোপন রাখছিল—সে কেবল হল্‌মের স্ত্রীর মনে স্বামীকে তুলে ধরবার, রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা জাগাচ্ছিল। সে ইচ্ছায় তার নিজের অন্তর পূর্ণ ছিল।"

দরজার পাশে মৃত্যুযানের চালক পুনরায় নত হইয়া তাহার বন্দীকে লক্ষ্য করিল এবং নিঃশব্দে আবার দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পূর্ব্বতন বন্ধুর মুখে একটা নিবিড় অন্ধকার ভাব। জর্জ্জ তাহা সহিতে পারিতেছিল না, সে মুখের আবরণ টানিয়া দিয়া সোজা ভাবে দেওয়ালে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিস্‌টার মেরী বলিলেন, "সিস্‌টার ঈডিথের সঙ্গে কথপোকথনে হল্‌মের স্ত্রীর মনে স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে পাপের পথে অবাধে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে অনুতাপ জেগেছিল। এই ভাব সে এই প্রথম অনুভব করলে। অবিশ্যি এই প্রথম দিনই তার স্বামীকে তার ঠিকানা জানতে দেওয়ার কথা হয়নি বটে, তবে পরে সেটাও ঠিক হ'ল। গুস্তাভসন্, আমি বিশেষ জোর ক'রে বল্‌তে পারি না সিস্‌টার ঈডিথ তার মত পরিবর্ত্তন করিয়ে তাকে বিশেষ কিছু ভরসা দিয়েছিল কি না; তবে আমি জানি যে,সে তার স্বামীকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করতে বলেছিল।

সিস্টার ঈডিথ ভেবেছিল, হয়ত তাতে ক'রে হল্‌মের উপকার হবে। আমি বল্‌তে বাধ্য যে, সে সিস্টার ঈডিথের প্ররোচনায় একাজ করেছিল; ডেভিড হল্‌ম্ যাদের চরম সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌তে পারে তাদের সঙ্গে আবার মিলিত হ'ল। আমি এবিষয়টা অনেক ভেবে দেখেছি ও এখনো ভাবছি। আমি এখনো বুঝতে পারি না যে, যদি হল্‌মের উপর তার নিবিড় ভালবাসা না-ই ছিল তা হ'লে সে নিজের ঘাড়ে এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব নিতে স্বীকার পেলে কেমন ক'রে?"

মহিলাটি বিশেষ জোর দিয়ে শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী রমণীর ভালোবাসার কথা শুনিয়া অদৃশ্যদেহধারী যে দুইজন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা শান্ত হইল। যুবকটি চোখের উপর হস্ত আচ্ছাদিত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ভূমিশায়ী লোকটির মুখে এই ঘরে আনীত হইবার পূর্ব্বে যে ভয়াবহ ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তেমনই ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল।

সিস্টার মেরী বলিলেন, "ডেভিড হল্‌ম্ কোথায় গেছে আমরা কেউই জান্‌তাম না; কিন্তু সিস্টার ঈডিথ এক ভিখারীকে দিয়ে তাকে খবর পাঠাল যে তাকে তার স্ত্রী ও ছেলেদের খবর দিতে পারে; সে অবিলম্বে হাজির হ'ল। সিস্টার ঈডিথ স্বামী-স্ত্রীর মিলন ক'রে দিলে, তাকে ভদ্রপোষাক পর্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিলে এবং সহরে এক রাজমিস্ত্রীর কাছে তাকে এক কাজও দিলে। সিস্টার ঈডিথ হল্‌মের কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি চায়নি। সে জান্‌ত, যে ওই প্রকৃতির লোকদের প্রতিজ্ঞা দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। বুদ্ধিমান কৃষকের মত, যে বীজ আগাছার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছে তাকে তুলে মাটীতে সে পুঁতে দিলে; তার বিশ্বাস ছিল সে কৃতকার্য্য হবে।"

"যদি তার শরীর অসুস্থ হ'য়ে না পড়ত তবে হয়ত সে কৃতকার্য্য হ'ত, কিন্তু গোড়াতেই সিস্টার ঈডিথের ফুসফুসের ব্যারাম হ'ল। সেটা যখন সেরে আস্‌তে লাগল ও সে শীগ্‌গির সম্পূর্ণ সুস্থ হবে ব'লে আমরা আশা কর্‌লাম তখনই সে আবার আক্রান্ত হ'ল ও আমরা তাকে স্বাস্থ্যাগারে পাঠাতে বাধ্য হ'লাম।

"ডেভিড হল্‌ম্ যে তার স্ত্রীর প্রতি কেমন ব্যবহার করেছিল সেকথা বলার প্রয়োজন নেই· তুমি তা বেশ জান। আমরা খালি সিস্টার ঈডিথকে এ বিষয়ে কিছু জান্‌তে দিইনি। জান্‌লে সে ব্যাথা পেত, আমরা আশা করেছিলাম যে, এবিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেই দেহত্যাগ কর্‌বে, কিন্তু আজ আর সে বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয় সে সমস্ত জানে, কেমন ক'রে তা বল্‌তে পারি না।

"ডেভিড্ হল্‌মের সঙ্গে তার যে অদ্ভুত অপার্থিব বন্ধন ছিল তা এত নিবিড় যে, আমার বিশ্বাস, সে কোনো অলৌকিক উপায়ে ডেভিড-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার জান্‌তে পারে এবং সে সমস্ত জানে ব'লেই আজ সমস্ত দিন তার সঙ্গে কথা বল্‌বার জন্য ছটফট কর্‌ছে। সে ডেভিডের স্ত্রী ও ছেলেদের অকথিত যন্ত্রণার কারণ হয়েছে এবং তার কৃতকার্য্যের প্রতিকার কর্‌বার তার আর বেশী সময় নেই। আর আমরাও এমন অসহায় যে, ডেভিডকে এখানে নিয়ে এসে যে তার মৃত্যুকালে কিছু সাহায্য কর্‌ব তাও পার্‌ছি না।"

যুবকটি প্রশ্ন করিল, "সিস্টার মেরী, তাতে লাভ হবে কি? তিনি এত দুর্ব্বল যে, তাকে কিছু বলবার ক্ষমতাও তাঁর নেই।"

সিস্টার মেরী দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "তার হ'য়ে আমিই ডেভিডকে কথা বল্‌ব। মৃত্যু-শয্যার পাশে যদি আমি কথা বলি তা হ'লে সে বোধ হয় তা শুন্‌বে।"

"তাকে আপনি কি বল্‌বেন? বল্‌বেন কি সিস্টার ঈডিথ তাকে ভালোবাস্‌তেন?"

সিস্টার মেরী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার বুকের উপর হস্ত রাখিয়া নিমীলিত নেত্রে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—

"ভগবান, দয়া ক'রে সিস্টার ঈডিথের মৃত্যুর আগে ডেভিড হল্‌ম্‌কে তার কাছে এনে দাও। তাকে বুঝিয়ে দাও সিস্টার ঈডিথ তাকে কত ভালোবাস্‌ত! তার ভালোবাসার আগুন যে তার আত্মার কঠোরতাকে গলিয়ে দেয়। ভগবান, তার এই ভালোবাসা কি ডেভিড-হল্‌ম্‌এর অন্তরকে গলাতে পার্‌বে না? হে শক্তিমান,

তুমি আমায় সাহস দাও, আমি যেন সিস্টার ঈডিথকে এই দুঃখ থেকে ত্রাণ কর্‌বার চেষ্টা না করি—যেন তার প্রেমের আগুনে ডেভিডের আত্মা পূত হয়। ভগবান, এই প্রেম সে অনুভব করুক—আত্মার মধ্যে স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহের মত, দেবদূতের পক্ষ-বিধূমিত বাতাসের মত, পূর্ব্বাশার তমিস্রাবিদারীনবোদিত অরুণের মত। সে যেন না ভাবে যে, আমি তাকে তার কৃতকার্য্যের ফল দেখিয়ে প্রতিহিংসা নিচ্ছি—তাকে বুঝিয়ে দাও—যে সিস্টার ঈডিথ কি নিবিড়ভাবে তার অন্তরাত্মাকে ভালোবেসেছে—যে আত্মাকে সে নিজেই পিষে নষ্ট কর্‌তে চেয়েছে। হে ভগবান!—"

সিস্টার মেরী সহসা চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন,—যুবকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোট গায়ে দিতেছিল—।

সে ধরা গলায় বলিল, "সিস্টার মেরী, আমি তাকে আন্‌তে চল্‌লাম, তাকে না নিয়ে আমি ফির্‌ব না।"

ডেভিড হল্‌ম্‌ দরজার পার্শ্ব হইতে জর্জ্জকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "জর্জ্জ, এখনো কি যথেষ্ট হয়নি? যখন আজ প্রথমে এখানে এসেছিলাম তখন ওদের কথাবার্ত্তায় মুগ্ধই হয়েছিলাম—আমার মন নরম হয়েছিল—এই ভাবে কথাবার্ত্তা চললে হয়ত অনুতপ্ত হ'য়ে পড়তাম কিন্তু আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা না বল্‌তে ওদের সাবধান করা তোমার উচিত ছিল।"

মৃত্যুযানের চালক উত্তর করিল না, ইঙ্গিতে ঘরের দিকে তাহাকে লক্ষ্য করিতে বলিল। খর্ব্বাকৃতি এক বৃদ্ধা ভিতরের ঘরের ক্ষুদ্র দরজা দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সে নিঃশব্দে কথোপকথননিরত দুইজনের পাশে আসিয়া গভীর আবেগে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—

"সময় হ'য়ে এসেছে—এখনই বুঝি সব শেষ হ'য়ে যাবে।"

(ক্রমশঃ)

ত্রিত্ববাদ*

মহেশচন্দ্র ঘোষ

চুনী-বাবু এই পুস্তিকাতে 'ত্রিত্ব-বাদ'-কে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এই তিন লইয়া ত্রিত্ববাদ। এই তিনের মধ্যে সম্বন্ধ কি সে-বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। চুনী-বাবু এ-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতেছে, তাঁহার এ-বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নাই। তিনি দুই স্থলে দুইপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাস এই দুইটি ব্যাখ্যা একই মতের ব্যাখ্যা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি দুইটি পৃথক্‌ মতকে একমত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। একটি মত এই—"এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিন জন বিভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।...ইঁহারা ঈশ্বরাভ্যন্তরে তিনজন মৌলিক পুরুষ"। পৃঃ ১৩।

এখানে চারিজনের কথা বলা হইল—ঈশ্বর এক; পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিন; মোট ৪ জন। Sabellius (স্যাবেলিয়াস্‌) নামক এক ব্যক্তি অতি প্রাচীনকালে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মত এই—The world development is the Trinitarian process in which the God who is essentially one shows himself forth as Father, Son and Spirit, appearing in the concrete reality of his being in these three determinate forms,(Baur : Church History, Voll ii., p 97) ইহার বিস্তৃত বিবরণ Dorner's Doctrine of the Person of Christ নামক গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে (১।২।১৫০—১৭১ ; ৪৭১ দ্রঃ)। স্যাবেলিয়াস্‌ যাহা বলিয়াছেন, লেখকও সেই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এই মত ৩২৫ সালের সভাতে (Council of Nicaea) বর্জ্জিত হইয়াছিল।

অপর একস্থলে লেখক অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি ইংরেজী কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার এইপ্রকার অনুবাদ করিয়াছেন:—

"পিতা অনন্য-জাত। তিনি সৃষ্ট বা জনিত নহেন। পুত্র পিতার অধীন। তিনি কৃত বা সৃষ্ট নহেন; কিন্তু পিতা হইতে জাত। পবিত্রাত্মা পিতা ও পুত্র হইতে সম্ভূত। তিনি অকৃত, অজাত ও অসৃষ্ট; কিন্তু পিতা ও পুত্র হইতে সতত নিঃসরণশীল"। পৃঃ ১৪।

এই অংশ কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দের সমষ্টি। অনুবাদও ঠিক হয় নাই।

এই অংশে জাত, সৃষ্ট, কৃত, উদ্ভূত এবং নিসৃত প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। কিন্তু সে পার্থক্য কি?

কয়েক স্থলে begotten শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'জাত'; আবার একস্থলে 'made' শব্দেরও অর্থ করা হইয়াছে জাত (made of none =অনন্যজাত)। 'Create' শব্দের প্রচলিত অর্থ 'সৃষ্টি করা'। কিন্তু দার্শনিক বিচারের সময়ে সাবধানে অনুবাদ করা উচিত। অবস্তু হইতে কোন বস্তুকে উৎপন্ন করিলে তাহাকে বলা হয় 'Create'; কিন্তু সৃষ্টি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্‌। তবে এ-সমুদায় বিচার অনাবশ্যক।

* ত্রিত্ববাদ—শ্রী চুনীলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত; এস্‌, পি. সি. ক হইতে রেভারেণ্ড্‌ ফাদার টি, ই, টি, শোর্‌ এম্‌-এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ২৮; মূল্য দুই আনা।

এখানে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে, এই দ্বিতীয় মত প্রথম মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্বিতীয় মতে পিতার মৌলিকত্ব; প্রথম মতে ঈশ্বরের মৌলিকত্ব এবং এই ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা।

লেখক একাধিক স্থলে আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, "কেহ যেন স্বপ্নেও না ভাবেন, যে, খৃষ্টানেরা প্রকৃত প্রস্তাবে তিন ঈশ্বরের অর্চনা করে।"

বার বার এক কথা বলিলেই যে তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে তাহা নহে। কেহ যদি বারবার বলে "আমি এখন সুষুপ্ত"—আমরা কি তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিব?

লেখক স্বীকার করিয়াছেন, "তিন জন মৌলিক পুরুষ"। মৌলিক পুরুষ যখন তিন জন, তখন ইহাদিগের চৈতন্যের কেন্দ্রও তিনটি। পুরুষ তিন জন, কেন্দ্র তিনটা অথচ খৃষ্টীয়ানগণ বলেন, এ তিনটি একই। ইহা অর্থশূন্য এবং যুক্তিশূন্য সিদ্ধান্ত।

তিন যদি এক হইতে পারে, তবে ভারতের বহু এক হইতে পারিবে না কেন? হিন্দু আচার্য্যগণ কি চিরকালই এই কথা বলিয়া আসিতেছেন না? বৈদিক যুগেও কি 'বহু'-কে 'এক' বলা হয় নাই? হিন্দুগণ কি বলিতে পারেন না, "আবার বলি, কেহ যেন স্বপ্নেও ভাবেন না যে হিন্দুরা প্রকৃত প্রস্তাবে বহু ঈশ্বরের অর্চনা করে"?

খৃষ্টিয়ানগণ তিন ঈশ্বর মানেন না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য লেখক এই যুক্তি দিয়াছেন :—

"খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রত্যক্ষভাবে ইহুদী ধর্ম্মজাত। ইহুদী ধর্ম্ম যে কিরূপ উৎকট একেশ্বরবাদী তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, খৃষ্টধর্ম্ম কি তাহার মূল হইতে এতটা স্বতন্ত্র বা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, ঈশ্বর একাধিক এরূপ বাতুলোচিত উক্তি এই ধর্ম্মে স্বীকৃত হয়?"

আমাদিগের বক্তব্য এই :—বাস্তব শিষ্যগণ যতদিন ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল ততদিন খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় একেশ্বরবাদীই ছিল। কিন্তু যখন হইতে খৃষ্টিয়ানগণ ইহুদী সমাজ হইতে পৃথক্ হইতে আরম্ভ হইল এবং গ্রীক্ সভ্যতার সংস্পর্শে আসিতে লাগিল তখন হইতেই ইহারা একেশ্বরবাদ হারাইতে লাগিল। অপরদিকে যতই একেশ্বরবাদ হইতে দূরে গমন করিতে লাগিল ততই ইহুদী সমাজ ইহাদিগকে সম্যক্ পরিবর্জ্জন করিল। তিন ঈশ্বরের মতের জন্য ইহুদীগণ আর খৃষ্টিয়ান্‌ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

Harnack (হার্ণ্যাক্) তাঁহার এক গ্রন্থে Mission and Expansion of Christianity, Vol. i) এবিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন Tertullian এবং Origenও খাঁটী একেশ্বরবাদী ছিলেন না (পৃঃ ৩৫)। হার্ণ্যাকের আর-একটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Many philosophic Christians (even in the second century) did not share this severely monotheistic idea of God : in fact, as early as the first century we come across modifications of it." পৃঃ ৩৫। অর্থাৎ প্রথম শতাব্দী এবং এমন কি দ্বিতীয় শতাব্দীতেও অনেক দার্শনিক খৃষ্টিয়ান খাঁটি একেশ্বরবাদী ছিলেন না।

খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের প্রধান উদ্দেশ্য—যীশুর ঈশ্বরত্ব স্থাপন। আমাদের দেশের এক কবি বলিয়াছেন—মেরীর তনয় যদি জগদীশ হয়,
ঘোষের তনয় তবে দোষের ত নয়।"

যীশুকে যদি ঈশ্বর বলা হয় তাহা হইলে চৈতন্য ও রামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিবার বলবত্তর কারণ রহিয়াছে। আর খৃষ্টিয়ান-সম্মত যুক্তি দ্বারা প্রত্যেক মানবেরই ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা যায়।

খৃষ্টিয়ানগণ বলিতে চাহেন, যীশু পিতার উপাদানেগ ঠিত; ভারতের একটা প্রধান মত প্রত্যেক মানবই ঈশ্বরের উপাদানে গঠিত। যীশু যে অর্থে ঈশ্বরের পুত্র, প্রত্যেক মানবই সেই অর্থে ঈশ্বরের সন্তান। কোন মানব বিষয়েই বলিতে পারি না—"your father, the devil" (যোহন ৮।৪৪ দ্রঃ)।

লেখক ত্রিত্ববাদকে সমর্থন করিবার জন্য অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কৃতকার্য্য হন নাই—তাহা তিনি নিজেই বুঝিয়াছেন। শেষে তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে :—

"আর-একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। কথাটি এই, সকল সময় সকল মতের ঠিক্ যুক্তি দেওয়া যায় না। যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলেই যে-কোন বস্তু অমূলক এরূপ মনে করা ধৃষ্টতা।"

লেখক এস্থলে যুক্তি না মানিবার যুক্তি দিয়াছেন। কথাটি দাঁড়াইতেছে এই—

'যাহা যুক্তিযুক্ত নয়, তাহাও মানিতে হইবে—অবশ্য তাহা যদি খৃষ্ট তত্ত্ব হয়।"

খৃষ্টিয়ানগণই যে কেবল এই কথা বলেন তাহা নহে। সমুদায় সম্প্রদায়েই এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ঐ-প্রকারের কথা বলিয়াই সমুদায় কুসংস্কার সমর্থন করিয়া থাকেন। যুক্তি বর্জ্জন করিবার যুক্তিকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলে জগতে কিছুই বর্জ্জনীয় থাকে না; পৌত্তলিকতার মধ্যে যাহা জঘন্যতম পৌত্তলিকতা, বামাচারের মধ্যে যাহা জঘন্যতম প্রবৃত্তিমার্গ, তাহাও গ্রহণীয় ও উপাদেয় বলিয়া প্রমাণিত হয়।

লেখক যুক্তি বর্জ্জনের সমর্থন করিতে যাইয়া বিজ্ঞানের অনুমানের (theoryর) কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, বিনা প্রমাণে বিজ্ঞানে অনেক 'অনুমান' স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

লেখক এস্থলে বিষম ভুল করিয়াছেন। জগতের প্রত্যক্ষ ঘটনা-সমূহ কিপ্রকারে সম্ভব হইয়াছে ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্যই বৈজ্ঞানিকগণ একটা theory অর্থাৎ অনুমান স্বীকার করিয়া লন। বিজ্ঞানের ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ কিন্তু ত্রিত্ববাদ কি এইপ্রকার একটা প্রত্যক্ষ ঘটনা? আর ত্রিত্ববাদকেই যদি একটা অনুমান বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব কোন্ প্রত্যক্ষ ঘটনা প্রমাণ করিবার জন্য ত্রিত্ব-বাদ রূপকল্পনা আবশ্যক হইয়াছে? যীশুর জীবনে কিংবা খৃষ্ট সমাজে এমন একটা ঘটনাও ঘটে নাই যাহাকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য ত্রিত্ব-বাদ রূপ কল্পনার আবশ্যক হইতে পারে। বিজ্ঞানের 'অনুমান' বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে—বিজ্ঞান-জগতে এমন একটি অনুমানও নাই যাহা ত্রিত্ববাদের ন্যায় দোষ-দুষ্ট।

তাহার পরে লেখক এই বলিয়া পুস্তিকা শেষ করিয়াছেন—"এই প্রণালীতে বিচার করিলে ত্রিত্ব-বাদ যে বর্জ্জনীয় নহে, বিগত দুই সহস্র বৎসরে খৃষ্টধর্ম্ম তাহা নানা উপায়ে প্রতিপন্ন করিয়াছে।"

কিন্তু খৃষ্ট দর্শন ও খৃষ্ট ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে "প্রথমে এই ত্রিত্ব-বাদ সাহিত্যে স্থান পায় নাই।"

যীশু নিজে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করেন নাই এবং তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। মার্ক্ লিখিত পুস্তকই যীশুর প্রাচীনতম জীবনচরিত। এই পুস্তকে দেখিতে পাই যে, শিষ্যগণ তাঁহাকে 'didas kalos' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইংরেজী বাইবেলে এই শব্দের অনুবাদে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (১) master অর্থাৎ প্রভু; (২) teacher অর্থাৎ শিক্ষক এবং (৩) doctor অর্থাৎ পণ্ডিত। এই শব্দের প্রকৃত অর্থ শিক্ষক। অপর তিন খানা জীবন-চরিতে didas kalosও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অনেক স্থলে যীশুকে Kurios অর্থাৎ প্রভু বলিয়াও সম্বোধন করা হইয়াছে। শিষ্যের শিষ্যগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না—তাঁহারা যীশুকে আরও

[illegible]তর আসন প্রদান করিলেন। কালে তাঁহাকে ঈশ্বরের স্থানে প্রতি-[illegible]ত করা হইল। সর্ব্বদেশেই এই প্রকার হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেবের [illegible]গণ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। যীশু-[illegible]য়েও এই প্রকার হইয়াছিল। কিন্তু সমাজে সর্ব্বশ্রেণীর লোকই [illegible]কে। প্রাচীন খৃষ্টিয়ান সমাজেও এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁহারা [illegible]প্রকার মতের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। Theodotus, Artemon, Beryllus, Arius প্রভৃতি বহু পণ্ডিত যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিতেন। যীশু-বিষয়ক নানা মতের সংঘর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে এই সমুদায় মীমাংসা করিবার জন্য ২৬৯ সালে Antioch (অ্যান্টিয়ক্) [illegible]রে এক সভা হয়। এই সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, পিতা ও পুত্র (অর্থাৎ যীশু) এক উপাদানে গঠিত নয়। যাহাকে গ্রীক্ ভাষায় Homo-ousios' বলা হয় তাহা এস্থলে অস্বীকার করা হইল। কিন্তু [illegible]হাই ত্রিত্ববাদের বিশেষত্ব। এ সভায় ত্রিত্ববাদ গৃহীত হইল না।

ত্রিত্ববাদিগণ এসিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইলেন না—আন্দোলন চলিতে লাগিল। ইহার পরে Nice নামক স্থানে ৩২৫ সালে এক সভা হয়। এই সভায় এরিয়াসের (Ariusএর) একত্ব-বাদ বর্জ্জন করিয়া ত্রিত্ব-[illegible] গ্রহণ করা হইল। ইহাতেও আন্দোলন থামিল না—একত্ব-বাদ [illegible] হইল না। সেইজন্য ৩৮১ সালে কন্স্টান্টিনোপল্ (Constantinople) নগরে আর এক সভা আহূত হইল। এ সভাতেও ত্রিত্ব-বাদ [illegible]ত হইয়াছিল।

ইহার পরে রাজশক্তি, জনশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা একত্ববাদকে বিনাশ করিবার জন্য নানা প্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। কিন্তু [illegible]তেও এ-মত সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল না।

[illegible]র্ণার (Dorner) বলেন—ষোড়শ শতাব্দীতে তিন শ্রেণীর লোক [illegible]বাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল (Doctrine of the Person of Christ; II, 2. 159)। প্রথম শ্রেণীর নেতা—Hetzer, Denk, Joris এবং Campanus. দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা—Servetus; একত্ববাদের জন্য ইঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া বিনাশ [illegible] হয়। তৃতীয় শ্রেণীর নেতা দুই জন 'সোসিনাস্' (Laelius Socinus এবং Faustus Socinus)। ইঁহাদিগের উপর বহু [illegible]চার করা হইয়াছিল। এই মতাবলম্বী বহু লোককে হত্যা করা [illegible]ছিল এবং দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল।

[illegible] ইংলণ্ডের ডিষ্ট (Deist) ফরাসীদেশের ভল্টেয়ার এবং তাঁহার [illegible]গণ, এবং জর্ম্মাণীর বহু দার্শনিক পণ্ডিত ত্রিত্ববাদ-বিরোধী।

বর্ত্তমান যুগের পার্কার, চ্যানিং, সাণ্ডারল্যাণ্ড; এসিন কার্পেণ্টার, [illegible], ইফোর্ড ব্রুক; ফ্লাইডারার, অয়কেন, হার্ণ্যাক্ প্রভৃতি চিন্তাশীল [illegible] একত্ববাদী। হার্ণাকের ভাষায় ত্রিত্ববাদ জ্ঞানবিরোধী *irrational*. Harnack's Expansion of Christianity Vol i, page 35)

লোকে যে আর ত্রিত্ব-বাদকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না [illegible] প্রমাণ ইউরোপ ও আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান্ (Unitarian) [illegible] সম্প্রদায়।

চুনী-বাবু উদার ভাবে ইতিহাস পড়িয়া বিচার করিলে বুঝিতে [illegible]তেন সভ্যতার গতি কোন্ দিকে। এবং তাহা হইলে আর তিনি [illegible] পারিতেন না যে, ত্রিত্ব-বাদ গ্রহণীয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। [illegible]ক বলিয়াছেন যে যীশু 'অনন্তজীবের পাপতাপ বিমোচনের ভার [illegible] গ্রহণ' করিয়া 'আত্মাহুতি' দিয়াছিলেন। পৃঃ ১১।

ইহা নিতান্তই অসত্য কথা। যীশু নিজ ইচ্ছায়, জীবন বিসর্জ্জন করেন নাই। তিনি প্রথম হইতেই জীবন-রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে-স্থলেই বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইত, সেই স্থান হইতেই তিনি নিজে পলায়ন করিতেন এবং শিষ্যগণকেও পলায়ন করিতে উপদেশ দিতেন। আত্মরক্ষার জন্য শিষ্যগণকে তরবারী সংগ্রহ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রাণ-ভয়ে গেৎসেমানীর উদ্যানে পলায়ন করিয়া মৃত্যুরূপ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়াও প্রার্থনা করিয়াছিলেন "আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলে ?"

দেখা যাইতেছে, তিনি নিজ ইচ্ছায় জীবন দান করেন নাই।

এক স্থলে লেখক বলিয়াছেন—"যীশুখৃষ্ট যে ভাবে ঈশ্বরকে 'পিতা' সম্বোধন করিলেন তাহার উপমা খৃষ্ট ধর্ম্ম ব্যতীত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।" পৃঃ ৬।

লেখকের এ কথাও সত্য নহে। ঈশ্বর সমগ্র জাতির পিতা এবং প্রত্যেক মানুষের পিতা—এ ভাব যীশুর বহু পূর্ব্বে ইহুদী জাতির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ভারতবর্ষ বৈদিক যুগ হইতেই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছে।

আর যীশুর যে পিতৃভাব, তাহা উচ্চশ্রেণীর নহে। তাঁহার নিকট পিতা এবং প্রভু প্রায় এক শ্রেণীর। 'দুই পুত্র' নামক উপমাতে (The Parable of the two sons) তিনি যে-ভাবে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন তাহা প্রভু ও দাসেরই সম্বন্ধ। এই উপমাতে পুত্র পিতাকে সম্বোধন করিতেছেন 'প্রভু' বলিয়া। গ্রীকে আছে Kurie; ইংরেজী বাইবেলে অনুবাদ করা হইয়াছে 'Sir' শব্দ দ্বারা; কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ "হে প্রভো!" (মথি, ২১।৩০)। অর্থাৎ পিতা হইলেন 'প্রভু' আর পুত্র হইল "দাস"।

আর যীশুর জীবনেও যে পিতৃভাব সম্যক্ বিকশিত হইয়াছিল তাহাও নহে। বিষম বিপদের সময়েই বুঝা যায়, লোকের ধর্ম্মভাব কি প্রকার। যখন তিনি ক্রুশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন.—"আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলে ?" (মার্ক ১৫।৩৪; মথি ২৭।৪৬)।

পিতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি বলিতেন না 'আমার ঈশ্বর', 'আমার ঈশ্বর'; স্বভাবতই তাঁহার প্রাণ হইতে 'হে পিতঃ' "হে পিতঃ" এই ধ্বনি নিঃসৃত হইত।

আর যিনি প্রকৃত সন্তানত্ব লাভ করিয়াছেন, কোন ঘটনাতেই তিনি পিতৃস্নেহে সন্দিহান হন না। লোকে বলে বিপদ্ ও মৃত্যু; কিন্তু তাঁহার নিকট বিপদও সম্পদ, মৃত্যুও অমৃতত্ব। পিতার কাজে জীবন যাইবে, ইহা ত শুভ কথা, ইহা ত আনন্দোৎসব। এই উৎসবে তাঁহার রব—'ধন্যোঽস্মি' (ধন্য হইলাম) 'কৃতকৃত্যোঽস্মি' (কৃতকৃত্য হইলাম)।

পুস্তক লিখিত গ্রন্থে অন্য যে একটি প্রার্থনা আছে সে-বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক। প্রবাসী (১৩৩১, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ) এবং Modern Review (1924, Sep.) পত্রিকাতে আমরা বিচার করিয়া দেখাইয়াছি যে এই অংশ প্রক্ষিপ্ত।

অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। অশিক্ষিত, বা অর্দ্ধশিক্ষিত, বা অন্ধ-বিশ্বাসী বা ভয়ার্ত্ত বা সুখলোলুপ, বা ধর্ম্মব্যবসায়ী বা বংশগত খৃষ্টিয়ানগণ যাহা বলিয়া থাকেন, চুনী-বাবু এই পুস্তিকাতে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। ইহা গৌরবের বিষয় হয় নাই।

এলেন কেই

(১৮৪৯—১৯২৬)

এলেন কেই আর ইহজগতে নাই। ইউরোপীয় নারী-প্রচেষ্টার এক অধ্যায় আজ শেষ হইল। এলেন কেবল-মাত্র নারী অধিকারবাদী ছিলেন না, তাহার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন মহীয়সী নারী; ইতিহাসে বহু পুরুষকে যে অর্থে 'মহাপুরুষ' বলা হয়, তাহা অপেক্ষা প্রকৃততর অর্থে তিনি মহীয়সী ছিলেন। তিনি তাঁর উদার কর্ম্মজীবনের কীর্ত্তির সাহায্যে নারীজাতির অধিকারের বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি নির্ম্মূলে খণ্ডন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং স্ত্রীশক্তি যে সমাজকে পবিত্র ও উচ্চতর স্তরে তুলিয়া দিতে পারে আপনার জীবন দিয়া তাহা প্রমাণ করিয়া সেই নারী-শক্তির মহত্তম প্রকাশ দেখাইয়াছেন।

এলেন কেই

তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিবার মহৎ অধিকার পাইয়াছিলাম এবং আল্‌ভাষ্ট্রায় (সুইডেন) তাঁহার আশ্রমে আতিথ্য উপভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম বলিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমার সামান্য ভক্তি-উপহাররূপে তাঁহারই একটি চিত্র নিবেদন করা আমার কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। ক্রিশ্চিয়ানিয়ার প্রাচ্য-সংসদ (ডাঃ ষ্টেন কোনোর নেতৃত্বে) এবং ট্রণ্ডয়েম (নরওয়ের) ছাত্র-মহাসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। রলাঁ মহোদয় তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুবর্গের স্বাস্থ্যের জন্য সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন; তিনি সেই দারুণ শীতে আমার এ নিমন্ত্রণ-গ্রহণে আপত্তি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মধ্য রজনীর রবি-কিরণে উদ্ভাসিত সেই মায়ালোকের প্রতি তাঁহার তরুণ ভারতীয় বন্ধুর অদম্য আকর্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে অবশেষে মত দিতে হইল। কিন্তু স্কাণ্ডিনেভিয়া যাত্রার উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ যাহাতে আমি সঙ্গে লইয়া যাই সে-বিষয়ে তিনি খুব কড়া হুকুম দিলেন এবং তাঁহার ভারতীয় বন্ধুটিকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য এলেন কেইকে একটি চিঠি লিখিয়া দিলেন।

এলেন কেইকে দেখিব! আমার আশা উধাও হইয়া ছুটিল। আমি তাড়াতাড়ি আমার প্যারিসের "ঠাকুমা" মাদাম ক্রুপির (সিনেটার ক্রুপির পত্নী) নিকট দৌড়িলাম। তাঁহার রচিত "সুইডেনের লেখিকা" পুস্তকে তিনি এলেন কেই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কারণ তাঁহাকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। সেই বইখানি আগাগোড়া পড়িয়া আমি এলেন কেই সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। মাদাম ক্রুপির নিকট

দুর্গা

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

আরও অনেক খবর পাইলাম। তিনিও এই মহীয়সী সুইডিস্ মহিলাকে একটি চিঠি লিখিয়া দিলেন। ফলে তাঁহার নিকট হইতে আমি একটি সুমিষ্ট নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম; এলেন কেই সুইডেন-বাসকালে আমাকে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

উৎসাহে মাতিয়া আমি শীতকাল ও তুষারাবৃত উত্তর সাগরকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াই চলিলাম। "বিনারিস্টজ" নামক নরওয়েজিয়ান জাহাজে অ্যান্টওয়ার্প হইতে রওনা হইয়া দুই দিন ও তিন রাত্রি একটানা সমুদ্র-পথে ভাসিয়া আমি ক্রিশ্চিয়ানিয়ায় উপস্থিত হইলাম। সমুদ্র-পথের দৃশ্য অপূর্ব্ব; কোথাও গভীর তরল জল, কোথাও কঠিন জমাট তুষারস্তূপ, মাঝে মাঝে বরফের চাপ ভাসিয়া চলিয়াছে, বরফ কাটিয়া জাহাজ চলিতেছে।

মার্চ্চ মাসের বেশীর ভাগই আমাকে ইবসেনের দেশ, অনুপম নির্ম্মল ও গম্ভীর সৌন্দর্য্যময় নরওয়েতে বক্তৃতা দিয়া ফিরিতে হইল, কিন্তু তাড়াতাড়ি এই অপূর্ব্ব শোভার খনি নরওয়ে ছাড়িয়া পলাইতে হইবে, পাছে এদেশের সৌন্দর্য্য-বর্ণনার নেশায় সুইডেনের তীর্থদর্শন পর্ব্বটা চাপা পড়িয়া যায়।

মার্চ্চ মাসের শেষে আমি নরওয়ে এবং সুইডেনের মধ্যবর্ত্তী সীমান্তপ্রদেশ পার হইতেছিলাম, পূর্ব্বে এই দুইটি দেশ যুক্ত ছিল; ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহারা দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে। ঘন সবুজ পাইন গাছে ঢাকা পাহাড়ের গা দিয়া ট্রেণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। একজন সুইডিস্ মহিলা আমাকে দয়া করিয়া দুনিরীক্ষ্য সীমারেখাটি চিনাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "গিরিপৃষ্ঠের গায়ে ঐ অস্পষ্ট রেখাটি দেখিতে পাইতেছেন? ঐ যে একসারি ঘন পাইন গাছ যেখানে—ঐ রেখাটি আমরা পরস্পরের সম্মতিক্রমে সীমান্ত রেখা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।"

এলেন কেইএর গৃহ

আমি বলিলাম, "কিন্তু সীমান্তরেখা ত কখনও পরস্পরের সম্মতিক্রমে মানিয়া লওয়া হয় না। সে ত জোর করিয়া দখল করা ও ধরিয়া রাখাই হয়।"

"হাঁ, কিন্তু এক্ষেত্রে সীমান্তপ্রদেশ স্থির করাটা অহিংস যুদ্ধের সাহায্যেই হইয়াছিল—এই অসাধারণ কীর্ত্তির জন্য আমরা স্কাণ্ডিনেভিয়ার মেয়েরা গর্ব্ব করিতে পারি। এলেন কেই এবং তাঁহার মত অন্যান্য মহিয়সী মহিলা-কর্ম্মীরা যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য বীরের মত সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটা মীমাংসা ঘটাইয়াছিলেন।"

আমি এই অপূর্ব্ব ঘটনার কথা পড়িয়াছি। আমাদের পুরুষ-রচিত রাজনীতিকে পবিত্রতর করিবার জন্য সমাজের স্ত্রীশক্তিকে মুক্তি দেওয়ার উপকারিতা যে কতখানি এই ঘটনা সর্ব্বোপরি তাহাই প্রমাণ করিতেছে। মিঃ জন জ্যানসন্ "নিউ লীডার" পত্রে এলেন কেইর মৃত্যু-সংবাদ দিবার সময় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া যে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়:—

"দুইটি প্রদেশের ভিতর শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য এলেন কেই সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, এবং যখন সমগ্র সোসিয়ালিষ্ট দল এবং ব্রাণ্টিং ও অন্যান্য সকলের উপর কারাদণ্ড আসন্নপ্রায়, তখন এই দুই স্কাণ্ডিনেভিয় দেশের ভিতর যুদ্ধ নিবারণ সর্ব্বোপরি এলেন কেইর চেষ্টাতেই ঘটিয়াছিল।"

সুইডেনে প্রবেশ করা মাত্র আমি ভূদৃশ্য ও আবহাওয়ার প্রভেদ অনুভব করিতে লাগিলাম, নরওয়ের পর্ব্বতবেষ্টিত সাগরশাখার ললিত-বক্র রেখাভঙ্গীর পরিবর্ত্তে ঘন সবুজ পাইনের রঙে রঞ্জিত উন্মুক্ত কঠিন প্রান্তর দেখা দিল। দিগন্তব্যাপী এই রুদ্র কঠোর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সুইডেনবর্গ ও ষ্ট্রিণ্ডবর্গের গষ্টাভস, এডলফস্ ও দ্বাদশ চার্লসের মূর্ত্তি মনে পড়িয়া যায়। হাঁ, চিন্তা-ক্ষেত্রে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সুইডেন নিঃশঙ্ক যোদ্ধাবীরের দেশই বটে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উপসালার প্রাচীন সহর, তাহার ভজনালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দেখিয়া আমি ষ্টক্‌হল্‌মে প্রবেশ করিলাম। সুন্দর পরিষ্কার সহরটি; ইহাকে প্রশংসা করিয়া উত্তরের ভেনিস্ বলা হয়। (ভেনিসের ঐতিহাসিক স্মৃতিমালা ও সুবিখ্যাত পূতিগন্ধ বাদ দিলে ইহাকে ভেনিস বলা যায় বটে!) সুরম্য হ্রদের পার হইতে আকাশের গায়ে আঁকা আলোকোদ্ভাসিত সৌধরেখাগুলি অপূর্ব্ব দেখায়। এলেন কেইর নিভৃত আশ্রম আবিষ্কারের উপায় সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করিতে করিতে এখানকার চিত্রশালা, ঐতিহাসিক যাদুঘর, রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদের প্রাচীন দুর্ল্লভ সূচিশিল্প ও প্রাচ্য গালিচা ইত্যাদি দেখিতে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। (রাজগৃহের অধ্যক্ষ ডাঃ বর্টিগারের সহৃদয়তায় এইসমস্ত দুর্ল্লভ সংগ্রহ আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম।)

"ক্লারা লার্‌সনের" নিভৃত হোটেলে আমার প্রথম সুইডিস্ বন্ধু রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অনুবাদিকা মাদাম বুটেন্‌সান্ থাকিতেন। ক্রিশ্চিয়ানিয়া হইতে ষ্টক্‌হল্‌ম পর্য্যন্ত আমার স্কাণ্ডিনেভিয়া ভ্রমণের আগাগোড়াই এই আমার বন্ধু, পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শকটি আমাকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে উন্মুখ ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত আমার ভবিষ্যৎ আল্‌ভাস্ট্রা ভ্রমণের বিষয় পরামর্শ করিতেছিলাম এমন সময় দরজায় টোকা পড়িল এবং পরিচারকা একটি কার্ড আনিয়া হাজির করিল। নোবেল-সংসদ এবং সুইডিস্ অ্যাকাডেমীর সভ্য প্যার হালষ্ট্রম আসিয়াছেন! তিনি যে সুইডেনের লেখকদের একজন অগ্রণী এবং তাঁহারই সর্‌কারী রিপোর্টের জন্য যে অবশেষে গীতাঞ্জলিকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় তাহা আমি জানিতাম। সুতরাং একই হোটেলের কোণে গীতাঞ্জলির সুইডিস্ অনুবাদিকা এবং নোবেল অ্যাকাডেমীতে সেই পুস্তকের সাহিত্যিক পৃষ্ঠপোষকটিকে দেখিবার সৌভাগ্য হওয়ায় বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম।

অসামাজিক বলিয়া সাহিত্যিক মহলে প্যার হালষ্ট্রমের বেশ একটু খ্যাতি আছে। ষ্টক্‌হল্‌মের উপকণ্ঠস্থিত তাঁহার নির্জ্জন আবাস হইতে তিনি ক্বচিৎ বাহির হন, যদি বা কখনও সহরে আসেন ত জনসমাজে প্রায় কাহারও সঙ্গে মেলা-মেশা করেন না। প্যার হ্যালষ্ট্রম অভিজাত-বংশোচিত জনবিমুখতা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নিবিড় রসবোধ এবং কিয়ৎপরিমাণে সুমার্জ্জিত বিতৃষ্ণাবাদের একটি সংমিশ্রণ। কোন্ শুভগ্রহের প্রসন্ন-দৃষ্টিতে তিনি যে আমার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন জানি না। মামুলী ভ্রমণকারীদের অজ্ঞাত ষ্টকহল্‌মের ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলীর পথে ভ্রমণ করিতে করিতে, বিখ্যাত সুইডিস্ চিত্রকর জোরণ্‌ম্ কর্ত্তৃক পুনর্গঠিত রমণীয় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন "গিল্‌ডেন্" পান্থশালায় আহার করিতে করিতে আমরা আধুনিক সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ক কত সমস্যা লইয়াই আলোচনা করিলাম; সেই সূত্রে ষ্ট্রিণ্ডবর্গের বিরুদ্ধ-বাদীদের মধ্যে একজন সুবিখ্যাত সাহিত্যিকের নিকট আধুনিক সুইডিস্ সাহিত্যের নূতন গতির ইতিহাসও কিছু শোনা হইয়া গেল; উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের বস্তুতন্ত্র-বাদ (realism) ও প্রকৃতিবাদের (naturalism) উৎপাতে ও বেয়াড়ামোতে অতিষ্ঠ হইয়া এই নূতন দলটি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এই সময়ই হেডেনষ্টামের মহাকাব্যসঙ্গীত, সেল্‌মা ল্যাগারলফের উপাখ্যানে "রহস্যলোকের নবযুগোন্মেষ", ও ফ্রয়ডিঙের কারুণ্যপ্রাণ মহান্ শিল্প দেখা দেয়। ফ্রয়ডিং সম্বন্ধে এলেন কেই বলেন যে, "ইনি নিজে বিষপান করিয়া অপরকে তাহা কেমন করিয়া অমৃতরূপে দান করিতে হয় সেই কঠিন মন্ত্রটি জানেন।" মহাশিল্পী প্যার হালষ্ট্রমের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ প্রকাশ-ভঙ্গিমার গুণে এই নবযুগ-সৃষ্টির ইতিহাস এই নব ব্যক্তিত্বের অরুণোদয়ের কথা আমার নিকট জীবন্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে এলেন কেইর জীবন-কীর্ত্তির আধ্যাত্মিক ও

মানসিক পটভূমিকাটি আমার নিকট সত্য হইয়া উঠিল।

ষ্টক্‌হল্‌মের ঐতিহাসিক চিত্রশালায় বক্তৃতা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম এমন সময় ডাকে একটি পরিচিত ছাঁদের হস্তাক্ষরের চিঠি পাইলাম। এলেন কেই, ট্রেন, গাড়ী বদ্‌লানো প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য দিয়া আমাকে তাঁহার আল্‌ভাষ্ট্রার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছেন। স্থানটি বিশেষ সুপরিচিত নয়, সুতরাং গন্তব্য স্থান পার হইয়া চলিয়া যাওয়া কিম্বা ভুল পথে গিয়া পড়া সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। আমি ভোরবেলা ষ্টক্‌হল্‌ম্‌ ছাড়িয়া বাহির হইলাম এবং কাটেনাহল্‌ম্‌ জংশনে ট্রেন বদ্‌লাইয়া বিকালে আলভাষ্ট্রায় পৌছিলাম। কিন্তু পৌছিবার পূর্ব্বেই আগের ষ্টেশনে এক ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এলেন কেইর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যে হিন্দু ভদ্রলোক আসিতেছেন আমিই তিনি কি না। এইভাবে আমাকে চিনিয়া লইয়া তিনি বলিলেন যে, আমি পাছে ষ্টেশন না চিনিতে পারি এই ভয়ে ভদ্র মহিলা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং আমাকে আমার ভারতীয় ধ্যান-প্রবণতা হইতে জাগাইয়া তুলিবার জন্য ভদ্রলোকটিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা দুইজনেই খুব হাসিলাম, কারণ আমাকে ঠিক তাঁহার কল্পিত আত্ম-সমাহিত যোগীর মত দেখাইতেছিল না। আল্‌ভাষ্ট্রায় ট্রেন থামিল; আমি আমার নাতিক্ষুদ্র বাক্সটি লইয়া গাড়ী হইতে নামিতেছি এমন সময় আশ্চর্য্য হইয়া দেখি একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা হাত বাড়াইয়া আমার ব্যাগ নামাইতে সাহায্য করিতে আসিতেছেন। আমি ব্যাগটা ফেলিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিলাম। তিনি তৎ-ক্ষণাৎ আমার হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আসুন, নাগ মহাশয়। আমিই এলেন কেই। আপনি ষ্টক্‌হল্‌মে আমার চিঠি পাইয়াছিলেন কি ?" আমি ধন্যবাদ ও কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়া দুই চারিটা কথা বলিলাম, কিন্তু আমার সমস্ত মন তখন সেই মূর্ত্তি দর্শনে নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; মাঝারি রকম লম্বা একটি মহিলা, সমস্ত চুল সাদা (বয়স ৭৩ বৎসর) কিন্তু মানুষটি একেবারে খাড়া; কৃষকরমণীর মত সাদাসিধা পোষাকের সরল মহিমায় মণ্ডিত, কিন্তু চক্ষু দুটি বুদ্ধি ও করুণার দুর্ল্লভ প্রভায় উদ্ভাসিত—ইনি এলেন কেই! এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলা রমণী!......

"নাগ মহাশয়, এই মাঠটা পার হইয়া তবে আমরা আমার কুটিরে পৌছিব।"

এই বলিয়া স্মিতহাস্যে তিনি আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিলেন; আমরা পাশাপাশি চলিলাম। তাঁহার পদক্ষেপ কি আশ্চর্য্য জোরালো! যেন ৭৩ বৎসর বয়সটা তাঁহার কাছে বয়সই নয়। তিনি আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছেন,—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া আমার কেমন লাগিল, ফ্রান্সস্থ আমাদের উভয়ের বন্ধু র'লা মহোদয়, মাদাম ক্রুপি এবং আর সকলের খবরাখবর কি। আমরা ভ্যাটার্ণ হ্রদের তীরে আসিয়া পৌছিলাম, তীরের উপরেই একটি সাদাসিধা সুরম্য দুতলা সাদা বাড়ী—তাহার ছোট সদর দরজার গায়ে লেখা Memento Vevere।

বাড়ীতে ঢুকিয়াই তিনি আমাকে খানিক বিশ্রাম লইতে বাধ্য করিলেন; নিজে এদিকে আমাদের বৈকালিক চায়ের আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। তিনি যেন কর্ম্মনিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার ঘরে দাস-দাসী নাই। একটি দরিদ্র অনাথ বালিকাকে তিনি পোষ্য লইয়া-ছিলেন। সে তাঁহারই সঙ্গে থাকে এবং অতিথি অভ্যাগত আসিলে ঘরকরণার কাজে তাঁহার সাহায্য করে। গৃহ-কর্ত্রী এলেন কেই অতিথি-সেবায় একেবারে মগ্ন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি আমার প্রতি এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন যেন আমি শিশু। মনে হইল তিনি যেন একে-বারে ঠাকুরমা হইয়াই জন্মিয়াছিলেন, তাই বোধ হয় তিনি মধ্যপথের মাতৃত্বের পরীক্ষাটা বাদ দিয়া একেবারে দুই ধাপ ডিঙ্গাইয়া নারী-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন! কি সহজেই তিনি মানুষকে কাছে টানিয়া লন! তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেন যাদুমন্ত্র আছে। বক্তারূপে হাজার হাজার মানুষকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। বিশ্রম্ভালাপে তাঁহার দোসর মেলা শক্ত।

তিনি আমাকে তাঁহার পাঠাগারে লইয়া গেলেন।

বড় বড় কাচের জানালা দেওয়া মস্ত একখানা ঘর ; জানালা দিয়া সারাক্ষণ কালো হ্রদের তরঙ্গমালা দেখা যায় ; কয়েকটি ভূদৃশ্য এবং সেণ্টফ্রান্সিস, সেক্ষপিয়র, গেটে, ক্রোপাটকিন প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকজন মহাপুরুষদের চিত্র দিয়া ঘরখানি সাজানো। সমস্তই তাঁহার উদাররুচি, এবং অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রসারতার পরিচয় দেয়। আমি এখন বুঝিতে পারি কেন এলেন কেই নারীর অধিকারের জন্য তাঁহার সমস্ত ইতিহাসখ্যাত সংগ্রামে খাঁটি ধীশক্তির অস্ত্রই ব্যবহার করিয়াছিলেন, নারীত্বের বর্ম্মের আবরণ তিনি ঘৃণাভরে দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেমন নারী-অধিকার-বাদবিরোধী পুরুষদের যুক্তির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ যুক্তি প্রয়োগ করিতেন, তেমনই স্বজাতীয়া প্রচণ্ড অধিকার-বাদিনীদের উন্মত্ত কোলাহল এবং অসহিষ্ণুতারও বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই বীর জাতির কন্যা প্রকৃত বীরের মতই সমদর্শিতা ও সাহস দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "মতামতের যুদ্ধে উভয় পক্ষের অবস্থা সমান হওয়া দরকার। ধীশক্তির যুদ্ধে কেবল ধীমানের অস্ত্রই ব্যবহার করা উচিত।"

সেই নিস্তব্ধ ঘরখানিতে বসিয়া আমরা কত কথাই আলোচনা করিলাম। এলেন কেইর কথোপকথন লিপিবদ্ধ করা সহজ নয়। আমি সে অসম্ভব প্রয়াস করিবও না। সেই মহাপ্রাণ রমণীর সহজ উক্তিগুলি শুনিবার অধিকার পাইয়াই আমি ধন্য হইয়াছি ; সে প্রাণ কত চিন্তা ও কত হৃদয়াবেগের সংগ্রাম স্থল! এলেন কেইর অধিকাংশ রচনা পড়িলে তাঁহাকে বিশুদ্ধ মনীষাসম্পন্ন নারী বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু তাঁহার এই মনীষার অন্তরালে গভীর হৃদয়াবেগে পূর্ণ একটি বিরাট্ জগৎ বিরাজিত।

থাকিয়া থাকিয়া তিনি আত্মজীবন কথায় মাতিয়া যাইতেছিলেন ; আমি সেই সূত্রে তাঁহার জীবননাট্য লীলার অঙ্কগুলি দেখিয়া যাইতেছিলাম। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক এমিল কেই ও কাউণ্টেস সেফিপসের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া এলেন কেই পিতামাতার নানামুখী শিক্ষার উৎকর্ষ ও মার্জ্জিতরুচি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হন। কুড়ি বৎসর বয়সেই তিনি উদারনৈতিক-দলকে সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার পিতা এই দলের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক (পাণ্ডা) ছিলেন। কোন-একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার পিতা সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া বসাতেও তিনি কিছুমাত্র দমিয়া যান নাই। অভিজাতোচিত স্বভাব ও শিক্ষা হইলেও এলেন (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) ষ্টক্‌হল্‌মের বিদ্যালয়ে তৎক্ষণাৎ সামান্য শিক্ষয়িত্রীর কাজ লইয়া ফেলিলেন।

সাধারণ লোকেদের সহিত এইভাবে ঘনিষ্ঠ যোগে আসিয়া পড়াতে তাহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল ; তিনি শ্রমজীবীদের ভিতর তাঁহার মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। শ্রমজীবীদের প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি আপনার দুর্ল্লভ বক্তৃতা-শক্তি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ বৎসর বয়সে আপনার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ অনুভব করিয়া তিনি চিন্তা ও কার্য্যক্ষেত্রে জনসাধারণের সেবায় নামিয়া পড়িলেন। সেই সময় মন্দগতি উদারনৈতিক দলের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি প্রকাশ্যে সোসিয়ালিষ্ট দলে যোগ দিলেন। তিনি চিন্তাক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্মগত অধিকার লইয়াই জন্মিয়াছিলেন, এবং সকল নেতার মতই তাঁহার মস্তকেও অজস্র সমালোচনা ও গালি বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতেও পর্ব্বতের মত অচল রহিলেন এবং পরিশেষে এই সকলকে পরাভব করিয়া জয়যুক্ত হইলেন। এই সংগ্রামের ইতিহাস তাঁহার বক্তৃতাদির অসম্পূর্ণ বিবরণী এবং ব্যস্তভাবে লিখিত "প্রেম ও বিবাহ," "নারীত্বের নীতি" "মাতৃত্বের নবযুগ" প্রভৃতি পুস্তকে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাহার "স্ত্রীশক্তির বাজে খরচ" নামক পুস্তক প্রচারের ফলে স্ত্রীজাতির সহিতই তাঁহার তীব্র সংগ্রাম বাধিয়া যায় ; * এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার স্বাভাবিক সত্যাভিমুখিতার সহিত তিনি স্বীকার করেন যে, নারী

* নারী তার রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের সংগ্রামে যখন উন্মত্ত তখন এলেন কেই স্মরণ করাইয়া দেন যে নারীর চরম সার্থকতা আদর্শ মাতৃত্বে ; যত বড় তাদের অধিকার তত বড়ই নারীর দায়ীত্ব। এই মূল সত্যটি ভুলিয়া জেদের বশে যে নারী সংঘ শুধু ভোট ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লইয়া মাতিয়া উঠিতেছিল তাদের সঙ্গে সংগ্রামের ভিতর দিয়া সমন্বয় করিয়া এলেন কেই নারী-প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

অধিকারবাদীরা কেবল ভাঙ্গার ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত নহেন, গড়ার কাজেও সাড়া দিয়াছেন, তখন এই বিবাদ কিয়ৎ পরিমাণে মিটিয়া যায়!

সুতরাং নারীঅধিকারবাদকে সুপথে পরিচালনা করিয়া এবং সোসিয়ালিজম্ ও শান্তিবাদের কার্য্যে সাহায্য করিয়া এলেন কেই আমাদের যুগের নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। নারী-জগতের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার স্থান কোথায় তাহা কাল নিরূপণ করিবে। আপাতত আমরা এইটুকু উল্লেখ করিতে পারি যে, ডাঃ জর্জ্জ ব্রাণ্ডেসের মত খুঁতখুঁতে সমালোচক এবং পণ্ডিতও একবার কোপেন্‌হেগেনের একটি জনসভায় তাঁহাকে, "সুইডেনের শ্রেষ্ঠ মনীষাময়ী মহিলা, সুইডেন কেন, ইউরোপ অথবা জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষাশালিনী মহিলা" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের মূল্য আর একদিক দিয়াও আছে। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ যে নারী-হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ ও সৌন্দর্য্যানুভূতি খর্ব্ব করিয়া দেয় না এলেন কেইর জীবন তাহা কার্য্যত দৃঢ়রূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। আমার কথা প্রমাণ করিবার জন্য আমি কেবল দুইটি বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব। এলেন কেই প্রকৃতির বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন বলিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জীবজন্তুর চিত্রাঙ্কণে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীগণের শ্রেষ্ঠ Bruno Liljeforsএর বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন। এলেন কেইর কথাগুলি আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিবে।

"প্রকৃতির কণ্ঠে যদি সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতে চাও (Liljefors যেমন করিয়াছেন) তাহা হইলে প্রকৃতির ক্রোড়েই আপনার নীড় বাঁধিয়া শিকারী মৎস্যজীবী কি বনের পশুর মত সেইখানে বাস করিতে হইবে। দিন ও রজনীর সহিত, সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত, কুয়াসা ও তুষারের সহিত এবং জল ও মাটির সহিত কথা কহিতে হইবে। সকল রকম আলো ও ছায়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইতে হইবে··· কীটপতঙ্গ, তৃণদলের পর্য্যন্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে হইবে; আলো ও অন্ধকারের লুকোচুরি খেলায় তাহারা কেমন করিয়া পরস্পরের অঙ্গে বিলীন হইয়া যায় তাহা চাহিয়া দেখিতে হইবে। তারপর এইসকল ধ্বনি ও রূপকে আত্মার অন্তঃস্তলে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া হারাইয়া বিস্মৃতির অন্তরালে মিশিয়া যাইতে দিতে হইবে, যেন অন্তরপটে চিত্রিত এইসব বিভিন্ন ছায়ামূর্ত্তি সংগ্রামের ভিতর দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া চৈতন্যলোকে আবার নবরূপে জন্মলাভ করিতে পারে।"

কবি ও চিত্রকরের অনুভূতির কি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ!

কিন্তু রাজনীতিবিদ্, বক্তা, জননেতা, শিল্পী ও ভাবুক এলেন কেইর সর্ব্বোচ্চ মহিমা তাঁহার মাতৃভাবে—নারীত্বের সেই অনুপম সম্পদে। তিনি আধুনিক যুগের Vestal Virginএর (রোমক দেবমন্দিরের চিরকুমারী পরিচারিকা) মত সত্য ও প্রেমের আলো চিরউজ্জ্বল রাখিবার জন্য আজীবন একক জীবন যাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু মাতৃহৃদয়ের স্বর্গীয় রূপ তাঁহার অন্তরে কোনো দিন ম্লান হয় নাই। তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তক "শিশু শতাব্দী"তে তিনি লিখিয়াছেন:—

"শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বভাবকে পরের বোঝার চাপে পিশিয়া মারাই গুরুগিরির পাপ। তাঁহার সম্মুখে যে একটি নূতন প্রাণ, একটি বিশেষ ব্যক্তি আপনি ভাবিবার অধিকার লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একথা শিক্ষক অনুভব করিতেই পারেন না। চিরপুরাতন মনুষ্য জাতিরই একটি নবতর প্রকাশ ছাড়া এই নবীন আত্মার ভিতর শিক্ষক আর কিছুই দেখিতে পান না। পিতামাতাও সমাজের দাবীমত সন্তানদিগকে সকল গুণের এক-একটি আদর্শ মূর্ত্তি দেখিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। সুতরাং আমরা হতাশ হইয়া দেখি যে, সেই এক ছাঁচে ঢালা মজবুদ ছেলে, মিষ্টি মেয়ে, ও কেতাদোরস্ত কর্ম্মচারীর দল চক্রের মতন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে।

কিন্তু হিসেবী ভদ্রতায় পালিত এইসব বালকবালিকার ভিতর অনাবিষ্কৃত পথের নূতন পথিক, ও অজ্ঞাত ভাবের নূতন ভাবুক, এমন সব নূতন ছাঁচের মানুষ কচিৎ দেখা যায়।······আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিবেক-গত শাস্তি দিতে হইবে; প্রচলিত মতবাদ, ধরাবাঁধা প্রথা ও সুবিধাজনক মনোবৃত্তি সকলকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস দিতে হইবে। তবেই এই সমষ্টিগত বিবেকের

স্থানে মনুষ্যজীবনের চরম গৌরব ব্যক্তিগত বিবেক দেখা দিবে।"

অচির ভবিষ্যতে নূতন বিবেকবান এই নবপর্য্যায়ের মানুষের আবির্ভাব দেখার সৌভাগ্য যদি আমাদের হয়, তবে সেই অজ্ঞাত বংশের কুমারী মাতা এলেন কেইকে সেদিন আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিব।

আমি বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি ভবিষ্যতের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাসের কথা বলিলেন; শুনিলাম, তাঁহার শেষ পুস্তক "সর্ব্বজয়ী যৌবন" তখন লিখিতেছেন। এই সর্ব্বজয়ী যৌবনে বিশ্বাসই তাঁহার জীবনের যেন মূলস্বর; কারণ আমি যে একজন ৭৩ বৎসর বয়স্কা বর্ষীয়সী মহিলার সহিত কথা বলিতেছি একথা একবারও অনুভব করি নাই। তাঁহার মনীষা ও তাঁহার সমবেদনা সকলই ছিল বিশ্বতোমুখী। তিনি আমাকে ভারত ও তাহার নারীজাতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। আমি যখন বলিলাম যে, তাঁহার রচনা আমাদের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের হাতেও পৌঁছিয়াছে এবং তাহারা সাগ্রহে সেগুলি পাঠ করে, তখন তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। ভারতের প্রতি তাঁহার অন্তরের যে কি গভীর সহানুভূতি তাহা আমি সেই প্রথম অনুভব করিলাম। তাঁহার বন্ধু-লিপি পুস্তকে আল্‌ভাষ্ট্রার বহু তীর্থযাত্রীর স্বাক্ষরের পাশে যখন আমিও কয়েক ছত্র লিখিয়া দিতেছিলাম, তখন এলেন কেই একখানি কার্ডে কয়েক লাইন লিখিয়া ধীরে ধীরে আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন:—

"প্রিয় ভারতভূমি! আট বৎসর বয়স হইতে আমি ভারতকে ভালবাসিয়া আসিতেছি এবং যতবারই আমি কোনো ভারত-সন্তানকে দেখি আমার হৃদয়ে আশা জাগিয়া উঠে। ভারতের শ্রেষ্ঠ পুত্রকন্যা! তোমরা যে-আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছ যে-সাধনায় নিবিষ্ট আছ, এবং যে-বেদনার মূল্য দিতেছ তোমাদের ভারতমাতা তাহারই অনুপাতে বড় হইয়া উঠিবে।"

Dear India
since I was
8 years old
I loved it
and every
time I see
one of India's
son's I hope:
Your mother
India shall
became what
her best sons
daughters
hope, work for
suffer for!
Ellen Key

এলেন কেইএর বাণী

এই মহামূল্য স্মৃতিচিহ্নটি লইয়া অস্তগামী সূর্য্যের আভায় রঞ্জিত তাঁহার দেবোপম মুখের "বিদায়" বাণী শুনিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাঁহার মহৎপ্রাণ শান্তিতে চির বিশ্রাম লাভ করুক ও তরুণ ভারতের সকল পুত্রকন্যার মস্তকে এই মহীয়সী নারীর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক!

শ্রী কালিদাস নাগ

আমাদের চরকা আবিষ্কার

শ্রী বিপদবারণ সরকার

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চরকা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা এবং ইহার প্রচারকল্পে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রথমেই প্রাচীন চরকাকে উন্নত করিবার জন্য দেশীয় আবিষ্কারকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। চিত্তরঞ্জন চরকা, সরলা চরকা, চট্টলা চরকা, ডাক্তার কাবাসীর অর্দ্ধস্বয়ংক্রিয় (Semi-automatic

চরকা, সিরাজগঞ্জ জিয়ার পাড়ার স্বয়ং-ক্রিয় চরকা, কমলা অটোমেটিক্, প্রভৃতি অসংখ্য চরকা বাজারে দেখা দিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই লোপ পাইয়াছে। আমি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, ইহাদিগের মধ্যে যান্ত্রিক আড়ম্বর ও অভিনবত্ব ভিন্ন, সূত্র-উৎপাদন-ক্ষমতা হিসাবে কোনও উৎকর্ষ ছিল না। বরং প্রায় সব চরকাতেই প্রাচীন চরকা হইতে অল্প সূতা কাটা যাইত! লাভের মধ্যে ঐগুলির দাম ছিল বেশী, এদের চালাইতে বেশী পরিশ্রম লাগিত। প্রথমতঃ আবিষ্কারকগণ ভাবিয়াছিলেন, সূতায় পাক দেওয়া আর নলিতে জড়াইবার কাজ যদি চরকা ঘুরাইলেই একত্র হইয়া যায়, এবং এই ভাবে বাম হস্তে তুলার পাঁজ লইয়া একবার হস্ত সম্প্রসারণ আর একবার আকুঞ্চন না করিয়া উহা যদি স্থির হস্তে নিবদ্ধ থাকে; তবে অল্প সময়েই বেশী সূত্র উৎপন্ন হইবে আর শ্রমলাঘবও হইবে। এই ধারণার বশেই যত অটোম্যাটিক চরকার সৃষ্টি, সূত্র বাহির হইয়া আপনা-আপনি নলিতে জড়াইয়া যাওয়ার অভিনবত্ব-টুকুও আমাদের দেশের কেহ আবিষ্কার করেন নাই, তাহা মিলের চরকারই অল্প অনুকরণ মাত্র। যাহা হউক ঐ চরকাগুলি সূতাও বেশী কাটিতে পারিল না, ইহাদের চালাইতেও জোর বেশী লাগিল। এই চরকাগুলির কথা ছাড়িয়া দিই—কিন্তু মিলের চরকার একটি টেকোতে যে সূতা উৎপন্ন হয়, আমাদের ২ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট পুরাতন চরকাতে তাহা হইতে কম সূতা কাটা হয় না। মিলের প্রস্তুত অত্যুৎকৃষ্ট পাঁজ লইয়া একজন চরকা কাটিতে বসিয়া যাউন; আর মিলের মত প্রাতঃকাল ৫টা হইতে রাত ৭টা কি ৮টা পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভূতের মত চরকা ঘুরাইতে থাকুন, দেখিবেন আপনি মিলের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন। খাঁটি সূতা প্রস্তুত হইতে মিলে অন্ততঃ ২টি চরকার দর্‌কার হয়, প্রথম চরকায় তুলার পাঁজ জুড়িয়া দিলে অতি অল্প-পাক-বিশিষ্ট খুব মোটা সূতা হয়, তাহাকে সূতা না বলিলেও চলে। তার পর সেই অর্দ্ধ-পাকবিশিষ্ট সূত্র বা পাঁজকে আর-একটি চরকায় জুড়িয়া দিলে খাঁটি সূতা তৈয়ার হয়। এই দুইটি চরকার কাজই কিন্তু আমাদের প্রাচীন একটি চরকায় হইয়া থাকে, সুতরাং প্রাচীন চরকা যদি মিলের চরকার অর্দ্ধ পরিমাণ সূতাও কাটিতে পারে তবুও তাহাকে মিলের সমকক্ষ ধরিতে হইবে। তবে মানুষ ত আর ভূতের মত খাটিতে পারে না, তাহার আহার, তৃষ্ণা, বিশ্রাম চাই।

কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যদি পায়ে চরকা চালান যায়, তবে দুই হাতে দুই পাঁজ ধরিয়া একই টেকোর দুই প্রান্তেই সূতা-কাটা সম্ভব হইবে। এ জাতীয় চেষ্টার মধ্যে ম্যাচ মেসিন আবিষ্কর্ত্তা কালীকচ্ছ-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অনেক চেষ্টা করিয়া তিনি দুই হাতে দুই খেই সূতা কাটার জন্য পদচালিত চরকার উদ্ভাবনা করিলেন, কিন্তু পাঁজের অসমতার জন্য পরিণামে এচেষ্টার ব্যর্থতা বুঝিয়া ইহা ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর একাধিক টেকো একই চরকার সাহায্যে চালাইবার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন। মাদারিপুরের জনৈক ডাক্তার, বর্দ্ধমানের অজ্ঞাতনামা জনৈক ভদ্রলোক, এই চেষ্টা করেন। পরি-শেষে কাশ্মীরের জনৈক মুসলমান যুবক নাকি বারটি শলা পর্য্যন্ত চালাইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বাজারে ত তাহার চরকা দশ বিশটা দেখিতে পাই না। চাঁদপুরের একজন ব্যাব-সায়ী এজাতীয় চেষ্টায় অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন; তাঁহার চেষ্টাও সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। তাহার পর আন্দোলন একটু মন্দীভূত হওয়ায় আবিষ্কারকগণও হাল ছাড়িলেন, আর দৈনিক কাগজগুলির পৃষ্ঠায় "বিংশ শতাব্দীর অভিনব আবিষ্কার, বস্ত্রের অভাব ঘুচিল," ইত্যাদি সব বড় বড় হরফে লেখা সচিত্র বিজ্ঞাপনগুলিও লোপ পাইল।

এই ত গেল আবিষ্কারকগণের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ইতিহাস। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, আবিষ্কারকগণকে মন্দ বলিবার জন্য আমি এ প্রবন্ধের আলোচনা করি নাই। আমাদের প্রাচীন চরকার গুণগান করাও আমার লক্ষ্য নহে। কি ভাবে চরকাকে অধিক পরিমাণ সূত্র উৎপাদনক্ষম করা যায় আবিষ্কারকগণের চিন্তার ধারা কোন্ পথে চালিত হওয়া আবশ্যক এসম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য কি এইসকল বিষয় আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

চরকা সম্বন্ধে যিনিই যাহা করিয়া থাকুন, তাহা ব্যর্থ

হইলেও উহার একটা সার্থকতা আছে, "Failures are pillars of success", আমাদের ব্যর্থ প্রয়াসগুলি কৃতকার্য্যতার স্তম্ভ স্বরূপ। ব্যর্থ হইতে হইতেই মানুষ ক্রমে সত্যে এবং সার্থকতায় পৌছায়।

অতঃপর যাঁহারা ইহা আবিষ্কার করিতে যাইবেন, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত মহোদয়গণের চিন্তার সাহায্য পাইবেন—তাঁহাদের ভুলগুলি তাঁহাদিগকে আর দ্বিতীয়বার করিতে হইবে না। দুঃখের বিষয় তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন নাই। আশা করি আবিষ্কারকগণ পরে তাহা লিখিয়া কোনও পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "ইংরেজ একটা হাই তুলিলেও তার ইতিহাস হয় কিন্তু আমরা কিছুই লিখিয়া রাখি না।"

এই তিন বৎসর ধরিয়া আবিষ্ক্রিয়া-চেষ্টার ফলে, আমরা নিম্নলিখিত সত্যগুলি লাভ করিয়াছি—

(১) একটি টেকো দ্বারা চালিত চরকা স্বয়ংক্রিয়ই হউক বা অর্দ্ধ-স্বয়ংক্রিয়ই হউক; পদদ্বারা চালিত হউক বা বাষ্পশক্তি দ্বারা চালিতই হউক—তাহা কখনও আমাদের পুরাতন ২ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট চরকা হইতে অধিক পরিমাণ সূত্র উৎপাদন করিতে পারিবে না।

(২) সুতরাং একই চরকায় একাধিক টেকো ব্যাবহার করিতে হইবে।

(৩) একাধিক টেকো একই চরকা-চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সংযোজিত হইলে, তুলার পাজগুলি সর্ব্বত্র সমান (uniform) হওয়া চাই।

(৪) কাজেই চরকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পিঞ্জনযন্ত্রের (Carding machine) বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

আমাদের আবিষ্কার-চেষ্টার ভুল ওখানেই; সকলেই উঠিয়া-পড়িয়া চরকার উদ্ভাবন করিতে গেলেন। কিন্তু পিঞ্জনের উৎকর্ষ সাধন ছাড়া চরকা আর এক পাও অগ্রসর হইতে চাহিল না। টেকোর সংখ্যা বাড়াইতে গেলেই, পাজা সর্ব্বত্র সমান না হইলে কাজের সূতা তৈয়ার হইতে পারিবে না। ব্যাণ্ডের চরকায় পিঞ্জনের একটু খোলা যন্ত্র যোগ করা হইয়াছিল। ৫নং ধর্ম্মতলার ভট্টাচার্য্য-মহাশয় দুই খণ্ড কাষ্ঠ-ফলকে তারের কাঁটা বসাইয়া একপ্রকারের তুলা পিঁজিবার যন্ত্র বাহির করিয়াছেন। আমার একটি উদ্যোগী ছাত্র উহা কিনিয়া ব্যবহার করিয়া দেখিল, উহাদ্বারা বিশেষ কোনও সুবিধা হয় না। সূতা-কাটা যন্ত্রের উদ্ভাবনের দিকে আবিষ্কারকগণের যত ঝোঁক্ দেখিলাম, পিঞ্জন-যন্ত্রের দিকে তাহার শতাংশের একাংশ মনোযোগও কেহ দেন নাই। ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প-সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, হার্গ্রিবস্ সাহেবের স্পিনিং জেনি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে, Flat card, Revolving card প্রভৃতি পিঞ্জনযন্ত্রের উদ্ভাব হইয়াছিল। ইহা হইয়াছিল বলিয়াই হার্গ্রিবস্ সাহেব একাধিক টেকো ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশের সকলেই যদি আজ এই কাজের হাল ছাড়িয়া না থাকেন, তবে তাঁহাদের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, একবার পিঞ্জনের উন্নতি করুন, তবেই আপনাদের চরকায় অবলীলাক্রমে অনেক টেকো জুড়িয়া সূতা কাটার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

পাশ্চাত্য মনীষীগণ এসম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছেন, এবং করিয়াছেন, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্যক্ অবগত হওয়া আবশ্যক। আমার ত মনে হয়, আমরা যদি শুধু Hargreaves' Spinning Jenny, Cromptons' Water Frame, আর Akwright's "Mule"এর হুবহু অনুকরণ করিতে পারি, তবেই বেগবতী নদীর তীরবর্ত্তী অনেক পল্লীগ্রামে ছোট ছোট সূতার কল স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার সমাধানের কথঞ্চিৎ সহায়তা করিতে সক্ষম হইব। পূর্ব্বোক্ত তিনটি আবিষ্কারকে অবিষ্কারের ভিত্তি ধরিয়া চরকার আরও অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে Hargreaves' Spinning Jenny, বা Akwirghts Mule এখন আর ইউরোপেও পাওয়া যাইবে না। আধুনিক 'চরকাগুলি উন্নত হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সরলতা তাহাতে আর নাই। হারগ্রিবস্ মহাশয় যখন জীবিত ছিলেন ইংলণ্ডের লোক তখনও কয়লার ব্যবহার জানিত না। তাঁহার চরকার অধি-

গজলক্ষ্মী

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

কাংশ অবশ্যই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছিল, আর তাহার নির্ম্মাতা ছিল গ্রাম্য মিস্ত্রীগণই, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না। গ্রামের জন্য মিস্ত্রীদ্বারা মেরামত করা সম্ভব না হইলে, তাহা কার্য্যকরী হইবে না। এই মেরামত করার অভাবে যাঁহারাই কোনও কল-কব্জার আড়ম্বর-বহুল কোনও যন্ত্র গ্রামে লইয়াছেন, প্রায়ই তাঁহারা মেরামত করিবার সময়ে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছেন। আমাদের দেশে কয়েকটা ধান-ভানা কলের কারবার এইজন্যই টিঁকিল না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ বা ততোধিক নলকূপ মেরামত অভাবে পড়িয়া আছে। তাই বলিতেছিলাম, হার্‌গ্রিবস্ মহাশয়ের চিন্তার ধারা তত্ত্বতঃ অবগত হইতে হইবে। তিনি যে-ভাবে যে-উপাদানে চরকাটি তৈয়ার করিয়াছিলেন, এবং পিঞ্জন-যন্ত্রও যে-ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেই আমাদের আবিষ্কার-প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করিবে।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হার্‌গ্রিবস্ মহাশয় একাধিক টেকোবিশিষ্ট চরকা আবিষ্কার করেন; ক্রম্পটন্ মহাশয় জলশক্তি দ্বারা যন্ত্র চালাইবার ব্যবস্থা করেন; আর অর্করিট্ মহাশয় পূর্ব্বোক্ত দুই মনীষীর যন্ত্র একত্র করিয়া জল-স্রোত-শক্তি-চালিত চরকার উদ্ভাবন করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে টানার সূতা (warp) প্রস্তুত করিতে পারিত না। কিন্তু যাই তাঁহারা এই চরকা আবিষ্কার করেন, অমনি খরস্রোতে বিলাতে বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে একখানি কাপড়ের সূতা কাটিতে অনেক লোককে খাটিতে হইত, কিন্তু এখন বহুল পরিমাণ সূত্র উৎপন্ন হওয়ায় আর Kay সাহেব ঠক্‌ঠকি তাঁত উদ্ভাবন করায়, ইংলণ্ড বস্ত্রশিল্পে পৃথিবীর প্রথম স্থান অধিকার করিল। আমরা জানি, ইংলণ্ড কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়া আমাদের বস্ত্র-শিল্প নষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু আমরা একটা কথা ভাবি না, তাহারা বস্ত্রশিল্প নষ্ট করিয়া, আমাদিগকে উলঙ্গ রাখিয়া দেয় নাই; বাঙ্গালার মত ক্ষুদ্র দেশ ইংলণ্ডে এত কাপড় উৎপন্ন হইতে লাগিল, যে ইংলণ্ড সমস্ত ভারতবর্ষকে কাপড় পরাইলে পূর্ব্বোক্ত মনীষীগণের কাছে ইংলণ্ড চিরকাল ঋণী থাকিবে। বলা বাহুল্য আমি এতদ্দ্বারা আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের প্রতি ইংরেজ বনিকগণের অত্যাচার সমর্থন করিতেছি না। এই আবিষ্কার-সম্পর্কে কংগ্রেসের একটি কর্ত্তব্য কাজ ছিল; কিন্তু কংগ্রেস আজ পর্য্যন্তও এসম্বন্ধে উদাসীন আছে। অথচ চরকার উন্নতি হউক. ইহা সকল নেতাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এমনকি মহাত্মা গান্ধীও গত বরিশাল কন্‌ফারেন্সে দুই সর্ত্তে যোগদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চরকা-প্রদর্শনী অন্যতম। চরকার সামান্য সূত্র উৎপাদনে সকলেই যেন একটু অনাস্থার ভাব পোষণ করিতেন—এবং তজ্জন্য ইহার যান্ত্রিক উন্নতির কামনা করিতেন। কিন্তু প্রদর্শনীতে পুরস্কার দেওয়া, সার্টিফিকেট্ দেওয়া ছাড়া তাহাদিগের আবিষ্কারকগণ তাঁহাদের হাতে আর কি উৎসাহ পাইয়াছেন? যখন চরকাকে এত প্রাধান্যই দেওয়া হইল, তখন ইহার আবিষ্কার জন্য অন্ততঃ একলক্ষ টাকা ব্যয় করাও কি কংগ্রেসের উচিত ছিল না? বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে এ-জাতীয় চেষ্টা ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে করিয়াছেন। তাঁহারা উৎসাহ না পাইয়া এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তার সাহায্য-টুকু হইতেও বঞ্চিত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন। যাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, আমরা ঠিক সেই হার্‌গিবস্ মহাশয়ের চরকাই চাহিতেছি। সে চরকার অধিকাংশ অংশ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছিল, এবং গ্রাম্য মিস্ত্রীগণই তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আমরা সেই যান্ত্রিক সরলতা আর চরকার ততটুকু উৎপান-ক্ষমতা চাই। যদি কেহ বলেন, চরকা-আবিষ্কারের প্রয়োজন নাই, কেননা অনেক টেকো-বিশিষ্ট চরকা ত সকল কাপড়ের কলেই চলিতেছে তাহা হইলে তিনি ভুল করেন। আজ যদি বহু অশ্বশক্তি (Horse Power) চালিত মিলগুলির অপকারিতা বুঝিয়া ইংলণ্ডের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ চরকা আন্দোলন করেন, তবে আমি তাঁহাদিগকে ঐ হার্‌গ্রীবস্ মহাশয়ের চরকা ধরিতে এবং

খুঁজিতে বলিতাম। আমাদের কত ভারতীয় ছাত্রই ত বিলাতে আছেন, তাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিয়া এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখুন না, ইহাতে আবিষ্কারের পথ সুগম হইবে। ইংলণ্ডে কাঁচা মাল নাই, তাই কত অসুবিধা, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে সকল দেশ হইতে তূলা বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমরা তাহা সূত্র-উৎপাদনে লাগাইতে পারিতেছি না, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? যে পদ্মার খরস্রোতে একুশরত্ন ধ্বংস হইল, যাহার বিক্রমে বিক্রমপুর বৎসর বৎসর ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভস্থ হইতেছে, আমরা কি সেই পদ্মার শক্তি কাজে খাটাইয়া, ছোট সূতার কল চালাইয়া হতশ্রী পল্লীর গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারি না? অথবা আমাদের দেশেই শত শত oil engine expert প্রস্তুত হইতে পারে; তাহাদের সাহায্যে ছোট ছোট চরকা বা অন্য কল চলিতে পারে; মটরকারগুলিও ত oil engine মাত্র। আজ কত ভদ্র যুবক এই মটর-পরিচালকের কাজ করিতেছে। যদি গ্রামে এইরকম চরকার ছোট ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়, তবে আজ যে দেশের সমস্ত যুবক শুধু কেরাণীগিরির জন্য নিজের বিদ্যার গৌরব বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহারাই আবার গ্রামে ফিরিয়া এই ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ প্রদর্শন করতঃ গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে। জাপান যখন শিল্পোন্নতি করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল, তখন তাহারা ইউরোপীয় যন্ত্রগুলির কাঠামের অংশ কাষ্ঠনির্ম্মিত করিয়া কারখানা স্থাপন করে; আর ১৫০০ কি ২০০০ টাকা বেতনে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ আনাইয়া কতকগুলি মোটা-সোটা শিল্প দেশে স্থাপিত করেন। আহা আমাদের দেশে যদি শিল্পোদ্ধারের জন্য বা নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য যমুনা লাল বাজাজের দান, বা দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরু বা ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষের মহান্ ত্যাগ থাকিত তবে কত যুবক আবিষ্কার করিয়া ও কারখানা স্থাপন করিয়া দেশকে ধন্য করিতে পারিত? কংগ্রেস বা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি নিম্নলিখিত উপায়ে চরকা আবিষ্কারের সহায়তা করিতে পারেন—

(১) একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হউক, যিনি পিঞ্জন-যন্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়া "হার্‌গ্রিব‌স্ স্পিনিং জেনি" বা তাহারই মত একাধিক টেকো বিশিষ্ট চরকা উদ্ভাবন করিতে পারিবেন তিনি অন্যূন ৫০০০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন। আবিষ্কারক মহাশয় দেশীয় হউন বিদেশীয় হউন তাহাতে কিছুই আপত্তি নাই। এই ভাবে পৃথিবীর সমস্ত মনীষা-সম্পন্ন মহোদয়গণকে এই কাজে আহ্বান করা যাইতে পারে; অথচ,ঐ অল্প টাকায়ই এই কাজ হইতে পারে। ইহাতে যন্ত্রের অনাবশ্যক আড়ম্বর থাকিতে পারিবে না, ইহা গ্রাম্য মিস্ত্রী দ্বারা মেরামত হইবার যোগ্য হওয়া চাই, চরকার মূল্য খুব বেশী না হয়—এদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(২) একটি শিল্পীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হউক (ইহাই হইবে আমাদের National Director of Industries) যাহাতে কংগ্রেস-নির্ব্বাচিত কতিপয় বিশেষজ্ঞ মিলিত হইয়া চরকা আবিষ্কারের পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিবেন, প্রবন্ধ লিখিবেন আর সেই অনুসারে চরকা আবিষ্কার করিবেন। মৌলিক আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা ফরমাইস দেওয়া চলে না। নিউটন্‌কে কেহ মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিতে ফরমাইস্ দেন নাই; ওয়াট্ মহাশয়কে কেহ বাষ্পশক্তির তথ্য আবিষ্কার করিতে বলেন নাই। কোন্ মৌলিক সত্য কাহার মনে কোন্ দিন উদিত হইয়া পড়ে, তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সে-কথা খাটে না। এক হিসাবে চরকা আবিষ্কার Invention নহে, উহা Discovery মাত্র। যাহা হইয়াছিল, যাহা যন্ত্রাকারে পরিণতও করা হইয়াছিল, সেই হার্‌গ্রিব‌স্ মহাশয়ের চরকা আবার অর্করিট্ মহাশয়ের "Mule" পুনরুদ্ধার করাই আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টা হওয়া উচিত; সুতরাং ইহার ফরমাইস দেওয়া চলে এবং একটা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে ইহার পুনরুদ্ধার একান্ত সহজ এবং সম্ভবও বটে। এই সঙ্ঘের কাছে আবিষ্কারক-গণ নিজ নিজ চিন্তাগুলি পেশ করিবেন; তাঁহারা তাহার সার্থকতা বুঝিলে চিন্তাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা করিয়া দিবেন।

এইপ্রকার ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা ও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে চরকা জিনিষটি অবশ্যই গড়িয়া উঠিবে।

এখন আমি হার্‌গ্রিবস্ মহাশয়ের চরকা সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা লিখিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

এই চরকার টেকোগুলি মাটির সঙ্গে লম্বভাবে সংযোজিত হইয়াছিল। আজকাল সূতার কলে টেকো-গুলি যে-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ঘুরিতে থাকে, হার্‌গ্রিবস্ মহাশয়ই তাহার আবিষ্কর্ত্তা, তাহারই অনুকরণে মিলের টেকোগুলি মাটির সঙ্গে লম্বমান।

আমাদের পুরাতন চরকার পাঁজটি যে-রূপ বাম হস্তে ধরিয়া একবার হয়ত সম্প্রসারণ, আর একবার টেকোতে জড়াইবার জন্য হাত চরকার দিকে আকুঞ্চন করিতে হয়, হার্‌গ্রিবস্ মহাশয়ের চরকার পাঁজগুলিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি caseএর ভিন্ন ভিন্ন খোপে সংযোজিত হইয়া সেইরূপে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরে সরিয়া যাইত, আবার জড়াইবার জন্য হঠাৎ চরকার ধারে সরিয়া আসিত। ডাক্তার কারাসীর অর্দ্ধস্বয়ংক্রিয় চরকার পাঁজের আকুঞ্চন-সম্প্রসারণ গতি কতকটা এইরূপ ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে আর যত স্বয়ংক্রিয় চরকা উদ্ভাবিত হইয়াছিল—তাহাতে পাঁজটিকে স্থির হস্তে ধরিয়া থাকার ঝোঁকটাই যেন বেশী দেখা গেল। ইহাতে সূতা অসমান হয়, পাঁজ হইতে সূতা বাহির হইয়া আসিতে কষ্ট হয়। বস্তুতঃ পাঁজ হইতে সূতা বাহির হইয়া আসা, তাহাতে পাক হওয়া, আর তাহা নলিতে জড়াইয়া যাওয়া—এই ত্রিবিধ কাজ যতই এক কেন্দ্রীভূত করিতে চেষ্টা করা যায়, পাঁজটি ততই সর্ব্বত্র সমান হওয়া এবং অত্যুৎকৃষ্ট হওয়া দরকার হইয়া পড়ে।

সূতার কলে এই ত্রিবিধ কাজ যুগপৎ হয় বটে, কিন্তু মিলগুলি তুলাকে পিঁজিবার জন্য কি আয়োজন করিয়া থাকে তাহা বঙ্গলক্ষ্মীর সূতার কল দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। মিলের পিঁজিবার যন্ত্রগুলি দেখিলে চক্ষু স্থির হইয়া যায়। আবিষ্কারকগণকে ধন্য ধন্য করিতে হয়। হার্‌গ্রীবস্ মহাশয়ের পিঁজিবার কল অবশ্যই এত উন্নত ছিল না, তাই তিনি সূতাকাটার প্রক্রিয়া তিনটিকে যথাসম্ভব ভিন্ন ভিন্ন করিয়া রাখিয়াই সূতা-কাটা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন—সুতরাং আবার বলিতেছি—চরকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে পিঞ্জনযন্ত্রের আবিষ্কার করুন। ইহা ছাড়া চরকা আবিষ্কার এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না।

সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত

আয়োজন

(কলিকাতা হইতে কুল্‌টি)

১

তারিখটা ঠিক মনে নেই, জুলাই মাসের একটা সন্ধ্যায় কয়েক বন্ধু মিলে আমাদের ক্লাবে (Gay Wheelers Club) ব'সে এবার পূজায় কোথায় যাওয়া যাবে তারই আলোচনা হচ্ছিল। সেদিন বৃষ্টিটা যেমন এলোমেলো ভাবে পড়্‌ছিল, সেইরকম আমাদের গন্তব্য সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনাটাও কোনো একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে পার্‌ছিল না। অনেক আলোচনার পর পেশোয়ার যাওয়াই যখন কতকটা ঠিক হ'য়ে এল তখন আনন্দ বল্‌লে, "আকর্ষণবিহীন পেশোয়ার অপেক্ষা ভূস্বর্গ কাশ্মীর যাওয়াই কি আনন্দদায়ক ও একটু বেশী adventurous ব'লে মনে হয় না?" কথাটা সকলেরই মনে লাগ্‌ল। কাশ্মীর পৃথিবীর মধ্যে একটি দেখ্‌বার মতো জায়গা। আর সাইকেলে যাওয়া দুঃসাহসিকতা ও নূতনত্বের বিষয় ব'লেই বোধ হয় আর কোন প্রতিবাদ উঠ্‌ল না। কাশ্মীর যাওয়া যখন স্থির হ'ল তখন কেউ কেউ এটা 'আগাগোড়া

সাইকেলে ভ্রমণ' হোক্ এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় অনেক তর্কের পর শেষে আমাদের প্রোগ্রাম দাঁড়াল—

Calcutta to Srinagar and Back Via Nagpur.

অর্থাৎ

'কলিকাতা হইতে শ্রীনগর ও শ্রীনগর হইতে নাগপুর হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন।'

ম্যাপে দেখা গেল, এই ভ্রমণটি ৪০০০ মাইলের বরঞ্চ কিছু বেশীই হবে আর সময়ও নেহাৎ কম লাগবে না। সেইজন্য কেবল চার জনের অতিরিক্ত উৎসাহের জন্য আমাদেরই যাওয়া ঠিক হ'ল। প্রোগামটা শেষ করা ও যাতে এই ভ্রমণটি বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেককে নিম্নলিখিতরূপে এক-একটি কাজের ভার দেওয়া হ'ল—

ভ্রমণকারীর দল
অশোক মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র ঘোষ, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জ মজুমদার

১। অশোক মুখোপাধ্যায়—General Manager, অর্থাৎ যাতে সমস্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তার জন্য দায়ী।

২। আনন্দ মুখোপাধ্যায়—Engineer, অর্থাৎ সাইকেল মেরামত ও সাইকেল সম্বন্ধীয় সব রকম কাজের জন্য দায়ী।

৩। নিরঞ্জ মজুমদার—Quarter Master, অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ও ঐ সম্বন্ধীয় সব রকম কাজের জন্য দায়ী।

৪। মণীন্দ্র ঘোষ—Log-keeper, অর্থাৎ দৈনিক সব রকম ঘটনা, রাস্তা ও দূরত্ব প্রভৃতির হিসাব রাখবার জন্য দায়ী।

২২শে সেপ্টেম্বর আমাদের যাওয়ার দিন ঠিক করা গেল। যাওয়ার কয়েক দিন আগে আমাদের সাইকেল চারখানা আগাগোড়া মেরামত করা হ'ল। সাইকেলে বেশী জিনিস নেওয়া অসম্ভব ব'লে আমরা নিতান্ত দরকারী জিনিস ভিন্ন আর কিছুই নিলাম না। তাতে আমাদের প্রত্যেকের সরঞ্জাম এই দাঁড়াল:—১টি কম্বল, ১টি লুঙ্গি, ১টি খাকী সার্ট, ১টি তোয়ালে, ১টি এনামেল কাপ। এছাড়া সাইকেলের 'টায়ার' ব্যতীত যাবতীয় সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি ও shaving set (ক্ষুর ইত্যাদি) সকলে ভাগ ক'রে নেওয়া হ'ল। এইসব সরঞ্জাম সমেত প্রত্যেক সাইকেলের ওজন দেখা গেল ৫৪ পাউণ্ড।

আমাদের সাইকেল চারটির মধ্যে ১টি Imperial Triumph, ১টি Albion ও ২টি Standard। আমরা Dunlop, Moseley, Burgounan ও Richmond টায়ার ব্যবহার করেছিলাম। তখন বেজায় গরম ও সাইকেল নিয়ে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর ব'লে জম্মুতে গরম কাপড়-চোপড় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। আমাদের যাওয়ার পোষাক হ'ল—খাকী সর্ট, সার্ট, কোট, হ্যাট, মোজা ও 'সু'।

যাত্রা কর্‌বার কয়েক দিন পূর্ব্বে আমরা কলিকাতার মেয়র ও স্থানীয় একজন M. L. C. ও দু'একজন নামজাদা লোকের চিঠি (introductory letter) যোগাড় ক'রে নিলাম। বলা বাহুল্য, এগুলি পুলিশের অনাবশ্যক অনুসন্ধিৎসা ও সহানুভূতির (?) হাত থেকে কতকটা রক্ষা করে। শুন্‌লাম, পুলিশ কমিশনারের এইরূপ একখানি চিঠি সঙ্গে থাক্‌লে পুলিশের হাঙ্গাম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সেইজন্য আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে জান্‌লাম যে, তাঁরা 'খোজ খার' না ক'রে কাউকে কোন রকম চিঠি পত্র দেন না। খোঁজ নেওয়ার জন্য আমাদের ঠিকানা রেখে দিলেন—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁদের 'সুপারিস-পত্র' পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। এইজন্যই আমাদের যাওয়ার দিন পেছিয়ে দিতে হ'য়েছিল।

নানা প্রকারের বিদ্রূপ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে যাওয়ার
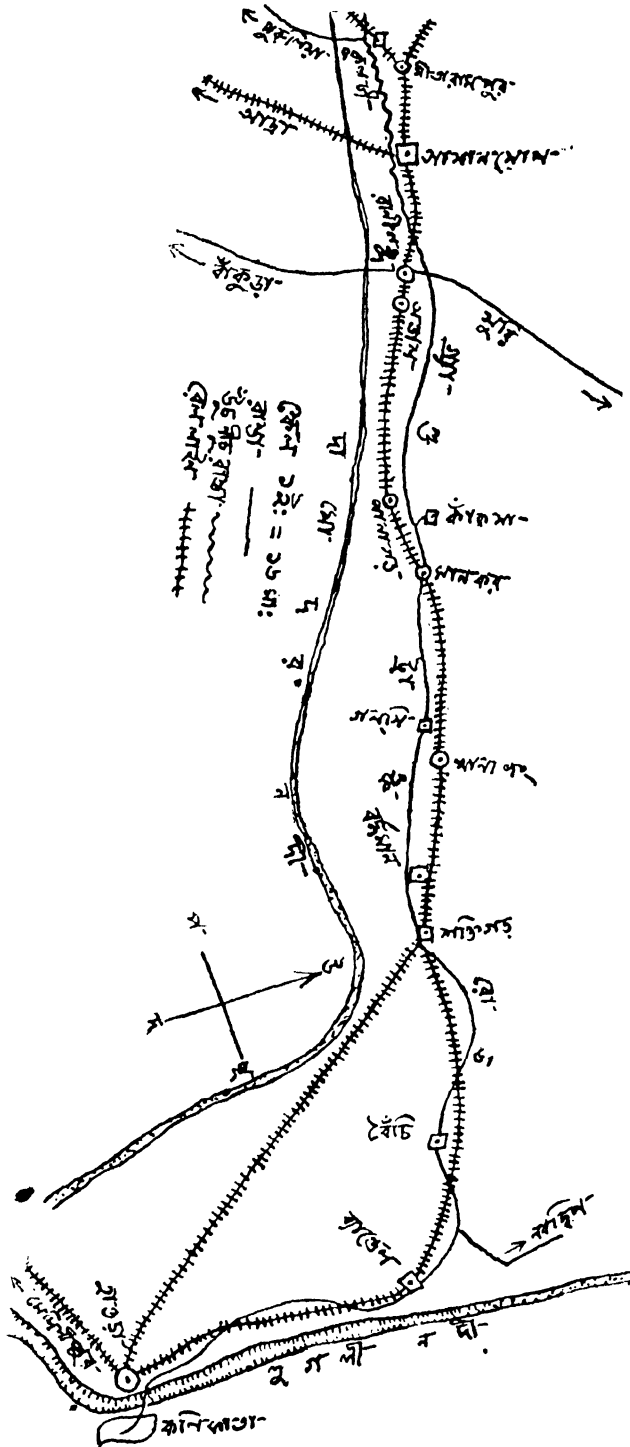
কলিকাতা হইতে কুল্‌টীর পথের মানচিত্র

দিন ক্রমশঃ এগিয়ে এল। এখন এইখান থেকে আমাদের দৈনিক-লিপি আরম্ভ করা যাক্।

কাশ্মীর-অভিমুখে

২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার – এই ঘটনা-বহুল ভ্রমণের এক অধ্যায়ের আজ প্রথম দিন। আমাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা বিদায় দিতে সমবেত হ'লেন। বয়োজ্যেষ্ঠেরা যাত্রার সময় কল্যাণ কামনা কর্‌লেন—বন্ধুরা 'all success' ব'লে বিদায় দিলেন। তখন রাত সাড়ে চারটা। সমস্ত নগর নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত, পথ জনশূন্য, আমরা ল্যাম্প জেলে রওনা হ'লাম। আমরা হাওড়া পুলে এসে দেখ্‌লাম পুল খোলা। কাজেই আমাদের এখানে প্রায় মিনিট পনের দাঁড়াতে হ'ল। পরে হাওড়া ষ্টেশনকে বাঁ দিকে ফেলে ক্রমশঃ আমরা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে পড়্‌লাম। তখনও বেশ অন্ধকার, কিন্তু রাস্তার আলো নিবিয়ে দেওয়ায় আমাদের একটু অসুবিধা হ'তে লাগ্‌ল। ভোরবেলা লিলুয়ায় এসে ল্যাম্প নিভিয়ে দিলাম। রাস্তা খারাপ হ'তে আরম্ভ হ'ল। পাঁচ মাইল-ষ্টোনের কাছে দেখা গেল মিটার আল্‌গা হ'য়ে যাওয়ায় সরে গেছে—তাতে কিছু ওঠে নি। নেমে মিটার ঠিক ক'রে আমরা সাইকেলে উঠ্‌লাম।

সূর্য্যোদয় হ'য়েছে। বালিতে গঙ্গাকে ডান দিকে রেখে উত্তরপাড়া; কোন্নগরের ভিতর দিয়ে চলেছি। দু'পাশে মিলের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলেছে। গাড়ী ঘোড়া ও লোকজনের ভিড়ও কম নয়। কলকাতার আঁচ এখনও একেবারে যায় নি। মাঝে মাঝে রেলের লাইনের গেট বন্ধ থাকায় আমাদের নাম্‌তে হচ্ছিল। ক্রমশঃ রাস্তার পাশে গাছপালা সুরু হ'ল।

সবুজ শাখা-পত্রসমাচ্ছন্ন বাগানের ভিতর দিয়ে বাড়ীগুলি পিছনে রেখে আমরা ব্যাণ্ডেলের কাছে এসে পড়্‌লাম। প্রখর রোদে তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে চা খাওয়ার জন্য মাইল খানেক কাঁচা রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে গেলাম।

রওনা হতে বেলা নটা হ'য়ে গেল। আবার গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে চল্‌লাম। রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভাল কিন্তু রোদের তেজে আমাদের বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল। মগরা ছাড়াতে প্রায় বারটা বাজ্‌ল। জল খাওয়ার জন্যে আমাদের প্রায়ই এখানে সেখানে নাম্‌তে হচ্ছিল। এবার অগ্রসর হওয়া কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। রাস্তার ধারে একটা বড় আম গাছের ছায়ায় আমরা বিশ্রাম কর্‌তে নাম্‌লাম। আশে-পাশের কুঁড়ে থেকে কয়েকটি চাষী সপরিবারে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। এখনও মনে পড়ে তাদের দেওয়া জল আমরা কত তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিলাম। মিনিট পনের বিশ্রামের পর আবার রওনা হ'লাম। এবার রাস্তা ক্রমশঃ বেশ ভাল হ'তে আরম্ভ হ'ল। বেলা একটার পর আমরা বৈঁচিতে মন্মথ কুমার মহাশয়ের গোলাবাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার জন্য উপস্থিত হ'লাম। এখানে আগেই খবর দেওয়া ছিল।

বেলা চারটার সময় চা খাওয়ার পর আমরা রওনা হ'লাম। সবুজ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে আম কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ঢাকা লাল রাস্তাটি এঁকে বেঁকে বর্দ্ধমানের দিকে চ'লে গেছে। সূর্য্যের তেজ কমে আসাতে আমাদের কষ্ট অনেক কমে গেল। এতক্ষণে সমস্ত দিনের শ্রান্তি লাঘব হ'ল। বাংলা মায়ের স্নিগ্ধ-শ্যামল ছবিখানি আমাদের মনের মধ্যে একটি রঙীন রেখা টেনে দিলে। বন্ধু অশোক উচ্ছ্বসিত হ'য়ে গান গেয়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ উচ্ছ্বাস রইল না। কিছু আগেকার ছোট্ট মেঘখানি একটু একটু ক'রে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। চারদিক অন্ধকার; ঝড় সুরু হ'ল। বৃষ্টি আসন্ন দেখে গান থামিয়ে আমরা জোরে যেতে লাগ্‌লাম। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা টুপির পাশ দিয়ে মুখে পড়তে লাগ্‌ল। আকাশের এই রকম অবস্থার জন্য বর্দ্ধমান পৌঁছানর আশা ত্যাগ ক'রে দূরে ষ্টেশন দেখে সেখানে আশ্রয় নিতে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লাম সেটি শক্তিগড় ষ্টেশন। আমাদের সেখানে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। রাত কাটাবার জন্য দু'খানা বেঞ্চ দখল ক'রে কম্বল পেতে বিছানা পেতে ফেল্‌লাম। চার পাশে সাইকেলের উপর আমাদের ভিজা পোষাক রাখা হ'ল। রাত ন'টার পর বৃষ্টি থাম্‌লে নিরঙ্ককে খাওয়ার যোগাড়ের জন্য পাঠান হ'ল, বেশী রাত হওয়ায় দোকান বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিছু পাওয়া গেল না। হ্যাভারস্যাক থেকে নাসপাতি নিয়ে, আর চিনির সরবত তৈরী ক'রে সে-দিনের মতো খাওয়া শেষ ক'রে ফেললাম।

ডায়েরী লেখার পর মশা ও ছারপোকার অনুগ্রহে বৃথা ঘুমের চেষ্টা ক'রে বাইরে খোলা প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালাম। ছিন্ন মেঘের ফাঁক থেকে পঞ্চমীর চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্না গাছের ভেজা পাতার উপর প'ড়ে পল্লী-মায়ের আর এক শ্রী দেখালে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। কোটটাকে গায়ে টেনে দিয়ে প্ল্যাটফরমে পায়চারি ক'রে আমরা কোনোরকমে রাত কাটিয়ে দিলাম। আজ মোট ৬৫ মাইল আসা হ'ল।

২

২৩শে সেপ্টেম্বর বুধবার—তখন আলো-আঁধারের মিলন-মুহূর্ত্ত। সদ্যোজাত শিশু-অরুণের রক্তিম আভা পৃথিবীর কোলে এসে পৌঁছয় নি। আমরা প্রস্তুত হ'য়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। লাল রাস্তার দু'পাশের শিশিরে ভেজা সবুজ ঘাসের রেখা যেন রাস্তাটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের সঙ্গে চল্‌তে সুরু করল। কালকের রাতের শ্রান্তি আজ ভোরের হাওয়ায় যেন কোথায় চ'লে গেল। ক্রমশঃ আশে পাশের, গাছে-ঢাকা বিহঙ্গ-নীড়ের মতো স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ গ্রামগুলি ফেলে রেখে আমরা বর্দ্ধমানের কাছে এসে পড়্‌লাম। এখানে সেখানে বাগানের দেয়ালে কোথাও বা গাছের গায়ে 'ডিঃ গুপ্ত', 'গেলের পাঁচন' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দেখা যেতে লাগ্‌ল। ধূমপানরত বৃদ্ধেরা একবার আমাদের দিকে আগ্রহশূন্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে আবার নিজ-নিজ কাজে গভীর মনঃসংযোগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। একটা ছোট পুল পার হ'য়ে আমরা কার্জ্জন গেটের মধ্য দিয়ে বর্দ্ধমান সহরে প্রবেশ কর্‌লাম। এক বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে তাকে যথেষ্ট বিস্মিত ক'রে

তুলেছিলাম। এত ভোরে এরূপ অভিনব বেশে হঠাৎ আমাদের আবির্ভাবের কারণের উত্তরে যখন শুধু 'Surprise' ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নাই বুঝিয়ে একখানা বেঞ্চে বসে পড়্‌লাম, ক্ষিদেটা তখন বেশ রীতিমতভাবেই অস্থির ক'রে তুলেছে। এখানে চা ও মোটা গোছের জলযোগের পর, গত রাত্রের জাগরণের অবসাদহেতু আজ আর অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে যখন মতদ্বৈধ হ'ল, তখন পকেট থেকে একটা টাকা বের ক'রে তার সাহায্যে ভাগ্য-পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল। আজ এখানে থাকার দলেরই জিৎ হ'য়েছে। সুতরাং কাছেই নিরঙ্কর মামা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী থাকায় সেখানে গিয়ে ওঠা গেল।

গুরুতর আহার ও রীতিমত বিশ্রামের পর সাইকেল পরিষ্কার ক'রে সন্ধ্যার আগে সহর দেখ্‌তে বার হ'লাম। সহর দেখে আমরা ষ্টেশনের দিকে চল্‌লাম। এখানে নূতন electric installation সুরু হ'য়েছে দেখা গেল। ষ্টেশনে নিরঙ্ক চিঠি লিখে আসানসোলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত ক'রে তার নিজের কর্ত্তব্য শেষ করলে। সকলের কৌতূহল-দৃষ্টি এড়িয়ে ও উপর্য্যুপরি প্রশ্নের যথা সম্ভব উত্তর দিয়ে বাড়ী ফির্‌তে রাত ন'টা হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা গত রাত্রের রাত্রিজাগরণের অবসাদটুকু পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। আজ ৮ মাইল এলাম। কলকাতা থেকে মোট ৭৩ মাইল আসা হ'ল।

২৪ শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—রওনা হতে ৫টা বাজ্‌ল। ষ্টেশনের পাশ দিয়ে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে আসানসোলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হ'লাম। ফর্সা হ'য়ে এল; রাস্তাটির বাঁদিকে ধান ক্ষেতের ওপারে দূরে কতগুলি সাদা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। খানিক দূর যাওয়ার পর অশোকের সাইকেলের ফ্রি হুইল একটু গোলমাল সুরু করলে। বাহনের ডাক্তার আনন্দর তখন ডাক পড়্‌ল। মিনিট দশেক কস্‌রতের পর সেটাকে ঠিক ক'রে আবার চল্‌লাম। চন্‌চনে রোদে তেষ্টা পেতে গলসি থানায় নেমে জল খেলাম। থানায় দু'একটা কনেষ্টবল ছাড়া আর কেউ নেই। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল ইন্‌স্পেক্টার-বাবুরা সদলবলে বেলজিয়ামের রাজদম্পতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য লাইনের ধারে সারবন্দী হ'য়ে পাহারা দিতে গেছেন। পর পর বারখানি ওভারল্যাণ্ড মোটর ধুলো উড়িয়ে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ধুলোয় সমস্ত শরীর ভ'রে গেল—এটা ভারী বিরক্তিকর। কে জান্‌ত তখন এই অসুবিধাটুকু অল্পবিস্তর রোজই ভোগ করতে হবে।

রাস্তার রং গেরিমাটির মতো লাল হ'তে সুরু হ'য়েছে। রেলের লাইনটি ক্রমশঃ স'রে আস্‌তে আস্‌তে একবারে রাস্তা ডিঙিয়ে পাশে পাশে চল্‌ল। বাঁ দিকে পানাগড় ষ্টেশন। দূরে ডান দিকে কাঁসর ঘণ্টার বাজনা শুনে আজ যে সপ্তমী-পূজা, মনে পড়ে গেল। বেলা প্রায় সাড়ে ন'টা। পূজা-বাড়ীতে এ বেলার মতো আতিথ্য গ্রহণ করা সকলের ইচ্ছা হওয়াতে আমরা একটা কাঁচা রাস্তা ধ'রে প্রায় মাইলখানেক যাওয়ার পর কাঁক্‌সা গ্রামের মধ্যে পূজাবাড়ীতে পৌঁছলাম। এ রকম নূতন ধরণের অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য বাড়ীর কর্ত্তারা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এত কষ্ট স্বীকার ক'রে আমাদের দেশ ভ্রমণে যাওয়ার অর্থ, যখন তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও বোঝাতে না পেরে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছি, বাড়ীর ছেলেরা তখন বেরিয়ে এসে আমাদের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন। তাঁরা আমাদের পোষাক ও সাইকেলের সরঞ্জাম দেখেই সমস্ত বুঝতে পেরেছিলেন ও বাইরের একখানা ঘরে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আমরা পোষাক ছেড়ে লুঙ্গি প'রে চান করবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। কর্ত্তারা একেই আমাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ্‌ছিলেন তার ওপর যখন লুঙ্গি প'রে আমরা পুকুরে চান করতে গেলাম, তখন বৃদ্ধ পুরুত মশায়ের সঘন দৃষ্টিপাত জানিয়ে দিল যে আমাদের এরূপ ম্লেচ্ছ-আচরণ তিনি বরদাস্ত করতে পারছেন না। কিন্তু আমরা তাতে নাচার। পরে সে দিন রাস্তায় আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। তখন বলাবলি করেছিলাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফল না কি!

বেলা তিনটার পর রোদের ঝাঁঝ কম্‌লে আমরা বেরুলাম। বাঁ দিকে দূরে অস্পষ্ট পাহাড় দেখা গেল। অবেলায় খাওয়ার জন্য বড় আলস্য বোধ হ'তে লাগ্‌ল। মন্থর গতিতে চলেছি, সাম্‌নে থেকে একটা গরুর গাড়ী

এসে আমাদের পাশে উপস্থিত হ'ল। গরু দু'টির রকম দেখে বোঝা গেল তারা আমাদের মানুষ ছাড়া, অন্য কোন জীব ঠাউরেছে। তিন জন পর-পর পাশ কাটিয়ে চ'লে যাওয়ার পর গরু দুটি ভয় পেয়ে হঠাৎ একবারে ঘুরে মাঠে নেমে পড়্ল, আর সেই সঙ্গে আনন্দর সাইকেলের সাম্নের চাকা গরুর গাড়ীর পিছনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এমন বেঁকে গেল যে সাইকেল একবারে অচল হ'য়ে পড়্ল। তখন বেলা পাঁচটা—আসানসোল আটাশ মাইল দূরে—এরূপ দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সাইকেলের রিমের এরকম অবস্থা দেখে ভারী মুস্কিলে পড়্লাম। কারণ এ-কে মেরামত কর্‌তে যে সরঞ্জামের দরকার তা সাইকেলে ব'য়ে আনা সম্ভবপর নয়, কাজেই আমাদের সঙ্গে তা ছিল না। যাই হোক কোন উপায় না দেখে আমরা বিনা সরঞ্জামে যতদূর সম্ভব মেরামতের চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হ'য়ে যখন ট্রেণে সাইকেলখানিকে পাঠাবার জন্য ষ্টেশনের খোঁজে কাছের এক গ্রামে যাওয়ার আয়োজন কর্‌ছি, তখন হঠাৎ বর্দ্ধমানের দিক থেকে একখানা মোটর লরী আস্‌ছে দেখ্‌তে পেলাম। কাছে এলে তাকে ইসারা ক'রে থামান গেল। গাড়ীখানি নূতন। কলকাতা থেকে কিনে মোটর সার্ভিসের জন্য বরাবর পাঞ্জাবে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিজের অবস্থা বুঝিয়ে তাদের সঙ্গে একটা রফা ক'রে, সাইকেল শুদ্ধ আনন্দকে ঐ লরীতে আসানসোলে পাঠানর ব্যবস্থা করা গেল।

যখন তিন জনে সব হ্যাঙ্গাম মিটিয়ে সাইকেলে উঠ্‌লাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মাইল দুই আসার পর যখন দুর্গাপুরের জঙ্গলে ঢুক্‌লাম তখন বেশ অন্ধকার হ'য়ে গেছে। আলো জাল্‌তে হ'ল। রাস্তাটি হটাৎ ঢালু হ'য়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছে। দু'পাশে বড় বড় গাছ দৈত্যের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল সাইকেলের সোঁ সোঁ শব্দ যেন এই নিস্তব্ধতায় আরও বেড়ে উঠ্‌ল। অন্যমনস্ক হ'য়ে ঢালু রাস্তায় পর পর তিন জন চলেছি, কতক্ষণ তা মনে নেই। চমক ভাঙ্‌ল যখন দেখি আমরা পরস্পরের ঘাড়ের উপর। ধূলো ঝেড়ে উঠে দেখি সাইকেল তিনখানি তিন জায়গায় প'ড়ে ঘুরুছে। হঠাৎ এ বিপত্তির কারণ আর কিছু নয়, রাস্তা মেরামত হওয়ার দরুণ বড় বড় গাছের গুঁড়ি ও ডাল-পালা-ফেলা বন্ধ রাস্তার ওপরে সাইকেল ক'রে যাবার আমাদের অন্যায় চেষ্টা! পরে আরও অনেক জায়গায় দেখেছিলাম P. W. D., No Throughfare এর নোটিশ এমনি ক'রেই দেয়।

জঙ্গল পার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা খারাপ ও উঁচু নীচু হতে সুরু হ'ল। দু'পাশে অন্ধকারে ঢাকা মাঠে এখানে সেখানে কুয়লা-স্তূপের আগুনের অস্পষ্ট আলোয় কুলীরা জটলা কর্‌ছে। থেকে থেকে তাদের মাদলের বাজনা শোনা যাচ্ছে। বুঝ্‌তে পার্‌লাম আমরা কয়লা খনির দেশে এসে পড়েছি। ক্রমশঃ চাঁদের ক্ষীণ আলো দেখা দিল। অণ্ডাল ছাড়িয়ে রাণীগঞ্জে চা খেয়ে নেওয়া যাবে মনে কর্‌লাম কিন্তু রাস্তা থেকে ষ্টেশন পাঁচ ছ' মাইল দূর শুনে একবারে আসানসোলের দিকে পাড়ি দিলাম। আসানসোলের কয়েক মাইল দূর থেকে Colliery (কোলিয়ারির) সাহেবদের মোটরের চোখ-ঝল্‌সান আলো আমাদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌লে। অশোকের সাইকেলের ফ্রি হুইল আবার গোলমাল সুরু কর্‌লে। বোঝা গেল আসানসোলে রীতিমত সংস্কার না কর্‌লে এর দ্বারা আর কাজ চল্‌বে না। কাঁক্‌সা থেকে বেরিয়ে অবধি একটা না হাঙ্গাম লেগেই রয়েচে। মিউনিসিপ্যালিটী ও ষ্টেশনের আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে, আমরা পিচ দেওয়া রাস্তা দিয়ে সহরের মধ্যে এসে পড়লাম। তখন রাত দশটা। রাস্তার ওপরে এক সাইকেলের দোকানে আনন্দকে দেখে আমরা নেমে পড়্‌লাম। সাইকেল মেরামত আরম্ভ হ'য়ে গেছে দেখে বর্দ্ধমানের বন্দোবস্ত-অনুযায়ী নিরঞ্জর আত্মীয় শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসুর বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। সমস্ত দিন হায়রানের পর কয়েক পেয়ালা চা অমৃতের মতো মনে হ'ল।

আজ ৬৬ মাইল আসা গেছে। কলকাতা থেকে মোট ১৩৯ মাইল আসা হ'ল।

২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার—সকালে উঠে চা খেতে না বাজ্‌ল। মিস্ত্রীকে তাড়া দেবার জন্য সকলে তার দোকানে উপস্থিত হ'লাম। এসে শুন্‌লাম সামনের ফর্কটি (For

আর না বদল করলে চলবে না। কাল রাত্রে দেখতে পাই নি, আজ দেখে বুঝতে পারলাম মিস্ত্রীর কথাই ঠিক। গাড়ীটির Fork (ফর্ক) ও একখানা mud guard (মাড-গার্ড) বদল আর Rim (রিম্) মেরামত করা হ'ল। বলা বাহুল্য এখানে এ সবের দাম ক'লকাতার দ্বিগুণ।

এইসব হ্যাঙ্গাম মিটিয়ে ফিরতে প্রায় বারটা বাজল। খাওয়া-দাওয়ার পর বেরুতে বেলা সাড়ে তিনটা হ'ল। সহরের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। বাঁদিকে সারি সারি দোকান ও ডান দিকে বরাবর রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোয়ার্টার ছাড়িয়ে আমরা বি, এন, আর পুলের ওপর উঠলাম ; নীচে দিয়ে লাইনটি আদ্রার দিকে চ'লে গেছে। বাংলার দৃশ্য এখানে একেবারে বদলে গেল। দূরে ছোট পাহাড় আর তাদের পায়ের নীচে ধানে-ভরা সবুজ ক্ষেত। ঘাসে মোড়া উঁচু নীচু মাঠের ওপর দিয়ে লাইনটি ক্রমশঃ অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে। রাস্তাটিও সঙ্গে-সঙ্গে ঢেউয়ের মতো একবার উঁচু একবার নীচু হ'য়ে চলল। এরকম রাস্তায় সাইকেল চালান ভারী কষ্টকর। ওপরে ওঠবার সময় সাইকেল সবচেয়ে উঁচু জায়গাটার কাছ পর্য্যন্ত এসে একেবারে থেমে পড়ে। নামবার সময় অবশ্য খুব আরাম কিন্তু লাভ লোকসান খতিয়ে দেখলে লোকসানের ভাগই বেশী। সীতারামপুরের কাছে নিয়ামতপুরে এসে জল খাওয়ার জন্য নামতে হ'ল। একে এ রকম রাস্তা তার ওপর রোদের ঠেলায় প্রাণ অস্থির। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আকাশে মেঘ জমতে সুরু করল। কুলটির কাছে যখন এলাম মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে—ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। বড় সুবিধা বোধ হ'ল না। আমাদের বরাবর পৌছানর কথা ছিল। সে প্রোগ্রাম বদলে কুলটীতে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। রাস্তার উপরে ডানদিকে কুল্টী কারখানার(Kulti Iron Works)সাহেবদের লাইন-বন্দি বাঙ্গলো। এখানকার মেডিকাল অফিসার ডাক্তার রায়ের নাম আমরা আগেই শুনেছিলাম। ইনি খেলা-ধূলার বিশেষ উৎসাহী ও টুরিষ্টদের উপর এঁর বিশেষ সহানুভূতি আছে। এঁর বাঙ্গলো খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। আমাদের দেখে খুব খুসী হলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল।

আজ মহাষ্টমী। এখানকার বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করেন। সহরটি খুব ছোট জায়গা —কারখানাটিকে উপলক্ষ্য ক'রে সহরটি গ'ড়ে উঠেছে। সহরের দৃশ্য বেশ মনোরম। রাস্তায় বিজলীবাতি ও জলের কলেরও অভাব নাই। শ্রান্ত হ'য়ে সহরের বাইরে খোলা মাঠে এসে বসলাম। পাতলা কুয়াসার জাল ছিঁড়ে চাঁদের আলো সহরটিকে ঘিরে ফেলেছে।

আজ ৯ মাইল এগিয়েছি, কলকাতা থেকে ১৪৮ মাইল আসা হ'ল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

হারামণি

কোন সময়ে আমি চন্দ্রনাথ-তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। তখন জনৈক বৈষ্ণবের মুখে একটি হৃদয়গ্রাহী গান শুনিয়াছিলাম। উহা একাধারে দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। দুঃখের বিষয় গানটি কাহার রচিত, তাহা জানিতে পারি নাই।

কত উঠছে আজব কারখানা—দিল-দরিয়া-মাঝে।
ডুবলে পরে রত্ন পাবি—ভাসলে পরে পাবি না।
দিলের মাঝে জাহাজ আছে,—ন'-জনা তার গুণ টানিছে।
ছ'-জনা তার দাঁড় টানিছে,—হাল ধরেছে একজনা।
দিলের ভিতর বাগান আছে—তাতে নানা-জাতি ফুল ফুটেছে,
(তার) সৌরভে জগৎ মেতেছে,—তাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রয়েছে ;
সেই তিনকে যে এক করেছে,—তার বা কিসের ভাবনা।

সংগ্রাহক—শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ছেলেদের পাততাড়ি
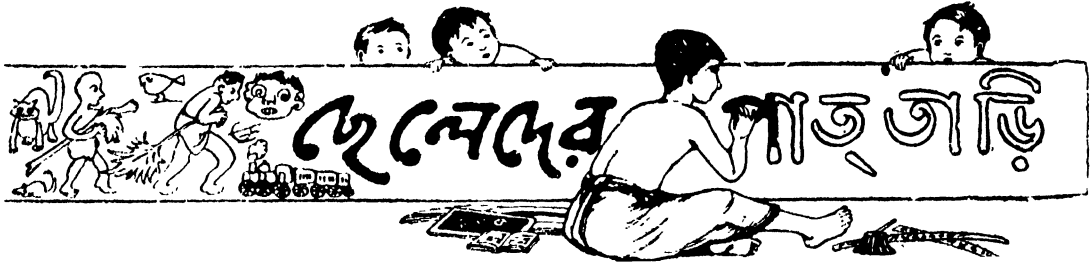
পাখা-টিকটিকি

প্রবাদ আছে—"আরশোলা আবার পাখী, খই আবার জলপান!" কিন্তু তাই বলিয়া আরশোলা উড়িতে ছাড়ে না। মাঝে মাঝে অন্ধকার ঘরে ইহারা এত উড়ে যে, মনে হয়, ইহারা বুঝি পৃথিবী জয় করিয়া ফেলিবে।

মালয় ও ফিলিপাইন্ দ্বীপে একরকম উড়ন্ত টিকটিকি আছে। ইহারা লম্বায় কয়েক ইঞ্চি মাত্র। ইহাদের গায়ের রং অত্যন্ত সুন্দর। ইহাদের দেহের দুই পাশে খানিকটা করিয়া চামড়া আছে। ইচ্ছা করিলেই তাহারা ইহা বাড়াইয়া প্রজাপতির পাখার মতন করে। এবং এই পাখার সাহায্যে ইহারা গাছের এক ডাল হইতে অন্য ডালে বা এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যায়। খুব বেশী দূর ইহারা উড়িতে পারে না। ইহাদের পাখা বেলুনের প্যারাশুটের মতও দেখায়। এই পাখার সমস্তটাই যে চামড়ার তাহা নয়, তাহার ভিতরে ভিতরে সরু সরু পাজরের হাড় আছে। মাথা হইতে ল্যাজ অবধি মাপিলে ইহারা আট ইঞ্চি। ইহাদের পাখার বিচিত্র রং দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহাদের গলায় মাংসের থলি আছে। উত্তেজনার কারণ ঘটিলে সেই থলি ইহারা ফুলাইয়া থাকে। পুরুষ-টিকটিকির এই থলির রং কমলা-লেবুর রংএর মত, স্ত্রী-টিকটিকির থলি নীল। ইহারা গাছে বাস করে। ইহারা কাহারও অনিষ্ট করে না।

গুপ্ত

পাখী-টিকটিকি

গ্রান্-ল্যাণ্ডের পালোয়ান

আমাদের দেশের অনেক পালোয়ানই খুব ভারী পাথর বুকের উপর রাখিয়া অপরকে দিয়া হাতুড়ী দ্বারা তাহা ভাঙাইয়াছেন। সম্প্রতি গ্রীন্ল্যাণ্ডের এইরূপ একটি পালোয়ানের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি বুকের উপর প্রায় দশ মণ ওজনের প্রকাণ্ড পাথর বসাইয়া অপরকে দিয়া তাহা ভাঙাইতেছেন।
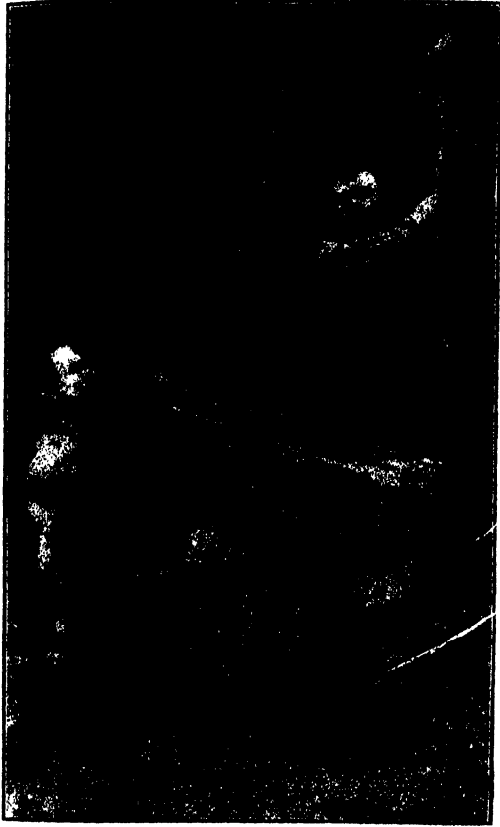
গালোয়ান গাষ্ট লেসিস্

—সেই ছবি আমরা দিলাম। এই পালোয়ানের নাম গাষ্ট লেসিস (Gust Lessis)।

—

মুদ্রার কথা

এখন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই চ্যাপটা এবং গোলাকার ধাতুখণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রার উপর বিভিন্ন রকমের মার্কা দেওয়া থাকে। চ্যাপটা এবং গোলাকার মুদ্রাই সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহারের উপযোগী বলিয়া অনেক শতাব্দী ধরিয়া এই আকারের মুদ্রার প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারের মুদ্রার প্রচলন ছিল।

বহু প্রাচীন কালে অদ্ভুত আকৃতির এক তাল ধাতু-পিণ্ডের উপর একটা সাদাসিধা মার্কা দিয়া মুদ্রা তৈয়ার হইত। ঐ অদ্ভুত ধরণের ধাতুর ডেলার ব্যবহারে অনেক অসুবিধা হওয়ায় ক্রমশঃ তাহা একটু গোলাকার ও চ্যাপাটা আকৃতির করা হয়। বর্ত্তমান উন্নত ধরণের মুদ্রাঙ্কণ প্রণালী সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে কোন দেশেই মুদ্রা ঠিক গোলাকার ছিল না। এসিয়ার প্রাচীন মুদ্রাগুলিই বিশেষ করিয়া অদ্ভুত আকারের ছিল তবে ইউরোপে ও আমেরিকায়ও নানা অদ্ভুত আকারের মুদ্রার প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর যে-সব দেশে ভাল টাকশাল ছিল না, সে-সব দেশে সাধারণতঃ ধাতু-শলাকা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। জাভা ও সিংহল দ্বীপের শলাকামুদ্রা বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। এইসব দ্বীপের প্রচলিত মুদ্রাগুলি লম্বা, ছাঁচে-ঢালা তাঁমার শলাকা হইতে প্রস্তুত হইত এবং যে শলাকা যতটা লম্বা হইত তাহার মূল্য তত বেশী হইত। শ্যামদেশে রৌপ্য-শলাকা পিটিয়া নানা আকারের মুদ্রা তৈয়ার করা হইত।

প্রাচীনকালে নানাধাতুর তার-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলনেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে পারস্য দেশের লারি-স্তানের মাছধরা বঁড়শি-আকারের তার-মুদ্রাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রূপার-তৈরী প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা এক-একটি তার ভাঁজ করিয়া ও একদিক্ বেঁকাইয়া এই প্রকারের মুদ্রা প্রস্তুত হইত। সিংহল ও ভারতবর্ষের নানা-স্থানেও তারের মুদ্রার চলন ছিল। আরব দেশে ও ককেশাস্ পার্ব্বত্য প্রদেশে ছোট ছোট তামার তার মুদ্রা-রূপে ব্যবহৃত হইত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইডেনে বড় বড় তামার পাতের উপর ছোট ছোট মার্কা মারিয়া মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। মূল্য-অনুযায়ী এই মুদ্রা-পাতগুলি ভারী করা হইত। সুইডেনের তৎকালীন একটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্যের মুদ্রার ওজন প্রায় ২৪ সের। সেখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুদ্রাপাত লম্বায় আড়াই ফুট ও চওড়ায় এক ফুট ও সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মুদ্রার আয়তন এক ইঞ্চিরও কম হইত।

যুদ্ধের দরুন্ অনেক সময় অনেক নগর অবরোধ করা হইত। সাময়িক কাজ চালাইবার নিমিত্ত অবরুদ্ধ নগর-

1. প্রাচীন গোলাকার গ্রীক্ মুদ্রা 2. ১৮০০ খৃষ্টাব্দের যাভা দ্বীপের তামার মুদ্রা 3. শ্যামদেশের প্রাচীন মুদ্রা—রৌপ্য-শলাকা বাঁকাইয় নির্ম্মিত 4. প্রাচীন ভারতবর্ষের রৌপ্যের তার হইতে প্রস্তুত মুদ্রা 5. জর্জ্জিয়ার মুদ্রা—তামার তার হইতে প্রস্তুত 6. ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত হারলেমের মুদ্রা—সহরটি এই সময় স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল 7. ১৭০২ খৃষ্টাব্দে ল্যাণ্ডাউএর অবরোধ কালীন মুদ্রা 8. ভারতবর্ষের ব্যাক্‌ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক প্রচলিত মুদ্রা 9. সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক প্রচলিত হিন্দুস্থানের মুদ্রা 10. প্রাচীন সুইট্‌সারল্যাণ্ডের ব্রকেটেট মুদ্রা 11. ক্যালিফোর্ণিয়ার আটকোণা মুদ্রা 12-14. ভারতবর্ষের আধুনিক দস্তার মুদ্রা 15. শ্যামদেশের লাও-রাজ্যের ডোঙার আকারের মুদ্রা 16. আকবর কর্ত্তৃক প্রচলিত মিহরবি মোহর 17. পেহাঙের টিন-নির্ম্মিত টুপীর আকৃতির মুদ্রা 18. খেদার ডিম্বাকৃতি মুদ্রা 19. খেদার একটি কিম্ভুতকিমাকার মুদ্রা 20. ইতালীর ডিম্বাকৃতি তামার তরী মুদ্রা 21. গ্রীসদেশের এজিনা দ্বীপের একটি মুদ্রা 22. মধ্যযুগের জর্জ্জিয় প্রদেশের মুদ্রা 23—24. মেক্সিকো দেশের সপ্তদশ শতাব্দীর মুদ্রা 25. পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের খণ্ডিত মুদ্রা 26. সেণ্ট্ লুসিয়া দ্বীপের মুদ্রা 27—28 খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বেকার চীনদেশের মুদ্রা 29. জুতার পাটির আকৃতির মুদ্রা 30. চীনদেশের একটি মুদ্রা 31. আনাম দেশের রৌপ্য-মুদ্রা 32. জাপানী রৌপ্য-মুদ্রা (কমোদোর পেরীর সমসাময়িক) 33. স্পেনীয় ডলার মুদ্রা 34. প্রাচীন চীনদেশের ছুরীর আকারের মুদ্রা 35. প্রাচীন কালের ক্যাথীর মুদ্রা।

গুলিতে তাড়াতাড়ি চারকোণা আটকোণা প্রভৃতি নানা আকারের মুদ্রা তৈয়ার হইত। ল্যাপ্ডাউতে ১৭০২ সালের ঐরূপ একটি অদ্ভুত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ প্রাচীন মুদ্রাই চতুষ্কোণ। সর্ব্ব-প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার নাম পুরণ। চতুষ্কোণ রৌপ্য-খণ্ডের উপর ছোট ছোট মার্কা দিয়া সেগুলি তৈয়ারী করা হইত। এদেশে ব্যাক্‌ট্রিয়ান্ যুগে ও তাহার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত চার-কোণা ছাঁচে-ঢালা মুদ্রার প্রচলন ছিল।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের নানা স্থানে রূপার পাত কাটিয়া চতুষ্কোণ মুদ্রা তৈরী করা হইত। সুইট্‌সার্‌ল্যাণ্ডে এই ধরণের মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। এই মুদ্রাগুলির নাম "ব্রাক্‌টিয়েট" (Bractiates)। ইহা কাগজের মতন পাতলা রূপার পাত কাটিয়া প্রস্তুত। পূর্ব্বকালে উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া স্বর্ণখনির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে অনেক দিন আগে আটকোণা স্লাগ (Slug) নামক স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এক-একটি স্লাগ-মুদ্রার মূল্য ছিল প্রায় ২ শত টাকা। অধুনা সেখানে ভারতবর্ষের এক-আনি, দু-আনি, সিকি ও আধুলির ন্যায় নানা আকারের দস্তার মুদ্রার চলন হইয়াছে। অনেক দেশে দস্তার মুদ্রার মধ্যভাগে একটি গর্ত্ত করিয়া ছাপ দেওয়া হয়।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর আগ্রায় "মিহর্‌বি মোহর" নামক একপ্রকার স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন করেন। মসজেদের মিহর্‌বির (অর্থাৎ উপাসনা-স্থলের মূর্ত্তি রাখিবার কুলুঙ্গী) ন্যায় আকৃতি বলিয়া উক্ত মোহরের এইরূপ নামকরণ হয়। ব্রহ্মদেশের ও মলয় উপদ্বীপের প্রাচীন মুদ্রাগুলির আকৃতিও অতি অদ্ভুত ধরণের। ব্রহ্মদেশের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে ও শ্যাম দেশের লাও রাজ্যে ডোঙার মতন ছাঁচে-ঢালা তামার শলাকা-মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মলয় উপদ্বীপের পেহাঙে চতুষ্কোণ টুপীর আকারের টিনের মুদ্রার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। খেদাতে (Khedah) টিনের ডিম্বাকৃতি মুদ্রার চলন ছিল। কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী ওল্‌বিয়াতে তিমিমাছের আকারের ব্রোঞ্জ (তামা ও টিন মিশ্রিত একপ্রকার ধাতু) ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং ইতালীর ইগুভিয়াম্ অঞ্চলে বাদামাকৃতি অথবা ডিম্বের আকারের তামার মুদ্রা ব্যবহৃত হইত।

অনেক স্থলে দেশের অধিবাসীদের ঔদাসীন্য অথবা অসাবধানতার ফলে মুদ্রার গড়ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। প্রাচীন গ্রীস-দেশের, রোমের জর্জ্জিয়ার ও স্পেন-অধিকৃত আমেরিকার কতকগুলি মুদ্রার আকৃতি মোটেই সুশ্রী নহে। ছাঁচের দোষেই মুদ্রাগুলির চেহারা ঐরূপ বিশ্রী হইয়াছিল।
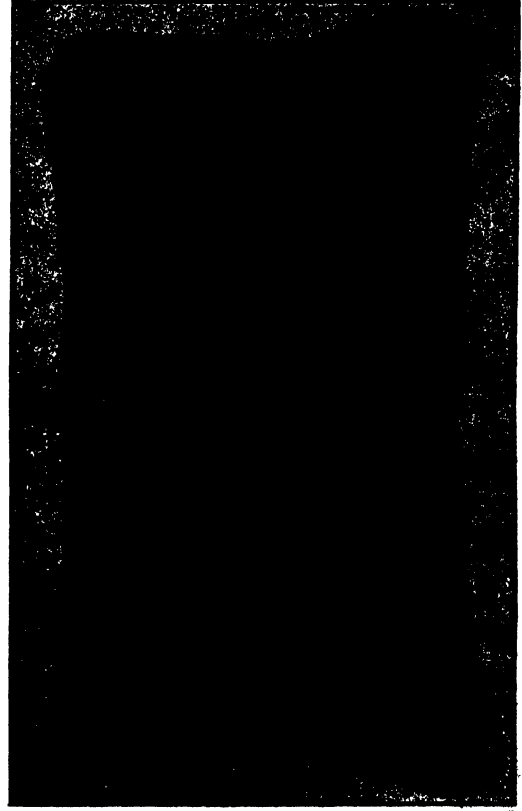
সুইডেনের একটি সুবৃহৎ প্রাচীন মুদ্রা
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইডেনে তামার পাতের উপর মার্কা মারিয়া এই ধরণের মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

মধ্যযুগে অনেক সময় সম্পূর্ণ গোলাকার মুদ্রাকে কাটিয়া নানা আকারের ও বিভিন্ন মূল্যের করিয়া ব্যবহার করা হইত। পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে এক শতাব্দী পূর্ব্বে পর্য্যন্তও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কোথায়ও কোথায়ও এক-একটি পূর্ণাকৃতি ডলারকে সমান্তরালভাবে কাটিয়া মূল্যানুযায়ী ভাগ করা হইত।

প্রাচীন কালের সকল দেশের মুদ্রার উপর চীন দেশের মুদ্রার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। চীনদেশের প্রাচীন মুদ্রাগুলি কিম্ভূতকিমাকার। সেখানকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রার আকার ছুরীর ন্যায়। খৃষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেখানে ঐ-আকৃতির মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। প্রাচীন চীনদেশে লাঙল-ফলকের আকৃতির প্রাচীন মুদ্রারও নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃষ্টজন্মের পরে সম্রাট্ ওয়াং মাং যখন চীনের সিংহাসন বলপূর্ব্বক দখল করেন তখন তিনি উক্ত দুইপ্রকার মুদ্রার

পুনঃপ্রচলন করেন। ইহা ভিন্ন চীনদেশে জুতার আকৃতির মুদ্রারও বহুল প্রচলন ছিল। আনাম দেশের সমকোণী আয়তক্ষেত্রের আকারের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার চলন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্তও জাপানে পাতলা সোনার অথবা রূপার পাত কাটিয়া ডিম্বাকৃতি বা সমকোণী আয়তক্ষেত্রাকার মুদ্রা তৈয়ার হইত।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রাচীন মুদ্রার আকৃতির বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয় প্রাচ্য দেশসমূহ ভিন্ন অন্য সকল দেশে সাধারণত চ্যাপ্টা এবং গোলাকার মুদ্রারই প্রচলন ছিল। কেবল অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সময় সময় নানা অদ্ভুত আকৃতির দস্তার ও অন্যান্য ধাতু-মুদ্রার প্রচলন হইত।

প্র

ধড়িবাজ

শ্রী বীরেশ্বর বাগছী

মোক্তারখানার ভাঙা জানালা দিয়ে গলা বের ক'রে মধু মোক্তার চেঁচিয়ে ডাক্‌লে—"ওরে ফটকে, শুনে যা'ত একবার এদিকে।"

পরনে কাঁঠালকোষী রংয়ের নতুন ধুতি—গায়ে আধ-ময়লা ময়নামতি ছিটের পাঞ্জাবী—তিন চার জায়গায় হলুদের ছোপ লাগা, পোকায় কাটা—একখানা গরদের চাদর মাজায় বাঁধা—বগলে গামছা দিয়ে জড়ানো একটা ছোট পুঁটুলি, মাথামোটা একখানা পাকা বেতের লাঠি, হাতে ক'রে আহাম্মুখ-চেহারার একটা লোক মোক্তার-বাবুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বল্‌লে—"আমাকে ডাক্‌তে লেগেছেন মোক্তার মশাই?"

রুক্ষস্বরে "মোক্তার মশাই" বল্‌লেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোকে নয় তবে কি পঞ্চা তেলিকে ডাক্‌ব? যার সাথে সংস্রব সে ইচ্ছে ক'রে না আস্‌লেও বেহায়ার মতন আগে আমাদেরই ডাক্‌তে হয়—গরজ বড় বালাই। বলি, বড় যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্, মোকদ্দমার তারিখটা কবে?"

একটু থতমত খেয়ে ফটকে ওরফে ফটিক বল্‌লে—"আজ্ঞে—আজ।"

ভেংচি কেটে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"আজ—এত বড় একটা সঙ্গীন মামলা তোর ঘাড়ে, আর তার উপযুক্ত তদ্বির না ক'রে তুই বেটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে জাবর কাট্‌ছিস্ আর বিড়ি ফুঁক্‌ছিস্ কোন্ আক্কেলে রে? জানোয়ার কোথাকার! তোর ছোট লোকের মাথায় ঝেঁটা। সাধে কি বলি যে, বাহাত্তর বছর না গেলে তোদের জাত সাবালক হয় না।"

ধমক খেয়ে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে ফটিক আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বল্‌লে—"আজ্ঞে, এই কথা কি যে, আপনার কাছেই যাব ভেবে দু' খিলি পান খেয়ে নিচ্ছিলাম। তা-তা আপনার সঙ্গে যৎক্ষন দেখাই হ'ল তৎক্ষন আর ভাবনা কি? এই যে সেই কাগজটা এনেছি।" ব'লে গামছা দিয়ে বাঁধা পুঁটুলিটি বগল থেকে নিয়ে অতি সাবধানে একখানা কাগজ বের ক'রে ফটিক মোক্তার-বাবুর হাতে দিলে। কাগজখানা হাতে ক'রে মোক্তার-বাবু জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন—"কিসের এখানা?" ফটিক বল্‌লে—"আজ্ঞে, এখানা হচ্ছে ছেরামপুর থানার দারোগার জবানবন্দীর নকল।" শুনে তাচ্ছিল্যভরে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"পুলিশ রিপোর্ট ও আর দেখতে হবে না। তার পরে, গেলবারের ফিটা এনেছিস? সেও ত প্রায় একরাশ টাকা।"

ফটিক বল্‌লে—"মুহুরীবাবুর কাছে সমস্ত মিটিয়ে দিয়েছি।"

শুনে মোক্তার-বাবু স্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ কর্‌লেন। সঙ্গে-সঙ্গে মুখের সাবেক চেহারাও অনেকখানি বদ্‌লে গেল। এবার ফটিকও একটু সাহস পেয়ে আব্দারের সুরে বল্‌লে—"টাকা-পয়সা ত যখন যা চাচ্ছেন তাই দিচ্ছি, কিন্তু দেখবেন, শেষটায় আমার ভাই যেন জেলে প'চে না মরে। তার ভাল-মন্দ একটা কিছু হ'লে মাকে আর বাঁচাতে পারব না।"

বার কতক গোঁফে তা দিয়ে এক গাল "Don't care" হাসি হেসে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন, "তুই ভাবিস্ কি রে ফটকে, জেল হবে আমি বেঁচে থাক্‌তে? আমাকে কি ধান-চাল দিয়ে পাশ-করা মোক্তার পেয়েছিস্ রে? নগদ ছ'শ খানি চকচকে টাকা ঘর থেকে বের ক'রে দিয়ে তবে মোক্তারীর সনন্দ এনেছি। তার পরে এই ক্লাম্বি-জোড়া পুশার জমাতেও বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।"

মোক্তার-বাবুর হাত-মুখ নাড়ার ভঙ্গী দেখে এবং বেপরোয়া কথাবার্ত্তা শুনে ফটিক অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত

হ'য়ে বললে—"মোটের উপর দেখবেন গরীবের যেন কোনো অনিষ্ট না হয়।" মোক্তার-বাবু পূর্ব্ববৎ বল্লেন—"মোকদ্দমার ডাক হ'লেই দেখতে পাবি'খন। ঐ হাবা গঙ্গারাম, নাদাপেটা ঘটিরাম ডেপুটীর কাছ থেকে তিন তুড়িতে যদি তোর ভাইকে ছুটিয়ে নিয়ে না আস্তে পারি তবে আমি মধু মোক্তার মাছকোটা বঁটী দিয়ে নিজ হাতে নিজের কান কেটে ফেল্‌ব আর তিন সাত্তে একুশ বার তোর দুই ঠ্যাংয়ের নীচ দিয়ে একবার যাব ওদিকে আবার আস্‌ব এদিকে। বুঝলি?'

একথা শোনার পর ভাইয়ের মুক্তিলাভ সম্বন্ধে ফটিকের মনে আর কোনো সন্দেহই থাক্‌ল না। মোক্তার-বাবুকে নমস্কার ক'রে সে বল্লে—"এখন তা হ'লে আমি কাছারীর সাম্‌নে বটগাছ-তলায় গিয়ে ব'সে থাকি। মোকদ্দমা উঠলেই আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।"

"বেশ, খুব হুশিয়ার হ'য়ে ব'সে থাক্‌বি" ব'লে মোক্তার-বাবু জান্‌লা থেকে গলা টান দিলেন।

২

ফটিকের ভাইয়ের মাম্‌লা যথাসময়ে উঠল। প্রাণ-পণে বৈধ-অবৈধ সঙ্গত-অসঙ্গত প্রভৃতি নানা রকমের জেরা ক'রেও মোক্তার-বাবু পুলিশ-শেখান সাক্ষীদের একজনকেও বাগাতে পার্‌লেন না। ইংরেজী-বাংলায় মিশিয়ে কাঁদ-কাঁদ সুরে বক্তৃতাও ঢের কর্‌লেন, কিন্তু ঘটিরাম ডেপুটীর মন কিছুতেই ভিজল না। কাঁটাল চুরির অপরাধে ফটিকের ভাইয়ের পঁচিশ ঘা বেতের হুকুম হ'য়ে গেল। শুনে ফটিক হাহাকার ক'রে উঠল। দু' জন খোট্টা কনষ্টেবল্ যখন দু' হাত ধ'রে ফটিকের ভাইকে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল, মোক্তার-বাবুও তখন ধীরে-ধীরে কাছারীর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই ফটিক কেঁদে বল্লে—"মোক্তার-বাবু, আপনার মনে এই ছিল—আমাকে একেবারে ধনে-প্রাণে মার্‌লেন? এতগুলো টাকা খেয়ে শেষে কিনা দেওয়ালেন পঁচিশ ঘা বেতের হুকুম! দুধের ছেলে পঁচিশ ঘা বেত খেলে কি আর বাঁচবে?" ফটিক আর কথা বল্‌তে পার্‌লে না, তার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। মোক্তার-বাবু গম্ভীরভাবে বল্লেন—"দ্যাখ ফটকে, এটা রাজ-কাছারী—তোর ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌বার জায়গা নয়। বেশী শোক উথলে উঠে থাকে ত বাড়ী গিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে যত ইচ্ছা কাঁদ—কেউ বাধা দেবে না। আচ্ছা, বেতের হুকুম হওয়াতে তোর ক্ষতিটা কি হ'ল শুনি? বেত না হ'য়ে যদি জেল হ'ত, তা হ'লেও নিদেন পক্ষে ছ মাসের ধাক্কা। জেলের খাটুনি—জানিস্‌ই ত হাড় জল হ'য়ে যায় একেবারে। হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির কথা ছেড়ে দিলেও জেলেই কি বিপদ কম! আজ ময়দা ভাঙা, কাল ঘানি টানা, পরশু সুরকী কোটা—এই ভাবের রকম-বেরকমের খাটুনি নিত্যি তিরিশ দিন লেগেই আছে। তার পরে বেত ত সেখানে কথায় কথায়। তাই আমি বলি, এসবের সঙ্গে তুলনায় বেত ঢের ভাল। নগদ কার্‌বার—কোনো বঞ্ঝাট নেই, যখনকার কাজ তখন হ'য়ে গেল, ব্যাস। শাস্তিটা হ'য়ে গেলে ভাইকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে যা—তখন কেউ তোকে আট্‌কাবে না। তার পরে, এমন যদি অসুখ-বিসুখই হয়, ডাক্তার দেখালেই পার্‌বি।"

ফটিক কেঁদে বল্লে—"পঁচিশ ঘা বেত খাওয়ার পর ওকে কি আর জীয়ন্ত বাড়ী নিয়ে যেতে পার্‌ব, মোক্তার-বাবু?" মোক্তার-বাবু বল্লেন—"তোর আধিখ্যেতা দেখে গায়ে জ্বালা ধরে একেবারে। বাইশ বছরের ডবকা ছেলে সামান্য কয়েক ঘা বেত খেলেই একেবারে ম'রে-ভেসে যাবে! যত সব অনাছিষ্টির কথা! বেত যেন আর কারো হয় না—তোর ভাইয়েরই এই নতুন হচ্ছে! আরে মুখখু, বেত খেলেই যদি মানুষ ম'রে যেত, তাহ'লে সরকার বাহাদুর আর খুনী আসামীর জন্যে আলাদা ক'রে ফাঁসীর ব্যবস্থা কর্‌তেন না—বেত মেরেই তাদের দফা নিকেশ করিয়ে দিতেন। এরকম হ'লে ফাঁসীটা উঠেই যেত। কিন্তু বুঝলি, আদতে তা নয়, ফাঁসীও রয়েছে—তার পাশাপাশি বেতও চল্‌ছে। কাজে-কাজেই এথেকে বুঝ্‌তে হবে যে, বেত মার্‌লে মানুষ কথ্‌খনো মরে না। মানুষকে সত্যি-সত্যি মার্‌তে হ'লে ফাঁসী দেওয়াই দর্‌কার। কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লি?"

ফটিক একটা কথা বল্‌লে না। মোক্তার-বাবু আবার বল্লেন, "আর শোন্—এখানে দাঁড়িয়ে অমন ক'রে চেঁচাস্‌নে। আজকালকার আইন খারাপ। ডেপুটী যদি তোকে চোরের ভাই ব'লে চিন্‌তে পারে, তাহ'লে তোরও যে বেতের হুকুম না দেবে তাই বা কেমন ক'রে বল্‌ব? তার পরে, এ ডেপুটি বেটাও তেমন সুবিধের লোক নয়।" শেষের কথা কয়েকটি শুনে ফটিকের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌ল। তার গলার সুর একেবারে নরম হ'য়ে গেল। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্লে—"আমি না হয় এখান থেকে স'রেই যাচ্ছি, কিন্তু মোক্তার-বাবু এর কি কোনো প্রতিকার নেই? বেতের হুকুমটা কি কোনো রকমেই রদ করিয়ে দেওয়াতে পারেন না?" মোক্তার-বাবু বল্লেন—"তা খুব পারি। তাহ'লে কিন্তু জেলের হুকুম হ'য়ে যাবে।" গলার আওয়াজ আরও একটু নামিয়ে ফটিক বল্লে—"আরে সর্ব্বনাশ! তা বল্‌ছি না আমি। একেবারেই কিছু না হয় এমন কি করা যায় না?"

সগর্ব্বে মোক্তার-বাবু বল্লেন—"তাও যায়। আমি

মধু মোক্তার না পারি কি? কিন্তু সে করার রুধির জোগায় কে? নগদ দু'শখানি টাকা ঝাড়, দ্যাখ এখনই বেকসুর খালাসের হুকুম দিইয়ে দিচ্ছি।"

শুনে ফটিকের চোখে আশা আর কাকুতি দুই-ই একসঙ্গে ফুটে উঠল। বিনীতস্বরে সে বল্‌লে—"কিছু কম নেন, মোক্তার-বাবু—দ্যান আমার এই উপকারটুকু ক'রে, চিরকাল আপনার কেনা হ'য়ে রইব।" মোক্তার-বাবু বল্‌লেন, "আচ্ছা, তুমি আমার পুরাণো মক্কেল। না দিলে দুশ—দেড়শ টাকা দাও, আন টাকা।" কাতরভাবে ফটিক বল্‌লে—"কাজটা ক'রে দিন—টাকায় আট্‌কাবে না। যত শিগ্‌গির পারি টাকাটা আমি দিয়ে দেব।"

মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"সে হ'বে না বাবা—আমার কাছে 'নগদ কড়ি চাক দ'বাড়ী'। এখন একটা বেজেছে। বেত হবে ৪টার পরে। এখনও যদি হাওলাত বরাত করে' টাকা সংগ্রহ ক'রে এনে দিতে পার, তবে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।"

"আচ্ছা, দেখি চেষ্টা ক'রে", ব'লে ফটিক মাথা চুল্‌কাতে-চুল্‌কাতে টাকার সন্ধানে চ'লে গেল।

৩

ক্লান্ত দেহে, আশান্বিত হৃদয়ে ফটিক যখন টাকা নিয়ে ফিরে আস্‌ল বেলা তখন তিন্‌টে। টাকা পেয়ে মহাখুসী হ'য়ে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"তুই এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ী চ'লে যা। আধঘণ্টার মধ্যেই আসামী বেকুসর খালাস পেয়ে যাবে।"

এর পরে ব্যাপার গিয়ে কি দাঁড়ায় তা না দেখে ফটিকের বাড়ী চ'লে যাবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। তাই সে বল্‌লে—"একা বাড়ী যেতে মন সর্‌ছে না। ভাইটাকে নিয়ে একেবারে এক সঙ্গেই যা'ব। ততক্ষণ আমি মহাফেজ-খানার বারান্দায় ব'সে বিশ্রাম করিগে।"

"তবে তাই যা" ব'লে মোক্তার-বাবু যেখানে বটগাছ-তলায় খোট্টা কনষ্টেবল্ দু'জন ফটিকের ভাইকে নিয়ে বসেছিল, ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে হাজির হ'লেন।

কনষ্টেবল্‌দের একজন গুন্ গুন্ ক'রে তুলসীদাসের দোঁহা আওড়াচ্ছিল, অন্য জন আসামীর হাতকড়ার মধ্য দিয়া দেওয়া একগাছা মোটা দড়ি ধ'রে ব'সে ব'সে ঝিমাচ্ছিল। যে-লোকটা দোঁহা আওড়াচ্ছিল মোক্তার-বাবু আস্তে-আস্তে গিয়ে তারি পাশে একখানা ইটের উপর ব'সে মৃদুস্বরে বল্‌লেন—"পাড়েজী, আপনার কাছে একটা আর্‌জী পেশ কর্‌তে এলুম।" চোখ রাঙ্গা ক'রে কনষ্টেবল্ রুক্ষস্বরে বল্‌লে—"হাম পাঁড়ে হ্যায় নেই—হাম মিশির আছে।" তিলমাত্রও অপ্রতিভ না হ'য়ে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"আর চটেন কেন? একটা হ'লেই হ'ল—মিশিরও বামন, পাঁড়েও তাই। এখন কথাটা হ'ল কি, যদি ইচ্ছা করেন তবে মোটা কিছু পাইয়ে দিতে পারি কিন্তু।"

টাকার কথা শুনে মিশিরের পুরু ঠোঁট দু'খানা ফুঁড়ে খইনি-টেপা তিনটে সাদা দাঁত এক মুহূর্ত্তের জন্যে ফুটে উঠে আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কোনো জবাব না দিয়ে সে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে একবার তার সঙ্গীটির পানে তাকাল মাত্র। মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"পাওনাটা দুজনের সমানই হবে। এই মুহূর্ত্তেই দু'খানা দশটাকার নোট আমি দু'জনকে দিয়ে দেব।"

আটটাকা মাইনের কনেষ্টবল্ একসঙ্গে দশ টাকা পাওয়ার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লে না—কান খাড়া করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কেয়া বাবু সাব্—আপ কেয়া বোল্‌তা হ্যায়?" যথাসম্ভব মোলায়েম স্বরে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"আপনাদের এই আসামী ছোক্‌রা সারাদিন আজ কিছু খায়নি। দেখুন ওর মুখখানা একেবারে শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গ্যাছে। এর পরেও আবার ওর হবে বেত। সারা দিন উপোষের পর পঁচিশ ঘা বেত খেলে ছোক্‌রা বাঁচে কি না বাঁচে তারও ঠিক নেই। মায়ের মাত্র ঐ একই ছেলে। দয়া ক'রে আধ ঘণ্টার জন্যে যদি ওকে আপনারা ছেড়ে দেন তবে কিছু খাবার খেয়ে আস্‌তে ওকে আমি বাজারে পাঠিয়ে দিই। অবিশ্যি আমি নিজে ওর জন্যে আপনাদের কাছে জামিন থাক্‌ব।" শুনে একজন কনষ্টেবল বল্‌লে—"সে নাই হোবে বাবু সাব্—আসামী ভাগেগা। হাম্‌লোক্‌কাভী ফ্যাসাদ হোনে শক্‌তা।" মোক্তার-বাবু হাত নেড়ে বল্‌লেন—"ভাগা অম্‌নি মুখের কথা? ভেগে যাবেন কোথায়? আজ ভাগেন কাল ধরা পড়বেন। এর নাম বাবা ইংরেজের আমল। একেবারে যমের বাড়ী গিয়ে না ভাগ্‌লে আর এর হাত থেকে রক্ষা নেই। যদি ভালোয়-ভালোয় ফিরে আসেন তবে বেত খেয়েই নিষ্কৃতি পাবেন, আর তা না হ'লে বুঝতেই ত পার্‌ছেন—বেত আর জেল দুই-ই অনিবার্য্য। সে যাই হোক্—আমি বল্‌ছি ও কখ্‌খনো পালাতে পার্‌বে না। আমি নিজে জামিন রইলুম। পালায় খুঁজে এনে দেব। খুনী আসামীর পর্য্যন্ত আমি জামিন হ'য়ে থাকি! আর এ-ত সাধারণ চোর।"

কনষ্টেবলেরা ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগল। তাদের দ্বিধা দেখে মোক্তার-বাবু পকেট থেকে দুখানা চক্‌চকে নতুন দশটাকার নোট বের ক'রে তাদের চোখের কাছে নাড়া-চাড়া কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লেন—"দেখুন বিবেচনা করে'—টাকার পরিমাণও একেবারে কম নয় আর পাচ্ছেনও অতি নিরাপদে। আধ ঘণ্টায় দশ টাকা পাওয়া বড় সোজা কথা নয়। অনেক বড়-বড় হাকিমেও পারে না।"

মোক্তার-বাবুর বোলচাল শুনে কনেষ্টবল্‌দের দ্বিধা কেটে গেল। তাদের একজন বল্‌লে—"মগর্ আপ্‌কা জামিন্ রহনে হোগা।" কার্য্যসিদ্ধির আনন্দে মোক্তার-বাবু হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন—"সে আর বেশী কথা কি? আমিই জামিন রইলুম। দিন্ হাত-কড়া খুলে'।"

পাগড়ীর ভিতর থেকে চাবি বের ক'রে একজন কনষ্টেবল্ আসামীর হাতকড়া খুলে' দিলে। মোক্তার-বাবু তার হাতে দু'খানা দশ টাকার নোট দিয়ে, আসামীকে সঙ্গে ক'রে খানিকদূর নিয়ে গিয়ে, তার কানে-কানে কয়েকটি কথা বল্লেন। বেচারার ম্লান মুখে হাসি ফুটে উঠল। দ্রুতপদে সে বাজারের দিকে চ'লে গেল।

৪

ঢং ঢং ক'রে কাছারীর ঘড়িতে চারটা বাজল। উকিল মোক্তারেরা একে একে সবাই বাড়ী চ'লে যেতে লাগল। শুধু আমাদের মোক্তার-বাবুই ডেপুটীর কাছারীর বারান্দায় নিশ্চিন্ত মনে পায়চারি ক'রে বেড়াতে থাক্‌লেন। ডেপুটীর কছারী তখনও ভাঙেনি। সবে একটা কানকাটা মোকদ্দমার সওয়াল জবাব আরম্ভ হয়েছে মাত্র। ঠিক্ এই সময়ে কনষ্টেবল দুজন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বল্‌লে—"বহুত ফ্যাসাদ হুয়া হ্যায়, বাবু সাব্। আসামী আবতক্ আয়া নেই।"

বিস্ময়ের ভাণ ক'রে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"আসেনি! বেটা ত ভারি পাজি! দ্যাখ ত একবার কাছারীর চার পাশ ঘুরে কোথায়ও ব'সে আছে কি না।" কনেষ্টবলেরা জানাল যে, কাছারীর চারধার ত তারা ভাল ক'রে খুঁজে দেখেছেই, তা বাদে বাজার, মাঠ, নদীর ঘাট প্রভৃতি সমস্ত স্থান তন্ন-তন্ন ক'রে তালাস ক'রে একেবারে হায়রান হয়েছে, কিন্তু কোথায়ও তার সন্ধান মেলেনি। একটু চিন্তিতভাবে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"আচ্ছা, পাইখানাটা দেখেছ—সেখানে ত নাই?" পাইখানাটা দেখাই বাকী ছিল। তৎক্ষণাৎ কনষ্টবলেরা এক দৌড়ে পাইখানায় চ'লে গেল। দুই জনে চারুটে পাইখানা খুঁজে কোথায়ও কাকেও না পেয়ে নিরাশ হ'য়ে ফিরে এসে বল্‌লে—"কো-ই হ্যায় নেহি।"

এইবার মোক্তার-বাবুর স্বরূপ প্রকাশ পেল। তিনি অম্লানবদনে বল্‌লেন—"তবে আর আমি কি করব? নিজেরা জেল খাটগে এখন, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।"

কনষ্টেবল দুজন যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। সমস্বরে তারা বল্‌লে—"আবতো উস্‌কা জামিন রহা থা!" কর্কশস্বরে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"তবে আর কি, জামিন হয়েছি ত একেবারে তোমাদের কাছে মাথা বিকিয়ে বসেছি। দ্যাখ, তোমরাও বাপু লোক সুবিধের নও। চারগণ্ডার পয়সা ঘুষের কথা শুন্‌লে একেবারে চোদ্দহাত লাফিয়ে ওঠ। পাঁচটার মধ্যে যে-আসামীর সাজা হবে, তাকে কিনা দশ টাকার লোভে দিলে ছেড়ে! সাবাস বুকের পাটা তোমাদের! বলিহারি সাহস! এখন আর আমি কি করব? বাধ্য হ'য়ে সমস্ত কথাই ডেপুটী-বাবুকে জানাতে হচ্ছে। তিনি যা ভাল বোঝেন করুন। মোদ্দা তোমাদের বাবা রক্ষে নেই। চাকরী ত যাবেই তার পরে দীর্ঘকাল সরকারী খোরাক খাওয়া আর শ্রীঘরে বসবাস একান্ত অনিবার্য্য জেনে রেখো।" ব'লেই মোক্তার-বাবু ডেপুটীর কোর্টের দরজার দিকে অগ্রসর হ'লেন। দেখে কনষ্টবলেরা প্রমাদ গন্‌লে। তাদের একজন তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর হাত ধ'রে বল্‌লে—"হামলোক্‌কো একঠো বাত্ শুনিয়ে বাবু সাব্। কাম ত বহুত খারাবি হো গিয়া আভি একঠো সলা বাত্‌লাইয়ে।" বিরক্তিপূর্ণস্বরে মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"দূর্ মেড়ুয়াবাদী! সলা বাত্‌লাবার বুঝি আর সময়-অসময় নেই? বেলা বাজে পাঁচটা—ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে—এখন খালি হাতে কে তোদের সলা বাত্‌লায় রে?" মুখ কাঁচু মাচু ক'রে কনষ্টবলেরা বল্‌লে—"কুছ রুপেয়া লিজিয়ে।"

প্রস্তাবটা মুখরোচক হওয়ায় মোক্তার-বাবু তখন তাদের সঙ্গে দরদস্তর আরম্ভ করলেন। যদিও খোট্টার হাত থেকে টাকা বের করা খুবই সহজসাধ্য নয়, তবুও ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর ব'লে মিনিট দশেক দর-কশাকশির পর নগদ ৪০৲ চল্লিশ টাকা তাঁর পকেটে আস্‌ল। এইবার হাসিমুখে তিনি বল্‌লেন—"আমি যা করতে বলব অসঙ্কোচে তাই করতে হবে কিন্তু—ভয় পেলে চল্‌বে না—ইতস্ততঃ করলে কোন ফল হবে না।" কনষ্টেবলেরা জানাল যে, তাঁর আদেশে আত্মরক্ষার জন্যে তারা বাঘের মুখে যেতেও পিছ্-পাও হবে না। তাদের দৃঢ়তা দেখে মোক্তার-বাবুর মুখখানাও প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। টাকা কয়েকটা আবার ভাল ক'রে গুনে—পকেটে নিরাপদ্ স্থানে রেখে ধীরে-ধীরে তিনি কাছারীর বারান্দা থেকে নেমে চারদিক্ পানে একবার সতর্কদৃষ্টিতে চাইলেন। তাঁর চোখে দুষ্ট হাসি ফুটে উঠল। হাতছানি দিয়ে তাদের দু'জনকে তিনি কাছে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন—"ঐ যে পানের দোকানের কাছে তিন্‌টে লোক দাঁড়িয়ে গল্প করছে, বেশ দেখতে পাচ্ছ?" তারা বল্‌লে—"হাঁ হুজুর।" মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"আচ্ছা, আর একবার ভাল ক'রে চেয়ে দ্যাখ ত, ওর মধ্যে যার সব-চেয়ে বয়স অল্প, তার চেহারার সঙ্গে তোমাদের পলাতক আসামীর চেহারার কতকটা মিল আছে কি না?" কনষ্টেবল্ দুজন ভাল ক'রে দেখে চিন্তিত ভাবে বল্‌লে—"থোড়া।" মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—আচ্ছা, থোড়া হ'লেই চল্‌বে। এখন দুজন গিয়ে যত শিগ্‌গির

পার ঐ লোকটাকে হাত-কড়ি লাগাও। কারো কথা শুনে ভড়কে যেও না। আজকের মতন বেত্‌টা ওরই হ'য়ে যাক্‌। শোনো, গেরেপ্তার ক'রে আনা চাই-ই। নচেৎ নিজেদের অদৃষ্টে যা আছে তাত বুঝতেই পার্‌ছ। একবার গেরেপ্তার কর্‌তে পার্‌লে আর কোনো ভয় নেই। তোমাদের রক্ষার ভার আমি নিলুম—যাও।"

কনষ্টবলেরা নিজেদের সমূহ বিপদাশঙ্কায় একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত হ'য়ে পড়েছিল। তাই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সটান গিয়ে মোক্তার-বাবুর দেখানো লোকটির ঘাড়ে বাঘের মতন লাফিয়ে পড়ল এবং সে বেচারা আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হবার আগেই তারা তাকে ঘাড় ধ'রে মার্‌তে মার্‌তে তফাতে নিয়ে এসে পিছমোড়া ক'রে হাতকড়া লাগাল। তার সঙ্গের লোক দুটি এবং কাছারীতে যারা তখনও হাজির ছিল, সকলে এক সঙ্গে মিলে কনষ্টেবলদের ঘিরে হৈ চৈ কর্‌তে লাগল। কনষ্টেবলেরাও চারিপাশের লোকগুলোকে যাচ্ছেতাই ব'লে গালাগালি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। অনেকে অনেকবার "ব্যাপার কি ?" এই কথা জিজ্ঞাসা করায় কনষ্টেবলেরা জানাল যে যাকে এই মাত্র গেরেপ্তার করা হয়েছে সে হচ্ছে বেতের আসামী। পাজি এতক্ষণ প্রস্রাব করার নাম ক'রে পালিয়েছিল। তাকে খুঁজতে তারা "বহুত তক্‌লিফ" পেয়েছে। এখন তাকে আর তারা কিছুতেই ছাড়বে না। ডাণ্ডা মার্‌তে মার্‌তে একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রে ফেল্‌বে।

আগাগোড়া যারা জানে না এবং আদত আসামীকেও চেনে না তারা বেশ হয়েছে বলে' এক এক ক'রে স'রে পড়তে, লাগল, তার সঙ্গের লোকদুটি কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে বিস্ময়ে অবাক্‌ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপার দেখে বহুক্ষণ তাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। অবশেষে বিস্ময়ের ভাবটা কতক কেটে গেলে তারা বল্‌লে—"দ্যাখ পাহারাওয়ালা সাহেব, তোমাদের পায়ে পড়ি—একে ছেড়ে দাও, এ কখ্‌খনো তোমাদের বেতের আসামী নয়। তোমরা ভুল ক'রে একে ধরেছ। আমাদেরই সঙ্গে এলোকটা গরু কিন্‌তে এসেছিল। এখানকার বাজারের অনেকে একে চেনে—না হয় তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর। দোহাই তোমাদের নির্দ্দোষীর সাজা হ'তে দিও না।" কনষ্টেবলেরা চুপ ক'রে থাক্‌ল। যাকে গেরেপ্তার করা হয়েছিল সে বেতের নাম শুনে ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। চীৎকার শুনে একজন কনষ্টেবল্‌ মাথা থেকে পাগড়ী খুলে ধাঁ ক'রে তার মুখ বেঁধে ফেল্‌লে—অন্যজন একটা চড় মেরে বল্‌লে—"চিল্লাও মাৎ উল্লুক।"

ঠিক মসএই র মোক্তার-বাবু এসে বল্‌লেন—"কিসের গোল হচ্ছে এখানে ? শিগ্‌গির আসামীকে নিয়ে যাও, বেতের সময় হয়েছে।" তাঁকে দেখে নতুন আসামীর সঙ্গের লোকদু'টা বল্‌লে—"দেখুন মোক্তার-বাবু কাণ্ডটা, খামাখা এই লোকটাকে এরা ধ'রে নিয়ে এসেছে—এত ক'রে বল্‌ছি কিছুতেই শুন্‌ছে না।" মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"সর্‌কার বাহাদুর কাউকে খামাখা ধরেন না। খামাখা ধ'রে থাকে তোমরা আরজী দাখিল কর।" তারা বল্‌লে—"আরে মশাই, আপনি জানেন না তাই বল্‌ছেন আমাদের সাথীটি একেবারে নির্দ্দোষ।" মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"বেশত, নির্দ্দোষ হয় দর্‌খাস্ত ক'রে সে-কথা ডেপুটী-বাবুকে জানাও।" তারা বল্‌লে—"আপনি বল্‌ছেন এখনি বেত হবে—সে-কথা সত্যি হ'লে আর দরখাস্ত দিয়ে কি কর্‌ব।" মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"তোমরা দরখাস্ত করার আগে যদি বেত হ'য়েই যায় তাহ'লে না হয় আপীল করো।" তারা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"বেতের আবার আপীল কি, মোক্তার-বাবু ?" মোক্তার-বাবু চ'টে বল্‌লেন—"সে আমি জানি না। যাও যাও, তাড়াতাড়ি আসামীকে নিয়ে যাও।"

আসামীকে নিতান্তই নিয়ে যেতে দেখে লোক দুটো ব্যগ্রস্বরে বল্‌লে—"একটু থাম—আচ্ছা মোক্তার-বাবু, ডেপুটী বাবু ত এখনও কোর্টেই রয়েছেন, আপনি তাঁকে মুখে দুটো কথা ব'লে, আজকের মতন বেতটা স্থগিত করিয়ে দিন্‌ না ?" মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"এর নাম বাবা ফৌজদারী হাকিম—আসল বাঘের বাচ্ছা। এর কাছে আমি মুখে কোন কথা বল্‌তে পার্‌ব না। তবে যদি উপযুক্ত ফী দাও তা হ'লে এখনই আরজী লিখে পেশ করিয়ে দিতে পারি। এ হচ্ছে খাঁটী গভর্ণমেণ্টের আমল বিনা পয়সায় এখন কিছু হয় না। বেত ত দূরের কথা—তোমাদের সাথীটির যদি বিনা কারণে মাথাও কেটে ফেলে, তবুও উপযুক্ত কোর্টফী না দিলে গভর্ণমেণ্ট সে-কথা শুন্‌বেন না। যাও, শিগ্‌গীর কাগজ-পত্তর কিনে নিয়ে এস—আর গোটা দশেক টাকা আমার কাছে রেখে যাও। অসময়ে কাজ কিনা, দু'চার টাকা হয়ত কৌশলী খরচ লাগলেও লেগে যেতে পারে।"

লোক দুটো দশটি টাকা মোক্তার-বাবুর হাতে দিয়ে দৌড়ে ষ্ট্যাম্প-বিক্রেতার সন্ধানে চ'লে গেল। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ষ্ট্যাম্প-বিক্রেতার দোকানে পৌছে শুন্‌লে যে, সে বাড়ী চলে গেছে। বাড়ীও আবার সেখান থেকে আধ মাইল দূরে। আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না ক'রে তারা আবার তার বাড়ী-মুখো ছুট দিলে।

ষ্ট্যাম্প-বিক্রেতার বাড়ী থেকে ডবল দাম দিয়ে কাগজ কিনে নিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে যখন তারাও হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। তারা এসে

দেখলে যে, মোক্তার-বাবু তখনও তাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর তাদের সাথীটি পঁচিশ ঘা বেত খেয়ে বটগাছের শিকড়ের উপরে ব'সে যন্ত্রণায় ডাক্ ছেড়ে কাঁদছে। বেতের ঘায়ে বেচারার পিঠের দুচার জায়গা কেটে রক্ত ঝরছে।

তাদের আস্তে দেখে মোক্তার-বাবু রেগে বল্লেন—ভারি কাজের লোক তোমরা যা হ'ক। সামান্য একটা গরু কর্তে এত দেরী করলে আমি বেত বন্ধ করব কেমন ক'রে। দশটা মিনিট আগে এলেও যা হয় একটা-কিছু ক'রে' ফেলা যেত। দেখি, কি এনেছ দাও।" ব'লে তাদের হাত থেকে ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে তিনি ডেপুটীর এজ-লাসে ঢুকে গেলেন। যে-লোকটার বেত হয়েছে সে কেঁদে বল্লে—"তখনই বলেছিলাম কাছারী দেখে কাজ নেই। গরু কিন্তে এসেছি গরু কিনেই ফিরে যাই। সে-কথা তখন তোমরা শুন্লে না। কাছারী দেখাতে এনে আমার জান মেরে দিয়েছ একেবারে।" সঙ্গী দু'জন তার একথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

৫

কানকাটা মোকদ্দমার জের তখনও চল্ছিল। বিপক্ষের মোক্তার কাছ থেকে আসামী-পক্ষের মোক্তার ফরিয়াদীর কানের কয় ইঞ্চি পরিমাণ কাটা হয়েছে এবং তাতে কানের যথার্থ ক্ষতি কতটুকু হয়েছে তাই আবিষ্কার করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। ডেপুটী-বাবু নিরুপায় মুখে মোক্তার-বাবুর জেরা শুন্ছিলেন। ঠিক এই সময়ে মধু মোক্তার গিয়ে তাঁর কানে কানে বল্লেন—"হুজুর সর্ব্বনাশ হয়েছে! সমূহ বিপদ্ উপস্থিত! আজ যার বেতের হুকুম দিয়েছিলেন, সে আসামীটা কৌশল-ক্রমে পাহারা-ওয়ালাদের হাত থেকে পালিয়ে গেছে, তারা আবার তাকে ধরতে না পেরে অন্য একটা লোককে ধ'রে এনেছিল। এখন বেত হ'য়ে গেছে নির্দ্দোষী বেচারারই। তার আত্মীয়-স্বজনরা ত আপনার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করব ব'লে চেঁচাচ্ছে—আমি অনেক ক'রে থামিয়ে রেখে আপনার কাছে এসেছি।" শুনে ডেপুটীবাবু জিজ্ঞাসা কর্লেন—"বটে! কোথায় সে লোকটা?" মোক্তার-বাবু বল্লেন—"ইচ্ছা হ'লে আপনার খাস কামরার উত্তর দিক্কার জানালায় দাঁড়িয়েই দেখতে পারেন, আর বলেন তাকে কোর্টেও ডেকে আন্তে পারি।" ডেপুটী-বাবু বল্লেন—"জানালা থেকেই আগে দেখি, তার পর যা হয় করা যাবে।"

উঠে গিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখে ডেপুটী-বাবুর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। হতভম্বভাবে তিনি বল্লেন—"দেখলাম ত, আমি এর আর কি করব? ওরা যা জানে করুক গে।"

মোক্তার-বাবু বল্লেন—"হুজুর কথাটা ভাল ক'রে বুঝে দেখবেন একবার। বেত হ'বার নিয়ম হচ্ছে কাছারীর পরে। যে হাকিম বেতের হুকুম দেবেন বেতের সময় তাঁকেও খোদ খাড়া থাক্তে হবে। বেত যদিও নিয়মানুযায়ী কাছারীর পরেই হয়েছে। কিন্তু আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ওরা যদি দরখাস্তে এইসব কথা উল্লেখ করে আর এই নিয়ে খবরের কাগজে আলোচনা চল্তে থাকে, তা হ'লে—ছোট মুখে বড় কথা বল্তে হয়—হুজুরের চাকুরী নিয়েও কিন্তু একটা গোলযোগ বাধা অসম্ভব নয়।"

ডেপুটী-বাবু ভেবে দেখলেন, কথাটা বড় মিথ্যা নয়। এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি যত কম হয় সেই ভাল। তাই তিনি জিজ্ঞাসা কর্লেন—"এখন তা'হলে করা যায় কি?"

মোক্তার-বাবু বল্লেন—"করা আর কি? একটা মিট্-মাট ক'রে ফেলিগে। হাজার হ'লেও ছোটলোক ত? বেত খেয়েছে—তাতে হয়েছে কি? কিছু টাকা পেলেই সব ভুলে যাবে।"

ডেপুটী-বাবু আর বাক্যব্যয় না ক'রে আর্দ্দালীকে ডেকে ফিস্ ফিস্ ক'রে কয়েকটা কথা বল্লেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আর্দ্দালীটা মোক্তার-বাবুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে দশ টাকা ক'রে, দশ খানা নোট তাঁর হাতে গুণে দিল। নোট পেয়ে মোক্তার-বাবুর মুখে আর হাসি ধরে না। যাবার সময় ডেপুটী-বাবুকে সেলাম ক'রে ব'লে গেলেন—"আমি চল্লুম—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সন্ধ্যা উত্তরে গেছে। লোক তিনটি মোক্তার-বাবুর অপেক্ষায় তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কোর্ট থেকে বেরিয়েই অতি দ্রুতপদে মোক্তার-বাবু তাদের সাম্নে গিয়ে হাত মুখ নেড়ে বল্লেন—"তখনই ত বলেছিলুম, বাবা, এর নাম ইংরেজের মুল্লুক—এখানে কি নির্দ্দোষীর গায়ে হাত তুলে পার পাবার উপায় আছে কারো? দ্যাখ, মজাটা এইবার! কাল এতক্ষণ লেংটী পরে রাস্তায় ব'সে বাছাধনদের পাথর ভাঙতে হবে।" ব্যাপার বুঝতে না পেরে তারা জিজ্ঞাসা করলে—"কি হয়েছে খুলেই বলুন না? আবার আমাদের কারো নতুন ক'রে জেল-টেলের হুকুম হ'ল নাকি?" গোঁফে তা দিয়ে মোক্তার-বাবু বল্লেন—"আরে না—না। এখনও বুঝতে পারেনি? যে পোড়া কনষ্টেবল্ দুটো তোমাদের সাথীকে বেঁধে এনে অকারণে বেত খাইয়েছিল, তাদের ত কাল পাল্টা বেতের হুকুম হ'য়ে গিয়েছে-ই, তার পরেও প্রত্যেককে তিন হপ্তা

ক'রে জেলের হুকুম দিয়ে দিয়েছি। বুঝুক্‌গে এইবার দিনে ডাকাতি করার মজাটা কেমন।"

শুনে লোক দুটি কথঞ্চিৎ খুসী হ'ল। কিন্তু যার পিঠের বেতের জ্বালা তখনও কমেনি, সে বল্‌লে—"তাদের বেতই হ'ক আর জেলই হ'ক, তাতে আমার কি? আমার যা হবার হ'য়ে গেল। কাছারী দেখতে এসে খুব শিক্ষা পেলাম।"

মোক্তার-বাবু বল্‌লেন—"যাক্‌গে, যা হবার হয়েছে—এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করো না। লোকে শুন্‌লে তোমাকেই উল্‌টে যা-তা ভাববে। নিজে ঠক্‌লে বাপের কাছেও বল্‌তে নেই। এখানে এসে কত জনের কত রকম দুর্দ্দশা হ'য়ে থাকে, কে তার খোঁজ রাখে? নিজে আর একথা কারো কাছে গল্প করো না।"

যাবার সময় তারা ব'লে গেল—"অদৃষ্টে যা ছিল—তাই হ'য়ে গেল। গল্প ক'রে আর কি হবে?"

শুনে মোক্তার-বাবুও নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ী চ'লে গেলেন।

গদ্য ও পদ্য

(ইংরেজি হইতে)

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

গাড়ীর চাকার কাদায় যখন যায় না পথে হাঁটা,
কিম্বা যখন আগুন ছোটে উড়িয়ে ধূলো-বালি,
শীতের ঠেলায় ঘরে যখন সার্সি-কবাট আঁটা,—
তখন ঘেমে' হাঁপিয়ে কেসে' গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন চামেলি দেয় হাওয়ায় আতর ঢালি',
ঝুম্‌কো-লতা দুলছে দেখি বারান্দাটির পাশে,
চিকের ফাঁকে একখানি মুখ, ফুল্ল ফুলের ডালি—
তখন ভায়া! পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

মগজ যখন বেজায় ভারী, যেন লোহার ভাঁটা!
বুদ্ধি ত' নয়!—যেন সমান চারকোণা এক টালি!
মন্‌টা যখন দাড়ীর মতন ছুঁচ্‌লো করে' ছাঁটা,—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন রক্তে জাগে ফাগুন-চতুরালি,
বর্ষ যখন হর্ষে সারা নতুন মধুমাসে,
কানে যখন গোলাপ গোঁজে হাবুল, বনমালী—
তখন ভায়া! পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

চাই যেখানে ভারিক্কে চাল—বিদ্যে বহুৎ ঘাঁটা,
'হ'তেই হবে' 'কখ্‌খনো নয়'—তর্ক এবং গালি,
ছড়ানো চাই হেথায় হোথায় "কিন্তু" "যদি"র কাঁটা
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন মেদুর হবে আঁখির কাজল-কালি,
মিলন-লগন ঘনিয়ে ওঠে কনক-চাঁপার বাসে,
যে-কথা কেউ জান্‌বে নাকো, সেই কথা কয় আলি
তখন ওহো!—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

সংসারেতে অনেক অভাব, অনেক জোড়াতালি—
তার তরে ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি;
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে—
তখন ওহো!—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রহিল। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ১৯২৯ সালে ভারত শাসন সংস্কার আইন পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যে রাজকীয় কমিশন বসিবে তাহাই এই সমস্যার সমাধান করিবে।

বহুদিন ধরিয়া এই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। ১৯১৮ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব করেন। সরকার তখন নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করেন। তখন মণ্টেগুচেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সম্পর্কিত তদন্ত হইতেছিল বলিয়া প্রস্তাবটি লইয়া বিশেষ আলোচনা হয় নাই। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্ম রিপোর্টে বলা হয় যে, ভাষাগত সাদৃশ্য অনুসারে প্রাদেশিক সীমা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তৎপরে ১৯২০ সালে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ ঐ মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহাতে শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব ছিল। কিন্তু তখন সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, যদিও সরকার এইরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদী নহেন তবু রিফর্ম কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য এই-সব প্রস্তাব স্থগিত রাখা উচিত। তাহাই করা হইল, ১৯২১ সালে সুরমা উপত্যকার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র নাগ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব তুলিলেন—কিন্তু সরকারী সদস্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, যদি আসাম কাউন্সিল বলে যে, শ্রীহট্ট বাংলায় যাইতে চায় তবেই এ-সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারে। তাহাই করা হইল। ১৯২৪ সালে আসাম ব্যবস্থাপক সভাতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এইরূপ একটি প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। তখন সরকার পক্ষ হইতে অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করা হইল। সরকারী সদস্য বলিলেন, এই প্রস্তাবের দুইটি বাধা আছে (১) আসামের জনসাধারণ ইহার পক্ষপাতী নহে, (২) বাংলার লোকের অভিমত না জানিয়া এ-সম্বন্ধে কিছু করা যায় না। কিন্তু সেই সময় আসাম ও বাংলার উভয় ব্যবস্থাপক সভাতেই শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হইল। এখন ভারত সরকার একটি অদ্ভুত কথা বলিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তাবটি চাপা দিতেছেন। তাঁহাদের মতে শ্রীহট্ট বাংলায় গেলে আসামের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইবে কাজেই ১৯২৯ সালের প্রস্তাবিত রাজকীয় কমিশন ভিন্ন কেহই এইরূপ সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন না।

দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর আন্দোলনের ফল এইরূপ বৃথা হইয়া গেল। এই প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের জনশক্তি প্রকৃত কথা বলিয়াছেন। সহযোগী লিখিতেছেন :—

দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর আন্দোলনের ফলে একটা অশ্ব-ডিম্ব প্রসব হইল। লোকমত পদদলিত করিয়া আম্‌লাতন্ত্র নিজ স্বেচ্ছাচারিতা ও দম্ভের পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীহট্ট আর বাংলায় গেল না, আম্‌লাতন্ত্রের জেদ বজায় রহিল।

রকফেলার ছাত্রবৃত্তি—

রকফেলার ছাত্রবৃত্তি ফণ্ডের পরিচালকবর্গ বিভিন্ন দেশের ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা ভারতসরকারকে কয়েকজন ছাত্র মনোনীত করিতে বলেন। পরিচালকবর্গ প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশ-মতে ছয়জন ছাত্রকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে দক্ষতালাভের জন্য বাছাই করেন। ভারতসরকার মাত্র ৪ জনকে মনোনীত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইজন মাদ্রাজী, একজন যুক্ত প্রদেশীয়, অপর জন পাঞ্জাবী।

প্রেস কর্ম্মচারী সমিতি—

গত মাসে কলিকাতা টাউনহল গৃহে নিখিল-ভারত-প্রেসকর্ম্মচারী-সমিতির প্রথম বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছে। সাধারণ সভাপতি শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু প্রেস কর্ম্মচারীদের বর্ত্তমান হীন অবস্থা সম্বন্ধে সারবান কথা বলিয়াছেন।

দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ—

আমরা দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের বিগত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যাপীঠের কার্য্যের প্রসার হইয়াছে। এই বৎসরে বিদ্যাপীঠের সংলগ্ন তিনটি নূতন গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা এই সদনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা—

দেশের নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। রাওলপিণ্ডী, দিল্লী ও এলাহাবাদে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদের সাধারণ ও জন্মগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করাতে স্থানে স্থানে এইরূপ গোলযোগ হইতেছে। আমরা নিম্নে মাত্র কয়টি দৃষ্টান্ত দিলাম :—

বালেশ্বর (উড়িষ্যা)

এখানে হিন্দুরা একটি সংকীর্ত্তনের মিছিল বাহির করে, এবং বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রধান বাজারের ভিতর একটি মস্‌জেদের সম্মুখ দিয়া গমন করে। সঙ্কীর্ত্তনের মিছিল যথাস্থানে পৌছিলে বরখান কাজী মস্‌জিদের কাছে বহুসংখ্যক মুসলমান জড় হইয়া জটলা করে এবং কেহ কেহ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে এই কথা জানাইতে যায়। সেখানে সুবিধা হইল না বুঝিয়া ফিরিবার কালে তাহারা কয়েকটি মাড়োয়ারী-বাড়ী আক্রমণ করিয়া সদর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহা ছাড়াও তাহারা স্বরাজ-আশ্রম আক্রমণ করে, কিন্তু পরে বন্দুকের ভয়ে তাহারা চম্পট দেয়!

মাদ্রাজ

হিন্দু তীর্থযাত্রীরা গান করিতে করিতে একটি মস্‌জিদের নিকট দিয়া গমন করিতেছিল। সেই সময় কতকগুলি মোপ্‌লা মুসলমান

আসিয়া তাহাদিগকে গান করিতে নিষেধ করে। হিন্দুরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ গান করিয়া চলিতে থাকে। ইহাতে মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু যাত্রীরা সংখ্যায় উহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী থাকায় কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বাংলায়—

(১) ঢাকাতে মিঃ জি ঘোষের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে বাজনা হইতেছিল। তাঁহার বাড়ার সন্নিকটস্থ মসজিদ হইতে কয়েকজন মুসলমান উত্তেজিত হইয়া ওঠে। মিঃ ঘোষ নমাজের সময় বাজনা বন্ধ করিতে স্বীকৃত হইলেও মুসলমানগণ ঠাণ্ডা হয় না। তাহারা আব্দার ধরে যে, বাজনা একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই অন্যায় আব্দার রক্ষা করেন নাই।

(২) "কৈপন" গ্রামটি কাটোয়া থানার অধীনে। ইহা একটি মুসলমান-প্রধান গ্রাম। এক বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রামের মুসলমানেরা রাস্তার পার্শ্বে একটি মসজিদ স্থাপন করিয়াছেন। যে রাস্তার উপর মসজিদ স্থাপিত সেই রাস্তা দিয়াই প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় উক্ত গ্রামের 'ধর্ম্মরাজ ঠাকুর'কে গীত-বাদ্য সহ লইয়া যাওয়া হয়। এবার ঐ গ্রামের মুসলমানেরা তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বলে যে, নওয়া-পুকুরের ধারে পূজার স্থানটি মসজিদের নিকট থাকা হেতু কোন প্রকার গীত-বাদ্য সেখানে হইতে দিবে না। এবং আরও বলে যে, তাহারা ঐ স্থানে গো-হত্যা করিবে। এই সংবাদে হিন্দুরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া যায় এবং প্রতিকার মানসে কাটোয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের শরণাপন্ন হয়। এস, ডি, ও আসার পূর্ব্বেই ১০ই জ্যৈষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তগণ পূজার স্থানে বেলা ৮।৯ টার সময় প্রকাশ্যে ২টি গোহত্যা করিয়াছে এবং দেবী প্রতিমা অপহরণ করিয়াছে।

(৩) বরিশালে কালিবাবুর বাজারের বৃদ্ধ যাদব মণ্ডল প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তন করিত। গত ৩রা জুন কীর্ত্তনের সময়ে কয়েক জন মুসলমান তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বলে। যাদব ইহার কিছু অর্থ ধরিতে না পারিয়া কীর্ত্তন করিতে থাকে। কয়েক মিনিট পরে, কীর্ত্তনস্থলে অবিরাম ইট-পাটকেল বর্ষণ হইতে থাকে। তখন তাহারা কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দুর্ব্বৃত্তদের তাড়াইতে বাড়ীর বাহির হয়। তাহারা পলায়ন করিয়াছিল।

(৪) কিন্তু পাবনা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, গত ১লা জুলাই সকালে প্রায় দশ হাজার হিন্দু, কালী ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি বিসর্জ্জনের জন্য একটি শোভাযাত্রা বাহির করে। প্রকাশ যে, শোভাযাত্রা দুইটি মসজিদ শান্তিপূর্ণ ভাবেই অতিক্রম করে। শোভাযাত্রা যখন বাজারস্থিত মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন কতিপয় মুসলমান লাঠি দ্বারা হিন্দুদের বাধা দেয়, এবং শোভাযাত্রার উপর ইটপাটকেল ছুঁড়িতে থাকে। ইহাতে হিন্দুগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং খোলাখুলি লড়াই আরম্ভ হয়। মুসলমানেরা পলাইয়া মসজিদের ভিতর আশ্রয় লয়। হিন্দুরা সেখানেও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। দাঙ্গার ফলে দুইজন হিন্দু এবং সাত জন মুসলমান জখম হয়। এই শোচনীয় ঘটনার নিবৃত্তি এইখানেই হয় নাই। পাবনায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যহ সেখান হইতে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, লুটতরাজ এমন-কি নারী-নিগ্রহের সংবাদ পর্য্যন্ত আসিতেছে।

বাংলায় নারী-নিগ্রহ—

হিন্দু-মুসলমান গোলযোগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় হিন্দুনারীদের উপর গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলমান দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্প্রতি নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়া হইতে যে ভীষণ নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ আসিয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিতে সকলেরই লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। প্রকাশ, বহু পল্লী নারী খোরসেদপুর স্নানযাত্রার মেলাশেষে দলে দলে নিজগ্রামে ফিরিতেছিল। এইরূপ একদল নারী মাত্র তিনচারিজন গ্রাম্য পুরুষ সঙ্গে লইয়া কুষ্টিয়া ষ্টেসনে যাইবার পথে গোরাই নদী-তটে খেয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তখন রাত্রি ৮।৯টা বাজিয়া গিয়াছে। এমন সময় সমীপবর্ত্তী গ্রামগুলির অধিবাসী কয়েকজন গুণ্ডা মুসলমান মেয়েদের আক্রমণ করে। তাহাদের সঙ্গী তিন চারি জন পুরুষকে অতি সহজে লাঠির আঘাতে পর্য্যুদস্ত করিয়া কয়েকজন মহিলাকে ছিনাইয়া লইয়া দুর্ব্বৃত্তগণ অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হয়।

এই সহসা বিপৎপাতে অন্যান্য সহযাত্রীদের মধ্যে মহা হাহাকার উঠে, কিন্তু কেহই অত্যাচারিত মেয়েদের ত্রাণ করিতে পারে না। অবশেষে স্থানীয় একজন মুসলমানকে বহু অনুনয়-বিনয় করিবার পর তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে ছয়জন ক্রন্দনরতা নারীকে বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধার করা হয়—প্রত্যেকেই লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে থাকে। অনেক অনুসন্ধানের পর অপর অত্যাচারিত নারীদিগকে পাওয়া যায়।

সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসিয়া কয়জন মুসলমানকে গেপ্তার করে। এ-সম্বন্ধে আরও তদন্ত হইতেছে।

সহযোগী হিন্দুসঙ্ঘে প্রকাশ—

বগুড়া জেলায় সেরপুর থানার এলাকাধীন ক্ষারায় চান্দাইকোনা গ্রামের সুভদ্রা দাসী বগুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক অভিযোগ করিয়াছেন—

"আমার (সুভদ্রা দাসী) দুটি বিধবা এবং একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল। মাসখানেক হয় একদিন রাত্রে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত আমার বড় বিধবা মেয়ে এবং অবিবাহিতা মেয়েকে চুরি করিয়া লইয়া যায়। স্থানীয় জমীদার ও প্রেসিডেণ্ট মণ্ডল বক্সের বাড়ী যাইয়া আমি এ ঘটনা জানাই। তিনি আমাকে খোঁজ করিতে বলেন। পরে আমি জানিতে পারি যে, উক্ত মণ্ডল বক্সের বাড়ীতেই নাকি আমার কন্যাদ্বয়কে তাঁহার সমক্ষেই দুইজন মুসলমানের সঙ্গে নিকা দেওয়া হয়। মণ্ডল বক্সকে একথা বলিলে, তিনি আমাকেও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পীড়াপীড়ি করেন। এসম্বন্ধে পরে আমার মত দিব বলায় আমাকে বাড়ী আসিতে দেওয়া হয়। আমার অপর বিধবা কন্যাকেও দুর্ব্বৃত্তেরা ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া চুরি করিতে চেষ্টা করে।

চট্টগ্রামের দৈনিক জ্যোতিঃ নারী-নিগ্রহের আর-একটি লোমহর্ষণ সংবাদ দিতেছেন—"চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত হাফানিয়া গ্রামে রজনীকান্ত নাথ ছোট দুইটি ভ্রাতাসহ বাস করে। নিকটে ৩।৪ ঘর নাথ ছাড়া কোন হিন্দুর বাড়ী নাই। সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র ও নিরীহ। গত ৯ই জুন তারিখে রজনী ও তাহার ভ্রাতাদের অনুপস্থিতিতে তাহার প্রতিবেশী রসিদ আহমদ, নজু মিঞা এবং মুরাদ আলি উক্ত রজনীর ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী শ্রীমতী যশোদাসুন্দরীকে জোর করিয়া লইয়া যায়। রজনী তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিশ দায়ের করিলে রসিদ আহমদ ও নজুমিঞার তলব হয় এবং যশোদা-সুন্দরীকে ধৃত করার জন্য সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। ইত্যবসরে উক্ত যশোদাসুন্দরী গত ১৭ই জুন তারিখে বিবাদিগণের হাটে যাওয়ার সুযোগে তাহাদের বাড়ী হইতে পলাইয়া নিজ বাড়ীতে আসে; এবং তাহার উপর অত্যাচার-কাহিনীর কথা সকলের নিকট বিবৃত করে।

রসিদ আহম্মদ প্রভৃতি হাট হইতে বাড়ী আসিয়া যশোদা পলাইয়া যাওয়ার সংবাদ জানিতে পারিয়া মহম্মদ, আবদুল মজিদ এবং আরও ৩০।৫০ জন লোক সঙ্গে করিয়া রাত্রি ৮।৯টার সময় রজনীর বাড়ী ঘেরাও করে, এবং ১০ জন লোক তাহার ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া রজনী ও তাহার ভ্রাতা নবীন ও অন্যান্যকে মারপিট করিয়া রজনীর দেড় বৎসর বয়স্ক ছেলেকে মায়ের কোল হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবার রজনীর স্ত্রী যশোদাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া যায়। রজনী ও তাহার ভ্রাতা নবীন পুলিসের ও প্রেসিডেন্টের নিকট ঘটনার কথা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করে। কিন্তু দরিদ্র রজনাকে কেহই সাহায্য করে নাই। নিরুপায় হইয়া ২৫শে জুন তারিখে রজনীর ভ্রাতা নবীন উপরোক্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া রাজদ্বারে নালিশ দায়ের করে। আজিও সে গুণ্ডাদের হাত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য আকুল ক্রন্দনে বক্ষ ভাসাইতেছে। তাহার দেড় বৎসর বয়সের শিশুসন্তান মায়ের জন্য কাঁদিয়া আকুল।" এইরূপ বহু শোচনীয় সংবাদ আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি। মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিলাম। ইহার প্রতিকার কি?

বঙ্গে বিধবা বিবাহ—

ঢাকার সদর মহকুমার এলাকাধীন কালিয়াকুরে বর্দ্ধিষ্ণু নমঃশূদ্র পরিবারের ১৫টি বিধবার বিবাহ গত মাসে হইয়া গিয়াছে।

আত্মরক্ষার বিধি—

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৯৬ ধারা হইতে ১০৬ ধারা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার অধিকার (Right of Private Defence) বিবৃত করা হইয়াছে:—

আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের জন্য যে কোন কার্য্য করা হইবে, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিম্নলিখিতরূপ আত্মরক্ষার অধিকার আছে:—

প্রথম—তাহার নিজের বা অন্য কাহারও প্রাণ বা শরীরের প্রতি যদি কেহ কোনরূপ অপরাধ করে বা করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে; দ্বিতীয়—যদি তাহার নিজের বা অন্যের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির প্রতি যদি কেহ চুরি, ডাকাতি, নষ্টামি বা অবৈধ প্রবেশ প্রভৃতি অপরাধ করে বা করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে।

নিজের বা অন্যের শরীর বা প্রাণ রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত অবস্থায়, আততায়ীর প্রাণনাশ বা তাহার জন্য কোনরূপ ক্ষতি করা যাইতে পারে, যথা:—

(১) আততায়ী কর্তৃক যেরূপ আক্রমণের ফলে প্রাণনাশ হইবার আশঙ্কা আছে;

(২) যাহার ফলে গুরুতররূপে আহত হইবার আশঙ্কা আছে।

(৩) স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার জন্য আক্রমণ;

(৪) অস্বাভাবিক পাশবিক অত্যাচার করিবার জন্য আক্রমণ;

(৫) স্ত্রীলোক, বালক প্রভৃতিকে অপহরণ বা জোর করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য আক্রমণ;

(৬) কাহাকেও অবৈধভাবে বন্দী করিয়া রাখিবার জন্য আক্রমণ।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণনাশ ভিন্ন আততায়ীর অন্য কোনরূপ ক্ষতি করা যাইতে পারে।

নিজের বা অন্যের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত অবস্থায় আততায়ীর প্রাণনাশ বা তাহার অন্য কোনরূপ ক্ষতি করা যাইতে পারে:—

(১) ডাকাতি; (২) অন্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া চুরি; (৩) লোকের বাড়ী, ছাউনী, জাহাজ প্রভৃতি আবাসস্থান আগুন দিয়া পোড়ান; (৪) এমন ভাবে চুরি, নষ্টামি বা অবৈধভাবে গৃহ-প্রবেশ যাহাতে মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে, আত্মরক্ষা না করিলে প্রাণহানি বা অন্য কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণনাশ ভিন্ন আততায়ীর অন্য কোনরূপ ক্ষতি করা যাইতে পারে।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, দেবস্থান, মন্দির, দেববিগ্রহ প্রভৃতি রক্ষার জন্য আততায়ীর প্রতি এই বিধি অনুসারে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে হয় এবং তাহা করিতে যাইয়া নির্দ্দোষীর ক্ষতি করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, তবে আইনে তাহাও করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে (১০৬ ধারা)।

ইহাই আত্মরক্ষার অধিকারের সাধারণ বিধি, তবে ইহার মধ্যে কতকগুলি নিষেধ-সর্ত্তও আছে। (১) যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার কর্ত্তব্য পালনের জন্য কোন কার্য্য করেন, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে না। (২) যদি আততায়ীর আক্রমণের বিরুদ্ধে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কর্ত্তাদের (অর্থাৎ পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির) সাহায্য লাভের যথেষ্ট সময় থাকে, তবে সেখানে আত্মরক্ষার অধিকার নাই। (৩) আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই আইনতঃ করা যাইতে পারিবে।

বঙ্গীয় কুম্ভকার সম্মিলনী—

নাটোরের বঙ্গীয় কুম্ভকার সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে:—(১) সম্প্রদায়গত বৈষম্য দূর করিতে হইবে, (২) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, (৩) বরপণ-প্রথা নিবারণ করিতে হইবে, (৪) কুম্ভকারদিগের জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, (৫) একখানি মাসিক পত্রিকা চালাইতে হইবে। এই সভার প্রস্তাবানুসারে শীঘ্রই একটি ব্যাঙ্ক, একখানি সংবাদপত্র ও একটি ছাপাখানা স্থাপিত হইবে।

নারী-শিক্ষা সমিতি—

গ্রীষ্মাবকাশের পর নারীশিক্ষাসমিতির অন্তর্ভুক্ত মহিলা শিল্পভবনের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। এ-বৎসর এই বিভাগে ৬০ জন অভাবগ্রস্ত মহিলাকে নিম্নলিখিত শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

(১) জ্যাম, জেলি, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করা, (২) সেলাই ও কাটছাঁট, (৩) বয়ন, পাড় ছাপান ও রং করা, (৪) অলঙ্কার গড়া, (৫) সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, (৬) সাবান প্রস্তুত করা, তেল পরিষ্কার করা, খেলনা তৈয়ার করা। ১০৫নং অপার সার্কুলার রোডে মহিলা শিল্প ভবনের কমিটির সম্পাদকের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র রায়—

বঙ্কিমচন্দ্র রায় ১৩০৭ সালে ১লা ভাদ্র বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঠশালায় ও বিদ্যালয়ে তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালেই দারিদ্র্যের সহিত তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। এই সময় হইতেই তাঁহাকে ছাত্র পড়াইয়া নিজের ও পিতামাতার দারিদ্র্য-কষ্ট নিবারণ করিতে হইত। ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর কলিকাতায় স্কটিস্-চার্চ্চ কলেজ হইতে ১৯১৭ সালে আই-এস্‌সি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এস্‌সি পরীক্ষা দেন এবং রসায়ন-শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৩২৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

তৎপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিবার জন্য বিজ্ঞান-কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ১৯২২ সালে এম-এস্‌সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই বিজ্ঞানের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করিলেও তিনি কখনও মাতৃভাষা-চর্চ্চায় বিমুখ ছিলেন না। তিনি 'প্রবাসী' ও অন্য মাসিক পত্রে নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া অল্পবয়সেই সুধীসমাজে যশ অর্জ্জন করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক গবেষণার ভিত্তি দৃঢ়তর করেন এবং তাহার এই গবেষণা লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "নেচার" নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ইঁহাদের কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা বাহির হয়।

বাণীর বরপুত্র হইয়াও ইঁহার দারিদ্র্যদুঃখ কিছুমাত্র মোচন হয় নাই। ইনি ২রা জুলাই জীবনের অবসান করেন। বাঁচিয়া থাকিলে এই প্রতিভাশালী যুবক দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেন।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষামন্দির—

চন্দননগরে সম্প্রতি নারীশিক্ষার জন্য কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দির নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে চন্দননগর বহু সদনুষ্ঠানে অগ্রণী। এই শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা চন্দননগর, তথা বাংলা দেশের গৌরবের বিষয়। সৎকার্য্য-পরায়ণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষামন্দির

চন্দননগরে ১২ই আষাঢ় "কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির" নামে নারীদিগের শিক্ষার একটি কেন্দ্র হইয়াছে। এই শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন উপলক্ষে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে চুঁচুড়া হুগলী শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং চন্দননগরের কতিপয় উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি হইয়াছিলেন স্থানীয় জজ মশিয়ে শ্যাঁনো। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী শিক্ষা মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

স্থানীয় মেয়র শ্রীযুক্ত নারাণচন্দ্র দে চন্দননগর অধিবাসীদের পক্ষ হইতে দাতাকে ধন্যবাদ দিয়া একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে জানা যায় যে, এই শিক্ষা-মন্দিরের অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও শিক্ষার ব্যয়ের জন্য শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ সর্ব্বসমেত এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজারের উপর টাকা দান করিয়াছেন এবং এই দান চন্দননগর পুস্তকাগারে দান ও চন্দননগর পুস্তকাগারের বাড়ি সম্বলিত তাঁহার পিতৃনামের স্মৃতিমন্দির স্বরূপ চন্দননগরের টাউন হল, দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি বালকদের ও একটি ছোট মেয়েদের জন্য দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রভৃতি দানেরই অন্যতম।

সভাপতি মহাশয় হরিহর-বাবুর দানের কথা সবিশেষ উল্লেখ করিয়া অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা করেন, দেশের নারী বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে এই নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ স্থান অধিকার করিবে এবং এই শিক্ষাপীঠ হইতে শিক্ষিত মেয়েরা সমাজের ও দেশের অনেক উপকারে আসিবে। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পরে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী বক্তৃতা করিয়া শিক্ষা-মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি এই শিক্ষা-মন্দিরের স্থানীয় সৌন্দর্য্যে ও ইহা যে শিক্ষা "মন্দির" —এই ভাবটিতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

শ্রীযুক্ত হরিহর-বাবুর বক্তৃতা অনেক প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ ছিল। প্রথমে এই নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে ফরাসী আইনের জন্য তিনি কিরূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। স্ত্রী-শিক্ষা কিরূপ ভাবে হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে তিনি অনেক আয়াস করিয়াছেন—"প্রবাসী"তে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে অভিমত সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন, বালিকাদিগের জন্য কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় চন্দননগরে স্থাপন করিবেন, কিন্তু পরে একটি আদর্শ ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের কথাই স্থির হয়। এবিদ্যালয়টি যে ঠিক্ প্রচলিত হাই স্কুলের মত হইবে তাহা নয়, যদিও এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন মত ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিন্তু ইহার প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েদের উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য যে-ভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, সেইভাবে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা। এই শিক্ষা-মন্দিরের সহিত একটি পুর-স্ত্রী বিভাগ খুলিবার কথা আছে। তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে পুরস্ত্রীদিগের উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা হইবার আশা করা যায়। শিক্ষা-মন্দিরের মধ্যে মেয়েদের বাসের উপযোগী বোর্ডিংয়েরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্র

আধুনিক জাপান—

প্রাচ্য জাপান পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও সভ্যতার অনুপ্রাণনায় পশ্চিম-দেশের পথে চলিয়া গত ষাট-সত্তর বছরে নিজের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়াছে তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি।

আধুনিক জাপানের 'চা-উৎসব'

এই ক্ষুদ্র দ্বীপের খর্ব্বকায় অধিবাসীরা ইউরোপের মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহের সহিত সমানে টেক্কা দিতেছে; ইয়োরোপের জাতিসমূহ তাহাকে বিশেষ হেলার চক্ষে দেখিতে আর ভরসা পায় না। জগতের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে জাপানের স্থান নেহাৎ তুচ্ছ নয়। পশ্চিমের সভ্যতার প্রবল-তাড়নে জাপানের পারিবারিক জীবনেও নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ইয়োরোপের ইম্পিরিয়ালিজমের প্রভাব চীনের প্রতি জাপানের অমানুষিক ব্যবহারেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বিজ্ঞানেও জাপান ইয়োরোপের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে। এই যে বৎসর বৎসর জাপানের ভাগ্যদেবতা তাহাকে লইয়া ঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতির ধ্বংসখেলা খেলিতেছে ইহাতেও জাপান দমিয়া যায় নাই।

আধুনিকতার প্রভাবে জাপানের কতকগুলি চমৎকার সামাজিক উৎসব নষ্ট হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে জাপানের "চা-উৎসব" সৌন্দর্য্য ও সুষমামণ্ডিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ জাপান-যাত্রীর পত্রে এই চা-উৎসবের চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। হোটেলের মত টেবিলে চেয়ারে সারবন্দী হইয়া চা খাওয়ার প্রথা পূর্ব্বে ছিল না। চা তৈয়ারী ও চা সরবরাহ করাটা কারুশিল্পের এক অঙ্গ ছিল। সে সময় মেয়েদের মুখে যে কমনীয়তা ও মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিত ওকাকুরা 'চা' সম্বন্ধীয় পুস্তকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই ছবিতে দেখুন, বিদেশীদের মত দল বাঁধিয়া টেবিল-চেয়ারে চা খাওয়া হইতেছে। কিন্তু মেয়েদের মুখের নম্রতা ও মাধুর্য্য বজায় আছে।

তীরন্দাজ জাপানী মেয়ে—

জাপানী মেয়েদের মধ্যে আজকাল ধনুর্ব্বাণ খেলা খুব প্রচলিত। তাহারা রীতিমত শিক্ষক রাখিয়া তীর ছুড়িতে শেখে; তীরন্দাজ মেয়েদের জন্য নানাস্থানে আখড়াও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছবিতে একটি আখড়ায় মেয়েরা তীর ছোঁড়া অভ্যাস করিতেছে দেখান হইয়াছে।

তীরন্দাজ জাপানী মেয়ে

—

নবীন ইতালীর প্রাণ—মুসোলিনি—

বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীতে যে

মুসোলিনি

গৃহবিবাদ সুরু হইয়াছিল, রাষ্ট্রে ও সমাজে যে দৈন্য ও হীনতা লক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে ইতালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে রোমীয় ইতালীর জড়তার প্রভাবে, অন্যদিকে রুষিয়ার বল্‌সেভিজমের মত্ততায় প্রাচীনে নবীনে যে দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছিল তাহাতে ইতালীর ভাগ্যাকাশ অন্ধকার মনে হইতেছিল। এমন সময় নবোদিত অরুণের মত ফ্যাসিষ্টদলের নেতা মুসোলিনির আবির্ভাবে ইতালীর রাষ্ট্র ও সামাজিক গগন সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইতালী পুনর্জীবন পাইয়া আজ মুসোলিনির নেতৃত্বে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের ও সমাজের সমস্ত পঙ্কিলতা ও গ্লানি কাটাইয়া উঠিয়া জগতের সভায় উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে। একটি মহাতেজোশালী পুরুষের প্রবল পরাক্রম কি অঘটন ঘটাইতে পারে মুসোলিনির কার্য্যকলাপ দেখিলে তাহা বুঝা যায়। ইতালী আজ মহাসমারোহে জগতের জয়যাত্রায় যোগ দিয়াছে। ইতালীর নবীন প্রাণে বিশ্ববিজয়ের উল্লাস জাগিয়াছে। আমাদের দেশের এই দুঃখ-দুর্দ্দশার দিনে এই মহাশক্তিশালী পুরুষের জীবনী ও কার্য্যকলাপ বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। অবশ্য পৃথিবীতে নিন্দুকের অভাব নাই। রাজতন্ত্রপরায়ণ জাতিসমূহ নানা মিথ্যা অভিযোগে ইহার মহৎ জীবনকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু পুরুষত্ব ও তেজ জয়লাভ করিবেই। বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তাশীল কবি রবীন্দ্রনাথ এই শক্তিকে নমস্কার ও অভিনন্দন নিবেদন করিয়াছেন। ছবিতে প্রদর্শিত মুসোলিনির মুখাবয়বটি তাঁহার অন্তরের শক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তেজের পরিচয় দিতেছে।

আংটিতে আতরদানি—

সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

আংটিতে আতরদানি

মহিলাদের অলঙ্কারের কিরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে পঞ্চশস্যে প্রকাশিত হইয়াছে। চুড়ী, নেকলেশ, ইয়ারিং প্রভৃতির সঙ্গে আংটিরও ক্রমোন্নতি হইয়াছে। উপরের ছবিতে দেখুন আংটির উপরে একটা ফাঁপা কৌটার মত আছে; তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আতরদানি রক্ষিত হয়। আতরদানিটি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে তাহাতে একটু চাপ দিলেই ফিন্‌কি দিয়া আতর বা সুগন্ধি বাহির হয়।

—

চীনে বলশেভিক প্রভাব—

যে চীন মহাদেশকে মহাবীর নেপোলিয়ান সুপ্ত সিংহের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন সেই বিরাট্ চীনের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিলে কষ্ট হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রুষিয়া প্রভৃতি ইয়োরোপের জাতিসমূহ ও স্বধর্ম্মী প্রাচ্য জাপান চীনের উপর কি অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে তাহার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। চীনের রক্ত শোষণ করিয়া ইহারা ক্রমশঃ

বলশেভিক্-মস্কো চীনদেশকে বলশেভিজম্ শিখাইতেছে

বলীয়ান্ হইতেছে। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিবাদে ও গৃহ-বিবাদেও চীন ছারখারে যাইতে বসিয়াছে। সান্-ইয়াৎ-সানের মত দুই একজন শক্তিশালী লোকের প্রভাবে চীন মধ্যে মধ্যে মাথা খাড়া করিতে চেষ্টা পাইয়াছে বটে কিন্তু সাম্রাজ্য-জোড়া অন্ধ-সংস্কার ও অশিক্ষার ফলে দেশ এক হইতে পারিতেছে না। যে চীন একদিন, জ্ঞান-গরিমায়, বিজ্ঞানে-শিল্পে পৃথিবীর আদিম গুরু ছিল সেই চীনের অধিবাসীরা আজ স্বদেশে বিদেশীর হস্তে কুকুরের মত লাঞ্ছিত হইতেছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কর্তৃক প্রাচ্যের এই রক্ত-শোষণ কবে শেষ হইবে কে জানে!

বর্ত্তমানে সমস্ত চীন মহাদেশব্যাপী বলশেভিক্‌দের রক্তবিপ্লবের (Red-Movement) প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া ক্যাণ্টন প্রদেশে বলশেভিক্‌দের প্রবল প্রতাপ। দলে দলে অশিক্ষিত ও নিষ্পেষিত দীনা শ্রমিকবৃন্দ বলশেভিক্‌দের সহিত যোগ দিয়া দেশে ধ্বংস ও সর্ব্বনাশের তাণ্ডবলীলা সুরু করিয়াছে। মানুষের সদ্‌বৃত্তিসমূহ লোপ পাইয়া খুন-জখম, লুট-তরাজ পাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীনে বলশেভিক্ দল লোকের মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই রক্তবিপ্লবের আওড়ে পড়িয়া চীনে এমন পৈশাচিক কাণ্ড সুরু হইয়াছে যে, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকেরা ভয় পাইয়াছেন। এমন কি সান্-ইয়াৎ-সানের বিখ্যাত শিষ্য চরমপন্থী মা-স্যু পর্য্যন্ত এই ধ্বংস-লীলা দেখিয়া ভীত হইয়া বলশেভিজ্‌মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়াছেন। বলশেভিক্‌রা অর্থ দানে লোকের মন ভাঙাইতেছে; মা-স্যু প্রাণপণে লোককে এই পথের বিপদ্ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি নিজে রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী অথচ বলশেভিক্‌বাদ চীনে প্রচারিত হইলে কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছেন। চীন মহাদেশে বলশেভিজম্ যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে তাহা মা-স্যুর মত লোককে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে দেখিয়া বুঝা যায়। তিনি নির্ভীক ভাবে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ইহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইবেন। তাঁহার গুরু ও প্রতিপালক সান্-ইয়াৎ-সানের মতনই ইনি কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে ভয় পান না। এমন কি তাঁহার নিজের দলের গুরু-ভাইদেরও অনেকের বলশেভিজম্-প্রীতি দেখিয়া

ক্যাণ্টনের পথে পতাকা-হস্তে চীনা বলশেভিক্

তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই পৈশাচিক তাণ্ডব রক্তবিপ্লব দমন করিয়া চীনে শান্তি-রাজ্য কবে প্রতিষ্ঠিত হইবে সমস্ত জগৎ তাহার প্রতীক্ষায় আছে। এখানে চীনদেশে বলশেভিজম্ বিষয়ে ফরাসী সংবাদ পত্রবিশেষ যে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ও ক্যাণ্টনের বলশেভিক্ দলের জয়োল্লাস-জ্ঞাপক একটি এই দুইটি ছবি প্রদর্শিত হইল।

—

অভিনব ব্যায়াম—

যত প্রকারের ব্যায়াম ও শরীর-সঞ্চালন প্রথা প্রচলিত আছে,
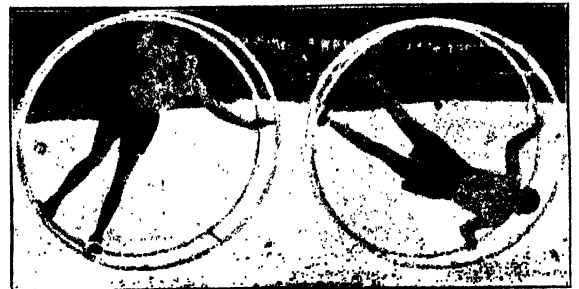
ঘূর্ণী ব্যায়াম

কোনোগুলিতেই নাকি শরীরের সকল অঙ্গ ও পেশীগুলি যথাযথ চালিত হয় না। জার্ম্মাণীর এক ব্যায়াম-বিদ্যালয়ে অভিনব উপায়ে শরীরের সমস্ত অঙ্গ চালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। একটি বৃহৎ চাকার মধ্যে অবস্থিত হইয়া চাকার সাথে ঘুরিলেই শরীরের পেশীগুলিতে টান পড়ে ও তাহাতে ব্যায়ামের কাজ হয়। আঘাত বা আঁচড় না লাগাইয়া যাহাতে হাত ও পা দৃঢ় থাকে তাহারও ব্যবস্থা আছে। উপরের ছবিতে এই ধরণের ব্যায়ামরত একটি লোকের ছবি দেওয়া হইল।

চরিত্র-নির্দ্ধারণের বৈজ্ঞানিক উপায়—

লোকের প্রকৃতি ও চরিত্র নির্দ্ধারণের এক বৈজ্ঞানিক উপায় উক্রেনিয়ার এক ডাক্তার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক দণ্ডের একপ্রান্ত পরীক্ষার্থীর দেহে সংলগ্ন থাকে, অন্যপ্রান্ত পরীক্ষকের হস্তে থাকে এবং এই দণ্ডের সহিত সংযুক্ত একটি মাইক্রোফোন তাঁহার কানে লাগানো থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তি এই দণ্ডের ভিতর দিয়া চালিত করিলেই পরীক্ষকের কানে নানাপ্রকারের শব্দ হয়। নানা ধরণের ও চরিত্রের লোককে পরীক্ষা করিয়া একটি চার্ট তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই চার্ট অনুযায়ী লোকের চরিত্র ঠিকঠিক বলিয়া দেওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চরিত্র-বিচার

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চরিত্র-বিচার

—

জাপানী সুন্দরী—

জাপানের সুন্দরী বলিতে আমরা বেঁটে মুখ-চ্যাপ্টা নাক-খাঁদা সুন্দরীই বুঝিয়া থাকি। আসলে আমাদের আদর্শেও জাপানে সুন্দরীর অভাব নাই। নাক মুখ চোখ ভুরু চুল সমেত জাপানের অনেক সুন্দরীরাই আমাদের চোখেও সুন্দরী বলিয়া গণ্য হইবেন। ছবিতে একটি জাপানী সুন্দরীর নমুনা দেওয়া হইল।

জাপানী সুন্দরী

চিড়িয়াখানায় উটপাখীর চিকিৎসা—

উটপাখী খুব 'বাবু' পাখী। চিড়িয়াখানায় ইহার একটা-না-একটা ব্যারাম লাগিয়াই আছে। বিশেষ করিয়া গলার ভিতরের ঘায়ে

উটপাখীর চিকিৎসা

ইহারা প্রায়ই কষ্ট পায়। গলার ঘায়ের চিকিৎসা কেমন করিয়া হয় তাহা এই ছবিতে দেখান হইয়াছে। যতদিন ঘা থাকে ততদিন তাহার গলা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখা হয়।

জিরাফের শক্তি—

জিরাফের গায়ে অদ্ভুত শক্তি। ইহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত-শিষ্ট বলিয়া চিড়িয়াখানায় ইহাদিগকে রাখিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যদি ইহাদের মাথায় একবার পলাইয়া যাইবার খেয়াল চাপে তাহা হইলে ইহাদিগকে আটকান দুষ্কর। এমন-কি পাঁচ ছয় মাসের শিশু

জিরাফের জোর

জিরাফকেও একটা জোয়ান লোক আটকাইয়া রাখিতে পারে না। ছবিতে লোকটির দুরবস্থা দেখুন।

টেলিফোন রিসিভারের উন্নতি—

গত পঞ্চাশ বৎসরে টেলিফোনের কি আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে তাহা রিসিভারের উন্নতি দেখিলেই বুঝা যায়। এই ছবিতে প্রদর্শিত রিসিভারটি

গ্রেহাম্ বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোন রিসিভার

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম্ বেল্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানের রিসিভারগুলি ইহার তুলনায় কত ক্ষুদ্র ও অধিক কার্য্যকরী।

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তকপরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

'বক্‌রা' শব্দের অর্থ

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল মহাশয় ভক্তি-পরীক্ষা শীর্ষক লেখায় কোরবানী ও ইব্রাহিমের যে আখ্যান লিখিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে ২।৪টি কথা লেখা দরকার মনে করিতেছি।

অধ্যাপক মহাশয় বক্‌রার কতকগুলি প্রতিশব্দ দিয়াছেন, তন্মধ্যে আরাবিকে যে বক্‌রা শব্দ আছে তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই বক্‌রা শব্দের অর্থ গাভী। কোর্‌আনে বক্‌রা সুরার ৭ম রূকুতে এই বক্‌রা শব্দের অর্থ গাভী পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে। এবং মাজমুয়ে খোত্‌বা গ্রন্থের লেখক এক জায়গায় কোরবাণী সম্পর্কে লিখিয়াছেন "বক্‌রী একসালা দোসালা হো বকর"—অর্থাৎ বকরী (ছাগ), এক বৎসরের ও বকর (গরু) দুই বৎসরের। ইহা লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কেহ কেহ হয়ত অধ্যাপক-মহাশয়ের লেখা পড়িয়া এই ভুল ধারণা পোষণ করিতে পারেন, যে, মুসলমানদের শাস্ত্র-মতে বিশেষভাবে গরু কোরবানী করিবার সম্বন্ধে কোনো কথা নাই।

ইয়ার মহাম্মদ

"ভক্তি-পরীক্ষা"য় আপত্তি

আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল মহাশয় লিখিত "ভক্তি-পরীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধের সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। গল্পটি মোসলমানী। উপযুক্ত হিন্দু লেখক কর্ত্তৃক এসলামের গৌরব-সূচক এইরূপ মোসলমানী গল্প প্রকাশে মোসলমান মাত্রই সন্তুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; এবং লেখক মহোদয়গণও মোসলমান সমাজের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এইসকল গল্প লেখার কালে অথবা কোনো কথায় মোসলমানদের মনে যাহাতে আঘাত না লাগে, যদি হিন্দু লেখক মহোদয়গণ দয়া করিয়া তৎপ্রতি একটু সুনজর রাখেন তাহা হইলেই আমাদের অন্তরের সমস্ত ভালবাসা ও ধন্যবাদ পূর্ণমাত্রায় পাইতে পারেন।

মোসলমান মাত্রই জানেন, হজরত ইব্রাহিমের দুই স্ত্রী ছিলেন, সারা ও হাজেরা। বিবি সারার গর্ভে ইস্‌হাক এবং বিবি হাজেরার গর্ভে ইস্‌মাইলের জন্ম হয়। ইস্‌হাকের বংশে যিশু এবং ইস্‌মাইলের বংশে হজরত মোহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাই বিশ্বসনীয় ইতিহাসের মত এবং জগতের যাবতীয় মোসলমান এই মতটিই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। লেখক মহোদয় সম্ভবতঃ Old Testament হইতে এই গল্পটির মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু মোসলমানগণ Old Testamentএর প্রত্যেক মতই সত্য বলিয়া মানিতে রাজী নহেন। এমতাবস্থায় শুধু বাইবেলের মত সমর্থন করিয়া মোসলমানদের কোনো কথা যথাযথ প্রকাশ করা বিজ্ঞ লেখকের কোনো মতেই উচিত হয় নাই। বিবি হাজের বিবি সারার পরিচারিকা ছিলেন, একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু বিবি সারার অনুরোধে হজরত ইব্রাহিম সন্তান উৎপাদনের জন্য বিবি হাজেরাকে যথারীতি বিবাহ করিয়াছিলেন। কাজেই এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদ হজরত ইব্রাহিমের বৈধ সন্তান ইস্‌মাইলের বংশধর।

আর একস্থানে লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, "বাইবেল-মতে ইব্রাহিম মেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন অতএব বকরীদে মেষ কোরবানীই প্রশস্ত।" মোসলমানগণ বকরীদে গো, মহিষ, উট, ছাগ, মেষ প্রভৃতি কোরবানী করিয়া থাকেন। লেখক-মহাশয় বাইবেল হইতে ফতোয়া দিয়াছেন "বকরীদে মেষ কোরবানীই প্রশস্ত।" ইহা লেখকের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া মনে হয়।

আব্দুল গনি

স্বর্গীয়া সরোজকুমারী দেবী

অতি দুঃখের ও উৎকণ্ঠার সহিত আপনার জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে স্বর্গগত সরোজকুমারী দেবী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িলাম। কিন্তু তাঁর আংশিক পরিচয় পাঠে তৃপ্ত হইলাম না। সম্বলপুরে যে-কেহ বাঙ্গালী একবার মাত্র গিয়াছেন, তিনি সেন পরিবারের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে কতখানি যত্ন ও আদর করেন, তাহা যাঁহাদের ব্যবহার হইতে বুঝা যাইত, শ্রীমতী সরোজকুমারী তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা, অন্যতম বলিলে অন্যায় হয়। আমরা প্রায় এক বৎসরকাল (সন ১৯১৪) সম্বলপুরে ছিলাম। সেখানে উপস্থিত হইবার পরদিনই, তিনি আমাদের পরিবারের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে আপ্যায়িত করিলেন, যে, তাঁহারা নিজেদের মত তাঁহাকে "গোঁড়া হিন্দু" জ্ঞান করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা ও ব্যাপকতা অনুভব করিয়া তাঁহাকে নিজের স্বজাতি মনে করিতেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা ও সুধীসমাজে ধীরমধুরভাবে সাহিত্য-সমালোচনা নীরবভাবে উপলব্ধির জিনিষ ছিল। উপরন্তু শিক্ষাবিস্তারে তাহার চেষ্টা সাধারণ সাহিত্যসেবীর ন্যায় লিখনেই বা আলোচনায় সমাপ্ত হয় নাই। তৎকর্ত্তৃক একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন তাঁহার বিশিষ্টতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

তাঁহার তিরোধানে বাঙ্গালীর একটি গৌরবের ধন লুপ্ত হইল।

শিবপ্রসাদ সে-

ছাতনায় চণ্ডীদাস

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বক্তব্য' পড়িয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম ও এইরূপ উষ্মাপূর্ণ লেখা অনেকদিন আমাদের নজরে পড়ে নাই বলিয়াই বোধ হইল। সাহানা-মহাশয় যে ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্য গোপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। পক্ষান্তরে মুখোপাধ্যায়-মহাশয় যে সত্যের খাতির করেন না ও সত্যে উপনীত হইবার কোনোরূপ চেষ্টার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই তাহা ধরিতে কষ্ট হয় না। যাঁহার মধুর পদাবলী প্রত্যেকের প্রাণকেই আকুল করে ও বঙ্গসাহিত্যে যিনি চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন, তাঁহার জীবন কিরূপে ও কোথায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য সকল বাঙ্গালীই লালায়িত। চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জিলার হইলেও বঙ্গবাসীর গৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই থাকিবে। ছাতনায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যেসব কিংবদন্তী প্রচলিত, তাহাদের মূলে কোনো সত্য আছে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সাহানা-মহাশয় ও বিদ্যানিধি-মহাশয় যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা যে ভুল-প্রমাদে পতিত হইতে পারেন না, তাহা নহে; এইরূপ ভুল-প্রমাদ কেহ ধরিতে পারিলেও তাহা লইয়া আলোচনা করিলে তাঁহারা সত্যান্বেষণে সাহায্য করিবেন, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এইরূপ আলোচনার ফল অনেক। কবি সেক্ষপীরের সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকেরা তাহার অধিকাংশই জানিতেন না। এইরূপ আলোচনার ফলে চণ্ডীদাসের জীবনের অনেক কথা পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে। ছাতনার চণ্ডীদাস যদি অন্য চণ্ডীদাসই হন, তাহা হইলেও তাঁহার জীবনের কথা জানিতে পারিলে অলাভ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হরেকৃষ্ণ-বাবু সেইরূপ মন লইয়া আলোচনা করেন নাই। চণ্ডীদাস যে বীরভূমের লোক, এসম্বন্ধে আমার দুএকজন বন্ধুর ধারণা এত দৃঢ়, যে, তাঁহারা কোনো কথা শুনিবার পূর্ব্বেই বলিয়া বসেন যে, ছাতনায় চণ্ডীদাসের কাব্যের খোরাক জুটিতে পারে না। আমাদের বহুদিনের ধারণাও ওলটপালট হইয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে নাকি শুনা যাইতেছে যে, ইলিয়াড ও ওডেসি একই লোকের লেখা নয়। চণ্ডীদাসের কাব্যসাধনার স্থল যদি সত্যই ছাতনা হয়, তবে অনর্থক হুজ্জুত বাধাইয়া তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধের আশায় রহিলাম, ও হরেকৃষ্ণ-বাবুর নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে, তিনি যেন চট্ করিয়া আবার আঘাত না পাইয়া বসেন। যদি তাঁহাকে আঘাত একান্তই পাইতে হয়, তাহা হইলে যেন তিনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সক্ষম হন।

শ্রী শঙ্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

পুস্তক-সমালোচনার সমালোচনা না ছাপাই আমাদের নিয়ম। —প্রবাসীর সম্পাদক

বঙ্গরবি আশুতোষ—শ্রী প্রসন্নকুমার রায়, বি-এ। ওরিয়েণ্টাল্ প্রিণ্টার্স্ এণ্ড পাবলিশার্স, লিমিটেড, ২৬।১এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। চার আনা।

বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক নেতার আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তাঁহাদের দ্বারা দেশের হিতও সাধিত হইয়াছে। তবে কর্ম্মবীর পুরুষসিংহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার একক জীবনের কর্ম্মের দ্বারা বাঙালী জাতির যে-উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বহুলোকের সম্মিলিত কর্ম্মেও সাধিত হয় নাই,—একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এমন এক অদ্ভুত কর্ম্মীর জীবন কথা আলস্যবিলাসী বাঙালীর মধ্যে যত প্রচারিত হইবে, বাঙালীর ততই মঙ্গল। আলোচ্য পুস্তকে আশুতোষের জীবন সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কর্ম্মময় জীবনের দীর্ঘ পরিচয় দেওয়া সহজ; কিন্তু তাহা সংক্ষেপে বলা শক্ত কাজ। গ্রন্থকার এই শক্ত কাজ সুন্দর ভাবে সাধন করিয়াছেন। আশুতোষের বৃহৎ জীবনের সুন্দর পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের ভাষাও সরল, সুমার্জ্জিত।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার কর্ত্তৃক অনূদিত ও সঙ্কলিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়, ১৯ দেব লেন, ইণ্টালি, কলিকাতা। দশ আনা।

অত্যন্ত সুখের বিষয়—আজকাল গীতার বহুল সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। প্রসিদ্ধ শাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হওয়ায় আলোচ্য গীতাখানির মূল্য বাড়িয়াছে। ইহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ভাল হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধন প্রশংসার যোগ্য। তাহার অনুপাতে দশ আনা দাম বেশী হয় নাই। সাধারণের নিকট বইটি আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতীয় সাধক—শ্রী শরৎকুমার রায় প্রণীত। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। এক টাকা।

বুদ্ধ, রামানন্দ, নানক, কবীর, রবিদাস, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি আটজন ভারতীয় সাধু পুরুষের জীবনচরিত ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এপুস্তকের সহিত অনেকেই পরিচিত আছেন। এখানি দ্বিতীয় সংস্করণের। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা ইহাতে দুইটি অধিক জীবনকথা দেওয়া হইয়াছে—দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের। শরৎবাবু জীবনী-বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার শিখ, মারাঠা, বৌদ্ধ প্রভৃতি যুগের ইতিবৃত্ত চমৎকার লোভনীয় পুস্তক। শরৎবাবুর ভাষা সরল ও ওজস্বী, জীবনী লিখিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। আলোচ্য পুস্তকখানি স্কুলের পাঠ্য হইবার একান্ত উপযুক্ত। সাত জন মহাপুরুষের ছবি সংযুক্ত হওয়াতে বইটির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা সুন্দর।

গুপ্ত

জহান্‌-আরা—শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, সি-আই-ই কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা। পৃঃ ১২৩। ১৩৩৩।

এই গ্রন্থে সম্রাট্ শাহ্‌জহানের বিদুষী কন্যা জহান-আরার চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। সম্রাট্-নন্দিনী জহান্‌-আরার জীবন রহস্যময়। ব্রজেন্দ্র-বাবুর বর্ণনাগুণে এই মহীয়সী মহিলার চরিত কথা সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থে কখনও বাদশাহজাদীকে প্রাসাদের 'প্রধান মহিলা'রূপে দেখিতেছি, কখনও ঐশ্বর্য্যক্রোড়-পালিত সুখলালিত এই সম্রাট্-দুহিতাকে রোগশয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষাকারিণী দেবদূতীরূপে দেখিতেছি, কখনও রাজমন্ত্রণাদাত্রী রূপে তাঁহার কূটরাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতেছি, আবার সম্রাট শাহ জহানের কারাগৃহের সঙ্গীনীরূপে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী মাতৃরূপে পিতৃপরিচর্য্যানিরতা দেখিয়া সম্রাটের জীবনের শেষাঙ্কের ট্র্যাজেডি উপলব্ধি করিতেছি। এই সুলিখিত গ্রন্থে জহান্‌-আরার অসীম পিতৃভক্তি, তাঁহার অতুলনীয় ত্যাগ, তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞানপিপাসার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে চমৎকৃত হইয়াছি। ব্রজেন্দ্র-বাবু ঐতিহাসিক তথ্য ঘাঁটিয়া জহান্‌-আরার এই জীবনী লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

নিগৃহীতা—শ্রীমতী বিজনবালা কর প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম—দেড় টাকা।

সাধারণ পারিবারিক চিত্রকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থের অনাড়ম্বর ঘটনাগুলি স্বচ্ছন্দ রস-মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার চারিধারের একান্ত খাঁটি বাঙ্গালী চরিত্রের আবহাওয়ার ভিতর দিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছেন এবং শেষ করিয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, পাশ্চাত্যের ব্যর্থ অনুকরণে শক্তি নিঃশেষ করেন নাই। তাই তাঁহার রচনার ভিতর অসাধারণত্বের ছাপ না থাকিলেও বাস্তবতার ছাপ আছে এবং চরিত্রগুলিও ফুটিবার অবকাশ পাইয়াছে। লেখিকার ভাষাও ভালো। বইখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

প্র

মানুষ গড়া—শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। আর্য্য পাবলিশিং কোং, পি ৫৭ রসারোড সাউথ, কলিকাতা। ১৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

দীর্ঘকাল দ্বীপান্তর বাসের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার নির্জ্জন কারাজীবনের 'সঞ্চয়'গুলিকে নারায়ণ ও বিজলীর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। তাঁহার এই সুচিন্তিত ও প্রাণময় লেখাগুলি বাংলা সাহিত্যের নূতন একটি দিক পুষ্ট করে। সেই প্রবন্ধগুলিই এপুস্তকে স্থান পাইয়াছে। মানবতার যে-আদর্শ ঘোষ-মহাশয় আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বৃহৎ আদর্শ। এই মহান্ আদর্শ প্রত্যেককেই অনুপ্রাণিত করিবে। শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের সাধনার আমাদের দেশে অত্যন্ত অভাব। ঘোষ-মহাশয় তাঁহার লেখার সর্ব্বত্রই এই সাধনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা অনেক সত্য ও তথ্য অবগত হইলাম। মধ্যে মধ্যে যে কারণেই হউক ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

অগ্নিশিখা—গ্রন্থকার ও প্রকাশক—শ্রী তারানাথ রায় প্রাপ্তিস্থান—শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। ১২৪ পৃষ্ঠা।

মিঃ যোসেফ হাটনের 'বাই অর্ডার অফ দি জার' উপন্যাসখানির আখ্যান-ভাগ লইয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। এই উপন্যাসখানি হইতে,জার রাজত্বের নির্ম্মম অত্যাচার-কাহিনী কেমন করিয়া রুশিয়ার জনসাধারণের মনে বিদ্রোহের দাবানল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। য়্যানার চরিত্র গ্রন্থকারের লেখনী-গুণে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বহিখানি আমাদের ভাল লাগিল।

মানস-কমল—শ্রী নরেন্দ্রনাথ বসু। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ৯১ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

ছোট গল্পের বই। এই সুন্দর ছোট গল্পগুলি বর্ত্তমান বাংলা গল্পসাহিত্য-রাবিশের মধ্যে মণিমুক্তার মত জ্বলজ্বলে। গল্পগুলি পড়িয়া গ্রন্থকারের মানসিক সুস্থতায় পরিচয় পাওয়া যায়। মনস্তত্ব বা প্রবলেমের বালাই না থাকাতে গল্পগুলি সহজেই মনে গাঁথিয়া যায়। গ্রন্থকারের ভাষা স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী।

স

অস্পৃশ্যের মুক্তি—শ্রী বিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত। অভয় আশ্রম, ৭৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। বারো আনা।

মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহারই অনুবাদ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। এই কার্য্য করিয়া অনুবাদক বাংলা দেশের উপকার করিয়াছেন। ইংরেজী-জানা ব্যক্তি মাত্রেই গান্ধীজির এইসব চিন্তার সহিত পরিচিত আছেন। আপামর বাঙালী হিন্দু পুস্তকটি পাঠ করুন এবং অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া হিন্দু সমাজকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন। গান্ধীজির বাণী তাঁহারা যেন মনে রাখেন—"অস্পৃশ্যতা দূর না হইলে হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস হইবে।"

গুপ্ত

দেশবন্ধু-স্মৃতি (সচিত্র)—শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—৩১নং হালদার পাড়া লেন, কলিকাতা। মূল্য ৩৲। পৃঃ ৫৫৩ (১৩৩৩)।

হেমেন্দ্র-বাবু কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জন-স্মৃতি সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাজারে দেশবন্ধু-সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থকারের ন্যায় নিপুণ ও নিখুঁতভাবে দেশবন্ধুর কর্ম্মময় জীবনের চিত্র কেহই অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। দেশবন্ধুর আত্মীয়, সহকর্ম্মী, বন্ধু ও শিষ্যগণের পত্রগুলি সংগৃহীত হওয়ায় পুস্তকখানি আরও সুন্দর হইয়াছে। দেশবন্ধুকে যাঁহারা সঠিক বুঝিতে চান তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের প্রকৃত পরিচয় যাঁহারা পাইতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা হেমেন্দ্র-বাবুর দেশবন্ধু-স্মৃতি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই ও ছবিগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

প্র

ভ্রমসংশোধন

প্রবাসী আষাঢ় ৪৭৩ পৃষ্ঠা ২য় কলম ষষ্ঠ লাইনে 'ইহার' স্থলে 'হইয়া' পড়িতে হইবে।
৪৬৬ পৃষ্ঠা ২য় কলমে নীচের দিক হইতে ষষ্ঠ লাইনে 'জপ' স্থলে 'রূপ' হইবে।
৫২৫ পৃষ্ঠায় 'ডাকটিকিটের সৌন্দর্য্য' বিষয়ক লেখার লেখক শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় বি এ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের নাম ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়াছে।
৫২৬ পৃষ্ঠার ২৩ নম্বরের টিকিট পর্টুগালের।

বিবিধ প্রসঙ্গ
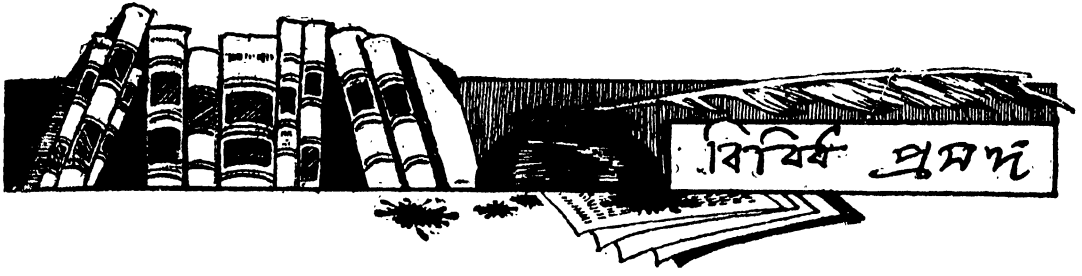
নারীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য

মানুষের এমন কোন কোন ব্যক্তিগত, সামাজিক বা জাতীয় কর্ত্তব্য আছে, যাহা রহিয়া বসিয়া দু'দিন পরে করিলেও চলে। কিন্তু যে-কর্ত্তব্য পালনের উপর মানুষের মনুষ্যত্ব ও সমাজের স্থিতি নির্ভর করে, যাহা স্বাধীন দেশেও মানুষের কর্ত্তব্য পরাধীন দেশেও কর্ত্তব্য, তাহা একদিনের জন্যও ফেলিয়া রাখিবার নয়। নারীর সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা, মাতৃত্বের মর্য্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা, এই প্রকারের একটি কর্ত্তব্য। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশে নারীহরণ, নারীর সতীত্বনাশ ও সতীত্বনাশচেষ্টা এত বেশী হইতেছে, যে, দেশে পাশবিকতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নারীর উপর এবংবিধ অত্যাচার ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও হয়, কিন্তু বাংলা দেশের মত এত বেশী কোথাও হয় না। ইহা মুসলমান বাঙালী ও হিন্দু বাঙালী উভয়েরই ঘোরতর লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। এইপ্রকার অত্যাচারের প্রতিকার করিতে হইলে হিন্দুর ধর্ম্মবুদ্ধিকে যেমন জাগাইতে হইবে, মুসলমানের ধর্ম্মবুদ্ধিকেও তেমনি জাগাইতে হইবে। ইহা সত্য বটে, যে, খবরের কাগজে এইরূপ অত্যাচারের যত সংবাদ বাহির হয়, তাহাদের অধিকাংশ মুসলমান-নামধারী এবং অত্যাচরিতারা অধিকাংশস্থলে হিন্দু। কিন্তু হিন্দু নারীর উপর হিন্দু পুরুষের অত্যাচারের সংবাদও একান্ত বিরল নহে, এবং মুসলমান পুরুষের দ্বারা মুসলমান নারীর নির্য্যাতনের সংবাদও মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে বাহির হয়; হিন্দু পুরুষের দ্বারা মুসলমান নারীর নির্য্যাতনের কোন সংবাদ অবশ্য এপর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। অতএব, বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অন্যতম রূপ মনে করিলে চলিবে না; ইহা তাহা অপেক্ষাও ব্যাপক অমঙ্গল। কারণ অত্যাচরিতাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই আছেন, যদিও মুসলমান কম; এবং অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্তদের মধ্যেও মুসলমান ও হিন্দু দুই আছে, যদিও মুসলমানই খুব বেশী। অতএব, এই অধর্ম্ম নিবারিত না হইলে হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজকেই বিনষ্ট করিবে বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা উভয় সম্প্রদায়েরই কর্ত্তব্য।

যদি অত্যাচরিতারা সকলেই হিন্দু হইতেন এবং অত্যাচারীরা সকলেই মুসলমান হইত, তাহা হইলেও এই অমঙ্গলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উভয় সম্প্রদায়েরই কর্ত্তব্য হইত। কারণ, যাহাদিগের উপরে এইরূপ অত্যাচার হয়, তাহাদের এবং তাহাদের সমাজের দুর্দ্দশা, দুর্গতি ও অধোগতি হইলেও, অত্যাচারীদের এবং তাহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের অধঃপতনও নিশ্চয়ই হয়, এবং খুব বেশী হয়।

কুষ্টিয়াতে অল্পদিন পূর্ব্বে তিনটি নারীর উপর যে-অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে, তাহাদের উদ্ধারসাধন করেন মাধু সেখ ও তাঁহার পুত্র ও প্রতিবেশী-গণ। অবশ্য তাহার পূর্ব্বে দুইজন হিন্দুও নারীদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা বিফল হয়। এই অত্যাচারের পর কুষ্টিয়ার মুসলমানগণ প্রকাশ্য সভায় এরূপ বর্ব্বরতার নিন্দা করেন। বঙ্গীয় মুসলমানদের ইংরেজী মুখপত্র "মুসলমান" ও "মোস্লেম্ ক্রনিক্ল্" এবং অন্যতম বাংলা মুখপত্র "খাদেম্" সম্প্রতি নারীর উপর অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। অতীত কোন দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করিয়াও ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, যে, সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের এরূপ অত্যাচারে মৌন সম্মতি আছে মনে করা অন্যায় হইবে। হইতে পারে, যে, যাঁহারা এরূপ দুর্ব্বৃত্ততার বিরোধী, মুসলমান সম্প্রদায়ের দুর্নীতি-পরায়ণ লোকদের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব নিশ্চয়ই কালক্রমে বৃদ্ধি পাইবে।

নারী-নির্য্যাতন সমূলে বিনষ্ট করিতে হইলে যাহা যাহা করা আবশ্যক, তাহার আলোচনা খুব বেশী হওয়া দরকার; আলোচনার ফলে যে-যে উপায় নির্দ্ধারিত হইবে, তদনুসারে কাজ করা আরও বেশী দরকার। অনেক সময় আমরা লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া ও কমীটি নিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। তাহা অনুচিত।

আত্মরক্ষার সামর্থ্য উৎপাদন, আত্মরক্ষার সামর্থ্য থাকা, নারীদের রক্ষণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও একান্ত আবশ্যক উপায়। নারীদের শিক্ষালাভ, নারীদের স্বাধীনতা লাভ, তাঁহাদের নিজের শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস লাভ, অন্তঃপুরের বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া সাহস অর্জ্জন,—এবংবিধ নানা দিক্ দিয়া তাঁহারা আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন। দৈহিক পটুতা অর্জ্জন নারীদের শিক্ষার

অন্তর্গত। ইহা কেহ অস্বাভাবিক মনে করিবেন না। বাঙালীর মেয়েদের মধ্যে এখনও অনেকে আছেন যাঁহারা ঘোড়ায় চড়িতে ও লাঠি খেলিতে পারেন, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা কম। বঙ্কিম-বাবু যে তাঁহার শান্তিকে ঘোড়সওয়ার করিয়াছেন, এবং তাঁহার দেবী চৌধুরাণীকে সকল প্রকার ব্যায়ামে অভ্যস্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার খেয়াল নহে। অনেকে মনে করিবেন, ইহা কবি-কল্পনা মাত্র। কিন্তু অশ্বারোহিণী ভারতীয়া নারীর দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এখনও পশ্চিমে প্রতিবৎসর রামলীলার সময় অশ্বারোহিণী ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ মিছিলের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। ফ্যানী পার্কসের ভারত-ভ্রমণ পুস্তকে বহু মহারাষ্ট্রীয়া নারীর অশ্বারোহণ-দক্ষতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজপুত নারীর অশ্বারোহণে গিরিসঙ্কট অতিক্রমের একটি প্রাচীন চিত্র কলিকাতার গবর্ন্মেণ্ট্ আর্টস্কুলে আছে। তাহার রঙীন প্রতিলিপি আমরা ছাপিয়াছিলাম। বাজবাহাদুর ও রূপমতীর গল্প একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী। তাহাদের অশ্বারোহিত মূর্ত্তির প্রাচীন ছবি আছে। বাংলা দেশেরও আধুনিক সময়ের একটি গল্প কিছুকাল পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। নাম বাদ দিয়া তাহা বলিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গের কোন জমীদারিন তাঁহার কন্যাকে কোন কারণে জামাতার গৃহে পাঠাইতে অস্বীকার করেন। জামাতা মোকদ্দমা করিয়া পত্নীকে গৃহে লইয়া যাইবার ডিক্রী পান। কিন্তু তথাপি তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী কন্যাকে পাঠাইতে রাজী না হওয়ায় আদালত হইতে খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। তখন তিনি কন্যাকে কোট প্যাণ্টালুন হ্যাট পরাইয়া অশ্বারোহণে অন্যত্র পাঠাইয়া দেন। এই কন্যাকে আমরা দেখিয়াছি, এবং তাহার জীবনে উপন্যাসসুলভ আর যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের আছে। তাহা বলিতে বিরত থাকিলাম। যে-ঘটনার কথা বলিলাম, তাহা অবশ্য শোনা কথা, সত্য কি না বলিতে পারি না।

আত্মরক্ষার জন্য বাঙালীর মেয়েদের অস্ত্রব্যবহারের দৃষ্টান্ত খবরের কাগজে একাধিকবার বাহির হইয়াছে। সরলা ও চপলা নাম্নী দুই অন্তঃপুরিকা একবার এক দুর্ব্বৃত্তকে আপনাদের সতীত্ব রক্ষার জন্য বধ করিয়াছিলেন, তাহা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। তাঁহাদের ছবি প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে আর-একটি খবর অনেক কাগজে বাহির হয়, যে, এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ তাহার যজমানের স্ত্রীর নিকট কুপ্রস্তাব করে। সমস্ত ঘটনাটা বলিবার আবশ্যক নাই। শেষে এই সাধ্বী নারী এবং দুরাত্মা পুরোহিতের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ হয়। সতী মহিলাটি নিহত হন। বদমায়েস বামুনটাও সাংঘাতিক আঘাত পায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মারা পড়িয়াছে কি না অবগত নহি। এরূপ সত্য ঘটনা আরও ঘটিয়াছে।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে বলিয়া রাখি, নারীরা ব্যায়াম করিলে ও অস্ত্রব্যবহারে নিপুণ হইলেও তাঁহাদের নারীসুলভ শ্রী কমিবে না, বরং স্বাস্থ্য ভাল হওয়ায় অনেক বয়স পর্য্যন্ত হিন্দুর চক্ষে তাঁহারা মা ভগবতীর মত প্রতীত হইবেন।

স্ত্রীস্বাধীনতার কথা উঠিলেই বাংলা দেশের একশ্রেণীর লোক পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার কুফল বর্ণনা ও পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদের কুৎসা করিতে আরম্ভ করেন। পুরুষদের স্বাধীনতাতেও তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত অনেক আছে। কিন্তু তজ্জন্য কেহ ত তাহাদের স্বাধীনতা লুপ্ত করেন না। এমন কোন সামাজিক ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত হয় নাই, যাহার অপব্যবহারে অনিষ্টের উৎপত্তি হয় নাই। সেইজন্য সুব্যবহারে কি ফল হয়, তাহাই বিবেচ্য। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা অন্যান্য ফলাফলের কথা আলোচনা না করিয়া, নারীনির্য্যাতন স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে বাড়ে কিম্বা কমে, তাহাই বিবেচনা করিব।

প্রথমে পাশ্চাত্য দেশের কথাই ধরা যাক্। যুদ্ধের সময় নারীর উপর অত্যাচার পৃথিবীর সব দেশে হইয়া থাকে—এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইহা একটা প্রধান যুক্তি। যুদ্ধের সময়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া শান্তির সময়ে দেখিতে পাই, যে, পাশ্চাত্য কোন দেশে নারীর উপর তেমন অত্যাচার হয় না, যেমন বাংলাদেশে হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। মহারাষ্ট্রে, অন্ধ্রদেশে, কেরলে, দ্রাবিড়ে, হিন্দুনারীদের মধ্যে পর্দ্দা নাই, তাঁহাদের মধ্যে স্বাধীনতা আছে। এই-সব দেশে বাংলাদেশের মত স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার হয় না। পঞ্জাবেও বাংলা দেশের মত পর্দ্দা নাই। সেখানেও বাংলা দেশের মত নারীদলন হয় না। অতএব স্ত্রীস্বাধীনতার অন্য কুফল যিনি যাহাই বলুন এবং তাহা আমরা স্বীকার করি বা না করি, ইহা আমরা দেখাইলাম, যে, স্ত্রীস্বাধীনতা থাকিলে নারীর উপর অত্যাচার বাড়ে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে, স্ত্রীস্বাধীনতা থাকিলে নারীদের সাহস বাড়ে, দৃঢ়তা বাড়ে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাড়ে, এবং তাঁহারা আত্মরক্ষায় অধিকতর সমর্থ হন। মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের চেয়েও অবরোধ-প্রথার ভক্ত। অথচ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অগ্রসর মুসলমান দেশ তুরস্কে ভারতবর্ষের মত অবরোধ-প্রথা নাই—পর্দ্দা তথায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়।

আমরা অবশ্য একথা বলিতেছি না, যে, হঠাৎ সমুদয় অন্তঃপুরিকাকে যেখানে সেখানে একা পাঠাইয়া দেওয়া বা যাইতে দেওয়া উচিত, এবং তাহা করিলেই নারী-

নির্য্যাতন কমিয়া যাইবে। তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে অথচ দ্রুত স্বাধীনতায় অভ্যস্ত করিতে হইবে।

আমরা কথায় লেখায় তর্কবিতর্কে নারীকে দেবী বলি বটে, কিন্তু ব্যবহারে নারীর মর্য্যাদা অনেক স্থলেই রক্ষিত হয় না, তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্যই দেখান হয়। নারীদের মনে নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে তাঁহাদের আত্মসম্ভ্রম সাহস দৃঢ়তা বাড়িবে। সমাজে পরিবারে যদি তাঁহারা শ্রদ্ধা লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাবতী হইবেন, কিন্তু বরপণের অস্তিত্ব থাকিতে, এবং শ্বশুর-বাড়ীতে বধূদের প্রতি যেরূপ অত্যাচারের কাহিনী আদালতে পর্য্যন্ত প্রমাণ হইয়া যায়, সেরূপ অত্যাচার থাকিতে, ইহা কখনই বলা যায় না, যে, বাংলা দেশ সেইস্থান যাহা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য বিখ্যাত—যদিও অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমরা,

"যত্র নার্য্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

এই শাস্ত্রবচন শুনিয়া আসিতেছি।

যেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে অথচ বাংলা দেশের মত নারীনির্য্যাতন নাই, এরূপ যে-সব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের উল্লেখ করিয়াছি, কেহ কেহ বলিতে পারেন, সেই সেই দেশে বাংলা দেশ অপেক্ষা পুরুষের পৌরুষ বেশী থাকা নারীনির্য্যাতনের অল্পতার কারণ। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙালীর পৌরুষ কিরূপে বাড়িতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা সকলে করুন। আমরা ইহা সর্ব্বত্র ও সকল ক্ষেত্রে সত্য মনে করি না। কিন্তু যেখানে যেখানে ও যে-সব ক্ষেত্রে বাঙালীর কাপুরুষতা আছে, তথায় তাহা দূর করিয়া সাহস অর্জ্জন মোটেই অসাধ্য নহে।

হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর পৌরুষের ও কাপুরুষতার তুলনা করিয়া কোন লাভ নাই। উভয়েরই পৌরুষ থাকা দরকার। যাহারা নারীর উপর অত্যাচার করে, তাহাদের পৌরুষ বেশী মনে করা ভুল। আবার যেমন, হিন্দুরা হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রাণপণ করে নাই, এরূপ লজ্জাকর দৃষ্টান্ত অনেক আছে, তেমনি এবিষয়ে মুসলমানের কাপুরুষতারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। চর মনাইরের অধিকাংশ ধর্ষিতা স্ত্রীলোকেরা ছিলেন মুসলমান; তাঁহাদের বাড়ীর পুরুষেরা তাঁহাদিগকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে মুসলমান পুরুষদের দ্বারা মুসলমান নারীর উপর অত্যাচারের যে-সব বৃত্তান্ত বাহির হয়, তাহাতে এরূপ দেখা যায় না, যে, অন্য মুসলমান পুরুষেরা প্রাণপণে নারী-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। এসব কথা সাতিশয় অনিচ্ছার সহিত লিখিতেছি। কিন্তু লিখিতেছি এইজন্য, যে, হইতে পারে হিন্দুদের পৌরুষ কম, কিন্তু মুসলমান সমাজও কাপুরুষতা দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। অতএব কোন সম্প্রদায়েরই অপর সম্প্রদায়কে কাপুরুষতার জন্য উপহাস করা উচিত নহে, যেরূপ উপহাস কোন কোন ভদ্র মুসলমান কাগজেও দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষ যে পরাধীন, ইহাই ত ভারতীয় সব সম্প্রদায়ের চরিত্রের পরিচায়ক।

হিন্দু বাঙালীদের আশার কথা এই আছে, যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেক লোক দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া নানা প্রকার দারুণ দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেহ কেহ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ও তাঁহাদের সমশ্রেণীর লোকেরা মাতৃজাতির সম্মান সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিলে বঙ্গদেশ নিশ্চয়ই কলঙ্কমুক্ত হইবে।

নারীকে প্রধানতঃ সম্ভোগের বস্তু বলিয়া ধারণা যতদিন মনের কোণে প্রচ্ছন্নভাবেও থাকিবে, ততদিন নারী-নির্য্যাতন নির্ম্মূল হইবে না। অতএব, নারীকে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে কল্যাণকারিণীর উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকেই করিতে হইবে।

আমরা এপর্য্যন্ত নারীদের আত্মরক্ষার কথাই বেশী বলিয়াছি। কিন্তু যদি ইহা সত্য হইত, যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার ভার প্রত্যেক পুরুষের লওয়া উচিত হইত। এবং যদি নারীরা আত্মরক্ষায় সমর্থ হন, অন্ততঃ কেহ কেহও হন, তাহা হইলেও পুরুষের নারীরক্ষা-কর্ত্তব্য লুপ্ত হয় না। প্রত্যেক পুরুষ মায়ের সন্তান। অনেকের জায়া, ভগিনী ও কন্যাও আছেন। মাতা, জায়া, ভগিনী ও কন্যার এবং অন্যান্যসম্পর্কীয়া সকল নারীর, এবং ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে নিঃসম্পর্কীয়া সকল নারীর মানসম্ভ্রম পবিত্রতা রক্ষা করা সকল সম্প্রদায়ের পুরুষদের কর্ত্তব্য। মুসলমানদের শাস্ত্রেও নারীর উচ্চস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হজরৎ মোহম্মদ বলিয়াছেন, স্বর্গ মাতার পদতলে।

—

সংখ্যায় ন্যূন লোকদের কৃতিত্ব

বাংলা দেশের অধিকাংশ পুরুষ মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি যদি নারীরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে নারীনির্য্যাতন অল্পদিনের মধ্যেই নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু যদি অল্পসংখ্যক লোকও এবিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন ও প্রাণপণ করেন, তাহা হইলেও নারীনির্য্যাতন নিবারিত হইতে পারে। বস্তুতঃ কোন এক দিকে মানুষের শক্তি ও প্রতাপের প্রমাণ দেশের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসে থাকিলে তাহার প্রভাবেও অনেক কুকর্ম্ম বন্ধ হইতে পারে। তাহার দু'-একটা দেশী ও বিদেশী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভারতবর্ষের বত্রিশ কোটি লোকদের মধ্যে শিখদের সংখ্যা বত্রিশ লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ ভারতে শতকরা একজন শিখধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু তাহাদের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসে দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় এরূপ রহিয়াছে, যে, তাহাদের পৌরুষের প্রতি সকলের মনেই একটা সম্ভ্রমের ভাব আছে। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা দুই কোটি আটষট্টি লক্ষের উপর। তাহাদের মধ্যে হিন্দু ৮৫ লক্ষ, মুসলমান এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ, শিখ প্রায় তেইশ লক্ষ। পঞ্জাবে শিখদের সংখ্যা এরূপ কম হইলেও, বাংলা দেশে হিন্দু-নারীর উপর মুসলমানের অত্যাচার যেরূপ হয়, পঞ্জাবে শিখনারীর উপর মুসলমানের সেরূপ অত্যাচার হয় না। শিখদের পৌরুষ ইহার অন্যতম কারণ। আর-একটা কারণ অবশ্য এই, যে, তাহারা হিন্দুদের মত এত বেশী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত নহে; তাহাদের মধ্যে ঐক্য অধিক।

শিখদের পৌরুষের জন্মের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে তাহার প্রধান কারণ দেখা যায় তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস। তাহারা সৎশ্রীঅকাল পুরুষের, অলখ নিরঞ্জনের উপাসক। তিনি অকলঙ্ক ও অবিচার অতীত। দেশ-কালের সীমার ও মৃত্যুর অতীত, অথচ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে অতি নিকট এই পরাৎপরে বিশ্বাস করিয়া শিখ মৃত্যুভয় এবং অন্য সব দুঃখভয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

বিদেশী একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নহে, রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের। ইতালীর লোকসংখ্যা চারকোটি। এই চারি কোটি লোকদের দেশে যে রাজ-নৈতিক দল শক্তিশালী তাহাদের নাম ফ্যাসিস্ট্ (Fascist)। ইহারা সর্ব্বেসর্ব্বা। ১৯২০ কি ১৯২১ সালে কতকগুলি ছাত্র (তাহারা তখনও গ্রাজুয়েট হয় নাই) দেশের কল্যাণের জন্য দলবদ্ধ হয়। ১৯২১ সালের শেষে দলের সভ্যসংখ্যা হয় ৩,৩০,০০০। ১৯২৫ সালের জুন মাসে ফ্যাসিস্ট্দের সংখ্যা ছিল ৫,৯৩,৭৮৭; তাহার এক বৎসর পরে হইয়াছে ৮,৭৫,৩৬২। যাহা হউক, চারি কোটির মধ্যে ৮।৯ লক্ষ লোককে সংখ্যায় কমই ধরিতে হইবে। অথচ এই সংখ্যায় ন্যূন লোকেরাই ইতালীতে প্রভুত্ব করিতেছে। এই দলের ও ইহার দলপতি মুসোলিনির অনেক নিন্দা শুনা যায়, কিন্তু তাহারা যে অনেক ভাল কাজও করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এখানে তাহাদের কাজের দোষগুণ বিচার করিতেছি না; কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, শিক্ষা ও দলবদ্ধতার গুণে এমন শক্তিশালী হইয়াছে, যে, এখন তাহারা যে-কোন ভাল কাজ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা অবিলম্বে করিতে সমর্থ হয়।

বাংলা দেশে হিন্দু পুরুষের সংখ্যা এক কোটি ৫ লক্ষ, মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা এক কোটি ২৯ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে নাবালকদিগকে বাদ দিলেও সমর্থ পুরুষ অনেক লক্ষ থাকে। তাহাদের সংখ্যা ইতালীর ফ্যাসিস্ট ৮।৯ লক্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী। এতগুলি বাঙালীর ত কথাই নাই, যদি কয়েক হাজার বাঙালীও দলবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে তাঁহারা নারীর উপর অত্যাচার দমন নিশ্চয়ই করিতে পারেন।

দুঃখের বিষয় বঙ্গের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা, বিশেষতঃ স্বরাজ্যদল, এবিষয়ে এতই উদাসীন, যে, কংগ্রেসের সভানেত্রী নারী হইয়াও বঙ্গে সফরের সময় কোথাও কোন বক্তৃতায় নারীনির্য্যাতনের প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কেহ কাগজে তাঁহার এরূপ কোন প্রতিবাদ পড়িয়া থাকিলে আমাদিগকে জানাইলে ক্রটি স্বীকার করিব ও তাহা পত্রস্থ করিব। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী কংগ্রেস্ প্রেসিডেণ্টের কাজ করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, কোন পুরুষ সভাপতি তাহা অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করেন নাই। তাঁহার কোন অমূলক নিন্দা আমরা করিতে চাই না।

কোন দল বা শ্রেণীর লোক শক্তিশালী হইলেও তাঁহারা সব সময়ে সব জায়গায় উপস্থিত থাকিতে পারেন না, সত্য; কিন্তু সশরীরে উপস্থিতিতেই যে সর্ব্বত্র সকল কাজ হয়, তাহা নহে; নামডাকে প্রতাপেও কাজ হয়। অনেক ইউরোপীয় নারী একা অতি অসভ্য লোকদের দেশে অনেক মাস অনেক বৎসর ধরিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছেন, অথচ কেহ তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। শ্বেতকায়দের বিক্রমের প্রভাবে এরূপ ঘটে। শ্বেতাঙ্গরাও সাহসী হন এই ভাবিয়া, যে, তাঁহারা একা হইলেও তাঁহাদের সমস্ত জাতিটা, এমন কি সমস্ত শ্বেতকায়ের দেশসমূহ তাঁহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে। হিন্দু নারীর এইরূপ বোধ জন্মিবার সত্য কারণ যখন থাকিবে, তখন তাহা তাঁহাদের সাহসের একটা কারণ হইবে।

—

নারীনির্য্যাতন বিষয়ে ব্যবস্থাপকদের ঔদাসীন্য

আমরা প্রবাসীর ন্যায় মডার্ণ রিভিউতেও লিখিয়াছিলাম, যে, গবর্ণ্মেণ্ট্ অন্য অনেক বিষয়ে উপদ্রব নিবারণের জন্য খুব সচেষ্ট ও সতর্ক এবং সেইজন্য আইনও করিয়াছেন, কিন্তু নারীর উপর উপদ্রব নিবারণের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। এলাহাবাদের "লীডার" এবিষয়ে আমাদের সমর্থন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা কেন কোন চেষ্টাই করেন নাই? শুধু স্বরাজ্যদলের সভ্যদিগকে আমরা দোষ দিতে চাই না।

অন্যদলের কোন সভ্যও এবিষয়ে কোন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও ত কোনদিন করেন নাই। স্বরাজ্যদলের সভ্যদের দোষ অবশ্য বেশী; কারণ তাঁহারা সকলে ইচ্ছা করিলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নারীনির্য্যাতনের প্রতিকার-কল্পে যে-কোন প্রস্তাব ধার্য্য করিতে পারিতেন;—তাহার পর তদনুসারে কাজ না করিলে দোষ হইত গবর্ম্মেণ্টের। কিন্তু তাঁহারা মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর করিয়া দ্বৈরাজ্য ভাঙ্গাটাই প্রধান ও বেশী পৌরুষের কাজ মনে করিয়াছেন; নারীদের সতীত্ব ও মানসম্ভ্রম রক্ষা তাঁহাদের মতে এতই তুচ্ছ ব্যাপার, যে, তাহাতে মন দেওয়া তাঁহারা দরকার মনে করেন নাই।

তাঁহারা নারীনির্য্যাতন বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় বা অন্যত্র কোন উচ্চবাচ্য না করায় লোকের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে, যে, মুসলমান স্বরাজ্য-সভ্যদিগকে চটাইতে চান না বলিয়াই তাঁহারা এই বিষয়ে মৌন অবলম্বন করিয়া আছেন। এইরূপ সন্দেহ দ্বারা মুসলমান সভ্যদিগের প্রতি সম্ভবতঃ অবিচার করা হইতেছে। সেই-জন্য নারীনির্য্যাতনের প্রতিকারকল্পে ব্যবস্থাপক সভায় যদি কোন প্রস্তাব আসিত, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে মুসলমান সভ্যদের বক্তৃতা ও অন্য ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদের মনের গতিকটা ঠিক বুঝা যাইতে পারিত, এবং তাঁহাদের প্রতি অমূলক সন্দেহ নিরসনেরও উপায় হইত। আমরা আগেই বলিয়াছি, এবিষয়ে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে বা মুসলমান মাত্রকেই মৌনী অনুমোদক মনে করা অন্যায় ও ভিত্তিহীন। দুশ্চরিত্র হিন্দুও অনেক আছে, এবং তাহাদের কাহারও কাহারও পদমর্য্যাদাও আছে। এইজন্য একটা কষ্টিপাথর-রূপ প্রস্তাব হইলে ভাল হইত। হিন্দু ও মুসলমান সভ্যদের মধ্যে কাহার কিরূপ ভাব, তাহা হইলে তাহা জানা যাইত। কষ্টিপাথর না বলিয়া 'ইথিউরিয়েলের বর্শা' (Ithuriel's spear) বলিলে আরও ভাল হয়। মহাকবি মিল্টনের প্যারাডাইজ্ লষ্ট মহাকাব্যে আছে, যে, অন্যতম স্বর্গদূত ইথিউরিয়েল্ শয়তানকে মানবজাতির আদিমাতা ঈভের কানের কাছে কাঠ ব্যাঙের আকারে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহাকে নিজের বর্শা দিয়া স্পর্শ করেন। তাহাতে শয়তান নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে বাধ্য হয়। আমরা যেরূপ প্রস্তাবের কথা বলিয়াছি, তাহার স্পর্শে কেহ কেহ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে বাধ্য হইলে মন্দ হইত না।

যাহারা পাশবিক বল প্রয়োগ দ্বারা নারীর সর্ব্বনাশ করে, তাহাদিগকে পশু, পিশাচ প্রভৃতি বলিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু যে-সব ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি অন্য উপায়ে নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াও সমাজে মান্য গণ্য হইয়া বেড়ায়, তাহারাও উক্ত নরপশুদেরই দলভুক্ত। লোকমত উভয় দলের বিরুদ্ধে সমভাবে প্রযুক্ত হইলে সামাজিক শাসন ন্যায়সঙ্গত ও সম্যক্ ফলদায়ক হয়।

—

নারী-নির্য্যাতন সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভার কর্ত্তব্য

নারী-নির্য্যাতনের প্রতিকারকল্পে হিন্দু-মহাসভার অনেক কর্ত্তব্য আছে। তাহার সবগুলি হয়ত নির্দ্দেশ করিতে পারিব না। কিছু করিতেছি। মহাসভার কর্ম্মী ও সভ্যেরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাধিত হইব।

বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় মহাসভার জেলা-শাখা থাকা বাঞ্ছনীয়। সেইরূপ প্রত্যেক মহকুমায়, সহরে ও গ্রামে উপশাখা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তাহা করিতে হইলে, বহু কর্ম্মীর প্রয়োজন। কর্ম্মীদিগকে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যয় দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে মহাসভার ব্যয় বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাহার সভ্য-সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, এবং প্রত্যেক সভ্যকে যথাসাধ্য বেশী চাঁদা দিতে হইবে।

মহাসভার প্রত্যেক সভ্যকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যে, তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞাতসারে হিন্দু অহিন্দু যে কোন নারীর উপর অত্যাচার হইবে, বা অত্যাচারের সম্ভাবনা হইবে, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন। কেহ এরূপ সফল চেষ্টা করিলে, তাহা মহাসভা অন্য সভ্যদের গোচর করিবেন। প্রতিজ্ঞা করিলেই তাহা পালিত হয় না, জানি। অনেক যুবক বিবাহের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেন, যে, পণ লইবেন না; কিন্তু পরে, মা আত্মহত্যা করিবেন বলিয়াছেন বা তদ্রূপ অন্য কোন কারণে পণ লইয়া থাকেন। তথাপি, প্রতিজ্ঞা দ্বারা বা অন্য কোন উৎকৃষ্টতর উপায়ে হিন্দু মহাসভার প্রত্যেক সভ্যের ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত, যে, নারীর সম্মান ও ধর্ম্ম রক্ষা প্রত্যেক সভ্যের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

মূল হিন্দু মহাসভার এবং তাহার প্রত্যেক শাখার এই একটি নিয়ম থাকা উচিত, যে, কোনও কুমারী, সধবা বা বিধবা নারী কোন প্রকারে অত্যাচরিতা হইলে পরিবারচ্যুতা বা সমাজচ্যুতা হইবেন না, এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরাও সমাজচ্যুত হইবেন না।

মানুষের মাথা একটা, তাহার আত্মসম্মানও একটা অখণ্ড জিনিষ। যাহার মাথা সামাজিক ব্যবস্থায় হেঁট হইয়া থাকে, যে সামাজিক হীনতা স্বীকার করিতে অভ্যস্ত, তাহাকে রাজনৈতিক ব্যাপারে মানুষের মত সোজা হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে ও মানুষের মত সাহসের কাজ করিতে, নিজের অধিকার ও সম্মান দাবী করিতে,

বলা বৃথা। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা যে ব্যাপকতর হয় না, তাহাতে যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও যোগ দিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিতে পারে না, তাহার একটা কারণ এই, যে, যাহাদিগকে সামাজিক ব্যবস্থা অবনত দলিত হীন সম্মানশূন্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা হঠাৎ মানুষের মত ব্যবহার করিতে পারে না। যে-সকল কারণে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কার্য্যাবলীর অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইহা একটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি সমগ্র হিন্দু-সমাজকে মনুষ্যত্বের সামাজিক সম্মান ও মর্য্যাদা দিয়া সমগ্র সমাজকে রাজনৈতিক সম্মান ও মর্য্যাদা লাভে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

কুষ্টিয়াতে দেখা গিয়াছে, কতকগুলি ধীবর তাহাদের সঙ্গের নারীরা দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের রক্ষার জন্য না লড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহাদিগকে বা তদ্রূপ অবস্থায় অন্য কোনও পলায়নপর লোকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া গালি দিয়া কোন লাভ নাই। তাহাদের কাপুরুষতার লজ্জা আমাদেরই লজ্জা। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ জাতির লোক মানুষের সম্মান পায় না, সুতরাং তাহারা পুরুষোচিত আচরণ না করিলে তাহাদিগকে দোষ না দিয়া তাহাদের সামাজিক মনুষ্যোচিত মর্য্যাদা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাহাদিগকে মানুষ হইবার সুযোগ দিতে হইবে। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় যে-কোন কারণেই মানুষের মাথা হেঁট ও শিরদাঁড়া বাঁকা হউক, সব স্থলেই তাহাদের ঐ নত অবস্থাটাই প্রায় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের পৌরুষ ও সাহস কতটা আছে, তাহার বিচার করিব না। কিন্তু ইহা বুঝা কঠিন নহে, যে, উন্নত ও অবনত, দণ্ডায়মান ও পদানত, উভয় প্রকার জাতিদের নিকট একই প্রকার পুরুষোচিত আচরণ আশা করা অনুচিত।

অতএব, হিন্দু মহাসভার কর্ত্তব্য, সমগ্র হিন্দুসমাজের সকল জাতিকে সামাজিক অসম্মান ও হীনতা হইতে মুক্ত করা এবং সকলকেই মানুষের মত মানুস বলিয়া গণ্য করা। সমগ্র ভারতবর্ষের হিসাবে মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম। অথচ তাহারা যে টিকিয়া আছে, তাহা কিসের জোরে? সব কারণের উল্লেখ এখানে না করিয়া দু' একটার উল্লেখ করিতেছি। হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সাম্য বেশী, সুতরাং ঐক্যও বেশী। অজ্ঞতম দরিদ্রতম মুসলমানের মাথাও সামাজিক ব্যবস্থায় হেঁট হয় না। মুসলমানরা যে তাঁহাদের মসজিদে একত্র আরাধনা ও প্রার্থনা করেন, তাহাতে শৈশব হইতে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে, যে, তাঁহারা সবাই ঈশ্বরের কাছে সমান এবং তাঁহার **দলবদ্ধ** সেবক। অর্থাৎ একা-একা তাঁহারা প্রত্যেকে যেমন ঈশ্বরের দাস, তেমনই সম্মিলিতভাবেও তাঁহারা ঈশ্বরের দাস। হিন্দু সমাজেও এইরূপ সামাজিক সাম্য ও ঐক্য স্থাপন করা হিন্দু মহাসভার কর্ত্তব্য, যাহাতে কাহারও মাথা হেঁট হয় না, এবং কেহ দলিত হয় না। এবং ভগবানের সম্মিলিত আরাধনা প্রচলিত করাও কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক জেলার সহর ও গ্রাম সকলে পূজা পার্ব্বণ তিথি যোগ স্নান আদি উপলক্ষ্যে যত মেলা ও মিছিল প্রভৃতি হয়, হিন্দু মহাসভার সেই সকলের স্থান ও তারিখ-যুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। আমার নিজের জেলা বাঁকুড়ার যে বিবরণ-পুস্তক শ্রীযুক্ত রামানুজ কর লিখিয়াছেন, তাহাতে কতকটা এইরূপ একটি তালিকা আছে। সব জেলার জন্য সেইরূপ কিন্তু তদপেক্ষা সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার পর প্রত্যেক জেলা মহকুমা নগর বা গ্রামের শাখার সাহায্যে প্রত্যেক মেলা মিছিল স্নান উপলক্ষ্যে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য ও নারীর উপর অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য ব্রতীর দল গঠন করিতে হইবে। মেলা আদির তারিখের অনেক পূর্ব্ব হইতেই মহাসভার প্রধান কার্য্যালয় শাখা সভায় চিঠি লিখিয়া জানিবেন, যে, সেখানে যথেষ্ট ব্রতীদল আছেন কি না; না থাকিলে অন্য স্থান হইতে ব্রতী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

শুধু মেলা আদি উপলক্ষ্যে নারী-রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেই চলিবে না, যদিও তাহার দ্বারাই সাক্ষাৎভাবে অনেক কাজ হইবে, এবং তাহার পরোক্ষ প্রভাবে অন্য সময়েও অনেক নারী নিরাপদ হইবেন। সকল সময়েই নারীদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত কতকগুলি দলবদ্ধ সভ্য হিন্দু মহাসভার প্রত্যেক শাখা উপশাখা প্রশাখায় থাকা একান্ত আবশ্যক।

হিন্দুদের কাপুরুষতার নিন্দা যিনি যতই করুন, নিষ্ক্রিয় সাহসে, অর্থাৎ দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতায়, অপরকে, আঘাত না করিয়া নিজে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার ক্ষমতায় হিন্দু অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা হীন নহে। তা ছাড়া, সক্রিয় সাহস, যাহাকে বিক্রম বলা যাইতে পারে, তাহাও বিস্তর হিন্দুর আছে। আমরা অহিংসার নিন্দা করিতেছি না—অহিংসা পরম ধর্ম্ম। কিন্তু ইহার অপব্যবহারে বিস্তর হিন্দু নির্বীর্য্য হইয়াছে। তাহারা অনেকে সাহস হারাইয়াছে। আবার যাহারা বাস্তবিক ভীরু নহে, অনভ্যাসবশতঃ আত্মরক্ষা বা দুর্ব্বলের বিপন্নের রক্ষার জন্যও অন্যকে আক্রমণ বা

আঘাত করিবার নিমিত্ত তাহাদের হাত উঠে না। বস্তুতঃ সভ্যতা শিষ্টতা খুব ভাল জিনিষ হইলেও, তাহার আতিশয্য ভাল নয়। অর্থাৎ সাধারণতঃ লড়াই করিতে উন্মুখ থাকা ভাল নয়, কিন্তু দুর্ব্বলের বিপন্নের রক্ষার জন্যও আবশ্যক হইলে কাহারও গায়ে হাত দিতে না-পারাটা সভ্যতা বা শিষ্টতা নহে, উহা অমানুষতারই লক্ষণ। এইজন্য হিন্দু মহাসভা সাত্ত্বিকতাকে অবশ্যই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবেন, কিন্তু বিপন্নের সহায় হইবার জন্য ক্ষাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেও সভ্যদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

—

তাঞ্জিমের কর্ত্তব্য

আমরা মুসলমান নহি। সুতরাং তাঞ্জিমের কর্ত্তব্য কি, সে-বিষয়ে কিছু বলা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা মনে হইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, যাহা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, সকল মানুষের সাধারণ কর্ত্তব্য। তাঞ্জিমের অন্যতম উদ্দেশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের নৈতিক উন্নতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইজন্য, এখন যে-বিষয়টির আলোচনা করিতেছি, সেই উপলক্ষ্যে ইহা বলা অনধিকার চর্চ্চা হইবে না, যে, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল বিপন্ন নারীকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যেমন হিন্দু-মহাসভার সভ্যদের ও অন্য সব হিন্দুদের কর্ত্তব্য, তেম্‌নি ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল বিপন্ন স্ত্রীলোককে অত্যাচার হইতে রক্ষা করা তাঞ্জিমের সকল সভ্যের ও অন্য মুসলমানদের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য কুষ্ঠিয়ার মাধু সেখ ও তাঁহার পুত্রেরা পালন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা মুসলমান সমাজের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

হিন্দু মহাসভার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা অপর যে-সব কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তাঞ্জিমের উপযোগী অন্য কিছু থাকিলে মুসলমানেরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুখী হইব।

—

নারী-নির্য্যাতন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

এবিষয়ে আমরা আষাঢ়ের প্রবাসীতে ৫৪৪ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি, তাহার উপর আর দু'একটি কথা বলিতে চাই। উহা লিখিবার পর সংবাদ আসিয়াছে, যে, কতিপয় শ্বেতকায়া নারীর উপর আফ্রিকার কেন্যা দেশের আদিম নিবাসী কেহ কেহ বল-প্রয়োগ করায় তথাকার ইংরেজ গবর্ণর যে আইন আরও কড়া করিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা করা হইয়াছে। কোনও কৃষ্ণকায় ব্যক্তি কোন শ্বেতাঙ্গনাকে ধর্ষণ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে, এবং ন্যূনকল্পে তিন বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড হইবে। বলাৎকারের চেষ্টা হইলে ঐরূপ অপরাধীর যাবজ্জীবন কারারোধ হইতে পারিবে। শ্বেতাঙ্গনার লজ্জাশীলতার হানি করিলে বা তাহাকে আক্রমণ করিলে চৌদ্দ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন, আদালত সকলকে ঐ সব দণ্ডের সহিত বেত্রাঘাত দণ্ড দিবারও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফ্রিকার রোডেসিয়া দেশেও এইরূপ দণ্ডবিধি প্রচলিত আছে। কেন্যা দেশে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গনার উপর অত্যাচার হওয়ায় সেখানেও ঐরূপ আইন করা হইল। এরূপ কড়া আইন কেবল শ্বেতাঙ্গনাদের রক্ষার জন্য করা হইয়াছে, কৃষ্ণাঙ্গনাদের উপর শ্বেতপুরুষরা অত্যাচার করিলে এরূপ দণ্ড হইবে না। এইরূপ শয়তানী বৈষম্যে যে শ্বেতদেরই অধঃপতন বাড়িবে, তাহা নিঃসন্দেহ। যাহা হউক, তাহা এখন আমাদের বিচার্য্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, কেন্যাতে যেমন অবস্থার পরিবর্ত্তনে আইনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বঙ্গেও তেম্‌নি অবস্থার পরিবর্ত্তনে আইনের পরিবর্ত্তন হউক, এবং সমুদয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিস কর্ম্মচারীকে উপদেশ দেওয়া হউক, যে, নারীহরণের ও নারীর উপর অত্যাচারের অভিযোগ মাত্রেরই তদন্ত বিন্দুমাত্রও কালবিলম্ব না করিয়া করিতে হইবে, এবং বিচারও যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অত্যাচারিতা নারীর পক্ষে উকীল না থাকিলে সরকার হইতে উকীল নিয়োগের আইন করিতে হইবে। কোন নারী অপহৃতা ও নিরুদ্দেশ হইলে তাঁহার উদ্ধারসাধনের চেষ্টা ও বন্দোবস্ত সরকার পক্ষ হইতে করিতে হইবে। উদ্ধার করিতে না পারিলে স্থানীয় পুলিসকে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে এবং তাহারা অকর্ম্মণ্য বিবেচিত ও তিরস্কৃত হইতে পারিবে।

দণ্ডের বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, আমরা প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু অন্যান্য কঠোরদণ্ডের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

মফঃস্বলে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও অপবিত্রীকরণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যেমন বলিয়াছেন, যে, ইহা বন্ধ করা পুলিশের অসাধ্য, নারীনির্য্যাতন সম্বন্ধেও সেই ধরণের কথা সরকার বলিতে পারেন। কিন্তু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের রক্ষা ও পালন রাজশক্তির একটি প্রধান কার্য্য। লাট লিটন্ যখন rule of claw বা নখরের রাজত্বের পরিবর্ত্তে rule of law বা আইনের রাজত্বের প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছিলেন, তখন ইহাই উহ্য ছিল, যে, রাজশক্তি, নখরবিহীন অর্থাৎ নিরস্ত্র এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ লোকদিগকেও রক্ষা করিবেন। পুলিস্ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু নারীনির্য্যাতন নিবারণ-

কল্পে গবর্ন্মেণ্টের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রমাণ পাইলেই অনেক দুষ্ট লোক সায়েস্তা হইয়া যাইবে।

—

হিন্দুর সংখ্যার ন্যূনতা ও হিন্দু নারীর লাঞ্ছনা

মুসলমানের, হিন্দুর, বা গবর্ন্মেণ্টের কাহারও এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, যে, যেহেতু বঙ্গের কতকগুলি জেলায় মুসলমান বেশী অতএব নারীনির্য্যাতন অবশ্যম্ভাবী। প্রথমতঃ এরূপ উক্তি মুসলমানের পক্ষে অপমানকর। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ এত অত্যাচার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গেও ছিল না। তৃতীয়তঃ, বাংলাদেশ অপেক্ষাও পঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশে মুসলমানের অনুপাত বেশী, কিন্তু সেই সেই দেশে এত হিন্দুনারী ধর্ষণ হয় না। সিন্ধু দেশে মুসলমানরা হিন্দুদের প্রায় তিনগুণ; পঞ্জাবে হিন্দু মোটামুটি ৬৫ লক্ষ, মুসলমান মোটামুটি এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ।

—

একখানি হিতকর পুস্তক

শ্রীযুক্ত ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রসূতিদের পরিচর্য্যা বিষয়ে যে-পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা, কি সহরে কি মফস্বলে, সর্ব্বত্র শুভফলপ্রদ হইবে। কলিকাতায় ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ ডাক্তার ও শিক্ষিত ধাত্রী আছেন। কিন্তু সকলে তাঁহাদের সাহায্য লইতে পারেন না, এবং যাঁহারা পারেন, তাঁহারাও কথায় কথায় ডাক্তারের পরামর্শ লইতে পারেন না। এইজন্য এই পুস্তক কলিকাতাতেও প্রসূতিদের খুব কাজে লাগিবে। বাংলাদেশ পল্লীগ্রাম-বহুল, পল্লীগ্রামের সমষ্টি বলিলেও চলে। পল্লীগ্রাম-গুলিতে ধাত্রী-বিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তার বা ধাত্রী নাই। এইজন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহিখানি পল্লীগ্রামের এরূপ প্রত্যেক পরিবারে থাকা উচিত যাহার অন্ততঃ একজনও লেখাপড়া জানেন। ছোট সহরগুলিরও অনেক-গুলিতে প্রসব-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য ডাক্তার বা শিক্ষিত ধাত্রী পাওয়া কঠিন। সুতরাং সেখানেও এই পুস্তকখানি হইতে উপকার পাওয়া যাইবে।

পুস্তকখানিতে কি কি বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

—

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের নারী-হিতসাধন

নারীপূজা সম্বন্ধে অন্যত্র উল্লিখিত মনুর বচন আমরা আওড়াই অনেকে, কিন্তু কাজে কিছু করি না। নারী-পূজার একটি প্রারম্ভিক কাজ বালিকা ও নারীদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা। ইহার দিকে দেশের লোকদের দৃষ্টি অতি ধীরে ধীরে পড়িতেছে। বালক ও পুরুষদের শিক্ষার জন্য বৃহৎ দান বাংলাদেশে কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু নারী-শিক্ষার জন্য ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দানের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশী নহে। এইজন্য চন্দননগরের হরিহর শেঠ-মহাশয় নারী-শিক্ষামন্দিরের নিমিত্ত যে-ব্যয় করিয়াছেন ও করিবেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার বিশেষ বিবরণ 'দেশের কথা' বিভাগে দৃষ্ট হইবে। নারী-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা জাতীয় সৌধের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছেন। শেঠ-মহাশয় এই সম্মানার্হ স্থপতিদের অন্যতম। তিনি অনাড়ম্বর সাদাসিধা জীবনযাপন করেন, এবং দেশের একজন প্রসিদ্ধ ধনীও নহেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ও সৎকর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে বহু প্রসিদ্ধ ধনী অপেক্ষা নমস্য করিবে। বলা বাহুল্য, নারীশিক্ষামন্দিরই তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তি নহে।

—

নারীশিক্ষা-সমিতি

গ্রীষ্মাবকাশের পর আগামী ১৬ই জুলাই শুক্রবার নারী-শিক্ষা-সমিতির অন্তর্ভুক্ত মহিলা শিল্প-ভবনের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। এবৎসর এই বিভাগে ৬০ জন অভাব-গ্রস্ত মহিলাকে নিম্নলিখিত শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে :—

জ্যাম, জেলি, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করা।
সেলাই ও কাট্‌ ছাঁট্‌।
বয়ন, পাড় ছাপান ও রং করা।
অলঙ্কার গড়া।
সূক্ষ্ম কারুকার্য্য।
৬ সাবান প্রস্তুত করা, তেল পরিষ্কার করা, খেলনা তৈয়ার করা।

এসকল শিক্ষা দিবার জন্য কোন ফী লওয়া হইবে না; তবে যাঁহারা বাসে আসিবেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে মাসে ৩৲ টাকা করিয়া গাড়ী ভাড়া লওয়া হইবে। ১০৫ নং অপার সারকুলার রোডে মহিলা শিল্প-ভবনের কমিটির সম্পাদকের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইতে হইবে।

—

প্রবাসী বাঙালীর গুণের আদর

এবার যে-সকল ভারতীয় ব্যক্তি রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যৌবন-কাল হইতেই পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার ছাত্রাবস্থাতেই অধ্যাপক হেস্টি

...পন্সে তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ...দের সহিত তাঁহার বয়সের তফাৎ অল্পই। কিন্তু আমরা ...ন বি-এ পড়িতাম, তখন তিনি নাগপুরে অধ্যাপকতা ...িতেন। তখন তৎপ্রণীত বেন্ জন্সনের এভ্রি ম্যান্ ইন্ ...জ্ হিউমার্ নামক একটি নাটকের টীকা পড়িয়াছিলাম। ...হাতে কোন কোন শব্দের অর্থ নির্ণয় ও বিশদ করিবার ...মিত্ত তিনি এরূপ কোন কোন ইংরেজী বহি হইতে ...ক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, যাহার নাম আমরা ত তখন ...নিতামই না, ইংরেজী সাহিত্যের অনেক অধ্যাপকও ...নেন না। এত বৎসর পরে আমাদের যতদূর মনে ...ড়ে, তন্মধ্যে এমন প্রাচীন বহিও ছিল, যাহা তখন পর্য্যন্ত ...িত হয় নাই, কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়মে হস্তলিপির ...কারে ছিল।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

[চিত্রকর শ্রী মুকুলচন্দ্র দের রেখাচিত্র হইতে

শীল মহাশয় কেবল দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে ...ণ্ডিত নহেন। অনেক বিজ্ঞানও তাঁহার জানা আছে। ...১১ সালে যখন লণ্ডনে বিশ্বজাতি-কংগ্রেসের (Universal Races Congressএর) প্রথম অধিবেশন হয়, তখন তিনি তাহার সভাপতি মনোনীত হন। নৃতত্ত্ব ও তৎসদৃশ অন্যান্য বিজ্ঞানে পারদর্শী বলিয়া তিনি মনোনীত হন। গণিতে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে। প্রাচীন হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি ইংরেজীতে যে বহি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার প্রাচীন ভারতীয় নানা বিদ্যার ও শাস্ত্রের জ্ঞানের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক নানা বিজ্ঞানের জ্ঞানেরও তেমনি পরিচয় পাওয়া যায়।

পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ করিবার সময় নানা বিদ্যা-বিষয়ে যেরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, তাহার অনেকটা শীল মহাশয়ের সহিত পরামর্শের ফল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নীবিদ্যা সম্বন্ধে যে ইংরেজী পুস্তক আছে, তাহার একটি বিস্তৃত উৎকৃষ্ট অংশ শীল মহাশয়ের লেখা।

আচার্য্য শীল নানাভাষাবিৎ। আরবী তাহার অন্যতম।

শীল মহাশয় রাজনীতি বিষয়েও পারদর্শী। তিনি মহীশূর রাজ্যের কন্সটিটিউশ্যন্ বা ভিত্তীভূত ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য লেখেন, তাহা রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত ও প্রগাঢ় জ্ঞান এবং চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য ও আদর্শ সম্বন্ধেও তিনি মহীশূর বিশ্ব-বিদ্যালয় সংগঠন উপলক্ষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, সমুদয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমুদয় কর্ম্মীর তাহা পাঠ করা উচিত।

তাঁহার মত লোককে "স্যার্" উপাধি দেওয়ায় অনুগ্রহ প্রদর্শিত হয় নাই; উপাধিটিরই সম্মান বাড়িয়াছে।

বাবু গোবিন্দ দাস

কাশী-নিবাসী বাবু গোবিন্দ দাসের মৃত্যুতে ভারত-বর্ষ একজন চিন্তাশীল সংসাহসী সুসন্তান হারাইলেন। তিনি হিন্দুস্থানী বৈশ্যজাতীয় ছিলেন। হিন্দুত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক তাঁহার কয়েকটি বহি আছে। তিনি কাশীর মিউনিসিপালিটী, কাশীর কয়েকটি শিক্ষালয়, প্রাদেশিক কন্ফারেন্স প্রভৃতি সম্পর্কে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন। বিলাত গেলে জাতি যায় কিনা, তদ্বিষয়ে কাশীতে একটি মোকদ্দমা হয়। তাহাতে বাদীদের মধ্যে বাবু গোবিন্দ দাস ছিলেন। সমুদ্র যাত্রায় পাতিত্য ঘটে না, তাঁহার এই মত ছিল, এবং তিনি বিলাত-ফেরত স্বজাতি বৈশ্যদের সহিত সামাজিক ব্যবহার করিতেন। এইজন্য তাঁহাদের পরিবারস্থ লোকদিগকে একঘরে করায় তাঁহারা এই মোকদ্দমা করেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী
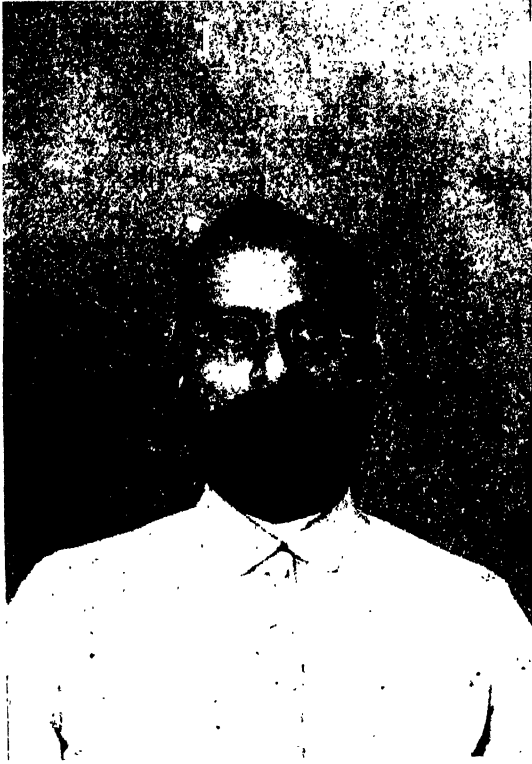
বাবু গোবিন্দ দাস

প্রভৃতির অনুবাদক তৎকালে কাশীর মুন্‌সেফ স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আদালতে ইহার বিচার হয়। সমুদ্রযাত্রায় পাতিত্যের সমর্থক কাশীর অনেক মহাপণ্ডিত বসু মহাশয়ের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানপ্রসূত জেরায় জেরবার হন।

—

বাঙালী যুবকের কৃতিত্ব

কয়েক বৎসর হইতে সিবিলসার্ব্বিসের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিলাতে ও ভারতবর্ষে উভয়ত্র হইতেছে। ভারতবর্ষের পরীক্ষা এলাহাবাদে হয়। ইহাতে বাঙালী ছাত্রেরা গত বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। এবৎসর গৌহাটীর অধ্যাপক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বি-এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় তিনি ১৭০০র মধ্যে মোট ১১৬২ নম্বর পাইয়াছেন। তিনি ছাড়া আর যে দুজন চাকরী পাইবেন, তাঁহাদের নাম ও নম্বর, এন্ এস্ অরুণাচলম্ (মান্দ্রাজ) ১১৫৭ এবং এস এ রহমান (পঞ্জাব) ১১১১; তাহার পর এলাহাবাদের বাঙালী এন্ বি বন্দোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

১১০৪ এবং বিহার-ওড়িষ্যা বাঙালী (?) এ এস বসু ১০৯১ নম্বর পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার একজন ভাল টেনিস্ খেলোয়াড়। তাঁহার কৃতিত্বে অন্য ছাত্রেরা উৎসাহিত হইবেন।

—

প্যারিসে ভারতীয় গ্রাম

আমরা আমাদের দেশের ও জাতির মন্দ দিকটা অনেক সময়, সংশোধনের ও উন্নতির ইচ্ছায়, দেখাইতে বাধ্য হই। কিন্তু বিদেশে তাহা দেখাইয়া টাকা রোজগার করা কোন ভারতীয়ের উচিত নহে। ফ্রান্সে আজকাল

গদীশচন্দ্র বসু তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া তাঁহার উদ্ভাবিত কলের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকদিগকে বুঝাইয়া দিয়া উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন, ইহা সন্তোষের বিষয়। কিন্তু এ বৎসর প্যারিসের চিড়িয়াখানায় "ভারতীয় গ্রাম" নামক যে প্রদর্শনী বসিয়াছে, তাহাতে আমাদের সম্মান বাড়িবে না, এবং সন্তোষের বিষয় কিছু নাই! ইহাতে দেড় শতের উপর ভারতীয় এদেশের অনুন্নত গ্রাম্য জীবনযাত্রা প্রণালী প্রতিদিন হাজার হাজার বিদেশীকে দেখাইতেছে। হাতী,

বাঁশ-বাজী

...গাড়ী, বাজীকর, নায়ার নাচওয়ালী, প্রভৃতিরা, ...তবর্ষ কি চীজ্, তাহা বিদেশীদিগকে প্রত্যক্ষ ...ইতেছে। আমাদের গ্রাম্য-জীবনে অগৌরবের ... অনেক আছে। কিন্তু ভালও কিছু আছে, যাহা চক্ষুগোচর করা যায় না। ভারতীয়েরা তাঁহাদের ...শক্তি গ্রামের উন্নতিকল্পে প্রয়োগ না করিয়া তাহার ...নত ও মন্দ দিকটা টাকা রোজগারের জন্য বিদেশী-...কে দেখাইলে তাহা বড় লজ্জার বিষয় হয়।

—

কলিকাতার ইস্‌লামিয়া কলেজ

কলিকাতার ইস্‌লামিয়া কলেজের সব ছাত্র ও অধ্যাপক মুসলমান হন, ইহা বাঙালী মুসলমানদের নেতারা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সব বিষয়ে চলনসই রকমেও অধ্যাপনা করিতে সমর্থ মুসলমান অধ্যাপক না পাওয়ায় ২।১ জন হিন্দুকেও অস্থায়ীভাবে রাখিতে হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ বেতনে যোগ্যতম যে অধ্যাপক পাওয়া যায়, তাঁহাকে নিযুক্ত করাই ভাল। কিন্তু মুসলমানরা যদি অধ্যাপনার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার না করিয়া মুসলমানই চান, তাহা হইলে ক্ষতি তাঁহাদেরই হইবে। তাহার পর যদি ইস্‌লামিয়া কলেজের ছাত্রেরা বেশী পরিমাণে ফেল হয়, তখন তাঁহাদের সন্দেহ হইতে পারে, যে হিন্দু পরীক্ষকরা পক্ষপাতিত্ব করিয়া ফেল করিয়াছে। ইহারও অবশ্য একটা উপায় মুসলমান নেতারা স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা চান, একটি স্বতন্ত্র মুসলমানী বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন আলীগড়ে আছে। ইতিমধ্যেই আলীগড়ের খুব খুস্‌নাম হইয়াছে। আগ্রা-অযোধ্যার এক সরকারী মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে, যে, ঐ প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষার মাপকাঠি সমান না হওয়ায় এবং কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়, সম্ভবতঃ বেশী ছাত্র পাইবার প্রতিযোগিতায়, নিজেদের আদর্শ খাট করায়, তথায় শিক্ষার অবনতি ঘটিতেছে। আগ্রা-অযোধ্যায় আজকাল উচ্চ শিক্ষার অবস্থা কিরূপ, তাহা বিশেষ অবগত না থাকায় আমরা এই মন্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। কিন্তু দেখিলাম, আগ্রা-অযোধ্যার কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষায় শতকরা ৫০ এর কিছু বেশী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং আলীগড়ের ঐ পরীক্ষায় শতকরা নব্বই জনের উপর ছাত্র পাস্ হইয়াছে। আলীগড়ের মুসলমান ছাত্রেরা খেলোয়াড় ভাল ইহা সবাই জানে, কিন্তু লেখা-পড়ায় ভারতীয় অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাস্ত করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। এরূপও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, যে, আলীগড়ের কোন একটি পরীক্ষায় একটি বিষয়ে সব ছাত্রই ফেল হয়, কিন্তু যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল যে, তাহারা সবাই পাস্ হইয়াছে!

বাংলা দেশে এরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইলে মুসল-মানদের পক্ষে পাস্ করিবার সুবিধা বেশী হইবে বটে, কিন্তু বিদ্যা বাড়িবে না। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইলে অনেক টাকার দরকার। এত টাকা মেদিনভী ও গজনভীরা দান বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহস্থল। স্যার্ সৈয়দ আহম্মদ বুদ্ধিজীবী চতুর লোক ছিলেন। তিনি আলীগড়ের জন্য হিন্দু এবং শিখ

রাজা ও ধনীদের নিকট হইতেও মোটা মোটা দান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেকালে যে উপায়ে যাহা করিয়াছিলেন, একালে একটি মুসলমান প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্য কেহ বাংলাদেশে তাহা করিতে পারিবেন না।

ফ্রান্সে ধর্ম্মঘটিত দাঙ্গা

লণ্ডনের 'দি ইন্‌কোয়ারার' (The Inquirer) নামক সাপ্তাহিক কাগজের ১৯শে জুনের সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হইয়াছে :—

"Riots similar to those between Moslems and Hindus in India are taking place in Paris, where Roman Catholics and Freethinkers are organizing demonstrations against each other. Free fights take place, and on Monday twelve persons were injured."

তাৎপর্য্য। "ভারতবর্ষে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গার মত দাঙ্গা প্যারিসে ঘটিতেছে। সেখানে রোমান ক্যাথলিক ও স্বাধীনচিন্তাবাদীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সভা ও মিছিল-আদির বন্দোবস্ত করিতেছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াইয়ে দর্শকরাও যোগ দিতেছে। গত সোমবার (১৪ই জুন) বার জন লোক আহত হইয়াছে।"

রোমান ক্যাথলিক ও স্বাধীনচিন্তাবাদীদের মারামারি ও পরস্পরের গলা কাটাকাটি নিবারণের জন্য ফ্রান্সে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের মত ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরিবারে নারীনির্য্যাতন

মুসলমানদের মধ্যে দুর্ব্বৃত্তেরা হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার করিতেছে বলিয়া কেবল সেইরূপ সংবাদে উত্তেজিত হইয়া থাকিলে চলিবে না। কেরোসীনে কাপড় ভিজাইয়া বঙ্গনারীর আত্মহত্যা এখনও কেবলমাত্র অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠাগত হয় নাই। তা ছাড়া অন্য উপায়ে আত্মহত্যাও আছে। এরূপ ঘটনা যে সব স্থলে আত্মহত্যা নহে, কিন্তু কখন কখন পরিবারস্থ লোকদের দ্বারা হত্যা, তাহার প্রমাণ আদালতে মোকদ্দমাতে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এক বধূকে (তাঁহার নাম আনন্দময়ী) দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কলিকাতার কোন "ভদ্র" পরিবার তাঁহাকে অনাহারে রাখিয়া ও অন্য প্রকারে কিরূপ ভীষণ যন্ত্রণা দিয়াছিল, সে মোকদ্দমার কথা এখনও লোকের মনে আছে। সেদিন অনেক কাগজে এই সংবাদ বাহির হয়, যে, একটা লোক নিজের স্ত্রীকে পাপব্যবসায়ী অন্যের নিকট বিক্রয়-চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। এসব পাপকথা লিখিতে প্রবৃত্তি [illegible] না; অগত্যা লিখিতে হয়। পরিবারস্থ পুরুষ ও নার[illegible] দ্বারা নারীনির্য্যাতন বন্ধ করিবার জন্য বিহিত [illegible] সর্ব্বপ্রকারে হওয়া আবশ্যক।

পাবনায় অরাজকতা

পাবনায় মুসলমানদের দ্বারা বহু গ্রামের হিন্দুদে[illegible] লুট এবং তথায় তাহাদের উপর অন্যান্য প্রক[illegible] অত্যাচারের কারণ কি কি, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে নি[illegible] হয় নাই। কারণ যাহাই হউক, ইহা মুসলমান সম্প্র[illegible] ঘোর কলঙ্কের বিষয়। কোন মুসলমান নেতা বা সংবা[illegible] স্বধর্ম্মীদের দোষ ব্যাখ্যা দ্বারা উড়াইয়া বা কমাইয়া দি[illegible] চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার ও তা[illegible] দোষ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে মুসলমান সম্প্রদা[illegible] কল্যাণ হইবে। হিন্দুরা ত দুঃখ ও অপমান [illegible] করিবার জন্যই জন্মিয়াছে, তাহাদের কথা ভা[illegible] প্রয়োজন নাই। কাগজে দেখিলাম, পাবনার কোন [illegible] মুসলমান-নেতা স্বধর্ম্মীদিগকে ঠাণ্ডা করিবার [illegible] করিতেছেন।

পাবনার শতকরা প্রায় আশীজন অধি[illegible] মুসলমান। মেদিনীপুরে শতকরা ৮৮ জনের অধিক [illegible] শতকরা প্রায় সাত জন মুসলমান। বাঁকুড়ায় শ[illegible] ৮৬ জনের উপর হিন্দু, শতকরা পাঁচজনও মুসলমান [illegible] হুগলীতে শতকরা ৮১ জনের উপর হিন্দু, এবং ১[illegible] মুসলমান। বর্দ্ধমান, বীরভূম, হাবড়া ও ২৪ [illegible] জেলাতেও মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অনেক [illegible] কিন্তু এই সকল জেলায় হিন্দুর সংখ্যাধিক্য বশতঃ [illegible] দল বাঁধিয়া গ্রামে গ্রামে মুসলমানদের ঘর-বাড়ী কখন[illegible] করিয়াছে বলিয়া পড়ি নাই, শুনি নাই। ভবিষ্য[illegible] করিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ বাঙালী হিন্দু [illegible] জাতি নহে। অবশ্য সাধারণ ডাকাত এবং "রাজনৈ[illegible] ডাকাত হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে আছে বটে। [illegible] বীরপদবাচ্য নহে। ইতিহাসের বড় বড় বীরেরা নগর গ্রাম লুটপাট ধূলিসাৎ ভস্মীভূত করিয়াছি[illegible] কঙ্কালের জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহা[illegible] খুনে ডাকাত বলিলে ইতিহাসের অপমান হয়। চলিত বাংলায় তাহা বলা যাইতে পারে। বলিবে[illegible] কে? বড় বড় বীরেরা যাহা করিয়াছিল, গ্রাম্য [illegible] তাহা করিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে [illegible] অত্যন্ত অন্যায়। তাহাদের প্রত্যেককে নবাব [illegible] দেওয়া উচিত। তাহা না করিয়া তাহাদিগকে

পাঠাইলে তাহারা হয়ত বা শহীদ্ বলিয়া পূজিতও হইতে পারে।

মুসলমান কোন কোন কাগজে পড়িয়াছি, যে, পাবনা সহরের হিন্দুরা গীতবাদ্যসমন্বিত মিছিল ইচ্ছা করিয়া এমন সময়ে এমন রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া লইয়া গিয়াছিল, যাহাতে মুসলমানদের নমাজে ব্যাঘাত জন্মে ও তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধে। তাহার পর যখন ঝগড়া বাধিল, তখন হিন্দুরা মসজিদের ভিতর পর্য্যন্ত ঢুকিয়া মুসলমানদিগকে ঠেঙায়।—ইত্যাদি। ইহা যদি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও পাবনা জেলার নানাগ্রামের হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুটপাট ও তাহাদের উপর অত্যাচার ন্যায়সঙ্গত বা স্বাভাবিক বলিয়া প্রমাণ হয় না। কারণ, পাবনা সহরের হিন্দুরা সমস্ত জেলার হিন্দুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের সাহায্যে ও সম্মতিক্রমে সহরের মুসলমানদিগের উপর অত্যাচার করে নাই।

কাগজে দেখিলাম, পাবনার গ্রামে গ্রামে এইরূপ জনরব উঠিয়াছে, যে, মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে, এখন সাতদিন ধরিয়া হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুট করিলেও কেহ কিছু বলিবে না, ইত্যাদি। ইহা অংশতঃ সত্য হইলেও যাহারা জনরব তুলিয়াছে, তাহারা অতি গর্হিত কাজ করিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের আদর্শ ও নমুনা এইরূপ বলিয়া বিশ্বাস করাইবার ও করিবার লোক যদি বর্ত্তমান সময়েও মুসলমানদের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহা ঐ সম্প্রদায়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। আশা করি, এই সংবাদ সত্য নহে। হয় ত পাবনার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব মুসলমান বলিয়া এইরূপ গুজব রটিয়াছে। যাহা হউক লুটতরাজ যেরূপ ব্যাপক হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে আকস্মিক মনে করা যায় না—ইহার পশ্চাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কাজ করাইতে সমর্থ মাথাওয়ালা লোক আছে।

পাবনার অরাজকতা কেবল ধর্ম্মবিদ্বেষজাত না হইতেও পারে। এই জেলার কৃষকেরা অধিকাংশ মুসলমান, জমীদারেরা তাহা নহে। জমীর মালীক ও চাষীদের মধ্যে মনোমালিন্য বশতঃ জেলার অনেক স্থানে চাষীরা চাষ না করায় জমী পড়িয়া আছে শুনা যায়। তাহাতে চাষীদেরও অন্নকষ্ট হইয়া থাকিবে। বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং—ক্ষুধার্ত্ত লোকেরা কি পাপ না করে? মহাজনদের টাকা না দিবার মৎলবে লুটপাট করাও অসম্ভব নহে। সমবায়-ঋণদান-সমিতি সকলের মূলধন বেশীর ভাগ হিন্দুরাই দিয়াছে শুনিতে পাই; অথচ শুনিতে পাই কোন একজন সরকারী উচ্চপদস্থ মুসলমানের কৌশলে পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলায় সমিতিগুলির কর্ত্তৃত্ব মুসলমানদের হাতে আসিয়াছে। ইহা কি সত্য? পাবনা কি সেইরূপ একটি জেলা?

সব দিকের সব কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া মুসলমান বা হিন্দু, যাহার যাহা অভিযোগ আছে, তাহার কারণ দূর করা আবশ্যক।

কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক শান্তিস্থাপন। পাবনার অস্থায়ী মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমেই সহরে যদি দৃঢ়তা দেখাইয়া দুর্দ্দান্ত লোকদিগকে দমন করিতেন, তাহা হইলে অরাজকতা এরূপ ভীষণ ও ব্যাপক আকার ধারণ করিত না, এবং নানাস্থানে মুসলমান জনতার উপর পুলিসকে গুলি চালাইতে হইত না। বহুশত মুসলমানকে গ্রেপ্তার করাও আবশ্যক হইত না।

লুণ্ঠিত গ্রাম সকলে হিন্দুদের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের যেরূপ দুঃখ-দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনা হইয়াছে, তাহা হৃদয়বিদারক এবং বর্ণনার অতীত। অর্থের দ্বারা দুঃখমোচন যতটা হইতে পারে, তাহার চেষ্টা হইতেছে, এবং চেষ্টা ক্রমশঃ ফলবতীও হইতেছে।

স্থায়ী প্রতিকার নির্ভর করিবে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মনের ভাব ও লোকমত পরিবর্ত্তনের উপর, হিন্দুসমাজের মনের ভাব ও লোকমত পরিবর্ত্তনের উপর, এবং গবর্ণমেণ্টের অপক্ষপাত ন্যায়পরায়ণ দৃঢ় ব্যবহার ও ব্যবস্থার উপর। মুসলমানদের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন দরকার, তাহা তাঁহাদের মধ্যে চিন্তাশীল লোকেরা স্থির করিলে ভাল হয়। আমরা বলিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু ইতিহাসের ইঙ্গিত উল্লেখ করা চলিতে পারে। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের পরস্পরের সহিত অসদ্ভাব ও প্রতিযোগিতা বশতঃ এখনও যে কয়টি মুসলমান দেশ স্বাধীন আছে, তাহারাও সেকালের মনোভাব ছাড়িয়া দিতেছে।

হিন্দু অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয় সত্ত্বেও এখনও বাঁচিয়া আছে; ভবিষ্যতেও সম্ভবতঃ মরিবে না। কিন্তু মানুষের মত বাঁচিয়া থাকা দরকার। সেইজন্য তাহাকে আত্মরক্ষার উপায় অনুশীলন করিতে হইবে। যাহাদের পৌরুষ থাকে, তাহারা সংখ্যায় ন্যূন হইলেও অন্যেরা তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে বা আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করে হিন্দুর সেই পুরুষকারের বিকাশ হওয়া আবশ্যক। ইহা বীজের আকারে প্রচ্ছন্নভাবে সকলের আত্মাতেই বিরাজমান। কেবল স্ফূর্ত্তির, বিকাশের প্রয়োজন। তাহা অসাধ্য নহে।

লর্ড লিটন যাহা প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন, অন্য ইংরেজ শাসকদেরও সেই মত। অর্থাৎ "ক্র", কি না অস্ত্রশস্ত্র, সরকার বাহাদুরের হাতে থাকিবে, সাধারণতঃ বে-সরকারী লোকদের হাতে থাকিবে না। কারণ,

তাহাদের হাতে হাতিয়ার থাকিলে তাহারা পরস্পরের গলা কাটাকাটি করিবে এবং তাহার ফলে ভারতীয় মানুষদের সমাজ জঙ্গলের হিংস্র পশুদের সমাজের মত হইয়া উঠিবে। কিন্তু সরকার বাহাদুর "রু"গুলা যথাসাধ্য একচেটিয়া করাতেও স্থানে স্থানে মানবসমাজ জঙ্গলীসমাজ হইয়া উঠিতেছে। লাট লিটনযাহা বলিয়াছেন, তাহাতে রক্ষণাবেক্ষণের ভারটা সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টরই লইবার কথা। কিন্তু কি নারীনির্য্যাতন সম্পর্কে, কি পাবনার মত অরাজকতায়, কোন ক্ষেত্রেই গবর্ণমেণ্ট এই কর্ত্তব্য-পালন করিতে পারিতেছেন না। যদি অমনোযোগ বা অবহেলা বশতঃ এরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ত্রুটির সংশোধন অবিলম্বে করা চাই। আর যদি অসামর্থ্য-বশতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের যে নীতিতে এই দেশের আইনের বাধ্য লোকদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য কমিয়াছে বা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, সেই নীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

ইংরেজের মুসলমান-পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে লর্ড অলিভিয়ার্

গত ১১ই জুলাই তারিখে ইংলিশম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা তারযোগে এই সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছেন :—

Lord Olivier, in a letter to "The Times" on the subject of Hindu-Moslem hostility says :—"No one with any close acquaintance with Indian affairs will be prepared to deny that on the whole there is a predominant bias in British Officialdom in India in favour of the Moslem Community, partly on the ground of closer sympathy, but more largely as a makeweight against Hindu nationalism. "Independently of this and its evil effects there has been vacillation in the action of the police and in police court practice, sometimes on the one side and sometimes on the other, encouraging each side to take liberties. This is almost universally attested by responsible Indians who impute it (I do not say justly) to a deliberate desire on the part of the authorities to maintain communal trouble as testimony against the possibility of constitutional progress.

"Contrary to the opinion of many Indians, I consider that the regulations recently promulgated in Bengal with regard to processions, etc., are on the right lines, if for no other reason than because they appear to me to follow the principles on which native rulers proceed.

"If Moslems must have beef it should in Hindu cities be purveyed through licensed abattoirs."

তাৎপর্য্য। "হিন্দু-মুসলমানদের সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ার্ টাইম্‌সে একখানা চিঠি লিখিয়া বলিয়াছেন, যাঁহার ভারতীয় ব্যাপারসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, এমন কেহই ইহা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না, যে, ভারতে ব্রিটিশ আম্‌লাদের মধ্যে মুসলমানদের অনুকূল একটা বদ্ধমূল প্রবল সংস্কার আছে। ইহা অংশত মুসলমানদের সহিত ঘনিষ্ঠতর সহানুভূতি-প্রসূত, কিন্তু প্রধানতঃ ইহা হিন্দু স্বাজাতিকতার বিরুদ্ধে "পাষাণ-ভারা" নীতির অনুসরণ হইতে উৎপন্ন। ইহা এবং ইহার কুফল হইতে সম্পর্কহীন ভাবে, পুলিশ কর্ম্মচারী ও পুলিশ আদালত সকলের কাজে সর্ব্বদাই নীতির অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা কখনও এক পক্ষ কখনও অন্য পক্ষ ঘেঁসিয়া কাজ করে। তাহাতে উভয় পক্ষই নিয়ম ভঙ্গ করিতে উৎসাহিত হয়। দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন প্রায় সকল ভারতীয়ই এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন (ইহা আমি ন্যায্য বলিতেছি না), যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছাপূর্ব্বক এই অভিপ্রায়ে ইহা করেন, যে, যাহাতে ভারতীয়দের আত্মশাসনকার্য্যে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে।

"অনেক ভারতীয়ের মতের বিরুদ্ধে আমি মনে করি, যে, বঙ্গে সম্প্রতি মিছিল প্রভৃতি সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্ট যে-সব নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা ঠিক্,—অন্ততঃ এই কারণে, যে, দেশী নৃপতিরাও এইরূপ নীতি অবলম্বন করেন।

"হিন্দু সহরে যদি মুসলমানদিগকে গোমাংস জোগান দরকার হয়, তাহা হইলে তাহা সরকারী-অনুমতি-প্রাপ্ত কসাইখানা হইতে হওয়া উচিত।"

লর্ড অলিভিয়ার্ ইংরেজ আমলাতন্ত্রের মুসলমান-পক্ষপাতিত্ব ও তাহার কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীর বিবিধপ্রসঙ্গে ৫৩৫, ৫৩৬,৫৩৭ পৃষ্ঠায় আমরা যাহা লিখিয়াছি,তাহা তুলনা করিয়া পড়িতে পাঠকদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

মিছিল সম্বন্ধীয় নিয়ম সম্পর্কে লর্ড অলিভিয়ার্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্ মনে করি না। কোন্ কোন্ দেশী নৃপতি এইরূপ নীতির অনুসরণ করেন, জানিতে চাই।

প্রবাসীর সম্পাদকের বিদেশ যাত্রা

লীগ্ অব্ নেশুন্স্ অর্থাৎ মহাজাতি-সংঘের সেক্রেটারিয়েট্ প্রবাসী-সম্পাদককে জেনিভায় গিয়া তথায় কিছু দিন থাকিয়া লীগের ব্যবস্থা, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তদনুসারে আমাদের ১লা আগষ্ট বোম্বাই হইতে ইউরোপ যাইবার সম্ভাবনা আছে। যাইবার পরের সংবাদ পাঠকেরা পাইবেন।

আমরা লীগ্ সম্বন্ধে সকল প্রকার তত্ত্ব ও তথ্য জানিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। লীগের আফিস্ সে-বিষয়ে সুবিধা দিবেন লিখিয়াছেন। প্রধানতঃ আমরা জানিতে চেষ্টা করিব, যে, লীগের দ্বারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থার, শিল্প-বাণিজ্যের, শ্রমিকদের এবং স্বাস্থ্যের কিরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। নারীঘটিত অন্তর্জাতিক পাপ-ব্যবসা দমন লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য। এবিষয়ে ভারতবর্ষের কি উপকার হইতে পারে, তাহা জানিতে হইবে। সকল জাতির মধ্যে জ্ঞানাহরণ ও জ্ঞান-বিস্তার-বিষয়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা লীগ্ ক্রমশঃ ভাল করিয়া করিবার চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই চেষ্টায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। ইহা কাজে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে হইবে। আফিং ও তাহা হইতে প্রস্তুত নানা মাদকদ্রব্য এবং কোকেন ও তদ্রূপ অন্যান্য নেশার জিনিষের ব্যবসা যাহাতে পৃথিবীতে বন্ধ হয়, এবং ঐ জিনিষগুলি কেবল চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, লীগ্ সেই চেষ্টা করিতেছেন। তাহা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, জানিতে হইবে। লীগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষকে অনেক টাকা দিতে হয়। ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের মতে ভারতবর্ষকে খুব বেশী টাকা দিতে হয়। তদনুরূপ ফল ভারতবর্ষ কি পান, এবং লীগের আফিসে ও অন্য কাজে ভারতীয় লোকেরা কি পরিমাণে নিযুক্ত হন, কি পরিমাণে অন্তর্জাতিক বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়।

সুইজার্ল্যাণ্ড ক্ষুদ্র হইলেও স্বাধীন দেশ। এই ক্ষুদ্র দেশে তিন চারিটি ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাভাষী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিবার জন্য ইংরেজ বা অন্য কোন জাতির প্রভুভাবে উপস্থিতি আবশ্যক হয় না। ইহার কারণ কি, তাহা দূর হইতেই অনেকটা জানা আছে। সেই দেশে কিছু কাল থাকিলে আরও ভাল করিয়া জানা যাইতে পারে।

যদি আমরা আরও কোন কোন দেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে অভিজ্ঞতা আরও বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। সমস্তই স্বাস্থ্য ও সুযোগের উপর নির্ভর করিবে। যাহা হউক, যদি কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি, এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারি, তাহা হইলে সন্তোষের বিষয় হইবে।

যে-কারণেই হউক, লীগের মত অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যে ভারতীয় সংবাদপত্রসকলের মতকে তুচ্ছ মনে করেন না, তাঁহাদের নিমন্ত্রণে ইহাই সকলের চেয়ে আনন্দের বিষয়। প্রবাসীর সম্পাদককেই যে প্রথমে ডাক পড়িয়াছে, তাহা আকস্মিক। ভবিষ্যতে যোগ্যতর সাংবাদিকেরা নিমন্ত্রিত হইলে লীগের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা অধিক হইবে, এবং ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর হিতও অধিক হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে।

—

গোরক্ষা

গোজাতির রক্ষা, উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি আমরা সর্ব্বান্তঃ-করণে প্রার্থনা করি। যে-যে কারণে ইহা প্রার্থনীয়, সেই কারণগুলি যতটা সর্ব্ববাদিসম্মত হয়, ততই ভাল। কেন না, তাহাতেই সুফল লাভের সম্ভাবনা অধিক। হিন্দুরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কারণে গোরক্ষা করিতে উৎসুক, এবং তাহা ব্যতীত কৃষির উন্নতি এবং দুগ্ধ ঘৃত আদির প্রাচুর্য্যের জন্যও গোরক্ষা ও গোবংশের বৃদ্ধি চান। মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মের লোক ধর্ম্মবিশ্বাসবশতঃ গোরক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করেন না; কিন্তু কৃষির উন্নতি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন প্রভৃতির প্রাচুর্য্য প্রভৃতি কারণে গোরক্ষার প্রয়োজন তাঁহারাও স্বীকার করিবেন। এইজন্য আমরা গোরক্ষার সম্মিলিত চেষ্টার ভিত্তি এইরূপ ঐহিক অর্থাৎ পার্থিব প্রয়োজনের উপর স্থাপন করিতে চাই। তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সকল চিন্তাশীল স্বদেশপ্রেমিক লোকের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, অথচ হিন্দুদের উৎসাহ ও সাহায্য তাহাতে কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

গোজাতির উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা কৃষি, গোপ-ব্যবসা প্রভৃতির উন্নতি করিতে হইলে, কেবল খাদ্যের জন্য গোবধ বন্ধ করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না; গোয়ালারা এবং অন্য গোপালক হিন্দু গৃহস্থেরা যাহাতে গোরুকে যথেষ্ট খাদ্য দেন ও অন্য প্রকারে গোরুর যত্ন করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবিষয়ে দেশের মধ্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগান খুব দরকার।

আরও একটি কর্ত্তব্যের দিকে মন দেওয়া চাই। পাশ্চাত্য কারখানায় প্রস্তুত কাপড় কলকব্জা আদি নানা পণ্যদ্রব্য দেশে আমদানী হইবার পূর্ব্বে সেইসব জিনিষ দেশী কারিকররাই প্রস্তুত করিত। তাহাদের আর সে-সব কাজ চলে না বা প্রায় চলে না। সেইজন্য তাহাদিগকে বেশী পরিমাণে জমীর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। অল্প অল্প করিয়া দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিও হইতেছে। এইজন্য গোচারণের জমী কমিয়া আসিতেছে, অথচ গবাদি পশুর খাদ্য বিশেষ করিয়া উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে না। এই চেষ্টা হওয়া খুব দরকার। অনেক

ডাঙ্গা জমী আছে, যেখানে হয়ত অন্য ফসল হইতে পারে না, কিন্তু গবাদির খাদ্য গিনি ঘাস প্রভৃতি হইতে পারে। জুয়ার, ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতির চাষ করিলে, দানাগুলি মানুষ ও পশু উভয়েরই কাজে লাগে এবং অধিকন্তু গাছ ও পাতাগুলি গোরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য হইতে পারে। গরুর খাদ্যের চাষ যে ডাঙ্গা জমিতেও বেশ চলিতে পারে, তাহা বিশ্বভারতীর স্রুরুল গ্রামস্থিত শ্রীনিকেতনের কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। এই ক্ষেত্র ব্রহ্মডাঙ্গা ছিল, কিন্তু এখানে অন্যসব ফসলের সঙ্গে গিনি ঘাস, জুয়ার প্রভৃতিও বেশ জন্মিতেছে।

ভারতবর্ষে যে যথেষ্ট গবাদি পশু নাই, তাহা কয়েকটি সংখ্যা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে। প্রতি এক শত মানুষের জন্য কোন্ দেশে কত গবাদি পশু আছে, নীচে তাহার একটা তালিকা দিতেছি।

দেশ	শত মানুষ প্রতি গবাদির সংখ্যা
ভারতবর্ষ	৩৯
ডেন্মার্ক	৭৪
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৭৯
কানাডা	৮০
কেপ কলোনী	১২০
নব জীল্যাণ্ড	১৫০
অষ্ট্রিয়া	২৫৯
আর্গেণ্টিন্ সাধারণতন্ত্র	৩২৩
ইউরুগোয়ে	৫০০

ভারতবর্ষের প্রায় ২২,৮০,০০,০০০ একার অর্থাৎ প্রায় ৭০ কোটি বিঘা জমীর চাষের জন্য কেবল ২,৪০,০০০০০ গবাদি পশু আছে; অর্থাৎ এক জোড়া বলদকে ১৯ একর বা প্রায় ৬০ বিঘা জমী চষিতে হয়। তাহা ভাল করিয়া করিবার সাধ্য তাহাদের নাই। তাহার জন্য ৪ জোড়া বলদ সাধারণতঃ দরকার হয়।

অতএব দুগ্ধাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল চাষের জন্যই গবাদির সংখ্যা বৃদ্ধি দরকার ও তাহাদের খাদ্য উৎপাদন আবশ্যক। বিদেশে গোরু এবং শুষ্ক বা অন্যবিধ গোমাংস রপ্তানী আইন দ্বারা বন্ধ করা উচিত। ভারতবর্ষেও খাদ্যের জন্য দুগ্ধবতী ও দুগ্ধবতী হইবার বয়সের গাভী এবং গোবৎস বধ না হইলে ভাল হয়। গবাদির খাদ্য উৎপাদনের কথা আগেই বলিয়াছি। গ্যালেটি সাহেবের মতে মানুষের খাদ্যশস্যের পাশাপাশি গবাদির খাদ্য উৎপাদন করা যাইতে পারে; তাহাতে মানুষের খাদ্যশস্যের ফসল কম হয় না।

আকবরের সময় গুজরাটের গোরু শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। তথাকার বলদ ২৪ ঘণ্টায় ১২০ মাইল যাইতে পারিত। কোন কোন গাভী প্রত্যহ আধ মণের উপর দুধ দিত। এক টাকায় প্রায় ৪৪ সের দুধ পাওয়া যাইত। ঘি টাকায় প্রায় ১০ সের পাওয়া যাইত।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁহার লিবারেটার্ নামক কাগজে লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা যে মুসলমানদের গোরু কোরবানী লইয়া এত গোলমাল করেন, ইহা আমার কখন যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নাই। সমগ্র ভারতে এই কারণে গোবধ বৎসরে ত্রিশ হাজারের বেশী হয় না, মনে করি। এবং মুসলমানদের আন্তরিক ধর্ম্মবিশ্বাস এই, যে, একটি গোরু কোরবানী করিলে তাহা ৭ জন মোমিন্‌কে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারে। অন্যদিকে ইংরেজ গোরা-বারিকে গোরাদের খাদ্যের জন্য বৎসরে অন্যূন দশলক্ষ গোরু জবাই হয়, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান সাধারণ লোকদের খাদ্যের জন্য জবাই হয় প্রায় ১৫ লক্ষ, এবং বিদেশে চামড়া ও গোমাংস রপ্তানীর ব্যবসার জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ গোরু বধ করা হয়।" স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অভিপ্রায় এই, যে, এত লক্ষ গোবধ যে হয়, তাহাতে হিন্দুরা বাধা দিতে পারেন না, কিন্তু বকরীদের সময় ত্রিশ হাজার গোরু কোরবানীর জন্য কতই না সাংঘাতিক দাঙ্গা মারপিট এবং তজ্জনিত মনোমালিন্য ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষ ঘটে। সত্য বটে, কোরবানীর গোরু অনেক সময় রাস্তা দিয়া প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, এবং তাহাতে হিন্দুর মনে আঘাত লাগে কিন্তু খাদ্যের জন্য বধ করিবার নিমিত্ত যে-সব গোরু কসাইখানায় লইয়া যাওয়া হয়, তাহাও প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এইজন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলেন, যে, এই কারণে মুসলমানদের সহিত ঝগড়া না করিয়া বরং ভগবানের নিকট এই প্রার্থনাই করা উচিত, যে, তিনি তাহাদের মনে এই বোধ জন্মাইয়া দিউন, যে, মানুষের সমুদয় কুপ্রবৃত্তি ও রিপু বলিদান দিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন, রক্তমাংসের বলি তাঁহার গ্রহণীয় নহে। এইরূপ কথা গত বকরীদের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খুদা বখশ্ ইংরেজী দৈনিক কাগজগুলিতে লিখিয়াছিলেন।

—

বঙ্গে ও ফিলিপাইন্সে শিক্ষা বিস্তার

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার হাতে আসে। ১৯১৮ সালের সেন্সস্ অনুসারে উহার লোকসংখ্যা ছিল এক কোটি তিন লক্ষ ১৪৩১০। ১৯২৩ সালে উহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১,২৮,৯৯৭। অর্থাৎ আমেরিকার অধীন হওয়ার ১৪ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এইরূপ হইয়াছে। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা মোটামুটি চারি কোটি সাতষট্টি লক্ষ। ১৯২৪-২৫ সালে বঙ্গের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১,৫০,৯৪২। ফিলিপাইন্সে ২৪ বৎসরে

আমেরিকা যাহা করিয়াছে, ইংরেজ ১৬৮ বৎসরে বঙ্গে তাহা করিতে পারে নাই। বঙ্গের লোকসংখ্যা ফিলিপাইন্সের লোকসংখ্যার প্রায় পাঁচগুণ; ফিলিপিনোরা যতদিন আমেরিকার অধীন আছে, বাঙালীরা তাহার প্রায় সাতগুণ সময় ইংরেজের অধীন আছে। অথচ বঙ্গের ছাত্রসংখ্যা ফিলিপাইন্সের ছাত্রসংখ্যার দ্বিগুণের কাছাকাছি মাত্র।

অথচ ফিলিপিনোরা আমেরিকান্ শাসনের আরম্ভের সময় খুব সুশিক্ষিত ছিল না। ঐ শাসন আরম্ভ হয়, ১৮৯৯ সালে। ১৯০১ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৬০,০০০। ১৯১১তে উহা হয় ৫,০০,০০০; ১৯১৯এ হয় ৭,০০,০০০; এবং ১৯২৩এ হইয়াছে ১১,২৮,৯৯৭। অন্য দিকে ব্রিটিশ শাসন আরম্ভের সময়, ইংরেজরাই বলেন, বঙ্গের গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল। ব্রিটিশশাসিত বাংলায় ৮৫১১১টি গ্রাম ও সহর আছে, এবং তাহাতে মোট ৫৭১৭৩টি সব রকমের শিক্ষালয় আছে। অনেক সহরে বিস্তর শিক্ষালয় আছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এখনও এমন গ্রাম বিস্তর আছে যেখানে কোন বিদ্যালয় নাই। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন এখনকার মত আধুনিক উচ্চশিক্ষা ছিল না বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এখনকার চেয়ে বেশী ছিল।

—

স্বরাজ্যলাভের চেষ্টায় বিঘ্ন

সাম্প্রদায়িক বিরোধে মানুষের মন অনেক দিন ধরিয়া এমন বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যে, স্বরাজ্যলাভের চেষ্টায় লোকে মন দিতে পারিতেছে না। সকল সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর সম্মিলিত চেষ্টা ত সুদূরপরাহত হইয়াই গিয়াছে, ভারতবর্ষের প্রধান যে দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান, তাহারা নিজেরাও স্বতন্ত্রভাবে স্বরাজ্যলাভ-চেষ্টা করিতে পারিতেছে না। মুসলমানরা সংখ্যায় কম হইলেও তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ কম বলিয়া তাহারা স্বরাজ্যলাভ-চেষ্টা অধিকতর একাগ্রতা ও ঐক্যের সহিত করিতে সমর্থ। কিন্তু সে-চেষ্টা তাহাদের কতিপয় নেতা কখন কখন করিলেও, মুসলমান সমাজ প্রধানতঃ সরকারী চাকরীতে এবং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজেদের ভাগটা বেশী করিয়া বসাইবার চেষ্টাই করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক লোক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গোড়া হইতে এবং পরে স্বরাজ্যলাভ-চেষ্টায় যোগ দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইদানীং হিন্দু-নারার নির্য্যাতন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁহাদেরও মন বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ভারতীয়েরা স্বরাজ্য লাভ করে, ইংরেজ জাতি তাহা চায় না। অবশ্য, আমরা স্বরাজ্যলাভ করিলে যদি ইংরেজদের ব্যবসাতে ও অর্থাগমে হাত না পড়ে, তাহা হইলে আমাদের স্বরাজ্যলাভে তাহাদের ততটা আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু ভারতে ইংরেজদের রাজনৈতিক শক্তির অপব্যবহার দ্বারা তাহাদের ব্যবসা ও অর্থাগম যতটা বাড়িয়াছে, আমাদের স্বরাজ্য লাভের পর তাহার কিছু হ্রাস হইবার সম্ভাবনা আছে। এইজন্য, যাহাতে আমাদের স্বরাজ্যলাভে বাধা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা ইংরেজদের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় মনে না হইতে পারে। তা ছাড়া, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিবারণ এবং তাহা ঘটিলে শান্তিস্থাপন ও মধ্যস্থতাকরণ যখন ইংরেজদের ভারতবর্ষে থাকিবার একটি কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তখন ঐরূপ বিরোধও ইংরেজদের বিরক্তিকর না হইবার কথা।

তাহা হইলেও ইহা নিশ্চিত, যে, ইংরেজ আম্‌লাতন্ত্র সাক্ষাৎভাবে বা লোক লাগাইয়া হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া বাধাইয়া দেন, ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না। অন্যদিকে ইহাও সত্য, যে, কতকগুলি লোকের ব্যবহার এরূপ যে, ইংরেজ আমলাতন্ত্রের টাকা খাইলে বা তাহাদের দ্বারা প্রলুব্ধ হইলে উহা যেমন হইবার সম্ভাবনা ছিল, অনেকটা সেইরূপই দেখা যাইতেছে।

এমন অবস্থাতেও যাঁহারা স্বরাজ্যলাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। যে-সব হিন্দু নারীনির্য্যাতনের প্রতিকারকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন না, কিম্বা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত অধিকারে হাত পড়িলেও তাহার উদ্ধার বা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন না, তাঁহাদের এই ঔদাসীন্য বা অবসরের অভাব যদি সত্য সত্যই স্বরাজ্যলাভচেষ্টায় সতত ব্যাপৃত থাকায় ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কতকটা মার্জ্জনীয়; নতুবা নহে।

দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা-বৃদ্ধি আমরা চাই না, কিন্তু জোড়াতাড়া দিয়া বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে বাহ্য মিলন রক্ষাও পছন্দ করি না;—তাহা টিকিতে পারে না। স্বরাজ্যদলের মধ্যে যে-বিরোধ দেখা দিয়াছিল, তাহা যদি সত্য সত্যই ভিতরে ও বাহিরে মিটিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সুখের বিষয়।

—

মন্ত্রিত্ব লওয়া হইবে কি না

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। দ্বৈরাজ্য যখন টিকিয়া আছে, এবং বাস্তবিক ভদ্র নামের উপযুক্ত লোকও কৌন্সিলে ঢুকিবেন, তখন খাঁটি লোকের মন্ত্রিত্ব গ্রহণই ভাল। মিথ্যাবাদী, ঋণগ্রস্ত, ঘুষখোর, সংকীর্ণমনা লোক মন্ত্রী হইলে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর।

পেশাদার অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে গিরীশচন্দ্রের মত

বৈশাখ মাসের বঙ্গবাণীতে "গিরীশচন্দ্রের স্মৃতি" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখকের সহিত পেশাদার অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে গিরীশচন্দ্রের কথোপকথনের রিপোর্ট আছে। একস্থানে গিরীশ-বাবু বলিতেছেন :—

দেখ, যাঁরা বেশ্যা ও মুর্খ নিয়ে থিয়েটার করাতে সমাজে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্চে, বলেন, তাঁদের আমি একটা কথা বলতে চাই। যা হোক ত্যাগ করুন আর যাই করুন, এই বেশ্যা আর মুর্খ তো সমাজে বিদ্যমান আছে। তাদের ত্যাগ করা কিম্বা ঘৃণা করাই কি সমাজসংস্কার? যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য কোনও অবতার পুরুষই এদের ত্যাগ বা ঘৃণা করতে শেখাননি—তাঁরা এদের জীবন উন্নত ক'রে দিয়েছিলেন। আমি ঐ মহাপুরুষদের অনুসরণ করবার দম্ভ করি না, কিন্তু যা হোক বেশ্যাদের একটি নুতন পথে চালিত কচ্চি—যে পথে তারা ইচ্ছা করলে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে, উচ্চ চিন্তা করতে পারে এবং বাজারে দাঁড়িয়ে অন্য লোককে প্রলোভিত করতে ক্ষান্ত থাকবে। আমি তো তাদের অর্থার্জনের একটা সুগম পথ খুলে দিয়েছি—অভিনয় করতে এরা উচ্চ চিন্তা উচ্চভাবের আবৃত্তি ও অভিব্যক্তি করে, কিন্তু বলতে পার এইসব রুচিবাগীশরা এদের সংস্কার করবার কি চেষ্টা করেছেন?

গিরীশ-বাবুর এই মত পড়িবার অনেক আগে আমরা পেশাদার অভিনেত্রীদের কাজের এই ভাল দিকটা দেখাইয়াছিলাম, যে, তাহারা সুযোগ পাইলে ও ইচ্ছা করিলে ইহার সাহায্যে পাপপথ ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, যে, কয়জন তাহা করিয়াছে, করিতে উৎসাহিত হইয়াছে, বা করিবার সুযোগ পাইয়াছে?

তার পর গিরীশ-বাবু "রুচিবাগীশদের" সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

ছেলে-বেলা এঁরা বেশ্যা ও বদমায়েস গুণ্ডাকে ভিন্ন চ'খে দেখে এসেছেন ও ঘৃণা করতে শিখেছেন। এঁদের মনে সত্য সত্য এইরকম একটা ধারণা দৃঢ় হ'য়ে আছে যে, যারা বেশ্যা ও গুণ্ডার সংস্রবে আসে—তারা জহন্নামে যায়। এই কথাগুলি যে সম্পূর্ণ মিছে, তা নয়। বাস্তবিকই বেশ্যার কুহকে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে, বেশ্যার কুটিল চাউনিতে অনেক যুবক বিপথগামী হয়েছে এই সব সত্য কথা। কিন্তু রঙ্গালয়ে নাটক দেখার নাম তো বেশ্যার সংস্রবে আসা নয়। রঙ্গালয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আছে—রঙ্গমঞ্চে কোনও রূপ অভদ্র বা অসভ্য ব্যবহারে শাসন আছে এবং যারা অভিনয় করে তারা নিজ নিজ চরিত্র play করতেই ব্যস্ত—তারা দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করতেই চেষ্টিত,—রঙ্গালয়ে যুবকদের সর্ব্বনাশ করবার অবসর তাদের কোথায়? ভাল নাটক অভিনীত না হ'লে অন্য কথা। তবে আমার মনে হয় যে, বেশ্যা ও গুণ্ডা আমাদের সমাজের একটি বিষম সমস্যা। এদের শুধু ঘৃণা ও উপেক্ষা করলে চলবে না। এরা একদিকে পিশাচ পিশাচী, আবার অন্যদিকে চালিত হ'লে এদের দ্বারা সমাজের অনেক হিত হ'তে পারে। থিয়েটারের মত প্রতিষ্ঠান ছাড়া এদের দাঁড়াবার জায়গা কোথায়?

কিন্তু সেই "দাঁড়াবার জায়গা" তাহাদিগকে "অন্যদিকে চালিত" এমন ভাবে করিতেছে কি, যাহাতে "সমাজের অনেক হিত হ'তে পারে?" "রঙ্গালয়ে যুবকদের সর্ব্বনাশ করবার অবসর" অভিনেত্রীদের না থাকিতে পারে, কিন্তু বাহিরে যে-সকল আছে, তাহাতে অনেক যুবকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অস্বীকার করিবার জো নাই।

প্রবন্ধটির শেষে পেশাদার থিয়েটারের পেশাদার অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত গিরীশ-বাবুর কথোপকথনের কিছু আভাস আছে। নীচে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

একবার এই হলঘরে কতকগুলি অভিনেত্রী আসে—সে-সময় স্বামীজী (আমেরিকায় যাবার অনেক আগে) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাদের বলেছিলাম—তোরা একবার সরলপ্রাণে তাঁকে (পরমহংস রামকৃষ্ণকে) ডাক্—তাঁর আশ্রয় নে—দেখ্‌বি আর তোদের ভয় নেই। স্বামীজী আমাকে ও-সব গোঁড়া, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তি, ইত্যাদি, ব'লে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। আমি তখন উত্তেজিতভাবে ঠাকুরের নামের গুণ ও ঠাকুর যে পতিতপাবন, তা বলতে লাগলাম। ভগবানের নাম যে একবার নেয়, দুনিয়াতে তার আর কোনও ভয় নেই। এইসব যখন বলচি, তখন স্বামীজী উঠে আমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে বল্লেন, "জি সি—dangerous doctrine preach করচো। আমি জানি নামের গুণ, আমি জানি তিনি পতিতপাবন, তিনি দুর্ব্বল পতিত তাপিতদের জন্য এসেছিলেন—কিন্তু"—স্বামীজী ছলছল চক্ষে বলিলেন, I love purity—পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্র প্রচার কর"—এই বলিয়া গিরীশবাবু বলিলেন, "স্বামীজীর সেই দিব্যমূর্ত্তি আমার চখের সামনে ভাসচে।"

—

বাংলার মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য কি কার্য্যকর?

বাংলার মুসলমানগণ যত প্রকার আব্দার করেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহাদের মতে এই, যে, তাঁহারা সংখ্যায় বাংলার অপর ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫৩·৫৫ জন মুসলমান, অর্থাৎ অন্যান্য লোকের তুলনায় বাংলার মুসলমানগণ শতকরা প্রায় ৮ জন করিয়া অধিক আছেন। একথার সত্যতা আছেও, নাইও। অর্থাৎ কিনা মুসলমানগণ সংখ্যায় শতকরা ৮জন করিয়া অধিক থাকিলেও এ সংখ্যাধিক্যের কোন কার্য্যকরতা নাই। মুসলমানগণ যে-সকল আবদার করেন, তাহা প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যাপার সংক্রান্ত। সুতরাং অগ্রে তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক মূল্য নির্দ্ধারণ না করিয়া কোন কথা বলা উচিত নহে। কারণ শুধু নিছক সংখ্যাধিক্য দিয়া কিছুই হয় না। অর্থ-উপার্জ্জন, কার্য্যনির্ব্বাহ অথবা যুদ্ধবিগ্রহ, কিছুই উপযুক্তরূপ জনবল না থাকিলে সুসম্পন্ন হয় না। যথা, একটি সমাজে যদি অপর একটি সমাজ অপেক্ষা দ্বিগুণ লোক থাকে; কিন্তু যদি এই দ্বিগুণ লোকসংখ্যার শতকরা ৯০ জন অন্ধ, পঙ্গু, শিশু ও স্ত্রীলোক হয়, তাহা

হইলে এই প্রকার সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে প্রথম সমাজ দ্বিতীয় সমাজের উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না। কারণ এদেশে **রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিষয়ে শুধু পূর্ণবয়স্ক পুরুষেরই মূল্য আছে**; শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণেরও মূল্য আছে, তবে তাহাও শুধু স্বাধীনভাবাপন্ন উচ্চ-শিক্ষিতাদিগের।

বাংলার মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শিশু, স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্কদিগের অনুপাত এত অধিক, যে, বস্তুত **বাংলায় শুধু পূর্ণবয়স্ক পুরুষদিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের সংখ্যার তারতম্য প্রায় নাই বলিলেই চলে।**

ইহার কারণ কি ?

কারণ এই যে মুসলমানগণের ভিতর অল্পবয়সে মৃত্যুর হার হিন্দুদিগের অপেক্ষা অধিক। যথা, যদি যে কোন ১০,০০০ মুসলমান ও ১০,০০০ হিন্দু লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, মুসলমানদিগের মধ্যে অপরিণত-বয়স্ক স্ত্রীলোকের সংখ্যা হিন্দুদিগের অনুপাতে অনেক অধিক। নীচের তালিকা হইতে একথার সত্যতা অনায়াসে প্রমাণ হইবে। তালিকাটি বাংলার সেন্‌সাস্ রিপোর্টের ১৯২১ খৃঃ অব্দের ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্-খণ্ডের সাহায্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যা প্রতি

বয়স	হিন্দু		মুসলমান		তুলনায় মুসলমান অধিক + মুসলমান কম—	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
০ হইতে ৫	১৩৯৫	১৪১৯	১৭০০	১৬৬৮	+৩০৫	+২৪৯
৫ ,, ১০	১১৫১	১১৭৯	১৪১৮	১৪০০	+২৬৭	+২২১
১০ ,, ১৫	১০৬৩	১০৭৭	১২৪১	১২৩০	+১৭৮	+১৫৩
১৫ ,, ২০	৯৯৬	৯৯৫	১০৬৪	১০৬৪	+ ৬৮	+ ৬৯
২০ ,, ২৫	৯৫০	৯৩১	৯৩৭	৯৪৪	— ১৩	+ ১৩
২৫ ,, ৩০	৮৯৫	৮৬৯	৮০৪	৮১৩	— ৯১	— ৫৬
৩০ ,, ৩৫	৮১৫	৭৮৯	৬৮৫	৬৯৫	১৩০	— ৯৪
৩৫ ,, ৪০	৭২৩	৬৯৮	৫৭২	৫৮৩	—১৫১	—১১৫
৪০ ,, ৪৫	৬১৫	৬০০	৪৭১	৪৮২	—১৪৪	—১১৮
৪৫ ,, ৫০	৪৭০	৪৬৭	৩৭২	৩৭৭	— ৯৮	— ৯০
৫০ ,, ৫৫	৩৩৩	৩৪১	২৭৯	২৭৯	— ৫৪	— ৬২
৫৫ ,, ৬০	২৩৫	২৪৬	১৯২	১৯৩	— ৪৩	— ৫৩
৬০ ,, ৬৫	১৬০	১৭৩	১২৪	১২৬	— ৩৬	— ৪৭
৬৫ ,, ৭০	১০৬	১১৪	৭৩	৭৫	— ৩৩	— ৩৯
৭০ ,, ৭৫	৫৮	৬৩	৩৯	৪১	— ১৯	— ২২
৭৫ ,, ৮০	২৫	২৮	২০	২২	— ৫	— ৬
৮০ ,, ৮৫	৯	১০	৭	৭	— ২	— ৩
৮৫ ও তদূর্দ্ধ	১	১	১	১	সমান	সমান

উপরের তালিকা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে মুসলমান-দিগের সংখ্যাধিক্য শুধু ২০ বৎসর অপেক্ষা অল্পবয়স্কদিগের উপরেই নির্ভর করে। এই **নাবালক-প্রাচুর্য্য** মুসলমান সমাজে অত্যধিক অকালমৃত্যুর ফল।

এখন দেখা যাউক, যে, শিশু, নাবালক ও স্ত্রীলোক-দিগকে বাদ দিয়া শুধু পুরুষ সাবালকের সংখ্যা কোন্ সমাজে কত আছে।

বাংলা দেশে পুরুষ সাবালকের সংখ্যা ১,২৫,৭৩,৫৬৫। ইহার মধ্যে ৬২,৯৫,৭৪৩ জন মুসলমান ও ৬২,৭৭,৮২২ জন অমুসলমান। অর্থাৎ মোটামুটি উভয় সমাজেই ৬৩,০০,০০০ করিয়া সাবালক আছে। কিন্তু যদি মুসলমানগণ বলেন, যে, ঠিক করিয়া গুনিলে ১৭৯২১ মুসলমান অধিক হয়, তাহা হইলে বলা দরকার, যে, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্ণবয়স্কা উচ্চশিক্ষিতা

স্ত্রীলোকগণের মূল্য পুরুষের সমান। বাংলায় ২৬৮০৯ জন **ইংরেজীশিক্ষিতা** স্ত্রীলোক আছেন। ইহাদিগকে অন্তত পুরুষের সমান বলিয়া ধরা উচিত। এই ২৬,৮০৯ জনের ভিতর মাত্র ১৭৫৯ জন মুসলমান ও ২৫০৬০ জন অমুসলমান। সুতরাং এখানে অমুসলমানগণ সংখ্যায় মুসলমান অপেক্ষা ২৩|২৪ হাজার অধিক এবং ইহার বিরুদ্ধে ১৭ হাজার সাবালক পুরুষ অধিক থাকাতে মুসলমানগণ অধিক বলীয়ান হইতেছেন না।

কোন কোন লোকের মতে শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষায় যে মুসলমানগণ অতিশয় নীচে পড়িয়া আছেন, সে কথা প্রবাসীতে বহুবার বলা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, যে, সকল লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের শীর্ষদেশ অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মুসলমান কয় জন। স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজার, কর্ম্মচারী প্রভৃতি লোক বিভিন্ন ব্যবসাতে কোন ধর্ম্মের কয় জন আছেন, দেখা যাউক।

স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার ও কর্ম্মচারী প্রভৃতি

ব্যবসা	মোট লোকসংখ্যা		মুসলমান	অমুসলমানের শতকরা অনুপাত
জমিজমার কাজ	২৮৬৩৯৮		৩৯০২৫	৮৫
খনির কাজ	২০০০		৬	৯৯
ফ্যাক্টরী ইত্যাদি	৮৫০		১০৩	৮৮
বহন ব্যবসা (জাহাজ, গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি)	১৬০০০	,,	১৬১	৯৯
সরকারী, পুলিশ (গেজেটেড কর্ম্মচারী) ইত্যাদি	১৬০০	,,	৩২	৯৮
সরকারী, বিচার, শুল্ক, কর আদায় ইত্যাদি (গেজেটেড কর্ম্মচারী)	২৮০০	,,	৭৬	৯৭'৫
উকিল, ডাক্তার অধ্যাপক ইত্যাদি	৫০,০০০	,	৪,০০০ (আন্দাজ)	৯২
জেলের অধিবাসী	১২,৩৪৯	,,	৭,৫৫৫	৩৭

উপরের তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে, উক্ত সকল কার্য্যক্ষেত্রে মুসলমানগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমুসলমানের চাকুরী করিয়া জীবন যাপন করেন। সুতরাং সরকারী চাকুরীর অধিকাংশ আবদার করিয়া পাইলেও যদি তাঁহাদিগের আন্দোলনে অসন্তুষ্ট হইয়া অমুসলমানগণ তাঁহাদিগকে নিজেদের কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে মুসলমানদিগের দুর্দ্দশা হইবে। অন্ততঃ সেই কারণে মুসলমান "নেতা"গণের ভাবিয়া-চিন্তিয়া ভেদনীতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মুসলমানগণ কিজন্য অর্থনৈতিক জগতে নীচে পড়িয়া আছেন, তাহার কারণ দেখাইতে হইলে দুই চারিটি কথায় হয় না। তবে একটি কারণ এই, যে, বাংলার কোন কোন শ্রেণীর মুসলমানদিগকে বাদ দিলে অনেক মুসলমানকে অগঠিত-চরিত্রের লোক বলা চলে। ইহার একটি প্রমাণ উপরের তালিকায় জেলের অধিবাসীর সংখ্যার মধ্যে পাওয়া যায়। জেলের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৬৩ জন মুসলমান। ইহা দ্বারা বোধ হয়, যে, মুসলমানদিগের অনেকের মধ্যে আইনভঙ্গ করিবার তাড়না প্রবলতর। যে-সকল মানসিক প্রবৃত্তির জন্য মানুষ আইনভঙ্গ করিয়া থাকে, সেগুলি সচরাচর মানুষের অর্থনৈতিক চেষ্টায় কৃতকার্য্যতালাভের অন্তরায় হয়। সুতরাং মুসলমানের অবনতির কারণ কিয়ৎপরিমাণে চরিত্রগত, একথা বলিলে সম্ভবত ভুল হয় না। অ

—

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মুন্সেফদের অভিযোগ

সরকারী চাকরী করিলেই মানুষ দেশসেবক হইতে পারে না, এই ধারণা ভ্রান্ত। অনেক সরকারী কর্ম্মচারী দেশের খুব হিত করিয়া থাকেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা সাংবাদিকদের খুব উচিত। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট করা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ বয়সে করা হয় যখন আর তাঁহাদের ভাল করিয়া কাজ করিবার মত শক্তি ও স্বাস্থ্য থাকে না, কিম্বা চাকরীতে স্থায়ী হইতে না হইতেই পেন্স্যন লইতে হয়। অভিজ্ঞ ও যোগ্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে বয়স শক্তি ও স্বাস্থ্য থাকিতে ম্যাজিষ্ট্রেট করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে তাঁহারা দেশের অনেক উপকার করিয়া নিজেদের গুণের পরিচয় দিতে পারেন।

মুন্সেফদের কাজের পরিমাণ বরাবরই বেশী আছে। তাঁহাদের যখন মধ্যে যাঁহারা সবজজ হন, তখন তাঁহাদের বয়স যতটা হয়, সেই হিসাবে কাজের পরিমাণটা কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে-সব মোকদ্দমার বিচার করা কঠিন, তাহা তাঁহাদিগকেই অবশ্য দেওয়া উচিত, কিন্তু অধিকসংখ্যক মোকদ্দমার বিচার তাঁহারা করিবেন, এরূপ ব্যবস্থা ঠিক নয়। সব-জজদের সংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের কাজ অত্যধিক, এবং তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে কিছুতেই পুরাতন মামলার শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবে না। সিবিল্ জাষ্টিস্ কমিটি একথা পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও, অতিরিক্ত সব-জজদের নিয়োগ প্রত্যাহার করিয়া এবং সিবিলিয়ান্‌দের সুবিধার জন্য তাঁহাদের কতক লোককে আসিষ্টাণ্ট সেশ্যন্-জজের কাজ দিয়া, গবর্ন্মেণ্ট সব-জজদের কাজ এত বাড়াইয়া দিয়াছেন, যে, এখন তাহাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে।

কলিকাতা ৯১, আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বনের পাখী

শিল্পী মিঃ এ, টমাস

[বাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী
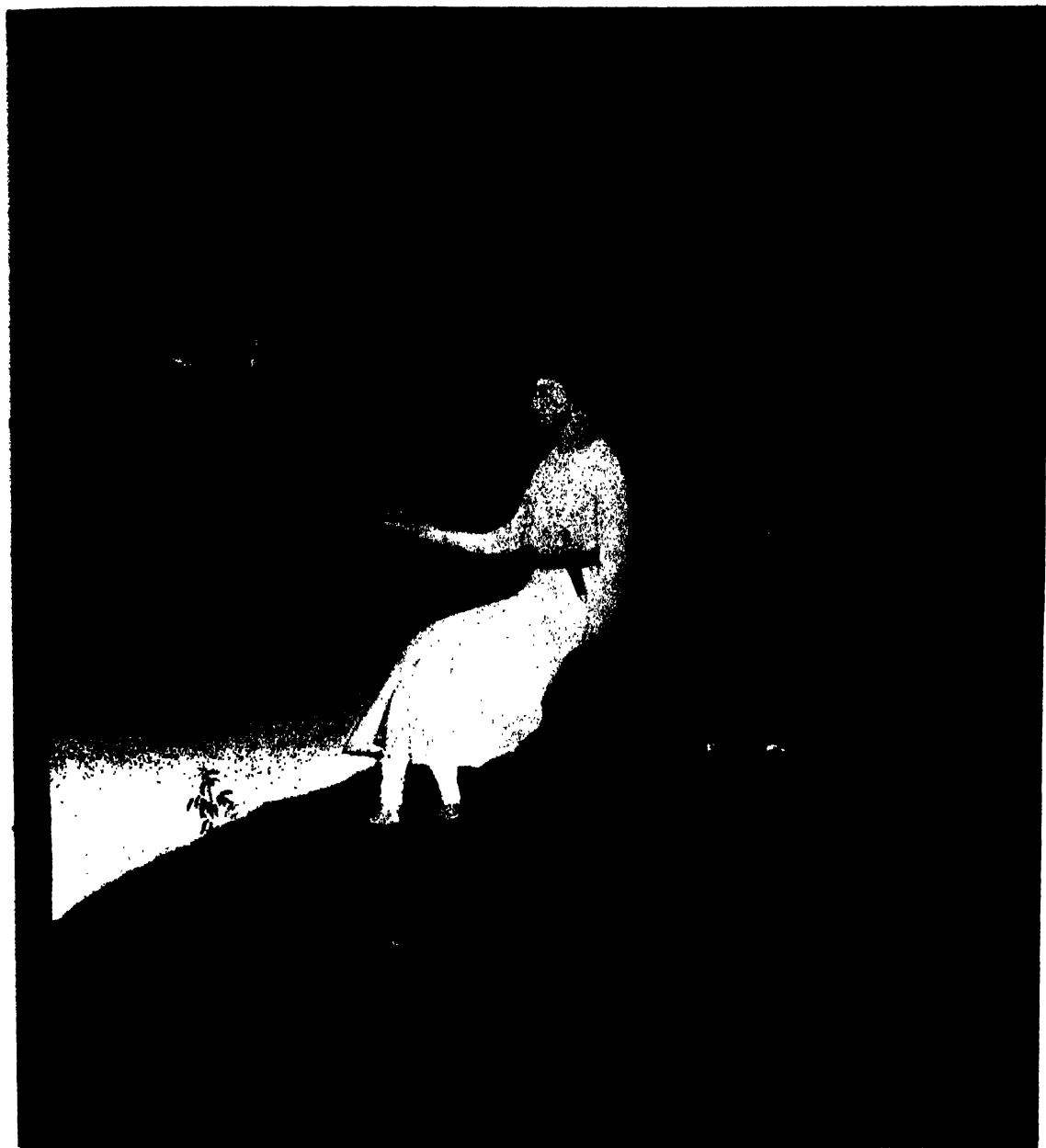
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩৩

৫ম সংখ্যা

বৈকালী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

অনেক কথা যাও যে ব'লে
কোনো কথা না বলি'।
তোমার ভাষা বোঝার আশা
দিয়েছি জলাঞ্জলি।
যে আছে মম গভীর প্রাণে
ভেদিবে তারে হাসির বাণে,
চকিতে চাহ মুখের পানে
তুমি যে কুতূহলী।
তোমারে তাই এড়াতে চাই
ফিরিয়া যাই চলি'।

আমার চোখে যে-চাওয়াখানি
ধোওয়া সে আঁখি-লোরে।
তোমারে আমি দেখিতে পাই
তুমি না পাও মোরে।
তোমার মনে কুয়াশা আছে,
আপনি ঢাকা আপন কাছে,
নিজের অগোচরেই পাছে
আমারে যাও ছলি',
তোমারে তাই এড়াতে চাই
ফিরিয়া যাই চলি'॥

(২)

লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।
চৈত্ররজনী আজ ব'সে আছি একা,
মনে হয় কেন, পুন বুঝি দিল দেখা,
বনে বনে তব লেখনী-লীলার রেখা;
নব কিশলয়ে কোন্ ভুলে এল ভুলি
তোমার আখরগুলি॥

মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী
দখিন পবনে মনে দিলো আজি আনি'
বিরহ-ব্যথার প্রথম পত্রখানি;
মাধবী-শাখায় উঠিতেছে দুলি' দুলি'
তোমার আখরগুলি ॥

(৩)

দে পড়ে দে আমায় তোরা
কী কথা আজ লিখেছে সে।
দূরের বাণীর পরশ-মাণিক
লাগুক আমার প্রাণে এসে।
শস্যক্ষেতের গন্ধখানি
একলা ঘরে দিক্ সে আনি,
ক্লান্ত-গমন পান্থ-হাওয়া
খেলুক্ আমার মুক্তকেশে ॥

নীল আকাশের সুরটি নিয়ে
বাজাক্ আমার বিজন মনে;
ধূসর পথের উদাস বরণ
মেলুক্ আমার বাতায়নে।
সূর্য্য-ডোবার রাঙা বেলায়
ছড়াবো প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন মনে চোখের কোণে
অশ্রু-আভাস উঠ্‌বে ভেসে ॥

(৪)

কাঁদার সময় অল্প ওরে,
ভোলার সময় বড়ো।
যাবার দিনের শুক্‌নো বকুল
মিথ্যে করিস্ জড়ো।
আগমনীর নাচের তালে
নতুন মুকুল নাম্‌ল ডালে,
নিঠুর হাওয়ায় পুরানো ফুল
ঐ যে পড়ো-পড়ো।

ছিন্ন-বাঁধন পান্থরা যায়
ছায়ার পানে চ'লে।
কান্না তাদের রইল প'ড়ে
শীর্ণ তৃণের কোলে।
জীর্ণ পাতা উড়িয়ে ফেলা—
কর খেলা সেই শিশুর খেলা,
নতুন গানে কাঁচা সুরের
প্রাণের বেদী গড়ো ॥

(৫)

কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে-আলোতে
বাঁশরী উঠেচে বাজি'।
ভালো বেসেছিনু এই ধরণীরে,
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমারি সাজি।

নয়নের জল গভীর গহনে
আছে হৃদয়ের স্তরে।
বেদনার রসে গোপনে গোপনে
সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার,
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
সুর তবু লেগে ছিল বার বার
মনে পড়ে তাই আজি ॥

(৬)

সেই ভালো সেই ভালো
আমায় না হয় না জানো।
দূর গিয়ে নয় দুঃখ দেবে,
কাছে কেন লাজে লাজানো?
মোর বসন্তে লেগেছে ত সুর,
বেণুবনছায়া হয়েছে মধুর,
থাক্ না এমনি গন্ধে বিধুর
মিলন-কুঞ্জ সাজানো ॥

গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল
নয়নে ভাবের খেলা।
উতল আঁচল এলোথেলো চুল
দেখেচি ঝড়ের বেলা।
তোমাতে আমাতে হয়নি যে কথা
মর্ম্মে আমার আছে সে বারতা,
না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা
আমার বাঁশিটি বাজানো ॥

(৭)

এবার এল সময় রে তোর
শুকনো পাতা-ঝরা।
যায় বেলা যায় রৌদ্র হ'ল খরা।
অলস ভ্রমর ক্লান্ত-পাখা,
মলিন ফুলের দলে
অকারণে দোল দিয়ে যায়
কোন্ খেয়ালের ছলে ;
স্তব্ধ বিজন ছায়াবীথি
বনের ব্যথা ভরা।
যায় বেলা যায়, রৌদ্র হ'ল খরা ॥

মনের মাঝে গান থেমেছে
সুর নাহি আর লাগে।
শ্রান্ত বাঁশি আর তো নাহি জাগে।
যে গেঁথেছে মালাখানি
সে গিয়েছে ভুলে।
কোন্ কালে সে পেরিয়ে গেল
সুদূর নদীকূলে।
রইল রে তোর অসীম আকাশ,
অবাধ-প্রসার ধরা।
যায় বেলা যায়, রৌদ্র হ'ল খরা ॥

(৮)

কেন রে এতই যাবার ত্বরা ?
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর
গানের ভরা ?
এখনি মাধবী ফুরালো কি সবি ?
বন-ছায়া গায় শেষ ভৈরবী ?
নিল কি বিদায় শিথিল করবী
বৃন্ত-ঝরা ?

এখনি তোমার পীত উত্তরী
দিবে কি ফেলে,
তপ্তদিনের শুষ্ক তৃণের
আসন মেলে ?
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল
কপোতকূজনে হ'ল যে আকুল,
চরণ-পূজনে ঝরাইছে ফুল
বসুন্ধরা ॥

(৯)

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে,
স্বপন দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদু বায় ॥
বনের ছায়া মনের সাথী,
বাসনা নাহি কিছু।
পথের ধারে আসন পাতি,
না চাহি ফিরে পিছু।
বেণুর পাতা মিশায় গাথা
নীরব ভাবনায়,
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদু বায় ॥

মেঘের খেলা গগনতটে
অলস-লিপি-লিখা।
সুদূর কোন্ স্মরণ পটে
জাগিল মরীচিকা।
চৈত্রদিনে তপ্তবেলা
তৃণ-আঁচল পেতে,
শূন্যতলে গন্ধ ভেলা
ভাসায় বাতাসেতে।
কপোত ডাকে মধুক-শাখে
বিজন বেদনায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদু বায় ॥

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

(২৮)

S. S. Hera. North Sea.
22. 5. 1901.

বন্ধু,

আমার সেই অসুখের পর এই পাঁচমাসে রবিবার পর্য্যন্ত ছুটি পাই নাই। তাহার প্রতিফল পাইতেছি। আমার লেক্‌চারের পর দু'বার মাথায় রক্ত উঠিয়া গুরুতর অসুখ হইয়াছিল। সমস্ত কাজকর্ম্ম কতক দিনের জন্য না ত্যাগ করিলে ডাক্তারেরা অমঙ্গল আশঙ্কা করেন। সেইজন্য জাহাজে কতকদিন ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অনেক অনুসন্ধানের পর Liverpool Mathematical Societyর সম্পাদকের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহার নিকট তোমার দাদার লেখা দিয়াছি। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িবেন এবং অন্যান্য specialistদের সহিত এসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আমাকে পরে পত্র লিখিবেন। তোমার দাদাকে আমার প্রণাম দিও।

রয়্যাল সোসাইটীতে আমার বক্তৃতা ৬ই জুন হইবে। তখন লণ্ডনে থাকিব মনে করিতেছি। এপর্য্যন্ত অনেকের নিকট হইতে উৎসাহজনক কথা শুনিতেছি। তবে তাঁহারা বলিতেছেন, "It is too sudden—we do not now know whether we are starting mom heads!" Daily কাগজেও একথা লইয়া একটু আমোদ চলিতেছে। Globe লিখিয়াছে, যে, ধাতুর উপর বিবিধ অত্যাচার করিবার সময় "The Professor's eyes were full of tears. This does him credit; but it will be long before he induces the British Householder to pet the fire-iron when it falls on the fender because the fall hurts the fire iron."

তুমি ত আমাকে বিশেষ করিয়া জান, কবে আমি জন্ বুলের বিরুদ্ধে এরূপ libel করিয়াছি? যে জন্ বুল S. A. এবং Chinaতে ইত্যাদি, সেই জন্ বুল যে লোহা আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে বলিয়া দুঃখ করিবে, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ করিতে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ।

সে যাহা হউক, আরও অনেক আশ্চর্য্য বিষয় discover করিবার আছে। তারপর জার্ম্মেনীতে যাওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সেখান হইতে শুনিয়াছি, যে, "We are more ready to accept your ideas than conservative England।" তা ছাড়া ফ্রান্স্ ও আমেরিকায় তোমাদের যজ্ঞের অশ্ব প্রেরিত হইবে কি?

বৈশাখের ভারতীতে তোমার গল্পটি অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি কি এক ভয়ানক পরিণাম প্রস্তুত করিতেছ জানি না।

ভাল কথা; তোমার লেখা অনুবাদ করিয়া কোন ম্যাগাজিনে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, গল্প অতি সুন্দর; কিন্তু original ব্যতীত অনুবাদ আমরা বাহির করি না। তোমার নাম জাল করিতে যদি অধিকার দাও, তাহা হইলে অনুবাদের কথা না বলিয়া একবার তোমার নাম দিয়া পাঠাইতে পারি। কি বল?

তোমার বই পুস্তকাকারে বাহির করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এদেশের অনেক পাব্লিশার চোর। বাণিজ্য-বিষয়ে এদেশের তৎপরতা দেখিয়া চক্ষুস্থির হইয়াছে। সেদিন যে আমার জন্য patent লইবার জন্য একজন বন্ধু আসিয়াছিলেন, তিনি সেদিন রাগ করিয়া গিয়াছিলেন। "এত সময় নষ্ট করিয়া আপনাকে serve

করিবার জন্য আসিয়াছিলাম, আপনি কিছু করিলেন না, "I do not want to have anything more to do with it." লেক্‌চ্যারের পর আবার লিখিয়াছেন, "I want to serve again." বন্ধু, আমি যেন এই commercial spirit হইতে উদ্ধার পাইতে পারি। একবার ইহার মধ্যে পড়িলে আর উদ্ধার নাই।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমার Experiment এত অদ্ভুত, যে, স্বচক্ষে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিত না। Experiment দেখিয়া যদিও অবিশ্বাস দূর হইয়াছে, তথাপি আমার বক্তৃতার পর একজন বিখ্যাত Electrician, Mr. Swinton, তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিতেছিলেন, "This is something beyond science, this is *Esoteric Buddhism.*" আমি যে quotation বলিয়াছিলাম, তাহাতেও কাহার কাহার এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। এখন বলত কি করি?

আমি British Association এ যখন বলিয়াছিলাম, তখন লোকে বিশ্বাস কি অবিশ্বাস করিবে, স্থির করিতে পারে নাই। এখন যখন সম্পূর্ণ নূতন method দ্বারা সেই বিষয় নূতন প্রকারে প্রতিপালন করিলাম, তখন লোকে মনে করিতেছে "ভৌতিক ব্যাপার।" এবিষয় প্রচার করিতে অনেক সময় লাগিবে; তবে Sir M. Foster যখন Royal Societyতে communicate করিয়াছেন, তখন সেইদিন আরও সমালোচনা হইবে। তারপর Physiological Society, পরে Medical Association, ইত্যাদি অনেক স্থানে বলিতে হইবে। ভূতের শ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া আমার পঞ্চভূত যে বিভিন্ন ভূতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

যদি আমার এদেশে অধিক দিন থাকা আবশ্যক মনে কর তবে তোমাকে আসিতে হইবে। লোকেন যে কবি হইয়াছে। বেশ লিখিয়াছে। উহাকে এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ না করিলে কখন কি করিয়া ফেলে বলা যায় না।

বন্ধুজায়াকে আমাদের দুজনের সাদর অভিবাদন জানাইবে। মীরাকে সকল প্রকার গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা করাইতে বলিবে। তোমার বন্ধুজায়ার বিশেষ পছন্দ হইয়াছে।

তোমার
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

(২৯)

লণ্ডন
১৪. ৬. ১৯০১.

বন্ধু,

তোমার কন্যার শুভবিবাহে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের বহু আশীর্ব্বাদ জানাইবে।

একখানা পুস্তক পাঠাই, তোমার কন্যাকে দিবে। সময় হইলে তুমিও পড়িও।

কি শক্তিবলে Joan of Arc এরূপ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিয়াছিলেন?

আগামী বারে দীর্ঘ পত্র লিখিব। তোমার পত্রের আশায় রহিলাম।

তোমার
জগদীশ

(৩০)

লণ্ডন
৬ই জুলাই ১৯০১

বন্ধু,

তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে পারি না। তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাতরাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত, কখনও একটু আলোক পাই তাহারই সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই—সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে? তাঁহার বরেই আমি বল পাই আমার আর কে আছে? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়, তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত, তোমাদের বলে আমি বলীয়ান্। তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত। আমি আর নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিব না; কি করিতে

হইবে বলিও। তোমরা যে আমাকে ঘিরিয়া আছ, আমি যে একাকী নই, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। তবে আমি যে কার্য্যভারে ও নিরাশায় অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ি, একথা মনে রাখিও, মাঝে মাঝে তোমাদের উৎসাহবাক্যে আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিও।

আর-একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার সুখে সুখী, আমার কষ্টে দুঃখী। আমি আমার সম্মানের কার্য্য ভিন্ন অন্য কথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলেও কি উচিত বুঝিতে পারি না। আমার কি শ্রেয়ঃ তুমিই তাহা আমার হইয়া স্থির করিও। তুমি আমার সমস্ত বিষয় জানিয়া যাহা ভাল তাহা স্থির করিও।

তবে এখন সব কথা বলিতেছি। আমি এদেশে একজনকে জানিয়া অতিশয় সুখী; তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য জীবন-কাহিনী তোমাকে দেখা হইলে বলিব। তাঁহার ন্যায় বহু বিজ্ঞানে জ্ঞানী বোধ হয় আর কেহ নাই। তিনি গত ৫০ বৎসর ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে যে-সব যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস এবং তাহার নেতাদের জীবন-চরিত বিশেষরূপে জানেন। তিনি আমার এই নূতন বিষয় জানিয়া বড়ই উৎসাহিত হইয়াছেন। তবে বলিলেন,

"You will very probably not live to see it universally accepted, it is too daring for this theological country. If you could persist the younger generations would have accepted you. You ought to go to Germany. But can you stand by yourself for years? Those who succeeded had brilliant disciples, they devoted themselves to the master. Have you any? You think scientific men are liberal—they are the most conservative of peoples. They are contented with what they have now :—Doubt is the Devil. Your theory upsets the old established physiological dogmas. Do you think they will easily give up, unless you make them? Have you made up your mind to fight single-handed for years? Then and then only they will come round. But if you leave it now, they will try not to think of it, and the thing will be forgotten, till some one else takes it up and makes a name by it."

আমার disciple ত নাই,তবে persistence আছে। এইজন্য মনে করিয়াছিলাম, ৫ বৎসর এখানে থাকিয়া সমস্ত objection meet করিয়া একরূপ মত স্থাপন করিতে পারিব।

আমি এ ছাড়াও অন্য তিনটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ে Paper লিখিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইবে, Royal Society তাহা publish করিবেন।

কিন্তু এই সম্পূর্ণ অভাবনীয়, সম্পূর্ণ নূতন বিষয় যদি আমাদের দেশ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আমি জীবন সার্থক মনে করিতাম।

আমি দুই বৎসরের Extentionএর জন্য India Officeএ আবেদন করিয়াছিলাম। Under-Secretary of State বলিলেন, পাইতে কোন কষ্ট হইবে না। তারপর জানি না হঠাৎ কি হইয়াছে—দেশে কিম্বা India Officeএ—হয়ত তোমাদের আনন্দের কোলাহল অপ্রিয় হইয়া থাকিবে—হঠাৎ খবর পাইলাম, যে, যদিও আমার scientific work is very important, yet the Secretary of State regrets, ইত্যাদি। আমাকে সেপ্টেম্বরের শেষভাগে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ইতিমধ্যে British Association ইত্যাদি স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। আস্তে আস্তে আমার মত যে গৃহীত হইল তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল, কিন্তু এই সংবাদে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধু, তুমি কি আমার মনের কষ্ট বুঝিতে পার?

আমি কি করিব জানি না। ফার্লোর জন্য আবেদন করিব, কিন্তু যদি আমার এদেশে থাকা তাহাদের অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যে ছুটী পাইব মনে হয় না।

তুমি তপস্যার কথা লিখিয়াছ ; বলত আমি কি করিয়া মনস্থির করিতে পারি।

তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করিবার ভার লইতে চাও। দেখ, আমার কার্য্য করিবার ইচ্ছা জান, তবে কতকাল স্বাস্থ্য থাকিবে জানি·না, কতকাল কার্য্য করিতে পারিব, তাহাও জানি না।' তোমরা যদি কোনদিন নিরাশ হও।

যদি তুমি বল তাহা হইলে একবার দেশে থাকিয়া সমস্ত ছাড়িয়া এদেশে থাকিব।

আমাকে শীঘ্র পত্র লিখিও।

তোমার
জগদীশ

(৩১)

লণ্ডন
১১ জুলাই ১৯০১

বন্ধু,

তুমি কি করিয়া জানিলে আমার হৃদয়ে দিবারাত্রি কি সংগ্রাম চলিতেছে? আমি নিশ্চয় জানি, যে, আমার ভিতরে এখন যাহা আসিয়াছে তাহা যদি অল্প সময়ের জন্যও ছাড়িয়া দি, তাহা হইলে তাহা আর ফিরিয়া পাইব না। দীর্ঘ রোগশয্যার সময় আমি বহুযত্নে মন স্থির করিয়াছিলাম, তাহার পর এই ছয় মাস মাত্র একাগ্রভাবে সাধনা করিয়াছি। এতদিনের চেষ্টার ফলে এখন আমার মন প্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া কি এক আলোক আসিয়াছে। দেখ, যদি সমস্ত বৎসরের চেষ্টার ফলে কেহ একটি paper Royal Societyতে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে কৃতার্থ মনে করে। আমি ছয় বৎসরের কায এই ছয় মাসে করিয়াছি—

1. On the continuity (?) of effect of light and Electrical Radiation of matter.

দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের একই প্রভাব প্রমাণিত হইয়াছে।

2. On the Switanity (?) of effect of mechanical and Radiation strabes (?)

3. On a new theory of photographic action.

4. On the Electric Response of Inorganic substance.

5. On the three types of electric conduction.

এই কয়টি বিষয় এই কয় মাসে শেষ করিয়াছি, এবং Royal Societyতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার এক একটি বিষয়ে জীবনব্যাপী নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার কার্য্য রহিয়াছে। যদি কেবল যশঃ সঞ্চয় তোমাদের অভিপ্রেত হয় তবে এই সব নূতন বিষয় দ্বারা সহজেই করিতে পারি। কারণ এইসব বিষয় পদার্থতত্ত্বসম্বন্ধীয়, ইহার সমস্ত মূলমন্ত্র সহজেই সাধনা করিতে পারিব এবং সকলকে বুঝাইতেও পারিব।

কিন্তু জীব ও নির্জ্জীব জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে আমার সমস্ত জীবন দিতে হইবে। কারণ ইহা দুই মহাশাস্ত্রের সন্ধিস্থলে। এদেশে বিভিন্ন শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর মধ্যে কি গুরুতর বিরোধ, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। Physicist এবং Chemist এবং উভয়ের সহিত Physiologist-দের কি অহর্নিশি দ্বন্দ্ব! সাবধান, কেহ যেন নিজ সীমা লঙ্ঘন করে না! আমরা physiologist, আমরা জীবিত বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করি—We do not deal with dead matter. We do not depend on mere physical laws.

আমরা বহুবাদী, এরূপ কিম্বদন্তী আছে। প্রকৃত বহুবাদিকে এখন বুঝিতে পারিতেছি। তুমি হিং টিং ছট লিখিয়া আমাদের দেশবাসীকে গালাগালি দিয়াছ। যদি এদেশের হিং টিং ছট দেখিতে। আমরা কোথায় লাগি! সম্পূর্ণ অর্থহীন ঘোর বাগাড়ম্বর, যে-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কম জানা সে-বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা শব্দাড়ম্বর। চিমটি কাটিলে দেখা যায়, A+ হইয়াছে এবং B− হইয়াছে—বিদ্যুততরঙ্গ

+ −
A B
→
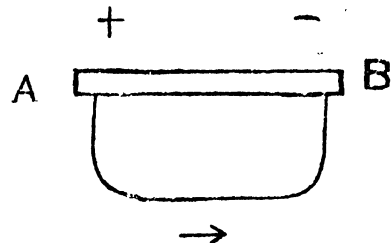
চালিত হয়। Explanation—this is because stimulus produces Anodic and Kathodic difference!

(Anode=greek for +

Kathode=greek for −)

এসব ত কিছুই নয়। কথার ঘটা এতদূর বাড়িয়াছে, যে, একজন physiologist অন্যের অর্থ বুঝিতে পারেন না।

"Wonderful is the power of word. I and Hering have been fighting all the time, by the same word he meant one thing and I another!"

সুতরাং এইসমস্ত জাল ভেদ করিতে হইবে। তার-পর হয় এক theory কিম্বা অন্য theory টিকিয়া যাইবে। Both cannot be true, one must give way to the other.

সুতরাং বুঝিতে পার ইহাতে জীবনসর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। আমি একদিকে একা কিন্তু তোমরা যদি বল তবে আমি প্রস্তুত আছি। আমি সহজ পথ ত্যাগ করিয়া কঠিন বর্ত্ম অবলম্বন করিব। হিন্দুরা কোন দিন ফলের আশায় কায করে নাই। ইহাতেই তাহাদের নিস্ফলতা, ইহাতেই তাহাদের গৌরব।

তবে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবারও বিশেষ কারণ দেখি না। তোমাকে যে-সব কথা আগে লিখিয়াছি তাহা কেবল তোমার মন বহুকাল অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য। সেদিন Sir William Crooks আমাকে বলিলেন, "Prof. Bose, you will learn that many are engaged in this country in research work—they are engaged in work which will lead to *nothing*, but you have got *something* of which there will be no end."

বর্ত্তমান কালের ধাতু (metallurgy) সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত Sir Robert Austen, F. R. S., এদেশের mintএর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। তিনি আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি ৩০ বৎসর ধাতব প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছি; আপনি যে-সমাচার সেদিন অকুতোভয়ে প্রচার করিলেন, ওরূপ একটা ধারণা অজ্ঞাত ও ঝাপসাভাবে আমার মন আক্রমণ করিয়াছিল। আমি ভয়ে ভয়ে একবার Royal Institutionএ এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলাম এবং সেজন্য বহুরূপে তিরস্কৃত হইয়াছি। আপনি যেরূপ সাহসের সহিত এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এবিষয় প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আমার অনেক দ্বিধা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে।

তবে আমাকে নিজের কলের উপর নির্ভর করিয়া নিজ চেষ্টায় প্রমাণিত করিতে হইবে।

আমি নির্জ্জীবের যে-সব স্পন্দন-রেখা ফটোগ্রাফী দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছি তাহার দু'চারিটি নমুনা পাঠাইতেছি, অন্যদিকে জীবিতের স্পন্দন-রেখার সহিত মিলাইয়া দেখিবে।

প্রকৃতিদেবী কি আমাদিগকে কখনও প্রতারণা করিয়া থাকেন? যদি তাহা না হয়, তবে এই দুই এক।

আরও অনেক বলিবার ও করিবার আছে, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। তোমার এই পুস্তকখানা দেখা হইলে ত্রিপুরার মহারাজকে আমার হইয়া পাঠাইয়া দিবে। তাঁহার উৎসাহ-বাক্যে আমি কিরূপ উৎসাহিত।

আমি এতদিন কল ও অন্যান্য জিনিষ স্থির করিবার পর হইতে কায আরম্ভ করিয়াছি। আমার একজন assistantকে এই ছয় মাসে সবে মাত্র কাজ সম্পূর্ণ করিয়া শিখাইয়াছি। এই সময়ে ত্যাগ করিয়া গেলে সমস্তই শেষ হইবে। আর আমার এই পূর্ণ হৃদয়ে এখন বাধা পাইলে আর কোন দিনও ফিরিয়া পাইব না।

তুমি যে-জন্য অনুরোধ করিয়াছ, দিন-রাত্রি কি আমার মনে সেই এককথা সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইতেছে না? তোমরা আমার সমস্ত বোঝা লইয়া আমাকে একাগ্রভাবে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছ; তবে দ্বিধা করি কেন?

একথা যদিও সত্য বটে, যে, politicsএর জন্য Bhownagreeর জন্য ভারতবর্ষ হইতে ৩০০০ পাউণ্ড

প্রেরিত হয়, আর আমাদের পূজনীয় নারোজীকেও ভারতবর্ষীয়েরা স্মরণ করিয়াছেন এবং তাহার জীবন নিরুদ্বেগ করিয়াছেন। আর তাতার Universityর জন্যও এদেশ হইতে ২৫০০৲ হইতে ১২০০৲ মাসিক বেতনে ইংরাজ অধ্যাপক মনোনীত হইবে।

কিন্তু politicsএর জন্য যেরূপ উৎসাহ, বিজ্ঞানের জন্য কি সেইরূপ উৎসাহ আছে? আর আমার জন্মভূমি বাঙ্গলাদেশও অতি দীন।

এজন্য দ্বিধা করিতেছিলাম। আরও মনে করিয়াছিলাম, যে তোমাদের নিকট হইতেই আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই, তোমাদের সাধুবাদও আমার জীবনের প্রধান গৌরব। যদি কোনদিন তাহা হইতে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে আমার মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক যাতনা হইবে।

কিন্তু তোমার লেখা হইতে আমি বুঝিলাম, যে, তোমাদের স্নেহ হইতে আমি কখনও বঞ্চিত হইব না। একথা আমাকে পুনঃ পুনঃ শুনাইও। আমার জীবনপ্রাণ দেশে ধাবিত হইতেছে, আমি অতিকষ্টে নির্ব্বাসন-কষ্ট ভুলিয়া থাকি।

আমি এখানে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৪৫ পাউণ্ড অর্থাৎ বাৎসরিক ৮১০০ টাকা + বৃত্তি ২০০০ × Research এর জন্য ২৫০০ = ১২৬০০ টাকা পাই। আমার assistant এবং কল ইত্যাদির বাবত প্রায় ৪০০০৲ টাকা খরচ হয়, আর বাকীতে আমাদের এখানকার খরচ অতি সাবধানে চালাইতে হয়। কারণ এখানে অনিবার্য্য বৈজ্ঞানিকদের সহিত মেলামেশার জন্য কিছু অধিক খরচ হয়।

আমি যে assistantকে তৈয়ারী করিয়াছি, তাহাকে যদি না রাখিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত কার্য্যই বিফল হইবে। কারণ আর নূতন কাহাকে শিখাইয়া লইতে আমার আর সহ্য হইবে না। যদি শীঘ্রই এদেশে ফিরিয়া আসা উচিত মনে কর, তবে ইহাকে বরাবরের জন্য নিযুক্ত করিতে হয়।

তোমার মিনির বিবাহ হইল। কাবুলীওয়ালা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছে।

তোমার

জগদীশ

(ক্রমশঃ)

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(৯)

গ্রীষ্মের যে তাপদগ্ধ অবসন্ন সন্ধ্যায় ব্যথিত গৃহপরিজনকে পিছনে ফেলিয়া ভারাতুর মূর্চ্ছিতপ্রায় হৃদয়ে হরিকেশব-দম্পতী গৌরীকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হন, তাহার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্ম ঘুরিয়া গিয়াছে, বর্ষার স্নিগ্ধ সজল মেঘ আবার আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; রৌদ্রপীড়িত বর্ণহীন ধূসর আকাশের ও শুষ্ক পৃথিবীর সে জ্বালাময়ী খর দীপ্তি আর নাই; ঘন নীল পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের বিরাট রূপে ও সদ্যস্নাত তরুশীর্ষের শ্যামল শ্রীতে চোখ জুড়াইয়া যায়; মাটির নগ্ন রুক্ষ মূর্ত্তি বৃষ্টিধারার আশীর্ব্বাদে শ্যাম-চিক্কণ হইয়া উঠিয়াছে।

গৃহবিচ্ছেদকাতর শোকাতুরা পিতামাতার হৃদয়ের জ্বালাও এই দীর্ঘ দিনের প্রবাস পর্য্যটন শান্তি ও সান্ত্বনার সুধা সিঞ্চনে অনেকখানি জুড়াইয়া দিয়াছে। মৃত্যু যে অতলস্পর্শ শূন্যতার গহ্বর তাঁহাদের চোখের সামনে খুলিয়া ধরিয়াছিল, বাহিরের পৃথিবী আপনার অজস্র ঐশ্বর্য্য আনিয়া তাহাকে অল্পে অল্পে ভরাট করিয়া তুলিতেছে; বিচ্ছেদ যে কঠিন পীড়নে হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি

টানিয়া ধরিয়াছিল সময়ের বিচিত্র রাগিণীর আলাপে তাহা আপনি শিথিল হইয়া আসিতেছে।

শিশু গৌরী বাহিরের মুক্ত আবহাওয়ায় আর আসন্ন কৈশোরের উদ্দীপনায় অনেকখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে; পৃথিবীর সঙ্গে তাহার এই যে পরিচয় তাহার দেহ-মনকে যতখানি পুষ্টি দান করিয়াছে, ঘরের আবেষ্টন তাহাকে তা বহুদিনেও দিতে পারিত না। সেখানে কৃত্রিম উত্তাপে অস্বাস্থ্যকর অনাবশ্যক মানসিক স্ফীতিটা হয়ত অনেক বেশীই হইত, কিন্তু তাহার তলায় তলায় প্রাণরসের এই সতেজ দীপ্তি কোথাও খুঁজিয়া মিলিত না। মাটির বুকের রস শোষণ করিয়া লতা যেমন বাড়িয়া উঠে, তেমনি স্বচ্ছন্দ অবাধ গতিতে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে নূতন লতারই মত। সঙ্গীহীন প্রবাসে প্রবাসে পিতা-মাতাই তাহার সখ্য ও প্রীতির আধার; পিতাই তাহার শিক্ষাদীক্ষা ও সকল রকম মনের খোরাকের জোগানদার।

বর্ষার প্লাবনে যখন দেশ ভাসিয়া যাইতেছে তখন প্রয়াগতীর্থে যমুনা নদীর তীরে একখানা বহু পুরাতন নবাবী আমলের পাথরের ঝরোকা দেওয়া ছোট বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য হরিকেশব আশ্রয় লইয়াছিলেন। পাথর-বাঁধানো সরু ঝোলানো বারান্দা হইতে তরঙ্গ-আকুল যমুনার উন্মত্ত গতি দেখা যাইত, ঘরের ভিতর হইতেই তাহার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শোনা যাইত। গৌরীর সারাদিন কাটিত সেই বারান্দার ধারে। সেখানে সে কখনও পিতার কাছে পড়াশুনা করিত, কখনও আপন মনে যমুনার তীরভাসানো নিষ্ঠুর লীলা দেখিয়াই তাহার সময় কাটিত। ভোর না হইতে তিনজনে মিলিয়া দীর্ঘ তরু-বীথির তলায় তলায় কোনো দিন গঙ্গাস্নান-যাত্রা কোনো দিন বা যমুনাস্নান-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতেন। পথযাত্রী মুসাফিরের দল এই ফুলের মত মেয়েটির দিকে স্মিতমুখে একবার না তাকাইয়া পারিত না। সাধু সন্ন্যাসী ভিখারী তাহারই কাছে আসিয়া হাত পাতিয়া বলিত, "মা, তোর ভলা হোবে, রাজরাণী হোবে, কুচ্ ভিচ্ছা মিল্ যায়।" সন্ধ্যায়ও পথচলার আর এক পর্ব্ব ছিল। তখন তরঙ্গিণী বাহির হইতেন না। গৌরী তাহার পিতার পিছন পিছন ছুটিয়া ছুটিয়া যমুনার পারে কি গঙ্গার ধারে কিম্বা খস্রুবাগে বেড়াইতে না গিয়া থাকিতে পারিত না। অকস্মাৎ বৃষ্টির আবির্ভাবে কত দিন তাহারা আপাদমস্তক স্নান করিয়া ফেলিত, কতদিন পথের পার্শ্বে অজানা লোকের দালানে কি মন্দিরের রোয়াকে দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িত, তবু তাহাদের এ খেয়ালের শেষ ছিল না।

পথের লোকে যে গৌরীকে দেখিয়া খুসী হয়, সেটা সে বেশ বুঝিত এবং সেজন্য তাহার মনে সগর্ব্ব একটা আনন্দের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। বিদেশী লোকেরা পান্থশালায় ক্ষণিকের আসা-যাওয়ার পথে আর পাঁচটা স্বভাবসৌন্দর্য্যের মতই গৌরীকেও একবার দেখিয়া আবার নিজের সুদূর আবাসে ফিরিয়া যাইত, কাজেই তাহাদের মুখ মনে উদয় হইয়াই সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়াও যাইত। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবির্ভাব হইল এক স্বদেশী মূর্ত্তির। প্রথম কয়েকদিন গৌরী কিছুই লক্ষ্য করে নাই। তারপর একদিন অকস্মাৎ সে অনুভব করিল সকালে সন্ধ্যায় পাথরের বারান্দায় আনমনে যখন সে পায়চারি করে, অথবা কোনো কাজে অকাজে এই দিকে আসা-যাওয়া করে তখন বিশেষ একজন মানুষ প্রায়ই বারকয়েক করিয়া বারান্দার তলা দিয়া ঘুরিয়া যায়। গৌরীর কৌতূহল হইল, সে দুই একদিন ঝুঁকিয়া পড়িয়া মানুষটিকে দেখিল। বুঝিল, গৌরীকে দেখ[illegible] তাহার আগ্রহ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আর কাহাকে[illegible] দেখিলেই সে সরিয়া যায়। মানুষটির এই লুকোচুরির দেখা সে বিস্মিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিত কিন্তু পুরাপুরি বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। মানুষের মানুষকে দেখার মধ্যে ভাল লাগার সঙ্গে একটা যে গোপনতার প্রয়াস থাকিতে পারে তাহা এই মানুষটির ব্যবহারে এই প্রথম সে অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এই গোপন-তার অন্তরালের দেখাশুনা কি নিষিদ্ধ কিছু, না ভালই তাহা সে ঠিক ঠাওর করিতে পারিল না। তাহার কৌতূহলের সঙ্গেই কেমন একটা ভয় হইল; দিনকতক সে বারান্দায় যাওয়া ছাড়িয়া দিল।

যমুনার ওপারের সুদীর্ঘ আম্রবীথির তলায় ধূলিধূসর জনবিরল পথে মাইল দুই চলিয়া সেদিন গৌরী যখন

যমুনার জলে রক্তাভ আকাশের ছায়ার রূপ দেখিতে দেখিতে পিতার সঙ্গে বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন দূরের ভুট্টার ক্ষেতের দিক হইতে ভিজা মাটির গন্ধ আসিয়া বৃষ্টির আগমনী জানাইয়া দিতেছিল। যমুনার পোলের ধারের দুই চারজন এক্কাগাড়ীওয়ালা গাড়ীর লাল ঘেরা-টোপ ফেলিয়া বাড়ী পলাইতে ব্যস্ত। পথে আলো নাই, নদীর বুকজোড়া বিরাট দোতালা সাঁকোটা একটা কালো অজগরের মত অন্ধকার মাখিয়া পড়িয়া আছে। পারের যাত্রীদের কাছে ট্যাক্সের পয়সা আদায় করিবার জন্য সাঁকোর মুখে দুইকোণে দুইটা পাহারাওয়ালা দুইটা লণ্ঠন জ্বালাইয়া বসিয়া আছে। সরীসৃপের চোখের মত এই আলো দুটি পথটাকে আরো ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। লোহার সাঁকোর উপর বোঝা-কাঁধে যাত্রীদের ভারী পায়ের শব্দ ধমনীর মত তালে তালে ধপ্ ধপ্ করিয়া চলিয়াছে। সেই সঙ্গে নারী ও পুরুষের উচ্চকণ্ঠের বিচিত্র আলাপের ধ্বনিটা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই অন্ধকারে এই লৌহসর্পের বিরাট কুক্ষির ভিতর ঢুকিয়া পড়িতে মানুষ সহজে সাহস করিত না।

গৌরী পিতার হাত ধরিয়া পথের উপরের আকাশের স্নিগ্ধ ম্লান আলো ছাড়িয়া পাহারাওয়ালার হাতে দুইটি পয়সা দিয়া-যেই ব্রীজের অন্ধকারময় লোহার ছাদের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, অমনি সে লক্ষ্য করিল বারান্দার নীচের সেই পরিচিত স্বদেশী মুখটি পাহারাওয়ালার লণ্ঠনের সামনে ঝুঁকিয়া পয়সা গুনিতেছে। গৌরী চম্‌কাইয়া উঠিল, বুঝিল মানুষটির চোখ এই অন্ধকারেই তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। তারপর লম্বা আধমাইল পথ সে যে তাহাদেরই পায়ে পায়ে পিছন পিছন আসিল, তাহা গৌরীর বুঝিতে বাকী রহিল না। অন্য দিন হইলে অন্ধকারে সমস্ত পথই সে পিতার সঙ্গে বক্ বক্ করিয়া বকিয়া চলিত; কিন্তু আজ তাহার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিল। ঐ মানুষটি যদি তাহার সব কথা শোনে! শুনিলে যে কি ক্ষতি তাহা সে পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিল না; কিন্তু তবু সহজ ভাবে কথা তাহার আসিল না। সাঁকোর শেষে ওপারেও পাহারাওয়ালা আলো লইয়া বসিয়া আছে, খোলা আকাশের আলোও খানিকটা আসিয়া পড়িয়াছে। এক্কাওয়ালা এবং নৌকার মাঝিরা কোলাহল করিতেছে। গৌরী তাহার ভিতর দেখিল লোকটি তাহার মুখের দিকে কেমন যেন করিয়া তাকাইয়া উল্টা রাস্তায় তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

পথে এমনি দেখা প্রায়ই হইত। গৌরী একবার ভাবিল মাকে বলিবে। কিন্তু মানুষটির দৃষ্টিতে কি যে একটা জিনিষ থাকিত, যাহাতে তাহার বলিতে বাধা আসিত। মনে হইত, মা হয়ত শুনিলে বুঝিতে পারিবেন না, হয়ত তাহার উপর রাগ করিবেন। কিন্তু ইহাতে তাহার যে অপরাধ কিছুই নাই সেটা ভাবিয়া বুঝিবার তাহার ক্ষমতা হইল না। মনে কমন তাহার একটা ভয়-ভয় থাকিয়া গেল। ভাবিল উহাকে এমন পিছন পিছন ফিরিতে বারণ করিয়া দিবে। কিন্তু যদি সে কিছু বলে? তাহার যেখানে খুসী যাইবার যেদিকে খুসী তাকাইবার অধিকার আছে; গৌরী তাহাকে বারণ করিবার কে? তাহার ছোট্ট মনের কাছে এই সমস্যার সমাধান করা বড় কঠিন হইয়া উঠিল। অথচ কে যে তাহাকে সাহায্য করে তার ঠিক নাই। বাবার হাতটা টিপিয়া ধরিয়া চিন্তিত মুখে গম্ভীরভাবেই আজ সে সারি বাঁধা নিমগাছ-তলার পথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। রাত্রিটাও তাহার কেমন অস্বস্তিতে কাটিল।

সকাল বেলা গৌরী বাড়ীর সামনের উঠানে চৌকি-দারের স্ত্রী ও মেয়ের যাঁতায় গমভাঙার পর্ব্ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিল। মা মেয়েতে ভারী যাঁতার দুইদিক্ হইতে পরস্পরের পায়ের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া বিচিত্র রাগিণীর গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে যাঁতার চাকা ঘুরাইয়া চলিয়াছিল। যাঁতার ফুটার ভিতর দিয়া মুঠা মুঠা গম ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া আটার ফোয়ারার মত চাকার তলা দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, দেখিতে গৌরীর বড়ই মজা লাগিতেছিল। গৌরী সেই গোবরলেপা উঠানে উবু হইয়া বসিয়া মন দিয়া গমভাঙা দেখিতেছে, এমন সময় তাহাদের বাড়ীর ঝি সুনরিয়া মেহেদী পাতায় হাত পা রাঙাইয়া কপালে সিকির মাপের অভ্রের টিকুলি লাগাইয়া রঙীন চুনরি সাড়া পরিয়া হাসিতে হাসিতে

আসিয়া হাজির। গৌরীকে দেখিয়াই সে একগাল হাসিয়া বলিল, "আরে গৌরীরাণী, হিঁয়া কি হচ্ছে?"

সুনরিয়ার বয়স অল্প; লম্বা পাতলা চেহারা, রংটি মিশমিশে কালো, কিন্তু তাহারই ভিতর একটা শ্রী আছে। সে ছোট বেলায় মিশনারি মেমদের কাছে মানুষ , কাজেই চালচলনে তাহার একটু ফ্যাসানের গন্ধ পাওয়া যায়। পরে দুই চারজন বাঙালীর বাড়ী কাজ করিয়া বাংলা বলার সখটাও তাহার প্রচুর।

গৌরী সুনরিয়ার কথায় হাসিয়া জবাব দিল, "আটা পিস্‌তে শিখ ছি।"

সুনরিয়া বলিল, "রাণী, দেখে যাও, ইধর একটা বড়া উম্‌দা চিজ আছে।"

চিজটা কি দেখিবার জন্য গৌরী ছুটিয়া গিয়া সুনরিয়ার গায়ের উপর পড়িল। সুনরিয়া একটু তফাতে সরিয়া গিয়া বলিল, "ইখানে দেখাব না; ওই ফাটক 'পর চলো, দেখাব।" গৌরী অগত্যা তাহাই চলিল।

সদর দরজার কাছে গিয়া ফিকা বাসন্তী রঙের শাড়ীর আড়াল হইতে সুনরিয়া একটা মোটা গোলাপী খাম বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিল। গৌরী বলিল, "এটা কি কর্‌ব?"

সুনরিয়া বলিল, "খুলে দেখো না—চিজ আছে।" খামটা খুলিতেই একটা আশমানী রঙের রেশমী রুমাল ও গোলাপী কাগজে বাংলা হস্তাক্ষরে লেখা একটা কবিতা বাহির হইল। সুনরিয়া দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "কেমন 'বাড়িয়া' রুমাল দেখেছ? তুমার ভালো লাগে?"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ, বেশ ভাল ত! তুমি কোথায় পেলে?"

সুনরিয়া বলিল, "আরে, হামি কি পাব, গৌরীরাণী! নিপেন-বাবু তুমার লিয়ে ভেজেছে।" গৌরী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "নিপেন-বাবু কে? আমাকে কেন দিয়েছে?"

সুনরিয়া বলিল, "সে বড়া ডাগ্‌দার সাহেবের ছেলে আছে। তুমাকে খুব ভালোবাসে তাই ভেজ্‌ল।" সুনরিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল। গৌরী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ভালবাসে? সে কি আমার কেউ হয়?"

সুনরিয়া হাসিয়া গৌরীকে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "আরে পাগল! কেউ হোবে কেন? তুমি এত খপসুরৎ আছ; তুমাকে দেখে তার দিল্ খুসী হয়, তাই ভালোবাসে।"

গৌরী যে কিছুই বুঝিল না তাহা নহে। সুন্দর হইলে তাহাকে মানুষের ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু অজানা অচেনা মানুষকে লুকাইয়া জিনিষ পাঠাইয়া দিবার অর্থ কি? গৌরীর মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। সে বলিল, "মাকে দেখাই গিয়ে?"

সুনরিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, মাকে দেখাতে নাই। তুমি এই দোঁহা পড় আর এই রুমাল রাখ। তুমার ভালো লাগে কি না লিখে দাও,আমি বাবুকে চিঠ্‌ঠি দিয়ে দেব।"

গৌরী ভাবিল এর মানে কি? একজনের আমাকে ভাল লাগিয়াছে, সে যদি কিছু দিয়া থাকে, তবে মাকে দেখাইব না কেন? গৌরী তাহার বিগত জীবনের স্বল্প অভিজ্ঞতার সহিত কি একটা মিলাইয়া দেখিয়া স্থির করিল পুরুষের পক্ষে মেয়েদের এইরকম ভালবাসাটা ঠিক যথাযথ জিনিষ নহে, অন্তত তাহার ভিতর গোপন করার একটা প্রয়োজন আছে। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই খারাপ কাজ, মাকে বলিলে মা তাহাকে বকিবেন। অতএব কিছু না বলাই গৌরী স্থির করিল। তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আর একটা সমস্যার বোঝা বাড়িল। সে সুনরিয়াকে রুমাল ও কবিতা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তুমি নিপেন-বাবুকে ফিরিয়ে দিও। আমি ত তাকে কখনও দেখিই নি। তার জিনিষ আমি নেব না।" সুনরিয়া একটু গম্ভীর হইয়া কি ভাবিল। আর বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। চিঠি ইত্যাদি ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "মাকে বোলো না, গৌরীরাণী। মা তা হ'লে আমাকে বক্‌বে। তুমাকে ভি বক্‌বে!" সুনরিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় গৌরী যখন নদীর ধারের বারান্দায় বেড়াইতে-ছিল, তখন আজ আবার তাহার চোখে পড়িল সেই

মানুষটি। গৌরী আজ আর তাহার দিকে কুতূহলী হইয়া তাকাইল না। সে ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য দরজায় ঢুকিতে যাইতেছে; হঠাৎ সুনরিয়া আসিয়া বলিয়া গেল, "ওই যে নিপেন-বাবু।" গৌরী বুঝিল এ তবে সেই একই মানুষ। তাহার ভয় বাড়িয়া চলিল।

সুনরিয়া অকস্মাৎ গৌরীকে প্রণয়তত্ত্ব শিখাইতে লাগিয়া গেল। সে গৌরীকে একলা পাইলেই কোনো না কোনো ছুতা করিয়া নানারকম বক্তৃতা সুরু করিয়া দিত। সাহেব মেম, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সকল জাতি সম্বন্ধেই তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। সেইগুলিকে স্বীয় বুদ্ধি ও রুচির রঙে রাঙাইয়া সে যখন গৌরীকে উপহার দিত, তখন গৌরী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া সব গলাধঃকরণ করিত বটে ; কিন্তু অনেক সময় বুঝিতে পারিত না সত্য কথা শুনিতেছে কি আজগুবি গল্প শুনিতেছে। সে সহজ চোখে মানুষকে যাহা দেখিতেছে, মানুষ যে তাহার চেয়ে অনেক বেশী রহস্যময় বিকৃতমস্তিষ্ক এবং কখনও বা ভয়ঙ্কর এইরকম একটা ধারণাই সুনরিয়ার শিক্ষায় তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এই ধারণার উপর বিশ্বাস সে একটানা জীয়াইয়া রাখিতে পারিত না।

(১০)

কি একটা যোগ ছিল ; তাই তরঙ্গিণী সকন্যা গঙ্গাসঙ্গম স্নানে যাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। ভোর না হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া নানা বিচিত্র রঙের শাড়ীর আঁচল উড়াইয়া হিন্দুস্থানী মান্দ্রাজী ও মারাঠি মেয়েরা যমুনা বাহিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে মাঝি মাল্লা ছাড়া দুই-একটি করিয়া মাত্র পুরুষ। পথেও সাধু সন্ন্যাসী এবং স্নান-যাত্রীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। লোটা ও লম্বা লাঠি লইয়া পুরুষের দল আগে আগে চলিয়াছে, পূজার সরঞ্জাম লইয়া সালঙ্কারা মেয়েরা পিছন পিছন মন্থরগতিতে চলিয়াছে। যাহাদের পর্দা বেশী তাহারা চলিয়াছে ঘেরাটোপ দেওয়া এক্কা গাড়ীতে। গাড়ীতে জনবাহুল্য হওয়ায় ঘেরাটোপের আড়াল হইতে রূপা ও কাঁসার মল ও চুট্‌কিতে ভূষিত অনেক জোড়া পা বাহির হইয়া আছে। পড়িয়া যাইবার ভয়ে সুন্দরীদের হাতও বাহিরের খোঁটার গায়ে দৃঢ়মুষ্টি হইয়া আছে দেখা যাইতেছে। এক্কা গাড়ীর ঝমর ঝমর শব্দে পথ মুখরিত ; তাহার উপর আছে পাণ্ডাদের চীৎকার। প্রয়াগের পাণ্ডা ত আছেই তাহার উপর জুটিয়াছে গয়া কাশী বৃন্দাবনের পাণ্ডা। কেহ চেঁচাইতেছে "গঙ্গাবিষ্ণু ছোটেলাল, গয়াজীকা পাণ্ডা," কেহ বা হাঁকিতেছে "মাধরাম শিউরাম সাড়ে সাত ভাই।" যাত্রী গ্রেপ্তার করিবার জন্য সবাই যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।

সঙ্গম হইতে গঙ্গাজল ও গঙ্গামৃত্তিকা আনিতে হইবে ; তরঙ্গিণী পূজার বাসন-কোশন গুছাইতে ব্যস্ত। গৌরী সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়াছে ; বেড়ানো এবং প্রসাধনটাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, স্নানযাত্রাটা একেবারেই গৌণ। বেলা হইয়া গিয়াছে, তার উপর এত লোকের ভিড় বলিয়া সে বরং জেদই ধরিয়াছে যে, আজ স্নান করিবে না। একপাল লোকের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করিয়া নদীতে নামিতে তাহার লজ্জা করে। মা বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তুই না হয় নৌকোতেই থাকিস্, একটু জল ছিটিয়ে দিলেই হবে।"

ঝি সুনরিয়া ও ভৈরোঁ মহারাজ নামক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা বাড়ীর কাছের যমুনার ঘাটে উপস্থিত হইলেন নৌকা ভাড়া করিতে। ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া কেহ বা ভিজা মাটির উপর লম্বা করিয়া পাতা তক্তার পথ দিয়া চলিতে চলিতে, আরো অনেক যাত্রী মাঝিদের সঙ্গে দর কষাকষি করিতেছিল। নূতন যাত্রীদের কাছে "গঙ্গাজীকে কসম" করিয়াও তিনচারগুণ ভাড়া আদায় করিতে তাহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ দেখা যাইতেছে না।

আর-একটি স্থূলকায়া বাঙালী গৃহিণী গায়ে এক গা সোনার গহনা পরিয়া কপাল ঢাকিয়া চুলে লতাপাতা কাটিয়া তাহার উপর অর্দ্ধ ঘোমটায় মুখখানি ঈষৎ আবৃত করিয়া হাতে তামার ঘটি গামছা ও গরদের শাড়ী লইয়া তরঙ্গিণীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে অল্পবয়স্কা দুটি মেয়ে। তরঙ্গিণী মাঝির সঙ্গে রফা করিয়া যখন এগারো আনায় একটি নৌকা ঠিক করিলেন তখন

পিছন হইতে তিনি বলিলেন, "দিদি, আপনি নূতন মানুষ দেখে ওরা আপনাকে ঠকাচ্ছে। আপনি আমাদের নৌকায় আসুন না! আমাদের ত সঙ্গে বেশী লোক নেই। দু' আনাতে আমি এই নৌকোখান ঠিক করেছি। আপনার যদি আমার সঙ্গে যেতে কিছু বাধ-বাধ ঠেকে, তাহ'লে না হয় আধাআধি বখরা করা যাবে।" তরঙ্গিণীর মাঝি গোলমাল করিয়া উঠিল; কিন্তু তরঙ্গিণী পয়সা বাঁচাইবার লোভে যত না হউক, বিদেশে সঙ্গিনী লাভের আশায় নবাগতার নৌকাতেই উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার দলের ছোট মেয়ে দুটির একটি নিতান্ত বাচ্চা, আর-একটির বছর চৌদ্দ বয়স, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই পদোন্নতির গর্ব্বে ও গৌরবে তাহার মুখখানি বেশ পাকা পাকা, চালচলনেও একটা মুরুব্বিয়ানা আছে।

বেণীমাধবের ঘাটের কাছে জোড়া জোড়া তক্তা পাতিয়া পাণ্ডারা কেহ ফুল কেহ গঙ্গাজলমিশ্রিত দুগ্ধ অথবা দুগ্ধমিশ্রিত গঙ্গাজল বেচিতেছে। তাহাদের মাথার ছাউনির উপর সারি সারি নিশান। কেহ বা একটি গোবৎসকে প্রতি পুণ্যার্থীর কাছে বারবার নূতন করিয়া বিক্রয় করিয়া দান করাইতেছেন। মাঝে মাঝে বালির চরে কি নৌকায় কেহ ঠাকুর লইয়া বসিয়া আছে। যাত্রীরা ঠাকুরদের দুই চারি পয়সার পূজা ছুঁড়িয়া দিয়া এই শ্বেতাভ জল ও ফুল কিনিতেছে গঙ্গাকে নিবেদন করিবার জন্য। পাণ্ডারা তাহাদের সাত পুরুষের নামধাম আদায় করিতেছে উত্তরাধিকারসূত্রে কে কাহার ন্যায্য সম্পত্তি বুঝিয়া লইবার ইচ্ছায়।

তরঙ্গিণী ও তাঁহার সঙ্গিনী ঘাটে নামিলেন, তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইতে হইবে। গৌরী বলিল, "মা, আমি আজ নাম্‌ব না।"

অল্পবয়স্কা বিবাহিতা মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "কেন ভাই! তুমি নাইবে না কেন? তোমার ত আমার মত কোনো গেরো নেই! আমায় উনি হাড় জ্বালিয়ে তোলেন, বলেন যে, যে-মেয়েমানুষ একঘাট পুরুষের সাম্‌নে স্নান কর্‌তে পারে তার লোক-দেখানো ঘোমটা একটা ন্যাকামি। পুরুষ মানুষে এত কথাও জানে, ভাই।"

গৌরী হাবার মত বলিল, "কে ভাই তিনি?"

মেয়েটি হাসিয়া গৌরীর গালে একটা ঠোনা দিয়া বলিল, "আহা, রঙ্গ দেখ না! কে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝ্‌বে, দু'দিন বাদেই বুঝ্‌বে। তখন আর অন্য কিছু বুঝ্‌বার অবসরই পাবে না। সত্যি বল্‌ছি ভাই, পুরুষ মানুষের মত এমন মন আমি সাত জন্মে কারুর দেখিনি। সারাক্ষণ ভাব্‌ছে আমরা বুঝি ওদের ফেলে পালাতেই ব্যস্ত।"

নিজের স্বামী সম্বন্ধে গল্প করিবার আগ্রহ মেয়েটির যতই প্রবল হউক, শ্রোতাটি বিশেষ সুবিধার নয় বলিয়া সে গল্প তেমন জমাইতে পারিতেছিল না। মেয়েটি অগত্যা অন্য পথ ধরিল। সে তাহার ভাইএর রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া গৌরীকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিল। সে বলিল, "তুমি ভাই, ডাক্তার বরেন গাঙ্গুলির ছেলে নৃপেন গাঙ্গুলির নাম শোননি? আহা, আমায় আর লুকোতে হবে না! দাদা ত তোমার নাম কর্‌তে অজ্ঞান। সেই ত আমাকে বল্‌লে মাকে সঙ্গে ক'রে তোমাদের এক নৌকোয় নিয়ে গঙ্গা নাইতে আস্‌তে। আমি কি ছাই অতো কিছু জানি? তাই ভাবি দাদার আমার রোজ রোজ যমুনার ধারে বেড়াবার এত সখ হ'ল কেন? মাগো, পুরুষমানুষের পেটে পেটে এতও থাকে! ওদের চিনে ওঠা দায়।"

পুরুষমানুষ সম্বন্ধে মেয়েটির নূতন নূতন গবেষণায় গৌরী কিছুমাত্র উৎসাহিত না হইয়া বরং আরোই গম্ভীর হইয়া গেল। সে যেখানে যেদিকেই যায়, সেখানেই এই নৃপেন আসিয়া জোটে কোথা হইতে? এ ত বড়ই মুস্কিলে পড়া গেল। সুনরিয়ার শিক্ষায় ও বক্তৃতায় তাহার জাগরণ-উন্মুখ মন অনেকটা দ্রুত গতিতেই জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশ্য শিক্ষয়িত্রীর পন্থা এবং উপদেশগুলি ঠিক কাব্যগন্ধী ও মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক সব সময় হইত না; কিন্তু গৌরী তাহা নিজের মনে ভালমন্দ নানাশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া তাহার একটা অর্থ করিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে-কোনো নূতন মানুষের সঙ্গে চট্‌ করিয়া এবিষয়ে আলাপ করা যে ঠিক নয়, এরকম একটা ধারণা তাহার ছিল। সুতরাং সে চুপ করিয়াই রহিল।

নৃপেনের ভগিনীর বাক্‌পটুতা কিছু বেশী এবং ধৈর্য্য কিঞ্চিৎ কম। কাজেই সে উত্তর না পাইয়া আর এক পা আগাইয়া আসাই বেশী বুদ্ধির কাজ বলিয়া ঠিক করিল। হঠাৎ গৌরীর গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া এক হাতে তাহার চিবুকটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাই, দাদাকে কি তোর মনে ধরে না? কেন সে ত বেশ দেখ্‌তে। বল্‌ না ওকে বিয়ে কর্‌বি? আমাদের কেমন রাঙা বউ হয় তাহ'লে।"

গৌরী এতক্ষণে একটা পথ পাইল। তাহার যে বিবাহ হইয়াছিল এ স্মৃতিটা তাহার মনে বেশ পরিষ্কারই জাগরূক আছে। ভালবাসিলে মানুষ যে মানুষকে বিবাহ করিতে চায়, এরকম একটা সন্দেহ আজ কয়েকদিন হইতেই আপনাআপনি তাহার মনে জাগিতেছিল; কিন্তু সে ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিল না। বাড়ীতে সে অনেকের বিবাহ দেখিয়াছে, কিন্তু সেখানে ভালবাসার কথা ত কোনো দিন শুনে নাই। কনে দেখিতে যায় আসে একদল লোক, আর বিবাহ হয় সম্পূর্ণ আলাদা আর একজনের সঙ্গে; তারপর তাহার সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ী যাইতে মেয়েটি কাঁদিয়া হাট বসায়, এই ত তাহার অভিজ্ঞতা। এখানে ভালবাসা অপেক্ষা রাগটাই বরং বেশী-হওয়ার কথা। তা ছাড়া স্থনরিয়াও এতদিনের মধ্যে একবারও বিবাহের কথা বলে নাই। বলিলে গৌরী সোজা একটা উত্তর দিতে পারিত। আজ পরিষ্কার প্রশ্নটা সাম্‌নে দেখিয়াই সে বলিয়া বসিল, "আমার ত ভাই, অনেক দিন আগেই বিয়ে হ'য়ে গেছে। আবার দুবার কি কারুর বিয়ে হয় নাকি?"

গৌরীর উত্তরে একান্ত বিস্মিত হইয়া মেয়েটি তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর তাহার সর্ব্বাঙ্গে সধবার চিহ্ন কি কি আছে চোখ বুলাইয়া খুঁজিতে গিয়া দেখিল কিছুই নাই, এমন কি এক-জোড়া শাঁখাও নয়। একেবারে কুমারীর বেশ। সে হাসিয়া বলিল, "বাবা, কি দুষ্টু মেয়ে। আমাকে শুধু শুধু ভড়্‌কে দিলে? তোর বিয়ে হ'য়েছে না ছাই হ'য়েছে। তবে লোহা সিঁদুর পরিস্‌ নি কেন?"

বছর দুই আগে চুল বাঁধিবার সময় সে সিঁদুর পরিত বটে; কিন্তু তখন চুল বাঁধার ব্যাপারখানাই তাহার কাছে এমন বিরক্তিকর ছিল যে, তাহার কোন্ অঙ্গটার সঙ্গে বিবাহের বিশেষ যোগ আছে অত ভাবিয়া দেখিবার তাহার অবসর ছিল না। কাজেই সিঁদুর পরা যে সে কবে হইতে কি কারণে ছাড়িয়া দিয়াছে তাহা তাহার মনেই পড়ে না। আর হাতের চুড়িও সে এতবার বদ্‌লাইয়াছে যে লোহা পরা না-পরার দিন তাহার স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত। সে বলিল, "কেন সিঁদুর না পর্‌লে কি হয়? আমি এমনিই পরি না। অত আমার মনে থাকে না।"

মেয়েটি বলিল, "তোমার মনে থাকার উপরেই সব দাঁড়িয়ে আছে কি না! সধবা মেয়ে কবে আবার লোহা-সিঁদুর পর্‌তে ভুলে যায় শুনি? তোমার মা তা হ'লে তোমাকে পিটিয়ে পরাত, না? কৈ, তিনি নিজে ত পর্‌তে ভোলেন না! তোমাকে যেন আর পরিয়ে দিতে পার্‌তেন না। আহা, আমার সঙ্গে চালাকি কর্‌লে আমি আর ধর্‌তে পারি না, না?"

গৌরী ভাবিল, "তাও ত বটে! মার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়াটা একটু অদ্ভুত।" জেরার সুরে হঠাৎ মেয়েটি বলিল, "আচ্ছা, তোর বর তোকে চিঠি লেখে? তোদের বাড়ী আসে?" গৌরী বলিল, "আমার সঙ্গে ত তার ভারি ভাব কি না, তাই আমাকে চিঠি লিখ্‌বে! সেই কবে ছেলেবেলা দেখেছি; তারপর আর দেখাই হয়নি। আর আমরাও বেড়াতে বেরিয়েছি আজ দেড় বছর; কবেইবা আস্‌বে।"

মেয়েটি বলিল, "বাবা, এতও গ'ড়ে গ'ড়ে বল্‌তে জানিস্‌। বিয়ে হ'লে বর নাকি আবার ভাবের অপেক্ষা রাখে! এত দিনে চিঠি লিখে ঘর ভরিয়ে দিত, আর ঘাড়ে ধ'রে তোকে দশ বার শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেত। নিতান্ত না হ'লে নিজে ত পাঁচবার আস্‌তই। তাও যদি কালো পেঁচা বউ হ'ত ত না হয় তোর কথা বিশ্বাস কর্‌তাম।"

গৌরী সব বিষয়েই হারিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার নিজের মনেও একটু খট্‌কা লাগিল। সে একটু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। মেয়েটি বলিল, "আচ্ছা, ওই ত তোর মা

আস্‌ছেন চান সেরে। দাঁড়া, আমি ওঁকেই জিজ্ঞেস্ করছি।"

গৌরী ভীতভাবে বলিল, "না ভাই, মাকে কিছু বোলো না। মা যদি রাগ ক'রে কি বকে?" নৃপেনের কথা কিছু একটা সে বলিয়া বসিবে এই ভয় গৌরীর ছিল।

মেয়েটি হাসিয়া গৌরীর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, "এইবার বুঝেছি তোমার ফন্দি। মিথ্যে বানিয়ে বল্‌লে মা ত বক্‌বেই। সে ভয়টুকু বেশ আছে। আচ্ছা, আমি লোক পাঠিয়ে দিলে আমাদের বাড়ী একদিন আস্‌বি বল্‌; তা হ'লে তোর মাকে কিছু বল্‌ব না।"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ যাব! তুমি লোক পাঠিয়ে দিও, আমি সেদিন গিয়ে তোমায় সব গল্প বল্‌ব।"

ছোট মেয়েটির সঙ্গে ভিজা কাপড়ে সপ্‌ সপ করিতে করিতে দুই গৃহিণী আসিয়া নৌকায় উঠিলেন। যে মেয়েরা স্নান করে নাই তাহাদের মাথায় আধঘটিটাক জল ঢালিয়া গঙ্গা-মাটির ফোঁটা পরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর নৌকায় কাপড় বদ্‌লাইয়া ছাউনির গায়ে ভিজা কাপড় শুকাইতে দিয়া যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। গৌরীদের গল্প অগত্যা অন্য পথে চলিল।

(ক্রমশঃ)

এলেন কেই

অন্নদাশঙ্কর রায়

বন্ধু মোর, অসমবয়সী,
আশা ছিল একদিন শিখে ল'ব পদপ্রান্তে বসি'
হৃদয়ের চিরন্তনী নীতি,
প্রীতি হ'তে কত ঊর্দ্ধে, যারে তুমি বল পরা-প্রীতি, *
রীতি তার বিধি তার কিবা;
স্বনেত্রে হেরিব তব সৌম্যস্নিগ্ধ বদনের বিভা,
নারী অঙ্গে দেবীর মহিমা,
সুন্দর ভাবনা আনে মুখপদ্মে কিবা মধুরিমা,
নিয়ত কল্যাণ ব্রত হ'তে
সর্ব্বদেহে কী লাবণ্য অলক্ষ্যে উৎসরে কোন পথে!
পুরিল না আমার সে আশ—
সব আশা পুরিয়াছে কার? ব্যর্থ দীরঘ নিশ্বাস!
তুমি গেলে দূর হ'তে দূরে
মরণের বাঁশিখানি ভরি' দিয়া যৌবনের সুরে।
হে রুচিরা সুচিরযৌবনা,
তরুণীর-তরুণের প্রেমে তব নিত্য আনাগোনা।
প্রণয়-সংহিতা † মাঝে থাকি'
প্রতি যুগলের করে বেঁধে গেছ মিলনের রাখী।
ভালো যারা বাসে একমনে
মিলিবে মিলিবে তারা কোনো দিন কোথাও কেমনে—
দিয়েছ এ সান্ত্বনা সংবাদ
প্রতি-যুগলের শিরে শুভ্রশুচি তব আশীর্ব্বাদ।
বাণী তব কী রহস্যে ভরা,
প্রিয়ে করে প্রিয়তর প্রিয়ারে সে করে' প্রিয়তরা।
প্রেমিকেরা খুঁজে পায় দিশা,
বরণের মালা হাতে অপেক্ষিতে পারে সারা নিশা;
স্থূলভেরে ধিক্কারিতে জানে,
কঠিনের তপস্যায় বাঞ্ছিতারে জয় করি' আনে;
প্রত্যহের তুচ্ছতা পাসরি'
চির প্রেমব্রতটিরে প্রতি কাজে প্রত্যহ আচরি।
দু'টি প্রাণে অখণ্ড প্রণয়,
একটি জাগ্রত স্বপ্ন কায়মন সর্ব্বসত্তাময়।
একখানি সম্পূর্ণ জীবন
প্রেম তার কেন্দ্র আর পরিধি যে অনন্ত ভুবন।
শেষে তার পূর্ণ পরিণতি
পবিত্র সুন্দর শিশু আরাধিত কাঙ্ক্ষিত সন্ততি।*
চিরন্তন প্রণয়ের কোলে
প্রিয় হ'তে প্রিয়তর প্রিয়া হ'তে প্রিয়তরা দোলে।
শুচিস্মিতে, তোমারি এ বাণী
সারা পথ চলি মোরা প্রেমে-প্রেমে প্রাণে-প্রাণে মানি।

Great Love.

† "Love and Marriage."

* The Century of the Child.

পরাবিদ্যা

জীব ও পরলোক

শ্রী নারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য (বা ব্রহ্ম) —ইহাদিগকে সপ্তলোক বলা হয়। জীবেরও পাঁচটি কোষ আছে ; যথা,—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় বিজ্ঞানময় (বা হিরণ্ময়) ও আনন্দময়। জীব তাহার বিভিন্ন কোষে বিভিন্নলোকে বিচরণ করে। যথা,—

অন্নময় ও প্রাণময়—ভূঃ (পার্থিব জগৎ)

মনোময়—ভুবঃ (astral plane ; ইহা পৃথিবীর গণ্ডীর ভিতরে ও বাহিরে স্থিত ; পরন্ত, অন্ধ যেরূপ সম্মুখস্থ দ্রব্য দেখিতে পায় না, তদ্রূপ আমরা ইহাকে অনুভব করিতে পারি না।) স্বঃ (সাধারণ স্বর্গ; Devachan।)

বিজ্ঞানময়—মহঃ (অরূপলোক,—এখানে "ধর্ম্মী" ব্যতিরেকে "ধর্ম্মের' জ্ঞান জন্মে।)

আনন্দময়—জন, তপঃ, সত্য (উচ্চতম স্বর্গ)।

আমাদের, এই স্থূলদেহই (physical body) অন্নময় কোষ। প্রাণময়কোষ জীবনীশক্তির (life principal এর) আধার। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত (স্থূল আধার অর্থাৎ রক্তমাংসগঠিত বাহ্য অবয়বের সহিত নয়, মাত্র উহাদের বিশেষ ধর্ম্ম বা শক্তির সহিত) মিলিত বুদ্ধিকে (অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে) বিজ্ঞানময়কোষ বলা হয়। ঐরূপে, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে (অন্তঃকরণের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তিকে) মনোময়কোষ বলা হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান—এই পঞ্চবায়ুর সহিত মিলিত পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের নাম প্রাণময়কোষ। [আত্মার অধিষ্ঠানবশতঃই প্রাণাদির কার্য্য হইয়া থাকে। কঠশ্রুতিতে দেখিতে পাই,—ঊর্দ্ধপ্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি—প্রাণবায়ুর কার্য্য নিশ্বাসপ্রশ্বাস; অপানের কার্য্য বিষ্ঠাদির বহিঃনিঃসরণ; ব্যানের কার্য্য ক্ষয় ও সংগ্রহ; উদানের কার্য্য অঙ্গের উন্নয়নাদি, সমানের কার্য্য দেহের পোষণ।] ব্যষ্টিভূত অজ্ঞান দ্বারা আত্মার স্বরূপ আচ্ছাদিত, উহাই আত্মার উপাধি (বা vehicle) —তাহারই নাম আনন্দময়কোষ বা কারণশরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই তিনটি সূক্ষ্মকোষের সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর বলা হয় এবং উহা জীবের স্থূলদেহের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। (Interwoven with the physical body as if to form its ethereal counterpart) ঐ দেহে আমরা সুখদুঃখ অনুভব করি। [পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎ কার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য॥ —সাংখ্য। অর্থাৎ, শোকাদির ভোগ লিঙ্গদেহের কার্য্য, স্থূলদেহের নয়। শব লিঙ্গদেহ বর্জ্জিত বলিয়া সুখদুঃখরহিত।] মূর্চ্ছায় বা নিদ্রাকালে লিঙ্গশরীর স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়,—মাত্র অতিসূক্ষ্ম রশ্মিবিশেষদ্বারা সংযুক্ত থাকে ; এতদুভয়ের সম্পূর্ণবিচ্ছেদই মৃত্যু।

মানবের প্রত্যেক বাসনা, চিন্তাপ্রভৃতির ছাপ (photographএর মত) automatically প্রথমতঃ মনোময় কোষের উপর পড়ে এবং দ্বিতীয়তঃ ঐগুলি ভুবর্লোকে উপাধি (ছায়াদেহ) গ্রহণ করে। [সূক্ষ্মদর্শীরা (clairvoyants) ইহা অবগত আছেন।] মনোময় কোষের উপর যে-সকল ছাপ মানব সারাজীবন ধরিয়া পাতিত করে মৃত্যুর পর, উহাদের সমবায়ে তাহার প্রেতদেহ নির্ম্মিত হয়। ডিম্বের shellএর মত, ঐ দেহ মনোময় কোষের আবরণস্বরূপ। প্রেতদেহ ও ভুবর্লোক একই আকাশীয় পদার্থে গঠিত। এই দেহ হইতে নিষ্ক্রমণকে অনেকে দ্বিতীয় মৃত্যু বলেন। দ্বিতীয় মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদির দ্বারা ঐ "খোসাকে" সম্যক্রূপে বিনষ্ট না করিলে, উহাদ্বারা সময়ে সময়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভৌতিককাণ্ড সংঘটিত হইয়া থাকে। শবকে দাহ না করিলে যেমন উহা বহুবৎসর পরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রাদ্ধ না করিলে প্রেতদেহ সত্বর বিনষ্ট হয় না।

কারণ, শ্রাদ্ধকালে তালবদ্ধ মন্ত্রধ্বনির স্পন্দন (vibration) ভুবর্লোকে সঙ্কল্পিত প্রেতদেহে আঘাত করিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়; আর, পিণ্ডদানকালে গোধূমাদিকে আধার করিয়া ইচ্ছাশক্তি (will force) ও মন্ত্রশক্তি (sound force) প্রভাবে ঐ বিনষ্টদেহকে উহার মধ্যে ন্যাস করিয়া স্বর্লোকবাসী পিতৃগণের উদ্দেশে যে বিসর্জ্জন করা হয়,—তাহাতে (পিতৃগণের দিব্য তেজদ্বারা) ঐ খোসা ভস্মীভূত হইয়া যায়। [একটী গৃহে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র এক সুরে বাঁধিয়া, একটিতে আঘাত করিলে অপরগুলিও স্পন্দিত হয়;—ইহাতে আমরা sound forceএর প্রতিঘাত করিবার শক্তি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। আমরা আরও জানি যে, সেনানায়করা অদৃঢ় সেতুর উপর দিয়া সৈন্যগণকে কুচ্ করিয়া লইয়া যান না; কারণ, তালবদ্ধ পদধ্বনির স্পন্দন উহাকে ভগ্ন করিতে পারে।]

আমরা এক্ষণে সাধারণ মনুষ্যের উৎক্রমণপ্রণালী কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। মৃত্যুকালে জীব তদ্দেহের অভিমান ভুলিয়া যায় এবং বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে অবস্থান করে। তখন সে তাহার আজীবনের ঘটনাবলী, বায়স্কোপের চিত্রাবলীর মত, চকিতে মানসচক্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিতে পায়; তদনন্তর, সে ভাবীদেহের (পরজন্মে যে-দেহ ধারণ করিবে) ভূতসূক্ষ্মে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাতে আত্মভাব করতঃ (অর্থাৎ, আমি স্ত্রী কি পুরুষ—অথবা মৃগইত্যাদিরূপ একপ্রকার ভাবনায় দৃঢ় অনুভাবিত হইয়া) পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়; অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়সমূহ নির্ব্যাপার হইয়া মনে লয় পায়, এবং মন প্রাণে ও প্রাণ জীবে লয় হয়। তখন অমনি হৃদয়ছিদ্রের অগ্রভাগ প্রদ্যোতিত হয় এবং জীব তাহার কর্ম্মানুযায়ী নবদ্বারের যে কোন এক দ্বার দিয়া উৎক্রান্ত হয়। উৎক্রান্তি সময়ে তাহার সংবিৎ থাকে না; সে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তদ্দেহ ও এতল্লোক পরিত্যাগ করিয়া যায়। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে সে আপনাকে ভুবর্লোকে প্রেতদেহে দেখিতে পায়; ঐ অবস্থা শাস্ত্রে, "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রেতদেহাবসানে মনোময়কোষ বিকশিত হয় এবং ঐ কোষাধিকারীও তখন স্বর্লোকে প্রস্থান করে এবং স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী তথায় স্বল্প বা দীর্ঘকাল অবস্থানান্তর পুনরায় ভুর্লোকে জন্মগ্রহণ করিতে আইসে। সাধারণ মানবের এই অবধিই সীমা। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের প্রেতাবস্থা হয় না।

বেদান্তে বিবেকবুদ্ধিইষ্টকারীদিগের পরলোক-গমনের দুইটি মার্গ কথিত হইয়াছে; উত্তরমার্গ বা দেবযান এবং দক্ষিণমার্গ বা পিতৃযান। স্বর্লোক অবধি যাহাদের সীমা, তাহারা পিতৃযানে গমন করে; জ্ঞানী প্রভৃতি যাঁহাদিগকে তদূর্দ্ধে যাইতে হইবে, তাঁহাদিগের জন্যই দেবযান প্রশস্ত। আর যাহারা বিবেকবুদ্ধিশূন্য ও ঘোরতর অনিষ্টকারী তাহারা চন্দ্রলোক নামীয় স্বর্লোকের অংশ-বিশেষে যাইতে পারে না এবং তাহারা রেতঃসিক্ভাব প্রাপ্ত হয় না। পরজন্মে তাহারা সচরাচর স্বেদজাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পিতৃযানগামীকে আতিবাহিকী দেবতারা (সূক্ষ্ম-শরীরী) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। তাহাকে প্রথমে ধূমদেবতা রাত্রিদেবতার নিকট লইয়া যায়; তখন রাত্রি-দেবতা কৃষ্ণপক্ষ-দেবতার নিকট, কৃষ্ণপক্ষ-দেবতা দক্ষিণায়ণদেবতার নিকট লইয়া যায়। ঐরূপে ক্রমান্বয়ে সে পিতৃলোক দেবতা, আকাশ-দেবতা এবং পরিশেষে চন্দ্রলোক দেবতা কর্তৃক চন্দ্রলোকে নীত হয়। তথায় সে তাহার কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে; ভোগাবসানে তাহার ভোগায়তন বিলীন হইয়া যায় এবং সে তখন কিঞ্চিৎ অভুক্ত-কর্ম্মের (অনুশয়ের) সহিত অবরোহণ করে। [সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ বলিয়া, পিতৃযানগামী অনুশয়যুক্ত হইয়াই অবতরণ করে।]

দেবযানগামীকে প্রথমে অর্চ্চিদেবতা অহর্দেবতার নিকট লইয়া যায়; তৎপরে সে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শুক্লপক্ষ দেবতা, উত্তরায়ণদেবতা, সংবৎসরদেবতা, দেবলোক-দেবতা, বায়ুদেবতা, আদিত্যদেবতা, চন্দ্রদেবতা, বিদ্যুদ্দেবতা, বরুণদেবতা, ইন্দ্রদেবতা ও প্রজাপতিদেবতার নিকট হইতে ব্রহ্মলোকবাসী কোন অমানব পুরুষকর্ত্তৃক সত্য বা ব্রহ্মলোকে নীত হয় এবং তথায় কল্পান্ত অবধি অবস্থান করে। দেবযানগামী বর্ত্তমানকল্পে আর ইহলোকে

প্রত্যাবর্ত্তন করে না। [৪৩২ কোটী বৎসরে এক কল্প হয়; কল্পান্তে—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্লোক ধ্বংস হইয়া যায় এবং মহর্লোক অধিবাসীশূন্য হয়। ১২০০ কল্প মহাপ্রলয় হয়; তখন সৎলোক অবধি বিনষ্ট হইয়া যায়।]

যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী অর্থাৎ আত্মার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, প্রাণাত্যয়ে তাঁহার উৎক্রান্তি হয় না। ব্রহ্ম সর্ব্বময়; সেই ব্রহ্মে তিনি সম্যক অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাতে একত্ব লাভ করেন। অর্থাৎ, তিনি ব্রহ্মই ছিলেন,—মাত্র অজ্ঞানাবরণে স্বরূপ অপ্রকটিত ছিল, এক্ষণে অজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায়—যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই হইলেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীগণের অর্চ্চিরাদি গতি নাই। [ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে॥ বেদান্ত। ব্রহ্মবিদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এইখানেই বিলীন হইয়া যায়।]

এইবার অবরোহণ-প্রণালী কিরূপ তাহা দেখা যাউক। যে-জীব জন্মান্তর গ্রহণ করিতে আইসে, সে চন্দ্রলোক হইতেই অবরোহণ করে। তৎকালে সে ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া সপ্রাণ, সেন্দ্রিয়, সমনস্ক, অবিদ্যা ও পূর্ব্বজন্মের সংস্কার এবং অনুশয়বিশিষ্ট হইয়াই অবতীর্ণ হয়। ঘৃতভাণ্ডের স্নেহের মত,—পূর্ব্বকথিত ভুবর্লৌকিক ছায়াচিত্রের ধ্বংসাবিশেষ কিছু তাহাকে আশ্রয় করে; উহা কর্ম্মফল ভোগের বীজস্বরূপ। মানবের পূর্ব্বজন্মের চিন্তা পর জন্মের প্রবৃত্তিতে, আকাঙ্ক্ষা সামর্থ্যে, চেষ্টনা প্রতিষ্ঠায়, লোভ চৌর্য্যপরায়ণতায়, পরদুঃখকাতরতা দানশীলতায়, ভূয়োদর্শন জ্ঞানে এবং ক্লেশসহকারে ভূয়োদর্শন (বা অনুভূতি) বিবেকে পরিণত হয়। আমরা পাতঞ্জলে এই মর্ম্মে দেখিতে পাই,—জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥—অর্থাৎ, বর্ত্তমান কালে, দেশে ও জন্মে যে-সকল সংস্কারাপন্ন হওয়া যায়,—তৎসমুদায় পুনর্জ্জন্মের জন্য অব্যক্তভাবে সঞ্চিত থাকে।

স্বর্লোক হইতে অবরোহণ করিয়া জীব প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়; ক্রমশঃ, বায়ু, অভ্র, ধূম, মেঘ এবং তাহা হইতে বৃষ্ট্যাদিরূপে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া শস্যাদি মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। পরে, কর্ম্মফলবিধাতৃদেবগণের কর্তৃত্বে ঐসমস্ত শস্যাদিভোক্তার শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রেতঃকণা সমাশ্রয়পূর্ব্বক নারীর জরায়ুমধ্যে গমন করে। তখন জীবের অধিষ্ঠানবশতঃ ক্রমবিকাশশক্তি প্রভাবে রেতঃ দেহে পরিণত হয়।—[ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণং অন্যথা পূতিভাব প্রসঙ্গাৎ ॥—সাংখ্য। ভোক্তার অধিষ্ঠান বশতঃই স্থূলদেহ নির্ম্মিত হয়; তদভাবে রেতঃ—শবের ন্যায় বিকৃত হইয়া যায়।] মুণ্ডকশ্রুতির—"সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্"—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অবরোহণ-প্রণালী সমর্থিত হয়।—পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম প্রভাবে সে উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় উক্ত হইয়াছে যে দিব, পর্জ্জন্য, পৃথিবী পুরুষ ও যোষিৎ এই পঞ্চাগ্নিতে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ—এই পঞ্চ আহুতি দ্বারা জীবদেহের উৎপত্তি। তবে, যে-সকল জীব মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে নীত হয় না, তাহাদের পুনর্জ্জন্মের জন্য পঞ্চমাহুতির ব্যবস্থা নাই; যথা—কীট, মশকাদি।

অনুশয়ী জীবের আকাশাদিভাব শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল শস্যাদিভাব শীঘ্র যায় না। এই "শস্যাদিভাব" দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, জীব ঐসমস্ত বায়ুর ন্যায় সংশ্লেষ মাত্র প্রাপ্ত হয়; ঐসব তাহার মুখ্য দেহ হয় না বা তৎসমুদায়ের সুখদুঃখভাগী হয় না অর্থাৎ সে সত্য সত্য ব্রীহিযবাদি হয় না,—উহাতে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র।

পূজার শাড়ী

শ্রী সীতা দেবী

অনিল একরকম দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। আফিসের বেলা ত হইয়াই গিয়াছে, এখন একেবারে এগারোটা না বাজিয়া গেলেই সে বাঁচে। অধর তাহার বাল্যের খেলার সাথী, অতি পুরাতন বন্ধু। হঠাৎ কাল সে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই কাল বিকাল হইতে রাত বারোটা পর্য্যন্ত তাহার কাছে না কাটাইয়া অনিল কিছুতেই পারে নাই। রাত্রে বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে বেশ একপালা ভালরকম ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়াও দেখা গেল, সুষমার মুখ ভার। অধরের কাছে আর-একবার যাইবার জন্য অনিলের তখন দুই পা উৎসুক হইয়াছিল, তবু সে দুই মিনিট দাঁড়াইয়া একটু ইতস্ততঃ করিল। সুষমার মুখে ঝড়ের যে-রকম পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাকে আরো চটান বুদ্ধিমানের কাজ হইবে কি না সন্দেহ। তাহার সঙ্গে এখনি একটা মিটমাট করিয়া ফেলিলে, আখেরে অনিলেরই ভাল হওয়ার কথা। তা না হইলে এই ঝগড়ার রেশ যে কতদিন ধরিয়া চলিবে তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। সুষমা মেয়েটির রূপ আছে, গুণেরও অভাব নাই, কিন্তু কি রাগ!

দুই মিনিট এধার ওধার ভাবিয়া অনিল বাহির হইয়াই পড়িল। নিজেকে নিরর্থক সান্ত্বনা দিতে দিতে চলিল। বিকাল নাগাদ সুষমা এসকল ঝগড়া-ঝাঁটির কথা ভুলিয়াই যাইবে। আর নাও যদি যায়—বাকিটা পরিষ্কার করিয়া ভাবিবার চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। যাহাই হউক, স্ত্রী রাগ করিবে বলিয়া ত আর কোনো আর্য্য পুরুষ-মানুষ ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না? পৌরুষ দেখাইবার মাত্র ঐ একটি ক্ষেত্র তাহাদের বাকী আছে, এটাও ছাড়িলে নিতান্তই পুরুষ মানুষের খাতা হইতে নাম কাটাইতে হয়।

কিন্তু আফিসের বড়-সাহেবটি স্ত্রী নয়, তাঁহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। কাজেই বন্ধুর লোভনীয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অনিলকে স্নানাহারের জন্য বাড়ীর দিকে দৌড়াইতে হইল।

সুষমার গাম্ভীর্য্য যেন দশ বারো গুণ বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। সে অনিলের সঙ্গে কথাই বলিল না এবং ভাত চাহিবার বহু পূর্ব্বেই এক থালা ভাত বাড়িয়া আসনের সাম্‌নে ঝনাৎ করিয়া আনিয়া রাখিল। স্ত্রীর মুখের পানে তাকাইয়া অনিলের বুকের ভিতরটা যেন মুশ্‌ড়াইয়া গেল। বড়-সাহেবের টান না থাকিলে সে বাড়ীতেই থাকিয়া যাইত, কিন্তু তাহা করিবার উপায় ছিল না। সেখানে কিরূপ সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিবে মনে করিয়াই তাহার বুক কাঁপিতেছিল।

ভাত ডাল মাখিয়া সে কোনরকমে তাড়াতাড়ি গিলিয়া গিলিয়া খাইতে লাগিল। সুষমা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার আর-কিছু চাই কি না। ঝগড়া-ঝাঁটি করিলেও স্বামীর খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে সে কখনও পান হইতে চূণটুকু খসিতে দিত না।

লীলা এতক্ষণ আপনার পুতুলের রান্না লইয়া ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া অনিলকে দেখিয়া সে তাহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বাবার গালে গাল ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "বাবা, আজ আমার সিল্কের জামা আন্‌বে না?"

"কিসের জামা রে?" তাড়াতাড়িতে কোনো জামার কথা অনিল মনেই আনিতে পারিল না।

লীলা চীৎকার করিয়া বলিল, "এরই মধ্যে ভুলে গেলে, বা রে! পূজোতে আমি নূতন জামা পরব না বুঝি?"

"ওঃ তাইত। আজ বিকেলে অফিস থেকে ফির্‌বার সময় ঠিক তোর ফ্রক নিয়ে আসব," বলিয়া তাড়াতাড়ি এক গেলাশ জল ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া অনিল

একরকম ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মনে মনে দুর্গানাম জপিতে লাগিল, গিয়াই যেন সাহেবের সঙ্গে শুভদৃষ্টি না হয়।

সচরাচর বাঘের ভয় থাকিলেই সন্ধ্যা হয় দেখা যায়, কিন্তু অনিলের অদৃষ্টগুণে আজ তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল। আফিশের সাম্‌নে আসিয়া বড়-সাহেবের ভ্রুকুটিকুটিল মুখের পরিবর্ত্তে তাহার সহকর্ম্মীদের বিকশিতদন্তমুখগুলি দেখিয়া তাহার দুই চোখ যেন জুড়াইয়া গেল। তাহারা সব কয়টি মিলিয়া দরজায় ভীড় করিয়া মহোৎসাহে গল্প করিতেছে।

"ব্যাপার কি হে?" বলিয়া অনিল ছুটিয়া গিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইল। "তোমরা সবাই ক্ষেপেছ না বড়-সাহেব পটোল তুলেছেন?"

"আমরাও ক্ষেপিনি এবং বড় সাহেবও পটল তোলেননি," প্রায় সমস্বরেই সব ক'জন উত্তর দিল। "তবে সাহেব পটোলের ক্ষেতের দিকে এক পা বাড়িয়ে ছিলেন বটে। মোটরে মোটরে ধাক্কা লেগে ঠ্যাং ভেঙে কর্ত্তা এক হপ্তার জন্যে হাঁসপাতাল বাস করতে গিয়েছেন।"

অনিল মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচা গেল, বাবা। আমি ত ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছি যে, ঢুকেই এক মাসের নোটিশ পাব। কিন্তু ভাল কথা, আমাদের মাইনের হ'ল কি? সেটাও পকেটে নিয়ে তিনি হাসপাতালে গেলেন নাকি?"

একজন প্রৌঢ় গোছের কেরাণী তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, " না হে না। আজই মিল্‌বে। আরো সুখবর আছে। আমরা দরখাস্ত করেছিলাম না যে বড় দিনে 'বোনাস' না দিয়ে সেই টাকাটা আমাদের পূজোর মাইনের সঙ্গে দেওয়া হোক, তা সাহেব তাতে রাজীই হয়েছেন।"

অনিলের বড় সাহেবের জন্য একটু ভাবনা হইতে লাগিল। হঠাৎ ভূতের মুখে রামনাম শুনিলে একটু ভাবনা হইবারই কথা। ব্যাটার ভাল মন্দ কিছু না হইলে হয়।

কিন্তু বড়-সাহেবের ভাবনা ভাবিবার তাহার বেশী সময় ছিল না। হঠাৎ এক সঙ্গে প্রায় দুই মাসের মাহিনার সমান টাকা হাতে পাওয়ার সম্ভাবনায় তাহার মন আনন্দে নাচিতেছিল। যাক্, পূজার কাপড়-চোপড় কোথা হইতে কিনিবে, সে ভাবনা আর ভাবিতে হইবে না। সুষমার জন্য একটা খুব ভাল রকম কিছু কিনিতে পারিলে এই অসুবিধাজনক ঝগড়াটার শীঘ্রই মিটমাট হইয়া যায়।

আফিশের ছুটি হওয়ার জন্য সে অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে ছুটি এবং টাকা একসঙ্গে লাভ করিয়া সে অধরের বাড়ীর দিকে চলিল। ইচ্ছাটা যে, বন্ধুকে সঙ্গে করিয়াই বাজার করিতে বাহির হইবে। অধর সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীতেই ছিল। চট্‌পট্ এক-এক পেয়ালা চা কোনোরকমে গিলিয়া খাইয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িল। অধরের অনেক জিনিষপত্র কিনিবার ছিল।

সর্ব্বপ্রথমে তাহারা এক কাপড়ের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল। লালার জন্য সিল্কের ফ্রক কিনিতে হইবে, কাজেই সর্ব্বপ্রথম অনিল তাহাই দেখাইতে বলিল। রাশি রাশি, নানা রংএর, নানা ছাঁটের ফ্রক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া সে অবশেষে সোনালী রংএর রেশমের একটি ফ্রক পছন্দ করিল। লীলা দিব্য টুক্‌টুকে মেয়ে, তাহাকে এ রংএ নিশ্চয়ই মানাইবে। দামটা অবশ্য তাহার অবস্থার পক্ষে কিছু বেশী, কিন্তু পকেটে তখনও ঝন্‌ঝন্ করিতেছে, কাজেই বেশী হিসাবী হইতে তাহার ইচ্ছা করিল না। এখন সুষমার জন্য খুব ভাল দেখিয়া একখানা শাড়ী কিনিতে পারিলেই হয়।

তাহার সামনে তাকভর্ত্তি করিয়া গাদা গাদা শাড়ী সাজানো। সেগুলির কত রং, কত রকম চেহারা। অনিল ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে, সুষমার জন্য কি কেনা যায়। জিনিষটা খুবই বেশীরকম সুন্দর হওয়া চাই, কিন্তু একেবারে তাহার অবস্থার অতিরিক্ত হইলেও চলিবে না।

"কি রকমের শাড়ী হ'লে ওকে সব-চেয়ে মানাবে বল্‌তে পার?" অনিল নিরুপায় হইয়া শেষে বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

অধর অত্যন্ত চটিয়া বলিল, "আমি কি ক'রে বল্‌ব রে, গাধা? আমি কি কখনও তোর বউকে চোখে দেখেছি? সে ফর্‌শা না কালো, তাও ত জানি না।"

সুষমাকে সুন্দরী বলিতে অনিলের মর্ম্মান্তিক আপত্তি ছিল, অন্তত তাহার সামনে। একেই মেয়ে-মানুষের জাতের জাঁক বেশী, তার উপর এই ধরণের কথা শুনিলে আর রক্ষা থাকিবে না। কিন্তু এখন ত আর সুষমা উপস্থিত নাই, কাজেই কোনোরকমে ঢোক গিলিয়া সে বলিল, "এই রংটা ফরশা গোছের আর কি।"

"ফর্‌শা গোছের আবার কি রকম? তোর চেয়ে ফর্‌শা না কালো?"

অনিল অগত্যা স্বীকার করিল যে, সুষমা তাহার চেয়ে বেশ কিছু ফর্‌শাই হইবে।

অধর বলিল, "তা হ'লে খুবই ফর্‌শা বল? যা খুসি কেননা কেন, তাকে ভালই দেখাবে। মেয়ের জন্যে সোনালী রংএর ফ্রক কিনেছিস্, বউয়ের জন্যেও ঐ রংএরই শাড়ী নে, খুব খুসি হবে এখন। কিন্তু আমি এখন চল্লুম, আমার জরুরী কাজ আছে।"

অধর চলিয়া গেলে, অনিল বসিয়া শাড়ী বাছিতে আরম্ভ করিল। দোকানের লোকগুলি ক্রমাগত গাদা গাদা বেনারসী শাড়ী, ঢাকাই শাড়ী, মান্দ্রাজী শাড়ী আনিয়া হাজির করিতে লাগিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনিল শাড়ীর স্তূপের আড়ালে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু তাহার আর কিছুতেই পছন্দ হয় না। কোনোটার বা রং পছন্দ হয় ত পাড় পছন্দ হয় না। কোনোটার বা খোল ভাল, কিন্তু রংটা একেবারে চোখে যেন হুল ফুটাইতে আসে।

অবশেষে তাহার একটা কাপড় পছন্দ হইল। রংটা তাহার ময়ূরকণ্ঠী, পদ্মরাগ আর মরকতের আভা মিলাইয়া যেন তাহার চোখের সম্মুখে ঝিলিক্ হানিতে লাগিল। সুষমাকে ইহা পরিলে কেমন দেখাইবে, সে তাহা মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল। ঠিক রাণীর মতই দেখাইবে। রাণী হওয়াই তাহার উচিত ছিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে হইয়াছে সে গরীব কেরাণীর স্ত্রী। রাণীগিরির বদলে দাসীগিরি করিয়াই তাহার দিন কাটে।

শাড়ীখানার মসৃণ কোমল গায়ে সাদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "এখানার দাম কত হবে হে?"

"একশ দশ টাকা।"

অনিলের কপাল চাপ্‌ড়াইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। শাড়ীখানায় সুষমাকে কি সুন্দরই না জানি দেখাইত, কিন্তু একশ দশ টাকা দেওয়া যে একেবারেই তাহার সাধ্যির অতীত। রাগটাগ তাহার এক নিমিষেই কাটিয়া যাইত। কিন্তু এত টাকা সে দিবে কি প্রকারে? সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শাড়ীখানি সরাইয়া বসিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "অল্পদামী এইরকম রংএর কিছু আপনাদের কাছে নেই?"

যে ছোক্‌রাটি তাহাকে কাপড় দেখাইতেছিল, তাহার ধৈর্য্যের আর সীমা নাই। "আচ্ছা, দাঁড়ান দেখ্‌ছি," বলিয়া সে পিছনের দিকে প্রস্থান করিল। অল্প পরেই সে কয়েকখানা শাড়ী লইয়া আসিল, কিন্তু সেগুলি দেখিবামাত্র অনিল ফিরাইয়া দিল।

সে একরকম নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার জোগাড় করিতেছে, এমন সময় দোকানের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া নীচু গলায় বলিল, "একটু পিছনের দিকে আস্‌বেন, মশায়?"

অনিল একটু অবাক হইয়া গেল, তবু লোকটির পিছন পিছন চলিল।

ভিতরে গিয়া লোকটি একটি কাগজে মোড়া পুঁটলি বাহির করিল। উপরের কাগজের আচ্ছাদন খুলিয়া সে একখানি শাড়ী বাহির করিল। শাড়ীখানা পূর্ব্বের সেই শাড়ীর মতই ময়ূরকণ্ঠী রংএর, দেখিলে আরো বেশী মূল্যের বলিয়া মনে হয়। অনিল কাপড়খানি হাতে লইয়া দেখিল, তাহার খোলও চমৎকার। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা আমায় দেখাচ্ছেন কেন মশায়, এর দাম বোধ হয় আরো বেশী?"

দোকানের লোকটি বলিল, "পঞ্চাশ টাকায় এটা পেতে পারেন।"

"কি রকম?" অনিল বেশ খানিকটা অবাক হইয়া গেল।

"এ জিনিষটা একেবারে নূতন নয়। মাসখানেক আগে এক ভদ্রলোক এখানা তাঁর স্ত্রীর জন্য কিনেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর এখন ভয়ানক অসুখ, মারা যেতে বসেছেন।

ভদ্রলোকের হাতে টাকাকড়ি কিছুই নেই, স্ত্রীর চিকিৎসা শুদ্ধ করাতে পারছেন না। তাই এখানা আবার ফিরিয়ে এনেছেন, যদি অল্প দামেও কেউ কেনে। এটা আমরা আবার ইস্ত্রি করিয়ে নিয়েছি, কেউ দেখলে বুঝবে না যে, এটা পরা হ'য়েছে।" অনিল পঞ্চাশটা টাকা ফেলিয়া দিয়া শাড়ীখানি ভাল করিয়া পাট করাইয়া কাগজে মুড়িয়া লইয়া বাহির হইয়া চলিল। দোকানের লোকটি তাহার পিছন পিছন আসিয়া বলিল, "অনুগ্রহ ক'রে আপনার ঠিকানাটা রেখে যান।"

অনিল অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" "সেই ভদ্রলোকটি অনেক ক'রে ব'লে গিয়েছেন। বেচারা মহা বিপদেই পড়েছেন। ঠিকানাটা দিয়েই যান মশায়, আপনার তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।"

অনিল ঠিকানা দিয়া এতক্ষণ পরে সত্যই সত্যই দোকান ছাড়িয়া বাহির হইল এবং বাড়ীর দিকে চলিল। তখন প্রায় রাত্রি হইয়া আসিয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে।

বাড়ী আসিতে-আসিতে কল্পনার চোখে সে কেবল সুষমার মুখই দেখিতে লাগিল। শাড়ী পাইয়া না জানি তাহার মুখের চেহারা কিরূপ হইবে।

বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখ করিয়া সুষমা দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে গো? অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

সুষমা শুষ্ক মুখে বলিল, "লীলার জ্বর হয়েছে।" মেয়ের অসুখ হওয়ায়, সে ভয়ে নিজেদের ঝগড়া-ঝাঁটি সবই ভুলিয়া গিয়াছে।

অনিল ভিতরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "সকালে ত তাকে ভালই দেখে গেলাম?"

"দুপুর-বেলা থেকে তার জ্বর এসেছে। আর বছর ঠিক এই সময়েই পুঁটুটাও আমাদের ছেড়ে গেল," এই-টুকু বলিয়াই সুষমা কাঁদিয়া ফেলিল।

বেচারা অনিলের বুকটা যেন দমিয়া গেল। কাপড় ছাড়িতে, জুতা খুলিতেও তাহার যেন ক্ষমতা রহিল না। কোনোরকমে জামা-জুতা ছাড়িয়া সে গিয়া লীলার পাশে বসিল। সে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, জ্বরের তাপে তাহার ফুলের মতন মুখখানি শুকাইয়া উঠিয়াছে। অনিল তাহার পাশে বসিবামাত্র সে ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া তাকাইল। তৎক্ষণাৎ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বাবা, আমার সিল্কের ফ্রক এনেছ?"

"এনেছি মা," বলিয়া অনিল তাড়াতাড়ি কাপড়ের পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিল। লীলা তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে সেটা ছিনাইয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। ফ্রকটা তাহার চোখে পড়িবামাত্র সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, কি সুন্দর! মা, মা, শীগগির এসে দেখ, বাবা আমার জন্যে কি সুন্দর জামা নিয়ে এসেছেন।"

লীলার ডাকে ছুটিয়া আসিয়া সুষমা ডাকের কারণ জানিয়া হাসিয়া ফেলিল। ভয়ের আঁধারটা এই হাসা-হাসির মধ্য দিয়া খানিকটা যেন কাটিয়া গেল। অনিল এতক্ষণ পরে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, সুষমার শাড়ীর বাণ্ডিলটা আনিয়া সুষমার হাতে দিয়া বলিল, "এইটা লীলার মায়ের জন্যে এনেছি।"

সুষমার তখন চোখে জল, মুখে হাসি। ছেলে-পিলের মা হইলেও তাহার নিজের বাল্যকাল তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। কাজেই শাড়ী পাইয়া তাহার যে আনন্দ হইল, তাহা লীলার আনন্দের চেয়ে নিতান্ত কম নয়। "চমৎকার শাড়ীটা ত!" বলিয়াই কিন্তু তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, সে এখন সংসারের গৃহিণী, এসকল অপব্যয়ের প্রশ্রয় দেওয়া তাহার উচিত নয়। গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "কত দিতে হ'ল এটার জন্যে?"

অনিল বলিল, "ওঃ, সে বল্‌তে অনেক সময় লাগ্‌বে, আমায় আগে চা দাও।"

চা খাওয়া ইত্যাদি চুকিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে সুষমাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। সুষমা নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "ওমা, তবে কিন্‌লে কেন? অন্যের পরা জিনিষ কি কিন্‌তে আছে? এর চেয়ে সস্তা দামের নতুন জিনিষও ভাল। সেই মেয়েমানুষটি নিশ্চয়ই এই শাড়ীটার জন্যে দুঃখ করছে। এটা পরে আমি কখনও শান্তি পাব না।"

সকালে লীলার জ্বর বাড়াতে তাহার শাড়ীর কথা এ

একেবারেই ভুলিয়া গেল। যতগুলি ডাক্তার তাহাদের জানা ছিল, প্রায় সব ক'জনকেই একসঙ্গে ডাকিয়া আনিল, সুষমা স্নানাহার সব ত্যাগ করিয়া মেয়ের পাশে বসিয়া রহিল।

সকালে সুষমা বসিয়া লীলাকে বাতাস করিতেছে, এবং অনিল তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছে, এমন সময় ঝিটা আসিয়া বলিল, "বাইরে কে একজন বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে, মা।"

অনিল বাহির হইয়া দেখিল, দরজার কপাট ধরিয়া একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কাপড়-চোপড় ময়লা, চোখ মুখের চেহারাও শোচনীয়। সে একটা কথা বলিবার পূর্ব্বেই অনিল বুঝিয়া লইল, এই লোকটি বেনারসী শাড়ী সংক্রান্ত ব্যাপারে আসিয়াছে।

লোকটি অনিলকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি আমার অনুরোধটা শুন্‌লে খুবই অবাক হবেন বোধ হয়। আপনি যে ময়ূরকণ্ঠী বেনারসী শাড়ীখানা কিনে এনেছেন, আমিই সেটা দোকানে বিক্রী কর্‌তে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সেটা এখনি ফিরে পাওয়া দর্‌কার।"

অনিল বলিল, "তা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। যাঁর জন্যে কিন্‌লাম তাঁর ত জিনিষটা কিছু পছন্দ হয়নি। তবে আমার টাকা পঞ্চাশটা দিয়ে যাবেন।"

ভদ্রলোকের মুখে একটুখানি শুষ্ক হাসি দেখা দিল। সে বলিল, "আমার হাতে এখন পঞ্চাশটা পয়সাও নেই। আপনাকে কিছুদিন পরে আমি টাকাটা দিতে পারি। কিন্তু আপনি যদি আমাকে শাড়ীটা এখন দেন তা হ'লে একটা হতভাগ্য জীবের অত্যন্ত উপকার করা হয়। একেবারে না দিতে চান, দুচার দিনের জন্যে ধার দিন।"

অনিল কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কিন্তু আপনি ওটা ফিরে চান কি জন্যে?" পিছনে তাকাইয়া দেখিল, কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া সুষমা তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে।

"কাপড়খানা আমি আমার স্ত্রীকে তাঁর জন্মদিনে কিনে দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর খুব শক্ত অসুখ হ'য়ে পড়ল। আমি অত্যন্ত গরীব, যা দু'চার পয়সা জমিয়েছিলাম, তা এই শাড়ী কিন্‌তেই শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁর ঔষধ-পথ্যের জন্যে বাধ্য হ'য়ে শাড়ীখানা আমায় বিক্রী ক'রে দিতে হয়। কিন্তু তাঁকে ত রাখতে পার্‌লাম না, তাঁর ডাক এসেছে। ক'দিন থেকে ক্রমাগত শাড়ীখানা চাইছেন। আমি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বল্‌ছি তাঁর কাছে, সেটা ইস্ত্রি কর্‌তে দিয়েছি। কিন্তু আর ত সময় নেই। দয়া ক'রে কাপড়খানা দিন।"

অনিল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এত টাকা দিয়া কিনিয়া জিনিষটা একেবারে হাতছাড়া করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কে যেন তাহাকে খোঁচাইতে লাগিল, গরীব বিপন্ন লোকটির কথা রাখিবার জন্য।

হঠাৎ পিছন হইতে সুষমা তাহার পাঞ্জাবী ধরিয়া একটান দিল। অনিল ফিরিতেই সে খিল্ খিল্ করিয়া বলিল, "দিয়ে দাও গো। বেচারী মেয়েমানুষটি মারা যাচ্ছে, এখন তার শেষ ইচ্ছা রক্ষা করতে হয়।" সে ঘরের ভিতর গিয়া শাড়ীখানা নিজেই বাহির করিয়া আনিল।

লোকটির চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। শাড়ীখানা হাতে করিয়া সে বলিল, "আপনাকে ধন্যবাদ দেবার চেষ্টাও কর্‌ব না সম্ভব হয় ত জিনিষটা দু'চার দিনের মধ্যেই আমি ফেরত দিয়ে যাব।

লীলার জ্বর কিছু বাড়িয়া যাওয়াতে তাহাকে লইয়াই অনিল আর সুষমা এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিল যে, শাড়ীর কথা একরকম তাহারা ভুলিয়াই গেল। তবু অনিলের মনে পঞ্চাশটা টাকা মারা যাওয়ার শোক এক-একবার মাথা জাগাইয়া উঠিতেছিল। সুষমার দু'একবার মনে হইল সেই মেয়েটি না জানি কেমন আছে।

দুপুরের দিকে লীলার জ্বর বেশ খানিকটা কমিয়া যাওয়াতে, অনিল একবার আফিশ ঘুরিয়া আসিতে গেল। কাল হইতে সুষমার স্নানও হয় নাই, আহারও হয় নাই। লীলা দিব্য ঘুমাইতেছে দেখিয়া সুষমা তাড়াতাড়ি গিয়া স্নান সারিয়া আসিল। তারপর খাওয়াটাও কোনোক্রমে শেষ করিয়া সে লীলার পাশে গিয়া শুইল। ঘুমাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, একটুখানি গড়াইয়া বিশ্রাম করিয়া

লইবার আশায় সে শুইয়াছিল। কিন্তু শরীরের ক্লান্তি তাহার মনের সংকল্পকে অল্পসময়েই হার মানাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

দরজার কড়ানাড়ার শব্দে লীলার ঘুমটা চট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সে সুষমাকে ঠেলা দিয়া ডাকিতে লাগিল, "মা, ম', দেখ দরজার কাছে কে যেন ডাক্‌ছে।"

সুষমা উঠিয়া দেখিতে গেল আহ্বানকারীটিকে। কপাটে একটা সুবিধামত ছিদ্র ছিল, তাহার ভিতর দিয়া দেখিল সেই ভদ্রলোকটি দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। সুষমা দরজা খুলিবে কিনা ভাবিতে লাগিল, কারণ অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস তাহার ছিল না। কিন্তু মানুষটির মুখে এমন গভীর বেদনার চিহ্ন, যে বেশী ইতস্ততঃ না করিয়া সে দরজা খুলিয়া দিল। বলিল "উনি ত নেই, বেরিয়ে গেছেন।"

লোকটি বলিল "আমি আপনারই কাছে দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি মা। আমার টাকা নেই যে শাড়ীর দাম দেব, কিন্তু শাড়ী ফিরিয়ে দেবার শক্তিও আমার নেই। আমার স্ত্রী চ'লে গেছেন। যাবার আগে শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন যে তাঁকে যেন ঐ শাড়ীখানি পরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। যখনি আমার ক্ষমতায় কুলবে আমি আপনাদের অর্থের ঋণ শোধ করে যাব মা, কিন্তু দয়ার ঋণ কোনোকালে শোধ হবে না।"

সুষমার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "শাড়ীটা আমারই জন্যে কেনা হয়েছিল, আমিই আপনাকে দিচ্ছি। টাকার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না, যখন হয় দেবেন।"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন মা," বলিয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

সুষমা ঘরে গিয়া দেখিল লীলা নিজের যত হাঁড়িকুঁড়ি বাহির করিয়া খাটময় ছড়াইয়া খেলিতে বসিয়াছে। সুষমা খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বিকালের রান্নার জোগাড়ে লাগিল।

সুষমার সব কাজ ছিল খুব গোছালো, পরিপাটি। লীলার অসুখের ধাক্কায় রান্নাঘর ক'দিন পরিষ্কারই করা হয় নাই। সে এখন ঝাড়িয়া মুছিয়া সব ঠিক করিতে লাগিল। কাজের মধ্যে সে এমনি ডুবিয়া গেল যে, রাস্তা দিয়া যে বাজনার শব্দ ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিতেছে, সেদিকে তাহার খেয়ালই রহিল না।

হঠাৎ সদর দরজাটা সশব্দে খুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখেছ গো, জোচ্চোরটার কর্ম্ম? একটু এসে দেখে যাও।"

সুষমা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া বলিল "কি? কি হয়েছে?"

"জানলা দিয়ে দেখনা, তাহ'লেই দেখ্‌বে কি হয়েছে।" অনিলের উত্তেজনায় অবাক হইয়া সুষমা জানলা দিয়া তাকাইয়া দেখিল। রাস্তা দিয়া একদল শ্মশানযাত্রী চলিয়াছে। তাহাদের সামনে ব্যাণ্ডের বিলাতী বাজনা· আর একদল ভিখারী। বারেবারে মুড়ি খই, কড়ি আধ পয়সা প্রভৃতি যা ছিটানো হইতেছে তাহাই কুড়াইবার জন্য ইহারা শকুনির মত কাড়াকাড়ি করিতেছে।

চারজন লোক ছোট একটি দড়ির খাটিয়ায় মৃতের দেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেহটি তরুণী রমণীর তাহার সুন্দর মুখে শান্তির হাসি তখনও জলজল্ করিতেছে। তাহার শুভ্র কপালে সিঁদুরের ফোঁটা শুকতারার মত ফুটিয়া আছে, পরিধানে তাহার সেই ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীটি।

অনিল হাত নাড়িয়া বলিল, "যাক্, টাকাও গেল, শাড়ীটাও গেল। কিন্তু লোকটা কি পাজী!"

সুষমা জানলার কাছে নত হইয়া মৃতা রমণীকে নমস্কার করিতেছিল। অনিলের কথায় বলিল, "অমন কথা বোলোনা গো, আমার শাড়ীর জন্যে কোনো দুঃখ নেই। অমন কপাল যেন আমার হয়। লোকটি এসে শাড়ী রাখবার অনুমতি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেছে। মেয়েটির শেষ ইচ্ছা আমাদের জন্যে যদি রক্ষা না হত, তাহলে, আমাদের ওপর শাপ লেগে থাকত।"

অনিল কথা বলিল না। পরদিন গিয়া সে সুষমার জন্য একখানা অল্প মূল্যের নীল ঢাকাই শাড়ী কিনিয়া আনিল, কারণ পূজার সময় যেমন তেমন হউক একখানা নূতন শাড়ী পরা চাই ত? ইহাতেই সুষমাকে

এমন সুন্দর দেখাইতে লাগিল যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

অনিল নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এখন মেয়েটা সেরে উঠ্‌লেই বাঁচি। যা লোকসানের কপাল আমার।"

লীলা নূতন ফ্রকটি পরিয়া খাটের উপর বসিয়াছিল। তাহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া সুষমা বলিল, "ঠিক ভাল হ'য়ে যাবে। সতী লক্ষ্মী স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছে।"

মহর্‌-রম্‌-উল-হরাম

[পবিত্র মহর্‌-রম মাস]

শ্রী অমৃতলাল শীল

অরব দেশে প্রচলিত-মাসের প্রথম মাসের নাম মহর্‌-রম্‌ [অথবা মোহর্‌-রম্‌]। শব্দের অর্থ পবিত্রীকৃত। অরবী হর্‌ম (বা হর্ম) হইতে গঠিত। হর্ম শব্দের অর্থ পবিত্র। গৃহের যে অংশ পবিত্র, যেখানে বাহিরের লোক আসিতে পায় না তাহাকে হর্ম বলে, ইংরাজিতে Harem হইয়া গিয়াছে।

অরব দেশে মক্কা নগরের প্রধান ও পবিত্র মসজিদ যে কত কাল হইতে উপাসনালয় রূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা ইতিহাস ঠিক করিয়া বলিতে পারে নাই। অরব-বাসীরা বলেন, ঈশ্বর আদি মানব আদমকে স্থূল মৃত্তিকা উপাদানে সৃজন করিয়া স্বর্গের উদ্যানে রাখিয়াছিলেন। আদমকে সৃজন করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর লঘুতর অগ্নি উপাদানে জিন (genii) ও লঘুতম আলোক উপাদানে ফিরিশ্‌তা (angels) সৃজন করিয়াছিলেন। স্থূল মৃত্তিকা উপাদানে আদমকে সৃজন করিয়া ঈশ্বর তাহাতে আপনার নফ্‌স (spirit) দিয়া প্রাণ সঞ্চার করিলেন। তাহার পর ফিরিশ্‌তা angel ও জিনদের genii বলিলেন, ইহা আমার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, ইহাকে সম্মান কর। তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিল, কিন্তু একটি প্রধান শ্রেণীর একটি ফিরিশ্‌তা বলিল, "আমাকে আপনি লঘুতম ও সূক্ষ্মতম আলোক উপাদানে বহুপূর্ব্বে সৃজন করিয়াছেন, আমি সূক্ষ্ম, এ মনুষ্য স্থূল শরীরযুক্ত, মৃত্তিকা হইতে আমার বহু পরে সৃজিত, অতএব আমি ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া সম্মান করিতে পারি না, ও করিব না।" অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বর ঐ ফিরিশ্‌তাকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সে ঈশ্বরের সম্মুখেই প্রতিজ্ঞা করিল, "আমি আপনার এই তথাকথিত শ্রেষ্ঠ জীবকে নানা প্রকারে প্রলোভিত করিয়া বিপথগামী করিব, দেখি আপনি কিরূপে রক্ষা করিতে পারেন"। সেই অবধি ঐ ফিরিশ্‌তা "শয়তান" (Satan) নামে প্রসিদ্ধ হইল, ও আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যকে নিরয়গামী করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছু কাল পরে, ঈশ্বর আদমের বুকের বামদিকের পাঁজরার একখানি হাড় বাহির করিলেন, ও তাহা দিয়া হব্বা (Eve) নামক একটি স্ত্রীমূর্ত্তি সৃজন করিয়া আদমকে দান করিলেন। ঈশ্বর আদমকে স্বর্গের উদ্যানের সকল ফল মূল খাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, কেবল একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শয়তান হব্বাকে প্রলোভিত করিয়া ঐ বৃক্ষের ফল খাইতে বলিলে হব্বা আপনি খাইলেন ও আদমকে খাওয়াইলেন। এই অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বর অত্যন্ত কুপিত হইলেন, ও উভয়কে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া পৃথিবীতে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রবাদ আছে যে আদম স্বর্গ হইতে আধুনিক

সিংহল দ্বীপে (Ceylon) এক গিরিশিখরে পড়িয়াছিলেন, সেখানে পাথরের উপর তাঁহার পায়ের দাগ আছে, ও ঐ গিরিশৃঙ্গকে আদমের শৃঙ্গ (Adam's Peak) বলে। হব্বা মক্কার কাছে মরুদেশে একস্থানে পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীতে আসিবার পর, প্রায় নয় শত বৎসর উভয়ে উভয়কে খুঁজিয়া পাইলেন না। পরে ফিরিশ্‌তা হজরৎ জিব্রঈলের (Gabriel) অনুগ্রহে মক্কার নিকট উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। হজরৎ জিব্রঈল মনুষ্যরূপে দেখা দিয়া বলিলেন, "এইবার তোমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া ও উপাসনা করা উচিত।" আদম বলিলেন, "আমি ত ধন্যবাদ দিতে অথবা উপাসনা করিতে জানি না।" হজরৎ জিব্রঈল তখন উভয়কে কি করিয়া উপাসনা করিতে হয়, সবিস্তারে শিক্ষা দিলেন। যেখানে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, মক্কার মসজিদ ঠিক সেই স্থানে নির্ম্মিত। আদম সেদেশের খাদ্যদ্রব্য সুলভ নহে দেখিয়া হব্বাকে লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিলেন, কিন্তু তাঁহারা প্রথম উপাসনার স্থানটি পবিত্র ও তীর্থরূপে চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানে প্রতি বৎসর অন্তত একবার গিয়া সেই স্থানে বসিয়া উপাসনা করিয়া আসিতেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে, হজরৎ নূহের (Noah) সময়ে প্লাবনে—যখন সকল পৃথিবীই ডুবিয়া গিয়াছিল, তখন উপাসনা-স্থানের চিহ্নও লোপ পাইয়া ছিল।

ইহার বহু কাল পরে, একেশ্বরবাদী ভক্ত হজরৎ ইব্রাহীমের সিরিয়া দেশে বাসকালে দুই স্ত্রীর গর্ভে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। গৃহ বিবাদের ভয়ে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলকে তাঁহার মাতার সহিত স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে বলিলেন। কনিষ্ঠ ইসহাক তাঁহার কাছে রহিলেন। কিছুকাল পরে, তাঁহার একবার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইল, তিনি খুঁজিতে খুঁজিতে পুত্র ও তাঁহার মাতাকে আধুনিক মক্কাতে পাইলেন। দেখিলেন, পুত্র বেশ গোছাইয়া সংসার পাতিয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে ইসমাঈল উপাসনা করিতে জানেন না। তিনি হজরৎ জিব্রঈলের মুখে শুনিয়াছিলেন ঐ প্রদেশে কোনও স্থানে হজরৎ আদমের উপাসনার স্থান আছে, তিনি ঐ ফিরিশ্‌তার সাহায্যে সে স্থান খুঁজিয়া বাহির করিলেন, ও সে স্থানের চারিদিকে পাথর ও কাদা দিয়া প্রাচীর গাঁথিয়া চিহ্নিত করিয়া দিলেন। এই স্থানটি লম্বা ও চওড়ায় ঠিক সমান ও চতুষ্কোণ না হইলেও প্রায় সমকোণযুক্ত চতুষ্কোণ। সেই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানই এখনকার "কাবা" বা মক্কার প্রধান উপাসনালয়, ও পৃথিবীতে প্রাচীনতম উপাসনার স্থান, অতএব পবিত্রতম স্থান। সেকালে প্রাচীর প্রায় চার ফুট উচ্চ ছিল, ও ছাদ ছিল না; ক্রমে লোকে প্রাচীর উচ্চ করিয়া লম্বা ও চওড়ায় প্রায় সমান করিয়া ফেলিয়াছে ও ছাদ করিয়াছে অতএব ঘর খানি কাবার (Cube) মত দেখিতে হইয়াছে, সেইজন্য উহার নাম "কাবা" হইয়াছে। এখন প্রাচীরগুলি ভাল কাটা পাথরের ও পাকা করা হইয়াছে, কিন্তু ভীত কেহ পরিবর্ত্তন করে নাই, হজরৎ ইব্রাহীমের বাঁকা চোরা ভীতের উপরই পাকা প্রাচীর করিয়াছে, পবিত্র জ্ঞানে প্রাচীন ভাতই রাখিয়াছে।

এই ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কায় মসজিদ পৃথিবীতে প্রাচীনতম উপাসনালয়। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এই উপাসনালয়ে চিরকাল একেশ্বরবাদীরা উপাসনা করিয়াছেন, তবে মধ্যে মধ্যে দেশের লোক আকাশের সূর্য্য, চন্দ্র, তারাকে ঈশ্বরের "জ্যোতি" বলিয়া সম্মান করিয়াছে, ও হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে দেশের লোকেরা আপনার আপনার বংশের প্রধান যোদ্ধাদের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া উপাসনালয়ে সাজাইয়া রাখিয়া ছিল, ও পরে তাহাদের সম্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিগুলিকে কখনও কেহ "ঈশ্বর" বলিয়া পূজা করে নাই। হজরৎ মহম্মদ এরূপ ৩৬০টি মূর্ত্তি উপাসনালয়ে পাইয়াছিলেন।

হজরৎ ইব্রাহীমের দুই পুত্র; ইসমাঈল অরবদের আদি পিতা, অতএব হজরৎ মহম্মদ তাঁহার বংশজ। অন্য পুত্র ইসহাক সিরিয়াতে বাস করিয়াছিলেন। ইহুদীরা ও ও যিশু খৃষ্ট তাঁহার বংশজ।

হজরৎ মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষেরা মক্কা নগরের ও উপাসনালয়ের রক্ষক ছিলেন, অতএব দেশের রাজা বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার বংশের নাম "কোরেশ"। ঐ বংশ অরব দেশে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ছিল। সেকালে

প্রতি বৎসর শীতকালে তিনমাস "পবিত্র কাল" বিবেচিত হইত, তখন লোকে মারামারি বা প্রতিহিংসা গ্রহণ করিত না। প্রতি বৎসর এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসীরা বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া মক্কাতে তীর্থ করিতে আসিত। সেই সময়ে সকল বংশের প্রধানেরা একত্রিত হইয়া সমাজের লোকের বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। অতএব এই তীর্থের সময় সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই আদরণীয় ছিল। তখন অরবদেশে মলমাস গণিত হইত, অতএব বসন্তকালেই হজ করিবার মাস [জি-উল-হজ্] পড়িত। প্রধান দেশের রাজারূপে বিশেষ আর্থিক লাভ ছিল না, তাঁহাদের ভরণ পোষণ বাণিজ্য দ্বারা হইত। মক্কায় প্রধানদের এই বাৎসরিক মিলনের সময়ে বিস্তর ব্যয় হইত। লাভ অতি অল্প হইত। তাঁহারা আতুর যাত্রীদের আহার দিতেন, ও সকল যাত্রীকেই মহামূল্যবান বস্তু—জল-দান করিতেন। বাণিজ্যের উপর সামান্য শুল্ক লাভ করিতেন।

মক্কায় প্রধান আচার্য্যরূপে হজরৎ মহম্মদের বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্মান ছিল, কিন্তু তাঁহাদের আয় ছিল বাণিজ্য হইতে। হজরতের পিতামহ অবদুল মুত্তলিবের (Abdul Muttalib) সময়ে বাণিজ্যে ক্ষতি হইয়া, তিনি কষ্টে পড়িয়াছিলেন কিন্তু বার্ষিক মেলার সময়ের দান কমান নাই। তাঁহার ১১।১২টি পুত্র ছিল; হজরতের পিতা অবদুল্লা (Abdullah) একাদশ পুত্র ছিলেন। অবদুল্লা সেকালে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর যুবক ছিলেন। মদীনা নগরের একটি অদ্বিতীয়া সুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। একমাত্র পুত্র মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বেই অবদুল্লার কাল হইল। ইহার ৬।৭ বৎসর পরে মহম্মদের মাতাও মদীনা নগরে দেহরক্ষা করিলেন। মহম্মদকে তাঁহার পিতামহ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহম্মদ অতি সুন্দর, প্রিয়দর্শন, শান্তস্বভাব, চিন্তাশীল, সত্যবাদী বালক ও যুবক ছিলেন। তাঁহার পিতামহ একমুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। ৫৭০ ঈশাব্দে মহম্মদের জন্ম হইয়াছিল। যখন তাহার বয়স ১০ বৎসর তখন তাহার পিতামহর কাল হইল। তাঁহার প্রতিপালনের ভার বৃদ্ধ আপনার অন্তপুত্র, অবদুল্লার সহোদর ভ্রাতা অবুতালিবকে (Abu Talib) দিয়া গেলেন। মহম্মদ সেকালের নিয়ম-মত লেখাপড়া শেখেন নাই; তাঁহার নিরপেক্ষ বিচার দেখিয়া দেশবাসীরা তাঁহাকে অমীন (Ameen) অর্থাৎ নিরপেক্ষ বিচারক (Judge) উপাধি দিয়াছিল। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বেশ বুঝিতেন। সে-সময়ে হজরতের ভাবী পত্নী খদীজা (Khadija) বিবি মক্কায় কোরেশ বংশে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালিনী বণিক ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার গমস্তা-রূপে নিযুক্ত হইলেন, পরে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের সময়ে খদীজা মহম্মদ অপেক্ষা ১৫ বৎসর বয়সে বড় ও চার কন্যার মাতা, দুই স্বামীর বিধবা ও অতুল ধনশালিনী ছিলেন। বাণিজ্যে ক্ষতি হওয়াতে অবুতালিব কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইজন্য মহম্মদ তাঁহার এক পুত্র অলীকে প্রতিপালন করিবার ভার লইলেন। অলীর জন্ম ৬০১ ঈশাব্দে হইয়াছিল। তিনি শিশুকাল হইতেই মহম্মদের প্রীতির আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়াছিলেন।

যখন ৬১২ ঈশাব্দে হজরৎ মহম্মদ জানিতে পারিলেন যে, তিনি সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছেন, তখন সকলের আগে হজরতের পত্নী খদীজা তাঁহাকে "রসুল" বলিয়া গ্রহণ করিলেন, অতএব খদীজা প্রথম মুসলমান। তাহার পরেই বালক অলী—তাঁহাকে "রসুল" বলিয়া স্বীকার করিলেন, অতএব পুরুষদের মধ্যে হজরৎ অলীই প্রথম মুসলমান। ৬২২ ঈশাব্দ পর্য্যন্ত মহম্মদ লাঞ্ছিত হইয়াও মক্কাতে আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অবুতালিব ও খদীজা উভয়ে একমাসের মধ্যে দেহ রক্ষা করিলেন। অতএব দেশ-বাসীর বিপক্ষতা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। কোরেশরা মহম্মদকে প্রাণে মারিবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। তখন তিনি অন্ধকার রাত্রে আপনার বাল্য-বন্ধু অবুবকরকে সঙ্গে লইয়া গোপনে পলাইতে বাধ্য হইলেন। পথে, প্রাণের ভয়ে কয়েক দিবস পর্ব্বত-গুহাতে লুকাইয়া ছিলেন। পরে, কেবল রাত্রে ভ্রমণ করিয়া, মদীনা নগরে প্রবেশ করিলেন।

মদীনাবাসীরা অতি সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। দিন দিন তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ৬৩১

ঈশাব্দে তিনি একবার মক্কা নগরে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন। নয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি অন্ধকারে একমাত্র বন্ধুকে সঙ্গে হইয়া প্রাণরক্ষার্থ মক্কা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ৩০,০০০ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুসলমান তাঁহাকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছিল। ৬৩২ ঈশাব্দে তিনি দেহরক্ষা করিলেন।

হজরৎ মহম্মদ ৬১২ ঈশাব্দে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর-আজ্ঞা পাইবার অল্পকাল পরে একদিন আপনাদের জ্ঞাতিদের সভাতে "ঈশ্বর ও ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর বলিলেন, "আমার একটি সাহায্যকারী খলীফার প্রয়োজন। আমি দেখিতেছি আমার যাহা করা উচিত তাহা একা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" যখন কেহই সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন বালক অলী সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, মহম্মদও তাঁহাকে "খলীফা" রূপে স্বীকার করিলেন। সে-সময়ে এরূপে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়া কম সাহসের কার্য্য ছিল না। মহম্মদ যখন ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন তখন দর্শকেরা তাঁহাকে ইঁট পাথর মারিয়া রক্তাক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিত, ধর্ম্মকথা কেহই শুনিতে চাহিত না। তাঁহার যে দশা হইত তাঁহার খলীফেরও সেইরূপ দশা হওয়া সম্ভব ছিল। ৬৩১ ঈশাব্দে মক্কা হইতে ফিরিবার পথে (শিয়ারা বলেন) মহম্মদ আবার অলীকে "খলীফা" রূপে প্রচারিত করিলেন। কিন্তু সুন্নীরা এ কথা স্বীকার করেন না।

৬৩২ ঈশাব্দে হজরৎ মহম্মদের কাল হইলে যখন অলী তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন তখন অন্য প্রধানেরা তাঁহাকে সংবাদ না দিয়াই অবুবকরকে খলীফা নির্ব্বাচিত করিলেন। খদীজার গর্ভে মহম্মদের একমাত্র কন্যা ফাতিমার জন্ম হইয়াছিল। এই ফাতিমার গর্ভে অলীর ঔরসে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, একটি শৈশবেই মরিয়া যায়, বড়র নাম অলহসন ও ছোট অলহুসেন। এই ছোট পুত্র অলহুসেনই মহরমের লোমহর্ষক কাণ্ডের নায়ক। খদীজার মৃত্যুর পর মহম্মদ আর দশটি বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু আর সন্তান হয় নাই। অতএব মরিবার সময়ে তিনি দুই দৌহিত্র, কন্যা ফাতিমা ও জামাতা অলীকে আপনার উত্তরাধিকারী রূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

৬৩২ ঈশাব্দে হজরৎ মহম্মদ স্বর্গারোহণ করিলে মুসলমান-প্রধানেরা তাঁহার প্রায় সমবয়স্ক বন্ধু. ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী আয়েশার পিতা অবুবকরকে তাঁহার "প্রতিনিধি" বা "খলীফ" নির্ব্বাচিত করিলেন। এই নির্ব্বাচনে মুসলমানদের দুইটি দল হইয়া গেল; তাহা ভবিষ্যতে শিয়া ও সুন্নী রূপ ধারণ করিয়াছে। যে দলের এখন নাম সুন্নী, তাহারা বলিল, হজরৎ মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেরিত "রসুল" ছিলেন, তাঁহার প্রতিনিধি কেহ হইতে পারে না, পৃথিবীতে কেহই তাঁহার আসনে বসিবার অধিকারী নহে; বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং বহুবার বলিয়াছেন তিনিই "খাতিম-উল-মুরসলেন" অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষ মধ্যে শেষ ব্যক্তি, ভবিষ্যতে কোনও কালে আর প্রেরিত পুরুষ আসিবে না। তবে তিনি যেমন পেশনমাজ রূপে মুসলমানদের নমাজ পাঠ করাইতেন, সকলের রক্ষক ছিলেন, সেইরূপ রক্ষকের যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহার শিষ্য মধ্যে উপযুক্ততম ব্যক্তিকে আমরা নির্ব্বাচন করিয়া লইব, সেই প্রয়োজন অনুসারে আমরা অবুবকরকে [জন্ম ৫৭৩, মৃত্যু ৬৩৪] নির্ব্বাচিত করিলাম। অন্য দল বলেন, হজরৎ আপনার জীবিতাবস্থায় একাধিকবার অলীকে আপনার "খলীফ" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তবে এখন অলীকে ছাড়িয়া অন্য লোক নির্ব্বাচন করিবার প্রয়োজন কি? একজন খলীফের অস্তিত্ব সত্ত্বে অন্যকে খলীফ বলা অন্যায় হয়। ইহা ছাড়া, মুসলমানদের রক্ষকের উচ্চ আসন হজরৎ মহম্মদের সন্তানের উত্তরাধিকার স্বরূপ প্রাপ্য, সন্তানের অবর্ত্তমানে নিকট আত্মীয় ও জ্ঞাতির প্রাপ্য। উপস্থিত ক্ষেত্রে অলীর অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাঁহার অবর্ত্তমানে দুই ভাই হসন ও হুসেনের প্রাপ্য। এই কথা লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে, কিন্তু ইহার মীমাংসা হয় নাই। সুন্নীরা বলিলেন, হজরতের ব্যক্তিগত ভাবে নিজের যদি কোনও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তবে তাহা তাঁহার সন্তানের—পুত্র বা কন্যার—প্রাপ্য। কিন্তু "রসুল" ভাবে কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহা সমাজ বা সঙ্ঘের প্রাপ্য। কিন্তু গুরুর

আসন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নহে, যে উপযুক্ত হইবে তাহারই প্রাপ্য। যাহা হউক ৬৩২ ঈশাব্দে অবুবকর খলীফ নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহার দুই বৎসর পরে ৬৩৪ ঈশাব্দে অবুবকরের দেহান্তের পর, প্রধানেরা ওমরকে (Omar) দ্বিতীয় খলীফ নির্ব্বাচিত করিলেন। ওমরের সময়ে মুসলমান সঙ্ঘ আর কেবল উপাসকদের দল রহিল না, তখন তাহারা পারস্যের ও রুমের (Byzantine) রাজ্যদ্বয় জয় করিয়া একটি অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। এখন মুসলমান পতির—অমীর-উল-মওমনীন—সম্মান সামান্য দলপতির সম্মানের মত নহে, উহা পারস্য ও রুম দেশের সম্রাট্‌দের মিলিত সম্মানের অপেক্ষা বেশী। তথাপি তাহাদের প্রধান খলীফ ওমর, রাজাদের মত ব্যয় করিয়া জাঁকজমক করিয়া জীবন যাপন করিতেন না। তিনি আপনার ব্যবসার আয় হইতে আপনার ব্যয় বহন করিতেন। মাদুর পাতিয়া বসিয়া, একটা মোটা কম্বলের জামা গায়ে দিয়া বসিয়া রাজকার্য্য করিতেন। একটি গল্প আছে, যে একদিন তিনি আপন দ্বারের দালানে ঐরূপ হীনবেশে মাদুরে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার একটি দাসী তদপেক্ষাও হীনবেশে কোনও কার্য্যে যাইতেছিল। ওমরের এক বন্ধু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, অমীর-উল-মওমনীনের দাসী কেমন মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া যাইতেছে।" ওমর অমনি বলিলেন, "তুমি ভুল করিয়াছ বন্ধু, ঐ স্ত্রীলোকটি অমীর-উল-মওমনীনের দাসী নহে, ও সামান্য এক বণিক ওমর বিনখত্তাবের (Omar-bin-khattab) দাসী। ওমর বাণিজ্যে আগে যত লাভ করিত, এখন আর তত পারে না, এই বেগার ঘাড়ে লইয়া আর বাণিজ্যে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারে না।" ওমর রাজকোষ হইতে বেতন স্বরূপ কিছুই লইতেন না। অবুবকর ওমরের মত ধনবান ছিলেন না, তিনি সাধারণ কোষ হইতে বেতন-স্বরূপ প্রত্যহ আধখানি মেষের মাংস লইতেন।

৬৪৪ ঈশাব্দে ওমর ঘাতকের ছুরিকাঘাতে মারা পড়িলেন। তখন মুসলমান-প্রধানেরা ওসমানকে (Osman) তৃতীয় খলীফ নির্ব্বাচিত করিলেন। ওসমান কোরেশ বংশীয়, অতএব হজরৎ মহম্মদের জ্ঞাতি-সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ইহা ছাড়া, খদীজাবিবির প্রথম স্বামীর ঔরসে যে চারটি কন্যা ছিল, তন্মধ্যে রুকিয়া (Rukiya) ওসমানের সহিত বিবাহিত হইয়াছিল, রুকিয়ার মৃত্যুর পর অন্য কন্যা, কুলসুমের (Kulsum) সহিত ওসমানের বিবাহ হইয়াছিল। খদীজা বিবির মৃত্যুর পর মহম্মদ যে দশটি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার একটি (আয়েশা) অবুবকরের কন্যা অন্যা (হাফেজা) ওমরের কন্যা। খদীজার গর্ভে জাত মহম্মদের একমাত্র সন্তান ফাতেমা (Fatima) অলীর সপত্নী হইয়াছিলেন। অতএব প্রথম বার জন খলীফের মধ্যে প্রথম দুইজন মহম্মদের শ্বশুর, ও শেষের দুইজন মহম্মদের জামাতা ছিলেন।

প্রথম দুই খলীফ যেরূপ নিরপেক্ষ ও নিস্পৃহভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ওসমান সেরূপ পারেন নাই বা করেন নাই; তিনি জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধব প্রতিপালক ছিলেন; স্বয়ং রাজকোষ হইতে বহু ধন লইয়া রাজাদের মত বাস করিতেন, তাঁহার কুটুম্ব ও বন্ধুরা বড় বড় রাজকার্য্য পাইয়াছিল, ও প্রয়োজনাতিরিক্ত বেতন পাইত, সাধারণ প্রজার প্রতি অত্যাচার করিত। ওসমানের কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে সাধারণ মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া বৃদ্ধ খলীফকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। এক কথায় প্রথম দুই খলীফের সময়ে খলীফরা আপনাকে সাধারণ মুসলমানের সমান, অবৈতনিক বা নামমাত্র বেতনভুক্ কর্ম্মচারী বিবেচনা করিতেন; ওসমানের সময়ে ইরান ও রুমের (Byzantine) সম্রাটদের অনুকরণে রাজা ও রাজপুরুষ হইয়া বসিলেন।

৬৫৬ ঈশাব্দে ৮২ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ওসমানকে অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী মুসলমানদের হস্তে মৃত্যুমুখে পড়িতে হইল। উপর উপর দুইজন খলীফকে ঘাতকের হস্তে মরিতে দেখিয়া যখন আর কেহও সম্মানাকাঙ্ক্ষী হইল না তখন প্রধানেরা বাধ্য হইয়া অলীর দ্বারস্থ হইলেন। অলী প্রথমে অস্বীকার করিলেন, তিনি কোরাণ-মতে নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি ওসমানের আত্মীয় প্রতিপালনের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাহাদের পদচ্যুত করিতে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। যখন সকলে অলীর নিরপেক্ষ বিচার স্বীকার করিতে সম্মত হইল, তখন

অলীও খলীফের পদ স্বীকার করিলেন। ওসমান বাগদাদে আপনার এক জ্ঞাতি মোয়াবিয়াকে (Moaviya) শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নানা কারণে অলী তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। মোয়াবিয়া সে-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কেবল যে অস্বীকার করিলেন তাহা নহে, তিনি অলীর নির্ব্বাচন অন্যায় হইয়াছে বলিয়া অলীকে খলীফ রূপে স্বীকার করিলেন না, ষড়যন্ত্র করিয়া সাধারণ মুসলমানদের উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মুসলমানদের রাজ্য এসময়ে যেরূপ-বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে মরুভূমি-বেষ্টিত মক্কা বা মদীনাতে বসিয়া সকল দেশ শাসন করা কার্য্যতঃ অসম্ভব হইয়াছিল। সেইজন্য অলী পারস্যের পশ্চিমে, বাগদাদের পূর্ব্বে, কূফা (Koofa) নামক নগরে বাস করিতেন। এই কূফার প্রধান মসজিদে ৬৬১ ঈশাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশ্য স্থানে ঘাতকের হস্তে অলী নিহত হইলেন।

অলীর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অল-হসন (Al-Hassan) খলীফ নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্র, গোলমাল ইত্যাদি সহ্য করিতে পারিতেন না; উপাসনা লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন; অতএব ৬৬১ ঈশাব্দের অগষ্ট মাসে তিনি ইচ্ছা করিয়া খলীফার আসন ত্যাগ করিলেন। মোয়াবিয়া নির্ব্বাচিত না হইলেও এখন সমস্ত মুসলমানদের সম্রাট্‌রূপে দমিশ্‌কে (Damascus) বসিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। হসনের সহিত মোয়াবিয়ার যে-সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে মোয়াবিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি আপনার জীবন-কালে রাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার পর আবার হসন, অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে হুসেন (Al-Husseyn) খলীফ হইবেন। ইহার অল্পকাল পরে হসনকে তাঁহার পত্নী মোয়াবিয়ার প্ররোচনায় বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। মোয়াবিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও মুসলমান প্রধানদের, কতক বলদ্বারা, কতক ভয় দেখাইয়া, আপনার পুত্র ইয়াজীদকে (Yazeed) যুবরাজ ও ভাবী উত্তরাধিকারী স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। প্রধানদের মধ্যে কেবল হুসেন ইয়াজীদের যুবরাজ-পদ স্বীকার করেন নাই। অতএব এই সময়ে প্রকারান্তরে নির্ব্বাচন-প্রথা উঠিয়া গেল; ইহার পর আর খলীফ নির্ব্বাচিত হয়েন নাই, উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার পর পুত্র খলীফ হইয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকরা অলী পর্য্যন্ত চার জন খলীফকে "খুলফায়-রাশদীন" বলেন, তাহার পর আর খলীফা বলিয়া স্বীকার করেন না। শিয়ারা খলীফ শব্দ ব্যবহার করেন না; তাঁহারা বলেন—ইমাম (Imam)। তাঁহারা অলীকে প্রথম ইমাম, হসনকে দ্বিতীয়, হুসেনকে তৃতীয় ইমাম বলেন; এইরূপে দ্বাদশ ইমাম হইয়াছিলেন। শিয়ারা প্রথম তিনজনকে (অর্থাৎ অবুবকর, ওমর, ও ওসমান) অনধিকারী রাজ্যাপহারী বলিয়া নিন্দা করেন; মহরমের সময়ে তাহাদের গালি দিয়া থাকেন, সেইজন্য সুন্নীদের সহিত বিবাদ হইয়া থাকে।

৬৮০ ঈশাব্দে মোয়াবিয়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ইয়াজীদ দমিশ্‌কে খলীফরূপে সিংহাসনারোহণ করিলেন। তখন অলী ও ফাতিমার জ্যেষ্ঠপুত্র অল-হসনের মৃত্যু হইয়াছিল, কনিষ্ঠ অল-হুসেন আপনার পুত্রপৌত্রাদি লইয়া মদীনাতে বাস করিতেছিলেন। কূফাবাসীরা এক-খানি আবেদনপত্রে নগরের দশ হাজার অধিবাসীর স্বাক্ষর করিয়া হুসেনের কাছে পাঠাইল, তাহাতে লিখিয়াছিল যে, "আমরা, হজরৎ মহম্মদের দৌহিত্র জীবিত থাকিতে, ইয়াজীদের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহি না; আপনি আসুন, আমরা আপনাকে খলীফ করিব। এই আবেদন-পত্রে যাহাদের স্বাক্ষর আছে তাহা ছাড়া আরও লক্ষ লক্ষ মুসলমান আপনার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।"

হুসেন মদীনাতে আপনার বন্ধুবান্ধবদের এই আবেদন-পত্র দেখাইলেন, পরে মক্কাতে গিয়া সেখানকার বন্ধুদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই কূফা-বাসীদের কথায় বিশ্বাস করিতে পরামর্শ দিলেন না। সকলেই বলিলেন, "কূফাবাসীরা অতি চঞ্চলমতি, ভীরু; তাহারা সম্ভবতঃ অন্তরে আপনার খিলাফৎ কামনা করে, কিন্তু ইয়াজীদের ক্ষাত্র বলের সম্মুখে কেহই আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে না, আপনি সেখানে যাইলে মহা বিপদে পড়িবেন।" যাহা হউক, কূফাবাসীদের বারবার আহ্বানে হুসেন লোভ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। তিনি সাত আট শত মাইল মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কূফা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার ও তাঁহার স্বর্গীয়

অগ্রজের স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি পরিবারবর্গ সকলেই ছিলেন; অর্থাৎ হজরৎ মহম্মদের বংশে যে কয়টি জীব তখন জীবিত ছিল, সকলেই সেই যাত্রীদলে ছিল।

অল-হুসেন কূফাতে আসিতেছেন, সংবাদ পাইয়া ইয়াজীদ কূফা নগরে আপনার পক্ষপাতী এক নূতন শাসনকর্ত্তা ও কিছু নূতন সাহসী সৈন্য পাঠাইলেন। নূতন শাসনকর্ত্তা কূফাবাসীদের স্পষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিলেন যে, "যে কেহ অল-হুসেনের পক্ষাবলম্বন করিয়া অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহাকে সবংশে অতি নির্দ্দয়ভাবে বিনাশ করিতে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন; তাহাদের প্রতি কোন প্রকার দয়া বা অনুগ্রহ করা হইবে না, অতএব কূফাবাসীরা সাবধান হউক।" কূফাবাসীরা স্বভাবতঃ অতি চঞ্চলমতি ও তদপেক্ষা বেশী ভীরু। তাহারা ইয়াজীদের ঘোষণা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, ও যদিও তাহারা অল-হুসেনকে সাত আট শত মাইল হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তথাপি তিনি আসিলে তাঁহাকে সাহায্য করিতে একটি লোকও অগ্রসর হইল না। অল-হুসেনের দলে তাঁহার এক কিশোরবয়স্ক পুত্র অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন। তিনি তখন অশ্বপৃষ্ঠে বসিতে পারিতেন না। তাঁহাকে একখানি খাটে শোয়াইয়া সেই খাটের চারিদিকে দড়ি ও বাঁশ বাঁধিয়া দোলার মত করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। যথা সময়ে হুসেনের দলে ইফ্‌রাৎ নদী (Euphrates) তীরে করবলা (Karbala) নামক স্থানে পহুঁছিলেন। তখন ইয়াজীদ-প্রেরিত দূত সসৈন্যে আসিয়া হুসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও বলিলেন, "আমার প্রভু খলীফ ইয়াজীদ আপনাকে অভিবাদন করিয়া আমাকে বলিতে বলিয়াছেন যে, যদি আপনি ইয়াজীদকে খলীফ বলিয়া স্বীকার করেন ও শপথ গ্রহণ করেন, তবে আপনাকে ইয়াজীদের সম্মানিত অতিথি রূপে কূফার রাজ-প্রাসাদে রাখা হইবে, ও পরে সসম্মানে দমিশকে লইয়া যাওয়া হইবে। কিন্তু আপনি যদি তাহা স্বীকার না করেন তবে আমাকে প্রাণপণে আপনাকে অগ্রসর হইতে বাধা দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। আমি রাজ-সেবক ও দূত মাত্র; রসুল অল্লার দৌহিত্রকে কটু কথা বলিবার বা তাঁহার পথ রোধ করিবার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" হুসেন ইয়াজীদকে খলীফ বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, অতএব সেনাপতি বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বাধা দিলেন। হুসেনের সহিত খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিন্তু জল ফুরাইয়াছিল; তাঁহার শিবিরে এক বিন্দু জল ছিল না। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, সকলেই জলাভাবে মরণাপন্ন হইয়াছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জলাভাবে জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক কাষ্ঠবৎ হইয়া গিয়াছিল; তাহাদের মাতাদের স্তনেও জলাভাবে দুগ্ধ ছিল না; শরীরের রক্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। শিবিরের সকলের জিহ্বা ও ওষ্ঠ এমন শুকাইয়াছিল যে, মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইতেছিল না। হুসেন বার বার বিপক্ষের সেনাপতির কাছে জল চাহিলেন, কিন্তু একই উত্তর পাইলেন, "ইয়াজীদকে প্রথমে খলীফ বলিয়া স্বীকার করুন, তবে আমরা আপনার সেবা করিব নতুবা সম্মুখে প্রায় দুইশত গজ দূরে নির্ম্মল জলপূর্ণ ইফরাৎ নদী প্রবাহিত, কিন্তু আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আপনাকে নদী-তীরে যাইতে, অথবা এক বিন্দু জল লইতে দিব না।"

পর দিবস হুসেনের দলের লোকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। হুসেন আপনার যে অল্প অনুচরগুলি সঙ্গে ছিল তাহাদের অনুরোধ, পরে আজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "ইয়াজীদের শত্রুতা কেবল আমার সহিত; অতএব আমাকে সে শত্রুতার ফল ভোগ করিতে দাও, তোমাদের সহিত ইয়াজীদের শত্রুতা নাই, তোমরা আমার সহিত কেন কষ্ট পাইতেছ ও প্রাণে মরিতেছ, তোমরা আমার শিবির ত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাও।" ইয়াজীদও তাহাদের শিবির ত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু সেবকেরা সে-কথা শুনিল না; বলিল, "আপনার সহিত আসিয়াছি এখন আপনার যে গতি আমাদেরও তাহাই; আপনাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া আমরা নিজের প্রাণ লইয়া পালাইতে পারিব না, যাইব না, অতএব বৃথা আজ্ঞা করিবেন না।" এই সময়ে হুসেনের এক প্রভুভক্ত অনুচর গলাতে একটি চামড়ার জলপাত্র বাঁধিয়া, তরবারি হস্তে সহস্র শত্রু ভেদ করিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল, জলপাত্র পূর্ণ করিল, কিন্তু স্বয়ং এক গণ্ডূষ জল খাইল না, ভাবিল তাহার

প্রিয় প্রভু জলাভাবে মরিতেছেন, সে কিরূপে আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিবে? সে যখন জল লইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল তখন শত্রুরা তাহার হাত, পরে পা কাটিয়া দিল, পরে মারিয়া ফেলিল। হুসেন জল পাইলেন না।

এইরূপে হুসেনের অনুচরদের প্রভুভক্তি ও সাহসের নানা কথা ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন। হুসেন আপন মৃত-প্রায় শিশু পুত্রকে দুই হাতে উচ্চ করিয়া তুলিয়া ইয়াজীদের সৈনিকদের দেখাইলেন ও বলিলেন, "হে ইয়াজীদের বীর যোদ্ধাগণ, তোমরা আমাকে বাধা দিতে আদিষ্ট হইয়াছ, আমাকে শত্রু বিবেচনা কর, অতএব আমার সহিত যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পার; কিন্তু এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি তোমাদের রসুল অল্লার বংশধর। * এখনও তোমাদের মধ্যে অনেক লোক আছে যাহারা রসুল অল্লাকে দেখিয়াছে, তাঁহার মুখে স্বর্গীয় সুধাপূর্ণ উপদেশ শুনিয়াছে। এই শিশুটি তাঁহারই বংশধর, সে তোমাদের শত্রু নহে, ইহাকে পীড়ন করিতে তোমরা আদিষ্ট হও নাই। আমি আপনার জন্য কিছু চাহিতেছি না। এই শিশুর জন্য অল্লাতালা ও রসুলের নামে ভিক্ষা করিতেছি, ইহাকে দয়া করিয়া, আপনাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদের স্মরণ করিয়া, এক গণ্ডুষ জল ভিক্ষা দিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা কর।"

হুসেন যখন এইরূপে বলিয়া সকলকে শিশুটি দেখাইতে-ছিলেন, তখন কোনও সহৃদয় সৈনিক শিশুকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর মারিল। শিশুর বুকে সেই তীর বিদ্ধ হইয়া পিঠ ফুঁড়িয়া বাহির হইল, ও সেই আঘাতে শিশু হুসেনের হাত হইতে নীচে পড়িয়া গেল। এইরূপে, মৃত-প্রায় শিশু জলাভাব-যন্ত্রণা হইতে চির-নিষ্কৃতি লাভ করিল। হুসেন, তাহাকে তুলিয়া একবার আদর করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন, পরে তাহার গর্ভধারিণীর ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও তোমার পুত্রের সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে, এখন সে অল্লাতালা ও আপনার পূর্ব্বপুরুষ রসুল-অল্লাহের কাছে পঁহুছিয়াছে।"

শিশুর মৃত্যুর পর হুসেন, এমন বিপত্তিকালেও, একাগ্রচিত্তে দুই প্রহরের নমাজ উপাসনা শেষ করিলেন, উপাসনার পর যুদ্ধ করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইবার জন্য যোদ্ধাবেশ ধারণ করিলেন। এত ক্লান্তি ও কষ্টের অবস্থা সত্ত্বেও তিনি যখন যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন শত্রুরা চারিদিক হইতে এককালে আক্রমণ করিয়াও সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহাকে নিহত করিতে পারে নাই। তিনি বহু শত্রু নিপাত করিয়া ও স্বয়ং বহু আঘাত পাইয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন।

এই ঘটনা ৬৮০ ঈশাব্দের ১০ অক্টোবর, ৬১ হিজরার মহরম মাসের দশ তারিখে হইয়াছিল। পৃথিবীতে যেখানে মুসলমানদের বাস আছে, বিশেষতঃ যেখানে অলীর পক্ষপাতী শিয়ারা বাস করেন, সেখানে প্রতিবৎসর এই নিদারুণ শোকের দৃশ্যের বার্ষিক স্মৃতি-রক্ষা অভিনয় করা হয়। এবৎসর [২১ জুলাই ১৯২৬] ঐ ঘটনার ১২৮৪তম বার্ষিক স্মারক দিবস। এ শোক-প্রকাশ কেবল মৌখিক নহে। যদিও ১২৪৬ সৌর বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি হজরৎ অলীর প্রকৃত ভক্তেরা প্রতি বৎসর এই সময়ে এমন শোকাকুল হইয়া পড়েন যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। লোকে হুসেনের মৃতদেহ বহন করিবার আধারের অনুকরণে, নানা ভঙ্গীতে তাজিয়া নির্ম্মাণ করে, মসজিদে ও ইমামবাড়াতে এই সময়ে মজ্‌লিস্‌ করিয়া হুসেনের মৃত্যু-কাহিনীর মর্সিয়া অতি করুণ ভাষাতে করুণ সুরে আবৃত্তি করে। সে শোক-গাথা শিক্ষিত কথকের মুখে শুনিলে মুসলমান, অমুসলমান উভয়ের অতি নির্দ্দয় পাষাণ হৃদয়ও একবার বিগলিত হয়, চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন করুণ রসের ঘটনা কোনও দেশে কোনও কালে ঘটে নাই। প্রতি মহরম মাসে হুসেনের পিপাসার কথা স্মরণ করিয়া মুসলমানেরা পথিককে সুবাসিত নির্ম্মল শীতল জল ও নানাপ্রকার শরবৎ দান করিয়া থাকেন।

অল-হুসেনের মৃত্যুর পর শিবিরের পুরুষ মাত্রেই নিহত হইল। অতএব ইয়াজীদের অনুমান অনুসারে হজরৎ মহম্মদের বংশে আর কেহ রহিল না। কিন্তু দোলাশায়ী পীড়িত যুবকের কথা কাহারও মনে ছিল না।

* হজরৎ মহম্মদের তিরোধানের ৪৮ বৎসর পরের ঘটনা।

হুসেনের কতক অনুচরেরা তাহাকে একটি ইরাণীর কুটীরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বিজয়ী সৈনিকরা কতক লুট করিতে ব্যস্ত ছিল, কতক অন্ধকারে দেখিতে পায় নাই। কিছুকাল পরে, এই যুবকের সহিত ইরাণের শেষ রাজ-বংশের এক রাজকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। তাহাদের বংশধরেরাই এখন হজরৎ মহম্মদের বংশের প্রদীপ। তাহাদের এখন "সৈয়দ" অর্থাৎ "সম্মানিত" শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। ইরাণে ও ভারতে যত সৈয়দ আছে অরবে তত নাই। অরব দেশে সৈয়দ বলিয়া তাঁহাদের তত সম্মানও করা হয় না।

চর্‌কার গান

(ওয়াডর্স্‌ওয়ার্থের অনুবাদ)

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায়

গুঞ্জন-ভরা তব চর্‌কার গাত্রে,
তোলো তোলো ঘূর্ণী শান্ত এ রাত্রে।
রাত্রির সাথে এল অবসর মনোরম;
দাও দাও চর্‌কায় দাও পাক হরদম।

যদি, অঙ্গুলি শ্রান্তিতে ক্লান্তই হ'য়ে যায়—
স্বপনের দেশ থেকে শক্তি সে ফিরে পায়।
শিশিরের ওড়নায় রাত্তির ঢেকে মুখ,—
বিছাইল ধরণীর বুকে অঞ্চলটুক।
রাত্রি শান্তিতে ভরে' লয়ে বক্ষ
দাও দাও চর্‌কায় দাও পাক লক্ষ।

তারা-ভরা আকাশের তলে যত ধেনুপাল
জড়ো করে' এনে তোলো চরকায় মৃদু তাল।
ধেনুগণ যবে মাঠে শুয়ে ঘোর নিদ্রায়,
সুমধুর স্বর উঠে তখনি তো চর্‌কায়;—
গতি হয় বাধাহীন, নাহি টুটিবার ডর—
সুচারু সূতার রেখা হ'য়ে আসে ক্ষীণতর।

দু'দিনের ভালবাসা—ক্ষণিকের সুখ-গান
চঞ্চল-আঁখি-কোণে লভে চির-অবসান।—
যবে, দিনান্তে পাহাড়ের ঘেঁসিয়া শ্যামল বুক,
নিদ্রিত ধেনু শুয়ে লভে বিশ্রাম-সুখ;—
শুভ্র তূলার বুক নিঙাড়িয়া চর্‌কায়,
চিক্কণ মনোরম যে তন্তু বাহিরায়,—
সত্য ও অনাদির বুক থেকে কুড়ানো—
নিত্যের মহা প্রেম ওরি সাথে জড়ানো।

কষ্টি পাথর

ভারতে কুষ্ঠ-সমস্যা

১৯১১ সালের আদমসুমারিতে দেখা যায় যে, কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ১০৯০৯৪ জন। ১৯২১ সালের আদমসুমারিতে উহার সংখ্যা দাঁড়াইল ১০২৫১৩ জন। Frank Oldrieve হিসাব করিয়া বলেন, প্রতি লক্ষের মধ্যে ৩২টি লোক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।

বেদে কুষ্ঠের উল্লেখ আছে, বাইবেলে খৃষ্ট বলিয়াছেন—Cleanse the lepers; গ্রীক ভাষায় "lepra" কথাটি চর্ম্মরোগজ্ঞাপক "Tarath" শব্দটির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। Aristotle খৃঃ পূঃ ৩৪৫ সালে কুষ্ঠ-রোগের বর্ণনা করিয়াছেন এবং Galen (80 A. D.) জার্ম্মানীতে এই ব্যাধির বিষয় লিখিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আরো বলেন যে, আফ্রিকা হইতে এই ব্যাধি ইয়োরোপে ও পরে আমেরিকাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রায় ৩০০০০০০ লক্ষ কুষ্ঠ-রোগী আছে। তন্মধ্যে প্রায় ২০০০০০ রোগী ভারতবর্ষে, প্রায় ৮ লক্ষ আফ্রিকার ইংরেজাধিকৃত প্রদেশসমূহে এবং অবশিষ্ট রোগী সিংহল, মরিশস্, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপসমূহে আছে।

সমগ্র ইংলণ্ডে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা মাত্র ৫০ জন। ১৯২০ সালে Icelandএ ৬৭ জন লোককে কুষ্ঠ-রোগে ভুগিতে দেখা গিয়াছে। নরওয়েতে ১৪০ জন। সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যে তিন হাজার রোগী দেখা যায়। স্পেন দেশেই নাকি সবচেয়ে বেশী কুষ্ঠ রোগী আছে। তাহাদের সংখ্যা মাত্র ৫২২ (১৯০৪ সালের census)। আর আমাদের দেশে ২ লক্ষ।

১৯২১ সালের প্রতি লক্ষের মধ্যে বর্ম্মাতে—৭৪ জন, আসামে—৫৬ জন, মধ্যপ্রদেশে—৫০ জন, মাদ্রাজে—৩৭ জন, বোম্বেতে—৩৬ জন, বাংলায় ৩৩ জন, বিহারে ৩২ জন, যুক্ত প্রদেশে—২৭ জন, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে—১১ জন, ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে—৯ জন কুষ্ঠ-রোগী।

দেশীয় করদ রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতি লক্ষে ত্রিবাঙ্কুরে ৫১, কোচিনে ৪৮, কাশ্মীরে ৪৬, হায়দ্রাবাদে ৩৪, বরোদাতে ২৬, গোয়ালিয়রে ১৫, মহীশূরে ৫, রাজপুতনা ও আজমীরে ৪ জন আছেন।

পৃথকীকরণ (segregation), চিকিৎসা ও রোগ-বিস্তার-রোধের (arrest of infection) ব্যবস্থা হইলেই এই ব্যাধির প্রকোপ কমিবে।

১৮৯০-৯৫ সালে হাউয়াই (Howaii Islands) দ্বীপপুঞ্জে হাজার-করা ১১জন রোগী ছিল। কিন্তু পৃথক করার ফলে ১৯১১-১৫ সালে দেখা গেল, হাজার-করা ৩জনে দাঁড়াইল।

ভারতে যদি ২ লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তাহার মধ্যে মাত্র ৯০০০ কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা হইতেছে। সর্ব্বসমেত ৭৩টি প্রতিষ্ঠান আছে এবং উহাতে মাত্র ৭৩১১টি রোগী আছে। বিরাট জন-সংখ্যার তুলনায় ইহা সমুদ্রে বারি বিন্দুবৎ নহে কি ?

পঞ্জাবে	৫টি	আশ্রমে	৪৭০টি	রোগী
যুক্ত প্রদেশে	১৪	,,	৮০২	,,
বিহার-উড়িষ্যাতে	৯	,,	১৩২২	,,
বাংলাতে	৩	,,	৬৪৯	,,
মধ্য প্রদেশে	৯	,,	১৩৭৩	,,
বোম্বেতে	১৪	,,	১০৯১	,,
মাদ্রাজে	১১	,,	৯৭৯	,,
বর্ম্মাতে	৪	,,	৫৫৬	,,
আসামে	৩	,,	৬৯	,,

বাংলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১৫৮৯৭ জন, অথচ তাহার জন্য মাত্র ৩টি চিকিৎসাগার আছে।

বাঁকুড়া, রাণীগঞ্জ ও কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রমে ৬৪৯টি লোক মাত্র চিকিৎসিত হইতে পারে।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)

শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী

—

ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট্ বা উদ্ভিজ্জ ঘৃত

এতদিন নানারূপ মৃত জীবের অনিষ্টকর চর্ব্বিই ঘৃতের সহিত মিশ্রিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিদেশজাত একপ্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল পদার্থ নূতন আমদানী করিয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ঘি বলিয়াই বাজারে প্রচলিত হইতেছে। এই পদার্থটির নাম ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট্। নারিকেল-তৈল প্রভৃতির ন্যায় ইহা উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত হয়। অবশ্য উহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে নাকি কোন অপকারী পদার্থ নাই। কিন্তু অপকারী পদার্থ নাই বলিয়াই যে তাহা স্বাস্থ্যের উন্নতির পথে অনুকূল হইবে এমন হইতে পারে না। আমরা যাহা আহার করি স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানের জন্যই করিয়া থাকি। এরূপ যে দ্রব্যের দ্বারা শরীর পুষ্ট হইবে তাহা পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া আহার করাতে কোনও ফল নাই। বিশেষতঃ যাহা ঘি নহে তাহা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘি বলিয়া প্রচলন অথবা ঘিয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। অনেকে আইন করিয়া ইহার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করাইয়া ইহার বহুল প্রচার বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সরকার বলেন যে, আইন করিয়া ইহার আমদানী বন্ধ করিলে ঘৃতে স্বাস্থ্যহানিকর দূষিত পদার্থের ভেজাল বাড়িয়া যাইবে, কারণ, প্রয়োজন-অনুযায়ী ঘি এদেশে উৎপন্ন হয় না। সরকারের এই উক্তির বিরুদ্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাহার উক্ত কথা সত্য হইলে বিদেশ হইতে আনীত উদ্ভিজ্জ ঘৃতের আমদানী যত শীঘ্র সম্ভব কমাইবার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন ; কারণ, যদি এই পদার্থ ঘিয়ের পরিবর্ত্তে প্রচলিত হইয়া যায়, তবে আমাদের দেশের অবনত

গোশালা ও গাভীগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে। একেই ত এদেশে গরু এবং গোশালার রীতিমত যত্নের অভাবে গব্য পদার্থের উৎপাদন কমিয়া আসিতেছে। এরূপ স্থলে যদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ আসিয়া ঘিয়ের স্থান অধিকার করিয়া লয় তবে গব্য উৎপাদন-প্রচেষ্টা যে আরও কমিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব সরকার হইতে যদি ইহার আমদানী কমাইবার জন্য সত্বর চেষ্টা না করা হয় তবে ফল যে কি হইবে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু কেবল আইন সৃষ্টির আশায় সরকারের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। যাহাতে আমাদের গোশালার অবস্থা উন্নত করিয়া প্রচুর পরিমাণে দুধ ঘি উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহার জন্য সরকারের সাহায্যে ও বেসরকারী ব্যক্তিগত ভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীরও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, এই ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট্ যেন ঘি নামে ও ঘিয়ের পরিবর্ত্তে বাজারে প্রচলিত না হয়। অধিকন্তু ভেজাল দেওয়ার কুপ্রথা যাহাতে সমূলে বিনষ্ট হয় অবিলম্বে এরূপ আইন সৃষ্টি করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য।

(আবাদ, বৈশাখ ১৩৩৩)

—

নারীগণের আত্মরক্ষার উপায়

প্রতিদিনই খবরের কাগজে নারীনির্যাতনের সংবাদ বাহির হইতেছে, তবু লোকলজ্জার ভয়ে কত সংবাদ প্রকাশই হয় না। দেশের মেয়েদের এই অপমান ও লাঞ্ছনার কথা যখনই মনে হয়, তখনই মন বিষাদে ও লজ্জায় অভিভূত হয়।

নিজেকে উন্নত করিবার, বিপদ হইতে মুক্ত হইবার, এবং অপরকে মুক্ত করিবার বুদ্ধি ও শক্তির বিকাশ করিতে হইলে দেশের মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে শারীরিক বলের চর্চা করা দরকার, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিশদরূপে দেওয়া কর্ত্তব্য। জগতে পাশব বল কি? তদ্দ্বারা নারীরা কিরূপে বিপন্ন হয় এবং কিরূপেই বা আত্মরক্ষা করা যায় তাহা তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝান উচিত। মেয়েরা যদি দৈহিক ও নৈতিক বলে বলশালিনী হয় তবে জগতে এমন কোন পাশবিক শক্তি নাই যাহা তাহারা জয় করিতে না পারে।

এই অত্যাচারের প্রতীকারের উপায় আমাদের মেয়েদেরও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যেসকল মেয়ে, উচ্চশিক্ষা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা ও সাহস অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের উচিত প্রতি পল্লীতে মেয়েদের উন্নতির ও শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করা ও তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারের শক্তির বিকাশ সাধন করা।

এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রত্যেক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দানই যখন প্রকৃত শিক্ষা-পদবাচ্য, তখন তাঁহাদের মেয়েদের ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইলে কোন শিক্ষাই কার্য্যকরী হইবে না।

বাংলা দেশের মধ্যে কলিকাতায় নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। কাজেই, বেথুন কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রভৃতির কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়া ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন এবং প্রথম পথপ্রদর্শন করেন তবে অপরাপর স্থানেও এই পন্থা নিশ্চয় অনুসৃত হইবে।

এবিষয়ে বরোদার বালিকা-বিদ্যালয়-সংক্রান্ত ব্যায়াম বিদ্যালয় দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য। তথাকার স্কুলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে আগত একজন মনস্বিনী নারীর মনে প্রথম এই বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় এবং তিনি তাঁহার ভাইকে বরোদার ব্যায়াম-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নিজেরা শিক্ষা করিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেন। প্রথমে কেহই মেয়েদের এই শিক্ষা দরকার মনে করিতেন না, বরং রীতিমত বিরুদ্ধে ছিলেন, পরে সকলেই ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন বরোদার মহারাজাই ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ঐ বিদ্যালয়ের মেয়েরা শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতেছে। জাতীয় জীবনের মূলস্বরূপা মাতৃজাতি যদি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না হয় তবে তাহাদের সন্তানগণও শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে নিশ্চয় উন্নত হইবে।

(মাতৃমন্দির, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) শ্রীমতী শ্যামমোহিনী দেবী

—

বেগম লুৎফ-উন্নিসা

অভাগিনী লুৎফ-উন্নিসার সম্বন্ধে কেহই বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। সিরাজচরিত্রের জটিল অধ্যায়গুলি পরিস্ফুট করিতে তাঁহারা যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও যদি তদীয় প্রিয়তমা বেগম লুৎফ-উন্নিসার চরিত্রাঙ্কনে ব্যয়িত হইত, তবে হয়ত আজ আমরা সিরাজের নৈতিক ও পারিবারিক বিবরণ সম্বন্ধে অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারিতাম।

যিনি প্রেমে, ভক্তিতে, সৌন্দর্য্যে, গৌরবে ও আত্মসম্ভ্রমে এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিশ্বস্ততায় জীবনের শেষ-দিন পর্য্যন্ত অটলা ছিলেন সেই মহিয়সী রমণী-রত্নই বেগম লুৎফ-উন্নিসা।

বেগম লুৎফ-উন্নিসা প্রথমে সিরাজ-জননীর বাঁদী-রূপে হারেমে পদার্পণ করেন। জনশ্রুতি এই যে, তিনি বঙ্গদেশীয় কোন হিন্দুরাজ-নন্দিনী ছিলেন। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত মোস্‌লেম দুহিতা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সিরাজের আগ্রহ দেখিয়া সিরাজ-জননী স্বীয় পেয়ারের বাঁদী লুৎফ-উন্নিসাকে স্বীয় পুত্রের হস্তেই সমর্পণ করিলেন। বেগম লুৎফ-উন্নিসার গর্ভেই সিরাজের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সম্পদের সময়ে লুৎফ-উন্নিসা যেরূপ ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী ছিলেন, বিপদের সময়েও তেমনি তিনি তাঁহার পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই।

সিরাজ মীরজাফরকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই; পরে যখন চিনিতে পারিয়াছিলেন, তখন প্রতিকারের আর কোনই উপায় ছিল না। সুতরাং এই মহাপাপিষ্ঠের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই এই তরুণ নবাবের ভাগ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। রণক্ষেত্রে জয়ের আশা নাই দেখিয়া যখন তিনি মুর্শিদাবাদ বা মনসুরগঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার ভাগ্যরবি ডুবিয়া গিয়াছে। সুতরাং আত্মীয়স্বজন ও অনুচরগণ কেহই তাঁহাকে কোনরূপ আশা-ভরসা দিলেন না। এমন-কি তাঁহার শ্বশুর মোহাম্মদ ইরিজ খাঁ পর্য্যন্ত এই দুর্দ্দিনে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন। সিরাজ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া একাকী পলায়ন করাই স্থির করিলেন। কিন্তু সাধ্বী সহধর্ম্মিণী পতিগতপ্রাণা বেগম লুৎফ-উন্নিসা কোন মতেই তাঁহাকে একাকী পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। বারবার তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া কাতরভাবে তাঁহাকে সঙ্গে লইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সিরাজ তাঁহাকে প্রথমে পথের কষ্টের কথা জানাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

ইহার দুই দিবস পরে অর্থাৎ ২৪শে জুনের গভীর রাত্রে সিরাজ তাঁহার ধনরত্ন ও মণিমাণিক্য কয়েকটি হস্তীর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া বেগম লুৎফ-উন্নিসা ও শিশু কন্যাকে লইয়া আবৃত গো-শকটে আরোহণ পূর্ব্বক গোপনে নগর ত্যাগ করিলেন। তিনি সাধারণ পলাতকের ছদ্মবেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কোন ক্রমে পাটনায় উপস্থিত হইতে পারিলে সেখান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি পাটনা অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। দুর্ভাবনা, পথশ্রম ও গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বেগম লুৎফ-উন্নিসা প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা করিতে নিরত হইলেন এবং রুমাল দ্বারা ব্যজন করিয়া ঘাম মুছাইয়া রৌদ্রপীড়িত স্বামীকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভগবানগোলায় পৌঁছিয়া সিরাজ সপরিবারে নৌকারোহণ করিলেন এবং তথা হইতে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজমহল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে বহরল নামক স্থানে তাঁহাদের নৌকা অচল হইয়া গেল; কারণ, গঙ্গার অপর পার্শ্বে নাজিরপুরের মোহনার দিকে যাইবার মত পানি তখন পাওয়া গেল না।

সিরাজ সপরিবারে তিন দিবস তিন রাত্রি প্রায় সম্পূর্ণ উপবাসে কাটাইয়া বহরলে উপস্থিত হইলেন। ক্ষুধায় কাতর সিরাজ বহরলে অবতরণ করিয়াই নিকটবর্ত্তী গ্রামে খাদ্যের সন্ধানে চলিলেন এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ দানা শাহ নামক এক পাষণ্ড ফকিরের আস্তানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদে বহুমূল্য জুতা দেখিয়া পাপাত্মা ফকিরের বিষম সন্দেহ হইল এবং মাঝির নিকট খোঁজ লইয়া—তিনি কে, তাহা সে শীঘ্রই জানিয়া ফেলিল। পুরস্কারের লোভে উক্ত পামর গোপনে মীর কাসেমের নিকট নবাবের সংবাদ প্রেরণ করিল। সিরাজ স্ত্রী-কন্যা ও ধন-রত্নসহ বন্দী হইলেন; তাঁহাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিয়া বন্দী অবস্থায় রাখা হইল।

সিরাজের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে অনেকেই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কেহই বেগম লুৎফ-উন্নিসার মত শোকে বিহ্বলা হন নাই। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে মীরজাফর নবাবের অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের সহিত তাঁহাকে ও তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক শিশু-কন্যাকে ঢাকায় বন্দী করিয়া রাখে। সেইখানেই তাঁহারা সাত বৎসর বন্দী অবস্থায় ছিলেন। সরকার হইতে তাঁহাদিগের জন্য যৎকিঞ্চিৎ মাসহারা নির্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তাহাও তাঁহারা নিয়মিতভাবে পাইতেন না। তাঁহাদিগের বন্দী জীবনের খাদ্য এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির জন্য তাঁহাদিগকে দারুণ কষ্ট পাইতে হইত। মইনুদ্দৌলা মুজাফ্‌ফার জঙ্গ মোহাম্মদ রেজা খাঁ ঢাকায় আসিয়া তাঁহাদিগের দুঃখ-কষ্টের অনেক লাঘব করেন। তিনি নিয়মিতভাবে মাসে মাসে তাঁহাদিগের বরাদ্দ টাকা তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। ইহার পর সুচতুর ইংরাজগণ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন ও সুনাম রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন।

ইহার পর অভাগিনী লুৎফ-উন্নিসা জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি স্বামীর গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। একদা মুর্শিদাবাদের জনৈক প্রসিদ্ধ আমির তাঁহার পাণিপীড়নে উৎসুক হইয়া একান্ত আগ্রহের সহিত প্রস্তাব করিলে তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত বিনীত ভাবেই নিরস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যিনি একদা হস্তীর অধিকারিণী ছিলেন, অভাবে পড়িয়া অশ্বতর লাভ করিলে তাঁহার অন্তর তৃপ্ত হইতে পারে কি?

এইখানেই আমরা তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব দেখিতে পাই। দারিদ্র্য অথবা লাঞ্ছনা কোন দিনই তাঁহাকে স্বামী-চিন্তা হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি যে সিরাজকে কত গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিলেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

মুর্শিদাবাদে মতি-ঝিলের অপর পার্শ্বে অর্থাৎ ভাগিরথীর দক্ষিণ দিকে "খোশবাগ" নামক যে-সমাধি-উদ্যান ছিল, তাহার পর্য্যবেক্ষণের ভার তিনি গ্রহণ করেন। এইখানেই নবাব আলীবর্দ্দী ও তাঁহার পরম স্নেহের দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা পাশাপাশি সমাহিত হইয়াছিলেন। এই সমাধিক্ষেত্রের লগ্ন লঙ্গরখানা (অন্নছত্র) ও অতিথি-নিবাস প্রভৃতির ব্যয়ের জন্য মাসিক ৩০৫ তিন শত পাঁচ টাকা ধার্য্য ছিল। বেগম লুৎফ-উন্নিসাই তাহা প্রাপ্ত হইতেন।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বেগমেরা মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি আর্জি পেশ করেন। তাহাতে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য ইংরাজ সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ জানান হয় এবং তাঁহাদের অবশিষ্ট দিনগুলির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎসামান্য মাসহারা প্রার্থনা করা হয়। এই আর্জিতে যে-সকল মহিলার শীলমোহর (সহি) ছিল, তন্মধ্যে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর বিধবা পত্নী বেগম সারাফ-উন-নিসা এবং বেগম লুৎফ-উন্নিসা ও তাঁহার কন্যার শীল-মোহরই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই দরখাস্তে কোনই ফল হয় নাই। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে বেগম লুৎফ-উন্নিসা বড়লাট বাহাদুরের কাছে আর-একখানি দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দরখাস্তের অবিকল অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইল:—

"নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার আত্মীয়দিগের বিশেষতঃ আমার অলঙ্কার ও ধনরত্ন সমস্তই লুণ্ঠিত হইয়াছে। আমি এক্ষণে অতিশয় দুঃখ কষ্ট ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিন গুজরান করিতেছি। আমার এ দুঃখের কাহিনীর পুনরুল্লেখ করিয়া অপরের দয়া আকর্ষণ ও নিজের কষ্টের বৃদ্ধি করিতে চাহি না। সেইজন্য আমি অল্প কথায় জানাইতেছি যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর আমরা মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খাঁ কর্ত্তৃক জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) নির্ব্বাসিত হইয়া তথায় বন্দী অবস্থায় বাস করিতেছিলাম এবং ৬০০্ টাকা হিসাবে মাসহারাও পাইতেছিলাম। তৎপরে কোম্পানী বাহাদুর যখন নিজ হস্তে দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন, তখন আমরা জাহাঙ্গীরনগর হইতে দেশে ফিরিয়া আসি। আমার কন্যার মৃত্যুর পর ঐ ৬০০্ টাকা পুনরায় বিভক্ত হইয়া যায়। তাহাতে আমার চারিটি দৌহিত্রী ৫০০্ টাকা পায় আর আমি মাত্র ১০০্ টাকা প্রাপ্ত হই। আমার আশ্রিতা ও বাঁদীদিগের অনেকে পুরাতন নবাবের জীবিতকাল হইতেই আমার অধীনে অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগকে এক্ষণে বিদায় দিতে আমি অক্ষম। কারণ, আমার মৃত স্বামীর সম্মান ও গৌরব তাহাতে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইবে। তদ্ব্যতীত সমাজে আমাদিগের পদ ও সম্মান বজায় রাখিবার জন্য কতকগুলি পুরুষ ভৃত্য বাহাল করাও একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, এইসমস্ত ব্যয়ের জন্য আমাকে কোন জায়গীর প্রদত্ত হয় নাই এবং অন্য কোনরূপ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয় নাই। অধিকন্তু নবাবের মৃত্যুর পরেই আমার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সবই অপহৃত হইয়াছে। আমার চারিটি দৌহিত্রীর মধ্যে দুইটি বিবাহিতা; তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে। সেই কারণে তাহাদিগের ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। অপর দুইটি এখনও অনূঢ়া; তাহাদিগের বিবাহের গুরুভার এখন আমারই উপর রহিয়াছে এবং সে-ভার আমাকেই বহন করিতে হইবে। কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন রাজা যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁহার পত্নী ও সন্তানসন্ততিগণ কোন অংশেই তাহার জন্য

দায়ী হইতে পারেন না এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে কোনরূপ দণ্ড দান করাও সঙ্গত নহে। ইহাই দেশ-কাল-প্রচলিত প্রথা এবং ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত রাজধর্ম্ম। এযাবত কোম্পানী এই ভাবেই কাজ করিয়া আসিয়াছেন যে, যখনই কোন পদস্থ ব্যক্তি অন্যায় ও অনুচিত কার্য্যের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তখনই তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির জন্য মাসহারার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু আমার বেলায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল কেন জানি না। এপর্য্যন্ত সসম্মানে সাধারণভাবে জীবন যাপন করিবার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই আমার জন্য করা হয় নাই।"

প্রথম পত্রের ন্যায় সরকার বাহাদুর এপত্রখানিও অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং তাঁহার নিজের ১০০৲ শত ও দৌহিত্রীদিগের ৫০০৲ শত টাকার উপরই তাঁহাকে আজীবন নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

এইরূপে লুৎফ-উন্নিসা ৩৪ বৎসর যাবত বৈধব্য-দশায় দারুণ দুঃখ-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিয়া সিরাজের সমাধি পার্শ্বেই শেষ-আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বামী-প্রেমের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ আজিও খোশবাগে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

(ইস্‌লাম-দর্শন, চৈত্র ১৩৩০)

—

গ্রাম্যবিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

অনেক স্থলে দেখা যায়, ছাত্রেরা রীতিমত স্কুলে উপস্থিত হয় না এবং সেই কারণে পাঠোন্নতিও সন্তোষজনক হইতে পারে না। এই বিঘ্ন দূর করিবার জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া দেখা যাইতে পারে।—

(ক) প্ররোচনা দ্বারা ছাত্র সংগ্রহ করিয়া স্কুলের প্রতি তাহাদের এমন আকর্ষণ জন্মাইতে হইবে যেন ছেলেরা নিজ হইতেই স্কুলে প্রত্যহ আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

(খ) স্কুল-কম্পাউণ্ড এবং স্কুল গৃহ এমন চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার প্রয়োজন যে, ছাত্রেরা অবসর-সময়েও অন্যত্র না গিয়া যেন এইখানেই আসিয়া খেলা বা বিশ্রাম করে।

(গ) প্রথম শিক্ষার্থীদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কোন-কোন অভিজ্ঞ শিক্ষকও নীচের দিকে মনোযোগ অল্প দেন ও মনে করেন প্রত্যেক বৎসর একটি ছেলে দ্বারা বৃত্তি আনিতে পারিলেই তাঁহার কৃতিত্বের প্রমাণ হইল। বাস্তবিক মনে এরূপ উদ্দেশ্য রাখা ভুল।

(ঘ) শিক্ষাদানের ফল এমন হওয়া উচিত যে, যাহারা স্কুল ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, তাহারা যেন অশিক্ষিতদের অপেক্ষা অধিকতর সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে; তাহারা যেন অধিকতর স্বাস্থ্যবান্, চরিত্রবান্, কর্ম্মক্ষম ও সুবিবেচক হইতে পারে। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের ক্ষেত্রের ফসল অন্য লোকের ফসল অপেক্ষা ভাল হওয়া উচিত; কারবারে গেলে, তাহাদের কারবার ভাল চলা উচিত; তাহাদের ভদ্রতা শীলতা প্রভৃতি গুণ থাকা উচিত।

স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ ও রীতিমত মেরামত করিয়া রাখা এক সমস্যা। সামান্য মেরামত ছেলেদের সাহায্যে নিজেরাই করিয়া নেওয়া মন্দ নয়। ইহাতে ছেলেরা শ্রমের মর্য্যাদা শিক্ষা করিয়া নিপুণ গৃহস্থ হইতে পারে, শিক্ষক মহাশয়কে তাহাদের একজন সহকর্ম্মী মনে করে ও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। বেঞ্চের অভাব একটি সমস্যা। এজন্য চাটাইর ব্যবস্থা করার বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয়। অনেক স্কুলেই হস্ত-সম্পাদ্য কাজের মধ্যে চাটাই বুনন শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি এইসকল কাজের সময় ঐগুলির ব্যবহারিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, তবে নিজেদের প্রস্তুত চাটাইতেই বালকেরা বসিতে পারে।

যে-সকল বিদ্যালয়ে বাগানের উপযুক্ত ভূমি আছে, সেখানে ছেলেদের সাহায্যে শিক্ষক বাগান প্রস্তুত করিবেন। ইহার উৎপন্ন ফসল ছেলেরাও ভোগ করিবে।

গণিত—স্থূল সংখ্যার সাহায্য অনেক স্থলেই নেওয়া হয় না। প্রত্যেক নূতন নিয়ম শিক্ষাদানের প্রারম্ভে ঐ নিয়মসংক্রান্ত মানসাঙ্ক অনেকগুলির সমাধান বালকদের দ্বারা করান দরকার। তার পর সহজ সহজ অঙ্ক শ্লেটে বা কাগজে কষিতে দেওয়া উচিত। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে যেখানে লক্ষ, কোটি পর্য্যন্ত সংখ্যার গুণ ও ভাগ অঙ্ক প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে দেওয়া হয় ও তাহাতে ছাত্রেরা ভয় পায়।

বানান শিক্ষা—ধ্বনির সহিত বানানের সম্বন্ধ-জ্ঞান জন্মাইবার চেষ্টা করা উচিত। এইজন্য পুস্তকে প্রাপ্ত শব্দের অনুরূপ বাহিরের শব্দের আলোচনা আবশ্যক। 'শীত' শব্দটি পুস্তকে আছে ইহা শিখাইয়া, তাহার প্রয়োগ শিক্ষার উদ্দেশ্যে, 'পীত' 'গীত' 'নীল' প্রভৃতি এবং 'জ্ঞান' শব্দের সঙ্গে 'অজ্ঞান' 'সংজ্ঞা' 'প্রজ্ঞা' প্রভৃতি শব্দের আলোচনাতে উপকার হয়। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, ছেলে আকার যোগ শিখিয়াছে, অথচ 'বাজার' 'পাহাড়' 'কামার' প্রভৃতি শব্দ জিজ্ঞাসা করিলে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে।

চিত্রাঙ্কণ—পেন্সিলের উপর অযথা জোর দেওয়া হয়, অগ্রভাগ সরু করিয়া কাটা হয় না। কাজ দিবার পূর্ব্বে পেন্সিল প্রভৃতি ঠিক কাটা আছে কি না দেখিয়া দেওয়া উচিত। প্রথম কয়েক দিন একটু দেখিলেই পরে ছেলেরা সতর্ক হইবে। অঙ্কিত চিত্রের অশুদ্ধি সংশোধন করা আবশ্যক।

সাহিত্য—অধীত গল্পের বা প্রবন্ধের মর্ম্মোপলব্ধি যাহাতে বালক-বালিকারা করিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। দেখা যায়, শব্দার্থ শিক্ষা মন্দ হয় নাই, কিন্তু বিষয়সংক্রান্ত কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শ্রেণী নিরুত্তর। শিক্ষক পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহার সারমর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রেণীতে আলোচনা করিয়া পরে পাঠ আরম্ভ করাইবেন ও উক্ত বিষয়ে কথোপকথন করিবেন।

আবৃত্তি—কবিতা আবৃত্তির সময় ছেলেরা ঝড়ের বেগে বলিয়া যায়। ইহা শিক্ষক মহাশয় প্রথম হইতেই বারণ করিবেন এবং সুস্পষ্ট আবৃত্তির দৃষ্টান্ত নিজে দিবেন।

বস্তুশিক্ষা—এবিষয়টি যেভাবে সাধারণতঃ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যেক ছেলে নিজে বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তার পর তাহার বিবরণ-লিপি প্রস্তুত করিবে। শিক্ষক তাহাদিগকে এই কার্য্যে পরিচালিত করিবেন।

আদর্শ লিপি—আদর্শের অনুকরণে অক্ষর গঠন হয় কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। প্রত্যেক পংক্তি লিখার পর, আদর্শের সঙ্গে তুলনা করা দরকার। এক পংক্তি বারংবার লিখিলেই অক্ষর ঠিক হইবে না। অক্ষর-গঠনের প্রয়াস থাকা প্রয়োজন। এক স্থানে দেখিয়াছি, "ভক্তিভরে করযোড়ে ডাক ভগবানে" বাক্যটি ৩ মাস কাল লিখান হইয়াছে, কিন্তু অক্ষরের অবস্থা "যথাপূর্ব্বং তথা পরম্"। এমন-কি, এরূপ দেখিয়াছি, প্রথম দিনের কাজের জন্য ১০এর মধ্যে ৩ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই একই বাক্য এক মাস কাল লিখার পর ০ পাইয়াছে। অনেক স্থানেই লিখা খারাপ হইবার কারণ, অনুপযুক্ত কলম ও খারাপ কালি। এইগুলি প্রথম প্রথম শিক্ষক লক্ষ্য করিলেই ছেলেরা সতর্ক হইবে। প্রত্যেক

বালকের সকল প্রকার লিখিত কার্য্যের লিখা এক ছাঁদের হওয়া চাই, নতুবা অক্ষর গঠিত হইবে না।

খাতা—জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত, এমন-কি কোথাও কোথাও ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দেখা যায় ছেলেদের খাতা বা পাঠ্যপুস্তক সংগৃহীত হয় নাই। শিক্ষক বলেন, অভিভাবক দেন না বা বাজারে পাওয়া গেল না, ইত্যাদি। তার পর, ছেলেরা খাতা প্রস্তুত করিতে পারে না। আমার বোধ হয় ডিসেম্বরের শেষ হইতেই এইজন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন; কোনও কোনও শিক্ষক তাহাই করেন। এক কেন্দ্রের অন্তর্গত সকল শিক্ষক যদি একত্র পাইকারী দরে তাহাদের দরকার মত কাগজ ইত্যাদি আনয়ন করেন, তবে ব্যয় কম পড়িতে পারে। ভাল খাতা বাঁধাই করা হস্তসম্পাদ্য কাজবিশেষ।

রচনা—রচনা শিক্ষার জন্য প্রথম প্রথম ছেলেদের দ্বারা তাহাদের জানা গল্প বলাইবার চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না। গ্রামের উৎসব বা অন্য নানা ঘটনার বিবরণ গল্পচ্ছলে তাহাদের দ্বারা বলাইয়া, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের ও অন্যের খবর লইয়া, কৌশলের সহিত কথার ধারা পরিচালন-ক্রমে বর্ণনার অভ্যাস জন্মাইতে পারেন।

চরিত্র-গঠন—এই বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষক এমন কিছু করিবেন না যাহা ছেলেদের অনুকরণের অযোগ্য। ছাত্রেরা শিক্ষকেরই অনুকরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করে।

ছাত্রেরা কখন কখন শ্লেট, পেন্সিল, স্কেল বা পাঠ্যপুস্তক নিজে আনে না, এবং তজ্জন্য একে অপরের জিনিষ লইয়া টানাটানি করিতে থাকে। প্রথম প্রথম দিন কয়েক শিক্ষক, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে, ছেলেরা আর ঐনকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য ফেলিয়া আসিবে না।

ছুটীর সময় হইলে, শিক্ষক ছাতা নিয়া বাহির হইলেন ও ছেলেরা গোলমাল করিয়া বিশৃঙ্খল অবস্থায় স্কুল ছাড়িতে লাগিল। এইরূপ না করিয়া শিক্ষক যদি ২ মিনিট পরে, অর্থাৎ সুশৃঙ্খলার সহিত একে একে ছেলেরা বাহির হইয়া গেলে গৃহ হইতে বাহির হন, তবে তাহারা শৃঙ্খলা শিক্ষা করিবে।

(শিক্ষা-সেবক, মাঘ ১৩৩২) শ্রী প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ

—

ইরাণে নরঘাতক সম্প্রদায়

ঈশাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারতময় এক নরঘাতক সম্প্রদায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের প্রচলিত ভাষাতে "ঠগ" বলিত। তাহাদের উদ্দেশ্যে হত্যা ও লুণ্ঠন উভয়বিধ ছিল। এই সম্প্রদায়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিল, তাহারা নরহত্যাকে পাপ বিবেচনা করিত না।

ইতিহাসে পাই, ঈশাব্দের একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইরাণ দেশে এক নরঘাতক সম্প্রদায় Society of Assassins প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার কাহিনী কৌতূহলপ্রদ।

ইরাণের প্রসিদ্ধ সম্রাট অলপ্-অর্‌সলান ১০৭৩ ঈশাব্দে মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মলিক শাহ রাজ্যলাভ করিলেন। সে-সময়ে প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও রাজনীতিজ্ঞ নিজাম-উল-মুলক তুসী (জন্ম ১০১৭, মৃত্যু ১৪।১০।১০৯২) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। হসন সব্বাহ নামক এক উৎসাহী যুবক অলপ্-এব-সলাঁর চোবদার mace-bearer শ্রেণী মধ্যে ছিলেন। তিনি মালিক শাহের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন, তখন ষড়যন্ত্র করিয়া নিজাম-উল-মুলুককে তাড়াইয়া স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। মলিকশাহ হসনকে দোষী জানিয়া রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। হসন রাজমন্ত্রী নিজামের ভয়ে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, ও মনে মনে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। হসন রাজধানী হইতে পলাইয়া জন্মস্থান র‍্যা নগরে কিছুকাল লুকাইয়া ছিলেন, কিন্তু নিজামের জামাতা র‍্যা নগরের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলে পলাইয়া কহিরা Cairoতে ফাতিমীবংশীয় খলীফ মুসতনসিরের Mustansir শরণ লইলেন (১০৮৬)। খলীফ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ইসলাম-জগতে, অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপে ঘোর আন্দোলন হইতেছিল। হসন পারস্য দেশে এইরূপ আন্দোলন করিবার জন্য খলীফের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। খলীফ হসনকে বিদ্বান বুদ্ধিমান কর্ম্মঠ দেখিয়া আন্দোলন করিবার অনুমতি দিলেন। খলীফ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজামের নামে আন্দোলন করিতে বলেন এবং হসনও সেইরূপ করিতে স্বীকার ও প্রতিজ্ঞা করিলেন। খলীফের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্য এক পুত্র মুসতাঅলী আপনার অগ্রজ নিজারকে নিহত করিয়া স্বয়ং মিশরে খলীফ হইলেন, কিন্তু ইরাণে হসন নিহত নিজার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে খলীফ বলিয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অতএব আন্দোলনকারীদের দুইটি দল হইয়া গেল। মিসর উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপে মুসতা-আলী ইমাম বা খলীফ বলিয়া প্রচারিত হইলেও কাহিরা Cairoতে আপনার রাজধানী করিলেন, কিন্তু ইরাণে নিহত নিজার ও তাঁহার পুত্র ইমাম বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। এখন এই দুই সম্প্রদায়েরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পশ্চিম ভারতে গুজরাটের বোহিরা সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা মুসতা অলীর সম্প্রদায়ভুক্ত ও আধুনিক প্রসিদ্ধ হিজ্ হাইনেস আগা খাঁ নিজারী অর্থাৎ ইরাণী সম্প্রদায়ের প্রধান। এই আন্দোলনকারীরা নানা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের ইস্‌মাঈলী, ফতিমী তালিমী (doctrinaire), কির্‌মতী, বাতিনী (গুপ্ত-Esoteric), ইত্যাদি বলিত। পরে ইরাণের গোঁড়া মুসলমানেরা উহাদের মুল্‌হিদ্ (Impious Heretics) বলিতে আরম্ভ করিল ও অনেকে নিজারীও বলিত।

হসন এই সময়ে ইস্‌মাইলী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন। ঐ সম্প্রদায়ের দায়ীরা [প্রচারকে Missionary] হসনকে বুদ্ধিমান চতুর ও কর্ম্মঠ দেখিয়া আপনাদের সম্প্রদায়ের ভাবী প্রধান বা নেতারূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি গোপনে মলিকশাহের রাজ্য ধ্বংস করিবার উপায় চিন্তা করিতে-ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রাজ্যের উপযুক্ত কর্ণধার মন্ত্রী নিজাম উল-মুলককে প্রাণে মারিতে পারিলে অথবা মলিকশাহের সহিত বিরোধ ঘটাইতে পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইবে। এই সময়ে রঈস মুজফফর বিদ্রোহ-চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি হসনকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। হসন কতক কৌশলে কতক বাহুবলে, আপনার সামান্য কয়েকটি অনুচরের সাহায্যে অল-হামুত নামক গিরি-দুর্গ অধিকার করিলেন (১০৯০ঈ)। ইহার পর আপনার অনুচর-সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি শেখ-উল্-জবল্ [পার্ব্বত্য রাজা Mountain Chief] নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইউরোপের ঐতিহাসিকেরা অনুবাদ ভুল করিয়া, তাঁহাকে old man of the mountain নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। এই সময়ে একবার সম্রাটের অনুগত জেরুসালেমের রাজা (Titular King of Jerusalem) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অতিথিকে আপনার ক্ষমতা দেখাইবার জন্য দুইটি যুবককে ডাকিলেন। একটাকে আজ্ঞা করিলেন, আত্মহত্যা কর; সে তৎক্ষণাৎ একখানি ছুরি দিয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিল; অন্য যুবককে এক উচ্চ গিরিশৃঙ্গে উঠিতে বলিলেন, উঠিতে তাহাকে পাশের গভীর খাদে লাফাইতে আজ্ঞা করিলেন, সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িল ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হসন অতিথিকে বলিলেন, যাহা দেখিলেন আপনার সম্রাটকে বলিবেন। কখনও তিনি যদি এইরূপ আজ্ঞাবাহী সৈনিক

সৃষ্টি করিতে পারেন তবে যেন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবার সাহস করেন।

ইহার পর হসন এমন একটি উপত্যকা খুঁড়িয়া বাহির করিলেন, যাহার চারিদিকে ঋজু পর্ব্বতমালা এরূপে প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান, যে, বাহির হইতে সে উপত্যকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারা যাইত না। তাহার একমাত্র প্রবেশের পথে তিনি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ, ও ঐ দুর্গ-মধ্যে আপনার রাজপ্রাসাদোপম বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। উপত্যকাটি একটি মনোরম উদ্যানে পরিণত করিলেন। কোরাণে বহিশ্‌ত্‌ বা স্বর্গের যে-বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনা-মত উদ্যান ও তাহার মধ্যে নানাস্থানে সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। গৃহে নানা প্রকার চিত্র অঙ্কিত হইল, উদ্যানে নানাপ্রকার স্বাদু ফল ও বিচিত্র পুষ্প-বৃক্ষ রোপিত হইল, ও নানা স্থানে নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষতঃ মৃগনাভি দ্বারা সুগন্ধিত করা হইল। উদ্যান-মধ্যে চারটি পয়নালা প্রস্তুত করা হইল। তাঁহার আজ্ঞা হইলে এই পয়নালীতে দুগ্ধ, সুরা, মধু ও নির্ম্মল জল বাহিত হইত। উদ্যানে কতকগুলি পরম সুন্দরী চতুরা শিক্ষিতা যুবতী বিচরণ করিত। তাহারা কোরাণে বর্ণিত স্বর্গের হুরিদের অনুকরণে অভিনয় করিত। এইরূপে হসনের বহিশ্‌ত্‌ স্থাপিত হইল।

হসন বাছিয়া বাছিয়া সাহসী যুবকদের শিষ্য করিতেন, তাহাদের অস্ত্র-ধারণ, যুদ্ধবিদ্যা, ছদ্মবেশ-ধারণ, অভিনয়-কৌশল, নানাভাষায় কথোপকথন বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল যে, পৃথিবীতে গুরুই, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি। অতএব গুরুকে ঈশ্বরবৎ মান্য ও ভক্তি করিবে; গুরু বিরূপ হইলে ঈশ্বরও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না; গুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা কোরাণে বর্ণিত ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞাপেক্ষা বলবত্তর, অতএব অলঙ্ঘনীয়, তাহার বিচার করা মহাপাপ, তাহা নির্ব্বিচারে পালন করিতে হয়। শিষ্যদের কাছে বহিশ্‌তের নানা বর্ণনা করিতেন, ক্রমে তাহাদের মস্তিষ্ক বহিশ্‌তে ও হুরীপূর্ণ হইলে তাহাদের মধ্যে ২।৪ জনকে হশীশ নামক ভঙ্গের সারাংশ দ্বারা প্রস্তুত মাদক বিশেষ খাওয়াইয়া একদিন অজ্ঞান করিতেন ও অজ্ঞানাবস্থায় এই উদ্যানের এক-একটি গৃহে এক-এক জনকে ছাড়িয়া দিতে। জ্ঞান হইলে তাহারা যাহা দেখিত তাহাকে সত্য-সত্যই গুরু-বর্ণিত বহিশ্‌ত্‌ বলিয়া বিশ্বাস করিত। কয়েক দিবস হুরীদের সঙ্গ ও স্বর্গভোগের পর আবার গোপনে তাহাদের হশীশ খাওয়াইয়া আপনার প্রাসাদে আনিতেন, ও তাহাদের বলিতেন, আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাদের আপনার স্বর্গীয় দূত (angel) দ্বারা স্বর্গে পাঠাইতে পারি, ও আবার আনিতে পারি। এই যুবকেরা হসনের কথা অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত, হসন অনুগ্রহ করিলেই ২।৪ দিবসের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে স্বর্গভোগ করাইতে পারেন, স্বর্গীয় দূত ও হুরীরা তাঁহার আজ্ঞাধীন, ও তিনি ঈশ্বর-নিয়োজিত ক্ষমতা-প্রাপ্ত মহাপুরুষ।

আজ্ঞাপালন তিনি এত কঠোরভাবে শিখাইতেন যে, তাহাদের সম্মুখে তিনি আপনার দুই পুত্রকে অবাধ্যতার অপরাধে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। তাহারা হসনের আজ্ঞামত নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জনতা-মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে দুঃসাহসিকভাবে হত্যা করিত; অতএব কেহই জীবিত ফিরিত না। তাহারা প্রায়ই খৃষ্টানদের রবিবারে গির্জ্জাতে, ও মুসলমানদের শুক্রবারে মসজিদে হত্যা করিত, অতএব দর্শক-মধ্যে কেহ-না-কেহ তাহাদের নিশ্চয় মারিয়া ফেলিত। হসনের কার্য্যসিদ্ধ হইত, কিন্তু ঘাতকদের আর পোষণ করিতে হইত না, তাহার গুপ্ত রহস্যও প্রকাশিত হইত না, তবে প্রত্যেক শত্রুর জন্য একটি করিয়া সাহসী যুবককে বহিশ্‌তে পাঠাইতে হইত।

হসন-প্রেরিত এইরূপ এক যুবক ঘাতক বৃদ্ধমন্ত্রী নিজাম-উল-মুলককে [১৪ অক্টোবর ১০৯২] হত্যা করিল। ইহার একমাস মধ্যেই মন্ত্রীর উপযুক্ত শিষ্য সম্রাট মলিকশাহের মৃত্যু হইল। মলিকশাহের মৃত্যুর পর ইরাণের ক্ষমতা ও রাজ্য-বিস্তার কমিতে লাগিল। হসন সব্বাহের আশা যোল আনা পূর্ণ না হইলেও অনেকটা পূর্ণ হইল। হসন নরঘাতকদের সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া দেশবাসীর ও আশে পাশের ছোট বড় রাজা ও শাসনকর্ত্তাদের ভয়ের কারণ হইলেন। সকল বারে তিনি নরহত্যা না করিয়া অবস্থা-বিশেষে কেবল ভয় দেখাইয়াও কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলেন। মলিকশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার অসমসাহসী যোদ্ধা পুত্র স্বয়ং সেনা লইয়া হসনকে দমন ও নির্ম্মূল করিতে যাত্রা করিলেন। পথে একদিন নিদ্রা-ভঙ্গের পর দেখিলেন তাঁহার পালঙ্কের নিকট মৃত্তিকাতে একখানি দীর্ঘ ছুরির ফলক অর্দ্ধেক পোঁতা রহিয়াছে, ছুরির গায় একখানি কাগজে লেখা আছে, তুমি বাল্যাবধি সাহসী বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইজন্য ক্ষমা করিলাম। নতুবা পৃথিবীর প্রস্তরময় কঠিন বক্ষ অপেক্ষা তোমার কোমল মাংসল বক্ষ সহজে বিদ্ধ হয়। নবীন সম্রাট, যিনি সম্মুখ সমরে কখনও ভীত হয়েন নাই, এই অজানিত রহস্যময় শত্রুর ভয়ে ফিরিয়া গেলেন। হসন যখন রাজবাটীতে কর্ম্মচারী ছিলেন তখন রাজবাটীর এক দাসীর প্রেমাস্পদ ছিলেন, এখন তাহার সাহায্যে ছুরি ও পত্র পাঠাইয়াছিলেন; রাজঅন্তঃপুরে তাঁহার ঘাতক চর ছিল না।

হসন ১১২৩ ঈশাব্দে আপনার পুত্র কিয়াকে রাজ্য ও গুরুর আসন দিয়া পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার বংশে আটজন রাজা ও গুরু হইয়াছিলেন। পরে মোগলেরা তাঁহার স্থাপিত রাজ্য ও সম্প্রদায় নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও ইস্‌মাঈলী সম্প্রদায়ের কোন কোন প্রশাখা ইরাণে কতক কতক নরঘাতক মত পোষণ করে।

পরবর্ত্তী কালে ঐ ঘাতক-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-বিশ্বাস কতক কতক পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ে সংক্রামিত হইয়াছিল। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পেশওয়ার ও কাবুলের মধ্যে খ্যাবর গিরি-সঙ্কটে বায়জীদ বিন-অবদুল্লা নামক অফগান রোশনিয়া নামক সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া আপনার শিষ্যদের সাহায্যে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিল। এই বায়জীদ ও তাহার পুত্র জললার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে আকবরের প্রিয়পাত্র হাস্যরসিক কবিরায় মহেশ দাস রাজা বীরবর ১৫৮৬ ঈশাব্দে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। বায়জীদের মতে "যাহাদের ঈশ্বর ও আত্মজ্ঞান নাই, তাহারা মনুষ্য নহে, যদি তাহারা অনিষ্টকারী জীব হয়, তবে তাহাদের বাঘ, নেকড়ে, সাপ, বিছা ইত্যাদি হিংস্র জীবের পর্য্যায়ভুক্ত জানিবে, অতএব আমাদের হত্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কেননা আরব দেশীয় রসুল বলিয়াছেন, 'হিংসা করিবার পূর্ব্বে হিংস্র জীব বধ কর।' যদি তাহারা অনিষ্টকারী জীব না হয়, তবে তাহাদের গো, মেষ, ছাগ ইত্যাদির পর্য্যায়যুক্ত জানিবে, অতএব তাহাদের হত্যা করায় অপরাধ হয় না, কেননা তাহারা ভক্ষ্যশ্রেণীভুক্ত। যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই, তাহারা মৃত বা জড়, তাহারা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বা ধনরত্নের অধিকারী হইতে পারে না; তাহাদের সন্তানেরাও ঐরূপ। অতএব তাহাদের মারিয়া তাহাদের সম্পত্তি লইলে পাপ হয় না—ইত্যাদি [রোশনিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বায়জীদ-বিন-অবদুল্লা লিখিত খ এর উল-বিয়ান নামক ধর্ম্মগ্রন্থ]।

(ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) শ্রী অমৃতলাল শীল

—

রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন বয়সে নিজে যে-সব মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার কোনটিই এখন আমার সম্মুখে নাই। তাহার মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু লিখিবার সময়ও

াই। এইজন্য কোন-কোনটির সম্বন্ধে আমার যাহা মনে হইতেছে তাহাই লিখিব।

রবীন্দ্রনাথের মাসিক পত্রে মুদ্রিত প্রথম রচনা "জ্ঞান-প্রকাশ" নামক মাসিকে বাহির হইয়াছিল। ঐ মাসিক বহুকাল লয় পাইয়াছে। 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা' একটি সেকালের কোন নারী নামধারী পুরুষের জাল রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনা "জ্ঞানপ্রকাশে" করেন। এই জাল তখনকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককে ঠকাইয়াছিল, কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ঠকাইতে পারে নাই।

তাঁহার "বালক" দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, যে, উহা তিনি যে সব বালকদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন, তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি রুচি সম্বন্ধে ধারণা তিনি তাঁহার নিজের বালক-কালের জ্ঞান বুদ্ধি রুচির মাপকাঠি অনুসারে স্থির করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই কারণে উহা 'ভারতীর' সহিত মিলিত হইয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হইতে পারিয়াছিল।

তিনি "ভারতী", "ভাণ্ডার", "সাধনা" এবং "বঙ্গদর্শন"এরও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিতেন, তখন আমার বয়স খুব কম। আমি তখন উহার পাঠক ছিলাম না। সুতরাং উহা কিরূপ কাগজ ছিল, সে-বিষয়ে অপর অনেকের মত আমার জানা থাকিলেও আমার নিজের সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ কোন মত নাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রথমে প্রকাশিত ও পরে পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত কোন কোন বহি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে ঠিক কোন মত প্রকাশ করা যায় না। যে-সকল বাংলা মাসিক পত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'কে আমি প্রথম স্থান দিয়া থাকি।

তাহার কারণ শুধু উহাতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলির উৎকর্ষ নহে। সমস্ত কাগজখানির উপরই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও লিখন-ভঙ্গীর ছাপ অনুভূত হইত—অন্ততঃ আমার তাহাই মনে হইত। ইহার একটা কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায় সমস্ত কাগজখানাই লিখিতেন। দ্বিতীয় কারণ পরে শুনিয়াছি—এবং আশা করি তাহা ঠিক্ শুনিয়াছি ও ঠিক মনে আছে। তিনি অন্য লেখকদের লেখা খুব ঘুরাইয়া দিতেন; তাহাতে হয় ত অনেক লেখা প্রায় পুনর্লিখিত হইয়া যাইত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত লেখকের লেখাও সংস্কৃত হইয়া তবে "সাধনা"য় বাহির হইত।

সেদিন কোথায় যেন বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর একটা তুলনা পড়িতেছিলাম। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখক বলিতেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে গড়িয়া পিটিয়া "মানুষ" করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু রবিবাবু তাহা করেন নাই। আমার বোধ হয়, লেখকের এই কথা অজ্ঞতা-প্রসূত। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাগজগুলির সম্পাদক রূপে অনেক লেখককে উৎকৃষ্ট রচনার পথ নির্দ্দেশ ত কার্য্যতঃ করিয়াইছেন, অন্য কাগজের সংস্রবেও বহু লোকের রচনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল 'প্রবাসী'র "সংকলন" বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজী অনেক মাসিক পত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে তাহার সারসংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিবার পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংক্ষেপণ খুবই হইত; অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁ-দিকের খালি জায়গায় লিখিয়া দিতেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকের এইরূপ সংকলন-কার্য্যের জন্য পরিশ্রম হইতে প্রতিভাশালী নবীন লেখকদের কিছু শিখিবার আছে। তাহা এই যে, কোনো কাজকেই ড্রাজারী (Drudgery) বা গাধার খাটুনী বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ সংকলন-বিভাগের ভার ত্যাগ করেন। তাহার একটা কারণ, ইংরেজী ম্যাগাজিনগুলির ক্রমাধোগতি, তাহাতে আর আগেকার মত হিতকর ও মনোহারী লেখা থাকিত না।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মাসিক পত্র সম্পাদককে অন্যের রচনার প্রত্যাশায় থাকিতে হয়। যাঁহারা কাগজ বাহির করেন, তাঁহাদের অনেকের কাগজ হয় এই কারণে অনিয়মিত হয়, কিম্বা তাঁহাদিগকে যা-তা কিছু দিয়া কাগজ ভর্ত্তি করিয়া বাহির করিতে হয়। সম্পাদকের নিজেরই যদি নানা রকম প্রবন্ধ গল্প কবিতা সমালোচনা প্রভৃতি লিখিয়া কাগজ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ ক্ষমতা অল্প সম্পাদকেরই থাকিবার সম্ভাবনা। আমি যত সম্পাদকের বিষয় অবগত আছি, তাহার মধ্যে তিনি যত প্রকার উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনার দ্বারা মাসিক পত্র অলঙ্কৃত করিতে পারেন, অন্য কেহ তাহা পারেন নাই। এইজন্য, অন্যের সাহায্য না পাইলেও নিয়মিতরূপে উৎকৃষ্ট ও নানা বিচিত্র রচনাপূর্ণ মাসিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন। এরূপ সঙ্কল্প তিনি কখনও করিয়াছিলেন কি না জানি না; কিন্তু করিলে তাহা ব্যর্থ বা বিন্দুমাত্রও অশোভন হইত না।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত মাসিকপত্রগুলি সম্বন্ধে বলিবারও অনেক কথাই আছে। এখন হাল্কা রকমের দু'একটা কথা বলি। যখন "সাধনায়" "ক্ষুধিত-পাষাণ" গল্পটি পড়িয়াছিলাম, তখন সেই মায়াপুরীর সম্বন্ধে ও তাহার অধিবাসিনী সুন্দরীর সম্বন্ধে কি যে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল হইয়াছিল, বলিতে পারি না। কবি যাহার মুখ দিয়া গল্পটি বলাইতেছিলেন, সেই লোকটি কৌতূহলকে চরম সীমায় উপনীত করিয়া হঠাৎ গাড়ীতে উঠিয়া যাওয়ায় অনতিক্রান্তযৌবন পাঠকের মন কবির প্রতি প্রসন্ন হয় নাই। গল্পটি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম অনেক রাত্রে। সে-রাত্রে ঘুম হইয়া থাকিলে কখন হইয়াছিল মনে নাই। 'বিনি পয়সার ভোজ' যখন রবীন্দ্রনাথের কাগজে পড়ি, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। তখন আমরা কয়েক পরিবার বেনিয়াটোলার লেনের একটি বাড়ীতে থাকিতাম। গল্পটি পড়িতে পড়িতে আমরা অতিমাত্রায় হাস্য-রসোন্মত্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের কর্ত্রীদিগের দ্বারা ভৎর্সিত হইয়াছিলাম মনে পড়ে।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ একটি আলোচনা সভা স্থাপন করেন। তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তখন উহার আফিস ছিল ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে। ঐ আফিসে বহু সাহিত্যিকের আড্ডা জমিত। সভার অধিবেশনে কোন-একটি বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর আলোচনা হইত। এরূপ সভার প্রয়োজন এখনও আছে।

নিজের মাসিক পত্র সম্পাদন ও তাহাতে নিজে লেখা ছাড়া তিনি অন্য যত মাসিকে লেখা দিয়াছেন, তাহার সবগুলির নামও আমি জানি না। এবিষয়ে তিনি খুব মুক্তহস্ত। মাসিক পত্রের লেখকরূপে তাঁহার একটি গুণের সাক্ষ্য ভুক্তভোগী সম্পাদক আমার দেওয়া উচিত। তাহা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্যতম অগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্চর্য্য নিয়ম-নিষ্ঠার কথা বলা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু ক্রমশঃ প্রকাশ্য লেখা প্রবাসীতে দিয়াছিলেন। তাহার কোন কিস্তির জন্য কখন অপেক্ষা করিতে বা তাগিদ দিতে হয় নাই। বরাবর মাসের ১লা কিম্বা ২রা তাঁহার লেখা ডাকে আসিয়া পৌঁছিত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও স্বতঃ

প্রবৃত্ত হইয়া বরাবর নিয়ম রক্ষা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং উহার হস্তলিপি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কখনও কোন কিস্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। তিনি একবার দারুণ শোক পাইয়াও ঠিক তাহার পরদিন একটি কিস্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ ধৈর্য্য, সংযম ও নিয়ম-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিরল। কবিরা বড় এলোমেলো ও খামখেয়ালী বলিয়া তাঁহাদের একটা বদনাম আছে। কিন্তু রবিবাবু কবি কি না সে-বিষয়ে কোন-কোন বাঙালী ও অবাঙালী গভীর গবেষকের সন্দেহ থাকিলেও মাসিক পত্রের খোরাক জোগান সম্বন্ধে তাঁহার কোন নিন্দা করা চলিবে না। এবিষয়ে তাঁহার সময়নিষ্ঠা অনতিক্রান্ত। ইহা তাঁহার অকবিত্বের প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও আমাকে এই সাক্ষ্য দিতে হইল।

এইরূপ নিয়মনিষ্ঠা সম্পাদক ও লেখক উভয় পক্ষেরই থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি রবীন্দ্রনাথ বরাবর কোন-না-কোন মাসিকের সম্পাদক থাকিতেন বা থাকিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইত। তাহার আর-একটি কারণ এই, যে, তিনি সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখিলেও তাহাতেও সাহিত্য-রস থাকে। যাহা হউক, সুখের বিষয়, সম্পাদকের কাজ তিনি কখন কখন করিয়া অন্যের পক্ষে পথপ্রদর্শক হইয়াছেন কিন্তু উহাতে অনর্থক বরাবর নিজের শক্তি ক্ষয় করেন নাই। কারণ, সম্পাদকের কাজ প্রতিভাশালী মনীষীদের কাজ নহে; শ্রমপটু সাধারণবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের দ্বারাই উহা চলিতে পারে।

(শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শূদ্র

শ্রী শচীন্দ্রমোহন সরকার

(১)

কে বলে শূদ্র ঘৃণ্য ক্ষুদ্র,—কে বলে জগতে তুচ্ছ তারা,
বহায়েছে যারা মর্ত্ত্যের বুকে স্বর্গ-অলকনন্দা-ধারা!
সমাজের ঘৃণা-অপমান-ভার নিয়েছে নিজের বক্ষ 'পরে,
শত শতাব্দী পদাঘাত সহি' সেবিছে নিত্য যুগ্ম করে।
দুঃখ করেছে জীবনের ব্রত—সমাজের সেবা উচ্চ কাজ,—
তাদের রাখিয়া চিরদিন দূরে—তোমরা হয়েছ পূজ্য আজ;
তারা যে 'মানুষ'—ভুলে গেছ হায়!—ভেবেছ কৃপার পাত্র তারা;
সমাজের মাঝে তারা আশি জন—ঘৃণ্য ক্ষুদ্র তুচ্ছ যারা।

(২)

তোমার গৃহের মলা ঘুচায়েছে আপনার শির উচ্চ করি',
ধন্য মেনেছে তুচ্ছ জীবন তোমার পাদুকা বক্ষে ধরি';
সূতিকা-গৃহেতে শূদ্রাণী তোমা প্রথম দুগ্ধ করেছে দান,
মুগ্ধ করেছে বিশ্ব নিখিল স্নেহের সলিলে করায়ে স্নান।
লঙ্ঘিয়া গিরি মথিয়া সিন্ধু রত্ন এনেছে তোমার তরে,
সাজায়েছে তব মন্দির-মঠ দেহ মন প্রাণ অর্ঘ্য ক'রে;
অশোক-স্তম্ভে—ভুবনেশ্বরে আজিও তাদের চিহ্ন আঁকা,
শিলালিপি-বুকে, পাটলীপুত্রে শূদ্রাণী-সুত-বহ্নি-রেখা।

(৩)

মন্দির গড়ি' দূরে স'রে গেছে,—নিষেধ-আজ্ঞা তাদেরি তরে;
ব্রহ্মা বিষ্ণু সাক্ষী গোপাল গড়েছে যে তারা আপন করে;
তাদের শিল্পী কল্প-লোকের বিশ্ব-রাজারে সৃষ্টি করি'
সাজায়ে দিয়েছে রক্তমাংসে শূদ্র-হৃদয়-অর্ঘ্য ভরি';
কে বলে তাহার 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' ব্রাহ্মণ নিজে করেছ তুমি,
তুমি যে নিয়েছ শূদ্র-সৃষ্ট বিশ্বরাজারে আদরে চুমি',
মন্দির-মঠ নিজ হাতে গড়ি'—দুয়ারের কোণে ভিখারী সাজি
বিশ্ব-ঘৃণ্য ক্ষুদ্র শূদ্র ছলছল চোখে রয়েছে আজি।

(৪)

বিশ্বের সেবা ঘৃণ্য যদি রে,—দেব নারায়ণ ঘৃণ্য তবে,
বুদ্ধ ঈশা ও শ্রীচৈতন্য তোমাদের 'ন্যায়ে' ঘৃণ্য হবে।
সমাজ-সেবক বিশ্বের বুকে পেয়েছে পেতেছে উচ্চ মান,
শুধু ভারতের-সেবক শূদ্র চির অবহেলা পেয়েছে দান।
আদরেতে তারে তুলে নেনা বুকে, পদাঘাতে আর রেখো না দূরে,
দেখিবি বিশ্ব বিস্মিত হবে,—দেবতা হাসিবে স্বর্গ-পুরে;
'শক্তি' আসিয়া আপনার করে পরাবে প্রেমের মাল্য গলে,
মদগর্ব্বিত নিখিল বিশ্ব লুটিবে ভারত-চরণ-তলে।

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৩২)

ইংলণ্ডে শিক্ষা

ইংলণ্ডের কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন্ কোন্ কৃষি-কলেজ বিখ্যাত? তাহাদের ঠিকানা কি? কোন্ কৃষি-কলেজের ছাত্রদের খরচ সর্ব্বাপেক্ষা কম? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এস্-সি বিলাতে যাইয়া উপাধি পরীক্ষার জন্য ভর্ত্তি হইতে পারে কি না? কয় বৎসর পড়িলে উপাধি পাওয়া যায়? তার পর কয়বৎসর রিসার্চ করিলে ডি-এস্-সি হওয়া যায়?

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সেন

(৩৩)

কলের লাঙ্গল

কলের লাঙ্গল দ্বারা কত অল্প পরিমাণ জমিতে চাষ করা সম্ভবপর? ইহা সব-চেয়ে কত মূল্যে এবং কোথায় পাওয়া যাইবে? উহা চালান শিক্ষা করিতে কোথায় যাইতে হইবে, এবং উহার শিক্ষা বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট্ হইতে কোন বন্দোবস্ত আছে কি না?

শ্রী তারাপদ সান্ন্যাল

(৩৪)

"ননদ ও ননাস"

কোনও কোনও স্থানে স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে ননাস ও কনিষ্ঠা ভগ্নীকে 'ননদ' বলিয়া ডাকা হয়। ননদ ও ননাস কথা দুইটির উৎপত্তি কোথা হইতে?

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সমাদ্দার

(৩৫)

বিলাত

"বিলাত" এই শব্দটি কোন্ ভাষা হইতে আসিয়াছে? ইংলণ্ডকে 'বিলাত' বলা হয় কেন? অন্য কোনো ভাষায় এই শব্দটি প্রচলিত আছে কি?

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

৩৬

কণ্টকারী ধ্বংস

অনেক জমিতে "কণ্টকারী" জন্মাইয়া কৃষকগণকে চাষ আবাদে বিশেষ বাধা প্রদান করে। কি উপায়ে উহার বিনাশ সাধন করিতে পারা যায়?

শ্রী দেবিদাস মিশ্র

(৩৭)

বৌদ্ধ শ্রমণের পরাজয়

শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট যে বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন, ইহার কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে? এই বিষয়ে কোন্ ঐতিহাসিক কি বলিয়াছেন।

শ্রী দেবিদাস চট্টোপাধ্যায়

(৩৮)

শিক্ষিত মুসলমানের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ

প্রবাসীর আষাঢ় সংখ্যার ৫৩৩ পৃষ্ঠায় "শিক্ষিত মুসলমানের হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ" শীর্ষক সংবাদটি পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে, গৌহাটির নিকটবর্ত্তী জামদীঘি গ্রামে ২১ জন শিক্ষিত মুসলমান স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্ত ভদ্রলোকেরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং তাঁহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ কি প্রকারে হইবে?

শ্রী প্রভাতকুমার দাশ

—

মীমাংসা

(১৭)

প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যে হিমালয় পর্ব্বতের নাম

কোন কোন ভূতত্ত্ববিৎ বলেন যে, যেস্থানে হিমালয় পর্ব্বত অবস্থিত

বহু প্রাচীনকালে তথায় সমুদ্র ছিল। সেইজন্য প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যে 'হিমালয়' নামের উল্লেখ দেখা যায় না।

শ্রী বিধুভূষণ শীল

(২৩)

আল্লা

আল্লা নাম হজরত মোহম্মদ কর্ত্তৃক প্রচলিত হয় নাই। হজরতের বহু পূর্ব্ব হইতে আরব্য কবিগণের কবিতায় "আল্লা" নাম পরিদৃষ্ট হয় অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের নামের কোন ধাতুগত অর্থ হয় না, সেইরূপ আরব্য ভাষায় "আল্লা" এই শব্দেরও কোন ধাতুগত অর্থ নাই, কিন্তু আল্লা বলিলে একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না। সংস্কৃত ভাষায় আল্লা শব্দের অর্থ—পরমেশ্বর, সর্ব্বগ্রাহী—অল্ (পর্য্যাপ্ত) -লা (গ্রহণ করা) ড ক। আপ্ প্রত্যয় করিলে স্ত্রী লিঙ্গে "আল্লা" হয়। আরব্য ভাষায় "আল্লা" শব্দ পুংলিঙ্গ।

শ্রী কিরণগোপাল সিংহ

(২৪)

সাঙ্খ্য ও বেদান্ত সম্বন্ধীয় পুস্তক

সাঙ্খ্য সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রণীত। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাঙ্খ্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বেঙ্গল থিওসফিক্যাল্ সোসাইটী হইতে গৌড়পাদভাষ্য, বঙ্গানুবাদ এবং ইংরেজী অনুবাদ সহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্ত ব্যাস-প্রণীত দর্শন-গ্রন্থ বিশেষ। বাঙ্গলা প্রবন্ধগ্রন্থ। ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রণীত। ইহা বটব্যাল-মহাশয়ের বেদ সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ। এইসকল প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রথমে "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল। কেবল দুইটি প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রী বিধুভূষণ শীল

(২৬)

বৃকাসুরের কাহিনী

বৃকাসুরের কাহিনী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে। উক্ত কাহিনী এই—বৃকাসুরের তপস্যায় শিব তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে বৃকাসুর বলে, "আমি যার মাথায় হাত দিব সে-ই যেন তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।" শিব তথাস্তু বলায় বৃকাসুর বলে, "তবে তোমার মাথায় হাত দিয়া দেখি তোমার কথা সত্য কি না।" মহাদেব ভয় পাইয়া পলাইয়া একেবারে বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত এবং পিছনে পিছনে বৃকাসুরও উপস্থিত। তখন বিষ্ণু বৃকাসুরকে বলেন, "মহাদেব তো গাঁজাখোর, তাঁর বরে বিশ্বাস কি? তুমি নিজের মাথায় হাত দিয়া আগে দেখ।" ফলে বৃকাসুরের মৃত্যু এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ।

শ্রী মণিমালা দেবী

(২৭)

ঈশা খাঁর জাতিত্ব

এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্ণালের ৪৫ খণ্ডের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালীর বীরত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে ঈশা খাঁকে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর সন্তান বলিয়াছেন। কারণ ঈশা খাঁর পিতা, কালিদাস অযোধ্যা-নিবাসী বাঙ্গালী। গৌড়ের প্রসিদ্ধ বাদশা হোসেন সার সময় কালিদাস মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তৎপুত্র ঈশা খাঁ ভূস্বামী স্বরূপে বাংলায় বাস করেন বলিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা হইয়াছে। 'বাঙ্গালীর বীরত্ব' নামক প্রবন্ধের ফুট-নোটে (৪র্থ সংস্করণ) একথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

(২৮)

দ্রৌপদীকে পণরক্ষা

হিন্দুধর্ম্মানুসারে দ্যূতক্রীড়া অতীব দোষণীয় বটে, কিন্তু মহাভারতের আমলে, দ্যূতক্রীড়া রাজন্যবর্গের করণীয় ও রাজধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত প্রমাণ—

আহুত মা নিবর্ত্ততে রণাদপি দ্যূতাদপি

* * * *

যুদ্ধ বা দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহুত হইলে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইও না। ইহাই ছিল সেই আমলে 'রাজ-ধর্ম্ম'। অবশ্য ঐ আহ্বান রাজায় রাজায়ই চলিত। যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কাজেই স্ত্রীকে পণ রাখিয়া ও দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহাকে "রাজধর্ম্ম" রক্ষার্থ রত হইতে হইয়াছিল। সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন বলিয়াই তাঁহাকে "ধর্ম্মরাজ" বলা হইত, বোধ হয়।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(৩০)

"বাবু" ও "সাহেব" শব্দ

সম্ভ্রান্ত বা সম্মানিত ব্যক্তি—এই অর্থে "বাবু" ও "সাহেব" শব্দদ্বয় মুসলমান যুগে আমাদের দেশে প্রচলিত হয়।

মুসলমান যুগের পূর্ব্বে বাংলায় "বাবা" (পিতা এই অর্থে) স্থলে "বাপু" শব্দ ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়। এখনও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেক স্থলেই "বাবার" পরিবর্ত্তে "বাপু" বলিয়া পিতাকে আহ্বান করিতে শুনা যায়। এই বাংলা "বাপু" ও ফারসী "বাবা" শব্দের সংমিশ্রণে বোধ হয় উর্দ্দুতে বাবু শব্দের প্রচলন হয় এবং ক্রমে-ক্রমে উহার অর্থ সম্প্রসারণ ঘটে (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানদ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বে এই "বাবু" শব্দে রাজবংশীয় ব্যক্তিগণের বা উচ্চপদস্থ জমিদারবর্গেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে এই "বাবু" শব্দ কোম্পানীর আশ্রিত পারসী ও ইংরেজী ভাষায় সামান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের প্রতি প্রযুক্ত হওয়ায় ইহার অর্থ-গৌরব অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে ইহা শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নামের পরে ব্যবহৃত সৌজন্য বা ভদ্রতা প্রকাশক শব্দমাত্রে পর্য্যবেশিত হইয়াছে। এই "বাবু" শব্দ এখন ইংরেজি Mr. বা Esquire শব্দের তুল্যার্থ-বাচক।

আরবী "সাহব্" শব্দ হইতে এই "সাহেব" শব্দের উৎপত্তি (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান দ্রষ্টব্য)। মুসলমানদের রাজত্বকালে এই "সাহেব" শব্দ ফকির, মৌলবী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নামেই প্রযুক্ত হইত। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর যখন ইংরেজরাই বাংলা দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল, তখন সম্ভ্রম-বাচক 'সাহেব' শব্দ হিন্দু বা মুসলমান-দিগের অপেক্ষা তাহাদের প্রতিই অধিকতর প্রযুক্ত হইতে থাকায় এই "সাহেব" শব্দ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও শুধু "সাহেব" বলিলে (শুধু "ঝি" বলিলে চাক্‌রাণী বুঝানর ন্যায়) আমাদের এই বাংলা দেশে যেন কেবল ইংরেজ বা ইরোপীয়দিগকেই বুঝায়। তাই ইংরেজদের নামের পর আমরা "সাহেব" শব্দ ব্যবহার করি, যেমন—লিটন্ সাহেব, রেডিং সাহেব ? ইত্যাদি।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

(৩১)

সগোত্রে বিবাহ

বশিষ্ঠ-সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে আছে :—

* * * গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা (সমাবর্ত্তন-স্নান) অসমানার্ষাম-স্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেৎ। পঞ্চমীং মাতৃবন্ধুভ্যঃ সপ্তমীং পিতৃবন্ধুভ্যঃ। বৈবাহ্যমগ্নিমিন্ধ্যাৎ।"

গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন-স্নান করিয়া অসমান-গোত্রা, অসমান-প্রবরা, অস্পৃষ্টমৈথুনা বয়ঃকনিষ্ঠা অনুরূপ ভার্য্যা লাভ করিবে।

অন্যান্য সংহিতাকারগণও সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। সগোত্রীয় বরকন্যার মধ্যে একই রক্ত প্রবাহিত হয় এবং তাহাদের যৌন সম্বন্ধ স্থাপন ভবিষ্যৎ বংশবৃদ্ধির হানিকর বলিয়া সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা আভিজাত্যের অভিমান হেতু শাক্যবংশীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেন। পুরাতন মিশর পারস্য প্রভৃতি দেশে একই বংশের বরকন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এখনও খৃষ্টীয়ান বা মুসলমানগণ সগোত্রে বিবাহ করেন। সুতরাং সগোত্রে বিবাহ হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই নিষিদ্ধ। কারণ ব্রাহ্মণদেরই গোত্র বংশগত এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের গোত্র গুরু বা পুরোহিতগত। তবে ব্রাহ্মণের দেখাদেখি অব্রাহ্মণ হিন্দুদিগের মধ্যেও সগোত্রে বিবাহ সচরাচর দেখা যায় না।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

হিন্দুধর্ম্মে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। গোত্র শব্দের আদিম অর্থ যাহাই হউক, পরে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এক গোত্রের মানুষ এক আদি পিতা হইতে জাত, সুতরাং সে-গোত্রের সকল পুরুষের দেহে একই বীজ, এবং নারীর দেহে একই ক্ষেত্র বর্ত্তমান। কৃষক মাত্রেই জানে, একই বীজ একই ক্ষেত্রে বপন করিতে থাকিলে শস্য ক্রমে অপকৃষ্ট হয়। এইরূপ মানুষের বেলায়, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা যাবতীয় জীবের বেলায় ঘটে। ইহা বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রাচীন আর্য্যেরাও বীজ ও ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত মানিতেন। হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কারণে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

ভ্রম-সংশোধন

শ্রাবণে প্রকাশিত ১নং প্রশ্নের মীমাংসায় দৃষ্ট হইবে "নচেৎ Ammoniaর আধিক্যে" এই Ammonia স্থলে Acid বসাইতে হইবে। Sulphar of Ammoniaতে Acid থাকে, এবং সেই Acidএর আধিক্যেই গাছ নষ্ট হইতে পারে।

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

এগারো

বেলা দশটার সময় ছেলে-মেয়েকে নাইয়ে-ধুইয়ে খাইয়ে দিয়ে কেদারের বাড়ী ফের্‌বার প্রতীক্ষায় প্রিয় বারবার বাসার সাম্‌নের রাঙা রাস্তাটির দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল এমন সময় ডাক-হরকরা এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। সইএর হাতের লেখা দেখে প্রিয়র বুকটা আনন্দে ফুলে' উঠল; ছেলেবেলাকার ছবি বায়স্কোপের মতন একবার চোখের সাম্‌নে ভেসে গেল। আহা সেবা, কী সুন্দর তার রূপ, কী মিষ্ট তার স্বভাব! পাগল স্বামী তার বিয়ের চার মাস পরেই নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। বছর দুই পরে তাকে যদি বা পাওয়া গেল তাও পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায়। তার পর বেচারীর মৃত্যু হয়। কথাটা মনে করাতেই প্রিয়র স্নেহ-কোমল প্রাণখানি বেদনায় টন্‌ টন্‌ করে' উঠল। সেবা অনেকদিন চিঠি পত্র লেখেনি, আজ হঠাৎ লিখেছে। কি লিখেছে জান্‌বার জন্যে কৌতূহল-ভরে প্রিয় চিঠিখানা খুলে পড়্‌তে লাগল—

প্রাণের সই—

তোমার দু' দুখানা চিঠির জবাব দিইনি ব'লে নিশ্চয় তুমি রাগ ক'রে আছ। তাইতে বোধ হয় চিঠিও আর লেখনি। সত্যিই এজন্যে আমি অপরাধী। কিন্তু, সত্যি কথা বল্‌লে বিশ্বাস যদি কর সই, তা হ'লে লিখ্‌ছি যে, মার কঠিন অসুখের জন্যেই আর চিঠিপত্র লিখে উঠ্‌তে পারি-নি। দু' মাস মা শয্যাগত থেকে যে-রোগটা ভুগে গেলেন তা আর কি বল্‌ব। মার রোগ-যন্ত্রণা মনে পড়লে এখনো আমার চোখ ফেটে হুহু ক'রে জল আসে। শুনেছি, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা শান্তি পায়। তাই মা বিহনে আমার দশদিক্‌ অন্ধকার হ'লেও মা রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন মনে ক'রে আমি আরাম পাই।

বাবা আবার বিয়ে করেছেন তা শুনেছ কি না জানি না। অনেকেই বল্‌লেন যে, তাঁর ত মোটে এখন পঞ্চাশ বছর বয়েস; এপক্ষে এক কালা-মুখী মেয়ে আমি আছি

সুতরাং বংশলোপ হ'বেই*। বাপপিতামহর পিণ্ডলোপ হওয়াটা মোটেই উচিত না; কাজেই বাবা বিয়ে করতে রাজী হলেন। আমি লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে তবু একদিন বল্লাম, "হাঁ বাবা, এবারেও যদি তোমার ছেলে না হয়"। বাবা বললেন, "না হ'লেও তোমার একজন অভিভাবক হবে তো।" আমি সেটা অস্বীকার করতে পারলাম না।

বাবার বউ—থুড়ি—নতুন-মা আমার চাইতে বছর তিনের ছোট। মাস দুয়েক হ'ল তিনি তাঁর নতুন ঘরকন্নায় এসে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। আমি চোখের জল নিশীথ রাতের আঁধার ঘরের জন্য পুঁজি রেখে, হাসিমুখে আমার স্বর্গগতা মার ত্যক্ত অধিকারের প্রত্যেকটি জিনিষ নতুন মার হাতে সঁপে দিয়েছি। যাক্ এসব কথা। আমার যা লিখতে ভাল লাগছে না তোমার যে তা পড়তে ভালো লাগবে না তা আমি বিশ্বাস করি। এখন দিন কতকের জন্যে আমি একটু মুক্তি চাই। তুমি বলবে, "তুমি কি জেলে পচে মরছ যে, মুক্তির জন্যে হাঁফিয়ে উঠছ?" কে জানে সই সত্যিই বড্ড হাঁফিয়ে উঠেছি। কিন্তু জগতে আমার এমন ঠাই নেই যেখানে দু'দিনের জন্যে গিয়ে হাঁফ ছাড়ি। কাল সন্ধ্যা-বেলা ব'সে ব'সে বড্ডই কান্না পাচ্ছিল। পুকুর-পাড়ে জল আনতে গিয়ে ঘাটের সিঁড়িতে ব'সে কতবার তোমার কথা মনে পড়ল। তোমার ছেলে-মেয়েদের কথা মনে হতেই বুকটা যেন জুড়িয়ে যেতে লাগল। আজ তাই নিজে হতেই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে লিখছি যে, দিন কতকের জন্যে পোড়ামুখী সইকে ঠাঁই দিতে পার কি? সয়া কি মনে করবেন তা জানি না। যাই হোক্ আমি ত আর্জ্জী পেশ করলাম; তার পর যা হয় হবে।

নতুন দেশে নতুন ঘরকন্না সাজিয়ে কেমন গিন্নি হ'য়ে বসেছ তা দেখতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে। আর দুটি সোনার চাঁদ ছেলে-মেয়ে কেমন ঘর আলো ক'রে তোমাদের 'বাবা মা' ব'লে ডাকছে তাও শুনতে লোভ কিছু কম হচ্ছে না। আজ আসি। পত্র পাঠ জবাব দিও।

তোমার অভাগী সই

চিঠিখানা পড়তে পড়তে প্রিয়র দুটি চোখে মুক্তোর মত দুটি অশ্রু-বিন্দু টল টল ক'রে উঠল। সেই সময় কেদার এসে ঘরে ঢুকে ব'লে উঠল, "কার চিঠি গো, প্রিয়ার প্রিয়র না কি?" অন্য সময় হ'লে প্রিয় এর উত্তর যা দিত তা কিছু নীরস হত না। এখন কিন্তু সে শুষ্ক স্বরে বললে,—"সই লিখিছে গো, দেখনা প'ড়ে। আহা কী কপাল ক'রেই সে পৃথিবীতে এসেছিল! দু পাঁচ দিনের জন্যে আমাদের কাছে এসে থাকতে চায়।" চুড়াধড়াগুলো খুলতে খুলতে কেদার ব'লে উঠল, "বেশ ত, আনিয়ে নাও না। সইএর বাবাকে লিখে দাও, তিনি মত করেন ত আমাদের জয়া আর চৌবে গিয়ে নিয়ে আসবে।"

প্রিয় সহজেই কেদারের মত পেয়ে বেশ একটু আশ্বস্ত হ'য়ে কেদারের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করতে গেল। আহারাদির পর প্রিয় নিজেই সইএর বাবাকে তার এখানে দিন কতকের জন্যে সইকে পাঠাবার কথা বার বার ক'রে লিখে পাঠাল। সইএর বাবা যথাসময়ে চিঠি পেয়ে এতে অমতের কিছু দেখলেন না। সুতরাং যথা-সময়ে সেবা সইএর প্রেরিত লোকজনের সঙ্গে সইএর বাড়ী এসে হাজির হ'ল। প্রিয় সইকে এতকালের পর, কাছে পেয়ে বুকে চেপে ধ'রে চোখের জল ফেলতে লাগল, সেবা কিন্তু কান্না-টান্না ভুলে' খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় তার টেবো গাল দুটি রাঙা করে' তুললে।

মীনা একদণ্ডের দেখাতেই সই-মার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলে। কেদার তখন বাড়ী ছিল না। সেবা খিড়কীর দরজা খুলে পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক্কার লাল কাঁকরের রাস্তার পাশে সবুজ গাছের সারি, আর এদিকে গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ীগুলি দেখে আনন্দে ব'লে উঠল, "বেশ দেশটি ত সই, খুব ভাল লাগছে আমার।"

আসল কথা মনটায় তখন তার আনন্দের রঙ ধরেছিল, কাজেই চোখে তার আমেজ না লেগে যায় কোথা? প্রিয় ভিতরে ছিল, সে খিড়কীর দরজায় উঁকি মেরে বললে, "সর্ব্বনাশ, করেছিস্ কি? পুকুর-পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিস্! এখন যে বাবুরা সব কাছারী যাচ্ছে, এখনি দেখে ফেলবে।"

সেবা হাসিমুখে বল্‌লে,—"তা দেখ্‌লেই বা ছেলে-ধরা তোমায় যে ধ'রে নিয়ে যাবে।"

ঘাটে জয়া মুখ ধুচ্ছিল, রমাদের বাড়ীর আর নন্দাদের বাড়ীর ঝি জলে নেমে কাপড় কাচ্‌ছিল। তারা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে—"ছেলে-ধরা নয়গো ঠাক্‌রেণ, এ গাঁয়ে আমাদের মেয়ে-ধরার ভারী ভয়।"

"সত্যি?" ব'লে সেবা মীনার হাত ধ'রে বাড়ীর ভিতর চ'লে এল। প্রিয় তখন বল্‌লে—"দেশটা বেশ সই, কিন্তু এখানকার মানুষগুলো যেন সব কী! রাত-দিন সব এওর ঘরের চর্চ্চা নিয়েই আছে। কার বাড়ীর মেয়ে, কার বাড়ীর বউ দেখতে কেমন, কি করলে, কি বল্‌লে, এইসব জটলা পুরুষে পর্য্যন্ত কর্‌ছে।"

সেবা বল্‌লে—"সে সব গাঁয়েই আছে সই। এ-গাঁকে শুধু দোষ দিলে হবে কেন? মানুষের যে স্বভাবই এই বোন, আমরা ওদিকে কাণ না দিলেই হ'ল।"

কেদারের সঙ্গে সেবার মোটে দু'বার দেখা। কেদারের এখন চেহারার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে; সুতরাং পুকুর-পাড়ের রাস্তা দিয়ে যখন কেদারকে দেখা গেল তখন নারী-সুলভ কৌতূহল নিয়ে সেবা জিজ্ঞেস ক'রে উঠল, "ও মানুষটি কে সই, বাঙ্গালী সাহেব—"

প্রিয় চোখের কোলে কৌতুক নাচিয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা সই, মানুষটি দেখতে কেমন ব'ল দেখি।"

সেবা বল্‌লে, "এই দ্যাখ সই, এই মাত্র পুরুষ বেচারীদের নিন্দে কর্‌ছিলি; আর নিজেরা কি ক'রে পুরুষ-মানুষের রূপের বিচার করতে চাইছিস? আমরা ঘোমটার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ওদের দেখি, আর ওরা আড়ালের পর্দ্দা-ফর্দ্দা না মেনে দু' চোখ মেলে স্পষ্ট ক'রে দ্যাখে, এতেই ত বেচারীদের যত দোষ, এই না? চোখের সাম্‌নে যা পড়ে তার দিকে মানুষ চোখ না দিয়ে পারে কি? তার ওপর চোখের যদি সেটা দেখতে ভাল লাগে তা হ'লে দু' দণ্ড ফিরে ফিরে দেখবেই।" কেদার এগিয়ে আস্‌ছিল, প্রিয় সইকে ঠেলা দিয়ে বল্‌লে, "যা জিজ্ঞেস করছিলাম তার ত জবাব দে।" সেবা কেদারের দিকে আর-একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বল্‌লে, "মন্দ কি, তবে ঐ যে ভুঁড়ির চিহ্ন, ঐটে সই মোটেই ভাল্ল না। আমাদের দেশে দু' রকমের চেহারা বাঁধা ধরা। এক হয় পিলে-রোগা হাত পা, পেটটি ডাগর; ম্যালেরিয়া যেন আঙুরের রসটি নিঃশেষে চুসে খোলসটি রেখে দিয়েছে। আর নয় ত ঘি-দুধে চিকণ-চাকণ দেহ আর সেই দেহে একটি মস্ত ভুঁড়ি"—

প্রিয় হেসে উঠে বল্‌লে, "তুই আবার এত টিপ্পনী কাটতে শিখলি কবে, সই? মানুষটি দেখতে কেমন জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তা তুই এখন দেশ-শুদ্ধো লোকের তুলনা সুরু কর্‌লি।"

সেবা বল্‌লে, "ভুল হ'য়ে গেছে সই, মাপ করো। এক-জনের জায়গায় বহুবচন সুরু করেছি। লোকটি দেখতে দিব্যিটি, তবে মুখখানা কামিয়ে-জুমিয়ে নেহাৎ ওদের মতন ক'রে ফেলেছে তাতেই—"

মীনার এতঃক্ষণ নজর পড়েনি যে বাবা আস্‌ছে; এইবার নজর পড়তেই "মা বাবা আস্‌ছেন, বাবা আস্‌ছেন" ব'লে ছোট দুটি পায়ে ঘুমুর-গাঁথা মল বাজিয়ে তখনি রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে গেল। সেবা প্রিয়র গালে ঠোনা মেরে বল্‌লে, "আচ্ছা দুষ্টু! নিজের বরের রূপ শোন্‌বার ইচ্ছে হয়েছিল, তা বল্‌লি না কেন, আমি সাতখানা ক'রে ব্যাখ্যান কর্‌তাম?"

প্রিয় হেসে বল্‌লে,—"তুই যে একেবারেই চিন্‌তে পার্‌লি না, দেখছিলাম চিন্‌তে পারিস কি না।"

সেবা বল্‌লে—"সেই ত বিয়ের সময় আর তার মাস পাঁচ ছয় পরে যা একবার দেখা। এখন আবার ভুঁড়ি হয়েছে, গোঁপ কামিয়ে মুখের ছিরিটিও বদ্‌লানো হয়েছে, তা চিন্‌ব কি ক'রে? গোঁফে বিছে-টিছে না পোকা মাকড় লুকিয়েছিল যে সব নির্ম্মূল করতে দিয়েছিস?" প্রিয় উত্তর না দিয়ে মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌তে লাগল। "তুই হাস্ দাঁড়িয়ে আমি স'রে যাই," ব'লে সেবা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কেদারকে ছুটে গিয়ে মীনা তার সই-মার আস্‌বার খবর দিয়েছিল। কেদার বাড়ী ঢুকেই প্রিয়কে বল্‌লে—"কই গো, মীনার সই-মা কই?"

প্রিয় বল্‌লে—"তোমায় সে চিন্‌তেই পারেনি। অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, লজ্জায় ঘরে লুকিয়েছে।"

কেদার বল্‌লে—"হুঁ হুঁ, একেবারে লুকোচুরী খেলা!

আচ্ছা, আমি এখনি খুঁজে বের কর্‌ছি। সেই যে কাণ মলে দিয়েছিল তার জ্বালা আমি এখনো ভুলিনি। আর পানের ডিবের ভিতর আরসোলা ভরা—যেমন ডিবে খুলেছি অমনি গোটা পাঁচ ছয় আরসোলা আমার গা-ময় সুড় সুড় ক'রে ছড়িয়ে পড়েছে, সব মনে আছে আমার।" অতঃপর কেদার কাপড় ছাড়তে গেলে প্রিয় সইকে ডাকতে গেল দেখা কর্‌বার জন্যে। এদিকে পুকুরঘাটে নন্দাদের ঝি জয়াকে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"ঐ বুঝি গিন্নির সই? রূপ ত না যেন লক্ষ্মীর পিত্তিমে!"

জয়া বল্‌লে—"আহা কপালটি ওর পোড়া, পাগল-ছাগল সোয়ামী যেটি ছিল, হতভাগা যম তাকেও নিয়েছে। দুটো মাছ-ভাত খাচ্ছিল, তাও খেতে পায় না।"

নন্দাদের ঝি চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, "ও মা, বিধবা না কি? তা গায়ে দেখমু বডি না কি আঁটা রয়েছে, হাতে দু গাছা সোনার চুড়ি; থান পরা না, কিছু না। এ কেমন বিধবা গো?"

রমাদের ঝি বল্‌লে—"ভদ্দর লোকেদের ঘরের বিধবায় বুঝি আবার সাজ-পোষাক পরে? এই ত আমাদের গিন্নির এক দিদি বিধবা—তা থান-পরা হবিষ্যি খাওয়া পুজো-আচ্ছা কত কি নিয়ে থাকেন এমন ত কখনও দেখিনি।"

জয়া বল্‌লে—"ছেলে বয়সে বিধবা হয়েছিল ব'লে মা বোধ হয় শুধু হাত দেখতে পারেনি—"

নন্দাদের ঝি ব'লে উঠল—"না জয়া, রেখে দে তোর কথা, কি হাসি, কি রূপের গুমোর, মানুষটি যেন কেমন কেমন!"

জয়া ওদের চাইতে বয়সে অনেক ছোট, তাই তার প্রতিবাদ একটুও টিক্‌ল না। দাসীরা তৎক্ষণাৎ তাদের মনের মতন ক'রে সেবার আকৃতি-প্রকৃতি সাজিয়ে নিয়ে নিজের নিজের কর্ম্ম-স্থানে গিয়ে এমন ভাবে বর্ণনা কর্‌লে আর কয়েক জন পুরমহিলা সে বর্ণনাটিকে এমন হৃদয়-গ্রাহীভাবে গ্রহণ কর্‌লেন যে, সেইদিনই পাড়ায় রাষ্ট্র হ'য়ে গেল যে, পুলিশ-গিন্নির এক সই এসেছে তার চাল-চলন আচার-ব্যবহার, হাসি, কথা, এমন-কি রূপটি পর্য্যন্ত কোন ভদ্র বিধবার উপযুক্ত নয়। মেয়ে-মহল ছাপিয়ে পুরুষ মহলেও সে-খবরটি গিয়ে পৌঁছুতে দেরী হ'ল না। কাজেই নবীন অধরের দলের লোকেরা খবরটিকে বেশ একটি সুখবর ব'লেই গ্রহণ কর্‌লে।

বারো

মানুষের স্বভাবই হচ্ছে স্পষ্ট ক'রে কোনো কিছু না বোঝা বা না বুঝ্‌তে দেওয়া—কেন না তা হ'লেই সব রহস্যের সমাধান হ'য়ে যায়; তাকে জান্‌বার জন্যে আর একটা অদম্য কৌতূহল মনের মধ্যে জোর তাগিদ দেয় না।

সেবা বেচারী তার সইএর বাড়ী আসার পর থেকে পাড়া-প্রতিবাসীদের মধ্যে যেন একটা সাড়া প'ড়ে গেছে। তার মতন সুন্দরী যুবতী মেয়ে বাপ থাক্‌তে যে সইএর বাড়ী বিদেশে বেড়াতে আসে এ-রকম অস্বাভাবিক ব্যাপার না কি এ গাঁয়ের লোক কেউ কখনো দেখেনি। তার বেড়াতে আস্‌বার কারণ এরা একটা হেঁয়ালী ব'লে ধ'রে নিয়েছে; আর তার অর্থটা জনে জনে নতুন রকম করার দরুণ সে-অর্থ ক্রমেই জটিল হ'তে কুটিল হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

সাধারণ লোকে এই শ্লোকটির সদর্থ খুব ভালো ক'রেই জানে ও মানে—অর্থাৎ যার সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনাটি কর্‌বে সেটি তার পরোক্ষেই কবে। এই পরোক্ষে করার দরুণ আলোচনাটির শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হয় অদ্ভুত রকম—আর তাতে বেশ একটি নির্লজ্জ কৌতুক-বোধের আনন্দ পাওয়া যায়।

এ-পাড়াতেও এই ঘটনার বেশ জম্‌কালো আলোচনা পরোক্ষে চল্‌ছিল ব'লে যাদের নিয়ে এইসব আলোচনা তারা এ-পর্য্যন্ত বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পারেনি। কাজেই রমা তার সইকে নিয়ে মতি-বাবুর বাড়ী ছাড়াও এ-বাড়ী সে-বাড়ী মধ্যে মধ্যে বেড়াতে যেত।

তবে সেবার সম্বন্ধে পাড়ার গিন্নিরা যে-রকমের কূট প্রশ্ন সুরু কর্‌তেন তার সরল উত্তর রমার মুখে জোগাত না; আর সেবার সাম্‌নেই এইসব প্রশ্ন হওয়ায় সে থতমত খেয়ে যেত; সেজন্যে দ্বিতীয়বার সে, সব বাড়ীতে যাবার

আর তার উৎসাহ থাক্‌ত না। কিন্তু রমা কোনো দিন এ-ধরণের জিজ্ঞাসাবাদ করত না, অথচ সেবা আর প্রিয়কে কাছে পেলে সে ভারী খুসী হ'য়ে উঠ্‌ত। সেজন্যে ওবাড়ীতে যাওয়া রমা বন্ধ করেনি।

একদিন সেবা আর প্রিয় রমাদের বাড়ী সমস্ত দুপুরটা কাটিয়ে চ'লে যাবার সময় রমা বাইরের দরজা পর্য্যন্ত তাদের এগিয়ে এসে যখন নিজের শোবার ঘরে ঢুক্‌ছে তখনই মতি-বাবুর সঙ্গে তার চোখোচোখী হ'ল। স্বামীর স্বভাব রমার অজ্ঞাত ছিল না, তাই একটু মুচ্‌কী হেসে বল্‌লে—"তখন দু দু'বার কিসের দরকারে এসে ফিরে গেলে শুনি? জান্‌তে না কি ঘরে অন্য বাড়ীর মেয়েরা আছে?"

মতি-বাবু ইতিপূর্ব্বে হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে মেয়েদের দেখে ফিরে গিয়েছিলেন। খালি পায়ে এসে-ছিলেন ব'লে মেয়েরা কেউ জান্‌তে পারেনি। একবার নয় দুবারই এই ব্যাপার ঘটেছিল—রমা বুঝেছিল তার স্বামীর এই হঠাৎ আসার মূলে যে-কারণটি লুকিয়ে আছে তা ভারী কুৎসিৎ। অবশ্য সে সঙ্গিনীদের কাছে তার একটুও ফাঁস করেনি।

যাই হোক্‌ এখন স্ত্রীর প্রশ্ন শুনে মতি-বাবু বল্‌লেন—"সত্যিই গো তোমার চাবীর খোলোটার ভারী দরকার হয়েছিল—আমার রিঙটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তা ভাগ্যিস্‌ চাবীর খোলোটা আমার হারিয়েছিল—"

রমা বল্‌লে—"কি রকম?"

মতি-বাবু বল্‌লেন—"যা রটে—তা বটে। চোখ দুটো আজ আমার সার্থক হয়েছে, তোমার বন্ধুর সইএর রূপের খ্যাতি সহরে যা রটেছে তা মিছে না।"

রমা উত্তর না দিয়ে ঘুমন্ত শিশুটিকে মাছির কামড়ে উস্‌খুস্‌ করতে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে তাকে চাপ্‌ড়ে মশারি ফেলে দিতে লাগ্‌ল। মতি-বাবু মশারিটা একটু সরিয়ে সেই বিছানার একপাশে ব'সে বল্‌লেন—"আহা—রাগ হ'ল বুঝি। তা রাগ কিসের, তোমার বন্ধুর রূপের বর্ণনা ত আমি করিনি, কোনো দিন তাকে আমি আড়াল-আব্‌ডাল থেকে দেখবারও চেষ্টা করিনি। বলো সত্যি কি না—"

রমা বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে—"পাড়ার কোন বউ-ঝির রূপ যে তোমার চোখ এড়িয়েছে তা ত জানি না।"

মতি-বাবু বল্‌লেন—"সেটা ত সব সময়ে ইচ্ছে ক'রে নয়, অনিচ্ছেতেও অনেককে দেখ্‌তে হয়েছে। নেহাৎ চোখোচোখী হ'য়ে পড়লে চোখ বন্ধ করা অভ্যেস মানুষের নয়, তবু ভাল যে ভগবান পেছন দিকেও দুটো চোখ দ্যান্‌ নি, তা হ'লে ত সর্ব্বনাশ হ'ত।"

"তোমার মত প্রকৃতির লোকের তাতে উপকারই হ'ত—" মুখ ভার ক'রে এই কথা ব'লে রমা ঘর থেকে খপ্‌ ক'রে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই মতি-বাবু এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাত ধ'রে বুকের ওপর টেনে' নিলেন।

শশব্যস্তে রমা ব'লে উঠল, "করছ কি, ছেড়ে দাও, এখুনি কেউ এসে পড়্‌বে।"

"আহা হা, এ ত আর কিছু চুরির ব্যাপার না যে কেউ এসে পড়্‌বে, দেখে কি মনে করবে, এই ভয়েতেই আমি শিউরে উঠ্‌ব? দিনে রাতে সদাই কি চোর হ'য়ে থাকতে বলো নাকি?"

এই ব'লে মতি-বাবু স্ত্রীর গালে আদরের চুম্বন এঁকে দিলেন। রমা কিন্তু জোর ক'রে স্বামীর সোহাগের বাঁধন কেটে নিয়ে সরে' দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"কিছু বল্‌বার থাকে বলো না, শুনে নিজের কাজে যাই।"

মতি-বাবু বল্‌লেন—"এখনো ত বেলা তিনটে বাজেনি, এখন আবার তোমার কাজের তাড়া কিসের? বল্‌ছিলাম কি, তোমার নতুন বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র কেমন দেখ্‌ছ?"

রমা রাগ ক'রে বল্‌লে—"দেখো, ওরকম খোঁজ নেওয়া কিন্তু তোমার ভাল দেখায় না। কার মেয়ের স্বভাব ভাল, কার বউএর স্বভাব মন্দ, তোমার আমার সে-সব খোঁজে কি দরকার? আর-একটা কথা বল্‌ছি শোন, অনেক হয়েছে আর না; এতদিন আমার চোখ বন্ধ ছিল, আজ আমারও চোখ ফুটেছে। মন্দ স্বভাব তুমি ছাড়, নইলে তোমার ভাল হবে না।"

স্ত্রীর কাছ থেকে এমন কথা শোনা মতি-বাবুর কোনো-দিন অভ্যাস ছিল না। তিনি বিরক্ত হ'য়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন, "তুমি স্ত্রী হ'য়ে আমায় শাপ দিচ্ছ না কি?

এমনটি ত ছিলে না তুমি। কার পরামর্শে তোমার এ স্বভাব হ'য়ে দাঁড়াল ? আমার মন্দ হ'লে তোমার বুঝি খুব ভাল হবে ভাব্‌ছ ? না তখন আর-একজনের হাত ধ'রে—" রমা নিজের হাতে স্বামীর মুখ চেপে ধ'রে আর্ত্ত-কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, "থাম গো থাম, আমায় তুমি কি পেয়েছ যে, রাগের মুখে যা তা ব'লে গাল দেবে ? আমার নিজের ভালর কথা আমি ভাব্‌ছি না; আমি তোমার ছেলের মা, মেয়ের মা, আমি তোমার বউ, সে কথাটা নেহাৎ ভুলে যেয়ো না। আমি বরং সদাই ভয়ে ভয়ে আছি কোন্ পাপে কখন কি শাস্তি পাই। পাপ কি কিছু আমিই কম করেছি যে, আমার মন্দকে ঠেকিয়ে রাখব ?"

মতি-বাবু বল্‌লেন—"নিশ্চয় তোমার নতুন বন্ধুই তোমার মাথায় এ-সব বুদ্ধি ঢুকিয়েছে, নইলে এসব বুলি কপচাতে কখনও ত তোমায় শুনিনি। তুমি সতী সাধ্বী, স্বামীর তৃপ্তির জন্যে, স্বামী সেবার জন্যে যা তুমি করেছ তার আবার পাপ কিসের ? আর তুমিও সত্যি ক'রে বল দেখি তোমার অমতে, তোমার গোপনে আমি কিছু করেছি, না তোমায় কখনো ভাল কাপড় গহনা বা কোন জিনিষের অভাবে কষ্ট দিয়েছি, কি কখনও তোমায় গাল-মন্দই করেছি ?"

রমা ছলছল চোখে স্বামীর হাতদুটি ধ'রে বল্‌লে, "তা করনি; কিন্তু তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি সত্যি করে' জবাব দাও দেখি, এই যে অকাজ কুকাজগুলো ক'রে বেড়াও, সত্যিই কি এতে তুমি কিছু তৃপ্তি পাও, না আনন্দ পাও ? আর আমার কথা জিজ্ঞেস করছ ! তোমার কথা শুনে শুনে আমি ভাবতাম বটে, স্বামীর তৃপ্তির জন্যে আমি যা করি এতে আমার দিক্ থেকে কিছু অন্যায় হয় না। কিন্তু ওগো, তোমায় আমি বোঝাতে পার্‌ব না যে, আমার বুকের মাঝখানে সময় সময় কতখানি খাঁ খাঁ ক'রে ওঠে। রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গিয়ে যখনি তোমার জায়গা খালি দেখেছি তখনি চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল বয়েছে। কিন্তু পাছে স্ত্রীর চোখের জলে তোমার অমঙ্গল হয় তাতেই তাড়াতাড়ি তা মুছে ফেলে ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েদের দেখে বুক ঠাণ্ডা করেছি। মন বল্‌তে চেয়েছে যাকে তুই বড় আপনার জন ব'লে জান্‌ছিস্ সে তোর পর, আমি মনকে প্রবোধ দিয়েছি 'না না, সে আমার স্বামী, আমার সন্তানের পিতা।'" একটু থেমে রমা আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "সত্যিই আমার বন্ধুর কথায় আমার জ্ঞান হয়েছে গো, তা তুমি এতে রাগই কর, আর অসন্তুষ্টই হও। স্ত্রী স্বামীর পাপ-পথে নাম্‌বার সহায় নয়, সে তাকে পাপ-পথ থেকে টেনে আন্‌বারই চেষ্টা কর্‌বে, তাতে তার কপালে যা থাকে থাক্। স্বামী তাকে ত্যাগ করেন সেও তার ভাল।"

রমা থেমে গেল। স্ত্রীর অশ্রু-ছলছল চোখ দুটি মতি-বাবুকে বেশ একটু কাতর ক'রে তুল্‌লে, কেন না তিনি স্ত্রীকে যে ভালবাস্‌তেন না তা নয়। খেয়ালের বশে, কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়, কুসঙ্গে মিশে অন্যায় কাজগুলো তাঁর এমন অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছিল যে সেগুলোকে তিনি অন্যায় ব'লেই আর মনে কর্‌তে পার্‌তেন না। পুরুষের চরিত্র-দোষ মার্জ্জনীয়, আর সামাজিক কোন ক্ষতিও তাতে নেই, ধর্ম্মেও কিছু তাতে পাতিত্য ঘটে না, এইসব মোটামুটি যুক্তিগুলো তিনি মেনে নিতেন। কচিৎ যদি মনের মধ্যে বিবেকের সাড়া পেতেন তখন তার সাম্‌নে এই যুক্তিগুলিকে দাঁড় করিয়ে তিনি হাঁফ ছাড়তে চাইতেন। এখন রমার কথা শুনে মনে একটু চাঞ্চল্য আস্‌তেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "দেখো, স্ত্রী স্ত্রীই থাক্‌লে তারও ভাল, তার স্বামীরও ভাল। সে যদি হঠাৎ মাষ্টার-মশাই সেজে উপদেশ দিতে আসে, কী পাদ্রী সাহেবের মতন লেক্‌চার ঝাড়ে তা হ'লেই সর্ব্বনাশ। আমাদের হিঁদুর ঘরে ওগুলো মোটেই মানায় না।"

অতঃপর মতি-বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রমা নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আপনার গৃহকাজে মন দিতে গেল।

তেরো

কেদারের বাসার পাঁচ সাত হাত দূরে একটি ছোট্ট বাগানঘেরা বাসা ছিল। বাগানটিতে অনেক রকমের ফুলের বাহার, সব সময়েই চোখ জুড়িয়ে দিত। সেবা ভোরের সময় ঘুম ভাঙতেই জান্‌লা দিয়ে যখন বাইরের

দিকে চাইলে তখন অন্ধকারের বিশ্বজোড়া পর্দ্দাখানা ঊষারাণী তাঁর সুন্দর শুভ্র হাত দিয়ে অল্প অল্প ক'রে ওপর দিকে টেনে তুল্‌ছেন। শীতের বাতাস বেশ শীতল হ'লেও ভোরের সময়কার একটা নির্ম্মল শান্ত ভাব তার কন্‌কনে স্পর্শের মধ্য থেকেও আপনার প্রকাশকে ফুটিয়ে তুল্‌ছিল। সেবা সে-স্পর্শে পুলকিত হ'য়ে সেই ছোট্ট বাগানটির দিকে চেয়ে রইল। গাঁদা ফুলে ফুলে বাগানটি অপূর্ব্ব শোভাময় হ'য়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে বড় বড় লাল, হল্‌দে ও গোলাপী রঙের গোলাপ তার গন্ধ বাতাসকে মধুরতর ক'রে তুলেছে।

শীতের সময় বাংলা দেশে বৈষ্ণবরা ভোর থাক্‌তে নাম গান ক'রে টহল দিয়ে যায়। সুমিষ্ট কীর্ত্তনের সুর ভাবপূর্ণচিত্তে সহজেই বেশ সাড়া দিয়ে শুধু বাইরের চোখের ঘুম নয়—মনের চোখেরও যেন ঘুম কেড়ে নিতে চায়। সেবার পুলকভরা চিত্ত গান শুনে ভারী খুসী হ'য়ে উঠ্‌ল। সে তখন জানালাটি ভাল ক'রে খুলে দিয়ে গানের পদগুলি শোন্‌বার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে রইল। গায়ক খঞ্জনী বাজিয়ে বার বার গাইছে "জাগো রে নীলমণি জাগো—"

সেবা নিস্পন্দ ভাবে অনেকক্ষণ ব'সে রইল। তার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে যেন কোন্ এক মহান্ আহ্বান-ধ্বনি বেজে উঠেছে এম্‌নি তার মনে হ'তে লাগ্‌ল। কতক্ষণ পরে তার সেই সাম্‌নের বাসার বাগানটিতে চোখ পড়তেই আর সে-ভাব রইল না। দেখ্‌লে একজন যুবক তার দিকে নিমেষহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সে-দৃষ্টিতে চম্‌কে উঠে সেবা স'রে এল। ছেলেটি যে স্কুলেরই একজন পড়ুয়া তাতে তার সন্দেহ ছিল না, কেন না সে শিখরের কাছে শুনেছিল যে, তাদের স্কুলেরই পাঁচ ছয়টি ছাত্র এখানে বাসা ক'রে থাকে। জয়া এই সময়ে ঘর ঝাঁট দিতে আস্‌তেই তাকে সেবা জিজ্ঞেস করলে—"হাঁ জয়া, একটি ছেলে যে ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে আছে ও কে?" জয়া একবার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েই ফিরে এসে নিজের কাজে হাত লাগিয়ে সেবার কথার জবাব দিলে—"ঐ হোথাকে এক গাঁ আছে সেই গাঁর জমিদারদের ছেলে। বোডিন না কিসে থাকে। এনাদের থাকা হয় না মর্‌তে আস্‌ছেন আমাদের পাড়াকে। পড়াশুনোর নিকুচি করেছে, কেবল রাত ভোর বদ্‌মাসী। বাপ ঠাকুদ্দা এদের কেন যে পড়তে পাঠায়ছে তা মা কালীই জান্‌ছেন। এক-একটি যেন অবতার।"

ছেলেদের এতখানি নীচতার পরিচয় সেবা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না; বল্‌লে, "জয়ার সঙ্গে আড়ি আছে না-কি যে, অত নিন্দে করা হচ্ছে?"

জয়া বল্‌লে,—"আমার সঙ্গে কিসের আড়ি থাকবে সইমা? সত্যি কথাই বল্‌ছি। ওনারা ঐ ধরণের লোকই হচ্ছেন। তাই বল্‌ছি। এই বয়সেই সব মদ খাওয়া ধরেছে, আরও সব কত নষ্টামী যে করে তা বল্‌তে পারব না। ঐ যে বাবুর কাছে অধর-বাবু আর নবীন-বাবু আসে তেনারাই তো হোচ্ছেন পাণ্ডা। গিন্নিমাকে ত পেরথম দিনই বলেছিলাম, ঐ বাবুরা ভারী মন্দ লোক। তেনাদের জন্যে আমরা ছোট লোকের বউ-ঝি হ'লেও ভয়ে ভয়ে পথ চলি।"

বেশ সুন্দর প্রফুল্ল মন নিয়ে সেবা আজ প্রথম নিদ্রা-ভঙ্গে চোখ মেলেছিল, জয়ার কথায় তার মন বড় অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠল। প্রিয়র ঘুম ভাঙ্‌তেই সে সইএর কাছে এসে সব শুনে বললে—"তুইও যেমন সই, ওরা মন্দ আছে তা আমাদের কি?"

প্রিয় মনে কর্‌লে যে, তার সম্বন্ধে একটা আলোচনা যে-ভাবে পাড়াতে প'ড়ে গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে পাড়ার কুচরিত্র পুরুষদের লোভাতুর দৃষ্টি যেমন ভাবে তার দিকে পড়েছে, তাতেই বোধ হয় ছাত্রযুবকটির লালসার চাউনী সেবাকে শঙ্কিত ক'রে তুলেছে। সেবা কিন্তু বল্‌লে, "না সই, কথাটা নেহাৎ গায়ে না মাখবার কথা নয়। আমার দিকে অমন ক'রে চেয়েছিল ব'লে যে আমি ক্ষয়ে গিয়েছি তা নয়। কিন্তু এই এত অল্প বয়সে ওদের এই মতিগতি কু-অভ্যাস, বদ্‌খেয়ালীর কথা শুনে আমার মনটা সত্যিই যেন দরদ বোধ করছে। এরাই আবার দেশের ভবিষ্যৎ! একে ত দেশের চারদিকেই কেবল ব্যভিচার আর অবিচারের অনন্ত লীলা চলেছে, তার ওপর এখনকার বালক যুবক ছাত্র যারা, তারাও যদি এই বয়েস থেকে এত হীন কলুষিত ভাবে নিজেদের চরিত্রকে কদর্য্য ক'রে তোলে তা হ'লে তার পরে যারা আস্‌বে তারা আরও কত হীন হ'য়ে পড়বে?"

প্রিয় বল্‌লে—"যেমন আব্‌হাওয়ার মধ্যে আছে তেম্‌নি সব হবেই। উনি ত দু' মাসেই হাঁফিয়ে উঠেছেন। সে-দিন বল্‌ছিলেন যে, এখানকার চাকরী পেরে উঠবেন না, হয় বদলী নেবেন, নয় কাজ ছেড়ে দেবেন। কেবলি খুনের খবর আস্‌ছে, আর সব খুন এই সব ছাই ভস্ম নিয়ে।

প্রিয় কাজে গেল। সেবার এখানে কোন কাজ ছিল না, তবে প্রিয় তাকে মীনাকে প্রত্যহ সকালে একবার ক'রে বই নিয়ে বসাবার ভার দিয়েছিল। আর শিখর ও রমার মেয়ে বিজু এরাও এসে ঐসময় একটু ক'রে তাদের পড়া জেনে নিত। নিজের সামান্য যা কিছু বিদ্যা সেবা পুঁজি কর্‌তে পেরেছিল এখন এভাবে তা কাজে লাগাতে পেরে তার ভারী আনন্দ হ'ত। পড়াশুনো তার যেটুকু হয়েছিল তা খুব বেশী না, তবে শিক্ষার আনন্দ, জ্ঞান-সঞ্চয়ের আনন্দ তাকে যেন নেশার মতো পেয়ে বসেছিল, তাইতে সে তার মনটি সর্ব্বদা সজাগ রেখে যেখান থেকে যে-অবকাশে যেটুকু শিখতে পারে তার জন্যে সচেষ্ট থাকত। এখানে এসে কেদারের কাছে অনেক ভাল ভাল বই ছিল দেখে তার মন ভারী খুসী হয়েছিল। এগুলি সে মন দিয়ে পড়ত যা বুঝ্‌তে পার্‌ত না তার জন্যে ক্ষুব্ধ হ'লেও পাঠে তার অবসাদ ছিল না।

মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসে সেবা ছাত্রদের প্রতীক্ষায় ব'সে রইল। ছেলেদের কলকোলাহল কানে ঢুক্‌তেই সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, পড়ুয়ারা হাজির; অধিকন্তু ভাইটিকে কোলে নিয়ে নন্দাও এসে উপস্থিত। সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই কিন্তু সেবা বুঝ্‌লে যে, পড়্‌বার চাইতে এরা আজ একটা নতুন কি এক খবর নিয়েই বেশী ব্যস্ত। বিশেষ ক'রে খবরটাতে এমন একটা রস আছে যেটা বাল-হৃদয়ের বেশ উপযুক্ত খোরাক অর্থাৎ হাস্যরস। জয়া, প্রিয়, সবাই এসে নন্দাদের কাছে দাঁড়িয়েছে দেখে সেবাও এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে—"ব্যাপার কি? হেসেই যে অস্থির সব।"

নন্দা মুখে কাপড় গুঁজে হাস্‌ছে, বিজুও খিল্ খিল্ ক'রে হাস্‌ছে, শিখরেরও সেই অবস্থা, জয়াও হেসে কুটি-কুটি। প্রিয় বল্‌লে—"হেসেই সব খুন হবি না খুলে কিছু বল্‌বি?" জয়া বল্‌লে—"শোনো গিন্নিমা, এই আমি ঘর ঝাঁট দিয়ে বাসন নিয়ে ঘাটকে—গেছি"—বাধা দিয়ে শিখর বল্‌লে—"চুপ কর জয়া, আমি বল্‌ছি। শোন দিদি ঐ যে নবীনের দিদি···"

নন্দা শিখরের মুখে হাত চাপা দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"এই আমি বল্‌ছি শোন মাসীমা। নবীনের দিদি সক্কালবেলা পুকুরে ডুব দিয়ে নাইছে আর দয়া পাগ্‌লীকে যে কি কি ব'লে গাল দিচ্ছে তা যদি শোন একবার আবার পার্শেল গিন্নিকে পর্য্যন্ত।" গালাগালির মধ্যে হাসির কিছু গন্ধ না পেয়ে বিরক্ত হ'য়ে প্রিয় বল্‌লে—"কি যে মিথ্যে তোরা হেসে সারা হ'চ্ছিস্ তা ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না আমি।"

সেবা বল্‌লে—"পার্শেলের আবার গিন্নি কি সই, তাও ত বুঝি না।"

নন্দা বল্‌লে—"ওগো পার্শেল-বাবুর গিন্নি। এইবার ভাল ক'রে বল্‌ছি শুনে হাস কি না দেখব। দয়া পাগলা, মোড়লদের বাড়ী খুব ধুম ক'রে অন্নপূর্ণো পুজো হয়—" বাধা দিয়ে জয়া ব'লে উঠ্‌ল—"ঐ যে গিন্নিমা নবীনের ঠাকুর গো।"

—"থাম্ তুই" ব'লে নন্দা জয়াকে ধমক দিয়ে বল্‌লে "—পুজোয় ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়েছিল। তাদের পাত থেকে সন্দেশ আর ক্ষীরমোহন কুড়িয়ে দয়া পাগলী একটা হাঁড়ী ভর্ত্তি করেছিল। রাস্তা দিয়ে যখন নিয়ে যাচ্ছে নবীন তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল; সে দয়াকে দেখে বল্‌লে, 'অ-দয়া, কি নিয়ে যাচ্ছিস?'"

দয়া বল্‌লে, "দাদাঠাকুর গো, এক হাঁড়ী সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছি। এই দ্যাখ ক্যানে, লাতিন আমার আর-বছর শ্বশুর-ঘরকে যাল্‌ছে আর আস্‌বার নামটি নাই। সে গাঁকে ভাল মন্দ কোনো খাবার-দ্রব্যি ম্যালে না দাদা-ঠাকুর, এই এক হাঁড়ী খাবার, লাতিন আমার ঘরকে থাক্‌লে কতই খাতো আহা হা"—নবীন তার দুঃখু দেখে বল্‌লে—"তুই না হয় তার শ্বশুর-ঘরে গিয়ে দিয়ে আয় না।" দয়া বল্‌লে, "পরের বাড়ীর ঝি আমি, কাজের বাড়ীতে ছুটি নেই, কেমন ক'রে যাব?" তখন নবীন বল্‌লে, "বেশতো ষ্টেসনে নিয়ে গিয়ে পার্শেল ক'রে দিগে না।" দয়া পাগলী

তুলির লিখন

শিল্পী শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

তখন পার্শেল-বাবুর কাছে গেছে। এদিকে নবীনের দুষ্টবুদ্ধি বই ত না, সে গিয়ে পার্শেল-বাবুকে চুপিচুপি টিপে দিয়ে দয়াকে বল্‌ছে কি না, দ্যাখ দয়া, পার্শেল পাঠাতে এক টাকা খরচ তার চাইতে তারে পাঠিয়ে দিবি কিছু খরচ নেই ? দয়া জানে তারে খবর আসে; খবর যায়। সে পাগল মানুষ স্বচ্ছন্দে তারে পাঠাতে ব'লে দিলে। পার্শেল-বাবু বল্লেন, "বেশ, আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি পাঁচ ছদিন পরে এসে জেনে যেও। দয়া তাই বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে। তারপর এখন দু'মাস পরে ওর নাৎনী এসেছে, তাকে সন্দেশের কথা জিজ্ঞেস কর্‌তেই সে বল্‌ছে, সন্দেশ-টন্দেশ কিছুই পায়নি। কাল তাই দয়া পার্শেল-বাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'হ্যাঁ বাবু, সন্দেশ যে এক হাঁড়ী পাঠিয়েছিলাম, আমার লাতিনের ঠেঁয়ে ত কই যায়নি ?"

পার্শেল-বাবু এদিকে সেই সন্দেশ নিজেরা খেয়েছে আর নবীনের সঙ্গে খুব ভাব ব'লে অর্দ্ধেক নবীনদের বাড়ী পাঠিয়েছে। নবীনের দিদি টিদি সব্বাই খুব খেয়েছে। এখন দয়া গিয়ে পার্শেল-বাবুকে জিজ্ঞেস কর্‌তেই পার্শেল-বাবু মাথা চুল্‌কুতে চুল্‌কুতে বলেছে, "হ্যাঁ দয়া, পার্শেলের হাঁড়ীটা সত্যিই তোমার নাৎনীর কাছে পৌঁছোয়নি। তারে যেতে যেতে এক জায়গায় হঠাৎ তারেরই একটা গাঁটে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে মাটিতে প'ড়ে গেছে। এমন ত হয় না, তবে কেন হ'ল তা বুঝতে পার্‌লাম না।" দয়া তখ্‌খুনি কপাল চাপ্‌ড়ে ব'লে উঠল "আ আমার কপাল, মুখের জিনিস লাতিন আমার খাতি পেলে না, বাবু। অ-ঠিক হইছে, আমারই দোষ, বাবু আমারি দোষ, হোক ক্যানে বামুনের পরসাদ এঁটো জিনিস ত বটে, তাতিই হাঁড়ী ভাঙিছে, এতক্ষণকে আমি বুঝ্‌ছি।" দয়ার বোঝবার সঙ্গে-সঙ্গে পার্শেল-বাবুও খুব বুঝলেন। এদিকে নবীনের দিদির কানে এসেও খবর পৌঁছেছে তাতেই গাল যা দিচ্ছে তা কি বল্‌ব। জাত-জন্ম সব গেলো আঁটকুড়ীরপোদের এঁটো পাতের মেঠাই খাইয়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব খোয়ালে গা।"—এই ব'লে চেঁচাচ্ছে আর ডুব দিচ্ছে। আমি যেই বলেছি, "গঙ্গা নাইতে যাও গো, পুকুরে নেয়ে কিছু হবে না, তখন আমাকে শুদ্ধো গাল দিচ্ছে।" কাহিনীটি শুনে শেষ পর্য্যন্ত সেবা, প্রিয় ত আর না হেসে থাক্‌তে পার্‌লে না। কিন্তু আবার তার পদ্যপাঠের ছড়া আওড়ালে—"লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ঘটিবে নিশ্চয়—কেমন বাবু সন্দেশ খাবার সখ। পাগলীকে ঠকাতে গিয়ে নিজেরাই ঠক্‌লে...।" পরচর্চ্চায় সময় নষ্ট হয় দেখে প্রিয় আলোচনা বন্ধ কর্‌বার জন্যে জয়াকে ধম্‌কে উঠল—"কতখানি বেলা হলো জয়া কখন বাসন কোসন ধুয়ে আন্‌বি বল্‌ ত ? সই, তুই এদের শীগ্‌গীর পড়িয়ে নে, আমি ওঁকে খাবার দিয়ে আসি।"

(ক্রমশঃ)

সিংহলে বাঙ্গালী কলাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত দেড় বৎসরাধিক হইল, সিংহলের আনন্দ কলেজের কলাধ্যাপক হইয়া নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার ভিতর দিয়া জাতীয় শিক্ষা-সভ্যতার প্রচারে সাহায্য করিতেছেন। কলম্বোর এই কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষা দিবার জন্য বিশ্বভারতীর নিকট একজন শিক্ষক চাহিয়া পাঠাইলে, মণীন্দ্র-বাবু মনোনীত হইয়াছিলেন। চিত্রকলা এবং নব্যভারতীয় কলারীতি সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ যে কী তাহা তাঁহার লিখিত একটি সুন্দর প্রবন্ধে সম্প্রতি প্রবাসীর পাঠকগণ জানিতে পারিয়াছেন। শৈশবকাল হইতেই চিত্রের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক একটা ঝোঁক ছিল। তাহারই ফলে, শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ে আন্তরিক যত্নের সহিত অধ্যাপক অসিতকুমার হালদার-মহাশয়ের নিকট চিত্রশিল্প শিক্ষারম্ভ করিয়া তিনি বিশ্বভারতীর কলাভবনেই তাহার সমাপ্তি করেন।

মণীন্দ্রবাবু শান্তিনিকেতন হইতে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিয়া চারি বৎসর ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু বি-এ পরীক্ষা না দিয়াই পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের নিকট চারি বৎসর শিল্প শিক্ষালাভ করেন। চিত্র ব্যতীত তক্ষণশিল্প (wood cut) এবং প্লেটএন্‌গ্রেভিংএ (bas-relief) মূর্ত্তি খোদাই শিল্পে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নকালেই তিনি ছোট ছোট ছেলেদের

শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

চিত্রের ক্লাশে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার চিত্র ভারতের নানা স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতা, ঢাকা, মান্দ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, গুজরাট, লাহোর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত, আহৃত এবং প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়াছে। অনেক বিক্রয়ও হইয়াছে। প্লেট-খোদাই মূর্ত্তি অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভী, স্বর্গীয় পিয়াসন্ সাহেব, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি-লিট, অধ্যাপক তারাপরওয়ালা, মিস্ ম্যাক্‌লিয়ড (বেলুড় মঠ) প্রমুখ গুণজ্ঞগণ গ্রহণ করিয়াছেন। মণীন্দ্রবাবুর চিত্র বঙ্গে প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রের এবং দক্ষিণ ভারতে "মাদ্রাজমেলের" ভিতর দিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। কলাজগতে ঐসকল পত্রিকায় এবং "Current Thought"এ মণীন্দ্রবাবুর বাঙ্গালা ও ইংরেজী প্রবন্ধাবলী ভারতীয় চিত্রকলা সাধারণের বোধগম্য করিয়া দিতে সাহায্য করিতেছে। কোন কোন প্রবন্ধ তেলেগু ও সিংহলী পত্রিকায় অনূদিত হইয়াছে। এবৎসর মাদ্রাজ সূক্ষ্মশিল্প প্রদর্শনীতে তাঁহার "কবি" নামক চিত্রের জন্য তিনি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। মিসেস্ এ, ই, আদেয়ার (Mrs. A. E. Adair) য়ুরোপের একটি প্রদর্শনীর জন্য ইহা লইয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় আন্ধ্রজাতীয় কলাশালায় শিল্পাচার্য্য হইয়া আসিয়া ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে স্থানীয় সংস্কার যেরূপ দেখিয়াছিলেন, মণীন্দ্র-বাবু সিংহলের আবহাওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রতিকূল দেখিতেছেন। তাহার কারণ, এদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা বড় ভাল নহে। বাঙ্গালী-নিন্দুক মেকলে সাহেব যেমন তাঁহার সমসাময়িক বানিয়ান, দোভাষ, খানসামা, বাবুর্চ্চী প্রভৃতির চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া বাঙ্গালী-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন, সিংহলীরাও তদ্রূপ তামিল কুলী এবং বণিক্‌দের দেখিয়া ভারতীয়দের সম্বন্ধে মত পোষণ করিয়া থাকে। মণীন্দ্র-বাবু এদেশে অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন এবং দেশবাসীদের সহিত খুব মিলিয়া দেখিয়াছেন,—এখনও তাঁহাদের দেশাত্ম-বোধ কিছুমাত্র জাগে নাই। ভারতীয় চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি এদেশে যে তেমন কদর (appreciation) পান নাই, তজ্জন্য নহে; তিনি বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, এখানে অনেকের বিশ্বাস, যাহা কিছু দেশীয় সবই খারাপ, আর যাহা কিছু য়ুরোপীয় সব ভাল। এমন-কি তাঁহাদের নব্য ভারতীয় চিত্রশিল্প, দেশীয় ভাব, দেশীয় পোষাক তাঁহাদের প্রশংসা জাগাইতে পারে নাই। সিংহল ভালমন্দ বিচার না করিয়া

য়ুরোপীয়দের হুবহু নকল করিতে শিখিয়াছে, এবং বুঝিয়াছে যে, একজন ভদ্রলোকের (gentleman) হ্যাট, কোট, টাই পরিধান করাই চাই।

মণীন্দ্র-বাবু কলম্বোর প্রদর্শনীতে তাঁহার নিজের ও ছাত্রদের ছবি পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে ও ভারতের বাহিরে তাঁহাদের চিত্র যেরূপ প্রশংসা ও স্থান লাভ করিয়াছে, এখানে তদ্রূপ হয় নাই। তিনি বলেন, এখানে আর্ট, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি লোকের বিশেষ interest নাই। সুতরাং এই আব্-হাওয়ার মধ্যে থাকিয়া তিনি সিংহলীদের ভারতীয় চিত্র-কলানুরাগ কতদূর বৃদ্ধি করিতে এবং তাহার ভিতর দিয়া ভারতীয় cultureএ দ্বীপবাসীদের কতটা অনুপ্রাণিত করিতে পরিবেন, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। "নিউইণ্ডিয়া" পত্র লিখিয়াছেন—

"Babu P. K. Chatterjee is art master in Musalipatam and Babu M. B. Gupta in the Ananda College, Colombo. They are helping to good effect in the needed works of restoring and developing the true Indian art instead of wasting time in shaddy imitation of foreign methods."

(New India, 1st April, 1926.)

তাৎপর্য্য—"বাবু প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মছলিপত্তনের কলাধ্যাপক এবং বাবু মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কলম্বোর আনন্দ কলেজের কলাধ্যাপক। তাঁহারা প্রকৃত ভারতশিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির প্রয়োজনীয় কার্য্যে সফল সাহায্য করিতেছেন; বিদেশী প্রণালীর বাজে অনুকরণ করিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন না।"

মণীন্দ্র-বাবু সিংহলীদের উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কলা ও সাহিত্য এই উভয় ক্ষেত্রেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি আর্ট সম্বন্ধে মাসিক ও দৈনিক কাগজপত্রে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখিয়া তাহাদের মধ্যে এসকল বিষয়ে একটা অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। এবং "The Librarian," "Ananda Review" "The Ceylon Theosophical News," "The Morning Leader" প্রভৃতি পত্রে তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতেছে। "Buddhist Chronicle"এ তাঁহার চিত্র-শিল্প-নিদর্শনও বাহির হইয়াছে।

মণীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ যে তাঁহাদের ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা দান করেছে, তাঁরা যে ভারত-বর্ষেরই লোক—সিংহলে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন, সে-কথা তাঁরা পরিষ্কার ভুলে গেছেন। আমাদের, বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীদের কর্ত্তব্য, সে-সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপন করা। কারণ, বাঙ্গালী রাজকুমার বিজয় সিংহই প্রথম লঙ্কাদ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগ স্থাপন করেন। 'লাইব্রেরিয়ান্' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়তুঙ্গ তাঁর পত্রিকার ভিতর দিয়ে ভারতের সহিত যোগস্থাপন করতে চান। 'লাইব্রেরিয়ান্' এধরণের একমাত্র মাসিক পত্রিকা। বাংলার যাঁরা সিংহলের সহিত যোগ রাখতে ইচ্ছুক, তাঁদের এই পত্রিকাকে প্রবন্ধাদি দিয়ে সাহায্য এবং উৎসাহিত করা উচিত। এখানে যাঁরা বয়স্ক তাঁদের কাছ থেকে কিছু আশা নেই। ছোট বালকেরা যারা এখনো তরুণ, তাদের ভিতর দিয়ে সিংহলের নতুন জীবনকে জাগিয়ে তুলতে হবে। একাজের পুরোহিত হবে বাঙ্গালী।"

গুপ্ত-মহাশয় সাত আট মাস পূর্ব্বে আমাদের এই পত্র লিখিয়াছেন। আজ তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার কালে সম্প্রতি "বঙ্গবাণীতে" অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় লিখিত "যৌবনের দিগ্বিজয়" প্রবন্ধের* কথা মনে পড়িতেছে। যৌবনের শক্তি লইয়া মণীন্দ্র-বাবু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে যেরূপ আশা ও উদ্দেশ্য লইয়া তরুণ সিংহলকে জাগাইবার জন্য আপনাকে নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি যে, যে-বীজ তিনি এক্ষণে বপন করিতেছেন, সময়ে তাহা অঙ্কুরিত হইবে এবং বৌদ্ধযুগের বাঙ্গালী বিজয় সিংহের রাজ্যে তিনি নব্য বঙ্গীয় কলা-শিল্পের "বিজয়কেতন উড়াইয়া" আসিয়া বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন।

* বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ১৩৩৩।

বীরভূমের রেশম-শিল্প

শ্রী গৌরীহর মিত্র

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বীরভূমের তসর-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা বীরভূমের রেশম-শিল্পের কথা বলিব।

তসর-শিল্পের ন্যায় রেশম-শিল্প বীরভূমের একটি প্রধান শিল্প। বীরভূমের এই শিল্প কতদিনের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে এই শিল্প যে বহুদিনের তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

চীন ও ভারতবর্ষ রেশমের আদি উদ্ভব-স্থল বা জন্মভূমি। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে রেশমী-(কৌষেয়) বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চীন ও ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপ প্রভৃতি দেশ এই শিল্পে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। আরব-দেশের লোক এই শিল্প ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়া স্পেন দেশে লইয়া যায়। সেখান হইতে ইতালি, তারপর ইউরোপের নানা স্থানে এই শিল্প বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

নানাজাতীয় রেশম-প্রজাপতি ও ডিম, কীট, গুটি প্রভৃতি
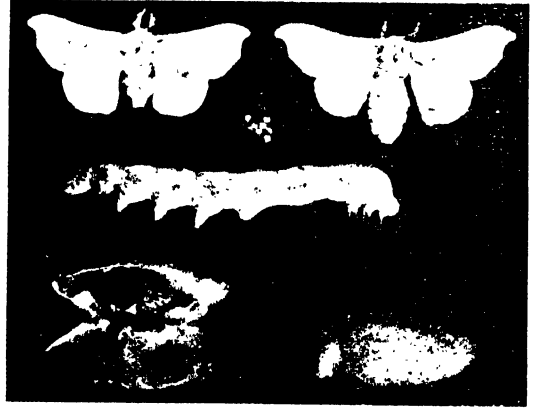
পুং ও স্ত্রী প্রজাপতি এবং ডিম, কীট, গুটি প্রভৃতি

বাঙ্গালার নানা জেলায় এই শিল্প বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া প্রভৃতি জেলার রেশমই প্রসিদ্ধ।

রেশম-শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবসা উপলক্ষে বীরভূমে ইংরেজদিগের সর্ব্বপ্রথম আগমন সূচনা হয়। তাহার পূর্ব্বে এদেশে ইংরেজের নাম-গন্ধ ছিল না। তৎকালে বোলপুরের সন্নিকট সুরুল গ্রামে দৈনিক হাজার-খানা দেশী হাতের তাঁত চলিত। তাহাতে কেবল সাদা সূতার বস্ত্র বয়ন হইত। সর্ব্বপ্রথম জন চীপ সাহেব সুরুলে উক্ত ব্যবসা উপলক্ষে বীরভূমে আগমন করেন। তারপর একে একে দুই-একজন ইংরেজ আসিয়া আমাদের শিল্পগুলির উপর হস্তক্ষেপ করেন। ক্রমে গণুটীয়ার বিরাট্ রেশমী কুঠী নির্ম্মাণ হয়। সে-সময় ভালরূপ যানাদির

ব্যবস্থা না থাকায় তাঁহারা শিবিকারোহণে সুরুল হইতে গণুটীয়ার কুঠীতে যাতায়াত করিতেন।

বীরভূমের গণুটীয়া রেশম-শিল্পের জন্য সর্ব্বদেশে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। মৌরাক্ষী নদীর তীরে এই সুবৃহৎ কারখানা রেশম-শিল্পের বিশেষ উপযোগী ছিল। রেশম-শিল্পের মূল্য বুঝিয়া ইংরেজ ও ফরাসীরা এদেশে আসিয়া নানাস্থানে রেশম-কুঠী নির্ম্মাণ করেন। বীরভূমের গণুটীয়ার বিরাট কুঠী তন্মধ্যে অন্যতম। সর্ব্বপ্রথম ফ্রাসার্ড (Frushard) সাহেব ইংরেজী ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এই বিরাট কুঠীর চালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জন্ চীপ (Jhon Cheap) সাহেব উক্ত বৃহৎ কারখানা চালাইতে থাকেন; কিন্তু ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গণুটীয়ার কুঠীতে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সেক্সপিয়ার (Shakespeare) সাহেবের অধীনে উক্ত কুঠী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। এইখানেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের শিল্পব্যবসা কর্ম্মের সমাপ্ত হয়। উক্ত কুঠী কলেক্টর কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া খাসমহলরূপে কিছুদিন চালিত হয়। পরে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানি উক্ত কুঠী ক্রয় করিয়া তাহার পরিচালনা করেন। কোটাসুর, ভদ্রপুর, তারাপুর প্রভৃতি স্থানে গণুটীয়া কুঠীর এক-একটি করিয়া শাখা-কুঠী নির্ম্মিত হয়। এই-সমুদয় স্থানে রেশম চাষ ও রেশমী বস্ত্র বয়ন করিয়া বৈদেশিকেরা প্রচুর অর্থলাভ করেন। কালের গতিতে এই বিরাট কুঠী সহসা উঠিয়া গিয়া বীরভূমের উন্নতমুখী রেশম-শিল্পের বহু ক্ষতি করিয়াছে। তবে বিদেশীর হাত হইতে এই শিল্প আমাদের আপন হাতে আসায় অনেক সুবিধা হইয়াছে বলিতে হইবে। হাতের তাঁত বিদেশী কলের তাঁতের প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিত না বলিয়া অনেক তন্তুবায় ইহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুখের বিষয়, এখন আমাদের দেশী তাঁতে আপন হাতে পূরা স্বদেশী ভাবে রেশমী-বস্ত্র বয়ন হইতেছে।

গণুটীয়ার কুঠীতে প্রত্যহ দুই সহস্রাধিক লোক কাজ করিত। এইসমুদয় লোক আবার নানা শ্রেণীর কার্য্যে বিভক্ত ছিল। কেহ রেশমী পোকা (পলু-পোকা)-গুলির যত্ন করিত, কেহ গুটি সিদ্ধ করিত, কেহ সূতা তুলিত, কেহ কেহ বা আমদানি-রপ্তানি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ইউরোপে সুলভে রেশমের চাষ হইলে দেশীয় শিল্পগুলি তাহার প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারায় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি জেলার বিদেশীগণ কর্ত্তৃক চালিত কুঠীগুলি উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বাৎসরিক লক্ষ লক্ষ টাকার আয় অবিলম্বে পরিত্যাগ করা একটা সহজ ব্যাপার নহে। ইংরেজ ও ফরাসী চালিত কুঠীগুলি উঠিয়া যাওয়ায় দেশীয় তন্তুবায়গণ তাঁহাদের পিতৃপুরুষ-পরিচালিত সাধের শিল্পের পুনরায় উন্নতি সাধন করিতে মনোনিবেশ করেন। বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী-ভুক্ত ভদ্রপুরের কুঠী মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর-নিবাসী সেখ মসুরুদ্দিন মহাশয় চারি সহস্র টাকায় ক্রয় করিয়া এই শিল্পটিকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন। বাকী কুঠীগুলি একেবারে কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিলেই হয়।

বীরভূমের মাড়গ্রাম, বসোয়া, বিষ্ণুপুর, পলসা, নোয়াদা, লোহাপুর, কোটাসুর, তারাপুর, ভদ্রপুর, মাধ্যার ও তেঁতুলিয়ার রেশমই বিখ্যাত। বীরভূমের উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলের মৌরেশ্বর থানা হইতে মুরারই থানার শেষসীমা পর্য্যন্ত অধিকাংশ গ্রামেই রেশম-গুটি ও তুঁতপাতার চাষ প্রচলিত আছে। রামপুরহাটের অধীন মাড়গ্রামের তন্তুবায়গণ রেশম-শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। বসোয়া, বিষ্ণুপুর ও তেঁতুলিয়া এই গ্রামত্রয় পরস্পর হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে। এই গ্রাম কয়খানিতে প্রায় সাত আট শত ঘর তাঁতীর বাস। তাঁতীপাড়া, বীরসিংহপুর, করিধা প্রভৃতি গ্রামের তন্তুবায়গণকে যেমন তসর ও সাদাসূতার অন্যান্য বস্ত্র বয়ন করিতে দেখা যায় তেমনি এই গ্রামসমূহের তন্তুবায়গণকে রেশম চাষ ও রেশম বস্ত্র বয়ন করিতে দেখা যায়। তাঁতীপাড়া, বীরসিংহপুর, করিধা প্রভৃতি গ্রামে রেশমের চাষ করিতে দেখা যায় না। জলবায়ুর পার্থক্য হিসাবে বীরভূমের এইসব স্থান রেশম-চাষের তাদৃশ উপযোগী নহে।

যাহারাই পলুপোকার (রেশমী-পোকা) চাষ করে তাহারাই যে বস্ত্র বয়ন করে এমন নহে। অনেক ভদ্র-সন্তান পলুপোকার চাষ করিয়া গুটিগুলি তন্তুবায়গণকে

বিক্রয় করিয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করেন। রেশম-কীটের প্রধান আহার তুঁত-পাতা বলিয়া, অনেকে শুধু তুঁতেরই চাষ করেন। যাহাতে এই বৃক্ষগুলি সতেজ ও বলবান হইয়া বহুপত্র-বিশিষ্ট হয় তাহার যত্ন করিতে ক্রটি করেন না। এইভাবে অনেক গৃহস্থ তুঁত-পাতা বিক্রয় করিয়া বৎসরে অন্ততঃ দেড়দুইশত টাকা উপায় করেন। তবে গণুটীয়ার বিশাল কুঠী উঠিয়া যাওয়ায় তুঁতপাতা বিক্রয় অবশ্য কিছু কম হইয়াছে বলিতে হইবে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বীরভূমবাসীরা রেশম-চাষ ও রেশম-ব্যবসা করিয়া আসিতেছে। বীরভূমের তন্তুবায় সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া গুটি অবিক্রীত অবস্থায় থাকে না। মনে করিলে অনেক ভদ্রসন্তান স্বাধীনভাবে পলুর চাষ ও রেশমী গুটি বিক্রয় করিয়া নিজেদের ভরণ-পোষণ-নির্ব্বাহের সুন্দর উপায় করিতে পারেন। এই ব্যবসা করিলে সঙ্গে-সঙ্গে দেশীয় শিল্পের সমধিক উন্নতিও হয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হয় না একথা সকলেই স্বীকার করেন।

তেঁতুলিয়া, বসোয়া, বিষ্ণুপুর, মাড়গ্রাম প্রভৃতি গ্রামের তন্তুবায়গণ প্রায় সকলেই রেশম-চাষ ও রেশম-ব্যবসা করে। দাদনকারীরা বীরভূমের এইসমস্ত স্থান হইতে বৎসর বৎসর রেশম ক্রয় করিয়া ভারতের নানা স্থানে এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করিয়া থাকে। কলিকাতার মহাজনেরা থানগুলি রঙ করাইয়া ভারতেরই মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে চালান দেয়। ইংলণ্ড-প্রভৃতি দেশে রঙ না করিয়াই রেশমের সাদা থান পাঠান হয়। উক্ত গ্রামসমূহ হইতে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। তসর-থান গুণানুসারে গজ ধরিয়া যেমন বিক্রয় হয়, রেশ্‌মী-থানও রেশমবস্ত্র (পট্টবস্ত্র) তেমন ভাবে বিক্রীত হইতে দেখা যায় না। রেশমী-থান ও রেশ্‌মী-বস্ত্রগুলি প্রায়ই ওজনে বিক্রয় হয় বলিয়া অধিকাংশ স্থলে তন্তুবায়গণ অসৎ পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। থান পাট (ভাঁজ) করিবার সময় চিনি মিশ্রিত করিয়া দিলে নাকি কেউ সহজে বুঝিতে পারে না; অথচ থান ওজনে ভারী হয়। এইজন্য ক্রেতাদের পক্ষে উচিত মূল্য দিয়া থান ক্রয় করিয়া অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্বে স্থানীয় মহাজনেরা রেশমবস্ত্র ও থান ক্রয় করিয়া মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় চালান দিত। এখন মুর্শিদাবাদের সহিত এই চালানী কারবার একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই জেলার সদরে বৎসর-বৎসর যে-কৃষিশিল্পের বৃহৎ প্রদর্শনী হয় তাহাতে বীরভূমের বিভিন্ন গ্রাম হইতে এই শিল্প-প্রদর্শনীতে অনেক রেশ্‌মী-দ্রব্য প্রদর্শিত হইতে আসে। বহু স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক এবং প্রশংসাপত্র শিল্পীকে উৎসাহ দিবার জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। পলুপোকার চাষ, গুটি হইতে সূতা তোলা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ব এই প্রদর্শনীতে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করা হয়। এই প্রদর্শনী শুধু এই জেলার উন্নতি-কল্পে সমাবিষ্ট নহে। যাহাতে বিভিন্ন জেলায় উন্নত উপায়ে কৃষি ও শিল্পের প্রচার ও প্রসার লাভ করে তাহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

তসর-পোকা গৃহাভ্যন্তরে পালন করা যায় না, তাহা সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। রেশ্‌মী-পোকা (পলুপোকা) গৃহাভ্যন্তরেও পালন করা হয়। বন্য ভাবেও রেশমী গুটি পাওয়া যায়; কিন্তু স্থানীয় লোকেরা পলুপোকা গৃহাভ্যন্তরে পালন করে। শিশু অবস্থায় কীটগুলিকে তুঁতের কচি কচি পাতা খাইতে দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ গত হইলে কীটগুলির শৈশবাবস্থা কাটিয়া যায়; তখন তাহাদিগকে আর কচি পাতা খাইতে দেওয়া হয় না। কারণ, এই সময়ে কচি পাতা খাইলে তাহারা ভাল গুটি প্রস্তুত করিতে পারে না; এবং তাহা হইতে ভাল রেশম পাওয়া একপ্রকার দুর্লভ হয়। শিশুকাল হইতে গুটি কোয়া (বা কোষ) নির্ম্মাণের পূর্ব্ব অবস্থা পর্য্যন্ত শীতকালে দশহাজার কীটের প্রায় নয় দশ মণ তুঁত-পাতার আবশ্যক হয়। বর্ষাকালে শীতকাল অপেক্ষা কম পরিমাণে

আহার করে বলিয়া উক্ত সময়ে রেশমচাষের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

তুঁতপাতাই যে এই কীটের প্রধান খাদ্য তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সিমুল, শাল, রেড়ি, ভেরেণ্ডা, বাদাম প্রভৃতি বৃক্ষের পাতা খাইয়া ইহারা তেমন পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। অল্প দিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায় বা বাঁচিলে তাহারা খুবই ছোট গুটি নিৰ্ম্মাণ করে।

বিভিন্ন জাতীয় রেশম প্রজাপতির মধ্যে বম্বিকৃস্ মরি (বড় পলু), বম্বিকৃস্ ক্রেইসি, বম্বিকৃস্ ফরটুনেটাস্, বম্বিকৃস্ সিনেনাশিশ্, বম্বিকৃস্ ঠেকুষ্টার, বম্বিকৃস্ মেরিডিথনৈলিশ, বম্বিকৃস্ এরাকেনেনশিশ্ প্রভৃতির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় প্রজাপতির সকলগুলিই আমাদের এখানে পালন করা হয় না। প্রথম জাতীয় রেশম প্রজাপতিগুলি চীন, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের গৃহাভ্যন্তরে পালন করা হইলেও আমাদের দেশে সাধারণতঃ ঐ-জাতীয় পলুপোকার চাষ করিতে দেখা যায়। এই জাতীয় কীটগুলি দেখিতে শ্বেত বা হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট। অন্যজাতীয় রেশমগুটি অপেক্ষা এই জাতীয় গুটি হইতে অনেক বেশী পরিমাণে রেশম পাওয়া যায়। তজ্জন্য এই জাতীয় পলুপোকার চাষ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। উক্তপ্রকার গুটি হইতে যে-রেশম পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল এবং টেকসই। এই জাতীয় প্রজাপতির ডিমগুলির রঙ পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। প্রথমে পাড়ার সময় ডিমগুলি সাদা দেখায়। তাহার তিন চার দিন পরে ডিমের রঙ ধূসরবর্ণে পরিণত হইয়া ডিম ফুটিবার প্রায় তিন চার দিন আগে ইহাদিগকে কালো দেখায়।

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ জাতীয় কীটগুলি বৎসরে তিন চার বার গুটি নির্ম্মাণ করে বলিয়া প্রথম জাতীয় কীটগুলি অপেক্ষা এই জাতীয় পলুপোকার চাষ এঅঞ্চলে বেশী হইয়া থাকে। ইহাদের কোষ (গুটি) গুলির অগ্রভাগদ্বয় সূক্ষ্ম এবং বর্ণ পীতাভ হয়। বর্ষাকালে, শীতের প্রারম্ভে এবং বসন্তকালে পলুপোকা পালন সুবিধাজনক বলিয়া এই অঞ্চলের পালনকর্ত্তারা তাহাই করিয়া থাকে।

তৃতীয় জাতীয় পলুপোকার গুটি অন্যান্য জাতীয় গুটি অপেক্ষা দেখিতে স্বল্পাকৃতি হয় এবং পরিমাণে কম রেশম পাওয়া যায়, তাহাও আবার অন্যপ্রকার রেশম অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং কম মজবুত হয়। এই নিমিত্ত এই জাতীয় পলু পোকার চাষ অপেক্ষাকৃত কম। ইহাদের গুটির আকৃতি অন্যজাতীয় গুটি অপেক্ষা আকারে সামান্য লম্বা বা টানা এবং দেখিতে ঈষৎহরিদ্রাযুক্ত শ্বেত বর্ণের হয়। তৃতীয় জাতীয় গুটির ন্যায় চতুর্থ জাতীয় গুটিগুলি আকারে ছোট এবং লম্বা। এই জাতীয় কোয়াগুলির রঙ পূর্ব্বোক্ত জাতীয় কোষের বর্ণের অনুরূপ হইয়া থাকে।

শেষ জাতীয়গুলির চাষ আমাদের দেশে হয় না; কেননা ইহাদের কোয়াগুলি আকারে বড় হইলেও তাহা হইতে অধিক রেশম পাওয়া যায় না।

প্রথমতঃ কীটগুলিকে বংশ নির্ম্মিত বড় ডালায় বা চালুনীতে তুঁতপাতা দিয়া রাখা হয় এবং কীটগুলি বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে গোলাকার ভাবে বংশদ্বারা বহু-বেষ্টিত বড় চালুনীতে (চন্দ্রকী) রাখিয়া দেওয়া হয়। এক-এক চঁদুরকি বা চন্দ্রকীতে প্রায় দুই তিন সহস্র কীট অনায়াসে থাকিতে পারে। তাহারা চঁদুরকির ভিতর বেড়ায়। নীচু ও উপরের ঠোঁট হইতে (তসর-কীটের ন্যায় পশ্চাৎদিক্ হইতে নহে) লালা (রেশম) নির্গত করিয়া নিজকে দুই দিন মধ্যে সামান্যরূপ এবং পাঁচদিনের ভিতর গুটিমধ্যে সম্পূর্ণরূপ আবদ্ধ করিয়া ফেলে। মাস তিন এই অবস্থায় থাকিলে কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হয়। রেশম জাতীয় প্রজাপতিগুলি উড়িয়া পলাইতে সক্ষম হয় না। দেখিলে ইহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে হয়। ইহারা দেখিতে প্রায় ধূসরবর্ণের মত। ইহাদের ডানায় দুই-তিনটি বা ততোধিক করিয়া কাল দাগ থাকে। স্ত্রী-প্রজাপতি পুং-প্রজাপতি অপেক্ষা লম্বায় কিছু বড় হয়। প্রজাপতিগুলি ফির ফির করিয়া যখন চন্দ্রকীর চারিপার্শ্বে নড়িতে থাকে তখন তাহা দেখিতে অতীব সুন্দর বোধ হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেড় দুই সহস্র প্রকারের রেশম-প্রজাপতি দেখা যায়। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে উহা অপেক্ষা আরও অনেক প্রকারের রেশম প্রজাপতি আছে।

এক-একটি প্রজাপতি পাঁচ ছয় শতের কম ডিম্ব প্রসব করে না। ডিম্ব প্রসবের পরই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য পুং-প্রজাপতি স্ত্রী-প্রজাপতি অপেক্ষা কিছু অধিককাল জীবিত থাকে। ডিমগুলি আকারে খুবই ছোট হয়। ডিমগুলি সময় সময় ধুইয়া রৌদ্রের উত্তাপ দিলে অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই ডিম ফাটিয়া গিয়া উহা হইতে ছয় প বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কীট বাহির হয়। কীটগুলির অতিশয় যত্ন করিতে হয়। সময়ে ইহাদের যত্ন না হইলে মরিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। কীটগুলি সময় সময় কালশিরা, কটাবা, চুনোকেটে (সর্দ্দি), রসা (সর্দ্দি গর্ব্বমি) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। আবার মাছি, টিকটিকি, আরসুলা প্রভৃতি শত্রু ইহাদের বড়ই অনিষ্ট সাধন করে। পলুর গৃহ মাঝে মাঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া চূণ ছিটাইয়া দিয়া গন্ধকের ধূম দিলে ইহাদিগকে অনেক পরিমাণে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করা যায়। ডালা চন্দ্রকী দৈনিক পরিষ্কার করিতে হয়। কীটগুলি যাহাতে কোনরূপ শত্রু বা ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া না যায় তাহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

অল্পবয়স্ক কীটগুলির চক্ষু থাকে না। গুটি পোকার (প্রজাপতিরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্ব অবস্থাপ্রাপ্ত কীট) চৌদ্দটি করিয়া চক্ষু থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলির গুটি পোকার আকার বা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে প্রায় দেড় দুই মাস সময় লাগে অর্থাৎ কীটগুলিকে দেড় দুই মাস লালন-পালন না করিলে তাহারা গুটি প্রস্তুত করিবার মত উপযোগী হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক কীটগুলিকে তিন ইঞ্চির অধিক লম্বা হইতে দেখা যায় না। তাহারা শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই সময় পর্য্যন্ত তাহাদের দেহের আকার পাঁচ বার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে। এই আকার পরিবর্ত্তনের নাম কলপ লাগা। আহার ত্যাগ করিয়া তাহারা চন্দ্রকির ধারে ধারে গুটি প্রস্তুতে মন দেয়। গুটিগুলি দেখিতে পীতবর্ণ। গুটি হইতে যাহাতে প্রজাপতি বাহির হইয়া না যায় তজ্জন্য তসরগুটির ন্যায় এই গুটি-গুলিকে সূতা বাহির করিবার পূর্ব্বে গরম জল বা বাষ্পে সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। কারণ গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া গেলে গুটিতে লালা লাগিয়া সূতা টেকসই কম হইয়া যায়।

এক-একটি গুটি হইতে প্রায় ৪৪০ গজ বা সিকি মাইল পর্য্যন্ত লম্বা সূতা পাওয়া যায়। একসের কাঁচা রেশমের মূল্য বিশ বাইশ টাকারও অধিক। ঐ রেশম দিয়া বস্ত্র বয়ন করাইলে তাহার মূল্য পঞ্চাশ ষাট টাকার কম হয় না। তিন সহস্র কীট হইতে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা মূল্যের রেশম পাওয়া যায়।

১০০ শত ভাগ রেশমের মধ্য হইতে ৫৩ ভাগ খাঁটি রেশম পাওয়া যায়; বাকী ২১ ভাগ শিরিষ ও আঠা, ২৪ ভাগ সাদা মত একপ্রকার বস্তু এবং বাকী ২ ভাগ মোম, রঞ্জন, চর্ব্বি প্রভৃতি পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

আগুন লাগাইলে খাঁটি রেশম ধুমাইয়া ধুমাইয়া পুড়িয়া থাকে এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। কিন্তু পাট, তুলা প্রভৃতি মিশ্রিত ভেজাল দেওয়া রেশম না ধুমাইয়া শীঘ্রই দাউ দাউ করিয়া পুড়িয়া যায়। প্রকৃত রেশম পরীক্ষার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

২৩০০ গুটি পোকায় প্রায় অর্দ্ধসের রেশম উৎপাদন করিতে পারে। একমণ কাঁচা রেশমের গুটি শুষ্ক হইয়া ওজনে প্রায় বার তের সের হয়। বার তের সের শুষ্ক গুটি হইতে প্রায় দুই সের আন্দাজ সূতা পাওয়া যায়।

ইস্‌লামপুর প্রভৃতি গ্রামে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের জন্য রেশমের ৭ গজি ও ১০ গজি থান, চাদর এবং রুমাল বয়ন হইয়া থাকে।

বীরভূম হইতে ১৯১৩-১৪ সনে ৯১৭১৪৮৲ টাকার ও ১৯১৪-১৫ সনে ৪৭৮৩০৩৲ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর পঞ্চাশ ষাট লক্ষ টাকার অধিক রেশম বিদেশে রপ্তানি হয়। এদেশে প্রতিবৎসর প্রায় ৩০ হাজার মণ রেশম-সূতা প্রস্তুত হয়; তন্মধ্যে ইহার অর্দ্ধেকের উপর রেশম ভারতবর্ষের লোকে ব্যবহার করে। সমগ্র ভারতের উক্ত রেশম মধ্যে কেবল বীরভূম হইতেই পাঁচ ছয় হাজার মণ রেশম প্রস্তুত হয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ রেশমী বস্ত্র পট্টবস্ত্র নামে অভিহিত হয়। এই বস্ত্র অতি শুদ্ধ এবং পবিত্র জিনিষ।

অন্নপ্রাশনে, বিবাহে এবং ঠাকুর দেবতার পূজা পার্ব্বণে এই বস্ত্র শুদ্ধবস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

পলু-পোকার ভালরূপ চাষ করিলে আমরা যে আরও বেশী রেশম উৎপন্ন করিতে পারি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং অবিলম্বে এই শিল্পগুলিকে দ্রুত উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই আবশ্যক। এইরূপ করিলে দেশ উন্নত হইবে এবং কাহাকেও উদরান্নের জন্য পরদ্বারস্থ হইতে হইবে না।

পাঁচটা টাকা

শ্রী মন্মথনাথ ঘোষ

১

আশ্বিন মাসের ভোরের বেলা, শরতের সেই দিন ক'টি কত আশা নিয়ে কত স্মৃতি নিয়েই না মানুষের ঘুম ভাঙ্গে!

সেও সেদিন একটা অজ্ঞাত পুলক নিয়ে চোখের পাতা মেলেছিল। খড়খড়ির মধ্য দিয়ে তিন চারটি আলোর রেখা দেয়ালের গায়ে আগুনের আঁচড় কাট্‌ছিল, ঘরের শূন্যতার ভিতর আলোর খেলা রামধনুর জাল বুন্‌ছিল—চেয়ে চেয়ে তার আর পলক পড়্‌ছিল না।

পূজোর বাড়ীর প্রভাতী সুরের রেশ ভেসে' আস্‌ছিল, সঙ্গে নিয়ে শরতের সেই সুদূরের আবাহন, আর আগমনীর নববর্ষের নব আশীর্ব্বাদ! তার চোখের পটে ফুটে উঠ্‌ছিল উৎসবের সেই আনন্দ-ছবি—লোকজন, হাসিগান, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের রঙীন সাজে রঙীন প্রাণের রঙীন উল্লাস।

গরীবের ছেলে, বাপের সাধ্য ছিল না পড়ার খরচ চালায়; এক ধনী আত্মীয়ের বাড়ী থেকে মানুষ হ'য়েছে, তাঁর খরচেই কলেজে পড়ে, থাকে হষ্টেলে।

সেদিন ভোরে পিয়ন এসে জানাল, টাকা এসেছে—মাসে খরচ বাদে পাঁচটা টাকা বেশী। কড়া অভিভাবক; বাঁধা নিয়মে টাকা পাঠানো একদিনও নড়চড় হয় না, কোনো মাসে বেশীও না, কোনো মাসে কমও না; পুজোর মাস, তাই পাঁচটা টাকা বেশী পাঠিয়েছেন।

কিন্তু যার কাছে টাকা এল, সে তো এতখানি আশা করে নাই—তার চোখে ভেসে' উঠল উৎসবের ছবি, পূজোর বাজার, দোকান-পাট, বিচিত্র পণ্যসম্ভার। নাম সই ক'রে টাকাটা নিয়েই পিয়ন বল্‌লে, "বাবু পূজো এসেছে, বক্‌শীস্।"

তাইতো, বক্‌শীসের খাতায় তারও নাম উঠোতে হবে, একথাটা তা তার মাথায় খেলেনি! কত দেবে ভাবতে ভাবতে শেষটায় একটা টাকা তুলে পিয়নের হাতে দিলে।

পিয়ন চ'লে গেল। জানালাটা ভাল ক'রে খুলে দিতেই এক ঝলক আলো এসে মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়্‌ল। আশ্বিনের নীল আকাশ থেকে খানিকটা হাল্‌কা হাওয়া এসে ঝির্ ঝির্ ক'রে ব'য়ে গেল। একটা বই টেনে নিলে, কিন্তু মন দিতে পার্‌লে না, স্নান করতে বেরিয়ে গেল।

২

স্নান ক'রে খেয়ে এসে কলেজের জন্যে বই গুছিয়ে নিচ্ছিল। পূজোর বন্ধ আস্‌ছিল, সেই শেষ দিন; ঠাকুর এসে বল্‌লে "বাবু, পূজোর পরবী।"

বইগুলো টেবিলের উপর রেখে সে বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করলে,—"কত?"

হেসে ঠাকুর বল্‌লে,"—তাও কি ঠিক আছে বাবু,কেউ দিচ্ছে চার আনা কেউ আট আনা, আবার কেউ এক টাকা।"

একটা সিকি বের ক'রে ঠাকুরের হাতে দিয়ে বল্‌লে "—এই নাও।"

মুখখানা ম্লান ক'রে পরণের ছেঁড়া ময়লা পাঁচ হাত কাপড়টা দেখিয়ে সে বল্‌লে—"দেখুন বাবু, এই কাপড় প'রে থাকি; আপনাদের সাম্‌নে বেরুতেও লজ্জা করে। আসার সময় ছোট মেয়েটা বারবার ব'লে দিয়েছিল, তার জন্যে যেন পূজোর সময় একটা ডুরে সাড়ী নিয়ে যাই।"

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, রেঁধে খায়, বাংলার এ দৃশ্য অপরিচিত নয়। পকেট থেকে আর-একটা সিকি বের ক'রে বল্‌লে"—এই নিন, আর কিছু বল্‌বেন না।"

ঠাকুর অনেকখানি চ'লে গিয়েছিল, ডেকে ফিরিয়ে এনে সে বল্‌লে"—আপনার আট আনা পয়সা দিন।" তার পর হাতে একটা টাকা দিয়ে বল্‌লে"—এর অর্দ্ধেক চাকরকে দেবেন, আর অর্দ্ধেক আপনি নেবেন।"

শেষে বাকি সিকি দুটো ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে,"—এ হচ্ছে আপনার মেয়ের কাপড়ের জন্য।"

সেদিন সে কলেজেও গিয়েছিল, ক্লাসেও বসেছিল, কিন্তু শত চেষ্টা ক'রেও প্রফেসারের একটা কথাও কানে তুল্‌তে পারেনি।

৩

বিকেল-বেলা কলেজ থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে সে বেরিয়ে পড়্‌ল সহরের পথে, পকেটে হাত দিয়ে একবার দেখে নিলে—দুটাকা আট আনা আছে। পাঁচ টাকা বেশী ছিল, অর্দ্ধেক গেছে, আর অর্দ্ধেক এখনও রয়েছে। মনে মনে ভাব্‌ছিল, এতেই ঢের হবে। চোখের সাম্‌নে বারবার সার বেঁধে ভেসে উঠ্‌ছিল পূজোর দোকানের ছবি—কত লোকের আনাগোনা, কলরোল, আনন্দ, উৎসাহ।

সেও যাচ্ছে তার আড়াই টাকার সওদা কিন্‌তে। কি যে কিন্‌বে সে নিজেও জানে না। কিন্তু কিন্‌তে যে হবেই সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ ছিল না।

একটা মোড় ঘুর্‌তেই তার চোখে পড়্‌ল, সাত আট বছরের একটা পশ্চিমা ছেলে; পরণে একটা নেংটী, উপুড় হ'য়ে রাস্তার মধ্যে কি খুঁজ্‌ছে। কাছে আস্‌তেই সে খোঁজা ছেড়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"চারটে পয়সা আছে বাবু?"

অবাক্ হ'য়ে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কেন রে?"

কিন্তু হঠাৎ ছেলেটার চোখের দিকে চেয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা দেখেই সে চম্‌কে উঠে বিবর্ণমুখে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল—"না না, বল্‌তে হবে না, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।"

পাঞ্জাবীর খালি পকেটটা বারবার সজোরে ঝাঁকি দিয়ে নেড়ে সে দ্রুতপদে চলে গেল।

এক নিঃশ্বাসে সে যখন সহরের মাঝখানটায় এসে পৌছল, তখন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। একটা চেনা ছেলের সঙ্গে দেখা হতেই সে ব'লে উঠ্‌ল—"আমাদের দেশের এইসব ভিখিরীদের জেলে পুরে দেওয়া উচিত।"

সহপাঠী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কেন?"

সে বল্‌লে—"বিলেতে তাই দেয়। এরা সব এক-একটা চোর।"

ছেলেটি হেসে নিজের কাজে চ'লে গেল, কিন্তু তার আর পা উঠ্‌ছিল না। কোথা থেকে একটা ক্লান্তি এসে সমস্ত দেহটাকে জড়িয়ে ধর্‌লে। কিছু পূর্ব্বেই চোখের সাম্‌নে যে-পুলকের আলো জল্‌ছিল, কখন্ তা নিভে গেল।

আশে-পাশে সারি সারি দোকান তাদের বিচিত্র পসরা সাজিয়ে বসেছিল; সেই লোকজন, কলরোল, আনাগোনা। কিন্তু তাদের উপর থেকে সে-দীপ্তিটুকু যেন কখন্ কোথায় মিশে গিয়েছিল, আর তার চোখের কোণ থেকেও সে-অঞ্জনটুকুও যেন কে মুছে ফেলেছিল।

দেহের জড়তাকে সে একেবার সজোরে ঝেড়ে ফেলে একটা দোকানে উঠে পড়্‌ল।

কিন্তু কিন্‌বে কি? কেনার জিনিষের ত অন্ত নেই, কিন্তু পূজোর বেসাতি কোথায়? যার উপরেই চোখ পড়ে, তার উপরেই ভেসে উঠে দুটো জলে-ভরা চোখ।

কিন্তু না কিন্‌লেও তো নয়, পকেটের ভিতর থেকে টাকা কটার তপ্ত তাপ এসে যেন গায়ে ফুট্‌ছিল।

একটা একটা ক'রে কত দোকানেই উঠ্‌ল,কিন্তু একটা জিনিষও কিনতে পারলে না।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল,—পথের আলো,দোকানের আলো, সবে মিলে একটা রঙীন নেশার রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল, কিন্তু বাইরের আলো তার চোখে আঁধারই ঘনিয়ে তুল্‌ছিল।

যে-পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে চল্‌ল, বুকের ভিতর হ'তে কে যেন ডেকে বল্‌ছিল—চারটে পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে এস; পূজোর বেসাতি ভোগের বেসাতি কোরো না।

সেই মোড়টার কাছে আস্‌তেই বুকটা তার ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল, সদ্য বিধবা যেমন ক'রে আছাড় খেয়ে পড়ে। সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোতেও ছেলেটা তার সেই হারানো জিনিস খুঁজে ফির্‌ছিল।

পকেট থেকে একটা আনি তুল্‌তে যেয়েও সে আর তুল্‌তে পার্‌লে না, ব্যথিত মুখে জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—"কি রে খুঁজ্‌ছিস কি ?"

খুঁজ্‌ছিল চারটে পয়সা। কুলীর ছেলে, মা পড়েছিল কাল-রোগে, বাপ দিয়েছিল চারটে পয়সা, সাগু মিশ্রি কিনে আন্‌তে; পথের মাঝে হারিয়ে ফেলে চোখের জলে খুঁজে ফির্‌ছিল।

গলাটা পরিষ্কার ক'রে সে বল্‌লে,—"তা এখনও বাড়ীর থেকে পয়সা নিয়ে সাগুমিশ্রি কিনে নিস্‌নে কেন ? তোর মা যে এখনও না খেয়ে আছেরে !"

ফুঁপিয়ে উঠে ছেলেটা বল্‌লে—"বাপ মার্‌বে বাবুজি।"

তার চোখ ছাপিয়ে জল আস্‌ছিল। পকেটে তখনও তার আড়াইটা টাকা; যা ছিল সব তুলে নিয়ে ছেলেটার হাতে দেবে—

কিন্তু টাকা! পকেটশুদ্ধ কে কেটে নিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার আকাশে তখন তারার ঢেউগুলো মিটমিট ক'রে জ্বল্‌ছিল; পূজোর বাড়ী থেকে আরতির ধ্বনি বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল, কানে কানে বল্‌ছিল, অতিরিক্তের মুঠো তিনি এমনি ক'রেই রিক্ত করেন।

সাইকেলে আর্য্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

বিহার

২৬শে সেপ্টেম্বর, শনিবার—সকাল ৬টায় রওনা হ'লাম। দূর থেকে ট্রাঙ্ক রোড বড় বড় গাছের সারির মধ্যে যেন একটা প্রকাণ্ড অজগরের মতন দেখাচ্ছে। মাইল আট আসার পর বরাকর নদীর পুলের ওপর এসে পড়লাম। এখানকার দৃশ্য বেশ সুন্দর। রাস্তার দু'দিকে যতদূর দেখা যায় বেশ ফাঁকা, মাঝে-মাঝে শাল-পলাশের বন আর দূরে নীল পাহাড়ের সারি। বরাকর নদী বাংলা ও বিহারের সীমানা। নদীর এপারে এসে আমরা বাংলা মাকে নতি জানিয়ে কিছুদিনের মতন বিদায় নিলাম।

দৃশ্য ক্রমেই বদ্‌লাতে সুরু হয়েছে। ঢেউ-খেলানো রাস্তার ওপর দিয়ে অতিকষ্টে সাইকেল চালাচ্ছি। আর বাংলার সেই আকাশতলে-মেশা হরিৎক্ষেত্র নেই, রাস্তার পাশের বাঁশ ঝাড় ও নারিকেল-গাছের শ্রেণীও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। লাল রঙের মোটা থানের কাপড় পরা বিহারী মেয়েরা কোথাও কূয়া থেকে জল তুলছে, কোথাও বা পুরুষদের সকল কাজে সাহায্য করছে। শক্ত মাটির মেয়ে ব'লে শক্ত কাজের মধ্য দিয়েও এদের স্বাস্থ্য হ'য়েছে অটুট।

ঘণ্টাখানেক পর নির্সাচটী ব'লে একটা ছোট চটীতে পৌছলাম। চটীর সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়। এখানকার একমাত্র বাঙ্গালী শ্রীযুত তিনকড়ি দত্ত মশায়ের

সঙ্গে আলাপ হ'ল ও এইখানে প্রাতরাশ সারা গেল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে বরাবর পাঞ্জাব অবধি আট দশ মাইল অন্তর চটী দেখতে পাওয়া যায়। চটীতে মোটামুটী রকমের খাওয়া-দাওয়ার জিনিষ-পত্র মেলে ও ভাল জলের বন্দোবস্ত আছে। এছাড়া রাস্তার ধারে ধারে কিছুদূর অন্তর কুয়াও দেখা যায়। প্রত্যেক চটীতেই প্রায় পনেরো ফিট উঁচু দুটি স্তম্ভ থাকে। এইগুলিই চটীর নিদর্শন ও এদের নাম 'কোশমিনার'। এইসমস্তই সেরশা'র অমর কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ভ্রমণপথে বিহার

এই অঞ্চল থেকে রেলওয়ে দূর ব'লে চটীগুলির প্রয়োজনীয়তা বেশ অনুভব করা যায়। সেইজন্যে এই-গুলির অবস্থা পূর্ব্বের মতই আছে। কিন্তু যেখানে রেল, কারখানা বা অপর কোনো কারণে রাস্তার আশে-পাশে সহর গ'ড়ে উঠেছে সেখানে এরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। কেবল কোশমিনারগুলি অতীতের চিহ্ন-স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

পোষ্ট অফিস থেকে বেরুতেই দেখি পুলিশ হাজির। নাম ধাম অন্য খোঁজ-খবর দিয়ে রওনা হ'য়ে পড়লাম। রাস্তায় বেরিয়ে পুলিসের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। তখন বেলা প্রায় আটটা। রোদ বেশ চন্‌চনে। রাস্তাও অসম্ভব রকমের উঁচু নীচু। ছোট ছোট চটীতে ঘন ঘন জল খাওয়া ও বিশ্রাম নেওয়া সুরু হ'ল। মোটরের টায়ার ফাটাতে এক সাহেবকে বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়তে হ'য়েছে। রোদে তার অবস্থা আমাদেরই মতন। আটাশ মাইল আসার পর গোবিন্দপুরে পৌঁছলাম। পোষ্ট আফিস, থানা ও ডাক্তারখানা ছাড়া পাকা বাড়ী দু'চার খানা আছে। খাবারের দোকানে পুরী ভাজার গন্ধে ক্ষিদেটাও বেড়ে উঠল। জায়গাটি বেশ ছায়া-ঢাকা ও খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা হবে ব'লে এইখানেই এবেলার মতন ছাউনি ফেলা গেল।

এখানকার বাঙালী ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'তে দেরী হ'ল না। তাঁর বাড়ীতে চা খাওয়ার পর ট্রাঙ্ক রোডের বাঁদিকে পুরুলিয়ার রাস্তার ওপর একটি বড় পুকুরে স্নান করা হ'ল। এখান থেকে পুরুলিয়া মাত্র ৪০ মাইল দূর।

যখন রওনা হ'লাম তখন বেলা তিনটা। বৃষ্টির দরুন্ রাস্তার পাশে একটা পোড়ো গোয়ালের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। পাশের গ্রামে নবমী পূজার ঢাক ঢোল বাজতে সুরু হ'ল। কতকগুলি ছেলে-মেয়ে আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও যান-বাহনের সরঞ্জাম দেখে আমাদের বিষয় গভীর আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিলে। ঘণ্টাখানেক পর বৃষ্টি থাম্‌লে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। সুমুখে দূরে পরেশনাথ পাহাড়টি নীল আকাশের গায়ে আঁকা-বাঁকা-লাইন-টানা একখানা ছবির মতন দেখাতে লাগল। বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে পরেশনাথ সব-চেয়ে উঁচু পাহাড় (৪৪৫০ ফিট) ও জৈনদের একটি মহাপীঠস্থান। দূরবীণ দিয়ে পাহাড়ের ওপরের জৈন মন্দিরটি বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। আমরা ক্রমেই পরেশনাথের কাছে এগিয়ে আস্‌তে লাগলাম।

রাস্তা বেজায় উঁচু নীচু ব'লে আমরা পরস্পর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে পড়তে লাগলাম। দেখতে ভারী মজা লাগছিল—কেমন ক'রে মাঝে-মাঝে একজন হেল্‌তে-দুল্‌তে অতি কষ্টে চড়াইয়ের উপর উঠছে আবার সমুদ্রের জাহাজের মতন প্রথমে পিছনের চাকা, কম্বল,পরে পিঠ ও শেষে টুপি অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ঘনিয়ে এল। পরেশনাথ তার সমস্ত কবিত্ব মুছে অন্ধকারে বিরাট্ দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নীচে তোপচাঁচির বাংলোতে আমরা রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। একদল সাহেব মেম এখানে চড়ুইভাতি ক'রে পাততাড়ি গুটাবার বন্দোবস্ত করছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ জমে' উঠল। তাদের

মধ্যে একজন নিজের কাশ্মীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দেখবার মতো জায়গার খোঁজ দিলে ও সকলে আমাদের কৃতকার্য্যতা কামনা ক'রে বিদায় নিলে।

মিটারে ২০০ মাইল উঠেছে। সুতরাং আজ আমরা মাত্র ৪২ মাইল এসেছি।

২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবার—তোপচাঁচি বাংলোর এক মাইল দূর থেকে পরেশনাথ পাহাড় আরম্ভ হ'য়ে রাস্তার ডানদিক্ দিয়ে বরাবর সাত আট মাইল এসে ইস্রি ষ্টেশনের কাছে শেষ হ'য়েছে। আজ তিন দিন পর আবার রেলের লাইনের সঙ্গে দেখা হ'ল। একটা ছোট নদী মহুয়া বনের ভেতর থেকে এসে একেবারে রাস্তার ওপর দিয়ে চলে গেছে। পাহাড়ী নদী—জল বেশী নেই, ছোট ছোট পাথরের ওপর দিয়ে জল যাওয়ার শুধু কুলকুল শব্দ। শরতের পরিষ্কার আকাশ, ভোরের মিঠে হাওয়া ও দূরের মহুয়া বনের নিস্তব্ধতায় চারদিকে বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব এনেছে। রাস্তা মন্দ নয়, তবে উঁচু নীচু। ছোট খাট পাহাড় জঙ্গল পিছনে ফেলে রেখে চলেছি।

আজ বিজয়া দশমী। বিহারীদের দশহরা; তারা দলে দলে পূজা ও মেলা দেখতে চলেছে। পথের দু'পাশে ঘন গাছের সারি। ক্রমশঃ যাত্রীর দল বাড়তে লাগল। শুন্‌লাম বাগোদরে মেলা বসেছে—উৎসববেশে সজ্জিত নরনারী দলে দলে বাগোদর অভিমুখে যাচ্ছে। এক এক করে তাদের সকলকে পিছনে রেখে আমরা বাগোদরে পৌছলাম। লোকে লোকারণ্য, রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দোকান ব'সে গেছে, চার পাশে মাঠে তামাসা দেখান হচ্ছে। আমরা মেলার কাছে মাঠে একটা বড় গাছের তলায় দুপুরের জলযোগের জন্য নেমে পড়লাম।

বাগোদর থেকে বাঁদিকের রাস্তায় হাজারিবাগ ও ডান দিকের রাস্তা দিয়ে গিরিডি যাওয়া যায়। ঐ দু'জায়গাতে যাওয়ার জন্য মোটর সার্ভিস আছে। লোকেরা প্রথমে দূর থেকে কৌতূহল-দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল। ক্রমে বোধ হয় তাদের সাহস বেড়ে গেল। একে একে পুরুষ ও পরে তাদের সঙ্গিনীরাও কাছে এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। এদের অধিকাংশের মুখ চোখ দেখে ঠিক খাঁটী বিহারী বা সাঁওতাল ব'লে মনে হয় না। তবে এরা সরল ও কর্ম্মঠ ব'লেই মনে হ'ল। এদের ভদ্রোচিত আচার ব্যবহার বেশ চোখে লাগে। গরুর গাড়ী থেকে এক বৃদ্ধ এসে মেলায় নাম্‌ল। কয়েকটি বালিকা ও তরুণী তাকে দেখে প্রত্যেকে মাথা নত ক'রে দু'বার তার পায়ে হাত ঠেকিয়ে নিজেদের মাথায় ছোঁয়ালে ও পরে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম কর্‌লে। এদের শীলতা ও শিষ্টতা আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়।

আজ বিপরীত দিক্ থেকে হাওয়া বইছে; সুতরাং উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটু বেশ শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল। মেলা হ'তে দলে দলে লোক ফির্‌ছে। রাস্তায় বড় ভিড়। পুরুষরা গায়ে হল্‌দে চাদর ও হাতে লাঠি নিয়ে গম্ভীর ভাবে চলেছে। মেয়েরা রঙ-বেরঙের ছোপান কাপড় প'রে, মাথায় ফুল গুঁজে, মেলা থেকে পুঁথির মালা আর্‌সি চিরুণী কিনে হাসি মুখে বাড়ী ফির্‌ছে। ছোট ছেলেদের এক হাতে খাবার, আর এক হাতে তারা মায়ের কাপড় ধ'রে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা কর্‌ছে। বছরের পরবের দিন, সকলের মুখে চোখে যেন একটা হাসিখুসী ভাব লেগে রয়েছে।

সন্ধ্যা ৬॥টার সময় আমরা বহিতে পৌছলাম। এটি একটি বেশ বড় চটী। এখান থেকে রাস্তার ডান পাশে বজৌলী যাবার পথ ও বাঁদিকের পথ দিয়া হাজারিবাগ যাওয়ার যায়।

শ্রীযুত রাধিকানাথ গুঁইয়ের অনুগ্রহে থাক্‌বার জায়গা পাওয়া গেল। এখানেও পূজার ধূম কম নয়। প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখে ফির্‌তে অনেক রাত হ'য়ে গেল ব'লে দোকান বন্ধ—কোন খাবার যোগাড় কর্‌তে পারা গেল না। আজ মোট ৫৮ মাইল এসেছি। কল্‌কাতা থেকে ২০৮ মাইল আসা হ'ল।

২৮শে সেপ্টেম্বর সোমবার—

কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নাই ব'লে নিজেরা রাঁধবার ব্যবস্থা কর্‌লাম। বাজার থেকে চাল ডাল ইত্যাদি কিনে এনে খিঁচুড়ী রান্না হ'ল। এখানে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার দালালের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি বেনারস হিন্দু

ইউনিভার্সিটীতে তাঁর সহপাঠীদের নিকট আমাদের জন্য একখানি চিঠি লিখে দিলেন।

রওনা হ'লাম ১২॥০ টায়। রোদ ও খিঁচুড়ী খাওয়ার জন্য তেষ্টায় অস্থির। মাইল দশ দূরে চৌপারণ থানায় নেমে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম। চৌপারণের কিছু পর থেকেই হাজারিবাগের জঙ্গল সুরু হয়েছে। সাত আট মাইল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তাটি চ'লে গেছে। এই পথটুকু বেশীর ভাগই উৎরাই। কিন্তু রাস্তার অবস্থা বড় মন্দ ব'লে উৎরাইয়ের সুখটুকু উপভোগ করা গেল না। জঙ্গল খুব ঘন নয়। শাল পলাশ ও মহুয়া গাছই বেশী। জঙ্গলের সীমানায় একটা নদীর পুলের উপর এসে বস্‌লাম। খানিক দূরে এক সাহেব মোটর সারাচ্ছে। আমরা নদীতে জল খেতে যাবার আয়োজন কর্‌ছি এমন সময় সেই সাহেবের মেম ও তাদের মেয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ সুরু কর্‌লে। এঁরা কুল্‌টীতে থাকেন। মোটরে গয়া যাচ্ছেন। জঙ্গলে টায়ার ফেটে আট্‌কে পড়েছেন। সাহেব টায়ার মেরামত কর্‌লে তবে যাওয়া হবে। আমাদের সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ আলাপ হ'য়ে গেল। প্রত্যেক জিনিস পত্র দেখাতে হ'ল। সাইকেলের সাম্‌নে বোর্ডে লেখা প্রোগ্রাম দেখে তাঁরা খুব উৎসাহ প্রকাশ কর্‌লেন। ম্যাপ চেয়ে নিয়ে রাস্তা দেখ্‌লেন ও আমাদের অনেক লজেঞ্জুস্ ও সুইট্‌স্ দিলেন।

এখানে এসে জান্‌তে পার্‌লাম বাইনাকুলার গগ্‌লস্‌ ও রিং শুদ্ধ চাবি কোথায় পড়ে গেছে। বাইনাকুলার এর জন্য পরে বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল। মাইল তিন চার পর থেকে গয়া জেলা আরম্ভ হ'ল। এখান থেকে সমান ও সুন্দর রাস্তা সুরু হয়েছে। অনেক দিন পর সমতল রাস্তা পেয়ে আমরা মনের সুখে জোরে সাইকেল চালিয়ে বড়াচটীতে এসে পড়লাম।

সন্ধ্যার ঠিক আগে ফল্গু নদীর ধারে এলাম। নদীর ওপরে পাথরের নীচু পুল। বর্ষার সময় পুলের ওপর দিয়ে জল যায়। পুলে কোন রেলিঙ নেই, কেবল মাঝে মাঝে এক ফুট উঁচু থাম। দূরে নদীর দু'পাশেই নীল পাহাড়ের সারি—মনে হয় যেন ফল্গু এক দিকের পাহাড় থেকে বেরিয়ে আর এক দিকের পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। বালীর চড়ার ওপর দিয়ে জলের শুধু একটি ক্ষীণ ধারা বয়ে যাচ্ছে। আর একটা ছোট পুলের পর ডান দিকে গয়া যাবার রাস্তা ২০ মাইল।

সন্ধ্যার সময় সাইকেল আমাদের সেরঘাটীতে নামিয়ে দিলে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড থেকে ডান দিকে একটু নীচু জায়গায় সেরঘাটী সহর। এখান থেকেও গয়ায় যাবার রাস্তা আছে। এইখানেই খাবার জোগাড় করা হ'ল। খাওয়া দাওয়ার পর ঠিক হ'ল আজ সমস্ত রাত্রিই চলা হ'বে। সেইজন্য ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিতে আমরা একটা কূয়ার ধারে আস্তানা নিলাম। সেরঘাটী থেকে ডানদিকে গয়া ও বাঁদিকে ডাল্টনগঞ্জ যাবার রাস্তা আছে।

আমরা রওনা হ'ব এমন সময় থানা থেকে ডাক এল। মামুলি নাম ধাম দেওয়ার পর থানার দারোগা আমাদের রাত্রে চলার অভিপ্রায় শুনে পথের ধারে জঙ্গলে ভালুকের উপদ্রব আছে ব'লে নিরস্ত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। কিন্তু হাজারিবাগ জেলার উঁচু নীচু রাস্তার জন্য এ ক'দিন আমাদের চলা বড়ই কম হচ্ছিল। আজকের সুন্দর সমান রাস্তা ও চাঁদনী রাতের আলো পেয়ে এ-সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছা হ'ল না। সেইজন্য আমরা আর বাক্যব্যয় না ক'রে বেরিয়ে পড়লাম।

মাইল দু'য়েক পর থেকে রাস্তা মেরামত হচ্ছিল। সেইজন্য মাঝে মাঝে হেঁটে যেতে হ'ল। ক্রমশঃ ভাল রাস্তায় এসে চলেছি। খুব জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পাশের গাছতলা থেকে এক বিকট চীৎকার শুনে আমরা হতভম্ব হ'য়ে ভাবলাম এ নিশ্চয়ই ভল্লুক! টর্চ্চ জেলে দেখি আমাদেরই মত হতভম্ব একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা আর কিছু নয় বেচারা চৌকিদার, পাহারা দিতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল আমাদের চারজনের সাইকেলের ঘণ্টা শুনে চম্‌কে চীৎকার ক'রে উঠেছে। ঘড়িতে দেখা গেল রাত ১টা। আর দেরী না ক'রে সাইকেলে উঠলাম।

ম্লান জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে দু'ধারে পাহাড় ও ঝোঁপ-ঝাঁপ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সুমুখ থেকে একটা গরুর গাড়ী ধীর মন্থর গতিতে আস্‌ছিল ব'লে জোরে ঘণ্টা বাজাতে সুরু কর্‌লাম। আলো, টুপি ও

ঘণ্টার শব্দ শুনে গরু দু'টি কিছু মাত্র দ্বিরুক্তি না ক'রে রাস্তা ছেড়ে মাঠের ওপর দিয়ে ঘুমন্ত গাড়োয়ানকে নিয়ে ছুট দিল।

রাত ২॥ টার সময় আরাঙ্গাবাদে পৌছলাম। তখন চাঁদ ডুবে গেছে—অন্ধকারের জন্যে কি রকম সহর কিছু বুঝতে পারলাম না। থানা ছাড়িয়ে চলেছি, এমন সময় পুলিশ পেট্রোলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। এদের হাতে রিভলভার, কোমরে তলোয়ার ঘোড়ায় চ'ড়ে ডিউটি ক'রে ফিরছে। মিলিটারী কায়দায় চ্যালেঞ্জ ক'রে দাঁড়াতে বললে। নাম ধাম লিখিয়ে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অন্ধকারে এক গাছতলায় ব'সে সঙ্গে-আনা খাবার নিঃশেষ করতে লাগলাম।

মাইল কয়েক পর বাতানা নদীর নীচু পুলের ওপর গিয়ে পড়লাম। এই পুলটি ফল্গুর পুলের অনুরূপ। ওদিক্ থেকে এক সারি মাল বোঝাই গরুর গাড়ী আসছিল। সাইকেলের ঘণ্টা শুনে ও আলো দেখে সামনের গাড়ীর গরু দুটি ঘুমন্ত গাড়োয়ান ও মাল ভর্ত্তি গাড়ী শুদ্ধ পুল থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ল। নদীতে বিশেষ জল ছিল না, আর নীচু পুল থেকে পড়ার জন্যে বিশেষ কিছু ক্ষতি বোধ হয় হয়নি। এরা রাত্রে ঘুমিয়ে গাড়ী চালায় ব'লে কেবল তারা নিজেদের নয় অন্যান্য পথিকদেরও বিশেষ অসুবিধায় ফেলে। এ রকম ঘটনা আমরা পরে আরও দেখেছি।

রাস্তা বেশ সমতল ও সোজা। দূরে শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক ষ্টেশনের আলো হঠাৎ আকাশের গায়ে ফুটে উঠল। আমাদের চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছে। মরুভূমির মরীচিকার মতন ষ্টেশন এই আসে আসে ব'লে নিস্তব্ধে গাড়ী চালাচ্ছি। ঘণ্টাখানেক এইভাবে যাওয়ার পর শোন নদীর জলের শব্দ শুনতে পেলাম। ক্রমেই জলের শব্দ বাড়তে লাগল; আমরাও নদীর কাছে এসে পড়েছি ব'লে সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে চলতে সুরু করলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ হাঁটার পরও যখন নদীর দর্শন পাওয়া গেল না তখন আবার গাড়ীতে উঠলাম। নদীর ধারে এসে খবর নিয়ে জানা গেল এখানে পারের কোন বন্দোবস্ত নেই। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে কেবল শোনের ওপরই রেলের ছাড়া আর কোন পুল নেই। নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে মাইল খানেক সাইকেল চালিয়ে ঠিক ভোর ৪॥০ টার সময় শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক ষ্টেশনে এসে উঠলাম। বর্হি থেকে আজ আমরা ৯১ মাইল এলাম। কলকাতা থেকে মোট ৩৪৯ মাইল আসা হ'ল।

২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার—সকাল ৮টার গাড়ীতে শোন পার হওয়ার জন্যে টিকিট ক'রে ফেললাম। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় টুরিষ্ট ব'লে সাইকেলগুলি না বুক করলেও চলতে পারে বললেন। কিন্তু ওপারের বিহারী ষ্টেশন মাষ্টার কর্ত্তব্যের জন্য পুরাপুরী সেলামী আদায় ক'রে ছাড়লেন। শোনের পুল লম্বায় দেড় মাইলেরও বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যে বেশ একটা বড় পুল। এই সময়ে নদীতে খুব অল্প জল, সবই প্রায় চড়া, কিন্তু বর্ষার সময় বড় ভীষণ হ'য়ে ওঠে। পুলের ওপর বাঁ দিকে সরু ফুটপাথ দিয়ে এপার থেকে ডিহীরি যাওয়া যায়। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের শেষে নদীর ওপর বরাবর ওপার পর্য্যন্ত বাঁধ আর মাঝে-মাঝে ফাঁক আছে। জল কম থাকলে বাঁধের ওপর দিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। বর্ষার সময় বা নদীতে জলে বেশী থাকলে রেলের পুল ভিন্ন অন্য কোন গতি নেই।

বেলা প্রায় ৯টার সময় ডিহীরিতে শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করা গেল। বেলা প্রায় ৫টার সময় আবার বেরিয়ে পড়লাম।

বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা ব'লে ডিহীরির প্রতিপত্তি আছে। সহরের মধ্যে কিন্তু আবর্জ্জনা ও ধূলার অভাব নেই। নদীর ধারটাই যা একটু ভাল ব'লে মনে হয়। ওপারের পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে, শাল পলাশ মহুয়ার বনও মিলিয়ে গেছে। রাস্তার দু' পাশে যতদূর দেখা যায় কেবল ধূধূ মাঠ।

সন্ধ্যার সময় সসারামে এসে পৌছলাম। এখান থেকে ডান দিকে আরা যাবার রাস্তা। [illegible] ডুমরাও ও বক্সার যাওয়া যায়। এখানকার লোক সংখ্যায় বেশীর ভাগই মুসলমান। সহরটির পুরান ধরণের বাড়ী ও রাস্তাঘাট দেখলে মুসলমান আমলের সহর বলে চোখে ঠেকে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর এ-রকম ধরণের সহর এই প্রথম। রাস্তার বাঁধারে জ্যোৎস্নার আলোতে দূরে শের সার সমাধি দেখা গেল। আজও সমস্ত রাত বাইক করব মনে

করছি। চারদিক নিস্তব্ধ। যেখানে দু' পাশের গাছের ছায়ায় রাস্তা একেবারে অন্ধকার সেখানে আমাদের ল্যাম্পের আলো অন্ধকার দূর ক'রে যাবার যেমনি পথ করছিল, ফাঁকা রাস্তার চাঁদের আলোতে নিজের অস্তিত্ব মিলিয়ে ঠিক তেমনি সুবিধার কারণ হচ্ছিল। প্রায় ১০॥টার সময় রাস্তার পাশে খালের ধারে একটি সুন্দর জায়গায় আমরা সে রাতের খাওয়া শেষ করলাম।

দূরে বোধ হয় রেলওয়ে ষ্টেশনের আলো দেখা গেল। সমস্ত রাত বাইক করার সঙ্কল্প কোথায় ভেসে গেল। বাকী রাতটুকু ঐখানেই কাটাব স্থির করা হ'ল। রাত ১১॥০ টার পর কুদরা ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় বাঙালী। আমাদের পরিচয় পেয়ে ওয়েটীং রুমে থাক্‌বার ও আলো জল ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ডিহীরি থেকে আজ মোট ২৮ মাইল আসা হ'ল। কলকাতা থেকে মোট ৩৭৭ মাইল এসেছি।

(ক্রমশঃ)

গীতাঞ্জলি ও অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব

শ্রী শিবকৃষ্ণ দত্ত

রবীন্দ্রনাথের ভগবৎ প্রেমের পূর্ণ পরিণতি গীতাঞ্জলিতে। উপনিষদের সার তত্ত্ব ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বালক রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যাহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া মহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

উপনিষদে যে জটিল অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব রহিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কবি সেই দুর্ব্বোধ্য সত্যকে কবিত্বের কোমলতা ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীতাকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ভগবান সৃষ্টির ভিতর দিয়া জীবকে যে আহ্বান করিতেছেন, জীব ও ব্রহ্মের মাঝে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবি গাহিলেন :—

আমার মিলন লাগি তুমি
আস্‌ছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণ-ধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে॥

তাঁহার চন্দ্র, সূর্য্য, তাঁহার আকাশ, জল, বাতাস, আলো তাঁহার অপার করুণারই সাক্ষ্য দিতেছে। জীবকে যে তিনি কত ভালবাসেন তাহা তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্য দিয়া বিচিত্র ভাবে অহরহ প্রকাশ করিতেছেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য জগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কবির সকল ইন্দ্রিয়ই অতিজাগ্রত,—তাই তাঁহার অনুভূতিও অতি সূক্ষ্ম; নয়ন নীলাকাশের দিকে ফিরাইলেই তাঁহার "নীলাকাশশায়ী" অপূর্ব্ব মূরতির কথা মনে পড়ে! শ্রবণ শক্তি কবির এতই সূক্ষ্ম যে, তিনি বিশ্বের মধ্যে সেই অপরূপের মধুর সুরঝঙ্কার অহরহ শুনিতে পান;—"তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী (আমি) অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি!" ফুলের সুগন্ধে সেই চির সুন্দরের অমৃত স্বরূপটি যেন বিজড়িত। মৃদু মন্দ মারুতের মধুর স্পর্শখানি করুণাময় নিখিল স্বামীর সর্ব্বময় সূক্ষ্মরূপের আভাস দিয়া যায়। এইরূপে বাহ্য জগতের পঞ্চভূত গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুর মধ্য দিয়া কবি অরূপের আনন্দময় সান্নিধ্যে সহজ গতি-বিধি লাভ করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সুখ অনুভব করিতেছেন, তাই কবি দেখিতেছেন সারা সৃষ্টিতে কেবল অনাবিল আনন্দ, দুঃখের লেশমাত্র নাই :—

সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যেদিক পানে নয়ন মেলি,
ভালো সবি ভালো।
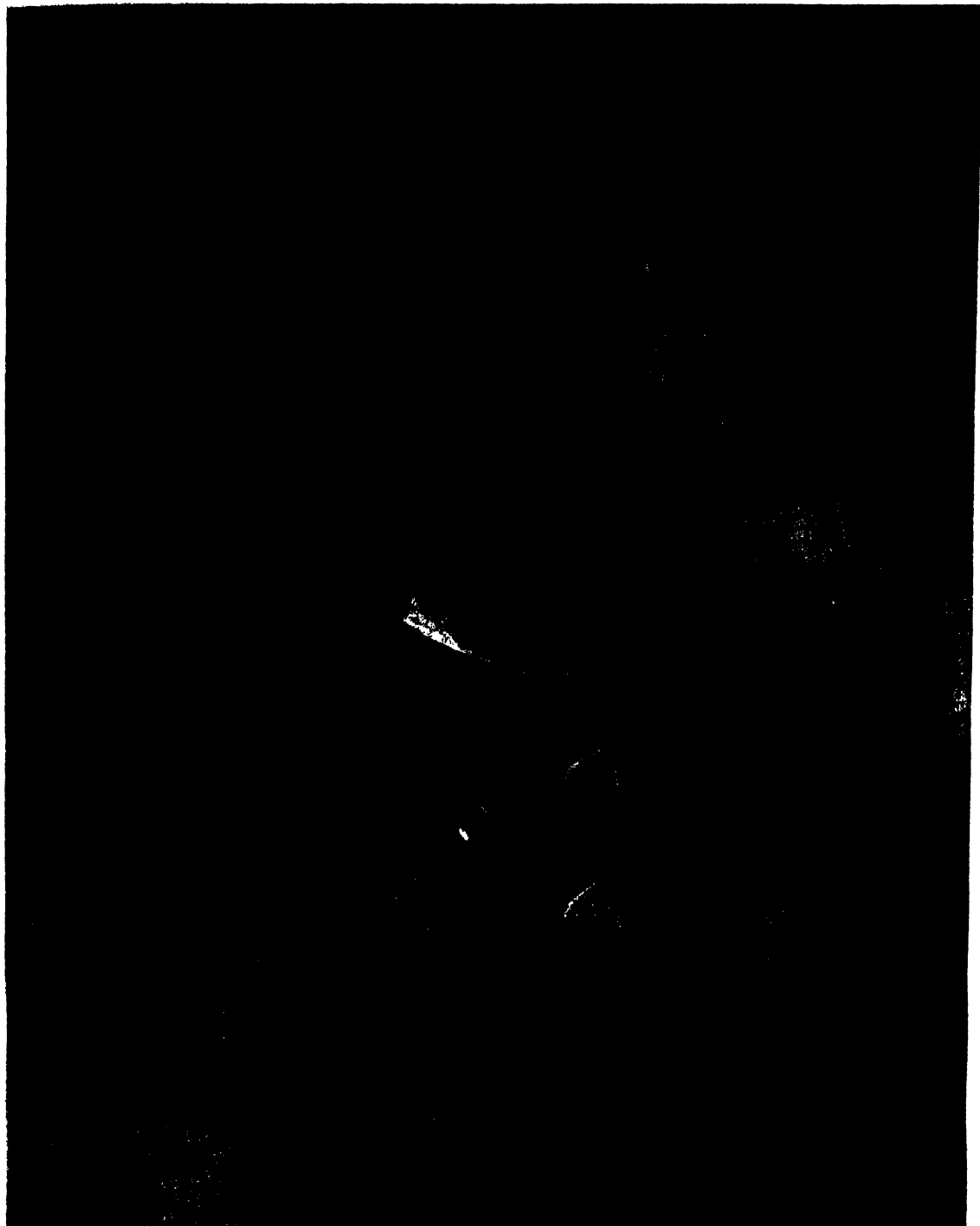
ব্যর্থ পূজা

শিল্পী শ্রী বিপিনকৃষ্ণ দে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ।

তাঁহার আলো গাছের পাতায় প্রাণের ধ্বনি ফুটায়, পাখীর বাসায় ভোরের প্রভাতী গান জাগায়। আবার :—

তোমার আলো ভালোবেসে
পড়েছে মোর গায়ে এসে
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত বুলালো বুলালো।

সাধনার দ্বারা মনের উন্নতি না হইলে সৃষ্টির আনন্দ-রহস্য বোধগম্য হয় না। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেই সুখ দুঃখ ও মৃত্যুর ছবি আমাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বৃহতের সহিত আমাদের চিত্তের যোগ নাই, তাই আমরা পলে পলে আনন্দের স্বচ্ছ অনাবিল অমৃতধারা হইতে বঞ্চিত হইতেছি! কবি গাহিতেছেন:—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি যাই
কোথাও মৃত্যু কোথাও দুঃখ
কোথাও বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ
দুঃখ হয়েছে দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।

জীব অজ্ঞানতাবশতঃ আপনার দুঃখ আপনিই সৃষ্টি করে। সে 'পূর্ণ' হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া প্রতিনিয়ত শত শত অভাবের অনুভূতি তাহাকে বিচলিত করিতেছে।

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারই
নিশি দিন কাঁদি তাই!

"যাহা কিছু যায় আর যাহা কিছু থাকে"—সবি যদি তাঁহাকে সমর্পণ করা যায়, তবে সকলে তাঁহার "মহামহিমায়" জাগিয়া রয়। এই বিশ্বে কিছুই ব্যর্থ নহে—"যে ফুল না ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরু পথে হারাল ধারা"—কবি বলিতেছেন তাহারা কেহই ব্যর্থ হয় নাই; জগৎ স্বামীর কাছে তাহাদের সার্থকতা আছে।

আমার অনাগত—
আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—
জানিহে জানি তাও হয় নি হারা!

এই বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুর মাঝে যে সেই অব্যয় পুরুষ বিরাজমান! দৃশ্য জগতের সমস্ত বস্তুই যে তাঁহাকে দিয়া "ভরা"! তবে আর কি করিয়া কোন্ জিনিস ব্যর্থ হয়! কবি বলিতেছেন "এই নিখিল আকাশ ধরা, এ যে তোমায় দিয়ে ভরা"—এই গভীর সত্যটি যেন তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃই স্ফুরিত হয়! আনন্দই জীবের চরম লক্ষ্য, জীব জ্ঞানে অজ্ঞানে আনন্দের পিপাসায় পিপাসার্ত্ত। উপনিষদ বলেন, আনন্দ হইতে জীবের জন্ম, আনন্দের মাঝেই জীবের পরিপুষ্টি ও আনন্দেই তাহার শেষ পরিণতি। সুতরাং জীব যে আনন্দ চায়, ইহা স্বভাবিক। জ্যোতির্ম্ময় আনন্দপুরুষ যে বহু হইয়া রূপের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছেন, উপনিষদ ও শ্রুতির মধ্যে এই যে তত্ত্ব নানা ভাবে গীত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের মাধুর্য্যে সেই জটিল তত্ত্ব সরস করিয়া ফুটাইয়া তুলিলেন—

আকাশ তলে উঠ্‌লো ফুটে
আলোর শতদল।
পাপ্‌ড়িগুলি থরে থরে
ছড়াল দিক্ দিগন্তরে
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।

জ্যোতিতে জ্যোতিতে সমস্তই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে প্রাণের প্রবাহ, চারিদিকে সঙ্গীতের অমৃত ধারা, অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া অমৃতপুরুষ বিরাজমান, তাঁর "গগনভরা পরশখানি লইয়া সকল গায়।" এই অনন্ত প্রাণসাগরে ডুব দিয়া কবি আপনার বক্ষ ভরিয়া লইতেছেন, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।—"আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে, বাতাস বয়ে যায়।" আনন্দের আলোকময় পাপড়িগুলি দিক্-দিগন্তরে ছড়াইল, কবি অনুভব করিতেছেন তিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় শতদলের মাঝখানে "সোনার কোষে" পূর্ণানন্দে বিভোর রহিয়াছেন।—"আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে আলোর শতদল!" ইহাতে কবি জীব ও ব্রহ্মের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের আভাস দিলেন। জীব না থাকিলে ব্রহ্মকে বুঝিত কে, জীব না থাকিলে তাঁহার প্রেম, তাঁহার করুণা কোথায় কাহাকে আশ্রয় করিত?—"আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।"—প্রেমের পূর্ণানুভূতি না হইলে এত বড় কথা বলা যায় না। ভক্ত বলিতেছেন, হে পূর্ণ, তুমি আমাকে লইয়াই পূর্ণ, আমাকে ছাড়িয়া নহে।

এই নিখিল দৃশ্যের যদি দ্রষ্টা না থাকিত, তবে তাহা নিরর্থক হইত। তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্য ও তেজ দিয়া তুমি যে অপূর্ব্ব বর্ণগন্ধময় নয়নাভিরাম প্রকৃতির সৃষ্টি করিলে, তাহা আমি না থাকিলে কে উপভোগ করিত? 'দৃশ্য বস্তুদ্বয় দেখিয়া আমি প্রতিনিয়ত বড় আনন্দ পাইতেছি'—এই কথাটি আমার মুখ দিয়া বাহির করাইয়া তুমি আপনাকে ধন্য করিতে চাও।

আমাকে তুমিই যে মহান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। "আমার মাঝে তোমার লীলা হবে"—আমার মধ্য দিয়াই যে তুমি তোমাকে ফুটাইয়া তুলিবে—

এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার
ঘুচে যাবে সকল অহঙ্কার
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" ইহাও ঐ গভীর ভাবদ্যোতক। ভাব হইতে রূপে ও রূপ হইতে ভাবে রূপান্তরিত হইয়া রসময় অমৃতপুরুষ আপনাকে নব নব ভাবে উপভোগ করিতেছেন।

যাঁহার অতীন্দ্রিয় বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় নাই, তিনি সীমার মাঝে অসীমের আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কবি দিব্য অনুভূতিবলে শুনিতে পান—

"জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে।"

জল স্থল, তরুলতা, পত্র পুষ্পে অসীমের সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। সেই সুরের ভিতর দিয়া পূর্ণ প্রাণের অমৃতময় রসধারা তাহাদিগকে নব নব রসে সঞ্জীবিত করিতেছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি বলে কবি দেখিতে পান—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া—নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

উপনিষদ বলেন দিব্য দৃষ্টিলাভ না হইলে সৃষ্টি-রহস্য বোধগম্য হয় না। জীব অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন, অবিদ্যাপ্রযুক্ত সে নিখিল দৃশ্য ভিন্নরূপে সন্দর্শন করিতেছে। কবির চক্ষে যে সকল বস্তু আনন্দপ্রদ, তাহার কাছে সেসকল দুঃখময়। ইহার কারণ কবি সমস্তের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিতেছেন।

জীবের প্রধান রিপু অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের মোহে জীব আপনার স্বরূপ হইতে দূরে রহিয়াছে। অহঙ্কার নাশপ্রাপ্ত না হইলে প্রকৃত আমিত্বের বিকাশ হয় না। গীতাঞ্জলির প্রথম গানই—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার, ডুবাও চোখের জলে।"

আপনার গৌরবগাথা গান করিয়া, যশঃ খ্যাতি লাভের জন্য ছুটাছুটি করিয়া, জীব কেবল আপনাকেই শত পাকে জড়াইতেছে। কবি প্রার্থনা করিতেছেন হে প্রভো, তুমি আমার এই আত্মপ্রশংসালাভেচ্ছা সংযত কর। "তোমারই ইচ্ছা করহে পূর্ণ, আমার জীবন মাঝে।" 'অহং'এর মুখর ধ্বনিতে হৃদয়ে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় না। শ্রীভগবানের কাছে পূর্ণ আত্মোৎসর্গের ফলেই চরম শান্তি পাওয়া যায়। কবি তাই প্রার্থনা করিতেছেন "আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয় পদ্মদলে।"

অহঙ্কারের ন্যায় বাসনাও জীবের বন্ধনের কারণ। জীব প্রতিনিয়ত বাসনাচক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে। রজনীকান্ত গাহিয়াছিলেন "লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে।" একমাত্র ভগবানের কাছে পূর্ণ আত্ম নিবেদনের ফলে বাসনা কমিয়া আসে।—"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।" জ্ঞানের বিকাশ হইলে সাধক দেখেন, জীবের ত কোন অভাবই নাই। পরম পুরুষ তাহার যে কোন অভাবই রাখেন নাই। "আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ" তিনি ত না চাহিতেই দান করিয়াছেন, তাঁহার এই মহাদান, এই অপার করুণার কথা ভাবিলে "বহু বাসনার" আর স্থান থাকে না। হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া তাঁহার কাছে মস্তক চিরঅবনত করিয়া রাখে।

কিন্তু মানুষ এই পরম তত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ ভোগ করিতে করিতে সে এমনি তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে, যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে চিত্ত ফিরাইবার আদৌ অবসর পায় না। অন্তর্জগতের কথা একরূপ বিস্মৃত হইয়াই আছে। অনিত্য বস্তুর প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগের ফলে সে তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ফলে আসক্তি জালে বদ্ধ হইয়া অবিরাম 'যাওয়া আসার' দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছে। আসক্তিনাশ

না হওয়া পর্য্যন্ত যাতায়াতের বিরাম হইবেনা ও আত্যন্তিক সুখলাভ হইবে না। কবি বলিতেছেন—

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হ'ল গেলি ভুলে!

মহাযাত্রার সময় জীব যদি তাহার পুঞ্জীভূত বিষয়-বাসনার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়, তবে তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না!

জীবনের প্রসার বৃহত্তর করিতে হইবে। সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই অজ্ঞান ও অবিদ্যার লীলা। মানুষ যদি বৃহত্তের সহিত প্রাণের সহজ যোগসাধন করিতে পারে তবে আর দুঃখ কোথায়? প্রকৃতির জগত ও মানুষের জগতে মিল নাই। মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের একটি ভিন্ন জগত সৃষ্টি করিয়াছে।

তাই প্রকৃতির 'হাওয়া' মানুষের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতির আনন্দ ধারা হইতে তাই মানুষ চির বঞ্চিত। প্রকৃতি হইতে দূরে রহিয়াছে, তাই সে বৃহৎ বা অসীমের সহিত চিত্তের সহজ যোগ হারাইয়াছে। আলো বাতাসের মধ্য দিয়া অনন্ত পুরুষের যে শাশ্বত আবাহন আসিতেছে, তাহা মানুষের অবরুদ্ধ হৃদয় দ্বারে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কবি বলিতেছেন—

তোমার আকাশ, উদার আলোকধারা,
দ্বার ছোট দেখে' ফেরে না যেন গো তারা।
ছয় ঋতু যেন সহজ নৃত্যে আসে
অন্তর মোর নিত্য নূতন সাজে!

আনন্দপুরুষ তাঁর অপার আনন্দ সারা নিখিলে প্রবাহিত করিয়াছেন। প্রকৃতি সেই আনন্দের সুরেই বাঁধা। তাই পত্র পুষ্পময়ী কাননরাণীর এমন ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য। কবি ইহা লক্ষ্য করিয়া অনন্ত পুরুষকে বলিতেছেন "তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে, বাঁধা যেন নাহি পায় কোন আবরণে।" সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁর আনন্দ যেন "পুণ্য আলোক সম" জ্বলিয়া উঠে। দিনের সর্ব্বকর্ম্ম মাঝে তাঁর আনন্দ সমস্ত দীনতা চূর্ণ করিয়া যেন দিব্যভাবে ফুটিয়া উঠে।

তিনিই যে একমাত্র নিত্য আনন্দের বস্তু। তাঁহাকে পাইলেই যে সকল পিপাসার অবসান হয়, তাহা সাধক কবির হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। কিন্তু মোহান্ধ চিত্ত তাহাতে বুঝিয়াও বুঝে না:—

জানিহে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা সম
তবু যে ভাঙ্গাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া যেতে পারি না যে!

এইখানেই চিত্তের দুর্ব্বলতা। বিষয়বস্তুর প্রতি মানুষের এক একবার ঘৃণা আসে। কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কবি বলিতেছেন—"আমি যে প্রাণভরি তাদের ঘৃণা করি, তবুও তাই ভালবাসি।" কবি আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিতেছেন "এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি, কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি।" চিত্তের এই দুর্ব্বলতা ও নানাবিধ অসম্পূর্ণতার কথা ভাবিয়া কবি দেখিলেন নিখিল স্বামীর করুণা ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় নাই। তাই প্রার্থনা করিলেন "তব দয়া দিয়ে হবেগো মোর জীবন ধুতে—এতদিন সর্ব্বাঙ্গে মলিনতা মাখা ছিল। আজ অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীভগবানের পুণ্য পবিত্র স্পর্শ ভিক্ষা করিতেছেন:—

আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়োনা গো দিয়োনা আর
ধূলায় শুতে।

ভগবৎ-বিরহে কবির প্রাণ কাতর হইয়াছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর প্রকৃত প্রেমের স্ফূর্ত্তি হইল। উপনিষদের জ্ঞান সাধক হৃদয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন সাধকের প্রকৃত রসানুভূতি বিকাশ পাইতে থাকে। রসের মধ্য দিয়াই অমৃতপুরুষকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপনিষদের জ্ঞান যেমন রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের অকৃত্রিম রসধারা তাঁহার প্রতিভাকে ততোধিক প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এতদুভয়ের সমন্বয়েই কবির সাধনা শতদলের ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞান প্রেমের রসে 'পাক' না হইলে পূর্ণ আনন্দ দান করিতে পারে না। এই অপূর্ব্ব প্রেমানুভূতিই রবীন্দ্রনাথকে মহিমা মণ্ডিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভগবৎ-বিরহ অনেকাংশে শ্রীরাধার বিরহের সহিত তুলনীয়। বিরহের ঘণীভূত মূর্ত্তি, বৈষ্ণব কবিগণ

শ্রীরাধা চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এচিত্রের তুলনা নাই। প্রেমের যখন অনুভূতি আরম্ভ হইতে থাকে, তখন সাধক প্রেমাস্পদকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। "মধুর" সম্বন্ধেই কবির ভগবৎ প্রেমের বিকাশ হইল।—

এই জ্যোৎস্নায়াতে জাগে আমার প্রাণ ;
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান ?
দেখতে পাব অপূর্ব্ব সেই মুখ,
রইবে চেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে
ফিরবে আমার অশ্রুভরা গান ?

ভক্ত ভগবানের এই সম্বন্ধটি বড়ই মধুর। অন্তর ব্যাকুল হইলেই অন্তরস্থ পুরুষ জাগিয়া উঠেন। অমনি চিদাকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইতে থাকে। সাধক ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে পান, আবার হারাইয়া ফেলেন। যখন পান তখন হৃদয় অসহ পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে; আবার যখন তিনি অন্তর্হিত হন, হৃদয় বিষাদ-ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কবি তাই দুঃখের সহিত গাহিলেন—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না,
কেন মেঘ আসে, হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।"

ক্ষনেক আলোকে, আঁখির পলকে যখন তাঁহাকে দেখিতে পান, অমনি ভয় হয়, পাছে তাঁহাকে হারাইয়া ফেলেন। কবি বুঝিলেন তাঁহাকে "আঁখিতে আঁখিতে" রাখিতে হইলে অনন্ত প্রেম চাই :—"এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ তোমারে হৃদয়ে রাখিতে !"

প্রেম-সাধনার প্রথম অবস্থায় কবি দেখিলেন তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখা যায় না। ভক্তের সহিত তাঁহার এ কোন্ লীলা ? এমন "আড়াল দিয়ে" চলিয়া গিয়া ভক্তপ্রাণে ক্লেশ দিবার আবশ্যকতা কি ? কবি ভাবিলেন তাঁহার হৃদয় কঠিন। তাঁহার চরণ রাখার তাহা যোগ্য নয়। কিন্তু নির্ব্বাক স্বামীর করুণার 'হাওয়া' লাগিলে পাষাণ হৃদয় কি গলিবে না ? তাঁহার সাধনা নাই, কিন্তু তাঁহার কৃপামৃতধারায় নিরস জীবনকুঞ্জ কি সরস হইয়া নব নব পুষ্প ফুটাইয়া তুলিবে না ?

কিন্তু প্রেমাস্পদ ভক্তের সম্মুখ হইতে এই যে সরিয়া সরিয়া যান, কবি সূক্ষ্ম অনুভূতি বলে তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন :—

"এ যে তব দয়া জানি জানি হায়।
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তবে মিলনেরই যোগ্য করে।"

প্রেমের অনুভূতি যতই গভীরতর হইতে থাকে, ততই মিলনের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। ভক্ত একমুহূর্ত্ত তাহার বিরহ সহ্য করিতে পারেন না।—"মুখ ফিরিয়ে রব তোমার পানে, এই ইচ্ছাটি সফল কর প্রাণে।" জীব মায়া মোহ ও সংসার-বাসনার প্রেরণায় নিত্য-বস্তুর দিকে চিত্ত ফিরাইবার অবসর পায় না। মন প্রতিনিয়ত বহির্জগতে ধাবমান। মোহের আলোকে সে 'বাহির'কে নানারঙে রঞ্জিত দেখিয়া তাহাকেই পরম প্রিয়বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি হারাইয়াছে, তাই বস্তুর স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। যিনি বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি আর বাহ্যজগতের মোহে মুগ্ধ হ'ন না। তিনি বস্তুর অন্তর অনুসন্ধান করিতে থাকেন, ও তাহার মধ্যে অনির্ব্বচনীয় শক্তিসম্পন্ন অখণ্ড চৈতন্যপুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। তখন তিনি দেখেন সেই সত্য পুরুষই নিখিল সৌন্দর্য্যের কারণ, তিনি তাঁহার অপার সৌন্দর্য্য নিখিল সৃষ্টিতে প্লাবিত করিয়া প্রত্যেক দৃশ্যবস্তু এমন নয়নাভিরাম করিয়াছেন, পত্রপুষ্পময়ী প্রকৃতি রাণীর সর্ব্বাঙ্গে সেই চিরসুন্দরের স্বর্গীয় সুষমা অসামান্যরূপ লাবণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ তিনিই সকল সৌন্দর্য্যের আকর। কবি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি-বলে সেই চিরসুন্দর সত্যপুরুষের যেদিন দর্শন পাইলেন, সেদিন জাগতিক সৌন্দর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। প্রেমের উৎস মুক্ত হইল, কবি প্রিয়তমকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করিতে চাহিলেন। কেবল তাঁহার দিকে "চাহিয়া" থাকিতে সাধ।—

কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা,
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা।
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষার
সকল দিনের কাজেরি মাঝখানে।

কিন্তু তাঁহাকে এরূপভাবে পাওয়া তাঁহার করুণার উপরই নির্ভর করে। বিষয়বস্তুকে পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে

না পারিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু মন হইতে বিষয়-ত্যাগ সহজে হয় না। অনেক শক্তির আবশ্যক। ভগবান করুণা করিয়া যাহাকে শক্তি দেন, সে-ই ত্যাগ করিতে পারে।—

শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দ্দা
ঘুচায়ে দাও তার।

তার 'মান অপমান লজ্জা সরম ভয়' কিছুই থাকে না। তাহার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া তুমিই বিরাজ করিতে থাক। তোমাকে এমন ভাবে পাইয়া সে তোমাকে দিয়াই তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখে।

ত্যাগেই যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা ভক্ত তখন বুঝিতে পারেন। বিষয়-ভোগের প্রতি তখন সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা আসে। বস্তুর বহিরঙ্গ আর তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। রূপের পারে রূপাতীতকে পাইয়া তাঁহার সকল পিপাসার অবসান হয়। সকল ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। নিখিল তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। "যে-গান কানে যায় না শোনা" সে-গান তখন তিনি শুনিতে পান।—প্রাণের বীণাখানি নীরব হইয়া যায় !!

অপূর্ব্ব প্রেমানুভূতির ফলেই রবীন্দ্রনাথ সহজে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিলেন। অনন্ত পুরুষকে প্রেমের বলেই ভক্ত আপনার শান্ত হৃদয়ে নিজের মনমত করিয়া উপভোগ করিতে পারেন। ভক্তপ্রাণে ভগবানের কতই লীলা। তিনি নিত্য নব নব রূপ ধারণ করিয়া ভক্তকে নব নব আনন্দ দান করিতে থাকেন। ভগবানকে এরূপ মধুর ভাবে পাইয়া কবি প্রার্থনা করিতেছেন :—

তোমায় আমি হেরি সকল দিশি,
সকল দিয়ে তোমার মাঝে মিশি,
তোমার প্রেম জোগাই দিবানিশি,
ইচ্ছা আমার সেইটুকু থাক বাকি।

'সকলের মধ্যে তোমাকে দেখি, সকল আনন্দের মাঝে তোমার আনন্দ বিরাজ করুক,'—এই যে-ভাব ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভগবৎ-প্রেমের বিশেষত্ব। তাঁহার প্রেম-সাধনা কোন সঙ্কীর্ণ শক্তিতে আবদ্ধ না হইয়া বিশ্ব-প্রাণের বিকাশক্ষেত্রে প্রসার লাভ করিয়াছে। এই প্রেমানুভূতির ফলেই তিনি আজ বিশ্ব-মানবের মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। শান্তিনিকেতনে সামান্য বিদ্যালয় স্থাপনে যে-প্রেমের উন্মেষ, কবি-জীবনের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে, স্বদেশ-প্রেমে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া, তাঁহার পরিণত জীবনে "বিশ্ব-ভারতীর" মধ্যে তাহা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইল।

বিশ্ব-প্রীতিতেই ভগবৎ-প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। এই বিশ্ব-প্রীতির মূলে রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম প্রকৃতি-প্রেম।

শৈশব ও বাল্যের মধ্যেই তিনি প্রকৃতি-রাণীর ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। যৌবনে সেই প্রেম ঘনীভূত হইতে থাকে ; ক্রমে সাধনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে তিনি প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্ম-অন্তর্দৃষ্টি-বলে তিনি দৃশ্য-প্রপঞ্চের অভ্যন্তরে যেদিন অব্যয় সত্তার সন্ধান পাইলেন, যেদিন তাঁহার সকল হৃদয়তন্ত্রী একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল।—

কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়-পুর!

তখন হইতেই তিনি অনন্ত পুরুষকে "মধুর" ভাবে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। মোহ-মদিরা একেবারে অপসারিত হইল। প্রেমের স্বরূপ পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। শৈশবের প্রকৃতি-প্রেম ও বাল্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদের জ্ঞানলাভ, নির্ম্মল জ্ঞান ও নির্ম্মল প্রেমের মধুর সমন্বয়ে রবীন্দ্র-সাধনার এমন বিকাশ! খেয়া, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, ধর্ম্মসঙ্গীত, গীতালি, গান ও কবিবরের আধুনিকতম আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলিতে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এতদিন তাঁহার সাধনাদর্শ কল্পনার মধ্যেই ছিল, আজ "বিশ্ব-ভারতীতে" তাহার বিকাশ হইল।

এলেন কেই

শ্রী কালিদাস নাগ

উত্তর সাগর বাহি' চলিয়াছে তরী—
শব্দহীন প্রাণহীন তীর
নিস্তরঙ্গ নীর।
বিরাট্-তুহিন-ব্যূহ ক্ষণে ভেদ ক্ষণে চূর্ণ করি'
পৌঁছিনু উত্তরা-পথ ;—
যেদিকেই চাই দেখি রাগহীন তুষার-পর্ব্বত।
শাদা শুধু অবিচ্ছিন্ন শাদা
শুষিয়া লয়েছে যেন যত রঙ যত রূপরেখা
ধরিত্রীর মুখ হ'তে ; আছে শুধু লেখা
ভীষণ মৃত্যুর মৌন ; প্রাণ পায় বাধা
দিকে দিকে।
খুঁজিতে লাগিনু তাই স্তব্ধ অনিমিখে
কোথায় প্রাণের সাড়া !
ত্রস্ত বিহঙ্গের মত দৃষ্টি খেয়ে তাড়া
পড়িল আসিয়া এক পাইনের শাখে,
যেন থাকে থাকে
বিস্তারিয়া সবুজের ডানা
উড়িয়া চলেছে তরু লঙ্ঘি' লক্ষ মানা
নির্ম্মম সমাধিপুর হ'তে
উদার-আকাশ-ভরা প্রাণভরা উজ্জ্বল আলোতে।

হে চির কুমারী মাতঃ! তেমনি তোমার
তেজদীপ্ত প্রাণ
সহস্র বাধার মাঝে নিশি-দিন-মান
পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরি' যুঝিয়াছে হইবারে পার
পুরুষের পুঞ্জীভূত উপেক্ষা-তুষার
লভিবারে অনাগত অজাগ্রত নারীশক্তি তরে
মুক্তির আকাশ।
চৌদিকে বেজেছে তব পুরুষের ক্রূর পরিহাস,
তবু দিব্য অচঞ্চল বিশ্বাসের ভরে
উঠে গেছ উর্দ্ধপানে,
অতীত নারীর মৌন আর্ত্তনাদ ভরি' তব কাণে
সুমহান্ ভবিষ্যৎ লাগি'—
যেথা জ্যোতির্ম্ময়ী নারী নিত্য রবে জাগি'
পুরুষের পাপক্লেদ নিত্য ধুয়ে ধুয়ে
ক্ষমা ধৈর্য্য প্রেমপূর্ণ প্রাণে
বিশ্বমাতৃকার নিত্য সহজ জাগ্রত টানে
সৃষ্টিরে সুন্দর সত্য-ভিত্তি পরে থুয়ে
লভিবে নারীর তরে অমর গৌরব।

তব স্বপ্ন তব ইচ্ছা সব
এখনও হয়নি পূর্ণ ;
পুরুষের অহমিকা এখনও হয়নি চূর্ণ
কিন্তু নারী উঠিয়াছে জাগি'।
প্রথম সে জাগরণ আধা স্বপ্ন আধা সত্য মাঝে,
তাই সর্ব্ব কাজে
ঝাঁপিয়া পড়িল নারী তর্কসিদ্ধ অধিকার লাগি',
আরম্ভিল নব রণ
নবজাত কন্যাদের সাথে ;
দেখাইলে অধিকার মাত্র এক দায়ীত্ব ভীষণ -
পূর্ণ শক্তি জননীরই হাতে
নারীর সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সত্য নারী হওয়া
সৃষ্টি-ভার বওয়া।
খুসী হয় নাই নারী তোমার কথায়,
সে অনেক চায়।
তবু তার জাগরণ বিরাট্ ঘটনা
এ যুগের ইতিহাসে ;
সেই আশে
মহান্ ভবিষ্য সৃষ্টি করিছ রচনা
চিরজীবী চিরজয়ী যৌবনের বন্দনার মাঝে।
নারীর প্রত্যেক যুদ্ধে তোমারই ত জয়ধ্বনি বাজে।
সন্ধ্যা নামে সঙ্গীহীন তোমার কুটীরে
জনশূন্য আল্‌ভাস্ত্রার তীরে
তবু দেখি প্রাণে প্রেমে উদ্ভাসিত নয়ন তোমার
হে জননী স্বামী-হীনা !
তোমারে করি গো নমস্কার ॥

আলভাস্ত্রা
(সুইডেন)
১৯২৩

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক ওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

ছাতনা ও চণ্ডীদাস

দেড় বছর আগে একবার ছাতনায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাজ-পথের ধারে ছাতনার পুরানো "বাসলী" মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখে ছাতনার রাজবাড়ীতে উপস্থিত হ'লাম। রাজবাড়ীতে, রাজবংশের ইতিহাসজ্ঞ শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর সাহায্যে রাজদপ্তরে একখানি হাতে-লেখা খাতা দেখ্‌তে পাই। খাতাতে গুটি আষ্টেক পাতা আছে। তাতে পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে ব্রাহ্মণ নগরের ছত্রিনা নগরে পরিণতি, হামির উত্তরের রাজ্যাভিষেক, বেণের পুঁটুলিতে বাসলীর রাজাবাড়ী আগমন, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে চণ্ডীদাসের পরিচয়ের সম্বন্ধে লেখা ছিল।

"অকস্মাৎ দৈবাদেশ শ্রবণে করে প্রবেশ
দেবীদাস পড়িয়াছ ভ্রমে।
* * * *
প্রিয় ভক্ত তুমি মম চণ্ডীদাস নিরুপম
দুটি ভাই কেহ নহে উন।
* * *
আছে এক কুলাঙ্গার জঘন্য আচার তার
চণ্ডীদাস নামে মাত্র ভাই।
আছে এক কলঙ্কিনী রাণী নামে রজকিনী
সেই তার তরা জরা জ্ঞান।
মানে না সমাজ প্রথা শুনে না কাহারো কথা
স্মরে মুখে মাত্র রাধা নাম॥
সমুদ্র গৌড় সমাজ গোত্র শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ
হরে মিশ্র কুলের সন্তান।
পুত্র হইল দুই জন উদ্ধব পদ্মলোচন।"
ইত্যাদি

শুনেছিলাম যে, মূল পুঁথি আনন্দময়ী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে আছে। সে-সময়ে তাঁকে পত্র দিতে পারিনি। সম্প্রতি তাঁকে যে চিঠি দিয়েছিলাম তার উত্তরে তিনি লিখেছেন যে, এই লাইন ক'টি তিনি অন্য পুঁথিতে দেখেছেন। তাঁর কাছে যে-পুঁথি আছে তা দেবীদাসের ছেলে পদ্মলোচন শর্ম্মা কর্ত্তৃক ১৩৮৭ শকাব্দে বিরচিত। পুঁথি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের কথা উঠতে পারে না, কেননা চণ্ডীদাসের কাল সম্বন্ধে আমাদের যা মোটামুটি জানা আছে তাতে এইটুকু জান্‌তে পারা যায় যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক। বিভিন্ন প্রমাণে জানতে পারা যায় যে, বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হ'তে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। ছাতনার যে-রাজার সময়ে বাসলী দেবীর প্রতিষ্ঠা হয় তাঁর নাম "উত্তর হামির"। ইনিই ছাতনা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ছাতনার রাজবংশের ইতিহাসজ্ঞ রামকিঙ্কর-বাবুর কাছে শুনেছিলাম এবং রাজবাড়ীর খাতার মলাটে লেখা দেখেছিলাম যে, উত্তর হামির বর্ত্তমান রাজার ঊর্দ্ধতন একবিংশ পুরুষ। বর্ত্তমান কাল-গণনার মতে এক পুরুষে ২৫ বৎসর ধরলে উত্তর হামির চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ কিম্বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলা যেতে পারে। কাজেই ছাতনা রাজপরিবারের ইতিহাস হ'তে আমরা চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক বল্‌তে পারি। সত্যকিঙ্কর-বাবু আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে যে-পত্র দিয়েছেন তাতে তিনিও উত্তর হামির ১৩৫০ হ'তে ১৩৭৫ শকের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র পদ্মলোচন শর্ম্মা ১৪৬৫ খৃঃঅব্দে পুঁথি রচনা করেছিলেন, সুতরাং আমরা তাঁর খুল্লতাতের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান থাক্‌বার সম্বন্ধে নিসংশয় হ'তে পারি।

সত্যকিঙ্কর-বাবু যে-ইষ্টকের কথা বলেছেন, তাতে উল্লিখিত আছে "শ্রী ছাতনা নগরের শ্রীউত্তররায়।" অবশ্য মন্দির-চত্বরে বহুবিধ রকমের ইট পাওয়া যায়। শুন্‌লাম তার পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা চল্‌ছে, কাজেই সে সম্বন্ধে বর্ত্তমানে নীরব থাকাই যুক্তিসিদ্ধ।

ছাতনার বাসলী যে তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষী নয় রামকিঙ্কর-বাবুও সে-বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মধ্যযুগের বাংলায় বৌদ্ধ তন্ত্রের পাশাপাশি হিন্দুতন্ত্রর মতও গড়ে উঠছিল; কাজেই বৌদ্ধ দেবদেবী ও হিন্দুর দেবদেবীর নামের ও পূজা-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃই দূর হ'য়ে আস্‌ছিল। বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় যে এক সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব খুবই বেশী ছিল তা শুধু ছাতনার বাসলী ঠাকুর কিম্বা স্থানীয় আচার ব্যবহার দ্বারা ছাড়া অন্য বিষয়ের দ্বারাও প্রমাণিত হয়। বাঁকুড়া সহরের অনতিদূরে দারুকেশ্বর নদের পরপারে "সোনা তাজলের" দেউল নামে এক ভগ্ন মন্দির আছে। মন্দির কত দিনের তাহা অনুমানের আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায়ে বল্‌বার উপায় নেই। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় একে বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দির বলেছেন। এই মন্দির-দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে ভূমি হ'তে প্রায় দশ হাত উর্দ্ধে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সুতরাং মন্দিরের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছু সম্বন্ধ ছিল ব'লেই মনে হয়। বাঁকুড়ার নানা স্থানে অনেক দেবায়তন ও বহু পুণ্যকীর্ত্তির এখনও সন্ধান হয়নি; হ'লেও প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষিত হয়নি। আশা করি সুধীগণ এই দিকে লক্ষ্য কর্‌বেন।

শ্রী প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভক্তিপরীক্ষা শীর্ষক গল্পের প্রতিবাদে আপত্তি

গত আষাঢ় মাসের প্রবাসী পত্রিকায় ভক্তিপরীক্ষা-কল্পে অধ্যাপক শ্রীঅমৃতলাল শীল মহাশয় মুসলমান সমাজের পূর্ব্বপুরুষ ভক্তবীর ইব্রাহিমের

যে-বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অপ্রকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে আবদুল গনি মিঞা যথাসাধ্য যত্নবান হইয়াছেন।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রবাসীর পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইবে, প্রতিবাদকারী অধ্যাপক মহাশয়কে বস্তুতঃ সমর্থনই করিয়াছেন। উক্ত গল্পের মাল-মসলা ওল্ড টেষ্টামেণ্ট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কারণ, উহার সত্যতা সম্বন্ধে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীরা সম্পূর্ণ সন্দিহান। আমার বিবেচনায় উক্ত গ্রন্থের যথার্থতা অস্বীকার করিবার কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে না। ওল্ড টেষ্টামেণ্টকে সমগ্র জাতি ইহুদিদিগের জাতীয় ইতিহাস বলিয়া মনে করেন। হজরৎ মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মবীর ইব্রাহিম জাতিতে ইহুদি ছিলেন। ঐ গ্রন্থ উক্তজাতি দ্বারা লিখিত বলিয়া উহাতে অসত্য বিষয়ের স্থান পাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, অধিকন্তু তৎকালে মুসলমানধর্ম্মের অস্তিত্ব না থাকায় উহার উপর বিদ্বেষ-ভাব পোষণপূর্ব্বক কাহারও সত্য গোপন করিয়া অসত্য বিষয় লিপিবদ্ধ করার কোন সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অবস্থায় উক্ত গ্রন্থের লিখিত বিষয় অস্বীকার করিবার কোন সন্তোষজনক কারণ থাকিতে পারে না।

গনিমিঞা কোরানশরিফকে প্রধান স্থান দিয়া ওল্ড টেষ্টামেণ্টের সত্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়াছেন। কোরান মুসলমান সমাজের ধর্ম্মগ্রন্থ; উহা আবার উক্ত সমাজের মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক লিখিত। সুতরাং উহাতে হেয় ও অসম্মানকর কিছু লিপিবদ্ধ করিলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। উক্ত কারণ বশতঃ সুনিপুণ তুলিকার যাদুকরী প্রভাবে উহা যে অধিকতর উজ্জ্বলাকার ধারণ করে নাই তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? শ্রীযুক্ত শীল মহাশয়ের গল্প হইতে জানিতে পারি, ইব্রাহিম বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সন্তানহীন হওয়ায় স্বীয় স্ত্রীর অনুরোধে এক পরিচারিকার গর্ভে ও নিজ ঔরসে এক সন্তান উৎপাদন করেন; তিনিই ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের আদি পুরুষ। গনিমিঞা জানাইতেছেন, ধর্ম্মবীর ইব্রাহিমের দুই স্ত্রী সারা ও হাজেরা। হাজেরা প্রথমে পরিচারিকা ছিলেন এবং যদিও সারাকে সেবা ও পরিচর্য্যা করিতেন বটে, কিন্তু পরে ইব্রাহিম স্ত্রীর অনুরোধে তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষ ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বিবরণ পাঠে যথার্থই প্রতিপন্ন হইবে, গনিমিঞা হাজেরাকে পরিচারিকা বলিয়া স্বীকার করিয়াও করিতেছেন না। তৎকালে ইহুদি সমাজে পরিচারিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা নিন্দনীয় ছিল না। এমন অবস্থায় প্রতিবাদ করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই। আমার মনে হয় অধ্যাপক-মহাশয় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যথার্থ বিষয় সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন।

প্রতিবাদকারী মেষ বলি সম্বন্ধে যথেষ্ট আপত্তি উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন কোরানে গরু মহিষ ছাগ মেষ প্রভৃতি পশু কোরবানী করিবার কথা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। এই বিষয়ে আপত্তি করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি নিজ বাক্য প্রমাণ করিতে কোরান হইতে কোন সন্তোষজনক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কোন প্রমাণ দেন নাই। আমার প্রতিবাদের সারবত্তা সমগ্র সুধীসমাজের বিবেচ্য। আশা করি আব্দুলগনি মিঞা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিবেন না।

শ্রী রাধানাথ শিকদার

—

ভারতীয় মুসলমানের ভ্রম

ভারতীয় মুসলমানের ভ্রম শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে-কোন কোন মুসলমান ভারতবিজেতা "মোগল পাঠান" বা "আরব জাতির বংশধর বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকে। ইহা সত্য হইলে তাহারা যে নিতান্ত ভ্রম-ক্রমেই এরূপ করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে আমার মনে হয় এরূপ ভুল ধারণা অধিকাংশ আর্য্যবংশীয় মুসলমানই করে না এবং করা উচিতও নয়। কেননা যাহাদের শরীরে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত তাহাদের হিন্দুদের বংশধর বলিয়াই গৌরব অনুভব করা উচিত। ইহার কারণ এই যে, এদেশীয় হিন্দুগণ আর্য্যবংশোদ্ভূত এবং আর্য্যগণ অতি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সুতরাং এহেন প্রাচীন সভ্য জাতির যাহারা প্রকৃত বংশধর তাহারা কেন যে নিজের প্রকৃত বংশ-পরিচয় গোপন করিয়া "সেমেটিক" বা অন্য কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবে, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম বরং আমি ব্যক্তিগত ভাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় আর্য্য সন্তান বলিয়া আপনাকে মহা গৌরবের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করি এবং এইজন্য আরোও অহঙ্কার করি যে, আমারি পূর্ব্বপুরুষ কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন বিচার-শক্তির সাহায্যে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেওয়ান একলিমুররাজা চৌধুরী

—

হারামণি

শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসীর 'হারামণি'তে যে-গানটি বাহির হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে প্রবাসীর 'কষ্টিপাথরে' একবার বাহির হইয়াছিল। গানটির উপরে ব্র্যাকেটের মধ্যে (মহেন্দ্র ক্ষেপা) লেখা ছিল।

শ্রী সুধা দেবী

—

চরকা আবিষ্কার

শ্রাবণের প্রবাসীতে এই নামের প্রবন্ধটি পড়িয়া প্রীত হইলাম। ইংরেজী-জানা বাঙ্গালীর মাথা হইতে যে নূতন নূতন চরকা বাজারে ও বিজ্ঞাপনে আবির্ভূত হইয়াছে, সে-সব স্মরণ হইলে বাঙ্গালীর বুদ্ধির দৈন্য-দশার জন্য দুঃখ হয়। আমার বিশ্বাস, কর্ম্মপটুতা অভাবে খেলানা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে এবিষয়ে লিখিয়াছিলাম।

আমি একবার মাস পাঁচেক চরকা চর্চা করিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, যে-ক্ষেত্রে ও যে-কালে চরকা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, সে ক্ষেত্র ও কালের পক্ষে চরকা উৎকৃষ্ট যন্ত্রই ছিল। কাপাস চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় বোনা গ্রামে গ্রামে হইতে থাকিত।

এই বিপুল গ্রামিক কলার কিয়দংশ রাখিব এবং কিয়দংশ ছাড়িব,—এই বুদ্ধিতে চরকা চালাইবার চেষ্টা সফল হইবে না। দেশী ও বিলাতী সুতাকাটা কলের সহিত চরকার বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই হেতু চরকার দ্বারা বেশী সুতা পাইতে হইলে সস্তায় পাইতে হইবে। কেবল চরকার উন্নতি নয় সুতা কাটার অন্যান্য

আনুষঙ্গিক কর্মেরও উন্নতি চাই। পূর্বকালে প্রত্যেক কলাজীবী স্বাধীন ছিল। অন্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজে নিজে সকল কর্ম করিতে হয়। এখন কর্ম্মবিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আমরা কাপাস বীজ কিম্বা কাপাস তুলা দিয়া দেশের লোককে বলিতেছি, চরকায় সুতা কাটিবে, দেশের বস্ত্র-দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে।

আমার বিশ্বাস, তুলার পরিবর্ত্তে যদি তুলার পাঁইজ দেওয়া হইত তাহা হইলে সুতাকাটনীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইত। ভেড়ার লোমে উল হয়, এই বার্তা প্রচার করিয়া বেড়াইলে কোনও মহিলা উল বুনিতে যাইতেন কি?

আমার চরকা চর্চার একটু ইতিহাস দিই। লাট কারজন্ সাহেবের বঙ্গচ্ছেদে বাঙ্গালাদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার আঁচ বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালীকেও তপ্ত করিয়া তুলিয়া ছল। আমি তখন কটকে। সেখানে নিবাসী ও প্রবাসী বাঙ্গালীরাও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিলাতী বস্ত্রবর্জনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে কটকে কয়েকজন স্বদেশী ভক্ত দেশী জিনিস বিক্রির এক দোকান করিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল "উদ্যোগী সমিতির ভাণ্ডার" তখন দেশে স্বদেশী ভাবের উদ্ভব হয় নাই। ভাণ্ডারে বিলাতী কাপড়ের স্থান ছিল না। বিলাতী তখন সস্তা। দেশী তাঁতের ও কলের কাপড় আক্রা। তথাপি রুচিপরিবর্তনের আশায় এই ভাণ্ডারের জন্ম হইয়াছিল। এক উকিল ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বঙ্গচ্ছেদের সময় দেশী কাপড় যোগাইতে পারিলেন না। কাপড়ের কল নাই, তাঁত ধরিলেন। তখন ঠক্ঠকী তাঁত সেখানে তেমন চলিত ছিল না। তিনি গ্রাম হইতে তাঁতী আনাইলেন এবং আট দশ খানা তাঁত বসাইলেন। উৎসাহ দেখিয়া কটকের এক মহন্ত তাঁহার মঠে খান কয়েক চালা ছাড়িয়া দিলেন। কাপড় বোনা হইতে লাগিল।

মনে আছে, চল্লিশ নম্বর সুতার প্রমাণ ধুতী চারি টাকা চারি আনায় পাওয়া যাইত। পূজার সময় একদিন অধ্যক্ষ মহাশয় আমায় সংবাদ দিলেন, এবং তাঁহার তাঁতশালা দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। পূর্বে তিনি আমার ছাত্র ছিলেন। দেখিলাম সব ঠিক, কোন তাঁতী কাপড় বুনিতেছে, কেহ ব তুলিতেছে, কেহ পুরণী করিতেছে, ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুতা কই"—"বাজারের সুতা।—"সে সুতা যে বিলাতী।—" "তাইত এ যে আধা দেশী।" সে সময়ে সুতার দেশী কল তত ছিল না। কটকে দেশী সুতা প্রায় পাওয়া যাইত না। আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি আকাশ হইতে পড়িলেন, এবং আমায় সূত্রচিন্তা করিতে বলিলেন। সে চিন্তা আমার যে কি দুশ্চিন্তা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

সে যাহা হউক, চরকা চর্চা করিতে গিয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহার বৃত্তান্ত প্রবাসীর ষষ্ঠভাগে (১৩১৩ সালে) চিত্র সহ প্রকাশ করা গিয়াছে। তুলার রোয়া টানিয়া সমান করিবার নিমিত্ত কাপাস-থাওইর তুল্য তুলা থাওই করাইয়াছিলাম। দেখিয়াছি, তেমন প্যাঁজ পাইলে দু-টেকো চরকায় দু-থাই সুতা একদা কাটিতে পারা যায়। জিজ্ঞাসু পাঠক প্রবাসী দেখিবেন।

যদিও চরকার সহিত উক্ত তাঁতশালার সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাহার পরিণাম লিখি। গ্রামের তাঁতী কখনও সহরে আসে নাই, এমন বাঁধা উপার্জ্জন কখনও করে নাই। ফলে নূতন অবস্থায় তাঁতীরা আপনাদিকে সামলাইতে পারিল না। কেহ গ্রামে চলিয়া গেল, আর আসিল না, কেহ বা দুশ্চরিত্র হইয়া শোচনীয় অবস্থায় ফিরিয়া গেল। তাঁতশালা বন্ধ হইল এবং নীতিও শিক্ষা হইল। কাহারও অবস্থান্তর হঠাৎ ঘটাইলে কুফল উৎপন্ন হয়।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

বরেন্দ্র কৈবর্ত্ত-নায়ক ভীমের রাজধানী

অধ্যাপক শ্রী রাধাগোবিন্দ বসাক

আজ প্রায় পনর-ষোল বৎসর অতীত হইতে চলিল—বাঙ্গালীরা গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর-নন্দি বিরচিত "রামচরিত" নামক অপূর্ব্ব শ্লিষ্ট কাব্যের সহিত পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এই গ্রন্থখানি কাব্য হইলেও—ইহাকে কেবল কাব্য বলিলে ইহার মর্য্যাদার লাঘব হয়। ইহা একাধারে কাব্য ও ইতিহাস কথা। এই গ্রন্থ দ্ব্যর্থবোধক নানাপ্রকার আর্য্যা-ছন্দে রচিত। চারিটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই গ্রন্থখানিতে কবি-প্রশস্তির শ্লোকগুলিসহ সর্ব্বসমেত ২১৫টি শ্লোক আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫শ শ্লোক পর্য্যন্ত ইহার একটি প্রাচীন (সম্ভবতঃ, গ্রন্থ-সমসাময়িক) টীকাও পাওয়া গিয়াছে। অনেকেই জানেন যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই, মহাশয় এই মূল্যবান্ গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা ও প্রকাশক। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপালে ইহা আবিষ্কার করিবার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রীমহাশয় ইহা বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর মেমোয়ার-রূপে (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, No I) প্রকাশিত করিয়া কেবল বাঙ্গালী জাতির কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই একখানি গ্রন্থের আবিষ্কার জন্যই যে কোন ব্যক্তি জাতির

নিকট চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য,—নানাবিদ্যার ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের নিকেতন শাস্ত্রী মহাশয়ের ত কথাই নাই। কিন্তু তিনি বার-তের বৎসরের অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও পরিশ্রমদ্বারা দ্বাদশ-শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত এই গ্রন্থের পাঠোদ্ধার-কার্য্য শেষ করিয়া যে-ভাবে ইহার সম্পাদন ও মুদ্রণকার্য্য সমাধা করিয়াছেন—সে-বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এ-যাবৎ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি কোথায়ও পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র একখানি পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করিয়া পাঠোদ্ধার সাধনে এরূপ মূলগ্রন্থের সম্পাদন যে কিরূপ দুরূহ ও কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার তাহা সহৃদয় ব্যক্তিরা বেশ বুঝেন। কিন্তু আমাদের দোষ এই যে, আমরা সহায় ও সহকারী লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে একটু দ্বিধা বোধ করি—মনে করি সহকারিগণের নাম উল্লেখ করিলে নিজ প্রতিপত্তির মাত্রা লঘু হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ ব্যবহার কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। এরূপ হইলে, যাহা সুন্দরতর করিয়া করা যাইতে পারে—তাহা তেমনটা হয় না। জানি না শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের মূল শ্লোকগুলির ও টীকাংশের সংশোধন-পূর্ব্বক মূল পাঠের উদ্ধারের জন্য কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া নিজের সহয়তার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন কি না। সে যাহা হউক, নানা কারণে এই গ্রন্থখানির পুনঃ সম্পাদনের সময় আসিয়াছে। ইহার সটীক ও অটীক অনেক শ্লোকের ব্যাখ্যা লইয়া এতকাল বহু আলোচনা ও সমালোচনা হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বরেন্দ্রের এই উপাদেয় অমূল্য গ্রন্থরত্নের একটি নূতন সংস্করণ (অনুবাদ, টীকা ও টিপ্পনী সহ) বাহির করার জন্য রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্তৃপক্ষীয়গণ লেখককে নিযুক্ত করিয়াছেন। আশা করি শীঘ্রই গ্রন্থখানি যথোচিত বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারিবে। যদি শাস্ত্রী মহাশয় আরও একটু বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিয়া পাঠোদ্ধার-কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে অনেকটা কল্পিত ঐতিহাসিক তথ্যের নাম লইয়া—বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক অভিনব ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইল বলিয়া—এতদিন অনেক নিষ্ফল আলোচনা ও বাদ-বিসম্বাদ প্রচার করিতে হইত না।

তাহার নিদর্শনরূপে আজ এই স্থলে একটি তথাকথিত ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের মেমোয়ারের উপক্রমণিকায় একস্থানে (১) লিখিয়াছেন যে কৈবর্ত্ত-নায়ক ভীম বিদ্রোহের সময় পাল-সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিকটে একটি "ডমর" বা "উপপুর" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই তথ্য বিচার-সহ কি নয়, তাহা না ভাবিয়াই আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ সকলেই "ডমর" শব্দটি দ্বারা ভীমের রাজধানী বুঝিয়া লইয়া, নানারূপ কল্পিত ঐতিহাসিক তথ্যকে অনিঃসন্দিগ্ধ সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় "বাঙ্গালার ইতিহাসের" একস্থানে (২) বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্রীমহাশয়ের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—"রামপাল যুদ্ধান্তে ভীমের রাজধানী ডমর-নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী ডমরকে শত্রুপক্ষের রাজধানী বলিয়া উপপুর আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।" এখন দেখা যাউক, এই দুইজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের এইরূপ সিদ্ধান্ত কতদূর মানিয়া চলা যাইতে পারে। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতের" যে শ্লোকের (৩) ও টীকার উপর নির্ভর করিয়া এই তথ্য প্রচারিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"অপি চাপদণ্ডমরমপ্রতিমদ্রবিণোঽবধূতনিখিলনৃপম্।
স ভবস্যাবিতজনকঃ করপল্লবলীলয়ালাবীৎ ॥ (৪)

শ্লোকটির অন্বয়—রাম-পক্ষে—

(ক) অপ্রতিম-দ্রবিণঃ অবিত-জনকঃ স ভবস্য চাপ-দণ্ডং করপল্লব-লীলয়া অবধূত-নিখিল-নৃপং (যথা তথা) অরং অলাবীৎ অপি।

রামপাল-পক্ষে—

(খ) অপি চ, অপ্রতিম-দ্রবিণঃ অবিত জনকঃ

---

(১) "And Bhima built a Damara, a suburban city close to the capital of the Pala empire".—Introduction, p. 13, Mem. A. S., Vol III, No. I.

(২) "বাঙ্গালার ইতিহাস"—প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৯১ পৃষ্ঠা।

(৩) "রামচরিত"—১।২৭

(৪) আর্য্যা ছন্দ।

স ভবস্য আপদং ডমরং অবধূত-নিখিল-নৃপং (যথা তথা) করপল্লব-লীলয়া অলাবীৎ।

ইহার অনুবাদ—রাম-পক্ষে—

(ক) অতুল-পরাক্রম রামচন্দ্র জনক রাজার সন্তোষ বিধান-সহকারে নিখিল নৃপতিবৃন্দের পরাভব উৎপাদন করিয়া নিজ করপল্লবলীলাক্রমে অতিশীঘ্র মহাদেবের শরাসন-দণ্ড ছিন্ন করিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

রামপাল-পক্ষে—

(খ) আরও,—প্রভূত-ধনশালী রামপাল প্রজাজনের প্রীতিবর্দ্ধন-সহকারে (বা রক্ষণ-সহকারে) নিখিল নৃপতিবৃন্দের পরাভব উৎপাদন করিয়া নিজ করপল্লবচেষ্টায় (অস্ত্রাদির প্রয়োগে) সংসারের আপদ-স্বরূপ উপপ্লব (বা বিদ্রোহ = মর) দমন করিয়াছিলেন।

রামপাল পক্ষে যে-অনুবাদ প্রদান করা হইল—ইহার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতেছে। দুর্ণয়-পরায়ণ দ্বিতীয় মহীপালের ক্রিয়াকলাপে প্রজাবর্গের বিরাগ ও অসন্তোষই বরেন্দ্রে একাদশ-শতাব্দীর কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের মূল কারণ। মহীপাল নিহত হইবার পর—কৈবর্ত্ত-নায়ক দিব্য বা দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্র অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। তখন মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাল-নরপাল রামপাল চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিরূপে কৈবর্ত্ত-প্রজাগণের এই বিদ্রোহ বা বিপ্লব দমন করিয়া, তাহাদের নায়ক ভীমের হস্ত হইতে "জনক-ভূ" (= জন্ম-ভূমি) বরেন্দ্রের উদ্ধার সাধন করিবেন। রামপাল যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সৈনিকগণ "বিদা ঈহান্" (১।২৬)—"বোধ-সহকারে চেষ্টমান" অর্থাৎ বিমৃষ্যকারী, তখন তাঁহার মনে বড়ই বল বাড়িতে লাগিল। এইরূপ বিবরণের পরেই সন্ধ্যাকর নন্দী আলোচ্য শ্লোকে মোটামুটি-হিসাবে লিখিলেন—রামপাল অস্ত্রাদিপ্রয়োগে এই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তার পর পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে কবি বর্ণনা করিলেন—রামপাল যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ও প্রবৃত্ত হইয়া কি উপায়ে পিতৃরাজ্যের সামন্তরাজ-চক্র একত্রিত করিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া পরমশত্রু ভীমের বধান্তে পুনরায় বরেন্দ্র-ভূমি স্বাধিকারে আনিতে পারিয়াছিলেন। এই আলোচ্য শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোক-সমূহেও আমরা কবিকে যুদ্ধের আয়োজনমাত্র সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে দেখিতে পাই—যুদ্ধ ত আরো অনেক পরে ঘটিবে বলিয়া বর্ণিত। এমন-কি, পিতা তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের পরলোক-প্রাপ্তির পর, মহীপাল কি প্রকারে "অনীতি-কারম্ভ রত" (১।৩১) (= নীতিবিরুদ্ধ-ক্রিয়ারত) হওয়ায়, বরেন্দ্রের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়—তাহারও বর্ণনায় কবি আলোচ্য শ্লোকের কিছু পরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তবিংশতি-সংখ্যক শ্লোকেই তিনি "যুদ্ধান্তে" রামপাল-কর্ত্তৃক "ভীমের রাজধানী ডমর-নগরের ধ্বংসের" উল্লেখ পাইতেছেন। পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে—কবি যুদ্ধবর্ণনা আরও অনেকটা পরে করিয়াছেন এবং আলোচ্য শ্লোক পর্য্যন্ত প্রকৃত যুদ্ধের কোন কথাই উল্লিখিত নাই। আরও দ্রষ্টব্য যে, সন্ধ্যাকরের ন্যায় এত বড় কবি কখনই অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের গৌড়াধিপ রামপালের চরিতকথার ঘটনাবলীর বর্ণনায় ক্রমভঙ্গ-দোষে দোষী হইতে পারেন না। উদ্ধৃতশ্লোকে দাশরথি রামের পক্ষে প্রযুজ্য অর্থেও আমরা দেখিতেছি—সবে মাত্র রাম হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া "জনক-ভূ" সীতাদেবীর পানিগ্রহণে কৃতকৃত্য হইতে চলিতেছেন। এই "জনক-ভূ"র হরণের পর রাবণ-বধ ত তখনও কত দূরের কথা! সুতরাং এ-স্থলে "যুদ্ধান্তের" কোন কথাই হইতে পারে না। ভীমের বধের পর, "রামচরিতের" তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা রামপালকে রামাবতী-নামে একটি নগরের পত্তন করিতে বর্ণিত দেখিতে পাই। তাহাতেও আমরা ভীম-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কোন পুর বা উপপুরের ধ্বংসাবশেষের উপর রামপালকে রামাবতী নগর প্রতিষ্ঠা করিতে দেখিতেছি না।

এখন দেখা যাউক, ভীমের রাজধানী বলিয়া "ডমর"-নামক কোন নগরের অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি না? কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ-সময়ে ভীম যে কোন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন রামচরিতের কোন স্থানেই আমরা তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। ভীম যে বরেন্দ্র অধিকার

করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা ইহাও বুঝা যাইতে পারে যে, জনপদের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পাল-রাজগণের রাজধানীও অধিকার করিয়া থাকিলে থাকিতে পারেন। কিন্তু কোথায়ও কি পাওয়া গিয়াছে যে, ভীম "ডমর"-নামক পুর বা উপপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরি উদ্ধৃত ইংরেজী কথা কয়টিই রাখালদাস-বাবুর উপরি উদ্ধৃত উক্তির কারণ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। আর বাস্তবিকই কি "সন্ধ্যাকরনন্দী ডমরকে শত্রু-পক্ষের রাজধানী বলিয়া উপপুর আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন?" যদি অন্য কেহ তাহা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বলা উচিত ছিল যে, সন্ধ্যাকরের কাব্যের টীকাকারই তাহা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি টীকাকারও তাহা করেন নাই—করিতেও পারেন না। যত গোলমালের হেতু মূল শ্লোকে "ডমর" শব্দের প্রয়োগ ও তাহার অর্থ লইয়া। মূলপাণ্ডুলিপিতে এই শ্লোকের টীকাংশে "ডমরং"-পদের পর যদি বাস্তবিকই লিপিকরপ্রমাদবশতঃ "উপপ্লবং"-পদ-স্থলে "উপপুরং" [অর্থাৎ 'প্ল' স্থলে 'পু' ও 'বং'-স্থলে 'রং'] লিখিত থাকিয়া থাকে—তথাপি পাঠোদ্ধারকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের উচিত ছিল বন্ধনী-মধ্যে 'উপপুরং'-পদটিকে "উপপ্লবং"-পদরূপে সংশোধিত করিয়া তদীয় মেমোয়ারে ছাপান। তিনি তাহা করেন নাই। তাহা করিলে এই শব্দের ব্যাখ্যা লইয়াও আমাদের এতটা উপপ্লব উপস্থিত হইত না। এখন টীকাকার এই শ্লোকের রামপাল-পক্ষে কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় এস্থলে যেরূপ টীকা মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা সেরূপই উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"অন্যত্র। অপি সমুচ্চয়ে। স রামপালো ভবস্য সংসারস্যাপদং বিপদং ডমরমুপপুরং শত্রুকৃতমলাবীৎ। বি[প]ৎপক্ষে অপ্রতিমদ্রবিণং (?) সংসারবিপ্লবনাৎ অপ্রতিমং দ্রবিণং ধনং যস্য অবিতাঃ প্রী (প্র)ণিতাঃ জনা প্রজা যেন করপল্লবলীলয়াষ্ট (?) দানেন। ডমরপক্ষে দ্রবিণং ধনং অবিতা রক্ষিতা প্রজা যেন করপল্লব-লীলয়া. আয়ুধ-চেষ্টয়া অবধূত নিখিল-নৃপং যথা ভবতি ॥২৭॥"

প্রশ্নবোধক চিহ্ন দুইটি আমাদের। পাণ্ডুলিপি হইতে এরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় মনে করিয়া থাকিবেন—"ডমর"-শব্দের অর্থ উপপুর, এবং "শত্রুকৃত" শব্দের অর্থ শত্রু নির্ম্মিত। শত্রু ত অবশ্যই ভীম। তাই তিনি উপক্রমণিকায় লিখিলেন—"Bhima built a Damara, a suburban city close to the capital of the Pala empire." 'উপপুর' শব্দের অর্থ যে শাখাপুর বা শাখা নগর হয় তদ্বিষয়ে আমরাও সংশয় করি না। কিন্তু আমাদের মতে এস্থলে মূলে অবশ্যই 'উপপুর' শব্দ নাই—উপপ্লব শব্দ আছে—পাণ্ডুলিপিতে 'উপপুর' থাকিয়া থাকিলেও তাহা লিপিকরের প্রমাদ। আবার শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় ইংরেজীতে "Damara' শব্দটির প্রথম অক্ষরটি "Capital letter"—দ্বারা মুদ্রিত থাকায়, সম্ভবতঃ রাখালদাস-বাবু মনে করিয়া থাকিবেন যে, ভীমের উপপুরের নাম বা সংজ্ঞা "ডমর"। সেইজন্যই বোধ হয় তিনি "ডমরকে" সংজ্ঞাবাচক শব্দ ভাবিয়া ইহাকে ভীমের রাজধানীর নাম মনে করিয়াছেন। এবং যাহা সন্ধ্যাকর নন্দী নিজে লিখেন নাই, তিনি কাল্পনিক যুক্তি দিয়া—ইহা কেন "উপপুর"—আখ্যায় অভিহিত হইল—তাহাও লিখিলেন। আমাদের সমালোচনা সমর্থনের জন্য আমরা এই স্থলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "Palas of Bengal"—নামক পুস্তক হইতেও একটি উক্তি পাদ-টীকায় উদ্ধৃত করিলাম (১)। বলা বাহুল্য এই উক্তি নিরর্থক।

নিজ মত পরিপোষণ করার জন্য এখন আমাদিগকে 'ডমর'-শব্দের অর্থের প্রমাণ দেখাইতে হইতেছে। সংস্কৃত অভিধানে ও সাহিত্যে ডমর-শব্দ উপপুর অর্থে কস্মিন্ কালেও প্রযুক্ত নহে এবং ইহা কখনই সংজ্ঞাবাচক শব্দও নহে। ইহা দস্তুরমত একটি আভিধানিক শব্দ। যদি ইহা 'উপপুর' অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারিত—তবে, বোধ

১ "Ramapala seems to have obtained an easy victory which was followed by the sack of the town of Damara, the capital of Bhima. The commentary on another verse states that Ramapala destroyed Damara a small town. The adjective *Upapura* is no doubt applied slightingly because it happened to be the capital of the enemy."—Mem. A. S. Bengal, Vol. V. p. 91.

হয়, ব্যাখ্যাতে টীকাকার শব্দটিকে "শক্র-কৃত" বলিয়া বিশেষিত না করিয়া, অধিকতর সঙ্গতের সহিত "শক্র-নির্ম্মিত" প্রভৃতি শব্দদ্বারা বিশেষিত করিতেন। নগরাদির নিবেশ বুঝাইতে 'কৃত' অপেক্ষা 'নির্ম্মিত' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ সুষ্ঠুতর হইত। আরও একটি কথা—এস্থলে "আপদং" পদটিও "ডমরং" পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজ্যে 'উপপ্লব' উপস্থিত হইলেই ইহাকে সংসারের আপদরূপে বর্ণনা করা সম্ভবপর—'উপপুর' কেমন করিয়া সংসারের আপদ্ হইতে পারে তাহা বিবেচ্য। সে যাহা হউক, ডমর-শব্দের বাস্তবিক অর্থ কি তাহাই এখন দেখা যাউক। অতি প্রাচীন কোষ রচয়িতা অমরসিংহ নিজ অভিধানে (তৃতীয় কাণ্ডের সংকীর্ণ বর্গে ২।১৪) যুদ্ধ-সম্পর্কীয় জয়, নিগ্রহ, অনুগ্রহ, অভিগ্রহ, সংগ্রহ, প্রভৃতি শব্দের পরিভাষা দিবার পরে সেই প্রসঙ্গেই লিখিতেছেন—"ডিম্বে ডমর-বিপ্লবৌ"—। ভানুজিদীক্ষিত ব্যাখ্যায় লিখিলেন—এই তিনটি শব্দ লুণ্ঠনাদি অর্থে প্রযুক্ত। ক্ষীরস্বামীর মতে শব্দত্রয় "অশস্ত্র-কলহ" অর্থে প্রযুক্ত। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কোষকার "কলিকাল-সর্ব্বজ্ঞ" হেমচন্দ্র ও তদীয় "অভিধান-চিন্তা-মণি"তে যুদ্ধ-সম্পর্কীয় জয়-পরাজয়, অবমর্দ্দ-নিযুদ্ধ, পলায়ন-অপক্রম প্রভৃতি শব্দের পারিভাষিক ব্যাখ্যা দিয়া লিখিলেন (৩ মর্ত্ত্যকাণ্ডে)—"ডমরে ডিম্ব-বিপ্লবৌ।" আবার তিনিই টীকাতে লিখিলেন "দাম্যতি ডমরঃ লুণ্ঠ্যাদিঃ। অশস্ত্রকলহ ইত্যেকে।" "দমের্নিদ্বা দশ্চ ডঃ —(উণা ৪·২) ইত্যরঃ ভত্র।" সন্ধ্যাকরের অপেক্ষা কিছু প্রাচীনতর অভিধান-কারক যাদব-প্রকাশও তাঁহার বৈজয়ন্তী নামক কোষে এই 'ডমর'-শব্দটিকে কোন্ কোন্ শব্দ-পর্য্যায়ে ধরিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি লিখিলেন—

"ডমরোপপ্লবোৎপাতা উপসর্গ উপদ্রবঃ।"

সুতরাং 'ডমর'-শব্দ যে উপপ্লব, উৎপাত, উপসর্গ বা উপদ্রব অর্থাৎ লুণ্ঠনাদিপূর্ব্বক বিদ্রোহকে বুঝায়—সে বিষয়ে আর কাহারও কোন সংশয় থাকা উচিত নহে। অতএব ইহাই নিশ্চিত যে, রাম-চরিতের টীকাতে যাহা মূলে 'উপপ্লবং' ছিল (জানি না পাণ্ডুলিপিতে এখনও তাহাই আছে কি না?) তাহাই সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদে পাণ্ডুলিপিতে 'উপপুরং' বলিয়া লিখিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় শব্দটিকে শুদ্ধভাবে ছাপিলেই সকলকে এতটা প্রমাদে পড়িতে হইত না। আরও একটি কথা—কবির প্রযুক্ত "অলাবীৎ" ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াও ডমরকে উপপুর বলিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। কৈবর্ত্তদের ডমর বা উপপ্লবকে সংসারের আপদ মনে করিয়া কবি রামপাল কর্ত্তৃক তাহার উচ্ছেদ-সাধনের বর্ণনায় 'অলাবীৎ' ক্রিয়ার উপযুক্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। টীকাকার বিপৎ-পক্ষে ব্যাখ্যাতে"সংসার-বিপ্লবনাৎ"-পদের প্রয়োগ দ্বারাও ডমরের অর্থ যে-বিপ্লব তাহার স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন। দেশ তখন একরূপ অরাজক—ইহার নেতা নাই। অকর্ণধার নৌকার মত তাহা যেন কোথায় ভাসিয়া চলিতেছে, সেইজন্য রামপাল প্রজাবর্গকে নানারূপ অর্থদানাদিদ্বারা সন্তোষিত করিয়া তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ডমর-পক্ষের ব্যাখ্যাতেও টীকাকার স্পষ্টতরভাবে লিখিলেন যে, রামপাল এই ডমর (বিপ্লব) করপল্লবলীলা দ্বারা অর্থাৎ আয়ুধ-চেষ্টা দ্বারা দমন করিয়াছিলেন। 'ডমরকে' এইস্থানে উপপুর বা স্থানবিশেষের সংজ্ঞা মনে করিয়া কেহ ভ্রান্তিতে আর না পতিত হন—এইজন্যই সেইরূপ ব্যাখ্যার এইরূপ প্রতিবাদ করা হইল। বরেন্দ্র-ভূমিতে কৈবর্ত্ত-নায়ক ভীমের কোন স্বতন্ত্র নগর বা উপপুর ছিল না—থাকিলেও তাহার নাম কিছুতেই 'ডমর' হইতে পারিত না। ঐতিহাসিকগণের অকারণ দুর্ব্যাখ্যায় বা ভ্রান্তিতে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ না হয়—এই প্রবন্ধ লিখিবার ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ, পরবর্ত্তী লেখকগণ গতানুগতিতেই বেশী চলেন—ভুলটা দৃঢ় হইয়া গেলে তাহার ত্যাগের ইচ্ছা সরল হয় না। তথ্যের সন্ধানে অত্যুৎকট কল্পনার আশ্রয় লওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

শিশু

মোহাম্মদ ফজলে রব্বি

গভীরে প্রাণে চায়
আছে কি ভালে লেখা ?
পরাণ-ধন কবে
মায়েরে দিবে দেখা।
প্রেমের রাগ যবে
হৃদয় ছেয়ে বয়,
সে-সাধ মনে জেগে
নয়ন মেলে রয়।

চাঁদেরি রূপ নিয়ে
আড়ালে লুকোচুরি,
মায়েরে ধরা দিয়ে
আদর নেবে তুড়ি।
হঠাৎ একদিন
তুলিয়া হৃদে দোল,
শিশুর নব দেহে
ভরিল মার কোল।

অজানা হেথা জাগে
আকুল ক্রন্দন,
মায়ের স্নেহ তারে
করিল বন্ধন।
অবোধ কচি প্রাণ—
না আছে কোন ভাষা,
মুখের আভা শুধু
টানিছে ভালবাসা।
কামনা যাহা ছিল
পূরিল মার মনে,
গভীর ভালবাসা
জনমে তার প্রাণে।

সুধায় তারে মাতা
টানিয়া বুক'পরে
"কোথায় ছিলি তুই
কে তোরে পালিত রে ?
আসিলি হেথা কেন
নিঠুর ধরণীতে ?
কাড়িয়া নিতে প্রাণ
একটি চাহনিতে ?"

অনুপ ঠারে শিশু
প্রকাশে তার কথা,
অসীম পরিচয়
অনাদি যত ব্যথা।

"অসীমে চির বাস
সৃষ্টি কাজ যার,
ছিলাম মিশি' আমি
কোমল হৃদে তার।
লাগিত ভাল মোর
তাহারি নভঃ-কোল ;
হাসিয়া চেয়ে চেয়ে
আদরে দিত দোল।
পূরণ করিবারে
তোমার আশাখানি,
হৃদয়ে স্নেহ মাখি'
আমারে দিল আনি'।
জাগে যে তব মাঝে
ব্যাকুল করে' রাখা,
নয়নে বিরাজিত
করুণ চেয়ে থাকা।"

ঝরিবে কোন্ ক্ষণে
শুকায়ে নেবে বায়,
শিশির-ফোঁটা হেন
শিশুরে রাখে মায়।
চাঁদের মত শিশু
মায়ের স্নেহে বাড়ে,
অমৃত হাসি-রেখা
রঙীন ঠোঁট-আড়ে।

একটু বিকাশের
একটা মৃদু বুলি—
মায়ের দেহে শিরা
পরাণ উঠে ফুলি।
এমন ক'রে কেও
পরাণ রয় মেলে?
স্নেহের সবটুকু
চুমাতে দিই ঢেলে।

শিশুপাল-বধ

শ্রী অনাদিনাথ সরকার

মহাকবি মাঘ বিরচিত শিশুপাল-বধ কাব্য সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্যের সন্ধান দিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা নহে; সমগ্র বঙ্গদেশে শিক্ষাদান নামে যে বিরাট্ শিশুপাল-বধ অভিনয় চলিতেছে তাহারই দুই-চারিটি অঙ্ক সাধারণের দৃষ্টিগোচর করাই লেখকের উদ্দেশ্য। যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া ইহার প্রতিকার করিলে এই অভাগ্য দেশের পরম উপকার সাধিত হইবে।

ভোক্তার পরিপাক-শক্তি বিবেচনা করিয়া খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ স্থির না করিলে যেমন ভোক্তার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা আছে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের শক্তি বিবেচনা না করিয়া তাহার পাঠ্য স্থির করিলেও ঠিক সেইরূপই তাহার অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সহজ সত্যটি প্রায় কোন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষই বিবেচনা করেন না; অন্ততঃ আমাদিগের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকাগুলি দেখিলে ধারণা হয় যে, তাঁহারা শিক্ষার্থীর পরিপাক-শক্তি সীমাহীন বলিয়াই মনে করেন। পাঠক-পাঠিকাগণ নিজ নিজ পুত্রকন্যাগণের পাঠ্য পুস্তকগুলি একবার লইয়া দেখিলেই আমার কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। আমার সবিনয় অনুরোধ, পুস্তকগুলি দেখিবার সময় সেগুলি যে পুত্র বা কন্যার পাঠ্য তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে এই প্রশ্ন করিবেন, সেইসমস্ত বিষয় ও পুঁথি আয়ত্ত করিবার শক্তি তাহার জন্মিয়াছে কি না।

বিদ্যালয়ের যে-শ্রেণী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাট্রিকুলেশনের (প্রবেশিকা পরীক্ষার) নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তক পড়ান হয় তাহার নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্তই এই শিশুপাল-বধ অবাধে চলিতেছে। কেন চলিতেছে তাহাও সহজেই বুঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশনের যে পাঠ্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত বহি কতকগুলি আছে, এবং অবশিষ্ট বহিগুলিও কয়েকজন ভাগ্যবান মহাত্মার বহি, সুতরাং উচ্চ কয়েকটি শ্রেণীতে ট্র্যান্স্লেশন্, কম্পোজিশন্, এসে রাইটীং, হোম ষ্টাডি প্রভৃতি অতি অল্প বিষয়ে নিজ ইচ্ছামত পাঠ্য নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের আছে। এই কয়েকটি বিষয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজের বা আত্মীয়ের বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির (গ্রন্থরচনায় নহে—যস্মিন্ তুষ্টে স্বার্থসিদ্ধিঃ)

অথবা স্কুলের কোন শিক্ষকের রচিত পুস্তক পাঠ্য নির্ণীত হইতে পারে। নিম্নশ্রেণীগুলিতে এই বাধাও নাই। ডিরেক্টরের অনুমোদিত বই ত নিম্নশ্রেণীগুলিতে ধার্য্য হয়ই, তদ্ব্যতীত তাঁহার অননুমোদিত বইও পাঠ্য ধার্য্য করিবার ক্ষমতা স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের থাকায় "স্কুল-পাঠ্য" ও "গৃহ-পাঠ্য" এই উভয় নামে কত অসার বোঝা যে ছাত্র-ছাত্রীর মাথায় চাপান হয় তাহার ওজন বলা যায় না। বিষয়-নির্ব্বাচনে বিচার নাই, পাঠ্যের সংখ্যার শেষ নাই, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই, থাকিলে বালিকা-বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে "পত্র ও দলিল শিক্ষা" পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইত না।

যে-সকল পুস্তক ডিরেক্টর ও সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট-বুক্ কমিটি স্কুলপাঠ্য মনোনীত করেন তন্মধ্যে বহু পুস্তক উৎকৃষ্ট, আবার বহুতর নিতান্ত অসার। শিরোনামায় "Approved by the D. P. I. as a text book, vide Calcutta Gazette" (শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত, কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য) এই তক্‌মা থাকায় সেগুলি নিতান্তই মেকী হইলেও আমাদিগের স্কুলে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কোন্ পুস্তকগুলি আমাদিগের ছাত্র-ছাত্রীর অধিক উপযোগী তাহা ইংরেজ ডিরেক্টর মহাশয় অপেক্ষা আমাদিগের শিক্ষকগণের সমধিক জানিবার ও বুঝিবার কথা, কিন্তু তাঁহাদিগের পাঠ্য-নির্ব্বাচন ও পঠন-প্রণালী দেখিয়া মন নিরাশায় ভরিয়া উঠে।

পুস্তক নির্ব্বাচনে গ্রন্থকারগণের অর্থাগম ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যের দিকে স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না, নতুবা প্রায় প্রতি বৎসর স্বাস্থ্যরক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে? ১৯২৪ সালে এক পাটীগণিত হইতে শিশু সংখ্যা-গণনা হইতে যোগ বা সঙ্কলন পর্য্যন্ত শিখিল, ১৯২৫ সালে সেই শিশু পরবর্ত্তী শ্রেণীতে উন্নীত হইল, সে-বৎসর অন্য গ্রন্থকারের পাটীগণিত পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইল! ভারতবর্ষের ইতিহাসও তদ্রূপ। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, আজকাল ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত প্রভৃতিরও ভাগ আছে, ইতিহাসের প্রথম ভাগে মুসলমান-শাসন পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজ শাসন, ভূগোল, পাটীগণিতেও তদ্রূপ। এই ব্যবস্থার একমাত্র ফল এই হয় যে, চারি পাঁচ বৎসরে এক-এক বিষয়ে চারি পাঁচখানি করিয়া বই নামে আবর্জ্জনা সংগৃহীত হয়। অথচ এই পুস্তকগুলি আর কোন কাজে লাগাইবার পথ স্কুলকর্ত্তৃপক্ষগণ রাখেন না। ধরা যাক্ এক গৃহস্থের বড় ছেলেটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে, দ্বিতীয় ছেলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে; বাৎসরিক পরীক্ষার পর দ্বিতীয় ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিল, কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণীতে নূতন নূতন বহি পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইল, তাহার দাদার পূর্ব্ব বৎসরে পঠিত বই আর তাহার ব্যবহারে লাগিবে না। অথচ পূর্ব্ব বৎসরের পাঠ্য পুস্তকগুলির অপেক্ষা পর-বৎসরে নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলি কিছুমাত্র ভাল নহে। সকল দিক্ দেখিলে এই কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্কুলকর্ত্তৃপক্ষগণ পাঠ্যগ্রন্থকারগণকে অতি দরিদ্র ও ছাত্র-ছাত্রীর পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে ছদ্মবেশী কুবের মনে করিয়া স্কুলপাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত করেন।

স্কুলপাঠ্য স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলির অধিকাংশের ভাষা দেখিলে গ্রন্থকারগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা হয়। এইখানে একটি (সত্য) ঘটনা বলি।—নয় বৎসর বয়সের কন্যা স্বাস্থ্যরক্ষার বহি খুলিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, এইটা পড়িয়া দাও ত।" পিতা পড়িলেন—"আমরা যে প্রতিনিয়ত শ্বাস টানিয়া লইতেছি, তাহাতে বায়ুর অক্সিজেন্ আমাদের বক্ষপঞ্জরাভ্যন্তরস্থ ফুস্‌ফুস্-দ্বয়ে প্রবেশ করিয়া শরীরের দূষিত রক্তকে প্রতিনিয়ত শোধন করিতেছে এবং সেই শোধিত রক্ত আবার শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইতেছে।" কিন্তু প্রথম চেষ্টায় তিনিও "বক্ষপঞ্জরাভ্যন্তরস্থ" পদ নির্ভুল উচ্চারণ করিতে অপারগ হইলেন।

বিলাতী শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি পাণ্ডিত্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রণয়ন করেন। এমন-কি স্যার্ আর্চিবল্ড গেকী, স্যার্ হেন্‌রি রস্কো, গ্রীন্, টোজার, টাউট্, ডাউডেন্, স্যার্ রিচার্ড জেব, গ্ল্যাডষ্টোন্, হাক্সলি, ফ্রীম্যান্, বিশপ ক্রেটন্, ষ্টাফোর্ড ব্রুক্ প্রভৃতি জগৎ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের শিশুপাঠ্য পুস্তক অনেক আছে। ইহার কারণ এই যে, শিশুগণকে

শিক্ষাদান যে বয়স্থগণকে শিক্ষাদান অপেক্ষা অনেকাংশে কঠিন ইহা পাশ্চাত্যগণ বুঝেন। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখার অপেক্ষা সহজ কাজ বুঝি আর কিছুই নাই। অপরাপর লেখকগণের লেখা পুস্তক হইতে "প্রাতরুত্থান" "ঈশ্বর-বন্দনা" "সত্যবাদিতা" "জীবে দয়া" প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কিছু কিছু নকল করিয়া, রাজা পঞ্চম জর্জ্জ, গবর্ণর জেনারল্, তাজমহল, হাজী মহম্মদ মহসীন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ছবি দিলেই বঙ্গদেশের ইংরেজী বা বাঙ্গলা স্কুলপাঠ্য হইয়া গেল। কেবল সম্রাটের ছবিটি ত্রিবর্ণে হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, আর যদি গ্রন্থকারের নামের সঙ্গে "সহ-গ্রন্থকার" ভাবে একটি ইংরেজের নাম থাকে তবে ত' সোনায় সোহাগা।

পাশ্চাত্য দেশের স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি graduated অর্থাৎ প্রথম ভাগ অপেক্ষা দ্বিতীয় ভাগ কিছু কঠিন, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয়, তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ এইরূপ কঠিন এবং ক্রমে নূতন নূতন বিষয়ের সমাবেশ। আমাদিগের বিদ্যালয়-সমূহে এক শ্রেণীতে মেক্‌মিলানের পরের শ্রেণীতে লংম্যানের ও তৎপরের শ্রেণীতে আবার আর-এক তৃতীয় ব্যক্তির বহি পাঠ্য নির্ণয় করায় এই তিনটি গ্রন্থকারের লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়। শিশু-শিক্ষায় এইরূপ graduated পাঠ্য যে কত প্রয়োজন তাহা আমাদিগের গ্রন্থকারগণের বুঝিবার শক্তি নাই এবং স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের এই বিষয়ে অবিবেচনার ফলে অনেক সময় দেখা যায়, যে উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য অনেকাংশে কঠিন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইংরেজি ও বাঙ্গলা সাহিত্যের (?) পাঠ্যগুলির অনেকগুলিই অপরাপর লেখকগণের রচনার সঙ্কলন মাত্র। কিন্তু শিক্ষকগণ গ্রন্থকারের সঙ্কলনে তুষ্ট নহেন, তাঁহারা নিজেরা আবার পাঠ বাছাই করেন। একখানি পুস্তকে হয়ত কুড়িটি গদ্য ও কুড়িটি পদ্য পাঠ আছে, তাহার মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম এইরূপ বাছাই করিয়া এক শ্রেণীতে আটটি গদ্য ও আটটি পদ্য পাঠ পড়ান হইল, অবশিষ্ট চব্বিশটি পাঠ বাদ দেওয়া হইল বা সময়ের অভাবে বাদ পড়িল। এক-একখানি বহি পর পর দুই শ্রেণীতে সম্পূর্ণরূপে পড়াইলে ছাত্রগণের উপকার কি অপকার হয় তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

এইসকল দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, স্কুলকর্ত্তৃপক্ষগণ পুস্তক-নির্ব্বাচনকালে সেগুলি আদৌ পড়িয়া দেখেন না। কেবলমাত্র গ্রন্থকারের বা প্রকাশকের অনুরোধ উপরোধে পাঠ্য-নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

বিলাতী শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়; কাগজ, ছাপা, ছবি, বাঁধা, সবই সুন্দর। আমাদের দেশের পাঠ্য পুস্তকগুলির কাগজ নিকৃষ্ট, ভাঙ্গা টাইপে ছাপা সমস্ত অক্ষরগুলির ছাপ উঠে না, ছবি অস্পষ্ট, প্রায় সকল বইগুলিই এমন ভাবে সেলাই করা যে খুলিয়া রাখা যায় না, এবং শিশুদের হস্তে দুইচারিদিনেই পাতাগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যেগুলি খুলিয়া রাখা যায় (যথা পাটীগণিত) তাহাদেরও সেলাই এত মন্দ ও মলাটের সহিত যোগ এত সামান্য যে, একবার হাত হইতে পড়িয়া গেলেই পাতাগুলি একস্থানে ও মলাট অন্যত্র গমন করে। মূল্য কিন্তু বিলাতী বইএর তুলনায় বেশী ভিন্ন কম নহে। অবশ্য উত্তরে বলা যাইতে পারে, এসকল বহি এক বৎসর চলিলেই হইল; কিন্তু এক বৎসরই ভালভাবে চলিলে ক্ষতি কি আছে?

এইরূপ ত পাঠ্য-নিরূপণ, এখন পঠন-সম্বন্ধে আরও দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। আজকাল স্কুলগুলি কলেজে পরিণত হইয়াছে। স্কুলেও লেক্‌চার দেওয়া হয় ও পড়া "ধরা" হয় মাত্র; নূতন পাঠ বুঝাইয়া দেওয়া, শব্দার্থ বলিয়া দেওয়া উঠিয়া গিয়াছে, সে-সকল কার্য্য পিতামাতা বা অভিভাবকের কর্ত্তব্য ধার্য্য হইয়াছে। অধিকাংশ পিতামাতা ও অভিভাবকই নানা কারণে পুত্রকন্যাকে নিজে পড়াইতে পারেন না। সুতরাং অসাধ্য হইলেও পুত্রকন্যার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হয়। তাই আজকাল গৃহ-শিক্ষক বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ পড়াইতেছেন ইহাও দেখিয়াছি, অথচ সে-শিশু স্কুলের ছাত্র!

মৃত্যু-দূত

সেল্‌মা লাগর্‌লফ্‌

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-সম্ভাষণ

মৃত্যু-শয্যায় শায়িত সিস্‌টার ঈডিথ্‌ সভয়ে অনুভব করিল ধীরে ধীরে তাহার জীবন নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। তাহার শারীরিক কোন যন্ত্রণা ছিল না বটে, কিন্তু মৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে প্রবল চেষ্টা করিতেছিল; রোগীর সেবায় রাত্রি জাগিতে গিয়া ঘুমের সহিত সে ঠিক এমনই যুদ্ধ করিত।

ঘুম দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিত—তোমার প্রলোভন খুব মধুর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি লোভ কাটাইয়া উঠিব। ক্বচিৎ কখনো দু' এক মিনিটের জন্য সে ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, কিন্তু চিন্তাভারাক্রান্ত মনে অবিলম্বে জাগিয়া উঠিয়া আপনার কর্ত্তব্যে মন দিয়াছে:

আজ মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া সে কতরকমের কল্পনা করিতে লাগিল। খুব ঠাণ্ডা একটা ঘর, তাহাতে একটি চওড়া পুরু বিছানা পাতা, পালকের মত নরম বালিশ, তুষার-শীতল বিশুদ্ধ হাওয়া অবাধে ঘরে প্রবেশ করিতেছে—নিশ্বাস লইতে তাহার আর কোনো কষ্ট নাই; অপরিসীম আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। এই ঘরে এই লোভনীয় শয্যায় শুইয়া প্রগাঢ় ঘুমে মগ্ন হইয়া দেহের ক্লান্তি দূর করিতে সে ব্যাকুল, কিন্তু তাহার ভয় হইতেছে পাছে তাহার এই সুখনিদ্রা না ভাঙ্গে। তাই আজিও সে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তি ভোগ করিবার সময় এখনো তাহার আসে নাই।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া ঈডিথ্‌ ক্ষুব্ধ হইল; তাহার মুখে ব্যর্থ অনুযোগের ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহাকে অধিকতর উগ্র দেখাইতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি যেন বলিতে লাগিল,—তোমরা কি নিষ্ঠুর! আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা পূর্ণ করিবার কোন চেষ্টাই তোমরা করিতেছ না। আমি যখন সুস্থ ছিলাম তখন বহুবার অসময়ে তোমাদের কাজে বাহির হইয়াছি; আমি যাহাকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চাই তাহাকে তোমরা এখনো আনিতে পারিলে না।

সে নিমীলিত-নেত্রে কিসের যেন প্রতীক্ষায় জাগিয়া ছিল; এমনি নিবিষ্টচিত্তে কান পাতিয়া ছিল যে, ঘরের ভিতরকার সামান্য শব্দও সে স্পষ্ট শুনিতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল পাশের ঘরে কোনো আগন্তুক প্রবেশ করিয়াছে ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। চকিতে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতরভাবে তাহার মায়ের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "ও যে রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মা, ওকে এখানে নিয়ে এসোনা।"

মা উঠিয়া মাঝের দরজা খুলিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চাহিলেন। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ওঘরে ত কেউ আসেনি মা, শুধু সিস্‌টার্‌ মেরী আর গুস্তাভ্‌সন্‌ ওখানে ব'সে আছে।"

রোগিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু, তাহার তখনও মনে হইতেছিল যেন ঠিক দরজার পাশে বসিয়া কে অপেক্ষা করিতেছে। যদি তাহার জামা-কাপড়গুলি বিছানার কাছাকাছি তাহার নাগালের মধ্যে থাকিত তাহা হইলে সে নিজে গিয়া তাহার সহিত কথা বলিত। মাকে কিছু বলিতে তাহার ভরসা হইতেছিল না; তিনি কিছুতেই তাহাকে উঠিতে দিবেন না।

অসহায় অবস্থায় শুইয়া-শুইয়া সে বাহিরের ঘরে যাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল; অন্ততঃ সে একবার ঘরখানি দেখিয়া আসিবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস

হইল যে, সে ওই ঘরে আসিয়াছে; সম্ভবত আগন্তুক ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই বলিয়া তাহাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে মা আপত্তি করিতেছেন। হয়ত মা ভাবিতেছেন, উহার সহিত দেখা হওয়ায় কিছু ফল হইবে না; মৃত্যুকালে তাহার সহিত দেখা হওয়া না-হওয়ায় আমার কিছু যাইবে আসিবে না।

অনেক ভাবিয়া সে একটা চমৎকার উপায় স্থির করিল। "মাকে বল্‌ব, আমাকে ওই বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে, মরার আগে ঘরটি আর-একবার দেখ্‌তে চাইব, মা তাহ'লে আর আপত্তি কর্‌তে পার্‌বে না।"

সে মাকে তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া ভাবিতে লাগিল, মা তাহার চালাকি বুঝিতে পারিলেন কি না। সে ঘর পরিবর্তন করিতে চায় বটে, কিন্তু হাঙ্গাম কম নয়।

মা বলিলেন, "এখানে কি খুব কষ্ট হচ্ছে, ঈডিথ্‌? অন্য দিন ত তুমি এখানে থাক্‌তেই ভালবাস্‌তে মা।"

পীড়িত সন্তানের খেয়াল পরিতৃপ্ত করাটা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। ঈডিথ্‌ মনে করিল, মা তাহাকে শিশু মনে করিয়া অবহেলা করিতেছেন। সেও শিশুর মত আব্দার করিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহিল।

সে বলিল, "মা, বড় ঘরে যেতে আমার বড্ড ইচ্ছে কর্‌ছে। সিস্‌টার্‌ মেরী আর গুস্তাভ্‌সন্‌ আমায় ব'য়ে নিয়ে যেতে পার্‌বে। তুমি তাদের ডাকনা। আমি বেশীক্ষণ ওখানে থাক্‌ব না।"

মা বলিলেন, "তুমি ও ঘরে গেলেই আবার এখানে আস্‌বার জন্যে ছট্‌ফট কর্‌বে," তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে উপবিষ্ট গুস্তাভ্‌সন্‌ ও সিস্‌টার্‌ মেরীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

সিস্‌টার্‌ ঈডিথ্‌-শৈশবাস্থায় যে ছোট্ট চৌকীখানিতে শুইত আজ তাহাতেই শায়িত ছিল বলিয়া সিস্‌টার মেরী গুস্তাভ্‌সন্‌ ও তাহার মা অনায়াসে তাহাকে তুলিতে পারিলেন। বড় ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে রান্নাঘরের দরজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সেখানে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিল, সে ঠিক দেখিতেছে কি না। হতাশায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। আশৈশব পরিচিত মধুর স্মৃতিরঞ্জিত ঘরখানির দিকে একবারও না চাহিয়া সে চক্ষু মুদিল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার বোধ হইল যেন দরজার পাশে কেহ দাঁড়াইয়া আছে।

সে ভাবিল, "না, অসম্ভব, আমার ভুল হয়নি। ওখানটায় নিশ্চয় কেউ আছে—সে কিম্বা আর কেউ।"

সে ক্ষুধিত দৃষ্টি লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘরটি পরীক্ষা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার বোধ হইল যেন দরজার পাশে কি একটা দাঁড়াইয়া আছে; ছায়ার মতনও পরিস্ফুট নয়, এ যেন উপচ্ছায়া।

মা অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার উপর ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে এসে একটু আরাম পাচ্ছ ঈডিথ্‌?"

ঈডিথ্‌ মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার কানে কানে বলিল, সে অত্যন্ত খুসী হইয়াছে। ঘরখানিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া সে রান্নাঘরের দরজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, দরজার পাশে সে কিসের ছায়া দেখিল; অথচ এটা বাহির করিতেই হইবে—এ যে প্রায় তাহার জীবনমরণের সমস্যা। সে ভাবিতে লাগিল।

তিনজনে ধরাধরি করিয়া চৌকীখানি ঘরের অপর প্রান্তে বসিবার ঘরে রাখিলেন। সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তিটি যেখানে দণ্ডায়মান ছিল চৌকিটি তাহার দূরতম স্থানে রক্ষিত হইল। ঈডিথ্‌ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ঈডিথ্‌ অস্ফুটস্বরে মায়ের কানে কানে বলিল, "এখানটা দেখা হয়েছে মা; এবার আমায় ও-ধারটায় নিয়ে চল না।"

ঈডিথ্‌ লক্ষ্য করিল, মাতা ব্যথিত দৃষ্টি লইয়া অন্য দুইজনের মুখের পানে চাহিলেন; তাঁহারাও বিষণ্ণ হইলেন। ঈডিথ্‌ ভাবিল চৌকাঠের পার্শ্বস্থিত ছায়ামূর্ত্তির নিকটে তাহাকে লইয়া যাইতে ইঁহারা ইতস্ততঃ করিতেছেন। সে মূর্ত্তিটি কাহার সে-বিষয়ে ক্রমশঃ তাহার ধারণা স্পষ্টতর হইতেছিল; কিন্তু তাহার মনে

কোনো ভয় জাগিল না; সে ত তাহারই সঙ্গে মুখামুখি বোঝাপড়া করিতে চায়।

সে আবার কাতর ভাবে মা ও বন্ধুদের দিকে চাহিল। বাধা দিতে তাঁহাদের মন সরিল না।

ঘরের ঠিক মাঝখানে আসিয়া ঈডিথ একটি অন্ধকার আকৃতির অস্পষ্ট আভাস পাইল; তাহার হস্তস্থিত কাস্তেখানিও তাহার লক্ষ্য এড়াইল না। ডেভিড্ হল্‌ম্ সে নয়। সে কে এতক্ষণে সে তাহা বুঝিল এবং তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য মনস্থির করিল।

তাহাকে আরো কাছে যাইতে হইবে; তাহার মুখে কাঙালের মত বেদনা-কাতর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ইঙ্গিতে তাহাকে রান্নাঘরের অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে বলিল। তাহার এই অস্থির-চিত্ততা দেখিয়া তাহার মা এত ব্যথিত হইলেন যে, তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। ঈডিথ একটু ম্লান হাসি হাসিল। তাহার মনে হইল মা তাহার শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছেন। সে তখন নিতান্ত ছোট; রান্নাঘরে মা রান্না করিতেন; সে ষ্টোভের সম্মুখে শান্তভাবে বসিয়া থাকিত; আগুনের আঁচে তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিত। বালিকা বসিয়া বসিয়া স্কুলে এবং বাহিরে নূতন জ্ঞানলব্ধ বিষয়গুলির কথা অনর্গল বকিয়া যাইত। আজ মা তাহার সেই শিশু-সন্তানকে যেন কোলে পাইয়াছেন কিন্তু মৃত্যুর নিদারুণ শূন্যতা তাঁহার মনে হাহাকার তুলিতেছে।

মায়ের দুঃখে ঈডিথ্ দুঃখিত, কিন্তু মা'র কথা বেশী ভাবিবার সময় নাই। জীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র, হয়ত মুহূর্ত্ত কয়েক আর অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যেই তাহার জীবনের আরব্ধ কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিতে হইবে—অন্যদিকে মন দিবার তাহার অবসর কোথায়?

রান্নাঘরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্ত্তিকে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লোকটির দেহ সুকৃষ্ণ আচ্ছাদনাবৃত, মস্তক ও মুখ টুপি দিয়া ঢাকা; হাতে একখানি কাস্তে। সিস্টার্ ঈডিথ্ নিঃসংশয়ে বুঝিল সে কে।

সে মনে মনে বলিল, "তাই ত, এ যে দেখ্‌ছি মৃত্যু-দূত।" দূত একটু তাড়াতাড়ি আসিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইলেও সে দমিল না।

ঈডিথ্‌কে নিকটে আনীত হইতে দেখিয়া মৃত্তিকাশায়িত হস্তপদবদ্ধ মূর্ত্তিটি আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিল, রোগিনীর দৃষ্টি হইতে সে আত্মরক্ষা করিতে চায়। সে সভয়ে দেখিল, মেয়েটি ঘন ঘন দরজার দিকে চাহিতেছে এবং যেন সে কিছু দেখিয়াছে। ঈডিথ্ তাহাকে দেখিতে পাইলে তাহার চরম অবমাননা হইবে। কিন্তু হল্‌মের সৌভাগ্যবশতঃ ঈডিথের দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল না, সে মাত্র জর্জ্জের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হল্‌ম্ দেখিল, মেয়েটি তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া ইসারা করিয়া জর্জ্জকে ডাকিল। জর্জ্জ তাহার মুখাবরণ আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া জড় প্রস্তর-মূর্ত্তির মত তাহার কাছে গেল, তাহার মুখে বিন্দুমাত্র কোনো ভাবের ছায়া ছিল না। ঈডিথ্ মৃদু হাসিয়া তাহাকে অস্ফুট ভাষায় অভিবাদন করিল। তাহার শয্যাপার্শ্বস্থিত জীবিতদের মধ্যে কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইল না। সে বলিল, "দেখ, তোমাকে আমার একটুও ভয় হচ্ছে না। আমি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে যাব কিন্তু আজ না। আমাকে আরও একদিন সময় দাও। ভগবান যে কাজের জন্যে আমায় সংসারে পাঠিয়েছিলেন তার আরো খানিকটা বাকী আছে; আমাকে সেটা শেষ কর্‌তে দাও।"

ডেভিড্ হল্‌ম্ সন্তর্পণে মাথা তুলিয়া তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করিল; দেখিল, তাহার অন্তরের শুচিশুভ্রতা তাহার ধ্বংসোম্মুখ দেহকেও একটা অপূর্ব্ব অপার্থিব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তাহাকে মহিয়সী করিয়া তুলিয়াছে। সেই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের পায়ে মাথা আপনি অবনত হয়; ডেভিডের কাছে তাহা এমনই লোভনীয় মনে হইল যে, সে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

ঈডিথ্ জর্জ্জকে বলিল, "তুমি বোধ হয় আমার কথা শুন্‌তে পাচ্ছ না, আর-একটু কাছে স'রে এস; অন্যের অগোচরে আমি তোমাকে দুচারটে কথা মাত্র বল্‌ব।"

জর্জ্জ নত হইয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল,

তাহার মস্তকাবরণ প্রায় ঈডিথের মুখস্পর্শ করিল। সে বলিল, "তুমি যত আস্তেই কথা বল আমি শুনতে পা'ব।"

ঈডিথ এমন অস্ফুট নিম্নস্বরে কথা বলিতে লাগিল যে, মা, সিস্টার মেরী কিম্বা গুস্তাভসন্ কেহই তাহার ঠোঁটের কাঁপুনী পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না। কেবলমাত্র জর্জ্জ ও ডেভিড্ হ্লম্ তাহার কথা শুনিতে লাগিল।

সে বলিল, "আমি জানি না, তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছ কি না। কিন্তু আমার একান্ত প্রার্থনা, আমাকে আর একদিন সময় দিতে হবে। আমার বড্ড দরকার। মৃত্যুর পূর্ব্বে একজনের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে—তাকে বোঝাতে হবে। তুমি জান না আমি কি অন্যায় করেছি। আমার নিজের বুদ্ধি আর কল্পনায় বিশ্বাস ক'রে কি ভুলটাই না করেছি তুমি যদি জান্তে! এই অন্যায়ের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি ভগবানের দরবারে গিয়ে দাঁড়াব কোন্‌মুখে!"

সেই চরমদিনের বিচারভয়ে তাহার চক্ষু আয়ত হইল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস লইয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে বলিতে লাগিল—

"গোড়াতেই আমার বলা উচিত যে, যার কথা বল্‌ছি তাকে আমি ভালবাসি। তুমি কি বুঝতে পারছ? আমি তাকে ভালবাসি।"

মৃত্যুযানের চালক উত্তর দিল, "কিন্তু সিস্টার্—লোকটা—"

সিস্টার ঈডিথ্ তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া বলিতে লাগিল—

"একথা যখন বল্‌ছি তখন বুঝ্‌তে পারছ আমার তাকে প্রয়োজন কতখানি। আমি যে ওই লোকটিকে ভাল-বাসি এটা স্বীকার করা আমার পক্ষে সহজ নয়। আমি এই ভেবে বিশেষ লজ্জিত যে, আমি এত নীচমনা হ'য়ে পড়েছি যে অন্যের বিবাহিত স্বামীকে ভালবেসেছি। এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে আমি অনেক যুদ্ধ করেছি কিন্তু জয়লাভ করিনি। আমি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করেছি যে, আমি এত হীন যে পতিতাদের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক না হ'য়ে আমি তাদেরই মত পতিত হয়েছি।"

মৃত্যুদূত এক হাত দিয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার ললাট স্পর্শ করিল এবং কোনো কথা না বলিয়া মেয়েটির ব্যথিত ইতিহাস শুনিতে লাগিল।

"একজন বিবাহিত পুরুষকে ভালবাসাটাই আমার চরম গ্লানি নয়, আমার সব-চাইতে দুঃখ এই যে, আমি ভালবেসেছি একজন দুর্ব্বৃত্তকে। আমি জানি না কেমন ক'রে তাকে আত্মসমর্পণ করলাম। হয়ত ভেবেছিলাম ওর মধ্যেও কিছু সদ্‌গুণ চাপা প'ড়ে আছে। কিন্তু আমি বার বার প্রতারিত হয়েছি। আমি নিজে নিশ্চয় পাপী, নইলে এতটা বিপথে যাব কেন! হায়-হায়, তুমি কি বুঝ্‌তে পারছ না, আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে মরতে চাই। নইলে আমি শান্তি পাব না। মরার আগে আমি তার একটু পরিবর্ত্তন দেখে যেতে চাই।"

জর্জ্জ্ সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "কিন্তু, তুমি কি যথেষ্ট চেষ্টা করনি?"

সিস্টার ঈডিথ্ চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে লাগিল। ক্ষণ-পরেই সে চক্ষু মেলিয়া জর্জ্জের দিকে চাহিল। কি যেন নূতন আশায় তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"তুমি হয়ত ভাব্‌ছ, আমি নিজের জন্য এত সব বল্‌ছি বা দুঃখ করছি। অন্য সবারই মত তুমিও হয়ত ভাবছ যে, তার ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে আমি তার ভালোমন্দের কথা ভাব্‌ছি না। না, আমি তারই কথা খালি ভাব্‌ছি! খানিকক্ষণ পরেই পৃথিবীর সকল মায়ার বাঁধন কেটে আমি চ'লে যাব; আমার নিজের জন্যে আর বিশেষ কিছু প্রয়োজন নেই। আজকে একটা ঘটনার কথা তোমায় বল্‌ছি—তাতে ক'রে বুঝ্‌তে পারবে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এত ব্যাকুল কেন।"

সিস্টার্ ঈডিথ আবার চোখ বুজিল এবং সেই অবস্থাতেই বলিতে লাগিল,—

"আজকের বিকেলের ঘটনা। আমি স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারব না ঘটনাটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল। এটা স্বপ্ন কি সত্য এখনো আমি ঠাহর করতে পারছি না। আজ বিকেলে আমি হাতে একটা টুক্‌রী নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম, সম্ভবতঃ কোনো গরীব লোকের জন্যে খাবার নিয়ে চলেছিলাম। একটা বাড়ীর উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম—সে বাড়ীতে আর কখনো গেছি ব'লে মনে হয়

না। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। আশেপাশে মস্ত মস্ত উঁচু বাড়ী এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর যে বেশ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী ব'লেই মনে হ'ল। আমি অবাক্ হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম যে, খাবার নিয়ে সেই সমৃদ্ধপল্লীতে আমি এলাম কেন। হঠাৎ দেখ্‌লাম একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর দেওয়াল ঘেঁসে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। সম্ভবতঃ মুরগী রাখার ঘর হিসেবে সেটা তৈরী হয়েছিল; কিন্তু সম্প্রতি সেটাতে যে মানুষ বসবাস কর্‌ছে তা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লাম, দেয়ালে কাগজের আর কাঠের টুক্‌রো পেরেক দিয়ে ঠোকা; গোটা দু'তিন ছোট্ট জান্‌লা। ছাদে লোহার পাতের দুটো চিম্‌নী; তার একটা দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছিল; ঘরে নিশ্চয়ই লোক আছে। সম্ভবতঃ ওইটাই আমার গন্তব্য স্থান। একটা খাড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে একটা পায়রার খোপের মত ঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে দরজায় ডাকাডাকি না ক'রে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

"ঘরের মাঝখানে তিনটি স্ত্রীলোক গভীরভাবে কি যেন আলোচনা কর্‌ছিল—আমাকে কেউ লক্ষ্য কর্‌লে না। আমি তাদের নজরে পড়্‌বার অপেক্ষায় একপাশে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম। আমার মনে হ'ল কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনে আমি সেখানে গেছি। ঘরখানার দুরবস্থা দেখে মনে হ'ল যেন কোনো খামার-বাড়ী। মানুষের বাসস্থান এমন বিশ্রী হ'তে পারে না। আস্‌বাব পত্রের বিশেষ কোনো বালাই ছিল না—একখানি চৌকীও না। এককোণে শতচ্ছিন্ন একটা তোষক পাতা ছিল; শোবার বিছানা হ'তে পারে। চেয়ার একটাও ছিল না, একটা সস্তা দেবদারু কাঠের ভাঙা টেবিল এককোণে প'ড়ে ছিল।

"তিনজনের একজনকে হঠাৎ চিন্‌তে পার্‌লাম, সে ডেভিডের স্ত্রী। বুঝ্‌লাম কোথায় এসেছি। আমি যখন হাঁসপাতালে ছিলাম তখন ওরা নিশ্চয়ই বাসা বদ্‌লেছে। কিন্তু ওদের অবস্থা এমন খারাপ হ'ল কি ক'রে কিছুতেই সেটা ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না। আস্‌বাবপত্র সব গেল কোথায়? সুন্দর সুন্দর ফুলের টবগুলি নেই। সেলাই-য়ের কলটিই বা গেল কোথায়? আরো সমস্ত জিনিষ যা ডেভিডের বাড়ীতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ছিল তার একটাও সেখানে ছিল না।

"ডেভিডের স্ত্রীকে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লাম—যেন হতাশার প্রতিমূর্ত্তি; লজ্জানিবারণ কর্‌বার মতন বস্ত্রও তার ছিল না। গত বছর শীতের সময় তাকে যেমন দেখেছি এখন তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকে ধ'রে তার খবর জান্‌বার জন্যে আকুল আগ্রহ হ'ল, কিন্তু দুটি অপরিচিত সম্ভ্রান্ত মহিলা তার সঙ্গে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি আলোচনা কর্‌ছেন দেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম; গুরুতর কিছু যেন ঘটেছে মনে হ'ল। ব্যাপারটা অবিলম্বে বুঝে নিলাম; ডেভিডের ছেলে দুটিকে কোনো অনাথ আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে; বাপের যক্ষ্মার ছোঁয়াচ থেকে তাদিকে বাঁচাতে হবে।

"আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না দুটি ছেলের কথা হচ্ছে কেন। আমি জান্‌তাম, ডেভিডের তিন ছেলে। অল্পপরেই কারণ বোঝা গেল। ডেভিডের স্ত্রীকে কাঁদ্‌তে দেখে দয়ালু মহিলাদের একজন অত্যন্ত সহানুভূতি দেখিয়ে বল্‌লেন যে, আশ্রমে তার ছেলেদের প্রায় বাড়ীর মতনই যত্ন হবে। ডেভিডের স্ত্রী বল্‌লে, 'ডাক্তার, আমি তা জানি। আমার এই দুর্ব্বলতা ক্ষমা করুন। ছেলেদের অন্য কোথাও না পাঠালে আমাকে এর চাইতে বেশী কাঁদ্‌তে হবে। আমার কোলের ছেলেটিকে এরই মধ্যে হাঁসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। তার কষ্ট যখন দেখি তখন মনে হয় এদুটিকে যদি কেউ দয়া ক'রে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান আমি সুখী হব এবং তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।'

"ডেভিডের স্ত্রীর কথা শুনে অনুতাপে আমার মন ভ'রে গেল। ডেভিড হল্‌ম্ তার স্ত্রীর ও ছেলেদের কি সর্ব্বনাশটাই না করেছে। আর এর জন্যে আসলে দায়ী আমি। আমিইত পরামর্শ দিয়ে ওকে স্বামীর সঙ্গে বাস কর্‌তে বাধ্য করেছি। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, ঘরের আর তিনজন আমাকে লক্ষ্য কর্‌লে না।

"ডেভিডের স্ত্রী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে

বল্‌লে, আমি রাস্তায় গিয়ে ছেলেদের ডেকে আন্‌ছি। তারা কাছাকাছি কোথাও খেলা করছে। আমার গা ঘেঁসে সে চ'লে গেল; তার ছেঁড়া জামা আর শরীর ছুঁয়ে গেল। আমি হঠাৎ বিহ্বলভাবে হাঁটু গেড়ে ব'সে তার জামার কোণে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌লাম—কথা বল্‌বার শক্তি আমার ছিল না। এই মেয়েটির উপর যে অন্যায় আমি করেছি এই সামান্য অনুতাপে তার প্রতীকার হয় না। সে যেন আমাকে লক্ষ্য করে নি এই ভাব দেখিয়ে চ'লে গেল। প্রথমটা ভারী অবাক্‌ হ'লাম। পরে মনে হ'ল, সে আমাকে ক্ষমা করেনি। যে তার জীবনকে এমনভাবে নষ্ট করেছে তার সঙ্গে কথা না বলাটা তার বিশেষ অন্যায় হয়নি।

"হতভাগিনী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই মহিলাদের একজন তাকে ডেকে বল্‌লেন, যে, ছেলেদের ডাক্‌বার আগে আর-একটা ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে হবে। তিনি হাত-বাক্স থেকে একটা কাগজ বের ক'রে প'ড়ে শোনালেন। সেটা একটা ছাপা অনুমতি পত্র, তাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল যে, যতদিন তাদের বাড়ীতে যক্ষ্মার ছোঁয়াচ থাকবে ততদিন এই ছেলেদের বাপ মা তাদিকে আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষের হাতে সঁপে দিচ্ছেন। এই কাগজে ছেলেদের বাবা ও মা দুজনেরই সই চাই।

"ঘরটির অন্যদিকে আর-একটা দরজা ছিল—সেদিক দিয়ে ডেভিড্‌ ঘরে ঢুক্‌ল। মনে হ'ল যেন সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুক্‌বার সুযোগ খুঁজছিল। তার গায়ে সেই শতচ্ছিন্ন জামা—চোখে সেই শয়তানী দৃষ্টি। তাকে দেখে মনে হ'ল যেন সমস্ত ঘটনাটি সে বেশ উপভোগ করছে—যেন এই দুঃখ-যন্ত্রণার দৃশ্যে সে খুসী হয়েছে। সে যে তার ছেলেদের কত ভালবাসে, একজনকেই হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে যা কষ্ট হচ্ছে অন্য দুজনকে সে কিছুতেই ছাড়তে পার্‌বে না—ইত্যাদি কত কি ব'লে যেতে লাগল।

"ভদ্রমহিলা দু'জন তার কথা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে না শুনে শুধু এই মাত্র বল্‌লেন যে, ছেলেদের দূরে না পাঠালে তাদিকে বাঁচিয়ে রাখা দুষ্কর হ'বে। ডেভিডের স্ত্রী ঘরের দেওয়াল ঘেঁসে পাথরের মতন নিশ্চল হ'য়ে তার স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল, শিকার যেমন আর্ত্ত-ব্যথিত দৃষ্টি নিয়ে শিকারীর দিকে চায়। স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লাম যে, যতটা অন্যায় করেছি ব'লে ভাব্‌ছিলাম তার চাইতে ঢের বেশী অন্যায় করেছি। যেন স্ত্রীর ওপর ডেভিডের একটা গভীর ঘৃণা আছে। সে আমার কথায় সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করবার আশায় তার স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করতে চায়নি; শুধু স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করবার সুবিধা পাবার জন্যেই আবার সংসার করছে।

"পিতার স্নেহ সম্বন্ধে সে ভদ্রমহিলাদের মস্ত একটা বক্তৃতা দিলে। তাঁরা বল্‌লেন যে, ডাক্তারের পরামর্শ মত চ'লে সে পিতৃস্নেহের পরিচয় দিক। ছেলেদের কাছে রেখে ব্যারাম ধরিয়ে দেওয়াটা পিতৃস্নেহ নয়। তারা বাড়ীতে থাকলে তাদের ছোঁয়াচ লাগবেই। ডেভিডের মনের ক্রূর অভিসন্ধি ওঁরা টের না পেলেও আমি তা স্পষ্ট অনুভব করলাম, ছেলেদের মঙ্গলে তার কিছু যায় আসে না, আসলে সে তাদের কাছে রেখে কষ্ট দিতে চায়।

"স্বামীর এই দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে স্ত্রী উন্মত্তের মত ভয়ানক আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, 'ও খুনে, আমাকে ও ছেলেদের একেবারে মেরে না ফেলে ও ছাড়বে না। এমনি ক'রেই আমার ওপর ও শোধ নিচ্ছে।'

"ডেভিড্‌ হলম্‌ বিষম বিরক্তিতে তার দিক হ'তে চোখ ফিরিয়ে বল্‌লে, 'মোট কথা ও কাগজে আমি সই করছি না।' মহিলা দু'জন রাগ ক'রে অনুরোধ ক'রে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। ডেভিডের স্ত্রী তাকে উত্তেজিত হ'য়ে গালাগালি দিতে লাগল। ডেভিডের মন গল্‌ল না। সে শান্ত নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বল্‌লে, ছেলেদের না হ'লে তার চল্‌বে না। সব শুনে যন্ত্রণায় আমি অধীর হ'য়ে উঠলাম। মহিলা দু'জন রাগে লাল হ'য়ে উঠলেন, ডেভিডের স্ত্রী অকথ্য ভাষায় তাকে গাল দিতে লাগল; আমি দুঃখে অভিভূত হ'য়ে কাঁদতে লাগলাম। ওরা ত কেউ ওকে ভালবাসে না, আমি ভালবাসি ব'লেই ব্যথা পেলাম। ঘরের কোণ থেকে ছুটে গিয়ে তাকে অনুরোধ করবার ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু আমি নড়তে পার্‌লাম না। কে যেন আমাকে ঐ জায়গায়

জোর ক'রে ধ'রে রেখেছে এরকম একটা অদ্ভুত ভাব আমার মনে এল। পরে ভাবলাম "কি হবে এর সঙ্গে তর্ক ক'রে, ওকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রে—ওকে পথে আনার একমাত্র উপায় ওকে ভয় দেখানো। ওর স্ত্রী কিম্বা আর দুজনে কেউ ওকে ভগবানের দোহাই পারেনি, তার ক্রোধ যে এই পাপের জন্যে তাকে দগ্ধে মারবে সে কথাও কেউ বল্‌লে না। আমার মনে হ'ল ঈশ্বরের বজ্র আমার হাতে, কিন্তু আমি তা প্রয়োগ করতে অক্ষম।

"ঘরের মধ্যে সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। মহিলা দু'জন যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লেন। তাঁদের কিম্বা ডেভিডের স্ত্রীর চেষ্টায় কোনো ফল হ'ল না। ডেভিডের স্ত্রী নির্ব্বাক্‌ভাবে গভীর হতাশায় দাঁড়িয়ে রইল। আমি কথা বল্‌বার জন্যে প্রবল চেষ্টা করলাম—মনের কথাগুলো যেন জিবকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি বল্‌তে চাইলাম, 'শয়তান, তুমি কি মনে কর তোমার মনের কথা আমরা কেউ বুঝিনি? আমি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে ঈশ্বরের বিচার-সিংহাসনের তলায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে ডাকছি। সেই পরম বিচার-কর্ত্তার কাছে আমি তোমাকে অভিযুক্ত করছি। তোমার সন্তানদের হত্যাকরার চেষ্টা করার জন্যে তোমার বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দেব।'

"আমি যখন এই কথা বল্‌বার জন্য ব্যগ্র হয়েছি অমনি দেখি আমি ডেভিডের ঘরে দাঁড়িয়ে নেই, আমার মায়ের ঘরে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। তখন থেকে আমি ডেভিডকে কতবার ডেকে পাঠালাম, কিন্তু সে এখানে এল না।"

সিস্টার ঈডিথ্ যতক্ষণ এই গল্প বলিতেছিল ততক্ষণ তাহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল। এখন সে আয়ত চোখ মেলিয়া গভীর বেদনার সহিত জর্জ্জের দিকে চাহিল।

(ক্রমশঃ)

রূপ ও আলাপ

শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটিকা—চৌতাল

প্রথম সুমরশ্রীগণেশ গৌরী-সুত প্রিয় মহেশ
সকল বিঘন ভয় কলেশ দূরমে নিবারে।
লম্বোদর ভুজ বিশাল কর ত্রিশূল চন্দ্র ভাল,
শোহত গল পুষ্পমাল রক্ত-বসন ধারে।
ঋদ্ধি সিদ্ধি দোউ নার চ র করত বার বার
মুষক-বাহন সবার ভক্তন হিত কারে।
পুরণ গুণ গণ নিধান, সুর মুনি যশ করত গান,
ব্রহ্মানন্দ চরণ ধ্যান, সকল কাজ সারে।

ব্রহ্মানন্দ।

আস্থায়ী।

০ ৩ ৪ ॥ ১´ ০ ২ ০ ৩
পা ণা । পা র্সা । ণা পা । স্পা -া । মা জ্ঞা । সা সা । ণা সা । জ্ঞা মা ।
প্র থ ম সু ম র শ্রী ০ গ ণে শ গৌ ০ রী ০

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা পা । মা জ্ঞা । পা মা । জ্ঞা সা । ণ্‌া সা । ণ্‌া প্‌া । ণ্‌া সা ।
সু ত প্রি য় ম হে ০ শ স ক ল বি ঘ ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ০ ৩ ৪
সা স । জ্ঞা সা । জ্ঞা মা । পা -া । পা ণা । পা ণা
ভ য় ক ন্সে ০ শ দূ ০ র মে ০ নি
১´ ০ ২
পা মা । পা জ্ঞা । মা মা ॥
বা ০ ০ ০ ০ রে

অন্তরা।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা -া । পা -া । মগা মা । পা ণা । পা মা । সা সা । ণা সা ।
ল ০ ম্বো ০ দ ০ র ভু জ বি শা ০ ল ক র
০ ২ ০ ৪ ১´ ০
র্জ্ঞা র্সা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -া । র্সা ণা । পা পা } }। পা -া । পা পা ।
ত্রি শ ০ ল চ ০ ন্দ্র ভা ০ ল শো ০ হ ত
২ ০ ৩ ৪ ১ ০ ২
মা জ্ঞা । পা -া । পা মা । জ্ঞা সা । ণ্‌া সা । জ্ঞা ম । পা পা ।
গ লে পু ০ ষ্প মা ০ ল র ০ ক্ত ব স ন
০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
ণা ণা । পা পা । র্ঝা র্সা । ণা পা । মা পা । জ্ঞা মা ॥
ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে

সঞ্চারী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
পা া । পা মা । জ্ঞ মা । পা পা । া পা । া পা । পা ণা । পা সা
ঋ ০ দ্ধি সি ০ দ্ধি দো উ ০ না ০ র্‌ চ ম র ক
২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
র্সা র্সা । ণা পা । পা ণা । পা পা । পা -া । পা পা । জ্ঞা -া ।
র ত বা ০ র বা ০ র মূ ০ ষ ক বা ০
০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
পা মা । পা মা । জ্ঞা সা । ণ্‌া সা । জ্ঞা মা । পা পা । মা জ্ঞা । পা মা
হ ন স বা র ভ ০ ক্ত ন হি ত কা ০ ০ ০
৪
জ্ঞা সা ॥
০ রে

আভোগ।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
পা -া । পা মা । গা মা । পা ণা । পা ণা । র্সা র্সা । ণা র্সা । র্জ্ঞা র্মা
পুঁ ০ র ণ গু ণ গ ণ নি ধা ০ ন স্থ র মু নি
২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
র্পা র্পা । র্মা র্জ্ঞা । র্মা র্জ্ঞা । র্সা র্সা}। সা -া । র্সা র্জ্ঞা । র্সা র্সা ।
য শ ক র ত গা ০ ন ব্র ০ হ্মা ন ০ ন্দ
০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
সা র্সা । র্সা ণা । পা পা । মা পা । জ্ঞা মা । পা পা । ণা পা ।
চ র ণ ধ্যা ০ ন স ক ল কা ০ জ সা ০
৩ ৪ ১´ ০ ২
ণা র্সা । র্জ্ঞা র্সা । ণা র্সা । ণা পা । জ্ঞা মা ॥
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে

গুর্জ্জরী—ধ্যান

শ্যামা সুকেশী মলয়দ্রুমাণাং
মৃদুল্লসৎ পল্লবতল্পমধ্যে
শ্রুতিস্বরাণাং দধতী বিভাগং
তন্ত্রিমুখা দক্ষিণ গুর্জ্জরীয়ম্।

ভাবার্থ—
মলয়তরুর মৃদু-উল্লসিত পল্লবের শয্যায় বসিয়া শ্যামা সুকেশী, তন্ত্রিমুখা যিনি সূক্ষ্ম স্বরসমূহের বিভাগ বিধান করিতেছেন, তিনিই দক্ষিণ গুর্জ্জরীয়ম্।

গুর্জ্জরী—আলাপ।

সম্পূর্ণ জাতি।
ঋ, গ, ধ কোমল। দুই নি।
গ—বাদী। ধ—সংবাদী।

অস্থায়ী।

সা ণ্‌া সা জ্ঞা -া জ্ঞা ঋা -া স্‌া -া স ন্‌া সা সা দ্‌া দ্‌া প্‌া -া
তে ০ ০ না ০ ০ ০ নে ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ।

স্‌া ণ দ্‌া -া দ্‌া সা -া স ন্‌া সা মা -া পা পা -া ণদা -া দা পা -া
রে না ০ ০ ০ ০ ০ তো ০ ০ ০ ০ ম্ না ০ তে ০ রে না ০

মা পা দা পা মা পা ম জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞ পা ম দা । দা মা জ্ঞাঃ জ্ঞঃ
নে তে তে ০ রে ০ না ০ ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ রো ০ ০

ঋা -া সা -া সা সা সা সণ্‌া সণ্‌ সা ঋা -া সা -া ॥
০ ০ না ০ তে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম্

অন্তরা।

পা মা ণ দা দা র্সা -া র্সা র্ঋা স র্না র্সা -া র্ঞা -া ণা দা
তা ০ না ০ ০ ০ ০ নে তো ০ ০ ০ ম্ না ০ তে ০

ণা র্সা -া র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্সা -া র্সা -া র্সা ণ দা -া পা -া মা -া দা
না ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ রে না ০ । ০ ০ তা ০ ০

মা জ্ঞাঃ জ্ঞঃ ঋা -া সা -া সা দ দা পা পা ণা দা মা জ্ঞা জ্ঞা
০ ০ ০ ০ ০ না ০ তো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

জ্ঞা ঋা -া সা । সা সা মা সণ্‌া সণ্‌া সা ঋা -া সা -া ॥
না ০ ০ ০ ০ তে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম্

সঞ্চারী।

মা -া পা পা দা মা পা -া পা পমা পা ণদা ণদা দা র্পা -া
তে ০ রে নে রি ০ ০ ০ রে না ০ ০ ০ ০ তে না ।

মা পা মা দা দা মা জ্ঞা -া জ্ঞা ঋা -া সা -া সা ণ দ্‌া -া প্‌া -া
তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ০ তে না ০ ০ ০ ০

ণ দ্‌া সা -া -া সা -া ॥
তো ০ ০ ম্ না ০

আভোগ।

মা ণদা -া র্সা -া সা র্সা স র্না সা র্সা -া র্সা র্সা ণদা র্সা
তে না ০ ০ ০ নে রি রে ০ ০ না ০ তে রে না ০

র্সা র্জ্ঞা -া র্ঋ র্সা -া র্সা ণদা -া পা -া মা জ্ঞা মা পা
০ ০ ০ তে না ০ তে না ০ ০ ০ তে ০ রি ০

দা দা মজ্ঞা -া জ্ঞ পা ম দা -া । মজ্ঞা -া -া ঋা -া সসা -া
রে ০ না ০ তো ০ ০ ০ ০ ম্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা সা সা সণ্‌া সণ্‌া সা ঋা -া সা -া ॥
তে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম

পুস্তক পরিচয়

[পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা না ছাপাই আমাদের নিয়ম। —প্রবাসী-সম্পাদক]

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—অনুবাদক শ্রী নরেন্দ্র দেব। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স (১৩৩৩)। মূল্য ৪্ টাকা।

বাঙ্গালা-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থান পেয়েছে ব'লে আজ প্রত্যেক বাঙ্গালী গর্ব্ব অনুভব করে' অথচ এটা নিজেদের কাছে স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই যে, বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গালাসাহিত্যের যোগ খুবই সঙ্কীর্ণ। এক্ষেত্রে কারবার চলে প্রধানতঃ অনুবাদের ভিতর দিয়ে; বিভিন্ন সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে যেসব বড় বড় বই বেরিয়েছে বিশ্বমানবের সেগুলি classic চিরন্তন সাহিত্য; অথচ তার কয়খানি বাঙ্গালায় অনূদিত হয়েছে? সব জিনিষ সব ভাষায় অনুবাদ করা যায় না তা মানি, কিন্তু কিছু কিছু ভাল জিনিষ ত অনুবাদ করা যেত। হোমর দান্তের কথা ছেড়ে দিই, সেক্সপিয়রের ভাল অনুবাদ কেন হয় নেই? ফরাসী ও জর্ম্মান্ সাহিত্যে মৌলিক প্রতিভার অভাব নেই তবু তারা এত জিনিষ অনুবাদ করে কেন? কেন রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের অনুবাদ লইয়া পাশ্চাত্য জগৎ মেতে আছে? কারণ জাতীয় সাহিত্যকে পুষ্ট করবার পক্ষে অনুবাদ একটি প্রকৃষ্ট উপায় ব'লে তারা জানে। পাশ্চাত্য নভেল বা ছোট গল্পের নাম বদলে মৌলিক ব'লে চা'লাবার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে যদি আমাদের লেখকেরা বড় বড় বই (Classic)-এর অনুবাদে লেগে যান তাতে তাঁদের কল্যাণ ত হবেই, বাঙ্গলা ভাষাও পরিপুষ্ট হ'বে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনেক জিনিষ ভাল অনুবাদ করবার সময় হয় ত এখনও আসেনি, কিন্তু প্রাচ্যখণ্ডের বহু পুস্তক যে অনুবাদ হ'তে পারে ও হওয়া উচিত সেটা কবি নরেন্দ্র দেব আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পুস্তক, কথাটি আমরা যে জ্ঞাতি ভ্রাতা পারসিকের কাছে পেয়েছি তাঁদেরই একটি অমূল্য রত্ন ওমরের রুবাইয়াৎ। এই বইখানি কিছুদিন পূর্ব্বে কবিবর কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাঁর পাকা কলমের পাকা টানে নক্স ক'রে আমাদের উপহার দিয়েছেন এবার কবি নরেন্দ্র দেব ও তাঁর প্রকাশক যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ক'রে "রুবাইয়াৎ"খানি বাঙ্গালী পাঠকের হাতে উপহার দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। ক্রমশঃ ফিরদৌসির এপিক্ প্রতিভা, সাদির অনুপম সহজ পেলবতা ও হাফিজের মরমী বীণার বেশ বাঙ্গলাসাহিত্যে জাগুক, এই আমাদের প্রার্থনা। প্রকাশকদের কাছে উৎসাহ পেলে তরুণ কবিরা এইসব কাজে লাগ্তে পারেন। শুধু পারস্য কেন, চীন ও জাপানী সাহিত্য থেকেও জিনিষ অনুবাদ করবার আছে।

তবে একটা কথা:--যেন অনুবাদ যতটা সম্ভব মূলের শরীর ও প্রাণের কাছাকাছি থাকে সে-বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার। সব ভাষা এক-জনের পক্ষে শেখা সম্ভব নয় এবং উপস্থিত আমাদের শিখ্বার উপায়ও নেই তা মানি, কিন্তু একটা ক'রে নতুন ভাষা শিখবার নেশা তরুণ লেখকদের থাকা ভাল। বিশেষভাবে কবিতায় অনুবাদের অনুবাদ করতে যাবার বিপদ্ আছে। চীনা কবি লি-পোর কাব্যের নমুনা দিতে হ'লে বাঙ্গালী অনুবাদককে এখন তার পাশ্চাত্য অনুবাদের সাহায্য নিতে হবেই তা স্বীকার করি, কিন্তু আরবী বা ফারসী সাহিত্য আমাদের দেশে ব'সে মূল প'ড়ে অনুবাদ করা অসম্ভব নয়। মূল ভাষার ভিতর দিয়ে ধরতে চেষ্টা না করলে অনেক সময় প্রথম অনুবাদকের মনগড়া ভাবটা দ্বিতীয় অনুবাদকের ঘাড়ে চাপে। ওমর খৈয়াম নিয়ে এ বিভ্রাট বেধেছে তার আভাস সম্প্রতি পেয়েছি। (*Message d' Orient*) "প্রাচ্যবাণী" গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড পারস্য নিয়ে এই গ্রন্থে *Le Cahier Persan* পড়তে গিয়ে দেখি আধুনিক পারস্য-সাহিত্যের দুজন প্রতিনিধি Ali No. Ronze ও Hassan Moghadam ওমর ও সাদি সম্বন্ধে আলোচনায় পাশ্চাত্য অনুবাদকদের বেশ একহাত নিয়েছেন। তাঁদের মতে ফারসী ভাল না জেনে ওমরকে ধরা বিষম কঠিন কাজ; কারণ, তাঁর মৌলিকতা সে-যুগের কবিদের মধ্যে অতুলনীয়। সুলতান মামুদের সভাকবি ফিরদৌসির শাহ-নামা (১০৫০) একদিকে, সাদির গুলেস্তাঁ আর এক দিকে (১২৫০); মধ্যে ক্রুশেদ জেহাদের শতাব্দীব্যাপী ঝঞ্ঝনা ইতিহাসের রুদ্রবীণায় বেজে উঠল (১১০০)। ওমর খৈয়াম তখন ষাট-বছরের বৃদ্ধ। এই যুগ-সন্ধিতে তিনি ছিলেন যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাগ্রত প্রজ্ঞা। ধর্ম্ম ও নীতির মুখোস প'রে মানুষের যত তামসিকতা অনৌদার্য্য অপ্রেম লুকোচুরী খেলে বেড়ায় সে সব ভণ্ডামীর আবরণ টুক্রা টুক্রা ক'রে কেটে তিনি সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন; তিনি সে-যুগের সত্য-দ্রষ্টা কবি—তাঁর রুদ্রহাস্যে সে-যুগের ইতিহাস চমকে উঠেছিল। এই আসল তাৎপর্য্যটি সৌখীন অনুবাদক Nicolas, ক্লাসিক (গ্রীক্-রোমীয়) সাহিত্যভক্ত Fitzerald, শ্রদ্ধাবান সাহিত্যিক Maurise Barres * কেউ সাচ্চ ক'রে উদ্ঘাটন করতে পারেননি। কারণ, তাঁরা ওমরের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যটি চাপা দিয়ে নিজেদের খেয়াল মতন তাঁর ভাষ্য করতে চেষ্টা করেছেন। ওমর সে-যুগের একজন অন্যতম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আবার পরবর্ত্তী সুফী সাহিত্য তাঁর 'পেয়ালা' ও 'সাকীর' উপর বড় বড় তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন; এত বড় একজন ভাবুক ও শিল্পীর রচনা মূল থেকে অনুবাদ করা উচিত। তবে মূল উৎসে যাবার উৎসাহ জাগাতে হ'লে প্রথম বইখানিকে মনোজ্ঞ ক'রে সাধারণের হাতে দেওয়া দরকার। সে-কাজটি নরেন্দ্র দেব সুচারুরূপেই করেছেন; ওমরের এতগুলি কবিতা তাঁর পূর্ব্বে বাঙালী পাঠকদের কেউ উপহার দেননি। এই চয়ন-কার্য্যের জন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। তার উপর প্রত্যেক কবিতাটিকে বাঙ্গালা ছন্দের মর্য্যাদা বজায় রেখে কবিতা ক'রে তুলে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর মতন কষ্টসহিষ্ণু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লেখকেরই উচিত মূল ফারসী থেকে ওমরের জ্ঞাতি কবি মনীষীদের রচনা অনুবাদ ক'রে বাঙলা ভাষাকে পুষ্ট করা। আশা করি এ কাজে তাঁর কলম সার্থক হ'বে।

বইখানির চিত্রগুলি দেখে আমরা খুসী হতে পারিনি। ওমর ও তাঁর প্রতিকৃতি দেখে খুসী হতেন কি না সন্দেহ। বড় বইএর চিত্রানুবাদ তার ছন্দানুবাদের চেয়ে কম কঠিন ব্যাপার নয় এটা আমাদের চিত্রশিল্পীদের বুঝবার সময় এসেছে।

---

* *Enquete and Pays du Levant* দ্রষ্টব্য।

কণারকের বিবরণ—শ্রী নির্ম্মলকুমার বসু রচিত। মূল্য ১৸০।

ভারতের স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে উড়িষ্যাবাসীদের কৃতিত্ব কত বড় স্থান অধিকার করে সেটা একবার উড়িষ্যার মন্দিরগুলি দেখিয়া আসিলেই বুঝা যায়; শ্রীক্ষেত্র ভারতবাসীর তীর্থ-স্থান, শুধু ধর্ম্মের দিক্ দিয়া নহে, শিল্পের দিক্ দিয়া ইহা সত্যই 'শ্রী'র লীলাক্ষেত্র। এখানে শিল্পের ক্রমবিকাশে যে ধারাবাহিকতা দেখি এমন ভারতের অন্যত্র মেলে না। বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিকদের অগ্রণী ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮০ সালে "উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব" (Antiquites of Orissa) লিখিয়া যশস্বী হন; এবং ১৯১০ সালে বাবু মনোমোহন গাঙ্গুলী "উড়িষ্যার ধ্বংসাবশেষ" (Orissa and Her Remains) লেখেন; স্থাপত্য শিল্পে নিজে বিশেষজ্ঞ বলিয়া মনোমোহন-বাবু সেই দিক্ হইতে বহু মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তারপর Kanarak or the Black Pagoda নামক গ্রন্থে Bishan Swarup (1916) একখানি গ্রন্থ রচনা করেন ইনিই মন্দিরের সংস্কার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক নক্সা ইত্যাদি দিয়া ও "মাদলা পাঞ্জি" নামক পুরী-মন্দিরের রোজ নামচা হইতে কণারক সম্বন্ধে সমসাময়িক বিবরণ অনুবাদ করিয়া বিষয়টি আরো বিশদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া পুরীতে তাঁর বাড়ী হইতে আশপাশের উড়িয়া স্থপতীদের নিকট মন্দির-নির্ম্মাণ-সংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ করেন; এখনও নৃতত্ত্বের দিক্ হইতে নানা আলোচনা তিনি উড়িষ্যার সম্বন্ধে করিতেছেন। তাঁর মত বিনয়ী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করিতে অভ্যস্ত ছাত্র যে কণারক ও উড়িষ্যার শিল্প অবলম্বন করিয়া কণারকের এই সুন্দর বিবরণ-খানি লিখিবেন ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। ইনি কণারক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য যথেষ্ট ত দিয়াছেনই তার উপর নিকটস্থ মন্দিরাদির সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব দান হইতেছে উড়িষ্যা-স্থাপত্যের পরিভাষা সংকলন করা ও সেই পরিভাষার সঙ্গে মিলাইয়া মন্দিরগুলির স্তর-ভেদ ও শিল্পবৈয়াকরণিক বিশ্লেষণ। হ্যাভেল্ সাহেব আধুনিক রাজপুত স্থপতিদের সঙ্গে মিশিয়া যেমন অনেক প্রাচীন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, নির্ম্মল-বাবু তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে খাটিয়া উড়িষ্যার শিল্প-পরিভাষা সংগ্রহ করিয়াছেন; সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বইখানির মধ্যে ছোট ছোট নক্সার সাহায্যে বিষয়গুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে। শেষে একটি পরিভাষা-কোষও দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে নির্ম্মলবাবু বই-খানিকে পূর্ণাঙ্গ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে আমরা বইখানি পড়িতে ও নির্ম্মল-বাবুকে উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করি। ভুবনেশ্বরাদি অন্য মন্দিরগুলি লইয়াও এমনি বই তিনি লিখিতে থাকুন।

শ্রী কালিদাস নাগ

প্রসূতি-পরিচর্য্যা বা পোয়াতী রক্ষা—ডাক্তার শ্রী বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ও পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক শ্রী অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

দেশ বলিতে তাহার মানুষকে বুঝায়; মানুষ বলিতে বয়স্ক লোককে যতটা বুঝায় তাহার অধিক বুঝায় দেশের শিশুদিগকে, কেননা তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ মানুষ, দেশের ধর্ম্ম, নীতি, আদর্শ ও কর্ম্মের বাহক, ধারক। মানুষকে প্রকৃত মানুষ-পদবাচ্য করিতে হইলে শৈশবেই তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করিতে হইবে। শিশুকে যথার্থভাবে রক্ষা ও শিক্ষিত করাই দেশের প্রকৃত কাজ। এই শিশুর গর্ভধারিণী, শিক্ষক ও পালয়িত্রী হইতেছেন নারী। সুতরাং দেশোন্নতির একমাত্র, পথ—দেশের নারীকে শিক্ষিত করা, সুস্থ রাখা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করা। নারী যে পরিমাণে সুস্থ ও শিক্ষিত, দেশ সেই পরিমাণে উন্নত ও অগ্রসর। সুখের বিষয়, আজ পরাধীনদেশবাসী আমরা দেশ-সভ্যতায় নারীর এই স্থান ক্রমশঃ বুঝিতেছি। অনেক প্রকৃত দেশহিতকামী ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া দেশের পাখীর-মত-খাঁচায়-আবদ্ধ জীর্ণ-দেহ নারীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রচুর চিন্তা করিতেছেন ও পুস্তকাকারে সে-চিন্তা প্রচার করিয়া দেশবাসীকে চেতন করিয়া দিতেছেন। এইরূপ দেশ-শুভার্থী ব্যক্তিগণের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায়। এই প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের নারীহিতমূলক কর্ম্ম ও প্রবন্ধাদি দেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত নয়। তাঁহার আলোচ্য পুস্তকখানি এই বিষয়ে অভিনব। পোয়াতী নারীদের কি করিয়া সুস্থ রাখা যায়, কি উপায়ে গর্ভস্থ সন্তানকে পরিপুষ্ট ও সুস্থ অবস্থায় উপনীত করা যায় ও সন্তানকে শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান করা যায় ইহাই বইখানির আলোচ্য বিষয়। এ আলোচনা মাত্র গবেষণা নয়, হাতে-কলমে জানা সুদক্ষ চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা-জাত। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, অমূল্য, সারবান, প্রত্যেকের প্রতিপাল্য আলোচনা।

বইখানিতে পোয়াতীর অস্বাভাবিক ঋতু, গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ, গর্ভাবস্থায় নিয়ম পালন, অস্বাভাবিক লক্ষণ, প্রসবের কাল-নির্ণয়, আঁতুড় ঘর কিরূপ হওয়া উচিত, প্রসবকালীন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, নিয়ম পালন, আঁতুড়ের ঝি, নবজাতের স্বাস্থ্য ও তাহা রক্ষার নিয়ম, প্রসূতির অস্বাভাবিক লক্ষণ, শিশুর খাদ্য, শিক্ষা, নিদ্রা, পোষাক, মলমূত্র ত্যাগ, নৈতিক শিক্ষা, সংক্রামক রোগে সতর্কতা, ইত্যাদি ইত্যাদি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় অতি সরল ভাষায়, সুবিন্যস্ত পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। বইটি এতই প্রয়োজনীয় ও এতই সুন্দর যে, সুদীর্ঘ আলোচনা করিলে তবে ইহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা দুই-একটি দরকারী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতেও দেখিয়াছি—প্রসবগৃহখানি একটি অন্ধকারময়, স্যাঁতসেঁতে, দুর্গন্ধপূর্ণ নরককুণ্ডবিশেষ। যে সন্তান আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, আমার বংশের দুলাল, সেই সন্তানের প্রথম অভ্যর্থনা আমরা কোথায় করি?—নরক-কুণ্ডে!......অন্ধ স্বদেশবাসী, তুমি সভ্যতার অহঙ্কার কর! একবার ভাব দেখি—যে-গৃহে একদিন মাত্র বাস করিলে সুস্থকায় যুবাপুরুষও রোগাক্রান্ত হয়, সেই গৃহে সদ্যো-জাত ক্ষীণজীবী একটি অসহায় শিশু ও তাহার সদ্যঃ-প্রসূত দুর্ব্বলা জননী কেমন করিয়া ৮।১০ দিন বাস করিবে?......বস্তুতঃ আঁতুড় ছুঁইলে স্নান করিতে হয় না। স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া, তবে আঁতুড় ছুঁইতে হয়।......যে-স্থানে সদ্যোজাত কোমল-প্রাণ নির্ম্মল শিশু আছে, সে স্থান সর্ব্বদা পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। তথায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।"

"অনেক বাড়ীতেই দেখিয়াছি, এই ঝী (আঁতুড়ের ঝী) রুগ্না, তাহার কাপড়-চোপড় ময়লা এবং আচার-ব্যবহারও বিশেষ নোংরা... এইরূপ ঝীকে আঁতুড়ে রাখা শিশু ও প্রসূতি দুইএরই পক্ষে বিষম বিপদ্জনক।"

"যে-সন্তান জীবনের প্রথম হইতেই আহার-বিহার ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে সৎশিক্ষা না পায়, সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না। সন্তানকে মাত্র আহার ও পরিধান প্রদান করিলেই তাহাকে পালন করা হয় না।...গর্ভধারিণী হওয়া সহজ কিন্তু মা হওয়া সহজ নয়।"

প্রত্যেক গৃহে পঞ্জিকা যেমন প্রয়োজনীয়, এই বইখানি তেমনি প্রয়োজনীয়। প্রত্যেকে বইখানি কিনিয়া নিজেরা শিক্ষিত হোন ও অপরদিগকে শিক্ষিত করুন।

বইখানির ছাপা, বাঁধান সুন্দর। অথচ দাম বেশী নয়।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার—শ্রী শরৎকুমার রায়। প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের সাধু পুরুষ, কর্ম্মী, দেশসেবক অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবন-চরিত। এই চরিতাখ্যানে অশ্বিনীকুমারের বংশপরিচয়, আদ্য জীবন, পারিবারিক জীবন, দেশসেবা, শিক্ষকতা, গ্রন্থরচনা, ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সরল ওজস্বী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। চরিতাখ্যানটি বৃহৎ নয়, কিন্তু ইহাতে জীবনী-রচনার সমস্ত উপাদানই সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা একখানি সুন্দর চরিত্রালেখ্য হইয়াছে। কয়েকখানি চিত্র সমন্বিত হওয়ায় বইখানি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। জীবনী-রচনায় প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিস রচকের শ্রদ্ধা। গ্রন্থকারের সেই শ্রদ্ধার আবেগেই অশ্বিনীকুমারের চরিত্র যথার্থ ফুটিয়াছে। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসে বইটি ভারাক্রান্ত নয়,—যে-দোষে অধিকাংশ জীবনী দুষ্ট হইয়া যায়। অশ্বিনীকুমারের রচিত অপ্রকাশিত কয়েকটি গান ইহাতে ছাপা হইয়াছে। গানগুলি ঔদার্য্য ও ভক্তিরসে অপূর্ব্ব। গ্রন্থকার এই মহৎ চরিত্রের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আখ্যান কোথাও অপ্রাকৃত হয় নাই। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

গুপ্ত

ভুলের কারসাজী—শ্রী সুধা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রী শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। মূল্য ১৲ এক টাকা। পৃঃ ১০৮ (১৩৩৩)।

উপন্যাসখানি গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথম উদ্যম। তথাপি চরিত্রগুলি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা আশা করি, এই নবীন লেখিকার বই পাঠকদের নিকট ভাল লাগিবে।

প্র

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙালী অধ্যাপকের ভাগ্যে এই উচ্চসম্মানলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহী জেলার করচমারিয়া গ্রামে যদুনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺রাজকুমার সরকার তখন উত্তর-বঙ্গের একজন উচ্চ-শিক্ষিত দেশসেবক জমিদার বলিয়া সুপরিচিত।

যদুনাথ যথাক্রমে রাজশাহী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। সমস্ত পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি-লাভ করিয়া, ১৮৯২ সালে তিনি ইংরেজীতে এম্-এ পরীক্ষা দেন। এম্-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কলেজ-সহপাঠীদের মধ্যে মহীশূর-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যার আল্‌বিয়ন্ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নাম করা যাইতে পারে। ১৮৯৭ সালে যদুনাথ ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি —এই চারি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া, রায়চাঁদ্ প্রেমচাঁদ বৃত্তি-স্বরূপ সাত হাজার টাকা ও মোয়াট স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থ "আওরংজীবের সমসাময়িক ভারতবর্ষ"—এই রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য লিখিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি মৌলিক গবেষণার জন্য 'গ্রীফিথ্‌স্ প্রাইজ' লাভ করেন।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। এ-বৎসর মার্চ্চ মাসে তিনি বিদ্যাসাগর (পূর্ব্বে মেট্রোপলি-ট্যান্ নাম ছিল) কলেজের অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হন। ১৮৯৮ জুন মাসে তিনি অধ্যাপকরূপে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। পাটনা কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ উইলসন্ সাহেব পর বৎসর তথায় ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার উন্নতিসাধনের জন্য যদুনাথকে সেখানে বদ্‌লি করান। সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর পাটনায় অতিবাহিত করিবার পর, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে তিনি দুই বৎসরের জন্য ভারতেতিহাস-বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে কাশী গমন করেন। ১৯১৮ সালে ইশলিংটন্ কমিটির নির্দ্দেশে তিনি এবং আরও কয়েকজন ভারতীয় কর্ম্মচারী প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগ হইতে (I.E.S.) ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে উন্নীত হন। ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি তাঁহাকে আবার তাঁহার স্থায়ী সরকারী কার্য্যে আনয়ন করা হয়। তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া, কটক রাভেন্‌শ কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালের অক্টোবর

মাসে তিনি পুনরায় পাটনা কলেজে ফিরিয়া আসেন, এবং অবসর-গ্রহণের শেষ দিন (৭ই আগষ্ট ১৯২৬) পর্য্যন্ত পাটনায় অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত বহুদিন হইতেই যদুনাথের সংযোগ ছিল। ক্রমান্বয়ে নয় বৎসর ধরিয়া তিনি হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট, সিনেট, সিণ্ডিকেট, বোর্ডগুলির, এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিণ্ডিকেট ও নানা কমিটির সদস্য ছিলেন। আট বৎসরকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট অধ্যাপকরূপে

[১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার ছবি হইতে

তিনি পাটনা কেন্দ্রে এম-এ ইতিহাসের শিক্ষকতা করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টরিক্যাল্ রেকর্ডস্ কমিশনের স্থাপনা (১৯১৯) হইতেই তিনি ইহার বিশেষজ্ঞ সদস্য নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। অনেক বর্ষ ধরিয়া প্রায় প্রতি পূজার ছুটিতেই তিনি ভারতের নানা ঐতিহাসিক প্রদেশ ও নগর ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলেই স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর আগ্রহে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুবিখ্যাত গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক্ সোসাইটি তাঁহাকে "সম্মানিত" সদস্য নির্ব্বাচিত করেন (১৯২৩); এই পদ, সমগ্র-সভ্য জগৎ হইতে বাছিয়া কেবলমাত্র ৩০ জন লেখককে দেওয়া হয়। ১৯২৬ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি-ভূষিত করেন। বর্ত্তমান বর্ষে বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটি সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে তাঁহাকে 'জেম্স্ ক্যাম্বেল স্বর্ণপদক' ও একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহা তিন বৎসর পরে পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখককে দেওয়া হয়। তিনি বাঁকিপুর অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং ১৯২৫ সালে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেন।

গ্রন্থকার হিসাবে অধ্যাপক সরকারের নাম দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত ইংরেজী গ্রন্থগুলি—'আওরংজীব', 'শিবাজী' প্রভৃতি সুধীসমাজে উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার লিখিত অনেক গবেষণামূলক ঐতিহাসিক ইংরেজী প্রবন্ধ মডার্ন্ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বিরাট পুস্তকাগারে বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টায় বহুকষ্টে গৃহীত ফার্সী, মারাঠি ও পর্ত্তুগীজ প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রিত পুস্তক ও দলিল-দস্তাবেজ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া বহু ঐতিহাসিক ছাত্র নিজেদের গবেষণার বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক সরকারের মতন গুরু লাভ করিয়া যাঁহারা মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের তথা বাঙ্গলার মধ্যযুগের ইতিহাসের নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া তাহা বঙ্গ-ভাষা-ভাষীদিগের জন্য যদু বাবু কতবার প্রবাসীতে উপহার দিয়াছেন—একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের পুরাতন পাঠকেরাই তাঁহার বাঙ্গলা প্রবন্ধগুলির সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারেন।

প্র

ছেলেদের পাততাড়ি
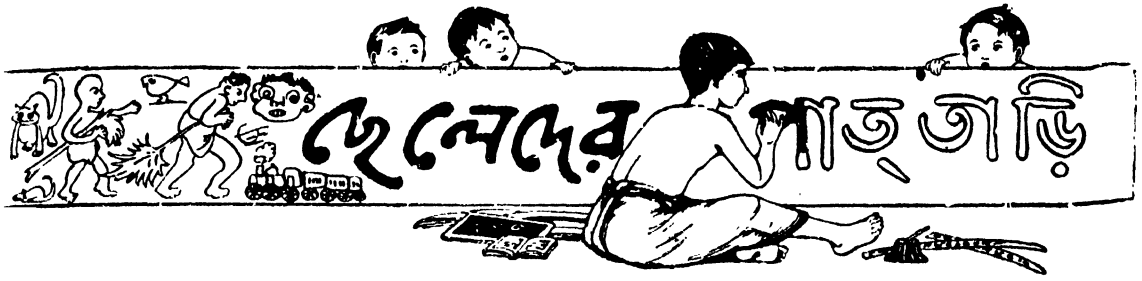
বাদ্‌লায়

(ঘুমপাড়ানি গান)

বিষ্টি পড়ে ঝুপ ঝুপ ঝুপ
টুপ টাপ টুপ টুপ,
ঘুমিয়ে পড়ো দুষ্টু ছেলে,—
মারটি খাবে খুব।
গুড় গুড় গুড় ঐ আকাশে
ডাক্‌ছে কালো ভূত,
কর্‌ছে রাগে গোঁ গোঁ সে,
কোরো না খুঁৎ খুঁৎ।
হুক্কা হুয়া যেই ডেকেছে
অম্‌নি এল জল ;
ল্যাজ গুটিয়ে গর্ত্তে পালায়
সব শেয়ালের দল ;
মাঝে মাঝে গর্ত্ত থেকে
কর্‌ছে খ্যাকর্‌ খ্যা—
না রে না ঘুমোয় খোকা,
পালিয়ে যা রে যা।

মিত্তিরদের ভাঙা বাড়ীর
কোটর থেকে আজ
বেরোয়নিকো থ্যাবড়া-মুখো
পেচক মহারাজ।
একবারটি আয় রে প্যাচা,
ইঁদুরটাকে ধর্‌—
খাটের তলায় কর্‌ছে কেবল
কুড়ুর্‌ কুড়ুর্‌ কড় ;

ধর্‌লে পরে ইঁদুরটাকে
ঘরটি হবে চুপ,
ঘুমিয়ে যাবে খোকন-মণি
ঘুমিয়ে যাবে খুব।

এই ঘুমুল, এই ঘুমুল,
এই যে এল ঘুম,
কেউ এস না, কেউ ডেকো না,
ডাক্‌লে দুমাদ্দুম
মারবে খোকা,—পালাও সবাই,
ঘরটি ছেড়ে যাও,
মণ্টু পালাও, ঝণ্টু পালাও,
দাও ঘুমুতে দাও।
ঐ এল রে জল এল রে
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ ;
আবার ডাকে আকাশ বুড়ো
কড় কড় কড় কড়।
গাছে-পালায় বিষ্টি পড়ে
ঝুপ ঝুপ ঝুপ ঝুপ ;
ঘুমিয়ে পড়ো দুষ্টু ছেলে
ঘুমিয়ে পড়ো খুব।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

—

জাপানের শিশু-উৎসব

আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনো উৎসব হয় না, অবিশ্যি সব পূজো পার্ব্বণেই ছেলেমেয়েরা যোগ দিয়ে থাকে। জাপানে শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়েই কয়েকটি উৎসব হয় ; সেই

'মোমো-নো-সেক্কু' দিনে অতিথি-সৎকার-পরায়ণা শিশু-গৃহিণী

উৎসব-দিনে তারাই যেন দেশে রাজত্ব করে; দেশের প্রত্যেক লোক তখন তাদের আনন্দের রসদ জোগাতে বাধ্য। এই শিশু-উৎসবগুলির মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য; মোমো-নো-সেক্কু, টাঙ্গো-নো-সেক্কু আর তানাবাতা।

পাহাড়চূড়ায় শীতে জমাট বরফ যখন গ'লে গ'লে নদীপথে সমুদ্রে নেমে যায়, পাহাড়গুলো যখন বরফের জামা ছেড়ে কালো গা-টিকে বেশ ক'রে খুলে রোদ পোয়াতে থাকে, ফুজিয়ামা শুধু সাদা টোপরটি প'রে আকাশের গায়ে জল্‌জল্ করতে থাকেন, পূবে হাওয়া মরা গাছপালা আর শুক্‌নো মাঠের বুকে নতুন প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দেয়, তখন জাপানী মেয়েদের আনন্দ দেখে কে। তারা মোমো-নো-সেক্কু অর্থাৎ বসন্তের অভিনন্দন করবে। এজন্যে মহা হৈ-চৈ প'ড়ে যায়, তারা রঙ বেরঙে কাপড় ছুপিয়ে রেখে পর্ব্বদিনটির জন্যে প্রস্তুত হয়। মোমো-নো-সেক্কু বিশেষ ক'রে মেয়েদের পর্ব্বদিন; ছেলেরা এতে যোগ দিতে পায় না। মোমো-নো-সেক্কু নামটা দেওয়া হয়েছে, মোমো-নো-হানা অর্থাৎ 'পীচফুলের কুঁড়ি' থেকে; পীচ-গাছের সারা গা কুঁড়িতে আর ফুলে ভ'রে যায়।

জাপানী বছরের তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিনে মোমো-নো-সেক্কু উৎসব; ফুলের মতো সুন্দর মেয়েরা দেশের আর ঘরের কর্ত্তা হ'য়ে অতিথি সৎকার করে; তাদের বাপ মা ভাই সেদিন তাদের অতিথি। সেদিন প্রত্যেক বাড়ীর বৈঠকখানায় মেয়েরা নিজেদের অনেক বছরের লিখিত পুতুল আর খেলনাগুলি সাজিয়ে রাখে; বছরের সেই একটি দিনে তাদের সবাইকে বের করা হয়। তাদের পদ-মর্য্যাদা অনুসারে তাদিকে সাজিয়ে রাখা হয়—রাজা উজীর থেকে চাষা-ভুষো-পর্য্যন্ত। পুতুলগুলিকে সাজিয়ে এক-একটা পুরাণ কাহিনীর বর্ণনা করা হয়—সব মেয়েদেরই একটা-না-একটা পুরাণ-কথা মুখস্থ থাকে।

এক-একজন গল্প বল্‌তে এত ওস্তাদ যে, সমস্ত দিন তার ঘরে তার গল্প শুন্‌বার জন্যে লোকের ভিড় জমে থাকে।

এই পর্ব্বদিনে ঘরে কোনো-রকম ময়লা জম্‌লে কি ভাঙা ফাটা পুতুল দেখালে মেয়েদের ভারী নিন্দার কথা; সেজন্যে জাপানী মেয়েরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অভ্যাস করে; আর প্রত্যেকেই নিজের পুতুলগুলির যাতে কোনো রকমে ক্ষতি না হয় সেদিকে ভারী নজর রাখে। এই পরিচ্ছন্নতা ও সাবধানতা বেশী বয়সে তার অনেক সুবিধার কারণ হয়।

মোমো কথাটির আরো অর্থ আছে। মোমো বলিতে দীর্ঘজীবন, সৌন্দর্য্য ও মাতৃত্বের বিকাশ বুঝায়। জাপানী মেয়েরা ছেলেবেলা থেকে সুন্দর হবার, ভালো গৃহিণী ও মা হবার আকাঙ্ক্ষা করে। জাপানের এই দ্রুত ও আশ্চর্য্য উন্নতিতে জাপানী মেয়েদের বারো-আনা রকম হাত আছে।

টাঙ্গোনো সেক্কু শুধু ছেলেদের উৎসব, জাপানী বছরের পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে এই উৎসব হয়। এই দিন বাড়ীর সব-চাইতে কনিষ্ঠ ছেলেকে নিয়ে উৎসব করা হয়; সেদিন তার ভারী খাতির। সেদিন রাস্তার বার হ'লেই চারদিকে পতাকা আর কাগজের রুই মাছ উড়তে দেখা যায়। রুই মাছ মাছের রাজা; গায়ের জোরের জন্যে রুই মাছের খ্যাতি আছে। রুই মাছের মতো ছেলের গায়ের জোর হোক, প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধেও যেন সে লড়তে পারে এইরূপ কামনা ক'রেই কাগজের রুই মাছ উড়ানো হয়।

তানাবাতা উৎসবে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে যোগ দেয়। জাপানী বছরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে এই উৎসব হয়। এই উৎসব মহাসমারোহে জাপানের সর্ব্বত্র করা হয়। উৎসবের আগের দিন ছেলেমেয়েরা শিশির কুড়িয়ে কাগজ কেটে, গান আর কবিতা লিখে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে; এইসব নিয়ে তানাবাতা অর্থাৎ তাঁতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজো হবে। আগের দিন সমস্ত রাত্রি নানা রঙের আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়, টেবিলে নানা ধরণের ফলমূল, পিঠে, সন্দেশ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয় তানাবাতার জন্যে।

উৎসবের দিনে ভোরের আলো দেখা যাবার আগেই ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি কোনো নদীতে গিয়ে রঙীন কাগজে মোড়া বাঁশের কঞ্চি ভাসিয়ে দেয় আর প্রার্থনা করে যেন তারা লেখাপড়ায় ভাল হয়।

মোমো-নো সেক্কু

জাপানে ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট সম্মান করা হয় ব'লে তারা ছেলেবেলা থেকেই আত্মমর্য্যাদা শিখ্‌তে পারে। নানা উৎসব আর পর্ব্বের মধ্যে দিয়ে তাদের মনে দেশপ্রীতি এমন ভাবে জাগিয়ে তোলা হয় যাতে ক'রে দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ভবিষ্যতে তাদের মুহূর্ত্তের জন্যে দ্বিধা করতে হয় না। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে দেশের প্রাণস্বরূপ এই শিশুরাই জীবন্মৃত অবস্থায় আছে। পাঁচ বছর বয়সেই তাদের শৈশব শেষ হইয়া যায়।

স

—

সবচেয়ে বড় জানোয়ার

এখন পৃথিবীতে হাতীই ডাঙ্গার সব-চেয়ে বড় জন্তু, তিমি মাছ ছাড়া ইহা অপেক্ষা বড় জন্তু আর নাই। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে একপ্রকার জানোয়ার ছিল; তাহারা হাতী অপেক্ষা বড়। তাহাদের দেহ ছিল হাতীর মত, গলা উটের গলার মত আর ল্যাজ প্রকাণ্ড গোসাপের ল্যাজের মত। ইহারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইওমিং নামক স্থানে বাস করিত বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, কেননা এই স্থানেই ইহাদের দেহের প্রকাণ্ড কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

:পুরাকালের প্রকাণ্ড জন্তু

জলে আশ্রয় লইত এবং নিশ্বাসের জন্য লম্বা গলার সাহায্যে জলের উপর নাক জাগাইয়া রাখিত।

কি করিয়া যে এই জানোয়ার পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল তাহা ঠিক করা শক্ত। বৈজ্ঞানিকগণ একটা আশ্চর্য্য অনুমান করেন এই যে, এই জানোয়ারই ক্রমবিবর্ত্তনে পাখীর আকার ধারণ করিয়াছে, অর্থাৎ ইহারা পাখীদের অতিবৃদ্ধ পিতামহ।

গুপ্ত

এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় হাতী যতটা উঁচু, কাঁধের উচ্চতায় ইহারাও ততখানি ছিল। পিছন দিকের উচ্চতা ১৩ ফুটের কম নয়। ইহাদের দেহ দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট, চারিটি পা, তাহাতে পাঁচটি করিয়া নখ; পা-গুলি থাবার মত। গলা ঠিক রাজহাঁসের মত লম্বা, কিন্তু তাহার চেয়ে মোটা ও শক্ত; দেহের তুলনায় মাথা ছোট, তাহা দৈর্ঘ্যে ২ ফুট। চোখ পাখীর মত মাথার দুই পাশে। মুখের সম্মুখ দিকে সরু সরু ঘনসন্নিবিষ্ট দাঁত, চিরুনির মত। মাথা ও গলায় দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৪ ফুট। ল্যাজটি মোটা হইতে সরু হইয়া গিয়াছে; তাহা প্রায় ৫০ ফুট লম্বা। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, ইহারা জল ও স্থল উভয় স্থানেই বাস করিত এবং জলে মুখ ডুবাইয়া জলজ উদ্ভিদ উপড়াইয়া খাইত। পায়ের থাবা হয়ত এই কাজে লাগিত; আর গাছগাছড়া দাঁতে করিয়া চাপিয়া ধরিত ও চালুনির মত দাঁতের ফাঁক দিয়া জল বাহির হইয়া যাইত। শত্রুর ভয়ে ইহারা হয়ত

কবি কৃষ্ণচন্দ্র

পদ্যপাঠের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী ছিল সেনহাটি গ্রামে। সেনহাটী পূর্ব্বে যশোহর জেলার মধ্যে ছিল, এখনও খুলনার দৌলতপুর পল্লীর পাশে অবস্থিত।

তাঁর রচিত ছোট ছোট কবিতাগুলি যেমন রসে ভরা আঙুরের মতন মধুর, তাঁর জীবনের ছোট ছোট ঘটনা-গুলিও তেম্‌নি হিত-কথার অমৃত-রসে পরিপূর্ণ।

১

তিনি এক সময়ে যশোহর জেলার স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। যে ক'টি টাকা পেতেন তাতে তাঁর সংসার কোনপ্রকারে চ'লে যে'ত। কিছুদিন কাজ কর্‌বার পর প্রধান শিক্ষক মহাশয় একদিন গেজেটে দেখলেন, মজুমদার মহাশয়ের ১০টি টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। পরে দেখা হতেই প্রধান শিক্ষক মহাশয় কৃষ্ণ-চন্দ্রকে বল্‌লেন,—"আপনার ভাগ্য ভাল, আজ দেখছি, এমাস হ'তে আপনার ১০টি টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছে।"

"কে বল্‌লে?"

"আজ আমি গেজেটে দেখেছি। এই দেখুন না।…"

এই ব'লে কাগজখানির যে-অংশে কৃষ্ণচন্দ্রের নামটি ছাপা ছিল তা লাল পেন্‌সিল দিয়ে দেগে দিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র চুপ ক'রে রইলেন, কোনো কথাই বল্‌লেন না।

ক'দিন পরেই একটা বন্ধ পেয়ে তিনি বাড়ী গিয়েছেন। বাড়ী হ'তে ফির্‌বার সময়, তিনি বাড়ীর অভিভাবক তাঁর ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"বাড়ীতে কি কিছু অভাব-অনটন আছে?" ভাই বল্‌লেন, "না আজ-কাল আর কোনো বিশেষ অভাব বা কোনো জিনিষের দর্‌কার নেই। একরকম চ'লে যাচ্ছে।"

কৃষ্ণচন্দ্র স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষককে বল্‌লেন— "আমি বাড়ীতে জিজ্ঞাসা ক'রে এলাম আজকাল আর আমাদের বেশী টাকার কোনো প্রয়োজন নেই, যা পাচ্ছি তাতেই চ'লে যাচ্ছে। কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিন, এখন আমার আর মাইনে বাড়িয়ে কাজ নেই।"

প্রধান শিক্ষক মহাশয় অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন,—একালেও এমন নির্লোভ লোক আছে!

২

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র একখানি কাপড় কিন্‌তে যশোহরের বাজারে গিয়েছেন। কাপড়ের দোকানগুলি প্রায়ই মাড়োয়ারীদের। তাদের অভ্যাস—কাপড়খানি যত টাকায় বিক্রি কর্‌বে প্রথমে চাইবে তার দ্বিগুণ বা দেড় গুণ। যাঁরা এই নিয়ম জানেন, তাঁরা সেই মতোই দর ক'রে কাপড় কিনে থাকেন।

কৃষ্ণচন্দ্র এনিয়ম একটুও জান্‌তেন না। তিনি একটা দোকানে অনেক কাপড় দেখে নিজের পছন্দ-মতো একখানি ঠিক ক'রে দাম জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"কত দাম লাগ্‌বে?"

মাড়োয়ারী কাপড়খানির কোণে যে দাগ ছিল তা উল্‌টেপাল্‌টে দেখে একটু চিন্তা কর্‌লে, তার পর বল্‌লে—"বাবু আড়্‌হাই রুপেয়া পড়বে।"

কৃষ্ণচন্দ্র ২৸৹টি টাকা দিয়ে কাপড়খানি তুলে নিলেন। তার পর হন্ হন্ ক'রে নিজের বাসা বাড়ীর পানে চল্‌লেন।

মাড়োয়ারী অবাক্ হ'য়ে গেল। এতদিন সে এই বাজারে কাপড় বিক্রি কর্‌ছে কিন্তু এমন খরিদ্দার সে একটিও দেখেনি যে,দাম চাইবামাত্র আর কোন দর না ক'রে টাকা দিয়ে দেয়!

কাপড়খানির খাঁটি দাম হ'ল ১৷৹ টাকা, অভ্যাস-মতো ১৲টি টাকা বেশী ক'রেই সে চেয়েছিল। এখন ২৷৹ টাকাই দিতে দেখে তার ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে আঘাত লাগ্‌ল। ভাবলে এমন সরল ধার্ম্মিক লোককে ঠকান উচিত নয়! এতে রামচন্দ্রজী রুষ্ট হবেন!

অম্‌নি সে দৌড়ে কৃষ্ণচন্দ্রের পানে গেল। একটু গিয়েই দেখা পেলে।

"বাবু! বাবু!"

কৃষ্ণচন্দ্র থাম্‌লেন, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"কি ব্যাপার?"

মাড়োয়ারী বল্‌লে—"ও কাপড়ের দাম আড়াইরুপেয়া নাহি, দেড় রুপেয়া। এক রুপেয়া ফেরৎ লেও।"

"তবে প্রথমে দিলে কেন, নিলেই বা কেন?"

"বাবু, আমাদের বেশী ক'রে দাম চাওয়াই অভ্যাস।"

"কী! তুমি মিথ্যা কথা বল! তোমার কাপড় আমি চাই না!" এই ব'লেই কাপড়খানা ফেলে দিলেন। তার পর কাপড়, টাকা কিছুই না নিয়ে হন্ হন্ ক'রে আপন পথে চ'লে গেলেন। মাড়োয়ারী সেইখানেই অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল!

৩

কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরের বাজারে মাছ কিন্‌তে গিয়েছেন। একখানি কাগজের ঠোঙায় কতকগুলি খলসে মাছ কিনে পথ-দিয়ে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বাসায় ফির্‌ছেন। তিনি যখন জেলা স্কুলের সাম্‌নে ভোলা পুকুরের ধারে এসে উপস্থিত হ'লেন তখন কাগজের ঠোঙার মধ্যে মাছগুলি বড়ই ন'ড়ে উঠ্‌ল। তাই দেখে তাঁর মনে হ'ল—'এতগুলি মাছ আটকে রেখে বড়ই কষ্ট দিচ্ছি। আমাকে যদি কেউ এম্‌নি ভাবে আটক ক'রে রাখ্‌ত তবে কতই না কষ্ট বোধ কর্‌তাম!'

এই ভেবেই তিনি পুকুরের বাঁধা ঘাটে নেমে মাছ-গুলিকে জলে ছেড়ে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"যাও, তোমাদের স্বাধীনতা দিলাম।"

৪

গ্রীষ্মের বন্ধ। সকলেই বাড়ী চলেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র আপনার জিনিষপত্র নিয়ে যশোহরের রেল ষ্টেশনে এসে গাড়ীর জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

এমন সময় একটি বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখে আলাপ কর্‌তে লাগলেন। কথায় কথায় পণ্ডিত লোকটি বল্‌লেন,—"আপনার নাম দেশ-বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছে।"

তার উত্তরে কৃষ্ণচন্দ্র হেসে উঠে বল্‌লেন,—"হাঁ, ঢাকের আওয়াজ দূরেই ভাল শোনায় কিন্তু ভিতরে শূন্য!"

ভৈরব নদের খেয়া পার হ'য়ে তাঁর বাড়ীতে পৌছাতে হয়। খেয়া-ঘাটে নৌকা আছে, কিন্তু মাঝি নেই। অনেকগুলি লোক জমা হ'য়ে নিজেরাই নৌকা বেয়ে পরপারে পৌছাল তার পর যে যার কাজে চ'লে গেল; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র দুইটি পয়সা একখানি কাগজে মুড়ে তার উপর লিখলেন—"পারের পয়সা।"

সেই মোড়কটি গলুইয়ের উপর রেখে তিনি তখন নিজের বাড়ী চ'লে গেলেন।

শ্রী অবলাকান্ত মজুমদার

গবেষণা-বিধায়না ও উন্মোচনা*

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

সমগ্র জীব-জগতে ক্রমোৎকর্ষ (evolution) মানব-জ্ঞানের এক প্রধান বিশেষত্ব। মানব প্রতিনিয়তই নব-নব তত্ত্বরাজি আহরণে ব্যস্ত। এই আহরণই গবেষণা নামে অভিহিত। গবেষণা দ্বিবিধ;—(১) বিধায়না ও (২) উন্মোচনা।

প্রথম প্রকারের গবেষণায় সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা-পুঞ্জে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে কতকগুলি বিধিতে (law) শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই বিধি সমূহের সাহায্যে পুনরায় নূতন নূতন বিধি উৎপন্ন হয়। যথা;—কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ (axiom) ও স্বীকার্য্য (postulate) লইয়া জ্যামিতি শাস্ত্রের আরম্ভ। এই স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য অবলম্বন করিয়া সমগ্র জ্যামিতিশাস্ত্র শাখা-প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; কেবল জ্যামিতি কেন, প্রায় সকল গবেষণাই এবম্বিধ উপায়ে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ক্রমশঃ নূতন নূতন বিধি সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে বলিয়া ইহা বিধায়না নামে অভিহিত হইল।

মানবের জ্ঞান মাত্রই ভ্রমসঙ্কুল। বিধায়নী জাতীয় গবেষণার সাহায্যে স্তরে স্তরে নূতন নূতন বিধি সংগঠিত হইতেছে। কিন্তু এই বিধি যতই পরিবর্দ্ধিত হউক, কুত্রাপি বলবৎ যুক্তিপূর্ণ বিরুদ্ধ বিধির উদ্ভব ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিতে অনবস্থা প্রদর্শিত হয় না। অথচ উক্ত বিরুদ্ধ বিধিও অপর কতিপয় পূর্ব্ববর্ত্তী বিধির উপরে নির্ভর করিয়াই উৎপন্ন। এতদ্দ্বারা চিরাগত সংস্কারবদ্ধ ভ্রমের নিরসন কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু এতৎ-সম্পর্কীয় বিতণ্ডা উক্ত সংস্কারের মধ্যেই নিবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ আন্দোলন (undulation) তত্ত্বের theory) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার উদ্ভবে নিউটন-প্রবর্ত্তিত আলোকতত্ত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। এই খণ্ডন কোন-একটি নির্দ্দিষ্ট বিধির অস্বীকার প্রকাশ করে মাত্র। এই প্রকারের বিধি বিশেষের খণ্ডনে কোনও মৌলিক সংস্কারের উপরে হস্তক্ষেপ করা হয় না।

দ্বিতীয় জাতীয় গবেষণার উহা হইতে এই প্রভেদ যে, তাহাতে সংস্কারের উপরে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপিত হয় না। সংস্কারকে সংস্কার বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়। বিজ্ঞান যে-সমস্ত বিধি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট ত্রুটী

* গত শিউড়ি সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত

আছে। তন্নিমিত্তই উক্ত বিধিগুলিকে প্রকৃত (real) বলিতে সন্দেহ জন্মে। ইহাদের মূলে একটি প্রকৃত বিধি আছে বলিয়া ধারণা হয় এবং উক্ত বিধি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আক্ষিক প্রমাণ (experiment) ও বিবিধ সংস্কারযুক্ত বিধির সহায়তায় যাচাই করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই প্রকারের গবেষণাকে উন্মোচনা বলা হইবে।

কোপানিকাস্ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। পর্য্যবেক্ষণে উক্ত গতিতে তিনি কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতা পরিদর্শন করিলেন।

অধিকাংশ জ্যোতিষ্ক সমবেগে চলিতেছে। কিন্তু মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটি গ্রহের গতিতে পূর্ণমাত্রায় বৈষম্য বর্ত্তমান। মাত্র তাহাই নহে। ইহারা অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ থামিয়া যায়, ক্রমে পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে; পুনরায় অগ্রসর হয়। ইহাদের গতিতে এই বৈষম্যের কারণ কি? অপরাপর জ্যোতিষ্ক-সমূহই বা কেন সমবেগে চালিত হয়?

আজন্ম যে জাতীয় জ্ঞান ও শিক্ষা দীক্ষায় তাঁহার মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা কিছুতেই ইহার মীমাংসা সম্ভবে না। এই মীমাংসার নিমিত্ত পূর্ব্ব সংস্কারের পরিবর্জ্জন একান্ত প্রয়োজন। এই সংস্কারমতে পৃথিবী সমগ্র জ্যোতিষ্ক-জগতের কেন্দ্র-স্থানে অবস্থিত। যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্র ইহাকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। অনেক সময়েই বিশেষ বিশেষ আক্ষিক প্রমাণ বিশেষ বিশেষ সংস্কারকে দূরীভূত করে। পরবর্ত্তী তত্ত্ব কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব খণ্ডিত হয়। কিন্তু কোপানিকাস্ যে-ভাবে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কারকে বিদূরিত করিয়াছিলেন, তাহা সে জাতীয় গবেষণা নহে। তিনি দেখিলেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি-বিধিতে অসামঞ্জস্য আছে। প্রচলিত সংস্কারে আস্থা থাকিলে তাহার সামঞ্জস্য সম্ভবে না। এই সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত স্বীয় চিন্তা-শক্তিকে বদ্ধমূল সংস্কারের সুদৃঢ় গণ্ডিভেদ করিয়া জ্ঞানের উন্মুক্ত পথে বিচরিত করান একান্ত প্রয়োজন। তিনি তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া তদীয় প্রগাঢ় গবেষণায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বর্ত্তমান সংস্কারজাত জ্ঞান, উক্ত অসামঞ্জস্যের মীমাংসায় শুধু অসমর্থ নহে, অধিকন্তু ইহা উক্ত অসামঞ্জস্যের কারণরূপেও বর্ত্তমান। তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমরা পৃথিবীতেই অবস্থিত; এমতাবস্থায় পৃথিবী সচলা কি অচলা আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে আমাদের পৃথিবীতে অবস্থানহেতু, ইহাকে কেন্দ্রস্থ ও সমগ্র জ্যোতিষ্ক-জগৎকে ভ্রাম্যমাণ বলিয়া প্রতীত (apparent) হওয়া স্বাভাবিক। এই সংস্কার বশতঃই গ্রহবর্গের গতি কোথায় কিরূপ প্রতীত হয় এবং পৃথিবীকে সচলা ধরিলে কি প্রকারে তাহার প্রণিধান করা যায়, তাহা তিনি গণিত-ঘটিত প্রমাণের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

কি বিধায়না কি উন্মোচনা উভয়বিধ গবেষণাই আক্ষিক প্রমাণের সাহায্যে নিষ্পন্ন। কিন্তু বিধায়ক গবেষণায় সেরূপ প্রমাণই সাধারণতঃ প্রধান অবলম্বন। উন্মোচক গবেষণা সেরূপ নহে। কারণ বিধায়ক গবেষণা প্রচলিত সংস্কারের উপর নির্ভর করে। উন্মোচক গবেষণা সংস্কারে সন্দিগ্ধ করাইয়া তাহার মূল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত করায়। বিধায়ক গবেষণা সংস্কার-আশ্রিত জ্ঞানে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বিবিধ বিধি আবিষ্কার করে। তাহাই পরম্পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হয়। উন্মোচক গবেষণা চিরাগত সংস্কার বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া তাহাকে বদ্ধমূল অবস্থা হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক জ্ঞানের গূঢ়তর স্তর প্রদর্শন করে, পরিশেষে তদ্দ্বারা প্রতীত ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য নিরাময় করিয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে নূতন আকারে প্রতিষ্ঠিত করে।

উন্মোচক গবেষণা প্রতীতিজাত সংস্কার উন্মোচিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিধায়ক গবেষণা উক্ত সংস্কারের সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া প্রতীত জ্ঞানেরই শৃঙ্খলা বিধান করে। তাহাতে অনেক অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়। তাহার মীমাংসার নিমিত্ত উক্ত সীমার বহির্ভাগে উপস্থিতি আবশ্যক। কিন্তু সংস্কারের সীমা উন্মুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে সে আবশ্যকতার উপলব্ধি আয়াসসাধ্য। যাঁহাদের মস্তিষ্কে এই উপলব্ধি উপস্থিত হয়, তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই উক্ত সীমা অতিক্রমণে অসমর্থ হইয়া মীমাংসাশূন্য কাল্পনিক যুক্তির অবতারণা করিতে থাকেন। ইহা হইতেই দার্শনিক বিতণ্ডার সৃষ্টি।

উন্মোচক গবেষণায় সংস্কারের সীমা অতিক্রমণের দ্বার উন্মোচিত হইলে পূর্ব্ব-প্রাপ্ত সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে বিপ্লব উপস্থিত হয়, সমগ্র বিজ্ঞান-শাস্ত্রে দৃষ্টি নবীন ভাবে ক্ষেপিত হয়; বৈজ্ঞানিক বিধি উলটপালটের নিমিত্ত নূতন উদ্যম আরম্ভ হয়; পরিশেষে বিভিন্ন ঘটনাবলী এরূপ উৎকৃষ্টতর বিধি-সমূহে শৃঙ্খলিত হইয়া বিজ্ঞান-জগতের যুগান্তর সৃষ্টি করে যে, পূর্ব্ব-প্রচলিত বিজ্ঞানশাস্ত্র নিতান্ত নগণ্য দশায় পরিণত হইয়া পড়ে।

যখন কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রথম প্রচারিত হয়, সে-সময়ে বিজ্ঞান-শাস্ত্র নিতান্ত সঙ্কীর্ণভাবেই আলোচিত হইত। সহস্র সহস্র বৎসরের চেষ্টায় ও জগতের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর চিন্তা যে গতিবদ্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে পাদক্ষেপ করিতে পারে নাই, কোপার্নিকাস্ তাহা উন্মোচন করিয়া বদ্ধ জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা হইতে উন্মুক্ত প্রান্তর অবলোকন করিলেন। গ্যালিলিও ও কেপ্‌লার নূতন উদ্যমে তথায় উপস্থিত হইলেন। নিউটন্ অভিনব উপকরণ সাহায্যে বিধায়ক গবেষণায় নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া তথায় নবযুগের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

তার পর বৈজ্ঞানিকযুগে যে-বিপ্লব উপস্থিত হইল, বৈজ্ঞানিকবর্গের নিকট তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু এখন আবার অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সে-সমস্ত বিপ্লব অতিক্রান্ত। এখন আর কোপার্নিকাসের উন্মোচনা ও নিউটনের বিধায়নায় আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। এখন মানব-চিন্তা চির-বাসভূমি ধরাধাম ছাড়িয়া আকাশে উড্ডীয়মান হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সমগ্র সৌরজগৎ এমন-কি নক্ষত্র-জগতের লীলাখেলা আয়ত্ত হইতে লাগিয়াছে। নূতন নূতন বিধায়ক গবেষণার সৃষ্টি হইতে লাগিয়াছে। কিন্তু আর যেন কেবলমাত্র নক্ষত্র-মণ্ডলে বিচরণ করিয়া প্রাণের ক্ষুধা মিটে না। প্রাণ আরও কিছু চায়। আবার উন্মোচক বা গবেষণার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আন্তিম (atom) নূতন আকারে প্রতিভাত হইল। অলক্ষ্যান্তিমে (electron) দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু ইহাকে উন্মোচক গবেষণা বলা যায় না। ইহা কোপার্নিকাসের আবিষ্কারের মত নহে। ইহার চেষ্টা অনেকটা বিধায়ক-গবেষণা-জাত। আঙ্কিক প্রমাণে অম্লজান (oxygen) প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ (elements) প্রত্যক্ষীভূত হইলে তাহাদের ধর্ম্মগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া কতকগুলি বিধি প্রাপ্ত হওয়া গেল। মনীষী ডেল্টন ইহার আবিষ্কর্ত্তা। ডেল্টনের বিধিগুলি পর্য্যালোচনা করা মাত্রেই আন্তিমের দিকে দৃষ্টি পড়ে। কোপার্নিকাসের মত-প্রচলিত সংস্কার দূর করিয়া ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় নাই।

মূলকণা (molicule), আন্তিম, অলক্ষ্যান্তিম প্রভৃতি যত সূক্ষ্ম পদার্থই আবিষ্কৃত হইত না কেন, বিভিন্নজাতির বলের (force) বিধিগুলি একভাবেই রহিয়াছে। নিউটনের গতি-সম্বন্ধীয় বিধিত্রয় মাধ্যাকর্ষণ (gravity) তত্ত্ব, বৈদ্যুতিক (electrical) আকর্ষণ তত্ত্ব প্রভৃতি সমাধানের কোন সুযোগই উপস্থিত হইতেছে না। এসমস্ত যেন আরও গোড়ার কথা। অথচ আমরা দেখিতেছি, একমাত্র গুরুত্ব (mass) ঘটিত পরিমাণ অনুযায়ীই এই বিভিন্ন প্রকার বলের ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। গুরুত্ব কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তবে উপরোক্ত বিধিগুলির আলোচনায় এই বুঝি যে, মাধ্যাকর্ষণ, তাড়িতাকর্ষণ ও বিভিন্ন গুরুত্বের মধ্যে পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত বলের ক্রিয়া যেন কোন নির্দ্দিষ্ট একই প্রকারের মৌলিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই তত্ত্ব পাওয়া গেলে অলক্ষ্যান্তিম প্রভৃতির গঠন-প্রণালী নিরূপিত হইবে এবং তদ্দ্বারা শক্তি (energy) ও গুরুত্ব জিনিষটা কি অবধারিত হওয়ায় আলো, তাপ, তড়িৎ, রসায়নিক (chemical) সংযোগ প্রভৃতির মূল, তত্ত্বগুলি গণিতের উপর নির্ভর করিয়াই সমাপ্তি হইবে। সমগ্র বিজ্ঞান-জগতে পুনরায় বিপ্লব সাধিত হইয়া নূতন আকারে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গঠন আরম্ভ হইবে।

কিন্তু এই মৌলিক তত্ত্বে উপস্থিত হওয়ার উপায় কি? উপায় উদ্ভাবনের দুরূহত্ব সামান্য নহে। কারণ আঙ্কিক প্রমাণের উপরই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার নির্ভর করে। যাহা আঙ্কিক প্রমাণ দ্বারা গৃহীত হয় নাই, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। মূলকণা,

আন্তিম ও অলক্ষান্তিমের বিধিগুলি কতকটা আক্ষিক প্রমাণের সহায়তা লইয়াই হইয়াছে। কিন্তু কোপার্নি-কাসের সময়েও এই দুরূহতা বর্ত্তমান ছিল। তিনি যদি প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়াই পৃথিবীর গতি নির্দ্ধারণ করিতেন, তবে পৃথিবীর উপরে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার তাহা করা চলিত না। তাঁহার সৌরজগৎ হইতে সরিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়ান আবশ্যক ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই এবং সেরূপ করা সম্ভবও নহে। তিনি কেবলমাত্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধির উপর নির্ভর করিয়াই যাহা কিছু কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। অথচ তাহাতে তাঁহার যুক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি সাধিত হইয়াছে, এরূপ কথা কেহ বলিতে পারিতেছেন না।

আমাদেরও সেরূপ সুবিধা আছে। আমরা যদি কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরুত্ব ও শক্তি লইয়াই চর্চ্চা করিতে যাই এবং মূলকণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর জিনিস অনুসন্ধান করিতে থাকি তবে তাহা সর্ব্বদা বিজ্ঞানের বর্ত্তমান সংস্কার যুক্ত বিধির উপর নির্ভর করিয়াই করিতে হইবে। আবহমান সংস্কার-জাত পৃথিবীর নিশ্চলতার উপর নির্ভর করিয়া কোপার্নিকাসের গবেষণা চালান যেরূপ অসম্ভব, ইহাও তাহাই।

তবে আমরা দেখিতে পাই, জগতের শক্তির মধ্যে আমরা ডুবিয়া আছি। আমাদের শরীর গুরুত্বময়। এমতাবস্থায় আমরা শক্তি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যে-তত্ত্ব পাই, তাহা টলেমির সিদ্ধান্তের ন্যায় সম্পূর্ণ আপেক্ষিক (relative)। সুতরাং এই আপেক্ষিকতা হইতে নিজকে স্বতন্ত্রীকরণ আবশ্যক। এই স্বতন্ত্রীকরণ মানসে আমাদের প্রাথমিক জ্ঞানের উপরে দৃষ্টি প্রয়োজন। আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের উপরেই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় আমরা ইতস্ততঃ যাহা দেখিতে পাই তাহা কি এবং বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তিতে তাহার মূলে কি আছে, প্রথমে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আমরা যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলি, যাহার প্রমাণের কোন আবশ্যক মনে করি না এবং যাহা প্রমাণ হইতে পারে না বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি; তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া গোড়ার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। "আমাদের ধরিত্রী সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত" ইহা যেরূপ কেবলমাত্র অহংকার-প্রসূত; স্বতঃসিদ্ধরূপে আমার ধারণা সমগ্র তত্ত্বের মূলে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও সেই রূপেই অহংজাত। এই অহংপূর্ণ সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ না করিলে মূলতত্ত্বে অবস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। অর্থাৎ অহংকে বলি দিয়া সম্পূর্ণরূপে যুক্তির উপরে দাঁড়াইতে হইবে। অনেক বিষয় আমরা ধারণা করিতে পারি না। পার্থিব সচলতায় সহজে ধারণা আসে না। দিনে পৃথিবীর উপরে দাঁড়াইয়া আছি, রাত্রে পৃথিবী ঘুরিয়া যায়। তথনও দেখি আমরা পৃথিবীর নীচে নামিয়া পড়ি নাই। দিনের মতই উপরে দাঁড়াইয়া আছি। নিম্নে বলিয়া কোন দিকে পতন হয় না। এ-সমস্ত কথা সেকালে মানব-ধারণার অতীত বলিয়াই বিবেচিত হইত। এখনও যদি স্বতঃসিদ্ধ (axiom) বিশ্লেষণ করিয়া এরূপ কোন তত্ত্বে উপস্থিত হওয়া যায় যাহা সাধারণ হিসাবে মানব-ধারণার অতীত কিন্তু যাহার যুক্তির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান নাই, তাহা হইলে সে-অবস্থায় কেবল ধারণার বহির্ভূত বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই।

উন্মোচক গবেষণার ধারণা সাধারণ ধারণা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এই নিমিত্ত যে, কেবলমাত্র গবেষকের মস্তিষ্কে প্রসূত হইলেই চলিবে তাহা নহে, ইহাকে যেন অপরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপযুক্ত করিয়া তোলা আবশ্যক। পরম্পরা-ক্রমে যদি গ্যালিলিও, কেপ্‌লার ও নিউটন জন্মগ্রহণ না করিতেন, তবে কোপানিকাসের পক্ষে সাফল্যলাভ সুদূর-পরাহত হইত। তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বে অপর এক মনীষী তাঁহারই উদ্ভাবিত সত্য মানব-জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইয়া-ছিলেন। ইঁহার নাম আর্য্যভট্ট। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয়, গ্রহণের অসমর্থতা-প্রযুক্ত তদীয় চিন্তার ধারাটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেন তাঁহার মনে পার্থিব অচলতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল, কেনই বা তিনি পৃথিবীকে সচলা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন, তাহা সংরক্ষিত করাও কেহ আবশ্যক বলিয়া বোধ করেন নাই। তাঁহার যাহা-কিছু সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর দেহের অনুসরণ করিল।

তুলনায় পার্থিব আবর্ত্তনের ধারণা অপেক্ষা সমগ্র চিন্তাজগতের কেন্দ্রজাত স্বতঃসিদ্ধ-নিচয়ের কুহেলিকা উন্মোচন করিয়া কেন্দ্রোত্তরে উপস্থিতি যে সমধিক আয়াস-লভ্য, তদ্বিষয়ে দ্বিধা করার কোন কারণ স্বভাবতঃই থাকিতে পারে না। উন্মোচনা ক্রমশঃই জ্ঞানরাজ্যের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তর আবিষ্কার করিবে। এঅবস্থায় এই স্বতঃ-সিদ্ধের কুহেলিকাজাল ছিন্ন করার নিমিত্ত কত আর্য্য-ভট্ট যে, মরুপ্রান্তরস্থিত মরীচিকায় আত্মনিয়োগ করিতে-করিতে শুষ্ক কণ্ঠে জীবন-সংগ্রামের অবসান করিবে, কতকাল পরে যে, গ্যালিলিও, কেপ্‌লার ও নিউটন যুক্ত দেশে পুনরায় দ্বিতীয় কোপানিকাসের জন্মগ্রহণ সম্ভব হইবে, কে জানে?

দেশ-বিদেশের কথা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা—

ইংলণ্ডের ৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বিজ্ঞান-বিভাগের একটি সভায় আচার্য্য বসু বক্তৃতা দেন। সভায় বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। যুবরাজ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ঐ সভায় ভারতের বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু যে-বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে, উদ্ভিদ-জগতের জীবনপ্রণালী প্রাণিজগতের জীবনপ্রণালী হইতে বিভিন্ন—একটি সর্ব্বদাই নিশ্চেষ্ট এবং অপরটি সর্ব্বদাই কার্য্যশীল। বাহ্য দৃষ্টিতে এই উভয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, তাহা মনে হয় না।

কলিকাতার বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই বিষয়ে ক্রমাগত দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, এই মত যথার্থ নহে। ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলেন যে, উদ্ভিদেরও হৃদয় আছে এবং তিনি স্পষ্টরূপে হৃৎস্পন্দন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন এবং উত্তেজক ও নিস্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের তারতম্য করিতে পারেন।

ঐ সভাতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা স্পন্দনকারী উদ্ভিদে ঔষধ প্রয়োগে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা প্রদর্শন করেন। মানুষের শরীরে রক্ত যেরূপভাবে সঞ্চালিত হয়, বৃক্ষদেহেও রস সেই ভাবেই যে পরিচালিত হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একটি মৃত প্রায় মেরীগোল্ড ইথারের মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং অপর একটি মৃতপ্রায় মেরীগোল্ড মারাত্মক বিষের মধ্যে স্থাপন করিলেন। প্রথম গাছটি পুনর্জ্জীবিত হইতে লাগিল, আর দ্বিতীয়টি ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া মরিয়া গেল।

অতঃপর একটি ছোট চারা গাছ বাঁচিবার জন্য যে বিপুল সংগ্রাম করিয়াছিল তাহা প্রদর্শন করায় শ্রোতৃবৃন্দ গভীর বিস্ময়-রসে মগ্ন হন। একটি অন্ধকার-গৃহে ঐ চারাগাছের নাড়ীর একটি প্রতিচ্ছবি প্রাচীর-গাত্রে আলোক-চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শন করা হয়। ঐ চারাগাছটির মধ্যে বিষ প্রয়োগ করা হইল। আলোক-বিন্দু বাম দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে সরিয়া গেল। তারপর যখন ঐ চারা গাছটি মৃতপ্রায় হইল, তখন উহাকে ইথারের মধ্যে স্থাপন করা হইল। এক মিনিট পরেই আলোক-বিন্দু স্থির হইল, তার জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তারপরই ঐ আলোক-বিন্দু দক্ষিণ দিকে—অর্থাৎ জীবনের দিকে—সরিয়া গেল। দক্ষিণের দিকে যখন আলোক-বিন্দু সরিতে লাগিল, তখন সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি উপস্থিত হইল।

ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র—

ভারতের হাই-কমিশনার সম্প্রতি যে-বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিভিন্ন ব্রিটিশ বিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়;—লণ্ডন ৩৬০, কেম্ব্রিজ ১১৭, অক্সফোর্ড ৮৬, এডিনবরা ১৬৫, গ্লাসগো ৬২, ম্যানচেষ্টার ৫১, ব্রিষ্টল ২৪, সেফিল্ড ২১ লীডস্ ১৭, বেলফাষ্ট ১৩, এবারিষ্টিথ ৪। এতদ্ভিন্ন ৫৮৩ জন ছাত্র ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে নারী সদস্য—

সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভার, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচন বিষয়ক নিয়মাবলী সংশোধিত হইয়া পালিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার মত থাকিলে সাধারণতঃ সকল শ্রেণীর মহিলাগণ ব্যবস্থাপক সভা সমূহের ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইতে পারিবেন। ব্যবস্থাপক সভায় মহিলাদের অনেক কার্য্য রহিয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা ইতিমধ্যেই মহিলাদের নির্ব্বাচনে অথবা মনোনয়নে মত দিয়াছেন। কবি হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীযুক্তা কমলা দেবী মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপকে সভার সদস্য-পদপ্রার্থী হইয়াছেন। আশা করি, অন্য সমস্ত প্রাদেশিক ব্যাস্থাপক সভাতেও এই অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তাব গৃহীত হইবে।

প্যান্-এশিয়াটিক্ কংগ্রেস—

টোকিওতে প্যান্-এশিয়াটিক্ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এশিয়ার সমস্ত দেশের প্রতিনিধিগণ এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন এবং পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং বিপদে-আপদে পারস্পরিক সাহায্য—এই কংগ্রেসের দ্বারা এইসকল উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া ভারতবাসীর এই প্রতিষ্ঠানে উৎসাহের সহিত যোগ দেওয়া উচিত।

কংগ্রেসে ফিলিপাইন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্য কংগ্রেসে তাহা আলোচিত হইতে পারে নাই। কেননা ইংরেজের মিত্র জাপান পুলিশ দিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা প্রতিনিধিগণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই বিষয়ে প্রতিনিধিগণই গোপনে আলোচনা করিবেন বলিয়া স্থির করেন।

ইণ্ডিয়ান্ কারেন্সী কমিশন—

ইণ্ডিয়ান্ কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কমিটির অধিকাংশের মতে প্রধান সিদ্ধান্ত কয়েকটি এই—

(১) ভারতে স্বর্ণমান প্রচলিত হইবে; (২) টাকার মূল্যের হার ১ শিলিং ৬ পেন্স নির্দ্ধারিত হইবে; (৩) রূপার টাকা ভবিষ্যতে টাকশাল হইতে মুদ্রণ করা হইবে না; (৪) ভারতে একটি সেন্ট্রাল্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ঐ ব্যাঙ্ককে কারেন্সী নোট বাহির করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

কমিটীর অন্যতম সদস্য স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস একটি অসম্মতিসূচক মন্তব্যে বেশ করিয়া হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ১ শিলিং ৪ পেন্সের স্থলে ১ শিলিং ৬ পেন্স বিনিময়ের হার হওয়াতে কার্যতঃ ভারতে আমদানী বিদেশী পণ্যের উপর শতকরা ১২॥ ভাগ বাউন্টী বা সাহায্য দেওয়া হইল।

কাঙ্গরা গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়—

গুরুকুল বিশ্ব-বিদ্যালয় এবৎসর ২৫ বৎসরে পড়িল। এজন্য উহার "জয়ন্তী" উৎসব আগামী বৎসর মার্চ্চ মাসে সম্পন্ন হইবে। প্রথমতঃ একটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে কলেজ এবং পরে আজ কয় বৎসর উহা একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আকারে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক গুরুকুল একটি উচ্চ আদর্শ ও জাতীয় সম্পদ। বঙ্গদেশের অনেকেই ইহার বিষয় বিশেষ কিছু জানেন না। বাঙ্গালী অধ্যাপক ও বাঙ্গালী ছাত্র কিন্তু এখানে প্রায় সকল সময়ই আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চার জন্যও এখানে ব্যবস্থা আছে। অত্রত্য অনুবেশন (Research) বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিধুভূষণ দত্ত এখানে একটি বাঙ্গলা লাইব্রেরী ও বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক পদ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

বাঙ্গলার স্বাস্থ্য-বিবরণী—

বাঙ্গলার ১৯২৪ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত হইতে কয়েকটি স্থূল বিষয় সহযোগী স্বাস্থ্য-সমাচার হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা দ্বারা তাঁহারা আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানের জন্ম-মৃত্যু-সংখ্যার একটা তুলনামূলক হিসাব পাইবেন এবং দেশ স্বাস্থ্য-বিষয়ে কতদূর উন্নতি বা তদ্বিপরীত অবস্থা লাভ করিতেছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন।

জন্ম-মৃত্যুর স্থূল বৃত্তান্ত (১৯২৪)—

১৯২৪ সালে প্রাদেশিক জন্ম-হার হাজার-করা ২৯.৫ জন হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ২৯.৯ জন হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু-হার হাজার-করা ২৫.৯ জন হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ২৫.৫ জন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে জন্ম-সংখ্যা শতকরা ১.৩ জন করিয়া কমিয়া গিয়াছে; মৃত্যু-সংখ্যাও শতকরা ১.৫ জন করিয়া বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় কলেরা, জ্বর ও অন্যবিধ ব্যারামের ফলে মৃত্যুর মাত্রা এই সালে কিছু বাড়িয়াছে; প্লেগে মৃত্যু কিছু কমিয়াছে এবং বসন্ত, আমাশয়, পেটের অসুখ, শ্বাসযন্ত্রীয় রোগে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় সমানই রহিয়াছে।

জন্মের বিশদ বিবরণ—

আলোচ্য বর্ষে ১৩,৭০,১১৪টি জন্ম-সংবাদ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭,১০,৯৭৩ জন পুরুষ ও ৬,৫৯,১৪১ জন স্ত্রীলোক, (অর্থাৎ প্রতি শত স্ত্রী-শিশুর অনুপাতে ১০৭ জন পুরুষ-শিশু) জন্মিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রাদেশিক জন্মহার ১৯২৪ সালে হাজার-করা হয় ২৯.৫; ১৯২৩ সালে ছিল ২৯.৯; গত দশ বৎসরের মাধ্যমিক হার ৩০.৩।

বাংলার সমগ্র জেলাসমূহে জন্মহার গত ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান হইল:—

নং	জেলার নাম	১৯২৪ সালের জন্মহার (হাজার করা)	১৯২৩ সালের জন্মহার (হাজার করা)	গত দশ বৎসরের জন্মহার (হাজার করা)
১।	মুর্শিদাবাদ	৪১.৫	৪২.০	২৯.৬
২।	দিনাজপুর	৩৫.০	৩৪.৭	৩৫.৮
৩।	মালদহ	৩০.০	৩৫.৮	৩১.৬
৪।	রাজসাহী	৩২.৫	৩৪.৯	৩৫.৪
৫।	নদীয়া	৩৩.৭	৩৭.৯	৩৫.৪
৬।	বীরভূম	৩৭.৫	৩৭.৩	৩৪.৪
৭।	বাঁকুড়া	৩৩.৫	৩৩.৭	৩৩.৮
৮।	জলপাইগুড়ি	৩১.৯	৩৪.৪	৩৩.৩
৯।	চট্টগ্রাম	৩৪.২	৩০.৪	৩৩.১
১০।	নোয়াখালি	৩৫.১	৩২.০	৩২.৮
১১।	রংপুর	৩১.৬	৩০.২	৩২.২
১২।	বাখরগঞ্জ	৩৩.৫	৩১.৮	৩২.০
১৩।	খুলনা	২৯.৫	২৯.২	৩১.০
১৪।	দার্জিলিং	৩৩.৫	৩৩.৯	৩০.৮
১৫।	ফরিদপুর	২৯.৯	৩২.২	৩০.২
১৬।	ঢাকা	২৯.০	২৯.৪	৩০.১
১৭।	বর্দ্ধমান	২৭.৪	৩০.২	২৯.৯
১৮।	মেদিনীপুর	২৭.২	২৮.৯	২৯.৮
১৯।	হাওড়া	২৭.৩	২৯.২	২৮.১
২০।	যশোহর	২৮.২	৩২.১	২৮.০
২১।	পাবনা	২৩.৬	২৭.২	২৭.৯
২২।	ময়মনসিংহ	২৮.৯	২৬.৫	২৭.৮
২৩।	হুগলী	২৫.৪	২৮.৪	২৭.৭
২৪।	বগুড়া	২৪.৬	২৩.৮	২৭.২
২৫।	ত্রিপুরা	৩২.২	২২.১	২৬.৪
২৬।	২৪ পরগণা	২২.২	২৩.৫	২৩.৫
২৭।	কলিকাতা	১৮.৩	২০.১	১৯.২

মৃত্যুর বিশদ বিবরণ—

১৯২৪ সালের প্রাদেশিক মৃত্যু-হার দাঁড়াইয়াছে হাজার-করা ২৫.৯; তৎপূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ২৫.৫; পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা হার ছিল ২৯.৬। আলোচ্য বর্ষে প্রকৃতপক্ষে ১২,০৩২,৪৪টি মৃত্যু লিপিবদ্ধ করা হয়; পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ১১,৮৫,৭৯১। ১৯১৯ সালে মৃত্যু-হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল (হাজার-করা ৩৬.২), ১৯২২ সালে কমিতে-কমিতে হাজার-করা ২৫.২ এ দাঁড়ায়, পরে আলোচ্য সালে কিছু বাড়িয়া ২৫.৯ এ উপস্থিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এবার রাজসাহী বিভাগে মৃত্যু-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে (হাজার-করা ৩০.৪); চট্টগ্রাম বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা কম দেখা যাইতেছে (হাজার-করা ২০.৮)। নিম্নে বিভিন্ন জেলার ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালের তুলনামূলক মৃত্যুর হিসাব দেওয়া গেল:—

নং	জেলা·	মৃত্যু-হার ১৯২৪ (হাজার-করা)	মৃত্যু-হার ১৯২৩ (হাজার-করা)	গত দশ বৎসরের গড়পড়তা হার (হাজার-করা)
১।	বীরভূম	২৮·৬	২৭·১	৪২·৯
২।	মুর্শিদাবাদ	২৬ ৯	২৬·৮	৪২·৯
৩।	নদীয়া	২৯·২	২৯·১	৪১·৬
৪।	দার্জিলিং	৩৬·১	৩৩·৩	৩৯·২
৫।	বর্দ্ধমান	২৫ ৩	২৫·৯	৩৮·৩
৬।	রাজসাহী	৩৪·৬	৩৫·৬	৩৭·৯
৭।	বাঁকুড়া	২৭·৮	২৪·২	৩৭·২
৮।	দিনাজপুর	৩০·৭	৩৪·৭	৩৪·১
৯।	মালদহ	২৩·৪	২৫·৯	৩৬·৩
১০।	জলপাইগুড়ি	৩১·২	২৯·৩	৩৩·৮.
১১।	হুগলী	২৫ ৬	২৫·৩	৩১·২
১২।	মেদিনীপুর	২৪ ৭	২৩ ৬	৩২·১
১৩।	পাবনা	২৯·১	২৮·১	৩৮·৮
১৪।	কলিকাতা	২৯·৬	২৮·৪	৩১·০
১৫।	যশোহর	২৭·২	২৬·২	৩·১০
১৬।	রংপুর	১৩ ৮	২৯·৮	৩০·১
১৭।	চট্টগ্রাম	২৩·২	২৪·২	২৮·৮
১৮।	বগুড়া	২৬ ৪	২৯·০	২৮·৫
১৯।	খুলনা	২৩·৯	২৩·৩	২৭·৮
২০।	ফরিদপুর	২৫·০	২২·৬	২৭·৬
২১।	হাওড়া	২৪·৩	২২·২	২৭ ৫
২২।	বাখরগঞ্জ	২৬·১	২৫·৭	২৭·৩
২৩।	ঢাকা	২২ ৭	২২·৩	২৫·৯
২৪।	নোয়াখালী	২৫·৪	২৪·৬	২৫·৫
২৫।	২৪ পরগণা	২৪·২	২২·০	২৪·৮
২৬।	ময়মনসিংহ	২৩·৯	২৩·৯	২৩·৭
২৭।	ত্রিপুরা	১৬ ৮	১৮·০	২০·৪

বঙ্গের মোটমাট ২৭টি জেলার মধ্যে মাত্র সাতটি জেলায় মৃত্যু-হার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিছু কম দেখা যাইতেছে; বাকী ১৯টি জেলায় মৃত্যু-হার অপেক্ষাকৃত বাড়িয়াছে ও কেবল একটি মাত্র জেলায় (ময়মনসিংহে) উহা সমান রহিয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় শতকরা ১৪·৮ জন, ফরিদপুরে শতকরা ১০·৬ জন এবং চব্বিশ পরগণায় শতকরা ১০ জন করিয়া মৃত্যু ১৯২৩ সালের মৃত্যু-হার হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিনাজপুরে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় মৃত্যু-হার শতকরা ১১·৬ হিসাবে কমিয়াছে। গত দশ বৎসরের মাধ্যমিক মৃত্যু-হারের তুলনায় সব জেলাতেই মৃত্যু-হার কম দেখা যাইতেছে; মুর্শিদাবাদে সব-চেয়ে বেশী কমিয়াছে (শতকরা ৩৭·৩ জন)।

মৃত প্রসূত —

মৃত-প্রসূতের সংখ্যা আমাদের দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৩ সাল অপেক্ষা ১৯২৪ সালে এই পর্য্যায়ের মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৩·৩ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২১ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৫৩,২৯৬; ১৯২৪ সালে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ৬৪,১৫৯। অনেক স্থানে মৃত-প্রসূতের সংখ্যা পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হইতে বাদ পড়িয়া যায়। আলোচ্য বর্ষে মোটামুটি প্রায় ৯০,০০০ মৃত সন্তান প্রসূত হইয়াছে বলিয়া অনুমান।

চট্টগ্রাম, রংপুর, নোয়াখালি পাবনা, কলিকাতা, ত্রিপুরা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় প্রতি ১৬টি হইতে ১২টি প্রসূত সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ একটি করিয়া মৃত প্রসব হয়।

১৯২৩ সালের তুলনায় ১৯২৪ সালে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা বেশী হইয়াছে। দেশীয় খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

একমাত্র ঢাকা জেলা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিভাগেই মুসলমানদিগের মৃত্যুর সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী। দার্জ্জিলিংয়ে হাজার-করা ৪০·৫, রাজসাহীতে ৩৬·৬, কলিকাতায় ৩৪·৫ ও জলপাইগুড়িতে ৩৪·২ জন মুসলমান মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যেও দার্জ্জিলিং ও রংপুর হইতে যথাক্রমে হাজার করা ৩৯·৫ ও ৩২·৫ জন হিসাবে মৃত্যু হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্ব জাতির সর্ব্ব বয়সের পুরুষমৃত্যুর সংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা বেশী হইয়াছে, কেবল ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা রমণীগণের (যে বয়সে সাধারণতঃ তাঁহারা অধিক সংখ্যক সন্তান প্রসব করেন) মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা এতদনুরূপ বয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর বলিয়া জানা যায়। পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স্ক এবং পঞ্চাশ হইতে সত্তর বৎসর বয়স্ক পুরুষদিগের মৃত্যু-সংখ্যা সমবয়স্কা নারীদিগের অপেক্ষা খুব বেশী। সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৩৩ জনের মৃত্যুই জন্মের একমাস হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এবং শতকরা ৮ জনের মৃত্যু পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে বাংলায় শিশু-মৃত্যু হইয়াছে মোট ২,৫২,৩৩৭; ১৯২৩ সালে হইয়াছিল ২,৫৩,৬৯৪; অর্থাৎ এই দুই বৎসরে যথাক্রমে জন্মপ্রাপ্ত প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ১৮৪·২ ও ১৮২·১ জন (এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক) শিশুর ইহলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। মৃতপ্রসূত শিশুর সংখ্যা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। ১৯২৪ সালে হাজার করা ১৯১·৪ পুরুষশিশু ১৭৫·৪ স্ত্রী-শিশুর মৃত্যু হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে ১২৭টি পুরুষ শিশু মারা গিয়াছে, তথায় মাত্র ১০০টি কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুরুষ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে ক্রমান্বয়ে দার্জ্জিলিং, কলিকাতা, ফরিদপুর, যশোহর ও হাওড়া। কলিকাতায় পুরুষ-শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা হাজার-করা ৩২৭·৮ ও স্ত্রী-শিশুর হাজারকরা ৩০৫·০; ত্রিপুরায় যথাক্রমে ১৩৭·৬ ও ১১৭·১—সর্ব্বাপেক্ষা কম।

গত পাঁচ বৎসরের তুলনায় শিশু-মৃত্যু সর্ব্ব জেলায় হ্রাস পাইতেছে, কেবল পাবনা জেলায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরের মধ্যে কলিকাতা, টিটাগড়, (চব্বিশ পরগণা) ও বাঁশবেড়িয়ায় (হুগলী) হাজার-করা তিন শত শিশুর বেশী মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে।

বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত এম্ এ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এস্-টি-এম্ (মাষ্টার অব সায়েণ্টিফিক্ থিওলজি) উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার অধ্যাপকগণ তাঁহার বিশেষ প্রসংশা করিয়াছেন।

ঘাটালে বন্যা—

ঘাটাল মহকুমায় বন্যার ফলে ১৯ বর্গমাইল ভূমি জলমগ্ন হইয়াছে। তাহাতে ২০০ শত গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে। ঐ গ্রামগুলির অধিবাসীদের সংখ্যা ৮ হাজারের অধিক। বন্যার জল বাহির করিয়া দিবার জন্য পাব্লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট্ বাঁধের কতকটা অংশ কাটিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় বারের বন্যার জল দ্বিগুণ বেগে ঐ পথ দিয়া প্রবেশ করে।

গ্রামগুলি এখন জলে ডুবিয়া গিয়াছে। শীঘ্র যে এই জল নিষ্কাশিত করা যাইবে এমন আশা নাই। গ্রাম-বাসীদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। প্রত্যহ শত শত গৃহ পড়িয়া যাইতেছে। ব্যারাম দেখা দিয়েছে। কলেরা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। শতকরা ৮০ জন লোক খাইতে পাইতেছে না। এই বৎসর এখানে কোন শস্যই পাওয়া যাইবে না, বরং অন্যান্য প্রকার ভীষণ ক্ষতিরও সম্ভাবনা। ঘাটাল বন্যা সাহায্য কমিটি দুঃস্থ লোকদের মধ্যে দুইদিন চাউল, ডাল বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সাহায্য প্রচুর নহে।

আসাম—

ভয়ানক বৃষ্টির দরুন্ চিন্তা নদীর জল বাড়িয়া আসামের নানা স্থানে বন্যা হইয়াছে। রেল লাইন ভাসিয়া গিয়া একস্থান হইতে অন্যত্র যাইবার পথ বন্ধ হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের কথা—

রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে সকল সময়েই কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সকল যাত্রী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ না করিলে এ-বিষয়ে সাফল্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি "তৃতীয় শ্রেণী যাত্রী সমিতি" গঠনের জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য সত্বর কলিকাতায় একটি সভা আহ্বান করা হইবে।

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

পাবনার হিমাইতপুরের প্রমথনাথ হালদার, সম্প্রতি তাঁহার স্বজাতীয়া একটি বিধবা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৪ শত লোক যোগদান করিয়াছিল। সম্প্রতি চিথলিয়াতে এবং সাগরকান্দির কাপালিকদের মধ্যে কয়েকটি বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মৈমনসিংহে টাঙ্গাইল হিন্দু সভার উদ্যোগে বিগত মাসে টাঙ্গাইলের উপকণ্ঠে সুরুঙ্গ ও পয়লা গ্রামে দুইটি বিধবা বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। টাঙ্গাইলের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি বংশীয় বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উভয় বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া বর ও বধূকে আশীর্ব্বাদ ও সভাসৌষ্ঠবাদি করিয়াছেন। সুরুঙ্গ গ্রামে শ্রীমান্ রাধানাথ দাস মালীর সহিত শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী দাসীর বিবাহ হইয়াছে, রাধানাথের বয়স ৩৪।৩৫ বৎসর এবং কৃষ্ণকুমারীর বয়স ১৮।১৯ বৎসর। সে ১০ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল।

পয়লা গ্রামে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র তিলকদাস শ্রীমতী এলোকেশী দাসীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ঈশানচন্দ্র ঐ-গ্রামের একজন সমৃদ্ধ গৃহস্থ। তিনি দ্বিতীয় পক্ষে এই বিধবাকে বিবাহ করিলেন। এলোকেশীর বয়স ১৯।২০ বৎসর, সে ১২ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল।

কর্ম্মী বালক—

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অধীন, সাহাজিরা গ্রাম নিবাসী, কতিপয় বালক একত্র হইয়া, গ্রামের মধ্যস্থ সাধারণের গমনাগমনের রাস্তাগুলি নিজ হাতে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে যে স্থানগুলি তাহারা এই অল্পদিনের মধ্যে সুগম্য রাস্তায় পরিণত করিয়াছে; এযাবৎ উহা মনুষ্য চলা-চলের অযোগ্য ছিল। লোকালবোর্ড বা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মুখের দিকে না চাহিয়া বালকগণ যে আপন বাহুবলের পরিচয় দিতে উৎসাহিত হইয়াছে, এজন্য তাহারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

মুসলমানের মহানুভবতা—

সহযোগী সঞ্জীবনীতে প্রকাশ—রংপুর জেলার অধীন বামনডাঙ্গা এষ্টেটের উত্তরাধিকারিণী সুনীতিবালা দেবী তাঁহার পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রিক্ত হস্তে লোকের দ্বারে দ্বারে পিতৃদত্ত সম্পত্তির উদ্ধার কল্পে যখন ঘুরিতেছিলেন, তখন সেই ১৯০৪ সালে বদান্যবর আলা মহম্মদ বক্স ইস্পাহানী নামক জনৈক মুসলমান বণিক সুনীতিবালার স্বত্ব মামলা করিয়া স্থির রাখিবার জন্য ২৩ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। ঐ-টাকা সুদে আসলে গত মে মাস পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা হইয়াছিল। সুনীতিবালা বর্ত্তমানে যখন টাকা পরিশোধ করিতে যান সেই সময় এই মহাত্মার পুত্র লক্ষাধিক টাকা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সামান্য বিশ হাজার টাকা গ্রহণে সুনীতিবালার দেনা শোধ গণ্য করিয়া ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। এই মহানুভব মুসলমান বণিকের আদর্শ বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-মুসলমানের চক্ষু উন্মীলিত করুক।

হিন্দু সমাজ সংস্কার—

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার উদ্যোগে একটি সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সভায় নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। (১) যদি কোন হিন্দু স্ত্রীলোককে কেহ চুরি করিয়া লইয়া যায় কিংবা জোর করিয়া অত্যাচার করে বা সতীত্বনাশ করে, তবে তাহাকে শরীর শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে গ্রহণ করা যাইবে। এইসকল ব্যাপারে ভক্তি-সহকারে গঙ্গাস্নান করিলেও শুদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট মনে করা যাইবে। (২) যদি শালগ্রামশিলা চক্র পর্য্যন্ত ভগ্ন হয়, তবে ইহা কোন এক নদীতে বিসর্জ্জন দিয়া আর-একটি নূতন স্থাপন করিতে হইবে। যদি চক্র না ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে বিসর্জ্জনের কোন দরকার নাই। যদি প্রতিষ্ঠিত দেব-বিগ্রহ ভগ্ন হয়, তবে তাহাও পূর্ব্বোক্তরূপে বিসর্জ্জন দিয়া শাস্ত্রানুসারে আবার নূতন দেব-বিগ্রহ স্থাপন করিতে হইবে। সঙ্গতিপন্ন হিন্দুদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য করণীয়। (৩) কেবল 'কলমা' পাঠ করা হিন্দুর পক্ষে পাপ নহে। যদি কোন হিন্দুকে জোর করিয়া অন্য জাতির কেহ ভাত কিংবা অন্য কোন নিষিদ্ধ বস্তু খাওয়াইয়া দেয়, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে গ্রহণ করা হইবে। (৪) যদি কেহ উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহের শাস্ত্রীয় আদেশ চান, তবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা হইতে বিনামূল্যে তাহা দেওয়া হইবে।

বাঙ্গালার জেল—

জেল কমিটির অনুমোদনানুসারে বাঙ্গালার জেল-সমূহের ১৯২৫ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে জেলের উন্নতি-মূলক অনেক কাজ করা হইয়াছে বলিয়া জেল-বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বয়সের বালক কয়েদীদিগের জন্য পৃথক্ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাহাদিগকে সাধারণ কয়েদীদের মত রাখা হইবে না। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য আলীপুরের জুভেনাইল্ জেলখানাটিকে পুনর্গঠন করিয়া টেক্‌নিক্যাল্ ও সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। টেক্‌নিকেল্ বিভাগে শিক্ষিত একজন কর্ম্মচারীকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গীয় শিশু আইনানুসারে শীঘ্রই উক্ত জুভেনাইল্ জেলকে সংশোধনাগার বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। ঐ স্থানে কলিকাতা ও সহরতলী এবং হাওড়া অঞ্চলের ১২-১৫ বৎসর বয়স্ক বালক অপরাধীদিগকে গ্রহণ করা হইবে।

তার পরে ১৯২৭ সনে, ১৬টি হইতে ২১ বৎসর বয়স্ক যুবক-অপরাধীদিগের রাখার জন্য একটি পৃথক্ বাড়ী তৈয়ার করিয়া ইংলণ্ডের বোরষ্ট্যাল্ বিদ্যালয়ের আদর্শে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। বার বৎসর বয়সের অনধিক বালক কয়েদীদের জন্য শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে।

রিপোর্টে কয়েদীদের বিশেষতঃ বালক কয়েদীদের মুক্তির পর তাহাদের সাহায্যের ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। রিপোর্টে প্রকাশ, সামান্য শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের সংখ্যা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাঙ্গালার জেলসমূহে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েদীদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

সশ্রম কয়েদীদের গড়পড়তা উপার্জ্জন আলোচ্য বর্ষে ৬৭৮/০ হইয়াছে। গত বৎসর ৭৪।৵ আনা হইয়াছিল। উপার্জ্জন হ্রাসের কোন কারণ দেওয়া হয় নাই। ম্যানুফ্যাক্চার বিভাগে গত বৎসরের চেয়ে আলোচ্য বর্ষে কয়েদীদের সংখ্যা অল্প বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরলোকে বাঙ্গালী ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসু—

লণ্ডনের ৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। বরোদার গাই-

ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসু

কোয়ারের তিনি বহু কার্য্য করিয়াছেন এবং রয়াল স্কটিশ এ্যাকাডেমীতে অনেকবার তিনি প্রদর্শক রূপে উপস্থিত হইয়াছেন। যদিও তিনি ষোল বৎসর বয়স হইতেই লণ্ডনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা হইলেও প্রাচ্য শিল্পকলার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল।

বাংলায় নারী-নিগ্রহ—

বাংলায় নারী-নির্য্যাতনের সংখ্যা এমাসেও কম নহে। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে ঐ-বিষয়ক ২।১ একটি লজ্জাকর সংবাদ পাঠ করি। আশার কথা দুই-একটি ক্ষেত্রে গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবক দল অথবা অন্য ভদ্রলোক নিজেদেকে বিপন্ন করিয়াও কয়েকটি বলপূর্ব্বক-অপহৃত নারীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। শ্রীহট্টের জনশক্তিতে প্রকাশ যে, নবীগঞ্জ থানার দারোগা মৌলবী মনাওর আলী প্রভৃত কষ্ট স্বীকার করিয়া এইরূপ একটি নির্য্যাতিত হিন্দু নারীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। অনেক স্থলে দুর্ব্বৃত্তরা অল্প শাস্তি পাওয়ায় অথবা তাহাদের দুষ্কার্য্যের প্রতিকার না হওয়াতে অধিকতর প্রশ্রয় পাইতেছে।

সুখের বিষয়, সংবাদপত্রের আলোচনার ফলে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী আগামী ভারতীয় এসেম্বলীর অধিবেশনে এই উদ্দেশ্যে একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করিবেন। এই আইনে স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার, স্ত্রী-হরণ প্রভৃতি স্ত্রী-লোকের উপর অত্যাচার-ঘটিত অপরাধে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে এবং ঐ-সমস্ত অপরাধের তদন্ত ও মামলার বিচার যাহাতে যথাসম্ভব শীঘ্র নিষ্পন্ন হয়, তাহারও ব্যবস্থা হইবে। বাঙ্গালা দেশে ও ভারতের নানা স্থানে নারীনির্য্যাতনকারী গুণ্ডা বদমায়েসদের সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে নিয়োগী-মহাশয়ের আইনের খসড়া এসেম্বলীতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া উচিত।

নারীরক্ষা সমিতির নিবেদন—

বঙ্গীয় নারীরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র নিম্নলিখিত নিবেদন-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা থানার অধীন ভুয়াইর গ্রামে এক গরীব পরিবার বাস করে। সে পরিবারে বৃদ্ধা বিধবা মাতা, শ্রীমতী রাধারাণী নাম্নী বিধবা পুত্রবধূ ও ১৬।১৭ বয়স্ক এক পুত্রসহ বাস করেন। রাধারাণীর বয়স ২১ বৎসর। গত চৈত্র মাসের শেষে ৪ জন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান শাশুড়ীর সম্মুখ হইতে রাধারাণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। ২৪ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে ফরিদপুর জেলার নানা-স্থানে এবং ঢাকা জেলার অন্তর্গত লেছড়াগঞ্জে লুকাইয়া রাখে। অবশেষে ৩২শে বৈশাখ একজন মুসলমান রাধারাণীকে কলিকাতা আনিতে রাজবাড়ী ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। একজন পুলিশ কর্ম্মচারী সেই মুসলমানের হস্ত হইতে রাধারাণীকে উদ্ধার করেন এবং মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেন। অতঃপর ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে।

এই মোকদ্দমার বাদী পক্ষে ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার ৪২ জন সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে হইবে। আসামীগণ ধনী ও প্রতিপত্তিশালী। সুতরাং দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিতে হইলে প্রায় পনের শত টাকা ব্যয় করিতে হইবে। বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা নারী হরণ করিতেছে। ইহাদিগকে দণ্ডিত করিতে না পারিলে নারীর সতীত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। নারীরক্ষা সমিতি বঙ্গদেশের নানা জেলায় অনেক দুর্ব্বৃত্তকে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং তাহার শুভ ফল হইয়াছে। মিঃ এস, আর দাস নারীরক্ষা সমিতির সভাপতি। প্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ইহার সহকারী সভাপতি, বিখ্যাত এটর্ণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ইহার ধনাধ্যক্ষ, কলিকাতার অনেক মাননীয় ব্যক্তি ইহার সভ্য। বঙ্গের প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তির নারীর ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য অর্থদান করা কর্ত্তব্য; তদ্বিষয়ে

৩ সন্দেহ নাই। নারীরক্ষা সমিতির নিবেদন এই যে, আপনারা ...ীর মোকদ্দমা পরিচালনে যথোপযুক্ত অর্থদান করিয়া দুর্ব্বৃত্ত-সহায়তা করিবেন।

...ার খাদির প্রসার—

...দি প্রতিষ্ঠানের প্রচার-বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত বিবরণ হইতে যায়:—

...ত মে মাসে খাদি-প্রতিষ্ঠান মোটের উপর ১৭,৯৮১ টাকার খাদি করিয়াছে। জুন মাসের বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫,৬৯৬ টাকা। ১৯২৪ সালে উক্ত দুই মাসের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৮৫৪ টাকা এবং ৬৫২৯ টাকা এবং ১৯২৫ সালে ছিল যথাক্রমে ১৮২১০ টাকা এবং ১৩৪২২ টাকা। ১৯২৪ সালে জানুয়ারী হইতে জুন এই ছয় মাসে মোটের উপর তাঁহারা ২৪২১৬ টাকার খাদি বিক্রয় করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে উক্ত ছয় মাসের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৭০৬১৬ টাকা, এবৎসর উক্ত কয়মাসে সেই পরিমাণটা উঠিয়াছে ১২০৫০৬ টাকাতে। এই তিন বৎসরের প্রত্যেক মাস ভিন্নভাবে হিসাব করিলেও দেখা যায়—বাংলায় খাদির বিক্রয় সমষ্টিগতভাবে যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে—মাসিক হিসাবেও তেম্‌নি বাড়িয়া চলিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের প্রাচীন চিত্র-সংগ্রহ

শ্রী রমেশ বসু

...ত হ্যাভেল্ সাহেব "ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা" ...ম পুস্তক প্রকাশ ক'রে প্রাচ্য শিল্পের ইতিহাসে এক ...ন্তর এনে দিলেন। এর আগে ভারতীয় প্রাচীন শিল্প ...ন্ধে যে-সব ধারণা চলিত ছিল সেগুলি সব ওলট্‌পালট্ ...য় গেল। ক্রমে শিল্প-সমালোচকেরা উক্ত শিল্পের মাহাত্ম্য ...ার করতে লাগলেন, আর শিল্প-সংগ্রাহকেরাও প্রাচীন ...রতীয় নিদর্শনগুলির আদর করতে সুরু ক'রে দিলেন। ...রতীয় শিল্প-ব্যাপারে শ্রীযুত হ্যাভেলের আগ্রহ ও তাঁর ...তে যে-সব চমৎকার চিত্র প্রকাশিত হ'য়েছিল, এ দুটি ...ে অজিত ঘোষের মনে খুব প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। আগে থেকেই এঁর বই কিন্‌বার বাতিক ছিল এবং ...দিন লণ্ডনের কোনো বইয়ের দোকানের তালিকায় ...নি দেখতে পান যে, "ভারতীয় ন' খানা প্রাচীন চিত্র" ...ী হ'বে ব'লে লেখা রয়েছে। তখনই তিনি সেগুলি ...ন্‌বার জন্যে চিঠি দেন। এই ছবিগুলির পার্শেল এলে ...নি দেখে খুব আনন্দ পেলেন, কারণ, কতকগুলি ছবির ...ছনে কোনো বিদেশীর হাতে লেখা ছিল 'আক্‌বর', ...ঙ্গ' ইত্যাদি অদ্ভুত ধরণের নাম। ছবিগুলি দেখেই ...নি বুঝতে পার্‌লেন যে, ন'খানার মধ্যে সাতখানা ছবি ...ল বাদশাদের ছবি ও প্রাচীন মুঘল চিত্রকলার উৎকৃষ্ট ...দর্শন, আর বাকী রাধা ও কৃষ্ণের রাজপুত চিত্র। ...রূপে হঠাৎ কয়েকখানা ভাল ছবি থেকেই এই সংগ্রহের ...ন হ'য়েছিল। গত প্রায় পঁচিশ বছর ধ'রে এই সংগ্রহাগারও বেড়ে উঠেছে। আজকালকার নাম-করা বিশেষজ্ঞদের মতে এই সংগ্রহটি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের একটি বৃহত্তম ও উৎকৃষ্টতম সংগ্রহ ত বটেই, কিন্তু ভারতীয় সকল রকমের চিত্রের কথা বল্‌তে গেলে এর তুলনা পাওয়া ভার।

চিত্র সংগ্রহ করায় শ্রীযুত ঘোষের আগ্রহের সীমা নেই—তিনি প্রাচীন চিত্র ও পুঁথি সংগ্রহের জন্যে দেশের নানা স্থানে সম্ভবপর ও অসম্ভবপর বহু জায়গাতেই খোঁজ করেছেন, আর কত জায়গায় কত রকমের অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। কোনো জায়গায় তিনি কিছু পাবেন ব'লে আশা ক'রে গিয়েছেন। কিন্তু প্রথম বারে যেয়ে নিরাশ হ'য়েই ফিরে এসেছেন, আবার কোন্ এক ঝোঁকের বশে বারে বারে—হয় ত তৃতীয় বা চতুর্থ বারে—সেই একই জায়গায়ই যেয়ে এমন-সব জিনিষ পেয়েছেন যাতে এঁর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার আশাতীত ভাবেই হয়েছে। একথা বল্‌লে হয় ত বেশী বলা হবে না যে,যাঁরা ভারতীয় চিত্র সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুত ঘোষের মতো আর কারো শিল্পের উৎপত্তিস্থলগুলি-সম্বন্ধে এত বেশী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়নি। বরাবর একটি দিকে লক্ষ্য রেখে ইনি সংগ্রহে হাত দিয়েছেন, সেটি এই—ভারতীয় প্রাচীন শিল্প আলোচনা ও উপভোগ করতে গেলে যে-সব নিদর্শন সব-চেয়ে বেশী কাজে লাগবে সেইগুলিই সংগ্রহ করা—দেখে দেখে তাঁর মনে এদিকে একটি সংস্কার জন্মে

রিজা আব্বাসীর চিত্র ; তাঁহার শিষ্য মুইন্ মুসাবির কর্ত্তৃক অঙ্কিত (পারসিক চিত্র)

গিয়েছে। যে-সব জায়গার পুরোণো ছবি একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে ব'লে মনে করা গিয়েছিল সে-সব জায়গা থেকেই অধিক সংখ্যায় ও অধিক দুষ্প্রাপ্য ছবি সংগ্রহ করবার বাহাদুরী এঁকে দিতে হয়। একজন নাম-করা বিশেষজ্ঞ এঁকে বলেছিলেন যে, বছর বারো আগে কোনো পাহাড়ী অঞ্চলের ছবি সংগ্রহ করবার সময়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, সেখানে যা-কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবই তিনি সংগ্রহ ক'রেছিলেন—কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সেই জায়গা থেকেই শ্রীযুত ঘোষ অতি চমৎকার সব ছবি নিয়ে এসেছিলেন। এইরূপে তিনি যে-সব আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে খুব মূল্যবান্ হচ্ছে কাংড়া প্রাচীন ধরণের ভিত্তিচিত্রাবলী—এজিনিস এপর্য্যন্ত কেউ পায়নি ও কোথাও এসম্বন্ধে কিছুই লিখিত হয়নি।

এই চিত্র-সংগ্রহের কাজে শ্রীযুত অজিত ঘোষ মহাশয় তাঁর দাদা শ্রীযুত অনু ঘোষ, এফ সি-এস্., এফ-জি-এস্, ও এম্-আই-এম-ই, মহাশয়ের সাগ্রহ সাহায্য লাভ করেছেন। ইনি ভূতত্ত্ববিদ্ হ'য়েও অনেক দিন থেকেই প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সংগ্রহে রত আছেন এবং ইনি বিশেষ ক'রে প্রাচীন কাংড়া ও তিব্বতীয় শিল্পে একজন বিশেষজ্ঞ ব'লে গণ্য।

শ্রীযুত অজিত ঘোষের সংগ্রহটি এত বড় আয়তনের যে, কেবল একটি প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে এর সম্যক্ আলোচনা চলতে পারে না, তাতে অনেক কথাই বাদ প'ড়ে যাবে—সুতরাং সে-দিকে চেষ্টা না ক'রে খুব সাধারণ রকমে ও বেশী বর্ণনার দিকে না যেয়ে একটি ছোট-খাটো বিবরণ দিলেই এর সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হ'তে পারবে।

জৈনদিগের চিত্রকলার যে-সব নিদর্শন এই সংগ্রহে আছে তার মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে লেখা গেল। সুপ্রসিদ্ধ "কল্পসূত্র" ও "কানকাচাই কথানকম্" ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ও অতি চমৎকার পুঁথির পাটা এই সংগ্রহের মূল্য বাড়িয়েছে। তারিখযুক্ত যে "কল্পসূত্র" পুঁথি এখানে আছে তা খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের আর এটি কাগজে-লেখা সচিত্র পুঁথির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি। এই দুষ্প্রাপ্য পুঁথির একটি চিত্র এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেখান গেল।

মুঘল শিল্পের কতকগুলি চিত্র—বিশেষ ক'রে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের চিত্র—১৯২৩ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীর ঐতিহাসিক বিভাগে দেখান হ'য়েছিল। এগুলিতে অনেকের খুব আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। "ভারতীয় ঐতিহাসিক লেখ সংস্থানের" (Indian Historical Records Commission) বাৎসরিক অধিবেশনে উপস্থিত ব্যক্তিরা এই সংগ্রহ হ'তে যে-সব ছবি বিশেষ অনুরোধে প্রদর্শিত হ'য়েছিল, সেগুলি দেখে আনন্দলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। সাধারণ রকমের যে-সব ছবি প্রদর্শনীগুলিতে দেখান হয়

পুঁথির কাষ্ঠাবরকের উপরকার চিত্র (বাংলা দেশ)

সেগুলি থেকে শিল্প ও ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে এগুলির স্থান অত্যন্ত উঁচুতে, তা একটু তুলনা ক'রে দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায়। এই সংগ্রহের কতকগুলি ছবি আগে মুঘল বাদশাহদের নিজেদের সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল, কারণ ঔরঙ্গজীব, শাহ্‌আলম ও ফরকৃশিয়ার প্রভৃতি সম্রাট্‌দের মোহর তাতে অঙ্কিত আছে। একটি ছবির কথা একটু বিশেষ ভাবে না বল্‌লে ঠিক হবে না। এখানা আকবরের সভার চিত্রকর রামের দ্বারা অঙ্কিত সুলতানা রাজিয়ার চিত্র, এটি কবি ও বাদশাজাদী জেবুন্নিসা বেগমের সম্পত্তি ছিল, কারণ, এতে তাঁর নিজের মোহর দেওয়া রয়েছে। এই সংগ্রহের এই বিভাগে রাম, চতরমন্ বা চিতরমম্,বালচন্দ, মোহন, নাম্বা ও আরও অনেকের নাম-সই-করা চিত্র জোগাড় করা হ'য়েছে।

রাজপুত চিত্রের অনেকগুলি পদ্ধতি আছে—এইসব পদ্ধতির প্রায় সমস্তগুলির খুব ভাল ছবি এই সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বতন রাজপুতীয় পদ্ধতির ছবির মধ্যে সব-চেয়ে প্রাচীন রাগিণী চিত্রাবলী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পাহাড়ী পদ্ধতিগুলির অনেক নিদর্শন আছে, তার মধ্যে লঙ্কা-আক্রমণের চিত্র-পর্য্যায়টি অতি কলা-কৌশল পূর্ণ। কাংড়ার চিত্রাবলীর মুদ্রিত নমুনা অনেকেই দেখেছেন বটে, কিন্তু সেগুলি প্রায়ই পরবর্ত্তী কালের। কাংড়ার প্রাচীন চিত্র বর্ণ-ফলানর সৌন্দর্য্য ও ক্ষমতায় এবং অঙ্কন-কলার সুস্পষ্টতায় প্রাচীন চিত্র-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটা বদ্‌লে দেয়, কিন্তু এরূপ প্রাচীন নিদর্শন দেখ্‌বার সুবিধা সাধারণের বড় একটা হ'য়ে ওঠে না—এই ঘোষ-সংগ্রহে ওরূপ অনেক প্রাচীন কাংড়ার চিত্র একত্র করা হয়েছে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, তখনকার রাজা-রাজড়ারা রাজপুত ও পাহাড়ী শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত কর্‌তেন। ইঁহারা প্রায়ই কোনো প্রাচীন মহাকাব্য বা আখ্যায়িকার নানা ঘটনাগুলি ধ'রে অসংখ্য চিত্র এঁকে ফেল্‌তেন। এই চিত্র-পর্য্যায়গুলির খুব বিশেষত্ব সবাই স্বীকার ক'রে থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুত অজিত ঘোষ মহাশয় এই চিত্র-পর্য্যায়ের অনেকগুলি সংগ্রহ কর্‌তে পেরেছেন। রাজপুত শিল্পের সর্ব্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ ডাঃ কুমারস্বামী ছাড়া আর কেউ এই শিল্প-সম্পদের অধিকারী নন। এই চিত্র-পর্য্যায়গুলির বিষয়—লঙ্কা-আক্রমণ, প্রাচীন রাজপুতীয় রাগিণীমালা, নল ও দময়ন্তী, ও গীত-গোবিন্দ। এই সংগ্রহের রাজপুত চিত্রাবলী দেখে আলোচনা ক'রে আমরা শ্রীযুত ঘোষের মতোই মনে করি যে, এতদিন ভারতীয় চিত্রবিদ্যাকে যে-সব পদ্ধতিতে ভাগ করা হ'ত এখন আর সেরূপ করা চল্‌তে পারে না। এমন সব বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা জানা যাচ্ছে যাতে চিত্রগুলিকে আলাদা আলাদা ব'লেই ধরা উচিত, কিন্তু এতদিন "পাহাড়ী" এই নামটির মধ্যেই ফেলা হ'ত। এরূপ একটি পদ্ধতিকে তার বিকাশভূমির নাম থেকে বাসোনী পদ্ধতি বলা যেতে পারে—কারণ, এই পদ্ধতির

প্রাচীন বাংলার পট, কালিঘাট

নিয়ে লিখিত পুঁথির মধ্যে হীর ও রন্‌জ্ঝার প্রেমকাহিনী অতি সুন্দর রাজপুত পদ্ধতিতে চিত্রিত হ'য়েছে; আর রাধাকৃষ্ণের লীলার একটি অতি পুরাতন পদসংগ্রহে পাহাড়ী পদ্ধতির চিত্র আছে। এসবের চেয়ে মূল্যবান্ হচ্ছে নায়িকাদের সম্বন্ধে একটি প্রাচীন পুঁথি, যাতে কাংড়ার একজন প্রাচীন শিল্পীর অতি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। চিত্রযুক্ত যে কয়খানা হিন্দী ও উড়িয়া কবিতার পুঁথি পাচ্ছে তা দেখে আমাদের কৌতূহল বরং বাড়েই। উড়িয়া পুঁথিগুলিতে লোহার লেখনীর সাহায্যে রেখাপাত ক'রে ছবি আঁকা হয়েছে।
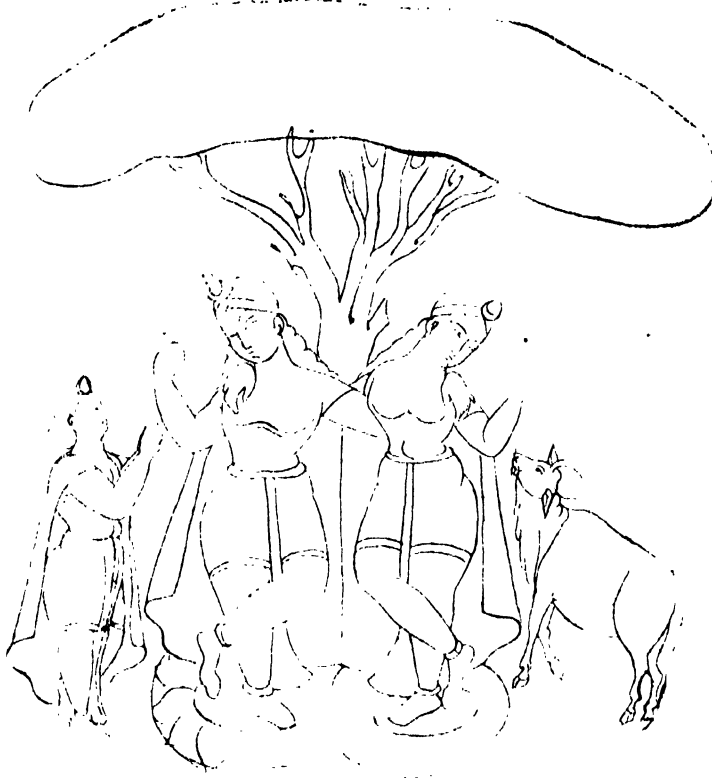
বহু চমৎকার কাজ পাওয়া গিয়েছে আর পাহাড়ী পদ্ধতিগুলির ইতিহাসে এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই ধরণের এমন কতকগুলি প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট ছবি এই সংগ্রহে আছে যা দেখে এরূপ মনে কর্‌বার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এগুলি কোন সময়ে ভিত্তিচিত্রাবলী (fresco-painting) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। গীত-গোবিন্দের বিষয় নিয়ে একটি চমৎকার চিত্র-পর্য্যায় আছে; তার পিছনে উক্ত বইয়ের শ্লোকগুলিও দেওয়া হয়েছে;—এইগুলি বাসোলী পদ্ধতির চরম উন্নতির সময়কার কাজ। চম্বাতে যে-পদ্ধতি চলিত ছিল তাতে একটি বিশিষ্ট ধরণে মানুষের ছবি আঁকা হ'ত।—এরূপ কতকগুলি ছবিও এই সংগ্রহে আছে।

আলাদা চিত্র সম্বন্ধে এতক্ষণ বলা হ'ল। চিত্রিত হস্ত-লিখিত পুঁথিও এসংগ্রহে স্থান পেয়েছে। এর আগেই চিত্রিত জৈন পুঁথির কথা বলা গিয়েছে। হিন্দুর বিষয়

এই সংগ্রহে চিত্রাঙ্কনের দিকে যেমন রেখাঙ্কনেরও তেম্‌নি উৎকৃষ্ট নিদর্শন জমা করা হ'য়েছে, এগুলি সংখ্যায় কয়েক শ হবে। শিল্প হিসাবে এইরূপ রেখাঙ্কনের চলন মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে খুব বিস্তৃত ছিল জানা যায়। ভারতীয় শিল্পী প্রধানেরা এরূপ কারুকার্য্যে উন্নতির শেষ সীমায় পৌচেছিলেন বলা যেতে পারে। কি সরল ও সবল ভঙ্গিতে রেখাগুলিই না অঙ্কিত হয়েছিল! এই সংগ্রহে মুঘল, রাজপুত, কাংড়া, শিখ ও প্রাচীন বাংলার পদ্ধতির নানা রকমের রেখাচিত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়। রেখা-বিন্যাসে হিন্দু শিল্পীরা পুরুষানুক্রমে যে-কারুকৌশল আরম্ভ ক'রে এসেছে তা সব-চেয়ে ভাল ক'রে ফুটে উঠেছে প্রাচীন রাজপুত শিল্পীদের এই রেখা-চিত্রেতে। এবিষয়ে তারা সব-চেয়ে ভাল মুঘল শিল্পীদের চেয়ে কোনো অংশেই হীন ত নয় বরং তারা চিত্রে যেরূপ ভাব ফোটাতে পেরেছে মুঘল শিল্পে সে কমনীয়তার অভাব ঘটেছে মনে হয়। মানুষের প্রতিমূর্ত্তি কর্‌তে গেলেই রেখা আঁক্‌বার হাত টের পাওয়া যায়। বাংলার প্রাচীন শিল্পীরা এই

লঙ্কা-আক্রমণ (প্রাচীন পাহাড়ী চিত্র, ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে)

রেখাঙ্কনের কায়দা কিরূপ আয়ত্ত করেছিলেন তা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব।

সেকালে চিত্রগুলির প্রতিলিপি কিরূপে করা হ'ত সে-সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটা কথা এখানে বলা যাচ্ছে। মুঘল ও রাজপুত শিল্পীরা শুধু যে নিজেরাই আঁক্‌তেন তা নয়, তাঁদের শিষ্যদের হাতও পাক্‌বার ব্যবস্থা কর্‌তে হ'ত। এখনকার দিনে প্রতিলিপি নিবার যে কাগজ চলিত আছে তা তখন পাওয়া যেত না। সেইজন্যে এরূপ চিত্রের রেখাগুলির উপর বরাবর স্থচের আগা দিয়ে ছোট ছোট ছিদ্র করা হ'ত। তার পর নীচে একখানা কাগজ রেখে উপরের কাগজে খুব আস্তে আস্তে কয়লার গুঁড়া বিছিয়ে দেওয়া হ'ত। এতে স্থচের মুখের ছিদ্রগুলি দিয়ে কয়লার গুঁড়ো নীচের কাগজে এসে পড়ত ও ছোট ছোট বিন্দুর সার দেখা যেত। এই বিন্দুগুলির সাহায্যে চিত্রখানার প্রতিলিপির আদ্‌রা গ'ড়ে উঠত। পরে ক্রমে ক্রমে চিত্রখানাকে সম্পূর্ণ করা হ'ত। এরূপে স্থচ দিয়ে ফোঁড়ানো কতকগুলি রেখাঙ্কিত চিত্রের মূ[illegible] লিপি এই সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে এম[illegible] আরো সব ছবি আছে যা দেখলে প্রাচীন শিল্পীরা ক্র[illegible] ক্রমে কি কি প্রক্রিয়ায় চিত্র আঁক্‌তেন তা বেশ বুঝতে পারা যায়। অনেকগুলি প্রতিলিপিতে শিল্পীগুরুর অঙ্কনরত শিষ্যদের স্থবিধার জন্যে কোথায় কি রং ব্যবহা[illegible] কর্‌তে হ'বে তার আভাস দিতে যেয়ে একটু একটু রংয়ে[illegible] পোছ লাগিয়ে রেখেছেন।

কাংড়ার বর্ণ-চিত্র অপেক্ষা রেখা-চিত্রগুলিই সংগ্রাহকে[illegible] খুব ক্লেশ দেয়, কারণ এগুলি বড় একটা খুঁজে পাওয়া যা[illegible] না। সৌভাগ্যক্রমে এই সংগ্রহে এরূপ অনেকগুলি ছবি[illegible] জোগাড় হয়েছে। এগুলির মধ্যে ঋতু বিষয় নিয়ে অঙ্কি[illegible] কয়টি চিত্র এবং পর্য্যায়ের বিশেষ উল্লেখ দর্‌কার, কার[illegible] এতে মানুষের চেহারার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই যে কেব[illegible]

যুবরাজ দানিয়েল্‌ ও তাঁহার পত্নী জনা বেগম (সমসাময়িক মুঘল চিত্র)

মাঝামাঝি অবধিও বেশ আদর পেতো। কিন্তু এখন এরূপ পটের কথা বল্‌তে যেয়ে আমাদের ভয় হয় শিল্পের ব্যাপারীদের কাছেও খুব নতুন গোছের শোনাবে। রেখা টানার বাহাদুরীতে, অঙ্কন-সৌন্দর্য্যে, আর মূর্ত্তি আঁকার হিসাবে দেখ্‌লে বাংলার এই প্রাচীন শিল্পটি বাংলার একটি গৌরব ছিল বল্‌তে হ'বে। অন্য যে-সব চিত্র-পদ্ধতি এতদিন সম্মানের আসন পেয়ে এসেছে তাদের ভাল ভাল নিদর্শনগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বাংলার এ শিল্পটিকে কেউ হেলা করতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার শিক্ষিত সামাজিকরা—যাঁরা বরাবর বিদেশী কদর্য্য ছবি দিয়ে ঘর-বাড়ী সাজিয়ে এসেছেন—এরূপ ছবির কথা ভুলেই গিয়েছেন ; তাই এর রেওয়াজও উঠে গিয়েছে। সাধারণ ভাবে বল্‌তে গেলে বাংলার শিক্ষিতদের অনাদর হ'তেই বাংলার শিল্পের সর্ব্বনাশ হয়েছে। তাই এখন লোকদের বুঝান শক্ত যে, এখন আমরা যে "কালিঘাটের পটের" নাম শুনে নাক সিঁটকাই কালে তারও গৌরব করবার কিছু ছিল। কোনো-এক সময়ে শ্রীযুত ঘোষকে এইসব পটের

জায়া রাখা হয়েছে তা নয়, প্রত্যেক ছবিতেই গোবর্দ্ধন াস নামে কাংড়ার একজন রাজাকে নায়ক হিসাবে াঁকা হয়েছে।

এবারে এমন একটি জিনিষের কথা বলব যা আমাদের রের হ'য়েও নিজের হ'তে পারেনি। আমি বাংলার ্রানো ধরণের পটের কথা বল্‌ছি। পট দু'রকমের াছে—রংয়ে ও রেখায়। রেখাঙ্কিত পট গত শতাব্দীর

প্রশংসা করতে যেয়ে আমাদেরই একজন মাননীয় নেতা-গোছের ব্যক্তির কাছ থেকে এরূপ প্রশ্ন শুনতে হয়েছিল—"আপনি কালিঘাটের পটে কোনো শিল্প-সৌন্দর্য্য আছে ব'লে মনে করেন ?" কিন্তু কালিঘাটের পুরানো যে সব ছবি এই সংগ্রহে একত্র করা হয়েছে তা দেখে এই ভদ্র-লোকের মতো আরও বহু লোকের চোখ ফুটবে, যাঁরা ভাব্‌তেও পারেন না যে, কোনো কালে কালিঘাটের পটে

কল্পসূত্রের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি (প্রথম যুগের জৈন চিত্র, ১৫শ শতাব্দী)

কোন গুণপনা থাক্‌বার সম্ভাবনা ছিল। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আমাদের দেশের 'ভদ্রলোকেরা' আর এ-সব ছবির আদর করেননি, এপদ্ধতির যা'কিছু পসার সাধারণ বা অশিক্ষিতদের কাছে ছিল তাও এখন ক'মে ক'মে প্রায় নেই বল্লেই হয়। এতেই এপদ্ধতির পতন হয়েছে—তাই আগেকার শিল্পীদের হাতে যে দৃঢ়তা ও কমনীয়তা ছিল তার বদলে পরবর্ত্তীরা শুধু দেব-দেবী ও সামাজিক জীবনের ঘটনাগুলি একঘেয়ে ভাবে মক্স ক'রে চলেছে দেখা যায়। এই সংগ্রহের এই অংশের ছবিগুলি দেখ্‌লে কালিঘাটের এই দু'ধরণের ছবিই তুলনা ক'রে দেখ্‌বার সুযোগ হ'তে পারে। এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে ইচ্ছা হয় আমাদের বর্ত্তমান বাংলায় যাঁরা অতি অদ্ভুত উপায়ে শিল্পচর্চ্চার প্রচলন ও শিল্পসৃষ্টির প্রবর্ত্তন নতুন করে' করেছেন তাঁরা যেন এই লুপ্ত পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ কাজগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজ করেননি। অথবা আসলে এর কোন মাহাত্ম্যই স্বীকার করেননি। তাঁরা কি এই-সব গ্রাম্য ও অশিক্ষিত পোটোদের দেশের শিল্পেতিহাসে পূর্ব্বগামী ব'লে মনে কর্‌তেও লজ্জা পেয়েছিলেন?

বাংলা দেশেই যখন বাঙালীর শিল্পের এঅবস্থা তখন বিদেশীদের আবার কথা কি? যখন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের খুব আদর হ'য়ে উঠ্‌ল তখন মুঘল, রাজপুত, কাংড়া ইত্যাদি রাজা-রাজড়া দ্বারা পোষিত শিল্পেরই নাম বিদেশে ঘোষিত হ'ল। বাংলা দেশের পোটোর কপাল এক রকমেরই থেকে গেল। অন্যের কথা দূরে থাক্ স্বয় হ্যাভেল্ সাহেব কলিকাতায় থেকেও কোনো দিন কালীঘাটের প্রাচীন পটের কথা জান্‌তেন না। গত জানুয়ারী মাসের "মডার্ন রিভিয়ু" পত্রের প্রবন্ধ প'ড়ে তিনি এ-দিকে উৎসাহিত হন। তার পর শ্রীযুত ঘোষে সংগৃহীত কয়েকখানা চমৎকার পটের ফোটো পাঠালে তিনি যা লিখেছেন তার মর্ম্ম এরূপ—এসব পটে বাস্তবিক প্রশংসা কর্‌বার যথেষ্ট আছে। কোন-কোন পট এম সুন্দর যে, যদি বাংলা দেশের নাম না ব'লে এগুলিকে "রাজপুত" শিল্প ব'লে চালান যেত তবে অনেকেই এগুলি সংগ্রহ কর্‌বার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তেন। আর তাঁর খু আগ্রহ যে বাংলার এই লুপ্তাবশিষ্ট শিল্পটিকে আবা উৎসাহ দিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা যায় কি না। আমরা বাঙ্গালী শিল্পী ও শিল্পরসিকদের দৃষ্টি এদিকে বিশেষ ক'রে আকর্ষণ কর্‌ছি।

শ্রীযুত ঘোষ অসামান্য পরিশ্রম ক'রে পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বাংলা পুঁথি চিত্রিত পাটার একটি অনন্যসাধারণ সংগ্রহ করেছেন এসব প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন সংখ্যা, সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য হিসাবে আর কোথাও দেখ্‌বার উপায় নেই। এগুলি খুব দুষ্প্রাপ্য ব'লে যাঁরা ভারতীয় শিল্পের খুব নাম-কর
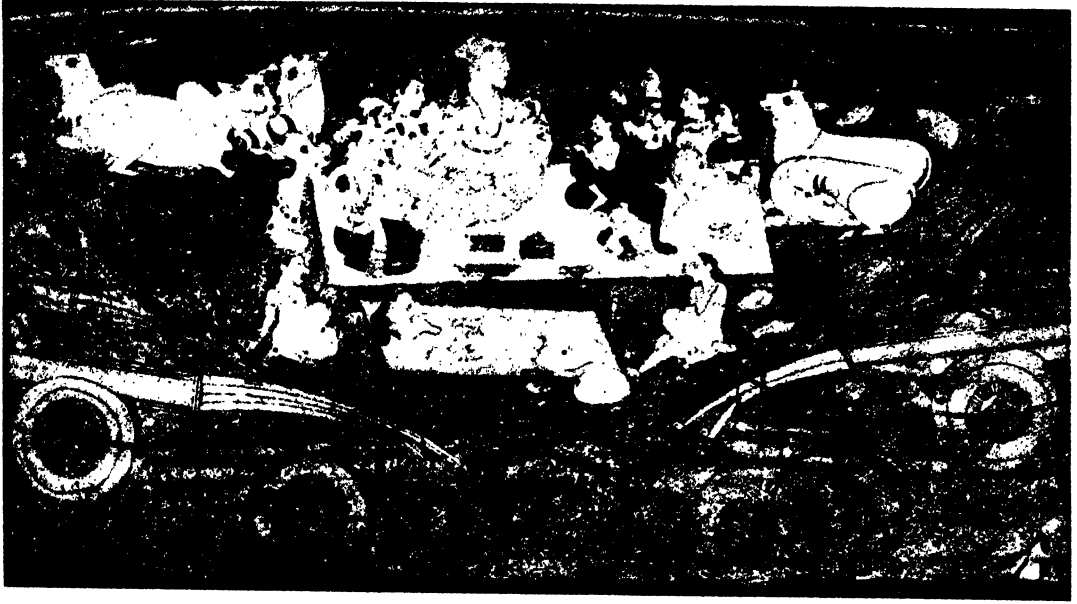
মথুরা-যাত্রা (প্রথম যুগের রাজপুত চিত্র, ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে)

সমঝদার তাঁদেরও এসম্বন্ধে জান্‌বারই সুযোগ হয়নি। কোন চিত্রশালাতেই এরূপ পাটার সংগ্রহ দেখা যায় না। অনেকেই পাটার বর্ণ-বিন্যাস ও অঙ্কন-কলার প্রশংসা ক'রে থাকেন। শ্রীযুত ঘোষ এইসব পাটা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ্‌ছেন।

খেল্‌বার তাসে যে-ছবি আঁকা হ'ত তা ভারতবর্ষের ধনী লোকেরা খুব পছন্দ করত। এরকমের তাস এখন ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এই সংগ্রহে খুব দুষ্প্রাপ্য হাতীর দাঁতের যে-তাস আছে তা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই তাসে প্রাচীন মুঘল বা ইন্দ-পারসিক ধরণের জীবজন্তুর ছবি আছে। এই চিত্রগুলি অতি সুন্দর ও মনসুরের চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই তাসগুলি সাধারণ গোল আকারের তাস নয়, চৌকোণা আকারের, আর চৌকণা তাস সংগ্রহ করা একটি দুরূহ ব্যাপার। বিষ্ণুপুরের দশ-অবতারযুক্ত যে-তাস আছে তা' খুব পুরাণো দেখেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

এঅবধি আমরা এসংগ্রহে শুধু ভারতীয় অংশেরই আলোচনা করেছি। শ্রীযুত ঘোষের শিল্পানুরাগ শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নয়। তিনি শিল্প-ইতিহাসকে একটি বিরাট্ ব্যাপার ব'লেই মনে করেন ও সকল জাতির শিল্পের দিকে এঁর খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখা যায়। যিনিই এঁর চিত্র সংগ্রহ দেখ্‌বেন তিনিই টের পাবেন যে, ইনি চীন ও জাপানের চিত্রের খুব পক্ষপাতী। মুঘল যুগের চিত্র-কলার প্রথমকার অবস্থায় পারস্যের চিত্রবিদ্যার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল ব'লে ইনি যে দ্বিতীয়টির প্রতিও আসক্ত হবেন তাতে আর সন্দেহ কি আছে? পারস্যের মধ্যযুগে অনেক ভাল ভাল চিত্র এখানে আছে। তার মধ্যে রিজা আব্বাসী ও তাঁর শিষ্য মুইন মুসাবিরের যে-সব রচনা আছে সেগুলিতে চিত্রকরদের নাম সই করা রয়েছে। এছাড়া চিত্রযুক্ত কতকগুলি চমৎকার হাতে-লেখা পুঁথিও সংগৃহীত আছে। তার মধ্যে একখানি এমন পুঁথি আছে যা কারুকার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; এপুঁথি বোধ হয় কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এই পুঁথির চিত্রগুলি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর বিহ্‌জাদের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে।

বহুকালের বিস্মৃত কিন্তু গৌরবময় অতীতের সাক্ষী এইসব বর্ণ ও সৌন্দর্য্যময় রূপরচনার অবশেষগুলিকে সংগ্রহ ও রক্ষা কর্‌বার জন্য আমরা শ্রীযুত ঘোষকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য। আর কোন চিত্র সংগ্রহে এত অধিক সংখ্যায় এত ভাল নিদর্শনগুলির সমাবেশ দেখাই যায় না। আর এতে জৈন, মুঘল, রাজপুত, কাংড়া, পাহাড়ী, শিখ, বাংলার, উড়িষ্যার ও দক্ষিণ ভারতের নানা পদ্ধতিগুলির ও তাদের আবার উপশাখাগুলিরও চিত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় ব'লে ভারতীয় শিল্প-রসিকেরা নিশ্চয়ই শ্রীযুত ঘোষের নিকটে কৃতজ্ঞ থাক্‌বেন। বাস্তবিক এই বহুবিস্তৃত সংগ্রহটি দ্বারা আমরা যে শুধু শিল্পচর্চ্চায় একটি নির্ম্মল

আনন্দই পাই তা নয়, এতে এত বেশী বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যে তাতে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার প্রায় সমস্তটা ইতিহাস আলোচনার পক্ষে প্রচুর উপাদান একসঙ্গে পাওয়ার সুবিধা হয়। আর যেরূপ পরিশ্রম, বিচারশক্তি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শুধু বাছা বাছা নিদর্শনগুলির সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে আমাদের দেশীয়দের শিল্পরুচি ও শিল্পসৃষ্টি দুটিরই উদ্বোধন ও বিকাশ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এই সংগ্রহের চিত্রগুলি যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা দেখেছেন তাঁরাই খুব প্রশংসা করেছেন। কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেবের মতে এ সংগ্রহটি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহাসিক নিদর্শনের আধার। সম্প্রতি কয়েকবার এই সংগ্রহের ছবি সাধারণের সুবিধার জন্য প্রদর্শনীতে দেখাবার উদ্দেশ্যে ধার দেওয়া হয়েছে—কলিকাতার ললিতকলা প্রদর্শনীর গত অধিবেশনে ও লক্ষ্ণৌয়ের শিল্প-সঙ্গীত প্রদর্শনীতে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় দাসপ্রথা

শ্রী জ্যোতিশ্চন্দ্র গুপ্ত

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গালায় দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল, তাহার নিদর্শন পত্রান্তর হইতে মুদ্রিত হইয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।
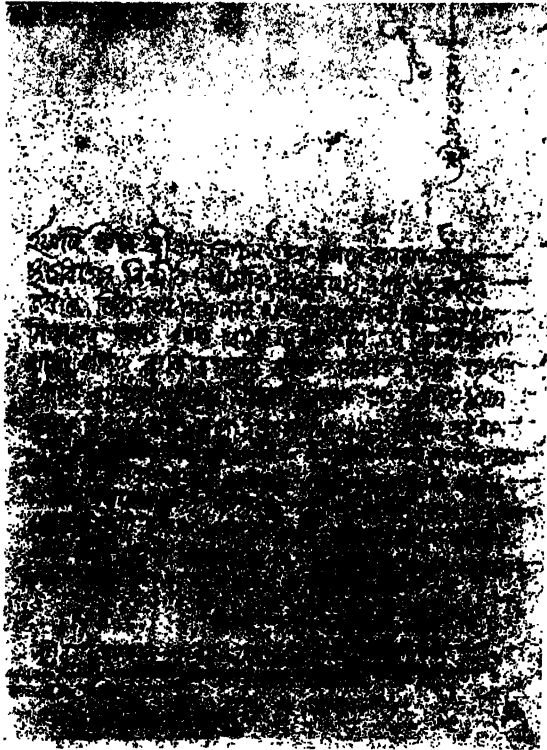
দাস-নিয়োগের দলিল

এতদপেক্ষাও অধিকতর পুরাতন ঐরূপ আর একখানি দলিল দৈবাৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। নারায়ণগঞ্জ নিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার ঘোস মহাশয়ের নিকট উহা প্রাপ্ত হই এবং তিনি উহার একখানি ফোটোগ্রাফ গ্রহণের অনুমতি দিয়া আমাদিগকে ঋণী করিয়াছেন।

দলিলখানির নিম্নভাগে একটি সাদা এম্‌বস্‌ড্‌ মোহর আছে। তাহাতে ফার্‌সী, বাঙ্গালা ও কায়েতীতে "খজানা খাম্‌রা" ও ইংরেজীতে Treasury কথাটি মুদ্রিত রহিয়াছে। এবং অপর পৃষ্ঠায়—

H. Burtm (এইচ. বার্টম) দস্তখৎ—

ও তন্নিম্নে　　নং ১০৩

সন ১৮২৪ ইং ৪ জুলাই

সন ১২৩১, ২২ আষাঢ় ৵০

লিখিত আছে। উহা ষ্ট্যাম্প খরিদের পরিচয় মাত্র।

দলিলখানির অনুবৃত্তি এইরূপ—

ইয়াদিকিদ্দ শ্রীরামলোচন গুই ওরফে রামনাথ গুই সুচরিতেষু লিখীতং শ্রীমতি করুনামই বএষ ২১ বৎসর জওজে জিতরাম সিকদার মতফাদোক্তরে সুর্য্যনারায়ণ সিকদার কস্য আপ্ত বিক্রি কওলা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী আপন রাজি রগবতে বহাল তবিয়তে হানার্থগুপহতি ক্রেমে আপনার স্থানে মবলগ সিক্কা ৩১ একত্রিষ টাকা নগদ মুল্য দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া আপ্ত বিক্রয় হইলাম—আমি হিমহয়াত পর্জ্জন্ত আপনার পুত্রপৌত্রাদিক্রেমে দাস্যত কর্ম্মে নিজোক্ত থাকিব আপনেহ আমার হিমহয়াত পর্জন্ত অন্ন আচ্ছাদন দিয়া আপনার পুত্রপৌত্রাদী ক্রেমে দাম বিক্রয় সত্যাধিকারি হইয়া দাস্যতা কর্ম্ম করাইতে রহেন এতদর্থে আপ্ত বিক্রয় কবালা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩১ বারনত　একত্রিষ সন তারিখ—১৩ ভাদ্র

শ্রী রাজিব লোচন　ইসাদী　ইসাদী

গীহ　শ্রী রামকান্ত দত্ত　শ্রী ভৈরবচন্দ্র মিত্র

সাং　তাজপুর　সাং　দত্তপাড়া　সাং　বারপাড়া

শ্রীহরেকৃষ্ণ দে

সাং টীপরদি　(মোহর)

খজানা খাম্‌রা

খজানা খামরা

Treasury.

মহিলা-মজলিস

অষ্ট্রিয়ার নারীসংঘ

মাদাম টুস ভাইগ ভিনটারনিট্জ (সাল্‌সবুর্গ)

অষ্ট্রিয়ায় সংঘবদ্ধ নারীপ্রচেষ্টার মূলে অনেকগুলি কারণ আছে; আর্থিক ও সামাজিক কারণই তাহার মধ্যে অন্যতম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ার পুরুষেরা নিজেদের অধিকার প্রসারিত করিতে যেমন চেষ্টা করিতেছিল নারীরাও তেমনই তাহাদের ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতে উন্মুখ হইয়াছিল। সোসিয়ালিষ্ট্ দল নরনারীর সমান অধিকারে বিশ্বাস করে এবং তাহারাই প্রধানত নারীর এই আত্মপ্রসারে সাহায্য করিয়াছে। এই সোসিয়ালিষ্ট্ দলের সঙ্গে ক্যাথলিক্ সংঘের ভাবগত যোগ আছে; সুতরাং ধর্ম্মসমাজ হইতে অষ্ট্রিয়ার নারীসংঘ কোনো বাধা পায় নাই; বরং বড় বড় নারীপ্রতিষ্ঠান ধর্ম্মসংঘের তত্ত্বাবধানেই কাজ করিতেছে। মহাযুদ্ধের পর যে-বিপ্লবে বিনা রক্তপাতে অষ্ট্রিয়ার রিপাব্‌লিকের (সাধারণতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা হইল তাহাতেই নারীরা ভোটে ও পার্লামেন্টে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার লাভ করিল। পার্লামেন্টে এখন অনেকগুলি নারীসদস্য আছেন।

নারীরা পুরুষদের মত সকলরকম চাকরি, ব্যবসায় ও শিক্ষালাভ করিতে পারেন। চিকিৎসা, আইনব্যবসায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সাধারণ শিক্ষালয়ের অধ্যাপনা—সকল ক্ষেত্রেই নারীরা কাজ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, দরিদ্রসেবা এবং অসহায় শিশু ও মাতাদের সাহায্যার্থ সরকারী যে-সকল বিভাগ আছে তাহা প্রায় সমস্তই নারীদের দ্বারা পরিচালিত। কুড়ানো ছেলেদের আশ্রম পরিচালন এবং সমিতির সাহায্যে আত্মীয় স্বজনত্যক্ত অসহায় বালক-বালিকাদের লালন-পালনের ভারও নারীদের উপর ন্যস্ত।

কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর মতভেদ থাকাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদে বিশ্বাস করেন না; অথচ বর্ত্তমানে সমাজের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, অনেক স্থলেই মাতা ও সন্তানের মঙ্গলের জন্য ইহার প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে।

শান্তিবাদীদের (Pacifist) প্রতি সাধারণের মন এখনও বিরুদ্ধভাবাপন্ন। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য দায়ে পড়িয়া শান্তিবাদী; কারণ সৈন্যদল বলিয়া এখানে বিশেষ কিছু নাই; তাহা ছাড়া আমেরিকার "ক্লুক্লুক্‌স্ ক্লানের" মত উৎকট ন্যাশন্যালিষ্ট্ দল অষ্ট্রিয়ায় বিশেষ সহানুভূতি পায় না। সুতরাং শান্তিবাদীদের প্রভাব অচিরে বিস্তারলাভ করিবে আশা করা গিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যত তাহা ঘটে নাই। শান্তি ও স্বাধীনতার প্রসারের জন্য যে আন্তর্জাতিক নারীসংঘ (The International League of Women for Peace and Liberty) সর্ব্বত্র কাজ করিতেছে তাহার প্রভাব অষ্ট্রিয়ার সহরে সহরে কতকটা অনুভূত হইলেও মফস্বলে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

যে-সকল নারী গত দশ বৎসর ধরিয়া নারীপ্রচেষ্টার অধিনেত্রীরূপে কাজ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার রিপাব্‌লিকের প্রেসিডেণ্টের অশীতিবর্ষীয়া মাতা মাদাম্ মারিয়ান্ হাইনিস্ অন্যতম; মাদাম ফ্যুর্থ্ নারীদের ভোটের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন; মাদাম সোয়ার্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কার্য্য করিয়াছেন; কুমারী ফেডর্ন কুলি-মজুরদের আনন্দ বিতরণ ও শিক্ষা-দান চেষ্টায় এবং দুঃখী ও দুঃস্থ শিশুদের মানসিক উন্নতি বিধানে নিযুক্ত আছেন।

অষ্ট্রিয়ার নর-নারীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ নারীই ঘরের বাহিরে কোনো-

না-কোনো অর্থকরী বৃত্তিতে নিযুক্ত। প্রাপ্তবয়স্কা অবিবাহিতা কন্যাকে পিতামাতার উপর আর্থিক হিসাবে নির্ভর করিতে প্রায় দেখা যায় না। নারীদের মাহিনা অবশ্য পুরুষদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। কোনো কোনো কাজে অবিবাহিতা মেয়েদেরই লোকে বেশী চায়। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নীই সন্তানদের অভিভাবক হইতে পারেন। আদালতে জুরী হইবার অধিকার নারীর আছে। যে-নারী সমাজের কোনো কল্যাণ-চেষ্টায় ব্রতী থাকে, সে অবিবাহিতা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না এমন-কি সন্তানবতী কুমারী হইলেও সমাজ তাহাকে কোনো প্রকারে নিগ্রহ করে না।

তথাপি যে অষ্ট্রিয়ান রমণী জাতীয় জীবনে আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না, তাহার একটি গুরুতর কারণ আছে। মহাযুদ্ধের ফলে অষ্ট্রিয়াদেশ বিশেষভাবে নিপীড়িত হইয়াছে; এবং বিশেষ করিয়া সেখানকার নারীদেরই যুদ্ধদানব আর্থিক অভাব ও পারিবারিক শোকদুঃখ ও লাঞ্ছনায় একেবারে মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধের এই শোকাবহ পরিণামকে জয় করিয়া আর্থিক ও পারিবারিক দুঃখের উপরে উঠিয়া আদর্শ জীবন নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে উদ্বৃত্ত শক্তি ও উৎসাহ থাকা দরকার নারীরা আজও তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাই জাতীয় জীবনে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এখনও তেমন দৃঢ় হয় নাই।

আমি প্রধানত সাহিত্যক্ষেত্রের রচনা ও অনুবাদাদির কার্য্য লইয়াই থাকি; নারীর ভোট-সংগ্রামের সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিশেষ ছিল না; তবে নারী পরিচালিত সামাজিক হিতসাধন ব্যাপারে আমি ১৯১৫ সাল হইতে যুক্ত ছিলাম। ১৯১৭ হইতে ১৯১৯এর মধ্যে অষ্ট্রিয়ার শত্রুদেশীয় যত নারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমবেত করিয়া ব্যার্ণ এবং জ্যুরিকে যে আন্তর্জাতিক নারীসংঘের অধিষ্ঠান হয় তাহাতে আমি শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিয়াছি, এবং যুদ্ধের ফলে যে লক্ষ লক্ষ শিশু অনাথ হইয়াছে, তাহাদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ইউরোপীয় নারীসংঘেরও সেবিকা ছিলাম। আমার ভারতীয় যে-সকল ভগ্নীরা শান্তি, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহানুভূতি নিবেদন করিতেছি।

শ

ত্যাগ

শ্রী শচীন্দ্রকুমার মৈত্র

(বিবেকানন্দের অনুসরণে)

ভোগ না করিলে ত্যাগের মর্ম্ম বুঝিবে কে ?
নৃপতি নহিলে কি ত্যাগ করিবে ভিক্ষুকে ?
বিলাসীর ত্যাগ সকল ত্যাগের বাড়া,
পথ কি দেখাবে যে-জন দৃষ্টি-হারা ?

পঞ্চশস্য

অন্তরে ও বাহিরে —

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় সভাপতি স্বর্গীয় উইলসন্ সাহেব কোনো মহান্ অনুপ্রাণনা লইয়া জাতি-সংঘ (League of Nations) স্থাপন করিয়া থাকিবেন, কিন্তু জাতি-সংঘের এতগুলি আড়ম্বরপূর্ণ অধিবেশন হওয়া সত্ত্বেও আজিও জাতিতে জাতিতে বিরোধ ঘুচিল না। দিক্‌বিদিক্ হইতে ঘটা করিয়া সভ্যবৃন্দ একত্রিত হইয়া দিনের পর দিন দার্শনিক গবেষণায় পৃথিবীর শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইতেছেন, অথচ আমরাও প্রতিদিন পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে কুরুক্ষেত্রের বিভীষিকা দেখিতেছি। আসলে সকলেই শান্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও নিজ অধিকারের সূচ্যগ্র পরিমাণ দাবীও কেহ ছাড়িতে রাজী নহে; পরন্তু প্রবলতম শক্তিসমূহও পরস্বাপহরণের চিরাচরিত অধিকার

অন্তরে ও বাহিরে

ছাড়িতেছেন না। জাতিসংঘ আজ পর্য্যন্ত কোনো দুর্ব্বল জাতিকে তাহার নিজ অধিকারে নির্ব্বিরোধে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই; সুতরাং এই সংঘ দুর্ব্বলতম জাতিসমূহের শ্রদ্ধা এখনও আদায় করিতে পারিতেছে না। অবশ্য আন্তর্জ্জাতিক বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে জাতি-সংঘ কাজ করিতে চেষ্টা পাইতেছে বটে, কিন্তু স্বার্থে আঘাত লাগিলেই প্রবলেরা বাঁকিয়া বসিতেছে। অহিফেনের চাষ ও চালান লইয়া গত অধিবেশনে যে-কেলেঙ্কারী হইয়া গেল তাহা হইতে মাত্র প্রবল জাতি-সমূহের দুর্য্যোধনবৃত্তি প্রকাশ পাইতেছে। ব্যঙ্গচিত্রখানিতে জাতিসংঘের সদস্যগণের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় ভাগই প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের মৌখিক শান্তি-প্রবণতার সহিত আন্তরিক যুদ্ধস্পৃহা কেমন প্রবলভাবে বর্ত্তমান তাহাই দেখান হইয়াছে। সম্মুখ ভাগের দৃশ্যে যুদ্ধোপকরণের চিহ্নমাত্র নাই, সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে; শান্তিদেবী শান্তি-শতক পাঠ করাইতেছেন, কিন্তু উক্ত সদস্যগণের পশ্চাতের দৃশ্যে প্রত্যেকেরই হস্তে কোনো-না-কোনো প্রাণান্তকারী অস্ত্র দেখিতেছি— সমর-দেবতা ক্রূর হাস্য করিতেছেন।

—

গাছে বজ্রাঘাত—

সাধারণতঃ আমরা শুনিতে পাই যে, বজ্রাঘাতে যত লোক মারা পড়ে তাহার অধিকাংশই কোনো গাছের তলায় আশ্রয় লইয়া থাকে অর্থাৎ পথ

ক্যালিফোর্ণিয়ার হলদে পাইন গাছ—প্রায় এইরূপ বজ্রদগ্ধ হইতে দেখা যায়

অধ্যাপক যতুনাথ সরকার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

চলিতে চলিতে বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াই অনেকে বজ্রাঘাতে প্রাণ হারায়। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অরণ্য-বিভাগ বজ্রাঘাতে লোকের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা ও আদম-সুমারী করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই অপঘাত মৃত্যুর অর্দ্ধেকাংশ প্রান্তরে খোলা মাঠে ঘটে, এক চতুর্থাংশ বৃক্ষতলে ঘটিয়া থাকে, অবশ্য অনুপাতে বৃক্ষতলেই মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ইহার কারণ, (১) গাছপালার সংখ্যাধিক্য, (২) বৃক্ষচূড়া মাটি হইতে অনেকটা উচ্চে সংস্থিত ও মেঘের সন্নিকটবর্ত্তী, (৩) গাছের শাখা-প্রশাখা দিকে দিকে বিস্তারিত ও খুব বিদ্যুৎ-বহ, (৪) জল জিনিষটি অত্যধিক বিদ্যুৎবহ এবং সাধারণতঃ বৃষ্টি-পাত সময়ে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এমনি-কি কাণ্ড পর্য্যন্ত জলে ভিজিয়া যায়। এতদ্‌ব্যতীত বৃক্ষাভ্যন্তরেও জলীয় পদার্থ বিদ্যমান, এমন-কি দেখা গিয়াছে ইবনাইট্‌ প্রভৃতি যে-সমস্ত গাছ অত্যন্ত বিদ্যুৎ-বিরোধী (non-conductor) সেগুলিও ভিজিয়া বিদ্যুৎবহ হইয়া পড়ে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার জঙ্গলে বজ্রদগ্ধ ফার্‌ গাছ

সাধারণতঃ খুব উঁচু ও সোজা গাছেই বজ্রাঘাত হইতে দেখা যায়, তাল নারিকেল, খর্জ্জুর দেবদারু, পাইন প্রভৃতি গাছেই প্রায় বজ্রাঘাত হয়। একই আঘাতে একসঙ্গে অনেকগুলি গাছ ভস্মীভূত বা আহত হয়। বজ্রাঘাতের ফলে গাছে নানা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়। কোন গাছ খালি ঝলসিয়া যায়, পাতা ফল ফুল কিছু থাকে না, গাছটি খালি শিরদাঁড়া লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কখনও দেখা যায় গাছের অর্দ্ধেকটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, অর্দ্ধেকটা অক্ষুণ্ন আছে। কখনো দেখা যায় বৃক্ষ-কাণ্ডের ছালটি মাত্র নষ্ট হইয়াছে। কখনো বৃক্ষের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র হইয়া যায়—যেন পোকায় খাইয়াছে। বৃক্ষকাণ্ডে বজ্রাঘাত হইলে অনেক সময় সেখান হইতে বৃক্ষচূড়া পর্য্যন্ত আরেকবার বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়, তাহাতে গাছটি একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বনের সব-চাইতে বড় গাছে বার বার বজ্রাঘাত হয়, ফলে গাছগুলি একেবারে না মরিলেও ঠিক মত বাড়ে না।

ক্যালিফোর্ণিয়া, ফ্লোরিডা, এরিজোনা প্রভৃতি স্থানের অরণ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বজ্রপাত হয়। এখানে ক্যালিফোর্ণিয়ার জঙ্গলের দুইটি বজ্রাহত গাছের ছবি দেওয়া হইল।

মানুষে-বনমানুষে—

জীবজন্তুদের তুলনায় মানুষের শক্তি বেশী কি কম ইহা লইয়া প্রচুর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, শরীরের আয়তন অনুপাতে

জোহানা
মানুষের দ্বিগুণ জোর

সুজেট ১২৬০ পাউণ্ড টানিয়াছিল

মানুষ দুই জাতীয় জন্তু বাদে অন্য সকল প্রাণী অপেক্ষা শক্তিশালী। এই দুই জাতীয় জন্তু যথাক্রমে বনমানুস ও সিংহব্যাঘ্রাদি। হস্তী ঘোড়া প্রভৃতি খুরসংযুক্ত প্রাণীরা কেহই অনুপাতে মানুষ অপেক্ষা বলশালী নহে। কিন্তু আয়তন ধরিয়া হিসাব করিলেও বনমানুষ ও ব্যাঘ্রাদির শক্তি মানুষ অপেক্ষাও বেশী। বনমানুষ ও ব্যাঘ্রাদির মধ্যে কাহার শক্তি বেশী তাহার বিচার এখনও শেষ হয় নাই। বাল্টিমোরের প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বিখ্যাত জন ই বম্যান সাহেব এসম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা

কুমীর বশীকরণ

বোমা—অবলীলা-ক্রমে ৮৪৭ পাউণ্ডের ঘরে কাঁটা টানিয়া রাখিয়াছিল। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক শক্তিশালী

করিতেছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে শরীরের ওজন অনুযায়ী বিচার করিলে একটি বনমানুষ একটি সবলকায় লোক অপেক্ষা ৩ হইতে ৫ গুণ বেশী জোর ধরে। বনমানুষ বলিতে শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং প্রভৃতি জন্তু বুঝায়। এই পরীক্ষাগুলি তিনি শক্তিপরীক্ষক ডাইনামোমিটার সাহায্যে করিয়াছেন; হাতল টানিয়া কে কত ঘর পর্য্যন্ত কাঁটা নামাইতে পারে তাহা হইতে বিচার হয়। খুব সুস্থ সবলকায় লোক বহু চেষ্টা করিয়াও কাঁটা ২০০ ঘরের নীচে নামাইতে পারে নাই; কিন্তু বোমা নামক শিম্পাঞ্জী অবলীলাক্রমে ৮৪৭ ঘর নামায়, সুজেট ১২৬০ ঘর পর্য্যন্ত নামায় এবং জোহানা ভয়ে একবারমাত্র ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেও তাহাতে দুইটি লোকের সমান টানে। এই পরীক্ষা করিয়া বম্যান্ সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন যে, কেন এরূপ হয়। মানুষের অপেক্ষা এই বন্যজন্তুর শক্তি এমন অসম্ভব রকম বেশী হইবার কারণ কি? ক্রমবিবর্ত্তনবাদ বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয় প্রত্যেক জন্মবিবর্ত্তনের পর মানুষ দুর্ব্বলতর হইতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যদি এই বনমানুষেরা হয় আমাদের মানুষ পূর্ব্বপুরুষেরাও নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল এবং ক্রমশঃ আমরা শক্তি হারাইতেছি। ইহার কারণ কি?

বম্যান্ সাহেব এখন পর্য্যন্ত যাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, বংশে-বংশে মানুষ দুর্ব্বলতর হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সভ্যতার আবেষ্টনীও মানুষের দুর্ব্বলতার কারণ। মিঃ বম্যান্ এবিষয়ে আরো গবেষণা করিতেছেন ও তাঁহার পরীক্ষা ভবিষ্যতে একটি অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করিবে বলিয়া মনে হয়।

আব্ দুল করিম—

মরক্কোর রিফ নেতা আব্ দুল করিম স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অমানুষিক ও অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও বীর বলিয়া জগতের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। স্পেন ও ফ্রান্স একত্রিত হইয়া তাঁহাকে দমন করিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি যে অন্যায় কিছু করেন নাই

আব্ দুল করিম

তাহা তাঁহার শত্রুরাও স্বীকার করিতেছেন। ইনি ইউরোপীয় সভ্যতাকে আদর্শ করিয়াছিলেন ও ইউরোপের জাতিসংঘকে বিশ্বাস করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতাকে আমরা শ্রদ্ধা করিয়াছি, কিন্তু আজ তাহার প্রতি আমার মনে এতটুকু শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস

নাই; ধ্বংসলীলায় এই সভ্যতা মরিয়া হইয়া লাগিয়াছে; বিষাক্ত গ্যাস, অরক্ষিত-নগরী-অবরোধ, তরল-অগ্নি প্রভৃতি প্রাণঘাতী অস্ত্র ইহারা নির্ব্বিচারে ব্যবহার করে। পার্শ্ববর্ত্তী দুর্ব্বল জাতিকে পদদলিত করিবার কৌশলের অভাব হইতে ইহাদের কখনো দেখি নাই।"

লেভায়াথন্—

স্বর্গীয় জে, পি, মর্গ্যান্ সাহেব জলপথে সকল কারবার আমেরিকার একচেটিয়া করিবার মতলব করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার হোয়াইট ষ্টার লাইন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের হস্তে বিক্রীত হওয়াতে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল—অনেকে এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু হোয়াইটষ্টার লাইনের অধিকাংশ জাহাজই ব্রিটিশ রেজিষ্ট্রীভুক্ত ছিল। সুতরাং তদ্বারা আমেরিকার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সম্প্রতি ইণ্টারন্যেশনাল

ভায়োলেট্ গিবসন্

মারক্যাণ্টাইল মেরিনের সভাপতি পি, এ,এস, ফ্রাঙ্ক্লিন সাহেব তাঁহাদের কোম্পানিটিকে একচেটিয়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যুক্ত আমেরিকার শিপিংবোর্ডের নিকট হইতে তিনি যে কয়টি জাহাজ এই বাবদে ক্রয় করিবার মতলব করিয়াছেন তন্মধ্যে লেভায়াথন্ জাহাজখানি বিখ্যাত, এত বড় জাহাজ কমই আছে।

উরে আবিষ্কৃত শিলালিপি-

উরের সুমেরীয় সভ্যতার ইতিহাস ও উর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের শিলালিপি ও প্রস্তরস্তূপের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।
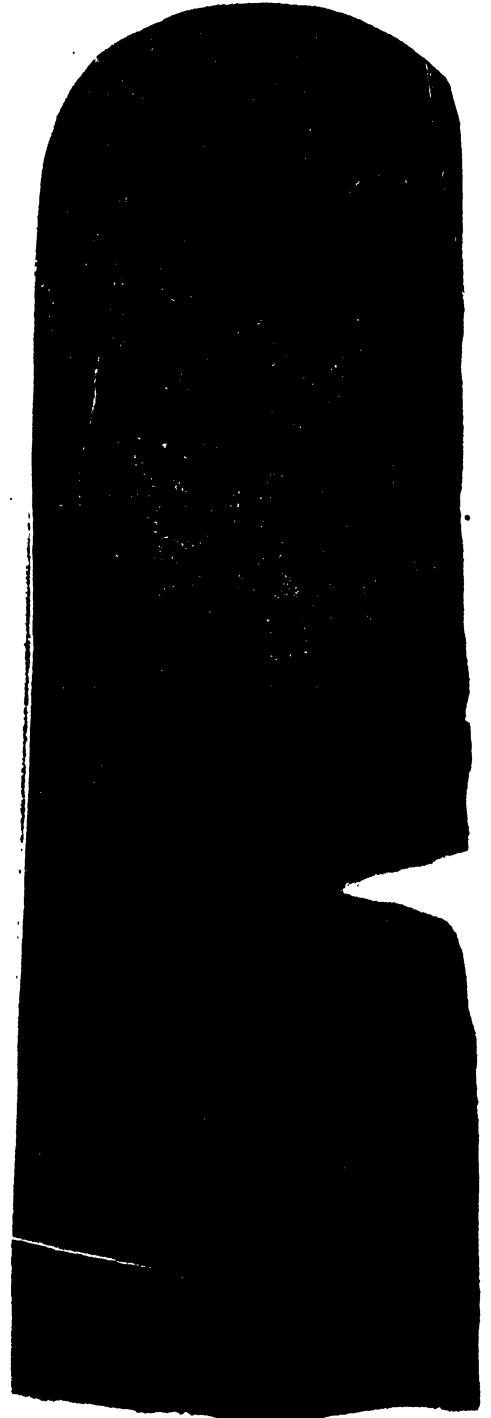
উরে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন

প্রমাণিত হইয়াছে যে, উর সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা হইতেও পুরাতন। কিন্তু সম্প্রতি উরের নিকটবর্ত্তী একটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে মিশরীয় সভ্যতার ছাপ স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে এই ধারণাই প্রমাণিত হয় যে, সুমেরীয়গণই সাক্ষাৎভাবে মিশরীয় সভ্যতার জন্মদাতা। পার্শ্বে সেই শিলালিপিটির ছবি দেওয়া হইল।

—

টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্ত্তা মর্স্—

একশ বছর পূর্ব্বের কথা। সালী নামক একটি জাহাজ হেভার হইতে নিউইয়র্ক বন্দরে প্রবেশ করিতেছিল। আমেরিকার একজন বিখ্যাত চিত্রকর স্যামুয়েল ফিন্‌লী ব্রিস্ মর্স্ একদল বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিকের সহিত জাহাজের একটি কামরায় আহারে বসিয়াছিলেন। অনেক কথার পর নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিকশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা উঠিল, কেমন করিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া মেঘের বিদ্যুৎ ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন, কেমন করিয়া আম্পিয়ার ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটের পরীক্ষা করিলেন, ইত্যাদি। একজন বলিলেন, "আমার জানিতে ইচ্ছা করে তারের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বৈদ্যুতিক শক্তির গতির হ্রাস হয় কি না।" বোষ্টোন

টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্ত্তা—মর্স্

হইতে আগত একজন পণ্ডিত বলিলেন, "তাহা হইতেই পারে না। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, তারের দৈর্ঘ্য যত হউক না কেন একটি অবিচ্ছিন্ন তারের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একইকালে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত হয়।" চিত্রকর মর্স্ সহসা বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, যদি একটি বৈদ্যুতিক বৃত্তের (ircuit) যে-কোনো স্থলে একই কালে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত হয় তাহা হইলে বিদ্যুৎকে সহজেই শ্রেষ্ঠ সংবাদবাহী করিয়া তোলা যায়।"

এই কথা বলিয়াই মর্স্ অননুভূত আনন্দ অনুভব করিলেন, তাঁহার মনে হইল যেন তিনি অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মনে এক মহতী আশা জাগিল, জগতের এক প্রান্তের সহিত অন্য প্রান্তের যোগ সাধন করিতে তিনি সাহায্য করিবেন। তাঁহার সহিত কথোপকথননিরত অন্য কাহারো মনে এই কথার চিহ্নমাত্র প্রভাব রহিল না বটে, কিন্তু মর্স্ এই দৈববাণীতে আশ্চর্য্য ও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। বাহিরে ডেকে দাঁড়াইয়া তিনি সমুদ্রের লহরীলীলা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন; এবং সহসা সমুদ্রবক্ষে তাঁহার টেলিগ্রাফের 'কোড' আবিষ্কার করিলেন।

একমুহূর্ত্তেই বিখ্যাত চিত্রকর, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মর্সে রূপান্তরিত হইলেন। টেলিগ্রাফের জন্মদাতা মর্স্ ভাবিতে লাগিলেন—

"যদি একটি নিরবচ্ছিন্ন তারপথে এককালে বিদ্যুৎ পরিভ্রমণ করিতে পারে এবং যদি প্রবাহ বন্ধ করিলে স্পার্ক (spark) দেখা দেয় তাহা হইলে এই স্পার্কটিকে একটি চিহ্ন ধরা যাইতে পারে। এই দুইটি চিহ্ন (ডট্ ও ড্যাস্) যোগে আমি একস্থান হইতে অন্যস্থানে যে-কোনো সংবাদ প্রেরণ করিতে পারি।"

তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার 'স্কেচবুকে' ডট্ ও ড্যাস্ দিয়া কতকগুলি শব্দ বিভাগ করিয়া ফেলিলেন। সেইদিন সেই জাহাজে জগতের এক পরম বিস্ময়কর আবিষ্কারের পত্তন হইল—এবং সেইদিন জগতবাসীর জীবন-যাত্রার এক মহা সুবিধার আরম্ভ হইল।

সালী জাহাজ যখন নিউইয়র্কে প্রবেশ করিল মর্স্ তখনো তাঁহার এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ভাবিতেছিলেন। জাহাজ হইতে নামিবার সময় জাহাজের কাপ্তেনকে তিনি বলিয়াছিলেন, "ক্যাপ্টেন, যদি কোনোদিন বিদ্যুৎসহযোগে সংবাদ প্রেরণের কথা শোনেন মনে রাখিবেন এই সালী জাহাজের উপর তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।"

—

সেলাম মুসোলিনী—

মুসোলিনীর অভ্যুদয়ে ইউরোপের কোনো-কোনো দেশবাসীদের কিরূপ গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে এই ব্যঙ্গ-চিত্রখানি দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। চিত্রটির বিষয় এই—মুসোলিনীর অমানুষিক অত্যাচার ও

সেলাম মুসোলিনী

হত্যা-তাণ্ডব দেখিয়া স্বর্গে (?) নীরো-এ্যাটিলা প্রভৃতি মহাখুসী হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মনের ভাব—"জীতা রহো মুসোলিনী; আমরা যা পারি নাই বা আরম্ভ করিয়াছিলাম তুমি তাহাই সাধন করিতেছ; আমরা খুসী হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

বিবিধ প্রসঙ্গ
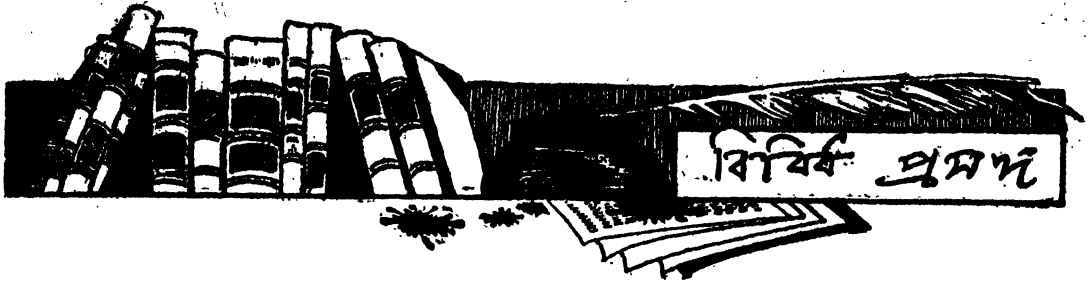
আর্ল্ উইন্‌টার্‌টনের ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত মতামত

প্রায় একমাস পূর্ব্বে পার্লামেণ্টে আর্ল্ উইন্‌টার্‌টন্ ভারত-সচিবের জন্য ৪৭,৪০১ পাউণ্ড বজেট গ্রাহ্য করাইবার জন্য যে-বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে নানা দিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেখিবার মত অনেকগুলি কথা আছে। প্রথমত ভারত-সচিবের কার্য্য সম্পন্ন করিবার সাহায্য হেতু প্রায় সকল অর্থই ভারতবর্ষ হইতে যায়। মুখরক্ষার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে কিছুকাল হইতে অল্প কিছু অর্থ ইণ্ডিয়া আফিসের জন্য ব্যয় করেন। এই সামান্য সাহায্যটুকু গ্রাহ্য করাইবার জন্যই আর্ল উইন্‌টার্‌টনের এত বৃহৎ একটি বক্তৃতার সূচনা। বৃটিশ জাতি ভারতের অর্থ ব্যয় করিবার সময় অতিশয় স্বল্পভাষী, কিন্তু নিজেদের অর্থ কিছুমাত্র ব্যয় হইবার সম্ভাবনা দেখিলে তাহাদের চরিত্রে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

আর্ল্ উইন্‌টার্‌টন্ বক্তৃতার সূচনায় ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশে ১৯২১-২২ খৃঃ অব্দে মেঘসঞ্চার ও বর্ত্তমানে তাহার ক্রমঃঅপসারণ বিষয়ে যাহা বলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, তিনি অধুনা ঘনঘটাচ্ছন্ন ভারতাকাশে কিছু কিছু আশার আলোক দেখিতে পাইতেছেন। ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে, ১৯২১-২২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডীয় ইম্পিরিয়ালিজম্ ভারতে যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল এখন তাহা ক্রমশ সে-অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতেছে। ইম্পিরিয়ালিজম্ হারান স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইতেছে, সুতরাং ইম্পিরিয়ালিষ্টগণ অতঃপর নিঃসঙ্কোচে ভারতে অধিকার বজায় রাখিবার জন্য দুই চার পয়সা খরচ করিতে পারেন।

আর্ল্ উইন্‌টার্‌টন্ বলেন যে, ভারত যে ক্রমশ সমৃদ্ধির দিকে যাইতেছে তাহার অবাধ গতি সাম্প্রদায়িক গোলমালে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এবং আর্ল্ উইন্‌টার্‌টনের মতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের পরিণাম হইতে কি ইংলণ্ডে, কি ভারতবর্ষে, কোন গভর্ণমেণ্টই (সে-গভর্ণমেণ্ট যতই কেন শক্তিশালী হউক না) দেশের মঙ্গল রক্ষা করিতে পারেন না। যদি কেহ ভাবেন যে, ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট শক্তিশালী নহেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের হস্তে ভারতের শাসনভার রাখা উচিত নহে তাহা হইলে উক্তরূপ চিন্তাকারীর ধারণা সত্য নহে তাহাই প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হইল।

আমরা নীচে আর্ল্ উইন্‌টার্‌টনের নিজের কথাগুলি ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের ছাপা রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

......in India, as in this country, no Government, however powerful, can prevent the evil effects of sustained and bitter struggle among different sections of the population from injuring the well-being of the whole nation. The Government can, it is true, do its utmost to prevent that struggle from becoming one of illegal violence, and the Government of India is doing its best, as I shall show, to prevent that, but it cannot prevent the sources of bitterness and distrust from polluting in degrees varying with its intensity, every department of human endeavour with which it comes into contact.

ইহার ভাবার্থ এই যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক কলহ যাহাতে বেআইনী-হিংস্রভাব ধারণ না করে তাহার জন্য যথাসাধ্য করিতেছেন; কিন্তু এইসকল কলহের মূল কারণ যাহা তাহা দূর করিতে গভর্ণমেণ্ট পারিবেন না। আর্ল্ উইন্‌টার্‌টনের বলিবার ভঙ্গীতে মনে হয় যে, সাম্প্রদায়িক কলহের মূল উচ্ছেদ এরূপ কঠিন কার্য্য যে, তাহা না করিতে পারার মধ্যে দোষাবহ কিছু নাই। আমরা এবিষয়ে উক্ত আর্লের সহিত একমত নহি। সাম্প্রদায়িক সংজ্ঞা ভারতবাসীর মনে চিরজাগ্রত রাখিবার মূলে যে গভর্ণমেণ্টের কোন কোন কার্য্য নাই একথা বলিলেও আমরা তাহার সত্যতা স্বীকার করিব না। সাম্প্রদায়িক ভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি গড়িয়া তোলা এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতার মূল উচ্ছেদ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার লক্ষণ নহে। আমরা **সাম্প্রদায়িকতার মূল উচ্ছেদ করিব না** বলিলেই আর্ল্ উইন্‌টার্‌টনের পক্ষে সত্য কথা বলা হইত।

—

স্যর আব্দার রহিম সম্বন্ধে আর্ল্ উইন্‌টারটনের মতামত

তাঁহার বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক কলহের মূল সম্বন্ধে কথা পাড়িয়াই আর্ল উইন্‌টারটন্ স্যর আব্দার রহিমের কথা পাড়িয়াছেন। আমরা তাঁহার কথা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

Without question, the political event of this period which created the greatest interest and stir was the presidential address to the All-India Muslim League meeting at Aligarh of Sir Abdur Rahim, who had relinquished his office on the expiry of its term as a member of the Executive Council of the Governor of Bengal only a few hours before the speech was delivered. The general drift of this speech which attracted a good deal of attention in this country at the time, and may have been read by members of the Committee, was *a militant appeal to the Muslims to be up and doing*, to resist all progress in reform which would leave the rights of the Muslim minority inadequately safeguarded, *to insist on the maintenance of communal representation*, and to counteract, by propaganda *and otherwise*, the recent activities of the more orthodox Hindu Associations.

The speech was, in fact, a startlingly open and authoritative ventilation of sentiments which had been known to be agitating Mohammedan minds to some extent ever since the institution of the reforms, and of late with increasing persistence, but which had never been so prominently voiced and from so high a quarter. Naturally, *this speech did little to allay the tension between the two communities, which for two years now has been uncomfortably acute.*

[ভাবার্থ :—"এই সময়ে যে রাষ্ট্রীয় ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ আকর্ষণ করে ও আন্দোলনের সৃষ্টি করে তাহা নিঃসন্দেহে স্যর আব্দার রহিমের, গভর্ণরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ও আলিগড়ে নিখিল ভারতীয় মুসলমান লিগের মিটীংএর সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতা। এই বক্তৃতাটির প্রধান বক্তব্য এদেশের সকলের মনোযোগ সে সময়ে আকর্ষণ করে এবং কমিটির সভ্যগণও ইহা পাঠ করিয়া থাকিতে পারেন। ইহাকে মুসলমানদিগের নিকট রিফর্ম্‌-সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার, সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রতিনিধি-নিয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং গোঁড়া হিন্দু সংঘগুলির কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে প্রচার ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিবার জন্য একটি **যুদ্ধোন্মাদক আবেদন** বলা যায়।

এই বক্তৃতাটির মধ্যে যে-সকল ভাব বহুকাল ধরিয়া মুসলমানদিগের মনে ছিল তাহা জোরের সহিত ও একজন মুখপাত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়। উত্তমরূপে ও এত উচ্চপদস্থ কাহারও দ্বারা এসকল কথা ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই বক্তৃতার ফলে দুই বৎসর ধরিয়া যে সাম্প্রদায়িক কলহ অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার উপশম কিছুই হয় নাই।]

সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া স্যর আব্দারের আলিগড়ের বক্তৃতার কথা পড়িয়াই প্রথমতঃ আর্ল উইন্‌টারটন্ লোকের মনে এই কথা জাগাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ গোলযোগের সহিত উক্ত নাইটের বক্তৃতা ও কার্য্যাবলীর কোন সংযোগ আছে। তাহার পর ঐ বক্তৃতাকে যুদ্ধোন্মাদক আবেদন বলিয়া ও ঐ বক্তৃতার ফলে সাম্প্রদায়িক কলহের কোন উপশম হয় নাই এই মত প্রকাশ করিয়া আর্ল উইন্‌টারটন্ এই ধারণাই আমাদের মনে জাগাইয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক কলহের বর্ত্তমান তীব্রতার জন্য স্যর আব্দারই বিশেষ করিয়া দায়ী। আর্ল উইন্‌টারটনের মত উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীর এইরূপ মত প্রকাশের পরে আমরা আরও আশ্চর্য্য হইতেছি যে, গভর্ণমেণ্ট্ কেন এইপ্রকার বিবাদের মূল উচ্ছেদ অসম্ভব মনে করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অমঙ্গলের মূল উচ্ছেদ অসম্ভব বলা এক কথা এবং মূল উচ্ছেদ করিব না বলা আর-এক কথা। আর্ল উইন্‌টারটন্ বলিতেছেন, এরোগের প্রতিকার অসম্ভব। কিন্তু রোগের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহাদের পরিষ্কার রহিয়াছে এবং সেই কারণ দূর করিবার কোন প্রচেষ্টা তাঁহাদের কার্য্যের ভিতর দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় রোগনাশের ক্ষমতার অভাব অপেক্ষা ইচ্ছার অভাবই অধিক আছে বলিয়া লোকের ধারণা হয়।

স্যর আব্দার গভর্ণমেণ্ট আফিস হইতে বাহির হইয়াই সটান আলিগড়ে গিয়া একটি যুদ্ধোন্মাদনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন এবং তৎপরে নানাপ্রকার "যুদ্ধ"ও নানা স্থানে ঘটিল; অথচ গভর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে জেলেও দিলেন না, দিবার চেষ্টাও করিলেন না। যে গভর্ণমেণ্ট্ সামান্য সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া "দেশের হিতের জন্য" বহুসংখ্যক লোককে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিতে পারেন, সেই গভর্ণমেণ্ট্ই যদি দেশের অমঙ্গলকর সাম্প্রদায়িক বিবাদের অন্যতম মূল এক ব্যক্তিকে অবাধে কিছু না বলিয়া ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে যদি লোকে এইরূপ ব্যবহারকে সহানুভূতি বলিয়া ভুল করে তাহা হইলে সে-ভুলের জন্য কি গভর্ণমেণ্ট্ই দায়ী নহেন? তাঁহার বক্তৃতার অপর এক স্থলে আর্ল উইন্‌টারটন্ বলিতেছেন।

......two assertions can confidently be made. The first is that the impartial third party---the British and the British troops in India---constitute the most effective safeguard against communal tension developing into wholesale massacre, the second is that the monstrous accusation made by extremist organs in India to the effect that the British members of Government and British officials in India either instigate or refrain from tak___ effective steps to prevent communal riots and violence, is devoid of all foundation.

[ভাবার্থ—দুইটি কথা খুবই জোরের সহিত বলা যায়। প্রথমটি এই যে, সাম্প্রদায়িক বিবাদ যাহাতে বিরাট্ হত্যালীলায় পর্য্যবসিত না হয় তাহার উপায়ের মধ্যে সেই যে নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি—বৃটিশ ও ভারতস্থিত বৃটিশ সৈন্য—তাহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভারতের চরমপন্থী কাগজগুলিতে বৃটিশ কর্ম্মচারীগণের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক কলহ বাধাইবার চেষ্টা ও বাধিলে থামাইবার যথাযথ চেষ্টার অভাবের যে বীভৎস অভিযোগ আনয়ন করা হয় তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।]

আমরা এ অভিযোগ সত্য কি না ও গভর্ণ্মেণ্ট্ নিরপেক্ষ কি না তাহার আলোচনা করিতে চাই না; শুধু বলিতে চাই যে, যে-গভর্ণ্মেণ্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেই গভর্ণমেণ্টেরই একজন সভ্যের পক্ষে অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলার কোন মূল্য নাই। আসামীর পক্ষে বিচারকের মত কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। গভর্ণ্মেণ্ট্ যদি নিজেরা সাম্প্রদায়িকতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন না প্রমাণ করিতে চান তাহা হইলে সে-প্রমাণ আর্ল্ উইন্‌টারটনের বক্তৃতায় দিলে চলিবে না—তাহা কার্য্যে দেওয়া প্রয়োজন।

—

আর্ল্ উইন্‌টারটনের বক্তৃতা ও কারেন্সী কমিশন

একথা সর্ব্বজনগ্রাহ্য যে, টাকার বিনিময়ের হার দেড় শিলিং ধার্য্য করার ফলে ভারতের পক্ষে ইংলণ্ডের দ্রব্য-সম্ভার আমদানী করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যাইবে। ইহার অন্যান্য কুফলের কথা এস্থলে আলোচ্য নহে। আমরা নীচে আর্ল উইন্‌টারটনের বক্তৃতার এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, ইংলণ্ডের নিকট হইতে ভারতের আমদানী সম্প্রতি বিশেষ কমিয়া গিয়াছে এবং এই আমদানী যে-কোন উপায়ে বাড়াইতে না পারিলে ইংলণ্ডের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা।

The exports for 1925-26, valued at 385 crores of rupees, were slightly lower than the figure of the previous year which constituted a record. Imports in 1925-26 also show some decline from the figure of 1924-25. To appreciate the figures, however, it is necessary to consider them in the light of the changed level of prices since 1913-14 when the figures of exports and imports were about 250 crores of rupees and 180 crores, respectively. If the figures for 1925-26 are recalculated with reference to the pre-war level of prices, exports work out at approximately 260 crores of rupees and imports at 120 crores of rupees.

অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ খৃঃ অব্দের ৩৮৫ কোটি টাকার রপ্তানীর কারবার তাহার পূর্ব্ব বৎসরের রপ্তানী হইতে কিছু কম হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর রপ্তানী চূড়ান্ত হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ সালে আমদানীও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল। এসকল হ্রাসবৃদ্ধির কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ১৯১৩-১৯১৪ এর সহিত তুলনায় বর্ত্তমানে টাকার দ্রব্য-ক্রয়-ক্ষমতার পরিবর্ত্তনের কথা বুঝা প্রয়োজন। ১৯১৩-১৪ খৃঃ অব্দে রপ্তানী ও আম্‌দানী যথাক্রমে ২৫০ কোটি ও ১৮০ কোটি হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ খৃঃ অব্দের টাকার মূল্য (দ্রব্য-ক্রয়-ক্ষমতা) ১৯১৩-১৪এর সমান করিয়া কষিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই বৎসর রপ্তানী ও আম্‌দানী যথাক্রমে ২৬০ কোটি ও ১২০ কোটি টাকা পরিমাণ হইয়াছে। এইরূপ ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ভারতের রপ্তানীর মাল কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের মূল্য যুদ্ধের পরে যত বাড়িয়াছে ইংলণ্ডের রপ্তানীর মাল, অর্থাৎ আম্‌দিগের আমদানী মালের মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বাড়িয়াছে। ফলে, আমাদের রপ্তানী যুদ্ধের পূর্ব্বের মতই হইতেছে, কিন্তু আম্‌দানী বিশেষ কমিয়া গিয়াছে। এই আম্‌দানী বাড়াইতে হইলে হয় ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের মূল্য কমাইতে হইবে, নয় অন্য কোন উপায়ে আম্‌দানীর কার্য্য সুবিধাজনক করিয়া দিতে হইবে। **ইংলণ্ড হইতে ভারতের আমদানীর কার্য্য সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য করিয়া দিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণ্মেণ্ট্ ভারতবাসীর খরচে পাউণ্ড সস্তা করিতেছেন**; অর্থাৎ ভারতবাসী সাক্ষাৎ ভাবে যাহা অল্প মূল্যে পাইবে পরোক্ষভাবে তাহার বাকি মূল্যটুকু কারেন্সী ঠিক রাখিবার খরচ হিসাবে খরচ করিতে বাধ্য হইবে। উচিত পন্থা ইহাই হইত যদি ইংলণ্ডের শ্রমিকগণের মজুরীর হার কমাইয়া ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের মূল্য কমান হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া তাহাদের মজুরী ঠিক রহিল এবং এই ভারি মজুরী দিবার ভার বহন করিল দরিদ্র ভারতীয় করদাতা। ইহা পরাধীনতার ফল।

—

রবীন্দ্রনাথের সহিত শত্রুতা

এবার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইতালিতে উক্ত দেশের রাষ্ট্রনেতা মুসোলিনির অতিথিরূপে অবস্থান করেন। মুসোলিনি ইয়োরোপের একজন মহা ক্ষমতাশালী লোক ও তাঁহাকে ইতালি-সম্রাট্ বলিলেও চলে। এহেন ব্যক্তির অতিথি হওয়া একজন বাঙালীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই। মুসোলিনির শত্রু অনেক এবং রবীন্দ্রনাথেরও শত্রুর অভাব নাই। এইসকল কারণে আমরা জনসাধারণকে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি সংক্রান্ত খবরাখবর বিশেষ সাবধানতার সহিত পাঠ ও বিচার করিতে অনুরোধ করি। দুইজনেরই জীবন, আদর্শ, পরস্পরের সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি নানা দিক দিয়া মিথ্যার সাহায্যে দুর্নাম রটাইবার চেষ্টা হইতেছে। এচেষ্টা যাহারা করিতেছে তাহারা ভারতের বন্ধু নহে। আমাদের পক্ষে কবি ফিরিয়া আসার পূর্ব্বে এসকল বিষয়ে কোন মতামত পোষণ না করাই শ্রেয়।

—

প্রাচ্যে বৃটিশের প্রভুত্ব আর কতদিন থাকিবে ?

'জাপান উইক্‌লি ক্রনিক্‌ল্' এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির অন্যতম। সম্প্রতি এই পত্রিকাতে জাপানী সংবাদপত্র-মহলে প্রাচ্যে বৃটিশ প্রভুত্বের কতদূর ও কি কারণে হানি হইয়াছে সেই বিষয়ে যে-সকল মতামত বাহির হইয়াছে তাহার একটি বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এবিষয়ের সত্যমিথ্যা আলোচনা না করিয়া শুধু জাপানীদিগের এসম্বন্ধে কি-প্রকার ধারণা তাহাই 'উইক্‌লি ক্রনিক্‌ল্'এর প্রবন্ধের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

জাপানী কাগজগুলিতে যখন বৃটেনের "যন্ত্রণা" (anguish) সম্বন্ধে কোন আলোচনা উত্থাপিত হয় তখন প্রধানত বৃটেনের চীনদেশে প্রভুত্বহানির কথাই বলা হয়। এই "যন্ত্রণা"র বিষয়ে "হোচি" (*Hochi*) নামক সংবাদপত্র বলেন যে, বৃটেনের পক্ষে বর্ত্তমানে পৃথিবীতে নিজের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখা ক্রমশ দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। বৃটেনের শক্তি প্রধানতঃ প্রাচ্যের পূর্ব্বতম দেশগুলিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে-সকল দেশে ঐ শক্তি অদম্য বলিয়াই গ্রাহ্য হইত। সম্ভবত ইয়োরোপীয় যুদ্ধ না হইলে এশক্তি আরও বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু বৃটেনের দুর্ভাগ্যক্রমে মহাযুদ্ধ লাগিয়া পৃথিবীর জাতিগুলির পরস্পরের তুলনায় শক্তির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল এবং এই পরিবর্ত্তন প্রাচ্যে বিশেষ করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল। একথা অনায়াসে প্রমাণ করা যায় যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে এশিয়ার অতি অল্প স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্রই বৃটিশের প্রভুত্ব পুরামাত্রায় বজায় ছিল। যুদ্ধের পরে এঅবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তুরস্কে বৃটিশের বিরুদ্ধবাদীগণ নিজেদের আদর্শানুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পারস্যে বৃটিশ প্রভুত্ব সম্পূর্ণ-রূপে নষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু সে-প্রভুত্ব আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল নাই। ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব এখনও রহিয়াছে; কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সে-দেশে শাসন-কার্য্য ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। বৃটিশ শাসকদিগের হস্তে আন্তর্জ্জাতিক খবরাখবর প্রেরণের ক্ষমতা এতটা রহিয়াছে যে, এক্ষণে ভারতের যথার্থ অবস্থা কি তাহা বলা শক্ত; কিন্তু এটুকু বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে একটি অসাধারণ রাষ্ট্রীয় জাগরণ আসিয়াছে। পার্লামেণ্টে কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীমতী বেশান্তের হোমরুল বিল লেবর-পার্টির সাহায্যে প্রথম বার পাঠ হওয়ার অবস্থা পার হইয়াছে। ভারতীয় এ্যাসেম্বলীতে স্বরাজীদিগের ব্যবহার শান্ত হইলেও তাহার ভিতর বিপদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। মার্চ্চ মাসে তাহারা, গভর্ণমেণ্ট প্রশ্নের উত্তর না-দেওয়াতে সদলবলে এ্যাসেম্বলীগৃহ পরিত্যাগ করে। মোটের উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতে বিপদাশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

—

চীনে বৃটিশ-বিরুদ্ধতা

বৃটিশ কর্ম্মচারীগণের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ তাহাদের চীনদেশে শক্তিহ্রাস। ক্যাণ্টন্ প্রদেশে বৃটিশ-বিরুদ্ধতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হংকংএর বাণিজ্য শতকরা ৫০ ও হংকংএর লোক-সংখ্যা শতকরা ৩০ কমিয়া গিয়াছে। কুয়োমিংটাং (Kuomingtang) যখন ক্যাণ্টনে প্রথমে বৃটিশদিগকে বয়কট করিতে আরম্ভ করে, তখন বৃটিশ কর্ম্মচারীগণ তাহাদের তাচ্ছিল্যের চক্ষেই দেখিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের এবিষয়ে মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। ইয়াংসি (Yangtse) বরাবরও বৃটিশ-বিরুদ্ধতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাংহাইয়ে যখন জাপানী সুতার মিলে ধর্ম্মঘট হয় তখন চীনাদিগের মধ্যে বৃটিশ-বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে জাপানী-বিদ্বেষ প্রচার করিবার বহু চেষ্টা হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল চীনাদিগের বিদ্বেষ-বহ্নি হইতে বৃটিশদিগকে বাঁচাইয়া জাপানীদিগকে ঘায়েল করা। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সকল দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে বৃটেন্‌কে চীনে নিজেদের পূর্ব্বকালীন রাষ্ট্রীয় প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া চীনাদিগের মতানুসারে কার্য্য করিতে হইবে, এইরূপ একটা দুর্দ্দমনীয় প্রয়োজনীয়তার আবির্ভাব হইয়াছে। হোচি (*Hochi*) পত্রের মতে যদিও বৃটেন্‌ এ কঠিন সমস্যায় পড়িয়া সকলের সহানুভূতি পাইতে পারে তথাপি তাহার পক্ষে যাহা প্রাচ্যের জাগরণের স্বাভাবিক ফল তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে না।

—

জাপান বৃটেনের বিপক্ষে নহে

চুয়ো (*Chuo*) পত্র বলেন যে, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চীনে বিদেশী-বিরুদ্ধতা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে বৃটিশ-বিরুদ্ধতায় পরিণত হইতেছে। চুয়োর টোকিও প্রতিনিধির মতে ৩০শে মের ঘটনাবলি সমস্তই বৃটিশের উদ্দেশ্যে ঘটিয়াছিল। যদিও জাপানী মিলেই এসকল ঘটনার সূত্রপাত হয় তথাপি উহার আসল উদ্দেশ্য ছিল বৃটেনের বিরুদ্ধাচরণ। জাপান নাম দিয়া কার্য্যারম্ভ সহজ হইবে বলিয়াই এরূপ ভাবে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। একথার সত্যতা প্রমাণ হয় যখন আমরা দেখি যে, ঐসকল ঘটনার ফলভোগ বৃটেনকেই অধিক করিতে হয়। জাপানী বয়কট

সাংহাইএ শেষ হইয়া গিয়াছে—বৃটিশ বয়কট এখনও চলিতেছে। পিকিংএ বয়কট প্রভৃতি সমস্ত বিদেশীর প্রতি বিরুদ্ধাচরণের বোঝা জাপান ও বৃটেনের উপর না ফেলিয়া শুধু বৃটিশদিগের উপর ফেলিবার চেষ্টা চলিতেছে। দক্ষিণে ক্যাণ্টন্ গভর্ণমেণ্ট্ বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এবং হংকংএর সর্ব্বনাশ সাধনে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। যে-সকল জাহাজ হংকং হইয়া আসিবে তাহাদিগের ক্যাণ্টন বন্দরে প্রবেশ নিষেধ করিয়া ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্ট-অনেক জাহাজের যাতায়াতের পথ পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। ইহার ফলে হংকং ছাড়িয়া বহুসংখ্যক শ্রমিক ক্যাণ্টনে চলিয়া গিয়াছে। ফলে হংকংএর পতন অনিবার্য্য। এই ঘটনা বৃটেনের পক্ষে বিশেষ বিভীষিকা-ময়, কারণ বৃটেনের চীনে কার্য্যকলাপ অনেকাংশে হংকংএর উপর নির্ভর করে। এই বিপদ হইতে বাঁচিতে হইলে বৃটেনকে ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টকে জয় করিতে হইবে এবং তাহা করা শক্ত। অপর দিকে শুল্কসভার কথাবার্ত্তাও বৃটেনের ভাল লাগিতেছে না; কারণ তাহার মধ্যে বৃটেনের বর্ত্তমান শুল্ক-আদায় প্রভৃতি বিষয়ে যে জোর আছে তাহার অবসানের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

—

রুশিয়ার কথা

চীনে যে বৃটিশ-বিরুদ্ধতা আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূলে বৃটেনের চীনের উপর বহুকাল ধরিয়া প্রভুত্বকরণ ও চীনা-দিগের প্রতি ইংরেজজাতীয় লোকেদের কুব্যবহার রহিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, রুশিয়া এই ব্যাপারের পশ্চাতে আছে। একথা অভ্রান্ত সত্য যে, সাংহাইএর ব্যাপারে রুশিয়া যথেষ্ট পরিমাণে লিপ্ত ছিল এবং বর্ত্তমানেও রুশিয়া ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টকে হংকংএর শ্রাদ্ধ করিতে উত্তেজিত ও সাহায্য করিতেছে। নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে বৃটেন্‌কে চীনা সোভিয়েট্‌গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে; কারণ ঐসকল সোভিয়েট্ রুশিয়ার কথা শুনিয়া কার্য্য করে। বৃটেন্ ক্যাণ্টনের চেম্বার অফ্ কমার্সকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছে। ক্যাণ্টনের শত্রু জেনারেল চেনকে (Chen) বৃটেন সাহায্য করিয়া কোন ফল পায় নাই! চিহ্‌লি (Chihli) দলের বোলশেভিক ধ্বংস-মন্ত্র বৃটিশের খুবই ভাল লাগিয়াছে এবং উত্তর চীনে এই মন্ত্রবাদীদিগের সম্মিলন সমাধানের জন্য বৃটেন্ গোপনে সাহায্য করিতেছে, এইরূপ গুজব। ইহার উদ্দেশ্য চীনের উপকার নহে—নিজের বিপদ হইতে আত্মরক্ষা। বৃটেনের সকল কার্য্যে এই স্বার্থসিদ্ধির ভাব অধিক দৃষ্ট হয় বলিয়াই জাপানের পক্ষে চীনে বৃটিশের সহায়তা করা কোন মতেই গভীর চিন্তা না করিয়া করা উচিত নহে।

—

বৃটেনের ক্ষতি দেখিয়া কলহাস্য

ওশাকা মাইনীচি (*Osaka Mainichi*) পত্রে হংকং, ক্যাণ্টন্ ও সওয়াওটাও (Swatow) প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ বয়কট হওয়ার ফলে উক্ত জাতির কত ক্ষতি হইয়াছে তাহার অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। জাপানী-দিগের বিরুদ্ধে চীনে যে-আন্দোলন সাংহাই ও শামীনে (Shameen) চীনা-হত্যা হওয়ার পর আরম্ভ হয় তাহা প্রায় থামিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে চীনের বিশেষত ক্যাণ্টনের, সহিত জাপানের বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু বৃটেনের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন হয় তাহার ফল এখনও বৃটেন্ ভোগ করিতেছে।

বৃটিশদিগের সঠিক রিপোর্ট (ওসাকা মাইনীচির কথা অনুসারে)হইতে দেখা যায় যে, গত বৎসর হংকংএর রপ্তানী ও আমদানী উভয়ই শতকরা ৫০ কমিয়া গিয়াছে। জাহাজের চলাচলও উক্ত বন্দরে শতকরা ৫০ হারে কমিয়া গিয়াছে। জনসংখ্যা ২০০,০০০ কমিয়া গিয়াছে। কারিগরদিগের মধ্যে ৬০,০০০ জন হংকং ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এঅবস্থায় যে হংকংএর প্রধান রপ্তানীর মাল চিনির রপ্তানী খুবই কম হইতেছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। জন-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ার ফলে জমীর দাম ও ভাড়া প্রভৃতি এত নামিয়া গিয়াছে যে, ফলে গভর্ণমেণ্টের একটি দারুণ আর্থিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বৃটিশ বণিকদিগের ভিতর অনেকে দেউলিয়া হইয়াছে এবং তাহাদিগের সাহায্যার্থে ৩০,০০,০০০ পাউণ্ড ধারের ব্যবস্থা করিয়াও খুব লাভ হয় নাই। এমন অবস্থা এখন হইয়াছে যে, ঐ প্রদেশে বৃটিশ-জাতীয় লোকের পক্ষে ব্যবসা করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থা আর কিছু-কাল থাকিলে যে বৃটিশ-ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠা এত বৎসরের পরিশ্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যাইবে। কি করিয়া এই অবস্থার উন্নতি সম্ভব ইহা এখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি মহা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। ওসাকার পত্রিকাটি বৃটেনের সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া উক্ত দেশকে শুল্ক-সভায় এরূপ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেছেন যাহাতে চীনারা তাহাদের ন্যায্য অধিকার পায় ও তাহাদের অপমান না হয়।

—

আমাদের মন্তব্য

প্রাচ্যে বৃটিশজাতি যে নিজের প্রভুত্ব হারাইতে বসিয়াছে একথা অবশ্য সত্য। ইহার কারণ শুধু উক্ত জাতির দোষই নহে; প্রাচ্যের নবজাগরণ ও জগৎ-সভ্যতার ক্রমবিকাশও এই এক জাতির দ্বারা অন্যান্য বহুজাতির উপর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে। উপরে আমরা যে-সকল কথা জাপানী কাগজ হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম তাহা হইতে আরও কয়েকটি কথা মনে হয়। প্রথম কথা এই যে, চীনের উপর প্রভুত্ব লইয়া জাপানে ও বৃটেনে খুব রেশারেশি চলিতেছে এবং সম্ভবতঃ উভয়ে উভয়কে ঘায়েল করিয়া লাভবান হইবার চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ চীনের বৃটিশ-বিরুদ্ধতার মূলে কতটা রুশিয়ার কার্য্য আছে আর কতটা জাপানী ষড়যন্ত্র আছে তাহা বলা শক্ত। চীনেরা বৃটিশ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির উপর খাপ্পা হইলে, লাভ রুশিয়া অপেক্ষা জাপানের অধিক হইবে; সুতরাং চীনের বৃটিশ-বিদ্বেষের মূলে যদি জাপানের কারিকুরি থাকে তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। তৃতীয়তঃ, জাপানীরা চীনের ব্যাপারে বেশ খুসী হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে এবং ইহার সহিত সিঙ্গাপুরে বৃটিশের নৌবহরের কেন্দ্রস্থাপন-চেষ্টা একত্র করিয়া দেখিলে যাহা মনে হয় তাহা অতি সহজ কথা।

—

ইতালী ও স্পেনের নূতন সন্ধি

যে-দিন মুসোলীনি ভূমধ্যসাগরের উপর ইতালীর অধিকার প্রচার করিয়া প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেন সেদিন হইতে ইতালী বৃটিশজাতির অপ্রীতির চক্ষে পড়িয়া যায়; কারণ ভূমধ্যসাগরের উপর প্রভুত্বের উপর বৃটেনের ভারতের উপর প্রভুত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় ফরাসীগণ ইংরেজদিগকে যখন ভূমধ্যসাগর হইতে তাহাদিগের সমস্ত নৌবহর লইয়া জার্ম্মান্ "হাই সী ফ্লীটের" বিরুদ্ধে উত্তর সাগরে গমন করিতে অনুরোধ করে এবং ফরাসীদিগের হস্তে ভূমধ্যসাগর রক্ষার সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দিতে বলে তখনও ইংরেজ সখা ফরাসীর হস্তে ভূমধ্যসাগর রক্ষার ভার দিতে রাজি হয় নাই। বৃটিশের সাম্রাজ্য-সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজের খাল নিজ হস্তে রাখা প্রয়োজন। এই কারণে বৃটেন ভূমধ্যসাগরে অন্য কোন জাতির আধিপত্য প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারে না।

সম্প্রতি ইতালী ও স্পেনের মধ্যে একটি সন্ধি হইয়া গিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য পরস্পরের দাবী দক্ষিণ আমেরিকায় ও ভূমধ্যসাগরে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা। এই সন্ধির ফলে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রমহলে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। ইতালী এবং স্পেন যদি উভয়ে মিলিয়া ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের আধিপত্য খর্ব্ব করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগে তাহা হইলে বিশেষ গোলযোগের সম্ভাবনা। এবিষয়ে এখনও পরিষ্কার সকল কথা জানা যায় নাই। যেটুকু গিয়াছে তাহাতে ইহা বুঝা যায় যে, উক্ত দুই জাতির উদ্দেশ্য মন্দ বলিয়াই বৃটেনের ধারণা। বৃটেন এবিষয়ে কি পন্থা অনুসরণ করিবে তাহা এখনও বলা যায় না।

—

নিজামের খবর

কিছুকাল পূর্ব্বে খবর বাহির হয় যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট হাইদ্রাবাদের নিজামের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে শাসনকার্য্য শৃঙ্খলার সহিত হইতেছে না এবং এবিষয়ে নিজাম অবিলম্বে মনোযোগ না দিলে নিজামের কার্য্যকলাপের সুব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ "কমিশন্" নিয়োগ করিতে পারেন। নিজামের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁহার রাজ্যে চাকুরী বিক্রয় হয়, ঘুষ চলে এবং নিজাম নিজের ভাই, ভগ্নী, পুত্র ও অধীনস্থ জমিদার ও রাজবংশীয় লোকদের সহিত কুব্যবহার করেন। ইহা ব্যতীত নিজামের রাজ্যে করদাতারা প্রপীড়িত, কর্ম্মচারীগণ মাসের পর মাস বেতন পান না, হাইদ্রাবাদের পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল লণ্ডন "টাইম্‌স্" পত্রে মুসলমান-দিগের সমর্থন করিয়া লেখালিখি করেন এবং নিজাম হাস্কা ছুতা দেখাইয়া রাঘবেন্দ্র রাও শর্ম্মা প্রভৃতির ন্যায় পদস্থ ব্যক্তিদিগকে রাজ্যের বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এইসকল খবর বাহির হইবার পরে প্রকাশ পায় যে, গভর্ণমেণ্ট নিজামকে তেমন কড়া রকম কিছু লেখেন নাই। "বোম্বে ক্রনিকল্" পত্রের একজন সংবাদদাতা খবর সংগ্রহ করেন যে, এত গোলমালের মূলে আর কিছুই নাই, শুধু নিজাম হাইদ্রাবাদের বাসিন্দা ইংরেজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত "রেসিডেণ্ট" মহাশয়ের উপদেশ বিশেষ করিয়া ও নিয়মমত গ্রহণ করেন না বলিয়া এবং তাঁহার রাজ্যে অধিক ইংরেজ চাকুরী পায় না বলিয়াই ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এদিকে মন দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। নিজামকে না কি বলা হয় যে, তাঁহার রাজ্যের ভিতরেই যখন বহুপ্রকার শাসন-সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে তখন তিনি যেন রাজ্যের বাহিরের ব্যাপার লইয়া বেশী নাড়া-চাড়া না করেন এবং যেন রাজকার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহিত করিবার জন্য কিছু ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী সংগ্রহ করেন। প্রথম অনুরোধটির মর্ম্ম বোধ হয় এই যে, নিজাম বর্ত্তমানে যে-মুসলমানত্বের দাবীতে নিজ রাজ্যের বাহিরে নানা স্থানে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন তাহা যেন আর না করেন; এবং দ্বিতীয় অনুরোধটির অর্থ সহজবোধ্য।

নিজাম এসকল বিষয়ে কি করিতেছেন অথবা এসকল খবর কতদূর সত্য সে-বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে পারি না; তবে যদি এসকল খবর সত্য হয় তাহা হইলে কয়েকটি কথা বলা যায়।

নিজামের রাজ্যে যে-সকল অবিচার, অনাচার, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির কথা উঠিয়াছে সেরূপ অবস্থা বা তদনুরূপ অবস্থা কি বৃটিশ ভারতে খুঁজিলে পাওয়া যায় না? বৃটিশ ভারতে কি সর্ব্বক্ষেত্রে চাকুরী দান, চাকুরী হইতে বরখাস্ত করণ, করদাতার করের পরিমাণ, পদস্থ লোককে নির্ব্বাসন প্রভৃতি আদর্শরূপে নির্দ্দিষ্ট ও নির্ব্বাহিত হয়? যদি দেখা যায় যে, বৃটিশ ভারতেও শাসনকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না অর্থাৎ উপযুক্ত লোকে চাকুরী পায় না, অনুপযুক্ত লোকে চামড়ার বর্ণের জোরে অথবা অন্য উপায়ে চাকুরী পায়, পদস্থ ব্যক্তিগণ বিনা বিচারে ও অকারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে স্বাধীনতা হারায় এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অর্থ ভারতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিবর্জ্জিত পন্থা অনুসরণে ব্যয় করেন; তাহা হইলে আমরা কি করিব? লীগ অফ্ নেশনস্ অথবা অন্য কাহাকেও ভারতের শাসন-কার্য্যের উপর একটি কমিশন বসাইতে অনুরোধ করিব অথবা বৃটিশ কর্ম্মচারীদিগকে অপর জাতীয় "রেসিডেণ্টের" পরামর্শ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিব? কিম্বা বৃটিশ ভারতে রাজ-কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যে-জাতীয় লোক অধিক তাহাদিগের মধ্যে অনেককে বরখাস্ত করিয়া অপর জাতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগকেই আমরা আদর্শ প্রতিকার মনে করিব?

আমরা নিজামের রাজ্যশাসন-প্রণালীর যেরূপ বর্ণনা সম্প্রতি শুনিয়াছি তাহাতে আমাদের উক্ত শাসনকর্ত্তার প্রতি শ্রদ্ধা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই। নিজামের অবিলম্বে নিজরাজ্যে ন্যায় ও শৃঙ্খলা আনয়ন করা উচিত এবং তাঁহার দরিদ্র ভারতবাসীর অর্থে "ইস্‌লাম" সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উন্নতির প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ করা অবিলম্বে ও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যিনি নিজামের বিচারক তাঁহারও উচিত আত্মদোষ দূরীকরণ।

—

মস্‌জিদের নিকটে বাজনা

বাংলা দেশস্থ মুস্‌লিম লীগের অনারারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুতুবুদ্দিন আহমেদ মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা বাজান সম্বন্ধে যে-মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকলের পাঠ করা উচিত। যে অর্থহীন বিষয় লইয়া বাংলার হিন্দু-মুসলমানে এত বিবাদ তাহার বিপক্ষে যে আহমেদ মহাশয় সাহস করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় সৎসাহস আরও অন্যান্য বাঙালী মুসলমানগণ দেখাইলে এই পশ্চিম হইতে আমদানী করা কলহ বাংলা দেশে অধিক কাল থাকিবে না। শ্রীযুক্ত আহমেদের মতে মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজান হইবে কি না এ প্রশ্নটি সম্প্রতিই উঠিয়াছে। পূর্ব্বে মুসলমানগণ এই ব্যাপার লইয়া কিছুমাত্র মাথা ঘামাইত না। হিন্দুদিগের নিকট সকল পূজা ও উপাসনার স্থান পবিত্র এবং তাহারা চিরকাল মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্ম্মের উপাসনা-স্থলের সম্মুখে বাজনা থামাইয়া আসিয়াছে—কাহারও অনুরোধে নহে, আপনা হইতেই। এখনও অনেক হিন্দু মস্‌জিদের সম্মুখে প্রণাম করে ও পীরের দরগায় বাতাসা দেয়। বর্ত্তমান অবস্থার মূলে হিন্দুদিগের কতিপয় বিরুদ্ধবাদী নেতার চেষ্টা রহিয়াছে। (এই স্থলে আমাদের সহিত আহমেদ মহাশয়ের মত সম্পূর্ণ মেলে না। কারণ হিন্দুদিগের বিরুদ্ধবাদের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহার মূলে মুসলমানদিগের অপরধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ পুরামাত্রায় রহিয়াছে। হিন্দু নেতাগণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এরূপ কথা কেহ বলে না, তবে মুসলমান নেতাদিগের দোষই অধিক।) মুসলমানদিগের সম্বন্ধে আহমেদ মহাশয় বলিতেছেন যে, অপরধর্ম্মাবলম্বী লোকে মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইতে পারিবে কি না এরূপ কথা মুসলমান ধর্ম্মের দিক দিয়া উঠিতেই পারে না। হজরত মহম্মদ নিজে মস্‌জিদের ভিতরে ঈদের সময় বাজনা বাজাইতে দিয়াছিলেন এবং হজরত আয়েশাকে তাহাতে উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলেন। ইস্তাম্বুলের খিলাফাতুল মুসলমান-গণ শুক্রবারে সালাম আলেক উৎসবের সময় সেণ্ট সোফিয়া মস্‌জিদে তুর্কী ব্যাণ্ড বাজাইয়া গমন করিত। মাহমেল মিছিল মক্কা যাইবার সময় সর্ব্বদা মিশরী ব্যাণ্ড লইয়া যাইত। মুসলমান রাজত্বের সময়ে দিল্লী জাম-ই-মস্‌জিদের সম্মুখে "রামলীলা" হইত এবং রাজবাড়ীর লোকেরা "রামের" গলায় মালা পরাইয়া দিতেন। কলিকাতায় যে-বাড়ীর উঠানে মস্‌জিদ আছে সেখান হইতে ব্যাণ্ড বাজাইয়া বিবাহের শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছে। কোন কোন "আখড়ার" দল এখনও মস্‌জিদ্ হইতে বাজনা বাজাইয়া বাহির হয় এবং বর্ত্তমানে সকল আখড়ার লোকেই মৌলালী দরগায় মস্‌জিদের পার্শ্বে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজনা বাজাইয়া থাকে।

এইসকল দেখিয়া আহমেদ মহাশয় বলিতেছেন যে, মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা না-বাজানর সহিত শারীয়াতের কোনো সম্বন্ধ নাই। ইহা স্বার্থান্বেষী লোকের মনগড়া ব্যাপার। গো-বধ নিবারণ প্রচেষ্টার উত্তরেই দুষ্ট লোকে এই কথার সৃষ্টি করিয়াছে।

আহ্‌মেদ মহাশয় আরও বলিতেছেন যে, দেশের

সর্ব্বত্র মাহিনা-করা মৌলবী ও পণ্ডিতগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশান্তি প্রচার করিতেছে। এই কার্য্যের উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমান বিবাদ চিরজাগ্রত রাখিয়া এইসকল ব্যক্তির নিজেদের পকেট ভারিকরণ।

একজন গণ্যমান্য মুসলমান যখন একথা বলিতেছেন তখন অন্তত মাহিনা-করা মৌলবীর ব্যাপারটি নিশ্চয়ই সত্য—কোন উপযুক্ত হিন্দু নেতার নিকট পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা শুনিলে আমরা তাহাও বিশ্বাস করিব।

—

মহরমের দাঙ্গা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ লোকের মত

"গার্ডিয়ান্" পত্রিকা খৃষ্টান্-পরিচালিত এবং ইংরেজ-সম্পাদিত। এই পত্রিকায় বিগত মহরমের সময় যে-দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় তাহার যে-বর্ণনা বাহির হইয়াছে আমরা নীচে তাহার তর্জ্জমা দিলাম। এই পত্রিকা হিন্দু কিম্বা মুসলমান কোন পক্ষেরই মিথ্যা সমর্থন করিবে বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই; সুতরাং ইহার মতামত হিন্দুমুসলমান সংক্রান্ত বিষয়ে সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

"মহরমের দাঙ্গা—মহরমের প্রথম কয়েক দিন বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিয়া যায়, রাত্রের মিছিলগুলিও বেশ সঙ্গত ভাবে চলে এবং সকলেই ভাবে যে, শেষ দিনের ব্যাপারেও বিসদৃশ রকম কিছু ঘটিবে না। পুলিশ যথাসাধ্য সুব্যবস্থার চেষ্টা করে এবং কেহই বলিতে পারে না যে, পুলিশ এই-বার অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। যে সকল ঘটনা ঘটিল তাহা যে কি ভীষণ—বিশেষতঃ কারবালা যুদ্ধ স্মরণোৎ-সবের মত গম্ভীর ব্যাপারের সহিত জড়িত বলিয়া—তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায় না। কারবালা যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের নিকট আত্মবলিদান ও আত্মসম্মান অকলঙ্কিত রাখিবার নিদর্শন এবং ইহা গভীরতম কলঙ্কের ও চূড়ান্ত অপমানের কথা যে, এইরূপ একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া কোন ঘৃণ্য ও পাশবিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বৃহস্পতিবার ১৫ই জুলাই রাজরাজেশ্বরী মিছিলের উপর মুসলমান গুণ্ডাদিগের একটি সম্পূর্ণ অকারণ আক্রমণ সংঘটিত হয়। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে বুধবার ২১শে জুলাই এই ব্যাপারের উত্তর আসিল, কারণ মুসলমান মিছিলকারীদিগের কথানুসারে আক্রমণ সেণ্ট্রাল্ অ্যাভিনিউএর হিন্দুদিগের দ্বারাই একটা বিশাল পটকা ছুঁড়িয়া আরম্ভ করা হয়। ইহা সত্য কি না স্থির করা মর্ত্ত-জগৎবাসী মানবের পক্ষে সম্ভব নহে; কিন্তু স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর আজন্মের সাধনার ফল বোস ইন্‌ষ্টিটিউটের উপর বর্ব্বরের ন্যায় আক্রমণের চেষ্টার কি কেহ কোন কারণ দেখাইতে পারেন? অথবা ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয় আক্রমণ-চেষ্টার কারণ? মুসলমান-নেতাগণ কি শুধু লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে কথা-যুদ্ধ ও চাকুরীর ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াই দিন কাটাইবেন?"

একথা সত্য যে, গত মহরমের দিনে আমরা আপার সার্কুলার রোডে যে-দৃশ্য দেখিয়াছি তাহার তুলনা হয় না। মুসলমান মিছিলকারীগণের ব্যবহার সম্বন্ধে পুলিশ যে-নিয়মাবলী মহরমের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রচার করিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম প্রতিপদে হওয়া সত্ত্বেও মিছিলকারীদিগকে পুলিশ ঘরে পাঠাইয়া দেয় নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। এবং লাঠি লইয়া পথে বাহির হওয়া সম্বন্ধে যে-নিয়ম প্রচারিত হয় তাহাও যাহারা অমান্য করে সে-সকল (বহুসংখ্যক) লোকের কোনও শাস্তি হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

—

হিন্দু-মুসলমান কলহ কি "অন্তর্বিদ্রোহ"?

অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দু-মুসলমান কলহ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান কলহ মুসলমান ধর্ম্মোন্মত্ততার কোনো সাময়িক রূপ মাত্র নহে। তাঁহার মতে ইহার আরও গূঢ় অর্থ আছে। ইহা আমাদের জাতির পক্ষে অন্তর্বিদ্রোহ (civil war) ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার উদ্দেশ্য, এই কথাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রমাণ করা যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যাহাই বলুন মুসলমানগণই এখনও ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সম্প্রদায় এবং তাহা-দিগের দাবীগুলিই সর্ব্বাগ্রে বজায় রাখিয়া ১৯২৯ খৃঃ অব্দের ষ্ট্যাটিউটারী কমিশন্‌কে কাজ করিতে হইবে। যদি এই ধারণাই সত্য হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তৃতীয় ব্যক্তিরূপে বিবাদের মীমাংসা করিলে ইহার কোন সুবিধাজনক নিষ্পত্তি হইবে না। হিন্দুদিগের ইহা উভয় সঙ্কট। ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দুগণকে এই উপদেশ দিতেছেন যেন তাঁহারা সাহস বা ধৈর্য্য না হারাইয়া অথবা মুসলমান-দিগকে বা গবর্ণমেণ্টকে উত্যক্ত বা আক্রমণ না করিয়া নিজেদের ন্যায্য অধিকার বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন। কি গবর্ণমেণ্ট কি মুসলমান কাহারও পাশবিক শক্তির দমন করিয়া এপ্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। হিন্দুজাতির মধ্যে নূতন জীবন আসিয়াছে। তাহারা কোন প্রকারেই দমিবে না।

মুসলমানগণ যে নিজেদের হিন্দু অপেক্ষা প্রধান প্রমাণ করিবার জন্য এরূপ করিতেছে তাহা আমাদের মনে হয়

না। তবে তাহারা যথেষ্ট গোলমাল করিতে পারে এবং সেই কারণে তাহাদের সকল ন্যায্য এবং অন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া লওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা, এইরূপ একটা ভাব হিন্দুদিগের ও গভর্ণমেণ্টের মনে জাগাইবার চেষ্টা যে তাহারা না করিতেছে তাহা আমরা বলিব না। তুরস্কে কামাল পাশার জয়ের ও মরক্কোতে আব্দুল করিমের ক্ষণস্থায়ী গৌরবের আলোকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমান-দিগের মধ্যে পৃথিবীতে তাহাদের লুপ্ত প্রভাব ফিরিয়া পাইবার আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই আশা-জাগরণের একটা ঢেউ যে ভারতে পৌছায় নাই তাহা নহে। কিন্তু ইহার মূলে একটি বিরাট ভ্রান্তি রহিয়াছে। আমরা নবীন তুর্কীও দেখিয়াছি, নবীন মুবও দেখিয়াছি। তাঁহাদিগের চরিত্র, ধৈর্য্য, সাধনা, শিক্ষা ইত্যাদি দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ইয়োরোপের নিকট হইতে তাঁহারা যাহা কিছু ভাল সবই লইয়াছেন—হঠাৎ নহে, ধীরে ধীরে বহু বর্ষ ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা নিজেদের জাতীয় জাগরণের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা জাতীয়তাকে ও অন্তরের উৎকর্ষকে আদর্শরূপে নিজেদের সম্মুখে ধরিয়া এরূপ ভাবে জীবন গঠন করিয়াছেন যে, আজ ঐসকল নবজাগ্রত 'মুসলমান' দেশগুলির মধ্যে অন্ধ গোঁড়ামী ও নির্ব্বুদ্ধিতার কোন স্থান নাই। খিলাফত-ধ্বংসী কামাল পাশা আজ "তুর্কী ফেজে" পদাঘাত করিয়া স্বজাতিকে উন্নত সভ্যতার পথে লইয়া যাইতেছেন; খৃষ্টান্ জগলুল পাশা আজ "মুসলমান" নবীন-মিশরের নেতা। এই যে "মুসলমান"গণ আজ আত্মোন্নতির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধে নামিয়াছেন ইঁহাদিগের সহিত কি পাবনা ও কলিকাতার মুসলমান-দিগের তুলনা হয়?

শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্তের অ্যাসেম্ব্লীতে প্রস্তাবনা

অ্যাসেম্ব্লীর আগামী অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত যে প্রস্তাবগুলি করিবেন তাহা অতিশয় সুচিন্তিত ও দেশের কল্যাণজনক। সেগুলির সার মর্ম্ম এই যে (১) গভর্ণর্ জেনারেল্ যেন দিল্লীর (১৯২৪) ইউনিটি কন্ফারেন্সে নির্দ্ধারিত উপায়ে আইন-কানুনের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ নিবৃত্তির চেষ্টা করেন, (২) যেন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ভাবে সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের রীতি উঠাইয়া দেওয়া হয়, (৩) যেন লীগ্ অফ্ নেশনস্এর ভারতীয় প্রতিনিধিগণের অধিকাংশ অতঃপর ভারতের ব্যবস্থাপক সভার জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন এবং (৪) ভারতে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে নির্ব্বাচক সম্প্রদায়গুলির নামের মধ্য হইতে "অ-মুসলমান" কথাটি উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন সাধারণ নাম ব্যবহার করা হয়।

এইসকল প্রস্তাবনা যদি গ্রাহ্য হয় তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল হইবে। ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি প্রভৃতি পার্থক্য সর্ব্বত্র বজায় রাখিতে গিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যাহা, জাতীয় একতা, তাহা আমরা হারাইতে বসিয়াছি। এ যেন ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী।

—

মগনলাল ঠাকোরদাস মোদী

মগনলাল ঠাকোরদাস মোদী, এল-সি-ই, সি-আই-ই মহাশয়ের মৃত্যুতে বোম্বাই প্রদেশ একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও মানবপ্রেমিক হারাইয়াছে। এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি বরোদা-রাজের পাব্লিক্ ওয়াৰ্ক্স্ ডিপার্টমেণ্টে এবং পরে বোম্বাই সরকারের ইরিগেশন্ ওয়ার্ক্স্-এ কাজ করেন। অল্পদিন এই কাজ করিয়া তিনি ইহা ছাড়িয়া দেন এবং ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। ব্যবসায়েই তিনি উন্নতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মগনলাল ঠাকোরদাস মোদী

সামাজিক ব্যাপারে মোদী-মহাশয়ের মতামত উদার ছিল। তিনি তাঁহার কন্যা ও নাতনীদিগের ষোল বৎসরের অধিক বয়সে বিবাহ দেন এবং অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানে অনাবশ্যক বোধে জাতিগত ভোজন উঠাইয়া দেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি সুরাট মহিলা বিদ্যালয়কে

তিন হাজার টাকা দান করেন। সুরাট কলেজে তিনি প্রথমে ত্রিশ হাজার ও পরে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁহার আরো অনেক জনহিতকর দান ছিল, এবং এইজন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯০০ সালে তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত ইচ্ছারাম সূর্য্যারাম দেশাই মহাশয়ের সহযোগীতায় তিনি বোম্বাইএ গুজরাটী টাইপ্ ফাউণ্ড্রির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফাউণ্ড্রির পরিচালনভার পরে তাঁহার ভ্রাতার উপর ন্যস্ত হয়। মৃত্যুকালে মোদী-মহাশয়ের বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

—

কুমারী শকুন্তলা পরাঞ্জপে

ইহা বাস্তবিকই সুসংবাদ যে, ভারতের প্রথম সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার্ ডক্টর্ আর, পি, পরাঞ্জপের কন্যা কুমারী শকুন্তলা পরাঞ্জপে, বি-এস-সি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, উচ্চতর গণিত শিক্ষার জন্য শীঘ্রই ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন। বৎসরে তিন হাজার টাকা করিয়া ও তিন বৎসর প্রাপ্য একটি বিশেষ ষ্টেট্ স্কলারশিপ তিনি লাভ করিয়াছেন।

কুমারী শকুন্তলা পরাঞ্জপে

—

কানাডায় ভারতীয়ের সম্মান

কানাডার জাতীয় প্রদর্শনীর দ্বারোন্মোচন-কার্য্যে নিমন্ত্রিত হইয়া সার্ টি, বিজয়রাঘব আচারিয়ার কানাডা যাত্রা করিয়াছেন। ভারতীয় আগন্তুকদের প্রতি কানাডা ভেদ-ভাব পোষণ করে। সুতরাং প্রদর্শনীর দ্বারোন্মোচনের জন্য একজন ভারতীয়কে আহ্বান করার ভিতর কানাডার কোন কূটরাজনীতিমূলক উদ্দেশ্য অথবা সরল ভাব আছে তাহা বুঝা শক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কানাডা পরিদর্শনে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যে-দেশ ভারতবাসীকে সেখানে নামিবার বা থাকিবার উপযুক্ত মনে করে না সেখানে যাইতে কবি ইচ্ছা করেন নাই। ইহা হইতে আমরা এমন নির্দেশ করিতেছি না যে, সকলেই কবির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন। ভারতের প্রতি কানাডার মনোভাব ভারতেই কিরূপ মনে করা হয় তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম।

বাংলা দেশে একটি গল্প আছে যে, এক ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণের গরু মারিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ব্রাহ্মণকে সেই গরুরই চামড়া দিয়া তৈয়ারী একজোড়া জুতা উপহার দিয়াছিল। ভারতকে সম্মানিত করার এই অদ্ভুত প্রণালী দেখিয়া সেই গল্পের কথা মনে পড়ে।

স্যার টি বিজয়রাঘব আচারিয়ার

—

ভারত-ঐতিহাসিকের সম্মান লাভ

পাঠকগণ জানেন, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বরোদা গভর্ণমেণ্টের নূতন অর্ডার অব্ মেরিট্ ব্যবস্থায় এই সম্মান লাভ করিয়াছেন—(১) এক সহস্র টাকা মূল্যের ইতিহাসের প্রথম পুরস্কার ও পাঁচ বৎসর প্রাপ্য বাৎসরিক ১২০০১ টাকা, এবং (২) দরবারের উপাধি "ইতিহাস-শিরোমণি;"—এই সর্ত্তে যে, তাঁহাকে প্রতি বৎসর বরোদায় পর্য্যায়-ক্রমে কতকগুলি বক্তৃতা দিতে হইবে।

বরোদা গভর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে ইউরোপে পাঠাইবার প্রস্তাবও করিয়াছেন। তিনি সেখানে গিয়া প্রধান প্রধান দেশের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিবেদন পাঠাইবেন। সেখানকার বেকার সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁহাকে অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিতে হইবে বলিয়া প্রকাশ। এইরূপ পর্য্যালোচনায় প্রভূত হিত সাধিত হইবে, আশা করা যায়।

—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, প্রসিদ্ধ ভারতীয় দার্শনিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ষষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক দর্শন সঙ্ঘে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া গমন করিয়াছেন। ইহার অধিবেশন এবারে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে হইবে।

ভারত-সভ্যতার প্রধান উৎস এবং ভিত্তি হইতেছে ভারতের দর্শন। এই দর্শনের অধিকাংশ কিন্তু দুর্গম জটিল সংস্কৃত গ্রন্থাদির মধ্যে নিহিত। দর্শনের গোড়াকার ও অপেক্ষাকৃত সহজ গ্রন্থাদি অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মতাত্ত্বিক ও ধর্ম্মনৈতিক সংস্কার ও মতবাদের সহিত সংমিশ্রিত। ম্যাক্সমূলার্ ও ডয়সন্ প্রমুখ ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিৎগণ ভারতীয় দর্শন-বিষয়ে যে অল্প কাজ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বোক্ত মতবাদেই সীমাবদ্ধ। ইহাতে কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মন ভারতীয় দর্শন-সম্বন্ধে উচ্চধারণা-যুক্ত হয় নাই। তাঁহারা মনে করিলেন, ভারতের যথার্থ কোন দর্শন নাই, ভারতের দর্শনের উচ্চ-নিনাদিত যে-প্রাধান্য তাহা পুরাণ-কথা মাত্র; এবং বাস্তবিক পক্ষে তাহা ভারতীয় বুদ্ধিমত্তার দীন প্রকাশ—সে-প্রকাশ ধর্ম্মতাত্ত্বিক, ধর্ম্মনৈতিক বা পৌরাণিক মনোভাবের উর্দ্ধে নহে। ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতির দিক দিয়া ভারতীয় দর্শনের প্রণালীবদ্ধ আলোচনার ব্যবস্থা বা চেষ্টা কখনও হয় নাই, অথচ ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিৎগণের কৌতূহল ইতিহাসগত ও পুরাণগত, দর্শনগত নয়।

প্রায় ২৫ বৎসর হইল আন্তর্জ্জাতিক দর্শন কংগ্রেস স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু নেপল্‌স্-এ ইহার পঞ্চম অধিবেশনের পূর্ব্বে ইহার কোন অধিবেশনের আলোচনায় যোগ দিবার জন্য অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষ নিমন্ত্রিত হয় নাই। ১৯২১ সালে প্যারিসে যে আন্তর্জ্জাতিক দর্শন কংগ্রেস হয় তাহাতে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ্যারিস্‌টটেলীয়ান্ সমিতির সদস্যরূপে কেম্ব্রিজের প্রতিনিধি হইয়া উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহারই প্ররোচনায় ডক্টর্ ম্যাক্‌ট্যাগার্ট এই কংগ্রেসে ভারতবর্ষকে নিমন্ত্রিত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের যথার্থ পরিচয়-জ্ঞাপক গ্রন্থ রচয়িতা কোন ভারতীয় দার্শনিক নাই, এই অজুহাতে প্যারিসে এপ্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ১৯২২ সালে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের "ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। পুস্তকখানি সকল প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কিরূপ সানন্দ আগ্রহে গ্রহণ করেন তাহা সকলেই জানেন। ১৯২৪ সালেই সর্ব্বপ্রথম ভারতের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই দর্শন কংগ্রেসে নেপল্‌স্-এর অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হন। এই অধিবেশনেই জগতের দার্শনিকগণের সমক্ষে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ইউরোপীয় দর্শনের অধিকাংশ মূলনীতি বহুপূর্ব্বে ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাঁহার উক্তির সত্যতা তিনি আধুনিক প্রসিদ্ধ ইতালীয় দার্শনিক বেনেডেত্তো ক্রোচের দর্শন হইতেই প্রমাণ করিতে পারেন, যে-ক্রোচের দর্শনের সহিত ভারতীয় চিন্তাধারার সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে করা হয় না। দাশগুপ্ত-মহাশয় আরো বলেন যে, ক্রোচের দর্শনের প্রায় অধিকাংশ মূলতত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্ম্মোত্তর ও ধর্ম্মকীর্ত্তি দর্শনে পূর্ব্বাভাসিত রহিয়াছে; আর এগুলির সহিত ক্রোচের যেখানে সাদৃশ্য নাই সেখানে ক্রোচেই ভ্রান্ত। ক্রোচে স্বয়ং এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন। এই সমালোচনায় তিনি অত্যন্ত প্রীত হন এবং প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের সহিত তুলিত হওয়ায় তিনি গর্ব্ব অনুভব করেন।

এই কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে দুইটি বক্তৃতা (Eastern and Western Mysticism, Philosophy and International Relations) দিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। এই অধিবেশন এবার সেপ্টেম্বরের ১৩ই হইতে ১৭ই পর্য্যন্ত হার্ভার্ডে হইবে। এই কংগ্রেসে যোগ দেওয়া যাহাতে দাশগুপ্ত-মহাশয়ের পক্ষে সম্ভব হয় তাহার জন্য ইলিনয়ের নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে ১৯২৬ সালের প্রসিদ্ধ হ্যারিস্ বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। জ্ঞানের বহু বিভাগের পক্ষ হইতে জগৎ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারা এই বক্তৃতা বরাবর প্রদত্ত

হইয়াছে। দাশগুপ্ত-মহাশয়,ভারতীয় মিষ্টিসিজমের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে পর পর ছয়টি বক্তৃতা দিবেন, মনস্থ করিয়াছেন। এই বক্তৃতা-সমূহে তিনি ভারতের নৈতিক ও ধর্ম্মগত জীবনের সকল দিকের প্রাধান্য প্রচার করিবেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই কংগ্রেসের কার্য্যতালিকায় ইহুদী ও আরবীয় দর্শনের স্থান আছে, ভারতীয় দর্শনের স্থান নাই। দাশগুপ্ত-মহাশয়ের প্রধান কাজের অন্যতম হইবে, এই কংগ্রেসকে ভারতীয় দর্শন গ্রহণ করানো এবং কংগ্রেসের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনকে যোগ্য স্থান দেওয়া। দাশগুপ্ত-মহাশয়কে শিকাগোতেও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে পর পর কয়েকটি বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। নিউ-ইয়র্কের ইণ্টার্ন্যাশন্যাল্ ইন্‌স্টিটিউট্ তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছে যে, আমেরিকার অনেক প্রধান প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয়, প্রাচ্যের দূত হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে প্রাচ্যের বাণী শুনিতে ইচ্ছা করে। ভারতীয় চিন্তা, সভ্যতা ও ধর্ম্মের মন্ত্র জগতের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করাই দাশগুপ্ত-মহাশয়ের উদ্দেশ্য; কারণ, এইখানেই ভারত সকল দেশ অপেক্ষা উচ্চে। দাশগুপ্ত-মহাশয়ের আশা এই, ভারতের মহান্ ঋষিগণ-ব্যাখ্যাত উদার ও গভীর বাণী যদি প্রতীচ্য দেশ গ্রহণ করে তাহা হইলে জগতের সমস্ত জাতিকে উন্নত ও মিলিত করিবার পক্ষে তাহাই হইবে যথার্থ শক্তি। পশ্চিমের নিকট ভারতের বাণী হইতেছে—বিশ্বজনীন শান্তি, মৈত্রী ও কল্যাণ; এই শান্তি, মৈত্রী ও কল্যাণ ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মসভ্যতার আদর্শ অনুসরণেই লাভ করা যাইবে।

—

ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ

বিগত ১৫ই মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রবধূ, নন্দিনী, গৌরগোপাল ঘোষ ও ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণের সমভিব্যাহারে বোম্বাই হইতে ইউরোপে যাত্রা করেন। ৩০শে মে তারিখে তিনি নেপল্‌স্-এ পৌছিয়াছেন। জুন মাসের ১লা রোমে পৌছিয়া কবি মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মুসোলিনী তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। অধ্যাপক ফর্মিকি ও ডক্টর্ টুচীকে প্রচুর পুস্তকোপহার সহিত শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করিয়া মুসোলিনী ভারত ও ইতালীর মধ্যে সভ্যতার আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন বলিয়া মুসোলিনীকে কবি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইতালীয় সংবাদপত্রসমূহ কবির ইতালী পরিদর্শন সম্বন্ধে সোল্লাস প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ফ্যাসিষ্ট্ আন্দোলনের প্রধানতম মুখপত্র ট্রিবিউনা কবির সহিত সাক্ষাতের এক দীর্ঘ বিবরণ ও তাঁহার হস্তলিখিত বাণী (রোম, ২রা জুন) প্রকাশ করে। সে-বাণী এই—

"ইতালীর মৃত্যুহীন আত্মা অগ্নিস্নান হইতে চিরোজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উত্থিত হইবে, এই স্বপ্ন আমি দেখিতেছি।"

দুই-চারিখানি সংবাদপত্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রচারিত ভারতীয় জীবনের দার্শনিকত্ব সম্বন্ধে একটু প্রতিবাদ-ভাব পোষণ করে। *La Voce Republican* (৪ঠা জুন) পত্রিকা লেখে—"ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে গতিশীল আর ভারতীয় সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে স্থিতিশীল ও দ্বৈতবাদমূলক। ঠাকুর-মহাশয়ের এই দুই সভ্যতার মিলনের যে-ধারণা তাহা সর্ব্বৈব আকাশ-কুসুম মাত্র।"

ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যাপক সেনেটর্ কিয়াপেলি স্বীকার করেন না যে, ইউরোপ প্রাচ্যের দর্শন গ্রহণ করিবে।—

"ঠাকুর-মহাশয় মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন! কী ভীষণ বৈপরীত্য! ধ্যানগত ও কর্ম্মময়—দুইটি জীবন মূর্ত্ত দেখিতে চাহিলে ঠাকুর ও মুসোলিনী অপেক্ষা দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার যোগ্যতর প্রতিনিধি মিলিবে না। যে-দেশ জগতে তাহার পথ কাটিয়া লইবে, যে-দেশকে দ্বিধাহীন প্রচণ্ড কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং সেই হেতু, কল্পনাজীবীর ভাবজাত আলস্য ও ধ্যানগত কর্ম্মহীনতা পরিত্যাগ করিয়া যে-দেশকে চরিত্র শক্তি ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি লাভ করিতে হইবে সেই দেশ-বাসী আমরা আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের বাণী আওড়াইতে পারি না।"

কবি ও তাঁহার সঙ্গীগণকে রোমের ফোরাম্, কলোসিয়ম্, কারাকালা বাথস্, প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান-সমূহ দেখান হয়।

৭ই জুন তারিখে রোমে কবিকে রোমবাসীর পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ইতালীর ইন্‌টেলেকচুয়্যাল ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে ৮ই জুন তারিখে কবি "শিল্পকলার অর্থ" (Meaning of Art) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

সেনেটর্ লুৎসাত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত শান্তি-উদ্যান (Gardens of Peace) নামক বিদ্যালয় কবি পরিদর্শন করেন। ইহা কবির শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শে পরিচালিত; ইহা দেখিয়া কবি অত্যন্ত প্রীত হন।

১০ই জুন তারিখে রোম বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে বিপুল অভ্যর্থনা করে। ইহাতে রেক্টর্ অধ্যাপক ডেল্ ভেকিও ও অধ্যাপক ফর্‌মিকি ভারতবর্ষের দূত কবিকে সাদর বক্তৃতায় অভিনন্দিত করেন। ডক্টর্ ভেরা চের্তা নামে সংস্কৃত পরীক্ষায় উপাধিপ্রাপ্তা এক ছাত্রী কবিকে মাল্য-

ভূষিত করেন। কবি উত্তরে বলেন—"বন্ধুগণ, ভারতের যুবক-চিত্তের প্রেমোপহার আমি আপনাদের জন্য আনিয়াছি। আশা করি, আপনারা আমাকে তাহার উপযুক্ত বাহক বলিয়া গ্রহণ করিবেন। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও কবি বলিয়া অন্তরে আমি যুবক, এবং এইজন্য ভারতের যুবকদের প্রতিনিধি হইবার দাবী রাখি। আমরা পৃথিবীর দুইটি বিভিন্ন জাতি; আমাদের স্বার্থ বিভিন্ন, সুতরাং সে-স্থানে আমাদের মিলন হইবে না। কিন্তু আমাদের স্বার্থ-ব্যাপারের ঊর্দ্ধে এমন এক জগৎ আছে যেখানে আমাদের আশা-বাসনা সমান, কৃতিত্ব ও লাভ সমান;—সেই জগৎই সমস্ত মনুষ্য-জাতির সত্য মিলনভূমি (আনন্দ-ধ্বনি)। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বাস্তবিক মিলিয়াছে। আজ আমাদের এই পরস্পর মিলনে মানুষের অধ্যাত্মিক মিলন আমরা বোধ করিতেছি। আশা করি, আপনারা আমাকে একজন দৈবাৎ আগত পরিদর্শক বলিয়া মনে রাখিবেন না; আমাকে মনে রাখিবেন প্রাচীন প্রাচ্যের দূতরূপে, যৌবন-শীল মানুষের কবিরূপে। ভবিষ্যতে সত্য ও প্রেমের তীর্থযাত্রায় যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের জন্য যুবক রোমের চিত্তে অতিথি আবাস স্থাপন করিয়া যাইতে যদি আমি সক্ষম হই তাহা হইলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিব (প্রচুর হর্ষধ্বনি)।"

—

রোমে বিশ্বভারতীর কার্য্য

ইতালীর শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাগণ, পণ্ডিতগণ ও ছাত্রগণ বিশ্বভারতী ও ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে পণ্ডিত ও ছাত্র আদান-প্রদানের জন্য প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতীয় বিদ্যা শিক্ষার্থী শান্তিনিকেতনে আগত কোন ইতালীয় ছাত্রকে কবি আগামী অক্টোবর (১৯২৬) হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য মাসে মাসে ৬০৲ টাকার বৃত্তি দিতে রাজী হইয়াছেন।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সস্ত্রীক রোমে গিয়া কবির সহিত মিলিত হইয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা-শেষে তিনি প্রস্তাব করেন যে, রোমে বিশ্ব-ভারতীর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হউক। এই প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়। ঠাকুর সভা (Tagore Circle) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতেও শ্রোতৃবৃন্দ চেষ্টা করেন। শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল ঘোষ এই সমিতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবার ভার লন। শ্রীনিকেতন কৃষি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করিবার ইচ্ছায় সমবায়-জাত কৃষি-প্রণালী বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিবার জন্য তিনি ইণ্টারন্যাশন্যাল্ ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ এগ্রিকাল্‌চারে যোগ দেন।

ইহার পর কবি সদল-বলে ফ্লোরেন্সে যাত্রা করেন এবং সেখানে নিজের বিদ্যালয় (শান্তিনিকেতন) সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক প্যাভোলিনি শ্রোতৃবৃন্দের সুবিধার জন্য কবির বক্তৃতা ইতালীয় ভাষায় অনূদিত করেন। টিউরিন্ হইয়া রবীন্দ্রনাথ সুইজার্‌ল্যাণ্ডের ভিলেন্‌এন্‌ভএ গমন করেন; সেখানে বিশ্রাম-লাভার্থ ১২ দিন (২২শে জুন হইতে ৪ঠা জুলাই) শান্তিপূর্ণ হোটেল বাইরনে রমা রলাঁর সহিত বাস করেন। এইখানেই তিনি জর্জ্জ ডুহামেল্, আগষ্ট ফোরেল্, মার্সেল্ মার্টিনেট্, অধ্যাপক ফেরিএর, চার্লস্ বৌডুইন্ প্রভৃতি মধ্য ইউরোপের লেখক ও বিদ্বজ্জনদের সহিত আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারের আলোচনা করেন। সার্ জেম্‌স্ ফ্রেজার্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

একদল যুবক গায়ক জেনেভা হইতে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গীতগানে প্রীত করে।

কবি তাহার পর ভিয়েনা গমন করেন। পথে তিনি দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন—একটি লুৎসার্ণ-এ ও অপরটি জুরিখ্-এ। তিনি চেকো-শ্লোভাকিয়ার সাধারণতন্ত্র পরিদর্শন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

—

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তীর মামলা

বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন ও বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের বিচারে "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তীকে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ১০৮ ধারা অনুসারে যে-শাস্তি দিয়াছিলেন তাহা অন্যায় প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে সংবাদপত্র-মহলে বিশেষ আনন্দ হইয়াছে; কারণ সকলেরই বরাবর এই ধারণা ছিল যে, প্রফুল্লবাবুর প্রতি অবিচার হইয়াছে। আমাদের দেশে বিচার যে অনেক সময় কি প্রকার হয় তাহা এই আপিলের ব্যাপারে অনেকটা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সুবিধার জন্য বিচার অনেক স্থলে হয়ই না এবং এইপ্রকার ব্যবস্থা আইন-সাপেক্ষ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি "বে-আইনী আইন" প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহাদের উপর এইসকল "আইন" প্রযুক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের একটা সুব্যবস্থা হইলে সকলের মনে পরাধীন দেশে বাস করিয়াও যেটুকু স্বাধীনতার ভাব জাগিতে পারে তাহা কথঞ্চিৎ জাগিবে।

—

ভারতে শিক্ষানীতিবিৎ ইজিপ্ট-মহিলা

শ্রীমতী জাকিয়া হানিম্ অবদেল-হামিদ সুলেমান নাম্নী এক উচ্চশিক্ষিতা ইজিপ্ট-মহিলা ভারত পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইনি ইজিপ্টে কিণ্ডারগার্টেন্ শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তক। ইনি কায়রোর শিক্ষা-বিভাগের

জাকিয়া হানিম্ অব্‌দেল-হামিদ সুলেমান

ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্। যে-সমস্ত ভারতীয় নারী তাঁহাদের ভারতীয় ভগ্নীদিগের উন্নতি কামনা করেন তাঁহারা যদি এই মহিলার সহিত দেখা করেন তাহা হইলে হিতকর আলোচনা হইতে পারে।

---

৬ কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম্, এ ; এম্, বি

কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" ছিলেন। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও উন্নতির জন্য যথা-সাধ্য করিয়াছিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞান-প্রীতি, একাগ্রতা ও ধৈর্য্য-শীলতার অনুকরণ করিলে তাঁহার ছাত্রগণের দ্বারা দেশের, আয়ুর্ব্বেদের ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক উপকার হইবে।

পুলিশের অতিরিক্ত খরচ

কলিকাতার পুলিশ দাঙ্গাহাঙ্গামার অতিরিক্ত খরচ বাবদ বাংলার ব্যবস্থাপক সভার নিকট ২,৫০,০০০ টাকা চাহিবেন। প্রথমতঃ দাঙ্গা-হাঙ্গামা যথাসময়ে না থামাইয়া পুলিশ দেশবাসীর অনেক ক্ষতি করিয়াছেন; তৎপরে চোর পালাইবার পর বুদ্ধি দেখাইবার মূল্য বাবদ আড়াই লক্ষ টাকা চাহিতেছেন। উত্তম ব্যবস্থা সন্দেহ নাই।

লর্ড বার্কেনহেডের আফগান প্রীতি

সেদিন লর্ড বার্কেনহেড হঠাৎ বলিয়া ফেলেন যে যদি আফগানিস্থানে ইংরেজের স্বার্থবিরুদ্ধ কোন কিছুর সূচনা হয়, তাহা হইলে আফগানগণ যেন মনে রাখেন যে ইংরেজ আফগানিস্থানে নিজ স্বার্থ বজায় রাখিতে অক্ষম নহে ইত্যাদি।

কথাটা শুনিয়া সকলেরই মনে হয় যে আফগানিস্থানে এমন কি ঘটিল যাহাতে বার্কেনহেড সাহেবের মাথার টনক নড়িয়া উঠিল? তাঁহাকে এবিষয় কেহ প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দেন যে, ইংরেজের সহিত আমিরের সম্বন্ধ প্রীতিপূর্ণই রহিয়াছে। তাহা হইলে ঠিক কি হইল বুঝা গেল না। কেনই বা বন্ধুকে শাসাইয়া এরূপ কথা বলা হইল, কেনই বা কোন ভয়ের কারণ থাকিলে তাহা চাপিয়া যাওয়া হইল? ভয়ের কারণ ত এক সেই চিরপরিচিত রুশিয়াতঙ্ক। যদি বোলশেভিকগণ হঠাৎ আফগানিস্থান দখল করিয়া ভারতে আসিয়া গোলমাল বাধায় তাহা হইলে ইংরেজ তাহা সহ্য করিবে না। কিন্তু আমিরের ন্যায় সর্ব্বেসর্ব্বা পুরানো-ফ্যাসনের রাজাও কি সেরূপ বন্দোবস্তের সমর্থন করিবেন? তাহা করিবার সম্ভাবনা কম। তাহা হইলে ভয়টা রুশিয়াকে না দেখাইয়া বেচারা আমিরকে দেখান হইল কেন?

কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট্

কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এক-দল সমালোচক এই রিপোর্টের মধ্যে নিছক শয়তানী দেখিতেছেন এবং অপর একজন দেখিতেছেন অতি মানবোচিত জ্ঞান ও অর্থনৈতিক বিচক্ষণতার প্রকাশ। আমাদের মতে রিপোর্টটি শয়তানী অথবা অতি-মানবীয় কোন দিক দিয়াই অসাধারণ কিছু নহে। ইহার ভিতর ভারতের অপকার করিয়া ইংলণ্ডের লাভ করাইয়া দিবার যে চেষ্টা আছে, তাহা নূতন বা অভিনব কিছু নহে। ভারতের করদাতার অর্থে এক্‌সচেঞ্জ ঠিক রাখিবার নাম করিয়া ইংরেজ বণিক্‌কে কিছু পাওয়াইয়া দেওয়ার পন্থা আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহার ভিতর নূতনত্ব কিছুই নাই। "গোল্ড্ এক্‌স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যান্‌ডার্ড" নাম দিয়া খোলাখুলি ভাবে কাজ হইত পূর্ব্বে, এখন হইবে "গোল্ড্ বুলিয়ন ষ্ট্যান্‌ডার্ড" নামে এবং by placing the currency authority under an obligation to buy gold and to sell gold *or gold exchange at its option* at appropriate prices. অর্থাৎ বর্ত্তমানে কারেন্সীর কর্ত্তাগণ সোনা **অথবা সোনার এক্‌সচেঞ্জ**

সুবিধামত দরে ও সময়ে বিনিতে আইনত বাধ্য থাকিবেন। এই সোনার এক্স্‌চেঞ্জ্‌ সুবিধামত দরে ও সুবিধা মত সময়ে কেনা-বেচার "বাধ্যতা" আবহমান কাল হইতেই "গোল্ড এক্স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যান্ডার্ড" বাদী বৃটিশ ভারতে ছিল। ব্যাপারটিকে নূতন নাম দিয়া খাড়া করিবার কোনোই সার্থকতা নাই। দেশের মঙ্গলের দিক দিয়া দেশের কেনা-বেচার কাজ অবাধে চলা বিশেষ প্রয়োজন। সে কেনা-বেচা দেশের অভ্যন্তরেই হউক আর আন্তর্জ্জাতিকই হউক। দেশের যে মান-মুদ্রা তাহার মূল্য বা দ্রব্য-ক্রয়-ক্ষমতা যদি স্থির না হইয়া চঞ্চল ও চির পরিবর্ত্তনশীল হয় তাহা হইলে দেশের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সুতরাং কারেন্সী কমিশনের নূতন ব্যবস্থার মধ্যে যেটুকু মান-মুদ্রার দ্রব্য-ক্রয়-ক্ষমতার ভিতর স্থিরতা আনয়ন করিবে সেটুকু দেশের মঙ্গলজনক হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মঙ্গলটুকুর পথ বন্ধ করিবার এত ছিদ্র রিপোর্টের প্রস্তাবগুলির ভিতর রহিয়াছে, যে এসম্বন্ধে কিছু না বলাই শ্রেয়। কারেন্সী কমিশনের ব্যবস্থাকে অনেকে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠা নাম দিয়াছেন। এনামটি ঠিক হয় নাই। যে-স্থলে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন পূর্ব্বমাত্রায় থাকিবে এবং স্বর্ণমানীয় কাগজের নোটগুলি নিজেদের পশ্চাতে গভর্ণমেণ্ট বা ষ্টেট ব্যাঙ্কের হস্তে পূরা, এমন-কি অর্দ্ধ-পরিমাণ স্বর্ণও মজুত বা রিজার্ভ না রাখিয়া দেশের বাজারে ঘুরিবে ফিরিবে সে-স্থলে এই ব্যবস্থা ততদিনই নির্ব্বিবাদে চলিবে যতদিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক সুনাম দুনিয়ার বাজারে থাকিবে। কাজেই এব্যবস্থাকে স্বর্ণ-মান না বলিয়া বৃটিশ "সুনাম-মান বা বৃটিশ ক্রেডিট ষ্ট্যান্ডার্ড" নামে অভিহিত করিলেই উপযুক্ত হইত। কারেন্সী কমিশন আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই বসিয়াছিল। ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাহার সাক্ষাৎ ভাবে বিশেষ কোনো চেষ্টা দেখা যায় নাই। ইহার কারণ এই যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের লাভ প্রায় সমস্তটিই ইংরেজের লাভ এবং ভিতরের কেনা-বেচার ব্যাপারে ইংরেজের তত টা স্বার্থ নাই। দেশের টাকার মূল্যের স্থিরতা, সময়মত টাকার পরিমাণ "দেশের বাজারে" (কলিকাতা বা বোম্বাইএর বৃহৎ-বাণিজ্যের বাজারে শুধু নহে) বাড়ান ও কমানর সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। কারেন্সী কমিশনের প্রস্তাবগুলির সাহায্যে যাহা হইবে তাহাতে একান্ত বৃহৎ-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থানগুলিতেই সাধিত হইবে দেশের সর্ব্বত্র সাধিত হইবে না। উপরন্তু দেশের সকল স্থান হইতে টাকা যাহাতে গ্রামবাসীর সঞ্চয়রূপে দ্রুত বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিতে পারে সরকার বাহাদুর তাহার ব্যবস্থাই করিতেছেন। ইহাতে গ্রামে গ্রামে নগদ টাকার অভাব বাড়িবে বলিয়াই বোধ হয়। মোট কথা, কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট পড়িলে মনে হয় যেন বৃহৎ বাণিজ্যের উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি হইবে এইরূপ একটি অর্থনৈতিক সত্য কেহ ধ্রুব বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এরূপ কথা কেহ প্রমাণ করিতে পারে নাই এবং অন্তত ভারতবর্ষে পারিবে না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এরূপ যে, তাহাতে এধরণের অবস্থা হওয়া অসম্ভব। অল্প কথায় সমস্ত বিষয়টি বুঝাইয়া বলা কঠিন। এবিষয়ের ভাল করিয়া আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেস অথবা স্বরাজ্য-দল হইতে একটি কমিটি বসাইয়া এই বিষয়ে মীমাংসা করা উচিত নহে কি?

—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কলিকাতার "ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলর্‌"

আমরা শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলর নিযুক্ত হওয়ায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সরকার-মহাশয় পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের দোষগুণের সহিত সুপরিচিত; সুতরাং তাঁহার দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের ইতিহাসের চর্চ্চায় পারসী লেখকদিগের লেখার সাহায্য গ্রহণ করিয়া যদুনাথ সরকার মহাশয় ঐতিহাসিক আলোচনার এক নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদেশের পণ্ডিত-বর্গ বহু সমাদর করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্য্যশীলতা অসাধারণ। এইসকল গুণের সাহায্যে তিনি আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়কে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিবেন বলিয়াই আমাদিগের আশা।

কোনো অধ্যাপক ইতিপূর্ব্বে কখনও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলর নিযুক্ত হন নাই। এদিক দিয়াও এই নিয়োগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নততর হইবে মনে হয়।

এই সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন যাহা অতিশয় দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নিয়োগের সংবাদ প্রথম যখন বাহির হয় সেই সময় হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোক তাঁহার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য কুৎসা করিয়া ও তাঁহার নিয়োগ খারিজ করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেশবাসীর মনে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নিদারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য যে গত বহু বৎসর ধরিয়া উপযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত ও আদর্শরূপে সম্পন্ন হইতেছিল না তাহা সকলেই জানেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে-সকল মহাপুরুষ কখন (সৎ) সাহস করিয়া দাঁড়াইবার মত মেরুদণ্ডের জোর দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহারাই আজ নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য দৈনিক পত্রের আফিস হইতে আরম্ভ করিয়া লাটসাহেবের দপ্তর পর্য্যন্ত ছোটাছুটি করিয়া ও যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে নানা-প্রকার অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া জগতকে হাসাইলেন। "যদুনাথ সরকারকে আমরা চাই না, যে-হেতু তিনি আমাদিগের সমালোচনা করিয়াছেন।". সমালোচনাগুলি সত্য কি মিথ্যা সে-কথা কেহ বলিলেন না। সমালোচনা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই সত্য হইয়াছিল বলিয়াই আজ যদুনাথ সরকার মহাশয় ভাইস্ চ্যান্সেলর হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাগণ আশা করি পরের অপরের দোষ দেখিয়া সময়ের অপব্যবহার না করিয়া নিজেদের কার্য্যে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ উন্নতির দিকে মন দিবেন। যদি কেহ বলেন, "তাহা হইলে আপনারা মাসিক পত্রিকায় পরের দোষ ধরিয়া বেড়ান কেন?" তাহার উত্তর এই যে, মাসিক পত্রিকার কার্য্য জগতের সকল ঘটনা পাঠকদিগের নিকট মন্তব্য সহযোগে উপস্থিত করা এবং দোষাবহ ও গুণাবহ সকল ঘটনাই পাঠকদিগের নিকট সমন্তব্য উপস্থিত করিবার যথা-সাধ্য চেষ্টা করা। ইহাই মাসিক পত্র-চালকের কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কোন্ কোন্ কার্য্য অবিলম্বে করা প্রয়োজন তাহা উত্তমরূপে জানেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য সফল হউক।

লর্ড অলিভিয়ার্ ও স্যর মাইকেল ওডায়ার্

সকল বিষয়ে পণ্ডিতের ন্যায় উক্তি করিবার জন্য স্যর মাইকেল ওডায়ার্ প্রসিদ্ধ। তাঁহার জ্ঞান যদি তাঁহার ভণিতার সমতুল্য হইত তাহা হইলে তিনি আজ জগতের নিকট হাস্যাস্পদ কিছু কম হইতেন। সম্প্রতি হিন্দু মুসলমান কলহের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি যে সকল কথা বিলাতী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকদিগের প্রাণে আরব্য উপন্যাস পাঠরত বৈজ্ঞানিকের মনোভাবের সঞ্চার হইয়াছে। যেরূপ কারণ দেখাইলে স্যর মাইকেলের অন্তরে তৃপ্তি হয় তিনি ঠিক সেইরূপ কারণেই হিন্দু-মুসলমান কলহ হইতেছে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে যদি ভারতকে "রিফর্ম্" দেওয়া না হইত তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমানে সুখে একত্রে বসবাস করিতে থাকিত। লর্ড অলিভিয়ার্ ওডায়ারের প্রতিবাদ করিয়া যে-পত্র "টাইম্স্" পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাহাতে তিনি উক্ত পাঞ্জাব-কেশরী "নাইট"কে উত্তম রূপেই ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়াছেন। লর্ড অলিভিয়ারের দুইটি মত আমরা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছে।

(১) Until the Communal Principle for electoral franchises is eliminated, ordered progress in constitutional Government will be impossible.

অর্থাৎ যতদিন প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতা গভর্ণমেণ্ট্ বজায় রাখিবেন ততদিন দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতি অসম্ভব।

শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত অ্যাসেম্ব্লীতে এই সাম্প্রদায়িকতা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপার হইতে দূর করাইবার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। আশা করি, লর্ড অলিভিয়ারের মত এবিষয়ে শুনানো পাইবে।

(২) No one with any close acquaintance of Indian affairs will be prepared to deny that on the whole there is a predominant bias in British officialism in India in favour of the Moslem community, partly on the ground of closer sympathy, but more largely as a make-weight against Hindu Nationalism.

অর্থাৎ, যদি কেহ ভারত-সংক্রান্ত বিষয়-সমূহের সহিত সুপরিচিত হন তাহা হইলে তিনি কখন একথা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে ভারতের বৃটিশ কর্ম্মচারী মহলে মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে। ইহার কারণ কতকটা মুসলমানের সহিত অধিক সহানুভূতি বটে, কিন্তু প্রধানত ইহা হিন্দু জাতীয়তার বিরুদ্ধে ভারবৃদ্ধিরই চেষ্টা।

লর্ড অলিভিয়ারের মতের সহিত আমরা একমত।

ভ্রম সংশোধন

এই মাসের পঞ্চশস্য বিভাগে ৮৪০ ও ৮৪১ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে "কুমীর বশীকরণ" ও "ভায়োলেট্ গিব্সন্"—এই দুইটি ছবি ভুলক্রমে বসান হইয়াছে। আগামী মাসে আমরা এই ছবি দুইটির পরিচায়ক লেখা দিব।

ভাদ্র পৃঃ ৭৩৮ দ্বিতীয় কলম ১৪ লাইনে পিল খিল্ স্থানে ফিস্ ফিস্ হইবে।

শ্রাবণ সংখ্যায় প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে ৭০৪ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব শীর্ষক লেখাতে আ-সি-এস্ পরীক্ষার্থী মিঃ এ এস্ রায় বাঙালী কিনা সন্দেহ করিয়া (?) চিহ্ন দেওয়া হইয়াছিল। আমরা সম্প্রতি অবগত হইয়াছি মিঃ এ, এস্ রায় বাঙালী এবং প্রবাসীর লেখক।

শ্রাবণ পৃঃ ৬৭১, ২য় স্তম্ভ ৩ লাইন "বরাবর" স্থলে বরকি পড়িতে হইবে।

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়
৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
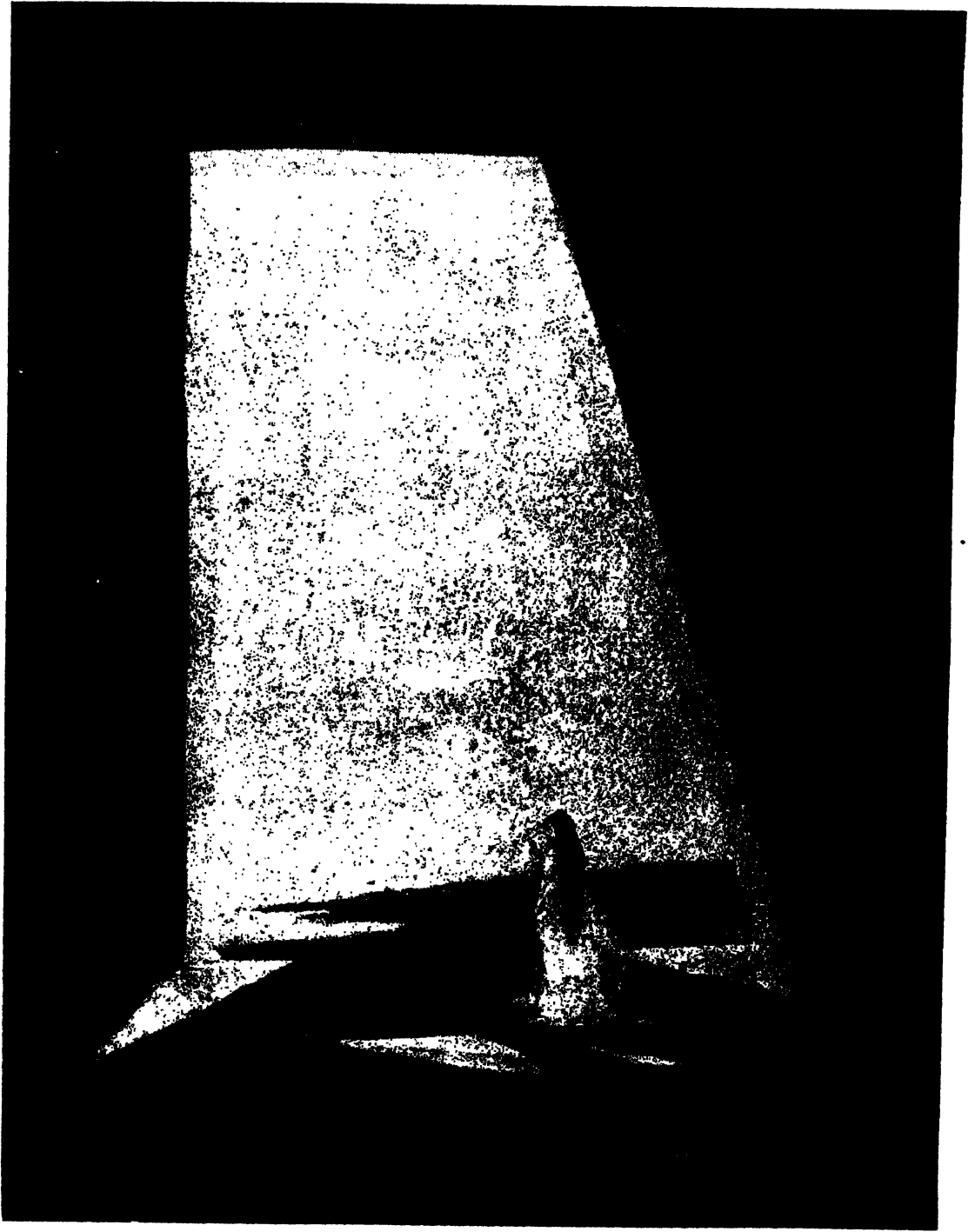
উদয়সাগরতীরে পদ্মিনী

শিল্পী শ্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৬শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৩৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বৈকালী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

দিন পরে যায় দিন, বসি পথ-পাশে,
গান পরে গাই গান, বসন্ত-বাতাসে।
ফুরাতে চায় না বেলা,
তাই সুর গেঁথে খেলা,
রাগিণীর মরীচিকা স্বপ্নের আভাসে।

দিন পরে যায় দিন, নাই তব দেখা,
গান পরে গাই গান, রই ব'সে একা।
সুর থেমে যায় পাছে
তাই নাহি আসো কাছে,
ভালোবাসা ব্যথা দেয় যারে ভালোবাসে॥

(২)

বনে যদি ফুট্‌ল কুসুম
নেই কেন সেই পাখী।
কোন্ সুদূরের আকাশ হ'তে
আন্‌ব তারে ডাকি'?
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে,
পাতায় পাতায় নাচন লাগে,
এমন মধুর গানের বেলায়
সেই শুধু রয় বাকি।
উদাস-করা হৃদয়-হরা
না জানি কোন্ ডাকে
সাগর-পারের বনের ধারে
কে ভুলালো তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায়
বারে বারে ডাকে যে তায়,
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায়
কেন সে দেয় ফাঁকি।

(৩)

এসো আমার ঘরে,
বাহির হ'য়ে এসো তুমি
যে আছ অন্তরে।

স্বপন-দুয়ার খুলে এসো
অরুণ আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে,—
ক্ষণকালের আভাস হ'তে
চিরকালের তরে
এসো আমার ঘরে ॥

দুঃখসুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপ বাণী
ফাগুন-বাতাসে—
বনের নিশ্বাসে।
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ
এসো বুকের পরে,
এসো আমার ঘরে ॥

(৪)

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি, কী জানি।
নানা কাজে নানা মতে
ফিরি ঘরে ফিরি পথে,
সে-কথা কি অগোচরে,
বাজে ক্ষণে ক্ষণে ?
কী জানি, কী জানি।

সে-কথা কি অগোচরে
ব্যথিছে হৃদয় ?
একি ভয়, একি জয় ?
সে-কথা কি বারে বারে
কানে কানে কয়—
"আর নয়, আর নয়।"

সে-কথা কি নানা সুরে
বলে মোরে "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম,
বাজে কি গগনে ?
কী জানি, কী জানি ॥

(৫)

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা
ম্লান দীপের থালা
হ'ল খান্ খান্।
এবার তবে জ্বালো
করুণ তারার আলো,
রঙীন ছায়ার এই গোধূলি হোক্ অবসান ॥

এসো পারের সাথী,
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
অন্ধকারের ছায়ে
শান্ত শীতল বায়ে
রাখ্‌ব তোমার পায়ে
ক্লান্ত বীণার গান ॥

ঋগ্বেদীয় উপনিষদের ব্রহ্মবাদ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

ঋগ্বেদের দুইখানা উপনিষৎ—একখানা ঐতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত; অপর খানার নাম কৌষীতকি উপনিষৎ। ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরণ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে। এইজন্য এই উভয় আরণ্যকই উপনিষৎ (দ্বিতীয় আরণ্যকের সায়ণ ভাষ্য, প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই তিন অধ্যায়কে সাধারণতঃ উপনিষৎ বলা হয় এবং এই তিন অধ্যায়ের নাম দেওয়া হইয়াছে

ঐতরেয় উপনিষৎ। ঋগ্বেদীয় ব্রহ্মবাদ এই উপনিষদেই পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু কত কল্পনা-জল্পনা, কত সাধ্য-সাধনার পরে ঋষিগণ শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা জানিতে হইলে সমগ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরণ্যকই পাঠ করা আবশ্যক। আমরা আবশ্যক মত এই উভয় আরণ্যেকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিব।

ঐতরেয় আরণ্যক

ঐতরেয় আরণ্যকের মতে আত্মাই ব্রহ্ম। কিন্তু 'আত্মা কি' এবিষয়ে অনেক মতভেদ ছিল।

এক স্থলে (২।১।৪) লিখিত আছে যে, ব্রহ্ম মানবদেহে প্রবেশ করিয়া পঞ্চ 'শ্রী' রূপে মস্তকে অবস্থান করিলেন। পঞ্চ 'শ্রী'র নাম—চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্ এবং প্রাণ।

এস্থলে প্রাণকে অন্যতম ইন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইল; কিন্তু ঋষি একটি উপাখ্যান্ দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, উক্ত পাঁচটির মধ্যে প্রাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব (২।১।৫)।

ইহার পরে (২।১।৮) বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অসু এবং প্রাণ; ভূতি এবং অভূতি। 'ভূতি' অর্থ 'সত্তা' এবং অভূতি অর্থ অ-সত্তা বা অ-বস্তু। ভূতিরই শ্রেষ্ঠত্ব দেবগণ ভূতির উপাসনা করিয়া লাভ করিয়াছিল এবং অসুরগণ অ-ভূতির উপাসনা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইহার পরে ঋষি এক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ প্রভৃতি নাম বিশ্লেষণ করিয়া ঋষি দেখাইয়াছেন যে, এ সমুদায় প্রাণই; প্রাণেরই বিশেষ বিশেষ শক্তি দেখিয়া ইহাকে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্রাদি নাম দেওয়া হইয়াছে (২।২।১,২)।

ইহার পরে ঋষি বলিয়াছেন যে, সুক্ত, ক্ষুদ্রসূক্ত, মহাসূক্ত, ঋক্, অৰ্দ্ধঋক্, পদ, অক্ষর, এবং সমুদায় বেদই প্রাণ (২।২।২)।

অন্য এক স্থলে (২।২।৩) ঋষি একটি উপাখ্যান দ্বারা প্রাণের ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন—"হে ঋষি, আমি তোমাকে বর দিতেছি।" বিশ্বামিত্র বলিলেন—"আমি তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি।" ইন্দ্র বলিলেন—"হে ঋষি, আমি প্রাণ; তুমিও প্রাণ এবং সমুদায় ভূতই প্রাণ। এই যে (সূর্য্য) উত্তাপ দিতেছে, ইহাও প্রাণ। আমি এইরূপে সমুদায় দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছি" (২।২।৩)।

এস্থলে ইন্দ্র ব্রহ্ম-স্থানীয়। পূর্ব্বোক্ত অংশে বলা হইল প্রাণই ব্রহ্ম।

সবিতৃদেব নিত্য-উপাস্য; গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা সবিতাকে প্রতিদিন উপাসনা করা হয়। ঋষি বলিতেছেন, উপাসক এবং এই উপাস্য একই। উপাসক নিজে বলিতেছেন:—

যঃ অহম্, সঃ অসৌ;
যঃ অসৌ, সঃ অহম্।

"আমি যাহা, তিনি (অর্থাৎ সবিতৃদেব) তাহাই; তিনি যাহা, আমি তাহাই" (২।২।৪)।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ঋষির মতে আত্মাই ব্রহ্ম। কিন্তু 'আত্মা' বলিলে প্রাণই বুঝিতে হইবে; প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।

কিন্তু প্রাচীনকালের ঋষিগণ সকলে এই আত্ম-তত্ত্বে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা অনেকে প্রাণকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় উপনিষদে প্রাণকে কোন শ্রেষ্ঠত্বই দেওয়া হয় নাই। এই গ্রন্থে ঋষি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—'আত্মা কি?' তাঁহার সিদ্ধান্ত, প্রজ্ঞানই আত্মা। এবং প্রজ্ঞান বলিলে সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অসু, কাম, বশ—এই সমুদায় বুঝিতে হইবে। এক স্থলে এই-প্রকার বলা হইয়াছে:—

"এই ব্রহ্ম (=ব্রহ্মা), এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমুদায় দেবতা; পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতিঃ এই পঞ্চ মহাভূত;……জঙ্গম, পতত্রি এবং স্থাবর—এই সমুদায়ই প্রজ্ঞানেত্র (অর্থাৎ প্রজ্ঞাদ্বারা চালিত), প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। লোক প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠা এবং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম" (আরণ্যক ২।৬।১; উপনিষৎ তৃতীয় অধ্যায়। প্রবাসী, ১৩২৯ কার্ত্তিক পৃঃ ৫-৭ দ্রষ্টব্য।

এই উপনিষদে বলা হইল, প্রজ্ঞানরূপী আত্মাই ব্রহ্ম।

ইহার পরে ঐতরেয় আরণ্যকের এক স্থলে আত্মবিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে—

যিনি অশ্রুত, যিনি অ-গত (যাহাতে গমন করা যায় না অর্থাৎ যিনি অগম্য, অ-মত (যাহাকে মনন করা যায় না)

অ-নত (যাহাকে বশীভূত করা যায় না), অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত, অনাদিষ্ট (অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার বিষয় উপদেশ দেওয়া হয় নাই) কিন্তু যিনি শ্রোতা, মন্তা, দ্রষ্টা, আদেষ্টা, ঘোষ্টা (যিনি ঘোষণ করেন), বিজ্ঞাতা, প্রজ্ঞাতা এবং সমুদায় ভূতের অন্তর-পুরুষ, তিনিই আমার আত্মা— এই প্রকার জানিবে (৩।২।৪)।

এই স্থলের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন, "আত্মা বিষয়ো ন ভবতি বিষয়ী তু ভবতি"—অর্থাৎ "আত্মা বিষয় নহেন, তিনি বিষয়ী"।

এখানে জ্ঞানবাদের পরাকাষ্ঠা; যাজ্ঞবল্ক্যও এই আত্মারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আত্মাই ব্রহ্ম।

কৌষীতকি উপনিষদের মত

ঐতরেয় আরণ্যকের কোন-কোন স্থলে প্রাণকে আত্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন ঋষি এই মত অগ্রাহ্য করিয়া আত্মাকে প্রজ্ঞান স্বরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু কৌষীতকি উপনিষদের একটি বিশেষত্ব আছে। এই উপনিষদের ঋষিগণ প্রাণ-বাদ এবং প্রজ্ঞান-বাদ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দেখা যাউক উপনিষৎ স্বয়ং কি বলিতেছেন।

(১)

এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পরে মানব ব্রহ্ম-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি কে?" তখন তিনি বলিবেন—

"আমি কাল (ঋতু), আমি কাল সম্ভূত (আর্ত্তবঃ), আমি আকাশ-রূপ যোনি হইতে, জ্যোতিঃ হইতে সম্ভূত। সংবৎসরের এই তেজ আমি; আমি ভূতের (ভূতকালের), ভূতের (প্রাণিগণের), ভূতের (পঞ্চভূতের) এবং ভূতের (সমুদায় সত্তার, আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদায় সত্তার) আত্মা। আমি আত্মা; তুমি যাহা আমিও তাহাই" (১।৬)।

এস্থলে 'ভূত' শব্দ চারিবার ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, একই অর্থকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য ঋষি একই শব্দকে চারিবার ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদিগের মনে হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন 'ভূত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐসমুদায় অর্থ কি তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা চারিটি স্থলে চারিটি অর্থ দিয়াছি এবং ইহাদিগের মধ্যে কোন অর্থই কষ্টকল্পিত নহে; সমুদায় অর্থই প্রচলিত। 'ভূত' শব্দের অন্য অর্থও আছে। প্রাচীন সাহিত্যে 'ঐশ্বর্য্য' অর্থে ভূত শব্দ ব্যবহৃত হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থলে (৩০।১০) 'ভূত' শব্দের এই অর্থ। এস্থলে সায়ণ লিখিয়াছেন, 'ভূতম্ ঐশ্বর্য্যম্'। আরও অনেক অবাস্তবিক অর্থ আছে।

এস্থলে এসমুদায় শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, এ অংশের ভাবার্থ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম-সমীপবর্ত্তী পুরুষ ব্রহ্মকে যাহা বলিতেছেন তাহার অর্থ এই—

"আমি আত্মা; আমি সমুদায়েরই আত্মা; আমি তুমিই।" এখানে বলা হইল "আত্মাই ব্রহ্ম"।

(২)

এখন প্রশ্ন 'আত্মা কি?' দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই এই প্রকার লিখিত আছে—

"কৌষীতকি বলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। মন প্রাণরূপ ব্রহ্মের দূত, বাগিন্দ্রিয় ইহার পরিবেষ্ট্রী, চক্ষু ইহার রক্ষক, শ্রোত্র ইহার প্রতিহারী। এই প্রাণরূপ ব্রহ্মের উদ্দেশে দেবতাগণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) অযাচিত ভাবে বলি প্রদান করিয়া থাকে (কৌঃ উঃ, ২।১)।

নিজমত সমর্থন করিবার জন্য ঋষি অপর এক ঋষির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। "প্রাণঃ ব্রহ্ম" ইতি হ স্ম আহ পৈঙ্গ—অর্থাৎ পৈঙ্গ ঋষি বলেন "প্রাণই ব্রহ্ম" (২।১)।

ঋষি কাহাকে প্রাণ বলিতেছেন, তাহা উক্ত অধ্যায়েই বর্ণিত হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য বিবাদপরায়ণ হইয়া এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করিল। তখন এই শরীর দারুবৎ শয়ন করিয়া রহিল।

অনন্তর বাক্ এই শরীরে প্রবেশ করিল। কিন্তু ইহা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্যোচ্চারণ-সমর্থ হইয়াও (পূর্ব্ববৎ) শয়ন করিয়া রহিল। তৎপর চক্ষু এই শরীরে প্রবেশ করিল। কিন্তু বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারণ-সমর্থ ও চক্ষুদ্বারা দর্শন-সমর্থ হইয়াও (পূর্ব্ববৎ) শয়ন করিয়া রহিল। অনন্তর শ্রোত্র এই শরীরে প্রবেশ করিল। কিন্তু ইহা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারণ, চক্ষু দ্বারা দর্শনে এবং শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণে সমর্থ হইয়াও (পূর্ব্ববৎ) শয়ন করিয়া রহিল। তদনন্তর মন এই শরীরে প্রবেশ করিল। কিন্তু ইহা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারণে সমর্থ, চক্ষুদ্বারা দর্শনে সমর্থ, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণে সমর্থ এবং মনদ্বারা চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াও (পূর্ব্ববৎ) শয়ন করিয়া রহিল। তখন প্রাণ এই শরীরে প্রবেশ করিল; তখন এই শরীর উত্থিত হইল। ইহা দেখিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হইল এবং প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা বলিয়া সম্যক্ অনুভব করিয়া সকলের সহিত ইহলোক হইতে উৎক্রমণ করিল" (কৌঃ ২।৯)।

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কে বড় এই লইয়া ঝগড়া হইয়াছিল। বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও প্রাণ এই পাঁচ জন প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, প্রাণও একটা ইন্দ্রিয়। সুতরাং 'প্রাণ' অর্থ 'প্রাণবায়ু'।

এই উপাখ্যান হইতে আরও বুঝা যাইতেছে, এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, সুতরাং সিদ্ধান্ত এই, প্রাণরূপী প্রজ্ঞাত্মাই ব্রহ্ম।

(৩)

তৃতীয় অধ্যায়ে এই তত্ত্ব আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদ

একটি উপাখ্যান রচনা করিয়া ঋষি বলিতেছেন—

"দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও পৌরুষ দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয়ধামে গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—'প্রতর্দ্দন! আমি তোমাকে বর দিব'। প্রতর্দ্দন বলিলেন, 'মনুষ্যের পক্ষে তুমি যে বর হিততম বলিয়া মনে কর, তাহাই আমার জন্য মনোনয়ন কর'। ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, 'বর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ) কখন অবরের জন্য (অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠের জন্য) বর মনোনীত করে না, তুমিই মনোনীত কর'। প্রতর্দ্দন বলিলেন, 'এরূপ হইলে বর আমার পক্ষে অ-বর (অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ) হইবে'। তখন ইন্দ্র সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না, কারণ ইন্দ্র সত্য-স্বরূপ। তিনি বলিলেন, 'আমাকেই জান; আমি ইহাই মানবের পক্ষে হিততম বলিয়া মনে করি যে, সে আমাকে জানিবে'।" (৩,১)।

প্রাণ=আয়ু=প্রজ্ঞাত্মা

ইন্দ্র এইসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন—

"আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা। আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা কর। আয়ুই প্রাণ এবং প্রাণই আয়ু। প্রাণই অমৃত। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই আয়ু; প্রাণদ্বারাই পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করা যায়। প্রজ্ঞাদ্বারা সত্য-সঙ্কল্প লাভ হয়। যে আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা করে সে ইহলোকে পূর্ণায়ু ও স্বর্গলোকে অমৃতত্ব ও অক্ষয়ত্ব লাভ করে (৩।২)।

প্রাণ কাহাকে বলে ঋষি এখানে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। প্রাণ ও আয়ু একই বস্তু। এস্থলে প্রাণ কেবল 'প্রাণবায়ু' নহে; ইহা জীবনী শক্তি। এই প্রাণ বা আয়ুর নামই আত্মা। এ প্রাণ জ্ঞানবিহীন নহে; ইহা প্রজ্ঞ, এইজন্য ইহার নাম প্রজ্ঞাত্মা। এস্থলে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইল।

একটি আপত্তি

কিন্তু এবিষয়ে ঋষি নিজেই একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। আপত্তিটি এই:—

"এবিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রাণ-সমূহ (ইন্দ্রিয়-সমূহ) একীভূত হইয়া থাকে, কারণ কেহ একই সময়ে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা নাম (বাক্য) উচ্চারণ করিতে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিতে এবং মন দ্বারা চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না।* সুতরাং প্রাণ-সমূহ একীভূত হইয়া এইসমুদায় কার্য্য একে একে সম্পন্ন করিয়া থাকে (অর্থাৎ প্রাণসমূহ একীভূত হইলে কেবলমাত্র

* কেহ কেহ এই অংশের এইপ্রকার অর্থ করেন—প্রাণ-সমূহ একীভূত হইয়া থাকে (নচেৎ) কেহ একই সময়ে.........চিন্তা করিতে সমর্থ হইত না।

একটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে, অপরাপর ইন্দ্রিয় নিজেদের কার্য্য না করিয়া ঐ ইন্দ্রিয়েরই অনুগমন করে এবং উহারই কার্য্য করিয়া থাকে—এইরূপে যখন যে-ইন্দ্রিয়ের নেতৃত্ব, তখন কেবল সেই ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হইয়া থাকে)। যখন বাগিন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করে, তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া উচ্চারণ করে। যখন চক্ষু দর্শন করে, তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া দর্শন করে। যখন শ্রোত্র শ্রবণ করে, তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রবণ করে। যখন মন চিন্তা করে, তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া চিন্তা করে। যখন প্রাণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদির কার্য্য করে, তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদির কার্য্য করে" (৩।২)।

প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে এই আপত্তি হইতে পারে।

উত্তর

ইহার উত্তরে ইন্দ্র বলিতেছেন :—

"ইহা সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে (মুখ্য) প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বও রহিয়াছে" (৩।২)।

এবিষয়ে এইপ্রকার যুক্তি দেওয়া হইয়াছে :—

"বাকশক্তিবিহীন ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, কারণ আমরা মূক দেখিতে পাই। চক্ষুবিহীন ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, কারণ আমরা অন্ধ লোক দেখিতে পাই। শ্রোত্রবিহীন ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, কারণ আমরা বধির দেখিতে পাই। মনবিহীন (অর্থাৎ চিন্তা-শক্তি-বিহীন) ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, কারণ আমরা বালক দেখিতে পাই। ছিন্নবাহু ও ছিন্নোরু ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, কারণ আমরা এরূপ ব্যক্তি দেখিতে পাই। এই প্রাণরূপী প্রজ্ঞাত্মাই শরীর পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে চালিত করে।" (৩।৩)।

এস্থলে বলা হইতেছে যে, চক্ষু, কর্ণ, মন, হস্ত, পদ না থাকিলেও মানব জীবিত থাকিতে পারে; একমাত্র প্রাণই দেহকে সঞ্জীবিত রাখে এবং চালিত করে। সুতরাং প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু নাই।

প্রাণ=প্রজ্ঞা

ইহার পরে প্রাণ ও প্রজ্ঞার একত্ব স্থাপন করা হইয়াছে।

"যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা; এবং যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ। এতদুভয়ে একত্রে এই শরীরে বাস করে এবং একত্রেই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে" (৩।৩)।

এস্থলে দুইটি কথা বলা হইল :—

(১) প্রাণ ও প্রজ্ঞা দুইটি পৃথক্ বস্তু; ইহারা একত্র অবস্থান করে এবং একত্র প্রস্থান করে।

(২) প্রাণ ও প্রজ্ঞা পৃথক্ হইলেও ইহারা একই।

ইহাদিগের একত্ব প্রমাণ করিবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে :—

(ক)

"এই পুরুষ যখন সুপ্ত হয় এবং কোন স্বপ্ন দেখে না তখন সে প্রাণে একীভূত হয়। তখন বাক্ সমুদায় নামের সহিত তাহাতে (অর্থাৎ প্রাণে একীভূত পুরুষে) গমন করে, চক্ষু সমুদায় রূপের সহিত, শ্রোত্র সমুদায় শব্দের সহিত, মন সমুদায় চিন্তার সহিত তাহাতে গমন করে। আবার যখন জাগ্রৎ হয় তখন, যেমন জলন্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ সর্ব্বদিকে গমন করে, তেমনি এই আত্মা হইতে প্রাণ-সমূহ যথাস্থানে গমন করে; এবং প্রাণ-সমূহ হইতে দেবগণ এবং দেবগণ হইতে লোক-সমূহ (নির্গত হয়)। (৩।৩)।

(খ)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এই :—

যখন এই পুরুষ আর্ত্ত ও মুমূর্ষু হইয়া দুর্ব্বলতাবশতঃ সংমোহ প্রাপ্ত হয় তখন লোকে বলে—চিত্ত উৎক্রমণ করিয়াছে, সে শুনিতে পায় না, সে দেখিতে পায় না, সে বাক্য উচ্চারণ করে না, সে চিন্তা করে না। তখন সে প্রাণে একীভূত হয়; তখন বাক্য সমুদায় নামের সহিত ইহাতে গমন করে, চক্ষু সমুদায় রূপের সহিত (ইহাতে) গমন করে, শ্রোত্র সমুদায় শব্দের সহিত (ইহাতে) গমন করে, মন সমুদায় চিন্তার সহিত (ইহাতে) গমন করে। যখন প্রতিবুদ্ধ হয় তখন, যেমন জলন্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ সর্ব্বদিকে গমন করে, তেমনি এই আত্মা

হইতে প্রাণ-সমূহ যথাস্থানে গমন করে এবং প্রাণ-সমূহ হইতে দেবগণ এবং দেবগণ হইতে লোক-সমূহ (নির্গত হয়)"। (৩৩)।

(গ)

তৃতীয় দৃষ্টান্ত এই :—

"যখন সে এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন এই সমুদায়ের সহিতই উৎক্রমণ করে। বাক্ ইহাতে (অস্মিন্) সমুদায় নাম বিসর্জ্জন করে, কারণ ইহা বাক্ দ্বারাই সমুদায় নাম প্রাপ্ত হয়। প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় ইহাতে সমুদায় গন্ধ বিসর্জ্জন করে, কারণ সে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই সে গন্ধ প্রাপ্ত হয়। চক্ষু ইহাতে সমুদায় রূপ বিসর্জ্জন করে, কারণ চক্ষু দ্বারাই সে রূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্র ইহাতে সমুদায় শব্দ বিসর্জ্জন করে, কারণ শ্রোত্র দ্বারাই সে সমুদায় শব্দ প্রাপ্ত হয়। মন ইহাতে সমুদায় চিন্তা বিসর্জ্জন করে, কারণ সে মন দ্বারাই সমুদায় চিন্তা প্রাপ্ত হয়। প্রাণেই এই সর্ব্বাপ্তি (অর্থাৎ সমুদায়ের বিলয়)"।

ইহার পরেই বলা হইল, "যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ। ইহারা এই শরীরে একত্র বাস করে এবং একত্রই উৎক্রমণ করে।" (৩৪)।

এই তিনটি স্থলে বলা হইল যে, (১) প্রাণ ও প্রজ্ঞা দুই হইয়াও এক। বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া একাকার ধারণ করে। এই সম্মিলিত অবস্থার নাম আত্মা।

(২) সুষুপ্তি ও মুমূর্ষু অবস্থাতে সমুদায়ই আত্মরূপে বিলীন হয়। যখন পুরুষ সংজ্ঞালাভ করে তখন

(ক) আত্মা হইতে প্রাণ-সমূহ নির্গত হয় ;

(খ) প্রাণ-সমূহ হইতে দেবগণ নির্গত হয় ;

(গ) দেবগণ হইতে এই জগৎ নির্গত হয়।

'প্রাণ-সমূহ' অর্থে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ; আর কৌষীতকি উপনিষদে (এবং আরও অনেক উপনিষদে) 'দেবগণ' অর্থেও প্রাণ সমূহ। তাহা হইলে (খ) অংশের অর্থ দাঁড়ায় "প্রাণ-সমূহ হইতে প্রাণ-সমূহ নির্গত হয়।" ইহা অর্থ-শূন্য কথা। ভাষ্যকার বলেন—'দেবগণ' অর্থে 'অগ্ন্যাদি দেবতা'।

কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ "ইন্দ্রিয়-শক্তি"। পরবর্ত্তী মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হয় 'দেবগণ' অর্থে 'রূপরসাদি ভূতমাত্রা'। তাহা হইলে সমগ্র অংশের অর্থ দাঁড়ায় এই :—আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহ, ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে রূপরসাদি ভূতমাত্রা, এবং রূপরসাদি ভূতমাত্রা হইতে স্থূল জগৎ উৎপন্ন হয়।

ভূতমাত্রার উৎপত্তি

বাক্ ইহার (অর্থাৎ প্রজ্ঞার) এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'নাম' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। প্রাণ (=নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস) ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'গন্ধ' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। চক্ষু ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'রূপ' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রোত্র ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'শব্দ' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। জিহ্বা ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'অন্নরস' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। হস্ত ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'কর্ম্ম' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। শরীর ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'সুখ-দুঃখ' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে।......পাদদ্বয় ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'গতি' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। মন ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'জ্ঞান, জ্ঞেয় ও কাম' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে"। (৫)।

ঋষির মতে নাম, গন্ধ, রূপ, শব্দ, অন্নরস, কর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, আনন্দরতি ও প্রজাতি, গতি, এবং 'জ্ঞান, জ্ঞেয় ও কাম'—এই দশটি ভূতমাত্রা। এই দশটি ভূতমাত্রা লইয়াই জগৎ। বাগাদি দশটি ইন্দ্রিয় প্রাণরূপী প্রজ্ঞাকে দোহন করিয়া এইসমুদায় ভূতমাত্রা উৎপন্ন করিয়াছে এবং এই-সমুদায় ভূতমাত্রাকে প্রজ্ঞারূপী আত্মার বহির্ভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। এই মতের সহিত Fichte (ফিক্টে) এর অধ্যাত্মবাদের সম্যক্ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এ জগৎ প্রজ্ঞামূলক

ঋষি বলিতেছেন :—

"(পুরুষ) প্রজ্ঞাদ্বারা বাগিন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বাক্য দ্বারা সমুদায় নাম প্রাপ্ত হয়"।

ইহার পরে ঋষি অনুরূপ ভাষায় বলিয়াছেন যে, প্রজ্ঞা-দ্বারাই পুরুষ অপরাপর ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ লাভ করিয়া থাকে। প্রজ্ঞাদ্বারাই পুরুষ প্রাণ (অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়) চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা, হস্ত, শরীর, পদ, ধী—এইসমুদায় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। এবং এইরূপে আশ্রয় করিয়া বাক্য দ্বারা নাম, চক্ষু দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস, হস্ত দ্বারা কর্ম্ম, শরীর দ্বারা সুখ-দুঃখ, পদদ্বয় দ্বারা গতি, ধী দ্বারা 'ধী, জ্ঞেয় ও কাম' লাভ করে (৩৬)।

এখানে বলা হইল, পুরুষ যাহা কিছু করে, তাহা প্রজ্ঞা দ্বারাই ; প্রজ্ঞা ভিন্ন কিছুই সম্ভব হয় না।

প্রজ্ঞা ভিন্ন জ্ঞান অসম্ভব

ইহার পরে বলা হইয়াছে :—

"প্রজ্ঞা-বিরহিত হইয়া বাগিন্দ্রিয় কোন নাম বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না; লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এ নাম অবগত হই নাই"।

ইহার পরে এই ভাষাতেই বলা হইয়াছে যে, প্রজ্ঞা-বিরহিত হইয়া অপরাপর ইন্দ্রিয়গণও নিজ নিজ বিষয় জানিতে পারে না। প্রজ্ঞাবিরহিত হইয়া চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা, হস্ত, শরীর, পদদ্বয়, এই সমুদায় ইন্দ্রিয় রূপ, শব্দ, অন্নরস, কর্ম্ম, সুখ-দুঃখ এবং গতি বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না। লোকে বলিয়াই থাকে আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই রূপ শব্দাদি অবগত হই নাই।

সর্ব্বশেষে ঋষি বলিতেছেন, 'প্রজ্ঞা-বিরহিত হইলে ধী সম্ভব হয় না, জ্ঞাতব্য বিষয়ও জানা যায় না' (৭)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রাণ হইতেই ইন্দ্রিয়-সমূহের উৎপত্তি, ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে ভূতমাত্রার এবং ভূতমাত্রা হইতে জগতের উৎপত্তি। এখানে বলা হইতেছে, প্রজ্ঞার সাহায্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়-সমূহ রূপ রসাত্মক জগৎ বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহ যে কেবল প্রাণের উপরই নির্ভর করিতেছে তাহা নহে, ইহাদিগকে প্রজ্ঞার উপরও নির্ভর করিতে হইতেছে। এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া ঋষি বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, প্রাণ ও প্রজ্ঞা—বিভিন্ন হইয়াও বিভিন্ন নহে; ইহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে; প্রকৃত পক্ষে ইহারা দুই নহে—একই।

প্রজ্ঞাত্মাকেই জানিতে হইবে

ইহার পরে ঋষি বলিতেছেন—"বাক্যকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, বক্তাকেই জানিতে হইবে"।

ইহার পরে অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া বলা হইয়াছে—গন্ধ, রূপ, শব্দ, রস, কর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, গতি, মন এই সমুদায়কে জানিতে ইচ্ছা করিবে না; ইহাদিগের বিষয়ীকে অর্থাৎ ঘ্রাতা, রূপবিৎ, শ্রোতা প্রভৃতিকেই জানিতে হইবে।

প্রজ্ঞামাত্রা ও ভূতমাত্রা

ইহার পরে ঋষি বলিতেছেন:—"এই দশটি ভূতমাত্রা (অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিষয়) প্রজ্ঞাশ্রিত এবং দশটি প্রজ্ঞামাত্রা (অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) ভূতাশ্রিত। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত, প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না এবং যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত ভূতমাত্রা থাকিত না। এতদুভয়ের মধ্যে কেবল মাত্র একটি হইতে কোনরূপই সিদ্ধ হয় না।"

ইহার পরই ঋষি বলিতেছেন—"ইহা নানা নহে (অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্রা ও ভূতমাত্রা পৃথক্ নহে)"।

ইহার পরে বলা হইয়াছে:—"যেমন রথের অর-সমূহে নেমি এবং নাভিতে অর-সমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রাতে এবং প্রজ্ঞামাত্রা ভূতমাত্রাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে" (৩৮)।

ঋষির বলিবার উদ্দেশ্য এই:—বিষয় এবং বিষয়ী অচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত। বিষয় ছাড়া বিষয়ী থাকিতে পারে না এবং বিষয়ী ছাড়াও বিষয় থাকিতে পারে না। এক অপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে বিষয় বিষয়ী পৃথক্ নহে।

আত্মাই ব্রহ্ম

ঋষির শেষ কথা এই:—"এই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অমর ও অমৃত। ইনি সাধু কর্ম্ম দ্বারা বর্দ্ধিত হয়েন না এবং অসাধু কর্ম্মদ্বারাও হীন হয়েন না। ইনি যাহাকে উর্দ্ধে লইতে চাহেন তাহাকে সাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন আর যাহাকে নিম্নে লইতে চাহেন তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। ইনিই লোকপাল, ইনিই লোকাধিপতি, ইনি সর্ব্বেশ্বর। ইনিই আমার আত্মা—এইরূপ জানিবে (৩.৮)।

এই অধ্যায়ের উপসংহারের প্রাণকে আবার প্রজ্ঞাত্মা বলিয়া বর্ণনা করা হইল। ইনিই আনন্দ স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ ও অজর। এই প্রাণ নিত্য পরিপূর্ণ, ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইল যে, সাধু বা অসাধু কার্য্য দ্বারা ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এখন প্রশ্ন—পাপপুণ্য করে কে?—ইহার উত্তর এই—প্রাণ ইন্দ্রিয়-সমূহের অন্তর্ভূত হইলেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব আছে। এই প্রাণ হইতেই ইন্দ্রিয়-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণই ইন্দ্রিয়-সমূহের কর্ত্তা, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের কর্ত্তা। ইনিই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবকে নিয়মিত করিতেছেন এবং বিশ্বজগৎকেও নিয়মিত করিতেছেন। বিশ্বজগৎ প্রাণ হইতে উদ্ভূত এবং প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই বলা হইয়াছে, "ইনি লোকপাল, লোকাধিপতি এবং সর্ব্বেশ্বর"। এই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে, ইনি আমার আত্মা। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—

আত্মাই ব্রহ্ম

ঐতরেয় আরণ্যকের নিম্নতম স্তরে প্রাণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহার শেষ সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞানরূপী আত্মাই ব্রহ্ম। এস্থলে প্রাণকে একবারেই অগ্রাহ্য করা হইল।

কৌষীতকি উপনিষদে প্রাণকে অগ্রাহ্য করা হয় নাই। ঋষি নানা উপায়ে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাণই প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই প্রাণ। তাঁহার মতে প্রাণরূপী প্রজ্ঞা কিংবা প্রজ্ঞানরূপী প্রাণই আত্মা এবং এই আত্মাই ব্রহ্ম।

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

(৩২)

২০এ জুলাই ১৯০১

বন্ধু,

তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তার পর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পড়িয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর, সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। এতদিন পর যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছু অভিপ্রেত নাই। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়। আর, তুমি যে-সব দুরূহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হও।

আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই, যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এসব দেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন্ দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন্ জাতি অনার্য্যকে আর্য্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে?

তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ, তোমরা কেবল নকল করিতে পার, ইত্যাদি কথা, বিদেশী কেন, স্বদেশী অনেকের নিকটও শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে আমার অনেক প্রশংসা করিয়াছ। যদি কিছু প্রশংসার থাকে, তবে তাহা এই, যে, আমি এই মন্ত্রপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি, যে, অন্যে যাহা করিয়াছে, তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন, তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন, সেই Eternal Life, যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা সমস্ত উৎসাহ নির্ম্মূলিত হইয়াছে সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে যেন চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি অনেক চেষ্টা করিয়া বিজ্ঞানাগারের জন্য এদেশ হইতে সমস্ত এক প্রকার ঠিক্ করিয়া গিয়াছিলাম। শেষে ক্ষুদ্র লোকের চেষ্টায় আমার পরাজয় হইল। সেই ক্ষোভ আমার কোনদিন মিটিবে না। কারণ আজ সেই পরীক্ষাগার থাকিলে ভারতবর্ষকে পুণ্যক্ষেত্র করিতে পারিতাম। কেবল আমাদের দেশ হইতে আমার শিষ্য দ্বারা জগতে একটি সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইত। এই আমার যে ইংরেজ এ্যাসিষ্ট্যান্ট আছে, সে যখন আসিয়াছিল, তখন একান্ত গো-বেচারী। এখন উৎসাহে তাহার মুখের এক নূতন জ্যোতি ফুটিয়াছে।

আমি এখন আরও কত নূতন বিষয়ের সন্ধান পাইতেছি, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

রমেশবাবুর সহিত সেদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার কথায় পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। একবার এইভাবে বাধা পাইলে যে আর ফিরিয়া যাইব না, তাহা বুঝিতে পারি। এদিকে দেশের মায়ার বন্ধনও সম্পূর্ণ কাটাইতে পারি নাই। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। তোমার পত্র পাইলে স্থির করিব।

লোকেনের সহিত সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর; একদিন আমি যাইয়া দেখা করি, তার পর আর দেখা নাই।

মহারাজার যে এদেশ হইতে tutor লইবার কথা লিখিয়াছিলে, তা' একজন ভাল লোক দেখিয়া দিতে পারি। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিও। আমাদের দেশের ও এদেশের আচার্য্যের অনেক প্রভেদ। আমাদের দেশীয় গুরু, শিষ্যের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু এদেশ হইতে

কাহাকেও লইলে তাহার অনেক গৌণ উদ্দেশ্য থাকিবে। রমেশবাবুর নিকট শুনিলাম, ময়ূরভঞ্জের রাজা তাঁহার ইংরেজ শিক্ষককে কোনরূপে ছাড়াইতে পারিতেছেন না। চক্ষুলজ্জা! এদিকে সে লোকটাই প্রকৃত রাজা। খাল কাটিয়া কুম্ভীরকে কেন আনিবে? ত্রিপুরার মহারাজ অনেকাংশে অন্যান্য রাজা হইতে অনেক প্রকারে স্বাধীন। সর্ব্বাংশে আমাদের দেশীয় রীতিনীতি তথায় প্রচলিত বলিয়া আমাদের অহঙ্কার হয়। সেখানে একজন বিদেশী তাহার মতলব সমস্ত ওলটপালট করিবে, ইহা অতি দুঃখের বিষয় হইবে। এখান হইতে একজন সদাশয় লোক পাঠাইব। কিন্তু সে কদিন সেরূপ থাকিবে?

আমি অনেক ভাল লোক দেখিয়া দিতে পারিব। তবে যাহা লিখিলাম, তাহা বিবেচনা করিও।

তোমার
জগদীশ

(৩৩)

লণ্ডন
১৩এ জুলাই ১৯০১

বন্ধু,

তোমার বেলাকে সৎপাত্রস্থ করিয়াছ, ইহা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। জামাতাটি যে সর্ব্বাংশে তোমার মনোনীত হইয়াছে, ইহা সৌভাগ্য মনে করি। তোমার শিলাইদহের ভবনে আমার মন সর্ব্বদা আকৃষ্ট। আমার ক্ষুদ্র বন্ধুটির ছবি আমার টেবিলের সম্মুখেই দেখিতেছি।

আমি গত দুই সপ্তাহে আরও কয়েকটি নূতন বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছি কি এক বন্যা আসিয়াছে, আমি তাহাতে ভাসিয়া যাইতেছি, আর নূতন নূতন দেশ দেখিতেছি। আমি সে-সব কি ভাষাতে প্রকাশ করিব, স্থির করিতে পারি না।

আমার মনও নানা কারণে ম্রিয়মাণ। Extension পাইলাম না, ফার্লোর জন্য আবেদন করিয়াছি, তাহাও পাই কি না সন্দেহ। এরূপ অবস্থাতে কাজ ফেলিয়া গেলে যে পুনরায় সূত্র ধরিতে পারিব না তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেছি। আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়া যে-সব আলোকরেখা দেখিতেছি, তাহা একবার মুছিয়া গেলে আর কখনও পাইব না। জার্ম্মানী ও আমেরিকা যাওয়ার বিশেষ আবশ্যক ছিল, কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে জানি না।

আমি সম্মুখের মাসে একখানা পুস্তক লিখিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা আমার মতের উপক্রমণিকা স্বরূপ হইবে। তার পর যদি কখনও আমার সমস্ত পরীক্ষা শেষ করিতে পারি, তাহা হইলে একখানা বড় বই লিখিব এরূপ ইচ্ছা করি।

তুমি যে গত মাসে আমার কার্য্যের আভাস বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি যে এত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার, ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি অনেক সময় মনে করিয়াছি, যে, বাঙ্গলা কোন মাসিক পত্রে আমার এই নূতন কার্য্যসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়া সে ইচ্ছা মনেই রহিয়াছে। যদি তুমি সেগুলি কোনদিন প্রস্ফুটিত করিতে পার, তাহা হইলে সুখী হইব।

আমার একখানা ছবি পাঠাই, গ্রহণ করিয়া সুখী করিবে।

আর একখানা ছবি তোমার বসিবার ঘরে রাখিও। ওয়াটের "আশা" অন্ধ-বালিকা—যন্ত্রের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাই বাজাইতে চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের আশাও এই ভগ্নতন্ত্রীর মত।

তোমার
জগদীশ

(৩৭)

লণ্ডন
১০শে আগষ্ট ১৯০১

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি বলিতে পারি না। আমি নানা চিন্তায় অবসন্ন, এক এক সময় মনে হয় কেবল কার্য্য লইয়া যদি থাকি তাহা হইলে আমার অন্যান্য কর্ত্তব্য কে করিবে? আমাকে নির্ম্মম

হইতে হইবে; সমস্ত ভুলিয়া এক অভীষ্ট সাধন করিতে হইবে। তোমার চিঠি পাইলে আমার মনের অবসাদ অনেক দূর হয়।

তোমার 'জয়পরাজয়' গল্পটি আমাকে কিরূপ আবিষ্ট করিয়াছে, বলিতে পারি না। রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটুসনের বক্তৃতার দিন যেন তাহারই অভিনয় হইয়াছিল। যদি ভক্তের পূজা ভারতী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে জয় পরাজয় আমার নিকট একই। তবে তোমরা যে আমার জন্য এত করিতেছ, তাহার জন্য আমার মন কখন অতি প্রফুল্ল, কখন একান্ত অবশ হয়। আমি কতটুকু করিতে পারিব? হয়ত অধিক করিতে পারিব না, এই মনে করিয়া কষ্ট পাই। তবে তুমি আমার শঙ্কা দূর কর। আর এক কথা—আমার হিতাকাঙ্ক্ষী এদেশীয় বন্ধুগণ আমার নূতন দুয়েকটি আবিষ্ক্রিয়া আমার স্বার্থের জন্য কিছুদিন অপ্রকাশিত রাখিতে পরামর্শ দিতেছেন, কেবল আমাকে যেন কোন ক্রমে একেবারে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়। কিন্তু আমি এইরূপ রুদ্ধজীবন লইয়া কাজ করিতে পারি না, আমার যাহা দিবার তাহা যেন আমি তোমাদের নামে দিতে পারি। Rome এ International Congress on Wireless Telegraphy হইতে অনুরোধ-পত্র আসিয়াছে, তাহাতে লিখিয়াছেন,—"আপনার কার্য্য হইতে অনেক উন্নতি আশা করি, আপনার উপদেশ এবং নূতন আবিষ্ক্রিয়াতত্ত্ব জানাইয়া উন্নতিবর্দ্ধন করিবেন।" আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত কর। আমি জীবনের বাকী কয়দিন যেন উন্মুক্ত প্রাণে কার্য্য করিতে পারি। তুমি আমাকে কয়মাসের জন্য আসিতে লিখিয়াছ, "সকল কথা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করিয়া লইতে"। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, যাহা ভাল মনে কর, আমার হইয়া কর। আমি কেবল এক কাজ বুঝি, আর বাকী সব তোমরা আমার হইয়া কর। আমি এখন ভাবে আবিষ্ট হইয়া আছি। তাহা যদি কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দেই, তবে সূত্র পুনরায় ধরিতে পারিব কি না এই ভয় হয়। এই দেখ, এইমাত্র একটি আশ্চর্য্য Experiment করিয়া আসিলাম, জন্তু এবং অ-জীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা ব্যবধান, তাই সেতু বাঁধিবার জন্য উদ্ভিদের জীবন-স্পন্দন-রেখা আছে কি না তার চেষ্টা করিতেছিলাম। এইমাত্র অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার ফল পাইলাম—এক! এক! সব এক! উদ্ভিদকে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া আমি দুই-দিকে আক্রমণ করিব—একই কল, একই লিখিবার যন্ত্র—কেবল এইমাত্র উদ্ভিদ, পর মুহূর্ত্তে জীবী, পর মুহূর্ত্তে অজীবীকে রাখিয়া দেখাইব—একই হস্তলিপি! তুমি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, ইহার অন্ত কোথায়? কত বিজ্ঞান একীভূত হইবে। বিষপ্রয়োগে কেন জীবনান্ত হয়? 'বিষ খাইয়াছে—মরিয়াছে' সব গোলমাল চুকিয়া গেল। কিন্তু কেন মরিল? কি মানবিক কলে চাবি পড়িল? কেন পড়িল, চাবি কি ঘুরাইয়া দেওয়া যায় না—কেন যাইবে না? এসব কথা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তোমার ডাক্তারী, তোমার ঔষধ ব্যবহারের কিছু অর্থ আছে? কেন থাকিবে না? অর্থ যদি বোঝা যায়, তবে এইসব পরীক্ষা দ্বারা যাইবে। বন্ধু, আমি শত জীবনে ইহার চিন্তা করিতে পারিব না—আমি সব দেখিতেছি—কেবল সময়াভাব। আমি কি করিয়া এসব ফেলিয়া একদিনের জন্যও চলিয়া আসি? এজন্য আমাকে একেবারে ছাড়িয়া দাও। কেবল তুমি কয়মাসের জন্য এখানে আইস। আমি ফার্লোর জন্য আবেদন করিয়াছি; জানি না কি হয়। তবে Anglo-Indian member of Councilএর মধ্যেও দুএকজন মানবিক ভাব একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাহার মধ্যে একজন আমাকে বলিয়াছেন, "আমি তোমার ছুটীর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব, for I think it will be a sin against Science to make you leave your work now"। তবে বিরুদ্ধবাদী অনেক আছেন। আর দেশে ফিরিয়া গেলে যে কিরূপ হইবে তাহা বেশ জানি।

আমি যদি কাজ ছাড়িয়া দেই তাহাও যেন সদ্ভাবে করিতে পারি। যে-পথ উত্তম, তাহাতে বিদ্বেষ নাই। তুমি আমাদের ভবিষ্যতের যে সংকীর্ণ পথের কথা বলিয়াছ, তাহাই মহৎ। বিদ্বেষ দ্বারা কোন কাজ হয় না। আমি তোমাদের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ লইয়া সব করিতে সক্ষম হইব।

আর তুমি জান, সার্ জন উডবার্ণ আমাকে সর্ব্বদা

সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদের হস্তেই আমাদের জীবনসংশয়। তুমি শুনিয়াছ কি, যে, প্রফুল্ল রায়কে নাকি দূরে পাঠাইবার চেষ্টা হইয়াছিল?

আজ এখানেই শেষ করি। আরও কত লিখিবার আছে। তুমি সর্ব্বদা লিখিও। লোকেনের সহিত সাক্ষাৎ পাওয়া দুরূহ।

তোমার
জগদীশ

(৩৫)

C/o Messrs. Henry S. King & Co.
6th Sept., 1901

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম। নৈবেদ্যের সমালোচনা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

আমার deputationএর extension পাইলাম না। ফার্লোই দিয়াছে। তজ্জন্য বিবিধ গোলমাল সহ্য করিতে হইবে। একয়মাস যাহা করিয়াছি এখন তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে। ইহাতে কতদিন থাকিতে পারিব জানি না। আর জার্ম্মেণী ও আমেরিকা যাওয়ার আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

তোমরা যদি পার তবে আমার মুক্তির সংবাদ শীঘ্র পাঠাইবে। আমার মন দিতে পারিতেছি না। যদি আমার কার্য্য নিরুপদ্রবে কয়বৎসর পর্য্যন্ত না করিতে পারি তবে হাত দিয়া কোন লাভ নাই।

আমি যাহা করিতেছি তাহা অনেক প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ। গোড়া কাটিয়া দিলে যেরূপ সমস্ত ভূমিশায়ী হয়, সেইরূপ অনেক বিষয় পুরাণো theoryর সহিত জড়িত। অনেক বিষয় নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। এইজন্য এই কার্য্যে হাত দিতে হইলে বদ্ধ সংস্কারের সহিত অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। আমি যাহা পারিয়াছি তাহাতে অনেকটা সাহস হয় কিন্তু ধৈর্য্য ধৈর্য্য ধৈর্য্য। এই গুণটি আমাদের নাই। ইহা ছাড়াও কিছু হইবে না। আমি প্রস্তুত আছি, তবে আমি আর তাড়াতাড়ি করিতে পারি না। আমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমাকে যদি নিশ্চিন্ত করিতে পার যে, আমার কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না, তবে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

তোমার
জগদীশ

(৩৬)

লণ্ডন
১১ই অক্টোবর ১৯০১

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমি বড় মনকষ্টে আছি। তোমার দাদার পুস্তক এখানকার এক Mathematical Societyর Secretaryকে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ingenuityর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তবে নূতন notation বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার চিঠি পাঠাই। এখানে Conservation সব দিকেই বেশী, যদি একজন অনেক কাল ধরিয়া নূতন সংজ্ঞা প্রচলিত করিতে না পারেন, তবে তাহা সর্ব্বসাধারণে দেখিতে চাহে না। আমার বিবেচনায় যদি তোমার দাদা পুস্তকের Litho Copy করিয়া বিভিন্ন Libraryতে পাঠান তাহা হইলে ভাল হয়।

আমি বহু কষ্টে এক বৎসরের ফার্লো পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে আমার বেতন যেরূপ কাটা হইয়াছে তাহাতে এখানে থাকিয়া কাজ করা দুরূহ। বিশেষতঃ জার্ম্মাণী, আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে যাওয়া আবশ্যক। তুমি যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ তাহাতে কৃতজ্ঞ হইলাম। তবে যখন কর্ত্তৃপক্ষদের ইচ্ছা নয় যে, আমি এদেশে থাকি সেজন্য সহজেই গোলমাল হইতে পারে। জানি না অজ্ঞাতসারে সরকারের কোন নিয়ম অতিক্রম করি। এজন্য তুমি আনন্দবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় তাহা করিও।

আমার কার্য্য অতি বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তবে এক কি দুই বৎসরের বেশী করিতে পারিব না। আমি কেবল বহু নূতন উপাদান সংগ্রহ করিতেছি। যদি তোমাদের ধৈর্য্য লঙ্ঘন না করি তবে আশা হয় আমার কার্য্য নিষ্ফল হইবে না।

তোমার
জগদীশ

(৩৭)

লণ্ডন
১৫ই অক্টোবর, ১৯০১

বন্ধু,

তুমি লিখিয়াছ, আমার বন্ধুত্ব তোমাকে এমন প্রবল ও গভীরভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতে না। হয়ত জান না যে, আমার অবস্থাও ঐরূপ। কেন আকৃষ্ট হইয়াছি তাহার কারণ এই যে হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা যাহা আমার মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। নিরাশার মধ্যে কে মন বাঁধিতে পারে? তবুও এক বিশ্বাস যে আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়াছি। দুই অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে,—প্রথম মিথ্যা-অভিমানী স্বজাতিবৎসল, আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতিদ্রোহী। আমার মনে হয় এখন বিনয়ী, বিশ্বাসী, ধৈর্য্যশালী, স্বজাতিপ্রেমিকের সংখ্যা দিনদিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও। এবং একসূত্রে গ্রথিত করিও। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম। বৎসরে ২।৪টি পুরুষও যদি এইভাবে প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না।

তুমি জান না তোমার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ আশ্বস্ত হই। আমার পদে পদে কত বিঘ্ন তাহা তুমি মনেও করিতে পার না। আমি কখন কখন একেবারে নিরাশ্বাস হই। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার কার্য্যে যত নূতনত্ব থাকিবে, সে-পরিমাণে বাধা পাইব। প্রচলিত যে-মত, যাহার ভিত্তিতে সমস্ত Electro-physiology স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উপর হাত দিলে অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ হয়। অথচ সত্য অপলাপ করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কোন দিন সত্য প্রচারিত হইবে না। আর আমার কার্য্য এরূপ কঠিন যে, ইংলণ্ডে ২।৩ জন লোক ব্যতীত আমার শ্রোতামণ্ডলী নাই। তাহারাও পুরাতন মতের অবলম্বী। Physicist এবং physiologistদের মধ্যে অনেক কাল সংগ্রাম চলিয়াছে, এখন একে অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না।

আমাকে এজন্য সম্পূর্ণ একাকী কার্য্য করিতে হইবে, কার্য্যও এত বিস্তীর্ণ যে, অনেক সময় লাগিবে, কত সময় লাগিবে তাহা এখন বলা অসম্ভব। অর্থাৎ প্রতি বিষয় নূতন করিয়া স্থাপিত করিতে হইবে।

তোমাকে বলিয়াছি যে, আমি আমার থিওরির প্রত্যহই নূতন ও অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণ পাইতেছি। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে আলোকরাশি দেখিতেছি। তুমি যদি এখানে থাকিতে তাহা হইলে তোমাকে দেখাইয়া বড় সুখী হইতাম। তুমি অনায়াসে বুঝিতে পার, এবং নিশ্চয়ই উৎসাহিত হইতে।

যাহা প্রমাণ দ্বারা একমুহূর্ত্তে দেখাইতে পারি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুরূহ। তবুও মনে করিতেছি যে, একখানা পুস্তক লিখিব, তাহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত experiment বিবৃত থাকিবে। তাহাও অনেক সময়-সাপেক্ষ।

Prince Kropotkin সে-দিন বিশেষরূপে আমার সমস্ত experiment দেখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মনস্বী ইয়োরোপে দুর্লভ। তিনি সমস্ত দেখিয়া বলিলেন, "আপনার experiment এবং argument পরম্পরার মধ্যে সূচ্যগ্র প্রবেশ করাইবার ছিদ্র নাই। আপনি অবধ্য, কেহ আপনার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না। আপনি অনেক আবরণ ছিন্ন করিয়াছেন, কিন্তু এজন্যই আপনাকে বহু প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইবে।"

তোমার
জগদীশ

এবার B. Assn. এ যে নূতন paper পড়িয়াছি তাহা পাঠাই।

(৩৮)

Royal Institution.
London
৮ই নবেম্বর, ১৯০১

বন্ধু,

তুমি লিখিয়াছ যে আমার নিমন্ত্রণ যেন মনে থাকে। একথা"কি সত্য? তুমি যদি একবার আসিতে পারিতে

তাহা হইলে যে কত সুখী হইতাম তাহা বলিতে পারি না। আমি এই বনবাসে আর কতকাল থাকিব? পারিলে একবার আসিয়া দেখা করিও। গত বৎসর প্যারিসে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল সে-কথা আমি তোমাকে লিখি নাই। সেখানে শুনিলাম, একটি স্ত্রীলোক আশ্চর্য্য শক্তিবলে লোককে আরাম করিতেছেন। আরও যোগশক্তিবলে নানাবিধ আজগুবি কাণ্ড করিতেছিলেন। আমার এক বন্ধু আমাকে দেখাইবার জন্য জেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি অবিশ্বাসী—যাই নাই। এবে আমার হাতের লেখা দেই। তাহা দেখিয়া স্ত্রীকে লইয়া কিছু কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন—তখন শুনিয়া হাসিয়াছি. এখন মনে হয় তাহাতে তোমার বিষয় উল্লেখ ছিল। ভবিষ্যদ্‌বাণী কতদূর খাটে তাহা দেখিয়া তোমাকে জানাইব।

বহুকাল পর লোকেনের সহিত সে-দিন দেখা হইল। সে কখন্ কোথায় থাকে তাহার স্থির নাই। দেখা করিবে বলিয়া কথা দিয়া পরে নিরুদ্দেশ।

তোমার জামাতাকে এই রবিবার দিন দেখা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। প্রার্থনা করি তাহার এদেশ বাস সফল হইবে। দেখ আমার ক্ষুদ্র বন্ধুটিকে আমি না আসা পর্য্যন্ত 'শ্বশুরবাড়ী' পাঠাইও না।

আমার রয়্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুসনের বক্তৃতা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তোমাকে সর্ব্বাগ্রে এক কপি পাঠাইব। বিষয়টি বড় জটিল। তবে যথাসাধ্য সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি. আমার বিশ্বাস তুমি সহজেই ভাল করিয়া বুঝিবে।

তবে এত সংক্ষেপে এতবড় বিষয় হজম করা কঠিন। ইহার শাখাপ্রশাখা অনেক আছে। আরও এত প্রমাণ আছে যাহা প্রকাশ করিতে হইলে একখানা পুস্তক লিখিতে হয়। তাহাই করিব মনে করিতেছি। কিন্তু অনেক সময় লাগিবে।

আর-এক কথা physiologistদের কতগুলি মূল মন্ত্র তাহা আমার experimentএর ফলে ভুল মনে করি। সে-সব ভাঙ্গিয়া না বলিলেও চলে না, অথচ বলিতে গেলে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়িতে হইবে। কতদিন হইল আমার এক বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলাম, there is absolutely a continuity of phenomena starting from the animal tissue, passing through the transitional vegetable, to the inorganic metal, you cannot draw a dividing line.

সেখানে একজন অতি বিখ্যাত physiologist ছিলেন, vegetable physiology তাঁহার একচেটিয়া। তিনি বলিলেন, "there can never be any electrical response in vegetables"। তাহার উত্তরে আমি উদ্ভিদ্‌রাজ্যের সাড়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি। যে সব অত্যদ্ভুত ব্যাপারের সন্ধান পাইতেছি তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এসব কথা গোপনে রাখিও। আমি একদিন. উক্ত physiologistএর চক্ষুস্থির করিব, এখন চুপচাপ রাখিতেছি। তোমাকে কয়েকটি photographic record পাঠাইতেছি। এই সমস্ত মূলা, কপির ডাটার উপর হইয়াছে। দ্বিতীয় ছবিতে চিমটির মাত্রা অনুসারে অনুভূতির বৃদ্ধি দেখি।

১—১গুণ চিমটি।
২—২গুণ চিমটি।
৩—৩গুণ চিমটি।

৩য় ছবি ক্লোরোফর্ম্মের ফল।

৪র্থ——ক্লোরালের নেশা।

৫ম——হঠাৎ গরম বাষ্পদ্বারা আচ্ছন্ন করা গেল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছে; তারপর ৫মিনিটের মধ্যে প্রাণ-বিয়োগ।

৬ষ্ঠ——বিষ।

কি বল?

তুমি আইস, আমি এসব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। একবার সব খুলিয়া বলিতে না পারিলে আমার ৫ম ছবির শেষ অবস্থা ঘটিবে।

আমি এসব কথা এখন না বলিয়া একেবারে পুস্তকে প্রকাশ করিব।

তোমার
জগদীশ

বেগুনে বিশেষ উত্তেজনা লক্ষিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এক-একটি বেগুন ৪ আনা মাত্র।

(৩৯)

London

২৯এ নবেম্বর, ১৯০১

বন্ধু,

গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল?—কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্ব্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দু সন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই সুখ-দুঃখের অংশী, সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও; তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্য জয়লাভ করিব।

আমার রয়্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুসনের বক্তৃতা পাঠাইতেছি। বিষয়টি বড় কঠিন, সাধ্যানুসারে সহজ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক ঘণ্টা সময়ে যতটুকু বলা যায় তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু আরও কত আশ্চর্য্য বিষয় বলিবার আছে তাহা বলিতে হইলে একখানা পুস্তক লিখিতে হয়। তাহাই করিতে হইবে।

তুমি কবে আসিবে?

তোমার

জগদীশ

(ক্রমশঃ)

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(১১)

বাড়ী পৌঁছিয়া সারাদিনই গৌরী কেমন গম্ভীর হইয়া রহিল। সন্ধ্যায় তাহার পিতা রোজকার মতই আসিয়া বলিলেন, "গৌরী, বেড়াতে যাবি? চল্, আজ নদীর ধারে যাওয়া যাক্।"

গৌরী বলিল, "না বাবা, আজ আমি যাব না। আমার ভাল লাগ্‌ছে না।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বাবা বলিলেন, "কেন মা, কি হয়েছে, অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে নাকি?"

তরঙ্গিণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "না, কিসের অসুখ? বেলা ক'রে গঙ্গা নেয়ে ফিরে অবেলায় রান্না-খাওয়া হয়েছে, তাই বোধ হয় ছেলেমানুষের শরীর একটু খারাপ লাগ্‌ছে। ও কিছু না, আপনি সেরে যাবে।"

হরিকেশব একটু চিন্তিতভাবে একলাই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

গৌরী সারাদিন ভাবিয়াছে; মাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল; কিন্তু এইসব প্রশ্নের উত্তর মা ছাড়া আর কেই বা দিতে পারে? এতদিন এসব কথা সে ভাবিয়া দেখে নাই; কিন্তু আজ যখন পরের প্রশ্নে অকস্মাৎ মনে এসকল কথা জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন সব সন্দেহ মিটাইয়া না লইয়া সে স্থির হইতে পারিতেছে না। সত্যই ত তাহার বিবাহ হইয়াছিল! তবে এত বিষয়ে বিবাহিতাদের সঙ্গে তাহার এমন প্রভেদ কেন? ময়নার বিবাহ তাহার অনেক পরে হইয়াছে; অথচ এই দুই সপ্তাহ আগেই সে বৌদিদির চিঠিতে খবর পাইয়াছে যে, ময়না আজ তিন মাস শ্বশুরবাড়ী রহিয়াছে, পূজার আগে সে মা বাবার কাছে ফিরিবে না। মেজ-বৌদিও আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল শ্বশুর-বাড়ীতেই আসিয়া

আছে। তাহারা যখন বাড়ীতে ছিল তখন যদিও সে আসে নাই, তবু মেজ দাদা ত দুই তিন মাস অন্তর প্রায়ই বৌদি'দের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইত। সে যদি বাপ-মায়ের কোলের মেয়ে বলিয়া এতদিন তাঁহাদের কাছেই থাকিয়াছে ধরা যায়, তবুও ত তাহার বর এখানে বেড়াইতে আসিতে পারিত, কিম্বা তাহাকে চিঠিপত্র লিখিতে পারিত।

বরের সঙ্গ কিম্বা চিঠিপত্রের জন্য গৌরী যে কিছু মাত্র ব্যস্ত ছিল তাহা নয়; কিন্তু বিবাহ হইলে যাহা সকলের পক্ষে স্বভাবতই হয়, তাহার বেলা তাহাতে সব দিকে এমন ব্যতিক্রম হইয়াছে কেন, সেটা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। মনে পড়ে অনেক কাল আগে একবার তাহার বর আসিবে বলিয়া বাড়ীতে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সবাই মিলিয়া তাহাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া এবং বরের সঙ্গে আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অসংখ্য সদুপদেশ দিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পর কি জানি কেন বর আসিল না। সে অবশ্য তাহাতে হাঁপ ছাড়িয়াই বাঁচিয়াছিল, কারণ তাহার ধারণা ছিল যে, বর আসিলেই তাহাকে মার কাছ হইতে কাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীতে টানিয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর ত কত কাল কাটিয়া গিয়াছে; আর সে আসিবার কিম্বা গৌরীকে লইয়া যাইবার নাম করে না কেন?

বর যদি তাহাকে আরো কিছু দিন না লইয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য ভালই। সে বেশ মা বাবার সঙ্গে দিন কাটাইতে পারে। হইতে পারে মা বাবা এখন তাহাকে লইয়া যাইতে বারণ করিয়াছেন। কিন্তু শাঁখা লোহা সিঁদুর পরিতে ত আর কোন কষ্ট হয় না। বরং সেগুলি না পরাই নাকি সধবার পক্ষে অকল্যাণকর। তবে তাহার মা নিজে সেসব পরিয়া তাহার বেলাই ভুলিয়া যান এও কি. কখনও সম্ভব হইতে পারে? মা ত আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন তাহার ভালমন্দর ভাবনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতে ভুলেন নাই।

গৌরীর মন নানা সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। ভিতরের ঘেরা উঠানে জ্যোৎস্নায় একটা দড়ির খাট বিছাইয়া তাহার মা শুইয়াছিলেন। গৌরী আস্তে আস্তে সেখানে গিয়া বসিল। মা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কিরে, এখানে এসে বস্‌লি যে? শুবি নাকি, শরীর কি খারাপ লাগ্‌ছে?"

গৌরী মাথার একরাশ খোলা চুল দুলাইয়া বলিল, "না শোব না। আমার চুল বেঁধে দাও।"

মা তাহার সুন্দর চুলগুলির ভিতর আঙুল চালাইয়া নাড়া দিয়া বলিলেন, "বিকেল বেলা যখন ডাক্‌লাম তখন ত হুঁস্ হ'ল না। এখন রাত্রির বেলা হঠাৎ চুলের ওপর এত দরদ কেন?"

গৌরী কথার উত্তর না দিয়া ঘরে গিয়া ফিতা কাঁটা চিরুণী আয়না সব সংগ্রহ করিয়া আনিল। মা উঠিয়া চুল বাঁধিতে বসিলেন। চুল বাঁধিয়া ভিজা গামছায় তাহার মুখখানি ঘষিয়া মাজিয়া দিয়া বলিলেন, "যা, ওদিককার ছাতে একটু বেড়িয়ে আয়, শরীরটা ভাল লাগ্‌বে।"

গৌরী তবু বসিয়া রহিল। তার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "কই, সিঁদুর পরিয়ে দিলে না ত?"

মা চম্‌কাইয়া উঠিলেন। গৌরীর মুখে আজ এপ্রশ্ন কেন? কখনও ত সে এমন কথা বলে না। কোনোদিন বলিতে যে, পারে তাহাও তিনি মূর্খের মত ভুলিয়া বসিয়াছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তর তিনি কি দিবেন? একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "তুই ত কোনোদিন সিঁদুর পরিস্ না। আজ আবার হঠাৎ পর্‌তে চাইছিস্ যে!" গৌরী বলিল, "তুমি ত সিঁদুর পর, আমি কেন পর্‌ব না?"

মা অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "তোমার বাবার কল্যাণের জন্যে আমাকে পর্‌তে হয়।" ইহার উত্তরে গৌরী কি বলিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। মা ও বাবাকে সে ঠিক সাধারণ বরবধূর পর্য্যায়ে ফেলিতে অভ্যস্ত ছিল না। তা ছাড়া এক্ষেত্রে মা ত বিবাহের কথা কিছু বলিলেন না। আর কোনও কারণেও ত মা বাবার কল্যাণ কামনা করিয়া সিঁদুর পরিতে পারেন। গৌরীও ভাবিয়া বলিল, "আর অন্য সব মেয়েরা কেন পরে? ঐ যে মেয়েটি আমাদের সঙ্গে নাইতে গিয়েছিল সেও ত সিঁদুর পরেছে।"

মা বলিলেন, "অনেক মেয়ে পরে, অনেকে পরে না। তুই যদি পর্‌তে চাস্ ত তোর বাবাকে জিজ্ঞেস্ ক'রে দেখ্‌ব তোর পর্‌তে আছে কি না।"

গৌরী আজ এইরকম আধ-ঢাকা উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিল না। সে বলিল, "কাদের পর্‌তে আছে আর কাদের পর্‌তে নেই, তুমি কি জান না?"

মা হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি কি বলিবেন? এ মেয়ের আজ হইয়াছে কি? কে ইহার মাথায় অকস্মাৎ এসব প্রশ্ন ঢুকাইয়া দিল? তিনি তাঁহার শেষ সূত্রটি অবলম্বন করিয়া আবার বলিলেন, "তোর বাবার কাছে ভাল ক'রে জেনে বল্‌ব।"

গৌরী অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "ঐ মেয়েটি ত বল্‌লে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সিঁদুর পর্‌তে হয়।"

মা না পারিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বিয়ে হ'লে অনেকে পরে বটে।"

গৌরী বলিল, "আমার ত বিয়ে হয়েছে।"

মা বলিলেন, "কে বল্‌লে তোর বিয়ে হয়েছে?"

গৌরী বলিল, "কে আবার বল্‌বে? আমার মনে আছে। সেই যে কত বাজনা বাজ্‌ল, বর এল, কত রাত পর্য্যন্ত গোলমাল হ'ল। তারপর তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমাকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে চ'লে গেল। সেখানে তোমরা কেউ যাওনি। আমি কতদিন ধ'রে কান্নাকাটি কর্‌লাম, তারপর আবার আমায় পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে।"

স্বামীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া গৌরীকে পরিষ্কার কোনো উত্তর দেওয়া উচিত কি না তরঙ্গিণী বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু কিছু ত একটা বলিতে হইবে। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, সে ছেলেবেলা তোকে নিয়ে আমরা একটা ছেলেখেলা করেছিলুম বটে। তার জন্যে তোকে এখন অত ভাব্‌তে হবে না। তারা তোকে আমার কাছ থেকে আর কেড়ে নিয়ে যাবে না।"

তরঙ্গিণী কন্যাকে বিচ্ছেদভয় হইতে মুক্তি দিয়া এসব প্রশ্ন থামাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু গৌরী ইহার ভিতরেও নূতন একটা প্রশ্ন খাড়া করিয়া তুলিল। সে বলিল, "বিয়ে হ'লে সবাই ত শ্বশুরবাড়ী যায়; ময়নার ত কত পরে বিয়ে হয়েছে, সে ত শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে রয়েছে; তা হ'লে আমাকে কেন নিয়ে যাবে না?"

তরঙ্গিণী দেখিলেন তিনি যতই হেঁয়ালি করিয়া কথার উত্তর দিন না কেন, 'বিবাহ হয় নাই' পরিষ্কার না বলিলে গৌরী বিবাহটা মানিয়াই লইবে। অথচ 'বিবাহ হয়নি' একথা পরিষ্কার বলিতেও তাঁহার ভয় হইতেছিল, কি জানি যদি তাহাতে আবার নূতন-কিছু গোলমাল বাধে।

তিনি বিবাহ-বিষয়ক প্রশ্নের আর কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে বারণ করেছি তাই নিয়ে যাবে না। ছেলেমানুষ তোমার তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কি দর্‌কার? বড় হও, তার পর সব বুঝ্‌বে। যাও মা লক্ষ্মী, ওসব কথা এখন ভাব্‌তে হবে না, একটু ছাদে বেড়িয়ে এসগে। নদীর ধারে কেমন জ্যোৎস্না উঠেছে, ছাদ থেকে ভারি সুন্দর দেখাবে।"

গৌরী অগত্যা উঠিয়া চলিয়া গেল। যমুনার জলে চাঁদের আলো পড়িয়া হাজার চাঁদের মালা ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। মিশন-কলেজের ছেলেরা ও দূরের কোনো কোনো সৌখীন বাবু ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া করিয়া নদীর জলে জ্যোৎস্না-বিহার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। সহস্র চাঁদের মালায় জড়ানো জলের ঢেউয়ের উপর নৌকাগুলি কালো মীনার কাজের মতন মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতেছিল। ছেলেদের বাঁশী ও গানের শব্দ নদীর নিস্তব্ধ দুই কূলে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গৌরীর কিন্তু এসব দিকে আজ মন ছিল না। তাহার ভাবনা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। মা তাহার একটা প্রশ্নেরও পরিষ্কার উত্তর দিলেন না কেন? তাহার জীবনে কি-এমন রহস্য আছে যাহা তিনি তাহার নিকট হইতে এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিতে চাহেন? কেনই বা চাহেন? এসব কথা যতই সে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিল, ততই নানা প্রশ্নে তাহার মস্তিষ্ক আকুল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, এই তীর্থভ্রমণের আগে এম্‌নি আরো একদিন তাহাকে নানা হেঁয়ালির মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। সকলে তাহাকে ময়নার নিকট হইতে

সরাইতে ও তাহার গহনা ময়নাকে পরাইতে বাধা দিতে কি রকম উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। সে সেদিন যাহা কিছু করিতে যাইতেছিল, তাহাতেই লোকে বাধা দিতেছিল। ছেলেবেলাকার কথা দুই দিনেই সে ভুলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আজ নানা কথার স্রোতে তাহাও তাহার মনে পড়িয়া গেল। কেন এমন হইয়াছিল? যদি ভাল কিছু হইত মা কি তাহা হইলে এমন করিয়া গোপন করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন; নিশ্চয় কোনো অমঙ্গল তাহার জীবনে লুকাইয়া আছে, যাহা নিজে সে আজিও জানিতে পারে নাই। ছাদে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে গৌরী কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রে যখন হরিকেশব বাড়ী ফিরিলেন তখন তরঙ্গিণী অশ্রুপ্লাবিতমুখে ঘরে বসিয়া। বহুকাল পরে তরঙ্গিণীকে আবার এমন শোকাকুল দেখিয়া হরিকেশব ভীত হইয়া উঠিলেন, সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, "কি হ'ল আবার? গৌরীর কিছু অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?"

তরঙ্গিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অসুখ করে-নি, তার বাড়া। মেয়েটা কি-সব ছাই-ভস্ম আমায় জিজ্ঞেস্ করছে, আমি কি করব বল না! আমার যে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করছে। মেয়ের মাথায় এসব কে ঢোকালে কে জানে?"

(১২)

প্রথম শোকের আঘাত পাইয়া হরিকেশব তাহার হাত হইতে পলাইতে চাহিয়াছিলেন, শুধু যে কন্যাকে বাঁচাইবার জন্যই তাহা নহে; নিজেকেও বাঁচাইবার প্রয়োজন ছিল। তিনি জানিতেন, সংসারের ভিতর থাকিতে হইলে এখন সংসারের সহিত তাঁহার যে-সংগ্রাম বাধিবে, বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ে তাঁহার সে-সংগ্রামে দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি নাই। কিন্তু সময়ের প্রলেপে ক্ষতের জ্বালা জুড়াইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আজন্মের পৌরুষশক্তি আবার গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। সংগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ যে জয়ী হইতে পারে না, এমন-কি প্রকৃত শক্তিও সঞ্চয় করিতে পারে না তাহা তিনি চিরকালই বুঝিতেন, আজ আবার নূতন করিয়া বুঝিবার সময় আসিল।

গৌরীর মনে যে-প্রশ্ন জাগিবে এবং সমাজের যত নিভৃত কোণেই আশ্রয় লওয়া যাক্ না, সমাজ যে আপনার আচার-ব্যবহার ক্রিয়াকলাপে গৌরীর চক্ষু ফুটাইয়া তুলিবে, গৌরী বড় হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবনা হরিকেশবকে পাইয়া বসিয়াছিল। তরঙ্গিণীর মতন তিনি ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন না। গৌরীর আঘাত পাইবার দিন আগাইয়া আসিতেছে, ইহা তিনি অনুভব করিতেছিলেন; তবে সে-আঘাতটা বাহিরের সমাজের নির্ম্মমতার জ্বালা শুদ্ধ বহন করিয়া আনিবে না এই ছিল তাঁহার পরম সান্ত্বনা।

তরঙ্গিণীর নিকট সকল কথা শুনিয়া হরিকেশব সস্নেহে তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "এ যে আস্‌বে সে ত জানা কথা, তরু। তার জন্যে কেঁদে কোনো ফল আছে কি? আসল আঘাতটা যখন বহন করতে পেরেছ তখন তার এ ক্ষুদ্র অংশটুকু দেখে ভয়ে পেছোলে চল্‌বে কেন? গৌরী বড় হচ্ছে, সংসার-সমাজের একেবারে বাহিরেও এসে পড়েনি, তার উপর তার নিজের স্মৃতিতেই অনেক ঘটনা জেগে উঠে তাকে ভাবিয়ে তুল্‌ছে; কাজেই ওকথা তার কাছ থেকে একেবারে চাপা দিয়ে দিতে ত তুমি পারবে না।"

তরঙ্গিণী তবু সজল চক্ষে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু ওই সর্ব্বনেশে কথাগুলো মেয়েটার মুখের ওপর আমি কি ক'রে বল্‌ব?"

হরিকেশব বলিলেন, "তুমি না পার অগত্যা আমাকেই বল্‌তে হবে। আমারই কাছে পাঠিয়ে দিও তাকে। যতই নিষ্ঠুর হোক, এ সত্য কথাটা আমাকেই তাকে শোনাতে হবে। তুমি ত জান, আর বেশী দিন বাইরে বাইরে থাকা আমার হবে না। আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, ইচ্ছে করলে অবশ্য আর কিছুদিন পালিয়ে বেড়াতে পারতাম, কিন্তু তা করলে বুদ্ধির কাজ করা হবে মনে হচ্ছে না। আমি গৌরীকে এই অল্পদিনেই যেটুকু গ'ড়ে তুলেছি, তাতে আমার ভরসা হয় যে, সকল কথা তাকে বুঝিয়ে বল্‌লে আমি তাকে যা বোঝাতে চাই তা সে বুঝবে। দেশে ফিরে যাবার আগে গৌরীকে এখান থেকেই আমি তৈরী ক'রে নিয়ে যেতে চাই, যাতে নিজের মঙ্গলের জন্য আমার পাশে দাঁড়িয়ে সে লড়্‌তে পারে আর

নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজে সজাগ হ'য়ে ভাবতে শেখে।"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "ঐ কচি মেয়েটাকে তুমি এরি মধ্যে কি লড়াই করাতে চাও? ওর কি সেই বয়স হয়েছে?"

যে তরঙ্গিণী একদিন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইবার শোকে সকল আঘাত ও দ্বন্দ্বের ভিতরই শিশু গৌরীকে রাখিয়া দিতে তর্ক তুলিয়াছিলেন, আজ উদ্যত আঘাত দেখিয়া তাঁহারই মাতৃহৃদয় কিশোরী কন্যার বেদনার ভয়ে বারবার পিছাইয়া যাইতেছিল।

তিনি আবার বলিলেন, "হ্যাগা, আর ছ'মাস ছুটি নিয়ে চল না আর-কোনো দিকে বেড়াতে যাই। মেয়েটাকে এদিকে সেদিকে ঘুরিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কি আর রাখা যাবে না? মিথ্যে বল্‌লে যদি কিছু না বাধে এখন না হয় ব'লে দেব 'তোর বিয়ে হয়নি।' আহা বড় ছোট আছে। ঘর ছেড়ে যখন ওর জন্যেই বেরিয়েছি, তখন যায় বাহান্ন তায় তিপান্ন। আর একটু ডাগর ক'রে নিয়ে চল, দেশে ফিরলে আপনি সব বুঝবে, আপনি সাম্‌লে চল্‌বে, আমাদের আর কিছু বল্‌তে হবে না।"

হরিকেশব বলিলেন, "তার বিয়ের কথা সে নিজেই যখন ভোলেনি, তখন তুমি তাকে মিথ্যা ক'রে বোঝাবে কি ক'রে? বিশেষত তার এখন এতটা বয়স হয়েছে যে, বাড়ী গিয়েই সে আপনার প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারবে। তখন যদি নিজের বাপ-মাকে সে মিথ্যাবাদী মনে করে, তাহ'লে কি তাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাক্‌বে, না, তাদের কথা শুনে সে চল্‌তে পারবে?"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "বাপ মা যে প্রাণের দায়ে মিথ্যে বলেছে এইটুকুই যদি মেয়ে না বুঝল, তবে মেয়ে আমাদের এতদিনের ভালবাসায় বুঝল কি?"

হরিকেশব হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথা তুমি ঠিক বলেছ বটে; কিন্তু লোকের কাছে আচমকা ঘা খাওয়ার থেকে, আজ যখন সে নিজে জানতে চাইছে তখন আমাদের স্নেহস্পর্শের ভেতর দিয়ে সত্যের পরিচয় পাওয়াই কি ভাল নয়?"

তরঙ্গিণী অগত্যা স্বামীর কথাই মানিয়া লইয়া বলিলেন, "যাই দেখিগে, মেয়েটা একলা একলা ঘুরে আবার কি সব মাথা-মুণ্ডু ভাবনার ঘোঁট পাকাচ্ছে। তোমার কাছেই এনে দি, যদি কিছু বলে ত বুঝিয়ে দিও।"

জ্যোৎস্নায় ছাদ ভাসিয়া যাইতেছিল। ছাদের উপর একছড়া যুঁই ফুলের গড়ে'র মতন গৌরীর নধর পেলব কিশোর গৌর তনু ঘুমে এলাইয়া পড়িয়াছিল। সারাদিনের চিন্তায় ক্লিষ্ট তাহার মুখখানি চাঁদের আলোয় আরো পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। তাহারই উপর ঠোঁটের কোণে একটুখানি ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেন সারাদিনের ভাবনার একটা কিনারা পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। বাস্তবে সে নিজের জীবনের রহস্যটা ঠিকমত উদ্ঘাটন করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু স্বপ্ন কোনো চাবির বাধা মানে না, সে সর্ব্বত্র আপনার গতি স্বচ্ছন্দ করিয়া লয়; গৌরীকে সে অনায়াসেই সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে।

গৌরীর শ্রান্ত নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকাইয়া তরঙ্গিণীর তাহাকে ডাকিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না; এতটুকু মেয়ে সারাদিন ভাবনায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, এতক্ষণে ঘুমাইয়া মুক্তি পাইয়াছে, উহাকে আজ আর ঐ সকলের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া কাজ নাই। মা তাহাকে ভূমিশয্যা হইতে ডাকিয়া তুলিলেন, "গৌরী, নীচে শুবি চল্। ভিজে ছাদটায় প'ড়ে আছিস্, হুঁস নেই, অসুখ করবে যে!"

একেবারে কচি মেয়ের মত ঠোঁট ফুলাইয়া চোখ কচলাইয়া গৌরী উঠিয়া বসিল। ঘুমের ঘোরে তাহার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। ভাল করিয়া চোখ না মেলিয়াই মা'র হাত ধরিয়া সে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় নীচে নামিয়া ভিতরের বারান্দায় আপনার ছোট খাটখানিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

* * * * *

ঘুম হইতে উঠিয়া গৌরী সবে খাটে পা ঝুলাইয়া বসিয়া চোখে-জড়ানো তন্দ্রার শেষ রেশটুকু উপভোগ করিতেছে; তখনও গত সন্ধ্যার ভাবনাগুলা তাহাকে ঘিরিয়া ধরে নাই; স্বপ্ন তাহার মনে কি-একটা রঙীন

খেলা খেলিয়া তাহার মনটাকে অনেকখানি হাল্কা করিয়া দিয়া গিয়াছিল। হরিকেশব দূর হইতে গৌরীকে জাগিয়া উঠিতে দেখিয়াই তাহার কাছে আসিয়া তাহার এলো-মেলো খোঁপাটায় একটা নাড়া দিয়া বলিলেন, 'কিরে, এতক্ষণে তোর সকাল হ'ল? বর্ষা পড়েছে ব'লে বুঝি আর সকাল বেলা উঠ্‌তে নেই। আজ ত বেশ পরিষ্কার ছিল, ভোরে উঠ্‌লে রেললাইন পার হ'য়ে কত দূরে বেড়াতে যেতাম! সেই লাট সাহেবের বাড়ী-টাড়ী সব ছাড়িয়ে!"

তাড়াতাড়ি চোখ-মুখ ঘষিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া পিতার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া গৌরীর মনে পড়িয়া গেল, রাত্রে সে ত এখানে শোয় নাই। কখন্ যে কি করিয়া সে এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে তাহা তাহার কিছুই মনে নাই। সে বলিল, "কালকে কখন ঘুমিয়েছি তাই ভুলে গেছি; কি অদ্ভুত!" তার পর কি একটা মনে করিতে চেষ্টা করিয়াই তাহার হর্ষ-বিস্ময়ে উৎফুল্ল মুখখানি অকস্মাৎ মলিন গম্ভীর হইয়া গেল। তবু আপনাকে খানিকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল, "কাল সন্ধ্যেবেলা মা আমাকে ছাতে পাঠিয়ে দিলেন; তার পর ছাতে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সেইখানেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; কে যে আমাকে এখানে নিয়ে এল তার ঠিক নেই।"

কথা বলিতে বলিতেই গৌরী কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। যে-কথা সে বলিতেছিল তাহাতে যে তাহার মন নাই, কিন্তু অন্য কথাটাও যে সঙ্কোচে সে পিতার কাছে পাড়িতে পারিতেছে না, ইহা হরিকেশব বুঝিলেন। মা, বাবাকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়াছিলেন, সুতরাং বাবা যে সব কথাই শুনিয়াছেন ইহা বুঝিয়া গৌরী আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার স্বাভাবিক ছেলেমানুষীটা পিতাকে দেখিয়াই নানা গল্পে ও আব্‌দারে তাই অন্যদিনের মত ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিন্তু গৌরীর এই আকস্মিক বয়োবৃদ্ধির বোঝাটা হরিকেশবের মনে বড় আঘাত করিতেছিল; তিনি যেন বোঝাটা তাড়াতাড়ি হাল্কা করিয়া দিবার জন্যই তাহার মুখখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, "কিরে পাগ্‌লি! কাল সারাদিন কি-সব বুড়োমি ক'রে মাথা ঘামিয়েছিস্; আজ আবার সকালে উঠেই বুড়ো ঠাকুমার মত গম্ভীর হ'য়ে বস্‌ল যে?"

গৌরীর মুখখানা একটু রক্তিম হইয়া উঠিল, সে চুপ করিয়া আপনার খয়ের-ডুরে শাড়ীর পাড়টা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল, কোনো কথা বলিল না। পিতার সহিত এমন সসঙ্কোচ ব্যবহার তাহার জীবনে বোধ হয় এই প্রথম। হরিকেশব তাহার মৌনতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহার মাথাটা কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া, গালে একটা টোকা দিয়া বলিলেন,"তোকে কে কি বলেছে, মা? তার জন্যে ভেবে হায়রান হচ্ছিস্ কেন? তোর বুড়ো বাবাকে ব'লে দেখ্‌না কিছু কিনারা কর্‌তে পারে কি না।"

গৌরী পিতার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া বলিয়া ফেলিল, "বাবা, ওই সব মেয়েরা বলে আমি নাকি মিছে ক'া বলেছি, আমার নাকি বিয়ে হয়নি। আমি লোহা সিঁদূর পরি না ব'লে ওরা আমায় ঠাট্টা কর্‌ছিল। কিন্তু বাবা, আমি ত সত্যিই বলেছি, আমার ত বিয়ে হয়েছিল। তবে কেন মা আমাকে সিঁদূর পর্‌তে দিলে না? আমি কত বল্‌লুম তবু মা শুন্‌লে না।"

গৌরী এক নিশ্বাসে সব বলিয়া গেল। হঠাৎ মার উপর তাহার অভিমান উপ্‌ছিয়া উঠিল। মা কেন তাহাকে অমন যা-তা বলিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করেন। গৌরী তাহার পাৎলা গোলাপী ঠোঁটদুটি ফুলাইয়া উত্তরের আশায় বাবার মুখের দিকে চাহিল। একবার সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়াতে সে আবার কাছ ঘেঁসিয়া একেবারে হরিকেশবের গলা জড়াইয়া বসিল। শিশুর মত আব্‌দার ও অভিমানের সুরে জীবনের এই করুণ-পর্ব্বের কথা লইয়া গৌরীকে প্রশ্ন করিতে দেখিয়া হরিকেশবের মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। হায় রে অবুঝ শিশু! সমাজ তোকেও তাহার বিধানের কঠিন নিগড়ে বাঁধিতে চায় কি করিয়া?

হরিকেশব গৌরীর মুখখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তুমি সত্যি কথাই বলেছিলে। তোমার বিয়ে খুব ছোটবেলা একবার হয়েছিলই ত।"

গৌরী অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "তবে কেন বাবা, কেন…" গৌরী মুখে আর কথা যোগাইতেছিল না।

হরিকেশব বুঝিয়া বলিলেন, "নাই বা পর্‌লে মা তুমি লোহা সিঁদুর! তাতে কি তোমার কিছু কষ্ট হয়? আর যা গয়না কাপড় তুমি পর্‌তে চাইবে, আমি সব আনিয়ে দেব। ওগুলো তোমার পর্‌বার দর্‌কার নেই।"

গৌরী বলিল, "না বাবা, তুমি জান না, লোকে যে আমাকে ঠাট্টা করে। বিয়ে হ'লে পর্‌তে হয়।"

হরিকেশবের মুখে শেষ কথাটা বাধিতেছিল; তিনি কি করিয়া বলিবেন যে, সেই তরুণ শৈশবের দেখা অপরিচিত-প্রায় একটি বালকের তিরোধানে তাহার জীবনমুকুল সমাজের চক্ষে চির-অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে? আপন জন ও প্রিয়-জনের মৃত্যুতে মানুষ গভীর বেদনা পায়, জীবনের সর্ব্বস্বপ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন করে, তারপর আবার ধীরে ধীরে শোকের অন্ধকার ভেদ করিয়া জীবন-যাত্রাপথে হাসিয়াই যোগ দেয়; কিন্তু অচেনা মানুষের অজানা মৃত্যুতে শিশুকেও যে চির-সন্ন্যাসের বোঝা বহিয়া অপমান ও লাঞ্ছনায় আজীবন কৃত্রিম শোকের অভিনয় করিয়া যাইতে হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হয়, সে কথা তাঁহার এই আদরিণী অভিমানিনী বালিকাকন্যাকে তিনি কি করিয়া বুঝাইবেন! সে-কথা যে তাঁহার মন বুঝে না, স্বীকার করে না। কিন্তু তাহাকে যে আজ শেষ কথাটা বলিতেই হইবে।

হরিকেশব বলিলেন, "হ্যাঁ মা, বিয়ে হ'লে যে পর্‌তে হয় তা আমি জানি; কিন্তু…কিন্তু যাদের বিয়ের সব শেষ হ'য়ে গেছে, তারা ওসব পরে না যে, মা লক্ষ্মী!"

কথাটা বলিয়াই হরিকেশবের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি গৌরীকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলেন। গৌরী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। 'সব শেষ হইয়া যাওয়া' মানে কি? বিবাহ ত মানুষের চিরকাল ধরিয়া হয় না; দুই এক দিনেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু এ 'শেষ' হওয়ার অর্থ যে অন্য, গৌরী তাহা বুঝিল। পিতার ব্যথিত বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া অর্থটা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গৌরীর কেমন ভয়-ভয় করিতেছিল। তাহার নিজের যে কি হইয়াছে পরিষ্কার তাহা না বুঝিলেও, এইসকল প্রশ্নে পিতার হৃদয়ে সে যে একটা নিষ্ঠুর আঘাত করিতেছে তাঁহার মুখের চেহারাই গৌরীকে তাহা বলিয়া দিতেছিল।

সে বালিকা হইলেও পিতার প্রতি তাহার মায়ের মত কেমন একটা স্নেহের ভাব ছিল। তাঁহাকে এতটুকু ব্যথা দিয়াছে মনে করিতে তাহার চক্ষে জল আসিত। সে সজল চক্ষে হরিকেশবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, আমি আর তোমায় বিরক্ত কর্‌ব না, ওকথা আর জান্‌তে চাইব না। চল বাবা, আমরা বেড়িয়ে আসি।"

ছোট্ট মেয়েটির সান্ত্বনা দিবার ভঙ্গীতে হরিকেশবের সমস্ত হৃদয় যেন ব্যথার সুরে কাঁপিয়া উঠিল। কচি মেয়ে কেমন অনায়াসে নিজের ভাব ঠেলিয়া ফেলিয়া পিতার ব্যথিত অন্তরের সেবায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যেন তিনিই শিশু আর সে-ই তাঁহার জননী। সে-ই যে তাঁহার বেদনার মূল একথা তাহাকে বলিতে তাই তাঁহার সঙ্কোচ হইতে-ছিল। তবু প্রাণপণ শক্তিতে সমস্ত সঙ্কোচ ও বেদনার বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "না আমার মা মণি, তুমি ত আমায় বিরক্ত করনি। তোমার কথা তোমার জান্‌তে চাওয়া ত স্বাভাবিকই। আমি যদি তা তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখি, তাহ'লে সেটা আমারই অন্যায় হবে। তোমার যা ইচ্ছে হয় আমাকে জিজ্ঞেস কর, আমি তার যেমন জানি জবাব দেবই। সত্যকে ঢাকা দিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই।"

গৌরীর বিস্ময় ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছিল। তাহার জীবনে কি যে একটা বিরাট গণ্ডগোল পাকাইয়া মা বাবা সবাইকে এমন রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে ভাবিয়া সে কূল-কিনারা পাইতেছিল না। সে যে ঠিক আর পাঁচজনের মতই নয় এবিষয়ে তাহার আর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কি অভিশাপ অথবা রহস্য যে তাহাকে ঘিরিয়া আছে তাহা না জানিয়াও তাহার মনে শান্তি ছিল না। সে ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাবা, বিয়ে শেষ হ'য়ে যায় কি করে আমি বুঝ্‌তে পারি না। সে কথা বল্‌তে কি তোমার কষ্ট হবে?"

হরিকেশব গৌরীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "কষ্ট হ'লেও বল্‌তে হবে, মা। একথা পরে বল্‌বার আগে আমারই তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে। যার সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয় সে যখন পৃথিবী ছেড়ে চ'লে যায় তখন সে বিয়ের সবই শেষ হ'য়ে যায়। তোমাকে নিয়ে আমরা যে বিয়ের খেলা খেলেছিলাম ভগবান তা ভেঙে দিয়েছেন। এখন ত আর তার কোনো অর্থ নেই।"

কথাকয়টা বলিয়া হরিকেশব গৌরীর মুখের দিকে তাকাইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর মুখ বেদনায় ও হৃদয়াবেগে পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইয়া অশ্রুধারায় ধৌত হইয়া যাইতেছিল। গৌরী পাছে দেখিয়া ফেলে তাই মুখটা যথাসম্ভব নীচু করিয়া তিনি যেন কোথায় লুকাইতে চাহিতেছিলেন। পিতার প্রসন্ন মুখের এই সকরুণ ছবি কিন্তু গৌরীর চোখ এড়াইল না। সে আর সকল কথা ভুলিয়া পিতার দুঃখে আকুল হইয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া তাঁহার বুক ভাসাইয়া দিল। থাকিয়া থাকিয়া ছোট একখানি হাত দিয়া পিতার পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কেবলই সে বলিতেছিল, "বাবা গো, লক্ষ্মীটি, তুমি অমন কোরো না, চুপ কর। আমি আর কখখনো ওসব ছাইভস্ম পর্‌তে চাইব না।"

গৌরীর কথায় হরিকেশবের চক্ষে অশ্রুর বাণ যেন উথলিয়া উঠিল। বৃদ্ধের বহুকালের রুদ্ধ বেদনার অশ্রু অবুঝ শিশুর না-বোঝা ব্যথার অশ্রুর সহিত মিলিয়া ঝরিতে লাগিল।

রহস্য যতদিন ঢাকা থাকে ততদিন তাহার না-দেখা না-জানা মূর্ত্তি মানুষের মনে ভয় বিস্ময় কৌতূহলের দ্বন্দ্ব তুলিয়া তাহাকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তোলে; মানুষ শান্তি পায় না, কেবলি গোপনকে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া মরে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে তখনই সে যত বড় আঘাত লইয়াই আসুক না কেন, অশান্তির সেই দুরন্ত তাড়না থামিয়া যায়। নিশ্চয়তা মানুষকে একটা স্থিরতার ভিত্তি আনিয়া দেয়, আর ঘুরিয়া মরিতে হয় না।

গৌরী যখন আপনার ভাগ্যলিপি বুঝিল, তখন অস্থির হইয়া কাঁদিল—সে আপনার শোকে নয়, পিতার ব্যথার শোকে। জানার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার চিন্তা-তরঙ্গে আকুল মন অনেকখানি শান্ত হইয়া গেল। তাহাকে কি-একটা রহস্যে ঘিরিয়া আছে এই ভাবনায় তাহার ক্ষুদ্র দেহ-মন ভাঙিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু সে রহস্য যে কি জানিতে পারিয়া আঘাত ত তাহাকে তেমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারিল না। একে অতীতের অদেখা মৃত্যু, তাহাতে মানুষটি অপরিচিত-প্রায়, গৌরীর হৃদয়-তন্ত্রীতে ব্যথার আঘাত পৌঁছিবে কোন্ পথ দিয়া? মৃত্যু তাহাকে কাঁদাইতে পারিল না। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে সে আপনার বঞ্চিত জীবনের কথা যতটুকু বুঝিল তাহাতেই নিরানন্দের ম্লান ছায়ায় তাহার ফুলের মত মুখখানি অন্ধকার হইয়া গেল। অজানা সেই মানুষের মৃত্যু তাহার কাছে যতই অর্থহীন হোক পৃথিবীর কাছে তাহার বহু অধিকার যে সেই মানুষটিই হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে হিন্দুর মেয়ের মনে সেকথা ধরা পড়লিই।

গৌরী চোখের জল মুছিয়া পিতার হাত ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তরঙ্গিণী সংসারের কাজের ছলে একবার সেইদিকে আসিয়া পড়িয়া স্বামী ও কন্যার মুখ দেখিয়া চোখে আঁচল চাপা দিয়া ছুটিয়া গিয়া ঘরের মেঝেতে লুটাইয়া পড়িলেন। হাস্যচঞ্চলা আদরিণী গৌরীর এই অশ্রুমলিন অকালগম্ভীর মুখের ছবি একটা জমাট কঠিন কালো ছায়ার মত তাঁহার সমস্ত বুকটা অন্ধকার ও ভারী করিয়া তুলিয়াছিল, মনে হইল গৌরীর মুখের হাসির সঙ্গে যেন বিশ্বের হাসি আলোও কে আজ নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। বর্ষার মেঘে জোড়া ধূমল আকাশ সমস্ত পৃথিবীর উপর শোকাচ্ছন্ন সজল নয়নে চাহিয়া আছে; সে চোখে আলো নাই, দৃষ্টি নাই, আছে শুধু দিগন্তজোড়া বিরাট একটা শূন্যতা। সৃষ্টি তাহার বিষণ্ণ ছায়ার অন্তরালে যেমন করিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তেম্‌নি করিয়া জীবন-জোড়া কুয়াশার ঘন অন্ধকারেই হয়ত ছোট এই মেয়েটির ভবিষ্যতের সকল হাসি ডুবিয়া যাইবে; কে জানে? তরঙ্গিণীর অন্তরে ভরাবর্ষার যে আকুল উচ্ছ্বাস গুমরিয়া গুমরিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল তাহাকে তিনি রোধ করিতে পারিতেছিলেন না।

একটা ঘন কালো মেঘ সকালের আকাশের সমস্ত আলো ঢাকিয়া ফেলিয়া আকাশের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার সহস্র বাহু ছড়াইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। বৃষ্টি আসিতে আর দেরী নাই। হরিকেশব আপনাকে সাম্‌লাইয়া গৌরীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৃষ্টি আস্‌ছে। চল মা,ঘরের ভেতর যাই।"

গৌরী পুতুলের মত পিছন পিছন উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর বাবার গা ঘেঁসিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবা, আমাকে আর কি-কি কর্‌তে নেই ব'লে দেবে? সে-বাড়ীতে আর ত আমায় কেউ নিয়ে যাবে না। আমি তোমার কাছেই থাক্‌ব, তুমি আমাকে সব শিখিয়ে দিও; আমি ঠিক তোমার কথা শুনে চল্‌ব।"

হরিকেশব কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমার যা ইচ্ছা কর্‌বে সবই কর্‌তে আছে মা। কেউ তোমায় মানা কর্‌বে না। তোমার যদি বিয়ে না হ'ত, তাহ'লে তুমি যেমন থাক্‌তে ঠিক তেম্‌নি থাক্‌বে। আমরা তোমার ছোটবয়সে ভুল ক'রে যা করেছি, তার দায় ত তোমার নয়; তুমি বড় হ'য়ে ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখে যা ভাল মনে কর্‌বে ঠিক তাই কোরো। তাহ'লেই আমার সকল দুঃখ দূর হ'য়ে যাবে। আমি জানি তুমি তখন আপনিই সব কর্‌তে পার্‌বে। যতদিন না বুঝ্‌বে ততদিন তোমার কিছু ভাব্‌বার দর্‌কার নেই। তুমি যেমন আছ তেম্‌নি থাক। ছেলে মানুষের কাছে যার কোনো অর্থ নেই, তার বোঝা ত তার বইবার কথা নয়।"

গৌরী সকল কথা বুঝিল না; কিন্তু বুঝিল যে পরের মুখ চাহিয়া কি করিতে আছে কি করিতে নাই ভাবিলে তাহার চলিবে না, নিজে তাহাকে পথ খুঁজিতে হইবে। সে পথ খোঁজায় পিতা যে তাহার সহায় হইবেন, এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন এটাও তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে বলিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

শরীর-গঠন

শ্রী হেমেন্দ্রনাথ গড়গড়ী

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শ্রুতির এই সত্য কথাটা কি বাঙ্গালী সত্যিই ভুলে গিয়েছিল? আমার ত তা' বোধ হয় না। শুধু আজ ব'লে নয়, অনেক দিন থেকেই বাঙ্গালীর মনে একটা ঝড় উঠেছে। দুটো ঠিক বিপরীত জিনিষ আমাদের মনকে দখল কর্‌বার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে আস্‌ছে। তাদের এই প্রাণপাত চেষ্টা অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবাপুরুষের জীবনে বেশ পরিষ্কার ভাবে ফুটে' উঠে আপনার অস্তিত্ব জানিয়ে আস্‌ছে। এ-দুটোর একটা হচ্ছে "বল" আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে "বাবুয়ানী"। কিছুকাল আগেও "বাবুয়ানীটাই" যেন একটু বেশী ক'রে আমাদের সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্গীয় যুবকদের মধ্যে বেশীরভাগই "মেয়েলিপনার" বড়ই পক্ষপাতী হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁদের চুলের টেরী থেকে পায়ের লপেটা পর্য্যন্ত তাঁদের কোঁচান-ধুতির ও গিলেকরা চুড়িদার পাঞ্জাবীর উদাস ভাব, তাঁদের একটু নাকিসুরে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার ঢং এবং সর্ব্বোপরি তাঁদের একটু কুঁজো হ'য়ে চল্‌বার চেষ্টা, যেন বাঙ্গালী ছাত্র-জীবনের একটা অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রবাসেই বলুন, আর আমাদের বাংলাদেশেই বলুন, পথে, ঘাটে, থিয়েটারে, সীনেমায়, এই ধরণের বাঙ্গালী দেখ্‌তে আমরা এতই অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলাম, যে যদি কদাচিৎ একটা লম্বা-চৌড়া লোক

আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চ'লে যেত তা হ'লে বিস্ময়ে আমরা হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে থাকৃতাম; মনের ভাবটা তখন এই রকম হ'ত যে "এ আবার এক কী অদ্ভুত জীব।" তার সেই বলবান চেহারা দেখে আনন্দ হওয়া ত দূরের কথা, সে যে একটা নেহাৎ "গেঁয়ো" এই কথাটাই আমরা নিজের মনকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে কোন রকম ক্রটী কর্তাম না।

যাক্ কি ছিল আর কি ছিল না, সে-কথা নিয়ে বেশী লিখ্বার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আমার নেই। যা কিছু সামান্য বল্বার আছে তা বর্ত্তমানের বাঙ্গালী যুবার জীবনের পরিবর্ত্তন নিয়ে।

ক্রমশঃ সকলেই বুঝ্তে পার্‌ছেন যে, বাঙ্গালীর জীবনে "বল" ও "বাবুয়ানী"র যুদ্ধে বলই জয়লাভ কর্‌ছে। পুরুষের মেয়েলিপনাকে আমরা ক্রমশ আন্তরিক ঘৃণা কর্‌তে শিখ্‌ছি। শরীরের বল আর মাংসপেশীর গঠনই যে পুরুষের আসল সৌন্দর্য্য, আর এ-দুটি জিনিষ আয়ত্ত কর্‌তে পার্‌লেই সে সব-চেয়ে বেশী "বাবুয়ানী" করা হয় এ কথাটি ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মনে বদ্ধমূল হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কোনো মতে দুচারটে "পাস" দিয়ে, পাঠ-ক্লান্ত জীবন নিয়ে চাক্‌রীতে ঢোকা ছাড়াও যে আমাদের আরো কিছু কাজ আছে তা এতদিনে আমরা বুঝ্‌তে শিখ্‌ছি। এখন তাই দেশে দেশে বাঙালী ব্যায়ামের আখ্‌ড়া, বাঙ্গালীর কুস্তির আখ্‌ড়া আর বাঙ্গালীর সন্তরণ-প্রতিযোগিতা একটির পর একটি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন কোন্ যাদু-মন্ত্রে ছেলেদের দল তাদের সুন্দর মাংসপেশী ও তাদের শরীরের অসীম ক্ষমতা দেখিয়ে তাদের দুর্ব্বল, ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত অত্যধিক-পাঠে-ক্লান্ত বন্ধুদের মনে আশার রঙীন আলো জ্বেলে দিচ্ছে। চারিধারে যেন নূতন কিসের বেশ একটু সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। তাদের এখন আর পোষাকের সে-পরিপাট্য নেই মাথায় আর সে টেরীর বহর নেই; মেয়েলী "সুরে" কথা বল্‌বার আর সে আগ্রহ নেই, আর সব-চেয়ে যা দেখ্‌লে মন আনন্দে নেচে ওঠে তাদের সকলেরই বুক চিতিয়ে চল্‌বার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা দুই বাড়্‌ছে।

পথে একটি বলবান লোক যেতে দেখ্‌লে, আমরা এখনও ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে তার দিকে চেয়ে থাকি বটে, কিন্তু এ চাওয়া বিস্ময়ের চাওয়া নয়; এ চাওয়াতে থাকে তার শরীর-গঠনের ধৈর্য্যের প্রতি আমাদের নীরব পূজা ও তার সেই পুরুষকারের প্রতি একটা গভীর ভক্তি। যখন তার সেই চওড়া পিঠ আর মস্ত বুকখানা দেখে আমাদের বুক আনন্দে ভ'রে ওঠে তখন আমরা ব্যাকুল হ'য়ে মনকে বোঝাই, "আর বেশী দিন নেই, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমিও একদিন ঠিক এম্‌নিই শরীর নিয়ে পথে বেরুতে পার্‌বে!"

এই পরিবর্ত্তনের দুটি কারণ প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে। এক হচ্ছে, পথে ঘাটে, ফুটবল ম্যাচে ও ট্রেনে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ ও ইউরোপীয়দের হাতে আমাদের অশেষ লাঞ্ছনা ও দ্বিতীয় পাশ্চাত্য দেশের ভাল ভাল স্বাস্থ্যোন্নতি-সাধকদের জীবনী ও তাদের কার্য্যকলাপ পাঠ আর তাদের সুগঠিত ও বলবান দেহের ছবি দেখা।

আমার শরীর-গঠনের মূল কারণ হচ্ছে এই শেষোক্তটি। লাহোর সিনেমাতে আমি যে-দিন "Maciste"র বিরাট-কায় ও তাহার সেই সুন্দর সুরক্ষিত ব্যায়ামাগার দেখি এবং তাঁর অমানুষিক দৈহিক শক্তির পরিচয় পাই, সেইদিন থেকেই একটি ব্যায়ামের আখ্‌ড়া গ'ড়ে তুল্‌বার আকুল আগ্রহ আমায় পাগল ক'রে তুল্‌ত। ঠিক তার দু'দিন পরে আমার একটি বন্ধুর বাড়ীতে আমরা চার পাঁচ জনে মিলে ব্যায়ামের একটি ঘর প্রতিষ্ঠা কর্‌লাম—তখন অবশ্য সেটাকেই আমরা জিম্‌ন্যাসিয়াম্ বল্‌তাম। আমাদের তখনকার সম্বল ছিল একজোড়া রোম্যান্ রিং, এক-জোড়া মুগুর ও একটি বড় আয়না। ব্যায়ামাগারখানি ছেলেদের ভিড়ে ক্রমে এত ভ'রে উঠ্‌তে লাগল যে, আমাদের সেই প্রিয় ছোট ঘরখানি বদ্‌লাতে হ'ল। তার পরিবর্ত্তে লাহোরের কালীবাড়ীতে একটি ছোটখাট ব্যায়ামাগার দাঁড় করালাম। সেই হ'ল আমার শরীর গঠন কর্‌বার প্রথম প্রয়াস।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার সেই চেষ্টা ফলবতী হয়েছে। আমি লাহোরে থাক্‌তে থাক্‌তে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্রের শরীরের আশ্চর্য্যরকম উন্নতি দেখে এসেছিলাম।

তাদের মধ্যে একটি বাঙ্গালী যুবক—শ্রী মনোময় ঘোষ (বিল্লা) সব-চাইতে মাংসল শরীর গঠন করেছিল। তার শরীরের একটি বিশেষ ভঙ্গীর ছবি এখানে দেওয়া গেল। আর আমার এই তিন বৎসরব্যাপী সাধনার ফলে সামান্য যা কিছু লাভ করেছি তাও আপনাদের সাম্‌নে ধ'রে দিলাম।

আমার মতে, চেষ্টা কর্‌লেই নিজের শরীর সুন্দর এবং বলিষ্ঠ ক'রে তুল্‌তে পারা যায়। শরীর গঠন কর্‌তে হ'লেই যে রাজভোগের প্রয়োজন এ-একটা নেহাৎ বাজে কথা। বাদাম, মাখম, মালাই ইত্যাদি না হ'লে যে শরীর বলিষ্ঠ করা যায় না এটা আমাদের একটা মস্ত ভুল ধারণা ছিল। নিজের দিক্ থেকেই ব'লি না কেন আমি সাধারণ গৃহস্থ ঘরের "বাঙ্গালী" ছেলে; ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, আর চুনো-পুঁটীর মুড়ো খেয়েই মানুষ। মাখম, বাদাম, কিম্বা ডিম ইত্যাদি যে খুব খেয়েছি সে-কথা আমি চেষ্টা ক'রেও মনে কর্‌তে পারি না। তা ছাড়া আমাদের দলের প্রায় সমস্ত ছেলের অবস্থা আমারই মতন। সে যাই হোক্, এ-বিষয়ে আমি জোর ক'রে কিছু বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না, কারণ সকলেরই এ-বিষয় একটা স্বতন্ত্র মত আছে।
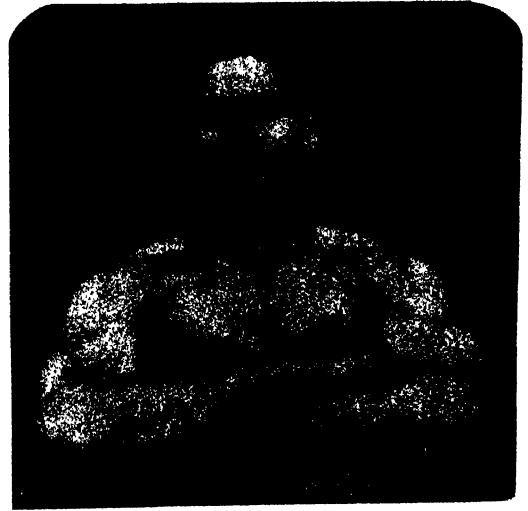
শ্রী মনোময় ঘোষ

বঙ্গের বাহিরে নব্য-বঙ্গীয় কলাশিল্পী শ্রী অসিতকুমার হালদার

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

দেখিতে দেখিতে বঙ্গের গৌরব আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসীকন্যা "নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা" বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী প্রতিভার বলে, প্রাচীন হিন্দুযুগের সংস্কার, বৌদ্ধ যুগের ধারা, রাজপুত ও মোগলযুগের বর্ণের ভিতর দিয়া এবং নব্যযুগের কল্পনার ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া বাঙ্গালীরই তুলিকামুখে এমনই বিশ্বচিত্তজয়ী যৌবনশ্রীতে ফুটিয়া উঠিতেছে; "প্রাচীর" শাশ্বত ভাব ও অনুভূতি এই "গুরুকুলের" (School) রূপকলায় এমন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে যে, তাহার বাস্তবতা ও সৌন্দর্য্য, তাহার জাতীয় জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার শক্তি ও প্রয়োজন, তাহার প্রভাব ও ভবিষ্যৎ যাঁহারা পূর্ব্বে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এখন যে স্বীকার করিয়া লইতেছেন, তাহার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। দশাব্দ পূর্ব্বেও কিন্তু ঠিক এমনটি ছিল না। নব্যতন্ত্রের গুরুগৃহে দশাব্দ মধ্যে ইহার জন্ম হইয়াছিল এবং দুই দশাব্দ মাত্র হইল ইহা সমালোচনার প্রখর রৌদ্র এবং বিদ্রূপের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি মাথায় করিয়া "প্রবাসী"র ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আচার্য্য স্বয়ং বলিয়াছেন, "বাংলার চিত্রকর সবাই ভবিষ্য অবস্থায় তখন, কেবল সকাল হচ্চে মাত্র। * * * নতুন বাংলার আর্টিষ্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর [প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের] আল্‌বমে তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হ'তে হয়েছে * *।"

কেন যে এরূপ হইতে হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ তখন আমাদের দৃষ্টি-কোণের পরিবর্ত্তন হয় নাই। তখন প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সহ হিন্দু-বৌদ্ধ-চিত্রশিল্প গুহাগত হইয়া পড়িয়াছিল, রাজপুত ও মোগল চিত্র ধনী-গৃহের প্রাচীর-গাত্রে জৈন মন্দিরে, রাজারাজড়া, নবাব বাদশাহের চিত্র-বাটিকা ও প্রমোদ-ভবনে বদ্ধ ছিল, এবং বাঙ্গালী তখনও স্বীয় জাতীয় সংস্কার ও ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করিয়া নবাগত পশ্চিমের সংস্কারে আপনাকে অভ্যস্ত করিবার অস্বাভাবিক

শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার

পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। স্বাধীন ভারতের প্রাচীন শিক্ষাবসানের অন্ধকারে ও পশ্চিমের নবীন আলোকে দেশের কলারসজ্ঞান তখন সাধারণতঃ দুই চরমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে এক দিকে এক সম্প্রদায় গ্রীক্ ভাস্কর ও ইতালীয় চিত্রকরদের কলারসজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অন্য সম্প্রদায় পুরীর জগন্নাথের ও কালীঘাটের পটেই সন্তুষ্ট ছিলেন। চল্লিশ বেয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা "ওরিএণ্ট্যাল্ সেমিনেরীতে" দুই তিন বৎসর মাত্র রূপ-কলার উপাসনা করিয়াছিলাম। শিল্পগুরু ছিলেন গবর্মেণ্ট্ স্কুল অব্ আর্টের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার বাবু হরিনারায়ণ বসু এবং যাদব-বাবু। তাঁহাদের পাশ্চাত্য ধারায় এই অল্প শিক্ষানবীশি করিয়া কলাদেবীর প্রসাদলাভ করিতে না পারিলেও এই নবীন শৈলীর মর্ম্ম-গ্রহণ করিবার মত চোখ দোরস্ত যে হয় নাই, তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি। তাই য়ুরোপীয় কলাবিদ্-গণের প্রাকৃতিক রূপানুকারী চিত্রণরীতির প্রতি আমার ন্যায় যাঁহাদের প্রশংসমান্ দৃষ্টি অব্যাহতভাবে নিবদ্ধ ছিল, নূতন ধারা হঠাৎ তাহার পথ অবরোধ করিয়া বসিলে, তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টিকোণ ফিরাইয়া তাহার রূপের ভিতর দিয়া রসের সন্ধান পাইতে সময় লাগিয়াছিল। তখন বিদেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিনিস্থায়ক পেশীপ্রদর্শক প্রসিদ্ধ চিত্রগুলির পার্শ্বে দেশের এই অর্দ্ধনিমীলিত নয়নদ্বয় ঔরগরেখাবদ্ধ প্রত্যঙ্গগুলি, বিষম ঠেকিবারই কথা। এমন-কি রবিবর্ম্মার "দময়ন্তী ও হংস", "শকুন্তলা" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রে নারীমূর্ত্তির কটিদেশ হইতে উর্দ্ধাঙ্গের সহিত নিম্নাঙ্গের আনুপাতিক বিভাগ অসমঞ্জস বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু প্রবাসীর অজন্তাগুহা চিত্রাবলীর ন্যায় ভারতীয় প্রাচীন শিল্পনিদর্শন ও ভাববিশ্লেষণাত্মক মৌলিক প্রবন্ধ, নব পদ্ধতির প্রবর্ত্তকদিগের স্বকীয় উদ্দেশ্য-বিবৃত্তি ও রহস্যোদ্ভেদ এবং তাহার আলোচনা ও সমালোচনা সাধারণের গতানুগতিক রূপরসগ্রাহিতাকে ব্যাহত করিয়া নূতন দৃষ্টিকোণের সন্ধান বলিয়া দিল। তাহার ফলে অর্দ্ধনিমীলিত ভাবমগ্ন নয়ন ঈষিকারেখার বক্রিমা, অতিতনুমধ্য, বিপুল নিতম্ব, দেব নর কিন্নরাদির স্বভাবা-তিরিক্ত বা অপার্থিব আকৃতির কল্পনা এবং লীলাবিলসিত অঙ্গবিন্যাসরীতি যে আমাদের প্রাচীন সংস্কারপূত ভারতীয় ঐতিহ্যের অননুকূল নহে, তাহাই হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এ সংস্কার হিন্দু বৌদ্ধ বঙ্গের নিজস্ব। তান্ত্রিক রূপকমূর্ত্তি পূজক এবং বৈষ্ণব রূপসাধক রাসরসিক ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী দশমহাবিদ্যা হইতে যাবতীয় দেবতাপ্রতিমার ভিতর দিয়া চিরসুন্দরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির রূপদর্শন ও মননে অভ্যস্ত। সুতরাং নব পদ্ধতি প্রবর্ত্তকদিগের চিত্রগুলি প্রথম হইতেই সাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষক ও চিত্তগ্রাহী না হইলেও অতি অল্প দিনেই তাহা হইতে সমর্থ হইল। তাহা না হইলে দেখিতে দেখিতে এমন দেশব্যাপী প্রতিবাদ, এত অধিক তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা বর্ত্তমানে বঙ্গের সাময়িক সাহিত্যে, অভিজ্ঞ ও সুধীসমাজে এবং

বঙ্গের বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এতদূর আদৃত ও ব্যাপ্ত হইত না।

দুই দশাব্দ ধরিয়া "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ"র চিত্র ও চিত্রপরিচয়ের ভিতর দিয়া বাহিরের ও অন্তরের চক্ষু বুলাইয়া আসিতে আসিতে বাঙ্গালীর এবং পরে ভারত-বাসীর দৃষ্টিকোণ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গীয় রীতি বঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া "নব্যভারতীয় চিত্রকলা"য় পরিণত হইয়াছে। প্রতীচ্যের শারীরতান্ত্রিক নৈসর্গিক, ছায়াচিত্রানুপদিক কলাজগতেও স্বীকৃত ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালীর এই জাতীয় শিল্পে "পুরাতন যে আধুনিকতায় পরিণত এবং আধুনিকতার মধ্যে পুরাতন পরিসমাপ্ত" হইতে চলিয়াছে তাহা এখন অভিজ্ঞগণের দ্বারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে। বঙ্গের এই গৌরব এখন ভারতের নিজস্ব হইতে চলিয়াছে। ভারতীয় কলাশিল্পে ইহা নব অভ্যুদয়ের যুগ। এই যুগ-প্রবর্ত্তনের মূল ঠাকুর-ভ্রাতৃদ্বয় আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন কলাভবন, গবমেণ্ট আর্ট-স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিষ্টার ই, বি, হ্যাভেল্, এবং অবনীন্দ্র-শিষ্য ও প্রশিষ্যমণ্ডলী, যাঁহাদের নাম অধুনা বাঙ্গালীর সুপরিচিত এবং যাঁহাদের কীর্ত্তিনিদর্শন আজ গৃহে গৃহে বিরাজিত। বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রকলার এই প্রাণ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে ইহার প্রচার ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন, বঙ্গের সেই বৈশিষ্ট্য-সংস্থাপক জাতীয় গৌরব-সংবর্দ্ধক কয়েক জনের সংবাদ অদ্য আমরা "প্রবাসী"র পাঠকপাঠিকগণের গোচরে আনিব।

যাঁহারা এই নবীন চিত্রকলার ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, নব্য শিল্পীদের চিত্রের আলোচনা ও সমালোচনায় যোগ দিয়াছেন এবং "Modern Indian Artists" গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, জাপানের কীও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যাচার্য্য জেমস্ কজিন্‌স্ সাহেব শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত ২৮ খানি চিত্র অবলম্বনে চিত্র-শিল্পে নবীন শৈলীর সমালোচনা করিয়া কলাজগতে শিল্পীর স্থান কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থমালার সম্পাদক কলাকোবিদ অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় সেই-সকল চিত্রের পরিচয় ও ভাব-ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া শিল্পীর মর্ম্মস্থান যে-ভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা শিল্পীর চিত্ত-চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া রূপের ভিতর যে-ভাবটি তার আত্মস্বরূপ বিরাজ করিতেছে এবং সেই ভাবরূপী আত্মাকে দেহবদ্ধ করিবার যে-প্রেরণা চিত্রপটে রূপ দিয়াছে তাহার সন্ধান পাই। শিল্পীকে কবি বলিয়া চিনিতে পারি। কবির হাতে শিল্পীর তুলিকা বর্ণে ও রেখায় ভাব কেমন ফুটাইয়া তুলে, আমরা এই চিত্র-কবির "বীণাবাদিনীর" চিত্রে তাহা দেখি এবং "কি সুর বাজে আমার প্রাণে, আমি জানি আমার মনই জানে" মর্ম্মী

লক্ষ্ণৌ গভর্ণমেণ্ট কারু ও চারু শিল্প বিদ্যালয়ের এক অংশ

মহাকবির এই অন্তরের রাগিণী রূপের ভিতর দিয়া দর্শকের হৃদয়-তন্ত্রীতে কেমন করিয়া বাজে, তাহা অনুভব করি। ভগিনী নিবেদিতা একদা মুক্ত আকাশতলের সৌধচত্বরে নির্জ্জনবাসিনী বীণাবাদিনীর স্বপ্নাবেশজড়িত মুখমণ্ডল, অনুভূতিমগ্ন নয়নতারা এবং করধৃত বীণার তারে করসঞ্চালন ভঙ্গিমার ভিতর দিয়া এই চিত্রার্পিতারই প্রাণের সুরের ক্ষীণ মধুর ধ্বনির স্পর্শানুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, "We can almost hear the faintest sweet notes of the Vina in her hand as she seeks for the song of the heart." আমরা আজিও সেই মধুরধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তেম্‌নি "কুণালের" চিত্র বৌদ্ধ-ভারতের কতটা ইতিহাস কত অশ্রুধারাপূত ঐতিহ্য, কত বড় লোকের মূর্ত্তি বুকে করিয়া

আত্মপ্রকাশ করে তাহা দেখি। এইরূপ অসিত-বাবুর প্রত্যেক চিত্রেই আমরা তাঁহার তুলিকামুখে ভাবকে রূপ দিবার কল্পনা বর্ণরেখায় ফুটাইয়া তুলিবার এবং প্রাচীন ভারতের সুপ্ত স্মৃতি, লুপ্ত ঐতিহ্যকে চিত্রকলায় ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ভারতের যে-সম্পদ কত শত বৎসর ধরিয়া অজন্তার গুহাগৃহে আত্মগোপন করিয়াছিল, আচার্য্য অবনীন্দ্র-শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা বিদুষী লেডী হ্যারিংহামের সহযোগে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া জগতে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার পশ্চাতে ভারতীয় সভ্যতা (culture) রূপে যে পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্য যুগযুগান্ত ধরিয়া বিরাজ করিতেছে তাহার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নূতন সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতমাতাকে যাঁহারা সম্পন্ন ও গৌরবমণ্ডিত করিতেছেন, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার তাঁহাদের অন্যতম। গবর্ন্মেণ্ট স্বীয় চিরাচরিত প্রথার অন্যথা করিয়া তাঁহাকে একটি প্রাদেশিক কলাশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার করিয়া দেওয়ায় একদিকে নব্য-ভারতীয় শিল্পকলাকে যেমন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি কলাবিদ্ হালদার-মহাশয়ের প্রতিভার উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিয়াছেন।

অসিত-বাবুর বয়স এখন ৩৬ বৎসর। এই বয়সে তিনি যুক্ত প্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট্ কর্ত্তৃক "School of Arts and Crafts" নামক কলাবিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ প্রবাস করিতেছেন। ভট্টপল্লী এবং শ্যাম-নগরের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ জগদ্দল তাঁহার পৈতৃক নিবাসস্থান। কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার জননীর মাতামহ স্বনামধন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসাদে ১৮৯০ অব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। অসিত-বাবুর পিতামহ ছিলেন ছোটনাগপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সরকারী ম্যানেজার এবং স্পেশ্যাল কমিশনর, স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার, যিনি ভারতের প্রথম সিবিলিয়ান্ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব্বে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার জীবনী বহুবর্ষ পূর্ব্বে আমরা য়ুরোপ-প্রবাসী বাঙ্গালী শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। অসিত-বাবুর খুল্লতাত বাবু নির্ম্মলচন্দ্র হালদার ৮ বৎসর হইল ৩২ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার গৌরবময় জীবনের অবসানে স্বর্গবাসী হইয়াছেন। তিনি ১৯০০ অব্দে বিলাতের কুপার্স্‌হিল কলেজ হইতে এঞ্জিনীয়ার হইয়া ভারতে ডিষ্ট্রিক্ট্ ট্রাফিক্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অল্পবয়সেই এদেশীয়দের দুর্ল্লভ রেলওয়ে বোর্ডের এসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটারীর দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানিত পদে উন্নীত হন। ১৯১৮ অব্দের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী বাঙ্গালীর এই গৌরব-রত্ন হরণ করে। অসিত-বাবুর পিতা শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া এক্ষণে দেরাসুলতানপুরে রাজার সরকারী তরফের অভিভাবক নিযুক্ত আছেন। বঙ্গমাতার এই মুখউজ্জ্বলকারী এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবপ্রতিষ্ঠাপক কুলে জন্ম লইয়া বাবু অসিতকুমার হালদার স্বীয় কৃতিত্ব দ্বারা তাঁহার বংশগত ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছেন।

দেশীয় চতুষ্পাঠী, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, আক্ষরিক বিদ্যা অথবা ব্যারিষ্টারের গাউন অসিত-বাবুকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, তাঁহার সহজাত প্রবণতা অল্পবয়স হইতেই তাঁহাকে ললিতকলার বার্ণিক ও রৈখিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু এই সুকুমার কলা তখন দেশে তদ্রূপ মানদ এবং অর্থকরী না থাকায়, প্রথমে তিনি অভিভাবকদিগের উৎসাহ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। তথাপি তাঁহার অন্তর্নিহিত রূপকলানুরাগ যখন তাঁহার এক-একটি ভাবময়ী মানস-প্রতিমাকে বর্ণ ও রেখায় রূপ দিয়া তাঁহার কবি-হৃদয়কে অভিব্যক্ত করিতে লাগিল, তখন তাঁহার আরব্ধ পথে আর বাধা রহিল না। অসিত-বাবুর নিজের ভাষায় বলিতে হইলে—

"ছেলেবেলায় ১৫ বৎসর বয়সেই প্রজ্ঞাদেবীর সেবা ছেড়ে দিয়ে কলাদেবীর আরাধনায় মন দিলুম এবং সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময় পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিকে গুরুরূপে পেলুম। লেখাপড়া ছাড়াতে আমার পিতা আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বিবেচনা করলেন এবং আমার খুড়া-মহাশয়ও এ-দেশে আর্টের বা আর্টিষ্টের কদর নেই জেনে আমাকে শিল্পকলা শিক্ষায় উৎসাহিত করতে পারলেন না। ১৯০৬ সালে আমি সব বাধা এড়িয়ে কলিকাতা গবমেণ্ট্ আর্ট স্কুলে শ্রদ্ধেয় অবনী-বাবুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমার জীবনে গৌরব করবার মধ্যে এই আছে যে, ঈশ্বরেচ্ছায় রামানন্দ-বাবু, রবি-বাবু, অবনী-বাবু, সার জগদীশচন্দ্র, শ্রদ্ধেয় ভগ্নী নিবেদিতা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাউণ্ট একাকুরা প্রভৃতি জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির স্নেহলাভ করেচি এবং তাঁদের সংসর্গে থাকবার সৌভাগ্য লাভও করেচি। শিল্পকলায় কবি রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে যে খুসী

শিশু কৃষ্ণ

শিল্পী শ্রী অসিতকুমার হালদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

করতে পেরেচি এতেই আমি পরম তৃপ্তি লাভ করেচি। কবি রবীন্দ্রনাথ আমার ২১৩ খানি ছবির উপর গান রচনা করেছিলেন।"

বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা "গবর্মেণ্ট্ স্কুল অব্ আর্ট"এ প্রবেশ করিয়া ৬ বৎসর পরে তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯১২ অব্দে তিনি শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি পান। ইতিমধ্যে (১৯০৮-৯) মিঃ এল জেনিংস্এর নিকট ভাস্কর-শিল্প শিক্ষা করেন এবং তাহাতে বিশেষত্ব লাভ করিয়া দুই বৎসরের জন্য "ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি অব্ ওরিএণ্ট্যাল্ আর্ট" ("Indian Society of Oriental Art") পরিষদ হইতে ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসর তিনি যুক্ত প্রদেশের প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক, ও তাম্র-পট্টে অলঙ্করণের জন্য গুণোৎকর্ষের নিদর্শন-পত্র (Certificate of Merit) পান। পরে তিনি উক্ত পরিষদ কর্তৃক লেডী হেরিংহামের সহিত অজন্তাগুহার প্রাচীন গাত্রাঙ্কিত চিত্রের (fresco painting) প্রতিলিপি গ্রহণ কার্য্যে নিয়োজিত হন এবং ১৯১৪ সালে ভারত গবর্মেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল্ সার্ভে বিভাগ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া মধ্য প্রদেশের সরগুজা রাজ্যে রামগড় শৈল-গাত্রাঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। ১৯১৭ হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে তিনি গোয়ালিয়র দরবার হইতে দুইবার মধ্যভারতের প্রাচীন বাগগুহা চিত্রাবলীর প্রতিলিপি করিবার ভার প্রাপ্ত হন। লণ্ডন, প্যারিস, জাপান, আমেরিকা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রদর্শনীতে, তাঁহার অনেক মৌলিক চিত্র প্রদর্শিত হইলে তাঁহার শিল্পচাতুর্য্যের প্রশংসা হয়। ঐসকল চিত্রের মধ্যে একখানি কলিকাতা মিউজিয়ম্, দুইখানি লাহোর মিউজিয়ম্ এবং অজন্তার প্রাচীর-গাত্রাঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রতিলিপি লণ্ডন সাউথ কেন্সিংটনের ভিক্টোরিয়া এল্বার্ট মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। লণ্ডন ও প্যারিস্ প্রদর্শনীতে প্রদত্ত চিত্রগুলি এবং শিল্পীর কলাদক্ষতার আলোচনা-প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ হ্যাভেল সাহেব কোপেনহেগেন হইতে ১৯১৬ সালে লিখিয়াছিলেন—

"At the recent exhibitions of the New Calcutta School Paintings in Paris and London, Mr. Haldar's work attracted much attention from the best French and English art critics."

১৯১৩ অব্দে অসিত-বাবু শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষক হন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে সিংহলের কলম্বো মহীন্দ্র কলেজের রূপকলাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনিভূষণ গুপ্ত, ত্রিপুরারাজ্যের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৯১৫ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে শিক্ষকতার পর ১৯১৭-১৮ অব্দের মধ্যে অসিত-বাবু কবিবর রবীন্দ্রনাথ

লক্ষ্ণৌ শিল্প-বিদ্যালয়ের চারু-শিল্পাগার

ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে "The Bichitra Studio for Artists of the New Bengal School" নামে যে কারুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে যোগ দেন। এখানে চিত্রকলার চর্চ্চা ব্যতীত গীত অভিনয় বক্তৃতা প্রভৃতিও হইত, এবং এখানে একটি পাঠগোষ্ঠীও স্থাপিত হইয়াছিল। বিচিত্রার মজলিস উচ্চ অঙ্গের অনুশীলন কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বাবু নন্দলাল ও মুকুলচন্দ্র দের সহিত অসিত-বাবু উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপকত্রয়ের অন্যতম ছিলেন। ১৯১৮ অব্দে অসিতবাবু "গবর্মেণ্ট্ স্কুল অব্ আর্ট"এ ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং ক্লাসে বিশেষ শিক্ষকরূপে কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু তথাকার তৎকালীন প্রিন্সিপাল তাঁহাকে হেডমাষ্টারের পদ না দেওয়ায় তিনি চাকরি ছাড়িয়া দেন। ইতিমধ্যে বরোদা রাজ্য হইতে আমন্ত্রিত হইয়া অসিত-বাবু তথায় যাইতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় বিশ্বভারতীর কলাভবন এক বৎসর

পরিচালনার পর বাবু নন্দলাল বসু কলিকাতার "Oriental Art Society"র কার্য্যে চলিয়া গেলে রবিবাবুর আহ্বানে ১৯২০ অব্দে অসিত-বাবু বিশ্বভারতীতে যোগ দেন এবং তিন বৎসর শান্তি-নিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষের কার্য্য করেন। কলাভবনে ছোট ছোট (miniature) চিত্রই অঙ্কিত হইত। অসিত-বাবু বৃহৎ চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়া তাহার পথপ্রদর্শক হন। এখান হইতে তাঁহার বন্ধু পীয়ার্সন (Mr. W. W. Pearson) সাহেবের সহিত অল্প দিনের জন্য বিলাতযাত্রা করিয়া তথাকার আর্ট্ গ্যালারী, মিউজিয়ম প্রভৃতি দর্শন করিয়া আসেন, কিন্তু ফিরিয়া বিশ্ব-ভারতীতে স্থান পান নাই, কারণ তাঁহার স্থলে অন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় জয়পুর আর্ট্ স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের পদে লোকের প্রয়োজন হইলে তাঁহার পূজনীয় গুরু অবনীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালের অক্টোবরে তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করেন।

মাটির খেলনা-গড়ার ক্লাস

জয়পুরের শিল্প বিদ্যালয় বহুদিন হইতে ভারতে প্রসিদ্ধ। ইহা ১৮৬৬ অব্দে মহারাজা বাহাদুর সওয়াই রামসিং কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তার সি, এস্, ভ্যালেণ্টাইন, তাহার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হন। শিক্ষকবর্গ তখন মান্দ্রাজ স্কুল অব্ আর্ট হইতে আনীত হইতেন। ডাক্তার ভ্যালে- ... বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন ইহার অধ্যক্ষ হন। ... ক্ষ হইয়া আসিলে তিনি দেখেন যে এই ... পক্ষে অর্থকরী শ্রমশিল্পবিদ্যালয় (School of Industrial Arts)। তাঁহার সময়ে বাবু শৈলেন্দ্রনাথ দে উপাধ্যক্ষ, বাবু বিনোদবিহারী রায় শো রুম ক্লার্ক এবং মাত্র তেরজন ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ের আটটি গুদামঘর শিল্পদ্রব্যাদিতে পূর্ণ। তাহার কোন হিসাব-পত্র নাই। তৎসমুদয় ভ্রমণকারী (tourist)-দিগের নিকট বিক্রয় করিবার পণ্যশালায় পরিণত হইয়া আছে। অসিত-বাবু বহু চেষ্টায় এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করাইয়া এবং ছাত্রদের বৃত্তি প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা করিয়া স্কুলটিকে ঠিক পথে আনিতে সমর্থ হন। পূর্ব্বে এখানে একটি মাত্র ড্রইং ক্লাস ছিল। তাহাতে কেবল কপি করা শেখান হইত মাত্র। অসিত-বাবু তথায় নেচার ষ্টাডি (nature study) এবং ডিজাইন (design) শিখাইবার দুটি নূতন শ্রেণী যোগ করেন। এই দুই বিভাগ যে কত প্রয়োজনীয় এবং কলাভবনের আদর্শ (Standard) ও গৌরববর্দ্ধক তাহা বলা বাহুল্য। শ্রম-শিল্পবিভাগে যে ১৫টি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তন্মধ্যে metal casting, carpentry, wood carving, damaskeen work, lacquer work এই পাঁচটি শ্রেণী অসিত-বাবুর নূতন প্রতিষ্ঠা। বিষয়গুলি পূর্ব্বে শিখানই হইত না, তাঁহার কৃতিত্ব খ্যাতি কলাভবনে বহুছাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল এবং এক বৎসর চারি মাসের মধ্যে এখানকার ছাত্রসংখ্যা ১৩ হইতে ১৬০ হইয়াছিল। অনেক কাগজ পত্রে এই নূতন অধ্যক্ষের কার্য্যকুশলতা বহুল প্রশংসিত হইয়াছিল। জয়পুর রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী সভার প্রেসিডেণ্ট্ এবং মধ্যভারতের বর্ত্তমান এজেণ্ট মাননীয় গ্লান্সী সাহেব (R. I. R. Glancey, I.C S. the Hon'ble Agent to the Govr. Gerl. Central India) লিখিয়াছিলেন—

"Jaipur art school once famous for its work throughout India, had fallen in evil days. Attention was almost exclusively towards the production of cheap trifles for tourists. Mr. A. K. Haldar was accordingly brought from the Tagore art school and entrusted with the work of restoring the standard of taste and the canons of work in Jaipur. Mr. Haldar is an artist and an enthusiast and I have therefore great hopes that he will make the dry bones live."

জয়পুরের এই কর্ম্মগ্রহণ করায় লণ্ডন রয়েল কলেজ অব্ আর্টএর অধ্যক্ষ আচার্য্য রদেন্‌ষ্টীন্ (Mr. W. Rothenstein, Principal Royal College of Art, London) অসিত-বাবুকে অভিনন্দিত করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"My dear friend, I was delighted to hear that you have been made Principal of the Jaipur school of arts......I cannot imagine any one better equipped for such a post than yourself. You will be able both to inspire others and to do creative work yourself ......Sincerely always" etc.

এই সময় আগ্রা অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের "গবর্ণমেণ্ট্ স্কুল অব্ আর্টস্"এর প্রিন্সিপ্যালের প্রয়োজন বিজ্ঞাপিত হইলে, শুনা যায় ঐ পদের জন্য দুই শত আবেদন পড়ে; অসিত-বাবুও দরখাস্ত করেন। নির্ব্বাচন-সমিতি সেই দুই শতের মধ্যে হালদার মহাশয়কেই নির্ব্বাচন করেন, সুতরাং ১৯২৫ অব্দের জুলাই মাসে তিনি শ্রীযুক্ত হিরন্ময় রায় চৌধুরী এ, আর, সি, এ, মহাশয়ের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া জয়পুর ত্যাগ করেন এবং গবর্ণমেণ্টের নবপ্রতিষ্ঠিত কারু-বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া লক্ষ্ণৌ প্রবাসী হন। এই সূত্রে গবর্ণর জেনারেলের মাননীয় এজেণ্ট্ উক্ত গ্লান্সী সাহেব ইন্দোর রেসিডেন্সী হইতে ১৯২৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী অসিত-বাবুকে অভিনন্দিত করিয়া পত্র দিয়াছিলেন এবং জয়পুরের মন্ত্রীসভার প্রেসিডেণ্ট্ রেনল্ডস্ সাহেব (L. W. Reynolds, I.C.S.) জয়পুরে অসিত-বাবুর কার্য্যের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"........your work in Jaipur now alas ! to terminate too soon. I would like to take this opportunity to thank you for the excellent work you have done in bringing the school of arts in Jaipur back into the right path. I am extremely sorry we are to lose you though I rejoice that you have obtained an appointment which will be more to your liking and give greater scope for your ability."

লক্ষ্ণৌএ আসিয়াও অসিত-বাবুকে স্কুলের সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে, স্কুলের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তাহার উপর "U. P. Arts & Crafts Museum" ও "Emporium"এরও ভার আছে। এম্পোরিয়াম্ একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ইহার কণ্ট্রোলারের কার্য্যের জন্য তাঁহার-স্বতন্ত্র বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। তিনি এই পণ্যপ্রতিষ্ঠানটিকে কলাভবনের সংস্রব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কেবল ব্যবসায়-প্রধান স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়া সরকারের মঞ্জুরী গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু স্বতন্ত্র করিলেও তাহার উন্নতির তত্ত্বাবধান সমানই করিবেন। তিনি এখানে এন্‌গ্রেভিং বিভাগে সোনারূপার উপর মিনার কাজ শিখাইবার নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং প্রসেস্ (process) ও ব্লক (block) প্রস্তুত-করণ-প্রণালী শিক্ষা আরম্ভ করাইয়াছেন। তজ্জন্য একজন শিক্ষককে জয়পুরে

লক্ষ্ণৌ শিল্প-বিদ্যালয়ের গৃহসজ্জা ও মণ্ডনশিল্প শিক্ষার ক্লাস

পাঠাইয়াছেন এবং অন্যান্যকে কলিকাতায় "ইউ রায় এণ্ড্ সন্স"এর কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া তিন বর্ণের ব্লক করা শিখাইয়া লইয়াছেন। সোনারূপার মীনার কার্য্য (enamelling) বিভাগের ন্যায় মুদ্রাশিল্প বিভাগ (art printing) এবং tin colour process তাঁহার দ্বারা এখানে নূতন প্রবর্ত্তিত হয়।

মাদ্রাজের "New India" পত্রিকা সত্যই বলিয়াছেন—

"The appointment of Mr. Asit Kumar Haldar as Principal of Lucknow School of Art marks a specially important step forward in the cultural movement in India for the first time as ar as we are aware, a working artist in the purely oriental style has been given a front rank appointment of great responsibility in a government school in British India without any of the limitations of

training in the western style and without any conventional academical acquirements.',

চিত্রকবি অসিত-বাবুর সাহিত্যানুরাগও বড় কম নহে। অল্পবয়স হইতেই তিনি বাঙ্গালা মাসিক পত্রে কবিতা এবং শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতেছেন ও পুস্তক রচনা করিয়েছেন। তাঁহার লিখিত "অজন্তা" "বাগগুহা ও রামগড়", "বুনো গপ্প", এবং হোদের গল্প" তাহার নিদর্শন। তাঁহার "চলিত বাংলা" বা কথ্য ভাষা শ্রুতিকটু না হইয়া বরং বেশ সরল ও হৃদয়গ্রাহীই হয় অজন্তার পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁহাকে এজন্য সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষা দিয়া আসিতে হইয়াছে। তিনি একখানি পত্রে এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"অজন্তার বিষয় ভারতী পত্রিকায় চলিত ভাষায় প্রবন্ধ লিখে আমি মহাগোলে পড়েছিলুম। আমার ভাষা সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত মহাশয় 'অশুদ্ধ বাংলা হয়েচে' ব'লে আমায় ভীষণ ভয় দেখিয়েছিলেন। ভয় পাবার কারণ ভারতীর পৃষ্ঠায় চলিত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে' তখনও বীরবল উপস্থিত হননি, তবে রবি-বাবু ও ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট উৎসাহ না পেলে হয়ত চিরদিনের জন্যে কলম বন্ধ করতে হ'ত।"

হালদার-মহাশয়ের দেশের ও বিদেশের অনেকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ আছে। তিনি "সোসাইটী অব্ ইণ্ডিয়ান আর্ট কলিকাতা"র সহিত যুক্ত, শান্তিনিকেতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশ্বভারতী পরিষদের সদস্য, এমেরিকার রোরিক মিউজিয়মের (Roerick Museum, U. S. A.) মন্ত্রীসভার সম্মানিত সদস্য এবং ইহার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কলাশিল্পবিশারদ ২৪জন সদস্যের মধ্যে একমাত্র ভারতবাসী। তিনি ইংলণ্ড্ ফ্রান্স্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জগতের পুরাদ্রব্যাগারসমূহ, প্রত্নবিদ্যা ও কলাশিল্পানুষ্ঠানগুলি দর্শন ও অধ্যয়ন করিয়া যেমন প্রতীচ্য পদ্ধতির পরিচয় লইয়াছেন, তদ্রূপ অজন্তা, রামগড়, মথুরা, কোণারক, ভুবনেশ্বর, নাসিক, কার্লী, এলিফাণ্টা প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানের ও সিংহল ভ্রমণ করিয়া তথাকার প্রাচীন রূপকলার নিদর্শন হইতে প্রাচ্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার একনিষ্ঠ রূপসাধনা এবং কলাকুশলতা তাঁহাকে জগতের বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বিখ্যাত কলাকোবিদ শিল্পধুরন্ধর রাজা মহারাজা এবং সমাজের পদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংস্রবে আনিয়াছে এবং অনেকের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ করিয়াছে। তাঁহাদের লিখিত রাশীকৃত চিঠিপত্র ও প্রশংসা-মুখরিত সমালোচনা প্রভৃতি তাহারই সমর্থন করে। দুই বৎসর পূর্ব্বে অবসর-প্রাপ্ত হ্যাভেল সাহেব লণ্ডন হইতে লিখিয়াছিলেন—

......Mr. Asit Kumar Haldar, an artist of undoubted original talent and wide general culture, possessing the qualifications which make a good teacher......Mr. Haldar has......both the creative instinct and the teaching capacity which are necessary in a good art teacher......",

ডাক্তার কজিনস্ সাহেব লিখিত অসিত-বাবুর শিল্পপদ্ধতি পরিচায়ক গ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনায় মিঃ মেহতা (Mr. N. C. Mehta, I.C.S.) বলিয়াছেন—

"Asit Kumar has true imagination and feeling and with the perfection of his technical resources, would play an important role in the revival of Indian painting."

ডাক্তার কুমারস্বামীর "Selected Examples of Indian art", ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ কৃত "A History of Fine Art in India and Ceylon", লণ্ডনের "Art Gazette" "The Modern Review", "The Modern World",The Connoisseur," The Chicago Daily Tribune" প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ, সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভিতর দিয়া অসিত-বাবুর সুযশ বহু বিস্তৃত হইয়া আজ বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

শরীর সাম্‌লাও!

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

মানুষ নিজেকে নিজে তারিফ্ করে; তা নইলে সে বাঁচ্‌তে পারে না। অবশ্য এ স্বভাবের জন্যে মানুষকে দোষ দেওয়া যায় না; গোঁড়া দুঃখবাদীদের মতে জীবনটা যা,—নিজেকে তারিফ্ করে' মানুষ জীবনকে তার চেয়ে ত' বড় কর্‌তে পেরেছে! তা ছাড়া এই আত্ম-প্রশংসা যখন এমন একটি আদর্শবাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়—যার লক্ষ্য ক্রমাগতই জীবনের কুশ্রী বাস্তবতা ফেলে' বৃহত্তর সত্তার পানে,—তখন মানুষ বার-বার আপনাকে নিজের আদর্শের সম্মুখীন করে' বিচার করে, এবং সমস্ত অক্ষমতা উপলব্ধি করে' আদর্শ অনুযায়ী হবার জন্য সচেষ্ট হয়। নীতিশাস্ত্রে ত এমন কথা লেখে না যে, নিজেকে নিজে তারিফ্ করো না! সহজবুদ্ধিতে এমন কথা বলে বটে—আত্মশ্লাঘা যেন মূর্খের মত না হয়। এ ধরণের আত্মশ্লাঘার উৎপত্তি—হয় মানুষের নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থেকে, অথবা নিজেকে বড় কর্‌বার জন্যে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত আরও কিছু যে থাক্‌তে পারে তা অস্বীকার কর্‌বার প্রবৃত্তি থেকে।

মানুষ যখন নিজের সাফল্যকে যথেষ্ট মনে করে' তাইতেই সন্তুষ্ট থাকে তখন সে আপনার অক্ষমতা নিজের কাছে গোপন রাখ্‌বার চেষ্টা করে মাত্র। যত ভাল হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব তত ভাল এপর্য্যন্ত কেউই হ'তে পারেননি। বিশেষত শারীরিক উৎকর্ষের বেলায় একথা যেমন খাটে এমন আর কোথাও খাটে না। যেমন মানসিক তেম্‌নি শারীরিক উৎকর্ষের বেলাতেও যতই অগ্রসর হওয়া যাক্ না—সাম্‌নে আদর্শের অভাব হয় না। মানুষ যে এ-ক্ষেত্রে থামে, সে নেহাৎ অন্তরের চির-অশান্ত চির-অস্থির প্রেরণাটিকে অলস দার্শনিক 'বুক্‌নি' দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে—"কুছ্ হরজ্ নেই, খাসা চলেছে দুনিয়া, তার সঙ্গে আমিও।"

আদর্শকে কোনকালে আয়ত্ত করা যায় না বলে' যেন কেউ না বলে,—সে-চেষ্টা করাই ভুল। আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়াতেই কি এচেষ্টার চরম সার্থকতা নেই? এই আদর্শই ত' মানুষকে শ্রেয় থেকে শ্রেয়তরতে নিয়ে চলেছে। মূঢ় আত্মপ্রশংসার দোষ এইখানে যে, মানুষ তাতে আদর্শ সম্বন্ধে অন্ধ হয় এবং সমস্ত প্রেরণা হারিয়ে বদ্ধজলার মত পচে' মরে।

অক্সফোর্ড—কেম্‌ব্রিজ

যুগে যুগে মানুষ শারীরিক উৎকর্ষের জন্যে সাধনা ও কামনা করেছে—এ কামনা মহৎ। এ কামনার অর্থ—দেহকে আত্মার উপযুক্ত মন্দির করে' গড়ে' তোলা।

এই তপস্যা ও সাধনার দেশে মানুষের জীবনের প্রধান কথাই ছিল—উৎকর্ষ লাভ। এবং শারীরিক উৎকর্ষ এখানে তার যোগ্য সম্মান পেয়েছে। কিন্তু তারপর অধঃপতনের যুগে দেশের লোক সকলপ্রকার সাধনার সঙ্গে শারীরিক উৎকর্ষের জন্য সাধনাকেও অবহেলা করেছে। আজকাল কথায় কথায় আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনতে পাওয়া যায়। এ শক্তি নিয়ে বড়াই যারা করে, তাদের পেছনে

তাদের সেই বড়াইকে সমর্থন কর্‌বার মত কোনও সাধনা নেই। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জ্জন কর্‌তেও সাধনা লাগে। শারীরিক শক্তির বেলায় যেমন, এখানেও তেম্‌নি শুধু কথায় বাজীমাৎ হয় না। দুই-ই সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। আর একথাও সত্য যে, রুগ্ন দার্শনিক যতটুকু স্বীকার কর্‌তে রাজি, দেহ ও আত্মার মধ্যে আত্মীয়তা তার চেয়ে ঢের বেশি।
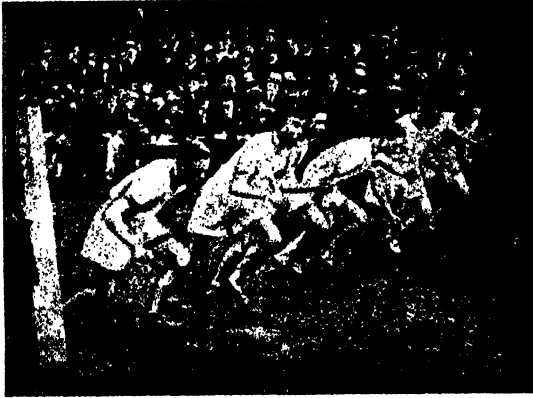
তিন মাইলের দৌড় শুরু হয়েছে। অক্সফোর্ড বনাম কেম্‌ব্রিজ

রুগ্ন গলিত দেহের মাঝে সবল সতেজ মনের বাস করা কিছুতেই সম্ভব নয়; তাছাড়া দেহের সৌন্দর্য্য কি অমনিই কাম্য নয়?

কেউ কেউ দূর ভবিষ্যতে এমন একদিন কল্পনা করে' আহ্লাদে আটখানা হন বটে, যেদিন মানুষ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিবর্জ্জিত একটি বৃহৎ মস্তিষ্কাধার মাত্র হ'য়ে রাশি রাশি যন্ত্রপাতির মধ্যে তার উন্নত জীবন যাপন কর্‌বে; আমরা কিন্তু প্রকৃতির একছত্র সম্রাট্ হবার লোভেও তাঁদের খাতায় নাম লেখাতে নারাজ। যন্ত্রপাতি দিয়ে দেহের বিলকুল কাজ চালানো যায় কি না দেখ্‌বার জন্যে আমরা এমন সুন্দর দেহটি খোয়াতে রাজি নই। ইচ্ছামৃত্যু প্রমাণ কর্‌বার জন্যে কেউ আত্মহত্যা করে কি? আর একথাও যেন স্মরণ থাকে যে, স্রেফ খুলি-রূপ আদর্শ-মানুষ এখনও পর্য্যন্ত ধোঁয়াতেই বাস কর্‌ছেন। আর কবে মগজ বেড়ে উঠে দেহের দোকানপাট তুলে দেবে সেই আশায় এখন থেকে দেহকে হেলাফেলা কর্‌বার মত আহাম্মুকি আর কি আছে! দেহের যখন প্রয়োজন রয়েছে তখন দেহের দিকে তাকাতেই হবে; নইলে
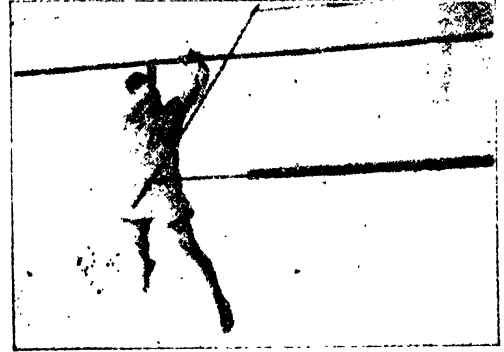
ডি, আর, মিচেনার 'ভার্‌সিটি পোল্ জাম্পে' জয়ী হলেন

জি, এম, বাট্‌লার (কেম্‌ব্রিজ), ডব্লিউ, ই, ষ্টিভেন্‌সানের (অক্সফোর্ড) কাছে হেরে গেলেন

ডব্লিউ, এ, ব্রিগস্ (জেসাস্ কলেজ) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজী জিতলেন

ম্যানুয়েল এলোন্‌সো

অতি-মানুষ জন্মাবার আগে মানুষই লোপাট্‌ হ'য়ে যাবে।

এই প্রবন্ধের নামের নীচেই যে-ছবিটি ছাপা হয়েছে সেটি কেম্ব্রিজ্‌ ও অক্সফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাত বাচ্‌খেলায় ১৯২৩ সালের প্রতিযোগিতার ছবি। যারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ্‌ থেকে নেমেছে তারা সেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ রাখ্‌বার জন্যে প্রাণপণ সাধনা কর্‌তে পেছ্‌পাও হয়নি। টেম্‌স্‌ নদীর ওপর বাচ্‌-খেলার এই বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার জন্যে কত কায়দা-

'বেবি' নর্টন বনাম ফেয়ং রিক্সেন

কুমারী রেড্‌-টম্‌সন্‌

কানুন তাদের শিখ্‌তে হয়েছে,—মাসের পর মাস কত কঠোর পরিশ্রমই না তারা করেছে !

চমৎকার সব ছেলে ! যে-কোনও জাত এদের নিয়ে গর্ব্ব কর্‌তে পারে।

ছেলেরা শিক্ষানবিশীর সময় দলে দলে দাঁড় টান্‌বার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ;—কত ঝড়-জল, কত তুষার তাদের মাথার ওপর দিয়ে যায়, জীবনের সকল রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাদের বিসর্জ্জন দিতে হয় ! নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, আর শারীরিক সৌষ্ঠবচর্চ্চার একটা মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য।

বাচ্‌-খেলা এক চমৎকার ব্যায়াম। শরীরের মাংস-পেশী বলিষ্ঠ সবল হ'য়ে ওঠে, মানুষ তেজীয়ান্‌ হয় ; একাগ্রতা ও একসঙ্গে কাজ করার শিক্ষাও এতে লাভ হয়।
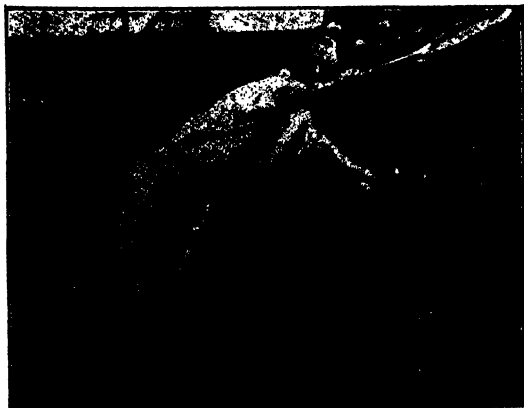
ক্রিকেট খেলা

আট জন লোক যখন একই সঙ্গে—এতটুকু ভুলক্রটি না করে' ঠিক্ কলের মত দাঁড় টেনে চলে—তারা যে একটা কিছু করেছে—একথা তখন আর কেউ অস্বীকার কর্‌তে পারে না। প্রাণপণে সকলে ঠিক একই সময়ে একাগ্রমনে কুড়ি মিনিটকাল ধরে' দাঁড় টেনে চলেছে—এতটুকু অন্য-মনস্ক হবার উপায় নেই,—হয়েছে কি তৎক্ষণাৎ সব মাটি হ'য়ে গেছে! কাজটা যে কিরকম শ্রমসাধ্য, একবার দেখ্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।

নর্টনের বিরুদ্ধপক্ষে জনষ্টন্

দৌড়-বাজির খেলা—সে আবার আর-এক ব্যাপার। পিস্তলের আওয়াজ হয়েছে কি—দে দৌড়! একশ গজ থেকে যে যতদূর পারে—সে যে কত মাইল তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। এর জন্যে তাদেরও রীতিমত শিখ্‌তে হয়। পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে এক মাইল পথ ছুটবার চেষ্টা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়—ব্যাপারটা কি। দূরপাল্লার দৌড়বাজি জিত্‌তে হ'লে রীতিমত বুদ্ধি থাকা দর্‌কার। কোন্‌খানে জোর ছুট্‌তে হবে, আর কোন্‌খানে আস্তে চল্‌তে হবে—বাজে লোক তার কিছু বুঝ্‌তে পারে না। ভাল দৌড়বাজের পক্ষেও স্থির-নিশ্চিন্ত হওয়া বড় কঠিন! বাজী জিত্‌বার চেষ্টা করে প্রত্যেকেই, কিন্তু তবুও কোন্ সময় ফস্ করে' কে যে এগিয়ে এসে' বাজী জিতে নেয়—কেউ বল্‌তে পারে না। জি, এম, বাট্‌লার ছিলেন এক-সময় অজেয়; কিন্তু এখন দেখি—ডব্লিউ, ই, ষ্টিভেন্‌সন্ তাঁকে হারিয়ে দিলেন।

জয়ী হবার জন্যে প্রত্যেককেই রীতিমত শিক্ষা কর্‌তে হয়। শেখ্‌বার সে-সব অনেক জিনিষ! প্রথম চাই—অভ্যাস, তারপর ধরণ-ধারণ; দৌড়বাজীর সুরুতেই চট্‌পটে হওয়া, শরীরের যৎসামান্য শক্তিটুকুকেও কাজে লাগানো,—তার জন্যে ঠিক পরিমিত ভোজন দর্‌কার,

যথেষ্ট ঘুমোতে হয়, ফাঁকা আলো-বাতাস দর্‌কার,আর চাই শান্ত, সংযত নির্দোষ জীবনযাপন। অনেকে খেলোয়াড় হ'য়ে জন্মে, কিন্তু আবার তৈরীও হয় তার চেয়ে বেশি। আর যারা জন্ম-খেলোয়াড়, বেশির ভাগ তারাই দিগ্বিজয়ী হ'য়ে থাকে।

ঘরের বাইরে যে-সব খেলা চলে—সে-সব হচ্ছে দৈহিক উৎকর্ষ সাধনের আর-একটা দিক। খেলা জিনিষটা মানুষকে আকর্ষণ করে বেশি, কারণ মানুষকে সেখানে একটুখানি বুদ্ধি খাটাতে হয়। অন্যান্য
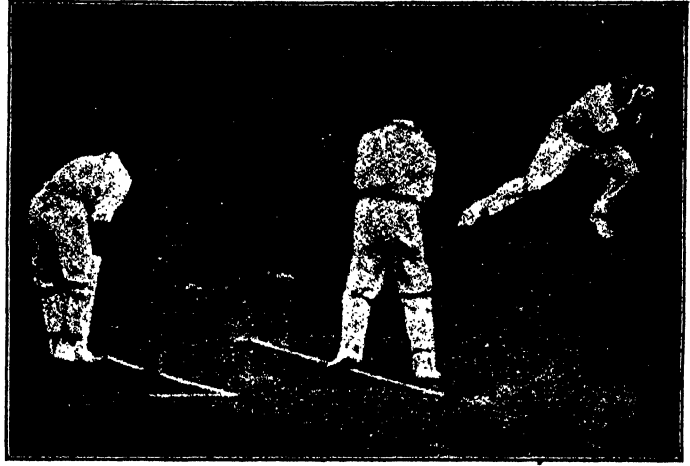
টি, সি, লাউরি ও জি, টি, এস্‌, ষ্টিভেন্‌স্‌

এতেও একাগ্র মনোনিবেশ চাই, এতে চোখের শিক্ষা হয়, দেহের সৌন্দর্য্য বাড়ে। প্রত্যেকের মন এতে ধীরে-ধীরে সমস্যাগুলির মীমাংসা কর্‌তে থাকে—দেহটাকেও ঠিক তারই সঙ্গে সঙ্গে কাজ কর্‌তে হয়। সভ্য মানুষের পক্ষে এ এক ভারি চমৎকার খেলা।
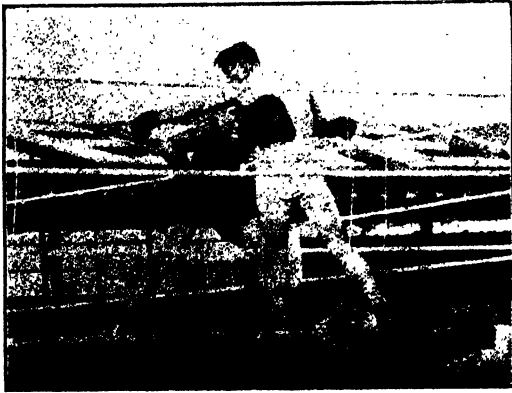
কারপেণ্টিয়ার ও নীল্‌স্‌

কুস্তি-কস্‌রতের চেয়ে খেলাধূলা দেখ্‌লে মনে হয়—হ্যাঁ, কিছু কর্‌ছে বটে! দৈহিক উৎকর্ষের দিক্‌ দিয়ে খেলাটাকেই বেশি প্রয়োজনীয় বলে' মনে হয়—কারণ এতে দেহ ও মন উভয়েরই একটা সামঞ্জস্য থাকে। এর একটা নিয়ম আছে, সঙ্কেত আছে। এমন সব খেলা আছে—বাইরে থেকে দেখ্‌লে মনে হয় এতে ভয়-ভাবনার কিছু নেই, ভারি সোজা; কিন্তু ঠিকমত খেল্‌তে গেলে শরীরের মাংসপেশীগুলোর রীতিমত জোরের দর্‌কার। টেনিস্‌ খেলাটা বলে নাকি মেয়েদের খেলা। কিন্তু এ'খেলা খেল্‌তে হ'লেও রীতিমত শক্তির প্রয়োজন।
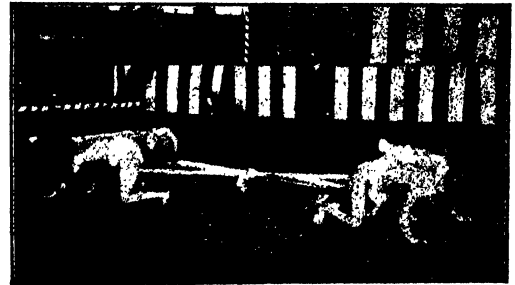
কোরিয়ার টাগ্‌-অফ্‌-ওয়ার্‌

পশুর মত গায়ে জোর থাক্‌লেই শুধু টেনিস্‌ খেলায় জয়লাভ করা যায় না। মন আর দেহ দুই-ই একসঙ্গে কাজ কর্‌বে। মিষ্টার জন্‌ষ্টনের কথাই ধরা যাক্‌। দেখ্‌লে তাকে ডিম্‌সের সঙ্গে লড়্‌বার উপযুক্ত পালোয়ান বলে' মনে হয় না; কিন্তু টেনিস খেলায় প্রত্যেকটি মার তাঁর যেমন নির্ভুল তেম্‌নি জোর। তাঁর আসল কায়দা হচ্ছে ঠিক সময়মত মার।

এম্‌নি করে' মানুষ তুল্‌তে পার ?

দুনিয়ার সেরা সাঁতারু—কুমারী এডারল্

এখন ক্রিকেটের কথা ধরা যাক্। এই খেলাটিতেও কি 'ব্যাটিং'এর সময়, কি 'ফিল্‌ডিং'এর সময়, একেবারে সজাগ না থাক্‌লে চলে না। ছবিতে টি, সি, লাউরিকে দেখ্‌লেই বোঝা যায়—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধির ওপর তাঁর কি অসামান্য অধিকার।

'ব্যাটিং' কর্‌বার সময় দ্রুতগামী 'বলে'র গতি দেখেই বুঝ্‌তে হবে সেটি কোথায় পড়্‌বে, এবং বল দেবার কায়দা থেকেই ঠিক কর্‌তে হবে মাটিতে পড়ে' বলের অবস্থা কি হবে। এই দুটি জিনিষ ঠিকমত আন্দাজ করাই সাধনা সাপেক্ষ। যা হোক্ করে' বল্‌টাকে ঠেকালেই চলে না। তাহ'লে হয়ত ছবির জি, টি, এস, ষ্টিভেনের অবস্থা হ'তে পারে। ভাল করে' হাঁকড়াতে গেলে সবল শিক্ষিত মাংস-পেশী দর্‌কার। ক্রিকেটে মাংস-পেশীর বেশ চালনা হয়।

যে 'বল্' দেয়, কাজটি তার নেহাৎ সহজ নয়। বল্ দেবার নিয়ম বজায় রেখে বল্‌টি তাকে ছুঁড়্‌তে হবে, এবং সেই ছোঁড়ার ভেতরেও চালাকি রেখে 'ব্যাট্‌স্‌ম্যান্'কে মাৎ কর্‌তে হয়। কেউ-কেউ বল্ খুব জোরে দিয়ে কাজ সারে, কেউ-বা বল্ এমন কায়দায় ফেলে যে বলটি পড়ে'ই একটু ব্যাঁক্ নেয়, কেউ-বা আবার এমন চালাকি করে' দেয় যে, দেবার ধরণ থেকে বল্ কি-রকম ভাবে আস্‌বে কিছুই বলা যায় না। একসঙ্গে এই তিনরকমের দু'রকম কায়দাও কারও-কারও আয়ত্ত। যাই হোক্ এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বল্ ভাল করে' দিতে গেলেও বেশ ফন্দিবাজ হওয়া দর্‌কার, তার সঙ্গে পেশীগুলোও যেন মাথার হুকুম মান্‌তে তৎপর হয়। শুধু একঘেয়ে খাটুনিতেই 'ট্যালেণ্ট্' জন্মায় না। বাইরের সব রকম খেলার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, এইসমস্ত খেলায় শরীর ও মন উভয়ই উপকৃত হয়।

বিশেষত যে-সমস্ত ব্যস্ত লোকের বিশিষ্ট রকম শরীর-চর্চ্চা কর্‌বার মত দীর্ঘ অবকাশ নেই তাঁদের পক্ষে এই সমস্ত খেলা অত্যন্ত উপযোগী। বিশিষ্ট রকম শরীরচর্চ্চা
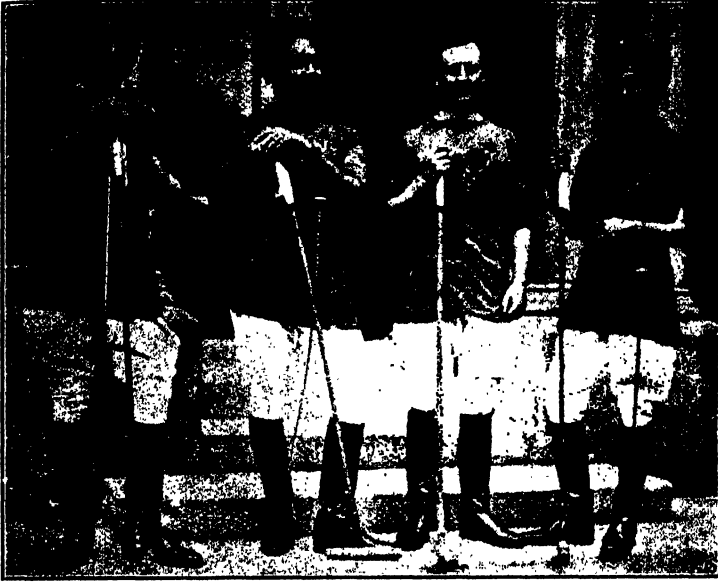
(বাঁদিক থেকে) কাউন্ট্ জন্-দি-মাদের, মেজর্ যশোবন্ত সিং, মেজর ই, জি, এ্যাট্‌কিন্‌সন্, এবং কর্ণেল যোগেন্দ্র সিং

সাইকেলের খেলা

বল্‌তে আমি বল্‌ছি কুস্তি, ঘুসোঘুষি, জিম্‌নাষ্টিক, যুযুৎস্থ, ভার-তোলা, পেশী-সংযম, ইত্যাদি! এর ভেতর অসিখেলা ধরাও বোধহয় উচিত। অসিখেলায় শরীরের ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দর্‌কার। বেশি বলের এতে প্রয়োজন হয় বলে' মনে হয় না।

জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রামে মাথা ঠাণ্ডা রাখার অত্যন্ত প্রয়োজন। ঘুষোঘুষিতে এই গুণটির একান্ত দর্‌কার। পশুবলকে শিক্ষিত মনের অধীনে এমন ভাবে কাজে লাগাতে হবে—যাতে ওজন, শক্তি বা বেগের যৎসামান্য শ্রেষ্ঠতা দ্বারাও জয়লাভ হ'তে পারে। আনাড়ি লড়্‌নেওয়ালার এলোপাথাড়ি মার বেমালুম কাটাতে হবে। কিন্তু ঘুষি-খেলার একটা মহৎ দিক্ আছে। ঘুষিখেলায় শুধু খেলার জন্যে যে নিঃস্বার্থ প্রীতি ও নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তা বাস্তবিকই সুন্দর। মুষ্টি-যোদ্ধাকে মাথা খাটিয়ে লড়্‌তে হয়। কুস্তি ও যুযুৎস্থতে মুষ্টিযুদ্ধের মত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শক্তি প্রয়োগ করার কৌশল শিখ্‌তে হয়। এ সকলেরই লক্ষ্য পেশী-সংযম, ক্ষিপ্রতা ও পেশীসমূহের উপর মস্তিষ্কের অধিকার।

বর্ত্তমান যুগের অলস-জীবনে অভ্যস্ত মানুষের পক্ষে শক্তি সংগ্রহ করা কঠিন। জিম্‌নাষ্টিকে যন্ত্রপাতি বা কস্‌রতের সাহায্যে সেই শক্তি অর্জ্জনের সুবিধা হয়। কি পুরুষ কি নারী—উপকার এতে সকলেরই হয়।

ভার তুল্‌লে বিশেষ-বিশেষ পেশীতে অসাধারণ শক্তি সংগ্রহ করা যায়। এ কাজটি কিন্তু সাধারণ মানুষের উপযোগী নয়।

ছবিতে যেমন কস্‌রৎ দেখানো গেল সেইরকম কস্‌রতে ছেলেবেলা থেকে যাদের স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাদেরই এ পথে যাওয়া উচিত।

কস্‌রৎ ইত্যাদি দেখালে সাধারণের মনে অতি সহজে শারীরিক উৎকর্ষসাধনের ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা যায়। কিশোর মনকে এত সহজে আর-কিছুতে মাতিয়ে তুল্‌তে পারে না। ছেলেবেলা সার্কাসের খেলোয়াড়দের মনে-মনে তারিফ করার দরুণ বড় হ'য়ে চমৎকার স্বাস্থ্য, চেষ্টা করে' লাভ করেছে, এমন ঢের দৃষ্টান্ত জানা আছে। কিন্তু শরীরের সাধনায় কস্‌রৎই জাতির আদর্শ হ'তে পারে না।

এই থেকেই কেউ যেন না মনে করেন যে, পাশ্চত্য জগতে খেলাধূলা ও শারীরিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে যা-কিছু উদ্ভাবন কর্‌বার—সব করা শেষ হ'য়ে গেছে। ভারতবর্ষেও এমন অনেক খেলা আছে যা মোটেই ব্যয়সাধ্য নয়। তবে সেগুলি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। আমাদের হাডুডুডু ও ডাণ্ডাগুলি খেলার কথা ত' সকলেই জানেন। ভারতবর্ষে কুস্তির চরম হ'য়ে গেছে। যুযুৎসুর জন্ম জাপানে। কোরিয়াবাসীরা কি রকম নতুন ধরণের 'টাগ্-অফ্-ওয়ার্' করে তার ছবি দেওয়া গেল। সৌষ্ঠব থাক্ বা না থাক্ খেলাটায় যে নূতনত্ব আছে এটা স্বীকার কর্‌তেই হবে।

সব শেষে, মানুষ যে-সব খেলাতে পশুকে সাথী করেছে সেইসব খেলার কথা ধরা যাক্। 'পলো' খেলায় মানুষ ও ঘোড়ার মধ্যে কি আশ্চর্য্য মিলনই না সাধিত হয়েছে! ঘোড়দৌড়ে ও ঘোড়ার পিঠে কস্‌রতেও পরস্পরের সেই সহায়তা আমাদের মুগ্ধ করে।

'শ্যাম্‌সন্'-ব্রাউন (বয়স ১৭ বছর)

সাঁতার জিনিষটা শরীর-চর্চ্চার একটা বিশেষ দিক্। যে-জল সাঁতারে-অপটুর পক্ষে মারাত্মক, সাঁতারু অবলীলাক্রমে সে-জলের উপর রাজত্ব করে। আর কিছুর জন্যে না হোক্, শুধু বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেও সকলের সাঁতার শেখা দর্‌কার। তা ছাড়া এতে আনন্দও আছে, স্বাস্থ্যও ভাল হয়। সাঁতারে শরীর যে কী কমনীয় ও সুন্দর হয়—মিস্ এডার্‌লের ছবি থেকেই তা বোঝা যেতে পারে। ডুবসাঁতার, জলঝাঁপ এবং দ্রুত সাঁতার কাটা শিখতে হ'লে ধৈর্য্য ধরে' বহুদিন সাধনা কর্‌তে হয়। তবে পুরস্কার—শরীরের উৎকর্ষ, আর একটি কঠিন বিদ্যায় দখল। বিদ্যাটিতে ফুর্ত্তি বড় কম নেই।

অনেকে কিন্তু সবল পেশীর চেয়ে সবল স্নায়ু, শরীরের সমতা ও দেহের ওপর অধিকার—বেশি পছন্দ করে।—যেমন, যারা দড়ির উপর হাঁটা ও সাইকেলের কস্‌রৎ দেখায়।

খেলাধূলা ও ব্যায়ামে নিছক্ শরীরের উন্নতি ছাড়া একটি সামাজিক উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। এমন লক্ষ্য লক্ষ্য লোক আছেন যাঁরা মানুষের সুখে জীবন যাপন করার জন্মগত অধিকারে বিশ্বাস করেন। আমরা যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্‌লাম তাতে মানুষের সুখ বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমান সভ্যতার চাপে মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দুশ্চিন্তা যে-পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে তাতে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন আরও বেড়ে গেছে। নিরানন্দ ভারতবর্ষে হাসিমুখ দুর্ল্লভ। স্বাস্থ্যহীনতাই এর জন্যে বেশি পরিমাণে দায়ী। তা ছাড়া ভারতবাসীর দুঃখ ভোল্‌বার অবকাশ মেলে না।

আরও মনোহর খেলাধূলা ও ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন করলে ভারতবাসীর দেহে স্বাস্থ্য ও মুখে হাসি ফিরে আস্‌বে।

কষ্টিপাথর

আমাদের ইতিহাস

আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এতদিন আমরা যে-ভাবে ইতিহাস পড়িয়া আসিতেছিলাম, সে-ভাবে আর চলিবে না। আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইউরোপীয়ানেরা আমাদিগকে ইতিহাস শিখাইয়াছেন, সে-কথা সত্য। তাঁহারা আমাদিগকে যে-পথে চালাইতেছিলেন, আমরা এখনও সেই পথে চলিতেছি; কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিলে আর চলিবে না।

খোঁড়াখুঁড়ি করায় রাশি রাশি তামার পাত বাহির হইতে লাগিল। সাহেবরা একটু চমকিয়া গেলেন। অশোক রাজার কতকগুলি রবকারী (পাথরের লেখা) বাহির হইল। আমাদের দেশের লোক সেগুলি পড়িতে পারিত না। সাহেবেরা পড়িলেন। শেষে স্থির হইল, সেগুলি চন্দ্রগুপ্তের নাতির সময়ের। কিন্তু সেগুলি থেকে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদের সময় পর্য্যন্ত মাঝখানটা খালি রহিয়া গেল। বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন—সাহেবেরা বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং প্রায় ষোল শত বৎসর একটা ফাঁক পড়িয়া রহিল। তারপর ক্রমে তামার পাত আর পাথরের লেখা পড়া একটা বিদ্যার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইল।

অনেকে মনে করেন, সাহেবেরা এবিদ্যা জানিতেন; আমাদের দেশের লোক একেবারেই জানিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবেরা পড়াইয়া লইতেন—দেশের পণ্ডিতদের দিয়া। কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মস্তিষ্ক চালনা করাইয়া যে তাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। একটি কথা সম্প্রতি জানিয়াছি—অতি সম্প্রতি জানিয়াছি। উইল্‌সন্ সাহেব ও প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের শিলালেখগুলি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় পাঠ করিয়া দিতেন। ক্রমে এইসকল লেখ পড়িয়া ও সিক্কা পড়িয়া জানা গেল যে, ভারতবর্ষে অনেক রাজার রাজত্ব ছিল—স্বাধীন রাজারা লেখা দিতেন। তাঁহাদের প্রজারা লেখ দিবার সময় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিত। স্বাধীন রাজাদের সকলেই সিক্কা তৈয়ার করিতেন এবং সিক্কায় তাঁহাদের নাম থাকিত।

এইরূপে দেখা গেল, প্রায় দুই হাজার রাজা এই ষোল শত বৎসরের ভিতর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহাদের বংশলতাও পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা কোন্ সময়ের রাজা এবং কোন্ দেশের রাজা, সেটা পাওয়া গেল না। যেমন কলিকাতার গঙ্গায় বয়া ভাসে, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতকগুলি রাজবংশ ভাসিতে লাগিল; পরস্পরের কি সম্বন্ধ, বুঝা গেল না, সুতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হইল না।

দু' চার দেশের দু' চারখানি ছোট বড় ইতিহাসও পাওয়া গেল, তাহাতে ইতিহাসের ধারাটা ঠিক হইল না। এতবড় যে সংস্কৃত-সাহিত্যটা, সেটার দিকে ইতিহাস-বাগীশেরা চোখও দিলেন না। সুতরাং যদিও কতকটা ইতিহাস হইল, সেটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, বেশ ঠাস গাঁথুনী হইল না।

সাহেবেরা কিন্তু বলিলেন, "ভারতবর্ষের সভ্যতাটা এই গুপ্তদের সময়েই হইয়াছিল—১৩।১৪ শত বৎসর আগে। তার আগে কাব্য ছিল না, দর্শন ছিল না, অলঙ্কার ছিল না, থিয়েটার ছিল না, সভ্যতার চিহ্ন বড়-একটা ছিল না। তবে অশোকের সময় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটু চর্চ্চা হইয়াছিল। কিন্তু চর্চ্চা হইলে কি হয়। মোক্ষমূলার সাহেব বলিলেন যে, বুদ্ধদেব যেই জন্মিলেন, সংস্কৃত অমনি ঘুমাইয়া পড়িল; সে-ঘুম একেবারেই ভাঙ্গে নাই, শুধু রাজারা কোন রকমে জাগাইলেন। বুদ্ধদেবের আগে ইহাদের ইতিহাস-টিতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। সব অন্ধকার।"

"আলোর মধ্যে বেদ। সে-বেদও অনেকটা বুদ্ধদেবের পরের লেখা, কিন্তু আমরা ধরিতে পারিতেছি না। সুতরাং ঋগ্‌বেদ বিশু-খৃষ্টের ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা, তার আগে কিছুতেই যাইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বোধ হয় হইয়াছিল, সেটা ১১।১২ শত বৎসর বিশু-খৃষ্টের আগে।"

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস ক্রমে পিছাইয়া গিয়া বিশু-খৃষ্টের ১২।১৩ শত বৎসর আগে পর্য্যন্ত পৌঁছিল। তার মধ্যে আবার বুদ্ধদেবের পর থেকে সেটার একটু আঁট বাঁধিল। তার আগে সব ফক্কা।

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত-সাহিত্যটা ভাল করিয়া সব দিক্ থেকে আরম্ভ করিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও অতি অল্প লোকের ছিল। সেটা ভাল করিয়া পড়িলে কিন্তু ইতিহাসের যে-দুর্দ্দশাটা হইয়াছে, সেটা হইত না।

অনেক শাস্ত্র আছে, যে-শাস্ত্রে প্রমাণ দিতে হয়—প্রমাণ না দিলে শাস্ত্র কেহ বিশ্বাস করে না। প্রমাণ দিতে গেলেই আগে সে-শাস্ত্রে যাঁহারা বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম করিতে হয় এবং তাঁহাদের কথা তুলিতে হয়। এই রকম করিয়া কথা তুলিতে তুলিতে একটা পূর্ব্বাপর ধারা দাঁড়ায়। স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপ প্রামাণিক শাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে, অকাট্য প্রমাণ দিতে না পারিলে লোকে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধাও করে না।

এই শাস্ত্রের যত পুঁথি আছে, সব পুঁথির একখানি ভাল ক্যাটালগ আজও তৈয়ারী হয় নাই। আর ইহা হইতে যে-ইতিহাস পাওয়া যায়, সেটা এখনও লোকের ধারণাও হয় নাই। কিন্তু শুধু ক্যাটালগ হইতেই দেখা যায় যে, নূতন রাজত্ব হইলেই নূতন স্মৃতি হইয়াছে। ঋষিদের যে-স্মৃতি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈয়ারি হইয়াছে, টীকাকারেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই ঋষিদের স্মৃতির টীকা করিয়াছেন।

তারপর মুসলমানরা যে-সময় এদেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই ঋষিদের স্মৃতি ও টীকাকারদের টীকা চলিল না। ব্রাহ্মণেরা তখন প্রত্যেক দেশের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া এক-একটা নিবন্ধ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানদের সময় যেখানে হিন্দুদের রাজনীতিতে একটু ক্ষমতা হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা নিবন্ধ তৈয়ারী করিয়াছেন। নিবন্ধে আর-একটু বিশেষত্ব আছে। যেখানে হিন্দুরা স্বাধীন, সেখানে নিবন্ধের মধ্যে একখানি বই রাজনীতির আছে। কিন্তু যেটা মুসলমানের দেশ, সেটায় রাজনীতির গন্ধও নাই। অনেক জায়গায় হিন্দুরা মুসলমানের দেশে আপনাদের দেওয়ানী মকদ্দমা করিতেন। সেখানে নিবন্ধের মধ্যে ব্যবহারের জন্য একখানি বই আছে। যেখানে মুসলমানের দেশে হিন্দুরা স্বাধীন হইয়াছে, সেখানে রাজ্যাভিষেকের উপর একখানি বই আছে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্মৃতির বই লিখিতে গেলে প্রমাণ দেওয়া চাই। এই প্রমাণ ক্রমে খাটিয়া-খুটিয়া দেখিতে গেলে, কোন্ বইখানি কোন্

সময়ে হইয়াছে, তাহা বেশ ধরা যায় এবং যদি আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের তেমন জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোন্ দেশে হইয়াছিল, তাহাও বলিয়া দেওয়া যায়।

সুতরাং ভাল করিয়া স্মৃতিটা পড়িলে ইতিহাসটা পাকাপাকি তৈয়ারি হইয়া যাইতে পারে। আমি যেরূপ জ্ঞানের কথা বলিতেছি, এরূপ জ্ঞান—এই ভাবে পড়া, পূর্ব্বে না হইলেও পূর্ব্বে যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের একটা আব্ছায়া-আব্ছায়া এইরকম ভাব ও জ্ঞান হইয়াছিল। তাই রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীতে "হেমাদ্রি"র প্রকাণ্ড নিবন্ধটি সব ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিন ভাগের দুই ভাগ ছাপান হইয়া গিয়াছে, হেমাদ্রির সময়ও জানা ছিল। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন।—দেবগিরির রামচন্দ্র রাজার অধীনে তিনি বড় বড় রাজকার্য্য করিতেন। সেটা ১২৫০ খৃঃ হইতে ১৩০০ খৃঃ পর্য্যন্ত। সুতরাং তিনি যে-সকল বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি তাহার পূর্ব্বে হইবে নিশ্চয়ই। কারণ, তিনিও ত একজন বড় পণ্ডিত, বড় রাজার সভাসদ্। তিনি আর পুঁথি না দেখিয়া তাহা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করেন নাই।

এই রকম করিয়া বোম্বাইয়ের মাণ্ডলিক সাহেব, মনুর উপর মেধাতিথির যে-টীকা আছে, সেটা ছাপাইয়াছেন। মেধাতিথি যে-সকল বইএর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলিও তিনি দেখিয়াছেন।

বিউলার সাহেব বলিয়াছেন যে, গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র বিশু-খৃষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্বে বলিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি না। গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র বৈদিক সংস্কৃতে লেখা নয়,—পাণিনি যে সংস্কৃতের জন্য ব্যাকরণ করিয়াছেন, সে সংস্কৃতে লেখা নয়,—মাঝামাঝি এক অবস্থার সংস্কৃত। পাণিনির সময় এখন এক রকম ঠিক হইয়াছে—বিশু-খৃষ্টের ৫ শত বৎসর আগে, গৌতম হাজার বৎসর আগে। গৌতমের ভাষার সঙ্গে পাণিনির ভাষা তুলনা করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

গৌতমও তাঁহার আগেকার স্মৃতির বই পড়িয়াছেন—তিনিও প্রমাণ দিয়াছেন। সে-সব প্রমাণ আমরা খুঁজিয়া পাই না, লোপ হইয়াছে। তিনিও স্মৃতিরই প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা হইলে গৌতমের আগেও স্মৃতি ছিল। স্মৃতি ত স্বাধীন শাস্ত্র নয়। সবাই বলে, স্মৃতি বেদের অধীন। লোকের সংস্কার, অনেক বেদ লোপ হইবার পর ঋষিদের যে-সকল কথা স্মরণ ছিল, তাহা একত্র করিয়া স্মৃতি হয়।

তাহা হইলে বেদ ছিল, বেদ লোপ হইয়াছিল, তার পর স্মৃতি হইয়াছে,—এই রকম করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসটা আরও পিছাইয়া যাইবে। কত পিছাইয়া যাইবে, তাহার একটা আভাস দিতেছি।

পুরাণে এক জায়গায় লেখা আছে, মহাভারতের যুদ্ধের পর অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর মগধে পর পর ৫৯ জন রাজা হইয়াছিলেন। তার পর নন্দরাজারা রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। নন্দরাজারা বিশু-খৃষ্টের ৪শত বৎসর পূর্ব্বে মগধে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। পার্জিটার সাহেব এই ৫৯ জন রাজার নাম অনেক পুঁথিপাজি ঘাঁটিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। মোটামুটি ধরিতে গেলে এক শতাব্দীতে ৪ জন রাজা হন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ৬০ জন রাজার ১৫ শত বৎসর হইবে; ৪শ আর ১৫শ যোগ করিলে ১৯০০ হয়। কিন্তু পার্জিটার সাহেব একশ বৎসরে ৪ জন রাজা ধরেন নাই—১০।১২ জন ধরিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা বিশু-খৃষ্টের পূর্ব্বে ১২ শত বৎসরে অথবা তাহারও পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সে-কালের রাজারা এখনকার চেয়ে একটু দীর্ঘজীবী হইতেন। আমরা বরং একশতে তিন জন রাজা ধরিতে পারি। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরও পিছাইয়া যাইবে। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে বলে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বিশু-খৃষ্টের ২৫শত বৎসর আগে হইয়াছিল। কেন না, তাঁহারা বলেন, কলির ৬শত বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়, আর কলি ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়; সুতরাং ২৫ শত বৎসর তেরিজের হিসাবে পাওয়া যাইতেছে।

ঋষিদের তখন অসীম প্রভাব। তখন দেখা যায় যে, বেদ খানিক-খানিক লোপ হইয়া আসিতেছিল। মহাভারতের যজ্ঞের যে-সব বর্ণনা আছে, তাহাতে কেবল জাঁকজমকের বর্ণনা। যজ্ঞটা কেমন করিয়া হইল, সে প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক্ দিয়াও যায় নাই। তাতেই বুঝিতে হয়, তখন যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং বেদও ক্রমে লোপ হইয়া আসিতেছিল। বেদ তখন ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্বে ভাগ হইয়াছে। তাহা হইলে বেদ বিস্তর পিছাইয়া পড়িল।

মহাভারতে লেখা আছে যে, ধৃতরাষ্ট্র রাজার এক কন্যা ছিল, একমাত্র কন্যা; তাহার বিবাহ হইল জয়দ্রথের সঙ্গে; এই জয়দ্রথ হইলেন সিন্ধু-সৌবীরের রাজা। সিন্ধুদেশে সৌবীরবংশ অনেক দিন রাজত্ব করিতেছিলেন। সে-বংশের জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহ হইল। সম্প্রতি সিন্ধুদেশে সিন্ধু নদের দুইটি মরা গর্ভের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড নগর খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সুমেরদের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এতদিন সুমেরদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, যাহা পাওয়া গিয়াছে পারস্য-উপসাগরের ধারে। অনেকে বলেন, সুমেররা মিশর দেশের অপেক্ষাও প্রাচীন। অনেকে বলেন—না, এরা মিশরদের চেয়ে একটু নূতন। আমরা বলি, সুমেরদের যখন এত বড় একটা নিদর্শন সিন্ধুনদের ধারে পাওয়া গিয়াছে, তখন সুমেররা ভারতবর্ষ হইতেও পারস্য-উপসাগরে যাইতে পারে, পারস্য-উপসাগর হইতে ভারতবর্ষেও আসিতে পারে। এই সুমের জাতিই ভারতবর্ষের সৌবীর। সে যত বিশু-খৃষ্টের ৩।৪ হাজার বৎসর আগে। আর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যদি তাহাদের সঙ্গে তুল্যকালে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতাটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইল, দেখিবার বিষয় হইয়াছে।

বেদ, স্মৃতি, এই দুইটি জিনিষ ছাড়িয়া দিলে আর-একটা কথা আমাদের মনে করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর পরীক্ষিৎ হস্তিনায় রাজা হন। তাঁহার ৪।৫ পুরুষ পরে হস্তিনানগর গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যায় এবং পরীক্ষিদ্বংশ কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজত্ব করেন। হস্তিনা গঙ্গার ধারে মিরাট জেলায় ছিল। কৌশাম্বী এলাহাবাদ হইতে ১৫।১৬ ক্রোশ পশ্চিমে যমুনার ধারে। প্রায় এই সময় পরীক্ষিদ্বংশে অধিসীমকৃষ্ণ নামে একজন রাজা হন। তাঁহার সময় ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লেখা হয়। তাঁহার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি লিখিবার সময়ে অতীত কালের বিভক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে। তাঁহার নিজের সময়ের ঘটনাগুলি বর্ত্তমান কালের ব্যাপার, আর তাঁহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ভবিষ্যৎ কালের ব্যাপার। যাঁহারা পুরাণ পড়েন, সকলেই মনে করেন, পুরাণগুলি অধিসীমকৃষ্ণের সময়ের লেখা। বাস্তবিক যদিও ভবিষ্যৎকাল, অধিসীমকৃষ্ণের সময় হইতেই, হস্তিনা, অযোধ্যা, মগধ প্রভৃতি দেশের রাজাদের বংশতালিকা অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, সেই বংশতালিকা হইতেই পার্জিটার সাহেব ৫৯ পুরুষ মগধের রাজা পাইয়াছেন। ইতিহাস মানে পুরাণ ঘটনা। ইতিহাস অতীত কালের হইয়া থাকে, বর্ত্তমানেও হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে কেমন করিয়া হয়? পুরাণের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য পরবর্ত্তী কালের লোক ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করিয়া পরের ঘটনাগুলি পরে জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এই ঘটনাগুলি একেবারে অসত্য হইতে পারে না। এখনকার লোক ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখিতে পারে না।

তাঁহারা এটাকে হয় নির্ব্বোধের কাজ, না হয় জুয়াচোরের কাজ বলিয়া মনে করেন। করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু পুরাণে ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার অধিক এবং ইতিহাসও অধিক। আর সে-ইতিহাস যে প্রামাণিক একথা পার্জিটার সাহেব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্য লোককেও স্বীকার করিতে বলিতেছেন।

অধিসীমকৃষ্ণের সময় যখন পুরাণ আরম্ভ হইল, তাহার আগের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে বেদের ভিতর গিয়া খুঁজিতে হয়। পার্জিটার সাহেব সে-চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাবজ্জীবন পুরাণ পড়িয়াছেন।

এইসকল কারণে বলিতেছিলাম যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পুরামাত্রায় ঢালিয়া সাজিতে হইবে। একশত বর্ষ পূর্ব্বে একজন দশকুমারচরিতকে যিশু-খৃষ্টের ৬ শত বৎসর পরের লেখা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি দশকুমারচরিত ভাল করিয়া পড়িয়া ইহাকে যিশু খৃষ্টের ২ শত বৎসর পূর্ব্বে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। যাঁহারা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি—ইহাদের সময় লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একজন পাণিনিকে খৃষ্টের নয় শত বৎসর আগেকার বলিয়া গিয়াছেন। একজন দুই শত বৎসর আগের বলিয়াছেন, পতঞ্জলিকে কেহ দুই শত বৎসর আগের বলিয়াছেন, কেহ যিশু-খৃষ্টের ছয় শত বৎসর পরের বলিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় দেখা গেল, এখন হইতে ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় বলিয়া গিয়াছেন,—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ইঁহারা সকলেই পাটলীপুত্রে পরীক্ষা দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। পাটলীপুত্র নগর যিশু-খৃষ্টের ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজধানী হয় এবং হাজার বৎসরের পূর্ব্বে দিবার আর উপায় নাই।

এইরূপে সংস্কৃত-সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে অনেকের স্থান ও কাল ঠিক হইয়া যাইবে। এ জিনিষটিকে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। শুধু ইংরাজী পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না। কিন্তু এখনকার ইতিহাসবাগীশেরা সাহেবের বই ছাড়া পড়িতে পারেন না। সংস্কৃত তাঁহাদের একেবারেই বাঘ বলিয়া মনে হয়। অনেকে আবার ১৮।১৯ টাকায় একজন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃতের কাজ সারেন। পণ্ডিত যাহা বলিয়া দেন, তাঁহাকে তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়। এই ভাবে ইতিহাস চালাইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সত্যের না হইয়া মিথ্যার রাশি হইয়া উঠিবে।

(সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩২)

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

—

অরব দেশের গল্প

১

একদিন পারস্যের সম্রাট্ নওশেরওয়াঁর রাজদ্বারে এক অরববাসী আসিয়া রাজদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আগন্তুক দ্বারীকে বলিল, "সম্রাট্‌কে সংবাদ দাও যে, একজন অতি হীন অরব আপনাকে দর্শন করিতে চাহে।" অনুমতি পাইয়া সে-ব্যক্তি সম্রাটের সম্মুখে আসিলে সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" সে উত্তর করিল, "আমি অরবদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।" সম্রাট্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার দ্বার-রক্ষককে এই মাত্র বলিয়াছ না, তুমি অতি হীন অরব?" অরব উত্তর করিল, "হাঁ সম্রাট্, সে-কথা ঠিক, আমি তখন অতি হীন অরব ছিলাম, এখন আপনার দর্শন লাভ করিয়া অতি সম্ভ্রান্ত অরব হইয়াছি।" সম্রাট্ এই সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত তোষামোদে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

২

খুসরো-পরবেজ পারস্য দেশের প্রসিদ্ধ সম্রাট্ ছিলেন; তাঁহার ও তাঁহার মহিষী, অদ্বিতীয়া সুন্দরী শীরীঁর নানা গল্প প্রচলিত আছে।

একদিন এক ধীবরের জালে একটি অতি বৃহৎ মৎস্য পড়িল। ধীবর সে-মৎস্যটি বাজারে বিক্রয় না করিয়া সম্রাট্‌কে ভেট দিতে আনিল। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী উভয়ে মাছ দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, ও সম্রাট ধীবরকে আট-হাজার দিরম (রৌপ্য মুদ্রা) পারিতোষিক দিলেন। দিরমগুলি কাপড়ে বাঁধিবার সময়ে একটি মুদ্রা পড়িয়া গেল। ধীবর সেটি কুড়াইয়া লইল দেখিয়া শীরিঁ সম্রাটকে বলিলেন, "দেখ, এই ধীবর কি লোভী! একটি দিরমের লোভ সাম্‌লাইতে পারিল না।" সম্রাট্ ধীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আট হাজার দিরম পাইয়া আশা মিটে নাই, যে একটি দিরম আবার কুড়াইয়া লইলে?" ধীবর বলিল, "না সম্রাট, আপনার দানে আমি এখন ধনবান হইয়াছি, আমার আর লোভ নাই। আমি যে ঐ দিরমটা কুড়াইয়া লইলাম, তাহা লোভবশতঃ নহে। যাঁহার দানে ও বদান্যতায় আমার এত ধন হইল তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা যে মাটিতে পড়িয়া থাকিবে, লোকে মাড়াইয়া সেই দাতার নামের অপমান করিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। সেইজন্য যত্ন করিয়া কুড়াইয়া লইলাম।" সম্রাট্ ধীবরের কথায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে আরও চার হাজার দিরম দান করিলেন।

৩

অরবদেশে অবু-অইয়ুব ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মরুভূমি মধ্যে যদি দিগ্‌ভ্রম হয়, তবে কোন্ দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া উচিত?" [ইসলাম ধর্ম্মমতে মক্কার প্রধান মসজিদ অর্থাৎ কিবলার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পাঠ করা নিয়ম]। অবু-অইয়ুব উত্তর করিলেন, "এরূপ অবস্থায় তোমার বোঁচকার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পাঠ করিবে যাহাতে কেহ তোমার দ্রব্যগুলি চুরি করিতে না পারে।"

৪

অরব দেশের প্রসিদ্ধ উপস্থিত বক্তা ও হাস্যরসিক সইয়ার অন্ধ ছিলেন। এক যুবক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "মহাশয়, শুনিয়াছি ঈশ্বর যখন কোনও ব্যক্তিকে একটি ইন্দ্রিয় হইতে বঞ্চিত করেন, তখন অন্য একটি সৌভাগ্য দান করিয়া থাকেন। আপনি চক্ষুর বিনিময়ে কি পাইয়াছেন?" সইয়ার উত্তর করিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমার মত লোকের মুখ দেখিতে হয় না।"

৫

এক খলীফের কাছে একটি লোক আসিয়া আপনাকে রসুল অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিল। খলীফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কিছু অনৈসর্গিক ক্ষমতার কার্য্য দেখাইতে পার?" সে স্বীকার করিলে খলীফ বলিলেন, "এ সময়ে তরমুজ হয় না, তুমি আমাকে একটি তরমুজ দিতে পার?" সে-ব্যক্তি বলিল, "অবশ্য দিতে পারি, আমাকে তিন দিন সময় দিন।" খলীফ রাগত ভাবে বলিলেন, "তিন দিন! একদিনও নহে। একদণ্ডও নহে, এখনি দিতে হইবে, নতুবা তোমাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিব।" আগন্তুক বলিল, "আপনি ত অদ্ভুত লোক দেখিতেছি! স্বয়ং ঈশ্বর তিন মাসের কম একটি তরমুজ

পড়িতে পারেন না, আর আপনি তাঁহার প্রেরিত দূতের কাছে সেই দ্রব্য এক মুহূর্ত্তে গঠন বা সৃজন আশা করেন?" খলীফ তাহার উপস্থিত বুদ্ধিতে তুষ্ট হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

৬

এক কৃষক আপনার চাষ-আবাদ ছাড়িয়া পুলিসের প্যেয়াদা হইয়াছিল। এক রাত্রিতে ডাকাতেরা তাহার মাথা ফাটাইয়া দিল। পর দিবস হেকীম [ডাক্তার] তাহার ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কোনও ভয় নাই, তোমার মস্তিষ্কে আঘাত লাগে নাই।" কৃষক-পুত্র বলিল, "আমার সে ভয় নাই হকীম সাহেব, আমার মোটে মস্তিষ্ক নাই, থাকিলে চাষ-আবাদ ছাড়িয়া পেয়াদাগিরি করিতে আসিতাম না।"

৭

হজরৎ মহম্মদের তিরোধানের পর ইসলাম রাজ্য তাঁহার প্রতিনিধিরা পালন করিতেন। এই প্রতিনিধিদের খলীফ বলিত। খলীফদের মধ্যে হজরৎ ওমর দ্বিতীয় খলীফ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে যে-ভাবে আড়ম্বরহীন অবস্থায় থাকিতেন, খলীফ নির্ব্বাচিত হইবার পরও সেইরূপে থাকিতেন। ওমর নিরপেক্ষ ন্যায়পর ও সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গভীর নিশীথে একাকী নগরে ভ্রমণ করিয়া নগরবাসীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এক রাত্রে এইরূপ ভ্রমণ-কালে তিনি শুনিলেন, গৃহবাসীরা অত্যন্ত গোলমাল করিতেছে। গৃহের সদর দ্বার বন্ধ ছিল, অতএব এক প্রতিবেশীর প্রাচীরে উঠিয়া এক উন্মুক্ত জানালা দিয়া ওমর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি পুরুষ ও একটি রমণী সুরাপানে মত্ত হইয়া বিবাদ করিতেছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোরা কোরাণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে লজ্জিত হইতেছিস না? তোরা কি ভাবিয়াছিস ঈশ্বর তোদের পাপ-কার্য্য জানিতে পারিবেন না?" পুরুষটি ওমরকে চিনিতে পারিয়া ভীত হইল, কিন্তু সাহস করিয়া বলিল, "হে অমীর-উল-মস্তমনীন (ধার্ম্মিকদের শাসনকর্ত্তা), আমি আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা করিতেছি। আমি কোরাণের একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি সত্য, কিন্তু আপনি তিনটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী হইয়াছেন।" ওমর থতমত খাইয়া বলিলেন, "তুমি আমার দোষ প্রমাণ করিতে পারিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব।" সে বলিল, "ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি তোমার প্রতিবেশীর কার্য্যের বিচার করিবে না। আপনি প্রথমতঃ এই আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন, 'যখন তুমি কোনও গৃহে প্রবেশ করিবে, তখন গৃহবাসীদের শান্তি কামনা করিয়া অভিবাদন করিবে। আপনি তাহা করেন নাই। তৃতীয়তঃ ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি যখন গৃহে প্রবেশ করিবে, তখন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। কিন্তু আপনি জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব আপনি তিনটি অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।" ওমর হাসিয়া গৃহত্যাগ করিলেন, কিন্তু প্রস্থানের পূর্ব্বে তাহাকে ভবিষ্যতে মদ না খাইবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন।

৮

শুস্তর নগরের শাসনকর্ত্তা হোরমজানকে কোনও অপরাধে বন্দী করিয়া খলীফ ওমরের সম্মুখে আনা হইলে, ওমর বিচার করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। হোরমজানের ভয়ে গলা শুকাইয়া গেল, তিনি এক পাত্র জল পান করিতে চাহিলে সেবকেরা ওমরের ইঙ্গিতে জল আনিয়া দিল; কিন্তু ভয় ও উৎকণ্ঠায় হোরমজান জল গিলিতে পারিলেন না। ওমর তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভাল করিয়া জল খাও, তুমি ঐ জলপান শেষ না করিলে তোমার শিরশ্ছেদন করা হইবে না।" এই কথা শুনিয়া হোরমজান পাত্র হইতে জল মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, ও বলিলেন, "এখন আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়া আমাকে মারিতে পারেন না।" ওমর তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিতে অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহার জীবনদান করিলেন।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ় ১৩৩৩) শ্রীঅমৃতলাল শীল

দেবতার দান

শ্রী সীতা দেবী

"কাকী-মা, তোমার ভাত দিয়েছে।"

কাকী তখন আপনার চিন্তাসাগরে ডুবিয়াছিল। ভাসুর-ঝির ডাকে মুখ তুলিয়া বলিল, "একটু দেরি কর্‌তে বল মা, উনি এখনও আসেননি। রোজ রোজ আগে খেয়ে ব'সে থাকি, আমার কেমন যেন লাগে।"

"কাকার আসার ঠিক কি, কাকী-মা? তিনি হয়ত বেলা তিনটার আগে ফির্‌বেনই না। তুমি ততক্ষণ ব'সে থাকবে নাকি? যা না তোমার শরীর হয়েছে, এর উপর যদি আবার এরকম অনিয়মের ঘটা লাগাও তা হ'লে আর টিঁক্‌তে হ'বে না।"

কাকী ইন্দিরার সুন্দর মুখে একটু বিষাদ-মাখা হাসি দেখা দিল। সে বলিল, "লীলা, তুমি সত্যিই যে আমার মা হ'য়ে উঠ্‌লে? কিন্তু নিজের যে কোনো যত্নই তুমি নাও না, লক্ষ্মী! তোমার খাওয়া, নাওয়া, ঘুমনো, কিছুরইত কিছু ঠিক ঠিকানা দেখি না।"

"কি যে বল তুমি, কাকী-মা! তোমার আর আমার

মধ্যে কোনো তুলনা চলে নাকি? আমি ত যত শীগ্‌গির যেতে পারি, ততই আমার পক্ষে ভাল। বাঙালীর বিধবার অদৃষ্ট ত যা। আর তুমি ত রাজরাজেশ্বরী, একশ বছর পরমায়ু হ'লে তবে তোমায় মানায়। তোমার কি এমন কর্‌লে চলে? তোমার স্বামীর মত স্বামী এদেশে ক'টা মেয়ের আছে? কুলে, শীলে, ধনে, বিদ্যায়, চরিত্রে, কারো নীচে তিনি যান না। তাঁর জন্যে ত তোমায় বেঁচে থাক্‌তে হবে, তুমি ছাড়া তাঁর আছেই বা কে?"

জমিদার দেবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম নানা কারণেই জেলার সর্ব্বত্রই খুব বিখ্যাত। ধনের খ্যাতি ত তাঁহার ছিলই, তাহা ছাড়া মানেরও অন্ত ছিল না। এতটা সম্মান যে তিনি কেবল অবস্থার খাতিরেই লাভ করিয়াছিলেন তাহা নয়। তাঁহার বিদ্যা ও চরিত্রের খ্যাতি তাঁহার ধনের খ্যাতিকেও যেন ছাড়াইয়া গিয়াছিল। জমিদারবংশের সন্তান হইয়াও জমিদারসুলভ আমোদগুলিতে তাঁহার মোটেই রুচি ছিল না। নিজের লেখাপড়া আর জমিদারী দেখা-শোনার কাজেই তাঁহার দিনরাতের বেশীর ভাগ কাটিয়া যাইত।

ইন্দিরা সর্ব্বাংশেই তাঁহার উপযুক্ত স্ত্রী হইতে পারিয়াছিল। সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী ইন্দিরারই মত, তাহার শ্রী ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। সে দরিদ্র ঘরের মেয়ে হইলেও, তাহাকে সম্ভ্রান্তবংশ হইতে আগ্রহ করিয়াই বধূরূপে বরণ করা হইয়াছিল, এমনই ছিল তাহার রূপগুণ ও সুশিক্ষার খ্যাতি। তাহার চরিত্রের মাধুর্য্যও ছিল অসাধারণ। কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্দিরার স্বামী-সৌভাগ্যের কথা লোকের গল্প করিবার জিনিষ হইয়া উঠিল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নির্ম্মল আকাশে মেঘসঞ্চার হইতে লাগিল। ইন্দিরার সন্তান হইল না। প্রথম প্রথম সকলে আশা করিতে ত্রুটী করিল না, কিন্তু ইন্দিরার ত্রিশ বৎসর পার হইয়া যাওয়ার পর সে নিজে আর কোনো আশাই রাখিল না। তাহার স্বাস্থ্যও নষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন ফুটন্ত গোলাপটি; এখন ক্রমে সে যেন মুদিতপ্রায় শ্বেতপদ্মের রূপ ধারণ করিতে লাগিল। দেবেন্দ্রের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও সে দিন দিন স্বল্পভাষী ও অন্যমনা হইয়া উঠিতে লাগিল। দেবেন্দ্রের বিধবা ভাইঝি লীলা ছিল এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সাহায্যকারিণী। কিন্তু তাহারও চেষ্টাতে বিশেষ কিছু ফল হইতে দেখা গেল না।

দেবেন্দ্র পিতামাতার একমাত্র সন্তান হইলেও তাঁর পরিবারটি ছিল মস্ত বড়। ধনের খ্যাতি ছিল বলিয়া আত্মীয়, অনাত্মীয়, কুটুম্ব সকলেই তাঁহার উপর ভর করিয়া থাকিত। কার্য্যের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল, জমিদারের সকল কার্য্যের সমালোচনা করা, এবং অযাচিতভাবে তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া। এখন এই দলটির জিহ্বা একেবারে বেশী রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এতবড় বনিয়াদী বংশ, একি এমন করিয়া লুপ্ত হইতে দেওয়া চলে? দেবেন্দ্রের আর-একবার বিবাহ করা একান্ত উচিত; তাহাতে ইন্দিরা না হয় খানিকটা কষ্টই পাইবে। ইন্দিরারও অবশ্য কষ্ট পাওয়া উচিত নয়; হিন্দুনারী সে, তাহার ত হাসি-মুখে স্বার্থত্যাগ করা উচিত। সে যদি স্বামীকে কর্ত্তব্য পালনে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে নিশ্চিত অনন্ত নরক। দরিদ্রের মেয়ে সে, এমন স্বামী যে পাইয়াছে, ইহাই তাহার জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফল। সে কোথায় স্বামীকে কর্ত্তব্য করিতে উৎসাহ দিবে, না সে-ই হইয়া দাঁড়াইল অন্তরায়।

প্রথম প্রথম এইসব কথা ইন্দিরার কানে যাইত না। দেবেন্দ্র আর লীলার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল যাহাতে এই সদুপদেশ ও মন্তব্যগুলি ইন্দিরার কান পর্য্যন্ত না পৌঁছায়। কিন্তু লোকের মুখকে কতদিন আর সংযত রাখা সম্ভব! ক্রমে ইন্দিরাও শুনিল।

প্রথমে তাহার যেন হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়া গেল। এরা বলে কি? তাহার স্বামী আবার বিবাহ করিবেন, সে বাঁচিয়া থাকিতেই? তাহার স্বামী যে তাহার একমাত্র দেবতা, একমাত্র আনন্দের সম্পদ। তাঁহাকে কি সে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া ভালবাসিতে পারিবে? না, ইহা তাহার পক্ষে সম্ভবই নয়।

কিন্তু ক্রমে কথাগুলা তাহার সহিয়া গেল। এমন-কি, এই কথার মধ্যে সে উচিত কথাও খুঁজিয়া পাইতে লাগিল। স্বার্থত্যাগই ত তাহার এখনকার জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সে সামান্য একটা স্ত্রীলোক বইত নয়, সে কেন স্বামীর কর্ত্তব্য পালনে বাধা হইবে? এত বড় সম্ভ্রান্ত

বংশ যদি তাহার ত্রুটীতে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে নরকে যাওয়াই ত তাহার উচিত?

আজ সে একরকম মনস্থির করিয়াই বসিয়া ছিল। সে স্বামীকে আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিবে। বুকের ভিতর তাহার যেন রক্তপাত হইতেছিল, তবু সে আপনার সংকল্প ছাড়িল না। তাই না খাইয়া সে আজ স্বামীর জন্য বসিয়াছিল। এক-একটা মিনিট যেন এক-একটা ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হইতেছিল, ঘড়ির কাঁটাও যেন নড়িতে চায় না।

দেবেন্দ্র সচরাচর দেরিই করিতেন, আজ যেন তাঁহার দেরি করার ঘটা আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। ইন্দিরা রোজ সকালেই স্নান করিত, কিন্তু আজ এতক্ষণ না-খাইয়া বসিয়া থাকিয়া তাহার অসহ্য গরম বোধ হইতে লাগিল। আর-একবার স্নান করিবে বলিয়া সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। তাহার খাস দাসী কদম ছুটিয়া আসিয়া বলিল "মা, এই ভয়ানক রোদ্দুরে কোথায় যাচ্ছেন?"

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল, "গরমের জন্যেই যাচ্ছি, আর-একবার একটা ডুব দিয়ে আসি।"

রৌদ্র তখন সত্যই প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হাওয়াও বেশ খানিকটা ছিল। ইন্দিরা ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া বসিয়া এই জলকণাস্পৃষ্ট ঝিরঝিরে হাওয়াটুকু উপভোগ করিতে লাগিল। জলের ঘন নীল রংটা যেন তাহার বুকের জ্বালা খানিকটা জুড়াইয়া দিল।

কতক্ষণ যে সে ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ লীলার ডাক কানে আসিয়া তাহার ঘোর ছুটাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লীলা, তোমার কাকা এসেছেন নাকি?"

"না গো না, এখনও আসেননি। সেই দুঃখে রোদে ব'সে ব'সে তুমি যেন জর কোরোনা।"

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল, "রোদে আর কই ব'সে আছি? আচ্ছা, তোমার যখন এত ভাবনা, তখন আর দেরি করব না। মাধীকে একটা শাড়ী দিয়ে যেতে বল ত।"

লীলা চলিয়া গেল। কয়েক মিনিট পরেই মাধী একখানা শ্যাওলা রংএর ঢাকাই শাড়ী, লাল ডোরা-কাটা টার্কিশ তোয়ালে, রূপার সাবান-দানিতে সাবান আনিয়া উপস্থিত করিল। ইন্দিরা একটা ডুব দিয়া, মাথা গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিল।

ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে এমন সময় সিঁড়িতে শুনিতে পাইল তার স্বামীর পায়ের শব্দ। সিঁড়ির মাথার কাছে আসিয়া ইন্দিরা উঁকি মারিয়া দেখিল, যদিই মুখখানা একটু দেখা যায়। তাহার লঘু পদধ্বনি শুনিতে পাইবার কথা নয়, তবু দেবেন্দ্রও কেন জানি না ঠিক সেই সময় উপর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। দুইজনে চোখাচোখি হইতেই আনন্দের হাসিতে দুজনের মুখই ভরিয়া গেল।

দেবেন্দ্র দুই তিন লাফে বাকি সিঁড়ি ক'টা পার হইয়া আসিয়া পত্নীর দুই হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কিসের মত দেখাচ্ছিল জান?"

ইন্দিরা হাসিয়া, স্বামীর বুকের কাছে একটুখানি সরিয়া আসিয়া বলিল, "কি করে জানব, আমি ত আর নিজেকে দেখতে পাইনি?"

"মনে হচ্ছিল যেন নন্দন-কাননের কোন অদৃশ্য গাছ থেকে সবুজ পাতায় ঘেরা একটি শাদা গোলাপ শূন্যে দোল খাচ্ছে।"

"যাও, যাও, বুড়ো বয়সে আর অত কবিত্বে কাজ নেই," বলিয়া ইন্দিরা দেবেন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া ঘরের ভিতর ছুটিয়া পলাইল। আনন্দ আর বিষাদের ঢেউ যেন একই সঙ্গে তাহার বুকের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এখনও তাহার মত হতভাগিনীর জন্য এতখানি ভালবাসা জগতে আছে। কিন্তু কি করিয়া সে আজ স্বামীকে আবার বিবাহের কথা বলিবে? নিজের হাতে নিজের সমস্ত সুখের মূলে কুঠারাঘাত করা ত কম কথা নয়? কিন্তু একাজ তাহাকে করিতেই হইবে। সে যেন দেখিতে পাইল তাহার শ্বশুর-গোষ্ঠীর শত শত পরলোকগত পুরুষ কাতর চক্ষে তাহারই দিকে চাহিয়া আছেন। সে যেন আত্মসুখ বলি দিয়াও তাঁহাদের নরকবাস-ভয় হইতে উদ্ধার করে।

দেরি করিয়া লাভ নাই, কাজেই ইন্দিরা কথা সুরু

করিল। "এত দেরি কর্‌লে কেন? তোমার জন্যে আজ আমি এখন অবধি ব'সে আছি।"

দেবেন্দ্র ঠাট্টার সুরে বলিলেন, "হঠাৎ আজ এমন নব বিধান কেন? এত সৌভাগ্য ত আমার কপালে বিশেষ ঘটে না?"

ইন্দিরা ঠাট্টা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল, তাই।"

দেবেন্দ্র জুতা ছাড়িয়া একটা কৌচের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ইন্দিরাকে টানিয়া নিজের পাশে বসাইয়া এক হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি কথাটা শোনাই যাক্।"

কিন্তু কথা বলা যে বড়ই কঠিন! ইন্দিরার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। আজ যেন দেবেন্দ্র অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশী প্রফুল্ল, মুখে হাসি ধরে না, প্রতি কথায়, প্রতি কাজে আদর ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু কর্ত্তব্য যা, তাহা করিতেই হইবে।

কোনো ভূমিকা না করিয়াই সে শেষে বলিয়া ফেলিল, "আমি চাই যে তুমি আবার বিয়ে কর।"

দেবেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। স্ত্রীকে বুকের সঙ্গে আরো নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "কাকে? তোমার ছোট বোন টেঁপীকে? তার ত মোটে চার বছর বয়স না?"

ইন্দিরার চোখে জল আসিয়া পড়িল। যে-কথা বলিতে তাহার অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া আসিয়াছে, স্বামী তাহা এম্‌নি ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলেন!

সে অনেক কষ্টে চোখের জল ঠেকাইয়া রাখিয়া বলিল, "আমি ঠাট্টা কর্‌ছি না। তোমার পরিবারের প্রতি, বংশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য ত আছে! তার খাতিরে তোমায় এ কাজ কর্‌তেই হ'বে।"

দেবেন্দ্র উঠিয়া-পড়িয়া বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য ত শুধু মৃত পূর্ব্বপুরুষের প্রতি নয়? যারা বেঁচে আছে তাদের প্রতিও আমার কর্ত্তব্য আছে। এসব বাজে কথা আর আমার কাছে বোলো না।" এই বলিয়া তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

ইন্দিরা প্রথমে যেন মুক্তির নিশ্বাস লইয়া বাঁচিল। তাহার যতটুকু করিবার কথা তাহা সে করিয়াছে, এখন দেবেন্দ্র যদি তাহার কথা না শোনেন তাহা ত আর ইন্দিরার দোষ নয়। তাহার বুকের উপর হইতে মস্ত বড় একটা পাষাণ-ভার যেন নামিয়া গেল। দেবেন্দ্রের সাম্‌নে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ সে আর তুলিবেই না ঠিক করিল। অনেক কাল পরে মনে একটুখানি শান্তি পাইয়া তাহার চেহারা শুদ্ধ ফিরিয়া গেল।

কিন্তু ইন্দিরা অনেক কাল সংসারে থাকিয়াও সংসারকে চিনিতে পারে নাই। শীঘ্রই তাহার প্রমাণও সে পাইল। সন্ধ্যার পর বাগানে বেড়াইয়া ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যাইবে, এমন সময় শুনিতে পাইল তাহার এক দূর সম্পর্কের খুড়শাশুড়ীর ঘরে মহা উৎসাহে গল্প চলিতেছে। প্রথমে সে সেদিকে কান না দিয়া সোজা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কয়েক সিঁড়ি উঠিতে-না-উঠিতেই নিজের নামটা কানে আসাতে তাহার গতিরোধ হইয়া গেল।

খুড়শাশুড়ী বলিতেছিলেন, "আরে বাছা, এত বয়েস হ'ল এখনও আমার মানুষ চিন্‌তে দেরি আছে নাকি? বৌমাকে দেখ্‌তেই ভাল মানুষ, কিন্তু ওঁকে দিয়েই এ বংশের সর্ব্বনাশ হবে।"

দেবেন্দ্রের এক পিস্‌তুতো বোন বলিলেন, "না গো, বৌ নাকি দাদাকে বিয়ে কর্‌তে বলেছে, মাধী নিজের কানে শুনেছে।"

প্রথম বক্তাকারিণী গলা একটু চড়াইয়া বলিলেন, "রাখ তোমার বিয়ে কর্‌তে বলা। মুখে একটা কথা ব'লে, তারপর কেঁদে শয্যা নিলে কেউ তার কথা বিশ্বাস করে? ছেলেকেও যেন তুক্ ক'রে রেখেছে, বংশলোপ হ'লেও সে কেবল বৌএর চাঁদ মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌বে।"

ইন্দিরার আর শুনিতে ইচ্ছা হইল না। বাকি সিঁড়ি ক'টা তাড়াতাড়ি পার হইয়া সে-ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর কান্নার ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে ছিল, কিন্তু সে জোর করিয়া তাহা চাপিয়া রাখিল। নিজের হাতে নিজের গলা কাটিয়া না দিলে এ জগতে

সুনাম পাইবার আশা বৃথা। তাহাতেও সব সময় কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। কারণ এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহাদের জন্য যতই ত্যাগ করা যায় ততই যেন তাহাদের উপকারীর প্রতি বিদ্বেষই বাড়িতে থাকে। শত্রুকে তাহারা ক্ষমা করিতে না পারিলেও ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উপকারীকে তাহারা ভুলিতে পারে না বলিয়াই ক্ষমা করে না। ইন্দিরার দয়ায় যাহারা লালিত-পালিত হইতেছিল, অধিকাংশই তাহাদের মধ্যে মনে মনে তাহার অমঙ্গলই কামনা করিত। কাহারও বা এই বিদ্বেষ ভাবে ও ভাষায় পরিস্ফুট ছিল, কাহারও বা ছিল না; এমন-কি অনেকে নিজের কাছেও এই কামনাকে স্বীকার করিত না। কিন্তু দরিদ্র ঘরের মেয়ে আসিয়া আজ তাহাদের উপর অধিশ্বরী হইয়া বসিয়াছে, এ জ্বালা মিটিবার নয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে কেবলমাত্র ইন্দিরার সুপারিশের জোরেই টিকিয়াছিল, নয়ত অক্ষমতা এবং আলস্যের প্রতি দেবেন্দ্রের যে খুব করুণা ছিল তাহা বলা যায় না। ইন্দিরার দুঃখে কিন্তু ইহাদের চোখে এক ফোঁটাও জল দেখা দিবে না, এ কথা সে আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিল।

সে এখন মহা দ্বিধায় পড়িয়া গেল। স্বামীর কাছে বিবাহের কথা তুলিলে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। আবার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেও সংসারের সকলের কাছে দুর্নামের ভাগী হইতে হয়। স্বামী কখনই তাহাকে স্বার্থপর ভাবিয়া দোষী করিবেন না, এও কি সে একেবারে নিশ্চয় করিয়া জানে! এ জগতে একেবারে নিশ্চয় কিছু কি আছে? এমনও কিছু কি আছে যার সীমা নাই, শেষ নাই? দেবেন্দ্রের প্রাণঢালা, স্বার্থলেশশূন্য ভাল-বাসারও একদিন অবসান ঘটিতে পারে, তখন তিনি কি ইন্দিরাকে দোষী করিবেন না? সে যে নিজের স্বার্থকেই স্বামীর স্বার্থের চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছিল ভাবিয়া মনে মনেও কি বিরক্ত হইবেন না? তাহা ছাড়া বংশের প্রতি এবং পরিবারের প্রতিও সত্যই মানুষের একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহাও উপেক্ষা করিবার নয়। ইন্দিরা এ বংশের বধূ হইয়া আসিয়া যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়াছে। এখন যখন ইহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিবার সময় আসিল, তখন যদি সে ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়, তাহা হইলে সে অপরাধই করিবে।

স্বামীর কাছে আবার তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করাই সে স্থির করিল। কিন্তু কথা তুলিবামাত্র দেবেন্দ্র এমন ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিলেন যে, সে ভয় পাইয়াই চুপ করিয়া গেল। স্বামী হয়ত কোনোকালেই আর বিবাহ করিবেন না, ইহা সে বুঝিল, কিন্তু বুঝিয়াও সুখী হইতে পারিল না। সে যে নিজের কর্ত্তব্য করিতে পারিল না, ইহাতে তাহার মনে একটা অশান্তি থাকিয়া গেল। তাহার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতেছে দেখিয়া দেবেন্দ্র বায়ু-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দেবেন্দ্রের পরিবারটি বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এটা তিনি কিছু পরেই বুঝিতে পারিলেন। হঠাৎ সকলে কেমন করিয়া জানি না বুঝিতে পারিল যে, ইন্দিরার অনুরোধ সত্ত্বেও দেবেন্দ্র আবার বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এখন তাহারা ইন্দিরাকে ত্যাগ করিয়া সদলে দেবেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। দেবেন্দ্রের রাত-দিনের মধ্যেও আর শান্তি রহিল না, বিশ্রামও রহিল না। দেবেন্দ্র চিরকালই দেরি করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, এখন আরো দেরি করিতে আরম্ভ করিলেন। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলেই তিনি ভিতর বাড়ী হইতে পলায়ন করিতেন। রাত্রে খাইয়াই গভীর নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া পড়িতেন, পাছে ইন্দিরাও তাঁহার শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। স্বামীর সহিত ব্যবধান ইন্দিরার যেন দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল। লুকাইয়া চোখের জল ফেলা তাহার নিত্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল, জীবনটা মনে হইতে লাগিল যেন একটা ঘোরতর দুঃস্বপ্ন।

সন্ধ্যার সময় জানলার ধারে বসিয়া ইন্দিরা আপনার দুর্ভাগ্যের ভাবনাই ভাবিতেছিল। লীলা বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "কাকী-মা, কি কর্‌ছ?"

ইন্দিরা বলিল, "কর্‌ব আর কি, মা? আমার কর্‌বার বিশেষ কিছু ত নেই? ভিতরে এসো না?"

লীলা ভিতরে আসিয়া ইন্দিরার চেয়ারের পাশে মাটিতেই বসিয়া পড়িল। বিধবা হওয়ার পর অন্য সব বিলাস-দ্রব্যের সঙ্গে খাট-চেয়ারও সে ত্যাগ করিয়াছিল,

মাটি ছাড়া আর কোথাও বসিত শুইত না। বসিয়া বলিল, "কাকী-মা, তোমায় একটা বুদ্ধি দিতে এলাম। তবে কাজে খাটাতে পারবে কি না, সে বাপু তুমি নিজে বুঝে দেখ।"

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল, "বুদ্ধিটা কি শুনি ত আগে, তারপর কাজে খাটানোর ভাবনা ভাব্‌ব।"

লীলা বলিল, "কাকার অবস্থা ত দেখ্‌ছি। ভদ্রলোকের নাওয়া-খাওয়াও সবাই মিলে ঘুচিয়ে দিয়েছে। বাড়ীতে ঢুকতেই তাঁর ভরসা হয় না। তুমিও ত শরীর পাত করতে বসেছ। ছেলেপিলে হ'ল না, এটা খুবই দুঃখের বিষয়, কিন্তু কি করবে বল? সে যাই হোক, কাকার আর বিয়ে করা চলে না। সতীনের ঘর করতে হ'লে তুমি দুদিন বাদেই মরবে। তোমায় এমন ক'রে হত্যা করলে সেটা বংশলোপ হ'তে দেওয়ার চেয়ে কম পাপ কিছু হ'বে না। তবু বংশটার কথাও একটু-আধটু যখন ভাবতে হয়, তখন এক কাজ কর। এ বংশে পোষ্যপুত্র অনেক বার নেওয়া হয়েছে, তোমরাও তাই নাও। কাকার অমত হবে ব'লে ত মনে হয় না। অন্ততঃ তাঁকে জিগ্‌গেস ক'রে দেখ। তোমাদের দু'জনেরই একটু শান্তি পাওয়া দরকার, যা দশা হ'য়েছে।"

ইন্দিরা একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তুমি বাঁচালে, লীলা। আমার কোনো অমত নেই, এখন ওঁর মত হ'লেই বাঁচি।"

"আমি একটি ছেলে মনে মনে ঠিক ক'রেও রেখেছি। এ বাড়ীর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের ছেলে। ছেলে ভালই; বাপ-মারও ঘরে দু'মুঠো ভাত নেই। তাদের কাছে কথা পাড়লে, তারা খুসি হ'য়েই দেবে।" এই বলিয়া লীলা চলিয়া গেল।

দেবেন্দ্র শুনিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পত্নী বলিলেন, "টাকার লোভ দেখিয়ে অন্যের ছেলে কেড়ে নেওয়া, আমার একটুও ভাল লাগে না। তবে এ মন্দের ভাল। আর-একবার বিয়ে করা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠবে না, আর কিছু একটা না করলে আমার জ্ঞাতি-গুষ্ঠী মিলে আর ক'দিনেই আমাদের দু'জনকে শেষ করবে। পোষ্যপুত্রই নেওয়া যাক্‌। ছেলেটাকে আনিয়ে একবার দেখতে হবে, তার হাত-পাগুলো অন্ততঃ ঠিক আছে কি না।"

সেই ছেলেটির বাপের কাছে প্রস্তাব করিতেই সে যেন লাফাইয়া উঠিল। তাহার পক্ষে এ একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। ছেলেকে সাজাইবার সামর্থ্য তাহাদের ছিল না, তবু যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ছেলের মা ও ছেলেকে লইয়া ভদ্রলোক চটপট্‌ জমিদার-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিশেষ প্রয়োজন না পড়িলে ইন্দিরা নিজের ঘর ছাড়িয়া নীচে আসিত না। আজও সে উপরেই বসিয়াছিল। একটা ঝি গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল।

নীচে আসিয়া ইন্দিরা দেখিল বাড়ীর যত লোক, চাকর দাসী শুদ্ধ দালানে জমা হইয়া ছেলেটিকে দেখিতেছে। সে হয়ত একদিন সকলের প্রভু হইবে, তাহাকে ত একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া দরকার? ছেলেটা একেবারে মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া আছে, তাহার বয়স বছর সাত হইবে। তাহার পিতার মুখ একেবারে আনন্দে উজ্জ্বল, সে কৃতজ্ঞ গদগদ দৃষ্টিতে দেবেন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছে। ছেলের মা মেয়েদের মধ্যে বসিয়া, তাহার মুখের উপর এমন দীর্ঘ ঘোমটা যে, তাহার চেহারার কোনো আঁচ পাইবার উপায় নাই।

ইন্দিরা নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই, সে মুখ তুলিয়া ইন্দিরার দিকে চাহিল। তাহার চোখে-মুখে এমন দারুণ বিদ্বেষ আর ক্রোধের চিহ্ন যে, ইন্দিরা ভয়েই যেন দুই পা পিছাইয়া গেল। ঐ দৃষ্টির ভিতর দিয়া সে যেন স্ত্রীলোক-টির হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। তাহার অর্থ নাই, তাই সে আজ সন্তান বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, কিন্তু যে-নারী অর্থের বলে তাহার সন্তান হরণ করিতেছে, তাহাকে সে ক্ষমা করিতে পারে নাই।

পিছন হইতে বাপের অনেক ঠেলা খাইয়া ছেলেটা এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া ইন্দিরার কাছে দাঁড়াইল। তাহাকে একটা প্রণামও করিল। তাহার মুখে ভয়ের চিহ্ন ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

ইন্দিরা আদর করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি, বাছা?"

ছেলেটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "মাখন"; বলিয়াই দৌড়াইয়া মায়ের কাছে পলাইয়া গেল। তাহার মা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি কোলের ভিতর টানিয়া লইল।

খানিক কথাবার্ত্তার পর, ছেলে, ছেলের বাপ-মা, সকলেই বিদায় হইল। বাড়ীতে মহা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। অনেকে আনন্দ করিতে লাগিল, রায়বংশ রক্ষা পাইল বলিয়া। ইন্দিরার শুভাকাঙ্ক্ষী যে দু'চারজন ছিল, তাহারা আনন্দ করিল, সে একটা দারুণ দুঃখের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইল বলিয়া। যাহারা তাহার দুঃখেই সুখী ছিল, তাহারা আনন্দ করিল দায়ে পড়িয়া। তাহা না হইলে লোকে বলিবে কি?

দেবেন্দ্র বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। যাহা হউক, তিনি বেশী কিছু না বলিয়াই কাজে চলিয়া গেলেন। ইন্দিরারও মন খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। মাখনের মায়ের ভয়ানক দৃষ্টিটা সে ভুলিতে পারিতেছিল না। অর্থের বলে তাহারা মাখনকে ক্রয় করিতেছে বটে, কিন্তু মাখন বা তাহার পিতামাতা কোনোদিন এই ক্রয়-কারীদের ক্ষমা করিতে পারিবে না। এ যেন পুরাকালের দাস ক্রয় করার মত।

যাহাই হউক, পোষ্যপুত্র লইবার সব-রকম আয়োজন চলিতে লাগিল। যজ্ঞ হইবে; আত্মীয়-স্বজন, প্রজা, সকলকে খাওয়াইতেও হইবে; এসবের জন্যে কিছু আগে হইতে প্রস্তুত হওয়া দর্‌কার; কাজেই বাড়ীতে রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। ইন্দিরাকে লইয়া দেবেন্দ্রের যে বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবার কথা ছিল, তাহা এখনকার মত চাপা পড়িয়া গেল।

মাখনকে তাহার বাবা রোজ একবার জমিদার-বাড়ী বেড়াইতে পাঠাইয়া দিত। সে আসিয়া খুব ভীত-মুখে খানিকটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; এখানে আসিলে তাহার হাসিখেলা সব যেন ঘুরিয়া যাইত। ইন্দিরা সম্বন্ধে তাহার কেমন যেন একটা বিদ্বেষ ছিল, হাজার লোভনীয় রকম ঘুষ পাইলেও সে ইন্দিরার কাছে যাইত না। জমিদার-বাড়ীর দেউড়ী পার হইলে তবে তাহার মুখে হাসি দেখা দিত।

যজ্ঞের দিন স্থির হইল, দিনটা ক্রমে ক্রমে কাছে আসিয়াই পড়িল।

সারারাত ইন্দিরার ঘুম হয় নাই, তাই ভোরের দিকে সে একটুখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে মহা চেঁচা-মেচি শুনিয়া তাহার ঘুমটা চট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল। কাহারা যেন তাহাকে ডাকিতেছে। সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। সব কয়জন দাসী তাহার দরজার সাম্‌নে জড় হইয়া মহা উত্তেজিত ভাবে কিসের যেন আলোচনা করিতেছে।

ইন্দিরা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে?"

সকলে মিলিয়া প্রায় সমস্বরে বলিল, "বল্‌ব কি মা, অবাক কাণ্ড! সকালে ঘাটে গেছি, একটা ডুব দিয়ে আস্‌ব ব'লে; ওমা, দেখি কি না সিঁড়ির উপর ছোট্ট একটা মেয়ে প'ড়ে, এই সবে ক'ঘণ্টা আগে হয়েছে বোধ হয়।"

কমলা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটা কই?"

ঝির দল নাক সিঁট্‌কাইয়া বলিল, "মাগো, তাকে কে ছোঁবে? কার মেয়ে, কোন্ জাতের মেয়ে কিছু ঠিকানা আছে? শেষে কি জাত খোয়াব তাকে ছুঁয়ে? ফিশ্‌ সে সেই সিঁড়ির উপরই আছে প'ড়ে।"

ইন্দিরা কথা বলিল না। জলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে চলিল। দাসীর দলও পিছনে-পিছনে চলিল, নিজেদের মধ্যে ফিশ করিয়া কথা বলিতে বলিতে।

একজন বলিল, "এটা রাধীরই, এতে আর ভুল নেই। লক্ষ্মীছাড়া মাগী নিজের মুখ বাঁচাবার জন্যে মেয়েটাকে মর্‌তে ফেলে গেছে। কিন্তু এ কথা না জানে কে? গাঁ-ময় ঢি ঢি প'ড়ে গিয়েছে না?"

আর-একজন বলিল, "চুপ কর গো, চুপ কর। পরের কথায় কাজ কি? শেষে আমাদের নিয়ে টানাটানি পড়্‌বে।"

ইন্দিরা অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিল, মা হইয়া কি করিয়া এভাবে সন্তান হত্যা করা যায়! ভগবানের আইনের চেয়ে মানুষের আইনের ভয় এতই কি বেশী?

ঘাটের সিঁড়ির কাছে আসিয়া ইন্দিরা দেখিল, শিশু মেয়েটি প্রথম ধাপের উপরই পড়িয়া আছে। দিব্য সুন্দর দেখিতে; হতভাগিনী মা তাহাকে ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়ায় জড়াইয়া এখানে ফেলিয়া গিয়াছে। এখনও মরে নাই, মাঝে মাঝে ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদিতেছে। ইন্দিরা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার শরীরের কোমল উত্তপ্ত স্পর্শে তাহার কান্না থামিয়া গেল, টুক্‌টুকে ঠোঁট দু'টি ফাঁক করিয়া সে খাদ্যের সন্ধান করিতে লাগিল।

ইন্দিরার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কে সেই হতভাগিনী যে সামাজিক দণ্ডের ভয়ে এমন সম্পদ্ পথের ধূলায় ত্যাগ করিয়া গেল? সে নিজে ত একটি শিশুর জন্য প্রাণও দিতে পারিত, আর তাহারই মত কোন রমণী অনায়াসে সন্তানকে হত্যা করিতেও দ্বিধা করিল না!

সে শিশুটিকে কোলে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিল। দাসীর দল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "করেন কি, মা? ওর জাত-জন্মের ঠিক নেই, ওকে কি ছুঁতে আছে? আপনাকে যে প্রাচ্চিত্তির কর্‌তে হবে মা, তা না হ'লে কেউ হাতের জলও খাবে না।"

"ছোট ছেলে মেয়ে নিষ্পাপ, তাদের ছুঁলে কখনও জাত যায় না," বলিয়া ইন্দিরা মেয়েটিকে লইয়া আপনার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

বাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এরকম কাণ্ড কেউ কখনও চোখেও দেখে নাই, কানেও শোনে নাই। ইন্দিরা যে বাড়ীর গৃহিণী, তাহার প্রাপ্য যে একটা সম্মান আছে, এ কথা রাগের ঝোঁকে সকলে যেন ভুলিয়াই গেল। যাহার মুখে যা আসিল সে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিল। ইন্দিরা তাহাদের কথায় কান না দিয়া, উপরের ঘরে বসিয়া শিশুটির পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র ভোরে উঠিয়া বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি না আসা পর্য্যন্ত সে কি করিবে, কিছু স্থির করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু শিশুটিকে সে পথে পড়িয়া মরিতে দিবে না, ইহা সে স্থিরই করিয়া ফেলিল।

লীলা এতক্ষণ ঠাকুরঘরের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল, তাহার কানে খবরটা পৌঁছিল কিছু বিলম্বে। সে তাড়াতাড়ি ইন্দিরার ঘরে ছুটিয়া আসিল। দেখিল, ইন্দিরা শিশুটিকে এক টুক্‌রা ফ্লানেলে জড়াইয়া কোলে লইয়া বসিয়া আছে। ব্যস্ত হইয়া বলিল, "করেছ কি, কাকী-মা? দু'দিন বাদে যজ্ঞ ক'রে ছেলে নিচ্ছ, আর এখন এই কাণ্ড ক'রে বস্‌লে? এখন আর কোনো বামুনে তোমার বাড়ী পা দেবে? একঘরে না করে ত সেই ঢের। সমাজে যখন রয়েছ, তখন সমাজের বিধি এমন ক'রে ভাঙলে চলে? প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হ'বে তোমায়, তা না হ'লে হাতের জলও কেউ খাবে না।"

ইন্দিরা বলিল, "ধন্য তোমাদের সমাজের বিধি বাছা! জোর ক'রে টাকার বলে গরীব মায়ের ছেলে ছিনিয়ে নিচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছিল পুণ্য; আর অসহায় শিশু, যার জগতে কেউ নেই, তাকে তুলে এনেছি ব'লে আমার এত বড় পাপ হ'য়ে গেল যে, আমার হাতে কেউ জল খাবে না।"

দেবেন্দ্রের সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠানো হইয়াছিল। তিনি এতক্ষণ পরে তাহাদের সঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। ঘরের ভিতর পা দিয়াই অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি?" লীলা তাঁহাকে দেখিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দিরা দুই হাতে মেয়েটিকে দেবেন্দ্রের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। বলিল, "দেখ, দেবতার দান। সমাজের চোখে ত আমি এখন পাপী, তুমি কি বল?"

দেবেন্দ্র কোনো উত্তর দিলেন না। মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়াই রহিলেন।

নীচে মহা কোলাহল শোনা গেল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দেবেন্দ্র নীচে নামিয়া গেলেন।

রায় পরিবারের কুল-পুরোহিত নীচে দাঁড়াইয়া। ক্রোধে ক্ষোভে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রায় বাক্‌রোধ হইয়া আসিতেছিল। দেবেন্দ্রকে দেখিয়া তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বৌমা দেখি ভয়ানক স্বাধীন হ'য়ে উঠেছেন! এ কি-রকম ব্যবহার তাঁর? তিনি প্রায়শ্চিত্ত না কর্‌লে আমি আর এবাড়ীর ছায়াও মাড়াব না।"

দেবেন্দ্র একটু ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি দাঁড়ান একটু, আমি উপর থেকে আস্‌ছি।"

ইন্দিরা তখনও আপনার অনভ্যস্ত মাতৃ-কর্ত্তব্য লইয়াই ব্যস্ত। তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দিরা, এই মেয়ের জন্যে সমাজ তোমায় যে শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে নিতে রাজী আছ?"

ইন্দিরা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "তুমি যদি আমার সহায় থাক, তাহ'লে আমি কোনো শাস্তিকে ভয় করি না।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা। কিন্তু এখন বেশ কিছু দিনের জন্যে আমাদের বাড়ী-ছাড়া হ'য়ে থাক্‌তে হবে। পুরীতে আমাদের বাড়ী ঠিকই আছে, কালই যাওয়া যাবে। তুমি সব গোছগাছ ক'রে রাখ। আমার যা ব্যবস্থা কর্‌বার আছে, আমি তা কর্‌ছি।"

বাড়ীতে সেদিন যেন কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। গালাগালি, চেঁচামেচির আর অন্ত রহিল না। কেবল উপরের ঘরে একটি শিশু হাসিতে লাগিল, আর নীচে পূজার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া লীলা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় মাখন আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ তাহার মাও তাহার সঙ্গে আসিয়াছে। অকস্মাৎ এরকম বিপ্লবের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাদের বিস্ময় উপভোগ করিতে হইল না। সকলে মিলিয়া চেঁচামেচি করিয়া তাহাদের একরকম বুঝাইয়া দিল ব্যাপারখানা কি। কিন্তু মাখনের মায়ের মুখে ঘৃণা বা ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া বক্তৃতাকারিণীর দল বেশ খানিকটা নিরাশ হইয়া গেল।

স্ত্রীলোকটি ছেলে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। কি কাণ্ড হয় দেখিবার জন্য সকলে তাহাদের পিছন পিছন চলিল।

পায়ের শব্দে ইন্দিরা মুখ তুলিয়া তাকাইতেই, মাখনের মা অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর মাথা তুলিয়া বলিল, "আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় ভাই, তবু তোমার পায়ের ধূলা নিচ্ছি। পরের সন্তানকে নিজের ব'লে নেবার ক্ষমতা তোমার আছে ভাই, তাই তুমি নিতে গিয়েছিলে। না বুঝে রাগ ক'রে অপরাধী হ'য়েছি।"

মাখনকে টানিয়া আনিয়া বলিল, "প্রণাম কর, বাছা।"

মেয়ের দল মহা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর কোলাহল করিতে করিতে আবার নীচে নামিয়া গেল।

উন্মোচনা

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

মানব জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায়ই পরিবর্দ্ধিত; জাগতিক ঘটনাবলির ঘাতপ্রতিঘাত ইন্দ্রিয়-মধ্য দিয়া প্রাপ্ত হওয়াতেই তাহার জ্ঞান উন্মেষপ্রাপ্ত। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানলাভের অন্য কোন উপায় নাই। মানব জগতের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অতএব উক্ত ঘাতপ্রতিঘাত তাহাকে বিচলিত করিতেছে। এমতাবস্থায় সে এই ঘাতপ্রতিঘাত যথাযথ প্রাপ্ত হয় না কারণ, তাহার কতকাংশ দ্বারা সে নিজেই চালিত। অবশিষ্টাংশে তাহার জ্ঞান প্রতিভাত।

এবম্বিধ অংশদ্বয়ে অনুসন্ধিৎসার পরিচালনাই যথাক্রমে উন্মোচনা ও বিধায়না জাতীয় গবেষণা। সর্ব্বপ্রথমে হরিত পীত রক্ত প্রভৃতি বর্ণ শিশুর চক্ষে পতিত হয়।

সে মিষ্ট তিক্ত কটু প্রভৃতি আস্বাদ গ্রহণ করে। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিই (perception) বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া বস্তুত্বের উপলব্ধি (conception) জন্মায়। বিভিন্ন বস্তুর (object) সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ক্রমশঃ তাহাদের ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই অভিজ্ঞতা হইতে বস্তুর ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কতকগুলি বিধি আমরা পাইয়া থাকি। এখান হইতেই বিধায়নার আরম্ভ। জ্ঞানের প্রসারে বিধির সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়। বিভিন্ন বিধির সংমিশ্রণ নূতন নূতন বিধি উৎপন্ন করে। এই বিধি-সমূহের পর্য্যায়ানুযায়ী সমাবেশেই প্রারব্ধ বিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। কিন্তু জ্ঞানচিকীর্ষুর চিন্তা ইহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। সংশ্লেষণের (synthesis) ন্যায় বিশ্লেষণও চিন্তার ভোগ্য। জগৎ হইতে যে ঘাতপ্রতি-ঘাত ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে, তৎসম্বন্ধে আলোচনাই সংশ্লেষণের বিষয়। এই সংশ্লেষণের জটিলতায় অনেক সময়ে চিন্তার অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতে সন্দেহের উৎপত্তি। সন্দেহই বিশ্লেষণের সৃষ্টিকর্ত্তা। সংশ্লেষণে চিন্তাধারা কারণ-(cause) রূপিনী ঘটনা দৃষ্টে ফলস্বরূপ কার্য্যে (effect) উপনীত হয়। সন্দেহে বিচার কার্য্য হইতে কারণ-মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যখন এই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের পুনঃ পুনঃ চিন্তা বিভিন্ন ঘটনাবলির কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ সুস্পষ্ট করিয়া বুদ্ধি সম্যক্ পরিমার্জ্জিত করে, তখন আর বিশ্লেষণের গণ্ডী সে প্রাথমিক জ্ঞান ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। জাগতিক ঘাতপ্রতিঘাতের অনুভূতিই প্রাথমিক জ্ঞানের জনয়িতা। এই জ্ঞানের গণ্ডী যাবতীয় চিন্তাজাত সন্দেহের মীমাংসা প্রদানে সমর্থ নহে। এমতাবস্থায় উক্ত গণ্ডী বিশ্লেষণ-চিন্তায় ক্রমশঃই আহত হইতে থাকে। মানবের স্বভাবজাত জ্ঞানে ভ্রম প্রদর্শিত হয়। তখন সে অনুভব করিতে পারে যে, জাগতিক ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার নিজত্বকে ভাসাইয়া লইতেছে। এই অবস্থায় যে জাগতিক স্রোতে সে এক-সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভাসিতেছে, তাহাকে উপলব্ধি করার নিমিত্ত উক্ত প্রকারের বিশ্লেষণই একমাত্র উপায়।

উপরোক্ত জ্ঞানের গণ্ডী সংস্কার নামে অভিহিত।

পোতারোহিগণের বহির্ম্মুখে দৃষ্টি পতিত না হইলে তাহারা পোতের গতি লক্ষ্য করিতে পারে না। অনুভূতিতে পোতকে স্থির বলিয়াই মনে হয়। আপেক্ষিক গতির বিশ্লেষণে আমরা এজাতীয় অনুভূতির ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারি। চলিষ্ণু বস্তুকে স্থির বলিয়া উপলব্ধি আমাদের স্বভাবজাত জ্ঞানে একটা আঘাত দেয়। এখান হইতেই সংস্কারে আঘাতের সূত্রপাত। এ-জাতীয় ক্রিয়ার ক্রমোৎকর্ষ সাধনেই আমরা পার্থিব গতি অনুধাবনে উপস্থিত হই।

বিধায়ক গবেষণার প্রথম অবস্থা একমাত্র সংশ্লেষণ-চিন্তায় পূর্ণ। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই সন্দেহ বিশ্লেষণ-চিন্তা আনিয়া দেয়। বিশ্লেষণ চিন্তা প্রসারিত হইলে কিছুতেই সংস্কারে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তবে সাধারণ বিশ্লেষণ-চিন্তা হইতে উন্মোচনার বিশেষত্ব এই যে, উন্মোচনায় সমগ্র বিজ্ঞান-জগতে একটা যুগান্তর আনয়ন করে। সাধারণ বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত সংস্কারে অল্পাধিক আঘাত প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত। কিন্তু উন্মোচনা চিরাগত সংস্কারজাত বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে; নূতন বৈজ্ঞানিক যুগের নিমিত্ত নূতন ভিত্তি সংস্থাপন করে; বৈজ্ঞানিক আলোচনার ধারা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

বিজ্ঞানজগতে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া উন্মোচনা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রারম্ভে কতকগুলি বিধি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এই বিধির সত্যতা সম্বন্ধে তৎকালে মনে কোন সন্দেহই জাগে না। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক বিধির সত্যতা এইসমস্ত স্বীকার্য্যের উপরই নির্ভর করে। এইরূপ স্বীকার্য্যে সন্দেহ হওয়াই উন্মোচনার উৎপত্তি। স্বীকার্য্যগুলির সত্যতা খণ্ডিত হইলেই আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া বিজ্ঞানের শৃঙ্খলা পুনর্গঠনের আবশ্যক হইয়া পড়ে। জাগতিক যে ঘাত-প্রতিঘাত আমার নিজত্বকে ভাসাইয়া দেয়, তাহা লক্ষ্য-পথে পতিত না হওয়াতেই উক্ত প্রকারের ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্যের উৎপত্তি। কোপার্নিকাসের পূর্ব্বে পৃথিবীকে অচলারূপে স্বীকার করিয়াই জ্যোতির্গণনার সূচনা।

এজাতীয় স্বীকার্য্য জ্যামিতিক স্বীকার্য্যের মত সূত্র-(proposition) বদ্ধ নহে। তৎকালের ভাষায়—"পৃথিবী

অচলা" এ আবার একটা স্বীকার্য্য কি? ইহা মনের সঙ্গে এতটা মিশ্রিত যে, ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া সূত্রাকারে পরিণত করা আয়াসসাধ্য। তদবস্থায় আপেক্ষিক দেশই (space) সার্ব্বভৌম (absolute) রূপে প্রতীত। সার্ব্বভৌম দেশের ধারণা মানব-বুদ্ধির অতীত। পোতারোহী ব্যক্তি পোতের গতি প্রত্যক্ষ করিতে পারায় সে তৎসংশ্লিষ্ট দেশের আপেক্ষিকতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। পৃথিবীর আকারের বিপুলতা তাহার গতি প্রত্যক্ষ করিতে দেয় না। তন্নিমিত্তই পার্থিব আবর্ত্তনে আস্থা জন্মাইবার নিমিত্ত, কেপলার, কোপার্নিকাস্, গ্যালিলিও ও নিউটন্ এই মনীষী চতুষ্টয়কে অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল সংস্কার এই প্রকারের ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্য দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ। সংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থায় এইসমস্ত স্বীকার্য্য সূত্রাকারে পরিণত করা নিতান্তই কঠিন। এমন-কি, এরূপ অনেক স্বীকার্য্য আছে, যাহা সংস্কার বিদূরিত অবস্থায়ও সূত্রবদ্ধ করা দুঃসাধ্য।

"পরাবর্ত্তিত (reflected) আকাশ-(ether) তরঙ্গ (vibration) নেত্রপথে পতনে দর্শন-ক্রিয়ার উৎপত্তি।" প্রচলিত বিজ্ঞানের ইহাই অভিমত। কিন্তু দর্শন শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আলোক-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ দর্শন শব্দের সৃষ্টি করেন নাই। আলোকতত্ত্ব আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব হইতেই দর্শন শব্দ প্রচলিত। আলোকতত্ত্বে অনভিজ্ঞগণ সর্ব্বদাই ভাষায় এশব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অতএব "দর্শন" শব্দের অর্থের সঙ্গে আলোকতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃত পক্ষে আলোক-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ দর্শন-ক্রিয়া অস্বীকারই করেন। তাঁহারা নূতন ভাবের অপর একটা কিছুকে "দর্শন" নামে অভিহিত করিতেছেন। সাধারণের ধারণা—চক্ষুর এরূপ একটি ক্ষমতা আছে যে, তাহা জড়কে (matter) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাত করাইয়া দেয়। এই ক্ষমতা-প্রকাশই দর্শন। শিশু যখন প্রথম দর্শন করিতে শিখে, তখন সন্দেহ বলিয়া তাহার নিকট আদবেই কিছু ছিল না। আমাদের নিকটও সাধারণতঃ দর্শনে সন্দেহের একটা কিছু স্থান পায় না। এমন-কি সম্ভব অবস্থায় যে-কোন সন্দেহই দর্শনদ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ দর্শনজাত জ্ঞান সন্দেহের অতীত। এ নিমিত্তই দর্শনশাস্ত্র দর্শন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্যই "অক্ষি" শব্দ হইতে "প্রত্যক্ষ" শব্দের সৃষ্টি। কিন্তু যে দিন প্রথম আলোকতত্ত্ব অবগত হইলাম, সে-দিন হইতে দর্শন সম্বন্ধে সে-ধারণা দমিয়া গেল। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনেক বিধিই আবিষ্কৃত হইতেছে। আলোকতত্ত্বের বিধিও একটি বিধি। অবশ্য অপরাপর বিধির ন্যায় এ বিধিতেও আমাদের আস্থা আছে। কিন্তু তাহা আস্থা মাত্র। "দর্শন লব্ধ বস্তুতে আমাদের আস্থা আছে" বলা চলে না। কারণ, আস্থা মাত্রে কিঞ্চিৎ সন্দেহের শঙ্কা থাকিবেই। বৈজ্ঞানিক বিধি পরিবর্ত্তনশীল। অতএব আলোকতত্ত্ব অনুযায়ী দর্শনে অবস্থার অতিরিক্ত কিছুই নাই। দর্শন দ্বারা বস্তুকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানিতাম। বিজ্ঞান এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষমতা অস্বীকার করিতেছে। বিজ্ঞান বলে, আকাশ-তরঙ্গের আঘাতে পরোক্ষভাবে দর্শন-জ্ঞান জন্মে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরস্পর বিপরীত অর্থে প্রযোজ্য। অথচ বস্তুর উপরে অক্ষি যে-ক্ষমতা প্রকাশে সমর্থ হওয়ায় "অক্ষি" শব্দ হইতে প্রত্যক্ষ শব্দের উৎপত্তি সে-ক্ষমতা সংপ্রতি পরোক্ষ রূপে পরিণত। সুতরাং সে-দর্শন আর এ দর্শন কি প্রকারে একই হওয়া সম্ভব হয়?

তবেই আলোকতত্ত্বের আবিষ্কারে নিম্নলিখিত স্বীকার্য্যে ভ্রম উপলব্ধি করায় সংস্কারের গণ্ডী উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে। দর্শন দ্বারা বস্তুকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যায়

আলোকতত্ত্বে আকাশ নামক একটি পদার্থ পরিকল্পনা (hypothesis) করিয়া তাহার পরিচালনা ঘটিত একটি বিধি গঠিত করা হইয়াছে। অতএব ইহা একটি বিধায়না। ইহাতে উন্মোচনার ভাব আছে এই মাত্র। কিন্তু বিধায়না নির্ণয়ই মুখ্য। এপর্য্যন্ত একমাত্র কোপার্নিকাসের গবেষণাই প্রকৃত পক্ষে উন্মোচনা নামে কথিত হওয়ার উপযুক্ত। তবে আলোকতত্ত্ব আবিষ্কারে দ্বিতীয় বার উন্মোচনায় হস্তক্ষেপ হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়-সাহায্যে প্রাথমিক জ্ঞানের উৎপত্তি। ইন্দ্রিয়-মধ্যে চক্ষুই শ্রেষ্ঠ। অতএব চক্ষু অবলম্বনেই জ্ঞানপথে অধিকতর অগ্রসর হওয়া ঘটে। এনিমিত্তই দৃষ্টিজাত

সংস্কারের উন্মোচনেই উন্মোচনার প্রারম্ভ। আপেক্ষিক ও সার্ব্বভৌম দেশের পার্থক্য দৃষ্টি দ্বারাই তুলনা করা হয়। সত্য বটে, দেশ ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ; কিন্তু জীব তাহার আধারের গতি নিরীক্ষণেই আপেক্ষিক দেশ অনুভব করে। পার্থিব-গতি-জাত আপেক্ষিক দেশ অনুভবে-অসমর্থতা হেতুই পৃথিবীকে অচলা বলিয়া মানবের ধারণা ছিল। কোপার্নিকাস্ এই দৃষ্টিজাত সংস্কারই উন্মোচন করিয়াছেন। এইরূপে প্রথম উন্মোচনায় দৃষ্টি-শক্তিতে দেশ-সংক্রান্ত আপেক্ষিকতা জাত ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে।

সংস্কারের প্রথম গণ্ডী ভ্রান্ত দৃষ্টি হইতে জাত। কিন্তু দ্বিতীয় গণ্ডী দৃষ্টি-ক্রিয়া-সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা হইতে উৎপন্ন। প্রথম স্তরের উন্মোচনায় বাহ্য বস্তুতে দৃষ্টি-জাত ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে দৃষ্টিশক্তিজাত ধারণায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভ্রম প্রদর্শিত হইবে। আলোকতত্ত্বে অবগত হইয়াছি যে, বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি না। পুনশ্চ আকাশ তরঙ্গ বস্তুকে যে-ভাবে অক্ষি-গোচর করায়, তাহাও ভ্রমাত্মক। বস্তুসমূহ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। বর্ণ বস্তুর ধর্ম্মরূপে চক্ষুতে প্রকাশিত। অথচ বর্ণসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর আকাশ-তরঙ্গের পরাবর্ত্তন হইতে উৎপন্ন। আকারের উৎপত্তিও তদ্রূপই। একটা বস্তু দেখিতে সম্পূর্ণ মসৃণ; অথচ তাহার সর্ব্বত্রই সংখ্যাতীত ছিদ্রে পরিব্যাপ্ত। কেবল তাহাই নহে। বস্তু হইতে প্রায় নিয়তই কণারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। পুনরায় নূতন নূতন কণা তাহাতে প্রবেশ করে। এতদবস্থায় বস্তুর পরিবেষ্টন স্থিরতা-বর্জ্জিত অর্থাৎ ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। আকাররূপে যাহা চক্ষে পতিত হয়, তাহা প্রতীত অনুভূতি মাত্র। বস্তুতে এই অনুভূতির অতিরিক্ত কিছুই নাই। কারণ, বস্তু কোন নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী কণারাশির সমষ্টি নহে। সতত পরিবর্ত্তনশীল ঘনীভূত কণারাশি হইতে পরাবর্ত্তিত আলো অক্ষি-পথে প্রবিষ্ট হইয়া যে-মূর্ত্তি উৎপন্ন করে তাহাই বস্তু নামে অভিহিত। স্পর্শাদিও এই মূর্ত্তিকেই অনুভব করায়।

রাসায়নিক সংযোজন (combination) ও বিয়োজনে (decomposition) স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়, আণিম সমূহের বিভিন্ন প্রকারের সমাবেশে (arrangement) বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি ঘটে। অম্লজান ও ওজনের (ozone) ধর্ম্ম-বৈষম্য ইহার উদাহরণ-স্থল। কারণ, ইহারা একই জাতীয় আণিমের সমাবেশে উৎপন্ন।

এসমস্ত আলোচনায় পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন অবস্থায় আকাশ-তরঙ্গের বিভিন্ন প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত চক্ষু-পথে পতিত হইয়া সততই ভ্রমাত্মক অনুভূতি প্রদান করে। ইতস্ততঃ প্রত্যক্ষীভূত বস্তুমাত্রই এক-একটি প্রতীত ভ্রমাত্মক মূর্ত্তি মাত্র। এই ভ্রমাত্মক মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা জ্ঞান-পথে অগ্রসর হই। দর্শন ও বিজ্ঞান ইহারই উপরে স্থাপিত। এই প্রতীতিকে প্রতীতিরূপে অবগত হইয়া প্রকৃতত্ত্বের অনুসন্ধানই উন্মোচনার ক্রিয়া। কিন্তু এখনও দ্বিতীয় স্তরের উন্মোচনার কিছুই হয় নাই। সত্য বটে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। আকাশ-তরঙ্গের পরিকল্পনা তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুত্বের কিরূপে উৎপত্তি? আকাশ-তরঙ্গের প্রকৃত স্বরূপ কি? কি ভাবে ইহার পরাবর্ত্তন ঘটে? সমস্তই আমাদের অপরিজ্ঞাত। মূলকণা, আণিম ও অলক্ষ্যাণিমের আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সমাবেশ সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি।

কোপার্নিকাস্ পার্থিব গতির আবিষ্কার করিলেন। গ্যালিলিও, কেপ্লার ও নিউটন সেই আবিষ্কারের উপরে নির্ভর করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নূতন বিধিসমূহে শৃঙ্খলিত করিলেন। এইরূপে প্রথম স্তরের উন্মোচনায় পার্থিব সচলতা ঘটিত যাবতীয় সন্দেহ মীমাংসিত হইল। পক্ষান্তরে আকাশ ও মূলকণা প্রভৃতি আবিষ্কারের পরে উল্লিখিত প্রশ্নগুলি স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রশ্নসমূহের সম্পূর্ণ মীমাংসা ব্যতীত দ্বিতীয় স্তরের উন্মোচনা পরিসমাপ্ত হইতে পারে না। কোন নির্দ্দিষ্ট বিধির প্রাপ্তিতেই বিধায়ক গবেষণার শেষ হয়। বিধিটি আয়ত্ত করার নিমিত্তই গবেষণা। একটি বিধির সমাধানে নূতন বিধি গঠনের উপকরণ পাওয়া অসম্ভব নহে। তৎ-সাহায্যে নূতন বিধি গঠনের নিমিত্ত গবেষণা চলিয়াও থাকে। কিন্তু প্রত্যেক বিধি গঠনের গবেষণাই পরস্পর

স্বতন্ত্র। গঠনেই তৎসংক্রান্ত অনুসন্ধিৎসার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি। উন্মোচনার অনুসন্ধানে আকাঙ্ক্ষা তত সহজে নিবৃত্ত হয় না। কারণ, বিধায়নায় পরিজ্ঞাত সত্যের সাহায্যেই বিধি গঠিত। সমাধানেই সন্দেহের নিরাকরণ। উন্মোচনায় অপরিজ্ঞাত সত্যে উপস্থিতি ঘটে। তদবস্থায় সন্দেহের প্রাচুর্য্য স্বাভাবিক। সন্দেহ বিশেষের মীমাংসায় সন্দেহান্তর সৃজিত হয়। সমগ্র সন্দেহ সম্যক্ বিদূরণেই উন্মোচনার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা।

উপরে যে-সমস্ত প্রশ্নের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সমাধান করিয়া উন্মোচনা পরিসমাপ্ত করিতে হইলে জড়ে শক্তি-সঞ্চারণ কি প্রকারে সঙ্ঘটিত হয় তাহাতে হস্তক্ষেপ নিতান্তই প্রয়োজন। কারণ, আকাশ-তরঙ্গের পরাবর্ত্তন, অলক্ষ্যান্তিমাদির সমাবেশ প্রভৃতি জড়ের উপরে শক্তির প্রয়োগ মাত্র। এ অবস্থায় জড় ও শক্তির সম্পর্কঘটিত মূল তত্ত্বের অবগতি ব্যতিরেকে এসমস্তের মীমাংসা সম্ভব নহে। শক্তি দ্বারা জড় তাহার গুরুত্ব অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অতএব গুরুত্বের স্বরূপ জানা আবশ্যক। শক্তি ও গুরুত্বের মূলস্বরূপ জানা অর্থ ই, যাবতীয় প্রকারের ঘাতপ্রতিঘাত আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (repulsion) প্রভৃতির মূলে শক্তি-ও গুরুত্ব-ঘটিত যে সম্পর্ক নিহিত আছে, তাহা জানা। প্রথম স্তরের উন্মোচনা আবিষ্কারের পরেই স্যর্ আইজ্যাক্ নিউটন্ এই ঘাতপ্রতিঘাত অবলম্বনে গতি সম্বন্ধীয় তিনটি বিধি এবং আকর্ষণ অবলম্বনে মাধ্যাকর্ষণের অপর তিনটি বিধি গঠন করিয়া নূতন যুগের বিধায়নার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশঃ বৈদ্যুতিকাদি অপরাপর আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের তত্ত্বে তাহা প্রসার লাভ করে। দ্বিতীয় স্তরের উন্মোচনা এই বিভিন্ন জাতীয় বলের মূল সূত্র উদ্ধার সাধন করিয়া ইহাদিগকে সুশৃঙ্খলায় গ্রথিত করিবে।

সঞ্চারিত শক্তি জড়ের উপরে যে-ক্রিয়া সাধন করে তাহাই বল। এই বল জড়ের গতিতে বেগ-(speed) ঘটিত বৈলক্ষণ্যের উৎপাদক। সময়ের পরিমাণ অনুযায়ী গতি-পথ অতিক্রমণে হ্রাস-বৃদ্ধিই বেগ নামে কথিত। এক্ষণে জড় ও শক্তির সঙ্গে সময় ও পথকে পাইতেছি। বল-বিজ্ঞানে (dynamics) সমাধান সৌকার্য্যার্থে জড়ের আয়তন-ঘটিত লঘুত্বের চরম (limit) কণিকা (particle) অবলম্বন করিয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার পথই রেখা (line)। এ অবস্থায় কণিকার সঙ্গে লঘুত্বে, সময়ের চরম ক্ষণ (instant) ও রেখার চরম বিন্দু (point) গৃহীত হয়। বিন্দু রেখার লঘুত্বের চরমে থাকায় ইহা দেশের বিস্তৃতি- (dimension) শূন্যতার চরমে (vanishing point) অবস্থিত।

এখন লঘুত্বের চরমে তিনটি পদার্থ (thing) পাওয়া গেল—কণিকা, বিন্দু ও ক্ষণ। গতি ও বল সহযোগে এই ত্রিবিধ পদার্থ অবলম্বনে যাবতীয় বল-বিজ্ঞানের সমাধান ঘটে। উল্লিখিত ঘাতপ্রতিঘাত-ও আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-ঘটিত তত্ত্বগুলি বল-বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া মূল তত্ত্বে উপস্থিতি নিমিত্ত কণিকা, বিন্দু ও ক্ষণের মৌলিক ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, জড় ও দেশের লঘুত্বের চরম যথাক্রমে কণিকা ও বিন্দু হওয়ায়, কণিকার অবস্থিতি বিন্দু। বল-বিজ্ঞানে কণিকার গতিপথকে রেখা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। গতি অর্থে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন। তদবস্থায় গতিবিশিষ্ট কণিকা গতি-সময়ে বিভিন্ন ক্ষণে গতিরেখার বিভিন্ন বিন্দুতে অবস্থান করে, এইরূপে গতি হইতে কণিকা, ক্ষণ ও বিন্দুর মধ্যে একটা সম্পর্ক পাওয়া যাইতেছে। সমগ্র বল-বিজ্ঞানে এই ত্রিবিধ পদার্থের সম্পর্ক নির্দ্দেশক অপর কিছু নাই। এ অবস্থায় এই গতি বিশ্লেষণ করিয়া মৌলিক তত্ত্বে উপস্থিত হইতে হইবে।

ইউক্লিড্ গতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়াই জ্যামিতিক সমাধানে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে সরল রেখার "অঙ্কন" ও "পরিবর্দ্ধন" এই দুই শব্দে গতি সম্বন্ধীয় ভাব নিহিত আছে। তৃতীয় স্বীকার্য্যের প্রয়োগে সরল রেখার আবর্ত্তন প্রচ্ছাদিত করা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ও অষ্টম প্রতিজ্ঞায় ইউক্লিড একটি স্বীকার্য্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা তাঁহার

স্বীকার্য্যের তালিকার মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই। স্বীকার্য্যটি এই :—

একটি সামতলিক ক্ষেত্রকে অপর একটি সামতলিক ক্ষেত্রের উপর পাতিত করা যাইতে পারে।

এই উপরিপাতন গতি অভাবে সম্ভবে না।

এইসমস্ত স্বীকার্য্য মৌলিকতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মৌলিকতত্ত্ব উন্মোচন নিমিত্ত ইহাদের বিশ্লেষণ আবশ্যক। ইহাদের মূলেই আমাদের ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্য নিহিত। বিশ্লেষণে তাহাও প্রকাশিত হইবে।

স্বীকার্য্যের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা অন্যরূপ। ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ পাঁচটি এই :—

১। যাহারা কোন একটির সমান তাহারা পরস্পর সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

৩। সমান সমান হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান।

৪। যাহারা মিলিয়া যায় তাহারা পরস্পর সমান।

৫। অংশ হইতে সমুদায় বৃহৎ।

ইউক্লিড সমান শব্দের কোন সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। স্বতঃসিদ্ধ কয়টি দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সমানতার সংজ্ঞা যেন ইহাদের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তাহা জানিতে পারিলে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ইহাদের কোন দরকার নাই। স্বতঃসিদ্ধের গঠন এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন তাহার গঠনেই স্বতঃসিদ্ধত্ব ফুটিয়া উঠে। এঅবস্থায় যদি আমরা সমানতা শব্দের কোন সংজ্ঞা দিতে সমর্থ না হই, তবে সমানতা-ধর্ম্ম উক্ত স্বতঃসিদ্ধ কয়টিতে পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন। যে-সমস্ত পরিভাষা লইয়া স্বতঃসিদ্ধ গঠিত হয়, আমরা যদি তাহাদের সংজ্ঞা প্রদানে সমর্থ হইতাম, তবে সংজ্ঞাতেই তাহাদের মৌলিকধর্ম্ম ব্যক্ত হইয়া পড়িত। স্বতঃসিদ্ধগুলি সেই ধর্ম্মের উপরই নির্ভর করিত, সুতরাং তাহারা অপ্রমাণ্য থাকিত না। উক্ত পরিভাষার সংজ্ঞাকরণে অসমর্থতাই স্বতঃসিদ্ধ নিবদ্ধ হওয়ার কারণ। সুতরাং স্বতঃসিদ্ধগুলির উদ্দেশ্য উক্ত পরিভাষাসমূহের ধর্ম্ম ব্যক্ত করা। ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধকয়টি সমানতা অবলম্বনে গঠিত হইলেও তাহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে সমানতা ধর্ম্ম ব্যক্ত করে না। অতএব আমরা ইহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে প্রস্তুত নহি।

যখন ইউক্লিডের তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া জড়-জগতের কারণ-স্বরূপ প্রকৃত স্বতঃসিদ্ধ প্রাপ্ত হইব তখন তথাকথিত স্বীকার্য্যের বিশ্লেষণে অন্তর্নিহিত ভ্রমাত্মক স্বীকার্য্য উন্মোচিত হইবে। তখন উন্মোচনা সংস্কারের দ্বিতীয় অর্গল খুলিয়া দিবে। সদ্য-মুক্ত গবেষণা উন্মোচনা-সুধায় সঞ্জীবিত হইয়া নবীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। নবীন উদ্যমে বিধায়নার প্রসার ঘটিতে থাকিবে। পূর্ব্বতন সন্দেহরাশি মীমাংসিত হইয়া যাইবে। জড় বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের যাবতীয় মুখ্য বিধি সেই নবোদ্ভাবিত স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে প্রাকৃত (pure) গণিতের উপর নির্ভর করিয়াই প্রমাণিত হইবে।

রিক্সওয়ালা

শ্রী সজনীকান্ত দাস

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে। সকাল হইতেই থাকিয়া থাকিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া জনসঙ্কুল সহরের দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। পথিকেরা আকাশের খামখেয়ালীপনায় বিরক্ত হইতেছিল; পথ চলিতে চলিতে বৃষ্টি নামে; কোনো বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় আশ্রয় লইয়া তাহারা কোনো রকমে একটু মাথা বাঁচাইয়া লয়; বৃষ্টি ধরিয়া আসে। ভরসা করিয়া গাড়ী-বারান্দার আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা যেমনি একটু অগ্রসর হয় অমনি আবার এক পশলা বৃষ্টি সুরু হয়।

সমস্ত দিন মেঘ করিয়াছিল; একটানা না হইলেও

বৃষ্টির বিরাম ছিল না; তবুও কেমন একটা গুমোট গরমের ভাপ্‌ সানিতে কলিকাতার সিক্তসন্ধ্যা থম্‌ থম্‌ করিতেছিল। এমন দিনে সাধারণতঃ কেহ ঘরের বাহির হয় না। নেহাৎ প্রয়োজনে ছোট ভাই বিনোদকে সঙ্গে লইয়া ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্‌ ধরিয়া কুমারটুলী অভিমুখে চলিতেছিলাম। তখন বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছে। শীকর-ভারাক্রান্ত বায়ুস্তর ভেদ করিয়া গঙ্গার ওপারের কার্‌খানাগুলির আলো মাতালের চোখের মত ঘোলাটে দেখাইতেছিল; ল্যাম্প-পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ-পোষ্টগুলির গায়ে কিম্বা টেলিগ্রাফের তারে তারে সঞ্চিত জলের উপর গ্যাসের আলো পড়িয়া চক্‌ চক্‌ করিতেছে। পথে লোকজন বা যানবাহনাদির বিশেষ বালাই ছিল না; কচিৎ কদাচিৎ এক-আধখানা ট্যাক্‌সি কিম্বা ছ্যাক্‌রা গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে কাদা ছিটাইয়া ছুটিতেছিল;—দূরে একখানা রিক্স ঠুন্‌ ঠুন্‌ ঘণ্টা বাজাইয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে; পিছনের আলোটি চোখের সম্মুখে একটি লাল রেখা টানিয়া দিতেছে।

বৃষ্টির ভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিলাম। নিমতলা পার হইতেই বেশ সমারোহ-সহকারে বৃষ্টি সুরু হইল; একটি গাছতলা আশ্রয় করিয়া কোনো রকমে মাথা রক্ষা করিতেছি, দেখি সেই রিক্সওয়ালা বিশেষ শ্রান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল। রিক্সখানা খালি। রিক্সওয়ালা সম্ভবতঃ বহুদূরের সোওয়ারী লইয়া তাহাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া ফিরিতেছে।

বৃষ্টি থামিবার গতিক দেখিলাম না। তবু ভাল; একখানা রিক্স পাওয়া গেল। এই সামান্য পথটুকু—ক' পয়সাই বা দিতে হইবে। পরিশ্রান্ত রিক্সওয়ালা ততক্ষণে মুখ মাথা মুছিয়া সুস্থ হইয়াছে। কথাকথি করিয়া দুই আনা ভাড়া স্থির হইল। বিনুকে উঠাইয়া দিয়া নিজে উঠিতে যাইতেছি, রিক্সওয়ালা বলিল, 'হুজুর, দু'জনকে পার্‌ব না।' বলিলাম, "সে কি রে, এই রোগা রোগা দু'জন লোক, আর কতটুকুই বা রাস্তা!" "আজ্ঞে না, হুজুর, পার্‌ব না।"একটু আশ্চর্য্য হইলেও চটিয়া গেলাম। বলিলাম, "দুনিয়া শুদ্ধ লোক দু'জন তিনজন লোক নেয়। তুই ব্যাটা নিবি না কেন?—অমন ষাঁড়ের মত শরীর তোর—" "শকেগা নেহি বাবু" বলিয়া সে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বৃক্ষতল ছাড়িয়া গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমন শক্ত-সমর্থ লোকের ব্যাকুলতাপূর্ণ 'শকেগা নেহি' শুনিয়া মনটা নরম হইল। তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা অদ্ভুত শঙ্কা ও কাতরতা মাখানো ছিল যে, আমার মন অসোয়াস্তিতে ভরিয়া গেল।

বৃষ্টি আর গাছের পাতার আচ্ছাদন মানিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলাম। রিক্সওয়ালা তখন কিছুদূর চলিয়া গিয়াছে। হাঁকিয়া বলিলাম, দশ পয়সা দিব। সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল এবং পর মুহূর্ত্তেই গাড়ী লইয়া দৌড়াইতে সুরু করিল।

বহুদূর হইতে রিক্সখানার ঠুন্‌ ঠুন্‌ আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল; পিছনের লাল আলোটি তখনো বর্ষাস্নাত অন্ধকার পথে একটি গতিশীল সিঁদুর টিপের মত দেখাইতেছিল।

সিক্তদেহে পথে নামিয়া পড়িলাম। সেদিন শ্রাবণ-নিশীথিনীর গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া একটি কঠোর মুখের মলিন বেদনাকাতর দৃষ্টি আমার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল।

* * *

কিছুদিন পরের কথা। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ পিক্‌চার প্যালেসে ছবি দেখিয়া একটি পরিচিত লোকের অপেক্ষায় হগ্‌-সাহেবের বাজারের কোণে দাঁড়াইয়া ছিলাম। হঠাৎ এক রিক্সওয়ালার সহিত দুই বিপুলকায় মাড়োয়ারীর বিশুদ্ধ হিন্দিতে বচসা হইতেছে শুনিতে পাইলাম। মাড়োয়ারীযুগলের গলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য একটু ঔৎসুক্য হইল। কাছে গিয়াই দেখি, ষ্ট্র্যাণ্ড্‌ রোডের সেই রিক্সওয়ালা। বচসার কারণ—সে দুইজনকে লইতে পারিবে না। ওই দুইটি বিপুলকায় বস্তাকে একসঙ্গে গাড়ীতে উঠিতে দিতে যে-কোনো রিক্সওয়ালার আপত্তি হইতে পারিত এবং তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, সেই লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। মাড়োয়ারী দুইজন অন্য যানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। রিক্সওয়ালাকে পরীক্ষা করিবার কৌতূহল হইল। তাহার সহিত ভাড়া স্থির করিয়া

তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলিলাম—আমার আর-একজন সঙ্গী আছে। করুণ ভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে আমাকে অন্য গাড়ী দেখিতে অনুরোধ করিল—দুইজনকে সে লইতে পারিবে না। আমি এতদূর বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম যে, বন্ধুর অপেক্ষা না করিয়াই রিক্সতে চড়িয়া বসিলাম।

সেদিনও আকাশ ব্যাপিয়া মেঘ করিয়া আসিতেছিল; ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন ও বিদ্যুৎচমকে কলিকাতার চঞ্চল আকাশ স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় রাস্তায় লোক-চলাচল অনেকটা কম। রিক্স-ওয়ালাকে তাড়া দিলাম—অবিলম্বে বৃষ্টি নামিবে—শীঘ্র বাড়ী পৌছান চাই। জোরে টানিতে গিয়া রিক্সওয়ালা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল; অবাক্ হইলাম। আমার মত ক্ষীণকায় পুরুষকে টানিতে এতটা পরিশ্রম হইবার কথা নয়। আগের দিনের মত একটা অজানা অস্বস্তিকর অনুভূতি মনে জাগিতে লাগিল। অমন বিপুলকায় একটা লোক আমার মত একটি সামান্য বোঝাকে টানিতে পারিতেছে না, ইহার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না; একটা অস্পষ্ট অলৌকিক ভয় মনকে পীড়া দিতে লাগিল।

বেচারার দুরবস্থা দেখিয়া মায়া হইল; শুধু বোঝা টানার পরিশ্রম ছাড়াও অন্য কোনো যন্ত্রণা তাহার হইতেছিল তাহারও আভাস পাইতেছিলাম। নানা কল্পনা করিয়া কোনো কিনারা করিতে পারিলাম না। তাহাকে যথেচ্ছ রিক্স টানিতে বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম। কৌতূহল-নিবৃত্তি করিবার যথেষ্ট ঔৎসুক্য হওয়া সত্ত্বেও চুপ করিয়া কি ভাবে কথাটা পাড়িব ভাবিতে লাগিলাম।

হঠাৎ চড়্ বড়্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। রিক্সওয়ালা চকিত হইয়া উঠিল। একটা বাড়ীর গাড়ীবারান্দার ধারে আসিয়া তাহাকে থামিতে বলিলাম। দু'জনে গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া মাথা মুছিয়া বৃষ্টি থামিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

রিক্সওয়ালাকে একটা সিগারেট দিলাম। সে বিনীত সেলাম করিয়া সিগারেট লইয়া ফুটপাতের উপর উবু হইয়া বসিয়া সিগারেট ধরাইল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনের অদম্য কৌতূহল আমাকে ভিতর হইতে ঠ্যালা দিতে লাগিল, কিন্তু পাছে বেফাঁস কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলি—এই ভয় হইতে লাগিল। তাহার নাম কি, কোথায় থাকে, তাহার কে আছে এগুলি বেশ সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম। তাহার নাম মকবুল, হাতীবাগানের বস্তীতে থাকে, এক বৃদ্ধা ফুফু ছাড়া তাহার কেহ নাই; শিশু অবস্থা হইতেই সে পিতৃমাতৃহীন—ফুফুর হাতেই সে মানুষ হইয়াছে। বিবাহ হইয়াছে, কি না জিজ্ঞাসা করাতে সে গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—বাবু, যে-বোঝা তাহাকে নিরন্তর টানিয়া বেড়াইতে হইতেছে তাহা লইয়াই সে অস্থির—ইহার উপর জরুর বোঝা বহিতে সে অক্ষম। বলিলাম—বুড়ী ফুফু ছাড়া তাহার কেহ নাই, অথচ অহরহ বোঝা বহিতে হইতেছে, ইহার অর্থ ত বুঝিলাম না। মকবুল্ চুপ করিয়া রহিল। আমি তাহাকে চিন্তা করিবার অবসর না দিবার জন্য বলিলাম—একটা বিষয়ে আমার ভারী কৌতূহল আছে। কিছুকাল আগে নিমতলাঘাটের কাছে তাহাকে দেখিয়াছিলাম—আজও দেখিলাম;—দুই দিনই সে একজনের অধিক সোওয়ারী লইতে অস্বীকার করিয়াছে অথচ সে দুর্ব্বল নয়। ইহার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তাহা হইলে—

মকবুল চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ হইয়া গেল। হাত দিয়া মাথার রগ টিপিতে টিপিতে সে বলিল—বাবু সে বড় ভয়ানক কথা। যে-কথা মনে হইলেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, তাহার বুকের তাজা রক্ত হিম হইয়া যায় মুখে সে-কথা সে প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া।

বলিতে বলিতে সে সভয়ে রিক্সখানির দিকে চাহিল। কি যেন একটা ভয়াবহ কিছু দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া তেরপলের পরদা দিয়া রিক্সখানি মুড়িয়া ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল। তখনও ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-ঝলকে কি যেন একটা অনন্ত রহস্যের ক্ষণিক আভাস মাত্র পাইতেছিলাম; জলভারাক্রান্ত বাতাস কলিকাতার

পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত একটা একটানা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিতেছিল। রাস্তায় জনমানবের চিহ্ন ছিল না।

তাহাকে আর-একটা সিগারেট দিয়া আমি তাহার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলাম। কি যেন একটা অজানা ভয়ে আমার মনও পীড়িত হইতে লাগিল। ব্যাপারটা আগাগোড়া এমন অস্বাভাবিক—মাঝে মাঝে সমস্তটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলাম; কিন্তু সম্মুখে উপবিষ্ট বিস্কুট-ওয়ালার অস্বাভাবিক-দীপ্তি-সম্পন্ন চোখদু'টি আমার মনে এক অলৌকিক ভয় জাগাইতেছিল—আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

কিন্তু এভাবে বসিয়া থাকা চলে না—বাড়ী যাইতে হইবে। এব্যাপারটা সম্বন্ধে বিস্তারিত না জানিয়াও যাওয়া যায় না। বলিলাম, মকবুল, এসব কথা ভাবিতে যদি তোমার বিশেষ কষ্ট হয় কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই—বৃষ্টি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, এখন যাওয়া যাইতে পারে।

সজোরে আমার পা দুইটি চাপিয়া ধরিয়া অধীরভাবে সে বলিয়া উঠিল—আর একটু দাঁড়ান বাবু। যে-কথা তিন বছর ধরিয়া বলিবার জন্য আমি ব্যাকুল—অথচ কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না—আজ আমাকে বলিতে দিন; এ যন্ত্রণা সহিতে আর পারিতেছি না।

নিবিড় সহানুভূতিতে চিত্ত ভরিয়া গেল। ভুলিয়া গেলাম, আমি মকবুল অপেক্ষা সামাজিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ লোক; তাহার সহিত এভাবে কলিকাতার রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়াইয়া আলাপ করা আমার পক্ষে হীনতাসূচক! সেই ব্যথাক্লিষ্ট মানুষটির গোপন কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

মকবুল অতি ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া হিন্দি-মিশ্রিত বাঙলায় যাহা বলিল এবং যাহা বলিল না—সবটুকু মিলিয়া যাহা বুঝিলাম তাহাই ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি। মকবুল বলিল—বাবু, আমি আপনাকে ব্যাপারটা ঠিক বুঝাইতে পারিব কি না জানি না। ঘটনাটা এমন অসম্ভব আর এম্নি ভয়াবহ যে, বিশ্বাস করা কঠিন! কিন্তু খোদার কসম বাবু আমি একটিও মিথ্যা বলিব না! আমি আজ তিন বৎসর ধরিয়া এই গাড়ীতে এক মৃতদেহের বোঝা টানিয়া বেড়াইতেছি। একজনের অধিক লোককে গাড়ীতে উঠিতে দিতে পারিব কেমন করিয়া? আর একজন যে নিরন্তর আমার গাড়ীতে বসিয়া আছে! তাহার নড়িবার শক্তি নাই—আমি তাহাকে বহন করিয়া লইয়া ফিরিতেছি। ইহার হাত হইতে আমার নিস্তার নাই। মৃতদেহ পচিয়া ভারী হইয়া গিয়াছে; আমি অহরহ দুর্গন্ধে অস্থির হইতেছি। মৃতদেহের ভার টানিয়া টানিয়া আমার সবল দেহ জীর্ণ হইয়া আসিল—এই অদৃশ্য শবদেহের ভারে আমি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি—আমি আর বাঁচিব না বাবু।

মনে হইল, উপকথা শুনিতেছি; মনে হইল, কলিকাতার আবেষ্টনী ধোঁয়া হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। এক জনশূন্য মরুভূমির মাঝে আমরা দুইজনে পড়িয়া আছি। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আমার সমস্ত চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইল। আমি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম—

তিন বছর আগেকার কথা। সেদিন প্রবল বর্ষণে কলিকাতা সহর ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল। রাত্রি নটা দশটার সময় আমি এই গাড়ীখানা লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে সোওয়ারীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। সেখানে দুই চার খান মাত্র গাড়ী ছিল; লোকের ভিড় ছিল না বলিলেই হয়; অমন দিনে সাধারণতঃ কুকুর-বিড়ালেরাও বাড়ীর বাহির হয় না; কিন্তু অভাব যাহাদিগকে পীড়া দেয় তাহারা কুকুর-বিড়ালেরও অধম। আমি বিবাহ করিবার লোভে অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলাম। বহিঃপ্রকৃতির সহস্র বাধাও আমার সঙ্গিনীপিয়াসী মনকে দমাইতে পারে নাই। বিবাহ করিবার কি অদম্য স্পৃহা আমার ছিল বাবু তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না—নহিলে অমন দিনে মানুষে বাহির হয় না। আজ বিবাহ করিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি আমার নাই; প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিতেছে; আমি আর বেশীদিন বাঁচিলে পাগল হইয়া যাইব। শুধু ফুফুর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি; সে আমার এই অবস্থার কথা জানিতে পারিলে কষ্ট পাইবে।

মনসা

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

মকবুল আবার চুপ করিল। যাহা শুনিতেছিলাম তাহার পরিষ্কার ধারণা করিবার মত শক্তি আমার ছিল না। জলের ঝাপ্‌টা লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল; অন্ধকার আকাশে তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে লাগিল।—কলিকাতার ঘরবাড়ী লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে; আকাশের নীচে গ্যাসের স্তিমিত আলোকে আমরা দুইটি প্রাণী এক অজানিত রহস্যলোকের দ্বার উন্মোচন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছি।—

সোওয়ারী জুটিল দুইজন। প্রচুর ভাড়া চাহিলাম, তাহারা তাহাতেই স্বীকৃত হইল। দুইজনের কেহই প্রকৃতিস্থ ছিল না,—একজন নেশায় একেবারে চুর হইয়াছিল—অন্য জনের তখনো হুঁস ছিল। এই ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির মাঝে বাগবাজার পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।

সোওয়ারী দুইজন ভিতরে বসিল। আমি ভাল করিয়া তেরপল মুড়িয়া দিলাম।

গঙ্গার ধারে ধারে সোজা উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম; দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা পানের দোকানে এক উড়িয়া বামুন সুর করিয়া কি পড়িতেছিল। রাস্তায় এখানে-ওখানে দুই একজন লোক চলিতেছিল; গাড়ীঘোড়া একেবারেই ছিল না। আমি নির্ব্বিঘ্নে পথের মাঝখান দিয়া রিক্স টানিয়া লইয়া চলিলাম। কুমারটুলীর কাছাকাছি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কতদূর যাইতে হইবে, উত্তর পাইলাম, "সিধা চালাও।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। পরিশ্রমে আর ক্লান্তিতে ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। মনে হইতেছিল, আর টানিতে পারিব না। এমন সময়ে পরদা ঠেলিয়া এক বাবু আমার হাতে পয়সা দিয়া এক বাক্স সিগারেট আনিতে বলিলেন। এক গাছতলায় গাড়ী রাখিয়া সিগারেট আনিতে গেলাম। কাছাকাছি দোকান ছিল না। এদিক-ওদিক ঘুরিয়া একটি বিড়ির দোকানের সন্ধান পাইলাম। সিগারেট কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাঁকিয়া বাবুদের সিগারেটের বাক্সটা লইতে বলিলাম। কেহ উত্তর দিল না। ভাবিলাম, মাতাল বাবুরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তেরপলের পরদা তুলিয়া সিগারেট দিতে গিয়া-এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম।—বাবু, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার জীবনের সমস্ত শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে; কাহার পাপের বোঝা মাথায় লইয়া আমি আজ তিন বৎসর কাল প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ফিরিতেছি জানি না; আর কতকাল এযন্ত্রণা সহিতে হইবে খোদাতাল্লাই বলিতে পারেন!

সামান্য আলো আসিতেছিল; দূরে গ্যাসপোষ্ট। গাছের তলে বেশ একটু অন্ধকার; বৃষ্টির বিরাম ছিল না। পর্দা তুলিয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম, গাড়ীতে একজন মাত্র লোক—মুখ বাঁধা—বুক দিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতেছে—সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। প্রাণ আছে বলিয়া মনে হইল না; কেমন করিয়া কি হইল প্রথমটা কিছু ঠাহর করিতে পারিলাম না; বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া আসিল; মনে বিষম ভয় হইতে লাগিল; চোখের সম্মুখে ফাঁসী-কাষ্ঠের ভয়াবহ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে যে চাপিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার কথা কে বিশ্বাস করিবে?—

বুঝিলাম, অন্য লোকটি মুখ বাঁধিয়া ছোরার আঘাতে এই লোকটিকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে। তাহাকে ধরিবার কোনো উপায় নাই; তাহার চেহারাটাও মনে আসিল না।

লোকটা নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে; গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম—তখনও গরম। ভাবিলাম—কোনো হাসপাতালে লইয়া যাই—চীৎকার করিয়া লোক জড় করি, কিন্তু সাহস হইল না। তাজা খুন দেখিয়া ভয়ে আমি তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য—আত্মরক্ষা করার কথাটাই আমার প্রথমে মনে হইল, সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া মৃত বা মরণাপন্ন দেহটি সেই বৃক্ষতলে ফেলিয়া রাখিয়া গাড়ী লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম।

কেমন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, কেমন করিয়া সেই রাত্রিতেই গাড়ীখানি ধুইয়া মুছিয়া আস্তাবলে রাখিলাম, আমার কিছুই স্মরণ নাই। তার পরে সাত আট দিন ধরিয়া আমি দারুণ জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া ছিলাম। ফুফুর মুখে শুনিয়াছি সে কয় দিন আমি খুন রক্ত ফাঁসী ইত্যাদি সম্বন্ধে ভুল বকিয়াছিলাম।

সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পরও গাড়ী লইয়া বাহির হইতে সাহস হইতেছিল না; গাড়ীখানির দিকে নজর দিতেও ভরসা পাইতেছিলাম না—কিন্তু পেট ত চালাইতে হইবে। আবার একদিন সকালে মনের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া গাড়ীখানি বাহির ক'রতে গেলাম। গাড়ীতে হাত দেওয়ামাত্র মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। রক্তের চিহ্নমাত্র ছিল না, তবু যেন রক্ত দেখিতে পাইলাম। মনের দুর্ব্বলতা জোর করিয়া উড়াইয়া দিয়া গাড়ী লইয়া বাহির হইলাম। সোয়ারী জুটিল। মাঝে মাঝে গা ছম্ ছম্ করিতেছিল বটে, কিন্তু দিনের আলোয় লোকের ভিড়ে সে-ভাব বেশীক্ষণ মনে থাকিতে পায় নাই। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল অন্যায় করিয়াছি—হয়ত লোকটা বাঁচিতে পারিত। বিপদের ভয় না করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ কোনো হাসপাতালে তাহাকে লইয়া যাইতাম হয়ত সে বাঁচিয়া উঠিত। লোকটা যদি মরিয়াই থাকে—নিজেকে তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল—সে-ভাবটাও কাটাইয়া উঠিলাম—কে জানে পরের দিকে নজর দিতে গিয়া হয়ত মহা ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইতাম। বাঁচিবার নসীব থাকিলে সে এমনই বাঁচিবে! এইভাবে নানা মানসিক দ্বন্দ্বে প্রথম দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

সমস্ত রাত্রি কেমন যেন একটা অশান্তিতে কাটিল; ঘুমাইতে পারিলাম না! ভয় হইল, আবার বুঝি জ্বর হইবে। সেই রক্তাক্ত দেহ মুখ-বাঁধা লোকটিকে যেন চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম! মাথা গরম হইয়াছে ভাবিয়া চোখে মুখে জল দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম—ঘুমও আসিল। কিন্তু ভোর-বেলায় আবার তাহার স্বপ্ন দেখিয়া ভীষণ ভয়ে ঘুম ভাঙিয়া গেল! সে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া আমার কাণে বলিয়া গেল—তুই আমাকে খুন করিয়াছিস্—! আমি আল্লা নাম স্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

সে-দিন গাড়ী লইয়া বাহির হইতে যাইব—মনে হইল কে যেন আমার পাছু লইয়াছে, পিছনের পথের উপর যেন রক্তের দাগ দেখিলাম। হায় আল্লা! একি হইল! কাহার পাপের বোঝা কাহার ঘাড়ে চাপাইলে তুমি! আমি যেখানে যাই সেখানেই যেন কোনো অদৃশ্য কেহ আমার পাছু লইতে লাগিল। ভাবিলাম, আমি কি পাগল হইয়া গেলাম!

বুঝিলাম আমাকে ভূতে পাইয়াছে। ওঝার কাছে গেলাম; সে অনেক ঝাড়ফুঁক করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; সে আমার পাছু ছাড়িল না।

মকবুল্ চুপ করিয়া গামছা দিয়া কপালের ঘাম মুছিল। আমার কাছে একটা সিগারেট লইয়া সেটা ধরাইয়া আবার বলিতে লাগিল—

দুই একদিন পরে সন্ধ্যার সময় হেদুয়ার মোড়ে দাঁড়াইয়াছিলাম, এমন সময়ে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য গাড়ীখানা তেরপল মুড়ি দিতে যাইতেছি দেখি পিছনে পিছনে কে যেন আসিতেছে! ফিরিয়া তাকাইলাম, কেহ নাই। তাড়াতাড়ি গাড়ীখানা ঢাকিয়া বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা হইল। গাড়ীর ছপ্পর হইতে পর্দাখানা ফেলিতে যাইব দেখি গাড়ীর ভিতরে সে বসিয়া—মুখ বাঁধা—বুক দিয়া রক্ত গড়াইতেছে! ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পর্দা ফেলিয়া দিয়া মূর্চ্ছিতের মত সেখানে বসিয়া পড়িলাম।

আমার এই অদ্ভুত যন্ত্রণার কথা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব, বাবু? আপনি কি বু'ঝতে পারিবেন? গাড়ীর ভিতর রক্তাক্তকলেবরে সে নিশ্চয়ই বসিয়া আছে! সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত সে ওই গাড়ীতে বসিয়া আছে; আমার পিছনে আর তাহাকে দেখি না—সে নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ীতে বসিয়া থাকে, আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়াই!

মকবুল চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—

বাবু, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ওই মড়ার বোঝা আমি টানিয়া ফিরিতেছি। একজনের অধিক সোওয়ারী তাই আর টানিতে পারি না। মড়া প'চিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে; আমাকে তাহাই সঙ্গে করিয়া ফিরিতে হইতেছে; অথচ আল্লার দোহাই বাবু ওই লোকটার মৃত্যুতে জ্ঞানতঃ আমার কোনো অপরাধ নাই!

আমি ওই নিরক্ষর লোকটিকে কি সান্ত্বনা দিব! চুপ করিয়া রহিলাম।

বাবু, বোঝা সব সময়েই বহিতে হয়, কিন্তু বর্ষারাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে ওই মৃতদেহ আমি দেখিতে পাই না। দেখিয়া দেখিয়া বোঝা টানিয়া টানিয়া অনেকটা সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও মাঝে মাঝে ভয় পাইয়া উঠি। ভিতরে ভিতরে আমার শরীর জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা আমি আর বেশীদিন সহ্য করিতে পারিব না।

এই গাড়ীখানি ছাড়িয়া দিবার সামর্থ্য আমার নাই, বাবু—এক অদৃশ্যশক্তি আমাকে ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছে; আমি তাহার কাছে সম্পূর্ণ শক্তিহীন। আজ তিন বৎসর ধরিয়া আমার এই ভীষণ কর্ত্তব্য আরম্ভ হইয়াছে; কবে শেষ হইবে এক খোদাতালাই বলিতে পারেন!—

মকবুল উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে বাবু, আপনি গাড়ীতে বসুন! আমি পরদিন তাহাকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিব কি না ভাবিতে ভাবিতে গাড়ীর নিকট গেলাম। মকবুল মুখ ফিরাইয়া কম্পিত হস্তে পর্দাখানি তুলিয়া ধরিল। আমি ভিতরে বসিতেই সে পর্দাখানি ফেলিয়া দিয়া গাড়ী টানিতে সুরু করিল।

পর্দা-ফেলা অন্ধকার রিক্সখানির ভিতর বসিতেই আমার গা ছমছম করিতে লাগিল; আমিও যেন আমার অত্যন্ত গা ঘেঁসিয়া এক অদৃশ্য রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম; একটা পচা দুর্গন্ধও নাকে আসিতে লাগিল। সভয়ে পর্দা তুলিয়া ফেলিয়া মকবুলকে রিক্স থামাইতে বলিয়া বলিলাম—আমার বাড়ী বেশী দূর নয়, আমি হাঁটিয়াই যাইতে পারিব। রিক্সখানির ভিতরে চাহিবার আর সাহস হইল না।

মকবুল বুঝিল। একটু শীর্ণ হাসি হাসিয়া গাড়ীখানি তুলিয়া ধরিয়া মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। আমি সেখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। রিক্সখানির দিকে চাহিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত আমার হইল না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রিক্সখানির ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। সে-রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না।

আমেরিকায় অপরাধ-প্রবণতা

শ্রী প্রভাত সান্যাল

আমেরিকা অন্যতম পাশ্চাত্য সভ্য জাতি। আমেরিকান্‌রা সাধারণতঃ মনে করে যে, তাহারাই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ। প্রাচ্য জাতিদের উপর তাহাদের অবজ্ঞা সুবিদিত। প্রাচ্যের অধিবাসী, বিশেষতঃ এশিয়াবাসীরা, তাহাদের মতে নৈতিক হিসাবেও সভ্যতায় নিকৃষ্ট স্থানীয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে সেই অজুহাতে আমেরিকাতে এশিয়ার লোকদের জন্য দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। সেখানে এশিয়াবাসীরা নাগরিকের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

অপরাধ-প্রবণতা হিসাবে আমেরিকার লোকেরা খুব নিকৃষ্ট। যদি অপরাধ প্রাবল্যই বর্ব্বরতার এবং অসভ্যতার মাপকাঠি হয়, তবে আমেরিকান্‌রা বর্ব্বর এবং অসভ্য।

অপরে নিকৃষ্ট হইলেই যে, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আমাদের নাই। কিন্তু আমেরিকান্‌দের যে অপরকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা এই প্রবন্ধ সংকলন করিলাম।

আমেরিকার একজন বিজ্ঞ রাষ্ট্রনীতিবিৎ সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে,আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই এক হিসাবে

জগতের অপরাধের প্রধান কেন্দ্র ("the United States is the most crime-bent nation in the world")। সত্য সত্যই সেখানে অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ-সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের মর্ডান্ রিভিয়ু পত্রিকাতে প্রকাশিত ডাক্তার সুধীন্দ্র বসুর প্রবন্ধ হইতে আমরা এইরূপ কয়টি অপরাধের নমুনা দিতেছি :—

(১) স্ত্রী স্বামীকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়াছে, কারণ, তাহার নামে স্বামী যে ত্রিশ হাজার টাকার জীবন-বীমা করিয়াছেন তাহা তাহার খুব জরুরী দর্কার। বীমার সর্ত্ত ছিল: যে, স্বামী শান্তভাবে নিজের শয্যায় প্রাণত্যাগ করিলে স্ত্রী মাত্র ১৫ হাজার টাকা পাইবে, কিন্তু যদি তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হয়, তবে স্ত্রী তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ত্রিশ হাজার টাকা পাইবে। বিচারে জুরীরা শেষোক্ত প্রকার মৃত্যু বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) আইওয়াতে একজন মাতা তাহার ১৫ দিন বয়স্ক শিশুর গলা ক্ষুর দিয়া কাটিয়া হত্যা করিয়াছে, কারণ, শিশু কাঁদিয়া মাতাকে বিরক্ত করিত।

(৩) মেসাচুসেট্স্ সহরের সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য একটি পার্কে একটি সভার অধিবেশন হইতেছিল। কতকগুলি সহরবাসী মতলব করিল, সভা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। দুই পক্ষে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইট-পাটকেল, পচা ডিম, বন্দুকের গুলি সবই উভয় পক্ষ হইতে চলিল। পুলিশ শান্তি স্থাপন করিতে পারিল না। পুলিশের কর্ত্তার রিভলভার, হাতকড়ি ইত্যাদি কাড়িয়া লওয়া হইল এবং বহু পুলিশ বন্দুকের গুলিতে জখম হইল।

(৪) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি বড় ঘরের ছাত্র একটি "পূর্ণাঙ্গ অপরাধ" (perfect crime) করিতে সঙ্কল্প করিল। তাহারা একটি ছোট ছেলেকে প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের মোটর-গাড়ীতে লইয়া গেল। পথিমধ্যে ধীরভাবে হাতুড়ি দিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং হতভাগ্যের মৃতদেহ রাস্তার একটি পুলের নীচে ফেলিয়া রাখিল।

(৫) ওহিওতে একটি স্ত্রীলোক তাহার ছয় সপ্তাহের শিশুকে জলের টবে ফেলিয়া সেই জল আগুনে চাপাইয়া দিল। কয়েক ঘণ্টা পরে শিশুর পিতা বাড়ী ফিরিয়া দেখেন, শিশুটি গরম জলে সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

(৬) যুদ্ধ-প্রত্যাগত একটি যুবক সৈনিক ইলিনয়্‌তে তাহার বাড়ীতে আসিয়া বৃদ্ধ পিতাকে দেখিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গীনের অগ্রভাগ বৃদ্ধের দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহাকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল।

(৭) দুইটি যুবতী পিস্তল লইয়া পশ্চিম ডাকোটা সহরের একটি ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিল। একজন খাজাঞ্চির মাথার নিকট গুলি-ভরা পিস্তল উঁচাইয়া ধরিল অপরজন ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি হাতাইতে লাগিল। কাজ হাসিল করিয়া তাহারা মোটরে চড়িয়া উধাও হইল।

(৮) নিউইয়র্ক সহরের একটি লোক হাতুড়ির আঘাতে একজন যুবতীর মাথা ভাঙ্গিয়া দিল, কারণ, সে তাহার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে বসবাস করিতে অসম্মত। হাতুড়ীর আঘাতে স্ত্রীলোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে লোকটি তাহাকে সিঁড়ির নীচে আনিয়া জলন্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করিল এবং ঐ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। হতভাগিনী প্রায় জীবন্ত অবস্থায় চুল্লীতে পুড়িয়া ছাই হইল।

এইরূপ বীভৎস অপরাধ ঘটিতে দেখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক-সহরের দায়রা-বিচারপতি মিঃ আল্‌ফ্রেড্ ট্যালী (Alfred J. Talley) বলিয়াছেন, "অতিরিক্ত অপরাধ-প্রবণতার অভিযোগে আজ যুক্তরাষ্ট্র জগতের সমক্ষে অপরাধী। বর্ত্তমানে তাহার আর এ অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, লোক-সংখ্যার অনুপাতে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান বা অন্য সুসভ্য দেশ হইতে বেশী অপরাধ-প্রবণ।

চোর, ডাকাত, দাঙ্গাবাজ ও ইতর প্রকৃতির লোকের দৌরাত্ম্য সেখানে ভয়ানক। তামাকের পাইপ অথবা স্ত্রীলোকদের পাউডারের কৌটার মতন রিভলবার সেখানকার লোকের একটি অপরিহার্য্য সঙ্গী।

লোকসংখ্যা অনুপাতে শিকাগো সহর আমেরিকায়

দ্বিতীয় এবং সমস্ত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সেখানে প্রতিদিন গড়ে একটি করিয়া খুন হয়। সুতরাং শিকাগো এক হিসাবে শুধু আমেরিকার নয়, খ্রীষ্টিয়ান্ জগতের পাপের রাজধানী।

নানা প্রকারের অপরাধের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে আমেরিকাই পৃথিবীর অগ্রণী। অপরাধের একটি প্রবল বন্যা গত ২৫ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আমেরিকার প্রুডেন্সিয়াল ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানীর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফ্রেডারিক হফ্‌ম্যান হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, গত ২৪ বৎসরে আমেরিকাতে খুনের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে প্রায় ৪ হাজার আমেরিকান্ প্রাণ দিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পর প্রত্যেক বৎসর আমেরিকায় উহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক খুন হইতেছে। আমেরিকায় প্রায় প্রতিবৎসর ১১ হাজার খুন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে গত কয়েক বৎসরে গড়ে প্রতি হাজারে ৮০ হইতে ১০০ জন খুন হইয়াছে। কিন্তু জাপান, আর্য্যল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, গ্রেট্ ব্রিটেন, সুইট্‌সারল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে ঐ গড় হাজার-করা মাত্র ৩ হইতে ৯। ডাক্তার হফ্‌ম্যানের মতে "আমাদের (আমেরিকান্‌দের) জাতীয় জীবন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিই, কোন সময়ে কোন স্থানে নিরাপদ নহে। এখানে এমন নিষ্ঠুরভাবে অথচ আশ্চর্য্য কুশলতার সঙ্গে খুন-জখম আরম্ভ হইয়াছে যে, অপরাধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গা-ঢাকা দিতেছে।"

অপরাধীর হাতে ধর্ম্ম ও আইন কর্ত্তাদের নাকাল

আমেরিকায় মোটরে হতাহতের সংখ্যাও কম নয়। যুক্তরাষ্ট্রের এসোসিয়েটেড্ প্রেস ১৯২৩ সালের মোটর দুর্ঘটনার যে-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, সেখানে প্রতি ঘণ্টায় দুইজন করিয়া লোক মোটর দুর্ঘটনার ফলে মারা যায়। নিউ ইয়র্ক সহরে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০ শিশু মোটর চাপা পড়িয়া মরে। শিকাগোতে ২৫০ জন শিশুর ঐ কারণে অকাল মৃত্যু হয়। এই হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০০ নিরপরাধী শিশুর মোটর-দুর্ঘটনায় প্রাণবিয়োগ ঘটে। তাই নিউ ইয়র্ক্ নেশন কাগজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "যদি প্রতি বৎসর ১০০০ নিরপরাধ শিশু তুর্কীদের দ্বারা হত হইত তবে কি লোকে এইরূপ চুপ করিয়া থাকিত?" কিন্তু মোটর-বিলাসীদের এদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

সমিতি হিসাব দাখিল করিয়াছেন যে, ১৯২২ সালে এক বৎসরে আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলিতে প্রায় ৫ শত রাহাজানি হইয়াছে এবং তাহার ফলে ৩৬৭৩৪৬৭৲ টাকা চুরি গিয়াছে।

আমেরিকার লিঞ্চিং রীতির কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই নিষ্ঠুর রীতি অনুসারে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদিগকে সামান্য অপরাধে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা যেরূপ ভাবে পোড়াইয়া মারে তাহা মনে করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। নিগ্রোদের আন্দোলনের ফলে যদিও আমেরিকাতে লিঞ্চিং কিছু কমিয়াছে, তথাপি ঐপ্রকার চূড়ান্ত বর্ব্বরতা এখনও উঠিয়া যায় নাই। ১৯১৯ সালের পূর্ব্বে আমেরিকাতে প্রতি বৎসর গড়ে ১০৭টি লিঞ্চিং হইত। ১৯২০ সাল হইতে পাঁচ বৎসর সেখানে ২৩৪টি লোককে লিঞ্চিং করা হইয়াছে। সেখানে কীরূপ বীভৎসভাবে জীবন্ত মানুষকেও পোড়াইয়া মারা হয় তাহা নিম্নলিখিত

পাপীর জয়

চুরি-ডাকাতি প্রভৃতিরও আমেরিকায় অন্ত নাই। সেখানে বালকবালিকারা পর্য্যন্ত রিভলভার উঁচাইয়া রেল থামাইয়া রাহাজানি করিতে শিখিয়াছে। ইহার ফলে ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে, ডাকঘর হইতে রাত্রিকালে রেলে মূল্যবান জিনিস পাঠান হয় না। সেখানে দিনের বেলায় সশস্ত্র প্রহরীর সঙ্গে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাস হইতে বোষ্টন সহরের প্রত্যেক ডাকঘরকে এক-একটি ছোট-খাটো দুর্গে পরিণত করা হইয়াছে, কারণ সব সময়ই সে-সব স্থানে চোর-ডাকাতে হানা দিতে পারে।

উইলিয়াম্ বার্ণ্‌স্ নামক আমেরিকার বিচার বিভাগের জনৈক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, রেলগাড়ী, ডাকগাড়ী, জাহাজ ও বন্দর হইতে আমেরিকাতে প্রতি বৎসর গড়ে ৩০ কোটি টাকা চুরি হয়। নিউ ইয়র্ক টাইমস্ কাগজে একজন লিখিতেছেন যে, আমেরিকার ব্যাঙ্কওয়ালাদের

DAY AFTER DAY
—Kirby in the New York World.

কোণঠেসা

নমুনাটি হইতেই বোঝা যাইবে। ঘটনাটি ১৯১৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের টেনেসি-প্রদেশের ছাট্টানুগা ডেলি টাইম্‌সে (*Chattanooga Daily Times*) প্রকাশিত হইয়াছিল।—

পোড়াইয়া মারা

ইষ্টিলস্প্রিংস্ শহরে লোমহর্ষক লিঞ্চিং দণ্ড

নিগ্রো জিম্ ম্যাক্‌ল্‌হর্‌ন্‌এর ফাঁসী

সহস্র সহস্র নর নারী শিশু দর্শক

নিগ্রো-রক্তপিপাসুদের উল্লাস

"অদ্য রাত্রি ৭টা ৪০ মিনিটের সময় নিগ্রো জিম্ ম্যাক্‌লহর্‌ন্‌কে প্রথমে তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা যন্ত্রণা দিয়া পরে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে। জিম্ গত সপ্তাহে ইষ্টিলস্প্রিংস্ সহরে রোজার্স ও টিগার্ট নামক দুইজন শ্বেতকায়কে গুলি করিয়া মারিয়াছিল এবং অপর এক-জনকে আহত করিয়াছিল। পোড়াইয়া মারার সময় নর-নারী ও শিশুতে প্রায় দুই হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। ......নিগ্রোটিকে একটি গাছের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার পার্শ্বে আগুন দেওয়া হইল। কিছু দূরে আর-একটি অগ্নিকুণ্ডে একটি লৌহশলাকা গরম করা হইল। শলাকাটি আগুনে লাল হইয়া উঠিলে জনতার মধ্য হইতে একটি লোক উহা জিমের দিকে বাড়াইয়া ধরিল। ভয়ে সে উত্তপ্ত শলাকা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। তখনই শলাকাটি তাহার হাত হইতে টানিয়া লওয়া হইল। বধ্যভূমি পোড়া মাংসের গন্ধে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু এইখানেই তাহার যন্ত্রণার অবসান হইল না। তাহার শরীরের নানা স্থানে উত্তপ্ত শলাকাটি বিদ্ধ করা হইল। তাহার আকুল আর্ত্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিল।

"এইরূপে কিয়ৎক্ষণ উৎপীড়ন করিবার পর তাহার সর্ব্বাঙ্গে আল্‌কাতরা ঢালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাহাকে গুলি করিয়া মারা হউক। ইহাতে দর্শকগণ তাহাকে টিট্‌কারী দিতে লাগিল।"

যে-জাতি জগতের সমক্ষে সভ্যতার গর্ব্ব করে, খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের মহিমা-কীর্ত্তনে যাহারা অগ্রণী তাহাদের মধ্যে এই চরম বর্ব্বরদের মত অপরাধ-প্রবণতার কারণ কি? বিগত দেড় শতাব্দীর মধ্যে আমেরিকা জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ঐশ্বর্য্যে যে আশ্চর্য্যজনক উন্নতি করিয়াছে শুধু তাহা দেখিলেই চলিবে না। আমেরিকার অপরাধ-প্রবণতা ও বর্ব্বরতাও দেখিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে আমেরিকা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির দিকে ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছে। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, জাতিবিদ্বেষ, ধর্ম্মবিদ্বেষ আমেরিকাতে দিন দিন বেশী হইতেছে গণতন্ত্রের মূলধর্ম্ম যে ঔদার্য্য-গুণ তাহাই দিন

WANTED AN EXTERMINATOR

—McKay in the New York *Herald Tribune*

আমেরিকায় পথে-ঘাটে পাপের ছুঁচো-বাজী

দিন আমেরিকা হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রকৃতিতে বোধ হয় কোনরূপ ব্যাধির বীজ প্রবেশ করিয়াছে।

নিউইয়র্ক সহরের ডাক্তারী কলেজের নিউরোপ্যাথলজির অধ্যাপক ও স্নায়বিক ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ম্যাক্স্ জি স্ক্যাল্প্ (D. Max G. Schlapp) বলেন যে, এইপ্রকার অপরাধ-প্রবণতা এবং তাহার সহিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও উন্মাদ রোগাদির প্রকোপ আমেরিকার জাতীয় চরিত্রে ভাব-বিপর্য্যয় ঘটাইবে। যখন কোন জাতি প্রকৃত অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহাদের সকল দিকেই উন্নতি হয়। কিন্তু জাতীয় জীবনে এমন একটা সময় উপস্থিত হয় যখন অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি জাতীয় চরিত্রে ভাববিপর্য্যয় আনয়ন করে। তাহা সেই জাতির অধঃপতনের সূচনা করে এবং তাহার ফলে দেশে অপরাধ প্রবণতা, উন্মাদ রোগাদি বৃদ্ধি পায়। ডাক্তার স্ক্যাল্প্ দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমেরিকা বর্ত্তমানে সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

প্রবাল

শ্রী সরসীবালা বসু

চোদ্দ

অনেক দিন প্রবালের কোনো খোঁজ নেওয়া হয়-নি। একবার তার সন্ধান নেওয়া দর্‌কার। প্রবাল অনেক চেষ্টা-যত্ন ক'রেও বাপের অসুখ সারাতে পার্‌লে না। কাশীনাথ-বাবু রুগ্ন ভগ্ন দেহ নিয়ে প্রায় পাঁচ বৎসর ধ'রে ভুগে ভুগে তার পর গঙ্গালাভ কর্‌লেন। যশোদা স্বামী-শোকে একেবারে ধরাশয্যা নিলেন। যথাসময় দেবীর মা প্রভৃতি প্রতিবাসিনীদের সাহায্যে মৃতের অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া ইত্যাদি শেষ হ'লেও তাঁর আর শোক সাম্‌লাবার মতন অবস্থা দেখা গেল না। কেদারের মা 'সবারি অদৃষ্টে সুখ-দুঃখ আছে' ব'লে নিজের রাজরাণী হ'তে কাঙালিনীর অবস্থা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দেখালেও যশোদা মোটেই ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌লেন না।

প্রবাল ইতিমধ্যে মাষ্টারীর অবকাশেই দুটো এগ্‌জামীন দিয়ে পাশ ক'রে নিয়েছিল; সেজন্যে তার পদোন্নতিও হয়েছিল। নিজে খুব হিসাবী ও সুবুদ্ধি হ'য়ে খরচ-পত্র ক'রে এতদিনে সে পৈত্রিক ঋণ সব শোধ ক'রে ফেলেছিল। তার পর বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ দেখে সে ছ'মাসের ছুটি নিয়ে নিজের সাধ্যমত বাপের চিকিৎসার ত্রুটি করে-নি। কিন্তু সে-চেষ্টা যখন বিফল হ'য়ে গেল, তখন সে বিধাতার বিধানকে মাথা নত ক'রে মেনে নিলে; কিন্তু মা'র অধৈর্য্য-অবস্থা দেখে বড় মুস্কিলে প'ড়ে গেল। যশোদার শরীর ও মনের অবস্থা এমন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাঁকে একা রেখে প্রবালেরও একদণ্ড বাইরে যাবার উপায় ছিল না; অথচ এভাবে দিনরাত্রি ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে আর শোকার্ত্ত জননীর অশ্রান্ত বিলাপ শুনে-শুনে তারও মন-প্রাণ পীড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল। শেষে সে নিজেও অসুস্থ বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। তার ম্লানমূর্ত্তি দেখে কেদারের মা বড় দুঃখ পেলেন। তিনি প্রবালকে দিনকতক ঠাঁইনাড়া হ'বার জন্যে উপদেশ দিলেন; বল্‌লেন, তাতে মা ও ছেলের দু'জনারই মন ও শরীর দুই দিকেই উপকার হবে। কেদার যে-জায়গায় আছে সেখানকার জল-হাওয়া ভাল ব'লে তিনি প্রবালকে কিছুদিন সেইখানে গিয়ে বাস কর্‌বার জন্যে অনুরোধ কর্‌লেন।

প্রবাল অনেক দিন থেকেই বন্ধুর বিরহ ভোগ ক'রে আস্‌ছে। অতি শৈশবকাল হ'তে দু'জনে হাত-ধরাধরি ক'রে যৌবনের পথপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। তার পরই

ছাড়াছাড়ি। কাজ-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে বিরহের তাগিদ এতদিন তার আর্জ্জি পেশ করতে সময় পায়-নি। এখন অবকাশের দিনে সে জোর তাগিদ দিয়ে বস্‌ল। প্রবালের সমস্ত মন তখনই বন্ধু-মিলনে যাবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠল। কিন্তু যশোদা রাজী হ'লেন না। চিরটা কাল গঙ্গাতীরে বাস করার পর শেষবয়সে শোকাতাপা অবস্থায় অগঙ্গার দেশে যেতে তাঁর মন চাইল না। তখন কেদারের মা বুঝিয়ে বল্‌লেন—"তবে দিদি, তুমি দিনকতকের জন্যে তীর্থ-ধর্ম্ম ক'রে এস! এতে তোমারও মন সুস্থ হবে, ছেলেটারও শরীর সেরে উঠবে।" যশোদা এঅবস্থায় সহজেই রাজী হ'লেন; প্রবালও উদ্যোগ ক'রে মাকে নিয়ে তীর্থের পথে যাত্রা কর্‌লে। তার তরুণ মন তখন বন্দীত্বের অবসাদ হ'তে মুক্ত হ'য়ে নবীন আলোকের পুলকধারায় যেন মুক্তিস্নান ক'রে তাজা হ'য়ে উঠল।

পড়াশুনা ও দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে অভিজ্ঞতালাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবালের প্রাণে খুবই প্রবল ছিল। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে সে তার এত বয়স পর্য্যন্ত দেশের বাইরে পা দিতে পারেনি। আজ দেশ-ভ্রমণে তীর্থের পথে বার হ'য়ে তার ভারী আনন্দ বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

প্রবাল নিজের মাকে চিরকালই খুব ভালোবাস্‌ত, প্রাণ ভ'রে শ্রদ্ধা কর্‌ত; আর সেই মা'রই আর-একটি রূপ যে জননী জন্মভূমি—তাঁর প্রতিও তার কিছু কম অনুরাগ ছিল না। স্বদেশের প্রতি, স্বজাতির প্রতি তার একটি প্রগাঢ় মমতা ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে সে নিজের চর্ম্ম-চক্ষে না দেখ্‌লেও অন্তরের চক্ষু দিয়ে সমগ্রের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেবার ক্ষমতা যেন সহজ ভাবেই অর্জ্জন ক'রেছিল। সেইজন্যে সে তার স্বভাবসুলভ ভালোবাসার জোরে সব দেশের লোককেই দেশভাই ব'লে মনে কর্‌তে পার্‌ত। স্বদেশী আন্দোলন যখন সমস্ত দেশে হঠাৎ একটা দেশভক্তির প্লাবন এনে অনেককে হাবুডুবু পর্য্যন্ত খাইয়ে দিয়েছিল তখন প্রবাল তার মধ্যে ডুব দিতে না পার্‌লেও যে সে-আন্দোলনকে প্রাণমন দিয়ে অনুভব করতে পারে-নি তা নয়। বরং সেইসময় দেশবাসীর ও রাজশক্তির মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ যে একটা বিষম বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল তাতে তার সমস্ত মন পীড়িত হ'য়ে উঠেছিল; এবং গভীর ভাবেই সে নিজের মনে চিন্তা কর্‌ত—দেশের মুক্তি সত্যিই আজ কোন্ পথে? তার চিন্তার মধ্যে গর্ব্বের লেশ ছিল না। সে প্রশ্নটাকেই ধর্‌তে পেরেছিল—সমস্যার সমাধান কর্‌বার মত চিন্তার নাগাল সে পায়-নি তখন।

স্কুলের ছাত্রদের সে যে পড়াত তা ঠিক মাষ্টারীর বাঁধা ধরা নিয়ম মেনে নয়। ছেলেগুলিকে সে হাল্কা চোখে মোটেই দেখ্‌ত না। তাদের মধ্যেই ভবিষ্যদ্দেশ-বাসীর যে তরুণ মনগুলি মুকুলিত অবস্থায় রয়েছে সে-গুলিকে সে ভারী শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখ্‌ত ব'লে অত্যন্ত যত্নের সহিতই তাদের শিক্ষাদান কর্‌ত। সহজেই স্বাভাবিক ভাবে যাতে তারা নিজের দেশকে ভালোবাস্‌তে পারে, দেশবাসীর ও স্বদেশের শিল্পের প্রতি অনুরাগশীল হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মকল্যাণলাভের জন্য সচেষ্ট হ'য়ে ওঠে এম্‌নি ভাবে তাদের মনোবৃত্তিগুলিকে পরিপুষ্ট কর্‌বার চেষ্টা প্রবাল কর্‌ত। এইসব কাজের জন্যে সে শুধু কতকগুলো মামুলী উপদেশ আউড়ে যেত না। ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি পড়াবার সময় তার নিজের চোখ মুখ শিক্ষাদানের আনন্দে এমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত, কণ্ঠস্বর এমন মধুর ও গম্ভীর হ'য়ে কানে বাজ্‌ত যে, ছেলেরা সহজেই এই মাষ্টারটির কাছে যে-পাঠ নিত সেটির মধ্যে তারা মুখস্থ করার বিভীষিকা দেখ্‌তে পেত না। জ্ঞানলাভের আনন্দে তারা মেতে উঠ্‌ত।

মা'কে নিয়ে প্রবাল প্রথমে শান্তিপুর, নবদ্বীপ হ'য়ে গয়া, বৈদ্যনাথ ধাম, কাশী, অযোধ্যা, জয়পুর, পুষ্কর, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন ক'রে হরিদ্বার এসে পৌছল। পথে সে তার দুই চক্ষুর পিপাসিত অনাবিল দৃষ্টি দিয়ে যা-কিছু দেখ্‌তে লাগ্‌ল, তার মধ্য হ'তে অনেক অভিজ্ঞতা ও আনন্দ সঞ্চয় ক'রে নিলে। হরিদ্বারে গিয়ে সে এক পাণ্ডার আশ্রয়ে উঠ্‌ল। সেখানকার গম্ভীর দৃশ্য তাকে এমন মুগ্ধ কর্‌লে যে, দিনকতকের জন্যে আর কোথাও তার নড়্‌বার ইচ্ছা রইল না। দেবমন্দিরের সংলগ্ন বাজার ইত্যাদি গুলোর মধ্যে যদিও সেই কাশী,

গয়া, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি তীর্থগুলির একই ছোট-বড় সংস্করণ দেখলে, তা হ'লেও তার সুদূরগামী দৃষ্টি সে-সব বাইরের ছোট জিনিষকে অতিক্রম ক'রে সহজেই তীর্থস্থানের প্রাকৃতিক সংস্থানটিকে গভীর সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতে পারলে। সমগ্র ভারতবর্ষে গঙ্গার যে তর তর কাহিনী গৌরবময়ী মূর্ত্তির বিচিত্রতা দেখা যায় হরিদ্বারে তার কিছুই নাই, বরং হরিদ্বারের মতন গঙ্গার এত ক্ষুদ্র পরিসর বোধ হয় কোনো স্থানেই চোখে পড়ে না। কালীঘাটের আদি-গঙ্গার সঙ্গে তার সাদৃশ্য কিছু আছে বটে; কিন্তু সেখানকার গঙ্গার জলের সঙ্গে এখানকার জলের স্বাদ ও বর্ণের যা তফাৎ সেটাতে আশমান-জমীন তফাৎ বললে বোধ হয় একটুও অত্যুক্তি হয় না। এখানে গঙ্গার জল খুবই অ-গভীর, উঁচু নীচু ছোট বড় প্রস্তর-খণ্ডের ওপর দিয়ে তুষারগলা স্বাদু নীরধারা প্রবল বেগে নিম্নমুখী হ'য়ে ধেয়ে চলেছে। কী তার বেগ, কী তার উদ্দাম গতি! তলস্থ উপল-শয্যা সেই অতি নির্ম্মল জলের ফাঁকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে মাছের ঝাঁকের কী নির্ভীক খেলা! অহিংসা পরম ধর্ম্ম ব'লে এস্থানে মাছ ধরার বা খাবার কোনো বালাই নেই। বরং যাত্রীরা ঐ-সব মাছদের আহার বিতরণ ক'রে কিছু পুণ্য-সঞ্চয়ের আশা রাখেন; সুতরাং মাছগুলি একেবারে ভয়লেশহীন। গঙ্গার জলের এমন মিষ্ট স্বাদ যে, বর্ণনা করা চলে না।

প্রবাল প্রত্যহ সেই নির্ম্মল জলে স্নান ক'রে আর এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়িয়ে ভারী আনন্দ বোধ করতে লাগল। দূরে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত উচ্চশির আকাশ-পটে সাদা তুলার রঙের মেঘসজ্জার ন্যায় চোখে পড়ে। সে গম্ভীর মহান্ দৃশ্যে সহজেই শির নত হ'য়ে আসে; হৃদয়ও নত হ'য়ে বিনা তর্ক-যুক্তিতেই এই স্থানকে মহাতীর্থ ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়। আর সেই অতীতকালের মহানুদর্শী ভক্ত পুরুষদের সুদূর ভবিষ্যদ্দৃষ্টিকে ধন্যবাদ দিয়ে ওঠে—যাঁরা স্থানে স্থানে প্রকৃতির অপূর্ব্ব বৈভব-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হ'য়ে অনাগত ভবিষ্যৎ মানব-সন্তানদের কল্যাণের জন্যে এমন সব বিরাট্ তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। একদিন প্রবাল সেখানে একজন সাধুর নাম-মাহাত্ম্য শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল। এক-স্থানে অনেকগুলি বড় বড় বনস্পতি পরস্পর পরস্পরের শাখায়-শাখায় জড়াজড়ি ক'রে নীচের দিকে বেশ একটি সুপ্রশস্ত ছায়াযুক্ত স্থান রচনা ক'রেছিল। সাধুর সেই স্থানটিই হচ্ছে আস্তানা। বর্ষায় তিনি সে-স্থান ছেড়ে চ'লে যান; শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে সেই আস্তানাটিতেই বাস করেন।

আজকালকার দিনে গেরুয়া বস্ত্রের বিশেষ কোনো মর্য্যাদা নেই, কারণ ভণ্ড, জুয়াচোর প্রভৃতি অনেক রকমের দুষ্ট লোকই ঐ জিনিষটিকে তাদের ভণ্ডামীর ভাল রকম আড়াল ব'লে নির্ব্বিবাদে ওর আশ্রয় নেয়। আসল বা মেকী চেনাও দুর্ঘট। শিক্ষিতরা আবার বিশেষ ক'রে এইজন্যেই ও-পোষাকটিকে মোটেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারে না। তার উপর মাঝে মাঝে ঐ ধরণের গেরুয়াধারী বড় বড় মোহান্তদের যে-ধরণের কীর্ত্তিকলাপ শুনতে পাওয়া যায়, তাতে সত্যিই ও-পোষাকটার ওপর লোকে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। প্রবালেরও মনের ধারণা কতকটা সেইরকম ছিল। কিন্তু এই সাধুটিকে দেখে তার সে-ধারণা ভেঙে চুর হ'য়ে গেল।

সাধুকে প্রণাম করতেই তিনি বিনয়ের সহিত 'নমো নারায়ণ' ব'লে নিজের মাথা ঈষৎ নত ক'রে তার পর আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে হিন্দীতে বললেন—'কি চাও, লাল!' লাল মানে বৎস। প্রবাল তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে খুসী হ'য়ে বললে যে, সে একজন শিক্ষার্থী। সাধু বললেন যে, শিক্ষার্থীদের জন্যে ত নানা স্থানে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে,তিনি আর কি শিক্ষা দেবেন। প্রবাল বললে যে, সন্ন্যাসপন্থী সাধুদিগের কাছে থেকে সে কিছু জ্ঞান লাভ করতে চায়। সাধু সেদিন বিশেষ কিছু বললেন না। কিন্তু প্রবাল দু'চার দিন তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করবার পর তিনি প্রবালকে সরল-ভাবাপন্ন দেখে খুসী হ'লেন এবং তার মধ্যে সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসা আছে দেখে কিছু-কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে লাগলেন। প্রবাল জিজ্ঞেস করলে—'সন্ন্যাসীরা যে সংসার-আশ্রম থেকে এ-রকম দূরে দূরে থাকেন এতে কি বোঝায় না যে, সংসারকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন?' সন্ন্যাসী হেসে বললেন—'না বৎস, তা মোটেই নয়। সংসার-রূপ মূলের ওপরেই সন্ন্যাসবৃক্ষ

প্রতিষ্ঠিত আছে। সে-সংসারকে আমরা অবজ্ঞা করব কি ক'রে? ভগবানের সৃষ্টি একদিনে লোপ পেয়ে যাক্, এ-বাসনা কোনো অর্ব্বাচীনই কোনো দিন করতে পারে না। তবে সাধনার জন্যে যার আত্মা ব্যাকুল হ'য়েছে সেই শুধু সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করবার অধিকারী। দেখো বৎস—এসব তত্ত্ব একদিনেই বোঝাবার নয়। যত বড় বিদ্বান্ বা পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান হোক্ ভগবৎ-তত্ত্ব এক মুহূর্ত্তে বোঝা কারুর পক্ষে সহজ নয়, কেননা এসব যুক্তি-তর্কের বাইরের জিনিষ। ধ্যান, ধারণা ও গভীর অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতির দ্বারা ভিতরকার বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট না হ'য়ে উঠলে এ গভীর তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করার উপায় নেই। মানুষ যদি সত্যিকার পিপাসায় উন্মুখ হ'য়ে ওঠে তা হ'লে সে যেন বিশ্বাস করে যে, তার জন্যে অমৃতের উৎস আছেই। জল না থাকলে তৃষ্ণার উদ্রেকই হ'ত না। অবশ্য পিপাসী হ'য়ে জলের সন্ধানে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকলেও চলবে না।"

প্রবাল একদিন সাধুকে জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, আপনারা বিশাল সাধু-সমাজ যে এভাবে নির্জ্জনে ব'সে সাধন-ভজন করেন এর ফল ত আপনারা নিজেরাই ভোগ করেন। কিন্তু আপনাদের সমস্ত দেশবাসী যে অজ্ঞানের মধ্যে ডুবে থেকে দুঃখ ভোগ করছে তাদের জন্যে আপনারা কি করেন? এতে কি দেশ আপনাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয় না?" সাধু স্নিগ্ধ হাস্যে বললেন—"তা কেমন ক'রে হয়, লাল? বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা যখন বাতাস থেকে প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ ক'রে সজীব থাকে তার ফল কি মাটির ভিতরের মূল পর্য্যন্ত ভোগ করে না? নিশ্চয় করে, কেননা কেউ কাউকে ছাড়া নয়। তোমরা জান জগতে কোনো বস্তুর বিনাশ নেই, সুতরাং সচ্চিন্তার বিনাশ নেই। চক্ষের অগোচরে মানুষের, বিশেষ ক'রে সমস্ত বিশ্ব-জগতের, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুগণের চিন্তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে পূর্ণ ক'রে রয়েছে। এ চিন্তার যথেষ্ট প্রভাব আছে, আকর্ষণ আছে। জগতে যত সাধু পুরুষ সাধনা ক'রে গিয়েছেন, বা এখনও গোপনে গিরি-গহ্বরে লোক-চক্ষুর অগোচরে সাধন করছেন একদিন তাঁদের সকলের সূক্ষ্মচিন্তার রূপ ঘনীভূত হ'য়ে কোনো মহাপুরুষের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ হবে। কাল অনন্ত, বৎস, সুতরাং নিশ্চয় জেনো—যিনি এই কালের অধীশ্বর তিনি সময় বুঝে যেমন যুগে যুগে দুঃখার্ত্ত মানবের জন্যে মহামানুষকে পাঠিয়েছেন তেম্‌নি আবার পাঠাবেন।"

প্রবাল সাধুর মুখের এই ধরণের কথাগুলি শুনে ভারী আনন্দ লাভ করলে। তারপর সে মাকে নিয়ে অন্যান্য ছোট-বড় তীর্থ ভ্রমণ ক'রে প্রয়াগে এল। তখন প্রয়াগে কুম্ভমেলা উপলক্ষে মহাস্নান চলেছে। স্নানে গিয়ে একদিন হঠাৎ একজন পরিচিতার সঙ্গে যশোদার দেখা হ'য়ে গেল। সেই বৃদ্ধাও নানা রূপে শোকক্লিষ্ট হ'য়ে আজ প্রায় সাত বৎসর যাবৎ কাশীবাসিনী। সম্প্রতি প্রয়াগে কুম্ভমেলা উপলক্ষে একমাসকাল গঙ্গাতীরের কুটীরে কল্পবাস করতে এসেছেন। হঠাৎ দেশের লোককে পেয়ে তিনি খুব খুসী হ'লেন এবং যশোদার দুঃখের কাহিনী শুনে নিজের জীবনের বিগত ঘটনা স্মরণ ক'রে চোখের জল ফেললেন। তার পর তিনি যশোদাকে বললেন—"বেশ ত বউ মা, দিনকতক আমার কাছে কুঁড়েয় থাকবে চলো। এখানে তীর্থ-স্থানে মনও ভাল থাকবে; তার পর কাশীতে যদি গিয়ে বাস করতে চাও সে মন্দ হবে না। আমার মতন অনেক হতভাগী সংসারের খেলাঘর ভেঙে যাওয়ায় বাবা বিশ্বনাথের পায়ের তলায় প'ড়ে রয়েছে।"

যশোদা এপ্রস্তাবে রাজী হ'লেন। প্রবালেরও ছুটীর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিল। সে মায়ের তীর্থবাসে আপত্তি না ক'রে নিজে আর দু'চার দিন সহরে থেকে যাবার ইচ্ছা করলে।

সেদিন বৈকালের দিকে মেলা-স্থল হ'তে সে যখন বাঁধের ওপর চলেছে হঠাৎ একটি সাহেববেশী যুবককে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল, আর মুখ থেকে অতর্কিতভাবে বেরিয়ে গেল—সঞ্জীব!

সঞ্জীবের সঙ্গিনী ছিল একটি তরুণী নারী। দামী ধূপছায়া রঙের রেশমী সাড়ী বিচিত্র ভঙ্গীতে তার দেহ বেষ্টন ক'রে বুকে মাথায় কাঁধে পাঁচ-সাতটা সোনার সেফ্‌টিপিনে বাঁধা পড়েছিল; পায়ের খুব উঁচু হীলের জুতো যেন অতি কষ্টে তার দেহভার রক্ষা করছিল। হাতে রেশমী রুমাল।

সঞ্জীব ফিরে চেয়ে দেখ্‌বার আগেই মেয়েটি প্রবালের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল যে, আধময়লা মোটা জামা কাপড় পরা লোকটার আস্পর্দ্ধা তো মন্দ না। ফট্ ক'রে এত লোকের সাম্‌নে ব্যারিষ্টার মিষ্টার ময়্‌টারের জামাতা নূতন ব্যারিষ্টার মিষ্টার রে-কে সঞ্জীব ব'লে ডাক্‌লে, বিশেষ যখন সঙ্গে তার একজন মহিলা।

এদিকে মেয়েটির চাউনীতে প্রবালও নিজেকে অপরাধী মনে ক'রে বেশ একটু সঙ্কোচ বোধ কর্‌ছিল। কিন্তু মুখের কথা আর হাতের ঢিল বেরিয়ে গেলে আর ফের্‌বার নয়। ইতিমধ্যে সঞ্জীব এগিয়ে এসে হাসি-মুখে প্রবালকে বল্‌লে—"প্রবাল? আমি চিন্‌তে একটু দেরী করেছি। খুব লম্বা-চওড়া চেহারাখানি বাগিয়েছ ত হে! মাথায় আবার পাগড়ী, হাতে মোটা লাঠি! আমি মনে করেছিলাম কোনো পাঞ্জাবী হ'বে।"

প্রবাল বল্‌লে—"আমি কিন্তু ছেলেবেলাকার সঞ্জীবকে এত বড় সাহেবী পোষাকে দেখেও চিন্‌তে দেরী করি-নি। আচ্ছা—উনি কে? আমি হয়তো অসময়ে আলাপ ক'রে একটু অন্যায় কর্‌লাম।"

সঞ্জীব বল্‌লে—"না, না, অন্যায় কিসের? ইনি হ'চ্ছেন মিসেস্ সঞ্জীব। ওগো একটু এগিয়ে এস, আমার বাল্য-বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—। হুগলীতে আমরা এক-সঙ্গে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়েছিলাম, এর মতো মেধাবী কিন্তু আমরা কেউ ছিলাম না।"

উর্ম্মিলা এগিয়ে এসে প্রবালকে নমস্কার কর্‌লে। প্রবালও নম্রভাবে তা ফিরিয়ে দিলে। তার পর সঞ্জীব প্রবালের উপস্থিত ভ্রমণ-কাহিনীর কথা শুনে বল্‌লে—"বেশ ত চলো আমাদের বাঙলায়। ওখানে দুদিন থেকে তার পর দেশে ফিরো। আমরাও শীগ্‌গীর কল্‌কাতায় ফির্‌ব। ভবানীপুরে আমার বাসা, সেইখানেই আমি প্র্যাক্‌টিস্ করি।"

উর্ম্মিলা কিন্তু এই অর্দ্ধমলিন-বেশী লোকটিকে তাদের অত বড় মোটরে নিজেদের পাশে বসিয়ে বাঙলায় নিয়ে যেতে হ'বে মনে ক'রে ভারী কুণ্ঠা অনুভব কর্‌তে লাগল। নিশ্চয় লোক্‌টার গায়ে বোট্‌কা গন্ধও ছাড়্‌বে—কি সর্ব্বনাশ! অতঃপর স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে সে মনে মনে রেগে উঠ্‌ল। স্বামীটিও একদিন পাড়া-গাঁয়ের ভূত ছিলেন, পাঁচ বৎসর বিলাত বাস ক'রে সাহেবী আদব-কায়দায় পূরো রকম দুরস্ত হ'য়ে আস্‌বার পরও এখনও তাঁর অনেক ত্রুটি কথায়-কথায় উর্ম্মিলা ধ'রে ফেলে। যেন তার মন বুঝেই প্রবাল সঞ্জীবকে বল্‌ছিল—"আজ থাক্ ভাই, ঠিকানাটি দিয়ে যাও, কাল গিয়ে দেখা কর্‌ব।"

উর্ম্মিলা তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল—প্রবাল-সম্বন্ধেও তার একটু ভাল ধারণা হ'ল। লোকটা ভদ্রতা জানে তা হ'লে। ঐ বেশে একজন ভদ্রমহিলার সাম্‌নে মোটরে বস্‌তে যে রাজী হয়নি এ ওর সদ্‌বুদ্ধির পরিচয়। তার পর সে সুগন্ধি রুমালখানা নাকে চেপে ধ'রে মিহিগলায় ব'লে উঠ্‌ল, "শীগ্‌গীর এখান থেকে বেরিয়ে চলো, বেজায় দুর্গন্ধ—যত সব ভূতের মত লোকগুলোর বিশ্রী ভীড়—প্রাণ যায়-যায় হ'য়ে উঠ্‌ল।"

প্রবাল একটু অবাক্ হয়ে উর্ম্মিলার মুখের দিকে চাইলে—উর্ম্মিলার চমৎকার বিদ্যাবুদ্ধির কথা শুনে সে বেশ খুসী হ'য়েছিল। তার বুদ্ধির লাবণ্যমণ্ডিত মুখশ্রীতে আমাদের দেশের সেই একঘেয়ে অসম্ভব জড়তার ভাব নেই দেখে আনন্দও পেয়েছিল। কিন্তু মুখে তার এ কি অবজ্ঞার বাণী! নিজেদেরই হাজার হাজার দেশবাসীর ভীড়কে সে এত লঘু চক্ষে দেখে? কৌতূহল-ভরে প্রবাল জিজ্ঞেস ক'রে ফেল্‌লে—"আপনি কি মেলা দেখ্‌তেই এসেছিলেন?"

উর্ম্মিলা বল্‌লে,—"মেলা নয়—সং দেখ্‌তে এসেছিলাম।" ব'লে সে হেসে উঠ্‌ল। তার পর সঞ্জীবকে একরকম টেনে নিয়েই এসে মোটরের দিকে অগ্রসর হ'ল। সঞ্জীব তাড়াতাড়ি পকেট হতে দু-খানা কার্ড বের ক'রে প্রবালের হাতে দিয়ে বল্‌লে,—"একটায় আমার শ্বশুরের বাঙলার ঠিকানা—আর-একটায় কল্‌কাতার বাসার। যাবে কিন্তু নিশ্চয়।"

প্রবাল জবাব দিলে না, মাথা হেলিয়ে শুধু সম্মতি জানালে।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র অর্ধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

প্রাচীন বাঙ্গালায় দাস-প্রথা

ভাদ্রের প্রবাসীতে (৮৩৫ পৃঃ) দাসত্ব সম্বন্ধে যে কওলার ফোটো দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি ফার্সী শব্দ আছে, তাহার অর্থ পাঠকের সুবিধার জন্ম দিলাম। "খজানা খামরা" পড়িতে ভুল হইয়াছে, শব্দটি "খজানা-আম্‌রা" অর্থাৎ সাধারণ ধনাগার। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রধান ধনাগারকে এখনও "খজানা-আম্‌রা" অথবা Central Treasury বলে।

১ পঃ ওলফে ওলদে হইবে। ওলদে পুত্র, অর্থাৎ রামনাথের পুত্র রামলোচন।

২ „ জওজে = স্ত্রী। জিতরামের স্ত্রী।

৩ „ মতফাদোক্তরে। দুইটি ভিন্ন শব্দ। মতফা—প্রকৃত অরবী শব্দ "মোতবফফা" (ব-অন্তস্থ) অর্থাৎ মৃত। নামের পর ব্যবহার হয়, এখানে "মৃত জিতরাম সিকদার"।
দোক্তরে। দোখ্‌ত্রব = কন্যা (পার্সী) দোখতরে সূর্য্যনারায়ণ = সূর্য্য-নারায়ণের কন্যা।

৪ „ রগবৎ (অরবী) - ইচ্ছা, অনুরাগ।
বহাল (অরবী) = সুস্থ।
তবিয়ৎ (অরবী) = শরীর, মন।
হানার্থগুপহতি—পড়িতে পারিলাম না। উচ্চারণ বিকৃত।

৫ „ মবলগ (অরবী) নগদ, (কেবল টাকার জন্য ব্যবহৃত)।

৬ „ দস্তবদস্ত (পার্সী) দস্ত = হাত। হাতে হাতে।

৬ ও ৮ „ । হিমহয়াত। হীন (অরবী) = কাল, সময় } জীবনকাল।
হয়াৎ (অরবী) = জীবন } যতকাল বাঁচিব।

৯ „ দাম বিক্রয়—"দান বিক্রয়" হইবে।

১০ „ কবালা (অরবী) কবুল করিলাম। প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহা লেখা হয়।

১২ „ রাজীবলোচন শব্দের নীচে "গীহ" লেখা হইয়াছে, সম্ভবতঃ "গুহ" হইবে, কেননা অন্য নামের পদবী আছে, ইহার নাই। গীহ শব্দেরও অর্থ হয় না।

মোহরে খজানা-খমরা স্থানে খজানা-আমরা হইবে।

শ্রী অমৃতলাল শীল

নবযুগের অর্থনৈতিক সমস্যা

গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে উক্ত নামধেয় প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র-কুমার সান্যাল মহাশয় অর্থ-ব্যবহার বাদ দিয়া অর্থনীতির সৌধ গড়িয়া তুলিয়া মানবের দুঃখ-কষ্ট লাঘব ও বিশেষ অশান্তি দূরকরতঃ প্রকৃত সভ্যতার পত্তন করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ উৎপাদন-কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে চাহিতেছেন ও যে-সকল মধ্যবর্ত্তী লোক নামে মাত্র উৎপাদক তাহাদিগকে উৎপাদক বলিয়া তিনি আদৌ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কিংবা বলিতে চাহেন যে উৎপাদক হিসাবে উৎপন্ন বস্তুর উপরে ন্যায়তঃ তাহাদিগের ভাগ অতি সামান্য হওয়া উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই মধ্যবর্ত্তী লোক-গুলিই বর্ত্তমান দুঃখকষ্টের মূলীভূত কারণ সুতরাং তাঁহার মতে বর্ত্তমান অর্থব্যবহার উঠাইয়া দিয়া প্রাচীন যুগের বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

এত বড় একটা সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে যাইয়া ফণীন্দ্রবাবু নানা দিক দিয়া বিচারকরতঃ যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন, মনে হয় না। মানুষের দুঃখকষ্টের প্রকৃত কারণ কী? কতকগুলি নৈসর্গিক; সেগুলির সঙ্গে মানুষ লড়াই করিয়া জয়লাভ করিবে, ইহাই সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়; একথা, জ্ঞানিগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। যতদিন মানুষ এই নৈসর্গিক কারণগুলাকে দূর কিংবা করতলগত করিয়া লইতে না পারিবে ততদিন ইহার উৎপীড়নজনিত দুখঃকষ্ট তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। বড় আশার কথা যে, মানুষ জল স্থল আকাশ সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয়, মানুষই মানুষের অবশিষ্ট দুঃখকষ্টগুলির মূলীভূত কারণ। এইজন্য মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। নানাবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া সে-পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। অর্থনীতির দিক্ দিয়া সেই পরিবর্ত্তন কিরূপে হইতে পারে তাহাই উপস্থিত আলোচ্য বিষয়। ফণী-বাবু ঠিকই বলিয়াছেন যে, কতকগুলা লোক খুব অর্থশালী হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। কতকগুলা লোক দিনান্তে একাহার জুটাইতে পারিতেছে না, আর পক্ষান্তরে কতকগুলা অর্থবান লোক আরও বেশী করিয়া অর্থবান হওয়ার লোভে আহার্য্য বস্তু দিয়া গোলাবাড়ী বোঝাই করিয়া সশস্ত্র পাহারা দিতেছে। ফণী-বাবুর মর্ম্মকথাই এই বৈষম্যের ভিতরে রহিয়াছে বলিয়া প্রবন্ধটি পাঠে বুঝিতে পারিয়াছি। এই বৈষম্যের বিদ্যমানতাকে তিনি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন; এবিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কাহারও মতের অনৈক্য না হওয়ারই কথা। কিন্তু দেখা যাক ইহার জন্য অর্থের ব্যবহার কি পরিমাণ দায়ী।

'অর্থ' জিনিষটা কী? এক মানুষ অপর মানুষের শক্তি-সামর্থ্য নিজের ইচ্ছা মত কার্য্যে ব্যবহার করার জন্য রাষ্ট্র হইতে লব্ধ হুকুমনামারই নাম অর্থ। এই হুকুমনামা ধাতব আকার হইতে ক্রমে কাগজে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং দোষটা অর্থের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে কেন? বস্তুতঃ দোষটা তার যার ইচ্ছাদ্বারা এই অর্থ বা হুকুমনামা পরিচালিত হইতেছে। মানুষের মনোবৃত্তির মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে স্বার্থপরতা বিদ্যমান থাকিয়া প্রতিবেশীর উপরে অন্যায় ব্যবহারে তাহাকে ব্রতী করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই অর্থের ব্যবহারে তার এই স্বার্থপরতা-প্রবৃত্তিটা চরিতার্থ করার সুযোগ ঘটিতেছে

এই পর্য্যন্ত দোষ থাকিলেও তার উপকারিতার দিকটা কি একেবারেই উপেক্ষার বিষয়?–'উৎপাদন' বলিতে ফণী-বাবু কী বুঝাইতে চাহিতেছেন? পৃথিবী-শুদ্ধ লোকগুলা সকলে সমান খাইবে পরিবে, তাহার ব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহা করাই কি ফণী-বাবুর 'উৎপাদন' কথার অর্থ? তা হইলে বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা ইত্যাদি যেগুলি মানুষকে তাহার পশুত্বের বাহিরে দেবত্বের সন্নিহিত করিয়া যথার্থ সভ্যতার পথ দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে সেগুলিকে বাদ দিতে হয়—যে বিজ্ঞান তাহার সেবককে আত্মহারা ভাবে নানাবিধ রোগের কারণ ও তাহার প্রতিকার নির্ণয়ে নিয়োজিত রাখিয়াছে, যে-বিজ্ঞান এমন-কি ফণী-বাবু সমর্থিত 'উৎপাদন' কার্য্যেরও পথপ্রদর্শক হইতেছে। যে-লোকগুলাকে খাটাইয়া লইয়া ধনিক সঞ্চিত অর্থকে বিগুণিত করিয়া তুলিবে সেই লোকগুলাকে পেটে মারিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথাও যে মারা যায়। সুতরাং মধ্য পথ হইবে ধনিকের ধন শ্রমীর শ্রম, জ্ঞানীর জ্ঞান সকলের উপরেই সকলের সমান দাবী। ইহাই হইবে নবযুগের "অর্থসমস্যার সমাধান"।

শ্রী বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন

সাইকেলে আর্য্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর

যুক্ত-প্রদেশ

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

৩ শে সেপ্টেম্বর বুধবার—বেলা ৭ টার সময় রওনা হ'লাম। মাঠে গরু মহিষের দল বরাবর রাস্তার পাশে চর্‌ছে। কিন্তু দুধের জন্য আশেপাশের গ্রামে চেষ্টা ক'রে সামান্য দুধও জোটাতে পার্‌লাম না। কাজেকাজেই টিনের দুধ ও ছোলা খেয়ে প্রাতরাশ সেরে ফেল্‌লাম।

বেলা ১১॥ টার সময় বিহারের সীমানা কর্ম্মনাশা নদীর পুল পার হ'লাম। যুক্ত-প্রদেশের রাস্তার বিশেষত্ব অল্পক্ষণ পরেই পাওয়া গেল। রাস্তা মাটির মত সাদা ও ধুলায় ভর্ত্তি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কাপড়-চোপড় ও সাইকেলের চেহারা ধুলায় সাদা হয়ে গেল। আজ বেজায় গরম, হাওয়া বিপরীত দিক্ থেকে বইছে। ক্লান্ত হ'য়ে একটা গাছতলায় কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলাম।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড্ ছেড়ে বেলা ৫টার সময় মোগল-সরাইয়ে এসে চা খাওয়া গেল। এখান থেকে বেনারস ৮ মাইল মাত্র। গঙ্গার ওপর ডাফ্রিন ব্রিজের ওপর দিয়ে রেলের লাইন ও দু'পাশে গাড়ী যাওয়ার রাস্তা। এই ব্রিজ পার হ'য়ে কাশী ষ্টেশনকে বাঁদিকে রেখে আমরা বেনারস সহরে ঠিক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হ'লাম।

দশাশ্বমেধ-ঘাটের কাছে একটা রেঁস্তরায় ঢুকে পড়্‌লাম। রেঁস্তরাটি বাঙালী ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। এক স্থূলকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক এতক্ষণ পেয়ালার মধ্যে গোঁফ ডুবিয়ে নিবিষ্টমনে চা পান কর্‌ছিলেন; এইবার পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে, ভরাগলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—

"কল্‌কাতা থেকে ঐ সাইকেল ক'রে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আবার সাইকেলেই ফির্‌ব মনে কর্‌ছি।"

"ঘাড়ে এ ভূত চাপ্‌ল কেন?"

আমরা বল্‌লাম, "দেখুন ইউরোপীয়েরা কি না কর্‌ছে! তারা দেশ দেশান্তর থেকে আমাদের দেশে এসে এভারেষ্টে উঠ্‌ছে—"

"ওসব সাহেবসুবোদেরই পোষায়, বাঙ্গালীর ছেলে একি খেয়াল বাপু! চেহারাও ত দেখ্‌ছি সে রকম নয়—শেষে হার্টফেল্ না করে। কাশী অবধি এসেছ বেশ হয়েছে, এইবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।" আমরা তাঁর দিকে আর মনঃসংযোগ না করে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলাম।

সে রাত্রের মতো লাক্‌সায় রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে উঠে পড়্‌লাম। এখানের সেবা আশ্রমটি মিশনের অন্যান্য সকল জায়গার সেবাশ্রম অপেক্ষা বড় ও বন্দোবস্ত বেশ সুন্দর। এখানে যথেষ্ট জল পাওয়া গেল, সমস্ত দিনের

রোদ ও ধূলো ভোগের পর স্নান ক'রে বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠলাম।

আজ ৬২ মাইল এসেছি—কল্‌কাতা থেকে মোট ৪৩৯ মাইল।

১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে উঠে নাগোয়ায় এলাম। হোষ্টেলের ছাত্রেরা আমাদের দেখে খুব আনন্দিত হলেন। সাইকেল পরিষ্কার ও অল্পস্বল্প যে মেরামত করা দর্‌কার হ'য়ে পড়েছিল এখানে তা সেরে নেওয়া গেল। সুখের বিষয় এ পর্য্যন্ত টায়ার বা টিউব আমাদের কোনো কষ্ট দেয়নি।

বিকাল বেলায় সহরের দিকে কতগুলি দর্‌কারী জিনিষপত্র কেন্‌বার জন্যে বার হ'লাম। রাস্তায় বেজায় ধুলো, পুরাণ ধরণের বাড়ী ও গলিঘুঁজি প্রচুর। সহরে বাঙালীর অভাব নেই। রামলীলার জন্যে রাস্তায় ভিড় যথেষ্ট। এখান থেকে চা দুধ প্রভৃতি কিনে হোষ্টেলে ফিরে আস্‌তে রাত ১০টা বেজে গেল। হোষ্টেলে কাশ্মীরের চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ললিত বসু মহাশয়ের পুত্রের সঙ্গে আলাপ হ'ল। কাশ্মীর-যাত্রী শুনে ইনি শ্রীনগরে তাঁদের বাড়ীতে অতিথি হবার জন্যে আমাদের নিমন্ত্রণ কর্‌লেন।

২রা অক্টোবর শুক্রবারভোরের আলোয় ইউনিভার্সিটীর সারি সারি বাড়ীগুলি ঘুমন্ত পুরীর মতোই নিঝুম। চারপাশের সবুজ মাঠের ভিতর দিয়ে লাল কাঁকরের সোজা সোজা রাস্তা। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং ভারতীয় স্থাপত্যকলার অনুকরণে তৈরী ব'লে মনে হয় যেন প্রাচীন যুগের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়েছি।

এখান থেকে একটি রাস্তা জোয়ানপুর ও প্রতাপগড় হ'য়ে এলাহাবাদে গেছে। রাস্তা ভাল, এলাহাবাদ প্রবেশ করার জন্যে গঙ্গার ওপর ও, আর, আর এর ব্রিজ (কার্জ্জন ব্রীজ) আছে। পুলের নীচের তলায় রেল-লাইন ও ওপর দিয়ে গাড়ী ঘোড়া লোকজন পার হয়। কিন্তু এলাহাবাদ এ পথে প্রায় ১০০ মাইলের ধাক্কা। এই রাস্তা দিয়ে রায়বেরিলি হ'য়ে লক্ষ্ণৌ যাওয়া যায়, দ্বিতীয়টি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। এ পথ মোগলসরাই থেকে সোজা এলাহাবাদ গেছে যমুনা ব্রিজ পার হ'য়ে। এ পুলটিও দ্বিতল, উপরে রেলের লাইন, নীচের পথটি গাড়ী ঘোড়া ও লোকজনের জন্যে। আমরা জোয়ানপুর-প্রতাপগড়ের রাস্তা ছেড়ে ও গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরার জন্যে মোগলসরাইয়ে ফিরে না গিয়ে ঝুঁসীর পথে এলাহাবাদ অভিমুখে চল্‌লাম। সহর থেকে বার হ'য়ে বি, এন্‌, ডব্লিউ লাইন পার হ'বার পরই একটা গাড়ীর ফ্রি হুইলের স্প্রিং কেটে গেল। যন্ত্রপাতি বার ক'রে সার্‌তে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগ্‌ল।

আজ খুব জোরে বাতাস বইছে। পথ ট্রাঙ্করোডের মতোই চওড়া, তবে বেজায় ধুলো—এটা বোধ হয় যুক্ত-প্রদেশের রাস্তার বিশেষত্ব। পাশের ক্ষেতে হিন্দুস্থানী চাষা, গায়ে পাঞ্জাবী, চাষ কর্‌ছে, পিছনে ঘাঘরা-পরা মেয়েরা বোধ হয় বীজ ছড়িয়ে চলেছে। এখানকার মেয়েদের শাড়ী পরার রেওয়াজ নেই। হিন্দুরা পরে ঘাঘরা ও মুসলমান মেয়েরা পায়জামা। আর একটা জিনিস বেজায় চোখে ঠেকে সেটা হচ্ছে সাদা রংয়ের গাধা। পাশের গাছে বাঁদরদের সভার কিচির মিচির শব্দ আর রাস্তায় কাঠবিড়ালীদের ছুটাছুটি আজকের পথের এক-ঘেয়েমি দূর করেছে।

দুপুর বেলা গোপীগঞ্জে নামা গেল। একটি ছোট খাট সহর। পথের ধারে ধারে বড় বড় পুকুরের মাঝখানে একটি করে লম্বা ত্রিশূল বার হয়ে আছে। আর পুকুরের ধারে ধারে শিব-মন্দির। এই রকম একটা পুকুরের ধারে বটগাছের তলায় কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমরা আড্ডা ফেল্‌লাম। পুকুরে স্নান ক'রে বাজারের পুরী খেয়ে পেট ভরান গেল। এখান থেকে সোজা জোয়ানপুরে যাবার পথ আছে।

রওনা হ'তে বেলা ৪টা বাজ্‌ল। রোদের তেজ ও হাওয়ার জোরের জন্যে আমরা বেশী এগোতে পার্‌ছি না। ঝুঁসী পৌঁছতে প্রায় রাত ৯টা বাজ্‌ল। পথটি গঙ্গার ধারে একটি পণ্টুন ব্রীজের সাম্‌নে এসে শেষ হ'য়ে গেছে। অক্টোবরের শেষ বরাবর থেকে মে মাসের শেষ অবধি এই পুল দিয়ে পার হবার বন্দোবস্ত থাকে। বাকী সময় পাছে বর্ষার স্রোতে পুল ভেসে যায় এইজন্যে পুল খোলা থাকে। রাত বেশী হ'য়ে যাওয়ায় ফেরী পাওয়া গেল না। অগত্যা কোনো

উপায় না দেখে বি, এন্, ডব্লিউ রেলের পুল দিয়ে পার হ'বার কথা হ'ল। ঝুঁসীর মিলের বিজলী বাতি দেওয়া রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে অনেক খানা, ডোবা, নালা, ঝোঁপ-ঝাঁপ পার হ'য়ে প্রায় মাইল খানেক যাবার পর লাইনের উঁচু বাঁধের ওপর অতি কষ্টে উঠলাম। পুলের ওপর দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাওয়া এক বিষম ব্যাপার! তিন চার হাত পর পর প্রায় আট দশ ইঞ্চি উঁচু লোহার কড়ি বরাবর লাইনের দু'পাশে বার হ'য়ে আছে। এর ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। পথটি হাত তিনেক চওড়া, পাশে মাত্র দু'টি তার রেলিঙের কাজ করছে। সাইকেল কাঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে চল্লাম। লোহার পাতে আমাদের জুতো মাঝে মাঝে পিছলে যেতে লাগল। সাইকেল শুদ্ধ নীচে গঙ্গায় পড়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় হবে না ব'লে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। পুল আর শেষ হয় না, কেবল জ্যোৎস্না ছিল ব'লে কোন দুর্ঘটনা ঘটল না।

সম্মুখেই ষ্টেসনের মিটিমিটি আলো জ্বল্‌ছে। প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে এলাহাবাদ সহরতলীর রাস্তা। ষ্টেসন দিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হ'বে না ভেবে এইখান থেকেই নীচে নাম্‌বার চেষ্টা দেখতে লাগ্‌লাম। লগলাইন দড়ি লগেজ খুলে বার ক'রে তার সাহায্যে একে একে সাইকেল-গুলিকে বেঁধে ঝুলিয়ে নীচে নামান হ'ল। এতেও নিষ্কৃতি নেই, নীচে শালের খুঁটীর বেড়া। কোনো রকমে বেড়া টপকে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লাম। চারদিকে অল্প অল্প কুয়াসা। ঘামে-ভেজা জামা গায়ে থাকায় এখন শীত শীত কর্‌তে লাগল। রাত প্রায় এগারটা। পুল পার হ'য়ে রাস্তায় আস্‌তে দেড় ঘণ্টার ওপর লেগেছে। মাইল দুই আসার পর এলাহাবাদ সহরের মধ্যে পৌছলাম। সব দোকান পাট বন্ধ, সহর নিস্তব্ধ। ঘোরাঘুরি কর্‌তে কর্‌তে একটা কাশ্মিরী হোটেল খোলা দেখে সেইখানেই ঢুকে পড়্‌লাম।

আজ ৭৪ মাইল বাইক করা গেছে। মিটারে দেখা গেল কল্‌কাতা থেকে মোট ৫১৩ মাইল এসেছি।

৩রা অক্টোবর, শনিবার—ডাঃ নীলরতন ধর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে সকালে উঠে আমরা কর্ণেলগঞ্জের দিকে রওনা হ'য়ে পড়্‌লাম। তিনি আমাদের দেখে ভারী খুসী হলেন ও তাঁর বাড়ীতে থাকার জন্যে অনুরোধ কর্‌লেন। হোটেলের পাওনা মিটিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে ফির্‌তে বেলা হ'য়ে গেল। ধুলোয় সাইকেলগুলির অবস্থা এমন হয়েছে যে রীতিমত পরিষ্কার না কর্‌লে আর তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা দুষ্কর।

ইউনিভার্সিটী, হাইকোর্ট প্রভৃতি দেখ্‌তে দেখ্‌তেই সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। রাস্তায় ট্রাম বা ট্যাক্‌সির চলন নেই, আছে কেবল টোঙ্গা—একার উন্নত সংস্করণ। এক্কার মতো চারদিকে লোক না ব'সে কেবল সাম্‌নে পিছনে দু'জন দু'জন ক'রে বস্‌তে পারে। এখানে ইতর ভদ্র সকলেরই যান টোঙ্গা ও এক্কা। চাঁদনী রাত—রাস্তায় আলোর বালাই নেই। জিজ্ঞেস ক'রে জানা গেল কৃষ্ণপক্ষ ছাড়া অন্য সময়ে এখানে রাস্তায় আলো জালা হয় না।

৪ঠা অক্টোবর রবিবার—খুব ভোরে বেরিয়ে পড়্‌লাম। ফোর্ট্, ও যমুনার দ্বিতল পুলের ওপর থেকে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম দেখে আবার গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড ধর্‌লাম। মাইল ছয় অতি খারাপ রাস্তা, বেজায় ধুলো। এইখানে রাস্তার বাঁদিকে বামরুলী এয়ারডোমে যাবার পথ। কিছুদূর থেকে ভাল রাস্তা পাওয়া গেল। পাশে পাশে বরাবর গম, ভুট্টা ও জোয়ারের ক্ষেত, মাঝে মাঝে দু' একটা ধানের ক্ষেতও আছে। পথের ধারে ধারে শুক্‌নো ডোবায় কাদাখোঁচা, কাক, সারস প্রভৃতি অনেক রকম পাখী দেখা যাচ্ছে। আম জাম নিম গাছের সারি রাস্তার দু'পাশে চলেছে। তারি ছায়ায় ছায়ায় চ'লে আমরা দুপুরবেলায় খাগোয়া চটীতে, বড় পুকুরের ধারে, এক বাগানের মধ্যে আড্ডা ফেল্‌লাম।

এখানে একটা ভারি মজার ঘটনা হয়েছিল। বাগানের মধ্যে দলে দলে বাঁদরের সভা ব'সে গেছে। পুকুরে স্নান ক'রে ফির্‌ছি, দেখলাম সাম্‌নেই এক 'পালের গোদা' আমাদের এক টুপি মাথায় পরে, একটু আগে আমরা যে রকম ভাবে গাছে ঠেস দিয়ে বসেছিলাম ঠিক সেইভাবে আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। এই রোদে টুপি না থাক্‌লে যে কি বিপদে পড়্‌তে হবে সে আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না। তাড়া দিতেই টুপীপড়া বাঁদরটি লাফ মেরে গাছে
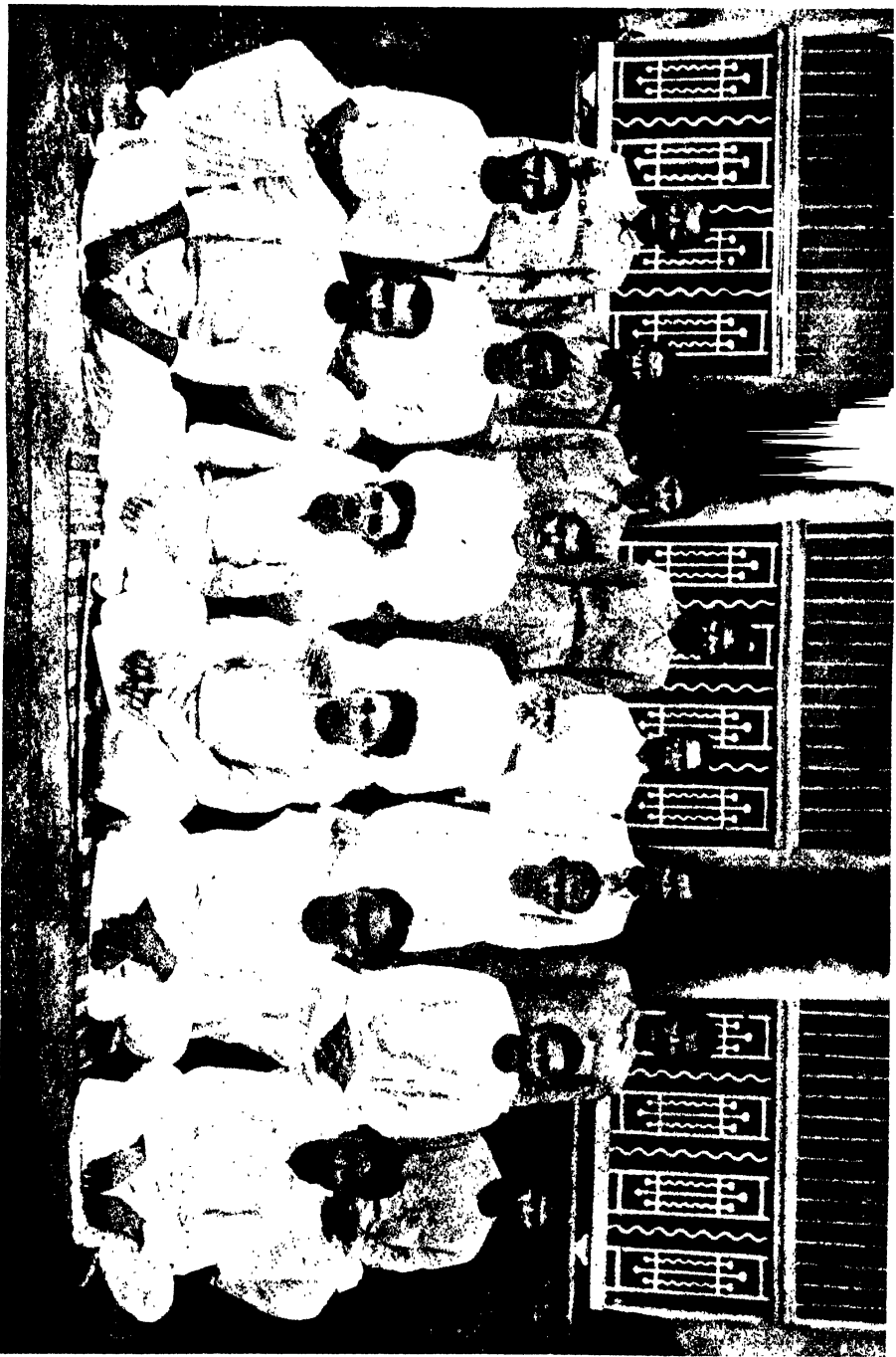
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও "প্রবাসী"র কর্ম্মচারীগণ

দ্বিতীয় সার—বামদিক্ হইতে—শ্রী হরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ম্যানেজার, ওয়েল্‌ফেয়ার্), শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার (ম্যানেজার, প্রবাসী প্রেস), শ্রী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ম্যানেজার, প্রবাসী-কার্য্যালয়), শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী রাখালদাস পালধি (ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ), শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (সহঃ সম্পাদক) ও শ্রী প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (টাইপিষ্ট্)।

তৃতীয় সার—বামদিক্ হইতে—শ্রী উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (অফিস্-অ্যাসিষ্টাণ্ট্), শ্রী প্রভাত সান্যাল (সহঃ সম্পাদক), শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় (কর্ম্মপরিচালক), শ্রী সজনীকান্ত দাস (সহঃ সম্পাদক) ও শ্রী নিকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় (অফিস্-অ্যাসিষ্টাণ্ট্)।

উঠ্‌ল, টুপিটা মাথা থেকে পড়ে গেল। আমরাও বাঁচ্‌লাম। এবার থেকে আমরা সাবধান হ'য়ে গেলাম। পাহারার বন্দোবস্ত না ক'রে জিনিসপত্র ফেলে আর কোথাও যেতাম না।

আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার গরু ছাগল খুব বড়। রাস্তার পাশে মন্দির ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজিয়ে ডুল্‌কি চালে সারি সারি উটের দল চলেছে। তাদের পায়ের ধূলোয় পিছনের রাস্তা অন্ধকার। খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম দিনাজপুরের মেলায় বিক্রীর জন্যে এদের নিয়ে যাচ্ছে।

বেলা পাঁচটার পর ফতেপুরে। ছোট খাট সহর। বাজনা বাজিয়ে রংবেরঙের নিশান উড়িয়ে একটা শোভা-যাত্রা চলেছে। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ডাকবাংলায় গিয়ে উঠ্‌লাম। বাংলায় ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের সাদর অভ্যর্থনা কর্‌লেন। রাত্রে এখানকার ওভারসিয়ার শ্রীযুত দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করা গেল। ফতেপুরে ইনিই একমাত্র বাঙালী। এখান থেকে ডান দিকে রায়বেরিলি ও বাঁদিক্‌ দিয়ে গাজীপুরে যাওয়ার রাস্তা দেখা গেল।

এলাহাবাদ থেকে আজ ৮০ মাইল আসা হয়েছে, রাস্তা মোট ৫৯৩ মাইল উঠেছে।

(ক্রমশঃ)

"প্রবাসী"-সম্পাদকের ইউরোপ-যাত্রা

বিগত ১১ই শ্রাবণ ১৩৩৩ (২৭ জুলাই ১৯২৬) তারিখে 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। লিগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌ বা জাতি-সঙ্ঘ নামক যে পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান, আমেরিকার মনীষী উড্রো উইল্‌সন্‌ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে যুদ্ধ-নিবারক ও জাতিতে জাতিতে প্রীতি-উদ্দীপক নানা সুব্যবস্থা সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন, সেই প্রতিষ্ঠান ভারত-বর্ষের সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে, তাঁহাদের কর্ম্মপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিবার জন্য সুইট্‌সার্‌ল্যাণ্ডের জেনেভায় আমন্ত্রণ করেন। এই পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের পর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু জাতি-সঙ্ঘের যথাযথ পরিচয় দেশবাসীকে জানাইতে সক্ষম হইবেন।

তাঁহার এই ইউরোপ যাত্রার দুই দিন পূর্ব্বে (৯ই শ্রাবণ ১৩৩৩) 'প্রবাসী'-কার্য্যালয়ের কর্ম্মীগণ তাঁহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করেন। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ, বিশেষ করিয়া "প্রবাসী"র সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকগণ, নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে গান শুনাইয়া আপ্যায়িত করেন। প্রবাসী-কার্য্যালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সান্যাল অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত বিনয়-কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, প্রভৃতি ছিলেন। গান হইবার পর 'প্রবাসী'-কার্য্যালয়ের কর্ম্মীগণ লেখার সকল রকম সরঞ্জাম পূর্ণ একটি বড় "রাইটিং-কেশ" রামানন্দ বাবুকে প্রদান করেন। তাহার পর "প্রবাসী"-কার্য্যালয়ের পক্ষ হইতে কবি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করিয়া রামানন্দ-বাবুকে অভিনন্দিত করেন :—

বোম্বাইএ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু

কবি যে, দেখেছে ছবি ভারতবর্ষের
সত্য, শুদ্ধ, মুক্তক্লেশ, অম্লান হর্ষের
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম, দৈন্য-ক্লেদ-হীন,
মুক্তচিত্ত, উল্লসিত, দুর্দ্দম স্বাধীন।
কবি নহ, তবু কবি-চিত্ত-মাঝে তব
সেই ছবি ভারতের সেই অভিনব
অতীত-গৌরব-ময়, বিমুক্ত, উদ্দাম,
সর্ব্বজয়ী, আত্মজয়ী মূর্ত্তি অভিরাম
উদ্ভাসিত হেরিয়াছ শয়নে স্বপনে।
হে তপস্বী, তাই তুমি অশ্রান্ত মননে
দীনা, হীনা, পদপিষ্টা, ক্লিষ্টা এ ভারতে
শিখাতে মুক্তির মন্ত্র যোগনিষ্ঠ ব্রতে
সঁপেছ জীবন তব।

হে ব্রাহ্মণ ত্যাগী,
জনসেবা শ্রেষ্ঠ সেবা, শুধু তারি লাগি'
কর্ম্ম তব চিন্তা তব নিয়োজি' নিয়ত
যাপিছ জীবন শান্ত ধ্যান জ্ঞান-গত।
ঈশ্বরচন্দ্রের কর্ম্মপুষ্ট বঙ্গভূমি,—
সেই শ্রেষ্ঠ সেবকের ধর্ম্মবাহী তুমি—
সবল নির্ভীক সৌম্য সত্যনিষ্ঠ প্রাণ।
অত্যাচারে অবিচারে বজ্রের সমান
হেনেছ লেখনী তব।—নিস্পৃহ, নির্লোভ,
অপমানে কণামাত্র পোষ নাই ক্ষোভ।
আলস্য-বিলাস-ক্লিন্ন পদলেহী দেশে
জাগিয়াছ দৃপ্ত মুক্ত দীপ্ত দৃঢ় বেশে।
হে ব্রাহ্মণ সত্যবাদী, মিথ্যা-বিনাশন,
চিন্তা তব বাঙালীরে করুক চেতন।

রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন, প্রকাশ্য সভায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ-বাবুর অভিনন্দন ইহাই প্রথম। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও রামানন্দ-বাবুকে একবার সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদগ্রহণ করিতে রাজী করিতে পারেন নাই। রামানন্দ-বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া জাতি-সঙ্ঘ যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য সম্মান প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বলেন, রামানন্দ-বাবু জোয়ান বা যুবক ভারতের প্রতিনিধি; কেননা, তিনি নব ভাবকে গ্রহণ করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি ইউরোপে যুবক-ভারতের বার্ত্তা ও উচ্চাশা বহন

এস্ এস্ পিল্‌স্না জাহাজে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

করিয়া লইয়া যাইতেছেন। বর্ত্তমান ইউরোপে গঠন-শক্তি যে-পরিমাণে দেখা যায়, ধ্বংস-শক্তিও সেই পরিমাণে সেখানে বিরাজ করিতেছে। জগতের হিত ও অহিত সাধনের উভয়প্রকার পন্থাই ইউরোপ আবিষ্কার করিয়াছে। রামানন্দ-বাবু তাঁহার প্রবীণ জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা তাহার হিতসাধক শক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয় বলেন, রামানন্দ-বাবু কখনও রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনপ্রকার সভা-সমিতিতে যোগ দেন না, অথচ দেশের সকল প্রতিষ্ঠান, সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধীর সমালোচক-দৃষ্টিতে অপক্ষপাত ও নির্ভীক সুবিচারপূর্ণ ভাবে আলোচনা করেন। এইজন্যই দেশের লোক তাঁহাকে বেশী শ্রদ্ধা করে। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউতে তাঁহার যে-সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহাতে বাংলা দেশে জনমত গঠিত হয় এবং দেশবাসী প্রভূত উপকৃত হয়। স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিতেন, "রামানন্দ বয়সে আমার কনিষ্ঠ হইলেও জ্ঞানে আমার জ্যেষ্ঠ।" রামানন্দ-বাবুকে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া লিগ্ অব্ নেশন্‌স্ প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকেই প্রাপ্য সম্মান দান করিয়াছেন। দেশে নানা প্রকার দল আছে, রামানন্দ-বাবু কোন দলেরই অন্তর্ভুক্ত নন, অথচ প্রত্যেক দলের ভালোটুকুর প্রশংসা করেন ও মন্দের নিন্দা করেন বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

এইসমস্ত বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে রামানন্দ-বাবু সভার সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, হিন্দু মুসলমান বিরোধে দেশের এই একান্ত দুর্দ্দশার দিনে দেশকে ছাড়িয়া বহু দূরে যাইতে তিনি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। যদিও প্রতিকারের উপায় নাই, তথাপি দেশবাসীর সঙ্গে থাকিয়া এই দুঃখের ভাগ লওয়াই তাঁহার পক্ষে ভালো ছিল। কিন্তু লিগ অব্ নেশন্‌স্‌কে কথা দিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে যাইতেই হইবে। এই চিন্তা অনেক সময় তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে যে, এ দেশটা কি কেবল দুই রকম জীবের বাসস্থান থাকিবে—বাঘ আর কেঁচো? কবে আমরা শক্ত ও সাহসী হইব? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশের ঠিক এইরকম দুর্দ্দশার দিনে স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় নিরাশ চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, এ দেশের উন্নতি কখনও হইবে কি না। তিনি বলেন, তাঁহার আশা আছে

—ভারতের সুদিন আসিবে। ইহাতে মতি-বাবু অত্যন্ত প্রীত হন।

সর্ব্বশেষে রামানন্দ-বাবুর জন্মভূমি বাঁকুড়া হইতে আগত উকিল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, আজ রামানন্দ-বাবু বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের যত গৌরবের বিষয়, তদপেক্ষা বাঁকুড়া জেলার তিনি অধিক গৌরবের বিষয়। অশিক্ষিত বাঁকুড়া জেলা রামানন্দ-বাবুর মত কৃতী যশস্বী বিদ্বান দেশসেবী সন্তান লাভ করিয়া ধন্য ও গৌরবান্বিত। তিনি বাঁকুড়াবাসীর পক্ষ হইতে রামানন্দ-বাবুকে আন্তরিক অভিনন্দন প্রদান করেন।

প্র

শিশির

শ্রী অমরকুমার দত্ত

ওরে ছোট শিশিরের ফোঁটা
ছোট্ট তৃণের নয়নের কোণে
তোর জীবনের বোঁটা।

সারা নিশীথের তিল তিল স্নেহ,
তিল তিল ভালোবাসা,
বাঁধিয়াছে তোর ঐ ছোট বুকে
তাহার গোপন বাসা,
ওরে ছোট শিশিরের ফোঁটা
নিশীথের তুই নয়নের বারি
তারকার আঁখি-ছটা।

ওই শীর্ণ তৃণের বুকে
কতটুক্ তোর জীবনের ঘের
কতটুকু হাসি মুখে?
পূবের আকাশ লাল হয়ে ওঠে
নহবত থেমে যায়,
সজল নয়নে সরে যায় উষা
মৃদুল মন্দ বায়;
ওই শীর্ণ তৃণের বুকে
শেষের স্বপন দেখিবি এবার—
শেষ-বিদায়ের দুখে।

তবু তবু এরি মাঝে হায়—
ধরার আঁচলে রং ধরে' গেছে
তোর আঁখি ইসারায়।
ওই ক্ষণিকের রামধনু রং
ক্ষণিকের চিকি মিকি;
দিয়ে গেছে এনে স্বপনের ঘোর;
সুরমা আঁখির দিঠি;
তাই তোর আঁখি ইসারায়—
প্রভাত লভেছে নিশীথের দান
ঘুম-ভাঙা-আঙিনায়—
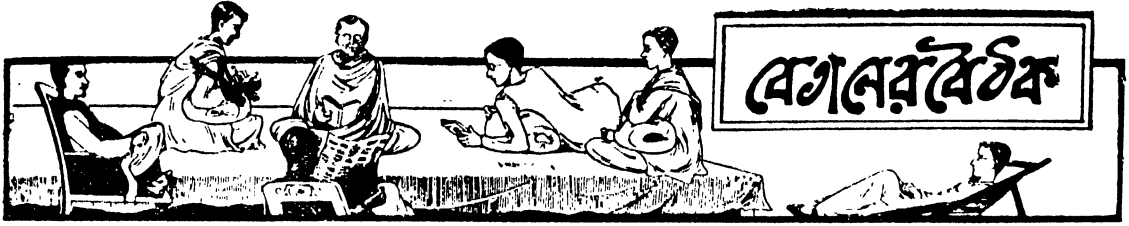
বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহু জনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৩৯)

কালির দাগ

কাগজ নষ্ট না করিয়া কালির দাগ উঠাইবার সহজ উপায় কি?

শ্রী প্রদ্যোতকুমার দে চৌধুরী

(৪০)

কবি হেমচন্দ্র

কবি হেমচন্দ্রের "নলিনীকান্ত" নাটকের প্রথমে "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি" এই শ্লোকার্দ্ধের সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়। উদ্ধার-চিহ্ন হইতে প্রতীয়মান হয়, উহা হেমবাবুর নিজের রচনা নহে। উক্ত শ্লোকার্দ্ধ হেম-বাবু কোন্ কবির কোন্ গ্রন্থ বা কবিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন?

শ্রী সুরজিৎ দত্ত

(৪১)

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

ময়মনসিংহে মহিলা কৃত্তিবাস দ্বিজ বংশী দাসের কন্যা চন্দ্রাবতী দেবীর লেখা রামায়ণ লইয়া নানা আলোচনা হইয়াছে। উক্ত রামায়ণ কত খণ্ডে সম্পূর্ণ ও কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী নলিনীবালা বসু

(৪২)

মহিলা ব্যায়াম-শিক্ষক

"বঙ্গ-মহিলার ব্যায়াম" শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা হইতেপারে? মহিলাদের উপযোগী ব্যায়াম শিক্ষা দিতে পারেন এমন শিক্ষয়িত্রীর সংবাদ ও ঠিকানা কেহ দিতে পারিলে উপকৃত হইব।

"জিজ্ঞাসু"

(৪৩)

আলিপনা

আলিপনা কোন্ যুগ হইতে হিন্দু ললনার শিল্পরূপে ব্যবহৃত হইতেছে? ইহার প্রবর্ত্তক কে? এসম্বন্ধে কোনো পুঁথি কিম্বা অধুনা-প্রকাশিত পুস্তক আছে কি?

শ্রী অখিল নিয়োগী

(৪৪)

পাখীর চাষ

পাখী-চাষ শিক্ষা করার কোনও বন্দোবস্ত ভারতে আছে কি না? থাকিলে, কোথায় আছে এবং কিরূপ ব্যয় সাধ্য? আমাদের দেশে poultry farm আছে কি? কোথায় আছে? বাঙ্গালা ভাষায় এসম্বন্ধে কোনও পুস্তক আছে কি না বা থাকিলে কোথায় পাওয়া যাইবে?

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৪৫)

নারিকেল-তৈল

ব্লটিং কাগজে ফিলটার করা সত্ত্বেও নারিকেল-তৈলের হরিদ্রাভ বর্ণ দূর হয় না কেন? কি করিলে দূর হয়? জলের মত রঙই বা কি করিলে হয়?

শ্রী কালিদাস ঘোষাল
শ্রী সুশীলচন্দ্র ঘোষাল
শ্রী পঞ্চানন ঘোষাল

মীমাংসা

গৌরীশঙ্কর ও মাউণ্ট এভারেষ্ট

গত ফাল্গুনের 'বেতালের বৈঠকে' "গৌরীশঙ্কর ও মাউণ্ট্ এভারেষ্ট"—শীর্ষক জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমতী মিনি সেন বৈশাখের মীমাংসায় লিখেছেন যে, গৌরীশঙ্কর ও এভারেষ্ট দুটি পৃথক শৃঙ্গ; এভারেষ্টর দেশীয় কোনো নাম নেই, আর গৌরীশঙ্কর এভারেষ্টের চেয়ে অনেকে ছোট—২৩৪৪৭ ফুট। কিন্তু শ্রীযুত D. N. Wadia কৃত "Geology of India" (1919) এর ৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে;—

Mt. Everest (Gaurishankar)...29000 Ft.
(Col. Burrard)

সুতরাং দেখা যায় শ্রীমতী মিনি সেন যা বলেছেন সেটা ভৌগোলিকদিগের সর্ব্ববাদি-সম্মত মত নয়। তা ছাড়া আর-একটা কথা এই যে, মাউণ্ট্ এভারেষ্টের মতন এত উঁচু একটা চূড়াকে আমাদের দেশের লোক যে Col. Everest এর আগে কখনো লক্ষ্য করেনি সেটা

সম্ভব মনে হয় না। আর যদি লক্ষ্য ক'রেই থাকে তা হ'লে তার একটা নামকরণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং মাউণ্ট্ এভারেষ্টের পুরোনো ও ভারতীয় নাম গৌরীশঙ্কর থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। বিশেষত এই দুটি নামের বিভ্রাট চূড়াটিকে যে আজও আঁকড়ে রয়েছে তাই থেকেই কি মনে স্বতই সন্দেহ জাগে না যে, চূড়াটির প্রাচীন নাম গৌরীশঙ্কর? এখন কথা উঠতে পারে, উপরি-উক্ত ২৩৪৪৭ ফুট চূড়াটির তবে কি নাম ছিল। এচূড়াটি হিমালয়ের পক্ষে এমন কিছু উঁচু নয় যে, এর একটা না একটা নাম নিশ্চয়ই ছিল। যদি থেকেই থাকে এরও নাম গৌরীশঙ্কর থাকা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। মনে হয় যেন কিছুকাল পূর্ব্বে 'বিবিধ-প্রসঙ্গে' পূজনীয় রামানন্দ-বাবু লিখেছিলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ এই শৃঙ্গটির ভারতীয় নাম ছেটে ফেলে দিয়ে মাউণ্ট্ এভারেষ্ট্ নাম চালাবার চেষ্টা চলেছে। এই কারণেও একটি ছোট চূড়াকে গৌরীশঙ্কর এই নতুন নাম দেওয়া অসম্ভব নয়; তা হ'লে লোকে শীঘ্রই মাউণ্ট্ এভারেষ্টের নাম যে গৌরীশঙ্কর ছিল একথাটা ভুলে যাবে। এ-বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য একথাটাও স্বীকার্য্য যে, প্রাচীন ভারতে সবকটি চূড়ার সম্ভবত নাম করা হয়নি। তা না হোলে কারাকোরামের ২৮২৫০ ফুট উচু K2 চূড়ার কোনো দেশী নাম নেই কেন?

শ্রী জ্যোৎস্না ঘোষ

(২৬)

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল

চারুবাবুর জিজ্ঞাসা হইতে বুঝিতেছি তিনি ধর্ম্মমঙ্গলখানি মন দিয়া পড়িতেছেন। আশা হইতেছে ইহার টীকা-সমেত সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিবেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রসিদ্ধ কর্তা শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন ভূমিকা লিখিয়াছেন; কিন্তু কে প্রকাশ-সম্পাদক ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। তিনি যিনিই হউন তিনি পুঁথী পড়িতে ও ছাপাইতে এত ভুল করিয়াছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কলঙ্ক হইয়াছে। ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত, গ্রন্থসমাপ্তি কালসূচক পদে আছে। ছাপা হইয়াছে,

সাকেরি ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিন্ধু সহ যুগ দক্ষে যোগতার সনে॥

হইবে,

সাকে রিতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিন্ধু সহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে॥

ইহার অর্থ, ১৭৩০ শকে, অর্থাৎ এখন হইতে ১১৮ বৎসর পূর্ব্বে। দীনেশ-বাবু ১৪৬৯ শকে মনে করিয়া পৌণে চারিশত বৎসরের পুরাণা স্থির করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি গ্রন্থের ভাষা লক্ষ্য করেন নাই। ইহা আধুনিক দেখিয়াই তাঁহার নিরূপিতকালে আমার সন্দেহ জন্মে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগে করা গিয়াছে। তিনি ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। জানি না, তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার প্রথম অনুমান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কি না।

কবি আধুনিক অথচ তাঁহার গ্রন্থে এমন শব্দ আছে যাহা বুঝিতে পারা যায় না। কতক শব্দ পুঁথীর লিপিকর কিম্বা প্রকাশকের কীর্ত্তি, অপর কতকগুলি যে কবির তাহাতে সন্দেহ হয় না। কবির বর্ত্তমান বংশধর বলেন, কবি তেমন পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু অমরকোষ তাঁহার যে পড়া ছিল, তাহার পরিচয় গ্রন্থের নানা স্থানে আছে। সেকালে পাঠশালায় অমরকোষ মুখস্থ করানো হইত। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বেও এই রীতি ছিল, তথাপি কবি কতকগুলি শব্দের কেমন করিয়া অপপ্রয়োগ করিলেন তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। হঠাৎ মনে হইতে পারে, তাঁহার সময়ে সেই সকল শব্দ প্রচলিত ছিল, এখন নাই। কিন্তু এরূপ মনে করিবার পূর্বে তাঁহার দেশে অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। কারণ শব্দের প্রাণ সহজে বহির্গত হয় না। কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষে লিখিয়াছিলাম, এক লেখক কতকগুলি 'নির্ব্বংশ শব্দে'র তালিকা করিয়াছেন। কিন্তু বাঁকুড়ায় দেখিতেছি তালিকার অধিকাংশ শব্দ সশরীরে সতেজে বর্ত্তমান, বংশরক্ষার চিন্তা অদ্যাপি উঠে নাই।

চারুবাবু যে কয়েকটি শব্দ তুলিয়াছেন, তন্মধ্যে লোটন শব্দটি কবরী অর্থে বহুপ্রচলিত আছে। বালিকাদের চুল ছোট, তাহারা খোঁপা বাঁধে। এছাড়া খোঁপা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। লোটনে মাথার চুল ঘাড়ের দিকে ঝুলিয়া, যেন লুটিয়া পড়ে। আমার মনে হয় এই হেতু নাম, লোটন। 'কমন্তরে'—কেমন-তরে। কেমন—কিপ্রকার, এই অর্থ বুঝাইলেও কেহ কেহ 'তর' যোগ করিয়া বলে, 'কেমনতর কথা'। 'কে' স্থানে 'ক' কবির না লিপিকরের কে জানে। চারু-বাবুর শব্দগুলির পৃষ্ঠাঙ্ক পাইলে ভাবিয়া দেখিতাম।

পৌরাণিক আখ্যায়িকার নিমিত্ত প্রথমে মহাভারত দেখা কর্তব্য। সাহিত্য-পরিষদ হইতে রামায়ণের সূচী প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, মহাভারতের সেরূপ সূচী প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত মহাভারত ও পুরাণ ব্যতীত কলিকাতার বটতলা হইতে প্রচারিত পুরানা বই দেখিতে বলি। সেকালে শতস্কন্ধ রাবণ বধ প্রভৃতি বইগুলির আদর ছিল। মাণিক গাঙ্গুলী এইরকম বই হইতে আখ্যায়িকা জানিয়া থাকিবেন। তা ছাড়া পূর্বকালে প্রচলিত "লাউসেনী দাঁড়া" নিশ্চয় পাইয়াছিলেন। তিনি ময়ূরভট্টের নাম করিয়াছেন। সকল আখ্যায়িকা যে সংস্কৃতে লেখা হইয়া পুরাণে নিবিষ্ট হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। এক এক ধর্ম-সম্প্রদায়ে অনেক উপাখ্যান চলিয়া গিয়াছে। এমনই করিয়া পুরাণের উৎপত্তি। প্রভেদের মধ্যে কোন কথা সংস্কৃতে, কোন কথা বা বাঙ্গালায় লেখা। রঞ্জাবতীর শালে ভর কিম্বা সূর্য্যের পশ্চিমে উদয়, সংস্কৃত পুরাণে নাই, বাঙ্গালায় আছে। হরিচন্দ্র রাজা ও তাঁহার রাণী মদনাবতী যে নিজপুত্রকে কাটিয়া এক ব্রাহ্মণ অতিথির সেবার্থে বলি দিয়াছিলেন, ইহা বাঙ্গালা পুরাণে আছে, সংস্কৃতে নহে।

বেলডিহা গ্রামে কবির বাসস্থান ছিল। সংস্কৃতে করিলে হইবে "বিল্বদ্বীপ।" এখন চলিত কথায় বলে "বেলুটে।" হুগলি জেলার পশ্চিম প্রান্তে বদনগঞ্জ নামে এক পোষ্ট আফিস আছে, বেলুটে ইহার নিকটে। আর এক কথা। দেখিতেছি, চারুবাবু গাঙ্গুলী—ঈকারান্ত না করিয়া, গাঙ্গুলি ইকারান্ত করিয়াছেন। ঈকারান্ত ঠিক ইকারান্ত ভুল। সে বানান যেখানেই থাক্।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

(৩০)

বাবু ও সাহেব শব্দ

"বাবু" শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের ভ্রম আছে। অশিষ্ট অজ্ঞ ইংরেজের মুখে এই শব্দের অপমান দেখিয়া আমরা বাবু ছাড়িয়া শ্রীযুত ধরিতেছি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, শ্রীযুত শব্দও হীনাবস্থা পাইতে পারে। বাপ, বাপা, বাবা শব্দের অর্থ, জনক, পিতা। বাপ শব্দে আদরে উযুক্ত হইয়া বাপু; ইহা হইতে বাবু। ইংরেজী Sir শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ অবিকল তাই। ইহার মূলরূপ sire, অর্থ জনক। রাজাকে সম্বোধন করিতে sire, অর্থাৎ পিতা বলা হয়। ভদ্রলোক মাত্রেই sir বলিয়া সম্বোধিত হন। বাঙ্গালাতেও সেইরূপ বাবু। অতএব যখন বলি বাবু কেশবচন্দ্র সেন, তখন বস্তুতঃ বলি Sir Keshab

Chandra Sen। ইংরেজীতেও sir শব্দ নিস্তার পায় নাই। Sirrah আকারে অবজ্ঞা-সূচক হইয়াছে। বাপু, বাবু শব্দ নূতন নয়। পুত্র পিতাকে বাপু, বাবু বলে, পিতাও পুত্রকে বাপু, বাবু বলেন। এইরূপ আরও আছে। যেমন কাকা, দাদা এবং সংস্কৃতে তাত। আমার বাঙ্গালা শব্দকোষ দেখুন।

সাহেব শব্দ আরবি সাহিব হইতে, অর্থ ভদ্রলোক।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

'বাবু' ও 'সাহেব' শব্দ পারসীক ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।

পারসীক ভাষায় 'বাবু' শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে এইরূপ—বা—সহিত। ব (খোস্‌বু)=সৌগন্ধ। 'বাবু' শব্দের অর্থ=সৌগন্ধের সহিত অর্থাৎ যাঁহার সৌগন্ধ (এসেন্স প্রভৃতির গন্ধ নয়) যশঃ আছে, তিনিই 'বাবু'।

এই 'বাবু' শব্দের অর্থ অনুরূপ। 'বাবু' শব্দ এবং শব্দগত অর্থের স্থান পারসীক ভাষায় খুব উচ্চে। যিনি ঈশ্বর-প্রিয়, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, যাঁহার যশোরাশি ফুলের সুবাসের মতই ছড়াইয়া পড়ে, তিনিই 'বাবু'। ইহাই শব্দগত প্রকৃত অর্থ।

'সাহেব' শব্দের অর্থ ও 'বাবু' শব্দের অর্থ পারসীক ভাষায় একই রূপ। কাজেই তাহার আর পৃথক্ বিশ্লেষণ দিলাম না।

ব্যবহারের ভুলে এবং চল্‌তি অর্থে এইরূপ বহু শব্দের অর্থের বিকৃতি ঘটিয়াছে।

শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কাব্য-কথা

প্রতিভা ও কবিকল্পনা (২)

শ্রী সত্যসুন্দর দাস

ভিতরের বা বাহিরের যে কোনও বস্তু বা তথ্যকে একরূপ ভাবদৃষ্টির সাহায্যে অভিনব আকারে প্রকটিত করার যে কবিবৃত্তি—তাহারই নাম কল্পনা, ইহাই কবির কাব্য-প্রতিভা। এই কল্পনা সত্যের বিপরীত বা মিথ্যা নহে, কারণ বিজ্ঞানের সত্য কাব্যের সত্য নয়, একথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই কল্পনারও সত্য-মিথ্যা আছে, তাহার প্রমাণ অন্যরূপ। যেখানে কবিদৃষ্টি দুর্ব্বল, বা ভাণমূলক, সেখানে কাব্য শব্দের চারুচাতুরী মাত্র, সেখানে সত্যকার কল্পনা নাই। কল্পনার মূলে কবির ব্যক্তিগত আন্তরিক উপলব্ধি না থাকিলে, কাব্য কতকগুলি শব্দ ও অর্থগত অলঙ্কার-রীতির কসরৎ হইয়া দাঁড়ায়। উপমা প্রভৃতির মধ্যে কল্পনার অতি সরল ও স্বাভাবিক বিকাশ আছে, তাহার কারণ, একটি মাত্র উপমা বা উপমা-সমুচ্চয়ের দ্বারা যথার্থ কাব্যই গড়িয়া উঠে, উপমাই সেখানে বাণী অর্থাৎ অন্তর্গত ভাবের বাঙ্ময় রূপ—উপমা অলঙ্কার বা প্রসাধন নয়।

তথ্যের সত্য কবির উপজীব্য নয়; কবির দৃষ্টি ভাবানুসারী, এই ভাবদৃষ্টির শর-সন্ধানে কবি যে লক্ষ্যভেদ করেন, তাহা মানুষের দেহমনপ্রাণের সাড়ায় সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। সাবিত্রী যমের হাত হইতে স্বামীকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন—ইহা যে তথ্য বা ইতিহাস নয়—কবিও তাহা জানেন, তথাপি একনিষ্ঠ প্রেমের যে শক্তি তিনি কল্পনায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা এতই সত্য, যে, তাহাকে প্রকটিত করিবার জন্য তিনি যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা একটুও অতিরঞ্জিত বোধ হয় না। কল্পনার দ্বারা এই যে সত্য সন্ধান, মনে হয়, ইহার মধ্যেই সৃষ্টি-ধর্ম্ম রহিয়াছে। কাব্যপ্রেরণায় ও প্রত্যক্ষ কাব্য-রচনায় ইহার লক্ষণ কি? সৃষ্টি কথাটির প্রথম ও শেষ তাৎপর্য্যই বা কি? এইরূপ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে কি দাঁড়ায়, এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে।

কবি যে স্রষ্টা, তিনি যে কিছু সৃষ্টি করেন—একথা নূতন নয়, আধুনিক কাব্যবিচারে ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। কিন্তু ইহার নানা অর্থ আছে। এই নানা অর্থের মধ্যে কোন্‌টি শেষ পর্য্যন্ত কবি-কীর্ত্তির প্রধান লক্ষণ হিসাবে, কবির দিব্যপ্রযত্নের যথার্থ-ধারণারূপে গ্রহণ করা উচিত আমি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া এই সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা Aesthetics বা রসতত্ত্বের উচ্চ অধিকার অক্ষুন্ন রাখিতে চান, তাঁহাদের

মতে 'রস'ই "সকল-প্রয়োজন-মৌলীভূত"—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং", অতএব কাব্যরচনা ব্যপদেশে কবি রসেরই সৃষ্টি করেন। ইহার উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয়, কবি কাব্যসৃষ্টিই করেন, রসসৃষ্টি কাব্যের মুখ্য প্রয়োজন নয়? বস্তুতঃ এই কথাটিই প্রকৃত কাব্য-পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি—ইহাই যদি অস্বীকার করা হয়, তবে কাব্যসৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝি তাহার আলোচনার উপায় বা প্রয়োজন আর থাকে না। রস একটি নির্ব্বিশেষ পদার্থ, কিন্তু কাব্য-প্রেরণা এতই বিশিষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট যে, তাহা প্রত্যেক কাব্যে একটি নিজস্ব ও বিলক্ষণ রূপ লইয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। কাব্যসৃষ্টিতে কবির সমগ্র সাধনা ও চেষ্টা মুখ্যতঃ রসকে লইয়া ব্যাপৃত নয়, একটি অতি অপূর্ব্ব ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে কেমন করিয়া যথাযথ আকারে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিবেন, ইহাই কবির একমাত্র ভাবনা—ইহাতেই তাঁহার আনন্দ। যদি সেই সাধনায় কবি সাফল্য লাভ করেন, সেই সাফল্যের নামই সৃষ্টি। যিনি কাব্য-রসিক তিনি কবিকল্পনার এই বিশেষত্বেই মুগ্ধ। যিনি দার্শনিক তিনি সকল বৈচিত্র্যকে একাকার করিয়া হাঁফ ছাড়িতে চান, তাই তাঁহার কাব্যজিজ্ঞাসা রসতত্ত্বে পৌঁছিয়া তবে নিবৃত্ত হয়। সৃষ্টি অর্থেই বহু, কবির আনন্দ সেই বহুকে উপলব্ধি করিয়া,—দার্শনিকের আনন্দ সেই বিশেষকে নির্ব্বিশেষে পরিণত করিয়া। কবির কাব্য-রচনায় পাই—

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলাম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

—ইত্যাদি। গাঁয়ের লোক যাকে কালো বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, কবির চক্ষে সে একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে-রূপ এত বিশিষ্ট যে কবি নিজে তাহার একটি নামকরণ করিয়াছেন। কবির মুগ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ মেয়েটির 'কালো হরিণ-চোখ' বটে। কিন্তু তাঁহার সেই ভাবটি ঠিক স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য স্থান, কাল, এমন কি চাহনির ভঙ্গিটুকু পর্য্যন্ত ধরিয়া দিতে হইল। কারণ, "কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ" ত' কত রূপে মুগ্ধ করিতে পারে, তাহার আকার ও ভঙ্গিমা কত মুহূর্ত্তে, কত অবস্থায়, কত রূপ হইতে পারে,—ঠিক ওই স্থান, ওই কাল, ওই চাহনিটি ধরিয়া দিতে না পারিলে, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি বা কল্পনার বিশিষ্ট প্রেরণা মাঠে মারা যাইত,—যে particularity সকল কাব্যসৃষ্টির প্রাণ তাহারই অভাবে কল্পনার সত্য রক্ষা হইত না। কবির কাজ এই পর্য্যন্ত, তারপর যে আনন্দ বা রসাস্বাদ অনিবার্য্যরূপে ঘটে, তাহার প্রকৃতি-নির্ণয় দার্শনিকের কর্ম্ম, কবির নয়। অতএব রসবাদীর রসতত্ত্ব যে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা নয়, ইহা নিশ্চিত। কবি যদি সর্ব্ববস্তুতে 'ব্রহ্মাস্বাদ' করিতেন, তবে আর কথা কহিতেন না, 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া চুপ করিয়া যাইতেন, কবিকর্ম্মের কোন প্রয়োজনই থাকিত না। কাব্যসৃষ্টির প্রারম্ভে কবিচিত্তে যে রসোল্লাস হয়—সেই emotion অতিমাত্রায় বস্তুগত, ও ব্যক্তিগত, অতিশয় অনন্যসাধারণ ও সুনির্দ্দিষ্ট; এই রসকে রূপ হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, ইহা নির্ব্বিশেষ নয়, সর্ব্বত্রই বিশেষের অনুবন্ধী। এজন্য কাব্যবিশেষের ভাষা, ছন্দ-ধ্বনি, শব্দচিত্র প্রভৃতি যাহা কিছু উপাদান—তাহার কোনটিকে বাদ দিবার বা একটু বদ্‌লাইবার যো নাই। এজন্য বিভিন্ন কবিতার যে নাম দেওয়া হয় তাহা নিরর্থক—সেই নাম হইতে কবিতার কিছুমাত্র পরিচয় ঘটে না। যতক্ষণ না কবিতার শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত পাঠ করা যায়, ততক্ষণ কবির কল্পনাটি বিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন আকারে কবিতা হইয়া ওঠে না। একটি উদাহরণ দিব। জ্যোৎস্না রাত্রির একটি রূপ, বিশেষ করিয়া তাহার স্তব্ধতার মাধুরী, কবি একটি শব্দচিত্রে এইরূপ আঁকিয়াছেন—

হের, সখি, আঁখি ভরি' শুভ্র নীরবতা,
পাহাড়ের দুটি পার্শ্ব জ্যোৎস্না আর মসী।
নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,
কাণ পেতে শোন হেথা বালুতটে বসি'।
নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে,
সুর মিলাইয়ে ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু মগ্ন কার ধ্যানে—
সন্তর্পণে হাতখানি রাখ মোর হাতে।
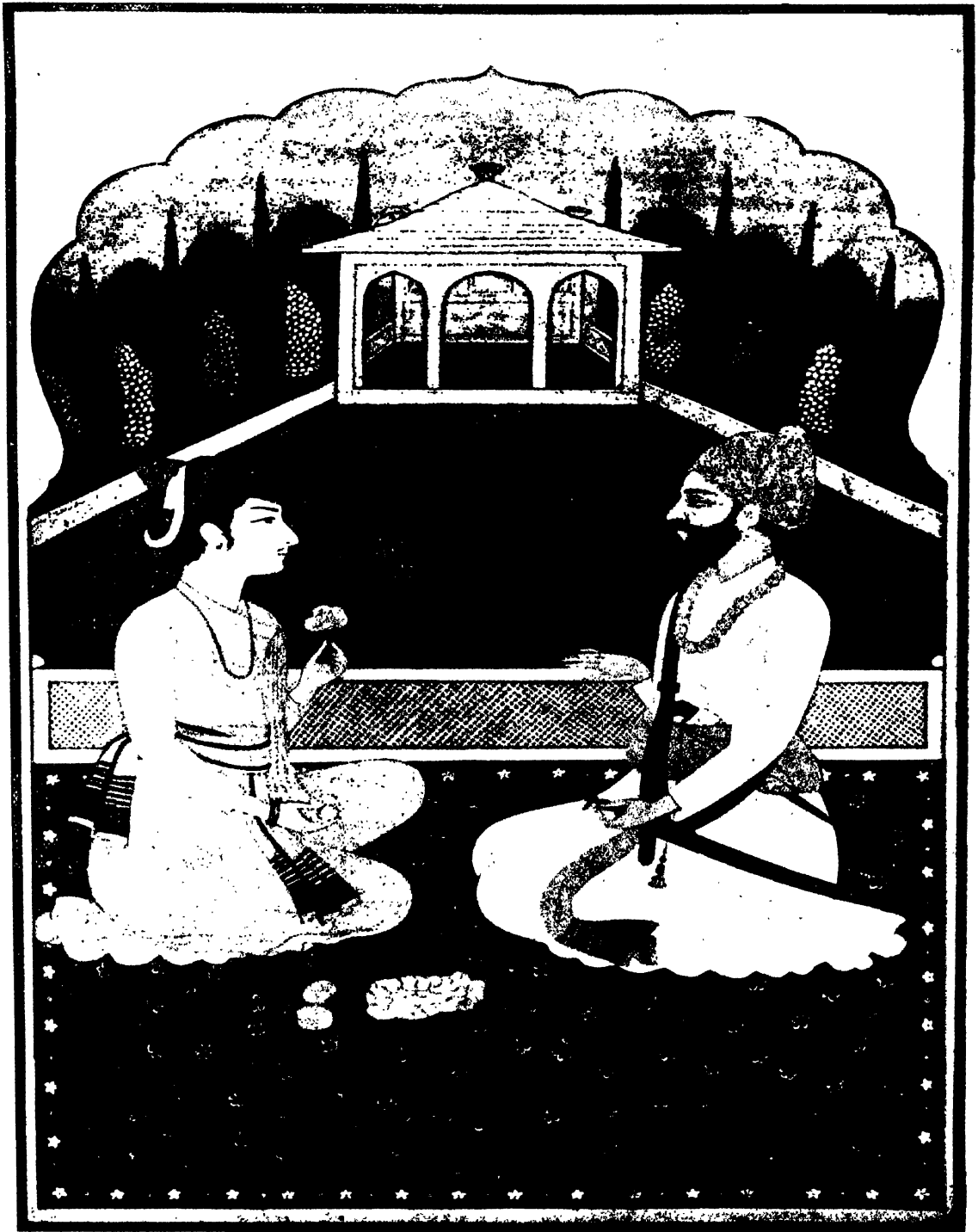
রাজ-সন্দর্শনে

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

[চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রমোহন বসুর সৌজন্যে

যাদুকর চন্দ্রকর তাদের বাকলে
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক,
মাধবী লতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক!
পাখী লুকায়েছে আঁখি পালক-শিথানে—
আজিকার কথা বঁধু কহ কাণে কাণে।

কবিতাটির নাম 'কাণে কাণে'। কিন্তু কবির প্রত্যক্ষ অনুভূতি-ঘটিত কল্পনা, এই কবিতাটির প্রত্যেকটি শব্দ-বর্ণনার—প্রতি বর্ণচ্ছেদটির ভিতর দিয়া, পৃথক্ ও সমগ্রভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে—ইহাদের একটিকেও বাদ দিলে কবিতার অঙ্গহানি হইবে। একেবারে শেষ কথাটিতে পৌঁছিলে তবে এই বিশিষ্ট অনুভূতির—এই খণ্ড রসের—অখণ্ড রূপটি সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হইবে, তার পূর্ব্বে নয়। 'শুভ্র নীরবতা' বা 'কাণে কাণে'—যে নামই থাক না কেন, সম্পূর্ণ বাণীটি যতক্ষণ না পাইতেছি, ততক্ষণ জ্যোৎস্নারাত্রির যে শুদ্ধরূপটি কবির ধ্যানকল্পনায় ধরা দিয়াছে তাহা যে ঠিক কেমন, সে ধারণা অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম, কাব্যমাত্রেই এমনি আপনাতে-আপনি নির্দ্দিষ্ট, যে আর কোনও উপায়ে সাধারণভাবে তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না।

কাব্যসৃষ্টির প্রসঙ্গে অনুকরণের কথা আসে। সৃষ্টি অর্থে অনেক স্থলে মৌলিকতা বা অনুকরণ-বিমুখতার প্রশ্ন ওঠে। উৎকৃষ্ট কাব্যে, বহির্জগৎ বা পূর্ব্বসৃষ্টির সাদৃশ্য না থাকাই যদি সৃষ্টিশক্তির লক্ষণ হয়, তবে কি কবি-কল্পনা অবস্তু-বিলাসের নামান্তর! এরূপ প্রশ্ন এক-কালে বিচারযোগ্য থাকিলেও, এ জিজ্ঞাসা কাব্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে বড়ই স্থূল ধারণার পরিচায়ক। এ বিষয়ে ইতি-পূর্ব্বে প্রসঙ্গান্তরে যাহা বলিয়াছি, এখানেও তাহাই বলিব। কবি-কল্পনা বহির্জগৎ বা বাস্তবসৃষ্টিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। বরং বাস্তব অনুভূতির বিশিষ্ট emotion-ই কাব্যের মূল প্রেরণা। কবির স্বতন্ত্র হৃদ্‌গত অনুভূতিই মৌলিকতার কারণ; কাব্য এক অর্থে Imitation হইলেও, তাহা Ideal Imitation বা কবির মনোমত অনুকৃতি।

তথাপি এই বাস্তব-অবাস্তবের কথাটা এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে ভালো হয়। কবি কীটসের Beauty-Truth-সূত্রটির কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ কবির আর-একটি অপূর্ব্ব উক্তি আছে, —"What the Imagination seizes as Beauty must be Truth, whether it existed before or not."—অর্থাৎ "কল্পনায় যাহাকে সুন্দর বলিয়া চিনিয়া লই, তাহা সত্য হইতে বাধ্য—তাহা অভূতপূর্ব্বই হউক বা ভূতপূর্ব্বই হউক।" এখানে বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্ব কবি স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। যে ভাবৈকরস চেতনায় সৃষ্টির মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত হয় তাহার সাহায্যে, আনন্দের অবশ্যম্ভাবী আবেগে যাহাকে উপলব্ধি করি—সেই 'সুন্দর' সারাচিত্তকে জয় করিয়া আত্মার পদ্মাসনে যখন বিরাজ করেন, তখন সেই যে আত্মসমর্পণ, তাহাই ত সত্যোপলব্ধি। বিচার-বুদ্ধি ও কবিদৃষ্টির এই বিরোধ তর্কে ঘুচিবে না; ইহা কবির মতই উপলব্ধি করিবার—যাঁহার সে শক্তি নাই তিনি প্রকৃত কাব্য-উপভোগে বঞ্চিত। কবিকল্পনার সত্য বাস্তব-অবাস্তবের সীমা-রেখায় বিভক্ত নয়—একটি অপূর্ব্ব চেতনায় নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিরাজ করে।

অতএব, কবিকল্পনায় বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্ন অবান্তর হইয়া পড়ে। তথাপি কল্পনা বলিতে একটি যে সংস্কার আমাদের মনে আধিপত্য করে, তাহাতে লোকাতিক্রান্ত Ideal সৃষ্টির প্রতি আমাদের একটি স্বাভাবিক আসক্তি আছে বলিয়া মনে হয়। সেক্‌স্‌পীয়ারের এত উৎকৃষ্ট চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও Caliban-নামক অপূর্ব্ব কল্পনাটি যেন বেশী করিয়া আমাদের সম্ভ্রম আকর্ষণ করে। মনে হয়, Caliban যেন একটি সত্যকার নূতন সৃষ্টি, উহাতে যেন সৃষ্টির নবপর্য্যায়ের আভাস রহিয়াছে। উহা পরিচিত জগতের বহির্ভূত, অথচ মানুষের মনে যে sentiment of reality বা বাস্তব-সংস্কার আছে—তাহার সম্পূর্ণ অনুমত, তাই তাহাকে জীবন্ত, প্রাণধর্ম্মী বলিয়া মনে হয়। অতি স্থূল কল্পনার বা রূপকথার দানব-দৈত্য-পিশাচের মত কোনো অনাসৃষ্টি, আর এই Caliban-এর মত উৎকৃষ্ট সৃষ্টি তুলনা করিয়া দেখিলেই, বাস্তব-অবাস্তবের মধ্যে কবি-কল্পনা কোথায় তাহার সত্য রক্ষা করিতেছে, কাব্যসৃষ্টির উৎকৃষ্ট লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কবিকল্পনার

এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াই Wordsworth ও Coleridge দুইজনে মিলিয়া Lyrical Ballads নামক কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন; তাহাতে Coleridge নিজে অবাস্তবকে বাস্তব করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছিলেন—Ancient Marinerএর মত কবিতায়; Wordsworthএর উপর ভার ছিল অতিপরিচিত দৈনন্দিন বাস্তবকে অবাস্তবের চমৎকারে মণ্ডিত করার। প্রকৃতিকে লইয়া এই খেলার ভিতরে কল্পনার উপর বাস্তবের প্রচ্ছন্ন শাসন থাকিলেও ইহাতে বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্বকে অনেকটা অস্বীকার করাই হইয়াছে। কথাটা ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিলে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার ধারণা এইরূপ দাঁড়ায়—যাহা লোকাতীত, যাহা সাধারণ অর্থে অবাস্তব, অথচ কবির মনে যাহা বৃহত্তর, সুন্দরতর এবং অতিশয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দেয়, যাহাকে তিনি 'forms more real than living man' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা সত্যই বাস্তববিরোধী নয়। কারণ, যাহাকে বাস্তব-জগৎ বলি তাহার মধ্যে সৃষ্টির যে গূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কবিকল্পনা তাহাকে ভেদ করিতে পারে বলিয়াই এমন বস্তু নির্ম্মাণ করে, যাহা বিসদৃশ হইলেও অনুভূতির উচ্চতর সোপানে অসঙ্গত বা অপ্রাকৃত বলিয়া মনে হয় না—আমাদের মনে বিস্ময় বোধ হইলেও কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না। প্রকৃতির গোপন কক্ষে, মায়া-মুকুরে তাহার যে মর্ম্মের রূপটি প্রতিফলিত হয়, কবিকল্পনার ইন্দ্রজাল তাহাকে আবিষ্কার করে,—সৃষ্টির নিগূঢ় সত্য আর-এক স্রষ্টার কল্পনায় আপনি আসিয়া ধরা দেয়।

এজন্য, বাস্তবকে সম্পূর্ণ অপসারিত করিয়া তদ্‌পরিবর্ত্তে একটি আদর্শ-রমণীয় চিত্তচমৎকারী ভাবস্বর্গ নির্ম্মাণকেই কবিশক্তির পরাকাষ্ঠা বলিলে যথার্থ হয় না। বরং উৎকৃষ্ট কল্পনায়, চিৎ ও জড়, Ideal ও Real ঐক্যসূত্রে গাঁথা হইয়া যায়। কবিকল্পনা বাস্তবের বাস্তবতাকেই—world of factsকেই—দিব্য অনুভূতিযোগে অভিনব-সুন্দর করিয়া পুনঃসৃষ্টি করে; কবিশক্তির মহিমা ও মৌলিকতা এইখানে। জগৎ ও জীবনের যত কিছু তুচ্ছতা ও অতি-পরিচয়কে কবি-কল্পনা এমন এক নূতনতর চেতনায় উদ্ভাসিত করে, মানুষের চিরন্তন ক্ষুধা—তাহার বাসনা-কামনার মলা-মাটিকেই এমন অক্ষয় ও অসীম সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে, যে বাস্তবের কর্কশ সুরগুলাই এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বাজিয়া; উঠে, মনে হয়, সে যেন—music yearning like a god in pain! হয় ত তাহাকে ঠিক Imitation of Nature বলা চলিবে না, কারণ, Nature কথাটির অর্থই যে এখানে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কবি-কল্পনার আশ্চর্য্য কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া একজন বলিতেছেন—

"What we have come to value most in art, is not the imitation of Nature, but the unprecedented and undreamt-of harmonies it creates, the surprise and strangeness of those authentic and yet unforeseeable visions, those worlds of beauty and truth and wonder which it opens to the imagination. Even in a phrase like:

Tiger! Tiger! burning bright
In the forests of the Night.

we seem to recognise the character of something inevitable, something that has a veracity of its own, that must exist, and has always existed, and from which we cannot withhold the name of reality."

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—"যাহা স্বপ্ন, কাব্যে তাহাই জাগর-লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়; সত্য, সুন্দর, ও চমৎকারের কল্পলোক আমাদের মানসগোচর হয়; সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এ যেন এমনটি হইবারই কথা, এ যেন চিরদিন আছে ও থাকিবে, ইহাকে সত্য না বলিয়া উপায় নাই। ইহাই প্রকৃত কবিকীর্ত্তি, ইহাকে প্রকৃতির অনুকরণ বলা যায় না।"—কিন্তু মনে হয়, কথাটা এমন করিয়া না বলিয়া যদি বলি, কবিকল্পনা বৃহত্তর বাস্তবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, সে বাস্তবের পক্ষে স্বপ্ন-জাগরের বিরোধ নাই, বাহিরের ক্ষুদ্র ও অন্তরের বৃহৎ সেখানে একই অনুভূতি-সত্যের আলোকে শাশ্বত-সুন্দর, তাহা হইলে কবি-কল্পনাকে অদ্বৈত-দৃষ্টির গৌরব দান করা হয়, এবং তাহা যথার্থ। একথা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই যে—কবি 'adds a new presence to the world,' অর্থাৎ, জগতের যে-রূপটি প্রত্যক্ষগোচর, কবি তাহাতে নূতন কিছু সংযোগ করেন—

* Logan Pearsall Smith.

রূপকে অপরূপ করিয়া তোলেন। তাই কবি নিজেই বলিতেছেন—

দিয়েচ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।
* * * *
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

এইবার প্রশ্ন উঠিবে—বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করিলে, কবিকল্পনার সুন্দর-চেতনায় একটি নির্দ্বন্দ্বের অনুভূতি—একটা Universal—সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা হইলে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির বৈশিষ্ট্য (particularity) এই সার্ব্বভৌমিকতা খর্ব্ব করিতেছে না? ওই Universal যদি শ্রেষ্ঠ কল্পনার মূলগত সত্য হয়, তবে কাব্যবিশেষের মৌলিকতার মূল্য কতটুকু? কবির ভাবস্বাতন্ত্র্য এই সত্য-সুন্দরের পরিপন্থী কিনা? ইহার উত্তরে একজন পণ্ডিতের * উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"The liberty of imagination is incompatible only with the servile kind of imitation. It is the most vital factor in that liberation of "the Universal" from disturbing particulars (from second-rate or outworn substitutes for the Universal) which Aristotle found the essence of poetry to be. This gift, explicitly and for the first time vindicated by the Romantic critics and poets, is rightly used by the Classicists to reach 'the Universal', the One amid the Particulars, the One amid the Manifold, Permanence through Change."

—ইহার অর্থ এই যে, বিশেষের প্রতি কবির যে নিষ্ঠা, অর্থাৎ কবির কল্পনা-স্বাতন্ত্র্য—নির্ব্বিশেষকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শাস্ত্র যাহাকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ছাঁচের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে, কবির স্বাধীন কল্পনা সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া যে অনন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তাহাতে সেই নির্ব্বিশেষকেই মুক্তি দেওয়া হয়—বহুর মধ্যে যে এক, অনিত্যের মধ্যে যে নিত্য, তাহাকেই আরও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিবার সুবিধা হয়। আমাদের কবিও কোনও একটি সন্ধ্যার বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে;
তোমার অনন্তমাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনো কালে,
আর হবে না কভু।
এম্‌নি করে'ই, প্রভু,
এক নিমিষের পত্রপুটে ভরি'
চিরকালের ধনটি তোমার লও যে নূতন করি'!

—শেষ দুই ছত্রে Universal ও Particular এর সম্বন্ধটি কি সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন!

এইবার আগেকার কথা স্মরণ করিতে হইবে। কবির সৃষ্টি-কৌশল কাব্যের মধ্যেই প্রকটিত হয়, অর্থাৎ, কল্পনার যাহাকিছু উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্য—কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে এই যে এত কথা, তাহার পরিচয় পাই কবিতাবিশেষের রচনা-সর্ব্বস্বের মধ্যে। কবির কল্পনা কাব্যকে এতটুকু ছাড়াইয়া আর কোথাও নাই। অতএব কবি-প্রতিভার সত্যকার প্রমাণ—কাব্যসৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ঐ বাণীরই সৃষ্টি। একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিগত অনুভূতিকে তাহার যথাযথ বাঙ্ময়রূপে প্রকাশ করাই কবির সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন। এই প্রকাশ-কৌশলের মধ্যেই কবিপ্রতিভার আদি ও শেষ পরিচয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা একটি সুস্পষ্ট ও সুপরিচ্ছিন্ন ভাব-রূপ; ভাব অর্থে কবির হৃদ্‌গত অনুভূতি, রূপ অর্থে তাহার বাঙ্ময় মূর্ত্তি। কিন্তু কবির ওই হৃদ্‌গত অনুভূতি পৃথকরূপে আমাদের প্রত্যক্ষ নহে, তাহার বাঙ্ময় রূপটিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। কবির কল্পনা বলিতে আমরা সাক্ষাৎ কবিতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝিব না। এই যে কবিতার আকারে কবির হৃদ্‌গত কল্পনাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার কারণ, কবি ভাবকে রূপ দিতে পারেন; কেমন করিয়া তাহা পারেন তাহার উত্তর—কবির দৃষ্টি অতিশয় একাগ্র ও বস্তুনিষ্ঠ, এবং কবির অনুভূতিতে একটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। কবি সকল বস্তুই এমন আপনার মত করিয়া, নূতন করিয়া দেখেন বলিয়াই সেই সকলের বাণী-রূপ এমন জীবন্ত হইয়া ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় কাব্যে এই বস্তুনিষ্ঠার, এই তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়-চেতনার উল্লেখ করিয়া সমালোচনাচার্য্য Sainte Beauve বলেন, এই যুগই সর্ব্বপ্রথম মানুষকে Sentiment of Realityতে দীক্ষিত করিয়াছে। তাই পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ সমালোচক বলিতেছেন, এই যুগের কবিগণ বহিঃ-প্রকৃতি সম্বন্ধে এতই সচেতন, রূপবিশেষের বৈশিষ্ট্যে এতই মুগ্ধ যে—

* C. H. Herford (Essays by the Members of the English Association, Vol. VIII)

"We find shape and identity perceived with a magical precision and delicacy, the mind fastening as it were with a peculiar intensity of vision upon any counterpart in the visible world of what it has imagined with delight."

এই কবিদৃষ্টিই কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা—এই দৃষ্টিই বাণীর জনয়িত্রী। এবিষয়ে আর অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমি এইরূপ কাব্যসৃষ্টির দুএকটি উদাহরণ দিব। কল্পনা সর্ব্বত্র একজাতীয় নয়, কিন্তু যেখানে যেমন সেখানে তদনুরূপ বাণী-বিগ্রহ নির্ম্মাণে কবি-প্রতিভা যে সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে, আশা করি, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) যে রূপযৌবন উমার পক্ষে ব্যর্থ হইল, মদন যাহার সহায়তা করিতে গিয়া ভস্ম হইয়া গেল, অবশেষে কৃচ্ছ্র-তপস্যায় নিয়মক্ষামমুখী হইলে পর গৌরীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল সেই রূপযৌবনকে মদনের সাহায্যে ছদ্মবেশ করিয়া, ঠিক উল্টাপথে, সেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া আর-এক নায়িকার মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি কবি-কল্পনায় কি অপরূপ সৃষ্টিসৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে! চিত্রাঙ্গদা মদনকে বলিতেছে—

মীনকেতু,
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি' ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাৎ? চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান। * * *
মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা,
বিদ্যুৎ-বেদনা সহ হতেছে চেতনা,
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে আমার আকাঙ্ক্ষা-তীর্থ
বাসরশয্যায়, অবিশ্রাম সঙ্গে রহি'
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি'
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

যে চরিত্র-কল্পনায় ও নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানে এই উক্তি নির্গত হইয়াছে তাহার সম্পর্কে ইহা যে কত সহজ অথচ বিস্ময়কর, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই কল্পনায় মানবাত্মার একটি অভিনব মহত্ত্ব-শিখর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কামনা, বাসনা ও দেহতৃষ্ণার মধ্য দিয়াই যে সুখের নরক ও দুঃখের স্বর্গ মানব-প্রাণের অনুভূতি-গোচর হয়, যাহার নৈরাশ্য-বিভীষিকায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আধুনিক ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—'The soul may be trusted to the end', মানব-জীবনের সেই বিচিত্র নিয়তি, পৃথিবীর ধূলামাটির সেই কাঞ্চন-দ্যুতি প্রাচীন কবিগণের কল্পনার অগোচর ছিল, কিন্তু আধুনিক কাব্যে তাহা এমন করিয়া স্বপ্রকাশ হইয়াছে।

(২) কবি বলিতেছেন,

মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহা মেরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারী-ব্রত, হিমবস্ত্র-পরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব্ব আভরণহীন;
যেথা দীর্ঘ রাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্র জননীর মত।

—মনে মনে ভ্রমণ যদি এমন হয়, তবে সত্যকার ভ্রমণে প্রয়োজন আছে কি? কোনো ভূপর্য্যটক কি এপর্য্যন্ত মহামেরু-দেশের এমন সংক্ষিপ্ত অথচ সত্যকার রূপ, আমাদের মানসচক্ষে, এমন করিয়া তাহার সমস্ত রহস্য পুঞ্জীভূত করিয়া, এমন চিন্ময় করিয়া তুলিতে পারিয়াছে?

(৩) কবির নিজের কথায়, "চিরদিবসের বিশ্ব আঁকি' সম্মুখেই দেখিনু সহস্রবার দুয়ারে আমার।"—সে কেমন দেখা?—

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে;
নদীর এপারে ঢালুতটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ও পারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে—ফসল-ক্ষেতের যেন মিতা—
নদীসাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।

—চির-পরিচিতের এই নব-পরিচয় সৃষ্টিশক্তির আর-এক লক্ষণ।

(৪) কাব্য-সৃষ্টির আর-একটি উদাহরণ দিব। লোক-বিশ্রুত "মর্ম্মর-স্বপ্ন" দেখিয়া কবি-কল্পনায় যে রূপাবলী ফুটিয়াছে, তাহার একটি এইরূপ—

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

—তাজমহলের মর্ম্মর-কান্তির কঠিন বাস্তবতা, "ফুটিল যা সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।"—তাহাকে এমন করিয়া 'ভাষার অতীত তীরে', 'দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে', অন্তরতম অনুভূতি-কল্পনার অরূপ-রূপে ফুটাইয়া তুলিবার যে শক্তি, তাহার পরিচয়ও বাক্যাতীত, —অন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়।

এই যে কাব্যসৃষ্টি, যাহার পরিচয় কেবল মাত্র প্রাণের প্রাবল্যে নয়—অতি বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত ভাবসৃষ্টি যাহার প্রাণ, আবার অপূর্ব্ব বাক্‌ভঙ্গিতে যাহার প্রকাশ, যাহা কবির নিজস্ব কল্পনায় অনুবিদ্ধ অথচ নিখিল-মানব-চেতনার অনুগত, যাহা অ-পূর্ব্বপরিচিতের মত চমৎকার, অথচ চিরসত্যের মত হৃদয়গ্রাহী—ইহারই অভাব লক্ষ্য করিয়া সমালোচকপ্রবর Herford* বলিতেছেন—

"Byron lacks supreme imagination. With boundless resources of invention, rhetoric, passion, wit, fancy, he has not the quality which creates out of sensation, or thought or language, or all together, an action, a vision, an image or a phrase which penetrated with the poet's individuality has the air of a discovery, not an invention, and no sooner exists than it seems to have always existed. A creator in the hightest sense Byron is not."

[অর্থাৎ, অতি উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় বায়রণের কাব্যে নাই। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি অফুরন্ত; বাক্যচ্ছটা, ভাবাবেগ, সূক্ষ্মবুদ্ধি, কল্পনা—এ সকলই তাঁহার প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও তাঁহার এমন শক্তি ছিল না যে, ভাষা বা ভাবনা বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি—ইহাদের যে কোনও একটি, অথবা সব কয়টিকে লইয়া এমন একটি ঘটনাবস্তু বা ভাবদৃশ্য, বা রূপবিগ্রহ বা শব্দচিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন, যাহার গঠনে কবির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিদ্যমান থাকিলেও স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে হইবে না। মনে হইবে, এ সকল যেন নিত্যকালের, কবি এগুলিকে প্রকাশিত করিলেন মাত্র। বায়রণ অতি উচ্চদরের স্রষ্টা ছিলেন না।]

তাহা হইলে, কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, কাব্যের বিষয়, উপাদান বা বস্তু যাহাই হউক, কবিকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই সৃষ্টিশক্তি। কাব্যবস্তুর বৈশিষ্ট্য, মৌলিকতা প্রভৃতি যতকিছু উৎকর্ষের মূলেও এই সৃষ্টি-প্রতিভা। কবি-সৃষ্টির কতকগুলি সর্ব্ববাদীসম্মত লক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত সমস্যার উত্থাপন ও আলোচনা করিয়া পরিশেষে যাহা দাঁড়াইল আমি তাহাকে কবিশক্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই। কবি কেমন করিয়া ভাববস্তুকে কাব্যবস্তুতে পরিণত করেন, আত্মগত অনুভূতি ও পরচিত্তের মধ্যে সেই যে অদ্ভুত সেতু-নির্ম্মাণ, ভাবের সেই তির্য্যক প্রতিকৃতি—যাহার নাম বাণী, তাহারই জিজ্ঞাসা কাব্য-কথার মূল প্রসঙ্গ বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, কাব্যসৃষ্টি অর্থে এই বাণীরই সৃষ্টি, ইহাই সকল কাব্য-জিজ্ঞাসার আদি ও শেষ সমস্যা।

* Age of Wordsworth.

পুস্তক পরিচয়

পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনার সমালোচনা না ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসীর সম্পাদক

বর্ণাশ্রম—শ্রী মৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রী গিরিজাভূষণ সরকার, বি-এ, ১৯ বি, প্রাণনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা। পৃঃ ৮/০+১১৫। মূল্য ॥০।

এই গ্রন্থে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং সাকারোপাসনাদি সমর্থিত হইয়াছে।

শক্তি-তত্ত্বামৃত, বা শক্তিতত্ত্বে চণ্ডী-গীতা-পাতঞ্জল-যোগবাশিষ্ঠের তরঙ্গামৃত—শ্রী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত (১৪নং ছকু খানসামা লেন, মৃজাপুর, কলিকাতা)। পৃঃ ৩২+১৭৫। মূল্য ১॥০ এবং ২৲।

গীতাদি শাস্ত্রের নানা তত্ত্ব এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা—জেলা খুলনা, পোঃ আঃ ছয়ঘরিয়ার অন্তর্গত আম্রতলা নিবাসী শ্রী রামচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। পৃঃ ৬+২০১; মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থে সরল ভাষায় ধর্ম্মের মৌলিকতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয় (১) উপক্রমণিকা (২) স্বরূপতত্ত্ব (৩) সত্যং (৪) জ্ঞানং (৫) অনাদি অনন্তং (৬) অবিভাজ্যং অদ্বয়ং (৭) নিরাকারং বিশ্বরূপং (৮) নিরপেক্ষং স্বাধীনং (৯) সর্ব্বজ্ঞং চিরজাগ্রতং (১০) শান্তং (১১) শিবং (১২) সুন্দরং (১৩) আনন্দরূপ অমৃতং (১৪) প্রেমময়ং (১৫) প্রাণেশং (১৬) সর্ব্বময়ং ইচ্ছাময়ং (১৭) নিরাকারং পবিত্রং (১৮) সর্ব্বশক্তিমান প্রভু (১৯) পরিশিষ্ট (স্বরূপতত্ত্ব) (২০) স্বপ্নদর্শন।

হিন্দু অহিন্দু সকলেরই উপযোগী।

মাতৃপূজায় মানব-ধর্ম্ম—শ্রী উমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দি প্রণীত। পৃঃ ২৩৫; মূল্য ১॥০। প্রাপ্তিস্থল—গ্রন্থকার, টেলিগ্রাফ আফিস রোড, চট্টগ্রাম।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর চরিত্রবল-বর্ণনা করিতে যাইয়া অনেক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম, নীতি, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা মনে করি, উপনিষদের ব্রহ্ম ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ একই। গ্রন্থকারও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

বিসর্জ্জন—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

এখানি রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ বিসর্জ্জন নাটকের বিশ্বভারতী সংস্করণ। সংস্করণ মন্দ হয় নাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু আশানুরূপ হয় নাই। কাগজ, ছাপা আরো ভালো হওয়া উচিত ছিল।

গায়ত্রী—শ্রী হরিপদ সেন দেবশর্ম্মা, শাস্ত্রী, এম-এ। প্রাপ্তি-স্থান ৯৪, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই আনা।

বইখানিতে গায়ত্রীর ইতিহাস, গায়ত্রীর অধিকারী কে, গায়ত্রীর পাঠ, গায়ত্রীর অর্থ, প্রভৃতি গায়ত্রী সম্পর্কীয় বিষয় সংক্ষেপে সরল ভাষায় সহজ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। বইটি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থকারের গবেষণার পরিচায়ক। বইটি যত অধিক প্রচারিত হইবে সাধারণের গায়ত্রী-জ্ঞান ততই বর্দ্ধিত হইবে।

হাসির হল্লা—শ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক শ্রী নৃপেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। দাম ছয় আনা।

রঙ্গরসাত্মক কবিতার গ্রন্থ। ছন্দবৈচিত্র্যে ও রসবৈচিত্র্যে বইখানি সুন্দর। হাস্য, করুণ, রঙ্গ—সকল রসেই কবির প্রকাশ-দক্ষতা দেখা যায়। তবে সকল স্থানে রস সুন্দর জমে নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—শ্রী মনোরম গুহ ঠাকুরতা। প্রকাশক বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্, আশুতোষ লাইব্রেরী, ৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। তিন আনা সংস্করণের জীবনীমালার অন্তর্গত।

সাধক রামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। বইটি মন্দ হয় নাই। কিন্তু ছেলেদের পক্ষে ভাষা কিছু গুরু হইয়াছে।

ভারত-লক্ষ্মী—শ্রী কুলদারঞ্জন রায়। সিটি-বুক সোসাইটি, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

আদর্শ-চরিত্রা প্রসিদ্ধা ভারতীয় নারী সতী, দময়ন্তী, সুকন্যা, সাবিত্রী, সীতা, চিন্তা, গান্ধারী, শৈব্যা ও শকুন্তলার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। সরল ভাষায় বিবরণ সুন্দর হইয়াছে। সুন্দর বাঁধন ও কয়েকখানি চিত্র-সংযোগের জন্য বইখানি উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

স্বামীজির স্বদেশ-মন্ত্র—শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। বর্ম্মন্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চার আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে দেশ-প্রেম ও দেশ-সেবা বিষয়ক বিবিধ চিন্তা সংগৃহীত ও স্থানে স্থানে অনূদিত হইয়া সংক্ষিপ্ত আকারে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। অনূদিত অংশগুলি সব জায়গায় সরল হয় নাই। মোটের উপর বইটি প্রচারিত হইলে দেশের মঙ্গল হইবে।

৺কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। বর্ম্মন্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্ম্ম অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত পতিত হইয়া বাঙালীর জীবনকে চেতন ও কর্ম্মোদ্যত করিয়াছে। তাঁহার জীবনের সকল ঘটনাই বাঙালীর পাঠ্য, কেননা এই পাঠেই জীবন-গঠনের সুযোগ। সুতরাং আলোচ্য বইখানিকে আমরা সাদরে আহ্বান করি। ইহাতে বিবেকানন্দের প্রেমময় ও কর্ম্মময় জীবনের প্রচুর আভাস পাওয়া

যায়। তবে বইখানির ভাষা সহজ ও সরল হয় নাই, কেমন কটমট হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ—শ্রী বিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত। অভয় আশ্রম, ই৭৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম পাঁচ পয়সা।

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক লিখিত হিন্দু-বিধবা বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রবন্ধগুলিতে ভাবিবার ও পালন করিবার বিষয় অনেক আছে। বাল-বিধবাকে অসহ্য কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া রাখা অথবা তাহার দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া সমাজের অন্তরে গোপন ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া সমাজের পক্ষেই প্রভূত অকল্যাণকর। এই কথাটি অতি সরল ভাবে গান্ধীজি বিবৃত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, অনুবাদের ভাষায় অনুবাদের গন্ধ যথেষ্ট আছে।

প্রাচীন চিত্র—শ্রী রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। প্রকাশক সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের দুই একটি প্রবন্ধ আমরা পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, এবং আশান্বিতও হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। কালিদাসের শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, প্রভৃতি চরিত্র, মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী এবং উত্তরচরিত প্রভৃতির সরল সহজ বিশ্লেষণমূলক গুণব্যাখ্যান এই পুস্তকটিতে স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন-কাব্য-পরিচায়ক এমন সুন্দর পুস্তক আমরা বহু দিন পাঠ করি নাই। বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা বেদান্তশাস্ত্রীর মত হয় নাই, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ভাষার মতই হইয়াছে—অতি সুন্দর, সহজ, অথচ তেজীয়ান। সাহিত্যিক মাত্রেই বইটি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

গুপ্ত

গান—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের পুরাতন 'গান' বহিখানিকে দুই ভাগ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত ও গান নামে দুইটি পৃথক্ পুস্তক প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মসংক্রান্ত আধ্যাত্মিক গানগুলি ধর্ম্মসঙ্গীতে স্থান পায়। শেষের 'গান'-খানিতে বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার-খেলা নামক দুইটি সম্পূর্ণ গীতি-নাট্য, জাতীয় সঙ্গীতগুলি ও অন্যান্য প্রায় ২০০ শত গান স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকখানি শেষোক্ত পুস্তকের পুনর্ম্মুদ্রিত সংস্করণ। বিশ্বভারতীর অধুনা প্রচারিত বানান-অনুযায়ী পুস্তকখানি ছাপা হইয়াছে। কাগজ ও বাঁধাই ভাল ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহিখানিতে অনেক ছাপার ভুল আছে। বানানের নূতন রীতি প্রচলন করিতে হইলে যে যত্ন ও সাবধানতাসহকারে প্রুফ দেখিতে হয় পুস্তকখানিতে তাহার অভাব লক্ষিত হয়।

আলো—রায় সাহেব শ্রী জগদানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান-পাব্‌লিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৯৩ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

জগদানন্দ-বাবুর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলির মত এই পুস্তক-খানিও চমৎকার ও হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে। এত সহজ সরল সুললিত ভাষায় কঠিন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে যে, একবার পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা কেন, বৃদ্ধেরাও এই পুস্তকে অনেক শিখিবার বিষয় পাইবেন। ছবি দেওয়াতে বিষয়গুলি বেশ সহজবোধ্য হইয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়া উচিত। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব—শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ও উপদেশ। ব্যাখ্যাকার শ্রী শশিভূষণ ঘোষ। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উদ্বোধন-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ৪৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা।

পুস্তকখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বিস্তৃত জীবনী ; তাঁহারই কথামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। এরূপ একখানি পুস্তকের নিতান্ত অভাব ছিল। শ্রদ্ধা-সহকারে লিখিত বলিয়া বহিখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে কষ্ট হয় না। মহাপুরুষের এই জীবনী পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। জীবনীখানির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা হইতে তৎকালীন বঙ্গসমাজের ও রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক মহাপুরুষদেরও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিগুলি দেওয়াতে বহিখানির বিশেষ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—শ্রী মতিলাল রায়, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ১৪৯ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

মতিলালবাবু তাঁহার হৃদয়গ্রাহী, ওজস্বী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী, বাণী ও তৎসঙ্গে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ক্রমবিকাশ এই পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বামীজি সম্বন্ধে ইহাতে অনেক নূতন কথা আছে। পড়িতে পড়িতে আমাদের জাতীয় দুর্দ্দশা চক্ষের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠে; কিন্তু স্বামীজির মুখনিসৃত বাণী শুনিয়া হৃদয় আশ্বস্ত হয়। বইখানির পাতায় পাতায় ছবি দেওয়াতে ইহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ছাপাই, বাঁধাই ও স্বামীজির ত্রিবর্ণ চিত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে।

রাজার জাতি—কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিসহ ধারাবাহিক ইতিহাস। কবিরাজ শ্রী রমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক প্রণীত ও সঙ্কলিত। ২৭ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, মহিলা প্রেসে শ্রী ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য সাধারণ সংস্করণ ২৷৷০ টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা।

নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের চতুর্ব্বর্ণ বিভাগের ক্ষত্রিয় বর্ণ অধুনা 'কায়স্থ' বলিয়া পরিচিত। বহিখানি গ্রন্থকারের যথেষ্ট অধ্যবসায়ের ফল ও তাঁহার প্রমাণ-প্রয়োগাদি পণ্ডিতগণের বিশেষ প্রণিধান ও বিচার করিবার বিষয়। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, মহাত্মা শাক্যমুনি কায়স্থ-কুল-জাত ছিলেন। গ্রন্থকারের চেষ্টা এবং বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রীয় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে জাতিভেদ প্রথা জাতীয়-জাগরণের বিশেষ অন্তরায় বলিয়া যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তখন মৃত শাস্ত্র ঘাঁটিয়া জাতি বিশেষকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস না করিলেই ভাল হইত। কায়স্থ ক্ষত্রিয়ই থাকুক কি শূদ্রই থাকুক বর্ত্তমানে সে মসীজীবী দাস মাত্র। অতীতের কঙ্কালকে লইয়া বড়াই করার দিন নাই। আমরা সকলে নিগৃহীত দাসজাতিভুক্ত,—এইটুকুই শুধু সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজার জাতি ছিলাম বলিয়া গর্ব্ব করা বর্ত্তমানে উপহাসের বিষয় ব্যতীত কিছুই নহে।

আসাম হইতে বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ—শ্রী রাজেন্দ্রকুমার সেন, বিদ্যাভূষণ প্রণীত। প্রকাশক, এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

লেখক যখন বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তখনকার ডায়েরী হইতে পুস্তকখানি লিখিত। আসাম হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত বর্ণনা সংক্ষেপে সারা হইয়াছে, হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ বদরিনাথ পর্য্যন্ত ভ্রমণের কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত। গ্রন্থকারের ভাষা এমন মধুর যে, তিনি ভাষার প্রবাহে পাঠকদিগকেও তাঁহার সহচর করিয়া লন—আমরা যেন তাঁহার সহিত তৎবর্ণিত তীর্থ স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরি। পরিশিষ্টে হরিদ্বার হইতে কেদার-নাথ পর্য্যন্ত চটির বিবরণ দিয়া ও মানচিত্রখানি সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থকার ভ্রমণকারীদের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সাধু সন্ন্যাসী ও তীর্থস্থানগুলির বর্ণনাও চমৎকার। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ—অধ্যাপক শ্রী নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এস্-সি, প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৪১।১১ গরিয়াহাটা রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ১৯১ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা।

বহিখানি কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি 'বান্ধব' 'প্রবাসী' 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটিই সুচিন্তিত ও নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। এই ধরণের পুস্তক বাঙলা সাহিত্যে আর একটিও নাই। প্রত্যেক ভারতবাসীর এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আপনাদের জাতীয় নানা দোষ ও গুণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। ভারতবর্ষের অধঃপতনের সাধারণতঃ নানা কারণ দর্শিত হইয়া থাকে। যথা—(১) ব্রাহ্মণদিগের বর্ব্বরতা (২) জাতিভেদ (৩) বিধবা বিবাহের অপ্রচলন ও বাল্যবিবাহের প্রচলন (৪) স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার (৫) পৌত্তলিকতা (৬) মন্ত্রাদি বিবিধ কুসংস্কারের প্রভাব (৭) মাংস না খাওয়া, ইত্যাদি। গ্রন্থকার এই কারণগুলির বিশদ বিচার করিয়া নানা যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াছেন যে, সন্ন্যাসই ভারতবর্ষের অধঃপতনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। গ্রন্থখানি সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি। ছাপাই, বাঁধাই সুন্দর।

সমাজরেণু—কবিতাপুস্তক। শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী নিরঞ্জন বিজলী, গোকুলনগর গ্রাম ও পোষ্ট মেদিনীপুর। ৯৭ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

রাষ্ট্রীয় ও সমাজগত দোষগুলি বিশেষ উচ্ছ্বাসের সহিত ছন্দোবদ্ধ ভাবে লেখক দেখাইয়াছেন। লেখার ছত্রে ছত্রে তাঁহার স্বদেশ-প্রেম লক্ষিত হয়।

মেসোপটেমিয়া ভ্রমণ—কারবালা, বাগদাদ প্রভৃতি তীর্থস্থানের কাহিনী সম্বলিত। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুস্ সত্তার প্রণীত। প্রকাশক মুসলীম পাবলিশিং হাউস, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৮৯ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের পবিত্র তীর্থস্থানগুলির কথা এই পুস্তকে বেশ সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আরবের অতীত কীর্ত্তিরও বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা মুসলীম তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করিতে চান এই পুস্তকখানি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবে।

পিয়াসা—এম, এল, হোসেন, বি-এস্-সি প্রণীত ও মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউস, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸৹ আনা।

এই পুস্তকখানিতে শিলংয়ের পথে, মনের ছায়া, রাজমহলে কয়েক সন্ধ্যা ও সুন্দরবনে শিকার এই চারিটি প্রবন্ধ আছে। ভাষা সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

সন্ধ্যায়—শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ১৩৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।৹। হিতৈষণা গ্রন্থাবলী ২৬।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"জীবনের এই সন্ধ্যাকালে বালুকাময় এই সংসার-সাগরের তীরে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি·········তন্মধ্যে যেগুলি অন্তরে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তাহারই কতকগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি······সেইগুলি 'সন্ধ্যায়' নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম।" ধর্ম্ম-বিষয়ক উচ্ছ্বাস। সুন্দর বাঁধাই।

অহিংস অসহযোগের কথা—শ্রী নিশীথনাথ কুণ্ডু, বি-এল, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান হরিপুর গ্রাম, জীবনপুর পোঃ, দিনাজপুর। ৫৪ পৃষ্ঠা; মূল্য ৵৹ আনা।

অহিংস অসহযোগ দ্বারা কি উপায়ে ভারতের মুক্তি অর্জ্জন করা যায় তাহার সুন্দর বিস্তৃত আলোচনা।

নব পর্য্যায়—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। প্রকাশক মোহম্মদ আফজাল-উল-হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৮২ পৃষ্ঠা; মূল্য ১৲ টাকা।

বাঙলার মুসলমান-সমাজকে উদ্বোধিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের সমাবেশ। কাজী সাহেবের ভাষা বেশ সহজ ও প্রাণময়। মুস্তাফা কামাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে অনেক জানিবার ও বুঝিবার কথা আছে।

শুকতারা—কবিতা-পুস্তক। শ্রী সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী রবীন্দ্রনাথ রায়, ৪৯এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ৸৹।

কবির কল্পনা-শক্তি আছে। ছন্দেরও গতি স্বচ্ছন্দ।

প্রমোদ—প্রথম লহরী। শ্রী প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুর, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, পাবনা প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১০০ পৃষ্ঠা; মূল্য আট আনা।

বাঙলা ভাষায় এটি একটি অভিনব পুস্তক। Wit ও Humour পরিপূর্ণ ছোট ছোট কাহিনী। মৃতপ্রায় বাঙালীর মুখে হাসি ফুটাইবে। আমাদের দেশের প্রচলিত এই প্রমোদগুলির সহিত প্রত্যেকের পরিচয় থাকা দরকার। মজলিশে এরূপ ছোট ছোট গল্পের আজকাল অভাব হইয়াছে। প্রবীণ ও প্রাচীন লেখক এই নষ্টপ্রায় রত্নগুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন। সুখের বিষয়, পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

দয়িতা সত্যভামা—পৌরাণিক নাটক। শ্রী পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। পিরোজপুর এমেচার থিয়েটার পার্টি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩৮ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা।

কৃষ্ণদয়িতা সত্যভামাকে অতিরিক্ত অভিমানী দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার কতকগুলি পুরাণ-বিরোধী কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থের কিছুমাত্র সৌষ্ঠব সাধিত হয় নাই। ভাষা ভাল নহে।

লছমী—সামাজিক নাটক। শ্রী গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কিশোরগঞ্জ হইতে শ্রী বাণীনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

পল্লীকথা—বড় গল্প। শ্রী প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী বিধুভূষণ বসু, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

বাঙলার পল্লীগ্রামের একটি সুন্দর চিত্র।

পথের সন্ধান—উপন্যাস। শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮নং রাধামাধব গোস্বামীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। ১৪৮ পৃষ্ঠা মূল্য। এক টাকা।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক 'শ্রীকান্ত'-প্রণেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নহে।

পূর্ণিমা সুন্দরী—উপন্যাস। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক শ্রী শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা।

একটি সুবৃহৎ উপন্যাস। বইখানির আখ্যানভাগ সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও বহিখানিকে অযথা বাড়াইতে গিয়া আসল গল্পকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

পুরুষোত্তম—জীমূতবাহন প্রণীত। প্রকাশক—এন্. মুখার্জ্জি, আর্ট প্রেস, ১নং ওয়েলেংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।

জমিদার-শাসিত বাঙলার পল্লী-সমাজের এমন চিত্র কেহ আঁকিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। পুস্তকখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বুঝা যায়, বাঙলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সুস্পষ্ট ধারণা আছে। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক সমাজ-সংস্কারকের অবশ্য পাঠ্য। অনেক নূতন তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি অনেক সমস্যার সমাধান ইহাতে আছে। বস্তুতঃ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সংসার ও সমাজের মত এই বইখানিরও আদর হইবে। বহিখানি পড়িয়া বুঝা যায়, গ্রন্থকার একজন খাঁটি হিন্দু এবং হিন্দুত্বের বর্ত্তমান পতনের কারণগুলি তিনি ভাল করিয়াই জানেন। পুস্তকে সর্ব্বত্র হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু জাতির নানা ভাবে অবনতি ঘটিতেছে, খৃষ্টীয় পাদ্রীগণ ও মুসলমান দুর্ব্বৃত্তেরা নানা ভাবে এই জাতির ক্ষয়সাধনে তৎপর হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু সমাজেরও যথেষ্ট দোষ আছে। গ্রন্থকার সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। অস্পৃশ্যতার দোষ নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পাঁক—শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। মূল্য ১৸০।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণে লেখা একখানি উপন্যাস। সমাজ বিশেষের নিখুঁত ছবি লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

জোয়ার-ভাঁটা—শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০।

বাংলা উপন্যাস-জগতে শৈলজা-বাবু প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের সুখদুঃখের কাহিনী লিখিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই পুস্তকখানিতেও তাঁহার নিপুণতার পরিচয় পাই। পুস্তকখানি পাষাণবীণা নামে কোনো সাময়িক পত্রে যখন বাহির হইতেছিল তখনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

Desire of the Moth for the Star—ইহাই পুস্তকখানির বিষয়। দরিদ্র বংশী উচ্চ-কুলশীলা নিভার প্রেমে পড়িয়া যে অন্তর্দ্দাহ ভোগ করিয়াছিল, ইহা তাহারই ইতিহাস। শিক্ষিতা নিভার মনেও কি করিয়া সেই আগুনের তাত লাগিল লেখক তাহার চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকের শেষে এই প্রেম বড় করুণ হইয়া উঠিয়াছে। দারিদ্র্য যে কেমন করিয়া সর্ব্বজয়ী প্রেমকেও নানাদিক্ দিয়া খণ্ডিত ও পিষ্ট করিতেছে, গ্রন্থকার উপন্যাসখানিতে তাহা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

স

শোধ-বোধ—(নাটক)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা। পৃঃ ৭৮। ১৩৩৩।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "কর্ম্মফল" নাটকাকারে শোধ-বোধ নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সম্পূর্ণ নাটকখানি বসুমতী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদকগণ বইখানির সব স্থানে বানানের সঙ্গতির দিকে নজর দেন নাই।

মুক্তির আহ্বান—শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। প্রকাশক ডি, এম্, লাইব্রেরী। পৃঃ ২৩৪। মূল্য ২৷০। ১৩৩৩।

লেখিকা মাসিপত্রিকার পাঠক-পাঠিকার নিকট সুপরিচিত। উপন্যাসখানি বাঙালী-গার্হস্থ্য-জীবনের কাহিনী। সাবিত্রী, মেধা ও যতীনের চরিত্র বেশ হইয়াছে। পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই বেশ ভাল।

প্র

দুর্দ্দিনের যাত্রী—কাজী নজরুল ইস্লাম। বর্ম্মন্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

এই "দুর্দ্দিনের যাত্রী" বইটির জাতি-নিরূপণ একটা কঠিন ব্যাপার। লেখকের পদ্য যে-ভাষায় লিখিত এই বইখানির ভাষাও ঠিক তদ্রূপ, ভাবও তথৈবচ। তবে তফাৎ এই যে, ইহাতে মিল নাই। বইখানি কতকগুলি উচ্ছ্বাসময় রচনার সমষ্টি। এই উচ্ছ্বাসের সুর কবির প্রবর্ত্তিত বিদ্রোহ-বাণীর সুর। এই সুরে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে যাহা পাঠকের মনেও বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলে—কবির রচনার বিরুদ্ধে। আমাদেরও মন এইরূপ বিদ্রোহে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আর কিছু না বলাই ভাল।

হিরণ্যকশিপু

ছেলেদের পাততাড়ি

নাগপঞ্চমী

নাগপূজা বা সাপ-পূজা অনার্য্য দেবতার পূজা কি না সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা যাইতে পারে, বাংলা-দেশে বাসুকী-ভগিনী মনসা দেবীর পূজা বহুদিন হইতেই চলিত আছে। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা প্রভৃতি জেলার কোনো কোনো স্থানে এখনও শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসাদেবীর পূজা হয়। বোম্বাই সহরে প্রভু নামক এক শ্রেণীর সুশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হিন্দু আছে; তাহাদের মধ্যেও নাগপূজা প্রচলিত আছে। প্রভুদিগের জাতীয় ইতিহাস এই:—কথিত আছে, প্রভুগণ পূর্ব্বকালে উদয়পুর ও মারবারে বাস করিত। মুসলমান বিজেতাগণের আক্রমণের ফলে তাহারা রাজপুতনা ছাড়িয়া কাথিবারে প্রভাস পত্তনে বস-বাস করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিজেতাগণ সেখানেও তাহাদিগকে ধাওয়া করে। ১০২৪ খৃঃ-অব্দে গজনীর মামুদ কাথিবারে প্রবেশ করিয়া সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করেন। তখন সোমনাথের মন্দির-রক্ষক প্রভুগণের রাজা ছিলেন ভীমদেব। তিনি রঘুপতি রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত। ভীমদেব গুজরাটের আনহিনওয়াড পত্তনে পলায়ন করেন। কিন্তু শেষে গুজরাটও মুসলমানদের হাতে আসে। ১২৯৩ খৃঃ-অব্দে প্রভুগণ বোম্বাই ও মহিম দ্বীপে বাস স্থাপন করে। সূর্য্যবংশধর প্রভুগণ যোদ্ধার জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। রাজা ভীমদেব বহু রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার অধীন সেনাপতিদিগকে এক-একটি রাজ্যের 'প্রভু' করিয়া দেন। রাজা ভীমদেবের বংশ প্রায় একশত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুগণ শক্তিহীন হইয়া পড়িলেও রাজা ভীমদেব ও তাঁহার বংশধরগণ প্রদত্ত উপাধি তাহারা এখনও পরিত্যাগ করে নাই। এখনও প্রভুগণের মধ্যে ধরাধর, ধুরন্ধর, গোরক্ষকর, জয়কর, কীর্ত্তিকর, কোঠাকর, মানকর, নায়ক, রাণে ও রাও প্রভৃতি উপাধি আছে।

এইসমস্ত উপাধি প্রাচীন কালের যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্র-শস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিই স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু প্রভুগণের যুদ্ধ-ব্যবসা আর নাই। তাহারা বহু পূর্ব্বেই তলোয়ার পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ সাজিয়াছে। শিবাজী ও পেশবাদের রাজত্বকালে প্রভুগণ তাঁহাদের অধীনে সামান্য চাক্‌রী করিত। পর্ত্তুগীজগণ বোম্বাই আক্রমণ করিলে, প্রভুগণ বোম্বাই ত্যাগ করিয়া যায়। ব্রিটিশ রাজত্বে তাহারা পুনরায় পূর্ব্ব-পরিচিত বোম্বাই দ্বীপে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে প্রভুগণ সরকারী চাক্‌রীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। তরবারী দ্বারা প্রভুগণ যশ উপার্জ্জন করিয়াছিল; কিন্তু লেখনীর বলে তাহারা বোম্বাইএ অদ্বিতীয় ধনী ছিল। এখন এই অবস্থাও সত্যযুগের অতীত কাহিনীতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতেও প্রভুগণ অন্য বিভাগে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। প্রভুগণের গৃহে এখন সোনারূপার ঝনঝনানি শোনা না যাইলেও তাহারা এখন লোকের যথেষ্ট প্রীতি ও সম্মানের পাত্র; এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট খুব বিশ্বস্ত। প্রভুগণের সংখ্যা যদিও বর্ত্তমানে ৪১০০এর বড় বেশী নয়, তথাপি তাহাদের মধ্যে এখন বহু জজ, ব্যারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, চিত্রকর ও ভাস্কর আছে।

নাগপূজার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রভুগণের মধ্যে এই গল্পটি প্রচলিত আছে।—

এক কন্যা। তার মা নেই, বাপ নেই, শ্বশুর-বাড়ীতে থাকে। পূজা-পালিতে যে একটু আমোদ-আহ্লাদ

কর্‌বে, তার উপায় নেই—আত্মীয়-স্বজন এমন কেউ নেই যে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যায়।

নদীর ধারে একদিন সে নিরালা ব'সে আছে—মনটা তার ভারী দ'মে গেছে। এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত।

"মা, তুই কাঁদিস্ কেন?"

"আমার মা নেই, বাপ নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, আমার আমোদ-আহ্লাদ সব গেছে।"

"কেন, এই যে তোর মামা আমি আছি। চল্ তোকে আমার বাড়ী নিয়ে যাব।"

কন্যার মুখে হাসি আর ধরে না।

কন্যা মামার বাড়ী নিমন্ত্রণে গেল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি ছিলেন নাগের রাজা। কন্যাটিকে কাঁদ্‌তে দেখে ব্রাহ্মণের বেশ ধ'রে এসেছিলেন।

কন্যা মামার বাড়ীর পথে খানিকটা যেতেই মামা বল্‌লেন, "দেখিস্ মা, যেন ভয় পাস্‌নি—কিছুতেই না।"

"না, ভয় কিসের?"

কন্যা মামার সঙ্গে যায়, যায়, যায়। খানিক দূর গিয়ে দেখে কি মামা এত বড় একটা পাথর পথ থেকে ওঠালেন। কন্যাও অবাক্!

কি আছে! না, নীচে সুড়ঙ্গে সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়ি ধ'রে নীচে আরও নীচে ঘুরে ফিরে মামা-ভাগ্‌নীতে নেমে গেল,—দেখে এক প্রকাণ্ড ঘর। পালঙ্কে এক নাগিনী শুয়ে আছেন।

ব্রাহ্মণ এখন নাগের বেশ ধারণ কর্‌লেন—মানুষের গলায় নাগিনীকে বল্‌লেন, "কন্যাটি আমার ভাগ্‌নী, আমোদ-আহ্লাদ কর্‌তে চায়, তাকে নিয়ে এসেছি।"

নাগিনী ছিলেন এসময়ে প্রসববেদনায় অস্থির। বল্‌লেন, "বেশ করেছ। একটা পিদ্দিম নিয়ে এসে মেয়েটাকে বল, পিদ্দিমটা ধ'রে থাক্।"

নাগিনীর সাতটি ছানা হ'য়ে মাটিতে কিলবিল কর্‌তে লাগ্‌ল। কন্যা ত ছানাগুলি দেখে ভয়েই অস্থির। ধপাস্ ক'রে পিদ্দিমটা একটা ছানার ল্যাজে প'ড়ে গিয়ে একেবারে তার ল্যাজটা কেটে গেল।

বুড়ো নাগের কিন্তু তাতে রাগ হ'ল না। বরং তিনি বল্‌লেন, "ভয় নেই, ভয় নেই।"

তার পর কন্যা আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটালেন।

পরদিন নাগ কন্যাকে শ্বশুর-বাড়ী রেখে এলেন। ব'লে দিলেন, "কারও কাছে আজকের ঘটনা বলিস্‌নি। আর বছর বছর এই দিনে নাগের পূজা করিস্।"

দিন যায়। বছর কেটে গেল্। ছোট ছোট সাপের বাচ্চাগুলি এখন বড় হয়েছে! ছ' ভাই ছোট ভাইকে ডাকে 'ল্যাজ-কাটা'। ছোট ভাই ত রেগেই আগুন।

"মা, মা, আমায় ল্যাজ-কাটা বলে কেন?"

"সে হ'য়ে গেছে এক কাজ" এই না ব'লে তিনি সব কথা তাকে খুলে বল্‌লেন।

ল্যাজকাটা ত রাগে আগুন। "যে আমার এদশা করেছে তাকে আমি একবার দেখে নেব।"

"না, না, এমন কাজ করিস্‌নি। সে তোদের বোন্। তোদের বাপ তাকে কত ভালোবাসেন।"

ল্যাজ-কাটা মায়ের কথা গ্রাহ্য কর্‌লে না। কন্যার বাড়ী খুঁজে বার কর্‌তে চ'লে গেল।

খুঁজে খুঁজে ল্যাজকাটা ত কন্যার বাড়ী বার কর্‌লে। দেকে কি না তার বোন দেয়ালে সাতটা নাগের ছবি এঁকে আরতি কর্‌ছে। পঞ্চ প্রদীপ ঘুরিয়ে কন্যা গানের সুরে বল্‌ছে—

'সাত সাত ভাই আমার, ল্যাজ-কাটা সেরা সবার।'

ল্যাজকাটা লজ্জিত হ'য়ে কন্যার কাছে গিয়ে বল্‌লে— "দিদিমণি, আজ নাগ-পঞ্চমীতে তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি।"

কন্যা মহাখুসী। তাকে খেতে দুধ দিলে, ফুল দিয়ে তাকে সাজালে, প্রদীপ ঘুরিয়ে আরতি কর্‌লে—গড় হ'য়ে প্রণাম কর্‌লে।

ল্যাজকাটা মহা খুসী। 'মায়ের কাছে গিয়ে বল্‌তে হবে, কি আদর আমি বোনের কাছ থেকে পেয়েছি।' হাজার হ'লেও, ছেলেমানুষ, দুষ্টবুদ্ধি যায় না। পথে দেখ্‌তে পেলে একটা ইঁদুর। অম্‌নি এক ছোবল মেরে মুখে রক্ত মেখে নিলে মাকে ভয় দেখাতে হবে।

মা দেখেন ছেলের মুখে রক্ত। "করেছিস্ কি? করেছিস্ কি? বোনকে খেয়েছিস্?"

"না মা, না মা। ইঁদুর খেয়েছি। বোন আমাকে কত আদর কর্‌লে, কত যত্ন কর্‌লে।"

ল্যাজ-কাটা সব কথা মাকে খুলে বল্‌লে।

সেই থেকে নাগপঞ্চমী পূজার সৃষ্টি হ'ল।

শ্রী অরূপকুমার সিদ্ধান্ত

—

জীবজন্তুর সংসার-যাত্রা

পৃথিবীতে এত জায়গা থাকিতে এঁটুলি যেমন গরুর গায়েই বাস করে, উকুন যেমন চুলের মধ্যে থাকিতেই ভালোবাসে, তেম্‌নি অনেক জীব আছে তাহারা নিজেদের জন্য অদ্ভুত বাসস্থান ঠিক করিয়া লয়। আমাদের দেশে শকুনি যেমন, তেম্‌নি আফ্রিকায় একরকম গো-খাদক পাখী আছে, তাহারা জীবন্ত গরু মহিষের উপর বসিয়া তাহাদের চাম্‌ড়া হইতে ছোট ছোট পোকা তুলিয়া তুলিয়া খায়। ঈজিপ্টে আর একরকম পাখী দেখা যায়, কুমীরের সঙ্গে তাহাদের খুব ভাব। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কুমীর মহাশয়রা যখন জল হইতে উঠিয়া নীল নদীর তীরে ভুঁড়ি উল্‌টাইয়া রোদ পোহাইতে থাকেন, তখন এই পাখীরা আস্তে আস্তে তাহাদের কাছে আসে। কুমীররা অম্‌নি হাঁ করে। তখন এই পাখী, কুমীরের দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে, চোয়ালে ও মুখের ভিতর যে-সব মাংসের টুক্‌রা লাগিয়া থাকে তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়। কুমীর কোন বাধা দেয় না, বরং একটু একটু করিয়া সেও হাঁ বাড়াইতে থাকে। পাখী তাহার মুখ পরিষ্কার করিয়া দেয়, আর নিজেরও পেট ভরায়। কুমীর আরামে চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে,—নাতি-নাত্‌নীরা কাণ খুঁটিয়া দিলে বুড়া দাদামশাইরা যেমন আরামে পড়িয়া থাকেন। পাখীগুলি একবারে কুমীরের মুখের ভিতর ঢুকিয়া যায়; কুমীর তাহাদের কোন অনিষ্ট করে না। এই পাখীরা কুমীরের গায়ের জোঁক বা পোকা-মাকড়ও খুঁটিয়া খাইয়া কুমীরের দেহ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

কোন কোন পিঁপড়ার বাসায় একরকম মাকড় বাস করে, তাহারা যেন পিঁপড়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ইহারা যে সব সময় আত্মীয়ের কাজ করে তাহা নয়, শত্রুর কাজও করে। পিঁপড়ারা যখন একজনের কাছ হইতে আর-একজনের কাছে খাবার চালান করে তখন ঐ আত্মীয় মাকড় সে-খাবার ছোঁ মারিয়া খাইয়া ফেলে। পিঁপড়ারা কিন্তু তবুও এই মাকড়কে তাড়াইয়া দেয় না। কেননা, ইহারা পিঁপড়াদের পরিত্যক্ত খাদ্যকণা বা জঞ্জাল খাইয়া ফেলে, মরা পিঁপ্‌ড়াও খাইয়া ফেলে। এই উপকারের জন্য পিঁপ্‌ড়ারা আপনাদের খাবার হইতে ইহাদিগকে কিছু কিছু দেয়। পিঁপড়ার ঘরে ইহাদিগকে ভিখারী বলা চলে।

সামুদ্রিক জীবের মধ্যেও এইরূপ বন্ধুত্ব দেখা যায়। অনেক সময় বিটার্‌লিং নামে একপ্রকার সমুদ্রের ছোট মাছের সঙ্গে লাল তন্তু দিয়া বাঁধা একরকম শুক্তি বা ঝিনুক দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাছের যখন ডিম পাড়িবার সময় আসে তখন ইহার ডিম্বনালী ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া দেহ হইতে সুন্দর লাল নলের মত বাহির হইয়া আসে। ইহাতেই শুক্তি আকৃষ্ট হয় ও আপনার দেহের আবরণ বাড়াইয়া তাহার দ্বারা ঐ মাছের ডিম্বনালীতে নিজেকে আট্‌কাইয়া রাখে। এইরূপে ঝিনুক লাগিলেই মাছ তাহা জানিতে পারে এবং ঝিনুকের কান্‌কোতে বা খোলায় ডিম পাড়িতে থাকে। প্রায় একমাস ধরিয়া ঝিনুকেই ঐ ডিম বাড়িতে থাকে। মাছ যখন নিরাপদ জায়গায় ডিম বাড়াইতে থাকে, শুক্তিও তখন ছাড়িয়া কথা কয় না। সেও নিজের ডিম ছাড়িয়া দেয়। ডিমগুলি লাল নল বাহিয়া মাছের দেহে আশ্রয় লয় ও সেখানে বাড়িতে থাকে।

ফিসালিয়া নামে একরকম সামুদ্রিক জীব জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। একরকম ছোট মাছের সঙ্গে ইহাদের খুব বন্ধুত্ব। কোন শত্রু তাড়া করিলেই এই মাছ আসিয়া ফিসালিয়ার আশ্রয় লয়। পুকুরের পানার যেমন শিকড় ঝুলিতে থাকে ফিসালিয়ার সেইরূপ শিকড়ে ঐ মাছ লুকাইয়া বেশ আত্মরক্ষা করে।

মোটা কলাগাছকে ছোট ছোট করিয়া কাটিলে তাহার একটা খাদি যেমন দেখায় সমুদ্রে প্রায় সেইরকম এক জীব জন্মে। অনেক সময় বড় শামুকের বা শাঁকের খোলার উপর এই জীব থাকে। এই জীবের ভিতর এক-

রকম মাছ আর এই খোলার ভিতর একরকম ছোট কাঁকড়া বাসা করে। ঐ জীবওয়ালা শাঁকের খোলাতেই কাঁকড়ার থাকার কারণ এই মনে হয় যে, ইহার সাহায্যে তাহার আত্মরক্ষা করিবার সুবিধা বেশী। আর ঐ জীবের ভিতরকার মাছ ও কাঁকড়া ঐ জীবের জোগাড়-করা খাদ্যের ভাগ সহজেই পায়; আর কষ্ট করিয়া খাবার জোগাড় করিতে হয় না! অনেক সময় হয়ত কাঁকড়া এই জীব জোগাড় করিয়া আপনার বাসের উপযোগী খোলার উপর লাগাইয়া দেয়। আবার যখন সে বাসা বদল করে, ঐ জীবটিকেও তখন সঙ্গে লইয়া যায়। মাছযুক্ত এইরূপ জীব না পাইলে কাঁকড়াকে অনেক সময় অস্থির ও অসুস্থ দেখা যায়।

কুমার-বক্ষ পাখী

মানুষের মধ্যে যেমন কেহ চাষের কাজ করে, কেহ রাজার কাজ করে, কেহ ব্যবসা করে, তেম্‌নি জীবজন্তুর মধ্যেও অনেকটা সেই রকম কাজের ভাগ দেখা যায়। মানুষ যেমন সমাজ বাঁধিয়া অনেকে একসঙ্গে বাস করে, অনেক জন্তুও তেম্‌নি দল বাঁধিয়া বাস করে। বিদেশী সোয়ালো (পাখী) আমাদের দেশের বাবুই পাখী প্রভৃতি দলে দলে একসঙ্গে বাস করে। দক্ষিণ আফ্রিকার এক জাতীয় পাখী গাছের উপর ঠিক তাঁবুর মত বাসা করে, ও তাহার ভিতর অনেকে বাস করে। বকেরা পরস্পর খুব বন্ধুভাবে বাস করে, নিজেদের জাত ছাড়া অপর জলচর পাখীদের সঙ্গেও ইহারা খুব ভাব রাখে। ভূমধ্য-সাগরের ফ্ল্যামিঙ্গো পাখী অপর কোন পাখীর সঙ্গে ঝগড়া করে না। টিয়া পাখী, পায়রা, ইহারাও দল বাঁধিয়া বাস করে।

যোগী কাঁকড়া

স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে অনেকে দলে দলে বাস করে। হরিণ, ছাগল, হাতী একসঙ্গে থাকে; শত্রু আসিলে সকলে মিলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়।

বাঁদরদের জীবনও এইরূপ। একলা থাকিলে ইহারা মোটে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। একলা ইহারা শত্রুর সম্মুখে যায়ও না, পলাইয়া যায়। কিন্তু দল বাঁধিয়া ইহারা শত্রুর ঘাড়ে পড়ে। বাঁদরদের দলে একজন করিয়া সর্দার থাকে; সে বীরের কাজ করে। সে দলকে এক গ্রাম হইতে আর-এক গ্রামে লইয়া বেড়ায় ও সকলকে রক্ষা করে।

মাংসাশী জন্তু, যেমন নেকড়ে বাঘ, দল বাঁধিয়া জন্তু শিকার করে। ঈগল, শকুনি, চিল প্রভৃতি পাখীও দলে দলে শত্রুকে আক্রমণ করে। অনেক প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য যেমন দল বাঁধে শত্রু তাড়াইবার জন্যও তেম্‌নি দল বাঁধে। তবে মজার ব্যাপার এই যে, অনেক সময় দুর্বল পাখীরা সবল পাখীদের আক্রমণ করে। কয়েকটি চিল একসঙ্গে মিলিয়া অনেক সময় ঈগল পাখীর কাছ হইতে খাবার কাড়িয়া লয়।

বাঁদর ও হনুমান কেবল যে দল বাঁধিয়া বেড়ায় তাহা নহে। খাবার জোগাড় করিবার সময় ইহারা দলে ভারী হইয়া যায়; আবার শত্রু দেখিবার জন্য নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে প্রহরী খাড়া করে এবং খাবার লইয়া পলাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া নিজেরা পাশে পাশে বসিয়া এক হাত হইতে অন্য হাতে খাবার চালান করে।

ব্রেজিল দেশের চিল খাবার শিকার করিয়া যদি দেখে যে, তাহা একলা লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়, তাহা হইলে বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া আনে।

পেলিকান্ নামে একরকম প্রকাণ্ড-ঠোঁটওয়ালা জলচর পাখী মাছ ধরিবার সময় কয়েকটি একসঙ্গে অর্দ্ধ-বৃত্তাকার হইয়া বসে। তাহাদের মাঝখানে যদি মাছ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে মাছের আর পলাইবার উপায় নাই।

কিন্তু ঐসব কাজে দল বাঁধা ছাড়া জীবজন্তুদের দল বাঁধার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায় যখন পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করে। যাইবার আগে তাহারা সকলে এক জায়গায় মিলিত হয়, কলরবে চারিদিক ভরিয়া ফেলে, প্রথমে একবার দেখিয়া লয় কে কেমন উড়িতে পারে, তাহার পর সকলে যাত্রা করে। দূর হইতে দূরে তাহাদের কলবর আকাশে তলাইয়া যায়, কালো বিন্দুর মত ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া তাহারা কোথায় যেন মিলাইয়া যায়। দেশ-ভ্রমণের জন্য পাখীদের এই যাত্রা দেখিতে চমৎকার।

গুপ্ত

নীল আকাশে

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

জান্‌লা দিয়ে পাঠিয়ে দুটি আঁখি
নীল আকাশের উপর তাহা রাখি'
থাকি চেয়ে থাকি।
মনে জাগে উদাস বিপুলতা,
মৌন নত সকল কথা ব্যথা,
স্তব্ধ আমার কর্ম্ম-অধীরতা।
নিথর আঁখি নিথর নীলে রহে,
চিত্ত ব্যাপি' শান্তিরি স্রোত বহে,
গোপন তারি বার্ত্তা মোরে কহে।

আমি একা—আকাশখানি ফাঁকা,
সরল আমার মনের যত ঢাকা,
মুক্ত হিয়া মুক্ত নভে রাখা।
নয়ন দিয়ে ও নীল করি পান,—
জুড়িয়ে গেল জুড়িয়ে গেল প্রাণ,
ক্ষুদ্র দুখ-শোকের অবসান।

পঞ্চশস্য

নবাবতার কৃষ্ণমূর্ত্তি—

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে"। কিলযুগের পাপভার হরণ করিতে এতকাল শ্রীভগবান সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। শুনা যাইতেছে সম্প্রতি তিনি মান্দ্রাজে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীমতী এ্যানি বেসাণ্ট ইঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন, জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট যেমন যীশুখৃষ্টকে আবিষ্কার। করেনএই অবতারের নাম কৃষ্ণমূর্ত্তি। তিনি সম্প্রতি তাঁহার অগ্রদূত শ্রীমতী এ্যানি বেসাণ্ট ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়কে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। ইয়োরোপে ও আমেরিকায় তাঁহার অসাধারণ খাতির। থিয়োসফি-প্লাবিত ইয়োরোপ ও আমেরিকার অনেকে সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি যখন প্যারিস গিয়াছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসের জন্য ইঁহার ভক্তেরা একটি অপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন সেখানেই মহিলারা অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহাকে

নবাবতার কৃষ্ণমূর্ত্তি

নবাবতারের জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট—শ্রীমতী এ্যানি বেসাণ্ট

ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা 'বিশ্ব-গুরু' কৃষ্ণমূর্ত্তির চরণতলে জ্ঞান শিক্ষার্থ ধাবিত হন। সভা লোকে লোকারণ্য, পথঘাটের জনতা ঠেলিয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। রাজা মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনা করে। প্রথমে সকলে ভাবিয়াছিল যে, অবতার আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিয়া আসিবেন, কিন্তু তাঁহাকে যখন অক্সফোর্ডের একটি নব্য ছোক্‌রারূপে দেখা গেল তখন অনেকেই হতাশ হইল। কৃষ্ণমূর্ত্তি চমৎকার ফরাসী ও ইংরেজী বলিতে পারেন; তিনি নিখুঁত আদব-কায়দাদুরস্ত। তাঁহার চক্ষু দুইটি কালো এবং গম্ভীরতার পরিচায়ক। তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলা হইলে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এই অবতারত্বের বোঝা বহিয়া আমি

অক্সফোর্ডের নব্য-ছোক্‌রা কৃষ্ণমূর্ত্তি

অস্থির হইয়াছি ; আশা করি আপনারা এই অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করেন না। আমি সাধারণ লোকের চাইতে শ্রেষ্ঠ নই।" তিনি খুব ভাল টেনিস খেলিতে পারেন।

জেম্‌স্ চ্যাপিন—

চিত্রকলা সম্বন্ধে যাহারা সম্পূর্ণ আনাড়ি তাহাদের কাছে ছবি আঁকা ব্যাপারটা একটা প্রকাণ্ড রহস্য। নানা ধরণের প্রশ্ন তাহাদের মনে জাগে। একজন বিখ্যাত আমেরিকান চিত্রকর বলিয়াছিলেন, "আমার মন যখন কাঁদে তখনই আমি তুলি লইয়া বসি।" বিখ্যাত চিত্রকর জেম্‌স্ চ্যাপিন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যায়। সাধারণ শ্রমিকের সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা, আনন্দ তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহাদের জন্য তাঁহার মন কাঁদে তাই শ্রমিকদিগকে তিনি তুলি ও পেন্সিলের মুখে অমন চমৎকার করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। সাধারণ শ্রমিকদিগের জন্য সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তিনি যেন তাহাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের সন্ধান রাখেন ; তাঁহার ছবিতেও শ্রমিকদের ব্যথা আনন্দ ইত্যাদি ভাবও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। ইয়োরোপের চিত্রকর ক্যাথি কোলউইজের মত দুঃস্থ, প্রপীড়ি

চাষীর স্ত্রীর রান্নাঘর

কাঠুরে

জেলে

ভায়োলেট গিবসন

নিগৃহীত শ্রমিকদের লইয়াই তাঁহার কারবার। সম্ভবতঃ তাঁহার এই শ্রমিক-প্রীতি বেলজিয়ামে শিক্ষানবিশী করিবার সময় শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি আমেরিকার নিউজার্সিতে জন্মগ্রহণ করেন ও শিশুকাল হইতেই চিত্রকলার দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল। তিনি এ্যাণ্টওয়ার্পে চিত্রকলা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। আমেরিকায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমটা তাঁহাকে সংসারের সহিত প্রবল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ফলে তাঁহার জীবনে ও শিল্পে অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হয়। আমরা এখানে চ্যাপিনের চারখানি ছবির নমুনা দিলাম।

—

ইউরোপের ভীতি—মুসোলিনী—

হনরেবল্ ভায়োলেট গিবসন মাত্র সেদিন যখন ফ্যাসিষ্টনেতা মুসোলিনীর উপর গুলি চালাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তখন ইউরোপের দৈনিকে সাপ্তাহিকে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল; তখন সকলে বলিয়াছিল, যাক্ একজন মহাপুরুষ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইলেন। আর আজ মুসোলিনী যেই ত্রিপোলী ভ্রমণ করিয়া ফিরিলেন অমনি ইংলণ্ড ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশের দৈনিকে, সাপ্তাহিকে তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠিতে সুরু করিয়াছে। নেপোলিয়ানের মত তাঁহার নাকি সাম্রাজ্য স্থাপনের মতলব আছে; মুসোলিনীর উন্নতি অর্থে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহের সমূহ অবনতি ইত্যাদি। এমন কি লণ্ডন ডেলী এক্স-প্রেস লিখিয়াছেন—"সম্ভবতঃ নেপোলিয়ানের মিশর-অভিযান ও রাজ্যচ্যুত কাইজারের প্রাচ্য প্রত্যন্ত দেশ পরিদর্শন এই দুই ঘটনা ব্যতীত এমন আর কোনো ঘটনাই সম্প্রতি ঘটে নাই যাহা দ্বারা ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে ওলট পালট ঘটিতে পারে।" ইউরোপের অন্যান্য জাতিসমূহ নাকি ইতালির বিশ্ব-বিজয়ের গোপন ইচ্ছা ধরিয়া ফেলিয়াছে। মুসোলিনী ডেলী এক্সপ্রেসের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন সাধারণের দ্বারা সাধারণের শাসন কার্য্য পরিচালিত হইতে পারে না। জুলিয়াস সিজারই তাঁহার আদর্শ। তবে প্রতিনিধি মহাশয় ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, যদিও সকলে ইতালীর আধুনিক অভ্যুদয়ে মুসোলিনী যে পন্থা অনুসরণ করিতেছেন তাহার নিন্দা করিতেছেন কিন্তু মুসোলিনী ইতালীর যে অদ্ভুত উন্নতি সাধন করিয়াছেন একথাও কেহ অস্বীকার করিতেছেন না।

লণ্ডনের নিউ ষ্টেট্স্ম্যান লিখিতেছেন—"এই মুসোলিনী প্রভাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কারণ মুসোলিনীর আধিপত্য দুনিয়ার শান্তি নষ্ট করিতে বসিয়াছে।"

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সাম্রাজ্যতন্ত্রপরায়ণ জাতি সমূহই মুসোলিনীর একচ্ছত্রাধিপত্যে ভয় পাইয়াছে।

—

টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা—গ্রেহাম বেল—

পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা আলেক্‌জাণ্ডার গ্রেহাম বেল তাঁহার সহকর্ম্মী টমাস ওয়াট্‌সনকে নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্রযোগে প্রথমে কথা বলিয়াছিলেন;—তাঁহাদের দূরত্ব ছিল মাত্র ৭৫ মাইল। আর আজ স্থান, কাল ও পাত্র নির্ব্বিচারে প্রত্যহ ১০ কোটি লোকে টেলিফোনযোগে সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন এমন কি রেডিও টেলিফোনযোগে অতলান্তিক মহাসাগরের এপারে ওপারে সম্প্রতি কথা বলাবলি চলিতেছে।

টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা—গ্রেহাম বেল

৫০ বছর পূর্ব্বে বোষ্টোনের একটি বিজ্ঞানাগারে টেলিফোন আবিষ্কৃত হয়। এবং ঐ বৎসরেই (১৮৭৬ সাল) টেলিফোনের পেটেণ্ট লওয়া হয়।

কুমীর-বশীকরণ—

ফোরিডার মিয়ামি সহরের হেনরী কোপিঙ্গার নামক এক অল্পবয়স্ক যুবক এক অলৌকিক শক্তি প্রভাবে অবলীলাক্রমে গভীর জলে ডুব মারিয়া ১৬।১৮ ফিট লম্বা কুমীর ধরিয়া আনিয়া নির্ব্বিবাদে তাহাদের সহিত তারে খেলা করে। এই খেলা দেখাইয়া সে প্রচুর পয়সা উপার্জ্জন

কুমীর-বশীকরণ

করিতেছে। কুমীরকে কাবু করিবার এমন একটি অদ্ভুত কৌশল সে আয়ত্ত করিয়াছে যাহাতে অতি বৃহৎ কুমীরও অত্যন্ত শান্তভাবে তাহার খেয়াল পরিতৃপ্ত করে। কোপিঙ্গার বলে কুমীরের স্পর্শ তাহার নিকট অতীব সুখপ্রদ।

—

মানব-শিশু-সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক তাপ-যন্ত্র—

শিশু গর্ভাবস্থায় পূর্ণ পরিণতি পাইবার পূর্ব্বে অসময়ে যদি ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। এমন কি
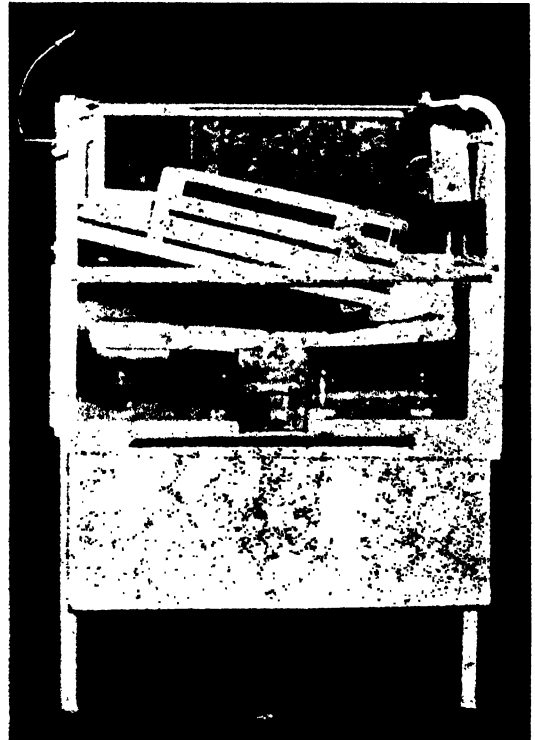
শিশু-সংরক্ষণী যন্ত্র

যে সকল শিশু পূর্ণাবস্থায়ও ভূমিষ্ঠ হয় অথচ অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহারাও কেহ প্রায় টিকে না। আসলে অপরিণত-শিশুকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন সেই পরিমাণ উত্তাপ জোগান কঠিন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে তৈল-মর্দ্দন করিয়া ফ্লানেল জড়াইয়া শিশুকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হইত। সম্প্রতি এক অভিনব বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোক-সাহায্যে এই যন্ত্রের অভ্যন্তরে সর্ব্বদা এক সমান উত্তাপ রক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত শিশুকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে অপর যে দুইটি (অর্থাৎ শিশুর যথাযথ আহার জোগান ও তাহাকে সংক্রামক ব্যারাম হইতে রক্ষা করা) বিষয়ে নজর রাখা আবশ্যক এই যন্ত্রে তাহারও ব্যবস্থা আছে। ডাক্তার টার্ণিয়ার প্রথমে ১৮৮০ সালে প্যারিস মেটারনিটি হসপিটালে এই যন্ত্রের ব্যবহার করেন। বর্ত্তমানে যন্ত্রের বাহ্য আকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইলেও আসলে যন্ত্রটি অনেক উন্নত হইয়াছে। নীচের তালিকা হইতে তাপ যন্ত্র ব্যবহার না করাতে টার্ণিয়ার কি পরিমাণ শিশুকে বাঁচাইতে পারিয়াছেন ও যন্ত্র ব্যবহার করিয়া টার্ণিয়ার ও ভুরহিজ (আধুনিক) কি পরিমাণ শিশুকে বাঁচাইয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে।

শতকরা সংরক্ষিত শিশু

বয়স	টার্ণিয়ার (তাপ যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া)	টার্ণিয়ার (যন্ত্র ব্যবহার করিয়া)	ভুরহিজ (যন্ত্র ব্যবহার করিয়া)
৬ মাসে জন্ম	০·০	১৮·০	
৬৷৷০ মাসে জন্ম	২৯·৫	৩৬·৬	৬৬·০
৭ মাসে জন্ম	৩৯·০	৪৯·৮	৭১·০
৭৷৷০ মাসে জন্ম	৫৪·০	৭৭·০	৮৯·০
৮ মাসে জন্ম	৭৮·০	৮৮·৮	৯১·০

শান্তি-দেবীর সংশয়—

দুনিয়ার অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পাপ, মাদকতা, বর্ণভেদ ইত্যাদি দূর করিবার জন্য বৎসরের পর বৎসর জাতিসংঘের অধিবেশন হইতেছে। একদল লোক জাতিসংঘের এই প্রচেষ্টার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী উত্তরোত্তর শান্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে! কিন্তু সংশয়ী লোকের অভাব নাই; জাতিসংঘে সম্পূর্ণ আস্থাহীন লোকেরও অভাব নাই। তাঁহারা জাতিসংঘের এই আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রচেষ্টাকে নিরন্তর ব্যঙ্গ ও পরিহাস করিতেছেন। পাশের ছবিখানি সেই অবিশ্বাসী-দলের একটি ব্যঙ্গ চিত্র। শান্তিদেবী প্রভু যীশু খৃষ্টের মত যেন শেষ-আহারে বসিয়াছেন, আশেপাশে তাঁহার শিষ্যবর্গ অর্থাৎ জাতিসংঘের প্রতিনিধিবৃন্দ। শান্তিদেবী হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন—"তোমাদের মধ্যেই একজন আমাকে ধরাইয়া দিবে"; অর্থাৎ তোমাদের একজনই পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ করিবে। ব্যঙ্গ চিত্রখানির গূঢ় অর্থ এই যে, জাতি-সংঘে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি হিসাবে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সকলের মন পবিত্র নয়, প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে ইঁহারা ছাড়িবেন না।

জাতিসংঘে শান্তিদেবী—"তোমাদের মধ্যেই একজন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে"

—

নব নেপোলিয়ান—

এই ব্যঙ্গ চিত্রখানিতে ফ্যাসিষ্টনেতা মুসোলিনিকে নেপোলিয়ানের মত সাম্রাজ্য-বিস্তার-প্রয়াসী দেখান হইয়াছে। ইতালী তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ছোট, তাহাতে তাঁহার কুলাইতেছে না। তিনি দুরবীণ-সহযোগে নূতন রাজ্যের সন্ধান লইতেছেন।

ITALIE

Marcel Capy

নব নেপোলিয়ান মুসোলিনি

লেভায়াথ্‌ন—

যুক্ত আমেরিকার সিপিং-বোর্ডের নিকট হইতে এই জাহাজখানি সম্প্রতি যুক্ত আমেরিকার মারকেণ্টাইল মেরিন ক্রয় করিয়াছেন।

—
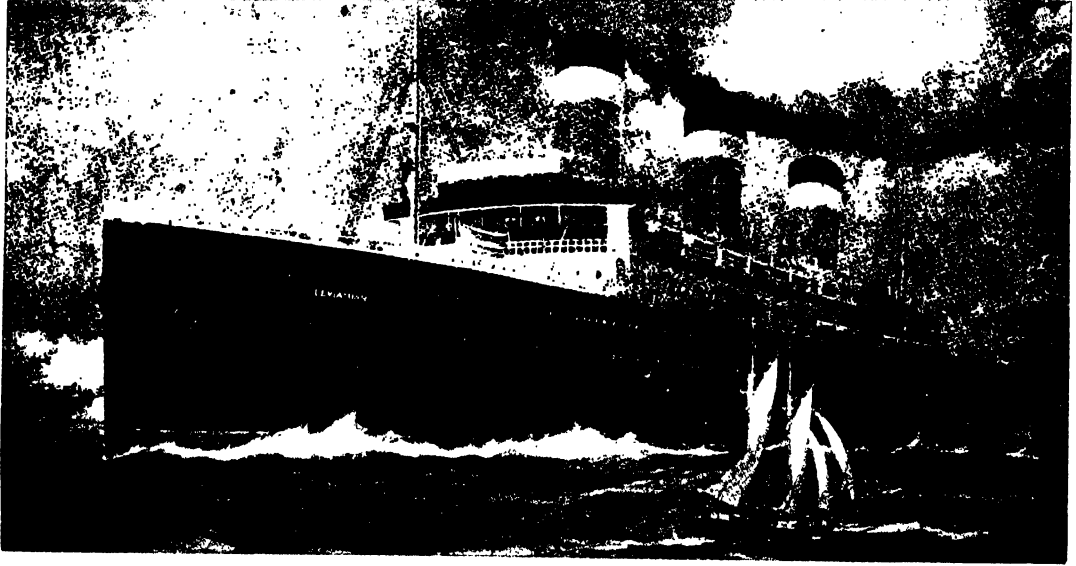
লেভায়াথন

ইংগ্রেসের একটি ছবি—

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে সমস্ত শিল্পী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ইংগ্রেস তাঁহাদের অন্যতম এবং স্বপক্ষের ও বিপক্ষের প্রশংসা লাভে এক। তিনিই সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশ্য গোঁড়ার দিকে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। এখন প্রাচীন ও নবীন উভয় শিল্পী সম্প্রদায়ই তাঁহাকে নমস্কার নিবেদন করেন। ছবির মধ্যে শুদ্ধ ও পবিত্র ভাব ফুটাইয়া তুলিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। এই ছবিখানি ইংগ্রেসের অদ্ভুত কলা-কুশলতার পরিচায়ক। ছবিখানি ১৮১৫ সালে অঙ্কিত হয় এবং চিত্রের কাজের সূক্ষ্মতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ছবিখানির নাম 'সুখের সংসার'। বাহিরের শান্তির সহিত অন্তরের নিবিড় আনন্দ চমৎকার ফুটিয়াছে।

সুখের সংসার

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টার্বিন ডাইনামো—

নিউইয়র্ক এডিসন কোম্পানী সম্প্রতি ইষ্টরিভার ষ্টেসনে যে বিদ্যুৎজনন যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন পর পৃষ্ঠার চিত্রটি তাহারই টার্বিন ডাইনামোর প্রতিকৃতি। ইউরোপ ও আমেরিকার যে কোনো ডাইনামোর দ্বিগুণ কাজ এই যন্ত্রে হইবে। নিউইয়র্ক এডিসন কোম্পানীর সহঃ সম্পাদক বলিয়াছেন যে এই যন্ত্রকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী যন্ত্র এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই যন্ত্রের উচ্চতা ৫০ ফিট এবং ওজন ১২৫০০ মণ। ইহার পরিচালনে প্রত্যেক ঘণ্টায় ৮২০ মন কয়লা ব্যবহৃত হইবে। ৮০০০ হাজার হর্স পাওয়ার বৈদ্যুতিক শক্তি ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন এই বিরাট যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা।
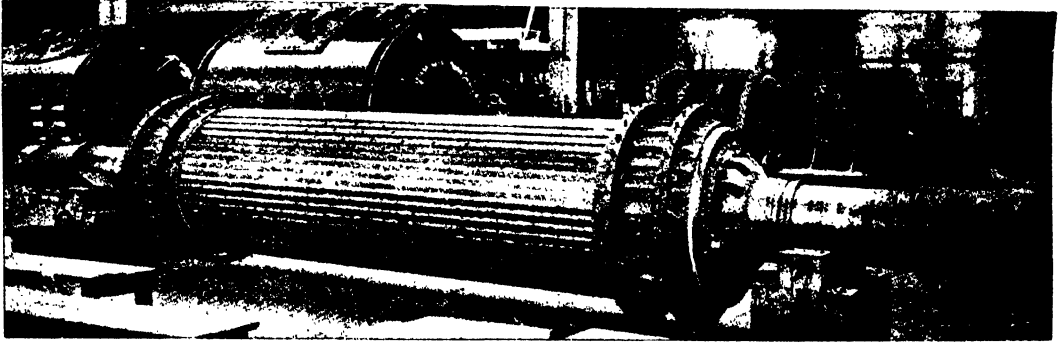
পৃথিবীর বৃহত্তম যন্ত্র

ইগ নেশ পেডারেওস্কি—

ইগ নেশ পেডারেওস্কি-বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিয়ানো-

শ্রেষ্ঠ পিয়ানো-বাদক ইগ নেশ পেড়েরেওস্কি.

বাদক। শুধু পিয়ানো বাজাইয়া ও পিয়ানো শিক্ষা দিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার খ্যাতিরও অসাধারণ।

—

অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন—

বর্ত্তমানে অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত। ইনি জার্ম্মানজাতীয় ইহুদী; জুরিকে অধ্যাপনা করেন। ইঁহার গবেষণার ফলে বিজ্ঞান-জগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ইনি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণবাদকে ভুল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। আপেক্ষিক-তত্ত্ববাদের জনয়িতা বলিয়া ইঁহার খ্যাতি। সম্প্রতি
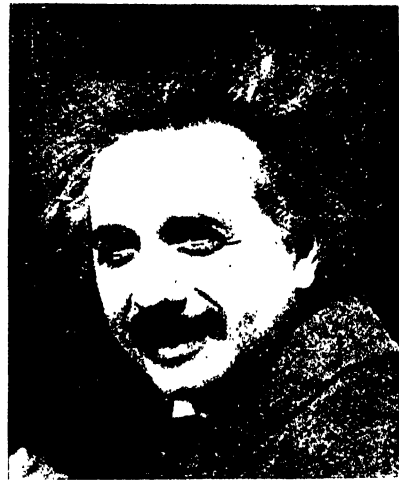
অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন

জেনেভার বিজ্ঞানবিদ্‌গণের যে বৈঠক বসিয়াছে তাহাতে অধ্যাপক আইনষ্টাইন আমাদের আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে নমস্কার নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন যে, জগদীশ চন্দ্র বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যতগুলি তথ্য দান করিয়াছেন তাহার যে কোনটির জন্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

—

পায়দলে পৃথিবী-ভ্রমণকারী নারী—

অদম্য-উৎসাহশীল নির্ভীক রোজিটা ফর্‌বৃশ পায়ে হাঁটিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। তিনি জাতিতে ইংরেজ। আফ্রিকা, আমেরিকা আরব, তুর্কীস্থান প্রভৃতি স্থানে তিনি হাঁটিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। এই অদ্ভুত সাহসী নারী নিজের হাতে ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন, দুর্দ্দান্ত দস্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, অলঙ্ঘ্য পাহাড় পর্ব্বত নদ-নদী, মরুভূমি উত্তরণ করিয়াছেন। পৃথিবীর নানা অদ্ভুত দেশে শুধু ভ্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই প্রত্যেক দেশের রীতিনীতি আচার ব্যবহার

রোজিটা ফর্বস

সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। আরবে অবস্থানকালে তিনি আরবী ভাষা আয়ত্ত করিয়া নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দিয়া আরব-দস্যুদের সহিত বাস করিয়াছেন।

এই মহিলা সম্প্রতি দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। আমেরিকার পল্লবগ্রাহিতার তিনি প্রচুর নিন্দা করিয়াছেন। আমেরিকার 'নারী' সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, "আমেরিকায় বিবাহের তিন চার বৎসরের মধ্যেই প্রত্যেক স্বামীস্ত্রীর বিবাহবন্ধন আইনত না হইলেও কার্য্যত ছিন্ন হয়; সন্তানবতী মাতার স্বামীর সহিত একেবারেই কোনো সম্পর্ক থাকে না; মাতৃত্ব বিকশিত হইলেই আমেরিকান স্ত্রী পত্নীত্ব বিসর্জ্জন দেয়। ইহার জন্য আমেরিকার পুরুষ সম্প্রদায়ই দায়ী, তাহারা আত্মম্ভরী ও অর্ব্বাচীন। আমি জানিনা আমেরিকার মেয়েরা জীবনের রসদ সংগ্রহ করে কোথা হইতে, স্বামীর সহিত তাহাদের দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই, সপ্তাহের কয়দিন তাহারা ব্যবসার খাতিরে বিধবা, রবিবারদিন তাহারা ক্লাবের জন্য বিধবা। আরব হারেমে স্ত্রীর সহিত স্বামীর যাহা সম্পর্ক এখানেও তাহাই তবে এই বিচ্ছিন্নতা হারেমের জন্য নহে ক্লাবের জন্য।" আমেরিকার যুক্তরাজ্যের এক ভদ্র মহিলার বাড়ীতে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই মহিলা তাঁহাকে উপদেশ দেন, "দেখুন আপনি যদি এখানে নাম কিনতে চান, কখনো আমাদিকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করবেন না, আমরা কোনো জিনিষ বুঝি না এই ভাবটাই সহ্য করতে পারি না।" নিউইয়র্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ঊর্দ্ধে নীলাকাশ ছাড়া আমেরিকার কোনো বাধা নাই—কিন্তু সে আকাশ আমেরিকার আকাশ। যে আমেরিকা সহস্র সহস্র জাতিকে এক করিবার ভার লইয়াছে সেই আমেরিকাই তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও সমুদ্র-বন্ধনের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। তাহার উচ্চতা আছে কিন্তু প্রসার নাই। এক মৃত্যু ছাড়া তাহাদের কোনো বিষয়ের কোনো প্রতিবন্ধক নাই কিন্তু তাহাদের অগভীর পল্লবগ্রাহিতা তাহাদিগকে মনের প্রসারতা হইতে বঞ্চিত করিতেছে। ইউনাইটেড ষ্টেট্স মানুষের আবাসভূমি নহে, উহা একটি যন্ত্রাগার মাত্র; নির্ব্বিবাদে অত্যন্ত শৃঙ্খলতার সহিত সব কিছু ঘটিতেছে কিন্তু প্রাণ নাই, মন নাই। একটি বোতাম টিপিলেই এখানে আলাদীনের মত অঘটন ঘটান যায় কিন্তু এখানকার যন্ত্র যান্ত্রীর হাতে চলে না—যন্ত্রীও যন্ত্রের অঙ্গীভূত। এখানে সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার একটা অকারণ স্পৃহা আছে; ইহাতে আমেরিকা জগতের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু আমেরিকায় মানুষ মনুষ্যত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। এদেশে সদর মফঃস্বল নাই—মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হইবে কেমন করিয়া?"

বিজ্ঞাপন-চরিত্র

(প্রবাসীর জন্য বিশেষ করিয়া লিখিত)

অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া দেখা যায় যে, এমন একদিন ছিল যখন ক্রেতা জানিত যে, তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু "অমুকের" নিকটে ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যাইবে না এবং বিক্রেতা জানিত যে, তাহার পণ্যদ্রব্য "অমুক ও অমুকের" নিকটে ব্যতীত আর কোথাও বিক্রয় হইবে না। আমাদের দেশে কোন কোন রেল-লাইন-বর্জ্জিত স্থানে এখনও এইরূপ অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মানুষের ব্যবসা ক্ষুদ্রায়তন রূপ ছাড়িয়া ক্রমশঃ বৃহত্তম আয়তন লাভের পথে নানান্ অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়াছে। প্রথমত ক্রেতা ও বিক্রেতা এক গ্রামেরই

লোক, এইরূপ ছিল। তৎপরে তাহারা এক গ্রাম ছাড়িয়া বিভিন্ন গ্রামবাসী হইলেও ক্রয় বিক্রয়ার্থে বহুদূর গ্রামে কখন যাইত না। কোন কোন দ্রব্য অবশ্য বহুদূর দেশ হইতেও ভ্রাম্যমান্ ব্যবসাদারগণ আনয়ন করিয়া সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া ফিরিত; কিন্তু সে কার্য্য যাহারা করিত তাহারা দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন-যাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট ছিল না। পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালী ক্রমশঃ কুটীরশিল্প হইতে যত কারখানার অন্তর্গত হইতে চলিল, এবং এক এক প্রস্তুতকারক সহস্র সহস্র ও ক্রমশ লক্ষ লক্ষ ক্রেতাকে মাল সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিল, ততই দ্রব্য-বিক্রয়-প্রণালীর উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিল। যে স্থলে ক্রেতা বিক্রেতার কুটীরে আসিয়া ইচ্ছামত দ্রব্য ক্রয় করিত, ক্রমে সে স্থলে ক্রেতার সহিত প্রস্তুতকারকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লোপ পাইয়া তৎস্থলে মধ্যবর্ত্তী দোকানদার প্রভৃতির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। এই সকল দোকানদার নানান্ প্রস্তুতকারকের পণ্যদ্রব্যনিচয় দেশদেশান্তর হইতে আনিয়া সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে দোকানে মজুত রাখিতে আরম্ভ করিল এবং বিক্রেতাগণ সর্ব্বত্র প্রস্তুতকারকের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বর্ত্তমানে আমরা যদি কোন সময় আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির প্রস্তুত-কারকের নাম ধাম প্রভৃতি অনুসন্ধান করি তাহা হইলে দেখিব যে পৃথিবীর ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যবস্থা লক্ষ পথে দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য পরস্পর নির্ভরশীলতার বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে।

The Smaller the Tools
the BIGGER the PAY
DRAFTING PAYS BEST

যন্ত্রপাতির নক্সা আঁকিতে শিখিবার একটি স্কুলের বিজ্ঞাপন। চিত্রে দেখান হইতেছে যে যত সূক্ষ্ম যন্ত্র লইয়া যাহার কাজ তাহার আয় তত অধিক। নক্সা-অঙ্কনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে যাহা আয় হয় হাতুড়ির সাহায্যে তাহার অনেক কম হয় ইত্যাদি

এই যে সকালে চিনি ও জমান দুগ্ধ দিয়া চা পান করিলাম—তাহার চিনিটুকু আসিয়াছে বহু দূরে সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত জাভা দ্বীপ হইতে, চা আসিয়াছে সিংহল অথবা দার্জ্জিলিং হইতে, দুগ্ধটি আসিয়াছে বহুদূর সুইট্জার-ল্যাণ্ড হইতে ও চায়ের পেয়ালাটি আসিয়াছে জাপান হইতে। এই প্রবন্ধ লিখন-কালে যে কলম ব্যবহৃত হইতেছে তাহার প্রস্তুতকারক আমেরিকার অধিবাসী, তাহার কালি প্রস্তুত করিয়াছে ইংরেজে এবং যে কাগজের উপর লেখা হইয়াছে তাহা জেকোস্লোভাকিয়াতে তৈয়ারী। প্রবাসীর ছাপার কাগজ বেশীর ভাগ ভারতে প্রস্তুত, ছাপার কালি ইংলণ্ডে প্রস্তুত ও ছাপার যন্ত্র জার্ম্মাণীতে নির্ম্মিত। যে দিকে তাকাই দেখিতে পাই আমরা সমগ্র পৃথিবীর সহিত ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধে আবদ্ধ।

ক্রেতা ও বিক্রেতার আলাপের প্রয়োজনীয়তা

পুরাকালে যখন কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য বিক্রেতার সম্মুখবর্ত্তী হইত তখন বিক্রেতার সহিত তাহার অনেক কথাবার্ত্তা হইত। দ্রব্যের দোষ, গুণ, দুর্ম্মূল্যতা, স্বল্পমূল্যতা, প্রয়োজনীয়তা, সৌন্দর্য্য, অপরে উক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে কি না, করিলে তাহাদের উক্ত দ্রব্য সম্বন্ধে মতামত ইত্যাদি বহুবিষয় লইয়া ক্রেতা

সুদৃশ্য বাড়ীর বেড়াও সুদৃশ্য না হইলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। ইহা ব্যতীত যদি সুদৃশ্য বেড়ার অন্য গুণও থাকে তাহা হইলে আরোই ভাল

ও বিক্রেতার আলোচনা হইত। বহুস্থলে ক্রেতার গৃহে বিক্রেতা আপনা হইতে গমন করিয়া তাহাকে নিজ পণ্য দ্রব্যের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। আমাদের দেশে ও পাশ্চাত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ফিরিওয়ালা, "ক্যানভাসার" প্রভৃতির আবির্ভাব বর্ত্তমান কালেও হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য আপনা হইতে চেষ্টা করাটা নিজ ব্যবসায়ের অঙ্গ বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। মুখের কথায় ও ক্রেতার চোখের সম্মুখে পণ্য সঞ্চালন করিয়া কার্য্য-উদ্ধারের রীতি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে পণ্যের প্রয়োজনীয়তা যত কম ও যাহা যতটা বিলাসিতার সামগ্রী তাহার জন্য বিক্রেতা তত অধিক বাক্যাড়ম্বর ও বিক্রয়চাতুর্য্য দেখাইয়া থাকে।

ক্রেতা ও বিক্রেতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অতিকায় কারখানা ও জগৎ-বিস্তৃত ব্যবসা বাণিজ্যের যুগে প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোপ পাওয়ার ফলে বর্ত্তমান কালে জগতের সর্ব্বত্র বিক্রেতা ক্রেতার দৃষ্টি নিজ পণ্যের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য নিত্য নূতন উপায়ে চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টা বর্ত্তমানে প্রধানত বিজ্ঞাপনের সাহায্যে হইয়া থাকে। শূন্যমার্গে এরোপ্লেনের সাহায্যে ধোঁয়ার লিখন হইতে আরম্ভ করিয়া ডাকের চিঠির টিকিটের উপর "ভারতে প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করুন" বলিয়া ছাপ লাগাইয়া দেওয়া অবধি সকল প্রকার বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য একই—বিজ্ঞাপন-দর্শকের মনে বিজ্ঞাপিত দ্রব্য-ক্রয়েচ্ছা জাগাইয়া তোলা।

আধুনিক জগতে এই বিজ্ঞাপনকার্য্য একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। কোন্ প্রকার দ্রব্যের পক্ষে কি প্রকার বিজ্ঞাপন সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী বিজ্ঞাপন দানের সহিত অপরাপর কি কি ব্যবস্থা করা দ্রব্য বিক্রয়ার্থে অবশ্য প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞাপন লিখিত ও সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইতে হইলে তাহা কি ভাবে লিখিত হওয়া প্রয়োজন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও বিচার লইয়া শত শত পুস্তক লিখিত হইয়াছে ও সহস্র সহস্র মস্তিষ্ক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু সাময়িক পত্রে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সেইগুলির সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে। একথা সকল সময় মনে রাখা কর্ত্তব্য যে শুধু বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াই কোন বিক্রেতা ক্ষান্ত থাকেন না। যে সকল স্থানে দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারিত
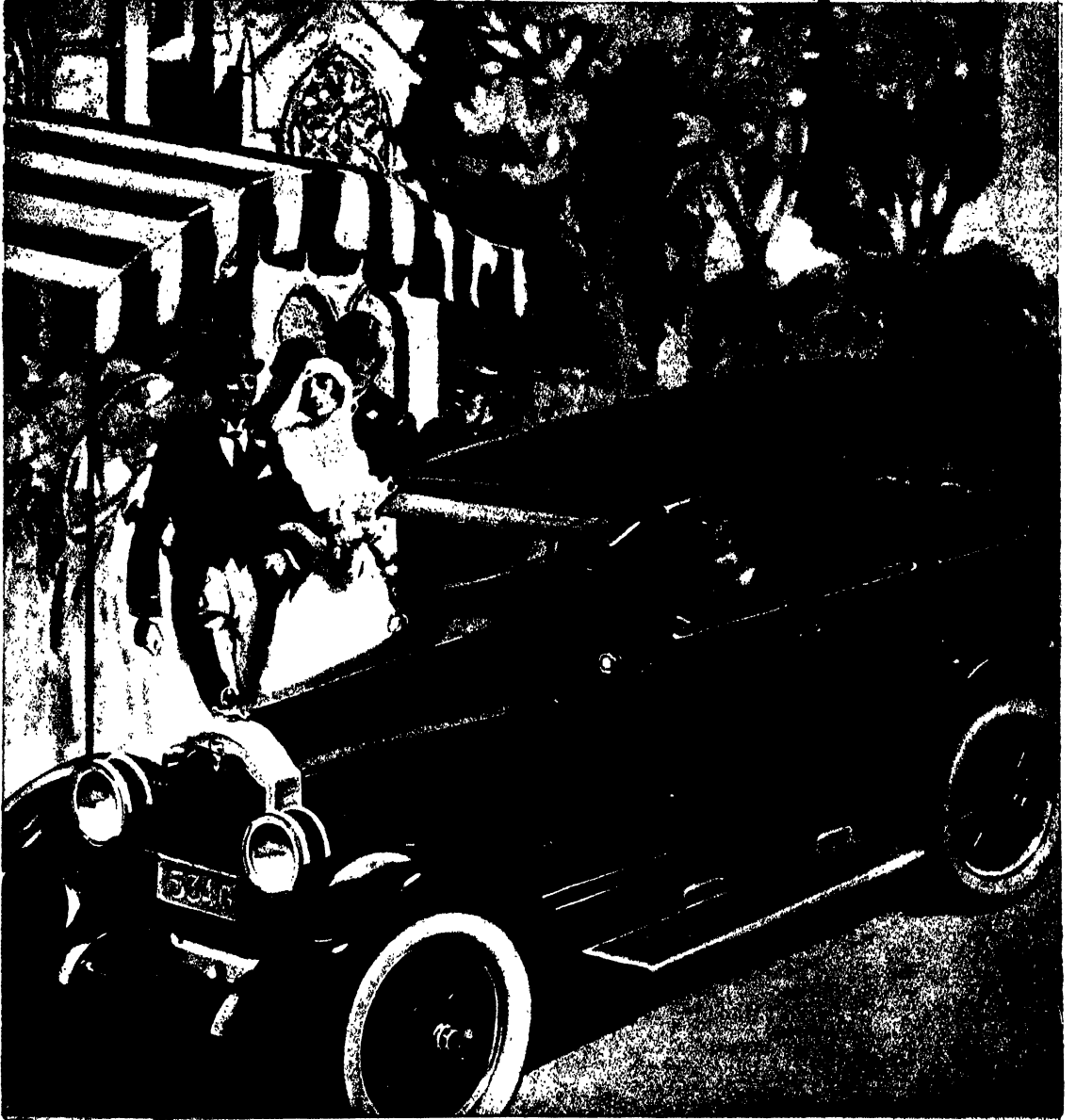
আমেরিকার মোটরকারের একটি বিজ্ঞাপন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

Happy Faces
Men tell us this makes
shaving a morning joy

একটি ক্ষৌরকার্য্য সুসমাধান করিবার উপযুক্ত সাবানের বিজ্ঞাপন। ক্ষৌর-সুখ-উপভোগী যুবকদ্বয়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখভাব দেখিয়া তাহাদের অনুকরণে অপরের ঐ সাবান ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক

হইবে সে সকল স্থানে বিজ্ঞাপিত দ্রব্য ডাকে অথবা অন্য উপায়ে (দোকান অথবা এজেন্ট মারফৎ) সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা ও অন্যান্য উপায়ে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা করা প্রভৃতিও সেই একই বিরাট দ্রব্য-বিক্রয়-প্রণালীর অন্তর্গত। আমরা বর্ত্তমানে সে সকল বিষয় ছাড়িয়া মাত্র বিজ্ঞাপন লিখন ও মুদ্রণ বিষয়েই আলোচনা করিব।

বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞান

বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞাপন লিখন ও মুদ্রণ যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা কতকগুলি বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন। যথা;

১। বিজ্ঞাপনের পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণী শক্তি

২। দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তৎপরে পাঠকের মনে বিজ্ঞাপন মনোযোগের সহিত পাঠ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত করাইবার শক্তি

৩। পাঠকের মনে বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করাইবার প্রয়োজনীয়তা

৪। এই কার্য্যে সুতর্ক ও সহজ বোধগম্যতার প্রয়োজনীয়তা

৫। পাঠকের মনে বিজ্ঞাপন-পাঠের ফলে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের অভাব বোধ ও উক্ত দ্রব্য-ক্রয়েচ্ছা জাগ্রত করাইবার ক্ষমতা

৬। বিজ্ঞাপিত দ্রব্য কি উপায়ে পাওয়া যাইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া

বিজ্ঞাপনের প্রতি দর্শক ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সাধারণত বড় ও অভিনব হরফ, চিত্র, অক্ষরের পার্শ্বে সুদৃশ্য "বর্ডার" ইত্যাদি ছাপা হয়। চিত্র, হরফ, বর্ডার প্রভৃতির একত্র সংস্থাপন হেতু বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য্য-রক্ষার কার্য্য কিছু জটিল হইয়া উঠে অর্থাৎ এই সকলের পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। চিত্রের সহিত হরফের, হরফের সহিত বর্ডারের, বর্ডারের সহিত চিত্রের বেশ মানাইয়া যাওয়া চাই নতুবা বিজ্ঞানটি কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া দর্শকের চিত্তে হাস্যরসেরই সৃষ্টি করিবে। বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্য বা "ব্যালান্সের" উপর তাহার সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে নির্ভর করে। এবং বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য্যের মধ্যেই তাহার আকর্ষণী-শক্তি নিহিত। সুতরাং বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য্যের উপরে তাহার কার্য্যকারিতা সবিশেষ নির্ভর করে একথা বলা চলে।

বিজ্ঞাপন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীগণ অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। আমরা যে রঙিন মোটরগাড়ীর বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত করিয়াছি, তাহা যে কোম্পানীর তাঁহারা প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিজ্ঞাপনার্থে ব্যয় করেন। উচ্চ বেতনভোগী একাধিক শিল্পী তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের জন্য নিত্য নূতন চিত্র অঙ্কন করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। চিত্রে মোটরগাড়ী, তাহার আরোহী ও পারিপার্শ্বিক সকল কিছু এত সুদৃশ্য ও সুরঞ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে যে পাঠকের মন স্বতই উক্ত মোটরগাড়ীর প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আভিজাত্যের সহিত ঐ মোটরগাড়ীর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিত্রের সাহায্যে প্রচার করা হইতেছে, যে, যে কেহ আভিজাত্য-অভিলাষী

When he comes to *your* home—what? *Master of bolts and locks . . armed for instant action . . a clever, cold-blooded criminal . . familiar with the habits of householders and servants . . prepared to stake liberty and life for the valuables he covets . . what protection have you against him?*

চোরের হাত হইতে ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য বীমা করার উপকারিতা দেখানই এই বিজ্ঞাপনটির উদ্দেশ্য

তাঁহার পক্ষে উক্ত মোটরগাড়ী ক্রয় করা অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে হইবে।

বিজ্ঞাপনের চিত্রে ও কথায় অভিনবতা থাকা প্রয়োজন। এক নম্বর চিত্রের বিজ্ঞাপনে দেখান হইতেছে যে হাতুড়ি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর যন্ত্র দিয়া কার্য্য করিতে শিখিলে অধিক আয় হইতে পারে। এই বিজ্ঞাপন দর্শন করিয়া যে সকল ব্যক্তি অল্প রোজগার করেন ও হাতুড়ি বা তজ্জাতীয় হাতিয়ার লইয়া কার্য্য করেন তাঁহাদিগের মনে উচ্চতর ও অধিক অর্থকরী কার্য্য শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিবার কথা। এই চিত্রে হাতুড়ি ও নক্সা আঁকিবার যন্ত্রপাতির একত্র সমাবেশ অভিনব ও সুদৃশ্যভাবে সাধিত হইয়াছে। ইহা একাধারে পাঠকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করত তাঁহার মনে বিজ্ঞাপিত পন্থা অনুসরণ করিবার ইচ্ছা জাগাইবে দুই নম্বর চিত্র একটি ধাতু-নির্ম্মিত বেড়ার বিজ্ঞাপন। এই বেড়া নিজ গৃহের চতুর্দ্দিকে দিলে কি কি লাভের সম্ভাবনা তাহা অতি বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের সাহায্যে পাঠককে ক্রেতাতে পরিণত করিতে হইলে যে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার এই বিজ্ঞাপনদাতা সেগুলির প্রত্যেকটিতেই মন দিয়াছিলেন দেখা যায়। যথা, এ বিজ্ঞাপনে তিনি প্রথমত চিত্রে, হরফে ও বর্ডারে সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি দেখিলেই সকলের মনে হইবে "আহা এ বাড়ীটি যদি আমার হইত!" দ্বিতীয়ত তিনি বিজ্ঞাপিত দ্রব্যটিকে (বেড়া) চিত্রের মধ্যে এরূপ স্থান দিয়াছেন যাহাতে চিত্রের কোন সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই কিন্তু দ্রব্যটি চিত্রে বেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তৃতীয়ত বিজ্ঞাপিত বেড়া ক্রয় করিলে যে সকল লাভের সম্ভাবনা তাহা উত্তমরূপে এ বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে। চতুর্থত এই বেড়া কোথায় পাওয়া যায়, ইহা কত প্রকারের হয়, ইহার আসল নকল কি করিয়া চিনিতে হয় ইত্যাদি সকল কথা অতি অল্প কথায় বলা হইয়াছে। ফলে এ বিজ্ঞাপনে, আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনের প্রধান দোষ যে, হরফ ও চিত্রের ভিড় বা ঠাসাঠাসি ভাব, সে দোষ একেবারেই দৃষ্ট হয় না।

বিজ্ঞাপনের চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকের মনে চিত্রের মত কিছু একটা পাইবার, হইবার, না-হইবার, না-পাইবার প্রভৃতি মনোভাব জাগ্রত করা। ক্ষৌর-কার্য্য সুসমাধান করিবার কোন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে অনায়াসে একটি উৎফুল্ল মুখের চিত্র দেওয়া যাইতে পারে, অথবা একটি নানা স্থানে ক্ষুরাহত রক্তাক্ত মুখও দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমটি হইলে লোকের মনে হইবে "এই-রকম আরামে ক্ষৌর-কার্য্য করিতে পারিলে বেশ হয়।" দ্বিতীয়টিতে মনে হইবে, "বাবা, এ অবস্থার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য অমুক মার্কা অমুক জিনিস কেনাই ভাল।" চোরের হাত হইতে ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য বীমা করার উপকারিতা প্রদর্শক বিজ্ঞাপনের চিত্রে চোরের ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া পাঠকের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করা হইতেছে। উদ্দেশ্য, পাঠক অতঃপর ভয়ের তাড়নায় বীমা করিতে ছুটিবেন।

চিত্রকরের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য বিক্রেতা এক দোকানের বিজ্ঞাপন। চিত্রের "খামখেয়ালবাদী" বা "বোহেমিয়ান" মহিলাটির প্রতিকৃতির সাহায্যে দোকানের প্রতি চিত্রকর-জগতের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা হইতেছে

একটি স্বদেশী বিজ্ঞাপন। হরফে, চিত্রে ও বর্ডারে ভীষণ ধাক্কাধাক্কি ও অসামঞ্জস্যের একটি উত্তম উদাহরণ

বিজ্ঞাপন লিখন ও চিত্রণ

দোকানদার যখন দ্রব্য বিক্রয় করে, তখন সে ক্রেতা বুঝিয়া কথা বলে, জিনিস দেখায় ও অন্যান্য উপায়ে জিনিস বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন-দাতার কিন্তু পাঠক বিচার করিবার সুবিধা থাকে না। অবশ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, অল্প-মূল্য, বহু-মূল্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কাগজের পাঠকের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষা-দীক্ষা বুঝিয়া বিজ্ঞাপন বিভিন্ন প্রকারের করা হয়, কিন্তু তাহা হইলেও নানা প্রকার লোকে একই বিজ্ঞাপন দেখে এবং এইজন্য সকলের মনেই ক্রয়েচ্ছা জাগাইতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া বিজ্ঞাপন লেখক বা চিত্রকরকে কার্য্য করিতে হয়। বিজ্ঞাপন যে বিক্রেতার

久留米絣

久留米絣同業組合

একটি সুদৃশ্য জাপানী বিজ্ঞাপন

সহায় তাঁহার পক্ষে ক্রেতাকে "কাপড়খানা নাড়িয়া চাড়িয়া" "হারমোনিয়ামটা বাজাইয়া" "ঘীটা শুঁকিয়া" কিম্বা "মিষ্টান্ন চাকিয়া" দেখিয়া লইতে বলিবার উপায় নাই। এমন করিয়া তাহাকে বিজ্ঞাপন লিখিতে হইবে, যে, যেন বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াই লোকের মনে হয় যেন নাড়িয়া চাড়িয়া বাজাইয়া শুঁকিয়া এবং চাকিয়া দেখিলাম। এই কারণে বিজ্ঞাপন লেখক অথবা চিত্রকরের পক্ষে বিজ্ঞাপিত দ্রব্য সম্বন্ধে সকল বিষয় বিশেষ করিয়া অনুশীলন করা প্রয়োজন। দ্রব্যের প্রত্যেকটি গুণ ও ব্যবহার তাহার জানা প্রয়োজন। কাপড়-কাচা সাবান যেন গায়ে মাখিবার সাবান বলিয়া না প্রচারিত হয় অথবা যে-দ্রব্যের গুণ স্বল্পমূল্যে তাহার যেন শুধু উৎকৃষ্টতার দিক্ হইতেই প্রশংসা না করা হয়। ইহা ব্যতীত কোন দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে যাহা চোখে পড়ে তাহা যেন সাধারণের নিকট উপস্থিত করা না হয়। যথা, সাধারণে মোটরগাড়ী বিচার করিবে সৌন্দর্য্য, মূল্য, রাখিবার খরচ, প্রভৃতি দিয়া; বিশেষজ্ঞ হয় ত তাহার অংশ-বিশেষ দেখিয়াই মুগ্ধ হইবেন। এক্ষেত্রে সাধারণের বোধগম্য বিষয়ের উপরেই বিজ্ঞাপন লেখকের নির্ভর করা উচিত। অবশ্য মোটর সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞদিগের যদি কোন পত্রিকা থাকে তাহাতে কলকব্জার কথা বিজ্ঞাপিত হইতে পারে।

বিজ্ঞাপন-লেখকের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে,তাহার বিজ্ঞাপন-পাঠ করিয়া পাঠকের মনে কোন-প্রকার সন্দেহ বা বিরাগের সৃষ্টি হইলে চলিবে না। এই কারণে বিজ্ঞাপন লেখকের উচিত কোন অসম্ভব কথা না বলা অথবা পাঠককে ভাবে প্রকারেও বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধবাদে উত্তেজিত না করা। সন্দেহ, রাগ, রেষারেষি, প্রতিবাদ প্রভৃতি মনোভাবের কোন উপকরণ বিজ্ঞাপনে না থাকা প্রয়োজন।

ছাপার হরফ, ছাপার কালি, বিজ্ঞাপনে কতটা লেখা ও চিত্র থাকিবে ও কতটা খালি থাকিবে প্রভৃতি বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য আছে। সে-সকল বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

জাপানে কুষ্ঠ-রোগ সমস্যা—

জাপান-সরকারের অর্থ-সচিবের নিকট দুইটি সরকারী কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের খরচার মঞ্জুরী প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই অর্থে একটি সরকারী কুষ্ঠাশ্রম ও কুসাতাসুতে একটি কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইবে। গণনায় জানা গিয়াছে, জাপানে প্রায় ৩০ হাজার কুষ্ঠী আছে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, সেখানে কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা ৫০ হাজারেরও অধিক। জাপানের স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ইয়ামাদা বলিয়াছেন যে, কুসাতাসুতে কুষ্ঠ-চিকিৎসাশ্রম স্থাপিত হইলে জাপানের অশেষ কল্যাণ হইবে। কারণ দেশের কুষ্ঠীদিগকে সেখানে চালান করিলে আর রোগ-সংক্রমণের উপায় থাকিবে না।

মক্কায় মুস্‌লিম কংগ্রেস—

গত ৬ই জুন তারিখে মক্কায় মুসলমান জাতিবৃন্দের একটি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং আরও কতিপয় ভারতীয় মুসলমান এই সভায় ভারতীয় খিলাফৎ সমিতির প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি 'টাইম্‌স' পত্রে আফগান-প্রতিনিধি সর্দ্দার ইক্‌বাল আলি সা এই-সম্বন্ধীয় তিনটি অতিশয় জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত বিবরণের স্থূলমর্ম্ম আমরা দিতেছি।

আরব-দেশে তুরস্ক-প্রাধান্যের অবনতির সহিত সেরিফ হোসেন এবং তাহার পুত্র আলি ঐ দেশের গবর্ণমেণ্ট চালাইতে থাকেন। ঘটনা-পরম্পরায় তাঁহারা যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে পরাজিত হইবার পর সম্প্রতি উযাহাবি জাতি দ্বারা আরবদেশ অধিকৃত হইয়াছে। নেজ্‌দদেশের রাজা আবদুল আলি ইবন সাউদ এবং তৎপুত্র আমীর ফৈসল এখন মক্কাদি মুসলমান ধর্ম্মস্থানসমূহ তথা আরবদেশ শাসন করিতেছেন। হেজাজের এই রাজাই কিছুদিন যাবৎ পৃথিবীর মুসলমান দেশ এবং জাতিসমূহের একত্রীকরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সভার তারিখ তিনবার পরিবর্ত্তন করিবার পর গত ৬ই জুন ইহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই কংগ্রেসে সমগ্র মুসলমান জাতিসমূহের প্রতিনিধি উপস্থিত হন নাই, এবং তুরস্ক, পারস্য, ইরাক্, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশ এই সভায় যোগদান করে নাই। কিন্তু এইসকল দেশ যোগ না দিলেও অপর দিকে রুষ হইতে ৭টি হেজাজ হইতে ১২টি, জাভা ৫, ভারত ১২, নেজ ৫, আসীর ৩, প্যালেষ্টাইন ৩, সিরীয় ৩ এবং ইবন সাউদের মনোনীত সুদানের ২ এবং মিশরের তিনটি সভ্য এবং তৎসহ আফগান প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এই কংগ্রেসে নিম্ন-লিখিত প্রস্তাব-সমূহ গৃহীত হইয়াছে :—

১। এই সভার নাম পৃথিবীর মুসলমান মহাসভা হইবে এবং প্রতি বৎসর হজ তীর্থ সময়ে ইহার অধিবেশন মক্কায় বসিবে।

২। পবিত্র স্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ 'হারাম'গুলিকে ধ্বংস করিয়া তথায় বিস্তৃত জনপথ তৈয়ার করা হইবে।

৩। জেদ্দা এবং মক্কা পর্য্যন্ত রেল লাইন করা হউক এবং তাহা মদিনার হেজাজ রেলের সহিত সংযুক্ত করা হইবে এবং মদিনার বন্দর ইয়ানবো পর্য্যন্ত একটি শাখা লাইন করা হইবে। ইয়ানবোর দক্ষিণে রাবিগ বন্দরেরও অনেক উন্নতিকর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই কাজের জন্য যে টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা পৃথিবীময় ইস্‌লাম জাতিসমূহের মধ্য হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সঙ্কুলান করিতে হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

৪। অন্যান্য প্রস্তাবসমূহের মধ্যে হজ-যাত্রীগণের সুবিধার জন্য হাসপাতাল, বিশ্রামাগার প্রভৃতির জন্য ব্যবস্থা, বাৎসরিক সভার জন্য ৩ শত পাউণ্ড খরচ এবং প্রত্যেক প্রতিনিধির নিকট হইতে একটি বাৎসরিক চাঁদার কথা উল্লেখযোগ্য।

মৌলানা মহম্মদ আলী এই সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি খিলাফৎ-নেতা এবং প্রচণ্ড মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এবং ঘোরতর ইংরেজ-বিদ্বেষী হইলেও, আরবদেশের মুসলমান মহাসভায় যাইয়া মুসলমানের আদি এবং ধর্ম্মভাষা আরবীতে অনভিজ্ঞতার দরুণ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া সভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন-কি, কোনও প্রতিনিধি তাঁহাকে এই 'কাফের' ভাষা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু মৌলানা-সাহেব ইংরেজীতেই বক্তৃতা করেন। মৌলানা মহাশয় সভার ভাবগতিক দেখিয়া নিরুপায় হইয়া স্বীকার করেন যে, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান, সংখ্যায় অধিক হইলেও অসভ্য নেজ, আসীর প্রভৃতি সকল দেশবাসীর নিকট তাহারা হেয় এবং নীচ।

—

ভারতবর্ষ

পর্ত্তুগীজ ভারতবর্ষে বিদ্রোহ—

গত মাসে গোয়াতে একটি ছোটখাট সামরিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। সামরিক অধিনায়কগণ অস্থায়ী গবর্ণরের নিকট নূতন প্রবর্ত্তিত বেতন-আইন উঠাইয়া দিবার জন্য বলেন। সামরিক কর্ম্মচারীগণ লিস্‌বনেও নূতন আইন তুলিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইয়া দরখাস্ত দিয়াছিল। কিন্তু সেখান হইতে কোন খবর আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা অস্থায়ী গবর্ণর কম্যাণ্ডার মোরিয়েঁকে পদত্যাগ করিতে বলে। তিনি অস্বীকার করাতে বিদ্রোহীগণ তাঁহাকে আটক করে ও তাঁহার স্থানে কর্ণেল সিকোরিয়াকে গবর্ণর-পদে প্রতিষ্ঠিত করে। লিসবন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক নব নিয়োজিত গবর্ণরকে পদচ্যুত করিয়া কম্যাণ্ডার মোরিয়েঁকেই গবর্ণর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ও বিদ্রোহী সেনা-অধিনায়কগণকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে।

নেপালে ক্রীতদাস-প্রথা রহিত—

কাটামুণ্ড, এ্যাণ্টিস্লেভারি আফিস হইতে সম্প্রতি যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, নেপাল হইতে দাসত্বপ্রথার

শেষ চিহ্ন বিদূরিত হইল। মহামান্য মহারাজা চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুর রাণার মহান্ প্রচেষ্টার ফলে মোটের উপর ৫৭৮৮৩ জন ক্রীতদাস মুক্তি লাভ করিয়াছে। বহুকালের উদ্যম, পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগের পর মহারাজা এতদিনে তাঁহার রাজ্য হইতে এই কলঙ্ক অপনোদন করিতে সমর্থ হইলেন।

ভারতে পীত-জ্বর—

কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য পরিদর্শক ডাঃ মার্শাল ফিলিপ্ সম্প্রতি পানামা-অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া পীতজ্বর সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপ অচিরেই এই ভীষণ ব্যাধির কবলে পতিত হইতে পারে। তিনি বলেন, ষ্টেগোমিয়া ফসুসিয়েটা (Stegomyia Fasuciata) নামক এক প্রকার মশক এই সংঘাতিক রোগের বীজ বহন করে। ঐ প্রকার মশক সিলোন ও ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে দেখা দিয়াছে। আমরা আশা করি যে, ডাঃ ফিলিপের সতর্ক-বাণী ভারতীয় স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ভারতীয় বন্দরগুলিতেই এই রোগ প্রথমে হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং বন্দরের স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ এখন হইতেই সতর্ক হইবেন, আশা করা যায়।

হিন্দুরমণীর আদর্শ বীরত্ব—

পার্কার জিলার সম্ভর সহর হইতে ৩ জন হিন্দুরমণীর বীরত্ব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। রাত্রি ৩ টার সময় তাঁহাদের বাড়ীতে কয়েকজন চোর প্রবেশ করে। চোরেরা মূল্যবান্ জিনিসপত্র লইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় রমণীত্রয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রাচীর টপ্কাইয়া পলায়নকালে একটি চোরকে তাঁহারা ধরিয়া ফেলেন, অন্য একটি চোর তাহার সঙ্গীর উদ্ধারার্থ আসে, তখন রমণীত্রয় ও চোর দুইজনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয়। একজন চোরের নিকট ছোরা ও আর একজনের নিকট লাঠি ছিল। একজন চোর পলায়ন করে, কিন্তু রমণীগণ অপর চোরটির সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল মারামারি করিয়া তাহার হাত হইতে ছোরাটি কাড়িয়া লন এবং শেষে তাহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন। তৎপরে পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়।

—পল্লীবাসী

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—

গত ১৮ই আগষ্ট ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান গত তিন বৎসরে ভারতে যে-সকল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে, তাহার হতাহতের একটা বিস্তৃত বিবরণ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দাখিল করেন, আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

তারিখ	স্থান	হত	আহত
২৪-৮-২৩	গোন্ডা, ইউ, পি,	২৮	০
২৪-৮-২৩	সাহারাণপুর, ইউ, পি,	১০	২৯৬
২৬-২৮-৮-২৩	আগ্রা, ইউ, পি,	২	০
৬-৭-৯-২৩	সাহারাণপুর, ইউ, পি,	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
২১-৩-২৪	বাগেলকোট, বোম্বে	০	২০
১২-৪-২৪	খণ্ডলা, মুজাফরনগর, ইউ, পি,	০	২৩
১৫-৪-২৪	হরপুর, ইউ, পি,	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
১১-৭-২৪	বালিয়ামুরান দিল্লী ইদ্গা কোহিনী		
১৫-৭-২৪	সর্দ্দার বাজার দিল্লী	১৭	১৫০
১৯-৭-২৪	জুমা মসজিদ, দিল্লী,		
১-৭-২৪	লিলুয়া বামনগাছি (বঙ্গদেশ)	০	২৭
১১-৮-২৪	আমেথই, ইউ, পি,	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
১১-৮-২৪	সম্বল, ইউ, পি,	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
২৩-৮-২৪	ভাগলপুর, বিহার এবং উড়িষ্যা	১	০
৩০-৮-২৪	নাগপুর,	১	০
৯-১০-৯-২৪	কোহাট	৩৬	১৪৫
১২-৯-২৪	লক্ষ্ণৌ	১	৩০
২২-৯-২৪	সাহারণপুর, ইউ, পি,	৬	১০৪
৭-১০-২৪	এলাহাবাদ	৮	১১০
৭-১০-২৪	সাগর, সি, পি,	০	৩০
৭-১০-২৪	কাঁকিনাড়া, বাঙ্গালা	০	৭
৮-১০-২৪	জব্বলপুর, সি, পি,	০	৮১
২৫-১-২৫	থানা সিটী, লুধিয়ানা পঞ্জাব	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
১১-২-২৫	ফতেপুর, ইউ, পি,	০	৮
৯-৩-২৫	মণ্ডল ভিরগাঁও, বোম্বে	০	৩
১২-৩-২৫	বাগেলকোট বিজাপুর, বোম্বে	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
১৬-৩-২৫	সর্দ্দার বাজার, ঘাড়ি বাওরালি ও নয়াবান দিল্লী	১	২১
১৭-৩-২৫	ঐ	০	৩৬
২-৭-২৫	কিংজর্জ্জ ডক্ খিদিরপুর, বঙ্গদেশ	১	৪২
৪-৭-২৫	তালিকাকোট বীজাপুর, বোম্বে	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
২-৮-২৫	সোলাপুর, বোম্বে	০	২১
১৫-৮-২৫	মিরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সারণ বিহার উড়িষ্যা	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
ঐ	জামালপুর, ইউ, পি	ঐ	
২৩-৮-২৫	টিটাগর, ২৪ পরগণা বঙ্গদেশ	০	৯
৩০-৮-২৫	খামগাও, সি, পি,	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
২৮-৯-২৫	ভারিয়াক ইউ, পি,	০	৩৫
১৩-১০-২৫	আরভি ওয়ারধা, সি, পি,	০	৪০
২০-১০-২৫	উটাঙ্গী বেলারী	৩	২৭
২২-১০-২৫	আলিগড, ইউ, পি,	৬	১৩০
২৬-১০-২৫	অকোলা বেরার	০	৩২
২৮-১০-২৫	সোলাপুর, বোম্বে	২	২২
ফেব্রুয়ারী ২৬	আগ্রা, ইউ, পি,	১	০
৭-২-২৬	মাধিপাথারডিমহল আহমদনগর বোম্বে	০	৬
১১-২-২৬	কারাণ্ডি পাটনাগিরি, বোম্বে	১	২২
১২-১৩-২-২৬	রেওয়ারি, পাঞ্জাব	১	বহু আহত
২-১২-৪-২৬	কলিকাতা	৪৪	৫৮৪
১৪-১৬-৪-২৬	সাসারাম, সাহাবাদ, বিহার	২	২০
১২-৪-২৬ ৯-৫-২৬	কলিকাতা	৬৬	৩৯১
১৭-৫-২৬	খড়্গপুর বঙ্গদেশ	১১	৩২
১ ৬-২৬	হাজিনগর পেপার মিল, কলিকাতা	০	৪৩
২২-৬-২৬	ডমো, সি, পি,	০	৭
২২-৬-২৬	দ্বারভাঙ্গা গ্রাম	০	৫
২২-৬-২৬	ঝুঁসি, এলাহাবাদ	১	৯
২২-৬-২৬	মুকুন্দপুর থানা কাটরা মুজাফরপুর জিলা	০	৫
২৩-৬-২৬	সিংহাসন বেনিয়াপট্টি দ্বারভাঙ্গা	৪	০
২৩-৬-২৬	শঙ্করপুর, সুরসন্দ থানা সীতামারি মুজাফরপুর	হতাহতের সংখ্যা অজানা	
২৩-৬-২৬	বিহার মহকুমা		আহতের রিপোর্ট নাই
২৩-৬-২৬	গয়া		আহতের রিপোর্ট নাই

২৪-৬-২৬	সিহালি বরবাঁকি, ইউ, পি,	০	১০
২৪-৬-২৬	দিল্লী	৩	৬৩
২৪-৬-২৬	গোবিন্দপুর, থানা গয়া	হতাহতের রিপোর্ট নাই	
২৪-৬-২৬	কাটরা, মুজাফরপুর	০	২
১-৭-২৬	পাবনা	০	৯
৪-৭-২৬	পাবনা	০	১০
১৫-৭-২৬	করাচী	০	১১
১৫-৭ ২৬	কলিকাতা	১৩	১০৯
১৫-৭-২৬	কলিকাতা	২	০
১৯ ৭-২৬	কলিকাতা	০	৬
২০-৭-২৬	কলিকাতা	০	”
২১-৭-২৬	পুর্ণিয়া, বিহার	০	১
২২-৭-২৬	কলিকাতা	৩ জন হত, ১০ জন আহতের	

মধ্যে ২ জন মারা গিয়াছে, ৭টি ছোরা-মারার সংবাদ আসে, তন্মধ্যে ২ জন মরিয়াছে।

বিদেশে ভারতীয় পণ্য—

বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির এক সরকারী বিবরণও ১৯২৪—২৫ এবং ১৯২৫—২৬ সনের ট্রেড কমিশনারের রিপোর্ট্ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ভারতীয় পণ্য-সম্ভারের অধিকাংশই জার্ম্মাণীতে প্রেরিত হইয়াছে। ফরাসী এবং ইতালি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯২৪—২৫ সনে ১০৩,১০ লক্ষ, ইহার মধ্যে জার্ম্মাণী ২৮,০৯ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য গ্রহণ করিয়াছে, ইতালী ২৩,৩৪ লক্ষ এবং ফ্রান্স ২০৯১ লক্ষ। ইউরোপ মহাদেশে ভারতীয় রপ্তানির শতকরা ৮০ এবং ৯০ অংশ—পাট, তিল, তিসি ইত্যাদি তৈল বীজ এবং খাদ্য শস্যে পর্য্যবসিত। ইতালী ভারতীয় তুলার প্রধান রপ্তানিকারক, জার্ম্মাণী পাটের, চামড়ার এবং চাউলের, বেলজিয়াম গমের। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ভারতের পণ্য দ্রব্যের একজন উৎকৃষ্ট গ্রাহক—অতঃপর জাপান। চা এবং তামাকের বাজারেও ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

অখিল-ভারত সংস্কৃত মহাসম্মেলন—

গত মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অখিল-ভারত সংস্কৃত মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

ভারত শাসনের নমুনা—

১৯২৪ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যক প্রদেশে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি (ভারতীয় দণ্ড বিধি অনুযায়ী) দায়ের হইয়াছিল এবং যতগুলি মামলায় যাহা হইয়াছে, তাহারও বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

	মামলা	সাজা
মাদ্রাজ	৭৫৮৬৯	৩৯০৮৮
বোম্বে	৪৪৮৮১	২১৭৪০
বঙ্গদেশ	৮৩৪৫৮	৩৭৩২৪
{ আগ্রা	৬৭৯৭১	৩৪২০৫
{ অযোধ্যা	২২৭৬৪	৯৩২৩
পাঞ্জাব	৬৯৬০৪	৩১০৩৭
বিহার	৩৫২২৩	১৮৭১৭
বর্ম্মা	৫৫৩০৬	৩৭৯৯৫
মধ্যপ্রদেশ	২০০০৯	১১৬৫৯
আসাম	১৬৯২৮	৭৮৫৫
সীমান্ত প্রদেশ	৯২৩০	৪৬৪৪
	৫০০৫৪৩	২৫৩৬৪২

ভারতে শিক্ষার প্রসার—

সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের ১৯২৪-২৫ সনের ভারতের শিক্ষা-সম্পর্কিত বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৪৮২,০৬৫ জন ছাত্র সহ ৯১১৩টি বিদ্যালয় বাড়িয়াছে। ১৯২৫ সনে শতকরা ৬·০৫ জন পুরুষ এবং শতকরা ১·২৪ জন স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে মাদ্রাজ, বিহার উড়িষ্যা, বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে। দিল্লী ও বাঙ্গালোরেই সংখ্যানুপাতে সর্ব্বপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্র বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছে। তারপরই বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কুর্গ। বেলুচীস্থানে সর্ব্বাপেক্ষা কম। বাঙ্গলাদেশে প্রতি বৎসরই কলেজে অধিক সংখ্যক ছাত্র যোগদান করে এবং এই প্রদেশে উচ্চ বিদ্যালয়ও বৎসর বৎসরই অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

ভারতসরকার শিক্ষার জন্য ৯৯,৮০১৫৭৪ টাকা ব্যয় করিয়াছেন অর্থাৎ জন প্রতি চার আনা শিক্ষার জন্য খরচ করিয়াছেন। জেলা মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐ শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতে পারে নাই। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার ব্যয় শতকরা ৪৮·৯ হইতে ৪৭·৯তে নামিয়াছে কিন্তু বেতনের আয় শতকরা ২১·৮ হইতে ২২·৪তে উঠিয়াছে। ছাত্রপ্রতি সরকারী তহবিল হইতে বিভিন্ন প্রদেশে ৩্ টাকা হইতে ৪২ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শিক্ষা সম্পর্কে কোন নূতন আইন করা হয় নাই।

ভারতের বিলাতযাত্রী ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ১৯২৫ সনে ১৫০০ হইতে ২০০০ ছাত্র বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে পাঠ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫৮৩ জন ব্যারিষ্টারী পড়িতেছে।

আলোচ্য বর্ষে বালিকাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৬৩ হইতে বাড়িয়া ২৫,৯৩৫ দাঁড়াইয়াছে এবং ছাত্রী-সংখ্যা ৪৬,৯৩১ হইতে বাড়িয়া ৯৯৭,৬১৭তে দাঁড়াইয়াছে। বালিকাদের চেয়ে দশগুণ বেশী বালক এবারও বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে ১৭,০০৭ ছাত্রীসহ ৫০০টি বালিকা বিদ্যালয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিহার উড়িষ্যায় ৩০০ ছাত্রীসহ ৩০০টি বিদ্যালয় বাড়িয়াছে।

উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের বালিকাদের শিক্ষা ভালই হইতেছে। পরীক্ষায় বেশ সুফল দেখা যাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ১৮৬টি বালিকা উপাধি পরীক্ষা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ১৪২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে এক হাজার ছাত্র ২২টি ইংরেজী-শিক্ষিত শিক্ষক তৈয়ারী কলেজ আছে, নর্ম্মাল ও নিম্ন-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬ কমিয়াছে।

আর্ট্ কলেজে যে-সকল ছাত্র পাঠ করিতেছে আলোচ্য বর্ষে তাহাদের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এক হাজার বাড়িয়াছে। বাঙ্গলার মুসলমান সম্প্রদায় এখনও শিক্ষাবিষয়ে খুবই অনুন্নত; সেখানকার লোক-সংখ্যার অর্দ্ধেকেরও বেশীই মুসলমান।

বাংলা

বাঙালী বালিকাদের ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা—

গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট-গৃহে মহিলা-ব্যায়াম-সমিতির উদ্যোগে নানা বিদ্যালয়ের বালিকাদের একটি ব্যায়াম ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। নারী শিক্ষালয়, সঙ্গীত শিক্ষালয়, মাড়োয়ারী বালিকা-বিদ্যালয়, রাজরাজেশ্বরী বিদ্যালয়

প্রভৃতির ছাত্রীবৃন্দ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সরলা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে বাঙালী ও ও মাড়োয়ারী বালিকারা লাঠি ও অসি খেলার কৌশল প্রদর্শন করে। মাড়োয়ারী বালিকা-বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষয়িত্রী অসি-ক্রীড়ায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। 'একটি বাঙ্গালী বালিকা ও একটি মাড়োয়ারী বালিকা দুই হাতে অসি চালাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সবচেয়ে সুন্দর হইয়াছিল ছোরা চালনা। দুইজনে পরস্পরকে ছোরা লইয়া আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী মেয়েরা সকলেই এই খেলায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। দুইটি বাঙ্গালী বালিকা মুষ্টিযুদ্ধের কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙ্গালী মেয়েরা নানাপ্রকারের স্কিপিং বা দড়ি-খেলাতেও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।

আমাদের মেয়েরা দিন দিন দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে—অন্যদিকে আত্মরক্ষার অপটু মেয়েরা পথে-ঘাটে দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীতা হইতেছেন। সুতরাং এরূপ অনুষ্ঠান দেশে যত বেশী হয় ততই মঙ্গল।

বিবাহে অপূর্ব্ব যৌতুক—

গত ২৬শে শ্রাবণ বগুড়া লোন অফিসের সেক্রেটারী শ্রীযুত ক্ষীরোদনাথ খাঁর দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে অন্যান্য যৌতুক সামগ্রীর মধ্যে একখানা ছোরা প্রদত্ত হইয়াছে। বিবাহের বৈদিকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর, দাতা কন্যার হস্তে ছোরাখানা সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ঐ-ছোরা আজীবন ধারণ করিতে এবং আবশ্যক হইলে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন।

—শক্তি (বর্দ্ধমান)

দান—

শ্রীমতী হরিমতী দত্ত তাঁহার স্বর্গগত স্বামী পরাণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর বাণীভবন নির্ম্মাণ ফণ্ডে পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি এই-কার্য্যে আরও দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। শ্রীমতী হরিমতীর স্বামী-স্মৃতিতে নারী-শিক্ষায় এই দান দেশের নারী-শিক্ষার ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া রহিবে।

ভাওয়ালের রাণী আনন্দময়ী দেবী ঢাকা স্বারস্বত-সমাজে চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী-বিভাগ সমবায় সম্মিলনী—

গত মাসে রাণাঘাটে প্রেসিডেন্সি বিভাগ সমবায়-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র তাঁহার অভিভাষণে বঙ্গীয় কৃষি সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে সারবান কথা বলিয়াছিলেন।

গো রক্ষিণী সভা—

গতমাসে কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গোরক্ষিণী সভার অধিবেশনে হয়। সভায় গো-জাতির অবস্থার উন্নতি, গোহত্যা নিবারণ, গোচারণ-ভূমির ব্যবস্থা, গো-চিকিৎসালয়ে ফুকা দেওয়া প্রথা রহিত করিবার ব্যবস্থা এবং গোজাতির রক্ষার জন্য সরকার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদির নিকট অনুরোধ-সূচক প্রস্তাব-সমূহ গৃহীত হয়।

আনন্দমোহন বসু স্মৃতি বার্ষিকী—

১৯০৬ সালের ২৭শে আগষ্ট আনন্দমোহন বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুস্মৃতি উপলক্ষে গত সালে কলিকাতা এলবার্ট ইনষ্টিটিউট্ গৃহে এক সভার অধিবেশন হয়। ৺আনন্দমোহন ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম র‍্যাংলার। সুরেন্দ্রনাথের সহিত দেশের কার্য্যে আনন্দমোহন একই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। দেশে শিক্ষার বিস্তার, নারী জাতির উন্নতি, রাজনীতিক জ্ঞানের উদ্বোধন প্রভৃতি কার্য্যে বঙ্গদেশে আনন্দমোহন অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভা ও সিটি কলেজ এখনও অটল কীর্ত্তিমন্দিরের মত বিদ্যমান রহিয়াছে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে ৭ই আগষ্টের সেই চিরস্মরণীয় সভায় আনন্দমোহনের সেই বাণী বাঙ্গালীর প্রাণে চিরকাল মিলনের শক্তি সঞ্চার করিবে। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনেও তিনি জীবনের অনেকাংশ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্র-চরিত্র ও ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার লোকহিতকর কার্য্যের জন্য তিনি কিরূপ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতেন, তাহা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনী পাঠে জানা যায়। নব্য-বাঙ্গলার অগ্রণীদলের এইসব মহৎ ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ করিলে জাতির কল্যাণ হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৫-২৬ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ঢাকা বোর্ড্ ও কলিকাতা ইউনিভারসিটি হইতে যাঁহারা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের অধিকাংশই কার্য্যক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার বিষয়ে কাঁচা থাকেন। যাঁহারা ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্রে ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা প্রায়শঃই ঐসকল বিষয়ের মূলনীতিগুলি অবগত নহেন। ১৯২৫-২৬ সালে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদিগের ভিতর একশতটি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের ৬৮ জন মুসলমান, ৩২ জন হিন্দু। মিস্ ফৈজলউন্নিসা নাম্নী একটি মুসলমান বালিকাকে মাসিক ৩২৲ টাকা করিয়া পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

মেদিনীপুরে বন্যা—

শ্রাবণের প্রবল বারিবর্ষণের ফলে উপর্যুপরি বন্যা হইয়া মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, সবং, ডেবরা, পিংলা, নারায়ণগড়, খড়্গপুর, কাঁথি ও তমলুক এলেকায় ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক আশ্রয়হীন ও সম্বলহীন হইয়াছে। ধান্যক্ষেত্র-সমূহ জলে ডুবিয়া থাকায় এবৎসরের ফসল একবারে নষ্ট হইয়াছে। অনেক গৃহ পতিত ও ভগ্ন হইয়াছে। গবাদি পশু অনেক মরিয়াছে, আহারাভাবে অনেকে মরিতে বসিয়াছে। মনুষ্যের দুর্দ্দশার সীমা-পরিসীমা নাই।

এই দুর্দ্দিনে মেদিনীপুরবাসী সকল সহৃদয় দেশবাসীর করুণা ভিক্ষা করিতেছে। অর্থে, সামর্থ্যে সহানুভূতিতে যিনি যে-প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে পারেন, তাহাই করা উচিত।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে মেদিনীপুর সহরে একটি বন্যা সাহায্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলা-কংগ্রেস কমিটির ও কলিকাতা সাহায্য সমিতির পক্ষ হইতে সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কলিকাতায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ৯২নং আপার সার্কুলার রোডে সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। সেখানে চাঁদা দিলেই যথাস্থানে সাহায্য পৌঁছিবে।

এই প্রসঙ্গে সহযোগী খাদেম কয়েকটি সারবান কথা লিখিয়াছেন। প্রত্যেক মুসলমান যুবকেরই তাহা পাঠ-করা উচিত। খাদেম লিখিতেছেন :

"বাঙ্গলার যেখানে যত বন্যা, অকাল বা সংক্রামক ব্যাধি হইয়াছে, বাঙ্গলার মোসলমানদের সংখ্যাধিক্য হেতু তার অধিকাংশ স্থানেই বিপন্নের মধ্যে মোসলমানের সংখ্যাই বেশী হইলেও তাদের রিলিফ কাজটা হিন্দুরাই পনর আনা করিয়াছে। উত্তর বাঙ্গলার প্লাবনে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাদের শতকরা নব্বুই জন ছিল মোসলমান; কিন্তু তাদের সেবা যারা করিয়াছিল, তাদের শতকরা নব্বুই জন ছিল হিন্দু। ইহা সংখ্যা-গরিষ্ঠ বাঙ্গালী মোসলমানের পক্ষে নিতান্ত অগৌরবের কথা। বাঙ্গলার মোসলমান যুবকদের স্বসমাজের এই গ্লানি দূর করিতে হইবে। তাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, সেবা-ধর্ম্ম মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—ইহা শ্রেষ্ঠ বীরত্ব। যে জাতির মধ্যে এই সেবার ভাব যত বৃদ্ধি পাইবে, সেই জাতির মধ্যে তত বীর জন্মগ্রহণ করিবে। ফাঁকি দিয়া ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, চালাকী করিয়া বীর হওয়া যায় না। যে জাতির যুবকদল সেবা-ধর্ম্মকে জীবনের ব্রত করিয়া না লইবে, সে জাতি কদাচ বড় হইতে পারিবে না, —শতকরা আশিটা চাকুরী পাইলেও না।"

কুলীর মৃত্যু—

কিছুদিন হইল সবুট-বিলাতী পদাঘাতে ভারতীয় কুলীর পঞ্চত্বপ্রাপ্তির কাহিনী প্রতিনিয়তই শোনা যাইতেছে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে অদ্ভুত বিচার-প্রণালী লক্ষ্য করিয়া সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকা ভারত সরকারকে একটি সাহেব-রক্ষা-আইন প্রণয়ন করিতে উপদেশ দিয়া লিখিতেছেন—

"হঠাৎ প্লীহা ফাটিয়া কুলীর মৃত্যু অপেক্ষা হত্যাকারী শ্বেতাঙ্গের বিচার-প্রণালী ও তাহার পরিণাম অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নিত্য নিত্য এই বিচার-প্রহসনের অভিনয় করিয়া আমাদিগকে এই যন্ত্রণা দিবার আবশ্যক কি? ওর বদলে একটা আইন হোক্ যে, কোন শ্বেতাঙ্গ হঠাৎ রাগের-বশে বা খেলার ছলে কোন কৃষ্ণাঙ্গ কুলীকে হত্যা করিলে আদালতে বিচার করিবার দরকার হইবে না; কেননা বিজেতার অ-লিখিত আইন অনুসারে এরূপ ক্ষেত্রে সে কোন অপরাধ করে না। শ্বেতাঙ্গ যদি কৃষ্ণাঙ্গ কুলীর প্রাণের মূল্য স্বরূপ পুওর্-বক্স বা দরিদ্র ভাণ্ডারে ৫০ টাকা কি ১০০ টাকা দান করে, তাহা হইলেই তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে,—স্থল বিশেষে তাহারও প্রয়োজন হইবে না, বরং হত্যাকারী শ্বেতাঙ্গকেই অনর্থক হয়রান হইবার জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে হইবে, যাহাতে সে ইংলণ্ডের কোন নিভৃত পল্লীতে বা ওয়েলসের কোন পার্ব্বত্য উপত্যকায় সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারে।"

গৌরীপুর মিলের কুলী জগনারায়ণের হত্যা-সম্পর্কিত মামলায় মিলের সাহেব কর্ম্মচারী আসামী স্পেন্সের মুক্তিতে ও আসামের মাধবপুর চা-বাগানের কুলী দশরথের হত্যা-সম্পর্কে মিলের ম্যানেজার উইলসনের মাত্র দুইশত টাকা জরিমানা হওয়াতেই সহযোগী উক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। সহযোগী আত্মশক্তি কুলীর প্রাণের মূল্যের আর-একটি নিদর্শন দিয়া বলিয়াছেন যে,

"আবার সিমলাতে একজন শিখ গাড়োয়ানের হত্যাপরাধে কিংস ওন রেজিমেণ্টের প্রাইভেট টমাসএর বিচার সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ জুরীর সংখ্যাধিক্যে প্রাইভেট টমাস মুক্তি পাইয়াছে। টমাস নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার পিস্তলের গুলীর আঘাতেই কুলীর মৃত্যু হইয়াছে। সরকার পক্ষের উকীলও বলিয়াছেন, আসামী কুলী-হত্যার যেরূপ বিবরণ দিয়াছে তাহা সন্দেহজনক, স্বয়ং বিচারকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও জুরীগণ বর্ণভেদে ৪ ও ৩ সংখ্যায় ভাগ হইয়া জানাইয়াছে, সাহেব নির্দ্দোষ। বিচারক জুরীর নির্দ্দেশ মানিয়া টমাসকে মুক্তি দিয়া আদেশ করিয়াছেন, যাহাতে সে সদ্ভাবে থাকে তাহার জন্য টমাসের নিকট হইতে ৩০০ টাকার জামীন মুচলেকা লওয়া হউক।"

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

গত মাসে কুষ্টিয়ার এলাকাধীন কোদালিপাড়া গ্রামে ঐ গ্রামনিবাসী মৃত রজনীকান্ত মণ্ডলের পঞ্চদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী অহল্যাদাসীর সহিত ঐ গ্রামনিবাসী মৃত গগনচন্দ্র মণ্ডলের সপ্তবিংশতি বর্ষীয় পুত্র শ্রীমান হরেকৃষ্ণ মণ্ডলের শুভ বিবাহ হইয়াছে। উভয় পক্ষই দরিদ্র।

গত ৩০শে শ্রাবণ পাবনা রঘুনাথপুরে একটি বালবিধবার বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী কমলবাসিনী দাসী। পিতা ডাঃ হরিদাস দাস। জাতি মাহিষ্য। ১১ বছর বয়সে মেয়েটির বিবাহ হইয়াছিল। পাত্রের নাম শ্রীশিবনাথ দাস, নিবাস শিবরামপুর, পাবনা। বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র ও আচার অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সম্প্রতি পাবনায় আরও ১টি হিন্দু বালিকা-বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্থান হিমাইতপুর পাবনা। বর—শ্রীপ্রাণনাথ হালদার। বয়স ৩৫। জাতি মালো। বিপত্নীক। বাড়ী—মালঞ্চী, পাবনা। কন্যা শ্রীমতী চারুবালা দাসী। বয়স ১৫। ১০ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। ১৯শে শ্রাবণ এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে।

মৈমনসিংহের হিন্দু-হিতসাধিনী সভার উদ্যোগে গত ১৫ই আগষ্ট টাঙ্গাইলের অন্তর্গত আড়রা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন দত্তের সহিত কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত রায়পাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকিশোর সরকার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বিমলাসুন্দরীর হিন্দুমতে বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহ-সভায় এই নগরের প্রায় ৬০০।৭০০ শত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পুরুষ ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। বিগত ৩০শে শ্রাবণ ময়মনসিংহে হিন্দু-হিতসাধনী সভার উদ্যোগে গফরগাঁওর জমিদার শতদল বিহারী চাকলাদারের অর্থানুকূল্যে ময়মনসিংহ সহরে এক বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সহরের সমস্ত ভদ্রলোকই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন। মনে হয়, দেশের লোকের সহানুভূতি আছে। পাত্র পাত্রী উভয়েই কায়স্থ। পাত্রীর পিতার নাম হরকিশোর সরকার; নিবাস রায়পাশা গ্রামে। পাত্রের নাম মনোমোহন দত্ত; নিবাস টাঙ্গাইলের এলাকায় আড়রা গ্রামে।

ঢাকা জিলার বাঁশতলী গ্রামে ১৮ই আষাঢ় তারিখে ১৬ হইতে ২২ বৎসর বয়স্কা ৭টি বিধবার, তালতলী গ্রামে ২২শে আষাঢ় ১৪ হইতে ২২ বৎসর বয়স্কা ৫টি বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রমতেই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের সহিত শ্রীমতী সুভাষিণী নাম্নী হিন্দু বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যাটি প্রথম-বিবাহের এক মাস মধ্যেই বিধবা হন। এ বিবাহে ৩,০০০ হিন্দু সমবেত হইয়াছিলেন। কয়েক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩০শে শ্রাবণ হাওড়া, শিবপুরে মহাসমারোহের সহিত পাঁচুবালা দাসী নাম্নী একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বিধবা বালিকার সহিত চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মশাট্ নিবাসী শ্রীমান্ লক্ষণচন্দ্র সিংহরায়ের শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। পাত্রটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

বাংলায় নারী-নিগ্রহ—

প্রতিদিনই সংবাদপত্রে বাংলায় নারী-নিগ্রহের সংবাদ পাইতেছি। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নোয়াখালি, নদীয়া, বরিশাল, রাজসাহী, ঢাকা, হুগলী, পাবনা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে একাধিক নারী-নিগ্রহের সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। সে-সব দুর্ব্বৃত্তদের ভয়াবহ পাশবিক অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু

অধিকাংশ স্থলেই দুর্ব্বৃত্ত অপরাধীগণ উপযুক্ত শাস্তি পাইতেছে না—কাজেই তাহারা দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না। সম্প্রতি কেনিয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে নারী-নির্য্যাতনকারীদের কঠোর শাস্তির বিধান হইয়াছে। সহযোগী সঞ্জীবনী হইতে আমরা কেনিয়া ও বঙ্গদেশের দুইটি অপরাধের ও তাহার দণ্ডের সংবাদ দিলাম।

কেনিয়ায়—

কেনিয়ার একজন দেশীয় লোক একটি বৃদ্ধা শ্বেতাঙ্গ মহিলার উপর অত্যাচার করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। দীর্ঘ শুনানীর পর এই মামলা শেষ হইয়াছে। আসামী দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তাহার প্রতি ১৪ বৎসরের কারাদণ্ড এবং ২৪টি বেত্রাঘাতের আদেশ হইয়াছে। এই ঘটনার জন্যই কেনিয়া গবর্ণমেণ্ট্ নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছে।

বঙ্গদেশে---

(১) শ্রীহট্ট জেলার তাহিরপুর থানার অন্তর্গত লাউড়ের গড় গ্রামের লালজান বিবি নাম্নী জনৈকা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া মুসলমান বালিকা পিতার অসুখ জানিয়া তাহার সম্পর্কিত দশ বৎসর বয়স্ক এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত পিত্রালয় ঘাগটিয়া গ্রামে আসিতেছিল। পথে নাছিরউল্লা নামক এক দুর্ব্বৃত্ত লোক তাহার উপর অত্যাচার করে। শ্রীহট্টের জজ আদালতে জুরীর বিচারে আসামীর দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

(২) কিছুদিন পূর্ব্বে চাঁদপুর ষ্টেশনে পাটকলের একজন সাহেব একটি ভদ্রমহিলার সম্ভ্রম-নাশের চেষ্টা করিয়াছিল। চাঁদপুরের হাকিমের বিচারে উক্ত শ্বেতাঙ্গের মাত্র ৫০৲ টাকা জরিমানা ও মাত্র ১ মাসের জেল হইয়াছে। আর জরিমানা আদায় হইলে ভদ্র মহিলাকে ৩০৲ টাকা দেওয়া হইবে। বিচারক এই জরিমানার টাকা মহিলাকে দিবার আদেশ দিয়া নারীসম্ভ্রমের অপমানকে দ্বিগুণিত করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন।

—বরিশাল

এইরূপ লঘু-শাস্তির দরুন্ অপরাধীরা খুব প্রশ্রয় পাইতেছে। পুলিশও এইসব দুর্ব্বৃত্তদের ধরিবার যথোপযুক্ত চেষ্টা করিতেছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ আজ দুই মাসের উপর হইল চট্টগ্রামের যশোদাসুন্দরী নামে একটি নমশূদ্র নারীকে মুসলমানেরা জোর পূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। কিন্তু এখনও তাহার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হইল না। সহযোগী আনন্দবাজারের নিম্নলিখিত মন্তব্যের প্রতি আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতেছি।

"চট্টগ্রামে হতভাগিনী যশোদার আজও দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানদের কবল হইতে উদ্ধার সাধন হইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট জারী করিয়া বসিয়া আছেন, আর পুলিশ মামুলী তদন্ত করিয়াই খালাস। দুই তিন মাস কালের মধ্যে একজন অপহৃতা নারীকে প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ শাসকগণ মুষ্টিমেয় দুর্ব্বৃত্তের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেন না, একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে মোটেই গুরুতর মনে করিতেছেন না। অপহৃতা ইংরেজ রমণী ইলিসের উদ্ধারের জন্য ভারতের সমস্ত সৈন্যবল প্রয়োগ করিবার কল-কোলাহল যাঁহারা করিয়াছিলেন, দরিদ্রঘরের বধূ যশোদার উদ্ধারের জন্য তাঁহারা বাঙনিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করিতে পরাঙ্মুখ। বাঙ্গলার শাসন-বিভাগের ছোট বড় সকল কর্ত্তাকেই আমরা স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, হতভাগিনী যশোদার উদ্ধার সম্পর্কে তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য আছে কি না? পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজেরও এবিষয়ে কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটী ঘটিতেছে।

কলিকাতায় টেলিফোন-খরচা—

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স বঙ্গীয় টেলিফোন কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে টেলিফোন-খরচা সম্পর্কিত একখানি পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, লণ্ডনের প্রত্যেক টেলিফোন গ্রাহক গড়ে প্রত্যেক কলিকাতার গ্রাহক অপেক্ষা বৎসরে প্রায় ৫০৲ টাকা কম চার্জ্জ দেয়—যদিও সেখানকার টেলিফোন বিভাগ কলিকাতা অপেক্ষা অনেক কার্য্য-তৎপর এবং সাধারণের সুবিধার প্রতি যত্নবান। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স বলেন যে, কলিকাতার মেসেজ রেট (অর্থাৎ প্রতি ডাক অনুসারে চার্জ্জ)অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ; কাজেই ঐ নিয়ম বদলান দরকার। তাঁহাদের মতে প্রতি গ্রাহক মাসে ত্রিশটি "কল" পাইবার অধিকারী এবং টাকায় ১২টির পরিবর্ত্তে ১৬টি "কল" হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রাহক-দিগকে যে সামান্য রিবেট (বাটা) দেওয়া হয় তাঁহারা তাহাও বাড়াইবার পক্ষপাতী।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা—

গত জন্মাষ্টমীর মিছিল লইয়া কলিকাতার খিদিরপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, হিন্দুরা পুলিশ লাইসেন্সের নির্দ্দিষ্ট সময়ে শোভাযাত্রা লইয়া যাইতেছিল। মুসলমানেরা তাহাদিগকে বাধা দেয় ও অনেককে আহত করে। বরিশালের পটুয়াখালি ও ঢাকা হইতেও হিন্দু-মুসলমান গোলযোগের খবর আসিয়াছে।

মৃত্যু-দূত

সেল্‌মা লাগরলফ্

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-সম্ভাষণ

ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া সিস্‌টার্ ঈডিথ্ কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, "দেখ, তার সঙ্গে একটিবার দেখা না হ'লে আমি মরতে পারব না, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এ অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইবে না—তার স্ত্রীপুত্রের কথা ভেবেও আমায় একটু সময় দাও!"

ডেভিড্ হল্‌ম্ অবাক্ হইয়া জর্জ্জকে দেখিতে লাগিল।

অদ্ভুত লোক ত ! মুমূর্ষু মেয়েটাকে একটি কথা বলিলেই ত চুকিয়া যায় ! জর্জ্জ ত বলিয়া দিলেই পারে যে, ডেভিড্ হল্‌মের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হইয়াছে ; এই দুনিয়ার লীলা-খেলাতে তার এখন 'প্রবেশ নিষেধ' ; স্ত্রীপুত্রের অনিষ্ট করা ত দূরের কথা ! তা না, জর্জ্জ আসল কথাটা গোপন রাখিয়া মেয়েটাকে আরো যন্ত্রণা দিতেছে—একেই ত বেচারা দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

জর্জ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "সিস্টার্ ঈডিথ্, ডেভিড্ হল্‌মের উপর তোমার কি কোনো জোর খাটবে মনে কর ? সে অতি নির্ম্মম, হৃদয়হীন—সহজে তার মন গল্‌বে না। তুমি আজ শুয়ে শুয়ে যে-ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছ সেটা আসলে হয়ত সত্যি নয়। তার প্রতিহিংসা কতটা বীভৎস হ'তে পারে—তার মনের রাগ কাজে খাটাতে পার্‌লে সে কি কর্‌তে পারে তুমি তারই পরিচয় পেয়েছ।"

সিস্টার্ ঈডিথ্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "না, না, অমন কথা বোলো না—আমার ভারী কষ্ট হয়।"

মৃত্যুযানের চালক বলিল, "আমি তাকে তোমার চাইতেও ভাল ক'রে জানি। ডেভিড্ হল্‌ম্ কেমন ক'রে এতটা অধঃপতনে গেল তার ইতিহাসও আমি জানি। সে বরাবর এমনটি ছিল না।"

সিস্টার্ ঈডিথ্ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "সে-কথা শুন্‌তে আমার বড্ড ইচ্ছে কর্‌ছে—তুমি বল। হয়ত সমস্তটা শুনে আমি তাকে ভাল ক'রে চিন্‌তে পার্‌ব।"

জর্জ্জ বলিতে লাগিল, "অনেকদিন আগের কথা। ডেভিড্ তখন এসহরে আসেনি ; তখন প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে, জেলখানা থেকে একজন কয়েদী খালাস পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল ; জেলখানার দরজায় তার জন্যে কেউ অপেক্ষা ক'রে ছিল না। মূঢ়ের মত, সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে তখনো একটু ক্ষীণ আশা জাগ্‌ছিল—কেউ হয়ত আস্‌বে—তার এই দুঃখ-মুক্তির সময় অভিনন্দন কর্‌তে। ছাড়া পাওয়াতে যে-আনন্দ তার হচ্ছিল সে একলা যেন সেটা উপভোগ করতে পার্‌ছিল না ; এই সুখের সময় তার মন সঙ্গী খুঁজ্‌ছিল। মদ খেয়ে মাত্‌লামী করার জন্যে লোকটার কয়েদ হয়েছিল।

"লোকটার দুর্ভাগ্য—সে বাইরে এসেই একটা মর্ম্মান্তিক আঘাত পেলে ; সে খবর পেলে যে, তার কয়েদ-অবস্থায় তার ভাই অধঃপতনের ধাপে-ধাপে দ্রুত নাম্‌তে সুরু করে, শেষে একদিন মাতাল হ'য়ে একটা লোককে খুন করে ; সম্প্রতি সে জেলে আছে। জেলখানায় সে ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা জান্‌তে পারেনি ; জেলের ধর্ম্মযাজক প্রথম তাকে খবরটা দিয়ে তার ছোট ভাই যে কুঠরীতে আটক ছিল সেখানে নিয়ে গেল। সে তখন হাতকড়া-লাগানো অবস্থায় চুপটি ক'রে ব'সে আছে—জেলের কুঠরীর ভেতরেও তাকে হাতকড়া দিয়ে রাখ্‌তে হয়েছিল, কারণ সে শান্তভাবে জেলে থাক্‌তে চায়নি। ভাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে যাজকটি তাকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'ওকে চিন্‌তে পার্‌ছ কি ?' ভাইকে এই অবস্থায় দেখে কয়েদ-খালাস লোকটা মর্ম্মাহত হ'ল ; ভাইকে সে প্রাণ ভ'রে ভালবাস্‌ত। ধর্ম্মযাজক বল্‌লেন, 'এই লোকটাকে আরো বহুকাল জেলে থাক্‌তে হবে, কিন্তু ডেভিড্ হল্‌ম্, আমরা সবাই জানি যে, আসলে তোমারই এই শাস্তি হওয়া উচিত ছিল, কারণ তুমিই ওকে প্রলোভন দেখিয়ে বিপথে নিয়ে গেছ ; তুমি এমন ভাবে তার সর্ব্বনাশ করেছ যে, ভাল-মন্দ বোধ ওর একেবারে নষ্ট হয়েছে।'

"তার ভাই কয়েদঘরে ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত ডেভিড্ কোনোরকমে নিজেকে সাম্‌লে ছিল, কিন্তু ভাই যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগল, এমন কান্না সে বড় হ'য়ে কাঁদেনি। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে যে, বিপথে আর কখনো যাবে না। এর আগে সে কল্পনাও কর্‌তে পারেনি যে, তার পাপের ফলে তার পরম স্নেহের পাত্র ভাইকে এভাবে যন্ত্রণাগ্রস্ত হ'তে হ'বে। ভাইয়ের কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে স্ত্রীর কথা ও তার ছেলেদের কথা ডেভিডের মনে প'ড়ে গেল। তার মনে হ'ল যে, তাদেরও নিশ্চয়ই দুরবস্থার একশেষ হয়েছে ; সে দ্বিতীয় বার প্রতিজ্ঞা কর্‌লে যে, তার নিজের দুষ্ট ব্যবহারে আর কখনো সে স্ত্রীপুত্রকে কষ্ট দেবে না। সেই রাত্রিতেই সে তার স্ত্রীর কাছে শপথ কর্‌বে, সে সম্পূর্ণ নতুন ক'রে জীবন গ'ড়ে তুল্‌বে।'

"কিন্তু সে তার স্ত্রীকে জেলের দরজায় দেখ্‌তে পেলে

না, রাস্তাতেও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল না। বাড়ী গিয়ে সে যখন দরজায় ঘা দিলে তখনও তার স্ত্রী এসে তার অভ্যর্থনা কর্‌লে না—ডেভিড্ হতাশভাবে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—কই এমন ত কখনো হয়নি, সে যখনই বিদেশ গেছে স্ত্রী উৎকণ্ঠিত চিত্তে তার প্রতীক্ষা করেছে—আজ একি হ'ল! নানারকমের বিপদের ভয়ে তার বুক দুরদুর্ কর্‌তে লাগল। সে কি তবে আর নেই—না, তা কখনই হ'তে পারে না, সে যখন জীবনের ধারা বদ্‌লে ফেল্‌বার জন্যে মনস্থির করেছে তখনই কি এতটা যন্ত্রণা তাকে সহ্য কর্‌তে হবে?

"না, সে মিছে ভাবছে! সে জান্‌ত তার স্ত্রী কোথাও যাবার সময় পাপোষের নীচে চাবি রেখে যেত, সে হাত্‌ড়িয়ে ঠিক জায়গায় চাবি পেলে,—দরজা খুলে সে হতভম্ব হ'য়ে গেল—ভাব্‌লে, সে স্বপ্ন দেখ্‌ছে বুঝি! ঘরখানা প্রায় একেবারে খালি, সামান্য দু'চার খান মাত্র জিনিষ আছে—স্ত্রী বা ছেলেপুলেদের কোনো চিহ্ন নেই।

"তার মনে হ'ল যেন বহুদিন সে-ঘরে কেউ বাস করেনি, ঘরে আগুন জ্বালা হয়নি, খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই, জ্বালানি কাঠ—এমন-কি জান্‌লায় পরদা পর্য্যন্ত নেই, সে পাগলের মতন তার প্রতিবাসীদের কাছে খবর জান্‌তে গেল। সম্ভবতঃ তার অবর্ত্তমানে সে অসুখে পড়ে; তাকে বোধ হয় কেউ হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে। প্রতিবাসীরা বল্‌লে, তার স্ত্রীর ব্যারাম-স্যারাম কিছু হ'য়েছিল ব'লে ত তারা জানে না, সে ত ভালই ছিল। তবে সে গেল কোথায়?—তারা সে খবর জানে না।

"ডেভিড্ দেখ্‌লে, তার এই দুরবস্থা দেখে তার প্রতিবেশীরা বেশ একটু আমোদ পাচ্ছে—তার দিকে কটাক্ষ কর্‌তেও ছাড়্‌ছে না, তাদের ভাবটা—যাবে আবার কোন্ চুলোয়—সুবিধা পেয়ে মাগী ছেলেপুলে আর জিনিষ-পত্র নিয়ে ভেগেছে; স্বামী কয়েদখানা থেকে ফিরবে ব'লে তার ভারী মাথাব্যথা কি না! ডেভিডের চারদিকে সব কেমন খালি খালি বোধ হ'তে লাগল, যেন সে শূন্য মরুভূমির মধ্যে একলা প'ড়ে আছে। স্ত্রী কাছে ফিরে আসবে এই কল্পনায় তার মনে কি সুখটাই না হচ্ছিল—সে কি ব'লে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইবে তা পর্য্যন্ত মনে মনে তালিম দিয়ে এসেছিল। সত্যি সত্যি তার ভাল হবার ইচ্ছা হ'য়েছিল। তার এক প্রাণের দোস্ত্ ছিল—লোকটা ভদ্র বংশের হ'লেও একেবারে ব'য়ে গিয়েছিল। সে মনে মনে শপথ করেছিল তার সঙ্গে আর মিশ্‌বে না। অবিশ্যি সে যে শুধু তার বদ্‌স্বভাবের জন্যে তার কাছে যেত তা নয়—লোকটার পেটে বিদ্যেও ছিল অনেক। সে পরদিন থেকে তার পুরোনো মনিবের কাছে গিয়ে কাজ নেবে ব'লেও ঠিক করেছিল—তার ছেলেদের ও স্ত্রীর জন্যে সে ভূতের মত খাট্‌বে; এবার থেকে, বউ ছেলে যাতে ভাল কাপড়-চোপড় পর্‌তে পারে, ভাল খেতে পারে, তার ব্যবস্থা কর্‌বে—তাদিকে একটুকুও অভাবে ফেল্‌বে না। এমন সময় তার অকৃতজ্ঞ স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ ক'রে গেল।

"সে রাগে আর দুঃখে ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল; এক-একবার তার মনে ভারী রাগ হ'তে লাগ্‌ল; স্ত্রীর নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে সে গরগর কর্‌তে লাগল। হ্যাঁ, সে যদি ব'লে-ক'য়ে সক্কলের সাম্‌নে ব'লে যেত তার কিছু বল্‌বার ছিল না—সে ত যথেষ্ট সহ্য করেছে। তা না ক'রে সে চোরের মত পালিয়েছে—তাকে কোনো খবর না দিয়ে। শূন্য ঘরে তাকে এম্‌নি ক'রে ফিরে আস্‌তে হ'ল! একটু খবর দিয়ে গেলেই ত হ'ত; তাহ'লে জিনিষটা এত মর্ম্মান্তিক হ'ত না। এজন্যে সেই অকৃতজ্ঞ মেয়েটাকে ক্ষমা করা চলে না।

"তাকে তার সমস্ত প্রতিবেশীর সাম্‌নে অপদস্থ হ'তে হ'ল; লোকে তাকে দেখ্‌লেই মুচকি হেসে চ'লে যেত। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, এই হাসি সে বন্ধ কর্‌বে। তার স্ত্রীকে সে খুঁজে বের কর্‌বেই—তার পর তাকে ঠিক এম্‌নি ভাবে জব্দ কর্‌বে—না, এর চাইতেও ঢের বেশী জব্দ কর্‌বে, তাকে সম্‌ঝিয়ে দেবে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া কাকে বলে।

"সেই নিরানন্দ জীবনের এই হ'ল তার সান্ত্বনা—স্ত্রীকে একবার হাতে পেলে তার ওপর প্রতিহিংসা কেমন ভাবে নেবে তার মাথায় খালি এই কথাই জাগ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর পুরো তিন বছর ধ'রে সে স্ত্রীর খোঁজে পাগলের মত ঘুরেছে; তার মনে পাক খেতে খেতে এই প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছাটা একটা ব্যারামে দাঁড়িয়ে

গিয়েছিল। সে পথে পথে একলা ঘুরেছে—প্রতিদিন তার রাগ আর হিংসা বেড়েই চলেছিল। একবার যদি স্ত্রীর দেখা পায় তা হ'লে তাকে কি-ভাবে যন্ত্রণা দেবে তার নানারকম চমৎকার ফন্দীও সে বের ক'রে রেখেছিল।"

শীর্ণকায়া মুমূর্ষু ঈডিথ্ নিঃশব্দে মৃত্যুদূতের এই কাহিনী শুনিতেছিল—তাহার রক্তহীন মুখে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাব-বিপর্য্যয় হইতেছিল; সে আর থাকিতে পারিল না; বেদনাকাতরকণ্ঠে সেই ছায়ামূর্ত্তিকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—

"থাম থাম, আর বলোনা, আমি আর সইতে পারছি না—হায় হায়, আমি কি ভীষণ অন্যায় করেছি—এর জবাবদিহি করব কেমন ক'রে—ভেবে পাচ্ছি না। আমিই ওদের মিলন ক'রে দিলাম। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা না হ'লে ওর পাপ এত বেশী হ'ত না।"

মৃত্যুযানের চালক গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "থাক্, আর বেশী বল্‌বার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু এইটুকু বল্‌তে চাই—আর সময় চাওয়া বৃথা—তুমি এর কোনো প্রতিকার করতে পারবে না।"

ঈডিথ্ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"না না—আমি পারব, তুমি একটু সময় দাও। এমন ভাবে আমি মরতে পারব না—সামান্য কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে তোমায় অনুরোধ করছি। তুমি জান আমি তাকে ভালবাসি—এই মুহূর্ত্তে তাকে যত ভালবাস্‌ছি আর কখনো আমি এত ভালবাসিনি।"

ভূমিশায়িত ছায়ামূর্ত্তিটি চঞ্চল হইয়া উঠিল, যতক্ষণ তাহারা কথা বলিতেছিল সে নির্নিমেষ নেত্রে সিস্‌টার ঈডিথ্‌কে দেখিতেছিল। তাহার মুখের প্রত্যেকটি কথা সে যেন পান করিতেছিল—মুখের প্রত্যেকটি ভাব সে যেন মনে গাঁথিয়া লইতেছিল—যেন অজানা অনন্ত ভবিষ্যতের পথে ইহাই মাত্র তাহার সম্বল। ইডিথ্ যাহা বলিয়াছে, যতই কেন তাহার বিরুদ্ধে হউক—সে মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছে; ঈডিথের বেদনা, ঈডিথের সহানুভূতি তাহার জর্জ্জরিত হৃদয়ে প্রলেপের মত স্নিগ্ধতা আনিয়াছে। তাহার প্রতি তাহার মনে এক অজানিত ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল—ইহার কি নাম সে জানে না; সে শুধু এইটুকু মাত্র বুঝিল, ইহার হাতে সে সব কিছু সহ্য করিতে পারিবে। এইটুকু মাত্র সে জানিল যে, তার মত একজন হতভাগ্য কাপুরুষকে ভালবাসিতে স্বর্গের দেবতারা পারেন কিনা সন্দেহ।—অথচ যে তাহাকে মৃত্যুর কোলে টানিয়া আনিয়াছে তাহাকেই সে ভালবাসিয়াছে। যতবার ওই নারী তাহাকে ভালবাসে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ততবারই তাহার আত্মা এক অননুভূত আনন্দে শিহরিয়া উঠিয়াছে, ইহার কল্পনাও সে কখনো করিতে পারে নাই। ডেভিড্ জর্জ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনেক চেষ্টা পাইল, কিন্তু জর্জ্জ তাহার দিকে চাহিল না, উঠিতে চেষ্টা করিয়া সে অসহ্য যন্ত্রণায় পীড়িত হইল।

সে লক্ষ্য করিল সিস্‌টার ঈডিথ্ কি যেন দুর্ব্বিষহ বেদনায় শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। সে দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জর্জ্জের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতেছে, কিন্তু জর্জ্জের মুখ জড় পাষাণের মত ভাব-লেশশূন্য।

জর্জ্জ অবশেষে বলিল, "সময় দিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না,কিন্তু আমি জানি তুমি বৃথাই সময় চাইছ—তুমি কিছুই করতে পারবে না।"

এই বলিয়া মৃত্যুদূত জীবনের সমাপ্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিবার জন্য একটু আনত হইল—এই মন্ত্র দেহ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আত্মাকে আহ্বান করিবার মন্ত্র।

সেই মুহূর্ত্তে ডেভিডের অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি বহুকষ্টে মুমূর্ষু ঈডিথের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। সে প্রাণপণ শক্তিতে আপনার বন্ধনমোচন করিয়াছে—এই প্রচেষ্টায় যে অসহ্য বেদনা সে পাইয়াছে তাহা সে কখনো মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনায় আনিতে পারে নাই। ইহার জন্য অনন্ত কাল তাহাকে যন্ত্রণা পাইতে হইবে, তা হউক—কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য সিস্‌টার ঈডিথ্ ব্যাকুল; তাহার এই বেদনা ও প্রার্থনাকে সে বৃথা হইতে দিবে না। সে জর্জ্জের অলক্ষ্যে সিস্‌টার ঈডিথের শয্যার অপর পার্শ্বে গিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল।

যদিও সেই রক্তমাংসবিহীন ছায়া-হস্তের স্পর্শানুভূতি জাগাইবার ক্ষমতা ছিল না—তবু সিস্‌টার ঈডিথ্ তাহার উপস্থিতি অনুভব করিল; ব্যাকুল আগ্রহে সে মুখ ফিরাইল;

দেখিল তাহারই পাশে নতজানু হইয়া তাহার প্রেমাস্পদ—তাহার ওষ্ঠ মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছে। মুখ তুলিয়া চাহিবার সাহস ডেভিডের ছিল না, কিন্তু তাহার যে অদৃশ্য স্পর্শহীন হাতখানি তাহার হাতে আলিঙ্গনবদ্ধ ছিল—তাহার দ্বারাই তাহার প্রেম, তাহার কৃতজ্ঞতা এবং তাহার অন্তরের নিবিড় প্রীতি ব্যক্ত হইতেছিল।

রোগিনীর মুখ অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সে তাহার মা ও বন্ধুদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল; এতক্ষণ তাহাদিগের কাছে সে একটিও বিদায়ের কথা বলিবার অবসর পায় নাই; তাহার এই দৃষ্টি যেন তাহার এই অপূর্ব্ব ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আনন্দে মাতার ও সখীদের সহানুভূতি কামনা করিতেছিল। সে মাটির দিকে হস্ত নির্দ্দেশ করিল—তাঁহারা যেন তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তাহার আনন্দের ভাগ পাইতে পারেন, যেন তাঁহারা দেখিতে পান যে তাহার ডেভিড আসিয়াছে—সে তাহারই পদতলে অনুতপ্তচিত্তে বসিয়া।

সেই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণাবরণাচ্ছাদিত মৃত্যুদূত তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "স্নেহের বন্দী—কারাগার ত্যাগ করিয়া আইস।"

সিস্‌টার ঈডিথ শয্যায় এলাইয়া পড়িল—একটি গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

ডেভিড্ হল্‌ম্‌কেও যেন সেই মুহূর্ত্তে কে টানিয়া লইয়া গেল—যে অদৃশ্য অথচ ক্লেশকর বন্ধনে সে বদ্ধ ছিল তাহা আবার তাহার হাত দুখানিকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পা মুক্ত রহিল। জর্জ্জ ক্রোধজড়িত স্বরে বলিল, এই অবাধ্যতার জন্য তাহাকে অনন্তকাল কষ্ট ভোগ করিতে হইত, পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরে এবার সে তাহাকে মাপ করিল।

সে বলিল,"আমার সঙ্গে এখনই চ'লে এস—এখানকার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, আমরা যাকে নিতে এসেছিলাম সে এসেছে।"

জর্জ্জ প্রবল বলে ডেভিডকে টানিয়া লইয়া চলিল ডেভিডের মনে হইল, উজ্জ্বলকায় কাহারা যেন সেই ঘরে প্রবেশ করিল—যেন সিঁড়িতে তাহাদের দেখা গেল বাইরের পথেও যেন তাহারা ছিল, কিন্তু জর্জ্জ এমনই বেগে তাহাকে লইয়া যাইতেছিল যে, সে কিছুই ঠিকমত বুঝিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

ডাহুকী

শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

মালঞ্চে পুষ্পিতা লতা অবনতমুখী,—
নিদাঘের রৌদ্রতাপে একা সে ডাহুকী
বিজন-তরুর শাখে ডাকে ধীরে ধীরে
বনচ্ছায়া-অন্তরালে তরল তিমিরে!
—আকাশে মন্থর মেঘ, নিরালা দুপুর!
—নিস্তব্ধ পল্লীর পথে কুহকের সুর
বাজিয়া উঠিছে আজ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে!
—সে কোন্ পিপাসা কোন্ ব্যথা তার মনে!
হারায়েছে প্রিয়েরে কি?—অসীম আকাশে
ঘুরেছে অনন্ত কাল মরীচিকা-আশে?
বাঞ্ছিত দেয়নি দেখা নিমেষের তরে!—
কবে কোন্ রুক্ষ কাল-বৈশাখীর ঝড়ে
ভেঙে গেছে নীড়, গেছে নিরুদ্দেশে ভাসি'
—নিঝুম বনের তটে বিমনা উদাসী
গেয়ে যায়; সুপ্ত পল্লী-তটিনীর তীরে
ডাহুকীর প্রতিধ্বনি-ব্যথা যায় ফিরে!
—পল্লবে নিস্তব্ধ পিক,—নীরব পাপিয়া,
গাহে একা নিদ্রাহারা বিরহিনী হিয়া!
আকাশে গোধূলি এল,—দিক্ হ'ল ম্লান,
ফুরায় না তবু হায় হুতাশীর গান!
—স্তিমিত পল্লীর তটে কাঁদে বারবার,
কোন্ যেন সুনিভৃত রহস্যের দ্বার
উন্মুক্ত হ'ল না আর, কোন্ সে গোপন
নিল না হৃদয়ে তুলি' তার নিবেদন!

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে নারী-প্রচেষ্টা

হেলেন বুর্‌খার্ড্‌

সুইস্ নারী দেশের শিল্প ও সাহিত্যের সকল আন্দোলনেই পুরুষদের সহিত বরাবর সমভাবে যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সন্ন্যাসিনী এলিজাবেথ ষ্টাগেল (Stagel) উপাসিকাসঙ্ঘের (Convent) উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জুলি বন্দেলি (Julie Bondeli) নারী হইয়াও রুসোর (Rousseu) সহিত গভীর বন্ধুত্বসূত্রে যুক্ত ছিলেন। আমাদের যুগে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়াছে। মাদাম মারী হাইন (Hein) প্রথম শিশুচিকিৎসায় শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করেন এবং শীঘ্রই বহু নারী চিকিৎসক বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাগার (Clinic) ও হাঁসপাতাল সম্পূর্ণ নিজেরা পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সুইস প্রদেশে নারী-ব্যবহারজীবী (advocate) রীতিমত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মসঙ্ঘের কাজে প্রচারকদের সাহায্য করা ছাড়া বেদী হইতে স্বয়ং প্রচারও করিতেছেন। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যশিল্পেও অনেক নারীর খ্যাতি আছে। আর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ লেখিকার সংখ্যাও যথেষ্টই। Lisa Wenger, Maria Waser প্রভৃতির রচনা লোকে আগ্রহ-সহকারে পড়িয়া থাকেন।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপের এই প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশটিতে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের এখনও তেমন প্রসার হয় নাই; এবং দেশের নারীপ্রচেষ্টার ভিতর ভাবের উদ্দীপনার অভাব বোধ হওয়াতে প্রচেষ্টা তেমন ব্যাপক হইতে পারিতেছে না। মেয়েরা এ দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আর্থিকভাবে স্বাধীন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা ও শক্তি ভাবক্ষেত্র অপেক্ষা কর্ম্মক্ষেত্রেই অধিকতর আবদ্ধ, সুতরাং নানা উপজীবিকায় ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইলেও সংঘবদ্ধভাবে উদার রাজনৈতিক জীবন ও আদর্শবাদ গড়িতে পারিতেছেন না। তবে লোকহিতকর নানা অনুষ্ঠানে তাঁহাদের হৃদয়বৃত্তি বিকাশের অবকাশ পাইতেছে। জুরিকে মাদকতা

মাদাম লীসা ভেন্‌গার
(Lisa Wenger)

নিবারণকল্পে সুরাবর্জ্জিত ভোজনালয়ের প্রতিষ্ঠা নারীরা করিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ আমোদের আয়োজন শুধু সহরে নয়, গ্রামে-গ্রামে পর্য্যন্ত তাঁহারা করিয়া বেড়ান। প্রধানতঃ এইসব কাজেই ব্যাপৃত থাকায় রাজনৈতিক অধিকারলাভের দিকে তাঁহারা তেমন মন দিতে পারেন নাই।

আমাদের দেশে কতকগুলি বড় বড় নারীসংঘ আছে।

সুইস্ নারী সঙ্ঘ

সমাজ-মঙ্গল সমিতি, কুমারী-রক্ষা ও শিশুরক্ষা সমিতি, * শিক্ষয়িত্রী সভা, জাতীয় নারী-সঙ্ঘ প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। ক্রমশঃ পল্লীগৃহিণীদের ও কৃষক রমণীদেরও সমিতি গঠিত হইবার উদ্যোগ চলিতেছে। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক নারী-সঙ্ঘেরও শাখা-প্রশাখা এদেশে বিস্তৃত হইতেছে। এই সঙ্ঘ স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী (International Women's League for Peace and Liberty)।

মানসিক উৎকর্ষ ছাড়া শরীর ও স্বাস্থ্য গঠনের উৎসাহও আমাদের নারীদের মধ্যে প্রবল। পাহাড়ে চড়া, নানাবিধ ব্যায়াম চর্চ্চা, অত্যধিক শ্রান্তি না আনিয়া ছন্দোবদ্ধ ব্যায়ামের অনুশীলন এদেশের নারীদের বিশেষত্ব। গতবৎসর একটি নারী আকাশপোত ও প্যারাস্যুট পরিচালনের পরীক্ষা দিয়া সরকারী সম্মান লাভ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে নারীর ভবিষ্যৎ লইয়া অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। একদল চান, অবিলম্বে পূরা ভোটের অধিকার আর একদল চান, নারীর মানসিক উৎকর্ষ। দুইটিকে মিলাইতে পারিলেই সব সার্থক হয়। *Schweizer Frauenblatt* পত্রিকাটি জার্ম্মান্ সুইস্ প্রদেশের নারী প্রচেষ্টার সব খবর দেয়। *Movement Feministe* পত্রিকাটি ফ্রেঞ্চ সুইস্ প্রদেশের নারীদের; কুমারী Gourd ইহার সম্পাদিকা; ইনি একদিকে যেমন কাজের মানুষ অন্যদিকে তেমনি বাগ্মিতার

জ্যুরিকের একটি নারী-প্রতিষ্ঠান
(Pro Juventute)

জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া সুইস্ নারীদের বাৎসরিক পঞ্জিকায় সব প্রসিদ্ধ ও কৃতী নারীকর্ম্মীদের নাম ও কার্য্যাবলী পাওয়া যায়।

নারীরা নিজেদের হাতের কাজ একত্র করিয়া প্রা[illegible] প্রদর্শনী খোলে; তাহাতে প্রধানতঃ শিল্পাদিরই প্রাধান্য কিন্তু শুধু সুকুমার শিল্প লইয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। আমাদের যে-সব দুর্ভাগা ভগ্নী কলে মজুর খাটিতেছে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নৈতিক পবিত্রতা, আর্থিক উন্নতি

* জেনিভায় আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতির প্রধান কেন্দ্র; ১৯২০-১৯২৩ সালের মধ্যে এই সঙ্ঘ প্রায় ৫০০,০০০০ ফ্রাঁ চাঁদা ও দান বাবদ তুলিয়াছেন।

ডাঃ লুইস্‌ জুরলিন্‌ডেন্‌
(Dr. Luise Zurlinden)

সব দেখিতে হইবে, তবেই উপরের ও নীচের নারীসমাজ এক কল্যাণচেষ্টায় গ্রথিত হইবে, আর্থিক জাতিভেদ দূর হইবে। স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষা যাহাতে শেষ না হয়, তার ব্যবস্থাও করা হয়; সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে ছুটির সময় সভা মজলিস বৈঠক ইত্যাদির আয়োজন করিয়া সমাজসেবার উপযোগী নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়; অথচ এ শিক্ষা পুঁথিগত নয়; স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের ভিতর দিয়া এই মন ও চরিত্র গঠনের কাজ চলে। ঘরকন্নার কাজ স্বল্পব্যয়ে স্বল্পপরিশ্রমে সুন্দরভাবে করিবার নব নব পদ্ধতি বিখ্যাত নারীকর্ম্মীরা শিখান। জুরিকে একটি সমিতি দুঃস্থ পরিবার হইতে রুগ্ন শ্রান্ত মা ও তার ছেলেদের আনিয়া একটি ভাল জায়গায় তাদের বিশ্রাম ও আনন্দের আয়োজন মধ্যে মধ্যে করেন। জনসাধারণের মেয়েদের জন্য গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় করা হইয়াছে, পাহাড়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া তারা পড়াশোনা করে; মাহিনা পুরা দিবার ক্ষমতা না থাকিলে কোন কোন নারী-সমিতি সেটাও দিবার ব্যবস্থা করে; অথবা একটি সঙ্ঘ আর একটিকে কিছুদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করে। ছুটির সময় এইভাবে প্রায় সকলেই একটু শান্তি ও বিশ্রাম পায়। কোন নারী ও তার ভাবী স্বামী যদি আর্থিক কারণে বিবাহ করিতে না পারে তাহাদের সংসার পাতিয়া দিবার জন্যও সাহায্য করিতে নারীসঙ্ঘ আছে।

উপরে যতগুলি প্রতিষ্ঠানের কথা বলিলাম তার অধিকাংশই সহরের নারীদের গড়া; গ্রামের নারীরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। কৃষি-বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এইসব মেয়েরা নানা বিষয়ে শিক্ষা পাইতেছে; তবে এপর্য্যন্ত গ্রাম্য নারীসংঘ মাত্র একটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহা Moudon (Vaud) তে ছয় বছর আগে স্থাপিত হয়; ইহার প্রতিষ্ঠাতা একজন মহাপ্রাণা কৃষক-

নারী জবনের বার্দ্ধক্য—সেকাল ও একাল

মাদাম আমেলী মোজের
(Madam Amalie Moser)

রোজা নয়েনশোয়ানডার
(Rosa Neuenschwander)

রমণী। এই প্রতিষ্ঠানটি একদিকে বীজ খরিদ করা, ফসল বেচা, উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি কাজে যেমন ব্যাপৃত, তেমনি কৃষক রমণীদের মধ্যে শিক্ষা, উৎকর্ষ ও অর্থ বিজ্ঞানের প্রচারে ব্যস্ত। শুধু ডিম বিক্রয় করিবার কাজে নামিয়া ১৫০,০০০ সুইস্ ফ্রাঁ এই সমবায়টি কেনাবেচায় খাটাইয়াছে। এই সমবায়ের সভানেত্রী মাদাম রাঁদা (Randin) কে সরকারীভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে অন্য প্রদেশে বক্তৃতাদি দিয়া নারীদের জাগাইবার জন্য।

নৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও সুইস্ নারীসঙ্ঘ খুব উৎসাহের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। পারিবারিক জীবনে জাতিগত ও আন্তর্জাতিক জীবনে যত প্রকার দুর্নীতি দেখা দেয় তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিতেছে। এদেশে মহোৎসব (carnival) ইত্যাদির সময় স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনের ফলে অনেক অশোভনতা প্রকাশ পায়; তাহা দূর করিবার জন্য নারী-সঙ্ঘ সর্ব্বদা সজাগ। জেনিভার ২০,০০০ হাজার নারী সরকারী বিভাগের নিকট আবেদন করিয়া দুর্নীতিমূলক ছায়াচিত্র (Cinema) দেখান বন্ধ করেন; এবং ভ্রূণহত্যা, বেশ্যা-বৃত্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা ও সরকারী আবেদনের সাহায্যে নৈতিক উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতেও নারীই অগ্রণী; দুঃখদারিদ্র্যে সহানুভূতি ও সাহায্য না পাইলে মানুষ বিপথে যায় তাই নারী-সঙ্ঘ বিশুদ্ধ আনন্দের আয়োজন করিতেও ব্যস্ত! ভাল সঙ্গীত নাট্যাভিনয় ইত্যাদি দেখাইবার জন্য, একক আত্মীয়হীনা নারীদের একটু আনন্দ দিবার জন্য, বিনা-মূল্যে রঙ্গালয়ের টিকিট বিতরণ করা হয়। বার্দ্ধক্যের অবলম্বনস্বরূপ জীবনবীমার ব্যবস্থাও হইতেছে।

গণিকাবৃত্তি, মাদকতা আফিমব্যবসায় প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের জন্যও সুইস্ নারীসঙ্ঘ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁদের আন্দোলনের ফলে সুইস্ রাষ্ট্র-সংসদ্ (Federal Council) আফিমের বিরুদ্ধে জেনিভা কন্‌ভেন্‌শনের ব্যবস্থাটি স্বীকার করিয়াছেন।

শান্তি-স্থাপনের ক্ষেত্রেও নারীকর্ম্মীরা মহা উৎসাহে

কাজ করিতেছেন; ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ সালে সোসিয়া-লিষ্ট নারী-সমিতি ও আন্তর্জাতিক নারীসঙ্ঘ মিলিয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া যে বিরাট মিছিল বাহির করেন তাহা জনসাধারণকে চমৎকৃত করে। সুইস্ জাতীয়-নারীসঙ্ঘ যুদ্ধের আয়োজন, বৈজ্ঞানিক পৈশাচিকতা ও নব নব মারণ অস্ত্রাদির উদ্ভাবন-সম্বন্ধে খবর প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে সজাগ রাখিতে ও যুদ্ধবিমুখ করিতে চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণে এতটা পরিশ্রম ও ত্যাগ-স্বীকার করিলেও সুইস্ নারী এখনও পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। ভোটে নারীর অধিকার এখনও স্বীকৃত হয় নাই; সরকারী কমিশন, শিক্ষাবিভাগ বা ধর্মসংসদে নারীর নির্ব্বাচন খুবই কম জায়গায় দেখা যায়; এমন কি উদারপন্থী রাজনৈতিক দলও (Liberal party) নারীদের সভ্য মনোনীত করিতে ও তাহাদের সভা-সমিতির অধিবেশনে ডাকিতে নারাজ! কিন্তু সুইস নারী তাহাতে হতাশ হন নাই—তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে এই নৈতিক সংগ্রাম ও সমাজ সেবার মধ্য দিয়াই তাঁরা প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্রটি ক্রমশ জয় করিয়া লইবেন; সার্থকতা যত দূরেই থাক, এই মহান্ সংগ্রাম প্রতিমুহূর্ত্তে নারীসঙ্ঘকে সেই গৌরবের অধিকারের জন্য প্রস্তুত করিতেছে।

আমাদের এই সংগ্রামের ইতিহাস আশা করি আমাদের ভারতীয় ভগ্নীদের উন্নতি-সাধন-পথে কিঞ্চিৎ আলোক-পাত করিবে।

ক

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতালী-ভ্রমণ

দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতালী হইয়া আসিয়াছিলেন। ইতালীবাসীরা তখন তাঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেন; ফ্লোরেন্স,টিউরিন প্রভৃতি বহুনগরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি এইসকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই; ইতালীতে পদার্পণ করার অল্পদিনের মধ্যে চিকিৎ-সকের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে তাঁহার পুনরায় ইতালী যাওয়ার কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাহেতু তখনও তাঁহার যাওয়া ঘটে নাই।

ইতিমধ্যে ইতালীর বর্ত্তমান কর্ণধার বেনিটো মুসোলিনী রোমের অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকির হাতে বিশ্বভারতীকে বহুসংখ্যক মূল্যবান ইতালিয়ান্ গ্রন্থ উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন; কার্লো ফর্মিকি বিশ্বভারতীতে কিছুকাল অধ্যাপনা করিতে আসেন। কিছুদিন পরে মুসোলিনী ডাক্তার জিউসেপ্পে টুচ্চি নামক অন্য একজন পণ্ডিতকে বিশ্বভারতীকে একটি নিখিল জাগতিক শিক্ষা ও মিলন কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিবার সহায়তা করিবার জন্য পাঠান। ১৯২৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে দিবার জন্য বিশ্বভারতীর কর্ম্ম-সচিবদ্বয়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার ইতালী যাত্রার ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়ে ইতালিয়ান্ গবর্ণমেণ্ট ও যথেষ্ট সাহায্য করিবেন বলিয়া উক্ত কর্ম্মসচিবগণকে জানান। ইতালিয়ান্ জাহাজ নেপল্‌সের ক্যাপ্টেন ইতালিয়ান্ রাজসরকারের ভবিষৎ-অতিথি বিশ্বভারতীর দলকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন।

ইঁহারা যখন নেপল্‌সে পৌঁছিলেন তখন বেনিটো মুসোলিনী কবিকে ইতালী সরকারের তরফ হইতে অতিথি-

স্বরূপ রোমে অবস্থান করিবার জন্য যথার্থ নিমন্ত্রণ করেন; কবি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। নেপ্‌ল্‌স্ হইতে স্পেশাল ট্রেণে করিয়া কবিকে রোম লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে রোমের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ও অন্যান্য দেশের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন।

বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিবদ্বয় কবির সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহাদের প্রেরিত সংবাদে বুঝা যায় যে, ইতালিয়ান্ রাজ-সরকার কবিকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন ও যেভাবে তাঁহার আদর-অভ্যর্থনা করেন তাহা রাজারাজড়াদের ভাগ্যেই ঘটে। বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে কোনো ভারতবাসীকে কোনো দেশে এরূপ সম্মান দেখান হয় নাই। কবি যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন তখন ইতালীর রাজসরকারের অতিথিরূপে সেখানে যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। বিশ্বভারতী কর্ম্ম-সচিবগণের প্রেরিত সংবাদ হইতে এইটুকু জানা যায় যে, কবির মনোভাব পরিবর্ত্তন যে-কোন কারণেই ঘটুক না, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানকে ইতালীতে পরিচিত করিবার পক্ষে মুসোলিনী কর্ত্তৃক এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ভালই হইয়াছিল।

রোমে পদার্পণ করিবার পরদিন মুসোলিনীর সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। মুসোলিনী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইতালিয়ান্ ভাষায় অনূদিত আপনার সমস্ত বইগুলি পড়িয়াছেন বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন আমি তাঁহাদের একজন—আমিও আপনার একজন ভক্ত।" ডাঃ টুচ্চিকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণের জন্য ও বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগারে বহুমূল্য গ্রন্থমালা উপহার দেওয়ার জন্য কবি বিশ্বভারতীর তরফ হইতে মুসোলিনীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ভারতীয় ও ইতালীয় শিক্ষার্থীদের ও পণ্ডিতদের পরস্পর জ্ঞানের আদান-প্রদানের একটা ব্যবস্থা করিবার কথাও কবি সেদিন উল্লেখ করেন।

ইতালীর সংবাদ-পত্রসমূহও রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠে। প্রায় সকল কাগজেই বড় বড় হরফে বিশেষ বিশেষ স্থলে তাঁহার সম্বন্ধে সংবাদ বাহির হইতে থাকে। কবি নেপ্‌ল্‌সের ইল মেজ্জোজোর্ণো নামক কাগজের সংবাদদাতাকে বলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বহু বিষয়ে ইতালীই অনেকটা তাঁহার আদর্শানুযায়ী। ইতালীর গৌরবময় অতীত ও বর্ত্তমান তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। রোমের ত্রিবুনা নামক কাগজের সংবাদদাতাকেও তিনি এই ইতালী-প্রীতির কথা জ্ঞাপন করিয়া ভারতবর্ষ ও ইতালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন, "আমার বিশ্বাস এই দুই জাতি পরস্পরের সহিত প্রীতি-সূত্রে মিলিত হইবে ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। আমাদের জাতীয় উন্নতিতে তোমরা সাহায্য কর—ভারতবর্ষের আত্মার গভীরতার মধ্যে তোমরাও অনেক কিছু শিখিবার বিষয় পাইবে।" তিনি বলেন যে, তিনি ইতালীর এক মহান্ ভবিষ্যতের ছবি দেখিতে পাইতেছেন। 'ত্রিবুনা' ইতালী সম্বন্ধে কবির উদ্দেশ্য ও মতের প্রভূত প্রশংসা করিয়া বলেন, "মুখে মুখে ও লেখনীর সাহায্যে কবির বাণী এশিয়ার সুদূর প্রান্তর অবধি ছড়াইয়া পড়িবে। যে শুভ-কামনা এই বাণীতে আছে আমরা তাহার সমর্থন করি। আমাদের বিশ্বাস, কবির স্বপ্ন সফল হইবে।"

কবি ইতালীর জনসাধারণের নিকট ভারতবর্ষের প্রকৃতির অপূর্ব্ব বর্ণনা প্রদান করেন। এই চমৎকার বর্ণনা-ভঙ্গীতে সুদূর ভারতবর্ষ বিদেশী ইতালিয়ান্‌দের কাছে জীবন্ত হইয়া উঠে; তাহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলে। তিনি বলেন, "দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরের বুকে কালবৈশাখীর রুদ্রলীলা আপনারা দেখেন নাই। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সহসা একদিন কালবৈশাখীর নৃত্য সুরু হয়—দূরে দিক্‌চক্রবাল সীমান্ত পর্য্যন্ত অনন্ত নীলাকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, ঘূর্ণী হাওয়ায় ধূলিরাশি মাতামাতি করে··· প্রবল বর্ষণ সুরু হয়···আমাদের তরুণেরা সেই ঝড়ের মাতনে পথে বাহির হয়—বাতাসের সহিত তাহারা দৌড়ের পাল্লা দেয়। আমাদের প্রান্তর সীমাহীন—দিগন্তব্যাপী; উর্দ্ধে নীলাকাশ ও নিম্নে বিস্তীর্ণ প্রান্তর—তাহাতে সবুজের আভাস ক্বচিৎ দেখা যায়। বসন্ত সেখানে লঘু পদক্ষেপে ধীরে ধীরে আসে—পলাশের লালে প্রকৃতিদেবী রক্তিম হইয়া উঠেন।" রবীন্দ্রনাথের বাণী ও ব্যক্তিত্ব ইতালীয়ান্‌দের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া

যায়; তাহাদের একজন তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম—এক অসাধারণ মানুষ, তাঁহার রূপ ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে এমন একটা বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে, যাহাতে সহস্রের মধ্যেও তাঁহাকে চেনা যায়। তাঁহার হৃদয় উদার; তাঁহার উদার প্রাণ ও গভীর সৌন্দর্য্যানুরাগের প্রেরণায় নিখিল জগতকে ভালবাসিবার ও বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি পাইয়াছেন।" একজন সংবাদপত্রসেবী তাঁহাকে এ্যাসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও অভিমত ইতালীর সকলকে সমান আকর্ষণ করিয়াছিল বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার প্রতি ইতালীর এরূপ সম্মান প্রদর্শন একদল সমালোচক পছন্দ করেন নাই। কিন্তু এই বিরুদ্ধবাদীরা সংখ্যায় নগণ্য। এ্যালেক্স্যান্দ্রো ল্যুয়োপ্পেল্লি নামক একজন বৃদ্ধ ইতিহাসাধ্যাপক ও সেনেটার্ ইল্ মেসাজ্জেরো নামক কাগজে লিখিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতা কর্ম্ম ও গতি (প্রাণ) কেই বড় করিয়া দেখে সুতরাং প্রাচ্যের শান্তি-প্রিয়তা পাশ্চাত্যের গতিশীলতার সহিত খাপ খাওয়ানো কঠিন। ভারতের অন্যতম মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধীর ভবিষ্যৎবাণী সত্ত্বেও শুধু এই শান্তি-বাদের ফলে আজিও ভারতবর্ষ ইংরেজ-শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিল না।" যদিও এই উক্তির সত্যতা বিচারের বিষয় ও ঐতিহাসিক মহাশয়কে আমরা বলিতে পারি যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা পরাধীনতার সহিত কোনো জাতির জীবন-দর্শনের বিশেষ কোনো যোগ দেখান কঠিন, কারণ পোলাণ্ড, গ্রীস সার্ভিয়া, বুল্গেরিয়া পরাধীন এবং ইতালীও কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত পরাধীন ছিল অথচ তাহার প্রাচ্যেরা শান্তিবাদ মানে না, কিন্তু এই প্রতিবাদ করিয়া ফল নাই। ইঁহার কথায় আমরা এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের উল্লেখ করিতে গিয়াও কোনো কোনো বিদেশী আমাদের স্বাধীনতাহীনতার কথা ভুলিতে পারেন না।

ইতালিয়ান্ গবর্ণমেণ্ট রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গকে রোম ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহ পরিদর্শন করিবার ব্যবস্থা ও সুবিধা করিয়া দিয়া যথেষ্ট অতিথিপরায়ণতা দেখাইয়াছেন। এই ভ্রমণের সময় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লুল্লী নামক একটি যুবক ইঁহাদের সঙ্গী ছিলেন। কবি ক্যাপিটোলাইন্ হিল, ফোরাম, কোলোসিয়াম্, কারাকাল্লার স্নানাগার প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। রোমের জনসাধারণের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে সম্মান দেখান। রোম-নগরার পক্ষ হইতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্যাপিটোলে একটি বিরাট অভ্যর্থনা-সভা হয়। সেখানে ইতালার অনেক বিশিষ্ট ও গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ৮ই জুন তারিখে কবি ইউনিওনে ইণ্টেলেক্চুয়ালে ইতালিয়ান্ সংঘের ব্যবস্থায় আর্টের অর্থ বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কুইরীনাল্ থিয়েটারে এই বক্তৃতা দেওয়া হয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ এবং রোমের আভিজাত-বংশীয়গণ প্রায় সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখ-যোগ্য—দি অনারেবল্ মুসোলিনী, ইতালার প্রধান মন্ত্রী; দি অনারেবল্ সালান্দ্রা, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী; দি অনারেবল্ গ্র্যাণ্ডি; কাউণ্ট ডি আন্কোরা প্রভৃতি। রোম বিশ্ববিদ্যালয় পরে কবিকে অভ্যর্থনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর্ অধ্যাপক ডেল ভেক্কিও কবিকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আজ রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক পরম শুভদিন; বর্ত্তমান যুগের মনীষী-কুলের মধ্যে একজন পবিত্র, উদার ও যুগপ্রবর্ত্তক মহাপ্রাণ আজ এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন; হে রবীন্দ্রনাথ, তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছ এবং তোমার সোনার ভারতে আমাদের প্রেরিত সহাধ্যাপক টুচ্চিকে তোমরা যে সম্মান ও প্রীতি দেখাইয়াছ তাহার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

"তুমি রোমে অপরিচিত বিদেশী নও, কারণ, অন্তরে অন্তরে রোম তোমাকে চিনিয়াছে। রোম নিখিল-মানব-চিত্তের সন্ধান জানিয়াছে সুতরাং বিশ্বমানবের কোনো প্রতিনিধি তাহার কাছে অপরিচিত নহে। নিখিলের সুখে দুঃখে আন্দোলিত তোমার কবিতা কেবলমাত্র হৃদয়োচ্ছ্বাস নহে, তাহা আজ সমগ্র মানবের জীবন-দর্শন; তোমার এই বাণী আমাদের চিত্তকেও আন্দোলিত করিয়াছে; আমাদের হৃদয়েও সাড়া তুলিয়াছে···তোমার বাণী আসলে কর্ম্মবাদেরই দর্শন, তোমার কবিতা কর্ম্মবাদই প্রচার করিতেছে। তুমি যে-কর্ম্মকে বড় করিয়া দেখাইয়াছ তাহা জ্ঞান, ন্যায়পরতা ও সুসমঞ্জস প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত; আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি আমার মনে হয়, ইহাই তোমার বাণীর অন্তর্নিহিত সত্য এবং ইহা আমাদেরও অন্তর্গূঢ় আদর্শ।" রবীন্দ্রনাথ যথাযোগ্য ভাষায় এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দেন; সভায় উপস্থিত প্রত্যেকে ভারতবর্ষ ও ইতালীর মধ্যে এক অভিনব নিবিড় প্রীতির বন্ধন অনুভব করেন। এই ভাবে ভার্জিল, ডাণ্টে ও টাসো; লিওনার্ডো, মাইকেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফেলের দেশে (ভারতের ও ইতালীর যোগসূত্র গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিয়া) রবীন্দ্রনাথের প্রবাস-বাস সমাপ্ত হয়।

—

রবীন্দ্রনাথের ইতালী যাত্রার উদ্দেশ্য

গত বৎসর ইতালীতে অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ যে-প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন তাহা রক্ষার্থই তিনি এবার ইতালী গিয়াছিলেন। ইতালী রাজসরকারের এই আমন্ত্রণ হঠাৎ আসে নাই এবং পূর্ব্ব হইতে এবিষয়ে কোনওরূপ বন্দোবস্তও ছিল না; যথাবিধি ও যথাকালে এই নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। আমাদের ধারণা ছিল যে, বেনিটো মুসোলিনীর নেতৃত্বাধীনে ইতালীতে নিছক জাতিসর্ব্বস্ব শাসনতন্ত্র (narrow nationalism) প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই ইতালী রাজসরকারের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না, কারণ তাহাতে তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক সেবা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। তাঁহার বিশ্বমানবতা ক্ষুণ্ণ হইবে। আমাদের যতদূর মনে পড়ে যাত্রার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন যে, ইতালীর শাসনকর্ত্তাদের তরফ হইতে কোনো নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিবেন না। কেমন করিয়া বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিববৃন্দ তাঁহাকে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করেন আমরা তাহা অবগত নহি। সম্ভবতঃ তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, এরূপ করিলে বিশ্বভারতীর প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হইবে। আমাদের মনে তখন নানা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারিলেও রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রীচতুষ্টয়ের (অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি, জিওসেপ্পে টুচ্চি ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) বুদ্ধিশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আশ্বস্ত ছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম যে, ইতালীর মত এক প্রবল শক্তিশালী জাতির সহিত সখ্যতা-বন্ধন স্থাপিত হইলে বিশ্বভারতীর তথা ভারতবর্ষের অনেক সুবিধার সম্ভাবনা আছে। আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের কথা যতই পাঠ করিতে লাগিলাম; যতই দেখিলাম বিশ্বভারতীকে সর্ব্বত্র একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলা হইতেছে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শাখা-বিশ্বভারতী স্থাপিত করিবার জল্পনা হইতেছে, তখন আমাদের আশা বাড়িয়া গেল; কবির সহযাত্রীদের উপর প্রভূত বিশ্বাস স্থাপিত হইল।

রবীন্দ্রনাথ ইতালীতে বিপুল সম্মান ও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন, যদিও এখনও এদিক ওদিক দুইএকজন প্রজাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রবাদী, সাম্রাজ্যতন্ত্রপরায়ণ 'খুনে' মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি দিয়াছেন। পরাধীন জাতির একজন ব্যক্তি যে বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রতাপশালী উন্নতিশীল এক জাতির মনে এতটা প্রীতি জাগাইতে সক্ষম হইবে ইউরোপ তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছে। অল্পকয়দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ইতালীর হৃদয় জয় করিলেন। ইতালী দ্বিধা-শূন্য চিত্তে রবীন্দ্রনাথকে প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। ইহা হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যোগের নিদর্শন; বৃথা তোষামোদ নহে; কিম্বা প্রীতিরভাব দেখাইবার ভাণমাত্র নহে। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সহিত যুদ্ধকালে যে-জাতি লোকবল অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা ইতালীর সহায়তা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ, সেই জাতির সহিত মিথ্যা প্রীতির ভাব দেখাইয়া কোন লাভ নাই। এই সখ্য-বন্ধন এক অতি প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী, বহুদিন যাবত নিগৃহীত, পরাধীন ও পরশোষিত জাতির অপর এক পরপদানত দেশের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতালীকে বর্ত্তমান স্বাধীন অবস্থায় উপনীত হইতে যে অন্ধকার, রক্তস্রোত ও হানাহানির ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে তাহার বেদনা ও ব্যথা এখনও সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই বলিয়া অনুরূপ অবস্থা-সম্পন্ন ভারতের প্রতি ইতালীর এই প্রীতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তরুণ ভারতের বার্ত্তাবহরূপে ইতালী গিয়াছিলেন; ইতালীর তরুণদল তাঁহাকে সেইভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বমানবতার প্রচারকের সহিত এক জন ফ্যাসিষ্টের মিলন সম্ভব কি না আমরা তাহার বিচারে অক্ষম; কিন্তু আমরা এই মিলনের মধ্যে ইতালীর সহিত ভারতবর্ষের মিলনের ছবি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম।

—

রবীন্দ্রনাথের মত-পরিবর্ত্তন

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠিটি মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজকে লিখিত। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিষ্ট দল ও তাহাদের রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা নাকি কবিকে শুধু ইতালী-রাজতন্ত্রের ভালো দিক্‌টাই দেখাইয়া কবির উপর এক নীচ চাল চালিয়াছেন, ইত্যাদি। কবির সহযাত্রী বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিবদ্বয়ের প্রেরিত ভারতবর্ষ ও ইতালীর প্রীতিবন্ধন ইত্যাদির সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদের পর এই সমালোচনা পড়িয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি হইতে বুঝা যায় যে, ফ্যাসিষ্ট দল নানা উপায়ে কবিকে ধাপ্পা দিয়াছেন। ইতালীতে পদার্পণ করিবার পরমুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহারা তাঁহাকে এরূপ চর্কি ঘোরান ঘোরাইয়াছেন যে, তিনি ফ্যাসিষ্ট দলের দুর্নীতি ইত্যাদির কথা ভাবিবার বা দেখিবার অবসর মাত্র পান নাই। ফ্যাসিষ্ট কাগজে তাঁহারা রবীন্দ্র-নাথের অভিমতগুলিকে ফলাও করিয়া দেখাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সম্ভবতঃ ইতালীর বাহিরে গিয়া ভিন্নদেশীয় লোকদের মুখে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ

ফ্যাসিষ্ট্ আন্দোলন-সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ জানিয়াছেন ও ইতালীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদসমূহের অনুবাদ পড়িয়া তাহাদের মিথ্যা ভাষণের বহর দেখিয়াছেন।

কবি যে-ভাবেই ইতালী সম্বন্ধে সত্য খবর জানিতে পারিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার পক্ষে এইসকল সত্য পূর্ব্বে হইতেই অনুসন্ধান করিয়া ইতালী-ভ্রমণকালে তদ্দেশীয় গভর্ণমেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত। আমাদের দেশেরও ইহাতে মঙ্গল হইত এই কারণে যে, কবি পূর্ব্বে ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ও তৎপরে তাঁহাদিগের সমালোচনা করিয়া ইতালীয়দিগের মনে যে-অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করিয়াছেন তাহা ভারতের পক্ষে কোনপ্রকারেই লাভজনক হইতে পারে না। যে অতিথি ও যে আতিথ্য দান করে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারের যে-আদর্শ তাহাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহাও না হইলেই ভাল হইত।

কবি বর্ত্তমানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সকল খবরাবর লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়া সম্ভব নহে। কোন্ দেশের কোন্ রাষ্ট্রনেতা কিভাবে নিজ দেশের উন্নতি বা অবনতি সাধন করিতেছেন তাহারও হিসাব রাখা কবির পক্ষে সম্ভব নহে। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি ভুলক্রমে সঙ্কীর্ণচেতা কোন রাষ্ট্রনেতার আতিথ্য গ্রহণ করেন ও তাঁহার সম্বন্ধে সখ্য ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কোন মত প্রকাশ করেন তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না যে, কবি উক্ত রাষ্ট্রনেতার বিষয়ে সেই এক মতই চিরকাল পোষণ করিবেন বা করিতে বাধ্য। আমাদের দেশে কোন কোন বড় রাজকর্ম্মচারী বহুকাল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের "নিমক" খাইয়া ও উক্ত গভর্ণমেণ্টের সমর্থন করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগের বিষয়ে নূতন জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহাদিগের নিন্দা ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। তাহার জন্য আমরা এইসকল রাজকর্ম্মচারীর প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা করি নাই। কবি যদি বিদেশে কোন ধূর্ত্ত রাষ্ট্ররথীর চক্রান্তে পড়িয়া ভুল বুঝিয়া কোন কথা বলেন এবং পরে যদি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভিন্নমত প্রচার করেন, তাহাতে দোষের কিছুই নাই। কিন্তু যদি তিনি বা তাঁহার কর্ম্মসচিবগণ উন্মুক্তচক্ষু অবস্থায় সঙ্কীর্ণ স্বদেশবাদের চরম উদাহরণ ইতালীর প্রভু মুসোলীনির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ উন্নত ও উদার-বিশ্বপ্রেমবাদীর অনুপযুক্ত কার্য্য করেন ও দ্বিতীয়তঃ যে-কোন কারণ দেখাইয়া তীব্র সমালোচনায় সেই মুসোলিনীর আতিথেয়তার প্রতিদান করেন; তাহা হইলে অন্তত একথা বলিতে হয় যে, ব্যাপারটি সকল দিক্ হইতে দেখিলে আদর্শরূপে সম্পন্ন হয় নাই। দার্শনিক কবি সকল বাহ্যিক অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন; তাঁহাকে কাহারও আতিথেয়তা গ্রহণ করা বা না-করা বিষয়ে আধুনিক রাষ্ট্রজগতের সকল অবস্থা বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আশা করা আমাদের পক্ষে দুরাশা হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ কর্ম্মসচিবদ্বয়, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (যাঁহারা যুবক, বর্ত্তমান জগতের সকল অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ, ইয়োরোপ-আমেরিকার বহু মনীষীর সহিত পত্রালাপে তৎপর এবং সুচিন্তা ও সুব্যবস্থায় বিচক্ষণ, তাঁহারা) কি বলিয়া কবিকে ইতালীর স্বেচ্ছাচারী নেতা ও মানব-স্বাধীনতার আদর্শের বিরুদ্ধাচারী মুসোলিনীর গৃহে অতিথিরূপে লইয়া গেলেন? মুসোলিনীর কার্য্যকলাপ যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল হউক বা মন্দ হউক, একথা সত্য যে, মুসোলিনীর মতামত কবির মতামতের প্রায় সম্পূর্ণ উল্টা। কবিকে এই মুসোলিনীর অতিথি করিয়া লইয়া যাওয়া উপরোক্ত বুদ্ধিমান যুবকদ্বয়ের পক্ষে কখনও উচিত হয় নাই। মুসোলিনী শব্দের অর্থ কি, তাহা তাঁহারা জানিতেন (কবি না জানিলেও) এবং ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত সখ্য-স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা ইহাদিগের সেই মনোভাবেরই পরিচয় পাই, যে-পরিচয় আমরা তাঁহাদিগের বিশ্বভারতীর সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টার মধ্যে পাইয়াছিলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ যে-বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার শিক্ষানীতির আজন্ম সমালোচক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যখন বিশ্বভারতীর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হয় তখন আমরা সে-চেষ্টার মধ্যে compromise বা আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া লাভের চেষ্টার পরিচয় পাই। এই অল্প লাভের আশা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহান্ ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত নহে। কারণ যে-কবি, যে-মহা-পুরুষ স্থান, কাল ও পাত্রের সকল প্রলোভন, অত্যাচার প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া দীর্ঘ পঞ্চাশ বর্ষাধিককাল নিজের জীবনের আদর্শের গতি শ্রেয়ের পথে রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কদাপি ক্ষুদ্র সুবিধার চেষ্টায় আদর্শকে বলিদান দিতে পারেন না। যে অদূরদর্শিতার ও আদর্শনিষ্ঠার অভাবের পরিচয় আমরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়-ঘটিত ব্যাপারে প্রথম পাই, আজ কবির কর্ম্মসচিবদিগের ইতালীয় "এ্যাড্ভেন্চারে" আমরা তাহারই পরিচয় দ্বিতীয় দফায় পাইলাম।

দরিদ্র ভারত যদি কোনদিন জগতকে কোন সত্য বাণী শুনাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে-বাণী উত্থিত হইয়াছিল গভীর-অরণ্যবাসী নিঃসম্পদ রিক্তভূষণ ঋষির কণ্ঠ হইতে। তাহার পশ্চাতে ছিল নীরব নিরাড়ম্বর সাধনা। কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তাঁহার শান্তিনিকেতনে আমরা এই প্রাচীন যুগের কর্ম্মীদিগেরই

জীবন ও কার্য্যের ছায়া এখন অবধি দেখিয়াছি। ইহাই তাঁহার বিশ্বভারতীতে আরও গভীররূপে ব্যক্ত হইবে বলিয়াই আমাদিগের আশা। ভগবান কবিকে ও বিশ্বভারতীকে "ফরেন পলিসি", "ডিপ্লোম্যাসি" ও "হাই ফাইন্যান্সের" কবল হইতে রক্ষা করুন। তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে এসকল দিকে আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের স্থান "স্বরাজ-পার্টিতে", বিশ্বভারতীতে নহে।

—

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

বিদেশীর হাতে পাসমার্কা না পাইলে আমরা কোনো মনীষীকে সমাদর করি না—এই ধরণের একটা অপবাদ বাঙালীর আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া এই কথা যথার্থ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার প্রাপ্য সম্মান তিনি এখানে কিছুই পান নাই; প্রশংসা ত দূরের কথা। তাঁহার গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞান-জগতে যে-আলোড়ন জাগিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এমন-কি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো বিজ্ঞানাধ্যাপককেও আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, জগদীশচন্দ্র ভূয়ো (Bogus) জিনিষ লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন; বিজ্ঞানের বাস্তবতায় কবিতার আকাশ-কুসুম রচনা করিবার প্রয়াস করিতেছেন মাত্র। আইনষ্টাইন্-প্রমুখ মনীষীদের নিচক প্রশংসাবাদ অর্জ্জন করিয়া ফিরিবার পর এইসব বিরুদ্ধবাদীরা কি ব'লবেন জানি না—হয়ত একটু হাসিবেন মাত্র। যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে বসিয়া জগদীশচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে, গুণীর সমাদর থাকিলে সেটি এতদিন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইত। বে-তার টেলিগ্রাফের সম্ভাবনার কথা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই মনে উদিত হইয়াছিল, অথচ সহানুভূতি ও অর্থাভাবে যে তাঁহার সেই গবেষণা পরিণতি-প্রাপ্ত হইল না এই কলঙ্ক চিরদিন বাঙলা দেশকে পীড়া দিবে। অসম্ভব প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি যে বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছেন ইহা তাঁহারই অদম্য উৎসাহ ও প্রতিভা জ্ঞাপন করিতেছে; দেশ তাঁহাকে এতকাল প্রত্যাখ্যানই করিয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি ইউরোপের বিজ্ঞান-জগৎ এই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব্ব প্রতিভাকে নমস্কার নিবেদন করিয়াছেন। আশা হয়, ইহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীর চক্ষু ফুটিবে। ইউরোপের যে যে প্রদেশে তিনি গমন করিয়াছেন সেই সেই দেশেই তিনি প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। সেদিন জেনেভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভায় জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকুলের নিকট যে-প্রশংসা পাইয়াছেন তাহা পৃথিবীর খুব কম বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে, তাঁহার যুক্তির সারবত্তা ও তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের অপূর্ব্ব সূক্ষ্মতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন মুগ্ধ হইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছিলেন—জগদীশচন্দ্র যে-সকল অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়াছেন তাহার যে-কোনটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

অক্সফোর্ডে ব্রিটিশ এসোশিয়েশনে ৬ই আগষ্ট তারিখে জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডের খ্যাতনামা শরীরতত্ত্ববিদ্ ও প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দিগের সম্মুখে তাঁহার নূতন আবিষ্কারসমূহ যন্ত্র-সংযোগে প্রদর্শন করেন। তিনি সেখানে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আভ্যন্তরীণ কলকব্জা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, আহার গ্রহণ ও পরিপাক ইত্যাদির প্রণালী সম্পূর্ণ এক প্রকার। বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতবর্ষের ইহা এক অপূর্ব্ব দান। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী আচার্য্য জগদীশের অপূর্ব্ব গবেষণা শুনিয়া ও তাঁহার যন্ত্রের অসাধারণ সূক্ষ্মতা দেখিয়া তাঁহাকে প্রভূত প্রশংসা করেন ও বেতার সংযোগে এই প্রশংসা বার্ত্তা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, জগদীশচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য ভারতবর্ষ বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও কলিকাতার বসু-বিজ্ঞান-মন্দির জগতের বৈজ্ঞানিকগণের একটি তীর্থস্থলে পরিণত হইবে।

গত কয়েক মাস ধরিয়া আমরা প্রবাসীতে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের যে পত্রাবলী প্রকাশ করিতেছি, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় কি প্রতিকূল ঘটনার সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ২৫ বৎসর ধরিয়া অদম্য উৎসাহে এই বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি যে আজ জয়ী হইয়া বিশ্বের কাছে নিজের মনীষা প্রদর্শন ও ভারতের সম্মান রক্ষা করিলেন, ইহা পরপদানত বাঙালী জাতির একজনের পক্ষে সত্যই অঘটন সংঘটন। এই চিঠিগুলি হইতে আমরা দেখিতেছি, ভারতের শুভসাধনায় তিনি কি ভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; তাঁহার মনের গোপনকক্ষে পতিত ভারতের উন্নতির জন্য কি বিপুল ব্যগ্রতা; বৈজ্ঞানিক হইয়াও অন্তরে অন্তরে তিনি কত বড় কবি!

বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি স্বদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অভিযোগের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অতীত ভারতের মহান্ গৌরবের আদর্শ তিনি নিরন্তর সম্মুখে রাখিয়াছেন—ভারতবর্ষকে জগতের চক্ষে সম্মানার্হ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অহরহ ব্যস্ত। তাঁহার মত স্বদেশপ্রীতি আমরা কচিৎ

দেখিয়াছি। যে-কেহ বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে একবার পদার্পণ করিয়াছেন তিনিই লক্ষ্য করিয়া থাকবেন, স্বদেশের প্রতি তাহার কি নিবিড় টান; ভারতের সোনার ভবিষ্যতের কি মহান্ স্বপ্ন তিনি দেখিতেছেন!

আজ তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে। তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে করিয়াছেন—আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করা। দেশের মহৎ ও মনীষাশালী ব্যক্তিদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আমরা যেন দেশের অকল্যাণ না করি। এং অনাদর ও উপেক্ষা দেখাইতে গিয়া আমরাই বঞ্চিত হইব।

—

বিধবা বিবাহ

লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা নামক প্রতিষ্ঠান দ্বারা বহু দিন ধরিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহাদের শাখাগুলি সুন্দর কাজ করিতেছেন। বিবাহেচ্ছু বিধবাগণকে পুনর্বিবাহিত করার প্রয়োজনীয়তা আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা উপলব্ধি করিতেছেন। ইহা খুবই সুখের বিষয়। বিগত জানুয়ারী ১৯২৬ হইতে জুলাই ১৯২৬ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে মোট ১৭০৯টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। জাতি ও প্রদেশ হিসাবে তাহা এই :—

জাতি হিসাবে—

ব্রাহ্মণ ৩২৪; ক্ষত্রী ২২৬; অরোরা ২৪৬; আগরওয়াল ২৫৪; কায়স্থ ৪৯; রাজপুত ১৫৬; শিখ ১৮১; বিবিধ ২৭৩,—মোট ১৭০৯।

প্রদেশ হিসাবে—

পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১১৬৪; সিন্ধু-দেশ ৪০; দিল্লী ৫১; সম্মিলিত প্রদেশ ৩৫০; বঙ্গদেশ ৬৪; মান্দ্রাজ ৬; বোম্বাই ৫; মধ্য ভারত ৮; আসাম ৫; বিহার ও ওড়িষ্যা ১৬;—মোট ১৭০৯।

এই কার্য্যে গত জুলাই মাসে স্বেচ্ছাকৃত দান পাওয়া গিয়াছে ১১৬৲ টাকা, এবং গত বৎসরে পাওয়া গিয়াছে ৭০৩১৲ টাকা।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কুমিল্লা বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা গত দুই বৎসরে ৬৬টি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন।

—

বাল্য-বিবাহের কুফল

আমাদের দেশের লোকের আয়ু ক্রমে ক্রমে ভীষণ কমিয়া যাইতেছে! অবশ্য, দারিদ্র্য হেতু খাদ্যাভাব, অশান্তি ও অপরিমিত পরিশ্রম ইহার জন্য খুবই দায়ী। কিন্তু এই আয়ু-হ্রাসের অন্যান্য বিশেষ কারণও আছে। তন্মধ্যে বাল্য-বিবাহ একটি প্রধান কারণ। অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রথা বহুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিত আছে বলিয়া প্রাচীন-পন্থীরা বলেন যে, বাল্য-বিবাহ দোষের কারণ নহে। কিন্তু এ মত সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত ও অজ্ঞতার ফল। মানব-দেহ যতদিন নিজে সম্পূর্ণতা লাভ না করে ও যতদিন সকল পুষ্টি তাহার নিজ গঠন-কার্য্যেই ব্যয়িত হয়, ততদিন তাহার সাহায্যে অপর দেহ সৃজন-চেষ্টার ফলে জনক ও জাত উভয় দেহই দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন হয়। তের বৎসর বয়সে দুর্ব্বল অপুষ্ট বালিকা সন্তান লাভ করিলে তাহার স্বাস্থ্য ত ভগ্ন হইবেই, আর যে-সন্তান সে প্রসব করিবে সেও দুর্ব্বল হইবে। এইরূপ জননীর সন্তান দেশে অধিক জন্মগ্রহণ করিলে দেশে দুর্ব্বল-প্রাণ লোকের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। ইহাতে দেশের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-দৈন্যের দিনে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই বাল্য-বিবাহের প্রতিবাদ করা উচিত।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে এক মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া তাহার বালিকা স্ত্রী আত্মহত্যা করে! এই সংবাদ পাইয়া মহাত্মা গান্ধী যাহা লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই :—

"বাল্য-বিবাহ প্রথা নৈতিক ও দৈহিক উভয় দিক্ হইতেই পাপ। কারণ, ইহাতে আমাদের নৈতিক ও ও শারীরিক অবনতি ঘটে। এই প্রথা পালন করিলে আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে ও স্বরাজ-লাভ হইতে দূরে সরিয়া যাইব। বালিকার কোমল বয়স সম্বন্ধে যে-লোকের বিবেচনা নাই, ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহার ধারণা নাই। যে-লোক অপুষ্টদেহ, স্বাধীনতার সংগ্রাম করিবার শক্তি তাহার নাই, আর স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিবার শক্তিও তাহার নাই। স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অর্থে কেবল রাজনৈতিক জাগরণ বুঝায় না; তাহাতে সমাজ, শিক্ষা, নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সকল প্রকার জাগরণই বুঝায়।

"সম্মতির বয়স বর্দ্ধিত করিবার জন্য আইন-ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে অল্প লোকেরই শিক্ষা হইবে। কিন্তু আইনের দ্বারা সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত পাপ নিবারিত হইবে না;—সর্ব্ব সাধারণের মত ও বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে এ পাপ বিদূরিত হইবে না। বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে যদি প্রবল জনমত দেশে থাকিত তাহা হইলে মান্দ্রাজের ঐ ঘটনা ঘটিতে পারিত না। যে-যুবকের স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছে, সে অশিক্ষিত শ্রমিক

নয়, বুদ্ধিমান শিক্ষিত টাইপিষ্ট। বাল্য-বিবাহ যদি দেশের সাধারণের অনুমোদিত না হইত তাহা হইলে ঐ যুবক ঐ বালিকাকে বিবাহ বা স্পর্শ করিতে পারিত না। সাধারণত ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।"

দেশের শিক্ষিত সাধারণ মহাত্মা গান্ধীর কথাগুলি ভাবিয়া দেখুন।

—

নারীর স্বাস্থ্যোন্নতি

শুধু অল্পবয়স্কা মেয়েদের বিবাহ নিবারণ করিতে পারিলেই যে, মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে, তাহা নহে। শারীরিক উন্নতি লাভের জন্য ছেলেরা যেমন ব্যায়াম করে, আমাদের মেয়েদেরও সেইরূপ নানা-প্রকার ব্যায়ামে অভ্যস্ত করিতে হইবে। দেশে নারী-নির্য্যাতন ও নারী-ধর্ষণ ভীষণ মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতিকার—গ্রামে গ্রামে নারী-রক্ষা সমিতি গঠন ত বটেই; সেই সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের শরীর-চর্চ্চায় শিক্ষিত করা দরকার। মেয়েরা যদি শারীরিক বলে বলী হন তাহা হইলে দুর্ব্বৃত্ত লোকে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে সাহস করিবে না। নারী চিরকাল অসহায় অবলা থাকিবেন, আর প্রতি পদক্ষেপে পুরুষের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন—নারীর এই অবস্থা নারীর পক্ষেই অপমানকর; আর তাহা পুরুষদের পক্ষে অধিকতর অপমানকর এই হেতু, যে, আমাদের দেশে নারীকে শতেক বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী পুরুষ। নারীকে এই দুর্ব্বলতার অপমান হইতে পুরুষকেই রক্ষা করিতে হইবে। মেয়েদের বাল্য হইতে নিয়মিত ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগকে শীঘ্রই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ প্রচেষ্টা যে দেশে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত—কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে শ্রীমতী সরলা দেবীর নেতৃত্বে কলিকাতার অনেক বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকারা ব্যায়াম প্রতিযোগিতা করে। ইহা খুবই আনন্দের কারণ। এই অনুষ্ঠানের পরিচয় এই মাসের "দেশবিদেশের কথায়" সবিশেষ দেওয়া হইল। আমরা এইরূপ প্রচেষ্টার আন্তরিক সমর্থন করি।

—

স্যার পি, সি, রায় ও মেদিনীপুর বন্যা

উত্তর বাংলায় যখন ১৯২২ খ্রীঃ অব্দের শেষের দিকে ভীষণ বন্যা হয়, সে-সময় স্যার পি, সি, রায়ের উদ্যমে প্লাবিত স্থানের অধিবাসীদিগকে সাহায্য-দান-কার্য্য অভূত-পূর্ব্ব রূপে সম্পন্ন হয়। সে-সময় দেশবাসী যেরূপ উৎসাহের সহিত আর্ত্তসেবার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না। যত অর্থ সে-সময় চাঁদা-স্বরূপ উঠিয়াছিল তাহার এক দশমাংশও আজ পাওয়া যাইলে মেদিনীপুরের দুঃস্থ লোকেরা কতকটা বাঁচিয়া যাইত।

উত্তর বঙ্গ রিলিফ্ কমিটি অর্থাৎ স্যার পি, সি, রায় বহু লক্ষ টাকা চাঁদা স্বরূপ পাইয়াছিলেন, সে-অর্থের সমস্ত বন্যাদুঃস্থের সাহায্যার্থ ব্যয় করা হয় নাই। তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ (প্রায় তিন লক্ষ টাকা) খদ্দর প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। মেদিনীপুরের বন্যার সময় মনে হইতেছে যে, যদি স্যার পি, সি, রায়ের আদায়ীকৃত এই অর্থ যে-কারণ দেখাইয়া জনসাধারণের নিকট আদায় করা হয় সেই কারণে ব্যয়ার্থে, অর্থাৎ আর্ত্তসেবার জন্য, মজুত রাখা হইত তাহা হইলে আজ সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ-রক্ষা হইত। ন্যায়ত এ অর্থ এইসকল বন্যা-পীড়িতেরই প্রাপ্য; কিন্তু স্যার পি, সি, রায় খদ্দর প্রচাররূপ উচ্চ আদর্শের দোহাই দিয়া অর্থটি ব্যয় করিয়া বসিয়া আছেন, কাজেই সে-কথা তুলিয়া কোন ফল নাই। খদ্দরপ্রচার-আর্ত্তসেবা বা Flood Relief কি না তাহা লইয়া তাঁহার সহিত কাগজে-কলমে তর্কের জাল বুনিয়াও লাভ নাই, কারণ তাহার ফলে মেদিনীপুরের বন্যাদুঃস্থদিগের কোন লাভ হইবে না।

—

জনসেবা ও ভোট আদায়

মেদিনীপুরে বন্যা হওয়ার ফলে অনেক কাউন্সিল্-প্রবেশাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ এই ঘটনা অবলম্বনে নিজেদের প্রতি ভোট আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। একবার মেদিনীপুর অঞ্চলে ঘুরিয়া আসিয়া অথবা কয়েক মণ চাউল বিতরণ করিয়া বা করাইয়া অনেকে দেশবাসীর নিকটে বিরাট্ জনসেবকরূপে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এইপ্রকার মিথ্যা অভিনয় অত্যন্ত লজ্জাকর ও মনুষ্যত্বের অভাব-পরিচায়ক। দেশবাসীর উচিত এইসকল ব্যক্তি ও ব্যক্তিসংঘকে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখা।

—

স্যার হিউ স্টিফেন্‌সনের অভিভাষণ বিতরণ

২রা আগষ্ট ঢাকা দরবার-হলে স্যার হিউ ষ্টিফেনসন্ যে-অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহার একটি বাংলা অনুবাদ কলিকাতার রাস্তায় "হ্যাণ্ডবিল" রূপে বিতরিত হইয়াছে। আপনাদের-সাফাই-গাওয়া এই বিজ্ঞাপনটি বিলি করিয়া সরকার বাহাদুর সম্ভবত দেশবাসী সকলকে বৃটিশের আমরণ পূজারীরূপে পাইবেন বলিয়াই আশা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, অধুনা দেশবাসী যেরূপ বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে এপ্রকার

"হ্যাণ্ডবিল"-উদ্দীপ্ত রাজভক্তি তাঁহাদের মনে স্থান পাইবে না। "হ্যাণ্ডবিল"টি B. G. Pressএ ২১-৮-২৬ তারিখে মুদ্রিত। উহার "জব-নম্বর" 49V এবং উহা ৩১,০০০ হাজার ছাপা হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ দেখিয়া মনে হয়, ইহার জন্ম কয়েক শত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। করদাতার অর্থে এইপ্রকার "হ্যাণ্ডবিল" বিলি করার অধিকার গভর্ণমেন্টের আছে কি না তাহার আলোচনা না করিয়া আমরা "হ্যাণ্ডবিলের" দুই চারিটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহার এক স্থলে হিন্দুমুসলমান-দাঙ্গা সম্বন্ধে স্যার হিউ বলিতেছেন :—

"গভর্ণমেন্ট কোন গভীর দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক এই অশান্তিবহ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছেন, আপনারা কেহ এই অদ্ভুত ধারণা কখনও পোষণ করিতে পারেন,—এমন কথা বলিয়া আমি আপনাদিগকে অপমানিত করিব না। আমা অপেক্ষা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকাশ্য বক্তৃতায় এইসকল যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন।"

ধরা যাউক গভর্ণমেণ্টকে সন্দেহ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত নীচতার পরিচায়ক; কিন্তু এই সন্দেহের অনুকূল যুক্তিগুলি কোন্ "কর্ত্তৃপক্ষগণ" কবে ও কোন্ "প্রকাশ্য বক্তৃতায়" "খণ্ডন করিয়াছেন"? গভর্ণমেণ্টের কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে কি না ইহার বিচার করিয়া স্যার হিউ বলিতেছেন :—

"পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ যখন উভয় সম্প্রদায় হইতেই আসিয়াছে, তখন এই অভিযোগ পরস্পর খণ্ডিত হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লইলে অসঙ্গত হইবে না।"

এইরূপ অপরূপ যুক্তি ঢাকাবাসিগণ মানিয়া লইয়াছেন কি না আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু আমরা এরূপ যুক্তি কখনও শুনি নাই। যদি কোন সম্প্রদায়ের প্রতি গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্ব থাকে তাহা হইলে সেই সম্প্রদায়ের পক্ষে নিজেদের গোপন সহানুভূতি লাভের কথা অপ্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। কাজেই যদি মুসলমানগণ বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগের প্রতি অথবা কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নাই একথা প্রমাণ হয় না। এ সূত্রে একথাও বলা প্রয়োজন যে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ লোকেরাও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করিয়াছেন—যথা লর্ড অলিভিয়ার্। উপরের ন্যায় যুক্তি ছাপার অক্ষরে বাহির করা স্যার হিউএর ন্যায় পদস্থ লোকের পক্ষে উচিত হয় নাই।

আর-একটি কথা আমরা উদ্ধৃত করিতে চাই। স্যার হিউ বলিতেছেন যে, যতদিন উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া দাঙ্গার সমর্থন করিবেন ততদিন

"পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেও তাহাতে কাপুরুষোচিত গুপ্ত হত্যা বন্ধ হইবে না।"

উত্তম কথা; তাহা হইলে যেন দাঙ্গার দোহাই দিয়া পুলিশের খরচ বাড়ান না হয়।

—

চীনে-বৃটিশে লড়াই

নিজেদের দেশে নিজেরা প্রভুত্ব করিবে এই দুরাকাঙ্ক্ষার শাস্তি-স্বরূপ চীনের রাষ্ট্রবিপ্লবকারিগণ ক্রমশঃ বৃটিশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। কোন প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা এখনও করা হয় নাই কিন্তু যুদ্ধের কার্য্য কিছু কিছু চলিতেছে। জাপানীরা এখনও নির্লিপ্তভাব দেখাইতেছে কিন্তু তাহারা সম্ভবত চীনকে সায়েস্তা করিবার কার্য্যে বৃটিশের সহিত যোগ দিবে এইরূপ ধারণা অন্তত কোন কোন বৃটিশ সংবাদপত্রের হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে কিছু এখন বলিতে চাই না। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে আমাদের (ভারতবাসীদিগের) চীনের সহিত কোন শত্রুতা নাই। আমরা সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে চীনের সহিত ধর্ম্ম ও সাহিত্য ও শিল্পকলার ভিতর দিয়া সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ আছি। সুতরাং বৃটিশ-বণিকের অর্থাগমের সুবিধার জন্য যদি কোন যুদ্ধ বৃটিশগভর্ণমেণ্ট চীনের বিরুদ্ধে চালাইতে চান তাহা হইলে যেন ভারতীয় সৈন্য সে যুদ্ধে ব্যবহার করা না হয়। এ্যাসেম্বলীর পাণ্ডা যাহারা তাঁহারা যেন এদিকে নজর দেন।

—

ইহা কি স্বরাজপার্টির অবসানের পূর্ব্বাভাষ

ইণ্ডিপেনডেণ্ট কংগ্রেস পার্টি নাম দিয়া যে পার্টি লালা লাজপতরায়, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও অন্যান্য নেতৃবর্গ সম্প্রতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতিষ্ঠানের ফলে স্বরাজ-পার্টির জোর দেশে বহুল পরিমাণে কমিবে। এই শক্তি হ্রাসের জন্য যদি কেহ বিশেষরূপে দায়ী থাকেন ত সে বর্ত্তমান স্বরাজপার্টির নেতাগণই। বিগত কিছু-কালের মধ্যে কাউন্সিলের ভিতরে ও বাহিরে তাঁহাদের যে প্রকার কার্য্য-কলাপ দৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে দেশের বহু ভোটদাতা স্বরাজপার্টির উপর আস্থা হারাইয়াছেন। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেস পার্টিই যে দেশের প্রভূত কল্যাণ, পার্টির কার্য্যের ভিতর দিয়া করিতে পারিবেন এরূপ ধারণা আমাদের নাই, তবে তাঁহাদের দলের অনেক ব্যক্তিই ব্যক্তি হিসাবে স্বরাজপার্টির নেতাগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং এই কারণে সম্ভবত শীঘ্রই তাঁহারা স্বরাজ-

পার্টি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাধারণের সহানুভূতি পাইতে সক্ষম হইবেন।

—

নেতা কে ?

দেশের কাউন্সিল খেলা-ঘরে ছলে বলে কৌশলে অধিক ভোট আদায় করিয়া যিনি প্রবেশ লাভ করিবেন তিনিই কি তৎক্ষণাৎ দেশনেতা বলিয়া প্রমাণিত হইবেন? নিশ্চয়ই না। নেতার যে সকল গুণের আধার হওয়া প্রয়োজন সে সকল গুণ যতক্ষণ কোন নেতৃপদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি দেখাইতে না পারিবেন ততক্ষণ তিনি দেশবাসীর ভোট পাইলেও শ্রদ্ধা পাইবেন না। ভোট পার্টির চেষ্টায় নানা কৌশলে আদায় হয় এবং তাহা পার্টির নিকট দাসখত লিখিয়া যাঁহারা যাঁহারা আত্ম-বিক্রয় করেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হইয়া থাকে। কাজেই ভোট পাওয়ার ফলে কোন ব্যক্তির চরিত্রবল, কর্ম্মক্ষমতা, যথার্থ জনহিতেচ্ছা; বিদ্যা, বুদ্ধি, কিছুই প্রমাণ হয় না। ভোট আদায় কালে ব্যক্তি বিশেষ যে সকল বক্তৃতা ও প্রতিজ্ঞা করেন তাহার একটিও যে কার্য্যে পরিণত হইবে এরূপ আশা করার কোন কারণ সেই ব্যক্তির আজীবনের কার্য্যকলাপ না বিচার করিয়া করা যায় না। এই কারণে ভোট দেওয়াতে যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহাদের উচিত ব্যক্তিকে পার্টি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিচার করিয়া তবে ভোট দেওয়া।

—

মেদিনীপুরে বন্যা

মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথি সাব-ডিভিশন প্রবল বন্যায় জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। তমলুকে প্রায় ১০০ বর্গ মাইল ও কাঁথিতে প্রায় ২০০ বর্গ মাইল বন্যা-প্লাবিত হইয়াছে। এইসকল জল-প্লাবিত স্থানে প্রায় ৩০০০০০ লোকের বাস এবং প্লাবনের ফলে তাঁহাদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

বন্যার কারণ এখন পর্য্যন্ত যাহা জানা যায় তাহাতে মনে হয় প্রবল বৃষ্টি এবং উপযুক্ত জল নিষ্কাশণের পথের অভাব। তমলুক অঞ্চলে কসাই ও কালিঘাই নদী ও এতদুভয়ের সঙ্গম হল্‌দী নদীর মুখ চড়া ও পলি পড়িয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় জল বাহির হইবার উপযুক্ত পথ নাই এবং কাঁথি অঞ্চলে রসুলপুর নদীর অবস্থাও ঐ এক প্রকার। ফলে প্রবল বৃষ্টির জল বাহির হইবার পথ না পাইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেশ প্লাবিত করিয়াছে। আমগাছিয়ার নিকটে একস্থানে কালিঘাই নদীর প্রায় ১ মাইল পরিমাণ বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে এবং সে-স্থান দিয়া এখনও বন্যার জল প্রবেশ করিতেছে। শুধু চড়া ও পলি পড়া জল বাহির হওয়ার অন্তরায় হইলেও তবু হইত, কিন্তু এই অঞ্চলে দেশের এক দিক্ হইতে অপর দিক্ পর্য্যন্ত হিজ্‌লি টাইডাল কেন্যালের বাঁধ অবস্থিত আছে। এই বাঁধ থাকায় বন্যার জল সর্ব্বত্র জমিয়া রহিয়াছে, বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। তমলুক অঞ্চলে জল কিছু কমিয়াছে, কিন্তু কাঁথিতে সর্ব্বত্র এখনও জল পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে।

বন্যার কথা প্রচার হইবামাত্র গভর্ণমেণ্টের লোক ঐ অঞ্চলে গমন করে। এইবার গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে যেরূপ তৎপরতা দেখা গিয়াছে, সর্ব্বক্ষেত্রে সেইরূপ হইলে দেশের মঙ্গল হইবে মনে হয়। শ্রীযুক্ত রাইড, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও শ্রীযুক্ত রহমান, সাবডিভিসনাল অফিসার, উভয়েই অতি যোগ্যতার সহিত বন্যা-প্রপীড়িতের সাহায্য করিয়াছেন। বন্যা প্লাবিত স্থানে গভর্ণমেণ্ট দুইটি চাউলের ডিপো খুলিয়াছেন ও তাহাতে ৫০০০ মণ চাউল মজুত করিয়াছেন। বন্যা-প্লাবিত স্থান ১০টি সার্কলে ভাগ করা হইয়াছে ও তাহার প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া সার্কল্-অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি ৩ জন সুপারভাইজার রাখা হইয়াছে। অবশ্য সরকারী সাহায্য ফ্যামিন্ কোড্ অনুসারে দেওয়া হইতেছে ও তাহাতে অনেক দুস্থ লোকেও সাহায্য পাইতেছে না; কিন্তু ইহার উপায় নাই এবং সরকারী কর্ম্মচারীগণ ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন না। কোন স্থলে গভর্ণমেণ্ট অন্য কোন উপযুক্ত সংঘের কার্য্যেচ্ছা দেখিলে তাহার হস্তে কার্য্য ছাড়িয়া দিতেছেন ও তাহাকে কার্য্য সুসাধিত করিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে বন্যাপ্লাবিত স্থলে যে সকল সংঘ কার্য্য করিতেছেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামকৃষ্ণ মিশন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কাঁথি বার লাইব্রেরী, কাঁথি কংগ্রেস পার্টি, তমলুক সেবা-সংঘ, এবং মহিশাদলের রাজার প্রেরিত দল। ভারত-সেবা-সংঘ ও অন্যান্য দুই একটি সংঘও কার্য্য করিতে প্রথমত গিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে সে সকল সংঘ কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন। স্যার পি, সি, রায়ের তরফ হইতে কোন কার্য্য বর্ত্তমানে হইতেছে না। একজন সংবাদদাতার খবর যে, তিনি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রাউত মহাশয়কে ৮৫০৲ দিয়া বন্যা-প্লাবিত স্থানে পাঠাইয়াছিলেন ও রাউত মহাশয় ৩০ মণ চাউল বিতরণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান বন্যার অবস্থা যেরূপ তাহাতে মনে হয় না যে, সর্ব্বস্থলে দুই মাসের পূর্ব্বে জল শুকাইবে। জল না শুকাইলে কোন-প্রকার কাজ দিয়া প্লাবিত স্থলের বাসিন্দাদিগের রোজগারের উপায় করিয়া দিবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে প্রায় একলক্ষ লোকের বিভিন্ন-প্রকার সাহায্য প্রয়োজন। এইজন্য সপ্তাহে শুধু চাউলই লাগিবে প্রায় ৬০০০ মণ। বস্ত্রহীনের জন্য কাপড়

কাঁথি-অঞ্চলে বন্যার দৃশ্য

ঝাঁপুরে গরু বাছুর লইয়া লোকে উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় লইতেছে

চাউল বিতরণ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্বেচ্ছাসেবকগণ

উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ

বন্যায় সহস্র সহস্র কুটির জলমগ্ন হইয়াছে

একটি বন্যা প্লাবিত গ্রাম

সাহায্য-গ্রহণকারীদিগের নামধাম গ্রহণ

লাগিবে প্রায় ৫০,০০০ খানা এবং কিছুকাল পরে গৃহ মেরামত করিবার জন্যও প্রায় ১০,০০০ পরিবারকে সাহায্য করিতে হইবে। বন্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহামারীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহার জন্যও এখন হইতে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। চাউল ও কাপড়ের জন্য বর্ত্তমানে সপ্তাহে প্রায় ৫০,০০০ টাকা লাগিবে। ইহার কত অংশ গভর্ণমেণ্ট দিবেন ও কত অংশ জনসাধারণকে দিতে হইবে তাহা বলা কঠিন। তবে সাধারণের তরফ হইতে অন্তত ১৫।২০ হাজার টাকা সপ্তাহে খরচ না করিলে বহু বিপন্ন লোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। যে-সকল সংঘের দ্বারা এখন কার্য্য হইতেছে তাহাদিগের পক্ষ হইতে বর্ত্তমানে অন্তত সপ্তাহে ১৫।২০ হাজার টাকা তোলা দরকার। এইজন্য কতিপয় সুযোগ্য ব্যক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। দেশবাসীর যে বন্যা-প্লাবিত স্থানের দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য একথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। কলিকাতায় ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ৫৬ নং হ্যারিসন রোড ও সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এই দুই ঠিকানায় অর্থ ইত্যাদি পাঠাইলে তাহা প্রকাশ্য সংবাদপত্রে স্বীকৃত ও উপযুক্তরূপে বন্যা-পীড়িতের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে। যাহাতে সংগৃহীত সকল অর্থের জমাখরচ-সংক্রান্ত হিসাব পত্র নিয়মিত প্রকাশিত ও পরিক্ষীত হয় তাহার সুব্যবস্থাও উপরোক্ত ব্যক্তিগণ করিতেছেন।

৺মন্মথনাথ দে

অল্প কয়েক দিন হইল "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" সমাজ আর একটি উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছে। গত ২৯শে আগষ্ট পাটনার ইংরেজী বিহার হেরাল্ড ও পরে এক্‌স্‌প্রেসের সম্পাদক, বাঙ্গালার কবি ও ঔপন্যাসিক, মন্মথনাথ দে ৬১ বৎসর বয়সে ১৫ দিন জ্বর ভোগের পর হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহাদের বংশ অতি পুরাতন এবং সম্ভ্রান্ত। আদি নিবাস কর্ণপুর হইতে তাঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ চারি শত বৎসর হইল নবাবশাসিত সুতানটী গ্রামে উঠিয়া আসেন, এবং পরে অনেকে নবাব দরবারে ও ব্রিটিশ রাজত্বে উচ্চপদ লাভ করেন। এখন তাঁহাদের বাগবাজারের পৈত্রিক বাড়ী "দে-সরকার বাড়ী" নামে পরিচিত।

মন্মথবাবুর পিতা নবীনচন্দ্র দে ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির প্রথম বৎসরে নব-প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। পরে ১৮৬৫ সালে পাটনায় ল ক্লাস খোলা হইলে তথায় প্রথম ল-লেক্‌চারার হইয়া আসেন এবং ওকালতীতে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সরকারী উকীল এবং উকীল-সভার সভাপতি হন। পাটনা মুরাদপুরে তাঁহার বাড়ী "নবীন কুঠী" নামে পরিচিত। তিনি উহা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে ওখানে ডাকঘর ছিল (এখনও বাহিরের ঘরগুলিতে আছে।) এবং অমর কবি দীনবন্ধু মিত্র এই গৃহে পোষ্ট মাষ্টার-রূপে অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন এবং কোন কোন নাটকও লিখিয়াছিলেন। নবীনবাবুর Notes on Hindu Law অনেক সংস্করণ ছাপা হইয়াছে।

মন্মথনাথ দে

মন্মথবাবুর মাতামহ কালীকৃষ্ণ ঘোষ ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক কবি, বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দুইজনে "প্রভাকর" ও "দিনকর" নামক সাপ্তাহিক দুইটি চালাইতেন এবং তাহাতে দুই বন্ধুর মধ্যে কবির লড়াই বেশ চলিত।

এই কালীকৃষ্ণের পুত্র ৺অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ইংরেজীতে অতি স্থলেখক ছিলেন। পুরাতন কলিকাতা রিভিউএ তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া বিখ্যাত ষ্টেড সাহেব সুখ্যাতি করেন।

মন্মথবাবু (জন্ম ১৮ জানুয়ারি, ১৮৬৫) পাটনা স্কুল ও কলেজে খুব গৌরবে পড়াশুনা করিয়া ১৮৮৬ সালে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার সহ বি-এ উপাধিলাভ করেন। সে যুগে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণী লাভ করা সস্তা ছিল না। পরে উকীল হইয়া তিনি আদালতে প্রত্যহই যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পড়া ও লেখা এত ভালবাসিতেন যে তাঁহার অমনোযোগে পসার হইল না। বৈষ্ণব কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র তাঁহার কণ্ঠে সর্ব্বদা বিদ্যমান ছিল নিজেও কবিতা রচনা করিয়া "শৈবাল" ও "ভেরী" নামে দুইখানি পুস্তিকা এবং "চন্দ্রথা" নামে একখানি নির্ম্মল সুপাঠ্য উপন্যাস ছাপিয়াছিলেন। শৈবালটি অতি বিনম্র ভাষায় আমাদের কবিশ্রেষ্ঠকে উৎসর্গ করা হইয়াছে :—

"দিলাম চরণ তলে ভক্তি উপহার,—
অজানা আঁধার কোণে
ফুটিল যা' সঙ্গোপনে
শত কুসুমের সনে প্রভায় তোমার।

তা ছাড়া, নব্যভারত, প্রদীপ, প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি মাসিকে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। কাশ্মীর, খাইবর-গিরি-সঙ্কট, লক্ষ্ণৌ, জব্বলপুর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া তাহার বর্ণনা লেখেন।

বাঁকিপুরের বাঙ্গালী সাহিত্য-সভা (নাম, সুহৃদ্-পরিষৎ) এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ ইহার প্রাণস্বরূপ। মন্মথবাবু অনেককাল ধরিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন এবং এই সংস্রবে লিখিত তাঁহার "বিবাহ-বাজার" নামক নাটক মহা আদরে পূজার সময় অভিনীত হইয়াছিল।

বাঁকিপুরের হরিসভাকে যে কয়জন ভক্ত ও কর্ম্মী নবজীবন দান করিয়া নিজস্ব সুবৃহৎ অট্টালিকায় স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মন্মথবাবু অগ্রণী ছিলেন। প্রতি রবিবার এবং তিথি-পার্ব্বণে এখানে কীর্ত্তন হয়, তাহাতে তিনি মহা উৎসাহে যোগ দিতেন, বিধিব্যবস্থা করিতেন, কোষাধ্যক্ষরূপে টাকা সংগ্রহ ও রক্ষা করিতেন। ভক্ত মন্মথনাথ শেষ রোগশয্যায় পড়িয়া প্রতিদিবস কাছে কীর্ত্তন করাইতেন, এবং মনের শান্তিতে অমরধামে গমন করিয়াছেন।

১৯০১-১৯১০ পর্য্যন্ত বিহার প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুখপত্র বিহার হেরাল্ড কাগজ তিনি সম্পাদিত করেন। পরে ১৯১৫ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দৈনিক এক্সপ্রেসের যোগ্য এবং সর্ব্বত্র সম্মানিত সম্পাদক ছিলেন।

তাঁহার কি মিষ্ট স্বভাব, সরল, সরস কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার, জনসেবায় কত নীরব স্থির চেষ্টা, তাহা তাঁহার বহু বন্ধুগণই জানেন। ঐ সৌম্য সহাস মুখখানি, ঐ মিষ্ট কণ্ঠস্বর আমরণ তাঁহাদের হৃদয়ে অশ্রুবিজড়িত স্মৃতি-রূপে থাকিবে।

যঃ সঃ

—

আমেরিকা-জাপান যুদ্ধ

'লিটারারি ডাইজেষ্ট্'-পত্রিকা বলিতেছেন, জাপানে নাকি আমেরিকা-বিদ্বেষ খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কিন্তু জাপানের কাগজপত্রে ওরূপ রোগের কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। কোনও একটি বিশিষ্ট পত্রিকার মতামতকে জাতীয় মত্ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ, যে-পত্রিকা পড়িয়া আমেরিকান্‌রা ঐরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা জাপানের কোনো উল্লেখযোগ্য পত্রিকা নহে। আমাদের নিকট ঐ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয়। 'লিটারারি ডাইজেষ্ট্' বলিতেছেন,—

"জাপানের সংবাদপত্রসেবীগণ আমেরিকার সহিত যুদ্ধ চাহিতেছেন এবং সেই মত-লেখার সাহায্যে সাম্রাজ্যময় ছড়াইতেছেন। "আমেরিকা জাপানের চু'চক্ষের বিষ," কারণ "জগতের সমস্ত শ্বেত জাতির বিরুদ্ধে জাপানের যথেষ্ট অভিযোগ আছে, বিশেষ করিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে"; জাপানের একমাত্র মুক্তির উপায় হইতেছে রাজ্য-বিস্তার-নীতি, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র "তাহাতে বাধা দিতেছে"; "যুক্তরাষ্ট্র অপদেবতার মতন জাপানের ঘাড়ে চাপিয়া তাহার অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে সচেষ্ট, সুতরাং অবিলম্বে একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাওয়া দরকার, যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী"; এইসমস্ত মত্ জাপানী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে এবং তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করিতে অনুরুদ্ধ হইতেছে। একবার ওয়াশিংটন্-কন্‌ফারেন্সের ঠিক্ পূর্ব্বে এবং আরেকবার 'ইমিগ্রেসন্ ল'তে আমেরিকান্ সেনেট্ কর্ত্তৃক জাপানী-বহিষ্কার প্রস্তাবিত হওয়ার পরে জাপানে এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধের গুজব রটিয়াছিল। ট্রান্স-প্যাসিফিক্ পত্রিকা বলেন—'ওয়াশিংটন্ কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ব-নিযুক্ত বক্তারা জাপানের পথে-ঘাটে যে-সব সস্তা 'বাণী' শুনাইয়া বেড়াইতেন, এই প্রবন্ধগুলি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।' উক্ত কাগজের সম্পাদক বলিতেছেন,

"এই মনোভাবগুলা আসিতেছে জাপানের মর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে; ইহা যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতি বা তৎকৃত কোনও কর্ম্মের প্রতি অসন্তোষজনিত

নহে। ইহাদের একটি হেতু হইতেছে, জাপানী সমাজের পক্ষে আজ আধ্যাত্মিকতা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং আমেরিকা-জাপানের যুদ্ধ সেই আধ্যাত্মিক হজমী-গুলির কাজ করিবে; আর-একটি হেতু হইতেছে জাপানের একটা শক্তিমান নৌ-বল গঠনের আকাঙ্ক্ষা।

যাহা হউক্, লেখক বলিতেছেন, "আগুনের সঙ্গে খেলা করার কথাটাই আমাদের মনে পড়ে।" শ্রীযুক্ত আকিয়ামার উত্তেজনালক যুদ্ধ-আহ্বানের কথার সঙ্গে তাঁহার মূল জাপানী কথাগুলি এবং জনৈক আমেরিকান্ সংবাদদাতার নিকট তিনি যে জবাবদিহি করিয়াছিলেন তাহা দেওয়া হয় নাই। জিরোকাওয়াশিমা নাকি আর-একজন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধমন্ত্রের প্রচারক। তাঁহার প্রবন্ধ-সমূহ 'নাইকোয়ান্' (অন্তর্দৃষ্টি) নামক একটি জাপানী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি নাকি তাঁর লেখায় জোরালো উত্তেজক ভাষায় আমেরিকাকে আক্রমণ করিয়াছেন, এমন-কি জাপানের (সম্ভাব্য) জয়-লাভের কথা পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কাওয়াশিমার প্রবন্ধাবলী জাপান এ্যাড্‌ভার্‌টাইজার-এর দীর্ঘ দুই সংখ্যায় অনূদিত হইয়াছিল। প্রবন্ধাবলী আরম্ভ হইয়াছে এই ঘোষণা লইয়া যে, জাপানের লোকসংখ্যা শীঘ্রই ১০০,০০০,০০০ তে পরিণত হইবে। কাজেই উপনিবেশের প্রয়োজন "জাতির জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপার"। প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন, "লেখক বিশ্বের সর্ব্বত্র অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য আন্দোলন করিতে বিরত হইবেন না। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং সমস্ত ছোটবড় রাষ্ট্রের দুয়ার যাহাতে চিরউন্মুক্ত থাকে তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই আন্দোলন করিবেন, কারণ উহাই ভগবানের আইন।"

"কিন্তু এই নীতি অবলম্বনে একজন বাধা দিতেছে। সে হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ সে ঔপনিবেশিকগণকে বাধা দিতেছে এবং মনে মনে এই গোপন ইচ্ছা পোষণ করিতেছে যে, ক্রমে যে-সব জাপানী আমেরিকায় বসবাস করিতেছে তাহাদের, এমনকি যাহারা আমেরিকায় নাগরিক অধিকার লাভ করিয়াছে তাহাদেরও অধিকারে বঞ্চিত করিয়া তাড়াইয়া দিবে। আমরা জানি, জাপানীগণ যুক্তরাষ্ট্রে নিপীড়ন এবং দুর্ব্ব্যবহার পাইয়াছেন। জাপানী-দিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়াও তার তৃপ্তি হইল না। যুক্তরাষ্ট্র তার বাহিরেও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে যাহাতে জাপানীগণ প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য সচেষ্ট। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য জাতিসমূহও তাহার অনুসরণ করিতেছে। একটা আমেরিকা-জাপান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয়।

"যুক্তরাষ্ট্রের জাপান-বিরোধী নীতির জন্য জাপান সত্যই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। যুক্তরাষ্ট্রের এই বিদেশী-বিরোধ-নীতির জন্য জাপানে রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এই গ্লানিকর বাধা জাপানের পথ হইতে পদাঘাতে দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। সুতরাং আমেরিকার সহিত যুদ্ধ জাপানের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘৃণাজনক বাধা অপসারিত হইলে সাম্রাজ্যে একটা নূতন স্বাস্থ্যসম্পদ্ আনিয়া দিবে।

"যদি যুদ্ধজয় জাপানের পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এই জাপান-আমেরিকা যুদ্ধ জাপানের পক্ষে মারাত্মক হইবে। জাপান কি কৃতকার্য্য হইবে? জাপানের অধিকাংশ লোকেই এই ভাবনায় উদ্বিগ্ন; কিন্তু লেখক বলেন—"জাপান যুদ্ধ-জয়ে সক্ষম হইতে পারিবে।"

—

বেরি বেরি

কলিকাতায় সম্প্রতি বেরিবেরি বা এপিডেমিক ড্রপ্‌সি রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই রোগের লক্ষণ পা ফোলা, বুক ধড়পড় করা, হাঁফ ধরা, দৌর্ব্বল্য ও জ্বর হওয়া। কি কারণে এই রোগ হয় তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই, তবে ইহার সহিত বিষাক্ত চাল ও তৈলের সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসকের ধারণা। চাল সেঁতসেঁতে স্থানে মজুত করিয়া রাখার ফলে তাহার ভিতর একপ্রকার বিষের সঞ্চার হয় বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক মতপ্রকাশ করিয়াছেন। তৈলে ভেজাল দেওয়ার ফলে এই বিষের উৎপত্তি বলিয়াও কাহারও কাহারও ধারণা। কারণ যাহাই হউক রোগের প্রতিকার কল্পে নিম্ন লিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলা দরকার।

যাঁহাদিগের রোগ হয় নাই অথচ আসে পাশে অনেকের রোগ হইয়াছে তাঁহাদিগের পক্ষে ভাত ও তৈল যথা সম্ভব বর্জ্জন করিয়া, তাজা ফল মূল, ঘৃত, ডাল, দুগ্ধ, ডিম্ব, মৎস, মাংস, রুটি ইত্যাদি খাওয়া দরকার। চাল ও আটা যতটা সম্ভব আতপ ও পালিশ না করা এবং জাঁতায় ভাঙ্গা হওয়া দরকার। স্বাস্থ্য সাধারণ ভাবে যতটা ভাল রাখা যায় তাহার চেষ্টা করা দরকার, অর্থাৎ ব্যায়াম দ্বারা শরীরের ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয়। যাঁহাদিগের রোগ হইয়াছে তাঁহা-দিগের পক্ষে অবিলম্বে ভাত খাওয়া বন্ধ করা প্রয়োজন। কোনপ্রকার গুরু পরিশ্রমের কার্য্য না করিয়া বিশ্রাম করা এবং চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

—

টোকিওতে "প্যান-এশিয়াটিক" সভা

১লা আগষ্ট নাগাসাকিতে এই সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ইহার উদ্দেশ্য এশিয়ার সকল দেশের পরস্পরের স্বার্থ বিদেশীর বিরুদ্ধে বজায় রাখা। প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা চীন, জাপান, ফিলিপাইন ও ভারত হইতে আগত। সভার কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হয় নাই; কারণ জাপানের উপর চীনের আস্থা বিশেষ কম। ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার সমর্থনে একটি প্রস্তাব উঠে কিন্তু উহা রাজনৈতিক কারণে স্থগিত রাখা হয়।

এই সভার বিষয় এখনও প্রকৃষ্ট কিছু জানা যায় নাই। কাহারও কাহারও মতে ইহার ভিতর জাপানের কোন ফন্দি আছে। জাপান সাম্রাজ্যবাদী জাতি এবং কোরিয়াতে জাপানের শাসন ও কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ভাবে চলিতেছে বলিয়া পৃথিবীর সকল লোকের ধারণা নহে। এক্ষেত্রে জাপানের পক্ষে এরূপ একটি সভার ব্যবস্থা করা কিছু আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হয়।

—

ডাক্তার স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিভাষণ

১৭ই আগষ্ট তারিখে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে ইংরেজী ভাষায় যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা শীল মহাশয়ের যে জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় পাই তাহা শতমুখী। তিনি উচ্চশিক্ষার আদর্শ বিচার করিবার সূত্রে আমাদিগকে জাতীয় জীবনের গূঢ়তম সত্য ও মানবীয় উন্নতির অনন্ত অভিব্যক্তির স্বরূপ এমন করিয়া দেখাইয়াছেন যাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছি। আমরা তাঁহার কথাগুলি যথাসাধ্য পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি। বর্ত্তমানে আমাদিগের দেশের বিভিন্ন স্থলে বহু বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও সহযোগিতার সৃষ্টি না করিতে পারিলে আমাদিগের জাতীয় উৎকর্ষ ও মনের গতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে ও আমাদের জাতীয় সভ্যতার মধ্যে বিকৃতি ও অনৈক্যের আবির্ভাব হইবে। বর্ত্তমান জগতে শিক্ষার যে আদর্শ সর্ব্বত্র সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে সেই আদর্শে আমাদিগের সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভিতর সেই সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে হইবে যে সম্বন্ধে একটি বিরাট দেহের বিভিন্ন অবয়ব আবদ্ধ। সর্ব্বত্র শুধু ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষার কোন আদর্শ বিশেষ ফুটাইয়া তোলা আধুনিক শিক্ষার আদর্শ নহে। ব্যক্তির শরীর ও মনের পূর্ণ বিকাশ হইবে কিম্বা সে ব্রহ্মচারী অথবা কায়দাদোরস্ত "ভদ্রলোক" হইবে এই সঙ্কীর্ণ আদর্শের উপর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত তাহার স্থান আধুনিক জগতে নাই। আধুনিক উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানমাত্রেরই মনে রাখিতে হইবে যে তাহার ছাত্রের, ব্যক্তির, শুধু নিজের শারীরিক বা মানসিক উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-সাফল্য নির্ভর করে না। সেই ছাত্র বা ব্যক্তি যে সমাজ, সংঘ, জাতি এবং মানব-জগতের অন্তর্গত, ছাত্রকে সেই সংঘের উপযুক্ত অঙ্গ বা অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সংঘের আদর্শের সহিত ব্যক্তির আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যের উপরেই আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা নির্ভর করে। জাতীয় জীবন ও সভ্যতার সকল উপকরণ লইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য, প্রভৃতি সকল বিষয় লইয়া জাতির জীবন ও সভ্যতা গঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় এই সকলদিকে যেন জাতীয় প্রচেষ্টা যথাযথরূপে যায় তাহার ব্যবস্থা সুচিন্তিত পদ্ধতি অনুসারে করিবেন। জাতি যেন মানব জগতের প্রয়োজনীয় অঙ্গ-রূপে বাড়িয়া উঠিতে পারে এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া না যায় তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এইজন্য আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ রক্ষাও ঘনিষ্ঠতর করিয়া তোলার চেষ্টাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য।

প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন স্থান বিশেষের অধিবাসী এবং তাহার শিক্ষার উৎকৃষ্টতা বিশেষরূপে নির্ভর করিবে তাহাকে সেই স্থানের সকল অবস্থার সহিত মানাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তাহার শিক্ষা কতটা সাহায্য করিবে তাহার উপর। এই স্থানীয়তা বা স্থানীয় অবস্থা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা সুশিক্ষার আর একটি আদর্শ। যে দেশে (স্থানে), যে ভাবে ও যে কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিলে ব্যক্তি আপনার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতা ও সফলতা দান করিতে পারিবে সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে সেইরূপ কার্য্য ও জীবন যাত্রার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে ইহা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং শিক্ষার আদর্শের দুইটি দিক রহিয়াছে জাতীয়তা বা জাগতিকতা এবং স্থানীয়তা বা প্রাদেশিকতা।

শিক্ষার এই স্থানীয়তাগুণ নিবন্ধন আমাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি যে সকল বিষয় ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য জানা প্রয়োজন সে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রকার শিক্ষা বিভিন্ন স্থানে অবস্থা বুঝিয়া বিভিন্ন প্রকারের হইবে।

—

ভারতের শিক্ষার আদর্শ

ভারতে জগত-সভ্যতার যে দুইটি বিরাট স্রোত তাহা মিলিয়া এক হইয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর আশা স্থল। কারণ,ভারতেই শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়া সকল জাতীয় মানবের বিভিন্নতা ও চরিত্র মিলিয়া মিশিয়া এক নূতন সার্ব্বভৌমিক মানব-চরিত্রের সৃষ্টি হইতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। ভারতে যে শিক্ষার আদর্শ অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান ছিল তাহার সহিত আধুনিকতম যে আদর্শ, তাহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। মানুষকে সমাজের অঙ্গ রূপে দেখা ও সেই ভাবে তাহাকে শিক্ষার সাহায্যে গড়িয়া তোলাই ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ফলে শিক্ষার্থী বিদ্যার পথে বহুদূর অগ্রসর হইলেও কখন সমাজের অঙ্গ-রূপে জীবন নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে অযোগ্য হইয়া পড়িত না। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তাহার স্থান সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকিত ও সে সেই স্থান যোগ্যতার সহিত পূর্ণ করিত।

আমাদের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিয়া আমাদের দেশে জ্ঞান যতটা বাড়িয়াছিল তাহাতে আমাদিগের গৌরব ব্যতীত লজ্জা বোধ করিবার কিছু নাই। আমাদের প্রাচীন গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, অস্থি-বিজ্ঞান, ন্যায়, রসায়ন, ব্যাকরণ প্রভৃতি তৎকালীন ও তাহার বহুপরের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিদ্যার তুলনায় অল্প অগ্রসর হইয়াছিল একথা ত বলা চলেই না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা পাশ্চাত্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। বৃটিশ রাজত্বের ঠিক পূর্ব্বে অথবা তাহার প্রথম দিকে ভারতে শিক্ষার যতটা প্রসার ছিল তাহার তুলনায় বর্ত্তমানে আমাদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। শতবৎসরের অধিককাল অবনতির পথে চলিয়াও ১৮১৫ খৃঃ অব্দে আমাদের দেশে শিক্ষা যতটা ছিল, আজ তাহা কোথায়? পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে প্রতি গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল, এখন তাহা কোথায়?

আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যে আমাদিগকে নিজেদের অতীতের সহিত সম্বন্ধ অটুট রাখিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে জগতের সহিত উন্নতির পথে সমানে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এক সময় আমরাই ইংলণ্ডকে জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার আদর্শ দিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে সে জনসাধারণ শুধু "দ্বিজ" জনসাধারণ নহে। **ভবিষ্যত ভারতে সকল মানবই "দ্বিজ" হইবে।** একবার তাহার জন্ম হইবে শারীরিকভাবে ও একবার আধ্যাত্মিক ভাবে।

আধুনিক জগতের সর্ব্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বমূলক স্বার্থপরতা ঔষধও আমাদের প্রাচীন আদর্শের মধ্যে রহিয়াছে। যেমন একদিকে আমাদের দেশে মোক্ষ ও আত্মবিদ্যা লইয়া ব্যক্তি সতত ব্যস্ত ছিলেন তেমনি অপরদিকে তিনি সর্ব্বমুক্তি, লোকস্থিতি, লোক সংগ্রহ, মহাজন-প্রত্যয়, মহাজন-সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়েও সতত আত্ম-নিয়োগ করিতেন। এক সময় ভারতে ব্যক্তি, সংঘের কল্যাণের জন্য এতদূর আত্মবলিদানে চিরপ্রস্তুত থাকিতেন যে কালে এই অবস্থার বিরুদ্ধে একটা জাগরণের সূচনা হয়। এই সংঘ-বিরুদ্ধতা ও ব্যক্তিসর্ব্বভাবের গতি এখন বহুদূর পৌছিয়াছে। এখন আমাদের পুনর্ব্বার সংঘের কল্যাণ জাতির সকল ব্যক্তির নিকট আদর্শরূপে উপস্থিত করিতে হইবে।

—

আমাদের জাতীয়তা

আমাদের জাতীয়তা রাষ্ট্রীয় নহে; উহা সভ্যতামূলক। এই জাতীয়তার ছাপ আমরা আমাদিগের ইতিহাসে শত শত রাজদরবারে না লাগাইয়া থাকিলেও ইহার ছাপ ভারতে ও যেখানে ভারত-সভ্যতা গিয়াছে সেখানকার সকল জাতির ভাষায়, রীতিনীতিতে, আদর্শে, ব্যবহারে, ধর্ম্মে, দর্শনে, বিশ্বাসে, এক কথায় তাহাদের জীবনের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ভারতবর্ষ লাগাইয়া দিয়াছে। আমাদের সভ্যতার ভিতর যাহা কিছু আমাদিগকে জগতের বর্ত্তমান অশান্তি ও ভেদাভেদ দূর করিতে সক্ষম করিবে তাহা লইয়া আমাদিগকে আবার জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ ও ব্যক্তির পক্ষে অধিকার অপেক্ষা ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যের উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়া; এই সকল আদর্শ আমরা নিজেদের বলিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি, এই সকল আদর্শের প্রচার আমাদের এবং জগতের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে।

—

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিভাষণের মূল্য

আমরা উপরে শুধু সংক্ষেপে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিভাষণের কয়েকটি কথা নিজেদের ভাষায় পাঠকদিগের

নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহা শুধু একটা পরিচয় মাত্র। যাঁহারা শীল মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে সকল উপদেশ ও সত্য আহরণ করিয়া লাভবান হইতে চাহেন, তাঁহাদের উক্ত অভিভাষণ মূল ইংরেজীতে পাঠ করা প্রয়োজন। এই অভিভাষণ কোন কোন সংবাদ পত্রে আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং অক্টোবর মাসের "ওয়েলফেয়ারে" সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে।

প্রবাসী সম্পাদকের খবর

আমরা খবর পাইয়াছি যে প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভেনিস, প্যারীস, লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রীজ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া বর্ত্তমানে জেনেভা নগরে লীগ অফ নেশনস্‌এর অধিবেশনে যোগদানার্থে অবস্থান করিতেছেন। আমরা আশা করি যে আগামী মাসে তাঁহার লিখিত পত্রাদির কিছু কিছু আমাদের পাঠক-দিগের নিকট উপস্থিত করিতে পারিব।

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

ভ্রম সংশোধন

ভাদ্র সংখ্যা—পৃঃ ৮২৮, ২য় কলম, ৪র্থ লাইন অনু স্থলে অনুকূল হইবে। ঐ ১০ লাইন "কালকাচাই" স্থলে কালকাচার্য্য হইবে। পৃঃ ৮২৯ ১ম কলম, ১১ লাইন. "চিত্তরমন্" স্থলে চিত্তরমন্ হইবে। ঐ ২য় কলম ২৩লাইন "বাসোনী" স্থলে বাসোলী হইবে। পৃঃ ৮৩২ চিত্রের নীচেকার লাইন "জনা," স্থলে জানা হইবে।. পৃঃ ৮৩৩ চিত্রে নীচেকার লাইন "প্রতিলিপি" স্থলে চিত্রাবলী হইবে।

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ৯১নং আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত